৩৬ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

..y, 28th January, 1977 শুক্রবার—১৪ মাঘ, ১৩৮৩

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
	সম্পাদকীয়	
	সাহিত্য	বৈকুণ্ঠ পাঠক
	আলোক সরকারের কবিতা	
	কবি পরিচিতি	শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়
	সমালোচনা	
	চিঠিপত্র	
	আপনগন্ধা (উপন্যাস)	শ্রীদীপালী দত্তরায়
	কর্ণার্জুন ও কর্ণ	শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার
	সুনীতিবাবুকে জীবনানন্দ দিয়েছিলাম	সুকুমার সেন
	বাদল (গল্প)	শ্রীহরিক রায়

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য অমৃত কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণিঅর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা—৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৭	ঘাতক	(গল্প)	শ্রীঅজিত দে
৩২	এই কলকাতায়		
৩৬	কৃষি : চৌবাচ্চায় মাছ চাষ		শ্রীসন্তোষ রায়চৌধুরী
৩৭	বন্দু ফিল্ম	(রহস্য উপন্যাস)	শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৪১	মোহিনী আড্ডা	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৪৫	প্রথম প্রবাস	(উপন্যাস)	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
৪৮	পুনশ্চ		শ্রীক্ষপণক
৪৯	বিজ্ঞান : বিজ্ঞান কংগ্রেসের নতুন বাঙালী সভাপতি		শ্রীমানস রায়চৌধুরী
৫১	নাচ গান বাজনা		
	ছয় ঋতু ছয় বিপু ছয় তার		জহুরী সদাগর
	ফিরদৌস রহমান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৫৪	ক্রিকেট আপনজন হারাল		শ্রীঅজয় বসু
৫৫	খেলাধুলো		শ্রীদর্শক
৫৭	ভয় কলকাতার দর্শকদের		শ্রীরূপক সাহা
৫৮	তথ্যচিত্রের নেপথ্য নাটক		ওয়াকিবহাল
৫৯	বাংলা বায়োস্কোপে হ্যাণ্ড		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬০	চলচ্চিত্র উৎসবের আর একদিক		শ্রীনির্মল ধর
৬৩	চিত্র সমালোচনা		শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী
৬৪	বাংলা ছবির দর্শক কারা ?		শ্রীঅসিতবরণ মিত্র

মনের কথা ও বস্তুজগৎ

শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা যতটা ভাবিত হই, মনের গোলযোগ ঘটলে কিন্তু সেরকম নয়। এর একটা কারণ অবশ্য খুবই বোধগম্য। কারণ আমাদের গোটা অস্তিত্বই নির্ভর করে শরীরের উপর। কিন্তু এমন প্রমাণও খুব একটা অমিল নয় যে, শরীর সুস্থ-সমর্থ থাকা সত্ত্বেও মন অকেজো হয়ে পড়ার ফলে মানুষের গোটা অস্তিত্বই হয়ে উঠেছে নিরর্থক।

সত্যি বলতে কি, উন্মাদ রোগ দেখা দিলে দৈহিক বাঁচাটা কেবল যে নিষ্ফল হয়ে ওঠে তাই নয়, মনোবিকারে আক্রান্ত ব্যক্তি সমাজের পক্ষেও নিতান্ত একটি বাড়তি বোঝা হয়ে পড়ে।

মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাও সেজন্যে ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই, সামাজিক কারণেও অত্যন্তই আবশ্যিক।

কিন্তু এদিকে এখনো তেমনভাবে দৃষ্টি পড়েছে বলে মনে হয় না। মানসিক হাসপাতালের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অঙ্গুলি-মেয়। চিকিৎসকের সংখ্যাও শোচনীয়ভাবে কম। তাছাড়া অসুখটা যেহেতু মনের, সেজন্য অসুখ সেরে যাবার পরও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লাগে রোগীদের। কিন্তু আমাদের বর্তমান কালের জীবনযাত্রায় সেরকম কোনো সহানুভূতিশীল পরিবেশ পাওয়া খুবই শক্ত। সেজন্যে দরকার, রোগ-নিরাময়ের পরও বেশ কিছুকাল ধরে কোনো নিরাপদ আরোগ্যশালার আশ্রয়। তেমন ধরনের ব্যবস্থা এখনো তৈরি করতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

এইরকমই, এবং আরো অনেক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেদিন কলকাতায়—ভারতীয় সাইকিয়াট্রিক সোসাইটির বার্ষিক সভাতে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি অন্য অনেক প্রসঙ্গের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচির রূপায়ন মনোবিকার থেকে নিষ্কৃতি পাবার অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করায় একটি অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের দিকে নজর পড়বে সকলেরই। দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা, পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্য এবং সমাজ-পরিবেশের বিরূপতা—এইগুলিকেই তিনি মনোব্যাধির প্রধান কয়েকটি কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। রাজ্যপালও মোটামুটি এইদিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। বাস্তব পরিবেশ এবং মানুষের প্রত্যাশার মধ্যে বড় রকমের ব্যবধান এবং সেই সঙ্গে বেকারী ও দারিদ্র্যের ফলে বহু মানুষই মানসিক পঙ্গুতার শিকার হয়ে পড়েন। রাজ্যপাল দারিদ্র্যকেই মূল ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এইসব শহরকেন্দ্রিক সেবা-প্রয়াসকে গ্রামের দিকেও ছড়িয়ে দেবার জন। সেসব অঞ্চলে পুরনো ভাবধারার সঙ্গে নতুন চিন্তার সংঘাতও হয়তো মানসিক অসুখের আরো একটি বড় কারণ।

যাই হোক, নানাদিক থেকে আলোকপাত ঘটায় জীবনের এই এক চরম সমস্যাকে নেহাতই মন খারাপের ব্যাপার বলে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রবণতা হয়তো এখন কমে আসবে। সমস্ত আলোচনার মধ্যে যে কারণটির কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন, তা হল সামাজিক পরিবেশ। এবং দারিদ্র্য। বলা বাহুল্য গ্রামেই এর চাপ সব থেকে বেশি। সেজন্যে বিশ-দফা কর্মসূচির রূপায়ণ বাস্তবের দিক থেকে তো বটেই, মানসিক স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও হয়ে উঠেছে অত্যন্তই আবশ্যিক।

পাঠক
সম্মান
দক্ষিণা

প্রিয় লেখক,

আপনি কি চান?

পাঠক। অনেক পাঠক। আর?

সম্মান। অনেক সম্মান। আর?

দক্ষিণা। অন্ততঃ লিখে সংসার চালানোর মত দক্ষিণা। তার চেয়ে বেশি হলে তো ভালোই।

আমরা জানি, অনেক রকমের লেখক আছেন। তিনি—

পাঠক পান বা না পান—লিখবেনই।

সম্মান পান বা না পান—লিখবেনই।

দক্ষিণা পান বা না পান—লিখবেনই।

এবং ছাপা হোক বা না হোক লিখবেনই।

এঁর জন্যে ভাবনার কিছু নেই।

ভাবনা হোল আপনার মত প্রথম দফার লেখকের জন্যেই। আপনি পাঠক না পেলে একদিন ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন। তাই আপনাকে অনেক পাঠকের কাগজে বেশ কয়েকবার যাচাই হওয়ার সুযোগ দিতে হবে সম্পাদককে।

সে সুযোগ সব লেখকের ভাগ্যে জোটে না। না জুটলেও সব লেখক ভেঙে পড়েন না।

বহুল প্রচারের কাগজে ঝরঝরে লাইনো টাইপে অনেক বই ছাপা না হয়েও মফঃস্বলের ভাঙা টাইপে আত্মপ্রকাশ করেও কোন কোন বই আজ বিখ্যাত। যেমন—কবি। কিংবা পাণ্ডুলিপি থেকে সরাসরি ভাঙাচোরা টাইপে অযত্নে প্রকাশিত হয়েও জাগরীর পাঠকের অভাব হয়নি।

শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্করদের ভেতরে অন্ততঃ বিশজন লেখক মিলে শ'চারেক বই লিখেছিলেন। তার ভেতর অন্ততঃ বিশখানা বই কি অনেক পাঠক পায়নি? সেই লেখকরা কোথায়? সেই বই-গুলোই বা কোথায়? গাছ মাটি চাপা পড়লে একদা কয়লা হিসেবে তার হদিশ মেলে। প্রাণী চাপা পড়লে তার চর্বি একসময় পেট্রল হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু পাঠকধন্য সেইসব বইয়ের পাতা তো আজ ঠোঙা হিসেবেও ফিরে আসছে না। এক যদি লাইব্রেরি রেখে থাকে। তাহলে?

তারাশঙ্কররা যে কাগজে লিখলে ভাগ্যবান মনে করছেন নিজেদের সেই মাসিক প্রবাসী তার সুদিনে বিক্রি হোত মাত্র ছ'হাজার করে। আজকের তুলনায় এই সংখ্যা কেমন উল্লেখযোগ্য, কি?

তবে ওঁরা কিসের জোরে লেখক হলেন? বহুল প্রচার তো লেখকজীবনের অনেকটা জুড়েই ওঁরা পাননি। ঝরঝরে লাইনো টাইপ তো অনেক সময়েই জোটেনি ওঁদের।

যাঁদের জুটলো? যাঁরা পেলেন? পরিষ্কার চোদ্দ পয়েন্ট রোমানে যেন এম-এ কমপোজ হয়ে যাঁদের শৈশব, যৌবনের কথা বহুল প্রচারের কাগজে সচিত্র বেরোলো—তাঁদের অনেকে আজও লেখক হতে পারেননি। কেন?

কারণ একটাই। তাঁরা পাঠকের মনের শ্রদ্ধার আসনে বসতে পারেননি। পাঠক তার মনে অনেক লেখাকেই সাময়িকভাবে জায়গা দেয়। কিন্তু সম্মানের আসনটি দেয় শুধু লেখককে। অর্থাৎ, যাঁরা বই লেখেন—তাঁরা সবাই লেখক নন—কেউ কেউ লেখক।

নীলবসনা সুন্দরী—অনেক পাঠক পেয়েছিল। দক্ষিণা পেয়েছিল। কিন্তু সম্মান পায়নি।

পাঠকধন্য দক্ষিণামুখে অনেক লেখকের জীবনে সম্মান আসেনি। কারণ, পাঠক তাঁকে দক্ষিণা ও প্রচার দিলেও শ্রদ্ধার জায়গাটি দিতে রাজি হয়নি। ফলে সেই লেখক সর্বদাই সুধীসমাজে অপাংক্তেয়।

পাঠক ও দক্ষিণার যোগাযোগ অনেক সময়েই হয়। কিন্তু অনেক পাঠক এবং অনেক সম্মানের যোগাযোগ ঘটে কদাচ। যেখানে ঘটে—সেখানে দক্ষিণার জন্যে কোন চিন্তা নেই।

প্রিয় লেখক,

সমস্ত-সম্পাদকের সহানুভূতি সর্বদাই আপনার দিকে। তিনি আপনাকে দিতে চান—

পাঠক। অনেক পাঠক।

সম্মান। অনেক সম্মান।

দক্ষিণা। সাধ্যমত।

আপনি তাঁকে কি দেবেন?

লেখা। আপনার সেরা লেখা।

সেরা লেখাই দেয় পাঠক। অনেক পাঠক। সম্মান। অনেক সম্মান।

ভাঙা টাইপ, ময়লা কাগজ জাগরী, কবির পক্ষে ছিল আশীর্বাদ।

ঝরঝরে লাইনো টাইপ, বহুল প্রচার কি অক্ষমকে সমর্থ করতে পেরেছে? পারেনি।

আপনি লিখলে দক্ষিণা আপনার দাশ।

ইতি—

বিনীত—

বৈকুণ্ঠ পাঠক

আলোক সরকারের কবিতা

ঈশ্বর

সেই শিশু যে তার মাকে
হত্যা করেছিল
সে আজ অন্ধ লোকটির হাত ধ'রে
বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছে।

তার খেলার সময় শেষ হলো, সন্ধ্যা নামছে চারদিকে।
অন্ধ মানুষটির বাড়ি ঠিক আর কতদূরে?
গাড়ি পিছলে চলেছে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে দ্রুত লোকজন—
সে কিছুই ভাবছে না, দেখছে চোখে পড়ছে যা কিছু।

পথের পাশের বেড়ালছানা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাঝরাস্তায়
তার পায়ের জোর খুব কম নয়।
সেই শিশু যে তার মাকে
হত্যা করেছিল থমকে দাঁড়াল হাস্নুহানার মুখোমুখি।

অন্ধ মানুষটির বাড়ি ঠিক আর কতদূরে?
সে কিছুই ভাবছে না কাঁপতে কাঁপতে চলেছে তার ছায়া—
সাদা পোশাক-পরা ঈশ্বর। অন্ধ মানুষটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে
ফেরার পথে চতুর তুলে নিল বুড়ো বাদামওলার এক মুঠো বাদাম।

একটি নির্মান

বিনিময় সমান মূল্যের ছিল। একজন চলে যাচ্ছে পূর্বদিকে, অন্যজন
উত্তরদিকের অভিলাষী। ব্যবধান
বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশই—বিনিময় সমান মূল্যের ছিল। ব্যবধান
বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশই ওই চলে যাচ্ছে পূর্বদিকে
অন্যজন উত্তরদিকের অভিলাষী। কতো দ্রুত যাচ্ছে ওই দেখো
পূবের মানুষ—তার ঘর-গৃহস্থালি আছে,
শ্রম আছে, কল্পনাও আছে।
উত্তরদিকের জন অধিকারপ্রিয়, প্রতিদ্বন্দ্বী ভালোবাসে, সংগ্রামের
ফলশ্রুতি ভালোবাসে। ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশই।
দুপুরের সুস্পষ্ট রৌদ্রের
ভিতরে নির্বাক বিনিময় যেমন হবার কথা
সমান মূল্যের বিনিময় আর এক মুহূর্তের এক মুহূর্তেই
একজন দেখলো উদ্ধত নাক, অন্যজন দেখলো ভুরুর নিচে
কালো তিল, একটু এলানো, আর তারপর
পূর্বদিকে ছড়ানো রয়েছে ধানখেত, উত্তরে হিজলবন, মাঝে মাঝে
বাঁশঝাড়—ওই চলে যাচ্ছে পূর্বদিকে কতো দ্রুত যাচ্ছে ওই দেখো
হিজলবনের পথে বস্তুর ভীষণ ভার বস্তু ও উদ্ধত
নাক মিলে মিশে একাকার; বস্তু ও এলানো
কালো তিল মিশ্রিত, নিষ্পন্ন ভাবে
ঘর-গৃহস্থালি, শ্রম, কল্পনা-অরব দ্যুতি ধানখেত হেলায় দুলোয়।

ডাক

মাঠের ওই প্রান্ত থেকে নাম ধ'রে ডাক দিল
অন্ধকার ঘন হয়েছে তখন।
কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসছে ডাক কুয়াশার মতো রঙ।

বর্ষায় পিচ্ছিল হয়েছে আলপথ জোনাকি জ্বলছে বাবলার ঝোপে।
উঁচুগলায় সাড়া দিয়ে দ্রুত
পার হতে চাইলো খানাখন্দ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসছে ডাক, ডাক থামছে
ডাক ভেসে আসছে আবার
কুয়াশার মতো রঙ রোগা নদীর মতো মলিন।

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই উঁচুগলায় সাড়া দিল আবার।
জল জমেছে আলপথের দুধারে
অমা দপদপ করছে জলে অন্ধকার কেঁপে উঠছে বিস্তীর্ণ।

দুটো কান আর একটা দ্রুত—ঘনঘন উঠছে নামছে পা
ইঁদুর সরে যাচ্ছে এদিক ওদিক
মেছো সাপ লাফিয়ে নামছে জলে
কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আসছে ডাক।

অন্ধকার চিরে চিরে উঠছে নামছে পা পার হচ্ছে পিচ্ছিল খানাখন্দ
দুটো কান আর একটা দ্রুত।
কোলাব্যাঙ লাফিয়ে উঠলো ডাঙায় মাঠের ওই প্রান্ত থেকে
ভেসে আসছে ডাক।

জন্ম : ১৯৩২

পেশা : অধ্যাপনা

আলোক সরকার

প্রথম থেকেই নিজস্ব ভঙ্গিতে কবিতা লিখেছেন আলোক সরকার। প্রথম থেকেই অনেকেরই প্রিয় আবার বিতর্কিতও বটে। তিনি যে একজন কেউ কেউ কবির দ পড়েন তা মেনে নিতে পাঠকের সময় নিয়েছে কেননা মঞ্চের আড়ালে নেপথ্য নায়কের ভূমিকা নিতে তিনি ভালোবাসেন এটা ও'র স্বভাব অনেকটা জীবনানন্দীয়; কবিতা লেখা ও তার প্রকাশের জন্য যেটুকু না করলে নয় তার বেশী উৎসাহ ক তৎপরতায় তাঁর একান্ত অনীহা। স্বভাব কোমল অথচ দৃঢ় চরিত্রের এই কবির কবিতার অন্তর্জগৎ নির্জন নিঃশব্দে। সেখানে প্রকৃতি আছে ঈশ্বর আছেন আর অভিমানী অনুভূতিপ্রবণ একটি সরল শিশুর নিজের বাড়ি খুঁজে পাবার আর্তি আছে। আলোক একটি সংহত সুন্দর আর সৌম্য স্থিতির রূপক হিসেবে তাঁর বাড়ির স্বপ্ন গড়ে তোলেন। পরিপার্শ্বের সংঘাত ও ভয়ংকর দিনযাপনের সকল আঘাত থেকে তাকে রক্ষা করতে করতে কবির বিষাদ ও আনন্দ আশ্চর্য নরম ব্যঞ্জনাবাহী শ বেজে ওঠে। কেউ যদি আজকের এ সময়ের অশান্ত রক্তাপ্লুত যুবক বা নাগরিকের সন্ধান করেন আলোক সরকারের কবিতায় তবে তা সরল সত্যের উপস্থাপনায় এখানে পাবেন না; অনেক অনুসন্ধানে তার নির্যাসটুকু পাবেন হয়তো।

মাত্র চারটি কবিতার বই শুধুই নিঃশব্দে বেরিয়েছে শ্রেষ্ঠ কবিতার বইও বেরিয়েছে। কিন্তু প্রকাশকদের উৎসাহ নেই এই কবিকে ঘিরে। অথচ তিনি লেখেন নিয়মিত; কবিতা কখনো প্রবন্ধ সমালোচনা।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বেহুলার ভেলা মতি নন্দীকে মতি নন্দী করেছে

ঠিক এই মুহূর্তেই মনে পড়ে যাচ্ছে বিবর্ণ হয়ে আসা একটা 'পরিচয়' পত্রিকার হঠাৎই একটা গল্প পড়ে একদিন চমকে উঠেছিলাম। গল্পের নাম 'তাপের শীর্ষে।' গল্পকার মতি নন্দী। ঘটনা কিছুই নয়— অতিসাধারণ, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের এক আপনজন মারা গেছে। যেতেই পারে। কেননা জীবনের অস্তিত্ব যেহেতু মৃত্যুর সাংকেতিকতায় তখন মৃত্যুটাও স্বাভাবিক। কিন্তু এর পরেও যা পড়ে থাকে তা হল দেহ আর সেই দেহটাকে নিয়েই আবার আনুষ্ঠানিক কতগুলো কাজ থেকে যায়—সেটা শ্মশানে। সুতরাং হাসপাতাল থেকে একটা ডেডবডি নিয়ে শ্মশানযাত্রা এবং শ্মশানে পৌঁছেই তারপর চিতা রচনায় যে সমাপ্তি—এই স্বল্প সময়ের অবকাশেই মতি গড়ে তুলেছেন তার গল্পের শরীর। যেন জীবনের কাঁধে মৃত্যুকে চড়িয়ে এক চরম ঠাট্টার কেন্দ্রবিন্দুতে এনে গল্পকে দাঁড় করিয়েছেন তিনি এবং কী নিস্পৃহ আরম্ভের মধ্য দিয়ে তিনি সময়ের ভয়াবহ এক নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরেছেন।

আসলে মতি নন্দীর গল্পের জগৎ এই শহরেরই নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের জগৎ। যে জগৎটা অন্তত কয়েক দশকের মূল্যবোধের পরিবর্তনে, ক্ষয়ে-যাওয়া ভাঙাচোরা যন্ত্রণার অস্থিরতায়, যন্ত্রজিঘাংসা আর যৌনতার শিকারে, পাপ-বোধ ও অবক্ষয়ের টানাপোড়েনে হয়ে পড়ে টালমাটাল, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাতসেঁতে জগৎটাকে মতি লক্ষ্য করেছিলেন বিভিন্ন অ্যাংগেল থেকে—কখনো পুরোনো বাড়ির ছাদের রেলিং-এর উপরে ঝুঁকে পড়ে, কখনো চোরাগলির অন্ধকারে, কখনো-বা পিচ্ছিল কলতলার পরিবেশে আবার কখনো রঙচটা পুরোনো বাড়িতে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়ে স্বামী-স্ত্রীর বিছানায়। ফুল-ফল-পাতাহীন-বৃক্ষহীন ইঁট, কাঠ, লোহা আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই খোঁয়াটে শহরটার নগরচরিত্র ও মান-সিকতা তাই মতির গল্পে উপস্থিত আর সেকারণেই তার গল্পের ভাষা এমন কাঠখোট্টা, এমন তিক্ততা ও নিস্পৃহভঙ্গি।

গল্পগ্রন্থের বিখ্যাত গল্পগুলি হল : 'বেহুলার ভেলা', 'টুপু কখন আসবে', 'উৎসবের ছায়ায়', 'এবং তারা ফিরে এল', 'সূর্যাস্তের প্রতিবিম্ব' এবং 'সুখী জীবন লাভের উপায়।'

'বেহুলার ভেলা' নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারেরই এক ভয়ংকর ভাঙনের ইঙ্গিত। ভাঙনের ইঙ্গিত। ভাঙনের চোরাবালিতে এখানে সন্দেহ এসে ঢুকে যায়। এই সন্দেহ স্বামী-স্ত্রীর ভেতরের

আধুনিক কবি পুরানের সঙ্গে যোগ

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। পুস্তক প্রকাশনী। ৮২।১ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম আট টাকা।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা জুড়ে অবস্থান করছে এক সম্ভ্রান্ত বিষাদের কারুকাজ। প্রতিটি উচ্চারণে উন্মোচিত হয় বোধ বোধের নির্দিষ্ট সোপান ধরে তিনি পাঠককে পৌঁছে দেন ভিন্নতর এক জগতে নিজস্ব বিচরণ ক্ষেত্রে। শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রারম্ভিক পঙ্‌ক্তিতে যথেষ্ট স্বনির্ভরতা দেখা যায় না যদিও তবু কবিতা রচনার শুরুতেই পবিত্র মুখোপাধ্যায় তাঁর শিক্ষিত স্বভাবের পরিচয় রাখতে সক্ষম ছিলেন নির্ভুল ছন্দোবদ্ধ পঙ্‌ক্তি নির্মাণের প্রকল্পে। 'শবযাত্রা' সর্গবিভক্ত এলিজিকাব্যের তিনটি সর্গ এখানে সংকলিত। সাম্প্রতিক কবিতায় দীর্ঘ কবিতা রচনার সূত্রপাত করার দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন পবিত্র তাঁর শিক্ষানবিশ শেষ করেই। কী নিপুণ নির্মাণশৈলী ছন্দ-বৈচিত্র্য ক্লাসিক অলংকৃত কবিতাশরীর; 'শবযাত্রা'য় তিনি সৃষ্টি করেছেন বিষাদময় রূপকথা যা বাংলা কবিতার গৌরব। পরবর্তীকালে 'ইবলিসের আত্মদর্শন' 'অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত' এবং 'বিধ্বস্ত স্বেদরক্ত' দীর্ঘ কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ের ফসল। সনেট রচনায় পবিত্র-র সিদ্ধি শুধুমাত্র আঠারো মাত্রায় বা অন্ত্যমিলের শাস্ত্রীয় নিয়মে আবদ্ধ থাকে নি পরবর্তীকালে পবিত্র আত্মজৈবনিক সনেটকল্প'-এ পঙ্‌ক্তি গণনা এবং চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রেখে (৮+৬) পঙ্‌ক্তির মাত্রা বৃদ্ধি হ্রাসের যে সুযোগ গ্রহণ করেছেন তার ফলে সনেট চর্চার নতুন দিক উন্মোচনের ঝুঁকিকে ছান্দোসিকেরা কি বলবেন জানি না এগুলিকে কবিতা পাঠক হিসাবে গ্রহণের বিকল্প দেখি না।

'আগুনের বাসিন্দা' পর্বের প্রতিটি কবিতাই পাঠকের রক্তকে আন্দোলিত করে। 'অভিমনু' কবিতায় মহাভারতের অভিমনুর গায়ে যেন ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যাবতীয় ফ্যাসিবাদের নৃশংসতা এবং কবিতার মোহাময় বিস্ময়। ঠিক তেমনি 'কর্ণ'তেও।

'প্রকীর্ণ কবিতাবলী'-র 'সাপ' কবিতার অন্বেষণা সম্ভবত পরবর্তীকালের 'পশু-পক্ষী বিষয়ক' রচনার সূত্র। কুকুর গাধা বিড়াল উট কেঁচো কচ্ছপ উইপোকা পিঁপড়ে প্রভৃতি বিষয় হয়ে পড়েছে কবিতার। এই সাম্প্রতিক বন্ধ্যা সময়ে পবিত্র বেছে নিয়েছেন অদ্ভুত নিরীহ এইসব পশু চরিত্র। শ্লেষ ব্যঙ্গ বা কিছুটা তির্যক উচ্চারণে প্রচন্ড অহংকারী করে তুলেছেন এদের। নাকি এরা কেউই পশু নয় বর্তমান সময়ের জীবিত মানব সমাজের পশুত্বপ্রাপ্ত মনুষ্যকুল।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ভয়ংকরভাবে ঋণী করে রেখেছেন নিজেকে। তাঁর ঋণ প্রধানত

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

পুরাকল্পের সমীপে দেশীয় এবং বিদেশীয় বিভিন্ন পুরাণ এবং পৌরাণিক চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন সাম্প্রতিকতায়। দ্বিতীয় ঋণ সময়ের কাছে এই সময় অর্থাৎ সমকালকে বন্দী করেছেন ইতিহাস চেতনার সঙ্গে আপন মর্যাদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবিতায় মগ্নতার মহিমায়।

প্রভাত চৌধুরী

অন্যত্র

শুধুমাত্র ক্যামেরা আর সেলুলয়েড দিয়ে তোলা ফিল্ম চলচ্চিত্র নয়।

পূর্ণেন্দু পত্রী। অন্বায়ন

তোমার হাতের অক্ষর ফুলের পাপড়ির মতো
সস্নেহে পড়ে আছে তোমারই শিয়রে
তুমি জাগবে কখন?

কৃষ্ণ ধর। কলাপ

রাজার মুন্ডু কেটে নিয়ে একজন ঘোষণা করে—ভাল আছি [illegible] নির্বাসনে।

কল্যাণ সেন। এই দশক

চিটিময় ফোঁটা ফোঁটা জলের দাগ ফুল হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে।

সমর মুখোপাধ্যায়। সত্তা

উত্তাল সমুদ্র আমার উঠানে।

অনীশ ঘোষ। কানি

শরৎ সাহিত্যের মূল কথা 'মানুষ'।

মণি মন্ডল। বোম্বাই বিচিত্রা

সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা শেষ বিকেলের লাল আলোয় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

আশিস ঘোষ। মহাদিগন্ত

নারী প্রগতির মূল কথাই হোল অর্থনৈতিক সুবিধা।

সুতপা চক্রবর্তী। নারী জগৎ

যারা জনমানসকে নিরন্তর প্রতিফলিত করছে।

ছায়ানাম

সুন্দরী তুমি এখন যেতে পার। আমার পালে পাগলা হাওয়া। আমার নৌকা সকলের জন্য নয়।

জীবন সরকার। জনার্দন

নির্জন মাঠে নির্জন অতীত যেমনটোপে আর্ট আটকেছে দুজনকে।

অমিত মুখোপাধ্যায়। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ স্মারক গ্রন্থ।

মাইকেল মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যে নজরুল আর এক বিদ্রোহদৃপ্ত পুরুষ

ভবানী মুখোপাধ্যায়। আজ

'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' বোধ করি আর কারও পক্ষেই গাওয়া সম্ভব নয়।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। শিল্প সাহিত্য

বইমেলা

গত বছরের মত এবারও ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের সংলগ্ন ময়দানে 'কলিকাতা পুস্তক মেলা' অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শতাধিক প্রকাশন সংস্থা এবং পুস্তক বিক্রেতা এবারের মেলায় যোগদান করছেন। স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিদেশী প্রকাশন সংস্থার মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া গ্রেট ব্রিটেন পশ্চিম জার্মানি ফ্রান্স আমেরিকার প্রকাশন সংস্থার নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] বিভাগ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সাহিত্য আকাডেমী অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন [illegible] সরকারের প্রকাশন বিভাগ এই সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন ফলে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত এবারের মেলায় প্রদর্শিত হবে।

মেলা চলাকালে একাধিক [illegible] ব্যবস্থা হয়েছে। উদ্যোক্তা 'দি ফেডারেশন অব পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া' ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

প্রখ্যাত লেখকদের সঙ্গে পাঠকরা সরাসরি কথাবার্তা বলবেন মেলা প্রাঙ্গণে এক সন্ধ্যায় এই চিত্তাকর্ষক ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মেলায় গতবারের মত এবারেও ক্রেতাদের শতকরা দশ কমিশন দেওয়া হবে 'বই বাজার' বসবে—যেখানে বেশ কম দামে বই কেনা যাবে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশ মূল্য ছাড়াই মেলায় আসতে দেওয়া হবে।

'কলিকাতা পুস্তক মেলা'র মুখ্য উদ্দেশ্য নাগরিকদের মধ্যে পাঠ [illegible] সৃষ্টি করা—[illegible] প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচীর অঙ্গ।
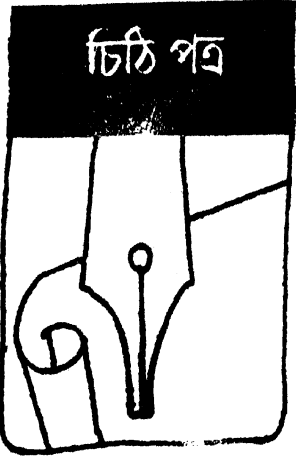
বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন

১৪ জানুয়ারীর অমৃতে বৈকুণ্ঠ পাঠকের উপরোক্ত শিরোনামের লেখাটির জন্যে অজস্র ধন্যবাদ জানাই। একমাত্র অমৃত সাপ্তাহিকেই সৎ ও বাস্তবধর্মী লেখা প্রকাশ হয়ে থাকে। অবশ্য এটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

বৈকুণ্ঠ পাঠকের লেখাটি সম্বন্ধে আমার মন্তব্য যদি অমৃতে প্রকাশিত হয়, কৃতজ্ঞ থাকব। এই লেখাটিতে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অবস্থা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মানুষের মধ্যে যে ডিগ্নিটি হাজারো প্রতিকূল অবস্থাতেও নষ্ট হয়ে যায় নি, তাকে দেখতে পাওয়া আর তেমনি করে প্রকাশ করা যারতার কম নয়। লেখক হলেই তা পারা যাবে না। তার জন্যে চাই শিল্পীর দৃষ্টি শিল্পীর দক্ষতা নিপুণতা। আজকাল কটা লেখকের তা আছে? তাই তাদের উপন্যাস--গল্পের নাম তো বটেই, একটা চরিত্র অথবা নায়ক-নায়িকার নাম পর্যন্ত কারো মনে থাকে না। কেবল চমক, আর ফাঁকিবাজি—এই পুঁজি নিয়ে ... হওয়া যায়, কিন্তু শিল্পী বা সাহিত্যিক হওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক বইটির প্রায় সব চরিত্র বাঙালী পাঠকের মনে অম্লান হয়ে আছে। কেন? লেখার গুণে। নইলে যে বাস্তবতা নিয়ে আমাদের এত মাতামাতি, আজকের দিনে বঙ্কিম অথবা সেকসপীয়ারের লেখায় এই দিনের বাস্তবতা কোথায়? তবু তাঁদের আঁকা চরিত্রগুলি কেন আমরা ভুলতে পারছি না? কেন চন্দ্রমুখী দেবদাস বিরাজ রমা রমেশ সকলের মনে বেঁচে রইল? হাজারো বার যুগ পালটাক, শিল্পকর্ম চিরদিনই বেঁচে থাকে।

এর আগের সংখ্যায় বৈকুণ্ঠ পাঠকের লেখাটি ভুলতে পারা যাবে না। কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, পথের পাঁচালী পুতুল নাচের ইতিকথা- ইত্যাদি কেন মনে জীবন্ত হয়ে থাকে? এই সংখ্যা অমৃত-তেই পড়লাম পরিষ্কার একটি লেখা--'চাঁদ আসে'। লেখক বোধহয় বিভূতিভূষণের পুত্র। ঐ লেখাই মানুষের মনে থাকে, থাকবে। **—তরুণকুমার চক্রবর্তী, হাজারীবাগ।**

।। ২ ।।

সবিনয় নিবেদন—আপনার কাছ থেকে বর্তমান আধুনিক কবিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পেলে ধন্য হব। আমাদের 'ডাক দিয়ে যাই' পত্রিকার জন্য আপনার কাছে এ অনুরোধ। নমস্কার নেবেন।—**বিশ্বজিৎ ঘোষ, ডাক দিয়ে যাই** বাকসাড়া হাওড়া।

।।৩।।

অমৃতের ১৪ জানুয়ারী সংখ্যা দেখে অভিভূত হলাম। **কারণ**--(১) 'সাহিত্য' **শীর্ষক ফিচার 'বঙ্কিমচন্দ্রের** সংগে কথোপকথন'-এ বর্তমান বাংলা উপন্যাসের রূপটি এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন বৈকুণ্ঠ পাঠক। (২) 'নতুন বই' বিভাগে লেখক-লেখিকাদের ফটোসহ পুস্তক-সমালোচনা এবং কবিতার বিভাগে কবির ফটো এবং কবি পরিচিতি দিয়ে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করা সত্যিই অভূতপূর্ব। আশা করি বাংলা কবিতা এবং তার সংগে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার কবিতার অনুবাদ ঠিক এই পদ্ধতিতেই অমৃতের পাতায় প্রকাশিত হবে।—**সুব্রত সাহা**, কলিকাতা—৪৭

মাঠ থেকে বলছি

১৪ **জানুয়ারীর** অমৃতে শ্রীঅজয় বসুর 'মাঠ থেকে বলছি' লেখাটির মধ্যে কিছু ভুল রয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন, ১৯৭৪ সালে ইডেনে আয়োজিত মোহনবাগান বনাম ইস্টবেংগলের খেলায় শ্যাম থাপার দেওয়া গোলে ইস্টবেংগল জিতেছিল। তথ্যটি ঠিক নয়। ইডেনে ঐ খেলাটি হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। ১৯৭৪ সালে শ্যাম থাপা কলকাতায় ছিলেন না। ঐ বছর তিনি বোম্বাইয়ের মফৎলাল মিলসের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। --তরুণ চক্রবর্তী, সুতনু চক্রবর্তী।

লিটল ম্যাগাজিন

গত ১০ ডিসেম্বর অমৃতে 'একটি পত্রিকা' সম্বন্ধে পড়লাম। শুরু করেছিলেন ভালোই, কিন্তু কলাইন পরেই তিনি গল্পের চেয়ে কবিতার সংখ্যাধিক্য কেন, যে প্রসংগে লিখেছেন, 'তাতে বোধ হয় জায়গা কম লাগে এবং অনেকের লেখা দেওয়া যায়।' লাইনটি পড়ে হতাশ হয়েছি। বরং ২৪ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'চিঠিপত্র' বিভাগে 'লিটল ম্যাগাজিন প্রসংগে' লেখক যে-কথা বলেছেন, তা খুবই যুক্তিনিষ্ঠ এবং বাস্তব সত্য। আমি এর আগে দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছি এবং এখনও একটি ত্রৈমাসিকের সম্পাদনা করছি। একাধিকবার আবেদন জানিয়েও আমরা যে দুটো গল্প পেয়েছি, তা আদৌ ছোট গল্প নয়। এক্ষেত্রে অরুচিকর গল্পের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়ে লিটল ম্যাগাজিনের অমূল্য ২।৩টি পৃষ্ঠার অপচয় করার কোন হেতু থাকতে পারে না। বাধ্য হয়ে তখন কবিতা দিতে হয়। দেখা গেছে, অতি তরুণ কবির কবিতাতেও কেমন উন্নত প্রকাশ-ভংগী। তাই সমালোচকের মন্তব্য মানা গেল না। গল্পের জন্যে লিটল ম্যাগাজিনের দরজা সর্বদাই খোলা। তবে এ কথা একেবারেই ঠিক নয় যে, অনেকের সুযোগ ঘটানোর জন্যে গল্পকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। তবে গত ৭ জানুয়ারী সংখ্যায় পত্র-লেখক লিখেছেন, লিটল ম্যাগাজিনের গল্প-গুলো প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশে অনায়াসে দাঁড় করানো যায়। এ কথার সংগে আমি আংশিক একমত।—**শ্যামল চট্টোপাধ্যায়**, ভদ্রকালী।

বাংলা গল্প, অবাংলা ছবি

৭ জানুয়ারী সংখ্যার সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকায় নিরীক্ষকের লেখা 'বাংলা গল্প, অ-বাংলা ছবি' প্রবন্ধের এক জায়গায় দেখলাম, তিনি লিখেছেন বাসু চ্যাটার্জীর সাম্প্রতিক ছবিগুলির (রজনীগন্ধা-ছোটিসি-বাত-চিতচোর) গল্পের কোনটিই বাংলা নয়,

যতদূর জানি, চিতচোরের গল্পটি সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের লেখা একটি কাহিনী থেকে নেওয়া। মূল নাম ছিল চিত্তচকোর—তবুও নিরীক্ষক ও কথাগুলি কেন লিখলেন বোঝা গেল না।—**বাসুদেব** মালাকর, ২৪ পরগণা।

একালের গান : দিলীপ রায়

১৭ ডিসেম্বরের 'অমৃত' পত্রিকায় সাধক-গায়ক দিলীপকুমার রায় সম্বন্ধে সন্ধ্যা সেনের সুলিখিত রচনাটি পড়লাম। কিন্তু লেখাটির মধ্যে কিছু ভুল আছে। দিলীপকুমারের গুরুকরণ প্রসঙ্গে লেখিকা এক জায়গায় লিখেছেন---'যোগিবর বরদা-চরণ মিত্র বললেন' ইত্যাদি। বরদাচরণ মিত্র নয়,---বরদাচরণ মজুমদার।

দিলীপকুমারের একখানি রেকর্ডে শ্রীমতী সেন 'শ্রীঅরবিন্দ স্তোত্র' ও 'মাতৃ-স্তোত্র'---গান দুটি শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দুটি গানই সংস্কৃত ছন্দে লেখা। তাই গান দুটির রচনা সম্বন্ধে লেখিকা বলেছেন---'দিলীপ রায়ের শৈশব কেটেছে সংস্কৃত সাহিত্যের রসসমুদ্রে অবগাহন করে। তাই তাঁর ভাষায়ও রস ও লালিত্যের এমন মিলন-সমারোহ।' কিন্তু এ ভাষা দিলীপ রায়ের নয়। শ্রীঅরবিন্দ স্তোত্রের রচয়িতা নলিনীকান্ত সরকার আর মাতৃস্তোত্র কবি নিশিকান্ত রায়-চৌধুরীর রচনা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে গ্রামোফোন কোম্পানি দিলীপকুমার রায়ের একটি এল্ পি রেকর্ড বার করেছেন। এই রেকর্ডেও শ্রীঅরবিন্দ স্তোত্র ও মাতৃস্তোত্র গান দুটি আছে এবং রচয়িতার নামও আছে তাতে। কিন্তু এখানে আবার আর-এক রকমের গণ্ডগোল। রেকর্ডের উপরকার পরিচয়-পত্রে ছাপা আছে—দুটি গানেরই রচয়িতা হচ্ছেন নিশিকান্ত সরকার। নিশিকান্তের নামের সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকারের পদবী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অদ্ভুত। **রবীন্দ্রনাথ মিত্র**
শ্রীঅরবিন্দ ভবন, কলিকাতা।

আপনগন্ধা

দীপালী দত্তরায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দুহাতে মুখ ঢেকে তখন মঞ্জু একটা ... বসে পড়েছে। অপমান, দুঃখ, তার ... ওর সামনে কেঁদে ভাসানোর লজ্জায় ...ক্ষণ মুখ তুলতে পারল না। নিঃশব্দে ... ওর শরীর ফুলে ফুলে উঠতে ...। নির্বাক জয়ন্ত চেয়ে চেয়ে দেখলো ... পকেট থেকে রুমাল বার করে ...খে দেখলো যথেষ্ট পরিষ্কার কিনা। ... থেকেই গেল, তাই আবার ওটা ...নে ঢুকিয়ে রাখলো। এদিক ওদিক ... কিছু খুঁজে পেলো না। তারপর ...র ওআর্ডবোব খুলে একটা ফর্সা ... এনে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো ... আর কেঁদো না। চোখ মুখ মুছে ... কেউ এসে পড়তে পারে এখনই।' ...খনও ফোঁপাচ্ছে। অসহায় জয়ন্ত কি ...ভেবে না পেয়ে, আলগোছে রুমালটা ... ওর মাথায় একটু ধাক্কা দিল। আরো ...হয়ে মঞ্জু মুখ তুললো। চোখের ... রুমালটা নড়ছে দেখে, এক ঝটকায় ...নে নিল। নিয়ে ঘষে ঘষে চোখমুখ আরো লাল করে তুললো। জয়ন্ত মৃদু স্বরে বললো, 'সরি, ভেরী সরি। আই ডিডনট মীন এনিথিং।' 'মিথ্যুক।' 'সত্যি বলছি।' 'পড়া ছাড়বে না?' 'আচ্ছা ছাড়বোনা!' 'ভালো রেজাল্ট করবে?' 'চেষ্টা করবো। কিন্তু তারপরে কি হবে?' 'কাজ করবে।' 'তারপর? তুমি তো তখনও অনেক ছোট থাকবে।' 'না আমি আর ছোট নেই। বড় হয়ে গেছি। আমিও পড়াশোনা শেষ করবো, কাজ নেবো।' 'তারপর ?' 'তারপর? আমি জানি না। তুমি বল?' 'তুমি এভাবে মানুষ হচ্ছ, তোমার কষ্ট হবে না?' 'না হবে না। কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা না কর তাহলে হবে। ভীষণ হবে। আর কোনওদিন খেলাটেলা এসব বলবে না তো? বোলোনা, হ্যাঁ? আমি ওরকম হবো না। তুমিও হয়োনা?'

জয়ন্ত তার কথা রেখেছিল। ফার্স্ট ক্যাশ ফার্স্ট স্ট্যাণ্ড করে সে। কিন্তু তবু মনোমতন চাকরী পেতে সময় চলে যায় বেশ কিছুদিন। তাও যখন পায়, সে সন্তুষ্ট হতে পারে না। তবু সকলের পরামর্শে, আপাতত ভেবে, নিয়ে নেয়। পোস্টিং দিল্লীতে। একটা সেমিগভর্নমেন্ট বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন সিণ্ডিকেটে মাঝারী গোছের চাকরী। মঞ্জু ততদিনে কলেজে ঢুকে পড়েছে। জয়ন্তর বেকার অবস্থায় ওর কাজই ছিল কেবল ওকে উৎসাহ দেওয়া সাহস দেওয়া আর প্রেরণা দেওয়া। জয়ন্তর অবস্থা দেখে ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, ও পাশ করে একটা চাকরী নেবেই। দুজনের রোজগারে সংসার ভালোই চলবে। কিন্তু জয়ন্তর মনে এ সম্বন্ধে যে খুঁত-খুঁতানি আছে, যা কিনা প্রায় ইনফিরিয়-রিটি কমপ্লেকস্‌এর পর্যায়ে এসে পড়ছে, সেটা বুঝতে পেরেও সবসময় একটা আতঙ্ক বোধ করেছে। খরচখরচা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠলো সে। বাবার কাছ থেকে যা হাতখরচা পায়, প্রায় সবটাই জমায়। এর ওপর কিছু কিছু বাচ্চা ছেলেমেয়েকে পড়ানোর কাজ নিল। অভ্যাসটা রপ্ত হয়ে থাকা ভালো। কোনদিকে কখন রোজগারের পথ করতে হবে, কে জানে? জয়ন্ত হয়তো অফিসের চাকরী পছন্দ করবে না, তাই অন্য পথ তো খোলা রাখতে হবে? ওর বন্ধুবান্ধবীদের টানে মাঝে মাঝে পার্টি-টার্টিতে গেলেও জানে, যে জয়ন্তর এসব ঠিক মনোমতন নয়। তাই যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব নয়। জয়ন্তও দিল্লীতে। একা একা কত সময় কাটানো যায়? জয়ন্তর ব্যাপারটা বাড়ীর কেউ জানে না। দূরে থাকায় দেখা সাক্ষাৎ কম। যতটুকু জানার, জানে হয়তো সদা আর আঈ, যারা মঞ্জুর প্রায় সব ব্যাপারই জানে। জেনে এসেছে এতকাল। মঞ্জুর বন্ধুবান্ধব, মা বাবা, ভাই এরা শুধু জানে মঞ্জু খুব কেরিয়ার মাইণ্ডেড্‌। বাবার প্রশ্রয়ের অভাব নেই। টাকাকড়ি সবই জমাচ্ছে ভবিষ্যতের জন্য। বাবলু খোকন কঞ্জুষ বলে ঠাট্টা করলেও, সে টলেনি। তার মন এক জায়গায় স্থির। যাই করুক, যেভাবেই থাকুক, তার সমস্ত মন ভবিষ্যতের দিকে।

যে সমাজে মঞ্জুর বাস, সে সমাজে অবাধ মেলামেশা, এবং সেই সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতারও সুযোগ যথেষ্ট। মঞ্জু কিছুটা স্বভাব উচ্ছল। একা একা তার পক্ষে থাকা কষ্টকর। যাকে সে জীবনে সব কিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করে নেবে বলে ঠিক করেছে, তার অনুপস্থিতিতে নিঃসঙ্গতা রীতিমত পীড়াদায়ক। তাই বন্ধুবান্ধবের আগ্রহে তাকে বেরোতেই হয়, পার্টি টার্টিতে যোগ দিতে হয়। পড়াশোনাতেও সে ভালো, তাই পড়াশোনাও অবহেলা করা চলে না। সবকিছুই সে সাধনার মতন চালিয়ে যাচ্ছে। ছোটখাট ছুটিছাটায় মাঝে মধ্যে দিল্লী থেকে জয়ন্ত এসে উপস্থিত হয়। আগে থেকেই জানা থাকে। সম্প্রতি আঠারো বছরের জন্মদিনে পাওয়া ছোট্ট হেরাল্ড গাড়ীটা নিয়ে মঞ্জু তখন সারাদিন উধাও থাকে। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে সামান্য সময়ের জন্য বাড়ী ফিরে আবার সারা সন্ধ্যা উধাও। মঞ্জু জানে মা তার জন্য ভাবেন না, বাবার সময় নেই। মুখ ভারী হয় শুধু

আঈর, যদি বেশী রাত করে বাড়ী ফেরে। তাই ও মনে মনে বলে 'জয় জয়' তুমি আছ বলেই বোধহয় আমি আছি। নইলে এই পরিস্থিতিতে কোথায় হারিয়ে যেতাম কে জানে?

জয়ন্ত এখনও সন্তুষ্ট নয় তার কাজ নিয়ে। এভাবে চলে না। সে জানে এই রোজগারে মঞ্জুকে তার বাবার কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া যায় না। কোনও কালেই তা সম্ভব নয়। তাকে বড় হতেই হবে। সকলের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে মঞ্জুকে নিয়ে আসতে হবে নিজের ঘরে। কি করে হবে, এই ভাবনাতেই মন বেশীর ভাগ সময় খারাপ থাকে। মাঝে মাঝে যখন আসে দুতিনদিনের জন্য, প্রায়ই অন্যমনস্ক। মঞ্জু মনে করিয়ে দেয়, 'তুমি কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় বর্তমানটাকে নষ্ট করছ। যতটুকু সময় আমরা একসঙ্গে থাকি ততটুকু সময় কি ভুলতে পারো না এ সব? না হয় কিছুদিন দেরী হবে, সময় তো প্রচুর আছে। এখন না হয় আমার দিকে একটু মনোযোগ দিলে?' জয়ন্ত অপ্রস্তুত হয়। তাড়াতাড়ি শুধরে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু আবার খানিকবাদে যে কে সেই। কেবল ভবিষ্যৎ, প্রসপেক্ট আর কেরিয়ার। মঞ্জু দমে যায়। যতক্ষণ ও দূরে থাকে, সেও তাই ভাবতে রাজী। বস্তুত তাই করে থাকে। প্রতি পদক্ষেপে কেবল সেই চিন্তা। জীবনের উদ্দেশ্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই। ভবিষ্যতের চিন্তা, আর সাধনা, বর্তমানকে কেবলই ভবিষ্যতের পায়ে ডালি দেওয়া। কিন্তু যতটুকু সময় জয়ন্ত কাছাকাছি থাকে, ও চায় এসব ভুলতে। শুধু এটুকু মনে রাখতে, যে ওরা কাছাকাছি, ওরা পাশাপাশি অথবা মুখোমুখী রয়েছে। ভবিষ্যত তো চিরকালই ছিল, এবং আছেও। কিন্তু এই যে অমূল্য মন কেমন করা দিনগুলো, এগুলো কি থাকবে চিরকাল? দুদিন বা তিনদিনের জন্য এসেও জয়ন্তর এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির বিরাম নেই। মঞ্জু ওকে সব জায়গায় নিয়ে যায়। পৌঁছে দেয়। অপেক্ষা করে, আবার তুলে নিয়ে আসে। একটা মুহূর্ত যেন অপচয় না হয়, সে চেষ্টায় সে সতর্ক থাকে। একবার ওকে মঞ্জু জিজ্ঞেস করেছিল 'এই যে তুমি এত চেষ্টা করছ বড় হতে, এসব কার জন্য জয়?' জয়ন্ত খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'কেন? কার জন্য আবার? তোমার জন্য। জানোনা নাকি?' 'উহুঁ!' মাথা নেড়ে মঞ্জু জবাব দিয়েছিল 'জানিনা! সত্যিই জানিনা মনে হয়। মনে হয় তুমিও গুলিয়ে ফেলছ সব। যদি আমারই জন্য হোত তো তুমি এমন পাগল হতে না। বুঝতে, আমি চাই না তুমি এমন হয়ে যাও। আমি তো তোমার কাছে বেশী কিছু চাই না জয়? শুধু একটু থাকার জায়গা আর তোমার মন। কিন্তু কোথায় তোমার মন জয়? সে যে ক্রমাগতই হারিয়ে যাচ্ছে? এই যে এত কাছে বসে আছি, একবারও তোমার উপলব্ধি হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না? আমি একটা মেয়ে জয়, শুধুমাত্র ভবিষ্যত চিন্তা করার আর ভবিষ্যতের কথা শোনার একটা মেশিন তো নই? কেন তুমি একবারও এই এখনের আমার আর তোমার কথা ভাবোনা?' জয়ন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। 'মানে?' 'কিছু না' বলে মঞ্জু ম্লান হেসেছিল। তার অভিমান শিকেয় উঠেছে। জয়ন্তর স্পর্শকাতর মধ্যবিত্ত মন যেন কিছুতে না আঘাত পায়, তার আত্মম্ভরিতায় যেন এতটুকু টোল না পড়ে, সেই চেষ্টাতেই মগ্ন থাকতে হবে শুধু। ভুলে যেতে হবে সে একটা আঠারো উনিশ বছরের রক্ত মাংসে গড়া মেয়ে। তার সহজ স্বাভাবিক জীবনের সমস্ত আমন্ত্রণ আয়োজন তুচ্ছ আর অবহেলা করে সে ছুটে চলেছে এক অজানা ভবিষ্যতের পানে। তার ধনীর ঘরে জন্ম নেবার ভুল, আরেকজনের অক্ষম জীবনের ব্যর্থতার পায়ে বলি দিয়ে শুধরে নিতে হবে। সাধ করে সে এ সাধনায় মেতেছে, আর তো ফেরার পথ নেই?

বাড়ীতে ঠাকুর দেবতার পাট নেই। প্রার্থনা করার ব্যাপারটা ছোটবেলায় স্কুলে শিখেছিল। আঈর বোধকরি লুকোন একটা মূর্তি টুর্তি কোথাও আছে। যার সামনে দাঁড়িয়ে সে রোজ প্রার্থনা করে। দু একদিন দেখেছে মঞ্জু ছোটবেলায়। আঈর ঘর তার ঘরের পাশেই। সেদিন তাড়াতাড়ি ফিরে-ছিল। জয়ন্তকে ট্রেনে তুলে দিয়েই ফিরে এসেছিল সোজা। আঈ ওর থমথমে মুখ দেখেই বুঝেছিল কিছু একটা হয়েছে। কাছে এসে বিড়বিড় করে বলেছে, 'সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে। স্নান খাওয়া নেই সময়মত। পড়াশোনা নেই। যা খুশী তাই করে বেড়াচ্ছে। মা দেখে না, বাবা খোঁজ রাখে না, আমার কথার আর কি দাম?' মঞ্জু হঠাৎ কথাবার্তা নেই, কেঁদে ভাসিয়েছে! 'সত্যি বলছিস আঈ আমার তুই ছাড়া আর কেউ নেই। কেউ তো আমার কথা ভাবে না? একবারও না?' তারপর খানিক-ক্ষণ আঈর আদর খেয়ে চোখ মুখ মুছে বলেছিল, 'আঈ তোর ঠাকুরের কাছে আমার হয়ে একটু প্রার্থনা করিস। যেন আর বেশীদিন এ কষ্ট সহ্য করতে না হয়।' আঈ আবার ধমক লাগিয়েছে। 'কষ্ট আবার কি? হেসে খেলে, নেচে গেয়ে বেড়াবার বয়স, তাই বেড়াচ্ছ। কষ্টর কি হোল?' মঞ্জু হেসে কথা ঘুরিয়েছে 'সত্যিই তো। বল দেখি আমার আবার কি কষ্ট?'

অবশ্য জয়ন্ত এবার দিল্লীতে পৌঁছে খুব ক্ষমাটমা চেয়ে চিঠি দিয়েছে। আশা করেছে মঞ্জু অবশ্যই ওর অবস্থাটা বুঝবে। ও যে মঞ্জুরই জন্য সবসময় চিন্তায় থাকে। কি করে ওকে কাছে আনবে, আদরে রাখবে সেই ভাবনাতেই অস্থির ইত্যাদি ইত্যাদি। 'আদর! আদর কাকে বলে কেউ কি জানে? যার টাকা নেই সে ভাবে টাকা ঢেলে দিলেই আদর দেখানো হয়। যার আছে, সেও ভাবে যত খুশী টাকা হাতে তুলে দিলেই আদর দেখানো হোল। আদর কাকে বলে? দরদ কাকে বলে? সর্বোপরি ভালোবাসা কাকে বলে? ভালোবাসা কি আছে? আমি নিজে কি ভালবাসি? জয়ন্তকে? ওকে কেন চাই? ভালোবাসি বলে, না নিতান্তই [illegible] কারণে? আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে আরো বেশী তলিয়ে দেখতে [illegible] ব্যাপারটাকে, কিন্তু একটা ঠিক সি[illegible] আসতে পারেনি। ওর জয়ের প্রতি ভ[illegible] বাসাটা কি একটা অঙ্গীকার রক্ষা করা না দেহের প্রতি দেহের আকর্ষণ সত্যিই মনের প্রতি মনের আকর্ষণ? দিই, তার বদলে কিছু চাই বলেই কি না, না দিয়ে পারি না বলেই দিই? কেন না পেলে এত কষ্ট হয়? পাওয়ার অর্থ আমার কাছে এক, জয়ের অন্য? জয়ন্ত কি চায় আমার [illegible] ভালোবাসাটা কি একটা অভ্যাস ভালোবাসি এই ভেবেই সন্তুষ্ট, বাসি, কেন তাকেই বাসি, এসব কথ[illegible] জানতে চায় না, জানেও না? কোনও বিশেষ ক্ষণে যদি কাউকে ভালো[illegible] যায়, তারপর কি শুধু তারই স্মৃতি চলতে হবে? তুমি আমার সম্পত্তি মনোভাব, এবং তোমাকে আমার লেগেছিল এই স্মৃতি, এই দুইয়ের [illegible] নামই কি ভালোবাসা? ভালোবাসা দা[illegible] দায়িত্ব নয়? আনন্দ? বোধকরি ত[illegible] কিন্তু তা প্রথমে, তারপর দায় ও দা[illegible] যদি তা না হোত সংসার টিঁকে [illegible] কি? এই যে আমি, ওর জন্য এত একি সুখ নয়? ও যে আমার জন্য খেটেছুটে মরছে এতে কি সুখ নেই এবং আমার? তবে আমিই বা এত [illegible] নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? বর্তমান যে এই মুহূর্তটুকু মাত্র, বাকি তো না যা কিছু সবই ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের তো লোকে খেটে মরে। আমি কে পাচ্ছি?

মঞ্জু জোর করে নিজেকে এসব থেকে বিরত করলো। আর কিছু না প্রত্যেকেরই জীবনে একটা [illegible] আ[illegible] তাই পালন করছি। আ[illegible]র সঙ্গে কেউ তো আমাকে বলেনি? আমি তাগিদে করছি। ভালো হোক মন্দ এই আমার ভালোবাসা। আমি এ সমর্পিত, বন্দীকৃত ও অঙ্গীকৃত। আর ভাবনা করা কেন এই নিয়ে?

মঞ্জুর দাদা খোকনের বিয়ে। চৌধুরীর সঙ্গে। ওরা নিজেরাই পরস্পরকে খুঁজে নিয়েছে। মন জা[illegible] পালা চুকেছে। খোকন এখন প্রা[illegible] অতএব বিয়ের আর দেরী করার মা[illegible] বাড়ীতে লোকজনের আনাগোনা হোল। মঞ্জুও মেতে উঠলো। কোনও বিষয়েই বেশী আগ্রহ দে[illegible] সেটুকু পূরণ ওকেই করতে হবে বৌ আসছে, এখানেই থাকবে। পেছনে লেগে, মিস্তিরি লাগিয়ে বাড়ী রং করানো শুরু হোল। [illegible] এর গন্ধে ওর মন যেন আবার হঠ[illegible] করে নেচে উঠলো। প্রথমেই মনে জয়ন্তর আসা উচিত। সবাইকে সকলের সামনে। খোকনকে বলবে অনেক লোকজন লাগবে কাজের জ[illegible]

…র এসব? জয়ন্তকে আনিয়ে নাও। ও …ব জানেটানে। দিল্লীতে চিঠি দিয়ে …ও, চলে আসুক ছুটি নিয়ে।' খোকন …লো, 'শিওর শিওর। এক কাজ কর না, …মার কাছে ঠিকানা আছে, তোমাকে দেব …মিই লিখে দাও।' 'তোমার বিয়ে, আমি …খব? না, তুমিই লিখবে। অত কি কাজ …মার? নাহলে জানই তো কি রকম …চি', খুব দুঃখিত হবে।' 'আচ্ছা আচ্ছা …ক আছে লিখব। আর কাকে কাকে …খতে হবে একটা লিস্ট করে ফেল। …ফিস যাবার সময় কাল দিয়ে দিও, টাইপ …রিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

'না। হাতে লিখবে। তোমার টাইপ …া চিঠি পেলে কেউ আসবে না। তুমি …রকম কেন দাদা? কিচ্ছু বোঝো না? …সঃ জ্বালালে। ঠিক আছে তাই লিখব। …টকথা তুমি একটা লিস্ট করে ফেল। …ব কাজ মেথডিক্যালি করা চাই, বুঝলে?' …লে এসব ব্যাপারে [illegible] খোকন …কে উপদেশ দিল। 'তুমি দয়া করে …দের মেথডটা ঠিক রাখো, তাহলেই …বে।' 'ও শিওর শিওর।' বলে খোকন …টে পড়লো।

মঞ্জু দেখলো বাড়ীতে বিয়ে, কেউ মাথা …য় না। বাবা তাঁর [illegible] আর …কেদের [illegible] একই, দেখা-টেখা [illegible] …তু তাঁরা কি [illegible]? [illegible] …দ্দীন যারা আছেন তাঁরা হয়তো এগিয়ে …সবেন কিন্তু [illegible] পারবে …। আত্মীয় স্বজনের মান অপমান, [illegible] …ন এ সবের পালা। কারো ওপর ভরসা …ই। মা এখনও নির্বিকার। সবার ওপরেই … ভার রয়ে গেল। বাবলু, ছোট, [illegible] …বারই মতন। বিয়ে মানেই ভালো ক্যামেরা …য়ে ছবি তুলে বেড়ানো শুধু। অতএব …ড়া করা লোক দিয়েই চালাতে হবে; তার …নেই টাকার প্রশ্ন। অপচয় বড় গায়ে লাগে …ন। মনে হয় এ অন্যায়। টাকা থাকলেও …ভাবে নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। … ধারণা জয়ন্ত এসব বিষয়ে অনেক সাহায্য …তে পারবে। সেও [illegible] সে সাহায্য …তে পারবে। তাই এত আগ্রহভরে ওকে …নাবার ব্যবস্থা করালো। তাছাড়া জয়ন্ত …কনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ওকে তো আনতেই …।

জয়ন্ত এলো উড়ে। বন্ধুর বিয়ের জন্য …লম তো বটেই, কিন্তু হঠাৎ এই অসময় …র্যায় শুধুমাত্র খোকনের বিয়ের জন্য …। সে একটা 'ট্রেনিং কাম সার্ভিসের' …ার পেয়েছে। দিল্লীতে মস্ত এক ফরাসী …র্কিটেক্ট ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের একটা … কমিশনে এসেছিলেন। তাঁরই ইউনিটে …নীং কাজ করছিল জয়ন্ত। এখন তিনি …জ শেষ করে আবার ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছেন। …খানে লিয়ন্সে তাঁর বিরাট স্থপতিশালা। …থিবীর সর্বত্র কাজ করে বেড়ান তিনি ও …াঁর কর্মীরা। সেই মঁসিয়ো ফাঁবে, তার …গ জয়ন্তকে লিয়ন্সে নিয়ে যেতে রাজী …ছেন। তার সঙ্গে কথা বলে, তার কাজের

উৎসাহ আর ধারা দেখে খুব খুশী হয়েছেন। জয়ন্তকে উৎসাহ দিয়েছেন প্রচুর, সর্বোপরি এই সুযোগ। জয়ন্তর পা যেন আর মাটিতে পড়ছে না। খোকনের বিয়ে শুনেও তার উৎসাহ উত্তেজনা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। মঞ্জু জানতে চাইল, কতদিন থাকবে সেখানে। ফুলে ফেঁপে সে জবাব দিল 'এই দু বছর, কিম্বা তিন চার বছরও হতে পারে। আমার তো ইচ্ছা যতদিন পারি থাকি যতটা পারি শিখে নিই। তারপর ভালো সুযোগ পেলে চলে আসবো, নয়তো ওখানে সেটল্ করতেই বা বাধা কি?' মঞ্জুর চুপসে যাওয়া মুখ দেখে হঠাৎ খেয়াল হোল কোথাও কোন গোলমাল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি গলার স্বর নীচু করে বললো, 'আরে তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? তেমন হলে তো তোমাকে এসে নিয়েই যাবো। তোমাকে ছেড়ে বেশীদিন কি থাকতে পারি? তোমারই জন্য তো সব!' তবু মঞ্জুর সব আনন্দ উবে গেল। দাদার বিয়ের উৎসব পানসে লাগতে লাগলো। সব কাজ সাধ করে ঘাড়ে নিয়েছিল, সে সবই চালালো। কিন্তু কোথায় সুর কেটে গেছে, তাল ভেঙ্গে গেছে। জয়ন্ত খুবই উৎসাহের সঙ্গে অনেক কাজ করলো, মঞ্জুকে সব ব্যাপারে সাহায্য করলো। কিন্তু ওর উৎসাহের আধিক্য ওর মনে শুধু জ্বালাই বাড়ালো। ঠিক যে কথাটি শোনবার জন্য ওর মন-প্রাণ আকুল হয়ে রইলো, সে কথাটি শুনলো না। যে কথাটি কেবলি বলতে চাইলো বলা হোল না। সে পরিবেশ বা মুহূর্ত এলো না বা আসতে পারলো না।

হিসাব নিকাশে পাকা হিসাবীকেও হার মানালো সে। বাবার টাকার অনেক সাশ্রয় করলো, কিন্তু সকলের কাছে নাম কুড়ালো বরাবর। বিয়ে চুকে গেল, বাড়ী হালকা হোল। বাবাকে জানালো, উনি ওর কাছে যে টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, তার থেকে ছয় হাজার টাকা বেঁচেছে। বাবা অবাক হলেন, 'আরে বাবা, তুমি তো খুব পাকা বিষয়ী হয়ে উঠেছ দেখছি? ঠিক আছে, ওটা তুমিই রাখো।' মঞ্জু আপত্তি জানালো 'আমি রাখবো কেন? কাল পরশু পেমেন্ট-টেমেন্ট হয়ে গেলে পর, আমি ওটা তোমায় ফেরৎ দিয়ে দেব। বাবা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা তোমাকেই দিলাম। ইউ হ্যাভ আর্নড ইট। ওটা দিয়ে তুমি একটা কিছু কিনে নিও' বলে বিদায় দিলেন। তবু মঞ্জু ঠিক করলো এ টাকাটা ও নেবে না। কিন্তু তা আর হোল না।

সেদিন খোকন আর সোমা, সোমার বাপের বাড়ীতে গেছে। মঞ্জুরও নেমন্তন্ন, জয়ন্তরও। কিন্তু মঞ্জু নিজে ভীষণ ক্লান্ত বলে, সে নেমন্তন্ন কাটিয়ে নিল। জয়ন্তকেও বললো কাটিয়ে নিতে। ওরা একসঙ্গে বেরোবে। জয়ন্ত এলে পর ওরা বেরিয়ে পড়লো। যাবে আর কোথায়? কোলকাতা শহরে কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্ত ঘনিষ্ঠতায় দু দণ্ড বসার সুযোগ আছে? যেখানেই যাও, হাজার হাজার লোক, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আইসক্রীম খাচ্ছে, ফুচকা খাচ্ছে, ভেলপুরী খাচ্ছে। প্যাঁ পোঁ বেলুন আর বাঁশী বাজছে। ময়দান-এর পেছন দিকে ক্যাশুয়ারিনা এ্যাভিনিউ-এর পাশে নির্জন জায়গায় গাড়ী দাঁড় করালো মঞ্জু। গরমের জন্য দুপাশের দরজা খুলে দুজনে গাড়ীতে বসেই কথাবার্তা কইতে সুরু করলো। সীটের ব্যাকে মাথা হেলিয়ে মঞ্জু চোখ বুজলো। 'বাব্বাঃ, যা খাটাখাটনী গেছে এ কদিন। তুমি ছিলে তাই কতটা রিলিফ। তোমাকে কি সেজন্যে ধন্যবাদ দিতে হবে নাকি?' 'আরে দূর! ধন্যবাদ আবার কি? খোকনের বিয়ে আমি খাটবো না? তোমার বড্ড বেশী পরিশ্রম গেছে তাই না? তোমার এত খাটবার প্রয়োজন কি ছিল? তুমি নাকি পয়সা বাঁচাবার জন্য সারাদিন সকলের পেছনে থেকেছ শুধু? এর কি দরকার ছিল? তোমার বাবার পয়সার অভাব নেই, তাছাড়া তোমার মা রয়েছেন। তুমিই বা কেন এত ঝামেলা নিতে গেলে? তুমি নাকি অসম্ভব কঞ্জুষ হয়ে গেছ, খোকন বলছিল।'

জয়ন্তর কথার প্রথমটা শুনে মঞ্জুর একটু আবেশ এসেছিল। মনে হচ্ছিল 'আঃ এটুকু কেউ বলবে, ভাববে, তারজন্যও অনেক পরিশ্রম করা যায়। কিন্তু শেষের কথাগুলো শুনেই আবেশ কেটে গেল। কথা, কথা, কথা, কেন সবসময়েই লোকে কথা বলতে চায়? কেন কোনওদিন জয় ঠিকমতন কথাগুলি বলে না? বলতে পারে না? কেন মানুষ মনের কথা, মনের ইচ্ছাটুকু বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে না? চায় না? কঠিনস্বরে বললো, 'দাদা যে আজকাল আমায় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করে জানা ছিল না তো? তা দাদা না হয় একটু আনব্যালান্সড হয়ে আছে এখন, নতুন বিয়ে করে, তুমিই বা কেন বলতে দিলে এসব কথা? আর টাকা যারই হোক সেটা অপচয় করা কি উচিত?

মঞ্জুর স্বরের উষ্মায় জয়ন্ত অবাক হোল, আহত হোল। সেতো অন্যায় কিছু বলেনি? তুমি হঠাৎ হঠাৎ এমন হয়ে যাও বলতো? কি বলেছি আমি? প্রাই মনে তুমি আমার ওপর খুশী নও। কি হ কি? খোকন যদি বলে, তো আমি কি পারি? তোমাকে কেউ কিছু বললে লাগে না মনে কর? এই ধরনের কথা আরো বেশী লাগে, যখন বুঝি তুমি এসব করছ।

মঞ্জু চোখ দুটোকে পুরো মেলে সেই অন্ধকারেই চেয়ে রইলো জয়ন্তর ছায়া মুখের দিকে। প্রায় অস্ফুট জিজ্ঞেস করলো 'কি বোঝো?' নিজেকে তুমি কিভাবে ভবিষ্যতের তৈরী করছ। কেন এভাবে তৈরী জয়ন্তর স্বর ভারী হয়ে এলো। সাধ আবেগশূন্য গলায় কথা বলা অভ্যাস মাঝে মাঝে মঞ্জুর মন তৃষিত হয়ে গলার স্বরে এতটুকু আবেগ, চোখের দৃ বিন্দুমাত্র মুগ্ধতা কেবলি খুঁজে বেড়া আর হতাশ হয়। দৃষ্টিতে মোহ গলার স্বরে আবেগের সৃষ্টি করায় জ বড় লজ্জা। কেবলি শুকনো গলায় কাঠ কথা বলে ও। আজ যেন কোথায় ভাঙলো। যখন বুঝি আমার জন্য কত সহ্য করতে তুমি প্রস্তুত, তখন ভালো লাগে, দুঃখও পাই। নিজের ওপরে ভরে যায় মন। মনে হয় আমার অধিকার নেই এভাবে তোমার জীব নষ্ট করার। কিন্তু ছাড়তে পারি কিছুতেই। তুমি নেই, তুমি আস আমার জীবনে, ভাবলেই সব কিছু অ মনে হয়। তুমি এখনও ছেলেমানুষ এই যা সান্ত্বনা, তবু কতদিন বসিয়ে রাখবো? তাই ভালো লা কিছু। তুমিও দুঃখ পাও, বিরক্ত অসন্তুষ্ট হও। কেবলি তোমাকে দে করে যাচ্ছি মনে হয়, যতবার তোমার আসি। এত কথা নিজেদের বন্ধে, হৃদয়ঘটিত কথা কোনওদি বলেনি। মঞ্জু দিশাহারা হয়ে পড়লো। যতদি শুনতে চেয়েছে, সব যেন একসঙ্গে আসলে আজ এসে ঢুকছে ওর কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। 'ও জয় জয় জ ঝাঁপিয়ে পড়লো জয়ন্তর দুহাতে জড়িয়ে ধরলো ওর গলা, রাখলো ওর বুকে। চুপি চুপি ওর পিন্ডকে জানালো ভালবাসি ভীষণ ভী-ষণ ভালবাসি।'

অনেক, অনেকক্ষণ পর আবেগ হলে পর, ওর কাঁধে মাথা রেখে, ও আলতো বুলোতে বুলোতে বললো যাবে জয়? না গেলে কি হয়? একটা ভালো চাকরী পেয়ে যা তাছাড়া আমি তো আছি, দুজনে রোজগার করবো?' 'সেটা পরের কথ যদি আজ সুযোগ পাই, সময় যখন সেটা না নেওয়া কি ঠিক? তুমিও পড়াশোনা যতটা পার এগিয়ে রাখ। এসে কোথায় থাকি সেই বুঝে আর বুঝে যা করার করা যাবে।

বাবার টাকাটা আর ফিরিয়ে হোল না। জয়ন্তর ফ্রান্সে যাবার

ড়া আরো সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না বাবদ, সে টাকা এবং নিজের সঞ্চয় কে সব তুলে নিয়ে মঞ্জু জয়ন্তর সব কিছু ছিয়ে দিল। জয়ন্তর আর কোলকাতায় না হোল না। দিল্লী থেকেই ফ্রান্সের নে উঠে চলে গেল সে।

ফ্রান্সে পৌঁছে কাজ সুরু করার সময়, ন্তর যে উৎসাহ ছিল জীবন সম্বন্ধে তাতে টা পড়েনি, কিন্তু ধীরে ধীরে প্রত্যয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেমন ঘটেছে, বিদেশ ম্বন্ধে মোহও তেমন কিছুটা কমেছে। জ নিয়ে যতটা মেতে উঠেছে, শিখে নিতে টা আগ্রহী হয়েছে, ততটাই আকুল হয়ে ড়ছে ফিরে আসবার জন্য। বিরাট দূরত্ব ত্বও প্রতিনিয়ত মঞ্জুর সান্নিধ্যউদ্রেককারী ঠিগুলির উত্তাপে ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটি তুন রংএ রংএ রাঙিয়ে তুলতেও সমর্থ চ্ছে। তার জীবনের সার্থকতা, আনন্দ, ফল্য সুখদুঃখের ভাগীদার তো অন্য কেউ ই, মঞ্জু ছাড়া? তাই কেবলি সব কথা, ব আশার কথা মঞ্জুকেও বলা চাই। তার ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছেন, বাবা আবার য়ে করেছিলেন, এবং নিয়ে করে নতুন রীর প্রতি এত মনোযোগ দিয়েছিলেন যে য়ন্ত কোথায় ভেসে যাচ্ছে খোঁজও নেননি। এই মায়ের মেয়ে খুকু, সেই বাড়ীর বেশির ভাগ, জয়ন্ত অবাঞ্ছিত। অতিরিক্ত। তার বিনে মঞ্জুর পদক্ষেপ তাই এত আলোড়ন সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল। আজ সে নেকটা স্থিতধী, নিজের জায়গা প্রায় ঁজে পেয়ে যাচ্ছে। মঞ্জু নইলে জীবন কি। দুঃখের দিনের দোসরের মতন, নন্দের দিনেও দোসর না খুঁজে পেলে বই অর্থহীন মনে হয়। তিন বছর পার ন তার ঘরে ফেরার পালা এখন। ঘর সে লেতেই বাঁধবে, মঞ্জুর কল্পেই বেশী ছিল। তাই ইন্ডোজার্মান কোম্পানীর নিরীর নিয়োগপত্রটি পকেটে নিয়ে, না নিয়ে, মঞ্জুকে চমকে দেবে বলে একমাস গেই জয়ন্ত দিল্লীতে নামলো। আর সেখান থেকে উর্দ্ধশ্বাসে চলে এলো কোলকাতায়। বে কোনও মতে সারা দিনটা অপেক্ষা করে বকেল চারটে বাজার আগেই এসে উপস্থিত হলো 'নিরালা'। পর্দা নেই ছুটিতে গেছে। নতুন বেয়ারাকে বলে দিল দিদিকে গিয়ে লতে, যে 'জয়সাব' এসেছে। হরিণীর মতো কে ছুটে আসবে এখনি, সেই আশায় সিঁড়ির দিকে চোখ ফেলে রাখলো।

বিহারী মিঠুলাল এসে জানালো 'জো-সাব আয়া হ্যায়।' জো মল্লিক অর্থাৎ জ্যোতির্ময় মল্লিক। মঞ্জুর পরিচিত একটি নামমার্কাগায়ে-পড়া ছেলে। কিছুদিন ধরেই মঞ্জুকে জ্বালিয়ে খাচ্ছে। যেখানেই যাবে পিছু ছাড়বে না। অনবরত টেলিফোন করবে এখানে ওখানে যাবার জন্য অনুরোধ করবে। বিরক্তির একশেষ। তাই দুর্ভাগ্যক্রমে জয়ন্তর কপালে জোর প্রাপ্য অসম্মানটুকু জুটলো। কেবলমাত্র না জানিয়ে আসার দুর্বুদ্ধির জন্য। জয়ন্ত সেটা জানলো না। তিন-চার বার আবার চেষ্টা করলো। কিন্তু মিঠুলাল মঞ্জুর কাছে ঢালাও অর্ডার পেয়েছে ওকে ফিরিয়ে দেবার, পরে আনবার জায়গায় তাই বেঁধে আনবার ব্যবস্থায় সে তৎপর হয়ে উঠলো। লাঞ্ছনার আর শেষ রইলো না জয়ন্তর। ফ্যালফ্যাল করে সে মিঠুলালের বক্তৃতা শুনলো 'দিদি ওকে রোজ ফেরাচ্ছে, তবু সাহেব বুঝতে পারছে না কেন দিদির ওকে বিলকুল পসন্দ নেহি? দিদির আরো বহুত বহুত দোস্ত আসে, দিদি ওদের সবার সঙ্গে কথা বলেন, বেরিয়ে যান। ওর সঙ্গে যখন দেখাই করছে না তখন থোড়া সা ভি আকল রহনেসে তো ওর বোঝার কথা, ওর আর আসাই উচিত নয়?' কান মাথা গরম হয়ে উঠলো জয়ন্তর। দাঁত দাঁতে চেপে একটুকরো কাগজ নিয়ে, রাগের হাতে যেমন তেমন করে ইংরিজীতে লিখলো 'মঞ্জু, অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা কর। আমি কিছু বুঝতে পারছি না!' রাগের বশে নাম না লিখে ইনিশিয়েল লিখলো 'জে, এম'। সামান্যক্ষণ পর জবাব এলো, ঐ কাগজেরই পিঠে। 'দুঃখিত। কিন্তু না বোঝার কি আছে? মঞ্জু।'

(ক্রমশঃ)

কর্ণার্জুন ও কর্ণ

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার

শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে। ত্রিশ শতকের মাঝামাঝি বরিশালের টাউন হলে কালী-পুজোর থিয়েটার সারারাতব্যাপী। শীতের শুরুতে সর্দি কাশি। তাও বাবাকে জড়িয়ে দেখতে গেছি গলায় ও কানে কমফর্টার পেঁচিয়ে। শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার চিত্ত বসু হবেন কর্ণ আর আমার জনৈক সহপাঠি হবে বৃষকেতু। মাঝরাতে চিত্তবাবুর মত প্রবীণ অভিনেতাও ঝোঁকের মাথায় অনেক কথা বলার পর ইতি উতি তাকাচ্ছেন। পুত্র বৃষকেতুকে করাত দিয়ে কাটা হবে নরমাংসলোলুপ ব্রাহ্মণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য। বৃষকেতু অতি কুণ্ঠিত প্রবেশ। কারণটা পরে জানা গিয়েছিল, ছোটবাইরে করতে গিয়ে বড়বাইরে পেয়ে গিয়েছিল। চিত্তবাবু যে বানিয়ে বানিয়ে রঙ্গমঞ্চ চালু রেখেছিলেন আমরা কেন অনেক থিয়েটার ঘুঘুও বুঝতে পারেনি। বৃষকেতুর সীনটা পি সি সরকারের ম্যাজিকের মতই ইন্দ্রজাল তৈরি করেছিল। আলো আঁধারের কারসাজিতে ও পিচকিরি দিয়ে লাল জল ছিটানোতে বৃষকেতুর মাথা করাত দিয়ে কাটার সে কী বীভৎস রূপায়ণ। পরে ব্রাহ্মণমূর্তি মিলিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আস্ত বৃষকেতুর হাত ধরে এলেও শিশুমনের ধিক্কার যেন মিটতে চায় না।

আর একটি জমাট সীন যেখানে কর্ণের কোলে পরশুরাম নিদ্রিত। তাঁকে গুরু ধরে কিশোর কর্ণ শরসংযোগ ও শস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিচয়ে। মিথ্যা প্রকট হল যখন পরশুরাম হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখলেন শিষ্যের ঊরু কীটের দংশনে রক্তে ভাসছে। তবুও তিনি নিস্পন্দ নির্বাক। পরশুরাম ভাবলেন চেলা ক্ষত্রিয়। ক্রোধে আগুন হয়ে বলছেন অভিসম্পাত দেব। কর্ণ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সত্য কথাই কবুল করলেন—তিনি ক্ষত্রিয় নন, সূতপুত্র।

নাট্যাচার্য অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর জীবন ও নাট্য প্রয়াস নিয়ে 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' বইতে স্মৃতিচারণা করেছেন। তার অনেকটাই কর্ণার্জুন অভিনয়ের কথা ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা। নবাগত অহীন্দ্রবাবু প্রথম এগার রাত অর্জুনের অভিনয় করে এসেছেন। চৌঠা আগস্ট ১৯২৩ হঠাৎ তাঁকে প্রবীণ অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তীর অসুস্থতার জন্য কর্ণের পার্টে নামতে হল, পার্টে নামতে হল দুদিন রিহার্সেলের উপর নির্ভর করে। জামদগ্ন্য শাসাচ্ছেন শাপ দেবেন। কর্ণের তখন আছে প্রায় বিশ লাইন সংলাপ। অহীন্দ্রবাবু লিখছেন, 'আমি একটু দ্রুত বললাম, লোকের বুঝতে কষ্ট হয়নি। শেষে নিজের পরিচয় দিয়ে, আমি সূতপুত্র বলে ওঁর পায়ের উপর পড়লাম। প্রথমে হাঁটু গেড়ে, তারপর লুটিয়ে পড়লাম, পায়ের উপর। তারপরেই মনে হল, মাথাটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে, বড় দুর্বল লাগছে। কী যে হচ্ছে না হচ্ছে টের পাচ্ছি না। করতালির ধ্বনি কানে আসছে এইমাত্র।' প্রথম অভিনয়ে তিনি পেয়ে গেলেন যা খুঁজেছেন—দর্শকদের সঙ্গে র‍্যাপোর্ট। এর জন্য ওঁর নিষ্ঠা ও কুশলতা যতটা দায়ী ততটাই কর্ণার্জুন নাটকটির উৎকর্ষ ও কর্ণ চরিত্রের মাহাত্ম্য।

নাট্য বিনোদ অপরেশচন্দ্র

এই নাটকের আগে অপরেশবাবু কিছু লিখেছিলেন, পরে আরও বহু। ১৯১৬ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁর রামানুজ নাটক অভিনীত হয়। ১৯১৯ সালে মিনার্ভার ম্যানেজারি ছেড়ে তিনি স্টারে আসেন ম্যানেজার হয়ে। দুটো তিনটে নাটক নিয়ে এগোতে চাইলেন, পারলেন না। তখন নিজেই লিখলেন উর্বশী—নাচগানের বই। কিন্তু অর্থাগম হল না। তার উপর স্টারের লেসী-শিপের ভারও পড়ল ওঁর উপর। ইবসেনের ভাইকিংস অবলম্বনে লিখলেন রাখী-বন্ধন। অভিনয় করালেন ১৯২০ সালে। জমল না, কিন্তু অপরেশবাবুও মেতে উঠলেন নতুন নতুন নাটক লেখায় ও প্রযোজনায়—ছিন্নহার, তারপর ঐতিহাসিক 'অযোধ্যার বেগম'। কিছুতেই দাঁড় করাতে পারলেন না। অপরেশবাবু স্থির করলেন একবার শেষ চেষ্টা করবেন, না হলে থিয়েটার ছাড়বেন। তার পরের ঘটনা অহীন্দ্রবাবুর ভাষায় বলিঃ

"সর্ব শক্তি দিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন কর্ণার্জুন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পরম ভক্ত ছিলেন উনি।...একান্তভাবে প্রার্থনা করেছিলেন এই শেষ, ঠাকুর আমায় শক্তি দাও। এই আকুলতা ঠাকুর বোধহয় শুনেছিলেন। তাই এ নাটকের জন্য তিনি পেলেন একটি দল, নবাগত ধনীদের অর্থভাণ্ডার এবং এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন সসম্মানে এবং পূর্ণ মহিমায়। দিনের পর দিন অভিনয় করেছি আর লক্ষ্য করেছি এর অসাধারণ জনপ্রিয়তা। এক ধনী ব্যক্তি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন—সোনার দোয়াত কলম। যে সার্থক কলম ধরেছিলেন, তা যেন সোনা হয়ে গেছে।"

কর্ণার্জুনের পর অপরেশবাবু আরও নাটক লিখেছিলেন। অস্কার ওয়াইল্ডের 'ডাচেস অফ পাডুয়া' অবলম্বনে 'ইরানের রাণী', যেটি ১লা জানুয়ারি, ১৯২৪ খোলা হয়েছিল। বাহান্ন রজনীর অভিনয় শেষে ওটিকে বাদ দিয়ে অপরেশবাবু আর একটি খুললেন বিদেশী ছায়ায় লেখা গীতিবহুল নাটক। নাম বন্দিনী। ভার্দি রচিত একটি ইতালীয় অপেরা আইদা, মিশরীয় ভূমিকায় তারই রূপান্তর। 'ইরানের র পঞ্চাশ রাত্রি চলবার পর জুবিলি হয়েছিল ১২ নভেম্বর, ১৯২৪ এবং উপলক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র পাধ্যায়। কিন্তু কর্ণার্জুনের মত এত হয়নি আর কোন নাটক। শুধু কলক নয়, মফঃস্বলে এবং বাংলার বাইরে থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত প্রতিটি শহরে সে যুগে কর্ণার্জুন হত। যেমন দারদের হাতে তেমনি শখের দলে। মু ভ্রাতৃগণের বিশেষ অনুরোধে ঈদের দিনে স্টার কর্তৃপক্ষ বিশেষ অভি বন্দোবস্ত করতেন। ওঁদের তো পৌরাণিক বলে আকর্ষণ করা যেত না, আসতেন দেখবার জিনিস আছে বলে

কর্ণার্জুন স্টার থিয়েটারে এক ২৬০ রাত্রি চলেছিল। ২৮ অ ১৯২৬ তারিখ ২৫০ রজনী প্রতি হয়েছিল। এক নাগাড়ে মানে সপ্তাহে দিনের মত শনি ও রবিবার। শততম পালিত হয়েছিল ২৪ মে, ১৯২৪। নয়ের আগে একটি সভা হয়েছিল শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে। এই সভাতেই অ বাবুকে নাট্যবিনোদ উপাধি দেওয়া হরপ্রসাদের ভাষণে ছিল ঃ

"...মুখোপাধ্যায় মহা এর কর্ণ নাটক পড়িয়া ও তাহার অভিনয় আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। মহা কর্ণের চরিত্র সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, অ বাবু তাহাকে আরও উজ্জ্বল করির অভিনয়ে কর্ণের চরিত্র দেখিয়া না হইয়াছেন এমন লোকই বিরল। তাই র্জুন উপরি উপরি একশত রাত্রি হইয়াও আজও পুরাতন হয় নাই। খানিতে গ্রন্থকার প্রায়ই মহাভারতের সরণ করিয়াছেন।"

কর্ণার্জুন

কর্ণার্জুন পাঁচ অঙ্কের নাটক। অভিনয় শনিবার, ৩০ জুন, ১৯২৩; ১৫ আষাঢ়, ১৩৩০। কুশীলবগণে ছিলেন ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় (নরেশ মিত্র (ব্রাহ্মণবেশী শ্রীকৃষ্ণ ও নাট্যকার ও ম্যানেজার অপরেশ মুখো স্বয়ং (পরশুরাম), তুলসী চক্রবর্তী চার্য), প্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত (দু অহীন্দ্র চৌধুরী (অর্জুন), দুর্গাদাস পাধ্যায় (বিকর্ণ) এবং তিনকড়ি

র্ণ)। মেয়েদের মধ্যে মনোরমা (কুন্তী), ভামিনী (পদ্মাবতী), নিভাননী (দ্রৌপদী) গরবালা (গৌরী ও সখী), নীহারবালা র্যাতি), ফিরোজাবালা (ভৈরবী ও সখী) মতিবালা, বেণুবালা, ননীবালা ও খুদী-বালা (সখীগণ)। প্রথম রাতের অভিনয়েই রা কলকাতা মেতে উঠেছিল, দর্শকরা ও রসিকরা যেন এতদিন ধরে এরই প্রতীক্ষায় ছিলেন।

নাটকের শুরুতেই কর্ণ উদীয়মান সূর্যের বন্দনায় রত। ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র হঠাৎ এক শূদ্রের ছায়া মাড়িয়েছেন বলে অগ্নিশর্মা ভীত শূদ্র যখন কর্ণের শরণাগত হলেন, কর্ণ বলছেন, এই দেহমাংস পেশী শোণিত, আর এর অন্তরালে যে প্রাণ—তা ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদ শূন্য।' অস্ত্র চালনার পরীক্ষা ভূমিতে ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য অর্জুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদ্যত কর্ণকে জাত তুলে অপমান করছেন 'হীন কুলোদ্ভব, তোমার এ অসম সাহস অমার্জনীয়।' দুর্যোধন তাঁকে বসালেন অঙ্গদেশের সিংহাসনে—অর্পণ করলেন রাজসিক বর্ণ। সেই মুহূর্তে কর্ণও প্রত্যর্পণ করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ ধন 'আমি আজ হতে এ জীবন তোমাকে উৎসর্গ করলাম।' এ যেন প্রাণদানের বদলে জীবনদান।

আর গ্রাম গোষ্ঠীও যে ঠিক মণি-মাণিক্য খচিত তা নয়। তরাইয়ের পাদদেশে, আজকের উত্তর বিহার ও উত্তর বাংলার অনগ্রসর অংশে, কর্ণকে নিশ্চয়ই নিতে হয়েছিল আরণ্যক উপজাতির দায়দায়িত্ব এবং
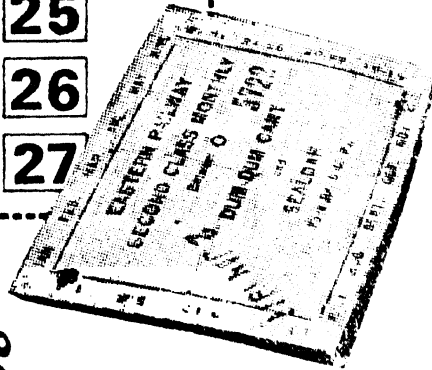
কৃষি বিস্তারের পরিকল্পনা। প্রত্যন্ত প্রদেশ অঙ্গে তাঁর অভিষেক তাই তাৎপর্যপূর্ণ। বেশী করে আরও কেননা দুর্যোধনের প্রণয়ের প্রতিদান দিতে তাঁকে জীবনের মোটা অংশ হস্তিনাপুরকে কেন্দ্র করে ব্যয় করতে হয়েছে।

পঞ্চাল স্বয়ম্ভর সভায় দ্রৌপদী মুখের উপরে কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করলেন, আবার সেই জাত ও পাত 'দ্রাতৃপ্রতিজ্ঞা বশে সূতকে বরণ করবার পূর্বে আমি অনলে জীবন বিসর্জন দেব।' কর্ণ সামর্ষ হাস্যে ধনুর্বাণ ও সভা উভয়ই পরিত্যাগ করলেন। কোন ক্ষোভ দেখালেন না, চূড়ান্ত অপমানে শিভালরির পরাকাষ্ঠা।

অপরদিকে অর্জুন এর তুলনায় হীনমন্যতা, অশোভন ব্যবহার ও বাক্য, ক্ষুদ্র চালাকি ও অসহিষ্ণুতার প্রতীক। হস্তিনাপুরে অক্ষক্রীড়ায় যখন দ্রৌপদীর বিবস্ত্র অপমান, অর্জুনের অবদান অপরেশবাবুর বইতে পরিষ্কার তুলে ধরা হয়েছে। পাশা খেলার আহ্বান নিয়ে বিদুর যখন ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করছেন, নিমন্ত্রণ কি নেব। অর্জুন উত্তর এড়িয়ে গেলেন, 'আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনি রাজা আমরা আপনার অনুগামী ভৃত্য।' দুর্যোধন দ্রৌপদীকে আপন উরু দেখিয়ে অশোভন ইঙ্গিত করছে, দুঃশাসন করছে কেশাকর্ষণ, অর্জুনের মুখে রা নেই। কর্ণ কেবল তাঁকে স্মরণ করাচ্ছেন, 'হে ফাল্গুনী, আজি কোথা সে বীরত্ব তব?' অন্ধকে অন্ধ বা খঞ্জকে খঞ্জ বললে তার মনে বড় লাগে। অর্জুনও দর্প করে জ্বলে উঠলেন, 'বীরত্ব বৈভব সমর্পণ করিয়াছি জ্যেষ্ঠের চরণে (এই অংশটুকু কৈফিয়ৎ), কিন্তু শোন দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা আমার—নিজ হস্তে পশুবৎ বধিব রে তোরে...সূতবংশাধম।' আবার জাত তুলে গাল।

শ্রীকৃষ্ণের কূটনৈতিক চাল ও চালাকি সারা কুরুক্ষেত্রকে বেড়ে রেখেছে। কর্ণকে অন্যায়ভাবে বধ করানোর সমস্ত পরিকল্পনাই তাঁর। তাই অপরেশবাবু কর্ণবধের প্রাক্কালে তাঁর মুখে দিয়ে বলাচ্ছেন, 'ভারত যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব না; কিন্তু সমস্ত অস্ত্রের ধার মুখে আমি।' অপরদিকে মহামৃত্যুর পূর্বে কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত ও নিরস্ত্র করেছেন। তবুও ধর্মরাজ বলছেন, 'আরে হেয় রাধেয়!' কর্ণের প্রত্যুত্তরে উত্তাপ নেই, আছে আশা ও আদর্শ। 'জান এক কথা—হীন আমি রাধার নন্দন, ক্ষত্র হয়ে আর নাহি জান কিছু? ...বীর্যবলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি ভেদ, ধরা হতে করিব নির্মূলে।'

রথের চাকা লড়াইয়ের ময়দানে বসে গেছে, কর্ণ নিরস্ত্র হয়ে নেমেছেন, দু' বাহুবলে চাকা টেনে তুলবেন। শ্রীকৃষ্ণ উস্কাচ্ছেন, 'অর্জুন, এইবার যুধিষ্ঠিরের অপমানের প্রতিশোধ নাও।' যুধিষ্ঠিরকে হাতে পেয়েও কর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন, কেননা কুন্তীকে কথা দেওয়া ছিল অর্জুনেতর কোন পান্ডবের বিনাশ তাঁর হাতে হবে না। কর্ণের নাকি এটিও একটি দুষ্কর্ম। অর্জুনকে তাতাবার পক্ষে এটিও একটি কলকাঠি। 'প্রতিজ্ঞা আমার কর হে স্মরণ, পশুসম সংহারিব তোরে।' বীর পুঙ্গবের এই বাণীর সাথে অর্জুনের হাতে কর্ণের অন্যায় মৃত্যু। প্রলেপ দিতে শ্রীকৃষ্ণের বাণী 'একমাত্র সেইজন পারে রোধিবারে নিয়তি শাসন, যেইজন নারায়ণে কর্মফল করে সমর্পণ।'

কর্ণ

কর্ণের কথা আলোপনে যেতে চাই আমার আরও শৈশবে। সবে পাঠশালা ছেড়েছি। বাবা একখানা বই উপহার দিলেন। বললেন, মন দিয়ে পড়বে—মহাভারতের শিশু সংস্করণ। এর থেকে প্রথম শুনলাম 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে', অর্থাৎ ভারতবর্ষের তাবৎ জানবার সবই মহাভারতে পাবে। আরও জানলাম অঙ্গীকার মানে সত্যবদ্ধ হওয়া এবং মান-প্রাণ সবকিছুর বিনিময়ে তা পালন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই কথাটা মহাভারতে অনেকভাবে বলা হলেও কর্ণচরিত্রে যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখান হল। আমার মহাভারতে ছিল গুরুজন ও অনারেবল চরিত্রদের জন্য সম্মানসূচক সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার যেমন তিনি, তাঁহারা, করিলেন, দেখিলেন ইত্যাদি। পান্ডবরা সেই দলে। বাকীরা ইতরজন সে ও তাহারা, করিল ও দেখিল; কৌরবরা স্বভাবত দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে কর্ণও। মহাভারতের আধখানা পড়ার পর কর্ণের প্রতি সহানুভূতি ও আত্মীয়তাবোধে মন এত আচ্ছন্ন হল যে নতুন বই-এর যেখানে কর্ণ আছেন সেখানেই 'সে' কেটে তিনি ও 'করিল' কেটে করিলেন বসালাম। ইতিহাস বা কাহিনী তো তাঁকে অনেক অবিচার করেছে। আমি তো আমার কাঁপতে খানিকটা শুধরে দিলাম।

কর্ণচরিত্রের সর্বাধিক বিস্ময়

সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্।

দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।

সদ্যজাত কর্ণকে যে মাতা কুন্তী নিজ হাতে ভাসিয়ে দিলেন, প্রথম ধাক্কায় সেটা অত মনে দাগ কাটেনি। হজরত মুসাকেও তো ফেরাউনের ভয়েতে জন্মেই ফেরারী বানিয়েছিলেন সদ্য প্রসূতা মাতা। তার ভিতরে অ্যাডভেঞ্চার ও রোমান্সের ভাবটাই বড় করে দেখেছিলাম। যার বদলে রোজ সকালে উঠে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে হোমটাস্ক নিয়ে বসা এবং দশটার ভিতরে চান করে ডাল-ভাত খেয়ে স্কুলের পথে পাড়ি দেওয়াটা নিতান্তই পদাতিক জীবন মনে হত। জলে ভাসানোর যে গর্হিত একটা দিক আছে সেটা উপলব্ধি হল ধীরে ধীরে। এবং সেই অবিচারের ফল কর্ণকে জন্ম থেকেই ঠেলে দিল ওধারে সমাজের নীচু তলায়। বর্ণাশ্রম সমাজ ও জীবনকে পাকে পাকে অজগরের মত বেষ্টন করে রেখেছে—এবং সুবিধা পেলেই শিং এবং খুরটুকু বাদ দিয়ে সব হজম করে ফেলবে। সে কথাই চোখে আঙুল দিয়ে কর্ণ দেখিয়েছিলেন : আমি যে জাতেই জন্মি না কেন, সেটা দৈবের হাত, আমার হাতে আমার পৌরুষ, আমার জীবনে ও প্রতিষ্ঠা।

মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা আন্দোলন, দাক্ষিণাত্যে হরিজনদের প্রবেশ নিয়ে তুলকালাম কান্ড, তফ জাতিদের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সংরক্ষণ সবই জাতের উপর পৌর প্রয়াসকে প্রতিষ্ঠিত করার কাহিনী। গোস্বামী যখন কংগ্রেস থেকে দলছ ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ মা নাজিমুদ্দীনের সাথে ভিড়ে গেলেন তাঁকে আইনসভায় পর্বেতন স অনেকই হিন্দু ভর্ৎসনা ও শ্লেষ মেরেছিলেন। গোঁসাই সেই অনুযোগ জন্য বর্ণহিন্দুর অহঙ্কার ও ঔদাসীন জাতের ও মুসলমানদের উপর সামা অর্থনৈতিক উৎপীড়ন, হিসাব যে দিনের বেশী দেরী নেই এমন অনে বলেছিলেন। সেগুলি আর্গুমেন্ট বা ম মোক্তার বা উকিলেরা হাকিমের কাছে করেন, হাকিমের এজলাসে বসেই আসে বা হাই ওঠে। মোক্ষম কথ গোঁসাই প্রতিপক্ষকে ছুঁড়ে মেরেছিল হল রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ ও কুন্তী' থেকে

কে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগে
কুলশীলমান হীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে। কেন চিরকা
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে

উঁচুজাতে জন্মাবার তকমা না কর্ণ আশৈশব পেয়েছেন লাঞ্ছ ও দ্রোণাচার্যকে গুরু মেনে অস্ত্রশিক্ষা নিতে গেলে, মানী ব্রাহ্মণ স্পষ্টই ব সৎব্রাহ্মণ বা শুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছাড়া কাউকে শিষ্য নেন না। স্বেচ্ছা নির্বাসনে কর্ণ মহেন্দ্র পর্বতে। পরশুরামকে গুরু কি কষ্টে, কি গ্লানিতে নিজেকে করেছিলেন ব্রাহ্মণ বলে। কিন্তু শেষ হল না। সূতপুত্র পরিচয় পেতে ব্রাহ্মণের ক্ষমা গেল ফুরিয়ে। তিনি শাপ দিলেন আপতকালে স্মৃতিভ্রংশ কোন মন্ত্র মনে থাকবে না।

কর্ণকে যখন সূর্য সনির্বন্ধ দিচ্ছেন সহজাত কুণ্ডল না জন্য। তখন কর্ণকে দেখি রাম সীতাবিসর্জনোদ্যত রামচন্দ্রের মহিমান্বিত। প্রাণ তুচ্ছাতিত কীর্তিই হচ্ছে মহাধন 'কীর্তির্যাং প জহ্যাম্'। কুন্তীর প্রতি কর্ণকে ঋজুবাক, কিন্তু মৃদুবাক্ নয়। অধ্যাত্ম সাহিত্যে আছে আর্জব মার্দব—দুইয়ের সমন্বয়ই বোধ হয় সম্পদ।

'বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া' কর্ণ কায়া ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ বাঙ্গালীর হৃদয় সাগর থেকে সমুত্থিত, মহাভারতের মহাসমুদ্র থেকে নয়। 'যে পক্ষের হবে পরাজয় সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কর না আদেশ।' প্রতাপাদিত্য থেকে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত সব বাঙ্গালীই তো কর্ণের দলে। মহাভারত তথা সর্বভারতের প্রতিকূলতায় যখন পটের রং ধূসর হয়ে এসেছে, তখন তাদের পৌরুষই তো আলোর ছটা ছড়িয়েছে। কর্ণের এই পৌরুষ ও অপাংক্তেয়তাকে তাই বাঙ্গালীরা সুযোগ পেলেই অনুরক্তির রংয়ে রঙ্গীন করে।

মহাভারতের কর্ণের প্রতি তাই আমাদের আকর্ষণ দুর্বার—তাঁর জটিলতা ও রহস্যময়তা আছে বলেই। এই জটিল চরিত্রে যে নীচাশয়তা মোটেই নেই সে কথাই বা বলি কি করে? দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করার প্রথম আদেশ কর্ণই দিয়েছিলেন। এই অসম্ভাব্যতায় দুঃশাসন লজ্জায় নিশ্চুপ : ব্রীড়িতং সমুপাবিশৎ। কর্ণও বিমন, তখনই দুর্যোধনের বাম উরু প্রদর্শন : অভ্যুৎস্ময়িত্বা রাধেয়ং সব্যম্ উরুম্ অদর্শয়ৎ।

অভিমন্যু বধ কি কর্ণের চরিত্রে চাঁদের কলংক? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তের দিনের দিন কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ও বৃহৎ বল কাছাকাছি লড়াইয়ের মাঠে। অভিমন্যু অমিতবিক্রমে সকলকে ব্যস্ত রেখেছেন। দুর্যোধনের আনন্দসুন্দর পুত্র লক্ষ্মণ সদ্য অভিমন্যুর তীরে নিহত হয়েছে। আর্ত দুর্যোধনের আর্তনাদ সবাইয়ের উদ্দেশ্যে, 'অভিমন্যুকে যে পার সামলাও, যমালয়ে পাঠাও, নইলে কারুর রক্ষা নেই।' দ্রোণাচার্য সর্বাধিনায়ক। কর্ণের প্রতি তাঁর বিশেষ আদেশ, 'কিশোর এই বীরের বর্ম অচ্ছেদ্য। ওর গায়ে শর নিক্ষেপ করা বেকার, বরং অশ্বরজ্জু ছিন্ন করো এবং পিছন থেকে আঘাত হানো।' যুদ্ধের প্রথম দশ দিন ভীষ্ম সেনাপতি ছিলেন। তাঁর সাথে নানান কারণে কর্ণের মতভেদ ও অপ্রীতি; পাছে তাঁকে অসম্মানন্য করতে হয় কর্ণ যুদ্ধেই যোগ দিলেন না। দুর্যোধনের প্রতি বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতেই হোক আর অধিনায়ক দ্রোণের আজ্ঞা শিরোধার্য করেই হোক কর্ণ যদি অভিমন্যু বধে হাত লাগিয়েই থাকেন তাঁকে দোষ দেবার যথেষ্ট উপকরণ কোথায়?

জাতে মারা ছাড়া কর্ণ অনেক মার খেয়েছেন আপন পৌরুষ ও শিভালরির জন্য। ব্রাহ্মণ ইন্দ্র এসে তাঁর কাছ থেকে সহজাত কবচ কুণ্ডল চেয়ে নিয়ে গেলেন। নইলে তো যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অপরাজেয় থাকার কথা। কুন্তীর কাছে তিনি প্রায় উপযাচক হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন পাণ্ডবদের একজন বই দ্বিতীয়কে মারতে যাবেন না। সপ্তরথীর মার যদি অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ হয়, কর্ণকেও তবে ছয়টা ফাঁস দিয়ে ধীরে ধীরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। তাই অপরেশবাবুও বলেছেন :

'একা অর্জুনের সাধ্য কি
কর্ণকে বধ করে!..দেখি ইন্দ্রকে
দিয়ে যদি কবচকুণ্ডল
ভিক্ষা করাতে পারি। কুন্তী!
তুমি, আমি, ইন্দ্র, মেদিনী,
রামের অভিশাপ ও অর্জুন
এই ছয়জনের দ্বারাই কর্ণ বধ হবে।'

সত্যি কথাবলতে কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তথা মহাভারতের ঘটনাপ্রবাহে মিথ্যাচার, প্রতারণা, অর্ধ সত্যতা ও কপটতার কমতি নেই। ভীষ্মকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে, তাই নপুংসক শিখণ্ডীকে রথের সম্মুখে উপস্থাপনা. দ্রোণাচার্যকে হত্যা করা দরকার, নাম সাম্যের সুযোগ নিয়ে হস্তীর মৃত্যু তাই পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যুরূপে ঘোষণা; ভূরিশ্রবার মত মহাবীর ডান হাত হারালেও পাণ্ডবরা নিশ্চিন্ত মন, তাই তিনি যুদ্ধ সংবরণ করে যখন ধ্যানে উদ্যোগী তখনও সাত্যকীর হাতে তাঁর হীন হত্যা; মাটির বুকে রথচক্র বসে গেছে, নিরস্ত্র কর্ণ দু হাতে চাকা টেনে তুলছেন তখনই তাঁর শেষ অর্জুনের শরে। পাণ্ডবদের উপর বড় অন্যায় ও অত্যাচার অনেক হয়েছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যখন হিসাব মেলাবার সময় এল, তখন ধর্মের ঋজু পথ ও শিভালরির গৌরব ক্রমে ক্রমেই ছেড়ে গেল। বিশেষত দশ দিন বাদে ভীষ্ম যখন শরশয্যায় পড়লেন।

সেই পটভূমিতে কর্ণ বীর এবং উন্নত শির। তাঁর চরিত্রের যে সব গুণ তাঁকে সাধারণে প্রিয় করেছে—অতিথি বাৎসল্য, ঔদার্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, বন্ধুপ্রণয়ে অবিচলতা—যুদ্ধের ডামাডোলেও তার বিশেষ লাঘব ঘটে নি। তিনি দাম্ভিক এ কথাও সত্য। তাঁর দম্ভ পৌরুষের, প্রার্থীকে নিঃশেষে দান করবার এবং কথা ও বন্ধু পালনের।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মুখে কৃষ্ণ... বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর জীবন থাকতে নয়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মুখে কৃষ্ণ স্বয়ং হস্তিনাপুর গেলেন সসম্মান শান্তি দৌত্যে। দুর্মতি দুর্যোধনের গোঁয়ারতুমিতে সব প্রস্তাবই ভেস্তে গেল। আসন্ন সর্বনাশের সংকেত দিয়ে কৃষ্ণ যখন কুরুসভা ছাড়লেন, তখনও একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলেন। কর্ণকে বললেন, 'আমাকে একটু রথ পর্যন্ত এগিয়ে দাও.' তারপর পথে যেতে যেতে, 'তোমায় ভারতবর্ষের সম্রাট করব, পঞ্চ পাণ্ডব তোমায় দেবে অসপত্ন ও শর্তহীন আনুগত্য। অহং ত্বাং অভিষেক্ষ্যামি রাজানং পৃথিবীপতি। নিজ হাতে আমি তোমার অভিষেকে পুতোদক ঢালব।' কর্ণ কিন্তু অবিচল ও আপন বিশ্বাসে অটল :

'ন পৃথিব্যা সকলয়া
ন সুবর্ণস্য চরাশিভিঃ
হর্ষাৎ ভয়াদ্বা গোবিন্দ
মিথ্যাকুর্তং তদুৎসহে।

হে গোবিন্দ, মিথ্যা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, মিথ্যাই লোভ। সারা দুনিয়া বা দৌলৎ কোনটার জন্যই দুর্যোধনকে ছাড়ব না। যদি ছাড়ি, চরম অধর্ম হবে।' কর্ণ ঘরভেদী বিভীষণ নন যে আপৎকালে দলবদল করবেন। নেতাকে তিনি কখনই ছাড়েন নি, কৌরব পক্ষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাঁর জীবন থাকতে নয়।

কৃষ্ণের সঙ্গে কর্ণকে দেখি দেবদুর্লভ শক্তির অধিকারী—কারণ অর্জুনের মত বিশ্বরূপ না দেখেও কর্ণ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। কৃষ্ণকে কথা শোনাচ্ছেন : 'কি করে তুমি ইতিহাসের গতিরোধ করবে? বৃথাই আমাকে পাণ্ডবদের দলে টানার চেষ্টা করছ। বিশ্বজগতের বিনাশ সমুপস্থিত, যে পক্ষে তুমি ও অর্জুন, সেই পক্ষের জয় অবশ্যসম্ভাবী।' কর্ণ আত্মদোষদ্রষ্টা, তাই তাঁর মুখে শুনি : এই বিশ্ববিনাশের নিমিত্ত শকুনিরহং—শকুনি ও আমি।'

বরং কর্ণের সঙ্গে রাবণের চরিত্রের কিছু কিছু আদল আসে। তবে রাবণ রাক্ষস হলেও উপবীতের অধিকারী এবং বর্ণে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকৃত। কর্ণের মত অন্ত্যজ নয়। জন্মে কৌন্তেয় হলেও পরিচিতিতে রাধেয়, আদিতে সূত, অধুনা তপশীলী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীঅধিরথ ও শ্রীমতী রাধার সন্তান। রাবণের ঐশ্বর্যের সীমা নাই, তাঁর সোনার রাজ্য তিনিই ছারখার করলেন আপন হঠকারিতায়, কর্ণ কিন্তু দৈবের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েই চলেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খৃষ্ট প্রাপ্তির নূতন আনন্দে ও উগ্র ইংরেজানবিশীর আতিশয্যে বলেছিলেন, খোশ মেজাজী খৃষ্টান ছোকরা হিসাবে আমার ভারী বয়ে গেল হিন্দুয়ানীতে কি আছে। তবে হ্যাঁ বাপ-দাদাদের যে সব পৌরাণিক লেখা আর দেবদেবীর গল্প আছে সেগুলি আমি খুবই ভালবাসি।' আরও পরিণত বয়সে যখন তিনি স্বদেশের কমলবনে আবার ফিরে এলেন তখন রামায়ণ নিয়ে লিখলেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বাংলা ভাষার চিরন্তনী এক গাথা। মেঘনাদ বধ কাব্য। তার নাম সেখানে রাম ও লক্ষ্মণের দেব মাহাত্ম্যকে ছাপিয়ে অনেক বিরাট ও উদার দুই চরিত্র আঁকা হল রাবণ ও মেঘনাদ, যাঁরা জাতিতে রাক্ষস। যদি মহাভারতকে নিয়ে লেখার মত মধুসূদনের সময় ও সুযোগ হত তবে কি তিনি কৃষ্ণ ও অর্জুন এই জুটির ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানান চালাকি ফুটিয়ে তুলে জাতহীন, নিঃসঙ্গ, দারুণ অভিমান, দারুণ তেজী কর্ণকে নিয়ে মহাকাব্য লিখতেন না? অপরেশবাবু কর্ণার্জুনে তারই খানিকটা আভাষ ও আদল আনে বলেই কি নাট্যপিপাসু ও পাঠককুলের এত প্রিয় হয়েছিল?

সুনীতি বাবুকে জীবনানন্দ দিয়েছিলাম : সুকুমার সেন

শাণ্ডিল্য
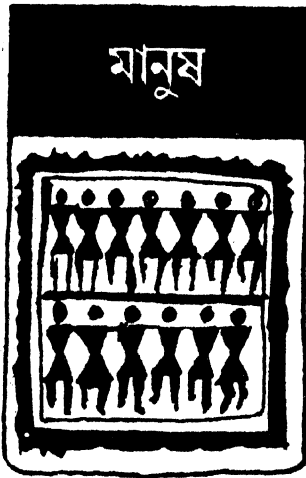
আমার গ্রন্থ উৎসর্গ করেছি
আমার বাবাকে
আমার মাকে
আমার স্কুলের শিক্ষককে

তাতে কি হল?

তাঁদের উদ্দেশে আমার এটিমোলজিক্যাল ডিকসনারিটা উৎসর্গ করেছিলাম। লোকে উৎসর্গের পাতাটাই পড়েনি। কেউ পড়াশোনা করে? সঅব ডকটরেট হচ্ছেন। হুঁউম, ডক্টর্যাট! কি গালভরা নাম। কিস্সু জানেনা, যত্তোসব মুর্খ।

মুর্খ বলবেন না স্যর, বলুন মুখস্থ করে...। কথাটা শেষ হল না,

মুখস্থ করে মানে? তাহলেও তো জানতাম কিছু জানে। টুকে। স্রেফ এ বই ও বই থেকে টুকে, এক হাতে ঢাক আরেক হাতে ডেলী পেপার বাগিয়ে বেমালুম বেরিয়ে যাচ্ছে। দাও একটা সংস্কৃত প্যাসেজ। জিজ্ঞেস করো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শব্দরূপ। ব্যাস, হয়ে গেল। তখন দৌড় কাকে বলে দেখবে। মুখস্থ করে সব স্কলার। দুন্দুরে, কিস্সু জানে না। ছিয়াত্তর বছরের ডঃ সুকুমার সেন এবার চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি বসলেন। শীতকালে এ বয়সে এম্নিতেই মানুষের মেজাজ ভালো থাকে না। তখনও দুপুরে খাওয়া হয়নি। তার ওপর ঘন্টাখানেক আগে সুনীতিবাবু আমার ইন্টারভিউ নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। কি কথা বলেছেন ভগবান জানেন, তবে বিষয় ছিল প্রেম একথা শোনা অব্দি আমি সামনের চেয়ারে পুরো জলছবি হয়ে সেঁটে আছি।

কবিতার প্রসঙ্গে বললেন---আমি একবার স্যারকে বলেছিলাম (মানে সুনীতিবাবু) আধুনিক কবি জীবানন্দের!) কবিতা পড়ুন। তো স্যর একদিন জীবানন্দ দাশের (জীবনানন্দ?) কবিতার বই নগদ ছ' টাকা দিয়ে কিনে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ছদিন বাদে জানালেন, ওহে, তুমি কি বই কিনতে বললে, পুরো পয়সাটা বরবাদ হয়ে গেল।

এবার গলার স্বরটা একটু নামিয়ে বললেন—চুপি চুপি একটা কথা বলি---আমিও কবিতা লিখেছি। শনিবারের চিঠিতে।

—সত্যি! কপি আছে নাকি?

নাহ্, কোথায় এখন তাকে খুঁজি।

কবিতাটা পেলে পাঠককে উপহার দেওয়া যেতো। তার বদলে উনি আমাকে যে 'মেঘদূত' উপহার দিয়েছেন তার আক্ষরিক অনুবাদের লাইন তুলে দিচ্ছি—সেখানে১ প্রিয়তমের বাহুপাশ-শিথিলতায় মুক্ত৩ নারীদের২ প্রেমক্রীড়াজনিত৫ দেহ-খেদ৪ দূর করে১০--সুতায় ঝুরি-গাঁথা৯ তোমার আচ্ছাদমুক্ত৪ উজ্জ্বল৭ চন্দ্র-কিরণের৯ উৎসাহ পেয়ে৮--স্পষ্টভাবে জল-বিন্দু বর্ষণ করে ১১ চন্দ্রকান্ত-মণি১২।। (শ্লোক—৬৭)

●

: অবসর সময় আপনার কাটে কি করে?

—ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে। ওটাই আমার লেখা প্রেরণা নেশা।

: কি পড়েন বললেন?

—কেন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে নেই? লোকে মদ ভাঙ গাঁজা সিগ্রেট নেশা করে। ওসব আমার নেই, আমার ঐ এক নেশা। ওর মধ্যে কোন চর্বিতচর্বন নেই। নিতানতুন থ্রিল। নতুন মাল মশলা।
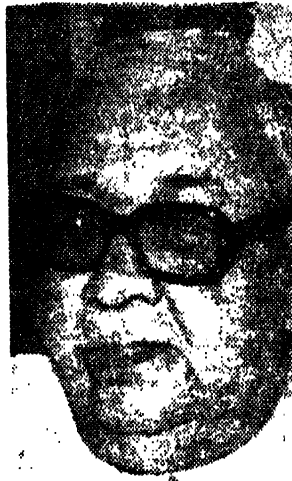
সুকুমার সেন

: আর আজকালকার গল্প?

রবীন্দ্রনাথ পড়ার পর, ওসব পড়তে আর ইচ্ছে করে না। সেই তো থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়। ঘেন্না ধরে গেল, বিদেশী উপন্যাস পড়ে ওসব আর ছুঁতে ইচ্ছে হয়?

: শুনেছি আপনি গল্প লেখেন?

—দেখুন, নিজের বলে বলছি না, আমার গল্পের বই যদি পড়ে দেখেন, দেখবেন সত্যি ভাল জিনিস। তবে কি জানেন, ভাল জিনিসের দাম আজকাল কেউ দেয় না। গল্পগুলো লেখা কালিদাসের সময়ে। প্রায় কালিদাসকে ডিটেকটিভে এনেছি। দুর্ভাগ্য, কেউ পড়ল না। ভালো জিনিসের কদর আজকাল নেই। অথচ এ বই পড়লে লোকে জানতে পারত, কালিদাসের সময়কে। সংস্কৃত ভালবাসলে সংস্কৃতকে। জানতে পারতো সে সময়ের তথ্য।

: সংস্কৃত কবিতা লেখেন বলে শুনেছি!

—তা লিখি। সুনীতিবাবুর আগে থেকেই লিখি।

ডঃ সেন বিশ্বরূপার গলিতে [illegible]সাগর ভবনে কো-অপারেটিভ ফ্ল্যাট [illegible]কনেছেন। তবে মন পড়ে আছে বর্ধমানে। মুকুন্দরামের পাশের গ্রাম, এখনো পাল্কী করে যেতে হয়। চাষবাস আছে দেশের চাল আসে, তার স্বাদই আলাদা। দেশের বাড়িতে ভাই-ই দেখাশুনো করে। আর বর্ধমানে শহরের বাড়িতে আমার ছেলে মাঝে মাঝে গিয়ে রেফারেন্সের বইগুলো নিয়ে আসে। আজকাল আর তত রেফারেন্স দরকার হয় না। মাথায় আঙুল খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন---এই মাথার মধ্যে, মনের মধ্যেই আজকাল রেফারেন্স থাকে।

●

নব্বুইভাগ লোক পই পই করে সাবধান করে দিয়েছিনলন, ওখানে যেও না, ইন্টারভ্যু দূরের কথা দেখলেই খেপে যাবেন। এমন কি কার্যকরী সম্পাদকের সামনে পর্যন্ত এক সাহিত্যিক একথা আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন ফিরে এলুম, তখন তাঁর দেয়া 'মেঘদূত' উপহার আমার হাতে। গোটা গোটা অক্ষরে লিখলেন---শ্রীমান্ (যা আজকাল কেউ লেখেন না) এবং সই করলেন শ্রীসুকুমার সেন। নিজের নামের আগে 'শ্রী' বসানো আজকাল আর প্রায় দেখা যায় না।

বাদল ॥ হীরক রায়

বাদল বলল, একটা ঝামেলায় পড়েছি কদম। আমার বউ বলে সব দোষ আমার। এখন বুঝতে পারছি কথাটা মিথ্যে নয়।

মিনিবাসটা তখন সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ পার হচ্ছে। কদম তাকিয়ে দেখল পেছনের সিটে এক ভদ্রলোক তার পাশের ভদ্রমহিলার হাত ধরে বসে আছেন। ও কিছু বুঝতে না পেরে বলল, তার মানে?

বাদল বলল, বুঝলি না?

কদম বলল, না।

—ভদ্রলোক কেমন হাত ধরে বসে আছে দেখেছিস। শালা গদগদ প্রেম। এটাতো আমি পারি না। শনিবার হলেই বউকে নিয়ে সিনেমা যাওয়া, হাত ধরে হাঁটা, ট্যাক্সিতে উঠলেই হাত বাড়িয়ে দেওয়া—এসব ন্যাকামী আমার একদম আসে না। অথচ বেশীর ভাগই এরকম করে। আমার বউও এরকম চায়। কিন্তু সে তো এ দেহে হবে না।

কদম জানে বাদলের ব্যাপারটা। বাদলের বউই বহুদিন ওকে বলেছে, জানেন, আপনার বন্ধু বাবা-মার ছেলে হিসেবে ভাল, বন্ধু হিসেবে চমৎকার, বোনেদের খুব আদরের দাদা, পাড়ার লোকের বড় আপনজন, কিন্তু স্বামী হিসেবে একেবারে যাচ্ছেতাই।

—কদম বলল, তা বললে তো হবে না বাছাধন। একটু আধটু ওরকম করতেই হবে। তা নইলে রাতে পাশে শুতে দেবে না মনে রেখ।

বাদল এপাশ ওপাশ তাকিয়ে বলল, এই আস্তে কথা বল। এসব বেডরুমের কথা অন্যের শোনা উচিত নয়। একটু থেমে বলল এর মধ্যে একটা কাণ্ড হয়েছে, জানিস!

কদম বলল, কি?

বাদল বলল, কয়েক দিন আগে মাঝরাতে হঠাৎ কানের মধ্যে সুড়সুড় করে উঠল। মনে হচ্ছিল কানের মধ্যে কি যেন ফরফর করে ঘুরছে। সঙ্গে একটু চিনচিনে ব্যথা। ঘুম ভেঙে গেল, ব্যথা আর কমে না। রুণা তখন ও পাশ ফিরে ঘুমচ্ছে। আমার তখন সাংঘাতিক অবস্থা। ব্যথা বাড়ছে, কানের মধ্যে সেটা ভয়ংকর ঘুরছে এ পাশ ও-পাশ। হঠাৎ মেজাজ গরম হয়ে গেল। ভাবলাম, আমি কষ্ট পাচ্ছি আর তুমি এভাবে আরামে ঘুমাবে এটা চলতে পারে না। টেনে একটা চড় মারতে যাচ্ছিলাম পিঠে। পিঠটা তখন আমার হাতের একেবারে সামনে। হাতটা তুলেছি এমন সময় ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল রুণা। বলল, কি হয়েছে! ওর চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। আমি বললাম, কানের মধ্যে কি ঘুরছে যেন। রুণা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তেল নিয়ে এল খানিকটা। ওর কোলের ওপর আমার মাথাটা টেনে নিয়ে কানে তেল দিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল চারপাশে। ব্যথাটা মনে হল কমে আসছে। আমি থ্যাংক ইউ বলে পাশ ফিরে শুলাম। পরদিন কি রাগ মাইরী। অন্য স্বামী হলে অত রাতে কানে তেল দেবার জন্য নাকি কত আদর করত। আমি একটা যাচ্ছেতাই।—আমি এসব শুনেছি আর ভাবছি চড়টা মেরে দিলে আরও কত যাচ্ছেতাই হয়ে যেত ব্যাপারটা।

কদম বলল, তা তুই রুণাকে কি বললি?

বাদল বলল, কি আবার বলব! বললুম, ন্যাকামী কোরো না তো। চুপ কর। ব্যস, ও এ্যানাসিনের বিজ্ঞাপন হয়ে গেল। আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলুম।

মিনিবাসটা তখন বাবুঘাটের কাছে পৌঁছে গেছে। কদম উঠে দাঁড়াল। বাদলও। কণ্ডাকটরকে বলল, বাঁধ বাঁধ। এখানেই নামবো।

একটু এগিয়ে মিনিবাস দাঁড়াল। ওরা নামল। তখন সন্ধ্যে সবে ঘনিয়েছে। শীত পড়েনি। কুয়াশাও নয় ধোঁয়াসা চারদিকে। লোকজন এদিকে কম। ওরা নর্থের দিকে এগিয়ে গেল। বাদল বলল, চল আজ প্যাগোডায় একটু বসবো। রংচং করেছে শুনেছি। দেখে আসি।

কদম বলল, তুই একটা গাধা। তাহলে এদিকে এলি কেন? প্যাগোডা দেখতে হলে ওপাশ দিয়ে যাওয়াই তো ভাল ছিল।

বাদল বলল, আরে ঠিক আছে বাবা। জলাদিকের রাস্তা দিয়ে চলে যাবো। তুই আয় তো। আমাকে রাস্তা চেনাস না।

সহজে-সুপুরুষ!
TF
ঠাকরসী ফ্যাব্রিক্স
TF
everfresh® DOUBLE EDGE easycare® easylene®
67% Terene, 33% Cotton

কথে বলাটা বোধ হয় ভাল হচ্ছে না। কৈ কদম তো কিছু বলছে না। কেন? ওর কি গোপন এসব ঘটনা নেই নাকি! তাও হয়!

কদমও চুপ করেছিল। কদম মনে করে, মানুষকে চুপ করে থাকতে দিতে হয়, বিশেষ করে মানুষ যখন কোন সমস্যায় পড়ে। চুপ করে না থাকলে এক মনে চিন্তা করা যায় না। আর একমনে চিন্তা করতে না পারলে সমস্যার সমাধানও পাওয়া যায় না। বাদলের সমস্যাটা এমন কিছু নয়। স্বভাবের বিশেষ করে অভিব্যক্তির একটু রদবদল করলেই এটা মিটে যেতে পারে। কিন্তু জোর করে বাদলের ওপর কিছু চাপানো যাবে না। কদম জানে তাতে ফল ভাল হবে না।

বাদল ভাবছিল, কোথায় গেল সেই সব দিন! আরও বেশী করে সেইসব দিনের কথা মনে পড়ছে আজ কদম পাশে থাকাতে। কলেজে থাকতেও এমনি একটা গাছের নিচে বসে ও আর কদম ঠিক করতো কলেজ সোস্যালে কে কে আসবে। কেউ জানতো না ও আর কদম ছাড়া। তখন কত পরিচিত। কত কাজ, কত খেলা। এত কিছুর মধ্যেও মনে কোন চিন্তা থাকতো না। এখন সব গেছে। সেই বিরাট সংখ্যায় পরিচিত জনেরা হারিয়ে গেছে। কাজ একটা অফিসের সময়ের ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে। মনের সেই শান্তিটাও আর নেই।

কদম—অনেকক্ষণ পর বাদল ডাকল।

কদম কোন উত্তর দিল না। চোখ তুলে বাদলের দিকে তাকাল।

বাদল বলল, এইরকম গাছের নিচে আমরা কলেজ ছাড়ার পর আর বসিনিরে! সেই দিনগুলো যে কোথায় গেল!

কদম হাসল। অস্পষ্ট আলোতেও ওর দাঁত স্পষ্ট দেখা গেল। বলল, দিন যায় দিন আসে। বছর যায় বছর আসে। যে গাছটার নিচে আমরা বসে আছি আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন এরও বয়স কম ছিল। এখন শিকড় অনেক গভীরে। আমরাও তো শিকড় গেড়েছি। আমার নন্দা, তোর রুণা।—এই শিকড় ছিঁড়ে আর কি যাওয়া যায়! সেই দিনগুলো চলে গিয়ে এই শিকড়গুলো আমাদের গছিয়ে দিয়েছে।

বাদল বলল, তা নয়। আমি সেসব কথা বলছি না। আমি বলছি, কত তাড়াতাড়ি আমরা পাল্টে গেলাম। অভ্যাস, স্বভাব সব। —একটু থেমে বলল—কত তাড়াতাড়ি আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম।

কদম বাদলের কথা শুনেছিল। শেষ কথাটা ওর কানে যেন ধাক্কা খেল। কানের পাশে কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালে দেখা যায়। যতবারই আয়নার সামনে দাঁড়ায় ততবারই ওর বয়সের কথা মনে পড়ে। বাদলের কথা শুনে ও যেন চোখের সামনে ওর কানের নিচের রুপালী চুল কটাকে দেখতে পেল। ও প্রতিবাদের ঢঙে বলে উঠল, না না, এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হব কেন? একটু কলপ দিলেই আমরা আবার যুবক হয়ে উঠতে পারি। বুড়ো হতে এখনও আমাদের অনেক দেরী।

বাদলের হাসি পেল। ও বুঝতে পারে নিজেকে বুড়ো ভাবতে কদম ভয় পায়। অথচ আর তো দেরী নেই। হাতের নাগালের মধ্যে এসে গেছে রোগ, শোক, মৃত্যু। চাল্লশ বছর বয়সটা মানুষের সবচেয়ে মারাত্মক সময়। এ সময়েই স্বজনেরা চলে যায়, শরীর থেকে চলে যায় প্রতিরোধ ক্ষমতা, বয়সটা হঠাৎ লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসে।—এই চাল্লশ বছর বয়সেই বাদল মৃত্যু, শোক, রোগে এই পৃথিবীর সব বোধকে চিনে নিয়েছে। এসব এখন আর নতুন করে দাগ কাটবে না। প্রথম ঝড়টা বড় মারাত্মক, কারণ একদম অচেনা। এখন যত ঝড়ই আসুক—সবই তো পরি-চিত। হয় ভাঙবে, দুমড়ে দেবে, নয়তো শাকা মেরে চলে যাবে। আর তো কিছু নয়!

বাদল বলল, কদম তুই কাউকে কখনও মারা যেতে দেখেছিস।

কদম বলল, না, মারা যাবার পর দেখেছি।

বাদল বলল, আমি একবার দেখেছি। সবাই বলে মৃত্যুযন্ত্রণা, সবাই বলে নিঃশ্বাসে বড় কষ্ট পায়। সেবার একজনকে মরতে দেখে আমার কি মনে হল জানিস—আমার মনে হল কোথাও যাবার জন্য ওর যেন ভীষণ তাড়া। ছটফট করছে। আমাদের কোথাও যাবার তাড়া থাকলে যেমন ছটফট করি ভেতরে ভেতরে—শুয়ে শুয়ে দেহটা সেরকম ছটফট করতে করতে একদম থেমে গেল। আমরা সবাই দেখলাম সে চলে গেল। সে নিস্পন্দ। কিন্তু তার যাবার রাস্তাটা আমরা কেউ দেখতে পেলাম না। কদম, ওই রাস্তাটা কেউ চিনিয়ে দেবে না। আমাদের সকলকেই খুঁজে নিতে হবে।

অনেকক্ষণ ওরা কেউ কোন কথা বলল না। স্থির ছবির মত বসে রইল। আকাশে তখন শুক্লপক্ষের চাঁদ। একটা গাছের ছায়া ওদের চোখের সামনে। ঝিলের জল এখন অনেক স্পষ্ট।

কদম কব্জি উল্টে ঘড়িটা দেখল। বলল, আরে সাতটা বাজতে চলল। আর একটু বসবি, না উঠবি।

বাদল বলল, কেন তোর কোন তাড়া আছে।

—না, তাড়া ঠিক নয়। নন্দা বলেছিল একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে।

বাদল আশেপাশের সবকিছু ভুলে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। একটু দূরে দিয়ে এক ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছিলেন ঘুরে বাদলের দিকে তাকালেন। বাদল তখনও হো-হো করে হাসছে। কদম বলল, কিরে, এরকম হাসছিস কেন?

বাদল বলল, এতক্ষণ বয়স, মৃত্যু সব নিয়ে আলোচনা করে অবশেষে কিনা বউ বলেছে তাই চললুম! এ বেলা তোমার বয়স বাড়ে না, না? এবেলাতো দিব্যি গুটিসুটি মেরে ছোট ছেলের মত কেটে পড়তে চাইছো।

কদম লজ্জা পেল, বলল, যাবই বলি নি তো। ও যেতে বলেছে তাই বললাম।

বাদল বলল, না না। আমি কি আটকে রেখেছি। একটু থেমে বলল, আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ভয় পাই।

কদম বাদলের কথা শুনে অবাক হল, বলল, কেন?

বাদল বলল, আমার মুখ দিয়ে ফস করে কথা বেরিয়ে যায়। আমার নিজের কানেই আমার খুব রূঢ় লাগে। ভালো কথা বলতে গিয়ে খারাপ কথা বলে ফেলি। আমি তাড়াতাড়ি ফিরলে রুণা তাড়াতাড়ি অশান্তি পাবে। তাই।

কদম বলল, তোর যেমন কথা! ঠিক আছে আমি রুণাকে জিজ্ঞাসা করবো।

বাদল খপ করে কদমের হাত ধরল, বলল, তুই বল তোর বাড়ীতে বাসন মেজে দিয়ে আসবো, যা বলবি সব করবো। কিন্তু দোহাই তোর—রুণাকে এসব কথা বলিস না। আমার প্রেস্টিজ তাহলে পাংচার হয়ে যাবে। আমার সব ইগো ধুয়ে মুছে যাবে। ও কক্ষনো করিসনি।

বাদল চোখ তুলে একবার স্টেডিয়ামের দিকে তাকাল। তারপর বলল, জীবনে সবাই সব কিছু পারে না। আমার ফুল খুব ভাল লাগে, কিন্তু নিজে হাতে কোন গাছে একটা ফুলও ফোটাতে পারি নি। অন্যের সুখের সংসার আমার দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু নিজের সংসারের সুখ আমি নিজে ভিতোতে দিই নি। আসলে এ জীবনে ওটা আর হবে নারে! দেরী হয়ে গেছে। আর শুধরাবার সময় নেই।

কদম বলল, বাজে কথা বলিস না। একগুঁয়েমিটা ছাড়। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাদল হাসল। বলল, বেঠিক এখন কিছু হয়নি। শুধু বে-তাল হয়ে গেছে। ঠিক ঠিক মতই শুচ্ছি, বসছি খাচ্ছি। শুধু তালটা কেটে যাচ্ছে। বারবার, বারবার।

কদম কিছু বলল না। বাদলের দিকে তাকিয়ে রইল। বাদল আবার বলল, রোজ সকাল হয়। আর পাঁচজনের মতই আমি চোখ খুলি। খোলার মুহূর্ত থেকেই আমি সতর্ক হই— যাতে সকালে অন্তত রূঢ় না হই। কিন্তু অত্যন্ত অসতর্কভাবে কিছু ক্ষণের মধ্যেই মুখ ফসকে সেটা বেরিয়ে যায়।

কদম বলল, তুই আরও এ্যালার্ট হ। এরকম হবে কেন?

বাদল বলল, কদম, তুই নন্দাকে কখনও গালাগালি করিস নি?

কদম বলল, না।

—কখনও খারাপ কথা বলিসনি?

কদম বলল, না।

—কখনও রূঢ় কথা বলিসনি?

কদম বলল, না।

বাদল কদমের কাঁধে হাত রেখে বলল, সত্যি বলতো। লুকোবি না। তুই নন্দাকে এট-অল ভালবাসিস!

কদম চমকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল মানে?

বাদল ফিসফিস করে বলল, তুই জানিস না কদম ভালবাসার লোককেই শুধু রূঢ় কথা বলা যায়।

ঋত্বিক / অজিত দে

শেষ রাতের দিকে বৃষ্টি নেমেছিল। জোর বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটায় তড়বড়িয়ে নামছিল আকাশ থেকে। অবিরাম বর্ষণের শব্দের ভিতর গা ডুবিয়ে নিঃসাড় পৃথিবী নাগাড়ে ভিজছিল।

কখন প্রথম বৃষ্টি নেমেছে জানি না। একটু বেশি গাঢ় ঘুম আমার, সহজে ভাঙে না। অনেক পরে টের পেয়েছিলাম, চারপাশে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। ততক্ষণে আমার মাথা বুক ভিজে একসা। শিয়রে জানালা খোলা ছিল। গরমের দিনে বরাবরই খোলা থাকে। জানালা দিয়ে ফুরফুরে করে বাতাস আসে। মাথার চুলে বিলি কাটে। মনে হয় কেউ আলতোভাবে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তখন আবেশে চোখ বুজে আসে। বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পায়ে কখন এক সময় ঘুম আমার বোধের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে চলে আসে তারপর ঘুরঘুর, ঘুরঘুর... অবিরাম ঘুরে বেড়ায় আমার শিরায় শোণিতে মগজে।

জানালা দিয়ে ফুরফুরিয়ে আসা বাতাসের স্পর্শটুকুর সুখই আলাদা, একেবারে অন্যরকমের। সেই লোভেই জানালাটা খুলে রাখি। সেদিনও রেখেছিলাম। তাছাড়া, জানালাটা বন্ধ করার বিশেষ কোনো কারণও ছিল না। নীল ঝকঝকেই ছিল আকাশটা। তুলোর আঁশের মতো দু এক টুকরো মিহি সাদা মেঘ ছিল কি ছিল না—থাকলেও অন্তত চোখে পড়ার মতো তেমন কিছু নয়, বরং কাছে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নক্ষত্রের ভিতর দিয়ে এক টুকরো চাঁদও উঠেছিল শেষমেষ—পাতলা ফিনফিনে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে নিঝুম হয়ে আসা পৃথিবীটাকে ক্রমশ মোহনী করে তুলছিল, শুতে যাওয়ার সময়ও আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম।

তারপর কখন মেঘ জমেছে, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে জানি না। বৃষ্টির ছাটে ভেজা সপসপে শরীরে ঘুম চোখে উঠে আমি জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দুটো পাট একসঙ্গে ভেজিয়ে দেওয়ার সময় কাছাকাছি বাজ পড়েছিল কোথাও। সতীশ ঘরামির টিনের চালে একটা একটানা ঝমঝম শব্দ বৃষ্টির বেগের সঙ্গে ওঠানামা করছিল—হঠাৎই অন্ধকার চিরে একটা বিশাল আলোর ফ্ল্যাশ, সেই সঙ্গে চরাচর কাঁপানো ভয়ংকর আওয়াজ। পৃথিবীর সব শব্দ যেন কার প্রবল ধমকে মুহূর্তের জন্যে পালিয়ে গেল কোথাও তারপর আবার ফিরে আসতে লাগল একে একে—সতীশ ঘরামির টিনের চালেও বৃষ্টির শব্দ ফের একটানা বাজতে লাগল ঝমঝমিয়ে।

পরদিন ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। কানে ঝমঝম শব্দটা তখনো লেগে। কাঁচ:ব যেন কানের পর্দায় জড়িয়ে গেছে শব্দটা। ভেন্টিলেটারের ফাঁক-ফোকর দিয়ে কয়েকটা সরল আলোর রেখা এসে উল্টোদিকের দেয়ালে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে। ওপর থেকে সেই আলো চুঁইয়ে নামছে ঘর জুড়ে। আলোয় আক্রান্ত অন্ধকার নিচু হয়ে নামতে নামতে মিহি ধুলোর আস্তরের মত মেঝের ওপর ছড়িয়ে গেল। টেবিলের নিচে, তক্তপোষের তলায় বইয়ের র‍্যাকের আনাচে কানাচে কিছু অন্ধকার তখনো গাঢ় হয়ে জমে রইল। দরজা-জানালা পুরোপুরি হাট করে [illegible] না দেওয়া পর্যন্ত ওটুকু যাবে না।

বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে [illegible] না। সারা শরীরে বেজায় আলসেমি। [illegible] তুলে পাশ ফিরে শুয়েছি, এমন সময় ভিতরের বারান্দার দূর প্রান্তে মেয়ে গলায় গান বেজে উঠল। একটা খুশিয়ালির ঢেউ যেন গোটা বাড়িটার বাতাসে ছড়িয়ে দিল কেউ। একটু পরেই বারান্দা ধরে গানটা আমার ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বেশ উঁচু দরাজ গলা। আমার দরজার কাছাকাছি এসে হঠাৎই গানটা থেমে গেল। গানের কথাগুলো [illegible] ঠিক শুনতে পাইনি। কিন্তু গলাটা ভীষণ চেনা। আমি জানি, এ গলা হিমির। ও ছাড়া খুব কম মেয়েই এরকম খোলামেলা গলায় গাইতে পারে।

পাজামা পরে শুয়েছিলাম। কুঁচকে গুটিয়ে হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে কখন। কোমরের দড়িটাও ঢিলে। দ্রুত হাতে পাজামাটা টেনে-টুনে ঠিক-ঠাক করে নিলাম।

ততক্ষণে দরজায় দমাদম ধাক্কা পড়ছে। উঠে গিয়ে খিলটা খুলে দিতেই দরজা ঠেলে হিমি মুখ বাড়িয়ে দিল। বলল, বাব্বাঃ, কী ঘুমটাই না ঘুমোতে পারেন আপনি অমলদা! সেই কখন থেকে এসে বসে আছি জানেন?

আমি দুহাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলাম, হাই তুললাম শব্দ করে। হিমি আবার বলল, কাল কতবার এসে ঘুরে গেছি জানেন? কমসে কম সাত-আটবার। বিশ্বাস না হয়, মাসিমাকে জিজ্ঞেস করবেন। সন্ধ্যের পরও এসেছিলাম একবার....পাত্তাই নেই বাবুর।

—এত ডাকাডাকি, কি ব্যাপার রে তোদের বাড়িতে...তোর বিয়ে-ফিয়ে লেগে গেল নাকি?

—ইয়ার্কি করবেন না অমলদা। ভাল্লাগে না। হিমি মুখ গম্ভীর করল। আমি আড়চোখে হিমির দিকে তাকিয়ে বড়ো-সড়ো একটা হাই তুললাম। বললাম, নে নে, আর গাল ফুলিয়ে ঢঙ করিস নি। ভেতরে ভেতরে তো বিয়ের জন্যে মরে যাচ্ছিস।

—যান্, আপনার সঙ্গে কথা বলব না। হিমি চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। খপ্ করে হিমির একখানা হাত ধরে ফেললাম। বললাম, অত রাগ করছিস কেন? ঠিক ...র্কি করব না।

হিমি আস্তে আস্তে ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বললাম, কিরে, বারবার আমাকে এত খুঁজছিস কেন বললি না তো!

—কাল সেজদা এসেছে, এসেই বন্ধুর খোঁজ, হিমি চোখ ঘুরিয়ে বলল, বাব্বাঃ, কী টান! বারবার আসছি আর ফিরে গিয়ে বলছি, অমলদা বাড়ি নেই....সেজদাও খানিক বাদে বাদে তাগাদা দিচ্ছে, যা আর একবার দেখে আয়—উফ্, পা দুটোর যে কি হাল হয়েছিল আমার!

মনটা আনন্দে নেচে উঠল। উঃ কত দিন চন্দনকে দেখিনি। কত কথা জমে আছে। আমার একদম ছেলেবেলার বন্ধু চন্দন। একই স্কুলে একসঙ্গে পড়াশুনো করেছি আমরা। হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করার পর চন্দন চলে গেল আমেদাবাদে। ওর মামার কাছে। হাতের কাজ শিখতে। ওখানেই খুব নামকরা একটা কারখানায় এ্যাপ্রেন্টিস হয়ে আছে ও। আর আমি ঢুকলাম কলেজে। বি-এ পড়তে। মাস দুই হল পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি।

—তুই যা, আমি হঠাৎই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, আমি মুখ-টুখ ধুয়ে একটু বাদেই আসছি।

—উঁহু, সেটি হবে না, জোরে জোরে মাথা নাড়ল হিমি, মোটেই একা যাওয়া চলবে না আমার। সেজদার হুকুম—একেবারে এ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবি অমলকে।

হিমির বলার ভঙ্গিতে হাসি পায় আমার। তবু মুখ গম্ভীর করে একটু অভিমানী গলায় বললাম, অতই যদি কেউ সেজদা ভালবাসে আমাকে তাহলে নিজে এল না কেন?

—ওমা, আসবে কী করে? বাড়িতে পৌঁছেই তো সেজদা চিৎপটাং। ট্রেন জার্নি করে গা ব্যথা, জ্বর—নাহ্, আপনি বড্ড দেরি করছেন অমলদা, হিমি তাড়া দিল, নিন, চটপট তৈরি হয়ে নিন—আমি মাসিমার কাছে আছি।

হিমি চলে গেল। আমি বিছানাটার দিকে তাকালাম একবার। ময়লা, অগোছালো চাদরটা কুঁচকে আছে। বিশ্রী ভাবে। থাক। ওতে হাত লাগাবার সময় নেই এখন। এগিয়ে গিয়ে শিয়রের দিকের জানালাটা খুলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রোদ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। আনাচে কানাচে যেখানে যতটুকু আবছায়া মতন অন্ধকার ছিল সব চেটেপুটে নিল অবাধে। এভাবে রোদ কখনো আসেনি এ ঘরে। আড়াল ছিল এতদিন। জানালার মুখোমুখি ঝুপসি বকুল গাছটা দাঁড়িয়ে থাকত। চারদিকে ছড়ানো ডালপালা পাতার ফাঁক দিয়ে যৎসামান্য রোদ চুঁইয়ে আসত এ ঘরে। খানিক বাদে বাদেই রোদ জায়গা পাল্টাত আর অন্ধকারের সঙ্গে একটা লুকোচুরি খেলা চলত ঘরময়।

জানালাটা খুলতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। সমস্ত জায়গাটা হা হা করছে। কে বলবে, দীর্ঘকাল ওখানে মাটিতে নিজের ছায়া ফেলে একটা বকুল গাছ দাঁড়িয়ে থাকত সারা দিনমান, রাতে শরীরে অন্ধকার জড়িয়ে নিঃশব্দে একটা মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে দিত বাতাসে। হাওয়ায় হাওয়ায় ঝুরঝুর করে অজস্র বকুল ঝরে পড়ত, নিচে ঘাসের জাজিমে শুয়ে থাকত। আজ কিছছু নেই। এতটুকু সবুজের আভাস নেই কোথাও। বৃষ্টিতে ভেজা নরম মাটি আর কোথাও কোথাও থিকথিকে কাদা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ছে না। সবুজের চিহ্নহীন ভূমিখন্ড এত বিকৃত, এত নিঃশেষ লাগে জানতাম না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, আমি যেন অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে আছি, পরিত্যক্ত। আমার খুবই অন্তরঙ্গ একটা দৃশ্য আমাকে এখানে ফেলে রেখে অন্য কোথাও চলে গেছে।

বকুল গাছটা ভীষণ প্রিয় ছিল আমার। আমার চেয়েও বেশি দীপুর। অমন তন্ময়ভাবে বকুল কুড়োতে আমি আর কাউকে দেখিনি। গাছটার নিচে ঘাসের ওপর অজস্র বকুল এলোমেলো ছড়ানো, তার ভিতর দিয়ে ফুলের গা বাঁচিয়ে খুব সাবধানে পা ফেলছে দীপু অনেকটা নিচু হয়ে ঝুঁকে আছে ও, মাথার কালো চুল ওর কান ঢেকে দু-গাল বেয়ে নেমে গেছে দু-পাশে, হয়তো এক আধবার দমকা বাতাস উঠছে কখনো, তখন পাতার ফাঁক দিয়ে চারপাশে ফিসফিসিয়ে বকুল ঝরে পড়ছে দীপুর সারা গায়ে, কিছু আটকে যাচ্ছে ওর শাড়ির ভাঁজে, মাথার চুলে। দীপুর এই ছবিটা আমার অনেকবার দেখা। আমি এখন ওই ছবিটা চোখের সামনে ভাসিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। অনাবিল রোদে ঝলসে যাচ্ছে ফাঁকা শূন্য জায়গাটা, ছায়াহীন। কোনো ছবির বিভ্রম কিছুতেই ফুটে উঠছে না ওখানে। আমার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল।

গাছটার জন্যে দীপু খুব কাঁদত নিশ্চয়ই। কিন্তু দীপু তো আর নেই। গেলবার বর্ষার সময় মেনেনজাইটিসে ভুগে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে ও। আর কোনোদিনই ও এসে চোখের সামনে দাঁড়াবে না, হাসবে না কথা বলবে না। কিন্তু তা বলে একেবারেই কী মুছে গেছে দীপু? তা যায়নি। দীপু আছে। তবে অন্য আর একরকম ভাবে। খণ্ড খণ্ড হয়ে, অনেক জিনিসের মধ্যে। যেমন ও ছিল বকুল গাছটার সঙ্গে জড়িয়ে, যেমন গাছের ছায়ায় দীপুর চেহারাটা ফুটে উঠত ছবির মতন। সেইরকমভাবে আরো অনেক কিছুর মধ্যে। আমার স্যুটকেশে পাশপোর্ট সাইজের ওর একখানা ফোটো কিংবা ফুলতোলা যে রুমালখানা ও আমাকে দিয়েছিল বা ওর দেওয়া চামড়ার ছোট্ট মানিব্যাগ যার ওপর-কার সুন্দর কারুকাজগুলো আমার খুব পছন্দ, এ-সবের মধ্যেই দীপু নানারকমভাবে আছে। আর ওরকমভাবে যা আমার স্যুট-কেশে নেই কিংবা অন্য কোথাও, তা থরে থরে সাজানো আছে আরো গোপনে। একে-বারে আমার বুকের ভিতরে।

ভুক্ ভুক্। চমকে তাকিয়ে দেখি ভুলু এসে দাঁড়িয়েছে ফাঁকা জায়গাটার ওপর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেজ নাচাচ্ছে সকালের দিকে বকুল গাছটা যেখানে ছায়া ফেলত, পাড়া বেড়িয়ে ভুলু সেখানটায় এসে আড়মোড়া ভাঙত, জিভ বের করে চোখ বুজে শুয়ে থাকত। বারকয়েক এ পাশ ও-পাশ ঘুরে ভুলু বোধহয় ছায়াটা খুঁজল। তারপর আন্দাজমতো ঠিক জায়গাতেই পা ভেঙে শুয়ে পড়ল। বৃষ্টি পরের রোদে তেজ বেশি। ভুলু উসখুস করে উঠল। ছায়া নেই কেন ব্যাপারটা বোঝার জন্যেই হয়তো বার-দুই মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল, তারপর কি বুঝল কে জানে, হঠাৎই খুব করুণ গলায় ডেকে উঠল, ভু—উ—ক, ভু—উ—ক।

খুব দরকারেই কাটা পড়েছে বকুল গাছটা। দু'খানা ঘর উঠবে ওখানে। তারপর ভাড়া দেওয়া হবে। অনেকদিন থেকে বাবার মাথায় মতলবটা ছিল। টাকার অভাবে আটকে ছিল এতদিন। এখন কে যেন ইঁট চুণ সিমেন্ট বালি এসব কিস্তিতে দিতে রাজি হয়েছে। একেবারে পাকা কথা সঙ্গে সঙ্গে তোড়জোড় শুরু। গতকাল সকালে উঠে দেখি, বাবা একেবারে অ

চেহারা নিয়ে ওই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে। ধুতিটা গাছকোমর বাঁধা, মাথায় ফেট্টি। খালি গা, রোমশ বুক আচ্ছে। কাঁধে কুড়ুল, ডান হাতে সামনে বাঁটটা মুঠো করে ধরা। সামনে আমার—আমার চেয়েও দীপুর প্রিয় গাছটা কাটা হচ্ছে, দৃশ্য সহ্য করতে পারব না। তাই গতকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম সোদপুরে। আমার মামা-বাড়িতে। বেরোবার সময় দেখলাম, বাবা গাছটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কুড়ুলের মুখটা মাটিতে ঠেকানো, বাঁটটা হাতের শক্ত মুঠোয়। মনে পড়ল, গাছটা বাবার হাতেই লাগানো। বাড়ির পা দিতেই কানে একটা আওয়াজ, হুঁ—উক্। প্রথম কোপ পড়েছে গাছে। আমার বুকের মধ্যে ধক্ উঠল। আমি দ্রুত পা চালিয়ে গেলাম। একবার পিছন ফিরে দেখার কথা হল। হিংস্র নিষ্ঠুর হলে বাবার চেহারা কেমন দেখায় দেখতে ইচ্ছে কিন্তু তাকালাম না। কেমন ভয় যেন। —উঃ অমলদা, আপনি কী তো, এখনো হাত-মুখ ধোননি, তাগাদা দিল, নিন, শিগগির করুন আপনার চা নিয়ে এসেছি, এরপর ঠাণ্ডা হবে কিন্তু।

হিমির কথায় আমার সম্বিত ফিরে এল। লজ্জিত মুখে আমি তাড়াতাড়ি দিকে চলে যাই।

রাস্তায় নেমে খানিক দূর এসে হিমি বলল, আপনি আর আজকাল আমা-বাড়ি যান না কেন অমলদা?

করে বলার মতো কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। যে-বাড়িতে দীপু সেখানে যেতে কি মন চায়? শুধু-দুঃখ বাড়ানো ছাড়া তো আর কিছু কিন্তু হিমিকে কি সে-কথা বলা

কিছু একটা জবাবের জন্যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমতা করে বললাম, আসলে কি একদম সময় পাচ্ছি না। চাকরির ঘোরাঘুরি করছি তো।

আমার মুখের ওপর থেকে ওর সরিয়ে নিল। কেমন যেন উদাস হয়ে গেল হঠাৎ। এতক্ষণ পাশা-হাঁটছিলাম, এখন ও একটু দ্রুত আমাকে ছাড়িয়ে কয়েক হাত এগিয়ে আমার কাছ থেকে ওর মুখটা করার জন্যেই বোধহয়। আমরা হাঁটছি। হিমি আগে, আমি ওর

রাস্তার গাছগাছালি এখনো বেশ তার ওপর বিশাল ছায়া ফেলে গাছ দু'ধারে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি-পাতাগুলো এখনো ভিজে ভিজে। তে জল থৈ-থৈ করছে, কিছু মধ্যে উঁচু করে আছে জলের ভেতর থেকে। আশেপাশে কাঠকুটো ভাসছে দু'-একটা।

রাস্তাটা ডান দিকে বেঁকে গেছে সামান্য। বাঁকের মুখে পরপর কয়েকটা দেবদারু। ওই পর্যন্ত এগিয়ে হিমি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি কাছে যেতে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, তারপর হাসল। এক ধরনের নিঃশব্দ করুণ হাসি। আস্তে আস্তে বলল, দিদি থাকলে আপনি কিন্তু ঠিকই যেতেন অমলদা।

আমি চুপ করে থাকি। এসব কথার কোনো জবাব হয় না।

হিমিদের বাড়িতে ঢুকে দেখি, জমাটি আড্ডা বসেছে তাসের। হই-হই করে খেলা চলছে। টোয়েন্টি-নাইন। একদিকে চন্দনের দুই বউদি, অন্যদিকে চন্দন আর জয়া। চন্দনদেরই পাড়ার মেয়ে। ওই জয়া মেয়েটাকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। ভীষণ দেমাক। অথচ একদম সাদামাটা চেহারা, কোথাও আকর্ষণের মত কিছু নেই। কেবল রংটা যা একটু ফর্সার দিকে। চন্দন যে কী দেখে ভুলল।

দুই বউদিরই মুখ কালো থমথমে। পাশে দু'খানা কালো সেট। আমাদের দেখেই বউদিরা উঠে পড়ল। মেজবউদি কথাবার্তায় খুব ওস্তাদ। বলল, ওই নাও ঠাকুরপো তোমার পার্টি এসে গেছে। আমরা উঠলাম, আমাদের রান্নাবান্না আছে।

আমরা বসলাম। হিমি আমার পার্টনার। অনেকক্ষণ খেলা চলল। মাঝে দু'বার খাবার এল, চা এল। তিনখানা কালো সেট খেয়ে জয়ার মুখ চুন চন্দনেরও। এর ওপর আবার খেলা ভাঙার সময় কাটা ঘায়ে একটু নুনের ছিটে দিল হিমি। বলল, এত তাড়াহুড়োর কি আছে আর একটু খেললে হত না।

আমাদের খেলা শেষ হতে হতেই বেশ বেলা হয়েছিল, স্নান খাওয়া সারতে আরো বেলা হলো। প্রায় তিনটের কাছাকাছি। খেয়ে উঠে একখানা চেয়ারে বসে পান চিবোচ্ছি, একটু ঝিমুনি মত এসেছে, চন্দন হঠাৎ বলল, আমি উঠিরে অমল, আমার একটু বেরোতে হবে। মানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ক'টা জিনিস আর একটা চিঠি পৌঁছে দিতে হবে। ভীষণ জরুরী।

—বারে, বেশতো, আমি অভিমানী গলায় বললাম, আমি এলাম তোর সঙ্গে কথা বলতে, গল্প করতে আর তুই—

—কী করব বল, বাইরে থাকলে এসব করতেই হয়, সবাই করে। কাকে কবে কার দরকার হয় তা কি বলা যায়। আমার এক-খানা হাত ধরে চন্দন বলল, তুই রাগ করিসনি অমল, আমি যাব আর আসব। সন্ধের মধ্যে ঠিক ফিরব দেখিস।

তারপর হিমির দিকে ফিরে বলল, অমলকে আটকে রাখিস হিমি। তোর ওপর দায়িত্ব রইল, ও যেন পালাতে না পারে।

হিমি আমাকে দোতলায় নিয়ে গেল। ওর ঘরে। আগে এখানে দীপুও থাকত। এখন একা হিমি। ঘরের দক্ষিণ দিকে ব্যালকনি। নিচে হাতকয়েক তফাতে হিমি-দের বাগান। নানা রকমের সবজি লাগানো হয়েছে ওখানে, কিছু সাধারণ জাতের ফুলও আছে।

ঘরে তেমন আসবাব নেই। একপাশে একটা আলনা। তার ওপর কিছু শাড়ি পাট করে রাখা। পায়ের দিকে আলনাটা সোজা-সুজি রেখে একখানা সিঙ্গল বেডের খাট। জানালার ধার ঘেঁষে একটা ছোটো টেবল। তার ওপর পড়ার বই, থাক করে সাজানো। একধারে খাতা, কিছু কাগজ পেন্সিল কলম আর কালির দোয়াত। দেয়ালে বাস্ট সাইজের বড়ো আয়না। নিচে লাগানো ছোট্ট র‍্যাকেটে ক্রিম, পাউডার স্নোর কৌটো নেল-পালিশের শিশি। আয়নার মাথায় দীপুর একখানা ফোটো। বেশ বড় দামী ফ্রেমে বাঁধানো। শরীর বাদ দিয়ে শুধু মুখের ছবি। এত নিখুঁত যে নাকের দু'ধারের

হাল্কা ভাঁজ দুটো পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ে। ফোটোর ওপর একগাছি কুটো গোল করে জড়ানো। ওটা মালা ছিল, ফুলে ফুলে গাঁথা ছিল কোনোদিন। এখন শুকিয়ে খর-খর করছে।

নিবিড় চোখে ফোটোটা দেখতে দেখতে আমি বললাম, ফোটোটা খুব জীবন্ত হয়েছে রে হিমি, মনে হয় দীপু অবিকল তাকিয়ে আছে।

—সব্বাই তাই বলে। হিমি বলল।

বাইরে রোদ পড়ে আসছে। গাছ-গাছালির মাথায় আলতোভাবে লেগে আছে এখন। একটু বাদে ওটুকুও মুছে যাবে।

—দিদির জিনিসগুলো দেখবেন অমলদা? বলে হিমি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই খাটের তলা থেকে একখানা ট্রাংক বাইরে টেনে আনল। তালা খুলে ডালাটা মেলে ধরতেই দেখলাম, ট্রাংকের ভিতরে সবকিছু খুব পরিপাটি করে সাজানো।

হিমি এক এক করে সব বের করতে লাগল। কিছু শাড়ি শায়া ব্লাউজ, গোটা-চারেক পুতুল, স্নো পাউডার শ্যাম্পু। আমার দেওয়া জিনিসগুলো বেরোল সব-চেয়ে শেষে। কিছু কাঁচের চুড়ি, এক-জোড়া ইমিটেশনের দুল আর খানকয়েক বই। ট্রাংকের কোণে একটা লম্বা টিনের কৌটো। সেটার মুখ খুলে উপুড় করতেই অনেকগুলো খুচরো পয়সা ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠল মেঝের ওপর, মাঝেমধ্যে কয়েকখানা ভাঁজ করা নোট।

—জানেন অমলদা, কৌটোটা পুরো ভর্তি ছিল, মানে একদম ঠাসা—হিমির গলায় একটা আক্ষেপ বেজে উঠে থেমে গেল হঠাৎ। কেমন কৌতূহল হল। বললাম, তারপর কি হল—কেউ সরিয়েছে বুঝি পয়সাগুলো?

—না, ঠিক তা নয়। আর সরাবেই বা কী করে? তালার চাবি তো আমার কাছে। মানে—কী জানেন অমলদা—হিমি আমতা আমতা করতে থাকে। আমি বুঝতে পারি, হিমি[illegible] কোথাও কোনো সংকোচ আছে। গম্ভীরভাবে বলি, তোর যদি আপত্তি থাকে তাহলে ও-সব কথা বরং থাক হিমি।

হিমি হাসল। ম্লান বেলা শেষের রোদের মতই করুণ। বলল, আপত্তি নয় অমলদা, বড় লজ্জা হয় এ-সব বলতে। শত হলেও একেবারে নিজেদের ব্যাপার তো। তবে আপনাকে বললে কোনো ক্ষতি নেই, অপমানেরও কিছু না। বরং দিদির ব্যাপারে কোনো কিছুই আপনার কাছে লুকোনো উচিত নয়।

আমি হিমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। কৌতূহলে আমার চোখের পলক পড়ে না। সামান্য সময় চুপ করে থেকে হিমি বলল, একদিন কৌটোর পয়সাগুলো মেঝেয় ঢেলে গুনে রাখছি এমন সময় মেজদা এল। ছড়ানো পয়সাগুলো দেখে বলল, গোটা দশেক টাকার খুচরো দে তো হিমি, খুব দরকার। আমি তোকে একখানা দশ টাকার নোট দেব, তুই বরং সেটা রেখে দিস কৌটোয়। আমি গুনে গুনে মেজদাকে দশ টাকার খুচরো পয়সা দিয়ে দিলাম। দিন যায়। কিন্তু মেজদা আর টাকা দেবার নাম করে না। যতবার বলি, কী মেজদা, টাকাটা দিলে না? মেজদা বলে, দেব দেব, নিশ্চয়ই দেব। দীপুর টাকা আমি মারব না।

বলা শেষ করে হিমি আমার দিকে তাকায়। তাকিয়ে হাসে। পাঁশুটে হাসি!

হঠাৎ-ই আমার বুকের মধ্যে ভীষণ তোলপাড় সুরু হয়ে যায়। চকিতে কী একটা কথা মনে পড়ে যায় আমার! ভিতর থেকে কে যেন একটা আঙুল উঁচিয়ে আছে আমার দিকে! অনবরত নির্দেশ করছে আমাকে। আমি কিছুতেই আঙুলটাকে সরিয়ে দিতে পারছি না।

আমার দিকে তাকিয়ে হিমি চমকায়। বলে, এ-সব শুনে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, না অমলদা?

দীপুর ফোটোটার দিকে তাকিয়ে আমি বলি, তুইও কিছু কম যাস না হিমি, দিদির ফটোয় একটা মালা দিতে পারিস না?

হিমি মুখ নিচু করে নেয়। আচমকা লজ্জা পেয়ে যায় খুব। খানিক সময় চুপ করে থেকে মুখ তুলে বলে, একটা কাজ করবেন অমলদা—আমি বাগানে গিয়ে ভাল করে একটা মালা গেঁথে আনি, আপনি বেশ দিদির ফটোয় পরিয়ে দেবেন।

উত্তরে আমি কিছু বলি নি। ট্রাংকের জিনিসপত্তর গুছিয়ে হিমি কখন চলে গেছে জানি না। আমি সামনের কিছু দেখছি না। ভাবছি না। আসলে এখন উজানের দিকে আছি। কিছু সময়ের জন্যে সময়ের বিপরীত দিকে চলে গেছি আমি।

দীপুর তখন অসুখ। খুব দৌড়াদৌড়ি চলছে। বাড়ির লোকেরা পালা করে রাত জাগছে। আমিও অনেক রাত অব্দি থেকে বাড়ি চলে আসি। কিন্তু ঘুম হয় না। উৎকণ্ঠায় স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে থাকে। রোজই ক্রমাগত অবসাদ জমা হচ্ছে শরীরে, মাথার ভেতরে ঝিঁ ঝিঁ করে। বড় দরকার একটু ঘুমের। একদিন একটু সকাল সকাল স্নান-খাওয়া সেরে নিলাম। ভাবলাম, দীপুদের ওখান থেকে একবার ঘুরে এসে দুপুরটা ঘুমিয়ে নেব। কিন্তু দীপুদের বাড়িতে পৌঁছে দেখি, অবস্থা সঙ্গীন। খাটের ওপর দীপু নিশ্চুপ শুয়ে আছে। পাশে দুই বউদির মুখ থমথমে। শিয়রের কাছে দীপুর মা ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। ডাক্তার-বাবু ঝুঁকে পড়ে দীপুকে পরীক্ষা করছেন। মুখ ভীষণ গম্ভীর। কপালে উদ্বেগের রেখা। রেখার ভাঁজে ঘাম।

ডাক্তারবাবু এক টুকরো কাগজ চাইলেন। আমি টেবলের ওপর থেকে এক-খানা খাতা এনে খুলে ধরলাম ওঁর সামনে। উনি খুব দ্রুত খস খস করে কী একটা লিখলেন তারপর বললেন এই ইঞ্জেকশানটা কিনে আনতে হবে, এক্ষুণি।

চন্দন আমেদাবাদে আছে, দ[illegible] দাদারাও কেউ বাড়িতে নেই। কাজে বে[illegible] গেছে। রোজ রোজ কে ডিউটি ব[illegible] করবে। দীপুর মা আলমারী খুলে এক[illegible] দশ টাকার নোট বের করে আমার [illegible] দিলেন। প্রেসক্রিপশন আর টাকা নিয়ে [illegible] ছুটলাম ওষুধের দোকানে। এক [illegible] গেছি, এক দৌড়ে ফিরেছি। ডাক্তারবাবু [illegible] রকম কেড়েই আমার হাত থেকে ও[illegible] নিলেন তারপর অভ্যস্ত দ্রুততায় সি[illegible] পুরে দীপুর ডান হাতের শিরায় ফুটিয়ে দিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক আ[illegible] সকলকে রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় রেখে [illegible] চোখ খুলল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস [illegible] বাইরে বেরিয়ে এলাম। আজ এখন সত্যিই ঘুমোতে পারব।

কাঠগোলা ছাড়িয়ে এসে দেখি, [illegible] মাথায় আমার বন্ধুরা জটলা করছে। [illegible]নই আছে। রাজা, তপু, ভোলা অরিন্দম। গাঁজায় দম দেওয়ার ভ[illegible] ভোলা সিগারেটে টান দিচ্ছে আর ভুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে! অরিন্দমটা [illegible] মুখিয়ে আছে তাতে মনে হয় সিগা[illegible] বাকি হাফ অংশটা ওর বরাদ্দে। ওদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে চোখে একটা আনমনা ভাব ফুটিয়ে এ[illegible] লাগলাম।

—এই শালা অমলার বাচ্চা, চেঁচিয়ে উঠল, কেটে যাচ্ছিস যে!

আমি জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়[illegible] খানিকটা ধরা পড়ে যাওয়ার মতো। এগিয়ে এসে আমার একখানা হাত মেয়েদের মতো গলা করে বলল, [illegible] তুমি পথ হারাইয়াছ?

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে [illegible] আমি বললাম, সব সময় চ্যাংড়ামি কর[illegible] ভাল্লাগে না।

ততক্ষণে বাকি সবাই এসে গেছে বলল, চ' সিনেমায় যাই। যা একখানা বই এসেছে না মাইরি—ক্রাইম [illegible] হেভি মারপিট শালা সব সিনে, তার বেলি ড্যান্স ক্যাবারে—আমি আস্তে বললাম, আমি ভাই এখন সিনেমা না।

—ক্যানো বে, অরিন্দম চিবিয়ে বলল, একি কথা শুনি শালা মন্থরার

—তোরা জানিস না, ভোলা বাতলে, দীপুর যে অসুখ! প্রিয়তমা শয্যায় আর অমলবাবু যাবেন সিনেমা শুনলো হয়? পরে জানতে পারলে [illegible] দিল জখম হয়ে যাবে না!

—এ্যাঁ, লয়না-মজনুর কিসসা শালা?

আমার নিতম্বে হালকা কয়েকটা পড়ল। ফুর্তির লাথি। বুঝলাম আশা গয়া। এদের হাত থেকে এখন আমার নিস্তার নেই।

…াড়ার সিনেমা হল। গলির ভেতরে। …ার গেটের সামনে এসে ভোলা বলল, …ল ছাড়।

…খ কাচুমাচু করে বললাম, আমার …কিছু নেই।

…বিশ্বাসের চোখে আমার আপাদমস্তক … দেখতে ভোলা বলল, ভালয় ভালয় …দে, না হলে সার্চ করব।

…ী সর্বনাশ! আমি চমকে উঠি। …ণে আমার মনে পড়ে যায় আমার … সাড়ে চার টাকা রয়ে গেছে। ইণ্টেক- … দাম নিয়েছে সাড়ে পাঁচ টাকা। বাকি … ফেরত দেওয়া হয় নি। দীপুর …ম একটা সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে টাকা … কথা কারো মনে ছিল না। কেউ … পয়সা চায় নি, আমারও দেওয়ার কথা …আসে নি। এখন উপায়?

…াঁক গিলে বললাম, মাইরি বলছি কিছু …

—বাজা, ভোলা হুকুম করল, অমলকে …ব।

…জা যেন তৈরী ছিল। ভোলা বলামাত্র … পকেটে হাত ঢুকিয়ে বাজা টাকা …লো বের করে আনল। আমার কাছে …য়সা আছে কেউ ভাবতেও পারে নি। … পাক খেয়ে নিয়ে বাজা আমার থুতনি …বলল, ছলনা কেন সখি? বলে চকাস … আমার মুখে একটা চুমু খেল।

…টিকিট কাটার পর হলের ভেতরে গিয়ে …। মনে অনিচ্ছা ক্ষোভ আর বিরক্তি। … বাদে বই শুরু হল। উদ্ভট আজগুবী …। কিন্তু একটা চুম্বকের টান ছিল …গোড়া। বাজা ভুলু ওরা মাঝে মাঝে … করে উঠছিল, সিটি দিচ্ছিল। কখনো …লি। উত্তেজনার মাথায় ওদের সঙ্গে …ও হাততালি দিয়ে ফেলেছিলাম বু…র। দীপুদের ফেরত পয়সাগুলোর … মন খচখচ করছে অল্প স্বল্প তার… আস্তে আস্তে কখন ভুলে গেছি …াম।

…আবার মনে পড়ল এখন। এতদিন …। মনে হল, হিমির মেজদার চেয়ে …ই বা কম কী? আমিও তো দীপুর …খের সুযোগে দিব্যি সাড়ে চারটে টাকা … দিয়েছি। ওই পয়সা খরচের ব্যাপারে …ওদের জবরদস্তি ছিল ঠিকই, কিন্তু …র নিজের ইচ্ছেটা কী ছিল? আমি কী … ফেরত দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত ছিলাম? …ী না। থাকলে সিনেমা দেখার পরেও …আমি যেভাবে হোক টাকার জোগাড় …বাকি পয়সা মিটিয়ে দিতে পারতাম। …ন যখন আমি দেখলাম, দীপুর …া ফেরে সাপের দিকে গেছে। দীপু … কিছুতেই বাঁচবে না।

…বের ভিতরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে …ও আর আলো নেই তেমন। ঘন …চ বং ধরতে গাছের নিচে নিচে।

…হিমি এখনো আসে নি। হয়তো পছন্দ- … ফুলে খুঁজে বেড়াচ্ছে বাগানে। আচ্ছা, … ব্যাপারটা জানতে পারলে আমায় কী …, কীভাবে তাকাত? নিশ্চয়ই খুব … ভাবত আমাকে, ঘেন্নার চোখে তাকাত। দীপুর ফোটোটার দিকে তাকালাম। মনে হল, ফোটোটার ভিতর থেকে দীপু কেমন এক রকমভাবে যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার শরীরটা ছমছম করে উঠল।

বারবার চেষ্টা করছি চোখটা অন্যদিকে সরিয়ে নিতে। অন্য কিছু দেখতে। পারছি না। ফিরে ফিরে চোখটা দীপুর ফটোটার ওপরই গিয়ে পড়ছে।

ভূত-টুতে আমার বিশ্বাস নেই, তবু আমি এক ধরনের গা-গুলানো অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। মনে হল, এখানে বেশিক্ষণ থাকলে হয় আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব, না হয় বমি করে ফেলব। তার চেয়ে এখন বরং চলে যাই। ঘণ্টা দুই বাদে চন্দন ফিরে-টিরে এলে তখন না হয় আর একবার আসব। মনে করে আমি নিচে নেমে এলাম।

সদরের দিকে গেলাম না। কারো চোখে পড়ে যাব। পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সামান্য দূরে পুকুর। ঘাট বাঁধানো। পাশে ঘন ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। মাটির। অন্ধকারে প্রায় মিশে আছে।

থমথমে নির্জনতা চারদিকে। গাছের পাতায় সিরসির শব্দ। অল্পের জন্যে থেমে থেমে ফের। পুকুরের কানাচে কানাচে দপদপিয়ে জোনাকি জ্বলছে নিভছে। বাঁশঝাড়ের দিক থেকে ভয়-ধরানো কটকট আওয়াজ উঠল একটা।

—এই অমলদা।

আমি চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাই, কে!

ঘন অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হয় না। অস্পষ্ট একটা নারীমূর্তি কাছে এগিয়ে আসে। বলে, আমি হিমি। কিন্তু আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন অমলদা!

হিমির হাতে মালা। বেশ বড়ো-সড়ো। বুনো ফুলের একটা গন্ধ এসে লাগল আমার নাকে। বললাম, একটু পুকুরে যাচ্ছি রে হিমি।

—পুকুরে কী?

—পুকুরে, হিমির কথাটারই প্রতিধ্বনি করে আমি একটু সময় নিলাম তারপর বললাম, হাতটা ধোব একটু।

—কেন, হাতে আবার কী হল?

—না, মানে—কী যেন লেগেছে হাতে বুঝলি!

আমার মনে হল, আমার উপর কেউ ভর করেছে। বোধহীন আমার ভেতর থেকে পরের কথাগুলো কে যে আমায় জুগিয়ে দিল আমি জানি না। বললাম, মানে ময়লা-টয়লা, কালি কিংবা রক্ত-টক্ত—

—রক্ত! হিমি চমকে উঠল, রক্ত কোত্থেকে লাগল?

—আরে না না, হিমিকে আশ্বস্ত করার জন্যে আমি এবারে কথা ঘোরাই, রক্তই যে লেগেছে তার কোনো মানে নেই। আসলে কিছু একটা লেগেছে অন্ধকারে আমি ঠিক দেখতে পাইনি। যাকগে, ধুলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

—তাহলে যান, ধুয়ে আসুন তাড়াতাড়ি। সেই কখন থেকে মালাটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমি পুকুরের দিকে কয়েকটা ধাপ তরতরিয়ে নেমে যাই তারপর দাঁড়িয়ে পড়ি। হঠাৎ আমার কেমন বিভ্রান্ত বোধ হয়। আমি কী ধুতে যাচ্ছি পুকুরের জলে? সত্যি সত্যিই কী কিছু লেগে আছে আমার হাতে?

বাঁশঝাড়ের দিক থেকে কটকট আওয়াজটা উঠল আবার। ঝিঁঝি ডেকে উঠল আরো জোরে। ভয় পেয়ে কিনা কে জানে।

—আঃ, কি হল অমলদা, অধৈর্য গলায় তাড়া দিল হিমি, আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

পিছনে না তাকিয়েও বলতে পারি, হিমি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ধর চোখে।

অল্প কয়েকটা ধাপ বাকি ছিল। আমি আস্তে আস্তে নেমে যাই। তারপর পুকুরের জলে ডুবিয়ে হাতটা ধুতে থাকি। মিছিমিছি।

একদিন ময়দানের একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম সামনের দিকে। পাতাল রেলের মাটি খোঁড়াখুঁড়ি যেখানে হচ্ছে সেখানে বিরাট বিরাট ক্রেণগুলো ক্রমাগত একাশ ওপাশ করছিল। তারও ওপাশে বিরাট কয়েকটা বাড়ি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতায় এমন বাড়ির সংখ্যা কত কে জানে? এখানকার হাজার হাজার অফিসে কোটি কোটি টাকা আয়। আমি পায়ে হেঁটে দেখেছিল এইসব বাড়িগুলোর শতকরা নিরানব্বুই ভাগ শিল্পীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। যদি সবাই অফিসে ছবি টাঙানোর অভ্যেস রাখতেন তবে তাতে অফিসেরও শ্রীবৃদ্ধি হোত আর সেই সঙ্গে কয়েক হাজার ছবিও বিক্রি হয়ে যেত।

সম্প্রতি এই সহরের একটি অফিসে একটি চিঠি দেখে চমকে উঠেছি। চিঠিটি পড়ে মনে হয়েছে, বোধহয় 'সৃষ্টির সহর' কলকাতাতেই এমন চিঠি লেখা যায়। চিঠিটি লিখেছেন সি এম ডি এ এর পক্ষে শ্রীভোলানাথ সেন। চিঠিটি প্রচারের জন্য নয়, হ্যাম্প কিংবা সাবওয়ের প্রশস্তিও নয়। চিঠিটি একটি আবেদন। আবেদন দু'শটি বেসরকারী অফিসের কাছে। তাতে লেখা আছে.......শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের প্রায় চল্লিশটি ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শণী আমরা করছি এ্যাসেম্বলী ভবনে ২১শে ডিসেম্বর থেকে উনিশশো সাতাত্তরের চউথা জানুয়ারী পর্যন্ত।........কলকাতাকে সুন্দর করার জন্য আমরা কিছু মূর্তি বসাস্ছি সহরের নানা জায়গায়।........আপনারাও তো পারেন এই সব ভাস্কর্যের কিছু কিছু কিনে নিয়ে আপনাদের অফিস, বাড়ি কিংবা রাস্তাঘাটের সৌন্দর্য বাড়াতে।'........

আমরা কলকাতাবাসীরা ভীষণ খুসী হবো যদি এই সহরের দু'শো অফিস এই চিঠির উত্তরে এগিয়ে আসেন, যদি দু'শোটি ভাস্কর্য শিল্পীর সৃষ্টিকে গণদেবতার চোখের সামনে তুলে ধরেন।—রাস্তায় পার্কে কিংবা অন্যত্র। আমি স্বপ্ন দেখি, এই সহর একদিন হঠাৎ ভাস্কর্যের সহর হয়ে উঠেছে। শিল্পীরা রাজার মত হাঁটছেন। তাঁদের প্রতিভার স্বীকৃতি, তাঁদের রাজার মর্যাদা দিচ্ছে। বিদেশীরা থমকে দাঁড়িয়ে বলছেন, এই সেই সহর—রবার্ট ক্লাইভ যাকে জঘন্য বলেছিলেন; এই সেই সহর যার মোড়ে এখন ভাস্কর্য, অপরূপ। শুনেছি ভোরের স্বপ্ন নাকি সফল হয়। আমি প্রত্যাশায় আছি, একদিন ভোরে ঠিক এমনই একটা স্বপ্ন আমি দেখবো।

রোজ আয়নায় নিজের মুখ দেখলে নিজের প্রতিচ্ছবি থেকে বোঝা যায় না শরীর রোগা না মোটা হল। অন্যের চোখে বোঝা যায়। যেমন এই সহরটার যে পরিবর্তন হয়েছে রোজ সহরময় ঘুরে সে কথা আমাদের মনে হয় না। অথচ এম সি সি ক্রিকেট দলের ম্যানেজার কেন ব্যারিংটন এসেই বলেছেন, এ সহরটা দশ বছরে একদম পাল্টে গেছে। এদিকে পাতাল রেল হচ্ছে, পুরোণো সব রাস্তা চওড়া হয়ে যাচ্ছে।....আরও দশ বছর পর যদি ব্যারিংটন সাহেব আসেন তবে দেখতে পাবেন হুগলী নদীর ওপর দ্বিতীয় ব্রিজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, পাতাল রেল মাটির নিচ দিয়ে ছুটে চলেছে, বস্তি নির্মূল হয়ে গেছে। এখন আমরা একটা পরিবর্তনের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। রাস্তা-ঘাট পরিবর্তনের সঙ্গে

নববর্ষের প্রতিজ্ঞা (ভাঙবার জন্য ?)

১। সি এম ডি এ-কে গাল না দিয়ে জল (অথবা চা) গ্রহণ করবো না—তবে রাস্তার কলে বা বাড়ীর কলে জলের অপচয় বন্ধ করবো। দরকার হলে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পকেট থেকে ২।৫ টাকা খরচ করেও রাস্তার কলে ট্যাপ বসাবো।

২। সিগারেট খাওয়া বন্ধ করবো না—কারণ পারবো না। তবে সিগারেটের টুকরো, প্যাকেট, দেশলাই কাঠি সব পকেটে রাখবো। দিনের শেষে ডাস্ট-বিনে বা আস্তাকুড়ে ফেলবো।

৩। টিকিট কিনে ট্রামে-বাসে চড়বো। তবে পুরোনো টিকিট পকেটে বা ব্যাগেই রাখবো। দিনের শেষে ডাস্টবিন বা আস্তাকুড়ে ফেলবো।

৪। খাটালের দুধ কিনবো না—খাবো না। খাটাল উচ্ছেদে সাহায্য করবো। কল-কাতায় গরুর সংখ্যা বেড়ে গেছে..... কমাতে হবে (সি এম ডি এ-কে অবশ্য হিসেবের মধ্যে ধরা হচ্ছে না)।

৫। কলকাতার নিন্দে শুনবো না, হতে দেবো না। রাস্তায়-ঘাটে বাসে-ট্রামে অক্ষম, দুর্বল আর বাচ্চাদের সাহায্য করবো—এমন কি যদি 'সিট' ছাড়লে সুন্দরী মহিলারা সেই 'সিটে' নাও বসেন বা যদি সহযাত্রীদের কাছ থেকে টিটকারী খেতেও হয়... (সুন্দরী মেয়েদের দেখে টিটকারী দেবার স্বাধীনতা তো আমাদের আছেই. ....)

৬। বিদেশী বা অন্য রাজ্যবাসী কলকাতায় বেড়াতে এলে হাঁ করা মুখ দেখে বা হ্যা-হ্যা করা হাসি না শুনে আমাদের কাছে পাবেন কলকাতার যাত্রা, থিয়ে-টার এবং জীবন দেখবার সুযোগ তাঁদের বলবো, কলকাতা দেখতে চান? দেখিয়ে দেবো?

৭। ফুল, ঘাস, গাছ কেবল গরু-ছাগলের জন্যই নয়, আমাদের জন্যও। দরকার হলে আমের আঁটি বা তেঁতুল বীচি থেকেও গাছ বানাবো কিন্তু কল কাতাকে সবুজ করবোই.. ...

৮। রাস্তায় পেচ্ছাব করতে বসবো না, শুধু পুলিশের ভয়ে নয়, নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং মাসল কন্ট্রোলের পরিচয় দেবার জন্যও।

৯। নিজের বাড়ী পরিষ্কার রাখবো তবে জঞ্জালটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবার আগে অন্ততঃ একবার ভাববো। সি এম ডি এ-র মাথা পেলে বা ডাস্টবিনে পেলে ভাববার দরকার নেই.....

১০। কলকাতার কি কি উন্নতি হচ্ছে, তার ফিরিস্তি না জেনেই সি এম ডি এ আর ভোলা সেনের শ্রাদ্ধ করবো...... আর যেখানে উন্নতি হয়েছে বা হচ্ছে, সেখান দিয়ে যাবার সময় চোখ বন্ধ করে যাবো (যেমন হাওড়া সুড়ঙ্গ পথ, চেতলা সেতু, অরবিন্দ সেতু, বিধাননগর বঙ্কিম সেতু, দ্বিতীয় হুগলী সেতু, পাতাল রেল......)

১১। সি এম ডি এ-র বিজ্ঞাপন পড়ে হাসবো আর বলবো, কাজের চেয়ে প্রচার বেশী (গাজনের চেয়ে বাজনা বেশী) একবারও ভাববো না যে ঢাকটা হচ্ছে কলকাতার জয়ঢাক, ঐ সংস্থার নয়।

সঙ্গে অলংকরণের কথাও ভাবতে হবে। এমন সময় একটি ভাস্কর্যের প্রদর্শনী এবং শিল্পপতিদের ডাক দিয়ে সি এম ডি এ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে আমি গিয়েছি, সঙ্গে উপরি হিসেবে দেখেছি ফুলের প্রদর্শনী। ফুলের সঙ্গে ভাস্কর্যের এমন মিলন হয়তো দুর্লভ। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সবাই ধন্যবাদ দেবেন 'ফ্লাওয়ার শো-য়ার এ্যাসোসিয়েশন' ও সি এম ডি এ'কে যুগ্মভাবে। বিধানসভার আনাচে কানাচে যেখানে রাজনীতির উত্তাপ তারই পূব দিকে থরে বিথরে সাজানো ছিল গোলাপ, ক্রিসেনথিমাম, ডালিয়া, নানা রকমের বাহারী ক্যাকটাস। এক সঙ্গে এত ফুল কোন সকালে দেখতে পেলে সে দিনটা নির্ঘাৎ ভাল কাটে।

ফুলের প্রদর্শনীর গায়েই বিরাট এলাকা নিয়ে ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। একজন ভাল কলা সমালোচক হতে হলে যে সব গুণগুলি থাকা দরকার তা আমার নেই। তার প্রয়োজনও নেই। আমার ভাল লাগাতেই আমি মশগুল হয়ে থাকি। ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মত ব্যাখ্যা করে নিই। কিন্তু এমন ভাস্কর্যের সমাহার কি ইচ্ছা করলেই দেখা সম্ভব? এমন রাম-কিংকর, চিন্তামণি কর থেকে শর্বরী রায়-চৌধুরী আদি পাশাপাশি? সমীর চক্র-বর্তীর 'ব্যালে' দেখে মনে হচ্ছিল, নৃত্য-রতা সুন্দরীটি এখুনি পাক খেয়ে সামনে দিয়ে ঘুরে যাবে। অদ্ভুত পেলব তাঁর ব্যালে ভঙ্গি, নরম গ্রীবা, সুন্দরী তনু। সুধীরঞ্জন ধর এর 'রোমান্স' একটি স্কুটার দুটি মূর্তি, সামনেরটি পুরুষ। বাতাসে তার চুল উড়ছে। পেছনে নারী—তার প্রেয়সী কিংবা জায়া। গভীর আবেগে ঝুঁকে সে পুরুষটি পেট হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে বসে আছে। গাড়ির গতিতে চালকের চুল উড়ছে, পেছনে নারীর আঁচল। অদ্ভুত জীবন্ত। চিন্তামণি কর-এর 'ন্যাশনাল' কিংবা রামকিংকর-এর মিথুন বহুদিন ধরে তাদের ভাবাবে, যাঁরা এই প্রদর্শনী দেখেছেন। প্রভাস সেন এর 'টু ওয়ার্ডস সান' এর গায়ে যেন পৃথিবীর সব মায়ের প্রার্থনা লেগে আছে—হে ঈশ্বর আমার সন্তানকে আলোকিত কর। একসঙ্গে এত ভাল ভাস্কর্য থাকার মুশকিল একটাই—কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখি। রামচন্দ্র প্রধানের ভ্যানগার্ড অফ ফ্রিডম, নিরঞ্জন প্রধানের 'বার্ড', শর্বরী রায়চৌধুরীর গেট অফ হেভেন কিংবা মানিক তালুকদারের 'গোল্ডেন পেয়ার'কেই কি ভোলা যায়?

স্বাধীনতার শান্তী : রামচন্দ্র প্রধান

চমকে দিয়েছেন সুরজিত দাস। তাঁর 'সুইমাস স্বপ্নের জগত থেকে মুহূর্তের মধ্যে রূঢ় বাস্তবে এনে ফেলেছিল আমাকে। সুইমার্স সন্তরণরত মূর্তি। কিন্তু কথাটা সেখানেই শেষ নয়। যে সহরে এই মূর্তিটি দেখলাম সেই সহরে বড় বড় হাউসের ছড়াছড়ি। কোথায়? কেউ তো কোন ভাস্কর্যকে আদর করে তাঁদের আঙিনায় টেনে নিলেন না! ক্রিকেটের মাঠে ক্রিকেটের ভাস্কর্য মূর্তি, ফুটবলের মাঠে ফুটবলের অনায়াসেই হতে পারতো। খেলা পাগল হাজার হাজার মানুষ তাদের প্রিয় ক্লাবে সম্মানিত কোন শিল্পীর ভাস্কর্য পেয়ে খুশীতে নিশ্চয়ই সাধুবাদ দিতেন। সি এম ডি এ এবারের শীতে মাঠে বল ছেড়ে দিয়েছেন। এখন আসরে নামা উচিৎ প্রতিটি ক্লাবের। তাঁরা এতকিছু করতে পারেন, এই সহরকে ভাস্কর্যের সহর করার জন্য কেন তাঁরা একটি প্রদর্শনী ম্যাচ করেন না? একটি ম্যাচের অর্থে সমস্ত সহর হয়তো সেজে উঠতো না। কিন্তু সেটা নজির হয়ে থাকতে পারতো। আর এমনি অনেক সদিচ্ছায় হয়ত এগিয়ে এলে, কলকাতাকে শেষ নমস্কার জানিয়ে যাবার আগেই আমরা সুন্দর দেখতে পেতাম।

প্রতিটি যাত্রা দল, প্রতিটি ফিল্মের প্রডিউসর প্রচারে টাকা ব্যয় করেন পেশাগত কারণে। তাঁদের দক্ষতায় কুশলতায় আমরা মুগ্ধ হই, যাত্রা আমাদের সম্মান বাড়িয়েছে। ফিল্মে আমাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছে। গ্রামে গঞ্জে সহরে যেখানেই যাইনা কেন এখন সর্বত্রই যাত্রার জনপ্রিয়তা দেখতে পাই। আসরে লোক উপচে পড়ে। যদি প্রতিটি যাত্রা দল একটি করে মূর্তি স্থাপনের কিংবা প্রতিটি প্রডিউসার কিছু ভাল ম্যুরাল স্বেচ্ছায় করান, তবে বাঙালী হিসাবে আমরা গর্বিত বোধ করতাম। সি এম ডি এ যদি সাব-ওয়েতেও চমৎকার ম্যুরাল বসাবার কাজ শুরুর উদ্যোগ করতে পারেন তবে কেন যাত্রা, ফিল্ম, তা পারবে না। তাদের সৌজন্যের কথাও সবিনয়ে উল্লেখ রাখা যেত। ইংরেজীর সেই প্রবচন বলে, 'ইট ইজ নেভার টু লেট টু স্টার্ট এগেন'। আমাদের জন্য আসুক না এমনই কোন অপরূপ বিস্ময়।

কলকাতা সহর যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি তেমনি এই দুশো বছরের পুরনো এই সহরটাকে আমরা রাতারাতি পরিবর্তিত করতে পারবো না। এর জন্য চাই সময়, প্রস্তুতি, উদ্যোগ আয়োজন। সময় বেজেছে। যাত্রা শুরু হয়েছে। এখন পরিক্রমা সমাপ্তির পথে।

আজকের কলকাতাকে সুন্দর করে সাজাতে হলে শুধু সি এম ডি এ কিংবা অন্য কোন বেসরকারী সংস্থার ওপর নির্ভর করলেই চলবে না, আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন আনতে হবে। স্বভাব যদি আমাদের অসুন্দর হয় তবে কি কখনও আমাদের পরিবেশ সুন্দর হয়ে উঠতে পারে?

যে কোন গৃহস্থ বাড়ির পাশে আবর্জনার দেখা যায় বাড়ির যত অবাঞ্ছনা স্ব সেখানে ফেলে রাখা হয়। সিগারেটের খালি প্যাকেট এ সহরের লোক রাস্তাতেই ফেলেন ডাবের খোলাও তো সর্বত্র দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে একুশ বছর বয়সে তরুণ ছাত্র পল এসেছিল কলকাতায় কয়েক দিন আগে। সে অবাক হয়ে বলেছিল তোমাদের দেশ কি চমৎকার, সুন্দর! কিন্তু

এরকম নোংরা করে রাখ কেন তোমরা? পলু ভারতবর্ষের শ্যামল শোভায় মুগ্ধ। পশ্চিমবাংলায় ধানের ক্ষেতের ঢেউ, ক্ষেতের মধ্যে গাছ, মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ দেখে মুগ্ধ। যতটা মুগ্ধ আবার ততটাই বীতশ্রদ্ধ এই সহরের রাস্তাঘাটে ঘুরে। এখানে হাঁটা যায় না। মানুষের ভিড়ে গাদাগাদি। শিয়ালদহ থেকে ও নাকি পালিয়ে এসেছিল ধাক্কা খেয়ে। আর দুর্গন্ধ—নানা রাস্তাতেই নাকি ওকে মুখে রুমাল চাপা দিতে হয়েছে।

অন্য দেশের কারো মুখে নিজের দেশের সম্পর্কে এমন কথা শুনতে হলে মনে হয় কানে যেন কেউ সিসে ঢেলে দিচ্ছে। পলকে বলেছিলাম, এ সহর পাল্টাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবও। আরো একবার এ-দেশে বছর দশেক পরে! মনে হয় তখন এ-সহরকে অনেক সুন্দর দেখতে পাবে তখন। কেননা আমাদের এই সহরের সব তরুণের প্রেয়সীর নাম কলকাতা। প্রেয়সীকে সুন্দরী করে তারা তুলবেই।

পলকে যাই বলি না কেন, মনে মনে আমি জানি, যতই উড়াল পুল, সাবওয়ে কিংবা নতুন কোন অলংকার কলকাতার গলায় ঝুলিয়ে দিই না কেন, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নোংরা অভ্যেস যতদিন না ত্যাগ করতে পারবো ততদিন সুন্দরী কলকাতার মালিন্য ঘুচবে না। পলের কাছেও কোনদিন কথা রাখা হবে না।

ভরসা পাচ্ছি সাবওয়ে দেখে—পরিষ্কার ঝকঝকে ভেতরটা। কলকাতাও এমনি ঝকঝকে হয়ে উঠবে একদিন নিশ্চয়। পলের ঠিকানা রেখেছি। সেদিন তাকে চিঠি লিখব।

দুটি আর্ট কলেজ এই সহরে আছে। ইন্ডিয়ান কলেজ অফ আর্টস এন্ড ক্র্যাফট্‌-ম্যানশিপ ও ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ। দুটি কলেজেই সম্প্রতি দুটি চমৎকার চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে গেল। তেলরং, জলরং, ব্লু-প্যাস্টেলের অসংখ্য ছবির এই প্রদর্শনী দুটি বহু দর্শক দেখে গেছেন। অনেকের কাজেই পরিণত শিল্পীর মুন্সিয়ানা। যাদের শিক্ষানবিশী শেষ, তাদের এবার যাত্রা শুরু হল। শিল্পের এইসব অভিযাত্রীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। কলকাতাকে সুন্দর করার সময় হয়তো এদেরও অনেককে আমরা কর্মরত দেখতে পাবো।

ডালহাউসী স্কোয়ারের জনাকীর্ণ রাস্তায় কিংবা গঙ্গা নদীর পাড়ে হয়তো শিগ্গিরই কোন দিন এক বিস্ময়ের মুখোমুখী হবেন অনেকেই। পরিচিত ভিড়, কিংবা নদীর গায়ে হঠাৎ যদি দেখা যায় চমৎকার কোন ছবি, কোন নিপুণ শিল্পীর—তাহলে তো অবাক হবারই কথা। না, এটা কোন অলীক স্বপ্ন নয়। ভাল লাগল এই কথা জেনে যে এমন একটা ঘটনা নাকি ঘটতে চলেছে। সি এম ডি এ নাকি গভীরভাবে ভাবছেন ব্যাপারটা।

আমরা কলকাতাকে সুন্দরী দেখতে চেয়েছিলাম। কলকাতা ক্রমশ সুন্দরী হয়ে উঠছে।

আগামী বছর কেমন যাবে ?

আরো কত কি হতে পারতো কিন্তু হল না। নতুন বছরের কথা বলছি। ভেবেছিলাম নতুন বছরের গোড়ার দিকেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের জলাধারের কাজ শেষ হয়ে যাবে। মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতায় একটু বেশি জল, একটু বেশি চাপে পাঠানো যাবে। কিন্তু হলো না। পাম্প মেশিন সময় মত এসে পৌঁছুল না। চালু হতে সময় লেগে যাচ্ছে।

এই হয়, যতদূর সম্ভব ভেবেচিন্তে চেষ্টা-চরিত্র করে একটা প্রকল্প শেষ করতে যাচ্ছি কিন্তু বাধা-বিঘ্ন এসে যাচ্ছে।

ব্রাবোর্ণ রোড ফ্লাইওভারের কথাই ধরুন না কেন। ভেবেছিলাম পুজোর আগেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে কিন্তু এখনোও হয় নি। কারণ অবশ্যই আছে তবে আপনাদের কাছে বলতে লজ্জা নেই যে আপনাদের মত আমরাও আশাহত হয়েছি। তবে বালীগঞ্জ-কসবা ব্রীজের কাজ পুরোদমে আর শিয়ালদহ অঞ্চলের পুনর্বিন্যাসের কাজও চলছে। এটা নিশ্চয়ই সুখবর। কারণ শিয়ালদার জটপাকানো সমস্যা সত্যি অসহ্য। আমরা একটা বিকল্প রাস্তার কাজে হাত লাগিয়েছি। সেটা শেষ হলে, মহাত্মা গান্ধী রোড, শিয়ালদহ স্টেশন কম্পাউন্ডের ভেতর ঢুকে আবার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তারপর এই মহাত্মা গান্ধী রোড এবং বিপিনবিহারী স্ট্রীটের মাঝখানের জায়গাটা ঘিরে দিয়ে আমাদের উঁচু রাস্তার (র‍্যাম্প) কাজ আরম্ভ হবে। ট্রাম-বাস-ট্যাকসী, গাড়ী সব রাস্তার ওপর দিয়ে যাবে আর সেই উঁচু রাস্তার পেটের ভেতর যে কয়টি ফোকর থাকবে, তার ভেতর দিয়ে যাবেন পদযাত্রীরা। এছাড়াও শিয়ালদহ অঞ্চলের আদালত প্রাঙ্গণে বিরাট বহুতল বিশিষ্ট বাজার তৈরি হবে। এইগুলি কল্পনা নয়, অবাস্তব [illegible] নয়। অবিশ্বাস করবেন না, কারণ অনেকগুলি কাজ সম্পূর্ণ করেছি। বারবার বলতে ইচ্ছা হয় না, তবু বলছি হাওড়া 'সাবওয়ে', চেতলা সেতু, অরবিন্দ সেতু, কালীঘাট...

মানিকতলা রেল ব্রিজের নীচটা সম্প্রতি দেখেছেন কি? দেখবেন আরেকটা ফোকর হয়ে গেছে। এরকম তিনটে ফোকর হবে (এখন যেখানে মাত্র একটা আছে) দু পাশের দুটো ফোকর দিয়ে এখনকার মতই একতলা বাস যাবে। তবে মাঝখানের ফোকরটা রাস্তাটা ডুবিয়ে দিয়ে অর্থাৎ নীচু করে এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে দোতলা বাস এবং বড় বড় ট্রাক-লরি যেতে পারে। রাস্তা ডুবিয়ে দিলে জল জমবে না তো? না তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। বিরাট ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে। এটাতেও সময় লাগবে আপনাদের মত আমরাও অধৈর্য—কিন্তু উপায় নেই।

এইভাবে কাজের মধ্যে দিয়ে কলকাতার মানুষের সঙ্গে সি এম ডি এ-র পরিচয়। অনেকগুলি কাজ হয়ে গেছে কাজেই বিদ্রুপটা এখন আর অত প্রখর নয়। আরও কাজ হবে তবে বিদ্রুপের ভয় না করেই সেই কাজ চলবে।

কিছু লোকের অভ্যেস আছে দুম করে খবরের কাগজে চিঠি লিখে বসা। তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ তাঁদের সন্দেহ, সংশয় অথবা অজ্ঞানতা প্রকাশ করবার আগে সি এম ডি এ-র জনসংযোগ দপ্তরকে আগে একটা সুযোগ দিন।
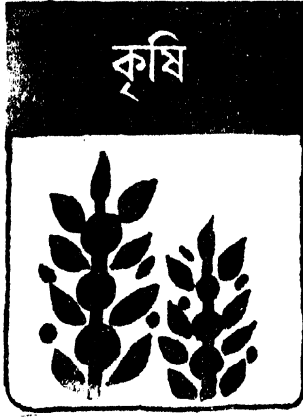
চৌবাচ্চায় মাছ চাষ

সুভাষ রায় চৌধুরী

মাছ ভাত বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। প্রয়োজনীয়ও বটে। পুষ্টির জন্য মাছ চাই। সেই মাছ মিলছে কোথায়? জলের পোকা চিংড়ি পর্যন্ত বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। গেল হপ্তায় পারশে ও বাগদার দর ছিল ২২ টাকা কেজি। আর সব যেমন তেমন মাছের বাজারে যেন আকাল পড়েছে।

দিনের কাজ শেষ করে রাতে খাওয়ার পাতে দেখি বেশ বড় রকমের চিংড়ি। মাছ খাব কি আমার তো মাথা ঘুরতে শুরু করল। গিন্নী কাছেই ছিলেন। মনের ভাব অনুমান করে বললেন মন্টু পাঠিয়েছে। তাঁর পুকুরের মাছ।

মন্টু আমার মধুর সম্পর্কের লোক। তাঁর পুকুর আছে। তাই মাছ খাওয়ার সখ মেটান সম্ভব হচ্ছে। যাঁর নেই তাঁর উপায় কি?

উপায় আছে। সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক ডঃ ধীরেন গাঙ্গুলি মশাই বলেছিলেন তাঁর জানাশোনা অনেক বাড়িতে চৌবাচ্চায় মাছের চাষ হচ্ছে। সবই তেলাপিয়া যত্ন-আত্তি খুব একটা লাগে না। সামান্য কিছু আটার গুলি পাতের কোণের ভাত ইত্যাদি দিয়েই তেলাপিয়া চাষ করা যায়। একোয়ারিয়াম বৈঠকখানার ঘরে শোভা বাড়ায়। সে জন্য যা খরচ হয় তার থেকে কম খরচে চৌবাচ্চায় মাছের চাষ করা যেতে পারে।

হাওড়ার বিজয়বাবু মাটি ছাড়া চাষবাস অনেক গবেষণা করেছেন। বিজয় চট্টোপাধ্যায়মশাই আজ নেই। কিন্তু চৌবাচ্চায় মাছ চাষ নিয়েও তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন।

তিনি দেখেছিলেন ৪-৫ ফুট খাড়াই ও চওড়া এবং ৬-৭ ফুট লম্বা চৌবাচ্চা থাকলে তাতে তেলাপিয়া মাছ বেশ ভালভাবেই বাড়ে। তবে অন্য কোন মাছের চাষ করতে হলে চৌবাচ্চা লম্বা আর একটু বড় করতে হবে। এবং তিনটি চেম্বার তাতে থাকা দরকার। প্রথম চেম্বারটি ৪ ফুট দ্বিতীয়টি ২ ফুট এবং তৃতীয়টি ৫-৬ ফুট হলে মাছ বাড়বে ভাল।

প্রথম চেম্বারটিতে কয়েক জোড়া পুরুষ ও স্ত্রী মাছ ছাড়তে হয়। উন্নত জাতের রূপোলী রুই বা সিলভার কার্প চৌবাচ্চায় ভালই হবে। এদের জন্য চৌবাচ্চা খাড়াই হবে অন্ততঃ ছয় ফুট।

প্রথম খোপে চৌবাচ্চার একদিকের গায়ে এক দেড় ফুট অন্তর দু-তিনখানা টালি বসিয়ে দিলে মাছের খেলা করার সুবিধে হয়। এক নম্বর চেম্বার থেকে দুই নম্বর চেম্বারে জল ও মাছের ডিম পাঠাবার মতো আধ ইঞ্চি লোহার পাইপ দেয়ালের এক ফুট নিচে বসাতে হবে। ঐ পাইপে সকেট থাকবে। ঐ সকেট খুলে নিয়ে জল ছাড়লে যাতে জলের তোড়ে মাছের ডিম দ্বিতীয় চেম্বারে যায় তেমন ব্যবস্থা রাখা চাই। অথচ পাইপ সরু হওয়ায় মাছ যেতে পারবে না অনুরূপভাবে দ্বিতীয় চেম্বার থেকে ডিম ফুটে চারা মাছ তৃতীয় চেম্বারে যাবার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

চৌবাচ্চায় পরিষ্কার নুড়ি অল্প পরিমাণে বিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সামান্য কিছু মাটি দিলেও ক্ষতি নেই। তবে মাসে একবার জল পাল্টাবার ব্যবস্থা রাখা দরকার। অবশ্য দু-তিন মাস বাদেও পাল্টান যায়।

চৌবাচ্চার মাঝে মাঝে টব বা ইঁটের ওপর এক ফুট চওড়া টবে কিছু জলজ গাছ রাখতে হবে। এই টব ওপর থেকে জলের এক ফুট নিচে থাকবে। তাছাড়াও কিছু ঝাঁঝি ও পানা রাখা যেতে পারে।

মাছের খাবার দেওয়ার জন্য কাঠের অথবা এনামেলের পাত্র ইঁটের স্ট্যান্ডের ওপর বসাতে হবে। ওপর থেকে এক দেড় ফুট জলের নিচে নিয়মিত খাবার দিলে মাছেরা ঠিক বুঝে-সুজে এসে খেয়ে যাবে।

খাবার হিসাবে চালের কুঁড়ো খুদ গমের ভুষি ছাতু মুড়ি ভাত বা রুটি এবং আটার ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে দিলেই চলবে। মাঝে মাঝে খোল কাঁচা গোবর বা ঘুঁটের টুকরো দেওয়া যেতে পারে। তবে একসঙ্গে বেশি খাবার দেবেন না।

চৌবাচ্চায় মাছের চাষ করতে গিয়ে অভিজ্ঞতার ফলে নিজেরাই অনেক কিছু জানতে এবং ঠিক করে নিতে পারবেন।

চীন জাপান এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশে অনেক আগে থেকেই চৌবাচ্চার মাছের চাষ চলে আসছে। মাছের ঘাটতির কথা বিবেচনা করে এবং টাটকা মাছ খাওয়ার সখ পেতে হলে নিজের বাড়িতে চৌবাচ্চায় মাছের চাষ শুরু করুন। এ ব্যাপারে মাছ দপ্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা আপনার প্রয়োজনে পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসবেন সন্দেহ নেই।

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

(রহস্য উপন্যাস)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মুখ ফুটে না বললেও হাবেভাবে বলেছিল। ম্যাগাজিনে পিন-আপ ছবি বিক্রী করে ওর পেট চলে। গাড়ীও কিনেছে ঐ টাকায়। ও ধান্দাবাজি আমার পোষায় না। নট মাই লাইন। তাছাড়া ওর ছবিও আমার স্ট্যান্ডার্ডে নয়।'

ডবল ব্লাফ কিনা ধরতে পারলাম না। পার্টনারশিপ ছিল এবং তা ধামাচাপা দেওয়ার জন্যেই অম্লানবদনে মিথ্যে বলছে না তো ম্যালকম?

খাঁই করে জিজ্ঞেস করলাম—'গুঁইয়ের বেশ কিছু পর্ণোগ্রাফি আপনি এনলার্জ করে দিয়েছেন, ঠিক?'

ভুরু তুলে আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে দোলাতে সত্যিই ভাল অভিনয় করল ম্যালকম সুকিয়াস।

'মিস্টার সি-আই-ডি, বুঝে কথা বলুন। আমার-উক্ত করছেন কিন্তু।'

'ঠিক কিনা বলুন? আমি অটল রইলাম।

'জামা আলগা করা বুকের ছবিকে যদি পর্ণোগ্রাফি বলেন, তবে বলব ইয়েস। কিন্তু ডজন ডজন ম্যাগাজিনে সে ছবি ছাপা হলে পর্ণোগ্রাফি হয় না কেন?'

'তার বেশী নয়?'

'হোয়াট দি হেল ইউ মীন? লাইফে পর্ণোগ্রাফি ছুঁই নি আমি।'

'গুঁইয়ের মডেলদের খবরাখবর রাখতেন?'

'অফকোর্স নট। আমার মডেল আসে এজেন্সী থেকে। কিন্তু গুঁইয়ের মডেল আসত বাড়ী বাড়ী থেকে।'

'এইমাত্র কিন্তু বললেন গুঁই ইনোসেন্ট ছিলেন।'

'কথা টুইস্ট করবেন না।' রেগে গেল ম্যালকম। 'কি মীন করেছি, তা বুঝেও লেগ পুল করছেন। এজেন্সী গার্ল কখনো বক্ষ সৌন্দর্য দেখিয়ে ছবি তোলে না।'

'শুক্রবার একটা মেয়ের ফটো তুলছিল গুঁই। চেনেন মেয়েটাকে?'

'নো, নেভার।'

'কোথায় ছিলেন শুক্রবারে?'

'তা নিয়ে আপনার দরকার কি?'

'খুনের তদন্ত করতে এসেছি মনে রাখবেন। জবাব আপনি না দিলে আপনার কর্মচারীদের মুখ থেকে বার করে নেব।'

জ্বলে উঠল ম্যালকম।

'কর্মচারীদের এর মধ্যে টানবেন না।'

'টানতে বাধ্য হব যদি আপনি ঠিক ঠিক জবাব না দেন। একে একে জেরা করব প্রত্যেককে।'

'গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'

'কি করতে?'

'আমাকে প্রায় লোকেশন শুটিংয়ে যেতে হয় মডেলদের নিয়ে। নতুন নতুন স্পট দেখে রাখতে হয় আগে থেকে। শুক্রবারে স্পট খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।'

'কোন দিকে গিয়েছিলেন?'

'শহরের বাইরে।'

'কোন দিকে? গুঁই যেখানে খুন হয়েছে, সেই দিকে? রতনপুরের কাছাকাছি?'

'ঐ রাস্তা দিয়েই আরো দূরে।'

'থ্যাংকিউ, মিঃ সুকিয়াস।'

বেরিয়ে আসবার সময়ে পেছনে না তাকিয়েই টের পেলাম কঠোর চক্ষু ম্যালকম নির্দয়ভাবে চেয়ে আছে আমার পিঠের দিকে। ছিল শান্তিতে, রেখে এলাম উদ্বেগে। উদ্বেগে আমিও। কেননা, ইন্টারভিউ একটি পরিচ্ছন্ন অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে—তার বেশী নয়।

এখন আমি যাই কোথায়? কাদায় পা আটকে যাওয়ার মত অসহায় বোধ করলাম। ম্যালকম গুঁইয়ের দোসর হলেও হতে পারত। কিন্তু সব রহস্যের মূলে হল সেই মেয়েটা—যার কথা অমূল্যবাবু পই পই করে বলেছেন—যার কথা থেকে থেকে খোঁচা মারছে মাথার মধ্যে। মেয়েটাই আসল—সব রহস্যের চাবিকাঠি। আচ্ছা, ফোয়ারা ঘোষকে আর একবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয় না? হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। ফোয়ারার শালাকে জেরা করা হয় নি। আমি করিনি। অমূল্যবাবু করে এসেছেন বটে—কিন্তু তাকে জেরা করা বলে না। মেয়ের নাক-কাটজনক ভঙ্গীর ফটোগ্রাফ যে পুলিশের দপ্তরে এসে গেছে, এই খবরটাই হেরম্ব ঘোষকে জানানো হয় নি। এমন কি ব্ল্যাকমেলিং সম্পর্কেও উচ্চবাচ্য করা হয় নি। এইসব কথা দিয়ে হেরম্বর অটলতার কাটল ধরাতে কি পারব না? মুখ ফসকে দু' একটা বেফাঁস কথাও কি বলাতে পারব না।

হেড কোয়ার্টারে গিয়ে ব্যাটম্যানকে দিয়ে পুরী তরকারী আনিয়ে লাঞ্চ সমাধা করলাম। পুলিশের খাদ্য হরেক রকম ভোজ্যবস্তু পাঠান সরকার বাহাদুর শয়ন মন্ত্রীমহোদয়দের। কিন্তু লোকে ভাবে না জানি আমরা কত সুখে চাকরী করি। অমূল্যবাবুকে ডেকে পাঠাতে গিয়ে শুনলাম তিনি বেরিয়েছেন। তাই ভেবে বসেন তাই ক্রন্দিতবদনে মুখখানা দেখাতে গেলাম তাঁর অফিসে। গিয়ে দেখি তিনিও টৌ টৌ করতে বেরিয়েছেন বাইরে। মন্ত্রীর মৃত্যু রহস্যের কিনারা করতে পারেন নি এখনো। ভালই হল। আমিও গুঁই হত্যার রহস্যে হাবুডুবু খাচ্ছি।

হেরম্ব ঘোষের ফ্যাক্টরী ছবির মত সুন্দর। কলকাতার বাইরে, অথচ শহরের সব সুবিধে হাতের কাছে। কয়েক বিঘে জমির ওপর কাঁচ আর অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে আধুনিক কারখানা। ভেতরে সাদা, কালো আর ল্যাভেন্ডার রংয়ের চোখ জুড়োনো ইন্টিরিয়র ডেকরেশন। সবই জ্যামিতিক ছকে তৈরী। পিকাসোর ড্রইং যেন। সম্রাজ্ঞীর মত একটি চীনে মেয়ে বসেছিল

টেলিফোন বকসের সামনে। মিষ্টি মুখ। এই দু'দিনে মিষ্টি মুখ এত দেখেছি যে একে দেখেও বিহ্বল হতে পারলাম না। বিশেষ করে মেয়েটি আমাকে সুললিত কণ্ঠে বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে যেই বললে, বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি—তখন যে উত্তরটা মুখে এসেছিল সেটা গিলে ফেলে শুধু বললাম মিঃ হেরম্ব ঘোষের সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিলেই আমি কৃতার্থ হব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে? তৎক্ষণাৎ জানতে চাইল চীনে সুন্দরী। আমিও তৎক্ষণাৎ বললাম অ্যাপয়েন্টমেন্টের দরকার হবে না। কেন না আমি সি আই ডি অফিসার।

চীনেদের মুখগুলো নাকি সব পাথর দিয়ে তৈরী—এমনি একটা প্রবাদ শোনা যায়, এই চীনে মেয়েটি তার ওপরে বেশ পোড় খাওয়া। চোখের পাতা একবারও কাঁপলো না। আমাকে বসতে বলে টেলিফোন তুলল। আমি না বসে শুনতে লাগলাম ফ্যাক্টরীর ভেতরে আর একটি মেয়েকে সে বোঝাচ্ছে সি আই ডি থেকে একটা মূর্তিমান উৎপাত এসেছে। মালিকের দর্শন প্রার্থী। দেখা হবে না জাতীয় কিছু কথা বলল বোধহয়। ও পাশ থেকে কোন সুন্দরী। (ঈশ্বর জানেন এ-রকম আরো কত সরূপা প্রতিদিনী নিযুক্ত হয়ে নারীদের প্রসাধন প্রস্তুত করেন হেরম্ব।) কিন্তু চীনে সুন্দরী হাল ছাড়ল না। সুতরাং মিনিট দুয়েক পরে লাল পাঞ্জাবী আর নীল পায়জামা পরা একটি সাদা রংয়ের মেয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেল হেরম্ব ঘোষের ভেতরের অফিসে।

অফিসখানা বাস্তবিকই দেখবার মত। অপূর্ব। আমি সময় নষ্ট না করে এবং হেরম্ব ঘোষকে তৈরী হওয়ার সময় না দিয়েই দ্রুত চলে এলাম কাজের কথায়। ঢুকেই অবশ্য লক্ষ্য করেছিলাম, ভদ্রলোকের চেহারাটা চ্যাম্পিয়ন বক্সারের মত। কদমছাঁট চুল। থ্যাবড়া নাক। চৌকো চোয়াল। কোট প্যান্ট টাই খুলে নিয়ে কারখানার পোশাক পরিয়ে দিলে কারখানার কর্মী বলে চালানো যায়। জোরী দুঁদে লোক সন্দেহ নেই।

সোজা কাজের কথা বলতে গিয়েছিলাম এইভাবে—'আমি আসছি সি-আই-ডি হেড-কোয়ার্টার থেকে। এস-আই সুমন্ত সেন।'

'এস-আই?' এমন খোঁচা মারা সুরে প্রতিধ্বনি করলেন যে ওর মধ্যেই বলা হয়ে গেল—বাপু হে, চুনোপুঁটি এস-আইদের সঙ্গে আমি আবার কি কথা বলব? আমার বাতচীত চলে আই-জি আর সি-পিদের সঙ্গে। তুমি কে হে! এরই নাম অদৃশ্য চাপড়। প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে বললাম—'ইন্সপেকটর অমূল্য বরাট এসেছিলেন আপনার কাছে বিশেষ একটা ব্যাপারে।'

'ও হ্যাঁ। ফানি বিজনেস। কি জানতে চান বলুন?'

'আপনার মেয়ে সম্পর্কে ইন্সপেকটর বরাট কিছু প্রশ্ন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ করেছিলেন। ব্যাপারটা মিটে গেছে নিশ্চয়?'

'মিটলে নিশ্চয় আসতাম না।'

'আ-চ্ছা!' আবার সেই খোঁচ। এস-আই'য়ের এলেম নিয়ে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

'আপনার মেয়ের সঙ্গে সনাতন গুঁইয়ের সম্পর্ক যে এত বেশী ছিল, আগে তা জানা যায় নি।'

'কি বলতে চান?'

'মিস ঘোষ প্রায় পোজ দিতেন—
জানি। বাধা দিলেন হেরম্ব। আমার মেয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতই মেয়ে।'

কিন্তু আমি লেগে রইলাম পয়েন্টে।

'এমন সব ছবিতে যা দেখে মনে হয় সনাতনের অনেক কিছুই উনি জানতেন।'

হেরম্ব ঘোষ আমাকে বসতে বলেন নি। ও সম্মানটুকু বোধহয় ইন্সপেকটর পার্শতে প্রাপ্য। তাই ব্রীফকেস রেখে ছিলাম বসবার চেয়ারে। দাঁড়িয়ে থেকেই খুললাম ব্যাগ—হাত ঢোকালাম ভেতরে। বার করলাম একতাড়া ফটো। হেরম্ব আর কথা বলেন নি—লক্ষ্য করছিলেন আমার কার্যকলাপ।

এবার আমার পালা। শুধোলাম চোখে চোখ রেখে—সনাতনের ক্যামেরায় মিস ঘোষ পোজ দিতেন, আপনি জানবে কি করে?'

আপনার ইন্সপেকটর বলেছিলে কিন্তু তাতে আপনার কি?

এই ফটোগুলো দেখলেই বুঝবেন।

বলে, নির্দোষ ছবিগুলো অ ধরিয়ে দিলাম। বেশি আপত্তিকর গ রাখলাম পরের পর্যায়ের জন্যে। য যখন করতেই হবে, ধাপে ধাপে হোব

নির্দোষ হলেও ছবিগুলো না নির্বিকার ভাবে সেগুলোর দিকে । রইলেন হেরম্ব। পরের পর সবগ দেখলেন। তারপর ফিরিয়ে দিলেন। ' কুঁচকোলেন না, চোখের পাতা কাঁপা না, ঠোঁট শক্ত করলেন না। বি ফাইটার মনে হচ্ছে। নক আউট না হয়।

গলা না চড়িয়ে বললেন—কো পেলেন?

'সনাতন গুঁইয়ের ফাইলে।'
আমাদের দেখালেন কেন? উঠি কিনা দেখবার জন্যে?

'না, অতটা ভাবিনি। তবে...এ দেখলে হয়ত চমকাতে পারেন।'

বলে, বাড়িয়ে দিলাম ত আপত্তিকর ছবিগুলো। পরের পর ছবিই দেখলেন হেরম্ব। কিন্তু ' মতই বিকারবিহীন মুখে। মনে অমূল্য বরাটের উক্তি। হিউম্যান অ্যাকশন পর্যন্ত দেখালেন হেরম্ব। ছবি দেখলে রক্ত-সম্পর্কিত পি তো বটেই যেকোনো মানুষই চ শিহরিত, রাগত হত। কিন্তু হেরম্ব অবহেলাভরে প্রিন্টগুলো ফেললে টেবিলে। আগে দেখা আছে নিশ্চয় তাই। হেরম্ব জা মেয়ে পনা এবং এ ছবি আগেই দেখেছেন।

বললেন, —চমকালাম না। আর খুঁটি নেই। সে যা ভাল না তা করতে পারে। আমি বাধা দিই
'মুখে বাধা দেন না। কিন্তু মন কি সায় দেয়?'

আমার মুখ দিয়ে আপনার কথা বার করবার চেষ্টা করবেন না যা করেছে, তা একসট্রিমলি ' কিন্তু আমি বলব এটা তার ছেলে কৌতূহল। চাইল্ডিশ স্টুপিডিটি। ছবি আমার মেয়ের জানলেন কি কোনো চিহ্ন তো নেই।'

'প্রিন্টগুলোর সঙ্গে একটা কাগ ছিল। তাতে নাম লেখা ছিল মেয়ের।'

সেইসঙ্গে যে মেয়ের বাপের ছিল, স্রেফ চেপে গেলাম তখনক ফাইট ইজ ফাইট। শনৈঃ শনৈঃ ছাড় সুতো। বড় মাছ কিনা।

'ছবিগুলোর গুরুত্ব কোন দিক থেকে?' হেরম্বর গলা এবার বিলক্ষণ কড়া।

'আপনার মেয়ে সনাতন গাঙ্গুইয়ের ক্যামেরায় ন্যুড পোজ দিতেন—ডাক পড়লেই ছুটতেন। অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই ছবি তা প্রমাণ করছে।

চেয়ে রইলেন হেরম্ব ঘোষ।

এবার দেখুন আর একটা সেট, বলে এগিয়ে দিলাম ক্ষণজন্মা সনাতনের তোলা শেষ ফটোগুলি। আগের মতই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখলেন হেরম্ব। তারপর চোখ তুলে তাকালেন অসহিষ্ণুভাবে।

'এসব কি? এ ছবিগুলোও কি আমার মেয়ের? তাই যদি হয় আমাকে দেখাচ্ছেন কেন? একটু আগেই তো বেশ জোর হয়ে প্রমাণ করে দিলেন মেয়ে আমার স্টুপিড— তাই ন্যুড ছবি তুলিয়েছে। তারপর আর কি চান? আবার কি প্রমাণ করতে চান?'

ঘর নিস্তব্ধ। আমি ছবিগুলো জড়ো করে তুলে নিলাম টেবিল থেকে।

তারপর বললাম আস্তে আস্তে, থেমে থেমে—সনাতন গাঙ্গুই এই ছবি তুলতে তুলতেই খুন হয়েছিল। নেগেটিভগুলো আমরাই ডেভেলপ করেছি পুলিশ ল্যাবোরেটরীতে।'

চোখের পাতা পড়ল না হেরম্ব ঘোষের। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপরেই বললেন— সিট ডাউন।

হাত বাড়িয়ে তুললেন টেলিফোন রিসিভার।

নো কলস, মিস চুং।

রিসিভার রেখে মুখোমুখি বসলেন হেরম্ব।

আপনার কথার তাৎপর্য খুব পরিষ্কার। আপনি ঘুরিয়ে বলতে চাইছেন যে সনাতন গাঙ্গুই মরবার সময়ে আমার মেয়ের ছবি তুলেছিল এবং তাকে খুন করেছে আমারই মেয়ে।'

'ঘুরিয়ে কিছুই বলতে চাইছি না। আমি জানতে চাই সেই মেয়েটা কে।

আমার মেয়ে নয়।

'কি করে জানছেন? চেহারা তো আপনার মেয়ের মতই।'

না। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি কি প্রমাণ করতে চান সনাতনের ব্যাপারে বেশ কিছু খবর আমি রাখি?'

'আপনি বড় স্পষ্টাস্পষ্টি বলছেন?'

নীতির ব্যাপারে আমি স্পষ্টাস্পষ্টিই বলি। আমার মেয়ে ন্যুড মডেল হতে পারে—খুন করতে পারে না।'

স্ট্রং মোটিভ থাকলে যে কেউ খুন করতে পারে।

আপনার অ্যাটিটিউড আমার ভাল লাগছে না। যে কেউ মানে? তার মধ্যে আমিও আছি? কেন? সনাতন গাঙ্গুইকে আমি খুন করতে যাব কেন? আমার মেয়েই বা যাবে কেন? আমি তাকে কি রকম দেখতে তাই জানি না।'

অল রাইট। শুক্রবার কোথায় ছিলেন বলতে আপত্তি আছে?

'আই অবজেক্ট ভেরি স্ট্রংলি। —জোরালো আপত্তি জানাচ্ছি আপনার কথার ধরনে। এরকম কোনো প্রশ্ন করার কোনো রাইট আপনার নেই খেয়াল রাখবেন।'

'আছে। আই হ্যাভ এভরি রাইট। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। জবাব না দিলেই যদি নিরাপদ মনে করেন, তাহলে দেবেন না। আমিও অন্ততঃ এ ব্যাপারে আর পীড়াপীড়ি করব না।'

ধরেছি ঠিক জায়গায়, বললাম মনে মনে। ঠিক পয়েন্টে মেরেছি ঘা। অনুমান মিথ্যে হয়নি। মেয়ের মতই জেদী। কিন্তু এই জেদই ফাঁদে ফেলেছে। নিজের জেদের বেড়াজালে নিজেই এখন অসহায়। হয় জবাব দিতে হবে, নয় আমার মনে সন্দেহের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হবে। একই চিন্তাধারা হেরম্ব ঘোষের মগজেও শুরু হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়। তাই হেলান দিয়ে বসে নির্নিমেষে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অস্বাভাবিক শান্ত গলায় যা বললেন, তা এই :

'আপনার ইঙ্গিত খুব খারাপ।

আমার মুভমেন্ট আমার ব্যাপার—সেটা যারতার সঙ্গে আলোচনা করার নয়। কিন্তু আপনি যখন নিরাপত্তার কথা তুললেন তখন বলতেই হল। টুকে নিন। শুক্রবার সকালে কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করেছিলাম— এইখানে। শেষ হয়েছিল সাড়ে এগারোটায়। তারপর গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলাম ফর ড্রাইভ।'

'ড্রাইভ? কাজের সময়ে?'

কনফারেন্স ডেকেছিলাম অত্যন্ত কঠিন সমস্যা সমাধান করার জন্যে। দায়িত্ব আমারই। তাই খোলা হাওয়ায় যাতে তলিয়ে ভাবতে পারি সেজন্যেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছিলাম। ওটা আমার বরাবরের অভ্যেস।

'কোথায় গেলেন?'

'গঙ্গার পাড় বরাবর রাস্তা দিয়ে।'

'কখন ফিরলেন?'

'তিনটে নাগাদ।'

প্রেমা শুধু মাথা নাড়ল। কোন কথা না বলে স্থির চোখে চেয়ে রইল সমুদ্রের ঢেউ-গুলোর দিকে।

দেবন জানে প্রেমার এই ধরনের ভাবান্তরের মুহূর্তগুলোতে কথা বলা নিরর্থক। সারা ভারত ভ্রমণের সময় বেশ কয়েকবারই সে প্রেমার এরকম মানসিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে।

চুপচাপ বসে রইল দুজন পাশাপাশি। এখন হাওয়ার খেলা শুরু হয়েছে সমুদ্রে। ঢেউগুলো আবেগে উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। প্রেমার শ্যাম্পু করা চুলগুলো তার কপাল আর গালের ওপর নাচের খেলা শুরু করে দিয়েছে। সেদিকে খেয়াল নেই প্রেমার। সে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে কিন্তু দৃষ্টি তার সেখানে নেই। সে তার বুকের বেলাভূমিতে দেখছে একটা ছবি। দেবন ঢেউ-এর মত দুটো বাহু দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে তার বুকের তটভূমি লক্ষ্য করে।

এখন কেমন বোধ করছ প্রেমা?

চমকে চূর্ণ চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে দিতে দিতে প্রেমা বলল, ভাল। খু-উ-ব ভাল।

তুমি ভীষণ রকম মুডি প্রেমা। নিজের ভেতর যখন থাক নাগাল পাওয়া যায় না।

হেসে তাকাল প্রেমা দেবনের মুখের দিকে। বলল, কোন দিন আমার মনের খোঁজ নিতে এসেছ কি দেবন?

আবার দেবনের সারা মুখে সেই অসহায় অবুঝ ছবির রেখা পড়ল। সে শুধু মৃদু হাসল। কোন উত্তর দিতে পারল না।

প্রেমা এবার কথান্তরে গেল।

তুমি তো ওদের সঙ্গে গেলে পারতে দেবন। এখানে একা একা থাকার কোন মানেই হয় না।

দেবন যেন ভারী আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, একা একা কেন, তুমি তো রয়েছ।

মনে মনে হাসল প্রেমা। দেবনের হাতখানা টেনে নিয়ে বলল, পরীক্ষা করে দেখতে প্রেমাপ্রেমা নামের মেয়েটি তোমার কাছে আছে কিনা।

দেবন প্রেমার হাতখানা ধরে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল, বলল, একেবারে বিশ্বকর্মা শিল্পীর হাতখানা গড়ে তোমার শরীরে যেন বসিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য তোমার আঙ্গুলের গড়ন।

প্রেমা খুশী হল দেবনের মুখে তার দেহ-সৌন্দর্যের কথা শুনে। কিন্তু হতাশ হল তার মনের কথাটা বুঝল না বলে।

প্রেমা বলল, যে কোন পুরুষ তোমার ঐ আকৃতি পেলে বিশ্বজয় করতে পারে।

দেবন বলল, সবাই বলে আমার দাদুর শরীরের সঙ্গে নাকি আমার অদ্ভুত সাদৃশ্য! সেদিন তোমার মত রোশেনারাও ঐ কথা বলেছিল।

প্রেমা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল মনে মনে। কথকশিল্পী রোশেনারারও চোখ পড়েছে দেবনের ওপর।

মুখে শুধু বলল, যারা সুন্দর সব মেয়েই তাদের পূজারী হয়।

দেবন সঙ্গে সঙ্গে বলল, মেয়েরাও তোমার মত রূপ পেলে ছেলেরা তাদের জন্যে পাগল হয়।

প্রেমা অমনি বলে উঠল, তারও ব্যতিক্রম আছে।

কি রকম?

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। তুমি কি কোনদিন কোন আকর্ষণ বোধ করেছ কারু জন্যে?

দেবন আজ নিবিড় চোখে তাকাল প্রেমার মুখের দিকে। বলল, বাস্তব জগতের অনেক আইনকানুনই আমার অজানা প্রেমা, কিন্তু তা বলে আমার নিজের সীমা ছাড়িয়ে যাব হয়ত এতটা নির্বোধ আমি নই।

প্রেমা বলল, তুমি অহংকারী দেবন। সীমা মেনে চলা তোমার একটা ছলনা।

সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখাতে যদি কোন দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় তাহলে আমি দাম্ভিক। আর সীমা মেনে জীবনের পথে চলার নাম যদি ছলনা হয় তাহলে আমি নিঃসন্দেহে কপট।

প্রেমা সহজ হল। দেবনের হাতখানাতে নাড়া দিয়ে বলল, তোমাকে আজ বড় চঞ্চল করে তুলছি তাই না? তোমার মুখে ক্ষোভের ছায়াতো কোনদিন দেখিনি তাই একটু দেখতে ইচ্ছে হল বলে এত কথা বললাম।

দেবন বলল, কিছু মনে কর না, একটা সত্য আমাকে বলতে দাও। আমি তোমাদের মত সম্পন্ন পরিবারের ছেলে নই। কলেজ ইউনিভারসিটির শিক্ষাদীক্ষাও নেই আমার। ছেলেবেলা থেকে শুধু একটা শিল্পকে আঁকড়ে ধরে সান্ত্বনা পেয়েছি মনে মনে। তাই বিশ্বাস কর সব ভুলে আমি আমার শিল্পের ধ্যানেই সময় কাটাতে শিখেছি। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সান্ত্বনা বল আর সঙ্গীই বল এই নাচটুকু।

প্রেমা এবারও আর গভীর কোন আলোচনার দিকে গেল না। সে হঠাৎ আলোচনায় ছেদ টেনে দিয়ে বলল, তুমি আমার বন্ধু দেবন, ব্যস। এর চেয়ে বড় পরিচয় তোমার আমার আর কিছু নেই।

দেবন বলল, তোমাদের স্বীকৃতিতেই আমার সান্ত্বনা। ভাবব আমার অদৃষ্টটা ভাল।

প্রেমা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে এল।

রোশেনারার পারফরমেন্স তোমার কেমন লাগছে?

ওর পায়ের কাজ দর্শকদের চোখকে টেনে রাখবে। তাছাড়া মোগল কসটিউমে ওর চক্করগুলো দেখবার মত।

অনসূয়া পাণিগ্রাহীর ওড়িশি?

দেবন বলল, করীহস্তকরণ মুদ্রায় ... যখন সম্বলপুরী লাল শাড়িতে সেজে রূপোর ঝকঝকে অলংকার পরে দাঁড়ায় তখন ওকে কল্পনার উর্বশী বলে মনে হয়। পদ্ম মুদ্রায় যখন হাতের আঙুল পদ্মের পাপড়ির মত গোল করে মেলে ধরে ঈষৎ হেসে স্থির দৃষ্টিতে তাকায় আর আলোর রশ্মিটা এসে পড়ে মুখের ওপর তখন মনে হয় সূর্যের ছোঁয়ায় সারা মুখখানা ওর পদ্ম হয়ে গেছে।

আর সুদর্শনার মণিপুরী?

ওর স্থানক মুভমেন্টের অনায়াস কাজগুলো দেখার মত। শাড়ীর ওপর স্বচ্ছ সাদা উত্তরীয়খানা কোমরে জড়িয়ে, চোলির ওপর লাল-সাদা ফুলের মালাটি দুলিয়ে যখন চলতে থাকে তখন শ্রীরাধার সঙ্গে আঁকা বলে মনে হয়।

ঐ সুন্দর মালাটিই তো তোমাকে উপহার দিয়েছে সুদর্শনা, তাই না?

দেবন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমার হাত ধরে বলল, এস আমার সঙ্গে।

ওরা একসময় এসে ঢুকল দেবনের ঘরের ভেতর। নির্জন হোটেল। অতৌধিক নির্জন ঘরখানা। দূরের সমুদ্র দেখার জন্যে একটা জানালা খোলা। শেষ বেলার সোনালী উত্তরীয় কাঁপছে সামনের নারকেল পাতার ঝালরে।

দেবনের উদ্দেশ্য প্রেমার অজানা। একটা কৌতূহল কাঁপছে তার চোখের তারায়।

দেবন বাকস খুলে সুদর্শনার দেওয়া মালাখানা বের করে প্রেমার দিকে তুলে ধরে বলল, নাও এ মালা। এতে আমার কোন প্রয়োজনই নেই।

প্রেমা বলল, আমি ... উচ্ছিষ্ট নেওয়াতে অভ্যস্ত নই দেবন।

এখন এ মালা আমার। একে মত বিলিয়ে দেবার অধিকারও আমার।

প্রেমার এই মুহূর্তে দারুণ ... দিতে ইচ্ছে করল দেবনকে। কিন্তু মুহূর্তে সে নিজেকে সংযত করে বলল, প্রাণের থেকে যে পুরস্কার সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পাওয়া। যদি ... দিন সে পুরস্কার জোটে তাহলে ... সেদিনই আমি তোমার সে পুরস্কার ... আদরে অনেক মান দিয়ে বুকে তুলে দেবন।

দেবনের চোখের দৃষ্টি নত ... সুদর্শনার দেওয়া মালাটা সে ঘরের এক ... ছুঁড়ে ফেলে দিতে প্রেমা এগিয়ে গিয়ে মালা কুড়িয়ে এনে দেবনের হাতে তুলে বলল, একটা হৃদয়কে তুমি এভাবে ... করতে পার না দেবন। সে তোমার জন্মা... স্মরণ করে এ ভালবাসার উপহা... দিয়েছে।

দেবন অভিভূতের মত সে মালা ... হাতে তুলে নিল।

প্রেমা বলল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে আজ দেবন? বলতে পার বান্ধবীর এক বাঙালীর দাবী।

বল।

সেদিন তুমি মণিপুরী পোশাক পরে এসেছিলে। আমি তোমার সে বেশ দেখিনি। আমার সুদর্শনার দেওয়া সেই ধুতি উত্তরীয় পরে আসবে আমার ঘরে।

দেবন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। একসময় বলল, বেশ যাও তোমার ঘরে আমি এখুনি আসছি।

হোটেলে প্রেমার জন্যে নির্দিষ্ট একখানা ঘর। ঘরখানা বেশ বড়। বার্মা টিকের পালিশ করা বড় গোল একটা টেবিলের চারদিকে খানা লাল গদী আঁটা সুদৃশ্য চেয়ার। এই টেবিল ঘিরে বসে গুণী শিল্পীরা প্রতিদিন তাদের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনায় মাতে। ছোটখাট নানা রকম পরিবর্তন সংযোজন এই ঘরে বসেই স্থির হয়। যে এই রূপের শুধু পরিচালিকাই নয় প্রাণ সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু প্রেমা কাজেই দেবনকে সামনে এগিয়ে দেয়। বিষয়ে মতামত যাচাই-এর সময় দেবনের মতই চূড়ান্ত বলে মেনে নেয় প্রেমা। র কিছু পরিকল্পনা থাকলে আগেই আলোচনা করে রাখে দেবনের সঙ্গে। কিন্তু মুখোমুখি বসে নিজের মত জাহিরের করে না সে।

ঘরে এসে ঢুকল প্রেমা। ঘরের কোণে থাকা একখানা চেয়ারে বসল সে। নিতে আঙুলে ঠেকিয়ে দরজার দিকে চুপচাপ বসে রইল।

প্রেমা যেন প্রেক্ষাগৃহের এক নিবিষ্ট । প্রতীক্ষা করে আছে শ্রেষ্ঠ কোন শিল্পীর আগমনের।

ঘরে এসে ঢুকল দেবন। পলক পড়ছে প্রেমার চোখে। অনাবৃত ঊর্ধ্ব অঙ্গ। না সুন্দর মণিপুরী কারুকরা সাদা উত্তরীয় বুকের দুই প্রান্ত দিয়ে তের মত নেমে গেছে জানু পর্যন্ত। তেমনি শুভ্র ধুতি। হাতে দুলছে ।

চেয়ার থেকে উঠে এল প্রেমা। দেবনের দাঁড়িয়ে কতক্ষণ দেখল তাকে। এক- দেবনের হাত থেকে মালাটা নিয়ে এটা হাতের অলংকার নয় দেবন, দোলাবার জন্যে তৈরী।

মালাটা দেবনের গলায় পরিয়ে দিয়ে সুদর্শনা থাকলে সেই তোমার রূটি- শুধরে দিত কিন্তু সে যখন নেই তখন র খাতিরে তার হয়ে এ কাজটুকু কই করতে হল।

দেবন প্রেমার একখানা হাত নিজের দু' মুঠোয় ধরে নিয়ে বলল, তোমার নি কি কোনদিনও ভাঙবে না প্রেমা!

কাল থেকেই সকলে নীরবে কাজ চলেছে। একটা ব্যস্ততা কেভালম হোটেলের প্রতিটি ঘরে। সুদর্শনা রোশেনারা অনসূয়ার দল পায়ের নূপুরের বাঁধন পরীক্ষা করছে। শাড়ী নির্বাচন করে সাজিয়ে রাখছে পাশে পাশে। পুরুষ শিল্পীরা মালাগুলো গেঁথে নিচ্ছে। মুখোশ কোল্লারমে সূঁচে স্টিচ দিয়ে বাঁধন শক্ত করে তুলছে। কেউবা আয়রণ করে নিচ্ছে ধুতি উত্তরীয় পাগড়ী।

আজ প্যালেস হোটেলে প্রেস শো। বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে 'সঙ্গম' ব্যালে গ্রুপ তাদের ভারত পরিক্রমার আগে নাচ পরিবেশন করবে। বিখ্যাত পত্র- পত্রিকার কলাসম্পাদকেরা থাকবেন উপ- স্থিত।

মিঃ পিল্লাই-এর ব্যস্ততার শেষ নেই। তিনি এইমাত্র প্রেমার ঘর থেকে দ্রুত পায়ে কি একটা জরুরী কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেন।

সরিতা ইন্দ্রের কাছে এসে বলল, নিউজ এডিটার রিপোর্টার মিলে প্রায় তিরিশজনের লাইট রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইন্দ্র স্টেজের ভেতরের ডেকোরেশন সম্বন্ধে দুটি লোককে নির্দেশ দিচ্ছিল। সরিতার কথায় পেছন ফিরে বলল, আরও কয়েকটা বাড়তি প্লেট রেখে দাও।

কেন? অন্য কোন নিমন্ত্রিতের জন্যে ... ছাড়া আর কিছু রাখা হবে ... ঠিক হল। ...

ইন্দ্র লোক দুটিকে শেষ দু চারটে কথা বলতে তারা কাজ বুঝে নিয়ে চলে গেল।

ইন্দ্র সরিতার কথার উত্তরে বলল কটি বিদেশী টুরিস্ট এসেছেন। তাঁদের ভেতর নাকি লেখক শিল্পী সাংবাদিক রয়েছেন কয়েকজন। এসেছেন ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। প্যালেস হোটেলের ম্যানেজার জানিয়েছেন ওঁদের অডিটোরিয়ামে নাচ দেখার জন্যে ইনভাইট করলে ভাল হয়।

আমি ছখানা কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি। তাই বলছিলাম আরও খান কয়েক প্লেটের ব্যবস্থা রাখ।

সরিতা চলে যেতে যেতে দুষ্টুমি করে বললে বিদেশিনী কজন?

ইন্দ্র অমনি বলল, একমাত্র সরিতা যেমন।

একটা খিল বাতাসে ঠুকতে ঠুকতে অদৃশ্য হয়ে গেল সরিতা।

প্রেমা এসে ঢুকল দেবনের ঘরে। হাতে একখানা কাগজ। কোন সীনে কোন আর্টিস্ট মঞ্চে আসবে তারই তালিকা। একবার দেবনকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবার ইচ্ছে। ভুলচুক থেকে যেতে পারে।

দ্রুত পায় এসেছিল প্রেমা কিন্তু থমকে থেমে দাঁড়াতে হল।

দেবন ধূপদীপ জেলে পূজার আসনে স্থির হয়ে বসে আছে। সামনে মহাদেবের ছোট একটি মূর্তি।

হঠাৎ প্রেমার মনে পড়ল, আজ তিরু আদিরা। মহাদেবের জন্মদিন। পার্বতীর উপবাস। সারা বেলার সীমন্তিনী মেয়েরা আজ স্বামীর কল্যাণে উপবাস করবে। কুমারী বিবাহিতা সবাই আজ মাঝ রাতে সমবেত হবে মন্দির সংলগ্ন পুষ্ক- রিণীর সোপানে সোপানে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে। সারা রাত হস্ততাড়নার

বিচিত্র এক ধরনের শব্দ তুলবে তারা। ভোরের আগেই উঠে আসবে জল থেকে। শুভ্রবস্ত্রে দেহ আবৃত করে তারা চোখের পাতায় দেবে অঞ্জনের প্রলেপ। কপালে আঁকবে তিলক। চুলে দেবে সুগন্ধী ফুলের মালা জড়িয়ে। নববধূরা খোঁপায় দেবে দশ-পুষ্পম। প্রেমের দেবতা মদনের গান গাইবে মেয়েরা সমবেত গলায়। তাম্বুলের রঙে রাঙা করবে সুচারু ঠোঁট দুটি। ঘরে ঘরে বাঁধা হবে সজ্জিত দোলনা। ওনজালে দোল খেতে খেতে স্পর্শ করবে তারা পৃথিবীর মাটি আর শূন্যলোক। মনে হবে শূন্য থেকে দেবপরীরা একবার নেমে আসছে মর্ত্যে আবার হাওয়ায় পাখা দুলিয়ে উড়ে চলেছে শূন্যলোক লক্ষ্য করে।

দেবনেরও তো আজ জন্মদিন। তাই হবি ও আজ বসেছে পুজোর আসনে ইষ্ট দেবতার বিগ্রহ সামনে রেখে। অচঞ্চল নিবিষ্টমূর্তি।

প্রেমা পায়ে পায়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দেবনের ঘর থেকে। তার মনে হল আজ সেও এই পবিত্র দিনটিকে উদযাপন করবে পার্বতীর মত উপবাসী থেকে।

প্যালেস হোটেল অডিটোরিয়ামে শুরু হয়েছে নাচ। বিখ্যাত আলোকসম্পাত শিল্পী মায়ারিচ্চন আলো ফেলেছেন। একটা হেভি গ্লাসের তৈরী সিঁড়ি আলোর প্রবাহে মনে হচ্ছে স্রোতস্বিনী। তার পাশে পাশে উপল ছড়ান। নাচে একটু হলুদ আলোর বৃত্তে ভগীরথরূপী দেবন তপস্যা-রত। রৌদ্রের মত হলুদ বসন পরিধানে। ঊর্ধ্ব অঙ্গ অনাবৃত। ঝুঁটিবদ্ধ কেশগুচ্ছ। একটি উজ্জ্বল দীপ্তিমান তপস্যা বলে মনে হচ্ছে দেবনকে। আকর্ষণীয় দেহভঙ্গী তরুণ তাপসের।

ঐকতান সংগীতের সুরে চকিত হল প্রেক্ষামঞ্চ। সুরলোক থেকে নেমে আসছেন গঙ্গা। শুভ্র বসন পরিধানে। কেশগুচ্ছের পুঞ্জিত সুষমা। তরঙ্গিত দেহভঙ্গী। তরঙ্গিত বাহু। ভক্তের আহ্বানে নেমে আসছেন তরঙ্গিনী।

প্রেক্ষামঞ্চে করতালি ধ্বনি উঠল। প্রেমা দেবনের দিব্য আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছে দর্শককুল।

প্রপাত থেকে যখন গঙ্গা এসে দাঁড়ালেন প্রেক্ষামঞ্চে তখন ভক্ত ভগীরথ উঠে দাঁড়াল তার আকাঙ্ক্ষিত দেবীর সামনে নমস্কার নিবেদনের ভঙ্গীতে। প্রসন্ন দেবী হাত তুলে ভক্তের প্রতি প্রসন্নতা প্রকাশ করলেন।

শুরু হল ভগীরথের নৃত্য। এত দুঃখের পথ পরিক্রমার পরে সে আজ করবেন তার অভিশপ্ত পূর্বপুরুষদের উদ্ধার। সংশয়ের মেঘছায়া সরে গেছে মনের ওপর থেকে। এখন রোদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভগীরথের প্রসন্ন অন্তর। নৃত্যের ভেতর সেই পরমপ্রাপ্তির লীলা। তার অন্তরের আকুতি বার বার সকৃতজ্ঞ প্রণতির রূপ ধরে নিবেদিত হচ্ছে দেবীর উদ্দেশ্যে।

কি অনায়াস দেহচালনা দেবনের। হস্ত-নয়ন চরণের মুদ্রাগুলি যেন দেহের শাখায় শাখায় ফুটিয়ে তুলছে নানা আকৃতির কুসুম।

নাচের মুদ্রাগুলি শেষ করে যখন তার সংগে আসার জন্যে ভগীরথ আহ্বান জানাল দেবীকে একটি বাহু প্রসারিত করে তখন শুরু হল আবার করতালিধ্বনি। দেবনের অতি স্বচ্ছন্দ নৃত্যভঙ্গিমার প্রতি দর্শকদের সদর স্বীকৃতি।

এরপর অভাবনীয় আলোর লীলা। শঙ্খমুদ্রায় হাতদুটিকে ওষ্ঠে স্থাপন করে ভগীরথ লীলাভরে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করছে। আর তার পশ্চাতে দেবী সুরধনী চলেছেন এঁকে বেঁকে। যেদিক দিয়ে যাচ্ছেন সেই-দিকে তাঁর চরণে আলোর জলরেখা সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

পরিকল্পনাটি এত দৃষ্টিসুখকর যে ভগীরথ আহ্বান করে গঙ্গাকে যখন উইংসের পাশ দিয়ে নিয়ে চলে গেল তখন দর্শককুল ফেটে পড়ল করতালিধ্বনিতে। তখনও মঞ্চের ওপর আলোয় আঁকা হয়ে আছে জলের আবর্তিত প্রবাহ।

প্রথম মঞ্চে অবতরণের পর প্রেক্ষাগৃহ থেকে যে কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে তা উৎসাহজনক।

রোশেনারা ছুটে এল দেবনের কাছে। প্রণাম করে দাঁড়াল। বলল অপূর্ব তোমাদের নাচ। এখন আশীর্বাদ চাইতে এসেছি। এর পরেই আমার স্টেজে নামার পালা।

একটু দূরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রোশেনারা আর দেবনের ছবি দেখতে পাচ্ছিল প্রেমা। স্ক্রীনের ভেতরে তবলার বোল উঠেছে। কথক-নর্তকী প্রস্তুত। উইংসের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যবনিকা তোলার অপেক্ষায়। ছুটে গেল দেবন তার পাশে। রোশেনারার পায়ের নূপুর শক্ত করে বাঁধা হয়নি। লক্ষ্য এড়ায়নি দেবনের। নীচু হয়ে বসে সে ক্ষিপ্রহাতে বেঁধে দিল তার পায়ের নূপুর।

আর একজনের দৃষ্টি এড়াল না। দেয়ালের প্রসারিত আয়নায় কিছুক্ষণ এ ছবি ধরা রইল। তারপর ঘণ্টাধ্বনির সংগে সংগে স্ক্রীন উঠল। তবলা তরংগের তালে তালে নূপুরের ধাতবধ্বনিও মিশে গেল। ছবি মুছল দেয়াল আয়নার ওপর থেকে কিন্তু নায়িকা প্রেমা সেনের মনের আয়না থেকে সে ছবি সহজে মিলিয়ে গেল না। সে ভারতনাট্যমের প্রসাধন নিতে ঢুকে গেল ড্রেসিংরুমে। কে যেন ওপাশের উইংস থেকে কিছু বলতে চাইছিল তাকে কিন্তু প্রেমা দূরের অস্পষ্ট ধ্বনির মত উপেক্ষা করল সে ডাক।

মেয়েদের ড্রেসিংরুম থেকে সবাই এখন বেরিয়ে গিয়ে গ্রীনরুমে ছড়ান চেয়ার-গুলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। প্রত্যেকের হাতে একখানা করে ছাপা প্রোগ্রাম।

প্রেমা ড্রেসিংরুমে কিছুক্ষণ চুপ… বসে রইল। দেবনের জন্যে সে উপবাস… আছে। কেউ জানে না তার আজকের তিরু-আদিরা ব্রতের কথা। পূর্ণিমার… পশ্চিম সাগরে ডুবে গেলে তবেই ব্রত… হবে তার।

কেন জানি না অনুষ্ঠানের স… উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে এল প্রেমার ম… ভেতর। সে গালে হাত রেখে বসে… আর দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার ব… ওপর।

ধ্যান ভাঙল সরিতার ডাকে। প্রস… ছলনা করে তোয়ালেতে মুখখানা… নিয়ে তাকাল সরিতার দিকে।

সরিতার একখানা কার্ড প্রেমার… ধরিয়ে দিয়ে বলল অসাধারণ। এ… অ্যাপোলো মূর্তি। গ্রীক আর্টিস্ট।… এসে কার্ড দিয়ে গেল।

সরিতা দাঁড়াল না। কথাকটি… করেই সে যেন বিদ্যুৎ হেনে বেরিয়ে…

প্রেমা দেখল সাদা কার্ডের ওপর… কালারের ফেল্ট পেন দিয়ে আঁকা… একটা ভঙ্গীর অবিকল স্কেচ। নীচে… —বিস্ময়কর অনুষ্ঠান।

সবশেষে নাম সই করেছে অ… —মাইরন।

কার্ডগুলো বোধহয় ছবি এঁকে… পাঠানোর জন্যে তৈরী। কার্ডের… ঠিকানা লেখা প্যালেস হোটেলের… ফ্লোর। রুম নাম্বার—সেভেন।… আগে লেখা হয়েছিল বলে মনে হল… কারণ ওটা ফেল্ট পেনের কালিতে… নয়।

কার্ডখানা যত্ন করে …গের ভেত… নিল প্রেমা। এই ম… র্ড একটা… প্রেরণা উত্তেজক সুরার মত তার… মনটাকে জাগিয়ে তুলল।

প্রেমা নিজেকে সাজাতে বসল। বে… সময় পরে পরে তার পারফরমেন্স… সময় নিয়ে ধীরে ধীরে ভারত… নর্তকীর ভূমিকায় সাজল সে। সাহা… এল। রক্তজবা রঙের শাড়ী বিশেষ… পরা হল। বেণীবদ্ধ কেশগুচ্ছ সা… গোলাপী আভার ফুলে। মুক্তো… দেওয়া সিঁথিমোর আর… সুদৃশ্য সোনার চোচ দিয়ে… হল কেকলাপের সঙ্গে। তিলকে… হল ললাট। পদ্মচরণ পূর্বাহ্নে… করে রাখা হয়েছিল। তা… বাঁধতে লাগল নূপুর। বাঁধতে গি… খানা একবার স্থির হয়ে গেল… ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসি… ফুটে উঠল। রোশেনারার সৌভা… দেবনের হাতের স্পর্শ পেয়েছে।… সমস্ত শরীরটা পরাণের সঙ্কোচে… জ্বলতে লাগল। মুখে ফুটে উঠল… পদ্মের রক্তোচ্ছ্বাস। ঈর্ষার কাঁটা… যেন ফুটে রয়েছে একটি গোলাপ।

(ক্র…

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খাদ্য ও সহযাত্রীদের প্রীতির সঙ্গে খাওয়ানো পানীয়তে শরীর চাঙ্গা ও উষ্ণ করে আমরা নাইট-ট্যুওরে বেরোলাম।

আজই প্যারিসে শেষ রাত। আজ রাত দুপুরে করে ফিরে কাল একটু বেলা করে বেরোব আমরা। তারপর লীল হয়ে বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড। অস্টেণ্ড থেকে আবার বোটে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডের ডোভার। সেখান থেকে ভিক-টোরিয়া স্টেশান-কান্ডান।

রাতের প্যারিস, বাস বা গাড়ি থেকে দেখার নয়। হাতে প্রচুর সময় নিতে যেতে হয় সেখানে, মনটাকেও খোলামেলা সংস্কার শূন্য অবসরে ভরে নিতে হয়—তারপর পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়, থিয়েটারে, অপেরায়; নাইট ক্লাবে। এখানে রাত-টাকেই দিন বলে মনে হয়। এত আলো, এত লোকজন, সারা রাত সমস্ত দোকান-পাট খোলা, রেস্তোঁরা খোলা, কাফে খোলা; দেখলে ভাবতে হয় এরা দিনের বেলাতেই ঘুমোয় বোধহয় আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জের স্টেশান মাস্টারমশাইদের মত। সেখানে রাতের বেলা মেলা ট্রেইন পাস করে বলে তাঁদের গভীর রাত অবধি জাগতে হয়, তাই দিনের বেলা পয়েন্টস-ম্যানের হাতে সবুজ নিশান, আর লোহার র‍্যাকেট দিয়ে দিনেই তাঁদের অবসর মেলে। নিন্দুকেরা বলেন, গ্রামগঞ্জের মাস্টার-মশায়দের স্ত্রীরা প্রায়ই দিনমানে গর্ভবতী হন। তাই?

কিন্তু এখানে দিনও জাগে, রাতও জাগে; তাহলে এরা ঘুমায় কখন?

আমাদের বাস এসে দাঁড়াল ম্যুলা রুঁজের সামনে। সেই চিত্রকর ভ্যানগো থেকে সেহান সকলে যে প্যারিস, সে ম্যুলা রুঁজ-এ এসে বসতেন সেই ম্যুলা রুঁজ-এ। বাইরে উইণ্ডমিলের পাখার মত পাখা ঘুরছে। কোলকাতার পার্ক স্ট্রীটের ম্যুলা রুঁজ এই ম্যুলা রুঁজকেই বড় করুণ অনুকরণ। সহজ সমীকরণ।

ঢুকতে হল লাইন দিয়ে। এ্যালান্টার নিশ্চয়ই আমাদের টিকিটের বন্দোবস্ত আগে করে রেখেছিল, না কি করে নি? জানি না, কিন্তু লাইন দিয়ে ঢুকলাম এ কথা মনে আছে।

বেশ ভাল জায়গায় আসন ছিল আমাদের। আসনে গিয়ে বসতেই শ্যাম্পেন দিয়ে গেল গ্লাসে গ্লাসে। টিকিটের দামের সঙ্গেই এর দাম ধরা আছে। কেউ বেশী কিছু খেতে চাইলে বা অন্য কিছু খেলে পয়সা দিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু স্টেজে একটু পরে যা দৃশ্য দৃশ্যমান হল তাতে কারো গ্লাসের দিকে চাওয়ারও অবকাশ হবে বলে মনে হলো না।

প্রথমে শুরু হল বিখ্যাত প্যারিসিয়ান ক্যানক্যান ডান্স। ক্যান ক্যান পরে সুন্দরীরা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে লাগল। এক একটা ক্যানক্যানে কত মিটার কাপড় লাগে তাই-ই ভাবছিলাম। পৃথিবীতে মেয়েদের সমুদয় সাজপোষাকের আড়ম্বর শুধু খুলে ফেলার জন্যে। ভাবলেই হাসি পায়। পুরুষদেরই কারসাজী এসব। যা অতি সহজে দৃষ্টিগোচর করা যায়, বিনা আয়াসে সেই সুন্দর নারী শরীরটাকে বহু মিটার কাপড়ে মুড়ে তারপর কষ্ট করে খোলার কি প্রয়োজন জানি না। এও এক রকমের বিকৃতি। তবে, ক্যান-ক্যান পরে মেয়েরা শুধু নাচেই, আদর খাওয়ার অব্যবহিত আগের পোষাক নিশ্চয়ই ক্যান-ক্যান নয়। অনুমান করা যায়।

আমি বাঙ্গাল মানুষ, আমার কাছে মেমসায়েব মাত্রই মেমসয়েব। চেহারা দেখে, কে আমেরিকান, কে ইংলিশ, কে জার্মান, কে ফ্রেঞ্চ, কে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান তা বলার মত তালেবর আমি হই নি। এ জন্মে হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে, একটু-আধটু যে তফাৎ নেই, তা বলা যায় না। প্রত্যেক জাতেরই বৈশিষ্ট্য থাকে। চেহারায়, ব্যবহারে, চোখের চাউনিতে, ধন্যবাদ দেওয়ার মধ্যের উষ্ণতার তারতম্যে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ক্যান ক্যান নাচ শেষ হল যখন, তখন ম্যাজিক দেখানো আরম্ভ হল।

পশ্চিমের দেশগুলো বিজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত—তাই ম্যাজিক ব্যাপারটাকে ওরা একটা অন্য উচ্চতায় পর্যবসিত করতে পারত। ইচ্ছা করলেই। উত্তর-পশ্চিম আমেরিকার পুরো ডিজনী ল্যাণ্ডটাই যেমন একটা ম্যাজিক। কিন্তু এই ম্যাজিকের বাবদে মনে হয় পশ্চিমীদের পুবের দেশের লোকের প্রতি একটা সহজাত সম্মান আছে। এমন কি হীনমন্যতাও আছে। পৃথিবী বিখ্যাত ম্যুলা রুঁজ-এ যেমন ম্যাজিক দেখলাম তেমন ম্যাজিক আমার মেজমামা গিরিডির মামা বাড়ির বারান্দায় পর্দা টাঙিয়েও দেখাতে পারতেন। আসলে, পরে বুঝলাম যে, এই ম্যাজিকটা স্টপ-গ্যাপ। ক্যানক্যান পরা সুন্দরীরা যে কি ত্বরিৎ-গতিতে গ্রীনরুমে বিবসনা হচ্ছিলেন তার কোন ধারণাই তখন আমার ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না।

আমি যে দেশে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সে দেশে কোন মহিলার গোড়ালীর ওপরে কোন দুর্ঘটনায় শাড়ী উঠে গেলেই পুরুষের বুকে স্পন্দন ও নারীর মুখে লজ্জা ফোটে। সেই দেশের লোক একটু পরে যা দেখলাম তাতে বাকরোধ হয়ে গেল।

স্টেজের মধ্যে আরেকটা স্টেজ। কত টাকা যে খরচ করা হয়েছে এই স্টেজ বানাতে তার ইয়ত্তা নেই। এদের উচিত সত্যজিৎবাবুর স্কেচে ভর করে বংশী চন্দ্রগুপ্ত যে স্টেজ করেন তা দেখা। দেখে শেখা। যাই-ই হোক, স্টেজে যখন এক সঙ্গে প্রায় কুড়িটি তরুণী দৌড়ে এল, নাচল কুঁদল, সিঁড়ি দিয়ে উঠল নামল, যাতে আমরা পয়সা উসুল করতে পারি ভাল করে, তখন ব্যাপারটা কি ঘটছে তাই-ই ভাল করে বুঝতে পারলাম না। ভগবানের উচিত ছিল মানুষকে দুটোর বেশী চোখ দেওয়া—এসব বিশেষ বিশেষ অকেশানে ব্যবহার করা জন্যে।

অতজন মেয়ে, তাদের কারো শরীরের কোথাওই কিছুমাত্র কাপড়-জামা নেই। তারা প্রত্যেকেই সুন্দরী, প্রত্যেকেরই দারুণ ফিগার, দারুণ নাক, দারুণ চিবুক, দারুণ বুক। কোথাওই কিছু নেই। কেবল এক টুকরো গোলাকৃতি আধুলী-সামন লাল, নীল, হলুদ অথবা বেগুনে রঙীন রাংতা ছাড়া। সেই গোল করে কাটা রাংতা-টুকু জায়গা বিশেষে কি দিয়ে জানি না সেঁটে রাখা হয়েছে। এত নাচা-কোঁদাতেও তা স্থানচ্যুত হচ্ছে না।

ফরাসী ক্রিমিনাল ল বা অশ্লীলতার আইনে কি আছে জানি না, তবে ওদেশে আইনজ্ঞদের এবং আইন মান্যকারী ও অমান্যকারীদেরও যে বিলক্ষণ রসবোধ আছে এ কথাটা অস্বীকার করার উপায় রইল না।

সম্পূর্ণ নগ্না সুন্দরীরা এল, গেল, কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, ব্যালে করার অজুহাতে আমাদের দিকে হাত পা ছুঁড়ল। পিছন ফিরে দাঁড়াল, সামনে ত দাঁড়িয়েই ছিল, অনেক কিছু করল যাতে কোন নিমকহারাম দর্শক বলতে না পারেন যে, ওঁদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওঁদের ঠকান হয়েছে।

অনেকে বলে থাকেন যে এই শো নাকি চমৎকার।

হয়ত চমৎকার! কিন্তু এই বাঙ্গাল দর্শক, এই শোয়ে অংশগ্রহণকারী নগ্নতার চমৎকারিত্বে এতই অভিভূত, স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে ছিল যে, শোয়ের চমৎকারিত্ব অবধি সে পৌঁছতে পারে নি।

এক সময় শো শেষ হল। সব শোই এক সময় শেষ হয়। শেষ হয় যৌবন, জীবনও শেষ হয়। কিন্তু কিভাবে হয়, কোন উদ্দেশ্যে সেই সময়টুকু ব্যয়িত হয়; তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

এই নগ্ন শো-এর চেয়ে আমার মায়ার খেলা অনেক ভাল লাগে। তার কারণ এই মঁলা রুজ-এর নাইট ক্যাবের সমস্ত নিরাবরণ চমৎকারিত্ব শরীরে এসেই থেমে গেছে। মনের সঙ্গে এর কারবার নেই। এই শো চার ঘন্টা দেখার আনন্দের সঙ্গে আশ মিটিয়ে ফেলে না কেউ, আশ রাখলে ফেরে এই একটা কলির সুর অনেক গভীরতর আনন্দের উৎস বলে মনে হয় আমার।

ইচ্ছে হল, বলি, (ফরাসী জানি যে বলব?) যে তোরা আমাদের দেশে আসিস। আমাদের দেশে কোণারক আছে, খাজুরাহো আছে কিন্তু তবুও আমাদের দেশের মেয়েরা কত শালীন, কত মিষ্টি করে তারা সাজে, কত সুন্দর করে হাসে, কত গভীর তাদের মনের প্রেমের দীপ্তি। তোদের নগ্ন স্টেজে, নগ্ন মেয়েদের, সমস্ত উচ্ছলতা সেই একটি হাসির ঔজ্জ্বল্যেরও সমকক্ষ নয়।

মনে মনে বললাম, আসিস ও দেশে।

আশার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, মেরসী মঁসিয়ে।

যাঃ বাবা। ভেবেছে হয়ত আমি সুখ্যাতি করলাম শো-এর।

এই সব তরল শো-এর সব ভাল। মানে, যা এর ভাল। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যা, তা হচ্ছে এই রকম শো দেখে ফিরে এসে মাঝরাতে হোটেলের একা ঘরে শুয়ে থাকা!

ইচ্ছা করে, পরানডাহারে গামছা-আ-আ দিয়া বান্ধি।

আজ সকালে প্যারিসের হোটেলে ঘুম ভাঙলো এক বিষণ্ণতার মধ্যে। বাইরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। দমবন্ধ আকাশ দেখা যাচ্ছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। ঘরের মধ্যে ফিস্ ফিস্, ঘরের বাইরে ফিসফিস— কারা যেন শ্বাস ফেলছে অবিরল।

চোখ মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পরে তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর স্যুটকেস হাতে নেমে এলাম নীচে ব্রেকফাস্টের জন্যে।

আজ রাতে লানডানে গিয়ে ডিনার খাবো। ফুরিয়ে যাবে ইয়ারোপের ঘূর্ণী-ঝড়ের ছুটির দিন।

সকলেই একে একে বাসে এসে উঠলেন। জ্যাক আজ একটা হালকা নীল টুইলের শার্ট পরেছে, তার সংগে গাঢ় নীল টাই। এ্যালানটারের মত বেশী লোক থাকলে কাপড় জামার ব্যবসাদারেরা সব লালবাতি জ্বালবে। গত পনেরো দিন সে তার কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, ছাইরঙা উলের গলা-বন্ধ একটি সোয়েটার এবং তার উপরে একটি বাদামী কর্ড রঙের কোট পরে দিব্যি চালিয়ে দিল। আন্ডার গার্মেন্টস কি ছিল, স্বাভাবিক কারণে জানা ছিলো না, তবে মনে পড়ে না ওর শার্টও কখনও দেখেছি বলে। নিশ্চয়ই প্রতি রাতে সেগুলো ধোওয়া-ধুয়ি করে নিত।

আমাদের দেশের মত চানটান করার উপায় নেই ওদের। বডি-ওডোনাইজার বা শরীর-সুগন্ধি আছে বহু রকমের। কি পুরুষ কি নারী সকলেই ফাস্ স-স্ করে সকাল বিকেল বগলতলায় ঘাড়ে গলায় একবার করে সেরে নিচ্ছে সুগন্ধি হাওয়া— ব্যাস্, তারপর সারা দিন ফুরফুর গন্ধ।

প্যারিসে ঢোকার সময় অর্লী এয়ার-পোর্ট দেখেছিলাম। পুরনো এয়ারপোর্ট প্যারিসের। ফেরার সময় দেখলাম চার্লস দ্য গল্ এয়ারপোর্ট! এখনও পুরোপুরী চালু হয়নি সে এয়ারপোর্ট— অর্লীর চেয়ে অনেক বড়।

কাল রাতে ম্যুলা রুজ-এ যাওয়ার আগে আবার সাঁসে-লিজে গেছিলাম। এদিকে ছটা পথ, ওদিকে ছটা পথ। মাইলের পর মাইল সোজা। এদিকের থেকে আসা অগুন্তি হয় সারির হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো এবং অন্যদিকে যাওয়া টেইললাইটের লাল আলোগুলি ভারী চমৎকার দেখতে লাগে।

মাঝ সকালে কোথায় যেন একবার কফি-ব্রেক হলো। নাম মনে নেই জায়গাটার। তারপর নীলু হয়ে বেলা বারোটার আগেই অস্টেন্ড-এ এসে পৌঁছলাম— বেলজিয়ামে আবার। যেখানে দিন পনেরো আগে বো[ট] থেকে নেমেছিলাম।

ক্যারল ও জেনী বলল চলো, আমরা একটু রোদে হেঁটে বেড়াই। সারাও দৌড়ে এল। আমরা সকলেই জানি আজ সন্ধে বেলায় আমাদের সকলের সংগে সকলের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। আজ থেকে বে[শ] কিছুদিন পর আমি ফিরে যাব আমার গরীব, নোংরা কিন্তু হৃদয়ের উষ্ণতার ওসা[র] ধরা কোলকাতায়। ওরা ফিরে যাবে যার যা[র] হৃদয়হীন দেশে। তারপর এ জীবনের মতো আর দেখা হবে না। কারো সংগে কারোও।

ছাড়াছাড়ি হবার সময় বাড়ো জ[্যাক] আবারও বলবে, হ্যাভ আ থ্রিল, তা[রপর] গোল্ড-ব্লক টোবাকোর টিনটা এগি[য়ে] দিয়ে, তারপর ওর বড় বোলের পাইপে একটা লম্বা টান দিয়ে এক মুখ ধুঁয়ো ছে[ড়ে] বলবে— উই হ্যাড আ ওয়ান্ডারফুল টাইম টুগেদার।

ডোন্ট উ থিংক সো?

আমি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ব বল[ব] ইয়া।

কিন্তু মনে মনে জানব, সমস্ত ওয়ান্ডারফুল টাইমই একসময় শেষ হ[য়]। আমরা কেউই শিখিনি, অর্থাৎ জন ক্যা[রল] জেনী এবং অন্য অনেকেই করে জীবনে[র] প্রত্যেকটা মুহূর্তকেই ওয়ান্ডারফুল ক[রে] তোলা যায়। আশচর্য।— ইজরায়েলের [মে]য়ে এজার মেয়ে সারাহ্ কিন্তু জেনেছে। মেয়েটাকে এই জন্যে ঈর্ষা হয়। ওযে [শুধু] শরীরের ব্যাপারেই শুধু সংস্কারমুক্ত ত[াই] নয়, ওর সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত নীল চো[খের] দৃষ্টিতে তাকালেই বোঝা যায় যে, ও ... হাল-দুনিয়ার এক বিশেষ জেদী জা[তের] প্রতিভূ।

প্রত্যেক জাতের কাছ থেকেই— প্র[ত্যেক] দেশের লোক থেকেই তাদের দো[ষ] সাবধানে বর্জন করে, ভালোটা নেও[য়ার] প্রয়োজন আছে আমাদের। ওদেরও নেও[য়ার] আছে অনেক কিছু আমাদের কাছ থে[কে]। যে জাতই তার মনের দরজা-জানালা... সব বন্ধ করে রেখে পণ্ডিতম্মন্য ... আত্মশ্লাঘায় মজেছে তার পতনই অনি[বার্য] হয়েছে; আজ কি কাল। ইজরায়েলের ... আজ, কিন্তু ওরা বড় বেশী গর্বি[ত] ... নয় আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ও ... তাদের খাবারের সংগে কিছু গর্ব ... যে খায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই;

গর্বই প্রধান খাদ্য হলে তার ফল হয় বিসময়। যেমন ভবিষ্যতের ইজরায়েলী; বর্তমানের বাঙালি।

আজকের লাঞ্চটা বড় তাঁড়-ঘাঁড়ির লাঞ্চ হল।

ইংলিস চ্যানেলে দাঁড়ানো জাহাজগুলো ভোঁ দিচ্ছে। বাঙাল যাত্রী আমি, ইস্টিশানে স্টীম এঞ্জিনের কু— এবং নদীতে স্টিমারের ভোঁ শুনলেই মনে হয়েছে চিরদিন : আমার ট্রেন বা স্টিমারই বুঝি ছেড়ে গেল। এই ছেড়ে-যাওয়ার ভয়টা ছোট-বেলা থেকে বুকের মধ্যে এমন করে সেঁধিয়ে ছিল যে জীবনে যখন অনেক বড় বড় প্রাপ্তির ট্রেন ও স্টিমারও সবাই ছেড়ে চলে গেল আমায় তখন আর ভয় করল না। একদিক দিয়ে ভাল। সয়েতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর ভয় করে না। তখন ভয় না করলে ভয়ের কারণ না থাকলে নার্ভাস-টেনসান হয়।

ক্যারল স্যুপ শেষ করে বলল, উড্ উ রাইট টু মী?

আমি বললাম, সার্টেনলি ইয়েস্।

- উইল উ কাম টু অস্ট্রেলিয়া?

বললাম ভেরী মে বী সাম ডে সামটাইম আই উইল।

ও বলল ইফ উ ড্রপ কাম প্লীজ স্টে উইথ আস। একেবারে জিভকে শুধরে বলল, আই মীন উইথ মী।

জেনী খিল্ করে হেসে উঠল।

ক্যারল আস বলাতেই জেনী বুঝেছিল ক্যারল ওর জার্মান বয়ফ্রেন্ডের কথা বলছে।

ক্যারল সত্যিই চটে গেল বলল স্টপ ইট জেনী।

আমি হাসলাম, বললাম আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ কি হবে জানো এই ট্রিপটা শেষ হয়ে গেলে?

কি? ওরা সমস্বরে শুধোল।

আমি বললাম তোমাদের দুজনের সামনে বসে তোমাদের খুনসুটি দেখতে পাব না আর।

তক্ষণি বুঝলাম। খুনসুটির ইংরেজী নেই: হয় না। যা হোক করে তাদের বোঝালাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল।

এবার জেটীর দিকে যাবার পালা। বিকেলের রোদ ঝলমল করছে নানা রঙা নৌকো ও জাহাজের গায়ে গায়ে। আজ কি ছুটির দিন? দিনের হিসাব হারিয়েছি। সব দিনই ছুটি। রোদের মধ্যেই একটা ছুটি ছুটি ভাব।

উপরের নীল আকাশ, নীল ইংলিশ চ্যানেলের জলে মুখ দেখছে। সাদা সী-গাল ওড়াউড়ি করছে। আমরা যখন ডোভারে পৌঁছব তখন প্রায় সন্ধে হয়ে আসবে।

লাইন দিয়ে একে একে আমরা জাহাজের দিকে এগোতে লাগলাম। আমার ফিলিপিনো সহযাত্রিনী একটা বড় চকোলেট দিয়ে বলল, মাই লাস্ট গিফ্‌ট টু উ্য।

ভদ্রমহিলা বড় ভালো। সাধারণতঃ অসুন্দর শরীরের মেয়েরা বড় সুন্দর মনের অধিকারিণী হন। ইনিও ব্যতিক্রম নন।

আমরা বোটে উঠলাম। তখনও লোক উঠছে। জেনী আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে এক কোণার একটা টেবলে বসল। এসেই, ওর ব্যাগ খুলে সেই কাগজটা বের করল।

ওকে নিয়ে আমি ইংরিজীতে একটা কবিতা লিখেছিলাম, নাম দিয়েছিলাম 'ফর জেনী'। কবিতাটি ওর খুব পছন্দ হয়েছিলো— ক্যারলেরও। সারা বলেছিলো, ট্রাস। আমারও তাই ধারণা।

সেই কবিতাটির উপরে জেনী একটা বলপেন বের করে আমার নাম ঠিকানা সব যত্ন করে লিখল, এমন কি আমার লানডানের ঠিকানা টোরোন্টোর ঠিকানা ন্যু-ইয়র্ক লস্-এঞ্জেলস-এর ঠিকানা এমন কি হনোলুলু এবং টোকিওর ঠিকানাও।

ও যখন সব ঠিকানাগুলো লিখছিল যত্ন করে আমি বুঝতে পারছিলাম যে লানডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে নেমেই ও আমাকে ভুলে যাবে। ভুলে যাবে ক্যারল সারা ভুলে যাবে জন জ্যাক্ গ্লোসেস্টারও।

আমিও ভুলে যাব ওদের। পথের আলাপ পথেই পড়ে থাকবে। বেশীর ভাগ সময়ই। তার জের জীবনে, বাড়িতে পথ ছেড়ে আসা মনে টানা যায় না। টানা ভুলও হবে।

জাহাজ ভোঁ দিল। এতবড় জাহাজে নোঙর তোলার আওয়াজ শোনা যায় না। শুধু বিরাট বিরাট শক্তিশালী এঞ্জিনের একটা একটানা গোঙানীর আওয়াজ। সেই চাপা গোঙানীটা জাহাজময়, আমাদের সকলের মনে মনে ছড়িয়ে গেল। আমরা বেলজিয়ামের মাটি ছেড়ে এলাম। এখন মাঝ সমুদ্রে। একদিকে রোদে-উজ্জ্বল অস্টেন্ড, অন্যদিকে নীল জল। সী-গাল উড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে। আজ বড় শীত বাইরে। আমার মনের মধ্যেও।

কারো নিমন্ত্রণ নিয়ে এ ছুটিতে আসিনি আমি। কিন্তু কেউ ছুটির নিমন্ত্রণে ডাকুক কি নাইই ডাকুক, সকলেরই ছুটিই ফুরিয়ে যায় একসময়, কখন তা কেউই বোঝে না; ফুরিয়ে যায়ই অন্যমনে।

।। শেষ ।।

পাঠক,

'প্রথম প্রবাসে'র শেষ কিস্তি লিখতে বসে বড় বিষণ্ণ বোধ করছি। হয়ত এই বিষণ্ণতার প্রভাব এই কিস্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার একটি সবিনয় নিবেদন আছে। লেখাটিকে উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল প্রথম থেকে। কিন্তু এটি উপন্যাস নয়। যাঁরা কখনও বিদেশে যাননি এবং যাঁরা হয়ত কখনও যাওয়ার সুযোগও পাবেন না তাঁদের, জন্যেই মুখ্যত রোজনামচার আবহাওয়ায় লেখা এই 'প্রথম প্রবাস'।

যদিও এ লেখা কিস্তিবন্দী ছিল কিন্তু কিস্তিমাৎএর কোনো উদ্দেশ্য এর ছিলো না। আমি যে ভাব ও যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে এ লেখা আরম্ভ করেছিলাম তাও নানা নৈর্ব্যক্তিক কারণে বজায় রাখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার দায় আমার যতখানি, আমার আয়ত্ত-বহির্ভূত কারণেরও ততখানিই।

শারীরিক অসুস্থতা ও কাজের চাপের জন্যে অনেক সময় কিস্তি সময়মত দিতে পারিনি। এর দায়ও সম্পূর্ণত আমার। আমি ক্ষমাপ্রার্থী, সেই অপরাধের।

এই পর্ব ইংলন্ড ও ইয়োরোপেই এসে শেষ হল। ইচ্ছে আছে কানাডা ইউ-এস-এ এবং হাওয়াই, জাপান ও থাইল্যান্ড নিয়ে লিখেই পুরোটা শেষ করব। কখনও আদৌ লিখব কি না সে সম্বন্ধেও মনস্থির করব তখনই, যখন পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিক মতামত জানব এই লেখাটি সম্বন্ধে।—

পুনশ্চ

“শিশিরকুমার ঘোষ”

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এইবার কলিকাতায় শিশিরকুমারের উদ্যোগে এক বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হইল। কলিকাতার মেয়র তখন স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ। বলিতে গেলে, তিনিই তখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সর্বেসর্বা। মিউনিসিপ্যালিটিতে এ দেশের লোকের আধিপত্য অতি অল্পই। শিশিরকুমার বুঝিলেন, মিউনিসিপ্যালিটির এদেশী করদাতৃগণের নির্বাচনাধিকার একান্ত প্রয়োজন। বন্ধু-বান্ধবগণকে তিনি একথা বলিলেন। তাঁহারা সন্দিহানচিত্তে উত্তর করিলেন, “এ উদ্যোগ সফল হইবার পক্ষে অন্তরায় প্রচুর।”

শিশিরকুমার কিন্তু এ আশঙ্কায় টলিলেন না। শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় নির্বাচনাধিকার সম্বন্ধে উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন, ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের কানে এই সভার কথা উঠিল। তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন ইহা শিশিরকুমারের কীর্তি। তিনি শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎকারের বাসনা করিলেন। ছোটলাটের রোটাস জাহাজে এক আমন্ত্রণসভার আয়োজন হইল। শিশিরকুমার এই সভায় আহূত হইলেন। এই নিমন্ত্রিত জনমণ্ডলী হইতে ছোটলাট শিশিরকুমারকে স্বয়ং বাছিয়া লইলেন। তাঁহার সহিত নানারূপ কথাবার্তা কহিলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে বেলভেডিয়ারে আহ্বান করিলেন। ছোটলাটের আদেশানুসারে শিশিরকুমার বেলভেডিয়ারে ছোটলাটের সহিত দেখা করিলেন। শিশিরকুমারের নিকট ছোটলাট বাহাদুর নির্বাচনাধিকার সম্বন্ধে সকল তথ্যই অবগত হইলেন। তাঁহার মন এই অধিকার প্রদানের দিকেই অনেকটা ঝুঁসিয়া পড়িল।

এদিকে বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন এবং এংলো ইণ্ডিয়ানগণ নির্বাচনাধিকার প্রণালীর প্রতিকূলে হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন, “হয় এদেশীয়ের হাতে মিউনিসিপ্যালিটির সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হউক, নচেৎ কিছুই দিবার প্রয়োজন নাই।” ছোটলাট এ কথাও শুনিলেন; শুনিয়া তিনি শিশিরকুমারকে ডাকাইয়া এই সকল কথা বলিলেন; আর বলিলেন, “কলিকাতার যাবৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি এই নির্বাচনাধিকারের প্রতিকূল হন, তাহা হইলে আমি কেমন করিয়া এ অধিকার প্রদান করিতে পারি?”

শিশিরকুমার উত্তর দিলেন, “আপনি সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকুন; কলিকাতার যাবতীয় করদাতাই এই নির্বাচনাধিকারের প্রার্থী। অবিলম্বে প্রকাশ্য সভায় ইহা প্রমাণিত করিয়া দিব।”

অতঃপর শিশিরকুমার, কলিকাতার প্রত্যেক করদাতার বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নির্বাচনাধিকারের উপকারিতা সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহারই উদ্যোগে টাউনহলে এক বিরাট সভার আয়োজন হইল। এদিকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভবনেও এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সভা বসিল। টাউনহলে শিশিরকুমারের সভায় দুই সহস্রেরও অধিক করদাতা উপস্থিত হইলেন—বক্তা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি। আর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভার লোকসংখ্যা দুই শত হইতে তিন শত মাত্র—সভাপতি রাজা রমানাথ ঠাকুর। ১৮৭৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী এই সভাধিবেশন হয়। পরিণামে শিশিরকুমারের প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ছোটলাট টেম্পল সাহেব এই অধিকার প্রদান করিলেন।

এই সময় প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে শুভাগমন করেন। ইঁহার অভিনন্দন উৎসবের জন্য বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আশী হাজার টাকা চাঁদা তোলেন। তাঁহারা স্থির করেন—এই টাকাটা আতসবাজী এবং আলোকসজ্জাদিতে ব্যয়িত হইবে। ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে শিশিরকুমার স্থির করেন প্রিন্স অব ওয়েলসের এই শুভাগমনের স্মরণকল্পে কোন স্থায়ী কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। একটি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনেরই কল্পনা হয়। ইহাতে ব্যয় অনুমান করা হয় তিনলক্ষ টাকা।

প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনের সাতদিন মাত্র পূর্বে শিশিরকুমারের মনে এই কল্পনা উদিত হয়; এক দিনেই তিনি দেড় লক্ষ টাকা পাইবার আশা প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা বলেন ছোটলাট টেম্পল বাহাদুর যদি বলেন টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করা উচিত, এবং এই স্কুলেই টাকা দেওয়া কর্তব্য, তাহা হইলে আমরা টাকা দিতে পারি নচেৎ নহে। এই কথা শুনিয়াই প্রিন্স অব ওয়েলস আসিবার পূর্ব দিন রাত্রি নয়টার সময় শিশিরকুমার বেলভেডিয়ারে গিয়া ছোটলাটের সহিত দেখা করেন। অত রাত্রে অপর কাহারও সহিত দেখা করা ছোটলাটের নিয়ম নহে। কিন্তু শিশিরকুমারের সর্বত্রই অবাধ গতি—প্রচুর সম্মান।

শিশিরকুমার ছোটলাট বাহাদুরকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, আর অনুরোধ করিলেন আপনি যদি তাঁহাদিগকে এই স্কুলের উপকারিতার কথা একবার বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে তাঁহারা টাকা দিতে আর ইতস্ততঃ করিবেন না।’ ছোটলাট বাহাদুর বলিলেন ‘তাহাদের সহিত দেখা হইলেই আমি একথা বলিব।’ শিশিরকুমার উত্তর করিলেন ‘আপনি আহ্বান না করিলে তাঁহারা আসিবেন না; সুতরাং দেখা হইবে কেমন করিয়া? ছোটলাট বলিলেন ‘আমি তাঁহাদিগকে আহ্বান করিব কখন? আজ তো সময় নাই, কাল প্রত্যূষে ছয়টার সময় আমি ষ্টিমারে করিয়া প্রিন্স অব ওয়েলসকে আনিতে যাইব। শিশিরকুমার তখন সাহস ভরে উত্তর করিলেন কৃপা করিয়া আপনি যদি তাঁহাদের নামে এক একখানি পত্র দেন, তাহা হইলে কাল ভোরে পাঁচটার সময় তাঁহাদিগকে আপনার নিকট লইয়া আসিতে পারি।

ছোটলাট বাহাদুর প্রথমতঃ পত্র দিতে কিছু ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু শিশিরকুমারের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁহাকে কয়েকখানি পত্র দিলেন। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় শিশিরকুমার সেই সকল পত্র লইয়া বেলবেডিয়র ত্যাগ করিলেন এবং সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অনাহারে ঘুরিয়া নির্দিষ্ট সেই কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ভোরে পাঁচটার সময় বেলভেডিয়রে আনয়ন করিলেন। শিশিরবাবুর উদ্দেশ্য সফল হইল; টেকনিক্যাল স্কুল বসিল নাম হইল ‘এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স।’

স্যার রিচার্ড টেম্পল শিশিরবাবুর অসীম কার্যদক্ষতার গুণে মুগ্ধ হইয়া এই স্কুলের [illegible] বার্ষিক আট হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। পরে কিন্তু স্যার এসলি ইডেনের রাজ্যকালে এই বৃত্তি প্রত্যাহৃত হয়।

ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল শিশিরকুমারকে যেমন প্রায়ই আহ্বান করিতেন [illegible] শাসন ঘটিত নানা বিষয়ে পরামর্শ তাঁহার সহিত করিতেন, তাঁহার পরবর্তী ছোটলাট স্যার এশলি ইডেন শিশিরবাবুর তেমনি প্রতিকূল হয়েন। শিশিরবাবুকে একদিন তিনি বেলভেডিয়ারে ডাকিয়া স্বমতের পক্ষপাতি করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু শিশিরবাবু কোনরূপ ভয় [illegible] হন নাই। কোনরূপ প্রলোভনে ভুলেন নাই।

১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ প্রাতে শিশিরকুমার একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে [illegible] কয়েকটি কথা পাঠ করিলেন, “[illegible] কাউন্সিলে একখানি বিল পেশ হইবে [illegible] এদেশে যে সকল সংবাদপত্র মাতৃভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, সে সকল সংবাদপত্রের সংযম সাধনই এই বিলের উদ্দেশ্য।” এই কয়েক ছত্র পড়িয়া শিশিরকুমারের মনে হঠাৎ [illegible] একটা বিদ্যুতের দীপ্তি খেলিয়া উঠিল [illegible] আরও একটি কাগজে তিনি এইরূপ বিবরণ পাঠ করিলেন। তখন শিশিরকুমার বুঝিলেন এইবার ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’র বুঝি সর্বনাশ উপস্থিত। তখন ভ্রাতারা মিলিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। স্থির হইল, মতিলাল ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া এ বিষয়ের আনুপূর্বিক সংবাদ জানিয়া আসিবেন। মতিলাল ব্যবস্থাপক সভায় গেলেন। শিশিরবাবু [illegible] হেমন্তবাবু দুই ভাই চঞ্চল মনে মতিলালের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় মতিলাল ব্যবস্থাপক সভা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। [illegible] আগমনবার্তা পাইয়াই শিশিরকুমার [illegible] হেমন্তবাবু তাড়াতাড়ি [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন “কি [illegible]” মতিলাল [illegible] [illegible] “দাদা, সর্বনাশ হইল [illegible] যায়।” শিশিরকুমার [illegible] [illegible] পত্রিকা [illegible] ইংরেজী ভাষায়ই লিখিত হইবে।”

([illegible]

[illegible]

বিজ্ঞান কংগ্রেসের নতুন বাঙালী সভাপতি

জ্ঞানস রায়চৌধুরী

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদর দফতর পাকাপাকিভাবে নিজের বাড়ীতে কলকাতায়, সদস্য ও কর্মকর্তাদের একটা বড় অংশ বাংলাভাষা বলেন। তবু স্বর্গত বীরেশ গুহ-র পর একটানা অনেক দিন সাধারণ সভাপতি হননি কোনো বাঙালী বৈজ্ঞানিক। কয়েক বছর আগে ডঃ অসীমা চ্যাটার্জী ঐ সম্মান পেয়েছিলেন। আগামী বছরের সভাপতি নামী উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ সৌরীন্দ্রমোহন সরকার। গড়িয়াহাট বাজারের ভিড়ে ফুলকপি, পালং, টমাটো কেনার সময় অধ্যাপক সরকারকে দেখে বোঝা মুস্কিল এই মানুষ জর্মান একাডেমী অব ন্যাচারাল সায়েন্স এর ফেলো, যার সদস্য তালিকায় আছে গোটে, ডারউইন, আইনস্টায়েন, পাংলভ, ম্যাক্স প্লাংক, রাদারফোর্ড প্রমুখ বরেণ্যরা। শুধুই সাধাসিধে গৃহস্থ সৌরীন্দ্রমোহন, যদিও বৈজ্ঞানিক খ্যাতি ছড়িয়ে আছে দেশে ও বিদেশে। তাঁর কাজের স্বীকৃতি পেয়েছেন দেশের প্রায় সব বিজ্ঞানী-সভার সম্মানিত সদস্য পদে আমন্ত্রিত হয়ে। বিদেশেও অনুরূপ সম্মান পেয়েছেন। ডঃ সরকারকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে বসি—আপনার প্রধান গবেষণা কি নিয়ে? একটুও দেরী না করে তিনি জবাব দিতে থাকেন, ধানের ফলন বাড়ানোর চিন্তাতেই আমার বেশিভাগ সময় কেটেছে। পি-এল-৪৮০-র গবেষণা অনুদানে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছি যাতে বাঙালীর পাতে আরো চারটি বেশি ভাত দেওয়া যায়। শুনতে খুবই সহজ, অধ্যাপকের কথাবার্তাও অবিশ্বাস্যরকমের স্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক জটিলতা মুক্ত—তবু তাঁর কাজের গুরুত্ব অন্ন নির্ভর এদেশের পক্ষে খুবই বেশি।

জন্মেছেন ১৯০৮-এ, উদ্ভিদবিজ্ঞানে প্রথম পাঠ প্রেসিডেন্সীতে, তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বৃত্তি নিয়ে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে ১৯৩৭-এ ডকটর সরকার হয়ে ফিরলেন। সঙ্গে একমাথা গবেষণার বীজ।

ধানের উচ্চতর ফলনের বিষয়ে কি করে ভূবিজ্ঞানের পাশাপাশি উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভূমিকা স্বীকৃত করে তোলা যায় এই তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল সে সময়। —দেশে ফিরে কি করলেন? সোজা উত্তর, কি আর করবো মাস্টারী সঙ্গে গবেষণা। আমাদের সময়ে মাস্টারীতে পয়সা আর সুযোগ দুই-ই ছিল খুব কম. তাবড় তাবড় অধ্যাপকরা লেকচারার হয়েই অবসর নিতেন— ডঃ সরকার হাসছেন যেন প্রথম ভাগের হাসি—'তবু তখন পড়াশুনোর আবহাওয়া ছিলো।' শুনুন না আমারই কথা, অধ্যাপক বলে চলেছেন, ১৯৩৭ থেকে '৫৬ এতগুলো বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছি লেকচারার হয়ে। মাঝে অবশ্য এক বছর সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহার কথায় গেলাম ঢাকায় বিভাগীয় প্রধান হয়ে, আরেকবার দু'বছরের জন্য দিল্লীতে সেন্ট্রাল এগ্রিকালচারাল কলেজে কৃষি-উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে,

ডঃ সৌরীন্দ্রমোহন সরকার

তবু কলকাতার টানে ফিরে আসতেই হলো। বিদেশেও কাজ করেছি, বক্তৃতা দিয়েছি কতো জায়গায়—ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড কিংবা ঘরের কাছে ফিলিপাইনস ও শ্রীলংকা—তবু কলকাতা, কলকাতা। এই কলকাতা কখনো আমাকে অনাদর করেনি।

ছিলাম স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক একটানা আট বছর। তারপর গেলাম বোস ইন্সটিটিউটে ডাইরেকটার হয়ে।

—বিজ্ঞানে আপনার বিশেষ অবদান কি? একথা তুলতেই মুখে নামলো সলজ্জ কুণ্ঠা. সামনে তুলে ধরলেন দুটি মানপত্র যা ১৯৭০-এ বীরবল সাহনী স্মারক পদক ও পরবর্তীকালে রফি আহমেদ কিদোয়াই পুরস্কারের সময় তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞানে এদেশের সর্বোচ্চ সম্মান। কিদোয়াই পুরস্কারের সম্মানদক্ষিণা দশ হাজার টাকা, যা দিয়ে থাকে দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ (আই-সি-এ-আর)। ওই মানপত্রে যেসব খটমটো কথা ছিল তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বললেন, যেখানে ত্রিশ বছর আগে আমাদের কৃষি-বিজ্ঞানীরা বলতেন ধান বা অন্য ফসলের ফলন বাড়ার জমিই আসল। নাইট্রোজেন সার দাও, ফলন বাড়বে। আমার প্রশ্ন ছিলো কে বাড়বে? জমি না ফসল? ফসল যদি জমির নাইট্রোজেন না নিতে পারে, যদি পাতার সবুজে এমোনিয়া জমে যেতে থাকে, তাহলে শুধু উর্বর মাটিই কি অধিক ফলন ফলাবে? কক্ষনো না। আমি ও আমার ছাত্ররা দেখালাম ধানের ফলন বাড়ানোয় ফসফরাসের কি ভূমিকা। ফসফরাসের ঘাটতি হলে ধানের চারা অঢেল নাইট্রোজেনও কাজে লাগাতে পারে না। দেখা দেয় এমোনিয়ার বিষক্রিয়া। এখন খানিকটা ওদের কানে জল গেছে। ধানের চারা যে একটা উদ্ভিদ, সেই উদ্ভিদের শরীরের কথা আমাদের খাদ্যে, বটানিস্টদের মুখ থেকে শুনছেন সরকারী কর্তারা।

টেলিফোনের শব্দ পেয়ে পাশের ঘরে গেলেন অধ্যাপক। মাঝারি মাপের মানুষ, কাঁচাপাকা কোঁকড়ানো চুল, মুখে একদিনের বাসি দাড়ি ও প্রশান্তি। ফিরে এলেন নলেন-গুড়ের সন্দেশ আর চা-বিস্কুট নিয়ে। 'একটু চা খান শীতের দিন।' দেশ কোথায় ছিল আপনার? বললেন, কুষ্ঠিয়ায়, নদীয়া, কৃষ্ণনগরের দোরগোড়ায়। সে নলেনগুড় আর পাচ্ছি কোথায়।

ঘড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললাম—স্যার আপনার আর সব কাজ—

—হ্যাঁ বলছি, আমাদের দেশের পুরোনো প্রথা অনুযায়ী আমন ধান বর্ষায় বুনে শীতে কাটা হয়। আষাঢ় থেকে অঘ্রাণ। ধানের উচ্চ ফলনে দেখেছি, আলোক-সংশ্লেষ (ফোটো-সিনথেসিস) খুব জরুরী ব্যাপার। ঐ সংশ্লেষ নির্ভর করে কতক্ষণ দিনের আলো পাচ্ছে ধানের চারা। দেখা গেছে ধানের চারার ক্ষেত্রে আদর্শ দিন হলো সোয়া এগারো ঘন্টার যাকে 'ক্রিটিকাল ডে-লেংথ' বলা হয়। আমন ফসলে ধানের চারা ঐ আলো পেতে পেতো কতো ভাদ্রে।

কিন্তু মেঘ-রোদ্দুরের খেলায় দিনের আলো তখন অস্থির, কখনো কম, কখনো বেশি। কিন্তু রবি ফসলের ক্ষেত্রে ফাল্গুন-চৈত্রের শুকনো আবহাওয়ায় ঐ ক্রিটিকাল সোয়া এগারো ঘণ্টা আলো একটানা পাওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় জল-সেচের ব্যবস্থাও করতে হয়। আমাদের গবেষণায় দেখিয়েছি রবি ফসল ঠিকমত জল আর সার পেলে আমনের চেয়ে ঢের বেশি ফলনশীল হতে পারে। আলোক-সীমা (ফোটো পিরিয়ড) ও আলোক-সংশ্লেষে আমার কাজ সরকারী মহলে ও বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে।

—কিন্তু উচ্চ ফলনশীল ধান যেমন আই আর—৮ সম্পর্কে আপনি কি বলেন?

—বড্ড খুবই মোটা, ফলন বেশি হলে কি হবে, ঐ চালের ভাত খেয়েছেন তো? চটচটে, দাঁতে লাগে। ওর আলোক-সংশ্লেষ ক্ষমতাও কম। আমার মতে দেশী ধান সীতাশাল চামরমণি ঝিঙেশাল প্রভৃতির শারীরবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে ঠিকমতো ব্রিডিং করালে ঐসব ধানের ফলন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাড়ানো যেতে পারে। সাধারণ ব্রিডিং-এ অবশ্য হেক্টর পিছু ৪-১০ মণ ফলন বাড়তে পারে মাত্র। এই ভারতীয় এক্সপেরিমেন্ট আমি আমেরিকা থেকে ফেরার পথে ম্যানিলায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণাগারে দেখেছি।

—এখন কি করছেন?

—আমার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একযোগে কাজ চালাচ্ছি উদ্ভিদের হর্মোন বা উত্তেজক রস নিয়ে যা উচ্চ ফলনের ব্যাপারে খুবই সহায়ক হতে পারে। জিব্বারেলিক এসিড এমন হর্মোন যা উদ্ভিদকে বাড়তে সাহায্য করে। প্রথমে এই এসিড দেখতে পেয়েছিলাম কচুরীপানায়। দেখছেন তো কচুরীপানা কেমন অনর্গল বেড়ে যায়। পরীক্ষা চালাচ্ছি যাতে ঐ জিব্বারেলিক এসিড দিয়ে পাটকে আরো ঢ্যাঙা করা যায়। জানেন লম্বা পাটের দর বেশী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছ-পালার হর্মোন নিয়েও কাজ চলছে।

—বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কতদিনের? জানতে চাইলাম অধ্যাপক, বলতে গেলে ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই। তারপর ১৯৬৩-তে উদ্ভিদবিজ্ঞান শাখার সভাপতি হয়েছি, ১৯৭৩ থেকে ৭৬ ছিলাম বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, ৬৮—৭১ কোষাধ্যক্ষ। কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসাবে এইতো সেদিন আমন্ত্রণ পেলাম ত্রিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলতে।

—আগামী বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় কি ঠিক হলো? আমার প্রশ্ন।

—"বিজ্ঞানের পঠনপাঠন ও গ্রামের উন্নয়ন"। ১০+২+৩ ক্লাসের নতুন পাঠক্রমের প্রেক্ষিতে আমাদের ভাবতে হবে গ্রামের ছেলেদের জন্য এমন কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু করা যায় কি যাতে তারা শহরে কেরানীগিরির লাইন না দিয়ে, নিজের এলাকায় উপযুক্ত জীবিকা খুঁজে পায়। আমি গ্রামের ছেলে শহরে পড়তে এসে উচ্চশিক্ষা পেয়ে আর গ্রামে ফিরিনি। কিন্তু বেশীভাগ গ্রামের ছেলে শহরে কেরানীর কাজ খুঁজতে আসে। পরে পায় হতাশা। এ ব্যবস্থা কি স্বাধীন দেশে বেশিদিন চলতে দেওয়া ভালো? আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। আমি কী উত্তর দেবো। এড়িয়ে গিয়ে নতুন প্রশ্ন ফাঁদলাম, অবসর সময়ে কি করেন? —কী আর, পড়াশুনো, যৌবনে শিশির ভাদুড়ী দেখতে ছুটে যেতাম, এখন সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত-র কাজ দেখতে মন্দ লাগে না। তবে গাছপালা আর ধানের উচ্চ ফলন আমার জীবনের প্রধান প্রসঙ্গ। —নবীন বিজ্ঞানীদের বিদেশে চলে যাওয়া, অর্থাৎ 'মগজ চালান' সম্পর্কে কি ভাবেন?

—ছেলেরা কেন বিদেশে যায় বলুন, অধ্যাপক একটু যেন উত্তেজিত, এদেশে। একটা যন্ত্র খারাপ হলে দুবছর লাগে তেল দিতে ঘুষোঘুষি, কবে বিদেশী মুদ্রা জুটবে, কবে লালফিতের ফাঁস খুলবে তার ঠিক নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিযোগিতায় এভাবে জেতা যায় না। বহুবার বিদেশে গেছি আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছি, ওদের কাজ দেখার সুযোগও পেয়েছি। ঐ সব দেশের বাণিজ্যে উৎকর্ষের একবার স্বাদ পেলে এখানে কাজ করে ছেলেরা সুখ পাবে কেন। তবে ইদানীং দেশের হাওয়া পাল্টেছে। অলৌকিকত্বের মুখোস খুলে যেমন সাধুবাবাদের পরীক্ষায় ফাঁকা হচ্ছে তেমনই আজ কাজ হচ্ছে বিজ্ঞানীদের প্রতিভার সম্মান জানানো। এইতো ভুবনেশ্বরে বিশ-এর কমবয়সী বিজ্ঞানীদের কয়েকজনকে কাজের স্বীকৃতিতে পদক দেওয়া হলো। খুব ভালো কথা। তবু, যদি মনের কথা শুনতে চান বলবো, আগেকার মত একনিষ্ঠ ও মেধাবী ছাত্র ইদানীং বেশি দেখি না। ভালো ছেলেদের তো সব নিয়ে নিচ্ছে ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং আর হালে আমাদের আবার বাণিজ্য আর ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স। জানি না আমার ছাত্ররা কিভাবে ছাত্রদের পড়াতে পায়। আমরা তো ভালো পেতাম দশ-পনেরো বছর আগে। তারা কিংবা আরো আগের আমার যৌবনের ছাত্ররাই এখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আর রিসার্চ সেন্টার চালাচ্ছে। বলতে গেলে ওরাই আমার জীবনের সুদ ও আসল।

ছয় ঋতু...

ছয় রিপু...

ছয় তার...

জহুরী সদাগর

আমীর খাঁ

চেতলার হাটে এ-দোকান ও-দোকান ঘুরছেন, মাঘশিশিরের মতন সকালের রোদ সঙ্গ নিয়েছে—পায়ে পায়ে ঘুরছে...চাঁদনির বাজারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে বলিষ্ঠ যুবকের মতন মধ্যাহ্নের খর রোদ তার দেহরক্ষী...চিৎপুর রোডের ওপর লুটিয়ে পড়ে গোধূলির আলো তাঁকে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছে...ম্লান আবছা আলোয় ছায়া ফেলে দীর্ঘ দেহযষ্টি ঈষৎ টেনে টেনে, তিনি হেঁটে চলেছেন...দুহাত উপচে পড়েছে বিশাল ভারী বোঝায়...অজস্র কম্বল লুঙ্গী গামছা চাদর বাচ্চাদের রঙীন মখমলের টুপি রঙীন মখমলের নকসা করা জামা...ঈদের মরশুমে এই পরিচিত ছবিটি কি বছরই দেখা যেত, এই ক'বছর আর দেখা যাচ্ছে না।

: একটা ট্যাক্সি নেব এবার?—সঙ্গী যুবক সাগরেদ মোট মাল মোড়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে। গুরুর ক্লান্তির কথা ভেবেই সে উদ্বিগ্ন।

জবাব পায় কলুটোলা ছাড়িয়ে : তুমহে তকলিফ মহসুস হো রহী হৈ...দো না মুঝে। 'তোমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে না? দাও না আমার হাতে'—গাঁঠরি ভারাক্রান্ত হাতটাই বাড়িয়ে ধরেন। কুণ্ঠা বাড়ে সঙ্গীর। বৌবাজারের মোড়ে তারা রিকসায় ওঠেন একটা—ওয়েলেসলি যাবে?

ইন্দোরের মোহল্লায় মোহল্লায় অনেকগুলি প্রার্থীর চোখ আশায় জ্বলজ্বল করছে...ঈদের উপহার আসছে তাদের জন্যে। তিনি কবে আসবেন? এবার ফেরা কোনদিকে—নিজামীর দরবার...বোম্বাইয়ের মজুরো...কলকাতাকা মেহফিল? আরে খবাস রে...গজব শহর কলকাত্তা। ইন্দোরের দুঃস্থদের ঘরে ঘরে বিতারিত হবে উঁইকরা কম্বল-চাদর পোশাকআশাক।

: আহা, ওদের দেবার কে আছে বল। আমার বাবার আমল থেকেই পেয়ে আসছে।..

তা বেশ তো। একটা ট্যাক্সি করলে দোষ কী ছিল?

: ট্যাক্সির কথা বলছ?—বিপুল দেহভার রিকসার পরিমিত পরিসরে লুটিয়ে রেখে বলেন : ট্যাক্সি কেন অচিন্ত্য, আল্লার দয়ায় এখন আমি এ শহরে একটা নিজস্ব গাড়িই মজুত রাখতে পারি। কিন্তু..ওদের কী হবে? আমার ফ্যামিলি যে মস্ত বড়। খরচ কত—মাড়ির লালচে রং হাসিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

বড় ছেলে কানাডায় প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার। ফ্যামিলি বলতে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী আর শিশুপুত্র। তবু তাঁর বিশাল পরিবার। ছোট ভায়েরনটি ছেলেমেয়ে। তারা সবাই ইন্দোরের বাড়িতে থাকে। তারা ছাড়াও ইন্দোর শহরের বাসিন্দা অসংখ্য গুণমুগ্ধ গরীব মানুষ আছে—সবাই তারা বাপ-ভাই, বাপের মতন ভায়ের মতনই দেখে তারা। এই সব স্বজনদের নিয়েই তার পরিবার। নিজে গাড়ি চড়লে এই ভারী বয়েসে একটু ভিউ আরাম আয়েসে থাকলে থাকা যায়, কিন্তু সকলের দিকে মুখ চেয়ে বসে থাকা মানুষগুলোর মুখে অস্তমিত রং ফোটান যায় না।..

এ-দানে অহংকারের দৈন্য নেই বৈরাগীর মমত্ব আছে...ভৈরোঁর করুণা...ললিতের মধুর বিলম্বিত..

: বড়ে ভাই নহী, মেরে বাপ থে বাপ, সচ মুচ.. আবেগবিহ্বল মুঠোয় আমার দু হাত চেপে ধরেছিলেন বশীর খান—ইন্দোর রেডিওর নামকরা সারেঙ্গীবাদক। উস্তাদ শাহমীর খান সাহেবের ছোট ছেলে। সেবার আমীর খাঁ সংগীত সংসদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলাম আমরা। আমার ভূমিকা ছিল নগণ্য—মঞ্চের নেপথ্য থেকে শিল্পীদের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। একদিকে শিল্পীর সঙ্গে সহযোগিতা করলেন বশীর খান। শুধু বড় ভাইয়ের গানের সঙ্গেই সংগত চলল না তাঁর। আমীর খাঁ সংগতে সারেঙ্গী নিতেন না। আনপ্রিন্সিপল্‌ড। বাবা বিখ্যাত সারেঙ্গী বাদক। ছোট ভাই সারেঙ্গী বাজান, অথচ..

অনেক দিন আগেই কারণটা জেনে নিয়েছিলাম। আজ বলতে দ্বিধা নেই। আর সকলের গানে সহযোগিতা চলে, আমীর খাঁর গানে প্রয়োজন কেবল শর্তহীন অনুগামিতা। সেখানে তবলার কেরামতি অবিচল গাম্ভীর্য আর অস্খলিত লয়-নিষ্ঠায়। সারেঙ্গী হোক, হারমোনিয়াম হোক তাকে একটা স্বপ্নের সুড়ঙ্গ-পথ বেয়ে সতর্ক অনুগমনে রাজি হতে হবে। কখনো আলোক বিচ্ছুরিত হবে সামনে—পঞ্চমপাদের উত্তরণে। আবার হঠাৎ কখন প্রায় মূর্ছিত রশ্মির অনুকম্পনকে লক্ষ্য করে বিস্ফারিত আঁধারের অতল নিখাদে নেমে আসতে হতে পারে তাকে—রাজি?

ঠোকাঠুকি লাগলে চলবে না, একমাত্র ধ্বনির তূণীর থেকে নির্বাচিত স্পন্দন ছাড়া শ্রোতার হৃৎপিণ্ড ছাড়া আর কারুর অধিকার নেই ধাক্কা দেবার, ধাক্কা পাবার। মানুষের হাতে বাজে এমন কোন সারেঙ্গী এ শর্তকে অনুসরণ করতে পারে না। তাই সারেঙ্গী বাজে না আমীর খাঁর গানের সঙ্গে।

তাতে দুঃখ নেই ছোট ভাই বশীর খাঁর। নাইবা হল সংগত, দাদার চরিত্রের সঙ্গ তো পেয়েছেন, সেটাও কম দুর্লভ নয়। মেঘের মতন প্রশান্ত ঔদাস্য মাঘের হিমঘ্ন মাল্যকোশে ভিজিয়ে গড়া দরবারীর অভিভাবকত্বে মানুষ হয়ে উঠেছেন। বড় ভাই নয়, পিতার ভূমিকা নিয়েছিলেন দাদা, তাঁর জীবনে।

এই অভিভাবকত্বের কথাই উঠেছিল ইস্পাতনগরীর এক প্রধান কর্মকর্তার বাড়িতে। বৈঠক বসেছিল তাঁর বাইরের ঘরে। প্রথম প্রশ্ন ছিল : গান-বাজনার ক্ষেত্রে (ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত) দেখা যায় অগ্রগণ্য গুণীদের মধ্যে হিন্দুদের তুলনায়

মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য, তাও আবার আরব পারস্যের মুসলমান নয়, ভারতীয় মুসলমান। এর কারণ কী?

খাঁ সাহেব মৃদু হেসে আমার দিকে মুখ তুললেন : জারন্যালিস্ট, জবাব দো।

আমি বললুম : আমার বিদ্যের আওতার বাইরে। আসলে মনে মনে উত্যক্ত বোধ করছিলুম। খাঁ সাহেবকে করার মত আর প্রশ্ন ছিল না? ওঁদের মতন শিল্পীর সংস্পর্শে এলে ওসব নকল ব্যারিয়ার আপনি খসে পড়ে। আমীর খুসরুর মাজারে বসে দেখবেন, মনে হবে দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন।

খাঁ সাহেব নিজেই প্রশ্নের জবাব দিলেন : আজ আপনার মতন সম্ভ্রান্ত লোকের বৈঠকখানায় আমার মত গাইয়েকে আদর করে বসাচ্ছে, সেকালে এদিন ছিল না। গান-বাজনা ইজ্জতের ব্যাপার ছিল না। সঙ্গীতশিল্পীর কৌলীন্য স্বীকৃতি পায় নি তখনকার সমাজে। দেউড়ির বাইরে বসেই সোহিনী ধরতে হত বিসমিল্লার পূর্বসূরীকে। মুসলমান রাজরাজড়ার উচ্ছিষ্ট ইবাদৎ কুড়িয়ে কায়ক্লেশে সংগীতকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল যারা—তারা প্রায় সবাই বিত্তহীন মুসলিম পরিবার। অভিজাত হিন্দুরা সম্ভ্রম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, অভিজাত মুসলমানরা সম্পদ নিয়ে। উত্তরকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সঙ্গীতের বীজ চারিয়ে গেছে রক্তে মজ্জায়। এটাই বড় কারণ। আর ভারতের সংগীতে ভারতীয়রা পারদর্শী হয়ে উঠবে, এটাই তো স্বাভাবিক। আরব-পারস্যের সে সুযোগ কোথায়?

ডেমোক্রেসীর যুগে বাদশাহী অভিভাবকত্বের, ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটে যাওয়ায়, এবার কি আস্তে আস্তে সংগীতের উৎস শুকিয়ে যাবে? কিংবা জনগণের মন ভোলানোর তাগিদে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করে গণমানসের উপযোগী লঘুত্বে নেবে আসতে বাধ্য হবে?

গণসংগীতে আস্থা নেই আমার। বাকিরদের দামামা বাজল স্বভাববিনয়ী আমীর খাঁর আটপৌরে গলায়।

অথচ আমরা যে আমীর খাঁকে চিনি তিনি কোন আমীর ওমরাহ নন আর পাঁচজনের মতনই ধূলোমাটির মানুষ। হাফশার্টে ঘোরেন, ট্রামেবাসে চড়েন, শার্টপ্যান্ট পরেন, সিনেমাথিয়েটার ক্রিকেটের অনুরাগী হিসেবে টেস্টক্রিকেটের টিকেট হচ্ছে একজন বললে : বলুন তো খাঁ সাহেব, গুগোলি মানে কী?

: বাঃ তাও জান না, বহু জায়গা এক ফোটোয় ধাঁও— মুগেলীদের পাস কী আমীর খাঁ দরগায় মাথা নোয়ান, বেলুড়মঠে প্রণাম করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর ছুটির দিনের কেরানীবাবুর মতন বসে ট্রানজিস্টার রেখে বিবিধ ভারতীর প্রোগ্রাম শোনেন। কোথাও পাঁচজনের থেকে আলাদা করে দেখাবার সাধ নেই নিজেকে।

কানপুর স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পৌঁছে শুনলেন গাড়ি আসবে সকালে। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমের ভেতরে বিশ্ব তখন নিদ্রামগন। চেয়ার টেবিল সোফাকৌচ যাত্রী কোলে করে ঘুমোচ্ছে। দোরগোড়ায় পা রাখার জায়গা নেই। সংগী বললে—এরা সবাই বোনাফাইড ফার্স্ট ক্লাস নয়, উঠিয়ে দেওয়া যাক।

: মাথা খারাপ? ঘুমন্ত লোককে তুলে বের করে দোব? না না—

প্ল্যাটফরমের একপ্রান্তে চাকা গড়ানো জায়গায় হোল্ড অল বিছিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে পড়লেন। শেষ রাত্তিরে এসে গেল পুলিশের লোক হাঁকডাক করছে : আজী উঠো, কৌন হো তুম? মুখ থেকে চাদর সরিয়ে হেসে জবাব দিলেন : আজী, হুঁ তো পদ্মভূষণ, মগর য়ঁহা লেটা হুয়া হুঁ।

পদ্মভূষণ ওস্তাদ আমীর খাঁ ইস্টিশানের প্ল্যাটফরমে মাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, আলিগড়ের কলমের ফেরিঅলার মতন। আধুনিক গানের জলসায় পয়লা সারির শ্রোতার মধ্যে বসে থাকেন। এক মস্ত নামজাদা মডার্ণ গাইয়ে তাঁকে দেখে মঞ্চ ছেড়ে দৌড়ে নেমে এসে হাত জড়িয়ে ধরেন : খাঁ সাহেব আপনি এসেছেন আমার গান শুনতে?

: কেন ভাই, তুমি যে যাও আমার গান শুনতে।

তাঁরই আবার সাংগীতিক গণতন্ত্রে স্পষ্ট অনীহা। সার্বজনিক ক্রয়সামর্থ্যের আওতায় পড়ে না বলে সাবেকী জড়োয়াকে যাদুঘরে পাঠান সম্ভব, কিন্তু গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে শিল্পের গুণগত অপকর্ষকে স্বীকার করা চলে না। শিল্পের সিদ্ধি থাকে সাধির নিভৃতচারী সেলের কন্দরে। নির্জন মনিকোঠায় চেরাগ জ্বালিয়ে তার তপস্যা। তিলোত্তমা করে মননশীলতার স্ফুরণ ঘটিয়ে তৈরী হয়ে উঠতে হবে। ভোগের অধিকার অর্জন করতে হবে। এখানে সবজনীন শরিকানা আছে, একচেটিয়া মালিকানা নেই। রক্তের সার ছাড়া এই দাক্ষাক্ষেত্রের অন্য উপচার নেয় না।

মাঝে মাঝে ভাবি। অনেক আগে ভেবে। পুরনো ছবিগুলো একের পর এক ভেসে ওঠে চোখের ওপর। একটুকু একটা ফিয়াট গাড়ির সীটে ঠাসাঠাসি করে যে লোকটার পাশে বসে এলুম, মহাজাতি সদনের মঞ্চে বসার সংগে সংগে সেই লোকটাই কখন কেমন করে পালটে গেল।

গান হচ্ছে দরবারীতে : 'পলককাসে মগ ঝাড়ু... আঁখিপল্লব দিয়ে তোমার পায়ের ধুলো মুছিয়ে দেব, হে প্রিয় পরম।

সেদিনই দুর্গাপুরের গেস্টহাউসে বসে বলেছেন : আজ একটা নোতুন গান গাইব দরবারীতে। আগে শোনোনি। এটা একটা পদাবলী থেকে পেলাম। অন্তরায় এসে যখন গাইলেন : তোমা মনপ্রাণ ভরে...আমার তনুমনপ্রাণ অন্ততঃ সেই মুহূর্তে দরবারীর মদিরায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বন্ধু আমার কানে কানে বললে আর কী চাই? জীবনের সব চাহিদা মিটে গেছে আজ।

অনেকে আমায় প্রশ্ন করেছেন—আমীর খাঁ সাহেবের কী কী বৈশিষ্ট্য তাঁকে অনন্য করে তুলেছে? এক হিসেবে শিল্পী মাত্রেই তো অনন্য। তবে?

কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের জবাব দেওয়া আমার সাধ্য নয়। সেক্ষেত্রে দুটি কয়েকটা কথার অবতারণা করা যেতে পারে। খাঁসাহেব নিজে একাধিকবার আমাদের কাছে বলেছেন : আমার আওয়াজ (ভোকাল কোয়ালিটি) আবদুল করিম খান কি গুলাম আলি খানের মতন অত ভাল নয়।

আমি আবাল্য অমতেক ঠ করিম খাঁ এবং মহাকিকার গুলাম আলির অনুরাগী। তা সত্ত্বেও খাঁসাহেবের কথার ঠিক মর্ম বুঝিনি। আমাদের অভিজ্ঞতায় বলে আমীর খাঁর আওয়াজের উৎস অর্থাৎ স্বরস্থান এমনই স্বতন্ত্র ছিল, যার ফলে শাস্ত্রে যাকে শঙ্খনাদ বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ সেটাই আমরা তাঁর গলায় শুনতে পেতুম। এবাবদে সংগীত শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধৃত করে একটা সংস্কৃত শ্লোক খাঁসাহেব প্রায়ই উচ্চারণ করতেন। যার মানে হচ্ছে—প্রথম স্বর অর্থাৎ ষড়জের স্থান নাভিতে, দ্বিতীয় অর্থাৎ ঋষভের নাসিকায়...ইত্যাদি

উত্তরকালে ব্যক্তি আমীর খাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যত এগোচ্ছি, ততই আমার মনে হয়েছে সংগীতের অন্তরঙ্গ সাধনা তাঁকে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাইতেই তিনি সহজ সবলীল সাংগীতিক প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন।

ফরদৌসী রহমান

…া সেন

বছর দুয়েক আগে রবীন্দ্রসদনে নাট্যোৎ…
…ার একটি আসরে শুনেছিলাম বাংলা-
…র শিল্পী ফিরদৌসী রহমানের গান।
…ক মুহূর্তের জন্য যেন এপার বাংলার
ওপার বাংলার গ্রামীণ জীবনের আনন্দ
… সুখ-দুঃখের ছবি আঁকা হয়ে গেল।

…বৃক্ষের ছায়া যেমন রে
…মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে—

অনুষ্ঠানের দিনই ওঁর সংগে আলাপ
। ফিরদৌসীর বেশভূষা আধুনিক হলেও
…কে আলোচনায় স্বপন কল্পনায় নদী-
… বাংলাদেশের সহজ সরল মিষ্টি
…রতের নানা জায়গায় ঘুরেছেন
…গিয়েছেন ইয়োরোপে সফরের
…ও আছে। তবু দেশের মাটি আর
… সুরের প্রতি টান একনিষ্ঠ এবং

…গীতির প্রতি ওঁর ভালোবাসা শুধু
…সংস্কারও। পিতা প্রখ্যাত পল্লী-
…শিল্পী আব্বাসউদ্দিন—একদা যাঁর
…রেকর্ড বাজত না অবিভক্ত বাংলাদেশে
…টিই ছিল না। কিন্তু পল্লীগীতি
…জন্মগত হলেও যে বস্তুটি
… রহমনের একান্তই আপনার
… শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি অনুরাগ
…য়ে নৈপুণ্য। ফিরদৌসীর জন্ম
… আব্বাজানের সংগে কলকাতা
… ছিল নিয়মিত। ছোটবেলা থেকেই
… সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের

ফলেই পদ্মাতীরের মেয়ে গঙ্গাতীরের মানুষ ও তার সংস্কৃতির সংগে একটা আত্মীয় বন্ধন অনুভব করত: এই অনুভবের তাগিদেই ভালবাসল এপার বাংলার শিল্প গান ও শিল্পীকে। আব্বার সংগে স্টুডিও গানের আসর ও কনফারেন্স যেতে যেতে মনের মধ্যে শিশুকাল থেকেই একটা গানের সংস্কার গড়ে উঠেছিল।

'পার্টিশনের পর চার-পাঁচ বছর ঢাকায় ছিলাম। কলকাতার সংগে কোন যোগাযোগই ছিল না। এত কষ্ট হত কি বলব—ফিরদৌসী বললেন অন্তরংগ সুরে।

উচ্চাংগ সংগীতের তালিম পেয়েছেন। প্রথমে মহম্মদ হোসেন খসরু ও মুনীর হোসেন খাঁর কাছে। তারপর ইউসুফ খাঁ এবং সর্বশেষ সালামত খাঁর কাছে। পল্লীগীতি শিখেছেন মোমাদা জামান ও আব্বাসউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে। এছাড়া রেডিও থেকে কলকাতা ও ঢাকার নানা শিল্পীর গান যখন-তখন তোলা ও গাওয়া ত ছিল খেলারই সামিল।

সবরকম গান গাইতে ভাল লাগলেও উত্তরবংগের ভাওয়াইয়া গানের প্রতি ওঁর একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। কারণ? 'আব্বা এইসব গান প্রথম প্রচার করেছিলেন আর সে গান সবাই সমাদরের সংগে গ্রহণ করেছিলেন—গাইবার সময় এই কথাটাই আমায় উদ্বেল করে। পৃথিবীর যে প্রান্তে বসে এইসব গান গাইনা কেন আমার দেশের মাটির গন্ধ সবুজ বন নদী রূপালী তাজা মাছ সবকিছুই যেন চোখের সামনে দেখতে পাই—শান্তি শান্তে।

তবে একটা কথা। ভাওয়াইয়া গান কিংবা অন্য গান ভালবাসলেও উচ্চাংগসংগীত আমার কাছে বীজমন্ত্রের মতই। ক্লাসিক্যাল বেসিস না থাকলে কোনো গানই ভালো করে গাওয়া যায় না। সুর দুলে ওঠে না পায় তার সৌন্দর্য।

আমি গান শেখবার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে ভেবেছিলাম কলকাতায় এসে শিখব। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই এপার বাংলা ও ওপার বাংলার মানুষের পরস্পরের দেশে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। তাই সে আশা পূর্ণ হল না। গেলাম ইংল্যাণ্ডে স্টাফ নোটেশন শেখবার জন্য। ওদের নোটেশন পদ্ধতি সত্যিই খুব উন্নত ধরণের। অনেক দেশ ঘুরেই গান গেয়েছি। সব দেশেই গেয়ে দেখেছি অধিকাংশ শ্রোতারই ঝোঁক ফোক-সং-এর প্রতি। এক দেশের মাটির সহজ অনাড়ম্বর মৌলিক সুর অন্য দেশের মানুষেরও মন টানে।

ফিরদৌসী রহমানের ফ্রেণ্ড ফিলসফার ও গাইড হলেন তাঁর স্বামী রেজাউর রহমান। স্থিতধী কলারসিক সুদর্শন।

কয়েক বছর আগে গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে ফিরদৌসী রহমানের সুন্দর দুটি গানের একটি রেকর্ড বেরিয়েছে। গান দুটি হল 'ছি ছি কি ভুল করেছি' ও 'এবার আসবে তুমি'।

উদয়শঙ্করের নতুন সম্মান

সৌরভ সংস্থার তরফ থেকে উদয়শংকরকে ভুয়ালকা পুরস্কারে সম্মানিত করা এ সপ্তাহের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে শিল্পী এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃজনমূলক কাজ করেছেন—এমন ব্যক্তিত্বকে প্রতি বছর সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা স্বর্গত অদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রীসুকোমলকান্তি ঘোষ উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান উদয়শংকরকে নিয়ে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু করার জন্য। কারণ উদয়শংকর শুধু ভারতীয় নৃত্যের উদ্গাতাই নন তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি।

শ্রীঘোষ, প্রধান অতিথি প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র এবং বিশেষ অতিথি তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় সংস্থার কর্ণধার অদ্রিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের অকাল তিরোধানের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন এবং অধ্যক্ষা নমিতা চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানান এই শোক-মুহূর্তেও এমন কঠিন কর্তব্য পালনের জন্য। সুব্রত মুখোপাধ্যায় প্রসংগত জানান, সরকার খুব শিগগির উদয়শংকরকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র করছেন।

উদয়শংকরের হাতে মানপত্র ও দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন প্রধান বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র।

যামিনী কৃষ্ণমূর্তির ভারতনাট্যম কুচিপুরী

রবীন্দ্রসদনে যামিনী কৃষ্ণমূর্তির নাচ দেখে মনে হয়েছিল মন্দির প্রাচীরের ভাস্কর্যমূর্তিগুলির আবেগ, বেদনা ও স্তব্ধতা যেন মুখর উচ্ছ্বাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর একক নৃত্যের এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন শ্যামশ্রী ঠাকুর, সিলভার স্টারের তরফ থেকে।

সূচনায় রংপ্রবারেম ঢং-এ এবং অনেকটা আলারিপ্পুর আংগিকে দেবদেবী থেকে সুরু করে দর্শক অবধি প্রণাম জানানোর দীপ্ত অথচ নম্র ভঙ্গী ভারতীয় নৃত্যকলার উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই ধ্রুপদী পটভূমিকাতেই দশাবতার শ্লোকম নবরস এবং বর্ণমে যামিনী দেখালেন নৃত্যে নাট্যকলার আশ্চর্য বিকাশ তার প্রকাশভঙ্গির পরিধি কতখানি বিস্তৃত করেছে।

পরের পর্যায়ে কুচিপুরী নৃত্য ভারতনাট্যমের কৌণিক ভঙ্গি এখানে ঋজু হয়ে গেছে, ভক্তিভাবে এসেছে লাস্যের জোয়ার।

ক্রিকেট আপনজন হারাল

অজয় বসু

কেন এই শোচনীয় মৃত্যু?

বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ও বেতার ভাষ্যকার বেরি সর্বাধিকারীর আত্মহননের পরও একটি প্রশ্নই সকলের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। কৃতবিদ্য ও সফল সাংবাদিক-ভাষ্যকার, জীবনব্যাপী সাধনায় যিনি খেলা ও খেলাধুলোর সেবা করে গেছেন, পাঠক ও শ্রোতাদের মনোরঞ্জনে যাঁর অবদান অপরিসীম, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তাঁকে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করতে হোল কেন? কেন এই মর্মান্তিক পরিণতি? আর্থিক অস্বচ্ছলতা? শারীরিক অসুস্থতা? নিঃসংগবোধ? অথবা অন্য কোন কারণ?

কারণ যাই হোক না কেন ঘটনাটি বড়ই বেদনাদায়ক। আত্মাহুতি দিয়ে বেরি সর্বাধিকারী শুধু ক্রীড়ামহলেরই নয় সেই সংগে বৃহত্তর সমাজের চেতনাকে খোঁচিয়ে দিয়ে গেছেন। ভাবা দরকার যে বয়স্ক ক্রীড়াবিদদের সম্পর্কে সমাজের কিছু করণীয় আছে কিনা।

ভরা যৌবনে বাড়তি প্রাণশক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেলোয়াড়েরা হাজার হাজার দর্শককে মাঠে টেনে আনেন। রুপোর টাকা জমালে সংগঠকদের, ক্ষেত্রবিশেষে রাজ্য সরকারেরও ভাঁড়ারে সংগ্রহ বাড়ে। তাঁদের দেখে, ক্রীড়াকৃতির পরিচয় পেয়ে জনসাধারণের সুখ স্বপ্নের পেয়ালা পূর্ণ হয়ে ওঠে। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি থাকেন সাংবাদিক ও বেতার ভাষ্যকারেরা। জনসাধারণকে আনন্দ দিতে, খেলার আমেজে ডুবিয়ে রাখতে তাঁরাও নিষ্ঠাভরে দায়িত্ব পালন করে যান। খেলোয়াড় এবং সাংবাদিক-ভাষ্যকার উভয়েই আক্ষরিক অর্থে 'পাবলিক এন্টারটেইনার'। কিন্তু অপরের মনোরঞ্জনে যাঁরা এমন নিরলস পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা করেন তাঁদের ঋণ পরিশোধের কোনো ব্যবস্থাই আমাদের দেশে হয় না। দেহপটসনে নট সকলি হারায়। কবির এই খেদোক্তির সত্যতা প্রমাণেই যেন এদেশের খেলোয়াড় তথা সাংবাদিক - ভাষ্যকারেরা সমাজের অনাদর ও উপেক্ষা এবং কালের বোঝা বয়েই বেড়ান।

যাঁরা স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের আনন্দে দু হাত উজাড় করে সংসারে দিয়ে যান সংসার তাঁদের সম্পর্কে এমন উদাসীন কেন? এই কলকাতার মাঠের অনেক কিংবদন্তী দিতে দিতে ফতুর হয়েও শেষ জীবনে সামাজিক নিরাপত্তার আশীর্বাদ ফিরে পান নি। বেরি সর্বাধিকারীও তাঁদের অনুসরণ করে গেলেন। যাঁদের রাজার হালে দিন কাটাবার কথা, সমাজের অবিচারে তাঁরাই সব ফকির হয়ে গেলেন।

প্রচারসর্বস্ব এই কালে খেলোয়াড় তথা বর্ষীয়ান ক্রীড়াবিদদের মালাচন্দনে সাজিয়ে তাদের হাতে একখানি করে মানপত্র তুলে দেওয়ার ধুম পড়ে গেছে। নজিরটির নিন্দে করা যায় না। কিন্তু এই দৃষ্টান্তের পাশে বেরি সর্বাধিকারীর আত্মাহুতির ছবিটি যদি তুলে ধরা যায় তাহলে সভাসমিতিতে শুকনো প্রশস্তি গাওয়ার আয়োজনকে নিরর্থক বলে ঠেকে। মনে হয়, কোথাও যেন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিজের দায়িত্ব এড়াতে কেউ বুঝি চোখধাঁধানো অনুষ্ঠানের আয়োজনে বাস্তব প্রয়োজনের সংগে নির্মম রসিকতা করছেন! যৌবনোত্তীর্ণ অবস্থাতে খেলোয়াড় এবং সাধারণ্যে পরিচিত ক্রীড়াবিদদের সামাজিক নিরাপত্তা করাই আজ বাস্তব প্রয়োজন। দেশে ক্রীড়া সংস্থা আছে। রাজ্যে রাজ্যে ক্রীড়া পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের সদর দপ্তরে ক্রীড়া মন্ত্রকও খোলা রয়েছে। এইসব সংস্থা কি বিগতকালের নায়কদের নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না? না পারলে খেলা ও খেলোয়াড় কল্যাণে উচ্চারিত সব অঙ্গীকারই যে শূন্য কলসীর ফাঁপা আওয়াজে পর্যবসিত হয়ে পড়ে।

সমকালীন সমাজের বিবেক বলে যদি কিছু থেকে থাকে, যদি গর্ববোধ হয় শিক্ষার ও সহৃদয়তার তাহলে বেরি সর্বাধিকারীর আত্মাহুতির মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে চিরতরে ঠেকিয়ে রাখার যেন যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাঁর মৃত্যু একটি তর্জনী উঁচিয়ে রেখে গেছে। দেখে

বেরি সর্বাধিকারী

জাতিগতভাবে আমাদের শিক্ষা উচিত।

লাখ লাখ টাকা খরচ করে খেলাধুলোর আসর সাজানো হয় কেন খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদদের একটি স্থায়ী নিরাপত্তা ভাণ্ডার [illegible] না তাই ভাবি। মাঠে অগুন্তি টাকা দেন হয়। নিজের পকেট উজাড় করে ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের দ্বিধা কিছুই নেই। এই অর্থের অং[illegible] সংরক্ষিত রেখে বর্ষীয়ান ক্রী[illegible] দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ বোলানো পারে। হতে পারে মাছের তেলে ভাজা। প্রস্তাবটি বহুবার উত্থাপিত কিন্তু প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়নি অযথা অনেক দেরি করা হয়েছে। আরও টালবাহানা করা হলে আমাদের কালকে কাঠগড়ায় দাঁড় ছাড়বে না।

বেরি সর্বাধিকারী আমার আ[illegible] সমবয়সী ছিলেন না। তবু তাঁকে আমি আত্মীয় ও বন্ধু বিয়োগ কাতর হয়েছি। বুঝেছি যে আমাদে[illegible] সাংবাদিক - ভাষ্যকারের সংসার এ[illegible] মাপের মানুষকে হারালো। আর ক্রিকেট হারালো তার এক দরদী বেরি সর্বাধিকারী কোনোদিন কা[illegible] গুরুগিরি ফলাতে চান নি তবু তাঁর কাছ থেকে অনেক শিক্ষা আ[illegible] পেতে নিয়েছি। সহক[illegible] ও উত্ত[illegible] কাছে তিনি ছিলেন বন্ধু, [illegible] আপনজন ও শিক্ষণীয় প্রতিষ্ঠান ছাত্র ছিলেন। স্কটিশচার্চ স্কুল প্রেসিডেন্সী (তিনি যে প্রেসিডেন্সি ছিলেন তা আমার জানা ছিল না। শ্রীসুনীলকান্তি রায় স্বেচ্ছায় [illegible] পরিবেশন করেছেন) ও [illegible] কলেজের সহপাঠীরা এখনও তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। [illegible] চেয়েছিলেন, পড়াশুনো করে বেরি ব্যারিস্টার হবেন। কিন্তু খেলাধুলো তিনি এমনই এক পথ বেছে নি[illegible] বাহ্যিক জৌলুষের আড়ালে [illegible] ছড়ানো ছিল অনেক কাঁটা। চাক[illegible] হয়তো পথের কাঁটা সরাতে পারতে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে নিরাপত্তার প্রতি তাঁর লোভ ছি[illegible] পথে তিনি নিঃসঙ্গ ও নিঃশংক [illegible] আমাদের দেশে স্বাধীন, [illegible] ফ্রিলান্স জার্নালিজমে তিনিই পথি[illegible] তাঁর বুলি ছিল যথার্থই 'টোটাল ক্রিকেটেরই'।

ইনিংসেও সর্বোচ্চ রান করেছিলেন অধিনায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকার (৩৯ রান)। এম সি সি-র পক্ষে বোলিংয়ে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন কোপ—৬২ রানে ৯ উইকেট (৪১ রানে ৬ ও ২১ রানে ৩) এবং মিলার ৯৩ রানে ৬ উইকেট (৩৯ রানে ২ ও ৫৪ রানে ৪)।

জাতীয় খো খো প্রতিযোগিতা

১৬তম জাতীয় খো খো প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই খেতাব জয়ী হয়েছে। মহারাষ্ট্র পুরুষ বিভাগের ফাইনালে কর্ণাটককে এবং মহিলা বিভাগের ফাইনালে মধ্যপ্রদেশকে পরাজিত করে।

পুরুষ বিভাগে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে 'একলব্য' পুরস্কার লাভ করেন কর্ণাটকের অধিনায়ক শ্রীনিবাস। অপরদিকে মহিলা বিভাগে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে 'লক্ষ্মীবাঈ' পুরস্কার জয় করেন মধ্যপ্রদেশের অধিনায়ক নিশা বৈদ্য।

টেস্টে বেদীর ২০০ উইকেট

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে মাদ্রাজের চলতি তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে (জানুয়ারী ১৪, ১৯৭৭) ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টনি গ্রেগের উইকেট পাওয়ার সূত্রে ভারতের অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট পাওয়ার দুর্লভ গৌরব লাভ করেন। মাদ্রাজের এই তৃতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসে বেদী যে চারটে উইকেট পান তা নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বেদীর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২০৩—তাঁর ৫১তম টেস্ট খেলার মাথায়। এখানে উল্লেখ্য, ভারতের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র বেদীই ২০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

বাঙ্গালোরে আয়োজিত ২৭তম জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস পুরুষ বিভাগে এবং মহারাষ্ট্র মহিলা বিভাগে খেতাব জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সার্ভিসেস ১৯৫৭ সাল থেকে একটানা (কেবল ১৯৬৮ সাল বাদে) পুরুষদের খেতাব জয় করে চলেছে। এবার পুরুষদের ফাইনালে সার্ভিসেস দলের সঙ্গে খেলেছিল বিহার। পুরুষ বিভাগের ফাইনালে বিহারের এই প্রথম আবির্ভাব। মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র এই নিয়ে ৮বার খেতাব জয়ী হল। এবার মহিলা বিভাগের ফাইনালে রানার্স-আপ হয়েছে কর্ণাটক। এ পর্যন্ত কর্ণাটক মহিলা বিভাগে তিনবার চ্যাম্পিয়ান এবং পাঁচবার রানার্স-আপ হয়েছে।

মহিলা বিভাগের সেমি-ফাইনালে গত বছরের রানার্স-আপ পশ্চিমবাংলা ৫৯—৯২ পয়েন্টে কর্ণাটকের কাছে হেরে যায়।

ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ : সার্ভিসেস ৯১—৭২ পয়েন্টে বিহারকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ৭১—৫৩ পয়েন্টে কর্ণাটককে পরাজিত করে।

পুরুষ বিভাগে রেলওয়ে ৯৫—৯৮ পয়েন্টে কর্ণাটককে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পায়। অপরদিকে মহিলা বিভাগে কেরল ৬৯—৩৮ পয়েন্টে পশ্চিমবাংলাকে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

জাতীয় টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা

এলাহাবাদে আয়োজিত ৩৮তম জাতীয় এবং আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসরে রেলওয়ে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। রেলওয়ে এই আসরে প্রধান সাতটি খেতাবের মধ্যে সাতটি খেতাবই পেয়েছে—পুরুষ ও মহিলা বিভাগের দলগত খেতাব এবং ব্যক্তিগত বিভাগের পাঁচটি খেতাব—পুরুষ ও মেয়েদের সিংগলস, পুরুষ ও মেয়েদের ডাবলস (মহারাষ্ট্রের সহযোগিতায়) এবং মিকসড ডাবলস। রেলওয়ের মনজিৎ দুয়া পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'ত্রিমুকুট' খেতাব লাভ করেন।

প্রতিযোগিতার বাকি দুটি দলগত খেতাব পেয়েছে উত্তরপ্রদেশ বালক বিভাগে এবং আসাম বালিকা বিভাগে।

বাংলা পুরুষ বিভাগে ৬ষ্ঠ স্থান, মহিলা বিভাগে ৮ম স্থান, বালক বিভাগে ৯ম স্থান এবং বালিকা বিভাগে ৫ম স্থান পেয়েছে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিংগলস : ২নং বাছাই দুয়া (রেলওয়ে) ২১—১৭, ২১-২১—১৭ পয়েন্টে কে জয়ন্তকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিংগলস : শৈলজা (রেলওয়ে) ২১—১৫, ২১—২১—১১ পয়েন্টে উষা সু[illegible] (কর্ণাটক) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নীরজ (মহারাষ্ট্র) এবং মনজিৎ (রেলওয়ে) ওয়াকওভার রেলওয়ের বি বিশ[illegible] এবং মেননের বিপক্ষে।

মেয়েদের ডাবলস : শৈলজা (রেলওয়ে) এবং কাশ্মীরা (মহারাষ্ট্র) ২১—৯, ২১-২১—১৬ পয়েন্টে অনীতা এবং কিরণ ওয়াদেকারকে পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : মনজিৎ দু[illegible] নন্দিনী কুলকার্নি ২১—১৩, ২১—১০ ও পয়েন্টে সি আর রমেশ বা[illegible] লক্ষ্মী করনাতকে (কর্ণাটক) [illegible] করেন।

পুরুষদের সিঙ্গলসের [illegible] খেলোয়াড় নীরজ বাজাজ (মহা[illegible] মেয়েদের সিঙ্গলসের ১নং বাছাই ইন্দু পুরী (রেলওয়ে) অপ্র[illegible] হেরে যান। নীরজ বাজাজকে [illegible] করেন ৪নং বাছাই কে জয়ন্ত এবং ইন্দু পুরীকে পরাজিত [illegible] বাছাই উষা সুন্দররাজ কর্ণাটকেরই জয়জয়াকার।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযো[illegible]

পাটনার মৈনুল [illegible] ষ্টেডিয়[illegible] জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগি[illegible] বসেছে। বর্তমানে প্রতিযোগি[illegible] ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে আসরে অংশ গ্রহণ করেছে এই ২৫টি দল ৮টি গ্রুপে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলে প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান [illegible] টার ফাইনালে খেলবার যো[illegible] করেছিল। কোয়ার্টার ফা[illegible] দলকে দুটি গ্রুপে সমান [illegible] লীগ প্রথায় খেলতে হয়েছি[illegible] ফাইনালে উঠেছে কোয়ার্টার [illegible] প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান [illegible] আপ দল।

গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বা[illegible] লীগ পর্যায়ের খেলায় উ[illegible] ৪—০ এবং মণিপুরকে [illegible] হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে [illegible] কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা গোয়া ২—১ গোলে মহারাষ্ট্র[illegible] গোলে পাঞ্জাবকে হারিয়ে [illegible] উঠেছে। এপর্যন্ত বাংলা [illegible] খেলায় ১৬টা গোল দিয়ে মা[illegible] খেয়েছে।

...য় কলকাতার দর্শকদের

রূপক সাহা

—'যে কোন ইউরোপীয়ানের মুখ দেখলেই ...তার ভিখারীরা ছেঁকে ধরে।' 'কলকাতার গ্র্যাণ্ড ...লটা বড্ড পুরানো ফ্যাশনের।' 'ভারতীয় ক্রিকেটারদের ...াচ্ছি না, ভয় কলকাতার দর্শকদের।' 'ওরা ক্রিকেটের ...গুলো নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে।'

ইংল্যাণ্ডের কাছে পর পর দুটো টেস্টে হেরে ...ীয় ক্রিকেট এখন ধুঁকছে, কলকাতার ক্রিকেট- ... মানুষ এখন ক্ষুব্ধ। ঠিক এই মুহূর্তে ওপরের ...লো নিশ্চয়ই কানে বাজবার মত। কিন্তু বিশ্বাস ..., শুনতে ভাল না লাগলেও কথাগুলো সত্যি। কল- ... সম্পর্কে এই মন্তব্যগুলো ক্রিকেট টেস্ট উপলক্ষেই ... দেওয়া। দিয়েছেন কয়েকজন বিদেশী।

সাগর পারের দেশ থেকে যে কয়েকজন সাংবাদিক ...টেস্ট সিরিজ কভার করতে এসেছেন তাঁরা কল- ...তেও ছিলেন কয়েক দিন। কয়েকজন এর আগেও ...তা ঘুরে গেছেন, কেউ কেউ এই প্রথম। ইডেন ...সের ক্লাব হাউসের তিনতলায় প্রেস বক্সে একই ...দিন পাঁচেক আমরাও ওদের সঙ্গী ছিলাম। ওঁরা ... আগ্রহে খেলা দেখেছেন, খেলার সময় খুব একটা ...জব করতে দেখি নি কাউকে। বিদেশী সাংবাদিকরা ... খবর পাঠিয়েছেন রোজ। সেই সঙ্গে কিছু মন্তব্য। ...তা সম্পর্কে ওঁদের অভিজ্ঞতার কথা।

লণ্ডনের ইভনিং নিউজের এলান লী সেণ্ডারের ... প্রথমে বলা যাক। কলকাতার টেস্ট আরম্ভ হবার ...য়েক আগে উনি পৌঁছান কলকাতায়। গৌহাটিতে ...-পূর্বাঞ্চল ম্যাচে যান নি। তিরিশে ডিসেম্বর ... যে খবর এখান থেকে পাঠান তার প্রথমাংশটিতে ...ম্যাচের টিকিট পাওয়ার জন্য কলকাতার লোকেদের ...রের চিত্রটিই ফুটে উঠেছে বেশী। সেই সঙ্গে ...তা সম্পর্কে ওঁর মানসিকতাও। উনি লিখেছেন, ...বাজারীরা চার ধারে বেশ সক্রিয়। ভারত ইডেনে ...ই—এখানকার লোকেদের এই বিশ্বাসে কালো- ...দের পোয়া বারো। ওরা এক একটা টিকিটের ...দিকে দর হাঁকছে, সত্তর টাকার টিকিট পাঁচশো ... দুঃখ কষ্টেভরা কলকাতা শহর—যেখানে যে কোন ...ীয়ানের মুখ দেখলেই শক্ত সমর্থ ভিখারী ...রা, করে ফুটপাতের শীর্ণ বাচ্চা ছেলেরা ছেঁকে ...খানে ক্রিকেট নিয়ে এই পাগলামি ঠিক যেন দুটো ... চিত্র।'

...স্ট ম্যাচের টিকিট নিয়ে আরো অনেক ইংরেজ ...ক কটাক্ষ করেছেন। লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার ...ষ ঐদিনই যে খবর পাঠিয়েছেন তাতে ওর ক্ষোভ ...। 'টিকিট টিকিট করে কলকাতার লোক এখন ... এম-সি-সি-র সঙ্গে এসে আমাদেরও ঝামেলায় ...ছে। রাত্তিরে হোটেলের বেডরুমে হাজার বার ...ন ঝাঁকায় উঠছে। রিসিভার তুললেই ভেসে আসে— ...ম্প্লিমেণ্টারী টিকিট দিতে পারেন। কেউ কেউ ...কাও সাধছে। হোটেল থেকে মাঠে যাওয়ার পথেও ...্যাকসী ড্রাইভাররাও টিকিট চায়!'

...লকাতা কি অপরিচ্ছন্ন? বিদেশী সাংবাদিকদের ...লকাতা তাই। ইভনিং নিউজের সেন্ডার লিখেছেন— ...এম-সি-সির খেলোয়াড়রা ফিরেছে। ওরা থাকছে ... ফ্যাশানের গ্র্যান্ড হোটেলে। সাবেকী আমলের ... কাঠের আসবাবপত্রে আর ককটেল পার্টিতে ভরা ...টেলের কয়েক গজ দূরেই অপরিচ্ছন্নতা বর্তমান— ...লেই যা চোখে পড়ে।'

ডেইলি মিরর পত্রিকার পিটার লেকার কলকাতায় আগেও এসেছেন। ওর দৃষ্টিকোণ আবার অন্যরকম, লেকার ভয় পেয়েছেন কলকাতার দর্শকদের। লিখেছেন, 'প্রাথমিক বিপদ ভারতের ক্রিকেটাররা নয়। সেটা হলো কান-ফাটানো, কখনও কখনও ভয়াবহ গর্জন যেটা ইডেনের এক লক্ষ বাঙালী সৃষ্টি করে যখন তারা ক্রিকেটের নিয়ম নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে।'

ইডেনের দর্শক সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকটির এই ধারনার পেছনে ওর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টনি গ্রেগ কলকাতার দর্শকদের সম্বন্ধে কি বলছে তা শোনা দরকার। টেস্ট ম্যাচের সাড়ে চারদিনই স্টেডিয়ামের দর্শকদের নানা রঙ্গরস করে জমিয়ে রেখেছিল গ্রেগ। কিন্তু এই গ্রেগই খেলা আরম্ভের আগের দিন নিজের দেশের সাংবাদিকদের বলেছে, 'এটা ঠিক কলকাতার মতো ক্রিকেটের পরিবেশ বিশ্বে কোথাও নেই। তবুও বলব এখানে লোকেরা বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ে। খেলোয়াড়রাও ওদের ছোঁয়াচে আম্পায়ারদের এমন ভুলে বাধ্য করাতে পারে যাতে এমন কি খেলার ভাগ্যও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।'
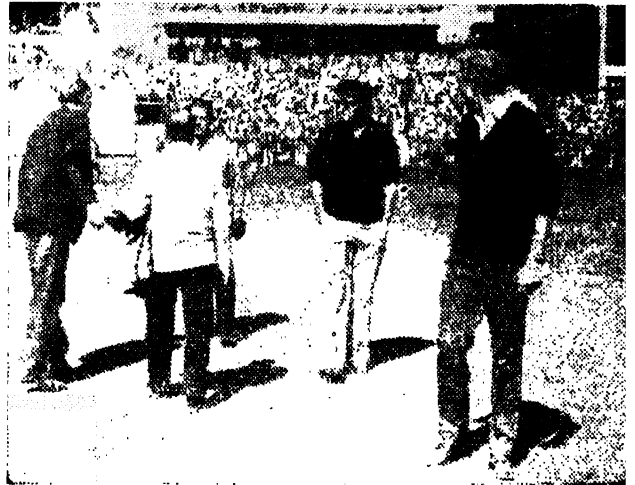
আত্মঘাতী ... লেখছেন সাংবাদিকরা। সঙ্গে ভারতীয় সাংবাদিক

গ্রেগের বক্তব্য সাংবাদিক পিটার লেকার লিখেছেন, 'কলকাতা ক্রিকেট খেলার পক্ষে আদর্শ স্থান। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও নিজেকে মনে করতে পারবে একজন ফিল্ম স্টার। তা সত্ত্বেও এখানে গতবার আমার অন্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভারতীয়েরা যতবার এক রান নিয়েছে ততবারই প্রচণ্ড চীৎকার ফেটে পড়েছে ইডেন থেকে। আমরা যখন ব্যাট করেছি তখনকার ছবিটা অন্যরকম। বল আমাদের ব্যাটস-ম্যানদের ব্যাটের নাগালের পাশ দিয়ে উইকেট কীপারের গ্লাভসে যখনই আশ্রয় নিয়েছে এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ার যতবারই আকাশের দিকে হাত তুলে আউটের আবেদন করেছে ততবারই সারা ইডেন গর্জে উঠেছে। এই পরিবেশে ব্যাটসম্যানদের বুক কেঁপেছে। এবার আমি দলের সবাইকে বলে দিয়েছি নিশ্চিত না হয়ে কেউ যেন ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানদের আউটের আবেদন না করে। আশা করি ভারতীয়দের মনোভাব তাই হবে।'

তথ্যচিত্রের নেপথ্য নাট

ওয়াকিয

'লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন'—এটাই হচ্ছে উত্তরস্বাধীনতাকালের অঘোষিত শ্লোগান। ১৯৬২-৬৩ সালের কথা। চীনের সঙ্গে আমাদের তখন যুদ্ধ চলছে। এক তরুণ চিত্র পরিচালক নিজের পয়সায় একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে বিভিন্ন দপ্তরে ঘোরাঘুরি করছেন ছবিটি বিক্রি করার জন্য। এইভাবে বেশ কয়েক মাস ঘোরাঘুরির পর এল মার্চ মাস। সরকারী বছরের শেষ মাস। পরিচালক তখন সব আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। এমন সময় তাঁর ছবিটি কেনার জন্য এগিয়ে এলেন দুই বিভাগের দুই গৌরীসেন। তাদের কথাবার্তার একটা অংশ এখানে তুলে ধরছি,—

প্রথম গৌরীসেন—'এ ছবিটা আমি কিনব ?'

দ্বিতীয় গৌরীসেন—'না মশাই তা হবে না, এটা আমিই কিনব !'

প্রথম গৌরীসেন—'আহা, বুঝছেন না, মার্চ মাস এসে গেল, বাজেটে ফিল্ম বাবদ যা টাকা ধরা হয়েছিল তার মধ্যে দেড় লক্ষ টাকা এখনো খরচ করে উঠতে পারি নি।'

দ্বিতীয় গৌরীসেন—'আপনার তো দেড় লাখ, আর আমার অবস্থাটা কী তা ভেবে দেখেছেন ? মশাই পনেরো কোটি টাকা এখনো আমি খরচ করতে পারি নি। টাকাটা কি হোস পাইপ দিয়ে গঙ্গাজলের মতো রাস্তায় ছড়াব ?'

একমাত্র এইসব গৌরীসেনদের টাকায়, তথ্যচিত্র নির্মাণ হয়ে থাকে। সিনেমায় 'ধূমপান নিষেধ' আইন জারি হবার পর সিগারেট কোম্পানীদের বিক্রির ঘাটতি পূরণ করার জন্য এগিয়ে এলেন তথ্যচিত্র দপ্তর। হলে যখন তথ্যচিত্র দেখান হয় তখন দর্শকরা একটু সুযোগ পান, বাইরে ধূমপান করার। সে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি, নড়ে, কথা বলে, অভিধানে তাকেই তথ্যচিত্র বলা হয়। সেই জন্য স্বাধীনতার পর থেকে আজ অবধি সত্যিকারের কোন ভাল ডকুমেন্টারি ছবি আমরা পাই নি। এই কলকাতায় বেশ কয়েকজন ভাল তথ্যচিত্র পরিচালক আছেন, যারা ফিল্ম ডিভিশন অথবা অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য উঁচু মানের ছবি করেছেন; কিন্তু তাঁরাই যখন কদাচিৎ গৌরীসেনদের সুনজরে পড়ে ছবি করেন—সে ছবি উঁচু মানের হয় না। কেন জানেন ? গৌরী-সেনদের 'খোদার ওপর খোদগারি' করার পরিণাম।

বেশ কিছুদিন আগে, এক গৌরীসেন রবিবার সকালে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন এক তরুণ পরিচালককে, ছবি করাবার জন্য। তাদের কথা-বার্তার একটা অংশ এখানে তুলে ধরছি—

গৌরীসেন—'আরে বস, বস—সিগারেট আছে নাকি ?' (একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা পরিচালককে ফেরত না দিয়ে সামনের টেবিলে রাখেন) 'কাল অলিম্পিয়াতে একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে, এখনও হ্যাংওভার কাটে নি।' (গৌরীসেনের মেয়ে ঘরে ঢুকল)

মেয়ে—'বাবা এখন তোমার অফিসের গাড়ি তো এল না, মর্নিং শো-এর দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

গৌরীসেন—'দশটায় আসতে বলেছিলাম, একবার গ্যারেজে ফোন করতো।'

মেয়ে—'ফোন করেছিলাম, বেজে যাচ্ছে, কেউ ধরছে না।'

গৌরীসেন—(পরিচালককে উদ্দেশ্য করে) 'তোমার গাড়ী এনেছ না কী ?'

পরিচালক—'না, আমার গাড়িটা সারাতে গ্যারেজে দিয়েছি।' (এখানে চুপি চুপি বলে রাখি, এর আগে এই পরিচালকের গাড়ি, দশ মিনিটের জন্য নিয়ে, টালা থেকে টালিগঞ্জ ঘুরেছেন বেশ কয়েকবার। এবার তাই তিনি গাড়িটা একটু দূরে রেখে, হেঁটে এসেছেন।)

লাল ফিতের মানে হল—'বস্তু আটুনি ফস্কা গেরো।' সেই ফিতার বাঁধন খুলে এই রকম পরিবেশে ভাল তথ্যচিত্র কখনই বেরিয়ে আসতে পারে না। মনে পড়ে একবার বিদেশী একটি কার্টুন ছবি দেখেছিলাম। একটি ছোট্ট রেল স্টেশনে একজোড়া গিনিপিগ-এর বাক্স এসে পৌঁছল। স্টেশন মাস্টার মাশুলের বই খুলে অনেক খুঁজলেন, সেখানে হাতি থেকে পিগের ভাড়া দেওয়া আছে, কিন্তু গিনি-পিগের কোনও উল্লেখ নেই। তিনি তখন ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছে চিঠি লিখলেন। উত্তর না পাওয়া অবধি গিনিপিগ দম্পতিকে নিজের কোয়ার্টারে রেখে দিলেন। উত্তরটা যখন 'প্রপার চ্যানেলের থ্রু দিয়ে ফাইল চালা-চালি হয়ে একশ আটটা দস্তখৎ-এর নামাবলি নিয়ে এসে পৌঁছাল, এদিকে তখন গিনিপিগ দম্পতি মা ষষ্ঠীর কৃপায় অধিক ফলনশীল ধানের মতো বেড়ে প্রায় এখনকার লোক-সংখ্যার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। এই রকম লাল ফিতার বাঁধনে একজন পরিচালকের বিল আটকে আছে বেশ কয়েক মাস। তিনি প্রায়ই এক গৌরীসেনের ঘরে তদবির করতে যান। সেদিনও গেছেন তাঁর ঘরে। কেরাণী দাঁড়িয়ে।

গৌরীসেন—(পরিচালকের উদ্দেশে বস বস ! (কেরাণীটিকে উদ্দেশ্য করে একবার গাড়ি নিয়ে বাড়িতে যান, স্ত্রী ব্যাঙ্ক-এ যাবেন। তারপর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে থেকে নতুন চশমাটা নিয়ে দোকানটা চেনেন ?

কেরাণী—হ্যাঁ স্যার। (প্রস্থান)

গৌরীসেন—(পরিচালককে উদ্দে সিগারেট আছে নাকি ? আপনাদের মাঝে-মধ্যে ভাল সিগারেট খাওয়া হয়

পরিচালক—আমার বিলটা অনে হয়ে গেল—

গৌরীসেন—হ্যাঁ ভাল কথা বিয়ে করছ ?

পরিচালক—কেন বলুন তো ?

গৌরীসেন—না ভাবছি শরী ম্যাজ ম্যাজ করছে, তাহলে বিকেলে অলিম্পিয়ায় বসা যেত।

পরিচালক—চলুন।

গৌরীসেন—(উল্লসিত হয়ে) তা একটু ঘুরে পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটার ম এর মধ্যে আমি তোমার বিলটা কত হল, খোঁজ করছি।

আগেকার জমি দারেরা যেমন খুসি, মেজাজ অনুযায়ী,—কখনও ওঠাতেন, কখনও খ্যামটা নাচের আসর বসাতেন; এ গৌরীসেনরা ঠিক তেমনই মেজাজে চিত্রের বিষয়বস্তু বাছাই করে থাকে এই অর্ধশিক্ষিত দেশে ফিল্ম, জন একমাত্র শক্তিশালী মাধ্যম।

রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি, কোন এ গৌরীসেন, বিখ্যাত বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালক, শিক্ষিত বা ডাক্তার হানস্‌কাকে ডেকে বলছেন, 'বুঝলে 'গ্রামে ফিরে চল' ছবিটা করছেন, দেখাবেন শহরে জল জমার দুর্দ দেখাবেন গ্রামে জল জমছে না। বৃ মাত্রই ধান ক্ষেতে গড়িয়ে চলে অতএব গ্রামে থাকলে বৃষ্টি জলে ব্রেকডাউন হবার কোন আইডিয়াটা কেমন ? এটা আমার আমার বড় মেয়ে বলছিল; তো।'

দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়ে ভাবি— দেশে তথ্যচিত্রের অর্থ খোঁজা

বাংলা বায়োস্কোপে হুণ্ডি

রঞ্জন মজুমদার

…কায়দা ?

…থ মুখুজ্যে, পেশায় যে ফিল্মের …-ম্যান, ভ্রূ-কুঁচকে বললে— … শুটিং করতে গিয়ে মাঝে মাঝে …বেকায়দায় পড়তে হয় জানতে … তাহলে সে গপ্প একদিন বলব …।

…া কটি বলে অনাথ মুখুজ্যে …তে হাত চালাতে লাগল খলনায়ক …চক্কোত্তির মুখে। তাড়াতাড়ি …ছাড়তে হবে। ফেয়্যারে লাইট করা …এখন আর্টিস্ট গিয়ে ক্যামেরার …জিশন দিলেই ডিরেক্টার ভন্দর- …প্রাডিউসারের তড়পানির হাত …াই পান আরকি !

…ল ন'টায় আর্টিস্ট কল্ ছিল, …ছিল অতএব পাক্কা সাড়ে ন'টায় …ক্যাপস্টিক পড়বে। কিন্তু গত …াস—এগারটা পার হয়ে গেছে, …ক পড়ার কোন লক্ষণ নেই। এতে … প্রোডিউসারের মাথা গরম হয় ? …ত কাঁড়িখানেক টাকা দৈনিক ব্যয় …ার, চড়া সুদে হুণ্ডি কেটে …রা এ-টাকা, মশাই এভাবে …া হয় ? বাংলা বায়োস্কোপ ? … যদি আপনারা ডিরেক্টার হয়ে …া করেন তাহলে সত্যি বল্ মা …ড়াই কোথায় ? নাহ্, এই নাকে … বাংলা বায়োস্কোপ নয়, এবার …ন। যে গরু দুধ দেয় তার …া হয়। কিন্তু দুধ দেবে কিনা …ক নেই অথচ মশাই চাঁটের … ত্রিভুবন অন্ধকার—এই বাংলা …প।

…ডিউসার লোকটি আসলে হুণ্ডি- … লোক, ছবি-টবি নয়—সে শুধু …া। বাংলা বায়োস্কোপ কেন … করে তার সাইকো হচ্ছে—কম …গিয়ে কম রিস্ক করে বেশী …ট করা, বেশী মার্জিন তোলা। …এসব চলবে না। সেখানে অনেক …ী, ছবি করতে অনেক বেশী …াপার, অনেক ঝক্কাট। ওখানে … মর্জি বুঝে শুটিং—একেকটা … হতে দু আড়াই বছর না-হ'ক …। অদ্দিন কে টাকা আটকে … তার চেয়ে বাংলা বায়োস্কোপ …ী হতে মোটে চার ছ মাস …কার। টাকা চার থেকে সাড়ে … ঘুষ দিয়ে ছবি রিলিজ করতে …—ছ মাস বাদে সুদে-আসলে …র্ণ। কেউ আটকাবার নেই …ণ্ডিওয়ালার পয়সা মেরে দেবার …-ভারতে কারও নেই। আদায় …। না দিলে তার অন্য ব্যবস্থা …জ ব্যবসাকরে খায় তারা আর যাই হোক—হুণ্ডিওয়ালাকে চটাতে সাহস পায় না।

কলকাতায় ক'জন বায়োস্কোপের হুণ্ডিওয়ালা আছে, আমি জানি। তবে ধরতে কাউকে পারা যায় না। কারণ সবই বেনামা। ধর্মতলা পাড়ায় অফিস খোলার সময় সকাল দশটা সাড়ে দশটা। খদ্দেররা ঘুরে ঘুরে ছবি পছন্দ করে—মফঃস্বলের সিনেমা হলে চালাবে বলে নগদ কড়ি গুণে দিয়ে নিয়ে যায় বা রেলের পার্শেলে পাঠাতে বলে যায়। আর এই একই সঙ্গে ঘরে ঘরে হুণ্ডিওয়ালাদের কর্মচারীদের দেখা যায়—তারা সুদের টাকা কালেকশনে বেরিয়েছে। বিক্রী হওয়া মাত্তর নগদ টাকা হুণ্ডি-ওয়ালার কর্জ শোধে চলে যায়। কেউ টুঁ শব্দ করবে না। অধিকাংশ কালো টাকা। যে দিচ্ছে আর যে নিচ্ছে, প্রায় দু দুজনেরই ওই একই কারবার।

কলকাতার একজন বিখ্যাত অবাঙালী হুণ্ডিওয়ালা একদিন ঠাট্টা করতে করতে এখানকার জনপ্রিয় একজন নায়ককে বলেছিল, কী মশাই আপনার ডেট পাওয়া যাবে ?

নায়ক তখন কলকাতার একটি পশ্ হোটেলে কোন একটি বাংলা ছবির আউটডোর শুটিং করছিলেন। সামান্য হেসে তিনি প্রশ্ন করলেন, কেন, আপনি ছবির প্রোডাকশন করবেন নাকি ? যে ডেটের খোঁজ করছেন ?

জবাবে নায়ক ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন, সেই সঙ্গে সে-ছবির যাবতীয় আর্টিস্ট এবং টেকনিশিয়ানরা—না না আমি আর নিজে ছবি করব না। তবে আপনার ডেট নিয়ে চারিদিকে খুব কাড়াকাড়ি চলছে বলে ভাবলাম বছর তো তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে, তা ডেটগুলো কিনে নিলে কী রকম হয় ? মানে ধরুন, আমি একসঙ্গে এক চেকে সমস্ত ডেট গুলো অ্যাডভান্স বুক করে দিলাম। তারপর যখন যার প্রয়োজন, সে এসে নগদ টাকায় আপনার ডেট কিনে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে—

—ও। কিন্তু তাতে আপনার কী লাভ ?

কেন ? আমি আপনার ডেটগুলো ব্যাকে বিক্রী করব। এক একটা আট ঘন্টার ওয়ার্কিং শিফ্টের জন্যে দশ হাজার টাকা। এমনি এমনি থোড়াই ?

টাকায় কুড়ি পার্সেন্ট অনিবার্য,—এই যদি মান্থলী রেট হয় হুণ্ডির, তাহলে স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে-সব বাংলা ছবি ফ্লপ বলে প্রচার করা হয়, তার একটাও ফ্লপ নয়। কর্জ টাকার সুদ বাদ দিলে মূল লগ্নী এমন বিশেষ কিছু নয়। কলকাতায় চড়া রেটের আর্টিস্ট মাত্র একজনই আছেন এখন। বাদবাকী সবাই অল্প টাকায় অভিনয় করেন। টেকনিশিয়ানরা একটা ছবির মূল বাজেটের আঠারো পার্সেন্ট টাকা পেয়ে থাকেন। তাও অনেক সময় মার যায়। আর স্টুডিও এবং ফিল্ম কিনতে যে টাকা খরচ হয়, সেটা স্টাণ্ডার্ড। ভারতের সর্বত্রই একহারে স্ট্যাণ্ডার্ড বাঁধা আছে। সাড়ে তিন লাখ টাকার নীচে আজকাল আর ছবির নেগেটিভ হচ্ছে না। এতে প্রযোজক যদি ষাট হাজার টাকা খরচ করেন তো বাকি সবটাই আসে এদিক-ওদিক থেকে। তার ওপর লাগছে দেড়লাখ টাকা রিলিজের সময়। এটার বেশীর ভাগ হুণ্ডিওয়ালাদের টাকা। এই থোক্ টাকাটা হুণ্ডিওয়ালারা দেবার জন্যে বসে আছে। কড়ার,—সিনেমা হলের মালিকের কাছে সে-ছবির বিক্রী বাবদ যে টাকা প্রাপ্য হবে প্রযোজকের, সেই টাকা হুণ্ডিওয়ালা সরাসরি নিয়ে যাবে। শর্ত মানা ছাড়া তখন উপায় থাকে না।

হুণ্ডিওয়ালারা অনেকেই আবার সিনেমা হলের মালিক।

হুণ্ডিওয়ালারা নিজেরাই ছবি ডিস্টিবিউটার।

হুণ্ডিওয়ালারা অনেকেই বেনামা প্রযোজক। আবার এমন হুণ্ডিওয়ালাও আছে যে একাধারে সব কিছু। গাছের এবং তলার দুটোই কুড়িয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা তাদের এমন পোক্ত যে বাংলা সিনেমার নাভিশ্বাস উঠছে! নাগাড়ে প্রফিট দেবার ক্ষমতা সব বাংলা ছবির নেই। কিন্তু হিন্দী সিনেমার আছে। ফলে কলকাতার প্রায় সব সিনেমা হল ধীরে ধীরে হিন্দী সিনেমায় সুইচ করছে। নীট রেজাল্ট : বাংলা ছবি রিলিজ দেওয়া দুষ্কর হচ্ছে।

উপযুক্ত ওষুধ-এর ছিল। ব্যাংক। রাষ্ট্রীয়করণের পর এই ব্যাপারে ব্যাংক এগিয়েছিল সামান্য। ব্যাংকের টাকায় তোলা দু একটি ছবি সাংঘাতিক ফ্লপ করার পর ব্যাংকও হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তার জন্যে ব্যাংক-ই বেশী দায়ী। তারা বেছে বেছে সেইসব পরিচালকদের টাকা দিয়েছিল, যাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বেশী আছে। যাঁরা সাধারণ ছিমছাম বাংলা ছবি করার আবার পক্ষপাতী নয়। ওঁরা ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবি পাঠাতে বেশী আগ্রহী। বর্ধমান বা বাঁকুড়ায় তাঁদের ছবি যে একেবারেই অচল—গোড়ায় এটা ব্যাংক খতিয়ে দেখেনি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে।

সেই রকম একজন পরিচালককে প্রশ্ন করা হয়েছিল—এবারও ব্যাংকের টাকায় ছবি করছেন নাকি ?

তিনি মৃদু হেসে জবাব দিয়েছেন—অত ঘন ঘন ব্যাংক ডাকাতি করলে ওটা যে ফেল্ পড়ে যাবে।

চলচ্চিত্র উৎসবের আর একদিক

নির্ম্মল ধর

: ভারতীয় ছবি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

—সত্যজিৎ রায়ের বেশ কয়েকটি ছবি আমি দেখেছি। যদি ওঁর ছবিগুলি ভারতীয় ছবির সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড হয়, তাহলে আমি বলব ভারতীয় ছবি নিশ্চয়ই খুব ভাল।

কোন সাংবাদিক আর পাল্টা কোন প্রশ্ন করেননি উত্তরদাতা কুরোশোয়াকে। নীরবে মুচকি হাসি দেখা গিয়েছিল অনেকেরই মুখে।

জাপানের খ্যাতনামা পরিচালক আকিরো কুরোশোয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজ্ঞান ভবনের 'বি' কমিটি রুমটি সেদিন ভিড়ে ভিড়াক্কার। পাঁচ-ছটি মুভি ক্যামেরা তিনদিকে বসান। উপস্থিত সাংবাদিকরা অনেক কথা শোনার আশায় প্রস্তুত। কিন্তু সব আশার জলাঞ্জলি হোল যখন দেখা গেল দোভাষী ভদ্রলোক ঠিকমত তাঁর কর্তব্য করতে পারছেন না। প্রশ্ন এবং উত্তরের মাঝে হারিয়ে গেল অনেক কথা, এমনকি অনেকবার প্রশ্ন আর উত্তরে কোন মিলই খুঁজে পাওয়া গেল না।

কিউবার তরুণ বিপ্লবী পরিচালক উমবার্তো সোলাসের সঙ্গে সাংবাদিকদের মোলাকাতটিও তেমন সুখকর ছিল না। জনৈকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—'আমাদের দেশ খুবই ছোট, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিও বড় নয়। তবুও আমরা ভিয়েতনাম, চিলি বা অ্যাঙ্গোলায় গিয়ে ছবি করি এই কারণে যে আন্তর্জাতিকতায় আমরা বিশ্বাসী। এবং সর্বোপরি স্বাধীনতাকামী যে কোনো দেশের শোষিতের সংগ্রামে আমরা সামিল হতে চাই।'

সোলাস তিনজই অ্যাঙ্গোলার ওপর দুটি প্রামাণিক চিত্র তৈরী করেছেন, ইচ্ছে আছে আরো একটি কাহিনীচিত্র করার। লাতিন আমেরিকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সোলাস বললেন গ্লোবার রোশাকে (ব্রাজিল) লাতিন আমেরিকা ফিল্মের জনক বলা হয়। কথাটা মিথ্যে নয় তবে রোশাও কিন্তু কিউবা-বিপ্লবের ফসল। সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে ফিল্ম নিয়ে এখন যে আন্দোলন চলছে সেটা কিউবার চলচ্চিত্রের অনুপ্রেরণায়।'

আরও অনেক প্রশ্নোত্তরের মাঝে অনুপযুক্ত দোভাষীর প্রবেশে উত্তরদাতার উত্তরগুলো না তোলাই ভাল। তাতে তাঁকে হয়ত বা ভুল বোঝার অবকাশ থাকতে পারে।

ঐ একই দিনে দেখা হল ইতালীর পরিচালক মাইকেল অ্যাঞ্জেলো আন্তোনিওনির সঙ্গে। দোভাষীর দৌরাত্ম্য অবশ্য ছিল না এখানে। তাই রসিক আন্তোনিওকে কিছুটা কাছের লোক করে নিতে পেরেছিলেন অনেকেই।

আমেরিকার এলিয়া কাজানের সঙ্গে সাংবাদিক-সাক্ষাৎকারটি ছিল সত্যিই উপভোগ্য। যদিও ছবি সম্পর্কে কোন গভীর আলোচনা বা প্রশ্ন ওঠেনি তবু তিনি বেশ ঘরোয়া ভঙ্গিতে সবার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। 'স্ট্রীট কার নেমড ডিজায়ার'; 'আমেরিকা - আমেরিকা'; 'এ
বুকলিন' খ্যাত পরিচালক এ
বললেন— 'সেন্সর ব্যাপারটা ও
বারেই পছন্দ নয়। বড় বড়
রোমান ক্যাথলিক চার্চ এবং নি
শরাতে এত কাটছাঁটি করি
সেন্সরের কাঁচির মুখে যেতে
না।'

তিনি আপাততঃ 'আমেরি
দ্বিতীয় পর্বটি করার কথা ভা
সেই সঙ্গে চলছে নতুন বই লে
কি লিখছেন জিজ্ঞেস করায়
'বলে ফেললে আর লিখতে
সুতরাং এখন সিক্রেটই নট।'

আর্জেন্টিনার পরিচালক
ভেরা; কানাডার ফিল্ম
করপোরেশনের ডিরেক্টর মাইকে
অভিনেত্রী সিলিন লোমেজ
ফিল্ম বোর্ডের ডেনিস ন্যাডেন
পরিচালক সের্জে নিকোলাস্কি
পরিচালক কুর্ট প্লুবে ও
চেক চিত্র-প্রযোজক যোসেফ
পরিচালক তোমাস ফেরিস;
শিল্পী প্লাস্টিচি; হাঙ্গেরীর
পিটার বাকসো; আমেরিকান
অ্যালেন রানস্টিন (অ্যালিস
যিনি এবার সেরা ছবির
পুরস্কারে সম্মানি ত); ডেরে
সিসিল টাইসন আর্ল জোন্স
বব্ শা; রুশ অভিনেত্রী দি
রোভা; শ্রীলঙ্কার অমরনাথ
মালিনী ফোনসেকা প্রমুখ বিদে
প্রায় সকলেই ভারতীয় ছবি
প্রশংসা করে স্ব-স্ব দেশে ছ
আশা প্রকাশ করেছেন।

যুগোশ্লাভিয়া অবশ্য
থেকেই বাছাই করে পাঁচটি
ছবি ইতিমধ্যে কিনে নিয়েছে
রায়ের আটখানি; দক্ষিণ ভার
এবং বাকি ছবি হিন্দী। এ
সম্মেলনে যুগোশ্লাভ ফিল্মে
জানালেন— 'যুগোশ্লাভ স
নিয়েছেন যে গোষ্ঠি নিরপেক্ষ
সঙ্গে তাঁরা এখন সরাসরি
এবং সেই সিদ্ধান্তের ফলেই
এতগুলি ভারতীয় ছবি আমর
পরবর্তী বছরে আরও বেশী
আছে।'

ব্যবসায়িক সাফল্যে এ
নিশ্চয়ই অনেক বেশী উল্লেখ
শহরের বারোটি প্রেক্ষাগৃহে
বেশী ছবি চালিয়ে যে লা
সেটি বাদ দিলেও রাশিয়া লে

ব্রেজিলের ছবি ডেভাশি কুয়েল

কিছু দেশে প্রচুর ভারতীয় ছবি বিক্রী হয়েছে। তুলনায় ভারতই বোধহয় ছবি কিনেছে কম।

দু-একদিন পরেই ইম্পেক (ভারতীয় চলচ্চিত্র আমদানী সংস্থা) এর সভাপতি মিঃ কুকা বিশদ তালিকা নাকি পেশ করবেন।

বিদেশী অভ্যাগতের ভিড় নামীদামী চলচ্চিত্রকারদের উপস্থিতি এবারের উৎসবকে জমিয়ে দিয়েছে বটে। ইতিপূর্বে এমন চোখধাঁধানো ব্যাপার চোখে পড়েনি। এবং সেইদিক থেকে ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পরিচালক আনন্দকুমার ভার্গবকে ধন্যবাদ। তাঁদের যত্নআত্তিতেও কোনো ত্রুটি ছিল না। আন্তর্জাতিক প্রযোজক সংস্থার (ফিয়াপ) সভাপতি মিঃ রি'স সস্ত্রীক দিন-দশেক ছিলেন এখানে স্বচক্ষেই সবকিছু দেখে গেছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কর্তৃপক্ষ তাঁকে একবারও সাংবাদিকদের সামনে হাজির করলেন না। কেন তা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। প্রতিযোগিতা বিভাগের পাঁচিশটি কাহিনীচিত্রের মধ্যে সাতটি এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবির প্রায় বেশীর ভাগই সাংবাদিকদের দেখানো হয়নি—এখবরটা কি মিঃ রি'স নিয়ে গেছেন প্যারিসে? কোন আন্তর্জাতিক উৎসব প্রতিযোগিতা বিভাগের সব ছবিগুলিও সাংবাদিকদের দেখান হয়নি—এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা জানি না।

উৎসবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল তিনদিনব্যাপী আলোচনা সভা। আলোচনার এক নম্বর বিষয় ছিল—'চলচ্চিত্র কারের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ছবি বা সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ ছবি।'

এই ধরনের আলোচনা সভায় সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে অর্থাৎ নিষ্ফলা বাক্য-বিন্যাস তার ঘাটতি ছিল না মোটেই। সরকারী পক্ষের এফ এফ সি-র সভাপতি জগদীশ পারেখ এবং এন ভি কে মূর্তি সংস্থার কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করে 'ভালো ছবিকে অর্থলগ্নী করার খোলাখুলি আলোচনা করেন।

সরকারী লাইসেন্সিংয়ের ফাঁস অযোগ্য লোকের খবরদারি ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে চলচ্চিত্রকার সুখদেব কুমার সাহনি বক্তব্য রাখেন। বাসু ভট্টাচার্য ও অস্ট্রেলিয়ার জন হ্যুজ চলচ্চিত্রকারের সামাজিক দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন—সেন্সরশিপ রাজনৈতিক অবস্থা এবং সর্বোপরি ফিল্ম জগতের আর্থিক কাঠামোই অনেক সময় এই ধরনের ছবি করায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় পরিচালকদের কাছে।

আলোচনা সভার দ্বিতীয় দিনে দিলীপ কুমার সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রমোদ করের বোঝা হালকা করার অনুরোধ জানিয়ে ভারতীয় ছবির যে অর্থনৈতিক চিত্রটি তুলে ধরলেন তা রীতিমত ভয়ানক। ফিল্ম কো-অপারেটিভ; বোল মিঃমিঃ; ব্যাপকহারে ছবি করার পক্ষ সমর্থন করে জগৎ মুরারী; এন ভি কে মূর্তি বক্তব্য রাখেন। কিন্তু অপরাপর বক্তারা প্রায় সকলেই ছবি মুক্তির গ্যারান্টির প্রসঙ্গ তুললে আলোচনা অন্যদিকে মোড় নেয়। ফ্রান্সের এম নিক্সা ইংল্যান্ডের জন গিলেট; আমেরিকার রে কিশার; চেকোশ্লোভাকিয়ার মিঃ ব্রোসিক; ভারতের এস কৃষ্ণস্বামী; কান্তিলাল রাঠোর; জগমোহন; নরেশ চন্দ্র; সতীশ বাহাদুর বিভিন্ন দিনের সভাপতি অশোক মিত্র; ভি কে নারায়ণ প্রমুখ প্রত্যেকেই আলোচনায় বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন দিক থেকে আলোকপাত করেন। নরম সভা কখনও কখনও তাই গরম হয়ে ওঠে। তবে গতবারের মত বিস্ফোরণ ঘটেনি।

কয়েকশ পাতা এই আলোচনার পর সরকারী প্রচেষ্টায় কিংবা মুনাফাবাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তোলা ছবিগুলির চরিত্রগত কোন পরিবর্তন হয় কিনা—সেটাই লক্ষ্যণীয়। কারণ আগে এমন সভাসমিতি প্রচুর হয়েছে বিভিন্ন সরকারী কমিটির রিপোর্ট সরকারী মহাফেজখানায় সযত্নে রক্ষিত আছে। তাদের প্রস্তাব কটি কার্যকরী হয়েছে চলচ্চিত্রজগতের লোকেরা ভালো করেই জানেন। সুতরাং এই আলোচনা সভার রিপোর্টে বাড়তি কি কাজ হবে তার অপেক্ষায় থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এক বয়সে শিল্পী অবহেলার শিকারঃ তরুণকান্তি ঘোষ

গত ১১ জানুয়ারি সারকারিনা মঞ্চে তুষার যুগ আসছে নাটকের শততম রজনীর স্মারক উৎসব উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে তথ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি রূপে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ উপস্থিত থাকেন। সারকিনা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাঁদের প্রতিটি কর্মচারী ও শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার দেন যথাক্রমে শ্রীমতী ঘোষ স্বরাষ্ট্র (পুলিশ মন্ত্রীর স্ত্রী) এবং তথ্যমন্ত্রীর স্ত্রী।

শিল্পীদের স্বীকৃতি দানের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের সকল শ্রেণীর কর্মচারীকে পুরস্কৃত করার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন, এই ব্যাপারটি আমার খুব ভাল লেগেছে।

ঘরোয়া মেজাজে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, কার্যোপলক্ষে আমি গোটা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি। সর্বত্রই বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং এ দেশের শিল্পীদের সম্বন্ধে জনগণের উচ্চ ধারনা লক্ষ্য করেছি। এটা বাঙালী হিসেবে নিশ্চয় আমাদের গৌরব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই বাংলা দেশেই শিল্পীরা স্বীকৃতি পাবার পরও একটা বয়সে পৌঁছে অবহেলা ও দারিদ্রতার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হন।

তিনি কথা প্রসঙ্গে উপস্থিত অতিথি শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীমতী অমলাশঙ্কর ও বর্ষীয়ান শিল্পী হরিধন মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, এঁর মধ্যে অনেকেই আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের বন্ধু এবং খ্যাতনামা ব্যক্তি। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে এঁরা অনেক কিছুই দিয়েছেন। কিন্তু তার বিনিময়ে আমরা তাঁদের কি দিয়েছি। তাই এঁদের সম্মানিত করা, এঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। সুখের বিষয় আমার ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীমান সুব্রত এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই সরকারী তরফে কিছু কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। যার ফলে যাত্রা শিল্প থেকে প্রায় সবক্ষেত্রেই শিল্পী ও কলাকুশলীরা বহুলাংশে উপকৃত হয়েছে। আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে আমার ছোট ভাইটির প্রতি। তাঁর স্ব ভবিষ্যতে সকল শ্রেণীর কর্মী ও শিল্প রাই উপকৃত এবং স্থায়ী নিরাপ আশ্বাস পাবেনই।

সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে প্রথ শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ঘো প্রতি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, আজেই আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা স্বরা (পুলিশ) মন্ত্রী তরুণদার কাছে শিল্প দের ভবিষ্যত নিরাপত্তার জন্য একটা প্রস্ রেখেছি। আমার সেই প্রস্তাবে বলা হয়ে দুস্থ শিল্পী, কলাকুশলী ও সাহিত সাংবাদিকদের সাহায্যের জন্য দশ লক্ষ টা একটা ফান্ড গড়ে তোলা হবে। এই টাব তোলার জন্য প্রতিটি ক্রিকেট ও ফুট ম্যাচের ওপর পাঁচ থেকে দশ পয়সার (কর) ধার্য করার প্রস্তাবও আছে।

প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ব আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আ দাদা বিষয়টির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবে

শ্রীঅমর ঘোষ সবাকারিণার তর সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পরে 'তুষার যুগ আসছে' অভিন হয়।

লায়লা মজনুঃ একালের দর্পণে

শ্যামল চক্রবর্ত

'লায়লা মজনু'—এই অমর প্রেমকাহিনী বহু বছর আগের এবং সর্বজনবিদিত। নতুন করে এ সম্পর্কে কিছু বলার নেই। আরব দেশের ওমান রাজ্যের এই মুসলীম প্রেম কাহিনী দেশ কালের ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে সারা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু বলার বিষয় হল, মূল প্রেম কাহিনীটি ক্রমে ক্রমে হারিয়ে গিয়ে বর্তমানে রূপ নিয়েছে এক গীতি-আলেখ্যে। 'লায়লা মজনু' নিয়ে এদেশে আরো ছবি হয়েছে, সেই নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগের বর্তমান ছবিটিসহ। সব ছবিতেই ধীরে ধীরে মূল তথ্যবহুল কাহিনীটি ভিন্ন রূপ নিয়েছে, এবং মানবীয় প্রেম-কাহিনী ক্রমেই অলৌকিক পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। আলোচ্য ছবিটি সম্পর্কে একই বক্তব্য।

চিত্র পরিচালক এইচ এস রাওয়েলের স্ত্রী শ্রীমতী অঞ্জনা রাওয়েল এই ছবিটির কাহিনীর বিন্যাস ঘটিয়েছেন। তিনি এবং পরিচালক রাওয়েল বর্তমান 'লায়লা মজনু' ছবিটিকে মূল প্রেম কাহিনী থেকে সরিয়ে পুরোপুরি একটি সঙ্গীত আলেখ্য হিসাবে পর্দায় উপস্থিত করেছেন। অথচ, কিছুতেই ভাবতে পারছি না 'লায়লা ও মজনু' যে সময়কালের সেই সময়ে আজকের এই আধুনিক হিন্দী গানের কলগুলো ছিল, কিম্বা লায়লা ও কয়েস গান গেয়ে এরকম অলৌকিক কাণ্ড করতো! এছাড়া, পোশাক নিয়েও অনেক কথা বলা যায়। কিম্বা, কয়েস লায়লাকে আধুনিক কাগজে লিখে চিঠি দিচ্ছে—এও কি সম্ভব বলে ধরে নিতে হবে?

'লায়লা মজনু' ছবির ডায়লগ আবরার আলভি লিখেছেন। লিখেছেন চোস্ত উর্দু ও ফরাসী শব্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। কিন্তু গানের সুর ও ভাষা হয়ে গেল হিন্দীতে, সঙ্গে সামান্য কিছু উর্দু শব্দের সাহায্য নিয়ে। রাওয়েল সাহেব এসব নিয়ে ভাববার সময় বোধ হয় পান নি। আসলে, এ ধর পুরোনো প্রেমকাহিনী নিয়ে ছবি কর গেলে যে অনুশীলন ও গবেষণার প্রয়োজন এদেশের পরিচালকরা করেন না। অথ কিছুদিন আগে আমরা রোমিও জুলি দেখেছিলাম—কী অসাধারণ ছবিই না ছিল! আসল কথা—ছবি তৈরীর ব্যাপ আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

অভিনয়ে মজনু বা কয়েসের ভূমি ঋষি কাপুর চিত্রনাট্য অনুযায়ী ভাল অ করেছেন। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় জর্জ ভাবটি তাঁর অভিনয়ে সুন্দর ফুটে উঠে লায়লার ভূমিকায় নবাগতা রঞ্জিতার অ নয় বিস্ময়কর। মনেই হয়নি, এই তার প্র অভিনয়। লায়লার ভাই পারভেজের ভূমি রঞ্জিত এবং লায়লার বিবাহিত স্ব ভূমিকায় ড্যানীর অভিনয় মনে দাগ কা এছাড়া ইফতিকার, আশারাণী, অরুণা ইরা অচলা সচদেব, টৈপেটোল, প্রীতি গাঙ্গ অভিনয় যথাযথ। সংগীত পরিচা স্বর্গত মদনমোহন চিত্র পরিচালকের অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত পরিচা স্বাক্ষর রেখেছেন। গানগুলি গেয়েছেন ও রফি। ছবিটির শিল্পকর্মে সুধেন্দু যত্ন করে আরবদেশের বিশ্বাস্য ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও ক্যামেরা রঙের ব্যবহার তার প্রতি সুবিচার করে এই যা দুঃখ।

জবংশ
কমন ছবি ?

পরিচালক পীযূষ বসু মোটা দাগের
। কাজে ইদানিং বেশ মুন্সিয়ানা
চছেন। যুক্তিহীন কাহিনী—ঘন নাটক
শন ও হৃদয়বেগের যোগাযোগে দর্শ-
চোখের সামনে একটা ধোঁয়াটে পরি-
সৃষ্টি করে তাৎক্ষণিক যৌক্তিকতা
উপস্থিত হয়। পীযূষ বসু কোন-
প্রিটেনশনের ধার ধারেন না। গরিষ্ঠ
কর মন জয় করার ইচ্ছেটাই ওর
। এই প্রবল ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যোগ
ছেন—উত্তম প্রতিভা। রাজবংশ ছবিটি
র কথারই প্রতিধ্বনি করছে।

এ ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য
রবায়ে। কাহিনীর ময়নামতী রাজ-
ঠিক কোথায়—সেটা পরিস্কার করে
দেওয়া হয় নি। প্রথম দৃশ্যের পর
প্রতাপনারায়ণ (উত্তমকুমার) চলন্ত
বসে ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে কাহিনী
শুরু করেন। ময়নামতী রাজস্টেটের
ভৈরবনারায়ণ ছিলেন নারীলোভী
চরিত্রের লোক। যুবতী মেয়ে-
দের শরীরে ছিল তার প্রমত্ত নেশা।
নেশারই শিকার হলেন প্রতাপনারা-
মা, ভৈরবনারায়ণের স্ত্রীর অন্তরঙ্গ
ী পটলা। প্রতাপ সেই পটলের গর্ভে
নারায়ণের ঔরসজাত সন্তান। অবৈধ
প্রতাপকে নিয়ে পটলা শেষপর্যন্ত
দায়ে ময়নামতী ছেড়ে কলকাতায়
আসে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখিয়ে
কে বড় করলো। দীর্ঘদিনের অর্থকষ্ট
টানাপোড়েনে পটলা এক সময় অসুস্থ
বিছানা নিল এবং মৃত্যুশয্যায়
কে বলে গেল—জোর করে যেন
তী স্টেটের অংশ ও বৈধ সম্মান
করে নেয়।

প্রতাপনারায়ণ এবার ময়নামতীতে
বৃদ্ধ ভৈরবনারায়ণের কাছে
পরিচয় দিয়ে রাজার ছেলের বৈধ
চায়। কিন্তু সে তা পায়নি, রাজ-
শুধু থাকার অধিকারটুকু পায়।
সন্তুষ্ট নয়, তাই জোর করে দাবী
তৎপর হয়। প্রতাপের এই ইচ্ছায়
গী হন রাজবাড়ির ডাকতার। কারণ
বেদ স্ত্রী বহুদিন আগে ঐ ভৈরব-
ণের লোভের শিকার হয়ে আত্মহত্যা
বাধ্য হয়েছিলেন। ডাকতার তাই
াধ নিতে চান এবং এই সহযোগি-
পরিবর্তে প্রতাপকে ডাকতারের মেয়ে
কে বিয়ে করতে হবে। প্রতাপ রাজী
তারপর ক্রমে ক্রমে ডাকতারের সহ-
ায় প্রতাপ প্রথমে টিটেনাশ ব্যাক-
দিয়ে ভৈরবনারায়ণেকে খুন করে
সম্পত্তি পুরোপুরি পাবার লোভে
তীর ছোট রাজকুমার রাজনারায়ণকেও
বিষ দিয়ে হত্যা করে। এবার নিষ্ক-
প্রতাপ—ময়নামতী স্টেটের অধি-

সব্যসাচী ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী

কর্তা। কিন্তু প্রতাপের চরিত্রের এই
রূপনা প্রতিহিংসার রূপ দেখে ওর স্ত্রী
শিবানী ওকে ছেড়ে চলে গেল, শ্বশুর
ডাক্তার আত্মহত্যা করলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত
করার জন্য। প্রতাপ দীর্ঘ প্রতিহিংসার
খেলার শেষে পুলিশের কাছে ধরা দিল
এবং দীর্ঘদিন জেল খেটে মুক্তি পেয়ে
ফিরে আসার সময়ে চলন্ত ট্রেনে বসে
ফেলে আসা কৃতকর্মের জন্য ভাবিত।
এবার ফ্ল্যাশ ফরোয়াড-অনুগতি, ট্রেন
দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে।

পরিচালক ছবিটির চিত্রনাট্য এমন

নাটকীয় মুহূর্তের ঠাসবুনুনিতে সাজিয়েছেন—যে চোদ্দ রীলের ছবি দেখতে বসে সময়কে ধরে রাখা যায় না।

অভিনয়ে উত্তমকুমার এই ছবিতে তিনটি বিভিন্ন বয়েসের চরিত্রে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। বৃদ্ধ ভৈরবনারায়ণের ভূমিকায় উত্তমকুমারের অভিনয়ের ব্যক্তিত্বটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য নীয়। এই চরিত্রের মেক-আপ হয়েছে নিখুঁত। ডাকতারের ভূমিকায় বহু দিন পর বিকাশ রায়ের উজ্জ্বল অভিনয় মনে দাগ কাটে। একইভাবে নীলিমা দাসের পটলা। দিলীপ রায়ের রাজনারায়ণ উল্লেখ করার মত আরতি ভটটাচার্য ও প্রেমানারায়ণ—অভিনয়ের খুব বেশী সুযোগ পাননি, তথাপি স্বল্প সুযোগের সদব্যবহার তাঁরা করেছেন। এ-ছাড়া তরুণকুমার, ছায়াদেবী ও স্বপনকুমার ভাল অভিনয় করেছেন।

ছবির অপর আকর্ষণ ...ীত। শ্যামল মিত্র সঙ্গীত পরিচালক এবং ... নের সুর সিচ্যু... অনুযায়ী সুন্দর।

কলা... ...র কাজে প্রথমেই শিল্প-নির্দেশনায় ...র্য চ্যাটার্জীর নাম করতে হয়। স্টুডিও নির্মিত সেটগুলি বিশ্বাস্য হয়ে উপস্থিত। চিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা ও শব্দ ধারন প্রশংসনীয়—ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার পক্ষে এ'দের কাজ যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

আপবীতি গতানুগতিক

পঞ্চাশ এবং ষাট সালের বম্বের সামাজিক ছবিগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তখনকার ছবির কাহিনীতে বাস্তবতার অভাব ছিল না। কেবল আঙ্গিকের দিক থেকে দুর্বল ছিল। এখনকার ছবিতে কাহিনী বলতে কোন কিছু সারবস্তু থাকে না। দেখা যায় একই কাহিনীকে কেন্দ্র করে একাধিক ছবি নির্মিত হচ্ছে অর্থাৎ নতুন বোতলে পুরনো মদ। এসব ছবির মূল বকতব্য—বস্তাপচা গল্প এবং দর্শকদের মনে সস্তা সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি করা। এ ছবির শেষ দৃশ্যে যে ঘটনা উপস্থিত ক...রে দর্শকদের সমবেদনা ... করতে চেয়েছিলেন পরিচালক। সে ... ব্যর্থ হয়েছে।

প্রযোজক ও পরিচালক মোহনকু... ছবিতে অতি-নাটকীয় ঘটনাবলীর ... দিয়ে ছবিকে অযথা দীর্ঘ করেছেন। স... তিকালে মোহন সেগল একই কাহিনী ভিত্তিক আউলাদ ও সন্তান ছবির প... চালনা করেছেন, সেদিক থেকে কাহিনী দৈন্যতাই সবচেয়ে পীড়াদায়ক। অভিন... —অশোককুমার (বাবা); নিরুপা ... (মা) হেমা (সীতা) শশী (রণজিৎ) ... বরি ছবির অনুপ্রেরিত বাহাদুর চরি... প্রেমনাথ বেশ সাবলীল। সুজিতকু... অরু..., আসরানী, মদনপুরী, কুল... কোমিলা, কিক প্রভৃতি দুর্বল চিত্রনাট... শিকার হয়েছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে ... এইচ কাপাদিয়া এবং শিল্প নির্দেশ... সুধেন্দু রায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দি... ছেন। সম্পাদক প্রতাপ ভট্ট একা... শ্লথগতি সম্পন্ন দৃশ্য আরও নির্মম ... পারতেন। লক্ষীকান্ত প্যারেলালের স... পরিচালনা গতানুগতিক, সব মিলিয়ে ব... চলে—একটি রমণীয় ছবিকে অংকু... বিনষ্ট করা হয়েছে।

বাংলা ছবির দর্শক কারা ? কোন বয়সের লোক ?

অসিতবরণ মিত্র

বাংলা চলচ্চিত্রের বক্স-অফিস হিট করা বা না-করা নির্ভর করে কাদের ওপর ? কারা আমাদের ছবির নিয়মিত বা অনিয়মিত দর্শক ? এই নিয়ে ভাবনা-চিন্তার শেষ নেই।

সাধারণভাবে বাংলা ছবিতে এখনও মাঝারিয়ানার জয়জয়কার। মাঝারি রুচিসম্পন্ন, মাঝারি বয়স্ক এবং মধ্যবিত্ত—এ'রাই বা... ছবির পৃষ্ঠপোষক। আর সবচেয়ে বেশি করে আছেন ...হপরবশ মায়েরা। যে-কোন মানের ছবিই হোক, সবচেয়ে আগে ভর্তি হয় লেডিজ ক্লাস। সামাজিক ছবিই এ'দের প্রিয়, তবে ভাল কাহিনী ও মনোমত নায়ক-নায়িকা হওয়া চাই।

শ্রমজীবী মানুষ ...রুচি বা মানের তোয়াক্কা না করে তাৎক্ষণিক আনন্দ পেতে চান, তাঁদের কাছে বাংলা ছবি যেন ক্যানভাসের ওপর আঁকা সমুদ্রের বুকে থমকে থাকা জাহাজ। আবার সত্যিকারের রুচিসম্পন্ন লোকের চোখে বাংলা ছবির আঙ্গিকের দীনতা বড্ড প্রকট। আর এও তো অস্বীকার করা যায় না আজও বাংলা ছবি (নাকি বই ?) সাহিত্যের আঁচলধরা। শিল্পগত গুণসম্পন্ন ছবির থেকে এখনও কাহিনী ও নায়ক-নায়িকার অভিনয়সমৃদ্ধ ছবির বেশি কদর।

তারুণ্যের জোয়ার এখন হয় ফিল্ম ক্লাবে, নয় হিন্দী সিনেমার বুকিং কাউণ্টারে আছড়ে পড়ছে। এদের কাছে বাংলা ছবি মানে সেই একঘেয়ে প্যানপ্যানানি। একটা বড় দল, 'গুরু'-কে দেখতে যারা বারবার ছোটে, তারাও কমে আসছে।

...বাংলার ...চিত্র জগতে এমন ...জন আছেন যাঁর ছবি শুধু দেশে না, বিদেশেও বিশে... সমাদৃত। এরা সকলেই বাংলা ছবির দর্শক একথা বললে নিশ্চয় ... হবে না। তবে সত্যজিৎ রায়কে বাদ দিয়ে যে বাংলা ... তার দর্শক কারা এটাই ভাবা শেষে।

বাংলা ছবি স্বাভাবিকভাবেই বাঙা...দের ... কিন্তু এই প্রদেশে বসবাসকারী কিছু ...বাঙালীও আ... যাঁরা আমাদের ছবিতে আগ্রহী। ... কাহিনী অবল... নির্মিত ছবিগুলি এ'দের প্রিয়। এখানেও সেই কাহি... আকর্ষণ।

আমার কথা, আমাদের এমন কিছু দর্শক ... যারা ভাল ছবির বরাবরই কদর করে। চলচ্চিত্রকে ... কেবলমাত্র প্রমোদ উপকরণ হিসাবে দেখতে নারাজ। সাহিত্যের মত ভাল চলচ্চিত্রেরও এদের কাছে ... খাতির। অপরদিকে আরও একদল সেই পুরনো ... রয়ে গেছে। ফলে বর্তমান বাংলা ছবির দর্শক ... মিশ্র প্রকৃতির। আর প্রকৃতিকে বুঝতে গিয়ে প্রযো... হিমসিম খাচ্ছেন।

কলকাতা ও মফঃস্বলের কয়েকটি হলে অনু... করে বাংলা ছবির দর্শকদের মোটামুটি একটা বয়সের ... পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়, দর্শকদের বেশির ... প্রাপ্তবয়স্ক। এদের ভেতর আবার মহিলারাই ... অধিক। বর্তমান কর্মব্যস্ততার যুগে পরিবারের স... নিয়ে সিনেমা দেখা কারুরই খুব একটা হয়ে ওঠে না। মহিলারাও বসে থাকে না। পাড়ায় পাড়ায় সিনেম... হওয়াতে তারা নিজেরাই ছোটে নুন অথবা ম্যাটিনী ... অল্পবয়সীরা, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরাও ভিড় কর... দৃষ্টি খোতে।

অমৃত পাবলিশার্স ... শ্রীস... ...কার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে ... ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

বলুন
এস.সি.ডি
অমনি
একটি স্টেশন খুলে যাবে

আমাদের স্ট্রীট কলেকশন এ্যাণ্ড ডেলিভারি সার্ভিসকে ডাকুন, দেখবেন, আপনার বাড়িতে মালের একটি বুকিং স্টেশন খুলে গিয়েছে। সেখানে আপনার মালপত্র 'বুক' ক'রে তক্ষুনি রেলওয়ে রসিদ দেওয়া হবে। যদি প্রেরককে বলে দেন তাহ'লে বাইরে থেকে পাঠানো মালপত্রও আপনার দোরগোড়াতেই আপনি পেতে পারেন।

নীচের যে কোন একটি নম্বর ধরুন; দেখবেন, কত তাড়াতাড়ি আপনার মাল পাঠানোর সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

স্ট্রীট কলেকশন এ্যাণ্ড ডেলিভারি সার্ভিস-এর জন্য

৩৪-৮৩৬৭ ট্রান্সপোর্ট ট্রেডিং কর্পোরেশন
পি ৩ নিউ সি.আই.টি. রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

গুড্স বুকিং অফিস: ১২৮ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৭

৬৬-৪০৭৭ চীফ পার্শেল এ্যাণ্ড লাগেজ ইনস্পেক্টর, হাওড়া

৬৬-৩৩৫৬ গুডস্ ইনস্পেক্টর, হাওড়া

৩৫-১২১১ চীফ লাগেজ ইনস্পেক্টর, শিয়ালদহ
গুডস সুপারভাইজার, শিয়ালদহ

২৩-০২১১ এস-সি-৩, মার্কেটিং এ্যাণ্ড সেল্স্
৩ কয়লাঘাট ষ্ট্রীট, কলকাতা-১

মাল খালাসের সময়: সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা
মাল তুলবার সময় : সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টা

কনটেইনার-এর জন্য

৬৬ ৫১৭৮ কনটেইনার টার্মিনাল, হাওড়া
২৩ ০২১১ এস-সি-৩, মার্কেটিং এ্যাণ্ড সেল্স্
৩ কয়লাঘাট ষ্ট্রীট, কলকাতা-১

medium

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 4th February, 1977 শুক্রবার ২১ মাঘ, ১৩৮৩

১৬ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃত

১ সম্পাদকীয়
৫ লিটল ম্যাগাজিন : কিছু ছাড়া ছাড়া ভাবনা দিগ্বিজয় দিকপতি
৬ ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা
৭ কবি পরিচিতি শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়
সবার প্রথম শারেন্দু শ্রীশচীন দাশ
৮ যাট দশক কবিতায় একটি দশক
৯ সাহিত্য বৈকুণ্ঠ পাঠক
১১ লিখছি না। কারণ : দ্বিতীয় পর্ব
: সন্তোষকুমার ঘোষ শাণ্ডিল্য
১২। যদিও ইন্দ্রিয় সুখভোগ। তবু সুখ নেই গৌতম ঘোষ
১৩ প্রাসঙ্গিক
১৬ চিঠি
১৫ আপনজনেরা (উপন্যাস) শ্রীদীপালী দত্তরায়
১৯ অরবিন্দ ঘোষ শ্রীমনোরঞ্জন বসু
২২ বুদ্ধদেব বসু ও কলকাতার একটি রাস্তা শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার
২৪ বীরপুরুষ (গল্প) শ্রীবিজনকুমার ঘোষ
২৮ কারিগর (গল্প) শ্রীমনোজিৎ মিত্র
৩২ কিছু বাঙালী নির্যাতিত ছবি কেনেন : লেডি রাণু
শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩৩ আঙিনায় কালের চাষ শ্রীসন্তোষ রায়চৌধুরী
৩৪ ব্লু ফিল্ম (রহস্য উপন্যাস) শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
৩৮ মোহিনী আটম (উপন্যাস) শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি

আজকের সূচী

৪৪ কুম্ভমেলার চিঠি শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
৪৭ বাউল মেলায় শ্রীগৌতম ভট্টাচার্য
৪৮ ফাঁকা স্টেডিয়ামে সন্তোষ ট্রফি শ্রীরূপক সাহা
৪৯ জাতীয় ফুটবলে পাহাড়ীদের চমক
৫০ চোরের মায়ের বড় গলা! শ্রীঅজয় বসু
৫২ নাচ গান বাজনা
আমীর খাঁ...ছয় ঋতু জয়ন্তী সদাগর
যুগলবন্দী : আলী আকবর ও
বিলায়েত শ্রীসন্ধ্যা সেন
৫৭ দিল্লী উৎসবের উপযুক্ত নয় : সত্যজিৎ রায়
শ্রীনির্মল ধর
৫৯ গোদার মাত্র একজনই শ্রীপ্রণয় শূর
৬০ বাঙালী শওলাদার দাঁতে কাহিনী নেয় শ্রীঅঞ্জন মজুমদার
৬২ পীযূষ বসুর সব্যসাচী—শরৎচন্দ্রের নয় শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী

প্রচ্ছদের ছবি
প্রশান্ত বসু

অঙ্গ সজ্জা
সুবোধ দাশগুপ্ত
গৌতম রায়

সব পটুয়ারই দুটো
করে নাম
সচিত্র আলোচনা
গৌরচন্দ্র সাহা

আগামী সংখ্যায়

শংকর চট্টোপাধ্যায়ের
তিনটি কবিতা
সত্যেন্দ্র আচার্য
অমিতাভ চক্রবর্তীর গল্প
শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে
মনোরঞ্জন বসু
চোয়াড় বিদ্রোহে
কর্ণগড়ের রাণী
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

শংকর চট্টোপাধ্যায়

প্রয়াত কবি

বই পড়া ও
পড়ার বই

আজকাল বই সম্বন্ধে সচেতনতা বোধহয় কিছুটা বেড়েছে। এবং বইয়ের ব্যাপারে এই কৌতূহলকে ব্যাপকতর করে তোলার চেষ্টাও বাড়ছে।

পূজোর সময় এখন অনেক উৎসব প্রাঙ্গণের পাশেই বইয়ের দোকান চোখে পড়ে। সারা কলকাতা শহরে ফুটপাতে বইয়ের দোকান তো অজস্র। নিশ্চয়ই কেউ কেউ এসব বই কিনেও থাকেন, না হলে কে আ বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত ভবানী পাঠকের মতো দোকান সাজিয়ে বসে থাকেন!

বই সম্বন্ধে এই আগ্রহের পরিচয় মেলাগুলিতেও পাওয়া যাচছে এখন কলকাতায়। প্রায় সব মেলাতেই একাধিক বইয়ের দোকান থাকে। এবং সে সব প্রয়াসের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। ফলে স্বীকার করতে হবে, আজকের জীবনযাত্রায় বইয়ের আবশ্যকতা বিষয়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়পক্ষই সচেতনতা অর্জন করেছেন।

কিন্তু একটি কথা। বইয়ের বিক্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বইয়ের নির্বাচন বিষয়েও সমস্যা দেখা দি এখন গুরুতর রকম।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, শিশুসাহিত্যে এবং কিশোর সাহিত্যে নতুন লেখকের আবির্ভাব এখন খুবই বিরল হয়ে এসেছে। বইয়ের সংখ্যা যে কমেছে তা নয়, কমেছে ভাল বইয়ের সংখ্যা। ফলে যে বই তাদের জন্য কেনা হয় এবং তাদের পড়ানো হয়, তার থেকে আনন্দ পাওয়া তো তাদের হয়ই না, রুচিগঠন তো পরের কথা। তাছাড়া আরো একটি গুরুতর ক্ষতি ঘটে এর ফলে। পড়ার আগ্রহটাই কমে যায় তাদের।

এই ব্যাপারটি আরো বেশি পরিমাণে ঘটে সদ্য বয়ঃবৃদ্ধি অতিক্রান্ত অতি-তরুণদের ক্ষেত্রে। তারা শিশু তো নয়ই, কিশোরও নয়। আবার পরিণত যৌবনের সমস্ত রকম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা যে তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তাও বলা যাবে না। এই বয়সের পাঠকদের জন্য কোনো বই যে এখন লেখা হ না, এটা বাস্তব সত্য।

ঘটনাটি যে কেবল আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়, বিদেশেও একই অবস্থা। সেখানেও সদ্য তরুণদের জন্য বই লেখা কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই।

ইংলণ্ডের একজন সমাজতাত্ত্বিক ডঃ পিটার মান তাই এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়েছেন প্রায় দশ বছর ধরে। সমস্যাটিকে তিনি বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন নানাদিক থেকে।

সমীক্ষার ফলে যা জানা গেছে তা যে খুবই দুশ্চিন্তার ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। ১৪ বছর বয়সের মেয়েরা হয় শুধু কমিকস্ পড়ে, অথবা লাইব্রেরি বই প্রায় কিছুই পড়ে না। মনে রাখা ভাল, সেদেশে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তিত, এবং সমীক্ষায় মেয়েদের কথা জানা গেলেও সেটা ছেলেদের বেলাতেও অন্যরকম হবার কারণ নেই। ডঃ মান-এর মতে তফাৎ কেবল এইটুকু যে, ১৪ বছরের পর অনেক মেয়ে যেমন কি বয়সের অ্যাডভেঞ্চার ইত্যাদির বই পড়ার পর হালকা ধরণের পড়াশোনায় ব্যাপৃত হয়, ছেলেরা ঠিক সে রাস্তায় না গিয়ে বয়স্কদের জন্য লেখা যৌন-আবেদনময় বইয়ের মধ্যে পাঠস্পৃহা মেটাতে শুরু করে।

ফলাফল সহজেই অনুমেয়। সদ্য যুবকের বিকাশোন্মুখ সুকুমার মনে বেআবরু যৌনচর্চার অভিঘাত সহজেই তার মিতাবস্থার ভারসাম্যের পক্ষে হানিকর হয়ে দাঁড়ায়। তাদের পরবর্তী জীবনের অ অশ্রুময় দুর্ঘটনার কারণ শুরু হয় এভাবেই।

এবং ক্রমেই এই সমস্যাটি তাদের ব্যক্তিগত গণ্ডি অতিক্রম করে হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক সমস্যা

আমাদের দেশেও কি এ সমস্যার সূচনা দেখা দিচ্ছে না? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও একজন ১৪—১৮ বছরের সদ্য তরুণ যেমনভাবে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি ছোটগল্প, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত নিষ্কৃতি বৈকুণ্ঠের উইল ইত্যাদি, এবং বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি, আরণ্যক পড়ে পাঠস্পৃহা মেটাতে পারত, সেই সঙ্গে প্রস্তুতও করে নিতে পারত তাদের মনকে পরবর্তী পর্যায়ের অধিকতর পরিমাণের নিরাবরণ চরিত্র জীবন-আলেখ্যের জন্য, এখন সে সুযোগ খুবই কমের দিকে।

কাজেই বই পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে পড়ার মতো বইও দিতে হবে পাঠকদের। এবং সদ্যযুবক পাঠকদের কথাও মনে রাখতে হবে সেই সঙ্গে।

লিট্‌ল ম্যাগাজিন : কিছু ঘনিষ্ঠ ভাবনা

দিগ্বিজয় দিক্‌পতি

পুরুলিয়া থেকে কাকদ্বীপ আর মেদিনীপুর থেকে উত্তরবাংলা ইস্তক বিশাল চৌহদ্দির এখান ওখান থেকে নেই নেই করেও বেশ কয়েক হাজার লিট্‌ল ম্যাগাজিন নিয়মিত কিংবা অনিয়মিত প্রকাশিত হয়। ঠিকানা তাদের কখনও খাস কলকাতা আবার কখনও মেদিনীপুর, বর্ধমান কিংবা বীরভূমের কোন গণ্ডগ্রাম। সম্পাদনা করেন সদ্য গোঁফের রেখা আঁকা উঠতি যুবক থেকে দীর্ঘ দিনের পোড় খাওয়া কোন সাহিত্য অনুরাগী। উদ্দেশ্য তাদের প্রায় ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া যায় সাহিত্যচর্চা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্তই সম্পাদকের সাহিত্যজগতে একটু নাম জানানোর প্রয়াস—এটা বলতেও বাধা নেই। সেইসব লিট্‌ল ম্যাগাজিনে মূলতঃ সম্পাদকের গল্প কবিতা প্রবন্ধ ধারাবাহিক উপন্যাস অথবা পত্রিকাগোষ্ঠী সদস্যদের কাব্যগ্রন্থ কিংবা গল্প সংকলন প্রশংসার 'কোটিন'-এ মোড়া সমালোচনা থাকে। কখনও কখনও পত্রিকার প্রথম দিকের পাতায় সম্পাদকের ছবি অথবা গোষ্ঠীর একজন জাঁদরেল সদস্যের স্নাতক পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখানোর খবর ফলাও করে ছাপা থাকে। এছাড়াও থাকে একাধিক অপাঠ্য লেখা—যা লেখেন সম্পাদকের সহযোগীরাই। সম্পাদকের সাহিত্য দৃষ্টি যেখানে দুর্বল, অথবা যেখানে সাহিত্যজগতে তাঁর পরিচিত হওয়ার বাসনা থেকে পত্রিকার জন্ম, সেখানে ভালো লেখা প্রায় থাকে না বললেই চলে। কেননা ভালো লেখা প্রকাশ করার মন অঙ্গীকার নিয়ে তিনি পত্রিকা শুরু করেন নি। এগুলো লিট্‌ল ম্যাগাজিন অথবা 'ছোটদের কাগজ' কোন চিহ্নেই চিহ্নিত হতে পারে না।

অবশ্য একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে ওপরের ছবিটিই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের প্রকৃত চেহারা। ওটি অংশ বিশেষ মাত্র। এর কলকাতা আর গ্রামগঞ্জ থেকে এমন কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেরোয় যার পাতায় জোরালো গদ্যের ধাক্কা দেওয়া গল্প থাকে; চমকে দেওয়া কবিতা কিংবা রীতিমত সিরিয়াস বিষয় নিয়ে ভালো প্রবন্ধ। এমন পত্রিকার নজীর অ-মিল নয়। যেমন বারুইপুর থেকে 'মহাদিগন্ত' পত্রিকা পরিচ্ছন্ন ছাটের ভেতর অনেকবারই কিছু উন্নত মানের সাহিত্যভাবনা নিয়ে আমাদের সামনে এসেছে। এর প্রবন্ধ সংখ্যা, কবিতা সংখ্যা ও গল্পসংখ্যা রীতিমত সুচিন্তিত সাহিত্যভাবনার ফসল। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় একটি মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত 'রুচি' পত্রিকাই প্রথম 'বিলকে সংখ্যা' প্রকাশ করেছিল। পরে অবশ্য কলকাতা থেকে অনেকগুলি পত্রিকাই 'বিলকে সংখ্যা' প্রকাশ করতে এসেছিল। তবু বররুচির প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। হুগলী জেলা থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য সেতু' কাগজ চমকে দিয়েছিল পরপর কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা বের করে। এদের মধ্যে 'কলকাতা সংখ্যা' 'ভৌতিক সংখ্যা' উল্লেখ করার মত। 'শব্দ' পত্রিকার জন্ম হাওড়ার মফঃস্বল এলাকায়। এর 'শব্দ সংখ্যা' কিংবা 'প্রতীক সংখ্যা' রীতিমত বিস্ময় জাগায়। এদের নিষ্ঠা আর পরিকল্পনার কোন ফাঁক নেই। সংখ্যা দুটি গবেষকদেরও সহায়তা করতে পারবে বলেই বিশ্বাস। অবশ্যই একেবারে গেঁয়ো চেহারায় আনাড়ি লিট্‌ল ম্যাগাজিনও 'শরৎচন্দ্র সংখ্যা' উপহার দিয়েছে ইদানিং। নজর টানার মত কোন ক্ষমতা তাদের ছিল না। ছিল না লেখার নির্বাচন অথবা সাজানো গোছানোর কোন মুন্সীয়ানা।

খাস কলকাতা থেকেও বেশ কিছু ভালো পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'অন্বিষ্ট' 'জীবনানন্দ' 'গঙ্গোত্রী' 'কবিপত্র' এমন আরো অনেক কাগজই লিট্‌ল ম্যাগাজিন হিসেবে সত্যিই উন্নত মানের। 'অন্বিষ্ট' পত্রিকার 'পটসংকলন' 'প্রয়াণ বিষয়ক সংকলন' শিশুসাহিত্য সংকলন কিংবা 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সংকলন' বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধ-আলোচনায় ভরা যেমনি 'জীবনানন্দ' 'অনাদিন' অথবা 'গঙ্গোত্রী' পত্রিকায় নির্বাচিত কবিতা এবং কবিতা-বিষয়ক কিছু চিন্তাশীল লেখা প্রায়ই চোখে পড়ে। আবার নির্ভেজাল ছোট গল্প নিয়েও বেশি না হলেও গুটিকয়েক পরিচ্ছন্ন পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

এই নাগরিক, মফঃস্বলী কিংবা গ্রামীণ কাগজগুলোর ভেতর নতুন লেখকের মর্যাদা করার চেষ্টা-চরিত্র যে চোখে পড়ে না এমন নয় তবে যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদক অথবা সম্পাদকমণ্ডলীর সাহিত্য ভাবনা স্বচ্ছ নয় সেই কারণে কিছু এলোমেলো ভাবনা চেহারা নেয় অপরিণত এবং নিতান্তই কিছু কাঁচা লেখার নির্বাচনে। এই ধরনের কাগজ কখনও মান ছুঁতে পারে না। তরুণ সাহিত্য প্রয়াসীদের সাহিত্যভাবনাও তুলে ধরার ক্ষমতা রাখে না। আবার ছোট পত্রিকার অনেক সম্পাদককেই দেখা যায় কলকাতায় হাঁটাহাঁটি করতে। প্রতিষ্ঠিত কিংবা নামী লেখকের বাড়ি কিংবা অফিস অথবা কাগজের দপ্তরে হানা দিয়ে তাদের পাকড়াও করে তাদের লেখা সংগ্রহ করতে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনের পাতায় এদের লেখা ছাপার দরকার কি? পত্রিকাকে জাতে তোলা? সেই জন্যই দূর-দূরান্তের গ্রামগঞ্জ ছাড়িয়ে রেলপথে এসে হাওড়া কিংবা শিয়ালদার প্লাটফর্ম ছুঁয়ে ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়? এটা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মেরুদণ্ড শক্ত করে না। বরং রক্তচাপ বৃদ্ধির আশংকা আনে। আর তা ছাড়াও শহুরে হোমরা চোমরা লেখক কখনই রুগ্ন শরীরের গেঁয়ো কাগজগুলোকে বিনা পারিশ্রমিকে গদ্য রচনা দিতে রাজি হন না। পদ্য রচনাকারেরা অবশ্য উপায়ান্তর না দেখে কখনও সখনও এক আধটা কবিতা দিয়ে থাকেন (সকলেই অবশ্য এমন নন)।

এত কিছু সমালোচনা করার পর এবার একটু লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলোর অভাব-অভিযোগের দিকে নজর দেওয়া যাক। সত্যিকারের সাহিত্যচিন্তা নিয়ে এমন কিছু কাগজ একসময় গ্রামগঞ্জ থেকে বেরোত যা এখন শোকসংবাদ। কারণ অবশ্যই আর্থিক রক্তস্বল্পতা। এরা বাণিজ্য করতে চান নি। কিন্তু টিঁকে থাকার জন্য এদের বাণিজ্য মাধ্যমের অনিবার্য প্রয়োজন ছিল। সহানুভূতির বিজ্ঞাপনে আর কতদিন অর্কসিজেনের কাজ চলে? অতএব গভীর দুঃখের সঙ্গে...। এ বিষয়ে বাণিজ্য সংস্থা প্রকাশক বা এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি একটু সহায়তা করতে পারেন না কি? পারলে ভালো হোত। যেখানে কাগজের দামে আগুন লেগেছে। ছাপার দরে চড়বড়ে আঁচ। ব্লক তৈরী করতে গিয়ে দর শুনে বুকের ব্যামো হয় সেখানে এরা বাঁচবে কি করে? এই এলোমেলো পথে হেঁটেও শহর গ্রামে বেশ কটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন মারী মড়ক বাঁচিয়ে টিকে আছে তার সবগুলোর সব লেখাই না হলেও একটা দুটো ভালো লেখা যে প্রকাশ হচ্ছে না এটা বলা যাবে না। মাঝে মধ্যেই ভালো কবিতা অথবা গল্প চোখে পড়ে। এই লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো ঘাটলেই দু-পাঁচজন লেখককে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যায় যাদের কবিতায় অথবা গল্পে রীতিমত জোর আছে। যদি কলকাতার বড় কাগজগুলো এদের ঠাঁই দেন তবে সত্যিকারের লেখক তৈরীর আনন্দ পাবেন। আনকোরা তেজী লেখা পাঠককে উপহার দিতে পারবেন আর সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলের সেই অবহেলিত কবি কিংবা গল্পকারকে বড় লেখক হতে যাওয়ার পথে অনেকটাই আগিয়ে দিতে পারবেন।

'অমৃত' পত্রিকা শুরু থেকেই ছোট পত্রিকাগুলোর বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। আজও যতদূর সম্ভব শহর, মফঃস্বল অথবা গ্রামের সব লিট্‌ল ম্যাগাজিনই সহানুভূতির সঙ্গে অমৃতের পাতায় আলোচিত হয়। স্থানাভাব সত্ত্বেও ভালো লেখার উল্লেখ করে। প্রয়োজন হলে দুর্বল লেখার সমালোচনাও করে—ভবিষ্যৎ সংশোধনের প্রয়োজনে।

ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা

আমার যা কিছু

আমি শুধু দারিদ্র্যের কথা জানি—
আর কোনো কথাই জানি না।

দেখেছি কিশোরী, তা'র ম্লান মুখ—
আমি আর কিছুই দেখি নি।

আমি শুধু
ভালোবাসবার কথা বুঝি—
আর কোনো কথাই বুঝি না।

ক্লান্তি

আজ কোনো কথা তুমি আমাকে বোলো না।
এবছর, শীতের সামান্য আগে, বসন্ত বাতাসে
ঝরা-পাতাটির মতো ভেসে-ভেসে গিয়েছি রাস্তায়।
আজ কতো কাজ ছিলো,
আজ কোনো কাজ নেই আর—

আজ রাতে নিমন্ত্রণ, ঘুম, ডাক দিচ্ছে বিছানায়।

এসো সুসংবাদ এসো

দিনগুলো, কেমন চাকার মতো,
অযথা আমাকে
পিষে যায়...।
—বাস থেকে নেমে মনে হ'লো
বিদেশেই আছি। তবু
কে ওই মেয়েটি?
আমাদের
ঘরের মেয়ের মতো মনে হয়।
হয়তো মিনুর বোন হবে। এসো,
সুসংবাদ এসো—
আর কোনো ইচ্ছে নেই, শুধু ওই
মেয়েটির সঙ্গে যেন
আমাদের
তরুণ কবির বিয়ে হয়।

জন্ম : ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫ খৃঃ

ভাস্কর চক্রবর্তী

এই সময়ের নানা চাপাপোড়েনে ত্রিশ একজন নাগরিক যুবক যেভাবে কথা বললে স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হয় ভাস্করের কবিতা তাই; যে মানুষ তার কবিতার কেন্দ্রে নারীই হোক বা পুরুষই হোক তারা যে এই শহর এই কলকাতার যুবক যুবতী তা চিনে নিতে অসুবিধে হয় না এবং ভাস্করের মতন উদ্বেগের কথা এমন পরিচিত গলায় বলতে আমি আর কাউকে দেখিনি। তবে অবশ্যই কথা বলার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি একজন দূরে বা কাছে সব সময়েই আছে, ওই 'তুমি' সর্বনামটি প্রায়শই উপস্থিত; তারা যে কথা বলে তাতে স্পষ্ট ঋজুতা আছে, আর কান্না করে বলার চেষ্টাও করে না অথচ পড়বার সময় মনে হয় কবিতাই পড়ছি এবং তা এই আমাদের সময়ের।

এই ভাঙাচোরা ভাব ভাস্করের চরিত্র, কারণও আছে, ওঁর কবিতার কেন্দ্রস্থ চরিত্র প্রায় সব সময় যুবক কিংবা যুবতী তাদের হারান শৈশব স্মৃতি স্মরণ, তার জন্য নস্টালজিয়া কিশোর বয়সের স্বপ্ন অস্ফুট প্রেম হঠাৎ ঘনিয়ে আসা বিষাদ যৌবনে তার সার্থকতার জন্য সন্ধান না পেয়ে অভিমান, আহত পুরুষের নৈসর্গিক দৃষ্টি বিষাদ ইত্যাদি ভাস্করের কবিতাকে অভিমানী যুবকের ক্রম পরিণতির ইতিহাস বলে তুলে ধরে। যেটা ওর সবচেয়ে বড় গুণ তা হল পাঠক ও কবির মধ্যে ব্যবধান খসে পড়ে পাঠের শুরুতেই ওই টানা পয়ার কিংবা গদ্যছন্দই ভাস্কর ব্যবহার করেন বেশী। পরিচিত পরিবেশ থেকে, ঘর গৃহস্থালী থেকে শব্দ বেছে নিয়ে কবিতার শরীর নির্মাণ করেন ভাস্কর; এই প্রবণতা অবশ্য এসময়ের কবিতার সার্বিক চরিত্র, কিন্তু ভাস্কর অনেক ব্যবহারকে পেটেন্ট করেছেন যা তাঁরই; স্বতন্ত্র চরিত্রবান বলে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে গেছেন এইসব কারণে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সর্বত্র মুখর শীর্ষেন্দু

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

একালের বাঙলা গল্প !! শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় !! রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা—৯ !! মূল্য : ষোল টাকা।

আজকাল গল্পগ্রন্থ প্রকাশের সংখ্যা দিন দিন যেন কমে আসছে। অন্তত সে তুলনায় কবিতা গ্রন্থের প্রকাশ এখনো খানিকটা উজ্জ্বল। একেই ছোটগল্পের বাজারের অবস্থা মন্দা প্রকাশকরাও সাহস করে গল্পের বই প্রকাশ করতে এগিয়ে আসেন না, তার উপর কিছু শক্তিবান তরুণ গল্পকার যেখানে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে নিজেদের খরচে মাঝে মাঝে গল্পের বই প্রকাশ করতেন, সেখানেও পড়েছে ভাটা—প্রেস এবং কাগজের অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধিতে তাও আর হয়ে ওঠে না সম্ভব, ফলে এখনো অনেক ভাল ছোটগল্প গ্রন্থভুক্ত না হওয়ায় পাঠকের চোখের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। সেদিক থেকে অন্তত রামায়ণী প্রকাশ ভবনকে ধন্যবাদ যে, তারা এই ডামাডোলের বাজারেও ছোটগল্প সংকলনের একটা সিরিজ বের করবার চেষ্টা করেছেন। আর এই সিরিজের ২য় সংকলনটিই হল ইতিমধ্যেই সুপরিচিত স্বনামী গল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের।

সম্ভবত এটি শীর্ষেন্দুর দ্বিতীয় গল্পসংকলন। যদি 'পাপ' বা 'ঘরের পথ' ইত্যাদি জাতীয় কয়েকটি বইকে সেই অর্থে সংকলন হিসেবে না ধরি তবে এই গ্রন্থটিই তার দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে।

মোট কুড়িটি বিভিন্ন চরিত্রের গল্প নিয়ে এই সংকলন। গল্পগুলোর মধ্যে কোথাও কাহিনীর বিস্তার নেই তেমন, তবে সব গল্পগুলোর ভেতরেই কোথাও না কোথাও শীর্ষেন্দু উপস্থিত থেকে প্রচারকের ভূমিকা নেন। তাই তার গল্পের কোন চরিত্রই শেষপর্যন্ত তার আত্মিক যন্ত্রণা বা আনন্দে ডুবে যায় না। মুখ্যত সেখানে শীর্ষেন্দুই উপস্থিত থাকেন। থেকে বলেন তার কথা। অবশ্য দু-একটি ব্যতিক্রমও আছে। চরিত্রগুলোই শেষপর্যন্ত সেখানে যন্ত্রণা-ভোগা ভূমিকা নেয়।

আসলে, এক ধরনের অর্থহীনতা বা মিনিংলেসনেস, এক ধরনের পরাজিত চেতনা আর নস্টালজিক ফিলিংস-এর স্রোতে পেছনের দিকেই বারবারই ফিরে যেতে চান শীর্ষেন্দু—তাই তার চরিত্রগুলো বারবারই পেছনের স্মৃতিতে ডুবে যায়। এই স্মৃতি প্রায়শই কোন দুঃখবোধ, মৃত্যুচেতনা বা পিন ফোটানোর মত যন্ত্রণাবোধ থেকে উঠে আসে। কিন্তু স্মৃতি কি শুধুই দুঃখবোধ, মৃত্যুচেতনা বা ওই ধরনের যন্ত্রণা-বোধ ?, স্মৃতি কি ভয়ংকর নয় ?, অন্তত দেশকালের

ব্যাপ্তিতে মানসিক গণ্ডীর প্রসারে। না, তাঁর গল্পের ভেতরে তেমনভাবে এটা উঠে আসেনি। হয়নি বিস্তার। সে-কারণে চরিত্রগুলো ঘোরাফেরা করে এক জাতীয় মৃত্যু-চেতনার উপলব্ধিতে, ফেলে-আসা সুখকর জীবনের হাহাকারের বেদনায়, পরাজিত হয়েও প্রার্থনার সুরের অবগাহনে, দাম্পত্যজীবনের উপলব্ধির ফসলে কিংবা বয়ঃসন্ধির প্রেমের উত্তরণে।

আলোচ্য সংকলনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প আছে। উল্লেখযোগ্যতার কারণ এই গল্পগুলোর মধ্যেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া যায়। অন্তত বিষয়-বৈচিত্র্য, রীতিশৈলী ও বক্তব্যে তার স্বাতন্ত্র ধরা পড়ে। এই গল্পগুলো হল--পটুয়া নিবারণ, সোনার ঘোড়া, সাধুর ঘর এবং মুনিয়ার চারদিক!

মুনিয়ার চারদিক গল্পটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হইচই পড়ে গিয়েছিল। লেবু গাছের গোড়া থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা সাপ; মুনিয়া তাকে ব্যথা দেওয়ায় সে মুনিয়াকে ছোবল মারল। ফলে মুনিয়ার মৃত্যু। আর তারপরেই মুনিয়র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে চরিত্রগুলো ঘুরছে। দীর্ঘদিন লক-আউটের পরে যে সুবিনয় কারখানায় ঢুকেছে, যার ভেতরে একদিকে যেমন কারখানাটা না খুললে সে কিভাবে নিজের সংসারটা অন্যভাবে গুছিয়ে নেবে তার চিন্তা, আবার অন্যদিকে বিশ্বাস, এত ছোটখাট লড়াই তার জন্য নয়, মানুষের জন্য মস্ত লড়াই পড়ে আছে। সে অপেক্ষা করছে অন্য এক জীবনের ডাকে। সুতরাং এখানেই শীর্ষেন্দু মস্তবড় ভুল করে বসেছেন। যদি আমাদের জাতীয় জীবনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে একজন স্বার্থপর নেতার মানসিক অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করতেন, তবে একই ব্যক্তির ভেতরে এমন দুটো দিককে মেনে নেয়া যেতে পারত। কিন্তু শীর্ষেন্দুর সুবিনয় এখানে আদর্শ চরিত্র, অন্তত ক্যারিয়ারিস্ট হওয়ার বদলে যে পার্টির হোলটাইমার হওয়াটাকেই বড় মনে করে এবং যে বিশ্বাস করে অনাগত এক জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্য। পূর্বে এশিয়ার যোজন জুড়ে শকুনের ডানার ছায়া। মুক্তি আনবেন কার্ল মার্কস। তখন শীর্ষেন্দুই কেমন গোলমেলে হয়ে পড়েন। এত কথা বলতে হত না যদি না মুনিয়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সুবিনয় সেই সাপ খুঁজতে খুঁজতে একদিন নিজস্ব পথ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ত। আর সাপ এখানে একটি প্রতীকরূপে এসেছে এবং সাপটাকে খুঁজতে গিয়েই শীর্ষেন্দুও সুবিনয়কে করে ফেলেছেন বীভৎস, অবশেষে গল্পের শেষে জানিয়েছেন সুবিনয়ের শোবার ঘরের শিয়রে টাঙানো যে মার্কসের ছবিটা দেখে সুবিনয় একদিন জীবন্ত থাকত, ক্রমে সেই মার্কসের ছবিখানায় ধুলো পড়ে। মাকড়সা জাল বুনতে শুরু করে। কিন্তু এখানেই আপত্তি—ফলে যে কারণে গল্পটি কয়েক বছরের মধ্যে একটি ভয়ংকর উল্লেখযোগ্য গল্প হয়ে উঠতে পারত সেই কারণে গল্পটি হয়ে উঠল দুর্বল। আসলে কয়েকটি ভিন্নধর্মী চরিত্র—খলিল, হামিদ, পরাগ, চন্দনা ইত্যাদিকে বড় তাড়াতাড়ি হজম করতে গিয়েই শীর্ষেন্দু এমন একটি গল্প লিখে ফেললেন।

তবু সেদিক থেকে **সাধুর ঘর** বা **সোনার ঘোড়া**-কেই শ্রেষ্ঠ গল্প বলা যায়। সাধুর ঘরে যে সাধুকে একদিন সবাই চোরচোট্টা বলে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল, তীব্র এক অনুভূতির মধ্য দিয়ে সেই সাধুই উপলব্ধি করল অন্যের ঘর পোড়ালেও 'পরের ঘর বাঁধতে আমি একদিন ঠিক সাচ্চা সাধু হয়ে যাবো।' 'সোনার ঘোড়া' পরিবেশ পটভূমি আলাদা। সেই আলাদা পটভূমিতেই শীর্ষেন্দু এঁকেছেন আকালের ছবি। তবে ভাষা এত নরম আর শান্ত যে পড়তে গিয়েই হোঁচট খেতে হয়।

কিন্তু **পটুয়া নিবারণ** বা **সাদা ঘুড়ি** বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রীতিপ্রকরণে সত্যিই অন্য স্বাদ এনে দেয়। ডুবুরী; **কীট; দূরত্ব** ইত্যাদি গল্পগুলোও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। **ডুবুরী**-তে সেই নস্টালজিক অনুভূতি এবং **কীট** ও **দূরত্ব**-তে বিচ্ছিন্নতাবাদ—যে বিচ্ছিন্নতা শীর্ষেন্দুর আরও গল্প উপন্যাসে পরবর্তী কালেও নানাভাবে এসেছে।

এছাড়া কতগুলো গল্প আছে যেখানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি সর্বত্র প্রখর। এবং এই গল্পগুলোই পড়তে গিয়ে যেন ঝিম মেরে থাকতে হয় অনেকক্ষণ। কেননা, এই গল্পগুলোতে যদিও কোথাও নেই সেই তথাকথিক চমক কিংবা গল্প বানানোর চেষ্টা বরং এখানে জীবনের খুঁটিনাটি নানান অবস্থাকে, আমাদের অস্তিত্বকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন গভীর মন নিয়ে। তাই আমরা, **শেষ বেলায়; বন্ধুর অসুখ; নীমুর দুঃখ** ইত্যাদি গল্পগুলোয় আমরা দেখি আমাদের জীবনের চেহারা। এখানেই শীর্ষেন্দুর বৈশিষ্ট্য।

ষাট কেন কবিতায় একটি দশক

ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা !! সম্পাদনা ঃ পবিত্র মুখোপাধ্যায় ।। পুস্তক প্রকাশনী ।। কলকাতা—৯ ।। মূল্য ঃ সাত টাকা।

অবশেষে ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতাও প্রকাশিত হল। শুধু প্রকাশিতই নয়, সংযুক্ত হল একটি নতুন ইতিহাস, যখন এই দশককে ঘিরেই একদিকে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা আবার প্রামাণ্য কোন দলিল না থাকায় (গ্রন্থভুক্ত সংকলন) অন্যদিকে মতান্তর, ঠিক তখনই এই সংকলনের প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, অন্তত যে দশকের দোরগোড়ায় এসেই সামাজিক তথা রাজনৈতিক অবস্থাটা বাঁক নিল তাড়াতাড়ি, চরিত্রটা গেল রাতারাতি পাল্টে, পরিস্থিতি হয়ে উঠলো ভয়ংকর—রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা, সাম্যবাদী শিবিরে ভাঙন, মূল্যবৃদ্ধি, গণআন্দোলন, সামাজিক অবক্ষয়, প্রগতিশীল শিবিরের ব্যক্তি-হত্যা-সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করেই ষাটের দশকটা যখন হয়ে উঠল বিশিষ্ট, যার সঙ্গে পূর্বাপর দশকগুলোর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ টানাপোড়েনেই সে হয়ে উঠল চরিত্রবান, বিশেষ এক পরিস্থিতিতে চিহ্নময়, তখন সেই চিহ্নই যে এই দশকের কবিদের গায়ে এসে লতানো আঁকড়ের মত জড়িয়ে ধরবে—সেটাই তো স্বাভাবিক।

আর সেই চরিত্র নিয়েই ষাটের কবিরা হয়ে উঠেছেন বিশিষ্ট—যেমন বিষয়বৈচিত্র্যে, বিচিত্র অনুসন্ধানে, তাদের চিন্তায়, চেতনার স্তর থেকে গভীর অনুভূতি নিয়ে উঠে এসে তাঁদের সামাজিক অবস্থানকে মনে রেখে বিভিন্ন আকৃতিতে, তেমনি রীতিশৈলী, বাক্‌বিন্যাস ও ছন্দের বৈচিত্র্যে তাঁদের কবিতায় গড়ে উঠেছে একটা স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল। অথচ তবুও কেন ষাটের কবিরা পেলেন না তেমন স্বীকৃতি? কেনই বা রচিত হল না তাঁদের নিয়ে কোন আলাদা ইতিহাস? তবু ভাল শেষপর্যন্ত পুস্তক প্রকাশনীর আগ্রহেই প্রথম এই দশকের চল্লিশজন কবিকে অন্তত দুই মলাটের ভেতরে গ্রন্থভুক্ত করা গেল।

প্রকৃতপক্ষে চল্লিশজন কবি হলেও তাঁদের মানসিকতা বিভিন্ন রকম—তাই কবিতাও হয়ে উঠেছে বিচিত্রগামী। আর এঁদের সততাও আশ্চর্যভাবে লক্ষণীয়। নিজ নিজ ভূমিতে দাঁড়িয়ে তাই এঁদের সরল কণ্ঠ ক্রমশই ভাস্বর হয়ে উঠেছে নিজস্ব ভঙ্গীমায়। চল্লিশ দশকের কবিতায় দায়দায়িত্ব বোধ, সামাজিক অবক্ষয় এবং গাম্ভীর্যের চিহ্ন। ষাট দশকে এসে কবিতার মূল্যবোধ বদলে গেল—নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, দেখা এবং দেখানোর, চেনা এবং চেনানোর অনুসন্ধানে কবিরা ক্রমেই হয়ে পড়ছিলেন অন্তর্মুখী।

যে-যার নিজস্ব পরিমণ্ডলে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, বেড়ে উঠছিলেন স্বতন্ত্রভাবে, তাই একের সঙ্গে মিলন না অপরের—ফলত পবিত্র মুখোপাধ্যায় বা রত্নেশ্বর হাজরা, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বা কালীকৃষ্ণ, ভাস্কর কিংবা সুব্রত চক্রবর্তী, পুষ্কর কিংবা প্রভাত চৌধুরী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা শামশেরের সঙ্গে কোন মিল খোঁজা কঠিন হ'ল। এ' ব্যাপারে সম্পাদক নিজেই জানিয়েছেন, '...যেহেতু, সচেতন প্রতিক্রিয়ায় আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসন্ধান, অতএব শৈলীগত প্রশ্নে আমাদের খুবই সচেতন যেমন থাকতে হয়েছে, তেমনি, সমসময়ের সামাজিক দায়কেও আমরা অস্বীকার করিনি। কিন্তু তা ব্যক্তিত্বের দ্বারা পরিশীলিত, বোধ ও বেদনায় জড়িত; যেহেতু সাংবাদিক চরিত্র যা আগের অগ্রজদের মৌল হাতিয়ার আমরা তাকে পরিত্যাগ ক'রে, কবিতার মূলে বিন্দুতে পেঁৗছতে চেষ্টা করলাম।' সে কারণেই রত্নেশ্বর যখন লেখেন, 'যে বিদ্রোহী সে বিদ্রোহী-ই, তার কোন কিছু কেড়ে না নিলেও। দাঁড়িয়ে থাকে প্রবলতম বাধায়...' অথবা 'এই শর্তে রাজি আছি ঃ রক্তপাত ঘটে গেলে। জল দিয়ে ধোয়ানো হবে না...' তখন পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, 'ঘুমিয়ে ছিলাম, তাই জানা নেই নির্গমনের রাস্তা। বাবা বলেছেন ন— ভেদ করে প্রবেশের পদ্ধতি...' অথবা '...পায়ের তলে মাটি নেই, ইঁদুরের গর্তে ভরে গেছে। হৃদপিণ্ড উপড়ে নিয়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে সংখ্যাহীন সভ্যতার কীট...' কিংবা বুদ্ধদেবের কবিতায় যখন, 'আমাদের আগামী যেদিন সেও ঠিক আসে না এখনো। শুধু ভোর হয়, খালি ভোর হয়, অর্থহীন বোঁচা কালো ভোর...', যখন শামসেরের কবিতায়, 'অতিদূরে শৈশব থেকেই আমি পাপী। অতিদূরে শৈশব থেকেই আমি জ্বলে গিয়েছি, পুড়ে। গিয়েছি ধর্মের জ্বালায়...', তখন কিন্তু দেবাশিসও লেখেন, '...মাছেরা ঠুকরে খায় আত্মা, আমি তাই। পাখিদের জাগার আগেই জেগে উঠি,। জেগে উঠে পুনরায় ঘুমের রাত্রির দিকে চলে পড়ি!' আবার প্রভাত চৌধুরীর 'শরৎকালীন নৈশরূপকথা', বা 'বিস্ফোরণে জ্বলন্ত নগরে'-র সঙ্গে পাশাপাশি লেখা হয় অরুণাভ দাশগুপ্তর 'চূর্ণ অনুভবমালা'; গৌরাঙ্গ ভৌমিকের 'মৌসুমীর শোক' বা 'অবিকল আমি' যেমন প্রচণ্ড অনুভূতি নিয়ে উঠে আসে তেমনি কালীকৃষ্ণ গুহ-র 'জীবনযাপন বিষয়ক পাণ্ডুলিপি', হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ল্যাণ্ডস্কেপ চোলডাঙা বা হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'এইসব যুবকেরা কবিতায়-ও উঠে আসে তাঁদের নিজস্ব জগৎ। সুতরাং এখানেই তাঁদের মৌলিকতা।

স্বল্প পরিসরে তেমনভাবে আলোচনা সম্ভব না হলেও একথা বলা যায় আলোচ্য সংকলনের আরও অনেক উল্লেখযোগ্য এই দশকের কবি—সুব্রত চক্রবর্তী, ভাস্কর চক্রবর্তী, কবিরুল ইসলাম, রাণা চট্টোপাধ্যায় কিংবা অনন্ত দাশের যেমন তরতাজা কবিতা অনেক আছে তেমনি আছেন মৃদুল গুহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, দেবারতি মিত্র ও যোগব্রত চক্রবর্তীর মত শক্তিমান কবিরা। পরিচ্ছন্ন, প্রণবেশ মাইতির সুন্দর প্রচ্ছদে সাজানো এই সংকলনটি বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি নির্ভরযোগ্য সংকলন—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

শচীন দাস

বাবার ধানীজমি এবং উপন্যাস

বাবার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নাম ছেলে। কিন্তু সেই ছেলের চেয়েও বাবার অনেক বড় জিনিস থাকে কোন কোন সময়। যদি বাবা শিল্পী হন। যেমন—

বাবার আঁকা ছবি। লেখা কবিতা। উপন্যাস। ইত্যাদি।

কোন কৃতী সন্তান তাঁর পিতৃদেবের ধানী-জমি, আমবাগান বাড়াতে পারেন। বাবার কাটানো দীঘি সংস্কার করতে পারেন। সম্রাটের পত্তন করা সাম্রাজ্য অনেক সময় ছেলে আরও বাড়িয়েছে। কিংবা খুইয়ে বসেছে।

কিন্তু বাবার আঁকা ছবিতে কি ছেলে তুলি বোলাবার অধিকারী?

কিংবা ছেলের ওপর খোদকারী কোন বাবার কি ভালো লাগে? অবশ্য প্রয়োজনে প্ল্যাস্টিক সারজারি আলাদা

শ্রীকান্তর শরৎ পরবর্তী পর্বগুলি পাঠক গ্রহণ করেননি।

শেষ প্রশ্নের শেষটা এখনো আমাদের কাছে প্রশ্ন।

কল্লোল যুগের বারোয়ারি উপন্যাস সেফ বারোয়ারি ভেজাল। কারণ সে-উপন্যাসের কোন জনক নেই। বৃহন্নার কোন ছেলে থাকলে বৃহন্নার অবর্তমানে সে নিশ্চয় হিমালয়ের চেহারা স্বাস্থ্য ফেরাতে বসতো না। এ তো আর বাবার একতলা বাড়ি দোতলা করা নয়।

সম্প্রতি কয়েক বছরে বাংলা উপন্যাসের মাঠে দু'জন ঈশ্বর-সদৃশ ঔপন্যাসিকের দুই ছেলে পিতৃবিয়োগের পর তাঁদের বাবার লেখা উপন্যাস ধানী-জমি কিংবা আমবাগানের মত বাড়াতে গিয়েছেন। ব্যাপারটা সেফ খোদার ওপর খোদকারী। বাঙালির ভালো লাগেনি। বাবার বইয়ের রয়ালটি নেওয়া সুখের কথা। কিন্তু শুধু জন্মের অধিকারে অধিকারী হয়ে আমরা কি সাহিত্যের ইতিহাসের খিলান কিংবা কড়িবরগায় অদলবদল করতে পারি? ধরেই নিলাম বাবার শিল্পগুণ ছেলেতে বর্তেছে। তবুও কি পিতার সৃষ্টিতে সংযোজন, বিয়োগ, অদলবদল উচিত? না, সম্ভব? বিশেষ করে যে-সৃষ্টি একটি ভৌগোলিক সীমানার ভেতর জাত কোন জাতির স্বপ্ন, ইতিহাস, শিল্প? যেসব গ্রন্থ, ছবি, ভাস্কর্যের নিদর্শন আমাদের পরিচয়, আমাদের গর্ব তাতে ঈশ্বরেরও হাত দেওয়ার অধিকার নেই। একমাত্র মহাকাল সে ভাগ্য স্থির করবে।

কখনো দেখা গিয়েছে, মহাকালও শিল্পের হাতে মার খেয়ে বসে আছে। মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে বালির ঝড় তুলে অশ্বঘোষকে মহাকাল শেষ অবধি চেপে রাখতে পারেনি। বুদ্ধচরিত কয়েক শতাব্দীর বিস্মৃতিকে সরিয়ে দিয়ে পরাজিত মহাকালের মুখোমুখি হয়েছে।

অশ্বঘোষের ধানী জমি ছিল কিনা জানি না। ছেলে ছিল কিনা—তাও জানি না। তবে, এটা জানি বিভূতিভূষণ কাজলের দায়িত্ব নিতেন না। নিতেন না তারাশংকর মৃত্যু-পরবর্তী তাঁর নামধারী বইয়ের।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

পত্র পত্রিকা

অনন্ত। নবম বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা। ১৩৮৩।
অনন্ত। নবম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। ১৩৮৩। সম্পাদক ঃ
সুশীলকুমার নন্দী।

'অনন্ত'র দুটি সংখ্যাই অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়েছে। বুকের ভেতর ধাক্কা দেবার মত দুটি কবিতা লিখেছেন শঙ্খ ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। একজন তাঁর সময়ের মানুষের দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণায় অধীর। তাই 'দুই হাতে দুই মশাল দিও। শান্তিও চাই, অশান্তিও।' আর একজন আত্মপ্রেমে মাতোয়ারা। তাই তাঁরও 'এইভাবে এ জীবন কেটে গেল, কেটে যাবে। চমৎকার গোপন আরামে।'

পূর্ণেন্দু পত্রীর একটি অসাধারণ প্রবন্ধ আছে এই সংখ্যাতে। নাম 'পোকা-মাকড় হইতে সাবধান।' প্রবন্ধটি মূলত বুনুয়েল ও বার্গম্যানের দুটি ছবি সম্পর্কিত। প্রসঙ্গত যুক্ত হয়েছে সার্ত্রে-র 'দি ফ্লাইস' নাটকের রূপক-সাংকেতিকতা। কম পরিসরের মধ্যে দুটি ছবি ও একটি নাটকের মর্মকথা ও তার গভীরার্থক ব্যঞ্জনা প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রবন্ধের ধর্ম তাঁর হাতে সম্মান পেয়েছে।

ঠিক উল্টোটা হয়েছে, নবম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় দেবেশ রায়ের প্রবন্ধে। অর্থহীনভাবে কতগুলি শব্দের পারমুটেশান-কম্বিনেশানের খেলা খেলেছেন। 'কবিতা, কবিতাই। গল্প, গল্পই। এই দুই ফর্ম মিলতেও পারে, কখনো কখনো কিন্তু মিলনের আগে বা পরে, গল্প গল্প, কবিতা কবিতাই। মিলন-মুহূর্তে- টিতেও।'

অবশ্য ভাল প্রবন্ধও আছে ঐ সংখ্যাতে। 'শেষের কবিতা' সম্পর্কিত শীর্ষেন্দু চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি। তিনি দেখিয়েছেন, শেষের কবিতা' নিছক রোমান্টিক কল্পনার উচ্ছ্বাস-ময় একটি উপন্যাস নয়। এর নিরবচ্ছিন্ন কৌতুক, তির্যক প্রকাশ ভঙ্গী ও ব্যাজস্তুতির মধ্য দিয়ে কল্পনার উচ্ছ্বাসময় একটি উপন্যাস নয়। এর নিরবচ্ছিন্ন কৌতুক, তির্যক প্রকাশ ভঙ্গী ও ব্যাজস্তুতির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর সমাজের অন্তঃসারশূন্য মাটির হাঁড়িটাকে ভেঙে দিয়েছেন। 'জীবনের' কাছে 'কথা আর কথা'র পরাজয়ে, অমিত সংযত হয়েছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পটি খোঁয়ারী —শক্তিমান গল্পকারের গল্প বলে চেনা যায়। নেশা ও বিষণ্ণতার ভারে অতিরিক্ত অবসন্ন।

দুটি চমৎকার কবিতার ছবি এঁকেছেন কল্যাণ সেনগুপ্ত। পুতুলের সীতাহার ও লাল বেনারসী নিয়ে যে অবুঝ মেয়ে মায়ের বিচ্ছেদ ভুলে ছিল, ময়নার মুখে মায়ের শেখানো বুলি শুনে চকিতে তার চোখ দুটি যদি হয়ে ওঠে 'কি করুণ মেঘলা সরসী'—তাকে ছবির মত চোখের সামনে দেখা যায়। যেমন দেখা গেছে সবুজ মাঠের মাঝখানে বজ্রাহতের মত কঙ্কাল গাছটা।

অমল মুখোপাধ্যায়।

কৃত্তিবাস। অগ্রহায়ণ। ১৩৮৩।
সম্পাদক ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

কৃত্তিবাস, অঘ্রাণ ১৩৮৩, বেরিয়েছে: মোটামুটি নিয়মিত বলা চলে কৃত্তিবাসকে। ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ লেখায় ভরে উঠছে কৃত্তিবাস, লক্ষ্য করার মতন। মাসিক পত্রিকা বাংলায় নেই বললেই চলে; পরিচয় আছে, কৃত্তিবাস আছে, দুই মেরুর অধিবাসী বলে দুজনেই সমান আকর্ষণীয়।

এ সংখ্যাটিতে বাংলা বানান নিয়ে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে পরিমলকুমার দে লিখেছেন, দুটিই মূল্যবান ও সময়োপযোগী লেখা। পুজোর উপন্যাস নিয়ে প্রধানাথ মণ্ডলের আলোচনা আরো বিস্তৃত ও সাহসী হতে পারতো। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুব্রত সরকার, গৌতম চৌধুরীর কবিতা ভালো। বলরাম বসাকের গল্পটি ফ্যান-টাসীর ঢঙে লেখা, মন্দ না। সমস্ত কাগজটি গম্ভীর ও সুরুচিপূর্ণ।

অনুস্বর। সম্পাদক ঃ দেবাশিস বসু

মনে হচ্ছে অতি তরুণদের মুখপত্র। সাম্প্রতিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে নানা ধ্বনি আছে। দশক নিয়ে সোরগোলের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয়তে অভিযোগ আছে, তবে বয়সে তরুণ বলেই যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তারই সমর্থন থাকছে কাগজে। প্রতিবাদ ত তেমন তাজা নয়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় যা বয়স্ক, অন্যান্য লেখকরা সত্তরের মুখ, অনেকেই চেনা। কারো কারো লেখায় প্রতিশ্রুতি আছে। ভালো কবিতারও অভাব নেই। দৃষ্টি রাখবার মতন চরিত্র আছে পত্রিকাটির।

শিল্প সাহিত্য। সম্পাদক ঃ সমীর চট্টোপাধ্যায়

মাসিক সাহিত্য, শিল্প, চলচ্চিত্র, নাটক বিষয়ক বুলেটিন দুটি সংখ্যা বেরিয়েছে; প্রথম সংখ্যাটিতে দেবব্রত বিশ্বাসকে নিয়ে একদা অন্যায় বিতর্ককে আঘাত করেছেন সমীর চট্টোপাধ্যায়, এ সংখ্যায় ঋত্বিক ঘটকের ছবির মুক্তি নিয়ে একা লেখক আলোচনা করেছেন। এছাড়া চলচ্চিত্র, নাটক, কবিতা গান প্রভৃতি প্রসঙ্গে সংবাদ; আলোচনা রয়েছে। এ জাতীয় কাগজের ভূমিকা আছে, যদি নিয়মিত বেরোয়।

অন্যত্র

আমি চলেছি মানুষের কাছে থাকবো বলে।
পুবের আকাশের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ।
আমি চলেছি সেই যুদ্ধ জয়ে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। দুর্গাপুর সংবাদ

পৃথিবীটা বড়ো জটিল, জীবন বড়ো রহস্য-ময় মানুষ বড়ো বিশ্বাসঘাতক। সুরথের মাথাটা অনেক দিন বাদে আবার ঝিমঝিম করে ওঠে।

নৈজয়ন্তী বাউর। পদ্মাগঙ্গা

আত্মকেন্দ্রিকতাই জাতীয় অপচয়ের মূ[illegible] কারণ।

মানু ভট্টাচার্য। ডাক দিয়ে যা[illegible]

তুমি জানো কোথা কোনখানে পড়ে আছে
সর্বসত্ত্বসংরক্ষিত স্বর্গের ঠিকানা।

ফণিভূষণ আচার্য। সীমান্ত সাহিত[illegible]

জ্যোৎস্নায় ভিজছে তার শরীর।

প্রদীপ ঘোষ। সাহিত্য-সে[illegible]

শিল্পীর সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিয়ে 'মান'-এর মতো এমন করে আর কেউ ভাবেন নি।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বনান[illegible]

হঠাৎ হাওয়া ওঠে। ফিসফিসিয়ে ওঠে গাছ-গাছালি। ভয় পাওয়া পাখী ডানা ঝাপটায়।

নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধানী

লিখছি না

কারণঃ হিতৈষীরা শীতল

সন্তোষকুমার ঘোষ

খবরের কাগজে তাঁর কর্মব্যস্ত ঘরটি নয়– আমরা বেছে নিয়েছিলুম ধর্মতলার বারন'ইগার নির্জন।

তিনি বলে যাচ্ছেন, আমি শুনে যাচ্ছি, তাঁর মুখের কথা শুধু শুনে যাওয়াই একটা অভিজ্ঞতা। আমি প্রশ্ন করি : বোম্বেতে শুনলুম শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য নাকি খুব হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে? আপনি কি শরৎচন্দ্রকে আমাদের সাহিত্যের একজন প্রধান লেখক বলে মনে করেন না?

—প্রধান লেখক? তিনি বাঙালীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ের পর যে সাহিত্য কোথায় উঠতে পারতো শরৎচন্দ্রের পর সেই সাহিত্য কি উদ্বেগজনকভাবে পিছিয়ে যায় নি? আর এই যে আমরা পপুলার সাহিত্যের শিকার হয়েছি—তাও কিন্তু ঐ একই কারণ পান করেই। কারণ বা প্রেরণা, যা ইচ্ছে ভাবো। তবে তিনি সেকালে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ওদের অনেক উপকার করেছেন, এ ব্যাপারটা মনে রাখার মতো।

—কেন 'শেষ প্রশ্ন?'

: ওটা কোনো উপন্যাসই নয়।

—'পথের দাবী'?

: সব্যসাচী কোনো চরিত্রই নয়। বিপ্লবী হতে গিয়ে রোমান্টিক হিরো হয়ে গেল। ফিল্মে রোলটা করছেন উত্তমকুমার।—কী ব্যাপার বলো তো, তুমি কি শুধু শরৎচন্দ্রকে নিয়েই সময় কাটাবে? আমার আজকে কলাম লেখার কাজ আছে।

—মানে আপনার সন্তোষকুমার ঘোষের কলম? কেন লেখেন এসব, এতে কি আপনার সম্মান বাড়ে?

: নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু গল্প-উপন্যাস লিখছি না, সপ্তাহে ওটা লিখলে মনে হয় হাতটা চালু আছে। আমার কলম তো নানা ব্যাপারেই নাক গলায়।

আসলে আপনি অনেক দিন কিছু লিখছেন না। কেন?

—এর আবার কোনো উত্তর হয় না কি!

: আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।

—বেশ, শোনো। লিখছি না তার কারণ আমার অস্থিরতা, অভিমান। খুশি!

: আপনি এড়িয়েই যাচ্ছেন।

—বেশ আরো শোনো। লিখছি না, তার কারণ আমার এককালের হিতৈষীদের শীতলতা, আমার দিকে ঔদাসীন্য!

:একজন কথাশিল্পীর তাতে কিছু এসে যায়?

—তবে আর জিজ্ঞেস করছো কেন। তবে এটা হয়তো ঠিক, স্থিরতা না থাকলে সত্যিই লেখা যায় না।

: একটা কথা, অনেক দিন আগে দেখেছি একটা উপন্যাস, বোধ হয় কোনো সাপ্তাহিক ধারাবাহিক বেরুনোর কথা ছিল, আপনি দু-গ্যালি লিখে ড্রয়ারে আটকে রেখেছিলেন, সেটা আর বেরোয়নি, কেন বলুন তো?

—বলতে পারো ইচ্ছে করেই হারিয়ে দেওয়া। যেমন কোনো মানুষ মেলায় ছেলেকে হারিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বলে—খুঁজে পাচ্ছি না। দ্যাখো নি—দরিদ্র বাবা তার রুগ্ন সন্তানকে পৃথিবীতে এনে ওষুধ-পথ্যের অভাবে মেরে ফ্যালে, এই রকম আর কি!

—কেন, আপনিও তো অনেকের মতো জনপ্রিয় হতে পারতেন।

—আমি কী আমি জানি না। পপুলার...কী জানি হয়তো হওয়া যেতো। 'মেমের পুতুল' বা 'কিনু গোয়ালার গলি'র জনপ্রিয়তার পর শুধু লেখায় আমি যখন প্রথম জটিল হই—সেই ১৭।১৮ বছর আগে, তখন বন্ধুরা এই লেখা পড়ে বাহবা দিল। ব্যস্, এবার লিখতে শুরু করলুম ওদের জন্যে। আমার আর পপুলার হওয়া হোলো না। তবে অন্যরকম আরো দু-একটা উপন্যাস লেখার ইচ্ছে আছে। তার একটার পটভূমি হবে, হয়তো, আমার জীবন দিয়ে দেখে-লেখা গ্রাম, মাটি, মানুষ, স্মৃতি।

: আজ প্রাচুর্য-টাচুর্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু লেখাকে উপজীব্য করতে পারেন না? জীবন এভাবে যাবে তাই তো চেয়েছিলেন, তাই না?

এখন আর তা পারি না।

: কেন?

—চাকরী আমাকে মানুষ হিসেবে আরো অনেক নির্ভরতা এনে দিয়েছে, শৃঙ্খলিত করেছে। আমার কয়েক ঘণ্টা বিক্রি করার পর একটা মুক্তি রয়ে আছে। তাছাড়া আমার চাকরীর এমন কোনো সর্ত নেই যাতে মাথা নীচু করার ব্যাপার আছে। সুতরাং সে প্রয়োজন কখনো হয়নি, হবেও না। কিন্তু শুধু সাহিত্যের খাতায় নাম লেখালে সব বাবুর কাছে বাঁধা থাকতে হয়। আমি তা ভাবতে পারি না। তাছাড়া এখন আমার নতুন করে কিছু ভাববার মতো অবকাশ নেই, সে বয়সও নেই।

—বেশ, আপনার নিজের লেখা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আন্দাজ করা গেল, কিন্তু পাশাপাশি আপনার কনটেম্পোরারি লেখকদের লেখা আপনার কেমন লাগছে?

—আমার বয়সী লেখক বলতে তোমার মতো অনেকেই আমাকে রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, বিমল কর বা গৌরকিশোর ঘোষের দলে ফেলে দেন। আসলে তা নয়। ওঁরা আমার একটু পরে। আমার সমসাময়িক লেখক বলতে এ্যাকচুয়ালি নারায়ণ গাঙ্গুলী, নরেন মিত্তির বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীদেরই বোঝায়। আমি লিখতে শুরু করেছিলাম ওদের সময় থেকেই। তবে যাদের নাম করলে তাঁরা নিঃসন্দেহে ক্ষমতাবান। কিন্তু আমার দুঃখ হয় গৌর-এর জন্যে। ওর মতো পাওয়ারফুল কলম শেষ পর্যন্ত হাস্যরস লেখার উপজীব্য বিষয় করে তুললো। এই সময়ের সবচেয়ে বিতর্কিত লেখক সমরেশ। বিবর বেরুবার পর সবচেয়ে আগে ওকে নিয়ে লিখেছিলাম হি ইজ দা গ্রেট রাইটার অফ আওয়ার টাইম। কিন্তু 'বি টি রোডের ধারে' 'শ্রীমতী কাফে' থেকে সমরেশ দুম্ করে সরে এসে ভুল করলো। ওর এক-একটা লেখা বেরুচ্ছে আর আমরা অবাক বিস্ময়ে যেন কালীপুজোর রাতে একেকটা নতুন বাজি ফাটানো দেখছি। ঠিক সেই সময়েই ওর জায়গা থেকে ও সরে
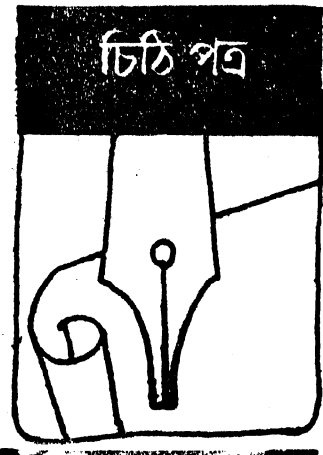
শ্রীনিকেতনের সাহেব চাষী

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত একজন বহু-কাল শান্তিনিকেতন নিবাসী রবীন্দ্র সাহিত্য ও জীবনীর তথ্যাভিজ্ঞ পণ্ডিত কি ভাবে তাঁর 'শ্রীনিকেতনের সাহেবচাষী' প্রবন্ধ দুটি তথ্যগত ভুল' পরিবেশন করেছেন তা দেখে বিস্মিত হলাম।

১। 'রবীন্দ্রনাথ, এলমহার্স্ট এবং তাঁর চাষী ছেলেদের জন্যই লিখে দিয়েছিলেন—'আমরা চাষ করি আনন্দে'। কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। এই গানটি রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বে 'অচলায়তন' নাটকের জন্য লিখেছিলেন।

'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন এলমহার্স্ট ও তাঁর চাষী ছেলেদের জন্য।

২। 'কিছুদিন পরে মিস গ্রীন নামে এক আমেরিকান মহিলা এসে শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দেন। তিনি এখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনা করেছিলেন। পরে কালীমোহন ঘোষের চেষ্টায় চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত গ্রামকেই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতায় আনা হয়।' এটিও ভুল তথ্য।

শ্রীগ্রেসন গ্রীন শ্রীনিকেতনে এসেছিলেন এলমহার্স্ট থাকাকালে। তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন এবং গ্রামের মহিলাদের সন্তান প্রসবকালে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শিক্ষিত ধাত্রী তৈরী করার প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন।

স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ১৯৩০ সালের পর। এগুলিকে 'সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি' রূপে বলা চলতে পারে। ১৯৩০ সালে প্রায় ছয় মাসের মত সমগ্র পশ্চিম ইয়োরোপ, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি দেশে নানা প্রকৃতির সমবায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি দেখবার জন্য শ্রীঘোষ ভ্রমণ করেন। ফিরে এসে তিনি শ্রীনিকেতন হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির স্বাস্থ্যকেন্দ্র গ্রামে গ্রামে স্থাপন করেন, যা উপরোক্ত আমেরিকান মহিলার থাকাকালীন গ্রামে ছিল না।

এই ঐতিহাসিক তথ্যগুলির বিকৃতি যাতে না হয়, তাই আমায় এ চিঠি প্রকাশ করে বাধিত করবেন।—সলিল ঘোষ, বোম্বাই।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'প্রেম ও কবিতা প্রসঙ্গে' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শাণ্ডিল্য-র সাক্ষাৎকারটি পড়ে আনন্দ পেলাম। শ্রীশাণ্ডিল্য আচার্যদেবের বর্তমান মানসিকতার পরিচয় সাক্ষাৎকারে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধি ও মেধার সঙ্গে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে মফঃস্বলের পাঠক হিসেবে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পণ্ডিতকে তাঁর জীবন সায়াহ্নের ক্লান্ত দিনগুলো শান্তি ও নিরুদ্বেগের মধ্যে অতিবাহিত হতে দেওয়া উচিত। সাক্ষাৎকারে সুনীতিবাবুর কথাবার্তার মধ্যে বুঝলাম সভাসমিতির কোলাহলমুখর ব্যাপারগুলোতে যোগ দেওয়া এখন তাঁর কাছে যথেষ্ট বিরক্তিজনক ও ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া তাঁর কাছে খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে অনেকে যাতায়াত করেন। অনেক রকমে প্রশ্ন করেও তাঁকে বিরক্ত করা হয়। এতে তাঁর সৃজনমুখী চিন্তার অনবচ্ছিন্নতা ভেঙে যায়। ফলে তাঁর সম্ভাব্য গ্রন্থ রচনাতে তিনি সময় দিতে পারবেন না। এতে ক্ষতি হবে আমাদের। কেননা আর কতদিন তাঁকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে বলা যায় না। এর মধ্যে তাঁর অমূল্য চিন্তাধারা প্রসূত গ্রন্থগুলি যদি লেখা শেষ না হয় তাহলে জাতি এক বিস্ময়কর সৃষ্টিসম্পদ থেকে বঞ্চিত হবেন। কাজেই দেশবাসীর কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, অনর্থক সভা-সমিতি ইত্যাদিতে ডেকে যেন তাঁর জাতীয় অধ্যাপকের অমূল্য সময় নষ্ট না করেন। আচার্যদেব যেন তাঁর অবশিষ্ট দিনগুলো শান্তির মধ্যে সৃষ্টির কাজে ব্যয় করার সুযোগ পান। —**বিমলকান্তি ভট্টাচার্য**, আদ্রা পুরুলিয়া।

বাংলা গানের চাহিদা

'অমৃতে' ৭ জানুয়ারী সংখ্যায় নিরীক্ষক-এর 'বাংলা গল্প, অবাংলা ছবি' লেখাটি পড়লাম। অ-বাংলা ছবি করিয়েদের বাংলা গল্পের দিকে হাত বাড়ানোর যেসব কারণ তিনি লিখেছেন, আমি তার সঙ্গে একমত। তবে এর মধ্যে একটা বড় কারণ শ্রীনিরীক্ষক বাদ দিয়েছেন।

বোম্বের সিনেমা ব্যবসায়ীরা দেশের জরুরি অবস্থায় একটু বিপদে পড়েছেন। তাঁরা যেভাবে ইচ্ছা মতন ছবিতে যৌনাচারের উৎকট দৃশ্য দেখিয়ে দর্শকদের সস্তা আনন্দ দিচ্ছিলেন এখন তা একেবারেই পারছেন না। তাঁদের অর্থকরী ইচ্ছা শুধু খুন-জখম, মারামারি দিয়ে আর তেমন সুবিধা করতে পারছে না। ফলে তাঁদের নিটোল গল্প খুঁজতে হচ্ছে। আর এই গল্প খুঁজতে খুঁজতে তাঁদের বোনিয়াপ্রবৃত্তি বাংলায় এসে নোঙর ফেলছে। না-হলে 'শক্তিধর' পরিচালক শক্তি সামন্ত—যিনি একদা 'এ্যান ইভনিং ইন প্যারিস'-এর মতন চক্ষুলেহ্য ছবি করে হঠাৎ কি খেয়ালে যে 'অনুরাগ' কিংবা 'অমানুষ'-এর মতন ছবি করেন সহজেই বোঝা যায়। বোম্বাইয়ের অনেক পরিচালকই বাংলা গল্প খুঁজে আনার জন্য লোক লাগিয়েছেন শুনতে পাই। কেন? এসবই কি বাংলার সাহিত্য সম্পদের প্রতি শুভ অনুরাগ? নিঃসন্দেহে নয়।—**তপতী মোদক**। শিবপুর। হাওড়া।

আপনগন্ধা

দীপালী দত্তরায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রাগ-দুঃখের জ্বালার ওপর অপমানের জ্বালাবিছুটি লাগলো। পনেরোদিন সময় হাতে ছিল, পাঁচদিনও থাকা হোল না। পালিয়ে গেল বম্বেতে। সারা রাস্তা ট্রেনের চাকা আওয়াজ তুললো কি হোল, কি হোল? কেন হোল, কেন হোল?' বম্বে প্রায় অপরিচিত সহর। কাউকে চেনেও না, থাকলেও খুঁজে বার করবার ইচ্ছে হোল না। খুঁজে পেতে একটা ছোট্ট হোটেলে ঢুকে, আহত জন্তুর মতন, আঘাত লুকিয়ে বসে রইলো। কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই, কোনও দৃশ্য দেখার মন নেই, মাথায় কোনও চিন্তার জায়গা নেই। সব কিছু ফাঁকা। শূন্য। আর বুকের মধ্যে অসহ্য জ্বালা। মনে হোল কাজে জয়েন করবে না, ভেসে পড়বে আবার দুনিয়ার বুকে। চাকরী করে মানুষের মতন মানুষ হয়ে বেঁচে থেকে কি হবে? যার জন্য এতসব, সেই যদি তাড়িয়ে দিতে পারে কুকুরের মতন, তবে এ জীবন থাকলেই কি আর গেলেই বা কি? কিন্তু এত সব ভাবলেও রক্ত গরম হয়ে ওঠে, হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে, চোয়াল আঁট হয়ে বসে। মনে এক ভীষণ প্রতিজ্ঞা জেগে ওঠে শোধ নেবার। বদলা নিতেই হবে। বড়লোকের মেয়েকে শিক্ষা দিতেই হবে। এই মূর্খ অহংকারের জবাব দিতেই হবে। চাকরীতে জয়েন করার দিনে তাই নতুন অফিসে গিয়ে উপস্থিত হয়, নির্দিষ্ট সময়ে তার জন্য কোম্পানীর ভাড়া করা বাংলোতেও গিয়ে ওঠে। বাংলো রাঁচিক্যান্টিনে। সুন্দর জায়গা, বাংলোটিও সুন্দর। বাগান, মালী, গাড়ী শোফার, বেয়ারা জমাদার সমন্বিত রাজকীয় প্রায় জীবন সুরু হয় জয়ন্তর। শুধু এ জীবনে রাণীই অনুপস্থিত। যাকে এ সমস্ত দেখাবার আশায় এখনও মন ছটফট করে। জয়ন্ত নিজেকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। লোকসঙ্গ এখনও ভালো লাগে না। কাজের সময়টা কেটে যায়। টেনে টেনে সেটাকে যতটা পারে লম্বা করেও দিন যেন ফুরায় না। কোম্পানী নতুন, সহকর্মীর সংখ্যা বেশী নয়। অন্যান্য কর্মী যথেষ্ট থাকলেও উৎসাহ পায় না কারো সঙ্গে মেতে আলাপ জমাবার। কাজের কথা যতক্ষণ, ততক্ষণ সে বাক্যবাগীশ; বাকী সময়ে প্রায় মূক। কোম্পানীর নির্দেশে এবং খরচে এক ক্লাবের মেম্বার হয়েছে বটে, কিন্তু সেখানেও ভালো লাগে না। তাই সন্ধ্যেগুলো খাঁ খাঁ করে। কিছু ভালো লাগে না, গান শুনে। বিদেশ থেকে প্রচুর দুর্মূল্য আর দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড আর টেপ নিয়ে এসেছে। এনেছে স্টিরিয়োগ্রাম। সবই মঞ্জুর জন্য। মঞ্জু গান ভালোবাসে। বলে পাঠিয়েছে এটা কিনো ওটা কিনো। ফরমাশের অতিরিক্তই নিয়ে এসেছে সে। সে সবই সঙ্গী এখন, আর সঙ্গী বোতল। বিদেশে খেয়েছে, কিন্তু সে নিয়মরক্ষা বা প্রয়োজনের খাতিরে, কখনও কৌতূহলের বশে। কিন্তু এখন ওটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কখনও কখনও ভেবেছে চিঠি লিখবে মঞ্জুকে, অথবা খোকনকে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে কেন? আমি কি ভিক্ষুক? অতএব তার খবর কেউ ভালো করে পায়নি। বাবাকে মাসে মাসে ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠিয়ে দেয়। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান বিশেষ নেই। ইচ্ছে করেই ঠিকানা দেয়নি। স্বেচ্ছায়, প্রচণ্ড অভিমানে, কোলকাতার সকলের কাছ থেকে সে নির্বাসন নিয়েছে। এইভাবেই থাকবে। কাউকে তার প্রয়োজন নেই। ব্যাঙ্ক মারফৎই, মঞ্জুর কাছ থেকে, যাবার সময় যে টাকা নিতে হয়েছিল, সে টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্থের ঋণ তো শোধ করা গেল অন্তত? বাকীটা পরে হবে। হবেই সব।

ডুসেলডর্ফ থেকে মঞ্জুর জয়ন্তকে লেখা চিঠি ফেরৎ এলো। মঞ্জু কিছু বুঝে পেলো না। বৌদি সোমা, তখনও বাপের বাড়ীতে বাচ্চা নিয়ে। খোকনও সন্ধ্যা কাটায় সেখানেই। একদিন গেল বাচ্চাটাকে দেখতে। মনটা খারাপ। জয়ন্তর কোনও চিঠি নেই; খবর নেই। খবর নেবে এমন উপায় নেই। জয়ন্তর বাড়ীতে টেলিফোন নেই। ও বাড়ীতে কখনও যায়নি, হঠাৎ করে এখন যাওয়াও যায় না। সোমা আর সোমার বোন রুমা-ঝুমার সঙ্গে গল্প করে মনটা হালকা করবে ভেবে এলো। ভাইপোকে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করলো। তারপর ওদের সঙ্গে গল্প। মঞ্জু সকলেরই প্রিয়। মঞ্জুর রূপ আর গুণে মুগ্ধ সোমার বোনেরা। কথায় কথায় সে আলোচনা উঠলো। রুমা ঝুমা মঞ্জুর স্বামী বাছার ভার নিলো ভীষণ উৎসাহে। অনেক ভেবে ভেবে রুমা লাফিয়ে উঠলো পেয়েছি। খোকনদার বন্ধু জয়ন্ত। ওর সঙ্গেই লাগিয়ে দাও দিদি ওর বিয়ে। কি সুন্দর হয়ে এসেছে দেখতে। দিদির বিয়ের সময়ের চেয়ে হাণ্ড্রেড টাইমস বেটার। দারুণ চাকরীও বাগিয়েছে শুনলাম। দাও না দিদি ওর সঙ্গে মঞ্জুর বিয়ে?' মঞ্জুর সারা শরীরে ও মুখে কে যেন সপাং করে চাবুক মারলো। জয়ন্ত ফিরে এসেছে? অকৃত্রিম বিস্ময়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো। মুখের চেহারা প্রাণপণ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে। 'ওমা সেজো করে? এসে আবার বম্বে চলেও গেছে। খুব

ভাল কাজ পেয়েছে। আর কি যে হ্যাণ্ডসাম হয়েছে না?' মঞ্জুর কানে শুধু 'এসে আবার চলে গেছে'র পর আর কিছু ঢুকলো না। সোমা খোকন হৈ হৈ করে রুমার পেছনেই লেগেছে জয়ন্তর কথা তুলে, সে সব ওর মাথায় একবর্ণও ঢুকতে পারল না। হঠাৎ উঠে আবার বাচ্চাটাকে নিয়ে টানাটানি করলো। মুখভাব আর গোপন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে যাচ্ছে যেন। কিছুক্ষণ অনামনস্কভাবে বাচ্চাটাকে চটকাবার পর ওর সমস্ত সত্তা ঠেলে এক উদগ্র কান্না যেন বেরিয়ে আসতে চাইলো। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে 'আমি এখন চলি, কেমন?' বলে একরকম ছুটেই প্রায় বেরিয়ে এলো। কেমন করে গাড়ীতে এসে বসলো, চালিয়ে বাড়ী ফিরলো, ফিরে গাড়ী গ্যারাজ করে ওপরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো, কিছুই তার বোধগম্য হোল না। শুধু বুঝলো, সে বিছানা আর কোনও দিন ছেড়ে উঠতে পারবে না। চাইবে না। দরকার নেই। সবকিছুর দরকার ওর ফুরিয়েছে। আঙ্গি এসে অনেক ডাকাডাকি করলো খাবার জন্য। কোনও সাড়া না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো। পরদিন সকালে যখন অফিসের সময় পেরিয়ে যায়, তবু যখন উঠলো না মঞ্জু, তখন আঙ্গি অত্যন্ত ঘাবড়ে গিয়ে মাকে খবর দিল। মা এসে ঠ্যালাঠেলি করলেন, মঞ্জু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। ডাক্তার এলেন, দেখে শুনে বললেন, মনে হচ্ছে হঠাৎ কোনও কারণে শক্ পেয়েছে। রেস্ট দরকার। চিকিৎসা চললো। পালা করে আঙ্গি আর সদা ওর সেবা-শুশ্রূষা করলো। সামান্য ভাল হওয়ার পর আঙ্গি চিন্তিত মুখে জানতে চাইলো 'কি হয়েছিল বেবী?' মঞ্জু জবাব দিল না মুখ ফিরিয়ে নিল। শুধু এই কদিন বাদে এই প্রথম ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। সদাকেই ডেকে আনা উচিত মনে করলো আঙ্গি। চিরকাল সদা কিম্বা আঙ্গিই ওর কথা শুনেছে অথবা বের করেছে। মা বাবা এসে দাঁড়ালে ও আরো চুপ মেরে গেছে বরাবর। সদার হাতযশ বেশী কারণ সে ধমক ধামক একটু কড়া করে দিয়ে সব বার করে নিতে পারে। আঙ্গির স্বভাব মৃদু। সদা এসে স্বভাবসিদ্ধ গুরুগম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো 'কি? হয়েছেটা কি? কান্নাকাটি কেন? কে আবার আমার মঞ্জুদিদিকে কাঁদালো? সেই জয়ন্ত দাদা নাকি?' সদা দেশ থেকে ফেরার সংগে সংগেই মিঠুলালের ছুটি হয়ে গিয়েছে। কাজেই সে ঘটনা কারো জানা নেই; জানার কথাও নয়। মঞ্জুর যা অবস্থা অতদূর চিন্তা করে ঘটনা মিলিয়ে নেবে সে ক্ষমতাও নেই। তাছাড়া সে তো বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা। মঞ্জুর ধারণায় জয়ন্ত ফিরেছে আরো পরে। তাই এখন সদার কথায় মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজিয়ে নিল। চোখের ধার বেয়ে আরো দুটি জলের ধারা নেবে এলো। 'নিঘঘাত তাই।' সদা কিছু না দেখেই ঘোষণা করলো। 'তা সে করেছেটা কি বল দিদিমনি? চিঠি দিচ্ছে না? না কি মেম-সাহেব বিয়ে করবে বলে খপর দিয়েছে?' সদা খুব হালকা গলায় বললো। মঞ্জু মাথা নাড়লো জোরে জোরে। 'তাও নয়?' তবে হয়েছে কি?' 'ফিরে এসেছে।' 'ফিরে এসছে? তো তাতে কান্নাকাটির কি আছে? দেখা করতে আসেনি বলে বুঝি? আমি আজই গিয়ে ধরে নিয়ে আসবখন।' না না। ও এখানে নেই। চলে গেছে বম্বে। এসেছিল কিন্তু চলে গেছে।' মঞ্জুর গলা প্রায় বুজে এলো। সদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। ঘটনাটা অসম্ভব মনে হোল তার। জয়ন্ত ঠিক কথার খেলাপ করার লোক বলে ও কোনওদিন মনে করেনি। অথচ—। শিশুকে সান্ত্বনা দেবার ভংগীতে সে বললো 'তা যদি না এসে থাকে তো পরে আসবে। হয়তো চিঠি লিখবে, জানাবে কি অসুবিধা ছিল। ও নিয়ে তুমি আবার মাথা ঘামাচ্ছ, বলে আসবার পথ পাবে না। আর না আসে তো বয়েই গেল। আরো কত কত ভালো ছেলে আসবে। তোমার আবার এ নিয়ে ভাবনা।' দুর্বল গলায় যতটা পারে চেঁচিয়ে মঞ্জু বললো 'দূর হয়ে যাও এখান থেকে।' আঙ্গি তীব্র ভর্ৎসনা চোখে নিয়ে সদার দিকে তাকাল। সদা মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি পালালো।

২য় অধ্যায়

মঞ্জুর মা রেণুকা মিত্র এক আশ্চর্য মহিলা। অসম্ভব রকমের ফর্সা রং। হালকা শরীর। হাত ও পায়ের পাতা আশ্চর্য রকমের স্বচ্ছ। চোখ মুখ প্রায় ভাবলেশহীন। জীবনের কোনও সময়ে কোনও বয়সে তার চোখে মুখে রং লেগেছিল কিনা সেকথা একমাত্র তাঁর স্বামী মনোজ মিত্রই বলতে পারেন। এ সংসারের আর কেউ সেকথা [illegible] না। জানার সুযোগ হয়নি। অ[illegible] আলোর মাঝখানে যদি তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন কেমন একটা অশরীরি আলোর মূর্তি বলে ভ্রম হয়। অনুজ্জল ছায়া--ছায়া আলোর মাঝখানে যখন দেখা যায় তখনও যেন তাঁকে ভালো করে দেখা হয় না। তিনি যেন সামনে থেকেও আশ্চর্য-ভাবে অনুপস্থিত। তাঁর দেহ আর মন যেন সদাসর্বদা এক অদ্ভুত নেতিবাচক লীলায় মগ্ন হয়ে আছে। প্রথমে দেখলে বিস্ময় জাগে। তারপর বারকয়েক দেখার পর আর যেন মনেই থাকে না তিনি আছেন সামনেই। নির্বাক নিশ্চল প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে যেন এক উদাসীন নিরুপায় হয়ে বসে আছে। পালিয়ে যাবার পথ নেই অথবা উপায় নেই তাই আছেন নতুবা থাকার যেন কোনও কারণ প্রয়োজন অথবা আগ্রহ নেই।

মনোজ মিত্রের সামাজিক জীবন খুব একটা সরগরম নয়। বেশীর ভাগ সফল ব্যারিষ্টারের মতন তাঁরও ব্রীফ দেখে জুনিয়রদের পরামর্শ নির্দেশ ইত্যাদি দেওয়া এবং কেবলমাত্র কেস সম্বন্ধেই আলোচনা করা ছাড়া তাঁর বিশেষ কিছু করা অথবা কোথাও যাবার সময় হয় না। ইদানীং স্বাস্থ্যও সামান্য ভাঙছে। ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে খোঁজ রাখার বিশেষ সময়ও পান না মনেও থাকে না। যতটুকু সময় পান যেন উপস্থিত অথচ নিরুদ্দেশ স্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণেই সেটুকু ব্যয় করেন। নির্বাকপ্রায় রেণুকা চিরকাল শ্রোতার ভূমিকা নিয়েই বিরাজ করেন স্বামীর সামনে। আলোচনা বেশীর ভাগই 'কেস' সংক্রান্ত। কখনো সখনো পরিবারভুক্ত কারো কারো বিষয়েও হয়। এমনকি যে ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে তাঁরা অবিশ্বাস্যরকমের উদাসীন তাদেরও সম্বন্ধে হয়। যেমন আজ হচ্ছিল মঞ্জুর সম্বন্ধে। রাত্রি নটা বেজে গেছে। মনোজ মিত্র তাঁর লাইব্রেরীরুম থেকে উপরে উঠে এসেছেন। রোজ এই সময়ে আসেন। ঠিক নটা বাজলেই সদা গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এবারে ওপরে যাবার সময় হয়েছে। সারা-দিনের কাজ শেষ। এবারে উপরের ঘরে এসে স্নান সেরে একটি অথবা দুটি স্কচের পেগ নিয়ে বসবেন রেণুকার সামনে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট এমনিভাবেই কাটবে। তিনি মৃদুস্বরে যা হোক কিছু নিয়ে আলোচনা করবেন। রেণুকার হাত চলবে উল অথবা ক্রুশের কাঁটার সংগে সংগে। মনোজ ধীরে ধীরে চুমুক দেবেন গেলাসে। দুটি পেগ শেষ হবে। শোবার ঘরের পাশেই একটি আলাদা খাবার ঘরের ব্যবস্থা আছে। সদা সেখানে সব নিয়ে উপস্থিত। স্বামী স্ত্রী উঠে গিয়ে খেতে বসবেন। খাওয়া সাংগ হলে মনোজ একটি সিগার ধরাবেন। সেটি কখনো শেষ হয় কখনো শেষ হয় না। এরপরেই শোবার আয়োজন। ভোর ছটায় যে দিনের শুরু সে দিনের শেষ এমনিভাবে। রোজ। চির-কাল। অন্তত যারা এখন চারপাশে আছে তাদের চোখে এর ব্যতিক্রম কখনো ধরা পড়েনি। মনোজ কখনো বুফলেস ছিলেন কিনা, হাতে তাঁর অপর্যাপ্ত সময় কখনো ছিল কিনা স্ত্রী অথবা শিশু সন্তানদের নিয়ে কখনো উজ্জ্বল উদ্বেল হয়ে উঠতেন কিনা অথবা উঠতে চাইতেন কিনা সে কথা কেউ মনে করতে পারে না। সমস্ত কিছুর প্রায় সাক্ষী সদাও না। রেণুকা চিরকালই প্রস্তর মূর্তি। সে পাষাণে আঁচড় ফেলার ক্ষমতা হয়তো মনোজ মিত্রের কোনও দিনই ছিল না নেই। স্যার বিরাজমোহনের কন্যা শ্বেতপাথরের প্রতিমূর্তি রেণুকা বসু সদ্য বারে প্রতিষ্ঠিত উঠতি ব্যারিষ্টার মনোজ মিত্রের গৃহিণী হয়ে আসার আগে প্রাণটুকু অন্য কারো কাছে গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন অথবা প্রাণ নামক বস্তুটি কোনও কালে আদৌ তাঁর ছিলই না, এ খবর মনোজ মিত্র সম্ভবত পান নি। নানান উপায়ে অবশ্যই চেষ্টা করেছেন। হার মেনে, মনে মনে একটা ভাসা ভাসা ধারণাও করে নিয়ে-ছেন, কিন্তু পাষাণময়ীর মুখ থেকে একটা কথা বার করতে পারেন নি কোনও দিন এ বিষয়ে। অগত্যা স্ত্রীর বিগত জীবন বলে কিছু আছে কিনা, এ বিষয়ে নিরর্থক গবেষণায় কালক্ষয় না করে 'প্র্যাকটিস'এর দিকে সমস্ত মনোযোগ নিয়োজিত করেছেন।

তবু আজো এই নির্বাক প্রতিমার সামনে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে, হয়তো এখনও মনের অগোচরে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে যান। হয়তো ভালোবাসেন স্ত্রীকে; নয়তো 'ভালোবাসি' এই ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রতিদিনের নিয়ম পালন করেন। তাই দেখে মঞ্জু ভাবে, ভালোবাসা কি অভ্যাসমাত্র? না কোনও এক গোধূলির স্মৃতি, এবং সেই সন্ধ্যায় প্রায় এক অশিক্ষিত পুরোহিতের নির্দেশনায় নিরুত্তাপ দুটি হাত এক করে, অর্থ না বোঝা কোনও এক অংগীকার, আমরণ, বিনা প্রশ্নে, বিনা প্ররোচনায় মেনে যাওয়ার নির্বুদ্ধিতা মাত্র? মা বাবাকে নিয়ে বেশী ভাবতে মঞ্জুর ভয় করে। ঐ চিরকালের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অভ্যাস ও অন্যমনস্ক প্রয়োজন মেটানোর সম্পর্ক, তার মনে ভীতির সঞ্চার করে। জীবন মানে উত্তাপ। ভালোবাসা মানে আগুন, যে আগুন ছাড়া সংসার অচল। সে আগুন যদি জ্বালায়ও তবু তা কাম্য। শীতল সহাবস্থানের চেয়ে তা শতগুণে বাঞ্ছনী

মার খুব কাছে আসতে ও কোনও দিন সাহস পায়নি। ঐ নিরুত্তাপ সান্নিধ্য তাকে এক অসহ অস্বস্তিতে অস্থির করে তুলতো। ছুটে পালিয়ে যেত খানিকক্ষণ থাকার পরই। ঝাঁপিয়ে পড়তো আঙ্গী-র ওপর নয়তো অত্যাচার চালাতো সদার ওপর। ওদের বকুনী কিম্বা তাড়নাও ওর কাছে অমৃত মধুর মনে হোত, মায়ের ঐ নিশ্চুপ উপস্থিতির চেয়ে। মাকে সে ভালো রকম চেনেই না। বাবাকেও নয়। তবু বাবার প্রতি এক আশ্চর্য মমতা বোধ করে। তার মনে হয়, মা যেন চিরকাল বাবাকে ভয়ানক রকমের ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। বাবার জীবনের আঙিনায় কোনও রুবোষ্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করে, কোনও দিন সেখানে এতটুকু সবুজের ছোঁওয়া আনেন নি। একটিও ফুল ফোটান নি। আরো ছোট যখন ছিল, তখন ভাবতো, কেন মেনে নিলেন বাবা, মায়ের এই চিরশীতলতা? কেন তাঁর নিজের উত্তাপে সে শীতল পাষাণ গলালেন না? কেন এ সংসারে এক অতি প্রয়োজনীয় স্নেহ প্রীতির নিঝরিণী বহিয়ে দিতে সাহায্য করলেন না? বাবা কেন এত অসহায় হয়েই রইলেন? এই ক্ষোভে, দুঃখে সমবেদনায় বাবাকে মনে মনে সে বড় ভালোবাসে। কিন্তু এ সংসার সবকিছু নিয়েও ফুলে ফলে সুরভিত হয়ে উঠলো না, ওঠাবার জন্য বাবাও কোনও দিন চেষ্টা করলেন না, নিজের হয়ত কোনও একটা নিয়মিত সুখ অথবা স্বাচ্ছন্দ্য মাত্র সৃষ্টি করে সন্তানদের কথা ভুলে রইলেন, এ অভিমান তার মনে এত প্রবল হয়ে রইলো, যার জন্য তার মমতায় ভরা মনটিকে চিরকাল লুকিয়েই রাখলো। খোকন কিম্বা বাবলুর মনে এ নিয়ে কোনও বিকার অথবা ক্ষোভ আছে কিনা তা সে জানে না। কোনও এক অলিখিত নিয়মে এ নিয়ে তারা কোনও দিন আলোচনা করে না।

আজ যখন মঞ্জু উনিশ বছর বয়সে এত বড় আঘাত পেলো, তখন সে মুখ লুকিয়েই রইলো। যতটুকু জানার, সদা এবং আঙ্গীই জানলো। পরিবারের আর কারো সঙ্গে এ আলোচনা করার কথা অথবা পরামর্শ করার

কথা তাদের মনেও এলো না। শুধু মঞ্জুর এই অসহ দুঃখ দেখে, সমবেদনা আর সমদুঃখে ওরাও মূক হয়ে রইলো।

আজ সন্ধ্যায় মনোজ মঞ্জুর কথাই তুললেন রেণুকার সামনে। জানতে চাইলেন ও সুস্থ হয়ে উঠেছে কিনা। রেণুকা মৃদুস্বরে জানালেন সামান্য সুস্থ হয়েছে মনে হচ্ছে। মনোজ নিজের মনেই যেন বললেন 'কিন্তু এতখানি শক্ সে পেলো কি করে? যমুনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, সে তো কিছু জানে না? কি এমন হয়ে থাকতে পারে? ডাক্তার যা অনুমান করছেন তা তো হ কথা নয়? তার সঙ্গে এমন কারো ঘনিষ্ঠতা ছিল বলেও তো ওরা কেউ জানে না? থাকলে যমুনার অন্তত জানা উচিত ছিল?' রেণুকা চোখ তুলে তাকালেন স্বামীর দিকে। নির্জীব স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি ধারণা ও জিল্টেড হয়েছে? আর যদি হয়ে থাকে যমুনা সেটা জানবে?' 'জানবে না? জানা অন্তত উচিত।' 'কেন?' 'যমুনা ওর মার মতন।' মনোজ অন্যমনস্কভাবেই বললেন। কোনও ক্ষোভের সুর বেজে উঠলো না গলার আওয়াজে। মঞ্জুর আসল জননীর প্রতি কোনও অনুযোগের সুরও নয়। তাহলে যমুনাকে ডেকেই জিজ্ঞেস করে নাও। যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে তবে একটা ব্যবস্থা করার কথাও চিন্তা কর।' রেণুকা হঠাৎ একটু অস্থির হলেন বেনিয়মে। কণ্ঠস্বর শীতলতায় আর এক ধাপে নাবলো। বললেন, 'নিজের মেয়ের প্রতি তোমার এটুকু কর্তব্য আছে বলে কি তুমি মনে করো না?' মনোজ বিস্মিত হলেন। ভেবে পেলেন না, তাঁর কি করণীয় থাকতে পারে এতে। ক্ষুন্ন স্বরে বললেন, 'আমি কি করতে পারি বল?' রেণুকা তখনই জবাব দিলেন না। স্বভাব মতন আবার শুধু হাত চলতে লাগলো ক্রুশের কাঁটার সঙ্গে। মুখ রইলো বন্ধ। মনোজও তলিয়ে গেলেন ভাবনায়—।

খাওয়ার সময় হয়ে আসছে। মনোজেরও দুটি পেগ শেষ। ক্রুশ কাঁটা আর সুতো গুছোতে গুছোতে রেণুকা ধীরে সুস্থে উঠলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন 'আর কিছু না পার, ধরে বেঁধে ভালো দেখে একটা বিয়ে দিতে পারো? সব মুশকিলের আসান? নাকি আজকের মেয়েকে দিয়ে আর তা করানো যায় না?'

মনোজ স্তম্ভিত। দীর্ঘকাল সাধ্যসাধনায় যে কপাট খুলেছিল না বলে, বন্ধই পড়েছিল, এত কাল, আজ যেন তা আলতো হাতের ছোঁওয়ায় হঠাৎ খুলে গেল। বিয়ের প্রায় তিরিশ বছরেরও বেশী দিন পর, নিজের প্রত্যাখ্যাত চেহারাটা সম্যক উপলব্ধি করলেন। উঠতে যাচ্ছিলেন, বসে পড়লেন। সারা জীবনের বিবর্ণ চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে উঠলো। নীরস, নিরক্ত জীবন। যা তাঁর সত্যিই প্রাপ্য ছিল কিনা কোনও দিন বুঝে উঠতে পারেন নি। একটা অদ্ভুত ভোঁতা ব্যথায় মন ভরে উঠলো। জোর করে বিয়ে? অনাসৃষ্টিকে? মঞ্জুকেও তাই করতে হবে? কখনও নয়। তবে কি মঞ্জুকে যে দুঃখ দিল, তাকেই কোনও উপায়ে ধরে এনে বিয়ে দেবেন মেয়ের? তাও কি সম্ভব? আজকের দিনে? যদিই বা সম্ভব হয়, মঞ্জুর জীবনের সমস্ত আগামী দিনগুলি কি এমনি নিষ্ঠুর উপেক্ষায় ভরে উঠবে না? তা হয় না, কিছুতেই হয় না। রেণুকাও নিশ্চয়ই তা চান না? নিজের জীবনে যে দুঃখ পেয়েছেন, তারই পুনরাবৃত্তি মেয়ের জীবনেও ঘটুক। এ কখনই তিনি চাইতে পারেন না। আবার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠলো। পরস্বাপহরণের গ্লানিতে মন যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। সারাজীবন শুধু কাজের চিন্তায় নিজেকে বিভোর রেখেছেন। সারা দিনের ক্লান্তির পর এই যে একটুখানি জুড়িয়ে নেওয়া, ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মনকে, এও যেন রেণুকা হঠাৎ আজ কেড়ে নিলেন। তাঁর এ সংসারে পাওনা বলতে যেন আর কিছুই রইলো না। তাঁর নিজের ধরনে যতটুকু পেরেছেন, সবই তো দিয়ে এসেছেন চিরকাল। যতটুকু হোক, পাচ্ছি বলে মনকে যে সান্ত্বনা দিতেন এতকাল, তাও আর রইলো না। এই সাতান্ন বছর বয়সে, তাঁর ফ্যাকাশে নিরক্ত জীবন যেন একটা ধুলির ঝড়ে একেবারেই মলিন হয়ে গেল। জীবনসঙ্গিণীর আগ্রহের অভাবে, তাঁর নিজের সব আগ্রহ ধীরে ধীরে কবে থেকেই তো ঝরে ঝরে পড়ছিল। আজ যেন দমকা হাওয়ায়, জীবন সম্বন্ধে অবশিষ্ট যেটুকু অনুরাগ বা অনুভূতি ছিল, তাও একরাশ বৃন্তচ্যুত ফুলের মতন একসঙ্গে খসে পড়লো। নিজেকে এত রিক্ত, নিঃসহায়, এত আশ্রয়চ্যুত আর কখনো মনে হয়নি।

ছেলেদের প্রায় চেনেনই না। মেয়েকে কখনো কখনো কাছে ডেকে আনার ইচ্ছা মনে জেগে, অনভ্যাসের লজ্জায় আপনা থেকেই মিলিয়ে গেছে। শুধু পুত্রবধূ সোমাকে মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখেন। তার, এই সংসারটাকে আবার একজোটে বাঁধার চেষ্টা, সকলের প্রতি মায়া মমতা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবার আকাঙ্ক্ষা দেখে কখনো সখনো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। নারীর স্নেহময়ী রূপ, তাঁর অপরিচিত বুভুক্ষু এক অতিগোপন হৃদয়কে কোথায় যেন ঘা মারে। নিজেকে দীনহীন মনে হয়। নিজের এই শিশুর মতন কাঙ্গালপনা দেখে লজ্জায় যেন আরো দূরে, আরো আড়ালে চলে যেতে ইচ্ছে করে। ছেলেকে ঈর্ষা হয়। ভাবেন ও কোন গুণে এতসব পাচ্ছে? তিনি কেন পেলেন না?

উঠলেন অভ্যাসবশতঃ। উঠে খাওয়ায় বসলেন। সামান্য খেলেন। খাওয়ার ইচ্ছা অনেক আগেই উধাও। জানেন, না খেলে, কোনও চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠবে না, কোনও মন চিন্তিত হয়ে পড়বে না। কোনও হৃদয় বিষণ্ণ ব্যাকুল হবে না। জীবনের এই ধারা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই নিরুত্তাপ অনৌৎসুক্য, অযথা প্রশ্ন-হীনতার এই নিষ্ঠুরতা আজ তাঁকে চারদিক থেকে চেপে ধরলো। মনে হোল, শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। মনে হোল কেউ নেই তাঁর, কেউ কোনও দিন ছিল না, কোনওদিন থাকবে না। অসুখ হলে ডাক্তার আসবে প্রয়োজনমত নার্স। ঔষধপত্র কোনও কিছুরই অভাব ঘটবে না, শুধু হৃদয়ের কাছে হৃদয়ের উত্তাপ নিয়ে কেউ কোনওদিন এগিয়ে আসবে না। জীবন নির্জন জীবন নিষ্প্রাণ জীবন শুধুমাত্র একক। আর তিনি নিজেই তা মূর্খের মতন হতে দিয়েছেন। স্ত্রী সন্তান কারো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হাত দেননি কোনওদিন অকারণ অশোভন প্রশ্ন করেননি কোনও ঔৎসুক্য দেখাননি। শুধু গম্ভীর স্বাতন্ত্র্যে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন দূরে। ব্যক্তিত্বের মহিমায় নিজেকে অচল অটল রেখেছেন। অনাবশ্যক কারো সঙ্গে কথা বলেননি, অসময়ে ডাকেননি বিনা প্রয়োজনে কাছে এগিয়ে যাননি। স্ত্রী সন্তান সকলের জন্য আলাদা আলাদা মহল তৈরী করেছেন, সব মিলিয়ে একটি গৃহ দেননি। স্বাধীনতা দিয়েছেন ভালোবাসা দেননি স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন সুখ ও সাহচর্য্য দেননি। স্ত্রী সন্তান সবাই মিলে একই বাড়ীতে বসবাস করছেন যেমন করছে অসংখ্য চাকরবাকর কিন্তু কেউ কারো মনের কাছাকাছি নেই। বুকের পাশটিতে নেই। শুধুমাত্র একটি নাম সকলকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করে রেখেছে।

তাঁর ছেলেবেলাতে কি এর বেশী কিছু পেয়েছিলেন? অথবা চেয়েছিলেন? তাঁর মা বাবা কি কাছাকাছি ছিলেন পরস্পরের? অথবা সন্তানদের? মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে তাঁরাও এভাবেই চাকরবাকর আয়া ইত্যাদির মাঝখানেই শৈশব কাটিয়েছিলেন! তারপর বোর্ডিং স্কুল কলেজ বন্ধুবান্ধব। এই ছিল জগৎ। বাড়ীতে বাবা ছিলেন অবিসম্বাদী সম্রাট। মা সম্রাজ্ঞী। কিন্তু তাঁরাও ছিলেন কিছু দূরের মানুষ। মার সঙ্গে দিনে একবার করে দেখা করার রেওয়াজ ছিল। কবে তাও ঘুচে গেল তাও মনে পড়ে না। আসলে মনোজ ভাবলেন আমরা যেভাবে মানুষ হয়েছি যে আবহাওয়া এবং পরিবেশে যে ধারায় তাতে পরিবারের প্রতিটি লোকের প্রতি বংশগত আনুগত্য ছাড়া আর কোনও বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠবার সুযোগ অথবা সুবিধা হয়নি। এতকাল তার প্রয়োজনও বোধ করিনি। পারিবারিক মর্যাদার ঐতিহ্য বহন করে যাবো, বংশ বৃদ্ধি করে যাবো সন্তানসন্ততির জন্য অর্থ মর্যাদা আভিজাত্যের নিদর্শন রেখে যাবো, এমনিই একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে চলেছি এতকাল। আমার পূর্বপুরুষদের আমল থেকে আমার যৌবনকাল পর্যন্ত একইভাবে চলেছে। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠার পর তাদের কর্মধারা একটা বাঁধাধরা নিয়মে স্থির হয়েছে, বিবাহ স্থির হয়েছে বংশমর্যাদা অনুসরণ করে। সকলের কথা জানেন না তিনি অন্তত এটাকে অমোঘ বলেই মেনে নিয়েছেন এবং সেই একই রীতিতে তাঁর জীবন এবং পরিবারের সকলের জীবন চালিয়ে এসেছেন। আসতে চেয়েছেন। কিন্তু সময় যে কখন পাল্টে গেছে কার মনে বিদ্রোহ অসন্তোষ দানা বাঁধছে কে বা কারা এ রীতিকে অগ্রাহ্য করার জন্য তৈরী হচ্ছে তা বুঝতেও পারেন নি।

(ক্রমশঃ)

অরবিন্দ ঘোষ

মনোরঞ্জন বসু
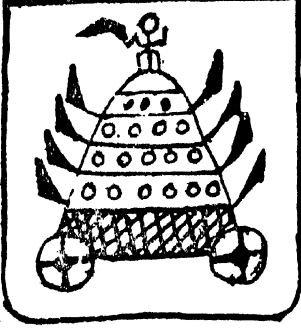
জগতে এক জাতের লোক আসেন জন্ম থেকেই যাঁরা মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, এক ধরনের মানুষ আসেন ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—সে-সব লোকোত্তর প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবন কথা ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। অচিন্ত্য দৈবী শক্তির লীলাক্ষেত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন কথা এক গভীর রহস্য। ক্রান্তদর্শী, কবি-দার্শনিক, বিপ্লবী মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা এখানে বলা হবে ২-টি প্রবন্ধে, লোকশিক্ষার জন্য। প্রথমটি অরবিন্দের শিক্ষা ও কর্ম-জীবন, দ্বিতীয়টি শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন—উভয়ের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র বিদ্যমান।

পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আছ জাগি পরিপূর্ণতার মাঝে সর্বলাধাহীন।' সেই সদা-জাগ্রত, জীবন্মুক্ত পুরুষটির জন্ম হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট, কলিকাতা মহানগরীতে। পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ সিভিল সার্জন, মাতা স্বর্ণলতা দেবী, বিদুষী, সর্বগুণান্বিতা। তিনি ছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। পিতা ডাঃ কৃষ্ণধনের চিত্তে যে ভগবৎ-এষণা বীজস্বরূপে নিহিত ছিল, পুত্র অরবিন্দের সত্তায় সেই বীজ মহীরুহে পরিণত হয়ে আজ দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষ্ণধনের লক্ষ্য ছিল বংশ-পরম্পরায় মানবজাতির উন্নতি সাধন, অরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য মানুষকে দিব্য স্তরে উত্তরণ। পিতা কৃষ্ণধনের মতে সত্য-ভগবান, ভগবানের সৃষ্টি, পুত্র অরবিন্দের মতে কেবলমাত্র কর্ম ও বহিরঙ্গ দ্বারা ভগবৎ উপাসনার পূর্ণতা ঘটে না, তিনি চেয়েছিলেন 'ব্রহ্মৈব কেবলম,' 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-র উপলব্ধি। কৃষ্ণধনের জীবনব্রত ছিল গতানুগতিক নীতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা পুত্র অরবিন্দের লক্ষ্য ছিল সনাতন, অনন্ত ব্রহ্ম সত্তা উপলব্ধি করা—যা চরম ধর্ম ও নীতির ঊর্ধ্বে—যে ধর্ম লাভ করতে হলে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করতে হয়।

পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন তাঁর তিন পুত্র (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ) ছাড়া সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন পরবর্তীকালে তা অনেকখানি সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, 'বেনো (জ্যেষ্ঠপুত্র বিনয় কুমার) কাজ-কর্মে পিতৃতুল্য হবে, তার কর্মের গণ্ডী হবে স্বল্পপরিসর। কর্মজীবনে বিনয়কুমার কুচবিহার রাজ দরবারে কাজ নেন এবং সেখানেই তাঁর কর্মের সমাপ্তি। দ্বিতীয় পুত্র মনো (দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহন) লাভ করবে পিতার আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে বিশ্বব্যাপী আত্মার অভীপ্সা এবং মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কাব্য-প্রতিভা। কর্মজীবনে মনোমোহন ঘোষ কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের খ্যাতনামা ইংরেজীর অধ্যাপক হন—তাঁর বৈদগ্ধ্য ও কাব্য-প্রতিভা ছিল গভীর ও বিস্ময়কর। অরবিন্দ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'অরো তার দেশকে মহিমা-মণ্ডিত করিবে চমৎকার পরিচালনা ও ব্যবস্থা দ্বারা।' শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভা সম্পর্কে আজ একথা বলা যায়, 'অরবিন্দের প্রতিভা পর্বত কন্দর-জাত নির্ঝরিণীর মত, প্রথমে স্বল্প পরিসর কিন্তু দুর্জয় ধারায় প্রবাহিত হইয়া কালক্রমে বিশাল স্রোতস্বিণীতে পরিণত হইল। সেই
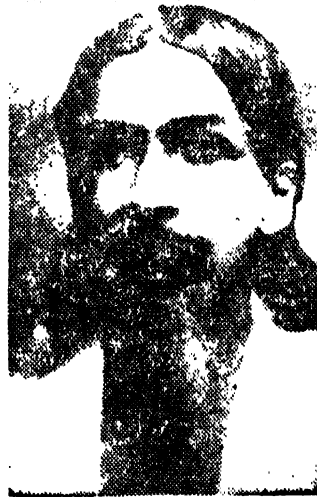
শ্রীঅরবিন্দ

স্রোতস্বিণী আজ মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত।' এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য—স্বদেশী যুগে রাজনারায়ণের স্বদেশ প্রেম, স্বাদেশিকতা যেমন একদিকে তাঁকে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁর পাণ্ডিত্য ভগবদভক্তি, ব্রহ্ম-জ্ঞান তাঁকে ঋষির তুল্য আসন দিয়েছিল। মাতামহের ঐ সকল গুণ অরবিন্দের সত্তায় প্রকট হয়ে বৃহত্তর সার্থকতা লাভ করেছিল।

অরবিন্দের শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয় দার্জিলিং-এর লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে। তখন তাঁর বয়স ছিল পাঁচ, সেখান থেকে পরে বিলাত যান এবং ড্রয়েট দম্পতির কাছে পড়াশুনা করেন। ড্রুয়েট সাহেব ল্যাটিন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন—তাঁর কাছ থেকেই অরবিন্দ ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। পরে লন্ডনের সেন্ট পলস স্কুলে ভর্তি হন। সেখানকার প্রধান শিক্ষক গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি অরবিন্দকে উত্তমরূপে গ্রীক ভাষা শেখান। বিলাতে স্কুল জীবনে ৫ বৎসরের মধ্যে অরবিন্দ ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে য়ুরোপের ইতিহাস পাঠ আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালে আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত মানব মিলনের ইতিহাস এবং সামাজিক বিবর্তনের মনস্তত্ত্ববাদ প্রবন্ধে অরবিন্দের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিবিড়—পরিচয় তিনি ঐ সময় লাভ করেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূলকথা এবং পাশ্চাত্য-দর্শন তাঁহার নিকট 'হস্তামলকবৎ' হয়ে যায়। পাশ্চাত্যের জ্ঞানের গণ্ডী কতদূর ইহার বাধা তার কারণ কি, কিংবা প্রাচ্যের জ্ঞানৈশ্বর্য কোথায়, তা উপলব্ধি করা জগদ্বাসীকে দেখান অরবিন্দের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাঁর এই ব্যাপক ও বহুমুখী শিক্ষার জন্য।

অরবিন্দ নিজের সম্পর্কে নিজে কখনও কিছু বলতেন না। তাঁর লিখিত 'ভগবৎ জীবন' তাঁর আত্মজীবনী ঘটনা সেখানে মুখ্য নয়, ছন্দ সেখানে প্রধান এবং সে ছন্দ হচ্ছে চেতনার বিকাশ। একমাত্র পিতাকে লিখিত পত্রাংশে অস্কার ব্রাউনিং অরবিন্দের পরীক্ষার উত্তর পত্র সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন, তার উল্লেখ দেখা যায়। অস্কার ব্রাউনিং বলেছিলেন 'আমি তেরটি পরীক্ষার উত্তর পত্র পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু তোমার

মত চমৎকার উত্তর পত্র আর দেখি নাই—তোমার প্রবন্ধটি অদ্ভুত হয়েছে।' উক্ত প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অরবিন্দ পিতাকে লিখেছিলেন....এই প্রবন্ধে 'শেক্স-পিয়রের সহিত মিলটনের তুলনায় আমি প্রাচারুচির যথাসম্ভব পরিচয় দিয়াছিলাম, ইহাতে ভরপুর ছিল গাম্ভীর্যপ্রধান দেশসুলভ কল্পবিলাস, আর ছিল ভাষার অলংকার বৈচিত্র্য এবং ইহাতে নির্বাস ভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল আমার যথার্থ হৃদয়াবেগ।

বাল্যকাল থেকেই একান্ত বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত, বিলাতী আবহাওয়ায় মানুষ হলেও, ষোল-সতের বৎসর বয়সেই অর-বিন্দের মধ্যে ভারতীয় সত্তা জাগ্রত হয়েছিল এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজের চেষ্টায় প্রাচ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়ে-ছিলেন।

কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেই অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন, (১৮৯০), এবং ঐ পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। লাতিন ও গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন এবং বীচক্রফট্ নামে এক সাহেব দ্বিতীয় হন, (ভাগ্যচক্রে ঐ সাহেবের নিকট আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের বিচার হয়েছিল।); কিন্তু আই সি এস-র চাকুরী তিনি পরিত্যাগ করেন। কারণ সম্ভবত তখনই তিনি উপলব্ধি করে-ছিলেন যে, এক মহান ব্রতে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। ঐ সময়ে নিজের চেষ্টায় তিনি ইতালী, জার্মান ও স্পেনীয় ভাষা শেখেন। পূর্বেই তিনি ভাষা শিখেছিলেন। পরে তিন বৎসরের জায়গায় দুই বৎসরের মধ্যে প্রাচীন ভাষায় ট্রাইপোজ পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি উত্তীর্ণ হন—কিন্তু দ্বিতীয়াংশের পরীক্ষা তিনি দেন নি। কোন প্রকার ডিগ্রী বা ব্যক্তি-জীবনের সাফল্যের প্রতি কোনদিন তাঁর কোন মোহ ছিল না।

ইংল্যান্ড থাকাকালীন শেষের দিকে বিশেষ কষ্টের মধ্যে অরবিন্দ দিন কাটান, অনেকদিন তাঁকে অর্ধাশনে থাকতে হয়—বৃত্তির টাকায় কোনপ্রকারে দিন গুজরান করেন। কিন্তু সে সময়েও তিনি তাঁর জ্ঞান-আহরণের পথ থেকে এতটুকু সরে আসেন নি।

অবশেষে স্যার হেনরি কটনের ভ্রাতা জেমস্ কটন সাহেবের সহায়তায় বরোদার মহারাজা সায়াজী রাও গায়কোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, অরবিন্দ বরোদা রাজ্যের কাজে যোগ দেওয়ার সংকল্প করেন এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যান্ড ত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসেন। অরবিন্দের বয়স তখন ২১ বৎসর। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তিনি এক গভীর স্তব্ধতা অনুভব করলেন, মৌনী ভারতের অন্তরাত্মার বাণী তিনি শুনলেন, তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন।

অরবিন্দের কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনদিন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে তিনি কোন কাজ করেন নি—সর্বাবস্থায় তাঁর দৃষ্টি ছিল কোন সুদূরে লক্ষ্যে নিবদ্ধ, যে লক্ষ্যে পৌঁছিলে সব কিছুই শান্তিময়, আনন্দময় হয়ে উঠে।

বরোদার শান্ত পরিবেশের মধ্যে অরবিন্দের জ্ঞান-তপস্যা ও রাজনীতিক পরিকল্পনা চলতে লাগল। চোদ্দ বৎসর বিদেশে থেকে তিনি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-সমুদ্রের অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করে-ছিলেন, বরোদায় এক যুগ—'তিনি প্রাচ্যের আদি অনন্ত জ্ঞানার্ণবে নিমগ্ন রইলেন'। বরোদায় অরবিন্দ ভারতীয় সাহিত্য, ধর্ম, তত্ত্বদর্শন, যোগদর্শন প্রভৃতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং গুজরাতি, মারাঠি, বাংলা প্রভৃতি কয়েকটি ভারতীয় ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করেন। তা ছাড়াও কবি সুরেশচন্দ্রের একটি লেখা থেকে জানা যায় যে, কলিকাতা ত্যাগ করবার পূর্বে অরবিন্দ তামিল ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। এই তপস্যায় তিনি ছিলেন একক এবং তাঁর অধ্যয়ন বিলাতে থাকার সময়ের মতই ছিল অতন্দ্র।

বরোদায় এই গভীর জ্ঞান-তপস্যায় অরবিন্দের চিত্তে পূর্ণ জ্ঞান কুম্ভের উদয় হয়, 'এই জ্ঞান-সূর্যের উষার লালিমায় উদ্ভাসিত হল স্বদেশী যুগের বাংলা—তার ছটা পড়ল সমগ্র ভারতে। আজ এই জ্ঞানসূর্য জগতের মধ্যাহ্নাকাশে মধ্যাহ্ন গায়ত্রীরূপে ভাস্বর'। দেশবাসী তাঁর জ্ঞানের প্রথম পরিচয় পেল—'বন্দেমাতরম', 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' পত্রিকায়—উজ্জ্বল-তর দীপ্তি প্রকট হল 'আর্যে'।

বরোদায় আসবার অব্যবহিত পরেই অরবিন্দ বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক এক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারা-বাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে কতকগুলি ছিল রাজনৈতিক নিবন্ধ—লেখাগুলি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট থেকে ১৮৯১-র ৬-ই মার্চ পর্যন্ত চলে। ঐ প্রবন্ধ সকলে অরবিন্দের অপূর্ব দেশ-প্রেম এবং তরুণ হৃদয়ের অন্তরাগ্নির পরিচয় মেলে, যে অগ্নি কয়েক বৎসর পরেই 'বন্দেমাতরম'-র উদ্দীপক লেখায় পরিস্ফুট হয়। তখনই তিনি তৎকালি[ন] কংগ্রেস নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি লিখলেন 'আমাদের যথার্থ শত্রু আমাদের বাহিরের কোন শত্রু নয়, আমাদের শত্রু হইতেছে আমাদের সুব্যক্ত দুর্বলতা। আমাদের কাপুরুষতা, আমাদের অর্থান্ধ ভাবালুতা—কয়েক বৎসর পরেই অরবিন্দ তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত এক পত্রে বলেন—'[illegible] জাতি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার [illegible] আমাদের গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়—তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না—জ্ঞানের বল। ক্ষত্র তেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্ম তেজও আছে সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহা[illegible] সাধন করিতে আমাকে পৃথিবী[তে] পাঠাইয়াছেন।' চোদ্দ বৎসর বয়সে বীজ[illegible] অংকুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে তার প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অটল হইয়াছিল।

অপরদিকে তিনি ধীরে ধীরে যোগ পথে আকৃষ্ট হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, গীতা উপনিষদ ও ভারতীয় সংস্কৃতির নানা[illegible] গ্রন্থ পড়ে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায়

প্রেরণা লাভ করেন। এই প্রেরণা অনুভব করবার পর তিনি কিছুকাল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করেন, কিন্তু তাঁর গুরু-গ্রহণ হয় নাই। তিনি নর্মদা তীরে বসনাথ নামক স্থানে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। পরে মহারাষ্ট্রীয় বিষ্ণু ভাস্কর লেলে মহারাজের কাছ থেকে কিছু সাধন কৌশল শিখেছিলেন। কিন্তু এ-সবই ছিল উপলক্ষ্য মাত্র, 'যোগ পথে তিনি হৃদয়স্থিত ব্রহ্মবর্তিকায় অগ্রসর হন নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে'।

দেশমাতৃকা সম্পর্কে অরবিন্দের অভিজ্ঞান তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে লিখিত পত্রে দিয়েছেন, 'অন্যালোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি পূজা করি'।

১৯০৭-৮ খ্রীষ্টাব্দের চারি মাস—এই স্বল্পকালের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিক কর্মতৎপরতা তাঁকে ভারতখ্যাত করে। এ-সময়ে দিনের পর দিন তিনি 'বন্দেমাতরম'-এ লিখিতে থাকেন, নানা সম্মেলনে যোগদান করেন ও সভা-সমিতিতে এবং জনসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করেন। সুরাট কংগ্রেস পণ্ড হবার পর, কলকাতায় ফিরবার পথে তিনি বোম্বাই শহরে ও বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি শহরে জনসভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলি একদিকে যেমন তেজো-ব্যঞ্জক এবং দেশপ্রাণতায় ভরপুর, অপর-দিকে তেমনি সেগুলি জাতীয় আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশক। অতীব গম্ভীর ভাষায় অরবিন্দ দেশবাসীকে বুঝান যে জাতীয় আন্দোলন নিছক রাজনীতিক আন্দোলন নয়—ইহা জাতির তন্দ্রাভঙ্গসূচক, তমো-নাশক অভ্যুদয়, আত্মচেতনার উদ্বোধন। এখানে উল্লেখ্য ভারতের আত্মচেতনা হল অধ্যাত্ম চেতনা, বীরাচারী শক্তি সাধক। কম বীর অরবিন্দ দেশমাতৃকার দাসত্বের শৃংখল-মোচনে নিজেকে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হলেন। ভাগ্যচক্র ঘুরল, কালের ভেরী বেজে উঠল, বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত হল, রুদ্রের আহ্বান এল। রুদ্রযজ্ঞে অরবিন্দের অন্তরতম কয়েকজনকে জীবনা-হুতি দিতে হল, অপর অনুগামীদের দিতে হল নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষা। এই তরুণদের নেতা অরবিন্দকেও কঠোর দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তে হল, কারণ তিনিই হলেন বিপ্লবা-গ্নির হোতা—তিনিই হলেন তরুণদের বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল।

ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। ভারতের চতুর্দিকে বিপ্লবের বহ্নি ছড়িয়ে পড়ল, মজঃফরপুরে বোমা ফাটল, দুজন ইংরাজ মহিলা নিহত হল। অরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ এল জাতীয় দলের তিনি যেমন প্রকাশ্য নেতা তেমনি তিনি বিপ্লববাদী তরুণ দলেরও গুপ্ত নায়ক। ফলে মজঃফরপুরের হত্যা-কাণ্ডের পর যখন মাণিকতলার বোমার কারখানা ধরা পড়ল অমনি বিপ্লববাদীদের সঙ্গে অরবিন্দও ধরা পড়লেন এবং অপর বিপ্লবীদের ন্যায় তাঁর বিরুদ্ধেও গুপ্ত হত্যা ও রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। অরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তারে সমগ্র দেশ টলমল করে উঠল। পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে এ কি অভিনব কাণ্ড। শীর্ণকায় বাঙালীর বুকে এ কি দুর্জয় সাহস, আত্মত্যাগের এ কি দিব্য প্রেরণা, দেশের স্বাধীনতার জন্য কি অপূর্ব পণ। ভারতে ও ইংলণ্ডে ইংরাজ প্রমাদ গণল।' এই বিপ্লব বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে আবর্তিত হয়ে পরিণতি লাভ করল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে।

সেদিন আদালতে অরবিন্দকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য প্রখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা দেন তাতে অরবিন্দের জীবনাদর্শ এমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছিল যা পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কবিতার ন্যায় অপূর্ব ভবিষ্যৎ বাণীরূপে আজও প্রোজ্জ্বল। চিত্তরঞ্জনের সেই অমর উক্তি—

"Long after this controversy hushed in silence, long after this tur_ moil, this agitation ceases, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patrotism, the prophet of nationa_ lism and the lover of humanity; long after he is dead and gone, his woods will be echoed and re_echoed not only in India, but across the distant seas and lands".

ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। কারাগার জীবনে অরবিন্দের দৃষ্টিতে অধ্যাত্মজগতের এক নব-দিগন্ত ধরা পড়ল। মনে হয় স্বয়ং বাসুদেব তাঁর পরম গূঢ় যোগ উপলব্ধি করাবার জন্যই অরবিন্দকে বাইরের কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নির্জনতার মধ্যে নিয়ে গেলেন। শ্রীঅরবিন্দ সেখানে মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ নামধারী সত্তাবিশেষের মধ্যে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখলেন না। বিশ্বের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বরূপ দেখলেন। ভূমা উপলব্ধি করলেন। দেখলেন বাসুদেবঃ জগৎ। এই বিরাট উপলব্ধিই হল তাঁর উত্তরকালের যোগাভিত্তি।

মহানগর

বুদ্ধদেব বসু ও কলকাতার একটি রাস্তা

শিবপ্রসাদ সমাজদার
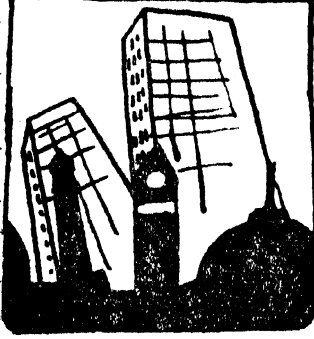
শিলংয়ের নির্জন পাহাড়ী পথে অমিতের গাড়ীর সঙ্গে লাবণ্যের গাড়ীর ধাক্কা লেগেছিল। গাড়ীতে টুপিটা খুলে রমনীরঞ্জন ভঙ্গিতে অমিত মৃদুস্বরে বলেছিল, অপরাধ করেছি। মাটির মানুষ লাবণ্য অবশ্য ব্যাখ্যা করেছিল অপরাধ নয়, ভুল। রাস্তায় এমন অবস্থা যে পাশ কাটাবার জায়গা নেই এবং শেষ পর্যন্ত না গিয়ে বেরবার উপায় ছিল না। আকাশচারী অমিতের দুঃখ যে গাড়ী চালিয়ে পর্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছবার পথ নেই। বাড়ী ফিরে অবশ্য লাবণ্যর বক্তব্যের সারাংশটুকু নথিভুক্ত করল। প্রথমে নোটবুকে, 'পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামী করলে। দুজনকে দু জায়গা থেকে ছিঁড়ে আনলে।' পরে নিবারণ চক্রবর্তীর বকলমে, 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি এবং হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।' রবি ঠাকুর মহাশয়—পথের পাগলামি পাহাড়ের পাকখাওয়া চরিত্রেরই একটি উপাদান এই ধারণা জাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। তবে পথের বাঁধন যে একেবারেই আলগা তার বড় আটুনি যে ফস্কা গেরোরও অধম সেই কথাটি আভাসে বলে গেছেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু সমতল সুদীর্ঘ সরল পথের কথা বলেছেন। ঝাঝা ১৭৫ মাইল লেখা সাইন পোস্টকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে রঞ্জন এগিয়ে এল মোটর বাইকে। নিঃশেষিত পেট্রল মোটর গাড়ীর সঙ্গে মোলাকাত এবং ঐ কাঠামোর তলায় মঞ্জুকে আবিষ্কার দুটি পদপল্লবপ্রান্তে। তবু নির্জন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তাই দোষের বদলে পাবে পাঠকের প্রশংসা। প্রথম অঙ্কের দৃশ্যান্তরেই বিস্তৃত মসৃণ রাজপথের ও বনমালী ইঁদুরের সুযোগ নিয়ে মঞ্জুর থেকে রঞ্জনের কাছে স্টীয়ারিং হুইলের হস্তান্তর। শেষ অঙ্কে রঞ্জনের বাইক পুনরায় মঞ্জুর মোটর গাড়ীর সহগমন করার আগে বিয়োগব্যথায় বিধুর অশ্রুভারাক্রান্ত শ্রীমতীর স্টীয়ারিং হুইল বিসর্জন, কিন্তু পেট্রলের শেষ বিন্দু গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রাস্তাতেই গাড়ী দাঁড় করিয়ে দিল, যতক্ষণে না রঞ্জনের আবির্ভাব। মন দেওয়া নেওয়ার গাঁট মজবুত করে বাঁধার বাহাদুরি দৈবের নয়, প্রকৃতপক্ষে পথেরই প্রাপ্য। 'পথ বেঁধে দিল' নাটকটি মিলনান্তক এবং লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শরদিন্দুবাবুকে তাই 'হে বন্ধু, বিদায়' বলে শেষ করতে হয়নি অথবা হঠাৎ আলোর ঝলকানির আমেজ টেনে বেড়াতে হয়নি।

টানতে হয়েছে বুদ্ধদেব বসুকে, এমন কি তাঁর সঙ্কলনের নামাঙ্কনই করলেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। প্রথম প্রবন্ধ 'পুরানা পল্টনে' কবুল করেছেন যে ঢাকা ছেড়ে আসতে একটুও দুঃখ বোধ করেননি কেন না কলকাতায় এসে বসবাস করা ওঁর বহুদিনের অভিপ্রায়। 'ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ' লেখাটিতে তিনি সন্ধ্যার জনস্রোতে বাসের হুজ্জত কাটিয়ে রাস্তার মোড়ে সশরীরে অবতরণ করলেন। সব ক্লান্তি ও বিভ্রান্তি কিন্তু কেটে গেল, যখনই বিরাট দুই বাড়ীর মাঝখানে তাঁর চোখের উপর ঝলসে উঠল চাঁদ। 'ছাদ' লেখাটিতে গুণগান করেছেন শহরের এবং শহরের সড়কের—যেহেতু সরাসরি আকাশের তলায় যাওয়ার জন্য তিনি রাস্তায় বেরোন, তখনকার ডবল ডেকারের খোলা ছাদে চাপেন অথবা আলিপুর অঞ্চলের পথে পথে ঘুরে বেড়ান পল্লবছায়ায়। তবে তাঁর 'কলকাতা' লেখাটি সত্যই চিত্ত ঝলমল করানো। তিনি কলকাতায় বড় হননি, বড় হয়ে এখানে এসেছেন। তাই কলকাতাকে তিনি ভালবাসেন মায়ের মত করে নয়, প্রিয়ার মত। সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিকের চীৎকারে, নিরবচ্ছিন্ন জনস্রোতে, উজ্জ্বলতায় উন্মত্ততায় তাঁর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়, গ্রীষ্মের দুপুরে ক্লাইভ স্ট্রীটের ফেনিল জনস্রোতের মাঝে হাঁটতে তাঁর রোমাঞ্চ হয়, কলকাতার রাস্তার আলকাতরা, আর মনুষ্য-শ্রম মিশানো গন্ধ বর্ণনা করার জন্য তাঁর কবিসত্তা হয় উন্মুখ।

বুদ্ধদেব বসু

করুণ রঙিন পথ

এই শুভেচ্ছার কথা বলতে বুদ্ধদেব বসুর নাম নিয়েছি। পথের পরিচর্যার কথা বলতে তাঁর শেষ ইচ্ছা শোনাই। আমি তখন কলকাতা পুরসভার কমিশনার। ২২ মার্চ ১৯৭৪ তারিখে তদানীন্তন পৌর প্রশাসকের কাছ থেকে আমার পাঠান একটি ফাইল ফেরত পাই। প্রশাসকের অর্ডার: 'প্রস্তাবটি অনুমোদিত হল। টাকার বন্দোবস্ত কিভাবে করা যায় ফাইনান্স অফিসার যেন দেখেন।' আমি সঙ্গে সঙ্গে ফাইলটা সেক্রেটারিকে পাঠাই, তিনি যেন দেখেশুনে এটি আমার কাছে পেশ করেন। আমি জানুয়ারি মাসে প্রস্তাবটি গ্রহণ করার সময় লিখেছিলাম, ডিস্ট্রিক্ট-এঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে আর্থিক বছরের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে কাজটি শেষ করাতে চাই যাতে প্রস্তাবটির উদ্যোক্তার কাছে আমি নিজেই জবাব পাঠাতে পারি।

সন্ধ্যাবেলা একটি তরুণ সাংবাদিক এসে বললেন বুদ্ধদেব বসু মারা গেছেন: কেওড়াতলা শ্মশানে একবার খোঁজ করা যায় শেষ কাজ ঠিকমত হয়েছে কিনা। শোনামাত্র আমি লাফিয়ে উঠলাম, বুদ্ধদেব [illegible] থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত প্রিয় বলে নয়, এইমাত্র তাঁর ফাইলটা আমি দফতরে ফেরত পাঠিয়েছি বলে। সেক্রেটারি বা তাঁর বিভাগের লোকেরা ততক্ষণে চলে গেছেন, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ফাইলটা পেলাম না। তরুণ সাংবাদিকটি আমার চেয়েও মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। বুদ্ধদেববাবুর মৃত্যুদিন ও প্রস্তাবটির অনুমোদনের দিন যখন এক হয়ে গেছে, তাঁর স্বহস্তরচিত প্রস্তাবটি খবরের কাগজে ফোটো কপি করে ছাপা থাক দুজনেরই এই মতলব ছিল। একটুকুর জন্য হল না। সেটি আজ পেশ করি।

এই পত্রটি কবিতাভবন ৩৬৪।১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড কলিকাতা-৪৭ থেকে ৩ নবেম্বর ১৯৭৩ তারিখে মহাধ্যক্ষ কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান (অর্থাৎ কমিশনার)-এর উদ্দেশ্যে লেখা:

'সবিনয় নিবেদন, আপনার কাছে একটি অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। আমার বাড়ী নাকতলায়, জায়গাটার স্থানীয় নাম বকসীপল্লী। এখানে পাকা রাস্তার অভাবে গাড়ি চলাচল বড়ো বিঘ্নিত হয় বর্ষায় পায়ে হাঁটাও সুসাধ্য থাকে না। দেশবিদেশ থেকে

অনেকে আমার সংগে দেখা করতে আসেন, আমার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বহু ব্যক্তির সংগে সংযোগরক্ষার প্রয়োজন ঘটে। উপরন্তু আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা বসু দীর্ঘকাল ধরে কঠিন রোগে পীড়িত আছেন—তাঁকে নিয়মিত ডাক্তারের ক্লিনিকে যেতে হয়, ডাক্তারদের আনাগোনাও লেগেই থাকে—এসব কারণে আমি সপরিবারে এই সমস্যাটি সুতীক্ষ্ণভাবে অনুভব করছি। আমরা এ বাড়িতে বাস করছি আজ সাত বছর—ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের অনেক গলিপথ সংস্কৃত হয়েছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদেরটাই কিছু করা হয়নি।

সম্প্রতি আমাদের পাড়ায় সি এম ডি এ পাতাল-ড্রেন খনন করছেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি রাস্তা-নির্মাণ তাঁদের কাজ নয়—আশঙ্কা করছি তাঁদের খনন কার্যের ফলে রাস্তাটি না আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগত্যা, এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে, বিষয়টি আপনার গোচরীভূত করলাম, ভরসা করি কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এখানে যথোপযুক্ত নাগরিক পথ নির্মিত হতে পারে।

বকসীপল্লী এলাকাটি অশ্বত্থাকৃতি, দুটি কালভার্ট দ্বারা বড়ো রাস্তার সংগে যুক্ত—তার একটি অনেক দিন যাবৎ ভাংগা, অন্যটি কোন মতে ব্যবহার্য, তাই দিয়েই সারা পাড়ায় গাড়ি, লরি যাতায়াত করে। পশ্চিম দিকের কালভার্ট থেকে আমাদের বাড়ী কিঞ্চিৎ মাত্র দূরে, অন্ততঃ সেটুকু যদি অবিলম্বে নির্মাণ করা সম্ভব হয়, তা হলে শুধু আমি ও আমার পরিবারবর্গ নই, এই পল্লীর সকলেই উপকৃত হবেন। যাতে সর্বঋতুতে বিবিধ যানবাহন স্বচ্ছন্দে ঢুকতে ও বেরোতে পারে, এটুকু ব্যবস্থা অত্যন্তই জরুরি।

'সনাক্তীকরণের সুবিধার জন্য একটি নকসা সংগে দিলাম। পত্রটির একটি প্রাপ্তি-স্বীকার পেলে বাধিত হবো। নমস্কারান্তে'

চিঠিটি ছিল রেজিস্ট্রার্ড এ ডী কলকাতা ইউনিভার্সিটি পোস্ট অফিস থেকে পাঠান, খামের ঠিকানা টু দি কমিশনার। আগেই বলেছি আমার আর প্রাপ্তিস্বীকার করা হয় নি। তবে ওঁকে মুখে মুখে বলা হয়েছিল যে, একক পত্রটিকে জোরদার করতে পাড়ার পাঁচ জনের নামেও যেন একটি দরখাস্ত পাঠান। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ তারিখে নাকতলা পোস্ট অফিস থেকে কমিশনারের নামে রেজিস্ট্রি করে তিনি দ্বিতীয় পত্র পাঠালেন : 'সবিনয় নিবেদন, আপনাদের পরামর্শ অনুসারে প্রতিবেশী-দের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি পত্র পাঠালাম। আশা করি অবিলম্বে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। ধন্যবাদ ও নমস্কারান্তে...।

সংগের পত্রখানি ইংরেজীতে লেখা। স্বাক্ষরকারী প্রথমে বুদ্ধদেব বসু, তলায় আরও তেইশজন। বক্তব্য : 'আমরা বকসীপল্লী —নাকতলার আবাসিকবৃন্দ জানাই যে আমা-দের বাড়ীর সামনে চলাফেরার জন্য যে পথ আছে সেটি ত্রিশ বছরেরও আগে এই পল্লী প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এবং প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সাধারণের ব্যবহার্য বলে স্বীকৃত। তা ছাড়া জমি বিক্রীর দলিলে এই সব অংশ পথ হিসাবে সুস্পষ্ট দেখানো আছে। অতএব ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন উঠছে না। এটি বা পল্লীর অন্যান্য রাস্তার ভিতরে সি এম ডি এ কোন পার্থক্য না রেখে ইদানীং এখানে পাতাল ড্রেন ও অন্যান্য কাজে হাত লাগিয়েছে। আমরা শুনেছি যে আপনারা আমাদের এলাকায় পাকা রাস্তা বানানোর মঞ্জুরী দিয়েছেন। সেই উপলক্ষ্যে, টেকনিকাল বা আইনগত কোন বাধা উঠলে, আশা করি, এই খবরটুকু কাজে লাগবে। বহু দিন যাবৎ আমরা সব ঋতুতে গাড়ি চলার উপযোগী রাস্তার অভাবে কষ্ট পাচ্ছি। আপনারা অবিলম্বে ব্যবস্থা করলে অত্যন্ত বাধিত হব। ধন্যবাদান্তে...।

অশ্বত্থের পথটুকুতে কিন্তু যান্ত্রিক অশ্বচলাচলের ব্যবস্থা করতে আমাদের বছর ঘুরে গেল—১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি। প্রথম কারণ, সি এম ডি এ রাস্তাটা খোঁড়াখুঁড়ি করছিল বলে তাদের বলা হয়েছিল কাজটা করার জন্য। ওরা কিছু দিন রেখে এই বলে ফেরত পাঠান যে কাজটা যখন নতুন, সি এম ডি এ'র প্রোগ্রামে আসবে না। পুরসভাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে হাত লাগাবে না অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুন নাকচ করবে। দ্বিতীয় কারণ, ফাইলটি আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অফিস থেকে কিছু দিন নিখোঁজ। জোর গোয়েন্দাগিরি করে আমিই বের করলাম। তত দিনে ২৫০০০ টাকার প্রাথমিক হিসেবের থেকে খরচা বেড়ে গেছে এবং অশ্বত্থের নীচের অংশে যাঁরা আছেন তাঁরা বলতে শুরু করলেন ও পাশের বড় রাস্তার দরুন নীচে যে দ্বিতীয় অশ্বত্থরে আছে সেটিকেও যেন পাকা করা হয়। বুদ্ধ-দেববাবুর শেষ ইচ্ছা এবং প্রতিভা দেবীর ব্যক্তিগত অনুরোধের সংগে বাকী প্রতিবেশী-দের আবেদন এড়ানো গেল না। শেষ মেষ প্রায় ৫০০০০ টাকা খরচে ইংরিজী এইচ আকৃতিতে প্রায় সবটা রাস্তাই পিচ করা হল।

তব বন্ধুর পথে বন্ধুর মত

এই কাহিনী থেকে, ফাইল খোয়ানো ও খোঁজার কৌশল এবং রাস্তা মেরামতির ব্যাপারে সি এম ডি এ'র সীমিত দাক্ষিণ্য ছাড়াও অনেকগুলি শিখবার ব্যাপার আছে। এক নং, নতুন পাড়ায় সুষ্ঠুভাবে রাস্তা তৈরীর দায়িত্ব ডেভেলপার বা উন্নয়নকারী ব্যক্তি তথা সংস্থার উপরে থাকলেও প্লট করে জমি বিক্রি করার পর তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় না এবং কাঁচা বা আধ-খেচরা রাস্তার দায়িত্ব ঘুরে ফিরে পুরসভার উপরে বর্তায়। দুই নং ন্যরাল, রাস্তার দখল ও রক্ষণাবেক্ষণ নেবার জন্য দুটি শর্ত হল সেটি যেন অন্ততঃপক্ষে দশ মিটার বা বত্রিশ ফিট দশ ইঞ্চি চওড়া হয়; এবং রাস্তাটি ত্রিরিশ বছর বা ততোধিক সময় জনসাধারণ ব্যবহার করে আসছে একথা দু পাশের সব মালিক স্বীকার করবে। তখন বিশেষ প্রস্তাব বলে কর্পোরেশন এটি নিয়ে নিতে পারে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলব, টাকার টানাটানি সত্ত্বেও এই রকম বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের প্রচুর করতে হয়।

টাকার কথাই যখন উঠল আমাদের সাম্প্রতিক অবস্থাটা বিশদ করে বলি। রাস্তা মেরামতির জন্য কর্পোরেশনের কোন নির্দিষ্ট আয় বা হাতবন্দী টাকা নেই। বাড়ীঘরের কর থেকে বছরে আসে আট কোটির মত টাকা। এর মধ্যে পঁচিশ ভাগ খরচা করার কথা জল সরবরাহে, দশ ভাগ স্যুয়ারেজ বা জলনিকাশী ব্যবস্থায়, নয় ভাগ রাস্তার আলোয়, আর বাকী ৫৬ ভাগ জঞ্জাল অপসারণ সহ তাবৎ পৌরসেবামূলক কাজে। চল্লিশের দশকে রাজ্য সরকার কর্পোরেশনের হাত থেকে মোটর যান কর নিয়ে নেন। এই করের বছরকার আদায় নয় কোটি টাকা থেকে সরকার কর্পোরেশনকে দেন দশ লাখ টাকা। তাছাড়া রাস্তা সারাইয়ের জন্য পাঁচ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই ১৫-৫ লাখ টাকার সংগে কর্পোরেশনের সাধারণ তহবিল থেকে যতটা সম্ভব যোগ করে বছরে ৭৫ লাখ টাকার মত রাস্তা সারাইতে খরচা হয়। ৫১০ মাইল রাস্তার প্রয়োজনের তুলনায় এটি অকিঞ্চিৎকর। মূলধনী কাজ বা আমূল সংস্কার তো এই টাকায় অসম্ভব।

কোন রাস্তা ঠিক রাখতে গেলে পাঁচ বছর অন্তর তার আমূল সংস্কার দরকার। এই খরচা ১৯৭৪—৭৫ সালের হিসেব অনুযায়ী বোম্বাইতে ৩-৫ কোটি, দিল্লীতে ১-৫ কোটি আর মাদ্রাজে ১-১ কোটি। অর্থাভাবে এক যুগ ধরে কলকাতা কর্পো-রেশন কিছুই করতে পারেনি, কেবল সি এম ডি এ গত দু বছরে এক কোটি টাকার মত খরচা করে একশত মাইল রাস্তায় যতটুকু পেরেছে হাত লাগিয়েছে। চার-পাঁচ বছর ধরে যদি কর্পোরেশন বছরে পাঁচ কোটি টাকার মত পাই তবে অন্য মহানগরীর মত না হলেও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। পুর এলাকার রাস্তাঘাট ঠিক রাখতে রাজ্য সরকার সম্প্রতি এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে একজন চীফ এনজিনিয়ারের অধীনে একটি পৃথক দফতর করা হবে। এই দফ-তরের প্রথম প্রয়োজনই হল যথেষ্ট টাকা। এ বিষয়ে সরকারের পূর্তে—রাস্তা বিভাগের এনজিনিয়ার ইন চীফ তথা সচিবকে একটা হিসেব তৈরী করতে বলা হয়েছিল। তিনি সুপারিশ করেছেন যে ৫১০ মাইল রাস্তায় ঠিকঠাক ব্যবস্থা করতে এখনই সাড়ে দশ কোটি টাকা চাই। রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডও এ ব্যাপারে লেখাপড়া করছেন। এনজিনিয়ার ইন চীফ ও পুরসভার অফিসারদের সংগে সম্প্রতি যে বৈঠক হয়ে গেল তাতেও রাস্তার ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থ চাই, প্রতিটি পৌর জেলায় রোড রোলার, পিচ গলাবার বয়লার, অ্যাসফালটাম কেন্দ্র চাই এই ধরনের কথাই পরিকল্পনা বোর্ড বলেছেন। অর্থাৎ টাকার ব্যাপারে কোন শর্ট কাট বা সংক্ষিপ্ত পথ সম্ভব নয়।

বীরপুরুষ

বিজনকুমার ঘোষ

বারো টাকা কিলো মাংসের কথা ভেবে ললিত লাইনে দাঁড়িয়েছিল। মাংস কেনার পক্ষে ওর আপাতত তিনটি যুক্তি আছে। আজ নববর্ষ; দুই, বাজারে আসার সময় চন্দন বলে দিয়েছে, বাবা মাংস আনবে, চন্দন চিনু মাংস খেতে খুব ভালবাসে; তিন কল্যাণীর এ সময়টা একটু ভালমন্দ খাওয়া দরকার।

ললিত গুণে দেখল ওর সামনে গলে হাতে সাইত্রিশটি মাথা। পাঁঠা ঝুলছে চারটি। আরও কয়েকটি দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। সুতরাং তিনশো গ্রাম মাংস কিনতে গিয়ে হতাশ হতে হবে না। মনে পড়ল, মাস চারেক আগে বেহালার ওর মাসতুতো বোনের বিয়েতে একাই সাতশো মাংস টেনে দিয়েছিল। জামাই ইঞ্জিনীয়ার আর মেসোর অবস্থাও ভাল। হঠাৎ ললিতের চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। মাংসওয়ালা বিরাট ছুরিটা হাতে নিয়ে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হিন্দী বাংলায় একজনকে বলছে, বারো রুপিয়ার কথা ভুলিয়ে যান, তেরো রুপিয়া কিলো, পোষায় লিবেন না পোষায় না লিবেন—! সামনে আর মাত্র পনেরজন দাঁড়িয়ে, এই অবস্থায় মাত্র তিরিশটা পয়সার জন্যে পিছিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। আপাতত আঙুলে কাটা তো ভিজুক। মেসোর এখনো বিয়ের যুগ্যি তিন মেয়ে আছে। তখন না হয় কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া যাবে।

মাংসের পর আলু, পেঁয়াজ আদা পুঁইশাক ইত্যাদি আরও কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে পয়লা বৈশাখের সূর্য আরও তেজী হয়ে উঠল। ললিতের কপাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। থলিটা রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে পাশের বাড়িকে শুনিয়ে জোর গলায় বলল, মাংস এনেছি, সেদিনের মত আবার কড়া ঝাল দিয়ে রেঁধো না। ছেলেমেয়েরা খেতে পারবে না।

বাথরুমে ছিল কল্যাণী, সেখান থেকেই চেঁচিয়ে উঠল, সেদিন আবার কোথায়, সে তো ছ' মাস আগের ঘটনা!

কথা আর না বাড়িয়ে ললিত হাত মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসল। খবরের কাগজ দিয়ে গেছে, এখন শুধু চায়ের জন্যে অপেক্ষা। তেল সংকট প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর নজর গেল মধ্য প্রাচ্যে সিরিয়-ইজরায়েলী বাহিনীর মধ্যে গুলী বিনিময়ের দিকে। এই সময় পাশের বাড়ির বড় ছেলে তপন হাঁফাতে হাঁফাতে এল, কাকু দিদিমা মারা গেছে—

—বলিস কি রে!

—হ্যাঁ, এই তো আমি দেখে এলাম। —তপন সম্প্রতি পাড়ার ইস্কুলে নাম কাটিয়ে তিরিশ টাকা মাইনের ইস্কুলে ভর্তি হয়ে ভাল বাংলায় কথা বলা প্র্যাকটিস করছে। বলল, মাত্র পনের মিনিট আগে দেহরক্ষা করেছেন।

—ঠিক বলছিস তো! —বলেই ললিতের মনে পড়ল দুশো টাকার কথা। তপনের বয়স বারো বছর। পয়লা বৈশাখের সকালবেলায় কেন-ই বা শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতে আসবে! যদি সত্যি সত্যি মারা যায়, তাহলে দুশো টাকার ঝামেলা থেকে চিরতরে মুক্ত! ভাবতেই মুখে দুঃখের ভাব ফোটাতে গিয়ে ভিতরের চাপা উত্তেজনার খুশি হয়ে উঠল ললিত। চা নিয়ে এগোচ্ছিল কল্যাণী, খবরটা শুনে হাত কেঁপে উঠতেই অদ্ভুত তৎপরতার ছোঁ মেরে কাপটা নিয়ে চুমুক বসিয়ে দিল। গণ্ডগোল শুনে চিনু চন্দন ছুটে এল। তপনের মাও এল একটু বাদে সকালবেলায় কি চাও ঠাকুরপো' উনি আবার বিরাট এক মুরগী এনে হাজির। আমি বলেছি, ইচ্ছে হয় তুমি খাও, আমি খেতে পারব না—।

বারান্দায় এসে সবাই পাশের চারতলা বাড়িটার দিকে তাকাল। দিদিমা থাকত তিনতলায় দক্ষিণ দিকের ঘরখানায়। এত-বড় বাড়িটায় খুব একটা চাঞ্চল্য নজরে পড়ছে না। রাঁধুনী হরিদাসীর মা আর ছোকরা চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির তিন ছেলেই বাইরে। মেজ তুহিনবাবু শুধু বাড়িতে থেকে প্র্যাকটিস করে। স্টেথিসকোপ

হাতে পাড়ার মাখন ডাক্তার গম্ভীর মুখে বেরোল। তার পেছনে তুহিনবাবুর স্ত্রী, তার পেছনে তুহিনবাবু। দিদিমা ছাড়া ও-বাড়ির আর কারুর সঙ্গে ললিতের আলাপ নেই। কিন্তু এ সময় চুপ করে থাকা ঠিক নয়। ললিত এগিয়ে গেল, তুহিনদা—

—হ্যা, মা একসপায়ার করেছে। —তুহিনদা অল্প কথার মানুষ : এই কিছুক্ষণ আগে।

—কি হয়েছিল?

—সেরিব্রাল থমবসিস।

ললিত মুসড়ে পড়ার ভঙ্গী করে মাথায় হাত দিল। কিন্তু সেটা না দেখেই তুহিনবাবু কাকে যেন টেলিফোন করতে ছুটল।

কল্যাণী বলল আচ্ছা কালও সারা বিকেলটা আমার ঘরে গল্প করে গেল মানুষটা! অথচ একটুও বোঝা যায় নি।

তপনের মা বলল, যাকে বলে রত্নগর্ভা! আমার ঘরে রোজ একবার পা দেওয়া চাই-ই। বলে, তোর ঘরটা ভারী সাজানো গোছানো বৌ, আমার খুব ভাল লাগে।

ললিত আলোচনাটা মাঝপথে থামিয়ে দিল, খাটের তলা থেকে আমার রবারের স্যান্ডেলটা বের কর দেখি।

—কেন, শ্মশানে যাবে নাকি?

—নিশ্চয়ই।

—বলছিলাম কি, আজ পয়লা বৈশাখ। —বিব্রত হল কল্যাণী : পাড়ার তো অনেক লোক আছে, তুমি না গেলে!

ললিত বলতে যাবে, তা হয় না। কিন্তু তার আগেই তপনের মা'র গলা চুলবুল করে উঠল, আহা যাক না যাক্ না থাকলে ওনাকেও পাঠিয়ে দিতাম। ওতে কিচ্ছু হয় না।

এ পাড়ার বলতে গেলে ললিতরা নতুন, এই বছর দেড়েক হয় এসেছে। একখানা ঘর, এক চিলতে বারান্দা রান্নাঘর। বাড়িওলা দূরে থাকে, মাসের প্রথম সপ্তাহে এসে ভাড়া নিয়ে চলে যায়। কল পায়খানা কমন। কল পায়খানায় যেতে হলে এই বারান্দা দিয়েই যেতে হয়। এই সুযোগে তপনের মার অর্থাৎ বৌদির আনাগোনার বিরাম নেই। এবং যখন তখন নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হয় ললিতকে। আসলে ভাড়া কম বলে এখানে পড়ে আছে। না হলে কবে উঠে যেত।

ভাগ্যিস বৌদির কচুর শাক পোড়া লেগে যাচ্ছিল, সে জন্যে আর দাঁড়াল না। কল্যাণী এই ফাঁকে ফিস ফিস করে বলল, দুশো টাকার কথা মনে আছে তো?

ললিত বিরক্ত হল, হ্যাঁ, মনে আছে।

—আমার বাপু ভয় করে। আসা অব্দি শুধু ধার নিয়েই যাচ্ছ, একবারও শোধ দাও নি।

—ধার করি কি আমার নিজের জন্যে?

কল্যাণী একটু থতমত খেল, আমার পেটে ছেলে আছে তাই বলছি। একটু নরম হল ললিত। একবার একজনের কাছ থেকে তিরিশ টাকা ধার নিয়ে পরে ইচ্ছে করেই দিতে ভুলে যায়। সেই সময় চন্দন হয়। হতে গিয়ে কল্যাণী মৃত্যুর দরজা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিল। ও মনে করে, লোকের সঙ্গে বেইমানি করার প্রতিফল! ললিত মনে করে, এটা কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। তবে কুসংস্কার সবাই কাটাতে পারে না। বলল, সামনের মাসে অফিস থেকে কিছু টাকা পাওয়ার কথা আছে। পেলেই দিয়ে দেব।

—কাজের আগে দিলেই ভাল হয়। ওদের এখন টাকার দরকার।

—শুনলে না, বৌদি বলল রত্নগর্ভা! —হাসি ছড়িয়ে তরল করে দিতে চাইল : আমাদের এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে।

—কি এত কেনাবেচার কথা পয়লা বোশেখে! —কচুর শাক নামিয়ে রেখে বৌদি ফের চলে এসেছে : বেনারসী দিচ্ছ নাকি বৌকে?

বিরক্ত মুখে ললিত বলল. হ্যাঁ, নূনে কেনার পয়সা নেই তো বেনারসী!

আর দাঁড়াল না। পায়ে রবারের স্যান্ডেল গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। চন্দন পেছনে পেছনে ছুটেছিল, ওকে কষে এক ধমক।

একতলা, দোতলা ভাড়াটে থাকে। তিন-তলা, চারতলায় দিদিমারা। একটা অ্যাল-শেসিয়ান কুকুর আছে, তুহিনবাবু মাঝে মাঝে পাশের মাঠে এসে একটা বল নিয়ে দৌড় ঝাঁপ করায়। কুকুরটা ভারী ভদ্র আর বিনয়ী। একদিন বাজার থেকে আসার পথে ললিত ওর পিঠে আলগোছে হাত রেখেছিল। কিচ্ছু বলে নি।

লম্বা করিডর পেরিয়ে পাড়ার অনেকেই আসছে। দেড় বছরের মধ্যে ললিত এই প্রথম দিদিমার বাড়িতে এল। বড় বড় ঘর আলো বাতাসে মাখামাখি। দিদিমা কিন্তু ওদের দিনের বেলায় লাইট জ্বালা ঘরে অনেকবার গেছে। একবার বৃষ্টির দিনে ভিজতে ভিজতে ঘরে ঢুকেই দেখে খাটের ওপর গোলাপ ফুলের রং নিয়ে এক বুড়ি বসে আছে। কল্যাণী আলাপ করিয়ে দিল, এই যে আমাদের পাশের বাড়ির দিদিমা—

ললিত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে দিদিমা বলল, জামা-কাপড়টা ছেড়ে বোসো বাবা, ঠান্ডা লাগবে। কল্যাণীকে বলল, আদা দিয়ে চা কর বৌ, ছেলে খাবে।

পাড়ার দিদিমাদের বহুকালের বাস। পাড়ার মাথা, বনেদী ঘর বলতে ওদেরই বোঝায়। সুখ, সফলতা আর স্বচ্ছলতায় মোড়ানো নীল রংয়ের চারতলা বাড়িটা। ছেলেরা সবাই উপযুক্ত, বড় বড় চাকরী করে। ছোট ছেলে ডাক্তার, বিলতে থাকে। বাড়ি ভাড়া মায়ের নামে. ছেলেরা ফি মাসে মাকে ভাল রকম হাত খরচ পাঠায়। এদিকে বুড়ির কোন দায়িত্ব নেই। খুব আলাপি। আলাপ না থাকলেও ঘরের মধ্যে ঢুকে মোড়া টেনে নিয়ে আলাপ করতে বসে। সুখ দুঃখের গল্প শোনে। তা দেড় বছর আগে বৃষ্টি ধোওয়া এক সন্ধ্যায় অত্যন্ত খুশি হয়ে ললিত ভেবেছিল, এত দিকে

এখন দিদিমার নজর, তখন পঁচিশটা টাকা ধার চাইলে গোলাপি রঙে কালচে দাগ পড়তে পারে কি না।

কল্যাণী বলে, ধার চাওয়া তোমার একটা অভ্যাস।

মেজাজ চড়া থাকলে রেগে যায় ললিত। ভাল থাকলে বোঝাতে বসে, দ্যাখ ইচ্ছে করে কেউ ধার করে না। আগে খুব চা খেতাম এখন কমিয়ে দিয়েছি। মদ খাই না, রেস খেলি না। সিগারেট থেকে বিড়িতে নেমেছিলাম, বাজেটের পর সেটাও তুলে দিলাম। তবুও কোন দিকে কুলিয়ে উঠতে পারি না। কারখানা যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। লসে রান করছে। বুঝলে, আমাদের বাইরে গিয়ে সংগ্রাম করতে হয়। তোমাদের মত ঘরে বসে থাকলে অনেক ন্যায় নীতির কথা বলতে পারতাম।

তবু পরদিন এই কল্যাণীই দিদিমার কাছ থেকে টাকাটা জোগাড় করে এনে দিয়েছে। শোধ দেওয়া হয়নি, বরং আরও বারকয়েক ধার করতে হয়েছে। ভেবেছে, একশো টাকা জমুক, পরে দিদিমাকে একটা বড় নোট দিয়ে দেবে। দিদিমার হয়ে শেষে কল্যাণী তাগাদা দিয়েছে, কই দিলে না তো? আমি কিন্তু আর চাইতে পারব না। আমার বাপু লজ্জা করে।

ললিত উত্তর দিয়েছে, লজ্জা নারীর ভূষণ। ঠিক আছে, এবার থেকে আমিই চাইব। মেরে তো দেবো না। শোধ একদিন দেবই।

কিন্তু শোধ আর দেওয়া হয়নি। এদিকে একশো টাকা থেকে দুশো টাকায় দাঁড়িয়ে গেছে।

কল্যাণী বলেছে, নেহাৎ দিদিমা ভাল মানুষ বলে। আর কেউ হলে—

—আরে দিদিমার মেলাই টাকা। যেন এই টাকা না পেলে হাঁড়ি চড়বে না।

একটা বিরাট ধবধবে খাটে দিদিমা ঘুমিয়ে আছে। মাথার কাছে কিছু ফুল জমেছে নিঃশব্দে। শুধু দেওয়াল থেকে একটা ক্যালেণ্ডার মাটিতে ফেলে দেবার জন্যে বাতাস প্রাণপণে চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা কানে আসছে, 'আহা ভাগ্যবতী, রত্নগর্ভা।' ললিতের মনে হল, বুড়ি কখনো দুশো টাকার জন্যে তাগাদা দেয়নি। আর অবশ্য ধার পাওয়া যাবে না। তা না যাক, ঋণ মুক্তিরও একটা আলাদা আনন্দ আছে। তবে বুড়ি যদি কাউকে বলে গিয়ে থাকে তাহলে তো মুশকিলের কথা। ললিত ভয়ে ভয়ে তুহিনবাবুর দিকে তাকাল। তুহিনবাবু এদিকেই আসছে। হঠাৎ ললিতের হাতটা ধরে বলল, একটা কাজ করবেন, গাড়িটা নিয়ে গিয়ে একটা খাট কিনে আনবেন?

—নিশ্চয় নিশ্চয়। —ললিত একেবারে গলে গেল।

তুহিনবাবু একশো টাকার একটা নোট বের করে ফেলল, কত দাম তা তো জানি না। কাঠের আনবেন। যা লাগে দেবেন—

সিঁড়িতে পাড়ার তরুণ সমাজসেবী নিতুর সঙ্গে দেখা। নিতু যে কোন বাড়িতে বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পৈতে, মুখেভাতে ভাড়ার ঘর আগলায়। ফালতু একটা পিঁপড়েও তখন ঢুকতে পারে না। বলল, গাড়ি যাচ্ছে যখন সঙ্গে যাব নাকি?

অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিল, চল।

বহুকাল পর প্রাইভেট কারে চড়ল ললিত। পয়লা বোশেখের কড়া রোদে একটা ঝকঝকে বর্শা ফলকের মত গাড়িটা বেরিয়ে যাচ্ছে। খাটওয়ালার সঙ্গে দরদাম যা করার নিতুই করল। নরম গদীতে ললিত সারাক্ষণ কাঠ হয়ে বসে চিন্তা করল, তুহিনবাবু হয়ত ব্যাপারটা জানে না। নাহলে বলতে পারত, আপনার কাছেই তো টাকা আছে, ওই দিয়ে খাট কিনে আনুন। কিম্বা এও হতে পারে, এখন চাইল না, পরে কাজের সময় চাইবে।

বাড়িটা এখন জমজমাট। অনেক গাড়ি জমে গেছে। আরও আসছে। দুজনে গাড়ির মাথা থেকে খাটটা ধরাধরি করে নামাল। এই সময় পাড়ার দুজন ফালতু লোক হাত লাগাতে গিয়েছিল, ললিত চোখ কটমট করে ধমক দিয়ে উঠল। তারপর খাটের ওপর বিছানা বালিশ নতুন চাদর পেতে এক শিশি সেণ্ট ঢেলে দিল। এই কাজগুলি সে এমনভাবে হাকডাক দিয়ে করতে লাগল, যেন ওর নিজের দিদিমা মারা গেছে।

দিদিমার মেয়ে জামাই দুজনেই অধ্যাপক, চন্দননগরে থাকে। খবর পেয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে এসেছে। ললিত তাড়াতাড়ি দরজা খুলে অর্ডার দিল, নিতু এঁদের ওপরে নিয়ে যাও—

একটু বাদে এল ঘাটালের এস ডি ও বাদলবাবু, দিদিমার সেজ ছেলে। সঙ্গে স্ত্রী আর এক ছেলে। ললিত আগে আগে দিদিমার ঘরে ঢুকে পরিষ্কার চেয়ারের গদীতে যারা থাবা ধুলো ঝাড়ল। বাদলবাবু কিন্তু বসল না। কিম্বা কান্নায় ভেঙে পড়ল না। তা এক দিক দিয়ে ভালই, রত্নগর্ভাদের কপালে বেশি কান্নাকাটি নেই।

তবে সুলুদি মেয়ে বলেই মাথার কাছে বসে অল্পস্বল্প কাঁদছে। শোকসন্তপ্ত মুখখানা ললিত আড় চোখে জরিপ করে নিল। মা মেয়ের খুব ভাব ছিল। একে প্রফেসার, তার শোকতাপ, দুশো টাকার কথা অবশ্য ভুলতে খুব একটা সময় লাগেনি।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল তুহিনবাবু, এইবার বাকে ফের বলা যাক,

মাকে বের করা হবে কিনা, তা নিয়ে স্বয়ং ব্যারিস্টার পরামর্শ চাইছে। অত্যন্ত খুশি হয়ে ললিত বলল, দাদার জন্যে আর একটু ওয়েট করলে হয় না?

তুহিনবাবু বলল, এইমাত্র দাদার ফোন এসেছে, পরশু দিনের লোডশেডিং নিয়ে মিনিস্টারের সঙ্গে বৈঠক হচ্ছে। দাদা ডাইরেকট শ্মশানে যাবে বলেছে।

—তাহলে রওনা হওয়া যাক। এরপর রোদ আরও চড়ে যাবে।

খাট তোলার সময় ললিত পাড়া কাঁপিয়ে চেঁচাল, বল হরি—

পয়লা বৈশাখের দিনেই দিদিমাকে কাঁধে তুলতে হবে কে জানত। তুহিনবাবুরা বেশ প্রগতিশীল রবারের স্যান্ডেলে আপত্তি করেনি। এর মধ্যেই পিচ গলতে আরম্ভ করেছে। প্রত্যেক বারই ললিত ভাবে এই মাসে একটু সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু অসুখ বিসুখ বাড়তি খরচের চাপে তা আর হয়ে ওঠে না। প্রত্যেক বারই আগেভাগে মাইনে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে চোরের মত বেরিয়ে পড়তে হয়। যাক, এই পয়লা বৈশাখে অন্তত এক ভাল পাওনাদার কমল।

শুকনো কাঠ, কড়া রোদ আর দিদিমার শরীরে প্রচুর চর্বি থাকায় দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল পাঁচ মিনিটেই। ললিত একটা বাঁশ নিয়ে চিতার চারপাশে আগুন উসকে দিতে লাগল। ওই যে চীফ ইঞ্জিনীয়ার সাহেব এসে গেছে! ললিত করুণ ভাবে তাকাল। দশ মিনিট আগে এলেও মুখাগ্নি করতে পারত বেচারা। তবে যতই চীফ ইঞ্জিনীয়ার হও আর মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক কর, ললিত সরকার যেমন এখানে আসবে, তেমনি তোমাকেও একদিন আসতে হবে। হঠাৎ কথাটা কানে গেল, সুনুদি বলছে, মেজদা মা তো পাড়ার অনেকের কাছে টাকা পেত, সেগুলোর একটা বিহিত—

ললিত তাড়াতাড়ি আগুন উসকে দেওয়ার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তুহিনবাবু বলল যা পাড়া কেউ কি নিজে থেকে এসে স্বীকার করবে!

এস ডি ও সাহেব বলছে, একসপ্লয়েট করা। তখনই বলেছিলাম বাড়ি বিক্রী করে বালিগঞ্জে চল।

এই সময় তুহিনবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হল। বাঁশটা অনেকখানি পুড়ে গিয়েছিল, ললিত সেটা ফেলে দিয়ে আর একটা নিয়ে এল। তোদের মা এখনো ছাই হয়ে যায়নি, এখনো আগুনের মধ্যে ফটফট শব্দে ফেটে যাচ্ছে, আর এ সময় কিনা বাজে আলোচনা। চীফ ইঞ্জিনীয়ার বলছে, মা অপরকে দিতে ভালবাসত, এখন তা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করার দরকার নেই। মার আত্মা কষ্ট পাবে ওতে। ললিত চোখ বড় বড় করে তাকাল। এই না চীফ ইঞ্জিনীয়ারের মত কথা। আহা, শ্মশানে তো একদিন সবাইকে আসতে হবে, তবে ইনি যে একটু লেটে আসেন। কেননা পৃথিবীতে ভাল মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ললিত চমকে উঠল, তুহিনবাবু হাত ধরে টানছে, চলুন একটু চা-টা খাওয়া যাক, অনেক পরিশ্রম করেছেন।

শ্মশানের সামনে মিষ্টির দোকান। রোদে বিকেলের রং লেগেছে। ভেবেছিল, মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে ছুটির দুপুরে কষে ঘুম লাগাবে। এখন খিদেটাই মরে গেছে। তুহিনবাবু বলছে, ওরে আরও রসগোল্লা নিয়ে আয়—

আগুন লোহা ছুঁয়ে ললিত ঘরে না ঢুকে বারান্দায় শুয়ে পড়ল। দক্ষিণ থেকে ঝিরঝিরে বাতাস আসছে। মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের ফল ফলেছে। আর লোডশেডিং হয়নি। চন্দন পড়তে বসেছে। চিনু গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল, পেছন থেকে কল্যাণী টেনে ধরল।

—শুয়ে পড়লে কেন? যাও স্নান করে এসে ভাত খাও।

ললিত বলল, চা বানাও দেখি। এখন ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না।

সাড়া পেয়ে ছুটে এল বৌদি।

—কি ঠাকুরপো, এর মধ্যেই হয়ে গেল?

—হুঁ।

—আমিও ওবাড়ি থেকে এই মাত্র এলাম। —বৌদি গলার স্বরটা নিচু করল : সুনুদি বলছিল ভাল মানুষ পেয়ে অনেকে নাকি মার টাকা মেরে দিয়েছে :

দুটো চোয়ালই শক্ত হয়ে গেল। কল্যাণী কোথায় সেটা লক্ষ্য করে ললিত আস্তে বলল, আমার কাছে কিছু পাওনা নেই।

—হ্যাঁ, সেকথা আমিও বলেছি, ঠাকুরপো সেরকম লোক নয়।

হারিকেন হলে একদম পড়তে চায় না চন্দন। আজ চমৎকার বিজলীর আলোয় উচ্চস্বরে পড়া মুখস্ত করছে, প্রাচীন ভারতে একজন বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁর নাম সংগ্রাম সিংহ—

ছেলের সঙ্গে হঠাৎ ইয়ার্কি করার ইচ্ছে হল ললিতের। মেজাজ ভাল থাকলে মাঝে মাঝে এরকম ইচ্ছে হয়। বলল, কি পড়ছিল রে?

—ইতিহাস বাবা।—চন্দন খুশি হয়ে তাকাল।

—ওঁব বাজে ইতিহাস।—ললিত হাসল একশো বছর পরে তোদের মত ছেলেরা নতুন ইতিহাস পড়বে। তাতে কি লেখা থাকবে জানিস?

—কি?—মজার গন্ধ পেয়েছে চন্দন।

—লেখা থাকবে প্রাচীন ভারতে সংগ্রাম সিংহের চাইতেও একজন মস্ত বীর ছিলেন, তাঁর নাম শ্রীললিতকুমার সরকার—

চন্দন হেসে উঠল, ইস, সংগ্রাম সিংহ কত বড় বীর। তাঁর শরীরে আশিটি অস্ত্রের চিহ্ন ছিল। তুমি অন্তত একটা চিহ্ন দেখাও।

মুশকিলে পড়ে গেল ললিত। যুদ্ধে যে ধরনের অস্ত্র ও আঘাত পেয়েছে তার চিহ্ন তো খালি চোখে দেখা যায় না। তবু মান রাখতে খুঁজে পেতে একটা বের করল।

চন্দন আরও জোরে হেসে উঠল, এতো টীকার দাগ, এতো সবার শরীরেই থাকে।

দুটো চোয়াল আবার শক্ত হয়ে গেল। এইটুকু ছেলে অবিশ্বাস করছে! জোরে ধমক দিয়ে উঠল, একটি চড় দেব, আজকাল বড়দের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে শিখেছ! যাও পড়তে বোসো।

এক মিনিটের মধ্যে দুই রকম বাবাকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে দশ বছরের চন্দন ফের ইতিহাসের পাতা মেলে ধরল।

কারিগর / মনোজিৎ মিত্র

সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে জোলো হাওয়ার ঝাপট লাগছে খড়ের চালে কেমন শনশন শুনশুন শব্দ হয়। খানিকদূরে রায়েদের ছোট পুকুরটায় খই ফোটার মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ে। রাস্তার প্যাচপেচে কাদা আরও দলা পাকাতে থাকে। একটা দুটো লোক ভাঙা ছাতা নিয়ে সন্তর্পণে যায়। এতদিনে বৃষ্টি নেমেছে।

দাওয়ায় কাৎ হয়ে শুয়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখে হারাণ পাল। গা কেমন শিরশির করে মাজম্যাজ করে। বেলা হল কিন্তু আজ তেমন কাজে বেরোবার মন নেই। বৃষ্টির সময় এক একদিন কেমন যেন হয়। চেপে নাববে গো চেপে নাববে এবার বর্ষা নিজের মনে বিড়বিড় করে হারাণ। এই কদিন আগেও গাঁয়ে সব কেঁইকেঁই করেছে শ্রাবণ মাসেও বর্ষা হল না বলে। এইবারে নাও সামাল দাও ভাবে হারাণ। কার কত লাঙলের জোর দেখ এবারে। আরও জুত করে মাদুরে চেপে শোয় হারান।

ভিতরের ঘরে তার বউ গজগজ করে ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে না বলে। ঐ লাও হারাণ আবার বেড়বিড় করে। ছাতার বর্ষা না হলেও কেঁইকেঁই হলেও কেঁইকেঁই। ওপাশ থেকে ছ্যাঁকছোঁক রান্নার শব্দ আসে। ছোট ছেলেটা চীৎকার করে নামতা মুখস্থ জুড়েছে। নে বাবা যে যার কাজ কর তোরা হারাণ ভাবে। আমি আজ এই দাওয়ায় সেঁটে রইলাম।

তাকিয়ে তাকিয়ে আরও একজনের কাজ করা দেখতে পায় হারাণ। তার মেজ ছেলে বলাই খুব ব্যস্ত প্রতিমা গড়ায় চালাঘরে। কাল কোথা থেকে জনমজুর দিয়ে মাটি আনিয়ে তুম্বু বানিয়েছে খানিক চালার মধ্যে খানিক বাইরে। এই বৃষ্টি হয়ে ছেলেটার হয়েছে ঝামেলা। তা বলাই বেশী কথার লোক নয়। যখন যা ঝামেলা হয় চুপচাপ সামাল দিয়ে যায়। প্রতিমার কাজকর্ম নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা হয় না তবু হারাণ টের পায় বলাই খুব উঠে পড়ে লেগেছে। কোথা থেকে যেন মাটি আনবে থোকা থেকে যেন টাকা আনবে লোক রাখবে; নিজে খাটবে অনেক ঠাকুর গড়বে বড় ববসা করবে এইসব তাল। মাথায় গামছা বেঁধেছে এখন বর্ষার জন্যে। হ্যাঁ খাটতে পারে বলাই বছর বছর খাটনি বাড়িয়েই যাচ্ছে।

চালাঘরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় হারাণ। বর্ষা চেপে এল। আকাশে গুড়গুড়ুম শব্দ হয়। আর দুদিন পরে রায়েদের পুকুরের জল গড়াবে রাস্তাটার ওপর দিয়ে। ভেজা খড়ের গন্ধ ছড়াচ্ছে জোলো হাওয়ায় গা শিরশিরিয়ে যায়। প্রিতিমে গড়বি তুই কত প্রিতিমে গড়বি? নিজের মনে বিড়বিড় করে হারাণ। কতবড় প্রিতিমেওয়ালা হবি তুই পালের ব্যাটা? তোর বাপ গড়ল তার বাপ গড়ল তাদের বাপের বাপ সবাই কত হাজার প্রিতিমে গড়ল রে বলাই। এখন তুই চালাঘরে ঢোকালি এ্যাঁ? গড়ে গড়ে কোথায় যাবি কত বড় ব্যবসা করবি কি হবি রে তুই পালের পো? গত বছর বি ডি ও সাহেব তোর প্রিতিমে দেখে কি বলে গেল যেন শিল্পী শিল্পী। তুমি ত শিল্পী হে বলাই কত্তা বড় পুণ্যবান শিল্পী তুমি। মায়ের প্রতিমা গড়ে রুজি-রোজগার করছ তোমার জীবন ধন্য। খুড় ভাল ভাল কথা রে বলাই বাবুরা অনেক বোঝে।

ছড়াৎ করে কুলকুচির জল ফেলে হারাণ তারপর ঢকঢকিয়ে আধ ঘটি জল খেয়ে প্রকান্ড এক ঢেঁকুর তোলে। আঃ। আমি এই দাওয়ায় সেঁটে রইলাম তুই খেটে যা তোর চালাঘরে। তুই টাকা রোজগার কর বলাই মায়ের প্রিতিমে গড়ে জীবন ধন্য কর। আমি ঐ বাঁশের ঝুড়ি বানাব, আমার দেড় বিঘিতে লাঙল দেব রায়দের জমিতে লাঙল দেব রায়েদের বাগানে বেড়া দেব

ব ভি ও সাহেবের কাছে ধন্না দেব সি পি
লান টি পি লোনের জন্যে। আমার তোর
ত পুণ্যি করার তাড়া নেই টাকা বানানের
ড়ো নেই। তুই পালের ব্যাটা পাল, আর
আমি পালের ব্যাটা জনমজুর রে বলাই।
তার ঐ চালাঘরে আমি নেই। প্রিতিমে
দুগ্গা ধম্ম কম্ম পাপ পুণ্যি স্বগ্গ নরক
সব ঝামেলায় আমি আর নেই রে বাবা।
নজের মনে হারাণ একটু শব্দ করেই
সে।

বার বছর হল বার বছর। বার বছর ঐ
লাঘরে হারাণ ঢোকে নি। চালাঘরটার বয়স
অনেক বেশী ঐ চালাঘর বানানের সময়
রাণ হাত লাগিয়েছিল। আকাশে গড়াম
ম শব্দ হয়, চড়াৎ চড় করে ঝিলিক মারে।
রাণ ভাবে না তবু মনে পড়ে পড়ে যায়।
বার এরকম বর্ষায় ঐ চালাঘরে দিন
টিয়েছে হারাণ। পুজো যত এগিয়ে
সেছে তত খাটনি বেড়েছে। এক একবার
সে দাওয়ায় বসে খেয়ে আবার গভীর
ত পর্যন্ত চালাঘরে। এ অঞ্চলে বায়না
লই ছিল বরাবর। তাই জমিজমা না
ড়াতে পারলেও ঐ অন্য টুকটাক কাজের
ঙ্গে প্রতিমা গড়ে দিন চালাতে পেরেছে
রাণ। আগে দাওয়াতেই গড়ত তারপরে ঐ
নার জঙ্গল সাফ করে সাপব্যাঙ তাড়িয়ে
লাঘর তুলে ফেলেছিল। হাত ভালই ছিল
রস্বতী-কালী-লক্ষ্মী আর দুচারখানা
র্গাও ভালই কাটত। পুজোর সময়
মছা কাঁধে আশেপাশের গাঁয়ে গিয়ে নিজের
ড়া প্রতিমার পুজো হারাণ দেখে আসত।
-এক জায়গায় ভলান্টিয়ার বাবুরা লিখেই
খত প্রতিমার সামনে---হারাণ পাল।
রানের প্রিতিমের চোখ জ্বলে হে, গাঁয়ের
াকে বলত।

তা পালের বাটা পাল তার হাতে
তিমের চোখ ত জ্বলবেই। হারাণেরও
ন জিদ চেপেযেত। গোপালপুরের বাবুরা
কবার এসে বলল একই দাম নিয়েছে
রাণ কিন্তু খয়রাখালির প্রতিমার মুখ
রও ভাল করে দিয়েছ। সব কাজ ফেলে
নিসপত্র বোঁচকা বেঁধে হারান দৌড়ল
পালপুরে ষষ্ঠীর দিন সারারাত জেগে
না কারিকুরি করে দিয়ে এল প্রতিমার
খে। সপ্তমীর সকালে ধন্যি ধন্যি পড়ে
ল। ঐ দুগাঁয়ে আবার ঐ দুর্গাপুজো
া ফুটবল খেলা নিয়ে রেষারেষিষ ত শেষ
কিনা।

জলকাদার মধ্যে ছপাং ছপাং করে বলাই
বার কোথায় চলল মাথায় গামছা বেঁধে।
াণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ডাকে না।
হয় বাখারী কঞ্চির খোঁজে যাচ্ছে মাটি ত
গেছে। যাক গে জানার দরকার নেই।
প অল্প ছাঁট লেগে পায়ের পাতা দুটো
জে যাচ্ছে এবার। দেয়ালের দিকে চেপে
হারান। বলাই বড় ব্যস্ত। হারান
জর হাতে কিন্তু ওকে বেশী কিছু
াস নি। শেখাত বড় ছেলেকে। বড় ছেলে
াই। হারানের বাবা যতদিন বেঁচে
আদর করে ডাকত রামকানাই। হাটে
ঘুরতে ঘুরতে কানাই-এর যখন বার

বছর পূর্ণ হল তখন একবার আষাঢ় মাসে
হারান কানাইকে নিয়ে গেছল চালাঘরে।
বলেছিল পেন্নাম কর কেনো ঘরকে পেন্নাম
কর ঐ মাটির তালে পেন্নাম কর। এবারে
হা তলাগাবি মায়ের প্রিতিমে গড়বি বাপের
সাথে কেমন? ঘাড় নেড়ে কাজে লেগে গেল
কানাই।

বছর পাঁচেক ভালই হাত খুলেছিল।
ছোট কাজগুলো ওর উপর ছেড়ে দিল
হারাণ। কিন্তু কানাই-এর বাপের মতই জেদ
ছিল। দুর্গা গড়তে শুরু করল কানাই।
একবার বর্ধমান গেল পুজোর আগে মূর্ত
দেখে আসার জন্য। তারপর নিজের মত
করে মুখ গড়তে আরম্ভ করল। বাপের
ছাঁচের বাইরে। হারাণ খুশী করেছিল
ব্যাটার মতিগতি দেখে। বানাক পালের
ব্যাটা পাল বানাক যা পারে।

কানাই-এর বিয়ে দিল হারাণ। বউটা
ভালই হাসিখুশী মাঝে মাঝে বেশ ঘন করে
ডাল রেঁধে দিত। হারানের আবার ঘন করে
ডাল খাওয়ার শখ কিনা। মাঝে মাঝে
চালাঘরে গিয়ে মাটি ছেনে দিয়ে আসত।
রাত্তিরে লম্ফ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ
দেখত। হারাণ খুশী হত ওদের ছেলেপুলে
হল না। বউটা বাঁজা বলে হারানের বউ
মাঝে মাঝে আফশোষ করত। হারানের ওসব
ছিল না। কানাই ত খুশী তাহলেই হল।
ছেলেপুলে? ও যবে ভগবান দেনে তবে হবে।
বাপব্যাটা মিলে চালাঘরে মাটি কাঁচ
বাখারী দড়িদড়া নিয়ে খেটে যেত অক্লান্ত।

সেবারে কড়িপাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা ভাগ
হলেন। পাশাপাশি দুই বাড়ীতে ভিন্ন
পুজো আরম্ভ হল। দুবাড়ীরই বায়না এল
হারানের কাছে। ছোট তরফের প্রিতিমে তুই
করিব কানাইকে হুকুম দিল হারাণ। নতুন
বায়না মুখ যেন থাকে। মাটির তাল ছুঁইয়ে
দিল কপালে। পাশ থেকে হারানের বউ হাসি
হাসি মুখে বলেছিল জয় দুগ্গা মা।

তা প্রতিমা ভালই করেছিল কানাই।
ছোট বাঁড়ুজ্জে ভুরু কুঁচকে দেখে টেনে
বললেন বেশ বানিয়েছ হে পালের পা। হারান
মকে উঠেছিল ছেলেকে সং-এর পানা দাঁড়ে
রইলি যে বড়? পেন্নাম কর বাবুকে।
আপনদারে আশীব্বাদ কত্তা এ ব্যাটা ত এই
করেই খাবে মনে হয়। বড় খুশী খুশী মনে
বাড়ী ফিরল সেদিন হারাণ। ব্যাটা মুখ
রেখেছে।

কানাইও বড় আনন্দ পেয়েছিল। নিজের
কাচ্চাবাচ্চা ছিল না ত আর লাঙল ঠেলাতেও
তাত গরজ ছিল না। ঐ কাদামাটি ছানতেই
ভালবাসত. কাজ ভাল হয়েছে শুনলে গলে
যেত ছোটকত্তার মুখের প্রশংসাই কাল হল।
পুজোর কদিন ওখানেই পড়ে রইল।
ওখানেই প্রসাদ খায় যাত্রা দেখে গভীর রাতে
বাড়ী ফেরে। বিসর্জনের দিন গেল হেঁটে
হেঁটে সেই অজয় নদী পর্যন্ত। বাঁড়ুজ্জেরা
ত আবরা দীঘিপুকুরে বিসর্জন দেবেন না।
ঘরে আসি মা বলে সন্ধ্যেবেলায় দাওয়ার

বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল। বউটা তখন সিঁদুরখেলা সেরে ফিরে সন্ধেপিদীম জ্বালাচ্ছে।

নদীর পাড় থেকে বাঁড়ুজ্জেবাড়ীর লোকেরা কানাইকে সোজা ঈশানপুরে এম-বি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে নাকি হেলথ সেণ্টারে। কিন্তু ডাক্তাররা ঠেকাতে পারেন নি। বলেছেন দেরী হয়ে গেছে। ভয়ানক বিষাক্ত কোন সাপ কামড়েছিল ঘাসবনের মধ্যে। তখন ত হিম হিম পড়ে গিয়েছে বাস্তিরে সাপ কেন বেরুল হারাণ ভেবে পায় না। তবে সেবারেও পুজোতে দু চার পশলা বৃষ্টি হয়েছিল বটে। গর্তে জলটল ঢুকে থাকবে বোধহয়। কেন যে দেরী হল কেন যে কোন ওষুধ লাগল না মাথায় ঢোকে না ঠিক ঠিক। দেরী দেখে সবাই রাত জেগে বসেছিল দাওয়ায়। ছোট ছেলে দুলালটা তখন সবে দু বছরের। তারপর ভোররাত্তিরে ওরা কাঁধে করে নিয়ে এল কানাইকে। প্রিতিমের বিসর্জন তারপর কারিগরেরও বিসর্জন।

তাই বি ডি ও সাহেবের কথা মনে পড়ে হাসি পায় হারানের। বলাইকে বলেছিল পুণ্যবান। কিসের পুণ্যি হে? নিজের মনে শুধোয় হারান। কিসের পাপ? কার মা হে? সারা দুনিয়ার মা দুগ্গা মা? তোর প্রিতিমে গড়েছিল যে বাটা তোর পিছু পিছু [illegible] গেলি? চীৎকার করে হারাণ বলেছিল কান খুলে শুনে লাও হে তোমরা এরকম মা আমার দরকার নাই। পাপপুণ্যি গোল্লায় [illegible] ধম্মকম্ম আগুনে যাক। এ কি বিচার রে?

চালাঘরে আর পুরাণ যায় নি। বাঁশের ঝুড়ি বানান শিখেছিল সাঁওতাল পাড়ায় গিয়ে। খেতের কাজ না থাকলে বসে বসে ঝুড়ি বানাত। বিড় বিড় করে মাঝে মাঝে বলত নিজের মনে, উ মাটির ডেলা হে মাটির ডেলা। আমার আর হাত ময়লা করে কাজ নাই। বউ যখন বিধবা ছেলের বউকে নিয়ে পুজোর সময় মণ্ডপে যেত হারাণ একমনে নিজের কাজ করে যেত। পুরোন বায়নাদারেরা প্রথম [illegible] ভাবসাব দেখে তা বিরক্ত করে নি। বউ বার [illegible] বলেছিল কারিগরের কাল উপরে রাগলে তুমি? নিজে কম্ম ছেড়ে দিলে? রাগ করলে কি কেউ ফেরৎ আসে?

ঝগড়াঝাঁটি তাতে হারানের আসে না। অন্য দিকে চেয়ে শুধু বলেছিল কাদায় আর হাত দিব না রে বউ। কাদা কাদাতেই থাক।

একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বউ বলে মা-এর উপরে কি রাগ চলে? মা-এর জিনিস মা দিয়েছিল মা ফেরৎ লিয়েছে। তাই বলে তুমি মা-এর মুখ দেখবে নাই? প্রিতিমা গড়বে নাই কারিগর?

কিন্তু হারান আর যায় নি চালাঘরে। কখনও কোথাও প্রতিমার মুখের দিকে তাকায় নি। চোখ পড়ে গেলেও ফিরিয়ে নিয়েছে। তার বউ, কানাই-এর বউ দাওয়ায় আছড়ে কেঁদেছে, মাথা ঠুকেছে দেয়ালে। তারপরে আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, আবার সুরু হয়েছে ধান কোটা, চাল মাড়ার শব্দ। চোখের কোণে হারাণ দেখতে পেয়েছে পুজোর কদিন তার বউ চুপি চুপি গিয়ে চালাঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসছে। বিধবা ছেলের বউকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে পুজো দিতে। মেজ আর ছোট ছেলের মুখে প্রসাদ ঠেকাতে দেখে হারান ভেবেছিল বারণ করবে, তারপরে আর কিছু বলেনি। করুক। ওরা যদি মা মা করে আনন্দ পায়, পাক।

কানাই যখন গেল, বলাই তখন তের বছরের। সবে কাদামাটি ঘাঁটতে শুরু করেছিল। কাজ শেখা বন্ধ হতে গেল। বলাই খেতে যেতে আরম্ভ করল কিন্তু হারাণ জানত খেতের কাজে বলাই-এর মন ছিল না। ছোটকাল থেকে বাপ দাদাকে কাদা ঘাঁটতে দেখে তারও মন গেছল ঐ দিকে। বছর আস্টেক বাদে বউ এসে একদিন বলল, খেতের কাজে বলাই-এর মন নেই।

বাঁশের কঞ্চি কাটতে কাটতে হারাণ বলে, কি করবে বলাই?

বাপ-ঠাকুরদার পুরোন কাজ করতে চায়, বউ আস্তে আস্তে বলে।

হাত থেকে দাটা নামিয়ে রাখে হারান। জিজ্ঞাসা করে, কাদা ঘাঁটতে চায়? বউ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ কি ভেবে বলাইকে ডাকে হারাণ। ছেলে সামনে এসে মাথানীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পা থেকে মাথা অবধি দেখে হারান জিজ্ঞাসা করে। তুই নাকি প্রিতিমে গড়বি?

প্রথমে তা কথাই বলতে চায় না, তারপর জেরায় জেরায় সব বেরুল। খেতের কাজ ভাল লাগে না, তাই কিছুদিন ধরে অন্য কাজের খোঁজখবর নিয়েছে ছেলে। ব্লক অফিসের বাবুরা বুঝিয়েছেন, কামার-কুমোর ছুতোর দোকানদার রিকশাওয়ালা পানওয়ালা সবাই লোন পাচ্ছে আজকাল। তোর বাপ-পিতেমোর কাজ কর, লোন পাবি ব্যাংক থেকে। আরও বলেছেন এসব লোন-টোন শোধ করার নানা সুবিধে আছে, মহাজনের ছড়ি ঘুরান কারবার নয়। ছোট বাঁড়ুজ্জে বলেছেন, লোন টোন নিয়ে বাপ-পিতেমোর কারবারটাই ভাল করে কর। এখন বায়না বাড়ছে দু পয়সা হবে। তাই বলাই চায় প্রতিমার কাজ শুরু করতে।

ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে হারান বুঝল, এরও চোখে রং লেগেছে। কানাই-এর ছিল বাহাদুরী পাওয়ার ঝোঁক, এরও ঝোঁক হয়েছে কাদা ছেনে অন্য কিছু পাবার। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দাটা আবার হাতে তুলে নিল হারাণ বলল কর তোর মন চায় তুই কর। তবে আমি আর চালাঘরে যাব নাই। বলে আবার কঞ্চি কাটতে লাগল।

তারপর এই চার বছর ধরে বলাই প্রতিমা গড়ছে। চালাঘরে জঙ্গল গজিয়েছিল, একদিক হেলে পড়েছিল। সেসব সাফসুফ মেরামত হয়েছে। কানাই-এর মত হাত নয় বলাই-এর, তবু খেটেখুটে দাঁড় করায়। কিছু কিছু করে বায়না আসছে। জয় দুগ্গা মাই কি বলে ভলান্টিয়ারবাবুরা প্রতিমা বের করে নিয়ে যায় চালাঘর থেকে। হারান বাঁশ কাটে, মুড়ি চিবোয়, কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোয়।

বলাই-এর কাজ নিয়ে কথাবার্তা তার আড়ালে হয়। কখন কিছু কানে এলেও শোনে না।

বলাই কথা বলে কম, কিন্তু খাটে খুব। প্রত্যেক বছর চেষ্টা করে নতুন বায়না ধরতে ভাল করে মূর্তি বানাতে। সেদিন ওর মা আর বউদি বলাবলি করছিল কোথা থেকে বলাই ভাল ভাল ছবি এনেছে বড় বড় জায়গার দুর্গাপ্রতিমার। নতুন [illegible] মুখের আদল না কি আনবে। [illegible] থেকে লোন গত বছর পায় নি, এ বছর নাকি পাবে। কাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছে, উলুবেড়ে থেকে মাটি নিয়ে আসবে। ভাল গঙ্গামাটি, তাতে ভাল মূর্তি হয়। হারাণ কিছু বলে না। শুধু মনে মনে ভাবে, বিড়বিড় করে নিজের মনে। পুণ্যি হচ্ছে হে, বড় পুণ্যি। আর বাঁশ কাটে।

বৃষ্টি যেন আর থামবে না। সারা দিন গেল, রাতে আরও ঝমঝমিয়ে এল। কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমোল হারাণ। পরদিন সকালেও চলছে টিপটিপ। বউ এসে বলে বলাই বোলপুরে যাচ্ছে, রেতে ফিরবে।

মাথায় গামছা বেঁধে বেরুচ্ছিল হারাণ। আজ একবার কেরোসিনের খোঁজে না গেলেই নয়। বলাই এসে প্রণাম করল। ব্যাংকের টাকা আজ পাওয়া যাবে, তাই বোলপুরে যাওয়া।

অ, তা আজ ত বড় বিষ্টি। ছেলের মাথায় একবার হাত দিল হারান, [illegible] বাসে ফিরিস, নয়তো বড় বেশী রাত হয়ে যাবে। তার বউ পথের দিকে চেয়ে নমস্কার করে, দুগ্গা দুগ্গা।

কেরোসিন জোগাড় করে, আরও কাজ কর্ম সেরে সাড়ে চারটে নাগাদ হারাণ বাড়ি ফিরল। বলাই ফেরে নি। বোধ হয় তিনটের বাস ধরতে পারে নি ভাবল হারাণ। [illegible]

দুপুরবেলায় বৃষ্টিটা ধরেছিল, আবার আকাশ চেপে মেঘ এল। কালো চাপ চাপ মেঘ, গড় গড় গড়াম আওয়াজ দেয়। টানা জোরালো হাওয়া সুরু হল দক্ষিণ দিক থেকে। তারপর টুপটাপ, তারপর ঝমঝম। আবার সেই বৃষ্টি।

মেঘের অন্ধকারের সঙ্গে যোগ দিল রাতের অন্ধকার। ছ'টার বাসের টাইমও চলে গেল। এরপর শেষ বাস বোলপুর থেকে ছাড়বে আটটায়। বলাই-এর পেঁছতে তাহলে রাত দশটা। কি কালো রাত্তির, কি তুমুল বিষ্টি। কাঁথা গায়ে দিয়ে চারজন বসে থাকে লণ্ঠনের টিমটিমে আলোতে। পশ্চিম দিকের বাঁশঝাড়ে কটকট্ কটকট্ আওয়াজ হয়। তুফানী হাওয়া ডেকে যায় সাঁ সাঁ। ঝড় দুর্জোগের রাতে হারাণ বিড়বিড় করে। কোথায় একটা কুকুর ক্রমাগত কেঁউ কেঁউ করে কাঁদছে, বোধ হয় ওঠার কোন জায়গা পায় নি, ভিজছে বিষ্টিতে।

বসে থাকতে থাকতে চারজনই মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ছিল। রাত তখন কত কে জানে। বাইরে কে হাঁক দিল হারাণ অ হারাণ।

লণ্ঠন হাতে ধড়মড়িয়ে দাওয়ায় এল হারাণ। হরিপদ মাঝি সঙ্গে একটা অচেনা লোক, দুজনেই কাকভেজা।

বড় বিপদ পড়ল যে হে হারান, গামছা দিয়ে মাথার জল মুছে হরিপদ বলে। তোমার ব্যাটা বোলপুর গিছল না কি সকালে?

বাকীটা বলল অচেনা লোকটি। তার বাড়ী গোপালপুর। সেও বোলপুর গিয়েছিল, আটটার বাসে ফিরেছে। তাদের বাস মাঝ-রাস্তা থেকে ঘুরে গিয়েছিল বোলপুরে। ছটার বাস মাঝ রাস্তায় উল্টে গেছে। বৃষ্টিতে রাস্তার মাঝখানে খানিকটা বসে গিয়েছিল, তাতে চাকা পড়ে বাস টাল সামলাতে পারে নি। কিছু প্যাসেঞ্জারকে আগের একটা লরী বোলপুর হাসপাতালে পেঁছে দিয়ে গেছে, বাকী কজনকে নিয়ে আটটার বাস ফিরে গিয়েছিল। তার মধ্যে বলাই ছিল, অতি কষ্টে নাম আর গ্রামের নাম বলেছিল বলাই।

হারানের গলার মধ্যে যেন একদলা কাপড় কেউ ঠুসে ধরেছে। বলাই...বলাই... তারপরে...

হরিপদ আর অচেনা লোকটি পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। তারপর হরিপদ হারানের কাঁধে হাত রাখে। আজ ত আর হবে না ভাই, কাল সকালে বোলপুর যাও, এর বেশী খবর ত আর এই লোকের কাছে নাই, কি বল?

দুজন সেই অঝোর বৃষ্টির মধ্যে আবার নেমে যায়। হঠাৎ চমক ভেঙ্গে পিছন ফিরে হারান দেখে, তিনজন পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। বউ-এর মুখ যেন ভাবলেশহীন... বলাই...বলাই...নাই?

হারাণ লন্ঠনশুদ্ধ হাত নাড়ে। জানি না...জানি না রে বউ...জানব কেমনে? চার-জন আবার দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর বউ হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দাওয়া থেকে। একছুটে চলে যায় চালাঘরে। ওরা তিনজন কোথায় যেন দাঁড়িয়ে। বউ ছুটে ফিরে আসে আবার। কারিগর, তুমি মাকে গিয়ে বল...মা ফিরায়ে দিবে—বলাইকে...তুমি যাও কারিগর... বলাই মা-এর একখানা মূর্তি রেখে গেছে...তুমি যাও।

হারানের হাত থেকে লণ্ঠন খসে পড়ে। হঠাৎ হারান চীৎকার করে, কে মা? মা ফিরায়ে দিল আমার কানাইকে? কানে শোনে মা?

মা-এর জিনিস মা নিয়েছিল, কারিগর। মা-এর উপর রাগ চলে না, তুমি বুঝলে নাই। বলাইকে মা নিবে না, ফিরায়ে দিবে, তুমি মাকে গিয়ে বল। তুমি যার বছর বছর মুখ দেখ নাই কারিগর, আজকে যাও।

পিছন থেকে দুলাল এসে হাত ধরে, যাও বাবা।

লণ্ঠনের ঝাপসা আলোয় ছোট ছেলের মুখের দিকে চায় হারান। বিধবা ছেলের বউ-এর মুখে চায়। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বলাই-এর মা আবার বুকফাটা চীৎকার করে, যাও কারিগর।

হারান বৃষ্টির মধ্যে নেমে যায়। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায় চালাঘরের দরজায়। ঘন অন্ধকার, মূর্তির মুখ দেখা যায় না। আকাশ ফাটিয়ে কোথায় বাজ পড়ে।
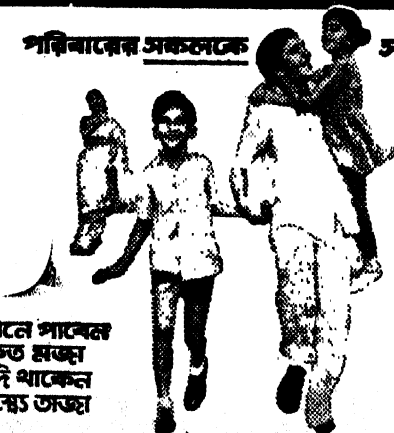
ছবি

কিছু বাঙালী নিয়মিত ছবি কেনেন : লেডি রাণু

প্রশান্ত দাঁ

[illegible] বাজারে ক্রেতাদের পালাবদল মূলতঃ সুরু হয় চল্লিশ দশকের গোড়ায়। এই সময়ে শুধু—ছবি কেনা বেচাতে কেন ঐতিহ্যবাহী ভারত শিল্পধারাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে আমদানি হত পাশ্চাত্য ছবি, ছবির প্রিন্ট ও শিল্পগ্রন্থ। ফলে বিদেশী চিত্ররীতি এবং ভাবধারার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে তোলার অবকাশ পেয়েছিলেন সেই সময়ে এ দেশের কলারসিকরা। পরিতোষ সেনের মুখে শুনেছি তিনিও সেযুগে সামরিক বাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ শিল্পরসিক কর্মচারীর সাহচর্যে সাগর পারের বিস্তৃত শিল্পলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন।

বস্তুতঃ কিছু রাজা মহারাজা ও জমিদার শ্রেণী ছাড়া তখন ছবির বাজারে প্রধান ক্রেতা ছিলেন সাহেব সুবোরা। চিরায়ত লোকশিল্পাশ্রয়ী। বাজার পেইন্টিং নতুন বিক্রির বাজার খুঁজে পেয়েছিল এদেরই শিল্পপ্রীতিতে। এঁরা ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় যামিনী রায়ের আঁকা অনুচিত্র ধরনের ছবি কিনেছিলেন হাজারে হাজারে। এরই পাশে পাশে অবনীন্দ্রনাথ অনুসৃত নব্য বঙ্গীয় চিত্রশৈলী অনুসারী ছবির বাজারও ভাল ছিল। কিন্তু অর্থমূল্য অত্যধিক হওয়ায় বিক্রি ছিল বিত্তবানদের স্তরে সীমিত।

অন্যদিকে ১৯৪৩ সালে ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপের আবির্ভাবের ফলে কিন্তু ছবির বাজার মধ্যবিত্ত শিল্পরসিকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসতে থাকে। কারণ চিত্রকলাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার অভিপ্রায়ে ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপ অধিকাংশ ছবির দাম রেখেছিলেন চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার মধ্যে। এদের প্রথম প্রদর্শনী হয়েছিল গোপাল ঘোষের ছবি নিয়ে। পরের প্রদর্শনী হয় নীরদ মজুমদারের। চিত্রমূল্য স্বল্প হওয়ায় বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ছবি কেনার অপরিমিত প্রত্যাশা প্রাণ পায়। অভিনেত্রী [illegible] দেবী এই প্রদর্শনী থেকে গোপাল ঘোষের [illegible] করা একটি নিসর্গ চিত্র কিনেছিলেন বারশ টাকায়।

এ প্রসঙ্গে সুভো ঠাকুরের মন্তব্য—[illegible] পর্যন্ত ছবির ক্রেতা ছিলেন মিডলক্লাস-এর মানুষ। কিন্তু এই শ্রেণী- [illegible] পর ছবির ক্রেতা বদলায়। [illegible] করেন।

মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের ক্রয়প্রবণতায় উৎসাহ যুগিয়েছিল ক্যালকাটা গ্রুপ। সনাতন রাজা জমিদারদের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছবি কেনার রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল। তখন ইংরেজরাই বেশী ছবি কিনতেন। ওরা ছিলেন সত্যিকারের আর্ট মাইন্ডেড। পার্সীরাও কিছু কিছু ছবি সংগ্রহ করতেন। পাঞ্জাবীদের পছন্দ ছিল আবার মডার্ণ আর্ট।

এখন কি আগের মত ছবি বিক্রি হয়! বোধহয় নয়। হাওয়া দেখে ত মনে হয় ত্রিশ টাকা দাম রাখলেও ছবি বিক্রি হবে না আজকাল। বাঙালীদের সাহিত্যপ্রীতি আছে। কিন্তু শিল্পপ্রীতি নেই। তা না হলে মিডিওকার সাহিত্যিকদের সাফল্যের পাশে আজও যথার্থ গুণী ও সৃষ্টিশীল চিত্রকরদের এই দুরাবস্থা কেন! কেবল ছবি এঁকে বেঁচে থাকা আজও কঠিন। অত্যন্ত আক্ষেপ করে সুভো ঠাকুর বললেন—শিল্পীদের বাঁচবার একমাত্র উপায় প্রকাশনার মাধ্যমে। সরকার কি পারেন না অন্যান্য পুস্তকের মত বছর বছর ছবির প্রিন্টের অ্যালবাম প্রকাশ করতে। তাহলে রয়েলটি এবং সম্মানদক্ষিণার টাকায় শিল্পীদের জীবনধারণের পথে খানিকটা সহায় হতে পারে। নিছক মৌখিক প্রেমে শিল্পপ্রীতির প্রমাণ মেলে না। ক্রেতাই ছবির আসল রসিক ও প্রেমিক।

কলকাতায় ছবি বেচা কেনার প্রধান কেন্দ্র হল গ্যালারীগুলো। যেমন অ্যাকদামি অফ ফাইন আর্টস এবং বিড়লা অ্যাকাদমি। পার্কস্ট্রীট পাড়ার 'কেমোল্ড'এ চিত্রকলার লেনদেন হয়ে থাকে প্রায় নিয়মিত। শিল্পী এবং ক্রেতার মধ্যবর্তী সংযোগকারী ব্যক্তির সাহায্যে বাট্টার বিনিময়েও ছবি হস্তান্তরিত হয়ে থাকে অহরহ। শিল্পীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ করে স্টুডিও থেকে পছন্দমাফিক ছবিও কিনে থাকেন কিছু চিত্রপ্রেমিক। আর্ট গ্রুপের মাধ্যমেও ছবি হাত ঘোরে। আর প্রদর্শনী ও আছেই। বঙ্গ সংস্কৃতির মত সাম্প্রতিক কিছু সাংস্কৃতিক মেলাতেও আজকাল ছবির প্রদর্শনী এবং বিক্রির রেওয়াজ গড়ে উঠছে। লক্ষণটি অবশ্যই শুভ। খুব সস্তায় খুব ভাল ছবি কেনার জায়গা হল মার্কেট স্কোয়ারের আর্ট ফেয়ার। বছরে একবার হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী নাগাদ। পাঁচ দশ টাকায় কিছু শিল্পী মেলা প্রাঙ্গণে বসে স্পট পোর্ট্রেট স্কেচ করে থাকেন প্রতি বৎসর। এত কম সম্মানদক্ষিণায় পেন্সিলে প্রতিকৃতির কথা ভাবাই যায় না। অথচ কৈ তেমন ভীড় ত দেখি না।

লেডী রাণু

প্রশ্ন উঠতে পারে আজকালকার দর্শকরা কোন ধরনের ছবি বেশি পছন্দ করেন? এক কথায় বলা যায় পুরোপুরি ইমপ্রেসানিস্টিক না হলেও মোটামুটি বাস্তবানুগ রীতিতে রচিত সাবজেকটিভ ধরনের মিষ্টি মিষ্টি ছবির ক্রেতার সংখ্যা বেশী। ল্যান্ডস্কেপ ও হিউম্যান রিলেসানস-এর ওপর আঁকা ছবির চাহিদা বাজারে সবচেয়ে অধিক। মিনিয়েচার কপি এবং লোকশিল্পাশ্রয়ী চিত্রাবলীরও চাহিদা যথেষ্ট।

কলকাতায় ছবি বিক্রির বাজার সম্পর্কে লেডি রাণু মুখার্জী বললেন, বিদেশীদের মধ্যে আগে বৃটিশরা যথেষ্ট ছবি কিনতেন। এখন কেনে না বললেই চলে। আমেরিকান এবং রাশিয়ানদের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য। ফরাসীরা ক্বচিৎ কখনও কেনেন। সবচেয়ে বেশি ছবি কেনেন পশ্চিম [illegible] শিল্পরসিকেরা।

ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীরা ছবি কেনেন যথেষ্ট ড্রইং রুম বা বাড়ী সাজাবার জন্যে। আর কিছু বাঙালী ক্রেতা আছেন যাঁরা প্রায় নিয়মিত ছবি কেনেন তাদের আয়ের অনুপাতে। যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রায় প্রতি বছর আকাদমি অফ ফাইন আর্টসের বার্ষিক প্রদর্শনী থেকে একটি করে ছবি কিনে থাকেন। আর বাঙালী শিল্পদরদীদের একটা বড় গুণ এই যে তারা বেশি দামাদামি করেন না। বাঙালী ছাড়া অন্যান্য জাতের মানুষও ছবি কিনে থাকেন। তবে তাদের মধ্যে পাঞ্জাবীরা সংখ্যায় বেশী। মাড়োয়ারী ক্রেতার সংখ্যা কম নয়।

কলকাতায় ছবি বিক্রির বাজার যতই ঠাণ্ডা হোক না কেন এটা ঠিক যে মানুষের ছবি কেনার আগ্রহ বাড়ছে। এবং সমকালীন অনেক শিল্পী এ ব্যাপারে হাত মেলাচ্ছেন এঁরা ছবি বেচেন খুব কম দামে। কেননা এঁদের ইচ্ছে—ছবির নতুন বাজার সৃষ্টি হোক। ছবি কেনার জন্যে মানুষের মন তৈরি হোক। বাস্তবিক তবেই শিল্পী বাঁচবে শিল্প বাঁচবে।

কৃষি

সুভাষ রায়চৌধুরী

মনের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য ফুলের প্রয়োজন থাকলেও কিভাবে সহজে সেটা মেটান যায় তা আমরা অনেকেই জানি না। মাথার ওপর ছাদ খোলামেলা বারান্দা অথবা এক ফালি জমি থাকলে অনায়াসেই প্রয়োজন মেটোবার মতো ফুল আমরা পেতে পারি।

আঙিনায় ফুলের চাষ করতে হলে খুব বেশি কিছু লাগে না। মাটি অবশ্যই থাকবে। পাতা পচা সার এবং গোবর সার জোগাড় করতে পারলে ভাল হয়। চায়ের পাতা একটা টিনে জমিয়ে পচিয়ে নিলে খুব ভাল সার তৈরি হবে। পায়রা ও মুরগির মল ফুল গাছের জৌলুস বাড়ায়। তাছাড়া খোল রাসায়নিক সার সামান্য পরিমাণে লাগে।

জমি থাকলে কেয়ারি তৈরি করে নিতে হয়। না থাকলেও ক্ষতি নেই। নানান জাতের ফুল গাছের জন্য নানা মাপের টব বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ফুলের জন্য বাড়তি নারকেল তেলের ফুটো টিনটাকেও কাজে লাগান যায়।

প্রথমে ঠিক করতে হবে কি কি জাতের ফুল লাগান হবে। অনেক ক্ষেত্রেই এটা নির্ভর করবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। বাড়িতে বুড়ো ঠাকুমা-দিদিমা থাকলে তাঁদের কথাও মনে রাখতে হবে। সকাল সন্ধ্যে দুবেলা ঠাকুর দেবতার পায়ে দেবার মতো ফুল গাছও দু-চারটি চাই। ময়নতরা দোপাটি বা গাঁদা ফুলের জন্য খুব বেশি যত্ন পরিচর্যার দরকার হয় না। ছোট-বড় টবে কিংবা টিনের কোটোয় এগুলি করা যায় —জমি থাকলে টগর গন্ধরাজ ও জবা দু-একটি করে লাগাতে পারেন। বারমাস ফুল পেতে এগুলির জুড়ি নেই। দেখতেও ভাল প্রবীণদেরও খুশি করা যাবে।

নবীনাদের নজর ফুলদানির দিকে। ঘর সাজাবার দিকে। যুঁই বেলফুল রজনীগন্ধা জিনিয়া কলাবতী সূর্যমুখী তাঁদের প্রয়োজন মেটাবে। ফুলের রাণী গোলাপ সব বয়সের মন ভোলায়। খোঁপার গোঁজার পক্ষে এর মধ্যে অনেকগুলিই কাজে লাগাবে।

শীতের মরশুমী ফুলের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকা ও ডালিয়ার তুলনা হয় না। এসবই বাড়িতে তৈরি করতে পারেন। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হতে পারে। অভিজ্ঞতা বাড়লে পরে দেখবেন খুব সহজ কাজ। সৌন্দর্যবোধ আর দরদ দুই-ই দরকার।

আপনার প্রয়োজন মতো ফুল গাছ বসানোর জন্য মাটির কেয়ারি তৈরি করুন। খুব বেশি চওড়া করবেন না। মাটি কুপিয়ে আগাছা তুলে দিন। উলটে-পালটে রোদ খাওয়ান। মাটির সঙ্গে গোবর সার ও পাতা পচা সার মিশিয়ে নিন। সামান্য পরিমাণে চুন দিলেও ভাল হয়। তবে সেটা জমি তৈরি করার সময় অর্থাৎ চারা লাগাবার মাসখানেক আগে দেওয়া দরকার। কেয়ারিতে ফুল চাষ করতে হলে মাটি হবে দোঁয়াশ জৈব সার দরকার কিছুটা বেশি। চারা বসানর পর নিয়মিত জল সেচ মাটি খুঁড়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ করতে হবে। আগাছা হতে দেওয়া চলবে না। গাঁদা ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকা গোলাপ ইত্যাদি ফুল গাছের জন্য সার বেশি লাগবে। অন্যান্য মরশুমী ফুলে কিন্তু তত বেশি লাগবে না। বাগান বিলাস সার পছন্দ করে না। জবা টগর কলাবতী গাছের জন্য বছরে দুবার অন্তত সার দিতে হবে।

প্রথমদিকে সার হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে রাসায়নিক সার না দিয়ে মিশ্র সার এক মুঠো হিসাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া ভাল। পরে অভিজ্ঞতা বাড়লে সুপার ফসফেট পটাস ইত্যাদি দু-চার চামচ হিসাবে গাছের গোড়ায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন। খোল ব্যবহার করলেও চলবে। র‍্যালি মিল বা স্টেরামিল জাতীয় জৈব সারও ফুলবাগানের পক্ষে ভাল: এক মুঠো ওই জাতীয় সার মরশুমী ফুলের পক্ষে যথেষ্ট। আর একটা সার ফুল গাছের পক্ষে উপযোগী। এক কেজি খোল ও এক কেজি কাঁচা গোবর একটিন জলে পচিয়ে সেই পচা জলের সঙ্গে পরিষ্কার জল মিশিয়ে চায়ের লিকারের মত রং হলে ফুল গাছে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভাল ফুল ফোটাতে হলে মাটি সরস থাকবে। জল বসা হলে চলবে না। গরমের সময় সকাল বিকেলে ঝাঁঝরি দিয়ে অল্প জল দিন। রোগ-পোকার আক্রমণ দেখলে অভিজ্ঞ প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনা করুন।

টবে ফুলের চারা বসাতে হলে ছোট গাছের জন্য ছোট আকারের টব নিন। রজনীগন্ধা দোপাটি কসমস ময়নতারা চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি ফুলের জন্য আট ইঞ্চি টব চলবে। ডালিয়া গাঁদা ইত্যাদির জন্য চাই দশ ইঞ্চি টব। আর বেলফুল কলাবতী ইত্যাদি ফুলের জন্য বারো ইঞ্চি টব হলে ভাল হয়। জবা টগর ইত্যাদির জন্য আগে বড় জায়গা দরকার।

টবের মাটি তৈরি করতে সমান সমান মাটি গোবর সার আর পাতা পচা সার মিশিয়ে নিন। মাটিতে এক চামচ চুন দিন। দিন কয়েক রেখে দেবার পর চারা বসানর সময় এক মুঠো মিশ্র সার টব পিছু মিশিয়ে নিন। বাড়তি জল নিকাশের জন্য টবের নিচে ফুটো থাকে। তার ওপর ছোট চায়ের ভাড় উপুড় করে বসিয়ে দিন। ৫।১০টা নছাট নুড়ি বা ইঁটের টুকরো টবের মধ্যে রাখুন। দু-তিন ইঞ্চি বালি দিয়ে পরে তৈরি মাটি টবে ভরে নিন।

এবার চারা লাগাতে পারেন। চারা বসিয়ে গোড়ার মাটি চেপে বেশ শক্ত করে ঠেসে দিন। নিয়মিত সেচ দিন। মাঝে মাঝে মাটি খুঁড়ে দিন। পরিচিত দোকানির কাছে চারা কিনলে ঠকার ভয় থাকবে না। অন্য প্রয়োজনে অগতের পরামর্শ নিন।

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

(রহস্য উপন্যাস)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'প্রশ্নের জবাব আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। রিপিট করতে বাধ্য নই।'

'আদালতে দাঁড়িয়ে শপথ করে রিপিট করতে বাধ্য হবেন। তার চাইতে এখনই করা ভাল নয় কি?'

'আদালতে শপথ নিতে যাব কেন? কোন দুঃখে? রিপিট করতেই বা হবে কেন? কোন অপরাধে? চার্জসীট আছে?'

'এখনো নেই তবে তৈরী হয়ে যাবো। কেন না আমরা জানি আপনি শুক্রবার সনাতন গুঁইয়ের সঙ্গে ছিলেন।'

'ছিলাম না।'

'শুক্রবার সনাতনকে দেখেন নি?'

'না।'

'সনাতনের বাড়ীতে যান নি?'

'না।'

হেলান দিয়ে বসলাম চেয়ারে।

'শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ আপনাকে একজন দেখেছে সনাতনের বাড়ীতে।'

'সাক্ষী?'

ভেবেছিলাম আঁৎকে উঠবে ফোয়ারা। কিন্তু একদম চমকাল না। খুবই চাপা। মনে মনে উত্তর খোঁজার জন্যেই শুধু 'সাক্ষী'? বলে চেয়ে রইল—আর কিছু না।

'হ্যাঁ, সাক্ষী। স্বচক্ষে আপনাকে দেখেছে একজন ও বাড়ীতে। বলুন কি জবাব দেবেন।'

'জবাব?' ভারী সুন্দর একটা হাসি লাল মেঘের মত ভেসে গেল ফোয়ারার লাল ঠোঁটের ওপর দিয়ে। মরি! মরি! শকুন্তলাও কি এমন হাসি হাসতে পারত?

'মিঃ সেন, সাক্ষীই যদি থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? সাক্ষীর কথায় জোর পাচ্ছেন না বুঝি? নট রিলায়েবল?'

ভারী স্মার্ট তো পুঁচকে পরীটা?

'তা নয়। শুক্রবার সনাতনের বাড়ীতে কি করতে গিয়েছিলেন—তা বলার একটা চান্স দিচ্ছি। নাথিং এল্‌স।'

'আপনার অসীম দয়া। কিন্তু আমি তো একবারও বলিনি যে সনাতনের বাড়ী গিয়েছিলাম। তাছাড়া, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ব্যক্তিগত। আপনি দয়া করে তার মধ্যে নাক গলাতে যাবেন না। বিশেষ করে তার খুনের ব্যাপারে আমি যখন কিছুই জানি না।

কে বললে আপনি জানেন না? খুনের মাত্র একঘন্টা আগে সনাতনের বাড়ী গিয়েছিলেন, কথাও বলেছিলেন। তারপরেও বলবেন খুনের ব্যাপারে কিছু জানেন না?

রিয়ালি আপনি একটা ছিনে জোঁক, মিঃ সেন। কে দেখেছিল আমাকে বলুন তো?

তা শুনে আপনার কি দরকার? আপনাকে দেখা গিয়েছে সনাতনের সঙ্গে—সেটা একটা ঘটনা। এবং খুব সঙ্গীন সময়ে—খেয়াল রাখবেন।

ইউ আর রঙ, মিঃ সেন। ভীষণ ভুল করছেন।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটছিল—সামলে নিলাম।

মিস্ ঘোষ, শুক্রবার কোনো একটা মেয়ে সনাতনের সঙ্গে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে পোজ দিয়েছিল। তখন দুপুর একটা। সনাতন খুন হয়েছে ঠিক তখনি। মেয়েটা টল, বিউটিফুল, গুড ফিগার। আপনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। রাইট? একটা নাগাদ যার মৃত্যু হয়েছে, ছবি তোলার জন্যে মেয়েটাকে নিয়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে নিশ্চয় বারোটা নাগাদ........ঠিক যে সময়ে আপনাকে দেখা গিয়েছিল তার সামনে.... এ থেকে যে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, তা থেকে রেহাই আপনি পাবেন না মিস্ ঘোষ। আপনিই সেই মেয়ে সনাতনকে নিয়ে যে বেরিয়েছিল বাড়ী থেকে—পোজ দিয়েছিল গঙ্গার পাড়ে।

এতক্ষণে রাগাতে পারলাম ফোয়ারাকে।

তাহলে বলতেই হয় সনাতনকে আমিই খুন করেছি।

আমি তা বলিনি। শুধু বলছি, খুনের একঘন্টা আগে আপনি তাকে নিয়ে গঙ্গার পাড়ে গিয়েছিলেন ছবি তুলতে।

এ কথার মানে একটাই—ফোয়ারা যদি সনাতনের সঙ্গে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে স্বহস্তে তাকে খুন না করলেও জানে আসল খুনী কে। ফোয়ারা বুদ্ধিমতী। মানেটা বুঝল। কিন্তু না বোঝার ভান করে জবাব এড়িয়ে গেল। শুরু হল নতুন করে অ্যাটাক।

মিঃ সেন, ইউ আর টকিং ননসেন্স। এত বাজে বকছেন যে যুক্তি টুক্তিগুলো পর্যন্ত গুলিয়ে ফেলছেন। রণরঙ্গিণী ফোয়ারার চোখ মুখ দেহ এখন আড়ষ্ট, উৎকণ্ঠা,—কঠিন। আপনিই বলছেন, শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ আমাকে সনাতনের বাড়ীতে কে একজন দেখেছে। যে দেখেছে সে নিজের মুখেই তাহলে স্বীকার করেছে যে দুপুর বারোটার সময়ে সনাতনের বাড়ীতে সে হাজির ছিল। তাকেই আপনি সাক্ষী খাড়া করছেন। এক্সেলেন্ট, মিঃ অফিসার, রিয়ালি এক্সেলেন্ট। কিন্তু আমি যদি বলি আপনার সেই সাক্ষী একটি মেয়ে, ছেলে নয়? কেন না, সনাতনের বাড়ীতে সনাতন ছাড়া ব্যাটাছেলে কাউকে যেতে দেখিনি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই : দুপুর বারোটার সময়ে সনাতনের কাছে গিয়েছিল আপনার যে সাক্ষী মেয়েটি, সনাতনকে নিয়ে ছবি তুলতে গঙ্গার পাড়ে গিয়েছিল সে-ই। আমি নই। তার বড় প্রমাণ হল, আমাকে দেখে চেনবার মত কেউ নেই। কারও সঙ্গে সনাতনের বাড়ী যাই নি—না ছেলে, না মেয়ে। সুতরাং আমাকে চিনবে কে? হাওয়া? সনাতনের সঙ্গে আমার যে ছবি তোলাতুলির সম্পর্ক আছে, সে খবরও কেউ জানে না। আমি ন্যুড পোজ দিই সখ করে। কাউকে বলি না বলবার নয় বলে—কাকে বলব? আপনার মত সংকীর্ণ অনুদার গোঁড়া নোংরা চরিত্রের মানুষ নিয়েই তো এই দেশ। যাকে বলব সেই ভাববে গোল্লায় গেছে মেয়েটা। কাজে কাজেই আপনি এমন

কাউকে বার করতে পারবেন না যে দিব্যি মেনে বলবে যে হ্যাঁ, শুক্রবার ফোয়ারা ঘোষকে সনাতনের বাড়ী দেখা গিয়েছিল। মিঃ সেন আপনি অন্যায়ভাবে আমাকে খুনী বলে ধরে নিয়ে যা মুখে আসে তাই বলছেন। আপনি মডার্ন নন—আলট্রামডার্ণ তো ননই—ঘরের বউঝিদের বোরখা পরিয়ে হেঁসেলে শেকল পরিয়ে রাখতে যারা চায়—আপনি সেই কেভম্যান টাইপের পুরুষ। তা নারীবর্ষে নারীকে লাঞ্ছনা করতে সাহস পান। ন্যুড ছবি তুলেছি দেখেই ভাবতে পারেন মানুষ খুনও করতে পারি। শেম। শেম।

হাঁ করে গিলছিলাম ফোয়ারা ঘোষের জ্বালাময়ী বক্তৃতা। বাপের সব গুণই বর্তেছে দেখছি! জেদী রাগী বচনবাগীশ কিন্তু আমি আলট্রামডার্ণ নই এবং আমি কেভম্যান অর্থাৎ গুহামানব শুনেই পিত্ত পর্যন্ত গেল জ্বলে। রেগে গিয়ে বললাম —বাজে কথা।

'বাজে কথা' কথাটাই এমনভাবে বললাম যে নিজের কানেই খুব বাজে হয়ে বাজল। গলার স্বরকে পর্যন্ত কন্ট্রোলে রাখতে পারিনি।

'ঠিক উল্টো', ফোয়ারা বলল, কিন্তু শানানো ছুরীর মত গলায়। 'সব সত্যি।'

সামলে নিলাম।

বললাম—'শুক্রবার সনাতনের বাড়ীতে যদি না গিয়ে থাকেন তাহলে বলুন তখন ছিলেন কোথায় ?'

'বলব না।'

দেখুন আর একটু হলেই স্টুপিড বলে ফেলতাম ফোয়ারাকে। কিন্তু সেটা নেহাত অনুচিত হবে ভেবে সামলে নিলাম।

কেন বুঝছেন না যে একটা মানুষ খুন হয়েছে ?

হাড়ে হাড়ে বুঝছি। আর আপনি বোঝাতে চাইছেন যে খুনটা আমিই করেছি।

টক্কর এবার সত্যিই জমেছে।

গলাটা নামিয়ে বলুন।

বলব না। আরো চেঁচাব। রাস্তার লোককে ডেকে বলব আপনি আমাকে খুনী ঠাউরেছেন।

কি জ্বালা! এত কথা বলছি কেন বলুন তো ? সনাতন গুঁইকে যে খুন করেছে তার নামটা জানার জন্যে তো ?'

'মিথ্যে কথা। আপনি আমাকেই খুনী বলতে চাইছেন।'

'ধ্যাৎ। আপনাকে খুনী বলব কেন।'

নিমেষহীন চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ফোয়ারা।

তারপর বললে আগের চেয়ে আস্তে —'সত্যি বলছেন ?'

অফকোর্স সত্যি বলছি।

তারপর চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে রইল ফোয়ারা।

বলল মৃদু স্বরে—'শেষ ছবিগুলোয় আমি যে পোজ দিই নি, তা প্রমাণ করার একটা পথ যদি আপনাকে বাতলে দিই ? মানে, পোজগুলো যদি আমার নয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই, তাহলেই প্রমাণ পেয়ে যাবেন যে গঙ্গার পাড়ে হাজিরও ছিলাম না, খুনও করিনি।

'বলুন ঠিক কিনা ?'

বিলকুল। পোজ দিলে গিয়েছেন—না দিলে যান নি। কিন্তু তা প্রমাণ করবেন কি করে ?

কি বললেন একটু আগে খেয়াল আছে ? খুন যে করেছে তার নামটা শুধু জানতে চান—আমি খুনী প্রমাণ করতে চান না। আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি তা প্রমাণ করার—কিন্তু আপনার সাহস থাকা চাই।'

'সাহস!'

'হ্যাঁ, সাহস। সৎ সাহস। পুরুষের মত সাহস! বলুন যা বলব তা করবেন ?'

এতো মহা ফ্যাসাদ। কি করতে হবে তাই জানি না, কথা দিতে যাবো কেন ?'

'তাই বলুন! ন্যায় বিচার চান না—আমাকে খালি ফাঁসাতে চান।'

ও ভগবান! হাল ছেড়ে দিলাম—বলুন কি করতে হবে। সাধ্যের মধ্যে থাকলে অবশ্যই করব।'

'আমার ছবি তুলবেন।'

'আপনার ? কেন ?'

'গঙ্গার পাড়ে ঠিক যেখানে সনাতন অশিক্ষিত মেয়েটার ছবি তুলেছে, সেইখানে নিয়ে আমার ছবি তুলবেন। ন্যুড।'

বলব কি, আমি কোন কথাই বলতে পারলাম না। শুধু চেয়ে রইলাম।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে ফোয়ারা—তাকিয়ে দেখার কি আছে ? অন্যায় কিছু বলেছি ? দুটো ফিংগারপ্রিন্ট কখনো এক হয় ? হয় না। দুটো মেয়েমানুষের ফিগারও কখনো এক হয় না। একই পরিবেশে একই পজিশনে আমার ন্যুড ফিগার দেখলেই বুঝবেন সে মেয়ে এই মেয়ে নয়, বলে বুকে রঙীন নখ দিয়ে টোকা মারল ফোয়ারা।

'কিন্তু...কিন্তু...আমি যে পুলিশের চাকরী করি।'

'ভয় করছে ?'

'গুলি মারুন আপনার ভয়কে ! ও সবের পরোয়া করে না সুশান্ত সেন !—কিন্তু খবরটা চাউড় হয়ে গেলে চাকরীটা যে যাবে।'

'তদন্তের ভার তো আপনারই হাতে ?'

'খানিকটা।'

'আপনাকে যদি স্যাটিসফাই করতে পারি, যদি বিশ্বাস করাতে পারি পোজ দিতে আমি যাইনি—আমাকে ছেড়ে দিয়ে আসল খুনীর খোঁজে বেরোবেন ?'

'তা...হ্যাঁ...কিন্তু প্রমাণস্বরূপ দাখিল করতে হবে আপনার ফটো।'

'ফটো তোলার দরকার হবে কি ? দেখলেই তফাৎ বুঝবেন।'

'আই ডোন্ট লাইক ইট।'

'আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দর কোনো দাম আছে কি ? আপনি পুলিশ ফোর্সের প্রতিভূ—খুনী সন্দেহে আমার পেছনে লেগেছেন। আপনি ব্রহ্মচারী হোন কি আর কিছু হোন—তাতে কিসসু এসে যায় না আমার। আমি চাই আমার ছবি তোলা হোক এমনভাবে যাতে এক পলকেই প্রমাণ করা যায় যে সনাতন আমার ছবিই তোলে নি শুক্রবার।'

জবাব দিলাম না।

'একটা কথা মানছেন তো ? ছবি দিয়ে প্রমাণ করা যায় আমি নির্দোষ...অথবা দোষী ? ছবি কি মিথ্যে বলে ?'

সায় দিলাম মাথা দুলিয়ে। মনে পড়ল মিলি লাহার কথা। এ কথা সে-ও বলেছিল। ফিগার দিয়ে ফিগার নাকচ। সত্যিই মেয়েদের ফিগার একছাঁচে ঢালা হয় না। এই দু'দিনে অনেক ন্যুড ফিগার দেখলাম। তন্বী সুগঠনা প্রত্যেকেই। তবুও তফাৎ আছে। ফোয়ারার বুদ্ধি আছে। কথাটা ঠিকই বলেছে। কর্তব্য সবার আগে। তদন্তের ভার যখন কাঁধে নিয়েছি, ফোয়ারা ঘোষকে কষ্ঠি-পাথরে ঘষে দেখতেই হবে গিনি কি গিল্টি। ওকে খুনী প্রতিপন্ন করব, এই আশা নিয়েই ডেকে পাঠিয়েছিলাম—এখন দেখছি বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে গিয়েছে।

বললাম—'বেশ। আপনার ফিগার আমি দেখব।' কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার পয়েন্ট যদি প্রমাণ করতে না পারেন—ঝামেলায় পড়বেন।'

'ঝামেলায় তো এখনি রয়েছি।'

'ফটো-মটো তুলতে পারব না।'

'রিয়্যালি...আপনি একটা...এত হেজি-টেশনের দরকার আছে কি ? আমার বেশ কিছু ন্যুড ছবি তো দেখেই নিয়েছেন। তার মধ্যে খানকয়েক তো একেবারেই অখাদ্য।

'কিন্তু আমি তো তুলি নি।'

'ঠিক আছে। প্রথমে ন্যুড দেখবেন। তারপর বিকিনি পরব—ছবি তুলবেন। প্রমাণ হিসেবে সেটা খুব এফেকটিভ না হলেও কাজ চলে যাবে—ওপরওলাকে দেখাতে পারবেন।'

'আগাগোড়া বিকিনি পরলেও তো হয়।'

'ভাবছেন খুব খারাপ মেয়ে আমি ?'

'ভাবিনি। কিন্তু প্রশ্নটা উঠছে কেন ?'

'উঠছে এই কারণে যে আপনি যদি আমাকে খারাপ ভাবে না নেন তাহলে ফ্র্যাঙ্কলি একটা কথা বলতে পারতাম।'

আরো ফ্র্যাঙ্কলি ? বেশ তো বলুন।

'সনাতন যে মেয়ের ছবি তুলতে তুলতে মারা গেছে, তার ফিগারের সঙ্গে আমার ফিগারের তফাৎটা কোথায় জানেন ?—সাইজে ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস কাকে বলে জানেন ? বুক কোমর পাছা আমার ছোট—ওর চাইতে। এখন বুঝেছেন কেন ন্যুড হতে চাইছি ?'

'ও-কে। দেখে বুঝব খন।'

'দেখবেন তো ?'

হেসে ফেললাম।

'কিন্তু শর্ত একটা। খবরটা যদি কোনো দিন বেরিয়ে যায়, আমি আপনাকে ছেড়ে দেব না।'

'বেরোবে না। কথা দিচ্ছি। কাউকে বলব না।'

'কাল সকাল সাড়ে দশটায় আপনাকে তুলে নিয়ে যাব। শুধু একই জায়গায় নয়, একই আলোয় আর অবস্থায় ছবিগুলো ওঠা চাই।'

'আমি তৈরি থাকব। থ্যাংকইউ, মিঃ সেন।'

কেন তা বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু ফোয়ারা বেরিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ খুব ফুর্তিতে রইলাম। অথচ তখন ফুর্তির সময় নয়। কেন না, একমাত্র সত্যিকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি হাতছাড়া হতে চলেছে। তবে যে মেয়ে অমনভাবে নিজেকে খুলে ধরতে চাইছে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে, তাকে সন্দেহ করি কি করে ? নির্দোষ বলেই সে এত দুঃসাহসী, বেপরোয়া এবং নির্লাজ। নিজের হাতে খুন করলে এতখানি বুকের পাটা ওর থাকত না। উল্টে ফিগার মিলিয়ে দেখার প্রস্তাব শুনলেই ভোঁ দৌড় দিত—পুলিশের ধারেকাছেও আসত না। ফোয়ারা নির্দোষ। নিশ্চিতভাবে তা জেনেই এত আগ্রহী ফিগার উন্মোচনের জন্যে।

কিন্তু অমূল্য বরাটের কানে আমার ডিটেকটিভ মেথডের বিবরণ গিয়ে পৌঁছলে তিনি যে কোন মেথডে আমার ছাল ছাড়াবেন, ভাবতেও শিউরে উঠলাম। নির্জনে নিয়ে গিয়ে একটি সন্দেহভাজন মেয়েকে ন্যুড স্টাডি করার ব্যাপারটা গর্হিত সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরো ঝক্কিটা তো আমার কাঁধেই চাপিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। সুতরাং শুচি-বায়ুতা বিসর্জন দিয়ে অপ্রচলিত পন্থার মারফৎও যদি ফোয়ারা ঘোষকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারি, উনি কি তা মেনে নেবেন না ?

নিশ্চয় নেবেন।

॥ ৮ ॥

গঙ্গার পাড়ে যাওয়ার পথে ফোয়ারা আমার সঙ্গে কথা বলল না—আমিও গায়ে পড়ে আলাপ করতে গেলাম না। একটা জীপ জুটিয়ে নিয়েছিলাম অফিস থেকে। ও বসেছিল আমার পাশেই। সুতরাং দু-একটা কথা বললে দোষের কিছু হত না—বরং পুরুষ সঙ্গী হিসেবে ন্যায্য কর্তব্যই করতাম। কিন্তু আমার মাথার মধ্যে তখন টাগ অফ ওয়ার লেগেছে দুটি বিষয় নিয়ে। প্রথমত আমি পুলিশের লোক। শুধু 'লোক' নই। দ্বিতীয়তঃ ফোয়ারা এখনো খুনী

র আওতায়। কথা বলতে ইচ্ছে কয়েকটি বিষয় জানবার জন্যে। যেমন, সে কলকাতায় একা থাকে, যেন গিয়েছিল সনাতনের ক্যামেরায় মডেল এবং কেন বলতে চায় না শুক্রবার ছিল । কিন্তু পারলাম না যেহেতু আমি ম্যান—শুধু 'ম্যান' নই।

ামেরা রেখেছি আমার আর ফোয়ারার ন। সেকেন্ডহ্যান্ড বিউটি ফ্রেজ। াটি' ফটোগ্রাফার নই আমি। তবে স্টাডি মোটামুটি ভালই করি। পাথর পাখীর ছবির চাইতে মানুষের সৌন্দর্যের খনি আবিষ্কারের চেষ্টা তবে যে পরিস্থিতিতে ছবি তুলতে কি তুলব ঈশ্বর জানেন......

থমবার রাস্তার যেখানে এসে পুলিশ াঁড়িয়েছিল, জীপ দাঁড় করালাম সেই- আগে নিজে নামলাম। ক্যামেরাটা হয়ে বার করবার সময়ে চোখের কোণ লক্ষ্য রাখলাম ফোয়ারার দিকে। নেমে কোন দিকে পা বাড়ায় বা কোনমুখো ুরে দাঁড়ায়—তা যদি গোড়াতেই ধরতে তাহলে আধখানা রহস্যের ফয়সালা ই হয়ে যাবে। ফোয়ারা কিন্তু শুধু এবং চুপ করে আমার দিকে চেয়ে ক্যামেরা নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল—'কোন দিকে ?' মনে মনে াৎ ফুল মার্ক দিলাম। হয় মেয়েটা কার পাওয়ার মত অভিনেত্রী, অথবা ই নির্দোষ। এ জায়গায় আগে আসেনি। াল বেয়ে ঝোপের মাঝখান দিয়ে পথ য়ে ওকে নিয়ে গেলাম খোলা ায়টায়।

'নাইস, বলল ফোয়ারা। প্রাইভেসি ় ?

'এদিকে কেউ আসে না। ছুটিছাটার পিকনিক পার্টিরা আসে বটে—তাও তে। পায়ে হেঁটে ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে া পথ আসার সখ কারো হয় না। রাং কেউ ডিসটার্ব করবে না।'

'গুড। বলুন এখন কি করব।'

্রীফ কেসটা বাড়ীতে রেখে এসেছিলাম। তু প্রিন্টগুলো পকেটে এনেছিলাম। সনাতনের নেগেটিভ থেকে নেওয়া প্রিন্ট। করলাম পকেট থেকে। তারপর এক এক সেই অনুযায়ী পোজ দিতে বললাম। ুলো পোজই ফোয়ারা দিলে। খুঁটিয়ে ্থ বোঝা গেল ছবির ফিগার আর তার ার এক নয়।

ফেরার পথে চোখ রইল রাস্তায়, মন মিলি লাহার কথায়।

মিলি বলেছিল, বারোটা নাগাদ একটা কে সনাতনের ঘরে দেখেছে। কে সে ? মিথ্যে বলতে পটু সন্দেহ নেই। তু ইনটেলিজেন্সের অভাব আছে। ের চামড়া বাঁচানোর জন্যে আর একটি র অস্তিত্ব কল্পনা করবার মত স্থিত বুদ্ধি তার মত মেয়ের ঘটে । তাহলে ?

আরও একটা ভাবনা ঘুর ঘুর করতে ল মগজের মধ্যে। ফোয়ারা ঘোষ তো ট বেরিয়ে গেল সন্দেহের জাল থেকে। এখন তো সে বলতে পারে শুক্রবার ছিল কোন্ চুলোয় ? মিলি লাহা তাকে দেখেনি, তা যখন এইমাত্র প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন শুক্রবারে তার থাকা হয়েছিল কোথায়—এ-কথার জবাব না দেওয়ার নিশ্চয় একটা কারণ আছে। আমাকে জানতেই হবে সেই কারণ।

বলেই ফেললাম—'মিস ঘোষ, প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।'

'যেহেতু এখন থেকে কেউ আর আপনাকে খুনী সন্দেহ করবে না, সেই হেতু এবার আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন শুক্রবার দুপুরে ছিলেন কোথায়।'

'বলতেই হবে ?'

পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ফোয়ারা।

'আপনাকে তো কেউ আর সন্দেহ করছে না ? বলতে বাধা কি ?'

'কিন্তু কেন ? আমি যখন খুন করিনি—'

'করেননি মানলাম। কিন্তু সুপিরিয়র অফিসারকে কি বলে বোঝাব যে, আপনি খুন করেননি ? ন্যুড স্টাডি সরে কী সিদ্ধান্তে এলাম তা বলব কেমন করে ?'

'আমার ন্যুড ফটো আপনারা প্রত্যেকেই দেখেছেন। আপনার বস্ও দেখেছেন।'

'মিস্ ঘোষ, প্লীজ, বুঝতে চেষ্টা করুন। আমি আপনি হলাম গিয়ে পার-মিসিভ সোসাইটির মানুষ। নারী-দেহ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে জিভ জড়িয়ে যায় না। কিন্তু আমার বস্টি সেকেলে মানুষ। এসব শুনলে আঁৎকে উঠবেন। তাই তাঁকে আমার এসব বলা......।'

'কেন বলবেন না ? আমার খুশী হয়েছিল সনাতনের ক্যামেরায় ন্যুড পোজ দিয়েছিলাম। আর এখন প্রাণের দায়ে আপনার ক্যামেরায় ন্যুড পোজ দিয়েছি। তফাৎটা কোথায় ?'

'তফাৎটা আপনার সঙ্গে আমার। সেটা কেন বুঝছেন না ? আপনি যেখানে খুশী ন্যুড পোজ দিন, তাতে কি আসে যায় ? কিন্তু আমি পুলিশম্যান হয়ে ন্যুড মেয়ের ফটো স্টাডি করতে পারি কি ? খুনী সন্দেহ করেও পারি কি ? সোজা কথাটা বুঝছেন না কেন ?'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ফোয়ারা।

তারপর বলল আস্তে আস্তে—'ভয়ে বলতে পারছি না।'

'কেন ? কিসের ভয় ?'

'যদি রেগে যান ? দেখুন, আমি না.... আমি সেদিন....সনাতনের বাড়ীতেই গিয়ে-ছিলাম।'

এমন চমকে গেলাম যে ক্যাঁচ করে ব্রেক কষে জীপ দাঁড় করালাম রাস্তার পাশে।

'আপনি গিয়েছিলেন ?' সত্যিই রাগ সামলাতে পারলাম না। 'আপনি—

'বলুন, বলুন, যা মুখে আসে তাই বলুন। মিথ্যুক, পাজী—'

'মিথ্যুকই তো আপনি। সন্দেহ আছে ?'

'সত্যি বললে তো সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করতেন। গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে ফটোও তুলতেন না।'

'বললে অন্যভাবে হেল্প করতেও তো পারতাম। আমি তো মানুষ—নাকি পিশাচ ?'

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরক্ষণেই অনুশোচনায় ভরে উঠল প্রেমার মন। ছিঃ ছিঃ এত ক্ষুদ্র সে। যদি দেবনের মনকে রোকেনারা কিংবা সুদর্শনা আকর্ষণ করতে পারে তাহলে সেটা নিশ্চয় তাদের ক্ষমতারই পরিচয়। সে যদি এ ক্ষেত্রে ওদের কাছে হার মানে তাহলে ঈর্ষা নিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে যাবার মত ক্ষুদ্রতা আর কিছুতে নেই।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া সরে গেল প্রেমার মুখের ওপর থেকে। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা উদার প্রসন্নতা। কিছু পরেই মনের ভেতর থেকে উঠে আসতে লাগল সর্বজয়ী একটা ভাব। আত্মপ্রত্যয়ের শক্তিতে উদ্ভাসিত হল প্রেমা মেনন।

দুটো নাচ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। শিল্পীরা সম্বর্ধিত হয়েছে করতালিধ্বনিতে। কোন কিছু কিন্তু কানে এসে পৌঁছয়নি প্রেমার। সে এতক্ষণ ডুবেছিল নানা চিন্তার আবর্তে। ইতিমধ্যে পড়ে গেছে ড্রপ সীন।

সরিতা ছুটে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুই এখনও এখানে বসে। ওদিকে সারা স্টেজ তোলপাড় করে তোকে খোঁজা হচ্ছে। সংগতকারীরা সব বসে গেছে মঞ্চে। এখুনি ঘণ্টা পড়বে। বেরিয়ে আয় চটপট। আমি চললাম। সোল্লুকাট্টুর বোল তুলতে হবে।

সরিতা বেরিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াল প্রেমা। নিজেকে মনে হল বহু যুগ আগের অপূর্ব স্থাপত্য খচিত কোনো মন্দিরের দেবদাসী। নাটমণ্ডপের চারদিকে জ্বলছে [illegible]। বসে আছেন পুরোহিত পারিষদ পরিবৃত তরুণ রাজা। আলোছায়ার [illegible] আছে সে নর্তকীর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি হলেই মঞ্জীরের ঝঙ্কার তুলে এগিয়ে যেতে হবে নাটমণ্ডপের দিকে। তরুণ রাজার সঙ্গে হবে তার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়।

ঘণ্টা বেজে উঠল। প্রেমা বিদ্যুৎচালিতের মত গিয়ে দাঁড়াল স্টেজের ওপর। বেজে উঠল মৃদঙ্গ মন্দিরা তিস্রম মিশ্রম তালে। সরিতার গলায় শুরু হয়ে গেছে সোল্লুকুট্টুর বোল। উঠে যাচ্ছে আরব সাগরের মত নীল তরঙ্গিত স্ক্রীন। দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা ঈষৎ বিযুক্ত পায়ে জানু দুটি বহির্ভাগে নত ও প্রসারিত করে। যুক্ত কর সুশোভিত মস্তকের ওপরে নমস্কারের মুদ্রায় স্থাপিত। অধরে বিশ্বজয়ী হাসির রেখা।

প্রেমার উপস্থিতি যে দর্শকচিত্তের আলোড়ন তা বোঝা গেল করতালির অভিনন্দনে।

বোলের সঙ্গে সঙ্গে স্থির দৃষ্টিতে এল স্পন্দন। যুগল ভ্রূ-লহরী লীলায় ওঠা-নামা করতে লাগল। স্কন্ধের ওপর মুখমণ্ডল দক্ষিণ থেকে বামাবর্তে ধীরে ধীরে হতে লাগল আন্দোলিত।

ভারতনাট্যমের সূচনা অংশ আলারিপ্পু। কুঁড়ি থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠার প্রথম পর্ব। অর্থও তার তাই।

প্রেমা মেনন তার নৃত্য আর মুখে অভিনয়ের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

আলারিপ্পুকে অনুসরণ করে এল জাতিস্বরম্। তালসংযোগে রাগভিত্তিক স্বরলিপি।

প্রেমা এখন বিশেষ মুদ্রায় নেচে চলেছে। নয়ন চরণ সকল অঙ্গ [illegible] আন্দোলিত হচ্ছে। বায়ুতাড়িত নারিকেল পত্রে প্লাবিত জ্যোৎস্নার নৃত্যলীলা ফুটে উঠছে চোখের সামনে।

প্রেমা মেনন শুদ্ধ নৃত্যভঙ্গীমায় শ্রেষ্ঠ ভাস্করের তৈরী এক শিল্প-প্রতিমায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

এবার এল সঙ্গীত। সঙ্গীতের কথা শুধু অনুসরণে চলল অভিনয়। সম্পূর্ণ নতুন নৃত্যভঙ্গীমা। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে শিল্পীর পদচারণা। ভুরুতে নয়নে নব নব মুদ্রার প্রকাশ। ওষ্ঠে অকথিত বাণীর কম্পন। সঞ্চালিত গ্রীবায় অভিনয়ের নিপুণ প্রকাশ। ভাব রাগ আর তালের এ যেন ত্রিবেণী সংগম।

শেষ হল শব্দম্। এল বর্ণম্। শব্দম-এর পরিপূর্ণ প্রকাশ বর্ণমে। আকুল অভিনয়ে ব্যাকুল দেহ। দমকে দমকে বর্ষার বারিধারা ঝরে ঝরে পড়ছে অমনি চমকে ফুটে উঠছে যূথি, কেতকী কদম্ব। গানের কথা আসছে বর্ষা ধারার মত। প্রেমার দেহের মুদ্রায় সে কথা মুকুলিত পুষ্পিত হয়ে উঠছে।

স্তব্ধগৃহ। স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি দর্শককুল।

প্রেমা এবার মদনের ভূমিকায়। বাম চরণ বাম বাহু সম্মুখে প্রসারিত। দক্ষিণ কর ধনুর জ্যা আকর্ষণের মুদ্রায় স্থাপিত। সমস্ত আননে নয়নে বিশ্ববিমোহন হাসির রেখা। পুষ্পশর সন্ধান করছে প্রেমের দেবতা অনঙ্গ লীলায়।

একি! নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে যায়। তালভঙ্গ হতে চলেছে। প্রেমা মেনন স্থির। লজ্জা ভেদে উদ্যত। সামনে দর্শক আসনে বসে আছে গ্রীক শিল্পী মাইরন। হাতে তার স্কেচের পেন স্থির হয়ে গেছে।

তার প্রেমার অচঞ্চল আঁখিতে নিবন্ধ। মুহূর্তে দুই শিল্পীর দৃষ্টিসংগমে বাস্তব বিশ্ব বিলুপ্ত।

নাচ শেষ হয়ে গেছে। প্যালেস হোটেলের ...টোরিয়াম থেকে চলে গেছে শেষ ...হী দর্শকটিও। অভিনন্দনের পালা ...। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে 'সংগম' ...র শিল্পীরা অভিবাদন করেছে দর্শক- করতালি আর সাধুবাদে শব্দিত ... প্রেক্ষামণ্ড।

...একক শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী ...কে সবিনয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ... গোষ্ঠীর নাচ। এখানে একের ...র্যের স্থান নেই। প্রশংসা যদি কিছু ... সে সকলেরই প্রাপ্য।

...কর্মীরা নাচের সকল সরঞ্জাম সরিয়ে ... গেছে কোভালম হোটেলে। শিল্পীরা ... গেছে দেবনের সঙ্গে। সরিতা ঘরে ...র আগে প্রেমার কাছে এল। গ্রীনরুমের ...র একটি সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল ...। এই নাট্যকাহিনীর সব চেয়ে বৃহৎ ... জুড়ে ছিল তার ভূমিকা। সারা দিন ...বাস করে আছে সে। অসম্ভব মানসিক ... ছাড়া অভুক্ত অবস্থায় বোধকরি এত বড় ...টা পারফরমেন্স সম্ভব নয় কারু পক্ষে। ...মার মনোবল চিরদিনই সাধারণের চিন্তার ...রে।

সরিতা বলল, তুই কি এখন ফিরবি ...মার সঙ্গে?

একটু বসতে দে। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।

জানিস দিদি, সেই বিদেশী আর্টিস্ট ...ার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। আমরা ...ন ওদের কফি সার্ভ করছিলাম।

প্রেমার চোখ দুটো ঝলকে উঠলো।

সরিতা আবার বলল, কিন্তু তোরাই তো ...ম করেছিলি কোন একক শিল্পীর সঙ্গে ...উকে দেখা করতে দেওয়া হবে না। তাই ...ক ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রেমা উঠে সোজা হয় বসে বলল, ...রিয়ে দেওয়া হয়েছে!

তাইতো হল। দেবন হাতজোড় করে ...ক্ষমতা জানিয়ে ফিরিয়ে দিলে।

দেবন ফেরাল!

তার অপরাধ কি বল। পরিচালক হলেও ...জেদের তৈরী নিয়ম তো সে আর ভাঙ্গাতে ...রে না!

প্রেমা আবার সোফায় এলিয়ে দিল দেহ। ...ই মুহূর্তে তার চোখের ওপর ভেসে উঠল ...দেবতা অ্যাপোলোর মূর্তি। দেহের ...তিটি রেখায় দীপ্ত পৌরুষের সঙ্গে ...শ্চর্য কমনীয়তার মিশ্রণ।

প্রেমা সরিতাকে বলল, আজ আমি যাও ...রতে পারি। হয়ত মিঃ পিল্লাই-এর সঙ্গে ...বার যোগাযোগ করতে হতে পারে। তুই ...ন যা। দারুণ খাটুনী গেছে তোর আর ...রর ওপর দিয়ে।

সরিতা বলল, তোরও তো ক্লান্তির শেষ ...ই।

ও কিছু নয়। দু-চারটে দিন বিশ্রামের ...তর থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। গুণী- ...নর সাধুবাদ হল সঞ্জীবনী সুরা। ঐ ...কেই দেখিস দু-এক দিনের সবাই তাজা ... উঠবে।

সরিতা চলে যেতেই অডিটোরিয়ামের ফোনটা হাতে তুলে নিল প্রেমা। এক্সচেঞ্জকে বলল, থার্ড ফ্লোর—রুম নাম্বার সেভেন।

প্রেমার গলাটা কেন জানি না একটু কেঁপে গেল।

রুম নাম্বার সেভেন থেকে কথা ভেসে এল।

প্রেমা বলল, আমি প্রেমা মেনন কথা বলছি অডিটোরিয়াম থেকে। তোমার অপূর্ব কার্ডের জন্যে ধন্যবাদ।

ওপার থেকে মাইরন বলল, তোমার ফোনের জন্য ধন্যবাদ। ইণ্ডিয়াতে এসে তোমার নাচ না দেখলে আমার দেশ দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

প্রেমা নূপুরের ঝঙ্কারের মত হাসি ছড়িয়ে বলল, এটা কি নর্তকীর পাওনার অতিরিক্ত উপহার নয়?

মাইরন বলল, নানাভাবে বলেও কিন্তু তোমার নাচের উপযুক্ত কমপ্লিমেন্ট দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রেমা বলল, তোমার অডিটোরিয়ামে বসে আঁকা ছবি আমাকে বিস্মিত করেছে।

আমি তোমার শরসন্ধানের ছবিটা নিয়ে পড়েছি। রাতের ভেতরেই শেষ করে ফেলতে হবে।

প্রেমা বলল, এত তাড়া কিসের?

মর্ণিং-এর ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি। তার আগে শেষ করে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে। দেখা যখন হল না।

এই মুহূর্তে তোমার হাতের তুলির কাজ দেখতে আমার দারুণ ইচ্ছে করছে।

চলে এস। এক্ষুনি। অবশ্য যদি তোমার অন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে।

প্রেমা বলল—রাতের মত এখন আমার ছুটি। আসছি তোমার রুমে।

ফোন ছেড়ে দিল প্রেমা কিন্তু সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল না। উত্তেজনায় এখন কাঁপছে তার সারা শরীর। সেই অ্যাপোলো মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাকে। তার রোমাঞ্চকে সে কেমন করে ঢেকে রাখবে। এ কি যোগাযোগ তার জীবনে। এমন ক্ষণিকের অতিথিকে সে বিনিময়ে কিই বা দিতে পারে।

এক সময় মনে হল থাক কাজ নেই গিয়ে। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ যাদের তাদের কাছে যাওয়া মানেই দুঃখ পাওয়া।

আবার মনে হল এ আকর্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কি তার।

উঠে দাঁড়াল প্রেমা মেনন। এক অদৃশ্য শক্তি তাকে টানছে। তার সমস্ত দেহের অণুতে পরমাণুতে সে টান এসে পৌঁছেছে। চাঁদের অদৃশ্য টানে ফুলে ফুলে উঠছে সারা আরব সাগরের প্রতিটি জলবিন্দু।

প্রেমা মেনন অডিটোরিয়াম পেছনে ফেলে জয়কিষণের দেওয়া কাশ্মিরী শাল- খানায় যত্দূর সম্ভব নিজেকে ঢেকে বিশাল প্যালেস হোটেলের থার্ড ফ্লোরে সাত নম্বর রুমের সামনে এসে দাঁড়াল।

না প্রেমা মেনন এখন একটুও দুর্বল নয়। জীবনে সে সুযোগ এলেই করেছে বিজয়িনীর ভূমিকায় অভিনয়। অপরিচিত

চরিত্রের মুখোমুখি হওয়াতেই তো তার আনন্দ। আশ্চর্য এক আবিষ্কারের উত্তেজনা রয়েছে এর ভেতর।

প্রেমা কলিং বেলে হাত দিল।

দরজা খুলে যেতেই প্রেমা ঢুকল। আবার ভেতর থেকে দরজা আপনি লক হয়ে গেল।

শিল্পী মাইরন প্রেমার হাতে নাড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

সোফায় পাশাপাশি বসল দুজনে।

প্রেমার চোখ পড়ল সামনে। একটা ইজেলের ওপর আঁকা ছবি। ছবি আকারে খুব ছোট নয়। নীচে আর একখানা ছোট্ট কার্ড পড়ে। প্রেমা কৌতূহলী হয়ে উঠে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে ছোট্ট কার্ডখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। তারই ছবি। প্রেমের দেবতা মদনের ভূমিকায় ধনুতে শর সংযোগ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাশের বড় ছবিটি ওরই অনুকরণে আঁকা। শুধু স্কেচ করা হয়েছে রং পড়েনি এখনও। কার্পেটের ওপর রঙের সরঞ্জাম।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কখন মাইরন। ছবি দেখা শেষ করে ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে প্রেমা চমকে তাকাল সেই অ্যাপোলো মূর্তির দিকে।

মাইরনের চোখের দৃষ্টি গভীর। মুখে অদ্ভুত আকর্ষণীয় হাসি। প্রেমার চোখ দুটো যেন চুম্বকের টানে মাইরনের মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল।

সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত। প্রেমা চোখ নামাল।

মাইরন বলল—ভারতীয় মেয়েদের চোখের একসপ্রেশান যে এত সুন্দর তা আমার জানা ছিল না।

প্রেমা অমনি একমুখ হাসি হেসে বলল—গ্রীকরা সুন্দর কিন্তু এত সুন্দর তা তোমাকে না দেখলে বোঝা যেত না।

প্রেমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মাইরন। প্রেমা মাইরনের প্রায় অনাবৃত হাতখানা স্পর্শ করে রোমাঞ্চিত হল। মাইরন আর প্রেমা হাত ধরাধরি করে এসে বসল সোফার ওপর।

প্রথম কথা বলল মাইরন আমি এদেশে আসার আগে শুনেছিলাম ভারতীয় মেয়েরা ভীষণ সাই।

প্রেমা অমনি কথাটা শেষ করল আমাকে দেখে তোমার সে ধারণা পালটে গেছে—তাই তো

মাইরন প্রেমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ধরে থাকা হাতখানাতে আলতো করে চাপ দিল।

প্রেমা আবার বলল—কথাটা তুমি প্রায় ঠিকই শুনেছ। তবে ভারতীয় মেয়েরা একবার যাকে মনে মনে বন্ধু বলে মেনে নেয় তার কাছে তাদের কোন সঙ্কোচই থাকে না।

মাইরন আবার প্রেমার হাতে চাপ দিল। বলল—আমি সৌভাগ্যবান বলে ভাবতে পারি মিস মেনন কারণ তুমি বন্ধু বলে আমার হাতে হাত মিলিয়েছ।

প্রেমা রহস্যময় চোখে মাইরনের দিকে চেয়ে হাসল।

মাইরন হঠাৎ বলল—তুমি যে ঐ তীর ছোঁড়ার অভিনয়টা করলে এর অর্থ কি?

প্রেমের দেবতা মদনের পাঁচটি শর আছে। ঐ শর যার হৃদয় লক্ষ্য করে ছোঁড়া হবে তারই হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে ফুটে উঠবে ভালবাসার রক্ত গোলাপ।

মাইরন অমনি বলল—তোমার ঐ অলক্ষ্য তীরগুলো কাকে নিশানা করে আজ ছুঁড়েছিলে প্রেমা?

যার হৃদয় আছে তারই দিকে নিশানা করেছিলাম।

সে নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান।

প্রেমার মুখে মিষ্টি হাসি। বলল—জানি না কে ভাগ্যবান। যে বান ছুঁড়েছে সে না যার হৃদয়ে বান বিঁধেছে সে।

মাইরন বলল—তুমি বিদুষী। কথা বলতে জান।

জলতরঙ্গের মত বেজে উঠল প্রেমার হাসি।

তোমার মত সমঝদার পেলে আমার যে কোন বিষয়ে প্রশংসাপত্র পেতে একটুও কষ্ট হবে না।

মাইরন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে একটা অনুরোধ করব?

বল।

একবার এই পোষাকেই তুমি দাঁড়াবে ঐ শর নিক্ষেপকারীর ভঙ্গীতে? তোমার চোখ আর ঠোঁটের একসপ্রেশানটা আর একবার দেখে নিতে চাই।

প্রেমা খুলে ফেলল গায়ে জড়ানো শালখানা। মুণ্ডি না পরে সাদা একখানা শাড়ী পরে এসেছিল। সে। শাড়ীর আঁচল ভাল করে কোমরে জড়িয়ে নিল। সী-গ্রীন রঙের জম্বরখানা শুধু রইল প্রেমার ঊর্ধ্ব অংগ আবৃত করে। প্রেমা আবার সে নৃত্যের মুদ্রায় ধনুতে শর সংযোগ করল। প্রেমার দৃষ্টিতেও সেই অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদের ছবি ফুটে উঠেছে। অধরের হাসিতে লক্ষ্য ভেদের সুনিশ্চিত প্রত্যয়।

মাইরন ইজেলের ছবিতে দরকারী রেখাগুলো টেনে নিল।

একসময় বলল—আমার প্রয়োজন মিটে গেছে। এখন বস সোফায়। আমি খুব দ্রুত ছবি আঁকতে পারি। রং দেওয়া হয়ে গেলে তোমাকে ডাক দেব। তখন ঠিক ঠিক বিচার করতে পারবে।

প্রেমা পিছু হটে আবার এসে বসল সোফায়। সাদার ওপর সারা জমিনে পিঙ্ক ফুল আর পাতার কাজ করা শালখানা গায়ে জড়িয়ে নিল। মাথায় তুলে নিল শালের খানিক অংশ ঘোমটার আকারে। প্রেমা মেননের মুখখানা একটা আধফোটা ম্যাগনোলিয়া ফুল হয়ে গেল।

ছবিতে বেশ কিছু সময় মগ্ন হয়ে রং তুলির কাজ করল মাইরন। প্রেমা বসে বসে চিত্রকর মাইরনকে দেখতে লাগল।

কত বয়েস হবে মাইরনের? কোন মতেই সাতাশের বেশী নয়। সাইড থেকে ওর প্রোফাইলখানা আরও সুন্দর। আচ্ছা ও কি কোন মেয়েকে ভালবাসেনি? নিশ্চয়ই। আর ওর না বেসে উপায় আছে। মেয়েরাই কি এমন অ্যাপোলো মূর্তিকে স্পর্শ না করে ছেড়ে দেবে? কালই চলে যাবে ও। কদিন আগে কেন পরিচয় হল না ওর সঙ্গে।

কথাগুলো মনের ভেতর নাড়াচাড়া করতে করতে একসময় বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল প্রেমার।

এমনি একজন শিল্পীকেই তো তার জীবনের সঙ্গী করতে চেয়েছিল সে। একজন হত নৃত্যশিল্পী অন্যজন চিত্রশিল্পী। প্রেমা নাচবে আর মাইরন আঁকবে সে নাচের ছবি। চারদিকের গুণী সমঝদারেরা বলবে আশ্চর্য যুগলবন্দী।

মাইরনের কথায় ধ্যান ভাঙ্গল প্রেমার।

কতখানি সময় আর তুমি আমাকে দিতে পারবে মেনন?

অফুরন্ত।

আচমকা কথাটা বলে ফেলেই প্রেমা সোফায় নড়েচড়ে বসল।

মাইরন ছবির থেকে মুখ তুলে তাকাল প্রেমার দিকে।

বলল—এত অঢেল সময় তোমার হাতে আছে মেনন।

প্রেমা বলল—শিল্পীর কাছে বসে বসে তার সৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকাও তো একটা কলা। আমার সময়টাকে এমনি করে অনেক পর ঘন্টা কাটাতে পারলেই আমি খুশী হই।

মাইরন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্রেমার কাছে এগিয়ে এল। অনেক সময় ধরে গভীর চোখে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

প্রেমা একসময় বলল, কি দেখছ এমন করে?

তোমার এমনি বসে থাকার ছবিখানা আমি মনের ভেতর এঁকে রাখলাম। দেশে ফিরে গিয়েই রূপ দেব।

প্রেমা বলল, তুমি আমার সব কিছুতেই যেমন সুন্দর দেখছ তাতে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কিসের সন্দেহ?

আমি সত্যিই সুন্দর কিনা।

মাইরন বলল, অন্যের চোখ কি বলবে জানি না তবে আমার চোখ যে তোমার দিকে তাকিয়ে বারে বারে তৃপ্তি পাচ্ছে একথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

প্রেমা বলল, আমার এই বসে থাকার ছবি যখন আমি কোনদিনও দেখতে পাব না তখন এর ভালমন্দ বিচারের ভার তোমার।

মাইরন আবার প্রেমার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে বলল, ভারতের মন্দিরের ভাস্কর্য আর নর্তকী মেনন আমার চোখে অভিন্ন। দুটিকেই আমি সমান বিস্ময় আর আগ্রহ নিয়ে দেখেছি।

প্রেমা মাইরনের দুটো হাত মাথায় ঠেকিয়ে আবার বুকের কাছে ধরে রেখে বলল, ও কথা বল না মাইরন। ভারতের ভাস্কররা মন্দিরে মন্দিরে যে মূর্তি সৃষ্টি করেছে তার তুলনা পাওয়া ভার। তাদের মুখের একসপ্রেশানগুলোর দিকে শুধু লক্ষ্য করে যাবে। জীবনের গভীরে এমন কোন দুঃখসুখের অনুভূতি নেই যা তাদের সৃষ্টির রেখায় ফুটে ওঠেনি। আমার অভিনয়ে আমি সেইসব অনুভূতির কতটুকুইবা ফোটাতে পেরেছি মাইরন।

তোমার কথা হয়ত ঠিক কিন্তু নাচের সময় তোমার দেহের নানা ফর্ম আর নানা ধরনের একসপ্রেশান শিল্পীর চোখ নিয়ে আমি গভীর আগ্রহে দেখেছি মেনন। শিল্পীর সাবজেকট হিসেবে তুমি যে কত বড় সম্পদ নিজের ভেতর ধরে রেখেছ তা তুমি জান না।

প্রেমা নত মুখে বসে রইল। এ তার প্রাপ্য কি প্রাপ্যের অতিরিক্ত তা সে বুঝতে পারল না।

মাইরন যে দারুণ মুডি তা বোঝা গেল যখন সে প্রেমাকে বলল, তুমি মাথায় ঐ গায়ের র‍্যাপারখানা তুলে যেমন বসেছিলে তেমনি একটু বসবে কি? আমি তোমার একটা স্কেচ করে নেব। স্মৃতি চুঁড়ে আঁকতে গেলে ঠিক এমনটি তো আর পাওয়া যাবে না।

প্রেমা হাসি ছড়িয়ে বলল, হেরে গেলে তো। তাও বা কি করে বলি। বরং বলব, তোমার মনে গভীর রেখা ফেলার মত ক্ষমতা আমার নেই। তাহলে স্মৃতি থেকেই আঁকতে তাই সত্য হত।

মাইরন হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। সে প্রেমার মুখোমুখি হাঁটু গেড়ে বসে শালখানা প্রেমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে মাথার খানিক অংশ ঢেকে দিলে। অমৎকোচে প্রেমার মুখখানা দু-হাতের পাতায় চেপে ধরে ডানদিকে একটুখানি কাৎ করে পোস করল। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে নিজের মাথাটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

প্রেমা যেন একটি পুতুল। বক্ষে আর গলার কাছে শালের সুন্দর নিটোল কটি ফোল্ড। মুখখানা অতি নিপুণ হাতে দক্ষ কোন পুতুল-শিল্পী যেন তৈরী করেছে। আর আশ্চর্য! প্রেমা তাকিয়ে আছে মাইরনের দিকে মুগ্ধ চোখে। পাতাটি পড়ছে না, তারাটিও নড়ছে না।

মাইরন কতক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এবার তোমাকে অবিকল এঁকে নিতে আমার একটুও ভুল হবে না মেনন।

প্রেমা বলল, কথাটা শুনে ভাল লাগল কিন্তু তোমার পরীক্ষা নিতে চাই মাইরন।

মাইরন বলল, পরীক্ষা? কিসের?

আমার দিকে না চেয়ে তুমি এখনি স্কেচ করে দেখাতে পারবে?

ও এই কথা!

মাইরন আর একবারও তাকাল না প্রেমার দিকে। একখানা ইজেলে সে তন্ময় হয়ে স্কেচ করতে বসে গেল।

প্রেমা তেমনি গায়ে চাদরটি জড়িয়ে চুপচাপ বসে রইল। সারা দিনের উপবাস, এত বড় দীর্ঘ ব্যালেতে অংশ নেওয়া, সব-কিছু ক্লান্তি তাকে এখন একটা অলস স্বপ্নের জগতে এনে ফেলল। সে যেন ইচ্ছে করলেও আর কোথাও যেতে পারবে না। কোন এক যাদুকর যেন তাকে মন্ত্রের গন্ডী দিয়ে বেঁধে রেখে দিয়েছে। সেই যাদুকরটি সামনে বসে সাদা ইজেলের ওপর কিসব আঁকিবুকি কেটে চলেছে। এক আশ্চর্য রহস্যময় যাদুকর বসে মনে হচ্ছে তাকে। কতক্ষণ পরে প্রেমার মনে হল ঐ মানুষটি উঠে দাঁড়াল। আর অমনি জানালার নীচে আরব সাগর থেকে উঠে এল একটা দমকা হাওয়া। সমস্ত দেয়ালগুলো তাসের ঘরের মত উড়ে যাচ্ছে। একটা তুফান ধেয়ে করে এগিয়ে আসে প্যালেস হোটেলের সংলগ্ন পাহাড়ের চূড়া লক্ষ্য করে। তারপর! প্রেমা

দেখতে পাচ্ছে ঐ ঢেউ-এর মাথায় একটা হলদে রংয়ের নৌকো। ঐ নৌকোটা এসে মন্ত্রের জোরে থেমে গেল একেবারে ওদের পায়ের কাছে। একি! যাদুকর তাকে বুকে তুলে নিয়ে উঠে পড়ল সেই নৌকোয়। তারপর ঢেউএর ভেতর গভীর থেকে অনেক গভীরে তলিয়ে যেতে লাগল তারা। কানে এসে বাজতে লাগল সারা সাগর জুড়ে অদ্ভুত এক ঘুম পাড়ানিয়া গান।

রাত কত? না ভোর হয়ে এসেছে? ঐ তো অস্পষ্ট গ্রীন বাল্বটা রহস্যময় আলো ছড়াচ্ছে। প্রেমা আচ্ছন্ন আবছায়ার ভেতর থেকে চৈতন্যের জগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল।

সামনের টেবিলে বিয়ার আর হুইস্কির বোতল। পানপাত্র তেমনি পড়ে। প্রেমার একটু একটু মনে পড়ছে সে মাইরনের সঙ্গে ড্রিংক করেছিল। ঐ তো টিপয়ের ওপর রাখা তারই শাল মুড়ি দেওয়া ছবিখানা।

মনে পড়ছে এখন। স্পষ্ট মনে পড়ছে। মাইরন ছবিখানা এঁকে তার সামনে তুলে ধরে বলেছিল, মিলিয়ে নাও। আচ্ছা ছবিখানা ধর আমি আসছি।

বলেই মাইরন একখানা আয়না এনে তার মুখের সামনে ধরে রেখে বলেছিল, এবার মিলিয়ে নাও ভাল করে।

বিস্ময়ে কতক্ষণ কথা ছিল না প্রেমার মুখে। শুধু বলেছিল, তুমি অসাধারণ মাইরন।

মাইরনও বলেছিলো তুমি অসাধারণ প্রেমা।

কেন মাইরন?

তুমি সামান্য হলে ছবি অসামান্য হয় কি করে?

প্রেমা কোন কথা আর না বলে, ছবির দিকে না তাকিয়ে শুধু চেয়েছিল মাইরনের মুখের দিকে।

মাইরন ছবিখানা টিপয়ের ওপর প্লেস করে বলেছিল, এস এখন একটু ড্রিংক করা যাক। আপত্তি আছে নাকি?

প্রেমা মাইরনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শুধু মাথাটা নেড়েছিল। অবসাদে তার শরীর তখন নরম সোফার ভেতর ডুবে গিয়েছিল।

মাইরন টেবিলে বোতল আর গ্লাস সাজিয়ে ডাক দিয়েছিল প্রেমাকে। প্রেমা ওঠেনি। সে শুধু বাড়িয়ে দিয়েছিল তার হাতখানা। মাইরন উঠে এসেছিল। প্রেমাকে হাত ধরে তুলে আবার হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

ওরা দুজনে বসে বসে ড্রিংক করেছিল কত রাত ধরে।

তারপর! তারপর বিশেষ কিছু মনে নেই প্রেমার। একটা স্বপ্নচালিতের মত সে মাইরনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। মাইরনের উত্তপ্ত একটা প্রস্তাব শুনে সে কতক্ষণ ধরে দ্রুত হারমোনিয়াম বাজানোর মত হেসেছিল। তারপর হঠাৎ হাসি থামতেই কেমন যেন কান্না পেয়ে গিয়েছিল তার। সে দুটো হাতের পাতায় চোখ চেপে ধরেছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটু আগের দেখা স্বপ্নের যাদুকরের মত মাইরন তাকে বুকে ভরে নিয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল।

প্রেমা মুখ ফিরিয়ে দেখল মাইরন তখনও ঘুমিয়ে।

পশ্চিমের জানালায় চোখ আটকে গেল প্রেমার। পাহাড়টা যেখানে সমুদ্রে নেমেছে সেখান থেকে আকাশের নীল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো নারকেল গাছ। শেষ রাতের পূর্ণ চাঁদটা তখন পান্ডুর হয়ে নারকেল পাতার ঝালরের প্রান্তটুকু ছুঁয়ে আছে। এর পরেই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে অথৈ সমুদ্রের বুকে।

প্রেমার সারা বুক ঠেলে সমুদ্রের ঢেউ-এর মত কান্না উঠে আসতে লাগল। সে বিশ্লেষণ করে জানতে চাইল না, কেন তার এই কান্না।

প্রেমা একসময় অতি সন্তর্পণে মাইরন-এর দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়াল। বিস্রস্ত পোষাকগুলো যথাসম্ভব ঠিক করে নিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ইজেলের দিকে। একটা স্কেচের প্যাড আর পেন্সিল পড়েছিল। হাঁটু গেড়ে বসে লিখতে লাগল।

বিদেশী বন্ধু, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি যখন জেগে উঠে আমাকে খুঁজবে তখন আমি অনেক দূরে। তোমার দস্যুতার চিহ্ন মুছে যাবে কিন্তু তোমার এই ছবির স্মৃতি হয়ত জন্মান্তরেও মুছে ফেলতে পারব না। তোমার ভোরের যাত্রা শুভ হোক।—প্রেমা।

নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল প্রেমা। প্রশস্ত করিডোর পার হয়ে নীচে নেমে এল। সামনে নারকেল গাছের তলায় খড়ে ছাওয়া দুটো কিয়স্ক্। পূর্ণিমার চাঁদ একেবারে পান্ডুর হয়ে উঠেছে। তার অস্পষ্ট আলোয় গোলাকার কিয়স্ক্ রহস্যাবৃত। প্রেমা দাঁড়াল তার তলায়। সমুদ্র থেকে রাত শেষের হাওয়া ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে তীরে ঢেউ-এর আছড়ে পড়ার শব্দ। নারকেল পাতার হঠাৎ হঠাৎ বেজে ওঠা। সব মিলিয়ে প্রেমার অর্ধচেতন মনের কাছে একটা কিসের যেন আমন্ত্রণ পৌঁছে দিল।

প্রেমা সোজা বালি ভেঙে সমুদ্রের দিকে নেমে গেল না। সারা প্যালেস হোটেলের দরজা জানালাগুলো চোখের মত চেয়ে আছে। সে এই মুহূর্তগুলোতে নিজেকে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখতে চায়। প্রেমা সামনের কটেজগুলোর পেছনের সরু রাস্তা ধরে ছুটে চলল। উঁচুনীচু পাথুরে পথ। নারকেল অরণ্যের ছায়ায় অস্পষ্ট। অভ্যস্ত পথে প্রেমা দ্রুত পা ফেলে চলছে। মানসিক উত্তেজনায় কাঁপছে পা দুটো। দু'তিনবার আছাড় খেয়ে পড়ল প্রেমা।

ডানদিকে নারকেল বাগানের ভেতর ক'ঘর সাধারণ মানুষের বসতি। ছোট্ট শিবমন্দির। বাঁধান একচিলতে পুকুর। ক'টি মেয়ে মাঝরাত থেকে স্নানে নেমেছিল। বাহুর আঘাতে চঞ্চল করে তুলেছিল জল। এখন তারা গান গাইতে গাইতে ভিজাচুল জড়িয়ে শিবমন্দিরে পূজো দিতে চলেছে। তিরু আদিরাই ব্রত উদ্‌যাপনের গান।

ধনুমাসত্তিল তিরু আদিরা
ভগবান তন্ডে
তিরুণাল আণ্।
ভগবান তন্ডে
তিরু নালিন নাল্।
ভগবতী কু
তিরু নোলম্বু আন।
ভগবতীড়ে
তিরু নোলম্বিন নাল্।
উন্নারুত্তে
উরাঙারুত্তে।

ধনুমাসের শুভ আদ্রা তিথি ভগবান মহাদেবের শুভ জন্ম ভগবানের জন্মদিনে উপবাস করে আ ভগবতী পার্বতী। এদিন উপবাসের অভুক্ত থেকে জাগরণে নিশি যাপ দিন।

প্রেমার মনে হল সেও স্নান করে দেবে ওদের সঙ্গে পুজায়। পরক্ষণেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠল তার সমস্ত অপবিত্র অশুচি সে। ঐ সামান্য কা জলে মুছবে না তার দেহের গ্লানি।

প্রেমা ছুটে চলল সমুদ্র লক্ষ্য এখন সে খাড়াই একটা টিলার ওপরে থেতে খেতে উঠে দাঁড়াল। সামনে অন সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে। তীরে আক্ষেপে যেন আছাড় খেয়ে লুটিয়ে ঢেউগুলো।

প্রেমা সমুদ্রের দিকে নিস্পন্দ রইল। হু হু করে বয়ে আসছে হা চুল উড়ছে। শাড়ীর আঁচল কখন লু পড়েছে পায়ের তলায়।

প্রেমা এবার নেমে চলল। নির্জন এসে সে বালির ওপর দিয়ে জলের ছুটতে লাগল। সমুদ্রের জল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে রক্তরাঙা গোলাকার কলঙ্ক ধুয়ে ফেলার জন্যে সে এখুনি জলরাশির তলায় ডুব দেবে।

প্রেমা মনে মনে উচ্চারণ কর মোহিনী। অমৃত হরণ করে নিয়ে নৃত্যের মায়ায় বিশ্বজনকে ভুলিয়ে সমুদ্র তোমার অমৃত তুমি ফিরিয়ে থেমে যাক মোহিনীর মিথ্যা মায়ার

সমুদ্রের জল ছুঁতে গিয়ে থেমে প্রেমা। কে যেন পেছন থেকে এসে ফেলল তার একখানা হাত। উদ্‌ভ্রান্ত ফিরে দাঁড়াল।

দুটো বিশাল বাহুতে ততক্ষণে পড়েছে সে।

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও দেবন, অশুচি। তোমাকে স্পর্শ করে থাকার অধিকার এখন আমার নেই।

তুমি জাননা প্রেমা আজ সারা দি আমি অভুক্ত। মনে মনে ইচ্ছা ছিল কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়ে আজ ব্রত ভাঙব।

ডুকরে কেঁদে উঠল প্রেমা।

আমি রিক্ত দেবন। কিছু নেই, নেই আমার।

দেবন আরও নিবিড় করে প্রে বুকের মাঝে জড়িয়ে নিয়ে বলল, মহা জন্মলগ্নে আমি ভূমিষ্ট হয়েছি আমাকে তুমি ভোলাতে পারবে না। অমৃত তোমার কাছেই রয়েছে।

প্রেমা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, সে মত উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। আমি মরে যাব তবু তোমার ঐ পবিত্রতাকে নষ্ট করতে পারব না।

দুঃখ পেওনা প্রেমা। আমি আজ সারা রাত এই নারকেল বনের ছায়ার গভীরে বসে নিজের মনকে প্রস্তুত করেছি। চাঁদের আলোয় দেখেছি তোমাকে অডিটোরিয়ামের বাইরে বেরিয়ে এসে আবার প্যালেস হোটেলের ওপরে উঠতে। আমি জেগে বসে সারাটা রাত তোমার ফেরার আশায় প্রতিটি পল অনুপল গুণেছি।

কেন, কেন তুমি বসেছিলে দেবন একটা ভ্রষ্টার প্রতীক্ষা করে। বিশ্বাস কর আমি নিঃশেষ হয়ে গেছি। আমার দেবার মত কিছু নেই তোমাকে।

দেবন প্রেমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েও তৃপ্তি পাচ্ছিল না। সে যেন প্রেমার ভেতর একাকার হয়ে মিশে যেতে চাইছিল।

সবার অলক্ষ্যে সব হারানো প্রেমাকেই আমার চাই। শূন্য রিক্ত হয়ে গেছ বলেই তো আজ ভরে দেবার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলাম।

প্রেমা আকুল হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে লুটিয়ে পড়ল বালির ওপর দেবনের একেবারে পায়ের কাছে।

দেবন নত হয়ে প্রেমাকে তুলে ধরে বলল, ঐ দেখ চাঁদ ডুবে গেছে। আর পূর্ব সাগরের দিকে চেয়ে দেখ সূর্যের রঙীন আভা ছড়িয়ে পড়ছে আকাশের নীল ছুঁয়ে। এ মুহূর্তে তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিওনা প্রেমা।

—শেষ—
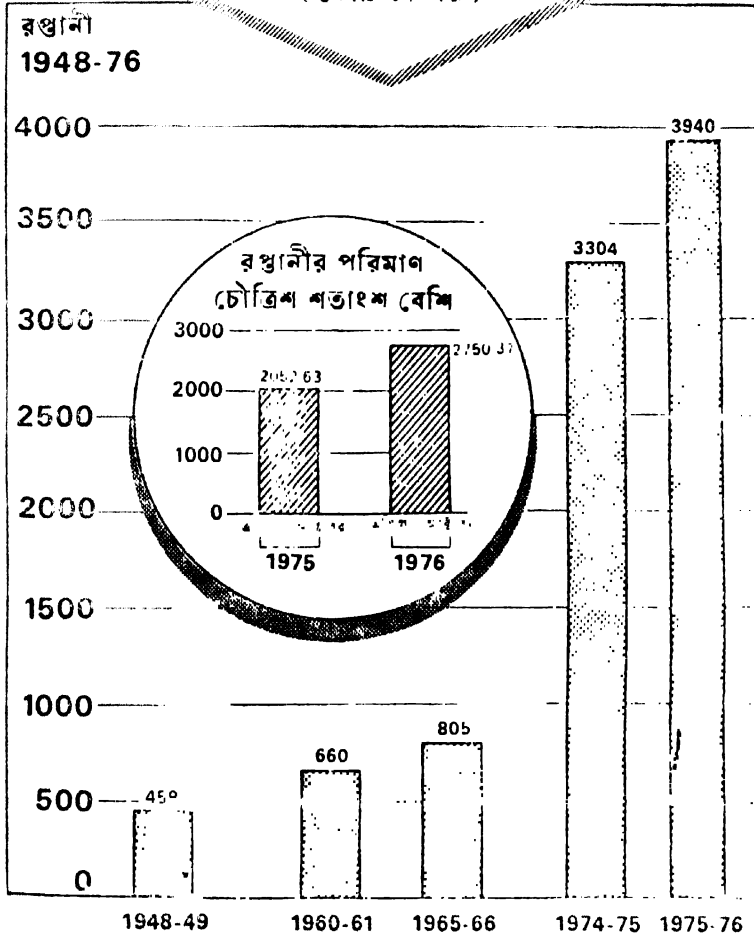
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

১৭।১।৭৭

ঘণ্টা কয়েক আগে এলাহাবাদে এসে পেঁৗছেছি। ক্রুশ্চেভ-বেজনেভের ময়দানের মিটিংকে কাঁদিয়ে গুণে দেব? এ বয়সে বারোর নামতা অতি কষ্টে স্মরণ হয়। সারারাত ভালো ঘুম হয়নি, মাঝে মাঝেই "জয় প্রয়াগরাজ" "জয় মহাদেব"-এর উথলে ওঠা ভক্তি ঘুমাতে দেয়নি। না দিক, আমিতো জেগে থাকতেই এখানে এসেছি, দেখতেও। কি দেখবো জানি না, তবে আমার সামনে মানুষ মানুষ এবং মানুষের ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ লিখলাম বলেই এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা ভাল যে আমি বিশ্বাস করি ধর্ম এখনো ভারতবাসীর প্রধান জৈবিক উপাদান। ভাকরা-নাঙ্গাল, ভিলাই, ভাবা এটমিক রিসার্চ প্রতিষ্ঠান যতই বিজ্ঞানের পোষাক পরাক না, আসল ভারতবর্ষ এখনো মন্দিরের ভিতরে লুকিয়ে আছে, কোনো নেতা কোনো লেফটানেন্ট জেনারেল-এর সাধ্য হয়নি তাকে বাইরে টেনে আনা। এই মুহূর্তে মাথার ওপরে যখন পরিষ্কার সূর্য, অদূরে হিমালয় পাঠানো অনচ্ছ জলের পবিত্র সম্মিলনের পাশে তিথি-উদগ্রীব পুণ্যকামী, আমি অপলক ঠিক তখনি চেয়ে আছি একটি দুবছরের শিশুর দিকে। তার বাবা মা বিহারের দম্পতি! শিশুটির বোধহয় একটা পায়ে খুঁত আছে, উদোম বালগোপাল। গতকাল রাতে সে কোথায় ছিল জানি না, তবে প্রচন্ড ঠান্ডা লেগেছে: নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট। অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন। কিন্তু বাবা মা তাকে স্নান করাবেই, তারপর হবে মস্তকমুন্ডন। তা হলেই অক্ষয় স্বর্গলাভ, তবে সশরীরে!

কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "ছেলেটিকে এভাবে রেখেছো কেন খালি গায়ে? নিমুনিয়া হবে যে?" উত্তরে এমনভাবে তাকালো যেন নিমুনিয়া তাদের গায়ে কখনো প্রবেশ করেনি! মুখে বললো "ইয়ে হামারা গুরুদেবকা নির্দেশ হ্যায়"। রাষ্ট্রভাষাটা এই ভীড়ে এই ধাক্কা খেতে খেতে লেখার সময় ঠিক ঠিক আসবে না তাই বাকীটা বাঙ্গালায় লিখছি—বললো, গুরুদেব বলেছেন মৌনী অমাবস্যা অবধি রোজ শিশুটিকে স্নান করালে পায়ের খুঁত সেরে যাবে।

আসার সময় হাওড়ায় ওয়ান আপ দিল্লী-কালকায় উঠতে না পারায় এক বৃদ্ধা বুক চাপড়াচ্ছিল আর কাঁদছিল হায় হায় তার আর এ জন্মে কুম্ভ হলো না। তার টিকিট ছিল, জোয়ান মরদ ছেলেও ছিল, কিন্তু রিজারভেশন বোধহয় ছিল না। লাল, হলুদ এবং নীল আলোর শেষে যখন ট্রেন ছেড়ে দিল তখনও বৃদ্ধা বুক চাপড়াচ্ছিল, অবাক বৃদ্ধার ছেলে কিন্তু হাসছিল।

কিন্তু শিবের গীত থাক, মেলার কথাই বলি। মকর স্নানের পর দুদিন লোক একটু কমলেও আজ আবার লোক আসতে আরম্ভ করেছে। আসল যোগ তো ১৯ জানুয়ারী। ১৪৪ বছর পরে গ্রহণনক্ষত্ররা আবার এই মহাযোগে মিঃ রাজী হয়েছেন, আর মানুষ হবে না? সুতরাং আবার। মানুষ! সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। তা উপরে কিন্তু সত্য মানুষের বিশ্বাস। না হলে এই অপরি কষ্ট পেতে কেউ আসে?

১৮।১।

সমুদ্রমন্থনের শেষে বিষ ও অমৃত দুই-ই উঠেছি মহাদেব বিষটুকু স্বকণ্ঠে ধারণ করে পৃথিবীর মানুষকে র করলেন। সুতরাং দেবতাদের দাবী, বিষ যখন মহা নিলেন, অমৃতটুকুও তাদের প্রাপ্য। আসলে অন্য কার ছিল। যে প্রাচীন প্রাচীকালের কথা, সে সময় দেবাসু যুদ্ধে দেবতারা প্রায়ই নিগৃহীত হতেন। পাছে অসুর অমৃতপান করে অমর হয়ে স্বর্গেও রাজ্যপত্তন করেন, ত তাড়াতাড়ি দেবরাজ পুত্র জয়ন্তকে পাঠানো হলো। মানু এক বছর দেবতার একদিন। এ থেকে বোঝা যায় পৃথি থেকে স্বর্গ কত দূরের পথ। তুলনায় নরক বোধকরি অ সমীপবর্তী, না হলে যমরাজ এতো ঘন ঘন আসেন কি ক যাহোক শ্রীমান জয়ন্ত বোধহয় শক্ত সমর্থ ছিল না তেমন ও ঐ কুম্ভও ছিল যথেষ্ট ভারী। অমৃতেরতো! দেবপুত্র জয় নাসিক, উজ্জয়িনী, হরিদ্বার ও প্রয়াগ এই চার স্থা বিশ্রামের জন্য কুম্ভটি রেখেছিল। রাখতে গিয়ে খানিক ছলকে পড়ে। এ চার জায়গার মাটি পবিত্র হয়ে যায়।

এলাহাবাদের এই সংগমে তিন নদীর মিল সাধারণত সংগম বলতে আমরা দুই-এর মিলন বুঝি। এখা য়ীর মিলন। গঙ্গা ও যমুনাকে দেখা যায়, সরস্বতী যায় না, সে বালির নিচে মুখ লুকিয়ে। কার লজ্জায় জানে? অথবা অন্য দুবোনের তুলনায় প্রথমাবধি ছিল বলেই তার এই লজ্জা।

পুরানেও এই ত্রিধারা সংগমের উল্লেখ আছে। তবে এ পূর্ণকুম্ভ-অর্ধকুম্ভ মেলার প্রচলন শোনা যায় শংক প্রথম করেন। শংকরাচার্যের প্রভাবে হিন্দুধর্ম বা ব্যাপক বিকাশের পর থেকেই বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় প্রান্তসীমার দিকে সরে যায়। বৌদ্ধধর্মে একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর অনুপস্থিত, হিন্দুধর্মে প্রতি স্তরে ভগবানই প্রধা

দুপুরে নিম্বার্ক আশ্রমের অধিপতি শ্রীজীকে দেখ গিয়েছিলাম। ওখানে প্রায় মটরদানার মতো ছোট শালগ্র শিলার পুজো হচ্ছে। শুনলাম দেবর্ষি নারদ নাকি নিজে এ শিলা ভজনা করতেন। গুরু পরম্পরাক্রমে বর্তমান আচা শ্রীজীর হাতে এই শালগ্রাম শিলা। ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছো হয়ে গেছে।

গতকাল সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম আনন্দময়ী মার আশ্র একটু আগেই তিনি আসন থেকে উঠে গেছেন। তাই অপেক্ষ করতে হলো। আধ ঘণ্টা পরে তিনি এলেন। কি অপ মূর্তি, যেন এক জ্যোতির্বলয় মাকে ঘিরে। ঘাড়টা এক একপাশে কাত করে বসেন। আমি পূর্ববাঙলার ছেলে বালক বয়সে ঢাকা সহরে দেখেছি। তিনি এখন প্রণাম নেবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মায়ের বিশে অনুরাগিনী। শুনলাম ইন্দিরাজীর গলায় যে মালাটি প্র ছবিতে আমরা দেখি ওটা আনন্দময়ী মায়েরই দেওয়া। প্রণাম নেবেন না বলে সমবেত জনতা চুপ করে দূরে দাড়ি ছিল। হঠাৎ একটি দুতিন বছরের ফুটফুটে ছেলে দৌ বাঁশের ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে ভেতরে গিয়ে মার পা স্পর্শ করল। সকলেই হতচকিত; কেউ বলে দেয়নি, শিখিয়ে দেয়নি কেউ। মা আনন্দময়ী বাচ্চাটিকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন, তারপর উঠে গেলেন আবার। তাঁর আর প্রণামের প্রয়োজন নেই, শিশুটি

সকলের প্রতিনিধি। আরো কতো বড় বড় মহাপুরুষ এসেছেন এ মহামেলায়, সকলের দর্শনলাভ কি সম্ভব হবে এ কদিনে?

এবার মেলার কথা বলি। কাতারে কাতারে লোক আসছে আবার। কালইতো মহাযোগ। ১৯শের ভোর থেকেই (মতান্তরে বেলা ৯টার পর থেকে) অমাবস্যার জো পড়ার পর থেকেই স্নান সুরু। অমাবস্যা যতক্ষণ স্নানও ততক্ষণ। একশো চুয়াল্লিশ বছর পরে এই মহা পুণ্যযোগ। কিন্তু আমি জলে কি করে নামবো ভাবছি। এত ঠান্ডা যে কাল সারারাত ঘুমই হয়নি। তবে এত লোক, এত নারী শিশু জলে নামবে, আমি পারবো না? ভাবছি দুপুর নাগাদ সংগমে নামবো। যতই ব্রহ্মান্ড-পাতাল কাঁপানো শীত পড়ুক অন্তত তিনটি ডুব দেবোই। প্রতি মুহূর্তে লোক আসছে। ভীড় দেখে লোক-সংখ্যা অনুমান করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে সকলেই বলছেন কাল মহাযোগের সময় অন্তত এক কোটি লোক হবে। ভাবতে রোমাঞ্চ লাগে, আমিও এই কোটির গোটিক—অর্থাৎ একজন। কাল কষ্টের কথা লিখেছিলাম আজ যেদিকে তাকাই কেবল আনন্দ। শারীরিক কষ্ট চূড়ান্ত, কিন্তু মুখে আনন্দিত বিশ্বাসের উদ্ভাস। "আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার"। আজকের সূর্য তার রৌদ্রতাপের সঙ্গে আরও যেন কিছু দিয়েছে।

রামদাস কাঠিয়া বাবার শিষ্য সন্তদাস মহারাজ, তস্য শিষ্য প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ার এক তাঁবুর ভিতরে স্রেফ বালুর উপর খড় বিছিয়ে গোটা দুই কম্বল সম্বল করে পড়ে থাকছি! আশ্রমের সাধুর মধ্যে শালপাতায় খিচুড়ি ও আলু খাচ্ছি; মেলায় গিয়ে দেখছি হাতীর পিঠে, ঘোড়ায়, পাল্কিতে, এমনকি ব্যান্ডপার্টির হিন্দীগানের সুরের সঙ্গে চলেছেন মন্ডলেশ্বর সাধুবাবা। দুনম্বর ব্রিজের কাছে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ইংরাজী বই বিক্রী করছে একজন মুন্ডিত-মস্তক গেরুয়াধারী আমেরিকান। যমুনার নীলধারার পাশে এক উৎকল দম্পতি সাধুদের কৌপিন বিলোচ্ছেন। শুনেলাম রোজই বিলোন। কি উদাসীন সেই বস্ত্রখন্ড মেলার মধ্যে ত্রিবেণী রোড বরাবর সারাদিনই মাইক বাজছে গাঁক গাঁক করে। রোজই হারিয়ে যাচ্ছে অনেকে। কাছেই কোন আশ্রমে নাকি ভূমিষ্ঠ হয়েছে শিশু। ১২ তারিখে একটি বোবা ছেলেকে মেলার অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর পরই মাইকে ছেলেটির সাজপোশাকের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। মিনিট কুড়ির মধ্যেই ঘোষিকা বোবা ছেলেটি সম্পর্কে বার তিনেক বললেন। শেষবারের ঘোষণাটি বিচিত্র, যথারীতি ছেলেটির বর্ণনা দিয়ে ঘোষিকা বললেন কেউ সহৃদয় যদি ছেলেটিকে গ্রহণ করে মেলা অফিস থেকে এসে নিয়ে যান তবে তারা কৃতার্থ হবেন। আজ ১৮ তারিখ, ১২ তারিখ থেকে মেলা অফিসে ছেলেটি আছে। সুতরাং বোঝা যায় কোনো পাষন্ড ইচ্ছে করেই পৃথিবীর এই নির্বাক সন্তানটিকে ফেলে রেখে গেছে।

সঙ্গে ম্যাপ না থাকলে এ মেলায় চলা মুস্কিল। খাকিশোভিত গাইড আছে অনেক। সেই সহর থেকে মূল মেলা এলাকায় ঢোকার পথে, যেখানে এক নামকরা আলো কোম্পানী সম্ভবতম তোরণটি বানিয়েছে (যে তোরণে দুদিকে রাম সীতার ছবি, জাতীয় পক্ষী ময়ূরের ছবি, সবার ওপরে মেলা থেকে ফিরে গিয়ে কেন ভবিষ্যতে আমাদের শুধু এ কোম্পানীর সামগ্রীই ব্যবহার করা উচিত তার সচিত্র বিজ্ঞাপন) সেখান থেকে নদীতীর অবধি অসংখ্য গাইড, কিন্তু অধিকাংশই স্থানীয় লোক নয়। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। "হাম এলাহাবাদকা আদমী নহী"—বাঁধাধরা উত্তর। কয়েক হাজার পুলিশ, দমকল কর্মী, ডাক্তার, ময়লানিষ্কাষণকারী এসেছে বাইরের রাজ্য থেকে। এমনিতে মেলার আভ্যন্তরীণ পরিচালনা খুব সুষ্ঠু। বেসরকারীভাবে অনেক গাইডবুক বেরিয়েছে। ভারত সরকার কি করেছে জানার জন্য ১৯১-এ মেলার নম্বরে টুরিষ্ট কেন্দ্রে ফোন একবার করে দেখি ভেবে মেলার ফায়ার ব্রিগেড কেন্দ্রে গেলাম। মেলায় খুব বেশী ফোন নেই। অফিসার ইন-চার্জকে অনুরোধ করতেই রাজী হয়ে ফোন করতে দিলেন। হা হতোস্মি এখানেও কি কলকাতা থেকে অপারেটর আমদানী হয়েছে। পাঠক বিশ্বাস করুন, পাক্কা ১৫ মিনিট বসে থাকার পরও টেলিফোন রিসিভারটির নির্বিকল্প সমাধি ভংগ হলো না। আরো ৫ মিনিট পর ওপারের ইংরেজী "হ্যালো" শুনে বোঝা গেল রিসিভারটি বধির ছিল না। আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম অন্য কারণে। ফায়ার ব্রিগেড, যাদের হাতে মেলার লক্ষাধিক তাঁবু ও আশ্রমকুটিরের অগ্নিনির্বাপণের দায়িত্ব, সেখানেও অপারেটরদের কেন এমন দায়িত্বহীনতা? টেলিফোনের স্থান, কাল, পরিবেশের প্রভেদের ক্ষেত্রেও বোধহয় অযোগ্যতার ঐক্য আছে।

আজ ১৯ জানুয়ারী। মৌনী অমাবস্যার পুণ্য যোগ। আশে পাশে সারা রাত ধরে চলেছে ভজন। সাধুরাও কেউ ধ্যানমগ্ন ছিলেন সারা রাত। রাতেও প্রতি মুহূর্তে লোক এসেছে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েছে। ধুনি জ্বালিয়ে মহাত্মারা বসে আছেন। নির্বিকার মুখ। শৈব, বৈষ্ণব, উভয় সম্প্রদায়ের সাধুর কি সুন্দর সহঅবস্থান।

গত রাত্রি বারোটা নাগাদ রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়ে-ছিলাম। মাথায় মাংকি ক্যাপ, গায়ে সোয়েটার, কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা। চোখ ও মুখটুকু শুধু খোলা। প্রতি নিশ্বাসে ঢুকে যাচ্ছে এ জীবনের তীক্ষ্ণতম শীত। প্রশ্বাসে ইঞ্জিনের ধোঁয়া। তবু তো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বলে শীত গতকালের চেয়ে দু-এক ডিগ্রী কম। গতকাল রাত্রে যে শীত সহ্য করেছি, এস্কিমোরা এর চেয়ে কত বেশী শৈত্যে বাস করে জানতে ইচ্ছা হয়? ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি মাঝে মাঝেই পড়ছে। কালে-সড়ক ও ত্রিবেণী রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। এখনো লোক আসছে ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ থেকে মনে হয় ঈশান নৈঋৎ কোণও লোক পাঠাচ্ছে এই মেলায়! বিরাট জটা নিয়ে সাধু, পোষা অজগর গলায় মহাত্মা, ত্রিশূলধারী শৈব, চোখের গ্রহণ ক্ষমতার অনেক বেশী চলেছে দৃশ্যের ভোজবাজী। বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম।

হঠাৎ চোখ গেল রাস্তার এক ধারে, যেখানে খাদি আশ্রমের দোকানগুলো রয়েছে, তারই এক ধারে পাঁচজন সাধু আগুন জ্বালিয়ে রুটি পাকাচ্ছেন। রাত বারোটায় রান্না? পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম 'কিউ মহারাজ? অভিতক আপকো কুছ সেবা হুয়া নেই?' নেই বাবা কাল কিসিনে ইস পাঁচ মূর্তিকো ভান্ডারা নেই দিয়া। দূরে শুয়ে ছিল একদল লোক। সকলের গায়ে কম্বলও নেই। তারাই নাকি সাধুদের অভুক্ত দেখে তাদের স্বল্প সঞ্চয় থেকে আটা এদের দিয়েছে। সাধুরা সব সময়ই জনের বদলে বলে মূর্তি। পাঁচজনের বদলে তাই পাঁচ মূর্তি। আসলে, আত্মা অবিনশ্বর এবং প্রতি মানুষেই ঈশ্বরের অংশ—এই কারণেই নিজেদের মূর্তি বলে সাধুরা। সব সম্প্রদায়ের সাধুরাই এ রকম বলে কিনা জানি না।

কিন্তু আর না, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, তাছাড়া এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে শীতের কামড় বেশী করে ঘাড়ে বসবে। তাঁবুতে ফিরতে না ফিরতেই জোরে বৃষ্টি নামল। নীচে খড় ভিজে উঠলো, একটা কম্বলও ভিজে গেল। আমার তো পুণ্য অর্জনের তেমন এমারজেন্সি নেই, 'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' দেখতে এসে-ছিলাম স্বদেশকে। তবু ভাবলাম আমার মাথায় তো তবু একটা তাঁবু, যারা খোলা আকাশের নীচে ভিজছে, তারাই তো এ মেলার সিংহভাগ। কত লোক যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কে জানে? এই তিন দিনে জনকুড়ি লোক মেলায় মারা গেছে। স্বাভাবিক মৃত্যু, বেশীর ভাগই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। গত-কাল ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে শুনলাম অনেকে, স্পেশ্যাল ট্রেন ১৯ তারিখের স্নানের জন্য কুম্ভমেলার যাত্রী নিয়ে আসছিল মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

ভোর সাতটা, বৃষ্টি একটু ধরেছে। মেঘের জন্য ১৯ তারিখের সূর্যোদয় দেখা হলো না। সাধুদের মিছিল আরম্ভ হয়ে গেছে। বড় বড় মঠাধীশদের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন

বাউল-মেলায়

গৌতম ভট্টাচার্য

বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের সেই মানুষটি গত সাত-সাতটা বছর ধরে ফি-বছর কেঁদুলির বাউল মেলায় আসছেন। মাঝে একটা বছরও তাঁর বাদ যায় নি। —অ্যামনটা।

বছর আটাশ বয়সের সেই নারী বসেছিল এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের খুদে সেবাকেন্দ্রটিতে। রিসেপশনিস্টের মত। টিপ-টপ পোষাক ও চড়া মেকাপের সেই নারী সমানে মেলাগতদের 'মন মোহিনী' মার্কা হাসি উপহার দিয়ে যাচ্ছিল। তার চারপাশে বসেছিল জনকয়েক তরুণ ও প্রৌঢ় ভক্ত। একজন গেরুয়াধারীও ছিল। নারী ও পুরুষগুলির বসা কথাবার্তা ইত্যাদির মধ্যে কেমন যেন একটা বেলেল্লা বেলেল্লা গন্ধ ছাড়ছিল।

ওদের দিকে তাকিয়েই সেই মানুষটি ঈষৎ রাগত ও বিষণ্ণ গলায় বলে উঠেছিলেন—মেলাটাকে নষ্ট করে ছাড়ছে।...।

এবার কেঁদুলির মেলায় গিয়ে ঐ জাতীয় অভিযোগের প্রকাশ ঘটতে দেখেছি আরও অনেকেরই কথাবার্তায় আর চোখ মুখের ক্ষুব্ধ ও হতাশার অভিব্যক্তিতে।

'ভোলা - মনে'র মেলায় অনেক মানুষেরই খুচরো-ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি দেখা গেছে। কেঁদুলি গাঁয়েরই এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের বাড়ীর দু একটা ঘর খালি করে মেলার ক'দিন ভাড়া দেন বহিরাগতদের। একটা রাতের জন্যে দুজন কোনরকমে শুতে পারে এমন একটা ঘরের ভাড়া ষোলো টাকা কি স্রেফ খড়-বাখারির দেওয়াল আর চাল-ওলা ঝুপড়িগুলোরও ভাড়া কি দারুণ চড়া। দোকান পাটে আক্ষরিক অর্থেই আগুন দাম। এক [illegible] কাটার ব্যবস্থা। কসাই-মনের পয়সা পেটার নেশা। আর এক নেশা হল ধন্দ ধান্দা ফুর্তি লোটার নেশা। ভাগাড়ের শকুনের মত চোখ করে একদল মানুষ কিছু কিছু দু-নম্বরী ভৈরবী বোস্টমীদের খোঁজে হন্যে হয়ে ফিরছে। তাদের শিকার করেছে বা শিকার হয়েছে।

একজন বলেছিলেন : গত ক'বছর ধরে আসছি ও প্রতিবারেই দেখি লোকের ভিড় বাড়ছে। —কত লোক এসেছিল এবার? বিশ হাজার ত্রিশ হাজার দেড় লাখ দু' লাখ? পৌষ সংক্রান্তির দিনে মেলায় প্রথম দিনের কাক-ভোরে আধ-হাঁটু কি হাঁটু জল অজয়ে পুণ্য স্নান সারছিল দলে দলে আধা-উলঙ্গ উলঙ্গ নারী পুরুষ। তবে ভিড়ের চাপটা বিশেষ করে বহিরাগতদের ভিড়-ভাট্টা আড়াইটা দিনের মাথা থেকে প্রায় পুরোটাই কেটে যায়। তারপর থেকে থাকে কেবল স্থানীয় মানুষদেরই সমাগম!

মেলা কিছুটা জমে উঠেছিল পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতটা থেকেই! দুর্গাপুর সিউড়ি বোলপুর থেকে একের পর এক বাস এসেছে সাঁই সাঁই করে। পেট-ভর্তি মানুষ উগরে দিয়েছে কেঁদুলিতে। ছই ঢাকা গরুর গাড়ি মোষের গাড়িতে চেপে অজয়ের ধু ধু চর আর হাঁটু জল পেরিয়ে অজয়ের ওপারের কত সব গাঁ-গেরামের শয়ে শয়ে মানুষজন এসেছে। রাত থেকেই লটবহর নিয়ে আস্তানা গেড়েছে মেলা ক্ষেত্রের এখানে সেখানে। একটু রেস্তোওলারা বাবু-ভদ্র আদমিরা গাঁয়েরই এর তার বাড়ীতে কি আশ্রম-গুলোয় ঘর ভাড়া নিয়ে আর রেস্তোহীন গরীব-গুরবো গাঁওয়ালিরা গাছগাছালির, কি আশ্রম-টাশ্রমের আটচালার তলায় গাদাগাদি করে আস্তানা গেড়েছেন। ভোর নাগাদ বেশ কিছু মোটর, রিজার্ভ মিনিবাস ডাইরেক্ট কলকাতা থেকে গিয়ে হাজির হয়েছে। তখনও সূর্য উঠতে বেশ দেরী। কষকষে অন্ধকার। পুণ্য সঞ্চয়ের পালা শুরু হয়েছে। অজয়ে স্নান জয়দেবের মন্দিরে পুজো দেওয়া। পুরুষদের থেকে নারীদেরই ভিড়টা উৎসাহটা বেশি। শহুরে মানুষরা বিশেষ করে গাড়িওলা-পার্টিরা পোজ-পাজ নিয়ে ঘুরেছেন ফিরেছেন। স্থানীয় গেঁয়ো মানুষেরা তাদের দিকে সমীহ মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। দোকান পাট বসেছে—জিলিপি কচুরি থেকে জড়ি বুটির পর্যন্ত। 'সুন্দরীর মরণ কূপে ঝাঁপে'র কি 'দু চোখে বিশ্ব দর্শনের তাঁবু পড়েছে। খুপরি খুপরি ঘরে দু-চারটে বই দোকান গীতা-সার সাব বিষ্ণু মাহাত্ম্য জয়দেব মাহাত্ম্য ইত্যাদি গোছের বইয়ের পাশাপাশিই বিক্রি হচ্ছে সচিত্র যৌন-বিজ্ঞান' কি 'রাতের মোহিনী' গোছের বই-টইও। কে যেন বলছিল—সব যন্তর মিলছে কিন্তু কোন দোকানে বাউলদের হাতের যন্তর ডোবা একতারা এসব নেই। বাউল মেলায় এসে অনেকেই তো ওগুলো কিনতে চায়। দুটো চোস্ত চেহারার ছোকরা এক বাচ্চা বাউলকে পাকড়েছিল। তার হাতের ডাবকী দেখিয়ে সাধাসাধি করেছিল ওটা পাঁচ দশ টাকায় বেচার জন্যে। বাচ্চা বাউলটা তার গুরু-বাপের দেওয়া বলে তা বেচতে চায় নি।

সকালবেলা থেকেই মাইকের ক্যার-ক্যারানি। আখড়া আশ্রমগুলোর ঢাক পেটানো সুন্দরী মরণ কুয়োর ঝাঁপ-দর্শনের আমন্ত্রণ তার সঙ্গে মাঝে মাঝে 'ভোলা মন ও ভোলা মন'। দুপুরে এসব একটু কমেছে। স্থানীয় সাঁওতাল কিছু যুবক যুবতী মিছিল বার করে 'মদ খেলে নেশা হয়. প্রেম পিরীত না হইলে মানুষ নয়...' এ জাতীয় গান গেয়ে মেলা প্রদক্ষিণ করে সারা মেলাটাকে জমিয়ে দিয়েছিল।

অনেকেই হোটেলগুলোতে খাওয়া-দাওয়া সারলেও, অনেকেই আবার আশ্রম আখড়াগুলোয় ঠাকুরের ভোগ সেবা করেছেন। এ ব্যাপারে আশ্রম আখড়াগুলো থেকে ঢালাও আমন্ত্রণ আসে। খাওয়া দাওয়ার চিন্তা কেঁদুলির মেলায় হয় না। সন্ধে থেকেই আসল মেলা। সাহিত্যের আসর বসেছে এক জায়গায়। তরুণরা পাঠটাঠ সব করেছেন। লিটল ম্যাগাজিন বিক্রি করেছে কেউ কেউ পত্রিকার স্টলও বসেছে। ভিড় হয় নি সেখানে একদম। আখড়াগুলোয় বাউলরা দর্শকরা মাইক বিলকুল সব ফিট। বাউল গানের আসর জমে উঠেছিল। এক-তারা দোতারা খঞ্জনি হাতে দু-জন তিনজন করে বাউল চুটিয়ে গান গেয়ে গেছেন। একজন থেমেছেন আর একজন ধরেছেন। এক-একজন একটা আসর সেরে আর একটা আসরে গিয়ে জুড়েছেন ফাঁক পেলেই গান ধরেছেন। স্থানীয় মানুষ বহিরাগত সবাই ভিড় করে গান শুনেছেন। বহিরাগতদের উৎসাহ বেশি, অনেক বেশি। কেউ কেউ টেপ-রেকোর্ডার চালিয়ে বাউলের গান টেপ করেছেন কেউ কেউ হরদম ক্যামেরায় ক্লিকক্লিক ছবি তুলেছেন। বাউলরা অনেকেই লোভ আর সচেতনতা নিয়ে সেগুলো লক্ষ্য করেছে। কোন কোন বাউলকে রীতিমত শহুরে ফ্যাশানশিপ নিয়েই গান গাইতে দেখা গেছে। —বাউলরা কি আজকাল আর বাউল থাকছে না? অনেক ক্ষেত্রেই তো তাই-ই মনে হয়েছে।

খারাপ ভারী খারাপ লেগেছে অনেকেরই—এটা নিশ্চিত। একটু রাত হলেই ফালতু পাবলিকের ভিড় কেটে যায়। গেছেও। আসর জমে ওঠে। উঠেছেও।

নেশার দোকানে ভিড় করে উল্টো-পাল্টা বকবক করেছে শহুরে নেশা-গ্রস্থরা। উল্টোপাল্টা বাউল গান গেয়েছে তারা। কে যেন বলেছিল গাঁজায় দোষ নেই' সারাক্ষণটাই তো গাঁজার আসর বসেছে আনাচে কানাচে। বাউলদের সঙ্গে সমানে কল্কে সেবা করেছে শহুরে হিপি-মার্কা [illegible] ছোকরারা অনেকেই।

ফাঁকে ফাঁকে কোন ছোকরা বাউলকে মুখে ক্রীম ঘষতে কিকোন যুবতী বাউলকে ধারালো মুখে প্রসাধন চর্চা করতে কোন কোন বোস্টমীকে স্থূল ভঙ্গিমায় আসর জমাতে দেখা গেছে। ও, কোন কোন শহুরে বাবু ভদ্রজনকে সন্ধ্যেবেলায় অজয়ের অন্ধকার তীরে অন্য আমোদের সন্ধানে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেছে। এ সব ঘটেছে। প্রতিবারই ঘটে। এবারও ঘটেছে।

ফাঁকা ষ্টেডিয়ামে সন্তোষ ট্রফি

রূপক সাহা

সন্তোষ ট্রফির খেলার প্রথম দু সপ্তাহে পাটনাতে ফুটবলনিয়ে তেমন একটা সোরগোল দেখলাম না। শুনেছি গতবারে কালিকটে খুব হৈ চৈ হয়েছিল। এবারে যেন নিষ্প্রাণ। পাটনাতে এসে ভেবেছিলাম সহজেই উদ্যোক্তাদের খোঁজ মিলবে। ঘন্টা চারেক ধরে ঘোরাঘুরি করেও কারো টিকি দেখতে পাইনি প্রথম দিন। স্থানীয় লোকেদেরও নিরুৎসাহ মনে হয়েছে। অনেকে জানেনও না পাটনাতে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা চলছে। রাস্তায় কোথাও ব্যানার নেই, চায়ের দোকানে ছেলেদের জটলা নেই।

এরই মধ্যে প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া পঁচিশটা টিমেরই খেলা হয়ে গেছে। পনের দিনের আয় মাত্র কুড়ি হাজার টাকা। রোজ খেলা হচ্ছে প্রায় শূন্য গ্যালারীতে। সবচেয়ে কম টিকিট বিক্রি হয়েছে যেদিন সেদিনের সংগ্রহ ছয়শো টাকা. সবচেয়ে বেশী সাত হাজার। চ্যাম্পিয়ান বাংলার প্রথম খেলার দিন মাঠে হাজার দুই লোক ছিল কিনা সন্দেহ। উদ্যোক্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। ডাকবাংলোতে ওদের অফিসে সবাই শুকনো মুখে আসা যাওয়া করছেন। সবার মুখেই একই প্রশ্ন সন্তোষ ট্রফির খেলা শেষ হওয়ার পর অবস্থাটা কি দাঁড়াবে।

বিহারে এর আগে কোনবার জাতীয় ফুটবলের খেলা হয়নি। জাতীয় ফুটবল কেন আজ পর্যন্ত মাঝারি ধরনের ফুটবলের আসরও বসেনি এখনে। এরা অবশ্য বলছেন পাটনার শ্রীকৃষ্ণ গোল্ডকাপ এককালে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু কলকাতার দু-একটা নামী দল খেললেই যে টুর্নামেন্ট জাতে ওঠে না—এ কথাটা বোঝাতে পারা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ গোল্ড কাপও এখন বছর চারেক ধরে হচ্ছে না। বোকারোতে স্টীল কাপ কভার করতে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। সেখানে দেখেছি, পাটনা, রাঁচী, জামসেদপুর এমন কি গয়া থেকেও ট্রাকে জীপে, ট্যাকসীতে রোজই হাজার হাজার লোক খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। অথচ স্টীল কাপ দ্বিতীয় শ্রেণীর টুর্নামেন্টও নয়। ধানবাদে অবশ্য মাঝে মাঝে আন্তঃরেল ফুটবল হয়, মন্দ জমে না।

পাটনাতে এখনও পর্যন্ত সন্তোষ ট্রফি খেলার আসর কেন গরম হয়নি—কারণটি দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। সারা ভারতের বাছাই দলগুলো খেলছে অথচ মাঠে দর্শক নেই, চিন্তাও করা যায় না। উত্তর প্রদেশের ফুটবল টিমের ম্যানেজার তো বলেই ফেললেন—পনের বছর ধরে ন্যাশনাল ফুটবল টুর্নামেন্টে যাচ্ছি মশাই, এরকম জৌলুষহীন আসর কোথাও দেখিনি।

এখানে পুরোনো দিনের নামী দামী ফুটবলাররা অনেকে হাজির। আছেন বলরাম, আজিজ ও আহমেদ হোসেন—এই তিন নির্বাচক। থঙ্গরাজকে দেখা যাচ্ছে উদ্যোক্তার ভূমিকায়। স্থানীয় একজন বললেন থঙ্গরাজ না এলে টুর্নামেন্টই আরম্ভ হোত কি না সন্দেহ। আরেকজন লোককে দেখলাম মাথা ঠান্ডা করে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি বোকারো স্টিলের স্পোর্টস অফিসার শ্রীএস এন প্রসাদ। একমাত্র ইনিই দেখলাম এখনও আশা রাখেন শেষের দিকে স্টেডিয়াম উপচে পড়বে।

থঙ্গরাজ এখন বেকারো স্টিলের ফুটবল টিমের কোচ। এখানে ওকে পাঠিয়েছেন বোকারো স্টিলের কর্তারা। লম্বা মানুষটা ছোটাছুটি করছেন খুব। একদিন দেখলাম, বাংলার স্টপার প্রদীপ চৌধুরীর কপাল কেটে যাওয়ায় কোলে করে তুলে নিয়ে এলো মাঠ থেকে। সেদিন বাংলা ভাল খেলতে পারেনি। উত্তর প্রদেশকে চার গোলে হারালেও বাংলার খেলায় আমাদের অখুশী দেখে থঙ্গরাজ একজনের পিঠ চাপড়ে বলল—ঘাবড়াবার কিছু নেই। ভাল টিমের বিরুদ্ধে বাংলা দারুন খেলবে দেখে নিও। ওর সাথে গল্প হলো অনেকক্ষণ। পাটনাতে তেমন হৈ চৈ নেই কেন তার উত্তরে থঙ্গরাজ জানালেন—কিছুদিন আগে ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান, মোহনবাগান ভাল খেলা দেখিয়ে গেছে এখানে। তাই ভিড় হচ্ছে না।

আমার মনে কিন্তু অন্যরকম সন্দেহ। বলছি না ফুটবল ভালবাসে এমন লোকের এখানে অভাব। ফুটবল খেলা হয় কতটুকু একথা জিজ্ঞেস করেছিলাম এখানকার এক কর্মকর্তাকে। অবাক হওয়ার মত উত্তর শুনলাম। বিহারে ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনই নেই। পাটনা এ্যাথেলিটক এ্যাসোসিয়েশনই ফুটবলের ব্যাপারে সর্বেসর্বা। পাটনাতে ফুটবল সিজন আটমাস। মোট চুয়াল্লটা দল তিনটে ডিভিসনে খেলে। এগারোটা ওপেন টুর্নামেন্ট হয়। এখানে নথিভুক্ত প্লেয়ারের সংখ্যা তিন হাজার। মোটে একটা খোলা মাঠে খেলা হয়। গান্ধী ময়দানে প্রথম ডিভিসনের খেলা চলার সময় পাশে জনসভা হতেও বাধা নেই। ফুটবলাররা একটা পয়সাও পায় না ক্লাব থেকে। কর্মকর্তা যাই বলুন, দেখেশুনে মনে হল এখানে সিরিয়াস ফুটবল খেলা মোটেই হয় না।

গত দশ বছরে বিহার থেকে একজন ফুটবলারও ভারতের হয়ে খেলেনি। চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ বিহারের লোক হলেও বাংলা থেকেই ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়েছে। এই উদাহরণ প্রদীপ ব্যানার্জী, সুভাষ ভৌমিকের বেলায় দিচ্ছি। পাটনা এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারীকে ধরেছিলাম ফুটবলের এই দৈন্যদশা কেন জানবার জন্যে। ভদ্রলোকের নাম ইজাজ হোসেন।

নিজে খেলেননি ফুটবল, তবে এখন রেডিও কমেনটেটার। পেশায় সাংবাদিক। স্থানীয় উর্দু কাগজের। ইজাজ হোসেন বললেন—পাটনাতে ফুটবল জমে না ওঠার জন্য বিহারের স্পোর্টস কাউন্সেল দায়ী। ওরা বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করে গেছেন। ছয় মাস আগে যখন এ আই এফ এফ বিহার অলিম্পিক এসোসিয়েশনকে সন্তোষ ট্রফি করার দায়িত্ব দেয় তখন থেকেই ওই ব্যবহার শুরু। যে জায়গায় খেলা হচ্ছে সেই মৈনুল হক স্টেডিয়ামের দেখা-শোনার দায়িত্ব ওদের ওপর দেওয়া। ওরা দাবী করেন প্রতিদিন এক হাজার টাকা ভাড়া দিতে হবে। এ ছাড়াও বিজ্ঞাপনের টাকা এবং পাঁচশো আসন ওদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। আমরা নারাজ হওয়ায় গোলমাল বাড়ে। কোন্দলটা গড়ায় খেলা আরম্ভের আগের দিন পর্যন্ত—তখন আট-দশটা রাজ্যদল পাটনায় পৌঁছে গেছে। নিজেরাও জানতাম না আদৌ পাটনাতে খেলা হবে কিনা! আমার ধারণা মেয়ের বিয়ের জন্য কোন বাড়ী ভাড়া নিলে বাড়ীওয়ালা কখনই দাবী করতে পারেন না তার পঞ্চাশজন লোককেও নেমন্তন্ন করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী জগন্নাথ মিশ্রের হস্তক্ষেপে অবশ্য স্পোর্টস কাউন্সেল নরম হন। এই গোলমালে আমরা কাজকর্মও ভালভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারিনি।

ইজাজ হোসেন নিজেও উদ্বিগ্ন সন্তোষ ট্রফির খেলা শেষ হলে কি হবে। অতো লোকসানের দায় নেবে কে? মোট বাজেট বারো লাখ টাকা। গেট মানি, স্যা[illegible]নির ও বিজ্ঞাপন থেকে টাকা উঠবে আশা করে ওরা নেমেছিলেন। সিজন টিকিট বিক্রি হয়নি নানা গোলমালে। রোজ টিকিট থেকে যা উঠছে তা বলার মতো নয়। অথচ খরচ হচ্ছে জলের মতো। এখন এমন অবস্থা—এরা যে-দলগুলো হেরে গিয়ে বিদায় নিচ্ছে তাঁদের প্রাপ্য টাকাও দিতে পারছেন না। একজন কর্মকর্তা নাকি বউয়ের গয়না বন্ধক দিয়ে দশ হাজার টাকা নিয়েছেন ব্যাঙ্ক থেকে।

যে ভদ্রলোক জাতীয় ফুটবলের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি হলেন বিহার অলিম্পিক সংস্থার সেক্রেটারী রবি মেহেতো। বত্রিশ বছর ধরে সন্তোষ ট্রফির খেলা চলছে অথচ একবারও বিহারে হয়নি—এই অজুহাতেই বাংলা, ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুর কাছ থেকে প্রতিযোগিতাটি ছিনিয়ে নেন। এখন ওঁর নাভিশ্বাস উঠেছে। রবি মেহেতো ব্যবসায়ী। এখানে ওকে সবাই খুব মানেন দেখলাম। মৈনুল হক মারা যাবার পর উনি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনে বিহারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এখন ফিনান্স কমিটির মেম্বার। চেয়েছিলেন জাতীয় ফুটবল করলে ওখানে ভাল পজিশন পাবেন। কিন্তু চেষ্টাটা মাঠে মারা যেতে বসেছে।

জাতীয় ফুটবলে পাহাড়ীদের চমক

পঁচিশটি রাজ্য দলের মধ্যে সতেরটি ছাঁটাই পর্বেই বিদায় নিয়েছে সন্তোষ ট্রফির খেলায়। এই সতেরটি দলের মধ্যে সিকিম ও পণ্ডিচেরী এই প্রথম জাতীয় ফুটবলের মুখ দেখলো। এদের মধ্যে চমক দিয়েছে সিকিম। কথা বলছিলাম ওদের কোচ এবং ক্যাপটেন জেরী বাসীর সঙ্গে। জেরী ভারত-এর হয়ে সত্তর সালের ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে খেলেছিল। ওর সঙ্গে যখন কথা বলি তখন উপস্থিত ছিলেন সিকিম দলের ম্যানেজার সিরিং দোরজি। ভদ্রলোক আই এ এস। সিকিম সম্পর্কে উৎসাহী দেখে উনি দলের ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন জেরী। বোম্বাইয়ের মফতলাল স্পোর্টস ক্লাবে খেলত। কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের হয়ে খেলার ইচ্ছে ওর বহুদিনের। পঁচাত্তর সালে কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু ওখান থেকে চলে যায় সিকিমে। কেন ইস্টবেঙ্গল ওকে খেলালো না, জিজ্ঞেস করায় জেরী উত্তর দিল—'কলকাতায় আমি যখন পৌঁছাই তখন ইস্টবেঙ্গলের প্র্যাকটিশ সুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি কোচ প্রদীপ ব্যানার্জিকে গিয়ে ধরি। উনিও খুব চেষ্টা করেছিলেন যাতে ইস্টবেঙ্গলে আমি খেলতে পাই। শেষ পর্যন্ত ক্লাব বলে আমি নাকি অনেক দেরী করে ফেলেছি। এদিকে ইণ্টার-স্টেট ক্লিয়ারেন্স নেবার ফলে মফতলালে ফিরে যাবার উপায় ছিল না। ঘুরতে ঘুরতে সিকিমে ফিরে যাই।'

জেরী যখন কথা বলছিল তখন ওর মুখে বিষাদের ছায়া লক্ষ্য করছিলাম। ওর পাশে বসেছিল সোনাম থাপ্ডু। দলের লেফট হাফ। দলের মধ্যে সেই বর্ষীয়ান। বলল,—'জেরী কিন্তু সিকিমের ছেলে। তাই ও যখন সিকিমে ফিরে গেল তখন আমরাই ওকে রেখে দিই।'

জেরী হাসি মুখে সায় দিল। বলল—'হ্যাঁ, সে সময় মন খুব খারাপ ছিল। একদিন গ্যাংটকের পোলো গ্রাউণ্ডে গিয়েছি, দেখি এরা প্র্যাকটিস করছে। মাঠে সেদিন ছিলেন সিকিম ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট সিরিং দোরজী কাজী। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলেন। অনুরোধ করলেন আমি সিকিমেই যেন থেকে যাই। ছেলেদের গড়ে তোলার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে দিতে চান।'

'আমি গ্যাংটকেরই ছেলে। বোম্বাইয়ে খেলতে গিয়ে রাজ্য ছাড়া বহুদিন। কলকাতায় খেলতে চেয়েছিলাম সিকিম কাছে বলে। দোরজী কাজী যখন আমাকে প্রস্তাবটা দিলেন তখন ভাবলাম মন্দ কি! সিকিমে থাকলে ছেলেদের তৈরী করতে পারব আবার মা-বাবার কাছেও থাকতে পারব। তাই রাজী হয়ে গেলাম।'

সন্তোষ ট্রফিতে সিকিম প্রথমবার খেলতে এসে কোন রকম অসুবিধা অনুভব করছে কিনা জিজ্ঞেস করায় জেরী বলল, 'আমাদের অনেক দেরীতে জানানো হয়েছিল আমরা জাতীয় ফুটবলে খেলতে পাব। সিকিম যখন ভারতের অঙ্গরাজ্য ছিল না তখন খুব একটা ফুটবল খেলা হতো না ওখানে। রাজকুমার নেতজিং নামগিল ফুটবলভক্ত ছিলেন। উনি কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটা টিম তৈরী করে খেলাতেন। দৌড় ছিল সবচেয়ে দূর দার্জিলিং পর্যন্ত। আমি গিয়ে দেখলাম মাত্র একটাই মাঠ সিকিমে। তাও বালি আর কাদায় ভর্তি। ফুটবলের জন্য আরো মাঠ চাই। ওরা আমাকে শিক্ষা বিভাগের সরকারি ডিরেকটরের পদে বসিয়েছেন। আমি সরকারকে মাঠ তৈরী করে দেবার কথা প্রথমেই বলি। এখন আরেকটা মাঠ বানাবার উদ্যোগ চলছে। তবে পাহাড়ের দেশে মাঠ তৈরী প্রচণ্ড সমস্যার ব্যাপার।'

সিকিমের এই দলটি মাত্র পনের দিনের অনুশীলনে গড়া। দলের মধ্যে সাতজন স্কুলের ছাত্র, দশজন কলেজের। জেরী বললেন, 'আমাকে এবং সোনাম থাপ্ডুকে বাদ দিলে ছেলেদের বয়সের গড় আঠারো বছর। এদের মধ্যে কেউই সিকিমের বাইরে কোনদিন খেলেনি। এমনকি প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলাও দেখেনি। পাটনার মাঠে এদের একটু অসুবিধা হবে। এতো ভালো মাঠে খেলার অভ্যাস নেই। আমাদের কাদা-বালি মাঠে বল দ্রুত ছোটে না।'

জেরী একটি ছেলেকে ডাকল। নাম তরুণ মুখিয়া, স্টপার ব্যাক। জেরী বলল—'এই ছেলেটি এবার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। এর মতো আরো চার-পাঁচজন আছে, যারা কয়েকদিন পরে গিয়ে পরীক্ষায় বসবে। এ খুব ভল খেলেছে। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা গোল করেছে হয়ত দেখেছেন।'

তরুণ জানাল ওর বাবা দার্জিলিংয়ের মিউনিসিপ্যালিটিতে কেরাণীর চাকরি করতেন। এখন রিটায়ার্ড। আরেকটি ছেলে—কুশল সুব্বা, বয়স পনেরও হবে না, হাসিমুখে বলল সন্তোষ ট্রফিতে খেলার অভিজ্ঞতা ওর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। লিংক্যান টার্সি ছোপেল ওর কাঁধ বেয়ে নেমে আসা চুল সামলে বলল—'অনেক নামী ফুটবলারের খেলা দেখলাম। গ্যাংটকে ফিরে গিয়ে চিন্তা করব কি শিখলাম।' ছোপেল সবে কলেজে ঢুকেছে।

জেরী বলল, 'আমার ছেলেরা সবাই সিডিউল ট্রাইব। এদের ঠিক গড়েপিটে নেব। খাটবার শক্তি প্রচুর এদের। চাই শুধু অভিজ্ঞতা। সামনের বছর কলকাতায় আই এফ এ শীল্ড খেলাব ভাবছি।'

সিকিম তিনটে ম্যাচ খেলেছে। দুটি ম্যাচে হেরে যায়। তামিলনাড়ুর কাছে আট গোলে, মহারাষ্ট্রের কাছে পাঁচ-এক গোলে। জিতেছে হরিয়ানার বিরুদ্ধে তিন-দুই গোলে। এটাই ওদের সান্ত্বনা। হরিয়ানা সন্তোষ ট্রফি খেলছে দশ বছর।

সিকিম সম্পর্কে দেখলাম অনেকেই উচ্ছ্বসিত। অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সিলেকটর বলরাম বললেন, 'সিকিম বছর দু তিনেকের মধ্যেই উঠে আসবে। ওদের ঘাটতি কেবল অভিজ্ঞতা। মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে গুছিয়ে খেলতে পারেনি কিন্তু হরিয়ানার দিন দারুন খেলেছে। সেদিন মানসিক চাপ ছিল না।'

সিকিম ছাড়া আরেকটি রাজ্যদল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছে। তারা হল পণ্ডিচেরী। ওরা প্রথমবার খেললেও ওদের দলে ছয়জন তামিলনাড়ুর ফুটবলার খেলেছে। পণ্ডিচেরী গোল দিয়েছে সাতটা, খেয়েছে পাঁচটা। ওদের গ্রুপে শক্তিশালী বিহার কোয়ার্টার ফাইনালে গেছে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি পার্বত্য অঞ্চলের ছেলেরা এখন ফুটবলকে সিরিয়সলি নিয়েছে। যে-কটা পাহাড়ী রাজ্য টুর্নামেন্টে খেলেছে তারা ভালো ফুটবল দেখিয়েছে। সিকিমের কথা আগেই বলেছি, মণিপুর, আসাম আরো দুটো উদাহরণ। এদের মধ্যে দুর্ভাগ্য আসামের। ওদের গ্রুপে তিনটে টিম ছিল। আসাম ও অন্ধ্রপ্রদেশ দু গোলে মধ্যপ্রদেশকে হারালেও নিজেদের মধ্যে খেলায় গোল করতে পারেনি কেউ। আসাম হয়ত জিততে পারত কিন্তু গোলের মুখে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সবকিছু করেও গোল করতে পারেনি। দুবার বারে লেগে বল ফিরে এসেছে। আসামের ইনসাইড দেবাশীষ রায় (জুনিয়ার ইণ্ডিয়া খেলেছে) নির্বাচকদের খুশী করেছে শুনলাম। খেলার শেষে লটারীতে আসাম হেরে যায়।

মণিপুরের ছেলেরা প্রমাণ করেছে ওরা ফুটবলের কলাকৌশল ভালোভাবে আয়ত্ত করেছে। গত অক্টোবরে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বাঞ্চলের খেলায় গৌহাটি কলকাতাকে তিন গোলে হারিয়েছিল। গৌহাটির বেশীর ভাগ ছেলেই ছিল মণিপুরের। ছোট্ট এই রাজ্য থেকে ইতিমধ্যেই গোপেশ্বর সিং ভারতের হয়ে খেলেছে বার তিনেক। ওদের প্রথম খেলা দেখার জন্য বাংলার কোচ অরুণ ঘোষ ছেলেদের নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন। কলকাতার বহু টিম ইম্ফলের চোরাচাঁদ শীল্ড খেলে প্রতি বছরই। কলকাতার ফুটবল ওরা রপ্ত করার চেষ্টা করেছে সন্দেহ নেই।

রেলওয়েজ কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি। তিনবারের চ্যাম্পিয়ান ও দুবারের রানার্স-আপ রেলওয়েজ ভালো খেলেছে, কিন্তু পাঞ্জাবের কাছে এক গোলে হেরে যাওয়ায় বিদায় নেয়। পাঞ্জাবের রাফ খেলার ধরন কাউকেই খুশী করেনি। রেলওয়েজ ছোট ছোট পাশে খেলে সারাক্ষণই প্রাধান্য রেখেছিল। পাঞ্জাবের ইন্দার সিং ও মনজিত-এর খেলা চোখে পড়ল। ছাঁটাই পর্বের খেলায় অনেক গোল হয়েছে। দুর্বল দলগুলো অনেক গোল খেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায় থেকে। ছাঁটাই পর্বে প্রায় দুশোর বেশী গোল হয়েছে। দেখে-শুনে মনে হয় ভারতীয় ফুটবলারদের গোলকানা বদনামটা নেহাতই বাজে।

চোরের মায়ের বড় গলা !

অজয় বসু

বৃহস্পতি সরে দাঁড়িয়েছে এখন যেন শনির দশা চলেছে। যা কিছু করতে যাচ্ছেন বেদী সবই কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মুঠিভরে ধুলো কুড়িয়ে নিলে ধুলোমাটি আর সোনায় রূপান্তরিত হয় না। উল্টে অঞ্জলিবদ্ধ কাঞ্চন কণাও অজান্তে যেন, ম্যাড়ম্যাড়ে মাটির চেহারা ধরে বসে। সত্যিই, বিষেণ সিং বেদীর সময়টা এখন ভাল যাচ্ছে না।

একেই তো পরপর টেস্টে টনি গ্রেগের দলের কাছে হার। তার ওপর লিভারের আচরণ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নতুন এক ঝামেলা। জন লিভার ভুরুতে ভেসলিন মাথানো গজ এঁটে চীপক মাঠে বল করতে নেমেছিলেন। বেদীর ধারণা দিল্লিতেও লিভার ওই কান্ড করেছিলেন। মনের কথাটি যেই না ঠোঁটের আগায় এনেছেন অমনি বৃটিশ সাংবাদিকেরা একযোগে ফণা তোলা সাপের মতো তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

বৃটিশ সাংবাদিকদের বক্তব্য হারতে হারতে বেদীর আর মাথা ঠিক রাখতে পারছেন না। নিজের দলের ব্যর্থতা ঢাকতে উলটো পালটা গল্প ফেঁদে সকলের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন। ক্রুদ্ধ বৃটিশ সাংবাদিকদের আরও দাবি বেদীর ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত। নইলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। টনি গ্রেগের দলের সঙ্গে যে কজন বৃটিশ সাংবাদিক এবার ভারত সফর করছেন তাঁদের সকলেরই এক রা। মনে হচ্ছে যে উঁচু পর্দায় গলা তোলার জন্যে ও'রা সবাই কোমর কষে বেঁধেছেন।

ব্যাপারটা কী? কী এমন ঘটলো যে বেদী বৃটিশ সাংবাদিকদের দু চোখের বিষ হয়ে গেলেন? কদিন আগেও তো ইংলন্ডের অধিনায়ক টনিগ্রেগ বেদী চরিত্রের মূল্যায়নে অনেক ভাল ভাল বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন। গ্রেগের কথায় বেদী একজন সত্যিকারের খেলোয়াড়। যেমন দক্ষতা তেমনি চরিত্রের গুণাবলী। এ মার্ভেলাস বোলার অ্যান্ড এ মার্ভেলাস কারেকটার। কিন্তু তারপরেই এ কী কথা শুনি সাগর-পারের 'মন্থরা'দের মুখে!

বেদীর না হয় মাথার ঠিক নেই। কিন্তু ভারত সফরকারী বৃটিশ সাংবাদিককুলের মাথাগুলি ঠিক আছে তো? তাঁদের কণ্ঠস্বরে চোরের মার বড় গলা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না নিশ্চয়ই?

ভেসলিন মাখানো গজ চোখের ভুরুতে ব্যবহার করার অভিযোগ প্রথমে তুলেছিলেন আম্পায়ার রুবেন টনিগ্রেগের মতে তিনি বিশ্বের সেরা পর্যায়ের আম্পায়ারদের সমতুল্য। বেদরী রুবেনের অভিযোগ সমর্থন করেছেন মাত্র। তবু বৃটিশ সাংবাদিকেরা রুবেনকে ছেড়ে বেদীর দিকে তাগ করে কামান দাগছেন কেন? আম্পায়ারকে চটিয়ে রাখলে পাছে তার রোষবহ্নিতে গ্রেগের দলকে উত্তরপর্বে জ্বলতে হয় এই ভয়েই কী? রামের বোঝা শ্যামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার এই চেষ্টা দেখে সন্দেহ হয় যে গোটা ব্যাপারটার মূলে অন্য কিছু আছে। আর আম্পায়ার রুবেন যে অভিযোগ করেছেন গ্রেগ-ব্যারিংটনও তা অস্বীকার করতে পারেনি। কী করেই বা পারবেন? রাসায়নিক পরীক্ষাতেই তো প্রমাণিত হয়ে গেছে যে লিভার ব্যবহৃত গজে ভেসলিন ছিল এবং সেই ভেসলিনের অস্তিত্বও চীপকে ব্যবহৃত বলের একপাশে লেপটেও থেকে ছিল। লিভার যদি বলে ভেসলিন না মাখিয়ে থাকেন তাহলে বলের একপাশে ভেসলিনের ছোঁয়া লাগলো কী করেই বা?

শুনলে হাসি পায় যে লিভার চোখের ভুরুতে গজ এঁটেছিলেন কপালের গড়ানে ঘামের গতি রুখতে। গড়ানে ঘাম রুখতে ভেসলিন মাখানো গজ ব্যবহার করতে হবে? কেন একখন্ড রুমালের কী বড় টানাটানি পড়েছিল? ঘাম মোছার সহজ পথ ছেড়ে হঠাৎ এমন অভিনব কায়দা করাতেই সন্দেহ জাগে যে লিভারের মতলব ছিল অন্যরকম।

যাঁরাই ক্রিকেট খেলেছেন তাঁরাই সুইং বোলারদের নানা ফন্দী ফিকিরের কথা জানেন। বলের পালিশ বা জেল্লা অক্ষুণ্ন রাখতে তাঁদের কেউ কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে কপালের ঘাম ও মাথার তেল নিজের হাতের তালুতে মাখিয়ে নেন। কেউ বা লাঞ্চ টেবিলে বসে মুঠি করে মাখন তুলে রাখেন। আর মাঠে নেমে সেই মাখনে ঘষাঘষি করে বলের জেল্লা বাড়িয়ে নেন। বলের একপাশে পালিশ থাকলে বাতাসে বলের বাঁক ফেরাতে পরিভাষায় সুইং করাতে সুবিধে হয়। একই উদ্দেশ্যে যে জন লিভার ভেসলিন মাখানো গজ ভুরুর ওপর এঁটে রাখেননি তাই বা কে বলতে পারে? মাঝে মাঝে ভুরুতে হাত দেওয়ার পর সেই হাতে বল তুলে নিলে ব্যাপারটা যে কীরকম দাঁড়াতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্রিকেটের ঘোষিত নিয়মে (৪৬ নং ধারা) পরিষ্কার করে বলা আছে যে কোনো বোলার তেল রজন মোম অথবা কোনো স্নেহ জাতীয় পদার্থ বলে ব্যবহার করতে পারবে না। এমন কাণ্ড করলে তা অশোভন ও অন্যায় বলে বিবেচিত হবে এবং আম্পায়ারদেরও সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশ যা তার বিরুদ্ধাচরণ করলেন জন লিভার আর সেই বে-আইনী কাজের প্রতিবাদ যিনি জানালেন বৃটিশ সাংবাদিকেরা তাঁকেই চড়াতে চাইলেন কাঠগড়ায়! নজিরটি মন্দ নয়। শোভনতা শালীনতা সদাচরণের প্রতীক যে খেলা সেই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে থেকেও বৃটিশ সাংবাদিকেরা সদাচরণের আদ্যশ্রাদ্ধ করেই ছেড়েছেন। বৃটিশ স্পোর্টসম্যানশিপ সম্পর্কিত পূর্ব ধারণার মূলেই ওরা কুঠারের কোপ বসিয়ে দিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে জাতভাইয়ের অপকীর্তি ঢাকতেই ও'দের চড়া গলা আজ সোচ্চার হয়েছে। যাতে মূল বিষয় থেকে কেন্দ্রীভূত দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্যত্র ঘুরে যায়।

কোনো কোনো বৃটিশ সাংবাদিক ব্যাপারটা হাল্কা করে দেওয়ার চক্রান্ত এঁটে বলেছেন যে ভেসলিন ব্যবহারের অভিযোগ তুলে বেদী বোধহয় রসিকতা করতে চেয়েছেন। ও'দের রসবোধ আছে! কিন্তু সে বোধ বড়ই একপেশে। তা না হলে ভুরুর ওপর ভেসলিন মাখানো গজ জড়িয়ে জন লিভার রসিকতা করতে চেয়েছিলেন তাও বোধহয় ও নিয়ে দিতে পারতেন। তবে রঙ্গ-রসের জোয়ার বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেও তাঁরা আসল ঘটনাকে কী চাপা দিতে পারতেন? মাছের অস্তিত্ব যে শাক দিয়েও ঢাকা যায় না!

কপালের ঘাম যাতে চোখে না গড়িয়ে পড়ে তার জন্যই নাকি ভুরুতে ভেসলিন মাখানো গজ এঁটে রাখার ব্যবস্থা। অদ্ভুত কৈফিয়ৎ। এরপর হাত ঘামার অস্বস্তিতে এড়াতে কোনো সুইং বোলার যদি হাতের তালুতে চাপ চাপ গ্রিজ মাখিয়ে রাখেন তাহলে বৃটিশ সাংবাদিকরা কী বলবেন? তবে ওরা যাই বলুন না কেন ক্রিকেটের আইন কিন্তু ছেড়ে কথা কইবে না। [illegible] ছেড়ে দিতে চাইলেন না আইনের [illegible] আম্পায়ার রুবেন।

আচ্ছা বল করার সময় হঠাৎ এক ফোটা ঘাম যদি চোখে এসে পড়ে তাহলে কী কোনো বোলারের মাথায় আকাশ ভেঙে নেমে আসে নাকি? বোলার তো আর ব্যাটসম্যান নন যে দৃষ্টি ব্যাহত হলে ওই মুহূর্তেই তাঁর শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে। কোনো ব্যাটসম্যান ঘাম গড়ানোর অজুহাত তুলে গজ ব্যবহারের কথা বললে না হয় তাঁর কথায় কিঞ্চিৎ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু বোলারের মুখে ওই কথা শুনলে হাসি চেপে রাখাই দায় হয়।

ঘাম গড়ানোর গতি রুখতে ভেসলিন মাখানোর কৈফিয়ৎ সত্যিই হাস্যকর। তবে মূল ব্যাপারটা মোটেই হাসি মসকরার নয়। বৃটিশ সাংবাদিকেরা ত[illegible] ভাল করে জানেন [illegible]লেই এক সিরিয়াস অপকর্মকে আড়াল করায় তারস্বরে গলা চড়াতে দল বেঁধেছেন। তাতে কিন্তু চিঁড়ে ভিজবে [illegible]—এই সত্যটি অতিথি সাংবাদিকদের [illegible]শের ওপরেই আমরা বলতে বাধ্য। বলাতে [illegible]রাই যে বাধ্য করালেন।

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

মাদ্রাজে ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ২০০ রানে জিতেছে এবং সেই সূত্রে ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৬-৭৭ সালের টেস্ট সিরিজে ৩-০ খেলায় 'রাবার' জয়েরও গৌরব লাভ করেছে। বর্তমান টেস্ট সিরিজের এখনো যে দুটো টেস্ট খেলা বাকি তার ফলাফল ভারতের অনুকূলে গেলেও ইংল্যাণ্ডের রাবার জয়ের কোন রদবদল হবে না। ভারতের তাতে কিছুটা যা মুখ রক্ষা হবে। এ পর্যন্ত ভারত বনাম ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে ১৪টা টেস্ট টেস্ট সিরিজ খেলা হল তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যাণ্ডের রাবার জয় ৯ বার, ভারতের রাবার জয় ৩ বার এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২ বার। ভারতের মাটিতে ভারত এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যে ৬টা টেস্ট সিরিজ খেলা হল তার ফলাফল : ভারতের জয় ২, ইংল্যাণ্ডের জয় ২ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২।

ইংল্যাণ্ডের কাছে ১৯৭৬-৭৭ সালের চলতি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারত ইতিমধ্যেই তিন রকমের শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছে—দিল্লির প্রথম টেস্টে এক ইনিংস ও ২৫ রানে, কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে ১০ উইকেটে এবং মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টে ২০০ রানে। বাকি দুটো টেস্টে ইংল্যাণ্ডের জয় হলে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের ষোলকলা পূর্ণ হবে। অর্থাৎ একটা টেস্ট সিরিজের পাঁচটা খেলাতেই ভারতের পরাজয়। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে কোন একটি দেশ একটি টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলাতেই হেরেছে এমন নজির আঙ্গুলে গোনা যায়। শোচনীয় পরাজয়ের এই ক্ষুদ্র তালিকায় ভারতেরই আছে দুটি নজির—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৫৯ সালের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ভারতের পাঁচটি খেলাতেই হার এবং ১৯৬১-৬২ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের পাঁচটি খেলাতেই ভারতের শোচনীয় পরাজয়।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে চলতি ১৯৭৬-৭৭ সালের টেস্ট সিরিজে ভারতের পরপর তিনটে টেস্ট খেলায় শোচনীয় পরাজয়ের প্রধান কারণই হল ব্যাটসম্যানদের চরম ব্যর্থতা।

মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্ট খেলার সূচনায় দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের ৩১ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ৩ উইকেটে ৫৩। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক গ্রেগ এবং সহ-অধিনায়ক রিয়ারলি দলের অতিমূল্যবান ১০৯ রান যোগ করেছিলেন। গ্রেগ তাঁর ৫৪ রানের মাথায় বেদীর বলে বিশ্বনাথের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে আউট হন। গ্রেগের এই উইকেট নিয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে বেদী ২০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। এ সম্মান অপর কোন ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়ের ভাগ্যে জোটেনি।

প্রথম দিনে ৭৯ ওভারের খেলায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ১৭১।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২৬২ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিনে ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের বাকি ৫ উইকেটে ৯১ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনের বাকি ১৪০ মিনিটের খেলায় ভারত তিনটে উইকেট খুইয়ে ৫৮ রান করেছিল। লিভার ২৮ রানে দুটো উইকেট পেয়েছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের খেলায় কোন প্রাণ ছিল না। অসহ্য লেগেছিল। শম্বুক গতিতে খেলা—১০ ঘন্টায় ১৫৫-৫ ওভারে ৩২০ রান—১৩ উইকেটে।

তৃতীয় দিনে ভারতের প্রথম ইনিংস ১৬৪ রানের মাথায় শেষ হলে ইংল্যাণ্ড ৯৮ রানে এগিয়ে যায়। ভারতের প্রথম ইনিংসে ত্রিশের ঘরে রান করেছিলেন মাত্র দুজন—গাভাসকার (৩৯ রান) এবং প্যাটেল (৩২ রান)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে গাভাসকার এবং প্যাটেল দৃঢ়তার সঙ্গে ১০২ মিনিট খেলে ৫২ রান যোগ করেছিলেন। গাভাসকার বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে করে সাড়ে তিন ঘন্টা মাটি কামড়ে খেলেছিলেন। তৃতীয় দিনের বাকি ১১২ মিনিটের খেলায় ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৪৪ রান করে ১৪২ রানে এগিয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড ২৮৩ রানের ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৮৫ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার এই অবস্থায় ভারতের জয়লাভের জন্যে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮৪ রান করার দরকার ছিল। চতুর্থ দিনে ভারত তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৫ রান সংগ্রহ করেছিল।

শেষ পঞ্চম দিনে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৪ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ৫ম উইকেট পড়ে গেলে ভারতের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। ভারতের ভাঙ্গন রোধ করা গেল না। ৫৭ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়লো। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের ৮৩ রানের মাথায় খেলা শেষ হয়। চতুর্থ দিনে বেংগসরকার মাত্র ১ রান করে আহত হয়ে খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে শেষ দিনে খেলতে নামা সম্ভব হয়নি।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের এই ৮৩ রান ভারতের মাটিতে যে-কোন দেশের বিপক্ষে ভারতের পক্ষে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। মাদ্রাজের এই তৃতীয় টেস্টে জয়লাভের ফলে ভারতের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড উপর্যুপরি ৬টি টেস্টে জয়লাভের গৌরব লাভ করলো—১৯৭৪ সালের সিরিজে ৩টি এবং চলতি ১৯৭৬-৭৭ সালের সিরিজে ৩টি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ২৬২ রান (রিয়ারলি ৫৯, গ্রেগ ৫৪ এবং নট ৪৫ রান। বেদী ৭২ রানে ৪, মদনলাল ৪৩ রানে ২ এবং প্রসন্ন ৪৫ রানে ২ উইকেট)

ও ১৮৫ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। আমিস ৪৬ এবং গ্রেগ ৪১ রান। প্রসন্ন ৫৫ রানে ৪ এবং চন্দ্রশেখর ৫০ রানে ৫ উইকেট)

ভারত : ১৬৪ রান (গাভাসকার ৩৯ এবং প্যাটেল ৩২ রান। লিভার ৫৯ রানে ৫, ওল্ড ১৯ রানে ২ এবং আণ্ডারউড ১৬ রানে ২ উইকেট)

ও ৮৩ রান (গাভাসকার ২৪ রান। আণ্ডারউড ২৮ রানে ৪, উইলিস ১৮ রানে ৩ এবং লিভার ১৮ রানে ২ উইকেট)।

বাঙলার সন্তোষ ট্রফি জয়

পাটনার মৈনুল হক স্টেডিয়ামে ৩৩তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ১-০ গোলে মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করেছে। এই নিয়ে বাংলা ২৫ বার ফাইনালে খেলে সন্তোষ ট্রফি পেল ১৬ বার এবং রানার্স আপ হয়েছে ৯বার। এপর্যন্ত ১৯টি দল সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলেছে এবং সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে ১১টি দল।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার এই চারটি রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে : (১) সর্বাধিকবার ফাইনাল খেলা (২৫ বার) (২) সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয় (১৬বার) সর্বাধিকবার রানার্স-আপ (৯বার) এবং ফাইনালে সর্বাধিক গোলে পরাজয় (১৯৭৪ সালে পাঞ্জাবের কাছে ০-৬ গোলে)।

মহারাষ্ট্র (আগের বোম্বাই রাজ্য) এই নিয়ে ১০বার ফাইনালে খেললো—বোম্বাই নামে ৭বার এবং মহারাষ্ট্র ৩বার। মহারাষ্ট্র সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে ২বার—১৯৫৪ সালে বোম্বাই নামে (বিপক্ষে সার্ভিসেস) এবং ১৯৬৩ সালে মহারাষ্ট্র নামে (বিপক্ষে অন্ধ্র)।

এর আগে বাংলা এবং বোম্বাই (অধুনা মহারাষ্ট্র) পরস্পরের সঙ্গে ৪বার ফাইনালে খেলেছে। এবং বাংলা চারবারই বোম্বাইকে হারিয়েছে—১৯৪৫ সালে ২-০; ১৯[illegible] সালে ১-০ ১৯৫১ সালে ১-০ এবং ১৯৫৯ সালে ৩-১ গোলে।

আমীর খাঁ

ছয় ঋতু...

জহুরী সদাগর

একবার আমীর খাঁর আসরে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মশায় হারমোনিয়ামে সংগত করছিলেন। পরপর কয়েকটি দ্রিসপ্তকী তান ও সরগম বিন্যাসের ফাঁকে একসময় জ্ঞানবাবু হারমোনিয়াম থামিয়ে দিলেন। নম্রভাবে মাইকে নিজের অক্ষমতা ঘোষণা করলেন। এটা গুণীজনের বিনয়। জ্ঞানবাবুর অক্ষমতা নয় ওটা আসল যেকোন যন্ত্রেরই এলিমেন্টাল অনুপযোগিতা। একটু হাসাহাসি হল। শ্রোতারা কেউ কেউ খাঁ সাহেবকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে বললেন। ও হ্যাঁ, জ্ঞানবাবু বলেছিলেন—এখন খাঁ সাহেব যেরকম কাণ্ডকারখানা করছেন, তাতে সংগত করা আমার সাধ্য নয়, আমি বরং সা-পা টিপে থাকি। খাঁসাহেব সেদিন যা বলেছিলেন, পরেও বহুবার আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন যে, যেকোন লোকই যদি গোড়া থেকে প্রাকটিশ করে তার স্বরস্থানটি ঠিক চিনে নিতে পারে, তবে দৈনন্দিন অনুশীলন বা রেয়াজের দরুণ ধীরে ধীরে তার মধ্যে এক ধরনের অতীন্দ্রিয় শ্রুতি জন্মাবে। সেটাকে অতীন্দ্রিয় শক্তি বা একসটা সেনসরি পারসেপশনও বলতে পারেন। আবার এই সহজ সেনসেরই আত্যন্তিক স্ফুরণ বা উচ্চতর বিকাশও বলতে পারেন। সে যাইহোক, ঐরকম স্টেজে পৌঁছলে সুরের 'সম্বাদ' শোনা যায়। অর্থাৎ কাপলার সিসটেমের হারমোনিয়ামের মতন—প্রকৃতির নিজে হাতে গড়া এই দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে শ্রবণযন্ত্রের রিসেপশন স্বরযন্ত্রের প্রজেকশান আর মস্তিষ্কের পারসেপশন-ট্রান্সমিশন ক্ষমতার সমন্বয়ে—একটি স্বর প্রক্ষেপনের সঙ্গে সঙ্গে তার পঞ্চম নোট এবং ক্রমান্বয়ে তার চতুর্থ নোট একসঙ্গে কানেগলায় মগজে বেজে উঠতে থাকে—তাকে স্পষ্ট শোনা যায়, ধরা যায়, ছুঁড়ে দেওয়া যায়, তাকে আড়ালে রেখে অনবরত ব্যঞ্জনা সৃষ্টিকরা যায়। গায়ক হিসেবে আমি বিশ্বের তুচ্ছতম গায়কেরও পদপ্রান্তে পড়ে থাকার যোগ্য নই। এই আমিও ঐ অনুভূতির যৎকিঞ্চিৎ স্বাদ পেয়েছি। তাতেই বুঝেছি ব্যাপারটা একেবারে বৈজ্ঞানিক। সততার সঙ্গে চেষ্টা করলে যে কেউই ঐ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে—পণ্ডিতম্মান্য সবজান্তারা ছাড়া।

আমার অভিজ্ঞতা অসীম নয়। তার পাল্লা ছোট। কিন্তু আমার জীবনে আমি আমীর খাঁ ছাড়া আর একটিমাত্র গুণীকে পেয়েছি, যিনি এই স্বরচিন্তনের বৈজ্ঞানিক পন্থাটি জানেন এবং হাতলে দিতে পারেন—তিনি পণ্ডিত জয়চাঁদ ভাট। চিকিৎসা বিভ্রাটে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। বম্বেতে থাকেন।

খাঁ সাহেব পষ্টাপষ্টি বলতেন : আমার কৃতিত্ব বিশেষ কিছু নয়। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক সূত্র আছে, যেগুলিকে অনেস্টলি প্রয়োগ করতে শিখলে, কমার্শিয়াল সাকসেসের মোহে ভেজাল না মেশালে, যেকোন গবেষণার মতন খানিকটা আত্মস্থ হয়ে সাধনা করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যাবে। আমি অল্পবিস্তর করেছি, প্রতিশ্রুত ফলও পেয়েছি, পাচ্ছি।...

ছেলেবেলায় গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর ওপর লেখা একটা ভ্রমণআলেখ্য পড়েছিলুম। তাতে লেখক বলছেন : গোমুখী বলে সচরাচর যে জায়গা দেখে সবাই ফিরে আসে, আসল গোমুখী তার অনেক উত্তরে। দুর্গম বলে গাইড সেখানে যেতে চায় না হিমে জমে যাবার ভয়ে। আমি সাহস করে সেখানে গিয়েছিলুম। সত্যি সত্যি অবিকল গরুর মুখের সকল হিমশিলা-বিন্যাসের উৎসমুখ ভেদ করে বেগবতী গঙ্গার ক্ষীণতীর আদি ধারার প্রস্রবন দেখে এসেছি। আমীর খাঁও তাই বলেন : মালা করতালি পদপদক কোমলবাহু আর কাঞ্চন ঝংকারে আশ্লেষ থেকে সাময়িকভাবে—নিজেকে ছাড়িয়ে এনে একবার ডুব মেরে দেখ—পাও কি না পাওই শাস্ত্রীয় সংস্কার ওপর এই তথ্যান্বেষী ভালবাসার নিবিড় নিষ্ঠাই আমীর খাঁর সাফল্যের মর্মকথা। এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁর গানকে অনন্য মহিমায় মুড়ে রেখেছে।

ময়রাকোলিয়ারীর তৎকালীন সুপারিনটেনডেন্টের নেমন্তন্ন রাখতে তাঁদের গেস্টহাউসে একদিন একরাত আতিথ্য নিয়েছিলুম আমরা। সুরম্য ভোজের পর পানপাত্র হাতে নিয়ে বলেছিলুম : পানের মধ্যে হুইস্কি আর গানের মধ্যে খেয়াল, না খাঁ সাহেব? একগাল হেসে তিনি জবাব দিলেন : বিলকুল। আর খেয়ালও যেমন তেমন নয় একেবারে আমীর খুসরুর খেয়াল। খুসরু ছিলেন তাঁর আদর্শ। আমি জন্মান্তর মানি। আমীর খাঁ নিজেই খুসরু। আমার ধারণা।

খেয়াল গানের উৎস সম্পর্কে নানারকম সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। অনেকের মতে মুঘল বাদশাহ মহম্মদশা-র আমলে অর্থাৎ সতেরশ উনিশ থেকে সতেরশ চল্লিশ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে এর প্রবর্তন হয়। কেউ কেউ মনে করেন, ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদই আদি শাস্ত্রীয় সংগীত এবং এর সঙ্গে গাইয়ের 'খেয়াল' বা সুবিন্যস্ত কল্পনার লঘুতর উপাদানের কিছুটা খাদ মিশিয়েই এই খেয়ালের সৃষ্টি। এই পক্ষ বলেন, বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক সংগীতজ্ঞ মিয়া তানসেনও যখন ধ্রুপদ গানই করতেন, তখন তাঁর আগে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের আগে নিশ্চয় খেয়াল গান সৃষ্টি হয়নি। এবাবদে আরো একটি মত আছে। সেটি হোল, খৃষ্টীয় তের-চোদ্দ শতকে আলাউদ্দিন খিলজীর শাসনকালে (১২৯৬-১৩১৬) মহান সুফী নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রধান শিষ্য আমীর খুসরুই খেয়ালের প্রতিষ্ঠাতা। খুসরু সে-আমলের একজন প্রখ্যাত বিদগ্ধ মানুষ। কাব্য-কলা-দর্শন-সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় প্রজ্ঞা ও মৌলিক চিন্তার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের ভাষাসমষ্টির শ্রেণীবিন্যাস এবং হিন্দুস্তানী ভাষার প্রবর্তনও তাঁর অবদান।

ওস্তাদ আমীর খাঁ খুসরুকেই খেয়ালের জনক বলে জানতেন। সুফীরা ছিলেন সে-যুগের এলিট্ পিপল্। উপনিষদের ঋষিদের উত্তরসূরী এই সুফীদের পাজ্ঞদর্শনের আওতায় দর্শন-বিজ্ঞান-কাব্য-সংগীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সিদ্ধির মহামূল্য ফসলে মানুষের সভ্যতা সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছিল। পরিণামে গ্যালিলিও থেকে রবীন্দ্রনাথ সবার ভাগ্যে যা জুটেছিল, কারাবাস, লাঞ্ছনা, ওষ্ঠকুঞ্চন, কুৎসা, একঘরে হওয়া....সবই তাঁদের অনেকেরই ভাগ্যেও জুটে-ছিল। সুফীসমাজের বিজ্ঞানস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ তাঁদের অধ্যাত্মমনীষাকেও ধর্মব্যবসায়ীদের গোঁড়ামির কুড়ুলের ঘা সহ্য করতে হয়েছিল। এই সময় বহু বিদগ্ধ সুফী ভারতের মাটিতে তাঁদের চিন্তার ফসলের বীজ বুনেছিলেন। ভারতীয় সন্তসমাজের এক বিরাট অংশের সঙ্গে আত্মিক সাযুজ্যের বাঁধনে তাঁরা বাঁধা পড়েছিলেন। সুফী নিজামুদ্দিনের সাধক শিষ্য আমীর খুসরু ঈশ্বরানুরাগীদের জন্যে রাগসংযোজিত যেসব ভক্তিমূলক গাথা রচনা করেন, নক্সা, কৌল, গুল, কলবানা, নাত, কাওয়ালী, খ্যাল তরানা

ক'টি গুচ্ছে সেগুলিকে ভাগ করা হয়েছিল। তার
ধ্যাল' বা 'খেয়াল' আর 'তরানা' এই দু' ধরনের গানই
লে ধর্মাচরণের নির্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়িয়ে রাজদরবারে,
রবারের চত্বর ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের কৃষ্টিচর্চার
দতে গড়িয়ে আসে। অন্যসব গান সন্তসমাজেই সীমা-
থকে যায়।

দর দর্শন :

ট্য ও ধর্মচ্যুতি

ফারসী শব্দ খেয়ালের মানে হল 'তন্ময়তা' অর্থাৎ
চন্তন, ভগবৎ আরাধনা। সূক্ষ্ম শ্রুতি ও স্বরালাপের
অভিষেক দিয়ে রাগরাগিনীর বিশুদ্ধ ভাবকে বজায়
সংগীত পরিবেশন করতে হবে। তার বাচিক অবলম্বন
দ যে কবিতাকে শিল্পী বেছে নেবেন, তার বাণীকেও
। রাগের ভাবানুগ হতে হবে। আলংকারিক উপাচারের
। শিল্পীর স্বাধীনতা থাকবে নিশ্চয়ই, কিন্তু থাকবে না
তিষ্ঠার চাপল্য, রাগের থিম্ বা ভাববিরোধী কোন
লাসের বিন্দুমাত্র অবকাশ। শিল্পীকে হতে হবে
থ, ধ্যানসমাহিত যোগীর মতন। তিনি হবেন সত্ব-
ভাঁড়ারী। স্বরের ক্রমবিস্তারে যেমন থাকবে তাঁর
প্রত্যয়পটুত্ব, তেমনি থাকবে বার্ণাঢ্য লীলাচাঞ্চল্যের
অবাধ গতিময়তার অধিকার, অগাধ সোহাগের দখল।
খেয়ালে পূর্ণতা আসবে, সার্থকতা আসবে।

ধারাবাহিক বিচার করলে দেখা যায়, খেয়াল গানের
স এইসব শাস্ত্রীয় শর্ত প্রায়ই লংঘিত হয়েছে। মুঘল
দর দাপটে দরবারের গায়ক-রচয়িতারা ভগবানকে ভুলে
বাদশা কিংবা ধনী ওমরাহদের কীর্তন করেছেন। ফলে
গানের ধর্মচ্যুতি ঘটেছে। একবার পা পেছলালে
াপে নেবে যেতেই হয়। তাই কালে বহু গায়কের
এমন নিকৃষ্ট রচনা শোনা গেছে, যাতে রুচিবান
। কানে হাত চাপা দিতে বাধ্য হন।
খেয়াল গানের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু
য়া কোমরে গামছা বেঁধে খেপলা জাল হাতে নেবে
বাজার গরম করতে। কেউ ঝোঁক দিলেন 'গলা
ওপর। অর্থাৎ কত প্রচণ্ড স্পীডে গলা ঘোরান যায়,
কসরৎ দেখাতে লেগে গেলেন। তাতে রাগের রূপ
না থাকে 'সোভি আচ্ছা।' শাস্ত্র মাঠে মারা গেল।
।। হাততালি তো রইল।

আবার কেউ গলার রেন্‌জ দেখাবেন। কত দূর-
গলা চলে তাঁর। তার-অতিতার করে সবসপ্তক
হারমোনিয়ামকে হার মানিয়ে সারেঙ্গীর ঘাম ঝরিয়ে
।। [একবার একজন বিশেষ নামকরা সম্মেলন-
তা কলেজ প্রতিষ্ঠাতা সংগীত-পৃষ্ঠপোষক ভদ্রলোক,
নজের আসরে নিজের গান শোনাতে গিয়ে এমন কাণ্ড-
। করেছিলেন, ভীমের কীচকবধ পর্ব তার চেয়ে কম
।। মন্দ্রে অতিমন্দ্রে গলা নাবানো দেখাতে দেখাতে
লা যখন আর নাবল না, তখন আঙুলের ইসারায় ঘাট
দেখাতে কল্পনায় শ্রোতাদের অতলে নাবিয়ে
ন। সার্থক সারেঙ্গী সংগত। স্বনামধন্য সারেঙ্গীয়াও
ড়তাঁত ছেড়ে দিয়ে আঙুলের ইসারায় শ্রোতাদের
দিলেন—তিনিও ঐ কাল্পনিক অবরোহণ পর্বে
অনুগমন করেছেন—(ফেথ্‌ফুলি এনাফ্)।]

'দরবারী কানাড়ার' মতন গম্ভীর মেজাজের পূর্বাঙ্গ
ইতে গিয়েও একজন হয়ত গলাকে তারসপ্তকে হরদম
যাচ্ছেন। কত উঁচু তারে চড়তে পারেন সেই
টিকস্ দেখাতে গিয়ে হয়ত ফল্‌স নোট লাগাতে
তবুও। আর একজন আবার তালের মারপ্যাঁচ
ন। বেহাগ রাগের গানে এমন জবরদস্ত তেহাই
। যে, সেই রুদ্রপীড়নে বেহাগ 'বাপ বাপ' বলে
নিল। কিংবা কেউ রাগের ব্যাকরণগত শুদ্ধতার
ায় পঞ্চমুখ, কিন্তু সেই জিনিসের ডেমনস্ট্রেশনের
সেই তৎপরতার কোন চিহ্নই রাখলেন না। এইসব

ব্যত্যয়ী চলনের দরুণ শাস্ত্রীয়সংগীতের প্রকৃত মান অবনত হয়ে পড়েছে। তার প্রসার ঘটেইনি বরং অপপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে বেশি। এমন জিনিস পাতে পড়লে ভদ্রলোক পাত ছেড়ে আসর ছেড়ে চম্পট দেবেন, ফিরেও তাকাবেন না—এটাই স্বাভাবিক। কাজেই প্রকৃত খেয়ালের একদিন নাভিশ্বাস উঠল।

আমীর খাঁ এই ধর্মচ্যুতির প্রতিবাদে ঋজু হয়ে দাঁড়ালেন। সনাতন শাস্ত্রীয় রীতির উজ্জীবন ঘটিয়ে তিনি মুমূর্ষু খেয়াল গানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন।

রেজারেকশন :

বাণী :

খেয়ালের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যজ্ঞে আরো দুজন মহান সুরসারথির কথা এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করলে অপরাধ হবে। তাঁরা হলেন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ আর ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ। তাঁদের অবদান অমূল্য। তবে খেয়ালের সবরকম শৈল্পিক শর্ত ষোলআনা পূরণ করে পুজোর কলস রসসম্ভারে ভরিয়ে তোলার জন্যে নিজেকে সবদিক দিয়ে তৈরী করা—আমীর খাঁর আগে কেউ করেন নি। প্রথমেই ধরুন লিরিক্যাল কমপোজিশনের কথা। রাগের যে ভাব ঠিক তার উপযোগী বাণী ছাড়া তাঁর চলবে না। যদি দেখেন সাবেকী গানের 'বোল্' রাগের মেজাজের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, বিনা দ্বিধায় সে বাণী নাকচ করে দেবেন, তা সে সতই পুরনো হোক। এ ব্যাপারে কোন গোঁড়ামির প্রশ্রয় কখনো দেন নি। সে জন্যে দরকার পড়লে নিজে গান রচনা করে নিয়েছেন। সে রচনার বাণী কাব্যসম্পদে অনুপম। বিলাসখানী তোড়ির বিলম্বিত, লয়ের প্রচলিত গান : 'বাজে নিকে ঘুংঘরোয়া' তিনি দ্রুতলয়ে গান। তার বদলে বিলম্বিতে তাঁর রচনা করা বন্দেশ : 'এ বৈরাগী' বিলাসখানীর বিধুর বৈরাগ্যের মর্ম-ধ্বনির সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় সুসমঞ্জস। এইরকম বহু স্বরচিত খেয়ালের বোল তিনি জীবনভর গেয়েছেন। তাঁর সাগরেদরা আজ তাই-ই গান।

রাগরূপ :

রাগের বিস্তারে ভাব বা থীম্ ছাড়াও তার কাঠামো ও প্রকৃতিগত চলনের দিকে তাঁর সজাগ লক্ষ্য থাকত। রাগটি পূর্বাঙ্গ না উত্তরাঙ্গ, তার বাদীসম্বাদী তার শ্রুতির সূক্ষ্ম-বোধ সব বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি এগোতেন। অথচ কখনো চালে আড়ষ্টতা থাকত না।

ভাব-রস-শ্রুতি :

দরবারী বা পুরিয়া রাগের শান্ত করুণ গাম্ভীর্যের অবয়ব রচনায় তিনি কখনো তারসপ্তকে বেশি বিস্তার করতেন না, কিংবা অতিরিক্ত তানসজ্জাবট কি সরগমের দ্রুতক্ষেপণের ধার দিয়ে যেতেন না, কারণ তাতে রসের ব্যাঘাত ঘটে। দরবারীর কোমল গান্ধার, ধৈভব ও নিষাদের কোমলত্বের পরিমাণ, কি পুরিয়ার কোমল ঋষভের ওজন এসব সম্পর্কে তাঁর অবিশ্বাস্য সংযম, স্বরশ্রুতির ব্যাপারে তাঁর খরশাণিত প্রেমনৈপুণ্যের অভিজ্ঞতার নমুনা লিখে জানানর জিনিস নয়। অতলস্পর্শী বৈরাগ্য তো বিরাগসম্ভূত উদাসীনতা নয়, সেটা বিরাজমানতার তন্দ্রাহীন সাধনা। ইন্দ্রিয়োত্তর অনুভূতির লেন্স দিয়ে তার ফটোগ্রাফ নেওয়া যায় হয়ত, কিন্তু সেই স্লাইড প্রজেক্‌শনের নিরভিমান যন্ত্র কই আমার? বর্ণোত্তর নিষ্কলংক স্ক্রীন কোথায় পাব?

গমক-মীড়-আশ্

খেয়াল গানের 'গমক' একটা বড় জিনিস। গমক সম্পর্কে তার শ্রুতি-সচেতনতা তীব্র ছিল। কোন শ্রুতিতে কতটুকু গমক পারমিট করবে তার সূক্ষ্মতম পরিমিতিবোধ। বেশি জোরাল গমক হলে শ্রুতির মুড নষ্ট হবে, যতটুকু 'কণ্' নেওয়া দরকার ঠিক ততটুকু, তার একতিল বেশি নয়।

মীড় কিংবা আশ্ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেই একই শ্রুতি-জ্ঞানের চুলচেরা হিসেব তাঁর। অথচ সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে শতকরা একশ ভাগ মিউজিক থাকছে। ঐ রকম জটিল গাণি দুরূহতা রসপ্রাবে বিন্দুমাত্র হানি ঘটাচ্ছে না। পরস্পর বিবাদী স্বরের এমন মাধুর্যমণ্ডিত সহাবস্থান আর কোথাও পেলুম না।

বিস্তার তান সরগম :

গলা তৈরীর সময় যেসব পাল্টা সাধানো হয়, গতানুগতিক পন্থায় পরে সেইগুলোই আবার তান বা সরগম রূপে দেখা দেয়। যেমন ধরুন, সারেগামা, রেগামামা, গামাপাপা... ইত্যাদি. গাইবার সময় এইগুলোই আবার 'আ-আ' করে তান করা হল, কিংবা সরগম গুলো সুর বুলিয়ে উচ্চারণ করে যাওয়া হল। আমীর খাঁ বলবেন : তাহলে ওগুলোর পাল্টা, তান, স্বরগম—এরকম আলাদা নাম হবে কেন? তফাতই যদি না থাকে?—তাঁর মতে এক্ষেত্রে—সারেগাগা, মাধামাপা, গামাসানি, ধাধাপামা, রেগামামা, গাগারেসা—এইরকম ধরণে হওয়া চাই, যাতে খেয়ালের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। মুখস্ত বলে গেলে আর খেয়াল রইল কোথায়?

লয় :

আমীর খাঁর গানে মুগ্ধ শ্রোতার সংখ্যা কত আমি জানি না। কিন্তু তাঁর গানের সমালোচকদের মোলাকাত পেয়েছি মাঝে মাঝে। একবার একজন বললেন, অ-ত বেশি বিলম্বিত শোনা যায় না বাপু। মেজাজ দমে যায়। আহা কী অদম্য শ্রোতা! আর একজন বলেন : খাঁসাহেবের গানে বিস্তার পোরশন কানে ভাল লাগে বটে, কিন্তু লয়কারীর মজা পাওয়া যায় না। কিন্তু কেন বলতে পারেন? তবলার খালি ঠেকা বাজে, তাই? মজা বলতে এঁরা কী বোঝেন কে জানে, তবে তাঁর লয়ের হিসেব এত নিখুঁত ছিল, যে নিপুণ লয়দার তবলচি ছাড়া অন্যের পক্ষে সেটা বোঝা খুব শক্ত। তবলচিরা কেন শুধু ঠেকা দিয়ে যেতেন সেটা তাঁরাই বলতে পারেন। তবে কেরামত খাঁ শ্যামল বসু এঁদের দেখেছি অত্যন্ত সাবলীল সামর্থ্যে সঙ্গত করে গেছেন। গানে অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ও অভিনন্দন জানিয়েছেন [illegible] একবার একটা প্রোগ্রামে মালকোষ গাইছিলেন খ[illegible] এক জায়গায় একটা তেহাই দিলেন। সেই তেহাইয়ে অনন্য খেয়ালী স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর—সচরাচর সবাই 'মাধানিসা' এই সরগমটাই তিনবার রিপিট করে তেহ[াই] খাঁসাহেব সেখানে 'মাধানিসা, গামানিধা, গামাগামা[...]' ঘুরে এলেন সমে। আন্তরিক তারিফে খাঁকে [...] মাননীয় তবলচি। হল্ আহা-কারে গুঞ্জিত হয়ে উ[...]

তারানা :

মধ্য যুগে তারানা গাওয়া হত অর্থহীন ধ[...] গান হিসেবে। তার অন্তরায় তবলা পাখোয়াজের[া] 'তিরকিট্-ধিরকিট্' ঢুকিয়ে দেওয়া হত। অনেক [...] তারানার ডেফিনিশনে লেখাও হয়েছে তাই : '[...] দুর্বোধ্যতার দরুণ অনেক ওস্তাদ তোম্, তানা, [...] ইত্যাদি অর্থহীন বোল দিয়ে এই গান রচনা কর[...] প্রচলিত গানের বদলে। এই ধারণাই চলে আসছিল। [...] দিনের এই ভ্রান্ত ধারণার লোপ করলেন আমীর [...] বহু অন্বেষণে তারানার উৎস খুঁজে বার করলেন [...] তাঁর এই আবিষ্কার : আমীর খুসরু রচিত অধ্যাত্মরসের কবিতা, যার নাম সবাঈ। সবাঈটি তুলে দিলুম :

আঁরেজকে রুহে পাককে আদম বরদান
হরচন্দ দরাঁনমী মুদন্ত সরন্দন।
খানন্দ পলায়েকা বলহনে দায়ুদ
দস্ দস্ দরতন দরাদ দরতন্ দরতন্॥

মর্মার্থ : মানুষের কায়া সৃষ্টির পর পর[মাত্মা] আত্মাকে নির্দেশ দিলেন ঐ কায়ায় স্থিত হবে তাতে সঞ্চার করতে। আত্মা কিন্তু ঐ কায়ার খোলসে বন্দী [হতে] অনিচ্ছুক। তখন হজরত দায়ুদ আর একটি ভক্[তিমূলক] (সবাঈ) শোনালেন। সবাঈ-মুগ্ধ জীবাত্মা এবার [...] হয়ে শরীরের গুহায় পা রাখলেন।

ব্রজেন মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যা সেন

দু-তিন বছর আগে সদারং সংগীত সম্মেলনের অনুষ্ঠানে এক তরুণ শিল্পীর নাম ঘোষণা করা হল—প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন কথক নৃত্যশিল্পী হিসাবে। ব্রজেন মুখোপাধ্যায়। দিল্লী ফেরৎ কিন্তু বাঙালী শিল্পী ঔৎসুক্য সেই কারণেই।

দেখলাম ওঁর কথক নাচ। তারপর কনফারেন্স মিউজিক সার্কেলে আরো নানা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ব্রজেন মুখোপাধ্যায়ের মেহনত ততখানি দীর্ঘস্থায়ী আবেদন সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ব্রজেন মুখোপাধ্যায়ের নাচে বিরজুপ্রতিম মধুরতা ছাড়াও অতিরিক্ত যে বস্তুটি পেলাম সেটি হল তার নৃত্য চিন্তার মৌলিকতা এবং সেই কারণেই ক্রম-বিকাশের নিঃসংশয় স্বাক্ষর।

শিক্ষা পারিবারিক শিল্প চর্চা উপরন্তু গুরুর তালিম এতগুলি বস্তুর পটভূমিকা ছিল বলেই ওর নাচে স্বপ্নের সংগে বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার এমন মিলন সম্ভব হয়েছে।

সম্মেলনে ভারতখ্যাত শিল্পীদের নাচ এবং বিশেষ করে শম্ভু মহারাজ ও বিরজু মহারাজের কত্থক দেখে ব্রজেনের চিত্তে লাগতো স্বপ্নের ঘোর। শম্ভু মহারাজ আর বিরজু মহারাজের ছবি পড়ার ঘরে রেখে সেই ছবির সামনেই চলতো একলব্যের মত তার নীরব সাধনা।

আশুতোষ কলেজে বি-এ পড়ার সময় যোগাযোগ হয় উদয়শংকরের সঙ্গে। তিনি উৎসাহ দিলেন। সে সময়ে বিরজু মহারাজ একবার রবীন্দ্রসদনে এসেছিলেন একটি নৃত্যানুষ্ঠানে। অনেক কষ্টে টাকা যোগাড় করে দেখতে গেলাম। ওঁর এক-একটা ভাও টুকরা দেখে আমার গায়ের লোম যেন খাড়া হয়ে উঠল। নাচের পর দূরে থেকে ওঁকে দেখে মনে মনে প্রণাম করেছি।—ব্রজেন বলে আবেগভরে।

বি-এ পাশ করার পর দিল্লী গেলাম যোগসুন্দরের সঙ্গে। প্রথম তালিম সুরু হল সুন্দরপ্রসাদজীর কাছে। একদিন ভারতীয় কলাকেন্দ্রে শম্ভু মহারাজের সংগে দেখা। আমার নাচ দেখে উনি খুসী হলেন। শেখাতেও চেয়েছিলেন।

কিন্তু বিধাতা এবার অনুগ্রহ করলেন না। এই ঘটনার অল্পদিন বাদেই উনি অসুস্থ হয়ে একেবারে সকল দেওয়া-[নেওয়ার] বাইরে চলে গেলেন।

তখন আমার একমাত্র চিন্তা হল [...] করে বিরজু মহারাজজীর কাছে [...] যায়। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর অনুগ্রহে [...] আমার নাচ দেখে শেখাতে রাজী [...] কিন্তু থাকব কোথায়? আমার এব[...] ব্যাংকে একটা কাজ যোগাড় করে দিল। চাকরির পরিবেশ আমার একটুও ভাল [লাগল] না।

মহারাজকে বললাম। হাসতে লা[গলেন।] শেষ অবধি তিনিই দেড়শ টাকার [...] স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিলেন। মন ঢেলে তালিম দিতেন। আমিও [...] খুশী করবার জন্য সিনীয়র স্টুডে[ন্টদের] কাছে আরও অনেক নাচ তুলে ওঁকে [দেখা]তাম। আমার চেষ্টায় খুশী হলেন। [পুর]স্কারস্বরূপ ওঁর কৃষ্ণায়ণ অনুষ্ঠানে সংগে আমায় নাচবার সুযোগ দি[লেন।] কুমারসম্ভবেও আমায় নিলেন।

ছুটিটা ওঁর বাড়ীতেই রেখেছি[লেন।] সেই দু মাসে যেন দুশো বছরের [...] দিয়ে দিলেন। এরপর ওঁরই সংগে রা[শিয়ায়] কালচারাল ডেলিগেট হয়ে গিয়ে খুব [...] পেলাম। ওখান থেকে ফিরে আসার পর [মহা]রাজের সকল অনুষ্ঠানেই আমি হয়ে উ[ঠলাম] অপরিহার্য।

নৃত্যগুরু প্রহ্লাদ দাস

ব্রজেন মুখোপাধ্যায়

কলকাতার নৃত্য শিক্ষকদের মধ্যে প্রহ্লাদ দাসের অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এখনকার কলকাতায় যে তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী নৃত্যনাট্যের নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত—তাঁদের অনেকের শিক্ষা এ'রই নৃত্যভারতী প্রতিষ্ঠানে। নাচ ছোট-বেলা থেকেই জীবনের শ্রেয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বহুধাবিস্তৃত নৃত্যশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও মঞ্চে নৃত্যশিল্পী হবার চেয়ে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে নৃত্যশিল্পী গড়বার দিকেই ছিল এ'র সহজাত প্রবণতা। বরিশালের ছেলে। একটি ডান্স-ড্রামা দলে ভিড়ে চিটাগং থেকে শুরু করে রেংগুন অবধি সফর করেছিলেন বেশ অল্প বয়সেই। রেংগুনে নর্তক মিঞা তানচির নাচ দেখে নাচের প্রেরণা দুর্বার হয়ে ওঠে।

প্রতি শনিবারে ওরা মিউনিকাপাল গার্ডেনে বা একটা নৃত্যানুষ্ঠান করত। সেই অনুষ্ঠানের গোড়ায় এর ওর নাচ দেখে তৈরী করা আমার নিজস্ব নাচ কিছু দেখাতাম।

সে নাচ দেখে তানচি তারিফ করতে না করতেই আমি ও'র কাছে নাচ শেখবার আবদেন পেশ করলাম। সাগ্রহে রাজী হলেন। ও'র কাছে জাভা বালি বার্মিজ নাচ শেখার ফলে নানারকম স্টেপিং আয়ত্তে এল। আর এইসব নাচের সংগে মণিপুরী নৃত্যের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে মনটাও খুশী হয়ে উঠলো। ছ' মাস এভাবে শিক্ষার পর নাচে আলাদা একটা ফর্ম এল। ফিরে এলাম কলকাতায়। আমার এক বন্ধু ক্যালকাটা অর্কেস্ট্রা পার্টিতে

প্রহ্লাদ দাস

চেল্লো বাজাতো। সে আমায় নিয়ে গেল নীরদবাবুর কাছে। তিনি ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য জানলেও কোন বিশেষ ধারায় নাচতেন না। ওরিয়েন্টাল ডান্স বলে একরকম পাঁচ-মিশেলী নৃত্যের চল ছিল। একবছর ধরে ও'র কাছে সেই নাচই শিখলাম। এইসময় উনি গুরু সীতারাম দাসের কাছে কথক শিখছিলেন। ও'র রেওয়াজ দেখে কথক নাচ শেখবার জন্য পাগল হয়ে উঠলাম।

চন্দ্রমা মিশ্রর কাছে কথক শেখা শুরু করলাম। তিনি মূলতঃ তবলচি মহারাজদের কাছ থেকে বোল ও আংগিক সংগ্রহ করায় লয় ও তালফেরতার রকমারী ছন্দ খুব ভাল জানা ছিল। এই সময় ক্যালকাটা থিয়েটারে নাটকের সংগে নাচও থাকত। শিবতাণ্ডব বলে একটা নাচ খুব পপুলার হয়েছিল। ভূমেন রায় শিব সাজতেন আর তাঁর সংগে নাচে যোগ দিতাম আমি, আংগুরী, সন্ধ্যারানী, শীনা দেবী, সরলা। নীহারবালাও আমাদের শেখাতেন।

এক বছর এইভাবে শেখার পর আচ্ছন মহারাজের কাছে শেখবার সুযোগ পেলাম। উনি এই সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন লীলা দেশাইকে নাচ শেখাতে। প্রথমে ছোট্ট ছোট্ট বোল মুখে বলে বুঝিয়ে দিতেন—তারপর দেখাতেন হাতের কাজ ও পায়ের ছন্দের সংগে মিলিয়ে কেমন করে তাকে সুষ্ঠুরূপে পৌঁছে দিতে হয়। সম্ভবতঃ একবছর শেখাবার পর চলে যাবার আগে আমায় রামনারায়ণ মিশ্রের হাতে দিয়ে গেলেন। রামনারায়ণ মিশ্র জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি আমার গুরু ছিলেন।

মাদ্রাজে গিয়ে গুরু রামচন্দ্র পিল্লাই-এর কাছে ভারতনাট্যম শিখেছিলেন নয় মাস।

বালা সরস্বতীর কাছে নবরস এবং আরও কিছু অভিনয়াংশ শিখেছি। বালা দুরকমের নবরস শিখিয়েছিলেন— একটা শ্রীরামচন্দ্রের অপরটা অর্ধনারীশ্বরের। বালার অভিনয়াংশ দারুণ একটা স্পিরি-চুয়ালিটি ছিল।

নমাস শিখে চলে এলাম। পরের বছর পন্তুনুরের কোর্স কমপ্লিট করতে গিয়ে শুনি আমার আগের গুরুজী গত। তখন নাট্যকলামণ্ডলমের বিদ্বান গণেশম পিল্লাই-এর কাছে নাচ শেখা শেষ করি।

এরপর কলকাতায় এসে বাণী বিদ্যা-বীথি আরো নানান প্রতিষ্ঠানে নাচের শিক্ষকতা শুরু করলাম। শেখাবার ভার নিলেও আমার শিক্ষা থেমে থাকেনি। গুরু গোপাল পিল্লাই-এর কাছে পাঁচ বছর কথাকলি শিখেছি। মাদ্রাজে যখনই গেছি শিখেছি গুরু কৃষ্ণ নায়ারের কাছে (রুক্মিনী অরুণ্ডেলের ঘরাণা) উনি তখন উদয়-শংকরের কল্পনা সহযোগিতা করছিলেন।

হঠাৎ এল নিজের প্রতিষ্ঠান নৃত্য-ভারতী প্রতিষ্ঠার সুযোগ। ১৯৪৮ সালে কৃষ্ণ নায়ার এখানে শিখিয়েছেন। এইসময়ে এখানে গুরুসমন্বয় নৃত্যের এক ইতিহাস-নিহিত ঘটনা। এখানে ছিল মণিপুরী গুরু [illegible] সিং রাজবাসী। এঁদের কাছে সেই সময় ভাল করে মণিপুরী নাচ শেখবার

...য় মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও ...ভাগ্য পেয়েছি।

...অনুষ্ঠান হয়েছিল সাপ্রু হাউসে। ...ী আমাদের মানে চারজন তরুণ ...মঞ্চে আনলেন। তারপর সংগীত ...াডেমীতে ইয়ং ডান্সার্স ফেস্টি-...তেও খুব নাম হয়েছিল। সর্বভার-...তে খ্যাতিলাভের সূচনা হল এই ... আমার একক অনুষ্ঠানে খুশী ...রাজজী আমায় এক টাকা আশী-...র্বাদ দিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীর পক্ষে সেটা ...ত বড় গৌরব। তারপর অনুষ্ঠান ...রাসারে, মিনিস্ট্রী অফ এডুকেশনের ...প্রেসিডেন্টের বাড়ী বিশেষ অনু-...ুরো, বৃন্দাবন, চণ্ডীগড়, জয়পুর, ...গ্যাংটক, লক্ষ্ণৌ। স্বপ্ন সার্থক ...কলকাতায় তানসেন সংগীত সম্মে-...৯৭৩ সাল) ও সদারং সংগীত ...(১৯৭৪) নেচে আপনাদের তারিফ ...বাইরের মধ্যে প্রোগ্রাম করেছি ...মস্কো, চেকোশ্লাভা, ওলগাগ্রাদ। গত ...রেন্দ্রশংকরের সাংস্কৃতিকীর উৎসবে ...করতে লণ্ডন গেছি।

সুযোগ পেয়েছি) কথকে রামনারায়ণ মিশ্র ভরতনাট্যমে মায়ুয়াপ্পা পিল্লাই। গুরু গুণাইয়া (কোন্ডী)—যখন মহাবোধি সোসাইটিতে বুদ্ধের অস্থি নিয়ে এলেন (স্বামিজী জিমরত্নের সময়) তখন তাঁকে ধরে নিয়ে এলাম নৃত্যভারতীতে। এরই মধ্যে (১৯৪৬ সালে) আমার সিলোনীজ ছাত্র তার পার্টির ম্যানেজার করে আমায় সিংগাপুর নিয়ে গেলো। সেখানে জাভানীজ শিল্পী ওয়ানের কাছে জাভানীজ ও বালি-নৃত্য শিখতাম—সে-ও আমার কাছে শিখতো ভারতীয় নৃত্য।

নাচ যখন জানতাম না তখন স্টেজে নেচেছি। নাচ শেখার পর ছায়াছবিতে নৃত্য পরিচালনার সুযোগ এল। প্রথম ছবি বিটলদাস পাঞ্চাভিয়ার 'খোসনসিফ'। তারপর আরো বার চোদ্দটি ছবিতে কাজ করেছি। এসব এবিতে অসুবিধা একটু হয়েছে নানা কারণে। শেষ ছবি চিত্রাঙ্গদায় পংকজবাবুর সংগে কাজ করে খুব আনন্দ পেয়েছি। উনি নাচটা কি বুঝতে চেয়েছেন।

যতক্ষণ না বুঝতে পেরেছেন নানারকম মিউজিক দিয়ে মর্মসূত্রটি ধরবার চেষ্টা করেছেন। কবি, বৈকুন্ঠের উইল মহাকাল—এইসব ছবিতে বেশীর ভাগ কথক ও ভারত-নাট্যম প্রয়োগ করেছি। আঙ্গিক ও অভিনয় দুটিতেই সমান জোর দিয়ে প্রচন্ড সাফল্য পেয়েছি বর্ষামংগলে।

১৯৫৩ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী পরে রবীন্দ্রভারতী প্রয়াগ সংগীত সম্মেলনে এবং বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষকমন্ডলীর সংগে প্রহ্লাদ দাস যুক্ত আছেন। এখন নৃত্যভারতীর অধ্যক্ষ বিড়লা একাডেমী ও গুজরাটী কলামন্দিরের নৃত্যবিভাগের প্রধান।

বিলায়েত খাঁ

যুগলবন্দী ঃ আলী আকবর ও বিলায়েত

আলি আকবর খাঁ

আলি আকবর ও বিলায়েত খাঁ সাহেবের যুগলবন্দী অনুষ্ঠানটি নেতাজী স্টেডিয়ামে পরিবেশন করেছেন আলাউদ্দিন মিউজিক সার্কেল।

নেতাজী স্টেডিয়াম সংগীত পরিবেশনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়। দশ হাজার শ্রোতার এক সামান্য ভগ্নাংশমাত্র বাজাবার অথবা গাইবার সময় শিল্পীদের মুখ দেখতে পান। তাছাড়া শিল্পীদের কাছ থেকে দূরত্বও উভয়ের ভাববিনিময়ের অন্তরায় হয়ে ওঠায় এ ধরনের আসরের সেই আনন্দময় পরিবেশ গড়ে উঠতে পারেনি। তবু ভিড় হয়েছিল শিল্পী-সমন্বয়ের অভিনবত্বের কারণে।

প্রথম রাগ ইমন। আলি আকবর ও বিলায়েত খাঁ সাহেব যন্ত্রসংগীতে দুটি বিভিন্ন ঘরানার শীর্ষস্থানীয় শিল্পী। দুজনের সংগীত ঐতিহ্য ধ্যানধারণা প্রকাশভঙ্গি এবং সংগীতভাবনার তফাৎও অনেক। তবু এ'দের বাজনা অনেক উপভোগ্য মুহূর্তের সৃষ্টি করেছিল উভয়ের দিক থেকে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা দিয়ে আনন্দ সৃষ্টির তাগিদ ছিল বলে।

আলি আকবর স্বল্প পরিসরের সীমায় সীমাহীনের ব্যঞ্জনাকে মূর্ত করে তুললেন। ধ্রুপদী মেজাজ খান্ডার বানী বাজ ছুট তান ও বোলতানের ভাবগাম্ভীর্য ও বিশালতা গাধিক শিল্পকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

বিলায়েতের সাপট তান, বি-সপ্তকে অনায়াস বিহার মীড়ের গুঞ্জন সব মিলি একটা চিত্তগ্রাহী রংবাহার সৃষ্টি করেছিল আর এই দুয়ের সমন্বয়ই হল আলি আক ও বিলায়েত খাঁর যুগলবন্দী।

তবলায় বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের এব অংগে বাজিয়েছেন মহাপুরুষ মিশ্র আ আকবর খাঁ সাহেবের সংগে স্বপন চৌধুরী দুজনের মিলিত তান এবং ঝালার স উভয়ের ঠেকায় সুর ও ছন্দের প্রবলধ্বনি সারা পরিবেশকে আকাঙ্ক্ষিত আবেগ উত্তেজনায় নৃত্যময় করে তোলে। মিশ্র কামদে রাগমালা বাজিয়ে এঁরা অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

পরের শিল্পী গিরিজা দেবী। ইনি বসন্ত রাগে খেয়াল ধরলেন। রাগ তান-সবই নিখুঁত। কিন্তু শিল্পীকে তাঁ যথার্থ মেজাজে পাওয়া গেল ঠুংরীতে এঁর ঠুংরী শুনে মনে হোল ইনি খেয়া গেয়েছিলেন গলাটা গরম করে নেবার জন্য কারণ ও'র খেয়ালটা ছিল পরের গানে দিকে। কেরামত খাঁ ও সগীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের তবলা ও সারেঙ্গী মেজাজী আব হাওয়া সৃষ্টি করেছিল। এ আসরের শেষ শিল্পী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে শোনা গেল কোমল আশাবরী। কোমল রেখাব এ রাগে সোজাসুজি লাগে না। আসে শ্রুতির পথ বেয়ে। তুলনামূলক বিচারে কন্ঠসংগীতে এ রাগ গাওয়া সহজ, যন্ত্র সংগীতে কঠিন। কিন্তু এই কঠিন কাজও অনায়াসদক্ষতায় সম্পন্ন করে শিল্পী তাঁর ঘরানার ঐতিহ্য ও শিল্পকৃতির দুরেরই উজ্জ্বল নজীর রাখলেন। তবলাসংগতে ছিলেন শংকর ঘোষ।

সত্যজিৎ রায় এবং বিজয়া রায়

দিল্লী উৎসবের উপযুক্ত নয়ঃ সত্যজিৎ রায়

নির্মল ধর

উৎসব শেষ। ষোলই জানুয়ারী
য় সুসজ্জিত বিজ্ঞান ভবনে শতাধিক
ী অতিথির উপস্থিতিতে চোদ্দ
র বুকে ধড়ফড়ানি শেষ হোল। ঘড়ির
র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেদিনের অনু-
এক সেকেণ্ডও দেরী করতে পারে নি।
মহারাজের নাচ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও
মন্ত্রী ভি - সি - শুক্লার মুহূর্ত-মাপা
রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি
দের আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন বাণী,
বোর্ডের সভাপতি সত্যজিৎ রায়ের
কার ঘোষণা মায় মিলোস ফোরম্যানের
বিতর্কিত আলোচিত ছবি 'ওয়ান ফ্লু
দি কাকুস নেস্ট'-এর প্রদর্শনীও
কাঁটাকে অবহেলা করতে পারে নি।

সাংবাদিক আসনের অনেকেই পূর্বাহ্নে
কোন্ ছবি কি কি পুরস্কার পেতে
তার একটি তালিকা নিয়ে বসে-
। পুরস্কার ঘোষিত হবার পর দেখা
তাঁদের কারও স্পেকুলেশনই ধোপে
নি। সবই ওলোট-পালট হয়ে গেছে।
ছবির সম্ভাব্য নাম রুমানিয়ার 'ডেথ
পে'র জায়গায় স্থান পেয়েছে জাপানের
'মোন এন্ড ইনো'। 'বিটোফেন ডেজ অফ
লাইফ' ছবির মুখ্যাভিনেতাকে সরিয়ে
দিয়েছেন ম্যান অন দি রুফ ছবির সুইডিশ
শিল্পী কার্ল গুস্তফ লিণ্ডস্টাড।

সত্যজিৎ রায়কে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায়
তিনি জবাব দিয়েছেন—'জাপানের ছবিটা

তোমরা কিভাবে দেখেছো জানি না, আমরা
জুরীরা কিন্তু এই ছবি দেখে অবাক হয়ে
গিয়েছিলাম। সকলেরই খুব ভালো
লেগেছে, এবং একবাক্যে আমরা রায়
দিয়েছি। কোনো দ্বিমতই হয় নি।'

আর অভিনেতা প্রসঙ্গ?

সত্যজিৎ রায়ের উত্তর—'বিটোফেন
চরিত্রের শিল্পীর অভিনয় আমাদের কারোই
তেমন ভালো লাগে নি। চেহারার সাদৃশ্য
আছে খুব। বোধহয় পরিচালক ওঁকে
দেখেই ছবিটা করেছেন। সিলেকশন খুব
সুন্দর, এটা মানতেই হবে কিন্তু ছবিটা
জমলো কই? বার বার খালি গায়ে মেয়ে-
টাকেই জড়ানো, অভিনয়ের তেমন সুযোগই
তো পায় নি।

'এই পুরস্কারে কার্ল গুস্তফের
সঙ্গে আরেকজন দাবীদার অবশ্য ছিলেন।
তিনি হচ্ছেন 'মোন এণ্ড ইনো'র
একটা ছবিকে দুটো অ্যাওয়ার্ড দেওয়া যাবে
না, তাই কার্লকেই দিতে হোল।'

সেরা পরিচালক (রাশিয়ার আলি
আখমারায়েভ) কিংবা অভিনেত্রীর (হাঙ্গেরীর
জানা শ্মিচতোভা) পুরস্কার নিয়ে তেমন
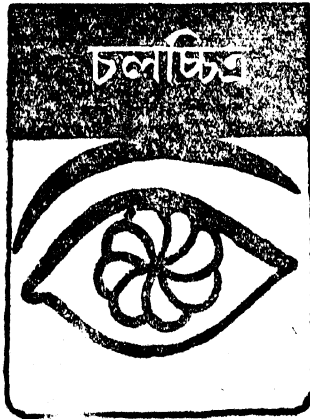
অসন্তোষ নেই। সুখদেবের ছবি 'আফটার **দি সাইলেন্স' শর্ট ফিল্ম বিভাগে সেরা ছবি হিসাবে স্বর্ণময়ূর পেল। নিঃসন্দেহে যোগ্য ছবি।**

পুরস্কার নিয়ে বিতর্ক বা অসন্তোষের **ঘটনা বিচিত্র নয়। হয়ই।** পুরস্কৃত ছবি-**গুলি ছাড়াও** প্রতিযোগিতা বিভাগে গ্রীসের **প্রমিথিউস,** ইতালীর দাস বিগান দি জার্ণি **টু,** ভোরটেকস, হাঙ্গেরীর রিকোয়াম ফর **এ** রেভ্যুলিউশনারি কিংবা কোরিয়ার লাভ ইন দি রেন, বিষয়ের অভিনবত্বে এবং নির্দে-**শনার** কারুশৈলীতে অবশ্যই **মনযোগ আকর্ষণ** করেছিল সকলের। শ্রীপলা ও রামেণিকা (শ্রীলংকা) ছবির মালিনী **ফোনস্কে** এবং ফ্যামিলি অনার (তুরস্ক) **ছবির** এরিক একস্যানের অভিনয়কে পৃথক-ভাবে উল্লেখ করার কারণ পরিষ্কার নয়। **দুজনের** সশরীরী উপস্থিতির জন্য **না দুই তরুণ** শিল্পীকে উৎসাহ দান করাটাই **আসল উদ্দেশ্য।**

নচেৎ প্রশ্ন তোলা যেত ইতালীর **ছবিতে** ইনগ্রিড থুলিনের অভিনয় কি লক্ষণীয়

আর্জেন্টিনার হেকটর অলিভেরা

নয়? সত্যজিৎ রায় তো নিজেই বললেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এদের কারও অভিনয়ই তেমন পছন্দ হয়নি।

সুইস ছবি জে

চোদ্দ দিনের মিলন মেলা ভাঙ্গার শেষ পর্বটি অনুষ্ঠিত হোল অশোক হোটেলে। শ্রী ভি সি শুক্লা নৈশ ভোজে সবাইকে ডেকেছিলেন সেদিন। আন্তোনিওনি - কাজানকে ছেড়ে দেখি সবাই ভিড় করেছে অমিতাভ বচ্চন - শশী কাপুরকে ঘিরে। বার্লিনের দুঁদে উৎসব পরিচালক আলফ্রেড বাউয়ার। অত ভিড়েও একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। হেকটর অলিভেরা সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছেন নিজের স্ত্রীকেই। আশপাশে কেউ নেই।

দরজার গোড়ায় নাগিসা ওশিমা দাঁড়িয়ে। ঋষি কাপুর কাছেই রয়েছেন। নীতু আর রেখার দিকে অটোগ্রাফ শিকারীরা ছুটছেন। ভিলগট শোমান - বো ওয়াইডার-বার্গ সঙ্গীহীন অবস্থায় নিজেদের ছবি নিয়েই আলোচনায় ব্যস্ত। কুরোশোয়া অনুপস্থিত। কবীর আনওয়ার সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কথা বলছেন।

আর একদল নির্বিকারভাবে ডান হাতের কাজটি সারতে ব্যস্ত। আন্তোনিওনিকে একটি চেয়ারের হাতলে অলস ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে বললাম—কি ব্যাপার কুম্ভমেলায় গেলেন, কলকাতায় যাবেন না?

সবিনয় হাসিতে অভিনন্দনের হাতটি বাড়িয়ে বললেন—'নিশ্চয় যাব। পরে আসবই।'

অন্যদিকে সত্যজিৎ রায় বিদেশি চিত্র বন্ধুদের সঙ্গে উৎসব আর ... আলোচনা করছেন। কদিন আগে টি ভি সাক্ষাৎকারে তিনি নাকি ... ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সুটেবল জায়গা দিল্লী নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার স্থানীয় সংবাদপত্র কিংবা অন্য কোথাও এর সংবাদ দেখলাম না। তাই ওঁকেই জিজ্ঞেস হোল—ঘটনাটি সত্য কিনা। ... নির্দ্বিধায় বললেন—হ্যাঁ বলেছি। অনেকদিন ধরেই একথা বলছি। ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলো কাদের ... ফিল্মের লোকদের জন্য তো ... কিন্তু সেই সংযোগ প্রায় ... মার্কিং কেন্দ্রে ... উৎসব।'

উৎসবের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ... দিক প্রশ্ন উঠতে পারে। জিজ্ঞেস যেতে পারে ইনফরমেশন বিভাগ ... করা কিন্তু ছবি সাংবাদিকদের দেখানো না কেন? বিজ্ঞান ভবন ... হল উৎসবের কেন্দ্রটিতে ... ও দেশীবিদেশী অতিথিদের ... ছবিগুলি দেখালে কি ক্ষতি ... অতিথিরা যে অনেকেই পয়সা ... ছবি দেখলেন সেটা কর্তৃপক্ষ ... পড়েছে কি? আর দুটি প্রশ্ন ... বিভাগে ভারতীয় ছবি গৌরব ... রিত সময়ের আগে তৈরী না ... কমিটিকে না দেখিয়েই ... উৎসব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—এটা ... সত্যি?

সব ত্রুটির জন্যেই ... অফিসিয়াল সংস্থা ... দায়ী। ... উৎসবের ব্যবসায়িক সাফল্যটাকেই ... করে দেখা যায় নাকি!

গোদার মাত্র একজনই

প্রলয় সুর

ফিল্ম সোসাইটিগুলোতে এখনকার [illegible]সী ছবি দেখে আমরা যখন ক্লান্ত বিরক্ত, [illegible]ন সরকারী উদ্যোগে মেট্রো সিনেমা হলে [illegible]থেকে ১৩ জানুয়ারী আবার একটি [illegible]সী চলচ্চিত্র উৎসব উদ্‌যাপিত হল। ৭ [illegible]ন ৬টি ছবি দেখানো হয়েছে। একজন নামী পরিচালকের ছবি উৎসবের সম্মান [illegible] রক্ষা করেছে।

ত্রুফোর ছবি 'আদেল এইচ'। 'লা [illegible]্যান্ট সাভেজ'এর শুটিংএর সময় ত্রুফো [illegible]ল-এর ডায়েরীর সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর ১৪ নম্বর ছবি। পরিচালককে বানাতে হয়নি। জার্নালে যা পেয়েছেন, [illegible]ই পরিচালকের কল্পনা রূপ দিয়েছে। [illegible] শতকের এক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি [illegible]র হ্যুগো। তাঁর বড় মেয়ে [illegible]পেলার্ডিনের কথা সকলেই জানে যে, স্বামীর সঙ্গে জলে ডুবে মারা যায়। [illegible] ছোট মেয়ে। তাকে নিয়েই সমস্ত তৈরী হয়েছে। ছবির বিষয় তার প্রেমের কাহিনী। তাদের নির্বাসনের [illegible]লোতে এ্যালবার্ট পিনসন নামে এক তরুণ ইংরেজ লেফটেনান্টের সঙ্গে [illegible]রিচয় হ'ল। আদেল তার প্রেমে [illegible] অগাস্ট ভাকট্রা তাকে বিয়ে করতে [illegible]ল। আদেল রাজী হয়নি। কারণ [illegible]কে ভালোবাসে না। ভালোবাসার [illegible] ডুবে যায় আদেল। ইংরেজ যুবা [illegible]ল কিছুদিন স্ফূর্তি করে সময়টা [illegible] দেবে। আদেলের [illegible] বাসার অর্থ বোঝার মতো হৃদয়ের [illegible]। লেফটেনেন্টের না থাকারই কথা। [illegible]কাটিকায় হ্যালিফ্যাকসে সে তার [illegible]ন্ট নিয়ে চলে যায়। আদেল একদিন এসে উপস্থিত। সে বিশ্বাস করে [illegible] ছাড়া প্রেম পূর্ণতা পেতে পারে না। তাকে ভুলে যেতে চায়, বার বার [illegible]রে আসে আদেল। 'তোমায় আমি [illegible]সি আমায় তুমি বিয়ে করো' এই [illegible]দেলের কথা। অজানা দেশ, অচেনা [illegible]রে বহুদূরে বাবা মাকে ছেড়ে [illegible]দিন গোনে কবে তাকে পিনসন বিয়ে [illegible]নারে ঢোকে যায় চারপাশে। বইয়ের [illegible] এসে দিস্তে দিস্তে কাগজ কিনে [illegible]য়। বাড়ি ফেলে। একা ঘরে [illegible] শব্দ আদেলের চোখের জলের [illegible] পড়ে। সাংকেতিক ভাষায় সে [illegible] লিখে যায় তার দুঃখ তার ভালো[illegible]বাসা। বাবা চিঠি লেখেন [illegible] ফিরে এসো আদেল [illegible] নাম বিরাট [illegible]। সে [illegible]। সে লোকটা যে বারবার তাকে [illegible]দেয়।

[illegible]লের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন আদজানি। অসাধারণ রূপসী সে নয় কিন্তু সিনেমায় দীর্ঘদিন এমন একটি মেয়ে দেখা যায় নি, যার শরীর মুখ দর্শককে এমন আবিষ্ট করে রাখতে পারে। এঁকে না পেলে ত্রুফো হয়তো এ ছবি করার কথা ভাবতেন না। যেমন জাঁ পীয়ের লো ত্রুফোর পুরুষ, তেমনি ইসাবেলা আদজানি ত্রুফোর নারী। আদেলের ভাষা উদ্ধার করেছেন ফ্রান্সেজ ভারনর গুইলি নামে এক আমেরিকান, তিনিই এই ডায়েরী সম্পাদনা করেছেন। একে আমরা গল্পের চেয়েও উত্তেজক ও রোমাঞ্চকর দেখি এবং দেখি ত্রুফোর ক্যামেরায়, ত্রুফোর চোখে যেমন করে সেকাল ভেসে ওঠে। পিরিয়ড পীস করার পরিচিত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বাইরে এ ছবি তিনি গড়ে তুলেছেন। দর্শককে তিনি কাঁদাতে চান না। ছবি দেখতে দেখতে দর্শকের সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে, পরিচালক তাই চান। ইতিহাসের একটা বিরাট অধ্যায় ছবির সমাপ্তিতে কেবল কিছু ডকুমেন্টেশান কিছু ফটোগ্রাফের মন্তাজ ব্যবহারে অসাধারণ চলচ্চিত্র রূপ লাভ করে। ত্রুফোর ছবি সম্পূর্ণভাবে তাঁরই নিজস্ব ছবি, যেমন বার্গম্যান হিচকক অরসন ওয়েলস্ এর ছবি, চিত্রনাট্য লোকেশন অভিনয়, 'লেনস' 'টেক' সাউন্ডট্র্যাক মিউজিক সর্বত্রই ত্রুফো, এরই নাম 'পারসোনল সিনেমা'।

জ্যাক এ্যারতুদ-এর ছবি 'দি ডেথ অফ এ সাইড'।

এক পর্বতারোহীর জীবনের দুঃখজনক পরিণতির কাহিনী। ছবির একমাত্র গুণ অসামান্য ফোটোগ্রাফি। রহস্যময় পর্বতের মহাবিশ্বে মহাকালের ছবি বারবার দর্শকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আত্মাভিমানী ফরাসী সন্তানেরা এখন আমেরিকার অনুকরণ করছে।

৪৫ বছর বয়সের অভিনেতা নিকোলাস। তার নাম যতো পরিচিত নয়, তার চেয়ে তার মুখটা বেশি চেনা। সিনেমা থিয়েটারে কাজ করে। রেডিও, টেলিভিসন ডাবিং নাইট ক্লাব বিজ্ঞাপন নিকোলাস সব জায়গায় আছে এবং খুব ব্যস্তভাবেই আছে। কিন্তু লাইফটা ঠিক এনজয় করতে পারছে না। তার খালি দেরী হয়ে যায়, মেকআপ তুলতে গিয়ে বেলা বয়ে যায়। নিজের জীবন সে কি ক'রে মেয়েদের কাছে ব্যাখ্যা করবে? নিকোলাস চেষ্টা করে, ফেইল করে। আর মহিলা যদি দুটি হয় তাহলে তো সব্বোনাশ। অভিনেতা হিসেবে তাকে নানা হাস্যকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। তার দুটি প্রেম, দুটি পুত্র, দুটি বাড়ি, দুটি প্রহেলিকা, একটি জীবনের নাম হেঁয়ালি। এই ছবির নাম, 'স্যালুট টু দি আর্টিস্ট', পরিচালক ঈভ রবার্ট। নায়কের ভূমিকায় মার্চেল্লো মাস্ত্রোইয়ানী। মার্চেল্লোর একক অভিনয় অনুষ্ঠান। এবং তাঁর অভিনয়ও ছবিটিকে বাঁচাতে পারে না, বাঁচানো সম্ভব নয়। দর্শকও খুশি নয়, কারণ মার্চেল্লোর সঙ্গে তারা সোফিয়া লোরেনকে পেল না। একটি অক্ষম দুর্বল চিত্রনাট্য ছবির কতো ক্ষতি করতে পারে, এই ছবি তার উদাহরণ হয়ে থাকল।

১৪ জুলাই ১৭৮৯ এক জনতা-সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে বাস্তিল দুর্গে। বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে সেটা ধ্বংস করা হয় ১৭৮৯-এর পরিচালক আরিয়ান মোওচকিন ইতিহাসকে নতুন করে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পান নি। কারণ এটি চলচ্চিত্রায়িত নাটক। 'থিয়েটার দ্য সোলেই'এর কমেডিয়ান অভিনীত এই নাটক ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কিত 'আভাঁ গার্দ' অপেরা। ছবিটি অধিকাংশ দর্শকের ভাল না লাগার কারণ, ঘটনাকে সিনেমায় যেভাবে বিবৃত হতে দেখে দর্শক অভ্যস্ত, পরিচালক সেই কাহিনীবর্ণন রীতি থেকে সরে গেছেন। ক্লদ সতে'র ছবি, 'ভিনসেন্ট, ফ্রাঁসোয়া, পল এবং অন্যারা'। মধ্যবয়সে নিঃসঙ্গতার সমস্যা, আবেগগত মনস্তাত্ত্বিক অর্থনৈতিক সমস্যা শহরের পরিবেশে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সব সমস্যাই পরিচালক খুব অসতর্ক হয়ে দেখেছেন, সবটাই আকস্মিক, ছবিটিতে পরিচালক টেকনিশিয়ান অভিনেতা অভিনেত্রী সকলেই অমনোযোগী। যদিও অভিনয় অংশে ঈভ মঁতা, মিশেল পিকোলী, স্তিফেন অদ্রান এরা সবাই ছিলেন।

বার্ট্রান্ড তাভেনিয়ার-এর ছবি, 'দি জাজ অ্যান্ড দি অ্যাসাসিন'। জোসেফ বোভিয়ারের ব্যক্তিগত আক্রোশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার অপচেষ্টায় পরিচালক প্রগতিশীল হতে চেয়েছেন। মিকোলাস জানশোর ছবি দেখলে তিনি তবু শিখতে পারতেন কিভাবে সিনেমায় গান প্রয়োগ করতে হয়, বিশেষ করে লালমান্ডার গান। সমস্ত ছবিটাই আসলে একটা 'এপ্রিল ফুল।'

কোসতা গ্যাবরাজের অসামান্য ছবি 'জেড' উৎসবে দেখানোর কথা ছিল। ছবিটি শেষ পর্যন্ত দেখানো হয় নি, কেন, সেটা উৎসবের কর্তাব্যক্তিরা আমাদের জানান নি।

মোটকথা ফরাসী সিনেমার নামে আমরা যতখানি বিনয়াবনত হয়ে যাই ততোখানি ভাগ্যহীন আমরা নই, ফরাসী দেশেও গোদার মাত্র একজনই।

বাঙালী শরৎবাবুর ধাঁচে কাহিনী চায়

রঞ্জন মজুমদার

টালিগঞ্জ মরতে বসেছে, সেটা তার নিজের দোষেই বেশী করে। ছিয়াত্তর সালে টালিগঞ্জের তৈরী যত ছবি রিলিজ হয়েছে তার দু-একখানা বাদ দিলে সবই প্রায় ফ্লপ। একদল অক্ষম চিত্রনির্মাতার জন্যে ব্যাপক-হারে এটা হয়েছে। মনে হয় না যে এটা ছিয়াত্তরেই শেষ হয়েছে; এটা চলতেই থাকবে—যতদিন না টালিগঞ্জের প্রকৃত চৈতন্যোদয় হচ্ছে।

গত কয়েক বছরে টালিগঞ্জে এমনসব চিত্রনির্মাতা দেখা দিয়েছে যাদের না আছে ছবি করার শিক্ষা-দীক্ষা, না আছে কোন রুচিবোধ। যেটা থাকলে সব হয়, সেই টাকা-টাই এদের ছিল, হয়ত এখনও অবশিষ্ট কিছু আছে। টালিগঞ্জ এমন একটা বিচিত্র জগৎ—যেখানে যে কেউ ইচ্ছে করলেই ছবি করতে পারে। যেমন খুশী তেমন ছবি সে করতে পারে এবং এই ব্যাপারে তার টেকনিক্যাল 'নো হাউ' না থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। এ নিয়ে স্টুডিওপাড়ার কোন মাথা-ব্যথা নেই। কোন নিয়ম-কানুন নেই, বিধি-নিষেধ নেই। তাই একজন লোহার ব্যাপারির যদি ছবি করার খেয়াল হয় এবং সেই সঙ্গে ফার্স্টিনস্টিং--তাহলে সে তা নির্বাধায় করতেই পারে এখানে।

আর এই একটা অভূতপূর্ব অবস্থার সংগে তাল মিলিয়ে চলছে ধর্মতলা স্ট্রীটের কিছু সিনেমার ব্যবসায়ী। যারা নাকি বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলা সিনেমার ওপর খবরদারী করে আসছে।

ছিয়াত্তর সালের সিনেমার লোকসান আজ সাতাত্তর সালের শুরুতেই প্রকট হয়ে উঠেছে। গত সপ্তাহে কলকাতার এক বড় স্টুডিওর ম্যানেজারের সংগে কথা বলতে গিয়ে আমি প্রথম হোঁচট খেলাম। তিনি বললেন, গতবছর এই জানুয়ারী মাসে স্টুডিওর কোন ডেট খালি ছিল না। দুটো ফ্লোরই বুক্‌ড ছিল। তাও তিন মাস আগে সেই বুকিং নেওয়া হয়েছিল। আর আজ এমন অবস্থা যে ফেব্রুয়ারী মাসে কোন ছবির স্যুটিং ডেটই পাওয়া যাচ্ছে না। ওড়িষার একটা পার্টি এসেছিল। তারা মৌখিক একটা বুকিং করেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ত সে বুকিংও ক্যানসেল হয়ে যাবে।

ছবি না চললে, প্রযোজকের লগ্নীকৃত টাকা ফেরৎ না এলে সহসা আর ছবি যে উঠবে না—এটা ভাবা এমন কঠিন কিছু নয়। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি হবে—তা ভেবে দেখার দরকার হয়েছে এবার। দুনিয়ার কোন প্রযোজক, কোন পরিচালক ফ্লপ ছবি করবার জন্যে নূন্যপক্ষে ছ'মাস প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে কখনও প্রোডাকশনে নামে না। লাভ করবার জন্যে, যশ অর্জন করবার জন্যেই এত সবকিছু। তা সত্ত্বেও ছবি দাঁড়াচ্ছে না। বাংলা ছবি দর্শকদের পছন্দ হচ্ছে না। পকেটের পয়সা খরচ করে কেউ ছবি দেখতে চায় না। তাই এখানে হিন্দী ছবির এত রবরবা।

প্রথম কথা ধরুন, বাংলা সিনেমায় ইদানিং ভাল গল্প নেই। অথচ ভাল ভাল অভিনেতা-অভিনেত্রী অনেক আছে। আমাদের বাঙালী দর্শকের বেশীর ভাগের টান এখনও শরৎ চ্যাটার্জীর গল্পের মত কাহিনীর দিকে। আমাদের দর্শকেরা আধুনিক জীবন-যন্ত্রণার ছবি একেবারেই দেখতে চায় না। চাইলেও তা দক্ষ পরিচালকের হাতে তৈরী ছবিতেই দেখতে চায়। অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত পরিচালকের ছবিতে ওসব সৃষ্টি কর্ম তারা আদৌ বরদাস্ত করতে চায় না।

বাংলা সিনেমার বড় খদ্দের হচ্ছে বাড়ীর গিন্নীরা। মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে এখন সখ-আহ্লাদ সিনেমা দেখায় এসে ঠেকেছে। সংসারের হাজারটা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট পুইয়ে গিন্নীবান্নীরা সপ্তাহে একটা দিন নিয়ম করে সিনেমা দেখতে আসে একটু আনন্দ পাবার আশায়। বাঙালী গিন্নী মেয়েরা কাঁদতে বড় ভালবাসে। যে ছবিতে কান্নাকাটি করার সুযোগ থাকে—সেখানে মেয়েদের ভীড় বেশী। সিনেমার চতুর ব্যবসাদারেরা আগেও এটা জানত, এখনও জানে—তবু কেন যে মাঝে মধ্যে হিসেবের গণ্ডগোল হয়—বোঝাতে পারা যায় না। এ গেল গিন্নীবান্নীদের কথা; কাহিনী সরল সোজা ভঙ্গীতে আবেগ মিশিয়ে সেলুলয়েডে বলতে পারলেই দর্শকেরা ভারী খুশী হয়। বাঙালী দর্শকেরা অল্পেই তুষ্ট। সেই আশুতোষ দর্শকদের যদি এখনকার চিত্রনির্মাতারা খুশী করতে না পারে—তাহলে সে দোষ খোল আনাই যারা ছবি তৈরি করে—তাদেরই। দর্শকদের কদাপী নয়।

বাঙালী দর্শকেরা কত উদার—সে[...] করুন! বিগত কয়েক বছরে সিনেমা[য়] নতুন নায়ক-নায়িকা আসেনি। পুরে[ানোদের] দিয়েই ছবি হয়েছে। সব রকম রোমান্টিক, ডিডেকটিভ, পৌরাণিক, হাসিক। দশ করা নির্দ্বিধায় তা পয়সা দেখেছে। আবার পাশাপাশি রঙীন ছবিতে সেই সব শিল্পীদের দেখেছে নবাগত, যাদের বয়স অল্প, [...] যৌবনের ছাপ রয়েছে, যেখানে নকল প্রবণতা কম। সে তুলনায় বাংলা [...] আর্টিস্টরা অনেক নিষ্প্রভ। টালিগঞ্জে ইচ্ছে করলেই একটা অল্পবয়স্ক জু[টি নিয়ে] রোমান্টিক ছবি তোলা যায় না। [...] স্ট্রীটের সিনেমার ব্যবসাদাররা প্রধানতঃ দায়ী। তারা ব্যবসায় কোন [ঝুঁকি] নিতে রাজী নয় বলেই আজ টালিগঞ্জে[র] দৈন্যদশা।

আমি কথা বলে দেখেছি। [পরি]চালকেরাও সাহস করে না। অথচ কোন নতুন প্রোজেক্ট শুরু হলে নতুন ছেলেমেয়েদের দারুণ খোঁজ পড়ে। দেখাও হয় এদিক-ওদিক। কিন্তু ছবি শেষ হয় তখন দেখি সেই পুরোনো সেই সুপরিচিত স্টাইল। বাংলা সিনে[মায়] বড় একটা জায়গা যেখানে মুখ থুবড়ে আছে। কি মুস্কিল, ঠেলে উঠছেও [না]।

গল্প? যার টাকা তার গ[ল্প]. [...] কোথায়! কিছু লোক চিরকালই [...] সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে গল্প নাট্য দুটোই লিখে দিতে প্রস্তুত, এ[মনকি] ক্রেডিট টাইটেলে তার নাম দেখানো [না হ]লেও। এখন এই টাকাওয়ালা লোক[ই] যে পরিচালক লাইনে নিয়ে এল—এ[...] করা ছাড়া তার কি উপায়!

টালিগঞ্জে ফি-বছর কাশ টাকা নি[য়ে] নতুন প্রযোজক ঢোকে—তার বেশীর [ভাগ] ইনটেক চিত্রপরিচালক না হন [...] ডিরেক্টরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। [...] সব প্রোজেক্ট ফিল্মের হয় অজানা [...] অপদার্থ টেকনিশিয়ানরা আশ্র[য়] নেয়। আর শিল্পীগোষ্ঠীর একটা [...] বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টিকিটই শুনেছে [...] পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক কন্ট্রাক্টে সই করে [...] আর সিনেমার একটা সংস্থা আছে। [...] টাকা দিয়ে মেম্বার যে কেউ হতে [পারে।] তারপর ফিল্মের পারমিট স্টুডিও আর্টিস্ট-টেকনিশিয়ানদের সম্মতি [...] খাস্ত করলেই পাওয়া যায়। ব্যস, হয়ে [গেল] ছবি। ফ্লপ ছাড়া কি হবে?

বুলেট ছবিতে পরভিন ববী ও দেবআনন্দ

বুলেট ঃ অতি সাধারণ

শ্যামল চক্রবর্তী

'বুলেট' নামের ছবিতে বুলেটের ছড়াছড়ি থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু বুলেট থাকলে তো চলে না, তাই খুন, রাহাজানি, নাচ, গান সবই যোগ করা হয়েছে এই বুলেট ছবিতে। তবু, বুলেট দর্শকদের বুলেটের মত লক্ষ্যভেদ করতে পারল না।

এই ছবিটি নবকেতন সংস্থার পঁচিশতম উপহার। ১৯৫০ সালে এরা 'আফসার' ছবি দিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং 'বুলেট' হল নবকেতনের পঁচিশ নম্বর ছবি। নবকেতনের পেছনে আছেন দেব আনন্দ। বুলেট ছবির নায়কও তিনি, পরিচালক হলেন ওর ছোট ভাই বিজয় আনন্দ। নবকেতনের মত একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'বুলেটে'র মত ছবি উপহার দিয়ে রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করবে ভাবিনি। বোম্বের হিন্দী ছবির সেই চিরাচরিত ক্রাইম ড্রামা হল বুলেট-এর প্রতিপাদ্য বিষয়। এক পুলিশ অফিসার ভুয়া সিপিং কোম্পানীর মালিককে ধরতে গিয়ে প্রথমে নিজেই জেলে গেল, তারপর জেল থেকে বেরিয়ে সেই জোচ্চর মালিকের কাছে গিয়ে বললেন, 'একটি বুলেট পকেটে রেখেছি, এই বুলেটটা তোমার বুকে বিঁধিয়ে আমার শান্তি হবে। এবার শুরু হল সেই পুলিশ অফিসার ও সিপিং মালিকের মারপ্যাঁচ। সতেরো রীলের ঝাড়া তিন ঘন্টার ছবিতে খুন, চন্ডু চরসের আড্ডা, কার রেজিং, মারামারি, ষড়যন্ত্র—কী নেই! সঙ্গে রয়েছে প্রেম। সেই পুলিশ অফিসার প্রেম করছে, প্যাকেচক্রে পড়ে গিয়ে খুনও করে ফেলেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী -সেই লোকঠকানো সিপিং মালিককে সেই বুলেটটা দিয়েই মেরে মনোবাসনা পূর্ণ করেছে।

'বুলেট' ছবিটা দেখার পর একটা প্রশ্ন এসেছে। এ ধরনের ছবি তৈরী না করলে কি হয় না? শুনেছিলাম নৈতিক অধঃপতন ঘটে কিম্বা নারীর অবমাননা, বা সামাজিক সুস্থ চিন্তাধারায় আঘাত পড়ে—এমন ছবি ভারত সরকার করতে দেবেন না। তাহলে বুলেট ছবি কি করে সেন্সার সার্টিফিকেট লাভ করল? এই ছবিতে যেভাবে হিপিদের আড্ডাখানায় যুবক-যুবতীদের চন্ডু, চরস, গাঁজা খাবার ব্যাপারগুলি দেখানো হয়েছে, যেভাবে ঐ আড্ডাখানায় যুবতী মেয়েদের স্বল্পবাস শরীরকে যুবকরা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে—এতে কি দেশের নৈতিক মান উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে? এসব দেখিয়ে লাভ কি, যেখানে এদেশের শতকরা নব্বুইজন লোক গরীব এবং বেশির ভাগ লোক গ্রামে বাস করে—তাদের এসব বড়লোকি কান্ড কারখানা দেখে মন বিষণ্ণ হবে না? একটি ভদ্র ঘরের মেয়ে হাফপ্যান্ট পরে বাপের সামনে সিগারেট খাচ্ছে, বাপকে মিথ্যা কথা বলে টাকা সরিয়ে নেবার পথ বাতলে দিচ্ছে মা—এসব ভাবনা সুস্থ সমাজকে অসুস্থ করার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? দুঃখের কথা, দেব আনন্দের মত প্রথিতযশা অভিনেতা ও প্রযোজক এ ধরনের ছবি করতে লজ্জিত হচ্ছেন না।

তবে, ছবিটির কলাকৌশলের কাজ খুবই উন্নত মানের হয়েছে। ফটোগ্রাফী এবং রঙের ব্যবহার প্রায় নিখুঁত বলা চলে। সম্পাদনা অতি চমৎকার, যে কারণে ছবিটির গতি তীব্রতর হয়েছে। সংগীত পরিচালনায় আর ডি বর্মণ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। অতি সাদামাটা তাঁর কাজ। অভিনয়ে নায়ক দেবআনন্দ যেরকম সব ছবিতে অভিনয় করেন, তাই করেছেন। বরং নায়করূপে এখন আর তাঁকে মানায় না। তাঁর পাশে তাজা জোয়ান ছেলে রাকেশ রোশান অনেক সুন্দর। পরবিন ববী হলেন নায়িকা - অভিনয়ের তেমন কোন সুযোগই নেই। কবির বেদী হলেন—সিপিং কোম্পানীর মালিক—ভি পি। খল চরিত্রে মানিয়েছে এবং অভিনয়ও ভাল করেছেন। মালা জাফিস দেহসৌষ্ঠব দেখানো ছাড়া আর কিই বা করবেন অন্ততঃ বুলেটের মত ছবিতে।

পীযূষ বসুর সব্যসাচী শরৎচন্দ্রের নয়

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' পীযূষ বসুর 'সব্যসাচী' ছবি নিয়ে দর্শকদের মতান্তর দেখা দিতে পারে। 'সব্যসাচী' ছবির কাহিনী পীযূষ বসুর নিজের পছন্দ অনুযায়ী তৈরি করেছেন এবং সেইভাবে ছবিটির প্রধান চরিত্র সব্যসাচীকে দর্শকদের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। আজকের নবীন দর্শকরা সব্যসাচী ছবিটি দেখে কী ধারণা পোষণ করবেন জানি না, কিন্তু যাঁরা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস পড়েছেন কিম্বা 'পথের দাবী' উপন্যাসের প্রথম চিত্ররূপ দেখেছেন—তাঁরা নিশ্চয়ই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হবেন।

পথের দাবী বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ গ্রন্থ। এই দেশে যখন বিপ্লবাদের [illegible] চলেছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবীরা যখন দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন—সেই সময়ে শরৎচন্দ্র পথের দাবী উপন্যাসটি লেখেন। এর [illegible] ১৩২৯ সনের ফাল্গুন মাস থেকে ১৩৩৩ সনের বৈশাখ পর্যন্ত বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশিত হয় [illegible] ১৩৩৩ এবং পথের দাবী উপন্যাসটির প্রথম সংস্করণের তিন হাজার কপি [illegible] গোপনে বাংলার সমস্ত [illegible] চলে যায়। ব্রিটিশ সরকার বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন ১৯২৭ [illegible] বই প্রকাশের কিছুদিন পর। পথের দাবী উপন্যাসটি নিয়ে সে সময়ে [illegible] যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল সেই ইতি[illegible] সকলেই জানেন। পথের দাবী বাঙালী পাঠকের কাছে একটি পবিত্র বই রূপে চিহ্নিত এবং এই উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে হলে যে সততা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল পীযূষ বসু তা পালন করেননি। 'পথের দাবী'র মত একটি উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র সব্যসাচীকে কেন্দ্র করে পীযূষ বসু নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী যে ছবিটি বানালেন বাঙালী দর্শকের হৃদয় কি প্রসন্ন মনে তা গ্রহণ করবেন? এই উপন্যাসটিকে ঘিরে যে সেন্টিমেন্ট গাঢ় হয়ে আছে তা কি আজকের নবীন দর্শকদের স্পর্শ করবে না?

পীযূষ বসু পথের দাবী উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র সব্যসাচীকে বেছে নিয়েছেন। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে সব্যসাচীর জনসাধারণ কর্মকাণ্ডের সম্পর্কে ছোট ছোট [illegible] ঘটনার কথা বলেছেন পীযূষ বসু [illegible] সব ছোট ঘটনাগুলিকে ফাঁপিয়ে [illegible] নিজের কল্পনার মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। অন্যদিকে পথের দাবী উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্রগুলি একেবারে মুছে দিয়েছেন কিম্বা আংশিকভাবে উপস্থিত [illegible]। [illegible] পথের দাবী উপন্যাস এই [illegible] পীযূষ বসুর সব্যসাচী।

[illegible] এখানে দুই একটা দৃষ্টান্ত [illegible]। [illegible] পারবেন [illegible] কাণ্ডকারখানা [illegible]। পথের দাবী উপন্যাসে অপূর্ব [illegible] অন্যতম প্রধান চরিত্র রয়েছে [illegible] আংশিকভাবে ও [illegible] উপস্থিত হয়েছেন। [illegible] ও [illegible]-এর প্রতি সুবিচার করা হয়নি।

[illegible] শরৎচন্দ্র যা করেননি [illegible]। সব্যসাচী [illegible] পলায়ন [illegible] সব্যসাচীর [illegible] দলের [illegible] সব্যসাচী [illegible] দেশের প্রয়োজনে [illegible] সরকারের [illegible] কল্পনার [illegible] দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। [illegible] পথের দাবীর দীপ্তিময়ী চরিত্র সুমিত্রা এখানে কীভাবে এসেছেন? শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটির দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত [illegible] উজ্জ্বলদিককে বড় করে দেখিয়েছেন তাঁর ফেলে আসা অতীতকে অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু পীযূষ বসু সুমিত্রার ফেলে আসা পঙ্কিল জীবনটাকেই এই ছবিতে প্রাধান্য দিয়ে নিজের কল্পনায় ঘটনা সৃষ্টি করে উপস্থিত করেছেন। সুমিত্রা এখানে মদ খাচ্ছেন হোটেল চালাচ্ছেন সিগারেট খাচ্ছেন এবং বোম্বাই ধরনের ভ্যাম্প চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের মানস প্রতি[illegible] সুমিত্রা এখানে গৌণ হয়ে রয়েছেন। প[illegible] দাবী উপন্যাসের ৩০০ পৃষ্ঠার ম[illegible] শরৎচন্দ্র সুমিত্রার পঙ্কিল জীবনের [illegible] আট চৌদ্দ লাইন ব্যয় করেছিলেন [illegible] পীযূষ বসু যোগ করেছেন চৌদ্দশো লাই[ন]। এছাড়া গোটা ছবিতে ঘটনার যে আ[illegible] সংমিশ্রণ তা নিয়ে আর বলে লাভ নে[ই]। শুধু একটা বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করা[illegible] সব্যসাচী হল এমন চরিত্র যিনি মাতৃভূ[মির] অগ্রদূত পরাধীন দেশের রাজবিদ্রো[হী] দুরন্ত বিপ্লবী। নৈরাশ্য যার মধ্যে [illegible] স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় নিজের চিত্তভ[illegible] যার শক্তি। সেই সব্যসাচী তিন জা[illegible] অস্ত্র ধরা পড়ে যাবার পর নৈরাশ্যে [illegible] পড়ে বলছেন—'আমি [illegible]'। পী[যূষ] বসু [illegible] সব্যসাচী চরিত্রে সব্যসা[চী] চরিত্রের এই হতাশা কী করে সম্ভব?

পীযূষ বসুর সব্যসাচী এইভা[বে] পর্দায় উপস্থিত হয়েছে।

উত্তমবাবু তাঁর সাধ্যমত সব্যসা[চী] চরিত্রের দীপ্তভাব ও ব্যক্তিত্ব ফুটি[য়ে] তুলেছেন। কয়েকটি দৃশ্যে তাঁর অভিনয় ম[নে] রাখার মত। সুমিত্রার চরিত্রে সুপ্রিয়া দেবী[র] অভিনয় সাধারণ সেখানে দীপ্তিময়ী ভা[ব] ঠিক ফুটে ওঠেনি। কিন্তু রোজি [illegible] ভূমিকায় সুপ্রিয়া দেবী সুন্দর অভি[নয়] করেছেন। চরিত্রটি তাঁর অভিনয়ে জীব[ন্ত] হয়ে দেখা দিয়েছে। ভারতীর ভূমিকা[য়] জয়শ্রী রায় বড় নিষ্প্রভ। সুমিত্রা ও [illegible] এই দুটি চরিত্রের প্রতি [illegible] সুবিচার করা হয়নি। শশী কবির চরি[ত্রে] তরুণকুমার সাধারণ অভিনয় করেছেন। ব্রজেন্দ্র হয়েছেন অনিল চ্যাটার্জি সব্যসা[চী] ছবির ব্রজেন্দ্র অনিলবাবু ভালোই করেছেন। বিকাশ রায় পুলিশ অফিসার নিমাইবাবু[র] চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন। রাম[illegible] তলওয়ারকর এই ছবিতে শাণিত তলোয়ারে[র] পরিবর্তে ভোঁতা হয়ে আছেন এই চরিত্রে অমরনাথের কিছুই করার নেই।

ছবিটির ক্যামেরার কাজ ভাল ইনডো[র] ও আউটডোর দুই বিভাগেই আলো ও কম্পোজিশন বিশ্বাসরূপে পেয়েছে। শু[ধু] বর্মার কোন এক বন্দর থেকে যখন [illegible] করে সব্যসাচী চলে যাচ্ছেন—সে সময় কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ে গিয়েছে—এই যা দুঃখ। ছবিটির ব্যাক গ্রাউন্ড বা নেপথ্য সঙ্গীতে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গানের সু[র] একটা মর্যাদা এনে দিয়েছে। এই বিষয়ে সংগীত পরিচালক উত্তমকুমারের প্রশং[সা] প্রাপ্য। এই ছবির বিভিন্ন চরিত্রের মেক-আপ বিশেষ করে 'সব্যসাচী'র বিভিন্ন চরিত্রে বিশ্বাসরূপে লক্ষণীয় এবং প্রশংসনীয়।

হাতে রইল তিন ছবিতে সংমিত্রা মুখার্জি
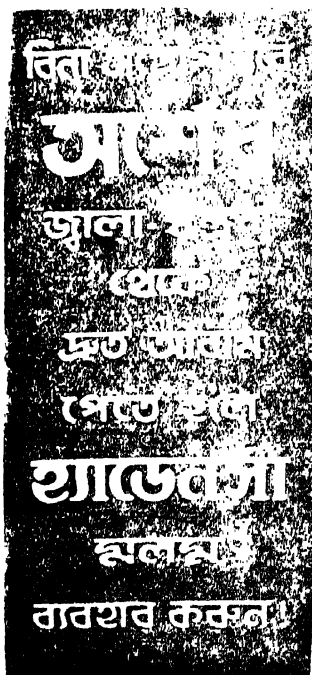
ইতালিয় ছবি

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

কলকাতায় ফেডারেশন অফ ফিলম সাইটিজ অফ ইন্ডিয়া এবং নয়াদিল্লীস্থ লিয়ান এমব্যাসী কালচারাল সেন্টারের ম উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইটালিয়ান ছবির সবে ফেলিনির যে ছবিটি দেখানো হয় র নাম লা দোলচে ভিটা (দি সুইট ফে) (১৯৫৯)।

উৎসবে প্রদর্শিত ফেলিনির লা দোলচে টার কাহিনী একটু দুঃসাহসিক। পাশ্চাত্য চ্ছিত্র শিল্পে একটা প্রধান ভূমিকা য়েছে রোম নগরীর। সেই রোমের ধনিক জীবনযাপন সেখানকার ওপর তার সমাজের দৈনন্দিন জীবন, যৌনতাব ও অস্বাভাবিক আকর্ষণ ইত্যাদি একজন বাদিকের (মার্সেলো মাস্ত্রোইয়ানি) চোখ য়ে দেখানো হয়েছে। যে নিজের যা কাল (স্বইচ্ছায় এবং কার্যকারণে) ছবিতে গুছিয়ে বলা কোন গল্প নেই। র তলার নরনারীর মানসিকতার ওপর রো টুকরো ঘটনা নিয়ে ফেলিনি ছবিটি ছেন। সাংবাদিকের সাধ ছিল, সেই সব চত্র ঘটনার কুশীলবদের নিয়ে সাহিত্য ষ্টি করবেন। যার জন্যে তিনি তাঁর কেও বঞ্চিত করেছেন।

অসাধারণ বক্তব্য এবং বাস্তবানুগে । বর্তমান রোমের অর্থবান বিলাসী রীর মানুষদের সমাজের দর্শন বলা যায় ছবিটিকে।

উৎসবের দ্বিতীয় ছবি 'অবসেশন' সেসিওনে। ছবিটি বিশ্ববিখ্যাত লুসিনো দকান্তির। ছবিটি তৈরী হয় ১৯৪২ সালে অবসেশন আপাতে অবৈধ প্রেমের গল্প ও যে সময় ছবিটি তোলা হয় ৯৪২). তখন এটি সমস্ত পৃথিবীতে লড়ন সৃষ্টি করেছিল।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। সেই র একজন ভবঘুরে মেকানিক ঘুরতে তে একটি সরাইখানায় গিয়ে পৌছল। ট বয়সী স্বামী ও পরন্ত যৌবনা স্ত্রী নে মিলে সরাইখানাটি চালায়। ছবির ক জিনো সেখান থেকে ক্রমে গিওভান নী মালিকের স্ত্রীকে যৌনাবেদন দ্বারা কৃষ্ট করে অবৈধ জীবনযাপন করতে ক এবং এক সময় সুযোগ বুঝে তার মীটিকে খুন করে সেই জীবনটা সহজ নেয়। কিন্তু ছবির যে দেখা যায় ওভানা স্বমীর খুনের বদলা নেয় নাকে খুন করে।

ছবিটি দর্শকদের মনে প্রচন্ড নাড়া য়েছিল সে সময়। সমালোচকরা ছবিটিকে ইটালিয় চলচ্চিত্রে নতুন ভাবনার জন্মদাতা বলে এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন।

অবশ্য এমন দুঃসাহস দেখাবার জন্যে তখন ভিসকান্তিকে কম খেসারতও দিতে হয় নি।

উৎসবের তৃতীয় ছবি 'সিয়েলো সুলো পালুডে' (হেভেন ওভার দি মার্সেস) (১৯৪৯) এর পরিচালক অগাস্টো জেনিনা।

ইটালিয় চলচ্চিত্র জগতের প্রথম স্রষ্টা জেনিনা। 'সিয়েলো সুলা পালুডে' ছবিটি মারিয়া গোরেটির কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত।

মারিয়া গোরেটি ও তার পরিবারের লোকেরা বেঁচে থাকার জন্য একটা কাজ পাবার সংগ্রাম করছে। সেই সঙ্গে এক-টুকরো জমির বাসনা। মোদ্দা গল্প এই টুকুই। জেনিনা এই গল্পটির মাধ্যমেই গরীব মানুষদের জীবনধারণ, তাদের সহজাত মানসিকতা ও তাদের আদর্শবাদের কথা বলতে চেয়েছেন।

চতুর্থ ছবি 'ও লা কনসকেভো' (আই নিউ হার ওয়েল) (১৯৬৫) ছবির পরিচালক আন্তোনিও পিয়েত্রাঞ্জেলি।

উৎসবে প্রদর্শিত তার ছবিটির মূল চরিত্র এমন একটি মেয়ে যে চলচ্চিত্রে অভিনেত্রী হবার বাসনা নিয়ে রোমে এসেছিল এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল।

এই ছবিতে পিয়েত্রাঞ্জেলো যুবক যুবতীদের কাছে চলচ্চিত্রের সর্বনাশা আকর্ষণ সেই জীবন ও তার মর্মান্তিক পরিণতি দেখাতে চেয়েছেন।

শচীনশঙ্কর ব্যালে গ্রুপের শৃঙ্গার নৃত্যে জয়শ্রী ও বৈজয়ন্তী

নাটমঞ্চ

থিয়েটার সেন্টারের নাট্যোৎসব

প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা থিয়েটার সেন্টার গত ৯ থেকে ২৩ জানুয়ারি তাঁদের ২২তম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে এক নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই উৎসবের সূচনা হয় গোর্কি সদনে এক বিশেষ অনুষ্ঠান

মারফৎ। উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। শ্রীমতী মায়া রায় প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত অতিথিরূপে ইউ এস এস আর-এর কলকাতাস্থ কনসাল জেনারেল মিঃ এ এইচ ভেজিরভ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

পরে 'লেবেদেফ' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

উৎসবের অন্যান্য নাটকগুলি অভিনীত হয় থিয়েটার সেন্টার-এর নিজস্ব মঞ্চে। নাট্যোৎসবে অথচ সংযুক্তা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বিশুলে অলীকবাবু এক পেয়ালা কফি (হিন্দী) ষোড়শী পরাজিত নায়ক ও নিশাচর পরিবেশিত হয়।

শিলিগুড়িতে নাটক

নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য জায়গার মত শিলিগুড়ির কয়েকটি দলের অবদানও এখন কিছু কম নয়। সেখানেও ইদানিং নাটক নিয়ে রীতি-মত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল কল্লোল ও অবসর নামক দুটি নাট্য সংস্থার নাট্য পরিবেশনের মাধ্যমে। কল্লোলের 'সীতা হরণ' (রচনা রতনকুমার ঘোষ) নাটকটি উপস্থাপনা ও দলগত অভিনয়ের গুণে তাঁদের পূর্ব সুনাম বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। এ নাটকে পুতুল ঘোষের বলিষ্ঠ অভিনয় দর্শকদের রীতিমত অবাক করেছে। গোরা ঘোষের অভিনয়ও বেশ সচ্ছন্দ। পরিচালক মঙ্গল দুবে সরোজ মিত্র প্রণব বিশ্বাস ও দিলীপ রায়ের অভিনয়ও সুন্দর। সেই অনুপাতে প্রদীপ ঘটকের সাজসজ্জা চরিত্রানুগ নয়। অবসর-এর রাধারমণ ঘোষ রচিত 'যদি আমি কিন্তু আমি' নাটকটিও সু-অভিনীত। অভিনয়ে কল্যাণ সেনগুপ্ত সুদীপ গুহ ও রবীন দত্ত দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। নির্দেশক রঞ্জন দত্ত'র অভিনয় সুন্দর কিন্তু তার হাতের আঙুলে এক গাদা সোনা ও রূপার আংটি বড় দৃষ্টিকটু লেগেছে।

ভিন্ন সাদের নাটক

অতি সম্প্রতি নাটকের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গীটা যেন কিঞ্চিৎ পথ বদল করেছে বলে মনে হচ্ছে। আমার এ-কথার প্রমাণ সাম্প্রতিক একটি নাটক। 'অঙ্কুর'।

গল্পটি টুকরো টুকরোভাবে সূত্রধরের ভূমিকা সহ বলা হয়েছে। তাতে কোন কোন দৃশ্যে নাটক বেশ জমাট বেঁধেছে। তবে তাঁর অতিরিক্ত সংলাপ বলার ঝোঁকও বেশ ঘন ঘন মঞ্চে অনুপ্রবেশ কিছুটা ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। তবে ঐ ভূমিকায় শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি ভাল অভিনয়ই করেছেন।

সুজিত বোসের রাজকুমার গৌতম ভট্টাচার্যের সেনাপতি চরিত্রচিত্রণ হিসেবে ভাল। তবে আরো একটু সিরিয়াস ও [illegible] হলে বোধহয় নাটকটি আরও গতি পেত।

[illegible] ভট্টাচার্য (অশ্বাব) [illegible] (ভিখিরী) চেষ্টা [illegible] চরিত্র দুটিকে ফুটিয়ে তুলতে। বলাইবাবুর বলিষ্ঠ তেজী অভিনয় দর্শকদের ভাল লেগেছে। আর কিছু রিলিফ দৃশ্যে দর্শকদের বেশ আনন্দ দিয়েছেন দেবজিৎ মুখার্জি ও পরিতোষ ভট্টাচার্য।

তরুণ দেবনাথের মিত্তির মশাই প্রথম দিকে ভাল হলেও শেষের দিকে বেশ দুর্বল। তবে তাঁকে মানিয়ে ছিল ভাল। এ নাটকের শ্রেষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ বলা যায় শ্রদ্ধা ঘোষের মুক্তি ও খোকন মুখার্জির বাউল।

[illegible] কর-এর মঞ্চ পরিকল্পনা এবং কমল মল্লিক-এর আবহসঙ্গীত সুন্দর। শেষ দৃশ্যে শিশুর জন্ম [illegible] (শব্দ [illegible] দাস) ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 11th February. 1977 শুক্রবার, ২৮ মাঘ, ১৩৮৩

১৬ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা

। সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদকীয়	৪	
সাহিত্য : সাহিত্যের জন্যে এক সিকি	৫	....বৈকুণ্ঠ পাঠক
শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা	৬	
কবি পরিচিতি	৭	....শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায়
সমালোচনা	৮	
নিগ্রহ	৯	....শ্রীপরেশ মণ্ডল
চিঠিপত্র	১০	
আমি ইংরেজিতে জীবিত সবচেয়ে বড় কবি : প্রীতিশ	১৩	....মল্লিনাথ গুপ্ত
আলি আকবর রবিশংকরের চেয়ে কম নয় অন্নপূর্ণা	১৪	....শ্রীসন্ধ্যা সেন
গ্রীষ্মে হ্রদ পদ্মে ভরে যায়	১৫	....বৈকুণ্ঠ পাঠক
চোয়াড় বিদ্রোহে কর্ণগড়ের রাণী	১৬	....শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
আপনগন্ধা (উপন্যাস)	১৯	....শ্রীদীপালী দত্তরায়
শূন্য ফিল্ম (উপন্যাস)	২৫	....শ্রীঅদ্রীশ বর্ধন
সমুদ্রের নীচেও পৃথিবী ছিল	৩০	....অয়স্কান্ত
সব পটুয়ারই দুটো করে নাম	৩২	....শ্রীগৌরচন্দ্র সাহা
পুনশ্চ	৩৪	....ক্ষপণক
শ্রীঅরবিন্দ	৩৫	....শ্রীমনোরঞ্জন বসু
মাসশাই (গল্প)	৩৭	....শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী
আকাশ জুড়ে (গল্প)	৪০	....শ্রীসত্যেন্দ্র আচার্য
একাদশে বৃহস্পতি	৪৩	....প্রিয়দর্শী
লেখ্‌ চায়া এখন ছায়াস্তরু	৪৪	....শ্রীপবিত্রকুমার সরকার

আজকের সূচী

জাতীয় ফুটবলে বাংলা এবারও সেরা	৪৫	....শ্রীরূপক সাহা
শতবার্ষিক টেস্ট	৪৬	....শ্রীঅজয় বসু
খেলাধুলো	৪৭	....দর্শক
আমীর খাঁ হয় খতু	৪৮	....শ্রীজহুরী সদাগর
বুদ্ধদেবের আগে অক্ষর বর্ণমালা ছিল না	৫২	....শ্রীসুধাংশুকুমার রায়
স্মৃতিওর জন্য চাই নিরিবিলি	৫৫	....শ্রীরঞ্জন মজুমদার
বাঙালী পাড়ার হিন্দী ছবির বাঙালী দর্শক	৫৬	....শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী
আদালত উপভোগ্য	৫৮	....শ্রীঅশোক মজুমদার
নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র	৬০	....শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
হাতে ছবি নেই তাই থিয়েটারে যাই	৬২	....শ্রীনির্মল ধর
[illegible] সঙ্গীত আসরে	৬৩	
[illegible]	৬৩	....শ্রীশান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

প্রচ্ছদের ছবি

প্রশান্ত বসু

অঙ্গসজ্জা

সুবোধ দাশগুপ্ত

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

তিনটি কবিতা

গল্প লিখেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অতি বৃহৎ রাঙা মুলো

লিখেছেন

বৈকুণ্ঠ পাঠক

আগামীতে থাকছেন এ'রা দুজন

আমাদের

ক্রনিক ব্যাধি

আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকে আমরা খুব যে একটা কাজে লাগাই তা মনে হয় না। কেননা পরিস্থিতি তাহলে হয়তো অন্যরকম হত।

বাজার দরের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে আলোচনা এবং দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে দীর্ঘকাল ধরেই। কি রবীন্দ্রনাথের উপমা ব্যবহার করে বলা যায়, ইঞ্জিনের সমস্ত বাষ্পকে যদি শুধু বাঁশি বাজিয়েই নিঃশেষ করা হয় তাহলে গাড়িটাকে যেমন সামনে টানা শক্ত, তেমনি সমস্যা নিয়ে যদি কেবল বাক্যস্রোতই প্রবাহিত হতে থাকে, তাহলে কাজের কাজ করে ওঠা কঠিনই হয়ে ওঠে।

একথা অবশ্য খুবই ঠিক যে জিনিসপত্রের দাম যথেষ্টই বেশি। শীতকালে শাকসব্জি এবং বিশেষ ধরনের কতকগুলি তরকারির দাম কম থাকে। এবার সে ব্যাপারেও বিধি বাম। প্রায় সমস্ত রকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম গতবারের তুলনায় বেশি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বেশির পরিমাণ দ্বিগুণকেও ছাড়িয়ে গেছে। যেমন সরষের তেল। তাছাড়া বাদাম তেল, বনস্পতি ইত্যাদি রান্না করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত স্নেহজাতীয় প্রায় সমস্ত জিনিসেরই দাম এখন উদ্বেগজনক।

বলাবাহুল্য সমস্যার গুরুত্ব ও জটিলতা অনুধাবন করে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তাঁরা দরবৃদ্ধি ও সরবরাহ প্রক্রিয়ার উপর সতর্ক নজর রাখছেন, যেন কিছুতেই তা আয়ত্তের বাইরে না যায়। সেইসঙ্গে রাজ্য সরকারগুলিকেও তাঁরা পরামর্শ দিয়েছেন, আন্তঃরাজ্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের চলাচলের উপর বিধি-নিষেধগুলিকে তুলে নেবার জন্য। ইদানীং দেখা যাচ্ছিল, এইসব আইনঘটিত অসুবিধার ফলে অনেক ধরনের জিনিসের আঞ্চলিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাছাড়া এইভাবে সরবরাহ ঘটিত ঘাটতির সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী যে রকম খেয়াল খুশি মত বাড়িয়ে চলত, সে সুযোগও সংকুচিত হবে কিছুটা।

কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য কালোবাজারীর দিকে বিশেষভাবেই দৃষ্টি দিতে বলেছেন রাজ্য সরকারগুলিকে। সেইসঙ্গে মজুতদারী বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পরামর্শ দিয়েছেন।

বাস্তবিক এই দুটি সমাজবিরোধী শক্তির অশুভ মিতালি যে আমাদের অনেক দুর্ভোগেরই মূ[illegible] তা অস্বীকার করা যাবে না। জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রথম দিকে এরা থমকে দাঁড়িয়েছিল। দোষী ব্যব[illegible]রা কেউ কেউ হাতেনাতে ধরা পড়ে মিসায় আটক হবার পর অনেক নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের দামও কমে গিয়েছিল সে সময়। কিন্তু আবার নানা ফিকিরে অসাধু ব্যবসায়ীরা মাথা তুলতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। আশা করা যায়, রাজ্য সরকারগুলিও অনুরূপ দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবেন।

কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার, শুধু সরকারী তৎপরতাই যথেষ্ট নয়। কালোবাজারী এবং মজুতদারীর মতো সমাজবিরোধী শক্তিকে উচ্ছেদ করতে হলে সামাজিক প্রতিরোধও দরকার। এবং সে দায়ি বলাবাহুল্য দেশের সাধারণ মানুষেরই।

সরকার যেমন আরো বেশি সংখ্যায় ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারেন, দেশের সাধারণ মানুষও সেই রকম ক্রেতা-সমবায়ের দোকান গড়ে তুলে কালোবাজারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। সত্যি বলতে কি, সাধারণ নাগরিকেরা যদি সমবায় আন্দোলন শক্ত ভিত্তিতে ছড়িয়ে দিতে পারেন দেশের সমস্ত অঞ্চলে, ঘাটতি তৈরির কোনো সুযোগই ঘটবে না। আর প্রয়োজনীয় জিনিস যদি ন্যায্য দামেই পাওয়া যায়, দাম বাড়ারও কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

কিন্তু আমরা যে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে চাই না, সে তো গোড়াতেই বলা হয়েছে।

আমাদের এই ক্রমিক কুম্ভকর্ণের ব্যাধি কবে সারবে, সে এক কঠিন প্রশ্ন।

স্কুলে পড়ার সময় আমাদের জ্যামিতির স্কেলে শুধু ইঞ্চির মাপ থাকতো। আমার মেয়ের স্কেলে দেখছি এক ধারে ইঞ্চি আরেক ধারে সেন্টিমিটারের দাগ টানা। স্কেলখানা নাড়াচাড়া করছিলাম। টেবিলের ওপর একখানি সাপ্তাহিকের চলতি সংখ্যা পড়েছিল।

তুলে নিলাম। নেড়ে চেড়ে দেখি, এই সাপ্তাহিক আর আমি একই বছরে জন্মেছি। আর ছ'বছর গেলেই আমাদের দুজনেরই বয়স অর্ধ শতাব্দী হবে।

কি খেয়াল হোল—আমার মেয়ের স্কেলের সেন্টিমিটারের (যাকে সংক্ষেপে সি এম বলে) দিক দিয়ে সাপ্তাহিকের মলাট থেকে মলাট অবধি মাপতে বসলাম। পঁচিশ বছর আগে আমাদের কলেজের দিনগুলোতে এ-সাপ্তাহিকের দাম ছিল তখনকার তিন আনা। স্টলে স্টলে রাস্তার ধুলো মেখে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকতো।

আমাদের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিকেরও যৌবন আসতে দেখলাম! দেশের গৌরব হয়ে উঠতে লাগলো কাগজখানা আমাদের প্রিয় বরেণ্য লেখকরা লিখতে লাগলেন। আমাদেরই চোখের সামনে এই কাগজ অনেককে লেখক করলো। একদিন সাপ্তাহিকের সম্পাদকের ঘরেও গিয়েছিলাম। ২৩।২৪ বছর আগে। রাত সাতটা হবে। একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হোত। দেখেছিলাম—তিনি ঘাড় গুঁজে কাজ করছেন। নিরাভরণ টেবিল। আমাদের যৌবনের স্বপ্ন—এমন কয়েকজন লেখক, গল্পকার, কবি তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। তারও কিছুকাল পরে দেখলাম সম্পাদকমশাই বেলা বারোটা নাগাদ ট্রামের জানলার সিটে বসে অফিসে চলেছেন। খানিক বুঝি খানিক বুঝি না—অত সুন্দর সাপ্তাহিকের সম্পাদক ট্রামে চলেছেন—ওই তিনি চলেছেন—অকারণেই কেমন একরকমে অবিশ্বাস আর বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধায় তাকিয়ে ছিলাম ট্রামখানার দিকে। কত গল্প, উপন্যাস, কবিতা ওঁকে ছাটাই বাছাই করতে হয়। ওঁর মত মানুষ এই সামান্য ট্রামে?

সাহিত্যের জন্যে এক সিকি

আশ্চর্য! তারপর এও চোখে পড়েছিল—তার সাপ্তাহিক কাগজখানা সেলুনে, ডাক্তারের চেম্বারে, বৌদির মাথার বালিশের পাশে, ট্রেনের কামরায় ক্রমেই বেশি করে জায়গা পাচ্ছে।

তা যা বলছিলাম। এই ১৯৭৭ সালের জানুয়ারিতে আমার চোখে বাইফোকাল চশমা। স্কেলের সেন্টিমিটারের দিক থেকে মেপে মেপে আমি অনেক কিছু আবিষ্কার করলাম। তিন কলমে ভাগ করা পৃষ্ঠাগুলো থেকে মেপে যা পেয়েছি—তা জানাচ্ছি।

মলাট সুদ্ধ কাগজের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬। তার ভেতর—

তিনটি কবিতা—৭২ সি এম
একটি গল্প—৪৯২ সি এম
একটি ভ্রমণ কাহিনী—২৮৭ সি এম
একটি প্রবন্ধ—১৫৯ সি এম
সাহিত্য প্রসঙ্গ—৪৬ সি এম
একটি ধারাবাদিক উপন্যাস—১৮৭ সি এম
পুস্তক পরিচয়—১২৩ সি এম
মোট—১৩৬৬ সি এম

অর্থাৎ খোদ সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার জন্যে ১৩৬৬ সি এম বা প্রায় ১৯ পৃষ্ঠা ব্যয় হয়েছে। তার মানে কাগজের সিকিভাগ জায়গা জুড়ে সাহিত্য।

এভাবেই স্কেলে মেপে পেলাম: বিজ্ঞান নানা ফিচার, খেলাধুলো, রঙ্গজগৎ ইত্যাদি কাগজের মোট ২৪ পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষের কাণ্ডকারখানা ছবি আর লেখায় একটি পৃষ্ঠা দখল করে আছে। এই স্ট্রিপ আর ওই ২৩ পৃষ্ঠা একত্রে কাগজের তিন ভাগের একভাগ বা টাকায় ৩৩ পয়সা অধিকার করে আছে।

মোট বিজ্ঞাপন রয়েছে ২৩৬৮ সি এম অর্থাৎ প্রায় ৩৩ পৃষ্ঠা। এর ভেতর রবীন্দ্রনাথ থেকে যৌনবিজ্ঞান পর্যন্ত বইয়ের বিজ্ঞাপন মোট সাড়ে ষোল পৃষ্ঠা। হোসিয়ারি থেকে প্রসাধনী পর্যন্ত ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন রয়েছে সওয়া পনর পৃষ্ঠা। থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ১ পৃষ্ঠার কিছু বেশি।

তাহলে মলাট সমেত মোট ৭৬ পৃষ্ঠার ভেতর—

সাহিত্য—১৯ পৃষ্ঠা
ফিচার ইত্যাদি—২৫ পৃষ্ঠা
বিজ্ঞাপন
বই—১৬ পৃষ্ঠা
ভোগ্যপণ্য ১৫ পৃষ্ঠা
থিয়েটার—১ পৃষ্ঠা

এই সেদিন সম্পাদকের ঘরে গিয়েছিলাম। এখনো প্রথম দেখলে মাথার চুল কাঁচা মনে হবে। হাসিতে, দৃষ্টিতে স্নেহ। সাহিত্যের জন্যে তিনি অনেক করেছেন। সাহিত্যের জন্যে তিনি এখন কাগজের সিকিভাগ রেখেছেন। দীর্ঘদিনের সম্পাদনায় তিনি কত সাহিত্যিক, কবি, লেখক বানিয়েছেন। সেই বানানোর ক্লান্ত আনন্দ তাঁর চোখে-মুখে।

বেরিয়ে আসার সময় মাথার ভেতর কয়েকটি সংখ্যা পাক খাচ্ছিল। কবিতা—৭২। গল্প—৪৯২। উপন্যাস—১৮৭। প্রবন্ধ—১৫৯। সবগুলিই সি এম। হায় গল্প! হায় কবিতা! হায় ধারাবাহিক! হায় প্রবন্ধ!

পাঠক। আপনার অবগতির জন্যে জানাই—আড়াই সি এম মানে এক ইঞ্চি। এবার আপনি নিজে অঙ্ক কষে দেখুন। তাহলে প্রবীণ, মধ্যম ও নবীন মিলিয়ে এতজন সাহিত্যসেবীর জন্যে মোট কত ইঞ্চি জায়গা? আমি সারা বছরের হিসেব ধরেই বলছি।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

অন্যত্র

অস্থিরতা মানেই যৌবন নয়, যৌবন মানেই অবিমিশ্র স্বাধীনতা নয়, উপরন্তু কবিতার যৌবন বড়োই অনির্বচনীয়।

সুভাষ ঘোষাল। হীনযান

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখতে বসলে নিজের প্রকাশ-শক্তির দৈন্য বড়ো বেশি অনুভব করি আমি।

রাধারাণী দেবী। সৈকত

কাব্য এবং উপন্যাসের দুই জগৎ—জীবনের মহান দুটি বোধের ধারা।

অরুণ ভট্টাচার্য। বিশ শতক

ঋত্বিক চলচ্চিত্রে রবীন্দ্র-চিন্তার প্রকাশ দেখতে পেলে সর্বপ্রথম দেখতে হয় 'কোমল গান্ধার'।

অরুণাংশু রায়। বর্ণমালা

নরেন দা তাঁর জন্মের কাকভোরে মৃত্যুর কাছে চেয়েছিলেন একটা আলোকিত প্রহর।

পান্নালাল মল্লিক। অমিতাভ

ক্যানিং মটরলঞ্চ সিন্ডিকেট, যাত্রীদের দুর্ভোগ বাড়িয়েই চলেছেন।

সুন্দরবন সমাচার

মদন ভস্মের শেষ ছাই মাখা বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে কবিতাকে বলতে হয় 'যাই'।
শব্দের মৃত্যুর পর তখন সশব্দে বাজে শ্মশানে সানাই।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। উপল

উঠোনে ঘাস, জোলো হাওয়া, হাসনুহানার গন্ধ, বর্ষার চাঁদ, টুকরো টুকরো মেঘ তবু বুকে পাথর।

গোপাল দাস। আঙিনা

অনবরত পেছনের দরজাটা বন্ধ রেখে
সম্মুখে চলাই চাই,
যেহেতু সময়ের সঙ্গে
আমরণ জীবনের লড়াই।

শিশির ভট্টাচার্য। [illegible]

শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

অলাতচক্র

স্মরণে নেভাও আলো, তুমি
মাল্যহীন রক্তাক্ত আহত
বিমুগ্ধ বিস্মিত বনভূমি
দর্পময়ী নিত্যকর্মরত।

বাসভূমি যৌবন চূড়ায়
মাধুর্যের সম্ভারে আনত
পুষ্পশুষ্ক বসন্ত ফুরায়
অবশেষে লগ্ন সমাগত।

পরিণামে পরিবর্তমান
তুমি জানি অজ্ঞাতাপরমা।
গভীরে অনন্ত অভিমান
রেখে যাও পরিশুদ্ধ ক্ষমা।

সর্বনাশ দূর পরাহত
স্মরকুঞ্জে রোমাঞ্চিত অলি
রিক্তপটে পূর্ণতর ব্রত
অন্য সব প্রপঞ্চ কেবলি।

স্মরণে নেভাও আলো, সীমা
নেই জেনো জলেস্থলে পাপ
বর্ণচোরা নির্মল নীলিমা
দিগ্বিজয়ী আমার সন্তাপ।

প্রাণে পুষ্প ফুটেছিল

প্রাণে পুষ্প ফুটেছিল রাতে
তোমার উদ্দাম পদপাতে
সূর্যের উল্লাস
জ্বলে যায় অরণ্য আকাশ
জ্বলে মরে বসন্তের মাস

তোমার হৃদয়ে ছিল রক্ত কোলাহল
আমি ঢালি এক বিন্দু জল
তুমি তাকে প্রবল বিরাগে
ছুঁড়ে দাও গোধূলির আগে

সত্তায় ছিল না কোন ভার
শোননি আমার হাহাকার

দীর্ঘ স্বর ম্লান ঝরোকাতে
প্রাণে পুষ্প ফুটেছিল রাতে
প্রাণে পুষ্প ঝরেছিল রাতে।

কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধের অনুবাদ

অমোঘ সংকেত কিছু জানা ছিল, আপৎকালীন
পাতাল সৈকত ছেড়ে উঠে আসি, অবাস্তব বিরোধী পদ্যের
সর্বস্ব সন্তোষে যেতে, অলৌকিক মর্মঘাতালিপ।

গোপন চালানে কিছু সাংকেতিক ব্যবহার পেয়েছে কবিরা
ময়দান রক্ষীর কাছে ঘুষ নিয়ে জেনে গেছে মৃত্যুর খোরাক
পতঙ্গ পশুর কাছে পাঠ নিয়ে অমরতা চিনেছে অনেকে
উদাসীনতার কাছে সঠিক পেয়েছে জ্ঞান বিবিধ জন্মের
ফল আহরণ কালে জেনে গেছে অসম্ভব বায়ুর পারিধি
কস্তুরীমালার ফুলে, মান্দাসে আরূঢ় শবে পেয়েছে আহ্লাদ
সহনশীলতা ছেড়ে চলে গিয়ে সকলেই দেখেছে মাস্তুল
পঞ্চমবার্ষিক প্ল্যানে পেয়ে গেছে বিস্ফোরণ ধর্ম বা মানুষ
সর্বজ্ঞ মেধাবী বলে পৌত্তলিক চিহ্নগুলি চিনেছে সত্বর
ঊরু ও জিভের স্বাদে রমণীরে ভালোবেসে দেখেছে গহ্বর
এবং মৃত্যুর বড় দেরী জেনে, এবং উত্থান বড় দেরী জেনে
ক্রমাগত পুড়েছে আগুনে।

বঙ্কিমের নায়িকারা অনেকেই আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল

আলোচনা উঠেছে শেকসপীয়র কেন?

প্রাচীন ও অনতিপ্রাচীন সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। আমরা এমন এক ক্রান্তিকালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যখন সাহিত্য, বিশেষ করে উপন্যাস হারিয়েছে তার পুরনো মূল্যবোধের আশ্রয় ও ঐতিহ্যের অঙ্গীকার, সামনে তার কোনো পথ খোলা নেই, ফলে, বৃহত্তর জনসমাজের দুঃখ-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার আসল চেহারাটিকে কখনো সে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারছে না। বস্তুত বাণিজ্য সফল প্রকাশক সম্প্রদায়ের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস আজ পরিণত হয়েছে সাবান, স্যাম্পুর মত অতি মনোরম এক ভোগ্য বস্তুকে! এই সাহিত্যকেই বলা হয়ে থাকে 'লুম্পেন সাহিত্য' যার সাম্রাজ্য আজ দ্রুত সম্প্রসারণশীল। এই সাহিত্য অন্তঃসারহীন হলেও, মানুষ এক ধরনের ফাঁপা, রংচঙে প্যাকেটে মোড়া দেখতে অনেক স্থূল করে বলেই তার বাজার আজ জমজমাট। আপাত চাকচিক্যের আড়ালে সে ছিনতাই করে নিয়ে যায় মানুষের বোধ ও বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা। বর্তমানে তাই আমাদের আদর্শস্থানীয় যেসব সাহিত্য তার বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

আলোচ্য গ্রন্থটি বঙ্কিম সাহিত্য বিষয়ে এক ছন্দগ্রাহী সমালোচনা পুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককুলের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের তিনি শুধু উদ্গাতাই নন, তাঁর উপন্যাসে ভারতীয় নরনারীর চিরন্তন সুখ দুঃখের ইতিবৃত্ত রূপায়িত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধে আমরা পাই পুরাণ, ধর্ম ও সমাজের নানা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বাঙালি মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসলসমূহকে বুদ্ধিজীবীমহলে প্রচারিত করেছিলেন। ইতিহাসচেতনা ছিল তাঁর মধ্যে এমনই প্রবল যে নানা গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা ও সংস্কারের কাঁটা বনে আবদ্ধ ভারতীয় সমাজে এমনকি তিনি সাম্যবাদ বিষয়েও চিন্তিত হয়েছিলেন। মানুষ হিসেবে ছিলেন তিনি একজন বিরল ব্যতিক্রম। আমরা বুঝতে পারি এই বহুমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণের কাজটি খুব একটা সহজ নয়। লেখক ও গবেষক শ্রীশঙ্করপ্রসাদ নস্কর বঙ্কিম প্রতিভার স্বরূপ উদ্ঘাটনে যথেষ্টই পরিশ্রম করেছেন। দুর্গেশনন্দিনীর রহস্য সন্ধানে, বঙ্কিম উপন্যাসে প্রকৃতি ও নারী, মেঘনাদবধ কাব্য ও বঙ্কিম-উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিম-প্রতিভার উত্তরণ প্রভৃতি আলোচনায় তিনি যতদূর সম্ভব বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর আলোচনা যতটা বঙ্কিমের উপন্যাসভিত্তিক, ততটা 'সাহিত্যসম্রাটের' সমস্ত সাহিত্যের অপরাপর দিকগুলি নিয়ে নয়। অর্থাৎ সমালোচক তাঁর সম্পাদনের কাঁটা বঙ্কিমের উপন্যাসের দিকেই ঘুরিয়ে রেখেছেন, পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাঁকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। তাই তাঁর ১৭৮ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ গবেষণাগ্রন্থটি মনোযোগী রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলেও, অনেকের কাছেই একপেশে বলে মনে হতে পারে।

সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারপদ্ধতি ও নিষ্ঠা সহকারে শেকসপীয়র অধ্যয়নের অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু শেকসপীয়রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনাধর্মী, চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শেকসপীয়রের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা না করেও স্বদেশী সাহিত্যে বঙ্কিমের উৎকর্ষ প্রমাণিত করা যায়। 'এই জন্যেই টেম্পেস্ট নাটক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে সুরু। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সুরু প্রাকৃতিক দুর্যোগে।'—(পৃষ্ঠা ৯১); কিংবা 'মিরান্দার নিকট ফার্দিনান্দ দ্বিতীয় পুরুষ। কপালকুণ্ডার নিকট নবকুমারও দ্বিতীয় পুরুষ' (পৃষ্ঠা ৯২)—তুলনার এধরনের প্রবণতা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের পক্ষে অন্তরায় বলে মনে হতে পারে। অহেতুক তুলনা করার প্রবণতা কোনো কোনো সমালোচকের মধ্যে বিপজ্জনকভাবে দেখা যায় যা তাঁদের বিপথে চালিত করে। শেকসপীয়রের সঙ্গে বঙ্কিমপ্রতিভার তুলনা ব্যাপারটি নতুন নয়। কিন্তু এবিষয়ে অগ্রসর হয়ে কোনো সমালোচকই কি নতুন পথের হদিশ দিতে পেরেছেন? বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীনস্করের প্রাসঙ্গিক আলোচনাও তাই গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে সংযুক্ত 'বঙ্কিম সমালোচনার পুনর্বিচার' নিবন্ধটি বেশ কার্যকরী। বঙ্কিমসাহিত্যের খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা শেষে লেখক এই অধ্যায়ে বঙ্কিম-সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে সাধ্যমতো আলোকপাত করেছেন। সমালোচনার আলোকে যুগ ও সময়কে বোঝা যায়। বঙ্কিম-সাহিত্যের সুলভ সংস্করণ এখন প্রকাশিত হয়েছে যত্রতত্র। বেশ কয়েক ফর্মা বই দপ্তরীর যোগ্য হাত ঘুরে চলে গেছে বহু বিত্তবান ও মধ্যবিত্তের ঝকঝকে গ্লাসকেসে। এর জন্যে প্রকাশকদের তহবিল বিশাল, বিপুলভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে কিনা আমরা জানি না, কিন্তু আদরণীয় ওই বস্তুটি যে তাঁরা অক্ষত তছরূপ করে বসে নেই এবিষয়ে আমরা নিশ্চিত। শুধু প্রশ্ন থেকে যায় আজকের তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় কিভাবে বঙ্কিমকে দেখছেন? পুনর্বিচার তাঁদের কোথায় নিয়ে যাবে বা কি সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করবে আমরা জানি না। তবে আশা করা যায় বঙ্কিমের রচনা পাঠের দিগদর্শন শ্রীনস্কর তৈরি করে রাখলেন তাঁর গ্রন্থে যা বহু সন্ধানী মানুষকে উপকৃত করবে।

বঙ্কিমের উপন্যাসে নারীর আত্মহত্যা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন সমালোচক। প্রশ্ন করেছেন: 'এটা কি জীবনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের একটা গভীর অনাসক্তি নয়?'—পৃষ্ঠা ১৬৬। কামুর 'দি মিথ অফ সিসিফাস' গ্রন্থে ফিলজিকাল সুইসাইড বিষয়ে একটি অসাধারণ রচনা আছে। কামু মনে করেছিলেন পৃথিবীতে যত সমস্যা আছে তার মধ্যে দার্শনিক আত্মহত্যার সমস্যাটিই সবচেয়ে জরুরি। বঙ্কিমের আত্মঘাতী নারীচরিত্রের মনোবিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীনস্কর তাঁদের বিংশ শতাব্দীর জলজ্যান্ত নারীচরিত্রদের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে একাত্ম করে দেখতে পারতেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার' রচিত হওয়ার পর নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে সমালোচকদের নতুন করে চিন্তার অবকাশ আছে। সচেতন সমালোচক হিসেবে শ্রীনস্করের কাছে এই বিষয়ে আরো মনোযোগী ও বিস্তারিত আলোচনা অপেক্ষায় থাকলাম। বঙ্কিম সাহিত্য বিচারে তিনি যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। বিচারের দাঁড়িপাল্লা নিয়ে তিনি এরপর দৃষ্টিপাত করুন সাম্প্রতিক গল্প উপন্যাসের জগতে! কতজন তাঁর হাতে পাশমার্ক পায় দেখতে উৎসুক থাকবে অনেকেই!

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্কিম বিচার। শঙ্করপ্রসাদ নস্কর। বিশ্বজ্ঞান। ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম দশ টাকা।

‘পাতাল আর কতদূর’?

ঃ সুধাংশু ঘোষ। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬। চার টাকা।

কলকাতা থেকে গ্রামে বেড়াতে এসে বরুণ, গাঁয়েরই চারটে ছেলে অংশু, রুণো, চন্দন আর সুমনকে নিয়ে মেতে উঠল সুমনদের পূর্বপুরুষদের ডাকাতি হয়ে যাওয়া ধনসম্পদ উদ্ধারে। ডাকাতি করে পালাবার সময় গুলিবিদ্ধ এক ডাকাতের হাত থেকে লুঠ-করা ধনসম্পদের পোঁটলাটা নদীর ধার ঘেঁষে জলের মধ্যে পড়ে যায় এবং তা গভীর পাঁকমাটিতে চাপা পড়েছিল। মাটি খুঁড়ে সেই সম্পদ উদ্ধার ও গরীব সুমনদের রাতারাতি কপাল ফিরে যাওয়া। কাহিনীর বিষয়বস্তুটি বাংলা কিশোর সাহিত্য যে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এখনও কতটা একঘেঁয়ে আছে—সেটাই মনে করিয়ে দেয়। তবু মূল কাহিনীটি একাধিক আকর্ষণীয় শাখা-কাহিনীর জোরে উতরে গেছে। এবং তার ফলে কিশোর পাঠকরা এই কিশোর উপন্যাসটি একটানেই পড়তে পারবে।

ওরা চারজন ঃ অজিত হাজরা। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

ওরা চারজন রথী, বিজন, আবীর আর কমল—সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ যুবসমাজেরই নির্ভেজাল প্রতিনিধি, যারা বেকারীর জ্বালায় অহোরাত্র জ্বলে মরে কবিতা লেখে, স্মাগলিং করে, প্রেম করে, সামান্য অর্থের জন্যে দলের টাকায় কুমীর খোড়েল দাদাদের হয়ে জান লড়ায়, সংসার-সুখ-স্থিতির স্বপ্ন দেখে—এইসব। কলকাতা থেকে ওরা চারজন কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত জীবনের কিছুটা নতুন স্বাদ পেল। কমল ওখানেই জ্বরে ভুগে মারা গেল। বাকি তিনজন নিজেদের আর একরকম নতুনভাবে খুঁজে পেল কি পেল না!—সব-কিছুই বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত। যেমনটা বিপ্লম ভবেশদা কেতকী শান্তনু সমীর প্রভৃতি চরিত্রগুলি। লেখকের আন্তরিক উপস্থাপনায় ওরা চারজন, কোন কোন মুহূর্তে পাঠকের বুকে দারুণ মোচড় দেবে। তবু বলতে হয়—কেতকীর মত চাকুরে ও ঘর-দুনিয়া সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকে-বহাল, মেয়েরা কি অত সহজে শান্তনুদের মত পশুদের খপ্পরে পড়ে বা অমনটা নিদারুণভাবে পড়ে? কি রথীদের মত শিক্ষিত বেকার তরুণরা কি অতো বেশি রকের শব্দ ব্যবহার করে? এগুলো লেখকের অভিজ্ঞতার কিছুটা ফাঁকটাই দেখিয়ে দেয়। প্রচ্ছদ ভালো।

দিনলিপি

অন্তরঙ্গ দিনলিপি ।। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।। পুস্তক প্রকাশনী ।। পাঁচ টাকা।

‘আজ কল্যাণী ও আমি নদীতে স্নান করে এলুম। খেয়ে স্কুল। চারটার সময় করুণা মুখুজ্যে আকাইপুরে ও আমি কলকাতায়।’ লিখি। স্কুল। মাকাল লতার ফল দেখে আজ চোখ দিয়ে সত্যিই জল এসে পড়লো।’ ‘সকালে উঠে কল্যাণী ও আমি স্নান করে আসি। তখনও আকাশে নক্ষত্র। লিখি। স্কুল সকালে ছুটি।’ পর পর কয়েকটি দিনের দিনলিপির অংশ। লেখক কে বলে দিতে হবে না। এতো সরলভাবে কথা ছদ্মবেশী অপু ছাড়া কে বলতে পারে? স্নান করার কথা ইছামতীকে ভালোবাসা গল্প করা স্কুল যাওয়া এমনি সব সরল সাধারণ বিষয় ‘অন্তরঙ্গ দিনলিপির’ পাতায় পাতায় হাজার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। সদ্য প্রকাশিত দিনলিপিটি একটু আলাদা জাতের। তিনি ভাবেন নি এ লেখাও ছাপা হয়ে লোকচক্ষুর সামনে হাজির হবে। নিজের গোপন ড্রয়ারে গভীর রাত্রিতে লিখে তালা বন্ধ করে শুয়ে পড়া চাবিটি অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখে—এ হলো সে জাতের ডাইরি। ছোট ছোট বাক্য গঠন ক্রিয়াপদও প্রায়ই নেই। সংসারী স্নেহপ্রবণ আবার উদাসীন লেখকের কিছু কিছু পরিচয় এখানে রয়েছে তবে ভাবুক বিভূতিভূষণ এখানে প্রায় অনুপস্থিত। প্রণবেশ মাইতির প্রচ্ছদ সুন্দর ও অর্থবহ। এই দিনলিপিটি অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নিগ্রহ

—আঁতেল, আঁতেল।

আচমকা দুটি বিকৃত ফরাসী-ঘেঁষা উচ্চারণ। চেয়ে দেখলাম। দেখলাম তিন-চারটে উঠতি ছেলের কলরব, ঠোঁটের ডগায় ঈষৎ হাসি, চোখে-মুখে বাঁকা ইঙ্গিত। বেশ মজাদার সংলাপ—কবি, আসলে কবিতা লেখা এখন কতো ইজি দ্যাখ্। ছন্দ লাগে না, মিল দরকার নেই, ভাবওনা। গোটাকয় শব্দ, ব্যাস।........

এদিক ওদিক তাকালাম। চোখে যা পড়ল, চলন্ত এমু কোচের মধ্যে কবি বলে কাউকে চিনলাম না। আঁতেল, যা ভাব-ভঙ্গিতে আঁতেল কেউ, না, দেখলাম না। তাহলে, তাহলে কি! একটু সংশয় খানিকটা কৌতূহল। কিন্তু ওদের একটা ছেলেকে ইঙ্গি-দুই চিনি। সেও। তবে কি, উপলক্ষ্য....এই অধম।

ভাবছিলাম।

আর

আশপাশের মানুষগুলো এমনভাবে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, আঁতেল শব্দটা কখনো শোনেনি। বেশ কিছু দূরত্ব ও বিস্ময় ওদের চোখে, তাকিয়ে বোঝারচেষ্টা করছিল।

মনে হলো, প্রতিটি মানুষ কতো একা, আলাদা বিচ্ছিন্ন, নির্জন দ্বীপের মতো কেউ যেন কাউকে ঠিক বোঝে না। সামাজবিজ্ঞানী হয়তো একেই বলবেন এ্যালিয়েনেশন, বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, শুকনো পণ্ডিত হতে চাইও না, আমি চাই—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় ‘রসে-বশে’ থাকতে। তবুও আঁতেল শব্দটা আমাকে...

ছেলেবেলায় স্পষ্ট মনে আছে, আমার দাদু আমাকে বলতেন পাগোল। এখনো, অনেকে হয়তো। হয়তো কেন, এই ছেলে-গুলো ভেবে নিয়েছে আমি পণ্ডিত বা এবং কবি। কিন্তু ওরা জানে না, আমি ওসব কিচ্ছু না, কিছু না।

শ্মশানের ভাঙা দেয়ালে কয়লার কালিতে কতো নাম লেখা দেখেছি। দেখেছি তীর্থ-ক্ষেত্রে, বৃন্দাবনের মন্দির-চত্বরে শ্বেত-পাথরে লেখা নাম-ধাম, ট্রেনের গায়ে কারা লিখেছে তাদের নাম, হয়তো বা মানুষের গোপন অভিলাষ এই—চিরকাল বেঁচে থাকবে। অথচ জানে না মহাভারতে যুধিষ্ঠীর কী বলেছিলেন। ‘মানুষ মরণ-শীল, একথা জেনেও সে চিরকাল বাঁচতে চায়।’ —এটাই পৃথিবীর সবথেকে আশ্চর্য বিস্ময়! ওরা কেন, আমিও চাই, এমনকি মৃত্যুর পরেও বাঁচতে! এবং চাই বলেই কবিতা লেখার চেষ্টা করি। চাই বলেই এ বিড়ম্বনা।

অফিসের এক বন্ধু তো বলে, কবি নয়, কপি। অতো কেন, ৪৪৪ নামে আমার কবিতার একটা বই বেরুবার পর যা প্রতিক্রিয়া! মনে আছে আমার এক গল্পকার বন্ধু জানাল, তার এক বন্ধু (ইংরেজীর অধ্যাপক) ও সে এক রেস্টুরেন্টে খাচ্ছিল। কথায় কথায় আমার কবিতার প্রসঙ্গ উঠতেই ঐ অধ্যাপকটি রাগে দুঃখে ক্ষোভে অভিমানে ফেটে পড়লো কাঁপতে কাঁপতে টেবিলে ঘুষি মেরে চেঁচিয়েউঠলো—এগুলো কবিতা? তুমি আমাকে কবিতা শেখাতে এসেছো?

সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। কেউ না জানুক আমি তো জানি, আমি কবি না, (লোরকা-কথিত দুয়েন্দে-র স্পর্শ আছে কি আমার লেখায়?) কবিতা লেখার চেষ্টা করি মাত্র, খুঁজে বেড়াই—এই পর্যন্ত। তবু অনেকেই কবি ঠাউরে আমাকে নিন্দা-মন্দে মেতে ওঠে। কেন, বুঝি না। এ ভালো-বাসার শাসন; অথবা শত্রুরূপে ভজনা। এরা ‘রাজা’ নাটকের কাঞ্চীরাজ নয়তো। আসলে এরা রসিক, তাই আমাকেও কবি ভেবে বসে; গুণ এদের, ত্রুটি যা-কিছু আমার।

মানুষ যথার্থই অনাগরিক। জন্তু পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ—রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘মানুষের ধর্মে’ একথা জানিয়েছেন। আমি বাসা ছেড়ে পথ চলতে চেয়েছি তাই কি এই নিগ্রহ?

পরেশ মণ্ডল

শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের কাছ থেকে শরৎ পুরস্কার নিচ্ছেন মারাঠী নাট্যকার শ্রীবিজয় তেণ্ডুলকার বোম্বাইয়ের শরৎ অনুষ্ঠানে।

শরৎ প্রসঙ্গে দুই লেখক ও পাঠক

(১)

আপনাদের ২১-১-৭৭ তারিখের প্রাত্যহিক অমৃত-এ কবি কৃষ্ণধরের লেখা অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের যে মূল্যায়ণ সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় করেছেন তা জানতে পারলুম।

বাটানগর সাহিত্য সংসদের সহ-সভাপতি সত্য রায়ের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত সংসদের অধিবেশনে (২২-১-৭৭) সাহিত্য সভায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, নানান পত্রিকার সম্পাদক, প্রবীণ-নবীন কবি ও লেখক এবং সাহিত্যানুরাগী সংসদ সদস্য সর্বসম্মতভাবে ঐ মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ব্যক্তি ও শিল্পী শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে শ্রীঘোষ এবং শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় যে মন্তব্য রেখেছেন, আমরা মনে করি তা শুধু শরৎচন্দ্রেরই অপমান নয়— অপমান সমগ্র ভারতবাসীর। যিনি ভারতীয় সাহিত্যের শিব, সেই শরৎচন্দ্রের নিন্দা সমগ্র মানবজাতির কলঙ্ক। আমরা আশা করি—আপনাদের বহুল প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক আমাদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের কথা প্রকাশ করে, একজন মহান শিল্পীর সৃষ্টি সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশের বিরুদ্ধে আমাদের ধিক্কারের ছবিটি তুলে ধরবেন। —বাটানগর সাহিত্য সংসদের সভ্যবৃন্দ।

১। অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়, ২। স্বামী প্রেমানন্দ, ৩। মনোজ হালদার, ৪। সুভাষ বিশ্বাস, ৫। অনুপকুমার আচার্য ৬। মনোজ গোস্বামী, ৭। দেবপ্রসাদ মণ্ডল, ৮। সত্য রায়, ৯। সত্যরঞ্জন মণ্ডল, ১০। স্বরূপ পাল, ১১। সঞ্জীব মৈত্র, ১২। তপন অধিকারী, ১৩। জগন্নাথ সান্যাল, ১৪। চিরঞ্জিব সেনগুপ্ত, বাটানগর ২৪ পরগণা।

(২)

যেখানে শ্রীসমরেশ বসুর মত শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক বলছেন, 'শরৎচন্দ্রের কাছে আমি ঋণী', সেখানে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আজকের মাপকাঠিতে শরৎচন্দ্রকে পাস মার্ক দিতে কি করে দ্বিধা প্রকাশ করেন, তার কারণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণধর যদি সবিস্তারে লেখেন তাহলে বাধিত হব। কেননা সন্তোষবাবু ও সুনীলবাবু কি কি যুক্তি দিয়ে শরৎচন্দ্রকে অস্বীকার করেন তা আমার জানতে বড় ইচ্ছে হয়। বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাকসাড়া। হাওড়া।

(৩)

এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ কোন জিনিসই পৃথিবীর চেয়ে বেশি অক্ষয় নয়। এবং অবশ্য সাহিত্য তো নিশ্চয় নয়। কারণ, সাহিত্য-শিল্পের চেয়ে অনেক বড় কয়েকটি জিনিস মানুষের চেয়ে আগে থেকে এখানে আছে। যেমন—হিমালয়, প্রশান্ত মহাসাগর। তাই মনে হয়—সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রকে যেমন অবশ্যই শ্রদ্ধা করবো—তেমনই এঁদের সম্পর্কে যদি সমালোচনার নতুন কোন আলো কেউ দেখতে পারেন—যদি সে যুক্তি শরৎ-রবীন্দ্রনাথকে ভিতসুদ্ধ তুলেও দেয়—তবু তা আমরা বিচার করে দেখবো না কেন? দেখতে দোষ কোথায়? এঁরা তো পৃথিবীর চেয়ে পুরনো নন। যুগে যুগে বহু বিশিষ্ট চিন্তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ উঠেছে। কোথাও প্রচলিত বিশেষ শিল্প সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। কোথাও চ্যালেঞ্জ ধোপে টেঁকেনি বলে

সেই বিশেষ শিল্প, মতবাদ, সাহিত্যের শেকড় আরও মূলে প্রোথিত হয়েছে।

অতএব শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সন্তোষকুমার ঘোষ বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যদি বলে থাকেন—শরৎচন্দ্রের কোন প্রভাব নেই, শরৎচন্দ্রের লেখায় বর্ণিত গ্রাম আর এখন নেই—তাতে অসুবিধা কোথায়? ওঁরা দুজন লেখক—তাই বোম্বাইয়ে শরৎ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ওঁরা লেখক বলেই কোন গভীর বিশ্বাস থেকে ওকথা বলেছেন। অনেকে সে-মতের সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু ওই দুজনের বিশ্বাসকেই বা অশ্রদ্ধা করি কোন দিক থেকে। ওঁরা দুজনই আমাদের মতই বাঙালী এবং লিখে থাকেন।

অমৃত সাপ্তাহিকের পাঠক হিসেবে আশা করব—সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যদি তাঁদের বক্তব্য বিশদ করে অমৃত-তে লেখেন—তাহলে আমরা ওঁদের বিশ্বাস সম্পর্কে একটা আন্দাজ পেতে পারি। বুঝতে পারবো—ওঁরা কোন বিশ্বাস থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ওসব কথা বলেছেন। ওঁরা দুজন আমার বিশেষ প্রিয় লেখক বলেই এভাবে ভাবছি। ওঁদের ওপর পাঠকের এই অধিকারটুকু আছে। কারণ পাঠক সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে পড়ে থাকেন।—বৈকুণ্ঠ পাঠক, কলকাতা-২৬।

(৪)

৩৫ সংখ্যা অমৃতে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে প্রখ্যাত সাহিত্যসেবীদের শরৎচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। একালের জনপ্রিয় লেখক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ এবং শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য জেনে বিস্মিত হলাম। অন্যান্য সাহিত্য-সেবীরা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যথেষ্ট শালীন ও শ্রদ্ধাশীল মন্তব্য করেছেন।

আমি একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী। আমার মত অনেকেই আছেন। আমার বই-এর আলমারীতে একমাত্র সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী আছে শরৎচন্দ্রের এবং গিরিশ ঘোষের। রবীন্দ্রনাথের আংশিক। আমি অনেক বাড়ীতেই দেখেছি শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী না থাকলেও কয়েক খণ্ড আছে এবং বারবার ব্যবহারে জীর্ণ অবস্থায়। আমি একাধিক লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এক সপ্তাহে যত বই পাঠকরা ব্যবহার করেন তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের বই-ই বেশী।

সাধারণভাবে জানা যায় শরৎচন্দ্র এখনও জনপ্রিয় লেখক। শতবর্ষে তাঁর কতো বই বিক্রি হয়েছে তার পরিসংখ্যান না জানা
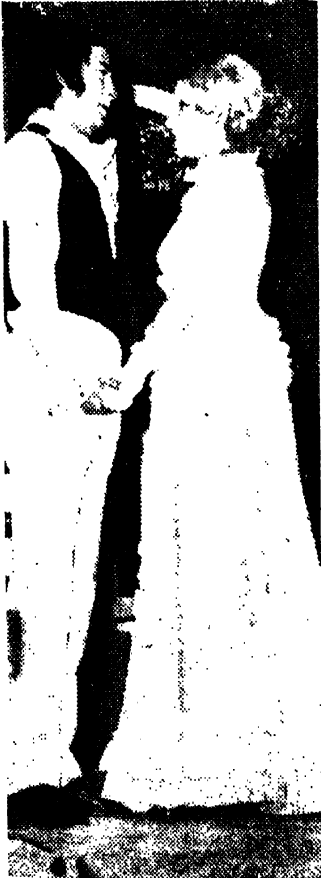
বোম্বাইয়ের শরৎ অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্রের নাটক কোরালের একটি দৃশ্যে মিলন মুখার্জি ও শিখা মুখার্জি। পরিচালনা অলোক ধর।

ভাষণ দিচ্ছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বোম্বাইয়ের শরৎ অনুষ্ঠানে।

থাকলেও এটা লক্ষ্য করেছি, অনেকে ধার করে গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করেছেন। সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে শরৎ-চন্দ্রের বইয়ের বিক্রি রবীন্দ্রনাথ থেকেও বেশী। মোট কথা শরৎচন্দ্রের কাহিনীর মধ্যে আমাদের জীবনের এক সূক্ষ্ম সাদৃশ্য আজও রয়েছে, যে কারণে তিনি আজও আমাদের গ্রহণযোগ্য। যে কোন মহৎ শিল্পের সার্থকতা এখানেই। আর সেখানেই শিল্পীর অমরতা। শরৎচন্দ্র কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। তাঁর পরবর্তী লেখকদের ওপর যে প্রভাব তিনি রেখেছেন তা বিস্তৃত বিশ্লেষণসাপেক্ষ। কিন্তু সুনীলবাবু বা সন্তোষবাবুর রচনা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ করেছে তা পরীক্ষার সময় এখনও আসেনি। শরৎচন্দ্রের গ্রাম বা চরিত্র যদি কেউ খুঁজে না পান তার জন্য যত আক্ষেপই করা হোক না কেন বৃহত্তর পাঠক সমাজও তাঁদের বিচারের জন্য অপেক্ষারত।

আরও একটি কথা, শরৎচন্দ্র বাঙলার সমাজ ও জীবনকে জানতেন। যার অভাব আজকের লেখকদের মধ্যে প্রকট। বাইরের জীবন, জীবন নয়। শব্দচাতুর্যে বা আচমকা বক্তব্যে হৈচৈ তোলা যায়। যেমন বাঙলার একটি রাজনৈতিক দল রবীন্দ্রনাথকে 'বুর্জোয়া' কবি বলে আসর জমাতে চেয়েছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং ঐ রাজনৈতিক দলকেই বারবার ক্ষমা চাইতে হয়েছে। একথা আমাদেরও মনে রাখতে হবে। **নীলকণ্ঠ সেন;** বারুইপুর।

(৫)

২৯ জানুয়ারীর অমৃতে কৃষ্ণ ধরের লেখায় যা জানলাম তাতে যশস্বী লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য মর্মাহত করে। সুসাহিত্যিক সাংবাদিক সন্তোষ-কুমার ঘোষের মন্তব্যও পীড়াদায়ক। শ্রীঘোষের মতে শরৎবাবুর গল্প রূপকথার মত। বাস্তবে এসব চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন দিক থেকে তিনি বিচার করেছেন জানি না। তবে একথা বলা যায় শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে যে সমস্যা-গুলি তুলে ধরেছিলেন একালে সেগুলির গুরুত্ব অনেক পরিমাণেই হ্রাস পেয়েছে। 'বিধবার প্রেম,, বিবাহ আজ আর সমস্যা নয়। তারউপন্যাসে বাংলার যে গ্রাম উপ-স্থিত ছিল সে গ্রাম নেই তার রূপ বদলেছে, গ্রামীণ মানুষের মন, আচার আচরণ অন্য দিকে মোড় নিয়েছে। কিন্তু সেকালের সমাজে যে সমস্যা যে চরিত্র বিরাজ করত তা যথার্থই তিনি বাস্তবায়িত করেছেন। বলতে দ্বিধা নেই গ্রাম বাংলায় ঘুরলে বহু গ্রামের গ্রামীণ মানুষের সংসারের ও মানুষের চরিত্রের সঙ্গে শরৎ-সৃষ্ট সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আজও আছে সেই নানাবিধ সংস্কার। তাই শরৎসৃষ্ট চরিত্র ও গ্রাম অতি বাস্তব--যা আজও সত্য। সুনীল-বাবুর মন্তব্য 'আধুনিক লেখকদের উপর কোন প্রভাব নেই' এর জবাব রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন তার বক্তব্যে। 'তিনি (শরৎচন্দ্র) নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে, স্পষ্ট করে, দেখিয়েছেন তেমনি সংগোচর করে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদ্ঘাটিত করেছেন সেইখানে আধুনিক লেখকের প্রবেশ সহজ হলো। তাদের আনাগোনাও চলছে। একদিন তারা হয়ত সেকথা ভুলবে। এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভোলে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে।'

চঞ্চল সিংহরায়
রোহিয়া (গড়াপ)

(৬)

গত ২৮ থেকে ৩০ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ের বঙ্গভবনে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের তিন দিনের শরৎ জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ ধর অমৃতের ২৯ জানুয়ারীর সংখ্যাটিতে।

অনেকের অনেক কথার মধ্যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একালের দুজন বহুল প্রচারিত লেখকের ধারণা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একজন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, অন্যজন শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীঘোষ বলেছেন — 'একটা বয়সে শরৎচন্দ্রকে ভাল লাগত। এখন লাগে না। শরৎবাবুর গল্প রূপকথার মত। বাস্তবে ঐ সব চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহসও ছিল না ভদ্রলোকের। ভালবাসার কথা লিখেছেন, বিয়ে দিতে পারেন নি।'

কিছু দিন আগে সুনীলবাবু বঙ্কিম-চন্দ্রকে তৃতীয় সারির ঔপন্যাসিক বলে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন। এবারে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বললেন—'শরৎবাবু ঐ সব গ্রামের কথা লিখেছেন [illegible]

হদিশ পাওয়া কঠিন। আধুনিক লেখকদের ওপর তাঁর কোন প্রভাব নেই।'

সন্তোষবাবুর বা সুনীলবাবুর ভাল লাগা বা না লাগায় কারোরই কিছু যায় আসে না। কিন্তু যখন বক্তার আসনে বসে আপন ধারণা ব্যক্ত করবেন তখনই আপত্তি। কেন আপত্তি। বলি, একজন বক্তা যখন মঞ্চে উঠে কারও সম্বন্ধে বা কোন বিষয়ে বক্তৃতা করেন সেক্ষেত্রে বক্তার ব্যক্তিগত ধারণাটাই প্রধান নয়। আলোচ্য ব্যক্তি বা বস্তুটির ওপর সমষ্টি এবং সমষ্টির কাছে আলোচ্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রভাব বিশ্লেষণই প্রধান হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত ধারণার প্রকাশ ঘটানই বক্তার একমাত্র কাজ নয়।

গণ্ডা কয় বিয়ে করে অসীম সাহসিকতার পরিচয়টা রাখতে পারেন তো। আর, সুনীলবাবু কি শরৎ গবেষক নাকি? কটা গ্রাম তিনি দেখেছেন? কটা গ্রামে গিয়ে বাস করেছেন যে তার হদিশ খুঁজে পাবেন? সুনীলবাবুকে বলি, আধুনিক লেখকদের ওপর শরৎচন্দ্রের প্রভাবটাই বড় কথা নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আজও তাঁর (শরৎচন্দ্রের) প্রভাব সমুজ্জ্বল। —মাধব ভট্টাচার্য, ফুলিয়া, নদীয়া।

(৭)

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে' বিভিন্ন গুণী ব্যক্তি এবং সাহিত্যিক, সাংবাদিকের যে মন্তব্য 'অমৃত' সাপ্তাহিকে কবি কৃষ্ণ ধর তুলে ধরেছেন, তার পক্ষে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সন্তোষকুমার ঘোষের মন্তব্য সম্পর্কে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমার কিছু নিবেদন আছে।

সন্তোসবাবু এবং সুনীলবাবুর বক্তব্যের বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝবার জন্যে মন্তব্যগুলি সামনে থাকা ভালো। সুনীলবাবু বলেছেন, 'শরৎবাবু যেসব গ্রামের কথা লিখেছেন বাস্তবে তার হদিস পাওয়া কঠিন। আধুনিক লেখকদের ওপর তাঁর কোন প্রভাব নেই।' সন্তোষবাবু বলেছেন, 'শরৎবাবুর গল্প রূপকথার মত। বাস্তবে এসব চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহসও ছিল না ভদ্রলোকের।'

সাহিত্যিক সমরেশ বসু—যিনি বর্তমান কালের একজন শক্তিমান কথাসাহিত্যিক, তিনি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন ঐ একই সম্মেলনে, তা কি ভুল? কিংবা যদি প্রশ্ন তুলি শ্রদ্ধেয় তুষারকান্তি ঘোষ, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু, অন্নদাশংকর রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপালচন্দ্র রায়েরও দৃষ্টি কি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত? রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যও কি ভ্রান্তিজনিত? প্রমথবাবুও কি শরৎচন্দ্রকে বুঝতে পারেন নি [illegible]?

ভাষণ দিচ্ছেন সমরেশ বসু—
বোম্বাইয়ের শরৎ অনুষ্ঠানে।

যে শরৎবাবুর গল্প-উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী থেকে সমস্ত বাঙালী পাঠকই মুগ্ধ তাঁর সম্পর্কে আজকের সাহিত্যিকদের এই মন্তব্য শুনে বিস্মিত হতে হয়। একজন বাঙালী হিসেবে দুঃখিতও কম হই না। —সত্য রায়। বাটানগর।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

৩৫ সংখ্যায় অমৃত পত্রিকায় অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার উপরে অমিতাভ গুপ্তর নাম ছাপা হয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম, কেননা লেখক সূচীতে এবং কবি পরিচিতিতে আছে অমিতাভ দাশগুপ্তের নাম। এত বড় ভুল কি করে ঘটল ভেবে পাচ্ছি না। আমরা আশা করব এমন ভুলের দিকে ভবিষ্যতে আপনাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে। —চিত্রভানু সরকার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

(দুঃখিত সতর্ক থাকবো)

একটি জিজ্ঞাসা, একটি অনুরোধ

অমৃতের বিনোদন সংখ্যায় প্রকাশিত 'উৎপল দত্তের জবানবন্দী' শিরোনামে প্রকাশিত লেখাটিতে একটি ভুল চোখে পড়ল। উৎপলবাবু তাঁর প্রিয় নাটকের উল্লেখ করতে গিয়ে শেক্সপীয়রের একটি নাটকের নাম করেছেন। আমার মনে হয় অমৃতে নাটকটির নাম ভুল ছাপা হয়েছে। অমৃতে ছাপা হয়েছে 'টিমস অফ এথেন্স'। ঐ নামে শেক্সপীয়রের কোন নাটক নেই। নামটি হওয়া উচিত 'টাইমন অফ এথেন্স'। ঐ নামে শেক্সপীয়রের একটি নাটক আছে। অনুমান শ্রীদত্ত নিশ্চয়ই ভুল বলেন নি।

উৎপলবাবুর কাছে অনুরোধ, শেক্সপীয়রের এত ভালো নাটক থাকতে এই বিশেষ নাটকটিই তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগল কেন যদি অনুগ্রহ করে জানান বাধিত হবো। বিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শালডিহা বাঁকুড়া

লেখক

২৮ জানুয়ারী অমৃতে পাঠক, সম্মান, দক্ষিণা লেখাটির জন্য বৈকুণ্ঠ পাঠককে আমরা অজস্র ধন্যবাদ জানাই। তিনি পাঠক ও লেখকের সুবিধা অসুবিধা উল্লেখ করেছেন তা নিশ্চয়ই লক্ষণীয়। লেখক যেন পাঠক-ও লেখকদের মনের কথা খুলে বলেছেন। লেখক বৈকুণ্ঠ পাঠক, ভেঙেপড়া লেখক ও তরুণ গল্পকারদের নিশ্চয়ই উৎসাহ যুগিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা লেখক বৈকুণ্ঠ পাঠকের কাছে আবেদন করছি—তিনি যেন সাহিত্য সম্বন্ধীয় ও লেখকদের গভীর সমস্যাবলীর বিশ্লেষণ করেন। আশা রাখি বৈকুণ্ঠ পাঠক আমাদের অজানা কিছু সাহিত্য সম্বন্ধীয় খবরাখবর ও নতুন লেখকদের উৎসাহিত করার মতো কিছু লিখবেন। —দীপ্তি মল্লিক, ২৪ পরগণা।

গ্রন্থ সমালোচনা

'অমৃত' পত্রিকার ২৯ জানুয়ারীর সংখ্যায় আমার লেখা 'নজরুল-জীবন চরিত' গ্রন্থখানির সমালোচনায় এটিকে গবেষণাগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত জানাই, গ্রন্থখানি আদৌ 'গবেষণা গ্রন্থ' নয়। আমি 'নজরুলের মানসলোক ও তাঁর সাহিত্যের উৎস'—এই সম্পর্কে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডকটরেট পেয়েছি, এবং সেই গবেষণার বিষয় স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে। গবেষণাকালে নজরুল জীবনের যে সকল উপাদান সংগ্রহ করেছিলাম, সেগুলি অবলম্বন করেই বর্তমান নজরুল জীবন চরিত গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। আশা করি, এই পত্রটি প্রকাশ করে সমালোচকের ওই ভুলটি সংশোধন করবেন।

এই সঙ্গে আর একটি কথা জানাই। গ্রন্থ সমালোচনাকালে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম, ঠিকানা ও মূল্য উল্লেখ করা রীতিসিদ্ধ ও শোভনসুন্দর। সম্ভব হলে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন অনুগ্রহ করে। —মিলন দত্ত, কলকাতা-৫৪।

২৮ জানুয়ারী অমৃতে প্রকাশিত 'সুনীতিবাবুকে জীবনানন্দ দিয়েছিলেম' লেখাটি পড়লাম। 'রবীন্দ্রনাথ' পড়ার পর ওসব পড়তে আর ইচ্ছে করে না' সুকুমার বাবুর মন্তব্যটা অন্ততপক্ষে এই সময়ে মেনে নেওয়া যায় না।

সুকুমারবাবুর মতো লোক আমাদের থেকে অনেক বেশিবার পৃথিবীকে সূর্যের চারিদিকে ঘুরতে দেখেছেন। অতএব আমরা আশা করব তাঁদের মতো পূজারা আমাদের ভুল ধরিয়ে দেবেন বলবেন—এটা এভাবে নয়—ওভাবে কর, ভাল হবে। কিন্তু অবহেলা দিয়ে কি কোনো প্রতিভার যথেষ্ট উন্মেষ সম্ভব?

কোনো সম্পাদক যদি নতুন লেখকের লেখা না পড়েই 'ওয়েস্ট পেপার বক্সে' ফেলেন তবে নতুন প্রতিভায় যাচাই হবে কি করে? দেবেশ চক্রবর্তী, ঢাকুরিয়া।

ামি ইংরিজিতে জীবিত
চেয়ে বড় কবি ঃ প্রীতিশ

নাথ গুপ্ত

কোনো বাংলা দৈনিকপত্রেই নামটা
ভাবে ছাপা হয়নি। টেলিপ্রিণ্টারে
 কিন্তু ঠিক বানানেই নামটা
ছিল।'— গলায় একটু দুঃখের তাপ
 প্রীতীশ নন্দী বললেন, 'আম
ী, আপাদমস্তক কলকাতার নাগরিক.
কবিতা আমাকে প্রথম সর্বভারতীয়
 এনে দিয়েছিলো তাও এই কল-
ক নিয়েই লেখা, অথচ কলকাতার
শ কবিতা পাঠক অনেকেই আমাা
প্রায় জানেনই না! সত্যিই বাংলাদেশে
ীশ নন্দীর নাম তেমন পরিচিত হয়ে
 এখনো। তাই তার পদ্মশ্রী প্রাপ্তিটা
কর কাছেই বিস্ময়ের।

রে lone song street -এর
 বাজছিল। প্রীতীশেরই কবিতার
 এটা স্বকণ্ঠে চমৎকার আবৃত্তি
ছেন, সঙ্গ দিয়েছেন প্রেমিকা শ্রীমতী
কা সরাভাই। কয়েকদিন আগে
ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
ঠানিকভাবে এই রেকর্ডটির উদ্বোধন
ছেন। ঐ lone song street কাব্যাংশ
 একটি ছোট্ট দু রিলের ফিল্মও তোলা
 হচ্ছে বলে তার ব্যস্ততা ছিল।
ীশ রেকর্ড বন্ধ করে দিলেন, ফিল্মের
দের সবিনয়ে বিদায় দিয়ে বল্লেন,
 ভেতরের ঘরে একটু আরাম করে বসা
 কলকাতায় আপনিই তো প্রথম এলেন
রভিউ নিতে।

এই ১৯৭৭ জানুয়ারীতে মাত্র ত্রিশে
ছেন। কবিতার জন্য এবারের একমাত্র
ী প্রীতীশ নন্দী সর্বভারতীয় ও
র্জাতিক ক্ষেত্রেও শ্রুতকীর্তি কবি।
ন ইংরেজীতে, যখন লেখেন উন্মাদের
 দ্রুত বেগে লেখেন। মাত্র দশ বছর
 থেকে লিখতে আরম্ভ করেছেন,
, এর মধ্যেই মৌলিক কাব্যগ্রন্থের
 তেরটি। এক ১৯৭৬ সনেই বেরিয়েছে
ট কাব্যগ্রন্থ। অধিকাংশই আবার
লেড হোনিম্যানের মতো বিখ্যাত
কের কাছ থেকে। এর আগে কবিতার
 তো নয়ই, অন্য কোনো ক্ষেত্রেও এত
 বয়সে কেউ পদ্মশ্রী পেয়েছেন কিনা
হ। অত্যাধুনিক সাজপোশাক, গুটীক
াদের মতো বাজুবন্ধের ওপর বিশেষ-
 ন্যস্ত ঘড়ি। কোমল দু চোখের সঙ্গে
নান রাগী ঠোঁট প্রীতীশ নন্দী সোফা
 নেমে মেঝের কার্পেটে গা এলিয়ে
ন। বল্লাম, নিজের তেরটি কাব্য-
 ছাড়াও তো আপনি অনেক অনুবাদ
ম্পাদনা করেছেন?

হ্যাঁ, নিজস্ব তেরোটি বই ছাড়াও দশটি
াদগ্রন্থ আছে। সমর সেন, সুভাষ
াপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র
াগুপ্ত, থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথের
কবিতাও অনুবাদ করেছেন প্রীতীশ। সম্পাদনা করেছেন পাঁচটি কবিতা সংকলন-গ্রন্থ। তার নিজের কবিতা পাঞ্জাবী, উর্দু, হিন্দী, গুজরাতি, তামিল, মালয়ালম, তেলেগু, মারাঠি এবং বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন অমৃত প্রীতম, কায়ফী আজমী, রমেশ গোর, চন্দ্রকান্ত বকসীর মতন বিখ্যাত অ্যাকাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্তরা। প্রীতীশ নন্দী নিজেও সাহিত্য অ্যাকাডেমী নির্বাচক মণ্ডলীর সভ্য। যদিও মনে করেন যে সাহিত্য নামক পবিত্র শব্দটির ডানপাশে যখন অ্যাকাডেমী শব্দটি আছে তখন অ্যাকাডেমিক রচনা ছাড়া প্রথাবিরুদ্ধ অনাপূর্ব-রচনার রচয়িতাদের সরকারী স্বীকৃতি পাওয়া মুস্কিল। যদিও পদ্মশ্রী এবং অ্যাকাডেমী পুরস্কার এই দ্বিবিধ সরকারী স্বীকৃতির মধ্যে অ্যাকাডেমী পুরস্কার পেলেই শ্রীনন্দী খুশী হতেন বেশী, বলে জানালেন। তাতে অন্তত এই-টুকু প্রমাণিত হতো সম্পূর্ণ নতুন রীতির লেখকদেরও সমাদর হয়। একবার নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে প্রীতীশের নামও উঠেছিল অ্যাকাডেমী পুরস্কারের জন্য। কিন্তু নিজে অ্যাকাডেমীর নির্বাচক সমিতির সভা হওয়ার সঙ্গত কারণেই তাঁর নিজের ভোটটি ব্যবহার করা যায় নি। বললাম অ্যাকাডেমী সম্পর্কে আপনার এই সবাক বিরূপতা নিয়েও কেন এখনো সভ্য আছেন। বল্লেন, আছি প্রতিবাদ হিসাবে। এই ক বছরে প্রতিবাদ হিসাবে প্রত্যেকবারই আমি টাটকা, তাজা, সৎ, নতুন রীতি প্রকরণের রচনার লেখকদের নাম পাঠিয়ে আসছি, সঙ্গত কারণেই একজন লেখকও তাঁদের মধ্যে মনোনীত হননি এযাবৎ।

বাইরের ঘরে বেশ কিছু লোক তখনো বসে আছেন। ইচ্ছে থাকলেও বেশী সময় দেবার ক্ষমতা নেই, তাই সরাসরি কতগুলো প্রশ্ন করলাম ও উত্তর চাইলাম প্রীতীশ নন্দীর কাছে।

প্রশ্নঃ প্রথম ইন্দো-এ্যাংগলিয়ান কবি হিসাবে পদ্মশ্রী পেয়ে আপনার মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে?

উত্তর ঃ দেখুন আমি ইন্দো-এ্যাঙ্গলিয়ান কবি নই। যেহেতু এখন ইংরাজীও অন্যতম স্বীকৃত ভারতীয় ভাষা, সেহেতু আমি সব অর্থেই একজন খাঁটি ভারতীয় কবি। সব অর্থে বল্লাম এই কারণে যে ইতিপূর্বে যে সব ভারতীয় ইংরেজী ভাষায় হাস্যকর কবিতা রচনা করে-ছেন, তাঁদের অধিকাংশেরই কাছে আদর্শ ও মানদণ্ড হিসাবে ছিল বৃটিশ কবিতা সে সব ভারতীয়রা আঙ্গিকে ও প্রকরণে অনুকরণ করতেন বা এখনো করেন বৃটিশ কবিতারই। অথচ, আজ কে না জানে যে
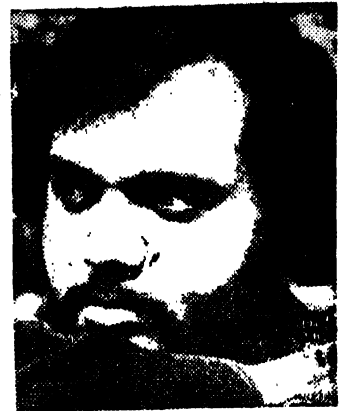
ইংরেজী কবিতা এখন আছে আফিক্রান কবিদের কলমে, আছে আমেরিকায়—বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকায়। আমি বোধহয় সর্বপ্রথম কবিতা লিখলাম সম্পূর্ণ ভারতীয় মানসিকতায়। একথা বলতে পারি—এটা দম্ভ নয়, আন্তরিক বিশ্বাস নিয়েই বলছি লিখে নিন, আমাকে পদ্মশ্রী দিয়ে সরকার বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত ইংরেজী ভাষার কবিকেই সম্মানিত করলেন।

প্রশ্ন ঃ এখনকার বাংলা কবিতা নিয়মিত পড়েন?

উত্তর ঃ নিশ্চয়। সমর সেন থেকে সুনীল গাঙ্গুলী অবধি যখন অনুবাদ করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছি তখন অন্তত বিগত তিন-চার দশকের কবিতা আমাকে পড়তে তো হয়েছেই।

মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে এতসব যিনি করেছেন ও করছেন, যার কবিতা আমেরিকা ও ভারতের বিভিন্ন ইউনিভারসিটিতে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। যিনি বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানলেও লেখেন শুধু ইংরেজী ভাষায় বিখ্যাত গেস্টকিন উইলিয়ামস প্রতিষ্ঠানের পাবলিক রিলেশসনস্ ম্যানেজার শ্রীনন্দী ব্যক্তিগত জীবনে জাতীয়তাবাদী, বিশেষত নিজের বাঙালীত্ব প্রচারে পরম উৎসাহী। বিদায়ের আগে তাই বললেন দেখুন ডম মোরেস, নিশিম এসিকেল বা খুশওয়ান্ত সিং—যাঁরা ইংরেজীতে লেখেন এবং বলে বেড়ান যে ইংরেজী ছাড়া ভারতীয় অন্য আর কোন ভাষায় কিছু লেখা হচ্ছে না, এটার প্রতিবাদ করা উচিত। এই ডাহা মিথ্যা চলতে দিলে আমাদের আত্মার কাছে আমরা অপরাধী হয়ে থাকবো। যাঁরা ইংরেজী ছাড়া আর কিছুই জানেন না (বিশেষত ডম মোরেস) তাঁরা বাংলা কবিতা বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কি লেখা হচ্ছে তার খবর রাখবেন কি করে? বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদে তাইতো আমার এত অক্লান্ত উৎসাহ।

দরজা অবধি এগিয়ে দিতে দিতে প্রীতীশ বললেন আবার আসবেন, তবে পদ্মশ্রী প্রীতীশ নন্দীর কাছে নয় শুধু প্রীতীশের কাছে। যে নিজেকে শুধু 'কবি' এই প্রথম ও শেষ বিশেষণের অন্তর্গত দেখতে চায়।

আলি আকবর রবিশংকরের চেয়ে কম ন
অন্নপূর্ণাকে বলেছিলেন : আলাউদ্দিন

সন্ধ্যা সে

'অন্নপূর্ণাকে আলি আকবর, রবিশংকরের চেয়ে কোনো অংশে কম মনে কোরো না। আমার ধ্রুপদ অংগের যা কিছু সবই ওঁকে দিয়েছি। সে বাইরে বাজায় না। বাজায় শেষ রাতে আপনমনে. এই বাজনাই তার প্রণাম ঈশ্বরের চরণে'।—প্রিয় শিষ্যা এবং কন্যা অন্নপূর্ণা দেবী প্রসংগে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আমায় বলেছিলেন।

'অন্নপূর্ণা দেবী যখন বাজান, আলি আকবর খাঁ সাহেবও বসে মন দিয়ে শোনেন। তখন তাঁকে দেখলে মনে হয় আদরের বোন, অবাল্য খেলা ও শিক্ষা সংগিনীর মধ্যে তিনি অনুভব করছেন এক গোপনচারিণী নিভৃত সাধিকা সত্তাকে.—প্রতিদিনের হাসি, কৌতুক. স্নেহভরা খুনসুটির মধ্যে যাঁর দেখা মেলে না।'—বলেছিলেন ভারতের এক শীর্ষস্থানীয় শিল্পী।

...এসব শুনে তাঁকে দেখবার আর বাজনা শোনবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠবে না কার? কিন্তু ইচ্ছে হওয়াই সার। তিনি মাইহার. দিল্লীছাড়া কোথাও যান না। বাজানো ত দূরের কথা। বেরোনও না কারো সামনে অতএব...কিন্তু ওপরওয়ালার করুণার ঢল যখন নামে. প্রাপ্তি ছাপিয়ে ওঠে প্রত্যাশাকে। এই কথাটিই অনুভব করেছি যখন শুধু দেখা নয়, তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ তাঁর স্নেহসজল হৃদয়টির সান্নিধ্য সবই মিলেছিলো দিনের পর দিন। তাঁর মত এমন একটি আশ্চর্য চরিত্র কল্পনার বাইরেই থেকে যেতো যদি না প্রতিদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার আলোয় দেখতাম—তাঁর ত্যাগ ও মহত্ব, পাণ্ডিত্য ও বিনয়, সবার প্রতি দেবীদুর্লভ মমতা আর শিশুর মত সরলতা এঁর জোড়া একটিমাত্র শিল্পীকেই দেখেছি। কিন্তু সে প্রসংগ আজ নয়।

...১৯৫৫ সালের কথা। কবীর রোডে আলি আকবর খাঁ সাহেবই ফ্ল্যাটের অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন আমাকে আর আলি আহমেদ খাঁ সাহেবকে (সম্পর্কে ও'দের মামা)। কই? কোথায় তোমরা। ও'র ডাকে এলেন শ্রীমতী আলি আকবর খান। সঙ্গে এলেন এক তরুণী। তন্বী হাসিভরা মুখে সাদর আহ্বানের বিনম্রতা. সাদাসিদে বেশভূষা, দৃষ্টিও ভঙ্গীর সহজ সরল মধুরতা সব মিলিয়ে একে বাঙালী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। 'অন্নপূর্ণা, ম্যাকো কারা এসেছেন?'—আলি আকবর পরিচয় করিয়ে দিলেন। অন্নপূর্ণা? চমকে উঠি? ইনি অন্নপূর্ণা? যাঁর যোড়া যন্ত্রী সারা ভারতে দুচারজনই আছেন? অথচ নিজেকে জাহির করার চেয়ে গোপন করাতেই যাঁর সদাসজাগ প্রয়াস?...আমি তখন কলেজের ছাত্রীমাত্র।

কিন্তু ও'র সযত্ন সেবা, আগ্রহ ও সম্মানে নিজেকে দারুন একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। প্রতিটি মানুষকে, যত তুচ্ছই সে হোক—সম্মান দেবার এই শিক্ষা ও'রা ভাই-বোন পেয়েছেন, পিতা ও গুরু আলাউদ্দিন খাঁসাহেবের কাছে। বাজনা শেখাবার সংগে সঙ্গে এ শিক্ষাও ছিল তাঁর তালিমের অপরিহার্য অংগ। একথা অন্নপূর্ণাদিদির কাছেই শুনেছি। এক নিমেষেই এমন একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশ গড়ে উঠল ভুলে গেলাম তিনি মস্ত বড় গুণী, ও'র বাজনা শোনবার জন্য ভারতের গুণীমহল উৎসুক। আলাউদ্দিন খাঁসাহেবের নামী শিষ্যরাও সুযোগ পেলেই ও'র কাছে তালিম নেন।

দরবারী কানাড়া, কাফি—দুটি রাগই ও'র অন্তরে বেজে চলেছে। কখনও শোনা যায় এর গুঞ্জরণ, কখনও ওর। স্পর্শকাতর, অনুভূতিশীল মনের তার আলতো স্পর্শেই তোলে ঝংকার।

ও'র বাজনা শোনার সুযোগও এল। ... কাতার দুটি অনুষ্ঠানে বাজিয়েছিলেন। কিছুতেই রাজী করানো যায় না। বেগতিক দেখে মাইহারে বাবার শরণাপন্ন হলেন আলি আকবর ও তাঁর বন্ধুরা। মাইহার থেকে তার এল 'অন্নপূর্ণা যেন বাজায়।'

একমাত্র বাবার আদেশের কাছেই কঠিন প্রতিজ্ঞা টলত। সকল দৃঢ়তা নত হয়ে প্রণাম জানাতো ঐ একটি যায়গায়।

ও'র বাজনা সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলবার স্পর্ধা রাখি না। শুধু এইটুকুই জানাই টেপে-ধরে রাখা সেই কৌশিকী-কানাড়া আমি পরে শুনতে গেছি সুনন্দা পট্টনায়কের সঙ্গে। আলাপ শুরু হতে না হতেই—তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অশ্রু-ঝরা চোখে বারবার যেন আবিষ্টের মত বলে চললেন 'এমন বাজনা আমি কখনও শুনি নি। কোথাও শুনি নি। গান্ধারের শ্রুতি বেজে উঠলেই বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছে।'... ও'র কাছে তালিম নেবার সময় রাগের মর্মে শিক্ষার্থীকে পৌঁছে দেবার সে কাতর তন্ময়তা কতবার অনুভব করেছি আমি ও অন্যান্য সতীর্থরা। একসঙ্গে অনেককে শেখাচ্ছেন। কিন্তু সেই সম্মিলিত বাজনার মধ্যেও কারো হাত বেপর্দায় পড়লে কিংবা কারো সেতার-সরোদের সুর নেমে বা চড়ে গেলে তিনি বোঝেন—কোন হাত বা কোন যন্ত্র অবাধ্যতা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সবাইকে থামিয়ে দিয়ে আলাদা বাজাতে বলেন। শিক্ষার্থী অ-প্রস্তুত। 'এখন ত লজ্জায় দেখতে পাচ্ছিল না? এতক্ষণ বা... ছিলেন কি করে? তখন লজ্জা করে... ছিঃ। প্রতি মুহূর্তে স্নেহময়ী, ...দয়া... শেখাবার সময় নির্মম, নির্দয়। কোন খা... নেই। একজন ভাঁইরো বাজাতে গিয়ে কো... গান্ধার ছুঁয়ে ফেলতেই গর্—' ওঠেন ... রাগকে হত্যা করছেন। আপনি ... শয়তান।' শিক্ষার্থী যখন উঠল তার ... দিনের পাঠ পাক্‌কা। তখন কাছে ... কোমল সুরে বলেন 'বড্ড বকেছি ... এখনও দিদি'র কাছে শেখার সখ আছে? ... করব? এ যে আমার বাবার আদেশ। ... যেটুকু শেখাব যেন কোন শৈথিল্য না থাকে...

...প্রেসিডেন্সী কোর্টে যখন শুভকে (... ছেলে) নিয়ে ছিলেন—তখনও আমা... কয়েকজনকে শেখাতেন। আর শেখাতেন ... কিছু আত্মীয়দের (শংকর পরিবারে... শুভ যখন বাজাতো, মাঝে মাঝে মনে ... উনিই বাজাচ্ছেন। একথা ও'কে বলে... ছিলাম। উনি খুশী হয়েছিলেন। ... সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছিলেন 'দেখ ... পর্যন্ত কি হয়? আমরা আমাদের কর্তা... সবই ওপরওলার ইচ্ছে।

বিনা পারিশ্রমিকে এতগুলি শিক্ষার্থী... জন্য অনলস পরিশ্রম? ভাবা যায় আজ... অতি বাস্তব জগতে? ...কিন্তু ওর জী... এটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই সহজ। ... হল ব্রতচারিণীর গুরুপ্রণাম।

একদিন এক দারুণ নামী শিল্পী... সঙ্গে দেখা করতে গেছেন আ... ... বললাম, 'দিদিকে একটু শোনান না আপ... বাঁধা কৌশিকী ভাঁইরো?' ... সন্ধ্যা এতবড় শিল্পীকে এরকমভাবে ... তখন ফরমাশ করতে নেই বিশেষ ও'র ... নেই কাছে।' সকলের আবদার ও দিদি... সম্মান দেখানোর আগ্রহে তিনি ... দিদি মুগ্ধ। শেষ হতে— সবাই ধরল 'তার... কই?' 'এটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ... নিরহংকার বলে ও'র উপর এতটা অত্যা... করা ঠিক নয়।—তবলা ছাড়া তারাণা ... শিল্পী হাতে তাল দিয়েই তারাণা শোনালে... গানের শেষে এক অবাঙালী শিল্পী বলে... কি অমায়িক, সরল। অথচ অনেকে এঁ... কি নির্মম সমালোচনাই না করেন।'

'আর্টিস্ট কা মন্ এ্যায়সাই হোনে চাহি...' আমার বাবা বলেন, শিল্পীর মন ফুলের ... নরম পবিত্র হবে, শিশুর মত নির্মল হবে —বলেই দিদি ও'র দিকে চেয়ে বলেন ... যাই বলুক আপনার এই বৈশিষ্ট্য ছাড়... না। সাধক, সাধিকাকে প্রতি মুহূর্তে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়। কিছু যশ অ... অর্থের অহংকারে যারা মাথা উঁচু করে ... তারা মানুষের কাছে এক ধরনের ... পেতে পারে। কিন্তু মাথা নীচু করে ... চলে, তারা পায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ।'

চোয়াড় বিদ্রোহে কর্ণগড়ের রা

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ

ভারতে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বা বিদ্রোহী দলের নেত্রী ছিলেন বাংলার এক সাহসিকা নারী, একথা অল্প জানা হলেও আমাদের অতি গৌরবের বিষয়।

কিন্তু কাহিনী হল, আমাদের দেশের কলঙ্কময় কালের। প্রায় দুশ বৎসর আগের কথা। সে সময়ে বা তার কিছু আগে থেকেই ভারতের মুসলমান অধিপতি মোগল বাদশা বংশের ও তাঁদের অধীন প্রদেশ, শাসক, সুবেদার, নবাবদের শাসন, শক্তি, প্রভুত্ব, প্রতাপ, লোকবল এমন কি ধনসম্পদ ক্রমশ হ্রাস পেয়ে শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে।

আর বিদেশী মুষ্টিমেয় ইংরেজ ব্যবসায়ী দল 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'—যারা সাত হাজার মাইল দূর থেকে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় এদেশে এসেছিল, তারা ভারতের বুকে বসে এদেশের শাসকদের আত্মকলহের সুযোগে ও বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে বাংলার কার্যতঃ অধিকার বা শাসন-শক্তি লাভ করেছে।

এই ইংরেজদের চক্রান্তে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব (১৭৫৭ সালে) সিংহাসন হারালে নবাবীপদ তাদের আয়ত্তে এসে গেল। প্রথমে মীরজাফর, পরে মীরকাশিম, ইংরেজদের অনুগ্রহে 'নামে নবাব' হয়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেছিলেন। নবাবী পদের জন্য মীরজাফর ইংরেজদের প্রচুর ধনরত্ন ও কলকাতা সংলগ্ন বিরাট ভূখণ্ডের জমিদারি দিয়েছিলেন, কিন্তু মীরকাশিমের সময় রাজকোষ একেবারে শূন্য, সে কারণে তিনি ১৭৬০ সালে ইংরেজদের তিনটি জেলার জমিদারী স্বত্ব দান করেন।

এই তিনটির একটি হল মেদিনীপুর জেলা। শুধু ধনরত্ন নয়, এদেশের ভূমি লাভের আগ্রহ জেগে উঠল অতিলোভী ইংরেজদের, স্থান বিশেষের জমিদারী পাওয়ায় তারা আর তুষ্ট হয়ে থাকল না, তারা চায়, ভূমির উচ্চ অধিকার স্বত্ব।

আইনত সে অধিকার দেবার ক্ষমতা একমাত্র ভারতের সম্রাট বা বাদশার।

শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে তখন দুঃসময় চলেছে। দিল্লীর সিংহাসনে তখন নামমাত্র বাদশা দ্বিতীয় শা আলম। তিনি নামেই ভারত সম্রাট। তাঁর রাজ্য শাসন-শক্তি আর সম্পদ সৈন্যসামন্ত একেবারেই ছিল না বলা যায়, তাঁর অধীনে প্রদেশ বা সুবা-শাসক, সুবেদার কি নবাবরা তাঁকে মানে না, তাঁর প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছে, তাদের নিজ নিজ শাসন সীমায় সকলে স্বাধীন মালিক হয়ে গিয়েছে তাঁর দুর্বলতার সুযোগে। সর্বহারা বাদশার আর্থিক অবস্থাও ভেঙে গিয়েছে।

বাদশার এই শোচনীয় সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে লর্ড ক্লাইভ, বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা খাজনা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায় ও প্রভুত্বের অধিকার দানের প্রস্তাব করতেই অভাবগ্রস্ত বাদশা রাজী হয়ে গেলেন। ১৭৬৫ সালে বিদেশী বণিকরা ভারতের এক বিরাট অংশের দেওয়ানী অধিকার লাভ করে কার্যত মালিক হল। আর সে অংশের নবাব প্রায় সব দিক থেকে ক্ষমতা হারাল।

ইংরেজদের ওপর ভাগ্যলক্ষ্মী খুব সুপ্রসন্ন, ইতিমধ্যে ১৭৬০ সালে মীরকাশিম গিরিয়ার যুদ্ধে ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়েছেন, বাংলায় নবাবী শক্তি লোপ পেয়েছে।

ইংরেজরা এইবার তাদের দেওয়ানী অধিকার পাওয়া সীমার মধ্যে শোষণের কাজকর্ম চালাতে উদ্যোগী হল। প্রথমে তাদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল মেদিনীপুর জেলার ওপর।

মেদিনীপুর জেলায় ছোট বড় বহু ভূস্বামী ও জমিদার, বিরাট বিরাট এলাকা বংশপরম্পরায় ভোগ দখল করে আসছিলেন, তাঁদের অনেকে 'রাজা' বলে খ্যাত; বাদশা বা নবাবদের অধীনতা স্বীকার করেন ও তাঁদের খাজনা দেন, কিন্তু নিজ নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীন; পদমর্যাদায় বা শক্তিসম্পদে সামন্ত রাজাদের মত। তাঁদের নিজস্ব সৈন্যসামন্ত আছে, সৈন্যরা হল মেদিনীপুরের জঙ্গল মহলের মহাশক্তিশালী দুর্ধর্ষ বন্যজাতি—চোয়াড়রা। মেদিনীপুরের অনেক রাজা পাঁচ সাতশ এমনকি হাজার জনও চোয়াড় পোষণ করতেন। চোয়াড় সৈন্যদের মাসিক বেতনের বদলে সকলকে কিছু কিছু নিষ্কর জমি ভূস্বামী স্থায়ীভাবে দান করতেন, তাতেই তাদের বংশপরম্পরায় সংসার চলত। এ রকম জমিকে 'পাইকান' বলা হত।

দেওয়ানী ক্ষমতা পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজরা সারা মেদিনীপুর জেলায় ছোট বড় সমস্ত ভূস্বামী আর তাঁদের অধীন নিষ্কর-জমিভোগী চোয়াড়দের উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ কঠোর ও নির্মম হুকুম ঘোষণা করলেন। ভূস্বামীরা এতকাল যে রাজস্ব দিয়ে আসছেন তার পরিমাণ বাড়ানো হল। আর চোয়াড় সৈন্যরা যে নিষ্কর জমি ভোগ করে আসছিল তা ইংরেজ সরকারের অধিকারভুক্ত করা হল। চোয়াড়দের আর কোন জমির ওপর অধিকার থাকল না। ভূস্বামীদের কাছ থেকে রাজস্ব ইংরেজ দেওয়ানী সরকার ধার্য করেছে এবং তা করে দিতে হবে সপ্তাহের মধ্যে জানানো হল।

ইংরেজরা আরও ঘোষণা কর
ধার্য রাজস্ব নির্দিষ্ট দিনে কোন ভূ
না দেয়, তাহলে সেই দিনের সূর্যাস্তে
তার সকল সম্পত্তি এমন কি বাসগৃহও
ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসবে, ই
সৈন্যরা সব দখল করবে। সমস্ত
পাইকান জমি থেকে জোর করে চোয়া
উচ্ছেদ করা হবে। এ হুকুম অমান্য
চোয়াড়দের গুলি করবার ক্ষমতা ই
সৈন্যদের থাকবে।

সারা মেদিনীপুর জেলার ছোট
ভূস্বামী আর রাজাদের মধ্যে বিক্ষোভ
অসন্তোষ দেখা দিল। তাঁরা বংশপর
থেকে যে কর দিয়ে আসছেন ত
চারগুণ দাবী করেছে ইংরেজরা, শুধু
নয়, তাঁদের লোকবল চোয়াড়দেরও
করতে উদ্যোগী হয়েছে তারা। আত
ছোট ভূস্বামী, মধ্যবিত্ত প্রজা অ
অনেকেই দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গে
নিঃস্ব অবস্থায়। বড় বড় ভূস্বামী
রাজারা, যাঁরা বহুকাল থেকে স্বাধীন
বিক্রমের সঙ্গে নিজেদের সীমা শাসন
আসছেন, তাঁরা বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হ
অনেকে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রো
নেন কিনা, ভাবতে লাগলেন। রা
মর্যাদাভুক্ত শক্তিসম্পদশালীরা ঐ
নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করলেন।
শিলা, ঝাড়গ্রাম, লালগড়, গড়বেতার
কর্ণগড়ের রাণী ইংরেজ শক্তি
বিদ্রোহ করার মত আছে জানা

চতুর ইংরেজ বুঝেছিল—রাজারা
তাদের কাছে মাথা নীচু করবে না
সকলেরই লোকবল আছে। আর তাদের
বল বলতে ঐ চোয়াড়রা। চোয়াড়দের
থেকে উচ্ছেদ করলে অনাহারে তাদ
হবে। একদিন মরে যাবে। তাহলেই রা
শক্তির উৎস হারিয়ে দুর্বল হয়ে যাবে,
পর তাদের কাছে মাথা নীচু করে থা

ভূস্বামীদের রাজস্ব দেওয়ার
মতামতের জন্য অপেক্ষা না করে ইংরে
চোয়াড়দের জমি থেকে উচ্ছেদ শুরু
নির্মম হাতে। তাদের ঘরদোর আগুন
পুড়িয়ে দিল। অনেককে গুলি কর
হল। কিন্তু নির্ভীক চোয়াড়রা তীর
নিয়ে ইংরেজের বন্দুকের বিরুদ্ধে
করতে ভয় পেল না। কর্ণগড় রা
চোয়াড়রা তাদের প্রজাবৎসল ঐ রাণীর
গিয়ে তাদের অভিযোগ জানিয়ে তাঁর
পন্ন হল।

কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের
হয় ১৭৬০ সালে, সে-সময় থেকে এই
শিরোমণি কর্ণগড় রাজ্য বা জমিদারী
করছিলেন। অসম সাহসিকা ও বুদ্ধি
এই মহিলা ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে বি
করবেন ঠিক করেছিলেন। সে বিষয়ে

চ্ছেন এই সময় কর্ণগড়ের চারপাশের তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল।

কর্ণগড়ের সদর কাছারী বা দর-। তাঁর প্রিয় চোয়াড় সৈন্যদের ওপর ফৌজদের হিংস্র অত্যাচার আর ার কথা শুনলেন। চোয়াড়রা গোরা সৈন্যরা তাদের একটা গ্রামে দের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে, ঐ ..ধা দিতে গিয়ে চোয়াড়দের অনেকে র গুলিতে হতাহত হয়েছে, এ গ্রামে লোক ছিল না, তবুও তারা ইংরেজ-বন্দুকের বিরুদ্ধে তীর-ধনুক নিয়ে ছ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি, শড়কী ফুরিয়ে যেতে চোয়াড়রা বাড়ী-ছেড়ে দিয়ে সপরিবারে একেবারে পথে ছ...

রাণী চোয়াড়দরে ওপর ইংরেজ সৈন্য-নীর নির্মম উৎপীড়নের কাহিনী শুনে ক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলেন, চোখ জলে গেল। তিনি বললেন—যারা সপরি-নিরাশ্রয় হয়েছে, তারা আমার এই কর্ণ-র রাজধানীতে আশ্রয় পাবে। ইংরেজের লড়তে হবে, আমি তোমাদের সহায় , তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে হলে মণ্ডলের সব চোয়াড়দের দলবদ্ধ হতে, একটি ঘাটি করতে হবে। তোমরা ন একটি বড় দল সব সময় লড়াইয়ের প্রস্তুত থাকবে, এ অঞ্চলের সব চোয়াড় র সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, তাদের কোন তে ইংরেজ সৈন্য ঢুকেছে দেখলে তাদের এসে এই ঘাটিতে খবর দেবে তোমরা দ্ধ হয়ে ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে । নির্মমভাবে সড়কী, তীর চালাবে। র এই প্রাসাদ জন্দর ও দুটো দুর্গে াদের সৈন্যঘাটি করতে দেব। আমি দ থেকে তোমাদের সব কাজ চালাব। রেখ—তোমরা বীরের জাত, আমি াদেরে সকলের মা, তোমাদের পল্লীর জন-কে ইংরেজরা হত্যা করেছে, আমার আঘাত লেগেছে, সেজন্যে তার প্রতি-নেব—আমি কর্ণগড় রাজ্যের সব জকে নিশ্চিহ্ন করে দেব।

উত্তেজনায় রাণী শিরোমণির মুখ লাল উঠেছিল। তাঁর দু চোখে যেন আগুনের ক ছুটেছিল।

চোয়াড়রা হর্ষধ্বনি করে উঠেছিল—'জয় ণী শিরোমণির জয়'।

কর্ণগড়ে চোয়াড়রা প্রকাশ্য ও দলবদ্ধ-ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে ত হয়েছে জেনে ঐ অঞ্চলের আদিবাসী , কুরমী, মুণ্ডায়ীরাও চোয়াড়দের দল-হল—তারা চিরকাল বন-জঙ্গলের কাঠ, ল নিজেরা ভোগ করত আর হাটে-র বিক্রী করত। কেউ কোনদিন বাধা , কিন্তু এখন ইংরেজরা আপত্তি করতে করেছে। বন থেকে কোন আদিবাসী নিলে তারা গুলি করছে ফলে বহু বাসী মারা যেতে বসেছে। এ কারণে ড়দের বিদ্রোহী দলে তারাও যোগ দিল। মেদিনীপুরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলল । [illegible] জায়গায় জমিদার বা [illegible] ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ [illegible] । কেউ কেউ বিদ্রোহী [illegible]

পিছনে থেকে তাদের সাহায্য করতে লাগলেন।

চোয়াড় বিদ্রোহ সবচেয়ে তীব্র ও ব্যাপক ভাব দেখা গেল কর্ণগড় অঞ্চলে। ঐ স্থানের বিদ্রোহীদের যেমন শক্তি, তেমনি শৃংখলা ও একতা। ইংরেজ সৈন্য কোন গ্রামে ঢুকলেই দলে দলে চোয়াড় এসে সবদিক থেকে তাদের আক্রমণ চালায়। বড় গাছ, ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর সড়কী মেরে ইংরেজ সৈন্যদের হতাহত করে, তাদের ভাল-ভাবে দেখা যায় না, তারা কিছুক্ষণ তীর-সড়কী চালিয়ে যাবার পরই অদৃশ্য হয়ে যায়। ইংরেজদের কাছে এই কর্ণগড় অঞ্চলই হল সবচেয়ে ভীতিজনক। সেনাপতি ফার্গুসন আতঙ্কিত ও চিন্তিত হলেন। জানতে পারলেন কর্ণগড়ে বিদ্রোহীদের মস্ত ঘাটি হয়েছে—সে ঘাটিতে প্রায় এক হাজার চোয়াড় থাকে। আর রাণী হলেন বিদ্রোহী দলের নেত্রী, তিনি বিদ্রোহীদেরে পরিচালনা কর-ছেন। আর জঙ্গল মহলের আদিবাসী বিদ্রোহীদের কর্ণগড়ের চারদিকে আশ্রয় দিয়েছেন। ঐ আদিবাসীরা কর্ণগড় রাজার দুর্ধর্ষ সীমান্ত রক্ষক। গভীর ও দুর্ভেদ্য বনজঙ্গলে ঘেরা কর্ণগড়। রাজপ্রাসাদ আর দুর্গের তিন দিকে শক্ত উঁচু পাঁচিল, তারপর গভীর খাদ। অন্য দিকে প্রবল নদী। সাধারণের যাতায়াতের সব পথ এবং সেতু রাণীর আদেশে নষ্ট করা হয়েছে একটি মাত্র গোপন পায়ে-মাড়ানো রাস্তা আছে বিদ্রোহীরা ছাড়া অপরে তার বিষয় জানে না।

ইংরেজ সেনাপতির দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর্ণ-গড় আর চোয়াড় বিদ্রোহীদের ধ্বংস করতে হবে। সে উদ্দেশ্যে অসংখ্য সৈন্য তাঁর শিবিরে জমায়েত করলেন।

ফার্গুসন পরপর দুটি বাহিনী পাঠা-লেন কর্ণগড় আক্রমণ করতে। কর্ণগড়ে ঢোকার রাস্তা কিংবা খাদের ওপরের সেতুর সন্ধান না পেয়ে তারা বনের ভেতর দিয়ে কর্ণগড় দুর্গের দিকে একটু এগিয়ে যেতে অকস্মাৎ তাদের ওপর তীর, সড়কী বৃষ্টির মত পড়তে শুরু করল। এ জঙ্গলের মধ্যে বিদ্রোহীরা থাকবে তা ইংরেজ সৈন্যরা ভাবতে পারে নি। তারা প্রস্তুত হয়ে যখন গুলি গোলা ছোঁড়া শুরু করল বিদ্রোহীরা তখন গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ইংরেজ সৈন্য একটু অগ্রসর হলে তাদের পিছন দিক থেকে আবার আক্রমণ করল। কর্ণগড় আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে ইংরেজ সৈন্যরা শিবিরে ফিরে এল। ইংরেজ সৈন্যরা হতাশ হলে অদের সেনাপতি ফার্গুসন দমলেন না। তিনি জানতে পেরেছিলেন কর্ণগড়ে যাবার একটা গোপন পথ আছে। তিনি অবশ্য এও জানতেন যে পথের সন্ধান নিতে যদি কোন ইংরেজ যায়, তাহলে বিদ্রোহীরা তাকে দেখে মাত্র হত্যা করবে। ফার্গুসন ঠিক করলেন এই সন্ধানের কাজে মোটা টাকার লোভ [illegible] দেশী কোন লোককে পাঠানোই [illegible]। [illegible] লোকের [illegible]।

[illegible] টাকার লোভে [illegible]

রাজী হয়ে গেল। ফার্গুসন প্রথমে যাদের পাঠালেন, তাদের কেউ শিবিরে ফিরে এল না।

ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতি চিন্তা করলেন—গুপ্তচরেরা যদি কর্ণগড়ের সন্ধান না পেত তারা ফিরে আসতো। এল না, তারা নিশ্চয়ই বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে। অচেনা বাইরের লোক, যাদের ওদিকে দেখা যায় না, তাদের দেখতে পেয়ে বিদ্রোহীরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছিল।

রাণীর সদর দেওয়ান ছিল যুগলচরণ। অতি খল প্রকৃতির। সে স্বপ্ন দেখত, রাণীকে সরিয়ে কর্ণগড়ের মালিক হওয়ার। চেষ্টাও করত সেই মত। ঐ মতলবে যুগলচরণ মেদিনীপুরে ইংরেজ অধিকারের প্রথম থেকে তাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখছিল। কিন্তু মহাবুদ্ধিমতী রাণী যুগলচরণের সন্দেহজনক ব্যবহার ও গতিবিধি লক্ষ্য করে তাকে জেল থেকে দূর করেছেন আসল বিদ্রোহ শুরুর সময়ে। তিনি তাঁর আত্মীয় চুনীলাল খাঁকে দেওয়ান করেছেন। চুনীলাল খাঁ নেড়াজোলের ভূস্বামী, বিদ্রোহ ব্যাপারে রাণীর দক্ষিণ হস্ত। যুগলচরণ আশা ছাড়েনি, ফার্গুসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল। অবশ্য কর্ণগড়ের গোপন পথটার বিষয় যুগলচরণ জানতো না। কর্ণগড় থেকে তার চলে আসার পরই বিদ্রোহীরা ত তৈরী করেছিল। তবে সে ফার্গুসনকে কর্ণগড়ের ভেতরের অনেক কথা জানালে কথা প্রসঙ্গে বললে রাণীর উদ্যানের মধ্যে দণ্ডেশ্বর শিবমন্দির ও মহামায়া দেবীর মন্দির আছে, সেখানে সাধু-সন্ন্যাসীদের ধর্মশালা আছে। ঐ অঞ্চলের বা বাইরের অনেক সাধু-সন্ন্যাসী সেখানে যাতায়াত করে। কেউ কেউ ধর্মশালায় মাঝে মাঝে থাকে। যুগলচরণের এই কথাটা ফার্গুসন বেশ মন দিয়ে শুনলেন।

এদিকে সারা মেদিনীপুরের দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ত চোয়াড়দের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নেই। প্রায় গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। রাজা-প্রজা সবাই একজোট।
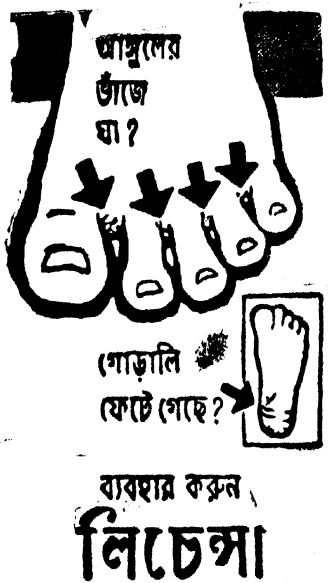
কর্ণগড়ের দণ্ডেশ্বর মন্দির সংলগ্ন একটা বড় বাগান তার মধ্যে একজন অচেনা সন্ন্যাসীকে দেখে বিদ্রোহীরা তাকে ধরে সর্দারের কাছে নিয়ে এল, সন্ন্যাসী বললে, সে এ অঞ্চলে কিছু দিন হল এসে এক গৃহস্থের বাড়ীতে ছিল—সে পরিব্রাজক কিন্তু কর্ণগড়ের বাইরে যাবার পথ না পেয়ে ধর্মশালায় খোঁজে এখানে এসেছে, সে শুনেছে এখানকার সাধুরা বাইরে যাতায়াত করে থাকে। সর্দারের আদেশে কয়েকজন বিদ্রোহী সন্ন্যাসীকে নিয়ে কর্ণগড় সীমা পার করে দিয়ে এল।

মেদিনীপুরের শক্তিশালী রাজাদের অনেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, বেশীর ভাগ ইংরেজ সৈন্য সেখানে গিয়েছে বিদ্রোহ দমন করতে। কর্ণগড়ের দুর্গ, প্রাসাদ বা রাজধানী এলাকায় ইংরেজ সৈন্য আসেনি বা আসতে সক্ষম হয়নি। তবে কর্ণগড়ের রাণীর জমিদারীর ভেতর তাঁর প্রাসাদের দুটি পল্লীতে ইংরেজ সৈন্য হঠাৎ ঢুকে সব লোককে হত্যা করেছে, স্ত্রীলোক বা শিশুদেরও বাদ দেয়নি। তারা কর্ণগড় বিদ্রোহী ঘাঁটিতে সময় মত খবর দিতে পারেনি। পরে সে বিষয় জানা গিয়েছে। রাণীর কানেও সে কথা গেল। তিনি সংকল্প করলেনশুধু বিদ্রোহ ঘোষণা নয়, কর্ণগড় থেকে কিছুদূরে লোধাসালিতে ইংরেজ সৈন্যদের যে ছাউনি আছে, হঠাৎ সেখানে আক্রমণ করতে হবে।

দুঃসাহসিক প্রয়াস হলেও নির্ভীক মহাশক্তিশালী চোয়াড়রা সে কাজে আগ্রহ প্রকাশ করল। রাশি রাশি অস্ত্রশস্ত্র তীর-ধনুক সড়কি টাঙ্গি তৈরী করে একটি গুদামে তারা জমা করতে লাগল। অপেক্ষা শুধু—বাইরে যে বড় দলটা গিয়েছে তাদের ফিরে আসা। তারা বাইরে থেকে আরও অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ নিয়ে আসবে, সে জন্য রাণী তাদের টাকা দিয়েছেন।

কর্ণগড়ের প্রাসাদ থেকে একটু দূরে মহামায়া দেবীর মন্দির, সেখানে পূজোপাঠ শেষ হতে বেশ রাত হয়। পূজার সময় বিদ্রোহীরা নাটমন্দিরের চত্বর থেকে দেবীর কাছে যুদ্ধ জয়ের প্রার্থনা করে। রাণীও তাতে যোগ দেন। দেবীর পূজো শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ, সকলে ঘুমিয়েছে। সর্বত্র নিস্তব্ধ। শেষ রাতে হঠাৎ কামানের প্রচণ্ড শব্দে কর্ণগড়ের সকলের ঘুম ভেঙে গেল। বিদ্রোহীরা ব্যস্ত উঠে মশাল জ্বালিয়ে দেখল—ইংরেজ সৈন্যরা কর্ণগড় আক্রমণ করেছে। সর্বত্র গোরা সেপাই। তারা বেপরোয়া কামান বন্দুক দাগছে। চোয়াড়রা কোন কারণেই ভয় পায় না, তারা ছুটে দুর্গে দিকে গেল, দুর্গের ভিতর আগাধারাতে অস্ত্র- [illegible]

তাই নয়, ইংরেজ সৈন্যরা কামান দেগে ভেঙ্গে দিয়েছে। দুর্গের মধ্যে যে বিদ্রো থাকত তাদের মধ্যে জীবিতরা প্রা তীর সড়কী চালাচ্ছে। বাইরে যা তারা টাঙ্গি নিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু কামান বন্দু বিরুদ্ধে অল্প পরিমাণ তীর-ধনুক স নিয়ে যুঝতে পারছে না।

বিদ্রোহীদের সর্দার ও বিদ্র নেতা দেওয়ান চুনীলাল খাঁ, রাণীকে প্র থেকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে নদীর তীরে সেখান থেকে ছিপ নৌকা করে নদী পার নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্র করল। চুনীলাল বললেন, তিনি পরিচালনা করবেন। কিন্তু রাণী হলেন না। সংকটে প্রিয় প্রজা আর বিদ্রো দের ছেড়ে তিনি যাবেন না— ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, সে জানালেন দৃঢ়ভাবে। পাশের ঘর একটা টাঙ্গি নিয়ে বার হতেই ইংরেজ তাঁকে অতর্কিতে ঘিরে ফেলল। দু টাঙ্গি তোলার উপক্রম করতেই গোরা তাঁর হাত চেপে ধরে হাতকড়া দিল। বিদ্রোহিনী রাণী শিরোমণি বন্দিনী হলেন।

ইংরেজ সৈন্য রাজপ্রাসাদ, দুর্গ প্রাচীর গোলার আঘাতে ইতিমধ্যে করে দিয়েছিল। প্রাসাদ চারশ চোয়াড় হতাহত পড়ে ছিল। ইংরেজ ফার্গুসন সশস্ত্র পাহারায় বন্দিনী কলকাতার ফোর্টে পাঠিয়ে দিলেন। সেখা কার কাউন্সিলের বিচারে রাণীর কারাদণ্ড দেওয়া হল। কারাবাসকা জনা রাণীর মৃত্যু হয় ১৮১২

স্থানীয় লোকদের মধ্যে বংশপরম্পরা একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রাণী কোন দণ্ড দিলে সারা মেদিনীপুর বিদ্রোহ ভয়ংকরভাবে দেখা দেবে, সে-ক বিবেচনা করে ইংরেজরা তাঁকে মুক্তি দে বা তাঁরই আবনগড় দুর্গে হয়ত নজ বন্দিনী অবস্থায় থাকতে দেয়। তবে রা তাঁরা প্রিয় চোয়াড় প্রজাদের স্মশানভূ কর্ণগড়ে আর ফিরে আসেননি।

বাংলায় শক্তি বা প্রত্নতত্ত্ব প্রতি কালে ইংরেজদের মনে প্রথম সন্দে দৃষ্টি করেছিল যে কর্ণগড়, সেই কর্ণ আজও আছে। আছে সেই সন বিদ্রোহিনী রাণীর গৌরবময় স্মৃতি ব করে।

মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় কেবল উত্তরপূর্বে বিরাট উঁচুনীচু প্রা তারপর গাছপালায় ঘেরা কর্ণগড়, পথে বহু দূর থেকে দেখা যাবে রাজবাড় দুটি বিরাট মন্দির, দণ্ডেশ্বর শিবের মহামায়া দেবীর। প্রাসাদ সীমায় চোখে পড়বে—রাণী শিরোমণির [illegible]

আপনগন্ডী

দীপালী দত্তরায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছেলে খোকনের বিয়ের সময়ে, বংশগত
নীতির পরিবর্তন শুরু হোল। নিজের
অনুযায়ী বিবাহ করাটা অবশ্যই
ন নয়। পুত্রবধূ যে পরিবার থেকে এসেছে
পরিবার বংশমর্যাদায় ও সামাজিক
ষ্ঠায় তাঁর পরিবারের চেয়ে হয়
নক খাটো। কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়।
পরিবার ছাড়াও আরো অনেক অনেক
দী পরিবার কেবলমাত্র রূপ দেখে
বধূ নিয়ে এসেছেন। স্বাভাবিক নিয়ম
হলেও এটা অভিনব ব্যাপার কিছু নয়।
তু সেই বিয়ের সময়, এবং বিয়ের কথা-
ঠামাত্র ছেলেমেয়ের মুখ থেকে যে
নের কথাবার্তা শুনেছেন, তাতে তাঁর মনে
হে এ পৃথিবীর অনেক বদল হয়েছে।
কের যুবসমাজ অনেক সাহস ও
য়ের অধিকারী। এবং ঐতিহ্য ধরে
চেয়ে ভাঙ্গার দিকেই তাদের আগ্রহ
ী। বংশমর্যাদা কথাটা তাদের কাছে
র্ণ অর্থহীন। তারা ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী,
র পিতৃদত্ত উপাধি অথবা পরিচয় নয়।
গত কৌলীন্যের তাদের কাছে আর
নও প্রাধান্য নেই, ব্যক্তিগত কর্ম এবং
তাই মর্যাদা দিলেন। তাঁরা [illegible]
[illegible]

অগ্রাহ্য করে দাদার বিবাহ চালাবার দায়িত্ব
নিল এবং টাকাপয়সা নামক একটি 'অকুলীন'
বিষয় নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ও তৎপরতা
দেখালো, তা সত্যিই তাঁর কাছে এক বিস্ময়-
কর ঘটনা। এ পরিবারের মেয়ে এ নিয়ে
এমন মাথা ঘামাতে পারে, এবং অর্থ সাশ্রয়ের
জন্য এমন উদয়াস্ত খাটনিতে মগ্ন থাকতে
পারে তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। অর্থ
উপায় পুরুষ মানুষ পার্থিব নিয়মে করে
তা করে খরচ করার জন্যই। অতিরিক্ত
উপার্জন হলে সঞ্চয় আপনা থেকেই হয়।
যা থাকে তা বংশধরদের জন্যই থাকে। তারা
এ নিয়ে হয় ছিনিমিনি খেলে, নয় তাকে
আরো বাড়িয়ে তোলে আপন আপন
ক্ষমতায়। এই জানেন তিনি। এ পরিবারের
কোনও পুরুষ এযাবৎকাল চাকরী করেনি।
সকলেই ব্যবসা, নয়তো কোনও পেশার
সঙ্গে যুক্ত। খোকন প্রথম, এ পরিবারের
ছেলে, যে এঞ্জিনীয়ারিং লাইনে গেল। এবং
শুধু গেলই না, পাশ করে চাকরী নিল।
পেশাগত প্রতিষ্ঠায় হয় সে বিশ্বাস
হারিয়েছে নয় শ্রদ্ধা। এ বিষয়ে খোলাখুলি
আলোচনা কখনও হয়নি। এঞ্জিনীয়ারিং
কলেজে ঢোকার আগে যতটুকু আলোচনা
হয়েছিল, তাতেই এই আভাষ পেয়েছিলেন।
তাই যখনও তাকে এ বিষয়ে মাথা দেবার

ইচ্ছা তাঁর হয়ও নি, দেনও নি। তার বিয়ের
সময় আরো বোঝা গেল, বৈবাহিক সম্পর্কে
সে শ্বশুরের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং বংশ-
মর্যাদা নামক জিনিষগুলিকে মোটেই আমল
দিতে রাজী নয়। 'ওসব দিন গেছে। এসব
নিয়ে আজকাল কেউ মাথা ঘামায় না।' এই
তার বক্তব্য।

স্বাভাবিকভাবেই মনোজ কিছুটা বিমূঢ়
হয়েছিলেন। কখন ছেলেমেয়ে বড় হয়ে
উঠলো, নিজস্ব চিন্তাধারায় পুষ্ট হয়ে
উঠলো, এতকালের ধারাবাহিকতাকে অস্বী-
কার করে, মনোজ তা ভেবেই পেলেন না।
অথচ নিজে যে তিনি ঠিক কি চাইছেন, তাও
যেন বুঝে উঠতে পারলেন না। তাঁর
জানাশোনা কয়েকটি পরিবার থেকে ছেলের
বিবাহের সম্বন্ধ আসেনি তা নয়। এ নিয়ে
মৃদুমন্দ আলোচনাও করেছেন স্ত্রীর সঙ্গে।
বারের দুচারজন বন্ধুস্থানীয় সমকর্মীদের
সঙ্গে এ নিয়ে বারকয়েক আলোচনাও যে
হয়নি তাও নয়। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা করা
এ নিয়ে, বা এর বেশী অগ্রসর হওয়ার কথা
তাঁর ঠিক খেয়ালে আসেনি। ভেবেছেন বড়
হয়েছে এবার বিয়ে দিতে হবে। ব্যস ঐ
পর্যন্ত। মনে মনে হয়তো আশা করেছেন
এ বিষয়ে রেণুকাই অগ্রসর হবেন, তৎপর
হবেন তাঁর যথাসাধ্য; এবং যা ঘটবার ঘটে
যাবে। অর্থাৎ যা ঘটবার তা আপনিই ঘটবে,
তিনি কিছু ঘটাবেন না।

মঞ্জু এগিয়ে এসেছিল, দাদার বিয়ের
ব্যাপারে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিল।
সোমার পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পরিচয়
তাঁকে বিশদভাবে জানিয়েছিল। এবং
জানিয়ে বলেছিল, 'কিন্তু তোমরা এ নিয়ে
কোনরকম আপত্তি তুলতে পারবে না।' তিনি
বলেছিলেন! বেশ আপত্তি তুলবো না,
তোলার ইচ্ছেও নেই। কিন্তু কেন আপত্তি
তুলবো না বলতো?' 'কারণ তোলার কোনও
কারণ নেই। মেয়ে হিসেবে সোমা চমৎকার।
ব্যস! আর কি চাই? তাছাড়া জীবনে
কোনওদিন ছেলেমেয়েদের বেলায় কোনও
ইণ্টারেস্ট দেখালে না, আজই বা দেখাবে
কেন? যার যা খুশী এতকাল করতে দিয়ে
এসেছ আজই বা দেবে না কেন?'

মনোজ বিস্মিত হলেন। মঞ্জু এভাবে
সরাসরি আক্রমণ করবে, ভাবেননি। বললেন
'এতে কি তোমরা সুখী হওনি? প্রতি পদে
বাধা পেলেই কি খুশী হতে?' 'অন্তত
এটুকু বুঝতাম যে তোমরা আমাদের সম্বন্ধে
ভাবো। আমরাও বুঝতাম, তোমরা আমাদের
কাছে কি আশা কর। দ্যাট, উই বিলং টু ইউ,
জেনে পায়ের নীচে অন্তত একটা শক্ত মাটি
খুঁজে পেতাম।' মনোজ চমকে উঠলেন।
'পায়ের নীচে শক্ত মাটি নেই তোমাদের?
তোমরা হরিহর মিত্তিরের বংশের ছেলে-
মেয়ে নও? সমাজে তোমাদের যথেষ্ট
মর্যাদা নেই? সম্মান নেই? কতবড় বংশের
ছেলেমেয়ে তোমরা কতবড় পরিচয় তা
তোমরা জানো না?' 'জানি বাবা, হয়তো
অন্যরাও জানে। আমার নিজের কাছে আমার

কি পরিচয়? হরিহর মিত্তিরের বংশের মেয়ে শুধু? হরিহর মিত্তির কে? তাঁকে আমি চিনি না। আমার কাছে আমার পরিবার মানে আমার বাবা মা ভাই। তাদের কাকে আমি কতটুকু চিনি? তারা আমাকে কতটুকু চেনে? আমি কে? কোনও এক মঞ্জরী মিত্র, না স্যার হরিহরের গ্রেট গ্র্যান্ড ডটার? তিনি যখন ছিলেন তখন ছিলেন। আমার জীবনে তাঁর কি প্রভাব? তিনি তো আমার কাছে কেউ নন?' 'কেউ নন? হরিহর মিত্তিরের কোনও মূল্য নেই তোমার কাছে? তাঁর বংশে জন্ম নিয়ে তুমি সুখী নও?' 'না বাবা। তুমি রাগ কোরো না। আমি জানি আমি তোমার মেয়ে। এটুকুই আমার গর্ব আর সুখ। আর কিছু নয়। কিন্তু এটাও জেনো তোমার মেয়ে বলেই আমি তোমার পথে চলবো না। আমি আমার নিজের পথ নিজেই করে নেব। দাদাকেও তাই করতে দাও।' 'নিজের পথ নিজে করে নেবে? বংশ পরিবার সর্বকিছু অগ্রাহ্য করে একা চলবে?' 'একাই তো চলতে হয় বাবা। তুমি তো সর্বকিছু মেনে নিয়েই চলেছ এতকাল। তোমার পাশে কে আছে? তুমিও কি একা নও? হয়তো মানুষ সঙ্গী কখনো পায় না তবু সে তার নিজের ধরনে চেষ্টা করে খুঁজে নেবার। গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে চললে সে আশা কখনোই পূরণ হবে বলে মনে হয় না আমার।' 'তুমি এত কথা বলছ, খোকনের বিয়ে নিয়ে, এত মাথা ঘামাচ্ছ, তার কারণও কি এই? তোমার নিজের বেলায় যাতে কোনও বাধা না আসে? তুমিও কি এমনি এক সাধারণ পরিবারের ছেলেকে বিয়ে করবে ঠিক করেছ?

মঞ্জু নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, 'সাধারণ অসাধারণ, কে বা কোথায় তা জানি না। যদি করি, হয়তো এমনি কাউকেই করবো, যার পরিচয় শুধু তার পূর্ব-পুরুষের কীর্তি নয়। যার পরিচয় সে নিজে। যে তার পরিবারকে একটা দামী নাম দিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না। যে আমাকে টাকার পাহাড়ের ওপর বসিয়ে রেখেই কর্তব্য শেষ করবে না। যার জীবনে সামাজিক ব্যর্থতা আছে, আর্থিক অনটন আছে, যার দুঃখ হতাশায় আমার অংশ আছে এবং থাকবে, যার উন্নতিতে আমি খুশী হয়ে উঠবো, যে না দিলে কেড়ে নিতে চাইবো, যে আমার কাছে কিছু না চাইলে কেঁদে ভাসাবো। যার আমাকে অপমান করার সাহস থাকবে, যার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারবো, যাকে কেবলই মেনে নেব না, অথচ যাকে উপেক্ষা করার কথা আমার কল্পনাতেও আসবে না।'

মঞ্জু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। মনোজ অদ্ভুত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত আবেগ, এত আকাঙ্ক্ষা যার, সে কি তাঁর মেয়ে? বিশেষ করে রেণুকার? কি করে, কোথা থেকে, সে এক উষ্ণ প্রস্রবণ ধরে এনে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে? এই পরিবারের মেয়ে হয়ে, এত তীব্র অনুভূতি ও কোথা থেকে পেলো?

সেদিন আর কথা বাড়ান নি। খোকনের বিয়ে হয়ে গেছে নিরুপদ্রবে। মঞ্জু প্রায় একাই এ বয়সে সমস্ত সামলিয়েছে। গর্বিত স্বরে তিনি রেণুকার এবং আর সকলের কাছে ওর এই কর্মক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। সকলেই বিস্মিত হয়েছেন বলা বাহুল্য। আড়ালে প্রশংসা এবং হাসাহাসি দুইই হয়েছে। রেণুকা শুধু বলেছেন ও ছেলে মানুষ, বাড়াবাড়ি করছে করুক, তুমি এই নিয়ে সকলের কাছে বলে বেড়িয়ে আর বাড়াবাড়িটা করো না। মনোজ চুপ করে গেছেন। শুধু বুঝেছেন, রেণুকার এটা পছন্দ হয়নি। না হওয়ারই কথা। তাঁদের পরিবারের মেয়ের টাকা-পয়সা নিয়ে এত মাথা ঘামানোটা লজ্জারই কথা। কোথায় যেন দৈন্যের ছাপ ফুটে ওঠে।

কিন্তু সেদিন মঞ্জুর সঙ্গে অকস্মাৎ ঐ ধরনের আলোচনার পর থেকে, মনোজ নিজেও যেন কেমন একটা অভাব বোধ অনুভব করতে সুরু করেছেন। ঠিক যে জানতে করছেন তা নয়, তবু মনের অগোচরে এ ভাঙাগড়া চলছিলই। মঞ্জুর অসুস্থতা এবং তার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে অনুমান করে অত্যন্ত অসহায়ও বোধ করছেন। এমন প্রাণবন্ত মেয়ে তাঁর, এ বয়সে সে এমন কোনও আঘাত পেতে পারে, ধারণার বাইরে ছিল। বেশ তো ছিল হাসিখুশী। খোকনের বাচ্চাটা হওয়ার পর থেকে যেন আরো একটু বেশী খুশী। তাঁকেও এ নিয়ে দু-চারবার ঠাট্টা করেছে, 'হ্যাল্লো নিউ গ্র্যান্ড পা! নাতি হবার পর কেমন লাগছে? খুব খুশী, যেমন চিরকাল নির্বিকার, তেমনই আছে?' উনিও হেসে জবাব দিয়েছেন, 'একজন যে বেজায় খুশী তাতো দেখাই যাচ্ছে।' 'কে? নতুন ঠাকুমাটি কি?' 'না না নতুন পিসী হয়েছে যে সেই।' 'ওঃ! আমি তো সব সময়েই খুশী।' বলেছে মঞ্জু।

এমনি যে সব সময়েই হাসিখুশী মেয়ে তার কি হোল? কার কাছে জানবেন? জানতে যে হবেই, এমন একটা অদ্ভুত তাগিদও অনুভব করছেন হঠাৎ। রেণুকার কাছে তাই কথাটা পেড়েছিলেন। সে আলোচনার মোড় যে এমন ভাবে নেবে কল্পনাও করেন নি। [illegible]

হোল, তিনিও এক ব্যর্থপুরুষ। যা পাওয়ার ছিল, পাওয়া হয়নি। অদ্ভুত জীবনধারার প্রভাবে, সেটা এতকাল ভালো করে বুঝতেও পারেন নি। আসল ট্র্যাজেডিটা বোধ হয় সেখানেই, ভাবলেন মনোজ। অতএব কাকে দোষ দেবেন? যে দিল না তাকে? না যে নিতে চাইলো না, আদায় করতে পারলো না তাকে? উভয়েই কি তাঁরা সমান দোষে দোষী নন? হয়তো রেণুকা তাঁর গতজীবনের হতাশার কথা ভুলতে পারতেন, যদি তিনি দু হাত বাড়িয়ে টেনে নিতেন তাঁকে। নিজের হাতে মুছিয়ে দিতেন, সে না পাওয়ার অশ্রু। নতুন করে হয়তো প্রাণপ্রতিষ্ঠা হোত ঐ মর্মরমূর্তিতে। কে জানে, সংসারের চেহারা হয়তো অন্যরকম হোত? এতকাল পরে এ নিয়ে বিলাপ করার বিলাসিতা কি তাঁকে সাজে? নিজের কর্তব্যে যে অবহেলা করলো, পরের কর্তব্যের ত্রুটি ধরে সে কি করে অসন্তুষ্ট হবে?

বিছানায় শুয়ে পড়লেন মনোজ। রেণুকাকে অভ্যাসমতন 'গুডনাইট ডিয়ার' জানিয়ে। চঞ্চল রেণুকাও হয়েছেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, তারা যত দূরে দূরেই থাকুক, জননীর শুভাকাঙ্ক্ষা অবশ্যই আছে। যে যার নিজের মত বড় হয়ে উঠে, নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে, এটাই স্বাভাবিকভাবে চেয়েছেন। তাঁর ছেলে বা মেয়ের জীবনে যে প্রত্যাখ্যানের দুঃখ আসতে পারে, এটা হয়তো ভেবে দেখেন নি। বেছে নেওয়ার ভার ওরাই পেয়েছে। এটা জেনেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। এমন ধরনের কোনও ঘটনা ঘটতে পারে, কল্পনারও অগোচর ছিল। ছেলেমেয়ে হিসেবে, তাঁর সন্তানেরা কেউই অসার হয়ে ওঠেনি। সামান্য রকমের লাগামছাড়া জীবনযাপন করলেও, প্রকৃত উচ্ছৃঙ্খল কেউ হয়নি, এটুকু জানেন। হলে ছেলেমেয়ের মুখের রেখায় তা ধরা পড়তো। যতটা বিচ্ছিন্নভাবে থাকুন না কেন, একই বাড়ীতে তো থাকেন? তাই যেন বুঝে উঠতে পারছেন না, মঞ্জুর ঠিক কি হয়েছে। সে অসুস্থ হওয়ার পরও, সাধারণ ব্যাপার, ছেলেমানুষী কোনও 'ইমোশনাল স্ট্রেন, ভেবেই মনকে বুঝিয়েছেন। এমন কি এতটাও ভেবেছেন, যে, হয়তো শারীরিক কোনও আক্রমণও এর হেতু হতে পারে। যা এই বয়সের মনকে বিহ্বল করার পক্ষে যথেষ্ট। একা একা চলাফেরা করে, কখন কোথা দিয়ে এ ধরনের আক্রমণ আসে কে বলতে পারে? আজকালকার মেয়েরা স্বেচ্ছায় যখন বেছে নিয়েছে একা একা চলাফেরা করা, এর প্রতিরোধ করার ব্যবস্থাও তাদের নিজেদেরই করতে হবে। লোক বুঝে মেলামেশা করতে হবে। যাই ঘটে থাকুক চিকিৎসা হচ্ছে, তেমন কোন ক্ষতি অথবা লাঞ্ছনা ঘটেনি, এটুকু জেনে আবার নিশ্চিন্ত ছিলেন। আজ আবার একি ধরনের কথা মনোজ বললেন? আজকালকার ছেলেমেয়েরা প্র্যাকটিক্যাল জীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তার ওপর এই বয়সেই মঞ্জু রীতিমত বিষয়ী বুদ্ধি রাখে। সে যে না বুঝে শুনে এগিয়ে, নিজের আঘাতসহতা সম্বন্ধে অনবহিত থেকে, এতটাই বেসামাল হয়ে পড়বে, এটা যেন ভাবতে পারছেন না। প্রতিটি পদক্ষেপ যার এত উদ্দেশ্যপূর্ণ, সে এমনভাবে হঠাৎ নিজেকে আঘাত পেতে দেবে কেন? মঞ্জু তো তার মতন অসহায় নয়? তাঁরা তো তাঁদের ছেলেমেয়েকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন সব বিষয়ে। বেড়ে উঠতে দিয়েছেন, নিজের উদ্দেশ্যমত। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত শিক্ষা দীক্ষা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি কোনও কিছুতেই তো পিছিয়ে থাকার মতন নয় এরা? খোকনের বিয়ের সময়ে একথাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে বিবাহ নামক ব্যাপারটিও সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছাধীন। তবে? তিনি যা পারেন নি, তাঁর মেয়ে, সম্পূর্ণ অন্য যুগে জন্মেও তা পারবে না? তবে কি ভবিতব্যই বড়? ব্যক্তিত্ব, কুশলতা ও স্বাধীনতার কোনও ক্ষমতা নেই? নিজের জীবনে জয়-পরাজয়ের কথা কখনও মনে হয়নি তাঁর। তিনি পারেন নি। সময় অন্য ছিল, তাঁর তরুণী বয়সে ব্যক্তিত্ব দুর্বল ছিল, নিজের ওপর আস্থা ছিল কম, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও কম ছিল। তাই পারেন নি। কিন্তু মঞ্জু কেন হেরে যাবে? না হেরে যাবে না। তিনি হারতে দেবেন না। কিন্তু মেয়েকে কেমন করে জিজ্ঞেস করবেন এ বিষয়ে? জিজ্ঞেস করলেই জবাব দেবে? মন খুলবে? ভয়ানক হতাশ হয়ে পড়লেন। মনোজ কেন জেনে নেন না ওর কাছ থেকে? মেয়ে হয়তো মুখ খুলতে পারে ও'র কাছে? কিন্তু তাঁর কি এ বিষয়ে এতটুকু আগ্রহ আছে? ডেকে জিজ্ঞেস করবেন? করতেই হবে। এতো শুধু মেয়ের ব্যাপার নয়? এতে কোথায় যেন, তাঁর, তাঁদের নিজেদের জীবনও জড়িয়ে আছে। বারবার ভাগ্যকে এভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কোনও অবস্থাতেই যিনি কোনও দিন উত্তেজিত হন নি, আজ তিনি কেমন উত্তেজিত বোধ করতে লাগলেন। হাতে পায়ে কেমন একটা শিরশিরানি। মনে হতে লাগলো, আজই, এক্ষুনি এর একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে, ভয়নক ক্ষতি হয়ে যাবে। যা কোনও মতেই হতে দেওয়া যায় না। মনোজের বিছানার কাছে গিয়ে ডাকলেন 'ঘুমিয়ে পড়েছ?' মনোজ ঠিক ঘুমান নি সামান্য তন্দ্রা এসেছিল মাত্র। রেণুকা তাঁর গায়ে হাত রাখলেন, সামান্য ধাক্কা দিলেন 'শোনো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? 'মনোজের তন্দ্রা ছুটে গেল, ধড়মড় করে উঠলেন। 'কি হয়েছে? কি ব্যাপার?' রেণুকা একটু অপ্রস্তুত হলেন। এভাবে ও'র ঘুম ভাঙ্গানোটা ও'র উচিত হয়নি। এ বয়সে এতে কিছু একটা ক্ষতিও হতে পারে। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। মনোজ ততক্ষণে খাট থেকে নেবে এসেছেন। 'কি কি? মঞ্জু—' 'না না মঞ্জু ঠিকই আছে। কিন্তু ওর বিষয়ে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাই, তাই ডাকলাম। তুমি শোও। শুয়ে শুয়েই আলোচনা কর। আমি এখানে বসছি।' বলে একটা চেয়ার টেনে নিলেন। মঞ্জুর বিষয়ে? মনোজ ভীষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন।

'কি বলতো? কি আলোচনা? ও কি কিছু বলেছে?'

'না, ও আমাকে কিছু বলবে না। তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর।'

'কি জিজ্ঞেস করবো?'

'সত্যিই ও কাউকে ভালো মানে পছন্দ করছে কিনা, এবং যদি করেই থাকে,

তবে কে সেই ছেলেটি? তাকে ডেকে পাঠাতে বল। সত্যিই তেমন কিছু হয়েছে কিনা, অথবা সামান্য সাময়িক ব্যাপার, সব জেনে নাও। জেনে নিয়ে যা-হোক একটা ব্যবস্থা কর।'

'ও কি বলবে আমায়?'

'তাহলে সোমাকে আনিয়ে নাও। ওকে দিয়ে জিজ্ঞেস করাও। ওরা প্রায় সমবয়সী। হয়তো ওর কাছে বলবে।'

'হুম্। কাল সকালে আমাকে মনে করিয়ে দিও। সোমার বাবাকে টেলিফোন করে দেব। কিন্তু হঠাৎ কি হোল বল দেখি?' মনোজ সত্যিই রেণুকার এই ভাবপরিবর্তনে অকৃত্রিমভাবে বিস্মিত হয়েছেন। ঘর প্রায় অন্ধকার। তাই ওই ভাবলেশহীন মর্মরমুখে কোনও ভাবের খেলা অথবা রং লাগানো কিনা মনোজ টের পেলেন না। সামান্য দ্বিধার পর জবাব এলো 'হবে আবার কি? মেয়েটা কষ্ট পাচ্ছে।'

'মেয়ের কষ্ট দেখে আর কারো কষ্টের কথা মনে হচ্ছে?'

'বিদ্রূপ কোরো না আজ এতকাল পরে।'

'বিদ্রূপ? না রেণু, বিদ্রূপ করিনি। শুধু জানতে চাইছি।'

'কি হবে জেনে?'

'নিজের অন্যায়ের মাপটা অন্তত বুঝতে পারবো তাহলে।'

'অন্যায়? তোমার কিসের অন্যায়? তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি?'

'করিনি? তবে কেন কেবলই অপরাধী ভাবলাম নিজেকে?'

'সে তুমি অত্যন্ত নির্লোভী বলে। নিজের কি আছে না আছে তার দিকে তো কোনও দিন চেয়ে দেখ না। আমাকেও দেখনি।'

'তোমাকে দেখিনি? কাকে দেখেছি তবে?'

'আমার বাইরেটা দেখেছ শুধু, ভেতরটা নয়। জীবনের সুরুতে যে প্রত্যাখ্যান ছিল, সেটা দেখেছ শুধু, পরের প্রতীক্ষাটা দেখনি। দেখতে চাওনি। বড় অল্পে তুষ্ট তুমি, তাই ভাবো আর সকলেও তাই।'

মনোজ চুপ করে রইলেন। এরপর আর কিছু বলার থাকে না। সারা জীবন খোঁজেন নি, শুধু জেনেছেন পাননি। এতকাল পর যখন বুঝলেন কিছু পাওয়া হোল না, বুকে মন হাহাকারে ভরে উঠলো, সেই সময়েই কে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিল অন্ধকারে। দেখলেন থরে থরে সব সাজানো রয়েছে। তাঁরই জন্য। শুধু তিনি নিজে হাতে প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা কখনো করেননি। উঠলেন, আবার; উঠে জল খেলেন। আবার খাটে এসে বসলেন।

বললেন 'এসব কথা যদি আরো আগে বুঝতে পারতাম, হয়তো শোধরাবার সময় থাকতো। আজ এতকাল বাদে এর জন্য ক্ষমা চাওয়াটাও বোধহয় প্রহসনের মত শোনাবে, তাই না?'

'ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। অপরাধ তোমার নয়। ইচ্ছাকৃত না হলেও আমারই। এসব কথা এখন থাক। মঞ্জু যাকে চায়, সে যদি ওকে না চায়, তবে কি কোরব সেই কথাটাই ভাবো।'

'আজকের ছেলেমেয়ে, অভিভাবকের কথা মতন কিছু করবে বলে তো মনে হয় না। টাকা পয়সার লোভে তোমার মেয়েকে কেউ বিয়ে করুক, তাও নিশ্চয়ই চাও না? অথচ আর কি করা যায়, তাও তো ভেবে পাচ্ছি না। যদি তার মন ভেঙে থাকে, তবে হয়তো তাকে কাছে কাছে রেখে, সান্ত্বনা আর সহানুভূতি দিয়ে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলা যায়। দেখা যাক সোমা কিছু জানাতে পারে কিনা? প্রয়োজন হলে চল, ওকে নিয়ে কোথাও আমরা বাইরে ঘুরে আসি কিছুদিন। ওর মনটাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা অন্তত করা যাবে। তুমি এই নিয়ে আর ভেবো না। আমি হয়তো এসব বিষয়ে কিছু বুঝি না, কিন্তু দেখি কি করতে পারি। তোমার মেয়ে যাতে তোমার মতন কষ্ট না পায়, সে চেষ্টা প্রাণপণ করবো কথা দিচ্ছি। এর বেশী আর কিছু বলতে পারছি না এখন।'

রেণুকা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। মুখে কোনও কথা ফুটলো না। শুধু মনে মনে বললেন আমার মতন স্বামী যেন পায় এ আশীর্বাদও কোরো ওকে। উঠে পড়লেন। এই আটচল্লিশ বছর বয়সে, আজ হঠাৎ বুকের মধ্যে এক নতুন আবেগ অনুভব করে, লজ্জায় এতদিন পর তাঁর শ্বেত প্রস্তর মূর্তির গালে রং-এর আভাস ফুটলো। দেখতে না পেলেও কানের কাছে যে উত্তাপ বোধ করলেন, তাতেই বুঝলেন, একটা অদ্ভুত আবেগের সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর মনে। তাড়াতাড়ি হালকা পায়ে নিজের শোবার ঘরে চলে এলেন। মেয়ের হতাশা তাঁর জীবনের এই সায়াহ্নকালেও এক অভূতপূর্ব সুখের আস্বাদন এনে দিয়েছে, তাঁর ফেলে আসা যৌবনের দিনগুলির হতাশাকে নতুন এক আশায় রাঙিয়ে তুলছে, এটা বুঝতে পেরে নিজের কাছে নিজেই মরমে মরে গেলেন। মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হোল। নিজের মাঝে এতকাল কি ভাবে নিরুদ্ধ ছিলেন, তা যেন ভয়নকভাবে বুঝতে পারলেন। সময় কি সব চলে গেছে? আর কি নতুন করে সুরু করা যায় না? আবেগ বিমুখ এই যে জীবন তাঁদের, তাকে আবার জীবনের উত্তাপে ভরিয়ে তোলা যায় না? যায় না? বড় কি হাস্যকর হবে তা? সবাই কি অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে? ছেলেমেয়ে বিশ্বাস করবে না? কাছে আসবে না? তবু ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থাকবে? আত্মিকে হিংসে হোল তাঁর। ওরই সঙ্গে ওদের যত আবদার প্রত্যাচার। তিনি কেন পাননি? চেষ্টা করেননি? নাঃ চেষ্টা করে এসব হয় না। স্নেহের প্রস্রবণ স্বতোৎসারিত। জীবনের একটি হতাশা তাঁকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখলো, যার ফলে আর কিছুর দিকে তিনি চেয়ে দেখলেন না। একটি না পাওয়ার অভিমানে, আর কিছু চাইলেন না। একটি আঘাতের ব্যথাই বিবশ করে রাখলো তাঁকে, সে বিবশতা কতদিকে কত হতাশা আর আঘাতের সৃষ্টি করলো তা কোনও দিন জানতেও চাইলেন না। তারই পাপে কি আজ মঞ্জু কষ্ট পাচ্ছে? না না ওকে বোঝাতে হবে সব বলতে হবে। নিজের মান মর্যাদা আঘাত-এর কথা সব ভুলতে হবে, যদি তাতে মঞ্জুর উপকার হয়, মঞ্জুর ভবিষ্যৎ সংসারের কল্যাণ হয়।

সোমা যখন এ বাড়ীতে ফিরে এসে সব শুনলো, রীতি মতন অবাক হোল। 'মঞ্জু? মঞ্জুকে কেউ ডিচ্ করেছে? অসম্ভব? ওই তো কাউকে পাত্তা দেয় না জানি। কারো সঙ্গে ওর কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই সে বয়সের। কখন ঘটলো এসব ব্যাপার? আমি একটও বিশ্বাস করি না এসব। ইটস ইম্পসিবল।' প্রায় ঘোষণা করার ভঙ্গীতে সে খোকনকে বললো। খোকন বললো 'আমি এসব জানি না। আমাকে বলে কি লাভ? ওর বন্ধু-বান্ধব কে বা কারা আমায় এসব জানায়

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

(রহস্য উপন্যাস)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

'কিন্তু কারণটা যে বলা যায় না।'

'কেন বলা যায় না?'

ঠোঁট কামড়ে সাদা করে ফেলল ফোয়ারা। বেশ কিছুক্ষণ চোখ নামিয়ে থাকার পর হঠাৎ চোখ তুলে আমার চোখে চোখ তাকিয়ে সিরিয়াস গলায় বললে—'বলব, কিন্তু কথা দিন কোনো অ্যাকশন নেবেন না। এটা তো বুঝেছেন সনাতনের ক্যামেরায় পোজ দিলেও খুন আমি করিনি?'

'কথা-টথা দিতে পারব না। ভুলে যাবেন না খুনের তদন্ত করতে বেরিয়েছি।'

'খুনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'নেই তো বলতে কি হয়েছে? সম্পর্ক নেই যখন অ্যাকশন নেব কি না নেব সেটা আমি বুঝব।'

'আপনি....আপনি না একটা জোঁক। ধরলে ছাড়েন না। বেশ, বলে বুকটা হাল্কা তো করি। যা খুশী করুন গিয়ে। সনাতনের বাড়ী গিয়েছিলাম বাবার জন্যে।'

'বাবার জন্যে? মানে?'

'বাবাকে ব্ল্যাকমেল করছিল সনাতন।'

'আ—! পথে আসুন।'

বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল ফোয়ারা।
'আপনি জানেন?'

'আঁচ করেছিলাম। আপনার বাবা মানতে চাইছিলেন না।'

'তাহলে বলুন মেয়ে হয়ে আমি কি করে বলি সে কথা? বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারটাও চেপে গিয়েছিলাম পাছে ঐ কথা এসে যায় এই ভয়ে।'

'দেখুন মিস ঘোষ, ফালতু না বকে কাজের কথাটা বললে আখেরে লাভ হবে আপনারই। মনে রাখবেন আমি মার্ডার ইনভেস্টিগেশনে বেরিয়েছি।'

'বার বার সেটা না বললেও চলবে।' বলে আবার আনত চোখে কি ভাবল ফোয়ারা। তারপর মুখ তুলে সহজ সুরে বললে—'বেশ, সব বলব। কিন্তু একটা শর্ত। খুনের মামলায় এ-ব্যাপারে জড়াবেন না।'

'কথা দিতে পারছি না।'

'কি মুস্কিল! খুনের তদন্তে দরকার যদি না হয়, তাহলেও জড়াবেন?'

'না। সেক্ষেত্রে কাকপক্ষীও জানবে না।'

'খবরের কাগজওলাদের কানে তুলে দেবেন না তো?'
'না।'

'তাহলে শুনুন। এক হপ্তা আগে সনাতনের একটা চিঠি পৌঁছয় বাবার কাছে। চিঠির সঙ্গে খামের মধ্যে আমার খানকয়েক স্যাম্পল ফটো—সবচেয়ে খারাপগুলো। সেই সঙ্গে টাকার দাবী। বাবা চিঠি পেয়েই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। আগে ফোন করলেন আমাকে। বললেন, বৃহস্পতিবার রাতেই আসছেন কলকাতায়। আগে আমার একটা ব্যবস্থা করবেন—তারপর সনাতনের। বুঝতে নিশ্চয় পেরেছেন, বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ বনত না। তাই বাবা আমার ওপর যতটা খাপ্পা হলেন, সনাতনের ওপর ততটা হলেন না।'

'কত চেয়েছিল সনাতন?'
'ফটো পিছু দশ হাজার...ফ্রেমে বাঁধানো।'

'স্কাউন্ড্রেল। মিঃ ঘোষ না রাগলেই অবাক হতাম।'

'সেদিক দিয়ে উনি বিশ্বামিত্র। যখন-তখন রেগে যান—বিশেষ করে আমার ওপর। তাই ভয় পেয়ে গেলাম। এমনিতেই আমার মাসোহারা কমাতে কমাতে এমন জায়গায় এনে ফেলেছেন যাতে বাধ্য হয়ে বোম্বাই ফিরে যাই। এবার তো একেবারেই বন্ধ করে দেবেন। তাই ভয়ে শুক্রবারেই দৌড়োলাম সনাতনের বাড়ী।'

'কিসের আশায়?'

'ভেবেছিলাম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমার সবকটা প্রিন্ট আর নেগেটিভ উদ্ধার করব ওর কাছ থেকে। বুঝিয়েছিলাম, ভয় দেখিয়েছিলাম, হাতে-পায়ে ধরতে বাকী রেখেছিলাম। এমন কথাও বলেছিলাম যে, আমার বাবাকে আমি চিনি—সে চেনে না। বাবা আমার শুধু বদরাগী নন, ভীষণ কড়া, জেদী আর অসৎ। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল কি করে বেঁকাতে হয় তা জানেন। টাকার জোর আছে বলেই তা পারেন। বাবাকে ভয় করি সেই কারণেই। সনাতন যেন এত ঝুঁকি না নেয়—কেলেংকারি ঘটতে পারে।'

'কি বলল সনাতন?'

হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছি। যে মেয়ে নেকেড ছবি তুলতে পারে সে মেয়ের এমনি সাজাই হওয়া উচিত। আমার বাবার ভয়ে আমি জুজু হয়ে থাকতে পারি—সনাতন পরোয়া করে না। ওঁর অনেক টাকা—ছ্যাতলা পড়ছে। কয়েক খামচা দিতে হবে মেয়ের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে। আমি তখন বললাম আমার বাবা আমার ইজ্জতের ধার ধারেন না। আমার জন্যে পাই-পয়সাও খসাবেন না তিনি—কিন্তু তাবৎ সম্পত্তি উড়িয়ে দেবেন সনাতনের সর্বনাশ করার জন্যে।'

'শুনেও ভয় পেল না সনাতন?'

'একদম না। মিনিট দশেক শুধু তর্কই করে গেলাম। কিন্তু বিশ্বাস করাতে পারলাম না। এভাবে সনাতনকে কখনো কথা বলতে শুনিনি। ভদ্র ব্যবহার করেছে চিরকাল।

মেয়েদের মন জয় করত ঐ কথা দিয়েই। সেই লোকটাই হঠাৎ কিনা বলে বসল, অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি—আর নয়। তার চাইতে বরং ড্রেস খুলে খানকয়েক স্পেশাল পোজ যেন দিই—প্রত্যেকটা পোজের জন্যে বাবার কাছে বিশ হাজার আদায় করা যাবে। শেয়ার ফিফটি ফিফটি। শুনে এত ভয় পেলাম যে একরকম ছুটেই পালিয়ে এলাম বাইরে।'

'বাড়ীতে গিয়েছিলেন কটা নাগাদ?'

'দশটা থেকে বারোটার মধ্যে।'

'বেরিয়ে এসেছিলেন কখন?'

'মিনিট কুড়ি পরে।'

'সে মেয়েটাকে দেখেন নি?'

'না। সনাতন একাই ছিল। শোবার ঘরে মেয়েটা ছিল কিনা বলতে পারব না। হয়ত ড্রেস খুলছিল শট নেবে বলে। আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ বেরোয়নি ঘর থেকে। আচ্ছা, যে মেয়েটা আমাকে দেখেছিল সেই কি?'

'না। সে নাকি স্টুডিওর জানলা থেকে উঁকি মেরে আপনাকে দেখেছিল সনাতনের সঙ্গে কথা বলতে। তাই আর ভেতরে যায়নি। চলে এসেছে। কে জানে বানিয়ে বলছে কিনা। হয়ত সেই শোবার ঘরে লুকিয়ে বসেছিল। আপনি চলে আসতেই সনাতনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।'

চুপ করে রইল ফোয়ারা। লাল ঠোঁটে সাদা সিগারেট ঝুলিয়ে টানতে লাগল জনন। দৃশ্যটা মন্দ নয়। মেয়েরা সিগারেট খেলে আমার ভাল লাগে দেখতে।

নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল ফোয়ারা। স্মোকিংয়ের ধরন দেখে বুঝলাম। কিন্তু এবার যা বলল, চমকে দিল আমাকে।

বলল আচমকা—'না শোবার ঘরে সে থাকতে পারে না।'

'কেন পারে না?'

'দেখুন মিঃ...... আচ্ছা আপনার পুরো নামটা কি? আমার মনের কথা যদি বলতেই হয় আপনাকে ঐ মিস্টার-ফিস্টার বলে হবে না। আরো কাছে যেতে হবে। কি?'

'সুমন্ত সেন।'

'আমি বলব শুধু সুমন্ত অথবা সুমন্তবাবু। যা মুখে আসে। দেখুন, আমি বড় ঝামেলায় পড়েছি।'

'আবার কিসের ঝামেলা?'

জীপের একধারে গুটিসুটি মেরে বসে সিগারেট টানছিল ফোয়ারা আর জুলজুল করে দেখছিল আমাকে। হঠাৎ আধপোড়া সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিধে হয়ে বসল।

'সুমন্তবাবু কথাটা মুখে আটকে যাচ্ছে।'

আমি চেয়ে রইলাম। কি বলতে চায় ফোয়ারা?

'আমার বাবাও সনাতনের বাড়ীতে গিয়েছিলেন।'

সত্যিই বুকটা ধড়াস করে উঠল। প্রস্তুত ছিলাম না খবরটার জন্যে।

'আপনার বাবা? তবে যে বললেন আপনি একা গিয়েছিলেন।'

'আমার সঙ্গে যান নি। পরে গিয়েছিলেন। একা।'

'আপনি জানলেন কি করে? বলেছিলেন?'

'না-না। সনাতনের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমি বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিলাম কলকাতা ফিরব বলে। রাস্তার মোড়ে এসে দেখি বাবা আসছেন একটা অফিসের গাড়ী নিয়ে। আমাকে দেখতে পান নি রাস্তা দেখছিলেন বলে। মোড় ঘুরে সনাতনের বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। নিশ্চয় সনাতনকে একহাত নিতে।'

হতবুদ্ধির মত বসে রইলাম। হত-ছাড়া এই কেসটা আমার মাথার ঘিলু পর্যন্ত নাড়িয়ে ছাড়বে দেখছি। ভারী গোলমেলে মামলা। হেরম্ব ঘোষ যদি ও বাড়ী যান মিসিস লাহাকে অবশ্যই দেখেছেন। অথচ ফোয়ারা বলছে সনাতনের সঙ্গে পোজ দিতে সে যায় নি। কেন? ফোয়ারা জানল কি করে? জিজ্ঞেস করতে হবে।

করলাম। ফোয়ারা বললে—'গেলে আমি দুজনকে দেখতে পেতাম। একটাই তো রাস্তা গেছে বড় রাস্তার দিকে। আমি যখন চলে আসছি তখন একটা গাড়ীকে যেতে দেখেছিলাম বাবাকে দেখার আগে। কিন্তু বাড়ীর দিক থেকে গাড়ীঘোড়া আসেনি। সনাতনের স্টেশনওয়াগনটা অন্ততঃ চিনতে পারতাম। তাছাড়া—তাছাড়া আমি যে আবার গেছিলাম ওর বাড়ীতে।'

'আবার গেছিলেন? কেন?'

'ভয়ে, সুমন্তবাবু ভয়ে। আমার বাবাকে আপনি চেনেন না। ভয়ংকর রাগী। রাগলে অমানুষ হয়ে যান। রাগের মাথায় সনাতনকে খুন করেও ফেলতে পারেন—এই ভয়ে ছুটে গিয়েছিলাম গাড়ীর পেছন পেছন। সঙ্গে সঙ্গে যাইনি। মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে ভেবেছিলাম। মনটাকে স্থির করার জন্যেই শেষপর্যন্ত ফিরে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম কি কাণ্ড চলছে সেখানে। কিন্তু কাউকে দেখিনি।'

'কাউকে দেখেন নি? বলছেন কি আমার চোখ দুটো নিশ্চয় সে সময়ে কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এই কেসটাকে লক সোজা ভেবেছিলাম, এখন দেখছি ঠিক তেমন জটিল।'

'বিশ্বাস করুন কেউ ছিল না।'

'অসম্ভব সনাতন গেল কোথায়?'

'আপনার গা ছুঁয়ে বলছি বিশ্বাস করুন। কেউ ছিল না বাড়ীতে। আমি যে বাড়ীর ভেতর পর্যন্ত দেখে এসেছিলাম। বাইরে পেয়ারা গাছের কোটরে একটা বাড়তি চাবি থাকত আমার জন্যে। সেই চাবি নিয়েই দরজা খুলে ঢুকলাম ভেতরে। প্রথমে অবশ্য কড়া নেড়েছিলাম—সাড়া না পেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম। সত্যিই বাবা ওকে মেরে পাট করে দিয়ে গেলেন কিনা—খুন করেও যেতে পারেন—বাবার অসাধ্য কিছু নেই। ঐ মেজাজের জন্যেই তো আমি বাড়ীছাড়া। তাই গেছিলাম ভেতরে।'

আমি বোবা হয়ে বসে কেবল শুনছিলাম আর ভাববার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ফোয়ারার একটা কথারও মানে বুঝতে পারছিলাম না।

ফের বলল ফোয়ারা—'এখন বুঝেছেন তো কেন বলতে চাইনি শুক্রবার কোথায় গিয়েছিলাম? রোববারের কাগজে সনাতনের ডেডবডি গঙ্গার পাড়ে পাওয়া গেছে শুনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম বাবার কাণ্ড। বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেলে দিয়েছেন। তারপর যখন আপনি ঐ ফটোগ্রাফের কথা তুললেন মাথা গুলিয়ে গেল। সনাতনের সঙ্গে মেয়ে ছিল শুনে ভেবে পেলাম না তা কি করে সম্ভব।'

'এ মামলার একমাত্র খাঁটি খবর তো সেইটাই। সনাতন একা যায়নি—সঙ্গে মেয়ে ছিল। কিন্তু আপনি যেন চাবি খুলে ভের ভেতরে ঢুকলেন সনাতন তখন ছিল কোথায়? লুকিয়ে?'

থাকলেও বাড়ীর মধ্যে নয়। তন্নতন্ন করে দেখেছি আমি। বাইরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ছিল হয়ত। কিন্তু কেন লুকোবে?

'আপনার বাবার ভয়ে। ওঁর রুদ্রমূর্তি দেখে পিলে চমকে গিয়েছিল বলে বোধহয়। বাবার কাছে শোনেননি বাড়ী গিয়ে উনি কি দেখেছিলেন?'

'জিজ্ঞেসই করিনি। ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল আমারও।'

'আপনার বাবার সঙ্গে আর একবার বসতে হয় দেখছি। নিশ্চয় অনেক ব্যাপার জানেন—চেপে যাচ্ছেন। আগে শুনি আপনি আর কি দেখেছেন। শুক্রবার যা কিছু ঘটেছে সবই অদ্ভুত, এমনই অদ্ভুত যে আমার বুদ্ধির গোড়া পর্যন্ত আলগা হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটাই এবার আবিষ্কার করা যাক। আপনি যা-যা বললেন আমি পর-পর বলে যাচ্ছি। ভুল হলে শুধরে দেবেন। প্রথমবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই শুরু করা যাক। বড় রাস্তার দিকে আসতে লাগলেন। কতক্ষণ লাগল আসতে?'

'মিনিট পনেরো তো বটেই।'

'রাইট। আসতে আসতে দেখলেন একটা গাড়ী যাচ্ছে—বাড়ীর দিকেই যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি গাড়ী?'

'মডেলটা ধরতে পারিনি। আমার বাবার নয়—সনাতনেরও নয়। মস্তবড় সবুজ

রঙের গাড়ী। পুরোনো পনটিয়াক হলেও হতে পারে। আমেরিকান গাড়ী।'

'কে ড্রাইভ করছিল?'

'আমার মাথায় তখন দুশ্চিন্তা ঠাসা—তাই অত দেখিনি। ব্যাটাছেলে ড্রাইভার। তার বেশী দেখিনি। গাড়ীটা পরেও দেখেছিলাম।'

'কখন?'

'বাবাকে যখন দেখলাম ফিরে আসতে, তারও অনেক পরে!'

'ও অঞ্চলে ছাড়া-ছাড়া বাড়ী আরও আছে। সুতরাং আমার দরকার আপনার বাবার গতিবিধির বিশদ খবর। আপনি যখন রাস্তার মোড়ে তখন দেখলেন উনি যাচ্ছেন। কতক্ষণ পরে পেছন নিলেন আপনি?'

'মিনিট পাঁচেক পরে। সঠিক বলা মুস্কিল।'

'যেতে যেতে দেখলেন উনি ফিরে আসছেন? সেটা কতক্ষণ পরে? মিনিট দশেক?'

'ওইরকম হবে। টিলার আড়ালে যেতে না যেতেই শুনলাম গাড়ীর আওয়াজ। এমন ভয় পেয়েছিলাম যে সাপখোপ আছে জেনেও ভাঙা ইঁটের দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলাম। গাড়ী পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর বেরিয়েছিলাম।'

'বাড়ীর ভেতরে ঢোকবার আগে দাঁড়িয়েছিলেন কতক্ষণ?'

'অনেকক্ষণ। একটা কাটা গুঁড়ির ওপর বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছিলাম কি করব। বাবা কি করে গেলেন, দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছিল না। এইভাবে প্রায় মিনিট পনেরো দোনামোনা করার পর ঠিক করলাম এসেছি যখন তার অবস্থাটা দেখে যাই। এই ভেবে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি এমন সময়ে সবুজ গাড়ীটা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। চলে গেল রাস্তার দিকে।'

দ্রুত অংক কষলাম মনে মনে।

'আপনার হিসেব ঠিকঠাক থাকলে বাড়ীর মধ্যে আপনার বাবা তিন চার মিনিটের বেশী থাকেন নি। কিন্তু উনি বেরিয়ে আসার পর আপনার বাড়ীর মধ্যে ঢোকার মধ্যে ফাঁক থাকছে—কুড়ি মিনিটের। ভাইটাল টাইম হল এই কুড়ি মিনিট। এই কুড়ি মিনিটেই অদৃশ্য হয়েছে সনাতন। কিন্তু কিভাবে? কিছুতেই বুঝছি না এই কুড়ি মিনিটের রহস্য। স্টেশন ওয়াগনটা দেখেছিলেন?'

'অত দেখিনি। গ্যারেজ বন্ধ ছিল কাজেই খুলে দেখার কথা মনে হয়নি। আমি তো ভেবেছিলাম গিয়ে দেখব থইথই রক্তের মধ্যে শুয়ে আছে সনাতন। তাই ঠান্ডা মাথায় কিছুই ভাবতে পারিনি। গিয়ে যখন দেখলাম সনাতন উধাও, তখন হাত-পা আরো হিম হয়ে গেল। ধরে নিলাম, বাবা নিশ্চয় রাগের মাথায় ওকে মেরেই ফেলেছেন। লাশটা গাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন এইমাত্র। আমার আর কিছুই করার ছিল না। তাই বড় রাস্তায় এসে বাসে ফিরে এলাম কলকাতায়।'

'আপনি আর যাই হোক মিথ্যে বলেন নি। কথাই বলেন নি। কিন্তু আপনার পিতৃদেব উপহার দিয়েছেন ঝুড়িঝুড়ি মিথ্যে।'

'আমাকে বাঁচানোর জন্যে। হাজার হোক বাপ তো। সেইসঙ্গে নিজেকেও বাঁচাচ্ছিলেন। খবরটা চাউর হয়ে গেলে টি-টি পড়ে যেত—রোটারীতে বাবা মুখ দেখাতে পারতেন না।'

'বুঝলাম।—শুধু বুঝলাম না সময়-রহস্যটা। আপনি সনাতনের ভাঙা বাড়ীতে ফিরে এসেছিলেন একটার পরে—আগে নয়। ঠিক তখনি মরে ভূত হয়ে যাওয়ার কথা সনাতনের। ডাক্তারের হিসেবে সনাতন মরেছে দুটোর আগে—পরে নয়। ধরে নিলাম দুটো পর্যন্তই বেঁচে ছিল সনাতন। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই তাকে

লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, মডেলকে গাড়ীতে তুলতে হয়েছে, গঙ্গার পাড়ে যেতে হয়েছে এবং তার আধ-ডজন ফটো তুলতে হয়েছে।'

'আমি বলব কি হয়েছিল?'

'আপনি?' অনুকম্পাভরে তাকালাম—'বেশ বলুন।'

কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে ফোয়ারা—'যা মনে হল, তাই বলছি। অমন করে তাকাবেন না। ধরুন, যে মেয়েটা আমাকে দেখেছে, সে বাড়ীর মধ্যেই ছিল—শোবার ঘরে বা অন্য কোথাও। বাবা যখন গেলেন তখন সনাতনকে নিয়ে সে ঢুকে বসেছিল গ্যারেজ ঘরে—গাড়ী বার করে গঙ্গার পাড়ে যাওয়ার জন্যে। বাবাকে দেখেই হয়ত দুজনেই গ্যারেজের দরজা বন্ধ রেখেই বসেছিল ভেতরে। বাবা কাউকে না পেয়ে ফিরে গেলেন। তারপর গেলাম আমি। আমাকেও দেখে দুজনে ঠিক আগের মতই ঘাপটি মেরে রইল গ্যারেজের মধ্যে। আমি চলে আসতেই গাড়ী বার করে গেল গঙ্গার পাড়ে।'

'খাসা! ডিটেকটিভ লাইনে এলেই পারতেন—দেশের মুখোজ্জ্বল হত।'

'ঠাট্টা করছেন?'

'না-না। বলেছেন ভালই। তবে কি জানেন, আপনার কথা মানতে হলে বলতে হয়, সনাতন গ্যারেজে ছিল একটানা অনেকক্ষণ—অস্বাভাবিক নয় কি?'

'মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মেয়েটাকে যাতে কেউ দেখতে না পায়, তাই বারবার গ্যারেজের মধ্যেই লুকোতে হয়েছে সনাতনকে। যে মেয়ে মডেল হত যায় লুকিয়ে চুরিয়ে, সে চায় না যে কেউ তাকে দেখে ফেলুক।'

'গুড পয়েন্ট। কিন্তু আপনার বাবার গাড়ী দেখে ভয় পাবে কেন সনাতন।'

এবার অনুকম্পাভরে তাকাল ফোয়ারা—'সত্যিই আপনার মত বোকা আর দেখিনি। বাবাকে দেখে সনাতন ভয় পাবে কেন? পেয়েছে মেয়েটা। যে মেয়ে নাড়ে পোজ দিতে চলেছে, য কোনো গাড়ী দেখলেই সে লুকোতে চাইবে। মেয়েদের সাইকোলজি বোঝেন না কথা বলেন কেন।'

'তাহলে যে মেয়ে আপনাকে দেখেছে, সনাতনের সঙ্গে গ্যারেজে সে লুকোয়নি। কেন না, সে মেয়ে বেহায়ার চূড়ান্ত।

'কিন্তু সুমন্ত...আই মীন সুমন্তবাবু, ধরুন আপনার চেনা মেয়েটা বাইরে থেকে দেখেই পালিয়েছিল। কে জানে তখন আরও একটা মেয়ে শোবার ঘরে লুকিয়েছিল কিনা।'

'আবার মেয়ে?'

'আপনিই তো বললেন মেয়ে একটা ছিলই সনাতনের সঙ্গে—শুধু ছিল না—সনাতনের সঙ্গে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে ছবিও তুলেছিল।'

'কিন্তু আপনি যখন ফিরে গেলেন তখন সে কোথায়?'

'আবার বোকার মত কথা বলে!...... গ্যারেজে... গ্যারেজে, সনাতনের সঙ্গে।'

'মাথা চুলকে বললাম—'কথাটা মন্দ বলেন নি। ছবিগুলোর একটা ধোঁকা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছিল না—আপনার কথায় তা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলেন কি ধোঁকা? মেয়েটার মুখ কোনো ছবিতেই সে মুখ দেখায় নি। মুখ দেখাতেই তার যত আপত্তি—শরীর দেখাতে নয়। গ্যারেজেও সেই কান্ড ঘটেছে।'

'তবে? পথে আসুন। আপনার কেস, আপনি হালে পানি পাচ্ছিলেন না। দিলাম আমি সমভব করে।'

'তা দিয়েছেন, কিন্তু মেয়েটাকে তো বার করতে পারেন নি। সে কাজটা এই শর্মাকেই করতে হবে। তার আগে একটা সিটিং দিতে হবে আপনার বাবার সঙ্গে।'

'আমাকে সঙ্গে যেতে হবে না তো?'

'না যেতে চাইলে জোর করব না।'

'দূর! কে যেতে চায়? তাছাড়া আমার খিদে পেয়েছে। বাবাকে নিরিবিলিতে পেতে হলে আড়াইটের আগে না যাওয়াই ভাল। এখন তো সবে বারোটা।'

'উনি লাঞ্চ খান না।'

'লাঞ্চ ড্রিংক স্মোক—কিছুই খান না। টাকা ছাড়া। সেই কারণেই খদ্দের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকতে পারেন।'

'দেখুন মিস ঘোষ, যথেষ্ট হয়েছে, আর না। 'যাকে একবার খুনী সন্দেহ করা হয়েছে, তাকে খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আমি খুনী নই। সন্দেহ আপনিও করেন না। মরুক গে সে কথা। আপনার পয়সায় খেতে আমার বয়ে গেছে। আমি কি খাওয়াতে বলেছি? শুধু বলেছি আমার আমার খিদে পেয়েছে—'

'যার নাম চালভাজা, তার নাম মুড়ি। মানেটা একই।'

'আজ্ঞে না। তার মানে তাই নয়।'

'তবে কি?'

'ইনভাইটেশন।'

চোখ বড় করে চাইলাম ফোয়ারার দিকে। দেখি ওর চোখে চাপা হাসি। হাসিটা আস্তে আস্তে নেমে এল ঠোঁটের ওপরেও।

বলল—সুমন্ত আজ আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন। আমার মনটা একদম হাল্কা করে দিয়েছেন। তাই চাই আপনাকে আপ্যায়ন করতে। নিজেও একটু জিন গিলতে চাই। বাবা যা-যা করেন না—আমি তার সব করি। রাজী?'

'রাজী—শুধু একটা সর্তে। জিনের টাকা দেব আমি।'

'ও-কে। ড্রাইভ অন, সুমন্ত।'

হেরম্ব ঘোষের ফ্যাকটরী পর্যন্ত ফোয়ারা আমার সঙ্গে এল বটে, কিন্তু ভেতরে গেল না। বসে রইল গাড়ীতে। এবার কিন্তু মেয়েদের বেড়াজাল টপকে হেরম্ব ঘোষের নাগাল ধরতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গেল আমার। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নই আমি। শেষপর্যন্ত পৌঁছোলাম তাঁর ঘরে এবং আগের চাইতেও অখুশী মুখে তিনি আমাকে ঘরে ঢুকতে দিলেও ফার্স্ট চান্সেই তাঁকে ফ্ল্যাট করলাম বম্বশেল নিউজটা ছেড়ে। বললাম সাক্ষী পাওয়া গেছে। সনাতনের বাড়ীর দিকে তাঁকে যেতে সে দেখেছে। শুনেই আমাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিত চাইলেন হেরম্ব ঘোষ এই বলে যে ও অঞ্চলে গাছের কাক পর্যন্ত তাঁকে চেনে না। কিন্তু আমি যখন বললাম, সাক্ষী কাক নয়—একজন মানুষ এবং সে তাঁকে আগাপাশতলা চেনে, তখন তিনি একটু নরম হলেন। সাক্ষীটি যে তাঁরই কন্যা সে খবরটি অবশ্য চেপে গেলাম। বলার দরকারও ছিল না। কিন্তু মিনিট খানেক পরে ভদ্রলোক আমাকেই ফ্ল্যাট করে দিলন দারুণ একটা কথা বলে। সনাতনের সঙ্গে উনি কথাই বলেন নি ঘরে লোক ছিল বলে। এবং সে লোকটি...

'মেয়েছেলে?' শুধোলাম আমি।

'না, পুরুষ মানুষ।'

শুনে খাবি খেলাম আমি। শুধোলাম পরক্ষণেই, 'কিন্তু গিয়েছিলেন কেন?'

'ন্যাকামো করবেন না। ব্ল্যাকমেলারকে যা বলা দরকার সেই কথা বলতে।'

'টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে?'

এমনভাবে চাইলেন হেরম্ব ঘোষ যেন এই মুহূর্তে আমার চোয়ালে একটা ঘুঁসি মারতে পারলে খুশী হতেন।

বললেন—'হেরম্ব ঘোষ কারও চোখ-রাঙানিতে ভয় পায় না। ওকে যা বলতাম, তাইতেই ওর জন্মের শিক্ষা হয়ে যেত। টাকা দেবো? ছোঃ'

'গিয়ে কি দেখলেন?'

'সামনের দরজা খোলা। ভেতরে গেলাম। দুজন পুরুষের গলা শুনলাম। খুব কথা কাটাকাটি চলছিল।'

'কি নিয়ে?'

'আড়িপাতার জন্যে যাইনি বলেই কথায় কান দিই নি। তবে দু' একটা কথা কানে শুনেই বুঝেছিলাম টাকা নিয়ে লেগেছে ঝগড়া। একজন টাকা চাইছে নিজের জন্যে বা কোনো কিছুর জন্যে। তারপর দুজনেরই গলাবাজি বেড়ে যেতে আমি চলে এলাম।'

'চলে এলেন? সনাতনের সঙ্গে দেখা না করেই?'

'হ্যাঁ।'

'অতটা পথ গাড়ী হাঁকিয়ে গিয়েও মুখ পর্যন্ত দেখালেন না?

'শুনুন শুনুন, সনাতনকে শিক্ষা দেওয়ার খুব একটা তাড়া আমার ছিল

। আমার কাছে ও একটা পোকা ছাড়া ছুই নয়। ওর ব্ল্যাকমেলিং হুমকিকেও ড়াই কেয়ার করি। এসব নীচলোকদের ড় কদ্দুর আমার জানা আছে। হেরম্ব ষের মেয়ের ফটো নিয়ে কেলেংকারী বার মত বুকের পাটা ওর মত পোকার ই। তাই ভাবলাম পরে আসব। অন্য াকের সামনে নিজের মুখটা আবার দেখাই ন। ক্লিয়ার?'

'একটা মেয়েকে দেখেছিলেন?'

'কোথায়?'

'সনাতনের বাড়ীতে?'

'না। থাকলে অন্য ঘরে ছিল হয়ত। জন পুরুষ মানুষের তর্কাতর্কি শুনেই ম এসেছিলাম।'

কেসটা ক্রমশঃ নাগালের বাইরে চলে চ্ছে। শুক্রবার সনাতনের পোড়ো বাড়ীতে জন গিয়েছিল কে জানত। এতজনকে ুকু সময়ের মধ্যে খাপ খাওয়ানোই যে িকল। তা না হলে ধরতে হয় ডাক ের মৃত্যুর সময় ভুল বলেছেন। বারোটা ক একটার মধ্যে কোনো একটা সময়ে াতন শুদ্ধ একজন মডেল মেয়ে নিয়ে গার পাড়ে গিয়েছিল ছবি তুলতে। কিন্তু ভাবে? এতগুলো লোক সেই সময়ের ধ্য বাড়ীতে ঢুকেছে আর বেরিয়েছে— উ দেখতে পেল না সঙ্গের মেয়ে- লোকিকে? গেলই বা কি করে? তবে কি য়েটা সনাতনের সামনে সেই লোকের শে চুপ করে বসেছিল? হেরম্ব ঘোষ া কথাই শুনেছেন—উঁকি মারলে কি কে দেখতে পেতেন? মেয়েটা কথা বলেনি ই তিনি হয়ত শুনতে পাননি। তারপর ই হেরম্ববাবু বেরিয়ে গিয়েছেন—সনাতন, সেই লোকটা আর মডেল মেয়েটা—তিন জনেই গিয়েছে গঙ্গার ধারে ফটো তুলতে। খুব সম্ভাব্য থিওরী। সনাতনের স্টেশন ওয়াগন কেন পড়ে-ছিল সেখানে, তারও একটা ব্যাখ্যা এ থিওরী অনুসারে পাওয়া যাচ্ছে। যে পুরুষটি সনাতনের সঙ্গে ঝগড়া করার পর গঙ্গার পাড়ে গিয়েছিল, তার নিজের গাড়ী ছিল। গাড়ী নিয়েই গিয়েছিল সনাতনের বাড়ী, সেখান থেকে গঙ্গার পাড়ে—তারপর কাজ শেষ করে...

শুধোলাম—'সনাতনের বাড়ীতে আর কোনো গাড়ী দেখেছিলেন?'

'দেখেছিলাম। সেই জন্যেই দরজা খোলা ছিল। গাড়ীটা দাঁড় করানো ছিল রাস্তার মাঝে। তাই আমার গাড়ী রেখেছিলাম ঢিবির পাশে।'

'গলাবাজির আওয়াজ বাড়ীর সামনের দিক থেকে আসছিল না পেছন দিক থেকে?'

'করিডরের ভেতর থেকে। আমি ভেতরে ঢুকিনি। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শুনেই যখন দেখলাম ঝগড়া বেড়েই যাচ্ছে, চলে এলাম।'

'কি গাড়ী দেখেছিলেন মনে আছে?'

'ইমপোর্টেড। আমেরিকান মডেল। ডজ কি পনটিয়াক অত খেয়াল নেই।'

'রঙ?'

'সবুজ।'

'ঠিকই দেখেছেন।'

'আই সী। আপনি জেনেই জিজ্ঞেস কর-ছেন। লোকটা কে?

'সেটা জানি না। তবে সবুজ আমে-রিকান গাড়ী আর একজনও দেখেছে। যে আপনাকেও দেখেছে।'

হেরম্ব ঘোষের আর কিছু বলার ছিল না। অগত্যা ফিরে এসে বসলাম জীপে—ফোয়ারার পাশে।

কারখানা থেকে কিছু দূরে এসে বললাম —'সবুজ গাড়ীটা আপনার বাবাও দেখেছেন। আচ্ছা, একটু খেয়াল করে দেখুন তো, গাড়ীর মধ্যে ব্যাটাছেলে ড্রাইভারের পাশে কি পেছনে কোনো মেয়েছেলে ছিল?'

'কি করে বলি বলুন? আমার তখন মাথার ঠিক নেই। তবে মেয়ে থাকলে দেখতে কি পেতাম না? কেন বলুন তো?'

'লোকটা সনাতনের সঙ্গে ঝগড়া করছিল ঘরের মধ্যে। আপনার বাবা শুনেছেন। সেই-জন্যেই আর না দাঁড়িয়ে চলে এসেছিলেন। সনাতনকে মুখও দেখাননি।'

'তাই বুঝি? কিন্তু মেয়েটা? সে মেয়েটা এল কোত্থেকে?'

'যত গোল তো ঐ মেয়েটাকে নিয়ে। নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে! আমার কি মনে হয় জানেন? মেয়েটা সবুজ গাড়ীর মধ্যেই ছিল। লোকটা তাকে সনাতনের বাড়ীতে রেখে গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যায়। তারপর আপনি ফের গেলেন সেখানে, চলেও এলেন। তার পরেতে সনাতন স্টেশন ওয়াগন বার করে মেয়েটাকে নিয়ে গেল গঙ্গার পাড়ে।—জানি, জানি, অনেক ছিদ্র আছে এ থিওরীতে—কিন্তু আপাতত এ ছাড়া কিছু ভাবতেও পারছি না।'

(ক্রমশঃ)

সমুদ্রের নীচেও পৃথিবী ছিল

অয়স্কান

বিশ্বের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন। মেলানেশিয়ার সলোমন দ্বীপপুঞ্জ কোথায়? ইন্দোনেশিয়ার পূবে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পূবে প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি ছোট ছোট বিন্দুকে বলা হচ্ছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। দ্রাঘিমা ১৬০ ডিগ্রী পূর্ব অক্ষাংশ ১০ ডিগ্রী দক্ষিণ—এই হচ্ছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান। এবারে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে দূরত্ব কত? বহু হাজার কিলোমিটার। দুয়ের মাঝখানে থেকে গিয়েছে ভারত মহাসাগর। অথচ কি আশ্চর্য এই দুই পৃথক স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে এমনই সাদৃশ্য যে এমনকি নৃতত্ত্ববিদরাও আলাদা করে চিনতে পারেন না।

ট্রপিকাল আফ্রিকার গোটা এলাকা জুড়ে বাস করে নিগ্রোয়েডরা। আবার এই নিগ্রোয়েডদেরই আমরা দেখতে পাই ভারত মহাসাগরের অপর দিকে—অস্ট্রেলিয়ার নিউগিনীতে মালয়ে। এত দূরের দূরের পৃথক দেশে তারা ছড়িয়ে পড়ল কি করে?

আফ্রিকার পূব উপকূলের কাছে মাদাগাস্কার বা মলগাসি দ্বীপটি দেখতে পাচ্ছেন কি? এমনিতে মনে হতে পারে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের মানুষদের সঙ্গে ও তাদের ভাষার সঙ্গে এই দ্বীপের মানুষদের ও তাদের ভাষার মিল থাকবে। বাস্তবে দেখা যায় আরো বেশি মিল রয়েছে এই দ্বীপের মানুষদের সঙ্গে মেলানেশিয়ানদের এই দ্বীপের মানুষদের ভাষার সঙ্গে ইস্টার দ্বীপের মানুষদের ভাষার।

মালাগাসির উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুলের চেহারা কেমন? আফ্রিকান কি? না তার চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়।

নিগ্রোয়েড জাতির মধ্যে একটি বড় উপজাতির মানুষরা বামন হয়ে থাকে। কেন? আবার এই বামনদেরই দেখা যায় আফ্রিকায় মালয়ে ফিলিপাইনে নিউগিনীতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে (শেষোক্ত স্থানের বামনরা এখনো রয়েছে প্রস্তরযুগে)। এমন কি হতে পারে অতীতের কোনো এক সময়ে আফ্রিকা দক্ষিণ এশিয়া ও ওসীয়ানিয়া জুড়ে বসবাস করত বিপুল একদল বামন মানুষ।

আফ্রিকা ও ওসীয়ানিয়ার ভূখণ্ডে যে নিগ্রোয়েডরা বাস করে তাদের মাঝখানে রয়েছে ভারত মহাসাগরের ব্যবধান। আবার এই আফ্রিকা ও ওসীয়ানিয়ার মধ্যে রয়েছে বিরাট এক ভূখণ্ড—এশিয়া মহাদেশ। এই মহাদেশে বাস করে দুটি বৃহৎ জাতি—একটি হচ্ছে মঙ্গোলয়েড। তারই মাঝেমাঝে ছিটেফোঁটা নিগ্রোয়েডও। মধ্য ভারতে রয়েছে মুণ্ডা উপজাতি যাদের বলা হয় দেশের আদিমতম অধিবাসী। দক্ষিণ ভারতে রয়েছে কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড়। এই দ্রাবিড়দের উদ্ভব যে কোথা থেকে তা বিজ্ঞানের কাছে রহস্য।

সবচেয়ে বড়ো বিতর্ক চলেছে তামিলদের নিয়ে। এই তামিলরাও দ্রাবিড় বিশিষ্ট সংস্কৃতির অধিবাসী। তামিলদের আদি বাসভূমি হিসেবে নানা দেশের ও এমনকি মহাদেশের নাম শোনা যাচ্ছে। তামিল ইতিহাসবিদরা বলেছিলেন দূর অতীতে তামিলদের বাসভূমি ছিল নবলম নামে বৃহৎ একটি দ্বীপের দক্ষিণাংশে। বিষুববৃত্তের কাছে প্রথম উদ্ভূত একাদি ভূখণ্ড হচ্ছে এই দ্বীপাদি। আর এই অঞ্চলেরই একটি অংশের নাম লেজুরিয়া—হারিয়ে যাওয়া এক মহাদেশ যাকে বলা হত সভ্যতার লালনভূমি।

তামিল পণ্ডিতরা ধারণা করেছিলেন গোণ্ডয়ানার উত্তরের উদগত অংশ হচ্ছে লেজুরিয়া। গোণ্ডয়ানা হচ্ছে বৃহৎ এক মহাদেশ—এখন রয়েছে ভারত মহাসাগরের তলদেশে।

ভারতে প্রচলিত নানা উপকথাতেও মহাসাগরে তলিয়ে যাওয়া দুটি মহাদেশের কথা বলা হয়েছে।

ভূতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন, ভারত ও আফ্রিকা একসময়ে বৃহৎ একটি ভূখণ্ডের সেতু দ্বারা যুক্ত ছিল। বর্তমানে ভারতের ভূখণ্ড ও মহাসাগরের মধ্যে রয়েছে দুটি পর্বতমালা—পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট। এই দুই পর্বতমালার লম্বা খাড়া উদ্গত অংশের দিকে তাকালে বোঝা যায় এখানে একসময় বিশাল এলাকা জুড়ে জমির অংশ জলের নিচে ডুবে গিয়েছে। আগ্নেয়গিরির লাভা নেমে গিয়েছে এক কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত মহাসাগরের তলদেশে। অর্থাৎ এখন যা সমুদ্রের তলদেশ একসময়ে তা ছিল ভূখণ্ড। সেটি যখন ডুবে যায় তখনই পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালার সৃষ্টি। বহু ভূতত্ত্ববিদ এই মত পোষণ করেন যে ভারতের গোটা উপমহাদেশটি হচ্ছে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাওয়া বিশাল এক ভূখণ্ডের থেকে যাওয়া অংশ আর শ্রীলংকা দ্বীপটি এই উপমহাদেশেরই অংশ।

"বোম্বাই অঞ্চলে জলের নিচে অরণ্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া বোম্বাই অঞ্চলে উপকূলের চেহারা দেখেই বোঝা যায় এখানকার জমি যে জলের তলা গিয়েছে তা খুব দিন আগের কথা নয়।

প্রাচীনকালের বহু ভূগোলবিদ ধারণা করেছিলেন যে ভারত মহাসাগর প্রকাণ্ড একটা হ্রদ তার চারদিকে ছিল ভূখণ্ড। এ ভূখণ্ড কি এখন ভারত মহাসাগরে তলদেশে?

হাজার হাজার বছর ধরে বা এমনকি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সারা বিশ্বে মানুষে দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। এমনও হা পারে যে এই একই সময়ে ঘটে গিয়ে বড়ো বড়ো ভৌগোলিক পরিবর্তন—জা কোথাও ডুবেছে কোথাও জেগেছে।

নিগ্রোয়েডরা যে এত দূর-দূর দে এমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছে—এ এমনিতে ধাঁধা মনে হতে পারে। কিন্তু এ ধাঁধার জবাব পাওয়া যায় যদি আমরা ধ নিই যে একসময়ে ভারত ও আফ্রিকার মা এবং এমনকি আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মা ছিল ভূখণ্ডের যোগ। সেই ভূখণ্ডটি এখ আর নেই সমুদ্রের তলায় বিলীন। এ মনে হয় প্রক্রিয়াটি এখনো চলছে। আধুনি গবেষণায় লব্ধ ভৌগোলিক তথ্য থেকে জানা যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সম উপকূল ভাগ আস্তে আস্তে সমুদ্রে থেকে ডুবছে। সম্ভবত অতীতকালে ডুবে ছিল আরো অল্প সময়ের মধ্যে আ ব্যাপকভাবে।

গোণ্ডয়ানাল্যাণ্ড ও লেজুরিয়া

বহু সংখ্যক ভূতত্ত্ববিদ মনে করে কোটি কোটি বছর আগে দক্ষিণ গোণ্ড বিশাল এক মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল আ সেই মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল দক্ষি আমেরিকা আফ্রিকা ভারত অস্ট্রেলিয়া ক্রমের, অঞ্চল।

গোণ্ডয়ানাল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশে উদ্ভিদকুল ও প্রাণীকুল ফসিল তুলনা করে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আর এ সাদৃশ্য শুধু ফসিলেই নয়। উষ্ণতায় মা থাকতে ভালোবাসে এমন এক ধরণে কেঁচো হুবহু একই প্রজাতির পাওয় গিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় ভারতে ও শ্রীলঙ্কায়। কেঁচো তো আর ভার মহাসাগর সাঁতার পার হতে পারে না অতএব ধরে নিতে হয় একসময়ে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া ভূখণ্ড দ্বারা যুক্ত ছিল কিম্ব পাশাপাশি অবস্থিত ছিল এবং পরে হাজা হাজার কিলোমিটার সমুদ্রের ব্যবধানে সরে গিয়েছে। শরীরের সঙ্গে যুক্ত থলিতে শাবক বহন করে এমন কোনো কোনো স্তন্যপায়ী জীব একমাত্র পাওয়া যা

চণ্ডীমঙ্গল বা কমলে কামিনীর পট

বাংলার পটশিল্প ও পটুয়াদের সম্পর্কে দেশ-বিদেশের শিল্পরসিক সুধীজনদের মধ্যে আজকাল গভীর আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে। পটশিল্প আমাদের দেশের প্রাচীন লোকশিল্পকলাগুলির অন্যতম। গ্রামবাংলার স্বভাবশিল্পীদের শিল্পমনের সৃজনবোধ পটকে আশ্রয় করে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা শুধু বিস্ময়করভাবে নয়নলোভনই নয়, লোকশিক্ষার যথার্থ ও অকৃত্রিম উপকরণ হিসাবেও চিত্রগুলির বিশেষ একটা ভূমিকা ও উপযোগিতা রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাচীন লোকসংস্কৃতির অন্যতম গুণগ্রাহী ও পৃষ্ঠপোষক শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয়ই বোধ হয় সর্বপ্রথমে তথাকথিত প্রায়-অশিক্ষিত গ্রাম্য পটুয়াদের শিল্পধারাটি আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর পটুয়া সঙ্গীত গ্রন্থটিতে বীরভূমের জীবিত পটুয়াদের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন, অনেক পটুয়াসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন। বীরভূমের পটুয়ারা এখন সংখ্যায় নগণ্য। তাঁদের মুষ্টিমেয় পুরাতন পটই শুধু অতীত দিনের গৌরবস্মৃতি বহন করে চলেছে—এ দিক দিয়ে বিচার করলে মেদিনীপুরের পটুয়ারা এখনও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে বেঁচে আছেন। অবশ্য আর কতদিন যে থাকবেন তাতে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গ্রামগ্রামান্তরে ঘুরে গান গেয়ে, পট দেখিয়ে যে রোজগার হয় তাতে আজকাল আর পেট ভরে না। পট কেনবার মত রুচিবান পৃষ্ঠপোষকও ক্রমে দুর্লভ হয়ে আসছেন।

সব পটুয়ারই দুটো করে না

গৌরচন্দ্র সা

মেদিনীপুরের পটুয়ারাও এখন মাত্র ১৫।১৬টি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নয়া, মালিগ্রাম, কিশোরপুর, হরিশতাড়া, টাকাপুর, চেতনাপুর, আঁকুপুর, চেতুয়া, নিভাইপুর, নাড়াজোল প্রভৃতি গ্রামে আমরা মাত্র ২।৪ ঘর করে পটুয়ার সন্ধান পেয়েছি।

এদিকের পটুয়া সম্প্রদায় নিজেদের নামের শেষে চিত্রকর উপাধি ব্যবহার করেন। অনেক পটশিল্পী ক্রমে ক্রমে প্রতিমাশিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছেন—আর্থিক কারণেই। পটুয়া পরিবারের মেয়েরাও রং ইত্যাদি তৈরি করে দিয়ে পুরুষদের সাহায্য করেন অবশ্য। নিভাইপুরে একজন মহিলা-পটুয়ারও সন্ধান আমরা পেয়েছিলাম—তিনি শ্রীমতী গৌরী চিত্রকর, স্বাধীনভাবে পটের কাজ করে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন।

পটুয়ারা সাধারণত রামায়ণ, মহাভার মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয় সুপরিচিত আ গুলিকে রং-তুলি দিয়ে পটে ফু তোলেন। মনসামঙ্গল (বেহুলা পালা) চণ্ডীমঙ্গলের (কমলে-কামিনী পালা) আঁকা অনবদ্য পট আমাদের চোখে প অনেক সময় অত্যন্ত আধুনিক বিষয় পটের উপজীব্য হয়েছে। আধুনিকা বেয়াড়া চালচলন ও শাশুড়ী-বৌ কাহিনী দর্শকদের কাছে যুগপৎ দৃশ্য শ্রব্য হয়ে যে কৌতুকরস সৃষ্টি করে তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। প্রধান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কুড়ি দফা সূচীও অবলীলায় পটে স্থান পে সাঁওতালী রূপকথা ও মুসলমান পী ফকিরদের মাহাত্ম্য-কাহিনী নিয়েও পটু পট তৈরি করেছেন—গান বেঁধেছেন।

হিন্দু পৌরাণিক আখ্যান, মুসলমানী কাহিনী অথবা অন্য কোনো কাহিনী যাই হোক না কেন, পরিকল্পনার পরিধি স্থির করে নিয়ে প্রায় দেড় ফুট×এক ফুট কাগজের কতকগুলি টুকরোতে পটুয়া শিল্পী আলাদা আলাদা করে ছবি এঁকে নেন। হয়তো রামের বনগমন থেকে রাবণ বধ ও সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত কাহিনী এই রকম ১৪।১৫ খানি টুকরো কাগজে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আঁকা হল। তারপর টুকরো ছবিগুলি পুরোনো কাপড়ের উপর আঠা দিয়ে পর পর সেঁটে দেওয়া হয়। এই কাপড়ের ফালির, ছবিগুলি জুড়বার পর যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০।২২ ফিট হয়ে যায়, দুই প্রান্তে দুটি মসৃণ, গোলাকার কাঠের দণ্ড বা বাঁশের কঞ্চি সেলাই করে দেওয়া হয়। এখন পট তৈরি শেষ হল এবং এটি শেষের দিক থেকে সুরু করে আরম্ভের দিকে গুটিয়ে রাখা হয়। এই রকম ২০।২৫ খানি পট চটের থলিতে ভরে পটুয়ারা গ্রাম-গ্রামান্তরে বেরিয়ে পড়েন কিছু রোজগারের প্রত্যাশায়। পট দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে যে গান পটুয়ারা গেয়ে থাকেন সে গান পটেরই বিষয়ানুসারী। এ সব গান পটুয়ারা হয় বংশপরম্পরাক্রমে পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছেন কিম্বা নিজেরা রচনা করে নিয়েছেন। পটের বিষয় অভিনব হলে গান নিজের তৈরি করে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সেদিক দিয়ে বিচার করলে পটুয়ারা শুধু স্বভাব-শিল্পী নয়, স্বভাব-কবিও।

পটুয়াদের পট আঁকবার পদ্ধতি-প্রকরণ খুবই সাদা-সিধে। যে কাগজে এঁরা ছবি আঁকেন তা অতি সাধারণ মিলের কাগজ। সব ছবিই আঁকা হয় জল-রংয়ে। তুলি চালাবার আগে কাগজে কোনোও রকম স্কেচও দরকার হয় না তাঁদের। বাড়িতে তৈরি ছাগলের লোমের তুলি দিয়ে সহজ সরল শুধু মোটা টানে কাহিনীর বিষয়টি কাগজের উপর ফুটিয়ে তোলেন তাঁরা। রং-ও এরা নিজেরাই ঘরে তৈরি করে নেন। নানা রংয়ের মাটি, গাছ গাছড়ার ছাল, শিকড় ও পাতা এঁদের মনোমত রং জুগিয়ে দেয়। শিম-গাছের পাতা, শিউলি ফুলের বোঁটা, পুঁই-শাকের পাকা বীজ, কাশামিল্লা গাছের ছাল, আর গাছের ছাল, পাতা, শিকড় বেটে ঘষে মিশ্র করে হরেক রকম রংয়ের ব্যবস্থা হয়। ছবিতে জেল্লা আনতে ব্যবহার হয় বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি বেলের আঠা।

এখানকার পটুয়ারা ধর্মে না পুরো হিন্দু না পুরো মুসলমান। প্রায় সব পটুয়ারই দুটো করে নাম—একটি হিন্দু নাম, অন্যটি মুসলমানী। হিন্দুপ্রধান গ্রামে পট নিয়ে গেলে নিজের হিন্দু নামটি ব্যবহার করেন—আর মুসলমান-প্রধান গ্রামে গেলে বলেন অন্য নামটি। তাই যতীন্দ্রনাথ চিত্রকরের অন্য নাম জৈনুদ্দিন শেখ, তাঁর ছেলে বিষ্ণুপদ চিত্রকরের আরেক নাম জাবের শেখ। এঁরা নিয়মিত নমাজ না পড়লেও ইদল ফিতরে এবং ইদুজ্জোহাতে নমাজ পড়বেন অবশ্যই। গোমাংসে নিষেধ নেই, কিন্তু অনেকে তা স্পর্শও করেন না। আবার প্রত্যেক বছর ভাদ্র-সংক্রান্তির দিনে এঁরা বিশ্বকর্মার পুজো করেন ঘটা করে। সেদিন কিছুতেই কাউকে পট দেখাবেন না। পটুয়া পরিবারের মেয়েরা মাথায় সিঁদুর দেন, হাতে লোহা পড়েন কিন্তু শাঁখা নয়। জলকে এরা জলই বলেন—পানি বলেন না। বাবা এবং মাও আব্বা-আম্মা নয়,—বাবা এবং মা। কাকা বা মামার মেয়েকে বিয়ে করবার রীতি এদের সমাজেও প্রচলিত। তালাক এবং নিকা প্রথাও মুসলমানদেরই মত। বিয়েতে দেন-মোহরের প্রচলনও আছে, তবে পণপ্রথা নেই। মুসলমানী বিয়ে হয় দিনে, এবং বর সেদিনই স্বগৃহে চলে যান। কিন্তু পটুয়াদের বিয়ে হয় রাতে, আর সেদিন বর-কনের বাড়িতেই থাকেন। মৃতদেহ মুসলমানদের মতই কবরে দেওয়া হয়, তবে অনেক সময় মুখাগ্নি করে তবে কবরে শোয়ানো হয়। এঁদের গোরস্থানও আলাদা।

এই মিশ্র ধর্মরীতির জন্য স্থানীয় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের কাছেই এঁরা অপাংক্তেয় হয়ে আছেন। হিন্দু বা মুসলমান কেউই তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চান না। ফলে পটুয়াদের বিয়ে শাদী সব কিছুই নিজেদের জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমায়িত।

পটুয়াদের মধ্যেও সামান্য কিছু জাতিভেদ আছে। নিজেদের জন্মবৃত্তান্তের যে কিংবদন্তী পটুয়ারা বলেন তার মধ্যেই এই জাতিভেদের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই কাহিনী বলবার অবসর এখানে নেই। তবু, সংক্ষেপে বলা যায় যে পটুয়ারা আরব দেশীয় এক মুসলমান চিত্রকরকে নিজেদের আদি পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। সেই চিত্রকর নানা কারণে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে দুঃখ পেয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেন। তাঁর চার ছেলে ঘুরতে ঘুরতে এ দেশে এসে হাজির হন। ক্রমে তাঁরা তিন ভাই তিন হিন্দু মেয়েকে এবং বড় ভাইটি এক সাঁওতালের মেয়েকে বিয়ে করেন। এখন যে সব পটুয়া এই বড় ভাইয়ের বংশধর বলে নিজেদের দেন তাঁরা স্থানীয় সাঁওতালদের কাছেও গুরুর সম্মান পান। দ্বিতীয় ভাই বিয়ে করেছিলেন এক ব্রাহ্মণকন্যাকে। চৈতন্যপুর, আঁধুপুরের কিছু কিছু চিত্রকর নিজেদের তাঁরই বংশধর বলে দাবী করেন এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুজীবন যাপনের চেষ্টা করেন। তাঁদের কারো কারো বাড়ীতে তুলসীমণ্ডপ পর্যন্ত আছে।

তৃতীয় ভাই বিয়ে করেন এক শূদ্র-কন্যাকে, আর চতুর্থ ভাই বিয়ে করেন পৌণ্ড্র জাতির মেয়েকে। 'মাল-পটুয়া' শ্রেণীর চিত্রকরেরা নিজেদের পরিচয় দেন এই চতুর্থ ভাইয়ের বংশধর বলে। মাল-পটুয়াদের সঙ্গে আবার অন্য পটুয়াদের সামাজিক ওঠা-বসা নেই।

পটুয়াদের এই রূপকথা-সুলভ জন্ম-বৃত্তান্তের মধ্যে সত্যাসত্য যাই থাকুক না কেন পটুয়ারা বলেন যে হিন্দুর ও মুসলমানের—উভয়ের রক্তই তাঁদের শরীরে রয়েছে বলে কোর-আন ও পুরাণ—দুয়েতেই তাঁদের সহজাত অধিকার জন্মেছে। জন্মসূত্রেই পেয়েছেন চিত্রাঙ্কনের প্রবণতা। সেই মূলধন সম্বল করে বহুযুগ ধরে পট এঁকে, গান গেয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দরজায় দরজায়, মারী-মন্বন্তরে এখনও শেষ হননি তাঁরা।

প্রবন্ধটির তথ্য-সংগ্রহে সহায়তা করেছেন মেদিনীপুরের শ্রীবিষ্ণুপদ চিত্রকর। পটের ছবিগুলি তুলে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রীবিশু পাল, টিপটপ স্টুডিও, বোলপুর।

সীতাহরণ পট

পুনশ্চ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু ইহার এক অন্তরায় ছিল। বহু সংখ্যক ব্যক্তি পত্রিকায় কেবল বাঙ্গালা লেখা পড়িবার জন্যই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীতে চালাইলে ঐ সকল গ্রাহক হারাইতে হয়। কিন্তু তখন আর সে চিন্তার সময় ছিল না। তখন অতি গুরুত্বের ব্যাপার জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ। যেরূপ আইনের প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাতে শিশিরকুমার স্থির করিলেন পর সপ্তাহে যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হইবে অমনি পত্রিকাকে আইনের বাহিরে ফেলা হইবে। সুতরাং মীমাংসা হইল পত্রিকা আর কোন ক্রমেই ইংরেজী ও বাঙ্গালা দুই ভাষায় প্রকাশ করা হইবে না। পর সপ্তাহ হইতেই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজী ভাষায় বাহির হইবে।

কিন্তু তাহাতেও বিষম গোল বাধিল. শিশিরবাবুর তখন ইংরেজী কাগজ বাহির করিবার উপযুক্ত টাইপও নাই, কম্পোজিটরও নাই। কলিকাতায় নিমতলার দত্তবংশীয় বাবু প্রাণনাথ দত্ত ও গিরীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা তাঁহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা পত্রিকার জন্য কতকগুলি ইংরেজী টাইপ ধার দিলেন। শিশিরবাবুর সব ভাইয়েই প্রত্যেকেই কম্পোজের কাজে নিযুক্ত। সুতরাং ইংরেজীতে কাগজ বাহির করিবার আর কোন বিঘ্ন রহিল না।

দিন দিন পত্রিকার উন্নতি হইতে লাগিল। পত্রিকার এইরূপ অভাবনীয় উন্নতির কারণ যে, কেবল শিশিরবাবুর এই উৎকৃষ্ট লিখনভঙ্গী, তাহা নহে। শিশিরবাবুর রচনার এমন অদ্ভুত মোহিনী শক্তি, তাঁহার এমনই বৈচিত্র্যময়ী লিপিকুশলতা যে, অতি পুরাতন বিষয়ও তাঁহার লেখার গুণে যেন সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়।

কিরূপে সাপ্তাহিক পত্রিকা দৈনিক হয় এইবার তাহারই কিছু উল্লেখ করিব। সহবাস-সম্মতি আইনের আন্দোলনে বঙ্গভূমি তোলপাড় হইতেছে—সমগ্র বাঙ্গালা জুড়িয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় দেশের একমাত্র ইংরেজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান মিরর দেশের লোকের পক্ষ ছাড়িয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে দাঁড়াইলেন। দেশের লোকের মনের কথা প্রকাশ করিবার আর কোনও কাগজ নাই। সুতরাং দলে দলে লোক আসিয়া পত্রিকা আফিসে আসিয়া গোলযোগের উপক্রম করিতে লাগিল।

সকলের মুখেই এক কথা, "পত্রিকাখানি দৈনিক করিয়া দেশের লোকের মনের কথা পত্রিকায় প্রকাশ করুন।" কিন্তু দৈনিক করা কি সহজ কথা? তাহাতে প্রথমেই প্রায় লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। এত টাকা আসে কোথা হইতে? লোকে তা তাহা বুঝে না। তাহারা বারম্বার এইরূপ জেদ করিতে লাগিল—"পত্রিকা দৈনিক করুন!"

শিশিরবাবুর অপার সাহস, অসাধারণ শক্তি। তিনি লোকের কথাই শুনিলেন, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, শেষে তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকাখানিকে দৈনিকে পরিণত করিলেন। ভগবানের এমনই অদ্ভুত লীলা যে, অমৃতবাজার যে দিন হইতে দৈনিক হইল সেই দিন হইতে ইহার আয়ও বাড়িতে লাগিল। ফলে একদিনের তরেও অমৃতবাজারের অর্থের অনটন ঘটিল না।

দৈনিক অমৃতবাজার ব্যতীত অমৃতবাজারের সাপ্তাহিক এবং বৈদেশিক এই দুইটি সংস্করণও প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৬৮ সালে যশোহর অমৃতবাজারে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে প্রথম অমৃতবাজার প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ সালে অমৃতবাজার খাঁটি ইংরেজী কাগজ হয়। দৈনিক হয় ১৮৯১ সালে। লর্ড রিপন যখন ভারতের ভাইসরয় তখন একদিন তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী শিশিরকুমারকে লাট ভবনে যাইবার জন্য এক পত্র লিখেন। লর্ড রিপন একজন প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাসী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং শিশিরবাবুর আগ্রহে বড়লাট বাহাদুরের এই আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুরের এই আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। এই আলাপে উভয়েই বিশেষ প্রীত হন। স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে বড়লাট রিপন বাহাদুর যে সকল আইন বিধিবদ্ধ করেন, শিশিরবাবুর তৎপক্ষে কৃতিত্ব প্রচুর।

ভারতের ফৌজদারী বিচারপ্রথা শিশিরকুমার বাবুর পক্ষে বহুদিন হইতে এক বিষম সমস্যার বিষয় দাঁড়াইয়াছিল। শিশিরবাবুর পূর্বাপর ধারণা ছিল যে, ভারতে অতি দুর্বল প্রমাণ-প্রয়োগের বলেই বিচারক আসামীর দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে তিনি ইহাও মনে করিতেন যে ভারতে আসামীর যে দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা বিলাতের দণ্ডের তুলনায় অত্যন্ত কঠোর। তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করেন এবং তাহাতে অনেকটা সুফলও ফলে। তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে ইহাও জানান যে, এ সম্বন্ধে স্বর্গলোকগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরামর্শদাতা। তদনুসারে বড়লাট রিপন বাহাদুর মনোমোহনবাবুকে দণ্ডবিধি সংস্কার সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। মনোমোহনবাবুও এক বিস্তৃত মন্তব্য লিখেন। এ মন্তব্য সমস্ত ভারতময় প্রচারিতও হয়। কিন্তু অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীই এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুতরাং সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় না।

এ হেন কঠোর রাজনীতিজ্ঞ শিশিরবাবু কিরূপে প্রেমমার্গীয় কোমল ভক্ত হইলেন, রাজনীতির আলোচনা ছাড়িয়া কিরূপে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমসাগরে ডুবিয়া গেলেন, তাহা ১ম খণ্ড অমিয় নিমাই চরিতের উৎসর্গপত্র হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিশিরবাবু লিখিতেছেন—

"শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষের প্রতি—

মেজদাদা! তুমি আমাকে এই জড় জগতে রাখিয়া গোলকধামে গমন করিলে, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি প্রকাশ করিয়াছিলাম—

"কয়েক বৎসর গত হইল আমরা দুই ভ্রাতা একটি শোক পাইয়া ব্যথিত হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে, যখন সকলকে মরিতে হইবে তখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু কি করিব কোথায় যাইব? মরিবার জন্য প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়? ইহা লইয়া দু' ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম।

পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞান-পথ আর এক ভক্তি-পথ। কিন্তু ইহার কোনটি ভাল? কোন পথে আমরা যাইব? তখন ইহার কোন নিরাকরণ করিতে না পারিয়া দু ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। জ্ঞান-পথ। এরূপ ভাগে আমরা কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজদাদা মধুরপ্রকৃতি, ভক্তিময় ও সর্বজীবে দয়ালু। আর আমি জ্ঞানাভিমানী, তেজীয়ান ভক্তিহীন ও হৃদয়শূন্য।

মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভক্তি পথ শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে পথ দিয়া অবশ্য লোকেই যাইতে পারে। অতএব তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান পথের গুরু কোথায়?

অগ্রে আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অন্বেষণ করিতেছি তখন শুনিলাম বোম্বাই নগরে আমেরিকা দেশ হইতে ব্লাভাট্‌স্কী নামক একটি মেম ও অলকট নামক একটি সাহেব আসিয়াছেন। ইঁহারা পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ অনেক অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট যাত্রা করিলাম ও কিছু [illegible] তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেখি সহর, আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান। এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চূর্ণী নদীর ধারে হাঁসখালি গ্রামে একটি পরিত্যক্ত নীল কুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। আর সেখানে নির্জনে কিছু কিছু মনঃসংযোগ কার্যও অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ)

ক্ষপণক

শ্রীঅরবিন্দ

মনোরঞ্জন বসু

একজন সাংবাদিক বন্ধু আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, দেশের এক বিশেষ সঙ্কট মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে পণ্ডিচেরী চলে গেলেন কেন? সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি ছিলেন তৎকালীন নেতা, বিপ্লবাগ্নি তিনি জ্বেলেছিলেন দেশের বুকে, বিপ্লব যজ্ঞের তিনি ছিলেন হোতা—দেশের বহু তরুণ যুবক সেদিন দেশ প্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কিছু যুবক বিপ্লব যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়েছিল তাদের তিনি ত্যাগ করলেন কেন? তিনি আরও বললেন, আমরা সাধারণ মানুষ, লৌকিক বিধি-নিষেধ ও পরম্পরায় আমরা বিশ্বাসী লৌকিক ঊর্ধ্বে বা অলৌকিক কোন কিছু শুনলে আমাদের মনে সংশয় দেখা দেয়, সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষ অরবিন্দকে বোঝবার কি কোন উপায় আছে?

আর একদিন কোন একটা ঘরোয়া আলোচনায় আমার একজন প্রণম্য ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা! 'অরবিন্দ দর্শন' নামে আজকাল একটা শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখি, এমনকি কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যেও 'অরবিন্দ দর্শন' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অরবিন্দ দর্শনের মূল বক্তব্য কি? শংকর-বেদান্ত বা রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ন্যায় অরবিন্দ দর্শন কি কোন তত্ত্বভিত্তিক, যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাপার, না অরবিন্দ দর্শন স্বতন্ত্র কিছু শিক্ষা দেয়?

পদ্ধতির দিক থেকে ভারতীয় দর্শন বলতে আমরা বুঝি—সাংখ্য-যোগ; ন্যায়-বৈশেষিক; মীমাংসা - বেদান্ত - আস্তিকাবাদী ষড়দর্শন; সংশয়বাদী লোকায়ত বা চার্বাক; এবং নাস্তিকাবাদী জৈন ও বৌদ্ধ। তাছাড়াও দ্বৈত; দ্বৈতাদ্বৈত; বিশিষ্টাদ্বৈত; অচিন্ত্য ভেদাভেদ; অদ্বৈত প্রভৃতি নানা মতবাদ আছে। অরবিন্দ দর্শনকে কি ঐগুলির কোনএকটির অন্তর্ভুক্ত করা যায়? যদি তা না যায় তবে অরবিন্দ চিন্তার স্বাতন্ত্র্য কোথায়?

সাধারণের দিক থেকে আর একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীঅরবিন্দের সাধনার স্বরূপ কি? অধ্যাত্ম ভারতের প্রচলিত সাধন পদ্ধতির সঙ্গে ঐ সাধনার পার্থক্য কোথায়, কোন অংশে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মৌলিকতা?

ভারতবর্ষের ধর্ম সম্প্রদায়ের ইতিহাসে দেখা যায় শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সৌর ও গাণপত্য পঞ্চোপাসক গিরী পুরী ভারতী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসী; তাছাড়াও শাক্তদের মধ্যে আছেন পশ্বাচারী বীরাচারী ও দিব্যাচারী তন্ত্রোপাসক; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, শংকরপন্থী যতি; জ্ঞানী যোগী ভক্ত আউল বাউল সহজিয়া মরমিয়া দন্ডী অবধূত প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষের ধর্ম ও অধ্যাত্ম চেতনার ইতিহাস পরিপূর্ণ। সম্প্রদায়গত সন্ন্যাসীদের সাধনা ছাড়াও মন্ত্র বিজ্ঞান ও মন্ত্র সাধনা ভারতীয় সাধন শাস্ত্রের একটা বিশেষ দিক। মীমাংসা ও তন্ত্রে মন্ত্রের ব্যবহার খুব বেশী। মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বীজমন্ত্রের সাধনা দেখা যায়। এসব ছাড়াও ভারতের প্রতিটি হিন্দু পরিবারে কুলগুরু আছেন সংস্কারের দিক থেকে ঐসব পরিবারের বীজমন্ত্র ও সাধনরহস্য কুলগুরুরা জানেন এবং ঐসব পরিবারকে ধর্মপথে চালিত করেন। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ— চিরায়ত ভারতবর্ষের চারিটি পুরুষার্থ—এই পুরুষার্থ সাধনের মধ্যে ভারতীয় জীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা। ফল কথা, অধ্যাত্ম ভারতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় স্থান নির্দিষ্ট করা কি সম্ভব? লৌকিক জীবনে সে সাধনার প্রভাব কতটুকু?

অরবিন্দ

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বর্তমান লেখকের লেখার একটা অংশ দেওয়া হল : ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ক্ল্যাসিক্যাল স্কলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী অরবিন্দ কিভাবে পরবর্তীকালে পন্ডিচেরীতে ঋষি বা যোগসিদ্ধ শ্রীঅরবিন্দ হলেন—অধ্যাত্ম বিবর্তনের ইতিহাসে এ রূপান্তর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এখানে উল্লেখ্য যে অরবিন্দ তাঁর প্রথম জীবনে মহারাষ্ট্রীয় বিষ্ণু ভাস্কর লেলে মহারাজের কাছ থেকে হঠযোগের সাধন সম্পর্কে কিছু কৌশল আয়ত্ত করেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন সে শিক্ষা তাঁর অধ্যাত্ম পথের দিশারী হয়নি। সসীম ও অসীম, ব্যবহার ভূমি ও অধ্যাত্ম জগৎ—উভয়ের মধ্যে অনতিক্রমনীয় ব্যবধানের কথা দীর্ঘদিন আমরা শুনে এসেছি, ফলে যে কোন অধ্যাত্ম প্রয়াসের মধ্যে কোথায় যেন একটা সংসার-বিমুখতা পার্থিব জীবন সম্পর্কে ঔদাসীন্য আমাদের অবচেতনে সংস্কার হয়ে গেছে। এ-ধারণা আমাদের ব্যক্তিজীবনে এত প্রবল এবং প্রচলিত চিন্তা ও আচার-ব্যবহারকে এ ধারণা এতখানি প্রভাবিত করেছে যে সংসারবিমুখতা সাধনার পক্ষে কেবলমাত্র অনিবার্য নয়, ইহাই যেন আধ্যাত্মিকতার একমাত্র পথ। শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করলেন বিশ্বপ্রকৃতি ধ্যান-নিমগ্না, সমগ্র জীবনই যোগ—প্রকৃতির অচেতন যোগ ও মানুষের সচেতন যোগ উভয় যখন সমপর্যায়ে উন্নীত হয় তখনই সত্যিকার যোগের পূর্ণ উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সিদ্ধ হয়। মানবজীবনে প্রাকৃত শক্তি ও ভাগবত শক্তির যোগ যদি সম্ভব না হয় তাহলে সে যোগ পূর্ণতা দিতে পারে না এবং মানব জীবন মুক্ত ও সিদ্ধ হয় না। কারণ মানুষ কেবলমাত্র [illegible] রূপান্তর নয়। সে ত্রৈধী শক্তির প্রতীকও বটে। আত্মা শক্তিতে সে নিজেকে রূপান্তরিত করে একদিকে যেমন সে ঊর্ধ্ব চেতনাকে উপলব্ধি করতে পারে, অপরদিকে তেমনি নিজের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাকে কার্যকর করতে সক্ষম হয়। এই সম্ভাবনাকে সিদ্ধ করবার জন্যই মানুষের জীবনে অধ্যাত্ম প্রয়াস। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এ সম্ভাবনাকে কার্যকর করবার জন্য এবং সমগ্র মানব জাতির মহত্তর উন্মেষের প্রস্তুতির জন্য ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে কখনও

কখনও এ-সাধনা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। অরবিন্দ উপলব্ধি করেছিলেন সামগ্রিকভাবে ভারতের অধ্যাত্ম জাগরণের মধ্যে পৃথিবীর মুক্তি অপেক্ষিত। তাই তিনি কিছুকালের জন্য নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন সমষ্টি জীবনের কর্মস্রোত থেকে। ফলে অগ্নিযুগের অরবিন্দ ও আন্তরবিপ্লবী পন্ডিচেরীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দের কর্মসাধনার মধ্যে এক আত্যন্তিক যোগসূত্র দেখা যায়। অরবিন্দের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে পন্ডিচেরী গমন কর্মক্ষেত্র ত্যাগ নয় মনুষ্য সমাজের মঙ্গলের পক্ষে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র প্রস্তুতির আয়াস। মানিকতলার বোমার কারখানা ধরা পড়বার পর অরবিন্দ বুঝেছিলেন সশস্ত্র আন্দোলনের পথে সরাসরি এগুনো এখন ঠিক হবে না, তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল দেশের মাটিতে যে বিপ্লবের বীজ অংকুরিত হয়েছে তার ফল অবশ্যম্ভাবী ফলবে। পন্ডিচেরীতে গিয়েও তিনি রাজনৈতিক চিন্তা ছাড়েন নি—সর্বদাই তিনি দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

অরবিন্দের দৃষ্টিতে লৌকিক ও অলৌকিক—উভয়ের মধ্যে আপাত কোন ব্যবধান ছিল না, লৌকিকের স্বরূপের মধ্যেই অলৌকিকের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই স্বরূপকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। মানুষের জীবনের অধ্যাত্ম রূপান্তর ছিল তাঁর কাম্য। এখানে উল্লেখ্য শ্রীঅরবিন্দ অতিমানস স্তরের সন্ধান জানতেন—এই অতিমানস-স্তর লৌকিক জগতের ঊর্ধ্বে, জাগতিক চিন্তার অতিক্রান্তিতে এই স্তর ধরা পড়ে।

'অরবিন্দ দর্শন' হল দিব্যদর্শন; আম্বিক্ষিকী বিদ্যার খুঁটিনাটি বিচারের মধ্যে এ দর্শন বদ্ধ নয়, মানববুদ্ধির বিশ্লেষণের মধ্যেও এ-দর্শনের পরিধি সীমিত নয়। প্রজ্ঞার ভাস্বর দীপ্তিতে এ-দর্শন উজ্জ্বল। এতদিন মানুষ ঐন্দ্রিয়ক উপাত্তের স্বরূপ নির্ণয় করতে উদগ্রীব ছিল, সামান্য লক্ষণ বিশ্লেষণ ও তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন ছিল দর্শন আলোচনার মূল লক্ষ্যবস্তু। আত্মপ্রতিষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ উপলব্ধি করলেন জ্ঞান আহরণের পথ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান নয়, মানসস্তর অতিক্রম করে চিত্তের বীক্ষণাগারে চেতনার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রজ্ঞার ভাস্বর জ্যোতির সন্ধান করতে হবে। ফলে প্রজ্ঞার আলোকে চেতনার বিভিন্ন স্তর উন্মুক্ত হয়ে যাবে—মানুষ তার অন্তর্নিহিত দিব্য সত্তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে। পদ্ধতির দিক থেকে আরোহন এ্যাসেন্ট ও অবরোহন ডিসেন্ট অরবিন্দ দর্শনে অপরিহার্য। চেতনার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্ববিবর্তনের ক্রমিক ধারা লক্ষ্য করলেন এবং সিদ্ধান্ত করলেন মনুষ্যস্তরে উন্নীত হওয়াই সৃষ্টির শেষ কথা নয়। অতিক্রান্তির মধ্য দিয়ে এ-স্তরেরও ঊর্ধ্বে যেতে হবে এবং সে পথের নিশানা একমাত্র মানুষই দিতে পারে। কারণ অন্যান্য জীবদের ন্যায় মানুষ কেবলমাত্র চেতনশীল জীব নয়, মানুষ সচেতনও বটে। এই সচেতনতাই মানুষকে অন্যান্য জীবন থেকে স্বতন্ত্র করেছে। মানুষই একমাত্র জরা-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে অমৃতত্ব লাভ করতে সক্ষম; কিন্তু এই অমৃতত্ব লাভই মানব জীবনের শেষ কথা নয়। কারণ মানস-ঊর্ধ্ব দৈবী শক্তির চেতনার উন্মেষ ও উত্তরণের মধ্যে বিবর্তনের রহস্য নিহিত। শ্রীঅরবিন্দ সে রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করলেন সচেতনতার ধারণা—প্রস্তুতি হল দর্শনের এক নূতন পদ্ধতি—অধ্যাত্ম চেতনার পথ পরিষ্কার হল—নিছক চেতনার দার্শনিক অভিযান—নতুন সৃষ্টি রহস্য যে সৃষ্টি প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত।

শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের মূল উৎস 'সচ্চিদানন্দ বিভব' লক্ষ্যবস্তু 'পরিপূর্ণতা' এবং লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছনর পথ আত্ম-উন্মেষ চেতনার বিভিন্ন স্তরের উপলব্ধি এবং সক্রিয় যোগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্তরে উত্তরণ। শ্রীঅরবিন্দের মতে চিন্তা ক্রিয়া জ্ঞান কর্ম বা জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয় বড় কথা নয়, আত্ম-উন্মেষ বা 'হওয়া' অরবিন্দ দর্শনের বড় কথা। এই হওয়া হল জীবনের নব-মূল্যায়ন, পুরুষার্থবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ 'হওয়া'র মধ্য দিয়া মানুষ তার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করতে সক্ষম হন। জীবন জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে তখন তাঁর দৃষ্টিতে কোন প্রভেদ থাকে না, দিব্যের স্পর্শে জগৎ তখন ব্রহ্মময় হয়ে উঠে, জীবন তখন দৈবীভাব লাভ করে, সমাজ তখন এক দিব্যছন্দে রূপায়িত হয়। সত্যের আলোকে সবকিছুই তখন সুন্দর সুসংহত ও ছন্দোময় হয়ে ধরা দেয়। শ্রীঅরবিন্দ দর্শন হল অধ্যাত্ম বা দিব্যদর্শন।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনা বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে বদ্ধ নয়। সংস্কারের বিভিন্নতা হেতু মানুষ নানাভাব নিয়ে পৃথিবীতে আসে, একটু লক্ষ্য করলেই আমরা এ-কথার সত্যতা বুঝতে পারি। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, বাইরের চাঞ্চল্য থেকে মুক্ত হয়ে সাধক যখন নিবিড় শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দিব্যশক্তি ঐ আধারে সক্রিয় হয়। প্রথমে ঐ শক্তি মস্তকে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) নেমে আসে এবং সাধকের মনের অন্তর্লীন কেন্দ্র সকলকে বিকশিত করে; পরে হৃদয়ে (অনাহত) নামার ফলে চৈত্যময় ও ভাবময় সত্তা মুক্ত হয়, নাভি (মণিপুর) ও অন্যান্য প্রাণকেন্দ্র সকলে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর প্রাণ-শক্তি সাবলীল হয়ে ওঠে এবং অবশেষে যোগে যাহাকে মূলাধার বলে তাহাতে নামলে দৈহিক সত্তা পায় পরম আলোকের স্পর্শ।

শ্রীঅরবিন্দ আরও বলেছেন, এই শক্তি সাধকের সমগ্র প্রকৃতিকে ধারণ করে একেবারে নয় এক-এক অংশ নিয়ে, তারপর যা বর্জনীয় তাকে বর্জন করে। যার রূপান্তর হওয়া প্রয়োজন তাকে রূপান্তরিত করে, নতুন যা সৃষ্টি হওয়া দরকার তাকে সৃষ্টি করে। এই শক্তি সমগ্র মানব সত্তার সমন্বয় সাধন করে এবং প্রকৃতিকে দেয় এক নতুন ছন্দ।

এই শক্তির কৃপায় সাধকের চেতনার রূপান্তর ঘটলে সাধক মহাশক্তির পরিচয় পায়। এই মহাশক্তির আশ্রয়েই সাধকের পরম পূর্ণতা লাভ হয়। অবশেষে সাধক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে তার কোন পৃথক সত্তা নাই সে মহাশক্তির দ্বারা সৃষ্ট ও বিধৃত সে কর্মী নয়—শক্তির বিকাশের আধার মাত্র।

সাধনায় শ্রীঅরবিন্দ হলেন একজন মহাযোগী, তাঁর যোগ-সমন্বয় অধ্যাত্ম জগতে এক যুগান্তর এনেছে; তিনি ছিলেন পরম শক্তিসাধক, অখণ্ড চেতনায় আরূঢ় হয়ে ধ্যান দৃষ্টিতে বিশ্ববিবর্তনের অতি সূক্ষ্ম রহস্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যোগমার্গে তিনি অনুভব করেছিলেন অসীম শান্তি গভীর নিস্তব্ধতা ও বিশালতা। সাধনায় এক বিরাট শক্তির সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছিলেন যে শক্তিতে সমস্ত শক্তি বিধৃত, যে বিরাট শক্তি সমস্ত শক্তির কারণভূমি। তাছাড়াও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক অদ্ভুত আলো যা প্রজ্ঞার স্বরূপ; উপভোগ করেছিলেন এক অপরিমেয় আনন্দ যা জগতের সব মাধুরীর উৎস। শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় মিলিত হয়েছে প্রজ্ঞা ও সিদ্ধি এক মহাশক্তিবিন্দুতে, যে শক্তির হ্লাদিনী রূপ নিরন্তর লীলা করে চলেছে সুসংস্কৃত করে তুলেছে সমাজ চেতনাকে—রূপান্তর করতে চাইছে সমগ্র মানব সমাজকে। বিজ্ঞানীদের সাধনার ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের সাধনা এক নতুন পৃথিবী রচনার সাধনা।

মাসশাই

অমিতাভ চক্রবর্তী

গোড়াতেই এক-ঝাঁক প্রশ্ন। আর তার সামলাতে আমার প্রাণান্ত। ভদ্র-র কথা শুনেছি অনেক। দেখেছি যার ক। তাও বাইরে থেকে। দোতলার ায় তাঁর গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখ। প্রৌঢ়ই যায়। দাড়ি গোঁফ কামানো। দীর্ঘায়ত াতুর দু'টি চোখ। কাছ থেকে দেখলাম ও সুন্দর।

প্রথম প্রশ্নটিই আমাকে হতচকিত করে া। গোত্র কি?

সামলে নিয়ে বললাম, শাণ্ডিল্য। াস জানা ছিল!

কোথাকার লোক তুই?

এটাও গোলমেলে প্রশ্ন। ঠিক বুঝতে পেরে বর্তমান ঠিকানাটা বলে দিলাম।

নাম কি?

এতক্ষণে একটা সরল জিজ্ঞাসার মুখো-থ হলাম। নাম বললাম।

কোন কেলাসে পড়িস?

ক্লাস এইট-এ।

কোন ক্লাসে পড়বি?

ক্লাস নাইন-এ।

হুঁ। তার মানে তুই পাশ করবি। বসে ।

বসে পড়লাম। আর সেদিন থেকেই টার মশাই-এর ছাত্র হয়ে গেলাম। ভুল াম, মাস্টার মশাই নন, মাসশাই। উনিই ছিলেন বেশি কথা বলতে নেই। সন্ধি । নিয়ে সংক্ষেপে বলবি। মাস্টার প্লাস ই হলো গিয়ে মাসশাই।

মাসশাই ঠাকুরপাড়ার বিখ্যাত মাস্টার-ই। তাঁর ছাত্রছাত্রীর অন্ত নেই। ঠাকুর-ার পাঁচ মন্দিরের লাগোয়া একটি বাড়ির তলা ঘরে ব্যাচ বাই ব্যাচ ছেলেমেয়েদের য়ে যাচ্ছেন সকাল থেকে রাত্রি। ববাহিত এই মানুষটি ঘোরতর সংসারী। বছর পঞ্চাশ ষাটটি ছেলেমেয়ে নিয়ে । বিরাট সংসার। আমিও ওই সংসারের জন হলাম। পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটে সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বি এস । চাকরি নিলেন কলকাতা কর্পোরেশনে। ন হলেন সুরেনবাবু। মফঃস্বল থেকে কাতায় চাকরি করতে যাওয়ার ধকল সইলো না। বছর দু-তিন কাটিয়েছিলেন কোন রকমে। তারপর একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক ডজন গোলাপ হাতে করে এসে ঠাঁই নিলেন এই ঘরটিতে। সেদিন থেকে হলেন মাসশাই। আমি যখন ওঁর ছাত্র তখন মাসশাই-এর কুড়ি বছর মাস্টারি জীবন পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ন্যাড়ার মুখে শুনেছিলাম এই কুড়ি বছরে একদিনের জন্যও তিনি দোতলা থেকে নামেন নি। মাটি স্পর্শ করেন নি।

ন্যাড়া আমাদের স্কুলে আমার সঙ্গে পড়তো। তাছাড়া মাসশাই-এর ওখানে যে ব্যাচে আমরা পড়তাম ন্যাড়া ছিল তার সর্দার পড়ো। ন্যাড়ার আরও একটা নাম ছিল চন্ডে। মাসশাই বলতেন বাবা চন্ডী। হঠাৎ হঠাৎ দারুণ ক্ষেপে যেত বলে ওর ওই নাম। কিন্তু ন্যাড়া অঙ্কে ওস্তাদ ছিল। আর সেই জন্যেই ও সর্দার পাড়া পোস্টে পাকাপাকিভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল। মাসশাই-এর ওখানে পড়ানোর রীতি ছিল অদ্ভুত। প্রথমে অঙ্ক করতে হতো নিজেকে। না পারলে যাও ন্যাড়ার কাছে। ন্যাড়াও যদি ফেল করে তবে যাও মাসশাই-এর কাছে। ন্যাড়া এমনই পাজি ছিল যে শক্ত শক্ত অঙ্কগুলোও দিব্যি করে ফেলতো। খুব কমই আমাদের মাসশাই-এর দ্বারস্থ হতে হয়েছে। মাসশাই যখন অঙ্ক করতেন সেটাও ছিল দেখবার মতো। তিনিই আসতেন আমাদের কাছে। উবু হয়ে বসতেন। ধীরে সুস্থে পেন খুলতেন। বলতেন পড়্। আমরা অঙ্কটা পড়ে যেতাম। তারপর কলমের ছুঁচলো মুখ দিয়ে শাদা কাগজে অক্ষর আর সংখ্যা বসিয়ে একখানা চমৎকার ছবি আঁকতেন। আমরা মোহাবিষ্ট হয়ে সেই চিত্রাঙ্কন দেখতাম। শেষ হলে বলতেন দ্যাখ। দেখতাম, অঙ্কটা মিলে গেছে। শেখার আনন্দকে দাবিয়ে দিত দেখার সুখ।

মাসশাই-এর কাছে আমরা যেতাম অঙ্ক করতে। অঙ্ক ছাড়া তিনি নিজে থেকে আর একটি বিষয় আমাদের শিক্ষা দিতেন যার নাম পড়ে জেনেছি ভাষাতত্ত্ব। কিন্তু ভাষা-তত্ত্বের নিয়মকানুনের তিনি ধার ধারতেন না। যা বলতেন পরে জেনেছি সেগুলি আইনসিদ্ধও নয়। একান্তভাবে সেই ভাষা-তত্ত্ব বা ব্যাকরণ মাসশাই-এর নিজস্ব। একে বলা যেতে পারে অদ্ভুত ভাষাতত্ত্ব বা অত্যদ্ভুত ব্যাকরণ। এখন অবশ্য বুঝতে পারি আপাত অদ্ভুত এইসব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের জহুরী বানাতে চেয়েছিলেন যাতে হাজার গন্ডা ভুলের মধ্যেও ঠিক পাথরটি চিনে নিতে পারি। সে কি সহজ কাজ? পারলাম কৈ!

একদিন কথায় কথায় বললেন বাঙালরা বড় সাংঘাতিক। ওদের মোটে চটাবি নে। ওরা ছুঁড়িকে বুড়ি করতে পারে।

কী রকম মাসশাই? কে একজন উসকে দিলো।

তোরা কি সব মেয়ে ?

ওই বয়সে মেয়েদের সঙ্গে আমাদের আড়াআড়ি। ওদের মোটে গ্রাহ্যের আনি না। সবসময় যে-কোন উপায়ে দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে মরীয়া ই আছি। এই অবস্থায় নিজেদের মেয়ে ভাবা ? এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো।

একটু রাগ রাগ গলায় বললাম, মেয়ে যাবো কেন ? ছেলেরা আবার মেয়ে নাকি ?

তাহলে ফুল পাবি কেন ? ফুল তো র জন্যই। মেয়ে হ, ফুল পাবি।

অকাট্য যুক্তি। সামান্য ফুলের জন্য এতবড় রিস্ক নিতে আমরা রাজি য় না। অগত্যা ফুলের আশা ছাড়তে া। তবে ফুলের চারা কাটিং অনেক রছি। বাড়িতে সেসব লাগিয়ে দেখেছি, শাই-এর মতো ফুল হয় না। ফুল নোও ভালো বাঁধুনীর কাজ। একটি া কিন্তু হাতের গুণে এক-একজনের া উতরোয়। মাসশাই-এর টবে যা তো, আমাদের ফুলগুলি তার কাছে লো মুড়ির মতন।

ক্লাস নাইনে যখন পড়ি, তখন তাঁর ম বাধলো ভূগোল নিয়ে। হাফ-র্লি পরীক্ষায় ভূগোলের প্রশ্ন এলো রিসাত। ফলে দু' তরফেই সুবিধে া আমরাও কিছু লিখিনি। স্যারকেও করে খাতা দেখতে হয়নি। কোথা-কান ও গোলমাল বাধিয়ে গিয়েছেন। একমাত্র —বিশ্বাসঘাতক, কী করে যেন তিন র পেয়ে গিয়েছিল।

যেদিন রেজাল্ট বের হতো, নিয়ম ছিল, ফেরার পথে মাসশাই-এর সঙ্গে দেখা যেতে হবে। মাসশাই-এর কাছে পাশ- দুটোরই সমান দাম।

একজন গিয়ে প্রণাম করলো।

কি হলো ?

পাশ।

বেশ, বেশ।

আর একজন প্রণাম করলো।

কি হলো ?

ফেল।

বেশ, বেশ।

পাশ, ফেল—দুই-ই বেশ। তবু শ্লা নিয়ে যেতে আমরা একটু ইতস্তত ছলাম। ন্যাড়াকে সামনে রেখে গুটি- ই ঢুকলাম। আমরা যাওয়ার আগেই শার খবর পৌঁছে গিয়েছে। প্রণাম র আগেই বললেন, কাল তোরা সব গাল বই নিয়ে আসবি। এখন বাড়ি যা।

আমরা তো অবাক। যাকগে, মাসশাই-এর কাছে ভূগোলটাও পড়া যাবে এই ভেবে বাড়ি ফিরলাম।

পরদিন ভূগোল বই নিয়ে সবাই হাজির।

জমা দে বইগুলো। মাসশাই-এর হুকুম।

একে একে ভূগোল বই জমা পড়লো। সব ব্যাপারে যেমন ন্যাড়া আগেভাগে, এ-ব্যাপারেও ওকেই এগিয়ে দিলাম। যদি কিছু অঘটন ঘটে, যাক তা ন্যাড়ার উপর দিয়ে।

কাল নিয়ে যাবি বইগুলো।

এতে রহস্য আরও ঘনীভূত হলো। তাহলে ভূগোল পড়ানো হবে না ? নাকি মাসশাই একবার বইটা পড়ে নিতে চান। তার জন্য এতগুলো বইয়ের কী দরকার ছিলো ? অনেক গবেষণা করেও আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম না।

তার পরের দিন বই ফেরত পেলাম। এক-এক করে সকলের হাতে বই তুলে দিলেন, ঠিক যেমন করে সকালবেলায় টিফিনটি এগিয়ে দেন।

পরে বললেন, বাড়ি গিয়ে বই-এর শেষ পাতাটা মন দিয়ে পড়বি। এবারে পাশ হবেই। বললেন কিন্তু চোখের কোণে যেন একটি কথার আলোও ছিল।

মন আনচান করছে। কী আছে শেষের পাতায় ? একবার লুকিয়ে বইয়ের পাতা খুলতে গিয়ে শিবশংকর ধরা পড়ে গেল। তাই নিয়ে মাসশাই-এর কী বকুনি।

কিন্তু বাড়ি অবধি যাওয়ার ধৈর্য রইলো না। রাস্তায় নেমে মাসশাই-এর চোখের আড়ালে যেতে না যেতে ঝটপট খুলে ফেললাম শেষের পাতাটি। পাতার মাঝামাঝি ছাপানো অক্ষরে লেখা—সমাপ্ত। তার নীচে মুক্তোর মতো অক্ষরে লেখা : 'এই বই মনোযোগ দিয়া পড়িলে অবশ্য বিবাহ হইবে।'

সেবার আমরা ভূগোলে পাশ করে-ছিলাম। পরে আর কোনদিন ভূগোলে ফেল করিনি, এও ঠিক। কিন্তু জীবনের সব পরীক্ষায় সমানভাবে সবাই যে আমরা পাশ করতে পারিনি, তার জন্য দায়ী আমরাই। এখনও মাঝে মাঝে মাসশাই-এর কথা মনে পড়ে। নানা ঘটনায়, নানা পরি-স্থিতিতে মাসশাই-এর উপদেশ ওষুধের মতো কাজ করে। সারা জীবনটাই যেন ভূগোল পরীক্ষা। বড় কঠিন পরীক্ষা।

এক-এক রাত্রিতে অন্ধকারে মাসশাই এসে হাজির হন। সেই উজ্জ্বল সুন্দর মুখ। দেখলেই মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

জিজ্ঞেস করি, মাসশাই কেমন আছেন ?

ভালো রে।

একটু চুপ করে থেকে আবার যেন বলে ওঠেন, ভূগোলটা পড়লি নে ? তোর আর পাশ করা হলো না।

আকাশ জুড়ে

সত্যেন্দ্র আচার্য

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙেছিল অদিতির। খোলা জানলায় তাকিয়েছিল বাইরে, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঘুম ভেঙে খুব অবাক হল অদিতি। আঁচলটা বুকে তুলে ছোট্ট একটা হাই তুলল। তারপর মুহূর্তখানেক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে বাইরে চলে এল।

এত বেলা হয়ে গেছে দেখে অদিতি মুখ বাড়াল রান্নাঘরে। কিন্তু কিছু বলার আগেই মা বললেন, নতুন চাকরি, ভাবলাম ডেকে দিই। কিন্তু—

মায়ের কথাটা যেন কেড়ে নিয়ে অদিতি বলল, কিন্তু কিসের? দেখলেই যখন ডাকলে না কেন? যেন একটু অভিযোগ আনল গলায় অদিতি। তারপর হেঁট হয়ে ব্রাশের ওপর পেস্ট নিয়ে পলকে একমুখ ফেনা তুলে তেমনি দ্রুত পায়ে ঢুকে গেল কলঘরে। বাথরুম সেরে জল ঢালল। ঢালতে ঢালতে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল বাইরে : তাড়াতাড়ি মা। কলঘর থেকে নিজের ঘরে ঢোকবার পথে আরো একবার শোনাল অদিতি, কি, খেতে দিয়েছ তো মা?

এই ব্যস্ততার দ্বিতীয় কারণ কুন্তল। কুন্তল স্টপে এসে দাঁড়াবে, এ যেন একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এই দ্বিতীয় কারণের জন্য সময় আরো সংক্ষেপ করল অদিতি, একেবারে সেজেগুজে খেতে এল। হাতে ভাতে করে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। অদিতি হেঁট হয়ে জুতো পরা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কাঁধে ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, আজ একটু ফিরতে দেরী হবে মা।

অদিতি স্টপে এসে দেখল কুন্তল অনেক আগে থেকেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। জোরে জোরে হেঁটে অদিতি ট্রামের স্টপে দাঁড়িয়ে হাঁফাল একটু, তারপর বলল, আজ কিন্তু সময় নেই হাতে। ঘাড় বেঁকিয়ে বলল ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বুঝেছ!

কুন্তল ও কথার জবাব দিল না। আর একবার হাত ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, জানি। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কুন্তল আরো কাছে সরে এল। বলল, এরপর তো বলবে, লক্ষ্মীটি একেবারে সময় নেই হাতে।

হাসল অদিতি। কাঁধের ব্যাগটা আরো সামনে টেনে ছোট্ট রুমালটা বের করে ঠোঁটটা একবার মুছে নিল, নিয়ে বলল, নতুন চাকরি, তুমি তো বোঝই।

সিগারেট থেকে এক মুখ ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে কুন্তল বলল, বুঝি না আর? হঠাৎ বাঁকা করে কথাটা বলে কুন্তল হাসল। হেসে বলল, চাকরীর দোষ দিচ্ছ কেন? কুন্তল কথাটা বলে বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে এবার একটু নিচু গলায় বলল, আমি এসে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি এসে শোনাবে চাকরির প্রেমে পড়ে গেছি।

অদিতি হাসল, কথা হল না। ট্রাম আগের স্টপে এসে দাঁড়ালে কুন্তল আরো ব্যস্ততা দেখাল। একটু গম্ভীর গলায় বলল, আজ ফিরছ কখন?

অদিতি উঠতে যাচ্ছিল। কুন্তল ওকে ভীড় সরিয়ে দিয়ে ওঠার সাহায্য করে বলল, আমি কিন্তু ছ'টায় মেট্রোর সামনে দাঁড়াব।

দাঁড়িয়ো। অদিতি হ্যান্ডল ধরে ভেতরে ঢুকে গিয়ে বলল। বলে মুখ ঘুরিয়ে হাসল।

দেখতে দেখতে এলগিন রোড, পরে চৌরঙ্গী পার হয়ে এসপ্ল্যানেডে নামল অদিতি। ঠিক এমনি জীবনের জন্য অদিতি কিন্তু প্রস্তুত ছিল না। অথচ চাকরি নিতে হল। কুন্তল বলেছিল হঠাৎ চাকরি নিচ্ছ যে?

কেন? চোখ তুলে তাকিয়েছিল অদিতি। রসিকতা করেছিল, চাকরির ওপর তোমার অত আক্রোশ কিসের। সতীনের ভাব দেখাচ্ছ? অদিতি আরো কাছে এসে হেসেছিল, কেন, চাকরি করা মেয়ে বুঝি প্রেম করে না?

আমি কিন্তু তা বলিনি। কথাটাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছিল, তোমার কষ্ট হবে তাই।

ঘনিষ্ঠ গলায় অদিতি বলেছিল, তোমার কোন কষ্ট হবে না, কথা দিচ্ছি।

অদিতি অফিসে ঢুকে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে ব্যাগ ঝোলাল চেয়ারের হাতলে। তারপর হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাস নিয়ে একটু জল খেল। খেয়ে কাজে দিতেই মালা এসে দাঁড়াল। অদিতি মুখ তুলে বলল, কিছু বলবে মালাদি?

না। মালাদি হাসল তেমনি। ওপর হাসি রেখে বলল, আমিও এলাম। দেখলাম তোমাদের। আর বলে চলে গেল মালাদি। দাঁড়াল না।

এই ঘরটাকে কেমন আশ্চর্য লেগেছিল অদিতির প্রথম প্রথম। সত্যিকারের ভেতর কতকগুলো প্রাণী কেমন ... তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম ... ছিটিয়ে মন্দ না। এই ঘরটাই হলঘরের মত। ওপারের ... চারদিক চাপা। কৌটর মত। আলো ঢোকে না বললেই চলে। ... পার হয়ে টাইপের খটাখট ... ঢুকে পড়ে। একরাশ ফাইলের ... অতীতকে মনে পড়ত আগে, ... পড়ত, এখন আর পড়ে না, ... নিজেই কখন হারিয়ে যায় অদিতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তবু ...

উঠে দাঁড়াল সাড়ে পাঁচে। কিন্তু আশ্চর্য অঘটন। ভীষণ গুঞ্জন অফিসে। নৃপেনবাবু দীর্ঘদিন ভুগছিলেন ব্লাডপ্রেসারে আর পেচ্ছাবের অসুখে। এই সংবাদ এল দুটোর সময় তিনি মারা গেছেন হাসপাতালে। নেতৃত্ব দিচ্ছে অশোক সামন্ত নৃপেনবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সহকর্মীদের শ্মশানে যেতে হবে বলে। তাকে সহযোগিতা করছে জোছন সেন। লিফটের সামনের গেট বন্ধ করে দিয়ে সিঁড়ির দিকের দরজায় শোক-সংকেত চেখে দাঁড়িয়ে আছে।

পরের দিন দেখা হলে কুন্তল বলল—বেশ এলে তো কাল?

বিশ্বাস কর অদিতি কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিল। কুন্তল যেন ধমকের সুরে বলল, রাখো তোমার বিশ্বাস। অফিসারদের চোখে পড়েছ এখন আমি কে! একটু চুপ করে থেকে কুন্তল আবার বলল, ওসব সতীপনা আমার জানা আছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা তুলনা। সব জানি।

এতক্ষণ মাথা নিচু করে সামনে দাঁড়িয়ে ছিল অদিতি মৃদু গলায় বলল—কি জানো? তবু যদি না দেখতুম।

কি? অদিতি বিস্ময় প্রকাশ করে বড় বড় চোখ করে তাকাল।

ভুবনদার ছোট ভাই তোমাদের অফিসে চাকরি করে না? জোছন? কুন্তল ঘৃণায় কপাল কুঁচকে বলল—সঙ্গে আরো কে একজন ছিল। নিউ মার্কেটের দিকে যাচ্ছে দেখেছি।

অদিতি আর কথা বাড়াল না। একটু গুম হয়ে থেকে বলল আমার ট্রাম আসছে।

আসছে, উঠবে। কুন্তল তেমনি কপাল কুঁচকে বলল—তোমার জন্য রোজ আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকব অত কাঙাল আমি নই। আমারও অত অঢেল সময় নেই হাতে। সব আমি বুঝে গেছি।

ওরা ফুল কিনতে যাচ্ছিল নিউ মার্কেটে। অদিতি বলল। ট্রাম এসে দাঁড়ালে অদিতি ওঠার জন্য সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—ওদের সঙ্গে শ্মশানে গেছিলাম কাল। অদিতি গুম গুম করে বলল—তুমি ভুল বুঝে শুধু আমাকেই কষ্ট দাও না তুমিও পাও। উঠতে যাচ্ছিল অদিতিও কুন্তল বলল—দরদ কত সব আমার জানা আছে।

ট্রাম চলে গেলে ফুটপাতের ওপর উঠে এল কুন্তল। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে একটা ধরাতে না ধরাতেই বৃষ্টি। কুন্তল বৃষ্টির মধ্যে একটু লাফিয়ে হেঁটে একটা বাড়ি বারান্দার নিচে আশ্রয় নিল। আসার সময় ঝড় উঠেছিল। ধুলোর ঝড়। গাছের পাতা, ধুলোর ধোঁয়া হাওয়ায় সাঁতার কেটে কেটে গায়ে মাথায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ভেতর দিয়ে হনহনিয়ে পার হয়ে এসে স্টপে দাঁড়িয়েছিল। বৃষ্টি কমলো এখন কিন্তু থামল না। সামনে একটা বাস পেয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে উঠে পড়ল কুন্তল।

সন্ধ্যায় কিন্তু দেখা হল আবার। অদিতি একটু গম্ভীর রইল। কুন্তল বলল—তোমার অফিসার আজ যে তোমায় ছেড়ে দিল?

অদিতি তাতেও কোন কথা বলল না। দুজনে মুখ নিচু করে হাঁটল। কম কথা বলল দুজনে। সুযোগ পেলেই কুন্তল ওকে আক্রমণ করে কথা বলছিল। অন্যদিনের মত গড়ের মাঠেও ঢুকল না। দুজনে অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে হাসাহাসি করল না। সিনেমাতেও গেল না। মাঝে একটা অভিজাত রেস্তরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কুন্তল বলেছিল চা খাবে?

মাথা নেড়ে শুধু অদিতি বলেছিল, থাক। তারপর ফেরার পথে ট্রামে উঠে দুজনে দুদিকে গিয়ে বসল। নিজের স্টপে অদিতি নামল। অন্যদিনের মত ওকে নামিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে বেশ কিছুটা এগিয়ে দিল না কুন্তল।

দুদিন পরে অদিতিই বাড়িতে গিয়ে দেখা করল কুন্তলের সঙ্গে। কি, রাগ পড়েছে?

কুন্তল বলল—কাল রবিবার গেল ভাবলাম আসবে। কাজ ছিল? একটু বাঁকা করে কথাটা উচ্চারণ করল কুন্তল।

বাড়িতে সব লোকজন এসে গেল। চেষ্টা করেও বেরুনো হল না। অফিসের পথে তাই দেখা করে গেলাম।

লেট হবে না? কুন্তল হেঁয়ালী আনল গলায়। নতুন অফিস, কত নতুন নতুন বন্ধু, ওভার টাইম, সহকর্মীর মৃত্যু, কত কি। আমার কি আছে বলো? একটা ঢোক গিলে কুন্তল বলল—ভারি তো একটা ওষুধ কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, সভ্য ভাষায় উঁচু দরের হকার বৈ ত নয়? কাজ যত তোমার। আমরা তো ফালতু।

আজ কিন্তু আসছো? অদিতি ট্রামে উঠতে উঠতে বসল। হাসল।

একটু গুম হয়ে থেকে কুন্তল বলল—কোথায়?

লাইট হাউসের সামনে। নতুন ছবি অদিতি হেসে ফেলে বলল—আমাকে কিন্তু টিকেট কাটতে দিলে খুশী হব।

দুজনে হাঁটছিল। কুন্তল এবার হেসে ফেলে বলল—তোমার আজকাল বেশ কথা ফোটে মুখে। অফিসে ঢুকতে না ঢুকতেই ক্লেছের আড়ষ্টতা ভেঙ্গে গেছে বেশ। লটারির টিকেট-ফিকেট কিনে যাচ্ছ তো?

স্টপে দাঁড়িয়ে দুজনে আরো কিছুক্ষণ কথা বলল। হাসাহাসি করল। তারপর অদিতিকে তুলে দিয়ে কুন্তল উল্টোদিকের বাস ধরল হাসপাতাল ধরবে বলে। যথাসময়ে অফিসে ঢুকে অদিতি দেখল কেমন ঢিলে-ঢালা ভাব। মিস ঘোষ বিদায় নেবেন আজ। ক্যানটিন হলে বেদী হয়েছে আজ। ফুলের সমারোহ। কেমন ব্যস্ত সকলে। মালাদির মাথায় সিঁদুর। মুখে হাসি। মালাদি সাদা জিন্সের একটা চাদর তৈরী করেছে নতুন ধরনের ডিজাইন তুলে। একে ওকে দেখাচ্ছে। মালাদি সহাস্য মুখে প্রশংসা শুনছে সকলের। মালাদি নিজে হাতে উপহার দেবেন। গৌরী পালিত নভেল পড়ছে চেয়ারের ওপর হাঁটু ভেঙ্গে বসে। কোলের ওপর বই, কখনো কপাল

কোঁচকাচ্ছেন, স্মিত হাসছেন কথ[া] সংক্ষিপ্ত সাজবেশ, পমিটেলা করে বেঁধেছে গৌরী পালিত। মিস ঘো[ষ] ফেয়ার ওয়েলে উদ্বোধন সঙ্গীত গাই[বে] আজ। আঁটোসাটো শরীর। সকলের [স]ঙ্গে হেসে ঢলে পড়ে কথা বলে।

সামনে এসে দাঁড়াল অশোক সাম[ন্ত।] আজ অত কিসের কাজ মিস রায়?

কেন? অদিতি তাকাল।

দেখছেন না?

কি?

মিস ঘোষ বিদায় নেবেন আজ।

কিছু বলবেন? অদিতি হাসল বাঁকা করেও উচ্চারণ করল না। বলল—শুনেছি।

দেখুন, জীবনে কি পেলাম আর [কি পেলাম] না, সে হিসেবের দিন আজ নয়। কি রেখে গেলেন তাও দুদিন পরে ভুলে [যাব] আমরা। সে থাক আপনাকে কিন্তু সম[বেত] সঙ্গীতটা গাইতে হবে আজ। এক[টা] এতদিন কাজ করলাম নামমাত্র এই কর্তব্য টুকু আমরা করব না?

খুব বিস্ময় প্রকাশ করে অদিতি হাত ছোঁয়াল। আমাকে?

আমরা শুনেছি। অশোক হেসে বলল—মালাদি বলেছেন সব। অ[...] বর্ণচোরা।

আমি? অদিতি হাসল না। [...] একটা যন্ত্রণা যেন অনুভব করল কপা[লে।]

অশোক বলল—দেখুন এই অ[ফিসে] আসা যাওয়া, ছোট্ট হাসি, আনন্দ, বেদনা, এসব নিয়ে বেশ কিন্তু খুশী [ছিলেন] উনি। কিন্তু কাল? নিচু গলায় অ[শোক] বলল—দোসর বলতে ও'র কেউ [নেই] পৃথিবীতে। প্রথম থেকেই উনি এ[কা।] অশোক একটু থেমে যেন দম নিল। বলল—কেন জানি না, হয়ত অনেক জমা আছে ভেতরে। কেউ [জা]না বলে আজ বিকেল থেকে সারা জীবন বড় এ[কা] নিঃসঙ্গ। যাক গে আপনি যেন [না] করবেন না।

চোখে দুটো জলে ভরে এল অদি[তির।] গুন গুন করে তবু বলল—আমার জরুরী একটা কাজ ছিল।

সাড়ে ছটা বাজিয়ে মাথা গুঁজে কুন্তল। ভীষণ যন্ত্রণা কপালে। শরীরে কেমন একটা ব্যথা অনুভব [করল] কুন্তল। পেশীগুলো কেমন দপদপ [করছে।] রক্তের ভেতর কেমন একটা জ্বালা, থেকে শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। জোরে হাঁটা কখনো। দাঁড়ান কখনো। সন্ধ্যার সম্ভারে সাজানো শহর। বিচিত্র [...] সৌখিন আলো। সাজানো পুতুল [...] কেসে। বিক্ষিপ্তভাবে এসব দেখতে [দেখতে] হাঁটছিল কুন্তল। হঠাৎ সামনে ট্যাক্সি পেয়ে কুন্তল হাত উঁচিয়ে করাল। ভেতরে ঢুকে গিয়ে আর [...] ঘড়ি দেখল। দেখে হাতে ঘড়ি উচ্চারণ করল শু—

একাদশে বৃহস্পতি

প্রিয়দর্শী

শ্চমবঙ্গ রাজ্য লটারির এখন থাকে একাদশে বৃহস্পতি। সপ্তাহে-খেলা। সপ্তাহে-সপ্তাহে টিকেট গত ১ জানুয়ারি স্টেট লটারির খেলা হয়ে গেল। অল্প কিছুদিন লটারিতে লাভের পরিবর্তে শুধুই ন চলে আসছিল। হাজার সাধাসাধি লোককে লটারির টিকেট কিনতে রানো যাচ্ছিল না। একসময় সরকার তুলে দেওয়ার কথাও বিশেষভাবে করছিলেন। টিকেট বিক্রেতারা কাজ খুঁজছেন বলে কাগজে বড় র বেরুল। সেই রাজ্য লটারির মরা আজ জোয়ার এসেছে। ভাগ্য : কারবারীদের দুঃসময় কেটে গিয়ে দিন। বহু লোকের মুখে হাসি হ যে, তার নাম স্টেট লটারি।

শ্চমবঙ্গ রাজ্য লটারির খেলা শুরু ৬৮ সালের শেষাশেষি। এখনকার য়মিত নয়। মাঝেমধ্যে খেলা হত টিকেটের দাম ছিল দু' টাকা। গত লে সরকার লটারি থেকে নেট ৪৫ খ ঘরে তুলেছিলেন। '৭০ সালে অংক কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৯ লাখে। ২ সাল থেকে লটারির দুর্দিন ৭২ সালে সরকার লাভের পরিবর্তে র টাকা লোকসান দেন। সেই সময় টারি তুলে দেওয়ার কথাও ওঠে। লটারির সঙ্গে জড়িত বহু লোকের জগার বন্ধ হয়ে যাবে এই । সরকার সেদিন লটারি তুলে পারেননি। লোকসানের বোঝা ঘাড়ে স্টেট লটারি চালু থাকে।

'৭৩ সালের নভেম্বরে শুরু হল টারির মাসিক ও অন্তর্বর্তী খেলা। ওয়া লাগল। জমে উঠল স্টেট সরকার লটারি সম্পর্কে জন-। সবরকম সন্দেহ দূর করতে সমাজের জ্ঞানীগুণী লোকদের খেলার বিচারক করলেন। খেলার দিন সর্বসাধারণকে নিমন্ত্রণ জানান হল। লোকে জানল স্টেট লটারির খেলায় কোনও জালিয়াতি বা কারচুপি নেই। হু-হু করে টিকেট বিক্রি বেড়ে গেল। এবার লোকসান এড়িয়ে লাভের মুখ দেখলেন রাজ্য সরকার। ঘরে এল নেট ১১ লাখ টাকা। স্টেট লটারি সম্পর্কে আশ্বস্ত হওয়া গেল এখন।

এবার সুযোগ বুঝে সরকার স্টেট লটারির খেলা মাসিক থেকে সাপ্তাহিক করলেন। গত '৭৫ সালের ৬ ডিসেম্বর পরীক্ষামূলকভাবে চালু হল স্টেট লটারির সাপ্তাহিক খেলা। খবরের কাগজে, ট্রাম-বাসের গায়ে বিজ্ঞাপন পড়ল 'সপ্তাহেতে প্রতিবারে লক্ষ টাকা মিলতে পারে।' এক টাকার বিনিময়ে এক লাখ টাকা। প্রথম পুরস্কার না উঠলে আছে অসংখ্য সান্ত্বনা পুরস্কার। লোকে হৈ-হৈ করে টিকেট কিনতে শুরু করে দিল। নামকরা এজেন্টের দোকানে, ফুটপাতের স্টলে, হকারের ঝোলা ব্যাগে কোথাও আর টিকেট পড়ে রইল না বিশেষ। শুরু থেকেই লোকে স্টেট লটারির সাপ্তাহিক খেলা দারুণভাবে নিয়েছে। টিকেট বিক্রির সংখ্যাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মাসিক খেলায় গড়ে টিকেট বিক্রি হত আট লাখ। এখন সাপ্তাহিক খেলায় গড়ে প্রতি মাসে টিকেট বিক্রি হচ্ছে ৩৫ লাখ। বেশি টিকেট বিক্রি মানেই সরকারের বেশি লাভ। '৭৪-'৭৫ সালে লাভের অঙ্ক ছিল ১৮ লাখ '৭৫-'৭৬ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৩২ লাখে। চলতি বছরের হিসেবেও লাভের পরিমাণ বাড়বে বই কমবে না।

লটারির টিকেট কারা কেনেন? কিছুকাল আগেও সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত লোকেরাই বেশি করে টিকেট কিনতেন। কিন্তু এখন স্টেট লটারির টিকেট প্রায় সকলেই কেনেন। প্রাইজ উঠুক বা না উঠুক, নিয়মিত টিকেট কিনে যাওয়া এখন কিছু লোকের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর মানুষের এই অভ্যেসের সুযোগ নিয়ে লটারির টিকেট বিক্রি হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজে একটি নতুন পেশার পথ। এই পেশায় সরকারি হিসেব মতো এখন ৫ হাজার লোক খাটছেন। সরকারের হিসেবের বাইরে এই পেশায় করে খাচ্ছে আরও কত সহস্র কে বলতে পারে? এখানে-ওখানে যাঁরা টিকেট বিক্রি করছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই হিসেবের বাইরে।

লাখ টাকা প্রথম পুরস্কার জেতার আশ্বাস দিয়ে যাঁরা সপ্তাহে-সপ্তাহে ক্রেতাদের হাতে এক টাকার বিনিময়ে স্টেট লটারির টিকেটখানা তুলে দেন—সেই ছা-পোষা, গরিব ভাগ্য-ফেরানোর কারবরীরা আজ কেমন আছেন? খবর কি ও'দের?

ও'দের খবর জানতেই সেদিন ঘুরতে-ঘুরতে শিবুর দোকানে। পোশাকী নাম শিবু সরকার। ও'র কারবারে ও এস সরকার নামেই বেশি পরিচিত। রোগা-পাতলা চেহারা। মুখে সরলতার হাসি। পঁচিশের এদিকে বয়েস।

বিধান সরণি-গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে স্টার থিয়েটারের পাশে ফুটপাতের ওপর লটারি টিকেটের একটি ছোটখাটো স্টল দিয়েছে শিবু। বছর আষ্টেক আগে শ'-তিনেক টাকা মূলধন নিয়ে সে মানুষের ভাগ্য ফেরানোর কারবারে নামে। আজ তর মূলধন বেড়ে তিন হাজার।

—'টিকেট বিক্রি কেমন?' শিবুকে প্রশ্ন করি।

'মিথ্যে বলব না আপনাকে', শিবু মাথা দুলিয়ে বলল, 'বাজার সত্যিই ভাল। উইকলি খেলার টিকেট দিয়ে উঠতে পারছি না। আগে দৈনিক দেড়শো টিকেট বিক্রি করতেই কেঁদে গেছি। এখন সারাদিনে চারশোর ওপর বিক্রি।' দোকানে খদ্দেরের ভিড় দেখেই মালুম হয়।

ওই একই জবাব দিল দামু। ওরফে দামোদর চট্টোপাধ্যায়। পরনে পাতলুন, গায়ে হাওয়াই শার্ট। তার ওপরে উলের সোয়েটার। কাঁধে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ। কী আছে ওই ঝোলা ব্যাগে? স্টেট লটারির শ'য়ে শ'য়ে টিকেট। হাওড়া হাটে দামোদরের সঙ্গে দেখা। কথাবার্তায় দারুণ স্মার্ট।

নরসিংহ দত্ত কলেজে নাইটে বি-এ পড়ে দামোদর। বাবা নেই। মা আর দাদা। দাদা সরকারি কেরাণী। বেতন যৎসামান্যই। তাই পড়ার খরচ দাদার ঘাড়ে না চাপিয়ে দামোদর স্টেট লটারির টিকেট ফেরি করতে নেমে পড়েছে কিছুদিন হল। মন্দ কি?

হাওড়ার ২০, গোপাল ব্যানার্জি লেনের ছেলে দামোদর কাঁধে স্টেট লটারির ঝোলা ব্যাগ নিয়ে আজ কোথায় না যায়? গাঁয়ের হাটেবাজারে, ট্রেনে মফঃস্বল শহরে সর্বত্র তার অবাধ গতি। দৈনিক একশখানা টিকেট দামোদরের ঝোলা থেকে বলতে গেলে উবে যায়। আর একশ' টিকেট বিক্রি করা মানেই হাতে নগদ পঁচিশ টাকা। তবে পড়াশোনা বাঁচিয়ে সবদিন বেরুনো সম্ভব হয় না।

বালাতন হ্রদের ধারে চারাগাছ লাগিয়ে যে কবিতাটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ
উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর য

লেবুচারা এখন ছায়াতরু

পবিত্রকুমার সরকার

হাঙ্গেরির বালাতন হ্রদ মধ্য ইউরোপের সবচেয়ে বড় মিঠে জলের হ্রদ। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এ এক মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থান। ইউরোপে অঞ্চলটির যথেষ্ট কদর আছে। বছর বছর বহু মানুষ আসে হ্রদটির তীরে—কেউ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে কেউ বা স্বাস্থ্য উদ্ধারে।

বালাতনের তীরে ছবির মত সাজানো ঝকঝকে তকতকে ছোট্ট একটি শহর ফুরেড। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে এখানে এসেছিলেন ভারতের বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ। তিনি একটি লেবু (লাইম) গাছের চারা পুঁতেছিলেন। গাছটি আজ লতায়-পাতায় উন্মীলিত এক ছায়াতরুর রূপ নিয়েছে।

বিশ্ব দরবারে ভারতকে চিনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রাচী ধরিত্রীর এই দেশটির সঙ্গে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ রচনায় পুরোধার ভূমিকা পালন করেছিলেন কবি। ১৯২৬ সালে 'ভারত-পথিক' রূপে তিনি আবার ইউরোপ পাড়ি দেন।

এই পর্যায়ে ইউরোপ সফরকালে কবির সঙ্গে বরাবর ছিলেন বিজ্ঞানী প্রশান্ত মহলানবিশ ও তাঁর পত্নী রাণী মহলানবিশ। প্রথমে তিনি এলেন ইতালিতে। ইতালি থেকে সুইজারল্যাণ্ড, প্যারিস, লণ্ডন হয়ে তিনি পক্ষকাল তিনটি স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান দেশ নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কে কাটান। তারপর তিনি আসেন জার্মানিতে। জার্মানির বহু শহর ঘুরে কবি আসেন চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী শহর প্রাগে। এখানে তাঁর পাঁচদিন কাটে। প্রাগ থেকে তিনি আবার এলেন ভিয়েনায়। বিরামহীন একটানা দীর্ঘ ভ্রমণে কবির শরীর খারাপ হয়ে পড়ল। তিনি বাধ্য হয়ে ভিয়েনায় কদিন বিশ্রাম নিলেন।

পুরোপুরি ভাল হয়ে উঠবার পক্ষে দশটা দিন যথেষ্ট ছিল না। শরীরের অবস্থা ঠিকমত না বুঝেই কবি আবার সফরে বের হলেন। ২৬ অকটোবর এলেন হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট। তিনি এখানে দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শরীর তাঁর আর বইছিল না। চিকিৎসকরা কবির সমস্ত কাজ-কর্ম বন্ধ করে দিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। ঐ পরামর্শ অনুযায়ী তিনি বালাতন তীরের ফুরেড নগরীর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুদাপেস্টে কবি একটি কবিতা 'পথ এখনো শেষ হল না' (২৭ অকটোবর) ও একটি গান 'দিনের বেলায় বাঁশি তোমায়' (৩০ অকটোবর) রচনা করেন। বালাতনে বিশ্রামের অবকাশে তিনি আর একটি গান 'পান্থ পাখির রিক্ত কুলায় বনের গোপন
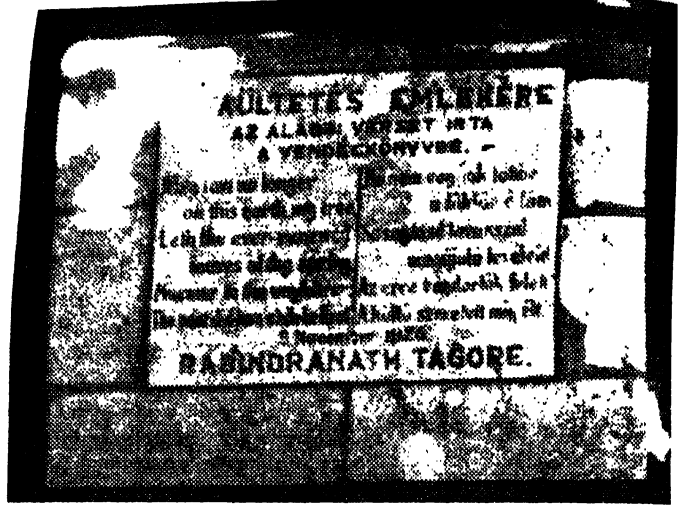
ডালে' (৯ নভেম্বর) লেখেন। এই পর্যায়ের বিদেশ সফরে এটাই তাঁর শেষ রচনা।

শারীরিক কারণে কবি বুদাপেস্টের সভা-সমাবেশে ও অনুষ্ঠানে খুব কমই যোগদান করতে পেরেছিলেন। একদিন হাঙ্গেরির সর্বময় কর্তা অ্যাডমিরাল হোর্থির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আর একদিন তিনি হাঙ্গেরীয় নাটকের জনক করোলি কিসফালোদির মর্মর মূর্তির কাছে একটি বৃক্ষ রোপণ করেন। তিনি অপর একদিন খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক যোরে জোকাই-এর স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান করেন। আর বালাতনে কবি সেই চারাগাছটি রোপণ করেছিলেন ১৯২৬-এর ৮ নভেম্বর।

কিছুকাল আগে হাঙ্গেরীর ওই ফারেড নগরীতে যাবার সুযোগ মিলেছিল আমার। কবির স্মৃতি ধন্য সেই গাছটিকে দেখলাম। এই পঞ্চাশটা বছরে দেশ ও দুনিয়ার বহু পরিবর্তনের মাঝে চারাগাছটি বেড়ে উঠে ঊর্ধ্বাকাশে নিজেকে মেলে ধরেছে। গাছটির পাশে কবির কালো পাথরের একটি আবক্ষ মূর্তি ও দুটি মার্বেল পাথরের ফলক আছে। একটি প্রস্তর ফলকে কবির কয়েক ছটির একটি ইংরেজী কবিতা সেই সঙ্গে তার হাঙ্গেরীয় ভাষায় তর্জমা খোদিত আছে। কবিতাটির সঙ্গে স্মরণ কবিতার কিছুটা মিল আছে। প্রস্তর ফলকে খোদিত কবিতাটি:—

When I am no longer
on this earth, my tree
Leth the ever-reviewed
leaves of thy spring
Murmur to the wayfarer
The poet did love when
he lived.

তুলনীয়:—

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন,
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন...

(স্মরণ)

কবির ওই দুটি ছত্রের ইংরেজী

কবিতাটির মধ্যে প্রকৃতির প্রতি, নিখি বিশ্বের প্রতি কবির একাত্মতার সুরটি ফু উঠেছে।

পরবর্তী কালে কবির প্রতি সম্মা প্রদর্শনের জন্য ফুরেড নগরীর বালাত হ্রদের গা-ঘেঁসা একটি জনবহুল রাস্তা নামকরণ হয়েছে। রাস্তাটির নাম 'টেগো সেতানে' অর্থাৎ যে পথ দিয়ে ক হাঁটতেন।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের হাঙ্গেরীতেও রবীন্দ্রনাথ বরেণ্য কবির মর্যা পেয়েছেন বহুকাল আগেই। ১৯২৪ থে ১৯৪৪-এর মধ্যে তাঁর বহু কাব্যগ্র হাঙ্গেরীয় ভাষায় অনূদিত হয় এ বিদগ্ধ পাঠকমহলে সমাদর লাভ কর ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগ সংকলন বেরিয়েছে হাঙ্গেরীয় ভাষায়। ও দেশে রবীন্দ্রনাথ একটি পরিচিত না

ভারত থেকে যাঁরা হাঙ্গেরী সফ আসেন তাঁরা প্রায় সবাই ফুরেড নগরী কবির স্মৃতি-বিজড়িত গাছটি আর ত মর্মরমূর্তিটি একবার দেখে যান। অ কবিমূর্তির অদূরে একটি উদ্যান তৈ হয়েছে। এটিকে 'ভারত কুঞ্জ' বলা যা এখানে বৃক্ষ রোপণ করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ জাকির হোসেন ১৯৬৮-র ৯ জুন। পরবর রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ১৯৭০-এর অকটোবর এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীম ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের ২২ একটি করে গাছ লাগিয়েছেন ঐ বাগা এছাড়া আরও কয়েকজন ভারতীয় তাঁ সফরকালে এখানে বৃক্ষ রোপণ ক গেছেন।

ভারত ও হাঙ্গেরীর মধ্যে মৈত্রী ত ডালপালা মেলে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ে অর্ধ শতাব্দী আগে এর বীজ বপন ক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির স্মৃতি জড় বালাতন তীরের গাছটি যেন দু দে বিকশিত মৈত্রীর প্রতীক রূপে ত করছে।

জাতীয় ফুটবলে বাংলা এবারও সেরা

রূপক সাহা

বাংলা আবার সন্তোষ ট্রফি জিতল। এই নিয়ে ষোলবার—তেত্রিশ বছর বয়সী সন্তোষ ট্রফিকে আর কোন রাজ্য এতবার ঘরে নিয়ে যেতে পারেনি। নিঃসন্দেহে এটা সুখবর। বিশেষ করে ফুটবল নিয়ে যাঁদের গর্ব সেই বাঙালীদের কাছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পাটনার জাতীয় ফুটবলে বাংলা এবার কেমন খেলল। কোন খেলায় হেরে গেলে আমরা চেঁচাই—হারার পোস্টমর্টেম করি। জিতলে অন্য কিছু মনে থাকে না। আমার মনে হয় পাশ কাটিয়ে না গিয়ে জেতাটাও সার্বিকভাবে খুঁটিয়ে দেখা উচিত। বাংলা মোট আটটি ম্যাচ খেলেছে—প্রথম পাঁচটি এক সপ্তাহের মধ্যে। গোল দিয়েছে পঁচিশটি—খেয়েছে চারটি। মোট ছয়টি দল বাংলার বিরুদ্ধে খেলেছে।

ক্লাস্টার ম্যাচ দুটিতে বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী দুটো দল ছিল দুর্বল। প্রথম দিন উত্তর প্রদেশের সঙ্গে খেলায় পরিবেশটা মানিয়ে নিতে বাংলা একটু সময় নেয় এবং দ্বিতীয়ার্ধে দেওয়া চার গোলে জেতে। পরের খেলায় হালকা ভাবে খেলে মণিপুরকে পাঁচ গোলে হারায়। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগ পর্যায়ের খেলায় বাংলা মুখোমুখি হয় পাঞ্জাব, গোয়া ও মহারাষ্ট্রের। এই তিন দলই ছিল সমান শক্তিশালী। জানি না খেলার তালিকা এই ভাবে তৈরী করার পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল। কারণ অপর গ্রুপের কোয়ার্টার ফাইনাল লীগের চারটি দলই ছিল নেহাতই সাদামাটা।

কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাকে সবচেয়ে বেগ দিয়েছে মহারাষ্ট্র। এই খেলাতে বাংলা প্রথম গোল খায়। প্রতিযোগিতায় বাংলাই একমাত্র দল যারা প্রথমে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচ ছিনিয়ে নিয়েছে। মহারাষ্ট্র দলে একজনও মহারাষ্ট্রীয়ান ছিলেন না। গোয়া তামিলনাড়ু বাংলা কেরালা ও কর্ণাটকের ছেলেদের নিয়ে গড়া এই দলে একটি জিনিসই ছিল দেখবার মতো তা হল টিম স্পিরিট। তাই মূলধন করে ওরা বাংলার সঙ্গে পাল্লা দেয় এবং জাতীয় ফুটবলে ওরা যে দ্বিতীয় সেরা দল তা যথাযথ ভাবে প্রমাণ করে —ফাইনালে উঠে। বাংলার বিরুদ্ধে গোয়াও সহজে মাথা নোয়ায়নি। দু'গোলে হারলেও গোয়া শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বাংলাকে উদ্বিগ্ন রেখেছিল। বাংলার কাছে পাঞ্জাবের ১—৩ গোলে পরাজয় সকলকে অবাক করে দিয়েছে। এবার পাঞ্জাব দলে আটজন ইন- [illegible]

ছেলেরা জান দিয়ে খেলে সেদিন। আমার মনে হয় ঐ ম্যাচেই বাংলা নিখুঁত এবং সেরা খেলা দেখায়। ওরা নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল সেদিন।

সেমি ফাইনালের প্রথম দফায় খেলার উদ্দেশ্যটাই পালটে গিয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের ছেলেদের অহেতুক ফাউলের জন্য। রেফারীর দুর্বল পরিচালনার জন্যও খেলাটি হয়েছে নীচু মানের। অন্ধ্রের উদ্দেশ্য ছিল রাফ্ খেলে বাংলার প্লেয়ারদের ভয় দেখিয়ে তাদের স্বাভাবিক খেলা নষ্ট করা। সেটা সফল হয়নি। কারণ অহেতুক লাথালাথির মধ্যেও বাংলার ফরোয়ার্ডরা দ্রুত বল দেওয়া-নেওয়া করে তিনটি গোল করে বসে। দ্বিতীয় দফার সেমিফাইনাল হয়েছে নেহাতই একতরফা। বাংলা অনেক গোল দিতে পারত কিন্তু আকবরকে দিয়ে হ্যাটট্রিক করানোর চেষ্টায় তা হয়নি। দুদফার খেলায় বাংলা জেতে মোট ৮—২ গোলে।

ফাইনালে বাংলা আবার মুখোমুখি হয় মহারাষ্ট্রের। এর আগে চারবার সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে এই দুটি টিম খেলেছে। একবারও বাংলা হারেনি। এবারও বাংলার ছেলেরা গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখল। লতিফুদ্দিনের গোলে বাংলা জিতল—দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাওয়ার এই খেলায়।

বাংলার ছেলেরা কে কেমন খেলল? সবাই জানেন, বাংলা দলে এবার অনেক নামী খেলোয়াড়দের বাদ দেওয়া হয়েছিল। সুভাষ ভৌমিক, হাবিব সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার, সমরেশ চৌধুরী, অশোক ব্যানার্জি ও তরুণ বোস-দের ছাড়াই বাংলা ট্রফি জিততে পারে—এটা যাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছিল তাঁরা আজ খুশী। বাংলা সন্তোষ ট্রফি জিতেছে ঠিকই তবে এ প্রসঙ্গে ভারতীয় দলের একজন নির্বাচকের বলা একটা কথা উদ্ধৃত করছি—'যে মানের ফুটবল বাংলার খেলায় দেখব আশা করেছিলাম তার অর্ধেকও দেখলাম না এবারের টিমের খেলায়।'

সে কথা যাক, গোলকীপাররা কেমন খেলল প্রথমে তা নিয়ে শুরু করি। তিনজন গোলকীপারের মধ্যে শিবাজী ব্যানার্জি একটা ম্যাচে (মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেলে। ও এত নার্ভাস ছিল যে বাংলাকে প্রথম গোল খাওয়ায়। অবশ্য পরের খেলাগুলোতে ওকে নামানোর সাহস বাংলার কোচ অরুণ ঘোষের হয়নি। সন্তোষ বসু অর্ধেক ম্যাচ খেলে অন্ধ্র প্রদেশের দ্বিতীয় দফার সেমিফাইনালে। এরই মধ্যে শ্যামল ঘোষের ব্যাক পাস বুঝতে না পেরে নিজেদের গোলে বল ঢুকে যেতে দেখে। বাকী খেলাগুলিতে [illegible]

হচ্ছি বিশ্বজিত নিজের ওপর আস্থা রেখে খেলতে পারে নি। একমাত্র পাঞ্জাবের বিপক্ষে ও দুটো অবধারিত গোল বাঁচিয়েছিল।

ডিফেন্সে প্রদীপ চৌধুরী এবং চিন্ময় চ্যাটার্জি সবার নজর কেড়েছে। বিশেষ করে লেফট ব্যাক চিন্ময়—ওভারল্যাপ করে ফরোয়ার্ডদের বল যোগানো থেকে শুরু করে নিজেদের রক্ষণভাগকেও দুর্ভেদ্য করতে সাহায্য করেছে। প্রথম ম্যাচে প্রদীপ চৌধুরী হেড করতে গিয়ে ভুরু জখম করে এবং তিনটি ম্যাচ খেলেনি। সুব্রত ভট্টাচার্য ওর জায়গায়টা পাকা করে নেয় এই সুযোগে। অবশ্য ডিফেন্সে যে কয়েকজন পাটনাতে গিয়েছিল তারা সবাই একই মানের। কোচ অরুণ ঘোষকে ধন্যবাদ—উনি প্রতিপক্ষের ফরোয়ার্ডদের বিচার করেই বাংলার রক্ষণভাগ সাজিয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের সাবির আলি ভাল হেডার—সুব্রতকে ও'র পেছনে লাগানো হয়েছিল। পাঞ্জাবের বিপক্ষে শ্যামল ঘোষকে বসিয়ে সুব্রত ও প্রদীপকে নামানো হয় মনজিত ও ইন্দারকে রুখবার জন্য। কারণ ওরা দুজনে টাক্ খেলতে সক্ষম।

তিনজন লিংকম্যান প্রসূন, প্রশান্ত ও রতন দত্তকে অরুণ ঘোষ সুযোগমত ব্যবহার করেছেন। প্রসূন তার স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারে নি। মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে এবং সেমি ফাইনালের প্রথম দফায় অন্ধ্রের বিপক্ষে সে অনেক ভুল ত্রুটি করেছে। প্রশান্ত প্রথম তিনটি ম্যাচ ভাল খেলেছে। শেষের দিকে ওর জায়গা দখল করে নেয় রতন দত্ত। তবে সামগ্রিক বিচারে বাংলার মিড ফিল্ড খেলোয়াড়রা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল।

ফরোয়ার্ডদের মধ্যে শ্যাম থাপাই সবটুকু প্রশংসা কুড়িয়েছে। কারণ এবার দলে হাবিব, ভৌমিক ছিল না। প্রতিটি ম্যাচেই (ফাইনাল বাদে) শ্যাম একটা-দুটো গোল দিয়েছে। এবারের টপ স্কোরার শ্যামের মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি ভলি করে গোল দেওয়া কোন দিন ভুলতে পারব না। সুরজিতের মতো উইংগার চোখে পড়ল না একটাও। তবে অনেক আক্রমণ সে নষ্ট করেছে অযথা ড্রিবলিং করে। অন্য কাউকে বল ঠেলে দিলে সে আরো গোল করাতে পারত। হাবিব ছাড়া আকবর যে নিষ্প্রভ তা প্রমাণিত হল জাতীয় ফুটবলের আসরে। আকবর পাগলের মতো চেষ্টা করেছে গোল করার জন্য। লতিফুদ্দিন পায়ের চোটের জন্য প্রথম কয়েকটি ম্যাচ খেলেনি। ওর খেলায় ধার দেখলাম না। মানস ও বিদেশ [illegible] ফাইনালে নিজেদের মানিয়ে নিতে [illegible] একবার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও।

শতবার্ষিক টেস্ট

অজয় বসু

দেখতে দেখতে একশ' বছরের আয়ু পূর্ণ হতে চলেছে। বয়সের ভারে মানুষ জীর্ণ, শীর্ণ, জরাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। আমাদের চেনা দুনিয়াটাও কতো পুরানো হয়ে যায়। ছিরি-ছাঁদ যায় বদলে। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের এসব বালাই নেই। যতো বয়স হচ্ছে, ততোই তার রমরমা ভাব বাড়ছে। আর এই অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে ঐতিহ্য হচ্ছে আরও পরিণত।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ১৫ মার্চ মেলবোর্ণ মাঠে যখন অস্ট্রেলিয়া-ইংলান্ড প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ আরম্ভ হয়েছিল, তখন কেউই ভাবতে পারেনি যে, ব্যাট-বল খেলাকে উপলক্ষ করে ভবিষ্যতে কোনোদিন এক-একটি মাঠে সত্তর-আশী হাজার দর্শক সমাবেশ ঘটবে। অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু সংগঠনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হবে। খেলার ক'দিন দেশে দেশে, অঞ্চল বিশেষে টেস্ট ক্রিকেট ছাড়া অন্য কোনো গীতও থাকবে না।

আরম্ভ হয়েছিল ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কালে-কালান্তরে অনুষ্ঠানটির আবেদন ছড়িয়েছে অন্য মহলেও। ক্রিকেটের সংসারটি বড় হয়েছে। ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া ছাড়া ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজও সেই সংসারের শরিকানা পেয়েছে। হয়তো অদূরভবিষ্যতে শ্রীলংকা এবং আরও কোনো কোনো দেশ এই পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। দক্ষিণ আফ্রিকা কী করবে? বর্তমানে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এককালে তারাও খেলতো। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সে তার নিজের পায়েই কুড়ুল চালিয়ে ফেলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা চেয়েছিল কালা আদমীদের অচ্ছ্যুৎ করে রাখতে। এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে, তারা নিজেরাই ক্রিকেট দুনিয়ায় একঘরে হয়ে গেছে। টেস্ট ক্রিকেটের সংসারে তাদের আজ ঢোকার অধিকার নেই। কৃষ্ণাঙ্গদের ত্যজ্য করতে গিয়ে উন্নাসিক বর্ণশ্বেতদেরই আজ শান দেওয়া বুমেরাংয়ের সামনে বুক পেতে দাঁড়াতে হয়েছে।

শতবর্ষের ঐতিহ্য এক ইতিহাস বটে। দিনে দিনে এই ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হবে। ক্রিকেট কুঁড়েদের খেলা। সময় নষ্টের আয়োজন। বৃটিশ ঔপনিবেশিকতার গন্ধ আছে এর প্রত্যঙ্গে জড়ানো। এইসব অজুহাত তুলে যতোই কেন না দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হোক, ক্রিকেট ঘিরে উৎসাহ, উদ্দীপনা বাড়ছে তো বাড়ছেই। 'লর্ডস গেম' এখন নির্ধনদের দুয়ারে গিয়েও টোকা মারছে। তার হাতছানি এড়াতে না পেরে জনসাধারণও আঙিনার চারপাশে ভিড় বাড়াচ্ছেন। ঠাসাঠাসি ভিড়, উচ্চরোল কলকণ্ঠ, ব্যাট-বলের ঠুকঠাক ঠকাঠাক শব্দ এবং গ্যালারি থেকে ছোঁড়া মেজাজী মানুষের সরস টিকা-টিপ্পনী মুখরিত পরিবেশে নাটকও জমছে।

এমনি এক নাটককে একেবারে পঞ্চমাংকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আগামী মার্চের ১২—১৭ ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে আর একটি খেলার ব্যবস্থা হয়েছে, ইতিহাসে যা শতবার্ষিক টেস্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৮৭৭ সালে যে মাঠে সর্বপ্রথম টেস্ট খেলা হয়েছিল, শতবার্ষিক টেস্টের অনুষ্ঠানকেন্দ্রও সেই চিহ্নিত ভূখন্ড। প্রতিযোগীরাও হলো সেই অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলন্ডই। সার্বিক মূল্যায়নে ওই খেলাটি হবে ৮০০তম টেস্ট ম্যাচ। টনি গ্রেগ এবং ইয়ান চ্যাপেল তাঁদের দলবল নিয়ে এই উপলক্ষে মাঝমাঠে হাজির থাকলেও, উৎসব-মুখী ক্রিকেট অনুরাগীদের দৃষ্টির সবটুকু শুধু তাঁরাই কেড়ে নিতে পারবেন না। তাঁদের আশপাশে থাকবেন বহু বিশিষ্ট ক্রিকেটার, একডাকে যাঁদের চিনতে পারা যায়, তাঁদের নিয়েও নিশ্চয়ই কম মাতামাতি হবে না।

শতবার্ষিক টেস্ট আসলে এক উৎসব। খেলা হবে। কিন্তু মজাও কম হবে না। গত একশ' বছরের ফাঁকে ইংলন্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার ইতিহাসে যাঁরা নিজেদের কীর্তি কৃতিত্বের স্বর্ণ স্বাক্ষর এঁকে রেখেছেন, খেলাটির আকর্ষণ বাড়াতে ও তার আবেদন ছড়াতে যাঁরা সংশয়াতীত অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকেই শত-বার্ষিক ক্রিকেটের যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ইংলন্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যাবার আমন্ত্রণ পেয়েছেন যাঁরা, তাঁরা সংখ্যায় হলেন ৯৩। খাস অস্ট্রেলিয়ার ক'জন যে এই উৎসবে যোগ দেওয়ার ডাক পেয়েছেন, তার হিসাব কে রাখে!

এমন একটি অসাধারণ উৎসব-মঞ্চে কাকে সবার সামনে ও সবার আগে দেখতে পাওয়ার জন্যে সারা অস্ট্রেলিয়া উঁচিয়ে আছে জানেন? না, স্যার ডন ব্র্যাডম্যানকে নন। অস্ট্রেলিয়া সর্বাগ্রে দেখতে পেতে চায় কিথ মিলারকে। মিলারকে মনে আছে নিশ্চয়ই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে অন্যূন দুবার আমরা তাঁকে কলকাতার মাঠেই দেখেছি। দীর্ঘকায় পুরুষ। শিল্পীর হাতে খোদাই করা শ্বেত পাথরের প্রতি-মূর্তি যেন। প্রাণের উত্তাপে টগবগ করে ফুটতেন নিরন্তর। যেমন জোরে বল করতেন, তেমনি জোরে ব্যাট হাঁকাতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবেই শীতের অলস প্রহরগুলি দমকা ঝড়ের মুখে পড়ে এলোমেলো হয়ে যেতে চাইতো। খেলতে খেলতে মিলারের মাথায় খুন চড়ে যেতো কিনা জানি না, কিন্তু দেখতে দেখতে দর্শকদের রক্তকণিকা যে নেচে উঠতো তাতে আর সন্দেহ কী!

শতবার্ষিক টেস্টের প্রস্তাব সামনে রেখে সিডনীর ডেইলি মিরার পত্রিকা পাঠক-বর্গকে শুধিয়েছিলেন, ওই আসরে আপনারা কাকে দেখতে চান? উত্তর এসেছে গণ-ভোটের মাধ্যমে। বেশির ভাগ পাঠকেরই ভোট পড়েছে কিথ মিলারের পক্ষে। তাঁর পর পর্যায়ক্রমে বেশি ভোট পান স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান, স্টান ম্যাকেব, রিচি বেনো, ইয়ান চ্যাপেল। লক্ষ্য করার বিষয় অস্ট্রেলীয় দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হলেন সে-দেশেরই খেলোয়াড়েরা। গণভোট অনু-সারে লোকপ্রিয় প্রথম আঠারোজনের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছেন মাত্র একজন ইংরাজ—অবিস্মরণীয় স্যার জ্যাক হব্‌স। কিন্তু স্যার জ্যাককে তো আর স্বচক্ষে দেখতে পাওয়ার উপায় নেই। যেহেতু অনেকদিন আগেই তিনি এই দুনিয়ার দেনাপাওনা চুকিয়ে সরে পড়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট অনুরাগীরা কী আক্ষরিক অর্থে একদেশদর্শী? নইলে ইংলন্ডের খেলোয়াড়কুলের আরও ক'জন অবিস্মরণীয় চরিত্র জনপ্রিয় প্রথম ক'জনের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারলেন না কেন? ক্রিকেটের স্বর্ণযুগের জীবন্ত বিগ্রহ রণজি প্রাক প্রথম মহাযুদ্ধ কালের রোডস ফস্টার, বার্ণস, প্রাক্‌ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের ওয়ালি হ্যামন্ড অথবা উত্তরপর্বের স্যার লেন হাটন, লেকার, ট্রুম্যান, পিটার মে, ডেনিস কম্পটন, কলিন কাউড্রে, আলেক বেডসার, টাইসন, ডেকস্টারও কম খেলোয়াড় ছিলেন না। হ্যারল্ড লারউডই বা কম কিসে? 'রান তোলার যন্ত্র' স্যার ডন ব্র্যাডম্যানকে যিনি একজন সাধারণ ব্যাটস-ম্যানে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন চড়া-ধাতের পেস বোলিংয়ের ঝড় তুলে? এই সব দিকপাল ইংরাজ ক্রিকেটারদের বিস্মৃতির অন্ধকারে রেখে দিয়ে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটরসিকেরা যথার্থ নিরপেক্ষতার পরিচয় রাখতে পারেননি।

তবে থাক্‌ এসব কথা। শতবার্ষিক টেস্ট ম্যাচ তার সংজ্ঞা ও এক ঐতিহাসিক আয়োজনের মর্যাদা রক্ষায় উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারলেই হলো। এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য যদি টনি গ্রেগ ও গ্রেগ চ্যাপেলের দল উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলেই ভাল। তাহলেই খেলার মতো খেলা হবে। নাটক জমবে। এবং এক ঐতিহাসিক আয়োজনের আদর্শ সম্পর্কে একালের ক্রিকেটারদের সুনিষ্ঠতার প্রমাণ পেয়ে প্রশান্তচিত্তে আশ্বস্তবোধ করতে পারবো।

দর্শক

আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিক্‌স প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজে রাজরত্নম স্টেডিয়ামে আয়োজিত ২৩তম আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার সাতটি বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—পুরুষ বিভাগে বিহার, মহিলা বিভাগে তামিলনাড়ু, বালক বিভাগে পাঞ্জাব (১৯ বছর ও ১৭ বছরের নীচে) ও পশ্চিম বাংলা (১৫ বছরের নীচে) এবং বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র (১৬ বছরের নীচে) ও তামিলনাড়ু (১৪ বছরের নীচে)।

পাঁচদিনের এই আন্তঃরাজ্য অ্যাথলেটিকস অনুষ্ঠানে যে ১১টি নতুন আন্ত রাজ্য অ্যাথলেটিকস রেকর্ড হয় তার মধ্যে জাতীয় রেকর্ড ছিল মাত্র দুটি বিষয়ে। মেয়েদের ৪x৪০০ মিটার রীলেতে কেরালা দল ৪ মিনিট ৩-৪ সেকেণ্ডে দৌড় শেষ করে নতুন জাতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় জাতীয় রেকর্ডটি প্রতিষ্ঠিত হয় মেয়েদেরই বিভাগে যখন ওড়িষ্যার উষারাণী মিশ্র হাই-জাম্পে জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেন।

ব্যক্তিগত বিরাট সাফল্যের পরিচয় দেন ২৩ বছরের রেলকর্মী আর গণশেখরণ। পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড় ১০-৬ সেকেণ্ডে শেষ করে তামিলনাড়ুর গণশেখরণ আন্তরাজ্য অ্যাথলেটিকসের উপর্যুপরি চারটি আসরে ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করেন।

মেয়েদের বিভাগে তামিলনাড়ুর অনুসূয়া বাঈ চারটি স্বর্ণপদক পান—১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, ডিসকাস এবং সটপুটে।

বালকদের বিভাগে (১৯ বছরের নীচে) তামিলনাড়ুর জে আমামালাই এই চারটি বিষয়ে স্বর্ণপদক জয় করেন—২০০ মিটার দৌড়, লংজাম্প, ট্রিপলজাম্প এবং ৪x১০০ মিটার রীলে।

পদক জয়ের তালিকায় বাংলা ৪র্থ স্থান লাভ করে—স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ১০ এবং ব্রোঞ্জ ১১।

বালিকা বিভাগের (১৬ বছরের নীচে) [illegible]

আন্তঃরাজ্য রেকর্ড করেন। এবারের আসরে পশ্চিম বাংলার পক্ষে এই একটাই আন্তঃ-রাজ্য রেকর্ড।

দলগত স্থান

পুরুষ বিভাগ : (১) বিহার (৬১ পয়েন্ট), (২) পাঞ্জাব ৩২ পয়েন্ট) এবং (৩) তামিলনাড়ু (২৬ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : (১) তামিলনাড়ু (৩৮ পয়েন্ট), (২) কেরল (৩৩ পয়েন্ট) এবং (৩) মহারাষ্ট্র (১৯ পয়েন্ট)

বালক বিভাগ (১৯ বছরের নীচে) (১) পাঞ্জাব (৪৩ পয়েন্ট), (২) তামিলনাড়ু (২৮ পয়েন্ট) এবং (৩) মহারাষ্ট্র (২১ পয়েন্ট)

বালক বিভাগ (১৭ বছরের নীচে) (১) পাঞ্জাব (২৯ পয়েন্ট), (২) পশ্চিম বাংলা (২২ পয়েন্ট) এবং (৩) মহারাষ্ট্র উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানা (প্রত্যেকে ১৪ পয়েন্ট)

বালক বিভাগ (১৫ বছরের নীচে) (১) পশ্চিম বাংলা (১৯ পয়েন্ট) (২) আসাম (১১ পয়েন্ট) এবং ত্রিপুরা (৬ পয়েন্ট)

বালিকা বিভাগ (১৬ বছরের নীচে) (১) মহারাষ্ট্র (২৭ পয়েন্ট), (২) পশ্চিম বাংলা (১৯ পয়েন্ট) এবং তামিলনাড়ু (১৩ পয়েন্ট)

বালিকা বিভাগ (১৪ বছরের নীচে) (১) তামিলনাড়ু (১৮ পয়েন্ট) (২) আসাম (১১ পয়েন্ট) এবং (৩) মহারাষ্ট্র (৯ পয়েন্ট)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
তামিলনাড়ু	১৬	১২	৬
পাঞ্জাব	১৩	১০	৯
বিহার	১০	২	৬
পঃ বাংলা	৯	১৪	১১
মহারাষ্ট্র	৯	১১	১০
কর্ণাটক	৭	২	৮
আসাম	৬	৩	৭
কেরালা	১	১৪	৫
উঃ প্রদেশ	৪	৫	৭
ওড়িশা	৪	২	৩
হরিয়ানা	৩	৫	৩
ত্রিপুরা	২	১	৩
রাজস্থান	১	৫	২
গুজরাট	১	৪	৬
অন্ধ্র	১	১	৩
দিল্লি	১	১	৩
চণ্ডীগড়	১	১	০
জম্মু-কাশ্মীর	০	০	১

ডেভিস কাপ

আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া শোচনীয়ভাবে ৫—০ খেলায় ভারতকে পরাজিত করেছে। পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে খেলবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড। পূর্বাঞ্চলের অপর সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যাণ্ড জিতেছিল ৫—০ খেলায় ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে।

রঞ্জি ট্রফি

পূর্বাঞ্চলের খেলা

ইডেনের রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত বাংলা বনাম বিহারের রঞ্জি ট্রফি খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও বিহার প্রথম ইনিংসে ১৮৩ রান বেশী করার সুবাদে খেলায় জয়ী হয়। এবং এই সূত্রে বিহার পূর্বাঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান হয়ে মূল প্রতি-যোগিতায় খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

প্রথম দিনে বাংলার প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট পড়ে ১৫৮ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় দিনে বাংলার প্রথম ইনিংস ১৬৬ রানের মাথায় শেষ হয়। বাকি সময়ের খেলায় বিহার প্রথম ইনিংসের ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২২১ রান তুলে বাংলার থেকে ৬৩ রানে এগিয়ে যায়। বিহারের মাত্র ২৮ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়েছিল। চতুর্থ উইকেটের জুটিতে রমেশ সাকসেনা এবং সন্দীপ রায় ১৬১ রান তুলে দলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

শেষ তৃতীয় দিনে বিহার তাদের প্রথম ইনিংসের ৩৪৯ রানের মাথায় (৬ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে বাংলার থেকে ১৮৩ রানে এগিয়ে যায়। খেলার বাকি সময়ে বাংলা দ্বিতীয় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ১২৩ রান সংগ্রহ করেছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলা : ১৬৬ রান (গোপাল বসু ৩২ এবং পলাশ নন্দী ৪৩ রান। শেখর সিংহ ৬৯ রানে ৩ এবং কাজল দাস ৪৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ১২৩ রান (২ উইকেটে। কল্যাণ চৌধুরী ৫৭ এবং রাজা মুখার্জি নটআউট ৩২ রান)

বিহার : ৩৪৯ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। সন্দীপ রায় ৭৬, রমেশ সাকসেনা ৯১, দলজিৎ সিং ৯০ এবং অনিল ভরদ্বাজ নটআউট ৫১ রান। বরুণ বর্মণ ১১১ রানে ৪ এবং অলোক ভট্টাচার্য ৭৮ রানে ২ উইকেট)

আমীর খাঁ

ছয় ঋতু... তিন

মঞ্জরী সদাগর

আমীর খাঁর গবেষণা সার্থক হল। তিনি বুঝলেন এখানেই তারানার উৎস নিহিত রয়েছে। বুঝলেন, নাদের দানি, তোদানি ইত্যাদি শব্দসহযোগে তৎকালীন সুফী সাধকরা জপ করতেন। আলালুম, আলি, আলাহিলা..এ সবই পরমেশ্বরকে সম্বোধন করার শব্দ। নাদের মানে প্রিয়পরম, ওদানি মানে সেই বেত্তা, 'তুদানি মানে তুমিই জানো। আমীর খুসরু রচিত তারানার অন্তরায় সচরাচর একটি ফারসী কবিতা বা 'শের' থাকত। এমনি একটি শের-সমৃদ্ধ খুসরু তারানা ওস্তাদ আমীর খাঁ দরবারী রাগে গাইতেন। তাল—দ্রুত একতাল। গানটির বাণী :

যারে মন বেয়া বেয়া
দরতন তাদীম বলবম্—রশিদা জানম্।
তো বিয়াকে জিনদম আনম্
বচেকার থাহী আমদ॥

বন্ধু হে প্রিয়তম পরম! এস আমার বুকে এস। আয়ু ক্ষীয়মান, প্রাণ আর থাকতে চায় না। বিরহকাতর এই বক্ষে এসে পা রাখ। আমায় মুক্তি দাও প্রিয়। এখনো না এলে পরে মরণের আর তর সইবে না। তখন সেই শূন্য পিঞ্জরে তুমি কার সাথে দেখা করবে নিষ্ঠুর। আমীর খান নিজেও অনেক গভীর ভাববহ তারানা রচনা করেছেন। তাঁর খেয়ালের মতই সেগুলি জনপ্রিয়।

স্বরস্থান :—

তাঁর অলৌকিক আওয়াজের কথা এর আগেও বলেছি। তাঁর স্বরস্থানের উৎস খুঁজতে নেমে যে কথাটা মনে হয়, সেটা হল শাস্ত্রবর্ণিত শংখনাদ। ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি নাদ অভ্যাসে ব্রহ্মজ্ঞান সহজে আয়ত্ত হয়—তাই শাস্ত্রে বলে, 'নাদাৎ পরতরং ন হী', সুরসাধনার মূলমন্ত্রই এই নাদ অভ্যাস। নাদের প্রকার ভেদ আছে। শংখনাদই শ্রেষ্ঠ নাদ। যে আওয়াজ কানে গেলে সারা শরীর সাত্ত্বিক পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, কোন বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য থাকে না—তাই শংখনাদ। ঐ আওয়াজে সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গীতে সিদ্ধিলাভ হয় না। পণ্ডিত ও মনীষীদের এই অনুমান প্রত্যক্ষ রূপায়িত হয়েছিল আমীর খাঁর কণ্ঠে। আমার বিশ্বাস ওস্তাদ আমীর খান শংখনাদের অধিকারী ছিলনে।

জন্মস্থান ও ঘরানার ইতিহাস :

ইন্দোররাজ হোলকারের রাজসভায় যেসব মনিমাণিক্য আলোক বিকীরণ করতেন, তাঁদের একজন হলেন ওস্তাদ শাহমীর খান, বা শমীর খান। বিখ্যাত বীণকার, বিখ্যাত সারেঙ্গীয়া। শুধু বিদ্যাবৈদগ্ধ্য বা পাণ্ডিত্য নয়, তাঁর স্বভাবটিও এমন মধুর ছিল আর এমন মুক্তহস্ত অমায়িক আর পরহিতপ্রবণ মানুষ ছিলেন যে, জ্ঞানীগুণীভাগ্যবন্ত থেকে দীনদুঃখী অবধি সববাই তাঁকে আপনজন বলে ভাবত। আদর করে সবাই ডাকত শম্মু খাঁ বলে।

শেষ মুঘল বাদশা বাহাদুর শাহ জাফরের দরবারে মিয়া ছংগে খাঁ ছিলেন সেরা সভাগায়ক। ইনি শমীর খাঁর পূর্বপুরুষ। ছংগে খাঁ নিজেই হোন বা তাঁর বংশের আর কোন ঊর্ধ্বতন কেউ হোন রাজনৈতিক কারণেই সম্ভবতঃ হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলেন। তখনকার সমাজ এই ধর্মান্তর ভাল মনে নিতে পারেনি। সমাজ পরিত্যক্ত এই পরিবার তখন থেকেই গানবাজনাকে পারিবারিক ব্যবসা হিসেবে অবলম্বন করলেন। মিয়া ছংগে খাঁর মৃত্যুর পর শমীর খাঁ বোম্বাইয়ে চলে যান। সেখানে ছজ্জু নাজীর খাঁ সাহেবের কাছে তালিম নিতে থাকেন। সারেঙ্গীয়া এবং বীণকার হিসেবেই তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধি ছিল। শমীর খাঁ গানবাজনাকে পাটোয়ারী মনোভাব নিয়ে দেখতে পারলেন না। বংশধারায় তিনি ব্যতিক্রম আনলেন। সঙ্গীতকলাকে নন্দন উপাসনার স্তরে তুলে আনবেন বলে শপথ নিলেন। তাঁর পরবর্তী গুরু হলেন ভারতবিখ্যাত বন্দেআলি খাঁ। অনেকে বন্দেআলি খাঁকে আবদুল করিম খাঁর মাতামহ বলে পরিচয় দেন। এ তথ্য ঠিক না ভুল আমি জানি না। যদি কেউ সঠিক জানাতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

মিয়া তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় নিরমল শাহ বীণকারের শিষ্য ওস্তাদ বন্দেআলি খাঁ কিরানা ঘরানার স্রষ্টা। কিরানার দুই প্রধান স্তম্ভ ওস্তাদ আবদুল করিম খান আর ওস্তাদ আবদুল ওয়াহিদ খান, মামা আর ভাগ্নে, দুটি বিশিষ্ট শাখার প্রবর্তক।

বন্দে আলি খাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন : আবদুল আজিজ খাঁ, ইমদাদ খাঁ, মুরাদ খাঁ, ভাইয়াসাহেব গণপতরাও, জোহরা বাঈ, চুন্না বাঈ...এঁদের মধ্যে কেউ গানে কেউ বিভিন্ন রকম বাজনায়, যেমন বীণা, সারেঙ্গী, বীন, বিচিত্রবীণা, হারমোনিয়াম ইত্যাদিতে সুদক্ষ ছিলেন। বন্দে আলি খাঁর নামজাদা শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন—আবদুল ওয়াহিদ খান (বহুরে), রজব আলি খাঁ, হায়দার বক্স, আমান আলি এবং শমীর খান। এই শমীর খাঁ ওরফে শম্মু খাঁ আমীর খাঁর বাবা। উনিশ শ বারো সালে ইন্দোরে আমীরের জন্ম।

করিম খাঁ আর ওয়াহিদ খাঁ কিরানার যে দুটি মুখ্য শাখার পথিকৃৎ—সেই শাখা দুটি ভবিষ্যতে একাধিক দিকপাল কণ্ঠশিল্পী প্রসব করেছে। এঁদের মধ্যে নামকরা প্রায় সবাই গন্ধর্ব, সওয়াই রামচন্দ্র বেহরে, রোশনআরা বেগম, সুরেশবাবু মানে (মালাবাবু)—এঁরা সবাই করিম খাঁ সাহেবের সাগরেদ। শেষের দুজনের ছিলেন করিম খান বলে শোনা যায়। ওয়াহিদ খাঁ সাহেবের সাগরেদদের মধ্যে—করিম খাঁর কন্যা হীরাবাঈ বরোদেকরও ছিলেন। কিছুদিন আগে সুরেশ সঙ্গীতসমাজের আয়োজনে সঙ্গীত সংহতি সম্মেলনে কলকাতায় গান করে গেছেন পণ্ডিত জয়চাঁদ ভাট। ইনিও ওয়াহিদ খাঁর শিষ্য। বর্তমানে কিরানার যে শাখাটি ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠা কায়েম করেছে। সেটি করিমশিষ্য সওয়াই গন্ধর্ববুয়ার শিষ্য প্রশাখা। যাঁর মধ্যে আছেন—গাঙ্গুবাঈ হাংগল এবং ভীমসেন যোশী।

নিষ্ঠাবান, নিরহংকার, শিশুর মত সরলস্বভাবের ওস্তাদ শমীর খান, শিক্ষক অভিভাবক হিসাবে কিন্তু খুবই কড়া ছিলেন। কাশীর কণ্ঠস্বিনী গায়িকা রসুলা বাঈ, বয়ঃকনিষ্ঠ গুরুভাই আমান আলি আর বড় ছেলে আমীর—এঁরা তিনজনই সাগির্দ হিসেবে তাঁর নাম রেখেছেন।

অল্প বয়েসেই আমীর মাতৃহীন হয়েছিলেন। তাঁর বয়েস তখন নয়ে নয় কি দশ। বিরহী স্বামী স্নেহসন্তান আমীর আর বিয়ে করেন নি। সেই থেকেই বাপের স্নেহাব যত্নের নিরেকবল আওতায় তালিম শুরু হল আমীরের। একটানা পাঁচিশ বছর

পর্যন্ত চলেছে সেই তালিম। একদিনের জন্যে রেয়াজে ছেদ পড়েনি। তারপর বাবা মারা যান।

শমীর খাঁর স্বপ্ন ছিল তাঁর আমীর আদর্শ খেয়ালিয়া হয়ে উঠবেন। সংগীতের নাম ভাঙিয়ে ভাঁওতা দিয়ে প্রচার চাতুর্যে বাজারমাত করার প্রবণতাকে তিনি ঘেন্না করতেন। খেয়াল বলতে শমীর বুঝতেন—হৃদয়দ্রাবী কণ্ঠমাধুর্য, স্বরের শুদ্ধাচার, শ্রুতির উৎসমুখী নিষ্ঠা, আর উপলব্ধ প্রজ্ঞার অলংকরণে সমৃদ্ধ পরিমার্জিত সুশৃঙ্খল আদ্যন্ত রসনিয়ন্ত্র সুব্যক্ত ধ্বনির সলীল সঞ্চার। • খণ্ডমেরুখচিত * অপরূপ বিস্তার সহযোগে রাগকে বিচিত্র লীলা লাবণ্যে মুড়ে অনায়াসে পরিবেশন করাই খেয়ালিয়ার ধর্ম। একজন খেয়াল গায়ক মানে একজন সুফীদরবেশ। পিতার এই আদর্শের কথা আমীর খাঁ সাহেবের মুখে আমরা অনেকবার শুনেছি। এই বর্ণাঢ্য স্বপ্নকে আমীর বর্ণে বর্ণে কণায় কণায় সার্থক করেছিলেন। তাঁর জীবনই তার প্রমাণ।

আমীর খাঁ বলতেন তিনি কারুর নাড়াবাঁধা শিষ্য নন। বাবাই তাঁর গুরু। পরে পিতৃশিষ্য আমান কালির কাছেও তিনি অনেক কিছু নিয়েছিলেন। সে ঋণের কথা তিনি সারাজীবন স্বীকার করে গেছেন। পিতৃবন্ধু ওস্তাদ রজ্জব আলি, ওস্তাদ ওয়াহিদ খাঁ...এঁদের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতেন। তবে এই প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার মতন একটা নগণ্য মানুষের কাছে এমন ইনটারেসটিং কিছু বলে গেছেন যাকে বিশ্লেষণ করলে প্রাচ্যদর্শনের তত্ত্ব উপলব্ধির সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে। সুযোগ মত এবং সাধ্যানুসারে সে-বিশ্লেষণ করার ইচ্ছে রইল।

আমীর খাঁর ঘরানা প্রসঙ্গে দীর্ঘকালীন একটা কনট্রোভার্সি ছিল। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার দরুণই হোক বা তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রতি সমীহের দরুণই হোক, ইদানীং আর সে প্রসঙ্গে বেশি কথাকাটাকাটি শোনা যায় না।

শমীর খাঁর সাগরেদ হিসেবে, বন্দে আলি খাঁর শিষ্য-পরম্পরার মধ্যেই তিনি পড়েছেন। সেক্ষেত্রে কিরানা ঘরের গাইয়ে বলেই তিনি গণ্য হবেন—এটাই সোজা হিসেব। পঁচিশ বছর আগে তাঁর গায়ক পরিচিতিতে তাঁকে কিরানার গাইয়ে হিসেবে লেখা হয়েছে—এ আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমীর খাঁ-এর প্রতিবাদ করেননি।

গানবাজনার লাইনের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছেন—আবদুল ওয়াহিদ খাঁর ক্লাসে তাঁকে শিক্ষার্থী হিসেবে দেখা গেছে। আমি আজ তাঁদের নাম করেই বলছি। তাঁরা হলেন—আবদুল করিম খাঁ সাহেবের ভাগ্নে ওয়াহিদ খাঁর ভাই আবদুল হাবিব খাঁ সারেঙ্গীয়া, কানা হবিব বলে যিনি পরিচিত ছিলেন। রামপুরের ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ সাহেবের সঙ্গে তিনি আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, এক নম্বর। আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে এক সময় সঙ্গীত শাখার প্রযোজক ছিলেন নলিনীরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর বাড়িতে বসে তাঁর মুখেও আমি শুনেছিলাম, ওয়াহিদ খাঁর ক্লাসেই আমীর খাঁর সঙ্গে তাঁর নাকি প্রথম পরিচয় হয়েছিল। এটা দুনম্বর। আমাদের সেদিনের কথাবার্তার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলা গানের বিশিষ্ট শিল্পী অখিলবন্ধু ঘোষ। তৃতীয় যে ব্যক্তি এ বাবদে প্রত্যক্ষদর্শিতায় সাক্ষ্য দেন তিনি পণ্ডিত জয়চাঁদ ভাট। খাঁ সাহেবের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা তাঁকে নিজের বড় গুরুভাই হিসেবে মানেন। এঁরা ছাড়া উত্তর ভারতের ও মধ্য ভারতের যেসব গুণীমহলে আমি একথা শুনেছি তাঁদের একটি নামই যথেষ্ট। ঘটনাটাই বলি।

পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। আমি তখন ইন্দোরে। কোন একটি রাজার বাড়ির বাগানে তখন ইন্দোর বেতার কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এখনো সেই বাড়িতেই আছে কিনা জানি না। ইন্দোর আকাশবাণী ভবনে আমার গতায়াতটা একটু ঘন ঘনই হত। তার নানান হেতু ছিল। রোমান্সঘটিত হেতুও যে একেবারে অনুপস্থিত ছিল তা নয়। একদিন আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি রেডিও শুদ্ধু সবাই তটস্থ স্টুডিওর ভেতরে এবং সংগীত শাখায় সাজ সাজ রব। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম দেবাস থেকে গান গাইতে আসছেন এক দেবর্ষি। নারদোপম গাইয়ে ওস্তাদ রজব আলি খাঁ। সেদিনই প্রথম তাঁর গান শুনি। গানের শেষে তাঁকে প্রণাম করার এবং দুটি একটি কথা বলার সুযোগ পাই। তাঁর প্রিয়বন্ধু ও গুরুভাই শম্মুর ছেলে আমীর আমার সবচেয়ে প্রিয় গায়ক শুনে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সেদিন সেখানেই আমীর খাঁ প্রসঙ্গে কিছু কথাবার্তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—শমীরের বাড়িতে গানের আসরে তিনি নিজে এবং অন্যান্য গুরুভাইরা প্রায়ই যেতেন। ওয়াহিদ খাঁও যেতেন। এবং আমীরের গানে ওয়াহিদের প্রভাব আছে। একথা অনেকেই জানে যে আমীর, আমান আলি এবং ওয়াহিদ খাঁর কাছে যাতায়াত করত।...

একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে ওয়াহিদ-আমীর সম্পর্ক প্রসঙ্গে যা যা শুনেছি তার কিছু কিছু বললুম। এবার এ প্রসঙ্গে আমীর খাঁ সাহেবের নিজের মুখ থেকে যা শুনেছি সেটাই বলব। কিন্তু তার আগে ঘরানা বিতর্কটা শেষ করে ফেলা যাক।

এযাবৎ প্রাপ্ততথ্যের ওপর ভিত্তি করে খাঁ সাহেব আমীর খাঁকে কিরানা ঘরের গায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে। অথচ তিনি নিজে ইন্দোর ঘরানার শিল্পী হিসেবে নিজের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। উত্তরজীবনে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় এই প্রবীণ শিল্পী ইন্দোর ঘরানার স্তম্ভ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ওপর তোলা ডকুমেন্টারি ফিলমের নামও ইন্দোর ঘরানা। তার কোথাও কিরানার নামগন্ধ নেই।

ষোল সতের বছর আগে কলকাতার এক সঙ্গীত সম্মেলনে ঘরানা সম্পর্কে আলোচনার আয়োজন হয়েছিল। এব্যাপারে বিশিষ্ট গুণীদের মতামত শোনা হয়েছিল। আমাদের কাছে তখনও এসব ব্যাপার যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। কেবল কতকগুলি নাম এবং বাইরের চিহ্ন থেকে কে কোন ঘরানার শিল্পী সেটা বুঝতে পারতুম। স্টাইলের স্বাতন্ত্র্য আসলে কোন বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেটার খোঁজখবর রাখতুম না।

কাজেই নিছক অর্ধশিক্ষিত ভাবাবেগের দরুণ যেমন আমরা সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ইত্যাদির সঙ্গে খামোখা নিজের আইডেনটিটিকে জড়িয়ে ফেলি এবং ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলি, দৃষ্টির স্বচ্ছতা ঘুচিয়ে বোধ বিভ্রম ঘটাই—অনেকটা তেমনি ফ্যানাটিক চশমার মধ্যে দিয়ে গানবাজনার ঘরানাকে দেখতে চেষ্টা করতুম। ফলে পদে পদে ভুল বাড়ত। সেদিন সেই সম্মেলনের আলোচনায় আমাদের শ্রদ্ধাভাজন এক গুণীজন খানদান ও ঘরানার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনের কথা বললেন। আর আমীর খাঁ বললেন সম্পূর্ণ আলাদা কথা। তাঁর কথা সেদিন আমাদের কাছে গানবাজনার ছাত্র হিসেবে খুব রুচিকর হয়নি, বরং মনে হয়েছিল এটা একটু বেশিরকম উদারপন্থী মনোভাব। এতে গায়নপদ্ধতির শুদ্ধতাহানি ঘটার আশংকা আছে। খাঁ সাহেব বলেছিলেন—সঙ্গীতের গভীরতর উপলব্ধির ক্ষেত্রে ঘরানার প্রতি কমিটেড মনোভাবটা অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে পারে। আমার খানদান বা গুরুপরম্পরার প্রতি আমার

* খণ্ডমেরু, মেরুখণ্ড বা মীড়খণ্ড স্বরবিন্যাসের একটি প্রয়োগ কৌশল। রাগের নির্বাচিত পর্দাগুলিকে, শ্রুতির হেরফের না ঘটিয়ে, কাঠামো যথাযথ বজায় রেখে, নানান বিচিত্রবুনট দিয়ে গানের সৌন্দর্য বাড়ান। চিকনের কাজের মতন।

আনুগত্য থাকা ভাল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে যদি পরম্পরাগত রুচি মজবুত পড়ে, পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেও, সেখানে আলাপের মোডিফিকেশনের স্বাধীনতা থাকা দরকার। ঘরানার দোহাইয়ের নাম করে তার কোন অক্ষমতাকে ধারাবাহিকভাবে বয়ে নিয়ে চলা আর হেরিডিটারি রোগবীজ বহন করা একই কথা। খাঁ সাহেবের নিজের ভাষায়: যায়, মৌসিকি তো নদী হ্যায় কি অগর রুকা রহে তো আপনী মোজমায় অপনী হী গোলী সে মারী জাতী হ্যায়...অর চুপ রহু তো তুমলোক কবতক মুর্দা হোতে চলোগে? যাও বাতেলাও কী জানো, যদি মুখ খুলি তো নিজের সেপাই নিজেরাই গুলি খেয়ে মরে—সেমসাইড হয়ে যায়, আর যদি চুপ করে থাকি তাহলে তোমরা জীবন্মৃত লাশ বয়ে বেড়াও, ভাই বা কাঁহাতক সহ্য হয়!

এই উক্তিটি তিনি অন্তরঙ্গমহলে করেছিলেন, এ ঘটনার অনেক পরে, জীবনের শেষভাগে। সেদিনকার আসরে তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল অনেক বেশি মার্জিত ও শোভন। কোনরকম রূঢ়তা প্রকাশ না করে, অপরের সেন্টিমেন্ট যথাসম্ভব বাঁচিয়ে, কাউকে আঘাত না দিয়ে অথচ স্পষ্ট করে নিজের মনোভাবটি ব্যক্ত করেছিলেন। ঘরানার প্রতি কোন কটাক্ষ করেন নি, একটিও কটূক্তি নয়। বরং বিভিন্ন ঘরানার গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছিলেন। স্পষ্ট বিরোধিতা করেছিলেন ম্যানারিজমের। কারুর নাম উল্লেখ না করে সেই শ্রেণীর গাইয়েদের আক্রমণ করেছিলেন যাঁরা অনুশীলন করে শুদ্ধবস্তু আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন না, কেবল ঘরানার দোহাই পেড়ে অশুদ্ধ জিনিসকে শুদ্ধ বলে চালানোর চেষ্টা করেন, তাঁরা ক্রমাগত শ্রোতাদের ফাঁকি দেন, শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করেন। ছলক তান, গমক, সপাট ইত্যাদি দেখাতে গিয়ে অনেক তথাকথিত নামজাদা ঘরানাবাজ বীভৎস সুরবিকৃতির প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। তারানার নাম করে জিভের কসরত দেখিয়ে আসছেন। ঠুংরীর নাম করে অশ্রাব্য অশ্লীল ইতরোমো পরিবেশন করছেন। লোকে অকুণ্ঠচিত্তে তাই গলাধঃকরণ করছে অসহায়ভাবে। সঙ্গীতের চারিত্রিক শুদ্ধিকরণের তাগিদেই একজন মৌলিক শিল্পপূজারীর ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি।

তবুও সেদিন অনেকের ভ্রূকুটিভাজন হয়েছিলেন। শেষে বলে আড়ালে কেউ কেউ বলেছিলেন—যাঁর নিজেরই ঘরানার ঠিক নেই, যে নিজেই কারুর কাছে জীবনে নাড়া বাঁধেনি, কোন গানের স্থায়ী জানে অন্তরা জানে না, তার মুখ থেকে খানদানী ঘরানার বিরুদ্ধে স্লোগান তো শোভেনাই। কলকাতায় এক নামকরা খেয়াল-ঠুংরী-ভজন গাইয়ে তখন আমাদের কাছে বলতেন 'আমীর খাঁর নিশ্বাসটাই কান পেতে শোনা যায়। তান করে রাজরোগীদের মতন।' তিনি এখনো গান করেন। গান শেখান। রেডিওতে গান। আমি মালিকের কাছে তাঁর জন্যে শুভকামনা জানাই: যেন মানসিক দৈন্য ঘোচে, যেন পরিণত হয়ে উঠতে পারেন। লোকটিকে বিপথে চালিত করার মতিভ্রম আর না থাকে। এঁর একাকালে অনেক ছাত্র ছিল। আর এক 'সঙ্গীতাচার্য' নাকি বলেছিলেন—'আমি যা গাই, তার কিছুটা ছায়া দেখতে পাই আমীর খাঁর বিলম্বিতে...' (ছায়াবাজির সেই যাদুকর স্বর্গে গেছেন। যদি না ক...
অপরাধ করে ফেলে থাকি, স্বর্গ থেকে যেন আমায় ক্ষমা করেন—আমি তাঁর পদধূলিরও যোগ্য নই।) সঙ্গীত সম্পর্কে প্রকৃত অজ্ঞ এইসব পাণ্ডিত্যম্মন্য ব্যক্তিদের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা দেশে গান-বাজনার যথার্থ ক্ষতি করে চলেছেন। সম্প্রদায়বিশেষ গোঁড়ারা যেমনভাবে ধর্মের নামে অধর্মের বেসাতি করে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন, অবিকল সেই একই ব্যাপার।

সত্যকামের পিতৃপরিচয়ের প্রয়োজন হয়নি তার অকপট চরিত্রই তার সহজাত দ্বিজত্বের দ্যোতক ছিল। ব্যাধিবিকৃত খেয়াল গানকে নিরাকার পরিশুদ্ধ বেদীতে বসিয়ে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন আমীর খাঁ—তিনি ভগীরথ। বাঁধারীতির কাটাখাল তাঁর জন্যে নয়। রবীন্দ্রনাথ কিংবা ম্যাকসিম গোর্কি কোন মার্কামারা ইস্কুলের ছাত্র হতে পারেন না। তাঁরা নিজেরাই এক একটি ইন্সটিটিউশন—এক একটি উৎস। সেখান থেকেই নানান চিন্তাধারা, স্কুল অব থটস্‌—উৎসারিত হয়। আমীর খাঁ নামকা ওয়াস্তে ইন্দোর ঘরানার শিল্পী। (কার্যতঃ তিনি বরঞ্চ তিনিই ইন্দোর ঘরের প্রবর্তক। শম্মু খাঁ কিরানারই প্রবক্তা ছিলেন।) আসলে তিনি ভারতীয় ঋষিদের উত্তর-সাধক। এই শতাব্দীর মুক্তিকামী বিশুদ্ধ সঙ্গীত-সিদ্ধির দীপবাহক। আসলে সব ঘরানার গাইয়েরাই আজ ভেতরে ভেতরে আমীর খাঁর স্কুলকে অনুসরণ করছেন। করছেন যে যার বৈশিষ্ট্য মাফিক। মনে পড়ছে একবার প্রবল জনশ্রুতি কানে এল: ভারতবিখ্যাত গায়ক ভীমসেন যোশী নাকি আমীর খাঁর কাছে নাড়া বাঁধতে চেয়েছেন। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু খাঁ সাহেব তাঁকে নিরস্ত করলেন। বললেন, নাড়া বাঁধতে হবে কেন? তুমি আমার ছোটভায়ের মতন। যখন যা প্রয়োজন হবে, হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেবে। তুমি নিজেই এখন বড় গাইয়ে, তোমার একটা পরিণত ফিলজফি আছে। যাঁদের তৈরি কান তাঁ...
অনুরোধ, একটু মন দিয়ে বিচার করে শুনে দেখুন—আগ্রা কিরানা পুণা বোম্বাইয়ের বিভিন্ন খ্যাতনামা গায়কের বিস্তারে, কিংবা তান-সঞ্চারে, কিংবা সরগমের বিন্যাসে কিংবা বঢ়তের উপচারে আমীর খাঁর স্টাইলের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়তে না পারলে আমার কান মলে দেবেন।

এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। এতে অগৌরবের কিছু নেই। আসলে এটাই আমীর খাঁর বক্তব্য ছিল। প্রকৃত সুরস্রষ্টা কখনো কোন ঘর-ঘরানার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নন। তিনি সার্বজনিক অধিকারের ধন। একমালী দৌলতখানা। আইনস্টাইনের তত্ত্বে কি ইহুদীদের মনোপলি? মার্কিনীদের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত?

তবে পাঁচজনের মুখ চেয়ে কাজের সুবিধের জন্যে অনেক সময় একটা পরিচিতিপত্র পকেটে রাখতে হয়, একটা মামুলি পাসওয়ার্ড—শিল্পীর রণক্ষেত্রে ছাড়পত্রের কাজ করে। সঙ্গীতজ্ঞের লৌকিক ব্যাখ্যা সেখানে গৌণ হয়ে পড়ে। যেমন হয়েছিল সেবার কলকাতায়—অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে। আমীর খাঁ তখন যুবক, কলকাতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। সম্মেলন উদ্যোক্তারা কেউ চেনেন না। প্রায় চারদশক আগের কথা। বলা বাহুল্য এটা আমার শোনা কাহিনী। খাঁ সাহেবের নিজের মুখেই শোনা।

কলকাতা শহরে তখন আমীর খাঁকে চিনতেন এমন কলারসিকের সংখ্যা এক আঙুলে গোনা যায়। শুনেছেন মস্ত জলসা হচ্ছে ঐ পর্যন্ত। কে তাঁকে ডাকবে? কে চেনে? একে ওকে ধরলেন। কোন ফল হল না। কাকেই বা ধরবেন? রোজই যাচ্ছেন। দাঁড়িয়ে থাকেন সম্মেলন মণ্ডপের বাইরে। রাস্তায় পায়চারী করছেন। আফসোস করছে দেহমন। একবার, একটা সুযোগ যদি আসত; শেষকালে সব বাধা জোর করে ঠেলে ফেলে নিজেই দেখা করলেন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে: আমি আমীর খাঁ। দিল্লীতে বোম্বাইয়ে গান করেছি। এখন কলকাতায় থাকি। আপনাদের জলসায় গান করতে চাই।

: আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা জানি না। একটু বিস্তারিত পরিচয় না জানলে আমরা আপনাকে প্রেজেন্ট করতে পারব না। এটা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট গুণীদের সম্মেলন। শ্রোতারা সমঝদার রসিকসমাজ।

(ক্রমশঃ)

রুণা লায়লা

সন্ধ্যা সেন

বাংলা দেশের শিল্পী রুণা লায়লার ান শুনেছিলাম বছর দুই আগে ন্যাশনাল করারের ইলা পালচোধুরী মঞ্চে। মঞ্চে বং তার বাইরেও ও'কে শোনবার এবং বং দেখবার প্রশস্ত অবকাশ পাওয়া ায়েছিল। রুণা সুঠাম, তন্বী। কেশ-ুচ্ছ সুবিন্যস্ত কবরীবন্ধ। চালচলনে, ্থাবার্তায় অভিজাত মুসলমান পরিবারের ায়দাদুরস্ত স্বাতন্ত্র্য ছিল। ছিল সুদর্শনা ুন্দরীর সচেতন গাম্ভীর্যও।

লোকসংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু রলেন। সর্বদিক দিয়ে নিখুঁত আধুনিকা। ন্তু গান সুরু করতে না করতেই সরলা, বলা' পল্লীবালার বিরহের আর্তি, মিল-নর আনন্দ দুই-ই যেন স্বতঃস্ফূর্ত ছন্দে ংসারিত হল।

দু-একখানি লোকসংগীতের পরই রলেন আধুনিক আমি নদীর মতন শত ্থ ঘুরে তোমার জীবনে এসেছি' গানের াব্যসৌন্দর্য গাইবার ঢং সব মিলিয়ে—াকর্ষণীয়। কিন্তু বিশেষ করে মনে দাগ কেটেছিল ও'র গজল আংগিকের গানগুলি। শিক্ষিত কন্ঠের সুরের রং, প্রেমের আবেগ ন্দের দোলা, মেজাজ সপ্রতিভ ভংগি—থা আসর জমাবার জন্য যা যা দরকার সব ছুরই অফুরন্ত প্রাচুর্যে এই পর্যায়ে শল্পী যেন ঝলমলিয়ে উঠেছিলেন।

গানের শেষে কয়েক মুহূর্তের আলোচনায় রুণার সংগীতভাবনার সঙ্গেও রিচয় হল। গান ও'র কাছে পারিবারিক ম্পদের মতই। কীর্তন এবং নজরুল-গীতিতে ও'র মার বাংলাদেশে দারুণ নাম াক। চেতনা জাগবার আগেই রুণার কন্ঠে জেগেছে সুরেরজোয়ার। পাঁচ বছর বয়স থেকেই ষ্টেজে গাওয়া সুরু রেছি। অতএব ষ্টেজ ফ্রি পদবীতে াছে ওর ন্যায্য অধিকার। হজাত সুরেলা কন্ঠ, মার্জিত ও শ্রুতি-ন্ধ্বত হয়েছে যোগ্য গুরুর শিক্ষায়। াম্মারং কদরের কাছে উচ্চাংগ সংগীত শিখেছেন অল্প বয়সেই এবং ক্ল্যাসিকক্যাল ংগীতের চর্চাতেই ও'র আওয়াজ এমন ন্ডতামুক্ত।

ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের সংগে সংগে লোকসংগীত, পপ সংগীত, গজল ও ভাব-গীতির তালিম নিয়েছেন ওস্তাদ হবি-ুদ্দিন আহমেদের কাছে।

রুণা আগে পাকিস্তানে ছিলেন। ও'র বাবা ছিলেন সেখানের পদস্থ কর্ম-চারী। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশে এসেছেন। এর মধ্যেই ও'র তিন হাজার রেকর্ড হয়েছে। এবং প্রতিটি ডিস্কই জনপ্রিয়।

কলকাতার শিল্পীদের গান বিশেষ শোনেননি। যাঁদের গান শুনেছেন তাঁদের মধ্যে ও'র প্রিয় শিল্পী হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়। 'আপনার আদর্শ শিল্পী?'

প্রশ্নের সংগে সংগেই জবাব এল 'লতাজী'।

বাংলাদেশের রিফিউজী ক্যান্সার হস-পিট্যাল আরো অনেক কল্যাণমূলক কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য বহু অনুষ্ঠানে গাইতে গাইতেই রুণা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশের সংকটলগ্নে—বেতারে ভেসে আসা তাঁর মধুর কন্ঠের করুণ আবেদন, এ-পার বাংলায় মানুষের চিত্ত ছুঁয়েছে, রেডিও প্রোগ্রামে গংগা আমার মা, পদ্মা আমার মা'—গানটি এই সময় অনেকবার গেয়েছি। গাইবার সময় মনের ভেতরটা যে কিরকম তোলপাড় করতো বলে বোঝাতে পারব না।

'সবরকম গানের প্রতিই আমার শ্রদ্ধা আছে। কারণ বিভিন্ন ধারার আধারে গানের বিভিন্ন দিক রূপ নিয়েছে। তবু গজল ভাল লাগার কারণ—এর মধ্যে সকল রং ও রসের হৃদয় ছোঁওয়া রূপ। ক্ল্যাসি কাল গান হচ্ছে সকল গানের উৎস। এ-সংগীতের ভিত্তি না থাকলে কোন গানই ভাল করে গাওয়া যায় না। গজলে মূলতঃ শৃংগার রসেরই প্রাধান্য ত? গজল গানে এ ক্ল্যাসিক্যাল টাচ্ এমন একটা সফ্‌ট ডেলিকেসি সৃষ্টি করে যা শৃংগার রসের চটুলতাকে নিভিয়ে দিয়ে সুরের মধ্যে একটা করুণ বিষন্নতা আনে। আবার শেরের সংগে বোলবিস্তারের সুরের ওঠা-পড়া, তালফেরতার চমকে যে রঙিন আবেশ সৃষ্টি হয় তার মধুরতরা আমায় মুগ্ধ করে।'

গানের প্রসংগে বললেন রুণা লায়লা।

রুণার কন্ঠের পরিসর ও'র নিজস্ব গায়কীকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। উচ্চাঙ্গ সংগীত, ভক্তিমূলক ছাড়াও পাশ্চাত্য সংগীত, বিশেষ করে সোনাটা-টেকনিকে ওর দখলকে অস্বীকার করা যায় না। বোম্বে দিল্লীর অনেক অনুষ্ঠানে এসব গান গেয়ে শ্রোতাদের অকুন্ঠ প্রশংসাও আদায় করেছেন। এখন ওর মনটা সবরকম গানের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে।

সম্প্রতি গোলাম কাদেরের (পণ্ডিত) সংগীত পরিচালনায় গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে রুণা লায়লার গজলের একটি লং-প্লেয়িং ডিস্ক বেরিয়েছে। গোলাম কাদেরে ছাড়া অন্যান্য দুজন গীতিকার হলেন সুরাইয়া তবশ্যাম সেভা আখতার।
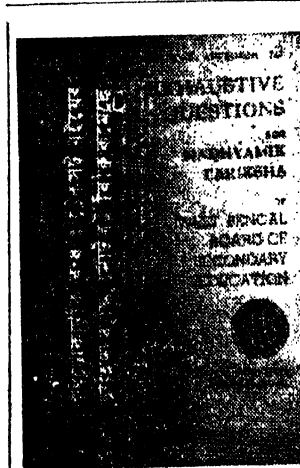
S	G	C	T	D	T	D	D	N	P	B	M	BHA	PHONETIC VALUE
𑀲	𑀕	𑀘	𑀢	𑀥	𑀝	𑀟	𑀤	𑀦	𑀧	𑀩	𑀫	𑀪	BRAHMI
Ш	Λ	⏚	(	A	Ψ	ℓ	D	‖	▯	◇	♉	H	INDUS SCRIPT
Djo	32	40	6	456	32	457	FEM 148	8	38	71	P426	342	MIC.Nos.

১নং চিত্র। তেরটি ব্রাহ্মীলিপির অক্ষরকে তাদের সৈন্ধব অক্ষরের সঙ্গে আকারগত মিল দেখে সহজেই বেছে নিতে পারা যায়। দুই লিপির মধ্যে এই কটি অক্ষর সেতু বন্ধনকারী।

15	|	॥	‴	Ψ	Y	Ψ	Y	^	)	y			/
16	78	29	16	174	40	362	454	40	148	L124 CDE			29
17	া			ি	ী	ু	ূ	ৃ	ে	ৈ	ো	ৌ	ং
18	ा			ि	ी	ु	ू	ृ	े	ै	ो	ौ	ं
19	f			f	f	t	t		ナ		ǂ		t·

২নং চিত্র। উপরের সারিতে সিন্ধুলিপির মাত্রাগুলি (অ্যাকসেন্টস) দেখান হয়েছে। নিম্নের দুই সারিতে বাংলা ও হিন্দী মাত্রার তুলনা করা হয়েছে। তুলনায় ব্রাহ্মীলিপির মাত্রা (সর্বনিম্নের সারিতে) সিন্ধু ও প্রাদেশিক লিপির মাত্রাগুলির মধ্যে রূপ বৈষম্য হেতু উভয়ের মধ্যে জন্মগত সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে, সৈন্ধব মাত্রার সঙ্গে প্রাদেশিক মাত্রার আকারগত মিল আশ্চর্যজনক।

ভারতবর্ষে আমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছি। মূর্খ শব্দের আভিধানিক অর্থের চেয়ে এর প্রচলিত বিশেষ করে হিন্দী 'আনপড়' বলতে যা বোঝায় সেই অর্থ বোঝাতে চাই। অনেকদিন আগে আমাকে কিছুকাল রাজস্থানের বুন্দী শহরে থাকতে হয়েছিল। প্রায়ই দেখতাম 'আনপড়' রাজস্থানী মেয়েরা সাজ-গোজ করে দলে দলে গান গেয়ে চলেছে টানা টানা সুরে। ব্রত পার্বন বিয়েতে এটিই রাজস্থানের রীতি। সে গান, সে সুর পরম্পরাগত। মা-মাসীদের মুখে গাওয়া গান মেয়েরা কানে শুনে শিখে নেয় ছেলেবেলাতেই। কেউ লিখেও দেয়নি, কেউ পড়েও শেখেনি। আজ চার বছর আমি ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিনপুর গ্রামে বাস করছি। প্রায়ই দেখি 'আনপড়' আদিবাসী সাঁওতাল মেয়েরা পূজাপার্বণে দল বেঁধে টানাটানা সুরে গান গেয়ে চলেছে। নিস্তব্ধ শালবনের রাস্তায় আদিম মানুষের আদিম গানের সুর অতীত যুগের বার্তা বয়ে আনে। মনে পড়ে কবির লেখা গানের কলি 'প্রথম সাম রব তব বনভবনে'। গভীর অরণ্যের পরিবেশে যেন আদিবাসী গানের সুর বৈদিক যুগের আনন্দ মুখর মন্ত্রের আসর বসায়। কিন্তু এ আনন্দ অল্পক্ষণই প্রাণে থাকে। চমকে উঠি এই ভেবে—বেদগানও তো 'আনপড়' ব্রাহ্মণদের রচনা! অন্ততঃ ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা তাই তো বলেন। বেদ, উপনিষদ সবই আনপড় ঋষিদের কাণ্ড-কারখানা। বুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে না ছিল অক্ষর না ছিল বর্ণমালা। যার মাথা নেই সে টুপি পরবে কি করে? মোক্ষম প্রশ্ন! বৌদ্ধ শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে বুদ্ধদেব ছেলেবেলায় লেখাপড়া শিখেছিলেন। অক্ষর-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত প্রবর ডিরিঙ্গার তাঁর 'অ্যালফাবেট' বইখানি নতুন করে দু খণ্ডে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর প্রাচীন-অর্বাচীন সব রকম বর্ণমালারই হিসাব-নিকাশ এই বইয়ে রয়েছে। ভারতীয় লিপির এই হল শেষ জমা-খরচ। তাঁর সমীক্ষার ফল হল যে ভারতবাসী বুদ্ধের পূর্বে ছিল 'আনপড়'। এমন কি ভারতীয় ব্যাকরণবিদ পাণিনিও ছিলেন আনপড়! তাঁর রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণে যে 'লিপি' শব্দের উল্লেখ রয়েছে সেটি প্রাচীন পারসীক ভাষা থেকে নেওয়া। কাজেই এই প্রতিভাবান ব্যাকরণবিদ নিশ্চয়ই মুখে মুখে ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়েছিলেন ছাত্রদের। তাঁর ছাত্রেরা আবার মুখে মুখে পাণিনির ব্যাকরণের শ্লোক তাঁদের ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছিল। এমনি করেই 'আনপড়েরা' ভারতবর্ষে পণ্ডিত হয়ে উঠত! অধ্যাপক অ্যালেনের এই মত ডিরিঙ্গার সাহেব বজায় রেখেছেন। অ্যালেন সাহেবের 'ফোনেটিকস ইন অ্যানসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' বইটি সবাইকে পড়ে দেখতে বলি। 'আনপড়' হয়ে গান রচনা করা যায়, ব্যাকরণ রচনা করা যায় কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি দরকার? 'আনপড়ের' ব্যাকরণ রচনার কি প্রয়োজন? পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আর কোন আনপড় পণ্ডিত ব্যাকরণ রচনা করেছেন কি? গ্রীকরা নাকি দশম-নবম খৃষ্ট পূর্ব শতাব্দে ফিনিসিওদের কাছ থেকে ধার করে বর্ণ পরিচয়ে হাতে খড়ি দেয়। কিন্তু হাজার বছরের চেষ্টায় তারা যে ব্যাকরণ রচনা করেছিল অধ্যাপক অ্যালেনের মতে, তা নাকি ভারতীয় ব্যাকরণের তুলনায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ব্যাপার। আর ইংরেজরা কত দিন থেকে লেখাপড়া করছে জানি না তবে ব্যাকরণ রচনায় হাত দিয়েছে মাত্র তিন-চার শ বছর আগে। আর ভারতে পাণিনির পণ্ডিতের নেই। তাঁর হাতে কোন পাথুরে
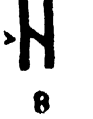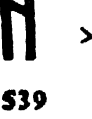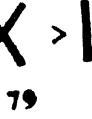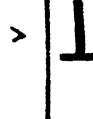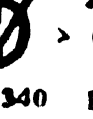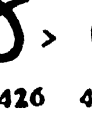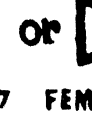
সুধাংশুকুমার রায়

পূর্ববর্তী আঠারজন বৈয়াকরণিকের নাম আমরা পাই। পাণিনি আনপড় হলে তাঁরাও 'আনপড়' ছিলেন।

গ্রীকরা ধার করে লেখাপড়া শিখে তবে ব্যাকরণ লিখেছিল। আমরা ভারতীয়রা লেখাপড়া না শিখেই ব্যাকরণ রচনা করে ফেলেছিলাম। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক অ্যালেন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষর-তত্ত্ববিদ অধ্যাপক ডিরিঙ্গার এ দুজন পণ্ডিতের মতামত কেটে সত্যি কথা লেখার ক্ষমতা কোন ভারতীয় প্রমাণও নেই। যদি বা একটু-আধটু প্রমাণ ছিল ডিরিঙ্গার সাহেব তাঁর রায়ে তা নাকোচ করে দিয়েছেন। এর পরেও যদি কোন ভারতীয় কথা বলতে যায় তবে তার জন্যে ছোট একটা দাওয়াই ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা কলমের ডগায় রেখে দিয়েছেন। বেশী কথা নয়েই—এমন কি বলতে পারে এই আশঙ্কায় এক গালি খাইয়ে দেন! ব্যস—আর নয় এবার মুখচুন করে ঘরের ছেলে ঘরে যাও। শব্দটি হল 'পেট্রিয়টিক'। দিয়ে বিল ক্লাস চাই ঔষধটির নাম দিতে চাই 'অ্যান্টি-পেট্রিয়টিক পিল।' ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখতে গেলে এই ওষুধটির ব্যবহার চাই-ই চাই।

আমি কিন্তু পাঠককে সেই পুরানো রূপকথার রাজপুত্রের গল্পটি মনে করিয়ে দিতে চাই। রাক্ষসেরা বন্দী রাজকুমারকে বলেছিল 'প্রাসাদের সবদিকে যাবে কিন্তু দক্ষিণ দিকে যাবে না'। আর দক্ষিণে গিয়েই অবাধ্য রাজকুমার পেয়েছিলেন ঘুমন্ত অপূর্ব সুন্দরী রাজকুমারীর দেখা। একজন স্কলার বা গবেষক 'পেট্রিয়টিক' কি না তা বড় কথা নয় তিনি সত্যনিষ্ঠ গবেষক কিনা আমাদের তা বিচার করে দেখতে হবে। যাক না তিনি দক্ষিণ দিকে।

ডিরিঙ্গার সাহেব ভাল করেই জানেন আমরা কি বলতে পারি। সিন্ধুলিপি কি

ALPHABETIC STAGES	TECHNICAL DEVELOPMENTS	BRAHMI	TRADITIONAL	PHONE VALUE
–	4 · 17 · 81 · 233 >	?	গ গ	G
>	Pl.XII-17 > 321 > 404 > FEM 33 >	Λ	ঘ ঘ	G̱
102 >	FEM 44 > 8 > 539 > 179 > 8 >	⊥	ন ন	N
406	> CDE.Pl.LI-9 > 340 > P. 426 > 457 or FEM148 >	D	– ঢ	Ḏ
–	106 >	?	ণ ণ	Ṇ

: চিত্র: প্রাদেশিক 'গ' সিন্ধুলিপি প্রসূত। ব্রাহ্মী 'গ' সৈন্ধব চৌকি গ থেকে আহৃত। প্রাদেশিক 'ঘ' ঐ চৌকি—গ থেকে ত। প্রথম দুটি ঘরে সিন্ধু অক্ষরের ক্রমবিকাশ ও শেষ দুটি ঘরে ব্রাহ্মী ও প্রাদেশিক অক্ষরের জন্মগত সম্পর্ক যে তারই যুক্ত তা দেখান হল।

র লিপি নয়? সে লিপি কি সাড়ে র বছরের প্রাচীন নয়? আচার্য সরকার ও অধ্যাপক ল্যাংডন করেন ব্রাহ্মীলিপি সিন্ধুলিপি তবে কেমন করে ভারতীয়রা হবে? এবার ডিরিঞ্জার সাহেবের শুনুন। প্রথমেই একটা 'অ্যান্টি-টিক পিল'। তারপরই বলছেন প কেতা-দুরস্ত চিত্রাক্ষর।' অর্থাৎ খার সঙ্গে শব্দ বা ভাষার কোন । অক্ষরগুলি ইঙ্গিতবহ এবং কিন্তু পাঠযোগ্য নয়। ডিরিঞ্জার বা পিকটোগ্রাফিক লেখার যে দিয়েছেন (আলফাবেট—১ম খণ্ড তা থেকেই জানা যায় এ ধরনের প্রচলন ছিল প্রাগৈতিহাসিক মধ্যে। আধুনিক ট্রাইব বা আদি-মধ্যেও এ লেখার প্রচলন এখনও রা তাদের ছবি দিয়ে মনের ভাব তে পারে কিন্তু প্রাণের কথা লিখে করতে পারে না। যেমন ইঞ্জিন সিগন্যাল আপ কি ডাউন দেখে রে সে গাড়ি চালাবে কি থামাবে। সিগন্যাল হল ড্রাইভারের চিত্রাক্ষর। কেরা যেমন নানা অঙ্গ-ভঙ্গী করে মনের ভাব প্রকাশ করে—চিত্রাক্ষরও তাই করে। সেকথা বলতে পারে না। চিত্রাক্ষর চিত্রকরের রচিত চিত্রলিপি, সে লেখকের লেখা পত্র নয়—আদিম আনপড় চিত্রকরদের কলা-কৌশল। আদি ঐতিহাসিক তাম্র-যুগের সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্ট লিপি কি করে আদিবাসী ট্রাইব্যালদের চিত্রলিপির সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেললেন ডিরিঞ্জার? বাদ দিতে হবে হুইলারের সুচিন্তিত মত-বাদকে। তাই লিখছেন 'হুইলারের মতে সিন্ধুলিপিতে বহু মাত্রা চিহ্ন থাকায় তিনি মনে করেন যে এই লিপি ধ্বনি সমৃদ্ধ। অর্থাৎ অক্ষরগুলি যদি ধ্বন্যাত্মক হয় তবে ধরে নিতে হবে যে লেখার পদ্ধতিও ঘোষণীয় (ফোনেটিক) কিন্তু সিন্ধুলিপি কি ফোনেটিক? আমার মনে হয় তা নয়। তবে কি? ডিরিঞ্জার আগেই বলে রেখেছেন—চিত্রলিপি, সেই আনপড়দের চিত্র-বিচিত্র ভাব-ভঙ্গী।

তবে কেন মাত্রা (অ্যাকসেন্ট) ব্যবহার করা হয়েছে সিন্ধুলিপিতে? হুইলার ঠিকই বলেছেন—'এ হল ধ্বনি সমৃদ্ধির লক্ষণ'। ক, কা, কি, কু ইত্যাদি একই ধ্বনির পরিবর্তিত রূপ। ধ্বনি থাকলেই তার পরিবর্তন হবেই। ভারতীয়। পদ্ধতিতে মাত্রাই সে পরিবর্তনের হিসাবনবিস। ধ্বনি আছে বলেই মাত্রা আছে। মাত্রা সিন্ধু-লিপিতে আছে বলেই সেখানে ধ্বনি আছে। মাত্রার সংখ্যা বার। এই এক ডজন মাত্রা চিহ্ন দিয়ে সিন্ধুবাসীরা কি করতে চেয়ে-ছিল? নিশ্চয়ই ধ্বনির পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছে। আর তা যদি না করে থাকে তবে মাত্রাগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে সংগত যুক্তি এবং অক্ষরের সঙ্গে মাত্রার সম্বন্ধ—এ দুটির অবতারণা ও নির্ণয় ডিরিঞ্জার সাহেবকে করে দেখাতে হবে। 'দিস সিমস আনলাইকলি' বলে হুইলারকে নরবাদ করা যাবে না।

যাই হোক 'আনপড়' ভারতীয়দের লেখাপড়া শিখতে সময় লেগেছিল নাকি অনেক। গ্রীকরা লেখাপড়া শিখেছিল পরের কাছে ধার করে নবম-দশম খৃষ্টপূর্ব শতাব্দে আর ভারতীয়রা ধার করে লেখাপড়া শেখে ষষ্ঠ-তৃতীয় খৃষ্ট পূর্ব শতাব্দে। ডিরিঞ্জার সাহেব ব্রাহ্মীলিপির পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। আগে একটা 'অ্যান্টি-স্পেটীরিয়টিক পিল' খান। তারপর শুনুন—তিয়াত্তর বছরেরও আগে আর. এন. কাস্ট রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক সোসাইটির পত্রিকায় ভারতীয় লিপির জন্ম-

বৃত্তান্তের উপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই থেকে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এই সমস্যার ওপর হাজার হাজার প্রবন্ধ ও বই লেখাও হয়েছে। তবুও আমি ব্রাহ্মীলিপির জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এখনও কাস্টের মতবাদেই বিশ্বাসী। তাঁর শেষ অভিমত দুটি হলঃ (১) ভারতীয় লিপি (ব্রাহ্মী) কোন ক্রমেই ভারতীয়দের দ্বারা স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হয়নি—যাই হোক এ হোল বিস্ময়কর এক ঋণ যা এরা অন্যদের কাছ থেকে পেয়েছে। (২) বিশেষ করে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিগুলি শুদ্ধ বর্ণমালার মাধ্যমে প্রকাশ করার কৌশল ভারতীয়রা পশ্চিম এশিয়া থেকে অবিসংবাদিতভাবে গ্রহণ করেছে।' (অ্যালফাবেট পৃ ২৬৩)। অনপড় ভারতীয়দের এই হোল গতি-মুক্তি!'

ভারতীয়রা লেখাপড়া শিখবে কি করে? 'প্রাচীন ভারতীয় দেব-দেবীর মধ্যে তো কোন লেখাপড়ার দেবতা ছিল না: সরস্বতী? সে হোল জ্ঞান বিদ্যা ও বাগ্মিতার দেবী।' (অ্যালফাবেট পৃ ২৫৮)। তবে কি গণেশ লেখাপড়ার দেবতা নন? ব্যাস কি গণেশের কাছে মহাভারত লেখাতে যাননি? হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে গণেশ সবচেয়ে প্রাচীন—কারণ তিনি রূপে থেরিওমরফিক—অন্তত প্রাচীনতমদের মধ্যে একজন। তিনি নৃসিংহ অবতারের সমসাময়িক। হয়তো আরও প্রাচীন—তার পুজো তাই অগ্রাধিকার পায়। থেরিওমরফিক বা পশু-মানবীয় দেবতার বয়স কতো? প্রাচীন মিশরে খৃষ্টপূর্ব ৩১০০ শতাব্দী থেকেই তারা পূজিত। গণেশ গণ-দেবতা নন গণনার দেবতা (গড অব কাউন্টিং)। কেবল মাত্র গণনার নয় লেখারও দেবতা। গণেশের মধ্যে অপার রহস্য লুকোনো রয়েছে। যেদিন আমরা গণেশকে চিনতে পারব জানতে পারব সেইদিন আমরা ডিরিঙ্গারের হাত থেকে মুক্তি পাব।

বিশ্ব-বর্ণমালার মেলায় ভারত হল পরাশ্রয়ী অধমর্ণ! সেমিটিক অক্ষর ও লেখার ধরন-ধারন থেকেই ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব! আর তা যদি না হয় তবে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে সিন্ধুলিপির সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির কেবলমাত্র সাদৃশ্যই বর্তমান নয় উভয় লিপির অক্ষরগুলির মধ্যে ধ্বনিসাম্যও বর্তমান। রূপ সাদৃশ্য ধ্বনিগত মিলের পরিপোষক হওয়া চাই। তবেই প্রমাণ হবে ব্রাহ্মীলিপি সিন্ধুলিপি জাত। [illegible] না হোলেই আমরা বলতে পারব যে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা অনপড় ছিলেন না বা পাণিনি লেখাপড়া জানতেন। প্রমাণ করে দেখাতে হবে সিন্ধুলিপি চিত্রাক্ষর-মালা নয় বর্ণমালা। অন্তত তার মধ্যে বহু এক-ধ্বনি বিশিষ্ট (ইউনিলিটারাল অ্যালফাবেট) অক্ষর বর্তমান। আর সেই অক্ষরগুলিই যে ব্রাহ্মী বর্ণমালার জনক (জেনেটিক রিলেশনশিপ) তা স্পষ্ট করে প্রদর্শন করা প্রয়োজন হবে। কিন্তু বিপদ ত্তোম মাত্রা নিয়ে। সিন্ধুলিপির মাত্রাগুলির রূপরেখা বাংলা হিন্দী গুজরাটি ইত্যাদি অন্যান্য প্রাদেশিক বর্ণমালার মতন। কিন্তু ব্রাহ্মী মাত্রার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। ব্রাহ্মীর মাত্রা মাত্র একটি তার অবস্থান ভেদে ধ্বনি ভেদ। ঘড়ির কাঁটা উপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে সময় জানায় তেমনি ব্রাহ্মী মাত্রা উপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে স্বর-সংযোগ ঘটায়। বাংলা দাঁড়ির মত তার রূপ; সে রূপে প্রাচীন কাজে অর্বাচীন। তাকে সিন্ধুলিপিতে দেখতে পাই কিন্তু সেখানে তার কাজ সীমাবদ্ধ। অবস্থানও একই। ব্রাহ্মীতে তার অবস্থান প্রয়োজন অনুসারী। অন্যদিকে সিন্ধুলিপির মাত্রাগুলির প্রত্যেকটিই বিশিষ্ট রূপের অধিকারী এবং অনুমান করা যায় যে এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তারা বিশিষ্ট গুণেরও অধিকারী। তা হোলে এই বৈসাদৃশ্যের ব্যাখ্যা কি করে করা যাবে? ব্রাহ্মীলিপি যে সিন্ধুলিপি প্রসূত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যাবে।

এবার দেখা যাক ব্রাহ্মীলিপির অক্ষরগুলির সঙ্গে সিন্ধুলিপির অক্ষরগুলির কোন রূপ বা আকারগত মিল আছে কিনা। ডিরিঙ্গার সাহেব বলছেন—'কেবলমাত্র আকারগত সাদৃশ্য থাকলেও হবে না প্রতিটি অক্ষরের জন্মগত সম্পর্ক ও ধ্বনিগত মিলও প্রমাণ করে দেখাতে হবে।' (অ্যালফাবেট পৃ ২৫৮)। যাই [illegible]ক বার বা তেরটি অক্ষরকে তাদের আকারগত মিল দেখে বেছে নিতে পারি। কিন্তু বাকী ব্রাহ্মী অক্ষরগুলির কি ব্যাখ্যা হবে? সিন্ধুলিপির সঙ্গে তাদের মেলান সম্ভব নয়। এই [illegible] ধরেই আমাদের অনুসন্ধান হতে হবে। যেমন করে হোক এই কটি অক্ষরের জন্ম পত্রিকা আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে: দেখতে হবে যে উভয় লিপির এই বার-তেরটি অক্ষর জন্মগত কারণেই আকারগত সাম্য ও ধ্বনিগত মিলের অধিকারী হয়েছে।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বৃটিশ মিউজিয়ামের অফিস ঘরে বসে বিখ্যাত সিন্ধুলিপি বিশেষজ্ঞ সি জে গ্যাড মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম। তখন তিনি দুঃখ করে আমায় বলেছিলেন—'যদি আমরা অন্তত এক ডজন (এবাউট এ ডাজন অব সাইনস) অক্ষরের হদিস পেতাম তবে হয়তো এতদিন সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হোত।' তাই ব্রাহ্মীলিপির এই এক ডজন অক্ষর সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে তেমনি ব্রাহ্মীলিপির জন্মের জাতীয় (জেনেটিক) ইতিহাসও উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবে। তার আগে দুটি বিষয়ের কৈফিয়ৎ দিতে হবেঃ (১) ব্রাহ্মীর মাত্রা একটি কেন? তার প্রয়োগ ভঙ্গী চক্রাবর্তাশ্রয়ী কেন? সিন্ধুলিপির মাত্রা বর্তমান প্রাদেশিক লিপিগুলির মাত্রা সংখ্যার সমান ও রূপে বা আকারে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ এবং এবং সাদৃশ্য যুক্ত কেন? এই দুই লিপির মাত্রাগুলির প্রয়োগবিধি একই রকম কেন? ব্রাহ্মী-মাত্রা ও সিন্ধু-মাত্রার মধ্যে যে অনৈক্য তা কি উভয় লিপির জন্মগত বিভিন্নতা [illegible]? (২) মাত্র বার বা তেরটি অক্ষর ছাড়া উভয় লিপির মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না কেন? যদি ব্রাহ্মী [illegible] লিপি হয় তবে সে লিপির রীতি চতুর্থ

খৃষ্টপূর্বাব্দের আগেও ভারতবর্ষের [illegible] কোন স্থানে বা প্রদেশে প্রচলিত [illegible] খনন কার্যের ফলে নিশ্চয়ই আম[illegible] কিছু নিদর্শন পেতাম। কিন্তু আমরা ঠিক তার উল্টোটাই। পুরাতত্ত্ব [illegible] শ্রীবি বি লাল একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছে[illegible] সিন্ধুলিপি সিন্ধু সভ্যতার অব[illegible] পরেও প্রচলিত ছিল। (অ্যানসিয়েন্ট ই[illegible] নং ১৬ ১৯৬০)। এসব প্রশ্নের [illegible] উত্তরের ওপরই নির্ভর করবে ভারত[illegible] দুই প্রাচীন লিপির যোগাযোগ স[illegible] অন্য দিকে কাস্ট ও ডিরিঙ্গার যে প[illegible] এশিয়ার সেমিটিক লিপির সঙ্গে ব্র[illegible] লিপির দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক দেখতে[illegible] তারও নিরসন ঘটবে।

ব্রাহ্মীলিপিকে আমি বৌদ্ধ লিপ[illegible] মনে করি। অধ্যাপক বাসাম ঠিকই বলে[illegible] যে 'ব্রাহ্মীলিপির ক্রমবিকাশ অংশতঃ [illegible] প্রণোদিত।' (দি ওয়ান্ডার দ্যাট [illegible] ইন্ডিয়া পৃ ৩৯৬)। বুদ্ধ চেয়েছিলেন [illegible] প্রচারিত ধর্ম সহজ, সরল ভাষায় মান[illegible] বোঝাতে। তিনি ছেলেবেলায় লেখ[illegible] শিখেছিলেন। তখন ভারতীয় [illegible] পদ্ধতির জটিলতার সঙ্গে [illegible] নিশ্চয়ই পরিচয় হয়ে থাকবে। পরব[illegible] লিখন পদ্ধতিকে তিনিই হয়তো সহজ [illegible] রূপ দেবার জন্য তাঁর শিষ্যদের উ[illegible] দিয়েছিলেন। অশোকের ব্রাহ্মীলিপি [illegible] উপদেশেরই পরিণাম। বুদ্ধ-পূর্ব লেখ[illegible] কিছু সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে [illegible] মনুরের মৃৎ পাত্রে উৎকীর্ণ লিপি চন্দ্র[illegible] গড়ের সীলমোহরের লিপি পাণ্ডুর[illegible] ঢিবির সীলমোহরের ও মৃৎ পাত্রে উৎ[illegible] লিপি গৌহাটিতে পাওয়া মৃৎ পাত্রে উৎ[illegible] লিপি সে সবই সিন্ধুলিপির কালপ্রব[illegible] নিদর্শন। কালপ্রবাহিত সিন্ধুলিপির অ[illegible] গুলি ক্রমশ অনেকটাই সরল হয়ে উঠে[illegible] মৌর্য যুগের রাজ-লেখকেরা অ[illegible] বুদ্ধের সঙ্গে তাদের আরও সরল ও [illegible] বোধগম্য এবং লেখ্য লিপিতে প[illegible] করেছিল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে য[illegible] উপদেশ ও অশোকের আদেশ ও আগ্রহ [illegible] ক্ষেত্রে যে রাজকীয় লেখকদের উপর [illegible] বিস্তার করেছিল তাতে কোন সন্দেহ [illegible] পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিগ্রহণ যে [illegible] খানি নিবিষ্ট চিত্তে করা হয়েছিল তা [illegible] মাত্র উদাহরণ দিয়েই বোঝান যায়। [illegible] বাংলা 'ক' অক্ষরকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে [illegible] ক-এর আঁকড়া বিপরীত মুখী করে [illegible] তাকে 'প' বা 'ত' বলে পড়তে শেখান [illegible] তবে ধরে নিতে হবে যে 'প' বা '[illegible] উৎপাদন উদ্দেশ্যমূলক বাসামের [illegible] 'ডেলিবারেট'। ব্রাহ্মীতে 'ল'-কে উল্টো [illegible] লিখে 'হ' করা হয়েছে। এও হতে পা[illegible] 'হ'-কে 'ল' করা হয়েছে। যাই হোক না [illegible] সিন্ধুলিপিতে খোঁজ করলে আমরা [illegible] যে কোন একটির প্রাচীন চিত্র-রূপ ([illegible] রিয়াল) আবিষ্কার করতে পারব [illegible] অন্যটির হদিস মিলবে না। একটির [illegible] রূপ তার জন্মের ভাষাগত ধ্বনিম[illegible] সন্ধানও দেবে কিন্তু অন্যটির [illegible] পরিস্থিতির কারণে এবং ঐ অক্ষ[illegible]

স্টুডিওর জন্যে চাই নিরিবিলি

রঞ্জন মজুমদার

স্টুডিওর মিনিয়েচার প্রোজেকশান রুম থেকে ছবির ট্রায়াল শো দেখে বেরিয়ে এসে একজন দর্শক পরিচালককে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা মশাই, লাস্ট সিনে সাইকেল রিকসার হর্ণ বাজল কেন ?

পরিচালকের মুখ গম্ভীর হল। একটু চুপ করে থেকে বললেন—স্টুডিওর পাশ দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা স্টেট বাস, লরি, ট্যাকসি, টেম্পো, সাইকেল রিকসা যাতায়াত করলেই এটা হবে। কারও ক্ষমতা নেই ওই হাই ফ্রিকোয়েন্সী সাউন্ড বাদ দিয়ে ডায়লগ রেকর্ড করে। ক্রমে ক্রমে অবস্থা যা দাঁড়াচ্ছে তাতে আর বেশীদিন হয়ত টালীগঞ্জের স্টুডিওতে সাউন্ড নিয়ে শুটিং করা যাবে না।

এই লেখাটা লিখছি, কারণ বিষয়টি খুব জরুরী। এই সমস্যা নিয়ে শুধু আলাপ আলোচনা হয়, কিন্তু প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা হচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতে যে হবে—এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। প্রতিদিনই স্টুডিওপাড়ার পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে। স্টুডিওর গা-ঘেঁসে একটার পর একটা বাড়ী উঠছে। লোকসংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে। আর তার সঙ্গে তাল দিয়ে বাড়ছে ইস্কুল কলেজ আর বাজার। সিনেমার স্টুডিওর পক্ষে এধরনের পরিবেশ আদৌ কাম্য নয়।

কলকাতার রাস্তাঘাটে শিল্পীদের নিয়ে শুটিং করা আজকাল অসম্ভব ব্যাপার। ফলে স্টুডিওর মধ্যে ঘর বাড়ী রাস্তা তৈরী করে চিত্রগ্রহণ করে কোনগতিকে চিত্রনাট্য রক্ষা করা হচ্ছে। কিন্তু নির্বিঘ্নে হচ্ছে কি ? কজন আর নিষেধ মানছে ? অথচ বছরদশেক আগে এই জায়গাতেই চমৎকার শুটিং হয়েছে।

সে-সব দিন উবে গেছে। লোকে চিনিয়ে না দিলে স্টুডিও খুঁজে বের করা দায়। চারিদিকের এগিয়ে আসা শহরের বাড়ীঘরের মধ্যে স্টুডিও যেন ডুব সাঁতার দিচ্ছে।

জনবসতির চাপে স্টুডিওগুলি যে এক-দিন বিপন্ন হয়ে পড়বে—স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এটা বহু আগে অনুমান করেছিলেন। তিনিই প্রথম মানুষ—ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীকে ডেকে বলেছিলেন, সামনে এমন একটা দিন আসছে যে তোমরা হয়ত টালীগঞ্জে টিকতে পারবে না। তার-চেয়ে কল্যাণীতে চল। কল্যাণী চমৎকার ফাঁকা জায়গা। তিনি তখন কল্যাণী উপ-নগরী গড়ছেন। প্ল্যান করে গড়ে তোলা হচ্ছে। ওখানে তোমাদের স্টুডিও করবার জমি দিচ্ছি, টাকা যা লাগে দিচ্ছি, সরকারী সাহায্য দিচ্ছি, ওখানে গিয়ে তোমরা একটা 'ফিল্ম সিটি' গড়ে তোল। ডাঃ রায় ভেবে-ছিলেন, এরা যেতে রাজী হলে কল্যাণীতে ফিল্মের আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ানদের জন্যে একটা স্বতন্ত্র কলোনী গড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রী ডাঃ রায়ের প্রস্তাবে রাজী হয়নি। কলকাতা থেকে হঠাৎ অতদূরে সরে গিয়ে কাজকর্ম করার তখন অনেক প্র্যাকটিকাল অসুবিধা ছিল ফিল্ম ইন্ডা-স্ট্রীর। কলকাতা সমস্ত পূর্ব ভারতের সিনেমা ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। সুতরাং এখান থেকে সরে গেলে ব্যবসা বিপন্ন হতে পারে—তখন অনেকেরই এই ধারণা হয়েছিল। আর আর্টিস্টরা কেউ কল্যাণীতে যেতে রাজী হননি। টেকনিশিয়ানরা আপত্তি করেছিলেন।

ফলে সেদিন ডাঃ রায় যে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, আজ হুবহু তাই ঘটতে চলেছে। টালীগঞ্জের স্টুডিওগুলি ক্রমশঃই পাড়ার চরিত্র নিচ্ছে। আর পাড়া হলে যা হয়—অর্থাৎ বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ আর উপনয়ন লেগেই আছে। ফলে মাইকের উৎপাত এখন নিত্যদিনের ঘটনা। বারোয়ারী পুজো মণ্ডপে মাইক বাজবেই। ঢাক বাজবেই। ফলে, ফ্লোরে চালু ছবির শুটিং বিঘ্নিত হচ্ছে। টেক্ আটকে যাচ্ছে। তখন স্টুডিও কর্তৃপক্ষ লোক পাঠাচ্ছেন মাইক বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে। অনুরোধে কোথাও কাজ হচ্ছে, কোথাও বা হচ্ছে না। এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে এমন যে অনেক সময় ইনডোর শুটিং করতেই কালঘাম ছুটে যাচ্ছে।

স্মরণ থাকুক যে একদা কলকাতার দক্ষিণ মিলিয়ে মোট চৌদ্দটি কর্ম ফিল্ম স্টুডিও ছিল। হ্রাস পেতে এখন তা মাত্র ছটিতে এসে ঠেকেছে। কলকাতায় এক অরোরা ছাড়া বাকি পাঁচটি স্টুডিওই টালীগঞ্জে। যার এখন সরকারী অধিগ্রহণে, অন্য বেসরকারী মালিকানায়। রাধা স্টুডিওতে সরকার অস্থায়ীভাবে কলকা টেলিভিশন সেন্টার করেছেন, কথা গলফ্ ক্লাবে স্থায়ী স্টুডিওতে উঠে গেলে 'রাধা' আরেকটি সরকারী স্টুডিও হিসাবে ইন্ডাস্ট্রীর ব্যবহারে

টালীগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছা কোথাও পাতাল রেলের স্টেশন তৈরী হবে এই ঘোষণা টালীগঞ্জের স্টুডিওর অস্তিত্ব রক্ষার ভিৎ কাঁপিয়ে দিয়েছে বলে হচ্ছে। প্রচুর লোক এখন এই এলা বাড়ী তোলবার জন্যে চেষ্টা করছেন। পরি বর্তন দ্রুত হচ্ছে। যখন রেল চলতে আরম্ভ করবে তখন টালীগঞ্জের সংখ্যা যে চার গুণ বেড়ে যাবে বাহুল্য। আর সেই অবস্থার চাপ স্টুডিওগুলি সামলে উঠতে পারবে ?

আমার মনে হয় আর দেরী না এখুনই স্টুডিওগুলিকে কলকাতার অপেক্ষাকৃত ফাঁকা অঞ্চলে সরিয়ে যাওয়া দরকার। ধরা যাক, ঠাকুরপুর ছাড়িয়ে ডায়মন্ডহারবার রোড দিয়ে দু পাশে এখনও এমন অনেক জায়গা পড়বে যেখানে স্টুডিওগুলির পুনর্বা বাস্তবঅর্থে সম্ভবপর হতেই পারে। যেখানেই হোক— আসলে জায়গাটি হওয়া চাই কলকাতারই অদূরে—যাতায়া যথেষ্ট সুযোগ সুবিধাসহ ফিল্ম উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে। ওসব ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। চওড়া রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বড় ওইসব অঞ্চল কোনদিনই ঘিঞ্জি হয়ে না। আর এই রকমই একটা জায়গায় স্বয়ংসম্পূর্ণ 'ফিল্ম নগরী' গড়ে সম্ভবপর।

শ্যামতেরে কিতনে ছবিতে শচীন ও সারিকা

থাকল যুগের দর্শকের গোড়া থেকেই। বিশেষ কারণগুলি হল—সামাজিক মূল্যবোধের অভাব, রুচি ও মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তন, বাংলা ছবির আর্থিক দৈন্যদশা এবং হিন্দী ছবির দর্শক মনোরঞ্জনের নতুন নতুন উপকরণ নিয়ে উপস্থিতি বাঙালী দর্শকদের বিভ্রান্ত করল।

বাংলা ছবিতে অবশ্য এ সময়কালে সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন ঋত্বিক ঘটক তপন সিংহ ও তরুণ মজুমদারের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এঁদের ছবির প্রতি বাঙালী দর্শকের আগ্রহ উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু এঁরা বছরে একটির বেশী ছবি করেন না। অর্থাৎ বছরে পাঁচটি ছবি নিয়ে তো বাংলা ছবি বাঁচতে পারে না? অন্য ছবিগুলি দর্শককে মুগ্ধ করতে পারছিল না, আর্থিক দৈন্যদশা অনিবার্যভাবে বাংলা ছবিকে গ্রাস করল। ছবির উৎপাদনও কমে এল। অন্য দিকে রুচি ও চিন্তাধারার পরিবর্তন—বড় সমস্যারূপে দেখা দিল। হিন্দী ছবির নির্মাতারা এই সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং হিন্দী ছবির নতুন ধরনের 'ককটেল' বাজারে আমদানী করলেন। রাজকাপুর, দিলীপকুমার, দেব আনন্দ—এই তিন নায়কের স্থলে নতুন নতুন মুখ হিন্দী ছবির আসরে উপস্থিত হতে লাগলেন আর ছবির নির্মাতারাও এইসব নতুনদের নিয়ে ছবিকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন রকম উত্তেজক ফরমুলা ছবিতে আমদানী করলেন। এই পর্যায়ের যে ছবিটি সর্বপ্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—তার নাম 'জংলী'। এর নায়ক শাম্মী কাপুর দর্শকদের কাছে নতুন এক ইমেজ নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং চটুল ও উত্তেজক সঙ্গীত ছবিটিকে দারুণ জনপ্রিয়তা এনে দিল। শাম্মী কাপুরের জয়যাত্রা কয়েক বছর অব্যাহত রইল। হিন্দী ছবির নির্মাতারা তাঁদের ফরমুলার সাফল্য ক্রমে ক্রমে দর্শককে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করার জন্য ছবিতে বিদেশী ছবির অনুকরণে ক্যাবারে নাচ, মারামারি, কার চেজিং, বোমা, দস্যু ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটালেন। দর্শক অনাস্বাদিত জীবনের বহু কিছুর সন্ধান হিন্দী ছবির মাধ্যমে পেয়ে গেল। অতৃপ্ত মনকে তৃপ্ত করতে লাগলেন হিন্দী ছবির উত্তেজক ফরমুলার দ্বারা।

এই সাফল্যের নীট ফল দাঁড়াল—(১) বাংলা ছবির হলগুলিতে নিয়মিত হিন্দী ছবি দেখানো শুরু হল। যথা—দর্পণা, মিত্রা, বীণা, বসুশ্রী, প্রিয়া। (২) আর্থিক দুরবস্থার জন্য বাংলা ছবির নির্মাণ কমে এল কয়েকটি স্টুডিও একেবারেই বন্ধ হল। (৩) ১৯৪৭ সনের পর যাঁরা জন্মেছেন, সেই সব নবীন কিশোর কিশোরী, যুবক-যুবতীদের রুচি ও চিন্তাধারার পরিবর্তন—হিন্দী ছবিকে বাঙালী দর্শকের কাছে প্রিয়তর করে তুলল। (৪) হিন্দী ছবির রঙিন দৃশ্য মারামারি, চটুল নাচ ও গান এবং যৌন উত্তেজক দৃশ্যের ছড়াছড়ি দর্শককে মোহাবিষ্ট করল।

হিন্দী ছবির এই অদ্ভুত প্রভাব থেকে বাঙালী দর্শক নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। সাধারণভাবে বাংলা ছবির আটপৌরে মানসিকতার যে বাঙালী দর্শক অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা হিন্দী ছবির আকর্ষণে নিজেদের ফেললেন। তাঁদের কোন উপায়ও নিজেদেরকে আলাদা রাখার ভাবাটা নয়। বাংলা ছবিতে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ নিয়েই কাহিনী গড়ে ওঠে হয় সাদা কালোয়, সেট সেটিং দুর্বল ও গরীব, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নবত্বের অভাব। এ-ছাড়া উত্তম-সুচি ছাড়া আর কোন অভিনেতা আকর্ষণ নেই। অথচ হিন্দী ছবির অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত। হিন্দী মনোমুগ্ধকর রঙিন দৃশ্যের স্বপ্নের নায়ক-নায়িকাদের দর্শন, যৌনতার উত্তেজক ফরমুলার উত্তেজনা—এ-সব সরিয়ে রেখে দর্শক কীভাবে বাঁচতে পারে? হিন্দী এই ককটেলের নেশায় আবাল বৃ বাঙালী দর্শক মোহগ্রস্ত। এই দর্শকদের নিজস্ব মতামতটা কী?

উত্তর কলকাতার একটি সিনে থেকে হিন্দী ছবি 'আদালত' নন। দেখে বেরিয়েছেন একজন যুবক, সঙ্গী তরুণী। আমি এগিয়ে গিয়ে পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করলাম—

—আপনারা হিন্দী এবং বাংলা মধ্যে কোনটা বেশি পছন্দ করেন?

—'হিন্দী ছবি'। ছেলেটি সপ্রতিভভাবে।

—কেন, বাংলা ছবি ভাল লাগে আমার প্রশ্ন।

—বাংলা ছবি প্যান-প্যানে। ছবিতে এক সঙ্গে অনেক কিছু যায়।'

—দু-একটা কারণ বলবেন?

—যেমন ধরুন—হিন্দী ছবি এ কোনদিন হয়তো দেখব না এমন স্থানের দৃশ্য দেখতে পাই, তারপর নাচ মারপিট—মানে একটা থ্রিল যাকে ছবিতে।' ছেলেটি এক নিঃশ্বাসে দিল। মেয়েটি কিছু বলছেন না আমি তাকে বললাম—'আপনি কিছু বল মেয়েটি বললেন—'হিন্দী ছবি দেখে আনন্দ পাই। ওদের ছবিতে এমন ব্যাপার থাকে যে বেশ মজা লাগে। বান্ধবদের নিয়ে হিন্দী ছবি দেখতে ভাল লাগে।'

—হিন্দী ছবির কোন কোন নায়িকা আপনাদের পছন্দ?

—'অমিতাভ রাজেশ ধর্মেন্দ্র কাপুর, রেখা, শর্মিলা, পারভিন।' এক সঙ্গেই বললেন।

এরপর আমি দক্ষিণ কলকাতার হলের সামনে একজন বয়স্ক [illegible] [illegible]

...মুখে ধরলাম। এঁরা উচ্চবিত্ত পরিলোক।
—আপনারা হিন্দী ছবি দেখেন কেন।
—'ভাল লাগে তাই দেখি।' অল্পবয়সী বধূটি বললেন।
—বাংলা ছবি কেমন লাগে ?
—বাংলা ছবি বেশীর ভাগ লাগে না।
—'বাংলা ছবি বেশীর ভাগই ভাল না। তবে সত্যজিৎবাবুদের ছবি ...রি না।'
—হিন্দী ছবি কেন ভাল লাগে ?
—'নানা কারণে। সব বলা মুশকিল।' হাসি নিয়ে বধূটি বললেন।
—'আপনার বাংলা ছবি ভাল লাগে' বয়স্কা মহিলাটিকে জিগ্যেস করলাম।
—'সুচিত্রা সেন আর উত্তমকুমারের ...ল লাগে।'
—হিন্দী ছবি আপনার ভাল লাগে ?
—'খুব ভাল লাগে তা নয়। তবে মেয়ে বউ এদের পাল্লায় পড়ে ... হয়।'

অফিস পাড়ায় গিয়ে একজন ...কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনিও ... ছবির সপক্ষে যুক্তি দেখালেন।

—আপনি হিন্দী ছবি দেখেন কেন ?
—'হিন্দী ছবি দেখি সাময়িক আনন্দ পাবার জন্য। দৈনন্দিন নানা রকম ঝামেলায় থেকে মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাই হিন্দী ছবি দেখতে যাই—ঘন্টা তিনেকের জন্য আজগুবি আনন্দ পাই।'

—বাংলা ছবি আপনার ভাল লাগে না ?

—'কখনও সখনও ভাল লাগে। বেশীর ভাগ বাংলা ছবিতেই চেনা-জানা দুঃখ আর প্যানপ্যানানি। একদম ভাল লাগে না।'

অর্থাৎ বাঙালী দর্শক কেন হিন্দী ছবি দেখেন, উপরের উত্তরগুলিই পরিষ্কারভাবে সকলের মনের কথা বলছে। এর থেকেই খুঁজে নিতে হবে বাঙালী দর্শকের রুচি ও মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তনের খবর। সিনেমা হলের—কর্তৃপক্ষ বলেন, বাংলা ছবি চালালে আমাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ একটি নতুন বাংলা ছবি এক সপ্তাহ পয়সা দেয়, তারপর আর হাউস ফুল হয় না। অথচ হিন্দী ছবি সমানভাবে চার সপ্তাহ চলে। নতুন নতুন হিন্দী ছবির ভীড় লেগেই আছে। সিনেমা হলের মালিকের চিন্তা থাকে না। বছরে হিন্দী ছবি কলকাতায় মুক্তি পায় একশো থেকে একশো পঁচিশ, আর বাংলা ছবির সংখ্যা বছরে মাত্র পঁচিশ থেকে তিরিশ। এই অল্প সংখ্যক বাংলা ছবি কলকাতার সব হলকে ব্যবসায়িক জোগান দিতে পারে না। হলের কর্তৃপক্ষ বলেন, হিন্দী ছবির দর্শক শতকরা পঁচাত্তর জন বাঙালী এবং সব বয়েসের।

আজকের বাঙালী দর্শকের কাছে হিন্দী ছবির নায়ক নায়িকারা এত জনপ্রিয় ভাবা যায় না। বাংলা ছবির একমাত্র উত্তমকুমার বাঙালী দর্শকের কাছে দারুণ জনপ্রিয়। হিন্দী ছবির গান বাঙালী দর্শকের মুখে মুখে, সেখানে বাংলা গান মনেও থাকে না। ঘরে ঘরে বিবিধ ভারতীর মাধ্যমে হিন্দী ফিল্মী গান চলেছে, সেখানে বাংলা ছবির গান অচল। এই অবস্থায় বাঙালী দর্শক হিন্দী ছবির প্রতি আরো আকৃষ্ট হবেন, বলাই বাহুল্য। হিন্দী ছবির অশুভ প্রভাব বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার কয়েকটি নীতির আইন করেছেন কিন্তু এখনও তার প্রতিফলন দেখতে পাইনি। বাংলা ছবিকেও দর্শক মনোরঞ্জনের উপকরণ সৃষ্টি করতে হবে, নয়তো ফলাফল আরো ভয়ংকর হবে। বাঙালী পাড়ায় এখনও যে কয়টি হল বাংলা ছবি দেখাচ্ছেন—তাঁরাও ভবিষ্যতে হিন্দী ছবি দেখাতে শুরু করবেন বাঙালী দর্শককে।

আদালত উপভোগ্য

অশোক মজুমদার

...ম্বের বেশ কিছু কাহিনীকার পরি... এতদিন কেবল বিদেশী ছবি ও ...্যাসের অনুকরণ করে হিন্দী ছবির ...র জমিয়ে রেখেছিলেন। সম্প্রতি ... সেন্সর বোর্ডের নীতি পরিবর্তনের ... সঙ্গে রাতারাতি ওঁরাও বদলে ...ন। কারণ সেন্সর কর্তৃপক্ষ একশ্রেণীর ...াধপ্রবণতা এবং যৌনতাকে প্রশ্রয় ...ন না। সুতরাং এই চলচ্চিত্র পরি...করা অপরাধ প্রবণতা বদলে বেছে ...ন সস্তা ভাঁড়ামো, অবাস্তব গল্প, ...য়োজনীয় নৃত্যগীত এবং ভাবাবেগপূর্ণ ...নটকীয়তার দৃশ্যাবলী। এইভাবে ওরা ...র্ণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু এখন... দর্শকরাও বেশ বুদ্ধিমান। ঐসব ...া ছবি তাদের মন টানে না। তাই বাধ্য ... সেইসব কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার ও ...চালক এখন অন্য পথ নিয়েছেন। অভি...য় এবং আঙ্গিকের কারসাজির আশ্রয় ... বাধ্য হয়েছেন। তবু এসব ছবি ...বার পর এই ভেবে দুঃখ হয় যে ...নে এখনও বেশ কয়েকজন পরিচালক ... বাজেটের শিল্পসম্মত ছবি তৈরি করে ...চিত্র জগতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি ...তে সমর্থ হয়েছেন, সেখানে ছকে বাঁধা ...-নাটকীয় বস্তাপচা গল্পের চিত্ররূপ ... কতদিন দর্শকদের বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে? এইভাবে অধিকাংশ পরিচালক রঙীন সেলুলয়েড নিয়ে যেভাবে অর্থহীন হিন্দী ছবি তৈরি করে অর্থের ছিনিমিনি খেলছেন, সেই টাকা দিয়ে বেশ কয়েকটি সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি তৈরি করা যায়। 'রফুচক্কর' ও 'মহাচোরে'র পর নরিন্দর বেদীর আদালত সামান্য অন্য ধরনের ছবি। বিশেষ করে এর অভিনয় এবং আঙ্গিকের দিকটা বেশ উচ্চাঙ্গের।

'ধর্মা' নামেএকজন অতি সজ্জন ও গরীব কৃষক কেবল অর্থের অভাবের জন্যে এক কুচক্রী স্মাগলার অজিত সিং-এর কাছে আত্মবিসর্জন দিতে বাধ্য হল। আর সেই কুচক্রী ওর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে স্মাগলিং-এর কাজে ফাঁসিয়ে দিল। বিচারে বাধ্য হয়ে সে জেলে গেল আর আসল অপরাধী অজিত সিং মুক্তি পেল। ধর্মার স্ত্রী অন্তঃসত্বা তাকে সাহায্য করতে গিয়ে ধর্মার একমাত্র আদরের বোন কুচক্রীদের একজনের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল। জেল থেকে ফিরে বোনের মৃত্যু এবং স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি কুচক্রীদের অত্যাচারের কথা জানতে পেরে এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে পরিকল্পনা করল ধর্মা। সুযোগমত একদিন সে এই অবিচারের প্রতিশোধ নিল, অজিত সিংকে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে। কুচক্রীকে দমন করতে এসে হারিয়ে যাওয়া পিতা ও পুত্রের পরিচয় হল। এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। অতঃপর পিতা ও পুত্রের মিলনের আর কোন বাধা রইল না। পিতা ও পুত্রের একই উদ্দেশ্য ছিল দুষ্টকে দমন করা এতদিনে ওদের সে স্বপ্ন সার্থক হল। কাহিনীকার পরিচালক নরিন্দর বেদী এ ছবিতে অভাবনীয় কোনকিছু দেখবার সুযোগ পাননি। পরিচালনার ত্রুটি অভিনয় ও আঙ্গিকের সাহায্যে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

অভিনয়ে—পিতা ও পুত্রের ভূমিকায় অমিতাভ বচ্চন বেশ সুন্দর ও বাস্তববাদী, মার চরিত্রে ওয়াহিদা রেহমানও বেশ সাবলীল। অন্যান্য চরিত্রে—নিতু সিং হীনা কৌসর অলকা লীলা মিশ্র নাজির হুসেন আনোয়ার হুসেন সুজিতকুমার প্রভৃতি শুধুমাত্র চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন।

আলোকচিত্র গ্রহণে পিটার পেরেরার চিত্রকল্পরচনা অর্থবহ। বামন ভোঁসলে ও গুরু দত্তর সম্পাদনার কাজ আরো উন্নত হতে পারত। সঙ্গীত পরিচালনা ও সুর সংযোজনায় কল্যাণজী আনন্দজী তাদের সুনাম রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র

কালীশ মুখোপাধ্যায়

শিশিরকুমার বলতেন, নরেশের ওপর অবিচার করা হয়েছে। অতবড় অভিনেতাকে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। নরেশের সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে আমিও সন্ত্রস্ত থাকতাম। কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের মধ্য দিয়ে অভিনয়-আসরে দুজনের উন্মেষ। একই সময় পাদপ্রদীপের আলোকমালার সামনে উভয়ের বিকাশ। রূপালী পর্দায় একই সময়ে দুজনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। সিনেমার মোহমায়া শিশিরকুমারকে আটকে রাখতে পারেনি। নরেশদা যেন মনে হয়, অভিনেতা ও পরিচালকরূপে সিনেমাতেই বেশী প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। শিশিরকুমার সারাজীবন মঞ্চকে আঁকড়ে থেকে সে স্বাচ্ছন্দ্য কোনদিন পাননি।

ছোটবেলা থেকেই নরেশচন্দ্রের নাট্যানুরাগ পরিলক্ষিত হয়—ছাত্রাবস্থাতেই এই অনুরাগ নির্দিষ্ট পথ বেয়ে অংকুরিত হয়ে ওঠে।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অফ ইয়ং ম্যান' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছিল—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সেই প্রতিষ্ঠানটি 'ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউটে' রূপান্তরিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নরেশচন্দ্র মিত্র ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউটে যোগ দেন। নরেশচন্দ্রের সমসাময়িক বন্ধুদের মধ্যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তি মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুশীল দে, যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী, রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ চক্রবর্তী, সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (সাহিত্যিক), প্রফুল্লকুমার গুহ, গিরিজাশংকর রায়-চৌধুরী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জুলিয়াস সীজার, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাজা ও রাণীর পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইনসটিটিউটে নবীনচন্দ্র সেনের কুরুক্ষেত্র নাটক অভিনীত হয়। নরেশচন্দ্র দুর্বাসা চরিত্রে অভিনয় করেন। শিশির-কুমার অভিমন্যু, শান্তি মুখোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীশ চক্রবর্তী অভিনয় করেন বাসুকী চরিত্রে। ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য পুনরায় কুরুক্ষেত্র অভিনীত হয়। দুর্বাশা চরিত্রে নরেশচন্দ্র অদ্ভুত অভিনয়-ক্ষমতার পরিচয় দেন। নাট্যশিক্ষক ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক মন্মথ বসু।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব নাটকে মারের অনুচরের ছোট ভূমিকায় নরেশচন্দ্রের বাচনভঙ্গী ও অভিব্যক্তি হয়েছিল অতুলনীয়। সিদ্ধার্থ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২২ জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত ও পুনর্জন্ম অভিনীত হয়। ঐ বছরই ইনসটিটিউটে ১৮ সেপ্টেম্বর চন্দ্রগুপ্ত অভিনীত হয়। শিশিরকুমার চাণক্য আর নরেশচন্দ্র কাত্যায়ন চরিত্রে অভিনয় করেন। মিনার্ভায় চাণক্যরূপে অবতীর্ণ হন দানীবাবু। ইনসটিটিউটে চাণক্য অভিনীত হবার আগে প্রায় সমস্ত সভ্যরাই মিনার্ভার অভিনয় দেখে আসেন। নরেশচন্দ্র এবং শিশিরকুমার দানীবাবুর সঙ্গে দেখা করে একাধিকবার তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করেন। শিশিরকুমারের চাণক্য যেমন দানীবাবুর মত প্রশংসালাভ করে, নরেশ মিত্রের কাত্যায়নও। অনেকে এরকম বলেন, নির্জীব কাত্যায়ন নরেশচন্দ্রের অভিনয়ে যেন নতুন রূপ পায়। স্বয়ং নাট্যকার এই দুই নবীন প্রতিভাকেই উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান। পুনর্জন্মে যাদব চক্রবর্তীর চরিত্রে নরেশচন্দ্র আর অশ্বিনী চরিত্রে অভিনয় করেন শিশিরকুমার। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জনায় নরেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা ছিল না। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর গিরিশ-চন্দ্রের অশোক নাটকে নামভূমিকায় শিশিরকুমার আর মার চরিত্রে অভিনয় করেন নরেশচন্দ্র। কবিগুরুর 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' শিশিরকুমার অবিনাশ আর কেদার চরিত্রে অভিনয় করেন নরেশচন্দ্র।

নরেশচন্দ্র শিশিরকুমার থেকে এক বছরের বড় ছিলেন। তাছাড়া অভিনয়ে নরেশচন্দ্রের দক্ষতা শিশিরকুমারের পূর্বেই ইনসটিটিউটে ও বন্ধুমহলে স্বীকৃত ছিল। ইনসটিটিউটের বাইরেও বহু অপেশাদার সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে নরেশচন্দ্র নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিকে সম্বল করে ওকালতি ব্যবসায়ের সুনিশ্চিত জীবিকার পথ পরিত্যাগ করে অভি[নয়] শিল্পজগতে যোগদান করেন। নরেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে শিল্পজগত জীবি[কা] খ্যাতি উভয় দিকে সুনিশ্চিত হয়ে দেয়।

১৯২১। ভারতের জাতীয় এসেছে নবজাগরণের সুর। সে সুর দেশে দেখা দিল প্রচণ্ড রূপে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ যেমন টলমল, তেমনি সাহিত্য শিল্পে বিভিন্ন দিকে দিকে নবজাগ[রণের] উত্তাল তরঙ্গমালা নতুন রূপে বঙ্গজন[নী] বিভূষিত করলো। বাংলার নাট্য পেছিয়ে রইল না। নতুন প্রতিভায় অঙ্গসজ্জায় নতুন রূপে উঠল ঝলম[লিয়ে] শিক্ষাপ্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করে শিশির[কুমার] যোগ দিলেন নাট্যপ্রাঙ্গণে। ম্যাডানের থিয়েট্রিক্যাল কম্পানীর মধ্য দিয়ে শি[শির]কুমারের আবির্ভাব দিকে দিকে সাড়া দিল।

১৯২২। নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় যোগদান মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ দ্বিজেন্দ্রলা[লের] চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য রূপে নরেশ আর অ্যাণ্টিগোনাস চরিত্রে অভিবাদন রাধিকানন্দন। সাজাহান নাটকে নরেশ সাজাহান আর রাধিকানন্দন জানান ঔরঙ্গজেব চরিত্রে।

প্যালারামের স্বাদেশিকতায় নন্দন প্যালারাম, মিঃ জেকব চরিত্রে মিত্র অদ্ভুত অভিনয়দক্ষতার পরিচয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর পর চরিত্রে বাঙালী অভিনেতার এরূপ অভিনয় দীর্ঘদিন নাট্যামোদী দেখতে পান নি। কথায়-চলনে-খাঁটি সাহেবের ছাপ আঁকলেন নরেশ কিন্তু সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত নাটকটি। অকটোবর মাসে মিনার্ভা অগ্নিদগ্ধ হয়।

১৯২৩। নবগঠিত আর্ট থিয়েটার লিমিটেড স্টার থিয়েটার মঞ্চে কর্ণার্জুন নাটক নিয়ে নতুন করে অভিবাদন 'শকুনি' চরিত্রে বিস্মিত করলেন নরেশচন্দ্র। নরেশচন্দ্রের জীবিতকালে মৃত্যুর পর আজও কেউ তার শকুনিকে ম্লান করতে পারেনি।

শিশিরকুমার যেমন পরিত্যাগ করে রঙ্গমঞ্চেই আত্ম[নিয়োগ] করেন। নরেশচন্দ্র নির্বাক যুগেই চিত্র[জগতে] বেশী জড়িয়ে পড়েন মঞ্চমায়া থেকে। খৃষ্টাব্দে মনমোহন রঙ্গমঞ্চে সম্প্রদায়ে যোগদান করে পুণ্ডরীকে ও অন্যান্য নাটকে অভিনয় করেন। খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার যখন কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে নাট্যমন্দির নিয়ে আত্ম[প্রকাশ] করেন বিসর্জন নাটকে নরেশচন্দ্র শিশিরকুমার সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যুক্ত

শিশিরকুমার রঘুপতির চরিত্রে যখন অভিনয় করেন নরেশচন্দ্র তখন জয়সিংহ চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। শিশিরকুমার জয়সিংহ আবার নরেশচন্দ্র রঘুপতি চরিত্রেও অভিনয় করেন।

নাট্যমন্দির থেকে স্টার থিয়েটারে যোগদান করে কবিগুরুর পরিত্রাণ নাটকে বসন্ত রায় এবং মগের মুল্লুকে নরহরি চরিত্রে অভিনয় করেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মনমোহন, মিনার্ভা স্টার বিভিন্ন মঞ্চে মঞ্চস্থ বিভিন্ন নাটকে নরেশচন্দ্র অভিনয় করলেও স্থায়ীভাবে কোন মঞ্চের সঙ্গে বেশীদিন জড়িত থাকেন না।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ মহানিশা নাটকে বেহারী চরিত্রে নতুন করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। এখানে নতুন নাটক অশোকে খল্লাতক, পতিব্রতায় কাশীনাথ, কাজরীতে অনাদি, বাংলার মেয়েতে জিতেন, পথের সাথীতে অমরেশ্বর, চরিত্রহীনে হারান প্রভৃতি আরো বিভিন্ন নাটকে নরেশচন্দ্র উল্লেখযোগ্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নাট্যনিকেতনে কেদার রায়ে শ্রীমন্ত, গোরায় পানুবাবু নরেশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রঙমহলে গোরা ও অন্যান্য পুরোন নাটকের পর বিধায়কের মালা রায়ে মিঃ সেন চরিত্রে নরেশদাকে দেখা যায়। এখানে চরিত্রহীন ও অন্যান্য পুরোন নাটকে নরেশচন্দ্র নতুন করে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ১২ জুলাই নাট্যনিকেতনে তারাশংকরের কালিন্দী নাটকে নরেশচন্দ্রের অচিন্ত্য বিস্ময়াভিভূত করে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় আর শিশির মল্লিকের পরিচালনাধীনে নাট্যভারতী মঞ্চস্থ করলেন তারাশংকরের দুইপুরুষ। দুইপুরুষ পরিচালনা ও অভিনয়ের দিক থেকে স্মরণীয় নাটক হিসেবে কীর্তিত হয়। নরেশচন্দ্র গোপীনাথ নাথের চরিত্রে যে দক্ষতার পরিচয় দেন তা তখনকার নাট্যামোদীরা আজও ভুলতে পারেননি বলে মনে করি।

নাট্যভারতীতে মঞ্চস্থ হল তারাশংকরের পথের ডাক ১৯৪৩ খৃঃ। রায় বাহাদুর চরিত্রে অভিনয় করলেন নরেশচন্দ্র। এই সময় প্রফুল্ল, সাজাহান ও অন্যান্য পুরোন নাটকও অভিনীত হয়। প্রফুল্ল নাটকে নরেশচন্দ্রের কাঙালীচরণের কথাও ভুলবার নয়। জুলাই মাসে মঞ্চস্থ হয় শরৎচন্দ্রের দেবদাস। নাট্যরূপ দেন শচীন সেনগুপ্ত। নাটকের বহুবিতর্কিত বসন্ত চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলেন নরেশচন্দ্র। অশ্রদ্ধার মনোভাব নিয়েই চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তোলেন নরেশচন্দ্র। পরিণত বয়সে নরেশচন্দ্রকে ম্লান মুখে বরণ করে নিতে হয় শোচনীয় ব্যর্থতা। বিশেষ করে যখন নির্মলেন্দু অপূর্ব দক্ষতায় বসন্তকে রূপায়িত করে তুললেন।

[illegible] মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত [illegible] নরেশ-চন্দ্র কালিকায় যোগদান করে কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেন।

দীর্ঘদিন বাদে নরেশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে ফিরে আসেন। চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় আত্মদর্শন ও কিন্নরী নাটক মঞ্চস্থ হলে আত্মদর্শনে মনরাজা চরিত্রে অভিনয় করেন। এখানে বহু পুরোন নাটকেও অভিনয় করেন এবং শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ হলে কাশীর পাণ্ডার চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে নরেশচন্দ্রের শেষ অবতরণ বিশ্বরূপায় ক্ষুধা ও সেতু নাটকে। তাছাড়া বৃদ্ধবয়সে মহাজাতি সদনে এবং মফঃস্বলেও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে নির্বাক চলচ্চিত্রে শিশিরকুমার আর নরেশচন্দ্র একসঙ্গে যোগদান করেন। তাজমহল পিকচার্সের আঁধারে আলো ছবিটি দুজনেই যুগ্মভাবে পরিচালনা করেন। অভিনয়াংশেও থাকেন: নরেশ মিত্র অভিনীত পরিচালিত নির্বাক ছবিগুলির মধ্যে আঁধারে আলো, মানভঞ্জন, চন্দ্রনাথ, দেবদাস ও নৌকাডুবি উল্লেখযোগ্য। অভিনীত অন্যান্য নির্বাক ছবির মধ্যে নামকরা যেতে পারে দুর্গেশনন্দিনী, সরলা, কপালকুণ্ডলা, গিরিবালা, কাল পরিণয়, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির।

নরেশচন্দ্র পরিচালিত অভিনীত প্রথম সবাক চিত্র সাবিত্রী।

নরেশচন্দ্র পরিচালিত অভিনীত অন্যান্য ছবিগুলি হল, মহানিশা, গোরা, শর্মিষ্ঠা, বাংলার মেয়ে, পথের সাথী, বিদুষী ভার্যা, স্বয়ংসিদ্ধা, কংকাল, নিয়তি অন্নপূর্ণার মন্দির, কালিন্দী, উল্কা, বৌঠাকুরাণীর হাট প্রভৃতি।

অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে নামকরা যেতে পারে প্রফুল্ল, পথের শেষে, বেকার-নাশন, চাণক্য, কবি জয়দেব, প্রতিশোধ, মীনাক্ষী, অশোক, স্বামীর ঘর, দিকশূল, শহর থেকে দূরে, রায়চৌধুরী, স্বপ্ন ও সাধনা, অনির্বাণ, মাটি ও মানুষ, শাঁখা সিঁদুর, ক্ষুধা, মা প্রভৃতির।

বোম্বাইয়ের শরৎ অনুষ্ঠানে চরিত্রহীন নাটকে শত্রুঘ্ন সিনহা ও জারিনা ওহাব

হাতে ছবি নেই তাই থিয়েটারে যাই

নির্মল ধর

বাংলার প্রথম সারির বহু শিল্পীকেই বিশেষ করে নায়ক-নায়িকাদের, আজকাল মঞ্চে দেখা যাচ্ছে। অবশ্যাই পেশাদারী মঞ্চ তাঁদের পছন্দ। যাঁরা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে হাজার হাজার দর্শককে রূপোলি পর্দায় তাঁদের ছায়াতে মুগ্ধ করায় অভ্যস্ত, তাঁরা এখন সশরীরে মঞ্চে অবতীর্ণ।

ছায়াছবির বিশাল আকাশ ছেড়ে মঞ্চের সীমাবদ্ধ জগতে তাঁদের এই উপস্থিতি কেন প্রশ্ন করলেই জবাব দেন—নাটক তাঁর ভালো লাগে। মঞ্চে কাজ করলে দর্শকের খুব কাছাকাছি আসা যায়। দর্শকের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হৃদস্পন্দন তিনি অনুভব করেন নাটকে অভিনয়ের সময়। এবং অভিনয়ের চূড়ান্ত রায় শিল্পীরা নাটকের মাধ্যমেই সরাসরি কুড়িয়ে নিতে পারেন।

এসব কারণ অবশ্যাই সত্য। কিন্তু আরও কিছু সত্যকথন অপ্রকাশিত থাকে। যেটা তাঁরা অনেক সময় মুখ খুলে বলেন না। প্রথমত এতদিন কেন তাঁদের এই সুবুদ্ধিটি মাথায় আসে নি? ছায়াছবির চমক লাগানো জৌলুষের মোহে অন্ধ কিংবা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁরা নাটকের গুণপনার কথা কি ভুলে গিয়েছিলেন? আর নাটকে অভিনয়ই যদি দর্শকের নিকটবর্তী হবার একমাত্র পথ হয়, তাহলে এতদিন কি তাঁরা দর্শককুল থেকে দূরে ছিলেন? এবং তাঁদের বিচারের রায় দূরে থেকে গ্রহণ করার সুযোগ পান নি বলেই অধুনা মঞ্চাবতরণ?

এটিও আংশিক সত্য, সর্বাংশে নয়। আসলে এই হঠাৎ মঞ্চপ্রীতির কারণ অন্যত্র। এবং সে কারণ নিশ্চিতরূপে অর্থনৈতিক। যে জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকা একদিন মোটা অংকের বিনিময়ে বছরে বেশ কয়েকটি ছবির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গৌবরবোধ করতেন, এখন আর সেই সুদিন তাঁদের নেই। তাঁরা এখন ছবি পাচ্ছেন না, পেলেও খুব কম। এবং সর্বদাই যে প্রধান চরিত্রে তা নয়, অধিকাংশই পার্শ্বচরিত্রে। অনেকে আবার তাও পাচ্ছেন না। দু-একজন ধার-কর্জ করে ছবি প্রযোজনা করেছেন নিজেই নায়ক হবেন বলে। বাংলার প্রথম সারির অনেক নায়ক-নায়িকার হাতেই এখন ছবির সংখ্যা গৌরববোধ করার মত নয়, কিংবা অর্থকরী আনন্দও দেয় না।

একজন শিল্পী পর পর কয়েকখানি ছবি মার খাওয়ার পর টাইপ চরিত্রের দিকে ঝুঁকেছেন। সেখানেও তেমন সুবিধা করতে পারছেন না। ছবিতে সুবিধা করতে না পারার জন্যই এককালের নামী নায়িকা এখন মঞ্চে জায়গা করে নিতে সচেষ্ট।

একদা বাংলা-হিন্দীর ব্যস্ততম নায়কের হাতেও কোনো ছবি নেই। তাঁকে আগামী যে দু-একটি ছবিতে দেখা যাবে সেগুলির নামে বা বেনামে প্রযোজক হয়তো তিনিই। অন্য প্রযোজকদের কাছে তাঁর সে আদর আর নেই।

বাংলা ছবির ব্যবসায়ে অনেক শিল্পীই এখন আর তেমন মুনাফা উৎপাদনকারী নন। সুতরাং ছবি থেকে তাঁরা সরে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। রুজি-রোজগার এবং ফিল্মি স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্যই তাঁদের মঞ্চের কাছে দ্বারপ্রার্থী হতে হচ্ছে। কিন্তু এই চরম সত্যটি স্বীকার করতে অনেকেরই বাধে। বোধহয় অগৌরব বোধ করেন। তাই এই আসল সত্যটি এড়িয়ে যান। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই মঞ্চ যে মাস মাহিনার মত স্থায়ী আয়ের এক নিশ্চিত জায়গা—এই

বোম্বাইয়ের শরৎ অনুষ্ঠানে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সুলক্ষ্মা পণ্ডিত

সত্যকে ঢেকে দিতে তাঁদের উঁচু আদর্শের কথা বলতে শুনি। অথচ নাটক নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে চলছে সেখানে তো তাঁদের মাথা ঘামাতে দেখি না। দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্যাই আছে। তাঁরা অবশ্য পেশাদারী মঞ্চের ধারে-কাছেও যান না।

এই অযাচিত মঞ্চপ্রীতির আরও একটি অভিসন্ধি আছে। একদা নায়ক-নায়িকা আজ সিনেমার আকর্ষণ হারিয়ে মঞ্চকে ব্যবহার করছেন পুনরায় হারানো সুনাম ফিরে পাবার বাসনায়। নাটক করে দর্শকের কাছে যদি আবার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে হয়তো-বা সিনেমার রূপোলী পর্দায় আবার ঠাঁই করে নিতে পারবেন। মনের এই সুপ্ত বাসনা বা অভিসন্ধিটুকুও কিন্তু অ-বলা থাকে।

অথচ বাংলার মঞ্চ ও নাটক এক সময় যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিগ্বিজয় করেছিল, তাঁদের অর্থের প্রয়োজন হলেও মঞ্চ ছেড়ে তাঁরা ছায়াছবির মায়ায় নিজেদের হারিয়ে ফেলেন নি কখনও। স্মরণ করুন শিশির ভাদুড়ী, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র প্রমুখ মহান শিল্পীদের। তাঁরা নাটকের জন্য প্রাণপাত করে গেছেন, বাংলা নাটকের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলোকে যাঁরা মহিমান্বিত করে গেছেন। তাঁরাও ছবিতে অভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু মঞ্চই ছিল তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান।

আবার বিপরীত মেরুতে দেখা যাবে প্রমথেশ বড়ুয়াকে। তিনি আজীবন ছবিই করে গেছেন। (অল্প বয়সে রাজবাড়ীতে শখের নাটক করার অধ্যায়টুকু বাদ দিলে) ছবির শিল্পসম্মত রূপায়ণে তাঁর দান অনস্বীকার্য। তাঁর জয়-পরাজয়, সম্মান-অসম্মান সব ছবিকে ঘিরেই। ছবি করিয়ে এবং অভিনেতা হিসাবে তিনি যেমন খ্যাতির জয়মাল্য পরেছেন, তেমনি অখ্যাতি এবং আর্থিক কষ্ট এবং যন্ত্রণাও সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ছবি ছেড়ে অর্থের প্রয়োজনে নাটক-প্রীতির মুখোশ পরেন নি। তাঁর এই অভিসন্ধি কখনই ছিল না।

বড়ুয়া সাহেবের ছবির প্রতি যেমন গভীর ভালবাসা ছিল, শিশির ভাদুড়ীদের ছিল মঞ্চের জন্য। এঁদের সকলেরই নিজস্ব মত ও পথ ছিল এবং সেভাবেই তাঁরা চলতেন। আজকালকার শিল্পীদের কজনেরই বা সে রকম ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে! থাকলে তাঁরা বোধ হয় এমন আদর্শের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে পেশাদারী মঞ্চের চাকরী করতেন না। সৎসাহসের সঙ্গে সত্য কথাটাই বলতেন—হাতে ছবি নেই টাকার জন্যই মঞ্চে আসা।

ডিরেক্টর আর মন্ত্রী হতে কোন ট্রেনিং লাগেনা

বছর কয়েক স্টুডিও পাড়ায় ঘুরলেই ডিরেকটার। পোস্টার লাগালেই মন্ত্রী। মাননীয় তথ্য এবং জনসংযোগ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় এমনিই স্পষ্ট কথা বললেন, চতুর্থ চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মঞ্চে। সবাই সত্যজিৎ রায় আর মৃণাল সেন হতে গিয়ে বাংলা ছবির বারোটা বাজালেন। এত বছর পরে আজ আমাদের সম্বল কয়েক জন মাত্র প্রথম শ্রেণীর ডিরেক্টার আর বছরে খান কয়েক সত্যিকারের ছবি। বাকী সব ভস্মে ঘি ঢালা। স্টুডিও পাড়ায় সারা বছর কেবল অক্ষম এক্সপেরিমেন্ট আর অর্থের শ্রাদ্ধ। সরকারী সাহায্য এখন ফুটো পাত্রে জল ঢালার মত। সুব্রতবাবু বললেন, আগে সমস্যাগুলো সর্ট আউট করে সমাধানের ব্যবস্থা না করলে বাংলা ছবিকে ক্র্যাচে ভর দিয়েই চলতে হবে। অর্ডিন্যান্স করে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের সংকট মোচন অসম্ভব। আমাদের সমস্যা আঞ্চলিক এবং সেইভাবেই এগোতে হবে।

মাত্র চার বছর বয়স হল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের। তা না হলে আর একটু সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আশা করা যেত।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চলচ্চিত্র শিল্পের জন্যে কিছু আশার কথা শোনালেন। বললেন, স্টাডি গ্রুপ সমস্যার চেহারা দেখে একটা রিপোর্ট দিতে চলেছে। সিনেমা হাউস আরো বাড়াতে হবে। প্রয়োজন হলে একটার পাশে আর একটা। যে সমস্ত চিত্র-গৃহ প্রদর্শনী সময়ের শতকরা ৬০ ভাগ বাংলা ছবিকে দেবে তারা সাবসিডি পাবে। থিয়েটার প্রমোদকর মুক্ত হতে চলেছে। থিয়েটারের জন্যেও পুরস্কারের ব্যবস্থা হচ্ছে। দূরদর্শন কেন্দ্র, রাধা ফিল্ম ছাড়লেই কালার ফিল্ম ল্যাবরেটারী হবে। স্টুডিওতে তৈরি হবে বিভিন্ন ভাষার ছবি। চিত্র নির্মাতাদের বললেন—সরকারের সমালোচনা করুন, আপত্তি নেই কিন্তু সমাধানেরও ইঙ্গিত রাখুন। শুধু বক্স অফিস দেখলে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হল না।

সুব্রতবাবু সেন্সারড বাংলা ছবি কেন বছরের পর বছর হল পায় না জানতে চাইলেন।

বিচারকদের মধ্যে কানন দেবী আর মনোজবাবু জানালেন, আমাদের বিচার প্রভাবমুক্ত। ভাল ছবি তাঁরা খুব কমই পেয়েছেন। ছবির মান হরিবল। পুরস্কার-প্রাপকরা হাসিমুখে পুরস্কার নিলেন কারোর কিছু বলার স্কোপ ছিল না। সত্যজিৎবাবু আসেন নি। তারকাদের দেখার জন্যে বাইরে দাঙ্গা হয় নি। বোধহয় শীতের জন্যে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থবাবু চান—আগামী উৎসবে পুরস্কার যাঁরা পান নি সেই সব পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলাকুশলীরাও আসবেন। অনুষ্ঠানের মর্যাদা আরো বাড়াতে হবে। আর জনসাধারণকেও বলতে হবে—বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কি?

গপ হেলেবি সত : ওড়িষী ছবি

কলকাতায় তো মাঝে মাঝেই চলচ্চিত্র উৎসব হয়। সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের ছবি দেখানো হলে বোধহয় সেটা ভালই হয়। সাংস্কৃতিক দিকটা ছাড়াও তাঁদের সামাজিক, মানসিক এবং শৈল্পিক দিকটাও পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে তুলে ধরা হলে প্রতিবেশীদের জানার সহায়ক হয় সেটা। অথবা দক্ষিণ ভারতীয় ছবির প্রদর্শন ব্যবস্থার মত (যদিও সেই প্রচেষ্টা বেশীর ভাগই সেই সব ভাষা-ভাষী দর্শকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই) নিয়মিত ঐ সব প্রদেশের ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় (কদাচিৎ অবশ্য ওড়িষী ছবির প্রদর্শন কলকাতায় হয় বলে শুনেছি, তবে সেগুলি প্রায়শই ধর্মমূলক ছবি সামাজিক নয়। অথচ সামাজিক ছবি দেখাবার ব্যবস্থা না করলে সেই ভাব বিনিময়ের জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাপারটা আদৌ সম্ভব নয় বলেই আমার ধারণা।) তাহলে সেই সব প্রদেশের যাঁরা এখানে আছেন তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও লাভবান হই। কথাটা চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ব্যবস্থা-পকদের ভেবে দেখতে বলি।

প্রসঙ্গটা আমার মনে এসেছে সম্প্রতি একটি রঙীন ওড়িষী ছবির প্রিভিয়্যু দেখতে বসে। ছবিটির নাম 'গপ হেলেবি সত'। অর্থাৎ 'গল্প হলেও সত্যি।' ছবিটির প্রযোজক স্বাতী ফিল্মস লিমিটেড। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নগেন রায়।

ওড়িষী ভাষায় তোলা প্রথম রঙীন ছবি 'গপ হেলেবি সত'র কাহিনী অবশ্য অনেকটাই ছকে বাঁধা। যেখানে উড়িষ্যার সাধারণ সমাজ জীবনের বদলে এক শ্রেণীর উচ্চবিত্ত পরিবারের গল্পই বলা হয়েছে একটি প্রেমের গল্পের মোড়কে। এ ছবির সুখী নায়ক আধুনিক মেয়েদের সংস্পর্শে থেকেও একটি গ্রাম্য মেয়ের প্রেমে পড়ে-ছিল। এবং অনেক ঘটনা ও অঘটনের পর নায়ক-নায়িকার মিলনান্ত দৃশ্যের অব-তারণা ঘটিয়ে আশুতোষ দর্শকদের ইচ্ছা পূরণ করা ও আনন্দ দেওয়া হয়েছে। হিন্দীতে যে শ্রেণীর গল্প আবহমান কাল ধরেই চলে আসছে।

তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হল শুধু কাহিনী নয়, হিন্দী সিনেমার মত অবাক-করা সেট সেটিং, রঙের খেলা, আউটডোর লোকেশন, জমাটি আবহসঙ্গীতসহ রীতিমত সুরেলা এবং তালের গান (যা হিন্দী সিনেমার সম্পদ) রীতিমত যোগ্যতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে এই ছবিতে। অর্থাৎ জমজমাটি হিন্দী ছবি দেখে দর্শক যে আনন্দ পায়, উড়িষ্যার সাধারণ দর্শকরা সেই আনন্দই পাবে। এটাও বড় কম কথা নয়। বলতে দ্বিধা নেই, পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্র জগতের একটা শ্রেণী যেটাকে চেষ্টা করেও রপ্ত করতে পারে নি। 'গপ হেলেবি সত' যেন সেটাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

এ ছবির নায়ক হরিশ (অন্যান্য কিছু আধুনিক-আধুনিকার মতই) হিন্দী আদব কায়দা দেখানোর চেষ্টা করেও সফল হতে না পারলেও নায়িকা বনজা মিশ্র দর্শকদের অবাক করেছেন। অন্য ভূমিকার শিল্পীরা মোটামুটি নিষ্ঠাবান।

এ ছবির বড় সম্পদ সুরেন্দ্র সাহুর ক্যামেরার কাজ (প্রাকৃতিক রঙীন দৃশ্যগুলি চোখ ও মনকে ভরিয়ে দেয়) এবং ভুবন-হরির সুরের জমাট গান (নেপথ্যে যাতে কণ্ঠদান করেছেন এবং গেয়েছেনও দারুণ সুমন কল্যাণপুর ও কিশোর-পুত্র অমিতকুমার)। অতএব আশা করা যায় ছবির প্রয়োগের সঙ্গে মণিকাঞ্চন ঘটিয়ে এ ছবি ওড়িষ্যার জনগণের মনোরঞ্জন করবেই।

তবু একটা কথা। চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যেমন এমন ছবির প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আছে আজকের এবং আবহমান কালের সমাজের প্রতি-নিধিত্বমূলক নির্ভেজাল ছবি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

রাষ্ট্রপতি আমেদের জীবনাবসান

রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদের জীবনাবসানে সারা ভারতের অগণিত নরনারীর সঙ্গে আমরাও গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন। দেশের এক অত্যন্ত জটিল এবং সংকটপূর্ণ সময়ে তাঁর সুচিন্তিত নেতৃত্ব পেয়ে আমরা বহু বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়েছি। ভারতের জনগণ চিরদিনই তাঁর অমর স্মৃতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হৃদয়ে লালন করবে।

রাষ্ট্রপতি আমেদের সমগ্র জীবনই এক উজ্জ্বল দেশপ্রেমের অভিজ্ঞান। বিদেশে উচ্চশিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও বহু সুবর্ণ সুযোগ হেলায় উপেক্ষা করে জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন তিনি, এবং বহুবর্ষব্যাপী কারাবাস ও নিগ্রহ ভোগ করেন। তাঁর অদম্য প্রাণোন্মাদনায় লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত হৃদয়ে স্বাধীনতা-তৃষ্ণা জেগে ওঠে। তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতেও প্রেরণা হয়ে থাকবে আমাদের দেশে।

রাষ্ট্রপতি আমেদের পরিবার ও আত্মীয়বর্গের প্রতি আমরা অন্তরের সুগভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

পাতাল থেকে ডাকছি

পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো?
এখন এসো, তোমার অমন আকাশ থেকে মাটির নিচে

এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, আমার আঁচে পোড়াও দু পা
দু হাত পোড়াও, নরম ননীর মতন শরীর পুড়িয়ে কালো
কলুষ করো, আমায় ধরো—পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে

চূড়ার থেকে শিকড় ধরে নামো আমার মুখের উপর
বুকের উপর, সুখের উপর, দুঃখভরা নখের উপর
যেন মাটির উপর থেকে আঁচড়ে মাটি নখ নিয়েছে

পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো
পাতাল থেকে ডাকছি, তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছো
এখন এসো, তোমার একার আকাশ থেকে মাটির নিচে

এসে দাঁড়াও, আমার কাছে, পাতাল বড়ো কষ্ট দিচ্ছে
আমার কাছে লুকিয়ে আছে তোমার জন্য ভালোবাসা ।।

বাদামের পাতা তুমি

পাতা ঝরে, পাথরের বুকের উপরে
ঝরে পাতা, ছেঁড়া কাঁথা আলো যায় ছিঁড়ে
ভাসন্ত বাহির থেকে ভিতরে নিবিড়ে
শীত ও হেমন্ত শুয়ে থাকে পাশাপাশি।

বাদামের পাতা ঝরে পাথরের বুকে
ঝরে পাতা বুড়ো পাতা উন্মুখ মাটিতে
পাখির পালক ঝরে মাদুর-পাটিতে
তুলো যেন বালিশের, থাকে কাছাকাছি।

মানুষ তেমনি করে অট্টালিকা থেকে
পথের উপরে, খাট ঢেকে যায় ফুলে
গন্ধ যেন শাণিত, যেন জলস্তম্ভ ওঠে
প্রাসাদ দেয়াল পরস্পর মাথা কোটে
অবহেলায় কেন গেলে কেন চলে গেলে
বাদামের পাতা তুমি বুড়ো পাতা তুমি।

তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না

তোমার কাছে যাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিলো খুবই
কিন্তু এই নিরুদ্দেশ উপত্যকা থেকে বাঁকা কেবল টেলিগ্রাফ-তার
বেরিয়ে যাচ্ছে রামগড়ের দিকে
আর কিছু যায় না—সকাল আসে
তোমার কাছে যাবার ইচ্ছা আমার হয়েছিলো খুবই
এখানে সকলে আমরা তাঁর সেকালের মুখের শ্রী
অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম
তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না, তুমি জানো।

তুমি তোমাদের সেই হলুদ বাগানে জল দিচ্ছো এখন
এখন তোমার পায়ের পাতায় পড়েছে কাদা জলের ছিটে
তোমার শাড়ির পাড় ভিজে গেছে ধুলোর জলে
দুনো নিয়ে ফিরছো—এ পরবাসে রবে কে, কে রবে সংশয়ে....
এখন তোমার মুখের উপর এসে পড়েছে তালতমালের আলো
তোমার মুখের পূর্বপশ্চিম কিছুই দেখা যায় না এখন
তোমার মুখের উপর আমার মুখের নির্যাতন ঘটেছিলো খুবই

এখন এখানে আমরা তাঁর সেকালের মুখের শ্রী
অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম
তাঁকে চিরদিন পাওয়া যায় না, তুমি জানো ।।

কিঞ্চিৎ উঠেই নেবে গেল। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়ে দুজনে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। রেখা ভাড়া চুকিয়ে দিতে গেলে গাড়োয়ান দু টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা দাবী করে বসলো। কাঞ্চন প্রতিবাদ জানাতে গাড়োয়ান ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো : 'ফুর্তি করবেন, হোটেলের ভাড়াটি দেবেন না?' লজ্জায় অপমানে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দ্রুত পায়ে অপরিচিতের মত তারা খানিকটা হেঁটেছিল। কিন্তু কাঁদেনি। কারণ একান্তে কাঁদবার মত আশ্রয় তাদের ছিল না। অসহায় অবরুদ্ধ প্রেমের যে হাহাকার গল্পের শেষে ভেঙে পড়েছে তার তুলনা আধুনিক সাহিত্যে বিরল।

সচেতনভাবে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্ভবত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর লেখায় মানিকেরই মত অবজেকটিভিটির প্রাধান্য। ডিটেলের প্রতি নজর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বর্ণনাগুলিতে ঐশ্বরিক নিষ্ঠুরতা আছে। ভাবনা চিন্তা ও সংলাপগুলি অতি বেশী পরিমাণে বাস্তবানুসারী॥ 'নিয়তি ফিয়তি' 'অমৃত টমৃত' গোছের শব্দ দিয়ে দীপেনের সব চরিত্রই কথা বলে কেন? 'লে বাব্বা' 'মেরে ফেল মুর্গীওয়ালা' 'নাও ঠ্যালা' 'এসো সো লাইনে এসো' 'জবাব নেই' 'লে বাঙালী'—এই ধরনের আধুনিক বাকচতুরতায় সব চরিত্র একই রকমভাবে সিদ্ধ কেন?

সচেতনভাবে দীপেন যাই করুন, যে আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখুন না কেন, প্রেমের জন্য আকণ্ঠ তৃষ্ণা তার গল্পগুলিতে একটি সূক্ষ্ম্যাসক্তি সৃষ্টি করেছে। এবং তাঁকে বাঁধিন্দিক রোমান্টিকতার জগৎ থেকে আত্মনির্বাসন নিতে দেয় না। প্রহরা গল্পে যে ক্ষত-বিক্ষত ছেলেটি অপমান ও আত্মধিক্কারের পথ পরিক্রমা করে নিশি আশ্রয়ের জন্য প্রেমিকা হিরণের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল, সে কিন্তু তাকে দেখে হিরণের বিস্মিত হওয়ার আঘাত হজম করতে পারেনি, গ্লানি আরো বেড়েছিল। অনেক পরে কিছুটা সহজ হয়ে অপ্রত্যয় ও দ্বিধা নিয়ে হিরণকে জিজ্ঞেস করে : 'সত্যি করে বলতো আমাকে দেখে চমকে ছিলে কেন?' গল্পের অন্তিম বাক্যটিতে হিরণ অস্ফুটে উত্তর দেয় : 'বাঃ আমি যে জানতুম তুমি আসবে।' তখনই রবীন্দ্রনাথের রক্তন-নন্দিনী অমল-সুধার কথা মনে পড়ে যায় আর এক বাটি কাচ স্বচ্ছ জলে এক ফোঁটা মেজেন্টা রংয়ের কায়দায় মনটাকে অধিকার করে নিতে থাকে।

অমল মুখোপাধ্যায়

বিশ্বাসের ভূমি থেকে

নরেশ গুহ

'দুরন্ত দুপুর' আর অনেক বছর পরে 'তাতার সমুদ্র ঘেরা', এই দুটি বই নিয়ে নরেশ গুহ। চল্লিশ দশকের সেই কবি, যিনি অতি লিখনে বিশ্বাসী কোনদিনই নন, নীরবতার স্বেচ্ছা নির্বাসনে আত্মসুখ থেকে প্রেরণা তাড়িত হয়ে কবিতা লিখেছেন, এখন লেখেন কালে ভদ্রে, কিন্তু থেমে যাননি একেবারে।

এই বর্ষীয়ান কবির ধ্যানজ মুগ্ধতা, একার সঙ্গে একার সংলাপ, পাঠককেও আত্মগত অনুভূতির আলো অন্ধকারে নেমে গিয়ে কান পেতে শুনতে হয় শব্দের অন্তরালাশ্রয়ী নৈঃশব্দ এক একটা অভিজ্ঞতা উপলব্ধির সত্যে উঠে আসে কিভাবে নিজের মধ্যে অনুভব করতে হয়, করতে করতে গলা ভারি হয়ে ওঠে, বিষণ্ণতা ও আনন্দ প্রতিধ্বনির মতন ঘুরতে থাকে মাথা কোটে।

শব্দ সংস্থান নরেশ গুহর এ পর্বের কবিতায় প্রবচনের অমোঘ চরিত্র অর্জন করেছে; যে পরিণতি আমরা একজন পরিশ্রমী কবির কাছ থেকে আশা করি তা তিনি পূরণ করেন, করেছেন। যদিও বিষয় নির্বাচনে বিস্তৃত জীবনের চেয়ে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিয়েছেন বেশী; এই প্রবণতা তাঁর স্বভাবেরই মধ্যে নিহিত; রোমান্টিক কবি নিজের ভান্ডে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখেছেন, এই দৃষ্টি তাঁর কবি দৃষ্টি, এই তাঁর ব্যক্তিক দর্শন—যা একজন কবিরই হতে পারে। 'তাতার সমুদ্রে ঘেরা' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে বয়সের ভারাতুর বিষণ্ণতা পটভূমি রচনা করেছে, আর মাঝে মাঝেই নিশ্চিত নিয়তির স্থির সৌম্য অবস্থান উপলব্ধি করেছেন কবি, কখনো তাকে বিনা প্রতিরোধে আমন্ত্রণ করেছেন, কখনো তার সর্বগ্রাসী অবলুপ্তির অন্ধকারময়

সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে ব্যক্তি ও মানবের উদাসীন সংগ্রামকে অনুভব করেছেন; কখনো তার কবিতায় নৈরাশ্য দেখিনি, যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা 'বিষাদ' তথাপি জীবনের অফুরন্ত আনন্দের আয়োজনকে ফিরিয়ে দেননি কখনো

'অন্য কোন অপার্থিব খুঁজবে ঊর্ধ্বে
নীলিমার শূন্যে?
সবই কি এখানে নেই, আবর্তিত নর-নারীর
...উদ্গত অশ্রুতে কেনা পুণ্যে?
অনিঃশেষ শেষ দেখা চোখ ফেরে না,
এমন, আশ্চর্য
মর্ত্যজীবনের পারম্পর্য।
...সাধ নেই, সাধ্য নেই এ-ক্ষণিক
আনন্দের শত্রুতা সাধতে পারবো না।

এই অসামান্য উচ্চারণে যে জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ধরা পড়েছে বিষাদের জন্ম এখান থেকে, কবি অনুভব করছেন 'অদৃশ্য বায়সে খায় সময়ের যে-যে ফল পাকে।'

'কী করে ডোবাই প্রাণ মৃত্যুময়তার অপাপোপেশ। অথচ কী করে বলি—ভুঁই হুঁ মম শ্যামসমান?'

এই মৃত্যুবোধ নরেশ গুহর এ পর্বের কবিতায় নানাভাবে অনুভূত হয়েছে; আর ব্যক্তি হিসেবে তিনি বেদনা অনুভব করেছেন সামর্থ্যের অভাবের জন্য, যে সামর্থ্য থাকলে তিনি মৃত্যু-প্রোথিত জীবনকে ভয়ংকর ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কবির মতো অসহায় আর কে? তিনি ভালোবাসেন বলেই অক্ষমতায় কেঁদে ওঠেন অসহায় মানুষের দুঃখে কাঁদা ছাড়া কীই বা করার আছে তাঁর?

তবু না কি মধুময় এ বিশ্বের
ভোরভরা লাশ।
শিশুর ঝলসানো চোখ তবু নাকি
ক্ষমা করে যাবে?
পবিত্র পদ্মের দল ডিতে নেবে
নবরক্তস্নানে
প্রাণের নীলিমা নাকি ধুয়ে রাখবে
সর্বংসহা আকাশ।

স্বদেশে তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন, আর সমস্ত আঘাত সহ্য করেছেন একা একা তাই কবিতার উচ্চারণ এতো মৃদু যেন কান পেতে শুনতে হয়। এমন সরল শিল্প-মণ্ডিত স্বাভাবিক কবিতাগুচ্ছ পাঠ করা একটা বিরল অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে প্রিয় পাঠককে আমন্ত্রণ জানাই।

তাতার সমুদ্র ঘেরা। নরেশ গুহ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ কলকাতা-১। ৯।

কবিতার কাছে দাঁড়িয়ে গল্প

বনতুলসীর মেয়ে। শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। আবর্ত প্রকাশনী, ২।৪৩ মাকতলা, কলকাতা-৯।

সাহিত্য পত্রিকায় শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা পড়েছি, গল্প তেমন পড়ি নি। কিন্তু এই গল্পগ্রন্থটি পড়েই হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম। এমন একটি নিজস্ব স্টাইল নিয়ে এসেছেন তিনি এখানে, যা সহজের আড়ালে নতুন কিছু অনুভব। অনেকটাই কবিতার কাছে দাঁড়িয়ে গা ঘেঁসে উচ্চারণের ভঙ্গীতে তিনি গল্প বলেছেন।

বিষয় হিসেবে চারপাশে ঘটমান সত্য ও নিত্যঘটিত সত্যই বেছে নিয়েছেন তিনি। ঘটনা হিসাবে তার তাৎপর্যটুকু নিয়েছেন, বিস্তারটা নয়। দু একটা গল্পে অবশ্য বিস্তারও আছে; তবে বলার মতন, দেখার মতন, অনুভব করার মতন মন সব গল্পগুলোর পেছনেই সক্রিয়। প্রতিশোধ, ক্ষুধা চোর, দাঁড়াচ, চাসনালা, বনতুলসীর মেয়ে, শাসন, ভিখারী ইত্যাদি গল্পে এক একটি মুডের প্রকাশ ঘটেছে। তবে দু এক জায়গায় ব্যতিক্রম আছে—পরিক্রমা, স্খলন কিংবা তিন পুরুষ গল্পে শুধুমাত্র মুডই নয় সার্থক বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়ে একটি কাহিনী সৃষ্টি করেছেন।

বন্ধুত্ব সত্ত্বেও সমালোচনা

সাহিত্য পত্রিকার পরিচয় ও রচনাপঞ্জী : ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক। সাহিত্যশ্রী। ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা-৯। দাম বারো টাকা।

বাংলা সাহিত্য ও সাময়িকপত্রের ইতিহাসে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা অনন্য। এই দীর্ঘায়ু পত্রিকাটি এক সময় রবীন্দ্র-বিরোধিতার ভূমিকায় ছিল অগ্রণী। সমকালীন দিকপাল সাহিত্য সাধকদের সঙ্গে সুরেশচন্দ্রের বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁদের সমালোচনায় কখনও পিছিয়ে থাকেননি। রক্ষণশীল সুরেশচন্দ্র বাঙলার সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর পত্রিকায় অসংখ্য রচনা প্রকাশ করেছিলেন। যার মূল্য থাকবে বহুকাল।

এই মূল্যবান পত্রিকাটি নিয়ে কাজ করেছেন ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক। গ্রন্থটির প্রথমেই কিছু দরকারী আলোকচিত্র এর গবেষণা মূল্য বাড়িয়েছে। একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন ডঃ ভৌমিক। যার মধ্যে আছে তাঁর পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠাবান গবেষকের বিস্ময়কর শ্রম। সত্যিকারের গবেষণা যে কি বস্তু, বর্তমান গ্রন্থে তা সুস্পষ্ট। পরবর্তী অংশে 'সাহিত্য' পত্রিকার ১২৯৭, বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩৩০, বৈশাখ সংখ্যা পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রকাশিত সংখ্যার লেখক ও রচনাসূচীর তালিকা সংযোজিত হয়েছে। একটি বিশেষ পত্রিকা কিভাবে সমকাল, পূর্বকাল ও উত্তরকালের বাঙালী মণীষা ও মনীষীকে জনসমাজের সামনে আনার সুযোগ করে দিয়েছে, বর্তমান গ্রন্থটি তার তথ্যের সমস্ত দিক তুলে ধরে। গ্রন্থটি সাহিত্যরসপিপাসু ও গবেষক উভয়েরই সংগ্রহ-যোগ্য।

দিশাকাক

বিমলেন্দু চক্রবর্তী। চারুবাক। ২২।২এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৩। সাত টাকা।

সেই সুপ্রাচীনকালে, সুসভ্য বাঙালীরা সমুদ্র পথে সারা দুনিয়া জুড়ে ব্যবসা করতে যাবার সময় সঙ্গে অবশ্যই কাক নিয়ে যেত। কাকরা তাদের ডাঙ্গার দিশা দিত। দেশের কাছে এসে উড়ে গিয়ে বেশ আগেভাগেই গঞ্জের ব্যবসায়ীদের কাছে ও আত্মীয়স্বজনকে তাদের আগমনবার্তা জানিয়ে দিত। এই কাকের বিদেশে এত কদর ছিল যে বাবেরু মানে ব্যাবিলন নামক নগরে এক একটা কাক একশ কাহন কড়ি দামেও বিক্রি হয়েছে।... কাক-সংক্রান্ত ইত্যাদি সব বিচিত্র তথ্যে বড়রাও চমকে উঠবেন। মাঝেমধ্যেই কাকতালীয় সব ঘটনা ঘটিয়ে আর বিদগ্ধ চরিত্র এনে আরও চমক দেওয়া হয়েছে। তবু একটানা একটা কাহিনী না থাকার দরুণ যাদের জন্যে এই বইটি সেই ছোটরাই এই বইটি পড়তে কতটা আনন্দ পাবে সে-বিষয়ে বেশ সন্দেহ আছে।

অন্য দ্রাঘিমা

নীলাদ্রি বিশ্বাস। প্রকাশক : সাধনা বিশ্বাস। রামচন্দ্রপুর, গোপালনগর, ২৪ পরগণা। চার টাকা।

গেঁড়ি-গুগলি কাছিম ওলকচু ইত্যাদির সংগ্রহ করে ও বেচে কি জন খেটে, আধপেটা কি উপোসে যাদের বেঁচে থাকা এমন কিছু মানুষের দুঃখ, দারিদ্র, সুখ, প্রেম ইত্যাদি সবকিছুই উপন্যাসে এসেছে। কিন্তু ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে। পাঠককে যেখানে তৃপ্ত করার সুযোগ ছিল, লেখক সে সুযোগ হারিয়েছেন। সব 'মাত্রাছাড়া গোছের চলিত' শব্দ বাক্য ব্যবহার করার সময় লেখকের মনে রাখার দরকার ছিল তাঁর লেখা যাঁরা পড়বেন তাঁদের কাছে অনেকক্ষেত্রেই ওইসব শব্দ দুর্বোধ্য হতে পারে। কোথাও আবার দেখা গেছে মাত্রা ছাড়া সাধু ভাষার প্রয়োগ। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ উন্নত হওয়া দরকার ছিল।

লেখক যে সুযোগ হারিয়েছেন
মাত্রা ছাড়া গোছের চলিত

কবি সম্মানিত

সম্প্রতি শেকসপীয়ার সরণীতে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিভিন্ন 'কোরাস' লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে তরুণ কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালকে সম্মানিত করা হল। ঐ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। একালের প্রতিষ্ঠিত অনেক তরুণ কবি পার্থপ্রতিমের কবিপ্রতিভা নিয়ে আলোচনা ও কবিতা পাঠ করেন। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গৌতম চৌধুরী, মৃদুল দাশগুপ্ত, রাধানাথ মণ্ডলের আলোচনা উল্লেখ করার মত। অনুষ্ঠানে সভাপতি কালিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তরুণ কবি পার্থপ্রতিমের একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

থাকলে ভালো হতো

দিগ্বিজয় দিকপতি

ছাপানো কার্ডে অন্তত তাই-ই লেখা ছিল। রোববার বেলা তিনটেয় শুরু গ্যালারী-এ আয়োজিত চলমান শিল্পের কবিতা পাঠের আসর, চৌরঙ্গীর রঙিন গম্বুজে। 'মাঘেই কেন শীতের যাই যাই' সংবাদপত্রে কারা যেন আক্ষেপ করেছিল। রোববারের শীত-কনকনে দুপুরে তারা নিশ্চিত আশাতীত সান্ত্বনা পেয়েছে। আমি সেই কনকনানি শীতের দাপাদাপি আক্রমণের ভেতর দিয়েই ছুটছিলাম দুর্মূল্য রোদ ঠেলতে ঠেলতে। ময়দানের খোলা বুকে তখন অগুন্তি মানুষ। আর তাদের পিঠে মাঘের আমেজী রোদ। তারা দাঁতে আখের খোসা ছাড়াচ্ছিল, ছোলা চিবোচ্ছিল এবং তাস পিটছিল কেউ কেউ। আমার তখন ঊর্ধ্বশ্বাস ছুট—টার্গেট রঙীন গম্বুজ।

ঘড়ির কাঁটা তিন ছুঁয়ে ফেলল। রঙীন গম্বুজ জুড়ে তখনও হাহা প্রান্তর। এক দুজন কবি অথবা কাব্যানুরাগী ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে। খিলানে খিলানে ঝোলানো হাতে আঁকা ছবি। লিটল ম্যাগাজিন। কোথাও লটকানো বিজ্ঞপ্তি। ঘড়ির কাঁটা সোয়া তিন সাড়ে তিন ছাড়িয়ে গেল।

আস্তে আস্তে কবিরা আসছেন। কেউ উত্তর আবার কেউ দক্ষিণ থেকে। কেউ বাসের অথবা ট্রামের থেকে নেমে জোরকদমে, কেউ শ্লথ পায়ে। দুজন কবি অথবা কাব্যানুরাগী এলেন স্কুটারে। কবিদের মধ্যে মহিলা কবিও আছেন অথবা কাব্যানুরাগীও হতে পারেন।

চারটেতেও অনুষ্ঠান শুরু হোল না। আমি অধৈর্য। একজন উদ্যোগী কবিকে পাকড়াও করলাম খবর জানতে। খবরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁকে আনতে গেছেন। তিনিই সোমনাথের কবিতা নিয়ে আলোচনা করবেন। আমার একটু অন্যত্র একটা কাজ ছিল শুনে উদ্যোগী কবি মানুষটি বললেন আপনি বরং ঘুরে আসুন ওখান থেকে আমাদের একটু......। বুঝলাম দেবালয়ের ঢাকনা খুলতে এখনও দীর্ঘ বিলম্ব। অগত্যা অন্যত্র।

ফিরে এসে দেখলাম সাড়ে চারটেতেও আলোচক আসেন নি। এদিকে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় কবিতা পাঠ শুরু করেছেন। অনেক কবিতা পড়ে গেলেন। এই মুহূর্তে দুটি একটি লাইন মনে পড়ছে যেমন, 'যুবতী মেয়ে দেখলে মনে পড়ে যায় সুতপার হাসিমুখ' কিংবা 'শুধু মিথ্যার আড়ালে ক্ষীণ বেঁচে আছি' অথবা 'মরে গেছি না বেঁচে আছি—কিছু বুঝতে পারছি না'। শুনলাম কবিকে আগেই আসলে পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন সমর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক দফার পাঠ শেষ হতেই সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে আলোচনা। আলোচক দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে সোমনাথ তাঁর কবিতায় যৌনতায় বিশ্বাসী—যদিও যৌনস্তরের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারেন নি। তুলনায় সোমনাথের কবিতায় গরীবীর দিকটা জ্যান্তো। প্রচার নেই। শুধু যেন 'জীবন থেকে নেয়া'। তাই জীবনের গন্ধে ভরা। শব্দ প্রয়োগেও তেমন কৌশল নেই। একই শব্দ বারবার ব্যবহার করেছেন। শব্দের নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে পারেন নি। এই গুলোই সম্ভবত দেবপ্রসাদবাবুর মোদ্দা কথা ছিল।

প্রায় পাঁচটায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এলেন। এবং দ্বিতীয় দফার কবিতা পাঠ হতেই আলোচনা শুরু করলেন। বললেন, এভাবে আট-দশটা কবিতা এক নিঃশ্বাসে শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তার উপর আলোচনা সম্ভব নয়। উনি নিজে সোমনাথের কবিতা আগেও পড়েছেন তাই সেই ধারণা থেকেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। সোমনাথের কবিতার মধ্যে কাহিনী সূত্রের কথা, চরিত্রের কথা বললেন। প্রথম লাইনেই একটা আকর্ষণীয় টান আছে তা-ও বললেন। শব্দ ব্যবহারের বিশিষ্টতার কথাও বললেন। প্রসঙ্গে একটা লাইন বেশ ভালো লাগল, 'কবিতা শব্দ নির্ভর শিল্প'। আজকাল আর দার্শনিকতা নির্ভর কবিতা হয় না, আমি নিজেও শুধু দার্শনিকতা নির্ভর কবিতা লিখতে পারি না এমন সব কথাও শুনলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনায়।

এরপর সোমনাথের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে উঠলেন দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনার মধ্যে দুটি গল্প শুনিয়েছেন। দুটিরই পটভূমি বীরভূমে। তাঁর চোখে তিনি আগেকালের রোম্যান্টিক, প্যাসনেট খুব বেশি আত্ম নাটক-সর্বস্ব কবিতার থেকে সোমনাথের কবিতাকে সরে আসতে দেখেছেন। তিনি বললেন, 'সোমনাথের কবিতা থেকে বুঝতে পারি জেনুইন নিজের কথা বলছে।' সে 'অ্যান্টি-হিরো' কবিতা লিখছে আজকের নাটকের মত।

এর পর সোমনাথের কবিতায় যৌনতা নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার আগের বক্তব্যেই অটল। সমরবাবুও সোমনাথের কবিতায় যৌনতার বিষয়ে আশংকার কিছু দেখলেন না। দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন সোমনাথের কবিতায় যৌনতা থাকলেও তাতে পর্ণোগ্রাফী নেই। আর সেই মুহূর্তে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটা ধারালো মন্তব্য ছাড়লেন দেবাশীষের মন্তব্য ছুঁয়ে......থাকলে ভালো হোত।

আমি রঙীন গম্বুজের চত্বর ছেড়ে চললাম। সোমনাথের কবিতার আলোচনায় নিয়ে অন্ধকার ময়দান তখন উথাল-পাথাল।

চিঠি পত্র

প্রথম প্রবাসের লেখক ও অভিনন্দন
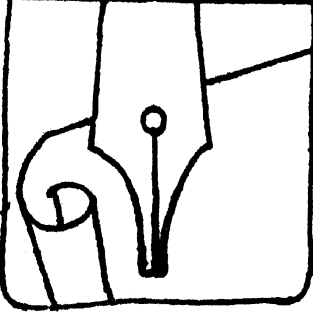
আপনার অমৃতে পত্রিকায় শ্রীবুদ্ধদেব গুহ মহাশয়ের 'প্রথম প্রবাস' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ায় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং লেখক মহাশয়কেও আমার নমস্কার জানাচ্ছি। এ লেখাটি নিঃসন্দেহে সাগরপারের মানুষগুলো সম্বন্ধে আমাদের জানার কৌতূহলকে অনেকখানি পূরণ করেছে। এ লেখাটি পড়ার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। 'অমৃত' হাতে পাওয়া মাত্রই আমি 'প্রথম প্রবাস' এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলতাম। লেখক শ্রীবুদ্ধদেব গুহ বাংলা সাহিত্যের একজন কৃতী লেখক। 'প্রথম প্রবাস' নিঃসন্দেহে লেখকের একটি বলিষ্ঠ বাস্তবধর্মী রচনা। 'প্রথম প্রবাস' বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।

লেখকের নিকট আমার অনুরোধ তিনি সুস্থ হয়ে যেন কানাডা, ইউ-এস-এ এবং হাওয়াই, জাপান ও থাইল্যান্ড নিয়ে পরবর্তী পর্ব অমৃতের জন্য লেখেন। আমরা ঐ লেখা পড়ার জন্য অপেক্ষায় রইলাম। **—সমীরকুমার চাকী**, সিঙ্গুর, হুগলী।

(২)

অমৃতের ৩৬ সংখ্যাটি পড়ে একটা আনন্দমিশ্রিত বেদনা অনুভব করলাম। আনন্দ পেলাম শ্রীবুদ্ধদেব গুহ মহাশয়ের 'প্রথম প্রবাস' এই ধারাবাহিক উপন্যাসটির শেষ সংখ্যাটি পড়ে, যে আনন্দ এই মনোগ্রাহী ভ্রমণ উপন্যাসের প্রতিটি সংখ্যা পড়েই পেয়েছি, যেটির জন্য সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থেকেছি এবং মাঝখানে যেটির প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম, বেদনা অনুভব করলাম সেটি সমাপ্ত হল বলে।

শ্রীবুদ্ধদেব গুহ মহাশয়কে আমাদের অনুরোধ তিনি যেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁর ভ্রমণ পর্বের পরবর্তী অংশের বিবরণটুকু আমাদের উপহার দিয়ে আনন্দদান করেন। **—দীপালি চট্টোপাধ্যায়**, কলকাতা-১৯।

(৩)

আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। দেশ ভ্রমণ মাত্র দীঘা ও শান্তিনিকেতন। ভবিষ্যতে হয়তো দার্জিলিং পর্যন্ত গেলেও যেতে পারি। লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস আমরা কল্পনাতেও আনি না। বুদ্ধদেব গুহের 'প্রথম প্রবাস' পড়ে ইউরোপের ওপর মোটামুটি একটা ধারণা করে নিলাম। 'প্রথম প্রবাস'-এর প্রথম পর্বের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বিতীয় পর্বের প্রতীক্ষায় রইলাম! **—বিক্রমজিৎ হালদার**, কলকাতা-৬৯

(৪)

'অমৃত' পত্রিকায় শ্রীবুদ্ধদেব গুহের লেখা 'প্রথম প্রবাস' বেশ ভালো লাগছে। এজন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাই।

আর একটি বিনীত অনুরোধ জানাই আপনাদের কাছে। আগামী মাসে কলকাতায় ফুটবল লীগের খেলোয়াড়দের দলবদলের পালা শুরু হবে। এই প্রসঙ্গে নতুন খেলোয়াড়দের আসা এবং পুরনো খেলোয়াড় চলে যাওয়ার পর যদি প্রত্যেক দলের শক্তি নিয়ে আলোচনা করেন তবে খুবই খুশী হব। **—ইব্রাহিম বক্‌স**, নীলগঞ্জ, ২৪ পরগণা।

(৫)

আমি 'অমৃত' নিয়মিত পড়ি। কারণ অমৃত আমার কাছে আমার প্রিয় লেখকের লেখা উপস্থিত করে। যেমন এখন বুদ্ধদেব গুহের 'প্রথম প্রবাস' উপন্যাস উপস্থিত করছেন। ইনি আমার প্রিয় লেখক। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি 'প্রথম প্রবাস'-এর পরবর্তী অংশ পড়ার জন্য। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি এত সুন্দর ও সাবলীল যে মনে হয় আমিও যেন তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করছি। আমি আশা করি 'অমৃত'ভবিষ্যতেও যেন লেখকের আরো নতুন নতুন রচনা সম্ভার আমাদের উপহার দেন। সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তিনি যেন আমার অভিনন্দন লেখকের কাছে পৌঁছে দেন। **কালীপদ চক্রবর্তী**; ফিডার রোড, কলকাতা—৭০০০৫৬।

বাংলা উপন্যাসে গ্রাম

'বাংলা উপন্যাসে গ্রাম' লেখাটিতে বৈকুণ্ঠ পাঠকের যে সাহস ও যুক্তিপূর্ণ পর্যালোচনা দেখা গেছে, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

আমি বলি—যেসব উপন্যাসের কথা আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে, যেগুলি বারবার পড়তে ইচ্ছে করে, যেগুলি কালজয়ী—বৈকুণ্ঠ পাঠক বেছে বেছে সেই নামগুলিই বলেছেন। আমার মনের সঙ্গে এখানেই মিল।

তবে, আমিকও আছে। তাই কি শু... এখনো বাংলা উপন্যাসে সাবালকের চেহারা পায়নি? এ জিজ্ঞাসা কেন? কলকাতা-... অসীমকুমার বসু যেমন বেশ কিছু শহর ভিত্তিক ভালো উপন্যাসের নাম বলেছেন আমিও বলছি ... ধনঞ্জয় বৈরাগীর ... পুতুল সাগরে', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল তুমি আলেয়া', 'পায়ে পায়ে' প্রতিধ্বনি প্রফুল্ল রায়ের 'এখানে পিঞ্জর' সমরেশ বসুর 'অপরিচিত' এসব উপন্যাসও তো রয়েছে।

এত দিন অমৃত সম্পাদকের যে উদার মনোভাবের কথা অনুমানে ধরা যেত, গত ... জানুয়ারীর সংখ্যায় তা আপনি লিখিতভাবে জানিয়ে দিলেন। অমৃত চিরকালই নতুন ও তরুণ লেখকদের ভালো লেখা কবিতা, ছোট গল্প, ফিচার, উপন্যাস প্রকাশ করেছে। অনেক আগে বলতে গেলে নতুন ও তরুণ লেখকের তাঁদের ভালো লেখাই অমৃতকে দিয়ে এসেছেন। আপনার এই স্বাগত সম্ভাষণ বিনীত আহ্বানে ও তাঁরা আরো বেশি করে দেবেন, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি। **—বিশ্বজিৎ ঘোষ**, হাওড়া

লিট্‌ল ম্যাগাজিন

৪ ফেব্রুয়ারীর অমৃতে দিগ্বিজয় দিকপতির 'লিটল ম্যাগাজিন : কিছু ঘনিষ্ঠ ভাবনা' লেখাটি পড়লাম। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি দিগ্বিজয় দিকপতি ও অমৃত পত্রিকাকে।

এ রকম লেখা আরও যাতে পড়তে পারি তার জন্য অনুরোধ রাখলাম। **—দেবেশ চক্রবর্তী**, কলকাতা-৩১

ইছামতীর জলে ঘোলা :: চারিধারে শ্যামল ::

সাহিত্যে প্রতিভার আবির্ভাবের পরিচিত নানা রাস্তার কথা বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরা বলে থাকেন। কিন্তু পরিচিত সব ফরমুলা নস্যাৎ করে দিয়েই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব।

ভাষার দিক থেকে স্বদেশী ও ভাবের দিক থেকে বিদেশীদের গুরু করেছিলেন বঙ্কিম। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্য চর্চার একটা ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণ চাপা থাকেনি। কিন্তু বিভূতিভূষণ?

'বিচিত্রায় পথের পাঁচালী ছাপা শুরু হতেই বাঙালী পাঠক চমকে উঠেছিলেন। বিচিত্রার সম্পাদকের দপ্তরে অনেকে খোঁজ নিয়েছিলেন—কে এই বিভূতিভূষণ? কোথা থেকে কোন পথ দিয়ে এলেন? কোনো দলের নন, কোন গোষ্ঠের নন। চিরা-চরিত ধারাকে ডিঙিয়ে হাজার হাজার পাঠককে মুগ্ধ করে টেনে নিয়ে চলেছেন—দেখিয়েছেন নিশ্চিন্দপুরের লতাগুল্মের শ্যামশোভা, নীলকণ্ঠ পাখি, সেই পথটা যেটা চিরকাল ধরে চলে গেছে রামায়ণ-মহাভারতের দেশে। চিনিয়েছেন সেই মুহূর্তটি যখন 'ছায়াভরা বৈকালটিতে, নির্জন বনের দিকে চাহিয়া, তাহার অতি অদ্ভুত সব কথা মনে হয়। অপূর্ব খুশীতে মন ভরিয়া ওঠে মনে হয় এরকম লতাপাতার মধু-গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে যেন একবার আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে; মনে হয় একটা কিছু যেন ঘটিবে, এই দিনগুলি বুঝি বৃথা যাইবে না।'

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের যথার্থ আবির্ভাব ঔপন্যাসিক হিসেবে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৫ সনের আষাঢ়ে শুরু হয়ে ১৩৩৬ সনের আশ্বিনে পথের পাঁচালী প্রকাশ শেষ হয়। বই হয়ে বেরোয় ১ নভেম্বর, ১৯২৯।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পথের পাঁচালী যে অভিনন্দন পেয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে এখন ইতিহাস। একজন সমালোচক লিখেছেন: 'বাংলা দেশের পাঠক ও লেখক সমাজ যুগপৎ বিস্ময়ে হতবাক হল। বিভূতিভূষণ বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলেন। একটিমাত্র উপন্যাস রচনা করেই এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ সাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশী চোখে পড়ে না।'

জন্ম পত্রিকার টান

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ১৩০১ সালের ২৮শে ভাদ্র বুধবার শ্রবণা নক্ষত্রে কৌলবকরণ অতিগণ্ড যোগে, মকর রাশি দেবগণ ও শূদ্র বর্ণ নিয়ে ২৪ পরগণার মুরাতিপুর গ্রামে এক উদাসীন পিতার ঘরে বিভূতিভূষণ জন্ম নেন। মা মৃণালিনীর প্রথম সন্তান বিভূতিভূষণ, তাই মামাবাড়িতেই তাঁর জন্ম-শঙ্খ বাজে।

পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন দারিদ্র্য, কবি-হৃদয়, ভবঘুরে প্রকৃতি আর বেড়ানোর নেশা। কয়েক বছর আগে বিভূতিভূষণের একমাত্র সন্তান যুবক তারাদাস চিকিৎসার জন্যে গিয়েছিলেন ডঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে। রোগ নির্ণয় এবং ওষুধের বিধান দেওয়া হয়ে গেলে আবীরলাল তারাদাসের পায়ের গুলিটি দেখতে চান। তারাদাস অবাক হলেও দেখিয়েছিলেন। আবীরলাল দেখেও নিরাশ হয়েছিলেন। কারণ বিভূতিভূষণের সুবিখ্যাত সেই হাঁটুরে পায়ের গুলিই নাকি তারাদাস পায়নি। বিভূতিভূষণের শিক্ষকতা-জীবনের স্নেহভাজন ছাত্র আবীরলালের কাছ থেকে তারাদাস জেনেছিলেন, প্রতিদিন অন্তত দশ মাইল হাঁটা বিভূতিভূষণের ছিল নিত্যকাজ।

১৯৫০ সালে বিভূতিভূষণের আচমকা মৃত্যুর সময় ছেলে তারাদাসের বয়স ছিল তিন। তিন বছর বয়সের কোনো স্মৃতি মানুষের থাকে কিনা তারাদাস জানেন না। কিন্তু আজও চোখ বুঝলে ছবির মত তিনি দেখতে পান বিভূতিভূষণের কাঁধের দুপাশ দিয়ে দুটি পা ঝুলিয়ে দিয়েছে তাঁর শিশুপুত্র বাবলু—বাবার ঝাঁকড়া চুল সমত্নে চেপে ধরে শিশু নিশ্চিন্ত। বিভূতিভূষণ হেঁটে চলেছেন ঘাটশিলার নির্জন

বিভূতিভূষণের দু'খানি চিঠি

শালবনের পথ ধরে। হাতে শালপাতার থালা। তাতে কিনে নিয়েছেন কাঠি গজা। চলতে চলতে একটি নিজের মুখে পুরছেন, দ্বিতীয়টি মাথার ওপরে বাবলুর জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র বিভূতিভূষণ নিষ্ঠার সঙ্গে লেখাপড়া করেছেন। ১৯১৪তে ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশান, ১৯১৬ ইন্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট ডিভিশান, ১৯১৮ বি এ তে ডিস্টিংশান। কাজের দিক থেকে শিক্ষকতা, মানুষের দিক থেকে শিশু ও কিশোরদের তিনি খুবই ভালবাসতেন। ইছামতীর জলে তাঁর কাঁধে চড়ে যারা সাঁতার শিখেছেন, চাঁদনীরাতে তাঁর কাছ থেকে গল্প শুনেছেন আফ্রিকা ও আমেরিকার বন বনান্তের, জেনেছেন নক্ষত্রলোকের বিচিত্র কাহিনী —বিভূতিভূষণের নিজের গ্রাম বারাকপুরের সেই শিশু ও কিশোররা এখন প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় এসে পড়েছেন। স্মৃতি-কথা বলার সুযোগ পেলেই মুখর।

ভালবেসেছিলেন নিজের গ্রামাঞ্চলকে, পল্লীপ্রকৃতির শোভা। সেখানকার সহজ সরল মানুষগুলিকে। কিন্তু জন্মপত্রিকার লিখনে, জীবিকার টানে তাঁকে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছে। আর্থিক অনটনে এম এ এবং ল' ক্লাশে ভর্তি হয়েও পড়াশুনো ছাড়তে হল। জাঙ্গীপাড়ার স্কুলে চাকরি নিলেন। সেখান থেকে এলেন সোনারপুর হরিনাভিতে। এরপর কিছুকাল গোরক্ষিণী সভার প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন। খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা এবং ঘোষ সাহেবের সেক্রেটারীর কাজ করলেন কিছুকাল। তারপর অবশেষে এসে পড়লো সেই অদৃশ্য নিয়ন্তার ডাক। যার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অ-সাধারণ উন্মেষ সাধিত হবে, সেই বিভূতিভূষণ খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে গেলেন ভাগলপুরের জঙ্গলে। সেই দুঃখ-ভরা দিনগুলির কথা আরণ্যক উপন্যাসে আছে। লিখেছেন :

'জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ, লাইব্রেরী থিয়েটার সিনেমা গানের আড্ডা—এসব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরীর কয়েকটা টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্ব আকাশে সূর্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরের রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার ঘন্টাব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা হইল আমার পক্ষে মহা-সমস্যা। কাজকর্ম করিলে অনেক করা যায় বটে, কিন্তু আমি নিতান্ত নব আগন্তুক, এখনও [illegible] করিয়া এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, কাজের কোন বিলি ব্যবস্থাও করিতে পারি না, নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়েকখানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোনরকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভাল বুঝি তাহাদের কথা। প্রথম দিন দশেক কি কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরীতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল।.... কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ জীবন আমার জন্য নয়।'

সত্যিই সে জীবন যুবক বিভূতিভূষণের জন্য ছিল না। ছিল বাংলা সাহিত্যের এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। প্রবাসের বেদনা আর গৃহকাতর মন তাঁর চোখের সামনে এনে দিল স্বপ্নময় শৈশব, গ্রামবাংলার নিসর্গ শোভা, বাবা মা, আত্মীয়স্বজনের বিষাদক্লিষ্ট মুখ। এই বেদনা থেকেই জন্ম নিয়েছে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের-ধারণা তছনছ করে-দেওয়া উপন্যাস—পথের পাঁচালী।

ভাগলপুর থেকে কলকাতায় ফিরে বিভূতিভূষণের সাহিত্য জীবনের যাত্রা শুরু। বিচিত্রায় পথের পাঁচালীর ধারাবাহিক আত্মপ্রকাশ ১৯২৮ থেকে। এই সময় আবার স্কুলে শিক্ষকতা। খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে। থাকতেন মির্জাপুর স্ট্রীটে। মেস বদল করে করে এলেন ৪১নং মির্জাপুরে। এখানে সঙ্গী পেলেন বাংলা ও ইংরেজী ভাষার দুই দিকপাল লেখককে। একজন ঠাকুরমার ঝুলি খ্যাত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। অন্যজন কন্টিনেন্ট অব সার্সি খ্যাত নীরদ সি চৌধুরী। উভয়ের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা লাভ করেছিলেন বিভূতিভূষণ। পারস্পরিক প্রভাবও যে নেই তা বড়াই করে বলা যায় না। মনের গোপনতম অনুভূতি নিঃশেষে প্রকাশের ক্ষমতা তিনজনেরই আয়ত্তে। একজন রূপকথায়, একজন জীবনকথায়, আরেকজন জীবন সত্যের উদ্ঘাটনে।

অশ্বমেধের ঘোড়া

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হল। এই সঙ্গে বইয়ের বাজারও ভাগ হলো। স্কুল কলেজ পাঠাগার বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশে অনেক বেশী ছিল। ১৯৫০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের বইয়ের বাজার এদিককার বইয়ের জন্য খোলা ছিল। সে-বছরেরই শেষদিকে পশ্চিমের বই পূর্বে যাওয়া পাকাপাকি বন্ধ হল। বলাবাহুল্য পশ্চিম বাংলার প্রকাশন সংস্থাগুলি বড় রকমের আঘাত পেল। এই দুঃসময়ের প্রকাশন সংস্থাগুলিকে ধাক্কা সামলে উঠতে সাহায্য করেছিলেন যাঁরা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ভেতর এক নম্বর। বিভূতিভূষণের অশ্বমেধের ঘোড়া কোথাও বাধা পায়নি।

পথের পাঁচালী বাঙালী পাঠকের প্রাণমন চুরি করে নিয়েছিল। সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই প্রাণমন চুরি করে নেওয়ার পালাটা গোপনে গোপনে অভিনীত হয়ে চলেছে গত সাতচল্লিশ বছর ধরে—ধীর কিন্তু স্থির গতিতে।

পথের পাঁচালীর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে কিছু দেরী হয়েছে সন্দেহ নেই। প্রকাশিত হয়েছে আশ্বিন ১৩৩৯ (১৯৩২)। কিন্তু জনপ্রিয়তার প্রথম ঢেউ বুঝতে দেরী হল না। ১৯৪৪ সালে ছোটদের জন্য পথের পাঁচালীর দুটি সংস্করণ বার করতে হল। একটি ছোটদের পথের পাঁচালী, অন্যটি আম আঁটির ভেঁপু। বাঙালী পাঠকের মনে পথের পাঁচালীর স্থান কোথায় দাঁড়াবে তার একটা আঁচ এখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত পথের পাঁচালী যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা বিস্ময়কর। গীতাঞ্জলির কথা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। গীতাঞ্জলিকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের আর কোনো গ্রন্থ এই জনপ্রিয়তায় অধিষ্ঠিত কিনা সন্দেহ জাগে।

প্রকাশন সংস্থা মিত্র ও ঘোষ ১৯৫০ থেকে পূর্ণ অধিকার নিয়ে পথের পাঁচালী ছাপাতে শুরু করেন। একমাত্র তাঁদের ঘরেই পথের পাঁচালীর বিক্রি দেখে অনেকেই অবাক হবেন। বিভূতিভূষণের দিক থেকে যদি কেউ চোখ ফিরিয়ে থাকেন, নতুন করে আকর্ষণ অনুভব করবেন। মিত্র ও ঘোষের ঘর থেকে এ পর্যন্ত পাঁচালী প্রকাশিত হয়েছে চৌদ্দ সংস্করণ। আধুনিককালে বিশেষত উপন্যাসের ক্ষেত্রে সংস্করণ দেখাতে মুদ্রণ বুঝলে ক্ষতি নেই, কারণ যথার্থ অর্থে সংস্করণ আর হয় কই? মুদ্রণই বেশীর ভাগ হয়। এরা যারা বিজ্ঞাপনে [illegible] [illegible] একই মুদ্রণের ভেতর টাইটেল পেজটি হেরফের করে অনেক সংস্করণ বানিয়ে দিতে পারেন। যে সংস্করণের কথা আমি বলছি তা ঐ রকম হেরফের করা সংস্করণ নয়। বাংলা প্রকাশন জগতের [illegible] এগারটি [illegible] সংস্করণও [illegible] দিক থেকে [illegible] বলা যেতে পারে রয়েল [illegible] সংস্করণ। প্রত্যেকটিতে ছাপা হয়েছে পাঁচ হাজার পাঁচশ থেকে সাত হাজার সাতশ কপি। অর্থাৎ ১১টি সংস্করণ মুদ্রণে ছাপা হয়েছে ৮৫৫০০ কপি। সেপার সাইজের তিনটি মুদ্রণে ছাপা হয়েছে ১২৫০০ কপি। ১৯৬০ থেকে ১৯৭৬ সাল একক্রমে ছাপা হয়েছে ২,৯২০০০ কপি। এর থেকে বিভূতিভূষণের অসাধারণ জনপ্রিয়তার একটা আকৃতি আন্দাজ করা যায়। কিন্তু সমস্তটা নয়।

প্রকাশের বৈচিত্র্য

বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী যত রূপ ও রং নিয়ে বেরিয়েছে বাংলা সাহিত্যে আর কোন গ্রন্থ তত রূপ ও রং নিয়ে বেরোয় নি। শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণ তাঁর গ্রন্থের জন্য প্রকাশকও পেয়েছেন লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত কবিকেও যারা প্রকাশের ব্যাপারে কালিদাস চক্রবর্তী, প্রবোধ ঘোষ প্রমুখ

মধ্বয়ের আনুকূল্য নিতে হয়েছে অনেক দিন পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে 'চর্যা'র কাছাকাছি এসে তিনি প্রকাশকের কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের জন্য প্রকাশক যেন ওৎ পেতে ছিলেন। ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে ধারাবাহিক প্রকাশ শেষ হয়। ১ নভেম্বর 'রঞ্জন প্রকাশন' পথের পাঁচালী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে নতুন হাইওয়ে খুলে দিলেন।

রঞ্জন প্রকাশন থেকেই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। এরপর থেকে পথের পাঁচালীর জয়যাত্রা শুরু হল। কে কত পরিপাটি করে প্রকাশ করতে পারে এই একটি বই নিয়ে যেন এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। রঞ্জন প্রকাশন থেকে বইটি এল কাত্যায়নীর হাতে। কাত্যায়নী ২।৩ সংস্করণ বার করেছিলেন।

সেখান থেকে এল মিত্র ও ঘোষের হাতে ১৯৪৪ সালে। মিত্র ও ঘোষের ঘর থেকে পথের পাঁচালীর বিজয় অভিযান শুরু। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০এর মধ্যে ৪।৫টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এখান থেকেই একটি রাজসংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। হাতে তৈরী কাগজে ছাপা। রেক্সিনে বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা। প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদে বেগুনী রংয়ের কালিতে বিভূতিভূষণের নিজের হাতের সই। অবশ্য অল্পসংখ্যক বই এভাবে তৈরী করা হয়েছিল।

১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে এ মুখার্জি এণ্ড কোং থেকে ছোটদের পথের পাঁচালী প্রকাশিত হয়। এখান থেকে গ্রন্থটির আনুমানিক দশটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়। পরের মাসে সিগনেট বার করে আম আঁটির ভেঁপু। এই চিত্রিত সংস্করণটির অলংকরণের দায়িত্ব নেন তৎকালীন সুবিখ্যাত কমার্সিয়াল আর্টিস্ট সত্যজিৎ রায়। বিভূতিভূষণ ও সত্যজিৎ রায়ের এই সংযোগ বাংলাদেশ ও সাহিত্যের এক পরম শুভ লগ্নে সংঘটিত হয়েছিল। সম্ভবত এই সংযোগের ফলেই সত্যজিৎ রায়ের মনে এক মহৎ শিল্পের সম্ভাবনার অংকুর জন্ম নেয়।

সিগনেট আম আঁটির ভেঁপুর ৫৬টি সংস্করণ বার করে। এই সময় পথের পাঁচালীর একটি স্কুলপাঠ্য ইংরেজী সংস্করণও বেরোয়। অনুবাদ করেন ক্ষিতীশ রায় ও ডঃ মিসেস মার্গারেট চাটার্জী। এই বইটিও সত্যজিৎ রায়ের অলংকরণসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন দিল্লীর এ্যালায়েড পাবলিশার্স।

প্রকাশে মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া

১৯৫০ সালের কার্তিক মাসে বিভূতিভূষণের আকস্মিকভাবে অকাল মৃত্যু হয় ঘাটশিলায়। ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ও মর্মন্তুদভাবে ঘটে যায় যে কলকাতায় খবর পৌঁছুতেও দুটো দিন দেরী হয়। তৃতীয় দিন সকালে যুগান্তর অমৃতবাজার ও আনন্দবাজার পত্রিকায় যে শোকমন্থর সংবাদ প্রকাশিত হয় তা দেশবাসীকে বিহ্বল করে ফেলে। সারা দেশে বিভূতিভূষণকে স্মরণ করে শোকসভা ও শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

একমাত্র ঘাটশীলাবাসীদের কাছ থেকে বিভূতিভূষণের পরিবার দুশ শোকপ্রস্তা অনুলিপি পান। সারা দেশ থেকে শ্রদ্ধা শোক ও সান্ত্বনার বাণী এই পরিব পৌঁছয়। সেই সব চিঠি, টেলিগ্রাম, শো প্রস্তাব ও ব্যক্তিগত দীর্ঘশ্বাসবাহী পত্র কত আন্তরিকতা পূর্ণ ছিল তার প্র বিভূতিভূষণের গ্রন্থের চাহিদায় অা বৃদ্ধি।

বিভূতিভূষণ তথা পথের পাঁচালীর প্রিয়তার কাহিনী এখানে শেষ নয়। আরম্ভ বলা চলে। সেইদিকেই লক্ষ্য রে সম্ভবত বেঙ্গল পাবলিশার্স 'অপু' নাম পথের পাঁচালী, অপরাজিত ও বিভূ ভূষণের সুযোগ্য পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপা রচিত কাজল একই গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তৃতীয় মুদ্রণ নিঃশেষিতপ্রায়। বেঙ্গল লিশার্স আম আঁটির ভেঁপুও প্রকাশ ক ছেন। 'শৈব্যা' সম্প্রতি ছোটদের অপু প্র করেছেন। ছোটদের পথের পাঁচা অপরাজিত ও তারাদাসকৃত কাজল এই স্থান পেয়েছে।

বাইরে

সাহিত্য এ্যাকাদেমীর ব্যবস্থাপ বিভূতিভূষণ সর্বভারতীয় পাঠকের অনেক দিন পরিচিত হয়েছেন। মালয়ালাম, কানাড়ী ওড়িয়া, অসমী তেলেগু গুজরাতী ও মারাঠী ভাষায় প পাঁচালী অনূদিত হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই সব ভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখকরাই উপন্যাস

মাইনাস পথের পাঁচালী

এ তো গেল শুধুমাত্র পথের পাঁচালীর কথা। এ ছাড়াও রয়েছে বিভূতিভূষণের বিপুল ভাণ্ডার। ১৭টি উপন্যাস। ২০টি ছোটগল্পের সংকলন। ছোটদের জন্য গল্প, গ্রন্থ, উপন্যাস, অনুবাদ গ্রন্থ। স্কটের আইভ্যান হো-র অনুবাদ। জন বারোসের টমাস বাটার আত্মজীবনীর অনুবাদ। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। লিখেছেন অনেকগুলি দিনলিপি ধরনের রচনা। ভ্রমণের ডায়েরীগুলিও বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র স্বাদের গ্রন্থ। প্রবন্ধ এবং ভূগোল-সাহিত্য—বিচিত্র জগৎ নাম নিয়ে যার আত্মপ্রকাশ। এই গ্রন্থের 'প্রকাশকের নিবেদন' অংশে প্রকাশক যথার্থ বলেছেন : 'আমাদের পরিচিত জগতের বাইরে যে একটা ব্যাপকতর অজ্ঞাত, সৌন্দর্যময় জগৎ আছে—যে জগৎ রূপে বর্ণে গন্ধে মাধুর্যে—অপূর্ব সমগ্রতায়—অবর্ণনীয় অপরূপ; বিচিত্র জগতের পাতায় সেই জগতেরই অনাস্বাদিত আনন্দময় রূপ বিকশিত হয়েছে, প্রবাহিত হয়েছে শান্ত সমুজ্জ্বল বর্ণোৎসবের দীপ্তি।'

সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টি গ্রন্থের উপর। জনপ্রিয়তায় পথের পাঁচালীর সমকক্ষ আর কোন গ্রন্থ নেই বটে, তাঁর অপরাজিত, আরণ্যক ও ইছামতী জনপ্রিয়তায় তিন অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাস। বিক্রিও হয়েছে দশ এগার বার সংস্করণ। এক একবারে মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা দু হাজার দুশ থেকে তিন হাজার তিনশ পর্যন্ত। আরণ্যকের সুলভ পেপার ব্যাক সংস্করণও নিঃশেষিত প্রায়।

আরণ্যক পরম মর্যাদায় ভূষিত বিভূতিভূষণের আর একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসটি থেকেও

কিশোর পাঠ্য তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থের জন্ম হয়েছে। ছেলেদের আরণ্যক, লবটুলিয়ার কাহিনী, আরণ্যক (সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ)। এই সবগুলি গ্রন্থই সাহিত্য একাদেমীর উদ্যোগে ওড়িয়া, তেলেগু, গুজরাতী, মারাঠী, মালয়ালাম, গুরুমুখী ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর দেবযান সবচাইতে বিতর্কিত ও আলোচিত উপন্যাস। দৃষ্টিপ্রদীপ মন কেড়েছে বহুজনের। প্রকাশিত হয়েছে ছোটদের জন্য সচিত্র সংস্করণ।

গল্পকথা

অনুসন্ধিৎসু পাঠক খবর নিলেই জানতে পারবেন কলেজ স্ট্রীটের এক বিখ্যাত প্রকাশক বিভূতি-রচনার 'আর গ্রাহক লওয়া হইবে না' বলে দরজায় বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছেন। বিক্রির অঙ্কের নিখুঁত হিসাব পাওয়া শক্ত। কিছু প্রকাশকের কাছ থেকে জেনে, কিছু অনুমান করে এবং কিছু কমবেশী বলার স্বাধীনতা রেখে যে অঙ্ক কষতে পেরেছি তাতে এই রকম দাঁড়ায়—

বিভূতি রচনাবলী (ডিলাক্স)—
১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা
ঐ সুলভ সংস্করণ—
১২ লক্ষ টাকা

পথের পাঁচালী
(একটি ঘর থেকে)—১০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা

অপরাজিত (ঐ)—
৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা

আরণ্যক (ঐ)—৫ লক্ষ টাকা

এইভাবে অন্যান্য ঘর থেকে ও সমস্ত গল্প উপন্যাসের বিক্রির পরিমাণ মেলালে দুই কোটি টাকার উপরে চলে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তার ওপর আছে গল্প উপন্যাসের সিনেমার স্বত্ব। নাটকের স্বত্ব। বিভূতিভূষণ নিজে জীবৎকালে লেখক হিসেবে আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছেন। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে তিনি একটি গল্পের জন্য একশ টাকা দক্ষিণা পেতেন। একমাত্র শরৎচন্দ্র ছাড়া তাঁর সময়ে আর কেউ এত টাকা পেতেন না। কাজেই গল্প উপন্যাস ইত্যাদি প্রকাশের কালেও মোটামুটি একটা মোটা অঙ্কের টাকা বিভূতিভূষণের হাতে গিয়েছিল।

গল্প আছে, এক পেটমোটা ব্যবসায়ীকে বড় অঙ্কের চাঁদা দেওয়ার সুবাদে রবীন্দ্রজয়ন্তীর সভাপতি করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিষয়ে বিভিন্ন বক্তার আলোচনা শেষে সভাপতির ভাষণ দিতে উঠে তিনি সবিনয় জানান যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ে কোন কিছু বলতে তিনি অপারগ—কারণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তিনি পড়েন নি। তবে একটা কথা তিনি বলেছিলেন, তিনি ব্যবসায়ী, ব্যবসাটা ভাল বোঝেন। অতএব দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় ব্যবসায়ী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কারণ সামান্য দামের অল্প কালি, এবং অকিঞ্চিৎকর মূল্যের একটি কলম ব্যবহার করে এক দাওয়ে তিনি বিদেশ থেকে যে এক লক্ষ নব্বুই হাজার টাকা খিচে নিয়েছেন। ব্যবসায়ের ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। উৎপাদন খরচ নিম্নতম রেখে উৎপাদিত বস্তু থেকে যতটা বেশী সম্ভব টাকা আহরণ করাই ঐ মহৎ ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের সূত্র। পরিহাস রসিকতাই এই গল্পের উদ্দেশ্য হলেও ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকই কিন্তু প্রথম স্পষ্ট করে বলেছেন সার্থক লেখকরা এক একজন একটি ছোটখাট শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে তুলনীয়। তাঁদের গ্রন্থের ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে কত মানুষ, কত পরিবারের জীবিকার প্রশ্ন জড়িত সাধারণ পাঠক তা কল্পনা করতে পারবেন না। রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর সমস্ত ব্যাপারটাই কিংবদন্তীর বিষয়। কিন্তু বিভূতিভূষণও ব্যবসায়িক দিক থেকে এমন এক সাফল্য যা বাংলা বই বিক্রির কন্দরে চিরদিন আলোচিত হবে।

অনুবাদ করেছেন। মালয়ালাম ভাষায় এর জনপ্রিয়তা বোঝা যায় এখন দেখি বাংলারই মত ঐ ভাষায়ও ছোটদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভাষার মধ্যে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় পথের পাঁচালীর অনুবাদ হয়েছে। ইংরেজী অনুবাদ ১৯৬৮ ও ফরাসী অনুবাদ ১৯৬৯-এ প্রকাশিত হয়। ইংরেজী গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে 'সঙ অফ দি রোড' আর ফরাসীতে অনূদিত গ্রন্থের নাম 'লা কাঁলাং দাদু সাঁতিয়'। ইংরেজী অনুবাদ করেছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টের দুই অধ্যাপক টি ডবলিউ ক্লার্ক ও তারাপদ মুখার্জী। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী ছবির অপু ও দুর্গার দুটি স্টিল ছবি সহযোগে অসাধারণ প্রচ্ছদ তৈরী করে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায় নিজেই। শুধু বাংলাই এই দুটি ইউনেস্কোর যৌথ পরিকল্পনায় প্রকাশ করেছেন লণ্ডনের বিখ্যাত প্রকাশক জর্জ এ্যালেন এণ্ড আনউইন। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে দ্বিতীয়টি চালু হয়েছে বেশ কিছু দিন। আমেরিকাতেও এই প্রকাশক পথের পাঁচালীর একটি পেপারব্যাক সং প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া লণ্ডনের ফোলিও সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন তার সভ্যদের জন্য বারোটি লিথোগ্রাফ শোভিত একটি অতি মনোরম সংস্করণ (স্পেশাল লাক্সারিয়াস বাউণ্ড এডিশন) প্রকাশ করেছেন। ইউনেস্কোর ব্যবস্থাপনায় নানান দেশের যে ১৩০টি গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে একমাত্র পথের পাঁচালীই একটি স্পেশাল বুক ক্লাব এডিশনের সম্মান পেয়েছে। ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন মাদাম ফ্রান্স ভট্টাচার্য।

'বাংলাদেশে' বিভূতিভূষণের জনপ্রিয়তা পরিমাপের নানান অসুবিধা আছে। তবে সে দেশের প্রকাশক মহলের মৌখিক খবর যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে এমন খবর আছে যে, বিভূতিভূষণের পরিবারের অনুমতি নিরপেক্ষভাবেই বিভূতিভূষণের স্বাদ পরিবেশিত হচ্ছে। এমন কি কেউ কেউ ঢাকা থেকে এসে প্রকাশের অনুমতিও চেয়ে গেছেন, এটা জেনেও যে, বাজারে অনেক বই বেরিয়ে আছে। ব্যবসায়িক জটিলতা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। তবে এইটুকু বলতে অসুবিধা হয় না যে সমস্ত বিধিনিষেধ ভেঙেও বাংলাদেশে বিভূতিভূষণ পরম প্রিয়।

গল্পের ক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণের জনপ্রিয়তা অপরিসীম। তাঁর কুড়িটি গল্পগ্রন্থ, শ্রেষ্ঠ গল্প ও গল্প সমগ্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীর অথচ অব্যাহত গতিতে বাঙালী পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছে। শ্রেষ্ঠ গল্পের হয়েছে সাতটি সংস্করণ, কুশল পাহাড়ীর তিনটি, মেঘমল্লার আটটি। এমনকি গল্প সমগ্র—যা খুব অল্প দিন আগে প্রকাশিত হয়েছে—দাম করা হয়েছে চল্লিশ টাকা—তারও দুটি সংস্করণ নিঃশেষিত হতে চলেছে।

এসব ছাড়াও বিভূতিভূষণের এমন কতগুলি গল্প উপন্যাস আছে যা হয়তো চাহিদার দিক থেকে অন্যান্য গল্প উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু বহু পরিশীলিত পাঠকের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি আছে। দৃষ্টিপ্রদীপ, ঊর্মিমুখর, অভিযাত্রিক নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব ইত্যাদি। বহু পাঠক বিভূতিভূষণের চিন্তা কথা ও কল্পনার মধ্যে বাস করেন বিভূতিভূষণের ভাব উদ্ধার করেন অহরহ। বিভূতির স্মৃতি যেন তাঁদের স্মৃতিতেই পরিক্রান্ত হয়েছে। পাঠক ও

স্বাভাবিক? না, অস্বাভাবিক?

বিভূতিভূষণের মত একজন মহারথী সাহিত্যিক মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে চলে যাবেন, এক সময় মন কিছুতেই ব্যাপারটাতে সায় দিতে চায় নি। তাছাড়া বিভূতিভূষণের ভেতরে বাইরে স্বাস্থ্যও ছিল খুবই ভাল। খেতে ভালবাসতেন সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতেও ভালবাসতেন তিনি। মনের মধ্যে আনন্দ আছে। খাও আর হাঁটো—সুস্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকার এর চেয়ে বড় দাওয়াই--ম্যাডিকেল সাইন্স দিতে পারবে?

তাহলে? তাহলে বিভূতিভূষণ কেন বাংলা সাহিত্যের নির্দিষ্ট আসনটি ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন? তাঁর কাছের কয়েকটি মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছি। মৃত্যুর আগে ও পরের কথা শুনে মনটা কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেছে। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে ২৮।২৯ অক্টোবর হবে, ধলভূমগড় রাজবাড়িতে (ঘাটশীলার কাছে) চায়ের নেমন্তন্ন ছিল বিভূতিভূষণের। মূলত সেটা ছিল সাহিত্যিকদের চায়ের আসর। কলকাতা থেকে বেশ কয়েকজন লেখকও গিয়েছিলেন। একটা কি খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল, সেটার রংটা খুব স্বাভাবিক ছিল না। সম্ভবত সিঙ্গাড়া। রাজবাড়িতে বাসি সিংগাড়া আসবে, তাও কি হতে পারে? কেউই সেটা খেলেন না। একমাত্র ভোজনরসিক, সিঙ্গাড়াপ্রিয় বিভূতিভূষণ সেটা খেয়েছিলেন। খাওয়ার অল্প পরেই অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। রাজবাড়ির ব্যবস্থাপনায় অন্য সবাই ঘুরতে বেরোন। বিভূতিভূষণ নিজের বাড়ি গৌরীকুঞ্জে ফিরে যান। সেখানে তিনি বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁর অনুজ নুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁর চিকিৎসা করেন। সারা শরীরে একটা যন্ত্রণা বোধ করছিলেন, মাঝে মাঝে ঘেমে উঠছিলেন ভীষণভাবে সম্ভবত দু-একবার বমিও হয়েছিল। স্ত্রী রমাদেবী ভাল চিকিৎসার জন্য কাতর ও উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। টাটার বিখ্যাত ডাক্তার বঙ্কু মুখোপাধ্যায়কে খবর পাঠান হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিভূতিভূষণের বন্ধু। মাঝখানে সামান্য সুস্থ হলে কে যে ডাঃ মুখোপাধ্যায়কে আসতে বারণ করে খবর পাঠিয়েছিলেন —পরিবারের কেউ আর তা হদিশ করতে পারেন না। সঠিক চিকিৎসার অভাবে ১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর রাত সওয়া ন'টায় তিনি এ-পৃথিবী ছেড়ে যান।

সেদিন গভীর রাত্রে একটি ঘটনা ঘটল। রহস্যময় ঘটনা। হয়তো চিরকাল রহস্যের আঁধারেই থাকবে। মৃত্যুর

একমাত্র ভোজনরসিক, সিঙ্গাড়াপ্রিয় বিভূতিভূষণ সেটা খেয়েছিলেন। খাওয়ার অল্প পরেই অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন

বিভূতিভূষণের শেষ জন্মদিনে। বামদিক থেকে বাণী রায়, মায়া দেবী, বিভূতিভূষণ ও কালীদাস রায়

ঘন্টা দুয়েক পর ঘাটশীলা থানার ও-সি একখানা পোস্টকার্ড হাতে করে বিভূতিভূষণের বাড়ী এসে উপস্থিত। চিঠিখানা লেখা হয়েছে বিভূতিভূষণকে, কিন্তু সম্ভবত ঠিকানার অভাবে কেয়ার অফ ও-সি ঘাটশীলা করা হয়েছে। অথবা থানার সংগে ব্যাপারটার যোগ করে দেওয়া দরকার মনে করে পাকুড় থেকে জনৈক বৈদ্যনাথ মুখার্জি প্রায় টেলিগ্রাফের ভাষায় জানিয়েছেন, বিভূতিভূষণের জীবনের উপর ভীষণ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সাবধান করে নির্দেশ দিয়েছেন, পত্রপাঠ ঘাটশীলা পরিত্যাগ করতে। অন্যথায় সমস্ত পরিবারের জীবনহানি ঘটতে পারে। চিঠিটাতে পাকুড়ের পোস্ট মার্ক ছিল। ১৯৫০ সালের ৮ নভেম্বর মাত্র এক সপ্তাহ পরে সুবর্ণরেখা নদীর ধারে, কি রহস্যময় কারণে-- দাদাকে বাঁচাতে না-পারার বেদনায় অথবা কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে— অনুজ নুটবিহারী কারবোলিক এসিড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। অকাল মৃত্যুর অভিশাপ নিয়ে এসেছিলেন মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র-কন্যারা। আগেই এক ছেলে মরেছিল হুপিং কাশিতে পাঁচ বছর বয়সে। বোন সরস্বতী বিয়ের পরেই মারা যান। জাহ্নবী স্নান করতে গিয়ে আর ফিরে এলেন না। বিভূতিভূষণ ও নুটবিহারী এমন করে চলে গেলেন। একমাত্র ঈশ্বর-ঘটিত ব্যাখ্যা ছাড়া বিনা চিকিৎসায় বিভূতিভূষণের মৃত্যু কোনই সান্ত্বনা রাখে না।

পারতো। অ্যারেকবার নোবেল প্রাইজ বাঙালী পেতে পারতো।

কোনো দলমত, সাময়িক পত্রিকা বা প্রকাশকের সযত্ন পৃষ্ঠপোষকতায় বিভূতিভূষণের জনপ্রিয়তা বাড়ে নি। বিভূতিভূষণের সংগে যে দুই বাড়ুয্যের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয় তাঁদের কিন্তু নানা দিক থেকে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য তারাশঙ্কর বা মানিক কারও তুলে ধরার মুখাপেক্ষী কোনদিনই ছিলেন না। কোনো রকম কটাক্ষ না করেই বলছি একজন তো বামপন্থীদের সুদৃষ্টি পেয়েছিলেন। অন্যজন শেষজীবনে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের ভালবাসা পেয়েছিলেন। একজনকে বামপন্থী দল ও পত্রপত্রিকা রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে প্রচার করে আসছেন।

সজনীকান্ত ও শনিবারের চিঠি বিভূতিভূষণকে আশ্রয় করেছিলেন সত্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা বিভূতিভূষণের যতটা পক্ষে গিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী বিপক্ষে।

এমন কি রবীন্দ্রনাথ, যিনি বিভূতিভূষণের সমসাময়িক লেখকদের স্বীকৃতি জানাতে কখনো দেরি করেন নি, তাঁর কাছ থেকেও বিভূতিভূষণের স্বীকৃতি এসেছিল বেশ খানিকটা দেরিতে। তাও প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি নয়। চারুচন্দ্র দত্তের **ব**ক রাও' সমালোচনা করতে গিয়ে পরিচয়-এর ১৩৩০ বৈশাখ সংখ্যায় 'রোমান্স প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে পথের পাঁচালীর কথা এসে পড়ে।

এই দেরির কারণটি অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। শনিবারের চিঠির সংগে বিভূতিভূষণের যোগ রবীন্দ্রনাথ প্রীতির চোখে নাও

দেখতে পারেন। পরিচয়ের যে আলোচনায় তিনি দেরি হওয়ার ত্রুটি স্খালন করেছেন তাতে রোমান্স ছাড়াও অন্য একটি প্রচ্ছন্ন কারণ যেন উঁকি মারছে। তিনি লিখেছেন, আধুনিক অনেক গল্প সম্পর্কে তিনি মত দেননি। সে তো স্বাভাবিক: ব্যস্ততা কারণ হতে পারে, হতে পারে কুঁড়েমিও। কিন্তু বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী সম্পর্কে নিজেই বলেছেন সে অপরাধ হল নির্বিচার এবং কুঁড়েমির যে কারণ দেখিয়েছেন সে সম্পর্কেও নিজেই বলেছেন সে ওজর তাঁকে বেমানান হয়।

সব চাইতে সত্য কথা হল এই যে, বিভূতিভূষণ সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নামী লেখক যিনি নিজেই নিজের প্রচারে কোনো সাহায্য করেন নি। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার বেলাভূমন্দ ইন-

স্টিটিউশনের পদে ইস্তফা দিয়ে প্রকৃতির অকৃত্রিমতার মধ্যে ফিরে যাওয়া তাঁর বাস্তব-বুদ্ধি, প্রচার বুদ্ধি ও ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবই স্পষ্ট করে। এই সময়ে তাঁর স্ত্রী রমা দেবীকে লেখা একখানা চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি—দিনে তিন পাতা করে লিখে যে অর্থ পাবেন এবং জনৈক প্রকাশকের কাছ থেকে যে সামান্য পঞ্চাশ টাকা মাসে মাসে পাবেন তাতে দুজনের খুব ভালভাবেই চলে যাবে—এই বলে চিঠিতে পরম তৃপ্তি ও সন্তোষ লাভ করেছেন।

বাঙালী পাঠকের প্রাণমন চুরি করেছেন যে বিভূতিভূষণ আসলে তিনি ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ নন, তিনি কবি বিভূতিভূষণ।

কল্লোলের শক্তিমান লেখক গোষ্ঠী যে শেষ পর্যন্ত মহাকালের পাথরে আঁচড় কাটতে পারলেন না তার কারণ আধুনিকতার কৃত্রিম সোরগোলে মোহগ্রস্ত হয়ে সমসাময়িকতার পাঁকে আত্মসমর্পণ করলেন। পাশ্চাত্য জীবন ও সভ্যতার যে ঝড়ো বাতাসে তাঁরা বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, তা শুধু কতগুলো শহরকেই আলোড়িত করেছিল; শহরের বাইরে যে বিরাট দেশ ও বিপুল সংখ্যক মানুষ অনাদৃত হয়ে পড়েছিল, তার সংগে এই তথাকথিত আধুনিকতার কোনই যোগ ছিল না। দেশ ও মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে সাহিত্য রচনা হয় না—কল্লোল তা অনেক মূল্য দিয়ে জেনেছে।

বিভূতিভূষণের পা মাটিতে ছিল বলেই—বিভূতিভূষণের পক্ষে এই ভুল করা সম্ভব ছিল না। দেশ মাটি মানুষের প্রতি তার ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম। এই ভালবাসার কাজল পরানো চোখেই তিনি সব কিছুকে দেখেছেন। তরুণ বয়সে জীবিকার টানে বারাকপুর ছেড়ে তাঁকে ভাগলপুর যেতে হয়েছিল। নিজের গ্রাম, পরিচিত প্রকৃতি ও প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বেদনায় তিনি অধীর হয়ে ছিলেন। সেই বেদনা থেকেই পথের পাঁচালীর জন্ম। আবার পরে যখন ভাগলপুরের বনবনান্তের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সেখানকার সহজ সরল মানুষগুলির অপরিমেয় আন্তরিকতা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন, তখনও কিন্তু সেই ছেড়ে আসা দিন, প্রকৃতি ও মানুষগুলির জন্যে বিভূতিভূষণের হৃদয় কেঁদে উঠেছে। আর তা থেকেই জন্ম হয়েছে আরণ্যকের।

এই যে যেখানেই যাওয়া, মায়াবদ্ধ জীবের মত সেখানেই আটকে পড়া, এটা কবির গুণ। ঔপন্যাসিকের গুণ হল নির্লিপ্ততা। খুঁটে খুঁটে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভেতরে বাইরে দেখা। বিশ্লেষণ করা। সমস্তটাকে মিলিয়ে দেখা—ছবি সুর তান রং রূপ গন্ধ স্পর্শ—এই দেখা কবির দেখা। আত্মতন্ময় হয়ে দেখা। এখানেই বিভূতিভূষণ নিখাদ। এখানেই তাঁর সাহিত্যের আবেদন।

ইউরোপীয় অর্থে যা উপন্যাস তাতে জীবনের জটিলতাই প্রধান। উপন্যাসে যত বেশী দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, ততই চরিত্রের স্ফুরণ। ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে চরিত্র যত বেশী ফুটছে তার উত্তাপও তত বেশী। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে সেই অর্থে চরিত্র নেই বললেই চলে। আধুনিক অর্থে জীবনের জটিলতা নেই। যা আছে তা হল তন্ময় হয়ে দেখা এবং দেখিয়ে অভিভূত করা।

কাজেই আত্মতন্ময়তা, যেটা আধুনিক রোমান্টিক কবির প্রধান গুণ, সেটা ঔপন্যাসিকের অপরিহার্য গুণ কিছু নয়। তবু যে বিভূতিভূষণ ঔপন্যাসিক তার কারণ, প্রসারিত জীবন তার লেখার বিষয়। ছোট বড়, খণ্ড-ক্ষুদ্র, স্থূল-সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত—সমস্তই একই আধারে; পরিচয় পত্রিকায় অপরাজিত উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে নীরেন রায় বলেছেন—'বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কবি। বিস্ময়বোধ কাব্যানুভূতির উৎস।'

বনজ্যোৎস্না

বিস্ময়বোধ ও তন্ময়তার সংগে আর একটি গুণ যোগ হয়েছে সেটি হল সৌন্দর্যানুরাগ। সৌন্দর্য উদ্ঘাটনের কারবারটা চিরকালই কবির দখলে। ঔপন্যাসিক মাঝে মধ্যে সেখানে উঁকি মারলেও এই ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই। অথচ বিভূতিভূষণ এক্ষেত্রে আছেন। 'গ্রাম বাংলার অবহেলিত তুচ্ছ প্রকৃতি বিষয়ের এত বড় রসিক আর নেই।' গ্রামদেশের গাছপালা, রৌদ্র-বৃষ্টি, আকাশ-বাতাস থেকে খানা-ডোবা পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং তাকে খুঁটিয়ে উপস্থিত করেছেন।

শুধু সৌন্দর্যানুরাগ নয়, ক্ষুদ্র তুচ্ছ ও খণ্ডের প্রতি এই যে মমতা এই মমতাই রোমান্টিক কবির মমতা। এমন ক্ষুদ্র বন্ধনে আর যেই বাঁধা পড়ুক ঔপন্যাসিক কখনো নয়। অথচ বিভূতিভূষণ বাঁধা পড়েছেন। তিনি যত বড় ঔপন্যাসিক তার চেয়ে অনেক বেশী কবি। পথের পাঁচালী আলোচনা প্রসংগে একজন সমালোচক বলেছেন, 'সমস্ত গ্রন্থটিই যেন গীতি কবিতার সুরে বাঁধা বাউলের একতারা। অপরে জীবনের সমস্ত ছোটখাট ঘটনা, অনুভূতি উপলব্ধি যেন এক একটি আশ্চর্য লিরিক।'

সত্যিই তাই। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিতে একজন কবি সব সময় বসে আছেন। বিভূতিভূষণ তাঁর রচনার জগতে চলা ফেরা করেছেন এঁরই ইচ্ছায়। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র কবিই হলেন স্মৃতিজীবী। ঔপন্যাসিকের পক্ষে নস্টালজিয়ার শিকার হওয়া একটা ত্রুটি। কারণ পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে। একই কথা বারবার ফিরে ফিরে আসা উপন্যাসের দোষ। কিন্তু কবিতার নয়। কবিতায় সুর, শব্দ ও পংক্তি বারবার ফিরে আসতে পারে। ফিরে আসে। রচিত হয় মায়াজাল। এই মায়াই মোহিনী মায়া। এখানেই বাংলাদেশের তথা বিদেশের পাঠক বিভূতিভূষণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

তাই বিভূতিভূষণ কবি। আলংকারিক বলেছেন, কবিরেবঃ প্রজাপতি। অর্থাৎ কবিও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সমতুল্য। অর্থাৎ জগৎস্রষ্টার আসনের পাশে আরেকখানা চেয়ার নিয়ে যিনি বসতে পারেন, তিনি একমাত্র কবি। আর সবাই কাহিনী লেখেন। গল্প বলেন। ভ্রমণের স্বাদ দেন। রসিকতা করেন। বড়জোর ট্রাজেডির অনিবার্যতার স্বাদে ডুবিয়ে দেন।

একমাত্র কবিই সৃষ্টি করেন নতুন পৃথিবী। সৃষ্টিকর্তাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, দ্যাখো তোমার চেয়ে কত নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ। সেই অবিনশ্বর সৃষ্টিই অপু, দুর্গা, নিশ্চিন্দিপুরে, মাজেরহাট স্টেশনে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল, লবটুলিয়া বইহার, ভানুমতী আর আরণ্যকের ফিরে ফিরে আসা বন-জ্যোৎস্না।

সাহিত্যের ইতিহাসে একটা কথা চালু আছে যে, একজন শিল্পী শুধুমাত্র তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বাঁচেন না, তাঁর সমসাময়িক বা উত্তরসাধনার মধ্যে তিনি কি ভাবে বেঁচে আছেন সেই বিচারেও অবিনশ্বর হয়ে থাকেন। অর্থাৎ পরবর্তীকালের লেখকদের একজন সাহিত্যিক কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছেন তার ভেতর সাহিত্যিকের বড় কৃতিত্ব লুকিয়ে থাকে। কথাটা সত্য হলেও সম্ভবত সর্বৈব সত্য নয়। অথবা একটু ঘুরিয়ে বিচার করার দরকার আছে।

অর্থাৎ মেঘনাদ বধ কাব্যের ওজস্বিতা, শব্দের ঝংকার, আবেগের উৎক্ষেপ, ছন্দের প্রবহমানতা, কল্পনার ও উপমার বর্ণচ্ছটা আত্মস্থ করে নিতে হলে যে প্রতিভার প্রয়োজন তা দুর্লভ। তাই পরবর্তী মহাকাব্যগুলি পড়ে পাঠক হতাশ হন। সমস্ত রকম মাল পেলেই সম্ভবত শিল্পীর কিছুটা অপেক্ষা করতে হয়। যেমন মধুসূদনকে রবীন্দ্রনাথ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

বিভূতিভূষণকেও সম্ভবত তাই করতে হবে। কারণ যে সমসাময়িকতা, নাগরিক দ্বন্দ্ব ও বেদনা আমদানীর-সূত্রে পাশ্চাত্য যৌন সমস্যা অতি আধুনিক উপন্যাসগুলির বিষয়—তাতে বিভূতিভূষণের প্রভাব আসা সম্ভব নয়। বিভূতিভূষণের প্রধান পাঁচটি উপন্যাসের বিষয় চিরকালের বিষয়; এবং প্রকাশের রীতিও অন্তরঙ্গ। যেখানে স্টান্ট, বাজিমাৎ বা কৌশল করার ব্যাপার আছে সেইখানে বিভূতিভূষণ নেই। বিভূতিভূষণ আছেন সেইখানে যেখানে কেউ দেখে না, কেউ দেখবে না—অথচ লতাগুল্মের শ্যামশোভার ফাঁকে ফাঁকে মানবজীবনের চিরাচরিত সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালবাসার প্রবাহ বয়ে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণের প্রভাবকে আত্মস্থ করার মত শক্তিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক বর্তমান কালের সাহিত্যে নেই বললেই চলে। তবে সচেতন প্রয়াসে গুরুর শ্রদ্ধায় যিনি বিভূতিভূষণের পদক্ষেপ অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করছেন, বলে মনে হয়, এমন অন্তত একজন লেখক এখন লিখছেন। সে প্রসংগ এখন থাক।

শস্যবিহীন মাঠ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নেতা গোছের মানুষটি দুরে হাত তুলে বলল, হুই তোর জমিন।

নিবারণের মাথার চুল সব খাড়া হয়ে গেল। একখণ্ড ভুঁই, আহা তার ভুঁই, আবাদ করবে, বসত করবে, তার নিজের ভুঁই, সে কথাটা এখনও বিশ্বাসই করতে পারছে না। সে বলল, সত্যি বলছেন গো বাবু! ই যে আজব কাণ্ড হয়ে গেল!

নিবারণ গতকাল অর্পণপত্র পেয়েছে। শহর থেকে সব আরও বড় বড় বাবুরা এসেছিল। সামিয়ানা টানানো হয়েছিল। ডে-লাইট জ্বালিয়ে ওদের জন্য বড় ফরাস পাতা হয়েছিল। নিবারণ চুলে কাকুই নিয়েছে। ছেঁড়া তালি মারা জামা ঘাড়ে কেচে নিয়েছে। সে কবে থেকেই শুনেছিল, তার ভুঁই দিবে ভগবান। ভগবান না দিলে কে আর দেবে! খুব সকাল সকাল উঠেছিল, বৌ কালী-দাসীকে বলেছে, ঘ্যানর ঘ্যানর করবি না। কাম-টামের কথা বলবি না। কেবল দশ পয়সার বিড়ি সম্বল করে সে সারাটা দিন কেমন এক নেশাখোরের মতো কাটিয়ে দিয়েছিল। আজ সকালে সত্যি তার নিজের ভুঁই মিলে গেলে মাথা একদম ঠিক রাখতে পারে নি। দৌড়ে গেছে। এবং প্রায় সে পাগলের মতো মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছে।

দু হাত লম্বা করে চেঁচিয়ে কেঁদেছে— মাগো, জোনাই গো ওলো তোলো দয়া হল।

এমন সব আরও জমিন, গাছপাতা আগাছা সম্বল করে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অনাবাদী, অনুর্বর, উড়াট জমিতে কার ভোগ দখল দিল নিবারণ কিছুই প্রায় জানে না। তার মতো আরও সব মানুষেরা জমি পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সীমানা ঠিক করে নিচ্ছে। কালীদাসী চারটা খোঁটা পুতে দিল। বাবুদের সামনে সবাই যে যার সীমানা ঠিক করে নিতে নিতে বেলা গড়িয়ে গেল। কালীদাসী বলল তখন, ঘর কোন্‌টে হবে?

দশ কাঠার মতো জমি নিবারণ তার লম্বা হাত দিয়ে মাপতে থাকল। একবার প্রস্থে একবার দৈর্ঘ্যে। তারপর একটা পাট-কাঠি মেপে নিয়ে সেটা দিয়ে আবার মাপ-জোক হল। ঘরের জন্য দশ হাত বাই আট হাত। তালগাছ একটা পড়েছে জমিতে, তালের পাতায় ছাউনি, আর বেড়া দিতে হয়তো, সময় মতো দেওয়া যাবে। জমিটাতে আছে সব নানা রকমের গাছ। আশ-শ্যাওড়া, মোথুনা ঘাস, কাশ ফুলের গাছ। এবং রুক্ষে চৈত্র মাস, খড়ায় হেজেমজে যাবার মতো এমনিতেই অবস্থা, শুধু কোদাল মেরে বংশ নির্বংশ করা বাকি এখন।

এতদিন জমিটা যেন সব সাপ-খোপ কীটপতঙ্গ আর আগাছার জঙ্গল নিয়ে বেশ ছিল। নিবারণ এসেই ধুপধাপ কোদাল মারতে থাকল। নড়ে উঠছে। জমির বুক কেঁপে উঠছে। চোরা গর্ত থেকে হিস্‌হিস্ করছে একটা কালভুজঙ্গ।

কালীদাসী বলল, কেডা আছেন, দ্যাখেন জমির ফোঁসফোঁসানি কি!

নিবারণ বলল, আছেন তেনারা। সাবধানে পা ফেলিস।

এবার নিবারণের মনে পড়ে গেল সেই ইঁটের পাঁজা, ভাঙা পরিত্যক্ত একটা বাড়ি। সে ছেঁড়া ত্রিপাল চেয়ে এনেছিল, মতি সার আড়ত থেকে। একটা ছেঁড়া চট। বিনি পয়সার জিনিস। ফেলে দেওয়া। সে ওটা ধরতে গেলেই দাম বেড়ে গিয়েছিল, তাকে তিন রোজ খাটুনি দিতে হয়েছে। কালীদাসী শাকপাতা বনআলু এনে তিন দিনের রোজ-গার পুষিয়ে দিয়েছিল। কালীদাসী পারেও! জবরে জনালায় কাজে কামে বের হতে না পারলে ঠিক সে বনের কাঠকুটো কেটে শহরে বেচে আসতে পারে। বাদির পয়সা, একটা কাগজি লেবু পর্যন্ত পেয়ে যায়। সেই কালীদাসী তাকিয়ে সমর্থ মানুষটার কাছে দু লাফে চলে এল।—হ্যাগো কিডা করতাছ।

কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই নিবারণের। সে বলল, হাঁড়ি কলসী, থালা বাসন সব নিয়ে চলি আয়। ভুঁই ছেড়ে আর যাচ্ছি না। যেন চলে গেলেই আর কেউ এসে ভোগ দখল নিয়ে নেবে। যুবা বয়সে তার ক্ষেমতা ছিল কত! এই বুড়ো বয়সেও কম যায় না। অহংকার করার মতো আছে শুধু তার শরীরটা। মেয়েছেলে বিয়োয়, বাঁচে না। অকালে অধম্মে সব তার লোপাট। এবং একটা বিষহরির ছোবল মেরে তার দু-দুটো বেটার যান নিয়ে নিল। সে তখন মরিয়া হয়ে ইঁটের পাঁজা সাফ করে বিষহরির জ্ঞাত-গুষ্ঠি নিলে মায় এগারটার বংশ নিব্বংশ করেছিল। এবং তখনই বাড়িটার আসল লোক এসে হাজির। —ওহে নিবারণ কার হুকুমে চালাঘর তুলে বসতি করেছ হে। কথা নাই বার্তা নাই দুমদাম ছেঁড়া চট, ত্রিপল ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আবর্জনার মতো। থানা-পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল। নিবারণ চুপচাপ উঠে গিয়েছিল, জমিটার দামদর কি আছে, মানুষ না থাকলে! আগাছায় ভরে থাকলে জমির মান-ইজ্জত থাকে না! লোকটা সেসব বুঝল না। বিনা বাক্যিতে তাকে সরে আসতে হয়েছিল। তারপর থেকে, গাছতলায়, পরিত্যক্ত মন্দিরে, কোনো ভাঙা ইস্কুলঘরে রাত যাপন নিবারণের। খায়-দায় খাটে। জ্বর জ্বালে গাছতলায় পড়ে থাকে। নিজের ভুঁই বলতে তার জন্মের পর থেকে কিছু ছিল না। কালীদাসী কি করে বুঝবে সব। সে বলল, যা বলছি করে লে।

এবং সে তার মতো খালি দাও দিয়ে কটা তালপাতাও কেটে ফেলল। দুটো বাঁশ কেটে টেনে আনল জমিতে। বসে দুবার দুটো বিঁড়ি ফুঁকল। কালীদাসী ফিরে এলে বলল, জায়গা সাফ করে দিইছি। সামুতে জল আছে। লাগা।

লাগা মানে উনুনে, আগুন দে। তাতে বন আলু, সেদ্ধ, শাকপাতা ভাজা, প্রায় মচ্ছবের সামিল ভোজন হবে। নিজের জমি, নিজের ঘর, এমন সুসময় আর জীবনে তার কবে এসেছে। পাশের জমিতে পরিচিত দু-একজন ভুঁই আগলাচ্ছে। বেড়া দিচ্ছে। ঝোপ জঙ্গল কাটছে। কখনও সমস্বরে চীৎকার করে গান গাইছে। কালীদাসীর কত দিনকার ইচ্ছে, এই ভাজে দু-একজন আত্মীয়কুটুম থাকুক। সে নিতাই নামে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে লতায়পাতায় আত্মীয় খুঁজে পেয়েছে। বড় উদাসী গলায় সে বলল, নিতাইরে কন।

নিতাই দূরে তার ভুঁই সাফসোফ করছিল। কোথাকার লোক কে জানে। খুব একটা পছন্দ না নিবারণের। তবু, সাক্ষাত অন্নপূর্ণা সেজে গেছে কালীদাসী। জীবনে সে এ-বাড়ি ও-বাড়ি কাজে কামে খেয়ে বেড়িয়েছে, কেউ এসে পাত পাতে নি। কালীদাসীর কথা ফেলতেও পারছে না। কত বড় মহাজন দ্যাখো। আমার মানুষ একেবারে ফেনা ভাতের মতো টগবগ করে ফুটছে। নিবারণ কোদাল মারতে মারতেই বলল, ইসছা যখন হইয়েছে বলে ফেল।

আর তখন কালীদাসী ঝোপজঙ্গল সরিয়ে শুকনো পাতা তোলার সময়ই চিৎকার—গেল গেল!

এবং নিবারণ দেখল, অতিকায় এক ভুজঙ্গ কালীদাসীর বুকের কাছে দুলছে। সে চিৎকার করে উঠল, দোহাই অতিথ্যমান, জমির এত ফোঁসফোঁসানি এনারই কম্ম। মাথার রক্ত উঠে গেছে। সব ভুঁই থেকে ছুটে আসছে মানুষজন। যে যার হাতের সম্বল নিয়ে এসেছে। দা কোদাল সড়কি। এবং চোখ বুজে আছে কালীদাসী।

নিবারণ হাঁকড়াল, সব খেয়েছিস তু। কালীদাসীকে খাস না। খেলে ঝাড়ে বংশে বাতি দিতে রাখবনি। দোহাই বড় নাগের। আর কি হল, মানুষজনের চিল্লাচিল্লিতেই হোক, আর নাগের দোহাই-র জন্যই হোক সাপটা কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ছোট হয়ে গেল। নেমে গেল নিচে। দুধের রং গায়ে সাপটার। এত বড় অলিসান ভুজঙ্গের বাস তার ভুঁইয়ে। লোকজন বলল, কোপা কোপা। গর্ত খুঁজে বের কর। কালীদাসীর সম্বিত ফিরে এসেছে। সে কোনো রকমে দু পা সরে লাফিয়ে চলে এল। তারপর মাটিতে পড়ে হাঁফাতে লাগল।

নিবারণ তখন হাঁকড়াল, কোপাস না। লক্ষ্মী আছে থাক। বলেই সে তার ভুঁই থেকে একজন পাগলদার মানুষের মতো সবাইকে সরিয়ে দিল। গাল দিল কেউ। মাথাটা গেছে। এত বড় অলিসান ভুজঙ্গ নিয়ে বাস, কবে কারে খাবে। আশ্চর্য সে আগের মতো জমি কোপাচ্ছে। কাল ভুজঙ্গ কাছেই গর্তে জুড়ে পড়ে আছে এখন কে বলবে!

সবাই যখন চলে গেছে, কালীদাসী উনুনে আগুন দিয়েছে, শাকপাতা তুলে এনে রেখেছে, তখন নিবারণ সেই ঝোপটার দিকে হাঁটু হাঁটু করতে করতে হেঁটে গেল। গাছ জঙ্গল সরিয়ে কি খুঁজতে থাকল। যেন তেনার নিবাস কোথায়, দেখা দরকার। জোর জার করে কিছু করা ঠিক না। বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলা, বড় নাগের কাছে, ভগবান জমিটো আমারে দিছেন। ভাবলে তো জায়গার অভাব কি। ছেড়ে যা। চলে যা। সে তারপরই দেখল, মজা বাঁশের গাড়ির ভেতর বেশ বড় আকারের খোঁদল। সে চুপি দিয়ে বুঝল, আছেন তেনারা। জোড়ায় আছেন। সে বলল, জমি ভগবান দিছেন। তোরা আর ভুঁইয়ে থাকিস না। কার কি কুনজরে পড়ে প্রাণ হারাবি, সরে যা। থানা পুলিশ করার মানুষ না আমি। পাপীতাপী মানুষ। ভুঁই যার থাকে না, সে বড় অভাগী নারায়ণ। কিসে কি দোষ পেয়ে নিবে।

কালীদাসী বলল, কি সব কথা বলছেন গো। কার লগে এই কথা।

নিবারণ বলল, তুই বুঝবি না। ওদের আর ডেকে দেখাতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। আক্রোশে কি করে দিবে, কাকে ডেকে বুকে পায় দিবে কে জানে। সে বলল, ভগবানের সামুতে কথা বলে নিচ্ছি।

তারপরও যখন নড়ল না, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, কেউ কেউ ভুঁই ছেড়ে আস্তানায় চলে গেছে, কেউ কেউ থেকে গেছে, আর যাবেই না হয় ত, এবং একটা উদাসীন মাঠে যখন দুটো একটা লন্ঠনও জ্বলে উঠল, তখন নিবারণ এসে বলল, অপনের (অপানের) কাগজটা কুথিরে? আমারে দে।

কালীদাসী বড় সংগোপনে রেখে দিয়েছিল। সে সেটা বের করে দিয়ে বলল, কি হবে?

—হবে, কিছু হবে।

এবং আশ্চর্য এত শক্ত মানুষটা এখন সেই ঝোপটার দিকে কুপি হাতে যাচ্ছে। তারপর কি সব বলছে! এক বিন্দু কিছু শুনতে পাচ্ছে না। সে কাছে গেল চুপি চুপি। দেখে ভাতের গন্ধ ছড়াচ্ছে। শাক পাক হয়েছে কখন খাবে, কখন নিতাইকে খাওয়াবে জোয়ামীকে খাওয়াবে, তবু মানুষটার গতিক বড় মন্দ লাগছে। সে কাছে গেলে দেখল, কাগজটা খোঁদলের কাছে নিয়ে

নাড়ছে আর বিড় বিড় করে কি বলছে। কালীদাসী বলল, কি বলছেন নাগের সঙ্গে।

নিবারণ বলল, বলছি, আমার ছুঁইয়ে তেনার থাকা আর ঠিক হবে না। সরে যেতে বলছি। অন্নপনের কাণ্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছি। মিথ্যা বলছি না। বলে নিবারণ উঠে পড়ল। অন্ধকারে প্রায় কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না।

তারপর খাওয়া দাওয়া সারা। নতুন তাল-পাতার ঘরে সে আর কালীদাসী। সারা রাত নিবারণ ঘুমোতে পারল না। নিতাই টো কাছে কোথাও শুয়ে আছে। কালীদাসীরও ঘুম আসছে না। ভরপেট খেয়ে কালীদাসী করে না ঘুমিয়েছিল সে ভেবে উঠতে পারে না। আর সেই তেনারা, যা ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, কখন কিলবিল করে মাথার ওপর উঠে আসবে—এত শত্রু থাকে জমি থাকলে সে আগে কখনও টের পায় নি। এবং যখন সে কালীদাসীকে বুকে টানতে গিয়েছিল, মনে হল শক্ত, প্রাণ নেই। সে হাঁকড়াল, কালী-দাসী! কালীদাসী বলল, উম্। সে বলল, কালীদাসী তুর হাত পা কাট কাট লাগছে কেনে রে! কালীদাসী বলল, উম্! সে বলল, কালীদাসী তুর হাত পা কাঠ কাঠ লাগছে কেনে রে! কালীদাসী বলল, উম্! এবং শক্ত কাঠেই যখন করাত চালিয়ে নিবারণ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল, তখন মনে হল কালীদাসী নাক ডাকছে। এবং নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল কখন জানে না। আর ভোর রাতে ঘুম ভাঙলে দেখল কালীদাসী পাশে নেই—কুনঠি গেল! উঠে দেখল, কালীদাসী আর নিতাই কুপি হাতে কার পিছু ধাওয়া করছে।

নিবারণ হাঁকল, কালীদাসী!

নিতাই বলল, সাপ দাদা।

—কোনঠি!

—চইলে যাচ্ছে।

সেও ছুটে গেল। সাপের আণ্ডাগণ্ডা সব মিলে বেশ সাত-আটজন তেনারা চলে যাচ্ছেন। নিতাই কালীদাসীর দিকে কেমন এখনও প্রলোভনের চোখে তাকিয়েছিল। নিবারণ কিছুটা সরে এসে প্রায় ধরে ফেলতে গেছিল একটা ভুজংগকে। এবং ওটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছিল ওদের ওপর। সে পারে নি শেষ পর্যন্ত। মনোরম সকালের বাতাস, সুন্দর শস্যক্ষেত্র, এবং ভূখণ্ডের জন্য মায়া তাকে সাধুপুরুষ করে তুলেছে। সে বড় ভাল মানুষের মতো বলল, তুরা চলি যায়। কখন কিসে কাটবে টের পাবি না। সে বড় ভালমানুষ হয়ে গেল। সে হেঁটে গেল কিছুটা। কিছু বলল না কাউকে। ধরায় এমন সুন্দর সকাল হয় সে জানত না। সে চুপচাপ আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য এক শস্যক্ষেত্রের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল।

কালীদাসী তখন দাঁতে কুট-কুট করে ঘাসের পাতা কাটছে। নিতাই কালীদাসীর দিকে একবার তাকাল। তারপর ঘাড় গুঁজে মুচকি হেসে হাঁটা দিল ওর জমির দিকে।

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেলিশপ্রক্রিস্টিন

প্রণতা দে

কী করে লেখাটি পেলাম

বিবেকানন্দ এমনই এক নাম—যাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই পৃথিবীর নিজের জিনিস। বিশেষ করে আমরা ভারতীয় বলে তিনি তো আমাদের আরও বড় ব্যাপার। তাঁর অপ্রকাশিত উনসত্তরখানি চিঠি? তাঁর এক বিদেশী শিষ্যাকে লেখা? সেই শিষ্যার জীবনের কথা? এই এতদিন পরে? এও কি সম্ভব?

গোড়ায় শুনে বিশ্বাস হয়নি। এ তো সোনার খান।

খবরটা এনেছিলেন শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যের দিকে অফিসের পর বিশুবাবুর সঙ্গে গেলাম। খিদিরপুরে।

লখনউয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার দে আর তাঁর স্ত্রী প্রণতা দে-র সঙ্গে আলাপ হোল। ওঁরা এসেছেন কলকাতায়। প্রণতা তাঁর বাপের বাড়িতে উঠেছেন। দক্ষিণ কলকাতায়। বাবা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ। প্রশান্ত মহলানবীশের পরে। ভাস্করের আগে।

বিয়ে হয়ে প্রণতা চলে যান লখনউয়ে। সেখানে ডাক্তার দে তিনপুরুষের বাসিন্দা। উত্তরপ্রদেশ হেলথ সার্ভিসের তিনি ডাক্তার। সারা ইউ পি ঘুরেছেন।

আগেকার লালরংয়ের সুন্দর মেঝে। প্রকাণ্ড সাইজের ঘর। শ্রীমতী প্রণতা দে-র সঙ্গে আলাপ হোল। আলাপ হোল ডাক্তার দে-র সঙ্গে। প্রণতা আর তাঁর স্বামী তিনটি বছর ছিলেন আলমোড়ায়। সেখানে কুন্দন হাউসে বশীশ্বর সেন মশায় এবং শ্রীমতী সেনের ওঁরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

প্রণতা বললেন, বশীদার মৃত্যুর পর বৌদি আমায় বলেছেন, তুমি এসব তথ্য, চিঠি ব্যবহার কর। বাঙালীদের জানাও। বাংলায়

প্রকাশিত হোক। মার্কিন সাংবাদিক শ্রীমতী বার্ক বৌদির কাছ থেকে কিছু চিঠি নিয়েছেন। বাকিটা আমি দেখেছি। নোট করেছি। তারপর আস্তে আস্তে লিখেছি। ওঁদের স্নেহ না পেলে হোত না।

বললাম, আপনার ম্যানাসক্রিপ্ট তৈরি।

প্রায় সবটাই তৈরি।

আমরা মেঝেতে বসলাম। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শ্রীমতী ক্রিস্টিন তাঁর টাইপ করা স্মৃতিলিপি নিজের হাতে সংশোধন করেছেন। তাই মেলে ধরলেন প্রণতা। ডেট্রয়েটের খবরের কাগজে ১৯২৫ সাল ক্রিস্টিনের যে-ছবি বেরিয়েছে—তাও দেখালেন প্রণতা। তারপর কলকাতার বোসপুকুর লেন থেকে লেখা ক্রিস্টিনের চিঠি।

সে এক খনি। প্রণতা একটু একটু করে সব গুছিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে সময়ের বালি সরিয়ে তিনি সবকিছু খুঁড়ে বের করেছেন। নিরলস পরিশ্রমী মহিলা। কখনো আলমোড়া, কখনো লখনউ, কখনো কলকাতা—দীর্ঘদিন ধরে নানা জায়গা ঘুরে এক একটি তথ্যের ভিত্তি খুঁজে বের করে জোড় মিলিয়েছেন। সঙ্গে সাহায্য করেছেন ডাক্তার দে। বিনয়ী, সদালাপী, নিরভিমান মানুষ—দুজনই।

ওঁরা ওঁদের বশীদাকে, বৌদিকে ভালবাসেন। ভালোবাসেন ক্রিস্টিনের স্মৃতিকে। এক বিদেশিনীর ভারত-প্রেম, বিবেকানন্দে সমর্পণ ওঁদের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা, ভালবাসার বিষয়।

প্রণতা বললেন, এ লেখা প্রকাশ পেলে বিবেকানন্দকে আরও জানা যাবে। জানা যাবে সেই মহীয়সী মহিলা—ক্রিস্টিনকে। ক্রিস্টিন এদেশে এসেছিলেন স্বামীজীর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে দেশে ফিরে যান। তারপর আবার এসেছেন। বশীদা ওঁকে মায়ের মত দেখতেন।

প্রসঙ্গত প্রণতা বললেন, বশীদার মৃত্যুর পর বশীদার কথা লিখেছিলাম আপনাদের অমৃত সাপ্তাহিকে।

বললাম, তাহলে আমাদের এ লেখা দিন। অমৃতের পাঠকরা এই লেখাই চান।

প্রণতা বললেন, সানন্দে। দেখুন—আমার পরিশ্রম যদি আপনাদের কাজে লাগে।

প্রণতা দে

এই লেখার মূলে যে দুজন মানুষ

বশীশ্বর সেন

'বশীশ্বর সেন বিজ্ঞান' জগতে, বুদ্ধিজীবীমহলে এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মধ্যে সুপরিচিত ব্যক্তি। আলমোড়ায় বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর, প্রতিষ্ঠাতা তথা পিতা। আদি বাড়ী বিষ্ণুপুরে। শ্রীযুক্তা সেনের ভাষায় বলি "গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষ করে বশী চাইলেন শহরে গিয়ে লেখাপড়া করবেন। কেমন করে করবেন? কোথায় সে সম্পতি? (বাবা ছিলেন ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্—তখন পরলোকে)। বশী একদিন নিঃশব্দে বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন তাঁর শহরবাসী কোন দিদি সম্পর্কীয়ার উদ্দেশ্যে। মাকে জানালেন না। পাছে বাধা পান। শুধু রান্নাঘরের দিকে ঝুঁকে দেখে গেলেন মা রান্না করছেন। মনে মনে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। চলেছেন মাঠের পথে খালি পায়ে, হাতে নিয়ে জুতো জোড়া। জুতো জোড়া পয়সা দিয়ে কেনা হয়েছে, পথের ধুলো কাদায় নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। পা-জোড়া তো পরে ধুয়ে নেওয়া যায়। পথে দেখা হয়েছিল এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে। তাকে বলেছিলেন মাকে বলে দিও শহরে যাচ্ছি লেখাপড়া শিখতে। শহরের স্কুলে বশী একটা মস্ত বৃত্তি পেয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল যখন আবার দেশে যাবেন টাকাটা নিজের মাকে দেবেন। সম্ভব হয়নি। মা তার আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন।"

সেনমহাশয়ের দুই কৃতী ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ বীরেশ্বর সেন ও ডাঃ জ্ঞানেশ্বর সেন এখন দিল্লিবাসী বিজ্ঞানী।

সেনমহাশয়ের বড় ভাই সুরেশ্বর সেনের নাম শ্রীশ্রীমা ও পরমহংস দেব সংক্রান্ত বিভিন্ন বইয়ে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীশ্রীমা বিষ্ণুপুরে গেলে এঁদের বাড়ীতে থাকতেন। পরবর্তী কালে সেন মহাশয়কে বলেছিলেন 'এই বাড়ীতে অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি এসেছেন, বাড়ীখানি রক্ষা কোরো।' বশী সেন জীবনে প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি লাভ করবার পরেও শ্রীশ্রীমায়ের 'আদেশ' ভোলেননি! তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিখ্যাত সম্পাদিকা, লেখিকা, বিদুষী পত্নী গার্ট্রুড (এমারসন) সেন তাঁর ইচ্ছা পালন করেছেন। বিষ্ণুপুরের পৈত্রিক বাড়ীটিতে ছোট একটি শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন যথেষ্ট অর্থব্যয় করে শ্রীশ্রীমায়ের নামে।

সেন মহাশয়ের কর্মজীবনে প্রচণ্ডরকম পরিবর্তন আনেন নিবেদিতা। নিবেদিতাই তাঁকে স্যর প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। গেডেস দেখলেন যুবকটি প্রতিভাদীপ্তিময়! সঙ্গে করে তাঁকে ইংলণ্ডে নিয়ে যান এবং এরপর থেকেই সেনের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। কী দেশের, কী বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান তিনি। ধনী আমেরিকান মহিলা মিসেস মুর তাঁর ল্যাবরেটরীর জন্য তাঁকে মোটা অঙ্কের অর্থ দান করেন। এই অর্থপ্রাপ্তির কৃতজ্ঞতায় শ্রীযুক্ত সেন মিসেস মুরকে চিঠি লিখছেন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে:—

New York City 7th Feb. 1930—". . . . of all the people who met Swami Vivekananda you are the only one I have the privilage to know who heard him deliver his first message It is the fitness of

things that this gift has came through you. Six years ago inspite of utter financial uncertainty and misgivings of my own ability I dared associate my little laboratory with Swamiji's name on strength of that Supreme Law he expanded. "Giving up all other thought who take refuge in me, carry him all that is necessary for him"......If you can spare the time it will be a great joy to convey personally a little of what your gift has meant.

With abiding gratitude and devotion.
Boshi

সেন মহাশয়ের জীবনের প্রতিষ্ঠার মূলে আছে তাঁর গুরুর প্রতি (স্বামী সদানন্দ) অবিচল বিশ্বাস, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি ভক্তি ও স্বামীজীর চিন্তাকে, ভাবধারাকে জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে প্রতিফলিত করবার সাধনায়। এই চেষ্টা বা সাধনা সম্ভব হয়েছে তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায়।

মিঃসংতোম সেন ... মাস বারমাস। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন দেশবাসী, বিভিন্ন ধর্মের বিখ্যাত, অখ্যাত ব্যক্তিদের সমাগম। গৃহী, সন্ন্যাসী, শিল্পী, বিজ্ঞানী, চিত্রকর, চিকিৎসকের বৈকালিক চায়ের টেবিলে জমাট গল্প আলোচনা। মনে পড়ছে চায়ের টেবিলে বশীদা বলছে 'একবার দার্জিলিং-এ জগদীশচন্দ্র বোসের বাড়ীতে খেতে বসেছি, মিসেস বোস (অবলা বসু) বিরাট একখানা মাছের মাথা কবির (রবীন্দ্রনাথ) পাতে পরিবেশন করলেন। কবি বিমূঢ়। পাশেই বসেছিলাম আমি। আমার দিকে তাকিয়ে কবি করুণ স্বরে ফিস ফিস করে বললেন, 'বশী! আমাকে বাঁচাও। এটি তুমি তুলে নাও।' আমার লোভ কিছু কম নয়। তবুও কবিকে বাগে পেয়ে বললাম, "বাঁচাব এক শর্তে— আমাকে কী দেবেন পরিবর্তে?" কবি জানাতেন আমি লোভীমানুষ। তাৎক্ষণিক প্রতিজ্ঞা "তোমাকে পিঠে খাওয়াবো।" পিঠের লোভে মাছের মুড়োর সদ্ব্যবহার মুহূর্তে করে ফেললাম। পরে আবার দেখা হল ইংলণ্ডে। (অথবা আমেরিকা বলেছিলেন সেনমহাশয়, আমার মনে নেই।) দাবী করলাম "আমার পিঠে কই?" কবি কাতর-ভাবে বললেন, "এমন নিষ্ঠুর হয়ো না বশী,—এখানে আমি ঘরছাড়া, অনাথ, অসহায়।"

মনে পড়ছে একবার রাণীক্ষেতে নতুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এলেন (১৯৬৬ জুন)। সেন দম্পতিকে আগেই খবর পাঠিয়েছেন 'দেখা করতে চাই।' ভীড়ের মধ্যে বৃদ্ধ দম্পতি এলেন না। দেখা হল দ্বিপ্রাহরিক ভোজে আর্মি মেসে। জড়িয়ে ধরলেন ইন্দু ও বশীদা পরস্পরকে।

স্বর্গতঃ প্রধানমন্ত্রী জহরলাল তখন খুব অসুস্থ।[১] বশী দিল্লি এসেছেন শুনে দেখা করতে বললেন। বাইরের লোকের ঘরে আসা নিষিদ্ধ তখন। সেনমহাশয় ঘরে গেলেন। গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। দুই বন্ধুর এই শেষ মিলন! এর অল্পদিনের মধ্যেই জহরলালের মৃত্যু হয়।

শ্রীমতী এমারসন সেন

মনে পড়ছে শ্রীযুক্তা সেনের কথা সেবার আলমোড়া জেল থেকে ছাড়া পাবার আগে জওহরলাল আমাকে চিঠি লিখলেন 'গার্ট্রুড, জেল থেকে সোজা তোমার বাড়ীতে গিয়ে লাঞ্চ সেরে সমতলে নামব।' (চিঠিখানি শ্রীযুক্তা সেন আমাকে দেখিয়েছিলেন, আমি পড়েছিলাম)। তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জেমস (সম্ভবত) ও তাঁর স্ত্রীকেও নিমন্ত্রণ জানালাম। মিঃ ও মিসেস জেমস আমাকে নাম ধরেই ডাকত। কিন্তু আমি একজন পাশ্চাত্ত্য মহিলা ইংরেজের শত্রু জওহরলালকে বাড়ীতে খেতে আপ্যায়ন করছি দেখে তিনি বিস্মিত, ক্রুদ্ধ, আহত। আমাকে শ্রীমতী সেন সম্বোধন করে সংক্ষিপ্ত একটি চিঠিতে জানালেন তিনি বা তাঁর স্ত্রী ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অক্ষম। এর পরে জেমসরা কখনও আমার বাড়ীতে আসে নি। কোথাও দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নিত।

মনে পড়ছে শ্রীযুক্তা সেনের গল্প 'একবার রবীন্দ্রনাথ এলেন। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন পাহাড়ী পথে উঠতে। বাড়ীর গেট থেকেই কাতরভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বশী! আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম যার জন্য তুমি আমাকে এত বড় শাস্তিটা দিলে?' বশী তো প্রথমে ঘাবড়ে গেল কী বা অসন্তোষের কারণ সে হয়েছে কবির। একটু পরে বুঝতে পেরে, হেসে উঠল বশী—সঙ্গে কবিও।

Pranata I do admire your energy and interest in writing these Bengali articles. If you are really contemplating a book about Christine, you ought to come up here and go through the whole trunk of material by, and concerning her, now in the Puja room. Also the letters Swamiji wrote to her, locked up in my safe.

এই দিনই আসন্ন সন্ধ্যায় একটি ছবি এঁকে পর দিন সকালে ছবিটি কবি শ্রীযুক্তা সেনকে উপহার দেন। তারিখটা ছিল ৬ মে। ছবির পেছনে লেখা কবির ও আমার একই জন্মদিনে উপহার পেয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীযুক্তা সেনের হিসেবে ভুল আছে। কারণ ২৫ বৈশাখ ৭—৯ মের মধ্যে পড়ে। ৬ কখনও পড়েছে বলে জানি না। শ্রীযুক্তা সেনের জন্মদিন অবশ্য ৬ মে।—এই ছবিটি শ্রীযুক্তা সেন পরে লেখিকাকে উপহার দিয়েছেন।

শ্রীযুক্তা বশী সেন শিকাগো নিবাসী অধ্যাপক আলফ্রেড এমারসনের কন্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞানী বশীশ্বর সেনের স্ত্রী। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, রয়াল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির ফেলো, সোসাইটি অফ উইমেন জিওগ্রাফারস-এর ফাউণ্ডার সদস্য এবং আমেরিকান এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। এশিয়া পত্রিকার সম্পাদনা করতেন প্রাক্ বিবাহ যুগে। বিবাহের পর পার্টটাইম সম্পাদিকা হন এশিয়া পত্রিকার। প্রাচ্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছেন এবং প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে এশিয়া পত্রিকাতে (ও অন্যান্য) প্রবন্ধ লিখতেন। কিছুদিন শবরমতী আশ্রমেও থেকেছেন। ভারতে এসে এদেশের জনজীবনকে জানবার জন্য উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা জেলার এক অখ্যাত গ্রাম পাঁচপেড়ুয়াতে (পাঁচটি গাছের গ্রাম) কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। সেই গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা ভয়েসেস ইণ্ডিয়া। গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে আমেরিকায়। এর মুখপত্র লেখেন রবীন্দ্রনাথ ও পার্লবাক। সেনসাহেবের সঙ্গে বিবাহ ১৯৩২, ২ নভেম্বর, কলকাতায়, হিন্দুমতে।

১। এই সময় ভুবনেশ্বর থেকে অসুস্থ হয়ে ফিরেছিলেন। এই ঘটনা শ্রীমতী সেনের মুখে শোনা। ঘটনার সত্যতা নিয়ে যদি কেউ আমাকে সন্দেহ করে আহবান করেন তবে তাঁকে বৃন্দাবন-হাউসের ঠিকানা দিয়ে দেব।

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ

১৮৯৭ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে

ক্রিস্টিনকে লেখা স্বামীজীর ১৮৯৭—৯৯ সালের পত্রাবলী শ্রীমতী মেরীলুই বার্কাকে সম্পূর্ণভাবে দিতে শ্রীমুক্তা সেন অঙ্গীকারবদ্ধ। নীচে ১৮৯৭ থেকে পত্রাবলী দেওয়া হল।

১　　জাহাজ প্রিন্স রিজেন্ট
সুইট পোল। ৩রা জানুয়ারী
১৮৯৭

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

আজ বেলা দুটোর সময় পোর্টসৈদ-এ পৌঁছেছি। আবার একবার এশিয়ায়। তোমার খবর অনেকদিন জানি না। আশাকরি তোমার খবর সব ভাল। মিসেস ফাঙ্কে, মিসেস ফেলপ্‌স্ এবং অন্যান্য বন্ধুরা কেমন আছে?

তোমাদের সকলকে আমার ভালবাসা জানাচ্ছি। যখন তোমার ইচ্ছে হবে তখন চিঠি লিখো।

বিবেকানন্দ
বরানগর মঠ। কলিকাতা।
ভারতবর্ষ।

(এটি ভারতের পথে জাহাজ থেকে লেখা একটি পোস্ট-কার্ড। উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দ ক্রিস্টিনকে সব চিঠিতে ক্রিস্টিনা বলে সম্বর্ধনা করেছেন। ক্রিস্টিনের কিছু অন্যান্যদের লেখা চিঠিতেও ক্রিস্টিনা স্বাক্ষর পাওয়া যায়। কিন্তু লোকে তাঁকে ক্রিস্টিন বলে।)

২　　আলমবাজার মঠ
কলিকাতা। ১৬ই মার্চ। '৯৭

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

ফটো ও কবিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমি এরকম সুন্দর জিনিষের অর্ধের সুন্দর জিনিষও কখনও দেখিনি।

সিংহল থেকে কলকাতায় পৌঁছেই আমার এত বেশী কাজের চাপ ছিল যে আমি এর আগে তোমাকে তোমার সুন্দর উপহারের প্রাপ্তি সংবাদ দিতে পারিনি। এই কাজে আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। আমি এখন দুরারোগ্য ডায়াবিটিস রোগের রুগী, এ রোগ কয়েক বছরের মধ্যেই আমাকে শেষ করে দেবে!

আমি তোমাকে এখন দার্জিলিং থেকে চিঠি লিখছি। এটি কলকাতার কাছেই একটি পাহাড়ী জায়গা। লণ্ডনের মত শীত এখানে। এখানে এসে একটু ভাল বোধ করছি। যদি বেঁচে থাকি তাহলে আগামী বছর আমেরিকাতে যেতে পারি।

তোমাদের কাজকর্ম সব কেমন চলছে? মিসেস ফাঙ্কে, মিসেস ফেলপ্‌স্ কেমন আছেন? মাঝে মাঝে যখন সম্ভব হয় কিছু কিছু ডলার জমাচ্ছ কী? এটা খুব দরকার।

চিঠিটা আজই ডাকে দেবার জন্য তাড়া করছি। তুমি শুনলে খুসী হবে যে ভারতবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে এবারে আমাকে সম্মান জানিয়েছে। আমি এখন তাদের উপাস্য হয়ে পড়েছি। আমার উদ্দেশে যেসব বক্তৃতা সবাই দিয়েছেন এবং তার যা প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে একটি বইয়ের আকারে গুডউইন প্রকাশ করবে। সর্বত্র যেরকম সভাসমিতি হয়েছে তা অভূতপূর্ব!

তোমাদের ভালবাসাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

৩　　আলমোড়া।
৩ জুন। ১৮৯৭

প্রিয় ক্রিস্টিনা,—তোমার আমার সম্বন্ধে এতটা শঙ্কিত হবার কিছু নেই। যেহেতু রকমারী রোগের ব্যাপার লেগেই আছে এবং ..... মস্ত আমি বেশ সেরেও উঠেছি। আমার সবল গঠন আমাকে বারবার সেরে উঠতে সাহায্য করছে, এবং সেই সবলতা রোগীটিকেও রীতিমত জোরালো করে তুলছে। সব বিষয়েই আমি extreme এমনকী শারীরিক ব্যাপারেও। আমি লোহার বল্টুর মত নয় তো একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি।

অত্যন্ত কাজের চাপে যে রোগ দেখা দিয়েছিল, বিশ্রামের পর তা উবে গেছে। দার্জিলিং-এ তো একেবারে সেরে গিয়েছিলুম। দেখতেই পাচ্ছ এখন আমি আলমোড়াতে আছি। এমনিতে ভালই আছি তবে একটু বদহজমে ভুগছি। সেজন্য আমি ক্রিশ্চান সায়েন্স অভ্যাস করছি। দার্জিলিং-এ আমি অনেকরকম মনের চিকিৎসা করতুম, রকমারী ব্যায়াম, পাহাড়ে ওঠা, ঘোড়ায় চড়া,

বিবেকানন্দের চিঠির প্রতিলিপি

খাওয়া ঘুমোনো। এই সবই এখন আমার কাজ। এর দরুণ শরীরে জোর পাচ্ছি এবং ভাল আছি। এরপরে যখন তুমি আমাকে দেখবে, আমি একজন রীতিমত অ্যাথলেট।

আমার নিজের ব্যাপারে আমি বলব, আমি এখন খুব সন্তুষ্ট মনে আছি। আমাদের কিছু লোককে আমি খানিকটা জাগিয়ে দিয়েছি। ব্যস্ এতটাই চেয়েছিলাম। তারপর কর্মফল অনুযায়ী জিনিষটা সেইভাবে পথ খুঁজে নেবে। আমার আর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আমি দেখেছি মানুষের সব কিছু নিজের স্বার্থে। জীবনটা নিজের জন্য, ভালোবাসা নিজের জন্য, সম্মান জন্য,—সবই শুধু নিজের স্বার্থে। আমি পেছন ফিরে নিজের জীবনটা দেখতে পাই—কিছু নিজের জন্য করিনি। এমনকী আমার খারাপ কাজগুলোও নিজের স্বার্থে নয়। অতএব ক্রিস্টিনা, আমি সন্তুষ্ট। একথা অবশ্য মনে করি না যে আমি একটা বিশেষরকম ভাল বা মহৎ কিছু করেছি। কিন্তু পৃথিবীটা এত ছোট, জীবনটা এত তুচ্ছ, বেঁচে থাকাটাই এমন একটা বন্ধন, যে আমি অবাক হয়ে যাই এবং মনে মনে হাসি আর ভাবি যে মানুষ বুদ্ধিযুক্ত মন সত্ত্বেও কী করে শুধু নিজের জন্য ছুটে বেড়ায়—যা এত হীন এবং ঘৃণ্য।

এই হল আসল কথা। আমরা একটা ফাঁদে ধরা পড়েছি এবং যতশীঘ্র এই থেকে ছুটি পেতে পারি ততই মঙ্গল। আমি এ সত্যকে বুঝতে পেরেছি, অতএব শরীরটা যদি কখনও একটু ভালমন্দ হয় কী এসে যায় তাতে?

এখন আমি যে বাড়ীতে আছি একটা সুন্দর পাহাড়ী বাগানে। উত্তরে দিগন্ত প্রসারী তুষারাবৃত পর্বত চূড়ারসারি। চারদিকে বনরাজি। এখানে এখন ঠান্ডা নেই। গরমও নয় তেমন। সকাল সন্ধ্যা বড় মনোরম। গ্রীষ্মকালটা এখানেই থাকব। বর্ষার প্রারম্ভে সমতলে নেমে যাবো, কাজ করতে।

তুমি কেমন আছ? কী করছ এখন? তোমার এবং মিসেস ফাঙ্কের কাজকর্ম কেমন চলছে? তোমার ব্যাঙ্কের অংকটা কিঞ্চিৎ ভারী হয়েছে? তুমি অবশ্যই একাজ করবে। আমার জন্যই করবে। যদি আমি কাজ করতে করতে ক্লান্ত, অসুস্থ, হয়ে পড়ি তবে কাজের ইতি করে আমেরিকায় যাবো। তোমাকে তখন আমাকে একটু খুশী ঠাঁই ও খেতে দিতে হবে। দেবে তো?

আমি জন্মেছিলাম এক কোনে বইপত্র নিয়ে লেখাপড়ার কাজে শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপনের জন্য। কিন্তু মায়ের ইচ্ছে হল অন্যরূপ। তবুও সেই ভাবটি (লেখাপড়া নিয়ে থাকা) এখনও আছে। তুমি মনের শান্তিতে এবং শারীরিক কুশলে আছ জানলে খুশী হব।

তোমার জন্য আমার সতত ভালবাসা

বিবেকানন্দ

পুনঃ—আমার অন্যান্য বন্ধুদের সকলকে ভালবাসা জানাচ্ছি। বেবীর কী খবর?

(৪)

যোধপুর। রাজস্থান।

৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৮৯

নতুন বছরে আমার ভালবাসা প্রীতিসম্ভাষণ তোমাকে জানাচ্ছি স্নেহের ক্রিস্টিনা। এই চিঠি যেন তোমাকে হৃদয়ে নবীনা, দেহে সবলা এবং শান্ততর মনোবলে দেখতে পায়! আমি এখনও সময়ে অসময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বক্তৃতা দিচ্ছি এবং বেশ যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করছি।

তোমার কি ইংলণ্ডের স্টার্ডির সঙ্গে দেখা হয়েছে? শুনলাম সে এখন জেরুয়েলে গেছে। কেমন লাগল তাকে তোমার? আমি এখন বেশ ভাল আছি এবং শরীরে বল পাচ্ছি। আশাকরি এই শুভ বছরেই তোমার সঙ্গে আমার আবার আমেরিকাতে দেখা হবে।

আমি দিন কয়েকের মধ্যেই কলকাতায় যাবো। সেখানে শীতের শেষকটা দিন কাটাবো! আগামী গ্রীষ্মেই ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে যাবার সম্ভাবনা। Ever, yours in the Lord

বিবেকানন্দ।

(৫)

বেলুড় মঠ। জিলা হাওড়া

বাংলাদেশ। ভারতবর্ষ

১১ই মার্চ, ১৮৯৮

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তোমার কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। একযুগে হল তোমার কোন চিঠি পাইনি। স্টার্ডির ডেট্রয়েটে আসবার পর বেশ কিছু জানব আশা করেছিলাম। কেমন লাগল তোমার তাকে? বেবী এবং লেডেন্ডদের খবর কী? মিসেস ফাঙ্কে কেমন আছেন? এই গ্রীষ্মকালটা কীভাবে কাটাতে চায়! একটু বিশ্রাম নাও স্নেহের ক্রিস্টিনা। আমি জানি তোমার একান্তই বিশ্রাম দরকার।

বস্টনের মিসেস বুল এবং নিউইয়র্কের মিস ম্যাকলয়েড এখন ভারতবর্ষে। আমরা আমাদের মঠটিকে পুরোনো ঝড়ঝড়ে বাড়ী থেকে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ীতে নিয়ে এসেছি। এটা স্বাস্থ্যকর এবং সুন্দর জায়গা। গঙ্গার এই দিকেই আমরা বেশ খানিকটা জমি পেয়েছি সেখানে মিসেস বুল এবং মিস ম্যাকলয়েড এখন আছেন। বিস্মিত হতে হয় কী চমৎকারভাবে এরা নিজেদের ভারতীয় জীবনযাত্রা—তার অসুবিধে, নানাবিধ অসাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কেমন মানিয়ে নিয়েছেন। আমেরিকার লোকেরা কী না করতে পারে! বস্টন এবং নিউইয়র্কের প্রাচুর্যময় জীবনযাত্রা থেকে এই ছোট্ট পোড়োবাড়ীতে কেমন খুশীতে, আনন্দে আছেন!! ইচ্ছে আছে আমরা একসঙ্গে কদিন কাশ্মীরে বেড়িয়ে আসব। তারপর আমি ওঁদের সঙ্গে আমেরিকাতে যাবো। আমি সুনিশ্চিত যে সেখানকার বন্ধুরা আমাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাবে। তুমি কী বল? এই খবরটি তোমার কাছে 'স্বাগতম' পাচ্ছে কী?

অবশ্য এবার আর আমি আগের মত কাজ করতে পারব না। প্রিয় ক্রিস্টিনা, তোমাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি সেরকম পরিশ্রম করা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অল্পস্বল্প কাজ করব, আর বিশ্রাম করব বেশী। আর লোকের ভীড় জড়ো করে হৈচৈ করা চলবে না! চুপচাপ নিরিবিলিতে কিছু ব্যক্তিগত কাজ করতে চাই।

এবারে আমি নিঃশব্দে যাবো, নিঃশব্দে ফিরব। শুধু নিজের পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব। কোনরকম হৈচৈ নয়। শীঘ্র চিঠি লিখো। আমি বড় চিন্তিত।

Ever your in the Lord

বিবেকানন্দ

পুঃ—"পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লেখক আছে। একদলের হৃদয় জলবৎ আর একদলের পাষাণবৎ। প্রথম জনের ওপরে যেকোন কিছুর ছাপ সহজে পড়ে এবং সহজেই মুছে যায়। অন্যজনের ওপরে সহজে ছাপ পড়ে না। কিন্তু একবার যদি পড়ে তবে তার ছাপ রইল গভীর হয়ে চিরতরে। না,—বরং বলব যত তাঁরা সেটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে, ততই তার ছাপ আরও গভীরতর হয়ে হৃদয়ের অন্তস্থলে চেপে বসে।" বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

The disciples (Christine and Mrs. Funkey) who travelled hundreds of miles to find me—they came in the night and in the rains.

(Vivekananda)

কে এই ক্রিস্টিন

আলমোড়া বিবেকানন্দ ল্যাবরেটোরীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত বশী সেন মশায়ের বর্ণনায় বোন ক্রিস্টিনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যের শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যা ভগ্নী ক্রিস্টিন ১৯৩০ সালে ২৭ মার্চ ভোরবেলা দেহরক্ষা করেন। ঐ সময় তিনি নিউ-ইয়র্কে তাঁর বন্ধু শ্রীমতী এলিস ফুলেন লি-রয়ের বাড়ীতে ছিলেন। নিউইয়র্কে চিকিৎসা, যত্ন যতদূর সম্ভব ততটাই শ্রীমতী লি-র ভগিনি ক্রিস্টিনের জন্য করেছিলেন। শেষদিকে সাতদিন বাড়াবাড়ি অবস্থায় অসুস্থ ছিলেন। শেষের চব্বিশ ঘন্টা একেবারে কথা বলতে পারেন নি। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান ছিল। মাঝে মাঝে চোখ খুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন যেদিকে বসে ওঁর প্রিয় সংস্কৃত শ্লোক গান হচ্ছিল।

দীর্ঘ দিনব্যাপী অসুস্থতা ওঁর সুশ্রী মুখমণ্ডলে একটা ক্লান্তি ও অসুস্থতার ছাপ রেখেছিল। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের ভাব অদ্ভুত রকম বদলে গেল। এক অপার্থিব জ্যোতি ও প্রশান্তি তাঁর মুখমণ্ডলে ছেয়ে যায়। এবং বার্ধক্যের ভাব ধুয়ে তারুণ্যের ছাপ। যে দুঃখ-যন্ত্রণা এতদিন তাঁর শরীরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে সব কিছুকে যেন তিনি স্বর্গীয় হাসি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন। এ যেন তাঁর পরম উপলব্ধি, যাকে তিনি আগেও অনুভব করে একবার লিখেছিলেন। —এ উপলব্ধির কথা ভাষায় লেখা যায় না। সাধারণ মানুষের ভাষা দিয়ে একে প্রকাশ করা যায় না। জাগতিক মায়ার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। সেখানে সমস্ত স্তব্ধ,—গভীর স্তব্ধতা। একে কী বলবে শান্তি? জীবনের সমস্ত কোলাহল সেখানে স্তব্ধ হয়ে যায় প্রথমে,—সেখানে উচ্ছ্বাস নেই, আশা নেই, ভয় নেই, আনন্দ, দুঃখ, কিছুই নেই। সব নেতি—নেতি নেতি। এমন প্রগাঢ় অবস্থা আমি আর কখনও উপলব্ধি করি নি। আমি শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অল্প বয়সে চার্চের অনুশাসন সম্বন্ধে তাঁর আবেগপূর্ণ ভক্তি ছিল তাঁর। তিনিই ডেট্রয়েটের প্রথম ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্টিস্টদের একজন হলেন। কিন্তু অশান্ত আত্মা তাতে তৃপ্ত হল কোথায়? তারপরেই সেই দিনটি এল—যার কথা তিনি তাঁর স্মৃতিলিপিতে লিখেছেন, সেই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটল যার জন্য আমাদের ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষা—যা আমাদের ক্লান্তিকর একঘেয়েমীকে অপসারিত করে জীবনকে নতুন খাতে চালনা করল। যা আমাদের ঘটনাচক্রে নিয়ে গেল এক দূর দেশে, যারা অপরিচিত অন্য মানুষ। কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁদের সঙ্গে আপন সম্পর্ক অনুভব করেছিলাম। আশ্চর্য মানুষ তাঁরা। তাঁরা জানতেন। তাঁরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন, জীবনের আসল উদ্দেশ্য কী!

স্বামীজীকে প্রথম দর্শন সম্বন্ধে ভগ্নী ক্রিস্টিন বশী সেন মহাশয়ের কাছে যা বলেছিলেন সে বিষয় তিনি বলেন—'১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৪ ফেব্রুয়ারি ভগ্নী ক্রিস্টিন তাঁর বন্ধু মিসেস মেরি সি ফাংকের অনুরোধে খুবই অনিচ্ছায় তাঁর সঙ্গে কে এক বিবেকানন্দ—ভারতের এক সন্ন্যাসীর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন। নিজেই বলছেন

Sister Christine —"Surely never in our countless incarnations had we taken a step so momentous!

মিনিট পাঁচেক ওঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতেই বুঝতে পারলাম এই সেই পরশরতন যা' এতদিন খুঁজে মরেছি। উত্তেজনায় তখনি বলে উঠলাম, যদি এই বক্তৃতা শুনতে না আসতাম! ভগ্নী ক্রিস্টিনের ভাষায়

It was the mind that made the first great appeal that amazing mind! What can one say that will give even a Faint Idea of its majesty, its glory, its splendour. Yes, marvellous as the ideas were, and wonderful as that intangible, something that emaneted from the mind, it was all strangely familier. I found myself saying 'I have known that mind before".

ক্রিস্টিনের অয়েলপেন্টিং

[illegible] আঁকা

"ছ সপ্তাহ স্বামীজি ডেট্রয়েটে ছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতা আমরা শুনতে গিয়েছি। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আমরা আমাদের যথার্থ শিক্ষককে পেয়েছি। না, 'গুরু' শব্দটা তখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত, ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু তখনও ওঁর সঙ্গে আমরা দেখা করিনি। কী এসে গেল তাতে, এই কদিনে যা শুনলাম সেটুকুকে আয়ত্ত করতে, জীবনে কার্যকরী করতেই তো দীর্ঘ দিন-বছর-কেটে যাবে। হয়ত পরে আবার কখনও, কোথাও, কোনও একভাবে আবার এই শিক্ষকের কাছ থেকে ফের কিছু শুনব ও শিক্ষা পাবো।'

না, দীর্ঘদিন নয় মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটল। তারিখটা ছিল ১৮৯৫ সাল, ৬ জুন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন থাউজ্যান্ড ইনল্যান্ড পার্কে গ্রীষ্মকালটা বাস করছিলেন। খবরটা জেনে ক্রিস্টিন ও তাঁর বন্ধু শ্রীমতী ফাংকে বিনা নিমন্ত্রণেই চললেন স্বামীজি দর্শনে এবং তাঁর কিছু বাণী শোনবার আশায়। এই দুটি শিষ্যা সম্বন্ধে স্বামীজি পরবর্তীকালে বলেছিলেন 'এই দুটি শিষ্যা শ' শ' মাইলের পথ অতিক্রম করে, বাদলা রাতে এসেছিল আমাকে খুঁজে পেতে।' পৌঁছেই ক্রিস্টিন বলে উঠেছিলেন 'আমরা এসেছি। যদি যিশুখৃষ্ট আজ থাকতেন তবে তাঁর কাছে এমনি করেই গিয়ে বলতুম 'আমাদের কিছু শেখাও।'

এর উত্তরে স্বামীজি স্নেহভরে বলেছিলেন 'যদি তাঁর মত ক্ষমতা আমার থাকত তোমাদের মুক্তি দেবার মত!'

পরদিন স্বামীজি ক্রিস্টিনের অনুমতি নিয়ে তাঁর 'জীবনটি পড়েন১ জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি কী সব পড়তে পারি?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর পেলেন 'নিশ্চয়! অবশ্য পড়তে পারেন।'

'রেড গার্ল' স্বামীজি বললেন, তারপর স্বামীজি ক্রিস্টিনকে বললেন 'তোমার ওপরে মাত্র তিনটি পর্দা আছে। তোমার তৃতীয় চক্ষু এই জীবনেই উন্মীলিত হবে।'

পরেরদিনই স্বামীজি ক্রিস্টিনকে দীক্ষা দেন।

সে সমস্ত দিনের স্মৃতিচারণ করতে করতে একবার ক্রিস্টিন বলেছিলেন, 'আমি এমন বোকা, স্বামীজিকে কখনও কোন তর্ক-প্রশ্ন করতুম না। সকলেই করত এবং কিছু-না-কিছু ওঁর (স্বামীজির) কাছ থেকে পেতে চেষ্টা করত। আমার ওঁর জন্য বড় দুঃখ হোত। কিন্তু এখন আমি ওঁকে কিছু প্রশ্ন করব ভাবছি।'

বশী সেন মহাশয় প্রতিবাদ করে ওঠেন, 'না, মা! তা' আপনি করতে পারবেন না।'

তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ক্রিস্টিন, 'ঠিক বলেছ পারব না। ঐরকম জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের সামনে গেলে সব সন্দেহ প্রশ্নের আপনিই নিরসন ও নিবৃত্তি হয়ে যায়। তাঁর গুটি কয়েক বক্তৃতার পরেই বোঝা যেত শোনার চেয়েও হৃদয়ঙ্গম,—উপলব্ধি আসল কথা।

থাউজ্যান্ড ইনল্যান্ড পার্কের বাড়ীতে নানাকথা উপলক্ষে বহুবার স্বামীজি ক্রিস্টিনের সঙ্গে ভারতের নারীর কাজকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। যেন কতকটা স্বগতভাবে বলে যেতেন নিজের আশা, সন্দেহ, বাধা সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়গুলি। অবশেষে ক্রিস্টিনের মায়ের মৃত্যুর পরে এবং ক্রিস্টিনের বোনেরা নিজেদের দায়িত্ববহন করবার উপযোগী হলে, ক্রিস্টিন পারিবারিক দায়িত্ব তাদের হাতে সঁপে দিয়ে ভারতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৯০২ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে ক্রিস্টিন কলকাতায় পৌঁছলেন। ভারতে এসে স্বামীজির সঙ্গে ক্রিস্টিনের মাত্র কয়েকবার দেখা হয়েছিল। কারণ, গ্রীষ্মপ্রধান কলকাতায় ক্রিস্টিন থাকতে পারবেন না মনে করে স্বামীজি ক্রিস্টিনকে মায়াবতীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর ৪ জুলাই স্বামীজি মহাসমাধি প্রাপ্ত হন। ক্রিস্টিন মনে প্রচণ্ড আঘাত পান। ঠিক করলেন তিনি ভারতেই থাকবেন এবং গুরু প্রদত্ত কর্মদায়িত্ব যেভাবেই হোক তিনি সমাধা করবেন। সে সময় ক্রিস্টিনের কাছে পয়সাকড়ি বিশেষ ছিল না। মিসেস ওলিবুল প্রদত্ত একটি সামান্য অর্থসাহায্য ছাড়া। যাই হোক ১৯০৩ সালের শরৎকালে স্বামী সারদানন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় ক্রিস্টিন একখানি ঘরের মধ্যে তাঁর 'বিবেকানন্দ স্কুল'টি শুরু করেন। এবিষয় স্বামীজির অন্যতমা শিষ্যা এবং ক্রিস্টিনের সহকর্মী ভগ্নী নিবেদিতা লিখছেন—

"The whole work for Indiar women was taken up and organised by Sister Christine and to her and her faithfulness and initiative alone, it owes all its success upto the present (1910)".

স্কুলটি উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা পায় এবং বেশ কিছু হিন্দু মহিলা এখান থেকে লেখাপড়া শিখে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করতে থাকেন। ওঁদের অনেকেই পরে নারীর বিদ্যাশিক্ষার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

১৭ নম্বর বোসপাড়া লেন ছিল ভগ্নীদের (ক্রিস্টিন ও নিবেদিতা) আবাসস্থল। অত্যন্ত সাধারণভাবে তাঁরা থাকতেন এবং তাঁদের এই রকম সাধারণ জীবনযাত্রার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ গোঁড়া হিন্দু বাড়ীর মহিলারা খুব সহজভাবে তাঁদের আপন করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অনেক ভক্ত বন্ধু ছিলেন এবং ঐ 'হাউস অফ দি সিস্টার্স' যেন এক তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, ডাঃ নীলরতন সরকার, জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি বহু অন্যান্য ব্যক্তি ও মহিলারা ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে সম্প্রতি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এবং স্কুল দেখতে আসতেন।

বার বছর অমানুষিক পরিশ্রমের পর ভগ্নী ক্রিস্টিনের স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। রোগমুক্ত হয়ে উঠে ১৯১৪ সালে বোনেদের সঙ্গে দেখা করতে তিনি আমেরিকা যান। মহাযুদ্ধের দরুণ সেখানে তিনি প্রায় দশ বছর আটকা পড়ে যান। এক হিসেবে এই দশ বছর সে দেশে আটকে থেকে ভালই হয়েছিল বলা যায়। এই দীর্ঘ সময় তিনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারত ও বেদান্তবাদের উপরে বহু বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন। বহু উৎসাহী ছাত্র ও ভক্ত। তিনি ওই সময়ে ডেট্রয়েটে পেয়েছিলেন, ভারত ও বেদান্তশাস্ত্রের ওপরে বহু বক্তৃতা তিনি বিনা মূল্যে (বিনা অর্থের বিনিময়ে) দিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন ডেট্রয়েটের মত স্থানেও মানুষ সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে পারে—যদি তার মধ্যে যথার্থ ভগবৎ বিশ্বাস ও জ্ঞানের দৃঢ়তা থাকে। বেদান্তের গভীর বাণীকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ না করে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বেদান্তবাদকে সেদেশে প্রচার করেছিলেন। এই সমস্ত বক্তৃতা সম্বন্ধে মিসেস এলিজাবেথ কিং এক জায়গায় বলেছেন—

"Her faultless dic'ion, her exquisitly modulated voice, her appearance as a pristess from some ancient temple made listening an endless joy".

১—স্বামীজীর মধ্যে অন্যের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখবার (বা পড়বার) ক্ষমতা ছিল। এর উল্লেখ পরে পাওয়া যাবে।—

বার বার তিনি ডেট্রয়েটবাসীর কাছে বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষকে জানো, আর তাকে ভালবাসো।' মিসেস এলিজাবেথ কিং আবারও বলেছেন,

She had only one theme — best expressed by Sri Krishna in the Gita — By me all these world is pervaded in My manifested aspect. Having manifested this entire universe with one fragment of my glory, I remain, "— but this given with such wealth of illustrations and variety of aspects that you found yourself rooted and immovably fixed in that knowledge".

১৯২৪ সালে ভগ্নী ক্রিশ্চিন আবার ভারতে ফিরে আসেন। কিন্তু বোসপাড়া লেনের বাড়ীখানিতে বাস করা তখন সম্ভব নয়। স্কুলটার (ম্যানেজমেন্ট) কর্তৃক তখন অন্যের উপরে ন্যস্ত হয়েছে। কাজেই শিক্ষাব্রতীর কাজটা তখন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে উনি স্থির করেন। পরবর্তী কালে ওঁর শারীরিক অবস্থায় এমনই অবনতি ঘটেছিল যে, কোন কঠিন পরিশ্রমের কাজ করা ওঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে তখন শশী সেন মহাশয় ক্রিশ্চিনের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সানন্দে, সগৌরবে গ্রহণ করেন এবং ওঁর (শশী সেনের) ৮ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে ওঁকে নিয়ে আসেন।

ভগ্নী ক্রিশ্চিনের ভারতে অবস্থানকালীন শেষ কটি বছরের সুন্দর চিত্র আমরা ভাসা ভালো। রয়োস্টারের রচনায় পাই---

— The voice that greeted us — so clear, so low, so sweet and vibrant, yet so pure and full and true opened out the reality of the purity and sweetness and fullness of her spiritual being, from the first word she uttered.

তাঁর ঋজু তন্বী দেহেও এই আভিজাত্য সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর চিক্কন সুগঠিত মাথাটি, ঈষৎ বক্র নাসিকা, কম্পমান নাসারন্ধ্র সব কিছুর মধ্যেই আভিজাত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ। মুখের রং ও গঠনে মাধুর্য ও বিষাদের এক অপূর্ব মিলন—আর পরের দুঃখে কী গভীরভাবে অভিভূত হতেন।'

ভারতে অবস্থিতির শেষ দুবছরের গ্রীষ্মকাল ভগ্নী ক্রিশ্চিন আলমোড়াতে অতিবাহিত করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এখানে বসে তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শশী সেন মহাশয় লিখছেন, '১৯২৮ সালের মার্চ মাসে আমরা কলকাতা থেকে সমুদ্রযাত্রা করি। দু'বছর কেটে গেল। এবার উনি (ক্রিশ্চিন) নিজের আত্মীয় বন্ধুদের সংগে দেখা করবার জন্য ডেট্রয়েটে গেলেন। মাস কয়েক শ্রী ও শ্রীমতী স্পেন্সার এ্যাডামসের মিশিগানে অবস্থিত বাড়ীতে কাটালেন। এর পর ক্রিশ্চিন শ্রীমতী লি-রয়ের কাছে থাকতেন। শ্রীমতী লি-রয় তাঁকে খুবই যত্নে রেখেছিলেন এবং যথাসাধ্য চিকিৎসা ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবুও ক্রিশ্চিন কবে আবার ভারতবর্ষে ফিরবেন সেই দিন গুণতেন। আমরা শেষ পর্যন্ত নভেম্বরে ফিরব বলে জার্মানী থেকে জাহাজে টিকিটের ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি দেহরক্ষা করলেন।'

দীর্ঘ ঊনিশ বছর ধরে ভগ্নী ক্রিশ্চিনের আশীর্বাদে তাঁর খুব নিকটসান্নিধ্যে থেকে তাঁকে জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। দেখেছিলাম কী গভীরভাবে তিনি ভারত ও ভারতবাসীকে ভালবেসেছিলেন। কখনও কোন উপলক্ষ্য বা তাঁর আচরণে সামান্যতম কোন [illegible] ভাব এতটুকুও দেখিনি। তাঁর মতে ভারত ছিল তাঁর গুরুর দেশ—তাই 'ব্লেসেড কান্ট্রি'। তাঁর মতে এই দেশ অগণিত শতাব্দী ধরে একের পর এক পুণ্যাত্মা ব্যক্তির জন্মভূমি—তাই পুণ্যভূমি।

তাই বলে এমন নয় যে, ভারতের তৎকালীন সমস্যা বা বৈষম্যগুলি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং সেগুলিকে দূরীভূত করবার জন্য তিনি তাঁর ভক্তি, বিশ্বাস ও আন্তরিক চেষ্টাকে যেভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তা তুলনা রহিত। তাঁকে দেখে দেখে মনে হত ভারতে থাকতে পারা এবং ভারতের সেবায় নিজেকে নিবেদন করতে পারায় তিনি যেন এক পরম সৌভাগ্যের অধিকারী।'

ভগ্নী ক্রিশ্চিনকে সবচেয়ে বেশী চিনেছিলেন এবং বুঝেছিলেন তাঁর গুরু। ৬ জানুয়ারি ১৮৯৬ সালে তাঁর এই সর্বোত্তম শিষ্যাকে তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন। এই কবিতাটিকে ক্রিশ্চিন মন্ত্রজ্ঞানে গ্রহণ করেছিলেন।

What though thy bed be frozen Earth
Thy clock the chilling blast.
What though no mate to cheer thy path
Thy Sky with gloom O'ercast;
What though if love itself fails
Thy fragrance strewed in vain
What though if bad O'er good prevail
And vice over virtue reign. —
Change not thy nature, gentle bloom
Than Violet, Sweet and Pure
But ever pour thy sweet perfume unasked, unstinte sure.

হোক না শয্যা তোমার বরফ জমা ভূমি
হিমেল হাওয়ার ঝাপটা কেন হোক না তোমার বসন
নাই বা তোমায় উৎসাহিত করার পথে কেউ
আকাশ তোমার ঢাকে যদি কালো আবরণ;
প্রেম যদি বা বিফল হ'ল
সুগন্ধ তোর মিথ্যা হ'ল
মন্দ যদি সুন্দরকে পিছে রাখে নীচে
করুক না পাপ পুণ্যেরে দমিত;
হে আমার শান্ত কুসুমকলি!
ভায়োলেট স্নিগ্ধ মধুর তুমি
নিজেকে পথহারা না করে
বিলিয়ে দাও—দেবে যাও সৌরভ তোমার
উদার হাতে, অযাচিত দানে—ধ্রুবপথে।১

(বঙ্গানুবাদ- প্রণতি দে)

শেষদিন পর্যন্ত এই কবিতার আদর্শে তিনি নিজের জীবনকে চালিত করেছিলেন। জীবন তাঁর কাছে বরাবরই বরফ জমা-ভূমির মত কঠিন ছিল। নানা প্রতিকূল অবস্থায় তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছিল ভারতে আসবার আগে এবং পরেও (ভারতে) প্রথম দিকে। স্বামীজির [illegible] কোন বিদেশিনীকে এতখানি কঠিন ও কষ্টকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি। তবুও যদি কেউ কখনও তাঁর কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করত তাহলে তিনি বলতেন।

"Would I have had it different? No a thousand times no. It is seldom that Vivekananda comes to this earth. If I am to be born again, gladly will I endure a thousand times the hardships of this life for the privilage that has been mine".

---

১ এই কবিতাটির অনুবাদ বাণী ও রচনার ৭ খণ্ডে (উদ্বোধন প্রকাশিত) পাওয়া যাবে।

ভগ্নী ক্রিশ্চিনের নিকট সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই মনে করতেন যে দৃঢ়তা ও শক্তির সঙ্গে তিনি সব কিছু প্রতিকূলতা ও বাধাঝঞ্ঝাকে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেন সে শক্তি বাহিরের নয় ঐশ্বরিক। বাইরের বাধা যতই প্রবল হত ততই যেন তিনি অদম্য হয়ে উঠতেন। বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতদের জন্য তিনি তাঁর সহানুভূতি ও মমতা বোধকে যেভাবে উজাড় করে দিতেন তাইতে তাঁর মনেরপ্রেরণার অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায় ক্রিশ্চিনের নিজের ভাষায় তাঁর নিজের কথা—"নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি যখন চিন্তা করি ভারী সুন্দর একটা অনুভূতি হয়। মনে হয় একটি কুঁড়ি যা কঠিনভাবে অস্ফুট ছিল যেন ধীরে ধীরে একটি করে তার পাপড়ি খুলে গৌরবের সঙ্গে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়াচ্ছে। পাপড়ি খুলে গৌরবের সঙ্গে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়াচ্ছে। আমি অনুভব করি। পাপড়িগুলি যখন একটি একটি করে খোলে আমি যেন বুঝতে পারি এ আমার মনের পাপড়ি একটি একটি করে বিকশিত হচ্ছে।

I see! I see! Life after Life'. The long endless series. So long, so sorrow laden. Never having forgotton the innate omnipotence, how I tried to mould my life--life after life to my will! The mistakes, the suffering, the heartbreak through long years! Age after age! Then in this life my will has become an occult will. It,had mighty powers.

কখনও এমনও মনে হয়েছে যে আমি যদি ইচ্ছে করি তাহলে বোধহয় আকাশের তারা নক্ষত্রদেরও স্থান পরিবর্তন করে দিতে পারি। বোধহয় যমকেও বলতে পারি "বাস্—এর বেশী আর এগুবে না'। যে কোনরকম বাধা বিপর্যয়কে আমি উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারি। এমন শক্তি আমার আছে। এই ইচ্ছে, এই প্রেরণা, আমাকে ভারতে নিয়ে এসেছে এই প্রেরণা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল যখন মানুষের মতে সেটা অসম্ভব মনে হত।

And now I surrender it. The Devine will now. 'Not my will, but thine be done.

তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

উপেক্ষিতা

ঋষিকবি বাল্মিকীর কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে এনে পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা পেলাম লোকচক্ষুর অন্তরালে আজীবন বিরহ-বিধুরা ঊর্মিলাকে 'কাব্যে উপেক্ষিতা'র মধ্যে। তুলনাটা ঠিক এক নয়। তবুও অনেক সময় মনে হয়েছে ভগিনী নিবেদিতার মত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের বহুল প্রচারের পেছনে ক্রিশ্চিন একেবারে অন্তরালে থেকে গিয়েছেন। লোকে তাঁকে কতটুকুই বা জানে।

এর অবশ্য একটা কারণ সহজেই অনুমেয়। ভারতে ভগিনী নিবেদিতার জীবন ছিল কর্মবহুল এবং বহুমুখী। তিনি ভারতে এসেছিলেন ক্রিশ্চিনের অনেক আগে এবং শেষদিন পর্যন্ত কর্মে ব্যাপৃত থেকেছেন। ক্রিশ্চিন ভারতে এলেন স্বামীজীর তিরোধানের মাত্র ক'মাস আগে এবং অল্প ক'বছরের মধ্যে কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। তবুও বলব যখন তিনি বিবেকানন্দ স্কুলের (পরে নিবেদিতা স্কুল) প্রধানা ছিলেন তখন স্কুলটিকে গড়ে তুলেছিলেন তিনিই (১৯০৩)। অথচ তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এমনকী সরলাবালা সরকারের লেখা নিবেদিতার জীবনী পাওয়া যায় কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বিশেষ জানা যায়নি ক্রিশ্চিন সম্বন্ধে। তবে ক্রিশ্চিনের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ স্কুলের কোন প্রাক্তন ছাত্রী (পুষ্প নামের কোন মহিলা) এলাহাবাদ থেকে ভান্‌তিন্‌কে জানাচ্ছেন১—"নিবেদিতা ছিলেন আমাদের বাবা, ক্রিশ্চিন মা। আমাদের দুর্ভাগ্য এত তাড়াতাড়ি দুজনেকেই হারালুম।"

অসুস্থা ক্রিশ্চিন জীবনের শেষদিকে (১৯২৬-২৯) আলমোড়ায় বশী সেন মহাশয়ের গৃহে মায়ের আদরে ছিলেন। আমি আলমোড়াতে ছিলুম ১৯৬৫-৬৮ সন। বহুবার সেন-মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়েছি। বহু গল্প, বহু লোকের, বহু দেশের রাজনীতি, ইতিহাস ও ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে; কিন্তু কখনও ক্রিশ্চিনকে জানব বা তাঁর জীবনী লিখব এমন ইচ্ছা মনে জাগে নি। সেন দম্পতির পুজোর ঘরে ঢুকতে দরজার পাশে বাঁ দিকের দেওয়ালে একটি বড় সাইজের অয়েলপেন্টিং। ২ একজন নান ধরনের পোষাকে দণ্ডায়মানা মহিলা—পেছনে হিমালয়ের পটভূমি দেখতে পেতাম। একদিন কৌতূহল বশে শ্রীযুক্তা সেনকে জিজ্ঞাসা করলাম "এটি কার ছবি" উত্তর ক্রিশ্চিনের। আসা ব্রুয়েস্টার এঁকেছিল। এইটাই ও'র ঘর ছিল কিনা। পরে বশীর পুজোর ঘর হল। ১৯৬৮ সালে আলমোড়া ছাড়বার পরেও অনেকবার আলমোড়াতে গিয়েছি। সেনদম্পতির কুন্দন হাউসে থাকি। শ্রীযুক্তা সেন বলেন "তুমি যে গেস্টরুমে আছ, ঐ ঘরে আমি এসে ১৯২৭ সালে বশীর গেস্ট হয়েছিলাম। ঐ ঘরে বসে আমি আমার ডার্কনেস ইণ্ডিয়ার প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ লিখেছিলাম। ঐ সময় সিস্টার ক্রিশ্চিন এখানে ছিলেন। উনি ঐ সময় স্বামীজির ওপরে স্মৃতিচারণ লিখছিলেন। পড়ে পড়ে শোনাতেন আমাদের ঐ ঘরে বসে।

কোনবার শ্রীযুক্তা সেন বলেছেন "ঐ যে আসকার্ডোর গাছটি দেখছ, ওর নীচে দাঁড়িয়ে একদিন ক্রিশ্চিন আমাকে বললেন "ইত্যাদি। এমনি করে এক অজানা অজ্ঞাত বিদেশিনী যাঁর সম্বন্ধে আমার কখনও কোন কৌতূহল হয়নি আগে—তিনি আমার সামনে মূর্ত হয়ে উঠলেন কখনও আসকার্ডো গাছের নীচে, কখনও পাইনের শীতল ছায়ার নীচে, কখনও বা কুন্দন হাউসের সামনের বারান্দায় তুষারাবৃত গিরিরাজির দিকে মুখ করে বসে, কখনও গেস্টরুমে আমারই খাটের আশেপাশে।

১৯৭৩ সাল। থাকি কানপুরে। একদিন কী মনে করে ঠিক লিখলাম শ্রীযুক্তা সেনকে ক্রিশ্চিন সম্বন্ধে কোন রচনার বিষয়বস্তু উপাদান তাঁর কাছে পাবো কিনা। তৎক্ষণাৎ উত্তর পেলুম "কী চাও তুমি তাতো জানি না। আছে। অনেক আছে। এসে নিয়ে যাও।"

তখনি যাওয়া সম্ভব হয়নি। '৭৪-এর নভেম্বরে। নিয়ে এলাম কিছু। উল্টেপাল্টে কিছু পড়লাম, কিছু নোট করে নিলাম। বাস ঐ পর্যন্ত। নানারকম পারিবারিক কারণে রচনার কাজে মন বা সময় কোনটাই তখন দিতে পারিনি। কাজ শুরু করলাম কিছুদিন পরে। দেখলাম উঁহু! আর একবার শ্রীযুক্তা সেনের সাহায্য চাই। তিনি লিখলেন "সেবারে তুমি সামান্যই নিয়ে গিয়েছিলে। আরও আছে। আমার পুজোর ঘরে একটা বিরাট বাক্সভর্তি আছে। এসো। শিগগির এসো। নিয়ে যাও।" যেতে পারিনি সংসারের ঝামেলায়। আবার চিঠি এলো

---

১ সম্পূর্ণ পত্রটি পরে উদ্ধৃত হয়েছে।

২ এ ছবি আমেরিকার শ্রীমতী মেরী বার্কের গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

করে আসবে? আমার শরীর ভাল নেই। বারবার তোমাকে অনুরোধ করব না। এই শেষবার বলছি। এসো, যা নেবে, নিয়ে যাও। যদি তুমি ক্রিস্টিনের জীবনের ওপরে কিছু লিখতে পারো, বলীর আত্মা বড় খুশী হবে। (সেনমহাশয় ১৯৭১ পরলোকগমন করেছিলেন)। নিবেদিতার তীব্র আলোকে ক্রিস্টিন চাপা পড়ে গেছেন। ক্রিস্টিন উপেক্ষিতা। তুমি ক্রিস্টিনকে পাঠকসমাজে প্রকাশ করো। তোমার ওপরে বলীর আশীর্বাদ ঝরে পড়বে।"

আবার গেলাম ১৯৭৬ সালে অগাস্ট মাসে বিরাট বাক্সে, সযত্নে রাখা—অসংখ্য চিঠি, ডায়রীর ছিন্ন পৃষ্ঠা, অসম্পূর্ণ রচনা, বক্তৃতার খসড়া, খবরের কাগজের কাটিং। কদিন ধরে চলল বাছাই, ছাঁটাইর কাজ। দুর্বল স্বাস্থ্য, পিঠে ব্যথা, চোখ থেকে জল পড়ে, তবুও শ্রীযুক্তা সেনের প্রাণপণ চেষ্টা কী করে আমাকে একটু সাহায্য করা যায়।

স্বামীজীর স্বহস্তরচিত চিঠিগুলি তুলে ধরলেন আমার সামনে। খুলে বসেন নিজের স্মৃতির ভাণ্ডার। আর মাঝে মাঝে যখন আমি চাই রেফারেন্স, তখন বুক সেলফ থেকে ধুলো ঝেড়ে বই টেনে টেনে বের করেন। বলেন "ভাগ্যিস তুমি এলে, তাই এই বইগুলোর ধুলো ঝাড়বার সুযোগ পাওয়া গেল।"

এমনিভাবেই অশীতিপর বৃদ্ধা বৌদির উৎসাহ ও সহযোগিতা ও স্বর্গতঃ বলীদার আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করলুম আমার কলমের কাজ। দোষত্রুটি ধরা পড়বে হয়ত অনেক পাঠকের চোখে। হয়ত তাঁদের মনে হবে ভাল লেখকের হাতে পড়লে এ জীবনী অন্যরূপ নিতে পারত। হয়ত সত্যিই এরপর অনেক সুযোগ্য লেখক 'ক্রিস্টিন-গবেষণার' কাজে হাত লাগাবেন।

ভগিনী ক্রিস্টিন তাঁর অসমাপ্ত 'মেময়ার্স অফ স্বামীজি' বলী সেন মহাশয়কে উপহার দিয়ে যান। এর ২।৪টি প্রবন্ধ প্রবুদ্ধ ভারতে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাদবাকী সবই আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত এবং শ্রীযুক্তা সেন সেগুলি সযত্নে রেখে দিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সেই স্মৃতিলিপির বঙ্গানুবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করা হল। তবে একটি কথা জানানো দরকার মনে করি। ক্রিস্টিন তাঁর স্মৃতিলিপিতে যেভাবে পরিচ্ছেদগুলি সাজিয়েছিলেন, আমি সেটি রক্ষা না-করে নিজের মত করে উপস্থাপনা করেছি। কারণ কতকগুলি অংশ যা সুপরিজ্ঞাত, বহু-পঠিত, এবং বহুর দ্বারা লিখিত, সেগুলি সে সময়কার পাশ্চাত্য-দেশী পাঠকের কাছে নতুন হলেও আজকের বাংলাভাষী পাঠকের কাছে অযথা পুনরুক্তি ও ক্লান্তিকর মনে হতে পারে। মনে করে সেই অংশগুলি বাদ দিয়েছি। মূলে স্মৃতিলিপির কিছু অংশ বাদ দিয়ে স্থানে স্থানে তাঁর ডায়রীর কিছু অংশ জুড়ে দিয়েছি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর পূর্ণাঙ্গ ডায়রী আমি পাইনি। তাঁর কোন পত্রে (৭ই ডিসেম্বর ১৯২৯) তিনি শ্রীমতী আসা বুয়েস্টারকে জানাচ্ছেন "আমি এক ধরনের আত্মবিবরণী লিখছি। হয়ত কখনও কারুকে এটা দেখাবো না। প্রকাশনার জন্য অবশ্যই নয়। প্রতিদিন কিছু-না-কিছু, কোন-না-কোন বিষয় লিখে চলেছি।" তবে ক্রিস্টিনের অন্যান্য রচনা, পত্রাবলী ইত্যাদির মধ্যে তারিখ দেওয়া টাইপ করা দুচারটি ছিন্ন এবং অসংলগ্ন পৃষ্ঠা যা পাওয়া গেছে সেগুলি সবই স্বামীজী সম্বন্ধীয়। মনে হয় বলী সেন মহাশয় স্বামীজী সম্বন্ধে ক্রিস্টিনের উক্তিগুলি তাঁর ডায়রী থেকে টাইপ করে রেখে থাকবেন।

"His compassion for the poor and downtrodden, the defeated was a passion. One need not to be told, but seeing him knew that he would willingly have offered his flesh for food and his blood for dring to the hungry.

(Christine)

"Formerly a teacher in the Duffield and Webster Schools who became a member of a Hindu Monastic Order. She is paying a visit to her old Home, but wishes to hasten back, as the passion for superficial joys in America repels her".

ডেট্রয়েটের কোন খবরের কাগজের (সম্ভবতঃ ১ জুন ১৯১৫) একটি বিবর্ণ ধূসর কাটিং থেকে উপরের উদ্ধৃতির উপরে ভগ্নী ক্রিস্টিনের একটি সৌম্য সুষমামণ্ডিত ছবি। হঠাৎ থমকে দেখবার মত মুখশ্রী। চোখ দুটি একটু যেন বিষণ্ণতা মাখা শান্ত। হয়ত বা গভীর চিন্তায় মগ্ন, অথবা প্রথম জীবনের নানাবিধ ঝড়ঝঞ্ঝা দারিদ্র্য দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হবার ক্লান্তিতে শ্রান্ত। ছবির উপরে বড় বড় অক্ষরে ছাপা 'হিন্দু সন্ন্যাসিনী, একদা ডেট্রয়েটের শিক্ষিকা, দেশে পুনঃসন্দর্শন।"

ওই সময় ভগ্নী ক্রিস্টিন ডেট্রয়টে নানাস্থানে বক্তৃতাকালে বলেন "দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ এবং নানাপ্রকার সমস্যা দুঃখনিপীড়িত ভারতবর্ষ আমেরিকার চেয়ে শতগুণে সুখী।" তিনি আরও বলেন একাধিক গির্জা, ধর্মীয় সংস্থা সত্ত্বেও আমেরিকার মধ্যে ধর্মভাবের একান্ত অভাব এবং আমেরিকাবাসীর অসুখী, অসহায়ভাব পরিস্ফুট এই কাগজের উদ্ধৃতিতে ভগ্নী ক্রিস্টিনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আমরা পাই—"এই সভার বক্তা ভগ্নী ক্রিস্টিন কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের একজন হিন্দু সন্ন্যাসিনী। ইনি জাতিতে ডেট্রয়েটবাসিনী আমেরিকান ছিলেন। চোদ্দ বছর আগে এখানে সকলেই এঁকে ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডেল বলে চিনতেন। ভারতে যাবার আগে এখানকার ডাফিল্ড স্কুলে চোদ্দ বছর এবং ওয়েবস্টার স্কুলে তিন বছর শিক্ষিকা ছিলেন। ইনি সম্প্রতি ডেট্রয়েটে আবার এসেছেন। কিন্তু ওয়াশিংটন থেকে 'পাসপোর্ট' পেয়ে গেলেই ইনি ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন। ডেট্রয়েটের প্রাক্তন শিক্ষিকা স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা বিভাগে আজ তের বছর ধরে প্রধানার পদে প্রতিষ্ঠিতা। যুদ্ধ না-থামা পর্যন্ত ইনি ডেট্রয়েটে থাকবেন। কলিকাতাবাসী মহিলা জগতে মিস গ্রিনস্টিডেল ভগ্নী ক্রিস্টিন নামে পরিচিতা। এইখানে বক্তৃতাকালে ভগ্নী ক্রিস্টিন বলেছিলেন "আপাতদৃষ্টিতে

Every momentary doubt is followed by a [illegible] assurance [illegible] the personality not received the stamp of approval from the one being in the world

নিজের হাতে লেখায় স্মৃতিলিপি

আমেরিকাকে অনেকের কাছে সুখী, উচ্ছল ও আনন্দের হাট মনে হতে পারে। এখানকার থিয়েটার ও সিনেমাগৃহ এবং অন্যান্য আমোদপ্রমোদের জায়গাগুলি সব সময় লোকে জমজমাট এবং হাস্য-ধ্বনিতে উচ্চকিত। এখানকার মানুষ অহর্নিশি চিন্তা করে, কী করে আমোদপ্রমোদে ব্যাপৃত থাকা যায়। এমনকি এখানকার দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যেও সেই একই মনোবৃত্তি—বিলাস, বাসন ও প্রবৃত্তির বশে ডুবে থাকা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—'এরা কী সত্যই সুখী? আমেরিকার অধিবাসীরা কী সত্যসত্যই সুখের সন্ধান পেয়েছে?'

সত্যকারের সুখ ও সভ্যতা সম্বন্ধে উক্ত বক্তৃতার কোন এক অংশে ভগ্নী ক্রিস্টিন বলছেন—ক্রাইস্টের ভাষায় সত্যকারের সভ্যতা হচ্ছে

"seek ye first the Kingdom of God & His righteousness & all these things will be added upto you.

ওঁকে যখন ডেট্রয়েটবাসীরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ভারতীয় নারীদের গোঁড়া এবং স্বতন্ত্রপূর্ণ সমাজের বাধা ভেঙে উনি কী করে তাদের অত আপনজন হয়েছিলেন'—উনি হাস্যোজ্জ্বাসিত মুখে উত্তর দেন, 'তা বটে!' তারপর বলেন, 'আমি কিন্তু কখনও ওদের গোঁড়ামি বা স্বতন্ত্রভাব অনুভব করিনি। আসলে যে তাদের কাছে যাচ্ছে এটা তার ওপরেই নির্ভর করে, সে তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারছে কিনা। আপনারা যদি কখনও ভারতবর্ষে যান এবং সেখানকার নারীসমাজের মধ্যে গিয়ে উপলব্ধি করেন—এরা আপনাদেরই মত নারী এবং এদের সুখ-দুঃখ, চিন্তাসমস্যা, ইচ্ছারুচি ঠিক আপনাদেরই মত, তাহলে আপনারাও নিজেদের তাদেরই 'একজন' মনে করতে পারবেন। কিন্তু যদি মনে করেন এরা কী বিচিত্র মানুষ, আপনাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে কত ভিন্নরকম, সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র্যবোধ আপনাদের মনে এসে যাবে, এবং উভয়ের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট দেওয়াল দেখা দেবে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়ে আমরা কখনই ওঁদের নিকটবর্তী হতে পারি না। অন্তর্দৃষ্টি ওঁদের ঠিক আমাদেরই মত। ওঁরা বেশ বুঝতে পারেন আমরা ওঁদের কী দৃষ্টিতে দেখছি—স্বভাবতই একটা ব্যবধানবোধ তখন এসে যায়। এবং 'এরা নিজেদের ব্যবধানে রাখতে চায়' যে-কথাটা আপনারা শুনেছেন—তখন তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতীয় নারীদের চোখে পাশ্চাত্যের নারীদের সম্বন্ধে এক জায়গায় ভগ্নী ক্রিস্টিন বলেছেন, 'ভারতীয় নারীরা অন্য দেশের (পাশ্চাত্যের) আধুনিক নারীদের ঠিক নারী মনে করে না, পুরুষ মনে করে। যদিও নানা বিষয় তারা পাশ্চাত্যের নারীদের অনেক কিছু প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখে, তবুও সে-বিষয়ে তাদের অনুকরণ করতে চায় না। স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবনের পথ বেছে নেওয়া, বা কোন কাজে স্বীয় সিদ্ধান্ত নেবার চেয়ে সনাতনীভাবে গৃহকর্ম ও সন্তানপালনে ব্যাপৃত থাকাই শ্রেয় মনে করে।

অপর কোন স্থানে কিন্তু ক্রিস্টিন আমাদের পাশ্চাত্য অনুকরণে জীবনযাত্রাকে প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ইংরাজ ভারত অধিকার করে নেবার ফলে এদের প্রাচীন জীবনযাত্রায় যদিও অনেক আলোড়ন এবং পরিবর্তন এসেছে, তবুও সেটা ঠিক এদের (ভারতীয়দের) দেশের ও সমাজের স্বাস্থ্য ও উন্নতির পক্ষে সহায়ক ও স্বাভাবিক নয়।' ইংরাজ রাজত্বের আগে ভগ্নী ক্রিস্টিন বলেছেন, 'ভারতীয়রা ভোরবেলায় উঠে দিনের সমস্ত কাজকর্ম রোদ কড়া হবার আগেই সেরে নিত। তারপর দ্বিপ্রাহরিক আহার ও বিশ্রাম, দিবানিদ্রা। বিকেলে রোদ পড়ে গেলে আবার উঠে দিনান্তের কর্ম সারা—এই ছিল তাদের পদ্ধতি'

কিন্তু এখন সকালে উঠে কাজ শুরু। ১০টায় খেয়ে স্কুল অফিসে দৌড়ন। ৯০ ডিগ্রী গরমেও ইংরাজপ্রভাবান্বিত জীবনের ব্যস্ততময়তা। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের পক্ষে এ-ধরনের কার্যপদ্ধতি একেবারে ঠিক নয়। দুপুরের চড়া গরমে পরিশ্রমের কাজ কোন-মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

গরমের দেশ বলে আরামের জন্য নিজ বাড়িতে শাড়ি পরতেন। শস্তাও বটে। ভগ্নী ক্রিস্টিনের ভাষায় 'শাড়ি ধোওয়াতে দেড় পয়সা লাগে। তবে কলপ-দেওয়া কড়া শাড়ির জন্য দু পয়সা। আমি বাইরে বেরুবার সময় ঐরকম শাড়ি পরি।' বিশ শতকের শেষে বসে দু পয়সার কড়া কলপ-দেওয়া শাড়ির কাহিনী রীতিমত আরব্য উপন্যাসের মত শুনতে লাগছে।

ভগ্নী ক্রিস্টিন ডেট্রয়েটে তাঁর ভারতীয় শাড়ি, কাশ্মীরী শাল সব সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'অবশ্য আমার কাছে দামী শাড়ি কিছু নেই' হাসতে হাসতে বলেন, 'ভারতবর্ষে আমি ভারতীয় পোষাকেই থাকি। তবে মনে পড়ছে, একবার একটা সভায় আমি মাথায় বড় টুপি পরেছিলাম। সভায় ঢুকতেই শুনতে পেলাম 'ওমা! ক্রিস্টিনকে দেখ—ঝুড়ি মাথায় দিয়ে আসছে।' 'ঝুড়ি!' ব্যস্! আর কখনও ওকম্ম করিনি। ওমন 'ঝুড়ি' মাথায় আর সভায় যাইনি।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিন ন্যুরেমবার্গে জার্মান মা-বাবার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যখন ওঁর বয়স মাত্র তিন বছর, সেই সময় ওঁর বাবা ফ্রেডরিক গ্রিনস্টিডাল আমেরিকাতে চলে যান এবং ডেট্রয়েটে বসবাস শুরু করেন। ওঁর বাল্যকাল কেটেছে ভারী সুখে। বাবা ছিলেন স্বাধীন চিন্তার মানুষ। মহৎ হৃদয় ও পাণ্ডিত্যবান্বিত। ক্রিস্টিনের চোখে বাবা ছিলেন আদর্শ পুরুষ। বাবাকে তিনি ভক্তি করতেন, পূজো মনে করতেন। কিন্তু ভদ্রলোকের ব্যবসায়-বুদ্ধি একেবারে ছিল না এবং ফলে নিজের যা-কিছু সঞ্চয় ছিল, এমনকি পৈতৃক পয়সাও—সব নষ্ট হয়ে গেল। বাবার মৃত্যুর পর মাত্র ১৮ বছর বয়সে ক্রিস্টিন তাঁর মা ও পাঁচটি ছোট ছোট বোনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ডেট্রয়েটের একটি পাবলিক স্কুলে চাকুরি পেলেন। এই সময় থেকে শেষদিন পর্যন্ত তাঁর জীবন নানারকম ওঠাপড়া ও দুঃখের মধ্যে কেটেছে। শীবুক্ত ... মহাশয়ের ভাষায় From this time on to the ve[illegible] end, life demanded of her heroic str[illegible]gles and noble self effacement.

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের মাত্র তিনদিন আগে ভগ্নী ক্রিস্টিন ইংলণ্ড থেকে ডেট্রয়েটে এসেছিলেন। তিনদিন পরেই যুদ্ধ ঘোষণা হবার দরুন যুদ্ধ না-থামা পর্যন্ত ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেননি। ঐ সময় তিনি জানিয়েছিলেন—

"Belief that spirits of men who went out in violence are still battling & that their influence is troubling the minds of thinking people all over the world is not confined entirely to spiritualists who strictly speaking are believers in spiritism in which matters are revealed through mediums. The broader meaning of the term spiritualist includes religious as well as various forms of psychic thought".

তাঁর মতে আজকের জগতে ব্যক্তিগত দুঃখই মানুষকে আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করে—

It is personal suffering which is responsible for the wave of spiritualism which is sweeping over the world to day.

ব্যক্তিগত দুঃখ-সমস্যাই আজকের বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিকতার ঢেউ তুলেছে।

অ্যাকশা বুস্টারকে লেখা ক্রিস্টিনের চিঠি

৮নং বোসপাড়া লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা, ২৩ মার্চ '২৭।

অ্যাকশা ডার্লিং,

তুমি কী জানতে তোমার মধ্যে অন্যকে বোঝাবার একটি গুণ আছে ? আমি খুব ফ্ল্যাটার্ড হয়েছি। ওরা তাই বলছে—বিশেষ করে আমি যখন শাদা শাড়ির সঙ্গে বারনাস পরে এবং একটি টুপি মাথায় তাতে ভেইল দিয়ে মুখ ঢেকে কোথাও যাই, তানিতন ১ বলেন, 'দি ডাজ ইট ওয়েল টু'। আমি কিন্তু এটা বেশ খুশী মনেই গ্রহণ করি এই ভেবে যে, এ-ক্ষেত্রেও আমাকে 'দি বিউটিয়াস ওয়ান (২)-এর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। হয়ত ওটা তার চেয়ে একটু গভীর.......শুধু বাইরের ব্যাপারেই নয়, দেখছি আমার অন্তরটাও ব্লেসেড ওয়েফারারস (৩)-দের সাহচর্যে সৌন্দর্যসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মুখে মাখবার লোশন থেকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ব্যাপার পর্যন্ত আমরা নিজেদের সম্পত্তি সগৌরবে এবং উদারভাবে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছি, দিয়েছি। আমাদের একসঙ্গে থাকবার দিনগুলির স্মৃতি ক্রমেই আরও গভীরতাময় হয়ে উঠছে।

জানি না তানিতন যখন আসবেন, তুমি তখন কোথায় থাকবে। তুমি নিশ্চয় কোথাও নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করবার জন্য ইচ্ছুক ? সেটা কোথায় ? তোমাকে 'ওয়েফারার' নাম দেওয়াটা দেখছি ঠিকই হয়েছে।

আমি এমনিতে ভালই আছি, তবে হঠাৎ গরমটা পড়ে একটু বেশি কাবু হয়েছি। আচ্ছা তোমাকে যদি খানিকটা 'তাপ' পাঠিয়ে দিতে পারতাম।

গুরুদাস ১লা এপ্রিল আলমোড়ায় পৌঁছে আমাদের জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা করবে। জানি না কোন্ বাড়িটা নেবে। বশী হয়ত ঈশ্বরকে (৪) আমাদের সঙ্গে থাকতে বলবে। ও বেচারী ঠিক আমাদের দুজনের মত 'একা'। যে আমেরিকানটি সম্প্রতি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, সেও আলমোড়াতে আসবে। মানুষটি সোনার মত খাঁটি। কিন্তু বশীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হতে পারেনি। আজ ও বাইরে লাঞ্চে গিয়েছে। লেডী বাকল্যান্ড ও তাঁর মেয়ে ওঁদের 'কার' নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং আমরা কাঁচের বাসন কিনতে দু' জায়গায় গিয়েছিলাম ওদের গাড়িতে করে। ওগুলো কেবলমাত্র দোকান, তাই কুমোর তার আঙগুলের সাহায্যে কেমন করে চাকার ওপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাসনে রূপদান করে তা আর দেখা হল না। **কী অপূর্ব এই দেশ ! মাঝে মাঝে মনে হয়:.. এই দেশকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে; গ্রহণ করতে হলে হাজার বছর.. লেগে যাবে !**

লর্ড লিটনের সঙ্গে বিদায় নেবার আগে দেখা করতে গিয়েছিল বশী—একটি মধুর বিদায়। লর্ড লিটন সম্বন্ধে বশীর মনে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

Dear love to the three of you ever and ever. You are such a cear. — Christina.

১—তানিতন তাঁর ক্ষুরধার রসনা ও প্রভুত্বপ্রিয়তার জন্য অনেক সময়েই অপ্রিয় হয়ে পড়তেন। যদিও তাঁর অনেক গুণ ছিল। নিবেদিতার প্রতি গভীর টান ছিল এবং নিয়ে মিসেস বুলের সঙ্গে তাঁর বেশ রেষারেষির সম্পর্ক ছিল।

২—বিউটিয়াস ওয়ান—অ্যাকশা বুস্টার।

৩—ওয়েফারার একটি কবিতা। কিন্তু বুস্টার পরিবার ভারতে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিভিন্ন জায়গায়, সেইজন্য তাঁদের ওয়েফারারস বলা হত।

৪—ঈশ্বর ব্রহ্মচারী। ৫—বাংলার গভর্নর।

শব্দের দুটির নীচে লাইন টানা লেখিকাকৃত।

সম্পাদনা করতে হয়েছে এভাবে : (১) অমৃতে কিভাবে লেখাটি পেল, (২) লেখিকার উদ্যোগ, (৩) বশীশ্বর সেন ও শ্রীমতী সেন, (৪) বিবেকানন্দের অপ্রকাশিত চিঠি, (৫) স্মৃতিলিপি, আলাপচারী ও ছবি থেকে ক্রিস্টিনের জীবন, (৬) অন্যকে লেখা ক্রিস্টিনের চিঠি, (৭) ক্রিস্টিনের কবিতা।

পরে আমরা ক্রিস্টিনের লেখা অন্যদের চিঠি ও তাঁর মৃত্যুতে বিশিষ্ট সব মানুষের শোকলিপিও এ লেখায় দেব।

(২)

প্রিয় অ্যাকশা, আমি ভাল আছি। আই র‍্যাপ অন উড একথা বলতে ভয় পাই, কারণ যখনই আমি এরকম করি, তখনই আবার রিল্যাপ্স করে। এখন আমি দিনে ২।৩ মাইল হাঁটতে পারি এবং অসুখের আগে যেরকম ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, এখন তার চেয়ে কম হয়। বশী ও আমি দুজনেই 'পাইন' (বাড়ি)-এর নীচে যে পাহাড়টি আছে, তার নীচে যে টোল-গেট, সেই পর্যন্ত প্রায়ই হাঁটতে যাই। ফেরবার পথে লক্ষ্মীরাম সাহার ওখানে হয়ে বাড়ি ফিরি। মাঝে মাঝে যেখানে চড়াই উঠতে হয়, সেখানে যেতে হলে ডান্ডি নিই। এখন সব রাস্তাগুলি আমার চেনা হয়ে গেছে। ধন্য আলমোড়া ! তুমি না হলে আমাদের এখানে আসা হোত না।

সবাই এখান থেকে চলে গেছে। রাটলেজ ও টার্নারেরা ট্যুরে গেছে—ক্রিসমাসের আগে ফিরবে না। ক্যাপ্টেন গ্রে ছাড়া কোন অফিসারই এখানে নেই। কেবল শ'খানেক সৈন্য আছে। বাড়িগুলি সব খালি। আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশীরা হলেন 'তারা-ভিলা'র (সেই ছোট তিনটি বাড়ির একটি বাড়ি).. মিসেস কুক ও এনিড্। আর হলেন কুটীরের (রামকৃষ্ণ কুটীর) বাসিন্দারা একদিকে, ও সিকি মাইল আন্দাজ দূরে রাস্তার অন্যদিকে স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আমাদের রাঁধুনী আশুকে আমরা ছুটিতে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। বিজয় আজকাল রান্না করছে (চমৎকার) এবং খেতেও দিচ্ছে। জলের ভিস্তি আজকাল বাজার আনা এবং দরকারমত ফুটফরমাস খাটে। জীবন-যাত্রা খুব সরল ও শান্ত। ঠিক যেমন পরিবেশটি চাই, তেমনি আমরা পাচ্ছি এবং সেটা বেশি করে উপভোগ করছি।

আমি আশা করি তোমার নতুন বাড়িতে তুমিও এমনি আনন্দে আছ এবং জীবন সুন্দর ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আশীর্বাদ-ধন্য বশীর প্রীতি (তোমাদের) আমাদের ভালবাসা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

তোমাদের সদা আশীর্বাদ জানাই—

ক্রিস্টিন।

তানিতন স্কেচটা পাঠান নি। আমারটি আমার পছন্দ হয়েছে।

তাঁর কবিতা

'Mogul Taj
Palaces
gardens
It is only in India that we find the Taj.
It is only in India that we find the Himalayas.
The H. are not mere mountains to the H.
Crown of mother India home of Shiva and Uma.
The light on the H is Uma's.
The Ma Ganga falls from the head of Mahadev the Great God.

ক্রিস্টিনের হস্তলিখিত একটি সংক্ষিপ্ত নোট।

Mogal Taj
Palaces — gardens.

It is only in India that we find the Taj—It is only in India that we find the Himalayas. The Himalayas are not mere mountains to the Hindus.
Crown of mother India, home of Shiva and Uma. The light on the H. (Himalayas) is Uma's
The Ma Ganga falls from the head of Mahadev — the great God.

এই কাগজের পেছনে লেখা আছে :

Rose Cottage — Stein Hall T. E. Darjeeling. April 20 '24.

ও'র ফাইলের মধ্যে তাজমহলের ওপরে একটি কবিতা পাওয়া গেছে ক্রিস্টিনের হস্তাক্ষরে। মনে হল কবিতাটি ও'রই রচনা। কিন্তু শ্রীযুক্তা সেনের মতে 'উনি কখনও কবিতা লিখতেন বলে জানি না। বলাও এ-বিষয় কখনও কিছু বলেননি। এক্ষেত্রে বলা মুস্কিল, ও'র হস্তলিপির কবিতার রচয়িতা উনি অথবা কোন কবির কবিতাকে উনি কপি করে রেখেছিলেন।'

আমার মনে হয়, যে-কোন কবিমানস-প্রকৃতির মানুষের পক্ষে তাজের সামনে গেলে আপনিই কবিতার ছন্দ ও ভাষা উৎসারিত হয়ে ওঠে।

কবিতাটি উধৃত করছি—

On Jamuna's bank stands Taj Mahal
The Taj Mahal of Jehan
The jewels of the Hindu Lords
A wonder beauty made with hands
And only love ever understands
The Taj Mahal of Jehan.
Above the .... which lowly creeps
Above the .... which lowly creeps
Near where the signing willow weeps
Within where human beauty sleeps
A tryst the sentinal .... marble keeps
Of mournful sad Jehan.

Beyond the tide the ebbs and flows
Where Suns nevr sets nor rise
Beyond the breath of wind that blows
Beyond the everlasting snows.
She lines, she lives and only knows
The Taj Mahal or the Skies
Sleep on sweet form of stones and sand
The sand eternal holds thy hand
The seas great lips still kiss the strong
The Sun's great arms embrace the land
The queen has gone to understand
The Taj Mahal of the Soul.

ও'র হস্তাক্ষরে আরও একটি কবিতা। রচয়িতা ক্রিস্টিন কিনা জানা নেই।

Let me know what is so
In a world full of woe
If I feel, let me tell
How I feel
Let me be on the lap where no sleeps
Let me stand in the battle of worlds
Unconquerred and rise in the bottle again
Let the meeting of spheres and the
crashing of worlds

Rock the seat of the goods till to chaos
'tis hurled
Till the deep sounding tonng
of eternity's sea.
Says that nothing is eft but......being
and me
Shall I fear? What is it? Who am I
shall I tell?
It is being I am and with arm all is well
Unmoved is the........where
answers will dwell
As it is, I am and there's nothing to tell.

সব প্রামাণিক তথ্য শ্রীমতী সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

বস্তিতে বাদশার বংশধর

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ব

বছর পনের ষোল আগের কথা। এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলাম— মুঘল বাদশার বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শার সাক্ষাৎ প্র-পৌত্র, কলকাতার ইটালি পল্লীর এক বস্তিপাড়ায় অতি দীন-হীন অবস্থায় বাস করছেন।

বন্ধুটির কাছ থেকে বাহাদুর শার বংশধরের নাম ও ঠিকানা জেনে নিয়ে, একদিন তাঁর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

ইটালি অঞ্চলের ফুলবাগান এলাকায় ক্যান্টোফার রোড যেমন সরু তেমনি নোংরা, বস্তি-বহুল গলি। কোন বাড়ীরই নম্বর প্লেট দেখা যায় না। ঐ রাস্তার বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করে ১৪ নম্বরের সন্ধান পেলাম।

জরাজীর্ণ, আধকোটা, নীচু, একতলা বাড়ী, সামনের দিকটা দেওয়ালে আঁটা, একপাশে প্রবেশ-পথ; সেখানে—অন্দরের আব্রু রক্ষা করতে অক্ষম—একটা ভাঙা দরজা।

বার কয়েক ঐ দরজার কড়া নাড়তে ভিতর থেকে পাজামাপরা একটি মুসলমান কিশোরী বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলে—কাকে চাই?

তাকে বুঝিয়ে বলতে সে আমাকে বাড়ীর মধ্যে একটু নিয়ে গেল, একটা ঘর দেখিয়ে বললে—ঐখানে বসুন....' তাঁকে ডেকে দিচ্ছি।

খুপেরির মত ছোট ঘর, নোনাধরা দেওয়াল। পলেস্তারা খসে গিয়েছে, দেওয়ালের ইটগুলি অস্বপ্রকাশে উদ্যত, ফাটা মেঝের এককোণে একটা শতচ্ছিন্ন কম্বল পাতা, তার ওপর বসবো কিনা ভাবতে একটু সময় গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ভদ্রলোক এলেন, পরণে ময়লা পা-জামা ও ছেঁড়া হাফ-সার্ট, ঘরে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আত্মপরিচয় দিলেন— তিনিই প্রিন্স বেদার বখৎ— শেষ মুঘল বাদশা—দ্বিতীয় বাহাদুর শার প্র-পৌত্র।

আমি সসম্মানে মাথা নীচু করে সেলাম জানিয়ে বললাম বা (ভুল করে) বলে ফেললাম— আপনিই— শাহাজাদা— প্রিন্স বেদার বখৎ (তিনি ঐ নামেই আত্মপরিচয় দিয়ে থাকেন—শাহাজাদা বলেন না)! প্রিন্স একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে 'শাহাজাদা' শব্দটি উচ্চারণ করলেন, শব্দটা যেন আর্তনাদের মত শোনালো, তাঁর বড় বড় চোখ দুটি ছলছল করছে, লক্ষ্য করলাম। প্রিন্সের দিকে চেয়ে থাকলাম, মনে পড়লো অতীত দিনের কথা... একশ' পনেরো-বিশ বছর আগেও ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরি-পরিস্থিতি যেমন ছিল তার যদি ঐ রকম শোচনীয় পরিবর্তন না ঘটতো, তাহলে হয়ত ইনিই দিল্লীর সিংহাসনে বসতেন। আজ তিনি কলকাতার বস্তিপাড়ার ভাঙ্গা ঘরে। নিয়তি কি নির্মম!

প্রিন্স বেদার বখতের বয়স প্রায় চল্লিশ। এখনও তাঁকে সুপুরুষ বলা যায়। সুন্দর স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মধ্যম আকৃতি, জন্মাবধি দিনের পর দিন দুঃখ ভোগ, হতাশা আর চরম অভাব অনটনের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটালেও তাঁর দেহের শ্রী বা লাবণ্য একেবারে অন্তর্হিত হয়নি, বিশেষ করে তাঁর দীর্ঘ চোখ দুটি আজও আকর্ষণীয়। প্রিন্স অতি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী। হিন্দী উর্দু মিশানো বাংলা ভাষায় কথা বলেন।

প্রিন্স কিছুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে একবার অন্দর মহলের দিকে ঘুরে এলেন, হাতে একখানা বড় খাম— তার মধ্যে ছিল— সংবাদপত্রের কয়েকটি ক্লিপিং।

...১৯২১ সালের রেংগুনে 'ডেলি নিউজ' পত্রে প্রকাশিত সংবাদ বিশেষের টাইপ করা কয়েকটি কপি প্রভৃতি, খামটি আমার হাতে দিয়ে বললেন— খামের মধ্যে যে সব কাগজপত্র আছে পড়ে দেখবেন— আমার ভাগ্যাহত জীবনের বহু কথা জানতে পারবেন। আমি হয়ত সব কথা ঠিকমত বলতে পারবো না, যতটা সাধ্য মুখে মুখে বলছি ;—

...আমার জীবনের সব কাহিনীই অতি করুণ এবং দুঃখে ভরা। পূর্ব পুরুষেরা তামাম হিন্দুস্থানের মালিক ছিলেন, লাখ লাখ আদমীকে রোটী যুগিয়েছেন, খুশী হয়ে কত হাজার হাজার নকর-বান্দাকে জমি-জায়গীর ও খয়রাতী করেছেন, আর আমার দিন কেটেছে— কখনো অর্ধাহারে অনাহারে, অনেক সময় বাসস্থান বলে কিছু ছিল না, দিনের বেলায় রাস্তায় রাস্তায় পার্কে ময়দানে, আর রাতে মানুষের বাসের অনুপযুক্ত ভাংগা ঘরে বা রাস্তার পাশে ফাঁকা বারান্দায় কেটেছে—।

মাঝে মাঝে দু'একজন দয়ালু ব্যক্তির সাহায্য বা খয়রাতি বৃত্তি পেয়ে ঘর ভাড়া করে থেকেছি, দু'বেলা না হলেও একবেলা খেয়েছি, কিন্তু সে সব দয়ার দান স্থায়ী হয়নি, আবার কিছুদিন পরে বন্ধ হয়ে গেছে। আবার পথকে আশ্রয় করেছি। আ খাওয়া-পরার কথা বলতে আমার ক শুনলেও আপনি দুঃখ পাবেন। অভা তাড়না বা ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে, বাদ বংশধর হয়েও কারখানার শ্রমিকও হ হয়েছে একদিন।

আমার জীবনের বেশি ভাগ কে অতি শোচনীয়ভাবে। গোড়া থেকে বল প্রথমে যে বিষয় উল্লেখ করছি সেসব আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ভারতের ইতিহ লেখা আছে—শুনেছি, পড়বার কোন সুযোগ হয়নি তবে এক মহাশিক্ষিত মৌলভী আত্মীয়ের কাছ থেকে যা জান পেরেছি তাই বলছি।

সারা ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ দম দিল্লী জয় করার পর ভারতের ইংরেজ সরকার বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আ প্রপিতামহ মুঘল বাদশা দ্বিতীয় বাহা শাকে ঐ বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ও য অপরাধী অভিযোগে নির্বাসনদণ্ড দি রেঙ্গুনে নিয়ে যান, তখন তাঁর সংগে ছি তাঁর প্রধান বেগম জিনাৎমহাল ও তাঁ অপ্রাপ্তবয়স্ক দুটি পুত্র—জওয়ান বখৎ শা আব্বাস। কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন—ইংরেজরা জওয়ান বখৎ হত্যা করেছিলেন, তিনি নয়, রেঙ্গু গিয়েছিলেন—তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী। এ কথা ঠিক নয়। আমার আত্মীয় সেই মৌ সাহেব বলেছিলেন।

প্রিন্স কথা থামিয়ে আমাকে বললে কোন্ কথা ঠিক, তা আপনি ইতিহাস দেখবেন। হোক, রেঙ্গুনে আ প্রপিতামহ ও তাঁর পরিবার সকলের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মাসে ৬০০ বৃত্তি ও বিনা ভাড়ায় থাকার জন্যে এ বাড়ীর ব্যবস্থা করে দেন। বছর চারেক বাড়ীতে থাকবার পর বাহাদুর শা মারা তারপর কিছুকালের মধ্যে বেগম জিনৎমহল ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শা আব্বাসের হয়। জীবিত থাকেন—বাহাদুর শার একমাত্র পুত্র—জওয়ান বখৎ। একমাত্র পুত্র—জামসেদ বখৎ ছিলে বাহাদুর শার একমাত্র পৌত্র ও আ পিতা। ইংরাজী ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯ সাল পর্যন্ত আমরা বংশ পরম্পরায় বৃত্তি ভোগ করেছি ও বিনা ভাড়ায় আগে বাড়ীতেই থেকেছি। আমি ঐ বাড় জন্মাই। কিন্তু আমি আমার পি দেখিনি, তিনি ১৯২১ সালের গো দিকে যখন মারা যান তখন মাতৃজঠরে।

পিতা জামসেদ বখৎকে রেঙ্গু লোকরা 'প্রিন্স অফ দিল্লী' বলতো, সময়ও আমাদের পরিবারের

পিয়ারে মির্জা। কলকাতার মেটিয়াবুরুজের লোক—অযোধ্যার নবাব বংশীয়, তিনি সে সময় রেঙ্গুণে একটা ছোট ব্যবসা করতেন। তিনি, মা ও আমার থাকবার ব্যবস্থা করলেন, তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তির ছাপরায় ছাওয়া একখানা ঘরে। এজন্য নানাকে দোষ দেওয়া যায় না। বড় ব্যবসায় ফেল করে, তাঁর সে সময় অবস্থা খারাপ যাচ্ছিল, সম্বল মাত্র ছিল একটা ছোট দোকান, সংসার বলতেও তাঁর তখন কিছুই ছিল না। আমাকে বুকে নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মা সেই সাবেক বাসা ত্যাগ করে ছাপরার ঘরে উঠলেন। সম্বল মার গায়ের খান কতক গহনা। নানা সামান্য সাহায্য করতে পারতেন।

দারুণ মনঃকষ্ট, অভাব, জঘন্য ঘরে বাস করে মার শরীর কিছুদিনের মধ্যে ভেঙ্গে গেল, তিনি বেশিদিন বাঁচলেন না। মার মৃত্যুর কিছুদিন পর নানা আমাকে দিল্লীতে নিয়ে এলেন। সে সময় আমি একটু বড় হয়েছি। দিল্লীর বিখ্যাত ব্যক্তি-দেশসেবক ও হাকিম, আজমল খাঁর সঙ্গে নানার পরিচয় ছিল। দয়ালু হাকিম সাহেব, কিছুকাল তাঁর বাড়ীতেই আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পরে আমি আরও কিছু বড় হলে, আমার মাসিক বৃত্তির একটা ব্যবস্থাও হাকিম সাহেব, করেছিলেন। এক খয়রাতী প্রতিষ্ঠান থেকে। কিন্তু কি কারণে, জানি না সরকারী আপত্তিতে সে বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল—ভাগ্যের নির্মম আঘাত আমার জীবনে একবার নয় জীবন ভোর চলেছে। নানা আমাকে কলকাতায় এনে আমার এক খালা (মাসী)র কাছে রেখে দিলেন। মাসীর বাড়ী ছিল মেহেদী স্ট্রীটে। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না, কিন্তু দয়ালু ছিলেন। খালা শুধু আশ্রয় দিলেন না—আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিলেন।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যও সঙ্গেই আছে, ঐ সময় কিছুদিনের মধ্যে নানা ও খালা মারা গেলেন। মাসীর পরিবারের মধ্যে থাকা চলল না। আমি নিরাশ্রয় হলাম। কিন্তু যাই কোথায়? বয়স বেশি নয়—কিশোর, সামান্য লেখাপড়া শিখেছি, কি কাজই বা করতে পারি?

কলকাতা বাসের সময় বিহারের এক জমিদার—দীপনারায়ণ সিংহের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়েছিল। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কখনো ভাগলপুরে কখনো বা কলকাতার-দিল্লীতেও থাকতেন। কলকাতা ত্যাগ করে আমি তাঁর ভাগলপুরের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করে দুঃখের কাহিনী জানালাম। তিনি আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করলেন, অস্থায়ীভাবে তাঁর বাড়ীতে থাকলাম ও চাকরি বা কোন কাজের জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম, এখানে ঐ সময় মির্জা মহম্মদ নামে এক খানদানী বংশের তরুণ দরাজদিল ব্যক্তির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তিনি মাসে মাসে আমাকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেছেন। শুধু ঐ সময় নয়—পরেও এবং বহুবার। তাঁরই যোগাযোগে সে সময়ের দিল্লীর বিখ্যাত কবি—খাজা হাসান নিজামীর সঙ্গে পরিচিত হলাম। সদাশয় কবির চেষ্টায় হায়দারাবাদ 'নিজাম খয়রাতী ট্রাস্ট' থেকে আমার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা হল—মাসিক ৫০ টাকা, কিন্তু আমার বয়স ষোল বছরের উপর হলে সে বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। আমি আবার পথে বসলাম। কয়েক বছর কেটে গেল—রাজা দীপনারায়ণ ও মির্জা মহম্মদের সামান্য আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে। তাঁদের সাহায্য কখনো পেতাম, কখনো পেতাম না।

বৃত্তি বা দানের ওপর বিতৃষ্ণা এসে গেল—মনে মনে স্থির করলাম—আর কারো কাছে বৃত্তি বা সাহায্য নেব না। নিজে উপার্জন করবো, যে কোন ছোট কাজই হোক করবো।

পাটনা শহর থেকে কিছু দূরে একটা নতুন কারখানা খুলেছে, সেখানে লোক নেওয়া হচ্ছে, জেনে সেখানে গিয়ে শ্রমিকের কাজ নিলাম।

কুলীধাওড়াতে নানা কারণে থাকা গেল না, বাসের জন্য একটা ঘর ভাড়া করতে হল।

কিন্তু হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, উপযুক্ত আহারের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকায়, শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেল; কাজও হারাতে হল। বেকার হয়ে পথে বসলাম। আমার তখন উন্মাদের মত অবস্থা, হাতে কিছু টাকা ছিল, তাই নিয়ে কলকাতায় এলাম। বহু ঘোরাঘুরি ও চেষ্টার পর এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীর একটি পরিত্যক্ত ঘরে থাকবার অনুমতি পেলাম, আর পেলাম মির্জা মহম্মদের কিছু সাহায্য।

কলকাতায় থাকি, কাজকর্মের চেষ্টা করি এমন সময় এক কংগ্রেসী ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল।

তাঁকে আমার পরিচয় ও আর্থিক দুরবস্থার কথা জানাতে তিনি বললেন—মেটিয়াবুরুজের অযোধ্যার নবাব গোষ্ঠী সরকারী বৃত্তি পেয়ে থাকেন, আপনি হয়ত পেতে পারেন, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা জানান, আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে দরখাস্ত পাঠান সরকারী বৃত্তির জন্য। ভদ্রলোকের উপদেশ মত দুটো কাজই করলাম। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, সে সময় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সব কথা শুনে আমাকে শুধু সরকারী বৃত্তি পাইয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন না, নিজে থেকে কিছু অর্থ সাহায্য করলেন, যা দিয়ে কোন ছোটখাট ব্যবসা করতে পারি। তাঁর টাকায় ব্যবসাও করেছিলাম, চালাতে পারলাম না—লোকসান হয়ে উল্টে দেনা হয়ে গেল। দুর্ভাগ্য যে আমার চিরস্থায়ী, আমার নসিবে আছে অনাহারে রাস্তার ধারে পড়ে মরবো... জীবন আমার অসহ্য ঠেকছে; দিন দিন ধৈর্যহারা হচ্ছি।

প্রিন্সকে বিশেষ বিপদগ্রস্থ দেখাচ্ছে, তিনি হতাশভাবে বললেন—এক বছর হল বৃত্তির জন্যে চেষ্টার পর চেষ্টা করে আসছি...কোন ফলই হল না...দরখাস্তগুলোর একটা উত্তরও এলো না, আর দু'এক মাস অপেক্ষা করবো, তারপর।...

ধীরস্থির প্রিন্স খুব বিচলিত হয়েছেন, তাঁর চোখ দুটি ঝক্ ঝক্ করছে। জিজ্ঞাসা করলাম 'তারপর' কি?

প্রিন্স দৃঢ় স্বরে বললেন—তারপর সো... চলে যাব দিল্লীতে, সেখানে আমার পূ... পুরুষের তৈরী 'হুমায়ুন মক... (বা সমাধি)র পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভি... করবো, লোকে দেখুক, জানুক, হায়... মুঘল বাদশার বংশধর আজ ভিক্ষা করছে... প্রিন্স দারুন অভিমানের সঙ্গে তাঁর ক... শেষ করলেন। তাঁর এ অভিমান কার ওপর... খোদার না নসিবের?

তারপর বহুদিন প্রিন্স বেদার বখ... আর খবর নিইনি, তাঁর কথা প্রায় ভু... গিয়েছিলাম। মনে পড়লো গত বছর... ১৯৭৫ সালের অকটোবর মাসে। ঐ সম... কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর প... জানলাম—দিল্লীতে ,শেষ মুগল সম্রা... বাহাদুর শাহ্র দ্বিশততম জন্মবার্ষিক স... সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সভায় প্রধা... অতিথি ছিলেন রাষ্ট্রপতি জনাব ফকরু... আহম্মেদ, তাঁর গলায় যিনি মাল্যদান কর... তিনি (দিল্লীর বাহাদুর শা স্মৃতিরক্ষা... সমিতি কর্তৃক আবিষ্কৃত বা স্বীকৃ... বাহাদুর শার বংশধর নাম—মীর্জা আলতমা... উদ্দিন, লালকেল্লার কিছু দূরে একটা গলি... মধ্যে বস্তিতে থাকেন, উপজীবিকা ... ধোলাই, তবে তাঁর কাছে আছে, বংশানুক্র... সুরক্ষিত একটি 'শিরাজ' (বা কুলজী... পুস্তক), প্রায় দু'শ বৎসর পূর্বে উর্দু... লেখা মুগল বাদশাহ বংশের ধারাবাহি... সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মীর্জা আলতমাদ উদ্দি... ঐ গলির মধ্যেই বাল্যকাল থেকেই ... করেন এবং তাঁর বংশের সকলে নামের ... মীর্জা উপাধি ব্যবহার করেছেন, তিনিও ... করছেন।

উক্ত সভার সংবাদ পড়ে প্রিন্স বেদার... কথা মনে হয়েছিল। একটা কৌতূহল... হয়েছিল—তাঁকে ঐ সভায় ডাকা হল ... কেন? এবং যিনি বাহাদুর শার বংশধর ... দিল্লীতে স্বীকৃত হয়েছেন তিনি কে... প্রিন্স আমা... বলেছিলেন যে, তিনি... বাহাদুর শার একমাত্র জীবিত বংশধর।

ঐ বিষয় জানবার জন্যে একদিন প্রিন্স... সেই ইন্টালি ফুল বাগান... বাসার খোঁজে গেলাম। ... যাবার পথে মনে হচ্ছিল, প্রিন্স ... কলকাতায় আছেন? শেষবার যখন ... কাছে যাই, তিনি বলেছিলেন,—যদি সরকা... বৃত্তি না পাই, তাহলে দিল্লী চলে যি... সেখানে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভি... করবো।

ফুলবাগান পল্লীর সেই বাসায় ... তাঁর বন্ধুর কাছে জানলাম—প্রিন্স ঐ ... বহুদিন ছেড়ে দিয়ে তালতলা বাজা... পিছনে এক গলিতে বাস করছেন। ... সরকারী বৃত্তি পেয়েছেন ও সাদি করেছে...

তালতলা বাজার স্ট্রীট সরু গলি। ... প্রধান, তার মধ্যে নোনাধরা জরাজীর্ণ বা... এক তলার পায়রার খুপরির মত ছোট ... ঘর। দিনের বেলাতেও প্রায় অন্ধকার, ... ঐ রকম একখানা ঘর নিয়ে সপরি... থাকেন।

আমাকে দেখে চিনতে পেরে ঘরের ... নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসালেন, নিজে ...

...কোণে বসলেন। লক্ষ্য করলাম, তাঁর ...হারা খুব খারাপ—ক' বছরের মধ্যে যেন ...ড়ো হয়ে গিয়েছেন।

কিছুক্ষণ আলাপের পর, আমার সেই ...তূহলের বিষয়—অর্থাৎ দিল্লীতে বাহা-...র শার স্মৃতি তর্পণ সভা ও সেই অনু-...নে যিনি বাদশা বংশের সন্তান বলে ...কৃত হয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে প্রিন্সকে সব ...থা বললাম।

একটু ভেবে নিয়ে প্রিন্স উত্তর দিলেন, —বাহাদুর শার বংশধর বলে দিল্লীতে যিনি স্বীকৃত হয়েছেন তাঁর কথা জানি না, আমি পাটনায় এক সরকারী কলেজের প্রফেসর মৌলানার কাছে শুনেছি—ইংরেজ সৈন্যরা দিল্লী অধিকার করতে আসছে জানতে পেরে বাহাদুর শা তাঁর স্ত্রী জেন্নাৎ বেগম এবং দুই শাহাজাদা জওয়ান বখৎ ও আব্বাস শা লালকেল্লা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান, ঠিক তারপরের দিন ইংরেজ সৈন্যরা দিল্লী অধিকার করে ও মোঘল বাদশাহ বংশের সকল পুরুষকে হত্যা করেছিল। সে সময় বাহাদুর শা বা তাঁর বেগম ও বালক পুত্রদের সন্ধান ইংরেজরা পায় নি; পরে যখন বাহাদুর শা ইংরেজদের কাছে ধরা দিলেন তখন কোম্পানীর সৈন্যরা বাহাদুর শাকে আর হত্যা করে নি, তাঁকে স্ত্রী-পুত্রসহ বর্মায় নির্বাসিত করেছিল। ঐ পুত্র দুজনের মধ্যে জওয়ান বখৎ ছিলেন আমার পিতামহ এবং আমি হলাম তাঁর একমাত্র জীবিত পৌত্র বা বাহাদুর শার একমাত্র বংশধর।
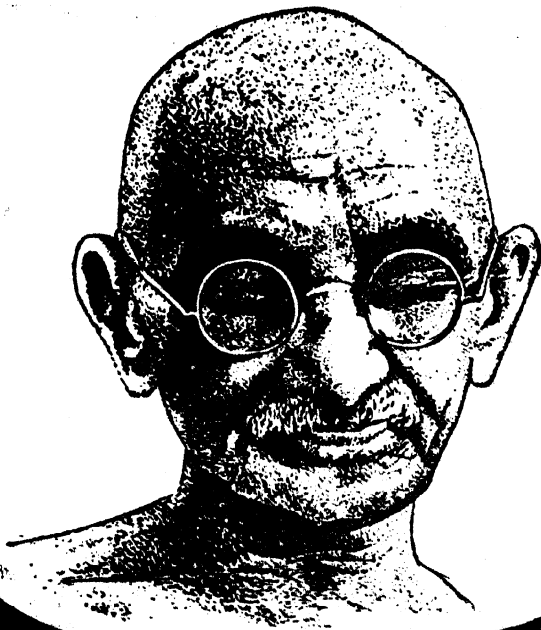
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুস্থ হয়ে উঠলো মঞ্জরী, কিন্তু ক্ষত রয়ে গেল। সকলের চোখের আড়ালে সে ক্ষত। সম্ভবতঃ নিজেরও মনের আড়ালে। এলিয়ে পড়া তার ধাত নয়। আবার স্বাভাবিকভাবেই অফিস যাওয়া সুরু করলো। এতকাল নিয়ম করে সন্ধ্যায় বেরোন ছিল না। মাঝে মাঝে বাড়ীতে থাকতে ভালো লাগতো। গান শুনে, বই পড়ে বেশ সময় কাটতো। এখন বাড়ী অসহ্য হয়ে উঠলো। বাড়ী মানেই নিজের মুখোমুখী। হারাবার বেদনা, প্রত্যাখ্যানের জ্বালা যেন এক মুহূর্ত ওকে তিষ্ঠোতে দেয় না। বসে থাকলেই স্মৃতিরা ভীড় করে আসে। ভাঙ্গা স্বপ্নগুলি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে চোখের সামনে। আর অসহায় ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে চোখ জ্বালা করে ওঠে। না, লুকিয়ে লুকিয়ে ও চোখের জল ফেলতে, ঐ ব্যর্থ দিনগুলির জন্য, অকারণ চেষ্টাগুলির জন্য, তার মন বিদ্রোহ করে। কৈশোর থেকে যে অক্ষম পুরুষটিকে, উৎসাহ দিয়ে, প্রেরণা দিয়ে, সাহায্য দিয়ে নিজের জোরে দাঁড় করাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে, আর কখন কেমন করে মনের অগোচরে তারই ওপর নির্ভর করেছে একান্তভাবে, তার এই বিশ্বাসঘাতকতা, তার মনের সমস্ত বিশ্বাসের মূলে ধরে নাড়া দিয়েছে। নিজের কাছে নিজেকেই যেন এর কোনও কৈফিয়ৎ নেই। নিজের কাছে নিজেরই এ মস্ত বড় পরাজয়। জয়ন্তর অকৃতজ্ঞতা তার নিজের লজ্জা। অমন মানুষকে বিশ্বাস করার লজ্জা। মানুষের ওপর আস্থা রাখা এর পর যেন আর সম্ভব নয়। কিন্তু, নিজের ওপর যতই ভরসা থাকুক, মনে যতই জোর থাকুক, জীবনস্বপ্নে দোসর যে চাই-ই চাই। একা একা পথ চলা যায়, পূর্ণ হওয়া যায় না। সদর্প আশ্বাস যতই হাস্যকর হোক, মনে মনে যতই জানুক জয়ন্তর এই ঔদাসীন্যের কোনও কৈফিয়ৎ আসবে না বম্বে থেকে, তবু তার তরুণ মন যেন আশার বিরুদ্ধেও আশা করেছিল, অন্ততঃ একটা খবর আসবে। কেন সে এল না, আসতে কোথায় তার বাধা, এসব জানিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেও যদি একটা চিঠি আসতো, মনকে বোঝানো যেত। কিন্তু জয়ন্তর এই নির্মম নীরবতা, যে সব নিয়মের বাইরে। সমস্ত যুক্তির অতীত। কি করে সে নিজের কাছে মুখ দেখাবে? বাড়ীতে থাকা তাই অসম্ভব। বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অজস্র ছিলই। ইদানীং তাদের সঙ্গে বেরোচ্ছিল না বেশী। আবার নতুন করে খুঁজে নিয়ে তাদের ভীড়ে মিশে যেতে হোল। প্রতি সন্ধ্যা, প্রত্যেকটি ছুটির দিন, রাত্রি, কেবল আড্ডা, পার্টি কিম্বা ডিসকোতে পড়ে থাকা। পোশাক আশাক, মুখের চেহারা বদলে যে লাগলো। আগেও প্রায়ই বেলবটম, তার সঙ্গে নিত্যনতুন টপ পরেছে, কিন্তু মঞ্জরী শাড়ী জাতীয় ভারতীয় পোষাকই পছন্দ করতো বলে বেশীর ভাগ সময়েই শাড়ী পড়তো। এখনও পরে, যখন অফিসে যায়। বাকী সময় শাড়ীর খবরই রাখে না। এখন মঞ্জরী মানেই উগ্রতম, আধুনিকতম পোষাকের চলন্ত নিদর্শন। চোখে মাসকারা, রংবেরং এর আই শ্যাডো, হাতে সিগারেট। চোখের দৃষ্টি ধারালো, ঠোঁটের কোণায় দুনিয়ার সব কিছুকে তাচ্ছিল্য আর উপহাস করা এক অপরূপ বঙ্কিম হাসি। সে কমনীয় কোমল, বুদ্ধিদীপ্ত, সুকুমার মঞ্জু কোথায় হারিয়ে গেল। তার বদলে যে রইলো, সে যেন এক অচঞ্চল, বিরক্ত-আশা ভিন্ন মন ক্ষুব্ধ বিক্ষুব্ধ, দুনিয়ার বেইমানীর পোড় খাওয়া এক তরুণী মাত্র।

তবু গোপনে জয়ন্তর খোঁজ চলে। বম্বে প্রত্যাগত কারো দেখা পেলেই অতি সন্তর্পণে জিজ্ঞাসাবাদ, 'আই সে, তুমি জয়ন্ত মজুমদারকে চেনো? বম্বের, জয়... পাল, 'না? হুঁজ হী?' 'না। এমন কেউ নয়, আমাদের একজন পারিবারিক বন্ধু। শুনেছিলাম বম্বেতেই আছে।' পুরোন সিগারেট থেকে নতুন সিগারেট ধরাতে ধরাতে অলস কৌতূহলকে আর প্রশ্রয় দেবার প্রয়োজনই থাকে না। শুধু মনে মনে ভাবে কি হোল কি? লোকটা কি উবে গেল নাকি? কেউ জানে না কেন? আমিও যেমন, এখনও খুঁজে মরি। উচ্ছে করে যে নিপাত্তা হয় তার পাত্তা কি বের করা এতই সহজ? ঠিক আছে দিব্যি আছে। মিলে যায়নি।

বলা বাহুল্য তার এ পরিবর্তন বাড়ীর লোকেদেরও নজর এড়ায়নি। প্রথমেই চিন্তিত হয়ে উঠে আঙ্গী। শাসন করতে গিয়ে উল্টে ধমক খেয়ে হাড়ি মুখ করে সে নীরব থাকে। ... পছন্দ হয় না মঞ্জুর ধরণ-ধারণ পোষাক, আশাক, সিগারেট, মেক-আপ ... কর, ওসব না হয় বাইরের ব্যাপার, কিন্তু মুখের চেহারা অমন কেন? এ বয়সে চোখের দৃষ্টি এত কঠিন কেন? গলার স্বর ... নিরুত্তাপ ও রুক্ষ কেন? আপন মনে ... নাড়ে সে। আঙ্গীর কাছে ভবিষ্যদ্বাণী ... 'নষ্ট হয়ে যাবে, একেবারে নষ্ট হয়ে ... মেয়েটা। কেউ দেখার নেই, বলার নেই। ... অমন মেয়ের এই হাল। ও হো হো ... কি মেয়ে কি হয়ে যাচ্ছে। এ বাড়ীর ... ডোবাতে হবে একেবারে। চোখের সামনে ... দেখা যায় না। রোজ এত রাত করে ফেরা, একদিন আর ফিরবেই না। ... একটা বিয়েরও চেষ্টা করে না?' আঙ্গী ... করে, 'চেষ্টা করে ওর বিয়ে দেওয়া ... মনে কর তুমি? ও নিজে থেকে না ... কিছুই ওকে দিয়ে করানো যাবে না। ... গুলিও জুটেছে সব এইরকম। কি যে হো... আমিও এবার থামো ভাবছি।' কিন্তু যা...

ই হবে না। ওর আর কে আছে? ওর বাওয়া হবে না ওদের।

সোমাও চিন্তিত হয়ে পড়ছে। খোকনের অনুযোগ করে 'তোমরা কিছু বলছ না খোঁজ খবর করছ না কেন? কত রাত বাড়ী ফেরে রোজ, এটা কি ভালো?' ম কি করতে পারি? ও নিজে যথেষ্ট হয়েছে, নিজের বিষয় বোঝার না। ইউ লীভ হার এ্যালোন, চির-ই সেলফগাইডেড। বলার কি আছে, জে নেবারই বা কি আছে? তুমি মাথা ঘামিয়ো না এ নিয়ে।' সোমা তবু তর্ক করছে। তাদের বাড়ীতে ভাইবোন দের জন্য চিন্তা করা, শাসন করা, ভালোপথে চালনা করার সর্বদাই দেখে এসেছে। সেও তাই অভ্যস্ত। নিজের মনের শুভকামনা অকৃত্রিমভাবে মঞ্জুর জন্য উৎকণ্ঠা করছে। চিরাচরিত নিয়মের বশবর্তী তা যেন কেবলই বলছে, ভালো চলছে না, মোটেই ভালো হচ্ছে এত স্বাধীনতা ভালো না। এ উচ্ছৃং-খল পথে অকল্যাণ আসতে পারে। দের যতটুকু বুঝেছে, সে জানে কেউ কখনো কারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না, স্বাতন্ত্র্যকে চ্যালেঞ্জ না, নির্দেশ উপদেশ দিয়ে অসম্মান না। না হয় এতকাল প্রয়োজন হয়নি, যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবু করবে নিজের মেয়ে, নিজের বোনকে এভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেখবে? এ কেমন ধারা এদের? মনের মধ্যে এতটুকু মঙ্গল কামনা নেই, ভালোবাসা নেই, মমতা নেই? তাই সে তর্ক করে 'কি করে তোমরা এত ক্যালাস থাকতে পারো বুঝি না। কেন বলবে না? ও তোমার ছোটবোন না?' 'আমার ছোটবোন হতে পারে, কিন্তু ও আর সত্যিই ছোটটি নেই তো? ও যা করছে বুঝে, শুনেই করছে। লীভ কোয়াইট এ সেলফরেস-পেক্টিং গার্ল'। কোথায় থামতে হয় অবশ্যই জানে। তুমি চিন্তা কোরো না।' 'কিন্তু তুমি কি করে এত শিওর হচ্ছ? ওর চেহারা কি রকম হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কথাবার্তাও কেমন কেমন! এ বয়সে ওর মতন বুদ্ধিমতী মেয়ে কেন এমন হয়ে যাবে? দেখে মনে হয় শীগ্রি কমপ্লিটলি ডিসইলিউশ্যান্ড উইথ দ ওয়ার্ল্ড। তুমি একটু খোঁজ করো না।' আমার ভয় করে জিজ্ঞেস করতে।' 'ও নিজেই ওর নিজের মালিক। আমি জিজ্ঞেস করলেও যদি কিছু না বলে, আমার কিছু করার থাকবে কি? তার চেয়ে অপেক্ষা কর। দেখবে একদিন ও আপনিই বদলে যাচ্ছে আবার। আমার তো মনে হয় ও একটা ফেজ-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।' কিন্তু, খোকনের এই মনোভাবে সোমা মোটেই সন্তুষ্ট নয়। অপ্রসন্ন মুখে বলে 'এ সবই তোমাদের উইশফুল থিংকিং। আসলে তোমরা কেউই দায়িত্ব নিতে চাও না, তাই এভাবে এড়িয়ে থাক। মঞ্জুকে দোষ দিতে পারি না। এরকম পরিবারের মেয়ে আর কি করবে বল?' খোকন রেগে ওঠে 'ইউ লীভ মাই ফ্যামিলি আউট অফ দিস। ড্যাম ইট।' একটা বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে কি করে আমার দায়িত্ব 'ও পারে?' বিশেষ করে বাবা-মা যখন সামনে রয়েছেন?' 'চমৎকার যুক্তি।' সোমা হার মেনে বলে। 'তোমাদের ফ্যামিলির খুরে খুরে নমস্কার। বাব্বাঃ।'

সোমা এরপর রেণুকার কাছে দরবার করে। ইদানীং তিনি কিছুটা সজীব এবং সবাক। মেয়ের দেখা কদাচিৎ কদাচিৎ মেলে আজকাল। তবু যতটুকু চকিতে দেখেন, তাতে তাঁর মনেও আশংকা জাগছে। চিন্তার রেখা প্রায়ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। সেদিনের সেই বাচ্চা ছেলে চাপা দেয়ার কাহিনী তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। এবং পরিবর্তনটা যে তারই পিঠোপিঠি আসছে এ সম্ভাবনাও তাঁর মনে উঁকি দিয়ে গেছে। কিন্তু নির্বাক দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া আর কি করার আছে? যেভাবে বড় হয়েছে ওরা, আজ হঠাৎ করে ব্যতিক্রম কি করে আনেন? তিনি চাইলেই বা ওরা মানবে কেন? নিজের মনেই পাক দিতে চেয়েছেন ভাবনা-গুলিকে। মনোজকে এসব বলে আর তাঁর শান্তি নষ্ট করতে চাননি। কি দরকার? এতকাল পরে যদি লোকটা আবার খুশী হয়ে উঠতে চায়, তবে আর তার মনে নতুন

করে ভাবনা ঢোকানো কেন ? কিন্তু না। না বললেও বোধহয় আর চলছে না। অন্তত তার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। যদি তার মনোমতন কেউ থাকে, বলুক। যদি কেউ তেমন না থাকে, তবে কি করা যাবে ? মঞ্জুর মতন মেয়েদের কি সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া যায় ? কি হয়ে গেল চোখের সামনে সব। যাই হোক, কথাটা অন্তত তুলতে হবে। এমনি যখন ভাবছিলেন, সোমা এল তার অভিযোগ নিয়ে। 'মা, মঞ্জুর কথা কিছু ভাবছেন কি ?' রেণুকা একটু চমকে গেলেন। মঞ্জুর কথা মানে কি ? 'কি কথা বল তো ?' 'ওর বিয়ে-টিয়ে দেবেন না ?' 'বিয়ে ? তা ও কি বলছে কিছু ? ওর নিজের যদি গরজ না থাকে, তবে কি কিছু করা যাবে ? অথচ একটা করার বোধকরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমিও ওকে নিয়ে ভাবছি আজ কদিন ধরে।' 'ওর বন্ধুবান্ধবদের কেমন লাগে আমার। ওদের সঙ্গে বোধহয় মেশাটা ঠিক হচ্ছে না ওর। আপনি ওকে এ-নিয়ে কিছু বলুন না।' রেণুকা চিন্তিত মুখে বললেন, 'আমি তো কোনও দিনই ওদের কার সঙ্গে মিশবে, কার সঙ্গে নয়, এসব নিয়ে কিছু বলিনি। আজ হঠাৎ বললে ও কি শুনবে ? আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোন পথে চলেছে, ভালো করে জানি না। বইয়ে-টইয়ে বিদেশের ছেলেমেয়েদের কথাই পড়ি। এখানেও কি এসব হচ্ছে ?' সোমা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। জবাব দিল না। 'তোমার সঙ্গে কি কোনও রকম আলোচনা করে না ? ওরা কি করে, না করে, এসব কিছু বলে না ?' সোমা মাথা নাড়লো। রেণুকার মনে কেমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হোল। কোনও মতে জিজ্ঞেস করলেন 'ড্রাগ এ্যাডিকট্-ট্যাডিকট্ হয়ে পড়েনি তো ? এবং আরো কত কি হচ্ছে আজকাল, ওদেশে ?' সোমা আবার মাথা নাড়লো 'আমি কিছু জানি না মা। আমারও ভয় করছে। খোকনকে বলেছিলাম, ও বলে লেট হার এ্যালোন।' রেণুকা নিশ্চুপ হয়ে রইলেন। কি বলবেন ভেবে পেলেন না। কি করা যায়, যেতে পারে বুঝে উঠতে পারছেন না। শুধু বুঝলেন, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। আর বোধহয় চুপ করে থাকার সময় নেই। কিছু একটা করতেই হবে। মনোজকে বলতেই হয়। কিন্তু মনোজেরও কি কিছু করার আছে ? তবু বলতে হবেই। সোমাকে ভরসা দিলেন, না নিজেকে, বোঝা গেল না। 'যাক, কিছু ভেবো না, একটা কিছু করতেই হবে। স্বাধীনতা মানে এই নয়, যে অন্যের শান্তি নষ্ট করা।'

মঞ্জুর কনফার্মেশন বেশ কিছুদিন আগেই হয়ে গেছে। খবরটা বাড়ীতে দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি সে। সে খুশী হয়েছে কিনা নিজেও জানে না। অতএব আনন্দের ভাগ কাকে দেবে ? দেবার মতন কে আছে ? ও তাদের মাত্রা শুধু আরেকটু বাড়লো। নিজেকে শ্রদ্ধা করে কিনা আর তাও বোধহয় ভেবে দেখে না। তাঁদের শুধু একজনকে দেখানো মঞ্জরী মিত্র কতটা দামী। জন্মের পরিচয়ে নয় কর্মের পরিচয়ে। মঞ্জরী মিত্রকে কারো ঠেলে ওঠাতে হয়নি। দুনিয়ায় তার জন্য ভাববার মতন কেউ নেই। কোনও দিন ছিল না হয়তো কেউ থাকবেও না। কারো কাছে সে ধারে না কারো সাহায্য সে প্রত্যাশা করে না। আপন মনে একা একা পথ চলে। সে পথ চলায় ক্ষয়-ক্ষতির মাশুল যদি দিতে হয় সে নিজেই দেবে। কাউকে সে আশা দেবে না নিরাশও করবে না। তার সফলতায় কারো মুখে সে হাসি দেখতে চায় না, তার পতনে কারো চোখে জলও সে আশঙ্কা করে না। সে একা একাই চলবে। দুনিয়াটা বেইমান কিনা, সে নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু একজনের বেইমানীর শাস্তি তাকে দিতেই হবে। মঞ্জরী মিত্রকে অত সহজে দমানো যায় না। অত সহজে তাকে অবহেলা করা যায় না। হয় সামনে এসে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিতে হয় নয় মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ... সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। ক্ষমতা থাকলে পরাস্ত করতে হয়। মঞ্জরীর ঋণ চেক পাঠিয়ে শোধ করা যায় না। অন্যভাবে শোধ করতে হয়। কিন্তু কিভাবে ? সেটাই সে আজ পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারেনি। সামনাসামনি যখন হব তখন ভাবা যাবে। এখন ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন যা যা করছে সবই জন্মান্তর অপচয়ের ব্যাপার। কিন্তু তাতে যে নিজের ছাড়া তার কারো ক্ষতি হচ্ছে না সেটুকু ... বুদ্ধি এখনও আছে। আছে ... জ্বালা বেশী। সেই চিরাচরিত প্রথায় নিজেকে কষ্ট দিয়ে প্রিয়জনকে কষ্ট দেওয়া, বড় হাস্যকর মনে হয় তার। তবু যায় ঐ পথে। কিছু না হোক কিছুটা সময় তো ভুলে থাকা যায়। নিজেকে দামী করে তোলা। একজনের ... তার কি হোল ? এ পথ শুধু হারিয়ে যাবার নেশা যোগায়। আর কি দেয় ? লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ যারা তারাই কেবল অস্বাভাবিক ... উত্তেজনার মধ্যে বেঁচে থাকার ... মিশিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। সেও কি এদেরই একজন ? না তা সে নয়। তবে একা থাকার ভয়ে সে এদেরই বেছে নিল আর সঙ্গী ছিল না ? না তার চারপাশে যারা আছে তারা অধিকাংশই এই। এদের মধ্যে কেউ তারই মতন জ্বালা জুড়োতে আসে কিনা তা সে জানে না। জানতে চায়ও না। এখানে কেউ কাউকে জানতে ... ভুলতে আসে। এই জন্যই ... সে এখানে লুকিয়ে থাকতে আসে ? মঞ্জু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে। নিজেই আবার বিরক্ত হয়ে জবাব দেয় অত জানি না জানার প্রয়োজনও নেই। কে কতটু জানতে চায় ? কে কাকে কতটুকু চেনে পৃথিবীতে শুধু লোকের ভীড়। ... কোথায় ? কার সময় আছে কারো কথা জানতে চাওয়ার ? কাউকে চিনে নেবার সবাই ভান করে। উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য মিটে গেলেই কেটে পড়ে।

(ক্রমশ

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

(রহস্য উপন্যাস)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ভ্রূকুটি করে ভাবছিল ফোয়ারা।

এখন বলল—'ঠিকই বলেছেন। সত্যিই হয়ত সবুজ গাড়ীর মধ্যে মেয়ে ছিল। মাথায় খাটো বলে হয়ত দেখিনি। হয়ত পেছনের সিটে বসে ছিল বলে চোখে পড়েনি।'

মাথা নেড়ে বললাম—'তা সম্ভব নয়, ফোয়ারা।' এই প্রথম ফোয়ারা নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু শুধরে নিলাম না। ফোয়ারাও সহজভাবে তাকিয়ে রইল। চোখে জিজ্ঞাসা। বললাম—'কেন সম্ভব নয় জানো? আই মীন...জানেন...'

এবার বাধা দিল ফোয়ারা—'বেশ তো তুমি-তুমি এসে যাচ্ছে। আপনা থেকে যা আসছে, তাকে আসতে দাও। বাধা দিও না।'

ভারী স্মার্ট মেয়ে তো!

বললাম—যে মেয়েকে আমার সাক্ষী মেয়েটা দেখেছে, সে কিন্তু তোমার মত লম্বা। গঙ্গার পাড়ে পোজও দিয়েছে এক-জন টল মেয়ে। মাথায় খাটো নয়। কাজেই মাথায় লম্বা মেয়ে, এই তোমার মত আর কি, সবুজ গাড়ীর মধ্যে থাকলে চোখে তোমার পড়তই। তুমিও তো বেঁটে গুড়গুড়ে নও। না, ফোয়ারা, না—এ রহস্যের নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা আছে—কিন্তু এখনো তা অন্ধকার।'

এইভাবে ক্রমাগত কথাই বলে গেলাম আর শুনে গেলাম সারাটা পথ। মীমাংসায় পৌঁছোতে পারলাম না। কলকাতায় এসে পার্কস্ট্রীটে গিয়ে চাইনীজ রেস্তোরায় ঢুকে লাঞ্চ খেলাম, ফোয়ারাকে জিন খাওয়ালাম পাশের বারে। ও ব্যাপারে খুব চোস্ত দেখ-লাম। ফিগারটাকে ঠিক রেখেছে এই সব করেই। তারপরেও কথা দিতে হল কেসের ব্যাপারে যোগাযোগ রাখব। খবরাখবর দেব। মানে, পুলিশের পেট থেকে যতটুকু খবর বার করা উচিত—তার বেশী নয়। ফ্ল্যাটে ছেড়ে দিয়ে আসার সময়ে আন্তরিকভাবে বলল ফোয়ারা আবার যেন আসি। তখন আমার ঘোর সন্দেহ হল। ফোয়ারা পুলিশ সাবইন্সপেকটর বলে সুমন্ত সেনকে ইন-ভাইট করছে না—খাতিরও করছে না—করছে মানুষ সুমন্ত সেনকে। কথাটা ভাবতেই গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল। ভালও লাগল। কিন্তু একি বিপজ্জনক চিন্তা মাথায় পাক দিচ্ছে! থাকি একা। ব্যাচেলর্স ফ্ল্যাটে। ফোয়ারাও থাকে একা। নিঃসঙ্গ জীবন। পাঁচ-জায়গায় মেলামেশা ওর পক্ষে কঠিন। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো। সেই জন্যেই চায় আমি আসি। কিন্তু আমি যে পুলিশের লোক! অত সামাজিকতা ঠিক নয়। কেসটা মিটে যাক। তারপর দেখা যাবে...

হেডকোয়ার্টারে গেলাম খুব অল্পক্ষণের জন্যে—পাছে অমূল্য বরাটের সঙ্গে মুখো-মুখি হতে হয় এবং পাছে সারা দিনের তদন্ত বিবরণ জিজ্ঞেস করে বসেন—এই ভয়ে একরকম পালিয়েই এলাম। ভয়ংকর সম্ভাবনাটা ভাবতেও খাড়া হয়ে যাচ্ছিল মাথার চুল। অমূল্য বরাট যখন শুনবেন এক নম্বর সাসপেক্ট ফোয়ার ঘোষকে খুনের দায় থেকে রেহাই দিয়েছি, তিন সেকেণ্ডও যাবে না উনি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন ট্রাফিক ডিউটিতে—ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাবে কলমের এক খোঁচায়।

রাত্রে বাড়ী ফিরে এই সব ভাবতে ভাবতে গরম হয়ে গেল। অনেক সুতো জড়িয়ে গেলে এমন জট পাকিয়ে যায় যে ছাড়ানো যায় না। মাথার মধ্যে চিন্তার সুতোগুলোও গেল সেইভাবে জট পাকিয়ে। সাংঘাতিক জট! শেষকালে ভাবলাম নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে বসা যাক। সনাতনের সব কটা ছবিই সঙ্গে এনেছিলাম। তার মধ্যে ছিল আউটডোর ইনডোর দুরকম ছবিই। আর্টিস্টিক ছবি ছিল, খুব খারাপ ছবিও ছিল। অনেকক্ষণ ধরে ঠায় চেয়ে রইলাম ছবি কটার দিকে—কিন্তু কিছুতেই আবি-ষ্কার করতে পারলাম না কোন্ বিদ্যেধরীটি শুক্রবার গিয়েছিল ফটো তুলতে সনাতনের সঙ্গে। উল্টে বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল ফোয়ারার ফোয়ারা রূপ। যে ছবির দিকেই চাই না কেন, ফুস্ করে কোন্ ফাঁকে ফোয়ারার চেহারার আদল এসে যায় মনে। এ তো ভারী জ্বালা! সব কটা মেয়েই দেখছি প্রায় ফোয়ারার মতই দীর্ঘাঙ্গী, নির্লজ্জ এবং লীলাবতী।

অথচ নিখোঁজ রহস্যময়ীকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি ছিল না সুমন্ত সেন নামক ইয়ং ডিটেকটিভের। সে চেষ্টা বার বার গুবলেট করে দিচ্ছিল মনোজগতে ভাসমান অতি সুন্দর একটি ইভ মূর্তি। কেন? ভাবতে গিয়ে দপ্ করে একটা নতুন

চিন্তার প্রশ্নবাণ্ব জ্বলে উঠল মগজের কোষে কোষে।

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলাম বিংশ শতাব্দীর গোপিনীদের দিকে। বিস্মিত হলাম চিন্তাটা কেন আগে মাথায় আসেনি বলে। সনাতন যত ছবি তুলেছে স্টুডিওর বাইরে, তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছবি গঙ্গার পাড়ে তোলা শেষ ছবি কটা। এ-ছবির সঙ্গে কেবল তুলনা চলে স্টুডিওর ভেতরে তোলা ফোয়ারার ছবির সঙ্গে। সত্যিই আর্টিস্টিক। শিল্পী সৌন্দর্যের ধ্যানে তন্ময় হয়ে রূপের পর রূপ সৃষ্টি করে গিয়েছে। পর্নোগ্রাফি কোন মতেই নয়। পক্ষান্তরে প্রতিটি ন্যুড স্টাডি অনুপম শিল্প নিদর্শন হিসেবে প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকায় ছাপবার উপযুক্ত। কিন্তু এ ছবি তুলল কেন সনাতন? কদর্য ভঙ্গিমায় বিকৃতরুচির ফটো তুলেই যার আনন্দ, হঠাৎ এমন মহান সৃষ্টি করার কল্পনা তার মাথায় এল কেন? নারীদেহের কুৎসিত ছবি তুলতে তুলতে কি ক্লান্ত হয়েই এ কাজ করেছে সনাতন? অন্তরের অন্দরে সে শিল্পী—প্রকৃত শিল্পী। তাই কি কদর্যতার মধ্যে নিমগ্ন থেকে ক্ষণিকের জন্যে ফিরে আসতে চেয়েছিল তার নিজস্ব সৌন্দর্যের জগতে? নাকি, কোন ম্যাগাজিনের ফরমাস রাখতে তোলা এসব ছবি?

সর্বশেষ চিন্তাটাই ফুলঝুরির মত ফুলকি ছিটিয়ে চলল মগজের আঁধার ঢাকা আনাচে কানাচে।

মনে পড়ল ম্যালকম সুকিয়ামের কথা। ম্যাগাজিনে পিন-আপ ছবি বেচেই পেট চালাত সনাতন। গাড়ীও কিনেছে ঐ টাকায়: তাহলে নিশ্চয় এমন ম্যাগাজিনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সনাতনের যাদের কাজ প্রতি সংখ্যায় ন্যুড ছবি ছাপা। এবং তা যদি

সত্যি হয়, অন্তত একজন এডিটরও চিনতে পারবে ন্যুড মেয়েটিকে। ন্যুড ছবি বিস্তর পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু ছাপা হয়ে বেরোয় খুব কমই। মডেলদের আপত্তি থাকে। অনুমতি না নিয়ে সম্পাদক ছবি ছাপেন না। সুতরাং সম্পাদকদের একে একে জেরা করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়?

ঘড়ি দেখলাম। আটটা বাজতে কুড়ি। ম্যাগাজিন স্টল এখনো ঝাঁপ বন্ধ করেনি। দোকানটা রাস্তার মোড়ে। নিজেই গেলাম। যে কটা ঐ ধরনের ম্যাগাজিন হাতের কাছে পেলাম, সব কিনলাম। সেকস ম্যাগাজিন যে এখনো বিকোচ্ছে জানা ছিল না। দোকানদার আমাকে চিনত। তাই ভয়ে কাঠ হয়ে রইল আমার পত্রিকা নির্বাচনের নমুনা দেখে। চোখমুখের চেহারা দেখে মায়া হল। আশ্বস্ত না করলে রাতে ঘুমোতে পারবে কিনা সন্দেহ। বললাম, একটা অশ্লীল বইয়ের লেখককে শায়েস্তা করার জন্যেই এত বই কিনছি—দোকানদারের কোন ভয় নেই। এই বলে ম্যাগাজিন বগলে ফিরলাম ফ্ল্যাটে। সবশুদ্ধ সাতটা ম্যাগাজিন: তিনটে বাতিল করলাম এক নজরেই। নিটোল ন্যুড ছবি ছাপার মত সাহস এদের নেই।

বাকী রইল চারটে। তার মধ্যে দুটো খুবই সম্ভাবনাময়। অন্য দুটোর পক্ষেও অসম্ভব নয়। ঠিক করলাম খুবই সম্ভাবনাময় যে দুটো, তাদের সম্পাদকদের ক্যাচ করব কাল সকালে।

পরের দিন সকালে বিপুল উৎসাহে হানা দিলাম অত্যন্ত নোংরা একটা পত্রিকার অফিসে। বাতিল ফর্মা, অবিক্রীত পত্রিকা আর কাগজের ডাঁইয়ের মধ্যে ভাঙা চেয়ারে বসে ভাঁড়ে চা খেয়ে সিগারেট টানছিল চশমাপরা সম্পাদক মশায়। আমাকে দেখে এবং আমার প্রশ্ন শুনে এক কথাতেই জবাব দিলে, হ্যাঁ, সনাতনের কাছ থেকে হামেশাই ছবি কিনতে হয়েছে তাকে।

"সনাতন ফ্রি-লান্স ফটোগ্রাফার। প্রায় আসত পিন-আপ গার্লের ছবি নিয়ে।

"যাদের ছবি ছাপতেন, তাদের নামধাম নিশ্চয় লিখে রাখতেন?"

"না, মশাই। নাম নিয়্যা কামডা কি কইতে পারেন?

"কিন্তু মডেলের পারমিশান ছাড়া ছবি তো ছাপতে পারেন না।"

'সেডাও কি আমারে কওন লাগবো,' স্টীল বাঁধানো দাঁত বার করে চোরা-হাসি হাসল সম্পাদক। "সেইজন্যেই তো: কন্ট্রাক্টটা ছাইড়া দেই ফটোগ্রাফারের উপর। আমরা কপিরাইট কিন্যা রাখি—যাতে কিনা একই ছবি আর কেউ ছাইপ্যা না দেয়।"

"কিন্তু তাতে কি আপনার বিপদ বাড়ছে না? মডেলের পারমিশান ছাড়া ছবি ছেপে যদি ফ্যাসাদে পড়েন, কত খেসারৎ গুনতে হবে জানেন?'

"আরে আমারে কি অত বোকা পাইছেন? এই ব্যবসা কইরা চুল পাকাইলাম বাংলার বাজার খারাপ তো হইছে ডা কি, হিন্দীতে চালাইতেছি। আজ পর্যন্ত মামলায় তো পড়ি নাই। আর ফটোগ্রাফার তো পারমিশান নিয়াই ছবিগুলান তোলে। টাকার জন্য মাইয়াগুলান পোজ দেয়। ছাপা হবে জাইনাও। নালিশ কইর্যা আয়ের পথ তারা বন্দ করে নাকি।"

শুনে বুকটা দমে গেল। তা সত্ত্বেও শেষ চেষ্টা করলাম। সনাতনের তোলা ফটোগুলো বার করে পাশাপাশি সাজালাম সম্পাদকের টেবিলে।

বললাম—"এদের কারো ছবি ছেপেছেন?"

অর্ধেকের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাকী অর্ধেক না দেখেই দৃঢ়কণ্ঠে সম্পাদক বলল—"আরে ছিঃ ছিঃ এরকম ছবি আমরা ছাপি না।

"কি ছাপেন আর কি ছাপেন না, তা শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই এই শেষের ছবির মেয়েটাকে চেনেন কিনা!"

মাথা নাড়লেন সম্পাদক মশায়।

'আপনি যদি না পারেন, তাহলে কেউই পারবে না।' বাঁকা সুরে বললাম এবং ছবিগুলো জড়ো করে তুলে নিলাম—চলি তাহলে। মিথ্যে সময় নষ্ট হল।'

চশমার ফাঁক দিয়ে পিটপিট করে তাকাল সম্পাদক।

'একটা হেল্প করতে পারি, স্যার।'

বুকটা দুলে উঠল আশার দোলায়—'কি?'

'আপনি বরং এক কাজ করেন। 'সুন্দরী' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দ্যাখা করেন। সনাতন ও পত্রিকায় ছবি বেচে। আর সে-সব ছবি ঐ কাগজেরই উপযুক্ত। —ওরা আপনাকে হেল্প করতে পারে।'

বড্ড দমে গিয়েছিলাম উৎসাহিত হয়ে 'সুন্দরী' পত্রিকায় তাই এক রকম ছুটতে ছুটতেই গেলাম। একই পাড়ায় অফিস। তবে এ অফিস অনেক গোছানো। আকারেও বড়। সম্পাদক বাইরে বসে ভাঁড়ে চা খান না—ভেতরে আলাদা খুপরি আছে। পত্রিকার যে কাটতি আছে, তার প্রমাণ।

আমার নামধাম পদ-মর্যাদা একটি স্লিপে লিখে কর্মচারী মারফৎ ভেতরে পাঠিয়ে দিতেই ডাক এল। সম্পাদকের বয়স তেমন কিছু নয়। আমার চাইতে সামান্য বড়। কিন্তু বেশ ঝানু মুখ। কথাও মিছরির রসে চুবোনো। আমি সে কাজের কথা পাড়লাম—আর তর সইছিল না বলে। মন বলছিল, এই আমার শেষ আর সেরা সুযোগ। এখানে ফেল করলে এক গালে চুন আর এক গালে কালি মেখে বাড়ী ফিরতে হবে।

সম্পাদকের নাম রাকেশ ভড়।

বললাম—'রাকেশবাবু, সনাতন গুঁই খুন হয়েছে।—জানেন ?....

জানি। বিচ্ছিরি ব্যাপার।

শুনলাম আপনি তার কাছ থেকে ফটো কিনতেন ?

কিনতাম—যৎসামান্য। লোকটার হাত ভাল। তাই বিনিতি ছবির ফাঁকে ফাঁকে লোকাল ট্যালেন্টকে চান্স দিতাম।

ফটোর তাড়া ফের বার করলাম—ঈশ্বর জানেন আর কতবার বার করতে হবে। রাখলাম রাকেশ ভড়ের সামনে।

এই মেয়েটিকে আইডেন্টিফাই করতে চাই। এই সিরিজের ফটো তোলার কাজ কি সনাতনকে দিয়েছিলেন ?

বলেই দমবন্ধ করে রইলাম। রাকেশ ভড় ছবিগুলো দেখল। মনে ধরল বলে মনে হল।

বলল—না। ঠিক এই সিরিজের কাজ না দিলেও এই ধরনের স্কীম নিয়ে একবার আলোচনা হয়েছিল। ফটোগুলো কোথায় পেলেন বলুন তো ?'

উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম—বলছি। —তার আগে বলুন তো কি ধরনের স্কীম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ?'

'বন্য সৌন্দর্য'র ওপর লেখা আদি-রসাত্মক কিছু কবিতা হাতে এসেছিল। ভাবলাম, এর সঙ্গে যদি ক্যাপশই ন্যুড দিলে একটা স্পেশ্যাল ইস্যু বার করা যায় বিক্রী হবে হট কেকের মত। ফটোগুলো অবশ্য বনে বাদাড়ে, জলের ধারে, আকাশের নীচে তোলা চাই এবং বিয়াল বিউটি হওয়া চাই। এই সনাতন গুঁইকে বললাম স্কীমটা। বললাম, ফিনিসটা কি রকম দাঁড়ায় দেখবার জন্যে খান-কয়েক ছবি বনে-বাদাড়ে তুলে দেখুক না। পাকা কন্ট্রাক্টটা পাব—আগে দেখি ছবি কি রকম দাঁড়ায়। উৎরে গেলে কিনবো তো বটেই। আমার বিশ্বাস, সনাতন এ ফটোগুলো তুলেছে আমারই কথা মত। আমি কিন্তু দেখছি এই প্রথম।

কে দেখাবে ? সনাতন তো এই ফটো তুলতে তুলতেই মার্ডার হয়েছে। ক্যামেরা থেকে নেগেটিভ বার করে আমরাই ডেভেলাপ করেছি, প্রিন্ট করেছি।

দুই ভুরু একত্র করে চাইল রাকেশ।

আ—। এবার বুঝেছি কেন এসেছেন।

নামটা চাই। —মেয়েটার নামটা হলেই চলবে। চেনেন আপনি ?

মনে হচ্ছে।

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিলাম নিজেকে। গোলক ধাঁধার শেষ দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে ?

আপনি চেনেন ?

মনে হচ্ছে। সনাতন গুঁইয়ের সঙ্গে স্কীম নিয়ে কথাবার্তা বলার সময়ে একটি মেয়ের প্রসঙ্গ এসে গিয়েছিল। এই ধরনের ওয়াইল্ড বিউটির ছবি তাকেই মানায়। সে নিজেও ভালবাসে। জানি না সনাতন তাকেই পাকড়াও করেছিল কিনা। ছবি দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললাম—নামটা ?

বন্যা লাল।

লাল ?

বাপ পাঞ্জাবী—মা বাঙালী। তাই—।

ঠিকানা ? জানেন ? এখুনি যেতে চাই—।

গন্ধ শুঁকে শুঁকে এতখানি এসে যেই উগ্র গন্ধ পেয়ে অস্থির হলাম, অমনি ভাসাভাসা কথা কইতে আরম্ভ করল রাকেশ; গা জ্বলে যায় !

বলল—খুঁজতে হবে। মনে হচ্ছে আমরাই ছবি ছেপেছিলাম আগের কোনো সংখ্যায়। একটু। —বিনয় ?

হাফসার্ট-পরা একটি ছোকরা ঢুকল ঘরে। রাকেশ ভড় তাকে বলে দিলে ওয় বর্ষ 'সুন্দরী'র পাতা খুঁজতে। রেকর্ড ফাইলেও দেখাতে হবে মডেল মেয়েদের নাম আর ঠিকানা।

ধূমায়িত উত্তেজনা সত্ত্বেও কি কষ্টে যে স্থির হয়ে বসে রইলাম, তা শুধু ভগবান জানেন। কিছুক্ষণ পরেই বিনয় ঘরে ঢুকল।

পেলে ? পেপার ওয়েট ঠুকতে ঠুকতে শুধোল রাকেশ ভড়।

হ্যাঁ—বলে বিনয় যে ঠিকানা গড়গড় করে আউড়ে গেল, সেটা চৌরঙ্গী লেনের একটি ফ্ল্যাট বাড়ীর।

রাকেশ ভড় পেপার ওয়েট ঠোকা স্থগিত রেখে বললে—পেয়েছেন ?

পেয়েছি মানে ? এ-আবার একটা প্রশ্ন হল নাকি ? কিন্তু রাকেশের দোষ নেই। ও কি করে জানবে যে শনি-রবি-সোমের হন্যে পরিশ্রমের পর এই প্রথম একটা সূত্রের মুখ দেখলাম ? এই সুতো ধরে এগোলেই পাবো মেয়েটাকে। মেয়েটাকে পেলেই জানব সব। প্রাণের ভেতর থেকে তাই ধন্য ধন্য করলাম রাকেশকে সহযোগিতার জন্যে এবং উর্ধ্বশ্বাসে নেমে এলাম রাস্তায়।

সিঁড়ি দিয়ে ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে নামবার সময়ে প্ল্যান আঁটছিলাম কিভাবে এখুনি পাকড়াও করব মেয়েটাকে। কিন্তু ফুটপাতে পৌঁছে ধাতস্থ হলাম। এই প্রথম একটা সত্যিকারের ক্লু যখন পেয়েছি, তখন আর তাড়াহুড়ো নয়। ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে কিস্তি মাৎ করতে হবে।

ধরে নিচ্ছি, বন্যা লাল সনাতনের ক্যামেরার সেই রহস্যময়ী—যে দেহ দেখাতে চায়—মুখটি বাদে। তাই যদি হয়, তাহলে বন্যা হয় নিজের হাতে খুন করেছে সনাতনকে, না হয় খুন করতে কাউকে সাহায্য করেছে! মোদ্দা কথা হল, এই

বটল্যার প্রেসিডেন্সিতে বন্যালাল ঠোঁটে প্যাডলক ঝুলিয়ে বসে থাকবে—একটি কথাও বলবে না। যদি বলে বসে, শুক্রবার পোজই দেয় নি সনাতনের ক্যামেরায়—তা হলেই সর্বনাশ। প্রমাণ করব কি করে? অসম্ভব। নামটা পর্যন্ত এই প্রথম শুনছি। সনাতনের ফাইলে ছিল না। রাকেশ ভড়ের কথার বশে তাকে খুনের দৃশ্যে জড়ানো কি সমীচীন হবে? নাঃ, ব্রেন সেলগুলোকে একটু রেস্ট দেওয়া দরকার। ঢুকলাম অ্যালবার্ট হলের কফি হাউসে। কফির অর্ডার দিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ঐ প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যেই এক মনে ভাবতে লাগলাম বন্যাকেই সেই কন্যারূপে প্রতিপন্ন করা যায় কিভাবে।

আমার প্রথম কাজ হবে শুক্রবারে বন্যার গতিবিধি আবিষ্কার করা। ঐদিন সে কোথায় ছিল, জানলেই বেরিয়ে পড়বে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিল কিনা। কিন্তু সন্দেহের উদ্রেক না করে এ তথ্য কি সম্ভব? ঘাটে ছিটেফোঁটাও বুদ্ধি থাকলে মুচকি হেসে ঝেঁটিয়ে কেটে পথ দেখতে বলবে আমাকে—তার বেশী একটি কথাও নয়।

আরও একটা প্রবলেম ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার মধ্যে। শুক্রবার হেরম্ব ঘোষ যে লোকটিকে সনাতনের সঙ্গে ঝগড়া করতে শুনেছিলেন, এখনো তার টিকির নাগাল ধরতে পারি নি। মনে মনে ভেবেছি, যে তিনজন ফটোগ্রাফারের ইন্টারভিউ নিয়েছি, লোকটা তাদের একজন। এবং সে যেই হোক না কেন, বন্যার সঙ্গে তার জানপহচান আছেই। থাকতেই হবে। নইলে এ থিওরীরও ভরাডুবি এইখানে। চরম মুহূর্তে সনাতনের বাড়ীখানা যেন একটা রেল স্টেশন হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ফটোগ্রাফারকে গিয়ে যদি এখন জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁ মশাই বন্যা বলে একটা বিউটিকে চেনেন? তাকে নিয়ে শুক্রবার সনাতনের বাড়ী গিয়েছিলেন? তিনজনেই বলবে—আজ্ঞে না। অপদস্থ হওয়ার চাইতে না যাওয়াই ভাল। তাহলে এখন করি কি? কিস্‌সু না। একেই বলে দ-য়ে পড়া। কফির পয়সা জলে গেল। ব্রেন খুলল না। ধুত্তোর! পয়সা মিটিয়ে দিয়ে নেমে এলাম ফুটপাতে।

ঠিক বিশ মিনিট পরে আমাকে দেখা গেল চৌরঙ্গী লেনে। ঈগল চোখে খুঁজছি সেই বাড়ীটি যার কন্দরে লুকিয়ে আছে এ কাহিনীর নিগূঢ়তম রহস্যের নায়িকা বন্যা।

পেলাম সেই বাড়ী। ঢালাই লোহার লতাপাতা আঁকা গেট। তারপর একথাক সিঁড়ি। সিঁড়ির পর একটা বড়সড় দরজা। পাশে পুশ বেল।

বেল টিপতেই ডিং-ডং ঘণ্টা বাজল ভেতরে। পায়ের শব্দ এসে দাঁড়াল। পাল্লা খুলে আমার দিকে সতর্ক চোখে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসল একজন প্রৌঢ়া—
নয়। জিজ্ঞাসু চোখে শুধু চেয়ে রইল

আমি বললাম—'বন্যা লাল আছে

হাসি মিলিয়ে গেল প্রৌঢ়ার
থেকে—'না।'

'কোথায় গেছেন?'

'জানি না। আগে এখানেই থাক
এখন নেই।'

'চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

মুখ উত্তপ্ত হয়ে উঠল সেই
শুনে। পাখী উড়ে গিয়েছে। বড়
করে ফেলেছি।

'কবে গিয়েছেন?'

ঠোঁট টিপে বলল প্রৌঢ়া—
দুয়েক আগে।'

পাগল হয়ে যাব নাকি? দু
আগে বন্যা যদি এ-বাড়ী ছেড়ে গিয়ে
তাহলে নিশ্চয় খুন করে গা-ঢাকা দে
জন্যে পালায় নি। অন্ততঃ এ-বাড়ী
নয়।

'কোথায় যাচ্ছেন বলে গেছেন কি
ঠিকানাটা পেতে পারি?'

দ্বিধায় পড়ল প্রৌঢ়া। সন্দিগ্ধ
কেবল চেয়ে রইল।

লঙ্কা নিয়ে লঙ্কাকাণ্ড

সুভাষ রায়চৌধুরী
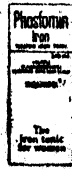
লংকা বলতে আমরা ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ললংকার কথাই বুঝতাম। আমাদের গাঁয়ে লংকাকে বলত মরিচ। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে মরিচ যে কখন লংকা হয়ে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। তবে লংকা নিয়ে অনেক লংকাকান্ডর খবর দেখেছি।

ব্যাপারটা কাকতালীয় না হলেও রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবিও স্বীকার করেছেন, মহিলারা কড়া স্বামী, কড়া চক আর কড়া ঝাল পছন্দ করেন। ঝাল অর্থে লংকা।

লংকার স্বপক্ষে এতবড় সার্টিফিকেট আর কেউ দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

মনে পড়ুক বা না-ই পড়ুক লংকা ছাড়া কোন পরিবারের চলে না একথা জোর দিয়ে বলা যায়। কেউবা শুকনো লংকা পছন্দ করেন। কারো পছন্দ কাঁচা লংকা। লালচে ডাসা লংকাও অনেকে পছন্দ করেন। তবে মজা কি জানেন, কাঁচা ডাসা অথবা পাকা লংকা গোটা গালে পুরে চুষে দেখুন আদৌ ঝাল লাগবে না। যতক্ষণ না লংকা ভেঙ্গে ভেতরে বীজ দাঁতে লেগে থাকে সেই অংশটা খাওয়া হচ্ছে। ততক্ষণ ঝালের বালাই নেই। ইংরাজীতে বলে ক্যাপসাইসিন।

কড়া ঝাল হোক বা না হোক রান্নার স্বাদের জন্য লংকা চাই। মুখরোচক রান্নায় লংকার স্থান অনেক উঁচুতে। বাজারের থলেতে কাঁচা লংকা একটা অবশ্য আইটেম। কাঁচা লংকায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। যদিও ভিটামিন খাওয়ার প্রয়োজনে আমরা লংকার ব্যবহার করি না। আমরা স্বাদের জন্য লংকা খাই। কেউ খান রংয়ের জন্য। শুকনো লংকার গুঁড়ো বা বাটা না দিলে নাকি ঝোলের রং খোলতাই হয় না। যাঁরা শুটকি মাছ পছন্দ করেন, তাঁরা জানেন প্রচন্ডতম ঝাল দিয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে শুটকি মাছের সদ্ব্যবহার করেন।

আচারের লংকায় ঝাল কম থাকে। তবে সেটা শুধু লংকার আচার তৈরি করা হলে। অন্যান্য আচারে ঝাল দেওয়ার প্রয়োজন থাকলে কড়া ঝালের লংকাই বাছাই করা হয়। আহা, ছেলেবেলায় আম মাখা, চালতে মাখার লংকা খাওয়ার কথা মনে হলে এখনও জিভে জল আসে। আজকাল-কার ছেলে মেয়েরা দুপুর রোদে লুকিয়ে কাঁচা আম মাখা খাওয়ার সুযোগ পায় না দেখে মনে কষ্ট পাই। আম মাখায় কাঁচা লংকা না মেশালে আসল টেস্ট মিলত না। চালতায় প্রয়োজন হত আগুনে সেঁকা শুকনো লংকা। অনেকে কাঁচা লংকা, সরষে বাটা দিয়েও চালতা মাখতেন। কুল মাখা খেতে কাঁচা লংকা ছিল অপরিহার্য। ইদানীং টক কুল বড় একটা নজরে পড়ে না। আর নারকোল কুলে মাখা খাওয়া চলে না।

কাঁচা লংকা খাওয়ার রেওয়াজ গাঁয়ে গঞ্জে শুধু নয় শহরেও যথেষ্ট। মুড়ির সঙ্গে কাঁচা লংকা আর পেঁয়াজ কুচি না হলে জমে না। সঙ্গে আদা থাকলেও কাঁচা লংকার দরকার হবেই। দুপুরে বিশ্রাম ও খাওয়ার সময় শ্রমিক শ্রেণীর হিন্দুস্থানীদের দেখা যায় ছাতুর সঙ্গে কাঁচা লংকা খেতে। মধ্যবিত্তেরা স্যালাডের সঙ্গে কাঁচা খেয়ে থাকেন। চাউওয়াতে চিলি চিকেন তৈরি হয় কাঁচা লংকা দিয়েই। বিয়ারের সঙ্গে ওর জুড়ি হয় না।

যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন, বৃহত্তর কলকাতায় কুড়ি লাখ পরিবারে গড়ে ১৫ গ্রাম কাঁচা লংকা ব্যবহার করা হলে রোজ লংকার প্রয়োজন পড়ে কত? কম করেও আড়াইশ থেকে তিনশ কুইন্টাল। অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩০ টন।

পশ্চিমবঙ্গে লংকা চাষ হয় কমবেশ কুড়ি হাজার একর জমিতে। যে ফলন হয় তাতে প্রয়োজন মেটান সম্ভব হয় না। শুধু বৃহত্তর কলকাতার চাহিদা মেটাতে রোজ কাঁচা লংকা আমদানি করতে হয় বিহার, ইউ-পি ইত্যাদি রাজ্য থেকে। কাঁচা লংকা, শুকনো লংকা লরি লরি আমদানি হয় আলু পোস্তার বাজারে। লরি ছাড়া ট্রেনেও আসে। কাঁচা লংকা শেয়ালদায় এসেই ঢোকে কোলে মার্কেটে। সেখান থেকে ছড়িয়ে যায় শহর আর শহরতলীর বাজারে।

পশ্চিম বাংলার সব জেলাতেই লংকা চাষ হয়। ব্যাপকভাবে চাষ হয়ে থাকে পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে। আগের তুলনায় সুন্দরবনের সাগর ব্লকে ব্যাপক হারে লংকা চাষ হচ্ছে। গোসাবা ব্লকেও যথেষ্ট লংকা চাষ হয়। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের লংকার বাজার নামকরা। বর্ধমানের কাটোয়াতে কাঁচা লংকার বাজার ভালো। কোচবিহারের দিনহাটা বাজারে শুকনো লংকা কেনাবেচা হয় বেশি। পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জের বাজার শুকনো লংকার জন্য বিখ্যাত। ওখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে ক্ষেত ভরতি পাকা লংকার গাছ দেখলে চোখ জুড়োয়। দার্জিলিংয়ে গোল ধা ভুটিয়া লংকার চাষ হয় চার হাজার ফুটের ওপর পর্যন্ত।

এতদিন পর্যন্ত লংকা চাষ সীমাবদ্ধ ছিল অসেচ এলাকায়। চাষ হত বর্ষাকালে। ফলন খুব একটা আশানুরূপ হত না। ইদানীং চাষের ধরণধারণ পাল্টাচ্ছে। কাঁচা লংকার জন্য আকাশী বা সূর্যমুখী ও মানিকচক জাতের চাষ হয়। শুকনো লংকার জন্য চাষ হয় পাটনাই, শিকারপুরি, পুসা এবং এন পি ৪৬এ জাতের। আচারের জন্য নবাবগঞ্জ, ক্যাপসিকাম, বুলনোজ ইত্যাদি জাতের লংকা চাষ হয়।

গ্রামাঞ্চলে ঘরের আনাচে কানাচে লক্ষ্য করা যায় ধানি লংকা। বিষ ঝাল। ছোট ছোট ক্ষুদে লংকাগুলোতে যেন ঝাল ছাড়া আর কিছু নেই। অসম্ভব কড়া ঝাল যাঁদের পছন্দ তাঁরাও ধানি লংকার কাছে হার মানেন।

পশ্চিম বাংলায় লংকার চাষ বাড়ছে। রাসায়নিক সারের ব্যবহার সেচের সুযোগ বাড়ায় লংকার ফলনও ভাল হচ্ছে। রোগ পোকার আক্রমণের বিরুদ্ধেও চাষীবাসীরা সজাগ। নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। আশা করা যায় অদূরভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন মেটাবার মত লংকা চাষ এখানে সম্ভব হবে। চাষীর আয় বাড়বে। আর, আমরাও বাজার থেকে ন্যায্য দামে লংকা কিনে এনে ঘরের শান্তি বজায় রাখতে পারব। অর্থাৎ লংকা নিয়ে লংকাকান্ড ঘটার মত আর কিছু থাকবে না।
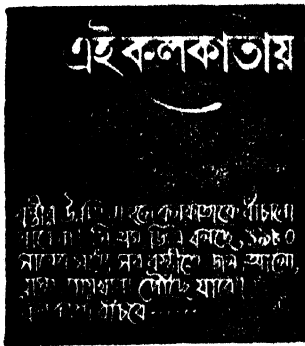
সতেরশো উনআশী খৃষ্টাব্দের তেইশে ডিসেম্বর কলকাতায় প্রবাসী এক ইংরেজ তনয় চিঠি পাঠিয়েছিলেন লন্ডনে তাঁর এক বন্ধুর কাছে। চিঠিটি ম্যাকিনটশ সাহেবের 'ট্রাভেল' বইতে ছাপা হয়েছে। তাতে লেখা আছে সকাল সাতটা নাগাদ আমার দারওয়ান গিয়ে সদর দরজা খুলে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বারান্দা ভরে যায়। একে একে আসে পিওন, সরকার-মশাই সুবেদার কেরাণী পাচক এইসব। ঠিক যখন আটটা তখন ঘরে ঢোকে জমাদার আমার একটা পা খাট থেকে নামাবার আগেই এরা সবাই হৈ-হৈ করে ছুটে এসে আমাকে তিন সালাম দেয় মাথা নিচু করে জোড় হাতে। ঘন্টাখানেক পরে জামা কাপড় পরে তৈরী হতে না হতেই আবার কয়েকজন ছুটে আসে আমার কাছে। তারা আমাকে মোজা জুতো পরিয়ে দেয়। স্নান করার সময়ও আমাকে শুধু কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কয়েকজন লোক আমাকে সাবান মাখিয়ে দেয়, মাথা ধুয়ে দেয়, গা মুছিয়ে দেয়। তারপর আমি যাই প্রাতঃরাশ খেতে। যখন আমি খাই একটি লোক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়িয়ে দেয়। আর একজন এগিয়ে দেয় গড়গড়া।......

এইসব ইংরাজরা থাকতেন সুন্দর পাকা বাড়িতে। আর তাদের সুবেদার কেরানী পাচক পিওনেরা থাকতো ছোট খুপচি ঘরে। এইসব খুপচি বাড়িই আজকের বস্তির আদিমতম স্পেসিমেন কলকাতার এখন যত বয়েস সম্ভবত কলকাতার বস্তিরও তত বয়েস। চমকে উঠেছি খবরটা শুনে যে কলকাতার প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে একজন হল বস্তিবাসী।

খবরটা জুগিয়েছিল মিলু। ও সোসিওলজি নিয়ে পড়ে। কি নাকি এক সমীক্ষা করতে গিয়ে এই খবর পেয়েছে। আমরা তখন পার্ক স্ট্রীটের এক ঠান্ডা ঘরে চিকেন ফ্রাইড রাইস খাচ্ছি। বেলা দিপ্রহর তবু হোটেলও জমজমাট। এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে বললাম, তাহলে মিলু এখানে যারা খাচ্ছে তাদের মধ্যেও বেশ কয়েকজন বস্তিবাসী নিশ্চয় আছে। তোমার সংখ্যাতত্ত্ব ঠিক হলে এখানেও কয়েকজনের থাকার কথা।

মিলু হাসল। বলল, যেমন তোমার বুদ্ধি তেমন কথা। কলকাতা মানে শুধু পার্ক স্ট্রীট ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স কিম্বা রেড রোড নয়। কলকাতার একটা মাপ আছে। সেই মাপের মধ্যে যারা বাস করে তাদের প্রতি তিনজনের একজন বস্তিবাসী। কিন্তু এই হোটেলে এখন যারা আছে তারা নয়। এরা ছাড়াও অন্য কলকাতা আছে।

মিলু আমাকে সেই অন্য কলকাতা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। উল্টোডাঙা ব্রিজ পার হয়ে অল্প একটু এগুতেই চোখে পড়েছিল জায়গাটা। বাড়ির গায়ে বাড়ি, তার গায়ে বাড়ি। জানালার গায়ে জানালা, দরজার গায়ে দরজা। বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে ছোট একটা গলি। কিন্তু তার কোথায় পা রাখবো! সর্বত্র জল থৈ থৈ করছে। কে যেন একটা ঢৌঙা ছুঁড়ে দিল জানালা দিয়ে। একটা বাচ্চা একটা ঘরে কাঁদছে। ঘরে কেউ কাউকে বকছে শুনতে পেলাম। প্রত্যেক ঘরে ফিসফিসানি হলেও সব মিলেজুলে একটা সোরগোল ওঠার কথা। উঠেছিলও। এই পরিবেশে কেউ কি পড়তে পারে, ভাবতে পারে কিম্বা লিখতে পারে। ভাল লাগছিল না। মিলুকে বলেছিলাম ফিরে চল। এটা না দেখলেও চলতো। মন ভাল হবার মত জিনিস এমনিতেই কম দেখতে পাই আজকাল। তার মধ্যে এ-রকম মন খারাপ করার মত জায়গা না দেখালেই পারতে।

মুখে যাই বলি না কেন সেইদিন থেকে কয়েকটি মুখকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সেই বস্তির যে ছেলেটি তার ডাগর সরল চোখ তুলে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল সেই চোখ যেন সামনে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মনে হয়। নিজের আরামটাকে মনে হয় অপ্রয়োজনীয়। সেই ছেলেটির বয়সী ছোট ভাইঝির দিকে ক্যাডবেরী এগিয়ে দিতে গিয়ে হাত কেঁপে ওঠে। মনে পড়ে ওকে তো কিছু দিয়ে আসি নি সেদিন। নিজের কাছে নিজেই কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাই।

প্রায় যখন হতাশ হয়ে উঠেছিলাম তখন একদিন দেখা অনীশের সঙ্গে। বহুদিন ওর বাড়ি যাই নি। বলল, এখন চিনতে তোর অসুবিধা হবে না। বাড়ির কাছেই একটা পার্ক হয়েছে। তার পাশ দিয়ে চলে আসবি। দেখবি বস্তিটাও কেমন পাল্টে গেছে!

অনীশের মধ্য কলকাতার কাশীয়া বাগানের বাড়ি খুঁজে পেতে আমার একটু কষ্ট হয় নি। পার্কের কথা বলতেই সবাই দেখিয়ে দিয়েছে। পার্কে সুন্দর দোলনা রয়েছে স্লিপ রয়েছে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভরদুপুরেও খেলছিল তখন। অনীশ বলেছিল যাবার আগে এখানকার ...... গার্ল মেমোরিয়াল কমুউনিটি সেন্টার একবার দেখে যাস। তোর ভাল লাগবে।

কমুউনিটি সেন্টারে যখন গেলাম তখনও সেখানে ক্লাস চলছে। দরজার কড়া নাড়তে এগিয়ে এলেন আনোয়ারা খাতুন বয়েস হয়েছে। কোন জড়তা নেই ব্যবহারে বললেন, কি চাই?

বললাম সেন্টারের কাজকর্ম দেখতে চাই। আনোয়ারা বললেন আসুন।

কমিউনিটি সেন্টারের অধ্যক্ষ মুখার্জীর তখন খুব ব্যস্ত সময়। ... পঞ্চাশেক মেয়ে তার সামনে বসে কাপড়ে ফুলের নকসা তুলছে। শ্রীমতী মুখার্জী হাসলেন, বললেন এই বাড়িটি বানিয়ে দিয়েছেন সি এম ডি এ কর্তৃপক্ষ। বস্তির মেয়েরা এখানে কাজ শেখে করে। ...

বস্তির সেকাল-একাল

[...]খে। সেলাইয়ের কাপড় সুতো সবই [...]া পয়সায় সরবরাহ করা হয়। অর্থ [...]গান 'কাসকন' কর্তৃপক্ষ।

দেখলাম বস্তির মেয়েরা চমৎকার কাজ [...]ছেন। ঐ বাড়িতেই সপ্তাহে তিনদিন [...]নাবায়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে, [...]ষ্টিকর খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা আছে, [...]ক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আর আছে [...] সিফটে প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত।

আনোয়ারার সঙ্গে কাশিয়াবাগান [...]স্তেও আমি গিয়েছি। ইঁটের তৈরী [...]ায় কয়েকটি ছেলে ক্রিকেট খেলছিল। [...]নোয়ারা অল্প অল্প ইংরেজী বলেন [...] বলার সময়। হাঁটতে হাঁটতে বলছিলেন [...] যে রাস্তা দেখছেন এ রাস্তায় কি হাঁটা [...] নাকি আগে! সব সময় কাদায় [...]চ প্যাচ করতো। কাঁচা রাস্তায় জল [...] যেমন হয় আর কি! সি এম ডি এ [...] বস্তীর কাজ টেক করার পর রাস্তার [...] ফিরেছে।

অনর্গল কাজে কিছু কিছু শুনে-[...]লাম। তবু আনোয়ারাকে বললাম, আর [...]য়েছে?

আনোয়ারা একবার আমার মুখের দিকে [...]কিয়ে একটা চটের পর্দা সরিয়ে দিয়ে [...] ভেতরে এসে দেখে যান।

[...]দ্বিধা ছিল সঙ্কোচ ছিল বেলা শেষে [...] অচেনা বাড়িতে ঢুকবো কিনা ভাব-[...]লাম। যদি প্রতিবেশীরা তাতে অসন্তুষ্ট [...] ইতিমধ্যে আনোয়ারার গলা শুনে [...] এল একটি বছর কুড়ির ছেলে। [...] স্বাস্থ্য। হাতে ট্রানজিস্টর। টেপ্ট [...] বিলে বাজছিল। বলল, আসুন না। [...] আসুন।

[...] চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। [...] দাওয়া। তার পেছনে ঘর। দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিল এক কিশোরী। তার পেছনের ঘরটাতে কয়েকজন বসে কাজ করছিল। আনোয়ারা তার তর্জনী ডানদিকে ঘোরাল। বলল, প্রথমে যখন কাজ করতে এসেছিল, ভেবেছিলাম কি আর হবে। কিন্তু কাজ শেষ হবার পর বলছি আমরা খুশী। আমি সি-এম-ডি-এ-র কথা বলছি। এখানে জল ছিল না জানেন! এতগুলো লোক অথচ কল মাত্র একটা, তাও কতদূরে! আমাদের জল বয়ে আনতে হতো লাইন দিয়ে। কি কষ্ট ছিল তা আপনারা ভাবতে পারবেন না। এখন এই দেখুন, ওরা ঘরে ঘরে কল লাগিয়ে দিয়েছে।

জলের শব্দ পাচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখলাম একটা বালতিতে জল পড়ছে কল থেকে। জলের আর এক নাম জীবন—আনোয়ারা বললেন।—জল ছাড়া চলে নাকি? জানেন আমাদের এখানে এখন সব পাকা পায়খানা নর্দমা হয়েছে রাস্তায় আলো বসেছে। তো ওদের এই কাজগুলো ভাল বলবো না তো কি!—আনোয়ারার বলার ভঙ্গিতে কোন সাজানো শব্দের আড়-ম্বর ছিল না। সরল মানুষের মুখে সরল সত্য শুনে ভাল লেগেছিল। সেদিন উল্টো-ডাঙ্গায় যা দেখেছিলাম তার সঙ্গে কাশিয়া-বাগান বস্তির যে আকাশপাতাল তফাৎ তাতো আমিও বুঝতে পারছিলাম।

নীল আকাশের নিচে এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে কতকগুলো জিনিস বড় প্রয়োজন। কবি-গুরু বলেছিলেন চাই স্বাস্থ্য চাই আলো আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। কিন্তু এই শহরের তিন হাজার বস্তির মানুষদের মধ্যে কোন আশার আলো ছিল না। এদের স্বাস্থ্য ভাল হবার কোন উপায়ও ছিল না। নর্দমা খাটা পায়খানার দুর্গন্ধে পরিবেশও দূষিত হয়ে উঠতো।

বৃহত্তর কলিকাতায় মোট বস্তি সংখ্যা তিন হাজার। বাস করেন তেইশ লক্ষ জন। বস্তির কথা না ভেবে যারা কলকাতাকে সুন্দর করার কথা বলেন, তারা এক আজব খোয়াব দেখেন। একটা মানুষকে সুন্দর পোষাক পরতে দিলেই শুধু হয় না যদি তার মাথায় জট থাকে মুখে একগাল দাড়ি থাকে দাঁতে থাকে নোংরা তবে কিছুতেই তাকে সুন্দর দেখাবে না। তেমনি বস্তির চেহারা না পাল্টালে এই শহরের চেহারা পাল্টানোও খুব মুশকিল।

কাশিয়াবাগানের আনোয়ারা আমাকে বলেছিল আরও বহু বস্তিতে নাকি কাজ চলেছে। দৈনন্দিন কাজের ফাঁকেও মনে ছিল কথাটা। একজন ওয়াকিবহাল বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বলতে পারো কল-কাতা কর্পোরেশনের মধ্যে কত খাটা পায়খানা আছে?

সে বলেছিল তা ধর হাজার ষাটেক হবেই। তবে এখন সংখ্যাটা অর্ধেকের মত মানে তিরিশ হাজারের মত।

তার মানে? জানতে চেয়েছিলাম।

সে বলল, তুমি তো জানো আমি যেখানে থাকি সেখানে আশেপাশে বেশ কয়েকটি খাটা পায়খানা ছিল। হঠাৎ সেখানে একদিন খবর এল সব খাটা পায়খানা পাকা করে দেওয়া হবে। ব্যাপারটায় ধন্দ লাগল। ও পাড়ায় ছিল এক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক। জানতাম ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু কোথাকার তা জানতাম না। সেদিন শুনলাম সি-এম-ডি-এ-র। তিনি বললেন শুধু পায়খানা নয় আরও অনেক কিছু আসবে। আমি তার কথা শুনে ভাবলাম ওনারও বোধহয় প্রতি-শ্রুতি দেবার দোষ আছে। আরো বলবো কি ভাই, কয়েকদিনের মধ্যে সব খাটা পায়খানা সত্যি সত্যিই দেখলাম পাকা হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্রের কলকাতা সমাজ

এই নামে কোন বই পড়েছেন কি? [...]চয়ই নয়। তাঁর লেখা পল্লীসমাজ অবশ্য [...]। এখনও মনে হয় সেই ট্র্যাডিশন [...] চলেছে। সেই সমাজ সেই শোষণ [...] কুসংস্কার।

কলকাতা ট্র্যাডিশনেও বিশেষ কিছু [...]লেছে বলে মনে হয় না। ১৮৬০ সালের [...] দেখছিলাম। তাতে লেখা আছে [...]র পর কলকাতা ভেসে গেল নগর-পালরা [...] করছেন?

আরও পড়ছি কলকাতার রাস্তার [...]জনক অবস্থার কথা গাড়ী-ঘোড়া [...]সিডেন্টের কথা।

জলের জন্য হাহাকার খবরের কাগজের [...]নামা বেশ কিছুদিন।

আর জঞ্জাল? আগেও সুনাগরিকরা [...]র ওপর জঞ্জাল ফেলতেন, এখনও চালছেন। তবে তফাৎ আছে। আগে যদি পাঁচজন ঢালতেন এখন ৫০০ জন। আগে যদি দু-এক জায়গায় জল জমতো এখন বিস্তীর্ণ এলাকায়।

আর খবরের কাগজের সমালোচনা নাগরিকদের কটূক্তি কলকাতা কর্পোরেশনের ওপর আগে বর্ষিত হত। এখন সব রাগ এসে পড়েছে সি-এম-ডি-এ-র ওপর। কারণ এই সংস্থাটি বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছে যে তাঁরা নাকি কলকাতার উন্নতি করছেন। উন্নতিটা কোথায়?

সেই কুমীরের ছানার মত তারা হাওড়া সাবওয়ে, চেতলা সেতু, অরবিন্দ সেতু আর কয়েকটা রাস্তা দেখাচ্ছেন।

জলের সরবরাহ যে বেড়েছে বৃহত্তর এলাকার অনেক বেশী সংখ্যক লোক যে এখন অনেক বেশী জল পাচ্ছেন সেই হিসাব কারও জানা আছে?

জল জমলেও সেটা যে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে সেটা দেখবার মত ধৈর্য কার? দেড় হাজার বস্তির তেরো লক্ষাধিক লোক যে একটু ভাল পরিবেশে আছেন সেটা সবাই জানেন কি?

শহরের আসেপাশের উদ্বাস্তু কলোনী-গুলির কিছুটা হাল ফিরেছে তাই বা ক'জন জানেন? অর্থাৎ পল্লী-সমাজের মত কল-কাতা সমাজের ট্র্যাডিশন একই আছে। ভাল করলেও নিন্দে। আবার কাজ না করলে অন্য শহরের তুলনা দিয়ে আরও দু-চার কথা শোনানো।

তা সত্ত্বেও কলকাতা বদলাচ্ছে। সি-এম-ডি-এ-র প্রশ্ন হলো 'কলকাতা সমাজের' কাহিনীকার কে হবেন? সি-এম-ডি-এ'কেই কি সেই ভার নিতে হবে?

একটি বস্তির সকাল

মুখের কথায় আজকাল বিশ্বাস রাখা কঠিন। সময়টা কেমন গোলমেলে। সঠিক তথ্যে একবার মেপে নিতে হয় শোনা কথা। সঠিক সংখ্যা কাশিপুর-বাগানের অনেকেই দিতে পারেন নি, বন্ধুটিও না। একদিন সেই বন্ধুটির চেনা ইঞ্জিনিয়ারের স্মরণাপন্ন হলাম। বললাম, আপনাদের কোথায় কি কাজ হয়েছে তার যদি একটু ফিরিস্তি দেন, জানতে খুব ইচ্ছা করে।

কিছু কিছু লোক আছেন যাদের মুখ সব সময়ই গম্ভীর এবং কথা খুব কম বলেন। এই ভদ্রলোকটিও তেমনি। আমার কথা শুনে বললেন, বসুন।—তারপরে উঠে গিয়ে একটা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা পড়ুন।

সেটা একটা ফিরিস্তি বিশেষ। এক দুই তিন চার করে আট পর্যন্ত লেখা। ওপরে লেখা এই কাজ শেষ হয়েছে। একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। মনে মনে বললুম, হাঁ মশাই সকালবেলাতেই গুল মারছেন না তো? মুখে বললুম, এই সব কাজ কলকাতা শহরেই হয়েছে।

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে আরেকটা কাগজ নিয়ে এলেন। তাতে লেখা বৃহত্তর কলকাতার মোট তিন হাজার বস্তির মধ্যে দেড় হাজারের কাজ শেষ। কাজ চলছে আরো দুশ বস্তিতে। বাকি আরো তেরশো বস্তির কাজ শেষ হবে উনিশশো আশী সালের মধ্যে।

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ফিরিস্তির একটা জায়গায় হাত দিয়ে বললেন পড়ুন কি লেখা আছে?—সেখানে লেখা ছিল পাকা পায়খানা ২৯,৫৩৩; টিউবওয়েল ২০৮ কলের পাইপ ৩৯৩৫২১ মিটার; ড্রেন ৬৬৫৩২০ বর্গমিটার; রাস্তা ৪৩৪৪টি, কল ১০০০০টি।

ভদ্রলোক বললেন সি-এম-ডি-এ এগুলো বসিয়ে ১৩ লক্ষ লোকের সুবিধা করে দিয়েছে।

এসব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ছিল উল্টোডাঙ্গা খালপাড়ের সেই ছেলেটির কথা। যে জলে থিকথিক রাস্তার পাশের একটা ঘরে বসে তাকিয়েছিল অবাক চোখে। ওই পরিবেশে বেঁচে থাকা কঠিন দুর্গন্ধ পচা জলে। ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে বলেছিলাম আচ্ছা উল্টো ডাঙ্গার পুল পার হয়ে এগিয়ে গেলে যে বস্তীটা পাওয়া যায় সেটাও পাল্টে যাবে এরকম? সেখানেও জল যাবে?

ভদ্রলোক বলেছিলেন আর তিন বছরের মধ্যে সব বস্তীই এইসব সুবিধা পাবে—কল রাস্তা ড্রেন আলো—সব। তাঁর বলার ভংগীতে ছিল অদ্ভুত প্রত্যয়।

জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। অনেকে অনেক কথা দিয়েছিল কথা রাখেনি। আর আজকাল তো লোকে কথা দেয় এই জেনেই যে, যে কথা রাখবে না। উনিশশো আশিতে ইঞ্জিনীয়ার ভদ্রলোককে আবার ধরবো যদি তার বলা কথা না মেলে। ততদিন অপেক্ষা করবো এই ভেবে যে একদা একজন একটা সুন্দর কথা বলেছিল। এবং আশ্চর্য এমন কথাও নাকি সত্যি হবে!

ঈশ্বর পাটনী মা লক্ষ্মীর কাছে একটা প্রার্থনা জানিয়েছিল দিবি যদি মা যদি সত্যিই দিবি, তবে এই কথা দে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

কোন পিতা মাতা পরম পুরুষের কাছে এমন প্রার্থনা না করে! কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা জানি দুধ নয় দুধের ছবি কেউ কেউ দেখতে পায় না। বস্তিতে কত মানুষ মাতৃস্তন্য পান করার পর তাঁরা আর দুধ খেতে পেরেছেন!

কারণটা কি তাও ভেবেছি। পৃথিবীর আর অস্তিত্বের সঙ্গে যে জিনিসটি মিশে গেছে তার নাম অর্থ। অর্থে সব করা যায়। অর্থ থাকলে বিকেলে টেস্ট ম্যাচ ভরপেট খাবার থেকে কাশ্মীরও করা যায়। কিন্তু বস্তির মানুষগুলোর কি করে সেই অর্থ আসবে। যদি একটা বস্তিতে দুশোটা থাকে তো সেখানে দুশোজনের দু রকমের জীবিকা। কারো চামড়ার কাজ কাঠের কারো বা লোহার এই রকম আর কি। এদের মূলধন নেই। ধার নিতে হয় মহাজনের থেকে. কিম্বা কোন কড়ে এসে জুটে যায়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কর্মই জীবন জ্ঞান করে ওরা কাজ করে কিন্তু মুনাফা হয় আরেকজনের। ওরা সামান্য মজুরী পায়। যা পায় তাতে রাখা যায় মান না ভরে পেট।

কারণ বুঝতে পারলেও তার প্রতিকার

উপায় আমার মাথায় সহজে আসতে চায় না। মনে হয়েছিল অভাবের এক নিদারুণ অসহায়তার মধ্যে এইসব বস্তিবাসীদের জীবনের কৈশোর যৌবন বার্ধক্য আসবে যাবে। পৃথিবীর বর্ণ রূপ রস গন্ধ ওরা চেনার সময় পাবে না। প্রাত্যহিক প্রয়োজনগুলো টিপে ধরতে ওদের গলা। এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় হঠাৎ একদিন এসে হাজির সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক। অভাবিত ব্যাপার। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বললাম, খুব ভাল লাগল আপনি আসাতে।

ভদ্রলোক ঠোঁটে হাসির একটু রেখা টেনে দিলেন। উনি বড় মেপে হাসেন আবার খেয়াল করলাম। বললেন আপনার কৌতূহল খুব আছে দেখেছিলাম। তাই আরো কয়েকটা বিষয় আপনাকে জানাতে এসেছি। সবাই তো শুনতে চায় না। আপনি শুনতে চান জানতেও। আপনার বোধহয় ভাল লাগবে।

আমি বললাম বলুন।

উনি বললেন, তার আগে একটা কথা বলুন তো ধরুন যদি আজ শহরের কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে কলেরা কিম্বা অন্য মহামারী হয়ে আসে তবে কি কলকাতা বাঁচবে।

ঘাড় নেড়ে বললাম, অসম্ভব।

উনি বললেন বুঝতেই পারছেন কলকাতার বাঁচার স্বার্থেই বস্তিগুলোকে সংস্কার করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে চাই সেখানকার মানুষদের কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য। তাই না? এই জন্য বস্তি [illegible] সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পরিকল্পনাও নিয়েছেন আমাদের অফিস মানে সি এম ডি এ। ঠিক করা হয়েছে আর ফড়ে নয়, দালাল নয়, মহাজন নয়। শ্রমিকদের মাথার ওপর মহাজন নামে [illegible] আর খেতে দেওয়া হবে না। বস্তিতে বস্তিতে বসানো হবে সার্ভিস সেন্টার। [illegible] ব্যাঙ্কগুলোকে বলা হয়েছে তারাও এগিয়ে আসতে রাজি। কুটির শিল্প দপ্তরকেও জানানো হয়েছে তারাও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। ঠিক করা হবে শুধু সার্ভিস সেন্টারে নানা রকম যন্ত্রপাতি থাকবে। যার যেমন প্রয়োজন সে তেমন ব্যবহার করতে পারবে অল্প ভাড়া দিয়ে। তারপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করে সরাসরি বাজারে যেতে পারবে বিক্রি করতে। কাঁচা মালের জন্য টাকা লাগবে। তার জন্য থাকবে ব্যাংক।

এছাড়া ভদ্রলোক একটু থামলেন। বললেন যার যেমন জীবিকা তেমন তেমন জায়গা তাকে দেওয়া হবে। একজন ধোপাকে শ্যামবাজারে টাউনশিপ করে থাকতে দিলে তো লাভ হবে না। তাই তাদের প্রয়োজন মত জায়গা যেমন কসবার কাছাকাছি বড় চৌবাচ্চা বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভদ্রলোক যেন সব সময় ঘোড়ায় জিন দিয়ে আসেন। কথা শেষ করেই উঠে পড়লেন। আমি বললাম, আরে আরে, প্রথম দিন এলেন একটু বসুন চা খেয়ে যাবেন।

উনি বললেন আজকে মাফ করবেন। ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার সময় হয়ে গেছে। সেখানে যাওয়ার পথে ঘুরে গেলাম। পরে একদিন আসবো।

আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, উনি রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

খবরের কাগজে সুন্দর ভাষায় নানা খবর বের হয় বাংলায়। পড়তে বেশ লাগে। একদিন একটা খবর বের হল, গোটা বড়বাজারটা নাকি পশ্চিম হাওড়ার কোণায় চলে যাবে। আর একদিন দেখলাম কোণায় নাকি নতুন টাউনশিপ হবে শিল্পনগরী হবে। ভাবছিলাম এক কোণায় কত কি হবে রে বাবা।

এত কথা শুনলে একটু দেখে আসতে ইচ্ছে করে। গিয়ে যা দেখলাম তাতে চিত্

বস্তির পথে সওদা নিয়ে হেঁকে যায় ব্যাপারী

চিত্তির। যা দামে জমি দিচ্ছে তা বিশ্বাস করা যায় না। দুশো [illegible] টাকা জমির পাকা পায়খানা ভিত ইলেকট্রিক পয়েন্ট জলের পাইপ সহ মাত্র [illegible] টাকা। শুনলে পড়তে ইচ্ছা করে। জমির সঙ্গে ভিত, জল, আলো!!!

সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে উনিশশো আশীতে সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক এক গাল হেসে বলবেন—কি মশাই বলেছিলাম না, দেখলেন তো সব বস্তি পাল্টে গেছে কলকাতা।

সেদিন কিন্তু আমি লজ্জায় মাথা নিচু করবো না। সোজা চোখ তুলে তাকিয়ে ভদ্রলোককে বলবো, আহা বেশ, আপনাদের মতো এমনি সবাই যদি কথা দিয়ে কথা রাখতো...!

একটি হতাশ চিত্র

মাঝে মাঝে হতাশা আসে। মনে হয় এ সব বুঝি ব্যর্থ বিফল আর পণ্ডশ্রম।

কলকাতার কথা বলছি। কলকাতাকে একটু ভাল করবার জন্য চেষ্টা ও প্রচেষ্টার অভাব নেই। যেদিকে তাকাই দেখি বিরাট কর্মকাণ্ড। শুধু সি-এম-ডি-এ-র কথা বলছি না পাতাল রেল, দ্বিতীয় হুগলী সেতু এগুলির কথাও।

কলকাতার লোক একটু বদলেছেন বোধহয় কারণ কলকাতায় কিছু হয় নি বা হবে না কথাটা বলতে হয় তো মুখে বাধছে কারণ চারদিকে তো তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন কি হচ্ছে আর না হচ্ছে।

তা হলেও একটা জিনিস বড় কষ্ট দেয়, আমাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু করবার আছে কিন্তু সেগুলি করা হচ্ছে না। যেখানে সেখানে যখন তখন আবর্জনা ফেলা, ভিড়ের জায়গায় মহিলা ও বৃদ্ধদের একটু সাহায্য করা ইত্যাদি। এগুলিতে পয়সা খরচ নেই অথচ কলকাতার সুনাম বৃদ্ধিতে এগুলি সত্যি দরকার।

তাই বলছিলাম বড়দের আচরণ দেখে মনে হয় যে তাঁরা তাঁদের অভ্যাস বদলাতে মোটেই প্রস্তুত নন। কাজেই সি-এম-ডি-এ-র তরফ থেকে ছোটদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। তাঁরাই তো শহরের ভবিষ্যত। এটা তো তাঁদেরই শহর। শহরটা ভাল হলে তাঁদেরই গৌরব। এখন থেকে অভ্যাস করুক ছোটরা যেখানে সেখানে আবর্জনা না ফেলার, জলের অপচয় বন্ধ করা ভিড়ের জায়গায় অক্ষমদের সাহায্য করবার বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে একটু মিশবার। এছাড়াও আছে। বস্তিতে যে সব লোকজন থাকেন তাঁদের নিয়ে এক সঙ্গে কাজ করবার। কোনটাই অসম্ভব নয় কোনটাতেই পয়সা খরচ নেই।

কলকাতার গোড়া পত্তন করেছিলেন এক সাহেব জোব চার্ণক। সাহেবদের দিন চলে গেছে কাজেই এখন যা কিছু আমাদেরই করতে হবে।

সি-এম-ডি-এ কি করছে না করছে, কলকাতার গোড়াপত্তন কিভাবে হয়েছিল এবং আমাদের কি কর্তব্য আছে সেগুলি জানবার চেষ্টা করুন। বড়দের তো বলছি ছোটদেরও বিশেষ করে বলছি কারণ শহরটা তাঁদেরই।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারত বনাম ইংল্যান্ড

চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট

ভারতের বিপক্ষে পর পর তিনটে টেস্ট জিতে ইংল্যান্ড শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালোরের চতুর্থ টেস্টে ভারতের কাছে ১৪০ রানে পরাজয় স্বীকার করেছে। ফলে ভারতের বিপক্ষে ১৯৭৬-৭৭ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটা টেস্ট খেলাতেই ইংল্যান্ডের জয়-লাভের সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া হল। ভারতের বিপক্ষে একটা সিরিজের পাঁচটা টেস্ট খেলাতেই এ পর্যন্ত জিতেছে এই দুটি দেশ—ইংল্যান্ড (১৯৫৯ সালে) এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৯৬১-৬২ সালে)।

প্রথম দিনে ভারতের প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬টা উইকেট পড়ে ২০৫ রান উঠেছিল। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে সুরীন্দর অমরনাথ এবং অংশুমান গাইকোয়াড় অতি মূল্যবান ৯৩ রান যোগ করে খেলার ভিত বেশ শক্ত করেন। সুরীন্দ ১৫৭ মিনিট খেলে তাঁর ৬৩ রানে বাউন্ডারী করেন ৯টা। এইদিন বিশ্বনাথের উইকেট পাওয়ার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে আন্ডারউডের উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৫। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্ব রেকর্ড আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ল্যান্স গিবসের—৩০৯টি উইকেট। সুতরাং এই বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করতে আন্ডারউডের এখনও অনেক উইকেট পেতে হবে।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আগে ভারতের প্রথম ইনিংস ২৫৩ রানের মাথায় শেষ হয়। কিরমানি এবং ঘাউড়ি ১০৪ মিনিট খেলে ৭ম উইকেটের জুটিতে অতি মূল্যবান ৬৬ রান সংগ্রহ করে দেন। কিরমানি ১৩২ মিনিট খেলে তাঁর ৫২ রানে ৮টা বাউন্ডারী করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১৩৮ রান তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ইংল্যান্ডের ৬৪ রানের মাথায় ৩য়, ৬৫ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ৬৭ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে নট (২৯ রান) এবং অ্যামিস দলের ৭০ রান তুলে দলের রানের চেহারা কিছুটা উজ্জ্বল করেছিলেন। অ্যামিস ৭৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। অ্যামিস ২৪২ মিনিটে ১১২টা বল খেলে তাঁর অপরাজিত ৭৬ রানে ১০টা বাউন্ডারী করেন। অ্যামিস একাই দলের মোট রানের অর্ধেকের বেশী করেন। তিনি দু'বার আউট হওয়ার সহজ সুযোগ দেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা কম করে ছ'টা সহজ 'ক্যাচ' ফেলেছিলেন।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ১৮ মিনিট পর ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ১৯৫ রানের মাথায় শেষ হলে ভারত ৫৮ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭৬-৭৭ সালের টেস্ট সিরিজে প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যান্ডের থেকে ভারতের বেশী রান করার নজির এই প্রথম। এইদিন ইংল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসের শেষ চার উইকেটে মাত্র ৫৭ রান সংগ্রহ করেছিল ৩৮ ওভার খেলে। ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (৮২) করেন অ্যামিস। তিনি ২৫৩ মিনিটে ১৮৫টা বল খেলে তাঁর ৮২ রানে বাউন্ডারী করেছিলেন ১১টা। তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের ৪টে উইকেট খুইয়ে ১০৫ রান সংগ্রহ করে ১৬৩ রানে এগিয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে ভারত তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৫৯ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। বিশ্বনাথ ৭৯ রান করে নট আউট থেকে যান। ভারত এই সময় ৩১৭ রানে এগিয়ে থাকে। ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৪টে উইকেট খুইয়ে এইদিন মাত্র ৩৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১০ ওভারের খেলায় মাত্র ৮ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়েছিল। বেদী ১২ রানে ২, ঘাউড়ি ৪ রানে ১ এবং চন্দ্রশেখর ১০ রানে একটা উইকেট পান।

শেষ পঞ্চম দিনে লাঞ্চের ১৮ মিনিট পর ১৭৭ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ভারত ১৪০ রানে জিতে যায়।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে অ্যালান নট অসাধারণ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিলেন। তাঁর এই খেলার জন্যেই জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হতে দেরী হয়। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৫ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়লে নট খেলতে নামেন এবং ৮১ রান করে শেষ পর্যন্ত নট-আউট থেকে যান। চন্দ্রশেখর এই খেলায় সর্বাধিক উইকেট পান—১৩১ রানে ৯টা উইকেট (৭৬ রানে ৬ ও ৫৫ রানে ৩)।

বিশ্ব রেকর্ড

বাঙ্গালোরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের তরুণ খেলোয়াড় যজুর্বেন্দ্র সিং তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে রাতারাতি বিশ্ব-খ্যাতি লাভ করেছেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনি এই চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দুটি ক্যাচ ধরার সূত্রে টেস্টের এক ইনিংসে এবং একটি টেস্ট খেলায় সর্বাধিক ক্যাচ ধরার দুটি বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন।

তবে যজুর্বেন্দ্র সিংয়ের এই দুটি বিশ্ব রেকর্ডের গুরুত্ব অপরের থেকে অনেক বেশী। কারণ তিনি তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় এই বিশ্বরেকর্ড করেছেন। তাঁর আগে বিশ্বরেকর্ড করেন:

(১) এক ইনিংসে সর্বাধিক ক্যাচ : ৫টি—ভি রিচার্ডসন (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ডারবান, ১৯৩৫-৩৬।

(২) একটি খেলায় সর্বাধিক ক্যাচ : ৭টি—গ্রেগ চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, পার্থ ১৯৭৪-৭৫।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ২৫৩ রান (সুরীন্দর অমরনাথ ৬৩, কিরমানী ৫২ এবং গাইকোয়াড় ৩৯ রান। উইলিস ৫৩ রানে ৬ এবং গ্রেগ ৪৪ রানে ২ উইকেট)

ও ২৫৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। গাভাসকার ৫০ এবং বিশ্বনাথ নট-আউট ৭৯ রান। আন্ডারউড ৭৬ রানে ৪ এবং উইলিস ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ১৯৫ রান (ডেনিস অ্যামিস ৮২ এবং নট ২৯ রান। চন্দ্রশেখর ৭৬ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ৪৭ রানে ৩)

ও ১৭৭ রান (নট ৮১ নট আউট এবং গ্রেগ ৩১ রান। বেদী ৭১ রানে ৬ এবং চন্দ্রশেখর ৫৫ রানে ৩ উইকেট)

টেস্টের বোলিংয়ে বেদী

বিষেণ সিং বেদীর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের একটা বড় আশা পূর্ণ হয়েছে। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র তিনিই টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে দুর্লভ ২০০ উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। ১৯৭২ সালে দিল্লীতে ইংল্যান্ডের কিথ ফ্লেচারের উইকেট পাওয়ার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে বেদীর একশত উইকেট পূর্ণ হয়। আর গত ১৪ই জানুয়ারী মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক টনি গ্রেগের উইকেট পেয়ে ভারতের অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদীর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২০০। বেদী তাঁর ২৬তম টেস্ট খেলায় তাঁর ১০০ উইকেট এবং ৫১তম টেস্ট খেলায় তাঁর ২০০ উইকেট পূর্ণ করেন। এই রেকর্ড গড়ার সূত্রে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে বেদী অমরত্ব লাভ করলেন।

ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে টেস্টে ২০০ উইকেট পাওয়ার সর্বপ্রথম রেকর্ড বেদীর। এ রেকর্ড চিরস্থায়ী হয়ে রইলো। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭৬-৭৭ সালের সদ্যসমাপ্ত ৪র্থ টেস্টের পর বিষেণ সিং বেদীর টেস্টে উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে—৫২টি টেস্ট খেলে ২১০ উইকেট।

টেস্টে বেদীর ২১০ উইকেট
(১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী ১০ পর্যন্ত)

বিপক্ষে	টেস্ট	রান	উইকেট
ইংল্যান্ড	১৮	[illegible]	[illegible]
ওয়েস্টইন্ডিজ	১৫	১৮৩৯	[illegible]
নিউজিল্যান্ড	১২	১০৯৯	[illegible]
অস্ট্রেলিয়া	৭	৬৩৮	[illegible]
মোট : [illegible]	৫২	৫৭১৪	[illegible]

আমীর খাঁ

ছয় ঋতু...

জহুরী সদাগর

ঃ আমার কব্লিদ ইন্দোরের রাজসভাসদ ওস্তাদ শাহমীর খাঁ মরহুম। আমি খাঁ আবদুল করিম খান মরহুমের শাগির্দ।...

হয়ে গেল বন্দোবস্ত। কলকাতার বুকে সেই তাঁর প্রথম পাবলিক পারফরমেন্স।...

প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রশ্ন উঠেও ছিল এ নিয়ে। কেন আমীর খাঁ আবদুল করিমের নাম করলেন? তাঁর শিষ্যতো তিনি নন। এতো মিথ্যাচার। হ্যাঁ। সত্যি কথা এটা মিথ্যাচরণ। কিন্তু এতে কার ক্ষতি হয়েছে? কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। রসিকমহল আরো কিছু সুধাভোজের সুযোগ পেয়েছেন। কলকাতা ধন্য হয়েছে। সেদিন ঐটুকু মিথ্যার আশ্রয় না নিলে কেউ তাঁকে আমল দিত না। শুধু কলালক্ষ্মী গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। সেদিনকার কলকাতা যার নামে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত সেই দ্রাক্ষাকণ্ঠ ওস্তাদের শিষ্যত্ব যেকোন গাইয়ের পক্ষেই একটা সমর্থ credential ছিল। আর যে সমাজে অপরিচিত প্রতিভার স্বাধীন পরিচিতির কোন মূল্যই নেই—সেখানে আর একজনের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে আরটিস্টকে মঞ্চে উঠতে হয়, সেখানে এছাড়া আর উপায় কী ছিল? আর তাছাড়া আরও একটা কথা, আমীর খাঁ বলতেন, এক হিসেবে এঁদের সকলের কাছেই তো আমার তালিম হয়েছে। আবদুল করিম, আবদুল ওয়াহিদ, রজব আলি, আমান আলি... । না, নাড়া বাঁধেননি কারুর কাছেই। ঐতিহাসিকভাবে কেউ তাঁর গুরু নন। সকলের বৈশিষ্ট্যই তিনি কানে তুলে নিয়েছেন। তারপর গলায় ঘসামাজা করেছেন। তারপর পাঠিয়ে দিয়েছেন হৃদয়ের ব্লাস্ট ফারনেসে...নাভিমূলের গভীরতম মেল্টিং স্টেশনে...তারপর একদিন সেই উচ্ছ্বসিত ললিত লাভা যখন আসমুদ্র হিমাচল রসভোজীভূখণ্ডকে প্লাবিত করেছে... তখন কি আপনি চিনতে পেরেছেন কোন বিস্ফোরণটির পেছনে কোন অঞ্চলের কোন বিশেষ ধাতুর ভূমিকা ছিল. ঝলসে ওঠা ইস্পাততরবারির লীলায়িত নর্তন থেকে বিশেষ ভূখণ্ডের আকরিক লোহার নিশ্চিত উপাদানটি আলাদা করতে পারেন?

তা হয় না মশায়, অসম্ভব। বিহারীলাল চক্রবর্তীর একবিন্দু গুরু-ত্ব রবীন্দ্র জলপ্রপাতের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না...রামকৃষ্ণকে সমাধি শিখিয়েছেন ন্যাংটা তোতাপুরী এ ইতিহাস হাস্যকর...স্বয়ংসিদ্ধ আমীর খাঁ তিল তিল করে সব ওস্তাদের কণ্ঠ থেকে প্রতিশ্রুত সিদ্ধির বাষ্পকণা আহরণ করেছেন... তারপর নিজের মর্মের উত্তাপে সব অভিজ্ঞ বিষাদের মেঘ গালিয়ে ধারাবর্ষণ ঘটিয়েছেন। সে কৃতিত্ব তাঁর একলার।

তিন সপ্তকের তিনটে রঙীন পশমের গোলা নিয়ে গ্রামের একটা বিচিত্র 'হানিকুম' প্যাটার্ন বুনছিলেন খাঁ সা একদিন হেমন্তের ভোরে। ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'আরে আও, তুম কাঁহা থে অবতক'...স্বরবয়নে সাময়িক বিরতি। কমলা রঙের একটা গুঞ্জন মৃদুল হাওয়ার ঠোক্কর লেগে গালচেয়....কাঁচের শার্সিতে....পরদার নকসায় ঘুরে লাগল। আবার ঝট করে হাত নেড়ে মুঠোয় তুলে নিলেন গোলা....খাদ থেকে সুর কুড়িয়ে নিয়ে ধাবিত ধৈবতকে কোলে ফেলে পৃথিবীর বিরহ নিংড়ে তীব্র নিখাদ থেকে ঋষভ ছুঁয়ে প্রসাদ পরিবেশন করতে করতে—'রেগপগরে সিঁড়ি দিয়ে নেবে এলেন। তারপরেই হো হো করে হেসে উঠ ঃ সমঝে যার, হমারে শাগির্দ তো সব মেরে দিমাগ কো হেঁ..মগর..আমার ছাত্ররা অবাক হয়ে কেবল ভাবে আমা ব্রেন...কিন্তু...বললুম, আপনার অন্তরে খোঁজ রাখে না।

ঃ তাই দেখ।..

অন্তরের খোঁজখবর রাখার অনেক ঝঞ্ঝাট যে। দোষ কী। তবু তাঁর শিষ্যদের, প্রিয় শিষ্যদের, (অপ্রিয় কেউ ছিল নাকি তাঁর?) অনেকেই অনেক কিছুই খোঁজ র প্রদ্যুম্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা ছিল বন্ধু প্রদ্যুম্নবাবুর স্ত্রী পূরবী মুখোপাধ্যায় তাঁর একেবারে দিকের ছাত্রী। এককালের আত্মীয়(?) বিলায়েত খান, অ একানন, উমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়. প একে একে এলেন সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাইদাস স অচিন্ত্য চৌধুরী, কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক সান্যাল, শ্রী বাকরে, কমল বসু, জোগীন্দর ও সুরিন্দর সিং, কৃষ্ণা দাশ কংকণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি চৌধুরী..এমনি অনেকে। এঁরা কেউ তাঁর অন্তরের কথা জেনেছেন। কিন্তু ততদিনে তো বিশাল সবুজ বিটপী অন্তর কন্দরের নিধূম দীপকের ফসিল হয়ে, অগ্নিগর্ভ অঙ্গার হয়ে কৌশকী কানাড়া হয়ে হরিৎক্ষেত্র মথিত অনেক উদুম্বর দ্রাক্ষারস হৃৎপিণ্ডের ভূ গুহায় সময়ের তাপ পেয়ে পেয়ে মারোয়ার মদিরা হয়ে যক্ষের চাপা নিঃশ্বাসগুলি একে একে মেঘের ডমরু হয়ে উঠেছে...মল্লারের থৈ থৈ বর্ষণের সারা রাত সারা ক্ষেত জয়ন্তীর গাঢ় শ্যাম অংকুরে ভরে উঠেছে....

সব কথা সবাই জানে না। কেউ কেউ জানে। এক পূর্বসূরী যন্ত্রীর অতিখ্যাত কলাবিৎ তনয় কিছু পুরনো জানেন। হৃৎপিণ্ড উৎপাটনের ইতিহাস। আমরা যখন কথা শুনেছি, ততদিনে বাগেশ্রীর নির্বাক অন্তরা ভৈরবের তবকে বরণ করে শরতের প্রসন্ন কাশ ক্ষেতের মতন আহীর রোঁয় ট্রান্সফরমড্ হয়ে গেছে। তাই সে কথা এখনো

'পিয়া পরবীণ....হে প্রিয় পরম চতুর' কাশের আকাশের মতন বর্ষণান্ত হাসির রেশ ঝরে আমীর গলায়....কোমল ঋষভ তীব্রগান্ধার কোমল মধ্যম তীব্র কোমল নিখাদ চিরায়ত তীব্র ঋজু, সুর-পঞ্চমের অবিচল খুঁটিতে ক্রমান্বয়ে দোল খায় একটি কড়ি একটি কোমল প

না! ঘরানার বাঁধনে বাঁধা পড়েন নি আমীর খাঁ, বাঁধনেও না। ব্যবহারিক জীবনে ইন্দোর ঘরানার গাইয়ে ব পরিচয়, কিন্তু আসলে খেয়াল গানের দিগন্তকে তিনি তাঁর উ চূড়োয় দাঁড়িয়ে অবলোকন করেছেন, জরীপ করে জরিপ করতে করতে এগিয়ে প্রসার ঘটিয়েছেন...অহ ধূলোকে তাঁর চুড়ো স্পর্শ করতে দেন নি...তাই ঘরের গর মানরিজমের-গণ্ডীর সংকীর্ণতা তাঁর লেন্সকে কলুষিত পারে নি—অতিতার সপ্তকের শিখরে দাঁড়িয়ে..প্রত্যয়ের গভ খনির তলদেশে বসে...বিশ্বস্ত সাংবাদিকের মতন প্রান্ত অবিসংবাদী সারস্তে রিপোর্ট পাঠিয়ে গেছেন। বংশের আ

মা, দেবোপম তাহেকান্তি, কম্বুকণ্ঠে অধীত বিদ্যার অধিকার... কিছু নিয়ে স্বয়ম্ভর যৌবনের স্বয়ম্বর সভায় একদিন উঁচু-য় দাঁড়িয়েছিলেন। স্বভাবতঃই বরমাল্য পেয়েছিলেন এক নন্দিতা ীর এক স্বরণীয় সুরশ্রেষ্ঠের সুরধনী কন্যার প্রার্থিত পুরুষ। নতুন সংসারসাধ্বস্বপ্ন সুরু করেছিলেন...সময়ে নন্দনলোকের টি হুরী নেবে এসেছিল নন্দিনী হয়ে...। একদিন কিন্তু ারোয়মতীর বিচিত্র...একদিন বাঁধন আলগা হয়ে গেল লোভী লয়াড়ির চক্রান্তে দুস্তর চড়া পড়ে গেল দুপাশে দুটি বহমান ার বুকের ওপর। জানি সে কথা...কিন্তু সে কথা আজো নয়... হবে। এখনো সেই বালুচরে চিতা জ্বলে...আগাছার অরণ্যে হাহাকার দেয় কী হবে রক্তপাত ঘটিয়ে? তার চেয়ে বিলাসখানী ড়ির সেই অবিস্মরণীয় কড়ি মধ্যমের কথাই বলি।

বিলাসখানীতে কড়ি মধ্যম! বিচিত্র কথা। আরোহণে ঃ গ দ, অবরোহণে কোমল গ, আর 'ম' লাগলেও অনেক ব্রীড়' ক দিয়ে তার পায়ে...তীব্র 'হ্ম' রূপে ক'ই এরাগের চৌকাঠ ানোর নজীর নেই তো তার। নজীর নেই, তবু লাগালেন খাঁ ব। অদ্ভুত একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখালেন। তীব্র 'হ্ম' ছাড়া ড়ি হয় কী করে। তোড়িতে কড়ি ম লাগবেই। আমরা লাগাইনা ণ লাগাবার কৌশল জানি না। কয়েকবার পঞ্চমে পা ফেলে পর একবার বৈঠকে উঠেই নেমে এলেন। এই অবরোহণের পর্বে ীর বেদনায় মুচড়ে নিয়ে এলেন 'হ্ম' কে। সেই মর্মবেদী প্রাচুর্যের হাহাকার হয়তো কোন কোন বন্ধুর শব্দধারক ফিতের আছে—তাঁদের বলবেন তাঁরাই শুনিয়ে দেবেন। খাঁ সাহেবেরই সাগরেদ আমার এক বাল্যবন্ধুর গলায় আমি একটিবার মাত্র তার ানি শুনেছিলুম। একবার নয়, দুবার নয়...বারবার বহুক্ষণ একটা প্রোগ্রামে এইভাবে গাইলেন খাঁ সাহেব। বললেন, আমার া ছিল কোন শ্রোতা এই নিয়ে প্রশ্ন করবেন, আপত্তি জানাবেন। লে আমিও বুঝিয়ে বলবার সুযোগ পাব। কিংবা বারুর ভাল ল কি খাপ্পাপ লাগল বুঝতে পারব। তার বদলে উচ্ছ্বসিত ত পেলেন। কেউ কোন কথা বলল না। একটু হতাশ হলেন পী। রাগের শুদ্ধতা সম্পর্কে শ্রোতারা কি উদাসীন? কিন্তু না। টু হেসে বললেন, তার পরের দিনই ভারতবিখ্যাত এক খানদানী ারী বিলাসখানিতে তীব্র মধ্যম লাগাতে গিয়ে তীব্র প্রতিবাদের বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেন এমনটা ঘটল?

: আসলে, রাগের সঙ্গে মোহব্বত গাঢ় হওয়া দরকার—ির খাঁ বলতেন : কোন রাগকে ভালভাবে জানতে হলে, তার দখল আনতে হবে। আর ভালবাসা না হলে দখলীস্বত্ত্ব জমাবে র ভিত্তিতে। তোমার দৃষ্টির প্রদীপে যার আরতি সার্থক হয়নি, ার মোমের আলোর মৃগয়ায় যার অহং গলে পড়েনি, হাত র অধিকার সে দেবে কেন? ভালবাসা, মজে যাও। আগে সাধো, াধনা কর, তবে তো পাবে সাধ মিটিয়ে প্রসাধন প্রয়োগের একান্ত ার।

এটাও একটা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের উপলব্ধি। দর্শনে বলে বস্তুর নিহিত সত্যদর্শন—তার ইনার সেলফের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাই আর সে জ্ঞান প্রেমেরই সাধ্য।

: কিন্তু এই মজে যাওয়া আর মজানোর খেলাটা খুব মজার খাঁ সাহেব।

বয়েসে এক প্রজন্মের ব্যবধান, বিদ্যাবত্তার সাতসাগরের —সাতজন্মের, সম্পর্কে গুরুশিষ্য তবুও সব ছাপিয়ে ঐ ময় গুণবন্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার মতন এক বিদূষকের একটা মনোরম বন্ধুত্ব কেমনভাবে যেন গড়ে উঠেছিল। জানি না।

ঠা ঠা করে হাসলেন খানিকক্ষণ। তারপর ডান হাতে বেঁটে পানপাত্রটি ধরে আর বাঁ হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে—সবদিক দিয়েই অসম এই অবস্থান—তাঁর যুবক বয়েসের একটা মজার গল্প শোনালেন :

অনেকদিন আগে দিল্লী কিংবা লাখনৌ থেকে তাঁর একটা নেমন্তন্ন আসে। নবাব শ্রেণীর কোন অভিজাত বাড়ি থেকে আমন্ত্রণ। সেখানে মেহফিল বসবে। ওস্তাদ আমীর খাঁর আসা চাই। কারণ সম্প্রতি তাঁর রেডিও-প্রোগ্রাম শুনে তাঁরা একেবারে মুগ্ধ। তিনি দয়া করে পদার্পণ করুন। কিছুদিন কাটিয়ে যান। গেলেন। সঙ্গে গেলেন আর এক সঙ্গী।

অতিথি সম্বর্ধনার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেবে এলেন যিনি, তিনি একজন মহিলা। শিখর থেকে নখর অবধি তিলোত্তমা। সদ্য সৌরভস্নাত অবয়ব থেকে প্রসাধিত সম্ভ্রমের অদৃশ্য লোধ্ররেণু ঝরে ঝরে পড়ছে। দু চোখে অপার্থিব বিস্ময়ের আলো, প্রতীক্ষার বাতাসে কম্প্র। আভূমি কুর্নিসে নত হলেন সেই উজ্জ্বল নারীরত্ন—শেরওয়ানিচুস্ত পাগড়ি দাড়িসম্বলিত মধ্যবয়সী অভ্যাগতের সামনে।

: আইয়ে আইয়ে খাঁ সাহেব...পাশেই স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নিখুঁত পাশ্চাত্য স্যুটপরা এক ছফুট যুবক। স্বর্ণগোধূমে তলোয়ারের মতন। চাপা হাসিতে চোখের চশমা ঝলসে উঠছে। প্রায় শিউরে উঠে শেরওয়ানী-শালোয়ারও তৎক্ষণাৎ শির বোকালেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন পাশে দাঁড়ান যুবক সঙ্গীর দিকে :

: খাঁ সাহাব, আপ হিঁ...আপ তো ওস্তাদ অমের খাঁ কো চাহতী হেঁ না আপ্সে মিলিয়ে :!

তার মিলিয়ে...মিলিয়েই গিয়েছেন তখন তিনি। ভুল শুধরে নেবার, দুটো কথা বলার কোন উপায়ই নেই তার... অপলকচোখে বিহ্বল মুহূর্তগুলো ভেসে চলেছে...হুঁস হারিয়েছেন হস্টেস। আমীর খাঁ নিজেই সিচুয়েশন সামনে নিলেন। বললেন : চলুন ওপরে চলুন...নবাব সাহেব কোথায়?

পরপর তিনদিন প্রোগ্রাম করলেন খাঁ সাহেব। অজস্র অফুরন্ত আনন্দের স্বাদ পেলেন গৃহস্বামী। কিছুতেই ছাড়তে চান না শিল্পীকে। এখানেই থাকুন কিছুদিন। স্বর্গীয় আনন্দ দিয়ে যান আমাদের। এখন তো কোন প্রোগ্রাম নেই আপনার। না। বাইরে আপাততঃ কোন প্রোগ্রাম নেই। অগত্যা থাকতে রাজি হলেন আমীর খাঁ। অন্ততঃ মাসখানেক থাকবেন স্থির হল। কিন্তু — — — — —

দিন চারেকের মাথায়। মাঝরাত্তিরে ঠেলে তুললেন সঙ্গী ভদ্রলোককে! জলদি তৈয়ার হো জাইয়ে, জানা হায়। সঙ্গী অবাক। সেকি। থাকব বলে সব ঠিকঠাক। এর মধ্যে কী হল? কী হয়েছে তা গাড়িতে বসে বলব। ভোরবেলায় ট্রেন, গোছগাছ করে নিন সময় নেই। গৃহস্বামী বিমূঢ়। কোন অপরাধ হয়ে গেল কি?—না না। হেসে হাত নাড়েন আমীর খাঁ। ছি ছি। আপনাদের যত্ন ভুলতে পারব না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা জরুরী কাজ বাকি রয়ে গেছে। সেটা সেরে পরে আবার আসব।

গাড়ি ছাড়তে স্বস্তির নিঃশ্বেস পড়ল। বাব্বা! বাঁচা গেল। কৌতূহল মেটালেন সঙ্গীর। আরে, বহু শরীফ্ অওরাত অন্দরমে বিলকুল পিথলা গয়ী মহিলাটি একান্ত মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন... শেষে কি (আর এক ভারত-বরেণ্য ওস্তাদের নাম করে বললেন) তাঁর মতন কেস্ হয়ে যাবে? যাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিলুম, তারই মাণিকটা নিয়ে পালাতে হবে শেষকালে? ...হাসিতে ফেটে পড়লেন খাঁ সাহেব।

আমীর খাঁ কি সংযতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন খুব? নাকি স্থির বুদ্ধিমান? অথবা বিজ্ঞান কুশলী শিল্পী। গাণিতিক হিসেব কষে চুলচেরা মাপ করে পা ফেলতেন পৃথিবীতে? সচরাচর আরটিস্ট মানুষ কিছুটা খামখেয়ালী হয়ে থাকেন।

*

খামখেয়ালী মনের কাটার ঠিক নেই। কথার দাম থাকে না তাঁদের—এই রকমই ধারণা আমাদের। আমীর খাঁর মতন আরো কয়েকজন সেরা শিল্পীর কথা জানি যাঁরা এই আইডিয়ার ব্যতিক্রম। বিছানায় আধশোয়া হয়ে গল্প করছেন, আড্ডা দিচ্ছেন। গোঞ্জি গায়ে পরণে লুঙ্গী। কথা বলতে বলতেই ঘড়িটা বাঁধলেন, উঠে বসে জুতো মোজা পরছেন আড্ডা চলেছে..কথার খেই হারায় নি..প্যান্ট পরলেন, শার্ট গলালেন। পাঁচ মিনিটে একদম রেডি। সাড়ে আটটায় গাড়ি নিয়ে আসবার কথা একজনের। কাঁটায় কাঁটায় আটটা তিরিশে নিচে এসে দাঁড়ালেন খাঁ সাহেব।

অথচ এই সীরিয়স ভাবটা থাকলে লোকে ব্যাংক ব্যালান্স বাড়াতে পারে..স্টীলের কোটা..সিমেণ্টের পার্মিট..মন দিয়ে ভাগ্য গুছিয়ে তুলতে পারে। এই কেজো ভংগিটা একজন খেয়ালি মানুষের পক্ষে কেমন আনমুজুয়াল লাগে না? রেডিও, টেলিভিশন, ছায়াছবি, ভারতব্যাপী সব রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই যুক্ত থেকেছেন, অথচ ষোল আনা কমার্শিয়াল হতে পারলেন না কোন—তিরিশ হাজার মুজরো নিচ্ছেন। আমীর খাঁর কী—আটশো-তিরিশ হাজার মুজরো নিচ্ছেন। আমীর খাঁর কী আটশো হাজার দেড় হাজার বড়জোর তিন হাজার টাকা। অনুজ স্থানীয় একজন বিখ্যাত যন্ত্রী একদিন অনুযোগ করলেন—আপনি দক্ষিণা বাড়ান। নইলে আমাদের অসুবিধে হয়।....

...আবার একদিন বেঁকে বসলেন। আট হাজারের এক পয়সা কম নেবেন না। লঘু মন্তব্য কানে এসেছে! উদ্যোক্তারা অন্যদের পাঁচ হাজার দর ধরেছে, আর ওঁকে ধরে নিয়েছে ফালতু, যা দেবে তাতেই রাজি হয়ে যাবেন। কিছুতেই কমালেন না দর গেলেনইনা শেষ পর্যন্ত।

...ফিল্মে বা কোথাও চটুল সস্তা নিচুমানের গান গেয়ে নিজের ইমেজ নষ্ট করেন নি, খেলো হতে দেন নি তাঁর ভাবমূর্তি। অসামান্য ঠুমরী গাইতে পারতেন—রান্না করতে করতে কতদিন গুন গুন করে শুনিয়েছেন—কিন্তু পাবলিক পারফরমেন্সে..হরগিজ নহী। একটি মাত্র বাংলা ছায়াছবিতে তাঁর ঠুমরী শোনা গেছে..পরিচালকের সনির্বন্ধ অনুরোধে গেয়েছিলেন..ঐ একটি মাত্র ঠুমরীরই রেকর্ড আছে আমীর খাঁর..'পিয়াকে আওন।'

একবার কলকাতার বাইরে থেকে অনুষ্ঠান সেরে ফিরছেন। একই গাড়িতে রয়েছেন আরো এক শিল্পী দম্পতি। খাঁসাহেব কুশল প্রশ্ন করলেন। স্ত্রীটি বেশ বিনয়ী। নম্র হেসে কথাবার্তা বললেন। স্বামী ভদ্রলোক গোমড়া মুখে হুঁ হাঁ করে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। কথার জবাব দিলেন না, তাকালেন না ভাল করে। কিসের আত্মম্ভরিতা তাঁর, কে বলবে?

: আপনার সামনে এরকম ঔদ্ধত্য দেখালেন উনি!

: ছি ছি 'আমার সামনে' বলে বলছ কেন, আমি কে? আসলে কলাবন্ত মানুষের ঔদ্ধত্য থাকাই উচিত নয়। কলা কে সম্মানে ম..ত নহী রহনা চাহিয়ে...'

ভারতীয় সংগীত...ভারতের উপনিষদের শিক্ষা, যোগ-বিজ্ঞান মানুষকে রাজভোগী হতে শেখায়। চরিত্রে কস্তুরীর বহমানতা নিশ্চিত করে। 'ব্রহ্ম' শব্দের আর্থিক যোগ বিস্তারের সঙ্গে। বিস্তারশীল মানুষকেই বলে ব্রাহ্মণ। গ্রাম্য বিষয়ে তার আসক্তি কম হতে থাকে। এই নির্মোহ নির্লোভ মানসিকতা তার সামাজিক দায় নয়, এটা তার অনুশীলনের প্রসেসে লব্ধ উৎকর্ষের আবশ্যিক অঙ্গ। 'ইগো'র ভারী ব্যাগ পর্বত আরোহণে ব্যাঘাত জন্মায়। আমীর খাঁ একজন যোগকুশলী পর্বতারোহী..অবাধ বিস্তার এবং সলীল আরোহণেই তার প্রমাণ রেখেছেন।

..যে স্পন্দন বিশ্ব সৃষ্টির মূলে সেই অনাহত নাদকে খুঁজে বার করাই ভারতীয় সংগীতের সাধনা। কুমার খোঁজেই তার অন্তহীন প্রয়াস..তার নাদোপাসনায় ..

খেয়াল গানের স্রষ্টা আমীর খুসরু। আর খেয়ালের সর্বার্থসাধক রূপকার আমীর খান। তিনিই একমাত্র গাইয়ে যিনি জীবনে খেয়াল ছাড়া আর কিছুই গাইলেন না।

শরৎ বসু রোডে কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। বৃন্দাবনে সম্মেলন হয়ে গেল। তারই গল্প। হরিদাস গোস্বামীর নামে সম্মেলন। বেশ ক'দিনের লম্বা অনুষ্ঠান। খাঁসাহেবেরও প্রোগ্রাম ছিল দু তিন দিন। কথা বলতে বলতে বললেন : বোধহয় একটা খুব ভুল করে ফেলেছি বুঝলে?

বৃন্দাবনে ওঁর প্রোগ্রামের আগের দিন বিকেল বেলা এক সাধু দেখা করতে এসেছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে ওঁর ব্যক্তিগত সৌহার্দ ছিল। তাঁদেরই কেউ একজন হবে। নিয়ে আসতে বললেন। যিনি এলেন তাঁকে এর আগে কখনো দেখেন নি। গায়ে হলুদ আলখাল্লা। মাথায় দাড়িতে জটা গুচ্ছ। হাতে তানপুরা। অস্তিত্বের কোথাও একটা অজানা লুকোন রয়েছে। তার ছটা নেই, কেবল আভাস আছে। বিমূঢ় হয়ে রইলেন আমীর খাঁ। পরিচয় জিজ্ঞেস করা হল না। সন্ন্যাসী বললেন : বেটা, তোমার গান শুনতে আমি খুব ভালবাসি। আমার এই তানপুরাটা রেখে দাও। কাল এটা নিয়ে গান করো। আমি তোমার গান শুনতে যাব।

বলে আর বসলেন না। চলে গেলেন।

পর পর তিনদিন প্রোগ্রাম করলেন খাঁসাহেব। সন্ন্যাসীর সেই তানপুরা নিয়েই। উদ্যোক্তাদের বলে রেখেছিলেন এই রকম চেহারার কেউ এলে তাঁকে সামনের সারিতে যত্ন করে বসাতে। সন্ন্যাসী কিন্তু আসেন নি আর। তানপুরাটা ফেরত নিতে লোক পাঠান নি। বৃন্দাবন ছাড়ার আগে সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের হাতেই তানপুরাটা জমা দিয়ে এলেন খাঁ সাহেব। যদি উনি পরে কোনদিন আসেন..লোক পাঠান।

খুব ভুল হয়ে গেছে খাঁ সাহেবের। ট্রেনে ফিরতে বসেই মনে হল কথাটা। তখন আর ফিরে যাওয়াও চলে না কিন্তু, তানপুরাটা যে তাঁকেই দিয়েছিলেন বৈরাগী। এই বৈরাগীর তানপুরা। লোকে বলে, বৃন্দাবনে হরিদাস স্বামী আজও দেহ ধরে আছেন। শুধু প্রকৃত গুণী জানতে পারে তাঁর গান...

'খুব ভুল হয়ে গেছে কমল.'

একটা কাক তীব্র কর্কশ চিৎকার করে আমাদের কানে কানে খবর মুখে করে কলকাতার অন্য দিগন্তে উড়ে যাচ্ছিল। একটা হিম হিম কুয়াশার মতন বিষাদ পর্দার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে মেজাজের ভেতরে ঢুকে আসছিল। একটা নতুন বানানো পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে কমলবাবুর ড্রেসিং আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে চোখ রেখেছিলেন আমীর খাঁ। জামাটা মানাচ্ছে? এই পরে কাল শ্যামা দরবারে রাজরাজেশ্বর বিদ্যেশ্বরের সভায় যাওয়া চলবে তো? তানপুরাটা কোথায় গেল..বৈরাগীর মন্ত্রপুত তানপুরা? মনে হয়নি? গুন গুন করলেন..ওঁর কারো মেঘে..গুণ নারী.. ভোজসভা থেকে সে রাতে আর ফেরেন নি আমীর খাঁ।

●

ঈদের রোদ গায়ে মেখে, চেতলার হাটে সেই দাড়িওয়ালা মানুষটাকে আজকাল আর ঘুরতে দেখা যায় না—কোন কোন গর্বিত মুগ্ধের চেতনার ছায়াচ্ছন্ন পথে মাঝে মাঝে ঘোরাফেরা করেন। চিৎপুরের....চীৎকৃত রাস্তায়, মধ্যাহ্নের ধুলো মেখে ইদানীং আর ডাক দেন না : এ্যাই রিকসা.. চাঁদনীর বাজার ঘুমিয়ে পড়ার পর....অজস্র চাঁদনি ঝরা কোন কোন নীরব নিশীথে তাঁর 'চন্দ্রমধুর' গুঞ্জন ভেসে আসে—স্মৃতিতে, তীব্র নিষাদ....কোমল গান্ধার....তীব্র মাধ্যম ॥

ংলা গানের এ দৈন্য থাকবে না : মান্না দে

ন্ধ্যা সেন

১৯৪৩ সালে প্রথম বোম্বে গিয়াম কাকার (কৃষ্ণচন্দ্র দে) সঙ্গে ওঁর এবং সহকারী হয়ে। আমার যা কিছু গা সহবং সংগীতধ্যান সব কাকার কাছেই য়া। দবীর খাঁ সাহেবের কাছেও শিখে াম ধ্রুপদ এবং খেয়াল। ফ্রেমওয়ার্ক ? এঁদেরই গড়া।

বাংলা গানে মনটা মশগুল করে ইছিলো শচীনদার সুর। এ সুরের মাদক- আবেশ বোধহয় জীবনের অন্তিমদিন ন্ত মনকে স্বপ্নে ভরে রাখবে।

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির সেই জলসার টি মনে পড়ে। শচীনদা ভীষ্মদা সবারই ছিল। এক একজন গাইছেন আর শ্রোতা নদের যেন পাগল করে দিচ্ছেন, নানারঙা র্তির সে রোমাঞ্চ এখনকার শ্রোতারা কল্পনা করতে পারবেন ?

ওঁদের গান শেষ হয়ে আসতে কাকা পুরো বেঁধে আমার হাতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে ধরলেন ছোট একটি খেয়াল। গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসর েল। খেয়ালের ঐ কটি তান যেন মনের দরজায় ধাক্কা দিয়ে সুরের ে থেকে নিয়ে এল। এরপর ঠুংরী খেয়া ল গানে বইলো বন্যার জোয়ার। রাত কি সাড়ে চারটের সময় যখন রাতের ভোরের আলো ... বোল-ভক্ত দেন কীর্তন। ভৈরোঁর শান্তরসের ... চোখের জলে ভিজে দর্শক এখন ... নয়নে কাঁদছে। ... কখন পকেট হাতড়ে রুমাল করে চোখ মুছতে সুরু করেছি বুঝতে পারিনি। হুঁশ হোলো, ... টেলা খেয়ে 'সব তারাগুলো ... করে উনি বাজাতে বলছেন।' ... আমার ভালোলাগো ছাড়ি।

এমন মুহূর্ত জীবনে বারবার আসে কিন্তু যখন আসে মনের মধ্যে ... ঘটিয়ে দিয়ে যায়। কাকা এটা কেমন পারলেন ? তিনি যে তাঁর দিব্যদৃষ্টি ... দেখতে পেতেন সুরপিয়াসীর ... আর্তিকে। জানতেন এ ... কেমন করে জাগাতে হয় আর ... দিতে হয় প্রণামের মধুরতায়। ... ফিল দি পালস অফ দি লিসনারস।' ... বাবা কৃষ্ণচন্দ্র দে'র ... দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ ... রইলেন মান্নাবাবু।

১৯৬৪ কি '৬৫ সালে বিজন ভট্টাচার্য ... ছবিতে (হিন্দী ও মারাঠি) আমার ... করেছিলো। কিন্তু তখন প্লে- ... আর্টিস্টদের নাম দেওয়া হোতো না। ... পাইনি। 'একদিন রাত্রে' ... 'সব সত্যি' গানটা আমায় যেন রাতা- ... জনপ্রিয়তার দরবারে পৌঁছে দিলো। ... আগে শান্তারামের মরাঠি ছবি 'অমর ...' তে গান গেয়েছি। ঐ ছবিরই বাংলা ভার্সনে মারাঠী অঙ্গের বাংলা গান গেয়েছিলাম—আমি ও লতা।

শচীনদার সংগীত পরিচালনা নিজস্ব চরিত্র গৌরবে সকলের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিল। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধীরোদাত্ত পটভূমিকায় লাগল পল্লীগীতির ভাব-প্রবণতা, রং আর আবেশ। গানে এলো এমন একটা ফ্লেক্সিবিলিটি যা এর আগে কারো চিন্তায় আসেনি। এ সবের উৎস কোথা জানেন ? শচীনদা গানের চাহিদার দিকে তাকিয়ে দরকার মত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন কিন্তু সুরের নকসায় নিজের ক্যারেকটার সবসময় বজায় রেখেছেন। শচীনদার বিস্ময়কর সাকসেসের আর একটা কারণ তিনি হিন্দী উর্দু দুটি ভাষা ও শিখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিখেছিলেন ঐ ভাষাকে ভালবাসতে। উনি মেকানিক্যাল ওয়েতে সুর করতেন না। ডুবুরীর মত একেবারে গানের ভেতর চলে যেতেন। তাঁর গানের এমন ইউনিভার্সাল এ্যাকসেপটেন্সের কারণ বোধহয় এটাই।

শচীনদা, কাকা এঁদের মত উদার মনের সংস্পর্শে এসেই আমি সব রকমের গানকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখেছি। যখনই সময় এবং সুযোগ পেয়েছি ঘন্টার পর ঘন্টা জাজ মিউজিক শুনেছি। নীরব নিস্পন্দ মুহূর্তে শুনেছি। শুনেছি কলরবের হুল্লোড়েও। আর ঐ প্রতিটি ধ্বনির হৃৎস্পন্দে কান রেখে শুনতে চেয়েছি সে সংগীতের ভাষা। মনে হয়েছে— দে আর সিংকিং সামথিং হুইচ দে ডু নট নো।

এই জাজ মিউজিকের এফেকট দিয়ে ছবির ড্রামাটিক সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেক সময় নয়েজি মিউজিক হয়ে যায়। জারিংও হয়। কিন্তু সব এক্সপেরিমেন্টই যে সবসময় সাকসেসফুল হবে এমন আশা কেনই বা করব ?

ক্ল্যাসিক্যাল, ফোক ছাড়াও বাংলা গানে আমি কর্ণাটক, গুজরাটি, মারাঠি, সুরের বৈচিত্র্য এনে এ গানকে আরও সমৃদ্ধ করার পক্ষপাতী। আমরা শুধু বাঙালী নয়, ভারতবাসীও। এই কথাটি মনে রাখা দরকার। আমি দেখেছি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছলে গানের ফ্লেভারের রূপ কেমন করে আস্তে আস্তে বদলে যায়। বাংলাদেশের মত অন্যান্য প্রদেশের গানেরও একটা অ্যাপীল আছে। সৌরাষ্ট্রের ভজনের কি চার্ম ! হোয়াই উই আর নট ট্রান্সফারিং দ্যাট চার্ম উইথ বেংগলী সং ?'—

'এবার পুজোর রেকর্ডে আপনি গেয়েছিলেন—

চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি
তোমায় দেখে ফেলেছি।

ও-গান গাইতে ভালো লেগেছিল ?

....'এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন ?'

'আপনার সংগীতভাবনার যে ছবি এতক্ষণ পেলাম তার সঙ্গে ওর রং মিলছে না।'

'দেখুন জীবনের সব কাজই কি আমরা ভালবেসে করি ? আমি প্রফেশন্যাল ম্যান। কমার্শিয়াল দিকটার কথা আমায় ভাবতে হয়, বিশেষ করে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য জনপ্রিয়তা প্রাচুর্য সবই যখন চাই। একশটা গান গাইলে আশিটা হয়ত ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় কি ?

তবে এসব আমাকে দমাতে পারে না। আমার আদর্শ হোলো কাজের নিষ্ঠা। ওঁকে দেখেছি সারারাত জেগে প্রোগ্রাম করে মাত্র এক ঘন্টা ঘুমিয়ে উঠেই আবার রেওয়াজে বসতে। কখনও কোনো নতুন তবলার বোল শুনলেই আমায় বলতেন, 'এটা লেখ।'

ক্ল্যাসিক্যাল লেভেল থেকে জনমনের গ্রহণের উপযোগীরূপে বাংলা গানকে পৌঁছে দিয়েছেন নিঃসন্দেহে বাবা, শচীনদা, পংকজবাবু। এঁদের মধ্যে পংকজবাবুর অবদান অনেক বেশী। কানন দেবী, সায়গলকে দিয়ে কত ভাল গান—রবীন্দ্র-সংগীত গাইয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে গানকে পৌঁছে দিয়েছেন। অবশ্য ওঁদের প্রধান এ্যাসেট ওঁদের কণ্ঠ ও সংগীতনিষ্ঠা। গানকে মডার্নাইজড করেও রসরূপে সৃষ্টি করা সেইজন্যই ওঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এঁদের পরের যুগে হেমন্ত-বাবু, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্ময় মিত্রর প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য।

তারপরের যুগে বেশীমাত্রার আধুনিকী করতে গিয়ে গানের সিরিয়াস-নেস চলে গেল। এই আগের যুগেই আই মেট টাওয়ারিং পার্সোনালিটি লাইক গিরিজাবাবু, জ্ঞান গোস্বামী।—তারপর আস্তে আস্তে সেই আগুনের তেজ যেন কমে আসতে লাগল।

কেন ? না, প্রতিভার অভাব নয়। জ্ঞানের অভাব। জানবার, বোঝবার নিষ্ঠা ভেসে গেল রাতারাতি প্রতিষ্ঠা কামনার উন্মত্ত জোয়ারে।

আজও আমি হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও রেওয়াজে বিরতি দিই না। ঐ সময়টুকু একান্তই আমার।

পরিচালকের নিগ্রহ

রঞ্জন মজুমদার

আমরা দেখতে পাই—দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে যে বিমর্ষ মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন—তিনি একজন সৎ, বিবেকবান, সামাজিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন চিত্র-পরিচালক। এঁকে চিনুন, ইনি একজন নিগৃহীত মানুষ। এই জন্যে যে পেটের দায়ে এঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন সব ছবি করতে হয়েছে, যেগুলি ওঁর করার কথা নয়। প্রযোজকের স্ত্রীর লেখা গল্প, প্রযোজকের তত্ত্বাবধানে লিখিত চিত্রনাট্য ও সংলাপ পর্দায় তুলে ধরতে ভদ্রলোকের অসীম ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছে। অথচ কন্ট্রাক্টের পুরো টাকাটাও শেষ পর্যন্ত উনি পাননি। উনি এখন বর্তমান চলচ্চিত্রের দ্বারস্থ—পরবর্তী কোন কাজের প্রত্যাশায়।

এই হচ্ছে বর্তমান সিনেমার এক সত্যনিষ্ঠ নির্মম চিত্র। সিনেমার পরিচালকেরা অনেকেই রাতের পার্ক স্ট্রীটের হোটেলের টেবিল থেকে, কমার্শিয়াল হাউসের হঠাৎ ফেঁপে ওঠা এয়ারকন্ডিশনড অফিস থেকে, কফি হোঁজ এবং জোতদারদের মধ্যে থেকে পার্টী ধরে আনেন স্টুডিওতে। এই আনাটা খুব সহজে হয় না। অসীম ধৈর্যে দিনের পর দিন হাঁটাহাঁটি করে কনভিন্স করাবার পর তবে একেকজন অর্থ বিনিয়োগকারীকে সিনেমা লাইনে আনা যায়। অনেক ক্ষেত্রে শুধু এই স্বপ্ন চরিতার্থ করতে যে একটা সিনেমা করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। পার্টীকে ভোলাবার জন্যে এঁকে অনেক মিথ্যে স্তোক বা আশ্বাস দিতেই হয়। শতকরা ৫০ জন আসে ভিন্ন মতলব এঁটে। সেই মতলবে পরিচালকের সায় থাকা দরকার।

যারা টাকা খরচ করে প্রথমে ছবি করতে আসে, তারা বুঝতে চায়—এই পরিচালক ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীতে প্রভাবশালী কিনা। আর্টিস্টদের সঙ্গে এর হরদম-মহরম আছে কিনা। আসলে এই লোকটিকে সঙ্গে রাখলে আর্টিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ট মেলামেশার সুযোগ হবে কিনা এবং প্রতিপত্তি অর্জনে এর কতটা সাহায্য পাওয়া যাবে। পার্টি যদি বোঝে হ্যাঁ হচ্ছে—তবেই সে সিনেমায় টাকা ঢালতে আগ্রহী হবে। এরপরই তো কাহিনী নির্বাচন, শিল্পী নির্বাচন........

যে পরিচালক এত কান্ড করে পার্টিকে বাস্তবিকই স্টুডিওতে এনে ফেললেন, তাঁকে চিহ্নিত করা হল আড়কাঠি হিসাবে। এটা মর্মান্তিক। চলচ্চিত্রের নিজস্ব যে প্যাটার্ন গড়ে উঠেছে—তাতে এটা হওয়া ছাড়া আপাততঃ অন্য পথ নেই।

তাঁর আনা পার্টি সিনেমার সব কিছু বোঝে। সে, কাহিনী বোঝে। সিনেমায় সূক্ষ্ম কারিগরী ব্যাপার বোঝে, শি
সাহিত্য বোঝে, রাজনীতি বোঝে। প
চালক তার ডিকটেশন চলুক—এটাই
আশা করে। এখন সে আর্টিস্টদের ব
কারণ কিছু আর্টিস্ট তার বন্ধুত্ব
সমান আগ্রহী। শুটিং-এ প্রযোজক অ
করে পরিচালক তার অভিপ্রায় বুঝে ক্যা
বসাবে, আর্টিস্ট তার মর্জিমত অ
করবে। সে একটা যে সাংঘাতিক
করতে চলেছে—পরিচালককে দিয়ে
ইন্ডাস্ট্রীতে এই কথাটি চালু কর
পরিচালক শুটিং-এর সময় শুধু স
'সাউন্ড' এবং 'কাট' শব্দটি উচ্চারণের
হাজির থাকবেন। আর সম্পাদনার টে
কণ্টকিত শটগুলি জোড়া দিয়ে গল্প সাজা
আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন।

পরিচালকের বড় নিগ্রহ সেখানে
যেখানে সিনেমা [illegible] প্রযোজকদের
চিত্র পরিচালনা করতে হয়। ন
লেখকের কাহিনী, দামী তারকা সমা
কাস্টিং-এইসব চমৎকার উপকরণ তাঁর হ
তুলে দিয়ে স্টিয়ারিং—যেখানে অ
থাকে। তারকার পছন্দে কাহিনী, তার
প্রাধান্য বজায় রাখা চিত্রনাট্য এবং সংলা
কাস্ট—এসব অক্ষুণ্ণ রেখে ছবি প
চালনা আর আত্মহত্যা প্রায় এক ক
ফলে দামী আর্টিস্টের ছবিতে প্রতিভা
আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পরিচালকেরা অ
ইদানিং অনিচ্ছুক।

পরিচালকের মর্মান্তিক নিগ্র
সেখানে—যেখানে তিনি অকপটে নি
চিন্তার কথা খুলে বলতে উদ্যোগী হ
তার ভিত্তিভূমি সামাজিক হতে পা
রাজনৈতিক হতে পারে বা ইউটোপিয়
এদেশে এখনও দর্শক তৈরি হয়নি। বি
করে সেইসব বিচক্ষণ দর্শক যারা প
চালকের মেরুদন্ড হতে পারেন। সিনে
এত বেশী লঘু সুর বেজেছে যে ভাব
কষ্ট হয় এবং সেই অনুযায়ী দর্শক গ
গড়ে উঠেছে। অথচ সিনেমা এই শত
একটা শক্তিশালী আর্ট-মিডিয়াম। এ
অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতেই পা
একজন পরিচালক এই মিডিয়ামে নত
কিছু বলতে গিয়ে যদি দেখেন তাঁর ঘ
গামছা দুই যাবার উপক্রম হচ্ছে—তি
তদ্দণ্ডেই ব্যাক-গিয়ারে ফিরতে বা
শিল্পে কখনও আপস হয় না—
**কথাটি জানা সত্ত্বেও বহু পরিচা
তাঁদের নিজস্ব ফর্মুলায় জনপ্রিয় ছ
তোলেন—শুধু টিকে থাকার চেষ্টায়। ও
জাভা বা বর্মায় গিয়ে ছবির যে দৃ
শুটিং অনিবার্য ছিল—তা কলকা
স্টুডিওর নকল সেটে কিছু ভাড়াটে বাম
দেখিয়ে এখনও কম্প্রোমাইজ হচ্ছে।**

বালিকাবধূ, তরুণবাবুর হিন্দী কবিতা

শ্যামল চক্রবর্তী

তরুণবাবু ইচ্ছে করলে হিন্দী ...বধকে সেলুলয়েডের কবিতা তৈরি ... পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন ...কেন করলেন না সেটাই ভাবছি। তরুণ-... আগে বাংলায় এই ছবিটি করে-... এবং তাঁর নিজস্ব কমার্শিয়াল ফর-... সাফল্যলাভ করেছিলেন। ... হিন্দীতে অনেক বেশী অর্থ-আনু-... এবং রঙিন ফটোগ্রাফীর সুযোগে যদি ... বালিকাবধূ-র ভিন্নরূপে উপস্থিত ...তন, তাহলে কি তাঁর শক্তিমত্তার ... পরিচয় পেতাম না? অথচ, ছবি-... তিনি সেলুলয়েডের কাব্য হবার মত ...বহু দৃশ্য ও কম্পোজিশন সৃষ্টি ...ছিলেন, এবং অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ ...পারতো যদি সেরকম বিন্যাস ঘটিয়ে ...গানের বাহুল্য বর্জন করে দিতেন।

...নীক করে সাবার গানটি ...অমলের মুখে শেষপর্বে সেই আশ্চর্য ... গানটি ছাড়া আর কোন গানের ...ন ছিল কি? তেমনি প্রেমানারায়ণের ...পোল খেলার নাচ ও গানের বিলম্বিত ...এবং আশাবাণীকে নিয়ে বিয়ের আসরে ...ী বাকচাতুর্যের প্রয়োজন ছিল না। ...দৃশ্যগুলি বাদ দিলে ছবিটি অন্য ...ধরূপ লাভ করতো। এই দেশে কিশোর ...র ছবি তো হয়ই না, তরুণবাবুই ... সুযোগটিকে নিজস্ব ফরমুলায় নিয়ে ...বাংলা বালিকা বধূর হিন্দী সংস্করণ ...ছেন সামান্য কিছু অদল-বদল করে। ... সেই ফরমুলায় ছবিটি অনাভাবে ...লাভ করবে বলাই বাহুল্য। সুখ্যাত ...ক বিমল করের এই মিষ্টি মধুর ...নীর বিস্তারিত চিত্ররূপ দিতে গিয়ে ...বাবু তাই কোন রিকস নিতে চান নি, ...চ সংবরণ করে নিয়েছেন।

...ছবিটির লোকেসন-এর জন্য স্থান ...চনেও তরুণবাবু হিন্দী ছবির ...নে নতুনদিকেরউন্মোচন ঘটিয়েছেন। ...দিও গ্রাম বাংলার লোকেসান ...েছে গিয়ে দু-একটি দৃশ্যে ...ট্রের পাহাড়ের ছায়া চলে এসেছে। ... কাহিনীর সময়কাল অনুযায়ী ...ক্ত সেট, সেটিং এবং পাত্রপাত্রীর পোষাক বিষয়ে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েও অমল এবং রমেশের জন্য হাইকলার প্যাঞ্জাবির ব্যবস্থা করেছেন—যেটা ঐ সময় প্রচলিত ছিল না। আর একটা কথা—ছবিটি একটু দীর্ঘ হয়েছে, যে কারণে কোন কোন সময় বোরিং লাগছিল। আর একটু কাঁচি চালালে বড় ভাল হত।

অভিনয়ের দিকে প্রধান চারটি চরিত্রে কার অভিনয় বেশী ভাল বলা মুশকিল। 'রজনী' বা চিনির চরিত্রে নবাগতা কিশোরী রজনী শর্মা এমন সহজ সুন্দর অভিনয় করেছেন যা ভোলা যায় না। বলা যেতে পারে তার অভিনয় অভিনয়ের ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। অমলের ভূমিকায় শচীন শান্ত, সুন্দর রূপটি মধুর অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। রজনীর জন্য তাঁর বাধিত মনের প্রকাশ এত দরদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যে বিস্মিত হতে হয়। অমলের বোন চন্দ্রার ভূমিকায় কাজরী উজ্জ্বল রূপটি যা ফুটিয়েছেন তার চাইতে ভাল বোধহয় হতে পারে না। ভগ্নীপতির ভূমিকায়—হিন্দী ছবির নামকরা আশরানী অভিনয় করেছেন। এই ছবিতে আশরানীর অনবদ্য অভিনয় এক বিস্ময় এবং তিনি যে হিন্দী ছবির গড্ডলিকা প্রবাহে তার অভিনয় ক্ষমতাকে অপচয় করে চলেছেন—অন্তত সেটা তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় এই ছবিতে আঁকা হয়ে রইল—এটাই বড় কৃতিত্ব। অন্যান্য সকলেই তরুণবাবুর পরিচালনার গুণে হিন্দী ছবির প্রচলিত অভিনয় ধারার বাইরে সুন্দর অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার মধ্যে এ কে হাংগল ও ওম শিবপুরীর অভিনয় বিশেষ করে মনে দাগ কাটে।

ছবিটির রঙিন ফটোগ্রাফীতে নন্দু ভট্টাচার্য আগাগোড়া আউটডোর লোকেশনের যে অসাধারণ কাজ করেছেন, বিদেশী ছবিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে চাঁদের আলোয় কাশবনের ফুলের পাশ দিয়ে রজনী ও অমল ছুটে চলেছে এবং পরে ওরা দুজন বসে গান গাইছে, সেই দৃশ্যটির কম্পোজিশন, লং সটে দূর চলাচরের শিল্পদৃশ্য ভোলা যায় না। তেমনি পালকি চলাকালীন পালকি বেয়ারাদের ক্লোজ শটে মুখের সাজেসটিভ ব্যবহার, বিপ্লবী ছেলেটির ভোরের সূর্যের আলোর ছটায় ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বহু দৃশ্যের মধ্যে উন্নত ফটোগ্রাফীর পরিচয় বহন করে। ছবিটির এডিটিং বিষয়ে সামান্য সতর্ক হলে ভাল হত, যদিও জাম্প কাটগুলি ছবির গতিকে দারুণ এফেক্ট এনে দিয়েছে। শুধুমাত্র একটি দৃশ্যে গোলমাল চোখে পড়ল। রজনী যখন প্রথমবার ঘরে ঢুকে অমলকে ডাকল সে সময় রজনীর চোখের চাহনি যে হাইটে ছিল, অমলকে পরের শটে দেখাবার সময় এই দুটো শটের হাইট সমান থাকে নি। এডিটিং করার সময়ে এই বিষয়টা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ায় আমাদের চোখে পড়ে।

রাহুল দেববর্মণ এই প্রথমবার ভাল আবহসঙ্গীত ও সুর রচনা করেছিলেন। হিন্দী ছবির চিরাচরিত পাশ্চাত্য সুরে রচনার পরিবর্তে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ও সুরের ব্যবহার তিনি এই ছবিতে করেছেন— যা বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বে সুন্দর। হিন্দী ছবির জগতে বালিকা বধূ ভিন্ন স্বাদ ও গন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এবং মারামারি, সেক্স ছাড়াও দর্শককে আকর্ষণ করার মত ছবি করা যায় এই ছবিটি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যদিও কমার্শিয়েল ফরমুলার বাইরে এই ছবিটি নির্মিত হলে হিন্দী ছবির জগত অন্য কিছু লাভ করতো।

নায়ক যখন পরিচাল[ক]

নির্মল

অস্কার-পাওয়া অভিনেত্রী অ্যালেন বার্নস্টিনকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল—অভিনেতা কি শুধুমাত্র ইন্টারপ্রেটর, না সৃষ্টিশীল শিল্পীও?

কয়েক মুহূর্ত ভেবে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—ফিল্মে সৃষ্টির সব কাজটুকুই করেন পরিচালক। আমরা তাঁর সহকারী মাত্র। তাঁর সৃষ্টির অংশীদার। অভিনয়ের মাধ্যমে পরিচালকের সৃষ্টিকে রূপ দিতে চেষ্টা করি। সুতরাং আমাদের একদিকে যেমন ইন্টারপ্রেটর বলতে পারেন তেমনি শিল্প সৃষ্টিতেও আমাদের দানটাকে অস্বীকার করেন না কেউ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বার্নস্টিন হলিউডে অ্যাকটর স্টুডিওর অন্যতম শিক্ষয়িত্রী।

তাঁর মত একজন শিল্পীর কাছ থেকে এমন জবাব পাবার পর ফিল্মের ক্রিয়েটিভ দিকটায় পরিচালকের প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্বের কথা স্বীকার না করে উপায় থাকে না।

কিন্তু একটি বারের জন্যও যদি ভারতীয় ফিল্মের চেহারায় নজর ফেলা যায় দেখা যাবে চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে না হয় ক্রিয়েটিভ কিছু, না হয় ব্যবসা!

এখানে গল্প নির্বাচন থেকে শুরু করে ছবি রিলিজের হাউস—দিনক্ষণ মায় নায়িকার হেয়ার স্টাইল অবধি নায়কের কাছ থেকে সবুজ সংকেত না পেলে থেমে থাকে।

ভারতীয় ছবির বিস্তীর্ণ ল্যান্ডস্কেপে যাবার দুঃসাহস আমার নেই, এই কলকাতায় টালিগঞ্জেই যাতায়াত। কি ভাগ্যিস, এখানে সত্যজিৎ-মৃণাল আছেন, ছিলেন ঋত্বিক। নইলে....

নইলে হয়তো এই টালিগঞ্জ হতো হাতে গোনা দু-তিনজন শিল্পীর দোনাত্রো স্বর্গরাজ্য। কিছুটা হয়েছেও। সত্যজিৎ মৃণাল আর বছরে কখানাই বা ছবি করেন বছরে পাঁচ-ছ-সাতখানা ছবি করার ম[তো] ব্যবসায়ী শিল্পীরাই নাকি বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে। মুমূর্ষ বাং[লা] চলচ্চিত্রে রক্তদান করছেন সেই শিল্পী শিল্পীরা যাঁর বা যাঁদের চরিত্রায়ণে [...] ছাপ খুবই কম লক্ষ্য করা যায়, একমেবা[দ্বিতীয়ম্] দ্বিতীয়ম হয়ে তাঁরাই সারাটা ছবি জুড়ে বিচরণ করেন নিজেকে প্রাধান্য দেবার জন্য প্রায়শঃই তাঁরা সহশিল্পীদের চরিত্রগুলি কেটে-ছেঁটে ছোট করে দেন—এমন কি শরৎচন্দ্রের কাহিনী হলেও নির্মম হস্ত-ক্ষেপে তাঁদের সংকোচ হয় না।

নিজের কোন দৃশ্যে কটি ক্লোজ-আপ থাকবে, সহশিল্পীদের কোন অ[ংশ] দিয়ে তাঁর মুখ চাপা চলবে না। যৌবন হারানো চেহারাকে সর্বদা এমন অ্যাঙ্গেল থেকে ফটোগ্রাফ করতে হবে যাতে দর্শক তাঁকে চিরকুমার ভাবতে পারেন। বস্তি বাস্তব কাহিনী নিয়ে ছবি করা হোক না কেন, তাঁকে সর্বদা রাজপুত্রের সাজে রাখতেই হবে। হেয়ার স্টাইল [...] তাঁদের বদলানো যাবে না। পোশাক আশাকের ব্যাপারেও নিজস্ব মত থাকবে এবং সেটা মেনে চলতে হবে নির্দেশককে। বৈষ্ণবী সাজে সিল্কের গরদ অবশ্যই প্রয়োজন—এমনি সব আর কি!

কিন্তু কই, বিদেশে তো এমনটি খুব দেখা যায় না! মার্লন ব্রান্ডোর মত শিল্পীকে কুইমাদা ছবিতে একবারে অন্য-রূপে দেখা গেছে। মনে পড়ে কি পল মুনির এমিল জোলাকে, কিংবা গুড আর্থ ছবির চীনা চাষীর চরিত্রটি, পল মুনি চরিত্রটিকে ছাড়িয়ে এক মুহূর্তের জন্যও বেরিয়ে আসতে পারেন নি, রোমান পোলানস্কির চায়না টাউনে জ্যাক নিকলসন সারাটা ছবিতে নাকে আঘাত পাওয়ায় প্লাস্টার লাগিয়ে অভিনয় করলেন। তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন বলে শোনা যায় নি। গোদারের পিয়ের দা ফ্যুল ছবিতে জাঁ পল বেলমঁদো মুখে যেভাবে রং মেখে-ছিলেন সন্দেহ হয় এখানকার কোন শিল্পী অমন কাজ করতে রাজী হতেন কিনা! ওয়াজদার অ্যাসেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস ছবিতে সিবুলস্কির ডি-গ্ল্যামারাইজড

আর গভীর মননশীল অভিনয় এক- াবতে চেষ্টা করুন।

আচ্ছা, কন্টিনেন্টাল ছবির কথা না দিচ্ছি। হলিউডের কিছু ছবির থাক। দি অরগানাইজেশনয়ে পোইতিয়ের, দি প্যাসেঞ্জারে জ্যাক বার্নি এণ্ড ক্ল্যাইডয়ে ওয়ারেন আনটিল ডাকে অড্রে হেপ- তালিকায় পাতা ভরে যাবে। কি এক্সেটরা অনেক শিল্পী হলি- বা বিদেশী ছবিতে যেভাবে কাজে বাংলা ছবির নামী-দামী নায়ক- কাছ থেকে সেটুকুও পাওয়া।

তাহলে কি বাংলার শিল্পীদের অভি- মতা নেই—এমন প্রশ্ন উঠতে পারে। নিশ্চয়ই অভিনয় ক্ষমতা আছে। দুর্গাদাসের উত্তরসূরী ভিহীন একথা সত্য নয়। তারই সাথে এই সত্যটা পরিচালকের কাজে নাক কিংবা চিত্রনাট্যকারের দায়িত্ব তুলে নেওয়াটাই হয় বোকামি। নির্বোধের মত কাজটি করে ইমেজ আর পপুলারিটি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ঘটে তখনই। চরিত্রের কথা ভুলে গিয়ে বজায় রাখবার ব্যর্থ ম্যানারিজমের শিকার হয়ে তিনি বা তাঁরা দর্শকের হচ্ছেন কিনা সেই হারিয়ে ফেলেন।

ক্রিয়েটিভ আর্ট। এবং হচ্ছেন ক্রিয়েটর। সেখানে প্রায় আগে কিংবা পরে যদি ইন্টারাপশান হতে থাকে তখন শোচনীয় হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অনেক শিল্পীই জানি চাল নিয়ে ক্রিয়েটরদের যোগ্যতা তুলতে পারেন। তাঁদের উদ্দেশে বক্তব্য— পরিচালকদের ছবিতে অভিনয় জীবিকার জন্য বছরে দুটি কাজ করলে কি আপনাদের প্রয়োজনটুকু মেটে না? বাছাই শুরু করুন না! যোগ্যতাহীন ক্রিয়েটররা আপনা যাবে। সত্যিকার ভালো কিছু দেখা মিলবে। তাঁদের ছবিতে নির্দেশে কাজ করে আনন্দই পাবেন, ও কম জুটবে না।

তেমন সুবুদ্ধি কি হবে শিল্পীদের? জীবন আর জীবিকার ধুয়ো তুলে অযোগ্য শক্তিহীন কিছু ব্যক্তিকে ক্রিয়েটর-এর শিরোপা পরাবার অপচেষ্টা কেন করছেন? জঞ্জাল তো তাতে বেড়েই যাবে, বেড়ে চলবে ছবির লোকসানের পরিমাণ। ইণ্ডাস্ট্রিকে রক্ত- দানকারীর মুখোশ পরে রক্তশোষকের ভূমিকায় কি আপনারা অবতীর্ণ হচ্ছেন না?

এমন বহু নজির আছে যে নতুন উৎসাহী তরুণ পরিচালকদের ছবিতে নামী-দামী শিল্পীরা কাজ করতে চান না মূলত চিত্রনাট্যগুলি তাঁদের মনোমত হয় না বলে। এবং বিপরীত পক্ষে বহু সময় সেই তরুণ পরিচালকরাও শিল্পীর নির্দেশমত চলার জন্য নরম মেরুদণ্ড না থাকায় তাঁদের কাছেই যান না। সযত্নে পরিহার করে চলেন একে অপরকে, ফলে হয় কি, ভালো পরিচালক যেমন অনেক সময় ভালো অভিনেতা পান না, তেমন ভালো অভিনেতারাও তেমনি ভালো পরি- চালক কদাচিৎ পান।

আর এই ব্যবস্থাটা বজায় রাখার অনেকটা দায়িত্বই দেওয়া যায় শিল্পীদের। যদিচ প্রযোজক-পরিচালক এবং ছবি তৈরির অর্থনৈতিক দিকটায় অনেক জটিলত আছে, কিন্তু কিছু দিনের জন্য শিল্পীরা পরিচালকের কাজে অবৈধ হস্তক্ষেপটা বন্ধ করুন দেখি। পরিচালক সম্পূর্ণ স্বাধী- নতায় ছবি করুন, অন্ততঃপক্ষে ক্রিয়েটিভ ক্রিয়াকলাপে তাঁকে ব্যাঘাত দেওয়া বন্ধ হোক।

দিকপাল শিল্পীরা, নিজের কর্তব্য- টুকু যথাযথ পালন করে যান। ইমেজের কথা ভুলে গিয়ে চরিত্রকে বুঝতে চেষ্টা করুন। অভিনয় দিয়ে আমাদের আবিষ্ট করুন। আপনাদের তো সে ক্ষমতা রয়েছে।

সময়ই বলে দেবে কে-ই বা সব্য- সাচী, কে-ই বা প্রতিদ্বন্দ্বী, জ্বলন্ত বহ্নি- শিখা।

রবিনহুড জুনিয়র চোর চরণদাস

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

ভারতে শিশুদের জন্যে ছবি তৈরি এখনও পর্যন্ত লোকসানের ব্যবসা। সেই জন্যেই কোন প্রযোজক বা পরিচালক এদিকে নজর দেন না। সেই অনীহা কাটিয়ে যদিও বা ছোটদের জন্যে কেউ কেউ ছবি করতে উদ্যোগী হন, নিছক মোটা দাগের ছবি করেন ব্যবসার নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে।

সেদিক থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় সত্যজিৎ রায়। তাও তিনিই বা কটা ছবি করেছেন।

অথচ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলি এ ব্যাপারে অনেক সচেতন। তার প্রমাণ পাই এখানে কদাচিৎ কখনও ছোটদের ছবির উৎসব হলে। যেখানে অনেক সময়েই বহু বিদেশী রাষ্ট্রের শিশু চিত্র আমদানী করা হয়।

সম্প্রতি নবতরঙ্গ চিত্র র উদ্যোগে যে শিশু চলচিত্র উৎসব হয়ে গেল তার মধ্যে অবশ্য তিনটিই ভারতীয় ভাষার। আর একটি চেক ছবি হিন্দীতে ডাব করা। বাকি তিনটি ছবি লণ্ডনের চিলড্রেন্স ফিল্ম ফাউণ্ডেশনের। ছবি তিনটির নাম রবিনহুড জুনিয়র, হেডলাইন হান্টার্স ও হোয়ার হজ জীন। আর ভারতীয় ছবি যাদু কা শঙ্খ, চরণদাস চোর, নেকদিল যাদুগরনী ও উরাঞ্চু সবকটিই হিন্দী এবং ভারতের চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির ছবি (তার মধ্যে একটি ডাব করা)।

লণ্ডনের তিনটি ছবির মধ্যে হোয়ার হজ জীন বেশী ভাল লেগেছে। এ ছবির সাসপেন্সের সঙ্গে এমন একটা মজা আছে যা বাচ্চাদের স্বভাবতই রোমাঞ্চিত করে। এই ছবির ছোট নায়কের প্রিয় কুকুর এক বিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরী থেকে এমন একটা জিনিস খেয়ে ফেলে, যা খেয়ে সে অ… হয়ে যায়, অথচ তার অস্তিত্ব খা… বেশ মজাদার ঘটনা। বাচ্চারা উপভো… করেছে দারুণ। আরো মজা হল, অ… দেহে জল লাগলেই সে দৃশ্যমান … পড়ছে। সেই জিনিস অর্থাৎ যার … চড়ক তাই খেয়ে অদৃশ্য হয়ে … চোরকে কিভাবে ধরল মজাদার ঘটনার মা… তাই দেখানো হয়েছে।

রবিনহুড জুনিয়র-এর গল্প … বাঞ্চক। একটি দুষ্ট লোকের হাত … তরুণী রাণীকে উদ্ধার করার রোমাঞ্চ… এ্যাডভেঞ্চার ছবিতে দেখানো হয়ে… এটিও বাচ্চারা উপভোগ করেছে।

সেদিক থেকে হেডলাইন হান… অনেকটাই নিরস। এদেশের শিশু দর্শক তেমন আকর্ষণ করেনি।

ভারতীয় ছবির মধ্যে 'চরণদাস … সবচেয়ে আকর্ষণীয়। গল্পটা কিঞ্চিৎ … তালে চললেও দুটি চোরের মজাদার … (ছোট চুরি থেকে ক্রমশ বড় চোরে রূ… পান্তরিত হওয়া); তার সঙ্গে ক্রমশ … সঙ্গে দর্শককেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া … লীলার তার কৃতিত্ব অবশ্যই শ্যাম বে… গালের। হিন্দী ভাষায় এমন উপভো… অথচ শিক্ষামূলক, সেই সঙ্গে কমপা… ছবি শিশুদের জন্যে খুব কম … হয়েছে। শেষের দিকে ফ্যান্টাসীর … আমদানীও সার্থক। বিশেষ করে … কল্পনাপ্রবণ মনের কাছে।

যাদু কা শঙ্খ সৎ প্রচেষ্টা, … চিলে হাতের … ছবি। তবে … শিশুর অভিনয় সুন্দর। এই ছবিতে অ… নয় করার জন্যেই শিশু নায়িকা নান্দ… আরস ১৯৭৫ সালে মসকো চলচ্চিত্র উৎ… সবে শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেত্রীর পুরস্কা… পায়। ছবিটির পরিচালক সাই পরাঞ্জপে…

নেকদিল যাদুগরনি-র গল্প হাল… কমেডির চালে। ছবিটির পরিচালক ভাক… লাভ ভরলিসেক। এই চেক রঙ্গিন ছবি হিন্দী ভাষায় ডাব করা হয়েছে।

এছাড়া কয়েকটি ছোট মাপের ছবি এই উৎসবে দেখানো হয়েছে।

গতবারের মত এবারের শিশু চল… চিত্র উৎসবের ছবিগুলির মান তে… উন্নত না হলেও উদ্যোক্তাদের প্র… প্রশংসনীয় অবশ্যই।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে
মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

শুক্রবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৩৮৩

Friday, 25th February, 1977

১৬ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা

আজকের সূচী

সম্পাদকীয়	৪	
সাহিত্য	৫	বৈকুণ্ঠ পাঠক
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা	৬	
কবি পরিচিতি	৭	পবিত্র মুখোপাধ্যায়
সমালোচনা	৭	শচীন দাশ
গ্রেট ম্যাগাজিন	৯	
মানুষ : বিজয়কুমার বসু	১০	শাণ্ডিল্য
কবিতা	১২	শোভন মহাপাত্র, শ্যামলকান্তি দাস, বিষ্ণু সামন্ত, মৃদুল দাশগুপ্ত এবং প্রমোদ বসু
চিঠিপত্র	১৩	
বাঘচক্রোত্তির সংসার	১৫	পিনাকী চট্টোপাধ্যায়
বেড়ালের কাণ্ড ও লোকটা (গল্প)	২৩	সমীরকান্তি বিশ্বাস
অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন	২৫	প্রণতা দে
বাংলা দেশে বাংলা ভাষা	৩৪	শিশিরকুমার দাশ
বুড়িগঙ্গা থেকে মেডিক্যাল কলেজ	৩৯	নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
পার্সিপোলিসের পথে	৪০	সবিতা ঘোষ
সমালোচনা তখন এবং এখন	৪৩	দিগ্বিজয় দিকপতি
আপনগন্ধা (উপন্যাস)	৪৮	দীপালী দত্ত রায়
ব্লু ফিল্ম (উপন্যাস)	৫২	অদ্রীশ বর্ধন
পুনশ্চ	৫৫	ক্ষপণক
কাসাই-এর তীরে টুসু ঠাকুর	৫৬	শান্তি সিংহ
ধামতোড়ি পার্বতীপুরের বিরিঞ্চি ঠাকুর	৫৬	তারাশিস মুখোপাধ্যায়
খেলাধুলা	৬০	দর্শক
তিন রাজ্যের রুই কাতলা ফুটবলার	৬১	রূপক সাহা
আয়নায় নিজেকে ভেঙচাই	৬২	
নয়ন : দারুণ ছবি	৬৩	শ্যামল চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ
সুবোধ দাশগুপ্ত
সহায়তায়
দিলীপ বসু

অঙ্গসজ্জা
সুবোধ দাশগুপ্ত
ধ্রুব রায়

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা

কলকাতা বইমেলার বিশেষ ক্রোড়পত্র

সত্তরের আরও পাঁচ কবি

আগামী সংখ্যায়

সুদীর্ঘ প্রচ্ছদ কাহিনী

বিপ্লবী চৈতন্যদেব

লিখেছেন

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ
শিশিরকুমার দাশ
প্রসূন মিত্র
মনোরঞ্জন বসু
প্রভাত মুখোপাধ্যায়
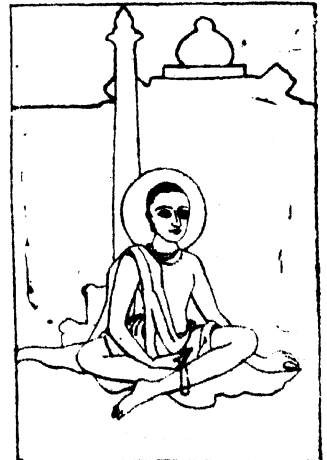
শিক্ষায় নতুন যুগ
নতুন দাবি

দেশের গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাই আজ এক যুগসন্ধির ভিতর দিয়ে পার হচ্ছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য আর উপায় নিয়ে নতুন চিন্তাই এই রাস্তা বদলের কারণ।

পুরনো ধাঁচের পাঠক্রমে যে কাজ হচ্ছিল না, এ এক সাধারণ অভিজ্ঞতা। পথ যখন লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় না হয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরতে থাকে, তখন ব্যর্থতা আসা খুবই স্বাভাবিক।

দেখা যাচ্ছিল, শিক্ষার ফলে এমন ছাত্রের সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে যারা জীবনযুদ্ধে অনুপযোগী। একে তো পাশের চেয়ে ফেলের হার বেশি, তার উপর সাধারণ শিক্ষার ধরণটাই ছিল এরকম যে, পাশ করলেও চাকরির দরজায় উমেদারি করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না। ইস্কুলের পয়লা পর্যায় থেকেই শিক্ষাটা হত পুঁথিগত। বইয়ের জ্ঞান হাতেনাতে প্রয়োগ করার সুযোগ প্রায় ছিল না বললেও চলে। নতুন শিক্ষানীতিতে তাই জোর দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে এই দিকটাতেই। পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রেরা যাতে কাজ শেখে, এবং তার ফলে শুধু কর্মদক্ষতা নয়, কর্মমুখীনতাও বাড়ে, তাদের নতুন শিক্ষাপদ্ধতির এই উদ্দেশ্যটি অবশ্যই অভিনন্দন পাওয়ার মত।

কিন্তু উদ্দেশ্যটি কাজে প্রয়োগ করতে গিয়ে বিশৃংখলা যতো কম ঘটে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। কেননা পরীক্ষার অন্তর্বর্তী কালে ছাত্ররা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে, সেটাও কম দুর্ভাগ্যের নয়।

দেখা যাচ্ছে বিশৃংখলার একটা বড় কারণ, পরীক্ষার ফল বেরোতে দেরি হওয়া। এতে কেবল যে ছাত্রদের পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছাতে অযথা দেরি হয়ে যায় তাই নয়, পড়ার আগ্রহ এবং উৎসাহও যায় নষ্ট হয়ে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষাপদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে তার গোটা দায়টিই ছাত্রদের কাঁধে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা। এবং পরিবর্তনকে কেবল পাঠক্রমের মধ্যে আটকে না রেখে শিক্ষক ও পরীক্ষকদের বেলাতেও প্রয়োগ করা উচিত ছিল কিনা।

একথা নিঃসন্দেহেই সত্য যে, পুরনো শিক্ষাদান পদ্ধতির মতো পুরনো পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিও কীটদষ্ট এবং অকেজো। কিন্তু শিক্ষাদানের ব্যাপারে যদিবা কিছু নতুন চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, পরীক্ষাগ্রহণ ব্যবস্থা এখনো কালাতিক্রমণ দোষে কিল্পষ্ট।

পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থাটি এমন হওয়া ভালো, যাতে ছাত্রদের সময় নষ্ট না হয় এবং শিক্ষার ব্যাপারে নিরুৎসাহ না দেখা দেয়। কেননা উদ্যমহীনতা এমন জিনিস যা মানুষকে অকেজো করে তোলে। অথচ নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য কিন্তু একেবারেই বিপরীত।

পরীক্ষকদের এবং পরীক্ষাগ্রহণকারী সমস্ত সংস্থাকেই সেজন্যে নতুন করে ভাবতে হবে। পরীক্ষাব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের কথাও শোনা যাচ্ছে ইদানীং। যেভাবেই হোক, সমাধানের পথ বার করতেই হবে। কেননা, দেশ আজ জাতির কাছে নতুন যুগের নতুন কর্মী চায়। সময়ের দাবি স্বীকার করে শিক্ষাব্যবস্থায় বদল ঘটানো হয়েছে, পরীক্ষাব্যবস্থাতেও রূপান্তর আনা দরকার।

খালি চোখে ৬০০০ নক্ষত্র

খালি চোখে ছ' হাজার তারা দেখা যায়। মানমন্দিরের দূরবীনে নিশ্চয় আরও বেশি দেখা যায়। সাপ্তাহিকের লেখা ছাঁটাই বাছাই করতে বসে একজন মানুষের পক্ষে কত শব্দ পড়া সম্ভব?

ঠিক একইভাবে আরো কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগছে।

একজন মানুষ সারাদিনে কত কথা বলতে পারে? আগন্তুক, লেখক, কবি যশোপ্রার্থীর সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর্ব চালাতে বসে একজন মানুষ সারাদিনে বাক-যন্ত্রকে কতটা পরিশ্রম করাতে পারে? বিশেষ করে দিনের পর দিন—ঘন্টার পর ঘন্টা—বাক্-বিনিময় যদি একই ধরনের হয়? যেমন—

বসুন। চা খাবেন?

আনুন। আমার গল্পটা দেখেছেন?

কোনটা?

গত শনিবার বিকেলে যেটা দিয়ে গেলাম।

কি নাম ছিল বলুন তো?

সময়ের নদী। ফুলস্কেপে আট পৃষ্ঠা। ছাপলে তিন পৃষ্ঠা জায়গা নেবে।

আচ্ছা পড়ে দেখবো।

দেখবেন কিন্তু। আমি কবে আসবো আবার?

মাসখানেক পরে আসুন।

বিকেলের দিকে?

তা আসতে পারেন।

[এই সময় বিবেক বলল: বৈকুণ্ঠ। কেন ভাই মিথ্যে ঘোরাচ্ছো? তোমার দফতরে বছরে অন্তত ৩০০০ গল্প জমা পড়ে। কবিতা জমা পড়ে বছরে অন্তত ১৫০০০। গল্প খুব বেশি বছরে ১০০টি ছাপতে পারবে। বছরে কবিতা ছাপা সম্ভব ৩০০। সত্যি কথা বলে দাও না।]

বিবেককে জবাব দেওয়ার সময় পাওয়া গেল না। এরই ভেতর ছাপাখানার টেলিফোন: বৈকুণ্ঠবাবু। সাঁইত্রিশ পাতায় একটা ডবল কলম পনর সি-এম বিজ্ঞাপন পড়েছে। তাহলে আপনার পাতা তো ভাঙতে হয়। ভাঙলে ওদিকে আবার এক কলমে আট সি এম ম্যাটার কম পড়ছে। তাড়াতাড়ি বলুন কি করব?

এরই ভেতর আরেকজন লেখক এলেন। গল্পটা ফেরৎ দিলেন কেন?

আমাদের কাগজের সঙ্গে মিলছে না। আরেকটি লেখা দিন।

এমন সময় আবার টেলিফোন। ধারাবাহিক ছাপবার মত আমার তিনখানি উপন্যাস আছে।

দু' বছরের ভেতর ছাপবার মত আমাদের উপন্যাস ঠিক হয়ে আছে।

তাহলে পুজো সংখ্যায় দিন।

টেলিফোন রেখে দিতে হল।

পাঁচজন তরুণের প্রবেশ। তাঁদের ভেতর একজন পকেট থেকে পাণ্ডুলিপি বের করলেন। আপনাকে একটু শুনতে হবে। ছোট কবিতা। ষোল লাইনের। ছাপুন বা না-ছাপুন—আপনার মতামত চাই।

এখন কি ভাই শোনার মত অবস্থা আছে? রেখে যান? পড়ে দেখবো।

আপনারা পড়েন না। না পড়েই ফেরৎ দেন। যদি পড়ে ফেরত দিতেন—তাহলে বলার কিছু ছিল না। আমাদের—দশকের কবিদের আপনারা একদম দেখছেনই না।

অনেক কথা একসঙ্গে মনে আসছিল। দশক। তারুণ্য। সৃষ্টি। অভিমান। ক্ষোভ।

অনবরত কথা বলতে হচ্ছিল। শুনতে হচ্ছিল। টেলিফোন ধরতে হচ্ছিল। যতই দিন শেষ হয়ে আসছিল—ততই মনে হচ্ছিল—তিনটি গল্প পড়া বাকি। সিনেমার কপির কাটাকুটি বাকি। আর্টিস্টের সঙ্গে কথা বলা হয়নি। কয়েকখানি চিঠি লেখা বাকি। কয়েকখানি চিঠির জবাব দিতে হবে। কাজের অদৃশ্য পাহাড়টা ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে।

বাকি আরও অনেক কিছু।

প্রফুল্ল রায়ের 'মানুষের জন্য' উপন্যাসটি নিয়ে রেখেছি। পড়া হয়নি।

অফিসের পর বড়বৌদিকে দেখতে যাওয়া দরকার। বৈকুণ্ঠ নিজে সামান্য কিছু লেখে। সেসব লেখার সুতো কতদিন হোল ছিঁড়ে গেছে। কোনদিন আর জোড়া দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অজিতেশের শের আফগান আজও দেখা হয়নি। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের নয়ন দেখতে পেলাম না। রেমন মার্কাস এসে চলে গেল। মেয়ে দুটোকে দেখাতে পারিনি। যদি সামনের বছর আবার আসে ওরা। ধরণীর কথা বাদ থাকলো। বাদ থাকলো—বাবার মাসিক শ্রাদ্ধের কথা। সামনের অমাবস্যা তিথিতে যদি তিন মাসের শ্রাদ্ধ একসঙ্গে করা যায়—

সুনীলের বাড়ি কতদিন যাই না।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বৈকুণ্ঠ এবার ওয়ালক্লকের দিকে তাকিয়ে ভাবলো—এখন আমি রাত সাড়ে সাতটা থেকে রাত আটটা অব্দি একা একা ভাববো। যেকোন একটা বিষয় নিয়ে। অমৃত কিসে আরও গভীর, গাঢ়, অভিনব হতে পারে।

আমরা স্বরূপনগর থেকে আসছি বৈকুণ্ঠদা।

ভালো কথা।

আসছে শনিবার বিকেলে ইছামতীর তীরে সভা। আমাদের দশকের কবিরা সবাই থাকবে। আপনি সভাপতি।

মাফ করুন ভাই। সভা করে সাহিত্যের ভেতর আমি নেই। মাইক হাতে নিয়ে শিল্প। পারবো না। কোন—সম্মেলনে কোনদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দলবেঁধে—ট্রেনে চড়ে।

আপনারাই তো আমাদের গড়ে পিটে তুলবেন।

না ভাই। দারোয়ানির কাজ করতে পারবো না।

তাহলে আমরা কি করে লিখবো?

কেন? বাড়িতে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে বালিশ দিয়ে। কিংবা টেবিলে। তারপর ডাকে কাগজের অফিসে পাঠাবেন।

ও তো আপনারা পড়ে দেখেন না। আমরা নেগলেকটেড দশকের কবি—গল্পকাররা—

সন্ধ্যেরাতে আকাশে তাকিয়েছেন কখনো?

হ্যাঁ। কতবার। কেন বৈকুণ্ঠদা?

কত তারা দেখতে পান?

গুনিনি তো কখনো।

কোন বইতে পড়েছিলাম—আমরা সন্ধ্যার আকাশে খালি চোখে একসঙ্গে ছ' হাজার তারা দেখতে পাই। আর বাইরেও কত লক্ষ তারা পড়ে থাকে। আমাদের দিগন্তে সব তারা ধরা পড়ে না। ওরাও কয়েক কোটি দশকের সৃষ্টি। ওদের কি হবে বলতে পারেন?

এ আপনি কি বলছেন বৈকুণ্ঠদা!! মানমন্দির আছে। দূরবীন আছে। নক্ষত্র-লোক সম্পর্কে বই আছে। তাই দিয়ে দিগন্তের বাইরের নক্ষত্রদের দেখতে হবে।

আমার কি আছে ভাই বলুন? আমি তো একজন সামান্য মানুষ। এসবের বাইরে আমার নিজেরও তো একটা জীবন আছে। জগৎ আছে। লেখা আছে। সামান্য কিছু ভালবাসা—

তাহলে আমাদের কি হবে বলুন? আমরাও লিখতে চাই। আপনার যদি সহানুভূতি না থাকে—

নিশ্চয় আছে। আপনারাও লিখুন। কিন্তু মনে রাখবেন—আমি একজন সাধারণ লোক। অতিকায় কিছু নই।

কি আর বলবো। দেখুন না আমাদের দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতার সমালোচনায় বেছে বেছে আমাদের কজনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

চল্লিশজন কবির ভেতর সবার নাম দেওয়া সম্ভব?

কিন্তু প্রধান প্রধান কবির নাম বাদ পড়ে গেল?

সমালোচকের স্বাধীনতা তো থাকবেই। আপনার বক্তব্য লিখে দিন। আমরা প্রকাশ করব।

সেটা খারাপ দেখায়।

তাহলে কি করব বলুন। আপনি চামড়া বাঁচিয়ে চলতে চাইছেন। আসলে আমরা সবাই যে খুবই অর্ডিনারি।

কথাটা বলে মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেল। ভাবছিলাম—সম্পাদনা মানে কি কোন সওদাগরি অফিসের জনসংযোগের কাজ? না, নিভৃতে বসে ধীরেসুস্থে পাণ্ডুলিপি থেকে লেখক, কবি, প্রাবন্ধিকের মনীষার সঙ্গে পরিচিত হতে হতে নিজেকে—আরও তরুণ আরও উজ্জ্বল করে তোলা?

বৈকুণ্ঠ পাঠক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা

দেখা হবে

দেখা হবে চৌরাস্তায় বুধবার বিকেল পাঁচটায়
অথবা যদি না যেতে পারি
দেখা হবে নদীতীরে বালার্ক উষায়
কামানের ঘোর শব্দ যখন জোয়ার-স্রোত ভাঙে
অথবা যদি না যেতে পারি
দেখা হবে স্কুল-পথে যেমন শৈশবে
বারবার দেখা হয়ে যেত
একটি চাহনি কিংবা দু' পলক হাসির ঝিলিক
দেখা হবে অশেষায়, পরাজিত ঘোর অবেলায়
দেখা হবে শৃংখলিত দিনে কিংবা নিকষ রাত্রিতে
অথবা যদি না যেতে পারি
যদি সব পথ জুড়ে খাড়া থাকে মৃত্যুর দারোগা
প্রলয়ের শেষে দেখা হবে।

ভালোবাসা

ভালোবাসা নয় স্তনের ওপরে দাঁত?
ভালোবাসা শুধু শ্রাবণের হা-হুতাশ?
ভালোবাসা আনে হৃদয় সমীপে আঁচ
ভালোবাসা মানে রক্ত চেটেছে বাঘ!

ভালোবাসা ছিল ঝর্ণার পাশে একা
সেতু নেই তবু অক্লেশ পারাপার
ভালোবাসা ছিল সোনালি ফসলে হাওয়া
ভালোবাসা ছিল ট্রেন লাইনের রোদ।

শরীর ফুরোয়, ঘামে ভেসে যায় বুক
অপর বাহুতে মাথা রেখে আসে ঘুম
ঘুমের ভিতরে বারবার বলি আমি
ভালোবাসাকেই ভালোবাসা দিয়ে যাবো।

তুমি আমি

গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে থাকে
তুমি আমি জমি কিনি, রবিবারে রুই মাছের মুড়ো
এসব দোষের নয়, আত্মসুখ কে না চায়, বলো?
যেখানেই যাও তুমি, গরীব ও ভিখিরির বড় আবর্জনা
তুমি আমি চলে যাই সমুদ্রে বা পাহাড়ে বেড়াতে
গরীব কোথায় নেই, গরীবেরা বীজাণুর মতো
মাঝে মাঝে ক্ষোভ হয়, মনে হয় কিছু করা যাক
তুমি আমি সভা করি, মিছিলে গর্জাই
বিমানের পেটে ঢুকে রাজধানী যাওয়া-আসা করি
গরীবেরও জীবনের দাম আছে, এ রকম সার সত্য বলে
নিজের জীবন বীমা মাসে মাসে সুরক্ষিত থাকে।
গরীবের কথা ভেবে মনে পড়ে, তোমার আমার
চেয়ে আরও কত বেশী ধনীরা রয়েছে, কেন, কেন?
আরও গায়ে জ্বালা ধরে, গরীবের জন্য দুঃখ বাড়ে
গরীবের নাম নিয়ে মদের টেবিলে ওঠে ঝড়।
গরীব না খেয়ে থাকে, গরীব রাস্তায় শুয়ে মরে
যেমন আপন মনে বহুকাল এমনই মরেছে
তুমি আমি কষ্ট পাই, কবিতায় খুব রেগে উঠি।

পঞ্চাশ বছর আগে বক্সায় এক আসর নিয়ে যে গল্প...

বাম নয়, কালবেলা, তোপ—তাঁর কয়েকটি গল্পের নাম

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

যদিও দশকবিভাজিত সাহিত্য গদ্যের ক্ষেত্রে কতটা প্রামাণ্য বলা মুশকিল তবুও এ-কথা অন্তত বলা যায় যে পঞ্চাশের দশকেই বাংলা ছোট গল্পে দেখা দিয়েছিল বিষয়-বৈচিত্র্য এবং রীতিনীতির নতুন পরীক্ষা। এর আগে যদিও আমরা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু বা বিমল করের মতন শক্তিমান গল্পকার প্রমুখের সন্ধান পেয়ে গেছি তবু বিভিন্নভাবে নানাদিক থেকে বিষয়কে বক্তব্যের গভীরে টেনে নিয়ে রচনাশৈলীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ছোট গল্পকে পঞ্চাশ দিয়েছেন আরও চারিত্রময়তা, করেছেন তাকে পুষ্ট, বাড়িয়েছেন তার সীমানা এবং শরীর। তাই একদিকে তাদের গল্পে যেমন কনটেন্টের সঙ্গে ফর্মের ঘটেছে মিশ্রণ আবার অন্যদিকে বক্তব্যের প্রয়োজনে গল্পকে আরও ধারাল করে এনেছেন তাতে বৈচিত্র্য—ফলত পঞ্চাশের দশকের ছোট গল্প তাই হয়ে উঠেছে এত নিরীক্ষাগামী।

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্প সংকলন পড়ে আমার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। সম্ভবত এটিই বরেনের এ-পর্যন্ত একটি নির্ভরযোগ্য গল্প-সংকলন অন্তত যেখানে দাঁড়িয়ে গল্পকার বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হয় না। বরং খুব তাড়াতাড়িই ধরে ফেলা যায় তাঁর নিজস্ব জগতের চেহারাটা বা কিনা বক্তব্যের গভীর ও রচনারীতিতে উজ্জ্বল।

এক-একজন লেখক আছেন যথেষ্ট ক্ষমতাবান হয়েও যারা প্রায় অনুচ্চারিত থাকেন। আর এ সব ব্যাপার শুধু এদেশেই সম্ভব—কেননা প্রথমত যেহেতু তাদের বিচরণ সমস্ত রকম গতানুগতিকতার বাইরে, আর দ্বিতীয়ত প্রচারের অভাব; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা থাকেন তাঁদের রচনার কাছে নিবেদিত—পারেন না সরে আসতে তাঁর সৎ ও বলিষ্ঠ রাস্তা ছেড়ে সহজের দিকে। হতে পারেন না তাই সহজ ও সস্তা—নিজস্ব পথ ধরেই তিনি এগোতে থাকেন। ভাঙেন, নিজেকে বিশ্লেষণ করেন, তাই তাঁর রচনায় এসে যায় নতুন নতুন কথা, বিষয়বৈচিত্র্য ও বক্তব্যের গভীরতা।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় সম্পর্কে আমার এই রকমই ধারণা। অন্তত তাঁর গল্প পড়তে পড়তে এই ধারণাটা পুষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি গল্পের প্রয়োজনে গল্পকে না এনে বক্তব্যের প্রয়োজনে তার গল্পে বিষয় এসে যায়। এবং শেষ

একালের বাংলা গল্প ॥ বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ॥ রামায়নী প্রকাশ ভবন, ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৯ ॥ মূল্য : ষোল টাকা।

জন্ম—১৯৩৪ পেশা—সাংবাদিকতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চাশ দশকের কোনো কবির কবিতা যদি তারুণ্যের সর্তহীন অভিনন্দন লাভ করে থাকে, এবং যাঁর অসংখ্য ধ্রুপংক্তি বহু ব্যবহারে অতিপরিচিতি লাভ করে থাকে, তাছাড়া যদি কোন একজন মাত্র কবিরও নাম করা যায় যাঁর লেখার উৎকর্ষ অপকর্ষের বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে একদল উত্তরসূরীর উপর, তবে সেই নাম নিঃসন্দেহে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সুনীল সব সময়েই তরুণ, লেখায় ও চরিত্রে, ফলত তাঁর রচনা গত দেড়দশকের তারুণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে; বলা যায় নাগরিক মানসিকতার, বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়ের উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, আনন্দ উচ্ছাস যেমনভাবে বুঝতে পেরেছেন, কোন ছদ্মবেশ ধারণ না করে তাকে আন্তরিক আলাপচারিতার স্পষ্টতার কবিতায় শব্দবন্ধ করেছেন তিনি। প্রেম ও বিষন্নতা তাঁর কবিতার মৌল উৎস, অতীতের প্রতি নিবিড় মমতা, ছেলেবেলার স্মৃতি জড়ানো অতীত, বয়ঃসন্ধির উদ্দীপনা, রোমান্স সুনীলের কবিতাকে সহজেই আপন করে নিতে প্রলুব্ধ করে; বলা যায়, সব অর্থেই গৌরবান্বিত প্রেমের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর লেখার স্টাইল ঋজু, স্বচ্ছ, স্পষ্টবাদী; একজন সুশিক্ষিত নাগরিক যুবকের তরতাজা স্মার্টনেস সর্বত্র উপস্থিত; ফলত তরুণ বয়সের পাঠক ও কবিযশপ্রার্থী তাকে আপন ও অনুকরণযোগ্য বলে চিনে নিতে পারেন সহজেই; এই জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান; যদিও সবটাই কবিতার জন্যে নয়; গদ্য লেখক সুনীল সর্বস্তরের পাঠকের আলোচ্য; তবু তিনি মূলত কবিই এবং একালের অন্যতম প্রধান কবিও বটে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সাপের সঙ্গে সহবাস... সোনার ঘড়ি... দ্রৌপদী...

পর্যন্ত বক্তব্যের ভারে কিন্তু গল্প শুধুমাত্র বক্তব্য-ধর্মী হয়ে ওঠে না। এখানেই বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্বতা।

মোট উনিশটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্পগ্রন্থ। কিন্তু প্রতিটি গল্প এবং তার চরিত্রই এখানে আলাদা। যেন একটার সঙ্গে আর একটা মেলে না—কিন্তু সব গল্পগুলোতেই খুঁজে পাওয়া যায় গল্পকারকে।

বস্তুত একটা আইডিয়া বা ভাবনাকে রূপ দেবার জন্যই বরেন বেছে নিয়েছিলেন এত বিচিত্র চরিত্র—গ্রাম-গঞ্জ, শহর-শহরতলীর মানুষজনকে। নদী-জল-আকাশ-মাটিকে যেমন আলাদা করে দেখাতে বরেন বিশ্বাস করেন না তেমনি করেন না গল্পের জন্যই শুধু গল্পই তৈরি করা। অন্তত 'বজরা', 'তোপ', 'জুয়া', 'ব্যাঘনখ', 'কালবেলা', 'দধীচির হাড়, সনাক্তকরণ, সহবাস, জব চার্ণকের কলকাতা, বলিছে সোনার ঘড়ি', আলোচ্য সংকলনের এই গল্পগুলোই সেকথা প্রমাণ করে।

পঞ্চাশ বছর আগে যে বজরায় বাঈজীর জলসা আর মদের আসর বসাতেন ছোটকর্তা। বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তি করতেন; আবার ওই বজরা থেকেই প্রয়োজনে রাজ্যশাসন করতেন—পঞ্চাশ বছর পরেও কিন্তু দেশকাল মানুষের পরিবর্তন হলেও ওই বজরার ভূমিকাটা বদলে যায় নি। এখন আর সেই বাঈজীরা নেই সত্যি কিন্তু এখনো বাবা তার মেয়ের আঁচলে মদের বোতল গুঁজে ভেট পাঠান বজরার উদ্দেশ্যে। বক্তব্য ও বিষয়বৈচিত্র্যে নতুন হলেও 'বজরা' গল্পটি একটু যেন ফ্ল্যাট।

কিন্তু 'দধীচির হাড়' বা তোপ গল্পে এসে কিন্তু বরেনের কলম ভয়ংকর শাণিত ও তীক্ষ্ণ। 'দধীচির হাড়' একটা মৃতদেহ আর একটি রূপোলী মাছের গল্প। মৃতদেহটা কে বা কারা বস্তায় ভরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। মাছটি খাদ্যের সন্ধান পেয়ে তার ভেতরে ঢুকে পড়ে। এর পর শুরু হয় এদের দুজনের বেঁচে থাকার রহস্য নিয়ে গল্প। মৃতদেহ মাছটাকে বলেছিল, পালিয়ে যাও। এখানে থেকো না। এ এক বন্দীশালা। কিন্তু রূপোলী মাছ তখন কেবল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল, হে ঈশ্বর আমাকে অফুরন্ত আয়ু দাও। যেন যুগ যুগ ধরে এই খাদ্যসামগ্রী খেয়ে শেষ করে যেতে পারি। কিন্তু মাছ তা পারল না। যে পথ দিয়ে সে প্রবেশ করেছিল সেই রাস্তাটাই সে ফেলে-ছিল হারিয়ে। ফলত চড়ায় আটকে যখন সেই মৃতদেহসহ মাছটিও গেল মরে আর আস্তে আস্তে একদিন মৃতদেহের পবনে সার ছড়িয়ে পড়ল চড়ায় তখন গল্পকার দেখালেন যদি একদিন কেউ এসে দেখে সেই চড়ায় ফুটেছে ফুল জন্মেছে উদ্ভিদ তবে কি সে চিনতে পারবে এ ফুলের ইতিহাস কি!

'সনাক্তকরণ' বা 'সহবাস' বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের দুঃসাহসিক গল্প। কাল্পনিক একটি সাপের সঙ্গে সহবাস করে যে যুবকটি সারাটা রাত দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে ভোরবেলা ঘুম ভেঙেই সে দেখে তারই ঘাম দিয়ে আঁকা বিকৃত একটি মানুষের ছাপ তার সারা বিছানায়। 'সহবাস' গল্পের এই কাল্পনিক সাপ আর যুবকটিকে চিনতে আমাদের কোন অসুবিধেই হয় না।

এছাড়া আছে 'বলিছে সোনার ঘড়ি', 'দ্রৌপদী, 'নাগরদোলা' বা 'কানি বোষ্টমীর গঙ্গাযাত্রা'-র মত অসংখ্য উজ্জ্বল গল্প, যেগুলো পড়া মাত্রই আমাদের নাড়া দেয়, চিনিয়ে দেয়, দেখায়, দেখিয়েও দেয় আমাদের। আমরা তাই পড়ি। আর পড়তে পড়তে একান্ত গোপনেই কখন যে বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের ঘনিষ্ঠ পাঠক হয়ে পড়ি নিজেরাও বুঝতে পারি না।

শচীন দাশ

বই মেলায়

শাস্ত্র বিরোধীরা

এবার বঙ্গ সাংস্কৃতি সম্মেলনের বই মেলায় দর্শকদের মণ্ডপের উত্তর দরজার কাছে একবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। কেননা সেখানেই ছিল শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্যের স্টল। দেওয়ালে টাঙানো বাজে কাগজের ঝুড়িতে লাগানো ছিল দুটি পোস্টার, যাতে লেখা ছিল আমরা শাস্ত্র বিরোধী এবং শাস্ত্র বিরোধিতার বিরোধী। স্টলে প্রায় দিনই বিতর্কের ঝড় রয়েছে। জিজ্ঞাসু দর্শক প্রশ্ন করেছেন, শাস্ত্র বিরোধী সাহিত্য কোন কোন শাস্ত্রের বিরোধী এমনি সব আরও প্রশ্ন। শাস্ত্র বিরোধীরা তার উত্তর দিতে গি আলোচনা শুরু করেছেন। শাস্ত্রবিরোধী স্টলের চারপাশ জমজমাট উৎসাহী দর্শকে হয়েছে। পাশাপাশি এক বনেদী প্রকাশকের স্টলে খ্যাতিমান উপন্যাসিকরা নিজের অটোগ্রাফ দিয়ে বই বিক্রী করেছেন। পাঠকদের কাছাকাছি হয়েছেন।

ছবিতে শেখর বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, পরেশ মণ্ডল। আর অন্যরা

শাস্ত্রবিরোধী স্টলের বাণিজ্যও কম নয়। এই দশকের নতুন পুরনো সব সংখ্যাই শেষ। শেষ ঈগল গল্প এবং চোখ পত্রিকার শেষ সংখ্যাগুলি শাস্ত্রবিরোধী এক লেখকের রিপোর্ট উপন্যাস-গল্প গ্রন্থের বিক্রীও ভালো।

আসলে

গ্রেট ম্যাগাজিন

বাংলা লিটল ম্যাগাজিন প্রকৃত অর্থে লিটল নয়, গ্রেট,
তাদের স্বার্থত্যাগে, ভালবাসায় এবং সাহিত্যের প্রতি প্রবল টানে
বলেছেন শীর্ষবিন্দুর দীর্ঘলোচন। বর্তমান দশকের
আলটিমেট কবি আবদুর রহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ— দুরন্ত —
তমসা পোহায়-এর ৬২টি কবিতা পড়তে হলে ধান কন্যার
দেশে যোগাযোগ করুন—ডাক ঃ ছয়ঘরি....

আমাদের পাবলিক ইউরিনালের দেওয়ালে যত খারাপ কথা লেখা হয়—সংখ্যায় তার চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি সাহিত্যের কথা বুকে নিয়ে আমাদের গ্রেট ম্যাগাজিনগুলো বেরিয়ে আসছে। শুধু এ জন্যেই মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত।

এমন আরও অনেক। বেশ কয়েক হাজার গ্রেট ম্যাগাজিন সারা দেশের তাজা শক্তি, সাহিত্য প্রীতির জোরে প্রকাশিত হচ্ছে। সে সব থেকে কয়েকটি উধৃতি—

যেন চেনা বন্দী চেনা কারাগার।

শংকর চট্টোপাধ্যায়

জন্ম মুহূর্তেই সব ঠিকঠাক হয়ে যায় কার কি গায়ের রঙ, চোখ, নাক, চুলের বাহার—

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

মরাল গ্রীবার মতো বেঁকে ওঠে বেলা ক্রমশঃ পশ্চিমে।

স্বপন মণ্ডল

নদীহীনতায় ভুগছে যে পাহাড়, তুমি তাকে কি দেবে? সহাস্য আঁচল।

প্রভাত সাহা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথা অস্বীকার করা যায় না ঃ বিনা ডিমে যেমন ওমলেট হয় না, তেমনি কাব্যগুণ না থাকলে কবিতা হয় না।

*

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি ফকনারকে যিনি বলেছিলেন, ' লেখকদের আমি বিচার করি অসম্ভবকে ধরতে গিয়ে তাঁদের মহৎ বিফলতার ভিত্তিতে।'

অশোককুমার ভট্টাচার্য

প্রবাসী মেয়ের আশায় বিষণ্ণ অর্জুন।

সমীরণ ঘোষ

ভেঙে ফেলি আয়না, কাপ-ডিস, সংসার।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

এবং সম্পাদক হিসেবে আপনি পূর্ণ অসার্থক। সম্পাদনা ভয়ংকর অসহজ কাজ। সবাই পারে না।....প্রথম সংখ্যার আবির্ভাব আমার কাছে অতি-সাধারণ ঠেকেছে। কল্যাণবাবু, খুব সাবধানে পা ফেলুন। 'কবি' নাম কেনার লোভে একদল লোভী যুবক

তাদের লোভের জিভ আরো চওড়া করবে।

শর্মিষ্ঠা মজুমদার

আমার প্রণয়ীকে ভালো বাসে, আমি তার মৃতদেহ ভালবাসি।

*

ঝোপানো লেবু গাছের নীচে জমে থাকা কিছু মেদুর শৈশব

*

আর্দ্রতা-কাতর ঘাস লুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

কল্যাণ ভৌমিক

আমার দু চোখ তোমার প্রতীক্ষা করতে করতে রাস্তার পাথর হয়ে পড়ে আছে।

সৈয়দ মোহম্মদ জায়্যাদ

পৃথিবী ঐতিহাসিক ক্ষত স্থানে মলম লাগাও।

রাণা সেনগুপ্ত

তখন বৃক্ষের ছায়া দীর্ঘতর জনহীন পথের ওপরে।

ঊর্ধেন্দু দাশ

একটি ভৌতিক ট্রাম গাড়ীর শব্দ তোমাকে নিয়ে যায় হাইকোর্ট ছাড়িয়ে, মহাশূন্যে।

জমিল সৈয়দ

করুণা কুয়াশা ভেঙে ছোটবাবু বেরিয়ে আসুন।

বাসুদেব দেব

তোমার ভবিষ্যৎ নেই, দুঃখবোধ নেই বৈরাগ্য নেই।

স্বপোন সরকার

বোমা-বাঁধা সাড়াশির মত শক্ত ভয়ংকর আঙুলগুলোকে দিতাম জন্মের মত থেঁতলে।

যদুপতি মল্লিক

শেয়ালের মহান প্রতিভা জেগে নেই। ভেবে দ্যাখো কি রকম মৃত্যুতে সাজানো দিন, খাঁ খাঁ ফাঁকা ছিল কোজাগরী, প্রেম নেই, পূজা নেই, পরিতাপ নেই—

শ্যামলকান্তি দাশ

ঘরের ভেতর তার খুচরো দিন খারাপ।

হুসেন আহমদ নূরী

যেমন বেদনার নিজস্ব কোন বেদনা নেই।

পূর্ণেন্দু পত্রী

মেলে নিতো উরু স্বালে স্বালে।
যন্ত্রণাটি ফুল-ছরি লেপ্টেছি।
বুকেরও সেই যুগল-গোলাপ॥

দেবাশিস মিত্র

মানুষ

—শুধু সাংহাইয়েই তিনহাজার চোর ছিল
—বিজয়কুমার বসু

শাণ্ডিল্য
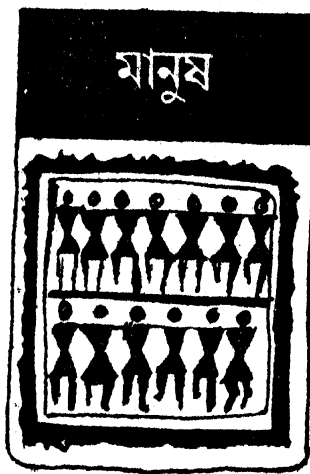
—আশী কোটি মানুষের দেশ চীনে আকুপাংচার প্রায় সব রোগ সারিয়ে দিচ্ছে। আপনারা এতদিন ধরে এ পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন , এবং তা প্রচার যে হয়নি তাও নয় অথচ দেখুন, যে জনপ্রিয়তা পাওয়া উচিত ছিল, তা কি হয়েছে ? আপনি কি বলেন ডঃ বোস। সম্প্রতি চীন সরকারের আমন্ত্রণে কোটনিশ মেমোরিয়াল হলের উদ্বোধন উপলক্ষে যে ভারতীয় মিশন চীন সফরে গিয়েছিলেন, তার দলনেতা আকুপাংচার বিশেষজ্ঞ ডঃ বিজয় বসুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

ঃ সেরকম জনপ্রিয় না হলেও খুব যে কম তাও বলা চলে না। এখন এ্যাতো রুগী আসতে শুরু করেছে যে আমার একার পক্ষে সব কিছু দেখা সম্ভব হচ্ছে না, ফলে ভারতের নানা জায়গায় কেন্দ্র খুলতে হয়েছে।— সবশুদ্ধ কটা কেন্দ্র হবে ? —তা ২৫।২৬ টাতো হবেই। এক একটা সেন্টার খোলার জন্যে খরচ-খরচা আছে, এ্যাতো টাকা জোগাড় হোলো কথ্ থেকে ? কোনো বিদেশী সাহায্য-টাহায্য ? —না না, একেবারেই নয়, আমরা সেন্টার খুলি এই চিকিৎসায় উৎসাহী স্থানীয় জনসাধারণের ইচ্ছে থেকে। তাঁরা তাদের এলাকার নির্বাচিত ডাকতারদের আমাদের কাছে পাঠান, আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে আবার সেখানে পাঠিয়ে দিই। আচ্ছা—তাদের কি মাওবাদী হতে হবে ? এটা ঠিক ?

ঃ না—তো।

—তাঁরা কি নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ?

ঃ তাও, না।

—এদের মধ্যে কি কেউ জেল ফেরত কমরেড ? আছেন ?

ঃ একদমই না। একটা ব্যাপারে আপনি ভুল করছেন এটা এখানকার ঘটনা। এ ব্যাপারে কোনো দেশই সরাসরি যোগা-যোগ রাখতে পারে না। তাছাড়া এটা হোলো উদ্বুদ্ধ হওয়ার ব্যাপার। মাও বাদ বলে কোনো নির্দিষ্ট নাম চীনে চালু নেই, আসলে মার্কসবাদ আর লেনিন বাদই মাও সে তুঙের চিন্তাধারায় মানে থটস অফ মাও সে তুঙ-এ পরিশীলিত হয়ে যেভাবে এসেছে, দেশের মানুষ তাই-ই গ্রহণ করেছে। এ চিন্তাধারায় অনেকেই অনুপ্রাণিত হতে পারেন। আর আকু-পাংচারের জনপ্রিয়তার একটা কারণ হোল এ চিকিৎসা হল ওরিয়েন্টাল মেডিসিনের সঙ্গে ওয়েস্টার্ণ মেডিসিনের যোগ সাধন এদেশে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি বাত বা নার্ভ জাতীয় অসুখে এ চিকিৎসা ভালো কাজ দেয়, তাই এই সাফল্য মহান কোটনিশের নামে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্র খুলতে সাহায্য করেছে। এর সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যের সম্পর্ক নেই।

—চীন ঘুরে এলেন। একেবারে হাল আমলের চীন কেমন লাগলো ? —ভালো এবার গিয়ে মানুষের পোষাক-আষাকের উজ্জ্বলতা একটু বেশী চোখে পড়লো। আমার তো এই নিয়ে চারবার ঘোরা হোলো। গতবারে ইউয়ানের দর আমাদের ভারতীয় টাকা হিসেবে দু টাকা ছিল। এবার গিয়ে দেখলাম ও। সাড়ে চার টাকা। ডলারেরও বেশী টাকার দর পড়ে গেছে। ও দেশ কতটা উন্নতি করেছে এটা বোঝা যায়।

—এবার গিয়ে মাও আমলের পুরনো বন্ধুদের কেমন দেখলেন।

ঃ আপনি যা মিন করছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই বলি—এবার সফরে যাবার আগে মারামারি কাটাকাটি বা অশান্ত চীন কিভাবে আমাদের নেবে সে নিয়ে যে সন্দেহ ছিল না তা নয় কিন্তু গিয়ে দেখলাম তার ঠিক উল্টো। ৮০ কোটি মানুষের মনে যে কি উল্লাস সারা চীন ঘুরে শ্রমিক কৃষক, শিক্ষক যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারাই দেখেছি 'গ্যাং অব ফোর' চক্রান্তকারীদের দমনে উৎফুল্ল। সারা দেশ এ্যাতো খুশি হয়েছিল যে চার-পাঁচদিন ধরে প্রবিশন স্টোরের একটাও মদের বোতল ছিল না।

—জানলেন কি করে ?

ঃ এবারে চীনের দু নম্বর মার্শাল ইয়ে চি লিঙ আমাদের জন্যে যে পার্টি দিয়ে-ছিলেন সেখানে হান জিং লুং আমাদের বলেছিলেন।

—ওখানেও কি মদ্যপানের ব্যবস্থা ছিল ?

ঃ হ্যাঁ, আমরাও টেস্ট করেছি।

ওখানে বারের সংখ্যা কেমন ?

ঃ চীনে কোনো বার নেই আলাদা কোনো ওয়াইন শপ নেই যা পাওয়া যায় ওদের অন্যান্য জিনিসপত্রের পাশে কোনো কোনো প্রবিশন স্টোরে। বড় বড় হোটেল ছাড়া রাস্তাঘাটে রেস্তোরায় ড্রিংকের ব্যবস্থা নেই।

—চীনে তো চোরও নেই শুনেছি।

ঃ কে বললো নেই ?

কেন, আপনাদের মিশনের মৈত্রেয়ী দেবী।

—উনি যে কি করে একথা বললেন জানি না, আমরা সাংহাইয়ে সেন্ট্রাল জেল দেখতে গিয়েছিলাম এই জেলেইতো তিন হাজার চোর ছিল।

—মাও পরিবারের সঙ্গে কখনো আপনার আলাপ হয়েছিলো ? —শুধু আলাপ বললে ভুল হবে পারিবারিক বন্ধু হিসেবে মিশে গিয়েছিলাম সেই ১৯৩৯ সালে ওদের মুক্তি যুদ্ধের সময়। মাও তখন স্টেজের সুন্দরী অভিনেত্রী চিয়াং চিকে সদ্য বিয়ে করেছেন। চিয়াংকে দেখে-ছিলাম সাজতে ভালবাসতেম। —পাশে বিদেশী রুজ বা ঠোঁটে লিপস্টিক ছিল ? হয়তো ছিল সেটা ঠিক খেয়াল করে দেখিনি। ক্লাবে গিয়ে গান-বাজনা করতে ভালবাসতেন। আমাদের রান্না করেও খাইয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন তখন কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখে আমাদের এক-বারও মনে হয়নি উনি কালচারাল মুভমেন্টের একজন প্রথম সারির নেতা হতে পারেন। কারণ চীনের নেতাদের ইতিহাস হোলো সংগ্রামের ইতিহাস। লং মার্চ থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপেই যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে স্ট্রাগলের মধ্য দিয়ে নেতারা

বিজয়কুমার বসু

প্রথম সারিতে এসে বসেছিলেন সেরকম স্ট্রাগল চিয়াং চিং কখনোও ছিল না, অথচ কালচারাল মুভমেন্ট হবার পরেই ভদ্রমহিলা সরাসরি ফোর ফ্রন্টে চলে এলেন। চীনের জনগণের নেতা ঠিক এভাবে হওয়া যায় না।

—মাও কি রকম খাদ্য খেতেন, মানে চিলি খুব।

এটাতো ঠিক খেয়াল করিনি, তবে আমাদের সঙ্গে উনি খেয়েছেন সেটা ১৯৩৯-র সময়, মানে মুক্তি যুদ্ধের সময়। তখন মাও-এর খাবারের টেবিলে ও'র বরাদ্দ ছিল—কাবেজ স্যুপ তার মধ্যে কখনো-সখনো একটুকরো মাংস থাকতো, কখনো বা থাকতো না, আর বিন-কার্ড, আমাদের এখানে খানিকটা ছানার মতো দেখতে আর থাকতো মিলেট। মিলেটই একমাত্র খাবার: মাও বলতেন—মিলেট আর গান (বন্দুক) নিয়েই আমাদের সংগ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর আবার গেলাম চীনে উনিশশো সাতান্নয়। সেখানে পার্টির বার্ষিক জমায়েতে মাও হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন বাসু, তোমাকে চিনতে পেরেছি, তোমাদের কন্ট্রিবিউশন আমরা কখনো ভুলবো না। তোমরা কোটিনিশের দেশের মানুষ চীনের বন্ধু। মাও আমাদের ভারতীয় কোনো নেতাদের কথা জিজ্ঞেস করতেন না?—নেহরুজীর কথা মাও জিজ্ঞেস করতেন। আর আমাদের কম্যুনিষ্ট লীডারদের কথা?

—না, সেরকম কথা খুব একটা শুনিনি কারণ ইণ্ডিয়ান কম্যুনিজমকে মাও খানিকটা পুঁথিগত বলে আখ্যা দিয়েছেন, জনজীবনের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে নেমে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যে কম্যুনিজম ছড়িয়ে পড়ার কথা, এদেশে এটা ঠিক ঠিকভাবে ঘটেনি। খানিকটা চেয়ারের হাতলে হাত দিয়ে পার্টি করা।

—মাওকে দেখে আপনার কেমন লেগেছিল?

: যা লিখেছিলাম, সেকথা এবার গিয়ে দেখি কোটনিশ মেমোরিয়াল হলে খোদাই করা আছে। বলেছিলাম—'এনি কান্ট্রি উইল বি প্রাউড অফ লীডার লাইক মাও।'

আচ্ছা ডঃ বসু, সংগ্রাম বিষয়ক দুটো জনপ্রিয় বইয়ের কথা আমি জানি একটার নাম গীতা আরেকটি রেডবুক। দুটি জাতকেই উদ্বুদ্ধ করেছে বই দুটো। একটা নানা ভাষায় অনুবাদ হয়ে হাজার বছর পরেও হাজার হাজার কপি বিক্রি, সেই তুলনায় রেডবুকের প্রচার কত কম...। কথা থামিয়েই ডঃ বসু বললেন একটা কথা ভুলে যাবেন না, আজকাল চীনে রেডবুক খুব একটা কেউ পড়েন না। —তার কারণ? তার একটা মাত্র কারণ শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে চীনের সাধারণ মানুষেরা আজকাল ক্লাসিক মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের দিকে ঝুঁকেছে। এবার কমিউনে গিয়ে দেখি যে সব বই দেখে আমরা ঘাবড়ে যাই সে সব বই সাধারণ কৃষক শ্রমিক স্টাডি করছে ডায়লেকটিক থিয়োরী নিয়ে গভীরভাবে তাত্ত্বিক আলোচনা করছে। এর কাছে রেডবুক ছেলেখেলা। বৃহত্তর জনসাধারণের জন্যে গোটা মার্কসকে ছেঁকে মাও তৈরী করেছিলেন রেডবুক। যাতে পার্টির মানসিকতা এবং মার্কসিজমের আউট লাইনটা আত্মস্থ করে কমরেডরা পার্টির কাজে মনসংযোগ করতে পারে। মাও সে তুঙের পদ্ধতিই হোলো মাস লাইন। আর ধর্মীয় বই বা ধর্মের কথা বলছেন? বিলিজিয়ান হোলো ওপিয়াম অফ দি পিপল। এক কালের ধর্মীয় দেবতা কনফুসিয়াসের সম্বন্ধে সম্প্রতি চীনে নতুন আলোকপাত করে বলা হচ্ছে যে ধর্মীয় স্বার্থে শোষক শ্রেণীর স্বার্থে জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্যে দেবতার প্রচার। ভারতের মনু বা মনুসংহিতার সম্বন্ধেও বলা যায় একথা। শোষিত সমাজের বুকের উপর ধর্মের ভিত্তি রেখে বেশ কিছুকাল সময়টাকে বাড়িয়ে নেওয়া চলে।

—ভারতবর্ষে এখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা চলেছে। এ সম্বন্ধে ওদেশের জনগণ বা নেতাদের কি ধারণা। —গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওদের অন্য একটা ধারণা। এই বিশাল ইতিহাসে চীন ভারতের যুদ্ধকে ওরা কোনো ঘটনা বলেই মনে করে না। ও'রা বলেন—পৃথিবীটা ভাগ করার জন্য দুটো সুপার পাওয়ার কাজ করছে। তারা বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা হরণ করার চেষ্টা করছে। এখন উচিৎ তৃতীয় শক্তিকে শক্তি বৃদ্ধি করা। এই তৃতীয় শক্তি হোলো আফ্রিকা এশিয়ার দেশ। এরাই এখন থার্ড পাওয়ার। এই বৃহৎ শক্তির এখন জোটবদ্ধ হওয়া উচিত। ইণ্ডিয়া শুড জয়েন উইথ থার্ড পাওয়ার।

এত কোটি মানুষের চীনে পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই। নিশ্চয়ই আছে, তবে আমাদের মতো রেডিও কাগজের প্রথম পাতা বা রাস্তায় হোর্ডিং-ও নেই। ওরা মুখে মুখে উইমেন অর্গাইজেশনের মাধ্যমে বা গ্রামের পথে পায়ে হাঁটা ডাকতারের মাধ্যমে। তারাই এ বিষয়ে পরামর্শ গৃহস্থ চাষী শ্রমিককে দিয়ে আসেন। চীনে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখেছি—যে সিদ্ধান্ত পার্টিতে নেওয়া হোল সেটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঁচু থেকে নীচের ঘাস পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়ার কি নিপুণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অনুন্নত সম্প্রদায়কে ধরা নেই কারণ মুক্তি যুদ্ধের আগে শোষক শ্রেণী তাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো।

—কবিতা লেখেন শুনলাম।

: কে মাও?

—না, আপনি।

: আমি? না একেবারেই না। ভুল শুনেছেন।

: ফিল্ম-টিল্ম?

খুব একটা নয় তবে সত্যজিৎ, মৃণাল সেনের ছবি এলে দেখি। —প্রিয় কে?

: দুজনেই।

বয়স

শোভন মহাপাত্র

বয়স ছিল তখন একটু আমার
সাপিনী তার বাঁশীতে সেই ফুঁ দিয়েছে যেই
পাথর থেকে হীরের টুকরো কুড়াতে কেউ নেই
তখন থেকেই জল নিচ্ছি আস্তে
মুখ ঝাড়িয়ে শান দিচ্ছি রুপোর বাঁকা কাস্তের
এমনি যেন দৌড়াতে ভাল্লাগে
ধুলো উড়লে চোখের জ্বালা ব্যথাটা আজ লাগে।

বয়স ছিল তখন একটু আমার
চাঁদের আলোয় হাত ছুঁয়েছি, কুয়াশাতে মুখ ডুবেছে
তখন কথা ছিল না মেঘ নামার
তখন থেকে বৃষ্টিতে চোখ রাখি
বৃষ্টিতে চোখ রাখি
অল্প একটু অভিমানে ঝাপসা হতে থাকি
তখন থেকেই আঁচপোড়া সেই ছেলে
ধুলো উড়ায় তুলা উড়ায় আকাশে হাত তোলে।

সত্তরের সাতটি বছর অতিক্রান্ত

আমার গল্প

শ্যামলকান্তি দাশ

দেহের আঠায় দেহ জড়িয়ে আসছে
একটু একটু নুনের কাপটা লাগছে ঠোঁটে
সরে আসছে আরো গভীর গাছের তৃপ্তি
পাথর, প্রিয় আমার, এবার তোলো তোমার কুঠার
সোমরস, প্রভু আমার, এবার খোলো তোমার বন
আমি অমোঘ একটা মানুষ এইবার তোমাদের দিকে
ছড়িয়ে দিতে চাইছি আমার জীবনবীজ
আর মেঘ থেকে এখন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে
আরেকটা মেঘ, কম কথায় এখন কী গভীর রাত্রি
ভগবান আরশোলার মতন কামড়ে আছেন কড়িকাঠ
পাখি হয়ে আকাশে উড়ছেন

জল, ওগো স্বাদু জলের রানী, আস্তে, আস্তে
বিকশিত হোক এবার তোমার পেশোয়াজ
আমি এখন ভিতরে যাওয়ার জন্যই এত সহজ।

নারী ও প্রেমিকা

বিষ্ণু সামন্ত

ভেজানো দরোজা ঠেলে ফুরুৎ ফুরুৎ আসে পাখি
বস্তুত একটি পাখি দুটি হয়ে ঢোকে,
এসো বসো, এতক্ষণে তুমি এলে নাকি
এত কেন আভরণ এত কেন ছল
কিসের কাজল দুই চোখে?...
এভাবে আটকে থাকি দর্শনের জালে
অন্য পাখি উড়ে যায় অন্যমনে চোখের আড়ালে।
হাতছানি মানে না সে

জানি না কোথায় বসে বিভূতি-তিলক ভালে আঁকে—
নারী আসে প্রেমিকা আসে না।
প্রেমিকা সমস্ত দিন গেরুয়া বসন প'রে
স্বপ্ন-জানালায় জেগে থাকে।

ভাঙো

মৃদুল দাশগুপ্ত

খোঁজো, কারণ তা-ই সাধনা, খোঁজো ও খোঁড়ো শিকড়টিকে
এবং গোপন লক্ষ্য রাখো কাজোড়া চোখ তোমার দিকে—
তাকিয়ে আছে কঠিন জটিল, ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ উত্তেজিত
তোমার হাড়ের ভেতর হাওয়া, মাংস কঠিন, দুর্বিনীত
ভীষণ বললো থামো থামো, লোভ বললো এপথে নয়
গৃহী বললো ব্যস্ত আছি, ফসল বুনছি—কি সুসময়!
তোমার যাদের অন্যরকম, থুতু ছেটাও, ক্ষমাও করো
বাস্তু সাপের পুচ্ছ নাড়ে, ঐ অদূরে [illegible] পরম—
আছেন বসে, কি ছদ্মবেশ! চক্ষু [illegible] দৃষ্টি কিকে
মায়ার কঠিন পাথর ভাঙো, খোঁজো ও খোঁড়ো শিকড়টিকে

ঐশ্বরিক অনুভূতি মালা

প্রমোদ বসু

তিনি জন্ম নিলেন শব্দের জঠরেই,
যেন তাঁর উচ্চারণ-ই ব্রহ্ম,
যেন তাঁর মন্ত্রের মতো স্বর ছুঁয়ে রইলো বোধ
আগুন-লালিত সুখ।
আমি মুখ আড়াল করে চাই, তবু চোখ
উত্তাপে জ্বলে!
তিনি জন্ম নিলেন অমরত্বের পারে
ওখানে শ্মশান,
চিতার আগুনে ওঠে শব্দের শাসন।
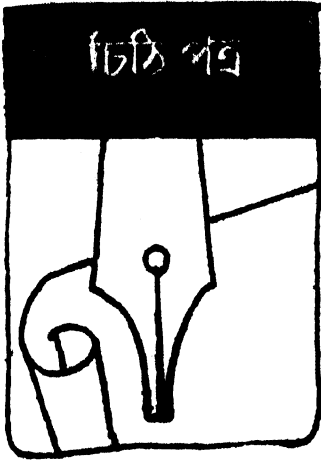
তেমন অসহনীয় নয়

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি চিঠি দেখলাম ১১ ফেব্রুয়ারীর অমৃতে। প্রত্যেকটি চিঠিরই আলাদা উত্তর হয়, সে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তার চেয়ে সাধারণভাবে দু-চার কথা বলা যাক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের মূলসত্য বোধ হয় এই যে, প্রধানভাবে তিনি যে গ্রাম্য পরিবেশ ক্রমাগত ব্যবহার করেছেন—তা রূপকথার আমেজ সৃষ্টি করে পাঠক বিজয় করেছে মাত্র। এখন যারা সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছেন তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন, বেশ কিছুকাল হল বাংলা সাহিত্যে যে তারল্য বাণিজ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রকৃত সাহিত্যরুচি বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত করে চলেছে—তার উৎস কে?

এখন অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে যে, পরিণত এবং নিরপেক্ষ সাহিত্যরুচি নিয়ে দ্বিতীয় পাঠে শরৎচন্দ্রের রচনা কোথায় দাঁড়ায়! আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এভাবে দেখলে সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য তেমন অসহনীয় নাও ঠেকতে পারে! নমস্কার জানবেন। **দিলীপ সরকার**; কেরাণীপাড়া, জলপাইগুড়ি।

(২)

বোম্বাইয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান-এ লেখক সুনীল গাঙ্গুলী ও সন্তোষ ঘোষ মহাশয় কি বলেছেন জানি না কিন্তু ২১শে জানুয়ারী অমৃতে প্রকাশিত সুনীলবাবুর উক্তিটি যথোপযুক্ত।

লেখক সুনীল গাঙ্গুলী বলেছেন শরৎচন্দ্র যতগুলি উপন্যাস লিখেছেন সবই গ্রামকেন্দ্রিক এবং বাস্তবে এর প্রভাব খুবই কম। আশা করি আধুনিক পাঠকরা যে উপন্যাসগুলি পড়ছেন সবই নতুন এবং আধু-

নিক চিন্তাধারায় সমাদৃত। এ প্রসঙ্গে অনেকে অনেক রকম কথা বলেছেন।

লেখক সমরেশ বসু শরৎচন্দ্রের কাছে কোন অর্থে ঋণী? নিশ্চয় শরৎসাহিত্যের প্রতি ঋণী নন। শরৎকাহিনীর অনুপ্রেরণার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি এবং তাঁর লেখনীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের গ্রামের কোন চিহ্ন নেই।

শরৎবাবুর গল্প শরৎবাবুর সময়ে চলতি কথাই ছিল কিন্তু এখন রূপকথার পর্যায়ে। রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের চিন্তাধারাও অনেক উন্নত, সুতরাং শরৎবাবুর উপন্যাস এখন রূপকথার বস্তু বলেই বিবেচিত।

শ্রীযুক্ত সত্য রায় মহাশয় শরৎ মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে যেসব ব্যক্তিদের নাম করেছেন তারা সবাই শরৎচন্দ্রের জীবনীর দিক থেকে আলোচনা করেছেন কিন্তু লেখক সুনীলবাবু তো তা বলতে চান নি। তিনি শরৎবাবুর সময় থেকে সমসাময়িক কালের বিধানের স্বপক্ষে আলোচনা করেছেন।

সর্বশেষে আর একটি চিঠির প্রতিবাদ করছি যেটি শান্তিপুরের নিকটবর্তী ফুলিয়া থেকে মাধব ভট্টাচার্য লিখেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন সুনীলবাবু গবেষক কিনা? প্রসঙ্গত বলে রাখি সুনীলবাবু যে উক্তির উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁর গবেষক হওয়ার তো দরকার নেই। গ্রামকে চেনার কিংবা ঘুরে দেখার দরকার নেই। আবারও বলছি সুনীলবাবু আধুনিক লেখকদের প্রসঙ্গে কথাগুলি বলেছেন এবং সমালোচক সাহিত্যিক সন্তোষ ঘোষও তাই বলেছেন, এর জন্য আধুনিক পাঠকরাই দায়ী! **বাসুদেব কীর্তন**; শান্তিপুর, নদীয়া।

(৩)

একুশে ফেব্রুয়ারী, কৃষ্ণ ধরের লেখা পড়ে বোম্বাই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের শরৎচন্দ্র বিষয়ে আলোচনার কিছুটা জানতে পারলাম। তবে নতুন কিছু নয়। এ ধরনের আলোচনা আগেও হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে এতো চিঠি লেখা-লেখি হবে ভাবিনি। বিশেষ করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সন্তোষকুমার ঘোষের বক্তব্য দুটো নিয়ে। এক-একটা চিঠি যেন অস্ত্রের মতো এই দুই মানুষের উপর তাক্ করা।

শরৎচন্দ্রের লেখাকে ভালো লাগার কারণ অনেক। শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে তাঁর পাঠকদের সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। মানুষের দুর্বল দিকগুলোকে বেশ গুছিয়ে বলতে পারতেন। সমাজের কথা বলেছেন। তবু শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাস জড়ো করলে মনে হয় বেশির ভাগ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রই এক। প্রায় সবাই কৃষ্ণ ধরের কাছে অনুরোধ করেছেন সন্তোষবাবু বা সুনীলবাবুর কেন শরৎচন্দ্রকে ভালো লাগে না তার বিশদ বিবরণ জানাতে। এর কি কোন প্রয়োজন আছে? দুজনের বক্তব্য তো বেশ পরিষ্কার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'আধুনিক লেখকদের উপর শরৎচন্দ্রের কোন প্রভাব পড়ে নি।' তা তো এখনকার লেখকদের লেখা পড়লেই বোঝা যায়। তবে, একটা বয়সে শরৎচন্দ্রকে ভালো লাগতো এখন লাগে না এর সঙ্গে জন্মস্থানের তুলনা সন্তোষবাবুকে ছোটো করে দেয়। তবু তো এঁরা শরৎচন্দ্রের অন্য দিকগুলোকে নিয়ে সহজভাবে আলোচনা করেছেন। সেদিক থেকে সমরেশ বসুর বক্তব্যই বেশ অস্পষ্ট। নিজে কি বললেন! ওই লাইনটা দিয়েই নামকরণ করা হলো কেন বোঝা যায় না। **রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়**; সালকিয়া, হাওড়া-৬।

(৪)

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে' বিভিন্ন গুণীব্যক্তি ও সাহিত্যিকের বিশেষ করে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য বিশেষ যত্ন নিয়ে পড়লাম।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দুজনেই প্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁদের লেখা সবাই পড়েন কিনা জানি না তবে অনেকেই পড়েন; এবং আমিও পড়ে থাকি। এবং সেই কারণেই এঁদের বক্তব্যে যেমন বিস্মিত হয়েছি, ব্যথিতও হয়েছি সেই রকমই।

ভেবে আশ্চর্য হই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস রূপকথার মত হয় কি করে? তাঁর চোখে দেখা মানুষগুলোর চরিত্র অবাস্তব হয় কি করে? তাঁর লেখায় গ্রামবাংলার যে ছবি আমরা পাই তা কি আর অবলুপ্ত?

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় এক জায়গায় বলেছেন, আমি কবি নই কল্পনা আমার আসে না। যা দেখি তাই লিখি। ঘন কালো মেঘ দেখে তাকে মেঘই দেখি—কোন এলোকেশী কন্যার কেশগুচ্ছ ভাবি না। সেই শরৎসৃষ্ট চরিত্র যদি অবাস্তব হয় বা তাঁর চিত্রিত গ্রাম বাংলাকে যদি খুঁজে পাওয়া না যায় তবে তা অক্ষমতা না সত্যভাষণে অনীহা?

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উভয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। তারা উভয়েই জানেন বলেই বিশ্বাস যে বাস্তবতা ছাড়া কোন সৎসাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। আর কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কালজয়ী হওয়া তো সম্ভবই নয়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র আজও ঘরে ঘরে জনে জনে সমাদৃত। তাঁর লেখা আজও মানুষ আগ্রহ নিয়েই পড়ে। নিজেকে জানার, দেখার পরিতৃপ্তি খুঁজে পায় তাঁর লেখায়।

কাউকে ছোট বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ চিঠি লেখা নয়। তবে আলোচ্য ব্যক্তির (কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র) প্রকৃত মূল্যায়ণে একান্ত আগ্রহী! বাক্-স্বাধীনতা সবার আছে ঠিক কিন্তু তাই বলে বক্তৃতামঞ্চে কিংবা আলোচনাচক্রে ব্যক্তিগত ধারণার প্রকাশের নামে বিড়ম্বনা সৃষ্টি কাম্য নয়। কারণ শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রই। তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ণেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানা প্রয়োজন।

আর একটা কথা এই সঙ্গে লিখে আমার চিঠি শেষ করবো। যে ত্যাগ, অভিজ্ঞতা, সর্বোপরি সে দরদী মন নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর লেখনী ধরেছিলেন, যাদের দুঃখকথা অনুভব করে তাঁর গল্প উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন, তা কি আজকের লেখক-গোষ্ঠীর আছে? আজকের লেখকদের সেই দৃষ্টি কোথায়? যে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সত্যকে জানা যায়? তারই তো প্রয়োজন আগে। তার সঙ্গে চাই সেই মন, দরদী মন যা জানায় লেখককে প্রেরণা দেয়, পথ দেখায়। শরৎচন্দ্রকে অস্বীকার আত্মহননেরই সামিল।—**বাবাই হালদার** সৎসঙ্গ দেওঘর।

(৫)

গত ২১শে জানুয়ারীর অমৃতে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে দুই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মন্তব্য পড়লাম। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সম্পর্কে দুই সাহিত্যিকের মন্তব্য পড়ে আমি অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হলাম। শরৎচন্দ্রের রচনা বর্তমান দশকের সমাজের কাছে অপ্রয়োজনীয় হলেও, এমন একটা সময় গিয়েছে যখন তাঁর রচনাগুলি ছিল সমাজের তথাকথিত সমাজ শাসকদের কাছে ত্রাসের মত। নারীজাতির প্রতি সমাজের অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কারও শরৎচন্দ্রের রচনার মতো অন্য কোনো সাহিত্যিকের রচনায় দেখা যায় না, একথা বাঙালী পাঠক মাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য। অথচ আজ ভাবতেও বড় দুঃখ হয়, যখন তাঁরই উত্তর সাহিত্যিকগণ তাঁর প্রতি অবমানকর মন্তব্য করেন। তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু এবং চরিত্র—যদি সত্যই রূপকথা হয়, তবে একথা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, তাঁর রচনায় উল্লিখিত নারীজাতির উপর তৎকালীন সমাজের অবিচারের কাহিনীগুলি নেহাতই রূপকথার মতো অসার। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

সবশেষে ঐ দুই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের নিকট প্রশ্ন করছি শরৎচন্দ্রের রচনাগুলি যদি রূপকথার মতো অলীকই হয় তবে বর্তমান উপন্যাস[illegible]গুলিকে কি আখ্যা দেব? **শিবকুমার [illegible]** রাণাঘাট, নদীয়া।

(৬)

চিরকালের সর্বজনপ্রিয় অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ১১ ফেব্রুয়ারীর 'অমৃত'তে অনেকগুলি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ঐ দুই লেখকের বক্তব্য পড়ে আমিও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

সমরেশ বসু স্বীকার করেছেন তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে ঋণী এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শরৎচন্দ্রের কাছে শুধু সমরেশ বসু কেন আমরা প্রত্যেকেই ঋণী। শুধু সন্তোষবাবু আর সুনীলবাবুই শরৎচন্দ্রকে যথার্থ মূল্য দিতে পারছেন না। তা [illegible] দিন তাতে কারও কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। **মীরা সরকার**, শ্রীনিকেতন, বীরভূম।

বাঘ চক্কোত্তি সংসার

আরামপুরের শোকসভায় অজিত মন্ডলের বিধবাকে টাকা দেওয়া হল। অজিত বাঘের পেটে গেছে। তাই দেখতে এসেছে কয়েক ডজন বিধবা। তারা তো অবাক। বাঘের মুখে প্রাণ দিলে বউ টাকা পায়! কোথায়? আমরা তো পাইনি।

সুন্দরবনে মাছ, মোম, মধু, কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে ফি বছর অনেকগুলো প্রাণ বাঘের থাবায় যায়। জলে নুন। বাতাসে নুন। বাঘের তাই ব্লাডপ্রেসার। ভীষণ রগচটা। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ২৮৯টি বাঘের জন্যে বছরে চাই ১১০০০ হরিণ। নইলে লেজসমেত পোনে তিন মিটার লম্বা বাঘ মানুষ তো খাবেই।

গোসবায় কাছাকাছি চামটা দ্বীপে বাঘেদের আড্ডা। গোসবা কোথায়? ক্যানিং থেকে লঞ্চে এক টাকা পঁয়ষট্টি। সাড়ে তিন ঘন্টায় নদীপথ। শিয়ালদা থেকে ৬০ মাইল। সেখানে বমন ডাক্তার বাঘের বিরুদ্ধে জেলেদের জন্যে অ্যাকসিডেন্ট ইন্সিওরেন্স চালু করছেন।

এই গোসবাতেই ১৯৩২-এ স্যার ড্যানিয়েলের অতিথি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রোজ লাঞ্চে তাঁকে আস্ত একটা ভেটকি সেদ্ধ করে দেওয়া হোত। সঙ্গে থাকতো কলকাতা থেকে আনানো কমলা নাসপাতি আর গোসবার কলা।

এখানেই এখন বাঘ দেখাশুনোর অফিস। কর্তা কল্যাণ চক্রবর্তী। বয়স ৩৬। স্টাটিসটিকসে এম এসসি। বিয়ে করেননি। বাঘই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। নদীপথ আর জঙ্গলে তাঁর ঘোরাফেরা। বিদেশীরা বাঘ দেখতে এলে ডলার, ইয়েন, মার্ক আসবে। জঙ্গল বাঁচাতে পারলে ভালো বৃষ্টি হবে। হরিণ বাড়বে। বাঘের নরমাংসের লোভ তাহলে কমবে। গাছের ফল আর শ্যাওলা খেয়ে মাছ আরও বাড়তে পারে।

এসবই দেখাশুনো করে বেড়াচ্ছেন বাঘ চক্কোত্তি। অমৃতে সাপ্তাহিকের তরফে খ্যাতিমান অভিযাত্রী পিনাকী চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি নদীপথে জঙ্গলে, ওয়াচ টাওয়ারে বাঘাবাবুর সঙ্গী হয়েছিলেন। ফিরে এসেই অমৃত পাঠকদের জন্যে তাঁর এই লেখা। কোন্ পিনাকী? ডিউক-পিনাকী। সেই পিনাকীকে কে না চেনেন।

বিশাল একখানা ছাতা আকাশ থেকে ঝুলেছে। সন্ধ্যার বাকি নেই বিশেষ। বাতাস প্রচণ্ড। দুর্গাদোয়ানি খালের বাঁধ ধরে আমরা কজন হাঁটছি। সামনে পিছনে আরামপুরের জেলেদের সর্দার শিশুপদ ও তার সঙ্গী সুনীল, সখীচরণ, অখিল, অনিল- মাঝখানে স্থানীয় ডাক্তার গোপীনাথ বর্মন, দুই যুবনেতা মনি মজুমদার ও বাসুদেব বিশ্বাস আর আমি। কলকাতার বাঁধানো রাস্তায় হেঁটে হেঁটে এমন বদ-অভ্যেস হয়ে গিয়েছে যে মাটির বাঁধের এবড়ো খেবড়ো সরু পথে পা চলে না। স্যান্ডেল খুলে আসে বর্ষায় মাটি ভিজে কোথাও থলথলে, কোথাও ভয়ঙ্কর পেছল। সর্বদাই ভয় এই বুঝি পা পিছলে আলুর দম হয়ে পড়ি। শিশুপদর হাতে একটা হ্যাজাক, ডাক্তার বর্মনের হাতে চার ব্যাটারীর লম্বাটে নাটির মত একখানা টর্চ। গম্ভীর খাজার মুখে অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। ডানদিকে নদী টেস্ট ম্যাচের রনজি স্টেডিয়ামের মত জল-জমাট, বাঁদিকে বাজার, থানায় পরিত্যক্ত চালকলের পোড়ো ভিটে, হ্যামিলটনের ছোট বাংলো পর পর পার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গন্তব্যস্থল আরামপুরের একটি শোকসভা।

গোসাবার পাশের গাঁ আরামপুরের অজিত মণ্ডলকে বাঘে খেয়েছে। চব্বিশ বছরের জোয়ান, ঘরে ষোড়শী বৌ, এক বছরের বাচ্চা একটা ছেলে ও ষাট বছরের বুড়ো বাপ মানিককে রেখে নদী ধরে জঙ্গলে নেমে গিয়েছিল ঘর-খোরাকির চাল-ডালের মাশুল যোগানোর জন্য মাছ মারতে। গোসাবা নদীর ধারে বাঘের আড্ডা চামটা দ্বীপের আট নম্বর ব্লকে ভোর ভোর নৌকো থেকে নেমে বুনো কেয়া লতা কাটছিল। নদীর চরে মাছ ধরার, কুমো বা কুঁয়ো বানাতে ডালপালা বাঁধার জন্য দড়ির অভাবে ওই লতা সুন্দরবনের জেলেরা ব্যবহার করেন।

দক্ষিণে প্রায় সমুদ্রের কাছে ওই চামটা দ্বীপ। বঙ্গোপসাগর আর চামটার মাঝখানে পড়ে আর একটি মাত্র দ্বীপ : গোসাবা। গোসাবা থেকে চামটা লঞ্চে পড়ে প্রায় আট থেকে দশ ঘন্টা, নৌকায়, ভাঁটির টানে অনুকূল বাতাসে পাল তুলে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা। গোসাবা নদীর পাড়ে চামটা—লঞ্চ থেকে মনে হয় যেন পুরো পাড় সবুজে আপাদমস্তক জোড়া বিশাল একখানা থালা। চারদিক ঘিরে ঘোলা অবিরল জলস্রোত। পাড়ে জল ঘেঁষে নরম পলিমাটিতে উঁচু হয়ে আছে লক্ষ লক্ষ শুলো। তারপর জলজ ঘাস। ঘাসের পর একরাশ কোঁকড়া চুলের মত বাইন গাছের ঝোপ। ওই ঝোপ শেষ হতে না হতেই শুন্দরী, গরান ও গেঁউয়ার জঙ্গল। বেশি পুরোনো নয় এমন দ্বীপ, হয়তো কয়েক শ বছর আগে নদীর বুক ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। ময়দার তালের মত নরম মাটি কেটে জলধারা অসংখ্য খাঁড়ি রচনা করে ভেতরে ভেতরে বহু গভীরে নেমে গিয়েছে। মাছ ধরার ছোট ডিঙ্গি ছাড়া আর কিছু ওই সব খাঁড়ি খাড়ি খালপথে ঢুকতে পারে না।

হাঁটতে হাঁটতে অজিতের শেষ দিনটির কথা শুনছিলাম সর্দার শিশুপদ মন্ডলের কাছে। মাঝারি সাইজের একখানা সলিড পাথরের মত গড়ন শিশুপদ। টেলিফোনের মত গায়ের রং বিরল কেশ চোখে চশমা পরনে লুঙ্গির উপর একটা হাফ শার্ট-হাফ ফতুয়া। বয়স বাহান্ন কি তিপ্পান্ন। জাতে রাজবংশী, শিশুপদরা ছ ভাই। দেশ ছিল বাংলাদেশে কপোতাক্ষী নদের ধারে আশাশুনি থানায় খাজরা গ্রামে। দেশ বিভাগের দু বছর পর অতিষ্ঠ হয়ে এক কাপড়ে ছোট ছোট পাঁচ ভাই এবং বাবা কালীকান্ত ও মা নারায়ণীকে নিয়ে নৌকায় পালিয়ে আসে এই বাংলায়। বঙ্গোপসাগরের পাড় ঘেঁষে, সমুদ্রের চেয়েও ভয়ঙ্কর হরিণভাঙ্গার দোতলা তেতলা ঢেউ ভেঙে ভেঙে ছ' সাত দিন বাদে এসে ওরা হাজির হয় গোসাবার কাছে সাতজেলিয়াতে। সেদিন ওদের মত আরো শয় শয় জন নৌকায় পরিবার একইভাবে পালিয়ে এসে সাতজেলিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল। অজিতের বাবা মানিক মণ্ডলও এসেছিলেন, অজিত তখনো হয়নি।

চোরা শিকারীর সন্ধানে বাঘ চক্কোত্তি

আরামপুরে আরামে থাকবি

শিশুপদর মুখে শোনা : তখন এদিক বাবু জনমানব শূন্য। লোক বসতি গোসাবায়, সাতজেলিয়ার আর রাঙাবেলিয়া কয়েক ঘর মাত্র। তা বছর কয়েক এধার ওধার ঘুরে কোথাও থিতু হ'তে না পেরে চলি এলাম এই আরামপুরে। আমাদের নিয়ে এলেন ডাকতারবাবু। রোগভোগ হলি আমরা ছুটে আসতাম ডাকতার-বাবুর কাছে। মসজিদবাটীতে গিয়ে রোগী দেখবার জন্য ওর ফি তখন দশ টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিতেন আট টাকা। উনিই বললেন, গোসাবায় আয়, আরামপুরে আরামেই থাকবি। তা তখন গোসাবার মণ্ডল কংগ্রেসের ছেকরেটারি ছিলেন শরৎ নাথ, উনি জমি জায়গার সব ব্যবস্থা করি দিলেন। আমরা ছ' সাত শ ঘর চলি এলাম। এসব বিশ বাইশ বছর পূর্বের কথা। তখন মানিকের ছেলে অজিত সবে হয়েছে।

তখন একটা নৌকোর ভাড়া গোটা মাসে একটি টাকা। এক এক কোটালে আটখানা নৌকোয় (২৪ জন দাঁড়ি মাঝি) এক থেকে দেড় হাজার টাকার মাছ উঠত। টাকায় চার পয়সা দৈনিক সুদে ক্যানিং-এর মাছের মাহাজন (শিশুপদ মহাজন বলেন না) পাঁচ ছশ অবধি ধার দিত। মাছ মেরে শোধ দিতাম।

ছ সাত বছরের মধ্যে মাহাজনের দেনা টেনা শোধ করে শিশুপদ ঝাড়া হাত পা হয়ে উঠল। বিয়ে করল রেণুবালাকে। পাঁচ মেয়ে এক ছেলে। বড় মেয়ে ঊষারাণীর বিয়ে হয়েছে ষাট মাইল দূরে হাসনাবাদের মালঞ্চ গাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক গোকুল মণ্ডলের সঙ্গে। জেলেকুলে শিশুপদ রীতিমত মাতব্বর ব্যক্তি। চারখানা নৌকো ও সাতখানা জালের মালিক। ছ' বিঘা ধেনো জমি থেকে বছরে গড়ে আঠারো মণ ধান পান। খাবার জন্য ঘরে প্রয়োজন সম্বৎসরে ছত্রিশ মণ। দুটি নৌকো ভাড়া খাটিয়ে কি কোটালে আয় হয় চল্লিশ টাকার মত, অর্থাৎ মাসে প্রায় আশি টাকা।

আরামপুরের মাঝখানে সাড়ে তিন বিঘা জমির উপর ছ ভাইএর বসত ভিটে। ছ ভাই-এর ছখানা মাটির ঘর। সবাই পৃথগন্ন। মাঝে ধানের গোলা। ওই গোলার পাশেই এদিনের শোক-সভার আয়োজন। প্রায় মাইলখানেক হেঁটে এসে এতক্ষণে একটু জিরোনোর সুযোগ মিলল। কিন্তু শিশুপদ নন স্টপ বকে চলেছেন। মূল প্রসঙ্গ বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন, শুধু আত্মকাহিনীর রোমন্থন। গাঁয়ের মানুষজন অতিথি সেবা থেকে সব ব্যাপারেই দিল খোলা, অকৃপণ।

লুঙ্গি : ২। গামছা : ৪

নিজের গল্প দিয়ে গোটা আরামপুরের অর্থনীতির একটা রূপরেখা শিশুপদ খাড়া করছিলেন : দৈনিক চার কিলো চাল লাগে। তিন বেলাই ভাত। সপ্তাহে দু কিলো গম। দৈনিক বাজার আট আনার : নিজের সারা বছরে লাগে একটা কাপড়, দুটি লুঙ্গি, তিনখানা গেনজি, দুখানা সার্ট ও চারখানা গামছা। স্ত্রী রেণুবালার জন্য বছরে নবান্ন দুখানা শাড়ি। ছ' ভাই ওরা যখন একসঙ্গে ছিলেন (১৯৬৮ সাল পর্যন্ত) তখন বছরে ডাকতারে ওষুধে লাগত তিনশ থেকে সাড়ে তিনশ টাকা। এখন সবাই স্বাবলম্বী। রামপদ, হৃদপদ দুজনে চাষী—প্রত্যেকে ছ বিঘা জমির মালিক। তৃতীয় প্রফুল্লকুমার গোসাবা হাটে কাপড়ের দোকান খুলেছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম গৌরচন্দ্র ও বাসুদেব ওই হাটেই স্বতন্ত্র দুখানা মুদির দোকানের মালিক।

বছরে দুখানা সিনেমা শিশুপদ দেখেন। গোসাবার কাছারি বাড়ির সামনের মাঠে টেমপোরারি সিনেমা হল ন মাস চলে, তিন মাস নেই। জীবনে একবার কলকাতায় এসেছেন। ক্যানিং-এ ফি মাসে হাপর বোঝাই মাছ নিয়ে দুবার যান বেচতে। বসিরহাটে দু মাসে একবার। যুক্তফ্রণ্টের আমলে জমি জবর দখলের মামলা। ওরা ছত্রিশ-জন জড়িত। উনসত্তর সাল থেকে ওই মামলা চলছে। এর মধ্যে চারজন তো মরেই খালাস। শিশুপদ বিড় বিড় করে বললেন, বাঘে ছুঁলে আঠারো আর মামলায় ছুঁলে বাবু ছত্রিশ ঘা। প্রতিবার বসিরহাটে যাই, আমরা বত্রিশজন মাথাপিছু দু টাকা করে দিই উকিলবাবুকে। যাতায়াত খাওয়া থাকায় আরো যায় জনপ্রতি বিশ-বাইশ টাকা। ক্লাস এইট অবধি পড়াশোনা। শিশুপদ নাক মলে কান মলে বললেন : আর কোনদিন ওই লাল ঝাণ্ডাদের সঙ্গে যাবুনি বাবু। আমাদের ঝামেলায় জড়িয়ে দিয়ে নিজেরা এখন চম্পট। পাশ থেকে ডাকতারবাবু বললেন, খালি বকর বকর, অজিতের কি হল?

অন্ধকারে ঠাহর হয় না, কতটা লজ্জা শিশুপদর ভাবলেশ-হীন মুখে খেলে গেল। বললেন, হ্যাঁ যা বলছিলুম। অজিত, সুনীল, অখিল, অমিয় সবাই মিলে চামটা দ্বীপে নেমে সকাল বেলা কেলে লতা কাটছিল। টেরও পায়নি কখন তিনি এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন। পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে সামনের দুটি পা অজিতের কাঁধে ক্যাজুয়ালি তুলে দিয়ে বন-জঙ্গল কাঁপিয়ে যখন ডাক ছাড়লেন—হে-আ-আ-উ, তখন আর সময় নেই। অজিতের সঙ্গী সাথীরা দা কুড়োল ফেলে দিয়ে হরিণের গতিকে হার মানিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতার কেটে নৌকোয় উঠে দাঁড় বেয়ে মাঝ নদীতে পৌঁছে যখন কাঁপুনি একটু থামল, ততক্ষণে বহুদূরে দ্বীপের প্রায় মাঝখান থেকে তৃপ্ত বাঘের জলখাবারের পালা শুরুর আর একটা ডাক শোনা গেল। ওই ঘটনার প্রায় এক মাস বাদে এই শোকসভা।

বিধবা গ্রাম

মাথার উপরে নৌকোর পাল একখানা দড়ি দিয়ে, শিশু-পদদের ভিটের চারধারের কুড়ে ঘরের বাঁশের সঙ্গে বেঁধে সামিয়ানার চেহারা দেওয়া হয়েছে; এক মাইল দূরে থেকে ডাকতারবাবুর ডিসপেনসারির ওষুধের টেবিল আনা হয়েছে, সেই সঙ্গে দুটো চেয়ার আর রোগীদের বসার

একখানা লম্বা বেঞ্চি। টেবিলের উপর হ্যাজাক। অতিথিদের জন্য কাচের গ্লাসে চা। সভা শুরু হল। মাটির উপরে উবু হয়ে বসে চল্লিশ পঞ্চাশজন জোয়ান-মদ্দ, কচি কাচা, বুড়ো রাজবংশী ও মালো। বনবিবির থানে পিদিম জ্বলছে। সুন্দরবনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বনবিবির থান। মাটির তৈরি দেবী মূর্তি কোথাও জগদ্ধাত্রীর মত কোথাও অপটু কারিগরের হাতের কাজের ফলে প্রায় বিমূর্ত: ব্যাঘ্রবাহিনী দেবীর গোলাপী আকৃতি পিদিমের আলো-আঁধারিতে অস্পষ্ট। চারপাশের মেটে ঘরের দাওয়ায় সার বেঁধে উলঙ্গ সব শিশু ও কিশোর। আর এক কোনে ডজন কয়েক থান পরা মহিলা। সবাই বিধবা। সবার স্বামী বাঘের খাদ্য হয়েছেন। তাই সবাই আজ অবাক হয়ে দেখতে এসেছেন অজিতের বৌ-এর সৌভাগ্য। বাঘে খাওয়া এমন কী একটা ঘটনা যে তার জন্যে ঘটা করে সভা হবে, দুঃখু জানানো হবে, বক্তৃতা দেবেন বাবুরা আর সবশেষে মাগীর হাতে দুশোটি টাকা দেবেন ডাকতারবাবু। এমনতর অনাছিষ্টি কান্ডকারখানা বাপের জন্মে জেলেপাড়ায় কে করে দেখেছে? কই তাদের স্বামীরা যখন গেল, এমনতরো সভা-টভা তো তখন হয় নি। অজিতের বৌ সত্যি সৌভাগ্যবতী। হাতে নগদ দুশো টাকা পাবে, আবার ফি মাসে দশটি করে টাকা। জেলেদের নিয়ে সমবায় সমিতি গড়ে এই সব নতুন বিধি ব্যবস্থা ডাকতারবাবুই চালু করেছেন ওই তল্লাটে। সত্যি সত্যি টাকাটা পাবে কিনা--খানিকটা অবিশ্বাস, খানিকটা ঈর্ষা নিয়ে ওরা এসেছেন এই সভায়। সভাপতির ভাষণ দিতে উঠলেন ডাকতার বর্মন। বছর দেড়েক আগে ওই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম।

ডাকতার বর্মন জেলেদের বোঝাচ্ছিলেন : প্রতি বছরই চার পাঁচজন বাঘের পেটে যায়। যারা যায় তারা যায় সেই সঙ্গে ভাসিয়ে দিয়ে যায় পরিবার পরিজন ছেলেমেয়ে বৌ বাচ্চাদের। ভবিষ্যতে ঘরের লোক যাতে আর কষ্ট না পায় তার জন্য এবার থেকে আমরা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির তরফ থেকে 'অ্যাকসিডেন্ট' বীমা করাচ্ছি।

অ্যাকসিডেন্ট

অ্যাকসিডেন্ট কথাটার কোন মানে হ্যাজাকের আলো ঘিরে বসা মানুষগুলির চোখ মুখে খুঁজে পেলাম না। তারা নির্বিকার। ডাকতার বর্মন এই মানুষগুলির শুধু রোগের নয় আর্থিক চিকিৎসাও শুরু করেছেন। মাছ-মারাদের মেরে মেরে ক্যানিং-এর মহাজনরা লাল হয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের মত ছুঁড়ে মেরেছেন এই সমবায় সমিতি। তাতে ক্যানিং-এ মাছের বাজার রীতিমত চটিতং। দু একবার ডাকতারকে শাসানো হয়েছে। প্রাণের ভয় দেখানো হয়েছে। সে কথা উঠলে ডাকতার শুধু হাসেন।

ডাকতারের কথা শুনেছি হ্যামিলটন ট্রাস্টের সবচেয়ে পুরোনো কর্মী জঙ্গবাহাদুর পান্ডের মুখে। ইউ পির গাজিপুর জেলার অবহেলিত গ্রাম থেকে পঞ্চাশ বছর আগে বাপের হাত ধরে কলকাতায় এসেছিল জঙ্গবাহাদুর। এখন বয়স প্রায় আটষট্টি। কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ। টকটকে গায়ের রং। ধুতির উপর পানজাবি, খালি পা। স্যার ড্যানিয়েলের খাস বেয়ারা ছিলেন। ট্রাস্টের চাকরি ১৯২৯ সাল থেকে। পিত্তন, মাহিনে তখন ছিল চোদ্দ টাকা।

১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন গোসাবায়। সঙ্গে পুত্রবধূ ও কন্যা। আরো কয়েকজন। স্যার ও লেডি হ্যামিলটনের অতিথি। রবীন্দ্রনাথ উঠেছিলেন পুরোনো জেটিঘাটের ধারে বর্তমান থানার গায়ে পরিত্যক্ত ভাঙ্গা ছোট বাংলোয়। জঙ্গবাহাদুরের সব মনে আছে : দেবতার মত চেহারা বাবু। চোখ দুটো সর্বদা হাসত। গায়ে জোব্বা, ধবধবে দাড়ি। তিন দিন ছিলেন। সারাদিন গান আর গান। খুব ভোরে উঠতেন। সকাল বেলা বড় বাংলো (যেখানে হ্যামিলটনরা থাকতেন) থেকে হ্যামিলটনের খাস বাবুর্চি জগন্নাথ আর রামনাথ চা নিয়ে যেত ছোট বাংলোয়। বাবুর্চিরা জাতে দোসাদ, চামার বাবু—বিহারের বালিয়াতে বাড়ি

রবীন্দ্রনাথের কোন বাছবিচার ছিল না—কানৌজি ব্রাহ্মণ জংগবাহাদুর বলে চলে। চায়ের পর ফল খেতেন। কলকাতা থেকে আনানো কমলা, নাশপাতি আর গোসাবার কলা। দুপুরে ভাত।

আস্ত ভেটকি

আমরা যেমন থালার উপর গোল করে ভাত সাজিয়ে দিই, রবীন্দ্রনাথের তা চলত না। লম্বা ফালি, একখানা পিঠের মত, থালার ওপর ভাত সাজানো থাকত। সংগে এক বাটি ঘন মুশুরীর ডাল। টমেটো ও লেটুস পাতার স্যালাড। আর একখানা ভাপে সেদ্ধকরা আস্ত ভেটকি মাছ। খানিকটা তরকারী।

রবীন্দ্রনাথের চলাফেরায় যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার জন্য হ্যামিলটন একটা টানা রিকশা আনিয়ে রেখেছিলেন। কবি চড়তে চাইতেন না। স্যার ও লেডি নাছোড়বান্দা। রবীন্দ্রনাথ বাঘ দেখেছিলেন? জংগবাহাদুরের জবাবঃ না বাবু, উনি এসেছিলেন গোসাবার স্কুল ও মানুষজন দেখতে। কবি চলে গেলেন, তার সাত বছর বাদে হ্যামিলটন গেলেন মারা, ট্রাস্টও ঝিমিয়ে পড়ল। ত্রিশ বছর বাদে উনসত্তর সাল নাগাদ ডাকতারবাবু ট্রাস্টি হওয়ার পর আবার সব একটু একটু চাঙা হয়ে উঠছে।

ব্যাংক হয়েছে, বাঘের অফিস, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসারচের গবেষণা কেন্দ্র এবং এই সমিতি। ডাকতারবাবুর ইচ্ছে এখানে সেই পুরোনো দিনের মত আবার ধর্মগোলা হোক, পাকা রাস্তা হোক, গড়ে উঠুক হেলথ সেন্টার, ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, শেষ হোক মহাজনী মন। কিন্তু তা তো হবার
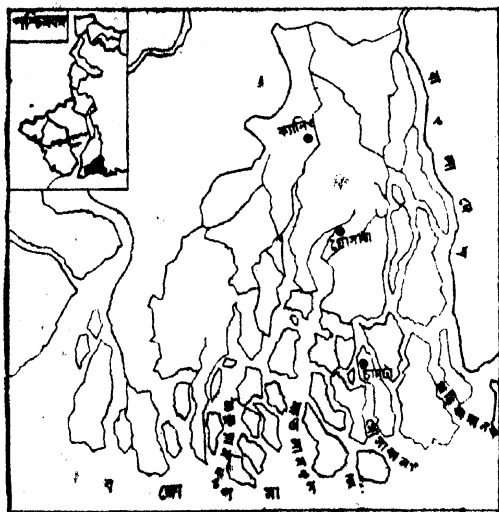
নয়। ট্রাস্ট যে ঠুটো জগন্নাথ। সব জমি জায়গাই যে সরকারের হাতে। ট্রাস্টের পাওনা টাকাও আজ ট্রাস্ট পাচ্ছে না। ডাকতার বর্মণ তখনো বলে চলেছেন : ট্রাম বাসের অ্যাকসিডেন্টের জন্য তো কলকাতা থেকে ট্রাম বাস তুলে দেওয়া যায় নি, তখন মানুষ খায় বলে সুন্দরবন থেকে ঝাড়ে-বংশে বাঘকে তো আর নির্মূল করা যায় না, উচিতও না।......

ডাকতার বর্মণ ভাষণ দিচ্ছেন। প্রায় ছ ফুট লম্বা শক্ত সমর্থ মানুষ। ষাটের কাছে বয়স। দেশ হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। কলকাতার নীলরতন থেকে ছেচল্লিশে ডাকতারি পাশ করে আটচল্লিশ সালে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এস্টেটের ডাকতারের চাকরি নিয়ে সেই যে এসেছেন আর এ জায়গা ছাড়েন নি। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। বড় মেয়ে ডাকতার, জামাইও ডাকতার। দুজনে এখন স্টেটসে। মেজ মেয়ের স্বামী ইন্জিনিয়ার। দুই ছেলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। একটা বাড়ী করেছেন ভবানীপুরে। কিন্তু স্ত্রী শোভারাণীকে নিয়ে গত ত্রিশ বছর পড়ে রয়েছেন এই গোসাবায়।

গোসাবা শব্দটি শুনলে মনে হয় যেন কতদূরে। অথচ কলকাতা থেকে বর্ধমান যতটা, গোসাবাও প্রায় ততটা। শিয়ালদা থেকে ক্যানিং রেলে মাইল আঠাশ। ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া ষোল টাকা, আর সর্বজনীন শ্রেণীর এক টাকা পঁচাত্তর। ক্যানিং থেকে বত্রিশ মাইল জল উজিয়ে যেতে হয় গোসাবায়। মাতলা, পুরন্দর, বাসন্তী ও গোসাবা চারটি নদী হয় পেরোতে। লঞ্চের খোলের ভাড়া যাত্রীপিছু একটাকা পঁয়ষট্টি, আর মাথার উপরে কেবিনের ভাড়া তিন টাকা। ক্যানিং থেকে রোজ তিনখানা লঞ্চ যায় গোসাবায়—সকাল দশটায়, দুপুর বারোটায় আর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। আসে চারখানা। গোসাবা থেকে ছাড়ার সময় সকাল চারটা, সাতটা, দুপুর সাড়ে বারোটা আর বিকাল পাঁচটা। সময় লাগে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা। একে লঝঝড়ে লঞ্চ তায় চড়া পড়ে পড়ে নদীগুলির প্রায় মরণদশা। তাই এত সময় লাগে।

ভাষণ শুনতে শুনতে সেদিন জানার কৌতূহল হয়েছিল, প্রতিবছর কত লোক যায় বাঘের পেটে? যারা যায় তারা কারা? তাদের পেশা কি? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বাঘ চক্কোত্তি

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর কল্যাণ চক্রবর্তীর কাছে প্রশ্নগুলি তুলে ধরলাম। ভদ্রলোক গোসাবায় অফিস খুলে বসেছেন। হ্যামিলটন সাহেবের কাছারিবাড়ির তেতলায়। সারাটা বছর লঞ্চ নিয়ে জংগলে জংগলে ঘোরেন। পোষা জীব-জন্তু তো অনেকেই ভালবাসেন, বুনো বাঘকে ভালবাসার কথা কল্যাণকে দেখার আগে কল্পনাতেও কোন দিন প্রশ্রয় দিই নি। স্ট্যাটিসটিকসের এম এস সি কল্যাণের বয়স পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ। বিয়ে করেন নি। সংসার বলতে সব কিছু বিধবা মাকে ঘিরে। ধ্যান জ্ঞান বলতে বাঘ। ওর অফিস ঘরের দেওয়ালে বাঘ, টেবিলে বাঘের উপর লেখা বিশেষজ্ঞদের পুঁথিপত্র, আর বাঘ সংক্রান্ত অজস্র সরকারী ফাইল, ঘরের বাইরে কাঠের আলমারী ভরতি বাঘের পায়ের ছাপ তোলা প্ল্যাস্টার অব প্যারিসের কয়েক হাজার ছাঁচ। অবসরও কাটে বাঘ চর্চায়।

হিসাব চাইতে নিজের লেখা একটা প্যাম্ফলেট পড়তে দিলেন। নামঃ ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজি অন দ্য সুন্দরবন ফরেস্টস—অবজারভেশন অন টাইগারস। সহলেখক এ বি চৌধুরী। সুন্দরবনের আঠারোটি দ্বীপপুঞ্জে ষাটের দশকে এক যুগে তিনশ ষাটজন বাঘের খোরাক হয়েছে। হিসেবটা তুলে ধরছি— চামটা—৪০, মাতলা ৪১, গোসাবা—৩৭, পীরখালি—২২, বাঘমারা-২২, গোমা—২১, চুলকাটি—৪, ঝিলা—৭, হেড়োভাংগা—৩, নেতিধোপানী—১৭, আজমলমারি—১৭, মায়াদ্বীপ—১৬, চাঁদখালি—১৬, পঞ্চমুখানি—১৪, ফ্রেজারগঞ্জ—৮, হরিণভাংগা—১৬, কাটুয়াঝরি—১২, ছোট হরদি—১০। অর্থাৎ বছরে প্রতিটি দ্বীপ গড়ে দুটি করে মানুষ খায়।

যাদের খায় তারা কারা? তারা হলেন জেলা চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে ৩৭১৮-১৩ বর্গমাইল বিস্তৃত সুন্দরবনের পনেরোটি থানার বাইশ লক্ষ মানুষেরই আত্মীয়-স্বজন। শুধু

করেছি গোসাবার একটি শোকসভা দিয়ে। সেই গোসাবা হল গোটা সুন্দরবনের সামান্য একটি অংশমাত্র। গোসাবা ছাড়াও আরো চোদ্দটি থানা হল—সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, মথুরাপুর, পাথর-প্রতিমা, জয়নগর কুলতলি, ক্যানিং, বাসন্তী, হারোয়া, মিনাখাঁস, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ। জল ও জঙ্গল এলাকা বাদ দিলে ১৯৭১-এর আদমসুমারি অনুযায়ী সুন্দরবনে প্রতি বর্গ-মাইলে জনবসতির সংখ্যা হল ৯৯০। প্রকৃত জঙ্গলের পরিমাণ আজ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে মাত্র ৪২২০-২৯ বর্গ কিলোমিটার। আর অখণ্ড সুন্দরবন, যার বেশির ভাগই পড়েছে বাংলাদেশে, নেহাৎ কম নয়: ২৮,০৮০ বর্গ মাইল।

আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী সুন্দরবনের বাইশ লাখ লোকের মধ্যে শতকরা ছিয়াশি ভাগের জীবিকার সূত্র জমি জল ও জঙ্গল। অর্থাৎ চাষবাস, কাঠকাটা, মাছ মারা ও মধু সংগ্রহ।

আর ওই মাছ মারতে গিয়েই, কাঠ কাটতে গিয়েই, মধু সংগ্রহ করতে গিয়েই ১৯৭৫ সালে বাঘের হাতে বেঘোরে মারা পড়েছেন হিঙ্গলগঞ্জের বিষ্ণু মণ্ডল (বয়স ৭০), হারান মিস্ত্রী (৬৫), কার্তিক মণ্ডল (৭০) ও বিদ্যানগরের বিষ্ণুপদ মিস্ত্রী (২১)। ওই বছর পয়লা এপ্রিল থেকে ২৪ জুলাই, প্রায় চার মাসে বাঘের মুখে পড়েছিল চুয়াল্লিশজন, মারা গিয়েছেন একচল্লিশজন। এর মধ্যে কাঠুরে চারজন—হেঁতাল গাছের পাতা ও কাণ্ড, ঘর ছাউনী ও বেড়ার কাজে যা লাগে, বন থেকে কাটতে গিয়ে দুজন বাঘের খাদ্য হন। মৌলি তেরোজন। আর মাছ মারা চব্বিশজন। মৃত একচল্লিশজনের মধ্যে ষোলজনের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। বাঘ সাধারণত আক্রমণের সময় হিসাবে বেছে নেয় সকালবেলাটা—ছটা থেকে আটটা, যখন কাঠুরে, জেলে ও মৌলিরা নৌকা ছেড়ে নানা প্রয়োজনে নামে জঙ্গলে। যে চুয়াল্লিশজন বাঘের মুখে পড়েছিলেন তাদের ঠিকানা গোটা সুন্দরবন জুড়ে ছড়ানো : সাতজেলিয়া, আমলামেথি, হিরণ্ময়পুর, ছোট মোল্লাখালি, আরামপুর, বেলতলি, লাহিড়ীপুর, মসজিদবাড়ি, দুলকি, রামকৃষ্ণপুর, পাটাখালি, কাগাতলা, দয়াপুর, বিজয়নগর, বিরাজনগর ইত্যাদি অজ্ঞাত অখ্যাত সব গ্রাম।

বাঙালী মাছে-ভাতে বাঁচে। সুন্দরবন বছরে গড়ে আড়াই হাজার টন মাছ জোগান দেয়। এই মাছের মধ্যে আছে—গলদা চিংড়ি, পারশে, ভাঙন, হরিণা চিংড়ি, চামনে চিংড়ি, নোনা চিংড়ি, চাপরা চিংড়ি, ঘুসো চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, ভেটকি, পয়রা চাঁদা, ইলিশ, পাঙাস, শোল, তপসে, চাঁদা, কানমাগুর, মেদ, গুরজাউলি, লটে, রূপবতী, নোনা ট্যাংরা, ফ্যাসা ইত্যাদি। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি—এই ছ মাস হল সুন্দরবনে মাছ মারার সময়—ওই সময় প্রতিদিন কম করেও গড়ে ছ হাজার জেলে সুন্দরবনের জলে নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মাছের সন্ধানে। জেলের মোট সংখ্যা প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার।

মাছের খাদ্য হল নানা ধরনের শ্যাওলা ও গাছের ফল। সুন্দরবনের নদী-নালায় প্রায় একশ জাতের শ্যাওলা পাওয়া গিয়েছে। আর জঙ্গল বলতে মূলত গরান, গেউয়া, পশুর, ধুঁধুল বাইন, কেওড়া ও সুন্দরী গাছ। কানমাগুর ও পাঙাস মাছ কেওড়া ও বাইনের ফল খেতে ভালবাসে। বারো কিলো ওজনের একটা পাঙাসের পেট চিরে বিশেষজ্ঞরা এক কিলো পরিমাণ বাইন ফল পেয়েছেন।

যে-সব গাছের কথা উল্লেখ করেছি তাদেরই ডাল, পালা ও কাণ্ড কাঠুরেদের নৌকা বোঝাই হয়ে কলকাতায় বারো মাস চালান আসে। কিছু কাঠ সস্তার আসবাবপত্র তৈরিতে লাগে, বাকি কাঠের ব্যবহার জ্বালানী হিসাবে। খুব কম করেও বিশ হাজার মানুষের জীবিকার সূত্র এই বনের কাঠ।

সুন্দরবন নাম নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কেউ বলেন, সমুদ্র সংলগ্ন বন, তা থেকে আদিতে নাম ছিল সমুদ্রবন। লোক-

দর্শকদের ওয়াচ টাওয়ার
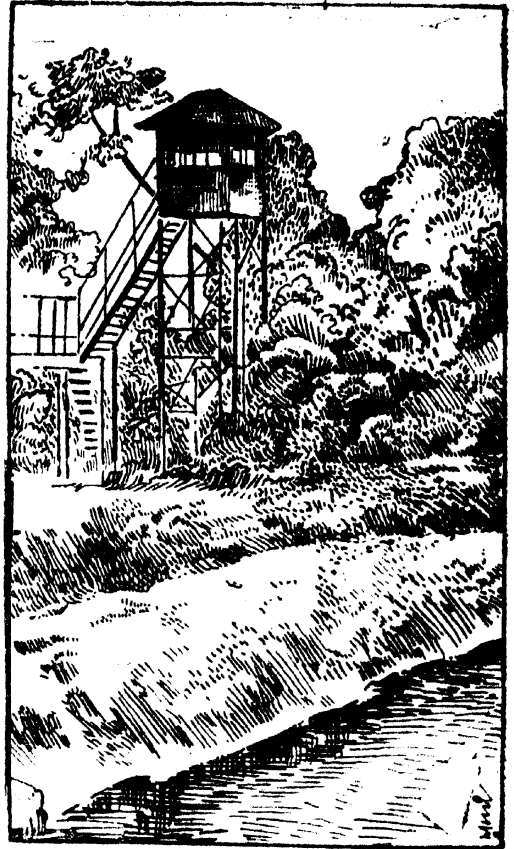
ওয়াচ টাওয়ার : সুন্দরবনের অন্যতম নির্জন দ্বীপ হলদিতে বাঘের জন্য মিঠে জলের পুকুর এবং বাঘ দেখার জন্য এই ওয়াচ টাওয়ারটি বানিয়েছেন বন দফতর। টাওয়ারের জন্য ব্যয় সাড়ে সাত হাজার টাকা। গত বছর অকটোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে এটি বানানো হয়। মাটি থেকে ৩০ ফুট উঁচু। শাল কাঠের খুঁটির উপর বসানো কাঠের ঘর। চারদিকে কাচের জানালা। ওঠা-নামার জন্য লোহার জাল দিয়ে ঘেরা কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি। পুরোপুরি নিরাপদ। সামনেই পুকুর। একশ তিশ ফুট বাই একশ ফুট। ছ ফুট গভীর।

মুখে পরিবর্তিত হয়ে আজ হয়েছে সুন্দর বন। আবার কারো কারো বক্তব্য সুন্দরী গাছের প্রাধান্য ওই বনে দেখতে পেয়ে একদা নাম রাখা হয়েছিল সুন্দরী বন, তাই থেকেই আজকের নাম সুন্দরবন। কাঠুরেদের কৃপায় সুন্দরবনে আজ সুন্দরী গাছই হচ্ছে সবচেয়ে বিরল।

মৌলি, জেলে ও কাঠুরে যারাই বনে ঢোকেন সকলেরই এক চিন্তা, অজিত মণ্ডলের মত প্রাণটা না যায়। কারণ জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ।

সুন্দরবনের বাঘ পৃথিবীর বাঘকুলে শ্রেষ্ঠোত্তম বলে খ্যাত। জন্মসূত্রে নরখাদক, হিংস্রতায় নজিরহীন, চূড়ান্ত ধূর্ত এবং ব্যাঘ্র বংশে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে পরিচিত।

নুন ও নরমাংস

সুন্দরবনের বাঘ নিয়ে বিভিন্ন প্রাণী বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সময় গবেষণা করেছেন। বিশ্ব বন্যপ্রাণী ভাণ্ডারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং লণ্ডনের জুলজিক্যাল সোসাইটির সায়েনটিফিক ফেলো গাই মণ্টকোয়র্ট ১৯৭২ সালে বাংলা দেশের খুলনায় গিয়েছিলেন বাঘ দেখতে, সুন্দরবনের বাঘকে জানতে। জঙ্গলে ছিলেন কয়েক-মাস। ফিরে গিয়ে একখানা বই লিখেছেন : 'টাইগারস।' ওই বই-এর উনিশ পাতায় অপর এক জীব বিজ্ঞানী ডঃ হুবার্ট হেনড্রিকসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে মনটকোয়র্ট লিখেছেন : 'জল-তলের উচ্চতা এবং জলের লবণাক্তর সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘের হিংস্রতা ও নরমাংস ভক্ষণের সম্পর্ক সুনিশ্চিতভাবে নিবিড়। যুগ যুগ ধরে নদীর ওই নোনা জল খেয়ে খেয়ে বংশ পরম্পরাক্রমে সুন্দরবনের বাঘের শারীরিক বহু পরিবর্তন হয়তো সাধিত হয়েছে, বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঘের লিভার ও কিডনী।' হেনড্রিকস দীর্ঘদিন সুন্দরবনে কাটিয়ে গিয়েছেন। এর পর মনটকোয়র্ট নিজের মন্তব্য জুড়েছেন ওই বই-এর ৪২ পৃষ্ঠায় : '১৬৬০ সাল ইস্তক যতদূর জানা যায়, সব না হলেও সুন্দরবনের অধিকাংশ বাঘই নরখাদক। বাঘের শিকার হল মৌলি, কাঠুরে ও জেলের দল।' মনটকোয়র্ট খোলাখুলি বলেছেন, ওই নোনা জলই সুন্দরবনের বাঘের হিংস্রতার মূল কারণ।

রগচটা

কল্যাণবাবু এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করেন এইভাবে : অতিরিক্ত নুন শরীরে গিয়ে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে মানুষ যেমন চট করে চটে ওঠে, ভদ্রতার আড়ালে লুকোনো দাঁত বার করে ফেলে, তেমনি বাঘও। এমনিতেই জীবকুলে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই চতুষ্পদটি। তার ওপর হাজার হাজার বছর ধরে রক্তে নুনের পলি পড়েছে। তাই এখন প্রায় বিনা কারণেই হিংস্র হয়ে ওঠে, মানুষ খুন করে, খিদে না পেলেও।

চক্রবর্তী ও চৌধুরী দুজনে মিলে অংক কষে তাদের গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, সুন্দরবনের বাঘের মুখে মানুষ মারা যায় সবচেয়ে বেশি এপ্রিল মাসে। তারপরেই জানুয়ারিতে। কারণ দেখাতে গিয়ে ওরা বলেছেন, এপ্রিলের পয়লা থেকে শুরু হয় সুন্দরবনের মধুমাস—মধু সংগ্রহের মরশুম এপ্রিল থেকে ১৫ জুন। কিন্তু শীতের মাস জানুয়ারিতে কেন তার পরেই বেশি মানুষ বাঘের খাদ্য হয় তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাদের প্রশ্নবোধক অনুমান : নর ও মাদী বাঘের বছরের ওই সময় উর্বরতা হ্রাসের দরুণই কী হিংস্রতা চাগাড় দিয়ে ওঠে?

সুন্দরবনের বাঘ সর্বভুক। মানুষ, হরিণ, শুয়োর, মাছ, বানর, কাঁকড়া, মৌচাক কিছুই বাদ দেয় না। বাঘের পেট থেকে মানুষের হাড়গোড়, হরিণের শিং, পাখির পালক পাওয়া গিয়েছে। আক্রমণ করে শিকারের পেছন দিক থেকে। ঘাড়ের ডানদিকটা কামড়ে ধরে। আজ পর্যন্ত যত মানুষ বাঘের মুখে পড়েছে তার মধ্যে মাত্র ২৮-৫ শতাংশের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

২-৬১ মিটার

বাঘের পায়ের ছাপ বা ক্ষত পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা সুন্দরবনের বাঘের শারীরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি তথ্য আবিষ্কার করেছেন। এখানে এ বি চৌধুরী ও কল্যাণ চক্রবর্তীর আর একটি গবেষণাপত্র (ডেভলপমেন্ট অব সুন্দরবন ফরেস্টস—এ সায়েনটিফিক স্টাডি) থেকে সুন্দরবনের নর-বাঘের কয়েকটি ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস্ তুলে ধরছি (সবই পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত বয়সী) : কড়ের দৈর্ঘ্য ০-১৪ মিটার, লেজের দৈর্ঘ্য ০-৭৭ মিটার, লেজ সমেত একটা গোটা বাঘের দৈর্ঘ্য ২-৬১ মিটার, লেজ ছাড়া ১-৮৪ মিটার।

বাঘ বাঁচে কুড়ি থেকে বড় জোর পঁচিশ বছর পর্যন্ত। এবং জন্ম, বাড় ও মৃত্যু সবই নির্ভর করছে তার খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তার উপর।

একদা এই বনে গণ্ডার, জলা জমির হরিণ ও প্রচুর বুনো মোষ ছিল সে সব এখন আর নেই। আছে মাত্র হাজার বারো চিতল হরিণ, হাজার দুই শুয়োর, অজস্র বানর, সাপ এবং জলে হাঙর, কামট ও মাছ। সবই বাঘের খাদ্য। কিন্তু তিন বছর আগেও বাঘ ছিল কিছু শখের শিকারী ও ব্যবসায়ীর বন্দুকের খোরাক। কলকাতার বাজারে একটি প্রমাণ সাইজের বাঘের চামড়ার দাম কম করে পনেরো হাজার টাকা। বিদেশে ওই চামড়াই পঞ্চাশ হাজারে বিক্রি হয়। বাঘের দোহাই পেড়ে সুন্দরবনের ধানী মানী গেরস্থ বহু মানুষ হাজার হাজার বন্দুকের লাইসেন্স আদায় করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম

মধু ও মোম

মাছ মারা, কাঠ কাটাদের পরেই আসছে মৌলিরা যারা জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনে গাছের গড় উচ্চতা পনেরো থেকে ত্রিশ ফুট। ত্রিশ ফুট লম্বা গাছ খুব কমই চোখে পড়ে। সাধারণত ওই ধরনের বড় গাছের দলে পড়ে কেওড়া ও গড়র। মৌমাছিরা চাক বাঁধে সাধারণত পাঁচ থেকে দশ ফুট উচ্চতার মধ্যে। একটা হিসাব এখানে দিচ্ছি তাতেই স্পষ্ট হবে বছরে কত লোক মধু সংগ্রহে জঙ্গলে ঢোকে এবং সারা বছরে কি পরিমাণ মধু ও মোম সংগৃহীত হয়।

বছর	মৌলির সংখ্যা..	সংগৃহীত মধুর পরিমাণ	সংগৃহীত মোমের পরিমাণ
১৯৬৩-৬৪	১৩৫২	১৩২৩-৮ কুইন্টল	১০০-১ কুইন্টল
১৯৬৪-৬৫	৯১৩	৫৯৯-৬ ,,	৩৮-২ ,,
১৯৬৫-৬৬	১০৭০	৯৫৯-২ ,,	৬৭-৮ ,,
১৯৬৬-৬৭	৯৪৪	৭৭৩-০০ ,,	৬২-৬ ,,
১৯৬৭-৬৮	১১৪০	৮৮৯-৫ ,,	১২৮-৫ ,,
১৯৬৮-৬৯	১১০৭	৭১৮-৬ ,,	৭১-০০ ,,
১৯৬৯-৭০	১০১৬	৬৮০-৫ ,,	৫৭-৩ ,,
১৯৭০-৭১	১৪৭৬	৯১২-৯ ,,	৭৪-৭ ,,
১৯৭১-৭২	১৪৯৫	৮৯০-০০ ,,	৭২-১ ,,

পশ্চাদপদ এলাকা বলে পরিচিত সুন্দরবনের মাত্র একটি গ্রাম কুমীরমারিতে খুব কম করেও একশ খানা বন্দুক আছে। বসিরহাটের এক বন্দুক ব্যবসায়ীকে জানি, যিনি সারা বছর নৌকো করে সুন্দরবনের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ান খদ্দেরদের কাছ থেকে গুলি-বন্দুকের দাম আদায় করতে। এমন কি তিন বছর আগে সুন্দরবনের আড়াই হাজার বর্গ কিলোমিটার ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন বলে ঘোষণা করার পরও ওই ভদ্রলোককে দেখেছি প্রকল্পভুক্ত এলাকার গাঁয়ে গাঁয়ে ব্যবসা সূত্রে ঘুরে বেড়াতে। তার খদ্দেরদের দৌলতেই ১৯৭২ সাল নাগাদ বাঘের সংখ্যা কমতে কমতে শেষমেশ ১২০-তে এসে ঠেকে। আইন করে বাঘ মারা নিষিদ্ধ হওয়ার পর, কল্যাণবাবুদের টহলদারি বাড়বার পর গত তিন বছরে ওই সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। গত মার্চের হিসাব : সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা এখন ১৮১। এর চার আনাই কাচ্চা-বাচ্চা।

১১ হাজার হরিণ

বাঘ চক্কোত্তির (কল্যাণবাবু মাফ করবেন) দেওয়া হিসাব অনুসারে প্রতিদিন একটি বাঘের প্রয়োজন দশ কিলো মাংস। তাহলে সারা বছরে ১৮১টি বাঘের প্রয়োজন ১৮১ × ৩৬৫ × ১০ কিলো বা ৬,৬০,৬৫০ কিলো। একটি হরিণের ওজন যদি হয় ষাট কিলো, তাহলে ওই পরিমাণ মাংসের জন্য বছরে দরকার প্রায় এগারো হাজার হরিণ। বর্তমানে হরিণের সংখ্যা যে বারো হাজার তা আগেই বলেছি। শিকার আইনত বন্ধ হওয়ায় বংশবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি হারে হচ্ছে বলে বন দফতরের ধারণা। কিন্তু আমার ধারণা বিপরীত—বাঘকে ছুঁলে আইন অনুযায়ী জেল-পুলিশের ভয়, তাছাড়া মাংসটা কাজে লাগে না, ধরা পড়ার আশংকা, কিন্তু হরিণের যে সর্বকিছুই মানুষ কাজে লাগায়। তাই নির্জন অরণ্যে বন্দুকের আওয়াজ লোকালয়ে পৌঁছোয় না, অথচ চোরাই পথে আজো হরিণের মাংসা কলকাতায় যে আসে তার খবর পাই। বাড়ি বাড়ি গোপনে চালান যায়।

সুন্দরবনে যতবার গেছি সাধারণ মানুষের কাছে বারবার একই অভিযোগ শুনেছি : বাঘ বাঘ করে কলকাতা পাগল, এদিকে বাঘ বাঁচানোর জন্য যে মানুষ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলে কাঠ কাটা চলবে না, নদীতে মাছ মারা চলবে না, সবেতেই যদি বাঘের ব্যাঘাত হয়, তাহলে আমরা বাঁচব কি করে ?, আমাদের যে বিকল্প কোন জীবিকা জানা নেই।

জবাবটা সরাসরি দেওয়া সম্ভব নয়। একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি। জাতীয় বন-নীতি অনুযায়ী দেশের মোট ভূ-সম্পদের

দুনিয়ার বাঘ এবং আমাদের

ক) (১) বিশ্ব বন্য প্রাণী ভাণ্ডারের হিসাব অনুসারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে (১৯১৮) সারা পৃথিবীতে বাঘ ছিল : ১,০০,০০০।

(২) ওই ভাণ্ডারের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭২ সালে পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা : ৫,০০০।

খ) (১) খ্যাতনামা বন্য প্রাণী সংরক্ষণকামী ই পি গীর হিসাব অনুযায়ী চলতি শতাব্দীর গোড়ায় ভারতে বাঘের সংখ্যা : ৪০,০০০।

(২) জিম করবেটের মতে ১৯৫৫ সালে ভারতে বাঘের সংখ্যা : ২,০০০।

(৩) ১৯৬৯ সালের ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাঘ সুমারি অনুযায়ী মোট বাঘের সংখ্যা : ২,৫০০।

(৪) ১৯৭২ সালের বাঘ সুমারি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে বাঘের হিসাব :

অন্ধ্র—৩৫, অরুণাচল — ৬৯, আসাম—১৪৭, বিহার — ৮৫, গুজরাট—৮, কেরালা—৬০, মণিপুর—১, মধ্যপ্রদেশ — ৪৫৭, মেঘালয় — ৩২, মহারাষ্ট্র—১৬০, মহীশূর — ১০২, নাগাল্যাণ্ড—৮০, ওড়িশা—১৪২, রাজস্থান—৭৪, তামিলনাড়ু—৩৩, ত্রিপুরা—৭, উত্তর প্রদেশ—২৬২ ও পশ্চিমবঙ্গ—৭৩।*

মোট ১৮২৭

* রাজ্য বন দপ্তরের মতে ওই হিসাব ঠিক নয়। এক সুন্দরবনেই ওই বছর ১২০ বাঘ ছিল।

বাঘ : পশ্চিমবঙ্গ ও সুন্দরবন

১৯৭২ সালের বাঘ সুমারিতে পশ্চিমবঙ্গে বাঘের সংখ্যা দেখানো হয় ৭৩। ওই সুমারি অনুযায়ী তখন রাজ্যের বিভিন্ন বনে বাঘের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ : বকসা—১৭, কারসিয়াং—৭, কোচবিহার—৭, বৈকুণ্ঠপুর—৭, জলপাইগুড়ি—৬, কালিম্পং—২ এবং সুন্দরবন—৭৩।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই হিসাবের সঙ্গে রাজ্য বন দপ্তর একমত নন। চব্বিশ পরগণার তদানীন্তন ডি এফ ও এ বি চৌধুরীর মতে ওই বছর এক সুন্দরবনেই বাঘের সংখ্যা ছিল ১২০।

১৯৭৩ সালের বাঘ সুমারির সময় সুন্দরবনের ২৫৯৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ১১৯টি দ্বীপে ব্যাপকভাবে গণনা করা হয়। প্রতিটি দ্বীপকে গণনার সুবিধার জন্য ১৫টি ব্লকে ভাগ করা যায়। প্রতিটি ব্লককে ৫টি কমপার্টমেন্টে পুনরায় ভাগ করা হয়। প্রতি কমপার্টমেন্টের জন্য ৫ জন বন কর্মী নিয়ে এক একটি গণনাকারী দল গঠিত হয়। ভারতেবাঘ গণনার দিক থেকে সুন্দরবনের এক বিষয়ে সুযোগ সর্বাধিক। নদীর পাড়ে নরম মাটিতে বাঘের পা বা কড়ের ছাপ স্পষ্ট আকারে পাওয়া যায়। ওই ছাপের ওপর কাঁচ রেখে তার ওপর ট্রেসিং পেপার ফেলে আগে ছাপ নেওয়া হয়। পরে তরল প্লাস্টার অব প্যারিস ঢেলে তুলে আনা হয় কড়ের হুবহু অনুকৃতি। মানুষের আঙুলের ছাপ প্রতিটি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি বাঘের কড়েরও। তদনুযায়ী বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১৮১।

শতকরা প'য়ত্রিশ ভাগ বন হলে সবদিক থেকে মঙ্গল। সেখানে দক্ষিণ বঙ্গের দশটি জেলা মিলিয়ে মোট জঙ্গলের আয়তন মাত্র বারো ভাগ। আর যদি সুন্দরবনকে বাদ দেওয়া যায়, তাহলে ঝপ করে ওই হিসাব নেমে আসবে ছয় শতাংশে। এর ফল কি হয়েছে—বৃষ্টির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, প্রচলিত ঋতুর সময় আর ঠিক থাকছে না। চাষবাস থেকে শুরু করে জনজীবনে নেমে আসছে বিপর্যয়। এই বিপর্যয় রোধ করা রাজ্যের অন্যান্য অংশে যখন তেমন সম্ভব হচ্ছে না, তখন বাঘের নাম করে সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখার একটা চেষ্টা চলছে। যদি ওই বন বাঁচে, তাহলে শুধু সুন্দরবনের বাইশ লাখ মানুষ নন, গোটা দক্ষিণবঙ্গের চার কোটি মানুষ বাঁচবেন—নইলে সব বন উজাড় হয়ে গেলে একদিন সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিতে থর মরুভূমির আকস্মিক অনুপ্রবেশ নেহাৎ কষ্টকল্পনা নয়।

আর বিকল্প জীবিকার পাশাপাশি বর্তমানে প্রচলিত জীবিকার সুস্থ অস্তিত্ব ওই বাঘ প্রকল্পই দেবে। গোটা সুন্দরবনে রেললাইন মাত্র ৪২ কিলোমিটার, রাস্তা ২৫৩ কিলোমিটার এবং জলপথ ২৮৯-৬ কিলোমিটার। পূর্ব রেল এখন ৮২ কিলোমিটার নতুন রেলপথ খোলা যায় কিনা ভাবছেন। যদি ওই প্রস্তাবিত লাইন গড়ে ওঠে, তাহলে বহু হাজার মানুষের অন্ন সংস্থানের পথ হবে প্রশস্ত।

তাছাড়া ব্যাঘ্র প্রকল্পের গবেষণায় ধরা পড়েছে, সুন্দরবনের নদীনালায় ইলিশ সমেত কয়েক জাতের মাছের আমদানি বছর বছর কমে যাচ্ছে। গবেষকদের বক্তব্য : সারা বছর ধরে একই জায়গায় মাছ না ধরে যদি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে করা যায়, তাহলে মাছের বংশবৃদ্ধির পথ হবে সুগম। এলোপাথাড়ি গাছ কাটা রোধ করে পরিকল্পনা মাফিক কাটলে একদিকে কাঠুরেদের জীবিকা যেমন অটুট থাকবে, তেমনি অপরদিকে নতুন করে গজিয়ে উঠবে জঙ্গল।

মাত্র তিন বছরের পরীক্ষায় বন দফতর দেখিয়ে দিয়েছেন সারা দেশে ন'টি ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে বাঘের সংখ্যায় সুন্দরবনের স্থান আজ শীর্ষে। প্রকল্পের সময় মোট ছ' বছর। যদি বাকি তিনটি বছর ওইভাবে কাটে, তাহলে সুন্দরবনের বাঘ যেমন খেয়ে-পরে বেঁচেবর্তে থাকার সুযোগ পাবে, তেমনি পাবে মানুষজনও ক্রমবর্ধমান বনসম্পদের করুণা। আর এখনো যে-বিষয়টি সম্পর্কে সুন্দরবন অনিশ্চিত, তা হল, পর্যটনের সুযোগ ও প্রসার। ওই বাঘ দেখিয়েই দিশী ও বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার, মার্ক, ইয়েন রোজগার করা সম্ভব। তার জন্য চাই উপযুক্ত লঞ্চ সার্ভিস, টুরিস্টদের থাকার হোটেল ও খাবারদাবার। সব কেন সরকার করবেন? এসব কাজ সব দেশেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবসায়ীরা এখনই এগিয়ে আসুন না। গোসাবা, নামখানা, বসিরহাট, সজনেখালিতে হোটেল খুলুন। লঞ্চ নামান জলে। বাঘ দেখার জন্য বন দফতর তো ওয়াচ টাওয়ার বানিয়েছেন, আরো বানাবেন। আজ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে দেখবেন লোকে দার্জিলিং, দীঘা ছেড়ে সুন্দরবনে ছুটছেন ছুটি কাটাতে—এরকম নদী, অত নিবিড় সবুজ জঙ্গল এবং স্বপ্নের মত সুন্দর ও ভয়ংকর বাঘ আর কোথায় আছে?

সুন্দরবন ও অন্যান্য ব্যাঘ্র প্রকল্প

১৯৭২ সালের বাঘ সুমারির ফল দেখে কেন্দ্রীয়হোক। সেই মত কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে মোট ন'টি
সরকার বিচলিত বোধ করেন। এই সময় বিশ্ব বন্য প্রাণীজঙ্গলকে আইনবলে ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করেন।
ভান্ডার ছয় কোটি টাকা অর্থ সাহায্যের এক প্রস্তাব দিয়েএখানে ওই নটি ব্যাঘ্র প্রকল্পের নাম, ঠিকানা, আয়তন,
ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন দেশের সম্ভাব্য বাঘেরকেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ও ১৯৭৬ সালের
আবাসগুলিকে নিরাপদভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করাগণনা অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা দেওয়া হল:—

নাম	ঠিকানা	আয়তন	অর্থের পরিমাণ	বাঘের সংখ্যা
১। করবেট পারক	ইউ পি	৫২৫ বর্গ কিমি	৩৬.১০ লক্ষ টাকা	৫৫
২। মানস	আসাম	২৮৩৭ ,, ,,	৪০.৯০ ,, ,,	৪১
৩। বন্দীপুর	কর্নাটক	৬৮৯ ,, ,,	৩৫.৬১ ,, ,,	১৯
৪। কানহা	মধ্যপ্রদেশ	১১০০ ,, ,,	৪০.৬০ ,, ,,	৪৮
৫। মেলঘাট	মহারাষ্ট্র	১৫৭২ ,, ,,	৩৬.৭১ ,, ,,	৩২
৬। রনথমভোর	রাজস্থান	২৯৮ ,, ,,	৩৫.০০ ,, ,,	২০
৭। পালামৌ	বিহার	৯০০ ,, ,,	৩৫.৮০ ,, ,,	৩০
৮। সিমলিপাল	ওড়িশা	২৫০০ ,, ,,	৩৮.৬২ ,, ,,	৭৫
৯। সুন্দরবন	পশ্চিমবঙ্গ	২৫৮৫ ,, ,,	৩০.৯২ ,, ,,	১৮১

বেড়ালটা অনেকক্ষণ ধরে লোকটার ব্যাপার-স্যাপার লক্ষ্য করছে। বেড়ালটার মনে হয়, লোকটা আর-আর দিনের তুলনায় আজ আরও রাতে এই ঘরে এল। এই ঘরে বাড়ির কেউই বড় একটা আসে না। অনেক দিন পরপর কে যেন ঘরটা ঝাড়পোঁছ করতে আসে, চারদিকের ছত্রাকার জিনিস-পত্তর এদিক-ওদিক করতে করতে এই ঘর ও ঘরের প্রতিটি জিনিসে তার তাচ্ছিল্য চোখে-মুখে স্পষ্ট করে তোলে, মাত্র কিছুক্ষণই সে এই ঘরে থাকে, ঘরের আনাচে-কানাচের দিকে নজর দেওয়ার সময়ই থাকে না। রোজই সন্ধের একটু পরে একজন এসে ভাল করে ঢাকা খাবারের থালা রেখে যায়। বেড়ালটাও বুঝতে পারে, তারও চোখে-মুখে থাকে তাচ্ছিল্য। লোকটা খুব ভোরে বেরিয়ে যায়। অনেক রাতে ফেরে। বাড়ি ফেরার পর ঘরের আনাচে-কানাচের দিকে তাকাবার মত মন-মেজাজ থাকেই না। তাই অনেক দিন থেকেই এই ঘরেই বেড়ালটার সুখের সংসার।

ঘরের এককোণে পুরনো আমলের একটা পেটরা। দশাসই। পেটরার পেছনেই জানলার চওড়া গোবরেট। এই জানলাটা কোন দিনই খোলা হয় না। পেটরা, গোবরেট ও জানলা মিলিয়ে যে চোখুপির মত জায়গাটা সেখানেই বেড়ালটার আস্তানা। তার সংগে থাকে তার ছিঁচকাঁদুনে ছানা। ছানাটারও শিগ্‌গিরই ছানা পাড়ার মত বয়স হবে। জানলাটার একটা কোণ একটু ভাঙ্গা। এই ভাঙ্গা জায়গা দিয়েই বেড়ালটা বাইরে যায়, বাইরে থেকে ভেতরে আসে।

বেড়ালছানা হঠাৎ ডাকে, মিঁউ! বেড়ালটা তক্ষুণি তার বাচ্চাকে বুকের কাছে টেনে আনে। বুকের কাছে টেনে আনতে আনতে লোকটার কর্মকাণ্ড দেখে।

পাড়ার অনেক বাড়িতে বেড়ালটা আস্তানা পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কোথাও পাত্তা পায় নি। রাত্তির, শুধু রাত্তিরটুকুই কাটাতে চেয়েছিল। কেননা, শীত-বর্ষার রাত্তিরে যেখানে সেখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়। একটা বাড়িতে কয়েক দিন লুকিয়ে লুকিয়ে রাত কাটাবার পর একদিন ধরা পড়ে যায়। সেদিন এঁটো-কাঁটার জঞ্জাল থেকে খিদে মেটাবার মত কিছুই খুঁটে আনতে পারে নি। তাই সারা দিনই পেটে খিদে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধের পর বাড়িটায় লুকোতে এসে দেখল, রান্নাঘরের উনুনের পাশে জামবাটিতে গরম দুধ। পেটে এত খিদে যে সে আর লোভ সামলাতে পারল না। কিন্তু দুধ খাওয়া হয় নি, মুখটাই পুড়েছিল। গরম দুধে মুখ দেওয়ার সংগে সঙ্গেই ধরা পড়ে যায়। বাড়ির চাকররা তার গায়ে গরম জল ঢেলে দেয়। সে পালিয়ে বাঁচে। গরম-জল এত গরম ছিল যে সে জ্বালায়-যন্ত্রণায় অনেক দিন পর্যন্ত ছটফট করেছিল। পোড়া ঘা-র জন্যই তার শরীরের জায়গায় লোম নেই। তার চেহারাটা আরও বেশি কুৎসিত হয়ে যায়। ভয় পাওয়ার মত চেহারাটা হয় আরও বেশি ভয় পাওয়ার

মত। তবে, তার বাচ্চাটা তার মত বিচ্ছিরি দেখতে নয়। তার বাচ্চাটার গা-ভর্তি ক্ষীর-রঙের লোম। দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। অনেক চেষ্টা করেও কুৎসিত বেড়ালটা কারুরই পোষা-বেড়াল হতে পারে নি। সে অনেক আদিখ্যেতা দেখিয়েছে। তাতে কোন কাজ হয়নি। সে এত কুৎসিত যে লোকে তাকে দেখলেই ভয় পায়। একবার আদিখ্যেতা দেখাতে গিয়ে একটা বাড়িতে এমন মার খেয়েছিল যে তার একটা ঠ্যাং ভেঙে যায়। সারা শরীরে অনেক দিন ব্যথা ছিল। কাঁকালে ত এখনও ব্যথা। বেড়ালটা তার ব্যথার জায়গাটা তার বাচ্চার ক্ষীর রঙের লোমে চেপে ধরে জুবুথুবু হয়ে বসে থাকে।

বেড়ালটা লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখতেই থাকে।

একটু রাত হলে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে লোকটা ঘরে ফেরে। ঘরে ঢোকার অনেক আগেই লোকটার জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায়। বেড়ালটা লোকটার জুতোর আওয়াজ চেনে। লোকটার জুতোর আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে সাবধান হয়। পেটরা-গোবরেটের চৌখুপির আড়ালে গা ঢাকা দেয়। বাচ্চাটা মিঁউ মিঁউ আওয়াজ করলে তাকে বুকে চেপে চুপচাপ বসে থাকে। লোকটা ঘরে ঢুকেই আলো জ্বালে। রোজই। আলো জ্বলতেই অনেকক্ষণ অন্ধকার হয়ে থাকা ঘরটা ঝলমলে হয়ে ওঠে। ঘরটার চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়ার পর সে বন্ধ জানলাগুলো খুলে দেয়। আজ ঘরে ঢুকে সে এসব কিছুই করে না। আলো জ্বালায় না। জানলাগুলো খোলে না। অন্ধকার ঘরের এককোণায় চুপচাপ বসে থাকে। বসেই থাকে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকার পর লোকটা আলো জ্বাললো। কিন্তু, জানলাগুলো খুলল না। একটা চেয়ারে বসে রইল। বসেই রইল। চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে দিয়ে হাতের তেলো ও আঙুল দিয়ে চোখ ঢেকে রাখল। অন্যান্য দিন জানলাগুলো খোলার পর সে জুতোর ফিতে খোলে, জুতো খোলে, আস্তে আস্তে জামার বোতাম খোলে। জামার বোতাম খোলার পর শার্ট খোলে। শার্টটা হ্যাঙারে রাখার পর প্যান্ট খোলে গেঞ্জি খোলে। প্যান্ট গেঞ্জি ইত্যাদি ঠিক ঠিক জায়গায় গুছিয়ে রাখবার আগেই পায়জামা পরে। পায়জামা পরার পরই সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়ির ভেতরে যাওয়ার দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে যায়। কিন্তু, লোকটা আজ এসব কিছু করছে না। চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে বসেই আছে। অনেকক্ষণ এই-ভাবে বসে থাকার পর জানালাগুলো খোলার জন্য এগিয়ে যায়। জানলাগুলো খোলার পর আবার চেয়ারে এসে বসে। আগের মতই বসে থাকে। অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর লোকটা একে একে জুতো, জামা, শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি খোলে ও পায়জামা পরে। তারপর আবার চেয়ারে এসে বসে। চেয়ারে পিঠ দিয়ে হাতের তেলো দিয়ে চোখ ঢেকে মাথাটা চেয়ারের পেছন দিকে ঝুলিয়ে দেয়। লোকটার ঠোঁট থেকেও ঝুলতে থাকে তোবড়ানো সিগারেট।

বেড়ালছানাটা আবার ডাকে, মিঁউ। কিন্তু লোকটা বেড়ালছানার ডাক শুনতে পায় না। বাচ্চাটা এত তিড়বিড়ে যে তাকে বুকের কাছে আটকে রাখতে বেড়ালটার খুব কষ্ট হয়। কেননা, শরীরে আগের মত তেমন জোর নেই। বেড়ালটা লোকটার কাজ-কারবার দেখতেই থাকে। লোকটা অন্যান্য দিন এত-ক্ষণে বাথরুম-টাথরুম সেরে এসে গামছা দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে ঘরের আরেকটা দরজা খোলে। এই দরজা দিয়েই বাড়ির বাইরে যাওয়া যায়। দরজা খুলতেই দেখা যায় একটা কুকুর জিভ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা লোকটাকে দেখলেই খুব জোরে লেজ নাড়ে। লেজটা নাড়াতে নাড়াতে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসে পড়ে। তারপর, লোকটা খেতে বসে। তখন কুকুরটার ঝোলানো জিভ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে, টস্‌টস্‌। লোকটা তার খাবারের আদ্দেকটাই কুকুরটাকে দিয়ে দেয়। রোজই এমন হয়। কিন্তু, লোকটা আজ এ-সব কিছুই করছে না। আগের মতই বসে আছে। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর লোকটা বাড়ির ভেতর যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঘরে ফেরে। লোকটা পা টিপে টিপে ঘরের ভেতর পায়চারি করে।
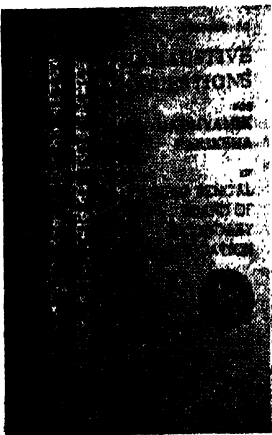
লোকটা ঘরের বাইরে যাওয়ার দরজাটা খুলতেই দেখে, কুকুরটা জিভ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে। কুকুরটা লোকটাকে দেখেই লেজ নাড়ে। লোকটা তার খাবারের থালা কুকুরের কাছে এনে রাখে। লোকটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, খিদেয় কাতর কুকুর কয়েক মিনিটেই থালার সব খাবার খেয়ে নেয়। অন্যান্য দিন খাওয়া-দাওয়ার পর লোকটা টেবিল-আলো জ্বালিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ে, লেখে, আরও অনেক কিছু করে। সে আজ এসব কিছুই করছে না। আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকে। ঘরে আলো জ্বালানো না থাকলেও ঘরটা কিন্তু তেমন অন্ধকার নয়। কেননা, এখন আকাশে চাঁদ। ঘরের ভেতর চাঁদের আলো।

বেড়ালটা লোকটাকে ভাল করেই লক্ষ্য করতে থাকে।

হঠাৎ লোকটা কোত্থেকে একটা দড়ি জোগাড় করে এনে একটা ফাঁস তৈরী করে। ফাঁসটা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর গলায় লাগিয়ে দেয়। লোকটা একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়ায়। দড়িটার অন্য দিকটা বাঁশের আংটায় বাঁধে। তারপর লোকটা চেয়ারটা লাথি মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে। চেষ্টা করতেই থাকে। চেষ্টা করতে করতে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যায়। লোকটার তাই-ই মনে হয়। কালো কুৎসিত বেড়ালটা তার ওপর লাফিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত তাই-ই মনে হয়। বেড়ালটা ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে লোকটা ভয় পায় ...র ভয় পায়। ভয় পাওয়ার পর তাড়াতাড়ি গলা থেকে ফাঁসটা খোলে। ফাঁসটা খোলার পর তার মনে হয়, সারা ঘরটা আলোয় আলোয় ঝলমলে—ঘরের ভেতরে ও বাইরে এত আলো যে সে তা সহ্য করতে পারছে না। ঘরের এক কোণায় কালো কুৎসিত বেড়ালটা ও তার ক্ষীর রঙের লোমওয়ালা বাচ্চাটার দিকে সে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার মনে হয়, শরীরে কোন শক্তি নেই। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। সে কোনরকমে বেড়ালটার দিকে এগিয়ে যায়। পা টিপে-টিপে এগোতে থাকে। ঘরের কোণায় এসে দেখল, কেউ নেই, কিছু নেই, ঘরে কোন আলোও নেই।

বেড়ালটা চৌখুপি থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, লোকটা চেয়ারে পিঠ দিয়ে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে বসেই রয়েছে। তার ক্লান্ত শরীর থেকে ঝুলতে থাকে হাত, পা, মাথা ইত্যাদি। তার গাল, গলা কপাল ও শরীরের অন্যান্য অংশ খুব ঘামতে থাকে। বেড়ালটা বুঝতে পারল, এখন লোকটার মরার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই।

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেলিশ্রক্রিস্টিন

প্রণতা দে

আলমোড়া। ২০শে মে। '৯৮

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

এইমাত্র তোমার চিঠিটি পেয়ে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছি। আমেরিকান মহিলাদের সঙ্গে আমি আবারও হিমালয়ে এসেছি। ইচ্ছে আছে এখান থেকে কাশ্মীর যাবার। আবারও বারকয়েক ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে (গত বছর) শরীরটা বেশ কাবু হয়েছিল। আশা করছি পাহাড়ের হাওয়াতে ভাল বোধ করব।

এইসব রোগের উপসর্গগুলো এখন পুরোনো বন্ধুর মত। সঙ্গে লেগে থাকে, উত্তেজিত করে না। কাশ্মীরের পর কলকাতায় ফেরা এবং সেখান থেকে 'আর একবার আমেরিকা'। তবে পরিকল্পনা নির্ভর করছে প্লেগ রোগের ওপরে যা এখনও কলকাতায় সংক্রামকভাবে দেখা দেয়নি। তেমন হলে আমাকে এখানে থাকতে হবে এবং আমার নিজের শহরের জন্য সাধ্যমত যতটা যা পারি সে-কাজ করতে হবে।

বেবীর অব্যবস্থচিত্তের কথা জেনে দুঃখিত হলাম। আমি আশা করছি ভারতবর্ষে এসে ওর থাকবার জন্য একটা বাড়ির ব্যবস্থা শিগগির যদি করতে পারি। আর তোমার জন্যও একটা— যদি তুমি ইচ্ছে কর এবং যদি তোমার সংসারের কর্তব্য থেকে অনুমোদন পাও। আমি নিশ্চিত জানি যে, আমি কলকাতার কাছে গংগার ধারে একটা জমি পেয়েছি জেনে তুমি খুব খুশী হবে। সেখানে সাধুদের জন্য মঠ ও মন্দির তৈরি হবার ব্যাপারটা খুবই সম্ভাবনাময়।

হিমালয়ে আলমোড়ার কাছাকাছি একটা জায়গায় আমার পাশ্চাত্যের বন্ধুদের থাকবার জন্য একটা বাড়ি শিগগির তৈরি

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ

করবার ইচ্ছে। আমার কাজ হবে কলকাতা থেকে হিমালয়। দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করতে আর পারব না। এখন চাই পরিপূর্ণ বিশ্রাম, শুয়ে বসে থাকা। সেটি কী অদূরে হবে ?

স্নেহের ক্রিস্টিনা, তুমি নিজের ওপরে অত্যাচার করে পরিশ্রম কোর না। বেশ দীর্ঘকালের মত লম্বা বিশ্রাম নাও। কর্তব্যের শেষ নেই। আর দুনিয়াটা বড় স্বার্থপর। এবারকার আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ থেকে ফিরে আসব সোজা কলকাতায়। এসে শুয়ে বসে থাকব আর নিরিবিলিতে কিছু কাজ করব—ভবিষ্যতের কর্মীদের ট্রেনিং দেব।

মিসেস ফাঙ্কে ও আমাদের অন্যান্য বন্ধুদের ভালবাসা জানিও। মিসেস ব্যাগলের মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। ভারী ভাল ছিলেন বন্ধু হিসেবে। আমি সুনিশ্চিত যে এবারকার আমেরিকা যাওয়া বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবার জন্য নয়। তুমি যদি ডেট্রয়টে আমার জন্য চুপচাপ নিরিবিলিতে থাকবার একটা ব্যবস্থা দিনকয়েকের জন্য করতে পারো, তবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবো। আমার কী দরকার, না-দরকার এ-বিষয় তোমার চিন্তিত হবার কিছু নেই।

(৭)

কাশ্মীর। ২৭ আগস্ট। '৯৮

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরি করে ফেলেছি। আমি নিরুপায়। যখনই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি, একসঙ্গে এত কথা, এত চিন্তা কলমের ডগায় এসে যায় যে, থেমে যাই এবং ভাবি কী এবং কতটা লেখা যায়! লোকে বলে যতক্ষণ না আমি ধাতস্থ (?) হই! গত দু'মাস ধরে খুবই আলস্যমগ্ন জীবন কাটাচ্ছি। নৌকায় (এটা আমার বাড়িও বটে) করে ঝিলাম নদীতে বেড়াচ্ছি আর দেখছি ভগবানের পৃথিবীতে, প্রকৃতির উদ্যানে, দৃশ্যাবলীর কী মহিমাময় সম্ভার! বাতাস, পৃথিবী, ঘাস, ফুল, বৃক্ষরাজি, পর্বতমালা, তুষার এবং মানুষের রূপ সবই ঈশ্বরের বাইরের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করছে। এমন কী এদের কাছে সামান্য কালিকলমও নেই। ঠিক যেন রিপ্-ভ্যান উইংকলের গল্পের মত!

তবুও মনটা মাঝে মাঝে যেন চিন্তায় টগবগ করে ফুটতে থাকে। গত তিন বছর থেকে শুধু মানুষের স্মৃতিই মনের মধ্যে ঘুরছে। একে কী বলব অদৃষ্ট ? নাকি এসব পূর্বজন্মের স্মৃতি যা গভীরে শিকড় গেঁথে বসেছে, নতুন শরীর তাদের ঝেড়ে ফেলতে পারছে না ? জীবনে এখন ভাঁটার টান, সময় চলে যাচ্ছে, শরীরের প্রতিটি অনু-পরমাণু পরিবর্তিত হচ্ছে, কত মুখের স্মৃতি যে মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে, আর যাচ্ছে। যেন স্বপ্নের মত। এই ভিড়ে এক একজন যেন বিশেষ করে স্মৃতিকে মন্থন করে জীবনটাকে যেন আবার নতুন করে উল্টোদিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইছে—যতই মনে জোর করে বাধা দিতে চাই না কেন। তুমি তো জানো খুব খানিকটা নৌকো বাইবার পর হাল ছেড়ে খানিকটা বিশ্রাম করা ভাল। মন্দ কী মনটাকে তার ইচ্ছেমত চলতে দিয়ে খানিকটা মজা দেখা। তাই আর বাধা দিই না, মনটাকে ছেড়ে দিই, চলুক তার স্বেচ্ছামত। সেই আদিকাল থেকে এইভাবে বুদবুদ উঠছে। চলুক আরও কিছুদিন। আমাকে একজন বলেছিলেন—যিনি আমার কাছে সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন, যে আমাকে আরও একবার সংসারে আসতে হবে। তবে তাই হোক। সব কাজেরই তো একটা কারণ থাকে। ধনুকের ছিলার টান ছাড়তে হবে আর একবার। সেজন্যও একজন কারো স্পর্শ চাই। আয়নাতে সব সময় যে নিজের এই জন্মেরই প্রতিবিম্ব পড়ে তা তো নয়। হয়ত আর কারো মুখের ছায়া তাতে পড়বে; তাই হোক।

"One little footstep must slip to give the pretence of cause to a travel anew through another body ......be it as it will."

এই হল আমার সাম্প্রতিক চিন্তা। নিজের সম্বন্ধে পরপর ধাপ-গুলি লক্ষ্য করে যাচ্ছি।

বেবীর কাছ থেকে একটি সুন্দর চিঠি পেয়েছি। ভারী খুশী হয়েছি। ও সুখে আছে এবং বন্ধুদের সাহায্য করছে। ঠাকুর বাছাকে আশীর্বাদ করুন। নিজেকে নিঃশেষ করে পরিশ্রম কোর না। এর কোন মানে নেই। সব সময় মনে রেখো 'কর্তব্য হল মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রখর। উত্তাপে মানুষের অনেক প্রয়োজনীয় শক্তি বা মনুষ্যত্ব পুড়ে যায়। নিজের চারিত্রিক গঠন ও শিক্ষার জন্য এর খানিকটা প্রয়োজন অবশ্যই আছে; কিন্তু তার অতিরিক্ত হলে সেটা যেন অসুস্থ স্বপ্নের মত হয়। আমরা কারুকে সাহায্য করি বা না করি কার্যাবলী বা ঘটনা ঠিক যা হবার তাই হবে। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা শুধু নিজেকে নিঃশেষ করি। নিঃস্বার্থতার চূড়ান্ত হওয়াটাও একটা মিথ্যে ভাবপ্রবণতা। এইভাবে সবরকম ভুল ও ক্ষতিকর বিষয়ের কাছে নতি স্বীকার করা মানে অন্যের আরও ক্ষতি করা। আমাদের নিজের নিঃস্বার্থতা দেখিয়ে অন্যকে স্বার্থপর করে তোলবার কোন অধিকার নেই! আছে কী ?

মাস তিনেকের আগে আমি আমেরিকা যেতে পারব না। আমরা জাপান ও চীনদেশ হয়ে যাবো। তাই সময় একটু বেশী লাগবে; নিজের শরীরের জন্য সবিশেষ যত্ন নেবে স্নেহের ক্রিস্টিনা। কোন বিষয় ভাবনাচিন্তা একেবারে করবে না। দুশ্চিন্তাই মানুষকে মেরে ফেলে। আর কোন কিছু নয়। যখন ইচ্ছে এবং যা ইচ্ছে আমাকে লিখো। আমার সব বন্ধুদের আমার ভালবাসা জানিও।

Ever yours in the Lord
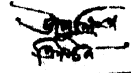
বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যাদের মধ্যে ভগিনী ক্রিস্টিন অন্যতমা। যাঁরা ভগিনী ক্রিস্টিনের নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের মতে তিনি ছিলেন স্বামীজীর শ্রেষ্ঠতমা ও সর্বাধিক প্রিয় শিষ্যা। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়, শ্রেষ্ঠ শিষ্যা এবং মানসকন্যা বলে পরিচিতা। অন্যত্র রেমণ্ড তাঁর দি ডেডিকেটেড গ্রন্থে জানাচ্ছেন—

"Swami Vivekananda expected much from Sister Christine because of her natural disposition was close to that of the Hindu Woman. তিনি ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন "I worry about everything, except you."

(আমি অন্যদের বিষয় চিন্তিত হয়ে পড়ি কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নেই)। ভগিনী নিবেদিতার ভাষায় ক্রিস্টিন সম্বন্ধে 'ক্রিস্টিনের মধ্যে অসাধারণ ধৈর্যশক্তি।' স্বামীজীর মায়াবতীতে থাকাকালীন অসুস্থতার সময় নিবেদিতা ক্রিস্টিনকে দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছেন, এবং বলেছেন—

"She sits up quietly and is so true to him. And yet she is always a link and never a discard."

তিনি য়ুমকে লিখেছেন 'ক্রিস্টিন ম্যাকলাউডের মত শক্ত অথচ শান্ত এবং লেগে থাকেন (clinging) not dominant like you—perfect in 'trustworthyness and so large in her views."

'রেম'র' ভাষায় 'এই মহিলাটির সঙ্গে একটি দৃঢ় রকম বন্ধুত্ব স্থাপন এখন নিবেদিতার পক্ষে খুবই দরকার। এঁর মধ্যে এমন কতকগুলো গুণ আছে যেগুলি তাঁর (নিবেদিতার) নিজের ভবিষ্যত জীবন ও কার্যাবলীর মজবুত ভিত্ তৈরীর পক্ষে একান্তই দরকার। এই জন্যই এঁর গভীর দুঃখের সময় (স্বামীজীর দেহরক্ষা) তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁর (নিবেদিতার) প্রধান কর্তব্য।'

স্বামীজীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা যখন কর্মজগতের আহ্বানে সাড়া দিলেন, ক্রিস্টিন তখন হিমালয়ের গহন কোণে মায়াবতীতে ধ্যান-ধারণায় জীবন অতিবাহিত করবেন মনস্থ করলেন। কিন্তু নিবেদিতার সবল ইচ্ছার বারংবার অনুরোধে ক্রিস্টিন সমতলের কর্মজগতে ফিরে এলেন।

এই দুটি নারী স্বভাবে একেবারে বিপরীত ছিলেন। কিন্তু এই বৈপরীত্যের মাঝেই দুজনে দুজনকে চেয়েছিলেন পরস্পরের শক্তি ও প্রয়োজনের সম্পূরক হিসাবে। রেম বলেছেন :

"Christine became the quiet background in Nivedita's life, the warmth of the nun's, the steady and friendly hand that held the rudder, while Nivedita herself swept along like some great stormy wind bringing life to every one it touched.... ..."

নিবেদিতা স্বভাবতঃই জন্মনেত্রী। তাঁর শৈশব থেকে 'নিবেদিতা' জীবন পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাল্যজীবন থেকেই মার্গারেট স্বাধীন মতামত প্রকাশে নির্ভীক। মিসেস উইলসন তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছিল তার। তাতে ধাক্কা খেতেন মা।...বিদ্যালয় পত্রিকায় মার্গট প্রচুর লিখেছে। কিন্তু কবিতা নয়...। সংগীত প্রভৃতি খুবই ভালবাসত। কিন্তু একুশ বছর বয়স থেকে সবকিছু ছেড়ে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে মগ্ন। সব সময়ই শিক্ষাবিদ্।....উদ্ভিদবিদ্যা ভালবাসত। সকলকে জুটিয়ে বক্তৃতা করতে পারত। ভূতের ও বাইবেলের গল্প বলে সকলকে মাতিয়ে রাখতে পারত।...ইতিহাসকে জীবন্ত করে রাখত আমাদের কাছে।...কিছুদিন সাংবাদিকতাও করে। মোটেও নয় শান্ত ছিল

দাঁড়ানো ক্রিস্টিন। পায়ের কাছে বসে যশী ও গেলেন .

না। সম্ভ্রম আদায় করে নিত। তাকে হেলাফেলা করা যেত না। সে মোটেও সেইণ্ট ধরনের নয়, বরং প্রফেট ধরনের।....নিবেদিতা আদর্শ প্রবেশ করিয়ে দিত। তার ছিল অখণ্ড মন।' (লোকমাতা নিবেদিতা)

এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় নিবেদিতা বুদ্ধিজীবী ও সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর এই বুদ্ধিজীবী মন ও বিজ্ঞানের প্রতি (বিশেষ করে উদ্ভিদবিদ্যা) আকর্ষণই যে তাঁকে জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধেছিল সে বিষয় আমরা নিঃসন্দেহই হতে পারি। এইরকম একজন প্রতিভাময়ী নারী যে সহজেই ক্রিস্টিনের মত অন্তর্মুখী শান্ত ধৈর্যশালিনী মহিলার চেয়ে বেশী জ্ঞাত, প্রচারিত ও জনপ্রিয় হবেন, সেইটাই স্বাভাবিক। অপরদিকে আমরা দেখি স্বামীজী তাঁর অন্তরঙ্গদের বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন গোঁড়া সংস্কারকের কাজ থেকে দূরে থাকতে। ক্রিস্টিন সম্বন্ধে বলা যায় ইনি সমস্ত জীবন নিজেকে পরার্থে নিয়োগ করে গিয়েছেন! পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক দায়িত্ব নিঃশব্দে বিনা অভিযোগে বহন করেছেন। সম্ভ্রম স্বীকৃতি কিছুই চান নি নিজের জন্য। চেয়েছেন শুধু অপরের হিত। তাই যখন থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে এলেন স্বামীজী দেখলেন এঁকে নূতন করে ত্যাগের দীক্ষা দেবার কিছু নেই। ত্যাগ এঁর সহজাত।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে একাধিক ব্যক্তির মতে 'বশী সেন স্পষ্টতঃই ক্রিস্টিন ঘেঁষা এবং জগদীশচন্দ্র বসু নিবেদিতা পক্ষীয়।' দুই ভগিনী স্বভাবে একেবারে বিপরীত ধর্মী ছিলেন। নিবেদিতা প্রধানতঃ কর্মী এবং বিদ্রোহী আইরিশ রক্ত তাঁর ধমনীতে। ক্রিস্টিন যদিও মুখে বলতেন 'আমার পথ রাজযোগ, জ্ঞান বা ভক্তি যোগ নয়'; কিন্তু স্বভাবধর্মে তিনি ভক্তিভাবে নত ছিলেন। (১)

এক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মতের বা পথের অমিলকে 'সংঘর্ষ' নামে অভিহিত করা যায় কী?

ডেট্রয়েটের খবরের কাগজে প্রকাশিত ছবি

বিশেষ করে দ্বজনেরই জীবনের ধ্রুবতারা যেখানে এক। ক্রিস্টিনের প্রতি নিবেদিতার যে গভীর মমতা, শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল তার পরিচয় পাই স্বামীজীর তিরোধানের পর নিবেদিতার ক্রিস্টিনকে লেখা চিঠি থেকে ও বারবার ধর্মপালকে লেখা ওলিবুলের পয়সা থেকে ক্রিস্টিনকে কিছু আর্থিক সাহায্য করবার অনুরোধে।

বশী সেন মহাশয় দুই ভগিনীর নিকট-সংস্পর্শে এসেছিলেন। অত্যন্ত গভীরভাবেই দুজনকে চিনেছিলেন এবং বুঝেছিলেন। শ্রী ও শ্রীযুক্তা সেনের নিকট-সান্নিধ্যে আসবার সৌভাগ্য আমার জীবনে হয়েছে। তাঁদেরই মুখে কতবার নানাভাবে শুনেছি সিস্টার নিবেদিতার জন্য তাঁর (বশী সেন) পক্ষে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নামী (যথা স্যার প্যাট্রিক গেডিস, বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ) ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ হয়েছিল এবং নিবেদিতার দরুনই তাঁর জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায় ব্রহ্মচর্যের হাতছানি থেকে বিজ্ঞানের সাধনায়। এই প্রতিভাময়ী মহিলার পরামর্শে তিনি পাশ্চাত্যদেশে যান। শ্রীযুক্তা গারট্রুড সেন বলেন 'গুরুর (স্বামী সদানন্দ) দেহত্যাগের পর বশী ঠিক করেছিলেন মঠে ব্রহ্মচারী হয়ে যাবেন। মঠের সাধুরাও তাই জেনেছিলেন। কিন্তু নিবেদিতা বশীকে বললেন, 'সেকী! তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র। তোমার মন বিশ্লেষণধর্মী। বিজ্ঞানী হও। তোমার জ্ঞান দিয়ে দেশকে সাহায্য করো।' নিবেদিতার করুণাতেই তিনি জগদীশচন্দ্র বসুর কাজের সঙ্গে যুক্ত হন মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে! অবশ্য খাওয়া ফ্রি!

বশী সেন মহাশয়ের পক্ষে নিবেদিতার প্রতি বিরূপ বা অকৃতজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। আমি তাঁকে খুবই কাছে থেকে দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি। মানুষের কাছে সামান্যতম কাজ পেলেও তাঁকে কৃতজ্ঞতাবোধে আপ্লুত হতে দেখেছি। নিজের গৃহভৃত্য সম্বন্ধে তাঁকে কতবার বলতে শুনেছি, 'কী অক্লান্তভাবে আমাদের সেবা করে, কী পায় বল ত? খানিকটা পয়সা ছাড়া? আমরা গুরুর সেবা করেছি। কেন? নিজের স্বার্থে। গুরুর কাছ থেকে জ্ঞান পাবো, শক্তি পাবো, ঈশ্বরের উপলব্ধির অন্ততঃ কিছুটা পাবো,—এই লোভ বা আশায়। এ-লোকটা কী পায় আমার কাছে? তাই এর ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে 'মানুষ' হয়ে উঠতে সাহায্য করে, একটু ঋণমুক্ত হতে চেষ্টা করি...........'

আমি স্তম্ভিত হয়ে শুনেছি গৃহভৃত্যের প্রতি জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর কৃতজ্ঞতাবোধের গভীর অভিব্যক্তি।

বশী সেন মহাশয়ের হস্তাক্ষর ছিল অনেকটা নিবেদিতার মত। হাসতে হাসতে বলতেন, 'নিবেদিতার লেখা দেখতে দেখতে ও পড়তে পড়তে ঐ ধরনের হাতের লেখা হয়ে গিয়ে থাকবে বোধহয়।'

এতৎসত্ত্বেও তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা-মমতাবোধ যদি কেউ ক্রিস্টিনের প্রতি বেশি দেখে থাকেন, তবে তার কারণ তিনি ক্রিস্টিনকে মায়ের আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি ভগিনী নিবেদিতার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু মাতা ক্রিস্টিনের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে পুত্রের কর্তব্যের দায়িত্বে বাধ্য ছিলেন। ক্রিস্টিন যখন গৃহহীন, সম্পদহীন, অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন, তখন স্বভাবতঃই দয়ালু স্বভাব বশী সেন মহাশয় পুত্রের গৌরবে তাঁকে মাথায় করে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে। প্রথম ৮নং বোসপাড়া লেনে। পরে আলমোড়াতে। ক্রিস্টিনের শেষ জীবনের দিনগুলি এঁদের মা ও ছেলের মধুর সম্পর্কে আলমোড়ার নিভৃত শান্তকোণায় কেটেছে—পুত্রের গবেষণার কার্যে ও মাতার অধ্যাত্ম আলোচনা ও লেখায় (এই সময় ১৯২৭—মেময়ার্স অফ স্বামীজি লিখছিলেন)। নিবেদিতা শেষদিন পর্যন্ত কর্মময় জীবনযাপন করেছিলেন। ক্রিস্টিনের কর্মজীবন স্কুলত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে। শ্রান্ত পথিক গুরুধ্যান ও ঈশ্বরচিন্তার পক্ষপুটে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন।

একথা সুস্পষ্ট যে, জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার গভীর গুণগ্রাহী ছিলেন। তবুও অবলা বসু ও জগদীশচন্দ্রের ক্রিস্টিনকে লেখা চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায় ক্রিস্টিনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক প্রীতির ও বন্ধুজনোচিত ছিল।

যদিও একথা মানতে হবে যে, নিবেদিতার কর্মক্ষমতার তুলনায় ক্রিস্টিনের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে বসু যেন একটু আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। নিম্নোক্ত পংক্তি কটিতে—আমরা দেখছি নিবেদিতার দেহ যাবার পর বসু উইলসনকে একটি পত্রে লিখছেন

"There is the women's school. She ...t it entirely under the control and guidance of Christine When I asked Nivedita to leave a proviso, in case Christine could not carry out the work,—poor child broke down feeling her helplessness .....I don't see the way just now. Christine is nervous and is declined at this moment to return to Calcutta. I don't know whether this is due to temporary 'nerve' or she does not feel herself upto it."

উপরিউক্ত প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ক্রিস্টিন দেখলেন স্কুলটির ম্যানেজমেন্ট অন্যের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এবং বর্তমান নিয়মাবলী ও কার্যাবলীর ধারা ক্রিস্টিনের মতে 'বিবেকানন্দের নারীশিক্ষার পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না।' ক্রিস্টিন দুঃখিত হন এবং স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। ১৭ নম্বর বোসপাড়া লেনে বসবাস করা সম্ভব হল না। চলে গেলেন দার্জিলিং-এ। অনেক দুঃখকষ্টের চরম অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। অবশেষে বশী সেনের গৃহে এলেন।

একথা অনস্বীকার্য যে জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসু নিবেদিতার সংস্পর্শে এসেছেন বেশী এবং স্বভাবতঃই ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। নিবেদিতার জীবন ছিল কর্মময়, এবং কর্মের তাগিদে

(১)শ্রীযুক্তা গারট্রুড সেনের মুখে একথা একাধিকবার শুনেছি।

তিনি বসুকেও যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন। নিবেদিতা বসুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে গ্রন্থরূপে লিপিবন্ধ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক মহলে বসুর স্বীকৃতির জন্য নিবেদিতা যথেষ্ট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। নিবেদিতার বিজ্ঞানের জ্ঞান সাধারণ মানুষের বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তবুও একটা কথা উল্লেখ করলে মিথ্যে বলা হবে না যে, নিবেদিতা লণ্ডনে থাকাকালীন যেভাবে বসুমহাশয়ের কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন সেটা 'নিবেদিতা' জীবনকে অস্বীকার করে পূর্বাশ্রমের মার্গটিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। এজন্য স্বামীজী তাঁর প্রতি রীতিমত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং অসন্তোষ 'কলহের' রূপ নিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না।

অপরপক্ষে বশী সেন মহাশয় স্বাধীনভাবে গবেষণায় নিযুক্ত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী দেখে বসু মহাশয় ছাত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং ক্রিস্টিনের প্রতিও উদাসীন হওয়াটা সেক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয়।

ক্রিস্টিন বোসপাড়ায় থাকাকালীন গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁকে যে অসংখ্য পত্র লিখেছিলেন তার প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমরা দেখছি তিনি জানাচ্ছেন—'নিবেদিতা ও বোসেদের আমার কথা মনে করিয়ে দেবেন' অথবা 'শুভেচ্ছা জানাবেন।' কিন্তু সরাসরি চিঠি তাঁদের না লিখে ক্রিস্টিনকেই লিখেছেন। প্রশ্ন আসে মনে। উত্তরও সহজেই এগিয়ে আসে। গোখলে সন্ত্রাসবাদী বিদ্রোহ, অসহযোগ আন্দোলন, ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সিমলা প্রভৃতি নানাস্থানের মিটিংএ বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যাখ্যায় স্বাধীনতা দাবী করাকে শ্রেয় পথ মনে করতেন। এক্ষেত্রে সন্ত্রাস-বাদীদের প্রেরণাদাত্রী নিবেদিতার চেয়ে ধীর শান্ত, মাতৃমূর্তির প্রতীক ক্রিস্টিনের সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিকযোগ গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। নিবেদিতা তাঁর ১ নভেম্বর ১৯০৫ এর চিঠিতে মিসকে লিখছেন 'মিঃ গোখলে ক্রিস্টিনের সবিশেষ গুণগ্রাহী। তাঁর হৃদয়বেত্তা সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই।' প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য ক্রিস্টিনের মৃত্যুর পর এলাহাবাদ থেকে জনৈকা পুষ্প (সম্ভবত বিবেকানন্দ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রী) মিস ম্যাকলিয়ডকে চিঠি লিখছেন—

"Sister Christine was real mother to-me. Nivedita was like father and Christine was wonderful mother. So I lost these parents of mine. Seldom such sacrifices are seen in this world." (1st April, 1930).

দুই ভগিনীর তুলনামূলক সমালোচনায় আরও একটি তথ্য পরিবেশনযোগ্য মনে করি। ক্রিস্টিন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে প্রথম যান নেহাৎ উপরোধে ঢেঁকি গেলা মনোভাবে ১৮৯৪ খ্রীঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি। পরে বলেছিলেন 'বক্তৃতা শুনতে বসে পাঁচ মিনিট বাদে বলে উঠলাম 'এই বক্তৃতা শুনতে যদি না-আসতাম।' ১৮৯৫ খ্রীঃ ৬ জুন তিনি শ্রীমতী ফাঙ্কের সঙ্গে আবার যান স্বামীজী সন্দর্শনে Thousand Island Park এ। পরদিন স্বামীজী ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন 'তোমার ওপরে মাত্র তিনটি আবরণ আছে। তোমার তৃতীয় চক্ষু এই জীবনেই উন্মীলিত হবে।' পরের দিনই তিনি নিজে আগ্রহ করে ক্রিস্টিনকে দীক্ষা দান করেন। অথচ নিবেদিতাকে দীক্ষা দিতে তিনি যথেষ্ট সময় নিয়েছিলেন। নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসে তারপর দীক্ষা পান (১৯০০ খ্রীঃ)। স্বামীজী বুঝেছিলেন এই তেজস্বিনী কন্যাটি তার সর্বোত্তমুখী কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা, বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তার স্বাতন্ত্র্যবোধ, তীব্র জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি বহিরঙ্গের দুর্বলতার ঊর্ধ্বে যতক্ষণ না উঠতে পারছেন ততক্ষণে তাঁর 'সময় আসেনি।' ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে শিষ্যের গুরুর কাছে 'আমি'কে নিঃশেষ করে আত্মসমর্পণের যে গুরুদায়িত্ব আছে সেটা [illegible] পক্ষে যত সহজ ছিল আত্মপ্রত্যয় [illegible] বোধসম্পন্ন,

ক্রিস্টিন

বিজ্ঞান প্রথায় বিশ্লেষণধর্মী মন, বিদ্রোহী আইরিশ রক্তের ধমনীতে অত সহজ ছিল না। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে তৎকালীন সংস্কারাচ্ছন্ন পর্দার অন্ধকারে আবৃত ভারতীয়, তথা বাঙ্গালী নারীসমাজে নিবেদিতার মত একটি তেজোময়ী নারীর প্রয়োজন ছিল একান্ত। একথাও সত্য স্বামীজীর দেহবসানের অনতিকাল পরেই নিবেদিতা মঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। কিন্তু ক্রিস্টিন তারপরেও প্রায় দশ বছর স্কুলটির পরিচালনা করে যান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। কেবলমাত্র পঠন-পাঠনের চেয়েও অসহায় দুঃস্থ এবং বিধবা নারীদের জন্য কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজন যে বেশী একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করে ক্রিস্টিন স্কুলটিতে শেলাই ইত্যাদি হাতের কাজ শেখবার বিভাগ খোলেন। কিন্তু 'নিবেদিতা তখন নিজের ঘরে বসে বই লিখতে মগ্ন ছিলেন' একথা ক্রিস্টিনের উক্তিতে পাওয়া যায়। নিবেদিতা নিজেও জানাচ্ছেন

"The whole work for Indian woman was taken up and organised by Sister Christine and to her and her faithfulness and initiative alone it owes all its success upto the present (1910)."

এম, সি, এফ জানাচ্ছেন 'একদিন উনি (বিবেকানন্দ) আমাকে বলেছিলেন যারা ওঁর কাজে যোগ দিতে চায় তাদের শুদ্ধচিত্ত হতে হবে। একজন শিষ্যার (ক্রিস্টিন) ওপরে ওঁর খুব আশা ছিল। তার মধ্যে উনি নিরাসক্তি ও আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়েছিলেন। ....একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ও খুব পবিত্র, শুদ্ধচিত্ত,—নয় কী?........আমি সেটা অনুভব করেছি। ওকে আমার কলকাতার কাজে একান্ত প্রয়োজন।'

অন্যত্র তানতিন বলছেন

'I think Swami loved Christine more than anyone else of us. She needed him and he all could give to her more fully than to others. She was the one western pupil who understood Vedanta best, Swami felt."

মিস ম্যাকলয়েড (তানতিন) নিজেও ছিলেন নিবেদিতার মত ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এজন্য মঠের জন্য যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য প্রদান এবং স্বামীজী ও মঠের

বিশিষ্টদের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক সম্পর্ক সত্ত্বেও আনুষ্ঠানিক-ভাবে কখনও দীক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি সগর্বে একাধিকবার বলেছেন I was not his (বিবেকানন্দের) disciple, I was his friend. আমি নিবেদিতার মত তাঁর পায়ের ধুলো নিইনি—আমি তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছি।১

প্রশ্ন জাগে নিবেদিতার মত ব্যক্তিস্বাধীনতাবোধসম্পন্ন মানুষটিরও কী উচিত ছিল না নিজেকে তানতিনের মত দীক্ষা-মুক্ত রাখা? কে জানে—হয়ত বা তাহলে তাঁর শেষজীবনের দিনগুলি অন্যরকম হতে পারত কিনা। এ প্রশ্ন আজ অর্থহীন।

স্বামী গম্ভীরানন্দের ভাষায় আমরা পাই 'মূলে ধর্ম-প্রবণ হলেও তিনি আত্মপ্রকাশ চাইতেন........যিনি ব্রহ্মচারিণী বেশ ধারণ করেও সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে উচ্চকণ্ঠে কথা বলেছেন।........সে বিষয় ছিল স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট নির্দেশ 'এই সংঘ রাজনীতি ও উগ্র সমাজ সংস্কার চেষ্টা থেকে দূরে থাকবে।'
(History of the R. K. Math and Mission).

নিবেদিতা জীবনকে অন্তরের অধ্যাত্মবাদ ও বাহিরের কর্ম-জীবনের সঙ্গে যে সমন্বয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের সাধকের পক্ষে এইটাই বড় বা শেষ কথা নয়! সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি মস্তবড় গুণের পরিচয় কিন্তু ধর্মীয় সংঘের মত ও পথ অনারূপ। সেইজন্যই গুরুশিষ্যার মধ্যে সংঘাত (বা পিতাপুত্রীর মধ্যে) দেখা দিয়েছিল। অবশ্য নিবেদিতা পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে গুরুর চরণে এসে আত্মসমর্পণ করেন। নিবেদিতা নিজেও এবিষয় জানিয়েছেন যে স্বামীজী তাঁর (নিবেদিতার) ভিতরকার একটা জিনিষ চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন যা যাচ্ছিল না। অন্যত্র নিবেদিতা বলছেন 'সিস্টার ক্রিস্টিন স্কুলে আসবার পর স্বামীজী যেন তাকেই শিক্ষা দিতে মনস্থ করেছেন মনে হয়েছিল। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি স্কুলেই থাকতেন নিঃসঙ্গে, আঘাতে, যাতনায়।' (লোকমাতা নিবেদিতা)।

এক কথায় বলা যায় ক্রিস্টিন যখন অন্তরালে বসে আরব্ধ কাজ সম্পাদন করতেন, নিবেদিতা তখন বহির্বিশ্বে আলোড়ন তুলছিলেন। প্রথমা বাল্যজীবন থেকে দারিদ্র্য ও দায়িত্বভারে ক্লান্ত হয়ে স্বভাবধর্মে নিজেকে সংকুচিতা রাখতেন,—দ্বিতীয়া আত্মবিশ্বাসে আধিপত্যপ্রিয় ছিলেন।

স্বামীজী একাধিকবার নানাভাবে নিবেদিতাকে জানিয়েছিলেন ব্রহ্মানন্দের উপর নির্ভর করে থাকতে। নিজে বেশীদিন জীবিত থাকবেন না, অথচ অবোধ কন্যা নিবেদিতার একটি অভিভাবক দরকার এইটাই বোধহয় ছিল তাঁর অন্তরের গহনে। কিন্তু ক্রিস্টিন সম্বন্ধে তিনি সংশয়মুক্ত ছিলেন। জানতেন জগদম্বিতায় চ-র সর্বদা ত্যাগের পন্থার অন্তর্নিহিতভাব এঁর ভেতরে সহজাত। ক্রিস্টিন পরার্থে আজীবন কাটিয়ে, নিজের কথা কম বলে, নিজের জন্য কম চেয়ে, নিজেকে আত্মপ্রচার থেকে সরিয়ে রেখে যথার্থ গুরুদক্ষিণা দিয়ে গিয়েছেন। আশীর্বাদস্বরূপ গুরু তাঁকে জানিয়ে গেলেন।

Ever pour thy sweet perfume
Unasked, unstinted sure."

উজাড় করে দাও, ঢেলে যাও সুরভি তোমার
অযাচিত দানে, ধ্রুবপথে।

---

১ একথা শ্রীযুক্তা সেন গুপ্তচুড়ে জানিয়েছিলেন।

নিবেদিতার চিঠি

স্বামীজীর ভগিনী ক্রিস্টিনকে লেখা ২১শে জুন ১৯০২ চিঠিটি মনে হয় তাঁর শেষপত্র। এর পর ৪ জুলাই তিনি মহা-সমাধি লাভ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণসহ নিবেদিতা ক্রিস্টিনকে নিচের চিঠিটি লিখেছিলেন। ক্রিস্টিন তখন মায়াবতীতে।

১৭ বোসপাড়া লেন
বাগবাজার। কলকাতা।
৭ জুলাই। সোমবার। ১৯০২ খ্রীঃ

প্রিয় ক্রিস্টিন,

কাল এই সংবাদটি তোমার জীবনকে শূন্য ও রিক্ত, করে দেবে। আমি তোমাকে বলতে পারি প্রিয়, যদি তুমি এখানে থাকতে তুমি নিশ্চয় সেই শনিবারে ওঁর কাছেই থাকতে। আমি সেদিন সকালে সাতটা নাগাদ মঠে পৌঁছেছিলাম এবং যতক্ষণ না তাঁর দেহ সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হয় আমি তাঁর পাশে বসে থাকবার অনুমতি পেয়েছিলাম। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ তাঁর দেহভস্ম মঠের মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার রাতে মৃত্যু কী মহান সুন্দররূপে তাঁর কাছে এসেছিল। ধ্যানের পর আধ ঘন্টা আন্দাজ ঘুমিয়ে ছিলেন। তারই মধ্যে চলে গেলেন। নিজের ঘরে গিয়ে শোবার এক-দেড় ঘন্টা আগেও তিনি মন্দিরে ছিলেন।

সেদিন সকালে উনি ঘন্টা তিনেক ধ্যানে বসেছিলেন। গত রবিবারে আমাকে বলেছিলেন একটি মহান তপস্যা তাঁর নিকটবর্তী—তিনি মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সেদিন আমি তাঁর ধ্যানের মধ্যে উপস্থিত না হলে বোধহয় তিনি আরও খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ থাকতেন। এখন বুঝতে পারছি গত দশ দিন ধরে তিনি ক্রমেই নিজেকে মহাসমাধির দিকে অগ্রসর করে নিচ্ছিলেন।

এখানে সবাই বলছেন শেষ দিনটি ...ক সকলের সঙ্গে খুব মধুরভাবে কথা বলেছেন। প্রত্যেকের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা,—ছেলেদের সঙ্গে তিন ঘন্টা ধরে বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন,—অনেক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। 'ডোণ্ট কাঁপ মি। কিক আউট দি ম্যান হু ইমিটেটস'—এইসব বলেছেন।

সাড়ে চারটে নাগাদ মঠ থেকে কেউ এসে ৫৭ নম্বরে খবর দিল যে উনি মোটেই ভাল বোধ করছেন না। ততক্ষণে কিন্তু উনি বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছেন। মাইল দুই হেঁটে এসেই সোজা গিয়ে ধ্যানে বসলেন—শেষ ধ্যান।

গত সপ্তাহে আমি ওঁকে তিনবার দেখেছি। বৃহস্পতি-বার রাতে বেশ দেরিতে এলেন। শনিবার সকালেও তাই। আমি সেদিন ওঁর কাছে যাচ্ছিলাম কিন্তু ছোট একটি চিঠি এল আমাকে যেতে বারণ করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজে এসে পৌঁছলেন। সমস্ত বাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। রবিবার সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত আমি ওঁর সঙ্গে ছিলাম। বুধবার সকালে দু-তিন ঘন্টা ছিলাম। কালও আবার যেতাম!

গত শনিবারে যখন এখানে এসেছিলেন তোমার ছোট বাক্সটি ওঁকে দিয়েছিলাম। বাক্সের ওপরে ঝুঁকে পড়ে উনি যখন ছোট কথাকটি পড়লেন মুখটা আরক্ত হল। তারপর আমার হাতে তুলে দিলেন পড়বার জন্য। তারপর যতক্ষণ কথা বলছিলেন

বাক্সটি নেড়ে-চেড়ে যেন খেলা করছিলেন। এবং এই শনিবার,—বিষাদক্লিষ্ট শনিবারে ও'র ঘরে গিয়ে দেখলাম ও'র টেবিলের ওপরে বাক্সটি রাখা আছে। তোমাকে জানাবার মত কোন কথা নেই প্রিয়। এমন মধুর, স্নেহময় ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন যে অন্যের কাজে উদ্যম ও শক্তির সঞ্চার করতেন।.........তোমার জীবনটি প্রিয়, নিঃসঙ্গ ম্যাডোনার মত হবে। তোমাকে রোসেটির বিখ্যাত কবিতাটি প্রায়ই বলতাম।....আমি জানি তুমি যেখানেই থাক যেটা হবার তা হবে।

এসো আমরা একাত্ম হয়ে যাই। সবাইর মত তুমিও মনে শক্তি সঞ্চয় করো। আমি চাই আমাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমরা যেন তাঁর ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে সার্থক করতে পারি। মুক্তির কথা ভাবব না, কর্মফল নিয়ে মাথা ঘামাব না, কোন কিছু চিন্তা না করে শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছা নিখুঁতভাবে সাধন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হব। তিনি নিজে হলে যেভাবে কাজটি করতে ভালবাসতেন, সেইভাবেই আমাদের করতে হবে। আমি চার বছর আগে এখানে এসেছিলাম এই জন্যই যাতে তিনি নিশ্চিতভাবে মহাসমাধি লাভ করতে পারেন।....ওঃ স্বামীজী! স্বামীজী! আমরা আজ আপনি-হীন! কিন্ত এ তো সত্য নয়! বিজয়ী!! এই কথাই বরং বলব। দুঃখ-কষ্টের ঊর্ধ্বে গিয়ে তিনি জয়লাভ করেছেন!—

এখানে সবাই বলছিলেন শেষ দিন উনি বলেছিলেন জাপানে গিয়ে কিছু কাজ করবার খুব ইচ্ছে ছিল ও'র। লোকে বলে এই রকম মহাত্মা পুরুষেরা সব সময় মনে একটি ইচ্ছা নিয়ে যান....

আমি এখন শুধু সেই মহাসমাধির কথাই ভাবছি যার মধ্যে তিনি বিলীন হলেন। আবার ভাবছি একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের কতটুকু ব্যাখ্যা আমরা করতে পারি? এই রকম ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা কতখানি আমরা কী বা বুঝি। শুধু এইটুকু বলতে পারি চিতার বেদীমূলে যখন মাথা রাখলাম ভাবলাম সব সময় এই কথাই স্মরণে রাখব যে তিনি সর্বদা আমাদের মনে করছেন—প্রতি মুহূর্তে।

দু বছর আগে ব্রিটানীতে তিনি আমার সংগে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন—সে সময় যে রকম রিক্ততার বোধ আমার হয়েছিল এখন সে রকম শূন্যতার বোধ আমার হচ্ছে না। তবুও অনুভব করছি এবং তাঁর উষ্ণবোধ সর্বদাই এই বরফ শীতল মনের ওপরে কাজ করেছে।....উনি ইউরোপীয় মহিলাদের খুব তীব্র সমালোচনা করতেন,—প্রায়ই করতেন, বিশেষত আমাকে, তাঁর এই কন্যাটিকে,—উল্লেখ করে। কিন্তু মিসেস সেভিয়ার সম্বন্ধে কখনও নয়,—সব সময় তাঁর উল্লেখ করতেন ভাল বলে। তাঁকে জানিও সে কথা!

আমার মনে হচ্ছে তাঁর গুরু তাঁকে নিজে হাতে নিজের কাছে টেনে নিলেন আবার সেই মুহূর্তে তাঁকে আমাদের মাঝে আমাদের প্রিয় স্বামীজী করে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্য সেই আত্মা যিনি ক্লান্ত দেহকে ত্যাগ করলেন চিরতরে, কিন্তু বিরাট হৃদয়টি অবিনাশী হয়ে থাকল, চলে গেলেন নির্বাণের রাজ্যে। আর আসবেন না। মহাসমাধির যা কিছু লক্ষণ, সবই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল। ও'র চুলগুলি নাকি সোজা হয়ে উঠেছিল, শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু নাড়ি তখনও চলছিল। তারপর সব শেষ। সব শান্ত। মহাত্মা পুরুষেরা কখনও মৃত্যুকষ্ট পান না!

তুমি শুনে খুশী হবে যে গত রবিবারে আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। উনি অনেক সুন্দর মিষ্টি সব কথা বললেন মিঃ 'ও' (ওকাকুরা?) সম্বন্ধে। যদিও সোমবারে আমার তাঁর (ও) সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু তাঁকে একথা তখন আমি বলতে পারি নি। বললে হয়ত তাঁর মনে হত আমি স্বামীজীর হয়ে অ্যাপলজি করছি বা স্বামীজীর জন্য তাঁর ভালবাসা ভিক্ষা করছি, স্বামীজী এ সবের অনেক ঊর্ধ্বে ও মহৎ ছিলেন। কিন্তু এখন

They are everything—and I am so thankful!

বুধবার দিন পুরো তিনটি ঘন্টা আমাকে ঠিক একটি ছোট প্রিয় শিশুর মত মনে করে তেমন ব্যবহার করেছেন। তোমাকে চিঠি লেখা সত্ত্বেও আজ আমি এসেছিলাম বলে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এসে দেখলাম আমার জন্য একটি উপহার রাখা আছে। যখন সারদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে কী আমি আসাতে স্বামীজী খুশী হয়েছেন?' তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সারদানন্দ বললেন 'হ্যাঁ'। এ সবই সম্ভব হল প্রিয় সদানন্দর জন্য। আমি তার কাছে ঋণী! এখানে এসে আমি কী খুশীই না হয়েছি! আমি দুঃখিত যে এ সৌভাগ্য আমি একাই পেলাম। কিন্তু আসলে তো তা নয়,—তুমি নিজে খুব ভালই জানো তিনি তোমাকে কতখানি আপন মনে করতেন।

I touch your feet dear little Mother. Everloving and for ever.

Nivedita *

উপরিউক্ত চিঠির সঙ্গে একটি পৃষ্ঠা বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া গেছে। মনে হয় এই চিঠির অন্য অংশটি হারিয়ে গিয়ে থাকবে, অথবা স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। চিঠিটি এই—

. . . "after a long time we heard from the Math from Sw. Brahmananda. He and Saradananda were always closest to Swami. They were both in Calcutta for a day or two. It seems after that walk in the afternoon Swami went to his room about night all to meditation. About eight he lay down and fell asleep. At nine he gave a sudden start and drew two long breaths. The youngman in attendance thought there was something strange and called one of the eldermen who felt for his pulse and found it stopped. They thought it might be samadhi over Trances, but when there was no sign of life they sent for a doctor. . . .

(অসমাপ্ত)

শ্রীমতী ক্রিস্টিন

* বিভিন্নজনকে লেখা কয়েকটি ছেঁড়া চিঠির সংগে এই চিঠিটি পাওয়া গেছে। সে কারণে অন্যকে লেখা চিঠির অংশ এর মধ্যে যুক্ত হওয়া সম্ভব।

ক্রিস্টিনের হাতের লেখা

Our love for you — Blessed trinity — grows and grows. Bless you ever. Tantine did not send the sketch. I love mine. Christina

অ্যাকশা বনস্টারকে লেখা ক্রিস্টিনের চিঠি

Almora, Dec. 7th '29.

Our beloved Achsah,

What joy your letters bring — letters as beautiful as yourself, fragrent with your personality. We both love them. I cannot tell you how glad I am that you have ...... and its shelters. I know what it must mean to you. Have you a friend, and are there Studios? We are so interested in all these little details. Perhaps Harwood will make a map for us sometime. Is there a garden — a large one?

I have for the time being given up attempting to write the memories. There were too many interruptions — cares, worries, mental disturbance. Perhaps I can go back to it later or perhaps this is all. I have come to a kind of end. It may really be the end, who knows?

But I have been writing a kind of soul diary for I have had some wonderful experiences of a most unusual kind. I may never let anyone see it and it will certainly not be for publication. I write something everyday of some kind.

And Achsah darling, I am well. I rap on wood. I am so afraid to say it because whenever I do, I get a relapse. Now I can walk two or three miles with even less fatique than before I was ill. Boshi and I often work to the toll-gate at the foot of the hill below The Pines. Then back to Lakshi Ram Shah's and home. Sometimes I have a dandy when there is any climbing to do. Now I know all the walks, I bless Almora. Without you we should never have come here.

Everyone has gone — the Ruttledgers and Turners on tour until Christmas all of the officers except Captain Gray. Only a hundred soldiers are left. All of the nouses are empty. Our nearest neighbours are Mrs. Cooke and Enid of Tara Villa (one of the three small houses) and the inmates of the Kutir on one side and the Principal of the college a quarter of a mile on the other side.

We have sent Ashu our Cooke home for a holiday. Bijoy cooks (excellently and serves us. Our water carrier also does the bazar and anything else that is required of him. Life is simplified and peaceful. We are having just the conditions we need and we love it more and more.

I hope the same will be true for you in your new home and that life will grow richer and ever more beautiful.

Our love for you blessed trinity grows and grows. Bless you ever. — Christina.

Tantine did not send the sketch. I love mine.

I cannot tell you how glad I am that you have ...... and its shelters. I know what it must mean to you. Have you a friend? And are there studios? We are so interested in all these little details. Perhaps Harwood will make a map for us sometime. Is there a garden — a large one?

অ্যাকশা বনস্টারকে লেখা চিঠির অংশ

১৯১৭। ডেট্রয়েট। সেদিনের কাগজে বেরিয়েছিল : চৌদ্দ বছর আগে কুমারী ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডাল ভারতে যান সেখানকার মেয়েদের আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে! ক্রিস্টিন সেদিন বলেছিলেন, বোম্বাই ও কলকাতা বাদে ভারতের অন্য সব জায়গা এখনও পিছিয়ে আছে পঞ্চাশ বছর।

শ্রীমতী সেনের সাগ্রহ সম্মতি

You will appreciate that some of these photographs are precious to me, and I will ask you after making your choice kindly to return the others immediately, and later also those selected by you. I hope you will see that they are not damaged or altered in any way in the process of making blocks. As an old Editor myself, I am well aware of how block-makers feel they can improve a picture by outlines, filling in or blocking out the background, etc.

I am sending a copy of this letter to Mrs. Pranata Sen and also sending her certain corrections I had made in connection with Gurudas Maharaj - Swami Atulananda. - You may also wish to publish the picture of the Brewsters. I have a good picture of Swami Atulanada somewhere, but in my search yesterday, could not find it. If I come across it, I will also send it along, under the same stipulation of its return to me in due course.

Sincerely yours,

Gertrude Emerson Sen

Mr. Shyamal Gangopadhya
"Amrita"
II/I Ananda Lane
Calcutta 70003

P.S. the photographs are being sent today by registered book post.

বাংলাদেশে বাংলাভাষা

শিশিরকুমার দাশ

ভারত বিভাগের পর পঁচিশ বছর ধরে পূর্ব বাংলায়, যা এখন বাংলাদেশ, মধ্যবিত্ত সমাজ বাংলাভাষা নিয়ে নানা সমস্যা ও আন্দোলনে জড়িয়ে ছিলেন। সেই সব সমস্যা ও আন্দোলন শুধুই নিছক ভাষাগত নয়, ধর্মীয় বোধ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার দ্বারা তা বহুল পরিমাণেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আংশিকভাবে এই ভাষা চিন্তা ও ভাষা আন্দোলনের প্রকৃতির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশের, যেমন ভারত, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া কিংবা ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের, এমন কি আরো বৃহত্তরভাবে দেখলে, কানাডার ভাষাদ্বন্দ্বের প্রকৃতির কিছু মিল আছে। কিন্তু ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ভাষা সমস্যা ও ভাষা আন্দোলন যেভাবে বাংলাদেশে জড়িয়ে গিয়েছিল, যেভাবে ভাষাকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেভাবে অন্যান্য দেশে হয়নি এবং সেখানেই বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের স্বাতন্ত্র্য। এই ভাষা আন্দোলন ও তার সঙ্গে জড়িত ধর্মীয় বোধ এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাস মূলত সমাজতত্ত্ববিদ বা ঐতিহাসিকের আলোচনার বিষয়। এই পঁচিশ বছরের ভাষা আন্দোলনের দুটি দিকের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং যাকে সমাজ-ভিত্তিক-ভাষাতত্ত্ব বলা হয় তার পটভূমিকায় এই দুটি দিকের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই। এই দুটি দিক প্রকৃতপক্ষে দুটি সম্ভাবনার ব্যাপার। তার মধ্যে একটি আপাতত বিনষ্ট, অন্যটি এখনও অনুৎপন্ন।

প্রথম সম্ভাবনাটি নিয়ে শুরু করা যাক। আমরা জানি যে পূর্ব বাংলায়, ভারত বিভাগের পর থেকে, এক দল বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। কেউ ছিলেন সরাসরি উর্দুর পক্ষপাতী এবং কেউ ছিলেন আরবী-ফারসী মেশানো এক নতুন বাংলার পক্ষপাতী; যে বাংলাকে তাঁরা মনে করেছিলেন মুসলমান সমাজের উপযোগী। এই মনোভাব অবশ্যই হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি। এর ইতিহাস বহু দিনের। অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসের যেটা মধ্যযুগ তখন থেকেই এক শ্রেণীর মুসলমানের বাংলার প্রতি ছিল হয় সোজাসুজি বিরোধিতা, নয় একটা দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব। এঁদের উদ্দেশ্যেই আবদুল হাকিম অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় লিখেছিলেন

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।।

আবার ১৮৮২তে হান্টার কমিশনের সামনে নবাব আবদুল লতিফ বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, যারা জাতিগত দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত, তাদের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলাভাষা, তবে শিক্ষিত হিন্দুদের সংস্কৃতায়িত বাংলা নয়, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় প্রচলিত প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ মেশানো বাংলা। আর মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত মুসলমানদের ভাষা হওয়া উচিত উর্দু, তার একটা কারণ এই সব মুসলমান বঙ্গবিজেতা মুসলমানদেরই বংশধর। আবদুল লতিফ দু শ্রেণীর মুসলমানের অস্তিত্ব করলেন, তাঁর মানদণ্ড এথ্‌নিক—এক দল মুসলমান আগে হিন্দু ছিলেন, তাঁদের যথার্থ মুসলমান করে তোলার জন্য চাই আরবী-ফারসী মেশানো বাংলা আর যাঁরা আরব-পারশ্য মধ্য এশিয়ার মুসলমানদের বংশধর তাঁদের জন্য প্রয়োজন উর্দুর।

বাংলাভাষা নিয়ে যখন উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যার জাল বেড়ে চলেছে তার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে সামান্য। অভিজাত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের বাংলা বিরোধিতার উদ্দেশ্য কিছুটা স্পষ্ট। উদ্দেশ্যটা হল, হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটা আরো স্পষ্ট ও তীব্র করে রাখা। হিন্দু মুসলমানে অনৈক্য আছে অনেক ক্ষেত্রে, ধর্মে, সামাজিক আচার ব্যবহারে। সে অনৈক্য অনেক দিন ধরেই আছে, হয়ত আরো অনেক দিন ধরেই থাকবে, যদিও অনৈক্য মানেই বিরোধ নয়। কিন্তু যেখানে অনৈক্যটা একেবারেই লুপ্ত হওয়া সম্ভব তা হল ভাষার ক্ষেত্র। আর সে জন্যেই অভিজাত উচ্চবিত্তরা এখানে যতটা সম্ভব পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য সক্রিয় হয়েছেন। এবং সম্ভব হলে বাংলার বদলে উর্দুর প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন।

যে মুসলমানী বাংলার কথা আমরা জানি, তার সঙ্গে বাংলার পার্থক্য গঠনগত নয়। গঠনের দিক থেকে মুসলমানী বাংলা বাংলাই। তফাৎ শুধু শব্দে। যখন উর্দু ভাষা গড়ে উঠেছিল, বা যে উর্দুকে আজ আমরা জানি, গঠনগত দিক থেকে, সামান্য ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য ছেড়ে দিলে, তার সঙ্গে হিন্দীর কোন তফাৎ নেই। মোটামুটি বলা চলে যে একই ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের ওপর ভিত্তি করে দুটি আলাদা ভাষা-রীতি বা স্টাইল গড়ে উঠেছে। উর্দুর একটা গণভিত্তি ছিল, তার ফলেই সেই আলাদা ভাষা-রীতি আস্তে আস্তে সংহত হয়েছে, নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছে এবং আজ কয়েকশ বছরের পরিশীলনে। স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিচিত হয়েছে। অন্যদিকে মুসলমানী বাংলা (যা আরবী-ফারসী এবং অনেক সংস্কৃতজাত তদ্ভব শব্দ, যা উর্দুতে ব্যবহৃত, দিয়ে গড়া) কোন বৃহৎ গণভিত্তি অর্জন করতে পারেনি। তা একটা স্টাইল হিসেবেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তা সমগ্র মুসলমান সমাজের অপরিহার্য ভাষা স্টাইল হিসেবে গণ্য হল না। যাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা কথোপকথনে অভ্যস্ত তাঁরা সেই স্টাইলকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার্য ভাষারূপে গ্রহণ করলেন না। সেই জন্যই তথাকথিত দোভাষী-পুথির ভাষা শেষ পর্যন্ত একটি স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা পেল না। যে মুসলমানী বাংলায় দোভাষী-পুথিগুলি লিখিত, কেউ কেউ মনে করে থাকেন ভারতচন্দ্রের 'যাবনী মিশাল' ভাষাতেই তার সূত্রপাত। কাজী আবদুল মান্নান সাহেব এ রকমও বলেছেন যে গোরিবুল্লাহ্—যাঁকে মনে করা হয় মুসলমানী বাংলার প্রথম বা অন্যতম ব্যবহারকারী—যখন মুসলমানী বাংলায় লিখতে শুরু করেন তখন এই মুসলমানী বাংলা রীতিটা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মুসলমানী বাংলা যে সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ যথেষ্ট নেই। মধ্যযুগের সাহিত্যে তার প্রসার যে হয়েছিল এমন তথ্য জানা যায়নি। কিন্তু একথা অনুমান করা চলে যে বহুকাল থেকেই একদল অবাঙালী মুসলমান উর্দু মেশানো বাংলা, এক ধরনের কিচুড়ি ব্যবহার করতেন। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তার নমুনা এখনও পাওয়া যাবে। টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলালে ঠকচাচার ভাষায় তার প্রাচীন নমুনা আছে। বাংলাদেশে অনেক মুসলমান ছিলেন যাঁরা বাংলাকে মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেননি, নানা প্রয়োজনে অনেকে পশ্চিম থেকে আসতেন তাঁরাও বাংলা জানতেন না। স্বভাবতই দেশের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করতেন তা একটি মিশ্র-ভাষা—সম্ভবত সেই মিশ্র ভাষারই স্টাইলাইজড রূপ দোভাষী পুথির ভাষা বা মুসলমানী বাংলা। কিন্তু মুসলমানী বাংলার উৎপত্তি যখনই হোক, আর যেভাবেই হোক, তা বাংলাভাষার থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। খৃষ্টীয় মিশনারীরা মুসলমানী বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন, ১৯৪০-এ সে অনুবাদের দশম সংস্করণও হয়েছিল। আমি ভাবি, বৈষ্ণবদের ধর্মান্তরিত করার জন্য মিশনারীরা ব্রজবুলিতে বাইবেল অনুবাদ করলেন না কেন?

একদিকে যখন চিৎপুর থেকে দোভাষী পুথি প্রকাশিত হচ্ছে রাশি রাশি, তখন কিন্তু কোন শক্তিশালী উপন্যাসিকের উপন্যাসে কোন মুসলমান চরিত্রের মুখে এ ভাষা দেখা গেল না। শরৎচন্দ্রের মুসলমান চরিত্রগুলির কথা ছেড়ে দিলাম (অনেকের মতে তিনি মুসলমান সমাজকে চিনতেন

কিন্তু এ যুগের মুসলমান লেখক-কোন উপন্যাসের কোন পাত্রপাত্রী ঐ ...বী রীতিতে কথা বললেন না। এটা যে ...নো রীতি এটাই তার একটা প্রমাণ। ...রো সংস্কৃত মিশিয়ে একটা বাংলা ...ছেন. বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, ...চন্দ্র যে বাংলায় লিখেছেন সেটা সংস্কৃত ...লে হিন্দু-বাংলা—এই ধারণার বশবর্তী ...য় যখন কোন কোন ব্যক্তি বাংলায় ...রবী-ফারসী শব্দের আমদানী বাড়াতে ...লেন, তখনকার মুসলমান রাজনৈতিক ...ন্দোলনের ভাষার দিকে যদি তাকাই ...হলে দেখি সেখানেও ঐ ধরনের রীতির ...ন নেই। মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ ...ন উত্তেজিতভাবে একটি নতুন বাংলা ...ড়াতে চাইছেন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, সেই ...ময়ের রাজনৈতিক ইস্তাহার থেকে নমুনা নেওয়া যাক।

সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে (১৯৩৩-এর ...দ সংখ্যা) মৌলানা ভাসানীর একটি বিবৃতি :

'বাংলা ও আসামের প্রজাগণের বর্তমান কর্তব্য

নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক ইউনিয়নে অতি সত্বর একটি করিয়া প্রজা সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। এ সকল ইউনিয়ন সমিতি নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির অন্তর্ভুক্ত জেলা সমিতির শাখারূপে গণ্য হওয়ার জন্য হেড অফিসে আবেদন জানাইতে হইবে।...ইউ-নিয়ন সমিতির অধীন যে সমস্ত পুকুর বা জলাশয় কচুরিপানা ও অন্যান্য জঙ্গল আদিতে পূর্ণ হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া হেড অফিসে পাঠাইতে হইবে।'

আর একটি নমুনা দিচ্ছি ১৯৩৭-এ ...দীয় নিখিল ভারত মোসলেম লীগ পার্লিয়ামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদকের বিবৃতি থেকে :

'মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি নিবেদন

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মুসলিম সম্প্রদায় মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সম্মিলিত মুসলিম দল গঠনের জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছে এবং কবে সেই শুভদিন আসিবে তাহার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। উন্নততর শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের সময় হইতেই তাহারা নির্বাচন এবং আইনসভায় নিজেদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন লাভের দাবী জানাইয়া আসিতেছে। তাহা-দের এই দাবী সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে আংশিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে।'

রাজনৈতিক আন্দোলনের ইস্তাহার ও রাজ-নৈতিক বিবৃতি ইত্যাদির ভাষা যখন দেখি. যার লক্ষ্য শুধু কয়েকটি শিক্ষিত মানুষ নয়, দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যার কাছে পৌঁছনো, সেখানে কিন্তু তথাকথিত মুসল-মানী বাংলার কোন ব্যাপক প্রয়োগ হয়নি। ভারতবর্ষ বিভক্ত হবার পর পূর্ব পাকি-স্তানেও বারবার বাংলাভাষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে. বাংলাভাষার মাধ্যমে হিন্দুয়ানি ঢুকে পড়ে ইসলামকে বিপন্ন বা বিকৃত করতে পারে এরকম আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে; রবীন্দ্রসংগীত যখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে তখন একদল বুদ্ধিজীবী সেই আদেশের সমর্থনও করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আজ যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে মুসলমানী বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস মোটামুটি বিলুপ্ত। বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক ও লেখক সম্প্রদায় সেই বাংলাতেই লিখছেন যে বাংলায় পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা লিখে থাকেন।

বাংলাভাষার ইতিহাসে এই ব্যাপারটা অবশ্যই আকর্ষণীয়। মধ্যযুগ থেকে আরবী ফারসী মেশানো যে মিশ্রবাংলা প্রথমে মুখের ভাষায় দেখা দিয়েছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যা মুসলমানী বাংলা হিসেবে দোভাষী পুঁথিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা চাইছিল তার বিকাশের আরো সম্ভাবনা ছিল। এই মিশ্র-ভাষা যদি আরো বহুল প্রচারিত হত, যদি এর বৃহত্তর গণভিত্তি গড়ে উঠত, তাহলে এর স্বাতন্ত্র্য অনিবার্য হয়ে উঠত। অর্থাৎ উর্দু যেমন হিন্দীর থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে এবং স্বতন্ত্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে—এই বাংলাও নতুন ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হতে পারত। উর্দু গড়ে উঠেছিল শুধু অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় নয় বিভিন্ন ভাষাভাষী সৈনিক ও রাজকর্মচারী-দের মধ্যে ভাষাগত সংযোগের প্রয়োজনে এবং ধীরে ধীরে তার গণভিত্তি ব্যাপকতা অর্জন করেছিল। অন্যপক্ষে মুসলমানী বাংলার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা ছিল সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে. তার গণভিত্তি কখনই বিস্তৃত হয়নি, আর মুসলমান সমাজের যাঁরা বড় লেখক, মীর মশাররফ হোসেন কিংবা কায়কোবাদ কিংবা নজরুল ইসলাম তাঁরা সেই ভাষাকে কোন গুরুত্ব দিলেন না। কাল ভিন্ন, পরিবেশ ভিন্ন কাজেই একযুগে খাড়ীবোলী ভিত্তিক উর্দুর জন্ম হয়েছিল, আর এযুগে বাংলা ভিত্তিক নতুন উর্দুর সম্ভাবনা বিনষ্ট হল। বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ বাংলাভাষার এই রূপকে গ্রহণ করতে রাজি হননি—বাংলা-দেশের ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাসই তার প্রমাণ। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক দিকে আকর্ষণীয় ব্যাপার হল যে বাংলাভাষার ইতিহাসে এই রকম একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

(২)

এখন দেখা যাক ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বাংলাভাষার গতি কোন দিকে যেতে পারে বা কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে পূর্ব বাংলায় যে সাহিত্য রচিত হয়েছে, সংবাদপত্রে যে ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে যে ভাষায় সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে, রাজনীতিকরা যে ভাষায় বক্তৃতা করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক যে ভাষায় কথা বলছেন—তার সাধারণ রূপ অবিভক্ত বাংলার স্ট্যান্ডার্ড ডায়লেক্ট বা স্বীকৃত উপভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। লিখিত বাংলায় সেই স্বীকৃত উপভাষার সঙ্গে ঐক্য রাখা যতটা সহজ, মৌখিক ভাষায় ততটা সহজ নয়। আজ বাংলাদেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষা কিন্তু যে বাংলায় বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কথা বলে তার কোন একটি উপ-ভাষাকে—সে ঢাকার হোক, কিংবা চট্টগ্রামের হোক, শ্রীহট্টের হোক বা বরিশালের হোক—স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়নি। স্ট্যান্ডার্ড বলা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার একটি উপভাষাকে। যাকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড উপভাষা বলি, তা আর পাঁচটা উপভাষার মতই, তা কোন গুণগত কারণে অন্য উপভাষা থেকে শ্রেষ্ঠ নয়, তা বিশেষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে স্বীকৃত হয়, কোন অন্ত-র্নিহিত ভাষাতাত্ত্বিক গুণের জন্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উপভাষা যাঁরা বলেন, তাঁরা কলকাতা অঞ্চলের ভাষাকে স্ট্যান্ডার্ড রূপে মেনে নিয়েছেন—সেই ভাষাই স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, রেডিও, রঙ্গমঞ্চ, চল-চ্চিত্রে, আনুষ্ঠানিক ভাষণে, রাজনৈতিক বক্তৃতায় ব্যবহৃত হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার নানা উপভাষা-ভাষী অঞ্চলের মানুষের সামনে একটা মডেল বা আদর্শ রয়েছে। সেই আদর্শটা অবশ্যই কোন যান্ত্রিক আদর্শ নয়, তা একটা জীবন্ত আদর্শ। যাকে স্ট্যান্ডার্ড উপভাষা বলা হচ্ছে তারও হাজার হাজার

মনুর কথা বলে, হাজার হাজার মানুষের সেটাটিই প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা, ফলে অন্যান্য উপভাষাগুলি যাঁদের প্রথম ভাষা তাঁরা স্ট্যাণ্ডার্ড উপভাষার জীবন্ত আদর্শ থেকে স্ট্যাণ্ডার্ড উপভাষা আয়ত্ত করতে পারছেন। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে সেই জীবন্ত আদর্শ কোথায়? অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিছু বাঙালী বাংলাদেশে গেছেন, স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা যাঁদের প্রথম ভাষা, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অন্তত তাঁদের সংখ্যা এত বেশী নয়, যে তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষা-ভাষী মানুষ-এর সামনে স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার একটা আদর্শ স্থাপন করতে পারবেন। তাছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষার প্রভাবে সেই স্বল্পসংখ্যক মানুষের বাচনিক ব্যবহারে দ্রুত পরিবর্তন আসা অসম্ভব নয়।

পশ্চিমবাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার মৌখিক রূপটির কথা স্মরণ করে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যাক। পশ্চিমবাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায় সাতটি নাসিক্য স্বরধ্বনি আছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ উপভাষায় নাসিক্য স্বরধ্বনির স্থান নেই। স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় 'র' এবং 'ড়' দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনি, 'পরা' এবং 'পড়া' দুটি শব্দের মধ্যে শুধু অর্থগত নয়, ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের কোন উপভাষাতেই 'ড়' ধ্বনির অস্তিত্ব নেই। আবার বাংলাদেশের প্রধান উপভাষাগুলিতে ধ্বনির ঘোষত্ব বহু ক্ষেত্রেই ক্ষীণ। রূপতাত্ত্বিক দিক থেকেও স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা ও বাংলাদেশের উপভাষাগুলির মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। কাজেই বাংলাদেশে যদি পশ্চিমবাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, বাংলাদেশের স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় বিশেষ পরিবর্তন আসতে বাধ্য—বাংলাদেশ যে বাংলাকে আদর্শ করছে সে বাংলা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের মানুষের প্রথম ভাষা নয়। যাঁরা সুশিক্ষিত পূর্ববঙ্গবাসী, যারা দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন, তাঁদের বাংলাতেও নাসিক্য স্বরধ্বনির অভাব, ঘোষত্বের ক্ষীণতা, ব্যঞ্জনধ্বনি ও র-এর যুগ্ম উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য (যেমন 'বজ্র' শব্দটি পশ্চিম বাংলায় 'বজ্জ্রো', পূর্ববাংলায় বজ্-রো), স্বরভঙ্গির বিশিষ্টতা শুধু ভাষাতাত্ত্বিকের নয়, স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা যার প্রথম ভাষা তাঁর কান এড়িয়ে যায় না। আজকের ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত বাংলা খবর বা কথিকা ইত্যাদিতেও তা স্পষ্ট। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ পশ্চিমবাংলার একটি উপভাষাকে স্ট্যাণ্ডার্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তাকে 'বিশুদ্ধ' রাখার জন্য কোন জীবন্ত আদর্শ তার সামনে নেই। অনুমান করি, বাংলাদেশের স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় যে-সব বৈশিষ্ট্য এখন অনতিস্ফুট, তা পরিস্ফুট হবে কয়েক দশকের মধ্যেই এবং তা প্রধানত হবে ধ্বনির ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার সঙ্গে পশ্চিমবাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক পার্থক্য সম্ভবত বিশেষভাবে স্পষ্ট হবে তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে, নাসিক্য স্বরধ্বনির অনুপস্থিতিতে বা ক্ষীণতায় এবং বিশেষভাবে স্বরভঙ্গিতে।

রূপতাত্ত্বিক এবং অন্বয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের ও পশ্চিমবাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার ঐক্য অনেকটা নির্ভর করছে এবং করবে বোধকরি লিখিত রচনার ওপর। কিন্তু লিখিত বাংলায় পূর্ববাংলার বিভিন্ন অন্বয়রীতি ক্রমশই ব্যবহৃত হতে হতে দূর ভবিষ্যতে কিছুটা পার্থক্য অবশ্যই সৃষ্টি করবে। যেমন ধরা যাক, পশ্চিমবাংলার কোন লেখকই গদ্যে 'সাথে সাথে' প্রয়োগ করেন না। এখন যে কেউ কেউ প্রয়োগ করছেন তার একটা কারণ হয়ত পূর্ববাংলার কোন একটি উপভাষা তাঁদের প্রথম ভাষা। যদি ধরেও নিই যে পশ্চিমবাংলায় 'সঙ্গে' এবং 'সাথে' দুই চলছে, তাহলেও বলব এখনও 'সাথে' অনেকেরই কানে কটু। কিন্তু পূর্ববাংলার গদ্যে, ব্যবহারের অজস্রতাকে একটি সত্য হিসেবে গণ্য করলে, 'সাথে' প্রয়োগসিদ্ধ, গৃহীত। যে চলিত ভাষা এখন পশ্চিমবঙ্গে লিখিত বাংলার গৃহীত রূপ, সেখানে হিসাব—হিসেব, পূজা—পুজো, ধূলা—ধুলো, বিকাল— বিকেল, সুবিধা—সুবিধে ইত্যাদি বহু শব্দেরই দুটো রূপই প্রচলিত, দুটো রূপই মুখের ভাষাতেও আছে। কিন্তু শব্দগুলির দ্বিতীয় রূপটি পূর্ববাংলার কোন উপভাষার মধ্যে নেই। আর পশ্চিমবাংলায় ঐ শব্দগুলির প্রথম রূপগুলি মুখের ভাষাতে (আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা বা কথোপকথন বাদ দিলে) কম ব্যবহৃত। উদাহরণস্বরূপ আবু ইসহাকের 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটিতে দেখি লেখক এই ধরনের শব্দের ব্যবহারে কোন নির্দিষ্ট রীতিতে আসতে পারেননি। অনেক লেখকের রচনাতেই দেখা যাচ্ছে পূর্ববাংলার বিভিন্ন উপভাষার অন্বয়রীতি, যা পশ্চিমবাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় অগ্রাহ্য, যেমন 'কয়দিন হয় সে বিড়ি টানতে শিখেছে' 'হেসে দিল', 'কেঁদে দিল' ইত্যাদি। বাংলাদেশের বহু বিদগ্ধ লেখকই 'যেয়ে' অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ করেন। এই ধরনের প্রয়োগের বাহুল্য আরো দেখা দেবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

ইংল্যাণ্ডের ইংরেজি ও আমেরিকার ইংরেজির মধ্যে যে সম্পর্ক তার সঙ্গে দুই বাংলার সম্পর্কের কিছুটা তুলনা করা স্বাভাবিক। কিন্তু তুলনাটা বোধহয় আংশিকভাবেই করা চলে। আমেরিকার ইংরেজির সঙ্গে বৃটিশ ইংরেজির পার্থক্য শুরু হয়েছিল প্রথমে শব্দের মধ্য দিয়ে। নতুন দেশে এসে অপরিচিত প্রকৃতি, ফুল-ফল, গাছপালাকে নতুন শব্দে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে যে আমেরিকার ইংরেজির পার্থক্যের সূচনা—১৬২১ সালে মেইজ আর ক্যানু শব্দ দিয়ে বোধহয় শুরু। আর ১৭৮৯ সালে জন উইদারস্পুন (১৭২৩-৯৪), যিনি মার্কিনী কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পেছনে এক বড় শক্তি, মার্কিনী ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন: তখনই তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বৃটিশ ইংরেজির সঙ্গে মার্কিনী ইংরেজের শব্দগত এবং ধ্বনিগত এবং ব্যাকরণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আবার ১৭৮৯তে জন অ্যাডামস্ 'ডিসারটেশন অন দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ' নামক একটি বইতে প্রথম প্রস্তাব করেন যে আমেরিকার ইংরেজির একটি নিজস্ব মানদণ্ড তৈরী করতে হবে বৃটিশ ইংরেজি নিরপেক্ষভাবে। তিনি বললেন, আমরা স্বাধীন জাতি, আমাদের সরকার যেমন আলাদা, আমাদের ভাষাও হবে আলাদা আর সেইটেই সম্মানজনক। আমরা গ্রেট বৃটেনের সন্তান, গ্রেট বৃটেনের ভাষাই আমাদের ভাষা কিন্তু সেই ভাষা আর আমাদের আদর্শ নয়। গ্রেটবৃটেন বহু দূরে, এত দূরের কোন ভাষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

দুই বাংলার মধ্যে অবশ্য প্রধানগত ব্যবধান নেই—ভৌগোলিক দিক থেকে তারা পাশাপাশি। কিন্তু অন্য অনেক ব্যবধান আছে। সবচেয়ে বড় কথা পশ্চিম বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আদর্শ হয়ে থাকতে পারে কতদিন?

পশ্চিম বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষারও বিবর্তন ঘটছে। প্রথমত দেশ বিভাগের পর যে অসংখ্য মানুষ পূর্ববাংলা থেকে এসেছেন তাঁদের ভাষার সঙ্গে এই স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। যে সব উপ-ভাষাগুলি তাঁরা সঙ্গে করে এনেছেন সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নেবে। মধ্যবিত্ত সমাজে পরিশীলনের একটা লক্ষণ বোধ করি উপভাষা ত্যাগ করে স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষাকে গ্রহণ করা। ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে-সব পরিবারে মা-বাবা এখনও পূর্ববঙ্গীয় কোন উপভাষায় কথা বলেন, সামাজিক পরিশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ছেলেমেয়েরা সে সব উপভাষা পরিত্যাগ করতে শেখে, অন্তত তা ব্যবহারে সামর্থ্য হারায়। আগামী বংশধরদের কাছে সেইসব উপভাষার বোধগম্যতা থাকলেও ক্রমশই সে ভাষা ব্যবহারের পারদর্শিতা কমবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এইসব উপভাষাগুলির সঙ্গে স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার সংস্পর্শের ফলে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর মৌখিক এবং লিখিত ভাষায় পরিবর্তনের ছাপ দেখা দিয়েছে, এবং ক্রমশই তা স্পষ্ট হতে থাকবে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবাংলায়, বিশেষত কলকাতা শহরে বাংলার সঙ্গে হিন্দীর সংস্পর্শ ক্রমশই বাড়তে থাকবে। আজকের রাজনৈতিক বক্তৃতায়, শ্লোগানে, ইস্তাহারে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর শব্দ বাহুল্য, খবরের কাগজের ভাষায় হিন্দুস্তানী শব্দের নানারকম প্রয়োগও পশ্চিমবাংলার বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের কিছুটা ইঙ্গিতবহ। অর্থাৎ যাকে আজ আমরা স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা বলছি একশ বছর পরে তার প্রকৃতিতে বড় রকম পরিবর্তন আসা খুবই সম্ভব। বাংলাদেশের স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা কি তখনও পশ্চিমবাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার পরিবর্তনকে অনুসরণ করে চলবে?

সম্ভবত তা করবে না, এবং দুই বাংলার ভাষার পরিবর্তনের ধারা হবে ভিন্নমুখী। আগেই বলেছি যেহেতু, পশ্চিমবাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা, বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি নয়, এবং তাদের

অঞ্চলের লোকেরই প্রথম ভাষা নয়, অর্নাতাবিলম্বেই ধ্বনিগত পার্থক্য হয়ে উঠবে এবং ব্যাকরণগত পার্থক্যও ধীরে পরিস্ফুট হবে। এ ছাড়াও র্তনের আরও কয়েকটি সম্ভাবনা।

বাংলাদেশে বাংলা যেহেতু রাষ্ট্রভাষা, ান করা চলে যে তা জীবনের সমস্ত ব্যবহৃত হবে। বিচিত্র বিষয়ে এবং ভাবে জীবনের সব ক্ষেত্রে একটি ভাষার গের ফলে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ যেভাবে পারে, পশ্চিমবঙ্গের বাংলার বিকাশ সে না হওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে বাংলা ভাষার মধ্যে একটি ভাষা মাত্র একথা মনে তে হবে। রাষ্ট্রজীবনের সমস্ত স্তরে তবর্ষের বাংলার প্রসারিত হবার সম্ভা নেই।

এখন দুই বাংলাতেই বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার টা চলেছে। সে চেষ্টা ভালো কি মন্দ, তার াজিক ফল কি হতে পারে সে তর্কে ম যাচ্ছি না। যেটা আপাতত মূল্যবান য় তা হল এখানেও দুই বাংলার বিকাশ ছু পরিমাণে ভিন্নমুখী হতে পারে। ধরা ক বৈজ্ঞানিক পরিভাষার কথা। দুই লাতেই বিজ্ঞানের বই বাংলায় লেখা হচ্ছে, ন্তু পরিভাষা কি এক? দুই বাংলাতেই ংলায় বিজ্ঞান চর্চা হবে, কিন্তু দুই ংলাভাষার পরিভাষাবোধ কিছু পরিমাণে লাদা হবে। শুধু বৈজ্ঞানিক পরিভাষার থা নয়, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, াজতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয় যখন পুরো- ়ের বাংলায় চর্চা করা হবে, তখনও নেকদিন পর্যন্ত ইংরেজি বা অন্য কোন উরোপীয় ভাষার থেকে অনুবাদ করতেই বে। এবং সে অনুবাদ যে হবে তার মধ্য দিয়ে অনেক নতুন শব্দ, পদগুচ্ছ এমনকি কাশ রীতির অনেক অভিনবত্ব সৃষ্টি বে। কিন্তু সেই নতুনত্ব বা প্রকাশের অভিনবত্বের ক্ষেত্রে দুই বাংলার স্বাতন্ত্র্য মশই বাড়তে থাকবে। এরকম মনে করার োন কারণ নেই যে, এই স্বাতন্ত্র্য কয়েকটি ংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। আজ যে শব্দগুলি লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হবে, ভবিষ্যতে তার কিছু অংশ মুখের ভাষায় স্থান করে নেবে। তার ফলে আজ থেকে পঞ্চাশ বা একশ বছর পরে বাংলাভাষার দুটো রূপ দেখতে পাওয়া যাবে—যেমন দেখছি আজকের বৃটিশ ইংরেজি ও আমেরিকান ইংরেজি।

আমেরিকা ও বৃটেন উভয় দেশে তুলনামূলকভাবে দেখলে, বৃটিশ ইংরেজিতে উপভাষার পার্থক্য বেশী। মেনেকেন সাহেব তাঁর দি অ্যামেরিকান ল্যাংগুয়েজ (১৯৩৭) বইতে লিখেছেন যে, আমেরিকার ইংরেজিতেও উপভাষার পার্থক্য আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও 'নো আদার কান্ট্রি ক্যান সো সাচ্ লিংগুইস্টিক সলিডারিটি। আজকের পশ্চিমবাংলায় যে-সব উপভাষা আছে, তাদের সম্বন্ধে ভাষাতাত্ত্বিকদের বাদ দিলে, সাধারণ মানুষের জ্ঞান এবং কৌতূহল দুই-ই অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের সাহিত্যিকেরা, দু-একজন ব্যতিক্রম, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষাগুলির প্রতি বিশেষ কৌতূহল দেখাননি। অন্যদিকে, বাংলাদেশের উপভাষাগুলি অধিক পরিমাণে আলোচিত, এবং প্রত্যেকটি উপভাষার খুঁটিনাটি সাহিত্যে স্থান না পেলেও, যাকে পশ্চিমবঙ্গের লোক 'বাঙাল ভাষা' বলে থাকে, পূর্ববঙ্গের কতকগুলি উপভাষার একটা সাধারণ রূপ বাংলাসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে বহুদিন ধরে—সধবার একাদশীতে তার সূচনা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝিতে তার গভীর শক্তি বহুধারায় উচ্ছ্বসিত। গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে বাংলাদেশের উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে তার ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। সে তুলনায় পশ্চিমবাংলায় সাহিত্যে পশ্চিমবাংলার উপভাষার স্থান সংকীর্ণ। এর কারণ কি? একটা কারণ কি এই যে, পশ্চিমবাংলা লিংগুইস্টিক সলিডারিটির দিকে বেশী অগ্রসর? তাই তার উপভাষার প্রাধান্য সাহিত্যে নেই বললেই চলে?

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে সাহিত্যে উপভাষাগুলির মূল্য কি? সে মূল্য কি শুধু এক ধরনের অলংকরণের? না তার চেয়ে বেশী কিছু? সে কি শুধু কতকগুলি চরিত্রের বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করার বাচনিক কৌশল মাত্র? উপভাষাগুলি সাহিত্যে ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ঐ উপভাষাগুলি সাহিত্যের উপকরণ মাত্র, তার মাধ্যম নয়। কিংবা মাধ্যম হলেও একমাত্র মাধ্যম নয়। অথবা যেমন আমরা লোক-সংগীত, লোক-শিল্পের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করি, এ কি শুধু লোক-ভাষার প্রতি আমাদের উৎসাহ মাত্র? সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু উপভাষাগুলির প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের একটা আগ্রহ আছে দেখে মনে হয় বাংলাদেশে বাংলার একটা বড় পরিবর্তনের কারণ হবে এই উপভাষাগুলির প্রভাব। যেহেতু সেখানকার স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা কারো প্রথম ভাষা নয়, কোন না কোন উপভাষাই বাংলাদেশের মানুষের প্রথম ভাষা, সেই প্রথম ভাষার প্রভাব বাংলাদেশের এই 'কৃত্রিম' স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার ওপরে পড়বে। ভাষা যতই মুখের কাছাকাছি আসবে, ততই সে উপভাষাগুলির কাছে শব্দ সংগ্রহ করবে, প্রবাদ ও পদগুচ্ছ গ্রহণ করবে। এবং তখন হয়ত পশ্চিমবাংলার বাংলা তার কাছ থেকে ঋণ করবে নানা শব্দ, যেমন বৃটিশ ইংরেজি আমেরিকান ইংরেজির কাছ থেকে করে। রিলায়েবল, ইনফ্লুয়েনশিয়াল, ট্যালেনটেড আর লেংদি এই চারটি শব্দই নাকি বৃটিশ ইংরেজিতে এসেছিল মার্কিন ইংরেজি থেকে। কোলরিজ ১৮০০ সালে রিলায়েবল, এবং ১৮৪৩ সালে ইনফ্লুয়েনসিয়াল শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ট্যালেনটেডকে বলেছিলেন 'দ্যাট ভাইল এ্যান্ড রাববারনস্ ভোকাবেল।' মেকলে ১৮৪২ সালে ওই শব্দ সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'প্রোপার টু অ্যাভয়েড'। যদিও ঐ বছরেই চার্লস ডিকেন্স তাঁর লেখায় শব্দটি ব্যবহার করলেন। দুই বাংলার কোলরিজ, মেকলে এবং ডিকেন্সরা ভবিষ্যতে অনুরূপ আচরণ করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

ব্যক্তি বিশেষের, এমনকি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বিশেষের রুচি ভাষার গতিপথ নির্দেশ করতে পারে না, যে বৃহত্তর সমাজ ভাষা ব্যবহার করেন, তাদের সমষ্টিগত শক্তিতেই ভাষার গঠনে এবং প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসতে পারে। সেই বৃহৎ গোষ্ঠী যেহেতু নানা উপভাষা ব্যবহার করে থাকেন, উপভাষাগুলির প্রভাব সেইজন্যই গভীর হওয়া সম্ভব। বাংলাদেশের বাংলাভাষা চিরকাল পশ্চিমবঙ্গের স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না, মার্কিনী ইংরেজির মতই সে নিজের আদর্শ তৈরী করে নেবে। আর সেই আদর্শ তৈরী করার সময় তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক নিজের উপভাষাগুলির কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা। উপভাষাগুলির দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষাও বিশেষ করে

সাহিত্যের ভাষাও যে ভবিষ্যতে প্রভাবিত হবে তা অনুমান করা চলে। একালের কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

> মেখো আশা
> প্রাত্যহিকে মগ্ন করো মন
> এখানে নদীর পাড়ে চলেছে বুনন
> থামারে থামারে ধান, বাগানে গুঞ্জন
> শরতের দিনে রাতে মাঠে ঘরে নাচ
> এখানেই ভিত গড়ে ভাষা।

আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড লিখিত বা সাহিত্যিক ভাষা একদা সংস্কৃতায়িত ছিল, তার বিরোধিতা হয়েছে। সংস্কৃতায়নের অবসান হয়নি। এরকম বলছি না যে বাংলাভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ লুপ্ত করা হোক। অবশ্যই যা কিছু ভাষায় আছে, যা কিছু গৃহীত হয়েছে তা ভাষার শক্তি বাড়াবে। কিন্তু ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা ও প্রকাশ সামর্থের জন্য নানা প্রচেষ্টাই চলবে নিরবচ্ছিন্নভাবে, কখনও সচেতন চেষ্টায়, কখনও অসচেতনভাবেই। এবং এই চেষ্টা বাংলাভাষী অঞ্চলের দুই খণ্ডেই চলে... রাজনৈতিক প্রভাব, ধর্মীয় বোধ এবং... সামাজিক প্রয়োজনের পার্থক্য সেই চে... নিয়ন্ত্রিত করছে এবং চিরকালই করবে... তার ফলেই ভাষার রূপ পরিবর্তিত... অনিবার্যভাবে। ভবিষ্যতের সেই রূ... আমরা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি... শুধু বর্তমানের কতকগুলি তথ্য বাছে... করে ভবিষ্যতের সেই সম্ভাব্য রূপ... কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

বুড়িগঙ্গা থেকে মেডিক্যাল কলেজ

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালবাসা শুয়ে আছে মিনারে-দে, খিলানে-মন্দিরে—সে ভাল- মায়ের রক্তে ছেলের মুখে কথা ছেলের রক্তে মা খুঁজে পায় আত্মাকে। গঙ্গা-পদ্মা হৃদয়ের পাশ আরেকটি হৃদয়, গান করে গান —সে-গানের ভাষা আমরা জানি। ভাষা, আমার ভাষা। হিমালয়ে মায়ের থেকে ছাড়া পাবার আগে মায়ের বুক যে-ভাষা রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে ত সেই ভাষায়। অথচ সেই বাংলা সরকারী স্বীকৃতি পেতে রক্তের ডেকেছে, বন্দুকের ধোঁয়ায় কালো আকাশ।

শব্দের ভারে কি অতর্কিত প্রতিবাদের য় কে জানে সেদিন জিন্না সাহেবও টা চকচকিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গ গের পরের বছর মহম্মদ আলি জিন্না লেন ঢাকা সফরে। সদ্য-স্বাধীনতা- পাকিস্তানের জনপ্রিয় নেতা। দেশ- র একচ্ছত্র শ্রদ্ধার অধিকারী তিনি নিজেও জানতেন। পল্টন ময়দানে া লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ। া সাহেব বক্তৃতা শুরু করলেন জিতে। তারপর সিদ্ধান্ত ঘোষণা : ল উই উর্দু এণ্ড উর্দু এলোন বি দি স্টেট ল্যাঙ্গোয়েজ অব পাকি- এখানে ত জনতার মুখে ভাষা নেই। দিল বিশ্বশালের তরুণ ছাত্র সর্দার ল করিম। জনতাকে বিমূঢ় করে সে বাদ জানাল, না, বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা বে, উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে ে না। পল্টন ময়দান জুড়ে একটি ই সেন প্রতিধ্বনিত হতে থাকল 'না'। না সাহেব সেদিনই হয়ত টের পেয়ে- লেন বাঙালির বারুদের গন্ধ। জনতরঙ্গের ভাষা তিনি অনুভব করতে পে- লেন।

তারপর চলল বাংলা-উর্দু বাক- যুদ্ধ। স্বাধীনতার জোয়ার থিতিয়ে তে সময় লাগল। না, খুব বেশি সময় । সাধারণ মানুষ তখনও ঠিক রাজনৈতিক ন লাভ করেনি, যা কিছু অভিযোগ তিবাদ সীমিত হয়ে রইল বুদ্ধিজীবীর ধ্যে। তবুও পূর্ব বাংলার মানুষ এক- কো সরকারী সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন না। ছাড়া পূর্ব-পশ্চিমের বিরাট অর্থনৈতিক ষম্য চোখে পড়তেও সময় লাগল না। সলিম লীগের পূর্বাঞ্চলীয় নেতারা এই ন্যায় এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার য়ে উঠলেন না। এগিয়ে এলেন ধীরেন্দ্র- থ দত্ত। তিনি বললেন বাংলাভাষা পূর্ব লার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা। বাংলা াষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ পূর্ব ংলার জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাবী, াজনৈতিক দাবীকে স্বীকার করা। শিক্ষা, কির, দেশ গড়ার কাজে পশ্চিম পাকিস্তান য সুবিধা পাচ্ছে পূর্ব বাংলার জন- াধারণকেও সেই সুবিধা দিতে হবে।

১৯৫০ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে তিনি করাচীতে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলীতে বক্তৃতা করলেন। করাচী থেকে ঢাকা বিমান বন্দরে ধীরেন দত্ত যখন ফিরলেন, ছাত্ররা তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত অভি- নন্দন জানালো।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সোচ্চার হল। মুসলিম লীগের সরকার সে-দাবি উপেক্ষা করলেন। ১৯৫২-তে প্রাদেশিক পরিষদের অধি- বেশন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পাশ করানো হবে। রুখতে হবে, যে-কোন মূল্যেই হোক বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবী। ছাত্র সমাজের মনে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে। সরকারী প্রস্তুতিও এগিয়ে চলল। জারী হল ১৪৪ ধারা। ছাত্ররা জমায়েত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, ঢাকা হলে, ফজলুল হক মুসলিম হলে। অধি- কাংশের মত ২১ ফেব্রুয়ারী ১৪৪ ধারা ভাঙলে অশান্তি তীব্র হবে, সাধারণ নির্বাচন পিছিয়ে যাবে। তা থেকে মুনাফা তুলবে সরকার। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা এতে একমত হলেন না।

তারপর বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গার নৌকোয় বসে একদল ছাত্র সিদ্ধান্ত নিলেন আইনত ১৪৪ ধারা না ভেঙে দশজনের এক একটি দল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবেন। হলও তাই। ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা পূর্ণ হরতাল করল। ঢাকা হল, ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে দশজন করে ছাত্রছাত্রী নিয়ে এক একটি দল বেরুল। পুলিশও তৈরী ছিল, গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জ, ব্যাটন চার্জ, কাঁদানে গ্যাস চলল। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল মেডি- ক্যাল কলেজ গেটে, হস্টেলে, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হস্টেলে। পুলিশের বর্বর অত্যা- চারে রক্তগঙ্গা বইল।

প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন দুপুরে। ছাত্ররা পুলিশী জুলুমের প্রতি- বাদ জানালেন পরিষদের সদস্যদের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ক্ষেপে উঠলেন! বর্ধমান হাউস থেকে নির্দেশ দিলেন, গুলী চালাও। প্রথম গুলী চলল মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের সামনে। লুটিয়ে পড়ল জব্বার ও রফিউদ্দিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা তরুণ ছাত্র বরকতও গুলী- বিদ্ধ হলেন। এ ছাড়া বারুদের গন্ধে কাঁদানে গ্যাসের অন্ধকারে পুলিশের ট্রাক কতজন ছাত্রছাত্রীর মৃতদেহ পাচার করে- ছিল তার হিসেব মেলেনি।

শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল খবর। স্বাধীন দেশের সরকারের গুলীতে ছাত্ররা প্রাণ দিয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে। হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হল শহীদস্থান মেডিক্যাল কলেজে। প্রাদেশিক পরিষদ ভবনেও বিক্ষোভ। খয়রাত হোসেন আনলেন মুলতুবী প্রস্তাব, মৌলানা তর্কবাগীশ, আবুল কামাল শামসুদ্দিন মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করে খয়রাত হোসেনের দলে বেরিয়ে এলেন।

বাংলা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা। ২২ ফেব্রুয়ারী। কয়েক লক্ষ মানুষের প্রতিবাদ মিছিল। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে হাই- কোর্ট পর্যন্ত শুধু কালো মাথা। আবার পুলিশী তাণ্ডব। হাইকোর্টের সামনে গুলীতে শহীদ হলেন সরকারী কর্মচারী শফিকুর রহমান। মৌলানা ভাসানী গ্রেপ্তার হলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে শোভাযাত্রা পৌঁছল নবাবপুরে, নাম- না-জানা একজন রিকসাওয়ালা পুলিশের গুলীতে শহীদ হল।

পরের দিন শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হর- তাল। মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে বরকতের রক্তের ওপর রাতারাতি তৈরী হল শহীদ মিনার। হাজার হাজার মানুষ শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা জানাল, যারা তাজা প্রাণের বিনিময়ে বাংলা ভাষাকে যোগ্য মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারী প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখা হল। ২৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্রদের জোর করে হল থেকে বের করে দেওয়া হল। ভেঙে ফেলা হল শহীদ মিনার।

কিন্তু নুরুল আমিনের প্রতাপ কোথায় তলিয়ে গেল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ধরাশায়ী হল। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করলেন আওয়ামী লীগের ভাসানী ও সুরাবর্দী, কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক, নিজাম- ই-ইসলামের আসরফ উদ্দিন চৌধুরী। ঐতিহাসিক নায়ক শেখ মুজিবর রহমান তখন আওয়ামী লীগের একজন সংগ্রামী যোদ্ধা এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

অবশেষে ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে। কলংকিত বর্ধমান হাউস পরিণত হল বাংলা একাডেমিতে। পূর্ব বাংলার মানুষের ভাষার জন্য আন্দোলনের বীজ রক্তের মধ্যে প্রবাহিত ছিল নইলে তা সার্থক হতে পারত না। সালাম, বরকত, জব্বারের রক্তের রক্তে এখনও কৃষ্ণচূড়া পলাশ ফোটে, আজকের বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মন গর্বে রাঙিয়ে দিয়ে যায় কারণ, 'বাংলায় পড়ুন, বাংলায় লিখুন, বাংলায় কথা বলুন—ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করুন' সংগ্রাম জয়ী হয়েছে।

বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের জোয়ারে তৈরী হয়েছে বাংলা একাডেমি, বাংলা ভাষা উন্নয়ন বোর্ড। অথচ এ প্রান্তে সে-জোয়ার আছড়ে পড়ছে না।

বাংলা একাডেমি, ভাষা উন্নয়নের কাজে জীবন উৎসর্গ করব—আমরাও রক্তের সঙ্গে তার শপথ নি এবং এই একুশে ফেব্রুয়ারীতেই।

পার্সিপোলিসের পথে

সবিতা ঘোষ

আমরা দুমাসের ওপর দেশ ছেড়ে ইরাণের রাজধানী তেহরাণে আছি। এক বছরের জন্যে আসা। কর্তা ইউনাইটেড নেশন্‌স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম—সংক্ষেপে ইউ এন ডি পিতে একটা চাকরী নিয়ে এসেছেন। ইরাণ সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা। এক বছরের ব্যাপার, কাজেই আমাকেও আসতে হয়েছে। উপস্থিত ছেলে মেয়েও সঙ্গে আছে।

এখানে থাকতে থাকতে তেহরাণ শহরটা চেনা-জানা হয়ে আসছে। শহরের ভেতরকার কিছু কিছু দ্রষ্টব্য স্থানও দেখছি সুযোগমত। স্কুল, কলেজ খুললেই ছেলে-মেয়েকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। এর মধ্যে তেহরাণের বাইরের কোন জায়গা দেখে আসতে পারলে বড় ভাল হয়। ওরা ওদের বাবাকে তাগাদা দিতে লাগল।

কর্তা একদিন আপিস থেকে এসে বললেন—আমাদের আপিসের ড্রাইভার রেজা খুব ভাল গাড়ি চালায়। ওর ভাই এর ট্যাক্সির ব্যবসা। ও বলছে ভাই-এর একটা গাড়ি নিয়ে ও চারদিনে আমাদের ইস্পাহান, সিরাজ আর পার্সিপোলিস ঘুরিয়ে আনতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, ও সামান্য একটু ইংরিজিও জানে। এতে খরচ একটু বেশীই পড়বে, তবু আমরা এটাই আমাদের পক্ষে সুবিধেজনক হবে ভেবে গোছগাছ শুরু করলাম। শুক্রবার জুম্মাবার বলে সমস্ত বন্ধ থাকে। বৃহস্পতিবারও ইউ এন ডি পি আপিস পুরো ছুটি থাকে। মঙ্গল, বুধ ছুটি নিলেই চলবে। ১৭ জুন মঙ্গলবার বের হয়ে, প্রথম রাত্রি ইস্পাহান, পরের রাত্রি সিরাজ, শেষের রাত্রি পার্সিপোলিসে কাটিয়ে শুক্রবার রাত্রের মধ্যে তেহরাণ ফেরা। পরদিন যথারীতি আপিস। পারস্যে শনি, রবিবার সোম, মঙ্গলবারেরই মত।

এখানকার চেনা পরিচিতদের কেউ বললে—'জুন মাসে—ওঃ প্রচন্ড গরমে মারা পড়বেন। পুজো নাগাদ যেতে হয়।' আমরা দমবার পাত্র নই। 'প্লেনে গেলেই পারতেন। পথকষ্ট টেরই পেতেন না।' 'না, না, হুস করে উড়ে গিয়ে লাভ কি? দেশেও তো ঢের গরম। এমন কতো বেড়িয়েছি। বড় শহর সব একই রকম। পথে কতো ছোট-খাট জায়গা পড়বে। যাত্রাপথটাও তো একটা বড় ফ্যাকটর। গ্রামটাম দেখব।'—'হ্যাঁ গ্রাম! গ্রাম এ অঞ্চলে কোথায় পাবেন? পার হবেন তো ন্যাড়া পাহাড় আর ধু ধু মরুভূমি। এ কি আমাদের দেশ পেয়েছেন?'

অন্যজনরা—'আগ্রা দিল্লী দেখে থাকলে এসব আর আপনাদের চোখে লাগবে না। এরা এদের ঐতিহ্য, স্থাপত্য নিয়ে লাফ-ঝাঁপ, হৈ চৈ খুব করে বটে।'—'কেন ট্যুরিস্ট গাইডে তো খুব চমৎকার সব ফটো রয়েছে?' —'হ্যাঁ, ঐ ফটো পর্যন্তই। ও শুধু তোলবার কায়দা। চোখে দেখতে তেমন কিছুই নয়। ফটো তুলতে জানলে এঁদো পুকুর আর কচুবনও নন্দনকানন হয়।

একজনরা শুধু বললেন—'না, না, যান। দেখে আসুন। সেপ্টেম্বর, অকটোবরে যখন আপনাদের সুবিধে নেই বলছেন। তাই বলে ইরাণে এসে সিরাজ, ইস্পাহান দেখবে না ছেলে-মেয়েরা? গরম ঠিকই পাবেন। তবে খুব বেশী করে ফলটল, কোল্ড ড্রিংক

সঙ্গে নিয়ে চলে যান। ভালই লাগবে। ইরাণী ড্রাইভার তো, খুব সাবধান। ওকে ক্রমাগত মনে করাবেন—আগা, আয়াস্তে। আগা লুৎফান ইয়াভস। অর্থাৎ মিস্টার আস্তে। মিস্টার প্লীজ ধীরে চালান।' এই সাবধান-বাণীতে আমি তাঁ
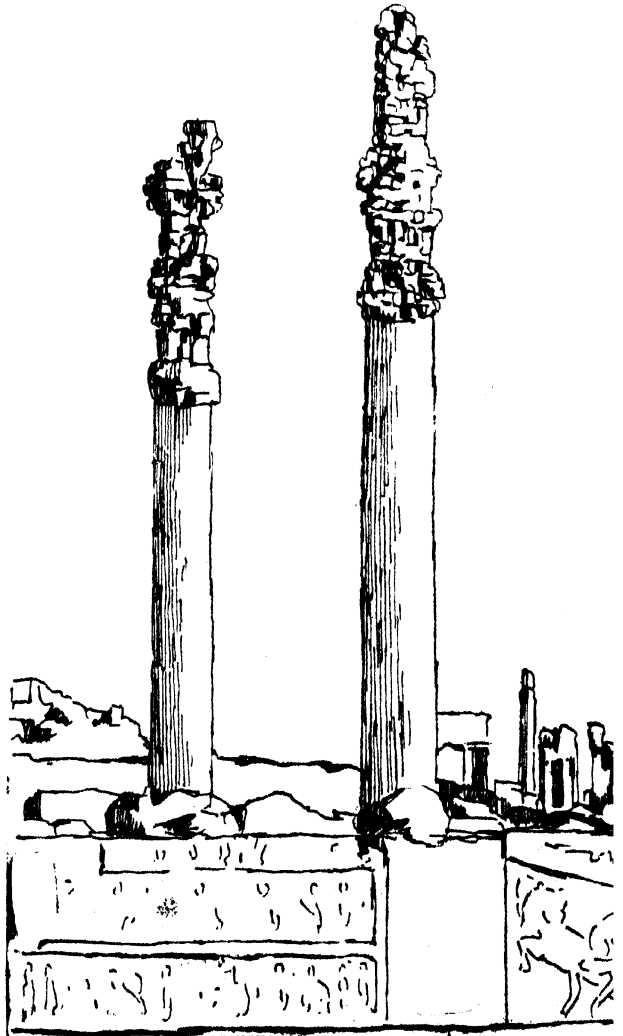
নদুষ আমার বেড়াবার উৎসাহ অর্ধেক নিভে ল। ছেলে-মেয়ে, তাদের বাবা আমার মুখ খে হেসেই অস্থির।

চারদিনের বেড়ান মানে তো খানকয়েক পড়-জামা একটা সুটকেসে পুরে ফেলা। টুটু ক্যামেরা নিচ্ছে, ট্রানস্পেরেন্স অব লার ফিল্ম কেনা হল। তারপর রসদ? সেটাই আসল আয়োজন। সকলের এতেই উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। সোমবার বিকেলে সব কেনাকাটা হল। মঙ্গলবার ভোরে উঠে চা, জলখাবার খেয়ে তৈরী: সঙ্গে চলল, কেক, বিস্কুট, চীজ, পাকা কলা চেরী, পিচ, আপেল, কমলালেবু। চকলেট, লজেন্স পেস্তাভাজা, পোটেটো চিপস। পেস্তাভাজাটা ইরাণের মুড়ি, মুড়কির মত। চিনেবাদাম ভাজার ততটা চল নেই। দুটো বড় ফ্লাস্ক-একটায় ঠাণ্ডাজল, অন্যটায় গরম। কফি, গুঁড়ো দুধ, চিনি, ঠিক সাড়ে পাঁচটায় রেজার হর্ণ। সুটকেস, খাবারের প্যাকেট, ক্যামেরা সব উঠল। ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে আমরা উঠলাম। অল্প কিছু দূরে গিয়ে আমি —টুটু, সুটকেসের চাবিটা? টুটু—তুমি নাও নি? আমি তো সুটকেসে চাবি দিয়ে চাবিটা ওর ওপরেই রেখেছিলাম। আমি কর্তাকে—কে সুটকেস নামাল, তুমি না টিংকু? কর্তা— টিংকু। টিংকু—আমি চাবিটাবি কিছু তো দেখিনি। খাটের ওপর সুটকেসটা ছিল, আমি নামিয়ে আনলাম। আর কি। আমি টুটুকে নিয়ে পড়লাম। —তোর আক্কেলকে বলিহারি। সুটকেসে চাবি লাগিয়ে আমায় চাবিটা দিবি তো! অন্ততঃ নিজের কাছেও রাখবি। তা, না, সুটকেসের ওপর রেখে দিলি। টুটু তখন ছোট ভাই টিংকুর ওপর একহাত নিল। আমার কি দোষ? টিংকু চোখ মেলে দেখবি তো। আমার ঠিক মনে আছে ওর ওপরেই রেখেছিলাম। তোর যেমন কাণ্ড। এমন হুড়বড় করিস। আমি—আমারই ঘাট হয়েছে। এতো বড় মেয়েকে চাবি লাগাতে বলা। ওটুকুর জন্যে পরের ওপর নির্ভর না করে নিজে লাগালেই হত।

যখন গাড়ির ভেতর এইসব হচ্ছে, ততক্ষণে গাড়ি অনেকটাই এগিয়ে গেছে। কর্তা শেষ পর্যন্ত বললেন—ছি ছি, কি কাণ্ড। ভাগ্যিস এখনও অন্ততঃ খেয়াল হয়েছে। নইলে নেমেই তালা ভাঙতে হত। রেজা গাড়ি ঘোরাও, চাবি ফেলে এসেছি। এটুকু বোঝাতে প্রাণান্ত। রেজা ব্যাক ব্যাক। হোম। বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়ে ফ্ল্যাট থেকে চাবি উদ্ধার করে আনল। সুটকেস তোলবার সময়ই মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই আধঘন্টাখানেক দেরি হয়ে গেল। যাক্ সবার মন হালকা হল।

আমাদের কাণ্ড। কোথাও যেতে বাক্সের চাবি হারানো, ফেরার পথে নিজে-দের ফ্ল্যাটের চাবি হারানো। তারপর পাড়া-পড়শী ডেকে সকলের চাবি দিয়ে সে সব খোলার চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত হাতুড়ির ঘায়ে দমাদ্দম তালা ভাঙা। তখন আবার ঐ জগদ্দল তালার ওপর রাগ, সোজায় খুলছে না কেন? এ জন্য কতো যে কীর্তি আছে আমাদের! সেই সব মনে করে আমার হাসি পাচ্ছিল।

উনি সামনে ড্রাইভারের পাশে। পেছনে মাঝখানে আমি। দু ভাইবোনে দুটো ধার দখল করে বরাবর। শহর ছাড়ালেই সত্যিই চমৎকার। প্রথম কথা বুক ভরে পরিস্কার হাওয়া নাও। তেহরাণ যেন একটা বেসিনে অবস্থিত। তিনদিকেই পাহাড়। কেরসিনের ধোঁওয়া, পেট্রোলের ধোঁওয়া, যানবাহনের, কলকারখানার ধোঁওয়ায় শহরের বাতাস বিষাক্ত। অবশ্য আমরা কলকাতার মানুষ। পৃথিবীর কোন দেশে, কোন অবস্থাতেই আমাদের অসুবিধে হবার কথা নয়। শহরের ঘন বসতি কমে এল। কিছুদূর পর্যন্ত শহর বাড়ানোর, আরো আরো পাহাড় আক্রমণ করে বসতি স্থাপনের নমুনা। পাহাড়ের মাঝে মাঝে বাড়ি উঠছে। রাস্তা তৈরী সবে শেষ হয়েছে। অথচ বহুদূর পর্যন্ত চওড়া রাস্তার দুধারে মরশুমি ফুলের গাছ। জেরেনিয়ম, পিটুনিয়া রংবেরংয়ের। টুটু বলছে—মা দেখ, এখানে এখনো তো বেশ গোলাপ রয়েছে। ভাগ্য ভাল থাকলে সিরাজে কিছু গোলাপ দেখতে পাব। তেহরাণেই সারা মে মাস কি গোলাপ ফুলের রেলা-রেলি যে দেখেছি না। বন্ধুরা বলছিল মে মাসের শেষে কিম্বা জুনের প্রথম সপ্তাহে সিরাজে যেতে হয় গোলাপ দেখতে। ঘর, বাড়ি, রাস্তাঘাট, বিখ্যাত বাগানগুলি সব নাকি গোলাপ ফুলে ঢেকে যায়। আমরা চলেছি জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পার করে। তার ওপর গত দু সপ্তাহ যা পরিত্রাহী গরম পড়েছিল যে মনে হয় সিরাজের গোলাপ নির্ঘাৎ সব শুকিয়ে গেছে। টিংকুর দিকে ফলের বাগান পড়েছে। কখনো এদিক বেশী সুন্দর, কখনো ওদিক। আমার তো দুপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘাড় ব্যথা হয়ে গেল।

যখনই যেখানে বেড়াতে যাই, বেরোবার আগের উত্তেজনা, আয়োজনটাই বোধহয় সব-চেয়ে মধুর। তার পর আমার ভাল লাগে যাত্রা পথটাকে। কতোক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছব বড় একটা ভাবি না। পথে বেরিয়ে প্রতিটি মুহূর্তই তো নতুন জিনিস, নতুন দৃশ্য নিয়ে হাজির হয়। পথটা মনে মনে পায়ে হেটে যেন মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি যাই। অবচেতন স্তরে থাকে গন্তব্যে পৌঁছে না জানি কি দেখবো। এটাই নিশ্চয় সমুখে ছোটায়। গন্তব্যে পৌঁছেই সাসপেনসের শেষ। অবচেতন মনটা অজান্তেই ফাঁকা হয়ে যায়। সজ্ঞান মনটির মধ্যে তাড়া লেগে
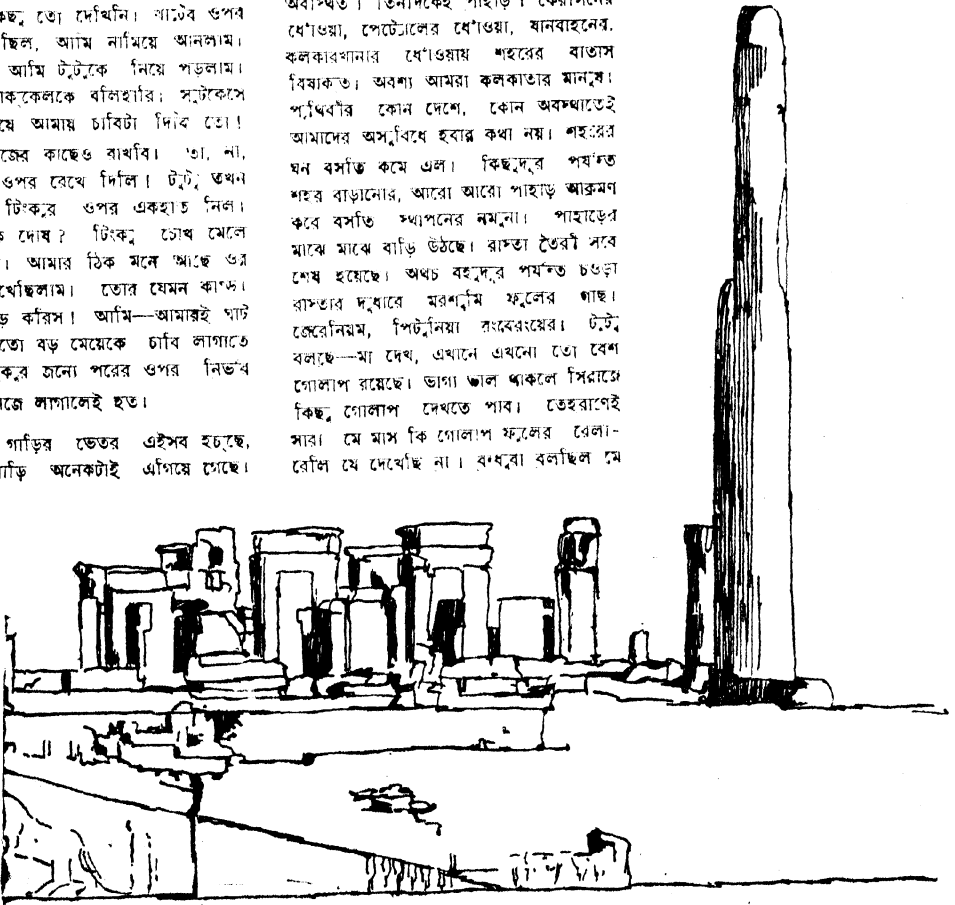
যায় এটা দেখতে হবে, ওটা দেখতে হবে। এটা ওটা কিনতে হবে। এই সব কিছু দেখে শান্ত মনে কোন কিছু ভাববার, উপভোগ করবার সময় কোথায়? সমস্ত জড়িয়ে ভায় গাটা মনের মধ্যে একটা ছাপ ফেলবার আগেই ফেরবার তাড়া শুরু হয়ে যায়।

তাই পথে যা দেখেছি, যা করেছি, যা ভেবেছি সবই আমি যাদের জন্যে লিখে চলি তাদের জানাবার একটা তাগাদা অনুভব করি প্রাণের মধ্যে। তেহরাণ থেকে চলেছি সোজা দক্ষিণে। গন্তব্য প্রথম ইস্পাহান। ৪৪০ কিলোমিটার। দুপুরে একটা, দেড়টার মধ্যে পৌঁছবার কথা। বেরিয়েছি সকালে। মোলায়েম রোদ। যানবাহন কম। ক্রমে রোদ চড়ছে। গাড়ির ভীড় বাড়ছে। লোকালয় কমছে। আগাগোড়াই পিচ বাঁধানো রাস্তাটা কিন্তু খুবই ভাল।........রেজা কি স্পীড বাড়াচ্ছে? আমার এক চিন্তা। কর্তাকে— ওগো, দেখো না স্পীডের কাঁটা কোথায়? ড্রাইভারকে— ও আগা রেজা,........কি যেন? টিংকু বললে—ইয়াভস। আমি অমনি শ্লোগান, ইয়াভাস, ইয়াভাস করে উঠেছি। রেজা পর্যন্ত হাসছে। ঠাণ্ডাজলের ফ্লাস্কটা খুলে সবাই জল খাওয়া। টিংকু সুবিধে করে মস্ত চকলেটের প্যাকেটটা বের করে নিয়েছে। এ হে হে। এরই মধ্যে রাংতার ভেতর গলেটলে কাদার ডেলা। ঐই খাওয়া। ভাগ করতে গিয়ে হাতেমুখে মাখ। পেস্তাভাজা, আলুভাজা ঠোঙা থেকে বেরোচ্ছে, মুখে যাচ্ছে অবিরাম। সামনের সীট থেকে—ওগো খিদে পাচ্ছে যে: একটা কিছু ছাড়ো না বাবা। বড় বড় পাকা কলা আর একপিস করে কেক সবার জঠরে চলে গেল। রেজা গাড়ি চালাতে চালাতেই অবলীলাক্রমে মুখে চালান করল। বেলা দশটা নাগাদ দেখি বেশ একটা মফঃস্বল শহর এল। নাম গোম। পরে শুনেছি ইরাণে মাসাদ-এর পরই গোম বড় তীর্থস্থান মুসলমানদের। হাত পা ছাড়াতে নামা হল। ছোট্ট দোকানে কোকাকোলাই খাওয়া। বাজারের মধ্যেই মস্ত সুন্দর পাথের কাজ করা ডোমওয়ালা মসজিদ। নকসায় নতুনত্ব আছে। জ্যামিতিক নানা রেখা দিয়ে কাজ। হাল্কা নীলচে সবুজ গম্বুজের গায়ে। রোদ পড়ে চক চক করছে। টুটু ফটো নিল। পথেঘাটে সুবিধে হবে বলে টুটু জিন পরে এসেছে। তেহরাণে তো জিনপরা তরুণীর সংখ্যাই বেশী। এখানে গোমে দেখছি সমস্ত মেয়েরাই কালো চাদর মুড়ি দেওয়া। ইরানে প্রায় পঁচানব্বই ভাগ লোকই মুসলমান। প্রগতির পথে ইরান খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, কিন্তু পর্দাপ্রথা এখনো লোপ পায়নি। তেহরাণের মত শহরেও আমার আন্দাজি হিসেব মত বোধহয় দশ ভাগের তিন ভাগ মেয়েরাই বাইরে বেরোলে আপাদমস্তক চাদরে মুড়ি দেয়। চাদর কথাটাও ফার্সি। বোরখার জায়গায় একটা প্রকাণ্ড অর্ধ চন্দ্রাকার চাদর ব্যবহার করে। শুধুমাত্র চোখ দুটি আর নাকের ডগা ছাড়া কিছু দেখা যায় না। কাজেই আমার শাড়ি পরা মূর্তির চেয়েও দ্রষ্টব্য হল টুটুর জিনপরা চেহারা। মেয়ে, পুরুষ সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকছে। বুড়োসুড়ো ফকীর পথের ধারে, মসজিদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে বসে মালা জপছে। অন্ধ ভিখারী, খোঁড়া ভিখিরি, রুগ্ন বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত কিছু লোক ভিক্ষে চাইছে।

ঝকঝকে তেহরাণের কাছে এ অত্যন্ত পুরোনো, সেকেলে গরীব শহর। অবশ্য তেহরাণেও যথেষ্ট ভিখারী আছে। আমি বললাম বাথরুম গেলে হত। রেজা বললে মসজিদের এলাকার মধ্যে আছে। টুটু আমি চললাম। ধারে ধারে ছোট ছোট দোকান থেকে প্লাস্টিকের কৌটো নেড়ে নেড়ে কি যেন কিনতে বলছে। উনি টিংকুকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ইস্পাহানি সোহন হালুয়া। আর কি, এক কৌটো কিনে ফেলা হল। দোকানের ছোকরা হাসতে হাসতে টুটুকে দেখিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে কি বলল।

ইসারায় বুঝলাম, বলছে মসজিদে ঐ পোশাকে ঢুকতে দেবে না। তেহরাণ থেকেই জানি মসজিদে ঢুকতে হলে মাথা ঢেকে ঢুকতে হয়। খেয়াল ছিল না। আমি তো শাড়ির আঁচল দিয়ে ঘোমটা দিলাম। আমার হ্যাণ্ডব্যাগে সিল্কের স্কার্ফ ছিল। সেইটা মাথায় দিয়ে টুটু চলল। নিশ্চিন্তে হাত দোলাতে দোলাতে। আমার পাশে পাশে। মসজিদ চত্বর ঝাঁট দিচ্ছিল যে ঝাড়ুদার, সে ফটকের সামনে এসে ঝাড়ুর ডাণ্ডাটা বাড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়াল। টুটুর পোশাক এখনো মসজিদে ঢোকার উপযুক্ত নয়। গাড়িতে ফিরে গিয়ে আমার স্টোলখানা নিয়ে শরীরের যতটা সম্ভব ঢেকে টুটু [illegible] অভিযানে চলল। এবারও একজন [illegible] গোছের লোক মাথা নেড়ে নামঞ্জুর [illegible] বললে হাত তো বেরিয়েই যাচ্ছে। [illegible] আমি ততক্ষণে শাড়ির আঁচলে [illegible] দু হাত ঢেকে ফেলেছি। শেষ পর্যন্ত সোহন হালুয়ার দোকানদার ছোকরা ছেঁড়া ফুটো ফুটো, কোঁচকানো [illegible] চাদর এনে হাজির। এক তোমান ভাড়া এটা নাও, পর। তথাস্তু। টুটু হাসিমুখে তাইই পরে নিল। কায়দা [illegible] শুধু চোখ দুটো বের করে রেখেছে। [illegible] কাজ সেরে, চত্বরে একটু ঘুরে চলে এ[illegible] 'আমরা কিছু দেখবো কি, ভীড় করে সবাই আমাদেরই দেখতে লাগল।

অস্বস্তির একশেষ। এদের [illegible] পয়সার হিসেব হল দশ রিয়াল [illegible] তোমান। এক তোমানের দাম আ[illegible] দেশের এক টাকা পঁচিশ পয়সার মত। দোকানে চাদর ফেরত দিয়ে বললে—ও[illegible] বোটকা গন্ধ চাদরটায়। ওর ভেতর মুড়ি[illegible] নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমার দম [illegible] আসছিল।

আধ ঘন্টাখানেক গেল। গাড়িতে [illegible] আবার চলা। টুটু বললে—খুব ভুল হয়ে[illegible] মসজিদ দেখতে শাড়ি ছাড়া আর কখনো [illegible] না। চলেছি......। সূর্য মাথার [illegible] চড়ছেন। তাপ বাড়ছে। রাস্তা [illegible] লোকালয়, জনমানব শূন্য। এমন [illegible] পাখীহীন নিষ্প্রাণ জায়গা কখনো দেখি[illegible] রাস্তা বেশ পাহাড়ী। চকচকে পিচের [illegible] রাস্তা সর্পিল গতিতে উঠছে, নামছে। [illegible] দা গাড়ি করচিং। রেজা স্পীড বাড়াচ্ছে বাড়াচ্ছে।......কেউ লক্ষ্য করছে না। [illegible] এই নির্বান্ধব প্রান্তরে যেন নিরুদ্দে[illegible] পাড়িতে এরা তিনজনে এই [illegible] উপভোগ করছে আমি যে একাই ভয় পা[illegible] এটা বার বা জানাতে ইজ্জতে বাধছে। আ[illegible] প্রাণ কি আমার একার? মায়া মমতা শুধু আমারই আছে? মুখ চল[illegible] কথাবার্তা, এমন কি লজেন্স, বাদাম খাও[illegible] বন্ধ করে সবাই আমরা প্রকৃতির কে[illegible] একটা রিক্ত, নিঃস্ব রূপ দুচোখ [illegible] শুধু দেখছি নয়, যেন রূপসুধা পান করা বন্ধ্যা রুক্ষ পাহাড়ের কি ভয়াবহ, [illegible] রূপ।

প্রকৃতি যেখানে শস্যশ্যামল, [illegible] সজল, যেখানে চোখজুড়োনো গ্রাম, [illegible] মোষ, বৌ ছেলেপুলে, টোকা মাথায় চা[illegible] পুকুরে হাঁস ভাসছে, নারকেল বন, কলাগ[illegible] সেখানে তার শান্তশিষ্ট ছোটখাট মাতৃমূর্তি সবাইকে কোলে নিয়ে যেন বসে আছে। কিন্তু আবার এই যে জীবনের ছবি, এ আ[illegible] মৃত্যুর কথাও মনে করিয়ে দেয়। সবই আ[illegible] কিন্তু সবই অস্থায়ী। রেলগাড়িতে, মো[illegible] গাড়িতে যেতে এই-ই আমাদের অতি প[illegible] চিত্ত ছবি। আবার ঘন ঝোপ জঙ্গলাকী[illegible] নির্জন পাহাড়ী পথেও কম বেড়াই নি।

(চলবে

সমালোচনা তখন এবং এখন

দিগ্বিজয় দিকপতি

বাংলাদেশে সমালোচনার ইতিহাস তো খুব বেশি দিনের নয়। বড়জোর **একশো বছরের**। আর তারও শুরু ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণেই। বৈষ্ণব যুগে খালি সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের বেশ কিছু 'টীকা' লেখা হয়েছিল। মধ্য যুগে কিংবা মঙ্গল কাব্যের যুগে পুরোপুরি সমালোচনা গ্রন্থ নজরে আসে না। সম্ভবত মধ্য যুগের শেষের দিকে সাহিত্য বিচারে মানসিকতা সুবোধের সন্ধান মেলে ভারতচন্দ্রে।

এর পর পট পরিবর্তন। পাশ্চমী শিক্ষার ঢেউ লেগে বাংলাদেশের জীবন আর সাহিত্যে বিরাট পরিবর্তন। ঊনিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু হয়ে পঞ্চাশ বছরের ভেতর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র আর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আর সাময়িকপত্রের বিরাট উন্নতি হোল। বেশ স্বাস্থ্যবান চেহারাই তখন তার। বঙ্কিমের আবির্ভাব তাহাই অনেকটা সহজ করে রেখেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে অবশ্য নাম করতে হয় আর একজনের তিনি কবি এবং সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত। তিনিই তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরের পাতায়, সেকালের প্রকাশিত বইপত্রের আলোচনা করতেন। খুব সম্ভব সাময়িকপত্রে 'পুস্তক সমালোচনা'র চেষ্টা সেই প্রথম। এর পর থেকেই এ ব্যাপারে 'চল' দেখা গেল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' আশ্রয় করে সমালোচনা সাহিত্য মর্যাদা পেয়ে গেল। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর 'বঙ্গদর্শন'।

সেকালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমকৃত সাহিত্য সমালোচনা ছাড়াও সাহিত্য, সাধনা, ভারতী, প্রবাসী, সবুজপত্র, সাহিত্য সংহিতা পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্য সমালোচনার দৃষ্টান্ত দিয়ে সেকাল একালের সমালোচনার ধারা আর তার স্বভাব আর চেহারার বদলা-বদলিটুকু স্পষ্ট করার চেষ্টা করা গেল।

'বঙ্গদর্শনে' কাগজে 'নতুন গ্রন্থের সমালোচনা' বিভাগ চালু করার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছিলেন তা থেকে সংশ্লিষ্ট সময়ের সাহিত্য সমালোচনার ধারা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা হবে। প্রয়োজনীয় বিবেচনায় তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—"আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণ-দোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে।....গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুই ছত্রে সিদ্ধ হইতে পারে না!"

কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশ রঞ্জিনী' **কাব্যাংশের** বিস্তারিত সমালোচনা বঙ্গদর্শনে ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচনার ভাষা যেমন তীক্ষ্ম এবং বাহুল্য-বর্জিত বক্তব্যও তেমনি স্পষ্ট। এবং বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনায় কবি নন কাব্যই প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন 'যে সকল মোহিনী সৃষ্টির গুণে কবিগণ চিরস্মরণীয় হয়েন, 'অবকাশরঞ্জিনী'তে তাহার কিছু নাই এবং থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। অপিতু কোনো রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণা দৃষ্ট হয় না।...সে সকল গুণ না থাকিলেও 'অবকাশরঞ্জিনীর' কবিকে সুকবি বলা যায়। কেন? তার উত্তরও বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন--'তাঁহার একটি ক্ষমতা যে তিনি শব্দচতুর। কতকগুলো শব্দ প্রয়োগের দ্বারা যিনি বাগাড়ম্বর করিতে পারেন, তাঁহাকে শব্দচতুর বলি না; অথবা যিনি শ্রুতি-মধুর শব্দ প্রয়োগে দক্ষ; তাঁহাকেও বলি না। কাব্যোপযোগী শব্দের মাহাত্ম্য এই যে একটি বিশেষ শব্দ প্রয়োগ করিলে তদভিপ্রেত পদার্থ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দদায়ক পদার্থ স্মরণ পথে

Just published, at the Serampore Press;
Part I of
An
Interlinear Translation
of
Esop's Fables
In Bengalee and English
Price: 4 Annas
Specimen of the work
Fable XV
The Man and his Goose
মানুষ ও তাহার রাজহংস

সমাচার দর্পণ
১৯ জুলাই ১৮৩৪ খৃঃ

আইসে। এই কবির সেই শব্দ প্রয়োগে পটুতা আছে। কাব্যো-পযোগী সামগ্রীগুলিন আহরণ করিয়া সাজাইতে ইনি বিশেষ ক্ষমতাশালী। যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন তাহাই উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট করেন।' আবার 'অবকাশরঞ্জিনী'তে পূর্ববর্তী কিংবা সম-কালীন কবিদের প্রভাব কোথায় তাও স্পষ্ট এবং সাহসী উক্তিতে তুলে ধরেছেন।'...অল্প বয়স্ক কবিগণ, বিনানুকরণে রচনা করিতে সক্ষম হইলেও একটু একটু অনুকরণপ্রিয় হয়েন। 'অবকাশরঞ্জিনী' হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠে শ্রীমধু দত্ত মহাশয়কে স্মরণ হইবে।'

তেমনি কোন কোন অংশে নবীনের কাব্যে হেমচন্দ্রের প্রভাবও স্পষ্ট করেছেন বঙ্কিম। এবং মাইকেল ও হেমচন্দ্রের আদর্শ বাইরণকেও মনে পড়িয়ে দেয় তাও বলেছেন। অবশ্য এ প্রভাবের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই নবীনচন্দ্রের প্রতিভাকে অসম্মান করেন নি। বরং তিনি বলেছেন, 'আমরা এমন বলিতেছি না

না যে এই কবি অন্য লেখকের নিকট ঋণী। পশ্চাদবর্তী লেখক-গণকে পূর্ববর্তী লেখকগণের নিকট কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঋণী হইতেই হয়। সেই পরিমাণের অতিরেকে ইনি কাহারও নিকট ঋণী নহেন। ইনি নিজ মানস প্রসূত কবিত্বরত্ন যেরূপ পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রন্থ মধ্যে বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহাকে পরের নিকট ঋণী বলিতে অন্যায় নিন্দা করা হয়।'

বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে যে বইখানিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন 'বঙ্গদর্শনে সেখানিরও সমালোচনা করেছিলেন বঙ্কিম। প্রথার কুফল সম্বন্ধে ঈশ্বরের স্বপক্ষেই তাঁর রায় ছিল। কিন্তু বইখানিতে পরিসংখ্যা কিছু ভুল এবং কিছু অতিশয়োক্তির জন্য বঙ্কিম সমালো নির্মম হতে কুণ্ঠিত হন নি। দুঃসাহসীর ভূমিকা নিয়ে ঈ চন্দ্রের মত এক সার্বজনীন ব্যক্তিত্বকেও প্রশ্নের মুখো করেছেন। সমালোচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি,... বহু বিবাহ এদেশে যতদূর প্রবল বলিয়া বিদ্যাসাগর প্রতি করিবার চেষ্টা করয়াছেন বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে।....হু জেলায় যত গুলিন বহু বিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যা প্রথম পুস্তকে তাঁহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের শুনিয়াছি যে তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ কেহ বলে

মৃত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশের দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। ....যাহা হউক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও হুগলী জেলার সমুদয় লোকের মধ্যে কয়জন বহুবিবাহপরায়ণ পাওয়া যায়?....দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদন-পরায়ণ কিনা সন্দেহ। এই অল্প সংখ্যক দিগের সংখ্যাও যে দিন

সম্প্রতি উক্ত যন্ত্রে ['মোকাম বহুবাজারে নেবুতলার লেনে অমর সিংহ চৌধুরীর বাটীতে উপেন্দ্রলাল যন্ত্রে'] মরিস এবরুজমেণ্ট [গ্রামার] গৌড়ীয় সাধু ভাষায় তাৎপর্য্যার্থ সমূল মুদ্রিত হইবেক ও বিবিবিলাস ও ভর্ত্তৃহরিত্রিশতক যন্ত্রিত হইবে এতদ্গ্রন্থ গ্রহণাভিলাষী যদি কেহ হন তবে মলঙ্গার শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন সিংহ চৌধুরির নিকটে পত্রী প্রেরণ করিবেন গ্রামার মূল্য ৩ ভর্ত্তৃহরিত্রিশতক ২ বিবিবিলাস ১ ইতি।

সমাচার দর্পণ
[২৮ অগাস্ট ১৮৩০ খৃঃ]

দিন কমিতেছে, স্বতই কমিতেছে, তাহাও সকলেই জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোনো রাজ ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন যে এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতস্থ দেখিয়া, অনেকেরই ডন্ কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানেই থামেন নি তিনি মূল বিষয়ের আরও গভীরে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, '..কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম বহুবিবাহ এদেশে বড় চলিত—আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব?...মনে করুন দেশসুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত এমত নহে। সে সমাজ মধ্যে ধর্ম শাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচার সম্মত তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত, যাহা লোকাচার বিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলেও প্রচলিত হইবে না।...আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ সেই কারণেই বহু বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহ পরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, 'যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটি বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আপনি কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতে-ছেন, এই বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু সেই বিধিতে যে যে অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই সেই বিধানানুসারে প্রয়োজন মত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেননা সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্তব্য।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে বঙ্কিমের সমালোচনা আরও এক মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে। সে প্রশ্ন, বহুবিবাহ যদি হিন্দুদের পক্ষে দোষনীয় হয়ে থাকে মুসলমানদের পক্ষেও নয় কেন? এ প্রস্তাবের আওতায় তাদেরও আনা উচিত। এ সম্পর্কে বঙ্কিমের সমালোচনার কিছু অংশ তুলে ধরছি, 'যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে?' বহুবিবাহের সমাধান প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের পথনির্দেশের অসম্পূর্ণতাও স্পষ্ট হয়েছে বঙ্কিমের এই উক্তিতে, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপাল দোষে বহুবিবাহ নিবারণের সদুপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কেও সমালোচকের মন্তব্য নিদারুণভাবে স্পষ্ট, 'ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষণীয় ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূর্বাবধি কলঙ্কশূন্য। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন।'

'সাধনা' পত্রিকার সমালোচনার ধারাতেও দেখি বঙ্কিমের তীক্ষ্ণতা। সুরেশ সমাজপতির কলমও বড়ই নির্দয়। সেখানেও লেখকের চেয়ে লেখাই বড়—নামের চেয়ে সাহিত্য। স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথও সেই কড়াধাতের সমালোচনা থেকে রেহাই পান নি। ১৩০০ সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যার সাধনায় একটি গল্প প্রসঙ্গে সমালোচক, 'সমাপ্তি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গল্প। আমরা বহুদিন পরে মাননীয় রবীন্দ্রবাবুর একটি গল্পের প্রশংসা করিবার অবকাশ পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহার পুরুষ-প্রকৃতির, চঞ্চল স্বভাব মৃন্ময়ী, তাঁহার পাড়াগেঁয়ে ইয়ং বেঙ্গল অপূর্ব অল্পের ভিতর বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। গল্পভাগও মনোরম। কিন্তু স্বামীর প্রতি চিরবিরূপ মৃন্ময়ী কেমন করিয়া সহসা পতিপ্রেমাকাঙ্ক্ষিনী হইল,—গল্পে তাহার তথ্য পাওয়া যায় না।...রবীন্দ্রবাবু যদি কারণ ও ঘটনার সন্নিবেশ করিয়া মৃন্ময়ীর হৃদয়ের এই পরিবর্তন দেখাইতে পারিতেন। তাহা হইলে তাঁহার গল্প সর্বাঙ্গসুন্দর হইত। মৃন্ময়ীর হৃদয়ের পরিবর্তন লেখক সহসা স্বয়ং করিয়া দিয়াছেন,—গল্পকৌশলে তাহা ব্যক্ত করেন নাই, এইজন্য 'সমাপ্তির' মাঝখানটা কেমন খাপছাড়া ও অতৃপ্তিকর হইয়া পড়িয়াছে।'

এই পত্রিকারই বৈশাখ সংখ্যায় (১৩০১) রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি সম্পর্কে আলোচনা আছে, 'এবারকার সাধনায় সব প্রধান প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্কিমচন্দ্র'। বঙ্কিম-

চন্দ্র বিষয়ে এ পর্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রবাবুর বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।'

প্রবাসীর আশ্বিন ১৩১৮ সালের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন' নামক নাটকখানির আমরা সমালোচনা করিব না। যদি সম্ভব হয় পরে তাহার পরিচয় দিব।

'অচলায়তনে' রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। মেঘনাদ মেঘের আড়াল হইতে বাণ বর্ষণ করিতেন। আজকাল অনেক ব্রাহ্ম ও কালাপাহাড় লেখক সাহিত্যের অন্তরাল হইতে প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিতেছেন। 'অচলায়তনের' প্রধান প্রতিপাদ্য—হিন্দুধর্ম অত্যন্ত সংকীর্ণ, হিন্দুর মাত্র ব্যর্থ, বাগাড়ম্বর, হিন্দুর সমস্ত অনুষ্ঠান বিদ্রূপের উদ্দীপক। নুপমণ্ডুকের মকমকে সুবিস্তৃত 'অচলায়তন' মুখরিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ 'মেটারলিংক' হউন আমরা আনন্দলাভ করিব। কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিবেন না।'

'সবুজপত্রে' বৈশাখ ১৩২৫-এ রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' গল্প সমালোচকের কলমে এইভাবে সমালোচিত হয়েছিল—'শ্রীরবীন্দ্রনাথের কবিতায় গ্রথিত গল্প 'মুক্তি'। ইহা কবিবরের নবরচিত ছন্দে সহজ কথায় লেখা। ছোট জীবনের ছোটকথা, কিন্তু পড়িয়া মনে হয়,

হাই ত মানবজীবনের বড় কথা। বিশ্বের একটা সনাতন স্মৃতি রেণুর লেখায়, চিন্তার রেখায় এই কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।'

এরপর বৈশাখ ১৩১৩ সালের 'সাহিত্য-সংহিতা' থেকে কয়েকটি গ্রন্থ সমালোচনা তুলে ধরা গেল। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সমালোচনার আকার যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত। বিশ্লেষণও অনেক কম।

১৯০৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক উক্তি করেছেন, '১৯০৪ সালে অনেকগুলি উপন্যাস বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস মোটেই নাই বলিলে হয়। আমরা নিম্নে কয়েকখানি পুস্তকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'সপত্নী' উপন্যাসের সমালোচনা করতে গিয়ে সংক্ষেপে কাহিনী বর্ণনাই করে গেছেন আগাগোড়া পরিশেষে সামান্য চরিত্র বিষয়ে মন্তব্য, 'কুমুদিনী, কার্ত্তিক, কার্ত্তিকের উপপত্নী কিরণবালা এবং মাণিকের পত্নী, এই কয়টি চরিত্র নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। ...মোটের উপর এই গ্রন্থখানি আজিকালকার সাধারণ উপন্যাস অপেক্ষা যে অনেকটা উচ্চশ্রেণীর তাহাতে সন্দেহ নাই।'

সাহিত্য সংহিতার পাতায় ১৯০৫ সালে প্রকাশিত বইপত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, 'আলোচ্য বর্ষে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টশতাধিক পুস্তক ও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে উচ্চঅঙ্গের পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প।'

স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' বইখানির আলোচনা 'সাহিত্য সংহিতা'র পাতায় এইভাবে হয়েছিল। '...ইহা একখানি দর্শনগ্রন্থ। ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশি সমুদ্ভূত স্পন্দ, সহস্র বর্ষব্যাপীকাল ধরিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত, পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশে সুখ দুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত অসম্বন্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে, এবং কোন দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয় 'বর্তমান ভারত'-এ আলোচিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' সাহিত্য সংহিতার পাতায় আলোচিত হয়েছিল। সেটা সমালোচনা বলা যায় না। বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সাধনা কিংবা সমকালের পত্রিকায় সমালোচনার যে ধার দেখেছি, তা এখানে অনুপস্থিত। অবশ্য পরিসরও অল্প। 'স্বদেশ' আলোচনায় 'সাহিত্য সংহিতা'—স্বনাম প্রসিদ্ধ সুকবি ও উপন্যাসকার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বঙ্গদেশে এমন পাঠক-পাঠিকা কে আছেন, যিনি রবীন্দ্রনাথকে চিনেন না? রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশ তাঁহার নাম আরও সমুজ্জ্বল করিয়াছে। ইহাকে দার্শনিক কাব্য বলা যাইতে পারে।' পরিশেষে সামান্য তীক্ষ্ম উক্তি আছে, 'মনোযোগ সহকারে 'স্বদেশ' পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, কবির মতিগতি ফিরিয়াছে,—তিনি এক্ষণে আমাদের সেই প্রাচীন পূজ্যপাদ ঋষিগণের প্রদর্শিত পথই শেষ বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।'

একালে সমালোচনার ধারা পাল্টেছে। সময়ে সময়ে ধারও পাল্টেছে। লেখার চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে লেখকই প্রাধান্য পাচ্ছে সমালোচনায়। স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে গেলে সমালোচনায় এখন বিজ্ঞাপনেরই ভাষা। সমালোচনা অনেকটাই বিজ্ঞাপন। নামী অনামী লেখক নির্বিশেষে সমালোচনার হুল ফোটাতে সেকালের মত একালের সমালোচক অতটা বেপরোয়া হতে পারেন না। লেখকের মুখ চেয়ে রাশ বাগাতে হয়। ফল অনিবার্যভাবেই দুঃখজনক—সমালোচনার মানের অবনতি। অবশ্যই এর ব্যতিক্রমও আছে। একালের সমালোচনার কিছু নমুনা নিচে দেওয়া হল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

একালের একটি উপন্যাস সম্পর্কে একাংশের আর একটি সমালোচনায় উল্লেখ করছি। একটি পত্রিকায় প্রকাশিত এই সমালোচনায় এখনকার একখানি উপন্যাস নিয়ে সমালোচক বলছেন ঃ 'বইটি একালের সামাজিক অবক্ষয়ের ও সম্ভাব্য জাগরণের রূপকোপন্যাস। হয়তো একালের নয় চিরকালেরই, কেননা, মহৎ ঔপন্যাসিকদের রচনায় এই যন্ত্রণা ও আলোড়নের ছবি ও তার থেকে নতুন পৃথিবী গঠনের আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির প্রকাশ আমরা বারবারেই দেখেছি। ...একালের আত্মকেন্দ্রিক বিষণ্ণ স্বগতোক্তির প্রচলিত ঔপন্যাসিক রীতির মধ্যে সমাজের ভাঙা-গড়ার সমস্যায় ব্যক্তির কঠিন পরীক্ষাকে রূপকের আবরণে প্রকাশ করে ঔপন্যাসিক মানুষের রুগ্ন আত্মকেন্দ্রিকতাকে সরিয়ে দিয়ে মহৎ বিশ্বাসের ছবি নিয়ে এলেন।—যুগসঙ্কটে মহৎ কবি-শিল্পীর দায়িত্বই তিনি পালন করলেন। বইটি শেষ করে উদ্বোধিত পাঠকের কানে মিলেন রসের সেই অ্যাপোক্যালিপটিক্যাল উচ্চারণ সৃষ্টির প্রথম ঘন্টাধ্বনির মত বেজে ওঠে ঃ চোখ মেলে চাও। দ্যাখো। তোমরা আর নেই। তোমরা মুক্ত। আকাশে যেমন নতুন তারা ওঠে, তোমরা তেমনি এক-এক করে জীবনের নতুন আকাশে উঠবে। মানুষের ঘরে জন্ম নেবে। এখন থেকে তোমরা ঈশ্বরের মানুষ। তিনি তোমাদের সব। ঈশ্বরিত মানুষের এই রূপকারকে ধন্যবাদ জানাই।' এটিও বিজ্ঞাপনের 'কপি' হতে পারত!

একালের প্রায় সব পত্র-পত্রিকাতেই সমালোচনায় এই হাল। লেখকের দিকে তাকিয়ে বই-এর বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়াস। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দুটি বিজ্ঞাপনেও দেখি সেই চেহারা। বুদ্ধদেব বসুর 'পাতাল থেকে আলাপ' সম্পর্কে সমালোচক, 'এতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন রং নেই। চরিত্রাঙ্কনের প্রতিটি আঁচও সম্পূর্ণ, অর্থপূর্ণ। এক একটি আঁচড়ে সমগ্রের আভাস।...উপরি পাওনা হিসাবে ফিল্ম লাইনের চাল-চলন ও রকম-সকমের সুন্দর চিত্রকল্প লেখকের উপন্যাসে পাওয়া যায়। লেখাটির টেকনিকও অভিনব। তেমনি চমৎকার ভাষণ। জায়গায় জায়গায় সরস তো বটেই। হিউমারের প্রক্ষেপ বেশ সুখভোগ্য। ...সব মিলিয়ে বলতে গেলে, উপন্যাসটি বুদ্ধদেব বসুর একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।'

বিমল করের 'পরিচয়' নামের একটি উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখকের বিস্তৃত পরিচয় দেখে মনে হতে পারে একালে সমালোচনা নয়। সমালোচনার মোড়কে বিজ্ঞাপনই তৈরী হচ্ছে দৈনিক আর সাময়িক পত্রের পাতায়। সমালোচনার কিছুটা তুলে ধরছি, 'গভীর কথা সহজ করে বলার প্রবণতা বিমল করের গত কয়েক বৎসরের রচনার একটি প্রধান লক্ষণ। তাঁর পূর্ববর্তী রচনাবলীতে তিনি বহু ক্ষেত্রেই প্রতীক, সংকেত ও ব্যঞ্জনাত্মক বর্ণনার ব্যবহার করেছেন, মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বপ্ন ও অন্যান্য যে-অনুষঙ্গের প্রসঙ্গ টেনেছেন তা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-নির্ভর, ফলে ব্যবহৃত শব্দাবলী, বাক্যগঠন ইত্যাদি অনিবার্য কারণেই ছিল অপেক্ষাকৃত দুরূহ মননপ্রধান।

কিন্তু 'খড়কুটো' থেকেই তিনি আরেক ধরনের ভাষাশিল্প নির্মাণ করছেন। সচেতন, বেগবান, স্রোত-স্বচ্ছন্দ ভাষায় তিনি অননুকরণীয় একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছেন। শনুকের ছিলার মত ঋজু, টান-টান, মেদবর্জিত তাঁর রচনা, আপাত-সহজ সুরে পাঠককে টেনে নিয়ে যায় গভীর প্রত্যন্ত দুরধিগম্য এক প্রদেশে যেখানে রচনার দার্শনিকতা মনে হয় না আরোপিত, তত্ত্ব বা বক্তব্য আলাদাভাবে সাঁটা থাকে না ডাক-টিকিটের মত। রূপ এবং ভালবাসা সমান ভোলায়। এ অংশটুকু পুস্তক পরিচয়ের আগের অংশ—অর্থাৎ পাঠক পরিচয়।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কেউ তো কারো নয় এ পৃথিবীতে? বাবা, মা, ভাই, বোন কেউ কারো নয়। কেউ কারো কথা ভাবে না। কারো সময় নেই, সময় থাকলে ইচ্ছা নেই। অথবা রুচি নেই। এতকাল পুরোন পৃথিবীতে, বংশ, রক্ত, আত্মীয় এ ধরণের কতগুলি কথা নিয়ে লোকে বন্দী হয়েছিল। যেন এই ধরণের কতগুলি কথা উচ্চারণ করেই মানুষ মানুষকে ধরে রাখতে পারে। যাদের তারা ধরে রাখছিল বলে ভাবছিল, তারা নিজেব গরজেই ছিল। তাদেরও আর উপায় ছিল না বলেই। তাদের ডানায় জোর ছিল কম, মনে সাহস ছিল কম। কেবল আশা আশা আশা এই নিয়েই দিন কাটিয়েছে তারা। একা থাকতে ভয় পায়, তাই সবার মাঝখানে থাকা। নয়তো সত্যিই কি কেউ কারো কাছে ছিল কোনও দিন? যদি ছিল, এখন নেই কেন? কে তাদের আলাদা করে দিল? ছিল না। কেবল ছিল এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা ভাবতো, তারা একা নেই, অনেকে মিলে আছে। আজও তাই চলছে। শুধু সেদিন আর আজকের মধ্যে তফাৎ এই যে, আমরা যারা আজ আপাত-দৃষ্টিতে একসঙ্গে আছি, তারা জেনে গেছি, আমরা একসঙ্গে নেই। আমরা সবাই একা। নিদারুণভাবে একা। জেনে গেছি, তাই আর ভাণ করি না একে অপরের কাছে উপস্থিত হবার। অপরের সঙ্গে মিলবার আর চেষ্টা করি না। কারণ জানি, তা আর হয় না, হতে পারে না। সব দরজা বন্ধ। সব মন রুদ্ধ। সব হৃদয় স্তব্ধ। হারিয়ে গেছে। এই সব বন্ধ দরজা, রুদ্ধ মন খুলবার চাবি। স্তব্ধ হৃদয়কে আবার কথা বলানোর মন্ত্র ভুলে গেছি। কেউ জানে না কোথায় সে চাবি, কার কাছে গেলে শেখা যাবে সে মন্ত্র। খোঁজেও না আর কেউ। কেবল হায়হায় করে। তেমন বেপরোয়া হলে সব ভেঙে গুড়ো করে ফেলার আয়োজন করে। কিন্তু নতুন কোনও চাবি, নতুন কোনও মন্ত্র সৃষ্টি করে না। পুরোন গতানুগতিকতাকে ভেঙে ফেলে নতুন গতানুগতিকতার সৃষ্টি হয় আর কিছু না। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অন্যের কথা কেউ ভাবে না, ভাবলেও বলে না— বলতে ভয় পায়। উপহাস আজকের দিনে সবচেয়ে বড় শত্রু। যদি সে উপহাস হৃদয়ের দুর্বলতা নিয়ে হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। তাই কান্না পেলে, মুখ বিকৃত করে সে কান্না চাপতে হয়, দুঃখ পেলে কৃত্রিম হাসি দিয়ে তা লুকতো হয়, আঘাত পেলে ভয়ানক হয়ে উঠতে হয়, মনে মনেই। আমিও তাই হচ্ছি। আঘাত পেয়েছি, দুঃখ পেয়েছি, কষ্ট একথা কোনও মতে যেন কেউ না এই আমার লক্ষ্য। আর কি? তবু পায়, দুঃখ পাই, আঘাত পাই। হৃদয় জানি, তবু হৃদয় খুঁজে মরি। একা একা থাকতে হবেই, জেনেও দোসর মরি। সবাই। সবাই জানি সবাই আলাদাভাবে কি চাইছি, তবু তা প্রকা করি না। করতে চাই না। কেন এমন হয় মানুষেরই তো ভাষা আছে একমাত্র তার ভাষা সৃষ্টি করেছিল নিজেকে প্রকা করার জন্য না গোপন করার জন্য? আমা একটা ভাষায় যখন যথেষ্টভাবে মনের গোপন করতে পারি না, তখন অন্য ভাষার সাহায্য অনবরত নিই। আকারে ইঙ্গিতে সেই চেষ্টা অনবরত। সমস্ত প্রাকৃতি নিয়মকে তুচ্ছ করে মানুও তার মনে ভাবকে কেবলই গোপন করছে। কেন পাছে কেউ উপহাস করে? পাছে ভাব আমি দুর্বল? যথেষ্ট সভ্য অর্থাৎ যথেষ্ট কৃত্রিম নই? যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা পাইনি? শিক্ষা-দীক্ষা, কালচার এসবই কি মানুষকে একের কাছ থেকে অন্যকে নিয়ে যাবার বাহন? তার আর কোনও সামাজিক প্রয়োজন নেই? একা যখন থাকবো, জ্বলে মরব। যখনই অন্যের সঙ্গে মিশব, তখনই মুখে কৃত্রিম খুশীর আলো জ্বালিয়ে রাখবো, এই কি নিয়ম? কেন বলা যায় না, তুমি আমার দুঃখ দিচ্ছ? কেন বলা যায় না আমি কষ্ট পাচ্ছি? কেন বলতে পারি না আমি কাঁদতে চাই? কেন যে জ্বালা দিল তাকে ফিরে জ্বালাতে চাই কেন? নিজেকে এত দুর্মূল্য ভাবি কেন? নিজের কাছে যখন নিজের মূল্য হারিয়ে ফেলি তখনই কি অহংকারের জালে নিজেকে ঘিরে রাখি। জয়ন্তর কাছে আর আমার মূল্য নেই বলে নিজেকেই বা মূল্যহীন ভাবছি কেন? জয়ন্তই কি আমার মূল্য যাচাই-এর কষ্টিপাথর? ওকে সে অমূল্য সম্মান দিল কে? আমার ভালবাসা? সে কি শুধু আরোপিত? তার নিজের কিছুই নেই? ছিল না? আমার কি কিছু আছে? শুধু অভিমান, অহংকার আর জ্বালা ছাড়া? শুধু এই নিয়ে কারো কাছে যাওয়া যায়? কাউকে চাওয়া যায়? যদি দেখা হয়, যদি কথা হয়, কোনওদিন কি বলতে পারব, তুমি আমায় দুঃখ দিলে। কেন দিলে? তেমন দীনহীন বেশে তার কাছে উপস্থিত হতে পারব? আমার সব অভিমান, অহংকার ত্যাগ করে বলতে পারব, তুমি ফিরে এসো? পারব না। জানি পারব না। অতএব তার দেওয়া মূল্যই আমার সম্বল। সে মূল্য হারালেই আমি পথের ভিখারী। তাই সেই দৈন্য লুকাতে আমায় অহংকার আর অভিমানের পরতেই হবে। তাই পরছি।

মনোজ রেণুকার কাছে মঞ্জুর কথা কিছু শুনলেন? শুনে চুপ করে রইলেন। ভাবলেন এ নিয়ে এখন কিছু বললেও কি লাভ কিছু হবে? নিজের সংশয়ের কথা

স্ত্রীকে জানালেন। রেণুকা বললেন 'অন্তত ওর জানা উচিত আমরা এ নিয়ে ভাবছি। সেটুকু ওর জানা দরকার। ওর উত্থান-পতনে আমাদেরও অংশ আছে সে কথাটা ওার জানা উচিত। তুমি তাই ওকে ডেকে বল।' মঞ্জুকে ডেকে পাঠানো হোল। একটু অবাক হোল সে। বেরোবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। পরণে অপর্যাপ্ত ফ্রেমার দেওয়া ট্রাউজারস। ওপরে সামান্য একটুখানি সবুজ রং-এর টপ্। কানে বড় বড় দুল, চুল বুক পর্যন্ত সোজা ঝুলে আছে। চোখের চারদিকে সবুজ রং-এর আই-শ্যাডো, পল্লবে ঘন কালো মাসকারা, ঠোঁটে জোনাকী রং-এর লিপস্টিক, পায়ে হাই প্ল্যাটফরম জুতো। তারও রং সবুজ। মূর্তি-মতী বিদ্রোহের মতন এসে দাঁড়ালো সে বাবা-মার সামনে। 'আমাকে ডেকেছ?' মনোজ তার দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। রেণুকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। 'বসো।' মনোজ আদেশ করলেন। মঞ্জু ঘটা করে ঘড়ি দেখলো, তারপর আলগোছে বসলো। 'তুমি রোজ কোথায় যাও?' মঞ্জু ভীষণ অবাক। 'কোথায় যাই? কোথায় আবার? এদিক ওদিক বন্ধু-বান্ধব।' 'তোমার বন্ধু-বান্ধব কারা?' মন্দ্রস্বরে জানতে চাইলেন মনোজ। মঞ্জু আরো অবাক হচ্ছে। 'কারা আবার? নাম বললে চিনতে পারবে? অবশ্য বাবা-মায়ের নাম বললে অনেককেই হয়তো চিনবে। কেন বলোতো?' 'জানা প্রয়োজন। কাদের সঙ্গে তুমি রোজ এতরাত পর্যন্ত কাটাও সেটা জানা দরকার বলে মনে করছি।' মেয়ের উদ্ধত ভঙ্গীতে মনোজ আহত এবং বিরক্ত হচ্ছেন। 'কিন্তু জানাবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না।' অকম্পিত স্বরে মঞ্জু জবাব দিল। 'ইউ আর ইম্পার্টিনেন্ট! আমার সঙ্গে এভাবে তুমি কথা বলবে না।' মনোজ প্রায় গর্জন করে উঠলেন। মঞ্জু ঘাড় বেঁকিয়ে সেই ভাবেই বসে রইলো। মুখ শুধু তার রক্তিম।

'আমার ধারণা ছিল, তুমি বলতে, ব্যক্তির ব্যবহারেই তার পরিচয়, তার বংশে নয়। তাই ব্যক্তি বংশের চেয়ে বড়। এ্যামাই রাইট?' মঞ্জু কোনও মতে মাথা নাড়লো। 'তবে কি পরিচয় দিচ্ছ তুমি আজ? কি অথবা কে তুমি?' সারা শরীরের রক্ত এসে জমা হোল মঞ্জুর মুখে। আঘাত ঠিক জায়গাতেই লেগেছে। কাল সারারাত নিজের মনে নিজের পরিচয় খুঁজে খুঁজে সে ব্যর্থ হয়েছে। হয়েছে। 'জনসন এ্যান্ড রবিনসন' কোম্পানীর জুনিয়ার মোস্ট এগজিকিউটিভ ছাড়া নিজের আর কোনও ব্যক্তিগত পরিচয় সে খুঁজে পায়নি। মনোজ সেখানেই আজ আঘাত হানলেন। সারা শরীর জ্বালা করে উঠলো তার। সাময়িকভাবে তার মন ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। নিজের পরাজয় অপরের চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার গ্লানিতে আর লজ্জায় সে দিশাহারা হোল। তাই চিন্তা না করেই বললো 'আমি যা, আমি তাই। আমায় কি কেউ আর অন্য কিছু হতে শিখিয়েছে? তোমরা কখনো এনাফ ইন্টারেস্ট নিয়েছ আমার সম্বন্ধে? তবে আজ এই সাডন কনসার্ন কেন? এতদিন জানতে চাওনি, আজকেও জানতে চেয়ো না। চাইলেও পাবে না।'

রেণুকা নতদৃষ্টিতে বসে রইলেন। বিস্ময়ে। লজ্জায়। এ অপমান তাঁদের প্রাপ্য বলেই মনকে বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু মনোজ থামলেন না। শুধু গলার আওয়াজ যথা-সাধ্য আয়ত্তে এনে বললেন, 'বেশ, বলতে না চাও বোলো না। দোষারোপ করে কোনও লাভ নেই এখন। তুমি যথেষ্ট বড় হয়েছ, এখন থেকে নিজের সম্বন্ধে পুরো দায়িত্ব তোমার। কিন্তু মনে রেখো, মাথা উঁচু রেখে চলতে হবে। নট আউট অব ইনসোলেন্স, বাট আউট অব সেলফ রেসপেকট্। তোমার জন্য যেন কারো মাথা হেঁট না হয়, আমা-দের এমনিভাবেই চলবে। যাও ঠান্ডা মাথায় গিয়ে ভেবে দেখ। আমার মেয়ে, এ বংশের মেয়ে বলে পরিচয় দিতে না চাও, দিয়ো না। কিন্তু নিজের নামে যখন পরিচয় দেবে, সে পরিচয়টা যেন সুখের হয়, সেটা দেখো।'

সারা শরীরে অবসাদ, আর মনভরা দাহ নিয়ে ঘরে ফিরে এলো মঞ্জু। সেলফ রেস-পেকট্! হি ওয়ান্টস টু লুক আপ টু মি!! ব্ল্যাকমেল। পিওর ব্ল্যাকমেল! নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা পালন না করে এখন আমার ওপর সব দায়িত্ব চাপানো। মানি না। মানবো না আমি, কিছুতেই মানবো না। বসে পড়ল আস্তে আস্তে একটা চেয়ারে। কেমন করে মনে মনে বুঝলো; জীবনে আজ এ্যাডজাস্ট-মেন্টের দিন এসে গেছে। এতকাল সবাই তাকে ভুলে ছিল, সেও তাদের ভুলে ছিল। নিজের মনে যা খুশী করে যাচ্ছিল। মাঝ-খানের এই একটা বছর, তার মন একেবারেই অসাড় হয়েছিল, তাই পারিবারিক বন্ধনের নাগপাশের উপস্থিতি তার অনুভূতিতে ছিল না। আজ তাকে ডেকে সেই কথা মনে করিয়ে দেয়া হোল। মনে করিয়ে দেওয়া হোল, কারো বীজ থেকে সে জন্ম নিয়েছে, কারো নাড়ির সঙ্গে তার নাড়ি কোনওকালে যুক্ত ছিল। সে স্বয়ম্ভু নয়। সামাজিক দায়িত্ব বল, পারি-বারিক দায়িত্ব বল, যত অল্পই হোক, তার ওপরে কিছু ন্যস্ত করা আছে, যা তাকে পালন করতে হবেই। অতীতের ভিত্তির ওপরেই তার বর্তমান দাঁড়িয়ে আছে, যে বর্তমানের পথ বেয়ে আসবে তার ভবিষ্যত। সে যেমনই হোক, গতকালের চেহারার সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে আজ, এবং আজকের সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে, তার ভবিষ্যত একদিন তাকে গ্রাস করবে। এর থেকে রেহাই নেই। মানিয়ে নিতে হবেই। যত ধীরে হোক, যত অল্প পরিমাণেই হোক, গোচরে অগোচরে এই এ্যাডজাস্টমেন্টের পালা তাকে চালিয়ে যেতে হবেই। তার মায়ের দিন থেকে তার দিন যত ভিন্ন হোক, বাইরের চেহারা যত তার অন্য হোক, ভেতরে ভেতরে এ খেলা চলতে থাকবেই চিরকাল। এর থেকে পরিত্রাণ নেই। আত্মীয়, স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের কাছ থেকে পালিয়ে গেলেও মনুষ্য সমাজে তাকে বাস করতেই হবে, তাই মেনে নেওয়া এবং মানিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সকল মানুষের কাছে সকল মান মেনে হার ঐখানেই। আবার জিতও ঐখানে। নিজের চাওয়া নিয়ে একা কেঁদে মরতেই হবে যতক্ষণ না অপরের চাওয়ার চেহারা দেখে মন নিজের দুঃখ ভোলে। চাইলে, দিতেই হবে। একবার দিয়ে ফেরৎ না পেলেও মন আবার আপন নিয়মে চাইবে। দেবার জন্যও প্রস্তুত হবে। একে অস্বীকার করা মানে বোকামী। এ পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে থেমে থাকা মানেই জীবনকে অস্বীকার করা।

বাবার ওপর রাগ আস্তে আস্তে নিবে গেল। মনে হোল, বাবা চেয়েছেন আমার কাছে। বাবা আমাদের স্বীকার করেছেন। আমার কাছে এটুকু চেয়ে বাবা আজ আমাকে ধন্য করেছেন। না চাইলে, আমি কি দেবার কথা ভাবতাম? বাবা নইলে আর কেউ কি চাইতো? মাও চেয়েছেন, কিন্তু চুপি চুপি, বড় সংগোপনে। দুঃখ হোল তার ওঁদের জন্য। ক্ষমা করলাম বাবা-মা, আমি তোমা-দের ক্ষমা করলাম। তোমরাও আমাকে ক্ষমা কর ভুল বোঝার জন্য। আমাকে আজ তোমরা বাঁচালে। আমার অতীত ছিল না, বর্তমান ছিল না, ভবিষ্যত তো নয়ই। আমি পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তোমরা আমায় আবার হাত ধরে এনে বসিয়ে দিলে ঠিক জায়গায়। বর্তমানকে খুঁজে পেলে ভবিষ্যতকে খুঁজে বের করবার পথ আপনা থেকেই পেয়ে যাবো।—

মাস দুই কাটবার পর, ম্যানেজারের ঘরে ডাক পড়লো। মঞ্জু এসে দাঁড়াতেই, তাকে বসতে বলে হাসিমুখে মিঃ রায় বললেন 'আই হ্যাভ এ ভেরী প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ ফর ইউ।' মঞ্জু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে বললেন 'আন্দাজ করতে পারছ না তো? ট্রান্সফার! ট্রান্সফার টু বম্বে। তুমি অনেকদিন আগে আমাকে বলেছিলে। আমি ভুলিনি। কি খুশী তো?' মঞ্জু ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না সে খুশী কিনা। মিঃ রায় চেয়ে আছেন প্রত্যাশী দৃষ্টি নিয়ে। মঞ্জু খুশী হয়ে উঠবে, ধন্যবাদ জানাবে। প্রত্যা-শিত খুশীর আলো ওর মুখে দেখতে না পেয়ে বললেন 'কি ব্যাপার? ওয়াজ ইট এ পাসিং হুইম? তুমি বম্বে যেতে চাও না এখন?' সামান্য নিরাশ হলেন, আর সেজন্য বিরক্তও। মঞ্জু তাড়াতাড়ি বললো 'না না। আমি খুশী। কি বলে ধন্যবাদ দেবো ভেবেই পাচ্ছি না। আপনি এত কাইন্ড আর থটফুল। থ্যাংকিউ ভেরী মাচ স্যার।' মিঃ রায় তখনো ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। 'তুমি চেয়ে-ছিলে বলেই তোমাকে রেকমেন্ড করেছি আমি। নাহলে চ্যাটার্জিকে পাঠানো হোত। এখন তো ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমার ফ্যামিলি থেকে কোনও রকম আপত্তি উঠবে আশংকা করছ নাকি? এসব ইভেনচুয়ালিটির কথা আগে থেকেই ভেবে রাখা উচিত ছিল।' 'না না আমার ফ্যামিলি থেকে কোনও বাধা আসবে না। কোনও দিকেই কোনও বাধা নেই। আমি সত্যিই ভীষণ খুশী। অজস্র ধন্যবাদ। ইয়ে, থাকার কিছু ব্যবস্থা আছে কি?' 'ইউ'ল গেট ইওর ওন ফ্ল্যাট। কম্পানী ফ্ল্যাট। সে বিষয়ে ভাবনা কিছু নেই। কিন্তু নেক্সট্ মান্থেই যাচ্ছ তুমি। সময় বেশী নেই। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।' 'থ্যাংকিউ স্যার!' বলে মঞ্জু চলে যাচ্ছিল। আমার ডেকে বললেন 'তোমার বাবাকে আমার

রিগার্ডস দিও।' 'ধন্যবাদ।' মঞ্জু ফিরে এলো নিজের অফিসে। ভালো হোল, কি মন্দ হোল, কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। তখন আবদার জানিয়ে ছিল, তখন পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল। জয়ন্ত তখনও বিদেশে, বম্বেতে চাকরী নেবে কথাবার্তা হচ্ছে। সেই ঝোঁকেই বলেছিল। তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে। জয়ন্ত কোথায় হারিয়ে গেছে। তার জীবন অন্য রকম হয়ে গেছে। এখন বম্বেতে যাওয়া মানেই হয়তো কোনও অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হওয়া। কোনও না কোনও দিন নিশ্চয়ই ওরসঙ্গে দেখা হবে। দেখা না হলে দেখা হওয়ার ইচ্ছা হবে। দেখা হলে জ্বালা বাড়বে, না হলে যন্ত্রণা। কি করে সে এখন? অথচ এখন আর বলা চলে না 'আমি যাব না।' সমস্ত ব্যবস্থা আপসেট হয়ে পড়বে। মিঃ রায় বিরক্ত হবেন, সে নিজেও অপ্রস্তুত হবে। বড় বিপন্ন বোধ করতে লাগল সে। কি করা যায়? কেন মনে পড়ল না আগে? কেন বারণ করে রাখল না সে? তাহলেই তো আজ আর এই অবস্থায় পড়তে হত না?

বাড়ীতে এসে প্রথমেই জানাল অলককে। তারপর সদাকে। ওদের দুজনেরই মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। বাড়ী ছেড়ে বাড়ীর মেয়ে যাবে চাকরী করতে। এমন কথা ওরা আমলই দিল না। সদা সব খবরই রাখে, তাই একটু ভরসা হোল, সাহেব আর মেমসাহেব বাধা দেবেন। সেদিন সাহেব মঞ্জুকে ডেকে ধমক দেবার পর ওর চালচলন বদলে যায় নি কি? এবারও নিশ্চয়ই বলবেন কিছু। দরকার হলে চাকরী ছেড়ে দিতেই বললেন। কিন্তু ওঁরা দুজনেই আর কিছু বললেন না। মঞ্জুকেই ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ওর নিজের কি ইচ্ছা। মঞ্জু সামান্য ইতস্তত করে বললো 'আমি বুঝতে পারছি না। অর্ডার এসে গেছে, এখন আর আমার করার কিছু নেই। এক হয়তো রিজাইন করতে পারি। সেটাও চাইছি না। যাই, দেখি গিয়ে কেমন লাগে। ভালোই হয়তো লাগবে। হয়তো পোজিশন একটু বেটার হতে পারে। বম্বেতেই যখন হেড অফিস, তখন প্রসপেকটও বেটার হতে পারে। দেখা যাক কি হয়। থাকার জন্য চিন্তা নেই, কমপেনী ফ্ল্যাট পাবো।' মনোজ আর কথা বাড়ালেন না। রেণুকা বললেন, একা একা ওখানে থাকতে পারবে? অবশ্য যমুনা তোমার সঙ্গেই যাবে, তবু অপরিচিত জায়গা, বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, খারাপ লাগবে না? 'লাগলেই আর কি করা যাবে? চাকরী করতে গেলে, অত সব ভাবলে চলে না; আর আয়া সঙ্গে থাকলে, তোমাদেরও আর ভাবনা করার কিছু থাকবে না। তাই না?' সহজ সুরেই বললো। তবু রেণুকা চুপ করে গেলেন। বাঙ্গই যদি করে, তবেই বা কি করার আছে? মঞ্জু চলে আসছিল, মনোজ বললেন 'আর ইউ শিওর, ইউ ডিড-নট এনজিনীয়র দিস?' মঞ্জুর মুখ লাল হয়ে উঠলো। ভয়নক লজ্জা পেলো। বুঝতে পারলো ওঁরা অসহায় বোধ করছেন। সেদিনের সেই ঘটনার জের হিসেবে, সে শোধ নিতে চাইছে, ভাবছেন তাঁরা। কোনও মতে বললো নিশ্চয়ই। তারপর পালিয়েই এলো এক রকম। বাবার সঙ্গে মিঃ রায়ের দেখা হতে পারে। মিঃ রায় বলতে পারেন, সে নিজেই চেয়েছিল বম্বেতে ট্র্যান্সফার। কবে চেয়েছিল, সে কথাটা বলবেন কি?

তৃতীয় অধ্যায়

চলে এলো বম্বেতে। এসে চারদিক দেখে-শুনে ভালো লাগল। সুন্দর শহর। ছোটবেলায় এসেছিল একবার। ভালো মনে নেই। এখন সবই নতুন লাগছে। তার ফ্ল্যাট যে পাড়ায়, সে পাড়ার এ অংশটাও নতুন। শোপিয়ান সী রোড। এ ধারটায় মস্ত মস্ত মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ ভর্তি। তারই একটা বিল্ডিং-এ তার ছোট্ট ব্যাচে-লারস ফ্ল্যাট। কেমন একটা মুক্তির স্বাদ যেন। আয়া আছে সঙ্গে। ঘর-সংসারের ভাবনা তবু কিছু কিছু ভাবতে হচ্ছে। এসব কোনও দিন করে নি। রান্নাঘরের দিকে কখনও উঁকিও মারে নি। অন্তত অনেককাল। স্কুলের শেষ দিকটাতে আর কলেজের একেবারে প্রথম দিকটাতে মাঝে মাঝে গিয়েছে। জয়ন্তর জন্য নিজের হাতে অমলেট বানাতে, নয়তো ফিশফ্রাই, ক্যোকে শামি কাবাব ইত্যাদি ভাজতে। সবই তৈরী করে দিত, বাবুর্চি, সে শুধু নিজের হাতে ভেজে এনে জয়ন্তকে খাওয়াতো। গর্বে ভরে যেত বুক, আনন্দে মন। আর কি সে কোনও দিন কাউকে কিছু তৈরী করে খাওয়াবে? অন্য কাউকে নয়, জয়ন্তকে? যাক এসব ভাবনা ভেবে মন খারাপ শুধু। কিন্তু এসে থেকেই মনে হচ্ছে সব। একা থাকবে কখনও কল্পনা করেছিল কি? বাড়ী ছেড়ে বেরোবে একজনের হাত ধরে, এমনি একটা কথা ছিল না? যে নাকি সকলের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে তাকে নিয়ে আসবার জন্য তৈরী হচ্ছিল? যে নাকি তারই জন্য সব কিছু সংগ্রহ করছিল, কোথায় গেল সে? ভুলে গেল কি করে সব কথা? কথার কি সত্যিই তবে দাম নেই? কথা শুধু কথা মাত্র? বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে, মুখের বাষ্পের কয়েকটা বুদ্বুদ মাত্র? ভোরের রোদ্দুরে ছোট্ট ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল মঞ্জু। যদি দেখা হয়, তবে কি বলবে? যদি দেখা না হয়, কি করে থাকবে? এই এত বড় শহর, অগণ্য লোকজন, কোথায় একটা মানুষ লুকিয়ে আছে, তাকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে? গেলেও কি কিছু লাভ হবে? হয়তো তার জীবন এখন অন্য রকম, হয়তো গৃহ, গৃহিণী সন্তান, সব নিয়ে দিন কাটাচ্ছে সুখে। এর মধ্যে তার জায়গা কোথায়?

তবু একবার দেখা হওয়া চাই। জেনে নিতে হবে কি তার অপরাধ, কেন এমন চুপি চুপি পালিয়ে এলো। কেন বলে আসার মতন সাহস সে সঞ্চয় করতে পারলো না? মঞ্জুর এটুকুও কি প্রাপ্য ছিল না? এতটুকু সম্মানও কি সে তার নিজের ভালোবাসাকে দেখাতে পারত না? চিঠিতেও কি এর একটু আভাষ দিতে পারতো না? অভিমান আর নেই, অহংকারও গেছে। শুধু এটুকু জেনে নিয়ে সে তাকে চির-কালের মত ক্ষমা করতে চায়। ক্ষমা সে করেইছে। শুধু এটুকু জানতে চায়। নাহলে শান্তি নেই। বিবাদ নয়, বিসম্বাদ নয়, শুধু শান্তভাবে জিজ্ঞেস করবে 'কেন এমন করলে? করলে তো ধানালে না কেন?' বাস ঐ পর্যন্ত। আর কিছু না।

আসার আগে, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছে আরে। জয়ন্ত আছে না বম্বেতে? জান নাকি তার ঠিকানা-ফিকানা? কোন অফিসে কাজ করছে জানো? দিও তো। কনট্যাকট করা যাবে। কাউকে তো বড় বিশেষ চিনি না। দু-একজন জানাশোনা থাকলে ভালোই হবে। সোমা ঘাড় নেড়েছে, না সে জানে না কিছুই। খোকন প্রায়ই বলে জয়ন্তটা একটা রাস-কেল। একেবারে গোল্লায় গেছে। একটা খবর পর্যন্তও দেয় না। তখন ভেবেছে, যাবে? জয়ন্তদের বাড়ী তো কাছেই, সেখানে যাবে খোঁজ করতে? কিছু কেউ ভাবলো তো রয়েই গেল। একদিন ওপথে যেতে যেতে ওদের বাড়ীর সামেন গাড়ী থামিয়ে, জয়ন্তর বোনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, জয়ন্ত এ বাড়ীতে থাকতো না, ও এখন বম্বেতে আছে, তাই না? 'জয়ন্তর বোন খুকু মাথা নাড়িয়ে জানিয়েছে হ্যাঁ।' আমার দাদার বন্ধু। আমি বম্বে যাচ্ছি, দাদা কি পাঠাতে চায়। ওর ঠিকানাটা দেবে? খুকু অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টি নিয়ে বলেছে, 'ঠিকানা আমরাও জানি না। বাবা চিঠি দিলে ব্যাংকের কেয়ারে চিঠি দেন। ও চিঠি দিলেও ঠিকানা দেয় না। বড় চাকরী পেয়ে এখন আর বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।' এ আবার কোনদেশী কথা? মঞ্জু অবাক হয়ে ভেবেছে। খুকুর হাব-ভাব, চোখ-মুখের চেহারা ওর কেমন লাগলো। চোখের তারা ভরা ঘৃণা শুধু। কার প্রতি? মঞ্জুর? না জয়ন্তর? চলে এসেছিল তাড়াতাড়ি। মনটা কেমন বিস্বাদ লেগেছিল। এ কেমন ধরনের মেয়ে? অত-ক্ষণের মধ্যে একবারও সামান্য হাসির লেশও ফুটে ওঠে নি মুখে। কেমন অনড়, অচল মুখ; অথচ বয়স কতই বা হবে? ওরই বয়সী কিম্বা ছোট? (ক্রমশঃ)

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কণ্ঠস্বর চড়িয়ে বললাম—'আমি সি-আই-ডি অফিসার। এসেছি একটা সিরিয়াস ব্যাপারের ইনভেসটিগেশনে। বন্যা লাল এখানে থাকতেন আপনিই বললেন। চলেও গেছেন বললেন। আমি জানতে চাই উনি এখানে কি হিসেবে থাকতেন, কেন চলে গেলেন, কোথায় গেলেন।'

'সিআই-ডি অফিসার?' অবাক হলাম প্রৌঢ়ার মুখে তৃপ্ত হাসি ফুটে উঠতে দেখে। 'ভেতরে আসুন, বলছি।'

পেছন পেছন ঢুকলাম ভেতরে। প্রথমেই একটা খাওয়ার ঘর। বড় টেবিল পাতা। এখন শূন্য। তারপর একটা ছোট্ট ঘর। অতিরিক্ত আসবাবপত্রে পা ফেলা দায়। ন্যাপথেলিন আর কীটনাশক কেমিক্যালের উগ্র গন্ধে ভরপুর।

ঘরে ঢুকতেই সামনে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ়া বললে—'দরজাটা বন্ধ করে দিন। এ-বাড়ীর অনেকের কান বড্ড বড়।'

রহস্যের গন্ধ পেয়ে মনটা আনচান করে উঠলেও মুখ বুজে রইলাম। প্রৌঢ়ার পেটে খবর আছে মনে হচ্ছে।

'বন্যাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'এ-বাড়ীতে ওর মত মেয়েকে রাখা যায় না।'

'কিন্তু কেন?'

'বাড়ীর দুর্নাম কেউ চায়? সুনাম আছে বলেই তো মিসেস ভাদুড়ীর কাছে দূর দেশ থেকেও সবাই এসে থাকে। এটা আমার প্রাইভেট বোর্ডিং হাউস। মেয়েও আছে, পুরুষও আছে। প্রত্যেকের ফ্ল্যাট আলাদা। ওয়ান রুম, টু-রুম—যে যেমন চায়। খাওয়া পাশের ঘরে। কিন্তু বন্যাকে এদের মধ্যে রাখা যায় না।'

'কি মুস্কিল।' কেন রাখা যায় না বলবেন তো।'

'গায়ে কাপড় না দিয়ে ছবি তুলত কেন? ভদ্দরলোকের মেয়েরা ঐভাবে ফটো তোলে?'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'প্রমাণ আছে। মিথ্যে দোষ দেব কেন?'

'কি প্রমাণ? দেখাতে পারেন?'

'দেখাবোই তো। একশবার দেখাবো। বেলেল্লাপনা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবে কেন?'

বলে মুখ বেঁকিয়ে প্রৌঢ়া ছিটকে গেল একটা আলমারীর সামনে। আঁচলে বাঁধা চাবি দিয়ে পাল্লা খুলে বার করল তিনটে কোয়ার্টার সাইজ এনলার্জমেন্ট।

আমার হাতে দিয়ে বললে—'এ ছবি দেখানো যায় না। আমি দেখাতামও না। কিন্তু দেখাচ্ছি শুধু প্রমাণ করার জন্যে যে সে খারাপ মেয়ে। তাই তাড়িয়েছি এখান থেকে।'

আমি জবাব দিলাম না। দিতে পারলাম না। ইলেকট্রিক শক খেলেও বুঝি এভাবে চমকে উঠতাম না। মিসেস ভাদুড়ী অবশ্য আমার তড়িতাহত মুখে চেহারা দেখে ভাবলেন। এমন ছবি দেখতে অভ্যস্ত নই বলে চমকে উঠেছি। কিন্তু এই কদিন এই ধরনের ছবি এত বেশী দেখেছি নতুন করে শক খাওয়ার কিছু ছিল না। আমি শকড হলাম অন্য কারণে এবং সেই কারণটাই ঘূর্ণিঝড়ের মত বোঁ বোঁ করে পাক দিতে দিতে মনটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্য চিন্তায়।

বন্যা নাকি দু হপ্তা আগে গিয়েছে এখান থেকে। অর্থাৎ কৌতূহলী প্রৌঢ়া প্রিন্টগুলো হাতিয়েছে তারও আগে। কিন্তু এ ছবি সে সময়ে বন্যার হাতে গেল কি করে? ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি?

'মিসেস ভাদুড়ী, ফটো তিনটে পেলেন কোথায়?'

'এই বাড়ীতেই।'

'কোথায়? কোনখান থেকে? কিভাবে

এই প্রথম অপরাধীর মত কুণ্ঠি হাসি হাসল মিসেস ভাদুড়ী। পোড় খাও মুখে জ্ঞানপাপীর চোরা হাসি হেসে বলল

'বন্যার ঘর থেকে। আমিই সরিয়েছি। নইলে ঝিয়েদের চোখে পড়ত। ছেলেদে কানে কথাটা উঠলে কি হত বলুন তো?'

'তাই সবার চরিত্র রক্ষার জন্যে আপনি চোরের মত ছবিগুলো চুরি করলেন এব বাজেয়াপ্ত করলেন। দুটোই সমান অপরাধ, আর বললাম না। লেবু বেশী কচলালে তেতো হতে পারে। সাক্ষী হিসেবে মিসে ভাদুড়ীকে দরকার হবে।' থাকগে, যা করেছেন করেছেন, ফটোগুলো বন্যার তো?'

'নইলে সরাবো কেন?'

'বন্যার [illegible] আপনি চিনলেন কি করে?'

'আমি চিনব কি করে? কি ব বলেন! ওর ঘরে পেয়েছি, ওর ড্রয়ারে মধ্যে পেয়েছি, তাই চিনেছি। বন্যাকে আমি চিনবো না?

'বেশ, তাহলে আপনি বলছেন, ছবিগুলো বন্যারই। এখন যা জিজ্ঞেস করব নির্ভুলে জবাব দেবেন। ঠিক কবে বন্যা লাল এ বাড়ী ছেড়ে গিয়েছে?'

'পনেরো দিন আগে।—গতকাল পনেরো দিন হয়েছে।'

'বন্যার মা বাবার ঠিকানা জানেন? মানে, যেখান থেকে এসেছিল আপনার কাছে থাকতে?'

'আমতা আমতা করলেন মিসেস ভাদুড়ী—'দিল্লীর সবজীমন্ডী থেকে এই-টুকু জানি। প্রায় চিঠি আসত। বাবা-মা বোধহয় ঐখানেই থাকে।'

এনলার্জমেন্ট তিনটে বঁা পকেটে পুরলাম। অরিজিনালগুলো রইল ডা

কটে। ইচ্ছে করেই রাখলাম। যাতে শ না যায়।

রাখবার পর বললাম—"ছবিগুলো ম নিয়ে চললাম। সাবধান, এ ব্যাপার র আর কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। উ যেন না জানে। বুঝেছেন? পরে আবার সবো। এখন যা বললেন, সব লিখে নবো—আপনি তলায় সই দেবেন। রুপরেও একবার পুলিশ অফিসে আসতে র সাক্ষী হিসেবে।"

মুখ শুকিয়ে গেল মিসেস ভাদুড়ীর। "আ-আমি ছবি না নিলে ছেলেরা... ন, ছেলেরা খারাপ হয়ে যেত।"

কান দিলাম না। যত তাড়াতাড়ি পারি, রিয়ে এলাম রাস্তায়। মিসেস ভাদুড়ী বনের অনেকঘাটে জল খাওয়া বিধবা। লে এই বাজারে প্রাইভেট বোর্ডিং হাউস লিয়ে পেটের ভাত জোগাতে পারত না। র আমার পাল্লায় পড়ায় ভয়ের চোটে তে পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। মন র এত ছোট, তাকে একটু ভয় দেখানো কারও ছিল।

বাড়ী থেকে কিছুদূর এসে একটা র্জন কোণে দাঁড়িয়ে বাঁ পকেট থেকে নলার্জমেন্ট তিনটে বার করলাম এবং পাঁচ রের খোকার মত বড় বড় অবাক চোখে য়ে রইলাম। নিজেকে সত্যিই শিশু মনে ল। অলিগলির গোলকধাঁধায় হারিয়ে ওয়া অসহায় শিশু যেন আমি! জীবনে কম শকড্ কখনো হইনি। ব্লাডি কেস! মনটাকে একেবারে উল্টো করে দাঁড় রিয়ে দিল এই তিনখানা ছবি।

নিজের চোখ জোড়াকেও বুঝি বিশ্বাস তে পারলাম না। এ কি দেখছি আমি? মার ডবল হাতে রয়েছে একই দিগম্বরীর র তিনটে নির্লজ্জ দেহভঙ্গিমা। তিনটেই গার ধারে সুনীল আকাশের তলায় তোলা। নটে ছবিরই প্রতিটি বর্গইঞ্চি আমার না—ভীষণ চেনা। যে ছবি আমার ডান কেটে রয়েছে, যে ছবি পুলিশ হেড-কোয়ার্টার থেকে বেরোনোর সময় পকেটে রে এনেছি—এ ছবি সেই ছবি তিনটেরই র এক সেট প্রিন্ট। সনাতনের তোলা বশেষ ফটো—সুন্দরীপুজোর সর্বশেষ দর্শন। কিন্তু সনাতনের নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট নেওয়া হয় নি। হতে পারে না। সে গেটিভ আমরা ডেভেলাপ করেছি। তবে?

এভাবে বোকা খোকার মত রাস্তায় কা যায় না। কিছুদূরে একটা চায়ের দোকান দেখলাম। মুসলিম রেস্তোরাঁ। ভেতরে কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট ছোট খুপরি। একটা খুরিতে [illegible] বসলাম। য়ের অর্ডার দিলাম। তারপর ডান পকেট থেকে সনাতনের তোলা ছবিগুলো বার করতে গিয়েও করলাম না। তার বদলে বার করলাম ফাউন্টেনপেন। মিসেস ভাদুড়ীর কাছ থেকে বাগিয়ে আনা এনলার্জমেন্ট তিনটে উপুড় করে রেখে প্রতিটির পেছনে লিখলাম মিসেস ভাদুড়ীর নাম আর ঠিকানা। তলায় সই করলাম আমি। তারিখ বসালাম তার তলায়। তারপর ফাউন্টেন পকেটে রেখে বার করলাম সনাতনের তোলা বিউটি স্পেশিমেনগুলো। এগুলোও কোয়ার্টার সাইজ এনলার্জমেন্ট। পাশাপাশি রেখে মিলোতে গিয়ে দেখি একই ছবি। আরও ভাল করে তাকালাম। চোখ কাছে এনে এবং দূরে রেখে বার বার দেখলাম। একই ছবি। কিন্তু একই ছবি 'পনেরোদিন' আগে বন্যা-লালের ড্রয়ারে পৌঁছোলো কি করে? ফটো তোলার 'দশদিন' আগে ফটোর এনলার্জমেন্ট বন্যা জোটালো কিভাবে? আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? এযে অবিশ্বাস্য উদ্ভট! অথচ সত্যি! মিসেস ভাদুড়ী খামোকা মিথ্যে বলতে যাবে কেন? তারিখটাও পিছিয়ে বলবে কেন?

প্রিন্টগুলো ফের মেলালাম। মাথা ঠাণ্ডা রেখে একটু একটু করে দেহের প্রতিটি অংশ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলাম। তফাৎটা তখনি চোখে পড়ল। খুব সামান্য তফাৎ। একইরকম দেখতে হলেও দুটো পোজ হুবহু এক নয়—ঈষৎ প্রভেদ আছে। যেমন হাত ঘোরানো, পায়ের ভঙ্গিমা। একই নেগেটিভ থেকে নেওয়া এনলার্জমেন্ট নয় তাহলে। অথচ সবদিক দিয়ে বিচার করলে সনাতনের তোলা ছবির অনুরূপ—উনিশ-বিশ তফাৎটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। একই জায়গা, একই আলো, একই পোজ। অবশ্যই একইদিনে তোলা। সত্যিই কি একই দিনে তোলা? অসম্ভব। সনাতনের সব কটা নেগেটিভের এনলার্জমেন্ট আমরাই বানিয়েছি। হঠাৎ একটা কথা মনে হল। সনাতন দু সেট ফটো তোলেনি তো? নিশ্চয়ই তাই। যেকোন কারণেই হোক, প্রথম সেট ফটো মনে ধরে নি। তাই আবার শট নেওয়ার জন্যে বন্যাকে নিয়ে গিয়েছে একই জায়গায়—তুলেছে দ্বিতীয় সেট ফটো। প্রথম প্রচেষ্টায় ত্রুটি অবশ্য দেখলাম না। হয়ত আছে। আমি পেশাদার ফটোগ্রাফার নই বলে ধরতে পারছি না।

মোট কথা, গঙ্গার ঘাটে নিভৃত বাগে দুবার গিয়েছিল সনাতন। প্রথমবার কয়েক সপ্তাহ আগে। দ্বিতীয়বার গত শুক্রবারে। প্রথমবারে নেওয়া শট তিনটের একটা করে কপি দিয়েছিল বন্যাকে। এছাড়া এই রহস্যের আর কোন ব্যাখ্যা হতে পারে না।

বন্যালালই এখন সেই সোনার চাবি যা মুঠোয় আনতে পারলেই রহস্য-সিন্দুকের ডালা যাবে খুলে। রহস্য-নীহারিকার নাভি-বিন্দু এই বন্যা। এই মুহূর্তে পর্যন্ত তার সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া গেছে—অনুপ্রভায় এসেছে। এখন মুখোমুখি হওয়া যায়। কিন্তু কোথায়? এই মুহূর্তে সে কলকাতায় না কালিকটে, বোম্বাই না কেরালায়, দিল্লী না মাদ্রাজে জানছি কি করে? অভিশপ্ত এই সমস্যার শেষ কি নেই?

মা আমায় ঘুরাবি কত চোখ বাঁধা কলুর বলদের মত?

টেলিফোন করা যাক—দিল্লী পুলিশকে। তারা যদি হদিশ বার করতে পারে। কিন্তু পারবে কি? সবজীমন্ডীতে কতজন লাল পরিবার আছে, সে হিসেব পুলিশের রাখতে বয়ে গেছে। জায়গাটা পুরোনো দিল্লীতে এইটুকু জানি। কিন্তু শ্রীমতী বন্যার মুখটি কিরকম, তা জানি না। সে মুখ স্টেটবাসের পশ্চাদভাগের মত হলেও হতে পারে। শুধু টল, স্লিম ফিগার বললে দিল্লী পুলিশ কি বুঝবে? চুল স্ট্রেট—পিঠ পর্যন্ত। পদবী লাল। মা বাঙালী, বাপ পাঞ্জাবী; ওরকম লাভলি ফিগারের মেয়ে হাজার হাজার ঘুরছে দিল্লীর পথেঘাটে। বন্যা যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, নামটাও নিশ্চয় পাল্টে নিয়েছে: সে জানে তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পুলিশের হাতে কোনোদিনই পড়বে না। নেহাৎ দৈব সহায় হয়েছিল, তাই মিসেস ভাদুড়ী পর্যন্ত পৌঁছোতে পেরেছি—পেরেও তার নাগাল ধরতে পারিনি। শুধু মনটাকে শান্ত করা গেছে যে, হ্যাঁ, বন্যাই সনাতনের ক্যামেরায় সর্বশেষ মোহিনী।

দিল্লীতে বন্যা পুলিশের জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে নেই জেনেও ফোন করলাম হেডকোয়ার্টারে এসে। বুঝিয়ে বললাম রাজধানীর আরক্ষাবাহিনীর ভার-প্রাপ্ত অফিসারকে। রিসিভার রেখে দেওয়ার পর মনটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল। তদন্ত শুরুর আগে তদন্তের কুম্ভশূন্য ছিল—এখনও তাই। দিল্লী থেকে জবাব না আসা পর্যন্ত আমার আর কিছুই করার নেই।

রাত্রে আবার ভাবতে বসলাম। নরক গুলজার করা ছবিগুলো আবার বিছিয়ে রাখলাম টেবিলে। কাল রাতে ব্রেনটাকে খাটিয়েছিলাম বলেই তো শেষ পর্যন্ত বন্যালালকে জেনেছি আজ রাত্রের ব্রেনওয়েভ কি বন্যাকে পাইয়ে দেবে না?

মন জিনিসটা নিজেই একটা প্রহেলিকা। মনের কারবার মনোবিশারদরাও সঠিক জানেন কিনা সন্দেহ। কে যেন বলেছিল,

ব্রেন কিছু ফেলে দেয় না। যা শোনে, দেখে সব জমিয়ে রাখে। ইন্দ্রিয় যে খবরই পাঠাক না কেন, মস্তিষ্ক তা কমপিউটার মেমারি ব্যাংকের মত স্মৃতিশালায় সঞ্চয় করে রাখে। এইভাবে নাকি একটা সুস্থ মস্তিষ্ক পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত খবর জমাতে পারে। সে রাতে আমার ব্রেনেও কি ধরনের সুইচ টেপাটেপি হয়েছিল বলতে পারব না—তবে আচমকা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত দুম করে ফোয়ারার একটা কথা মনে পড়ে গেল। "জল কোথায়?"

জল কোথায়! দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখলাম মনের চোখে। এ দৃশ্য একবারই দেখেছি এ-জীবনে। নিরাবরণা সুন্দরী যুবতীর রোদে ধোওয়া দেহসুষমা দেখবার সুযোগ খুব অল্প যুবকের ভাগ্যেই ঘটে। তাই দৃশ্যটা ভোলবার নয়। জলে হাত দিতে গিয়েও নাগাল পায়নি ফোয়ারা। তাই জিজ্ঞেস করছে—"এইখানে তো? আপনার ভুল হয়নি? জল কোথায়? কাছে গিয়ে দেখেছিলাম, জোয়ারের জল সরে গেছে। জোয়ার নেই—জলরেখাও নেই। নেমে গেছে। কি করছি অতশত না ভেবেই সনাতনের ছবির পাশে রাখলাম মিসেস ভাদুড়ীর দেওয়া ছবি। গঙ্গার ঘাট। জলে হাত ছুঁইয়ে হেঁট হয়েছে যেন স্বর্গের দেবী। এক ছবি। জলরেখা এক জায়গায়। মিলে যাচ্ছে হুবহু।

নিঃশ্বেস নেওয়া বেড়ে গেল আশ্চর্য এই ব্যাপার দেখে। চোখ দুটোও নিশ্চয় ঠেলে বেরিয়ে এল শামুকের চোখের মত—নিষ্পলকে শুধু চেয়ে রইলাম পাশাপাশি রাখা প্রিন্ট দুটোর দিকে। দুটোর মধ্যে একটা ছবি নেওয়া হয়েছে কম করেও দিন পনেরো আগে। জোয়ারের জল প্রতিদিন সমানভাবে ফেঁপে ওঠে না, এক উচ্চতায় পৌঁছোয় না—তা যে কোনো স্কুলের ছেলে জানে—আমিও জানি। সেই কারণেই ফোয়ারাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে দেখেছিলাম, জোয়ারের জল সরতে সরতে অনেক নেমে গিয়েছে। সুতরাং সেটা একটা ঘটনা। কিন্তু এটাও কি একটা ঘটনা যে হপ্তা কয়েকের ব্যবধানে দুদিনে দুসেট ছবি তোলার সময়ে জলের রেখা এক জায়গাতেই ছিল? কাকতালীয়, নিঃসন্দেহে! কিন্তু দারুণ কাকতালীয়! ভাবাও যায় না!

প্রথম ছবিগুলো ঠিক কোনবারে তোলা হয়েছে যদি জানতাম, ঠিক সেইবারে জলের ধারে গিয়ে না হয় দেখে আসতাম জোয়ারের জল কদ্দুর পর্যন্ত উঠেছে। যেমনটি গিয়েছিলাম শুক্রবারে। কিন্তু তা জানা নেই। সুতরাং হয়ত স্রেফ কাকতলীয়। অথবা শুক্রবারটাই নির্বাচন করেছিল সনাতন জোয়ারের জল ঐ পর্যন্ত উঠবে বলে। কিন্তু তা অস্বাভাবিক। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল। দুসেট ফটোই তোলা হয়েছে।

মৌজ করে ধরালাম একটা সিগারেট। একলা থাকি ফ্ল্যাটে। মাঝে মাঝে সমস্যায় উৎপীড়িত হয়ে ভেবেছি, আর কেউ যদি এ-সময়ে পাশে থাকত, মনটা হাল্কা করা যেত আলোচনা করা যেত। সেদিনও বড় ইচ্ছে হল কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলি। চিন্তার বোঝাটা তার ওপর চাপিয়ে নিজে খানিকটা হাল্কা হই। সমস্যার জটগুলো তাকে দিয়ে কিছুটা খুলে নিই। এমন মানুষ কিন্তু একজনই—যাঁর কাছে এ সমস্যা নির্দ্বিধায় বলা যায়—অমূল্য বরাট। কিন্তু বলে লাভ হবে কি? উপরন্তু তাঁকেও নাকানিচোবানি খাওয়ানো হবে। আমি নিজে তো হাবুডুবু খাচ্ছি, তিনি আরও দিশেহারা হবেন। সবচেয়ে সাংঘাতিক হল, অমূল্যবাবুকে সব কথা বলতে গেলে ফোয়ারার ক্যুগ্র কাহিনীও বলতে হবে। ভাবতেও গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

এই পর্যন্ত ভাবনাটা এসেই থমকে গেল। আরেকটা ভাবনা উঁকি দিল। ফোয়ারাকে বললে হয় না? পরিস্থিতির জটিলতা সে জানে। শুধু জানে নয়, অতি যাচ্ছেতাই এই ব্যাপারটার আমি যা জানি, ফোয়ারাও তা জানে। এবং সে নিরেট নয়। অন্য মেয়েদের মত বুদ্ধিমতী। আমার সমস্যায় হয়ত সে আলো দেখাতে পারবে।

টেলিফোনের পাশে গিয়ে বসলাম। রিসিভার তুললাম। কিন্তু নাম্বারটা ডায়াল করতে গিয়ে ইতস্ততঃ করলাম। ফোয়ারা যাই হোক বাইরের মেয়ে—পুলিশের নয়। তাই কি হাতের মামলা নিয়ে খুঁটিয়ে কথা বলা যায় তার সঙ্গে? তবে ডাকছি কেন? আড্ডা মারার জন্যে? ঘন্টাখানেক ফুর্তিতে কাটানোর জন্যে? দুত্তোর! তদন্তে নেমে অনেক অলিখিত নিয়মই লঙ্ঘন করেছি—আর একটা করলেই বা ক্ষতি কি? মোদ্দা কথা, কেসটা আমাকেই সলভ করতে হবে। সলভ করতে পারলেই ক্ষমা মিলবে ফোয়ারার নিরাবরণ রূপের ফটো তোলা। এমনকি, তখন আর সে কাহিনী উল্লেখ করলেই চলবে। কিন্তু যদি সুরাহা করতে পারি, তাহলেই বরং অক্ষরে অক্ষরে করতে হবে আমার যাবতীয় কুকীর্তি।

সুতরাং ডায়াল করলাম নাম্বার।

তারপরেই শুনলাম ফোয়ারার গ… আমার সাড়া পেয়ে আনন্দ যেন উপচে প… কণ্ঠস্বরে। খুশীতে যেন কলকলিয়ে উঠ… অদ্ভুত ব্যাপার তো! হাজার হোক অ… পুলিশের লোক—ভয়ডর নেই। অদ্ভুত বটেই। অস্বাভাবিকও বটে। হা… পুলিশ সাব-ইন্সপেকটরের গলা শ… কোটিপতি কন্যার গদগদ হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক। যাই হোক, আমি গলার… যথাসম্ভব ভারিক্কি রেখে বললাম, হা… মামলার একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট… আলোচনা করতে চাই। আসতে পারি…

সেকেণ্ড কয়েক আর কোন কথা … তারপর—

'ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট? আমাকে … নয় তো? মানে, খারাপ কিছু নাকি … জড়িয়ে পড়ব কি?'

আশ্বস্ত করলাম।

'না, তোমাকে নিয়ে নয়। ফটো… নিয়ে গোলমালে পড়েছি। তুমি দেখলে … বুঝবে।'

'তাতে কি তোমার উপকার হবে?'

'তা একটু হবে বইকি।'

'তাহলে দেখব। কিন্তু সুমন্ত, … মুস্কিল যে রয়েছে।'

'কি মুস্কিল?'

'জিনের বোতল পর্যন্ত ফ্ল্যাটে রা… হুইস্কি তো নয়ই।'

—শাট আপ! আমি কক্‌টেল পা… করতে যাচ্ছি না। তদন্তটা খানের… থাকে যেন। … স্বর হঠাৎ এ… হবে ভাবতে পারিনি। ম্যানেজ করার… চটপট বললাম—'রাগ করলে?'

'মোটেই না। পুলিশের লোক কাটখোট্টা হয়। ম্যানার্স জানে না। করবে?'

'শোধবোধ। নো রাগ।'

'সুমন্ত, তোমাকে এখুনি … ইচ্ছে যাচ্ছে যে। তুমি আসবে, না … যাব? খালি ট্যাকসি ফ্ল্যাটের স… দাঁড়িয়ে আছে।'

'আসবে কিন্তু আমার কাছেও … জিন নেই।'
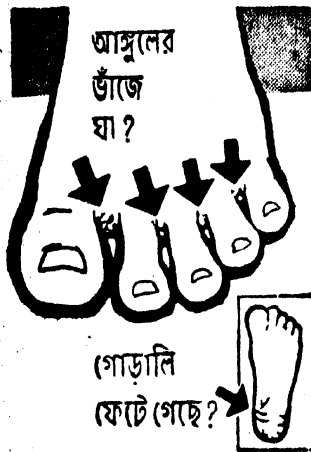
'না থাকুক।'

'তবে ইয়ে আছে।'

'কিয়ে?'

'হুইস্কি।'

'তুমিও! তুমি না পুলিশের … লোক?'

(ক্র…

পুনশ্চ

শিশিরকুমার ঘোষ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এদিকে মেজদাদা মহাশয় আমাদের গ্রাম যশোহর জেলাস্থ মাগুরা (অমৃত-) গ্রামে, সপরিবারে থাকিয়া ভক্তিচর্চ্চা ত লাগিলেন। তিনি গ্রামস্থ লোক একটি হরি-সংকীর্ত্তনের দল লেন। সন্ধ্যাকালে হরি-সংকীর্ত্তন করেন, অন্যান্য সময়ে ভক্তি গ্রন্থানুশীলন ন। মেজদাদা মহাশয়ের ভক্তিরস ক্রমেই র্ষ লাভ করিতে লাগিল ও তাঁহার -গুণে গ্রামস্থ অনেক লোকও ভক্তিমান ত লাগিলেন।

ক্রমে সংকীর্ত্তনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। একবার করিয়া সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, প্রাতে এবং অবশেষে আবার বাহ্নেও সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। রূপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রায় অহর্নিশ র্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গ্রামস্থ লোক সেই তরঙ্গে ডুবিয়া লেন, এমন কি অনেকে আপনাদের সারিক কার্য্য করিতে অপারগ হইতে গিলেন। শেষে সংকীর্ত্তনের নিবিধ দলের হইতে লাগিল। বালকের একদল ল এবং স্ত্রীলোকেও কীর্ত্তন করিতে হইলেন।

আমার মেজদাদা মহাশয় তখন কীর্ত্তনে দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। র তখন তিনি সমুদায় বিষয় কার্য্যে সর্জ্জন দিয়া কেবল ভক্তি-তরঙ্গে সন্তরণ রা বেড়াইতে লাগিলেন।

আমাদের প্রায় দুই মাস দেখাশুনা নাই। ন্তু মেজদাদা সমস্ত দিবা কিরূপে পন করেন, তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন। মিও প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্তু আমার লিখবার কিছু নাই, সুতরাং বিষয় কথা তীত পরমার্থ কথা কিছুই লিখি না। মন সময় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত, ত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, মেজদাদা মহাশয় সিখালিতে শুভাগমন করিলেন।

মেজদাদাকে দর্শন করিয়া বড় সুখবোধ ইল। তিনি তখন এক সন্ধ্যা আহার করেন, ৎস্যাদি সমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন।... আমি লিলাম, বৈষ্ণবগণ মৎস্যাদি খাইয়া থাকেন, মি কেন খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, ধর্ম্মের খাইলে ধর্ম্ম যায়, না খাইলে র্ম্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্ম্মের মরণ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম্ম আমি নি না।......

বিকালে দুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে লাম। গাড়িতেও ঐ কথা। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ী মধ্যে থাবার্ত্তা বন্ধ হইল। মেজদাদা আপনার বে রহিলেন, আমি আমার ভাবে হিলাম।

একটু পরে মেজদাদা গুন গুন করিয়া কটি গীত গাহিতে লাগিলেন। গীতটির দায় কথা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন হইল না। সেই গীতটি আমার হৃদয়কমল ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে লাগিল। ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মধ্যাবশেষ। ভক্তের শুধু কণ্ঠস্বরেই শ্রোতাদের হৃদয় স্পর্শ করে।

মেজদাদা গুন গুন করিয়া গাহিতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে যেন, শ্রীভগবান আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন। আমি মনোনিবেশপূর্ব্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে উহা আমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর আমাকে অস্থির করিতে লাগিল।

মেজদাদা যে গীতটি গাহিতেছিলেন, তাহা আমি পরে শিখিয়াছিলাম। সে গীতটি তাঁহার নিজস্ব কৃত। সেটি এই—

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধূলায় পড়িল গোরা,
ধূলায় ধূসরিত অঙ্গ দু' নয়নে বহে ধারা।।
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোরা।।
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি আমার প্রাণধন তুমি আমার নয়নতারা।।

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাঘটিত গীত পূর্ব্বে মহাজনগণ কিছু কিছু প্রস্তুত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। সে প্রথা মেজদাদা কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইল। এখন উপরিউক্ত আদি গীতটি দেখাদেখি কত শত গৌরাঙ্গ-লীলা ঘটিত পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

সে যাহা হউক, পর দিবসে মেজদাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই করুণ স্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল। মেজদাদা বাড়ী যাইয়া আমাকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার ভাবার্থ এই : শিশির! আমি জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও নাই।

মেজদাদার এই পত্রে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ আমি বুঝিলাম যে, মেজদাদা যে কথা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ন্যায্য। আমি আগেও বুঝিয়াছিলাম, তখন আরও বুঝিলাম যে, আমি বৃথা জ্ঞানের কথা বলিয়া মেজদাদার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি। তখন হৃদয় মাঝারে সেই গুন গুন শব্দটি আরও যেন কাঁদিয়া উঠিল।

তখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয়বস্তু, আর মেজদাদাও আমার প্রিয়বস্তু। এ উভয়ের অনুরোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু জানা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেও গৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম, এবং শুনিয়া উহার প্রতি বড় লোভ জন্মিয়াছিল। যখনই গৌরাঙ্গ-লীলা শুনিতাম, তখনই উহা আমার নিকট মধু হইতেও মধু লাগিত।

আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজদাদাকে পত্রের উত্তর দিলাম। মেজদাদাকে যাহা লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই : এবার তুমি আমার সঙ্গে যে দুঃখ পাইয়াছ অন্য বারে আমি তাহা দূর করিব। বিচিত্র কি আমিও তোমার মত হরিবোলা হইব।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থখানি আসিল ও আমি উহার পার্শ্বে বসিলাম। পুস্তকখানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেমন আমার অঙ্গ দিয়া যেন একটি আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। পিপাসাতুরের জল পান করিয়া যেমন অঙ্গ শীতল হয়, পুস্তকখানি স্পর্শ করিয়া সেইরূপ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। আমি চৈতন্যভাগবত অল্প অল্প করিয়া পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি কেন, না, অতি অল্পেই আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল।

মেজদাদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন ও আবিষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিতেন। সে সমুদায় পত্রগুলি যেন তাঁহার হৃদয়ে কেহ প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশগুলি আমি বড় মান্য করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মেজদাদাকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে আর তাঁহাকে দুঃখ দিব না। সেই পত্রের উত্তর আসিল।

তখন সকালবেলা, প্রায় আটটার সময়। আমি ঘরে একাকী আছি। আমার ঘরের মেঝে বাঁশের চাঁচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজদাদার পত্রখানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার ভাবার্থ এই : শিশির! কোন দেবতা আমি তাঁহাকে চিনি না, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি গৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। ঐ দেহ দ্বারা মহাপ্রভুর অনেক কার্য্য সাধন করিবেন।

এই পত্রখানি পড়িয়া আমি সেই চাঁচের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। একটু পরে উঠিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম।... আমি তখন অতি কাতরভাবে করযোড়ে শ্রীভগবানকে নিবেদন করিলাম যে, ভগবান! যদি তুমি অন্তর্ধনে কেবল আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া, নিজ গুণে আমার প্রতি এইরূপ কৃপা কর, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যথাসাধ্য যাবজ্জীবন, তোমার চরণ ভজন ও জগতে তোমার গুণগান করিব।'

(উপরিউক্ত প্রস্তাবটি ১২৯১ সালের চৈত্র। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)

'মেজদাদা! তুমি আবিষ্ট হইয়া পত্রে আমাকে যাহা লিখিয়াছিলে তাহা আমি লজ্জাক্রমে সব প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি শ্রীগৌরাঙ্গলীলা লিখিব কি তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, ইহা যখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তখন তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে যে, আমার ভাগে সে ফল লেখা আছে। সেই তোমার শ্রীমুখের বাক্য এখন সফল হইতেছে। অতএব তোমার কনিষ্ঠের এ পরিশ্রমের ধন আর কাহাকে দিব? তুমিই গ্রহণ কর।'

দেখিয়াছি, শিশিরকুমারের অমিয় নিমাই চরিত এবং কালাচাঁদ গীতা পড়িয়া রসিক পাঠক কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন। শুনিয়াছি, শিশিরবাবুর ইংরেজী ভাষায় লিখিত লর্ড গৌরাঙ্গ পড়িয়া আমেরিকার অনেকে গৌরাঙ্গ-মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

—কণপক

কাঁসাইয়ের তীরে টুসু ঠাকুর

শান্তি সিংহ

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে পুরুলিয়া অনেকের কাছে খরার দেশ বলে পরিচিত। কিন্তু শত অভাব-অনটনের মাঝেও টুসুগান এ জেলার লৌকিক জীবনে গভীর সাংস্কৃতিক চেতনার পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। তাই যখনই শীতের শিশিরমাখা সকালে দেখা যায় আতপ্ত রোদ্দুরে উজ্জ্বল সোনালি রঙের ধান অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী ঘরে ঘরে আসেন—তখনই সাধারণের মনে গুন-গুনিয়ে ওঠে টুসু গান। কারণ টুসু হচ্ছে শস্যোৎসবের গান গ্রামের মেয়ে-ছেলে ছোট-বড়ো কমবেশী সকলেই এ গান ঘরে-মাঠে-হাটে গেয়ে থাকে। (যদিও এ গান মূলত মেয়েদের)। গানের বিশেষ সুর গ্রাম ছাড়িয়ে কাঁসাই কুমারীর বুক ছুঁয়ে আদিগন্ত রুক্ষতাক্ত খোয়াই পেরিয়ে মিলিয়ে যায় লাল অরণ্যমাখা ছোট-বড়ো ডুংরির ওপারে।

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন বাউড়ী ঐদিন গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে পিঠে আর খেজুর গুড়ের সুঘ্রাণের সঙ্গে মেশে টুসু গান—

টুসু পূজার দিনে
যত দেবী সন্ধ্যা লাভ তুষ্ট মনে।
শুভ্রকান্তি সরস্বতী গো
প্রণমি মা চরণে
পদ্মাবতী সীতাদেবী বন্দি গো
মনে মনে।

চলে সারারাত জাগরণ। কিন্তু সাধারণ নারী জীবনের ধর্মপ্রাণতার মধ্যে সুখ-দুঃখ ঈর্ষার তীব্রতাও মিশে যায়। যেমন, পর পিরিতি জ্বলন্ত আগুন: যেন জ্বলছে লো তুষের আগুন। কিংবা পরথম পিরিতি কালে বাপের কিরা খাওয়ালে। মিষ্টিছাপে মধু খাঁয়ে অন্তরে দাগা দিলে। রাতভর বিচিত্র ভাবের ও রসের গানে শীতার্ত পল্লীর বুকে জাগে অদ্ভুত আমেজ।

রাত্রি জাগরণের পর দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন ভোর থেকে মেয়েরা দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে টুসু ভাসানে যায়। এই ভাসান উপলক্ষে পুরুলিয়া শহর থেকে পাঁচ কিলো-মিটার দূরে দুলমি ছাড়িয়ে কাঁসাই নদীর ঘাটে হয় বিরাট মেলা। কাছে দূরের অসংখ্য গ্রামের কুমারী থেকে বয়স্কা অবধি মেয়েরা সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে নদী ঘাটে আসে। তাদের হাতে থাকে বাঁশের ফ্রেমের ওপর রঙিন কাগজের কাজ করা রথাকৃতি চৌদল। (স্থানীয় উচ্চারণ চৌডল।) চৌদলের সেই ভিতরে টুসুর সরা থাকে।

সংক্রান্তির সকালে চোখে কাজল আর রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি মেখে মেয়েরা পথ চলতে চলতে গেয়ে ওঠে:

মনের এই বাসনা
টুসু মাকে জলে দিব না।
দেখতে লেগবো (নিয়ে যাবো)
টাটার কারখানা।

একদলের মেয়েরা অন্য দলের মেয়েদের উদ্দেশে নিছক আমোদ অথবা

ধামতৌড়ি পার্বতীপুরের বিরিঞ্চি ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গের লোকজীবনে শাস্ত্রীয় পূজো-পার্বণের পাশাপাশি ঠাঁই করে নিয়েছে ব্রত-ছড়া-আলপনা ও আঞ্চলিকভাবে প্রসিদ্ধ নানা উৎসবের সমারোহ। এই সমারোহে শাস্ত্রীয় নিয়মের কঠোর বেড়াজালে আবদ্ধ পুজো-পার্বণের সঙ্গে লৌকিক অথবা লোক পরম্পরায় চলে আসা বার-মাসে-তের পার্বণের এক বিচিত্র মেলবন্ধনের ঘটনাই চোখে পড়ে। এই মেলবন্ধনের তাগিদে একদিকে যেমন পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে লৌকিক দেব-দেবীর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন ওঠে নি—ঠিক তেমনি, লৌকিক দেব-দেবীর পুজো অর্চনায় শাস্ত্রসিদ্ধ আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সমাজেও কোন বিক্ষোভ অথবা প্রতিবাদের ঝড় তোলে নি। অবশ্য এই সাংস্কৃতিক সমঝোতা নিছক বহিরঙ্গের ঘটনা নয়—আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপায়ণে একটি অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতার নিদর্শনও বটে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষভাবে মেদিনীপুর জেলার মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ-দের মধ্যে প্রচলিত বিরিঞ্চি পুজো—যথার্থ লোকসংস্কৃতি অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়-অঞ্চলের মধ্যবর্তী মেদিনীপুর জেলার নবশায়ক জাতির পুরোহিতেরা 'মধ্য-শ্রেণী ব্রাহ্মণ' বলেই পরিচিত। শুনেছি আগে এঁদের সঙ্গে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য সেই সংস্কারের চাপ এখন হ্রাস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে এঁদের অনেকেই নিজেদের 'মধ্যদেশীয় রাঢ়ী' বলে পরি-চয় দিয়ে থাকেন। মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি পদবী হল—ভৌমিক, সিংহটাল, চক্রবর্তী, মিশ্র, ভট্ট, কুলভী, টিয়া, চূড়ামণি, ভট্টাচার্য, পালোধি, পিতাড়ী, সিমলাই ও অধিকারী। সরেজমিনে জেনেছি—পৌষ মাসের প্রথম রবিবার বিরিঞ্চি পুজোর সূচনা হয়। পৌষ মাসের প্রতি রবিবার ছাড়াও, পৌষ সংক্রান্তির দিনে ব্রাহ্মণ বিরিঞ্চি পুজো করেন। কোন কোন পরিবারে ঐদিন পুজোর শেষে বিরিঞ্চির মূর্তিটি বিসর্জন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বিরিঞ্চির প্রতীক ও তাঁর বাহনের সমাবেশে একই থানার অন্তর্গত গ্রাম-গুলিতেও বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। শুধু তাই নয়, প্রতীক নির্মাণের উপকরণে, পুজোর উপচার, রান্না ভোগ ও অর্ঘ্য

পুরুষদের টুসু

আক্রোশবশত গানের সুরে গালিগালাজ করে। যথা—

অ্যাতো বড় মকর পরবে
তোদের পা পড়ে না কিসের
গরবে ?

এই গালাগালি টুসু দেবীকেও সংক্রামিত করে—

আমাদের টুসু মুড়ি ভাজে চুড়ি
ঝনঝন করে গো
উআদের টুসু হ্যাংলা মাগী
আঁচল পাত্যে মাগে লো।

সেকালের কবি গানের মতো এই গানের লড়াইয়ে আদিরসের ছড়াছড়ি। বহু পুরুষ মানুষও টুসু করে। তারাও ঢাক ঢোল কাঁসি মাদল নিয়ে উন্মত্ত-ভাবে নাচতে নাচতে টুসু ভাসানে যায়। রাত জাগা মেয়ের দলও গ্রামীণ নাচের বিচিত্র ভঙ্গিমায় ভাবোন্মত্ত হয়ে টুসু গায়। একদল মেয়ে পাশাপাশি যুবক বা নাগর পুরুষদের উদ্দেশে রং-ধরা গানের কলি দ্যায় ছুড়ে—

ভালোবাসা রাখবি গোপনে
কাপড় কাচো দিব সাবনে....

যুবক বা নাগর দলও গানের কলি লুফে নেয়। পাল্টা সুর ছুড়ে দ্যায়—

খোঁপায় দিব চাঁপা ফুল গুজে
ও তুই আসবি লো রাঁঝে রাঁঝে
(আনন্দে আনন্দে)।

কিংবা,

কাজলি কালো চোখের তারাতে
কত নীল সাগরের ঢেউ আছে
সঞ্চারু ওই বাঁকা ভুরু দুটিতে
মনটাকে টান দিতেছে
যেন লোহা টানা চুম্বকে
আছে লো বিপিনের আশা
ভালোবাসায় বাঁধিতে।

মেয়েরা চৌদল জলে ভাসিয়ে দেয়। ক্ষীণস্রোতা কাঁসাইয়ের ঠাণ্ডা জলে করে মকর চান (স্নান)। এতে নাকি অর্ধেক গঙ্গা বা গঙ্গাসাগর স্নানের পুণ্য হয়।

মকর চানের পর প্রায় প্রত্যেকেই নতুন জামা-কাপড় পরে। নদীঘাটেই অনেকে বাসি পিঠে খায়। সঙ্গে চপ-মুড়ি ও মিষ্টির চাপানও হয়। সব শেষে বিষাদগ্রস্ত মনে দল বেঁধে ঘরে ফেরার পালা। তখনও গুনগুনিয়ে উঠতে থাকে টুসু গান। এই দৃশ্যকেই বুঝি লোক সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ডঃ সুধীরকুমার করণ পোষালি খিন্নয়া বলতে চেয়েছেন।

টুসু মেলা থেকে ফেরার পথে কোন এক প্রচ্ছন্ন মমতায় বার বার পিছনে তাকাচ্ছিলাম। দুটি নদীর রুপালি বালির শরীর ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল দূরে বহু দূরে— অযোধ্যার ঢেউ খেলানো নীলাভ শৈল-শ্রেণীর দিকে। ভাবছিলাম,বটগাঁড়-বাদের আপাত রুক্ষতার গভীরে নর-নারীর গোপন হৃদয়ার্তির কথা—যার সুর দৈনন্দিন দুঃখ-সমস্যাকে ভুলিয়ে দ্যায় গড়ে তোলে মায়াবী জগৎ।

তারাশিস মুখোপাধ্যায়

নিবেদনে—এমন কি মূর্তি বিসর্জনের দিন নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কুলাচারের প্রভাব দেখা যায়। তবুও একই আঞ্চলিক পরিবেশে এতটা গরমিলের সমাবেশ সত্যিই বিস্ময়কর। ফলে, কোন একটি বিশেষ গ্রামের লৌকিক দেব-দেবী অথবা লোক উৎসবকে অনুসরণ করে যদি কোন অনুসন্ধিৎসু গবেষক একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক পরিধিতে সেই দেব-দেবী কিম্বা উৎসব সম্পর্কে সমানী-করণে আগ্রহী হন—তবে গবেষণা-পদ্ধতিগত একটি ত্রুটীকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

মেদিনীপুর জেলার 'তমলুক মহকুমার মীর্জাপুর গ্রামের এক মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ পরিবারে—বিরিঞ্চি ঠাকুরকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্থানীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণের অভিমত হল, 'বিরিঞ্চি শব্দটির অর্থ ব্রহ্মা'। কিন্তু বিরিঞ্চি নারায়ণের পূজো শীত ঋতুর অন্তর্গত পৌষ মাসের রবিবারগুলো ছাড়াও পৌষ সংক্রান্তির দিনটিতে নির্দিষ্ট হওয়ায়—এঁর সঙ্গে সূর্যের কোন প্রভেদ নেই। এই কারণে, সূর্যের ধ্যানমন্ত্রেই বিরিঞ্চি পূজা হয়।' প্রসঙ্গত, 'বিরিঞ্চি' শব্দটির অর্থ 'ব্রহ্মা' হলেও—রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা' অভিধানে 'বিরিঞ্চি' অর্থে বিষ্ণু ও শিব অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অভিধানগত অর্থ ছাড়াও, বিরিঞ্চি পূজা উপলক্ষে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদনের দৃষ্টান্ত মেলে মীর্জাপুরে। একটি ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিচার করলে, পৌষ মাসটি বিরিঞ্চি পূজোর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার মূলে—সূর্যের উত্তরগতি বা উত্তরায়ণের একটি প্রতীকী তাৎপর্য অনুমান করা যায়। কারণ, বর্তমানে যে তারিখ থেকে উত্তরায়ণের সূচনা, তা হল ৭ই পৌষ বা ২২শে ডিসেম্বর। বর্তমান পঞ্জিকার হিসেবে পৌষ মাসের প্রথম রবিবার মোটামুটিভাবে উত্তরায়ণের সূচনাকেই ইঙ্গিত করে: যেমন, বর্তমান বঙ্গাব্দ

১৩৮৩ সনে পৌষ মাসের প্রথম রবিবার হল ৪ঠা পৌষ বা ১৯শে ডিসেম্বর। আঞ্চলিক লোকবিশ্বাসের নিরিখে উত্তরায়ণের সূচনা প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সুচিন্তিত অভিমত হল, 'ষোল শত বৎসর পূর্বে' পৌষ সংক্রান্তির দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। পরদিন ১লা মাঘ নূতন বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব-অঙ্গে প্রাতঃ স্নান করি। লোকে বলে মকর স্নান' (পূজা-পার্বণ, পৃষ্ঠা ৩)।

এখনও পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তির দিনে বিরিঞ্চি ঠাকুরের প্রাঙ্গণে 'মকর' নিবেদনের প্রথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিরিঞ্চির পূজক ব্রাহ্মণেরা কাঁচা দুধের সঙ্গে নতুন ধানের আতপ চাল, আখের গুড়, ফল, আদা, মুলো, কড়াইশুঁটি ইত্যাদির মিশ্রণকেই 'মকর' বলেন। সামগ্রিক-ভাবে বিচার করলে—'মকর' নৈবেদ্য ছাড়াও, পৌষ সংক্রান্তিতে মকর বাহন গঙ্গাদেবীর পূজা এবং কোন সাগর-তীর্থে 'মকর স্নানের' যে প্রথা আছে—তা পরোক্ষে উত্তরায়ণের সঙ্গে প্রতীকী যোগসূত্র রক্ষা করে। কুলাচারে কোন কোন ব্রাহ্মণ পরিবারে আবার এইদিন পূজোর শেষে বিরিঞ্চি ঠাকুরের প্রতীক বিসর্জন দেওয়া হয়। অবশ্য ১লা অথবা ২রা মাঘ তারিখেও বিসর্জনের ঘটনা বিরল নয়। নিকটবর্তী জলাশয়ে বিরিঞ্চির প্রতীক বিসর্জন ছাড়াও, পৌষ মাসে রান্নার কাজে ব্যবহৃত মৃৎ-পাত্রগুলিকে বর্জন করে ১লা মাঘ থেকে নতুন মৃৎ পাত্রে রান্না হয়। পুরাতন মৃৎ পাত্রগুলিকে এঁরা 'কালি হাঁড়ি' বা 'মুলো হাঁড়ি' বলেন। কথা প্রসঙ্গে জেনেছি—যে মৃৎপাত্রে পৌষ মাসে রান্নার কালি পড়েছে বা মুলো রান্না হয়েছে, তা মাঘ মাসে ব্যবহার হয় না। এমন কি, পৌষ সংক্রান্তির পূর্বে বাস-গৃহটিও ভালভাবে পরিষ্কার করা হয়। কারণ, কোন কিছুতেই 'পৌষ কালি' রাখতে নেই। শুধু তাই নয়—যেহেতু বিরিঞ্চি নারায়ণ মুলো নৈবেদ্যেই বেশী সন্তুষ্ট হন, তাই তাঁর বিসর্জনের পরে মাঘ মাসে মুলো খাওয়া সকলেই অশাস্ত্রীয় মনে করেন। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরাই নয়, আঞ্চলিকভাবে অনেকেরই এই অভিমত।

তমলুক মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে বিরিঞ্চির মূর্তি তৈরীর আনুষঙ্গিক উপকরণ, প্রতীকের গঠন ও বাহনের সমাবেশে বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। স্থান-বিশেষে বিরিঞ্চির প্রতীকের গঠনে এই মহকুমায় চৈত্র অথবা বৈশাখ মাসে শিবগাজন উপলক্ষে পূজিত মাটি অথবা সিমেন্টের তৈরী গৌরীপট্টাকৃতি সূর্য-বেদীর তুলনা করা চলে। কোন কোন পরিবারে এই প্রতীকের আকৃতি একটি ছোট মাটির স্তূপ অথবা ঢিপির আকারের। অবশ্য সব ক্ষেত্রে বিরিঞ্চির উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদনের যে প্রথা আছে—তা শিবগাজন উপলক্ষে সূর্যবেদীর ওপর অর্ঘ্য নিবেদনেরই মত। সচরাচর গৃহ সংলগ্ন পারিবারিক মন্দির, তুলসী মঞ্চ অথবা উঠোনের উন্মুক্ত জমির ওপরে বিরিঞ্চি ঠাকুরের প্রতীক নির্মাণে যে উপকরণগুলি প্রয়োজন হয় তা হল—নরম মাটি, লাল কুঁচ ফল, হরীতকী ও কড়ি। উল্লেখ করা যেতে পারে কোন পরিবারেই বাড়ীর ভেতর প্রতীক তৈরী হয় না।

পৌষ মাসের প্রথম রবিবারের কুয়াশা-ঘেরা পাখী ডাকা ভোরে অথবা আগের দিন বিকেলের মিঠে পড়ন্ত রোদে—পরিবারের অভিজ্ঞ পুরুষদের সঙ্গে ঘোমটা-টানা গৃহবধূরাও বিচক্ষণ মৃৎশিল্পীর মত বিরিঞ্চির প্রতীক তৈরীতে অংশ নেন। কুলাচার
করে নির্ধারিত জমির ওপর প্র
ছোট মাটির স্তূপ অথবা
অনুকরণে প্রতীকের অবয়ব গ
এই প্রতীকের ঠিক পূর্বে, প
দক্ষিণে একটি গোলাকার
চতুষ্কোণ কুণ্ড খোঁড়ার
এই কুণ্ডে বিরিঞ্চির উদ্দে
অর্ঘ্যের উপকরণগুলি স্থান প
গাজন উপলক্ষে সূর্যবেদীর
দেওয়ার জন্য যেমন একটি
বসানো হয়—বিরিঞ্চির
ওপরেও ঠিক তেমনি একটি
পোঁতা থাকে। পূজক এই হ
বিরিঞ্চির মাথা হিসেবে ম
তমলুক থানার সায়রা গ্রামে
প্রতীক স্তূপের ওপর পা
দুটি কড়ি বসানো থাকে।
বিরিঞ্চির চোখের প্রতীক।
ব্রাহ্মণেরা জানালেন, 'বিরিঞ্চি
গায়ে বৃত্তাকারে সাজানো যে
ছোট মূর্তি দেখছেন, ওগুলি
সন্তান—কোনটিই মেয়ে নয়
এই চোদ্দটি মূর্তির প্রতি
কড়ি ও কড়ির দুই প্রান্তে
বসানো হয়েছে।' এই গ্রামে
দক্ষিণে মনুষ্য মূর্তির অনুকর
'বসু-বলরাম'র যে প্রতীক
তার মাথা ও বুকে একটি করে
এবং মুখে একটি কড়ি চো
জানলাম, দুটি কড়ির
কড়ি বসিয়েই চোখের রূপ
হয়েছে। তুলনামূলকভাবে,
থানার মির্জাপুর গ্রামে ছোট
মত বিরিঞ্চির প্রতীকের উ
যে মানুষের মূর্তি থাকে,
তাঁর সন্তান হিসেবে কল্পনা
কিন্তু ওদের কোনটিতেই ব
হরীতকী বসানো হয় না। তবে
মাথায় একটি হরীতকী থাকে।
তমলুক শহরের উপকণ্ঠে
গ্রামে বিরিঞ্চির উভয় দিকে
প্রতীক মনুষ্য মূর্তি শোভা
শুধু গঠনে বৈচিত্র্যই নয়—
দুটির মধ্যে একটি ছেলে
মেয়ে। মজার কথা, এই এক
ধামতৌড়ী গ্রামে বিরিঞ্চির
সঙ্গে কোন বাহন অথবা ম
মূর্তি স্থান পায় না।

আঞ্চলিক বৈচিত্র্যে
শহরের অন্তর্গত পার্বতীপুরে
মত বিরিঞ্চির প্রতীকের পাশে
সাতটি গোলাকার মূর্তি চোখে
এছাড়া প্রতীকের উত্তরে বির
বসু বলদের' পশ্চিম মুখ
হাতীর মত শুঁড় এবং পিছনে
মত লেজ দেখা যায়। শুধু
'বসুবলদের মু দিকে যে গোল
জানলাম তা 'বসু-বলদের' পূ
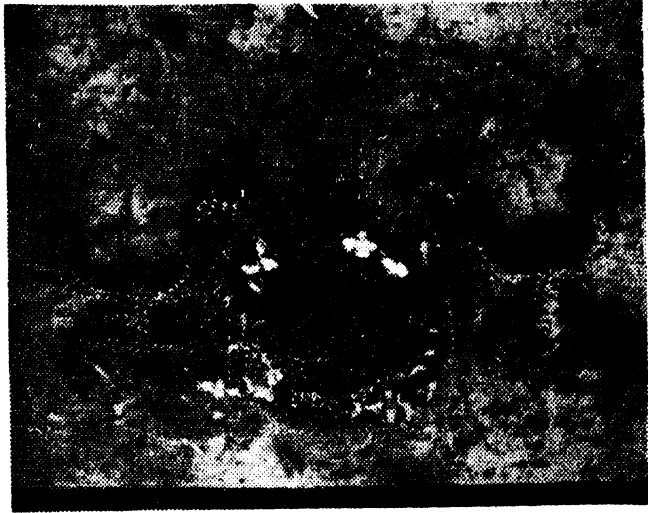
ত মশাই জানালেন 'বিরিঞ্চি র সঙ্গে যে সাতটি গোলাকার - দেখছেন—ওগুলি অষ্টবসুর ' অবশ্য পৌরাণিক আখ্যানে ষ্টপুত্র (গণদেবতা) বা অষ্টবসু তিনি কোন ইঙ্গিত করেন নি। ও পৌষ সংক্রান্তির দিনে ঠাকুরের যে বিশেষ পুজো ও ব্যবস্থা হয়—তা ঐ একই দিনে ত গঙ্গাপুজোর সঙ্গে পরোক্ষভাবে বলে অনুমান করা চলে। একই- পাঁশকুড়া থানার আটবেড়িয়া টোপির মত প্রতীকের মাথায় জটা শোভা পায়। এই প্রতীকের কে দু'টি ও পশ্চিমে একটি র্তিকে বিরিঞ্চির সন্তান হিসেবে করা হয়। এছাড়া—'বলদ বাহন' র প্রতীকের পার্শ্বে রাখা মাটির ওপর দক্ষিণমুখী একটি বলদের থাকে। চিত্তাকর্ষক এই বলদটির পা, দুটি শিং দুটি চোখ, ও জিহ্বা ও শরীরে অলংকরণ ও—কোন লেজ নেই। অবশ্য মহকুমার সুতাহাটা থানার কান গ্রামে বিরিঞ্চির প্রতীকের একটি লেজবিশিষ্ট বাহনের বিরল নয়। প্রসঙ্গত, পারিবারিক তায় বিরিঞ্চির প্রতীক, কুন্ড, ও মানুষের আকারের মূর্তি শেষে ওগুলির দেহে হরীতকী, কুঁচ ফল বসানো হয়। শ্রেণী- সাজানো কুঁচ ফলের বিন্যাসে লোকায়ত শিল্পকলার ভাবরূপটি পায়। শুধু তাই নয়, বিরিঞ্চি আগে নিকোনো জমির ওপর ী হাতের পিটুলী-অলংকৃত নর রেখাঙ্কনে সমগ্র পরিবেশটি ও পবিত্রতায় ভরে তোলে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিরিঞ্চি পুজোর কোন ঘট স্থাপন করা হয় না। বিরিঞ্চির প্রতীকের সামনে পূর্ব উো মুখে বসে পুজো করেন কমের উপচার দিয়েই পুজো হয়। দি পৌষ মাসের প্রথম রবিবার ও তাঁর বাহনের মাথায় বসানো নীর ওপর সিঁদুর দেওয়া চলে: জোর কয়েকটি উপকরণ হল— চন্দন, রক্ত পুষ্প, সরষে ফুল, বেলপাতা, দুর্বা, হরীতকী, চিনি ও কাঁচা দুধ। কুলোচারে, কিম্বা সেদ্ধ চাল, গোটা পান, সুপারী, টক কুল ও হলুদ- ী মেশানো জলের ব্যবহারও নয়। এছাড়া পুজোর বিভিন্ন দিনে কার পদ দিয়ে অন্নভোগ,

বিরিঞ্চির প্রতীকের সঙ্গে অষ্টবসু ও বসুবলদ

খিচুড়ী-পায়েস, পিঠে-পায়েস, টক কুলের অম্বল এবং 'ডালা' হিসেবে মুড়কি, মোয়া, চাল ভাজা, ছোলা-ভাজা ইত্যাদি নিবেদনের প্রথা বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয়। এমন কি, পৌষ সংক্রান্তির দিনে 'মকর' নৈবেদ্যই নয়—বিরিঞ্চির উদ্দেশে মুগের ডালের খিচুড়ী, কয়েক প্রকার ভাজা, তরকারী এবং পিঠে-পায়েস দেওয়ার দৃষ্টান্ত বেশীর ভাগ পরিবারেই চোখে পড়ে। ব্রতীদের লৌকিক বিশ্বাসে 'অন্নভোগ' ছাড়াও 'ডালায়' নিবেদিত খাদ্য সামগ্রী পুজোর দিন সকালেই ভাজতে হয়। কারণ বিরিঞ্চি নারায়ণকে কোন বাসি খাদ্য দেওয়া চলে না।

অধিকাংশ পরিবারেই বিরিঞ্চি পুজোয় শঙ্খ, কাঁসর ও ঘণ্টা বাজানো হয়। কিন্তু তমলুক থানার অন্তর্গত ধামতোড়ী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা জানালেন, 'আমরা শঙ্খ বাজাই না। কারণ, সূর্য পুজোয় শঙ্খ বাজানো নিষেধ।' অবশ্য কোন পরিবারেই ঢাক বাজানো হয় না। আনুষ্ঠানিক পুজোর শেষে তাম্রপাত্রে কাঁচা দুধ, হরীতকী অথবা টক কুল ছাড়া আরও কয়েকটি উপকরণ দিয়ে ব্রাহ্মণ পূজক বিরিঞ্চির মাথায় তিন, পাঁচ অথবা সাতবার অর্ঘ্য দেন। এই উপকরণগুলি কাছাকাছি কুন্ডে জমা হয়। পুরোহিত ছাড়া ধামতোড়ী গ্রামে বিজোড় সংখ্যায় সধবা মহিলারাও পূজকের নির্দেশে সাত বার অর্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে পুজোর আগের দিন নিরামিষ আহারে ব্রতীদের দৈহিক শুচিতা রক্ষা করতে হয়। পরদিন সকালে ব্রতীদের নাম, গোত্র উল্লেখ করে সংকল্প ও

পুজোর শেষে তাঁরা অর্ঘ্যের স্নান জল, প্রসাদী ফল, জল খাবার এবং হবিষ্যি করেন। সাবরা গ্রামের সধবা ব্রতীরা জানালেন, 'দেখুন, কেবল বন্ধ্যা নারী-দের সন্তান কামনাই নয়—সন্তানবতী-দের সন্তান রক্ষা, ব্যাধি মুক্তি, পারি-বারিক সুখলাভ, বাস্তু শান্তি ইত্যাদি নানা কারণেই তো বিরিঞ্চি পুজোর প্রচলন হয়েছে। অবশ্য বাড়ীর পুরুষেরা ব্রতী না থাকলেও, পুজোর দায়িত্ব তো ও'দেরই হাতে।'

আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, মেদিনীপুর জেলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ বিরিঞ্চি পুজোয় শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের এক বিচিত্র মেলবন্ধন চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, বিরিঞ্চির প্রতীক ও তার বাহনের সমাবেশে, পুজোর উপকরণে, নৈবেদ্য ও ব্রতীদের কুলাচারগত ধ্যান-ধারণায় বৈচিত্র্য থাকলেও—সূর্যের ধ্যান মন্ত্রে পুজো অর্ঘ্যের বিষয়ে মৌল সাদৃশ্য ধরা পড়ে। লোক সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও এই পুজোয় সাত সংখ্যাটির প্রাধান্য অস্বীকার করা চলে না। আবার, গাণিতিক হিসেবে বিরিঞ্চি পুজোর সঙ্গে উত্তরায়ণের একটি প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র থাকার ফলে, এই পুজোটি নিছক মেয়েলী আচার-অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পড়ে না—বরং সৌর-উৎসব অথবা শস্য-উৎসবেরই প্রতীক বলা চলে। পরিশেষে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে বিরিঞ্চি পুজোর বিস্তৃতির পরিবর্তে কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলায় এই পুজোর সীমাবদ্ধতা কৌতূহলোদ্দীপক বটে।

খেলাধূলা

দর্শক

টেস্টে ২০০ বা তার বেশী উইকেট

১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টে ভারতের বিষেণ সিং বেদী চারটে উইকেট পান (৭২ রানে ৪ ও ৩৩ রানে ০)। এই চারটে উইকেটের প্রথম উইকেটটা পেয়ে তিনি তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট পূর্ণ করার দুর্লভ গৌরব লাভ করেন। টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে একজনের পক্ষে ২০০ উইকেট পাওয়া কি বিরাট সাফল্যের পরিচয়! খুব কঠিন কাজ! নিশ্চয়ই বিরাট সাফল্যের নজির এবং খুবই শক্ত কাজ।

মনে রাখতে হবে পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর বসে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া। সেই সময় থেকে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী ১০ পর্যন্ত ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, ভারত এবং পাকিস্তান—এই সাতটি দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলার যোগফল দাঁড়িয়েছে মোট ৭৯৪ : আর টেস্ট ক্রিকেট খেলার একশ বছরের ইতিহাসে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২০০ উইকেট পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছেন এপর্যন্ত মাত্র ১২ জন খেলোয়াড়—ইংল্যান্ডের ৫জন, অস্ট্রেলিয়ার ৪জন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২জন এবং ভারতের ১জন। টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৩০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন মাত্র দুজন—ওয়েস্ট ইন্ডিজের ল্যান্স গিবস (৭৯টি টেস্টে ৩০৯ উইকেট) এবং ইংল্যান্ডের ফ্রেড ট্রুম্যান (৬৭টি টেস্টে ৩০৭ উইকেট)।

এ পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৭৭) টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে যে ১২ জন খেলোয়াড় ২০০ উইকেট পূর্ণ করেছেন তাঁদের টেস্ট খেলা এবং উইকেট সংখ্যা নীচের তালিকায় দেওয়া হল :

ইংল্যান্ড (৫জন)..:

ফ্রেড ট্রুম্যান (টেস্ট ৬৭ ও উইকেট ৩০৭), ব্রায়ান স্ট্যাথাম (টেস্ট ৭০ ও উইকেট ২৫২), অ্যালেক বেডসার (টেস্ট ৫১ ও উইকেট ২৩৬), ডেরেক আন্ডারউড (টেস্ট ৬৭ ও উইকেট ২৩৯) এবং জন স্নো (টেস্ট ৪৯ ও উইকেট ২০২)

অস্ট্রেলিয়া (৪জন)..:

রিচি বেনো (টেস্ট ৬৩ ও উইকেট ২৪৮), গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি (টেস্ট ৬০ ও উইকেট ২৪৬); রে লিন্ডওয়াল (টেস্ট ৬১ ও উইকেট ২২৮) এবং ক্ল্যারি গ্রিমেট (টেস্ট ৩৭ ও উইকেট ২১৬)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২জন)..:

ল্যান্স গিবস (টেস্ট ৭৯ ও উইকেট ৩০৯)—বিশ্বরেকর্ড এবং গারফিল্ড সোবার্স (টেস্ট ৯৩ ও উইকেট ২৩৫)

ভারত (১জন):

বিষেণ সিং বেদী (টেস্ট ৫২ ও উইকেট ২১০)

আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

জলন্ধরে ৩২তম আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে এবং মহারাষ্ট্র বালক ও বালিকা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, গতবারও রেলওয়ে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে এবং মহারাষ্ট্র বালক বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। এ-বছর বালিকা বিভাগের দলগত খেলার উদ্বোধন হল।

পুরুষ বিভাগের সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে ৩-২ খেলায় পাঞ্জাবকে এবং কর্ণাটক ৩-২ খেলায় বাংলাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

মহিলা বিভাগের সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে ৩-০ খেলায় গতবারের রানার্স-আপ মহারাষ্ট্রকে এবং কেরল ২-১ খেলায় পাঞ্জাবকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

বালক বিভাগের সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্র ২-১ খেলায় দিল্লীকে এবং উত্তর-প্রদেশ ২-১ খেলায় কেরলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

নবপ্রবর্তিত বালিকা বিভাগের সেমি-ফাইনালে মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটক যথাক্রমে দিল্লী এবং উত্তরপ্রদেশের বিপক্ষে ওয়াক-ওভার পেয়েছিল।

দলগত বিভাগের ফাইনাল

পুরুষ বিভাগ : গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে ৩-২ খেলায় গত বছরের রানার্স-আপ কর্ণাটককে হারিয়ে রহিম তুল্লা কাপ জয়ী হয়।

মহিলা বিভাগ : গত বছরের চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে ৩-০ খেলায় কেরলকে হারিয়ে চাড্ডা কাপ জয়ী হয়।

বালক বিভাগ : গত বছরের বিজয়ী মহারাষ্ট্র ২-১ খেলায় উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে মারাং কাপ জয়ী হয়।

বালিকা বিভাগ : মহারাষ্ট্র ২-১ খেলায় কর্ণাটককে হারিয়ে নবপ্রবর্তিত কুরেশি কাপ জয় করে।

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজে ২৩তম জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় গতবারের চ্যাম্পিয়ান সার্ভি-সেস ৫৫ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে এবারও দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। সার্ভিসেস দ[illegible] ১১টি বিভাগেই খেতাব জয়ী হয়। প্রতি-যোগিতায় দ্বিতীয় স্থান পায় রেলওয়ে (১[illegible] পয়েন্ট) এবং তৃতীয় স্থান পাঞ্জাব ..(১[illegible] পয়েন্ট)। আসরে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা[illegible] সম্মান লাভ করেন সার্ভিসেস দলের বি এ[illegible] থাপা।

আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

ধারওয়ারে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যাল[illegible] ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে ওসমানি[illegible] ৯৮ রানে বোম্বাইকে হারিয়ে দশ বছর বা[illegible] রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়ী হয়েছে[illegible] বোম্বাই ৩০বার ফাইনালে খেলে ২৩বা[illegible] জিতেছে। সর্বাধিকবার ফাইনালে খেলা এ[illegible] সর্বাধিকবার রোহিন্টন বারিয়া ট্রফি জয়ে[illegible] রেকর্ড বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দলেরই[illegible] এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় ক্রিকেট প্রতি[illegible] যোগিতায় বোম্বাই রাজ্যের সর্বাধিকবা[illegible] ফাইনালে খেলা এবং সর্বাধিকবার রঞ্জিট্র[illegible] জয়ের রেকর্ড আছে।

জাতীয় মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

গোরখপুরে আয়োজিত ৪র্থ জাত[illegible] মহিলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনা[illegible] বাংলা প্রথম ইনিংসের রানের ব্যবধা[illegible] বোম্বাইকে হারিয়ে উপর্যুপরি তিনব[illegible] (১৯৭৪-৭৬) জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়া[illegible] হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। মেয়েদের এ[illegible] জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচ[illegible] ১৯৭৩ সালে। উদ্বোধন বছরের ফাইনা[illegible] মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে বোম্বাই চ্যাম্পিয়[illegible] হয়েছিল।

এ বছরের প্রতিযোগিতার সেমি-ফাই[illegible]নালে বাংলা ২১১ রানে হরিয়ানাকে এ[illegible] বোম্বাই ৮ উইকেটে গত দু বছরের রানার্স আপ কর্ণাটককে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছি[illegible]

ফাইনালে বাংলার প্রথম ইনিং[illegible] সর্বোচ্চ ৬০ রান করেন দলনেত্রী শ্রীরূ[illegible] বসু। বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংসের ২[illegible] রানের উত্তরে বাংলা তাদের প্রথম ইনিং[illegible] ২১৫ রান করে ৭ রানে এগিয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বোম্বাই : ২০৮ রান

ও ৮৭ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড[illegible] এস পণ্ডিত ৫০ নটআউট। শর্মি[illegible] চক্রবর্তী ১২ রানে ২ উইকেট)

বাংলা : ২১৫ রান (শ্রীরূপা বসু [illegible] রান। ডি এডুলজি ১৪ রানে ৫ উইকেট)

ও ১৫ রান (১ উইকেটে। এডুল[illegible] ২ রানে ১ উইকেট)

তিন রাজ্যের রুই কাতলা ফুটবলার

রূপক সাহা

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কলকাতার ফুটবল জগতে এ রকম কয়েকটি কথা শোনা যায়—'মনজিত আমাগো ক্লাবে আইত্যাছে' বা 'বার্নার্ড পেরেরা ও রনজিত থাপাকে আমরা কন্ট্রাক্ট করে এয়েছি,' অথবা 'সাবির আলি হাম লোগ্ কো টিম মে আ রহা হ্যায়।' কিন্তু প্রতি বছরই ফুটবল মরশুম শুরু হবার পর দেখা যায় ওরা প্রত্যেকেই যে যার রাজ্যে ঘরোয়া লীগ খেলে যাচ্ছেন বহাল তবিয়তে। এবারের কলকাতার ফুটবল সীজনের গোড়ায় অবশ্য তিন রাজ্যের রুই-কাতলা ফুটবলারদের নিয়ে খুব একটা তোলপাড় হচ্ছে না। সবটুকু গ্ল্যামার এখন শ্যাম থাপার। সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার এখন ও। ঘরোয়া লীগে বড় বড় ক্লাব ওকে টানবে বা ছাড়বে সেই ছবিটা পরিষ্কার হবে আগামী পনেরই মার্চ। কলকাতার নামী-দামী ফুটবলারদের খেলা দেখে চোখ এখন অভ্যস্ত। একটা সইয়ের খোঁচায় জামা বদলে ফেলে অস্বাভাবিক কিছু খেলা দেখাবে না ওরা। বরঞ্চ ভারতের অন্য প্রান্তের মুষ্টিমেয় কয়েকজন খেলোয়াড় যাদের নিয়ে সোরগোল প্রতি বছরই হয় তাদের প্রসঙ্গ আনা যাক।

সাবির আলির কথাই আগে বলি। মহারাষ্ট্রের টাটা স্পোর্টসে খেললেও আসলে ও হায়দ্রাবাদের ছেলে। বাহাত্তর সালে টাটার কোচ মহম্মদ হোসেনের ডাকে সাবির অন্ধ্র পুলিশের স্পেশাল ব্যাণ্ডের কাজ ছেড়ে বোম্বাইয়ে ঘর বাঁধে। টাটা ওকে চার অংকের মাইনের ভাল চাকরি দেয়। ছিপছিপে চেহারার সাবিরের বয়স মাত্র বাইশ। উনিশ বছরে ভারতীয় জুনিয়র দলের অধিনায়ক হয়েছিল ও ব্যাংককের এশিয়ান যুব ফুটবলে। তার পর থেকে ভারতীয় দলে ওর স্থান পাকা। সাবিরের বিশেষত্ব হলো ও খুব সুন্দর সুযোগ তৈরী করতে পারে বিপক্ষের গোলমুখে। আর মাথার কাজে তো অতুলনীয়। গোলের মুখে যে-কোন উঁচু বলে সবার মাথা টপকে সাবির হেড করবেই।

বাহাত্তর সালে ওকে কলকাতার একটি ক্লাব প্রথম খেলতে ডাকে। সাবির তখন টাটাতে সদ্য চাকরী পেয়ে হায়দ্রাবাদ থেকে বাবা-মাকে নিয়ে এসে বোম্বাইয়ে নিজের কাছে রাখার কথা ভাবছে। পারিবারিক কারণেই সেবার ও সাফ না বলে দেয়। বছর কয়েক পর কলকাতার আর একটি ক্লাব ওকে নিয়ে পড়ে। তখন আই এফ এ লীগে নিরাশা কাটিয়ে ওঠার জন্য ঐ ক্লাবটি ভিন্ রাজ্যে নতুন মুখ খুঁজছে। কলকাতা থেকে ঘনঘন লোক ছোটে বোম্বাইতে সাবিরকে রাজী করানোর জন্য। কিন্তু সেবারও সাবির পাশ কাটিয়ে যায়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে আন্ধেরীতে ওর ফ্ল্যাটে একটা চিঠি পৌঁছয়—লিখেছে কলকাতা থেকে একটি ক্লাব। দোনামনায় পড়ে সাবির। তবুও কেন এ মরশুমেও কলকাতায় আসছে না সাবির আলি?

ওর নিজের কথায় শুনুন, 'কলকাতা থেকে একটি দলের চিঠি পাওয়ার পর একটু ভাবনায় পড়েছিলাম না তা নয়। ওরা লিখেছিল আমার ইচ্ছামতো সুযোগ-সুবিধা দেবে। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি করা উচিত। উনি নিরুৎসাহ করলেন। টাটার চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। কলকাতায় যতদিন খেলব ততদিনই এ সব সুযোগ-সুবিধা, তারপর? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যাব না। তবে সামনের বছর ভেবে দেখব।'

আরেকজন নামকরা প্লেয়ার কিন্তু কলকাতার একটি ক্লাবের জন্য চাকরি ছেড়েছিল এক সময়ে। নাম অমর বাহাদুর। সুধীর কর্মকারের মতে যে সবচেয়ে বিপদজনক উইংগার। অমর যখন কয়েক বছর আগে সার্ভিসেসের হয়ে ডুরাণ্ড খেলতে যায় তখন কলকাতার কোন একটি বড় ক্লাবের কর্মকর্তার চোখে পড়ে। ফুটবল জহুরী ওকে আমন্ত্রণ জানান। ঠিক হয় আর্মি থেকে রিলিজ পেলেই অমর কলকাতায় চলে আসবে। খুব তাড়াতাড়িই ছাড় পেয়ে যায় অমর সেনাবাহিনী থেকে। কলকাতার ক্লাবকে চিঠি দিয়ে ও দেরাদুনে বসে থাকে। নির্দিষ্ট দিন পার হয়ে যাবার পরও কলকাতা থেকে কেউ ওকে না নিতে যাওয়ায় ও হতাশ হয়ে পড়ে। এদিকে মফৎলালের মালিক হেমন্তকুমারের লোক বোম্বাই থেকে হাজির হয় ওকে নিয়ে যাবার জন্য। অভিমান নিয়েই অমর বোম্বাই চলে যায়। তারপর কয়েকবার কলকাতা থেকে লোক গিয়ে বসে থেকেছে বোম্বেতে ওকে রাজী করানোর জন্য। কিন্তু যেহেতু অমর হেমন্ত মফৎলালকে কথা দিয়েছিল, মফৎলাল ছেড়ে কোনদিন যাবে না সেহেতু কলকাতায় আর আসেনি।

অমরবাহাদুর আমাকে বলেছে, 'সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য কলকাতায় কোনদিন খেলতে পেলাম না। সারা জীবন দুঃখ রয়ে গেল।' অমর বাহাদুরের মতে সুরজিত সেনগুপ্ত সবচেয়ে বড় ফুটবলার।

পাঞ্জাবের মনজিত সিংকে নিয়ে কলকাতায় কম সোরগোল হচ্ছে না! কিন্তু ফুটবল পাগলরা জেনে রাখুন মনজিত কোনদিনই কলকাতায় খেলবে না। বর্ডার সিকিউরিটিতে ভাল চাকরি করছে মনজিত। অবশ্য বছর কয়েক আগে ও কলকাতায় আসার কথা ভেবেছিল। কিন্তু পাঞ্জাব ফুটবলের কয়েকজন কর্তা ওকে সাবধান করে দেয়। বাংলাকে সমৃদ্ধ করে লাভ নেই। পাঞ্জাবের ছেলে যখন ওখান থেকেই ভারতের পক্ষে খেলতে পাচ্ছে তখন বাংলাতে যাওয়া কেন? মহারাষ্ট্রের বার্নার্ড পেরেরাও কোনদিন কলকাতায় আসবে না। কিছু নাক উঁচু বাংলার ফুটবলারদের জন্য ওর এই কঠিন মনোভাব। বাংলার বাইরেও ছেলেরা যে ফুটবল খেলতে পারে তা পেরেরা দেখিয়ে দিতে চায়।

পাটনায় জাতীয় ফুটবল খেলার সময় আরো অনেক নামী ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলেছি যাদের নিয়ে কলকাতা সময় সময় নেচে ওঠে। একসময় যাদের ধারণা ছিল বাংলায় ফুটবল না খেললে পাদপ্রদীপের আলোয় আসা যায় না। এখন এত টুর্নামেন্ট চলে যে সে ধারণাটা পাল্টেছে। অবশ্য বাংলার আকর্ষণ কিছু না কিছু থাকবেই। যেমন মহারাষ্ট্রের স্ট্রাইকার ক্যামিলো ডি' সিলভা বা উইংগার গুডিনহো, বিহারের প্রভাকর মিশ্র, লালন দুবে, আসামের দেবাশীষ রায়। এরা দারুণ খেলেছে সন্তোষ ট্রফিতে। প্রত্যেকেই আমাকে বলেছে কলকাতার কোন দল ডাকলে ওরা সাড়া দেবে। কলকাতার কাছাকাছি থাকার জন্য অবশ্য খগরাজের ডাকে বোকারো স্টীলে চাকরি নিচ্ছে মহারাষ্ট্রের চাটুনি, গুডিনহো, ভাস্কর মাইতি এবং মণিপুরের বংকুবিহারী শর্মা।

, আরেকজন ফুটবলার আটাত্তর সালে হয়ত কলকাতা মাতাতে আসবে। নাম ডেভিড উইলিয়ামস। তামিলনাড়ুর হয়ে জাতীয় ফুটবলে খেললেও আসলে ও নাইজেরিয়ার ছেলে। গত বছর জুন মাসে মাদ্রাজে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্য এসেছে। নাইজেরিয়ার উত্তরাংশ রাজ্যের লীগ চ্যাম্পিয়ান দল 'রাকা রোভারস'-এ খেলত। ঘানার বিরুদ্ধে একটা আন্তর্জাতিক ম্যাচও দেশের হয়ে খেলেছিল একুশ বছরের এই ছেলেটি। ভারতীয় দলের নির্বাচক আহ্মেদ হোসেন ওর খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেলেন

—'দেখছ, এক মুহূর্ত ও দৌড় থামাচ্ছে না। দু' পায়ে দারুন শট।' ডেভিড উইলিয়ামসকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন আমিও চমকে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় ও বলেছিল, 'যতগুলো টিম জাতীয় ফুটবলে খেলছে তার মধ্যে সেরা বেঙ্গল। আমাদের দেশেও এই ধরনের ফুটবল খেলা হয়। বেঙ্গলে আমি খেলতে চাই। কলকাতার একটি ক্লাব ইতিমধ্যেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ডেভিড একেবারে ব্রাজিলের পেলের মতো দেখতে। পাটনায় দর্শকরা ওকে দেখে চেঁচিয়েছে 'পেলে, পেলে' বলে। এ কথা বলতেই ও লাজুক হেসে বলেছে, 'ও কথা বোলো না, পেলে অনেক অনেক বড়'। ডেভিড খেলেও পেলের পজিশনে। দশ নম্বর জামা চাপিয়ে।

আয়নায় নিজেকে ভেঙচাই

হিন্দী ছবিতে অশোককুমার রোমান্টিক হিরো থেকে ঠাকুর্দার রোলে পৌঁছেছেন চল্লিশ বছরে। শিল্পী হিসেবে জীবনে তিনি সুশৃংখল। শিল্পে আস্থাশীল। সবার শ্রদ্ধা ও সম্মান তিনি না চাইতেই পেয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, খেলাধুলোর সময় কোথায়? একটা ছবি সম্পূর্ণ করতে সব সময়টাই খেয়ে যায়। দেরি মানেই খরচ। কখনো ফ্লোরে দাঁড়িয়ে সংলাপের লাইন পাই। কখনো আমাদেরও লাইন লিখে নিতে হয়—ডিরেকটরের সঙ্গে পরামর্শ করে। ডিরেকটরকে সংলাপের চেহারা পাল্টাতেও বলে থাকি। অনেক সময় তিনি তা মানেন না। তখন বাথরুমে গিয়ে আয়নায় নিজেকে ভেঙচাই—তাতে টেনশন কমে। তার পর ফ্লোরে এসে ডিরেকটরের নির্দেশমতো কাজ করি।

আমি কখনও উচ্চাকাঙ্ক্ষী নই। কাজের ব্যাপারে কোন বাদ-বিচার রাখি না। খ্যাতির পেছনে কখনো ছুটিনি।

তারকার দাম অনুযায়ী ছবির প্রস্তাব ওঠে। ভারতীয় সমাজের প্রতিবিম্ব ছবিতে প্রতিফলিত হবার কোন প্রশ্নই নেই। কোন্ তারকাকে কোন্ দামে কি বাজার দরে পাওয়া যাবে—সেটাই শুধু প্রশ্ন। শিল্প ও ব্যবসার এটা একটা দড়ির খেলা।

হিন্দী ছবি জাতীয় স্তরে হিন্দী ভাষাকে জনপ্রিয় করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। নিরক্ষর লোককে দেশের পুরাণ ও ইতিহাসের রূপদী কাহিনীর সঙ্গে হিন্দী ছবি পরিচিত করেছে।

কাজের সময়ে কেউ সময়ে আসেন না। তারকারা অসমাপ্ত শুটিং থেকে আর এক শুটিং-এ চলে যান। ফলে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় জগা খিচুড়ী।

গত বছর যতগুলো ছবি দেখেছি তার মধ্যে দত্তা আর অসময়ের সৌমিত্রদা আর দীপঙ্করের রোল দুটো আমার কাছে রীতিমত চ্যালেনজিং লেগেছে। ওই সব রোলে অভিনয় করেও সুখ।

: আপনার কি মনে হয় চান্স পেলে ইমপ্রুভ করতে পারতেন?

—ইমপ্রুভ করার কথা উঠছে কেন? সৌমিত্রদা যা করেছেন তার চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। আর দীপংকরের বদলে আমাকে নিলে আমি আমার মতই করতাম—ইমপ্রুভ হোত এ দাবি করবো না।

সংসার-সীমান্তে ছবিতে মিনিট কয়েকের একটা ছিচকে চোরের পারট করে সন্তু এখন টালিগঞ্জের ব্যস্ত অভিনেতাদের অন্যতম। চাঁদের কাছাকাছি, প্রতিশ্রুতি, পরিচয় ইত্যাদি ছবিতে সমবয়সী নায়িকাদের হাত ধরাধরি করে প্রেম-টেম করেছেন। এ ছাড়াও ডজনখানেক ছবিতে কাজ করছেন ইমপরট্যান্ট রোলে। থাকেন ভবানীপুরে। বাড়িটা নিজেদের। আর—আছে একটা স্টেশনারী দোকান। সংসার ও জীবিকার অনিশ্চয়তায় মুখে সর্বদাই কেমন একটা বিপন্ন বিপন্ন ভাব। মাসে গড়ে হাজার দুয়েক টাকা আয় হলে, নিজেই বললেন, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে কথাবার্তা বলা যেত।

গত সাত আট বছরে অনেক নতুন মুখ বাংলা সিনেমায় এসেছে। ছেলেদের মধ্যে রঞ্জিত, দীপংকর, মিঠুন, প্লাস সন্তু। মেয়েদের মধ্যে আরতি, সুমিত্রা, মহুয়া, জয়শ্রী, মিঠু। এ কথা উল্লেখ করে বললাম : সবাই কি কাজ পাচ্ছে? সেই সঙ্গে উপযুক্ত দক্ষিণা?

—কেউ কেউ পাচ্ছে, তবে অধিকাংশই না।

: আরো কি নতুন নতুন মুখ আসা দরকার?

মুখটা ইনটারভিউ ফেস করার মত গম্ভীর করে ভারী উচ্চারণে বললেন--নিশ্চয়। আরো দরকার।

: যারা এসেছে তাদেরই কাজ নেই, তবু দরকার?

এবার অসহায় ভাবে জবাব দিলেন—ইন্টারভিউয়ের সময় সবাই তো তাই বলে।

এক সময় বাড়ির বাজার নিজেই করতেন। বাড়ি বলতে বাবা, মা, কাকা, ছোট ভাই ও গোপা। বছর-খানেক আগে গোপা-সন্তুর বিয়ে হয়েছে। আড্ডায় যান হেঁটে, স্টুডিওতে বাসে। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পর অবশ্য সবরে সাইকেল রিক্সা। অনিল চ্যাটারজি ওর অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শেষ রক্ষার গদাই-এর রোলে নাকি ফাটিয়ে দিয়েছে।

অশোককুমার

সন্তু মুখার্জি

আজও সুচিত্রা সেনকে দেখিনি

এখন পর্যন্ত মহুয়া, সুমিত্রা ও মিঠুর এগেনস্টে রোমান্টিক লিড করেছে। সন্তুর বয়স ছাব্বিশ।

: কারা কারা অভিনয় করতে পারে না?

মুখে চোখে আবার সংকট। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটানোর জন্য হাসলেন। ডিরেকটর কেমন হলে ভাল হয়—অনেক ভেবে চিন্তে, গুছিয়ে গুছিয়ে বললেন : নলেজবান লোক, যে বিষয়টা ভালভাবে জেনে ছবি করতে নেমেছে। সন্তু কলকাতার হাফ বি-কম, যাদবপুরে দু' বছর বাংলা পড়েছিল। সিনেমায় আসার দু' বছর আগেও থিয়েটার করত। এখন থিয়েটারে অনিচ্ছুক।

—দু' বছর ধরে স্টুডিও পাড়ায় হাটাহাটি করছি, আজো সুচিত্রা সেনকে দেখি নি।

: ওর এগেনসটে চানস পেলে?

—সে তো স্বপ্ন।

কোন কনট্রোভারসিতে নিজেকে জড়াতে অনিচ্ছুক সন্তু এবার উঠে দাঁড়ালেন। কথাবার্তা শেষ। বাড়ি ফিরবেন। বন্ধু বাবলুকে বললেন, দু'খানা দো-অনজানের টিকিট কেটে দিবি? ঘাড় নেড়ে সায় জানালেন বাবলু। সুযোগটা অপচয় না করে জিজ্ঞাসা করলাম : সে কি হিন্দি ছবি?

সন্তু বললেন : বাংলা আর কোনটা দেখব?

কবি প্রীতিশ নন্দীর কবিতার একটি লং-প্লেইং রেকর্ড প্রকাশ অনুষ্ঠানে কবির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী

শ্যামল চক্রবর্তী

…ন

…র্শন ও শ্রবণ : এই দুইয়ের সমিল… যদি হৃদয়াবেগের মাধ্যমে …পন্দায় ঘটানো যায় এবং তার জন্য …ধা পথে এগিয়ে হৃদয় নামক নরম …ল মহার্ঘ বস্তুটির মূলে গিয়ে …দেওয়া যায়—তাহলে কি সেই …ক দোষের বলে ধরে নেবো ? অন্তত …ভাবনার বশবর্তী হওয়াটা বোধহয় …হবে না। 'নয়ন' ছবির কাহিনী ও …রচনার সময়ে সুখেন দাস শতকরা … আশুতোষ দর্শকের সেই পরম …ক নিংড়ে নেবার কথা ভেবেই …ন এবং তিনি সফলও হয়েছেন। …শ ছবি দেখতে গিয়ে দর্শক যার …শিক্ষিত অশিক্ষিত সবশ্রেণীর আবাল …তা রয়েছেন—তাঁরা সবাই চোখের …বরণ করতে পারেন নি। একটি ছবি দর্শককে ভাবাবেগে আপ্লুত করে কোণে জল নিয়ে আসে—তখন ধরে …হবে পরিচালকের প্রচেষ্টা ব্যর্থ …সেটা যতই ছকে বাঁধা কাহিনী …া কেন।

…য়ন' ছবিতে বহুদিনপর সন্ধ্যারানী …লনাদেবীকে দেখতে পাওয়া গেল, …মুখার্জি অনিল, সুখেন, সিতাংশু… রত্না, নির্মলকুমার ও অন্যান্যরা একটা টোটাল অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থিত হয়েছেন। স্বল্প বাজেটে নির্মিত ছবি 'নয়ন' হয়তো কিছু উন্নাসিক বুদ্ধিবাদী দর্শককে তৃপ্তি দেবে না, কিন্তু ছবিটি বেশিরভাগ দর্শকের হৃদয়ের কাছে পৌঁছুবে—এটাই বড় কথা। 'নয়ন' ছবিতে আধুনিক সফিস্টিকেশনের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ দোষগুণসম্পন্ন মানুষের কথা এই ছবিতে আছে।

ছকে বাঁধা পুরানো কাহিনী কিন্তু নতুন করে দেখতে ভাল লাগে। সুখেন দাস চিত্রনাট্যটি সাজিয়েছেন সুন্দর করে যে কারণে ছবিটির আগ্রহ শেষ পর্যন্ত বজায়

থাকে। এই ছবির কাহিনী চিত্রন
পরিচালনা সবই সুখেন দাসের এবং (
তার মধ্যে কোন বিশেষ মৌলিক ছি
তাই ছবিটি ছকে বাঁধা পথে সফল হ

অভিনয়ে নয়ন চরিত্রে সুমিত্রা ম
সুন্দর অভিনয় করেছেন। একটি
মেয়ে—আভাষ ইঙ্গিতে তাকে অভিনয়
হয়েছে এবং চরিত্রকে আনন্দ,
বেদনা ফুটিয়ে তুলতে হ
সুমিত্রা এই চরিত্রে এত
অভিনয় করেছেন বিস্মিত হতে হয়।
করে যে দৃশ্যে তাঁকে চরিত্রহীন
চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেই দৃশ্যটি
অভিনয়ে উজ্জ্বল। বোবা মেয়েদের
চাহনি ফ্যা হয়—সুমিত্রা লোটাও
করে তাঁর ক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন।
ভাইয়ের ভূমিকায় অনিল চ্যা
সংবেদনশীল অভিনয় মনে রাখার
মেজ ভাইয়ের ভূমিকায় নির্মলকুমা
চরিত্র প্রকাশে ব্যর্থ, তাঁকে মা
তেমনি তাঁর স্ত্রীর ভূমিকাতেও
অভিনয় অত্যন্ত দুর্বল। বরং ছো
এবং তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় সুখেন ও
ঘোষাল চরিত্র দুটি সুন্দর
ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া সন্ধ্যার
মলিনা দেবী স্বল্পক্ষণেও সুখকর
সৃষ্টি করে গিয়েছেন। শম্ভু মুখার
ভাল লাগল না, কেমন যেন
অভিনয়। অন্য ছোট দুটি ভূমিকায়
মুখার্জী ও সবিতাব্রত চোখে পড়ে
পার্থ বেশ সপ্রতিভ অভিনয় করেছে।

ছবির কলাকৌশলের কাজ
সাধারণ। ডাবিংয়ে বেশ গোলমাল
পড়ল। বিশেষ করে শিউলির
সঙ্গীত পরিচালনায় অজয় দাস তেমন
কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তবে
ঠাকুরের কণ্ঠে রাগপ্রধান গানটির সু
লাগল। চিত্র গ্রহণের কাজ সাধারণ
শব্দ ধারণের ক্ষেত্রেও আউটডোরের
ত্রুটি রয়েছে। সুখেন দাস এসব দিকে
দিলে কলাকৌশলের কাজ আরও ভাল
পারত।

রাজলক্ষ্মী যাত্রাভিনয়

বাগবাজারের অন্তরঙ্গ নাট্য
২৫ ডিসেম্বর নববৃন্দাবন নাটমন্দিরে
দের রাজলক্ষ্মী নাটকটি যাত্রাভিনয়
পৌরাণিক নাটকের ভাব ও রস
সঠিক ফুটে ওঠে নি। তাই প্রথম
শেষ অবধি নাটকটি যাঁরা দেখেছেন
কোন নতুন আবেদন নিয়ে যেতে পা
যাত্রায় বিবেকের গান প্রাণস্বরূপ এ
বিবেক নেই এমন কি রাজলক্ষ্মীর
সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে তা
এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য ক
পোশাক পরিচ্ছদ ভাল নয় এর
অনেক অসুবিধা দেখা গেছে,
কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় চোখে প

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩
হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির

শুক্রবার, ২০ ফাল্গুন, ১৩

Friday, 4th March, 197

১৬ বর্ষ, ৪১ স

সম্পাদকীয়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা ৪

কবি পরিচিতি ৫ পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য ৫ বৈকুণ্ঠ পাঠক

চিঠিপত্র ৭

বিপ্লবী চৈতন্যদেব

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ ৯ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

চৈতন্যদেব ১২ শিশিরকুমার দাশ

প্রেম কখন বিপ্লব? ১৮ প্রসূন মিত্র

চৈতন্য কেন অনন্য? ২৯ মনোরঞ্জন বসু

উৎকলে শ্রীচৈতন্য ও চরিতামৃতের

ঐতিহাসিকতা ২৩ প্রভাত মুখোপাধ্যায়

আজকের সূচী

ঘরের পুরনো খুঁটি (গল্প) ২৯ বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও

উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন ৪১ প্রণতা দে

কলকাতায় বই মেলা

বাংলা বইয়ের বাজার ৪৯ শচীন দাশ

আজকের সাহিত্য শুধু টাকার ভিখারী :
শ্রীশ কুণ্ড ৫৯

লেখা ভাল হলেই ছাপব : বুদ্ধ মণ্ডল ৬১ শ্যামল সান্যাল

বই একজন নির্বাক বন্ধু ৬২ মীরা দে

বইপাড়া । বই কেনা । বই মেলা ৬৪ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও অঙ্গ সজ্জ

সুবোধ দাশগুপ্ত

আগামী সংখ্যায়

সিদ্ধার্থ রা

ও আশিষ ঘোষের গল

তারাপদ রায়ের কবিত

সুধাংশুকুমার রায়ের প্রবন

আনন্দ কেনটিস কুমারস্বাম

সুদীর্ঘ প্রচ্ছদ কাহিন

নির্বাচনে

নারী

লিখেছে

শংকর ঘো

কাজল মি

শ্যামাপ্রসাদ সরকা

অমিতাভ চক্রবর্ত

প্রসূন মি

শাণ্ডিব

অশোককুমার চক্রবর্ত

এ

আরো একজ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর কবিতা

শীতের বর্ণনা

মোচন করেছে পাতা, তবু বৃক্ষ জেগে আছে ভূগর্ভে শিকড়ে।
আকাশে রয়েছে আজ শূন্যেভার কুয়াশার কূট অভিপ্রায়
ঐ খানে করোজ্জ্বল গ্রহটির স্থায়ী এলাকায় ছিল
নিরঙ্কুশ আলো। মনে পড়ে
আমার বিগত গ্রন্থে সে দিয়েছে যথোচিত তাপ। হায়
সেখানে কি করে এলো উপাসনাহীন শীত, এলো
বোকা গদ্য পদ্যে গড়া দুঃস্থ অন্ধকার।

এতোদিন আঁধারও ছিল না ঠিক আদ্যোপান্ত কালো
অমাবস্যায়ও থেকে গেছে নক্ষত্রের কিছু পরিশেষ,
নারীর প্রকৃত কাছে, গ্রীবা স্তন ও যোনির কাছে
হাঁটু গেড়ে বসেছে যে অক্ষরের শরণার্থী কবি; তার আছে
তারইতো প্রকৃত ছিল উচ্চকিত ক্ষমতার দাম্ভিক বিভূতি।
আজ কবিকেও জড়িয়ে ধরেছে কিছু টুংটাং মেডেল আর
অনাদায় শীত, কিন্তু তার সঙ্গোপন বুকে
ধমনীর তন্তুজালে দ্রুত জেগে উঠছে এক
থার্মোমিটার পেরুনো ফারেনহিট্
সে ক্রমশই এগিয়ে যাচ্ছে ক্রোধের গোপন খাদে—তাপের অসুখে;
অথচ বাহির দৃশ্যে শীতের বিস্বাদ আর সহরের ইঁট।

উদ্ভিদ তখনো তাকে করেছে লালন, শিকড়ের গূঢ় মন্ত্র
পুনর্বার তাকে করেছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বলছে সে এখন সময় নয়
কুয়াশা দুরাশা ছিঁড়ে পাখিকে ফেরানো নয় নয়........
উলঙ্গ বৃক্ষের কাঠে লক্ষ কোটি একদা উধাও
পাতারা আসুক ফিরে; আজানু বিনীত
বাঙালীর তরিতরকারিকে বসন্ত করুক আবার গভীর বিচলিত
তার আগে হে তুমি প্রকৃত কবি মাটির নিবিড় নিচে হও
সন্দীপন ভাষায় প্রস্তুত!

মাঝে মাঝে শীত ভাল, অন্ধকার ভাল, না হ'লে কবির
ভূমিকা দুর্বল হবে, কুয়াশার অভিপ্রায় ছিন্ন ভিন্ন করে জাগবেনা
করোজ্জ্বল মুখ ঐ সূর্য নামক গ্রহটির।

জড় করে রাখো

যা কিছু এখনো আছে তাকে খুব জড় করে রাখো;
বাজে খরচের দিন ঐ যে রয়েছে পড়ে সংবাদপত্রের ভিতরে!
বাসী ভালবাসা ভারী হয়ে গেছে মেয়েটির নিটোল পশ্চাৎ-এ
তাও দ্যাখো।
দেখে শিখে তুমি এবার লৌকিক থেকে লুপ্ত হও শব্দের জঠরে!

নদীটি যা দেখিয়েছে—সে তো স্রোত,
নীল ও সবুজে গাঁথা আরো ব্যাপক সাগরে আছে বাহিরের নুন,
তুমি কি একটিও মীনের অধীর গভীরতা
নিচে নেমে গিয়ে দেখে আসতে পেরেছো!
দেখেছো যা তাতো খুবই অমায়িক মৃত্যু—তার কথা
লোল জিহ্বা জানে স্বাদে, যা জানেনা
তা নিয়ে কখনো তুমি
বাজিয়োনা চোনাখার বিরক্ত ডমরু, কেউ শুনবে না।
প্রকৃত সঞ্চয় কারো প্রকাশ্যে আসে না, তবু তুমি জোরে
পাঠাও প্রতিধ্বনির জন্য মাত্রাবৃত্ত পাহাড়ের দিকে, [illegible]
পায়ে হেঁটে ঈশ্বরের সঙ্গে দ্যাখা করে আসো।
এসব উৎসবও বহুকাল হ'লো চেনা হয়ে গেছে
নর্ডেল রোডের মশা কি ভীষণ উড়ে গিয়ে দংশন করেছে
গরাণহাটার এক মহৎ কবিকে।

রাখো, এখন জানালা ছাড়া সমস্ত দরোজা এসে
নিজের গরজে রাখো অন্ধ বন্ধ করে,
অন্ধের দুচোখে আলো নেই, কিন্তু সূর্যকে সে
আটকে রেখেছে ফুসফুসে।

একলা থাকতে দাও

আবিষ্কার যে করে তাকে একটু একা থাকতে দাও,
তার অলস শুয়ে থাকাও অর্থবহ;
বায়ু যেমন দেখা যায় না মনও তেমন অদর্শনীয়,
ঐ মানুষটি বিশেষ মানুষ, তাকে থাকতে দাও
একা। যদি সে নষ্ট করে কাঁচের গেলাস, প্রাচীন প্রিয়
ঘড়ির শব্দ কুঁকড়ে যায়। জেনো এ সব তারই স্বেচ্ছা, বাহির মোহ,

তাকে তোমার বুকের মধ্যে রাখো এবং প্রাণ করে নাও।

শরৎ প্রসঙ্গে : দুই লেখক ও পাঠক

বোম্বায়ের বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে যে দুজন বরেণ্য সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্য মূল্যায়ন করেছেন তা এক যথার্থ সাহসিক প্রতিবেদনমাত্র। যাঁরা লেখালেখির মধ্যে রয়েছেন, মানে যারা আধুনিক লেখক, যেমন বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সিরাজ—এঁদের যে কোন লেখায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব 'জিরো'। অথচ বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, সতীনাথ ভাদুড়ী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—কোনো না কোনো ভাবে ভাষা ও শিল্পের মধ্যে কাজ করে গেছেন এইসব আধুনিক লেখকের গল্পে। উপন্যাসের (কাঠামো) ও রচনাশৈলীতে। শরৎচন্দ্র গ্রামবাংলার যে চিত্র এঁকেছেন তা অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে ও কল্পনাশ্রয়ী, শহরে অবাস্তব লেখা বলে ভ্রম হয়। অথচ বিভূতি-ভূষণ বা তারাশংকর গ্রামবাংলার যে ছবি তাঁদের কলমে এঁকেছেন তা জীবন্ত, এবং বাস্তব চিত্র। সুনীল মিত্র, গৌতম চৌধুরী, রাধানাথ মণ্ডল, বাজে শিবপুর, হাওড়া।

(২)

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শ্রীসন্তোষ ঘোষের বক্তব্য শুনে এবং অমৃতের ৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় শাণ্ডিল্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় শ্রীঘোষের মন্তব্যগুলি পড়ে বারবার আমার শুধু একটা কথাই মনে হয়েছে, সূর্য বা চন্দ্রকে গ্রাস করে রাহু পৃথিবীর বুকে অন্ধকার ছড়িয়ে দেওয়ার কৃতিত্বে আত্ম-প্রসাদ লাভ করে। কিন্তু তার স্থায়িত্ব বা মাহাত্ম্য কতটুকু?

শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ের মতে শরৎ সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার বিশ্লেষণ না করেই ভারতের অগণিত পাঠক সমাজ শরৎচন্দ্রকে গতানু-গতিক প্রাচীন ঐতিহ্যকে আকড়ে ধরার মতই ভালবাসে। ও'র বক্তব্যকে মেনে নিয়েই আমার একটি বিনীত প্রশ্ন, শরৎচন্দ্রের বেলায় লক্ষ লক্ষ পাঠকসমাজ যে নিবু-দ্ধিতা করছে, সেটা অন্যদের বেলায় কেন করছে না? শ্রীঘোষ অমৃতের পাতায় বলে-ছেন,—'শেষপ্রশ্ন' কোন উপন্যাসই নয়। সব্যসাচী কোন চরিত্রই নয়।' ফিল্মের রোলটা উত্তমকুমার করছেন বলে ও'র যে ব্যাঙ্গোক্তি তাকেও মেনে নিয়েই প্রশ্ন রাখতে চাই শরৎচন্দ্রের 'সব্যসাচী' আর পীযূষ বসুর 'সব্যসাচী' একই প্রাণ নিয়ে শ্রীঘোষের কাছে উপস্থিত হয়েছিল কি? শরৎ সমাজের বেণীমাধব ঘোষালেরা সমাজ থেকে আজও কি বিলুপ্ত হয়েছে?

এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত দিনের সভাপতি শ্রীসমরেশ বসুর উক্তি মনে পড়ে। তিনি বললেন,—'...কাউকে তুলনামূলক ভাবে ছোট করায় গৌরব বা কৃতিত্ব নেই। একের সঙ্গে অপরের তুলনা করে কখনও কারুর যথার্থ মূল্যায়ন করা যায় না। স্ব স্ব ভূমিকায় প্রত্যেকেই মহান।..'

স্বর্গ লাভের জন্য বড়বাড়ীর গিন্নীর যেমন অধিকার, তেমনি সমান অধিকার রয়েছে অভাগীরও। যার যার কর্মফল দ্বারা তার তার স্থান নির্বাচিত হয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী অথবা রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ের পরে শরৎচন্দ্রের পথের দাবীকে শ্রীঘোষের দল যতই ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিন না কেন, তাতে শরৎচন্দ্রের স্থানচ্যুত হওয়ার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই থাকবেন—এই হচ্ছে শরৎপ্রেমীদের অভ্রান্ত সত্যোপলব্ধি। এলা রায়, জব্বলপুর।

(৩)

বোম্বাইয়ের নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যে বাঙালী লেখক মাত্রেই অপমানজনক মনে করবেন। যখন তাঁকে জাতীয় লেখক বলে মেনে নিয়েছি। যে লেখকের জনপ্রিয়তা দেশজুড়ে তাঁর সম্পর্কে এমন উক্তির কঠোর সমালোচনার প্রয়োজন। সুনীলবাবু ও সন্তোষবাবু শরৎবাবুকে এভাবে অপমান না করে তাঁর লেখা ও সাহিত্য নিয়ে যদি গঠন-মূলক সমালোচনা করতেন তাহলে বোধহয় ভাল হত। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, মুক্তগঙ্গা পত্রিকা।

(৪)

বোম্বাইয়ের শরৎ মেলায় শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ যে মন্তব্য করে শরৎচন্দ্র তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে অপমান করেছেন, তা সাহিত্য-প্রেমিক মাত্রেই যে মেনে নেবেন না তা অতি স্বাভাবিক। একটি কথা শ্রীসুনীলবাবু এবং শ্রীসন্তোষবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, শরৎচন্দ্র যদি আপনাদের দৃষ্টিতে এতই ছোট তবে বোম্বাইয়ের ডাকে ছুটে গেলেন কেন? ভেবে বিস্মিত হই বাংলার মাটি থেকে গিয়ে বাঙালীর উঁচু শিরকে নিচু করে দিয়ে আসে যাঁরা, তাঁরাই আজ বাংলা সাহিত্যের পূজারী। শুভ্রা দত্ত, খড়গপুর, মেদিনীপুর।

কলকাতা পুস্তক মেলায় আমাদের স্টলে আসুন

তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়েছে

মহামহোপাধ্যায় - পদ্মভূষণ - মহাকবি - ভারতাচার্য

শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ
ভট্টাচার্য-এর

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-এর
বাংলা হরফে মূল শ্লোক
দর্শনাচার্য শ্রীমন্নীলকণ্ঠের
টীকা
শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য-এর
টীকা, পাঠান্তর, প্রতি পর্বের ভূমিকা,
ভারতযুদ্ধের কালনির্ণয়, বৃহৎ সূচীপত্র
এবং গদ্যে বঙ্গানুবাদ

আনুমানিক ৪০ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩০৲

এখনো কিছু গ্রাহক নেওয়া হচ্ছে

গ্রাহক চাঁদা ২৫৲। প্রতি খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২২৲।
ডাক খরচ আলাদা।

যাঁরা কলকাতার বাইরে থাকেন, তাঁরা ১০০৲ M.O. ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট (গ্রাহক চাঁদা ২৫৲+প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মূল্য ৬৬৲+ডাক খরচ ৯৲) করলেই ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড এবং গ্রাহক রসিদ রেজিস্টার্ড ডাকে পেয়ে যাবেন।

সম্পূর্ণ মূলানুগ সংস্করণ

ব্যাঙ্ক ড্রাফট M.O. অথবা নগদ পাঠাবার ঠিকানা :

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলকাতা-৯

নতুন বই।। নতুন বই।।

নিমাই ভট্টাচার্য-র
রোমান্টিক উপন্যাস
গোধূলিয়া ১২-০০

নীললোহিত-এর
হঠাৎ দেখা ১০-০০

মিলন মুখোপাধ্যায়-এর
প্যারিসের পটভূমিকায় লেখা
উপন্যাস
মুখ চাই মুখ ২৫-০০

ভ্রমর-এর
প্রেম কাহিনী
বাসন্তীর সংসার ৮-০০

দিলীপ মুখোপাধ্যায়-এর
সঙ্গীতজগতের ঐতিহাসিক কাহিনী
দরবার নটী কলাবন্ত

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-এর
নতুন স্বাদের উপন্যাস
সতী অসতী ৮-০০

সন্তোষকুমার ঘোষ-এর
নতুন গ্রন্থ
যুবকাল ১০-০০

সমরেশ বসু-র
ভিন্নস্বাদের উপন্যাস
বারোবিলাসিনী ৮-০০

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ

পবিত্র জাহ্নবীতীরে বিদ্বজ্জন পরিশোভিত নবদ্বীপ নগরে মনোহর ফাল্গুন মাসে ১৪০৭ শকে নির্মল পূর্ণিমা নিশিতে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হলেন। সেই সময় আবার চন্দ্রগ্রহণ হল এবং নবদ্বীপ নগরে সকলে হরিধ্বনি করে উঠলেন।

শিশুর শরীরটি অপেক্ষাকৃত কিছু বড়, কারণ ইনি ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। বর্ণ একেবারে কাঁচা সোনার ন্যায়।

জগন্নাথ পুত্রের নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ও বয়স্যরা তাঁকে ঐ নামে ডাকতেন, কিন্তু তাঁর জননী তাঁকে নিমাই বলে ডাকতেন। আর পরিশেষে সেই নামে তিনি নবদ্বীপে সর্বসাধারণের নিকট বিখ্যাত হন।

শিশুর জন্ম হতে শচী, জগন্নাথ ও নিজ জনে অনেকরূপ অলৌকিক ঘটনা দেখতে লাগলেন, শিশু যখন নিদ্রা যাচ্ছে তখন কেউ দেখল যে তার হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় কি বিরাজ করছে। কখন দেখল সর্বাঙ্গ বিদ্যুৎ আবৃত। আবার কখন শচীদেবী গৃহমধ্যে বহুতর জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখতে পেতেন, তখন ভয় পেয়ে জগন্নাথ মিশ্রকে ডাকতেন।

গৃহের ভিতর যাই হোক, যখন নিমাই খেলা করে, তখন ঠিক সামান্য বালকের মত। নিমাই সমস্ত দিন খেলায় উন্মত্ত। যদিও তার পিতা তার হাতেখড়ি দিয়েছেন, কিন্তু লেখাপড়ায় শিশুর কিছুমাত্র মন নেই।

নিমাইয়ের বয়স তখন পাঁচ বৎসরও নয়। ক্রমে নিমাই গঙ্গাতীরে—বালুকায় শিশুদের সঙ্গে খেলা করতে লাগল। পড়ায় একটুও মন নেই। পিতামাতাকে ভয় নেই।

শচীদেবীর বড় দুঃখ নাই। এই নিমেষে নিমাই সর্বদা জননীকে যন্ত্রণা দিত। যা ছুঁলে দোষ, শচীকে দেখিয়ে দেখিয়ে তাই স্পর্শ করত, আর শচী হাহাকার করতেন।

শচী বুঝলেন, তাঁর পুত্র অন্যের পুত্রের মত নয়। হয় পাগল—বুদ্ধিমার নেই, নয় কোন দেবাবিষ্ট।

নিমাইয়ের বয়স তখন ছয় বৎসর। সে বাইরে ছিল। বাড়িতে রোদনধ্বনি শুনে দৌড়ে এল। বাড়িতে এসে শুনল যে, তার দাদা সন্ন্যাস করতে গিয়েছেন। নিমাই বুঝল, দাদা আর আসবেন না; আর দাদাকে দেখতে পাবে না, এই কথা বুঝেই নিমাই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

তখনই শচী ও জগন্নাথ ক্ষণকালের জন্য বিশ্বরূপকে ভুললেন। এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে নিমাইয়ের শুশ্রূষা করতে লাগলেন। অনেক সন্তর্পণে নিমাই চেতনা পেল। তখন শচী ও জগন্নাথ নিমাইয়ের গাঢ় ভ্রাতৃস্নেহ দেখে তাঁদের নিজের শোক কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হলেন।

সমস্ত পূর্ব চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে নিমাই মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল। এমন কি তিলার্দ্ধও মাতাপিতাকে ছাড়ত না। পাছে নয়নের অন্তরালে গমন করলে মাতাপিতার মনে বিশ্বরূপের শোক পুনরুদ্দীপিত হয়, এই ভেবে গৃহে বসে পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করত।

শেষে মনে মনে এইরূপ স্থির করলেন যে, একটা ছেলে [illegible] জানল যে সংসার অনিত্য, আর ঘরের বা'র হল। আর এটাকেও পড়ালে ঠিক তাই হবে। অতএব নিমাইকে পড়তে না দেওয়াই ভাল।
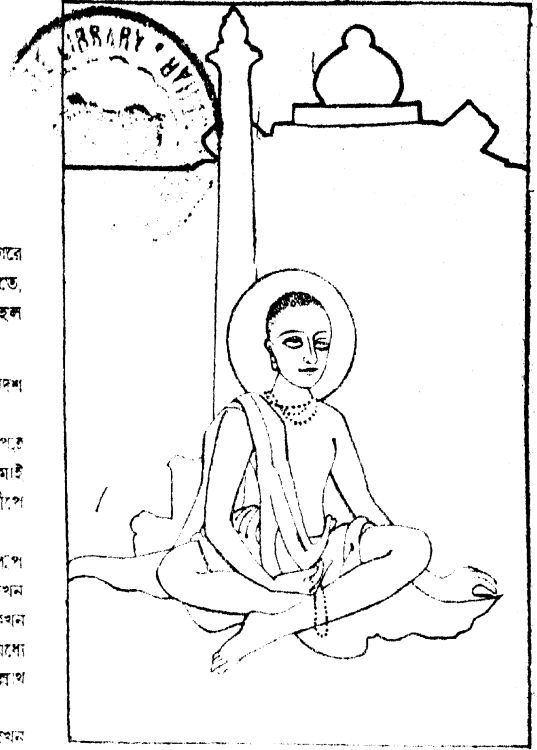
নিমাই পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করল না।

শচীর ও পাড়ার বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে জগন্নাথ নিমাইকে আবার পড়তে দিলেন।

এইভাবে নিমাইয়ের পড়া শুনার শুরু হল। তখন জগন্নাথ পুত্রের উপনীত দেওয়া পরামর্শ করলেন।

জগন্নাথের অন্তিমকালে উপস্থিত হলে শচী কাঁদিবার উপক্রম করলেন। নিমাই মাতাকে প্রবোধ দিয়ে বললেন যে, রোদন পরে হবে, এখন পিতার অন্তিমের শুভ দেখতে হবে।

বল্লভাচার্যের লক্ষ্মী নামে পরমা সুন্দরী এক কন্যা ছিল। বনমালী আচার্য এই সম্বন্ধের কথা শচীদেবীর নিকট উত্থাপন করলেন। অবশেষে নিমাই বিবাহ করে বাড়িতে ঘরণী এনে সংসারী হলেন।

এই সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে এলেন। ইনি বৈদ্য কি কায়স্থ বংশীয়, হালিশহরের একাংশ কুমারহট্টে এঁর পূর্ব নিবাস। এক দিন ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পথে নিমাইয়ের দেখা হল। এখন নিমাইয়ের টোল চলছে। কিছুকাল পরে ইচ্ছা হল পূর্বদেশে গমন করলেন।

যে নিমাই পণ্ডিত এক সময় যিনি বিদ্যারসে দিবানিশি উন্মত্ত, যিনি বৈষ্ণব দেখলে বিদ্রূপ করতেন, সেই নিমাই পণ্ডিত পূর্বদেশে কয়েক মাস মাত্র বাস করে, তারই মধ্যে দেশ হরিনামে উন্মত্ত করলেন।

কয়েক মাস পরে নিমাই পূর্বদেশ থেকে নবদ্বীপে ফিরে এলেন।

তোমার ঘরণী বৈকুণ্ঠলাভ করেছেন। তাঁকে সর্পাঘাত করেছিল, আর বহু চেষ্টাতেও তার প্রতিকার হয়নি। নিমাই ফিরে এসে একথা শুনলেন।

মহাত্মা শিশিরকুমার
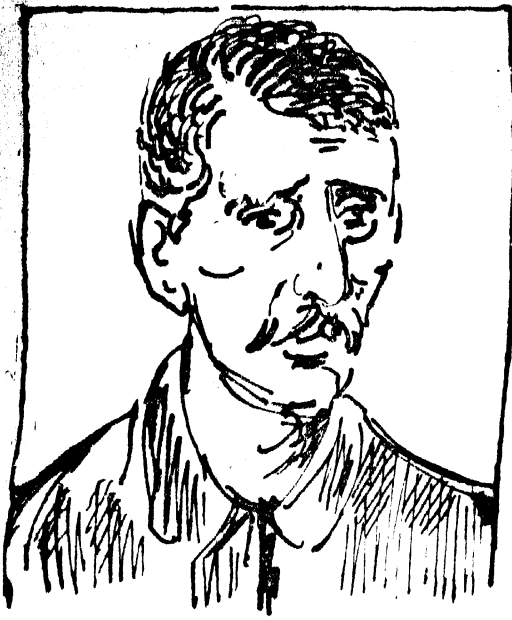
শচী যখন গঙ্গাস্নানে গমন করেন, তখন দেখেন যে, একটি বালিকা বিনীত হয়ে তাঁকে নমস্কার করে। সনাতন মিশ্রের এক কন্যা ও এক পুত্র। কন্যাটি বড়, নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। জননী যা স্থির করেছেন তাই তাঁর শিরোধার্য। অতএব দিন স্থির করে বিবাহের উদ্যোগ হল। এক দিন নিমাই শচীর নিকট গয়াক্ষেত্রে যাবার অনুমতি চাইলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ শোধ করতে যাবেন, শচী নিমাইকে নিষেধ করতে পারলেন না।

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখেই নিমাই মূর্ছিত হলেন। নিমাই একদৃষ্টে সেই পদপানে স্পন্দনহীন হয়ে চেয়ে রইলেন।

দর্শকদের মধ্যে ঈশ্বরপুরীও ছিলেন। নিমাইয়ের ভাব দেখে ঈশ্বরপুরী বুঝলেন উহা অমানুষিক। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের কর্ণে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্রটি দশাক্ষরী, 'গোপীজন বল্লভেয়।'

নিমাই গৃহে ফিরলে তাঁর আত্মীয়-কুটুম্ব শিষ্য-সেবক সকলে দেখলেন যে, তাঁর আর পূর্বভাবের কোন চিহ্ন নেই একেবারে পরিবর্তিত

পরদিন প্রভাতে নিমাই গঙ্গাস্নান করে টোলে পড়াতে গেলেন। বললেন তোমরা অনর্থক বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এত চেষ্টা করছ কেন? শ্রীভগবানের-পাদপ্রাপ্তিই জীবনের পরম পুরুষার্থ।

তখন নিমাই বললেন, 'এস আমরা কৃষ্ণ-কীর্তন করি।'

শ্রীনবদ্বীপে এই প্রথম শুভ শ্রীনাম-কীর্তনের সৃষ্টি হল। নেচে গেয়ে যে শ্রীভগবানের চরণপ্রাপ্ত করা যায়, তা নিমাই আপনি নেচে ও গেয়ে জীবকে প্রথম দেখালেন।

শ্রীবাস পরমভক্ত, তাঁকে দেখে নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তি একেবারে উথলে উঠল। তিনি শ্রীবাসকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করতে গেলেন, কিন্তু পারলেন না;—মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। পরে অনেক চেষ্টায় নিমাই চেতন পেলেন,—চেতন পেয়েই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে কাঁদতে লাগলেন। নিমাইয়ের এই সমস্ত অপূর্ব ভাব শ্রীবাস বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগলেন।

নিমাইয়ের নয়নধারার আর বিরাম নেই। তবে বহিরঙ্গ লোক দেখলে কষ্টেসৃষ্টে তা নিবারণ করেন মাত্র। কারও সঙ্গে বাক্যালাপ নেই। যদি কখন একটু চেতনা লাভ করেন, তখন সম্মুখে যাঁকে দেখেন, তাঁকে অতি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কৃষ্ণ কোথায় গেলেন?'

ক্রমে নিমাইয়ের দেহ অন্য ভাব ধারণ করল। প্রথম দেহ ভাবের অধীন ছিল, এখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাব দেহের অধীন হতে লাগল।

ভক্তগণ তখন একটি অপরূপ জ্ঞান লাভ করলেন। সেটি এই যে, 'কৃষ্ণপ্রেম' একটি কল্পিত দ্রব্য নয়, তা মদ্যের ন্যায় অতি তেজস্কর সামগ্রী! আর নিমাই ইচ্ছে করলেই তা জড়দ্রব্যের ন্যায় অন্যকে বিলাতে পারেন।

শ্রীভগবানকে প্রিয়-বন্ধু বলে ভজন করা, আর সর্বশক্তিসম্পন্ন বদান্য পুরুষ বলেও অনুভব করা যেতে পারে। গীতায় লিখিত আছে, শ্রীভগবানকে যিনি যেরূপ ভজন করেন, শ্রীভগবান তাঁকে সেইরূপ ভজন করে থাকেন। তুমি তাঁকে শক্তিসম্পন্ন দাতা বলে ভজনা কর, তিনি শঙ্খ চক্র প্রভৃতি হস্তে করে বর দিতে আসবেন; নিজ জন বলে ভজন কর, তিনি সমস্ত বিভূতি ফেলে তোমারই মত হয়ে আসবেন।

নিমাইয়ের দেহ কাচের স্বরূপ হয়েছে। কাচপাত্রে যে দ্রব্য রাখ, তা সেই দ্রব্যের বর্ণ ধারণ করে। সেইরূপ নিমাইয়ের দেহ মুহুর্মুহু নানা আকার ধারণ করছে। ঐ গৌরবর্ণ দেহ শ্রীভগবানের।

নিতাই প্রথমে নিমাইয়ের দর্শনে প্রায় সমুদয় জ্ঞান হারিয়েছিলেন। যা একটু ছিল, তাও সংকীর্তনে ও প্রভুর শ্রীভগবান-আবেশ দর্শনে গেল। নিশিযোগে কি মনে ভেবে তিনি আপনার দণ্ডকমণ্ডলু ভেঙে ফেললেন।

কিন্তু অদ্বৈতের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা প্রচুর। তখন শ্রীভগবান শ্রীঅদ্বৈতের ভাব দেখে সমুদয় ঐশ্বর্য সম্বরণ করলেন, শুধু জ্যোতির্ময় পরমসুন্দর নবীন পুরুষরূপে তাঁকে দেখা দিলেন এবং অভিমানে হাস্য করে নিকটে ডাকলেন। এই আশ্বাসবাক্য শুনে শ্রীঅদ্বৈত নিকটে এলেন। তখন শ্রীভগবান বললেন, 'ওহে অদ্বৈত আচার্য! তুমি জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে জীবউদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে আনতে কঠোর আরাধনা করেছ। তোমার আকর্ষণে এসেছি, এখন তুমি অকাতরে জীবকে ভক্তি ও প্রেমধন বিতরণ কর।'

ভক্তভাবে নিমাই জ্ঞান, প্রেতে ভক্তের নিকট দাসভক্তি প্রার্থনা করেন। আবার সেই নিমাই ভগবদ্ভাবে শ্রীমূর্তি সমুদয় পাশে রেখে দিয়ে স্বয়ং বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করেন ও তাঁর পাদপদ্মে ভক্তরা চন্দন তুলসী দিয়ে ভগবান বলে পূজা করেন কিন্তু তাতে তিনি আপত্তি না করে বরং সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং আপনি শ্রীকৃষ্ণ বলে আপনার পরিচয় দিয়ে অদ্বৈতের ন্যাড়া মস্তকে শ্রীপাদ তুলে দেন।

প্রভু বলছেন, 'হরিদাস! বর মাগো।'

হরিদাস বললেন, 'প্রভু! তুমি আমার গতি! তুমি আমার দয়াল। আমা হেন পতিতকে দয়া কর। তুমি ভক্তবৎসল, কিন্তু আমি ভক্ত নই। তুমি দীন-দয়াল, কিন্তু দীনও নই, অভিমানে আমার অন্তর পরিপূর্ণ।'

এই যে ভক্তরা নৃত্য করছেন, তা প্রেমের শক্তিতে। যাঁর হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হয়ে গেছে, তিনি কপট নৃত্য ব্যতীত প্রকৃত নৃত্য করতে পারেন না। হঠাৎ কারো হৃদয়ে কোন কারণে প্রেম শুষ্ক হলে,—সুরামত্ত ব্যক্তির মাদকতা ছুটলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেই জাতীয় ক্লেশ হতে থাকে—তার প্রেম-খোয়ারী হয়।

হরিনামই স্বয়ং ভগবান! ইনি আদিপুরুষ। এই নামরূপী আদিপুরুষ সকল সময়ে জগতে উদয় হন না, কলিতেই হয়েছেন।

এই লাখ লাখ চাঁদের ন্যায় শীতল তেজ, নিমাই যখন শ্রীভগবানরূপে প্রকাশিত হতেন, তখনই দেখা দিত। তিনি

অপ্রকাশ হলেও সে তেজ কিছুকাল সে-স্থানে থাকত। চন্দ্রশেখরের বাড়িতে সাতদিন অধিক পরিমাণে সেই হরিদ্রা-শ্বেতবর্ণ তেজ নির্গত হয়, তা অমনি রয়ে যায়। আর যদিও নিমাই সেই স্থান ছাড়লে প্রতিমুহূর্তে ঐ তেজ ক্ষয় হচ্ছিল, তবু সমুদয় ক্ষয় হতে সাতদিন লেগেছিল।

কিন্তু একটি কথা বিবেচনা করতে হবে। স্বয়ং ভগবান ভিন্ন নিঃসন্দেহ ভাবটি আর কারও সম্ভবে না। জীব মাত্রেরই এই প্রকৃতি। শ্রীভগবান যে-কোন রূপ ধরেই জীবের সম্মুখে আসুন প্রথম বিস্ময় কেটে গেলে জীবের মনে হবে যে, ইনি কি সেই?

দুধ জ্বালে দিতে থাকলে প্রথমে পাত্র উত্তপ্ত হয়। তারপর দুধ বিলোড়িত হতে থাকে। আরও উত্তাপ পেলে উথলে পড়ে। সেইরূপ তখন নদীয়াতে উথলে পড়ে — কি? না — কৃষ্ণভক্তি।

এই গৌর-অবতারে তিনি স্বয়ং, ও তাঁর সহচররা সকলেই তাঁদের চরিত্র দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

প্রথম মনে রাখুন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানরূপে প্রকট হয়ে সেই ভগবানকে কিরূপে ভজনা করতে হয়, তাও শেখাচ্ছেন। এই রূপে ভক্তভাবে গয়ায় গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করে, ও ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র নিয়ে ভক্তিরসে মগ্ন হলেন, এবং ভক্তদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণভজন আরম্ভ করলেন।

ভক্তিসাধনে যে ভগবানকে পাওয়া যায়, তিনি কল্যাণময় নারায়ণ, দয়াময় ও ক্ষমাশীল। প্রেমসাধনার যে সাধ্যবস্তু, তিনি পরম মিষ্ট, সুন্দর রসিক, কৌতুকপ্রিয়, প্রেমময় কিশোরস্বামী বঁধু। ভক্তি সাধনা করে বৈকুণ্ঠে নারায়ণকে পাবে, প্রেমসাধন করে গোলকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাবে। সেজন্য শ্রীগৌরাঙ্গ এখন হলেন — শ্রীরাধাকৃষ্ণ, কখনো শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করেন, কখনো শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধাকে আস্বাদন করেন।

রাধার প্রেম কিরূপ আদর্শ তা কেউ কখনো দেখেন নি, এবং শ্রীভগবানকে যে কেউ সেরূপ প্রেম করতে পারেন তাও অনেকে বিশ্বাস করতেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় এখন তাঁর পার্ষদরা তা প্রত্যক্ষ দেখছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং রাধা হয়ে, সেই প্রেমের যে কুটিল ও সুমধুর গতি, তা ভক্তদের দেখাচ্ছেন।

রস আস্বাদনের নিমিত্ত উভয় নায়ক নায়িকার প্রয়োজন। শুধু নায়িকার ভাব নিয়ে থাকলে রস হয় না। সুতরাং এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন নায়িকার ভাব দেখাচ্ছেন, সেইরূপ আবার নায়কের ভাবও দেখাচ্ছেন। রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ।

জীব আমার গার্হস্থ্য সুখ দেখে হরিনাম গ্রহণ করল না। এখন শ্রীপাদ! তুমি আমাকে উপদেশ দাও। তোমাদের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আমি সংসারে থেকে সুখভোগ করব, না কোপীন পরে তোমাদের দ্বারে দ্বারে ভাসিয়ে জীবদের উদ্ধার করব?'

প্রভু এবার আরো দ্রুতগমন করে চললেন। কিন্তু শচী 'নিমাই'! বলে কাঁদছে, বিষ্ণুপ্রিয়া মদনমোহন বলে ডাকছেন, ভক্তরা 'প্রভু' বলে চীৎকার করছেন। এই সমস্ত আকর্ষণ ও রোদন সূক্ষ্ম রজ্জুরূপে সৃষ্টি হয়ে প্রেমফাঁসরূপে পরিণত হচ্ছে। এই সমস্ত প্রেমফাঁস প্রভুকে চারদিকে ঘিরছে। তিনি অসীম শক্তিসম্পন্ন বলে এ সমুদয় রজ্জু ছিঁড়ছেন।

এদিকে হরিদাস প্রভুর চরণে পড়ে করুণ স্বরে কাঁদতে লাগলেন। প্রভু সকলের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল ও সকলে কেঁদে উঠলেন। প্রভু বললেন 'হরিদাস' তুমি যেরূপ করে আমার চরণ ধরলে, তুমি কৃপা কর যে আমিও এইরূপ কাতরে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের চরণ ধরতে পারি।'

নীলাচলে ছোটেই প্রভু মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলেন। দেখেই যেন চমকে গেলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি?' ভক্তরা বললেন, 'শ্রীমন্দিরের চূড়া'। শুনে নানাভাবে প্রভুর শরীর তরঙ্গায়মান হল, এবং এই সকল ভাব দেহে লুকোবার স্থান না পেয়ে প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল।

কালীঘাটের পটচিত্র অবলম্বনে

প্রভু দেখলেন জগন্নাথ সিংহাসনে বসে। তখনই ইচ্ছা হল, হয় তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করবেন, কি তাঁকে আপন হৃদয়ে পুরবেন। এইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন করবার নিমিত্ত প্রভু জগন্নাথ ধরতে গিয়ে লাফ দিলেন, জগন্নাথকে স্পর্শও করলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন।

সার্বভৌম যখন নবীন সন্ন্যাসীর মহাভাব প্রত্যক্ষ দেখলেন, তখন এরূপ মুগ্ধ হলেন যে, কাঁধে করে তাঁকে নিজ গৃহে আনয়ন করলেন। তারপর ভাবলেন, ত্রিজগতের মধ্যে এই নবীনই ভগবান। তখন আপনার বিদ্যাবুদ্ধি অতি নিষ্ফল ধন বলে বোধ হল।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম এর ঠিক বিপরীত। জাতি বিচার আবার কি, সকলেই ত শ্রীভগবানের? যে ভক্ত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন কি, অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত-চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ।

প্রভু নীলাচলে দোল দেখলেন, সার্বভৌমকে উদ্ধার করলেন, ... প্রভু শ্রীনিতাইয়ের হাত ধরে ও অন্যান্য ভক্তদের পানে চেয়ে বলতে লাগলেন, 'তোমরা আমার চিরদিনের বান্ধব; তোমাদের ঋণ শোধ দিব এমন আমার কিছুই নেই। তোমরা কৃপা করে আমাকে নীলাচলচন্দ্র দেখালে, এখন সেইরূপ কৃপা করে আমাকে দক্ষিণ দেশে যেতে অনুমতি কর।'

সার্বভৌম ও ভক্তরা নিবৃত্ত করতে পারলেন না।

শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর প্রিয় জীবনকে উদ্ধার করতে চলেছেন। ভক্তদের পশ্চাতে ফেলে, প্রভু একটু অগ্রবর্তী হয়ে বাহু তুলে, অতি মধুর নৃত্য ও অতি গম্ভীর স্বরে কীর্তন আরম্ভ করলেন।

প্রভু চলেছেন। কিন্তু তাঁর মহিমা আগে আগে যাচ্ছে। সে মহিমা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসীর বেশ ধরে জীবদের হরিনাম বিলাতে এসেছেন।

প্রভু যেখানে গমন করেন—সেখানে আপনিই এই কথা প্রচার হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন। এই কথা শুনে লোকে ভক্তির শক্তিতে উন্মাদগ্রস্ত হয়।

প্রভুর মস্তকে জটা, মুখে শ্মশ্রু, পরিধানে জীর্ণ কৌপিন। সেই অতি দীর্ঘ দেহ এখন ক্ষীণ হয়েছে, সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসরিত, নয়ন প্রেমে ঢলঢল ও ঈষৎ লোহিতবর্ণ।

প্রভু দুই বৎসর দক্ষিণ ভ্রমণ করে নীলাচলে প্রত্যাগমন করলেন।

আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা আনন্দময়। তা মলিন হলে, সেই

আনন্দলহরী চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়, তাকে তার দ্বারা আনন্দ খেলতে পারে না।

প্রভুর নয়নে পলক নেই, ধারার বিরাম নেই, তাঁর বাহ্যজ্ঞান নেই। মাঝে মাঝে শ্রীঅঙ্গ পুলকে আবৃত হচ্ছে আর অন্যান্য ভাব দ্বারা সুশোভিত হচ্ছে।

সকলে দেখেন যে, প্রভু তিলার্ধের মধ্যে প্রেমা-তরঙ্গে যেন সমস্ত সংসার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন; আর প্রভু সোনার পুত্তলির ন্যায় প্রেমে বিবশীকৃত হয়ে নৃত্য করছেন। সেই চতুর্হস্ত পরিমিত সুবলিত দেহ, গলিত-বিমল-হেমোজ্জ্বল-তেজ দ্বারা মণ্ডিত হয়ে, নানাভাবে তরঙ্গায়মান হচ্ছে।

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য ভক্তের নিমিত্ত, আর মধুর নৃত্য প্রেমিকের নিমিত্ত।

তুমি উপেক্ষিত হয়েছ বলে প্রভুর কথা উপেক্ষা না করে, আবার তাঁর চরণে শরণ লও, নিয়ে জগজ্জনকে দেখাও যে, যদিও তুমি রাজা, কিন্তু তব তুমি ভক্ত। প্রভুর কৃপা পাবার নিতান্ত উপযুক্ত। এইরূপে তুমি, তোমাকে প্রভুর কৃপা করতে যে বাধা আছে তা অন্তর্হিত কর। তবে প্রভু তোমার নিকট ঋণী হবেন।

যারা শ্রীভগবানের দয়ার সাগরে ডুবেছেন, তাঁরা ভাবছেন যে স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাদের গোলকধামে নিয়ে যাবার জন্য এসে তাদের সম্মুখে সন্ন্যাসীর রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এতে তাদের ভয় গেছে, আশা এসেছে, দুঃখ গিয়েছে, আনন্দ এসেছে।

শচীমাতার নিকট বিদায় নিয়ে প্রভু বৃন্দাবন গমন করেছেন। পুত্রকে বিদায় দিয়ে শচী সাধারণের চক্ষে, বড় দুঃখে দিন কাটাতেন। কিন্তু প্রভুর কৃপায় তাঁর অন্তরে কোন দুঃখ ছিল না। যেহেতু প্রভু যেই তাঁর নিকট বিদায় নিতেন অমনি তিনি কৃষ্ণবিরহে বিহ্বল হয়ে সংসারের সব কথা ভুলে যেতেন।

প্রভু শুনলেন মথুরায় এসেছেন, অমনি হঠাৎ দণ্ডবৎ হয়ে পড়লেন, এবং উঠে হুঙ্কার করে বিশ্রামঘাটে ঝাঁপ দিলেন। অবগাহনান্তে নৃত্য আরম্ভ করলেন। প্রভুর হুঙ্কারে চারদিক কম্পিত হতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক সংঘর্ষ হতে আরম্ভ হল।

প্রেম আনন্দের প্রস্রবণ। তার প্রমাণ এই যে, প্রেমের যে অল্প ছায়া জগতে দেখা যায়, তা হতে অজস্র পীযূষ ধারা বয়ে যায়।...এই যে প্রভু আনন্দে মগ্ন হয়ে শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করছেন, এর মধ্যেও তাঁর প্রিয় যে জীবগণ তাদের বিস্মৃত হন নি।

ব্রজলীলার রস আর কিছু নয়, শ্রীভগবানকে নিজ জন বলে ভজনা করা।

জীব দুই কারণে শ্রীভগবানকে চায়। হয় ভয় পেয়ে, না হয় স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত।...জীব বলে 'আমাকে বর দাও' আর শ্রীভগবান বর দিলেন। কিন্তু গোপীদের ভালবাসা নিঃস্বার্থ। তাঁরা বর চাইলেন না। তাঁরা বললেন, 'আমরা তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় নিলাম। আমরা কিছু চাই না, তোমাকে চাই।'

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হচ্ছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে, হৃদয় ব্রজে। প্রভু বাইরে, অন্যে যা দেখে, তা দেখতে পান না। আবার প্রভু যা দেখেন তা অন্যে দেখতে পায় না। একে বলে দিব্যোন্মাদ।

কথাটি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। অবতার বলতে জগতে শ্রীভগবানের কি তাঁর অংশের উদয়। অবতার আর শাস্ত্র, এর মধ্যে অবতার বড়, যেহেতু যদিও শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞা বলে গৃহীত হয়, তবু সে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নয়। অবতার-বাক্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা। অতএব শাস্ত্র অপেক্ষা অবতার বাক্য বড়।

শ্রীভাগবতে প্রথম শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম জীবের প্রধান আশীর্বাদ। শ্রীমহাপ্রভু সেই কৃষ্ণপ্রেম কি তা দেখাবার জন্য অবতীর্ণ হলেন। এরূপ পবিত্র মধুর ধর্ম জগতে ছিল না।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের এই স্বাভাবিক চরম। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের বীজ একটি। সেটি এই যে, শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সনাতন জীবের প্রতি কৃপার্থ হয়ে নবদ্বীপে শচী উদরে অবতরণ করেন এবং জীবকে উপদেশ দিয়ে জীবের সঙ্গে আলিঙ্গন করে শেষে জীবের মুখ-চুম্বন পর্যন্ত করেছিলেন।

এ জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বীজ। এতে সেইটি বলা আছে। যাঁর হৃদয়ে এই বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে তাঁর আর কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই।

চৈতন্যদেব

শিশিরকুমার দাশ

চৈতন্যদেব তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন, কৃষ্ণ বিরহে নিমেষ আমার কাছে যুগের মত দীর্ঘ, বর্ষাধারার মত চোখ থেকে ঝরছে অশ্রু, সমস্ত জগৎ আমার কাছে শূন্যময়। তাঁর এই কবিতায় মর্মরিত হয়েছে বহু যুগের বহু ভক্ত সাধকের প্রাণের যন্ত্রণা, মধ্যযুগের বহু ভারতীয় সন্ত ও সাধকের মুখেও ধ্বনিত হয়েছে অনুরূপ কথা, পারস্যের সুফী কবিদের রচনাতেও আমরা শুনেছি অনুরূপ ঈশ্বরবিরহের কথা, কিংবা মধ্যযুগের খ্রীষ্টান মরমীদের মুখে, যাঁরা এই বিরহের স্তরটিকে বলেছেন আত্মার অন্ধকার রাত্রি, কিংবা ইহুদী সাধকদের স্তোত্রে। যুগে যুগে এই ধরনের ভাবোন্মাদ মরমী সাধকদের অভিজ্ঞতার প্রকাশ প্রায় সমান্তরাল, কখনও কখনও প্রায় অভিন্ন। তাই অনেক সুধী প্রশ্ন তুলেছেন, ধর্মীয় তত্ত্বের মধ্যে, আচারের মধ্যে যতই পার্থক্য বা বিরোধ প্রকাশ পাক না কেন, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? হিন্দু সাধক ও খ্রীষ্টান সাধকের পরিণামী

বল্লাল দীঘি

অভিজ্ঞতা কি এক ও অভিন্ন, না, ধর্মীয় অভিজ্ঞতাও নানা স্তরের নানা প্রকৃতির? এ প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর কেউ দিতে পারেননি, কিন্তু যখনই সাধকেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করেছেন তখনই দেখা গেছে তার মধ্যে অসাধারণ ঐক্য। হয়ত সেই কারণেই একজন সাধকের কণ্ঠে আমরা বহু সাধকের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনি।

বাঙালী যখন প্রথম চৈতন্যের কণ্ঠে সাধকের এই তীব্র বেদনাধ্বনি শুনেছিলো, কিংবা তাঁর জীবন ও কর্মকে প্রত্যক্ষ দেখেছিল তখন কি ভারতবর্ষের অন্য কোন সাধকের জীবনকথা তার মনে পড়েছিল? বাংলাদেশে তাঁর পূর্বে কি এমন কোন সাধক বা সন্ন্যাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ঈশ্বরবিরহের এমন তীব্রতা। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রান্তে হয়ত ছিলেন এমন কোন সাধক ও সন্ন্যাসী—চৈতন্যের জন্মের বহু আগে কোন কোন আলোয়ার-এর কণ্ঠে শুনেছি কৃষ্ণের জন্য এমনই তীব্র বেদনার কথা, কিংবা আণ্ডাল-এর কাব্যে দেখেছি এক কৃষ্ণবিরহিণী মানবীকে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ছিলো না, যদিও কোনভাবে তাঁদের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় হয়েও থাকে, সে পরিচয় ক্ষীণ। চৈতন্যের মধ্যে বাঙালী তাই প্রত্যক্ষ করেছিল একটি নতুন সাধককে, যাঁর কণ্ঠস্বর নতুন, কর্মধারা অভিনব এবং অপ্রত্যাশিত। অথচ তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল স্বাভাবিক প্রথাবদ্ধ পথেই। তিনি বিদ্যা অর্জন করেছিলেন, সেই সঙ্গে বিদ্যার অহংকারও। গৃহস্থ হয়েছিলেন যথাসময়েই, অনুমান করা অসঙ্গত নয় জীবনে তিনি সুখীই ছিলেন। অর্থবান না হলেও অস্বচ্ছল ছিলেন না, পারিবারিক জীবনে সুখ ও তৃপ্তি ছিল। তারপরই এল হঠাৎ পরিবর্তন। এর প্রাকৃত কারণ হয়ত তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু, হয়ত তেইশ বছর বয়সে গয়ায় ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এখান থেকে শুরু হল তাঁর নবজীবনের প্রস্তুতি, আর পঁচিশ বছর বয়স থেকে শুরু হল সন্ন্যাস জীবন। তখন থেকেই বাঙালী রচনা করতে শুরু করল চৈতন্যের এক ভাবমূর্তি। এই ভাবমূর্তির সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই, একথা বলছি না, বরং তাঁর বাস্তব জীবনই এই ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। এই ভাবমূর্তি রচিত হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে, তাঁর অনুচর ও সমকালীন ভক্তরা তাঁকে দেখেছেন অবতার রূপে, ভক্তেরা তাঁকে কৃষ্ণস্বরূপ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, চৈতন্যচরিতামৃতকার একাধিকবার বলেছেন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু স্বয়ং ভগবান', এবং নরহরি সরকার তাঁর মূর্তির পূজা করেছেন। ধীরে ধীরে চৈতন্য তাঁর প্রাকৃত রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়েছেন, মানুষ থেকে দেবত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ধর্মের ইতিহাসে ইতিপূর্বে অন্তত দুবার ঐতিহাসিক মানুষ এই মহিমা অর্জন করেছেন এবং অবতারে পরিণত হয়েছেন, বুদ্ধ এবং যীশু। বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসেও কৃষ্ণ, রাধা এবং গৌরাঙ্গ তিনটি তত্ত্ব মিলে বৈষ্ণবের পরতত্ত্ব।

কিন্তু চৈতন্যের যে ভাবমূর্তির কথা বলছি, সে ভাবমূর্তি আজকের বাঙালীর কাছেও স্পষ্ট তা কোন গৌরাঙ্গতত্ত্ব বা গৌরপারম্যবাদ নয়। তার মূল্য মূলত বৈষ্ণবতাত্ত্বিক বা বৈষ্ণবভক্তের কাছে। সাধারণ বাঙালীর কাছে, যার সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের কোন যোগ নেই, এমন বাঙালীর কাছে চৈতন্যের যে ভাবমূর্তি তা ঐ ভাবোন্মত্ত সাধকের, যিনি একই সঙ্গে একটি পুরাণকথাকে তাঁর জীবনে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন এবং নিজের জীবনের দ্বারা সেই পুরাণকথাটিতে নতুন তাৎপর্য সঞ্চার করেছিলেন। যে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর সঙ্গে বাঙালী তাঁর সমকালেই পরিচিত ছিল, জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের রচনায়, যে কাঠামো ছিল কাব্যের কাঠামো মাত্র, সেই রাধাকৃষ্ণ কাহিনী যেন তাঁর জীবনে আবির্ভূত হল। ভক্তেরা তাই তাঁকে 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতম্' বলে পরিচয় দিয়েছেন। যা ছিল কল্পনার সৃষ্টি, এবং কাব্যের বিষয়, তা হঠাৎ দেখা দিল একজন ব্যক্তির জীবনে। আর তার ফলেই রাধাকৃষ্ণ পুরাণকথার নতুন শক্তির উৎসার
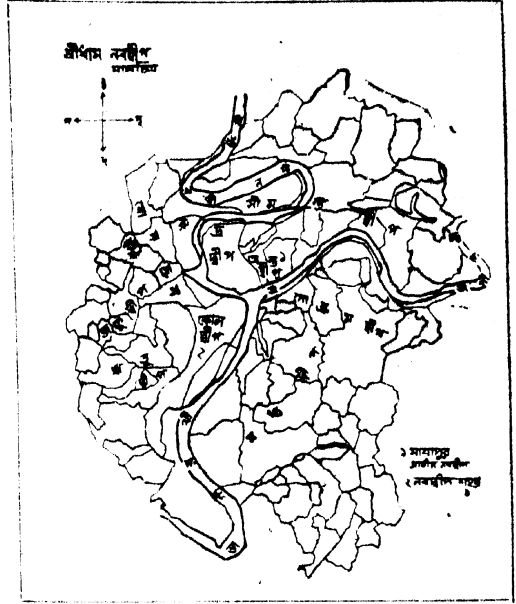
হল, এবার যে কাব্য লেখা হল তা আর শুধু কাব্যিক অভিজ্ঞতার বস্তু মাত্র রইল না, ভক্ত কবির হাতে তা হল নতুন একটা কাঠামো, তা রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর মাধ্যমে হয় নতুন একটি জীবনের বর্ণনা, কিংবা রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর পটভূমিকায় এবার যোজিত হল একটি ঐতিহাসিক মানুষের অভিজ্ঞতা। তাই চৈতন্যের জীবনে বাঙালী প্রত্যক্ষ করেছিল একই সঙ্গে একটি পুরাণকথার বাস্তব রূপ এবং তার ফলে পুরাণকথার আমূল রূপান্তর।

এর মূল কারণটা ছিল চৈতন্যের ধর্মানুভূতির প্রকৃতিতে। সেই প্রকৃতি মূলত কোমল। বাঙালীর চৈতন্যানুভূতি এবং চৈতন্যবিরোধিতা দুয়েরই মূল কারণ এখানে। আর চৈতন্যের যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে তার মূল উপাদানও এই কোমলতা। গত হাজার-দেড় হাজার বছরের বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে বাঙালী জীবনে 'কোমলতা'-র স্থান অত্যন্ত ব্যাপক, তার সাহিত্যে, শিল্পে, চিত্রে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, পারিবারিক জীবনে, ধর্মীয় জীবনে—শক্তি দেবী কালীর প্রাধান্য সত্ত্বেও। বাঙালী একটি মানুষের জীবনে আচরণে কর্মে এই কোমলতাকে এমনভাবে স্ফূর্ত হতে দেখেছিল যে তাকে জাতীয় স্বরূপের প্রতীক হিসেবে চিনতে দ্বিধা করেনি। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথায় 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'। চৈতন্যের যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে তা এই জাতীয় কোমলতার পূর্ণতার প্রতীক। চৈতন্যের প্রতি আধুনিক বাঙালীর যদি কোন সমালোচনা থাকে (এবং অনুমান করি তাঁর সমকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদেরও প্রধান সমালোচনা ছিল) এই কোমলতার বিরুদ্ধে। চৈতন্য জোর দিয়েছিলেন মৈত্রী ও ও প্রেমের ওপর, করুণা ও প্রীতির ওপর, জীবনের বিচিত্র সংঘাত ও দ্বন্দ্ব, সমাজের অসংখ্য বৈষম্য ও বিরোধিতার সমাধান অবশ্যই তিনি খোঁজেননি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও ব্যক্তির স্বার্থের সংঘাতের কি কারণ ও কি পরিণাম তা তাঁর চিন্তার পরিধির বাইরে ছিল, সমাজের পরিবর্তনের কারণ ও মানুষে মানুষে বিরোধের অসংখ্য কারণের জটিলতা সম্বন্ধে তিনি চিন্তিত হননি। কাজেই চৈতন্যের ধর্মবিশ্বাসে ও কর্মপন্থায় মধ্যে একটা সমাজের বা জাতির
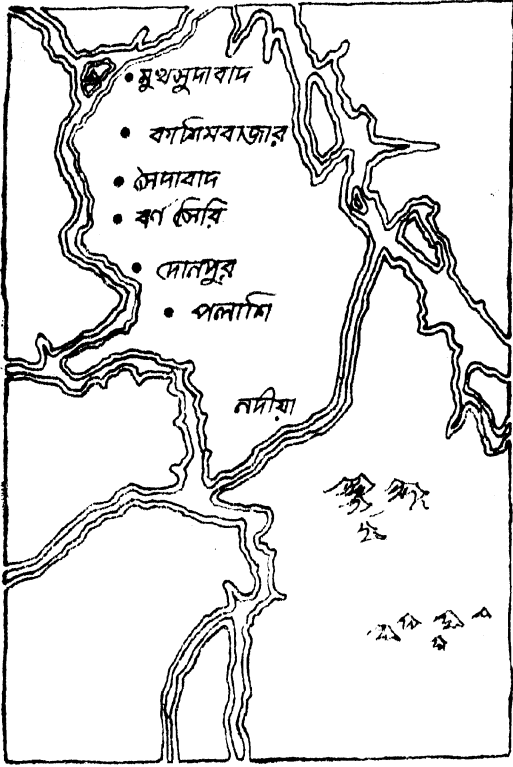
আচরণের ম্যানিফেস্টো সন্ধান নিতান্তই বৃথা। চৈতন্যকে বাঙালী মূলত গ্রহণ করেছে একজন সাধকরূপে, যাঁর মধ্যে তার জাতীয় চরিত্রের দিকটি বিকশিত হয়েছে, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে তাঁর একটি ভাব বিগ্রহ, যেখানে প্রেম ও কোমলতা, আবেগের তীব্রতা ও উচ্ছলিত ভক্তি একীভূত হয়েছে। চৈতন্য নামটি উচ্চারণের সঙ্গেই তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে এই মূর্তিটি, এক ঈশ্বরোন্মত্ত পুরুষ।

(২)

ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বিরাট ঘটনা ঘটেছিল, যাকে সাধারণত ভক্তি আন্দোলন বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। চৈতন্য এই ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম একজন নায়ক। এই ভক্তি আন্দোলনের একটা বড় উপাদান ছিল প্রতিবাদ। প্রতিবাদটা নানাভাবে দেখা দিয়েছিল। যে কোন সমাজেই যখন একটি কাঠামো, তা ধর্মজীবনেরই হোক, রাজনৈতিক জীবনেরই হোক, আস্তে আস্তে সজীবতা হারিয়ে কঠিন হয়ে ওঠে, তার উপযোগিতা সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে অথচ তার ভারটাই বড় হয়, তখনই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগে। সভ্যতার ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে চিরকালই এই লড়াই চলেছে। সমাজতত্ত্ব-বাদীরা বলেন একটা **structure** যখন স্থবির এবং স্থাবর হয়ে যায়, তখনই একটা **anti-structure** দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে সমাজে এই গঠনে এবং প্রতিবাদী গঠনে সংগ্রাম চলেছে। মধ্য-যুগের ভক্তি আন্দোলনের চেহারাটা কিছুটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। প্রতিবাদ ছিল অনেকক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে, জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, শুষ্ক পাণ্ডিত্য ও পাণ্ডিত্যাভিমানের বিরুদ্ধে। সারা ভারতবর্ষে এই সঙ্গে সব জায়গায় ভক্তি আন্দোলনের চেহারা এইরকম প্রতিবাদের নয়। অনেক জায়গায় ভক্তি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় প্রকাশেই সীমাবদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো নয়ই, বরং আনুগত্যই প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই যা-কিছু ভক্তি আন্দোলনের অন্তর্গত তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা এমন মনে না করাই ঠিক।

চৈতন্য যখন বাংলাদেশে একটা বিশেষ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁকে বেশ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যদি তিনি প্রথানুবর্তী হতেন, সমকালীন জীবনের রীতিনীতি মেনে চলতেন তাহলে অবশ্যই বিরোধিতা পেতে হতো না। তাঁর সমকালীন নবদ্বীপে বাঙালীজীবনের অনেকগুলি ধারাই বেশ প্রাণবান ছিল। একদিকে ছিল ন্যায়ের চর্চা, রঘুনাথ শিরোমণির হাতে যার নতুন গতিসঞ্চার। অন্যদিকে রঘুনন্দন গড়ে তুলেছিলেন নতুন স্মৃতিশাস্ত্র। তাঁর 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' হিন্দুসমাজের নতুন অনুশাসন। এতে তিনি তৈরী করলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটি কঠিন কাঠামো। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ চৈতন্য-সমকালীন শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক। চৈতন্যের প্রতি বিরোধিতা এসেছে শাক্ত, স্মার্ত এবং নৈয়ায়িক তিনটি দল থেকেই। তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপথ দুটির কোনটির প্রতি সমকালীন শক্তিশালী সম্প্রদায়গুলির আস্থা ছিল না। তাঁর চিন্তা ও কর্ম দুয়েরই মধ্যে তাঁরা একটা প্রতিবাদ লক্ষ্য করেছেন। ন্যায়ের চর্চা চৈতন্য যৌবনে করেছেন, ব্যাকরণ ও ন্যায়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মনে করেছেন ন্যায়চর্চা নিছক **scholasticism** মাত্র। তার সঙ্গে জীবনের মৌলিক সমস্যা-গুলির সম্পর্ক নেই। ভক্তি আন্দোলনের সবাই পাণ্ডিত্যবিরোধী, যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ নেই তার বিরোধী। রঘু-নন্দনের স্মৃতির বিরোধিতাও, যদিও চৈতন্য কোথাও স্পষ্ট করে স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানান নি, ভক্তি আন্দোলনের সাধারণ প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত। হিন্দুসমাজে জাতিভেদকে রঘু-নন্দন আরো পাকা করে তুলতে চেয়েছেন। চৈতন্য সোজাসুজি জাতিভেদ উঠে যাক, বা জাতিভেদ প্রথা খারাপ একথা বলেন নি কিন্তু হরিভক্তি পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভেদ স্বীকার করেন নি, এমন কি হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ এই মত প্রকাশ করেছেন। তার মত বা বক্তব্যের চেয়েও বড় হল এক্ষেত্রে তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ। তাঁর শিষ্য ও অনুচরদের দিকে তাকালে বোঝা জাতিভেদের কঠিন বন্ধনকে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাহলে বলা যায় না, তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট প্রতিবাদ নিয়ে এসেছিলেন।

শাক্তদের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতার কোন কারণ ছিল কি? শাক্তরা হয়তো তাঁর ধর্মজীবনের মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাধান্য, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দেখে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারেন। কিন্তু চৈতন্যের কি ভূমিকা ছিল শাক্তদের বিষয়ে? ভক্তি আন্দোলন উত্তরভারতে নির্গুণ ও সগুণ দুই ধারাতে পাশাপাশি রয়েছে। সগুণ ধারায় রাম, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ নানা দেবতাকে আশ্রয় করে সেই ধারা শতমুখে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, অথচ তার মধ্যে শক্তি-পূজার স্থান বেশী ছিল না। অথচ বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনার ধারা বহুদিন ধরে বয়ে চলেছে, শক্তিদেবীদের প্রভাব বাঙালী জীবনে রয়েছে বহু শতাব্দী ধরে। চৈতন্য যখন বাংলাদেশে আবির্ভূত হলেন তখনও শক্তিদেবীদের প্রাধান্য যথেষ্ট। অনেকেই চৈতন্যের ধর্মজীবনের প্রথম স্তরকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন মুসলমান শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে। বৃন্দাবনদাসের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে দেখব হিন্দুসমাজ এক নতুন অবতারের প্রত্যাশা করছিল, চৈতন্য সেই প্রত্যাশার পূর্ণতা। উৎপীড়িত সমাজে মানুষ যে অবতারের প্রতীক্ষা করে সে অবতার শক্তির উৎস। অথচ চৈতন্য কোন শক্তি-দেবীকে আশ্রয় করলেন না, তিনি আরাধনা করলেন কৃষ্ণকে, সেই কৃষ্ণও ঐশ্বর্যস্বরূপ, মাধুর্যস্বরূপ।

ভক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে দেখি, যদিও ভক্তি আন্দোলন

কোন কোন অর্থে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপন্থী এবং বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের কথাই বলেছে, তবুও ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত বিরল ছিল না। বাংলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের সংঘাতও নতুন নয়। এই সংঘাতের পেছনে তাত্ত্বিক কারণের চেয়েও আচারগত কারণই সম্ভবত বেশী ছিল। চৈতন্য শাক্তধর্মের কোন বিরোধিতা কখনও করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই, বরং পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য শ্রীজীব ভক্তিসন্দর্ভে রাধাতত্ত্বের সঙ্গে শাক্তের দুর্গাতত্ত্বের ঐক্য সাধন করেছেন, তিনি বলেছেন কৃষ্ণের স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রসমূহের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন দুর্গা। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবের শক্তিতত্ত্ব সহজেই তান্ত্রিকের শক্তি-তত্ত্বের সঙ্গে সমন্বয় করতে পেরেছে, এবং তার প্রেরণা ছিল চৈতন্যের জীবনেই।

চৈতন্যের জীবনে ও ধর্মান্দোলনে আসলে প্রতিবাদের চেয়েও সমন্বয়ের ভূমিকাই বেশী। তাঁর সমকালীন কবীর কিংবা কয়েকশ বছর পূর্ববর্তী বীর শৈবদের প্রধান প্রবক্তা বসবেশ্বর বা বসব-এর জীবনে ও কর্মে প্রতিবাদ অনেক বেশী। বসব বর্ণাশ্রম-ধর্মের পূর্ণ বিরোধিতাই শুধু করেননি, বেদ ও ব্রাহ্মণ এর শ্রেষ্ঠত্বে অবিশ্বাস করেছিলেন, মূর্তিপূজার পূর্ণ বিরোধিতা করেছিলেন। তেলুগু সাহিত্যের অন্যতম কবি এবং শৈবসাধক বেমন তীব্র ভাষায় ধর্মীয় আচার, পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে বলেছেন; বেমন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাশেষি জন্মেছিলেন। অনুরূপ তীব্রতা শুনি কবীরের কণ্ঠে। চৈতন্য ও তাঁর অনুচরবৃন্দ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযান করেননি, জাতিভেদ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য মৃদু, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অবসান চৈতন্য চাননি। এই দিক থেকে চৈতন্য ভক্তি আন্দোলনের প্রতিবাদী সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাননি। সেইজন্যে চৈতন্যকে বিদ্রোহী বা বিপ্লবী বলা চলে না, যদিও অনেকে তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের সুর আবিষ্কার করতে চান। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর মধ্যে সমাজের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই দেখা দেয়নি। আগেই বলেছি জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি ফতোয়া দেননি ঠিকই, কিন্তু নিজের জীবনে জাতিভেদ প্রথার আংশিক অবসান করতে পেরেছিলেন। উত্তর ভারতে তুলসীদাসের কাব্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবল সমর্থন দেখি, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাঁর অবিচলতায় আজকের পাঠক বিপন্ন বোধ করে। চৈতন্যদেব এদিক থেকে তুলসীদাসের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তুলসীদাসের মতই তিনি নামমাহাত্ম্যে বিশ্বাসী, কিন্তু জাতিমাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী।

আজ পাঁচশ বছরের দূরত্ব থেকে দেখা যায় হয় চৈতন্য বেমন বা বসব কবীরের মত সামাজিক প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু সেদিনের বাঙালী সমাজের পক্ষে তাঁর আচরণ অনেকাংশেই বৈপ্লবিক। বঙ্কিমচন্দ্র এক জায়গায় স্মার্তিশাসনকে শূদ্রপীড়ক বলেছেন। মানুষের সাধারণ সম্ভ্রমকে ষোড়শ শতাব্দীর স্মার্তশাসন নির্ভর ব্রাহ্মণসমাজ বিশেষভাবে বিপন্ন ও অপমানিত করেছিল। চৈতন্য এসে মানুষের সম্ভ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যখন তাঁর সংকীর্তনের আসরে নবদ্বীপের নানাশ্রেণীর লোকের আগমন হতে আরম্ভ করল তখন থেকেই নবদ্বীপের কোন কোন গোষ্ঠীর বিরোধিতা শুরু, তাঁর কাছে বহু মানুষের আসার মূল কারণই মানুষের প্রতি তাঁর সম্ভ্রমবোধ। জাতি বা বর্ণের মাপকাঠিতে নয়, ঈশ্বরপরায়ণতা এবং ঈশ্বরভক্তির আদর্শে এই মনুষ্যত্বের সম্মান তিনি দিলেন। অনেকেই চৈতন্যের প্রথম সংগঠিত নগর-সংকীর্তনকে ভারতবর্ষের প্রথম সত্যাগ্রহ বা শাসক শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। তা বোধহয় সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে চৈতন্যের বিরুদ্ধে নবদ্বীপের কাজীকে উত্তেজিত করার পেছনে কিছু হিন্দুশক্তিও ছিল, এবং তার মূল কারণ ছিল তাঁর ধর্ম সাধনায় জাতিভেদের অস্বীকার। অর্থাৎ বাঙালীর ইতিহাসে, হিন্দুসমাজের ইতিহাসে চৈতন্যই প্রথম ব্যক্তি, প্রথম ধর্মসাধক যিনি মানুষের স্বাভাবিক সম্ভ্রম ও সম্ভাবনাকে সম্মান দিলেন।

ভক্তি আন্দোলন

৩

সর্বভারতের ভক্তি আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আবেগবিহ্বলতা। গীতায় ভক্তির কথা আমরা শুনেছি, সে ভক্তি ধীর ও সমাহিত, প্রশান্ত ও অনুদ্বেলিত। ভাগবতের ভক্তিতে লেগেছে অন্য রং। সে ভক্তিতে এসেছে উচ্ছলতা ও চাঞ্চল্য। দক্ষিণ ভারতের তামিল বৈষ্ণব সাধকদের জীবনে ও রচনায় দেখি ভক্তির বিহ্বল রূপ—যে রূপ আমরা দেখি চৈতন্যের জীবনে ও তাঁর অনুচরদের জীবনে। চৈতন্যচরিতামৃতে আছে 'পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত'-এর অভিযোগ ছিল "হিন্দুর ধর্ম ভাঙিল নিমাঞি। যে কীর্তন প্রবর্তাইল কভু শুনি নাই।" শুধু তাই নয় "উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি। মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি। না জানি কি খাঞা মত্ত হয়্যা নাচে গায়; হাসে কাঁদে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়।। নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্তন। রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ।।" অর্থাৎ চৈতন্যের ধর্মজীবনে এমন একটি নতুনত্ব ছিল যার জন্য অনেকে তাঁর সমালোচনা করেছেন। বলাই বাহুল্য ভারতবর্ষের অন্য অনেক সাধকের জীবনে, বিশেষত তামিলনাদের বৈষ্ণব সাধকদের জীবনে এই ভাবোন্মাদতার কথা আমরা জানি, কিন্তু সম্ভবত বাংলাদেশে চৈতন্যপূর্ব কোন সাধকের জীবনে এইরকম অবস্থা দেখা দেয়নি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় esctacy বাংলায় বলতে পারি ভাবোন্মাদনা, আমাদের পরিচিত আর্যধর্মের মধ্যে তার স্থান নেই। অথচ তামিলনাদের বৈষ্ণবদের সাধনায়, বা চৈতন্যের সাধনায় তা এল কোথা থেকে। ভক্তি বা প্রেমের প্রকাশকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংযত ও সংহত ভাবে প্রকাশ করেছে। ভক্তি বা প্রেম স্বভাবতই উচ্ছল হতে পারে, তত্ত্বের বন্ধন যদি কঠিন হয় তাহলেই সে স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করতে পারে না। কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সেই বন্ধন ছাড়িয়ে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলেছিলেন ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে দুটো ধারা মিশেছে, একটি গীতার উচ্চ ধর্মতত্ত্ব, অন্যটি অনার্য আভীর গোপজাতির লোক প্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা। এই সূত্র ধরে আর একটু এগিয়ে বলা যেতে পারে কি, ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের এক প্রান্তে যদি থাকে ব্রাহ্মণ্য উচ্চ ধর্মতত্ত্ব, আর একদিকে আছে এক বা একাধিক লোকধর্ম। লোকধর্মগুলির একটি লক্ষণ এই আবেগের অবারিত প্রকাশ। উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও ধর্ম যেমন পুরাণকথার সাহায্যে, নানা দেবদেবীর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে একটি প্রচলিত হিন্দুধর্মে পরিণত হয়েছে, তেমনই এও কি সত্য নয় যে, হিন্দুধর্মের, বিশেষ করে ভক্তি আন্দোলনকালীন হিন্দুধর্মের একটা লোকভিত্তিও ছিল। অনেক দেবদেবীর ইতিহাস আলোচনা করে দেখা গেছে তারা এক লোকসমাজ থেকে হিন্দুর বৃহৎ দেবসংঘে স্থান পেয়েছেন। লোকসমাজে প্রচলিত ধর্মাচার, উচ্চ ধর্মের আচারের সঙ্গে, বিধির সঙ্গে মিলেমিশে আছে। প্রমাণ করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু অনুমান করা অসঙ্গত হবে না ভক্তিধর্মের বিকাশের সময়, দেশের বৃহত্তর লোকসমাজে প্রচলিত কিছু কিছু ধর্মচিন্তা, প্রথা ও আচরণ নতুনভাবে শাস্ত্রীয় হিন্দুধর্মের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। যে ধর্মোন্মাদনা বৈষ্ণবের ইতিহাসে দেখেছি, তার অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় সুফী সাধকদের জীবনে, এমনকি কোন কোন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভাবোন্মাদনার প্রচণ্ড বিহ্বলতা ও মাদকতার কথা আমরা শুনি নেও-প্লেটোনিস্ট-এর মুখে, কিংবা তারো আগে অরফিক রহস্যের মধ্যে কিংবা এলেউ-সিনিয়ান রহস্যে। অর্থাৎ মানুষের ধর্মের ইতিহাসে ভাবোন্মাদনার

একটা স্থান এবং মূল্য যুগে যুগেই স্বীকৃত হয়েছে। ঈশ্বরের জন্য ভাবোন্মাদনার ভিত্তি অবশ্যই ব্যক্তিগত অনুভূতি, বাংলা-দেশে বৈষ্ণবদের মধ্যেও যখন এই উন্মাদনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, তার পেছনে ছিল চৈতন্যের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও তার অকুণ্ঠ প্রকাশ। প্রকাশের এই অকুণ্ঠতা, আবেগের অবারিত বিস্তার স্বাভাবিকভাবেই চৈতন্যচরিত্রকে যেমন লোকের সামনে মহনীয় করে তুলেছিল, তেমনই সাধারণ জনসমাজ তার ধর্মীয় আত্মপ্রকাশের এবং উপলব্ধির নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল নতুন বৈষ্ণব ধর্মে।

মধ্যযুগের ভক্তিধর্মে, বাংলাদেশের ভক্তি আন্দোলনও তার ব্যতিক্রম নয়, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অনুভূতির একটা বিরোধ বড় হয়ে উঠেছিল। কিছু পরিমাণে ইউরোপের ধর্মান্দোলনেও সেই লক্ষণ দেখা যায়, বিশেষ করে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। বার্ণার্ড কিংবা হিউ মধ্যযুগীয় scholaticism -এর বিরোধিতা করে অনুভূতির গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন, যুক্তির পরপারে যে সত্য তা বুদ্ধির গম্য নয়, তা অনুভূতির গম্য নয়। আমাদের ধর্মজীবনে এই মিস্টিক অনুভূতির কথা বারবার বলা হয়েছে, ভক্তি আন্দোলনে তা প্রাধান্য পেয়েছে মাত্র। অনুভূতির ওপর জোর দেওয়ার ফলে, শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ক্রিয়াকর্মের ওপর শৈথিল্য আসা স্বাভাবিক। অবশ্য প্রত্যেক ধর্মগোষ্ঠী কোন-না কোন গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলে মানে, কোন-না-কোন গ্রন্থ থেকে ধর্মীয় অনুশাসন সংগ্রহ করে। চৈতন্য যেসব গ্রন্থ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন, তাদের কোনটিই খুব প্রাচীন নয়। ভাগবত অনেকেরই ধারণা দক্ষিণ ভারতে রচিত এবং তার রচনাকাল দশম শতাব্দী। এছাড়া চৈতন্যের প্রিয় রচনা হল বিদ্যাপতির কবিতা, মৈথিলীতে লেখা; আর চণ্ডীদাসের কবিতা, বাংলায় লেখা। আর দুটি গ্রন্থ তাঁর অতি প্রিয়, দুটোই সংস্কৃতে লেখা, গীতগোবিন্দ, দ্বাদশ শতাব্দীতে, আর কৃষ্ণকর্ণামৃত, যার রচনাকাল কারো কারো মতে পঞ্চদশ শতাব্দী। সমস্ত ভক্তি আন্দোলনেই যেহেতু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় ধর্মের সঙ্গে কমবেশি বিচ্ছেদ দেখা যায়, ধর্ম-গোষ্ঠীর শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে সংস্কৃতে লেখা অর্বাচীন গ্রন্থাদি, এবং তার চেয়েও বড় কথা, প্রাদেশিক ভাষায় লেখা গান ও কবিতা। চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে বাংলাভাষা বাঙালীর ধর্ম-জীবনের ভাষা হিসেবে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক মর্যাদা পেল। শুধু তাই নয়, এই ভাবোন্মাদনার প্রকাশ যেহেতু ঘটল বাংলাভাষাতেই (সংস্কৃতেও বৈষ্ণবরা লিখেছেন, কিন্তু তা শুধুই মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞের জন্য) বাংলাভাষার চেহারায় এল একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন। চৈতন্য-পরবর্তী বাংলা কবিতার দিকে তাকিয়ে, তার প্রকাশ-শক্তির আকস্মিক বিশাল বিস্তার, তার প্রাণচঞ্চলতার বিপুল বেগ, তার অলংকরণের নিবিড়তায় লক্ষ্য করে বলা চলে—

এ যে সংগীত কোথা হতে উঠে
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ
নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিণীভরে।

একটি সাহিত্যের বিশেষ একটি রূপ সৃষ্টি করা একজন অ-সাহিত্যিকের পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার। যে ভাববিহ্বলতা চৈতন্যের ধর্মজীবনে, সে বিহ্বলতা যখন সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করল, তখন সৃষ্টি হল এক অভিনবত্বের। যে মাধুর্য চৈতন্যের ঈশ্বরের স্বরূপ, এবং যে কোমলতার মূর্ত কান্তি চৈতন্য, সেই মাধুর্য এবং কোমলতা দিয়ে গড়ে উঠল এই নতুন সাহিত্য। এবং শুধু সাহিত্য নয়, ভাষাটাকেই গড়তে চাইলেন বৈষ্ণব সাধকেরা আরো মাধুর্য দিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উক্তিগুলি মাধুর্যে ও কোমলতায় গড়া। ঐ কাব্যের শক্তি ও দুর্বলতা দুই-ই নিহিত রয়েছে এই মাধুর্য ও কোমলতা অর্জনের প্রচেষ্টার মধ্যে। বাংলাভাষায় একটা নতুন কলধ্বনি শুনলাম বৈষ্ণবের কবিতায়, যুক্ত ধ্বনিগুলি ভেঙে গিয়ে স্বরলীলার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিল, আর নয়ত তুলল ধ্বনির নবীন গুঞ্জন, সৃষ্টি হল একটা ললিত লীলায়িত ছন্দস্পন্দের, যার মাধুর্য চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ জীবনের মতই জ্ঞান ও কর্মের জগৎ ছাড়িয়ে বাঙালীকে পৌঁছে দিলে খরস্রোতা রসতরঙ্গে, যার কলধ্বনি বাঙালীর সাহিত্যকর্ম ও রুচিকে বহু শতাব্দী ধরে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ভারতীয় ঐতিহ্য

চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ জীবনের সঙ্গেই মিলিয়ে দেখতে হবে কীর্তনকে। চৈতন্যকে সংকীর্তন-প্রবর্তক বলে তাঁর ভক্তরা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আমরা জানি ধর্মে সংগীতের স্থান ছিল নিতান্তই গৌণ। শিব ও বিষ্ণু উপাসনাতে একদা ব্রাহ্মণের পক্ষ বেদগানই ছিল একমাত্র গান। ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল নৃত্যগীতবাদ্যের প্রয়োগে। তামিল ভাষার একটি কাহিনী-কাব্য শিলপ্পদিকারম্-এ দেখি কুরবৈ নৃত্যের প্রসঙ্গ, কৃষ্ণই একদা গোপকুমারী নপ্পিন্নাই-এর সঙ্গে এই নৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন। এ-কাব্য রচিত হয়েছিল, ভাগবতের বহু আগে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। তামিল ভক্তদের সামনে ছিল বহু প্রাচীন নিদর্শন, যার মূলে অবশ্যই ছিল লোকজীবনের ধর্মচর্চায়, সেখানে সম্ভবত নৃত্য ও গীত ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল। দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য' (১৯৬৪) গ্রন্থে লিখেছেন, 'জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের (শৈব ও বৈষ্ণবদের) আবেগমূলক ভক্তিধর্ম প্রচারের প্রধান বাহনরূপে তাঁহারা সংগীতসাধনাকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোনো বিশিষ্ট সিদ্ধ পুরুষকে পুরোভাগে রাখিয়া দলে দলে ভক্তসাধারণ নৃত্যগীতসহযোগে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া দেশ পরিক্রমা আরম্ভ করিল।...প্রবল ধর্মোন্মাদনার ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল নতুন নতুন মঠ ও মন্দির। অবশেষে সেই মন্দিরে মন্দিরে চলিল তাহাদের তীর্থযাত্রা, পথে পথেই রচিত হইল সংগীত।' ভক্তি আন্দোলনের শেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ত্যাগরাজের হাতেই কর্ণাটকী সংগীতের নব উজ্জীবন। চৈতন্য যে সংগীতকে তাঁর ধর্মসাধনার একটি অঙ্গ করে নিয়েছিলেন, তার পেছনে একটি কারণ অবশ্যই তাঁর শিল্পরুচি। যিনি জীবনে ধনবল ও লোকবলের মতোই, কবিতাও কামনা করেননি। কবিতাকে কিন্তু তাঁর ধর্ম-জীবনের পাথেয় করে নিয়েছিলেন, আমরা আর কোন ধর্মসাধকের কথা জানি না যিনি সংস্কৃত ও প্রাদেশিক সাহিত্যের এত অনুরাগী ছিলেন। সংগীতও তাঁর শিল্পগত মনের সঙ্গী।

চৈতন্যের ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভবের আগে থেকেই অবশ্য বাংলাদেশে হরিকীর্তন বা হরিসংকীর্তন প্রচলিত ছিল, বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবতেই তার উল্লেখ আছে। তবে চৈতন্যই তাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেন এবং জনসমাজে প্রসারিত করেন। জন-সমাজে যে কীর্তন ব্যাপকতা লাভ করেছিল তা নামসংকীর্তন। ভক্তের আবেগবিহ্বলতার প্রকাশের একটি মাধ্যম ছিল এই নাম-কীর্তন। কিন্তু আর একধরনের কীর্তনও প্রচলিত হয়েছিল চৈতন্যের প্রচেষ্টায়, যাকে বলা হয়ে থাকে লীলাসংকীর্তন। তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কীর্তনের বিশেষ বিধিবদ্ধ গায়ন-রীতি গড়ে উঠল, সম্ভবত নরোত্তমদাসের হাতে। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে কীর্তনের উল্লেখ নেই। সম্ভবত লৌকিক রীতি থেকেই এর উৎপত্তি। চৈতন্য সেই লৌকিক রীতির নতুন সম্ভাবনা

খুলে দিলেন, তা পরিশীলিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠ হল এবং বাঙালীর সংগীতসাধনার ইতিহাসে তার স্থান বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানের চেয়ে সম্ভবত আরো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বৈষ্ণবের সাহিত্য এবং বৈষ্ণবের সংগীতরূপে যার আরম্ভ, তা শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। আর তার পেছনে যদি কোন প্রেরণার সন্ধান আমরা করি তা আছে চৈতন্যের ভাবোন্মাদনায় এবং ভাববিহ্বলতায়।

৪

ভক্তি আন্দোলন যদিও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছিল, তার রূপের অখণ্ডতার কথাও অনেকেরই চোখে ধরা পড়েছিল। মধ্যযুগেরই একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভক্তিধর্ম দ্রাবিড়ে উৎপন্ন, তার বৃদ্ধি কর্ণাটকে, মহারাষ্ট্রেও তার বিকাশ, গুর্জরে তার সাময়িক জীর্ণতা, আবার বৃন্দাবনে তার নবরূপ লাভ। এই শ্লোক খুব প্রাচীন নয়, হবার কথাও নয়। এর মধ্যে আছে ভক্তিধর্মের প্রাদেশিক প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যে সর্বভারতীয় রূপ ফুটে উঠেছিল তার কথা। ভক্তিধর্মের একটি বড় লক্ষণ হল, প্রাদেশিক বন্ধনকে স্বীকার করে, প্রাদেশিক ভাষার মূল্য স্বীকার করার পরেও তার মধ্যে ছিল আর একটি প্রেরণা, তাকে বলতে পারি ভারত-অভিমুখিতা। ভারত বলতে শুধু ভৌগোলিক ভারতবর্ষের কথা বলছি না, বলছি সাংস্কৃতিক ভারতবর্ষের কথা। ভক্তিধর্ম ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বহু ব্যাপারের সমালোচনা করেছে, বিরোধিতা করেছে, কিন্তু ভক্তিধর্ম ভারতবর্ষের অতীত সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা কামনা করেনি। প্রতিবাদের প্রেরণাই এসেছিল সমন্বয়ের বোধ থেকে। সেই সমন্বয় কখনও হিন্দুগোষ্ঠীর মধ্যেই মানুষে মানুষে সমন্বয়—জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই সমন্বয়ের অভাববোধ থেকে—। কখনও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়, কবীর এবং নানকে যার সবচেয়ে বড় প্রকাশ। ভক্তিধর্মের ইতিহাসে দেখেছি ভক্তরা একটি প্রদেশের নির্দিষ্ট গণ্ডী বা ভাষার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেননি। বিদ্যাপতির কবিতা মিথিলার বাইরে ছড়িয়ে গিয়েছে, মীরার গান গুজরাতী ও রাজস্থানী দুই ভাষারই সম্পদ, নামদেব মরাঠী ভাষাতেও কবিতা লিখেছেন, আবার সধুক্কড়ী খড়ীবোলী এবং ব্রজ ভাষাতেও কাব্য রচনা করেছেন। আর গ্রন্থসাহেব-এ সংকলিত হয়েছে নানা ভাষার নানা কবির কবিতা। এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে আছে সমকালীন ভারত অভিমুখিতা। কিন্তু আরো প্রচেষ্টা আছে যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে অতীত ভারতমুখিতা। অবশ্য তার কারণ অতীতপ্রিয়তা নয়, তার কারণ ঐতিহ্যধারার সঙ্গে যোগ রচনা। মধ্যযুগে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় তার কারণও ঐ। সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে যেমন প্রাদেশিক ভাষার ভেদকে লঙ্ঘন করা যাবে, তেমনই একটি বহতা পরম্পরার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করা যাবে। এই পটভূমিকাতে দেখলে দেখা যাবে বাঙালী জীবনে চৈতন্যের একটি বড় দান এই ভারত-অভিমুখিতা।

এই ভারত-অভিমুখিতাকে আর একটা ভাবে দেখা যেতে পারে। আজকাল কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে দুধরনের ঐতিহ্যধারা বা পরম্পরার অস্তিত্বের কথা বলে থাকেন। একটা Great tradition— যা দীর্ঘকাল ধরে বয়ে চলেছে, যার রূপটা অনেকটা নির্দিষ্ট, বিধিবদ্ধ, এবং বহুদিন ধরে যা শ্রদ্ধেয় বলে পরিগণিত। আর একটা হল Little treadition— যার প্রসার ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে, তা সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যে আবদ্ধ, সমগ্র সমাজের কাছে আদর্শের বা শ্রদ্ধার বিষয় নয়। প্রকৃতপক্ষে, একটু প্রসারিত অর্থে ভারতমুখিতা এই দুই ঐতিহ্যধারার সমন্বয়। আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে আমরা দেখেছি ছোট ছোট ঐতিহ্যধারা কিভাবে বৃহৎ ঐতিহ্যধারায় বিলীন হয়ে গেছে। আবার কখনও কখনও বিভিন্ন ছোট ছোট ঐতিহ্যধারা মিলেমিশে একটি বৃহৎ ঐতিহ্যধারায় পরিণত হয়েছে, তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধছে অন্য ছোট ছোট ঐতিহ্যধারার। চৈতন্যের জীবন ও কর্মের মধ্যে ভারতমুখিতার এই সবকটি দিকই দেখা যাবে।

দিব্য জীবন

চৈতন্য তাঁর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে দিয়েছিলেন নবদ্বীপ থেকে নীলাচল এবং নীলাচল থেকে বৃন্দাবন। ভক্তিধর্মের উদ্ভবভূমি দাক্ষিণাত্য পরিক্রমাও তিনি করেছিলেন। তার পেছনে শুধুই সন্ন্যাসীর তীর্থদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ছিল ভক্তিধর্মের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচয় সন্ধান। এই পর্যটনের ফলে বহু সাধকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন, তাঁর চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেক মানুষের মধ্যে, গ্রন্থ সংগ্রহ করেছেন, যেসব গ্রন্থ পরবর্তীকালে বৈষ্ণবের শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাশির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধকেরাই এইভাবে জীবনের কোন সময়ে তীর্থপরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছেন যার একটা বড় উদ্দেশ্যই হল আরো ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্যধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এবং নিজের অবলম্বিত ঐতিহ্যধারাকে পূর্ণতা দেওয়া এবং পরিপুষ্ট করা। কিন্তু চৈতন্যের আবেগবিহ্বল ভাব ও প্রেমের ধর্মকে একটি সুঠাম তাত্ত্বিক রূপ দিতে না পারলে এই ভারতমুখিতার আয়োজন ব্যর্থ হত। চৈতন্য সেই পথে নির্দেশিত করেছিলেন বৃন্দাবনের গোস্বামীদের। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রকাশের মাধ্যম হল সংস্কৃত, কারণ শুধু ঐ ভাষার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সুধীসমাজের কাছে পৌঁছনো যেতে পারবে, আর ঐ সংস্কৃতই হবে অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের সেতু। সনাতন লিখলেন পৌরাণিক আদর্শে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ বৃহদ্‌ভাগবত; ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা; রূপ চৈতন্যের আদেশে লিখলেন কৃষ্ণলীলা নিয়ে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক, কাব্যসংকলন করলেন, নতুন অলংকারশাস্ত্র রচনা করলেন, জীব রচনা করলেন ব্যাকরণ, রসশাস্ত্র, বৈষ্ণব স্মৃতি, বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থ। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কর্ম ও সাধনায় চৈতন্য জীবনের ও কর্মের বৃত্ত পেল সম্পূর্ণতা। শেষ জীবনে তাঁর মধ্যে চরম হয়ে উঠেছে দিব্যোন্মাদরূপ এইটিই হল বৈষ্ণবের অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত মুহূর্ত। নবদ্বীপে তাঁর অনুচরবৃন্দ প্রচার করে চলেছেন চৈতন্যের অভিজ্ঞতার কথা, অনুভূতির কথা, তার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চাইছেন এক নতুন ধর্মসম্প্রদায়, ভেদ বিপন্ন হিন্দু সমাজে যে ধর্মকথা আনছে নতুন আশা। এই হল চৈতন্যধর্মের কর্মের দিক, প্রচারের ও প্রসারের দিক। তার লক্ষ্য জনসমাজ, তার জন্য গড়ে উঠেছে একটি সজীব পুরাণ কথা, রাধাকৃষ্ণ লীলা, কাব্যে ও সংগীতে তা বিকশিত হয়ে উঠছে। আর বৃন্দাবনের কর্ম ও সাধনার মূল ভিত্তি বুদ্ধি ও জ্ঞান। জ্ঞান কিন্তু নিছক বুদ্ধিবিলাস নয়, একটি অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের ভাষায় অনুবাদ করা। যে রসশাস্ত্র গড়া হচ্ছে তার কাঠামো প্রাচীন, আর বস্তুটা নতুন। যে অলংকারশাস্ত্র তৈরী করা হচ্ছে তার কাঠামো বৈষ্ণবের সৃষ্টি নয়, তা ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের সাধারণ সম্পত্তি, কিন্তু তার বিষয়টা বৈষ্ণবের। যে দর্শনশাস্ত্র তৈরী হয়েছে তার কাঠামো ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের, তার আলোচ্য বিষয়টা বিশেষভাবে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনে আর কোন সম্প্রদায়ে একই সঙ্গে এই তিনটি উপাদানের সমন্বয় দেখা যায়নি।

ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নতুন ধর্ম ও নতুন সংস্কৃতি তার পূর্বতর সমাজের ধর্ম, দর্শন, কাব্য, শিল্পকে নতুনভাবে গ্রহণ করতে চায়। হয় তাকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করে,

তার ভাবকে রূপান্তরিত করে নেয়, আর তা না হলে তা গোপনে গোপনে কাজ করে যায়। বৌদ্ধধর্ম পূর্ববর্তী এবং সমকালীন ধর্মকে রূপান্তরিত করে গ্রহণ করেছে। খ্রীষ্টধর্ম প্লেটোকে অস্বীকার করতে পারেনি, গ্রীক দর্শনের মত, গ্রীক সাহিত্যকে এবং ল্যাটিন সাহিত্য allygory র মাধ্যমে নিজের জগতের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছে। মধ্যযুগের ভক্তি সাধনায় অবশ্য বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মত স্পষ্ট ভেদ দেখা দেয়নি বেশীর ভাগ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, আর খ্রীষ্টধর্ম ও প্রাক্-খ্রীষ্টীয় প্যাগান ধর্মের ও সংস্কৃতির প্রভেদের অনুরূপ অবস্থার প্রশ্নই ওঠে না। তবু ভেদ তো ছিল, কখনও তত্ত্বগত, কখনও নিতান্ত সামাজিক কারণবশত, কখনও কালের ব্যবধানের ফলে মানসিকতার। চৈতন্য ধর্ম প্রাচীনের সঙ্গে সেতু রচনাও করতে চেয়েছে। বৈষ্ণব গোস্বামীরা তাঁদের কাব্যে ও নাটকে, তত্ত্বরচনায় ও প্রাচীন গ্রন্থের ভাষ্যে, রসশাস্ত্র ও অলঙ্কারে সেই সেতু রচনা করেছেন। এবং এই দিক থেকে দেখলে চৈতন্যের যে মূর্তি গত পাঁচশ বছর ধরে বাঙালীর মনে গড়ে উঠেছে তা কিছুটা অসম্পূর্ণ মনে হতে বাধ্য। নিশ্চয়ই তিনি দিব্যোন্মাদ পুরুষ, কৃষ্ণবিরহে নিমেষকে যাঁর যুগের মত দীর্ঘ মনে হয়; জীবনের সব মাধুর্য, সব কোমলতা দিয়ে তাঁর মূর্তি গড়া, তিনি পুঞ্জীভূত আবেগ, একাগ্রিত উন্মাদনা। কিন্তু তিনিই প্রয়োজনে প্রতিবাদ এবং বিরোধিতা। তিনিই স্বভাবে সমন্বয়ের সন্ধানী। তাঁর কাছে ঋণী বাংলাভাষা ও বাংলা কবিতা, বাঙালীর সংগীত ও বাঙালীর সাহিত্যরুচি। তিনি একটি পুরাণ কথার ব্যাখ্যাতা ও তার আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার প্রবক্তা। আর তাঁর নিজের জীবনও একটি পুরাণ কথায় রূপান্তরিত। তিনি মধ্যযুগের প্রথম বাঙালী যিনি মানুষের অস্তিত্বের সম্ভ্রমে আস্থাশীল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তাঁর দিব্যোন্মাদ জীবনের আলোক উৎস থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছে আরো দুটি রশ্মিরেখা, একটি কর্মের পথে, একটি জ্ঞানের পথে; একটি জনজীবনের মধ্যে ব্যক্তিকে প্রসারিত করার পথে, অন্যটি ইতিহাসের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার যোগের পথে।

মহাপ্রভুর জন্মস্থান

চাঁদ কাজীর সমাধি

প্রেম কখন বিপ্লব?

প্রসূন মিত্র

প্রেম হল বৈপ্লবিক বিধান। বৈজ্ঞানিক সূত্র। চরাচরের যা কিছু সব—মানুষ, মানুষেতর প্রাণী ও তার একান্ত প্রতিবেশী হরিৎ পারিপার্শ্বিকের ঈশোপনিষদে যাকে বলেছে জগত্যাং জগৎ, সেই সব কিছুরই বেঁচে থাকা আর বেড়ে ওঠা, হয়ে ওঠা আর কয়ে ওঠা, স্ফুট অস্ফুট নানা ভাষায় স্ফুরিত হবার আকুতির পেছনে স্ফূর্তির যে অধরা রহস্য, সেই স্পন্দনের বীজ নিহিত আছে প্রেমে। তারই উচ্চারণকে বলি ঃ নাম। আব্রাহ্মণ চণ্ডাল বিশ্বের হাটেবাজারে এই নামমাধুর্যই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ দেব—যার বিকল্প নেই।

আমার ভাল লাগে এক নদের চাঁদ গোরা গো।'

আমার ভাল লাগে এব নদের চাঁদ গোরা গো।'

মোমের মতন মোলায়েম, চাকভাঙা মধুর মতন ঘরোয়া ভাললাগার এই আটপৌরে সংলাপে নেই অলংকারের আদিখ্যেতা, নেই মসৃণ মনোহার ময়েন। মামুলি মানুষের মরমের মৌচাকে সুদীর্ঘ পাঁচ-পাঁচটি শতাব্দী ধরে মৌসঞ্চয় করে রেখেছে নিমফুলের মধুর মতন একটি নাম ঃ নদের নিমাই। নিমগাছের তলায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তাই নিমাই। কেউ কেউ বলেন, মহাপণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র তখন একেবারেই নিঃস্ব। কুঁড়েঘরটুকু তোলারও সামর্থ্য ছিল না। তাই নাকি শচীমাতাকে গাছতলায় সন্তান প্রসব করতে হয়েছিল। একথার প্রমাণ নেই। তবে ঈশ্বরের পুত্র তো প্রায়ই এসেছেন অমনি ভাবেই.. কংসের কারাগারে...বেথেলহেমের আস্তাবলে। গৌরাঙ্গ জন্মেছিলেন ফাগুন মাসে। পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যা। চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছিল। জগন্নাথ মিশ্রের নিম-তুলসী ছাওয়া মেটে আঙিনা হরিনাম কীর্তনে ভেসে যাচ্ছিল। বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া গোরাচাঁদ সেই লগ্নে কায়া ধরেছিলেন। জায়গাটা নবদ্বীপ। ভাগীরথীর পূবপারে। গ্রামের নাম মায়াপুর। সময়টা চোদ্দশ' সাত শকাব্দ।

ভাগবতের এক জায়গায় কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের সম্ভাব্য লীলা বর্ণনা করে বলা হয়েছে,—তিনি এবারে গৌরকান্তি নিয়ে আসবেন, সাঙ্গোপাঙ্গো অস্ত্রপার্ষদ সঙ্গে নিয়ে চলবেন। 'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি বিশ্লেষণ করে জনশিক্ষা দেওয়াই তাঁর ধর্ম হবে। যাঁরা ভক্ত সুধীজন, তাঁরা চিহ্ন মিলিয়ে হিসেব করে দেখেছেন নবদ্বীপের গৌরহরিই কলির কৃষ্ণ। সাধারণ মানুষ আমরা ভাগবতীয় ব্যাখ্যা শুনতে অভ্যস্ত, বুঝতে সক্ষম নই। যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা 'কৃষ্ণ' শব্দটি ভেঙেচুরে পান 'কৃষ্' অর্থাৎ যা সবকিছুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে—অল অ্যাট্রাকটিভ। আমরা এসব বুঝি না, আমরা কেবল খুঁজি—একটি মনের মানুষকে, যে মানুষ হয়েও ভগবান, মর্ত্যে যার লীলাখেলায় আমরা নিজেদের মানব-জীবন ধন্য করি।

মানুষ চৈতন্যদেবকে জানতে হলে তাঁর পার্ষদ পরিচয়

বল্লাল ঢিপি

ইস্কন প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রোদয় মন্দির
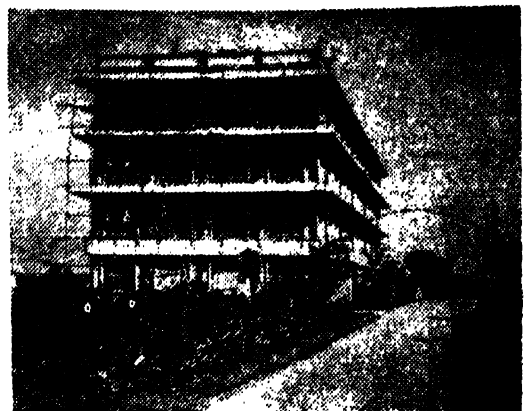
জানাতে হয়। তাঁর পরিবার, পরিবেশ সব কিছুর সংগেই পরিচিত হতে হয়।

শ্রীহট্ট জেলার 'ঢাকাদক্ষিণ' গ্রামের মিশ্র পরিবার সম্ভবতঃ এখনো সেখানে আছেন। তাঁরা উপেন্দ্রনাথ মিশ্রের বংশধর বলে পরিচয় দেন। উপেন্দ্রর ছেলে জগন্নাথ নবদ্বীপে বাস করতে আসেন। তখনকার নবদ্বীপ ছিল বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জায়গা। বলা হত ভারতের অকসফোর্ড। নবদ্বীপের বেলপুকুরে নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি। নীলাম্বরের মেয়ে শচীদেবীর সংগে জগন্নাথের বিয়ে হয়। জগন্নাথ শচীদেবীর প্রথমে আটটি সন্তান হয়েছিল। আটটিই মেয়ে। একটিও বাঁচেনি। ছোটছেলে নিমাই ওরফে গোবিন্দ ওরফে বিশ্বম্ভর মিশ্র। এই বিশ্বম্ভর মাত্র আটচল্লিশটি বছর মর্ত্যলোকে কাটিয়ে গেছেন। তার প্রথমার্ধ জন্মভূমির মাটিতে, বাকি জীবন বাইরে। ছেলেবেলার দামাল নিমাইকে নিয়ে শচীদেবী অস্থির। উদ্দাম কৈশোরের প্রাণপ্রাচুর্য আর বুদ্ধি চাতুর্য মধ্যলীলাবিস্তারে উৎসুক। তার কিশোরের বুকে গৌরাঙ্গের প্রেমের মানসিক পরিচয় পেয়ে কাঠপাণ্ডিত্যের দম্ভ উদ্ভ্রান্ত, ধর্মনায়কেরা ছিন্নভিন্ন। যৌবনে দু-দুবার বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু বিবাহিত জীবন স্থায়ী হয়নি। বৈরাগ্যের গেরুয়া ধূলি পায়ে মেখে পথের ডাকে বেরিয়ে পড়লেন গৌরাঙ্গ। পথের মধ্যেই প্রেমের সিংহাসন পাতলেন।

অথচ তার আগে দুর্দান্ত ডানপিটে ছেলে নিমাইয়ের দাপটে পাড়ার লোক ত্রাহি ত্রাহি করত। আবার সেই ছেলেই ন্যায় আর ব্যাকরণ পড়তে পড়তে প্রচণ্ড তার্কিক হয়ে উঠল। বড় বড় পণ্ডিত এসে হার মেনে যায়। দেশশুদ্ধ নৈয়ায়িক বৈয়াকরণের মাথা মুড়িয়ে অঢেল মোহর কুড়িয়ে ঘরে ফিরে এসে মুখর নিমাইকে কিসে ভর করল? বাবা মারা গিয়েছিলেন আগেই। তাঁর পারলৌকিক কাজ করতে গয়ায় গেলেন। এবার এই প্রথমবার মাথা মুড়োলেন একজন মানুষের কাছে। ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁকে গুরু করলেন। গদাধরের পাদপদ্মে মন প্রাণ বিকিয়ে দেউলে হয়ে ফিরে এলেন গৃহদেউলে। ভক্তিরসে মাতোয়ারা ছেলের মন পান না শচীদেবী। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া মারা যাবার পর বিয়ে করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। বেচারী রূপলাবণ্যের উজ্জ্বল্যটা ভাজি, স্বামী থাকতেও বিধবা। বিশ্বের আত্মিক বিপ্লব যার ব্রত সে বিপ্লবীকে হায়, কী দিয়ে বাঁধা যায়!...

বিশ্বম্ভর গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হরিকথা সংকীর্তন আর ভাগবত পাঠ আর কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে করতে চলেন। লোকে মুগ্ধ হয়। অবাক হয়ে দেখে সেই উদ্ধত জ্ঞানগর্বী বাকপটু নিমাই পণ্ডিতের অনিন্দ্যগৌর শরীর আর এক নতুন রাগে রঞ্জিত, আর এক নতুন ফাগে প্রসাধিত। যে রাগের নাম ভক্তিরাগ, যে ফাগের নাম প্রেম। শুধু ফাগুনের পূর্ণিমা তিথির শূন্য বাসর সাজিয়ে রাগরঞ্জিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রাণপ্রিয়ের আশায় পথ চেয়ে বসে থাকতে হয়। মাঘ মাসের এক শুক্লপক্ষে, মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসে, কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস নিলেন গৌর। নতুন নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এতদিন নামমাত্র গৃহী থাকতেও কাজের অসুবিধে হচ্ছিল। এবার সে বাঁধন ছিঁড়ে গেল। শুদ্ধাভক্তির জোয়ারে এবার দেশের মানুষকে ভাসিয়ে দিলেন। প্রজ্ঞায় পরাস্ত হয়ে শান্ত হয়েছিল অনেকে। প্রেমে প্লাবিত হয়ে মত্ত হল সবাই। দ্বিতীয় দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হল। প্রেম বিলিয়েই তিনি ব্রহ্মের সৎ, পুরুষোত্তমের চিৎ ও ভগবানের আনন্দ—এই ত্রিবিধ গুণা-বলীর সামঞ্জস্যে সচ্চিদানন্দে পরিণত হলেন। তিনি কৃষ্ণেরও অধিক, তাঁর ভেতরেই হ্লাদিনী রাধা।

হাওড়া কাটোয়া লাইনে নবদ্বীপ একটা রেলওয়ে স্টেশন। বড় নামকরা শহর। কলকাতা থেকে ঘণ্টা তিনেকের পথ। শেয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর হয়েও যাওয়া যায়, খেয়া পেরিয়ে। নবদ্বীপে সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির আছে। একালের বহু পণ্ডিতের বাস। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলাসহচর অদ্বৈত আচার্যের বংশধর অনেক পরিবার পরম্পরাক্রমে বাস করছেন ওখানে। তীর্থ করতে আসেন বহু লোক।

অনেকে বলেন আমরা বাঙালীরা আত্মবিস্মৃত জাতি নিজেদের অতীত কীর্তির সব পার্থিব স্মৃতিচিহ্ন অবহেলায় অবলীলায় এমন করে লোপ করে সাবাড় করে দিতে আর কোন জাত এমন পটু নয়। চৈতন্যদেব চলে গেছেন প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে। তিনি যাবার দুশো বছরের ভেতরেই লোকে তাঁর কথা ভুলতে বসেছিল। আর আজ এই মহপ্রেম বাঙালীর চিত্ত থেকে কালে বিস্মরণের ধুলোয় কোথায় হারিয়ে যায়, খেয়ালই থাকে না আমাদের। কোন কোন পাগল শুধু খুঁজে বেড়ায় কোথায় হারাল তার পায়ের চিহ্ন...কোথায় পাব তাঁরে?...

এইরকম একজন পাগল ছিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ছিলেন গৃহী। আগের নাম কেদারনাথ দত্ত। স্বরূপগঞ্জে তার বসতবাড়ি এখনো অটুট আছে। সেকালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগরে কালেকটারী করার সময় কি শনিবার রবিবার নবদ্বীপ শহরে যেতেন। তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন, সাবেককালের ম্যাপ হাতে

নিয়ে। শেষকালে হতাশ হয়ে পড়েছেন। নাঃ এ শহর আসল নবদ্বীপ নয়। এখানে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কোন ঐতিহাসিক ভৌগোলিক প্রমাণ নেই। এসব জায়গা মানুষের মনগড়া। খুঁজতে থাকেন ভক্তিবিনোদ। গ্রামে গঞ্জে শহরে নদীয়া জেলার সর্বত্র। কিন্তু তাঁর আবিষ্কারের অলৌকিক গল্প বলার আগে আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের বিষয়ে আরও কয়েকটা কথা সেরে নিই।

চৈতন্য পরিবেশ

চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেবার পর থেকে জীবনের বাকি অর্ধেক তীর্থদর্শন, দেশ পর্যটন আর দর্শন প্রচারেই কাটিয়েছিলেন। প্রথমে কাটোয়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুরে কিছুদিন থেকে পুরীধামে গিয়ে রইলেন। তারপর সেখান থেকে বেরুলেন প্রব্রজ্যায়। গোটা দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্র গুজরাট ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসে বৃন্দাবন যাবেন বলে শান্তিপুরের পথ ধরে গঙ্গার পথে গৌড়ে এলেন। সেবার কোন কারণে বৃন্দাবন যাওয়া হল না। গৌড়ের কাছে রামকেলি বলে একটা গ্রাম থেকেই ফিরে এলেন।

রামকেলিতে তখন হুসেন শাহ সুলতানের দরবারের দুই বিশিষ্ট মন্ত্রী দবীরখাস আর সাকর মল্লিক এই দুই ভাই ছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটল। তাঁর সংস্পর্শে এসে এই দুই ভাইয়ের মনে বৈরাগ্য এল। তাঁর শিষ্যত্ব নিলেন। তাঁদের নতুন নাম হল সনাতন আর রূপ। বৈষ্ণবজগতে রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী দুটি অবিনশ্বর নাম। এরপর শ্রীচৈতন্য ছোটনাগপুরের পথে কাশী প্রয়াগ হয়ে মথুরা বৃন্দাবন চলে যান। এইভাবে সারা ভারতে ভক্তিযোগ প্রচার করতে করতে বছর ছয়েক কেটে গেল। জীবনের শেষ আঠারো বছর পুরীতে কাটান।

নীলাচল ছেড়ে আর নড়েন নি। এই আঠারো বছরে উৎকল দেশের মাটি তাঁর প্রেমপ্লাবণে নিষিক্ত হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকতে থাকতেই তিনি দেখে যান ভারতভূখণ্ডের পণ্ডিতেরা তাঁকে ভগবানের অবতার বলে গ্রহণ করেছে। উৎকলের রাজা প্রতাপ রুদ্র তাঁর মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। একবার মহাপ্রভু যখন কিছু দিনের জন্য পুরী ছেড়ে বৃন্দাবনে যান, প্রতাপ রুদ্র তাঁর পায়ের ওপর পড়ে চোখের জলে বললেন—একটা দিনও আপনাকে না দেখে থাকতে পারি না। আমার কী গতি হবে? প্রভু বললেন—আমার একটা মূর্তি বানিয়ে রেখে দাও। সেটা দেখলেই বিরহব্যথা কম হবে। সুদক্ষ দারুশিল্পীকে দিয়ে নিমকাঠের চৈতন্য বিগ্রহ তৈরী করালেন প্রতাপ রুদ্র। ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী হরিপুরের কাছে প্রতাপপুরে সেই দারুনির্মিত চৈতন্য মূর্তি অনেক দিন ছিল। এখনও আছে কিনা জানি না। একবার ওখানের মঠে আগুন লেগেছিল।

বিশ্বকোষের রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু মশায় যখন ময়ূরভঞ্জে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সেই সময় স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরিজি সংকলন বার করেন। তাতে দাঁতোন(?) অরণ্যক পরিবেশের মধ্যে পাওয়া ওই প্রাচীন দারুবিগ্রহের কথা ছবি দিয়ে ছাপা হয়েছিল। তখনকার অমৃত বাজার পত্রিকায় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এই নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। নগেনবাবু প্রতাপপুরের পাণ্ডাদের মধ্যে শুনতে পান যে ময়ূরভঞ্জ আর মেদিনীপুরের সীমানায় 'গোপীবল্লভপুর(?)' বলে একটা গ্রামে অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব পুঁথিপত্র আছে। সেখানে পুঁথিপত্রের মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্য রত্ন তাঁর হাতে পড়ল। সংস্কৃত পুঁথি। নাম 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড'। [illegible]

খণ্ডের প্রাচীন জনপদের ভূগোল আর ইতিবৃত্তের বর্ণনা আছে। পৌরাণিক প্রথায় লেখা। কিন্তু কে লিখেছেন, কোথায় লেখা হয়েছিল, কিছুই জানবার উপায় নেই। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত H. H. WILSON এই পুঁথির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন ১৮৯১ সালে Indian Antiquary পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে। তাঁর মতে পুঁথিখানি ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি লেখা হয়েছিল। পুঁথির বর্ণনায় বাংলাদেশ বা পুণ্ড্রদেশকে সাতটি প্রদেশে বিভক্ত বলা হয়েছে। গৌড়, বরেন্দ্র, নিবৃত্তি, নারীখণ্ড, বরাহভূমি, বর্ধমান আর বিন্ধ্যপার্শ্ব। তার মধ্যে বর্ধমানমণ্ডলের আয়তন কুড়ি যোজন। বর্ধমান প্রদেশে চারটি বর্ণের নিবাসভূমি বার হাজার গ্রাম বর্তমান। এই সমস্ত গ্রামের মধ্যে প্রথমেই মায়াপুরের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড বলছে, ভাগীরথীর পাশে কাশবন কেটে মায়াপুর গ্রামের পত্তন হয়েছিল। এইখানেই বিদ্যাতীর্থ নবদ্বীপ স্থাপিত হয়। বহু মানুষ বহু চিকিৎসক-অধ্যুষিত এক সমৃদ্ধ জনপদ এখানে ছিল। মায়াপুরকে নবদ্বীপের কেন্দ্র বলে বুঝতে পুঁথিটি সাহায্য করছে। বোঝা যাচ্ছে, অন্ততঃ সাড়ে তিনশ বছর আগেও মায়াপুর ওরফে নবদ্বীপ একই জায়গা বলে গণ্য ছিল। তখনকার নবদ্বীপ বর্ধমানের ভেতরে ছিল।

Nadia Gazetteer এ পাচ্ছি 'Nabadwip is very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A.D. by one of the Sen Kings of Bengal. In Lakhan Sen, Nadia was the capital of Bengal., Sir William Hunter লিখছেন "Nadia (Navadwip) ancient capital of Nadia district and the residence of Laxhan Sen. According to local legend, the town was founded in 1063 by Laxhan Sen. Here in the end of the 15th century was born the great reformer Chaitanya.' (Hunter's Imperial Gazetter, 1880).

হান্টারসাহেব তাঁর Statistical account এ লিখছেন : নবদ্বীপ শহরটি ভাগীরথী নদীর পশ্চিমপারে আর জলঙ্গী নদীর দক্ষিণে। নদীর পশ্চিমে। ...আরো লিখছেন :

On the other side of the river there is a large mound still called after Ballal Sen. The founder Laxhan Sen built a palace of which the ruins are still extent.'

এটাই অবশ্য নদীয়া গেজেটিয়ারে প্রতিধ্বনিত। নদীর পূর্বপারে 'বর্তমান নবদ্বীপ' শহরের ঠিক বিপরীতে 'বামন পুকুর' গ্রামে 'বল্লালঢিবি' নামে একটা উঁচু স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। একে বল্লালসেনের ভগ্নাবশেষ বলা হয়। এই ধ্বংসস্তূপের কিছুদূরে এক বিরাট দীঘির নাম 'বল্লালদীঘি'। বল্লালদীঘি আর বল্লাল ঢিবি নিয়ে পরে আবার আসছি। ওপরের রিপোর্টে একটা তথ্যের ভুল আছে। লক্ষ্মণসেন এই রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেননি। করেছিলেন তাঁর পিতামহ বিজয়সেন। কারণ ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণের জন্মই হয়নি। ইতিহাসে বলে বক্তিয়ার যখন নদীয়া লুণ্ঠন করেন সেটা বারোশো তিন খৃষ্টাব্দ। তখন লক্ষ্মণসেনই রাজা। বাংলায় স্বাধীন মুসলমান আমল কায়েম হয়েছিল এর অনেক পরে, পনের শতকের মাঝামাঝি। Travels of a Hindu নামে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত একটা বইয়ে লিখছে :

'In the twelfth century it was the capital of Luchmanya, the last of Sen Kings.'

বাংলাদেশের প্রাচীনতম দুটি ম্যাপে—মাহমুদ ফেমভার ব্রুকের নির্দেশে তৈরী ম্যাপ আর ভন ডেন ব্রুকের তৈরী ম্যাপে, যেটা ১৬৭৫-এ ছাপা হয়ে 'দি থার্ড বুক অফ দি ইংলিশ পাইলট' বইয়ে প্রকাশিত হয়েছিল—সে-দুটোতেই 'নদীয়া' বলে যে জায়গার চিহ্ন আছে, সেটা প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুরের, বর্তমান নবদ্বীপ নামে পরিচিত শহরের নয়।

তবে গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর গতিপথ এতবার পরিবর্তন হয়েছে যে, এক-এক শতাব্দীতে এই নবদ্বীপ বা নদীয়ার অবস্থান আলাদা আলাদা হয়ে চিহ্নিত হয়েছে। পুরনো দিনের ম্যাপ আর নদীর ইতিহাস খুঁজে দেখলেই সেটা বেশ বোঝা যায়। আঠারো শতকে নবদ্বীপ ছিল কুলিয়াদহের বা কলীয়দহের এখনকার চড়ার ওপর। কিন্তু সতের শতকে নবদ্বীপ দেখছি আজকের নিদয়া শংকরপুর রুদ্রপাড়া এইসব অঞ্চলে। আবার শ্রীচৈতন্যের আমলে যার নাম ছিল পাহাড়পুর বা কুলিয়া গ্রাম, বর্তমানে সেটাকেই নবদ্বীপ বলছে। সঠিক স্থানের সন্ধানে এইজন্যেই দুশ্চিন্তিত হয়েছিলেন কেদারনাথ দত্ত। সেরেস্তার কাজে নদীয়া জেলার গ্রামে গ্রামে ঘোরেন আর খোঁজেন। মনে শান্তি নেই তাঁর। বিনিদ্র রাত কাটান স্বরূপগঞ্জের বাড়িতে। কিংবা আজকের নবদ্বীপ শহরে। একদিন গভীর রাতে নিকষ অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল। জলঙ্গীর উত্তরে ভাগীরথীর পূবপাড়ে ফাঁকা মাঠ আর জলাভূমির ওপর একটা তালগাছের মাথা থেকে সেই আলো বিচ্ছুরিত হোল। সে-আলোয় গঙ্গার এপার-ওপার আলোময় হয়ে উঠল। সেই আলো দেখেছেন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু। সেই 'মধুর আলোর' কথা তাঁর মুখে শুনেছেন অদ্বৈত-বংশের পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী। সেই আলো সম্পর্কে অমৃতবাজার পত্রিকার দেশমান্য মতিলাল ঘোষ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে লিখছেন : 'সপ্রণাম নিবেদনম্—শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী যে-মধুর আলো দর্শন করেন, ইহাতে তাঁহার ও প্রভু রাধিকানাথ গোস্বামীর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনি প্রকৃত স্থানটি নির্দেশ করিয়াছেন।.......'

২৩শে নভেম্বর ১৮৮৮ তারিখে দেওঘর থেকে মহাত্মা শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে পত্র দিয়ে জানাচ্ছেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল। শিশিরকুমার ভক্তিবিনোদের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি তাঁকে সপ্তম গোস্বামী বলতেন।...দেখা যাচ্ছে ততদিনে ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্ণয় করে ফেলেছেন। কীভাবে করলেন ? সেই মধুর অলৌকিক আলোর ইশারা নিয়ে তিনি বল্লালদীঘি ও সন্নিহিত গ্রাম বামুনপুকুরে গিয়ে হাজির হলেন। সেরেস্তা-সংক্রান্ত কাগজপত্র, সেটেলমেন্ট রেকর্ড, পুরনো ম্যাপ, প্রাচীন পুঁথিপত্র সব মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনিয়ার দ্বারিকবাবুকে দিয়ে নবদ্বীপমণ্ডলের একটি নক্সা বানিয়েছিলেন। আর তাঁর হাতে সবচেয়ে বড় পথনির্দেশকা ছিল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত-অমিয়পুঁথি দুটি। যার মধ্যে সেকালের সব গ্রাম ও ঘাটের বিবরণ ছিল। সেইসব প্রাচীন বর্ণনার সঙ্গে তাঁর পাওয়া তথ্যাদি সব হুবহু মিলে যেতে লাগল। প্রাচীন নবদ্বীপের বেলপুকুর, বামুনপুকুর, মায়াপুর, বল্লালদীঘি, ভারুইডাঙা, কাজিপাড়া, খোলভাঙার ডাঙা—সব খুঁজে তিনি পেলেন। গৌরাঙ্গের তিরোধানের পর তাঁর ভিটেমাটির ডাঙাটুকু বাদে বাকি সব জলে ডুবে গিয়েছিল বলে গ্রামের লোকজন উঁচু ডাঙায় উঠে গিয়েছিল। তাতেই কিছু কিছু হেরফের হয়েছে। ঐসব গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাবার্তায় সমস্ত সন্দেহ দূর হল ভক্তিবিনোদের।

রায়বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিকের নদীয়া-কাহিনী লিখছে—'...কাজির সমাধি আজ পর্যন্ত মায়াপুর গ্রামের অদূরে উত্তর-পূর্ব কোণে বিদ্যমান। একটি সুবৃহৎ গোলকচাঁপার বৃক্ষ ঐ সমাধির উপর তাঁহার সুশীতল ছায়াদানে কবরটাকে শীতল রাখিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, এই কাজির নাম ছিল মৌলানা সিরাজুদ্দিন। কথিত আছে, ইনি নদীয়ার কাজিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন।'

মামা চাঁদকাজী

এই কাজিই চাঁদকাজী, নবদ্বীপের ফৌজদার। বলরাম দাস ওরফে নিত্যানন্দ দাসের লেখা প্রেমবিলাসে বলছে শচীদেবীর বাবা নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল বেলপুকুরে, কাজিপাড়ার গায়েই। তাইতে গ্রাম সুবাদে গৌরাঙ্গদেব কাজীসাহেবকে মামা বলে ডাকতেন। ভক্তরা বলেন, কাজী নাকি গতজন্মে কৃষ্ণের মামা কংস ছিলেন। গৌর তাঁর গুণ্ডো দলবল নিয়ে হল্লা করে বিদ্রোহ করতে চাইছেন—এইরকম একটা অনুমান করে হুসেন শাহ কাজীসাহেবকে বলেছিলেন, দলটাকে শায়েস্তা করতে। চাঁদকাজী তাঁর ফৌজ নিয়ে গিয়ে শ্রীবাসের বাড়িতে কীর্তনের আখড়ায় মৃদঙ্গ ভেঙেচুরে কীর্তন পণ্ড করে সবাইকে শাসিয়ে দিয়ে এলেন। খবর পেয়ে চৈতন্যদেব প্রচণ্ড রেগে যান। এবং সমস্ত শহরের লোক জড় করে নগরসংকীর্তন করতে করতে কাজীর বাড়ি গিয়ে ওঠেন। কাজী ভয়ে লুকিয়ে পড়েন। পরে বেরিয়ে এসে বলেন, নগরের কিছু হিন্দু তাঁর কাছে এসে নিমাই পণ্ডিতের অধার্মিক আচরণের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। তারা বলছে, ছোকরার মাথা খারাপ হয়েছে। সে হিন্দুধর্ম নষ্ট করতে বসেছে। তুমি তাকে শায়েস্তা কর। গৌরাঙ্গ তখন তাঁর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করে তাঁকে এমনই মুগ্ধ করে দিলেন যে, চাঁদকাজী তাঁর পা ছুঁয়ে হরিভক্তি ভিক্ষা করলেন। সেই থেকে তিনি ভক্তকাজী হিসেবে সম্প্রদায়নির্বিশেষে সব মানুষের পুজো পেতেন। তাঁর সমাধির ওপর মহাপ্রভুর নিজের হাতের লাগানো চাঁপাগাছ আজো রয়েছে। সেখানে কী হিন্দু, কী মুসলমান আজো মানত করে, ফুল চড়ায়, শিন্নি মানে। কাজীর বংশধরেরা কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে কাজীবংশের বৃদ্ধদের কথাবার্তা হয়েছিল।

কাজীবংশের প্রাচীন দলিল থেকে মায়াপুরের নাম পাওয়া গেল। পরিত্যক্ত মায়াপুরের পরবর্তী নিরক্ষর বাসিন্দারা মায়াপুরকে মেয়াপুর বা মিয়াপুর বলে ডাকলেও জায়গাটা যে আসলে প্রাচীন নবদ্বীপ-মায়াপুর, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ওখানের একটা উঁচু ডাঙা সম্পর্কে সেকালের কিছু বৃদ্ধ বললেন—জায়গাটা শুধু শুধু পড়ে রয়েছে দেখে ওখানে অনেকে হালচাষ করতে থাকে। কিন্তু যে-বীজই ছড়াক কেবল তুলসী গজায়। উপড়ে ফেলে দিলেও নিস্তার নেই। চাষ হল না। তখন পতিত ডাঙায় কবরস্থান করার চেষ্টা চলে। মাটি ধসে গোর-স্থানের গর্ত বুজে যায়। তখন গ্রামের প্রাচীন মুসলমানরা তাদের সাবধান করে দিয়ে বলেন : ওখানে কিছু করো না। আমাদের পূর্বপুরুষের মুখে শুনেছি ওখানে গৌর জন্মেছিলেন। ও ডাঙা পবিত্রভূমি, পবিত্রস্থান। একটা কাটা নিমগাছের গুঁড়ি দেখিয়ে তারা বললেন, এও অমর গুঁড়ি। আমাদের বাপদাদারা ছেলেবেলা থেকে একে এমনি দেখে আসছেন। বরাবরই একইরকম। এই কাটা গাছের গুঁড়ি থেকেই মুকুল বেরিয়েছে দেখা গেল। নিমাই নাকি এই গাছের নিচেই জন্মেছিলেন। শোনা যায়, বিষ্ণুপ্রিয়া নিজে হাতে কুড়ুল দিয়ে গাছটা কেটে ফেলেছিলেন—ক্ষোভে, কিংবা বিরহতাপে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আর সন্দেহ রইল না। কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলের প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা ডেকে তিনি তাঁর বিস্তারিত গবেষণার ফলাফল তুলে ধরলেন। সুধীসমাজ স্বীকার করলেন বল্লালদীঘি আর বামুনপুকুরের সন্নিহিত মায়াপুরেই প্রাচীন নবদ্বীপধাম। এখানেই একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, দেবগ্রামের পরাক্রান্ত দিকপাল বিক্রমরাজকে পরাজিত করে এসে, বিজয়সেন তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এখানেই বল্লালসেন আর লক্ষ্মণসেন সেনবংশের শেষ দীপশিখা জ্বালিয়ে গেছেন। এই

নবদ্বীপই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। এখানেই পনের শতকের শেষপাদে নবদ্বীপের কেন্দ্রবিন্দু অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছিল।

ইতিহাসে বিজয় সেনের অভ্যুদয় একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ১০২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। কর্নাটকের সেনবংশ তাঁর পূর্বপুরুষ। পশ্চিমবাংলায় এই বংশের শাখারা আজো যত্রতত্র ছড়িয়ে আছেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে গৌড়পতি রামপালের এক প্রধান সামন্ত বিক্রমরাজের পরিচয় পাওয়া যায়। রামপালের (১০৫৭-১০৮৭) আমলে তিনি প্রচণ্ড পরাক্রমী ছিলেন। তাঁর রাজধানী বিক্রমপুর, আজকের দেবগ্রাম রেলস্টেশনের দক্ষিণদিকের বিক্রমপুর গ্রাম। মায়াপুর নবদ্বীপ থেকে এই বিক্রমপুরের দূরত্ব হবে মাইল পনের। বিক্রমরাজের সঙ্গে বিজয়সেনের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলেছিল। সম্ভবত যুদ্ধের প্রয়োজনে সেই সময়েই বিজয়সেন মায়াপুর বা প্রাচীন নবদ্বীপে শিবির করেছিলেন। আর সেই থেকেই বোধহয় ঐখানে নগরপত্তন হয়। যুদ্ধে বিক্রমরাজকে হারিয়ে বিজয়সেন বিক্রমপুর দখল করেন। ক্রমে গোটা বাংলার রাজা হন। আর পয়মন্ত মায়াপুর বা নবদ্বীপ হয় তাঁর বংশের রাজধানী।

বিজয়সেনের ছেলে প্রতাপান্বিত রাজা বল্লালসেন বিক্রমপুর সাঁওতা দেবগ্রাম থেকে নিয়ে নবদ্বীপ পর্যন্ত অনেক জনপদ বসিয়েছিলেন, অনেক পথঘাট করিয়েছিলেন, খনন করিয়েছিলেন অনেক দীঘি। সেইসব দীঘি কোথাও মজে হেজে ডোবা হয়ে রয়েছে, কোথাও ধানক্ষেত হয়ে গেছে। তবু তার চিহ্ন এখনো স্পষ্ট বোঝা যায়। আর সাবেকী খাতাপত্রে আর লোকমুখে নাম শোনা যায়—বল্লালদীঘি।

সেই প্রাচীন রাজধানী গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে। ধুলো আর বিস্মৃতির কবরে রাজপ্রাসাদ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কৃষ্ণনগর থেকে 'বাপী'র বাসে চড়ে হুলোরঘাটের পথে বামুনপুকুর বাজারে নেমে চাঁদকাজীর সমাধি মন্দিরে মাথা ঠেকিয়ে রিক্সা ধরলেই পৌঁছে যাবেন : বল্লালঢিপি।

বল্লালসেন মায়াপুরেও থাকতেন, বিক্রমপুরেও থাকতেন। কিন্তু তাঁর ছেলে লক্ষ্মণসেন স্থায়ীভাবে মায়াপুরে অর্থাৎ নবদ্বীপে বাস করতে লাগলেন। লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে থাকাকালেই বখতিয়ারের মহম্মদ তাঁর রাজধানী আক্রমণ করেছিলেন। এটাকে একটা ডাকাতি হামলা বলাই ঠিক হবে। লুঠপাট ছাড়া আর কিছুই হয়নি। মহম্মদের নদীয়া বিজয় (?) ঘটেছিল তের শতক যখন সবে চৌকাঠ পেরিয়েছে (১২০৩ সালে) তখন। আর এ অঞ্চলে মুসলমান আমল শুরু হয়েছে পনের শতকের মাঝামাঝি, মানে ঐ ঘটনার প্রায় আড়াইশ বছর পরে।

সেনরাজাদের সময় নদীয়া সমৃদ্ধির চূড়োয় বসেছিল। মহম্মদ-ই বখতিয়ারের প্রায় চার দশক পরে ঐতিহাসিক মিনহাজ নবদ্বীপকে নতুন দ্বীপ এই অর্থে 'নৌদিয়া' বলে বর্ণনা করছেন। নদীয়া নামটা সেই থেকেই চালু হল সম্ভবত।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব। বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সূত্রধারণ করেছেন হুসেন শাহ। কেননা তাঁর সময়ই শ্রীচৈতন্যের সময়। তাঁর শাসনাধীন বাংলার মৃত্তিকায় তখন সন্তর্পণে ধাতব পরিবর্তন আনছেন চৈতন্য। (বাঙালীর সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে চৈতন্যস্পর্শ)

ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত স্তরে মানুষের চিন্তা ও ব্যবহারের মালিন্য, জড়ত্ব আর বিনাশমুখী অবগমনের ক্লেদ—সব কিছুতে জীবন-চৈতন্যের বিদ্যুতপ্রবাহ যোজনা করে মানুষকে সামগ্রিক জড়ত্ব থেকে মুক্তি দিতে আসেন এমন লোকোত্তর মানুষই নিজের নাম রাখেন চৈতন্য। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন বাংলার সমাজচিন্তায়, চৈতন্যোত্তর যুগের সাহিত্যসংস্কৃতি সব কিছুর ওপরেই যে চৈতন্যের আলো পড়েছে, সব কিছুই যে চৈতন্যপ্রভাবিত ও বিভাবিত একথা বোধহয় প্রমাণ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখানে আমরা কেবল কিছু প্রাসঙ্গিক নাম উল্লেখ করব।

সেনবংশের সময় নবদ্বীপ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের প্রধান বিদ্যাকেন্দ্রই শুধু ছিল না, বাংলা, সারা ভারতেরই জ্ঞানতীর্থ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চৈতন্যের জন্মের সময় দেশজুড়ে ব্যাপক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। সমাজের উঁচু মহলের লোকেরা ক্ষমতা প্রতিপত্তি আর পদমর্যাদার লোভে, এবং নিচুতলার মানুষ কিছু ভয়ে, কিছু ভক্তিতে, কিছু বা সুবিধে-সুযোগের মোহে ধর্মান্তর নিয়ে মুসলমান হয়ে যাচ্ছিল। সমাজে স্বেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব হচ্ছিল। সাহিত্য সংস্কৃতি জ্ঞানবিদ্যার চর্চা সব কিছুতেই সমাজের এই নীতিভ্রষ্ট হাতের ছাপ পড়ছিল। চৈতন্য যে হিন্দুকে বাঁচাতে এসেছিলেন এরকম ভাবা ভুল। তিনি মানুষকে হীনতার নোংরামি থেকে বাঁচাতে এসেছিলেন।

তখনকার ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ একধরনের পংকিল গোঁড়ামিকে ধর্ম বলে মনে করতেন। তাঁরা মানুষে মানুষে যতদূর সম্ভব ভেদ বুদ্ধি বাড়িয়ে চলতেন। 'ইতর জাতের' ছায়া মাড়ালে করতেন স্নান। চৈতন্য ধর্মের নামে সব ভেদ লোপ পাইয়ে দিচ্ছেন, সব একাকার করে দিচ্ছেন বলে তাঁদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। বহুভাবে তাঁকে হেনস্তা করার চেষ্টা হয়েছিল। কায়েমী স্বার্থ তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের পর চক্রান্ত করেছে। প্রাণে মারার চেষ্টাও হয়েছে কতবার। তবু তাঁর সান্নিধ্যপ্রয়াসী মুগ্ধ জনতা এক থেকে দশ...দশ থেকে শত...শত থেকে সহস্র হয়ে তাঁকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করেছে। কী মন্ত্র তিনি শিখিয়েছেন তাদের? শুধু ভালবাসা, স্বার্থহীন, অকপট অপ্রত্যাশী প্রেম। কিছু চেয়োনা, শুধু দিয়ে যাও, দেখবে একদিন সমস্ত পৃথিবী তোমার হয়ে গেছে।

বাঙালী জেগে উঠল

চৈতন্যের এই প্রেমভক্তির পাত্রবিচার ছিল না। কে হিন্দু কে মুসলমান, কে ব্রাহ্মণ কে হাড়িমুচিডোম, কে পণ্ডিতাগ্রগণ্য, কার 'ক' অক্ষর গোমাংস—কোন হিসেব ছিল না। 'পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইল গোরা গুণে। কারে বা না কৈল ভক্তিদান'—নরহরি চক্রবর্তী লিখেছিলেন। চৈতন্য বলেছিলেন প্রেমের অধ্যাত্মশক্তির উৎস সব মানুষেরই মর্মের কেন্দ্রে রয়েছে। ইচ্ছুক যে কোন উৎসসন্ধানীই সমাজে তার গুণগত বা কর্মগত বৈশিষ্ট্য যাই থাক না কেন এই আন্তরশক্তির চর্চার অধিকারী। শ্রীচৈতন্য এই সিদ্ধান্তের ব্যবহারিক অনুচর্যা দিলেন—জীব মাত্রের প্রতি দয়া আর সহানুভূতির ভাব, অন্তরস্থ কেন্দ্র পুরুষের প্রতি অচলা ভক্তি, আর ভক্তির প্রয়োজনে অনির্বাণ নামগানের অনল জেলে রাখাই ছিল এই অনুচর্যা। এই তাঁর ধর্মের আধার। এবং জনশিক্ষার একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই শিক্ষার আদর্শ—সব-রকম সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার জড়ত্ব উপড়ে ফেলে সমাজে একতা আনা। শ্রীচৈতন্যের জীবন, তাঁর বাণী, তাঁর অমৃত উপদেশ, তাঁর অলোকসামান্য দুঃখবরণের তপস্যা একটা গভীর প্রভাব বিছিয়ে দিয়েছিল বাঙালী মানসে। এক অখণ্ড বাঙালী জাত গড়ে ওঠার প্রেরণা পেয়েছিল ঐ মরমী মানুষটির ছোঁয়ায়। ঈশ্বরের মতো তিনি ছিলেন সৃষ্টিশীল, তাই তাঁকে ভগবান বলা হয়।

বৈষ্ণব কবিদের অন্য নাম মহাজন, পদকর্তা। তাঁরা পদ বেঁধেছেন গানের ছন্দে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এই মহাজনদের অগ্রগণ্য পূর্বসূরী। তাঁর ভাষা মৈথিলী।

চৈতন্যদেবও বিদ্যাপতির অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পদের ভাষায় মৈথিলীর সঙ্গে বাংলাভাষা মিলেমিশে গিয়ে একটা নোতুন ভাষার সৃষ্টি হয়ে গেল। এই ভাষার নাম ব্রজবুলি। লোকে একে প্রায়ই ব্রজ ভাষা অর্থাৎ ব্রজ বা বৃন্দাবনের ভাষার সঙ্গে এক করে ভাবে। আদৌ তা নয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে অফুরন্ত রসরচনার কিছু ব্রজবুলিতে, কিছু তৎকালীন বাংলা ভাষায় পরিবেশিত হতে লাগল। তার মধ্যেই মিশে গেল চৈতন্যের জীবন জোয়ার। একটা নতুন যুগান্ত এল বাংলা সাহিত্যে। সমকালীন কোন জীবন্ত মানুষের চরিতকথা লেখার প্রচলন সেযাবৎ বড় একটা ছিল না (কিছু রাজসেবক লেখকের প্রভু গুণগানের কথা বাদ দিলাম)। এবার এল চৈতন্যজীবনীর যুগ। দুয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার কথাই কেবল বলছি।

বাংলাভাষায় চৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্য চৈতন্যভাগবত—চৈতন্যদেব বেঁচে থাকতে থাকতেই, কিংবা তাঁর চলে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই লেখা হয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য, শ্রীবাস প্রভুর নাতি বৃন্দাবনদাস বইটি লিখেছেন গুরুর নির্দেশে। চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের জীবনপ্রভাতের বর্ণাঢ্য ছবি আর সে যুগের নবদ্বীপসমাজের ছবি অপরূপ লীলানৈপুণ্যে বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞানবৃদ্ধ ভক্ত দার্শনিক কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত চৈতন্যচরিতামৃতই বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রেষ্ঠ জীবনী, একথা প্রায় সবাই বলেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে যেমন গৌরাঙ্গদেবের শৈশবজীবনের মনোরম কাব্যবর্ণনা, চৈতন্যচরিতামৃতে তেমনি তাঁর উত্তরজীবনের সুদক্ষ চিত্রায়ন। তাতে এমন অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে, যা এর আগে কোথাও পাওয়া যায় নি। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব যেমন বিরাট, তেমনি এর দার্শনিক মূল্যও তুলনাহীন। রঘুনাথ দাসের মুখে অনেক কথা শুনেছেন কৃষ্ণদাস। শ্রীচৈতন্যের মতো যুগন্ধর পুরুষের জীবনকথা লিখতে গেলে ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা এবং দার্শনিক তত্ত্বের যে বিশ্লেষণী সমন্বয় প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যভাগবত সেদিক দিয়ে সর্বকালীন সার্থকতা দাবী করতে পারে।

চৈতন্য পরিকর

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল পুরোপুরি গ্রাম্য লেখা। পাঁচালির মতো তা আঞ্চলিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। মহাপ্রভুর উৎকল যাত্রাপথের কিছু খুঁটিনাটি তথ্য এই বইয়ের বিশেষত্ব যা আর কোনও বইয়ে বিশেষ মেলে না। জয়ানন্দ বলেন, তাঁর শৈশবে চৈতন্যদেব নাকি তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। তিনিই নাকি জয়ানন্দের নামকরণ করেন। গোবিন্দদাসের কড়চায় আধুনিক ভঙ্গিমায় শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বৃত্তান্ত লেখা আছে।

চৈতন্য-জীবনীকারদের নানাজনের লেখায় আমরা পাই পুরি ভ্রমণকাহিনীর ইতিবৃত্ত। সে সময়ের গ্রামগুলির ভৌগোলিক বিবরণ এবং যাত্রাপথের বর্ণনাও মেলে।

নরহরি চক্রবর্তী ওরফে ঘনশ্যামদাস ঠাকুরকে বোধহয় আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ জীবনীলেখক বলতে পারি। তাঁর 'ভক্তি রত্নাকর' বইটি বৈষ্ণব ইতিহাসের রত্নপেটিকা। এই ভক্তিরত্নাকর আর 'নবদ্বীপ পরিক্রমায়' নটি বিভিন্ন দ্বীপের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে :

'নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়। নবদ্বীপ নব-দ্বীপ বেষ্টিত যে হয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ গ্রাম। পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম।।'

মনে হয় বিজয়সেনের আমলে নতুন দ্বীপ হিসেবে যে নবদ্বীপের পরিচিতি, উত্তরকালে, বিশেষতঃ ভক্ত ও সন্ধানীদের বিবরণীতে তাই-ই নয়টি দ্বীপের সমষ্টি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে ঈশান ঠাকুরের ভ্রমণবৃত্তান্তে এই দ্বীপের তালিকা এইভাবে পাওয়া যায় : অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ আর মোদদ্রুম দ্বীপ। প্রথম চারটি দ্বীপ গঙ্গার পূবপাড়ে, আর বাকি পাঁচটি পশ্চিম পাড়ে। এর মধ্যে অন্তর্দ্বীপেই হল মায়াপুর। কোল দ্বীপ বা কুলিয়া গ্রামেই আজকের শহর নবদ্বীপের অবস্থান। নবদ্বীপ-পরিক্রমা-য় মায়াপুরকে কেন্দ্র করে যাত্রাপথের পাশে পাশে সেকালের গ্রাম ও পাড়ার যে বিবরণ পাওয়া যায়, সে-সব জায়গার অনেকগুলিই আজও সেই নামেই চেনা যায়। সে সময়ের পথ-ঘাটের নাম বিবরণ চৈতন্যভাগবত আর চৈতন্য চরিতামৃতেও অজস্র দেওয়া আছে। বেলপুকুর বা বামনপুকুর, দুলের ঘাট, খোলভাঙার ডাঙা—এসব এই সেদিনকার সেটেলমেণ্ট রেকর্ডেও যথাযথ পাওয়া যাচ্ছে।

অশেষ পুরুষ

চৈতন্যদেব বাঙালীর জীবনের সবকিছুর সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছেন যে, তাঁকে বাদ দিয়ে, তাঁকে আলাদা রেখে বাঙালী সংস্কৃতির কোন দিকই পূর্ণাঙ্গ হওয়া মুশকিল। আসলে বাঙালী সমাজে তিনি এমন এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেছিলেন, উত্তর পুরুষ সেই দৃষ্টির স্বচ্ছতা নিয়েই দর্শনীয় সব কিছুকে বিচার করতে চাইল। এমন একটা নতুন মানসিকতা তিনি খুলে দিয়ে গেলেন, যার আলোয় জমাটবাঁধা প্রচ্ছন্ন কুয়াশা, মিলিয়ে গিয়ে সুস্থ চিন্তার নির্মুক্ত আকাশ দেখা গেল, অর্গলবদ্ধ গতানুগতিকতার দরজার বাইরে বৃহত্তর আঙিনার প্রসার গেল বেড়ে, দিগন্তের পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হল।

একজন বিপ্লবী মহানায়কের চরিত্রেই এই দুর্লভ গুণগুলি থাকতে পারে। ধর্মবিকারের তীব্র সংকটমুহূর্তে মাঝে মাঝে এমন একজন লোকোত্তর পুরুষের জন্ম হয় যিনি মানুষকে বাঁচার পথ দেখাতে আসেন। শাস্ত্র এমন মানুষকেই ভগবান বলেছে। তা ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আলাদা ভগবান নেই। বিবেকানন্দ বলেছেন, human form এ ছাড়া God exist করে না। বার্নার্ড শ বলেছেন, Beware of him whose God is in the skies. এঁদের আপ্তবাক্য আমরা মানব না? সেই হিসেবেই শ্রীচৈতন্য মানুষ হয়েও ভগবান। সমস্ত বিচারে সর্বোত্তম এই মানুষটিকে যদি ভগবান বলা না যায়, আমি আর কাউকে ভগবান বলতে রাজি নই।

— শ্রী

'শেষ নেই যে শেষ কথা কে বলবে?' চৈতন্যদেব একজন অশেষ পুরুষ। মায়াপুরের চন্দ্রোদয় মন্দিরের পাঁচতলার ছাদে দাঁড়িয়ে বর্ণচ্ছটাময় এক শেষ অপরাহ্ণে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল—পূবেপশ্চিমে ভাগীরথী আর জলঙ্গীর দুখানি প্রেমল বাহু বাড়িয়ে তিনি আমার মতন অগণিত মরমানুষকে আগলে রেখেছেন—পারমাণবিক অবলুপ্তির আতংক থেকে, অপমানবিক আত্মহননের বিভীষিকা থেকে...প্রতিদিনের মোহান্ধ তুচ্ছতা থেকে, প্রতি রাতের অবধ্য ক্লান্তির অবসাদ থেকে। কানে কানে বলছেন : আমি তোমাদের জন্যে তৃণের চেয়ে নীচে নেমেছি, তরুর মতন সর্বংসহ হয়েছি। অপমানিতাকে ধুলো থেকে কুড়িয়ে বুকে নিয়েছি। এস আমার সঙ্গে একবার হরি কীর্তন কর। আমি তোমার সব জ্বালা সব গ্লানি হরণ করব—মা শুচ।।

চৈতন্য কেন অনন্য ?

মনোরঞ্জন বসু

নব্য ন্যায়, শাক্ত সাধনা, ও বৈষ্ণব চিন্তায় নব রূপায়ণ বাঙালীর এক অভিনব সম্পদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচিত চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত অচিন্ত্য ভেদাভেদ ভারতীয় তাত্ত্বিক ও সমসাময়িক ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এক নব যুগান্তর এনেছে। চৈতন্য নিজকে মাধ্ব সম্প্রদায়ের অনুগামী বলে স্বীকার করলেও তাঁর বক্তব্যের অংশ বিশেষের সঙ্গে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মিল দেখা যায়। শুদ্ধ প্রেমে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ ও রাধা চেতনার মূর্ত বিগ্রহ এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে এই তত্ত্ব চেতনার উৎস আনন্দ উপলব্ধিতে বিস্তার বহিরাঙ্গিক ও আন্তর শক্তি চেতনার এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধে, ব্যবহার প্রেম ভক্তি ও স্নেহের সম্বন্ধে। এ মতবাদ অবিমিশ্র দ্বৈতবাদ নয়, কারণ এখানে অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় ঈশ্বর, জীব ও জগতের মধ্যে নিত্য ভেদ স্বীকৃত হলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এমন একটি স্বরূপগত অভেদ ও ঐক্যের উপর যা ভেদ বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। এই মতবাদে বেদ সকলই প্রকৃত প্রমাণ এবং পরম তত্ত্ব হলেন হরি, ভগবান বা পরমেশ্বর। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হলেন সেই পরম তত্ত্বের আধ্যাত্মিক দেহের জ্যোতি এবং স্বরূপগত হরির একটি অংশ হল, সৃষ্টি জগতের মূল সত্তা বা পরমাত্মা। তাছাড়াও হরি হলেন পূর্ণ সৌন্দর্য (শ্রী), ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্যের ঐক্য। অচিন্ত্য ভেদাভেদ মতে ভগবান হরির পূর্ণ স্বরূপ হল কৃষ্ণ ও রাধার দ্বৈত। দ্বৈত রূপ। একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত বা অভিন্ন। পূর্বোক্ত ঐশ্বর্য ও বীর্য এই দুই গুণের সাহায্যে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হয়েছে-বিষ্ণুরূপে তিনি এই জগৎ পালন করছেন। এখানে উল্লেখ্য মূল তত্ত্বের অংশ হলেও বিষ্ণুর পূর্ণতা ও ঐক্য এখানে কোন অবস্থায়ই ক্ষুণ্ণ হয় নি। কারণ অনন্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্পর্কে এ—কথা ঠিক যে উহার আনন্ত্য সর্বগ্রাহী। পূর্ণতার স্বরূপ হল পূর্ণতা, ফলে পূর্ণতা থেকে পূর্ণতা বিয়োগ করলে পূর্ণতাই অবশিষ্ট থাকে।

কালনাপুরের শ্যামানন্দ প্রতিষ্ঠিত
ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে নির্মিত
কাষ্ঠ চৈতন্য মূর্তি

যে সকল অচিন্ত্য ধর্ম ভগবানের মূর্ত রূপের বৈশিষ্ট্য সেগুলি তাঁর স্বরূপ শক্তি। ভগবানের স্বরূপ ধর্ম ও তাঁর বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ তা ভেদ হয়েও অভেদ ও অচিন্ত্য। এখানে উল্লেখ্য, ভগবানের বিশ্বাতীত স্বভাব তাঁর বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে নিঃশেষিত হয় না। তাছাড়াও ভগবান যে সকল শক্তি ব্যবহার করেন, সেগুলি বস্তুতঃ তাঁর স্বরূপ শক্তির নানা রূপ, এবং প্রকাশের দিক থেকে এই স্বরূপ শক্তি পরম তত্ত্ব। এই শক্তিই তিনটি রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন, চিৎ শক্তি—প্রকাশ বা জ্ঞানের শক্তি, (২) জীব শক্তি—নিজেকে বহু জীবে পরিণত করার শক্তি, (৩) মায়া শক্তি—জড় বা অচেতন জগৎ রূপে ধারণ করার শক্তি। এখানে প্রশ্ন—যে স্বরূপ শক্তি স্বভাবতঃই অধ্যাত্ম, তা কি করে জড় জগতের অচেতন রূপ ধারণ করতে পারে, বা অনন্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কি করে নিজের অখন্ড সত্তা সম্পূর্ণ বজায় রেখে নিজেকে অসংখ্য সান্ত আত্মায় বিভক্ত করতে পারে এবং পরিণামে এক অখন্ড ঐক্যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে—সেখানেই পরম তত্ত্বের অচিন্ত্য রহস্য।

পূর্বোক্ত চিৎ শক্তি, জীব শক্তি, মায়া শক্তি—তিন আকারে সক্রিয় ঐ সকল শক্তির স্বরূপ কি? পরমেশ্বর হলেন সচ্চিদানন্দ স্ব—স্বরূপ শক্তির তিনটি প্রকার ভেদ—(১) হ্লাদিনী আনন্দাংশ, (২) সন্ধিনী সদংশ, (৩) সংবিদ চিৎ বা জ্ঞানাংশ।

এখানে মূল প্রশ্ন— চিৎশক্তি পদার্থটি কি? ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের শক্তিরূপে উহার স্বরূপই বা কি?

চিৎ বা চৈতন্য হচ্ছে পরমেশ্বরের সেই শক্তি যার সাহায্যে তিনি নিজের স্বরূপকে ভগবান কৃষ্ণ ও তাঁর শক্তি রাধার আধ্যাত্মিক ভেদাভেদ উপলব্ধি করেন। হ্লাদিনী রূপে এই উপলব্ধি হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের প্রেম, সন্ধিনীরূপেই শক্তি প্রকটিত হয় ভগবানের আধ্যাত্মিক জগৎ (বৃন্দাবন) এবং তার অনুষঙ্গিক পদার্থসমূহে এবং সংবিদরূপে উহা ভেদাভেদের স্বরূপকে একটিত করে অনাব্যক্তকে ব্যক্ত করে। প্রকটিত করে রাধা কৃষ্ণের সম্বন্ধের উপলব্ধির মধ্যেই আছে অচিন্ত্য ভেদাভেদের গূঢ় রহস্য।

ষড়ভুজ মন্দিরে ষড়ভুজমূর্তি

উৎকলে শ্রীচৈতন্য ও চরিতামৃতের ঐতিহাসিকতা

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

বাঙলা চরিতকারেরা তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যের জীবনী বর্ণনা করেছেন। তাঁরা মহাপ্রভুর মুখ দিয়ে এমন অনেক কথা বলিয়েছেন, যা তিনি বলেন নি বা বলতে পারেন না। ১৫১০ সালে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গেলেন। জীবনের শেষ চব্বিশ বছরের অধিকাংশ সময় তিনি নীলাচলে কাটিয়েছিলেন। নবদ্বীপের মাহাত্ম্য বাড়ানর জন্যে সমসাময়িক পদকর্তারা ও পরে বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতে প্রভুকে কৃষ্ণ কল্পনা করলেন। অর্থাৎ কলিযুগে কৃষ্ণ নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহচরেরাও গৌড়দেশে জন্ম নিলেন ও গৌরাঙ্গের সঙ্গে গোষ্ঠলীলায় যোগ দিলেন।

কিন্তু কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে বসে গোস্বামীরা নবদ্বীপে কৃষ্ণের আবির্ভাব কল্পনা গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁরা শ্রীচৈতন্যকে রাধা-কৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ কল্পনা করলেন। প্রভুকে কৃষ্ণ না বলে রাধা-কৃষ্ণের অবতার বলা হলো। গোস্বামীরা গৌরকান্তি শ্রীচৈতন্য ও শ্যামকান্তি শ্রীকৃষ্ণকে অভিন্ন ভাবতে দ্বিধা করলেন। তাই সনাতন গোস্বামীর মতে প্রভু হলেন 'রাধা ভাব দ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ'। কৃষ্ণ রাধার রূপ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

গোস্বামীদের মতবাদ প্রচারের ভার বৃন্দাবন নিবাসী কৃষ্ণদাস কবিরাজকে দেওয়া হলো। চৈতন্য চরিতামৃত লেখার পঞ্চাশ বছর আগে রচিত চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ বলে প্রচার করলেন। এই বই গৌড়দেশে লোকপ্রিয় হয়েছিল। তাই সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলায় চৈতন্য চরিত লিখলেন। চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবন সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস তাই সন্ন্যাস জীবন বিশদ-ভাবে বর্ণনা করলেন।

গোস্বামী মতবাদ প্রচারের জন্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ রায় রামানন্দকে মুখপাত্র করলেন। রামানন্দকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করার কারণ ছিল। তিনি তাঁর জগন্নাথ বল্লভ নাটকে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনা করেছিলেন। কবিকর্ণপুরের চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের নবম অংকে তাঁকে 'উত্তম ভাগবত' বলা হয়েছিল। স্বয়ং মহাপ্রভু সার্বভৌমকে বললেন যে তিনি দাক্ষিণাত্যে শৈব, পাষণ্ডী ও বৈষ্ণব মত শুনলেন। 'কিন্তু ভট্টাচার্য, রামানন্দ মতমেব রুচিতম্' (চৈতন্য চন্দ্রোদয়, অষ্টম অংক) রামানন্দ—শ্রীচৈতন্য মিলন বর্ণনায় কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণিত হরিভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরের অবিকল অনুবাদ করেছেন। তিনি কবিকর্ণ-পুরের কাব্য ও নাটক হতে 'মানোপচার-কৃত-পূজনং' শ্লোক ও প্রেমবিলাস বিবর্ত সম্বন্ধে ব্রজবুলিতে লিখিত পদ্য উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ কবিকর্ণপুরের ঋণ স্বীকার করেন নি। তিনি রামানন্দকে দিয়ে বলিয়েছেন যে রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করে নিজ রস আস্বাদন হয়েছেন। একথা কবিকর্ণপুর লেখেন নি। তাই তাঁর ঋণ স্বীকার করলে এ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত—বোঝা যেত।

কবিরাজ গোস্বামী রামানন্দের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে দেখিয়েছেন যে তিনি উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। চৈতন্য ভাগবতেও শ্রীচৈতন্যকে দিয়ে বলান হয়েছে যে নিত্যানন্দ মদ্যপ বা অসচ্চরিত্র হলেও তিনি বন্দনীয়। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তুলনায় রামানন্দের আত্মসংযমকে বড় করে তিনি প্রকারান্তরে প্রভুকে ছোট করেছেন। রামানন্দের পাণ্ডিত্য প্রসঙ্গে বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় দেখিয়েছেন যে ১৪৫৫ শকে রচিত বিদগ্ধ মাধব নাটকের পঞ্চম অংকের শ্লোক সম্বন্ধে ১৪৩৮ শকে রূপ গোস্বামী রামানন্দের মত জানতে চেয়েছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন যে রামানন্দ-মিলন লীলা তিনি স্বরূপ দামোদরের কড়চা অনুসারে লিখেছেন। তিনি একথাও লিখেছেন যে প্রভুর শেষ লীলা স্বরূপ দামোদরের কড়চায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস অন্তালীলা লেখবার সময় এই কড়চা থেকে একটি শ্লোকও উদ্ধৃত করেন নি।

বলা হয়, স্বরূপ দামোদরের কড়চা এখন হারিয়ে গেছে। কৃষ্ণদাস গ্রন্থ অর্থে কড়চা শব্দ ব্যবহার করেছেন। কড়চা কোন লেখকের শ্লোকগুলির সমষ্টি—এই অর্থেও তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও অন্যান্য কড়চা-কর্তা-দের কথা লিখেছেন। কিন্তু রঘুনাথ দাস চৈতন্য লীলা সম্বন্ধে মাত্র কুড়িটি শ্লোক রচনা করেছেন। স্বরূপ দামোদরের কয়েকটি শ্লোক পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলির সমষ্টি হল স্বরূপ দামোদরের কড়চা ও কৃষ্ণদাস পুরের নাম না করবার জন্যে এই কড়চার দোহাই দিয়েছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রূপ গোস্বামীর ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ও উজ্জ্বল নীলমণি অনুসারে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব রামানন্দকে দিয়ে বর্ণনা করিয়েছেন। রাধা মহাভাব স্বরূপিণী—এ কল্পনার জন্যে তিনি জীব গোস্বামীর ভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু একথা লেখা যায় না যে তিনি ব্রহ্মসংহিতা

চৈতন্য—নিত্যানন্দ—অদ্বৈত উনিশ শতক

কৃষ্ণকর্ণামৃত পুঁথির নাম উল্লেখ করেছেন। ব্রহ্মসংহিতার লেখক ব্যাসতীর্থ বা ব্যাসরাজ 'প্রভুর সমসাময়িক ছিলেন ও পেনুকোণ্ডায় থাকতেন। ১৫১০ সালের মধ্যে কি তাঁর ব্রহ্মসংহিতা পুঁথি প্রসিদ্ধি লাভ করে সুদূর মালাবারে আদৃত হয়েছিল? দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত পুঁথি প্রায়ই আঞ্চলিক লিপিতে লেখা হতো। ব্রহ্মসংহিতা কি মালয়লম্ লিপিতে লেখা হয়েছিল? কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকাকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুকে এই পুঁথি সংগ্রহ করার জন্যে কৃষ্ণবেন্না নদী পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। রামানন্দকে পুঁথি দুটি দেবার জন্যে প্রভু নর্মদা তীর হতে সোজা পুরী না গিয়ে আবার দক্ষিণ ভারতের রাজমহেন্দ্রীতে গেলেন অর্থাৎ ৫০০ মাইল বেশী হেঁটে গেলেন; যদিও কয়েক মাসের মধ্যে রামানন্দের পুরী যাবার কথা ছিল।

শ্রীচৈতন্য রাজমহেন্দ্রী হতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর গেলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই তিনি রামেশ্বর যাবার জন্যে বেরিয়েছিলেন। এমনকি পুরীতে এক মাস থেকে রথযাত্রা দেখার জন্যে অপেক্ষা করলেন না। চৈতন্য চরিতামৃতে প্রভু বলেছেন যে তিনি সেতুবন্ধ দেখে ফিরবেন; মুরারী ও কবিকর্ণপুরেও রামেশ্বর যাত্রার উল্লেখ করেছেন। অথচ শ্রীচৈতন্য ভারতের শেষ প্রান্ত কন্যাকুমারী পর্যন্ত গিয়ে বৈষ্ণবদের চোখে পবিত্র আদি কেশবের মন্দির দর্শন করেছিলেন। কবিকর্ণপুরের কাব্যেও মল্লার দেশবাসী পাষণ্ডী ভট্ট মারীদের উল্লেখ আছে। ধনুতীর্থে স্নান ও রামেশ্বর শিব দর্শনের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করার কারণ কি ছিল? অনুমান করা যেতে পারে যে ভারতী সম্প্রদায়ের ব্রহ্মচারী (চৈতন্য) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী সম্প্রদায়ের প্রধান পীঠ শৃঙ্গেরী মঠ দর্শন তাঁর প্রথম কর্তব্য মনে করেছিলেন। এই মঠ রামেশ্বরে অবস্থিত ছিল। *

* চতুর্থে। দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গেরী বর্ত্ততে মঠঃ

* * *

অস্ত্রান্যে দেবতা যত্র ক্ষেত্র রামেশ্বর বদোং

চৈতন্যচরিতামৃত গৌড়ীয় মঠ সংস্করণ

শুধু কৃষ্ণদাস কবিরাজ নয়, সকল বৈষ্ণব চরিতকারেরা রামেশ্বরে শৈবপীঠ শৃঙ্গেরী মঠ দর্শনের কথা উল্লেখ করেন নি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃষ্ণকর্ণামৃত পুঁথি সংগ্রহের জন্যে শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণবেন্না নদী পর্যন্ত নিয়ে গেলেন ও শুধু পুঁথি সংগ্রহের জন্যে যাওয়া যদি বিশ্বাসযোগ্য মনে না হয়, তাই নির্বিন্ধ্যা নদীর নিকট আরেক ধনুতীর্থ পর্যন্ত তাঁকে নেওয়া হলো। সেকালে অনেক শৈব ভক্ত চার ধাম পর্যটন করতেন। কবিরাজ গোস্বামী রামেশ্বর থেকে শৈবপীঠ দ্বারকা পর্যন্ত ভ্রমণের কাহিনী শুনে থাকবেন। কিন্তু তিনি আরও কয়েকটি স্থানের নাম জুড়ে দিলেন। বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় লিখেছেন, 'প্রভু উত্তরে একস্থান দেখিয়া দক্ষিণে আসিলেন, আবার সেই স্থান দেখিবার জন্যে উত্তরে গেলেন এবং পুনরায় দক্ষিণে আসিলেন। এরূপ ভাবে ভ্রমণ করা সম্ভব মনে হয় না (চৈতন্য চরিতের উপাদান পৃ ৩৬২)।

গোদাবরীর উৎসের কাছে নাসিক থেকে গোদাবরীর মোহানায় রাজমহেন্দ্রী যাবার কোন যাত্রীপথ ছিল না। কৃষ্ণদাস এই দীর্ঘ পদযাত্রার কোন বিবরণ দেন নি, কারণ তাঁর ভৌগোলিক জ্ঞান সীমিত ছিল।

কৃষ্ণদাস প্রভুর গভীর পাণ্ডিত্যের উল্লেখ করেছেন—যা তাঁর বাল্যবন্ধু মুরারী গুপ্ত তাঁর কাব্যে করেন নি। 'কৃষ্ণদাস' বেদান্ত বিচার প্রসঙ্গে যেসব কথা শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। তাহার অনেকগুলি কবিকর্ণপুর নাটকে সার্বভৌমের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন।' (চৈতন্য চরিতের উপাদান পৃ ৩৫১)।

অন্ত্যলীলা আকারে ছোট হওয়ায় কৃষ্ণদাস দুটি কাহিনী জুড়েছেন। বার্দ্ধক্যের দরুন তাঁর খেয়াল হল না যে এসব ঘটনা উল্লেখ করে তিনি প্রভুর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছেন। সার্বভৌমের জামাই অমোঘ মন্তব্য করেছিল যে সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য দশ-বার জনের অন্ন ভোজন করেছেন। এই রকম অপবাদের অপরাধে তার কলেরা হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করার কথা যে চৈতন্য চরিতামৃতে অমোঘের অপবাদ মিথ্যা। একথা বলা হয়নি। দ্বিতীয় ঘটনা অনুসারে তরুণ সন্ন্যাসী ছোট হরিদাসের গুরু তাকে মাধবী দাসীর কাছ থেকে চাল আনতে পাঠিয়েছিলেন। সে প্রকৃতি সম্ভাষণ করেছিল, এই অপরাধে প্রভু তাকে বর্জন করলেন। ক্ষোভে হরিদাস আত্মহত্যা করল। প্রভুকে তার মৃত্যু সংবাদ জানান হলো। 'শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত। প্রকৃতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।' এই কাহিনীতে 'বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী' মাধবী দাসী এবং হরিদাসের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

কবিরাজ গোস্বামী দেখিয়েছেন যে শ্রীচৈতন্য অন্তরে রাধার বিরহ ব্যথা অনুভব করতেন ও শ্লোক আবৃত্তি করে বিলাপ করতেন। ভাবোন্মাদ বর্ণনার সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'নিজের লেখা গোবিন্দ লীলামৃতের বহু শ্লোক শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন' (শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান পৃ ৩৯২)।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভক্তদের জন্যে চরিতামৃত লিখেছেন। তাই তাঁর বই ভক্তি দিয়ে পড়া উচিত, যুক্তি দিয়ে নয়। তাঁর আদর্শের শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ইতিহাসের শ্রীচৈতন্যের সম্পূর্ণ মিল নেই।

নীলাচলে মহাপ্রভুর যাত্রাপথ

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে, শ্রীচৈতন্যদেব যখন প্রথমবার উৎকল যাত্রা করেন তখনকার বিবরণে এইসব জায়গাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় :

ছত্রভোগ : চব্বিশ পরগণা জেলার মথুরাপুর থানায়। এখান থেকে নদী পার হয়ে শ্রীচৈতন্য উৎকল রাজ্যের প্রয়াগ ঘাটে উঠলেন। প্রয়াগঘাট ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি মন্ত্রেশ্বর নদীর কোন ঘাট হতে পারে। তমলুক : মুরারি গুপ্তের কাব্যে আর জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাচ্ছি।

নারায়ণগড় : মেদিনীপুর থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে। রেললাইন হবার আগে তীর্থযাত্রীরা হাওড়া জেলার উলুবেড়ে পর্যন্ত নৌকোয় এসে এই পথ হয়ে দাঁতনে যেতেন। দাঁতন : জনশ্রুতি এখানে মহাপ্রভু দাঁতন করে ফেলে গিয়েছিলেন। তা থেকে গাছ বেরিয়েছিল। সেই থেকে এই নাম।।

জলেশ্বর : সুবর্ণরেখার কূলে। প্রভু এখানে জলেশ্বর শিবের মন্দির দর্শন করেছিলেন। হুসেন শাহ এ মন্দির ভেঙে দিয়েছিলেন। অমর্দা রোডস্টেশন থেকে ন কিলোমিটার পূবে অমর্দায় একটি পুকুরে মহাপ্রভু স্নান করেছিলেন। পুকুরের প্রধান ঘাটের নাম চৈতন্য ঘাট। অমর্দার কাছে সুন্দরকুলি গ্রামে চৈতন্যদেব ভিক্ষা করেছিলেন আর রাত কাটিয়েছিলেন বলে জনশ্রুতি।

কানপুর : প্রাচীন নাম নৃসিংহপুর। এখানে তাঁর পদধূলি পড়েছিল। সতের শতকের গোড়ায় শ্যামানন্দ ঠাকুর এখানে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি এখানে একটি মন্দিরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের দারুবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরটির এখন শেষ অবস্থা।

সদানন্দপুর : প্রাচীন নাম বাঁশদা। চোদ্দ শতকের তাম্র-লিপিতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

রামচন্দ্রপুর : বালেশ্বরের কাছে। চৈতন্যমঙ্গলে উল্লেখ আছে। বালেশ্বর থেকে পাঁচ মাইল দূরে রেমুনা। চৈতন্যদেবের আগে মাধবেন্দ্র পুরী নীলাচলের পথে এখানে গোপীনাথদর্শন করে-ছিলেন।

সেদরা গ্রামে মহাপ্রভু সিদ্ধেশ্বর শিবদর্শন করেছিলেন।

ভদ্রক : কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে আছে, প্রভু গৌড়দেশে ফেরার পথেও এখানে বিশ্রাম করেছিলেন। ভদ্রকের উপকণ্ঠে সাইথা গ্রামের মদনমোহন মন্দিরে তাঁর ব্যবহৃত কাঁথা রক্ষিত আছে।

ধামনগর : প্রাচীন নাম ধর্মনগর। ভদ্রক থেকে ৪৮ কিলো-মিটার দক্ষিণ-পূবে।

আনন্দপুর : ধামনগরের দক্ষিণে। এখানে পরে চৈতন্যমন্দির হয়েছে।

গৌরাংগপুর : এখানে একটি প্রাচীন মন্দির সংস্কারের অপে-ক্ষায় রয়েছে। চৈতন্যদেব এখানে বৈতরণীতে স্নান ও পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করেছিলেন। বলে শোনা যায়। পরে স্থানীয় জমিদার গৌরাংগের পুণ্য স্মৃতিজড়িত এই গ্রামের নাম রাখেন গৌরাংগপুর। গৌরাঙ্গমন্দিরে প্রায় চার ফুট উঁচু গৌরাংগের দারুমূর্তি আছে। জনশ্রুতি সত্য হলে এটি অন্যতম প্রাচীন চৈতন্যমূর্তি।

যাজপুর : নদীর তীর ধরে প্রভু এখানে বরাহমন্দির দেখতে এসেছিলেন। গৌরাঙ্গপুর থেকে যাজপুরের দূরত্ব মাইল দশেক।

গৌরাঙ্গপুরের : চৈতন্য মূর্তি

আটুলমর্দ : যাজপুরের দক্ষিণ উপকণ্ঠে। মন্দাকিনী নদী এককালে এই গ্রাম দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এখন প্রায় বিলুপ্ত। হিন্দু আমলে নির্মিত সেতুর চিহ্ন আজও দেখা যায়।

পুরুষোত্তমপুর : যাজপুর থেকে বারো কিলোমিটার দক্ষিণে। বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চার কেন্দ্র ছিল। ওড়িয়া কবি দ্বিজসনাতন বিদ্যা-বাগীশ দ্বাদশ স্কন্দ ভাগবত বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এখানে চৈতন্যমন্দির হয়েছিল।

গোপীনাথপুর : এখানে বিরূপা নদী মহানদীর সঙ্গে মিলেছে। চৈতন্যদেব বিরূপা নদীর বাঁধ ধরে চৌদ্বারে পৌঁছ-লেন। চৌদ্বার : মহানদীর উত্তরে। চৌদ্বারের কাছে মহানদীর চায়া-পাড়া ঘাটে পাথরের ওপর একটি পায়ের ছাপ আছে। ভক্তদের ধারণা এটি প্রভুপদচিহ্ন।

কটক : গড়গাড়িয়া ঘাটে একটিছোট মন্দিরেও প্রভুর চরণ-চিহ্ন আছে। তিনি ফেরার পথে এখানে ছিলেন তা শোনা যায়। আশ্বিন পূর্ণিমার রাতে তাঁর উপস্থিতি স্মরণ করে গড়গাড়িয়াঘাটে বালিমেলা শুরু হয়। কটকের বারবাটি দুর্গে তিনি সাক্ষীগোপাল দর্শন করেছিলেন।

কলিয়ন্তা : এখানে কুয়াখাই নদী পেরিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব ভুবনেশ্বরে গেলেন। ইংরেজ আমলেও লোকে এই পথে যাতায়াত করত।

ভুবনেশ্বর : চৈতন্যদেব বিন্দুসরোবরে স্নান করে লিঙ্গরাজ শিব মন্দির দর্শন করলেন। এখান থেকে যাত্রা করে তিনি বালকাটির কাছে ভার্গবী নদী পার হলেন। তাঁর স্মৃতি নিয়ে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। ভার্গবী নদীর পশ্চিম কূল ধরে তিনি নীলাচল রওনা হলেন।

কমলপুর : অধুনালুপ্ত গ্রাম। ভার্গবী নদীতে স্নান করে প্রভু কপোতেশ্বর মন্দিরে পুজো দেন। এই মন্দির জনকদেইপুরের কাছে। পুরী থেকে বারো কিলোমিটার দূরে 'তুলসী চোরা' থেকে চৈতন্যদেব জগন্নাথ মন্দিরের চূড়া দেখেছিলেন।
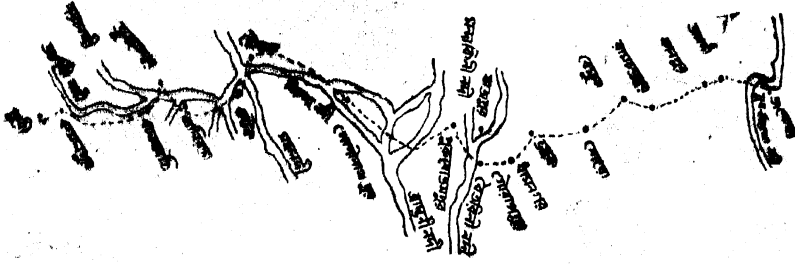
আঠার নালা : এখান থেকেই তিনি একা জগন্নাথ মন্দিরের দিকে ছুটে গেলেন।

'পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।'
—চৈতন্যচরিতামৃত।

বিদেশে কৃষ্ণচেতনার প্রসার

উনিশশ উনসত্তর সালে রথযাত্রার দিনে ক্যালিফর্নিয়ার সান-ফ্রান্সিসকো শহরে আমি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। প্রশান্ত মহা-সমুদ্রের পাড়ে মুন্ডিত মস্তক, গেরুয়া পরণে কয়েক সহস্র শ্বেতাঙ্গ নরনারী ভক্তিভাবের আর এক অশান্ত মহাসমুদ্রে আলোড়ন তুলেছিল। তাদের মুখে : হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে : মন্ত্রের দৃপ্ত উচ্চারণ।

ওদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল পরে। ওরা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্যসমিতি, সংক্ষেপে 'ইসকন' মঠের বৈষ্ণব। ওদেশে এদের বলে হরেকৃষ্ণ পীপল। ওদের গুরুদেব গৌড়ীয় মঠের প্রাক্তন আচার্য, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর শিষ্য স্বামী ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ। সারা পৃথিবীতে এখন তার সংঘের কম করে দুশোটি শাখা কেন্দ্র। জগৎজোড়া খ্যাতি। শ্রীধাম মায়াপুরে 'ইসকন' প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রোদয় মন্দির দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। প্রভুপাদ প্রকৃত বৈষ্ণব সাধু। তিনি বাঙালী। গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম শ্রীঅভয়চরণ দে। পরি-ণত বয়সে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের চরণ ভরসা করে নিঃসম্বল অবস্থায় সাগরপাড়ি দিয়েছিলেন এগার বছর আগে। আজ তার মিশন সার্থক।

পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষ তাঁর কাছে শিখেছে : গৌরাঙ্গের দেওয়া হরিনাম। ভরত ভূমিতে জন্ম সার্থক হয়েছে তার।

মাঝরাতে দরজায় টোকা পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল গোলোকবাবুর। না-জানি আবার নতুন কোন উপদ্রব শুরু হল।

বাইরে এখন বরফ পড়ার মতো অবস্থা। যেমন ঠাণ্ডা তেমন সেই কনকনে উত্তুরে বাতাস। খানিকক্ষণ ঐ বাতাসে দাঁড়ালে নাকের ডগা পাথর হয়ে ওঠে। কে বলবে আজকেই এ বছরের শীতলতম দিন কিনা!

গোলোকবাবু অর্থাৎ গোলবাবু নামেই যিনি বিশেষভাবে পরিচিত সেই বাহান্ন বছর বয়সী সাব ইন্‌সপেকটর সাহেব হুঁ-হাঁ শব্দ করার আগে তাঁর হস্তিনী-সদৃশা স্ত্রীর দেহের উপর থেকে হাতখানা সরিয়ে নিলেন। তারপর ঘরের অন্ধকারের দিকে চোখ পেতে প্রশ্ন করলেন, কে? কে বাইরে?

—আজ্ঞে হুজুর! আমি সুদর্শন। সুদর্শন জেনা।

—ও সুদর্শন! তা, এই রাতে আবার কেন পিরীত করতে এলে গো? কি হয়েছে?

—সামুলি থেকে এই মাত্র খবর এসেছে হুজুর, ডাকাত পালাচ্ছে। এই চেকপোস্টে তার গাড়ি আটকাতে হবে।

—ডাকাত! গাটা কেমন ঝাঁকি খেয়ে উঠল। এত রাতে কেন! ওদের কি শালা শীত গ্রীষ্ম নেই, রাত বিরেত নেই।

কিন্তু এ ধরনের মন্তব্য গোলোকবাবুর মুখে সাজে না। নিজেকে সামলে নিলেন, ডাকাত পালাচ্ছে! কি রকম গাড়ি? নম্বর বলেছে? যত শালা ঝামেলা।

দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এলো, তেরশ' চার কিংবা আঠারো শ' চার যে কোন একটা হবে হুজুর। তিন আর আটে একটু গোলমাল আছে। ওরা অন্ধকারে নম্বরটাকে ঠিক মালুম করতে পারে নি।

—পারে নি তো আমরা কি করব! তেরশ চার আর আঠারো শ' চার এক হল! দাঁতে দাঁত চেপে বিরক্তি প্রকাশ করলেন গোলোকবাবু। পাশে তাঁর স্ত্রী হেমাদেবীও ততক্ষণে জেগে উঠেছেন। পাছে গোলোকবাবু এখনি বিছানা ছেড়ে উঠে আবার ডাকাত ধরতে বেরন এই ভয়ে তিনি থলথলে একটা হাতে হাতীর শুঁড়ের মতো গোলোকবাবুকে জাকড়ে ধরলেন। এ সময় ওঁর রা-কাড়া শোভা পায় না, কেন না বাইরের লোক তাতে বুঝবে, গোলোকবাবু তাঁর স্ত্রীর কোলে শুয়ে আছে। দুশ্যটা নিয়ে কেউ আলোচনা করুক এটা আদৌ কাম্য নয়।

গোলোকবাবু শুধালেন, কি রকম গাড়ি? বর্ণনা দিয়েছে?

উত্তর এল অ্যাম্বাসাডার। চকোলেট অথবা একটু হাল্কা বিস্কুট ধরনের। টর্চের আলোয় ঝট করে রং ধরে উঠতে পারে নি। তবে কালো নয়, লাল নয়, অরেঞ্জও নয়।

—অরেঞ্জ! প্যান্টের বোতামগুলি খোলা ছিল, এক হাতে বোতাম খুঁজতে খুঁজতে আবার মুখ বিকৃতি করলেন গোলোকবাবু, অরেঞ্জের নিকুচি করেছে। বাংলায় কমলা বলতে অসুবিধা হয়!

হেমাদেবী ফিস ফিস করে কানে মন্ত্র দিলেন, তাড়িয়ে দাও না। গাড়িটা তো এখান দিয়ে যাবেই। আটকিয়ে না হয় যেন তোমাকে ওরা ডাকে!

হেমার হাতটাকে বুকের ওপর থেকে সরাবার চেষ্টা করলেন গোলোকবাবু। বেশ ভারি।

ফলে, এবার ফিস ফিস করে স্ত্রীর উদ্দেশ্যেই বললেন, আহ, ছাড়ো, ডাকাত চলে যাবে।

এত সোজা কিনা। স্ত্রীও দমবার পাত্র নন।

অগত্যা গোলোকবাবু আবার শুধোলেন, গাড়িতে ক'জন লোক? কি রকম দেখতে?

দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এল, তিনজন স্যার। তিনজনেরই বয়স ওরা আন্দাজ করছে তিরিশের কম।

—তা হলে সব যুব ডাকাত! আরমস্ আছে?

—থাকাই স্বাভাবিক! চিবিয়ে চিবিয়ে দরজার ওপাশ থেকে উত্তর দিল সুদর্শন। কতক্ষণ আর এভাবে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কথা বলা যায়। ওপরআলা হয়েছে তো কি হয়েছে! দরজা খুলতে পারে না। কে জানে, এখন কি করছে।

হেমাদেবী এবার পাশ থেকে অনুনয় করলেন, তুমি যেও না গো! আজকালকার ওসব ছেলেদের বিশ্বাস নেই।

গোলকবাবু শুধোলেন, আরমস্ বললে কি ধরনের জিনিসপত্র বলেছে?

সুদর্শনের ইচ্ছা হল এবার বলে, এই মেসিনগান টেসিনগান হবে বোধ হয়। স্যার। কিন্তু সাহেবের সংগে এ রসিকতা সাজে না। যা শুনেছিল তাই বলল। বলল, কয়েকটা দেশী পিস্তল আছে বলে ওরা সন্দেহ করছে। দুটো একটা হ্যাণ্ড গ্রেনেডও থাকতে পারে।

গুম হয়ে আরমসের কথা শুনলেন গোলোকবাবু। কোথায় এই শীতের রাতে একটু আরাম করে ঘুমোব, না, ডাকাত ধর। কি কুক্ষণেই যে এমন একটা চাকরিতে ঢুকেছিলাম। সুরেন্দর জোক না হলে কেউ এ লাইনে আসে! হেমা মিথ্যে বলে না, বোকা লোকের চাকরি করা সাজে না এখানে। বোকারা চিরকাল পাঁটি চোখে। আর বলনেওয়ালারা মাথাটুকু খাটিয়ে খাটিয়ে খায়। তোমাকে এই ধেরধেরা গোবিন্দপুরে বদলি করে দিল কেন বোঝ না হ্যাঁ এ জায়গাটারও নাম গোবিন্দপুর

গোলোকবাবু সব বোঝেন. তবু স্ত্রীর এই খবরদারি করা কথার প্রতিবাদ না করে পারেন নি. সব ব্যাপারে কথা বোলো না তো! অফিসের সব কিছুই যেন বুঝে বসে আছ!

—তোমার চেয়ে ভাল বুঝি! তোমার চেয়ে জুনিয়ার মিত্র ঠাকুরপো আজ কোথায় উঠে গেছে, আর তুমি কোথায় পড়ে আছ, চোখে দেখ না!

ভালই দেখেন গোলোকবাবু। মিত্র যে ভাবে চোখের মাথা খেয়ে বড় সাহেবের পায়ে তেল ঢালতে পারে, সেটা উনি মরে গেলেও পারবেন না। তাতে যা হয় হোক।

সুদর্শন দরজার ওপাশে তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। গোলোকবাবুর আর কোন সাড়া শব্দ নেই দেখে, বিরক্তিতে আবার বলল, স্যার বড় মশা।

—মশা! গোলোকবাবুও খিঁচিয়ে উঠলেন, মশা তো আমি কি করব। রাস্তা

বন্ধ করে সব কটা গাড়ি সার্চ শুরু করে দাওগে। আর কে আছে ওখানে? ভোলা ঘুমুচ্ছে না জেগে আছে?

—আপনি আসবেন না স্যার? আমরা মাত্র দুজন কি স্যার পেরে উঠব! যদি ওরা ফায়ার শুরু করে?

—তোমাদের কাছেও রাইফেল আছে। ওটা তো আর ফেলে রাখার জন্য দেয় নি। সরকার। তেমন বুঝলে তোমরাও ফায়ার করবে। তালাও অর্ডার রইল, ফায়ার করবে।

ফায়ার করার পেছনে অনেক হ্যাপা থাকে। সুদর্শন ভালই জানে সাহেব সামনে থাকলে কাজটা ওর পক্ষে অনেক সহজ হয়। কিন্তু পুরো ঝক্কিটা যে এখন ওর কাঁধেই চাপাতে চাইছেন গোলোকবাবু তাতে সন্দেহ নেই। সবুট মেঝের ওপর একবার ঠুকে শব্দ করে ও বলল, ঠিক আছে স্যার, আপনি ঘুমোন। আমি যাই। ঘুম ভাঙলে আসবেন। ঘুমোন মানে। গোলোকবাবু যেন গালে একটা চপেটাঘাত খেলেন। কিন্তু ততক্ষণে সুদর্শন যে গটমট করে চলে গেল, উনি বুটের শব্দেই তা ধরতে পারলেন।

—শুনলে তো, কি বলে গেল?

—বলবে না, তোমাকে গ্রাহ্যি করে তার! তোমার জায়গায় যদি আমি থাকতাম ওর মজা বার করে দিতাম। সামান্য একটা কনেস্টবলও তোমার ওপর ছড়ি ঘোরায়।

—আমার জায়গায় না থেকেও তুমি ওকে কম খাটাও না।

—খাটাব না কেন! একটা লোক রাখারও তো মুরোদ নেই তোমার।

গোলোকবাবু এবার গা ঝাড়া দিলেন, গায়ের ওপর থেকে লেপটা খাটের এক কোণায় গিয়ে ঝুলে পড়ল।

হেমাদেবী বেশবাস ঠিক করে নেবার জন্য তাড়াতাড়ি শুরু করলেন, ও কি! রাগটা লেপের ওপর না দেখালে হত না?

—বকবক না করে এখন ঘুমোও তো। খাট থেকে নেমে পড়লেন গোলোকবাবু। অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজে আলোটা জ্বালালেন। ওপাশে পাল্লাহীন দেয়াল আলমারির টেবিল ক্লকটার দিকে তাকালেন, তিনটে বাজতে আঠারো।

আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল হেমাদেবীর।

—মাগো, এখনো গোটা রাতটাই পড়ে আছে। সুদর্শনকে তো বলেই দিলে গাড়ি দেখতে। তোমার না গেলে হয় না? কি মড়াখেকো চাকরি রে বাবা।

রাতে এমারজেন্সির কথা চিন্তা করেই গোলোকবাবুকে ইউনিফর্ম পরে শুতে হয়। পায়ে মোজা গলিয়ে এখন শু পরতে যেটুকু সময়। লুঙ্গি পরে শুয়ে একবার কি ঝামেলাতেই পড়েছিলেন গোলোকবাবু! মনে পড়ল, স্বয়ং এস-পি সাহেব সেবার দয়া করে এসে ডাকাডাকি। রাতের ডিউটিই ছিল গোলোকবাবুর। রাতের ডিউটি মানে এই

নয়, চেকপোস্ট ছেড়ে ঘরে সংখনিদ্রা দেওয়া যাবে। তড়িঘড়ি সাহেবের ডাকে যখন বেরিয়ে এলেন গোলোকবাবু, তখন ওঁর পরনে লুঙ্গির বদলে একটা শায়া। কি করে ওরকম হয়েছিল, কে জানে! এস-পি সাহেব সেবার কেবলমাত্র 'শা শুয়োর' বলতেই বাকি রেখেছিলেন। ফলে এক ডাকে যেন বেরুতে পারেন, এমনি অবস্থাতেই আজও শুয়েছিলেন।

—আমার মাফলার কোথায়? ওদিকে সুটকেশের ওপর এক গাদা কাপড় চোপড় স্তূপ হয়ে আছে, একটু গুছিয়ে রাখতে পার না? কি কর সারাদিন?

হেমাদেবী চায়ের জন্য স্টোভে আগুন ধরাতে বসেছিলেন, বললেন, কাপড়গুলো আমার না তোমার? এসে যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে, হবে না।

সারাঘর ওলট পালট করে শেষ পর্যন্ত মাফলারটাকে খুঁজে পাওয়া গেল খাটের নিচে। কি করে যে এটা এখানে এল ভগবান জানে! তাও যদি বাড়িতে আণ্ডা-বাচ্চা থাকত।

হেমাদেবী বললেন, বোস, চা খেয়ে যাও। আর একটা কথা বলে দিই, নিজে আর বাড়িয়ে কিছু বাহাদুরি করতে যেও না।

গোলোকবাবু কথা বললেন না। বলে লাভ নেই। স্ত্রী মাত্রেই মুখে যাই বলুক

নিজের চেহারাটা তো দেখলে পার, তুমিও কোন উত্তমকুমার নও।

চায়ের কাপটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন গোলোকবাবু উঠে দাঁড়ালেন, আমি উত্তমকুমার হতে যাব কোন দুঃখে, তবে তুমি আমার সত্যিকার হেমা মালিনী।

স্ত্রীকে একটু আদর করার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন কিন্তু এমন সময় ওঁর ঘড়িতে চোখ পড়ল, তিনটে বত্রিশ। নাহ্, আর দেরি করা চলে না। সামুলি থেকে কোন গাড়ি যদি না থেমে ছুটতে শুরু করে বড় জোর চল্লিশ মিনিট লাগার কথা। অর্থাৎ কিনা আড়াইটায় যদি ঘটনাটা ঘটে থাকে, ডাকাতদের এখন এই চেক পোস্টে পার হয়ে যাওয়ার কথা।

দুর্গা দুর্গা করে গোলোকবাবু বেরিয়ে পড়লেন। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের অদৃশ্য ভালুক ঘরের ভিতর টলতে টলতে ঢুকে পড়ল। হেমাদেবী দরজায় দাঁড়িয়ে কেবল তাকিয়ে থাকলেন। সামনে কুয়াশা দুলতে লাগল।

কোয়াটার থেকে হাইওয়ে বড় জোর একশ মিটার। রাস্তার পশ্চিম দিকে একটা টিনের সেড। সেডের পেছন দিকে বর্তমান কলার বাগান বলে বেশ অন্ধকার মতো। বাগানটা আগেকার অফিসার দিব্দাবাবু করে গিয়েছিলেন, ফল ভোগ করছে এখনকার লোকেরা। ওখান থেকেও মাস তিনেক আগে

একটা বলার কাঁধ চুরি গিয়েছিল। বাঘের মুখ থেকে মাংস ছিনিয়ে নিয়ে খাওয়ার লোকও এ জঙ্গলে আছে।

আসলে সুদর্শন বা ভোলা দুটোই অপদার্থ। হদ্দ কুঁড়ে। এরা যদি তেমন চৌকস হতো, তা হলে কি আর এ অসময়ে গোলোকবাবুকে বেরুতে হয়।

বেরুতেই যখন হয়েছে তখন আর ভেবে লাভ নেই। গোলোকবাবু হন হন করে হেঁটে ঢাল সেড়ে উঠে এলেন। ওদিকে রাস্তা জোড়া জবরদস্ত একটা শাল-বল্লী কপিকলে আটকে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। বল্লীর মাঝামাঝি জায়গায় একটা ডেনজার সিগন্যাল, লাল হ্যারিকেন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে।

হ্যারিকেনটার দিকে একবার তাকালেন গোলোকবাবু। তারপর গটমট করে ঢাল সেড়ে উঠে এলেন।

বারান্দায় একটা বেঞ্চের ওপর দুই মূর্তিমান কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ছিল, গোলোকবাবুকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা উঠে দাঁড়াল।

গোলোকবাবু সটান ঘরে ঢুকলেন। ওখানে টেবিলের ওপর কাঁথার মতো লজঝড় একটা খাতা হাট করে খোলা। ঝুঁকে খাতায় উনি এন্ট্রি গুলি দেখে নিলেন। আড়াইটে থেকে তিনটে তিরিশের মধ্যে মাত্র পাঁচটা গাড়ি পার হয়েছে। তিনটে লরি, একটা জিপ, একটা অ্যাম-বাসাডার। অ্যামবাসাডারের নম্বর ষোল শ আটাত্তর। এখান দিয়ে পার হয়েছে তিনটে সাতে।

—সুদর্শন! ডাকলেন গোলোকবাবু।

সুদর্শন আর ভোলা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সুদর্শন বলল, বলুন স্যার।

—অ্যামবাসাডার একটাই পার হয়েছে দেখছি। গাড়িটা সার্চ করা হয়েছে?

—আজ্ঞে না স্যার, ও সময় আমি আপনাকে ডাকতে গিয়েছিলাম।

—ভোলা কি করছিল?

ভোলা বলল, স্যার আমিই এন্ট্রি করেছি ওর নম্বর। ওটা আমার লেখা।

—গাড়ি সার্চ করা হয়েছে কি হয়নি?

ভোলা থতমত খেয়ে গেল। আমি স্যার একা ছিলাম।

—একা ছিলে তো কি হল? গাড়িটা তো থেমেছিল।

—থেমেছিল স্যার।

থামার পর গাড়ির কাছে যাওয়ার দরকার হল না?

—আমি একা মানুষ স্যার, খাতায় এন্ট্রি করেছি। তারপর কপিকল ঘুরিয়েছি। তাছাড়া ওরা যা গাড়ির নম্বর বলে লিখিয়ে গেল সেটা তেরশ চার বা আঠারো শ ছয় নয়। তাই আর মাথা ঘামাইনি।

—ওরা বলতে ?

—দুজন লোক গাড়ি থেকে আমার কাছে এসেছিল স্যার। একজনের দাড়ি-গোফ রবি ঠাকুরের মতো কিন্তু শাদা নয়, কালো। দুজনেরই ঘাড় অবধি ঝোলানো চুল।

—বয়স ?

—খুব একটা বেশি বয়স না স্যার। তিরিশের নিচেই।

—গাড়িতে আর কজন ছিল ?

—আরো দু-একজন হবে, খেয়াল করিনি। দাড়িওয়ালা লোকটার গায়ে একটা ভারি ওভারকোট ছিল, আর অন্য লোকটার গায়ে একটা লেডিস চাদর।

—গাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে নেওয়া হয়নি বুঝি ?

ভোলা চুপ করে থাকল।

—ওরা যে ভুল নম্বর দেয়নি, সেটা পরীক্ষা করা উচিত ছিল আমাদের।

ভোলা মনে করতে পারছে না, ও গাড়ির সঙ্গে নম্বরটা ঠিকঠাক মিলিয়ে নিয়েছে কিনা। কিন্তু গাড়িতে এক নম্বর আর এখানে এসে আর এক নম্বর বলে ভরকি দিয়ে যাবে, একথা ওর মাথায় ঢোকেনি। ও ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

সুদর্শন শুধাল, গাড়ির রংটা কি রকম ?

ভোলা স্মৃতি ঘেঁটে বলল, একটু ছাই ছাই হবে। তবে স্যার ও গাড়ির নম্বর তেরশ চার বা আঠারো শ চার কোনটাই নয়। ওতে কোন খারাপ লোক ছিল না। খারাপ লোক থাকলে ওদের চোখ-মুখ দেখেই কিছু না কিছু আঁচ করতে পারতাম।

মুখে একটা খিস্তি এসে যাচ্ছিল গোলোকবাবুর। সামলে নিয়ে ফোন তুললেন, হ্যালো, সায়ুজি চেক পোস্ট!

ওপাশ থেকে ঘুম জড়ানো গলায় উত্তর এল, বলছি।

—কে, মিস্টার ঘটক ?

—হুঁ, বলছি।

—আমি গোলোক দাশ। আরে মশাই কি একটা ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলেন, কি ব্যাপার বলুন তো ?

—সে কি আপনারা কোন অ্যাকসন নেননি ? আড়াইটে নাগাদ একটা অ্যাম-বাসাডারে জনাতিনেক ডাকাত, ডাকাতি করে পালিয়ে গেছে এখান দিয়ে। আমাদের চেজ করার উপায় ছিল না। আপনারা আটকান নি ?

—খবরই তো পেলাম এই কিছুক্ষণ আগে।

—কেন, আজ সন্ধে আমরা ফোন করেছি।

—কত ইরেসপনসিবল্ লোক নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয় এখানে বুঝুন; আমি খবর পেলাম এই মাত্র।

—তাই নাকি। খুব অন্যায় করেছে আপনার কনস্টেবল।

—এখন কি করি বলুন দেখি?

—অ্যাকসন নিন, নিজে বাঁচতে চান অ্যাকশন নিন মশাই। কেসটা অনেক দূর গড়াবে। স্থানীয় পার্টি অফিসের লোকজন আমাদের উপর এসে হম্বি-তম্বি করে গেছে।

গোলোকবাবুর গলা দিয়ে অাঁক করে একটা শব্দ বেরুল।

—সকালের মেসেজই নোট তৈরি করে পাঠিয়ে দিন ওদের নামে। খুব ডেঁটে দিন ওদের।

শীতটা যেন এখন হাত ফুটো করে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছে। ফোনের রিসিভারটা একবার থরথর করে কেঁপে উঠল।

—কামারহাটিতে যোগাযোগ করে খবর পাঠাব?

—আলবাত পাঠাবেন। পাঠিয়ে দিন। ডাকাতদের ধরতে না পারলে কিন্তু বেশ ঝামেলা হবে।

—ঠিক আছে, পাঠাচ্ছি।

—হ্যালো! ওপাশ থেকে আবার ডাক এল।

—বলুন!

—নার্ভাস হয়ে পড়লেন নাকি মশাই। হা হা—

—না না, নার্ভাস কেন? নার্ভাস কি?

—মিসেস কেমন আছেন? সেদিন খরগোশের মাংস পাঠিয়েছিলাম, মিসেস কি বললেন?

—ওয়াণ্ডারফুল। কালকে ওকে পাঠিয়ে দেব, রান্নাটা শিখিয়ে দেবেন।

—তা যা বলেছেন! হা হা—হাসির রোল ভেসে এল ওদিক থেকে।

গোলোকবাবু ফোনটাকে নামিয়ে রাখলেন। তারপর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে আবার ফোন তুললেন, হ্যালো! কামারহাটি!

কামারহাটিকে অবস্থাটা গড়গড় করে জানিয়ে দিলেন গোলোকবাবু। অ্যামনা-সাড়ে তেরশ চার কিংবা আঠারোশ চার। আসলে ইংরিজি তিন আর আট একই রকম কিনা তাই ধাঁধা হয়েছে। ডাকাতের সংখ্যা তিন। বয়স বিশ থেকে ত্রিশ। দেশী পিস্তল আর হ্যাণ্ড গ্রেনেড ক্যারি করছে। প্রয়োজন হলে মুখোমুখি এনকাউন্টার করবেন, খুব আরজেন্ট ব্যাপার কিন্তু।

—স্যার!

চমকে উঠেছিলেন গোলোকবাবু। সে মুহূর্তে বুঝলেন পাশ থেকে সুদর্শনই অমন হেঁড়ে গলায় ওঁকে ডেকেছে সেই সেই মুহূর্তে কিছুটা অবাক হলেন।

—না, বাজে কথা। তোমরা সবাই ঘুমুচ্ছিলে!

—না স্যার, ঘুমুই নি স্যার। ভোলাকে জিজ্ঞেস করুন না, কেউ ঘুমুই নি আমরা।

বাইরে আর একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে ছুটে এল বারান্দায়। চোখ ধাঁধানো বিশ্রী হেড লাইটটা জ্বলছে। অ্যামবাসাডারে এরকম হেড লাইট জ্বলে না। নির্ঘাৎ ওটা লরি।

গাড়ির গতিটা কমে এল। লরিই। সুদর্শন রাস্তায় নামল, গাড়ির কাছে এগিয়ে গেল। ভোলা জাবদা খাতায় গাড়ির নম্বর আর সময় লিখবার জন্য তৈরি হল।

গোলোকবাবু আর একটা সিগারেট ধরালেন। রাস্তার উপর এখন কুয়াশার স্তর বেশ জমাট বাধতে শুরু করেছে। যত ভোর হবে ততই এই কুয়াশা ভারি হয়ে উঠবে। ভোরের দিকে এমন কুয়াশা হবে যে দু হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট চেনা যাবে না।

গাড়িটার ওপর খুব হম্বি-তম্বি শুরু করে দিল সুদর্শন। এ যেন তুই জল ঘোলা করিস নি, তোর ঠাকুরদা করেছিল।

গোলোকবাবু সিগারেটটা টোকা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। নাক দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া না কুয়াশা বেরুচ্ছে বোঝা গেল না।

রিপোর্ট লেখার খাতাটা উনি দু আঙুলে তুলে নিলেন।

ভোলা বলল, স্যার, আপনি চলে যাচ্ছেন?

গোলোকবাবু শব্দ করলেন, হুঁ! তেমন বুঝলে আবার যেন ডাকা হয়। বলতে বলতে উনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে পিছু হটতে শুরু করলেন।

দরজা ভেজান ছিল। একটু চাপ পড়তেই খুলে গেল। অন্ধকার। হেমা লেপ মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

টুক করে আবার আলো জ্বালালেন গোলোকবাবু। দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। ঘড়িতে এখন চারটে কাটায় কাটায়।

—কি? ঘুমুলে?

লেপের ভেতর থেকে একটা শব্দ এল, হুম। পরমুহূর্তেই লেপটা একটু নড়ে উঠল, ডাকাতদের খোঁজ পেলে?

পা থেকে জুতো খুলতে যেটুকু সময়, গোলোকবাবু তড়াক করে খাটের ওপর লাফিয়ে উঠে লেপের নিচে সেঁধিয়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পাখির মতো মুখ দিয়ে একটা শব্দ করতে শুরু করলেন, কুহু কুহু।

—ওকি! ওকি! হেমাদেবী লেপ গায়ে এমনভাবে দুলতে শুরু করলেন যেন ঢেউ শুরু হয়েছে।

—পাখি ডাকছে ভোর হচ্ছে। কুহু উ উ উ....

—ইহিঃ ইহিঃ—ঠাণ্ডা হাত আমার গায়ে কেন? ইহিঃ....ইঃ ইঃ...এই! পাগল নাকি!

লেপটা খসতে খসতে গা থেকে মেঝেয় গিয়ে পড়ল। হেমাদেবী ভারি দেহটা নিয়ে খাটের ওপর উঠে বসলেন। কিন্তু বসেও স্বস্তি নেই, লোকটা তবে বরফের মতো আঙুলগুলো আবার পিঠের দিকে এগিয়ে আনছে। লোকটাকে উনি সরাতে সরাতে ধপাস করে খাট থেকে নিচে পড়লেন।

—দস্যি। ডাকাত!

উত্তর এলো, কুহু—চা কর!

—ছাই করব। রাগত মুখভঙ্গি করলেন হেমাদেবী।

গোলোকবাবু এবার খাট থেকে উঠলেন। রিপোর্ট লেখার খাতাটা নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলেন।

পরে যেন একটা দফারফা হয়ে গেছে, এইভাবে চারপাশে একবার তাকালেন হেমাদেবী। তারপর স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করলেন, কি করছ?

—রিপোর্ট লিখে রাখি। সকালেই না জানি আবার তলব হয়!

—ভাল করে লেখ তো! তুমি তো আবার দয়ার অবতার। কারো নামে কিছু লিখতে হলেই তোমার হাত কাঁপে।

গোলোকবাবু একবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, তারপর আবার ভারি গলায় আদেশ করলেন, চা কর!

সত্যিকার একটা মুরগীর ডাক শোনা গেল এ সময় কক্ কক্ কো—

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন

প্রণতা দে

(৮)

মঠ, বেলুড়
হাওড়া জিলা
বাংলাদেশ। ১৫ ডিসেম্বর
১৮৯৮

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

আমার কাশ্মীর থেকে লেখা চিঠি পেয়ে তুমি আমাকে অত্যন্ত বেশী ভুল বুঝেছ। আবার লিভারের গোলমাল দেখা দিয়েছে, মাঝে মাঝে নীল হয়ে যাই। তুমি ছাড়া কে আমাকে বুঝবে এবং মার্জনা করবে? অনেক সময় কোন একটা জিনিস কেউ ভালবাসে অথচ সেজন্য মনে ভয় থাকে। আবার সেই ভয়টাই হয় আনন্দের ব্যাপার।

তুমি কেমন আছ? এত পরিশ্রম কেন কর যেজন্য তুমি প্রায়ই অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়? বেবীর কী খবর? এই গ্রীষ্মেই তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে আমি সুনিশ্চিত। আমার মত এরকম কর্মের বাঁধনে চতুর্দিকে বাঁধা বোধহয় আর কোন মানুষ নয়, আর সেই বাঁধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য এরকম চেষ্টাও কেউ করেনি। আমাকে কে বেশী চালনা করে বলে তোমার মনে হয়—মস্তিষ্ক না হৃদয়? 'মা' হলেন আমাদের চালক, বা পথপ্রদর্শক—যা কিছু ঘটছে বা ঘটবে সবই তাঁর ইচ্ছায়।

আপাততঃ বিদায় নিচ্ছি। তিনটি রহস্যপূর্ণ বস্তুর জন্য একটুকুও চিন্তা করবে না। তাদের রহস্য উন্মোচিত হবে এবং তার শুভ ফল তুমি লাভ করবে। কোন ভাল চিন্তা ব্যর্থ হয় না

এবং আমি সুনিশ্চিত যে তোমার চিন্তা সর্বদা অতি সৎ। "মা" তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন, তোমায় সৎ ও শুদ্ধ রাখুন এবং তোমার ইচ্ছে সকল পূর্ণ করুন এই সতত প্রার্থনা।

তোমাদের
ঠাকুরের শরণাগত
বিবেকানন্দ।

পুঃ—সম্ভবতঃ তোমার এই চিঠির উত্তর পাবার আগেই আমি ইউরোপ যাত্রা করব।

যদি খামের ওপরে ঠিকানাটা ভুল লিখে থাকি কিছু মনে কোরো না। আমি আমার নতুন খাতাটা হারিয়ে ফেলেছি। পুরোনো খাতা থেকে ঠিকানা লিখেছি।

(৯)

মঠ, বেলুড়।
হাওড়া জিলা। বাংলাদেশ
ভারতবর্ষ। ২৬ জানুয়ারী। ১৮৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

তোমার অপূর্ব সুন্দর চিঠিখানির উত্তর দিতে এত দেরি করবার জন্য মাপ না চাইছি। আসলে আমি আবারও একবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। পুরোনো ডায়াবিটিস রোগ তো গেছে কিন্তু তার জায়গায় দেখা দিয়েছে যাকে ডাক্তাররা বলছেন হাঁপানী, বদহজম—সবই অত্যন্ত বেশী স্নায়ুর পরিশ্রমের দরুন। এটা বড়ই কষ্টকর রোগ। মাঝে মাঝে শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে মনে হয়। বেশ কদিন থাকে এভাবটা। আমি কলকাতাতে সবচেয়ে ভাল থাকি। তাই এখানে এসেছি। কদিন বিশ্রাম, নিরিবিলিতে থাকা আর হাল্কা খাবারের ওপরে আছি। যদি মার্চ নাগাদ সেরে উঠি তাহলে ইউরোপ যাত্রা করব। মিসেস বুল এবং অন্যান্যরা চলে গেছেন। ওদের সঙ্গে একসঙ্গে যেতে পারলাম না এই অসুখের দরুণ—ভারী দুঃখিত আমি সেজন্য।

তোমার এখানে আসবার পরিকল্পনাটি আমি খুব ভেবে-চিন্তে দেখেছি। তোমাকে দেখলে আমি কী খুশী হব সে তো তুমি ভালই জানো; কিন্তু বৎস, এখানকার গ্রীষ্ম তুমি সহ্য করতে পারবে না। তুমি যদি এখনই রওনা হও তাহলে এখানে পৌঁছবে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। তারপর এখানে কোনরকম উপার্জনের ব্যবস্থা তুমি করে উঠতে পারবে না। এমনকী আমার নিজের দেশে বসে আমার নিজের পক্ষেই নিজের জীবনধারণের জন্য কিছু পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া তুমি যেরকম পরিবেশে অভ্যস্ত, তার চেয়ে এত অন্যরকম, এত হতশ্রী পরিবেশ এখানে। যথা,—হয়ত আমাকে কেবলমাত্র একটি সুতোর ধুতি পরা অবস্থায় দেখবে। তুমি কী তাতে খুব বিচলিত হবে? এদেশে তিনচতুর্থাংশ লোকের পরন শুধুমাত্র কোমরের কাছে একটি ছোট্ট সুতোর কাপড়ের টুকরো! সহ্য করতে পারবে কী?

এখানেই আজ চিঠি শেষ করব। আমি বড় দুর্বল। যদি মার্চ নাগাদ সেরে না উঠি তাহলে তোমাকে এখানে আসবার জন্য লিখব। সত্যিই আমি তাই চাই। মৃত্যুর আগে একবার তোমাকে দেখতে চাই।

একটুও চিন্তান্বিত হয়োনা বৎস! 'মা' যা চান তাই তো হবে! আমাদের কর্তব্য শুধু তাঁর ইচ্ছা পালন করে কাজ করে যাওয়া।

ঠাকুরের শরণাগত
তোমাদের বিবেকানন্দ।

পুঃ—মিসেস বুল শীঘ্রই কেমব্রিজ 'মাসে' পৌঁছবেন। তুমি ইচ্ছে করলে তাঁকে চিঠি লিখে সব বিশদ জেনে নিতে পারো। আমি আবারও তোমার ঠিকানা হারিয়েছি। তোমার পরবর্তী চিঠিতে দয়া করে ঠিক সঠিক ঠিকানাটা জানিও।

(১০)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া জিলা
বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, ১০ মার্চ, '৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

আমি এখন আরোগ্যের দিকে। আমার প্রধান রোগ হল বদহজম এবং স্নায়ু অবসাদ। প্রথম রোগটির জন্য তো আমি সাবধানে আছি। দ্বিতীয়টি,—তোমাকে দেখলেই সম্পূর্ণ সেরে যাবে। পুরোনো, খুব পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে কী আনন্দ না হয়, বোঝ তো? প্রফুল্ল হও। ভাবনার কিছু নেই। আমার চিঠির মধ্যে হতাশাজনক কোন একটা পংক্তি পেলে একটুও বিশ্বাস করো না। আমি আজকাল অনেক সময় আর 'আমাতে' থাকি না। কেমন নার্ভাস মত হয়ে পড়ছি। আমি এই মাসেই ইউরোপে পাড়ি দিচ্ছি, তাঁ আমেরিকাতেও। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানবে।

ঠাকুরের শরণাগত
তোমাদের বিবেকানন্দ

(১১)

মঠ, বেলুড়, হাওড়া
১১ এপ্রিল, ১৮৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

তোমার ফাল্গুই মার্চের চিঠি এইমাত্র পেলাম। আমার রোগ? জানি না কী! কেউ বলেন হাঁপানী, কেউ বলছেন হৃদযন্ত্রের স্নায়ু দৌর্বল্য,—অত্যধিক পরিশ্রমের দরুন। যাই হোক মাঝে মাঝে যে শ্বাসপ্রশ্বাস আটকে যাবার কষ্ট হত এবং বেশ কদিন ধরে থাকত, সেটা আর গত দুমাস হচ্ছে না। তবে সব সময় হার্টের দুর্বলতা বোধ করি, সেটা সাধারণতঃ হাঁপানীর রুগীর লক্ষণ নয়। এর কারণ জানা আর যাই হোক বদহজম যে অনেকখানি দায়ী সে বিষয় আমি সুনিশ্চিত; আসলে সবটাই আমার পেটের অবস্থার ওপরে নির্ভর করে। আশ্চর্যের বিষয় এবছরের গরমকালটা আমাকে একটু একটু করে সুস্থ করে তুলছে আর গরমটা বেশ সহ্যও হচ্ছে আগের তুলনায়।

তারও আগেই আমার ইংলন্ডে পাড়ি দেবার কথা। কিন্তু গরমে সেরে উঠছি বলে আরও সপ্তাহখানেক থেকে যেতে লোভ হচ্ছে। সমুদ্র যাত্রা খুবই স্বাস্থ্যকর; কিন্তু কলকাতায় প্লেগের জন্য কিছু কাজ শুরু করে যাওয়ার ব্যাপারে আমার বিবেক মুক্ত!

সারদানন্দ (যে ইউনাইটেড স্টেটে গিয়েছিল) এখন পশ্চিম ভারতে আছে। যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতায় আসবার জন্য ওকে আমি চিঠি লিখেছি। ও এখানে এলে ওর ওপরে মঠের ভার

দিয়ে আমি ইংলণ্ড যাত্রা করব। তোমার চিঠি আমি নিয়মিত পাচ্ছি; কিন্তু খামের ওপরে লক্ষ্য করে দেখিনি সেগুলি মিঃ স্টার্ডি মারফত পাঠাও কী সোজা পাঠাও। ওঁরও শরীর তেমন ভাল যাচ্ছে না জানলাম। যাই হোক এই গরমে ইংলণ্ডে অবশ্যই যাচ্ছি যদি না কোন আকস্মিক কারণে (যা এখনও অজ্ঞাত) যাওয়া আটকে যায়। তুমি কী এই গরমে ইংলণ্ডে যাবে? এসো ক'দিনের জন্য। তোমাকে দেখলে বড় খুশী হব (গোটাকয়েক আশ্চর্যের চিহ্ন এখানে লাগিয়ে নাও!) মাসখানেক বা মাসদুয়েকের জন্য কাজ থেকে ছুটি নিতে পারো না? গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ড ইউ এস-এর চেয়ে যথেষ্ট ঠাণ্ডা। মিসেস ফাংকেকেও সংগে আসতে রাজী করাও। সমুদ্র পেরুতে দশ পাউণ্ড খরচ (সবকিছু মিলিয়ে)। ইংলণ্ডে থাকা ও খাওয়া সপ্তাহে মোটামুটি আট পাউণ্ড করে। ডেট্রয়েট থেকে নিউইয়র্ক রেলভাড়া ধর চার পাউণ্ড, অন্যান্য খরচ, বেড়ানো, দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখা, ইত্যাদিতে আরও দশ পাউণ্ড আন্দাজ খরচ ধর। ফেরবার খরচ আরও কুড়ি পাউণ্ড। অর্থাৎ দু'মাসের বেড়ানোতে ২৮৫ থেকে ৩০০ ডলার খরচ পড়বে।...

আমার জন্য তুমি একটুও মন খারাপ করবে না। আমি প্রচণ্ড রকম শারীরিক শক্তি নিয়ে জন্মেছিলাম। তবে একথাও অস্বীকার করব না যে, সারাজীবন ধরে এই শক্তিকে খুব বেশি রকম খরচ করেছি। এরপর থেকে আমি সাবধান হয়ে যাবো। শরীরের ভেতরের কলকব্জা সব অক্ষত এবং যথাযথ আছে, তাই ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রামের ফলে চাঙ্গা হয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে।

আর কী লিখি—বকবকানি! মাত্র তিন বছরে তোমার চেহারার হয়ত বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু আমাকে দেখলে তুমি চিনবে না। আমি এত বেশি বুড়িয়ে গিয়েছি রোগে ভুগে। দু' বছরের রোগ কুড়ি বছরের আয়ু কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আত্মার তো পরিবর্তন নেই! কী বল? হ্যাঁ, সেই পাগলাটে আত্মা ঠিক যথাযথ আছে। সেই একই চিন্তায় পাগল—যত গভীর, তত ব্যাপক! মনে হয় সেই তীব্র ইচ্ছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত উদ্বেলিত হয়ে এসে এই হার্টের রোগটি বাধিয়েছে। হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। আমি এ বিষয় এত বেশি আগ্রহী যে, কিছুতেই তা রোধ করতে পারি না। আমার চিন্তাগুলো সদাই মনের মধ্যে কাজ করে, যেমন দৃঢ় তেমনি গভীর এবং ব্যাপকভাবে।

মিসেস ফাংকের কী খবর? বেবীর সংগে দেখা হয়? কোথায় আছে সে? কী করছে? মিস্ ওয়ালডোর সংগে পত্রালাপ হয় কী? তুমি গত ক'বছর ডেট্রয়েটের বাইরে কোথাও যাওনি মনে হয়! তোমার সংসারের চর্কি আশা করি একটু সহজভাবে চলছে এবং বোনেরা তোমাকে কিছু সাহায্য করে।

আমি রওনা হবার আগে তোমাকে আর একখানি চিঠি লিখব। সম্ভবতঃ এ-চিঠির উত্তর ভারতবর্ষে বসে পাবার আর সময় থাকবে না। তার আগেই রওনা হব। আসল কথা 'মা' যা ভাল বোঝেন। আমি তাঁর শ্রীচরণে তোমাকে চিরকালের মত নিবেদন করছি। আর কী করতে পারি। এইটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে করি।—

মায়ের শরণাগত

তোমাদের বিবেকানন্দ

A Detroit Woman and Her Work in India by Rev. William F. Hopp. March 31, 1917. Detroit 'Saturday Night'. কাগজের কাটিং থেকে উদ্ধৃত)

সকলেই বলত 'সিস্টার ক্রিস্টিন'। শুনে শুনে ভাবতুম (তখনও ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়নি) রোমান ক্যাথলিক চার্চের কেউ হবেন। পরে খেয়াল হল, না,—ক্রিশ্চানধর্মীয় সংস্থার কেউ নন উনি কারণ ওঁর কার্যাবলী যা-কিছু সব ক্রিশ্চান ধর্ম বহির্ভূত অন্য কোন আন্দোলনের (অবশ্যই ধর্মীয়) সঙ্গে যুক্ত। অতঃপর একদিন বুঝতে পারলাম কেন লোকে ওঁকে সিস্টার ক্রিস্টিন বলে।

দেখলুম উনি রোমান ক্যাথলিক নন—আদৌ ক্রিশ্চান নন। কেবল নামেতেই তাই মনে হয়। উনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন হিন্দুধর্মের সদস্য। পনেরো বছর আগে উনি ডেট্রয়েটে আমাদের ক্রিশ্চান চার্চের সদস্য ছিলেন, শুধু তাই নয়, ক্রিশ্চান চার্চের কার্যাবলীর একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তার কাজকর্মে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আর পাঁচজন সাধারণ সদস্যদের মত তিনি কেবল নামমাত্র সদস্য ছিলেন না।

ডেট্রয়েটের নর্মাল স্কুল থেকে স্নাতক হয়ে তিনি সেখানে সতেরো বছর শিক্ষকতা করেছিলেন।

বছর বারো আগে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ধর্মমত গ্রহণ করেন। সেই থেকে তিনি হিন্দুদের মধ্যে বসবাস করছেন, তাদের জন্য কাজ করছেন, তাদের শিক্ষাদান করছেন, তাদের কাছ থেকে যা-কিছু শিক্ষণীয় তা শিখছেন, এককথায় তাদের সংগে সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন।

বারো বছর আগে নিজের ঘর, দেশ, চাকরি সব ছেড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন তাঁর অন্তরের আহ্বানের সাড়া দিতে—ফিরে এসেছেন আবার ডেট্রয়েটে। কিন্তু ডেট্রয়েট আর তাঁর দেশ নয় এখন। ভারতীয়দের মাঝে ফিরে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। কোনরকম বাধা না রেখে তাদের সঙ্গে [illegible] নিজেকে এক করে ফেলেছেন, তাদের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

সেদিন পরিচয় হল সিস্টার ক্রিস্টিনের সঙ্গে। ক্লাওসে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।........ওঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলবার পর বুঝতে পারলাম যারা ওঁকে চেনে এবং ওঁর কথা বলে, কেন এত ভালবাসার সঙ্গে বলে। ওঁর ব্যক্তিত্ব, ওঁর মুখশ্রী, ওঁর কণ্ঠস্বর কী অসাধারণ রকমের সহানুভূতিশীল, এবং আধ্যাত্মিক-ভাবপূর্ণ। এমন হৃদয়স্পর্শী এবং মনোমুগ্ধকর বাচনভঙ্গী ওঁর—যে লোকে ঘন্টার পর ঘন্টা ওঁর মুখ থেকে ভারতীয়দের জীবনের আদর্শ, সমস্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনতে চায়।

সম্প্রতি ডেট্রয়েটে স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং লালা লাজপত রায় এসেছিলেন। এখানকার লোকেরা লক্ষ্য করেছিল কী আশ্চর্যরকম মধুর ও সঙ্গীতময় তাঁদের কণ্ঠস্বর। ভগিনী ক্রিস্টিনের কণ্ঠস্বরও তেমনি কোমল ও সুরেলা। স্বতঃই মনে হয় এ স্বর কী ওঁর আগেও ছিল, না, যে-ভারতকে উনি নিজের দেশ করে নিয়েছেন, যে-ভারতের মানুষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, সেই ভারত এই আমেরিকান মহিলাটিকে এই কণ্ঠস্বর উপহার দিয়েছে? বাক্যালাপেই বোঝা যায়, রীতিমত বুদ্ধিমতী তিনি। যখন উনি বেদান্ত ধর্মের ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন উনি বুঝিয়ে দিলেন সোপেনহাওয়ার, হেগেল ও কান্ট বেদান্ত ধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত। হিন্দু স্থপতিশিল্প, প্রত্ন-

মিসেস মেজরের সঙ্গে প্রণতা দে। ১৯৬৯ খৃঃ

তত্ত্ব, ইতিহাস, ভারতের একাধিক ভাষা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার বিষয় অত্যান্ত বুদ্ধিদীপ্তভাবে বলতে পারেন। এছাড়া ভারতের দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে শ্রোতার আনন্দবর্ধন করতে পারেন। উনি বলেন—

"India has lived its religion more truely than any other country While the people speak little of their religious ideas, they always live them. Sometimes unconsciously. It is the greatest thing I have ever seen."

(ভারতবাসী ধর্মকে যেভাবে জীবনে পালন করে, এভাবে কোন দেশ করে না। মুখে নিজেদের ধর্মের কথা বেশি বলে না, কিন্তু জীবনে পালন করে। অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতে। আমি আজ পর্যন্ত যা-কিছু দেখেছি, তার মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ জিনিস!')

ভারতের কাজে নিজের অবদান সম্বন্ধে যদিও ভগিনী ক্রিস্টিন অত্যন্ত বিনম্রভাবে বলতেন, তবুও তাঁর মহৎ ও দয়ালু হৃদয়ের পরিচয় বহুল পরিমাণে পাওয়া যেত। তাঁর নিঃস্বার্থতা এবং অন্যকে সাহায্য করবার হৃদয়টিই তাঁকে তাঁর স্বদেশ, চাকুরি, আত্মীয়বন্ধু সকলকে ত্যাগ করে তাঁকে ভারতের সেবাকার্যে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডেলের (যে নামে তাঁকে ডেট্রয়েটে সবাই চিনত) জীবনকে স্বল্পকালের মধ্যে যে মানুষটি সম্পূর্ণ অন্যদিকে চালিত হতে প্রবাহিত করেছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। অজ্ঞাত, অপরিচিত এই মানুষটি শিকাগো পার্লামেণ্ট বিশ্বধর্মসভায় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দেন। আমেরিকার আতিথ্যে তিনি আদৃত হন এবং তাঁকে কিছু বলতে সুযোগ দেওয়া হয়। ও'র বক্তব্য বিষয় ছিল 'দি রিলিজিয়াস আইডিয়াস অফ দি হিন্দুস'। উনি বলেছিলেন পাশ্চাত্য দেশে এসেছেন এজন্য যে, বিশ্বাস করেন বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাদের চিন্তাধারার পারস্পরিক আদানপ্রদানের সময় এসেছে যেমন আমরা পণ্যদ্রব্যের আদানপ্রদান করি ব্যবসায়িক বাজারে। ও'র ধর্মমতের ব্যাপকতা, চিন্তাধারার নূতনত্ব মিস গ্রিনস্টিডেলকে আকৃষ্ট করেছিল। উনি কোন একটি বিশেষ ধর্মমতের হয়ে ওকালতি করেননি। প্রচার করেছিলেন সকল ধর্মমতের গভীরে যে শাশ্বত সত্য,—তাকে। ব্যক্তির জীবনে আত্মার উপলব্ধিকে। তিনি বলেছিলেন—

'what the world wants to-day, is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder and say they possess nothing but God. If God is true what else could matter? If He is not true what do our lives mean?"

(বিশ্ব আজ কী চায়? চায় জনকুড়ি নারীপুরুষ রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে সগৌরবে ঘোষণা করুক 'আমরা ঈশ্বরময়'। যদি ঈশ্বর সত্য হন তবে আর কিসের প্রয়োজন? আর ঈশ্বর যদি মিথ্যা হন, তবে আমাদের জীবনের অর্থ কী?)

কিছুদিন থেকে মিস গ্রিনস্টিডেল একান্তভাবে বিশ্বাস করছিলেন ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, এবং সর্বত্র বিরাজমান। সেজন্য তাঁর কোন সৃষ্টিই মন্দ নয়, এবং তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যা কিছু মন্দ, সব মিথ্যে। যদিও সাধারণ মানুষের কাছে সেগুলিকে সত্য বলে ভ্রম হয়। এই বিশ্বাসের ওপরে ভিত্তি করে তিনি নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। এর পর যখন স্বামী বিবেকানন্দ ডেট্রয়েটে এসে বেশ কিছু বক্তৃতা দিলেন তখন ক্রিস্টিন দেখলেন তিনিও (বিবেকানন্দ) সেইসব কথাই বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলছেন যা ক্রিস্টিনের নিজের বিশ্বাস। তিনি বললেন, ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। যা কিছু মন্দ তা সব মায়ামোহ—দুঃস্বপ্নমাত্র। ডেট্রয়েটের শিক্ষকাটি যত তাঁর কথা শুনলেন ততই আকৃষ্ট হলেন।

ডেট্রয়েটে বিবেকানন্দ প্রথমে সেনেটর পামারের অতিথি হয়েছিলেন। পরে গভর্নর ব্যাগলের স্ত্রী শ্রীমতী ব্যাগলের বাড়িতে ছিলেন। তাঁর বাড়ির ড্রইংরুম সভায় মিস গ্রিনস্টিডেল প্রায়ই যোগ দিতেন। শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হিন্দু সন্ন্যাসিনী (১) হন। পরবর্তী গ্রীষ্মকালে বিবেকানন্দ থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে বাস করছিলেন। ঘটনাচক্রে ভগিনী ক্রিস্টিনও সেবার গরমের ছুটিটি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে কাটাতে মনস্থ করেছিলেন। জানতেন যে, হিন্দু শিক্ষকটির সঙ্গে সেখানে দেখা হতে পারে। সেখানে গিয়ে তাঁর পদতলে বসবার ও আবার তাঁর মুখনিঃসৃত হিন্দুদর্শনের জ্ঞানের বাণী শোনবার সুযোগ পেলেন।

দুবছর কেটে গেল। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে গিয়েছেন। ক্রিস্টিন তাঁর শিক্ষা ও বাণী সৌন্দর্য ও সত্যতাকে যেন আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন। (তারপর মিস এক। বিখ্যাত ভায়োলিনবাদকের স্ত্রী মিসেস ওলিবুলের আমন্ত্রণে ক্রিস্টিন কলকাতায় বেড়াতে গেলেন। ক্রিস্টিনের মধ্যে একটি সহজাত মিশনারী ভাব ছিল। সব সময় চাইতেন পরার্থে আত্মনিয়োগ করতে। তাই বুঝেছিলেন ভারতবর্ষে সেবাধর্মের সুযোগ পাবেন সবচেয়ে বেশী। এ ছাড়া হিন্দু দর্শন যা এর আগেই তাঁর হৃদয় জয় করে নিয়েছে সে বিষয় আরও জানবার সুযোগ পাবার ইচ্ছাটিও ছিল। অতএব গেলেন ভারতবর্ষে। এক বছর মিসেস ওলি বুলের কাছে থাকলেন। এরপর মিসেস বুল আমেরিকায় ফিরে গেলে উনি রামকৃষ্ণ মিশন সংঘে যুক্ত হলেন এবং ভারতে থেকে গেলেন—এইভাবেই ভারতের সেবা করবার জন্য।)১

কলকাতায় এসে প্রথমে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারে ছিলেন। বন্ধুর ভারত ত্যাগের পর তিনি হিন্দু পাড়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করলেন এবং 'ভগিনী ক্রিস্টিন' নামে পরিচিতা হলেন।

তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুসমাজে হিন্দু মেয়েদের তথা নারীদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনা করতে ভগিনী ক্রিস্টিনকে যথেষ্ট পরিমাণে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তৎসত্ত্বেও আমেরিকান শিক্ষিকা তাঁর ইংরেজ সহকর্মিণীসহ এই কাজে ব্রতী হন এবং স্কুলটিকে সর্বোতভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেন।

এবারে ভগিনী ক্রিস্টিন যথার্থই শিক্ষয়িত্রী হলেন।

---

১ হপ্ সন্ন্যাসিনী লিখলেও ক্রিস্টিন সন্ন্যাস গ্রহণ করে সন্ন্যাসিনী হননি—যদিও জীবনযাত্রা সন্ন্যাসিনীর মত ছিল।

আমেরিকাতে লব্ধ শিক্ষাপদ্ধতিতে তিনি বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের স্কুলটিকে চালনা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষাধারাকে প্রাচ্যের নারীর উপযুক্ত করে তাদের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে এই স্কুলে প্রবর্তন করতে।

স্কুলটি প্রাথমিক ধাপে শিশুদের জন্য শুরু করে তারপর ক্রমে ক্রমে হিন্দু মেয়েরা যাতে বিবাহের আগে পর্যন্ত পড়াশুনো করতে পারে সেইভাবে চালনা করলেন। এ ছাড়া বিবাহিতা এবং বিধবাদের পড়বার ব্যবস্থাও ছিল। সিস্টার ক্রিস্টিন ও সিস্টার নিবেদিতা স্কুলটি এমনভাবে পরিচালনা করতেন যাতে স্কুলের ছাত্রীরা তাদের অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না-পারে। শিশু বা মেয়েদের তাদের ঘরবাড়ি থেকে আলাদা করে, একটি বিদেশী বা অপরিচিত আবহাওয়ায় টেনে আনতে তাঁরা চাননি।....

....বরং চেয়েছিলেন নিজেদের ভারতীয় আচার প্রথার সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভারতীয় নারীদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের আপনজন হয়ে থাকতে।

আধুনিক আন্দোলন (১৯১৭) নারীর সুযোগসুবিধেকে সঙ্কীর্ণতর করে দিয়েছে। তাদের সনাতনী হস্তশিল্প আজ সর্বনাশে রূপান্তরিত। আজকের দিনে মেয়েরা রান্না করতে জানে; কিন্তু সেলাই করতে পারে না। ফলে অবসর সময়বিনোদনের কোন উপায় তাঁদের নেই। ভগিনী ক্রিস্টিন দেখলেন বিবাহিতা এবং বিধবা মেয়েদের সূচীশিল্প শেখানো খুবই দরকার।...(হয়ত কী সেলাইর মেশিনকে হস্তশিল্পের সর্বনাশের কারণ মনে করছেন?)......

......বাগবাজারের স্কুলটিকে একটি বিরাট স্কুলে পরিণত না-করে ভগিনীরা তাদের সীমিত আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে চালাতেন। কাজে কাজেই ছাত্রীর সংখ্যা ধরে স্কুলের গুরুত্ব মাপবার চেষ্টা না-করাই ঠিক। সামান্য কটি ঘরের মধ্যে কীভাবে তাঁরা স্কুলটি চালাতেন সেকথা ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্টাডিস ফ্রম অ্যান ইস্টার্ন হোমের' মুখপত্রে বর্ণনা দিয়েছেন।

"Sister Christine with her gentle spirit conquered the spirit of aloofness in the quiet, proud, and intensely selfrespecting people of Bagh Bazar. She came to be accepted by the Hindus as their neighbour."

'ভগিনী নিবাস' (এই নামেই জনসাধারণের কাছে জ্ঞাত) কেবলমাত্র একটি স্কুল ছিল না। বরং ছিল বন্ধুদের পরামর্শ, সান্ত্বনা ও আলোচনার কেন্দ্র। কলকাতায় প্লেগের প্রকোপ দেখা দিলে ভগিনীরা রামকৃষ্ণ মিশনের গুরুভাইদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

সিস্টার ক্রিস্টিনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে তবেই পাশ্চাত্যের মহিলারা এদেশে তাঁদের কাজে সফল হতে পারেন।

"So she made great renunciation. The land to whose service she has devoted herself has made an overwhelming appeal to her. She understands its history and thought, its people and

ভগিনী ক্রিস্টিন, ১৯২৮ খৃঃ

their life, its present state of subjection and social transition."

(নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বদলে নিলেন। যে দেশের সেবার্থে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সে দেশ তাঁর মনকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল। তাদের ইতিহাস, চিন্তাধারা, তাদের সমাজ তথা জীবন, সাম্প্রতিক পরবশত্ব বা দাসত্ব, এবং সেজন্য সামাজিক পরিবর্তন সবই তিনি ভালভাবে বুঝতেন।)

ভগিনী নিবাস ছিল ভারতের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মিলন স্থান। ঠিক যেমন যিশুখৃষ্ট বেথানিয়ায় মেরী ও মার্টিনার বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করতে ভালবাসতেন। ভারতের কৃতী ও যশস্বী ব্যক্তিরা তেমনি যেতেন ভগিনীদের আতিথেয়তা গ্রহণ করে আনন্দ লাভ করতে। সেখানে কাউন্সিলের সদস্য, বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, শিল্পী, কবি, বিজ্ঞানী, বক্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, ছাত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লাজপত রায়, ডাঃ জে সি বোস (বিজ্ঞানী) এবং অন্যান্য হিন্দুরা যাঁরা আমেরিকাতেও যথেষ্ট পরিচিত, [illegible] যেতেন ভগিনী নিবাসে।

১ [ ] অংশটুকু যথার্থ নয়। ক্রিস্টিন-স্বামীজীর ইচ্ছাতে ভারতে এসেছিলেন তাঁরই কার্যসাধনের জন্য, ওলিবুলের ইচ্ছা রক্ষার জন্য নয়। ক্রিস্টিন ভারতে আসবার ২।২।। মাসের মধ্যে স্বামীজী দেহরক্ষা করেন। ক্রিস্টিন তখন মায়াবতীতে মাদার সেভিয়রের কাছে। ক্রিস্টিন ক্রিশ্চান মিশনারীর মত জনসেবাকেই ধর্মের আদি ও অন্ত মনে করেননি। তাঁর চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল আত্মোপলব্ধি। হিন্দুধর্মের এই বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব হয়ত অনুধাবন করতে পারেননি। ক্রিস্টিন পরিপূর্ণ বেদান্তবাদিনী ছিলেন। মঠে আসবার আগেই তাঁর দীক্ষা গ্রহণ হয়েছিল থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ডে।

সিস্টার ক্রিস্টিন তাঁর ইংরাজ সহকর্ম্মিণীর সঙ্গে এখানে ক'বছর কাজ করেছিলেন। ১৯১১ সালে নিবেদিতার দেহরক্ষার পর তিনি একাই কাজ করতেন। উপস্থিত তিনি (১৯১৭) ভারতের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ডেট্রয়েটে এসেছেন তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনো করতে এবং বিশ্রাম নিতে। কিন্তু তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কবে তিনি তাঁর বাগবাজারের স্কুলে ফিরে যেতে পারবেন যেখানে হিন্দু মেয়ে এবং মহিলারা তাঁদের শিক্ষয়িত্রী তথা বান্ধবীর প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে বসে আছেন। ১

ক্রিস্টিনের কবিতা

Now Faith is the substance
Ps. 16.9. (all)
I have set the Lord
always before me: because
he is at my right hand I
shall not be moved.
Therefore my heart is glad
and my glory rejoiceth; [illegible]
my flesh also shall [illegible]
(dwell confidently in hope)
Ps. 78.7. That they might set
their hope in God.
39.7. And now Lord, what
wait I for? my hope is in thee
71.5. For thou art my hope
O Lord: thou art my
trust from my youth.
Prov. 10-28. The hope of
the righteous shall be
gladness.

NOW FAITH IS THE SUBSTANCE

I have set the Lord always before me
Because he is at my right hand
Shall not be moved
Therefore my heart is glad
And my glory......
My flesh also shall......
Give me the least
Fragment of they wealth
That disclaims all the wealth of the world.

১ ১৯১৪ সালে আমেরিকায় গিয়ে ক্রিস্টিন ভারতে ফিরতে পারছিলেন না মহাযুদ্ধের জন্য।

শোকলিপি

ক্রিস্টিনের মৃত্যুর পর বশী সেন মহাশয় একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে যে শোকজ্ঞাপক চিঠি পেয়েছিলেন তার কতিপয় এখানে উদ্ধৃত করা হল।

স্বামী শিবানন্দ কানাডা থেকে কেবলগ্রাম পাঠান :—

Received at 64 Broad Street. New York. 1930,
March 28. P.M. 4.35
GLH/TV K 1499
Calcutta 10.28. 19-35.
EMPIRADLO LCO BOSHI SEN. C|o. tressmax,
New York.
Rest in Swamiji.
Shivananda, Tantire.

এই সময় মিস ম্যাকলিয়ড বেলুড়ে ছিলেন। কেবল গ্রামের পর তিনি সেন মহাশয়কে চিঠি লেখেন :

Sunday March 30, 1930. Belur.
Boshi Dear,

Your cablegram to Swami Shivanandaji arrived the 28th .... So our—your beloved Xtine is not to like in her own house—but she knew the good news 1 ..Details like life and death don't get near the soul of such as she! This may change your own completely. Dear Mrs. Le Roy write all her love care tenderness proved herself an angel of goodness, worthy of our Swamiji! Shall always be grateful to her. It seems so fitting that thine should have the best......Now she has Swamiji to whom she was so faithful! Swami Sivanandaji who dictated the three words "Rest In Swamiji" is his reply. I added my name to show I was still here.

Earl Brewster arrived with Dhanagopal 1 on March 27th in Bombay—a day with Jawaharlal Nehru in Allahabad. P in Benaras ought to bring them here by April 2nd and leave on 13th. It was indeed a surprise to knew Earl was here and what a jay.
Write to Banks Trust Paris. By May 1st. I will be in Venice—after that I have no plans and you'll let me knew yours—a postcard merely—Each week please.
Your love for X-tine is an asset in my life.
Blenyan Tantine

ক্রিস্টিনের বোনের চিঠি :—

To Mr. Boshi Sen.
40 East 61st Street. New York City.
Detroit, March 27, '30

My dear Boshi,
We all knew how kind you have been to our sister. We cannot say what we really feel. It is tragical always—, this losing our own. It seems too terrible. Life is too unhappy. I cannot write more. We all bless you for what you have always done for her.
Love from us all.
Elezabeth.

চিঠিতে পোস্ট অফিসের শীল :

Detriot. Mich March 28, 11.30 AM, 1930

১ এই সময় সম্ভবতঃ ৮নং বোসপাড়া লেনের বাড়ির একটা কোন ব্যবস্থা হয়েছিল, দুই সেনভ্রাতা ও ক্রিস্টিনের ওখানে থাকবার জন্য।

১ ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়।

ক্রিশ্চিন-এর জন্য বোন বার্থা এফলিঙের চিঠি :—

To Mr. Boshi Sen, Alleeghan, Michigan.
C/o Glenn Querton.
From 5255 New port Avenue, Detroit Michigan
Detriot, April
(তারিখ নেই)

Dear Boshi,

Your letter to us was the dearest, kindest letter, no one but you could have written one like it. How can we show our appreciation for all you have done for our Sister. Our one consolation is that you were with her to the end and that you would have no stone unturned to do everything to save her if it were possible and I don't know if anyone she would want with her more than you. Your years of love and devotion to her have been wonderful. You were everything to her. Never falling her in thought or deed, I cannot say too much for you.

I still miss her very much. She has been so good to me, especially since Howard is gone, her words of endearmant and courage meant all the world to me.

I have a feeling for the last two weeks that I would never see her again. In her last letter she said to me that inspite of all her care, good food and attention she was getting thiner and I wonder how she could exist. She was so thin when she left here last summer, but when the news came I was shoked more than I can tell. I have never seen any one as frail as she who did so much good. She used all her strength for these.

Dear Boshi, I shall never forget you, even if I don't write very often, I shall think of you everyday and I hope you will have blessings showered upon you....

Your loving sister Bertha Efling,

নিবেদিতার চিঠিটি এলাহাবাদ থেকে পুষ্প লিখছেন মিস ম্যাকলিয়ডকে ।

Canning Road, Allahabad.
April 1st 1930.

Tantine Dear,

So sister Christine is gone, alas! I know what a quiet worker she was. She had to suffer a lot for India, though a very few people would ever knew it. She did all many things but with what wonderful patience and she got very little, not even gratitude. Though I know she did not want any. Years ago I said good buy to her, who knew this was the last time we said good buy to each other at the Howrah Station. When I was with Sister Nivedita, Sister Christine was real mother to me. Nivedita was like 'father' and she was wonderful mother– so I have lost these of mine also. Seldom such sacrifices are seen in this world..................

..........How are you Tantine? How I wish to talk to you now for hairs. Do you know Tantine your talks are great tonic to me—if it sooths my mind so much.

With deepest love, from PUSPA.

এই পত্রটি ক্রিশ্চিনের চরিত্রের তথা জীবনের একটি স্বচ্ছ চিত্র।

সি এফ এন্ড্রুজের চিঠি

1172 Park Avenue, April 4.

My dear Boshi Sen,

Mr. James gave me your message and address in Michigan and told me of Sister Christine's passing away and your great sorrow. I want to write one brief word of love in comfort in the midst of an overwhelming number of things, to be done before I sail today.

May God bless you and comfort you.
With my sincere affection,
C. F. Andrews.

Primrose 0424
158 Haverstock Hill.
London N. W. 3.9.v.30

Dearest Boshi,

Your letter was a shock It was right that she would die radiantly. I wonder if you realize what a wonderful thing your love was for her the last twenty years? Being myself so dependent on love, I knew it. And you are bound to miss the giving forth of love. But if I know you at all, you have not lost her. You have a harvest of lovel memories, of loyal and understanding love in return, and so far as human things can be a perfect appreciation of your real self. And this Boshi, 'Mazar' tells you this is a......boon, to meet another human being in whom ones real, one's best self is dear. I don't think that happens too often in life. We form friendships, we find ourselves in certain relationships in life where for most of our time, our best self is supressed.

Dear Boshi, I hope that nothing will prevent your seeing me, my seeing you, on your way back to India. You can imagine how we feel just now. I am torn, in my ignorance, between compassion for Indians and regret. That some of them and as many as us are behvaing as this 1914 to 1918 had not tought the world that force settles nothing, except wastefully and leaving bitter memories.

In all this I feel Old. I feel that people are not growing better. We are going soft through luxury and comfort, and we are losing our right values for reality,

Come dear friend and let us have a talk together, and perhaps you from your heights can re invigorate

Your old friend,
K. M. R.

কলকাতায় বই মেলা স্মরণে ছবি
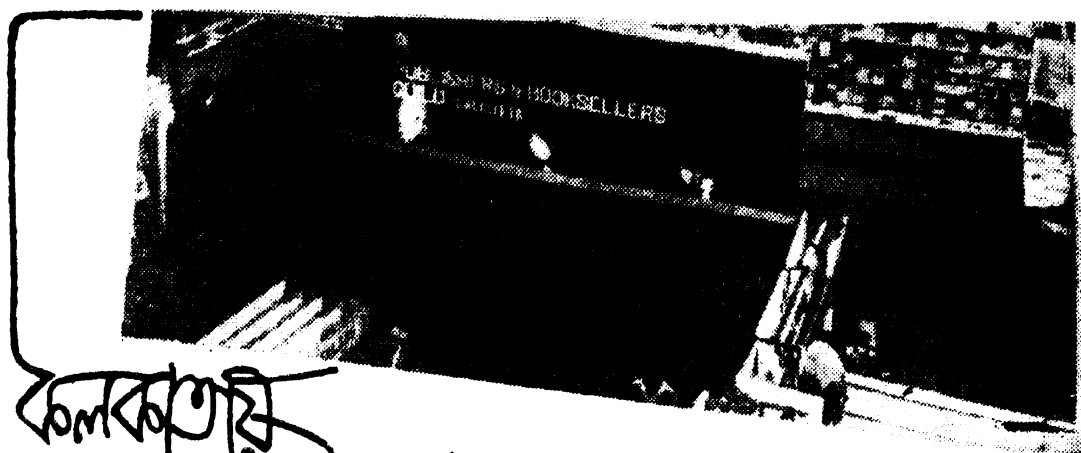
বাংলা বইয়ের বাজার

শচীন দাস

এই তো কিছুদিন আগে আমার এক প্রবাসী বন্ধু বাইরে থেকে এখানে এসেই আমাকে ধরেছিলেন কিছু বাংলা বই কিনিয়ে দেবার জন্য। বন্ধুটি অনেককাল বাংলার বাইরে আছেন, কিন্তু তাই বলে ভাষাটা ভোলেননি—বরং চেষ্টাচরিত্র করে নিজেরই উদ্যোগ এবং যোগাযোগের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এসেছেন দীর্ঘকাল, ইদানিং তিনি পরিকল্পনা করেছেন তার কর্মস্থানে অন্যান্য ভাষাভাষী গ্রন্থের সঙ্গে বাংলা গ্রন্থেরও একটি লাইব্রেরী করবেন যাতে প্রবাসী হয়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগটা রাখতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন কিছু বাংলা বই কিনিয়ে দেবার জন্য।

যাই হোক এ' ব্যাপারটায় আমিও উৎসাহিত হয়েছিলাম, কিন্তু বন্ধুটিকে নিয়ে বইপাড়ায় গিয়েই আমাকে হোঁচট খেতে হল। অন্ততঃ ১৫।২০ কিংবা ২৫ বছর আগেও যে বইগুলো বাংলা বইয়ের বাজারে তার নিজের গুণে বিদগ্ধজনের সম্বর্ধনা লাভ করত আজ সেগুলো বিক্রী হওয়া তো দূরের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। দু' একটা লাইব্রেরী অথবা কারুর কখনো হাতের ছালচামড়া ওঠা বিবর্ণ অবস্থার কোন কোন ফুটপাতে হয়তো পড়ে থাকতে দেখা যায়—তাও কিনতে চাইলে দাম যা চাইবে তাতে কেনার প্রশ্ন আর মনে থাকে না। থাকবে কি করে—বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যে বিরাট অংশটা চাল ডাল তেলের বাজারে দাঁড়িয়ে নিজেদের সামান্য দুটো উদরপূর্তির জন্য হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সেখানে অত দাম দিয়ে কটা আর পুরোনো বই সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং উৎসাহ এবং গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মন থাকা সত্বেও সবসময় তা হয়ে ওঠে না সম্ভব, ফলতঃ বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আজ অর্থনৈতিক চাপে পড়ে সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে সরে আসতে আসতে হয়ে পড়েছে কোণঠাসা।

অথচ একথা ঠিক বরাবরই দেখা গেছে বাংলা গ্রন্থের ক্রেতারা ভাল একটি গ্রন্থের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। এটা বাঙালীর রক্তের একটা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। সুতরাং ১৫ কি ২০ বছর আগেও যে গ্রন্থগুলো বাংলা বইয়ের বাজারে পাওয়া যেত আজ সেগুলো পুনর্মুদ্রিত হলে যে চলবে না—এটা কোন কথা নয়। কিন্তু ব্যবসার দিক থেকে ক্ষতির একটা আশংকা থেকে যায় বলেই প্রকাশকরা সেদিকে ততটা ঝুঁকি নিতে পারেন না। নেবেন কি করে? এই তো এই কয়েক বছরের ভেতরেই যেভাবে কাগজ, কালি এবং প্রেসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তাতে তাদের পক্ষে এটা একরকম অসম্ভবই প্রায় বলা চলে। সুতরাং ক্ষতি স্বীকার করে

পুরোনো ক্লাসিক গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের প্রশ্ন আর ওঠে না। অবশ্য এসব সত্ত্বেও কিছু কিছু পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে গ্রন্থাবলী সিরিজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেখানেও প্রকাশক খতিয়ে দেখেন অন্তত খরচটা উঠে আসার মত গ্রাহক পাওয়া যাবে কিনা। (অর্থাৎ পুনর্মুদ্রণের প্রশ্ন তখনই আসবে যখন প্রকাশক বাণিজ্যিক সাফল্যের আভাস পাবেন) ফলত একদা প্রকাশিত অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থের আজও পুনর্মুদ্রণ সম্ভব না হওয়ায় পাঠকের চোখের অন্তরালেই সেগুলো চলে যাচ্ছে।

বাংলা বইয়ের বাজার

এমনিতেই বর্তমান বাংলা বইয়ের বাজার খুব সংকটজনক। একটা এডিশনের বই চালাতেই প্রকাশককে বেশ দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়। যেখানে হিন্দী, তামিল, মারাঠী, তেলেগু বা মালয়ালম বইয়ের হাজার হাজার কপি বিক্রী হয় অনায়াসে, সেখানে বাংলা বইয়ের একটা এডিশনের কাটতি যদি পাঁচ থেকে আট বছরে হয় (বা অনেকক্ষেত্রে তাও নয়) তবে খুব শিগগিরই বাংলা বইয়ের সাম্রাজ্যে নেমে আসবে শকুনের কালো ছায়া। তার ফলে বহুল প্রচারিত ও গবেষণাসাপেক্ষ এই সংস্কৃতিটি যে অচিরেই লুপ্ত হয়ে যাবে তাতে আর কোন সন্দেহই থাকে না।

দেশ বিভাগের প্রতিক্রিয়া

বস্তুতঃ ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ যেমন একদিকে আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষতি অন্যদিকে বইয়ের বাজারেরও অনুরূপ ক্ষতিস্বীকার—কেননা ১৯৪৭-এ মূল ভূখণ্ড ভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বইয়ের বাজারও দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। ১৯৬৫ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থানের বাংলা বইয়ের বাজারের সঙ্গে তবু একটা সমঝোতা ছিল—ওখানকার বাজারটা এদিকের জন্য উন্মুক্তই ছিল। কিন্তু ঐ বছরের শেষদিকেই এই বাজারটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে বঙ্গ-বাংলা এদেশের বাজারটা থমকে দাঁড়াল। তবু যা হোক কিছুদিনের মধ্যেই (অন্তত বেশ কয়েক বছর) সেই অবস্থাটা সামলে নিয়ে প্রকাশকরা আবার নতুন উদ্যমে যদিও এগিয়ে এলেন কিন্তু বছর ১৫ থেকে ২৫-এর মধ্যেই আবার সেই টানাপোড়েন। ফলতঃ অবস্থা হয়ে উঠল সঙ্গীন। একদিকে যেমন হুহু করে কাগজের দাম বাড়ল তেমনি মুদ্রণ, ছাপার কালি, প্রেসের আনুষঙ্গিক ইত্যাদি এবং বস্তুবিধানায়। তখন প্রকাশকরা আর করবেন কি—উপায় একটাই ছিল, বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি। কিন্তু দাম বাড়িয়েই দেখা গেল ক্রেতা কমে যাচ্ছে। কমবেই—কেননা ক'জনের আর সামর্থ্য আছে বেশী দামেই বই কিনে নিয়ে বইয়ের গ্রাহক হওয়া।
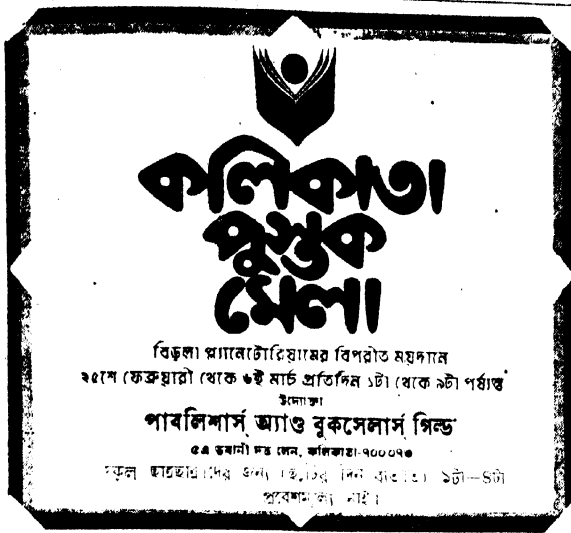
আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছেন

অজন্তা পাবলিশার্স
৪/২ রামমোহন রায় রোড কলিকাতা ৯

অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস
পি ১৭ মিশন রো একসটেনশন
কলিকাতা ১৩

অকসফোর্ড বুক অ্যান্ড স্টেশনারী কোং
১৭ পার্ক স্ট্রীট কলিকাতা ১৬

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
৫-এ ভবানী দত্ত লেন কলিকাতা ৭৩

অ্যালায়েড বুক এজেন্সি
১৮-এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

অ্যালায়েড বুক পাবলিশার্স প্রাঃ লি
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ কলিকাতা ৭২

আই. এ. বি. বুকস
৯/১ টেমার লেন কলিকাতা ৯

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

আর্য সমাজ
১৯ বিধান সরণি কলিকাতা ৬

ইউ. বি. এস. পাবলিশার্স ডিস্ট্রিবিউটর্স প্রাইভেট লিমিটেড
৮/১বি, চৌরঙ্গী লেন কলিকাতা ১৬

ইণ্ডিয়া বুক হাউস
২০-এ লিণ্ডসে স্ট্রীট কলিকাতা ১৬

এ. মুখার্জি অ্যান্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

এস. চাঁদ অ্যান্ড কোং লিঃ
২৮৫জে, বি. বি. গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

ওরিয়েন্ট লংম্যানস লি.
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ কলিকাতা ৭২

কোয়ালিটি বুক কোং
৩১ লেনিন সরণি কলিকাতা ১৩

চ্যাটার্জি পাবলিশিং কনসার্ন
৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৯

জিজ্ঞাসা
১-এ কলেজ রো কলিকাতা ৯

জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ লেনিন সরণি কলিকাতা ১৩

জোনাকি
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

টাটা ম্যাকগ্রহীল পাবলিশিং কোং লিঃ
১২/৪ আসফ আলি রোড নিউ দিল্লী ১

দি নিউ বুক স্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা ৯

দি ম্যাকমিলান কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

নব ভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

নয়া প্রকাশ
২০৬ বিধান সরণি কলিকাতা ৬

নির্মল বুক এজেন্সি
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭

ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

ন্যাশন্যাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণি কলিকাতা ৬

পি. এম. বাকচি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬

পুঁথিপত্র
৯ অ্যান্টনি বাগান লেন কলিকাতা ৯

প্রেন্টিস হল অব ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ
এম-৯৭ কনট সার্কাস নিউ দিল্লী ১

প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭/এ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

বিকাশ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৮/১ বি. চৌরঙ্গী লেন
কলিকাতা ১৬

বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

বেস্ট বুকস
১-এ কলেজ রো কলিকাতা ৯

ব্ল্যাকি অ্যান্ড সন্স (ইণ্ডিয়া) লি
২৮৫-জে বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

ব্ল্যাকি (ইণ্ডিয়া) এমপ্লয়ীজ কোঅপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ
১০/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

ভারতী বুক স্টল
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা ৯

মিনার্ভা অ্যাসোসিয়েটস পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড
৭-বি, লেক প্লেস কলিকাতা-২৯

রূপা অ্যাণ্ড কোং
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

শংকরস বুক এজেন্সি
৯/১ মোরিডিথ স্ট্রীট কলিকাতা ৭২

শরৎ বুক হাউস
১৮-বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ৭৩

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণি কলিকাতা ৬

সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
২২ রাজা উডমন্ট স্ট্রীট কলিকাতা ১

কলিকাতা পুস্তক মেলা উপলক্ষে অভিনন্দন—
ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এ-৫ গ্রীন পার্ক, নিউ দিল্লী ১১০০১৬

বাংলার বাইরে বাঙালী পাঠক

অথচ বাংলা বইয়ের কোতো নেই একথা বলা চলে না। বাংলার বাইরে প্রবাসী বাঙালীদের একটা বিরাট অংশ আছে যারা বাংলা বইয়ের প্রতি আগ্রহী—যেমন দিল্লী, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, ত্রিপুরা বা আসামেও বাংলা বইয়ের পাঠক আছেন অসংখ্য—যারা বই কেনেন। কিনতেনও নিয়মিত। কিন্তু সেখানেও পড়েছে ভাটা। এর পেছনে অবশ্য কয়েকটা কারণ আছে— (১) প্রথমত কেনার আগ্রহ থাকলেও উদ্বাস্তুদের বইয়ের মূল্যবৃদ্ধি এও একটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। (২) আর দ্বিতীয়ত প্রবাসী বাঙালীদের কাছাকাছি কোন লোকাল মার্কেট নেই। এই লোকাল মার্কেট না থাকার কারণ ডাকখরচ বেড়ে যাওয়া। বই পাঠতেই যা খরচ পড়ে তা দিয়ে প্রকাশকের অবশিষ্ট শেষপর্যন্ত আর কিছুই থাকে না বললেই চলে। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি প্রবাসী বাঙালীদের বেশ বড়সড় একটা অংশ বাংলা বইয়ের জগত থেকে সরে যায় তবে সেটা তাদের কোন অপরাধ নয়।

পশ্চিম বাংলায় বাঙালী পাঠক

অবশ্য বাংলার বাইরে বাঙালী ছাড়াও এক পশ্চিম বাংলাতেই বাঙালীদের কাছে বাংলা বইয়ের বাজারটা কিভাবে ছড়িয়ে আছে সেটা এবার দেখা যাক।

হ্যাঁ একথা ঠিক এখনও একটা বড় মার্কেট এই পশ্চিমবাংলাতেই পড়ে আছে। থাকাটা স্বাভাবিক—কেননা বাংলা যার মাতৃভাষা, বাংলার জলবায়ু সংস্কৃতিই যার প্রধান অবলম্বন সেখানে তো বাংলা বইয়ের কদর হওয়া উচিত—এটা ফুলে ফেঁপে বেড়ে ওঠা উচিত। কিন্তু ফুলে ফেঁপে বাড়া তো দূরের কথা ক্রমশ তা রোগা হতে হতে অস্থিচর্মসার হতে চলেছে। ফলে এক পশ্চিমবাংলাতেই বাজারটা যতটা ভাবা গিয়েছিল তা না হওয়ায় প্রকাশকরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। আর যদি এই অবস্থাটা চলতেই থাকে তবে পশ্চিম বাংলাতেই বাংলার বইয়ের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কল্পনা করতে একটুও অসুবিধে হয় না।

এই তো সেদিন আমার এক জানাশোনা পুস্তক প্রকাশক ব্যবসায়ী এবং আমার অগ্রজ বন্ধু আমাকে জানাচ্ছিলেন গত ২ বছরের ভেতরে তিনি কয়েকটি মূল্যবান বাংলা বইয়ের জন্য অন্তত প্রায় ১৫ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কিন্তু কোন বইয়েরই এখনো একটা এডিসনই কাটেনি—সুতরাং তিনি এবার গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ এবং কবিতা গ্রন্থের প্রকাশনা তুলে দিয়ে আগে যেমন শুধু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ

করবেন তাই করবেন। কিন্তু কেন এই হতাশা? তাহলে কি আমরা ধরে নেব তিনি যেসব গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের বইয়ের প্রকাশ করেছেন তা অখাদ্য—কোন ক্রমেই পরিবেশন করা যায় না। বা বইগুলো দেখতে খারাপ, ছাপা বাজে, পাতা লাল বা মলাটের রংচং বিচ্ছিরি? কিন্তু না—তাও নয়। অন্ততঃ আমি নিজেই জানি বেশ কয়েকজন নামী লেখকদের সত্যি ভাল লেখা তিনি প্রকাশ করেছেন আর বইগুলো দেখতেও সুন্দর। তবে?

বাংলা বইয়ের পাঠক

আসলে কারণটা অন্য জায়গায়। প্রথমেই দেখা দরকার এই বাংলাতেই বাংলা বইয়ের পাঠক কারা কারা? এবং তাদের শ্রেণী চরিত্রটির স্বরূপ কি? প্রথমত এই প্রসঙ্গে যাঁদের আগেই মনে পড়ে তাঁরা এই বাংলারই অধিবাসী, বাংলা তাঁদেরও মাতৃভাষা, বাংলার জলবায়ু গায়ে মেখে তাঁরাও লালিত হয়েছেন অথচ বাংলা বইয়ের প্রতি এঁদের একটা বড় অংশই মুখ ফিরিয়ে থাকেন। বাংলা বই কেনা তো দূরের কথা এঁরা বাংলা কাগজপত্র দেখলে মুখ সিঁটিয়ে থাকেন, উন্নাসিকতায় বেঁকে ওঠে মুখ এবং ইংরেজী কাগজেই বেশীর ভাগ সময় ওঁরা মুখ ডুবিয়ে থাকেন। অনেক দাম দিয়ে কেনেন রীডার্স ডাইজেস্ট, ইভস উইকলি, টাইম ম্যাগাজিন কিন্তু তার চেয়ে সস্তায় একটা বাংলা জার্নাল কিনতে এঁদের

আপত্তি। আর বই পড়তে হলে এঁরা পড়েন সস্তা কিছু আমেরিকান রিপোর্টাজ, কিংবা আগাথা ক্রিস্টি, হ্যারল্ড রবিন্স, হ্যাডলি চেজ, আর কিছু গোয়েন্দা কাহিনী। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে এঁদেরই মধ্যে তাঁরা আবার একটু ক্লাসিকের ভক্ত—তাও এদেশের নয়। ওদেশের। বাংলা বই দিলেই ওরা মুখ কুঁচকে বলেন, ওসব বাজে। রুচিবিকৃতি। ও হতো মেয়েদেরও প্রথম। অবস্থাটা বুঝুন। অথচ ফরাসী ভাষাবিজ্ঞ এক বিদগ্ধজনের কাছে শুনেছি ফরাসীরা নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেই প্রথম এবং প্রধান বলে মনে করেন। তারপরে অন্যদেশের ও অন্যদেশীয় কথা। কিন্তু আমাদের এখানে—!

নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পাঠক

যাক গে এই তো গেল একটা শ্রেণী। এরপরে যারা থাকেন, যারা আছেন তাদের একটা বড় অংশই আবার নিরক্ষর এবং শ্রমের বিনিময় বা চাষবাস সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত। কাজেই এদের বাদ দিয়ে আর যারা থেকে

যান [illegible] এখনো বেঁচে আছে বাংলা বইয়ের বাজার। এই সমস্ত নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত [illegible] পাঠকই বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলা বইকে। তাদের জন্য আছে কিছু সরকারী এবং বেসরকারী লাইব্রেরী কিন্তু কি কি ধরনের বই সেখানে সরবরাহ করা হয়? অথবা চাহিদাটাই বা কি ধরনের?

এটা জানার আগে তাহলে আবার একটু খাঁতিয়ে দেখা দরকার বাংলায় কি কি ধরনের বই প্রকাশিত হয়ে থাকে। বা তাদের বাজার দরটাই বা কেমন? কিংবা ডিমান্ড?

বাংলা বইয়ের শ্রেণী বিভাগ

বাংলা ভাষায় মোট ২২টি বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেমন— ১। উপন্যাস ২। ছোটগল্প ৩। কবিতা ৪। প্রবন্ধ ৫। রম্যরচনা ৬। ভ্রমণ কাহিনী ৭। ধর্ম ও দর্শন ৮। রাজনীতি ৯। ইতিহাস ১০। বিজ্ঞান ১১। পর্বতারোহণ ১২। চলচ্চিত্র ১৩। শিল্প ১৪। শিকার কাহিনী ১৫। সংগীত ১৬। খেলাধুলো ১৭। জ্যোতিষশাস্ত্র ১৮। নাটক ১৯। ফটোগ্রাফি ২০। শিশুসাহিত্য ২১। অনুবাদ সাহিত্য এবং ২২। বিবিধ।

তবে এদের ভেতরে সবচেয়ে বেশী প্রকাশিত হয়ে থাকে বাংলা আধুনিক উপন্যাস। অন্তত গত তিন বছরের হিসেবে এ পর্যন্ত উপন্যাসের সংখ্যা ৩২০। অর্থাৎ গড়ে বছরে প্রায় ১০৭ খানা করে। কিন্তু বছরে এই ১০৭ খানার ভেতরে হয়ত ১টি কি দুটি শেষ পর্যন্ত সাহিত্য হিসেবে ধোপে টেঁকে বাকিগুলো টেঁসে যায়। তবে তা বলে তাদের বাজার দর পড়ে না। বরং এরাই অধিকার করে থাকে বাংলা বইয়ের বাজারকে। এবং এইসব ঢাউস রগরগে চটচটে উপন্যাসই সরকারী এবং বেসরকারী লাইব্রেরীতে চলে যায় প্রচুর। কেননা এক বিরাট পাঠকশ্রেণীই এগুলো অধিকার করে থাকে।

সে তুলনায় ছোটগল্পের বাজার একেবারেই নেই বললেই চলে। প্রকাশকরা স্বেচ্ছায় ছোটগল্পের বই প্রকাশ করতে চান না। বলেন, ছোটগল্পের বাজার নেই, বিক্রী নেই, ছাপব কি মশাই। কিন্তু একমাত্র বাংলা ভাষাতেই পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর গল্প সাহিত্যের পাশাপাশি ছোটগল্প রচিত হয়েছে, যেগুলো যেকোন ছোটগল্পের সঙ্গে যেকোন তুলনায় দাঁড়াতে পারে—সুতরাং সেই গল্পকারদের গল্পের বইয়ের বাজার নেই—কথাটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। অথচ মনে আছে আজ থেকে ১৫।২০ বছর আগেও 'শ্রেষ্ঠগল্প' সিরিজ করে অনেক গল্পকারের গল্প প্রকাশ করে প্রকাশকরা সম্মান ও অর্থ দুই-ই লাভ করেছেন। আসলে ঢাউস এবং সস্তা ধরনের, হালকা মেজাজের বইগুলো এত অল্পায়াসেই প্রকাশককে অর্থ এনে দিচ্ছে যে প্রকাশকরা আর ছোটগল্পের ব্যাপারটাকে অতটা খতিয়ে দেখেন না।

যদি ঠিকমত প্রচার হয় বিজ্ঞাপন এবং প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছোটগল্পের বইকে পাঠকের সামনে আনা হয় তাহলে ছোটগল্পেরও যে বাজার আবার ফিরে আসবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।
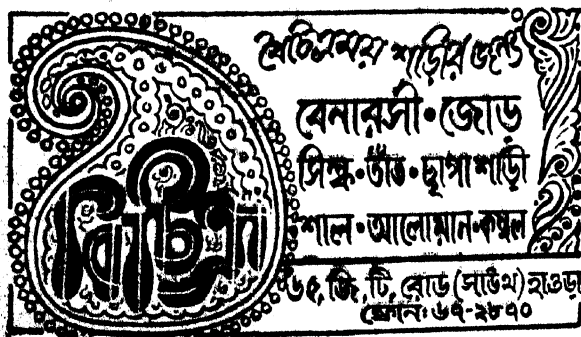
সাপ্তাহিক অমৃতের স্বত্বাধিকারী-বৃন্দ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবরণ। প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখের পরবর্তী প্রথম সংখ্যার প্রকাশিতব্য।

ফর্ম ৪

(রুল ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশনের স্থান : ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

২। প্রকাশনার সময়ক্রম : সাপ্তাহিক, প্রতি শুক্রবারে প্রকাশিতব্য।

৩। মুদ্রকের নাম : শ্রীসুপ্রিয় সরকার। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীসুপ্রিয় সরকার, নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৫। সম্পাদকের নাম—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। নাগরিকত্ব—ভারতীয়। ঠিকানা—১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩।

৬। যেসব ব্যক্তি পত্রিকাটির অংশীদার বা শতকরা এক অংশের বেশী শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা : সুধীরচন্দ্র সরকার (মৃত), ১৭১এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা—২৬; প্রাণতোষ ঘটক (মৃত), ১১১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা—৯; মুরারীবিলাস রায়চৌধুরী (মৃত), ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা; মনোজ বসু, পি-৫৬০; লেক রোড, কলিকাতা-২৯; গজেন্দ্রকুমার মিত্র, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২; সুমথনাথ ঘোষ, কেয়ার অব মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; বিশু মুখোপাধ্যায়, ১২ডি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৫; ভবানী মুখোপাধ্যায়, ৩০১/৪এ ব্যাচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলিকাতা-৩৪, তুলসীকান্তি দে বিশ্বাস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩; অমৃতবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩; তুষারকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩; শচীবিলাস রায়চৌধুরী, ৭৫, বনমালী নস্কর রোড, বেহালা এবং প্রফুল্লকান্তি ঘোষ, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩।

আমি সুপ্রিয় সরকার এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যাবলি আমার জ্ঞান-বিশ্বাস অনুযায়ী সর্বৈব সত্য।

স্বাঃ—সুপ্রিয় সরকার

তাং—২৫-২-৭৭

কবিতার বাজার

কবিতার বইয়ের বাজার বরাবরই একটু সংকুচিত ছিল। অর্থাৎ খুব হই-হই করে নয় আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিক্রী হত ঠিকই। কিন্তু ইদানিং কবিতার বইয়ের একটু অবস্থা ফিরেছে। কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ পাঠকমহলেও কবিতার বাজার একটু ফিরেছে। লাইব্রেরি এবং কোন প্রেজেন-টেশানেও কবিতার বই আজকাল যাচ্ছে অনায়াসেই। সেকারণে উপন্যাসের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনে কবিতার উপরও জোর দেয়া হয়। প্রকাশক দেখেন যেখানে অর্থ আছে বা এসে যাচ্ছে সহজেই সেখানেই তিনি বিজ্ঞাপনে জোর দেন। যে কারণে দু-একটি নামী প্রকাশন সংস্থা তাই বছরে অন্তত পাঁচ থেকে দশ কি বারোটি পর্যন্ত কবিতার বই নানাভাবে প্রকাশ করতে সাহস রাখেন।

এক সময় প্রবন্ধের বইয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হত। প্রবন্ধের বই বিক্রীও সেকারণে বাড়ত অনেক। এখনো তাই। প্রবন্ধের ভাল একটা বই প্রকাশিত হলে তা পড়ে থাকে না।

অন্যান্য বইয়ের বাজার

উপন্যাস ছোটগল্প কবিতা প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য বই মাঝেমাঝেই বইয়ের উপর গুরুত্ব বুঝে হটকেকের মত বিক্রী হয়ে যায়। যেমন এই কিছুদিন আগে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২-৭৩ কিংবা তারপরেও এখনো কিছুটা রাজনীতি সম্বন্ধীয় বইয়ের একটা জোয়ার এসেছিল। বিক্রীও হত তাই প্রচুর।

কেননা তার কারণ প্রধানত বাংলাদেশ (পশ্চিমবঙ্গ) ও বাঙালীর মানসিকতার পরিবর্তনের একটা ঢেউ।

এবং রাজনীতি সম্বন্ধীয় এই উপন্যাসগুলো যেমন একদিকে, তেমনি বিভিন্ন ভাষাভাষীর বামপন্থী মনোভাবাপন্ন উপন্যাস, গল্প এবং কবিতার অনুবাদ তাই বিক্রী হতে লাগল প্রচুর।

এছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের বাজার খানিকটা যেন তার নিজস্ব গ্ল্যামারের উপরেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ বইয়ের বিষয়ের স্ট্যান্টের উপরই নির্ভর করে সে বইগুলো মাঝে মাঝে বিকিয়ে যায়।

যেমন ভ্রমণকাহিনীর উপর বাঙালী পাঠকের এমনিই একটা হৃদয়ের টান আছে। সুতরাং তেমন যদি কোন নতুন স্বাদের ভ্রমণসাহিত্য বেরোয় তবে তা বিক্রী হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

রম্যরচনার ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। যে কারণে এই তো মাত্র কিছুদিন আগে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' বা রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা' হুহু করে বিক্রী হয়ে প্রকাশককে অর্থানুকূল্যের সাশ্রয় এনে দেয়। তবে নাটক, শিল্প সংক্রান্ত গ্রন্থ, সংগীত বা ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে বইয়ের বিক্রী খুবই সীমিত। অবশ্য খেলাধূলা বা শিশু-সাহিত্যের একটা নির্দিষ্ট মার্কেট আছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পাঠক তৈরি হয়েই থাকে। পড়ার আগ্রহ তার চিরকালের। কিন্তু এই পাঠককে আরও সুন্দরভাবে তৈরি করার দায়িত্বটা কার? অবশ্যই ভাল বইয়ের। ভাল বই-ই একজন পাঠকের ভাল বন্ধু। সেরা বই-ই পাঠকের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং ভাল বই প্রকাশের দায়িত্বটাও থেকে যায় প্রকাশকের। প্রকাশকের হাত থেকে যদি দিনের পর দিন ভাল বইয়ের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যেতে থাকে তবে পাঠকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাঠকও ক্রমশ সরে যেতে থাকে তার আপন সংস্কৃতির গন্ডী থেকে।

কিন্তু দোষ তো শুধু প্রকাশককেই দেয়া যায় না। কেননা প্রকাশক যখনই দেখবেন কোন বইয়ের বাজার পড়ে আসছে তখন সেই বই সম্পর্কে প্রকাশকের উৎসাহ কমে আসে। কেননা প্রকাশক দেখবেন তার অর্থানুকূল্য। সুতরাং এইভাবেই ভাল বইয়ের বাজার নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। তৈরি হয়ে যায় হালকা রুচির বাজার। তাহলে কি সবটা জনরুচির উপরই নির্ভর করে? না তাও শুধু নয়।

পাঠকের চোখের অগোচরে যখনই কোন বই চলে যেতে থাকে তখনই শুরু হয়

একটি সৎ ও নির্ভিক বইয়ের ধ্বংসলীলা। ফলে পরবর্তীকালে এসে আর পাঠকের মনে থাকে না সেই বইটির কথা। এভাবেই একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠকের চোখের অন্ত-রালে চলে যেতে পারে। তাহলে সঠিক কারণগুলো কি ?

বিদেশে একটি ভাল বইয়ের দু-তিনটে এডিসন হবার পরেই তা পেপার ব্যাকে সস্তা এডিসন বেরোয়—যাতে আরও বিপুলভাবে বইটি পাঠকের হাতে হাতে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চলে যেতে পারে। তাদের সমাদর হাতে লাভ করতে পারে। কিন্তু এখানে ? এখানে অন্তত বাঙলা বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় লেখকদের আপত্তি। প্রকাশকরাই বলেন, লেখকরা সস্তা এডিসন করতে দিতে সবসময় রাজীও হন না। তার উপর আছে কাগজের বাজারের মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা। যদি উত্তরোত্তর একই বাজারে কাগজ কালি এবং প্রেসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তবে প্রকাশকদের ক্ষেত্রেও অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেকারণে একটি বইকে সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য যে অতিরিক্ত খরচের দরকার ভয়ে প্রকাশক তা পারেন না। যদি আরও অসাধারণ কভার ড্রইং বা কভার ডিজাইন অফসেটে ছেপে, ভেতরে সুন্দর ঝকঝকে কাগজে কালো দামী কালিতে ছেপে উৎকৃষ্ট বাধাই হয়ে একটি বই বাজারে বেরোয় তাহলে তার যা দাম হবে তা পাঠকের কাছে একটা দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। সুতরাং প্রকাশক তা করবেন কেন। আর তা করবেন না বলেই প্রকাশকও তখন খোঁজেন সস্তা প্রেস, সস্তা কালি এবং লালচে কাগজ। বাধাইও তেমনি হয়। দু'দিন পরেই ফেটে যেতে থাকে। তা না হলে কিনবে কে ?

লাইব্রেরীর বই কেনা

যদিও বই প্রকাশিত হলে সরকারী লাইব্রেরি বা বেসরকারি লাইব্রেরীগুলো সেগুলো অনেকাংশেই কিনে নিতে রাজী হয়। কিন্তু যে পরিমাণ কমিশন চায় সরকারি লাইব্রেরিগুলো সে তাতে প্রকাশকের রাজী না হবারই কথা। যদি একটি বইয়ের উপর শতকরা ৪০ ভাগ কমিশনে দেওয়া যায়, তাহলে আর থাকে কি ? আর বেসরকারী লাই-ব্রেরীগুলোরও এমন অর্থনৈতিক অবস্থা নয় যে সে ঘন ঘন বই কিনতে পারে। এমতাবস্থায় প্রকাশককেই একটা মাঝামাঝি অবস্থা বেছে নিতে হয়। আর তারই ফলে বাংলা বইয়ের বাজারে এত নৈরাজ্য ? এত হতাশা ?

কিন্তু একটি ভাষা এবং তার সংস্কৃতিকে বাঁচাতে পারে একমাত্র বই। সেই বইয়ের বাজারে এই নৈরাশ্য এলে সেই জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি মরে যেতেই বাধ্য। সুতরাং তাকে বাঁচাতে হলে একদিকে যেমন লেখক, প্রকাশক এবং অন্যদিকে সর-কারকেও এগিয়ে আসতে হবে।

সরকারী সাহায্য

সরকার এ' ব্যাপারে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন ? হাঁ সরকার অনেকরকম উপায়েই বাংলা বইয়ের বাজারকে আবার প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। যদি হিন্দি বইয়ের প্রকাশকরা সরকারী অনুদানে রাত-রাতি ফুলে-ফেঁপে উঠতে পারেন তবে বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে কেন নয় ? (১) সর-কারী লাইব্রেরীগুলো এই ব্যাপারে আরও কম কমিশনে বই নিতে পারেন।

(২) সরকার সস্তা দরে কাগজ সরবরাহ করতে পারেন। আর তা সবরকম বইয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। বইয়ের উপর সরকার সামান্য মেইলিং চার্জ ধার্য করতে পারেন।

(৩) প্রেসের সরঞ্জাম যে যে বিষয় গুলো তার দাম কমাতে পারেন। যেমন কালি এবং টাইপের দাম অত্যধিক হওয়াকে কমিয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখায় নিয়ে আসতে পারেন।

(৪) বইয়ের প্রচার বাড়াতে পারেন। একদা সরকারী ঘোষণায় এই রকমই বলা হয়েছিল যে, পেট্রোল পাম্প-এর শো-কেস থেকে বিভিন্ন জায়গায় সরকারী তত্ত্বাবধানে প্রচার করা হবে—কিন্তু এখনো তা হয়নি। হলে তা মঙ্গল।

(৫) কাগজে প্রচার যে যে যথেষ্ট নয় তার কারণ একটি বইয়ের নাম শুধুমাত্র দেখে পাঠক কখনোই দূরে থেকে তার সম্পর্কে ধারণা করতে পারেন না। সুতরাং সেই ব্যাপারেও চাই প্রদর্শন কেন্দ্র। যে কেন্দ্রে বইয়ের প্রদর্শনী হলে পাঠক সহজেই তা হাতে তুলে নিতে পারবেন।

যদি এভাবে সরকার প্রকাশকদের সাহায্য করেন তাহলে প্রকাশকদের ক্ষেত্রেও কোন বাধা থাকবে না কোন দুষ্প্রাপ্য বইয়ের পুনর্মুদ্রনে। বরং প্রকাশক তাতে উৎসাহই পাবেন। শুধু তারাই নয়, সেই সঙ্গে পাঠকের সমর্থনও বাড়বে। কেননা মূল্য কমে এলে তা সংগ্রহ করতে তাদের পক্ষেও আর বাধা থাকবে না। এবং এভাবেই একটি জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্য বেঁচে থাকবে।

আজকের সাহিত্য শুধু টাকার ভিখারী : শ্রীশ কুণ্ড

বানানটা কিন্তু ভুল করবেন না। হ্রস্ব উকার দেবেন না, কুণ্ডু নয় কুণ্ড। শ্রীশকুমার কুণ্ড চোখের তারা দুটো ঝুঁকিয়ে দিলেন আমার নোট খাতাটার ওপর। পেছনের ছোট জানালার একটা পাল্লা খোলা। কলেজ রো-এর এই পুরনো বাড়ির তিনতলায় ছোট ঘরটায় সূর্য উঁকি মারে শুধু ওখান দিয়েই।

খদ্দরের পাঞ্জাবি ধুতি পরা সাড়ে পাঁচ ফুটের ওপর আরও ইঞ্চি তিনেক যোগ করা যায় তাঁর উচ্চতায়। মাথার চুল সাদা। বয়স একষট্টি। শ্রীশবাবু বললেন, গল্প উপন্যাস কবিতা প্রকাশ করি না, কারণ তার জন্যে অনেক লোক আছেন। শুধু প্রবন্ধ জাতের বই ছাপার জন্য নেই। শ্রীশবাবু বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'জিজ্ঞাসা'র স্বত্বাধিকারী। সোজা কথায় মালিক।

প্রবন্ধ ইত্যাদি বইয়ের বিক্রির হিসাব দিতে গিয়ে উনি চশমাটা খুলে প্রায় ছুঁড়ে টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন, লিখুন: একশ টাকার বই বিক্রি হলে নব্বই টাকার টেকস্ট বুক, স্কুল টু পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। আট টাকা গল্প উপন্যাস কবিতা। দু টাকা যায় প্রবন্ধের পকেটে। বলেই উনি হেসে উঠলেন।

পঁয়ত্রিশ বছর প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত কুণ্ড মশাইকে জিজ্ঞাসা করেছি, আজকের সাহিত্য সম্পর্কে আপনার ধারণা কী? চোখের পাতা খোলা রেখে ওঁর ঠাণ্ডা স্বরের জবাব— আজকের সাহিত্য শুধু টাকার ভিখারী। শক্তিমান লেখকরাও সব ছেড়ে শুধু মন-যোগানো লেখা লিখছেন। অথচ এঁরা অনেকেই বলিষ্ঠ লেখা লিখেছেন, লিখতেও পারেন। একটানা উনি বলেন, মানুষের দৈনিক প্রাকৃতিক কাজের জন্য সময় বড় জোর এক ঘণ্টা। সেই এক ঘণ্টাকে সমাজ-দর্পণের নাম করে চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপার বলে দেখালে তো চলবে না। ওঁর চোখে আবার চশমা ওঠে। বলেন, সাহিত্য সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের কাজে না লাগলে, কেমন করে বলি তাকে সাহিত্য?

তরুণ প্রকাশকদের সঙ্গে চিন্তা ভাবনায় তফাত? জেনারেশন গ্যাপ? মাথা নেড়ে শ্রীশবাবুর উত্তর, অন্তত আমি নিজেকে বুড়ো মনে করি না। কোনও তফাত নেই।
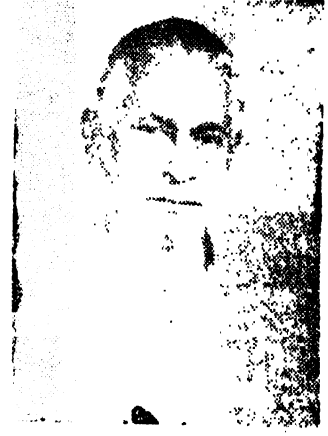
শ্রীশবাবু আগে ভগবান মানতেন না। এখন বিশ্বাস করেন। তিনি বললেন, আবার প্ল্যান নিয়েছি অল্পদামে বিখ্যাত লেখকদের প্রবন্ধ প্রকাশ করব। এক মুখ হেসে কুণ্ডবাবু জানালেন, এবার শুধু বাংলা নয় ইংরেজীও থাকছে। নাম দিয়েছি 'বিচিত্র প্রবন্ধগ্রন্থমালা'।

লেখা ভাল হলেই ছাপব : ব্রজ মণ্ডল

শ্যামল সান্যাল

পরনে সাফারি স্যুট। বলিষ্ঠ গড়ন। হাইটে, চেহারায় বাঙালী সাঁইত্রিশ বছরের তরুণটি চোয়াল শক্ত করে জানালেন, ক্ষতি হলেও লড়ে যাব। ও'র ডান হাতে 'এক মুঠো মাটি', বাঁ হাতে সিগারেট। সাধু? বিপ্লবী? রাজনীতি করেন?

ওসবের কোনটাই নন ব্রজকিশোর মণ্ডল, ওরফে ব্রজ মণ্ডল। উনি একজন প্রকাশক। মহাত্মা গান্ধী রোডে পরিচিত বিশ্ববাণী প্রকাশনীতে গেলেই ও'কে পাওয়া যাবে। পাওয়া গেলেই পরিচয় দিতে চাইবেন না। কারণ, পর্দার পেছনে থাকাই ব্রজবাবুর বেশী পছন্দ।

রাস্তার ওপরে বড় জানলা দিয়ে রোদ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ব্রজবাবু ও'র বাবা শ্রীবাসবের লেখা 'এক মুঠো মাটি' নামিয়ে রাখলেন। তারপর আবার ঘোষণা করে দিলেন, রিস্ক নিয়ে ডুবতে রাজী আছি। বাড়ি হবে না, গাড়ি চড়তে পারব না, এই তো? জানি, তবু এক্সপেরিমেন্ট করব। বারো শ' টাকায় মতান্তরেও ছাপছি। আবার বাংলা ইংরেজী কবিতা সঙ্গে ছবি দিয়ে পাবলিশ করেছি নীলিমা ও নৈরাজ্য। পঁচিশ টাকা দাম।

সিগারেট এগিয়ে দিয়ে ব্রজবাবু বললেন—বই বিক্রী তো হচ্ছে, তবে কম, এবং মার্জিনও কম। এইভাবেই চলবে। পাঠকে তৈরী হচ্ছে, আমারও খেয়ে পরে দিব্য দিন কাটছে। ঘি দুধ না হোক ডাল ভাত জুটছে, এনাফ এনাফ। আর কি চাই?

টেকস্ট বই ছাপি না, স্কুলের বেড়াই পার হইনি। তাই ওসবে ইন্টারেস্ট নেই। পত্রিকা করতাম, গল্প উপন্যাস পড়তে ভালো লাগত। বাবা পেশায় উকিল হলেও লিখতেন। বাবার একটা বই আর বাবারই দেওয়া পঁচিশ টাকা ক্যাপিটাল নিয়ে লাইনে এসেছিলাম।

বাইশ বছরের ব্রজকিশোর পনের বছর পাল্লা দিয়ে সমানে ছুটেছেন বাঘা প্রকাশকদের সঙ্গে।

এসব কথা ব্রজবাবু কিছুতেই নিজের মুখে বলবেন না। উনি বললেন, এতে অহমিকা প্রকাশ পায়। ব্রজবাবু কোটটা গায়ে চাপিয়ে বললেন, আজকের দিনটা আমার। পরকাল মরে গেছে। ভবিষ্যৎ জন্মাক তো আগে তখন দেখা যাবে।
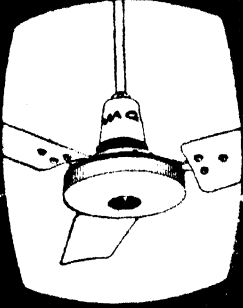
এখনকার সাহিত্য নিয়েই ব্রজবাবুর কারবার। উনি কী বদ গন্ধ পান? অশ্লীলতার গন্ধ? মুখের সামনে থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে ব্রজ মণ্ডলের জবাব, অশ্লীল হলে সাহিত্যই সে পথ মাড়াবে না। সাহিত্য আবার অশ্লীল হয় নাকি? আমি সাহিত্য বেচে খাই। লোকে যখন বই কেনে বুঝতে হবে এ সাহিত্য। বটতলার বই যাঁরা কেনেন, নিশ্চয়ই সমরেশ বসুর বই কেনেন না। আবার সমরেশ বসু বা আজকের সাহিত্যিকদের লেখা কিনে যাঁরা পড়েন, বটতলার বই পড়েন না। সেই পাঠক কি পাঠিকারা।

সৈয়দ মুজতবা আলির শবনম ব্রজবাবুর চেহারা প্রকাশক মহলে চিনিয়ে দিয়েছিল প্রথম। ব্রজবাবু বার বার আলি সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতার কথা বললেন। বিভিন্ন লেখক, কাগজের লোক, প্রেস সকলের সাহায্যের কথা উনি খোলাখুলি স্বীকার করে বললেন, সরকারী সাহায্যের নিয়মকানুন একটু সহজ হলে আরও ভালো হত। মহাভারতের দাম বেশ কম হত।

মহাভারতের জন্য অনেক টাকা আটকে গেছে। তবু ব্রজ মণ্ডল সামনের বছর আর একটা বড় কাজ করে চমকে দেবেন।

নতুন লেখক? ব্রজবাবুর জবাব, লেখা ভালো হলেই ছাপব।

বই একজন নির্বাক বন্ধু

মীরা দে

বিচিত্র মানুষ তার বিচিত্রতর রুচিবোধ নিয়ে মিলিত হয় মেলাপ্রাঙ্গণে। মেলার ঐতিহ্যে ভারতবর্ষ বোধহয় বিশ্বের সকল দেশকেই অতিক্রম করেছে। সুদূর অতীতেও বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা বসতো। পুণ্যার্থীরা দূর-দূরান্তর থেকে দলে দলে আসতেন সেইসব মেলায় পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। মেলায় পুণ্য সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের মানুষ কিছু কিছু আনন্দ সঞ্চয়ও করতো। মেলা-প্রাঙ্গণ শুধুই পুণ্য সঞ্চয়ের ক্ষেত্র নয়—এর সঙ্গে সঙ্গে উৎসব-আনন্দেরও ব্যবস্থা থাকতো। তাই মেলার আকর্ষণ ভারতবাসীর চিরন্তন। আজো তার বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ কমেনি। মেলা আবার শুধুই পুণ্যের আর আনন্দের পসরা সাজিয়েই বসে থাকে না, তার পসরায় থাকে আরো বহুবিধ লোভনীয় বস্তুসম্ভার, যার ক্রয়-বিক্রয়ও হয়ে থাকে এই মেলাপ্রাঙ্গণেই।

জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মেলার সংজ্ঞাও বিস্তার লাভ করেছে। আজকের মেলায় তাই শুধু সেই দেশেরই মানুষ যোগদান করে না, আজকের মেলা উৎসবে সমগ্র বিশ্ববাসী যোগদান করে থাকে। আরো আছে। আজকের মেলা শুধু ধর্মানুষ্ঠান বা পুজোকেই কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় না—আজ বিভিন্ন ধরনের মেলা আয়োজিত হয় বিশ্ববাসীর রুচি ও চাহিদার মান অনুযায়ী। যেমন বাণিজ্যিক মেলা, যন্ত্র ও কুটিরশিল্প মেলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও মেলা, সাংস্কৃতিক মেলা, শরৎ মেলা ইত্যাদি। এই ধরনের বিচিত্র মেলা ও প্রদর্শনী মানুষের জ্ঞানের পরিধি ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে। গ্রন্থমেলা তেমনই মার্জিত রুচির এবং পরিশীলিত মনের বিদগ্ধ মানুষের চাহিদা মেটানোর আয়োজন মাত্র।

গ্রন্থমেলার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লিপজিগ-এ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক মেলার এক সংকীর্ণ অংশে বইমেলার আয়োজন হয়েছিল। অর্থকরী চিন্তাধারার মধ্যে এ যেন এক অভিনব রুচির প্রকাশ। তারপর শুরু হয় সেই ভয়াবহ লোকক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ—জার্মানী হল দ্বিধাবিভক্ত। লিপজিগ-এ আন্তর্জাতিক মেলা হল বন্ধ। সূত্রপাত হয় আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে। সমগ্র বিশ্বের মানুষ এই মেলায় যোগদান করে থাকেন। আজো এই মেলার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। এই মেলায় যোগদানে সব দেশেরই উৎসাহ এত বেশী যে প্রতি বছরই অধীর আগ্রহে তাঁরা প্রতীক্ষা করেন মেলার উৎসবের সামিল হবার জন্য। একটি বছরের মেলা সাঙ্গ হোল তো প্রস্তুতি শুরু হোল পরবর্তী মেলার জন্য। কারণ এই আন্তর্জাতিক বইমেলায় সারা দুনিয়ার বইয়ের কারবারী এবং প্রকাশকেরা যোগদান করেন। তাই ফ্রাংকফুর্ট হয়ে উঠেছে বিশ্বের সমস্ত মানুষের সংস্কৃতিক মিলনের মহাতীর্থ। শুধু তাই নয়—ফ্রাংকফুর্ট-এর বইমেলা বিশ্বের বৃহত্তম পাইকারী পুস্তক বিকিকিনির কেন্দ্রও হয়ে উঠেছে। বই বেচা কেনার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার ব্যবসায়ীদের মেলামেশাও হয় এখানে। ফ্রাংকফুর্টের বইমেলার ব্যবসায়িক সাফল্যে অনুপ্রেরণা লাভ করে আরো বহু দেশে বইমেলার আয়োজন হয়েছে। প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, সুদূর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু শহরে যেমন কায়রো, কানুস, ব্রাসেলস, লণ্ডন, মস্কো, লিপজিগ, বোলোগনা মন্ট্রিল, মেক্সিকো, সিঙ্গাপুর, টোকিও প্রভৃতি দেশে বইমেলা সাফল্যের সঙ্গে আয়োজিত হয়েছে।

ভারত সরকারের একটি সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। এই সংস্থাটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে 'ন্যাশন্যাল বুক ফেয়ারের' আয়োজন করে থাকেন। তাছাড়া 'ওয়ার্ল্ড' বুক ফেয়ার'-এর আয়োজনও করেন এই সংস্থা। আঞ্চলিক পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। দিল্লীতে দুবার আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন হয়েছিল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে। মাত্র কয়েকদিন আগেই আমেদাবাদে ন্যাশনাল বুক ফেয়ার সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হল এই সংস্থার পরিচালনায়। বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বই মেলায় এই সংস্থাই ভারতবর্ষের প্রকাশিত বই নিয়ে যোগদান করেন।

আর কলকাতায় যখন শীতের আসর জমজমাট তখনই শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের মেলা। মেলার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে গত বছরের বইমেলা। গত বছর ৫ থেকে ১৪ মার্চ একটি বইমেলা সারা কলকাতায় আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বসন্তের হাওয়ায় হাওয়ায় সেদিন এই মেলাটি শুধু কবিকেই ডাক দেয়নি—ডাক দিয়েছিলো সারা শহরের বই-পাগল আর পড়ুয়া মানুষদের। লেখক-পাঠক, ক্রেতা-বিক্রেতার সে এক অভূতপূর্ব সম্মেলন এই মেলাটি কিন্তু সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড' বেসরকারী উদ্যোগে পুস্তক মেলা আয়োজনের পথিকৃৎ। সম্ভবতঃ কলকাতাতেই প্রথম এই বেসরকারী উদ্যোগ দেখা গেল। আশ্চর্যরকমের সাড়া মিললো সেদিন কলকাতাবাসীর। সমকালীন অন্যান্য নানা ধরনের মেলার সমস্ত চাকচিক্য ঔজ্জ্বল্যকে সেদিন ম্লান করে দিয়েছিলো বইমেলা। আজও স্মরণে আসে শহর কলকাতার পুস্তকপ্রেমী মানুষদের অকুণ্ঠ সেই সহযোগিতা। শুধু বই আর বই—অজস্র অগণ্য বই আর তারই মধ্যে সঞ্চরমান অজস্র বিদগ্ধরুচি পাঠকের দল। বহুক্ষণ সুদীর্ঘ লাইনে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তাঁরা প্রার্থিত প্রবেশপত্রটি সংগ্রহ করতে পেরেছেন। বহু দর্শক—দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারেন নি—ক্ষুণ্ণমনে ফিরে গেছেন। এই মেলায় যাঁরা বইয়ের দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন—গত বছরের সেই মেলার ব্যবসায়িক সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্য মেলায় যোগদানের প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁরা।

এই বছর আবার আয়োজন। যাঁরা বই ভালোবাসেন কিংবা যাঁরা এর ব্যবসায়ী তাঁদের উৎসাহে পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড কলকাতার ময়দানে ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে আবার বইমেলার আয়োজন করেছেন। গত বছরের লক্ষাধিক দর্শকের কথা স্মরণে রেখেই উদ্যোক্তারা এবার আরো অভিনব কিছু সংযোজনের চেষ্টা করেছেন।

গতবারের বইমেলায় অচিন্তনীয় সাফল্য কেবল ভারতবর্ষের বইয়ের ব্যবসায়ীদেরই নয় বহির্ভারতের বহু ব্যবসায়ীকে আকৃষ্ট করেছে। এবং তাই ফ্রান্স, জার্মানী, বিটেন, রাশিয়া ও আমেরিকার বইপত্রও এই প্রদর্শনীতে আনছে বিদেশী বইয়ের প্রকাশন সংস্থা। আর ভারতের তো কথাই নেই। কাশ্মীর থেকে আসাম, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সমগ্র বড় বড় সহরের ব্যবসায়ীরা যোগ দিচ্ছেন এবারের মেলায়। একটি বেসরকারী সংস্থার পক্ষে এই উদ্যোগ কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হবে তা নির্ভর করছে শহরবাসী বিদগ্ধজনের সহযোগিতার উপর, কিন্তু এই উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। শুধু বয়স্ক বিদগ্ধ পাঠকদের কথাই যে চিন্তা করছেন গিল্ড তা নয় দেশের শিশুদের কথাও চিন্তা

করেছেন তাঁরা। ছোটদের নবীন প্রাণে ও তরুণ মনে বইপত্রের প্রভাব যে কতখানি তা সবাই জানেন। তাদের অবাধ প্রবেশের জন্য তাদের প্রবেশমূল্য রহিত করেছেন উদ্যোক্তারা। কোনও প্রবেশ দক্ষিণা নয়—শিশুরা বিনা দর্শনীতেই প্রবেশ করবে মেলা প্রাঙ্গণে, দেখবে বই।

অল্পমূল্যে বই বিক্রয়ের চালাও ব্যবস্থা রয়েছে মেলায়। কমিশন বাদেই যে কোনও দর্শক বই কিনতে পারেন। শেষের দিনটি দিন তো অভিনব ব্যবস্থা। অল্প দামে বই বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে—ব্যবস্থা হয়েছে বই বাজারের। ক্রেতারা তাঁদের পছন্দমত বই নামমাত্র দাম দিয়ে কিনতে পারবেন এই মেলায়।

আরো কিছু আকর্ষণীয় আয়োজন হয়েছে এবারের মেলায়। জনপ্রিয় লেখকদের সঙ্গে অনুরাগী পাঠকদের কিছু কিছু সাক্ষাৎ, পরিচয়, আলাপের ব্যবস্থা আছে। বইয়ের মলাটে যাঁদের নাম মুদ্রিত দেখা যায় সেইসব জনপ্রিয় লেখকদের এবারের দর্শক স্বচক্ষে দেখার ও আলাপের দুর্লভ সুযোগ পাবেন। শুধু কি পাঠক ও দর্শকদের জন্য ব্যবস্থা? বইয়ের ব্যবসায়ীদের জন্যও উদ্যোক্তারা কয়েকটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছেন। 'আগামী দশকের বাংলা পুস্তক প্রকাশন', 'ভারতীয় পুস্তক-এর রপ্তানী' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনাচক্র বসছে মেলা প্রাঙ্গণে।

বই পাড়া\বই কেনা\বই মেলা

নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রিকসা, ঠেলা, ঝাঁকায় তামাম শ্যামা-চরণ দে স্ট্রীট ঠাসাই। র‍্যাসন ব্যাগ হাতে কাতারে কাতারে মানুষ রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই স্কুলপাঠ্য বই সওদা করছেন। ব্যাপারীরাও অতি মাত্রায় ব্যস্ত। খদ্দের ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে কিছু অল্প বয়সী তরুণ ওৎ পেতে রয়েছে। মুখ দিয়ে বই-এর নাম উচ্চারণ করার অপেক্ষা। পারলে মুখ দেখেই হাতে বই ধরিয়ে দেয়। বস্তা বস্তা নোট বই, পাঠ্য বই। অভিভাবকরা চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, কার নোট ভাল।

এ বছর স্কুল সিজনটা আরম্ভ হয়েছে দেরিতে। অন্যান্য বছর জানুয়ারীর মধ্যে প্রায় মিটে যায়। এ বছর বুক লিস্ট বেরিয়েছে দেরিতে। কারণ যে কোন বইয়ে টি বি মার্কা না পড়লে নাকি স্কুলের পাঠ্য তালিকায় আসতে পারবে না। তাই সব স্কুলই টি বি মার্কার অপেক্ষায় ছিলেন, সেটা পাবার পরই একসঙ্গে প্রায় সব স্কুলের লিস্ট এসে জমা হয়েছে বই-পাড়ায়।

পাঠ্য বইয়ের দাপটে উপন্যাস গল্পের প্রকাশকরা একটু স্তিমিত। অবশ্য প্রতি বছরই এই সময় উপন্যাস গল্পের বই বেরোনর সংখ্যা কমে যায়। তার কিছু কারণও আছে। প্রত্যেকটি প্রেসই এই সময় ওভার বুকড। রেটও কিছু চড়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্য বই বার করতে হবে। না হলে পুরো সিজনটাই বরবাদ। ব্লক মেকার, কাগজওয়ালা এমন কি পাঠ্য বইয়ের মলাট আঁকার শিল্পীরাও ব্যস্ত।

যে সব প্রকাশক পাঠ্য বই প্রকাশ করে আসছেন দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা তো আছেনই। এ ছাড়া শুধুমাত্র এই কটা মাস ঠিকে ব্যবসা করার জন্যে বেশ কিছু খুদে বই বিক্রেতা সাময়িকভাবে ফুটপাতে বসে পড়েন। তাঁরা প্রকাশক নন, বই কিনে বিক্রি, মাঝের কমিশনটাই লাভের খাতায়। মেলা ভাঙলেই পাততাড়ি গুটিয়ে ঘর। মোটামুটি এঁদের ব্যবসাও খুব একটা খারাপ নয়। এসট্যাব্লিসমেণ্ট মোটেই নেই, শুধু কেনা বেচার পরিশ্রম। আর ইনভেস্টমেণ্টও সামান্য। অনেক সময় খদ্দেরদের কাছ থেকে টাকা নিয়েই দৌড়ে বই কিনে এনে যোগান দেন। বিরল বই-এ লাভ বেশি, নোট বইয়ে যে যেমন পারেন। আর সরকারী প্রকাশনার কোন বইয়ের সরবরাহে ঘাটতি থাকলে তাতেও কিছু মুনাফা থাকে।

পাঠ্য বইয়ের ভিড় ঠেলে উপন্যাস গল্প কবিতার আওতায় এসে পড়লুম। দেখা হয়ে গেল সুধাংশুশেখর দে'র সঙ্গে। দে'জ পাবলিসিং চালাচ্ছেন বছর ছয়েক। বই-পাড়ার হালচাল জানতে ওকে নিয়ে বসে পড়লুম। মিস্টি তরুণ। প্যাঁচালো কথার ধার দিয়ে গেলেন না। সোজা সরলভাবেই বলে ফেললেন, জানেন, 'শংকর-এর স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ৫ মাসে পাঁচ হাজার কপি বিক্রি করেছি। আমার তো মনে হয় জীবিত কোন লেখকের বই এত কম সময়ের মধ্যে এত বেশি কপি বিক্রি হয়নি। সর্বাধিক বিক্রির এটাই রেকর্ড বলে আমি মনে করি।'

সত্যিই অবাক লাগল। এর থেকে অন্য কোন বই আর বেশি বিক্রি হয়েছে কিনা আমারও জানা নেই।

বললেন, 'গত ৫।৬ বছরের মধ্যে আমার প্রকাশনীর টাইটেলের সংখ্যা প্রায় দুশো। তার মধ্যে উপন্যাসেরই চাহিদা বেশি। প্রবন্ধের বইয়ের চাহিদাও আগের তুলনায় বেড়েছে। কবিতার বই দিয়েই এখন অনায়াসে ব্যবসা করা যায়। যাঁরা বলেন কবিতার বই ছেপে লোকসান খাচ্ছেন, তাঁরা ঠিক বলেন না। কয়েকজন কবির কবিতার বই-এর তো বেশ চাহিদা।'

জিগেস করলাম, এখন তো পাঠ্য-বই-এর জোয়ার চলছে, নিশ্চয়ই আপনাদের বিক্রি কম।

বললেন, কিছু কম ঠিকই, কিন্তু এই সময় প্রায় প্রত্যেকটি স্কুলেরই পারিতোষিক দেওয়ার সময়। ফলে কিশোর পাঠ্য বইয়ের বিক্রি আছে। অন্যান্য বছর ফেব্রুয়ারী থেকেই লাইব্রেরীর জন্যে বইপত্র কেনা শুরু হয়ে যায়। এ বছর মনে হয় মার্চ থেকে শুরু হবে। লাইব্রেরী সাধারণত উপন্যাস গল্পের বই কেনে। কাব্য সংগ্রহ, শ্রেষ্ঠ কবিতা বেশ ভালই কেনে। টুকরো কবিতার বইয়ের বিক্রি কম।

রয়ালটিমুক্ত বই প্রকাশ করার প্রবণতা এখন প্রকাশকদের মধ্যে বেশি দেখা যাচ্ছে। এটা কি নিছক ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখে না সত্যিই পাঠকরা চাইছেন?

বিদ্যাসাগর বঙ্কিম ইত্যাদি রচনাবলীর দিকে পাঠকদের ঝোঁক এসেছে। পাঠকদের চাহিদার কথা ভেবেই মনে হয় প্রকাশকরা এগিয়ে আসছেন। বিক্রি না হলে এত পয়সা ইনভেস্ট করে তাঁরা প্রকাশ করবেন কেন?

একই বই অনেক প্রকাশক বার করছেন তাতে ব্যবসার দিক থেকে অসুবিধে হচ্ছে না?

কিছু হয়ত হচ্ছে, কিন্তু সব প্রকাশকই বিক্রি করতে পারছেন। আমার তো মনে হয় ক্ল্যাসিক বইপত্রের ওপর পাঠকদের আগ্রহ বেড়েছে। বই পড়ুয়ার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেই বেশি।

আপনার বই কোথায় সব থেকে বেশি বিক্রি হয়?

উত্তরে বললেন, আসাম ও আগরতলায় বেশি বই যায়। কলকাতা এবং সমস্ত ধরলে দেখা যাবে যে কোন উপন্যাস প্রকাশ হওয়ার প্রথম ৭ দিনে প্রায় ৫০০ কপি চলে যায়। গল্প ১৫০ কপির মত। আর কবিতা ৭০।৮০ কপি। পাঠকদের মনের

ঢাকার বই মেলায় ভারতীয় স্টল

চাহিদা বুঝে বই বার করতে পারলে কোন বই-ই মার খায় না। অন্তত এই ক'বছরে আমার তাই ধারণা হয়েছে।

ঃ প্রকাশনার ক্ষেত্রে সাধারণত কি কি সমস্যা দেখা দেয় ?

ঃ সমস্যা অনেক। যেমন ধরুন কাগজ। এই মুহূর্তে বাজারে কাগজের প্রচণ্ড অভাব, অথচ ঠিক বোধ কারণ নেই। পাঠ্যবই মরশুমে প্রেসের ধারে কাছে এগোনো যায় না। সব প্রেসই বুকড্। রেটও কিছু বাড়িয়ে দেন। বইয়ের দাম, কাগজের দাম, বাঁধাই খরচ ইত্যাদি গত কয়েক বছরে বেড়েছে, কিন্তু লেখকদের রয়ালটি এক পার্সেন্টও বাড়েনি।

ঃ বিজ্ঞাপন বাবদ আপনি কত পার্সেন্ট খরচ করেন ?

ঃ মাত্র দশ ভাগ। আরও কিছু বেশি করলে ভাল হয়। কিশোরদের জন্যে বইয়ের প্রচুর চাহিদা। শিশু কিশোরদের জন্যে ভাল বই করতে পারলে আমার মনে হয় ভাল বিক্রি হবে। কারণ শিশু কিশোরদের উপযোগী বেশি বই এবং ভাল বই নেই। আমি নিজেও বাচ্চাদের জন্যে কিছু ভাল বই প্রকাশ করার পরিকল্পনা করছি।

প্রকাশনায় এই কয়েক বছর এসে আমি বুঝতে পেরেছি ঠিক ঠিক মত বই বার করতে পারলে লোকসান খাবার কোন ভয়ই নেই, বরং বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বই প্রকাশ করার আলাদা এক ধরনের আনন্দ আছে।

সেদিন এক অধ্যাপক বন্ধু আক্ষেপ করে বলছিলেন, কলকাতা থেকে অনেক দূরের এক গ্রামে পড়ে রয়েছি, সাহিত্য-সংস্কৃতির আমেজটা ঠিক অনুভব করতে পারছি না।

তোমরা বেশ আছো, সাহিত্যের উৎস-মুখে বসে থেকে ঘনিষ্ঠ উত্তাপ পাচ্ছো। কথাটা হয়ত একেবারে ফেলে দেবার মত নয়। ভারতবর্ষের তামাম মানুষ উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকে কলকাতার দিকে, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে কি হচ্ছে, এক তুফান থেমে আসার পর আর কোন নতুন তুফানের প্রেরণা আসছে!

এবারের বইমেলা আরম্ভ হয়েছে বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের উল্টোদিকের ময়দানে ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে। চলবে ৬ মার্চ পর্যন্ত। বইমেলা খোলা থাকবে দুপুর ১টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত। এই মেলার উদ্যোক্তা পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলারস গিল্ড।

মেলা মানেই তো মানুষের মিলন, তা সে যে মেলাই হোক। বইমেলায় যাঁরা আসবেন বই সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহ আছে এটা ধরে নিতেই হবে। সেই রকম বই-প্রেমিকের সংখ্যা কত?

উদ্যোক্তারা জানালেন, ১ লক্ষ ৮০ হাজার তো বটেই।

কেমন করে বুঝলেন?

গতবারের বই মেলার অভিজ্ঞতা থেকে। এবারে সাড়া পেয়েছি প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে। শুধু ভারত নয়, ফ্রান্স, জার্মানী, বিটেন, রাশিয়া, আমেরিকার গ্রন্থসম্ভারও এই মেলায় জায়গা করে নিচ্ছে।

এবারে ১৩০টি স্টল নিয়েছেন বিভিন্ন প্রকাশক। তার মানে প্রত্যেকটি স্টলের সঙ্গে যুক্ত আছেন অন্তত ৬।৭টি প্রকাশন সংস্থা। ১৩০টি স্টলের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলা বইয়ের স্টল ১৫টি, হিন্দি ৩টি, বাকি স্টলগুলিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার বইপত্র থাকছে। সারা পৃথিবীর প্রায় হাজার খানেক প্রকাশন সংস্থা তাঁদের বই পাঠাচ্ছেন এখানকার বিক্রয় সংস্থার মাধ্যমে। মাত্র এক বছরের মধ্যে এই রকম সাড়া পাওয়া যাবে ভাবতে পারা যায়নি।

: সারা ভারতে প্রকাশকরা যে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে আসছেন এর কারণ কি?

: এর প্রধান কারণ ব্যবসায়িক সাফল্য। দ্বিতীয় কারণ সত্যিকারের বই-প্রেমিকদের চোখের সামনে তাঁদের প্রকাশনার বই মেলে ধরা এবং তৃতীয় কারণ আরও বেশি বই পড়ার জন্যে পাঠককে উৎসাহিত করা। গতবারে মেলা থেকে বই বিক্রি হয়েছে ১৫ লক্ষ টাকার। আর বই-প্রেমিকরা প্রচুর উৎসাহ পাচ্ছেন তার কারণ একই চাঁদোয়ার নিচে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ভাষার এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বইপত্র এক সঙ্গে দেখার, পছন্দ করার, কেনার সুযোগ পাচ্ছেন। কমিশনের প্রসঙ্গটাও একেবারে দেবার মত নয়।

: ধর্মমূলক বইয়ের স্টল গতবারের থেকে এবারে বেশি। এর কারণ কি?

: গতবারে ভাল বিক্রি হয়েছে। তাছাড়া প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে তাঁরা বই-মেলাকে বেছে নিয়েছেন। এই সংখ্যক চিন্তাশীল মানুষের একত্র সমাবেশ আর কোথাও ঠিক পাওয়া সম্ভব নয়। কলকাতা বইমেলা প্রকাশকদের মনে সেইরকম আস্থা স্থাপন করতে না পারলে তাঁরা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসতেন না।

: বই মেলায় যাঁরা আসেন তাঁরা সবাই কি বই কেনেন?

: প্রায় সবাই কেনেন, তাঁদের সঙ্গতি অনুসারে। কেউ হাজার টাকার কেনেন আবার কেউ পাঁচ টাকা। মেলা থেকে বেরোনোর সময় প্রত্যেকের হাতে ছোটখাট প্যাকেট থাকেই। গতবারে এনসাইক্লোপিডিয়া প্রচুর বিক্রি হয়েছে।

: কি রকম বিত্তের ক্রেতারা বইমেলায় আসেন?

: খুব সাধারণ [illegible] থেকে শুরু করে বিত্তবানরা সবাই। গাড়ি নিয়ে এসে বই বোঝাই করতেও দেখেছি, আবার স্টল খোলার সময় থেকে রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে বই দেখে দেখে টুকটাক বই কিনে বাড়ি ফিরতেও দেখেছি। গতবারে দুর্গাপুর থেকে এক বয়স্কা মহিলা রাত্রি ৯ নাগাদ স্টল বন্ধ করার সময় এসে হাজির। বললেন, একটু দেখতে দাও বাবা, অনেক দূর থেকে এসেছি।

: তিনি কি বইমেলা দেখতেই এসেছিলেন?

: আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখে তাই মনে হোল।

উদ্যোক্তাদের একজন মুখপাত্র জানালেন, পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সব দেশের মানুষকে টেনে আনে। এ হাওয়ায় কি যাদু রয়েছে বলা মুশকিল, কিন্তু মানুষের সাহিত্য-ক্ষুধা যে দিন দিন বেড়ে চলেছে তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

কিশোর পাঠ্য বই, সোশাল সায়েন্স ও টেকনিক্যাল বইপত্রের বিক্রি গতবারে বেশি

হয়েছিল। ক্রেতাদের মধ্যে মহিলা ও পুরুষ প্রায় সমান সমান ছিলেন। কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যা ছিল বেশি। তারা গল্প ও ড্রইং-এর বই বেশি কিনেছে।

সারা পৃথিবীর মধ্যে কলকাতাকেই বইয়ের বড় বাজার বলা চলে। দিল্লিতে যে আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার থেকেও কলকাতার বইমেলা গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা এই মেলাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। বই-প্রেমিকদের চোখমুখের ভাষা থেকেই অনুমান করা যায় কতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে তারা বইমেলাকে গ্রহণ করেছেন। মন্তব্যগুলি করলেন উদ্যোক্তাদেরই একজন মুখপাত্র।

বইমেলার আয়োজনটা অবশ্য নতুন নয়। ভারত সরকারের একটি সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ন্যাশনাল বুক ফেয়ারের আয়োজন করে থাকেন। ওয়ালর্ড বুক ফেয়ারের আয়োজনও এ'রাই করেন। আঞ্চলিক পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও হয়। দিল্লিতে বার দুয়েক আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হল এ'দেরই উদ্যোগে। মাত্র কয়েক দিন আগে আমেদাবাদে ন্যাশনাল বুক ফেয়ার সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হল এই সংস্থার পরিচালনায়। কিন্তু কলকাতাতে বেসরকারী উদ্যোগে বইমেলার আয়োজনে পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস গিল্ডই সম্ভবত পথিকৃৎ।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, আন্তর্জাতিক বইমেলার স্থান হিসেবে কি কলকাতাকে বেছে নেওয়া যায় না?

বইমেলার উদ্যোক্তারা এবারে প্রচুর স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ছুটির দিন বাদে অন্যান্য যে কোন দিন দুপুর ১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত বিনা প্রবেশমূল্যে বই-মেলা দেখার সুযোগ পাবে।

এ ছাড়া কয়েকটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। 'আগামী দশকের বাংলা প্রকাশন', 'ভারতীয় পুস্তকের রপ্তানী' ও প্রকাশক-মুদ্রক সম্পর্ক' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনাচক্র অনেক সমস্যার সমাধানের সহায়ক হবে।

এক্সপোর্ট প্রোমোসন কাউন্সিল-এর কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠক বসছে কলকাতাতেই। এর থেকেই বোঝা যায় এবারের বইমেলাকে তাঁরা কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

কলকাতা বইমেলার প্রস্তুতি ও মেলা চলাকালীন যাবতীয় খরচপত্র বাবদ গতবারে লোকসান হয়েছিল ৪৭ হাজার টাকা। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য দিয়েছেন দশ হাজার টাকা। এবারেও ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে গিল্ড আবেদন জানিয়েছেন অর্থ সাহায্যের জন্য।

স্বল্পমূল্যে বই বিক্রির ঢালাও ব্যবস্থা হয়েছে মেলায়। আর শেষের তিনদিন তো অভিনব ব্যবস্থা। খুব কম দামে বই এবং বই বাজার। ক্রেতারা কেউই যেন অখুশী হয়ে ফিরে যেতে না পারেন।

দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানীর প্রবীর দাশগুপ্ত বললেন, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল আমি ঘুরেছি কিন্তু কলকাতার মানুষের মত এমন বই পাগল মানুষ কোথাও দেখিনি। আমার মনে হয় বই বিক্রি তেমন কোন সমস্যা নয়। ঠিক ঠিক লোকের কাছে বই পৌঁছাতে পারলে বিক্রি হবেই। বেশ কিছু বই-প্রেমিক আমাদের দেশে আছেন যাঁরা বই পেলেই কেনেন। এই তো গত বছর বই মেলায় 'ছোটদের টিফিন' নামে একটা বই ৮০০।৯০০ কপির মত বিক্রি হয়েছে, অথচ দোকান থেকে বইটির বিক্রি ছিল নগণ্য বললেই চলে।

এখানকার পাঠকদের মিশ্র রুচি লক্ষ্য করেছি। কোন পণ্ডিত মশাই ব্যাকরণ বইও কিনছেন আবার সেই সঙ্গে গল্প-উপন্যাসও কিনছেন। বই কেনার আগে পাঠকরা বাড়ি থেকে ঠিক করে আসেন বলে মনে হয় না। বা যা ঠিক করে আসেন দোকানে এসে হরেক রকম বই দেখে সিদ্ধান্ত বদল করেন। বই-মেলাতেই দেখেছি একই পাঠক বিচিত্র স্বাদের বই কিনছেন।

বইমেলায় সব থেকে যেটা আমরা লাভবান হই তা হোল পারস্পরিক আলাপ-পরিচয়ে। আমরা সবাই ব্যস্ত কারও দোকানে উজিয়ে গিয়ে পাটিপেড়ে গল্প করার মত সময় থাকে না। বই মেলার সুযোগে সকলকে একসঙ্গে পাওয়া যায়।

বইমেলায় বাংলা বইয়ের থেকে ইংরাজি বইয়ের চাহিদা বেশি। প্রায় চারগুণ বলা চলে। এর অন্যতম কারণ ভারত ও বাইরের প্রকাশকদের নানান ধরনের বইয়ের সমাবেশ একসঙ্গে আর কোথাও হওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবাংলার মানুষ নানান অভাব অভিযোগের মধ্যেও বই কেনার নেশাটা হারিয়ে ফেলেন নি।

প্রবীরবাবু প্রচণ্ড উৎসাহী মানুষ।

বইয়ের ব্যবসায় নতুন দিগন্তের সন্ধান পাওয়ার প্রতিও তিনি সদা উৎসুক।

এবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের বই মেলা নিয়ে বলি কয়েকটি কথা।

সম্মেলনের ভাইস প্রেসিডেন্ট অমিয়বাবু বলেছিলেন, সম্মেলনের পক্ষ থেকেই এই স্টলটি আমরা করেছি। মেলা শুরুর দিন থেকে রোজই স্টলে না এসে পারি না।

কেমন একটা নেশায় পেয়ে গেছে। বেলা তিনটে থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কেমনভাবে সময়টা কেটে যায় টের পাই না।

ক্রেতা ছিল বিচিত্র রকমের। সবাই যে বই কেনেন তা না, মন দিয়ে সব রকমের বই উল্টান, খোঁজ খবর নেন। কি কি ধর্মগ্রন্থ নেই তার তালিকা বলে যান। সব থেকে মজার হল ২৫ থেকে ৪০ এজ গ্রুপের লোকজনেরাই ধর্মগ্রন্থ বেশি কিনছেন। বয়স্কদের উৎসাহ সেরকম দেখতে পাইনি।

রামকৃষ্ণ কথামৃত কয়েক হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। এটির চাহিদাই সব থেকে বেশি। এর পরই উপদেশাবলী। বিবেকানন্দের জীবন সাধনার ওপর ক্রেতাদের খুব আগ্রহ। মহিলাদের থেকে পুরুষেরাই বেশী উৎসাহী। কিশোর-কিশোরীদের আগ্রহ এর আগের বছর এতটা দেখা যায়নি। তবে কিশোর কিশোরীদের উপযোগী ধর্ম পুস্তকের এখনও অভাব রয়েছে। আরও বেশি হওয়া দরকার।

প্রতিদিন গড়ে হাজার তিনেক পাঠক সব স্টল ঘুরে ঘুরে বই দেখেন। তার মধ্যে হাজার দুয়েক ক্রেতা। সংখ্যার দিক থেকে কবিতার বই-এর বিক্রি বেশী। তারপর উপন্যাস গল্প। রচনাবলী ও কাব্য সংগ্রহ কেনার প্রবণতা পাঠকদের খুবই।

পাঠকের প্রতি

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় ধারাবাহিক রচনা নিয়মিত বিভাগ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর চাহিদা প্রচুর। কিন্তু অনেক ক্রেতাই অভিযোগ করেছেন দামের দিক থেকে। দামটা একটু কম হলে আরও বেশী পাঠক সংগ্রহ করতে পারতেন। বই-এর দাম প্রতি সংস্করণে অত্যধিক বেড়ে যাচ্ছে বলে বেশ কিছু ক্রেতা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

মেলার অন্যান্য দোকান খোলার আগেই অনেকে বই মেলায় ঢুকে পড়ছেন। প্রত্যেকটি দোকানেই বেশ কিছু সময় খরচ করেছেন। এবং কিছু না কিছু বই কিনেছেন। কয়েকজন লেখকের বই-এর চাহিদা প্রচুর আবার কেউ কেউ সম্পূর্ণ অখ্যাত লেখকের বই-এর প্রতি বেশি আগ্রহ দেখান।

বিশ্ববাণীর ব্রজকিশোর মণ্ডল প্রচণ্ড উৎসাহ পেয়েছেন বই মেলায় অংশ গ্রহণ করতে পেরে। বললেন, ক্রেতাদের এখন আর তেমন বোঝাতে হয় না। বই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েই তাঁরা স্টলে আসেন। বই-প্রেমিকদের আগ্রহ দেখে প্রচুর উৎসাহ পাচ্ছি। ভাল বই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারার আনন্দে অন্য কাজ-কর্মের কথা ভুলে যাই।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য।

শুক্রবার, ২৭ ফাল্গুন, ১৩৮৩

Friday 11th March, 1977

১৬ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা

সম্পাদকীয়	৪	
সাহিত্য : বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধি ও জীবন	৫	বৈকুণ্ঠ পাঠক
তারাপদ রায়ের কবিতা	৬	
কবি পরিচিতি	৭	পবিত্র মুখোপাধ্যায়
সমালোচনা	৭	
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১০	একরাম আলি
গ্রেট ম্যাগাজিন	১১	
নতুনের কবিতা	১২	ইন্দ্রনীল বসু, শিখা সামন্ত, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়, রত্নদীপ, ঘাটি
মানুষ : রমেশচন্দ্র মজুমদার	১৩	শান্তিলতা
জাগরণের অবধারা	১৪	প্রভাত চৌধুরী
		পুরন্দর
চিঠিপত্র	১৫	
নির্বাচনে নারী	১৭	শংকর ঘোষ, কাজল মিত্র, প্রসূন মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, অমিতাভ চক্রবর্তী, শান্তিলতা, অশোককুমার চক্রবর্তী

আজকের সূচী

সিজিন	(গল্প)	২৯	সিদ্ধার্থ রায়
পেলাম না	(গল্প)	৩৩	আশিস ঘোষ
অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ			
ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন		৩৫	প্রণতা দে
প্রথম মেয়েরকারী মেডিকেল স্কুল		৪১	অমলকুমার চক্রবর্তী
আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী		৪৬	সুধাংশুকুমার রায়
কৃষি : পাঠশালার কলম বেণী		৫০	সুভাষ রায়চৌধুরী
এই কলকাতা		৫১	
আগনগন্ধা	(উপন্যাস)	৫৫	দীপালী দত্ত রায়
পার্সিপোলিসের পথে		৫৮	সবিতা ঘোষ
লক্ষ্য মূল থেকে পড়া		৬০	অজয় বসু
খেলাধুলা		৬১	দর্শক
হিট ছবির কমতি		৬২	ওয়াকিবহাল
নাটক : মেয়েদের চোখে		৬৩	মনুকুমার ঘোষ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সুবোধ দাশগুপ্ত

গত সংখ্যার প্রচ্ছদ
এঁকেছিলেন গৌতম রায়

আগামী সংখ্যায়

গল্প লিখছেন

সুধাংশু ঘোষ
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রাম বসুর কবিতা

ভোট সাহিত্য
অমিতাভ চক্রবর্তী

এবং
নারী : নির্বাচনী খতিয়ান

সুধাংশুকুমার রায়ের প্রবন্ধ
মহেঞ্জোদাড়ো দুর্গের
নিচের 'বকচত্বর'

খোজা কাহিনী
নারায়ণ দত্ত

সুদীর্ঘ প্রচ্ছদ কাহিনী

আমাদের নদী

লিখেছেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

পথের সমস্যা, এবং সমাধানের পথ

পথের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে যুগে বলেছিলেন বন্ধনহীন গ্রন্থির কথা, তারপর থেকে কোটি কোটি কিউসেক জল গঙ্গা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেছে। একালের পথ, বিশেষ করে কলকাতা শহরে, একেবারেই বন্ধনহীন নয়, বরং আগাগোড়াই গ্রন্থিবহুল।

সমাধানের চেষ্টাও যে কম হয়েছে তা নয়। কিন্তু সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে, সমস্যাটির মতো তাকে নিরাময় করে তোলার প্রয়াসও প্রায় ক্রমিক।

বেশ কয়েকটি নতুন ব্রীজ তৈরি করা হয়েছে, রাস্তাও চওড়া করা হয়েছে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে, এবং স্ট্র্যান্ড রোডের দুরপনেয় জ্যামকে ডিঙিয়ে যাবার জন্যে উড়াল ব্রীজও অবারিত হয়েছে এখন। কিন্তু সকলেই জানেন, এগুলি অত্যন্ত জরুরী কাজ হলেও সমস্যাটির ব্যাপকতার তুলনায় এইসব সুকৃতির ফিরিস্তি যৎকিঞ্চিৎ।

কলকাতার যানবাহন ও পথচারীর চাপ যে অঞ্চলে সব থেকে বেশি, সেটা হল আপিসপাড়া ও শহরের মধ্যাঞ্চল। এই এলাকাটিতে কোনো বিশেষ বিন্দু থেকে অন্য গন্তব্যে যেতে কতটা সময় লাগবে সেটা কেউই আন্দাজ করতে পারেন না। কারণ যে-কোনো জায়গা থেকেই প্রায় ভুইফোঁড়ের মতো জ্যাম উঠে এসে নাজেহাল করে দিতে পারে। উৎপত্তির হেতু খুঁজতে গিয়ে কখনো ট্র্যাফিক আলোর বিকলতা কখনো ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিটির সাময়িক অমনোযোগিতা এবং অনেক সময়েই বাস্তবাগীশ ও আনাড়ি ড্রাইভারের পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় বিপরীত দিকের যানবাহনের পথরোধ করা—অনেক কারণই আবিষ্কার করা যায়। হয়তো মধ্য কলকাতার রাস্তাঘাটের সংকীর্ণতা এবং সেই অনুপাতে ক্রমাগত লোকসমাগম ও যানবাহন বৃদ্ধিও অন্য কারণ। তারপর ফুটপাতগুলি হকারদের খোলাবাজারে পরিণত হওয়ায় পথচারীরা রাস্তায় নেমে পড়েন, এও কম বিপত্তির কারণ ঘটায় না।

ফলে এই বিচিত্র এবং বিমিশ্র সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন। বিশেষ করে এ-ব্যাপারে কলকাতার নাগরিকরাও যখন খুবই উদাসীন।

দৃষ্টান্ত হাতের কাছেই পাওয়া যাবে।

শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে কর্মব্যস্ত শীর্ষসময়টিতে প্রতিঘণ্টায় ৭৬,০০০ হাজার ট্রেনযাত্রী রাস্তা ব্যবহার করেন, এবং ঐ সময়ে ঘণ্টায় রাস্তা দিয়ে ২০০০ খানা গাড়ি যাতায়াত করে। এখানে ২-১৫ কোটি টাকা খরচ করে উড়াল পথ তৈরির পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় ১০০ জন স্টল-মালিক এবং কয়েক হাজার ফুটপাতের দোকানী জায়গা ছাড়তে নারাজ। এবং দমদমে নতুন দোকানঘরের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও তাঁরা অনড়, অটল। ফলে উড়াল পথের কাজও মাটি থেকে এক ইঞ্চি ওপরেও উঠতে পারেনি।

সমস্যা তো জটিলই, কিন্তু নাগরিকরাও যে কেন তাকে জটিলতর করে তোলেন, এ এক দুর্বোধ্য রহস্য।

বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধি ও জীবন

একজন রিক্সাওয়ালা অনেক বুদ্ধি করে ট্র্যাফিকের পাশ কাটিয়ে সওয়ারীকে শেয়ালদার জ্যাম থেকে কিড্ রোয়ের গাড়ি-বারান্দাওয়ালা নির্জন বাড়িতে পৌঁছে দেয়। গা-গতরে ঘেমে এভাবেই সে জীবন চালায়। গাছতলায় ছাতু, গাড়িবারান্দায় ঘুম, দেশে মানিঅর্ডার করে।

দত্তপুকুর রেলস্টেশনের পাশে রেল-পুকুরের পাড়ে এক গর্তে একটি শেয়াল বাস করে। বসতি বেড়ে যাচ্ছে। তাকে রোজ অনেক বুদ্ধি করে খাবার ও নিভৃতির ব্যবস্থা করতে হয়। এই করেই তার জীবন।

গবেষণা ও পড়াশুনো করতে করতে ডঃ এ কে রায় একদিন দেখলেন—সীতা ও হেলেনের মধ্যে মিল রয়েছে। একজনের জন্যে লঙ্কা, অন্যজনের জন্য ট্রয়ের দফা রফা। এ-বিষয়ে লেকচার দিয়ে, পেপার-সেট করে, খাতা দেখে ও প্রবন্ধ লিখে তিনি মাসমাইনে ও এক্সট্রা টাকা পান। তাই দিয়ে তিনি জীবনধারণ করেন। বাড়িভাড়া, রেশন, ইলেকট্রিক বিল চলে।

নোবেল, জ্ঞানপীঠ, আকাদেমি, রবীন্দ্র পুরস্কার ও বড় প্রকাশক আজও হরি-জীবন দস্তিদারের সন্ধান পায়নি। তিরিশ বছর ধরে লেখার পর দস্তিদারের ১৮১ জন পাঠক। এক বছরে একটা এডিশন হয় তাঁর বইয়ের। রোজ ১১ পৃষ্ঠা করে জমা দিলে তবে টাকা পান। আটপাতা লেখার পর দেখলেন—তাঁর বাড়ির জানলার নিচেই চারটে পাখি রেশনের শুকোতে দেওয়া ভিজে চাল খুঁটে খেতে এসেছে। তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে হরিজীবনবাবু লেখার দামী সময়টা পার করে দিলেন। বিকেলবেলায় পাবলিশারকে ম্যানাসক্রিপ্ট দিতে গিয়ে ধাতানি খেলেন। মন খারাপ করে ফেরার পথে ছাত্রজীবনের কলেজের গেট দেখে মনে পড়ল—ওখানে দাঁড়িয়ে তিনি পিকেটিং করেছেন। এখানেই তাঁর থার্ড ইয়ারের মনীষার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

বিকেল পড়ে আসছিল। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছিলেন হরিজীবন। বুঝতে পারছিলেন—ফেলে-আসা জীবনে আর ফিরে যাবার উপায় নেই। টাকা হলে অনেক খাওয়া যায়, বেড়ানো যায়, কেনা যায়। কিন্তু হারানো দিন কোন মনোহারী দোকানেই কিনতে পাওয়া যায় না।

এটা বুঝতে পেরে একটা গল্প হরি-জীবনের মাথায় এল। খুব কিছু নতুন চিন্তা নয়। কিন্তু গল্পের মোড়কে নতুন করে পরিবেশন করা যায়। সেই গল্পটা লিখে হরিজীবন টাকা পেলেন। অনুবাদ হল। আবার পেলেন। ছবি হল। আবার পেলেন। ওই নামের গল্প-সংকলন বেরুলো। আবার পেলেন। এডিসন হল। তিনটে। হরিজীবন আবার তিনবার টাকা পেলেন।

হরিজীবনের বউ রাধা দস্তিদার সাশ্রয় করে সংসার চালান। তিনি সব টাকা একত্র করে একটি ফ্ল্যাট কিনলেন। আত্মীয়রা বলল, দেখেছো—হরিজীবন লিখে বড়লোক হয়েছে।

শেয়াল, রিকসাওয়ালা, অধ্যাপকের মতই হরিজীবন বুদ্ধির জোরে জীবনযাপন করছেন? অবস্থা ফেরাচ্ছেন? না, হরি-জীবনের বুদ্ধি নাকি তিনজনের বুদ্ধির

চেয়ে একটু অন্য রকমের? যাকে আমরা বলে থাকি বোধি? যা কিনা অন্য বুদ্ধি-গুলোর খোসা ছাড়িয়ে একেবারে জীবনের বীজে চলে যায়?

শেয়ালের বুদ্ধি ধূর্ততার কাছাকাছি।

রিকসাওয়ালার বুদ্ধি গতরের সঙ্গে যুক্ত।

অধ্যাপকের বুদ্ধি চর্চার বিষয়।

কিন্তু লেখকের বুদ্ধি জীবনের বীজের দিকের যাত্রী বলেই সম্ভবত তা ভিন্ন—যাকে প্রায় বোধি বলা যায়।

অথচ চারজনই বুদ্ধি দিয়ে জীবন চালাচ্ছে।

এত কথা মনে পড়ল একটি কারণে। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশের গোলমালের দিনগুলিতে কলকাতায় ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত কিছু গুণী-জনের সই-করা একটি বিবৃতি কাগজে বেরিয়েছিল। তাতে বৈকুণ্ঠের সই ছিল। বৈকুণ্ঠের একসহকর্মী প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমরা সবাই ইয়া-হিয়ার বিরুদ্ধে। রাস্তার মুটে থেকে লোক-সভার সদস্য পর্যন্ত। তাহলে ওই বিবৃতিতে এসপ্ল্যানেডের একজন রিকসাওয়ালার সই থাকবে না কেন?

সেদিন কোন জবাব খুঁজে পাইনি।

এতকথা লিখেও মনে হচ্ছে না—সত্যিই জবাব খুঁজে পেয়েছি কি না।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

পত্র-পত্রিকা

ক্রীড়া-আনন্দ। প্রথম বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা।
সম্পাদক মানিক ঘোষাল। দাম ষাট পয়সা
৩২।৯ মতিলাল মল্লিক লেন। কলকাতা ৩৫।

বাংলায় খেলাধুলোর ভালো কাগজের একটা দীর্ঘকালীন অভাব সম্ভবত এবার মেটানো সম্ভব হবে। অন্তত 'ক্রীড়া-আনন্দে'র চেহারায় আর চরিত্রে সে প্রতিশ্রুতি আছে। প্রথম বছরের আট নম্বর সংখ্যাটি হাতে নিতেই কিছু ভালো লেখায় চোখ পড়ল। 'ডেইলি মেল'-এর ক্রীড়া সাংবাদিক মনে করেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের ভয় পেস বলে। সাংবাদিক আলেকস ব্যানিস্টার তাঁর এ লেখায় আরো কিছু উজ্জ্বল কথা বলেছেন। যেমন, ভালো বলকে থামাবার দক্ষতা না থাকলে মুস্তাক আলী, অমরনাথ এবং পুরোনো বড় বড় খেলোয়াড়দের মতন আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার সুযোগ কম। কিংবা ভবিষ্যতে প্রশাসনিক নীতি এমন করতে হবে যাতে পেস বোলারকে উৎসাহ দেওয়া হয় ও ঠিক সমতা রেখে পিচ তৈরী করা যায়। আমি অনুভব করি তখন পর্যন্ত ভারতকে জোর বলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। 'নতুন মুখ চাই, নতুন মুখ' শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটিও ভালো। 'খেলার খবর খবরে লেখা' বিভাগটিও ভালো লাগল। 'ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম পুরুষ' কমল গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক লেখাটি ক্রীড়ারসিক পাঠক-মাত্রেরই নজর টানবে। কাগজটির সামগ্রিক চেহারায় একটা সুরুচির ছাপ লক্ষ্য করা গেল।

মাঝি। সপ্তম বর্ষ। দ্বাদশ সংকলন
সম্পাদক প্রশান্ত রায়। দাম তিন টাকা
২৮বি সিমলা স্ট্রীট। কলকাতা-৬

শুভপ্রসন্নের আঁকা সুন্দর মলাটের ভেতর 'মাঝি' পত্রিকার চলতি সংখ্যাটি বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধ উপহার দিয়েছে। বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা যায় বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'পীর গোরাচাঁদ মুস্কিল আসান'। কবিতা সংক্রান্ত একটি প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে লেখা সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কবিতা, রহস্য এবং' প্রবন্ধটি। ছন্দ সংক্রান্ত আলোচনা 'ছন্দের হরিণ' সিরিয়স পাঠকদের ভালো লাগবে। রবীন্দ্রযুগের বিশিষ্ট কবি সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পর্কে হারাধন দত্তের লেখাটিও যথেষ্ট মূল্যবান।

'গুচ্ছ কবিতা' এবং 'নির্বাচিত কবিতা'র মধ্যে অনেকগুলি ভালো কবিতা দেখা গেল। বিশেষ করে একরাম আলী, সুনীল মুখোপাধ্যায়, প্রণব মাইতি, মলয় সিংহ, কমল চক্রবর্তী, পার্থ-প্রতিম কাঞ্জিলালের কবিতা ভালো লাগল। **নির্বাণবন্ধুর নিরুপায়**

তারাপদ রায়ের কবিতা

সব বন্ধ

জানলা-দরজা সব বন্ধ,
কেউ থাকে না এই বাড়িতে,
এই বাড়িতে একটা বড়ো তালা থাকে।

একটা বড়ো তালায় চাবি এই বাড়ির,
সেই চাবিটা অনেক দূরে,
কোমর থেকে একটু নিচে রুপোর রিং-এ
সেই চাবিটা অনেক দূরে অন্য পাড়ায়;
কিংবা কার হিপ্ পকেটে
চলতে ফিরতে ট্রামে-বাসে হাট-বাজারে
হঠাৎ কবে হারিয়ে গেছে,
কেউ ফেরে না এই বাড়িতে।

এই বাড়িটা আমার নয়
আমরা কিন্তু বাড়িতে থাকি
আমরা কিন্তু বাড়িতে ফিরি
আমার বাড়ির তালা আছে, চাবিও আছে
দরজা খুলি, বন্ধ করি।

মধ্যে মধ্যে বাইরে যাই, যেতেই হয়,
সবাই যাই, তালা দিয়েই বাইরে যাই
শুধু একটা কুকুর-ছানা তালার নিচে বসে থাকে।

সর্বনাশ

এ সব দুঃখের সর্বনাশ করে গেছেন তিনি।
গ্রেট্ ম্যান্ ছিলেন,
যেদিন চাকরি থেকে বিদায় নিলেন
ছাদে উঠে সারারাত ঘুড়ি ওড়ালেন
আশেপাশের বাড়ির লোকেরা বলে
শেষ রাতের দিকে ঘুড়ি বা সুতো কিছুই ছিলো না,
আকাশে হাওয়াও ছিলো না
তবু অক্লান্তভাবে শূন্য লাটাইয়ে
কি একটা অদৃশ্য চৌকো জিনিস,
কি একটা অজানা তোকাটা,
সবাই দেখেছে এবং শুনেছে
তার কোনো তুলনা নেই।

তাঁর স্ত্রী যখন মারা যাচ্ছেন,
দৌড়ে ডাকঘরে গিয়ে
আত্মীয়স্বজন সবাইকে টেলিগ্রাম করলেন,
ব্যাড নিউজ, খারাপ খবর এদিকে এসো না।

এই রকম সব আশ্চর্য ইতিহাস তাঁর
যে যেরকম জানে সেই রকম বলে
এতে তাঁর কিছু এসে যায় না।
এখন তাঁর নিজেরই খারাপ খবর,
পরশু দিন এক গেলাস ওলকচুর কাঁচা রস খেয়ে
কিছুতেই হেঁচকি থামছে না, এখন খবর খুব খারাপ।।

হয়তো সেই কুকুর-ছানাই
কুকুর-ছানাই হয়তো কারণ,
কিংবা অন্য কারণ আছে
অনেক বড়ো কোনো কারণ
যার অনেক মানে আছে এবং কোনো মানেই নেই।
বাইরে যাই, ফিরেও আসি
তালার নিচে নরম নীল ঠান্ডা একটা কুকুর-ছানা
চমৎকার জেগে থাকে।।

বিপদ

একবার বাঁয়ের দিকে তাকাও,
একবার ডাইনের দিকে তাকাও।
তারপর আর দরকার নেই
যতদিন পারো চোখ বন্ধ করে থাকো
চোখ খুললেই বিপদ।

তারাপদ রায়

জন্ম : ১৯৩৬ [illegible]

চাকুরীজীবী [illegible]

একেবারেই আলাদা, সমকালীন সতীর্থদের কবিতার পরিমণ্ডল থেকে বিপরীত মেরুতে নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে কবিতা লেখেন তারাপদ রায়। তারাপদ রায় বলতেই পাঠকের চোখে বাকপটু, পরিহাসমুখর সরল ও আন্তরিক একটি ছবি ফুটে ওঠে; এ যেমন তাঁর নিজের চরিত্রের পোশাকী দিক, তেমনি কবিতারও। তারাপদ রায়ের ব্যক্তি-চরিত্র ও কবিতার মধ্যে দূরত্ব সামান্যই। আপাতদৃষ্টিতে যে সহজ, স্মার্ট, ব্যঙ্গনিপুণ চরিত্র তাঁর কবিতাকে স্বতন্ত্র চরিত্রে স্থাপন করে, তা নেহাতই বাইরের দিক; অনুসন্ধানে অন্তঃশীলা বিষণ্ণ অনুভূতিলোকের স্রোত-প্রতিম দৃশ্য মনকে ভারি করে তোলে। 'তোমারি প্রতিমা' সম্ভবত রূপসী বাংলার পর বাংলাভাষায় বাংলাদেশের অন্তর্গত স্বরূপ উপলব্ধির ও বর্ণনার কবিতা। এক অর্থে অসামান্য। তবু, সেই অধিকৃত পথে তিনি না পদচারণা করে যেছে নিলেন ব্যঙ্গ, পরিহাস, কৌতুকের আপাতছদ্ম-আড়াল; হয়ত এমন সব অভিজ্ঞতার কথা বলতে চান যা প্রচলিত পথে বলা যায় না। তাই এই কবিকে ভুল বোঝার অবকাশ আছে, বোঝেনও অনেকে, কিন্তু তাকে বুঝতে হলে আন্তরিক অনুসন্ধান চাই। তারাপদ রায়ের কবিতা একমাত্রিক বিচারে বোঝা কঠিন।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

দুই বৃন্তচ্যুত যুবতী নিয়ে দু'টি উপন্যাস লিখেছেন সমরেশ \ প্রফুল্ল

সমালোচনা

সমরেশ বসু

প্রফুল্ল রায়

দুজনেই বৃন্তচ্যুত। যুবতী বয়েসেই ঝরে পড়েছে। একজন,—প্রফুল্ল রায়ের 'নিজেই নায়ক' উপন্যাসের শমিতা—যদি বা জীবনের কূলে পৌঁছল, মল্লিকা পারল না। মল্লিকা সমরেশ বসুর উপন্যাস 'বারো-বিলাসিনী'র নায়িকা। শমিতার প্রসঙ্গে পরে আসছি। আগে মল্লিকার কথাই বলি। মল্লিকার কোন আশাই ছিল না। কিংবা আশার ছলনা মাত্র দেখেছিল সে। তার বাস্তববোধ ছিল। মল্লিকা জেনে গিয়েছিল যেখানে ঝরে পড়েছে সেই কাদায় মাখামাখি হয়েই সেখানে সে হেজে মজে যাবে। সে সেই নিয়তিই মেনে নিয়েছিল। তবু অমলের ব্যাচেলার্স কোয়ার্টার, তার পরিপাটি বাথরুম, সুগন্ধ সাবান, দামী পাউডার, স্নানের শাওয়ার দেখে—সব শেষে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আপাদ-মস্তক দেখতে দেখতে মুহূর্তের জন্যে বড় বেশী সাধ হয়েছিল তার ঘরের বউ হতে। অমলের বউ হতে। কিন্তু সে অলীক চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে দেরি করেনি দ্বিধা করেনি মল্লিকা তৎক্ষণাৎ জাত বেশ্যার স্বভাবটাই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করতে পেরেছিল মল্লিকা। সর্বাঙ্গ নগ্ন করে অমলের ভোগের জন্যে নিজেকে বিছানায় পেতে দিয়েছিল জাত ব্যবসায়ীর মতন [illegible] অজান্তেই বুঝি প্রার্থনা করে বসেছিল যদি মজুর কল্ল ত রোজ আসব। [illegible] নিতে, সোব এই. মস্ত [illegible]। অমলের জিজ্ঞাসার উত্তরে [illegible] এই নকলবধূটিকে কোথায় [illegible] যাবে তাও বলে দিয়েছিল। [illegible] এক জায়গায় [illegible]

পরের দিন মোহাচ্ছন্ন অমল যখন তাকে খুঁজে পেল সে তাকে চিনতেই চায়নি শেষে দ্বিদি বা তিনশ টাকার শর্তে একঘণ্টার জন্যে সঙ্গ দিতে রাজি হল। এবং শুধু সঙ্গই [illegible] নিজ এবং তাকেও নিয়ে এল তার যথার্থ ঠিকানায়। সেটা মদ জুয়ার আড্ডাই শুধু নয়, ঘরে ঘরে তার মেয়েদেরও ব্যবসা। এবং এই সবটাই সেই বাঘ সদৃশ নিষ্ঠুর পুরুষ জিতেন মিত্তিরের সম্পত্তি— টাকা রোজগার করে নিয়ে না এলে যে মল্লিকার শরীর বেত মেরে ফাটিয়ে দেয় রক্তাক্ত করে।

মল্লিকা সেই নির্মম মারের দাগ দেখিয়েছিল অমলকে। অমলকে মল্লিকা ভালবাসতে চেয়েছিল—তাকে রান্না করে খাওয়াতে, তার কাছে সারা জীবন থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু পদস্খলিতার সাধ পূর্ণ হয় না। জিতেন মিত্তির নিজে হাতে তাকে অমলের হাতে তুলে দিতে এসেও পারল না। কেননা ততক্ষণে দুই পুরুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সংকট দেখা দিয়েছে—অমলের বিশ্বাস মল্লিকা জিতেন মিত্তিরকেই ভালবাসে। তার হাতে নির্মম মার খেয়েও সে সুখ পায়। আবার জিতেন মিত্তিরের বিশ্বাস অমলকেই মল্লিকা ভালবেসে ফেলেছে অতএব অমলই তাকে নিক। কিন্তু অমলের সন্দেহ, ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটা দুরভিসন্ধি। মল্লিকা আর জিতেন দুজনে মিলেই তাকে শোষণ করতে চায়। কিছু দিন মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে ও জিতেন মিত্তিরের মারের চোটে মল্লিকা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সে

আর দাঁড়াতে পারছে না এমনই দুর্বল। অসহায় শরণাগত মেয়েটাকে তবু বিমুখ হয়ে যেতে হল। আসলে দেহ যতবারই নগ্ন করুক মানুষ, হৃদয় একবারও অনাবৃত করে দেখাতে পারে না সে। সেই চরম ট্র্যাজিডিতেই তাকে অসুস্থ হতে হয়, শীর্ণ হতে হয় এবং শেষমেশ নিজেকে সমর্পণ করতে হয় নিয়তির হাতে।

এই উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে যদিও কখনই মনে হবে না এই লেখকই লিখেছেন 'বি টি রোডের ধারে' কিংবা 'শ্রীমতী কাফে' তবু পাঠক বুঝতে পারবেন সমরেশবাবুর মুনশিয়ানা কত স্বতঃস্ফূর্ত। কত গভীর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। তিনি যখন কলম ধরেন আপনা থেকে সত্তার অন্তঃস্থল হতে অস্তিত্বের নানা জটিল সমস্যা উঠে এসে স্পর্শ করে পাঠকের বোধকে। তাঁকে অভিভূত করে দেয়।

এ রকম অভিভূত করে দেবার গুণটি প্রফুল্ল রায়েরও আছে। পাঠককে তিনিও অনায়াসে তাঁর দিকে মনোযোগী করতে পারেন। অদ্ভুত এক দ্রুতগতি ভাষায় তিনি কথা বলেন, গল্প বোনেন। এ উপন্যাসে তাঁর কাহিনী-কথন ভঙ্গী চিত্রধর্মী। পাঠককে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে তাঁর নায়ক—'আপনারা আমার সঙ্গে আসুন—দেখবেন এক সময় সামনে অনেকগুলি দরজা খুলে গেছে আর আমি আপনাদের এক দারুণ রহস্যময় ওয়ারলডে পেঁৗছে দিয়েছি।'

সত্যি আমাদের এক রহস্যময় জগতের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন প্রফুল্লবাবু। সে জগৎটা আমাদের এই শ্রেণী সমাজের অন্তরালের জগৎ। সব সময় কালো যবনিকা দিয়ে ঢাকা—আমাদের চোখে তার সবই কালো, যেমন কালো টাকা, কালো বাজার। এখানেই তীব্র আলো ফেলেছেন প্রফুল্লবাবু। উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে নোংরা অন্ধকারের পশারিদের পণ্য ও পশুত্ব। জীবন নিয়ে, মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ইতিবৃত্ত। উপন্যাসের নায়ক রাজীব সরকার এই ছিনিমিনি খেলার বাজার থেকে জাল ফেলে তুলে আনে টাকা। মানে ধনী মানুষের উইক পয়েন্ট নিয়ে রাজীব সরকারের ফলাও বিজনেস। এই ব্যবসা উপলক্ষেই শমিতার সঙ্গে রাজীব সরকারের পরিচয়।

শমিতা প্রফুল্লবাবুর 'নিজেই নায়ক' উপন্যাসের নায়িকা। সমরেশ বসুর বারো-বিলাসিণীর নায়িকা মল্লিকা না হয়েও তারই যন্ত্রণার শরিক এই ধনীর দুহিতা। মল্লিকার বয়সী এই চব্বিশ বছরের যুবতী। গৃহ থেকেও সে অনিকেত। মা-বাবা থাকা সত্ত্বেও তার কেউ নেই। পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ এই সুন্দরী যুবতী তার অভিজাত পরিবেশের মধ্যে থেকে একটা কিছু ধরবার মতন অবলম্বন চেয়ে অবশেষে শূন্যে হাত বাড়ায়। এবং শূন্য যেহেতু কোন অবলম্বনই দেয় না, নিরবলম্ব সে বার বার শুধু শূন্য থেকে শূন্যে ভেসে যায়। ক্লাব থেকে ক্লাবে, হোটেল থেকে হোটেল, বার থেকে বারে আর নৈশ জীবনের উচ্ছৃংখলতার মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতেও হারিয়ে যেতে না পেরে কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। এবং বুঝতে পারে এক পরম শূন্যতার পাকস্থলীর মধ্যে রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে তার অবশ্যম্ভাবী অপচয়। জেনেই সে সেদিকেই অনন্যোপায়ের বেপরোয়া বেগে এগোতে থাকে। এগোতেই থাকত যদি না রাজীব সরকারের সঙ্গে তার দেখা হত। মা মনোবীণা সান্যালই তাকে ডেকে এনেছিল। মনোবীণা শমিতার বাবাকে ত্যাগ করে বিয়ে করেছিল শমিতার পিতৃ বন্ধু অরবিন্দ সান্যালকে। আর এনজিনিয়ার অরবিন্দ সান্যাল মনোবীণার রূপকে মূলধন করে ফেঁপেফুলে উঠেছিল এনজিনিয়ারিং ব্যবসায়। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মনোবীণাকে হারাতে হয়েছিল তার উচ্চ শিক্ষিত পবিত্র চরিত্র স্বামী এবং সুন্দর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী কন্যাকে। মেয়েকে নিজের হেফাজতে রেখেও তার দিকে নজর রাখতে পারেনি বেপরোয়া জীবনবিলাসিণী মনোবীণা। যখন চোখ পড়ল ইট ওয়াজ টু লেট। তবু শেষ চেষ্টা করতে রাজীব সরকারের 'পারসোনাল' ডিপার্টমেন্টের হেলপ চায়। রাজীব সরকার অ্যাডভান্স নিয়েই সর্বত্র কেটে পড়ে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটল না। শমিতার প্রেমে পড়ল রাজীব? জানি না। তবে বিজনেসে ডিজঅনেস্ট হলেও মধ্যবিত্ত সুলভ সেকস মোরালিটি তার প্রখর। ফলে শমিতাকে নিয়ে নিভৃতে ঘনিষ্ঠ হলেও তার দেহ স্পর্শ করে না রাজীব। তার সান্নিধ্যের উত্তাপে জর্জর হয়েও তবু সংযত থাকে। বস্তুত রাজীবের এই সংযমের জন্যেই শমিতা ফিরে দাঁড়ায়। রাজীবের হাত ধরে যে পাঁকে সে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিল সেখান থেকে উঠে আসতে পারে। আস্তে আস্তে সুস্থ জীবনের দিকে মোড় নেয় শমিতা। শমিতাকে সুস্থ জীবনের কূলে পেঁৗছে দিতে পারে রাজীব। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারে না—শমিতার ব্যাপারে নীতিভ্রষ্ট হতে না পারার জন্যেই আর একজন নীতিভ্রষ্ট মানুষ তাকে ফাঁসিয়ে দেয়। নিজের লোক ঠকানো ব্যবসার ফাঁদে নিজের পা-ই আটকে যায় তার। ফেঁসে যায় রাজীব। উপন্যাসের উপেক্ষিতা নায়িকা লতিকার চোখের জল সম্বল করে জেলে যায় সে। বইখানি রুদ্ধশ্বাসে পড়বেন পাঠক। বিশ্ববাণী প্রকাশনার বই-এর বৈশিষ্ট্য ভাল কাগজ, নতুন টাইপ, শক্ত বাঁধাই এবং আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ—এ বই দুখানিতে এ সবই বর্তমান।

বাণী-কণ্ঠ ভারতী

বারোবিলাসিণী। সমরেশ বসু। বিশ্ববাণী। কলিকাতা-৯। আট টাকা। নিজেই নায়ক। প্রফুল্ল রায়। বিশ্ববাণী। কলিকাতা-৯। আট টাকা।

কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে

'বিশ্বনারী বর্ষ' এই কিছুদিন আগে শেষ হল। এত কথার ফুলঝুরি ফুটেছিল সেই সময় যে আমরা প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বক্তৃতায় আমাদের কান হয়েছিল ঝালাপালা। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচিচ্চত্র—সর্বত্র ছিল শুধু প্রচার আর প্রচার। সেই তুলনায় কাজের কাজ কিছু হয়েছে কিনা তার হিসেব নেবে কে? তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ' উদ্‌যাপিত হয়েছিল। কিন্তু নারীজাতির সাম্য, অগ্রগতি ও শান্তি-র পথের কাঁটাগুলিকে সযত্নে নির্মূল করার সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা কি যথার্থ অর্থে ফলপ্রসূ হয়েছে? জানি, এ বিষয়ে রাতারাতি কোন বিপ্লব সম্ভব নয়। কিন্তু দেখতে দেখতে সময়ও তো বেশ কিছুটা অতিবাহিত হয়ে গেল। আজ মনে পড়ছে বিশ্বনারী বর্ষে আয়োজিত এক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। খ্যাতনাম্নী এক সমাজসেবিকা পুরুষালি কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'যদি নারীবর্ষে কোনো কাজ না হয় আমরা ডাক দেবো বিশ্বনারী দশকের অথবা বিশ্ব নারী-যুগের। যেভাবেই হোক মা, বোনেদের বাঁচতে হবে। যদি নারী দশক বা নারীযুগে সুফল কিছু না পাই আমরা পুরুষদের 'আন্তর্জাতিক পুরুষ বর্ষ' পালনে বাধ্য করব। সারা বছর ধরে তাঁদের শেখানো হবে ঘর-গেরস্থালির কাজ।' ভদ্রমহিলা মজা করেই কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর উক্তির নিহিতার্থ কি কিছু নেই? নিশ্চয় আছে। আছে বলেই দৈনন্দিন সমস্যাবহুল জীবনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদাকর সামাজিক সাম্যের প্রয়োজনে নারীদের জন্যে নারীবর্ষে কিছু জরুরি কাজের প্রোগ্রামের কথা বলা হয়েছিল্লো, যার অনেকটাই আমরা নিছক মনে রাখতে গিয়েও, ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রায় ভুলে গিয়েছি। সন্দেহ নেই, মর্মান্তিক এই অভিজ্ঞতা, যা কোনো অর্থেই প্রীতিকর নয়।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হঠাৎ রাতারাতি একদিনে নির্ধারিত হয়ে যায়নি। তার পিছনে আছে বহু ঘটনা ও সামাজিক কার্য-কারণের ঘাত-প্রতিঘাত ও টানাপোড়েন, যা নানা দেশ বহুধা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজ পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক একরকম আবার অনুন্নত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশসমূহে আরেক রকম। বহু বিচিত্র, বিপুলা এই পৃথিবীর দেশে দেশে নারী ও পুরুষের সম্পর্কে তাই দেখা যায় বহু বিভিন্নতা। সমস্যার প্রকৃতি ও চরিত্র দেশে দেশে পৃথক। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রতিটি দেশের নারীসমাজের নিজস্ব সমস্যাগুলিকে জানা। সমাজতাত্ত্বিক বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের দ্বারাই সেইসব সমস্যা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। শ্রীমতী অরুণা মুখো-

শাধ্যায়ের উপজীব্য ভারতীয় নারী। তিনি নিজে আইনজীবী। নারীর সমস্যা ও তার প্রতিকারের জন্যে যেসব আইনকানুন এদেশে প্রচলিত আছে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় সেগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি আদালতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সিন্দুক হাতড়ে বেশ কিছু ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। 'বহুদিনের পুঞ্জীভূত অভিশাপ, লজ্জা ও গ্লানি থেকে আমাদের নারীসমাজকে বিশেষ — গ্রাম বাংলার মা বোনেদের বাঁচাতে গেলে সর্বপ্রথম তাঁদের কাছে আইনজগতের পরিচিতি থাকা বিশেষ প্রয়োজন।'—তাঁর এই উক্তির সঙ্গে বাদী ও বিবাদী—দু পক্ষই একমত হবেন। 'পরিবর্তনশীল সমাজে জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পথে' নারীদের আজ আর বাধা দিচ্ছে কে?

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে পণপ্রথা নিরোধ, প্রসূতি কল্যাণ, স্বাস্থ্যসম্মত ভ্রূণনাশ, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয় আইনের যে মানবিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি শুধু যুগোপযোগীই নয়, ভবিষ্যতে নারীসমাজের সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির ক্ষেত্রেও তাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুভূত হবে।

ভূমিকায় লেখিকা অকপটে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সমাজ ও সংসারে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, সমান সম্মান, সমান আদরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে; এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সমস্ত সমাজের মধ্যে; এই কাজে অগ্রণী হতে হবে নারী সমাজকে; নিজেকে এই ব্রতে দীক্ষিত করতে হবে, দীক্ষিত করতে হবে নিজের পরিবারের সকলকে।' তাঁর এই উক্তি আবেগপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে একমত হতে পারবো না বলেই আমার বিশ্বাস। নারীর সমান অধিকার ও মঙ্গলের জন্যে পুরুষের কি কিছুই করার নেই? লেখিকার চিন্তাধারা একপেশে বলেই মনে হল। বিধবা বিবাহের জন্যে বিধবারা কতটুকু অগ্রণী হয়েছিলেন? এ ইতিহাস আজ সকলেরই জানা যে পরম দয়ালু এক মহাপুরুষ এগিয়ে না এলে আমরা শুধু বহু মানুষের কুমীর কান্নাই ঝরতে দেখতাম, ফলে প্রগতির ইতিহাসের সমস্ত পাতাই ঝাপসা হয় যেত, উঠত নকল সমবেদনার ঝড়, বিধবাদের দুঃখ তাতে কিছুমাত্রায় অপনীত হত বলে মনে হয় না।

পদাতিক

নারীর স্বাধিকার: অরুণা মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা পুস্তকালয়। ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২।, দাম: ৬.০০।

আসলে

গ্রেট ম্যাগাজিন

বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন তার নিষ্ঠার পরিচয়ে মহৎ
লিট্‌ল ম্যাগাজিন সত্যি অর্থে
তাই গ্রেট ম্যাগাজিন। আর এর ঘনিষ্ঠ মানুষজন অনিবার্যত
সাহিত্যের সৎ চাষী
হিমঘরের জীয়ানো ফসল না ঘেঁটে এদের দিকে চোখ
খুলুন। এরা অগুন্তি চাষী অবিরাম হাঁটছে
রোদবৃষ্টি সরিয়ে সাহিত্যের হাটে পৌঁছে দিচ্ছে তাজা ফসল

> সারা বছর হিন্দী ছায়াছবির জন্যে যত গান লেখা হয়— সংখ্যায় তার কয়েক লক্ষ গুণ বেশি কবিতা লেখা হয় বাংলায়। এ স্ট্যাটিসটিকস প্রমাণিত করেছে বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিন। এবং স্বভাবতই ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত আমরা।

আমার কবিতা লেখা হল না অন্য কবিকে দিয়ে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় মনে মনে ঠিক করে আমি লিখতে বসি না। বরং আচমকা নাকে লাগা একটা গন্ধ, কি আকাশের এক-টুকরো মেঘ, কি ডাস্টবিনের ধারে একটা কানা বেড়াল দেখে আমি লিখতে বসে যাই—অতঃপর বিষয় বিষয়কে টেনে নিয়ে আসে।

জ্যোতির্ময় নন্দী

*

আধুনিক গল্প মাত্রই হওয়া উচিত ইঙ্গিতধর্মী। ঘটনা এখানে কোন ব্যাপার নয়, গল্পের প্রয়োজন যার ঘটনাকে আনতেই হতে পারে, তবে যে মুহূর্তেই তা ইঙ্গিতের দিকে এগিয়ে যায় সেখানেই তো গল্প সার্থক

শচীন দাস

•

আর দশ বছর যদি বাঁচি, তা হলে হয়তো অন্তত একখানা ভাল বই লিখে যেতে পারব।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দীর্ঘ কবিতায় প্রচলিত সীমান্ত আমি ভেঙে দিয়েছি নিজের অশান্ত আত্মপ্রকাশের তাড়নায়।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁর জীবন ও সাহিত্যের সংগে নিশ্ছেদ জড়িত—অন্য যে-কোনো লেখক শিল্পীর সম্বন্ধে এ উক্তি যে-ভাবে ও যতোখানি সত্য, মানিক প্রসঙ্গে তার চেয়ে বেশী।

আবদুল মান্নান সৈয়দ

সেই সময়েই আমূল দিক পরিবর্তন না করলেও তাঁর অস্তিত্বের অনিবার্যতাকে আর একবার জানিয়ে দিলেন 'মহাকালের রথের ঘোড়া'।

*

'কাগজের বউ' বোধ হয় কোন 'সায়েন্স ফিক্‌সন' হতে পারত। কিংবা বিপুল হাস্যরসের উপন্যাস।

দীপঙ্কর দাস

শচীন দাস আরো অনেক গল্প লিখেছে। শুধু লিখেছে বললে অসত্য ভাষণ হবে। সৃষ্টি করেছে—বেশ কিছু সতেজ গল্প, যা আমাকে আলোড়িত করে।

প্রভাত চৌধুরী

কেউ কেউ বলেন, অমরের লেখায় নাকি ডিটেল এবং ডায়ালেক্টের বাহুল্য বড্ড বেশি, ফলত পাঠক কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করেন। এটা অভিযোগ আকারে এসেছে, কিন্তু আমার মতে, এটাই অমরের বিশেষত্ব এবং নিজস্বতা এবং এখানেই ওর কৃতিত্ব।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

আপনি যা ভাবেন, তা কলমের ডগায় ভাবুন, আনন্দ পাবেন।

শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য

কবিকে: একজন বাঙালী কবি-সমালোচক বলেছেন [illegible]।

[illegible] দাশগুপ্ত

মন কেবল জ্বালা দিলে কাউকে চাই না।

গৌতম দত্ত

শেষে একদিন মরা মকরের মত উলঙ্গ মানুষের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পথ হাঁটে যাব রাস্তায়।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমন্তকাল কোন এক অমোঘ কবিতার কাছে নিয়ে যায় আমাদের।

কালীকৃষ্ণ গুহ

বৃক্ষেরা হয় মত্তমান—নিরক্ষর গ্রামীণের মতো।

অমিতাভ গুপ্ত

ক্ষ্যাপা কুকুরের মত পাগলা-ঘণ্টিটা বেজে উঠুক অনর্গল।

সমরেন্দ্র দাস

দেয়ালির রাতে অলক্ষ্মীকায় পোড়ে অসংখ্য নোট আর খুচরো পয়সা।

দেবাশিস বসু

এখন সরল আছি বড়ো দীর্ঘ। শিশুরা খেলে যে-কারণে, সে কারণে শিশু আছি।

পদ্য গদ্য ও উপন্যাসের

ও কি ফুল? বুনো ফুল? গোলাপী পাপড়িময় চাবুকের দল আমরা কি চলে যাবো? কখনো দেবো না ওকে পরাগ-পরাগ?

মৃদুল দাশগুপ্ত

সজনে গীতি মুখ্যতঃ ও সম্পূর্ণতঃ গান। শুধুমাত্র গাওয়া হবে বলেই এগুলিকে লেখা হয়েছে।

জমিল সৈয়দ

বয়স আর মৃত্যু গভীর সংগোপনে গভীর নিস্তব্ধতার মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের অস্তিত্বের সন্ধান খুঁজে চলে।

[illegible] চৌধুরী

বিষন্ন প্রতিমা

ইন্দ্রনীল দাস

কিসের মধ্যে কেমন হতে থাকে তার প্রকৃতির উপল
নীল মেঘের মতো
সরল কুটিল মেঘ
তার আকৃতি মানুষের আকারে ওইখানে অনাহূতের মতো
পড়ে আছে মনে হয়
অনন্তকাল ধরে লোকাতীত শূন্যের প্রকৃতির মাথার উপরে ঘোরে যেন
আমার ভাঙা সংসারের নির্ভার প্রতিমা
দ্যুতিহীন ছন্দহীন আক্ষেপে বিলাপে

মোতুন মানসে থাকার সময় নিবীর্য এই মানুষের প্রেম
কতোদিন অবজ্ঞার ঘনতার মোহময় অন্ধকার দ্যাখে আর
সেই পৃথিবীর
ছেঁড়া কাঁথার মতো মমতা অদৃষ্টের উঠোনের জ্যোৎস্না হয়ে
জীবনের ছায়ার ভিতর ঝরে ঝরে মিশে থাকার মতো দুরন্ত বাসনার
গর্ভের সেই অনন্তবিহারী কন্যার বিভার সমতুল সৌন্দর্য দীপ্ত
হতে থাকে
যেন বসন্তের স্পর্শের গন্ধের তীব্রতার ঘনময় ছাপ

তার ক্ষমাহীন বিবর্ণ প্রকৃতির সম্পন্ন আলোয়
নিজের বাহুর মধ্যে প্রলয়ধারার মতো স্পর্শহীন নির্ভার প্রতিমা

বিকল্প

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়

যে যেমন
তাকে সেই ভাবে রাখো।
বৃক্ষ
তুমি গাছের মত দাঁড়াও।
কোনো প্রতিশব্দ নয়।
যে মরশুমে যেমন
কবিতায় শস্যের ব্যবহার হ'ক—
বাদাম...আমলকী...

শীত শেষ হয়ে এলো।
দরজায় হিমানীর মত প্রতীক্ষা।
আর বাড়ির পেছনে ফিরে আসা
গৃহস্থ গাভী।
আমার প্রত্যাবর্তন
আমার অপরাহ্নের ভ্রমণ
এমনি সব দৃশ্যের পারম্পর্য হয়ে ওঠে।

দৃশ্যের বদলে
এক বিশুদ্ধ ভ্রমণ ব্যবহৃত হ'ক।

পাথর প্রতিমা

শিখা সামন্ত

একদিন এই হাতে মমতার স্বাদ ছিল,
একদিন এই হাত ছুঁয়েছিল স্বর্গের সিঁড়ি
একদিন এই হাতে মুখর স্বপ্নের খেলা....
একদিন এই হাত প্রত্যাশায় বিশ্বাসী হয়
দীর্ঘ দেওদার বৃক্ষের তলায়
একদিন ঘুমঘোরে হেঁটে গেছি বকুলের বনে আনমনে
খুঁজেছি বকুল দুহাতে
একদিন কান পেতে শুনেছি নিবিড় পাখির ডাক
ডেকে ডেকে চলে গেছে হাঁসপাতি জলের তলায়
মনোময় দুপুরে
তালপাতা ঘেরা ওই একাকী কুটিরে কে ডেকেছে, একদিন,
জানি না
কালো মেঘে প্রতিমূর্তি দেখে চমকে (আমার নাকি)
হেসে উঠেছি
একদিন ছিল সে বুকের পাথারে স্থির বরফে জমাটবদ্ধ
একদিন সাধ করে পাথর প্রতিমা নিয়ে ডুবে যাই
জাতনীর জলে; একদিন

আঁধার বৈদূর্য হোক

র[illegible]ন ঘাটী

আঁধার বৈদূর্য হোক তারপর আঁধারেরে পাবণে ডাকবো—
এখন ডাকি নি বলে, ডাকতে পারলুম না বলে চলে যেও না।
তারপর পার্বণ শেষ হলে তোমাদের নিয়ে যাবো
মাছেদের দেশে, কুটিরে;
সেই হবে আমাদের কুটির, সেখানেই আমরা পেয়ে যাবো খুঁটিনাটি
অনল ও অভিমান, শীত ও শীতলপাটি, মেয়ে ও মরাল-মনীষা!
সেখানে জলে জলে হাল-লাঙল চাষবাস করবে কেউ,
কেউ ছড়াবে বীজ
কেউ বনশ্রী পেরিয়ে ফসল বেচতে যাবে হিমদেশের হাটে
একটি গোলায় তুলবো আমাদের সকলের ধান, ধ্যান ও ধারণার কণা
আর আমি সকলের আগে আগে ছড়িয়ে যাবো আঁধারের ধূলিরেণু
খুদে পিঁপড়ের চরণে জড়িয়ে দেবো আমাদের ভরণপোষণের ভার!
আমি জানি তোমরা জীবনের পরমা পাওনি,
অন্ন ও অভিলাষ মেটেনি তোমাদের
শুধুই ডাঙায় ডাঙায় কাটিয়েছো, জলে নামোনি,
ডুবসাঁতার দাওনি কখনো
তাই তো আঁধার থাকতে থাকতেই এইসব,
এই ছলাকলাহীন জীবনের প্রস্তুতি,
তাই তো সেই মহাজীবনের ব্যাপ্তি কামড়ে ধরবার অভিলাষ আমাদের।
এখন ডাকিনি বলে, ডাকতে পারলুম না বলে তোমরা চলে যেও না
আঁধার বৈদূর্য হোক, এখন সেই কল্যাণ ও মহাজীবনের দিকে আমরা।

মানুষ

আধুনিক কবিতা বুঝি না : রমেশ মজুমদার

শাশ্বত
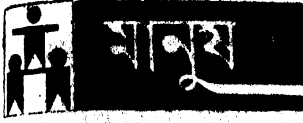
: ওসব ইন্টারভ্যু-টিন্টারভ্যু আমি দোবো না... বলছি তো দোবো না....

—আজ্ঞে, ঠিক আছে।

: আমার সম্পর্কে আমি আর একটা কথাও বলবো না, যত্তোসব ভুলভাল, উল্টোপাল্টা, যা তা লিখবেন, কাগজ পাঠাবেন না।

—আজ্ঞে ঠিক আছে।

: তাহলে বসে আছেন কেন বললাম তো একটা কথাও বলবো না।

—কিন্তু স্যার একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে এসেছিলুম....

: কি বিষয়?

—ওই যে, আপনি একবার বলে-ছিলেন না, সমুদ্র গুপ্তের সময়ে ইংলণ্ডের লোকেরা গাছে বানরের মতো বাস করতো। তা এসব প্রমাণ-ট্রমান আপনি কোথা থেকে পেলেন, যদি একটু গুছিয়ে বলেন। পিঠটা পুরো টান টান ছিল, এবার সেটা একটু বেঁকে সোফায় এসে লাগলো—না একথা তো বলিনি। বলেছি ফোর্থ সেঞ্চুরীর সময় ইংলণ্ডে সভ্যতা বলতে কিছু ছিল না। লোকেরা অসভ্য ছিল, বনাও বলা যেতে পারে। তা বলে গাছে উঠে বাস করতো, একথা বলেছি বলে তো মনে পড়ে না।

—আর ভাণ্ডারকর? কাগজে দেখছি ভাণ্ডারকরকে নিয়ে আপনি চার দিকে এখন আলোচনা করছেন। একটা কথা বলবেন? ঈশ্বরীপ্রসাদ আর ভাণ্ডারকরের সম্পর্কে এ্যাকচুয়ালি আপনার নিজের ধারণাটা কি? লাল রঙের ড্রেসিং-গাউনের হাতের কাফটা মুড়তে মুড়তে এক মিনিট ভেবে নিয়ে ডঃ মজুমদার বললেন—ভাণ্ডারকর মাচ বেটার স্কলার দ্যান ঈশ্বরীপ্রসাদ। ঈশ্বরীপ্রসাদ হলেন গুড রাইটার, বাট্ অরিজিন্যালিটি বলতে যদি কিছু থাকে, তা হল ভাণ্ডার-করের। ওঁর রিয়েলিটিটা বেশী।

যাক গে, পরের কথা ছেড়ে দিন, আমরা একটু ঘরের কথা বলি। এর আগে আমি আরও কয়েকবার আপনার কাছে এসে শুনেছি আপনি বাইরে গেছেন। কোথাও গিয়েছিলেন নাকি?

—বাইরে তো যাই নি, গিয়েছিলাম মেয়ের বাড়ী। নিউ আলিপুরে। শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না।

—শরীরের আর দোষ কি বলুন, বয়স তো কম হল না। এখন কত হবে?

—তা অনেক হলো, অষ্টআশী তো চলছেই।

—অষ্টআশী? তাহলে সুনীতিবাবুর চেয়েও আপনি প্রায় এক বছরের বড়ো?

—তা হবে।

—অসুখের সময়ে কিছু বইটই পড়লেন? এই কবিতা, গল্প, বা উপন্যাস?

: কবিতা? মানে আধুনিক কবিতা? ওসব আমি অনেক পড়ে দেখেছি, অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু এ জিনিষের মানে বুঝি নি, অর্থ বুঝি না। শব্দ, শব্দ, কতগুলো শব্দমাত্র। শুধু এদিক-ওদিক করে সাজিয়ে দেওয়া আছে। তার না আছে বিউটি, না আছে আইডিয়া, না আছে ভাব। আমি এবার আর একটু কাছে ঘেঁসে বললুম—নামকরা কোন আধুনিক কবির কবিতা পড়েছেন?—কেন বিষ্ণু দে। উঃ ওনার বই নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কিস্সু বুঝতে পারি নি। অর্থ থাকলে তো বুঝবো, অর্থ আছে বলে মনে হয় না। তা তিনি পেলেন 'জ্ঞানপীঠ!' পুরস্কার পাবার পর কমিটির অনেক চেনা লোকদের জিজ্ঞেস করলাম—আপনারা বুঝেছেন? তাঁরাও বললেন—না। কমিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট প্রবীণ বাঙ্গালী, তাঁকে ফোন করে বললাম,—কবি হিসেবে যে পুরস্কার দিলেন, মশাই আপনি কিছু বুঝেছেন? তিনি বললেন আমিও এর একবর্ণ বুঝতে পারি নি। তাহলে পুরস্কার দিলেন কেন? —সে আমি বলতে পারব না। —তাহলে একজন আধুনিক কবিকেও কি আপনার ভাল লাগে না? —কারো কারোকে লাগে, যেমন ধরুন জীবনানন্দের লেখা একটু বোঝা যায়। জীবনানন্দ মিস্টিওকার পোয়েট হলে কি হবে, এ এতটা দুর্বোধ্য নয়। কবিতার মধ্যে বেশ ভাব আছে।

—গল্পটল্প পড়ার সময় হয়ে ওঠে?

: হ্যাঁ, তাও পড়ি। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আর ঐ যে একজন ভালো লেখক মারা গেল, কি যেন নাম...বয়স হয়েছে, ঠিক মনে থাকে না। আমি বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে বললুম : বিভূতিভূষণ?

—না।

: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়?

—আরে না-না।

: নরেন মিত্তির, অচিন্ত্য।

—উঁহু।

—চট করে এবার একটা নাম মনে পড়তেই, বললাম—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়? —ইয়েস। তারাশঙ্কর। হি ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট। তবে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মধ্যে কবিতায় রবীন্দ্রনাথ আর উপন্যাসে শরৎবাবু। 'পথের দাবী' তো মাস্টার-পিস। আর ওই উপন্যাসটার যেন কি নাম, যার মধ্যে সতীশ ছিল। বললুম—চরিত্রহীন? হ্যাঁ, বিউটিফুল। রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র দুজনেই হাইক্লাস। তবে শরৎচন্দ্র নিছক ঔপন্যাসিক নন, উনি জীবনের বাস্তব ছবি এঁকেছেন। আর পার্সোনালি আমার শরৎচন্দ্রকে ভাল লাগে।

রমেশ মজুমদার

—রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আপনার কখনো মুখোমুখি আলাপ হয়ে-ছিল? মানে, এক টেবিলে বসে খাওয়া-দাওয়া গপ্পোসপ্পো করা, এই সব।

: বাঃ, তা ছিল না? উনি তো ঢাকায় আমার কোয়ার্টারে প্রায় সাত দিন গেস্ট হিসেবে ছিলেন।

—কেন?

: ওই যে, তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির গেস্ট হয়ে গিয়েছিলেন। —তা নিয়ে এলেন ইউনিভার্সিটি আর অতিথি হলেন আপনার? —তখন তো গেস্টহাউস ছিল না, আমরাই অতিথিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসতাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা দু দলে ছিলেন। এক দলে রথী-বাবু আর প্রতিমা দেবী। আরেক দলে রবীন্দ্রনাথ। ওঁরা দুই দল দুই বাড়িতে ছিলেন। ওখানে কবি কিছু লিখেছিলেন? —নাঃ, ও কদিন বাড়িতে সব সময় ভিড় লেগেই থাকতো। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে ফলমূল, খাবার-দাবার, রান্নাকরা মাছ আসতো। উনি খেতে খুব ভালোবাসতেন। সবচেয়ে—সবচেয়ে প্রিয় খাবার কি ছিল?—ঢাকাই রান্না ওঁর খুউব পছন্দ হয়েছিলো, সবচেয়ে ভালো লাগতো মাছ। কই মাছটা ওঁর খুব মুখে লেগে গিয়েছিল মাঝে মাঝে খেতে খেতে বলতেন তোমাদের বাঙালদেশের লোকেরা মাছটা বেশ ভালো রাঁধতে পারো। আর অন্যদিকে শরৎচন্দ্র একদম খেতে পারতেন না। যা-ই দেওয়া হোক একটু খুঁটিয়ে বাটি সরিয়ে রাখতেন। শরৎবাবুও ইউনিভার্সিটির গেস্ট হয়ে ঢাকায় গিয়ে আমার কোয়ার্টারে ছিলেন। ঢাকায় আপনি নিজের বাড়িতে থাকতেন না? —না, আমি থাকতুম কোয়ার্টারে।

—এখন নতুন কিছু লিখছেন?

: নতুন আর খুব বেশী নয়, পুরনো বইগুলোই রিভাইজড করছি। 'হিস্টি অফ দি এনসিয়েন্ট ল্যাণ্ডস'টা করলাম। কিছুদিন আগে অবশ্য একটা বই শেষ করেছি সেটা 'রেনেসাঁস অফ বেঙ্গল'। তাছাড়া আরেকটা বড় কাজ হয়েছে 'হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচার অফ ইন্ডিয়ান পিপল'-এর ১১।১২ নম্বর ভলুম-এর পর ৭।৮ নম্বর ভলুমটাই বাজারে বেরিয়েছে। এছাড়া পুরনো বক্তৃতা, লেখাগুলোকে ছাপাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।
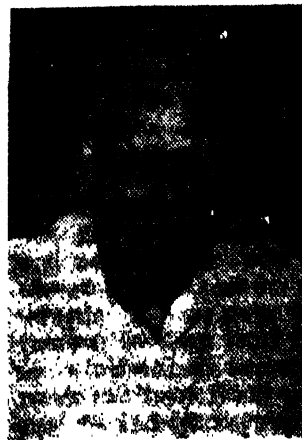
জাগরণের জয় যাত্রা

'আমি জাগরণের গান গাইব', ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মশাই যা বড় ফণিবাবু বিশ্বাস করতেন, 'যাত্রা মানে গতি, জাগরণ। শিল্পের কোন অঙ্গ যা পারে না, যাত্রা একা তা করতে পারে। যে-জাতির যাত্রা নেই সে অথর্ব।' বড় ফণিবাবুর এই সংকল্প এবং বিশ্বাস আজ প্রতিষ্ঠিত।

১৯৬১-র এক উজ্জ্বল সকালে কলকাতাবাসীর ঘুম ভেঙেছিল। তার আগে সুবেশী সুকেশী নাগরিকদের কাছে অচ্ছুত ছিল যাত্রাওয়ালারা।

সেদিন শোভাবাজার রাজবাড়িতে আসর বসেছিল। টিকিট বিক্রী করে যাত্রা-উৎসব। শহর কলকাতাতেই। অনেকেই ভাবতে পারেননি সেদিন প্রতিক্রিয়া কিরকম হবে। শুনলে অবাক হতে হয় প্রতিদিন পুরো টিকিট বিক্রি হতে সময় লাগতো মাত্র ছ-সাত ঘন্টা। সেদিনের এই ঘটনা যাত্রা সম্পর্কে প্রচলিত বহু ধারণাকেই বদলে দিয়েছিল। যাত্রা মানেই ঘুরে ঘুরে সখীদের নাচ নয়, সারারাতের ঘুম তাড়ানো কোনো খেলা নয়। যাত্রা মানে গতি, জাগরণের গান।

প্রথম দিন ছিল নিউ গণেশ অপেরার পালা 'পরিচয়'। সেই উৎসবে নট্ট কোম্পানী 'সোহার জাল', নবরঞ্জনের 'বর্গী এলো দেশে' নিউ রয়েলের 'কবি চন্দ্রাবতী' প্রভৃতির সঙ্গে সত্যাম্বরের 'সোনাই দীঘি' প্রমাণ করে দিয়েছিল পালাগানে নাট্যগুণই প্রধান। 'সোনাই দীঘি' পালার ভাবনা কাজি বা সোনাই অর্থাৎ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় বা জ্যোৎস্না দত্ত রাতারাতি কলকাতার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছিলেন।

১৯৬১ থেকে কয়েক বছর এগিয়ে আসা যাক। রথ-এর দিন বহু লোক পুরী ছোটেন রথের দড়ি ছুঁয়ে আসতে। জগন্নাথ দেবের রথ আর কোম্পানী বাগানের রথ এক নয়। জগন্নাথ দেবের রথের দড়ি ছুঁলে নাকি পুণ্য হয়। এতে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যে কেউ যেতে পারেন পুণ্য সঞ্চয়ের বাসনায়। কিন্তু কোম্পানী বাগানের রথের দড়ি কে আগে ছোঁবে তার জন্য এক অলিখিত প্রতিযোগিতা আছে। এবং কোনো রথের দড়ি। এখানে অনেক রথ। অনেক জগন্নাথ দেব। নগদ ১১১ টাকা দিয়ে কলম ছোঁয়াতে হয়। রথের দিনে বুকিং শুরু। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওই দিন ছুটে আসে বহু লোক। অসংখ্য নায়েক পার্টি। নায়েক পার্টিই মফস্বল যাত্রার সংগঠক। এদের সংগঠিত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পালাগানের আসর বসে বিভিন্ন অঞ্চলে। নামীদামী দল বাসে বা গাড়িতে করে ফিরে আসর মাত করে আসেন। যেন অশ্বমেধের ঘোড়া। তিলকে চন্দন, কণ্ঠে শুভ্র বিজয়ীর মালা। কে আগে ঘোড়া ধরবে। জানুয়ারী কোথায় দুরন্ত।

তরুণ অপেরার 'ছুটেলার' রথের দিনেই বায়না হয়েছিল ১৩০ দিনের। স্বপনকুমার যে বছর স্বপন অপেরা খুলেছিলেন তাঁর বায়না হয়েছিল ১৪১ দিন। এবছরে কলকাতা যাত্রা সমাজের 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-র বায়না ছিল ৭৫ দিন। তিনদিনের পালায় কম করেও ছ হাজার টাকা লাভ থাকে সংগঠকদের। মন্দ কি। পরিশ্রমও খুব একটা বেশী নয়। কিছু পোস্টার আর জনাকয়েক বিশ্বাসী কর্মী। টিকিট কেনার লোক প্রস্তুত হয়েই থাকে।

এই প্রস্তুতির গুপ্ত রহস্য কি প্রশ্ন করায় একালের পালাকার এবং নির্দেশক অরুণ রায় জানালেন, যাত্রা যদিও বিনোদন শিল্প তবু মূলত এটা একটা পারিবারিক শিল্পমাধ্যম। অর্থাৎ পরিবারের সকলেই একসঙ্গে উপভোগ করার মতো শিল্প এই যাত্রা। গোপনে বা না জানিয়ে ক্যাবারে কিংবা বালু-ফিল্ম দেখার মতো ব্যাপার নয়। রীতিমতো বুক ফুলিয়ে যাত্রার আসরে ঢোকা যায় এখন পর্যন্ত।

হ্যাঁ বুক ফুলিয়েই। সেই গৌরব আজ প্রতিষ্ঠিত। আর প্রতিষ্ঠিত বলেই 'চৌরঙ্গী' বা 'জীবনমরণ'কে দর্শক বর্জন করতে পেরেছে। যাত্রাকে কলুষিত হতে দেয়নি। 'ক্যাবারে'-র অনুপ্রবেশকে রুখে দিয়েছে প্রথম প্রচেষ্টাতেই। কোম্পানিবাগানের বিনোদনের যে কর্মকান্ড চলছে—তার মূল কথা এখনো 'জাগরণের গান গাইব'—মূল সংকল্প-এর জন্যই এই গৌরব। এই গৌরব দীর্ঘজীবি হোক।

প্রভাত চৌধুরী

কলকাতায় যাত্রাগানের প্রথম পালা অনুষ্ঠান হয় ১৮২২ সালে 'কলঙ্কভঞ্জন' পালাগানের মাধ্যমে। এই পালায় মহিলা শিল্পীরা প্রথম আসরে নেমেছিলেন এবং এদের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত হয়ে উত্তর কলকাতার শোভাবাজারের রামকুমার মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক ১৮২৬ সালে একটি দল করেন পুরুষ ও মহিলা শিল্পী নিয়ে। কলকাতায় যখন এইরকম পালাগান বা গীতাভিনয় চলেছে, বাংলা নাটক কিন্তু তখন মঞ্চে আবির্ভূত হয়নি। কলকাতায় বাংলা নাটক এল ১৮৫০-এর পর কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুপ্রেরণায়।

বাংলাদেশের যাত্রাগানের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮৫০ সালের পর। এই পর্বে যাত্রার গানের পরিবর্তে অভিনয় মুখ্য ভূমিকা লাভ করে। সঙ্গে নাচ ও গান অন্যতম সহ ভূমিকা নেয়। এই পরিবর্তনের কান্ডারী ছিলেন মদন মাস্টার (চন্দননগর) এবং হরিনারায়ণ দাস (সোনাছিয়া)। এই হরিবাবুর যাত্রাদলই পরবর্তী সময়ে মতিলাল রায়ের পরিচালনায় জনপ্রিয় হয় এবং যাত্রার নবরূপায়ণের প্রবর্তকরূপে মতিলাল রায় বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মতিবাবুর যাত্রার জনপ্রিয়তার সময়কাল শুরু হয় ১৮৭০ সাল থেকে এবং প্রথম পালাভিনয় হয়েছিল নবদ্বীপের পরমাতলায়। পালার নাম 'সীতার বনবাস'। মতিবাবুর বিখ্যাত পালা ছিল 'নিমাই সন্ন্যাস' এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি যাত্রাদল নিয়ে সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন।

স্বদেশী যুগে মুকুন্দ দাস দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যাত্রাকেই উপযুক্ত মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং মুকুন্দ দাসের উদাত্ত কণ্ঠের গান ও যাত্রার আসর সে যুগে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

এভাবেই যাত্রা গান বাঙালী সংস্কৃতির বাহক হয়ে দীর্ঘকাল বাংলাদেশের মানুষকে আনন্দ দান করে এসেছে। লীলাগান থেকে ক্রমে সংলাপযুক্ত পালায় রূপান্তরিত হয়ে রামায়ণ, মহাভারত ও ঐতিহাসিক কাহিনীর আশ্রয়ে আধুনিক যাত্রার পদক্ষেপ ঘটে। কিন্তু হঠাৎ করে দেশ বিভক্ত হয়ে যাবার পর এই প্রাচীন মাধ্যমটির আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হয় এবং ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত যাত্রার অস্তিত্ব সঙ্কটের মধ্যে চলতে থাকে। চলমান জীবনের সর্বক্ষেত্রে দারুণ পরিবর্তন আসায় যাত্রা পুরনো আঙ্গিকে মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারছিল না। চিৎপুর পাড়ায় বাংলা দেশের অধিকাংশ যাত্রা দলের প্রায় সর্বনাশ ওঠার উপক্রম হল, কোনরকমে এই ঐতিহ্যসম্পন্ন মাধ্যমটিকে তারা বাঁচিয়ে রাখলেন।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাত্রার আসরে স্পট লাইট ও মাইক্রোফোনের সংযোগ ঘটে এবং উপস্থাপনায় আসে আভিনবত্ব। এই প্রয়াস যে যাত্রাকে জনমনে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, যাত্রার অন্ধকার কেটে গিয়ে চিৎপুর পাড়ায় নব সূর্যোদয়ের উন্মেষ ঘটিয়েছে—আজকের যাত্রার নবযুগারম্ভই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। লীলাগান, কথকতা, নাচ, রামায়ণ, মহাভারত ও ঐতিহাসিক যুগ পেরিয়ে যাত্রা এখন আধুনিক সামাজিক কাহিনীর জগতে প্রবেশ করেছে। আঙ্গিকে ও অভিনয়ে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। যাত্রা এখন গ্রাম গঞ্জের শুধু নয়, শহরেরও বড় আকর্ষণ। চিৎপুর পাড়ায় এখন প্রায় চল্লিশটি উল্লেখযোগ্য যাত্রা দল আছে, এঁদের সঙ্গে যুক্ত আছে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় এক হাজার পরিবার এবং দশ হাজার মানুষের ভবিষ্যৎ। আজকের যাত্রার প্রতিদিনের বায়না দল হিসেবে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা এবং মাসিক খরচা সত্তর হাজার টাকা থেকে লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যায়। দেশের সরকার তাই ১৯৭৩ থেকে প্রতি বছর উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রায় প্রাণ সঞ্চার করেছেন এবং জনজীবনে যাত্রার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সাহিত্যচর্চার সাম্প্রতিক নিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন।

তবে লিটল ম্যাজিনের আর্থিক সমস্যার যে ছবিটি শ্রীদিকপতি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন—তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। উল্লেখযোগ্য তাঁর সেই আবেদনটি—যেখানে তিনি কলকাতার বড় কাগজগুলোর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন লিটল ম্যাগাজিনের লেখকদের ঠাঁই দিতে। যার ফলে প্রতিষ্ঠিত লেখক গড়ার কাজ সর্বত্রই প্রশস্ত হয়ে উঠবে। উৎসাহ পাবেন দূর দূরান্তের মফঃস্বলী ও গ্রামীণ কাগজগুলোর লেখকবৃন্দ। **বিমলকান্তি ভট্টাচার্য, আদরা, পুরুলিয়া।**

(৩)

গত ৪ ফেব্রুয়ারীর অমৃতে প্রকাশিত দিগ্বিজয় দিকপতির লিটিল ম্যাগাজিন : কিছু ঘনিষ্ঠ ভাবনা নিবন্ধটি পড়লাম। এ সম্পর্কে দু'একটি কথা না বলে পারলাম না। প্রথম কথা লিটিল ম্যাগাজিন সাধারণতঃ যা মফঃস্বল শহর থেকে প্রকাশিত হয় তা যতই দুর্বল মানের হোক না কেন, এটা ঠিকই, এ সব পত্রিকা থেকেই আগামী দিনের সাহিত্যিক সৃষ্টি হয়। কাজেই এই পত্রিকাগুলি সম্পর্কে সমালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু নিরুৎসাহিত করা কোন ক্ষেত্রেই ঠিক নয়। দিকপতি মহাশয় তাঁর নিবন্ধে লিখেছেন, 'সম্পাদনা করেন সদ্য গোঁফের রেখা ওঠা উঠতি যুবক থেকে দীর্ঘদিনের পোড় খাওয়া কোন সাহিত্য অনুরাগী।' 'পোড় খাওয়া সাহিত্য অনুরাগী' কথাটি লেখা কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? আবার লিখেছেন, 'পত্রিকার প্রথম দিকের পাতায় সম্পাদকের ছবি অথবা গোষ্ঠীর একজন জাঁদরেলের স্নাতক পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখানোর খবর ফলাও করে ছাপা থাকে'। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, আমি মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার প্রায় সমস্ত লিটিল ম্যাগাজিনগুলি পড়ি। আজ পর্যন্ত কোন পত্রিকাতে সম্পাদকের এ ধরনের অপচেষ্টা চোখে পড়ে নি। জানি না দিকপতি মহাশয় কোন পত্রিকায় এ ধরণের অপপ্রয়াস লক্ষ্য করেছেন? তিনি যখন পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলারও লিটিল ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে লিখেছেন তখন তাঁর উচিত ছিল পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন দুটি পত্রিকার ('ছত্রাক' এবং 'সাহিত্য বিচিত্রা' সম্পর্কে উল্লেখ করা।) দুটি পত্রিকাই এগার বছরের অধিককাল ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে। যদি এই সম্পাদকদের সত্যিই সাহিত্য জগতে পরিচিতি লাভের বাসনা থাকতো তবে হয়ত পত্রিকা দুটি দীর্ঘকাল থাকতে পারত না। একথা স্বীকার্য যে, মেদিনীপুর জেলাকে জরুরি ছাড়া আরও অনেক পত্রিকা আছে যা সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। মাসিক পত্রিকাও আছে। সেগুলির উল্লেখ করলে ভাল হোত। দিগ্বিজয় দিকপতির সর্বশেষ মন্তব্যটিকে সাধুবাদ জানাই। 'যদি কলকাতার বড় কাগজগুলি এঁদের ঠাঁই দেন তবে সত্যিকারের লেখক তৈরীর আনন্দ পাবেন।' একথা ঠিকই লিটল ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে এমন সব লেখা চোখে পড়ে যা সচরাচর বড় কাগজে দেখা যায় না। **সমীরন মজুমদার, মেদিনীপুর।**

কবিতা প্রসঙ্গে

আধুনিক কবিদের নিয়ে 'অমৃত'-এ যে এক সম্পূর্ণ নতুন প্রচেষ্টা চলছে, সত্যিই তাকে অভিনন্দন জানাতে হয়। কবিদের তিনটি করে কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় কবি পরিচিতি। এই ধরণের একটি অভিনব পরিকল্পনার জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ। **মন্মথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা-২৭।**

সাহিত্যের জন্য এক সিকি

অমৃতের পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। অমৃত তার পুরনো চেহারা পাল্টে রীতিমত আমাদের কাগজ হয়ে উঠছে। আমরা অমৃত পড়ছি।

বৈকুণ্ঠ পাঠক সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তাঁর 'সাহিত্যের জন্য এক সিকি' প্রতিবেদনটি নাড়া দেয়। নামে সাহিত্য পত্রিকা হলেও সাহিত্যের জন্য বরাদ্দ মাত্র সিকি ভাগ! কই এভাবে তো ভাবিনি আগে! ইঞ্চি মেপে তার প্রমাণ তো বৈকুণ্ঠ আমাদের হাতে নাতে দেখিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ বৈকুণ্ঠবাবু! আমরা পাঠকরা শুধু লেখা নয় তার সঙ্গে কাজটিও দেখতে চাই। **রূপা বিশ্বাস, কদমতলা, হাওড়া-১।**

নির্বাচনে নারী

প্রতিটি ভোটের পেছনে একটি করে দীর্ঘ লালিত আশ্বাস সঞ্চিত। সেই আশ্বাসই রাষ্ট্রশক্তিকে গতি জোগায়। ১৯৭০ সালে ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন: গণতন্ত্রে জনতাই ক্ষমতার অধিকারী। তাই আমরা ঠিক করেছি যে, আমরা জনতার কাছে যাব—আর নতুন করে জনতার রায় নেব। ১৮ জানুয়ারি—এ বছর প্রধানমন্ত্রী পাঁচ বছর আগে যা বলেছিলেন—সে কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেন, সরকার জনতার কাছ থেকেই ক্ষমতা লাভ করে। লোকসভা আর সরকারের উচিত জনতার কাছে কার্যবিবরণী দেওয়া আর জাতির শক্তি ও কল্যাণ সম্পর্কে সরকারী নীতির অনুমোদন নেওয়া।

আমরা তাই ভোট দিয়ে থাকি..দিয়ে আসছি..দিতে থাকব। জনগণই শক্তির উৎস। ব্যালট বাকসোই শক্তির তূণীর।

প্রধানমন্ত্রী ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার। তিনি লোকসভার গণনির্বাচিত প্রতিনিধি। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার রায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির পরিচালন—প্রশাসনের অধিকারী। আর কারুর সে অধিকার নেই। এই অধিকার জনগণই দেন—ভোটের মাধ্যমে। ভোটারই তাই ভারতের শক্তির উৎস। ভারত সরকার, ভারতের লোকসভা—সবার ওপর ভারতের ভোটদাতা জনগণ। এই ভোটদাতাদের স্বরূপ জানতে হলে আমাদের কয়েকটি তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে।

এইসব ভারতীয় ভোটাররা কারা? যাঁদের কাছে প্রধানমন্ত্রী বার বার রায় নিচ্ছেন? এই ভোটারদের স্বরূপটা কী?, যাকে প্রধানমন্ত্রী লোকসভা আর সরকারের উপরে ঠাঁই দিচ্ছেন? কী সেই অফুরন্ত উৎস যার থেকে প্রধানমন্ত্রী রায় গ্রহণ করতে চাইছেন।

জওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন যে, তিনি ছত্রিশ কোটি সমস্যার মুখোমুখি, কারণ প্রতিটি ভারতীয়ই এক-একটি সমস্যা। এই ব্যাপক বৈচিত্র্যকে একটি সাধারণ চরিত্র দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবু ভারতীয় ভোটারের আবশ্যিক চরিত্ররূপ সন্ধানের চেষ্টা চলেছে।

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্যার মাত্রা ও পরিমাণ বেড়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। কারণ সেদিনকার ছত্রিশ কোটি আমরা আজ ষাট কোটি ছাড়িয়েছি। মোট জনসংখ্যার সবাই ভোট দেন না বা দিতে পারেন না। সংবিধানদত্ত ভোটাধিকার অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক প্রকৃতিস্থ নাগরিক মাত্রেই ভোটার হতে পারেন। নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি, ভোট দেবার আগ্রহ, উৎসাহ, রাজনৈতিক সচেতনতা, সাধারণ শিক্ষা, সামাজিক বিবেচনা বোধ, যোগ্যতা ও অজ্ঞতার তারতম্য ভোটার সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির মূলে থাকে। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ৫১-৫৫ শতাংশ ভোট দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ৪৭-৫৪ শতাংশ, তৃতীয়তে ৫৪-৮০ শতাংশ আর চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ৫৭-৯৩ শতাংশ এবং পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে ৫৪-৮১ শতাংশ।

ভারত নানা বৈচিত্র্যের সমন্বয় ভূমি। বিচিত্র তার ঐতিহ্য, বিচিত্রতর প্রবণতা। এই বৈচিত্র্যের ধারা অনুসারে রাজ্যভেদে আঞ্চলিক ভোটদাতার সংখ্যারও তারতম্য হয়ে থাকে। গত ৫টি লোকসভার নির্বাচনে কোন রাজ্যে শতকরা কতজন ভোটার ভোট দিয়েছেন তার একটা মোটামুটি খতিয়ান:

রাজ্যের নাম:		শতকরা ভোটার সংখ্যা
তামিলনাড়ু	:	৭১-৮২
কেরল	:	৬৯-৬৮
হরিয়ানা	:	৬৪-৩৩
মহারাষ্ট্র	:	৫৯-৯০
অন্ধ্র	:	৫৯-৪০
পাঞ্জাব	:	৫৮-৮০
জম্মু-কাশ্মীর	:	৫৭-৫৩
গুজরাত	:	৫৫-৬০
রাজস্থান	:	৫৪-০৪
আসাম	:	৫০-৩৭
মধ্যপ্রদেশ	:	৪৮-০৩
উত্তরপ্রদেশ	:	৪৬-১৫
ওড়িশা	:	৪৩-২০
পশ্চিমবঙ্গ	:	৬৩-২৯

আমাদের এই রাজ্যে শতকরা তেষট্টি জনের বেশি লোক ভোট দিয়ে আসছেন। এর মধ্যে প্রতি হাজার জন পুরুষ ভোটার-পিছু নারী ভোটারের সংখ্যা সাড়ে সাতশো জন। এই আনুপাতিক সংখ্যা সমাজে জাগ্রত নারী মানসের সুস্পষ্ট দিগন্ত নির্দেশ করে।

সারা পৃথিবীতেই আজ নারী সমাজ নির্বাচনযজ্ঞে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নারীরা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতেও এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছেন। নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারীরা যে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তার প্রমাণ লিলিয়ান কার্টার। বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের মা। তাঁর অসামান্য বুদ্ধি, চেতনা এবং নির্বাচনী কৌশল পুষ্পবৃষ্টি করলো তাঁর ছেলের মাথায়। জিমি কার্টার জয়ী হয়ে 'হোয়াইট হাউস' দখল করলেন।

এদেশে নির্বাচনে নারীদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকবে এই তো স্বাভাবিক। কারণ, আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী। যে অসামান্য গুণাবলীর সংযুক্তি একজন মানুষকে আন্তর্জাতিক খ্যাতির চরম শিখরে নিয়ে যায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই গুণগুলি সহজেই আয়ত্ত করেছেন।

ভারতবর্ষে বিশেষত এই পশ্চিমবঙ্গে নারীরা ভোটের ব্যাপারে এখন আর কোনভাবেই পিছিয়ে নেই। তাঁরা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবেও এগিয়ে আসছেন * নির্বাচনী প্রচারেও বেশ সজাগ * ভোটের প্রশাসনিক দায়িত্বেও তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। *

এই রাজ্যে ভোট এবং নারী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে। রান্না-ঘরে রান্নাঘরে ভোটের আলোচনা। সকালবেলায় হকার কাগজ দেবার সময় তাড়াতাড়ি কাগজের ওপর চোখ বুলোলেই তো বড় বড় হেড লাইন : ভোট ফর..ভোট ফর..। দুধ আনতে গেলে দুধের বুথেও মেয়েরা আলোচনা করছে ভোট নিয়ে, অফিসে অফিসে ছেলেদের সংগে সমান তালে মেয়েদের ভোটযুদ্ধ, আজকার থিয়েটার-সিনেমা হলেও এই নিয়ে আলোচনা। নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে নারীসমাজ সীরিয়সলি কী ভাবছেন এ নিয়ে নারীসমাজের নানান্ স্তরের প্রতিনিধিদের সংগে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে। তাঁদের মতামত এখানে তুলে ধরছি : কলকাতার একটি বিশিষ্ট বিদ্যায়তনের শিক্ষয়িত্রী, সংসারের গৃহকর্ত্রী শিপ্রা নন্দী বললেন, এবারের লোকসভার নির্বাচন আমাদের কাছে বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে আসছে। অর্থবহ এই কারণে যে, দীর্ঘ দিনের অসামান্য প্রচেষ্টার ফলে ভারত আজ পৃথিবীর সম্মুখে একটি বিশিষ্ট শক্তি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই খ্যাতি বৃদ্ধি ঘটিয়ে পৃথিবীতে আরও বেশি শক্তি অর্জনই হবে নতুন সরকারের লক্ষ্য। সে কাজ সাধারণ রাজনীতিবিদদের দ্বারা করা সম্ভব নয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে সাফল্যের শীর্ষারোহন করতে পারবেন তাঁরাই হবেন দেশের ভবিষ্যতের সত্যিকারের কর্ণধার। আমরা তাই চেয়ে আছি সেই সরকারের দিকে যাঁদের আলোয় দেশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ঘুচে যাবে সব ব্যবধান, দুঃখ এবং যন্ত্রণা।

হাসি ফোটান শক্ত

এবারের প্রশ্ন দক্ষিণ কলকাতার আর এক গৃহিণীকে। স্বামী ব্যবসায়ী, দুই কন্যা ও এক পুত্রের জননী নিউ আলি-পুরের মঞ্জু মজুমদার বললেন : ব্যাপারটা কি জানেন আমাদের ভোটের মাপকাটি হচ্ছে নিউ আলিপুর মার্কেট। নিউ আলিপুর বাজারে গিয়ে যেদিন দেখি মাছ বেশ সস্তা, তরিতরকারীর দাম কমে এসেছে তখন সব কিছুই কেমন যেন সবুজ সবুজ লাগে, দখিনা বাতাসে মন উতলা হয়, এই সরকারকে ভারি ভালবাসতে ইচ্ছে করে। আবার যেদিন বাজারে ঢুকেই দেখি পোনা মাছ বাইশ টাকা কিলো, ছোট্ট একটা ফুলকপির দাম আড়াই টাকা তখন যে কি রাগ হয় আমার কি বলবো। ভীষণ সরকারকে বকে দিতে ইচ্ছে করে। আমরা বাপু বৌ-ঝি মানুষ। অতশত বুঝি না। বুঝি দোকান, বাজার, রেশন, ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ, কর্তার ব্যবসা। এগুলি ঠিকমত চললেই আমি খুশি। খুশি হই সেই সরকারের ওপর যে সরকার নিত্য আমাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবে। এ বড় শক্ত কাজ জানি, কিন্তু শক্ত কাজের দায়িত্ব নিতেই তো মানুষ সরকারে আসে। যাঁরা আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসবেন, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, সরকার গঠনের পর তাঁরা যেন আমাদের মত গৃহ-বধূদের মুখ স্মরণে রাখেন।

পূর্ব কলকাতার বাসিন্দা তরুণী অধ্যাপিকা বললেন : আমি ইতিহাসের ছাত্রী। তাই আমার কাছে এবারের নির্বাচন ঐতিহাসিক কারণেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। রাজনীতি মাঝে মাঝে জাতির জীবনে এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছয়। আমার বিশ্বাস এবারের নির্বাচন সেই সময়ের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই এর প্রয়োজন ছিল। তাই আমরা এবারের নির্বাচনে অত্যন্ত উৎসাহী। ব্যগ্র হয়ে চেয়ে আছি এই নির্বাচনের ফল ভারতবর্ষের ভাগ্যকে কোন পথে নিয়ে যায়। আমরা আবার নতুন দিগন্তের সন্ধান পাই কিনা, তার দিকেই চেয়ে আছি।

একা কলকাতা পশ্চিম বাংলার গোটা নারী সমাজের হয়ে কথা বলতে পারে না। মফঃস্বল এলাকাগুলো আছে। শহরতলী আছে, আর আছে অসংখ্য গ্রাম। জেলায়-জেলায়, গ্রামেগঞ্জে উপনগরে মহিলারা নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁদের মনের খবর জানতে তাঁদের দরজায় পৌঁছতে হয় আমাদের।

সেদিনই দুপুরে দিল্লিতে এ আই সি সি অফিসে কংগ্রেসের বারো দফা নির্বাচনী সনদ ঘোষিত হয়েছে। টিকিট না পেয়ে রাজ্যের জনা দুই কংগ্রেসী এম পি কংগ্রেস ছাড়বেন ছাড়বেন করছেন। সম্পাদক মশাই বললেন, যান না কাছে-পিঠে

উত্তরমেরু/দক্ষিণমেরু

ভারত আজ বিখ্যাত	:	শিক্ষয়িত্রী
বাজার সবই আগুন	:	ব্যবসায়ীর বউ
কালমুড়ি ভাল চলবে	:	মুড়িওয়ালী
রাজনীতির যুগসন্ধি	:	অধ্যাপিকা
নির্বাচন একটা হুজুগ	:	নৈতিবাদী শিক্ষিকা
ভোটে বিশ্বাস করি না	:	বর্ষীয়সী গিন্নি
ভোট দিতেই হবে	:	ছাত্রী
ইন্দিরাকে সিনেমায় দেখেছি :	:	বস্তিবাসিনী
ইন্দিরা আমার মেয়ে	:	শাশুড়ি
ইন্দিরা কিছুই করেন নি	:	পুত্রবধূ
ইন্দিরা বোমা ফাটিয়েছে	:	মা
বোমা ফাটিয়েছে বিজ্ঞানীরা	:	মেয়ে

কোন মফঃস্বল শহরের ঘরোয়া নির্বাচনী হাওয়াটা কেমন তেতেছে দেখেই আসুন না।

দুয়ার হতে অদূরে

দুয়ার হতে অদূরে সিঙ্গুরে সেদিন গিয়েছিলাম নির্বাচনী মেজাজটা একটু পরখ করতে।

তারকেশ্বর লাইনে, সেওড়াফুলি ও তারকেশ্বরের প্রায় মাঝামাঝি এই সিঙ্গুর, হাওড়া থেকে মোটে কুড়ি মাইল। ইলেকট্রিক ট্রেন। স্টেশনে নামলেই চোখে পড়ে পাহাড় প্রমাণ আলুর বস্তা আর বলার ছড়া—সিঙ্গুরেরও আশ-পাশের হিনটারল্যানডের ফসলে একসচেনজ ফারমার।

] সব মফঃস্বল শহরে যা থাকে সিঙ্গুরেও তার সবই আছে। স্টেশন থেকে শহরে ঢোকার মুখেই একটা বিখ্যাত মিষ্টির দোকান—ময়রার ছানার গজা, গরম সিঙ্গাড়া সিঙ্গুরের গর্ব। মাকড়সার জালে ছাতলা-ধরা দু পাশের একতলা দোতলা বাড়ির মধ্যে পাকাপাকি বন্দী রাজপথ সোজা তারকেশ্বর চলে গিয়েছে। বড়জোর কুড়ি ফুট। কাঁচা ড্রেন, ঢাউস প্রাইভেট বাসের সর্দারজী পাইলট, টিং টিংয়ে ডজন কয়েক সাইকেল রিকশা। দু ধারে পান-বিড়ি-সিগারেট, চা, স্টেশনারী, মিষ্টি ও মুদির দোকান। রাস্তার ডান দিকে হাট। বাঁ দিকে হেলথ সেন্টার, ছেলে ও মেয়েদের স্কুল, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি, জমিদারের ভেঙে-পড়া প্রাসাদ, শ্যাতলা-পড়া শিব মন্দির।]

বাসিন্দাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্যদের সংখ্যাই বেশি। এর পরই আসছেন নমঃশূদ্ররা। আর আছেন কয়েক ঘর ক্ষত্রিয় ছড়িয়ে ছিটিয়ে—নেহাৎই মাইনরিটি।

জলাঘাটায় প্রাক্তন জমিদার বর্মণদের বসত ভিটের উলটো দিকে বছর কয়েক হল বাড়ি বানিয়েছেন। এক অবসরপ্রাপ্ত জীবন বীমার অফিসার। ওঁর বাড়িতেই সেদিন উঠেছিলাম। শেষ দুপুরে খেতে বসে কান খাড়া করে শুনেছিলাম শাশুড়ি, পুত্রবধূ ও ননদের নির্বাচনী কথোপকথন।

পুত্রবধূ কলকাতায় ভিকটোরিয়া কলেজে পড়ে। বাংলায় অনারস।

শাশুড়ি : ইন্দিরার জন্যই আজ বিদেশে ভারতের এত নাম।

পুত্রবধূ : ঠিকই বলেছেন মা, ওই নাম কুড়োতে গিয়েই তো ঘরে জিনিসপত্তরের এত দাম। আপনার ছেলে বলছিল....

শাশুড়ি : থাম তো মা। ওই তো এক ফোঁটা ছেলে, সে আবার এ ব্যাপারে বলবে কি? কি বোঝে ও ইন্দিরার, জানে কতটুকু?

পুত্রবধূ ঘোমটাটা আর একটুখানি কপালের ওপর টেনে ভাতের থালায় আঁকিবুকি কাটতে ব্যস্ত হলেন। পাশ থেকে সমবয়সী ননদ বৌদির পায়ে চিমটি কেটে চোখের ইসারায় জানাল, দাঁড়াও জবাব দিচ্ছি।

ননদটিও ছাত্রী। হাওড়া গারলস কলেজে পড়ে। ডালের বাটিটা থালার উপর উপুড় করে দিয়ে মেয়ে পাল্টা বাণ ছাড়ল : মা, স্বাধীনতার আগেই তো তোমার বিয়ে হয়েছে, তাই না?

জনসভায় ইন্দিরা

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালিনী ভোটার

এক মুঠো কড়াই ডাঁটা দাঁতের ফাঁকে চেপে রেখে মা বললেন, হ্যাঁ তাতে তোর কি?

আমার কিছু না, তবে তুমিই না বলেছিলে দাদু তোমার বিয়েতে এক পয়সাও পণ দেন নি, শুধু লোক খাওয়াতে খরচ হয়েছিল দু হাজার টাকা?

পুরু লেন্সের ফাঁকে মায়ের চোখ জোড়া এক চক্কর ঘুরে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল : হ্যাঁ। তখন দিন-কাল সস্তা ছিল।

নিরীহ মুখে মেয়ে বলল : দিদির বিয়েতেও তো পণ লাগে নি। তবু কত খরচ হল? গত বছরই তো দিদির বিয়ে হল।

মা বললেন : তা হাজার দশেক লেগেছে। ত্রিশ বছরে জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে তাই।

খেই ধরল পুত্রবধূ : সে কথাই তো আপনার ছেলে বলছিল। সব জিনিসের দাম বেড়েছে। খাতাপত্র, কলম, পেন্সিল, বই-টই থেকে শুরু করে ওষুধপত্তর, খাবার-দাবার সব কিছুর, সিনেমার টিকিটের তো কথাই নেই।

বৌমাকে এক টুকরো জমি ছাড়তে নারাজ শাশুড়ি। পাতের পাশে অভুক্ত ডাঁটার ডাঁই-এর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে গুছিয়ে জবাব দিলেন এবার : তোমরা মা বিশ্ব-নিন্দুক! কোন কৃতজ্ঞতা নেই। এই তো সেদিন বোম ফাটাল ইন্দিরা।

বাইরে খাতির

বাইরে সবাই আমাদের খাতির করে। এর দাম দিতে হবে না? ঘরে খাই না খাই বাইরে সে কথা কি কেউ বলে বেড়ায়? নেহরুর আমলে সবাই দুয়ো দিত আমাদের ভিখিরি বলে—ইন্দিরার আমলে যে সে অপবাদ ঘুচল তার জন্য কাকে ধন্যবাদ দেবে?

চট করে শাশুড়ির মুখে মুখে রা করার মত ভরসা নেই সদ্যবিবাহিত বধূটির মুখে। ব্যাপারটা ননদের কাছে কিয়ার তাই ওই বৌদির হয়ে প্রশ্ন তোলে : রোজ কলকাতা, হাওড়ায় আমরা যাই। কয়লার গাড়ির বদলে ইলেকট্রিক ট্রেন নেহরু বসিয়ে গিয়েছিলেন তাই রক্ষে। সময় অনেক কম লাগে। কিন্তু গত বিশ বছর ধরে শুনছি বাবা-দাদারা রেল কোম্পানির হাতে-পায়ে ধরে সাধছে আর দু-একখানা ট্রেন বাড়াও, যেগুলো আছে তাতে দাঁড়ানোরও জায়গা থাকে না—তা কথা কি কেউ কানে তুলেছে?

মুখটা শক্ত করে মা বলেন : এক-আধটা ট্রেন না বাড়লে তার জন্য কি ইন্দিরা দায়ী?

ননদ, বৌদি একসঙ্গে : তাহলে বোমা ফাটানোর কৃতিত্ব কার—ইন্দিরার না বিজ্ঞানীদের?

প্রসঙ্গটা হাতছাড়া যাতে না যায় তাই মা এবার উল্টো পথ ধরলেন : আমাদের ছেলে বেলায় এই সিঙ্গুরে মাত্র একটা স্কুল ছিল মেয়েদের, এখন চার-চারটা।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের জবাবও প্রস্তুত : একটাও মা গভর্ণমেন্ট বানায় নি। বৌদি তো বাইরের মেয়ে, আমি সিঙ্গুরের। আমি নিজেই দেখেছি যেমন যেমন লোক বেড়েছে তেমন তেমন স্কুলের সংখ্যাও। পরে ধরাধরি করে আদায় হয়েছে সরকারী সাহায্য। তুমিই বল না মা, শুধু শুধু স্কুল কি একটাও হয়েছে না হয়?

: তোরা হেলথ সেন্টারের কথা ভুলে গেলি? আমাদের ছেলেবেলায় সিঙ্গুরে ছিল ম্যালেরিয়ার ডিপো। ওই সেন্টারটা খোলার পর ম্যালেরিয়া উধাও হল।

এই যে সিঙ্গুর থেকে তারকেশ্বর গোটা রাস্তাটা আজ পিচ বাঁধানো, আমাদের ছেলেবেলায় তো তা ছিল না।

পুত্রবধূ খুব আস্তে আস্তে বলে : বড় রাস্তাটা পাকা হয়েছে তো মা বহু দিন। আপনার ছেলে বলছিল, আমাদের বাড়ির সামনের এই রাস্তাটা ও জন্ম ইস্তক দেখে আসছে ভাঙাচোরা। এক বছর হল আমি এসেছি, কখনো সারাতে তো দেখি নি।

তুমি তো এরই মধ্যে অনেক দেখে ফেলেছ, আর এটা দেখো নি রাস্তায় রাস্তায় ইলেকট্রিক পোস্ট।

: একটাও রাতে আলো দেয় না। মেয়ের বাঁকা কথায় গা না করে মা বলেন, রাস্তায় হয়তো সব দিন আলো থাকে না, কিন্তু মাঠে মাঠে শ্যালো, ডিপ টিউবওয়েলে জল তো মেলে, বছরে এখন দুটো-তিনটে ফসল মেলে।

: মেলে তো মা, কিন্তু দাম তো কমে না একটিতেও।

এবার রাগে ফেটে পড়লেন মা—আর মুখে মুখে কথা বলতে হবে না। ওঠো। বাসনগুলো বৌমার সঙ্গে ধরাধরি করে কলতলায় নিয়ে যা।

সবাই পজিটিভ নন। সবাই নন আশাবাদী। আর একজন শিক্ষিকা তো বেশ রেগে উঠেই বললেন : মশাই, ভোট ভোট করে কী হবে? এটা কী ইলেকশন? এটা সিম্পলি একটা সিলেকশন। বাকি জিনিসটা স্রেফ লোক দেখানো জুজুং। আমি এসবে আদৌ বিশ্বাস করি না। আমি কথা বলার চেষ্টা করতেই আবার বলে উঠলেন, এতদিন ভোট ভোট করে তার রেজাল্ট দেখেছেন? ছাত্রদের বই পাওয়া যায় না। স্কুল-কলেজে পরীক্ষার ব্যাপারটা পর্যন্ত একটা হোকস্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে আর কী অবশিষ্ট রইল বলুন?

আমি বললুম, তবুও নির্বাচন তো একটা লড়াই। এর থেকে সরে দাঁড়ালে লাভটা কী হবে?

এবার আরও উত্তপ্ত কন্ঠে গলায় তিনি বললেন : এ লড়াইয়ে যে জিতবে তারই লাভ। নেতাদের কাছে জনগণ-টনগণ মিথ্যে। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। তার থেকে এক পাও এগোতে পারব না।

১৫ কোটি টাকা । ৩২ কোটি ভোটার

এবারের লোকসভার ষষ্ঠ নির্বাচনটা একটু বিশেষ ধরনের। কারণ দেশজোড়া জরুরী অবস্থা আর প্রেস সেন্সরশিপ তুলে, বন্দীদের মুক্তি দিয়ে সরকার একটা নতুন জমির ওপর নির্বাচনী আসরের চাঁদোয়া টাঙাচ্ছেন। সরকারের হাতে যে অস্ত্রগুলো আছে তার মধ্যে খুব জোরালো হলো বিশ দফা আর পাঁচ দফা—এই পঁচিশ দফা, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, কালোবাজার-চোরাচালানের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা। এই মোক্ষম অস্ত্র হাতে নিয়ে কংগ্রেস তথা সরকার মহল বলছে—'জিতবই।' অন্য দিকে বিরোধী শিবিরের পাশুপত্য হলো জরুরী অবস্থা তারই ফল পরিণামে অসংখ্য লোকজনকে আটক, সভা-সমিতির ওপর নিষেধাজ্ঞা, প্রেস সেন্সরশিপ ইত্যাদি আরও অনেক কিছু, আরও অনেক দফা এবার ভোটের আয়োজনে খরচও বেশি। পনেরো কোটি টাকা। ভোটারও আগের চেয়ে বেশি। বত্রিশ কোটি। পশ্চিম বাংলার ভোটার আড়াই কোটিরও বেশি। তাই ঘটাও বেশি, সোর-গোলও কম নয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ইতিপূর্বে দু দুবার লোক-সভা বাতিল করেছেন। ১৯৭০ সালে চতুর্থ লোকসভার আয়ু ফুরোবার চোদ্দ মাস আগেই অন্তর্বর্তী নির্বাচন চাইলেন। এ-বছরও লোকসভা বাতিল করা হল—যদিও আরো চোদ্দ মাস তা চলতে পারত।

এ বাবদে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচকদের অভিযোগ ছিল : বৈধতার অজুহাতে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী লোকসভা বাতিল করে দুবারই যাচাই করতে চেয়েছেন আইনসিদ্ধতা। সমালোচকদের জবাবেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। একজন প্রধানমন্ত্রী যে-কোন সময়ে জনতার রায় নিতে পারেন এবং অন্তর্বর্তী নির্বাচন অবশ্যই সংবিধানসম্মত।

এই পটভূমিকায় ভোটদাতাদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ভোটারদের স্বরূপ আরও একবার যাচাই করে নেওয়া ভাল।

ভোটারের চেহারা

এক সমীক্ষার মতে গড়পড়তা ভারতীয় ভোটার হচ্ছে একজন হিন্দু, নিম্নবর্ণ, গ্রামবাসী, কৃষিজীবী—সম্ভবত ছোট চাষী বা ক্ষেতমজুর,—নিরক্ষর, সম্ভবত জন্মস্থানের চৌহদ্দি পেরিয়ে কখনও সে বাইরে যায় নি, যার বয়স পঁয়ত্রিশের নীচে, বিবাহিত আর একাধিক সন্তানের জন্মদাতা, বার্ষিক আয় সাতশো টাকা, কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়—তবে অন্য দলের চেয়ে কংগ্রেসের প্রতি আকর্ষণই বেশী,—রাজনীতি সম্পর্কে ..ধ্যান-ধারণা ও চেতনা অস্পষ্ট।

দিল্লির এক গবেষক সংস্থার সংগৃহীত ১৯৬৭ সালের নমুনা সংগ্রহ অনুযায়ী দেখা গেছে যে, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে ভোটারদের শতকরা আশী ভাগই হিন্দু, ৭৭-২৬ শতাংশ গ্রামাঞ্চল থেকে আগত, ৫১-২৯ শতাংশের কোন কেতাবী শিক্ষা নেই, ৩৩-৪৯ শতাংশ সাত বছরও স্কুলে যায় নি, ৪০-৮৮ শতাংশ চাষী অথবা ক্ষেত-খামারের মালিক, ১২-৪৬ শতাংশ ভূমিহীন চাষী, ৩৫-২৪ শতাংশের মাসিক আয় একশো টাকার কম, ২৬-৯৩ শতাংশের আয় একশো থেকে দুশো টাকার মধ্যে, কেবলমাত্র ৮-৭০ শতাংশের আয় চারশো টাকা বা তার বেশী। ৩০-৮৭ শতাংশের জন্ম এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকে। শতকরা ৯০ জন বলেছেন তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। কিন্তু ৩১-৩ শতাংশের অভিমত কংগ্রেস অন্য দলের চেয়ে সাধারণ মানুষের বেশী কল্যাণ করতে সক্ষম। মাত্র শতকরা ২৯ জন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শতকরা ৩৬ জনের অভিমত ভারতে রাজনৈতিক দল প্রয়োজনীয় কিন্তু ২১ শতাংশ দলহীন ব্যবস্থার পক্ষপাতী আর ৩৫ শতাংশ এই প্রশ্নের উত্তর জানেন না বলে জানিয়েছেন। প্রায় ৫৪-৮ শতাংশের মত এই যে, রাজনৈতিক দলগুলির গ্রাম ও শহরের সমস্যা সমাধানে কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই।

এই পশ্চাৎপটটি মনে রেখে আমরা জনমানসের জরীপ করতে, বিশেষ করে নির্বাচন সম্পর্কে মহিলা মহলের মনোভাবের সার্ভে করতে ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছি কলকাতার শহরতলিতে পল্লী এলাকায়। আর সেই সংগৃহীত তথ্য নিয়ে হাজির হয়েছি পাঠকদের দরবারে। তাঁরা কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ শিক্ষার আলোর ঝলমল করছেন, কেউ অশিক্ষা আর অবসাদের অজ্ঞতা আর নৈরাশ্যের অন্ধকারে আছেন আজো। আশা করি ভবিষ্যৎ এঁদেরও আলোয় নিয়ে আসবে। এমনি দুটি-একটি নমুনা পেশ করি।

সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার, থাকিয়া থাকিয়া

পরিচয় ছিল না। ড্রইং রুমের দরজা খুলে একটু অবাক হয়ে প্রতি নমস্কার জানিয়ে উনি বললেন, কী ব্যাপার বলুন তো? জিগ্যেস করলুম আপনি তো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির...হ্যাঁ আমি ইউনিভার্সিটির এনসিয়েন্ট হিস্টির স্টুডেন্ট। আমার অসমাপ্ত কথার ওপর জবাব ছুঁড়ে দিলেন। শান্ত, নম্র, সুন্দরী শকুন্তলা। ঘরে বসে আমার উদ্দেশ্য জানার পর বেশ ধীরে ধীরে গুছিয়ে গুছিয়ে বললেন, ভোট দেওয়াটা আমাদের, অর্থাৎ ভোটারদের একটা কর্তব্য। তাছাড়া আমরা যে দেশের নাগরিক সেই দেশ পৃথিবীর বিগেস্ট ডেমোক্র্যাটিক নেশন। এর উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থার জন্যে ইলেক্টেড গভর্ণমেন্ট একান্ত প্রয়োজন :

প্রশ্ন করলাম : এমার্জেন্সীটা আরও আগে উইথড্র করলে গণতন্ত্রের দিক থেকে ভাল হতো নাকি?

: সরকার এমার্জেন্সী ডিক্লেয়ার করেছিলেন প্রয়োজন বুঝে। আবার তুলে নিয়েছেন প্রয়োজন হয়েছে বলেই। এমার্জেন্সীতে ডিসিপ্লিনটা একটা পজিটিভ গেইন বলে আমি মনে করি। আমরা সবাই সত্যিই ইনডিসিপ্লিন্ড হয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া আপনারাই তো কাগজে হিসেব দিয়েছেন এমার্জেন্সী পিরিয়ডে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার আর স্মাগলারদের কীভাবে দমন করা হয়েছে। সুতরাং এই বিরাট দেশে এই বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে সরকার যেটুকু করেছেন সেটা নিঃসন্দেহে একটা গুড এফর্ট। টোয়েন্টি পয়েন্টকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভোট দেওয়াটা আমার কাছে একটা সেক্রেড ডিউটি। আবার নমস্কার, আবার প্রতি নমস্কার। ড্রইং রুমের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

পাইপ কলোনি

পাইপ কলোনিটা কী ভাই? একটি ছেলে হাসতে হাসতে বললে, 'ঐ তো দেখুন পাইপ কলোনি।' পার্কের একটা কোণে জড়ো করা সি এম ডি এর রাশীকৃত পাইপ। তারই মধ্যে সংসার। রান্নার ধোঁয়া উঠছে। কাচ্চা ছেলে-মেয়ে কাঁদছে। দু-একটা ব্যাটাছেলে রোদে শুয়ে ঝিমোচ্ছে। মেয়েদের তীব্র গলার ঝগড়ায় মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে। একটা বড়সড়ো ৭২ ইঞ্চি পাইপের সামনে দাঁড়াতেই যে মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলো তাকে সোজাসুজি জিগ্যেস করলুম—তোমরা কী করো? মেয়েটি নির্দ্বিধায় বললে, ভিক্ষে করি। কথাটা বলেই কেমন যেন সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল আমার দিকে আপাদ-মস্তক। একটু হেসে বললুম, ভয় নেই। আমি থানা থেকে আসি নি। কয়েকটা কথা জানতে এসেছি। এর মধ্যে ছোট ছেলে-মেয়ের একটা দল আমার চারদিকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি আমাকে জিগ্যেস করল—কী কথা জানবে? বল্লুম আগে তোমার নামটা জানব। আমার নাম রানী। মেয়েটির জবাব। আমি বল্লুম, চমৎকার নাম তোমার। তুমি কোথা থেকে এসেছ? রানী বল্লে, ক্যানিং থেকে। আগে কী

যুগে যুগে

ভারতে লোকসংখ্যা যত, তার প্রায় অর্ধেক ভোটার। যত ভোটার তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক নারী। কাজেই গণতান্ত্রিক ভারতের প্রশাসন কার্যে নারীদের পরোক্ষ ভূমিকা অনেকখানি।

স্বাধীনতা-পূর্ব কালেও ভারতের নারীরা প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সরোজিনী নাইডু, সুচেতা কৃপালনীর নাম উল্লেখ্য।

স্বাধীনোত্তরকালে রাজ্য ও কেন্দ্র পর্যায়ে নারীদের প্রশাসন কার্যে যোগদানের সীমানা আরও প্রসারিত হয়। ইতিমধ্যেই আমরা পেয়েছি—২০ জনেরও বেশি মন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন অন্ততঃ তিনজন—শ্রীমতী বান্দোদকর, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, শ্রীমতী নন্দিনী শতপথী। সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বোচ্চ পদে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এযাবৎ সারা পৃথিবীতে মিলেছে মাত্র তিনজন নারীর নাম—ইজরায়েলের শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার, শ্রীলংকার শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক ও আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে : 'তিনি (প্রজাপতি ব্রহ্মা) এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিল।'

ঋক বেদেরই দশম মন্ডলের ১০৮ সূক্তে পাই : সরমা নামে এক মহিলা ইন্দ্রের দূতী হয়ে পনী রাজ্যে গিয়েছিলেন গো-অপহারকদের বিচার করতে।

রামায়ণ মহাভারতের যুগেও ইতস্তত কিছু প্রমাণ মেলে যেখানে নারীরা রাজনৈতিক শিক্ষা পেতেন, দিতেনও। গান্ধারী নিজ তনয় দুর্যোধনকে কিছু মূল্যবান রাজনৈতিক উপদেশ দিয়েছিলেন। নাগরাজ তনয়া মদালসা স্বীয় পুত্রদের দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা সঙ্গে সঙ্গে দুরূহ রাজনৈতিক শিক্ষাও দিয়েছেন।

তথাপি যথার্থ প্রশাসনিক কাজে নারীদের ভূমিকা আরও স্পষ্ট ঐতিহাসিক যুগে। মৌর্য যুগে একাধিক রাজ্যে নারীরা প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা দেখিয়েছেন, এমন প্রমাণ আছে। মেগাস্থিনিসের বিবরণে বলা আছে, পান্ড্য রাজ্যে মহিলারা প্রশাসনিক কাজকর্ম করতেন। মহিলারা রাজার দেহরক্ষীর কাজও করতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জানা যায়, গুপ্তচরের কাজে সেকালের ভারতীয় নারীরা দক্ষ ছিলেন। নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা হিসাবে রাজ্য শাসনের নজিরও ভূরিভূরি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী কুমারদেবী ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের স্ত্রী ধ্রুবদেবীর নাম সমসাময়িক ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখিত। কালিদাসের কাব্যে রানীদের পরমভট্টারিকা ও পরমভট্টারিকা-রাজিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সেকালের ইতিহাসের কাশ্মীর, ওড়িশা ও অন্ধ্র রাজ্যে শাসনকার্যে মহিলাদের যোগদানের নানা তথ্য পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী পরবর্তীকালে ভাইয়ের সঙ্গে রাজ্য পরিচালনায় অংশ নিয়েছিলেন। তিনি রাজদরবারে ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের পাশে বসে রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করতেন।

ভারতে মুসলমান আগমনের পর রাজনৈতিক চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই আমলেই প্রথম একজন

করতে? চাষ করতুম। এখন আর চাষ নেই। জমিও নেই। তাই এখানে এয়েচি ভিক্কে করতে।

আচ্ছা রানী, তোমার ভোট আছে? এবার খুব অবাক হয়ে রানী বল্লে ভোট কী? তারপর কী যেন একটু ভেবে আবার বল্লে, সেই লাল ঝাণ্ডার ভোট? সে তো কবে হয়ে গিয়েচে। সেবার ক্যানিংএ ভোট দিতে নে গেচলো। ভোট দিছলাম বাক্সোর মধ্যি। এখন আর নে যায় না। তারপর আবার জিগ্যেস করল, কেনগো, তুমি কী ভোটের বাবু? হাসতে হাসতে বল্লুম, আরে না, না, আমি বাবু-টাবু নই। এমনি জানতে চাইছি। ভোট হবে শীগ্গীর: সেকথা শুনেছ? রানী ঘাড় নেড়ে জানালে সে ভোটের কথা শোনে নি। তারপর বল্লে, বাবু, আমরা ভিকিরি। আমাদের ভোট থাকলিও কী না থাকলিও কী। ভিকিরিদের আবার জাত আছে নাকি? এরপর আর দাঁড়ানো যায় না ভেবে রওনা হলুম। এ-রাজ্যের ছেচল্লিশ হাজার ভিখিরি, যাদের মধ্যে আটাশ হাজারই ভূমিহীন চাষী পরিবার।

এক বর্ষীয়সী গুরুজনের কাছে ভোট সম্পর্কে মতামত জানতে গেলে তিনি মিটসেফের ভেতর থেকে শিশি বের করে প্রশ্ন করলেন: এটা কী বলতো? ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ করে নিয়ে বল্লুম, সর্ষের তেল। অমনি পিসী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। চেঁচিয়ে বল্লে, বাপ-চোদ্দ পুরুষের জন্মে বারো টাকা তেলের দর শুনিনি। চিনি-গুড়-চাল-মাছের এই দরের জন্যে আবার ভোট দোব? তোরা দিগে যা। তোদের সময় আছে। প্রাণে ফূর্তি আছে। একটা কেন এক-একজন দশটা করে ভোট দে। যত্তো সব চামচের দল। আমায় মেরেফেল্লেও আমি যাব না।

বউবাজারের মুখে মুড়ি, পানওয়ালী বুড়ি জানকীর সঙ্গে দেখা। উত্তর প্রদেশ থেকে বাইশ বছর আগে জানকী মরদের সঙ্গে এসেছিল কলকাতায়। মরদ বদরীপ্রসাদ মোট বয়। আর জানকী বেনিয়ে পড়ে মুড়ি-পান-ঝাল বাদাম নিয়ে। পথে পথে। আপিস টাইমে।

জানকীকে প্রশ্ন করলাম, এবারের ভোট সম্পর্কে তুমি কি ভাবছো? জানকী হাসলো। একগাল ভরা হাসি। সারা মুখে কোঁচকানো চামড়ার আলপনা। বললো, ভোট তো বহুত মজা বাবু। কিত্তো লোক, বাস, ট্যাকসী, পুলিশ। আমার বহুত মশলা-মুড়ি বিক্রী হবে, না বাবু। যো সব বাবু ভোট দিবে তাদের জিভে পান লাগবে না বাবু। ফি বরস ভোটের সময় আমি কত্ত পান বিক্রী করেছি বাবুজী। মুড়ির দাম ভি চড়ে যায় বাবুজী। হামি ইবার আগে থেকে মুড়ি কিনে রাখবো।

এক-একটি ভোটের পেছনে জড়িয়ে থাকে ঘরোয়া তেল-নুনের হিসেব। নোতুন নোতুন জনসেবক। নোতুন সরকার গড়লে বুড়ী চাচীর চাঁদের মতন ছেলেটা চাকরী পাবে। সংসারে আয় বাড়বে, দানাপানি নির্বিঘ্ন হবে।

ছেলে চাকরি পাব! তাই—

টেস্ট হাউসের উল্টোদিকে জর্জকোর্ট লাগোয়া মুসলমান পাড়ায় কিছু না হলেও চার পাঁচশো মেয়ে ভোটারতো হবেই। এখানে রমজান হয়, মোহররমের মিছিল বেরোয়, হাসানহোসেন হয়ে যাবার পরও খাসরাস্তা বরাবর পতাকা টাঙানো থাকে মাস-খানেক। বখরী-ঈদে প্রায় সব বাড়ীতেই খাসী মারা হয় রাতে অনেকে আসেন, পুলিশ থেকে কবি পর্যন্ত গোস্ত খেয়ে যান।

মহিলাকে সুলতানার পদে অধিষ্ঠিতা হতে দেখা যায়। তিনি হলেন সুলতানা রাজিয়া। ১২৩৬ থেকে ১২৪০—এই চার বছর তিনি প্রত্যক্ষভাবে দিল্লির মসনদে বসে রাজ্য শাসন করেছেন। এই প্রসঙ্গে রানী দুর্গাবতীর নামও স্মরণীয়। মধ্য-প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে গড় কাটাঙ্গার তিনি ছিলেন শাসনকর্ত্রী। নাবালক পুত্র বীর নারায়ণের হয়ে তিনি রাজ্য শাসন করতেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন সম্রাট আকবরের অধীনে প্রাদেশিক শাসনকর্তা আসফ খাঁ। রানী দুর্গাবতী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে পরাজিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরাঙ্গনার মৃত্যু বরণ করেন।

আকবরের বাল্যকালে তাঁর অভি-ভাবক হয়ে ভারত শাসন করতেন বৈরাম খাঁ। আসলে আকবরের ধাত্রী মোহাম অনঘই ছিলেন শাসনকর্ত্রী। বিজাপুরের চাঁদ সুলতানা, কান্ধারার তারাবাঈ, যোধপুরের অহল্যাবাঈ, ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাসে এক একটি উজ্জ্বল নাম। এই প্রসঙ্গে রানী ঝিন্দনের নাম বিশেষভাবে করতে হয়। ঐতিহাসিকদের মতে রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা করেছে। এই সন্ধিপর্বে রঞ্জিৎ সিংহের স্ত্রী রাণী ঝিন্দন নাবালক পুত্র দলীপ সিংহের পক্ষে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। শুধু তাই নয়, বিভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন শিখ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি অসামান্য সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

সভ্যতার মদগর্বে গর্বিত পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে যে অধিকার পেতে মেয়ে-দের অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় সংগ্রাম করতে হয়েছে সে অধিকার ভারতীয় নারীরা স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে-ছেন।

ফরাসী দেশেই একবার মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু তখন স্বয়ং রুশো এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। মেয়েদের ভোটা-ধিকারের আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬১ সালে। কিন্তু এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে বিটেনে শ্রীমতী এমিলিন প্যাংকহার্স্টের নেতৃত্বে। ১৮৯৮ সালে আন্দোলনের সূত্রপাত কিন্তু ভোটাধি-কার পেতে প্রায় তিরিশ বছর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাতে হয় বিটেনের নারী সমাজকে। বিটেনে প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে মেয়েরা ভোটাধিকার পান ১৯২৮ সালে। শ্রীমতী প্যাংকহার্স্ট জীবনে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছেন। একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। শাসক-দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি হাইড পার্কে হাতে পায়ে শেকল বেঁধে বক্তৃতা করতেন। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি জয়ী হয়েছিলেন। দেখেও গিয়েছিলেন তাঁর সাফল্য।

আমেরিকায় মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় ১৯২০ সালে। রুশো দিদেরোর ফ্রান্সে মেয়েরা ভোটাধিকার পান ১৯৪৫ সালে। ১৯০৩ সালে নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ডের মেয়েরা ভোটাধিকার লাভ করেন। রুশ বিপ্লবের পর সে দেশের মেয়েরা ভোটের অধিকার পান। সুইজারল্যান্ডে সীমিত ক্ষেত্রে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় এই সেদিন—১৯৭১ সালে। রাষ্ট্র পুঞ্জের নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংক্রান্ত কমিটির ১৯৭১ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে এখনও পৃথিবীর ৮টি রাষ্ট্রে মেয়েদের ভোটা-ধিকার নেই। এর মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্রই হলো মধ্যপ্রাচ্যের।

আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে কে হিন্দু কে মুসলমান বোঝা যাবে না, এখানে কখন রায়ট বা নকশাল ঝামেলা হয় নি।

ধরলুম ইয়সুফ মিঁঞাকে। এ পাড়ার মাতব্বর। ষাট বছরের কাছাকাছি বয়স। ধার্মিক মুসলমান, বই না দেখে হাজার খানেক বয়েৎ মুখস্ত বলে যেতে পারেন। পণ্ডিত লোক। তার বউয়ের সঙ্গেই কথাবার্তা বলা যেতো কিন্তু মিঞা সাহেব বললেন, না, তার চেয়ে ভাল বলবে আমার চাচী। এ পাড়ার সবচেয়ে বুড়ি। সেই ভোটের গোড়া থেকে ভোট দিয়ে আসছে।

চাচী হলেন মাসুদা বেগম। বয়স হবে প্রায় আশী। সেই প্রথম নির্বাচন থেকে ভোট দিয়ে আসছেন। চতুর্দিকে সারসার

ঘর, মাঝখানের উঠোন থেকে একটা মুরগী ভয় পেয়ে দাওয়ায় উঠে এলো। এ বাড়িতে টিঁয়া পায়রাও আছে। চাচী মোড়ায় এসে বসলেন, চোখে ছানি নিজের বয়স নিজেই বললেন চারকুড়ি। চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী, বউরা একটু দূরে।

--কবে থেকে ভোট দিচ্ছেন?

: তাতো বলতে পারবনি বাবা, তখনতো ফাঁকে বেরুনো হোতোনি মিঞার সঙ্গে গিয়ে ভোট দিয়ে এসছিনু পেথমবার। তারপর থিকি ফি বারেই দিতি হয়—

—এবারেও ভোট দিচ্ছেন তো?

: আবার ভোট হচছে নাকি ? ছেলেরাতো এখনো বলেনি। ছেলেরা নিয়ে গেলেই যাবো।

—ভোট দিতে ভালো লাগে ? ভোট দেবেন কেন ?

: ভোট দিতি ভালো লাগে কেন? কেন না, আমাদের সুবিধে হবে, র‍্যাশন বাড়বে, কাপড় সস্তা হবে, আমার ছেলেরা চাকরী পাবে, সেই কম্পানির আমলের মতো। তা হচছে কই, এই যে ছোট ছেলে, ভোটবাবুদের বনুনু—চাকরী দেবে তো, তারাতো মাথা হেলিয়ে চলে গেলেন। ভোট দিনু। ভোট হয়ে গেল! চাকরীতো বাবা হোলো না। —চাচী, আপনার ক' ছেলে? আঙুল দেখিয়ে বললেন—চার। বড় ছেলের নাম মহম্মদ তারপর শওকত তারপর আবুল হোসেন। ঐ আবুলকে নিয়েই হয়েছে ঝামেলা। ওর একটা চাকরী দরকার, ডাগর ছেলে হয়েছে, ওর এখন একটা চাকরী না হলে সাদী হবে কি করে।—তা চাচী এ্যাতোগুলো ঘরে শুধু ছেলে আর নাতি, বউ ?—তা কেন হবে, আমার মেয়ে জামাইরাও এখানে থাকে। সব মিলিয়ে আমাদের ঘরে চল্লিশ জন ভোট দেয় ?—চল্লিশজন!। এদের দু একজন বাদে এখনো কেউ ভোটের কথা জানে না।

—ইন্দিরা গান্ধীকে কখনো দেখেছেন ?

: না বাবা, চোখে দেখিনি, সিনিমায় দেখেছি।

—এখনো সিনেমা দেখেন ?

: না, এখন আর দেখি না, সেই দেখেছিনু, ৪।৫ বছর আগে।—কাকে ভোট দেবেন?—কংগ্রেসকে। কম্পানির আমল থেকেই তো কংগ্রেস জিতে আসছে।—কেন যুক্তফ্রন্ট?—এ্যাঁ, কি বললে বাবা ? বুঝলুম, কম্পানির আমল থেকে বুড়ি কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো পার্টির নাম জানে না।

এক একটি পরিবার যেন সৌরমণ্ডলের মত। কেউ লাল রঙের মঙ্গলগ্রহ, কেউ সবুজ রঙের পৃথিবী...। আপাততঃ তাদের কেন্দ্রে রয়েছে কেন্দ্রীয় লোকসভার নির্বাচন—ধরে নেওয়া যাক। তাই নিয়েই যে যার কক্ষপথে ঘুরছে। কোথাও ঐক-মত্য আছে, কোথাও বা স্পষ্ট মতান্তর।

নারীরা যে আজ সক্রিয় উৎসাহ নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছে তার প্রমাণ বাড়িতে বসেই পাওয়া যায়....

সেলস্ গার্ল নয়

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ছুটে গেলাম। দেখি একটি অল্পবয়েসী অচেনা মেয়ে। বয়েস পঁচিশের নিচেই হবে। স্লিম ফিগার। বেশবাস অতি সাধারণ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। কাঁধে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ। গোলাপী রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। ঘড়িতে এগারটা। ছুটির দিন। —'ভেতরে আসতে পারি?'

—আসুন।'

ড্রইংরুমে এনে বসালাম। পরিচয় হল। মেয়েটির নাম রমা। রমা দাস। কোনও প্রসাধন সামগ্রীর সেলস-গার্ল নয়। কংগ্রেসের একজন সাধারণ স্বেচ্ছা-সেবিকা। পাইকপাড়ায় থাকেন। মণীন্দ্র

কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীকে দূর থেকে দেখেছেন তিনবার।

—'আপনারা সবাই ভোট দিচ্ছেন তো?'

—'যদি লিস্টে নাম থাকে, নিশ্চয়ই দেবো।'

—'যদি নাম থাকে কেন, আগেরবার আপনারা ভোট দেন নি?'

—'না, মানে এ'পাড়ায় আমরা নতুন এসেছি তো। আগে কাশীপুরে ছিলাম। সেখানে নাম ছিল। এখানে উঠেছে কিনা জানি না।'

—'আপনি কোন সালে বি-এ পাশ করেছেন বললেন?'

—১৯৭১-এ।

—চাকরী পেয়েছেন?

—না। রমা কিছুটা অপ্রস্তুতভাবে ঘাড় নাড়ল।

—আপনার বাড়িতে আর কে আছেন?

—বাবা, মা, তিন দাদা আমি ও আমার ছোট বোন। বাবা সরকারী কেরানী। সামনের বছর রিটায়ার করবেন। এক দাদা অর্ডার সাপ্লায়ারের কাজ করে। দু ভাই বি-এ পাশ করে বেকার বসে। ছোট বোন মণীন্দ্র কলেজে বি এস্‌সি পড়ছে। ফিজিকসে অনার্স। গান শেখে।

—আপনাদের বাড়িতে কি সবাই কংগ্রেস করেন? সকলেই ইন্দিরার সাপোর্টার?

—'না। আমার বাবা রাজনীতি বোঝেন না। কোনও দিন তা নিয়ে মাথাও ঘামাতে দেখিনি। আমার বড়দাও তাই। রোজগারের ধান্দায় ব্যস্ত। বাকি দু ভাই এবং ছোট বোন কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধী। ইন্দিরা গান্ধীর পতন চায়। সঞ্জয়ের নামে চটা। একমাত্র আমিই কংগ্রেসকে সাপোর্ট করি। ইলেকশনের সময় কংগ্রেসের হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরি। কংগ্রেসের সাফল্য আমার সাফল্য। কংগ্রেসের পরাজয় আমার পরাজয়। কংগ্রেসের হয়ে আমি কাজ করি। প্রতিদান হিসেবে কিছুই চাই না। আমার চাকরীর জন্যে কোনও দিন কাউকে বলিনি। বলবও না।'

ভোট আসছে। বাতাসে এখন ভোটের হাওয়া। পাড়ায় পাড়ায় রাজনৈতিক কর্মীরা ব্যস্ত। কারোরই এখন দম ফেলার সময় নেই। ব্যস্ত মেয়েরাও। রমা, শিখা, মণিকারা বাড়ি বাড়ি ধরণা দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই সব মেয়েদের ভূমিকাও কিছু কম নয়।

রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী গীতিকা মৈত্র বললেন, আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে কাজ করতে মেয়েরা তৈরি। প্রায় দু হাজার মহিলা কংগ্রেসকর্মী কলকাতা ও শহরতলিতে নির্বাচনে খাটাখাটুনি করবেন।

শাসক কংগ্রেস ছাড়াও অন্যান্য দল আছে। আছে নির্দল প্রার্থী। তাদের হয়েও বহু মহিলা কর্মী কাজে নেমেছেন। যেসব কেন্দ্রে মহিলা প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মেয়েদের ভূমিকা সেখানে অনেক বেশি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে দল এবং প্রার্থী সম্বন্ধে ভোটারদের বোঝানোর দায়িত্ব তাঁদেরই বেশি করে নিতে হয়। ভোটাররা এইসব মহিলা কর্মীদের কথাই বেশি বিশ্বাস করে।

মোট চারজন

পশ্চিমবঙ্গে এবার ৪২টি লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের একাধিক মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। শাসক কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী হচ্ছেন দুজন—মায়া রায় এবং ডঃ ফুলরেণু গুহ। পাঁশকুড়া কেন্দ্রে জনতা পার্টির শ্রীমতী আভা মাইতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন ডঃ গুহ। বামপন্থী দলগুলিও দু-একজন মহিলা প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। সব মিলিয়ে এবার চারজন মহিলা প্রার্থী ভোট-যুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন। দেখা যাক কজন সংসদে জায়গা পান।

১৯৭১ সালে লোকসভার নির্বাচনে সারা দেশে মোট ৮৬ জন মহিলা প্রার্থী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জয়ী হন মাত্র ২১ জন। ১৯৬৭ সালে মহিলা প্রার্থী ছিলেন মোট ৬৬ জন। নির্বাচিত হন ২৮ জন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ৬৫ জন মহিলা-প্রার্থীর মধ্যে লোকসভায় জায়গা পেয়েছিলেন ৩৩ জন।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে জনসংখ্যা ৪৪,৩১২,০১১ জন। এখানে স্ত্রী পুরুষের অনুপাত, ৮৭৮ জন স্ত্রীলোক হাজার করা পুরুষ প্রতি। এবার মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রায় এক কোটি।

'হ্যাঁ, আমি এবার প্রথম ভোট দেবো। কিন্তু কাকে দেব তাই ভাবছি। প্রার্থী অনেক। ভোট মোটে একটা।'

১৩৭, নগেন্দ্রনাথ রোড, দমদমের বাসিন্দা তপতী চট্টোপাধ্যায় মাথা দুলিয়ে বলল, 'প্রথম ভোট দেওয়ার অধিকার পেলাম সেই ভেবে যেমন খুশি, ভোট প্রার্থীদের দিকে তাকিয়ে তেমনি হতাশ। পশ্চিমবঙ্গে এবার একাধিক দল। একাধিক মতবাদ। ভোটারদের এবার বেশ সতর্কভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।' তপতী এবার পার্ট-টু দিচ্ছে।

—'আপনি ভোট দেওয়ার সময় কোনটা দেখবেন, প্রার্থী না দল?'

'দুটোই দেখা দরকার।' তপতী জোরের সঙ্গে বলল, 'তবে দলের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় কম যোগ্য লোককেও নির্বাচিত করতে হয়। আমি দল দেখব।'

'যতবার ভোট হয়েছে ভোট দিয়ে এসেছি। এবারও দেব। এ ব্যাপারে কেউ আমাকে বাধা করতে পারে নি। পারবেও না। আমি ভোট দেব আমার বিবেচনা মত।'

ষাট বছরের বৃদ্ধা রাধারাণী দেবী আমার প্রশ্ন করা মাত্রই সাফ জানিয়ে দিলেন দলের প্রচারক ধরে নিয়ে।

কাশীপুর নির্বাচনী কেন্দ্রের দীর্ঘদিনের মহিলা-ভোটার রাধারাণী দেবী মনে করেন প্রধানমন্ত্রী পদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আরও কিছুকাল থাকা উচিত। জিনিসপত্রের দাম বহু গুণ বেড়েছে। নাতিরা কেউ চাকরী পাচ্ছে না। দেশজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি চলেছে। সব খবরই তিনি রাখেন। কিন্তু এ জন্য কংগ্রেস দায়ী। কেউ এসে তাঁর সামনে এমন কথা বললে তিনি বেশিক্ষণ সেখানে থাকেন না।

কান পেতে শুনলে জাতীয় জীবনের ধুকধুকিতে আজ নির্বাচনের স্পন্দন শোনা যাবে।

ভোটের আয়োজনে দেশ মেতে উঠেছে। যার ভোট নেই সেও ভোটের কথা ভাবছে। যার আছে সে তো ভাবছেই। পনেরো কোটি টাকার মহাযজ্ঞে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-তৎপরতার ঢেউ উঠেছে তাতে সামিল প্রায় সকলেই। কে ঠিক কে বেঠিক সেটা বড় কথা নয়। এটা জনগণের মতামত। বত্রিশ কোটি ভোটারের মধ্যে এই মতামত খুবই দামী।

তথ্যের পর তথ্য কল্পনা দিয়ে সাজিয়েছেন—শংকর ঘোষ, কাজল মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ সরকার, অমিতাভ চক্রবর্তী, আশিস্‌ ..., অশোককুমার চক্রবর্তী, প্রসূন মিত্র এবং আরও একজন।

ডাক্তার উকিল শিক্ষিকা এম এল এ

ছবির অভাবে

এম এল এ থেকে ডাক্তার

ইন্দিরার জন্যে মেয়েরা ভোট দিয়ে থাকে একথা সত্য নয়
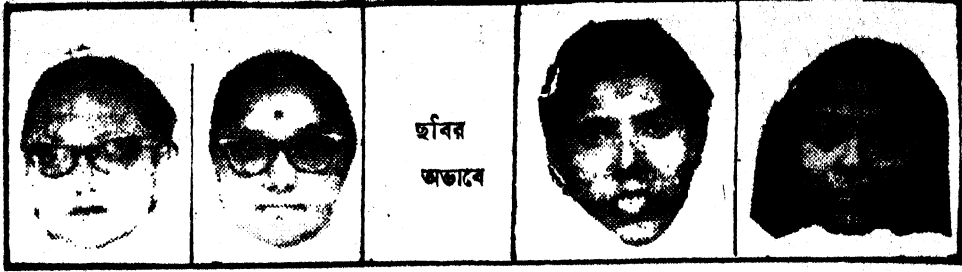
এই নির্বাচনে আপনারা কি ভাবছেন? প্রশ্ন রেখেছিলাম পাঁচজন মহিলা ভোটারের কাছে। তাঁরা হলেন : এম-এল-এ শ্রীমতী মীরা মিত্র, অ্যাডভোকেট শ্রীমতী মুক্তি মৈত্র, চিকিৎসক ডাঃ আরতি চৌধুরী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন-সংযোগ অফিসার শ্রীমতী অদিতি শ্যাম ও শিক্ষিকা কৃষ্ণা চক্রবর্তী।

পাঁচজনেই বলেছেন, মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়েছে সত্য—কিন্তু সেই অধিকার কতটা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, তা ভেবে দেখা দরকার। পাঁচজনের কেউই স্বীকার করেন না, মেয়েরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্যই ভোট দিয়ে থাকেন। পাঁচজনেই বলেছেন, কেবল ভোটের অধিকার পেলেই নারীমুক্তি ত্বরান্বিত হয় না। আমাদের দেশেও তা হয়নি।

চব্বিশ পরগণার গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের জন-প্রতিনিধি কংগ্রেসের শ্রীমতী মীরা মিত্র বলছিলেন গাঁয়ের মহিলা ভোটারদের কথা। ভোটের ব্যাপারে সচেতনতা মেয়েদের মধ্যে—কী শহরে, কী গ্রামে এখনও খুব একটা দেখা যায় না। তবে ভোট দিতে যাওয়ার ব্যাপারে গ্রামের মেয়েদের উৎসাহ খুব বেশি। নিজেদের উদ্যোগে মেয়েরা অবশ্য ভোট খুব কমই দিতে যায়। ভোট দিতে নিয়ে যেতে হয়। দশ বছর আগে দেখেছি ভোট দিতে যাওয়ার জন্য পাঁচজনের সামনে বের হওয়ার মতো শাড়ি অধিকাংশ বৌ-ঝির ছিল না। সে তুলনায় এখন অবস্থা অনেক ভালো। তবে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে মেয়েদের নিজস্ব মতামত বড় একটা নেই। কাকে ভোট দিতে হবে, এ ব্যাপারে স্ত্রীরা নির্ভর করে স্বামীদের উপর, স্বামীরা নির্ভর করে মোড়লের উপর। আগেকার চেহারাটা ছিল এইরকম। এখন একটু রকমফের ঘটলেও, পদ্ধতিটা প্রায় একই থেকে গিয়েছে।

মীরা দেবীর ধারণা, শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে রাজনীতি ও ভোটাভুটির ব্যাপারে আগ্রহ কম। এমন শিক্ষিত মেয়েও আছে যারা সবকয়টি রাজনৈতিক দলের নামও জানে না।

এতদসত্ত্বেও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মেয়েরা রাজনীতিতে এগিয়ে আসছে। আমার মিটিং-এ মেয়েদের ভীড় হয় খুব।

বললেন, মেয়েরা সাধারণত দল বেঁধে ভোট দিতে যায়। এখন প্রায় সব মেয়েই জানে, কী করে ভোট দিতে হয়।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মধ্যে ক্রিকেট ও ইলেকশন—দুইয়েরই আগ্রহ ক্রমে বাড়ছে। তবে একটি জিনিস লক্ষণীয়, ঘন ঘন ভোট দিতে হলে মেয়েরা খুব বিরক্তি প্রকাশ করে না।

শ্রীমতী মিত্র বললেন, ভোট দেওয়াই শেষ কথা নয়: মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আরও ব্যাপকভাবে দিতে না পারলে, ভোটের সুফলও মিলবে না। স্বাধীনভাবে [illegible] সঙ্গে [illegible] সুযোগ মেয়েরা যত বেশি পাবে [illegible] সমাজ ব্যবস্থারও ততই মঙ্গল। এখনও গ্রামের মেয়েদের কম বয়সে বিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধির শিকার হতে হয়।

না। আমি স্বীকার করি না, মেয়েরা কেবলমাত্র শ্রীমতী গান্ধীর কথা ভেবেই ভোট দিয়ে থাকে। তবে শ্রীমতী গান্ধী যে এ কালের ভারতীয় নারী সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে বিরাট এক ভূমিকা পালন করেছেন, তাতে কোন সন্দেহই নেই:

অ্যাডভোকেট মুক্তি মৈত্র কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করছেন প্রায় ২৩ বছর। বাপের বাড়িতে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় মানুষ। বাবা শশাঙ্কশেখর সান্যাল প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ থেকেই বাংলার রাজনীতিতে সুপরিচিত নাম। এবারও লোকসভার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর মতে, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা আগে যা ছিল, এখন তার চেয়েও খারাপ।

তিনি বললেন, ৭১ সালের নির্বাচনে কিছু মেয়েকে দেখেছি শ্রীমতী গান্ধীর কথা মনে রেখে ভোট দিতে। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম। সাধারণভাবে শ্রীমতী গান্ধীর জন্য মেয়েরা ভোট দিয়ে থাকে—একথা সত্য নয়।

তিনি বলেন, মেয়েরা ভোটের অধিকার পেলেও স্বেচ্ছায় তা প্রয়োগের স্বাধীনতা পায়নি। সামাজিক কাঠামোই আমাদের এমন যে, মেয়েরা নিজের পছন্দ মতো দিতে পারে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এ ব্যাপারে মেয়েরা স্বামী বা অন্য অভিভাবকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমন ঘটনা দেখেছি যে, স্ত্রী অন্য কাউকে ভোট দেবার বাসনা প্রকাশ করায় বাড়িতে তুমুল অশান্তি হয়ে গিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী ভোট দিতে হয়। সাবালক পুত্রের কথায় মা ভোট দিয়ে এসেছেন এবং তাতেই তার তৃপ্তি—এমনও দেখেছি! ভোট দেওয়ার ব্যাপারে বাড়ির ২১ বছরের ছেলের যে স্বাধীনতা আছে, এই বয়সীরই মেয়ে বা বউ-এর সে স্বাধীনতা নেই।

শ্রীমতী মৈত্র স্বাধীনতার আগে বাবার পক্ষে নির্বাচনে কাজ করেছেন। সেদিনের সঙ্গে একালের তুলনা করতে গিয়ে বলেন, আগে মেয়েরা বড় একটা ভোট দিতে আসতো না। বাড়ি থেকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে যেতে হতো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে। ৬৫ সালের পর থেকে দেখছি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মেয়েদের লম্বা লাইন। গাঁয়ের মেয়েদের তুলনায় শহরের মেয়েদের মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা বেশি। তবে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে মেয়েদের বড় একটা শুনিনি।

দিয়ে বেগুন ঝোল রান্নায় যত সময় ব্যয় হয়, রাজনীতি প্রসঙ্গ তার চেয়েও কম সময় পায়। তবে স্বাধীনতার আগেকার সময়ের তুলনায় রাজনীতি নিয়ে এখন অনেক বেশি মেয়ে কথাবার্তা বলে। স্বাধীনতার আগে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম : তখনকার দিনে মেয়েরা কেউ বড় একটা খবরের কাগজ পড়তো না। এখন প্রায় প্রত্যেকেই পড়ে। এর জন্যই বোধহয় আগ্রহ না থাকলেও রাজনীতি সংক্রান্ত কিছু না কিছু খবর এখনকার মেয়েরা রাখে।

শ্রীমতী মৈত্র জানালেন প্রার্থী [illegible] দলই [illegible]। ভোট দেওয়ার আগে তিনি বিচার করে দেখেন, [illegible] কী করতে পেরেছে এবং অন্য দলগুলিই বা কী করতে [illegible]।

অদিতি শ্যাম মনে করেন
সার্বিক স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়নি

ডাঃ আরতি চৌধুরী একজন চিকিৎসক। কলকাতার একটি মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন। অন্য সময় প্র্যাকটিশ করেন। চিকিৎসার সূত্রে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। তাঁর মতে রুগীদের সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা বাঞ্ছনীয় নয়। সময়ই বা কোথায়।

ডাঃ চৌধুরীর বাপের বাড়ির সবাই ডাক্তার। তিনি যে পরিমণ্ডলে মানুষ হয়েছেন, সেখানে রাজনীতি বিজ্ঞানের চেয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোচনা হতো বেশি। তিনি স্বীকার করেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিপুল প্রভাব আমাদের মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছে। শ্রীমতী গান্ধীর সাফল্যের কারণ কী? এর উত্তরে তিনি বলেন, শ্রীমতী গান্ধীর প্রখর ব্যক্তিত্ব। মেয়েরাও যে বিশাল ভারতবর্ষ শাসন করার মতো কঠিন কাজ করতে পারে, এটা তিনি প্রমাণ করেছেন। এর ফলে আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনাও অনেক বেড়েছে।

তাঁর মতে দলের চেয়ে প্রার্থীর গুণাবলীই প্রধান বিবেচ্য। কাকে ভোট দিচ্ছি, তার ব্যক্তিগত গুণাবলী কি, তাকে সমর্থন করা চলে কিনা—এসব ভেবে ভোট দিয়ে থাকি। বহু মেয়েই শ্রীমতী গান্ধীর কথা ভেবে তাঁর দলের প্রার্থীদের ভোট দিয়েছে—এটা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ভোট দেওয়ার ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীই একমাত্র কারণ—তা মনে হয় না।

সাতান্ন সাল থেকে ভোট দিয়ে আসছেন ডাঃ চৌধুরী। তিনি বললেন, আগের তুলনায় এখন মেয়েরা অনেক বেশি সংখ্যায় ভোট দিয়ে থাকে। ভোট দেওয়ার ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে। তবে রাজনৈতিক সচেতনতা বলতে যা বোঝায়—মেয়েদের মধ্যে তা সেই তুলনায় বাড়েনি।

কথায় কথায় ডাঃ চৌধুরী বলেন, ভোটের অধিকার দিলেই মেয়েদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। হয়ওনি। আমরা তো বিশ বছর ধরে ভোট দিয়ে এসেছি। কিন্তু মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কতখানি অর্জিত হয়েছে? ব্যক্তিগত প্রতিভা স্ফুরণের ক্ষেত্রে—এখনও আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। সুযোগ-সুবিধা থাকলে রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেয়েরা অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারতো। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা না পেলে মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তাও আসে না।

একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ অফিসার শ্রীমতী অদিতি শ্যামও মনে করেন, শ্রীমতী গান্ধীর প্রভাব ভারতের নারী জাতির অগ্রগতিকে সহায়তা করেছে। ভারতের মেয়েদের উন্নতির জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতী গান্ধীর সাফল্যের মূলে তিনি চারটি কারণ দেখিয়েছেন। এক, পারিবারিক ঐতিহ্য; দুই, সুযোগের সদ্ব্যবহার; তিন, স্বাভাবিক গুণাবলীর ক্রমোন্নতি; চার, গভীর পর্যবেক্ষণ দৃষ্টি।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, এখনও আমাদের দেশে মেয়েদের সার্বিক স্বাধীনতা লাভের পথ প্রশস্ত হয়নি। কারণ, সর্বাগ্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করা চাই। অনেক কিছুই হচ্ছে, আবার বাকিও অনেক। শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এই প্রত্যাশা আছে যে, বাকি অনেক কাজ তিনি করে যেতে পারবেন।

মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ খুব সহজেই আমরা এই অধিকার পেয়ে গিয়েছি। এরজন্য আমাদের কোন মূল্য দিতে হয়নি। সহজে যা পাওয়া যায়, তার মূল্য আমরা সহজে বুঝতে পারি না। সেইজন্যই এই অধিকার সম্পর্কে আমরা অতটা সচেতন নই। তবে মেয়েদের

১০০০\৭৫০

পশ্চিম বাংলায় প্রতি এক হাজার জন পুরুষে নারী ভোটারের সংখ্যা : সাড়ে সাতশ জন।

এবারকার ভোটের খরচ বেশি : ১৫ কোটি টাকা। ভোটার সংখ্যাও বেশি : ৩২ কোটি। পশ্চিম বাংলার ভোটার সংখ্যা : ২ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি।

এককালে চাষী পরিবারের অনেকেই এখন ভিখারি। এমন একটি পরিবারের মেয়ের অভিজ্ঞতা : বহুদিন আগে কারা যেন তাকে বাক্সে লালঝাণ্ডার ভোট দিতে নিয়ে গিয়েছিল। আর কোন খবর জানেও না। উৎসাহও নেই। এ রাজ্যে ৪৬ হাজার ভিখিরি। তার মধ্যে ২৮০০০ জন এসেছে ভূমিহীন চাষী পরিবার থেকে।

দুই দশকে ভোটদাতাদের শতাংশ বৃদ্ধির দিকেই।

এক সমীক্ষায় জনসাধারণের মাত্র ২৯ শতাংশ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ৩৬ শতাংশের অভিমত : ভারতে রাজনৈতিক দল দরকার। কিন্তু ২১ শতাংশ দলহীন ব্যবস্থার পক্ষপাতী। ৩৫ শতাংশ প্রশ্নের উত্তর জানেন না। ৫৪-৮ শতাংশের মত : গ্রাম ও শহরের সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক দলের কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই।

ভোটারদের স্বরূপ

হিন্দু, নিম্নবর্ণ, গ্রামবাসী, কৃষিজীবী—বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে অচেতন। বয়েস ৩৫-এর নিচে। বিবাহিত। ভারাক্রান্ত জনক। বার্ষিক আয় ৭০০ টাকা। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়। রাজনৈতিক চেতনা অস্পষ্ট। কংগ্রেসের প্রতি [illegible]।

১৯৬৭ সালের নমুনা সংগ্রহ

ভোটারদের ৮০ শতাংশ হিন্দু, ৭৭-২৬ শতাংশ গ্রামের বাসিন্দা, ৫১-২৯ শতাংশ নিরক্ষর, ৩৩-৪৯ শতাংশ যৎসামান্য শিক্ষিত, ৪০-৮৮ শতাংশ চাষী। ক্ষেত্রমালিক, ১২-৪৬ শতাংশ ভূমিহীন চাষী, ৩৫-২৪ শতাংশ মাসিক আয় ১০০ টাকার কম, ২৬-৯৫ শতাংশ আয় ১০০-২০০-র মধ্যে, মাত্র ৮-৭০ শতাংশ ৮০০র বেশি, ৬০-৮৭ শতাংশ জন্ম এই শতকের তিন দশকে, ৯০ শতাংশ রাজনৈতিক দলভুক্ত নন, ৫১-৩ শতাংশ অভিমত : কংগ্রেস অন্য দলের চেয়ে বেশি জনকল্যাণক্ষম।

ইন্দিরা

ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এই নিয়ে তিনবার লোকসভা নির্বাচনে নামছে। আগের তিনবার নেহরুর নেতৃত্বে। নেহরু আমলে লোকসভার পূর্ণ মেয়াদ বজায় রাখার রেওয়াজ দেখা গিয়েছে। ১৯৬৭ নির্বাচনে ইন্দিরা ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন। ১৯৭০এ ৪র্থ লোকসভার মেয়াদের ১৪ মাস আগে অন্তর্বর্তী নির্বাচন চাইলেন। এ বছরও ১৪ মাস আগে মেয়াদ শেষ হল। প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময় জনতার রায় নিতে পারেন। অন্তর্বর্তী নির্বাচন অবশ্যই সংবিধানসম্মত।

ষষ্ঠ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য : জরুরী অবস্থার সব রকম কড়াকড়ি তুলে দিয়ে বন্দীমুক্তি দিয়ে সরকার একটা নতুন ডাইমেনশন তৈরী করেছেন। বিশদফা আর পাঁচ দফা : মুদ্রাস্ফীতিরোধ, অবৈধ মজুত ও চালান বন্ধ করার সরকারের হাতে মোক্ষম অস্ত্র। সরকার জয়লাভে প্রত্যয়ী। বিরোধী শিবিরের প্রধান হাতিয়ার : এমারজেন্সি। ব্যক্তিস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করেছেন বর্তমান সরকার—এই হচ্ছে বিরোধীদের মুখ্য প্রচার।

স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে ভোট

মধ্যে এখন ভোট দেওয়ার আগ্রহ খুব বেড়েছে। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা বড় একটা হয় না। কলেজে পড়ার সময়ও দেখেছি, নির্বাচন ভোট সরকার ইত্যাদি নিয়ে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা সামান্যই হতো। এখনও যাদের সঙ্গে দেখা হয়, কথা ওঠে বিবিধ প্রসঙ্গে। রাজনীতি কদাচিৎ। আলোচনা বেশিক্ষণ চলে না। এ ব্যাপারে ছেলেরা দেখেছি খুব উৎসাহী।

শ্রীমতী গান্ধীর জন্যই মেয়েরা ভোট দিয়ে থাকে বা শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনী সাফল্যের মূলে মেয়েদের ভোট—এটা সবসময় সত্যি নয়। তবে মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর প্রভাব রয়েছে, তা মানতেই হবে।

শ্রীমতী শ্যাম জানান, ভোট দেওয়ার ব্যাপারে আমি প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণের কথা ভাবি। এমন বহু লোক আছেন যাঁরা কোন দলের নন, অথচ যোগ্য লোক, কিছু কাজ করতে চান—তাঁদের কথাও বিবেচনা করা উচিত।

দক্ষিণ কলকাতার একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্তী ৬২ সাল থেকে ভোট দিয়ে আসছেন। জানালেন, তিনি বরাবর একই দলের প্রার্থীকে ভোট দেননি। দলের ব্যর্থতা তাঁকে প্রার্থী বদলে বাধ্য করেছে। তবে তিনি মনে করেন, দলের কথা ভেবেই ভোট দেওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা গৌণ। দলের নীতি ও আদর্শই তাঁর কাছে প্রধান বিবেচ্য। তিনি আরও মনে করেন, যে দলই ক্ষমতায় আসুক—কী রাজ্যে, কী কেন্দ্রে—ভালো গরিষ্ঠতা নিয়ে যাওয়া দরকার। না হলে সরকারের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়েই সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কাজ হবে কখন?

শ্রীমতী চক্রবর্তী মনে করেন, আগের থেকে এখনকার মেয়েরা রাজনীতি নিয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামায়। এর পেছনে আছে ১৯৬৯-৭১ সালের দিনগুলির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। আর আছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রভাব। শ্রীমতী গান্ধী আমাদের কাছে একটি উদাহরণ। আগে ধারণা ছিল, মেয়েদের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষমতা সীমিত। শ্রীমতী গান্ধীকে দেখে এই ভুল ভেঙেছে।

রাজনীতি সচেতনতা তেমনভাবে না বাড়লেও নির্বাচনের ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে। তবে, ভোট দেওয়ার ব্যাপারে মেয়েরা প্রায়ই পরিবারের অভিভাবক স্থানীয় লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। স্বাধীনভাবে ভোট প্রয়োগের দৃঢ় মানসিকতা অনেকেরই নেই। আমাদের পারিবারিক অনুশাসন বিধিই এরজন্য দায়ী। এটা কাটতে সময় লাগবে।

ভোট দেওয়া উচিত, এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী চক্রবর্তী বলেন, অধিকার থাকলে তা প্রয়োগ করা দরকার। নাগরিক হিসাবে আমার যেমন কিছু প্রত্যাশা আছে, তেমনি কিছু কর্তব্যও আছে। ভোট দেওয়াটা এই কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলে মনে করি। তাছাড়া, পরোক্ষভাবে হলেও দেশের শাসন পরিচালনায় আমারও একটা ভূমিকা আছে এবং তা এভাবেই পালন করা যেতে পারে।

অমৃত প্রসঙ্গে

প্রথম সংখ্যা থেকেই আমরা অমৃত-এর নিয়মিত পাঠক। দীর্ঘকাল ধরে বাঙালী সাময়িকপত্র পাঠকদের মন খারাপের যুগ চলেছে। তাই অমৃত-এর আবির্ভাবকে আমরা মনে মনে স্বাগত জানাতে দেরী করিনি এবং আমরা দীর্ঘ ষোল বছর ধরে অমৃত-এর প্রতিটি সংখ্যাকে পাঠকের তৃপ্তি সাধনের উপযোগী করে তোলার জন্য অবিরাম যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে আসছে তা অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। ১৬ বর্ষ ৩৪ সংখ্যাটিকে (১৪-১-৭৭) তো আপনারা —যাকে বলে 'ষোড়শোপচারে' পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। 'সাহিত্য' থেকে 'পুনশ্চ' পর্যন্ত ঠাসা পাঠ্যবস্তুর বিষয় বৈচিত্র্যে যে কোন পাঠকের মন আনন্দে ভরে উঠবে। বৈকুণ্ঠ পাঠকের 'বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন' ও শান্তিদেবের 'প্রেম ও কবিতা প্রসঙ্গে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়' (মাঝে 'কুমার' না থাকায় অবশ্য একটু চমকে গেছি)-এর জবাব নেই। এই সংখ্যাতেই 'নতুন বই' বিভাগে আলোচিত গ্রন্থকারদের ছবি ছাপানো শুরু হলো। বিদেশে, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে এ রেওয়াজ বহুদিনের হলেও বাংলা সাময়িকপত্র জগতে এমন একটি সুন্দর বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক হিসেবে আপনারা অজস্র পাঠকের অকুণ্ঠ ধন্যবাদের পাত্র হলেন।

কিন্তু সূচীপত্রে বিষয়-নামের পাশে বন্ধনী মধ্যে 'কবিতা' শব্দটির অনুপস্থিতিতে আমরা চমকে উঠেছিলাম। কেন না, যতদূর মনে পড়ছে আজ পর্যন্ত অমৃত-এর কোন সাধারণ সংখ্যাই কবিতা-হীন হয়ে প্রকাশিত হয়নি। হঠাৎ এ কি হলো! অবশ্য আমাদের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ৩৬ পৃষ্ঠায়, যেখানে ছবি ও কবি পরিচিতিসহ প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের তিনটি সুন্দর কবিতা। এভাবে কবির ছবি ও কবি পরিচিতিসহ একজন কবির গুচ্ছ কবিতার প্রকাশও বাংলা সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে সম্ভবত এই প্রথম। তবু আমরা আমাদের চিরপরিচিত 'কবিতা'র সেই সাপ্তাহিক পাতাটিকে ছেড়ে দিতে রাজি নই। ঐ পাতাতেই আমরা অনেক নতুন কবির কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়েছি এবং ভবিষ্যতেও হবার আশা রাখি। কাজেই, আমাদের একান্ত অনুরোধ ছবি ও পরিচিতিসহ গুচ্ছ কবিতার পাতাটি প্রতি সপ্তাহে দেওয়া সম্ভব না হলেও 'কবিতা'র সাপ্তাহিক পাতাটি থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই। —দুর্গা বর্মণ; অমরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; পুরুলিয়া।

(২)

আপনার সম্পাদিত 'অমৃত' পত্রিকার বুদ্ধিদীপ্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আমরা আগেও 'অমৃত' পড়েছি কিন্তু এমনটি চোখে পড়েনি। যেমন ধরুন—বৈকুণ্ঠ পাঠকের 'সাহিত্য' বিষয়ক লেখা—এমন তীক্ষ্ণ রচনা 'অমৃতে' ভাবা যায় না। কবিতার বিভাগটির পরিবর্তন সুন্দর হয়েছে। বাংলা ভাষায় অন্য কাগজে এমন আছে কি? বোধ হয় না। অমৃত বড় একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। এবার যেন নতুন চেহারা নিচ্ছে। পরিবর্তনটির মধ্যে এখন বক্তব্যের ছাপ লক্ষ্য করছি। খেলাধুলো ও চলচ্চিত্রের লেখাগুলি বেশ বৈচিত্র্যময় হচ্ছে। চলচ্চিত্রের আলোচনার যে পরিবর্তন সেটাও প্রশংসার। 'সব্যসাচী' ছবির আলোচনাটি সঠিক ও সুন্দর। —শ্বেতা ধাম; বেলেঘাটা, কলকাতা—১০।

(৩)

'অমৃত' পত্রিকার পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। কয়েকটি লেখা সত্যিই ভাল যেমন, বৈকুণ্ঠ পাঠকের সাহিত্য, বইয়ের সমালোচনা, সন্তোষ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বুদ্ধদেব বসু ও কলকাতার একটি রাস্তা এবং দীপালি দস্তুরায়ের উপন্যাসটি। এছাড়া গানের বিভাগে আমীর খাঁ—ছয় ঋতু এবং মনোজিৎ মিত্রের গল্পটি ভাল লাগলো। আপনাদের পত্রিকার চিত্রসমালোচনা বেশ দুর্বল ছিল, এখন যেন নতুন কথা ও সুর লেখার মধ্যে। মোট কথা 'অমৃত' এখন আমাদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। —নন্দিনী চৌধুরী, কলকাতা—১০।

(৪)

অমৃতের নিয়মিত নতুন নতুন ফিচারগুলি আমার দারুণ ভাল লাগছে। আমি একজন অমৃতের নিয়মিত পাঠক। এবং অমৃত আমার দারুণ ভাল লাগে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারী সংখ্যাটি উপহার দেওয়ার জন্য, অজস্র ধন্যবাদ জানাই। ঐ সংখ্যায় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে আলোচনা নিশ্চয়ই অমৃতের মর্যাদা বাড়িয়েছে। অমৃতের নতুন ফিচারগুলি সত্যি সত্যি পাঠক মনে খুশীর জোয়ার এনেছে, কিন্তু গত কয়েকটি সংখ্যায় লক্ষ্য করে দেখেছি গল্পের হার আপনারা কমিয়ে দিয়েছেন। আমি একজন গল্প প্রিয় পাঠক আপনাদের নিকট অনুরোধ প্রতি সংখ্যায় দুটি থেকে তিনটি গল্প উপহার দিন। —ইব্রাহিম রহমান; [illegible]

গোটা শান্তিপুর লোকালটাই যেন আজ ঢাকের গাড়ি হয়ে গেছে। ভেন্ডারদের কামরাগুলোতে ঠাসা ঢাক, ওঠবার কোনো ফাঁকফোকরও নাই। সিজিনে সিজিনে ভেণ্ডার-কামরার মানুষজন পাল্টায় মালপত্তর পাল্টায়, কথাবার্তা পাল্টায়। ভেন্ডারদের কামরায় তাই কখনও আনাজপাতির গাদা কখনও ছানার জলের প্যাচপ্যাচে কাদা, কখনও মাছের চারার হাড়ি গপগপানো সারি সারি স্পন্দমান পেশী। আজ ষষ্ঠী—মা দুগ্‌গার পুজো, আজই ঢাকের সিজিন, শিয়ালদহ ইস্টিশনে আজ লাইনবন্দী ঢাক বসে বাদ্যি বাজাবে—শ-এ শ-এ হাজারে হাজারে হাত কথা জোটাবে হাজার হাজার ঢাকে, আলাদা আলাদা বোলে, হাতের কায়দার অদল-বদলে, মিহিন শিউলী ফুলের মতো কুরকুর আওয়াজ থেকে শুরু করে আরতির গম্ভীর টংকারের নাদ তুলে ঢাকগুলো। হাওয়ায় হাওয়ায় উত্তাল তরঙ্গ ঢেলে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির বলবোলে, ঝংকারে মাতিয়ে তুলবে ইস্টিশন, শহরের মাঞ্জামারা বাবুরা ঠোঁটে সিগারেট, লম্বা চুল, ঢোলাঢোলা প্যাণ্ট জামা পরে আসবে বায়না করতে আর বিকেলের ভেতরই বায়নায় বায়নায় ইস্টিশন চত্বরের সেই সমবেত টংকার ছড়িয়ে যাবে শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, এ তল্লাট থেকে ও তল্লাট। যার যেমন ভাগ্য, মা দুগ্‌গার যার উপর যত কৃপা, তারই তত কপাল খুলা, তত তাজা প্রাপ্তির ভাগে বায়না। ভেন্ডার কামরার ভিড়ের জন্য রতন উঠতে পারেনি। তাকে বাধ্য হয়েই পাশের একটা সাধারণ সেকেণ্ড কেলাশ কামরায় চড়তে হয়েছে। ট্রেনটা ইস্টিশনে থামতে, রতন স্বভাবত ঢাক কাঁধে ছুটে গিয়েছিল ভেন্ডার কামড়ার দিকে—সেখানে কোনো উপায় না-দেখে, পাশের কামরায় ছুটে যেতেই সাধারণ কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বাবুরা হেই-হেই করে উঠেছিল—'এত বড় একটা দশাসই ঢাক নিয়ে এই সকালবেলা আপিস টাইমের গাড়িতে নসল্লা করছ— যাও বাপু, অন্য কামরা দেখো।' ট্রেন তখন বাঁশি দিয়েছে। ইলেকট্রিকের ট্রেন কতক্ষণই বা দাঁড়ায়— ঠেলেঠুলে ঢুকে যায় রতন। লোকজন চেঁচামেচি শুরু করে। বাঁ-কাঁধে ঝোলানো কাপড়ে-মোড়া তার বিশাল ঢাকখানা লোক ঠাসা কামরার ভেতর উপায়ান্তরে সেঁধিয়ে পড়ায় এক বিশ্রী চাপের সৃষ্টি হয়। মাঝখানে একটা দলামোচড়া পাকানো পুন্যাত্তা হয়ে ঢাকটা চারপাশে লম্ব বাঁকা-তোরা মানুষজনের ভেতর আটকে যায়। ঢাকের গাটা লাল লাল ফুলকাটা কাপড়ে আর দুটো চামড়ার দিক মোটা নীল কাপড়ের ঢাকনায় মোড়া। 'এই এই ভাই! এ কী! এ কী! তোমার ঢাক সরাও ভাই! দাঁড়াবার জায়গাটারও দফা সারলে! তোমরা কী পেয়েছ বলো তো? একের পর এক ঢাক নিয়ে উঠছ! ভেন্ডার কামরায় যেতে পার না?' 'বাবু, এইবেলা ক্ষমা দেন বাবু!' ঢাকটা দুই হাতে আঁকড়ে রতন বলে, 'একটু সাইজ মারেন বাবু। আমার এই ঢাকটাকে ওই ধারে রাখি গিয়া। বাস—তাইলেই তো গোলমাল শ্যাষ। আর পুজোর সিজিন শুরু বাবু। আমরা শহর যাব—তার না বায়না হইবো, তার না মায়েব পুজো হইবো। ঢাকের বোল না বাজলে সিংহের উপর ঐ দেবীখান, কী চমমনাবে বাবু?'

'এখন তো মাইক আর গ্রামোফোনের যুগ হে—তোমার এই সব ঢাকটাক চলে আজকাল?'

বড় বড় লোহার আর কংক্রীটের সেতুবন্ধনে পারাপারের খেয়ারা হারিয়ে গেছে কোথায়, কোন অজ্ঞাতবাসে চলে যাচ্ছে মাঝিরা। ঢাকীরাও বুঝি মোহানায় চলে যাবে কখনও, ঢাকীরা ঠাকমা দিদিমার গল্প হয়া যাবে। শরতকালের আকাশে এমনিতেই কেমন মেঘছেঁড়া উতলা আভাস থাকে। বিশেষ করে রোদে। চলন্ত গাড়ির ফাঁকে বাইরে মাঠে ছড়ানো আলোর দিকে তাকিয়ে, পাশে ঢাকের ওপর হাত রেখে, রতনের মনে পড়ে যায় সরস্বতীর হাসিটা, অনেকটা এই শরতকালের, হলো গিয়া সিজিনসিজিন হাসিখান। সরস্বতীর কথা মনে পড়তেই সে ঢাকের দিকে তাকায়। গাড়ির দোলানীতে লালফুল কাপড় আর নীল ঢাকনা ঢাকা ঢাকখান অল্প অল্প দোল খায়। এই-গুলান সরস্বতী বানায় দিছিল। সিজিন-সিজিন হাসিমাখা সরস্বতী দোলে তার সামনে। কয়েক মাস আগে সরস্বতী শহরে

কাম খ‍ুঁজতে এসেছে। ঘরে পোলাপান না-খাওয়াইয়া হাভাত। দশ মাসের পোলা রাইখ্যা সেই যে সরস্বতী গ্যাছে গিয়া। আইবার সময় সরস্বতী যদি রইত। যাবার আগে খুব কেঁদেছিল সরস্বতী। কিন্তু এখন তো আর সংসার চলে না। বংশীদা বলে রতনদের চেনা একজন শহরে থাকে। অনেককে শহরে নিয়ে গেছে। তো একদিন বলল—সরস্বতী চলুক না আমার লগে, একখান কাম যদি ওইখানে হয়—তাইলে প্যাটের ভাবনার তো নিশ্চিন্দি। লালপাড় কোরা কাপড়খানায় লম্বা ঘোমটা টেনে যাবার আগে সরস্বতী ঝরঝর করে পোলাটাকে বুকে নিয়ে বসেছিল—কি যেন বলেছিল—শুনিয়ে। কোনো ইস্টিশানে গাড়িটা থামতেই বুকের ওপর মানুষের চাপ আরও বাড়ে। রতন দুটো পা ফাঁক করে রাখে। যাতে ঢাকটার গায়ে কোনো চাপ বা ধাক্কা না লাগে। ঢাক বড় আদুরে। সরস্বতী নিজের ছেঁড়া কাপড় তালি মাইরা মাইরা এই সব খোলস বানাইছিল। ঢাকটাকে ঘরের মাচানের ওপর তুলে রাখা, বিষ্টিবাদলে তালিমারা চালের ফুটো চোঁওয়া জলে যেন কোন ক্ষতি না হয়—সরস্বতী এককেরে সজাগ। পেত্যেকদিন ঝাড়পোঁছ—ঢাকনা খুইল্যা খুইল্যা রোদতাপ মাখাইয়া চামড়া টান টান রাখা। মেঘ গরজাইলে উপরে ভারী কিছু চাপা দেওয়া—ফাইটা না যায়। একমাস দুই মাস কইর‍্যা সিজিন আইতে থাকে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসভর চামড়া-পোড়া রোদে ঢাকখান তাইয়ে তাইয়ে সরস্বতী ঢাকের অন্তবর্তী বাজনাকে যেন গড়ে তোলে। অনাহত চামড়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বোলগুলো গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো ঘাই মারে, লাথি মারে, গোঁত্তা দেয়, আর একটামাত্র কাঠির সামান্য আঘাতেই ফোটে যায়—ঝংকৃত ছন্দময়—ডাম কুর কুর ড্যাং ড্যাং ড্যাং দিয়ে তা না না, ডাম তিন তিন, গিয়ে তা গিনি, গিন গিনা, গিন তিনা না তিনা, কুর কুর কুর, দিয়ে তা দিয়ে তিন তা না তিন, দিয়ে দিম দিয়ে দিম দিয়ে দিম দিয়ে দিম—শব্দের সুরলহরী এক সম্বন্ধ শৃংখলায় উৎসারিত হয়। উৎসের শব্দে দেহ পায়। ঢাকটার মোড়কগুলো সরস্বতী কাচত। কেচে চড়া রোদে ঢাকটার পাশে শুকোতে দিত। শুধু যে ঢাকের পোশাক পেলান তাই নয়, রতনের নীল জামাটা আর কস্টোলের কোরা ধুতিখানও। কাচত আর লম্বা দিয়ে ঢাকেরই পাশে শুকোতে দিত। প্রতিবারই পরদিন সকালবেলা সরস্বতীর পরিয়ে দেওয়া ঢাকের পোশাকে, চকচকে ঢাকটা নিয়ে, কাচা কাপড়-জামা পরে, রতন ঢাক কাঁধে রওনা দিত। হাওয়ায় রতনের চুল ওড়ে। তার জামা কাপড়ের দিকে তাকায় সে। এবার সরস্বতীর লালনহীন তার পোশাক, তার ময়লা ধুতি, তার এলোমেলো পরন, ঢাকের আধময়লা মোড়কগুলোন—সরস্বতী! একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ে রতন। তার হাত জামার পকেটে উঠে যায়—পকেটে একটা ভাঁজমলিন জীর্ণ পোস্টকার্ড। সরস্বতী মাস কয়েক আগে চিঠি দিয়েছিল। ওতে ঠিকানা ছিল কোথায় কাজ করে ও: কলকাতা, ইস্টিশানে, এই চিঠিখান দেখাইলে বাবুরা কয়া দিবে না। কয়া দিবে না—মোর সরস্বতী কাম করে কুন দিকে? পোস্টকার্ডটা সঙ্গে আনতে ভোলে নাই। একবার ছুঁয়ে দেখে। বাইরে ছড়ানো আলোয় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। নীল আকাশ আর বড় বড় টেলিগ্রাফ ওয়ারের থাম্বার মাথায় মাথায় লটকে লটকে আছে উচ্ছলতা। ভাদ্দের টান ধরেছে রোদে—হাওয়া স্যাঁত-স্যাঁতা নাই আর, গাছগুলানের ডাঁটপাতা চকচকা লকলকা মাঝে মাঝে ঝিরঝিরা ছেনালপানা বৃষ্টি হয়। বিকালে গা ধোয়ার মতো পথঘাট গাছপালা ভিজিয়ে আবার ঝিলিক। মেঘে ভার নাই মাটিতে ভার নাই, রোদে ভার নাই, মনটায় ভার নাই। সবই বেশ সিজিন-সিজিন। ঢাকের চারপাশে গোল হয়ে ভিড় বাড়তেই থাকে। আলম্বহীন বিচ্ছিন্ন শারীরিক অবস্থানে কামরাটা বাঁকা-চোরা হয়ে আছে। একটা দম-আটকানো ভিড় চারপাশ ঘেরে [illegible] আঁকড়ে ধরেছে—ভারি ক্লান্ত, একদম। পতনোন্মুখ শরীরপিণ্ড এক্ষুনি ঢাকটার চামড়ার ওপর দমাস করে পড়ে ভেঙে যাবে। রতন এক ঝটকায় ঢাকটার ওপর নিজের শরীর ঝুঁকিয়ে দেয়, বুকটা। ঢাকটার একটা বুক—নরম, টানটান নিহিত বাজনার অব্যক্ত ধ্বনিতে রিনরিনে বাঙ্ময় ধ্বনি প্রবাহময় শিরা উপশিরায় গভীর একটা বুক রতনের বুকে ঠেকে। যেন দশমাসী পোলাটার বুকে বুক লাগে। প্রায় একবছরী পোলাটা রতনের বুকে হাতের থাবা মারে। সোনাডা কই, আমার পরাণ, আমার লক্ষ্মীডা কই রে! রতন আদর করে, দ্যাখছাও, ক্যামনে বাবা মারে, আমারে, ক্যামনে পা ছোঁড়ে পোলা, দ্যাখছাও না! রতন শিশুর কোমল আঙুল ধরে নেড়ে নেয়। একটু ওঠে, শরীরটা শিশুর পাশে নিয়ে ওর পেটের চারপাশে খোঁচা দেয়। আর তার কুশলী ও অচেতন ছ্যাদাসর্ব হাতের অঙ্গুলি সঞ্চালনে শিশু খিলখিল করে হেসে ওঠে। দিয়ে দিয়ে তুন তা না না, তানা তুন দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে তুনা তুন। যেন ঢাকটাও খিলখিলিয়ে ওঠে।

'বুঝলেন না আজকাল চাল-চালান করবার তো সব নতুন নতুন ফন্দি বেরুচ্চে। সেদিন দেখি এইরকম একগাদা ঢাক নিয়ে উঠেছে। ঢাকের ভেতরটা ফাঁপা এই সুবাদে ফাঁকি দিয়ে ঢাক ঢাক চাল চোখের সামনে দিয়ে পাচার হয়ে গেল মশাই।' ফ্যালফ্যাল করে রতন চারপাশে তাকায়। চাল! ঢাকের ভেতর! রতনের! যার বৌ পেটের জ্বালায় ছমাস ঘড়ছাড়া দশ মাসের শিশু ফেলে। যার ঘরে একবেলা আহারের পর উপোস থাকতে হয় অনির্দিষ্ট। যার হাড়ভাঙা চষা মাটির ধান চোখের সামনে মালিক জোতদার লাঠিয়াল লাগিয়ে কেটে নিয়ে যায়। চষা থেকে রোয়াগাড়া, শস্য বেড়ে ওঠার গোটা পর্যায়েতে তার হাতের বেসিজিনের অবসর সময়কার অচেতন ছন্দ-বন্ধনে গোটা ফসলক্ষেত দুলে যায়, রং ধরে সবুজ, আবার চোখের সামনে সব ধূসর খড়াল হয়া যায়। তার ঢাকের ভেতর চাল। সেই ঢাক—বাবা যে-ঢাককে লক্ষ্মীমন্তের মতো রেখেছিলে। 'হেই বাবু কইত্যাছেনটা কি!' আমার ঢাকের ভিতর চালটাল কিছু নাই—বলে ঢাকের খোলস সরিয়ে আর দুবার টেঁআস টেঁআস শব্দ তোলে। অনুরণনহীন। কাপড়ের ঢাকনায় অনুরণন ব্যাহত হয়েছিল।

পেটের চামড়ায় চার পাঁচটা ভাঁজ পড়ে গেছে। ঢাকের চামড়ার টঙাস টঙাস শব্দ তোলা শেষে রতন হাতের তালুটা জামার ওপর দিয়ে পেটের চারদিকে বোলায়। কত-দিন ভালো করে খায় নাই। সক্কাল বেলা থেকে শহরে আসবার উত্তেজনায় তার খিদের কথা মনেই হয়নি। অথচ, তার খাওয়া হয়নি গত দুই দিন। ঘরের পোলাদের খাইতে দিলে নিজের খাওয়া জুটে না। ঘরে যা ছিল বেইচ্যা বুইচ্যা এই কয়দিন চালাইছে। তাকিয়েছিল এই সিজিনের দিকে। সর-স্বতীর টাকা [illegible]

কলকাতায় ওর কাছে হতো পয়সা পাওয়াই যাবে। আর বায়না তো আছেই। টাকা হবে। খাওয়াও হবে। পোলাপানদের জন্য চিন্তা হয়। চার-পাঁচ দিন কি হবে কে জানে। পকেটে পয়সা নাই, পেটে ভাত নাই, সমস্ত শরীর ময় খিদে, আর দুই হাতের অভুক্ত উপোসী শিরা উপশিরায় অচেতন সুপ্ত শব্দের টংকারধ্বনি নিয়ে রতন ইলেকট্রিক ট্রেনে করে হু হু ছুটে চলে কলকাতার দিকে। কলকাতায় বায়না আছে, টাকা আছে, খাওয়া আছে। সরস্বতী আছে। মনে পড়ে—এক সময়ে সরস্বতী গাইত আর রতন ঢাকে বোল তুলত :

জামতলায় সোনার টিয়া
ধিনাধিন্ না তিন্ তিনা
কুর কুরা কুর ধুমতাধিনা
মনে লয় আমি গিয়া
দিম দিমং দাদিম্ দিমা
ঘরে নাই দানাপিনা
ধিনাধিন্ ধিন্ ধা ধিনা
ক্যামনে হবো টিয়ার খানা
দি-দি দি দিন্ দা দিনা
ঘরে নাই সোনার পিঞ্জর
ধিন্ ধিন্ ধিনর ধিনর
ক্যামনে হইবো পক্ষীর ঘর
ধুন্ ধুন্ ধুম্‌কা ধুমর
ফলামু সোনার ফসল
কুর কুর কুর তানতা তিতল
বানামু পরান দিয়া
আনরে তর সোনার টিয়া
আনরে আন সোনার টিয়া
দিদিম দিদিম দি দি দি দামাম
গানের কাঁপিতে সরস্বতীকে ছুঁতে দামা।

ছুঁতে আর ঢাকের বোলে তার সন্তান তার অস্তিত্ব ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক সময় রতন শিয়ালদহ পোঁছে যায়।

শিয়ালদহে শরৎকাল নেমেছে। যে-উচ্ছলতা ট্রাকশন তারের থাম্বায় থাম্বায় লটকানো আকাশে আকাশে ব্যাপ্ত উড্ডীন পাখীদের ডানায় ডানায় প্রবাহিত এ দিগন্তে ও দিগন্তে, এক ট্রেন ঢাক নিয়ে সকাল বেলার নিয়মিত আপিস টাইমের শান্তিপুর লোক্যাল সেই ব্যাপ্ত উৎসব নিয়েই শেয়ালদায় ঢুকে পড়ে শঙ্খের ধ্বনি দিতে দিতে আর গোটা শেয়ালদায় প্ল্যাটফর্ম, ক্রমে ফটক, পেরিয়ে হলঘর, ডিঙিয়ে বাইরের চত্বরে, ঝাঁপিয়ে যায়।

ট্রেন থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকের কাঠি পড়তে শুরু করেছে। ঢাকে ঢাকে মুহূর্তে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের চারদিক ভর্তি হয়ে ওঠে। সবাই বাজাতে আরম্ভ করেছে। নেমে, রতন ওপর দিকে তাকায়। মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে লোহার বিম লাগানো ঢেউতোলা গোল ছাদ। তার থেকে ঋজু নেমে এসেছে ভারী থাম্বার সারি। ঢাকের সমবেত আওয়াজ ভূমি থেকে তীরের মতো মাথার ওপরকার গোল আকৃতিতে আঘাত করে ছিটকে ছটকে ধাক্কা খেয়ে ছিঁড়ে টুকরো হয়ে, বিভিন্ন ধারায় আবার ফিরে আসছে মাটিতে। ঊর্ধ্বগামী আওয়াজ ও নিম্নগামী বিচ্ছিন্ন, তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনির সংঘাতে তীব্র ঘূর্ণনের সৃষ্টি হয়—মাথার লাগে। রতন ঢাক বাজায় না। ভীড়ে ভীড়ে পায়ে পায়ে সে এগিয়ে যেতে চায় সামনের খোলা আকাশের নীচে, সে আকাশে শব্দ ছড়াতে চায়, সে আকাশ আনতে চায় শব্দে ধ্বনিতে ঢাকের বোলে—সমস্ত শরৎকাল যেন বোলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝেঁপে আসবে। বাইরে কলকাতার আকাশে, শেয়ালদার নতুন বিল্ডিং-এর মাথায়, ভাদ্রের রোদ্দুরে, পালক ভাসিয়ে উড়ে বেড়ায় খাম খিলেক পায়রা। কলকাতার আকাশে এরকম মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক ঝাঁক পায়রা অকারণ উড়ে উড়ে আকাশের যা শূন্যতায় একই অংশ ভরিয়ে তুলছে বার বার। ঘূর্ণমান এই উড়ন্ত গতিময়তায় মনে হয়, নীচের ঝুলন্ত ট্রাম-বাস দৌড়নো মানুষ ঠাসাঠাসি গাদা-গাদি ঘাম চাপ সব ঘুরতে ঘুরতে কল-কাতার ওপরের আকাশে উড়ে যাবে। রতনের সরস্বতীর কথা মনে পড়ে। ঢাকের তালের বোলে পাখীর মতো হাত ছড়িয়ে ঝিমিক ঝিমিক কোমর দুলিয়ে সরস্বতীও তো উড়াল দিত, মাধ্যাকর্ষণহীন হয়ে যেন ভেসে যাবে। ইতিমধ্যেই ঢাকীরা শেয়ালদা ঢোকবার মুখটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—যাতে বায়নার লোক এলেই প্রথমে তাদের চোখে পড়ে। দেখতে দেখতে ঢাকীদের সারি ভরাট হতে হতে রতন যখন সেখানে উড়ন্ত পায়রা দেখতে দেখতে পৌঁছল—তখন সে অনেক পেছনে। পেছনে বলে কী হয়েছে, বায়না তো হবে বাজনা শুনে, ঢাকের আওয়াজ শুনে। তবে ? প্ল্যাটফর্মের সব ঢাকীরা চত্বরে নেমে এসেছে। সবাই ঢাক বাজাচ্ছে। চত্বরটার নাগরিক শব্দমালা, ট্যাক্সি টেম্পো মালবোঝাই রিক্সা ঠেলা হুকার চীৎকার হঠাৎ উচ্চকিত স্বর গ্রামে চড়া ঢাকের এক দংগল আওয়াজে চাপা পড়ে চরিত্র বদলে নেয়। রতন কাঁধ থেকে ঢাক নামায়। আস্তে। ওপরের ঢাকনাটা খুলে ফেলে। কাঠির আঘাতে আঘাতে খাতপথ সমাতল চামড়ার কালো পেটানো অংশটা বেরিয়ে পড়ে। হাতের প্রসারিত চেটোটা সে ঢাকের চামড়াটার ওপর বুলিয়ে আনে। শব্দ টান-টান করবার জন্য ঢাকের গায়ের চামড়ার বাঁধগুলোর গোঁজা বাজনার কাঠি দুটো বার করে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে সেগুলো মোছে। ঢাকটাকে বাঁহাতে তুলে বাঁ-কাঁধে ঝোলায়। বাঁহাতে সরু কাঠিটা, মিহিন শব্দ আনবার জন্য, আর ডানহাতের পাজায় মোটা কাঠিটা ধরে। বাঁ-কাঁধটা ঝাঁকিয়ে ঢাকটাকে আড়াআড়ি করে নেয়। ডান হাতটা শরীর থেকে সরাতে সরাতে একটা আনু-ভূমিক দূরত্বে নিয়ে গিয়ে দ্রুত বাতাসের ঢেউ তুলে ঢাকের চামড়ায় আঘাত করেই, মুহূর্তেই দুই কাঠিতে কুর কুর কুর কুর মিহিন শিউলী কুঁড়ি ছড়াতে থাকে—ফলে টং করে এক সজোর ধ্বনির সঙ্গে আরতির বাজনার মতো একটা শব্দস্রোত বইতে থাকে রতনের ঢাক থেকে। কুর কুর কুর মিহিনতা থেকে সে ক্রমশঃ সম্বন্ধ তালের দিকে যেতে থাকে। ধীর লয় থেকে ক্রমশঃ জলদে—

নাক্কু নাকুর নাকুর নাকুর
নাক্কু নাকুর নাকুর নাকুর
নাক্কু নাকু নাক্কু নাকু নাক্কু নাকু
তা তিন্ তিনা
তিনা তিনা তিন্ তা তিনা
ধিঁধিম্ ধিঁধিম্ ধুম্‌তা
ধুম্‌তা ধুম্ ধুম্ ধুম্
দুমাই দুমাই দুমাই
ড্যাং ড্যা ড্যা ড্যাং
ড্যাং ড্যা ড্যা ড্যাং

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ধিন্ ধি না ধিন্ ধিন্ ধি না ধিন্ দিমিকি দিমিকি দিমি দিমি দাধ শেয়ালদা স্টেশনের এলোমেলো ছড়ানো ছিটোনো ট্রেন ব্যতীত অন্যান্য অনিয়মের ভেতর এই রকম তালফেরতা একটা সম্বন্ধ ছন্দ এনে দেয় হঠাৎ। আপিস টাইমের ট্রেনগুলো আসছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে গল-গল করে বেরুচ্ছে লোক। অন্য দিনকার ছন্নছাড়া বেসামাল আত্মমগ্ন দ্রুত পাগুলো হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের ধাক্কাধাক্কির পরই একটা ছন্দে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। ফলে এপাশের খোলা চত্বর থেকে প্ল্যাটফর্মের কাতারে

কাতারে প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকালে মনে হয়, সবাই যেন ছন্দে ছন্দে পা ফেলে পা ফেলে নাচতে নাচতে পদমর্দনায় স্টেশন পেরিয়ে আসছে। রোজকার এরকম ঘষ্যাত্তানো অভ্যাসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শেয়ালদায় নেমে, মহাত্মা গান্ধী রোড আপার সার্কুলারের ক্রসিং-এ সমস্ত শক্তি দিয়ে পাদানীতে ঝোলবার উপায়টুকু মাত্র করে নেবার মানসিক প্রস্তুতিতে, ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের অলিখিত আইনানুযায়ী ট্রেনে উঠেই ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে হঠাৎ শেয়ালদা আসবার আগেই জেগে উঠে ঘুম-জড়িত অসতর্ক ছেঁচড়ে-আনা পা টানতে টানতে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়েই হঠাৎ করে এতগুলো ঢাকের সর্বব্যাপ্ত অব্যবহিত ছন্দ-ঝংকারের প্রভাবে সমবেত গণনৃত্যের ভেতর পড়ে যাওয়ায় প্রত্যেকটি লোকই একটু হকচকিয়ে যায়। প্রত্যেকেই চাইছে, তালে তালে পা পড়বার পরম্পরাটা ভেঙে দিয়ে যাতে এলোমেলো পায়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু চত্বরের ঢাকিরা যেন আলেবোলে গোটা এলাকাটা এমন গাঢ় ঢেকে রেখেছে, সে-জাল এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই থাকে না—তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে সমবেত নৃত্য প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে আসতে থাকে। শারীরিক অস্বস্তি আর কেমন অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে এক-একটা দল সেই নিরুপায় নাচ শরীরে তুলে বেরিয়ে যায় বাইরে। বহমান এই জনস্রোতে গতিময়তাকে এমনিভাবে ঢাকের তালে জড়িয়ে নিতে নিতে, দুই হাতের প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে নিয়ে নিজের শিরা-উপশিরায় পেশীতে কোষে উত্তেজক ওষুধের মতো সুরমেশানো সেই ধ্বনি-মালাকে প্রবাহিত করে রতন আর ঢাক ক্রমশ একাকার হতে থাকে। মাথার ওপর-কার রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ, আকাশের শূন্যতায় ঘূর্ণ্যমান পায়রাগুলো, ইস্টিশন, নতুন বিল্ডিং উঠবার যন্ত্রপাতির দূরাগত আওয়াজ, লোকদের চীৎকার চেঁচামেচি, আর তার পেটের উপোষী যন্ত্রণা—সবকিছু এক ধ্বনিময় সুরছন্দবন্ধতায় যেন মিলে অম্বরের বৃত্ত হয়ে ওঠে। সেই ধ্বনিতত্ত্ববোধ তার গোটা শরীরময় ছড়িয়ে যেতে থাকে, চুল এলোমেলো হয়ে যায়, চোখ স্থির, রোমকূপে শরৎকালের শিশিরের মতো বিন্দু বিন্দু সৃজন ক্লান্তি,—সৃষ্টির প্রথম ওমকার যেন ওর চৈতন্য থেকে হস্ত-মুদ্রার সঞ্চালনে একটা চামড়ার বাদ্যে জেগে ওঠে। চারদিকে সেই দৈবপ্রেক্ষিত অশুভ ধ্বনির কোপানলে নন্দন, সৃষ্টির কেন্দ্র-বিন্দুতে বিনাশ—পুরাণের বিভিন্ন সৃষ্টি-শক্তি সমবেত, তাঁদের স্ব স্ব দেহ-নিঃসৃত স্ব স্ব সৃজনমহিমা শূন্যে গিয়ে এক অপূর্ব দৈব মিশ্রণে নবতর শক্তির জন্ম দেয়—সেই দেবীসত্তা সমবেত আহৃত শক্তিসম্বন্ধ মহিমায় নতুন ধ্বনিতে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন শুভ, রতনের কোন খেয়াল থাকে না। শরীর গরম হয়ে ওঠে। গায়ের জামা খুলে ফেলেছে। হাড় বের করা ভুখা কাঙাল শরীরটা, সরস্বতীর লাঞ্ছনহীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোন বেরিয়ে আসে। তার মুখে এতক্ষণ শরৎ-কালের কাশফুল আর ঢাকের বাজনার একটা উজ্জ্বলতা মিশে থাকায় শরীরের এই ক্ষুধা বোঝা যায়নি। হাতগুলো রোগা, হাড় বের করা বুক, গলাটা চিপিমারা সরু আটার গোলা, আর পিঠ খামচে-ধরা পেট-থাম। হাওয়ায় এত ধ্বনির পূর্ণতা, আকাশে উড়ন্ত পায়রাদের এত মুক্ত-প্রাণতা, শরৎকালের রৌদ্রে জলে শিকড়ে শাখায় ফুলে ফলে প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রার এই অন্বয়ে রতন সারা শরীর ফাটিয়ে বোল বাজায়, পুষ্টি নাই, আহার নাই, খিদাও নাই।

স্টেশনের চত্বর শূন্য করে সবাই চলে যায়। রতন আর ক'জন ঢাকীর বায়না হয় না। বেলা গড়িয়ে গেছে। শেয়ালদা স্টেশনের পশ্চিমদিকে বড় বড় হোটেল, বাড়ি দোকানের ছায়া-হেলে-যাওয়া সূর্যের আলোয় প্রলম্বিত ছায়া ফেলে শেয়ালদা স্টেশনের চত্বর ঢেকে নেয়। রতনের অবসন্ন ক্লান্ত, অভুক্ত শরীরটা একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে রতন গালে হাতে ঠেসে বসেছিল। বেলা পড়ে আসে। কল-কাতার বুকে ষষ্ঠীর আলো জ্বলে ওঠে। স্টেশন চত্বরটা আবার মুখর হয়ে যায়—মহানগরে ষষ্ঠী পুজো দেখবার জন্য লোকাল ট্রেনের যাত্রীতে। রঙীন পোশাক পরে এসেছে লোকেরা—কেউ স্ত্রী নিয়ে, কেউ ছেলেমেয়ে নিয়ে, কেউ একলা। রতন ওঠে। আস্তে আস্তে— শেয়ালদার মোড়ে আসে। হ্যারিসন রোড আর আপার সার-কুলারের ক্রসিং-এ একটা পুজো হচ্ছে। ফতেপুরসিক্রির মতো গেট করেছে। বুলন্দ-দরওয়াজা। টুনী বালবের মোহময় কারসাজিতে স্বপ্ন-স্বপ্ন হয়ে উঠেছে জায়গাটা। ঢাক কাঁধে রতন ট্রাম, বাস, সরকারি দোতলা, ট্যাক্সি, রিকসা, নতুন-ওঠা বাঁধাকপির বস্তাবোঝাই ঠেলা, কালো গাড়ি, স্কুটার, মোটর সাইকেল, টেম্পো, ঝাঁক ঝাঁক পথচারীদের মিলিত জ্যামের ভেতর নেমে পড়ে। ঢাকের সঙ্গে লোকজন-দের ধাক্কা লাগে। ঠেলা দিয়ে বেরিয়ে যায়। টাল খেয়ে রতনকে সামলাতে হয়। রতন একটি লোককেও স্থির দেখতে পায় না। ঢাক কাঁধে রতন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। হ্যারিসন রোড আর আপার সারকুলারের মোড়ে দীর্ঘ লাইনবন্দী গাড়ি—মানুষ ট্যাক্সি টেম্পো বাসের মাঝখানে একটা এলোমেলো ফাঁকে রতন আটকে পড়ে। আপার সারকুলার রোডটা পরিষ্কার করতে পুলিশ হ্যারিসন রোড বন্ধ করে পথ করে দিচ্ছে, সেইসব আটকে রতনের ঢাক এসে সামনে দাঁড়ায়। কাঠের প্ল্যাটফর্ম থেকে একজন পুলিশ চেঁচিয়ে ওঠে, 'এই হাটো।' রতন চেঁচামি শুনে সেদিকে তাকাতেই রতনের পেছনে যাত্রের ওপর দু-তিনটে ট্যাক্সি টেম্পো হর্ণ দিতেই চমকে সেদিকে ঘাড় ফেরানো রতনের পায়ের সামনে উল্টোদিক থেকে একটা ধুমসো লেল্যাণ্ড দাঁড়ালে রতনের ছিটকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রতনের পিছনে একটা সজোর বুটের লাথি এসে লাগায়, রতন সামনের দিকে দুলে-ওঠা ঢাক নিয়ে টাল খেলে একটা-দুটো-তিনটে পাঁচটা হাত ঢাকের পেছনের দিকে দমাস দমাস করে বাজাতে থাকলে চারদিক থেকে পাগলা হাতীর বৃংহনের উন্মত্ততায় অপেক্ষমান গাড়িঘোড়ার সবশুদ্ধ হর্ণের ধ্বনি বাজতেই থাকলে বাজতেই থাকলে ঢাকের ওপর পেছন থেকে দমাদ্দম দমাদ্দম চাঁটি পড়া জুড়ে সমবেত গালিগালাজ। রতনের কানে দেহে মনে বিভিন্ন বিসস্ত আঘাতে টাল-মাটাল ধাক্কায় ধাক্কায় তাকে পেঁছে যেতে হয় ফুটপাথে। শেয়ালদা বাজারের থেকে ছুঁড়ে ফেলা বাঁধাকপি আর ফুল-কপির 'টার ক্যাতক্যাতে পচা মন্ডে পা পড়াতেই হড়াক পিছলে দমাস আছাড়ের সঙ্গে সঙ্গে তার জামা কাপড় ধরে হ্যাঁচকা টানে কুচিমুচি কাপড়ের ছেঁচড়ে-যাওয়া দলামোচড়ায় পোস্টকার্ডটা ছিঁড়ে পড়তে শেষবার একটা লাথি 'করপোরেশন এলাকায় এরা ঢোকে কেন'-র সঙ্গে দমাস করে ঢাকের পেছন দিকে পড়ে।

এবড়ো-খেবড়ো ফুটপাথের ওপর দিয়ে ভয় পেয়ে রতন, ডাইনে বৌবাজারের রাস্তা ঢুকে পড়ে দৌড় লাগায়। গয়নার দোকান-গুলোয় সার-সার আয়নার প্রতিফলনে আলোয় প্রতিবিম্বে বৌবাজার অলীক। পুজোমণ্ডপে ঢাক বাজছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে ডানদিকে বেঁকে ফের হ্যারিসন রোড ট্রামলাইন ধরে দৌড়। হ্যারিসন রোডের চারপাশে পুজোমণ্ডপে ঢাক বাজছে। কলেজ স্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে সোজা দৌড়। মণ্ডপে যাবার জন্য সারবাঁধা ব্যাণ্ডমাস্টাররা হাড়বের-করা শরীরের ওপর রাজাবাদশার পোষাক চাপিয়ে ড্রাম কাঁধে শেষ মহলায় ব্যস্ত। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুর পুজোমণ্ডপে ঢাক বাজছে। আবার পেছনে এসে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে বাঁয়ে বেঁকে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির দিকে। কলেজ স্ট্রীট পুজোমণ্ডপে ঢাক বাজছে। বাটার পাশ দিয়ে ডানদিকে বেঁকে সোজা দৌড়। পুজোমণ্ডপে ঢাক বাজছে। কলকাতার বুকের ওপর ভয়তাড়িত সেই রতন ঢাকীকে তারই সঙ্গে আসা ও তারই সঙ্গে না-আসা ঢাকীদের ঢাকের আওয়াজ অশরীরি প্রেতাত্মার মতো আলোঝলমল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নিরুদ্দেশ তাড়া করে ফেরে।

ক্ষুধায় অবসন্ন দেহে ভোচকানি লেগে পড়ে যাবার আগে, সরস্বতীর ঠিকানা-হারানো, রতন-ঢাকী, কলকাতার আলো-কিত বুকের ওপর দাঁড়িয়ে, ষষ্ঠীর বোধন-লগ্নে, শরৎকালের সিজিল-মিজিল মানুষ-জনদের ভিড়ের ভেতর, দুই হাতে বাজন-কাঠি ধরে ফাটা ঢাকের অনুরণনহীন চ্যাপ্-চ্যাপ চামড়ায়, পাগলের মতো বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে [illegible]

বাস থেকে নামতেই বরফে ঢাকা ঝকঝকে পাহাড় চোখে পড়ল। সামনের রাস্তা একটু ঘুরে সোজা ওদিকে গেছে। সুধাকে বললাম—জায়গাটা দারুণ।

ছোট সুটকেশটা তুলে দিতে দিতে ও বললো—থাকার কোন ব্যবস্থা হলে, আরও দারুণ হয়।

কাঁধে দড়ি ঝোলান কয়েকজন কুলি কাছেই দাঁড়িয়েছিল। হাত নাড়তেই মোটা-সোটা একজন এগিয়ে এলো।—হোটেল চলেগা?

—আইয়ে। বড় সুটকেশ দুটো পিঠে বেঁধে, বেডিংটা মাথায় চাপাল। তারপর ডানদিকের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললো লোকটা। পেছনে আমরা।

কিছুটা যেতেই লাল ধুলোর রাস্তা। দুপাশে ছোট ছোট চায়ের দোকান। খাবার হোটেল। ওষুধ বা স্টেশনারি। আর একদিক ফাঁকা। নিচে গভীর খাদ। দূরে চাইলে বরফে ঢাকা শাদা পাহাড়ের সারি চোখে পড়ে।

কয়েক মিনিট হেঁটে কাঠের একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের বাইরে দাঁড়াতে বলে, লোকটা ভেতরে ঢুকে গেল। বাইরের বারান্দায় বসা একজনের সঙ্গে কি সব কথা হলো। তারপর সিঁড়িতে সুটকেশ সব নামিয়ে রেখে ইশারায় ভেতরে ডাকল।

ডানদিক দিয়ে সরু কাঠের সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। আবছা আলোয় সিঁড়ির মাথার দিকটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে না। কুলি পথ দেখিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। কাঠের নড়বড়ে সিঁড়িতে সাবধানে পা ফেলে আমরাও ওপরে উঠলাম। সিঁড়িটা মস্ত একটা হল ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। এদিকটাও প্রায় অন্ধকার। দুপাশে দড়ির খাটিয়া পাতা। কম্বল জড়িয়ে কে যেন শুয়েছিল। আমরা একটু এগুতেই উঠে বসলো। সুধা পেছনে ছিল। এখন গা ঘেঁষে দাঁড়াল। —কী জায়গা রে বাবা!

একটা ঘরের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। বাইরে থেকে শেকল তোলা। দরজা খুলতেই অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। দেশলাই জ্বালিয়ে লোকটা ভেতরে ঢুকলো। এদিক-ওদিক কি যেন খুঁজতে থাকল। শুধু একটা চৌপাই ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। লোকটা কোথায় নিয়ে এলো। এতটা রাস্তা হাঁটিয়ে, শেষ পর্যন্ত এখানে? সুধার দিকে চাইলাম। ও আমার দিকেই চেয়েছিল। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে বললো—চল। এখানে থাকা যায় না।

—ভেতরটা দেখবে না?

—তুমি দ্যাখো। আমার দরকার নেই। বলতে বলতেই সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

এই নিয়ে তিনবার। এর আগে যেখানে গিয়েছিলাম, সে হোটেলের ঘরটা মন্দ নয়। কিন্তু বাথরুম যাচ্ছেতাই। ঘরের তিনদিক বন্ধ। জানলা খুললে কিছুই চোখে পড়ে না।

বাথরুম দেখে, জানলা খুলে সুধা বলেছিল—শেষ পর্যন্ত এখানে? ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম—কত আর ঘুরবো বলো?

—তাই বলে এখানে? কঠিন চোখে চেয়ে সুধা বলেছিল—এ তো জেলখানা। জানলা খুললে, আর এক ঘরের জানলা চোখে পড়ে। দরজার বাইরে বারান্দা নেই। না, এখানে অসম্ভব।

এবার তিন নম্বর হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে কুলিকে মালপত্তর নামাতে বললাম। কতক্ষণ ঘুরতে হবে কে জানে। আর তো পারি না। যা হোক এবার একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

সুধাকে বললাম—তুমি যাও। আমরা বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

ও কি ভাবল, কে জানে। আমাদের

দিকে চাইল একবার। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো।

রাস্তার পাশেই একতলা লাল বাড়ি। সুন্দর। রাস্তা থেকে একটু উঁচু জমিতে হওয়ার জন্য তবে বাড়িটা দেখতে হয়।

কুলিকে বললাম—সুন্দর নাকি ?

লোকটা [illegible] বয়ে মালপত্তর [illegible] করতে করতে বোধহয় বিরক্ত হয়েছে। প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ল। তারপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কী যে বললো, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সুধা এখনো আসছে না। এবার বোধ-হয় ঘর পছন্দ হয়েছে। আসলে, মেয়েদের নিয়ে যত মুশকিল। সহজে খুশী হয় না। দরকার মতো মানিয়ে নিতে পারে না। থাকবো তো দু-একদিন। কোন রকমে একটা জায়গা পেলেই হয়। হোটেলে থাকবো কতক্ষণ ? তা ছাড়া এভাবে কতই বা ঘোরা যায় ? কিছু বলতে গেলে সুধা রাগ করবে। [illegible] বলে বসবে—তোমার সব কিছুতেই [illegible] তাড়া।

কুলিকে নিচে দাঁড়াতে বলে, সিঁড়ির দিকে এগুলাম। কিন্তু ওপরে উঠেও সুধা বা কাউকেই দেখতে পেলাম না। দুপাশে টানা বারান্দা। একদিকে পর পর সব ঘর। দরজা বন্ধ। আর একদিকে চওড়া উঠোন। উঠোনের ওদিকে ছোট ছোট ঘর কয়েকটা: বোধহয় বাথরুম, এই সব।

সুধাকে কোথাও দেখতে পেলাম না।

বারান্দা দিয়ে উত্তর দিকে এগুতেই সিঁড়ি চোখে পড়ল। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করলাম। না, কেউ নেই। কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পরিষ্কার ঝকঝকে সাদা উঠোনে সবুজ একটা পলিথিনের বালতি। পাশেই কুয়ো। দড়িটা কুয়োর গায়ে জড়িয়ে আছে।

ইচ্ছে করেই জুতোর শব্দ করতে করতে ওপরে উঠলাম। যা ভেবেছিলাম। দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে সুধা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে ডাকলাম। কি বলবো ? কি বলতে চাই ? দূরের দিকে দেখিয়ে ও বললো—দেখেছো ?

শেষ বিকেলের আলোয় পাইন আর ইউকেলিপটাস হাওয়ায় দুলছে। বরফে ঢাকা পাহাড়ের সাদা চূড়োর ওপর নীল মেঘের আস্তরণ। অনেকটা অস্পষ্ট। নিচের উপত্যকায় কী একটা পাখি ডানা ছড়িয়ে উড়ে গেল। কার্নিশে ঝুঁকে সুধা কি যেন দেখছিল। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। না, এখন কোন কথা নয়। ঘর খোঁজা নয়। জানি নিচে কুলি আমাদের মালপত্তর নিয়ে অপেক্ষা করছে। একটু পরে সন্ধ্যা [illegible] অন্ধকারে পথ খুঁজে মুশকিল হবে। হোক। ঠিক এই মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছে [illegible]

কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, [illegible] না। দুজনে দুজনকে দেখছি। কই, এ[illegible] তো দেখিনি। সুধা মুখ তুলে [illegible] দিকে [illegible] মুচকি হাসলো। আমিও। আমরা দুজনেই [illegible] যেন পালটে গেছি।

বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসে[illegible] পড়ন্ত আলোয় দূরে পাহাড়ের সাদা চূ[illegible] বেগুনী প্রলেপ। লালচে রোদের [illegible] নীল আকাশে আর কোন রং নেই।

নিঃশব্দে আমরা দাঁড়িয়ে আ[illegible] পাহাড়ের খাদ বেয়ে অন্ধকার উঠে আস[illegible] আবছা অন্ধকারে পরস্পরকে আমরা হা[illegible] ফেলেছি। ওকে আর স্পষ্ট দেখতে প[illegible] না। আমি একা। ভীষণভাবে একা। [illegible] কিছুর কেন্দ্রে আমি। আমি চেয়েছি, [illegible] তো এই অন্ধকার। এই নির্জনতা। [illegible] সবের মধ্যে মিশে যাচ্ছি। নিজেকে হা[illegible] ফেলেছি।

বুকে হাত দিতেই হৃদপিণ্ডের [illegible] টের পেলাম।

নিচের রাস্তায় কোথাও গাড়ির [illegible] হতেই চমকে উঠলাম। গায়ে ঠাণ্ডা হ[illegible] লাগতেই হাত-পা শির শির করে উঠে[illegible]

একটু এগিয়ে ওর হাত ধ[illegible] চাইলাম। কই, নেই তো ! —স[illegible] অন্ধকারে ওকে দেখার চেষ্টা কর[illegible] কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না। [illegible] তো, এখানেই ছিল। তাহলে ?

আবার ডাকলাম।—সুধা—এই স[illegible]

দূর থেকে অস্পষ্ট উত্তর [illegible] এলো। —এই তো—আমি এখা[illegible] অন্ধকারে লম্বা ছাদের একদিক থেকে [illegible] একদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দ[illegible] গাছগুলো শব্দে শব্দে আরও কাছে [illegible] এলো। শুধু হাওয়ার শব্দ। আর [illegible] আলো নেই। শব্দ নেই। দূরের [illegible] ঢাকা শাদা চুড়ো আর চোখে পড়ে না।

ছাদের কার্নিশ ধরে আস্তে অ[illegible] সামনের দিকে এগুতে লাগলাম। নিশ্চয়ই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধ[illegible] দেখতে পাচ্ছি না। ঠাণ্ডায় হাত-পা [illegible] জমে আসছে। ছাদটাই বা কত লম্বা! [illegible] কি অন্ধকারে মিশে গেল ? নাকি, [illegible] কোথাও দাঁড়িয়ে আছে ? একটু [illegible] হাত বাড়িয়ে ওকে খোঁজার চেষ্টা করল[illegible] না, কিছুই স্পর্শ করতে পারছি[illegible] কিছুই চোখে পড়ছে না। সুধাকে [illegible] পেলাম না। [illegible]

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন

প্রণতা দে

।১২।

সুয়েজ। ১৫ জুলাই ১৮৩১

স্নেহের ক্রিস্টিনা,—

দেখ, এবারে সত্যিই বেরিয়েছি এবং দু সপ্তাহের মধ্যেই লণ্ডনে পৌঁছব আশা করছি। এই বছরেই আমেরিকায় আসব। নিশ্চয়ই। এবং খুবই উদগ্রীব হয়ে আছি তোমার সঙ্গে দেখা হবার একটা সুযোগ হবে বলে। আমি এখনও কী রকম বস্তুবাদী আছি দেখছ তো,—এই স্থূল দেহে একবার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দেশ ছাড়বার আগে বেবীর কাছ থেকে একটা সুন্দর চিঠি পেয়েছি। আমি শীঘ্রই তোমার ঠিকানায় ওকে একটি চিঠি লিখব। এর আগে ওকে লিখে উঠতে পারি নি।

[illegible] আমার শরীর এত খারাপ হয়েছিল কী বলি! হার্টটা বরাবর খারাপ ছিল। হয়ত পাহাড়ে ওঠা, তুষার-গলা জলে স্নান করা, এবং অত্যন্ত স্নায়ুর দুর্বলতার দরুণ এরকম হয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে খুব 'ফিট' হোত। এক-এক সময় সাত দিন সাত রাত থাকত। এত বেশী নিঃশ্বাসের কষ্ট হত যে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত।

এই সমুদ্র যাত্রায় আমি যেন এক নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছি। বেশ ভাল বোধ করছি এবং এইভাবে যদি উন্নতি হয় তবে আমেরিকা পৌঁছবার আগে রীতিমত জোর পাব শরীরে। তুমি কেমন আছ? কী করছ? তোমার সব খবর—ই, টি, স্টার্ডি, ৩নং হল্যান্ড ভিলাস রোড লণ্ডন—এই ঠিকানায় লিখো।

চিরস্থায়ী ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ

ঠাকুরের শরণাগত

তোমাদের বিবেকানন্দ।

(১৩)

মার্সেলস্। রবিবার, ২৩ জুলাই ১৮৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

তোমার আন্তরিক স্বাগতপূর্ণ 'তার' এইমাত্র পেলাম। আগামী রবিবার নাগাদ আমরা লণ্ডনে পৌঁছোচ্ছি। আমরা সর্ব-সমেত চারজন—আমি, আর একটি সন্ন্যাসী, কলকাতা থেকে একটি ছেলে আমেরিকাতে পড়তে যাচ্ছে এবং মিস নোবল্।

মিস্ নোবল্ লণ্ডনের কাছে উইমবলডনবাসী একটি তরুণী মহিলা। ইনি ভারতবর্ষের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার কাজে আছেন। আমরা ইংলণ্ডে বেশী দিন থাকব না। আমার ভয় না তো এটা ঠিক কাজের মৌসুম, না আমার শরীর কাজের উপযুক্ত সুস্থ। যাই হোক লণ্ডনে কয়েক সপ্তাহ অন্তত আমি নিজে তো থাকবই, তারপর ইউ এস এ যাব। সাক্ষাতে এই সব এবং আরও অসংখ্য কত কী বিষয় আমরা আলোচনা করব। তোমার সঙ্গে আমার যে গল্পগুজব হবে তার পক্ষে ইংলণ্ডের গ্রীষ্মের দিনগুলি যথেষ্ট লম্বা কিনা সন্দেহ আছে আমার। আমরা ২১ দিনের জন্য উইম্বলডন্ যাব। তার-পর আমি লণ্ডনে ফিরে এসে একটা আস্তানার ব্যবস্থা করব এবং আমার পরিকল্পনা করব।

ডকে এসো। অবশ্য যদি সেটা সমীচীন এবং সম্ভব হয়। হ্যাঁ, সমীচীন বৈকি, কারণ আমাদের দলে একজন মহিলা আছেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনেকে (মহিলা) আসবেন। কেবল একটি কথা, যদি তুমি ক্লান্ত অথবা অসুস্থ বোধ কর তাহলে এসো না। আশা করি লণ্ডনের আবহাওয়া তুমি দারুণ উপভোগ করছ।

প্রাচ্যের লোকেরা আবেগের প্রকাশ পছন্দ করে না। আবেগকে চেপে রাখবার শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়।

মিসেস ফাঙ্কে কী তোমার সঙ্গে আছেন? যদি তাই হয় তবে তাকে আমার অনেক ভালবাসা জানাবে। এই মুহূর্তে আমি খুব ভাল বোধ করছি। এখন আমি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কল-কাতা থেকে রওনা হবার আগে আমি মৃতপ্রায় হয়েছিলাম। এই সমুদ্র যাত্রায় আমার স্বাস্থ্যের রীতিমত উন্নতি হয়েছে। শিগ-গিরি তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করছি।

ঠাকুরের শরণাগত
তোমাদের বিবেকানন্দ।

(১৪)

রিজ্লি ম্যানার। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

আশা করি এখন তুমি অনেকটা ভাল আছ। আমি প্রতিদিনই শারীরিক সুস্থতা বোধ করছি, তবে মানসিক নই। লণ্ডনের কাজ মনে হচ্ছে ভেঙে শতধা হয়ে গেছে। এখানকার সবুরা বিলক্ষণ অব্যবস্থিতচিত্ত। এমন কী স্টার্ডিও। যাই হোক মিসেস বুল্ এবং মিস ম্যাকলেয়ড আমার খাঁটি বন্ধু। তাঁরাই আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার ভরসা হয়ে আছেন। জীবনটা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে বন্ধ ও ভ্রান্তির ধারা। তাই না? জীবিকার জন্যও মানুষকে কিছু করতে হয়। ভাল এইটুকু যে এইটাই আমাদের খাড়া রাখে।

মিসেস ফাঙ্কে কেমন আছেন? তোমরা দুজনে এখন কোথায় আছ? আমি খুশী যে এই জীবনে আমার পাশে দাঁড়াবার মত সত্যিই কয়েকটি খাঁটি বন্ধু আমি পেয়েছি। আমি ভাল অবস্থায় আছি কী মন্দ অবস্থায় আছি, অথবা আমি সুস্থ কী অসুস্থ, তারা আমার পাশে আছে। সেই সব বন্ধুদের মধ্যে তোমরা দুজনেও।

এই কদিন আমি বেশ আনন্দে আছি। খুব শান্ত পরিবেশ, আর সবাই এত ভাল। দিন যত যাচ্ছে আমি তো সন্তুষ্ট থাকতে শিখছি। জীবনের আসল কথা কেবলমাত্র উপ-ভোগের মধ্যে নয়, অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যে শিক্ষা লাভ হয়—সেইটা। কিন্তু যখন আমরা ঠিক শিখতে শুরু করি তখনই আমাদের ডাক আসে। কাজেই অনেক কিছু মূল্যবান বৃক্তিতত্ত্ব ভবিষ্যতে জীবনের জন্য তোলা থাকে।

লেগেটদের পারিবারিক ডাক্তার আমাকে দেখতে এসে-ছিলেন। তাঁর অভিমত যে আমার হার্টের কোনই দোষ নেই কেবল নার্ভের কাঁপুনি। সেটাও ভাল খাওয়া-দাওয়া করলে ঠিক হয়ে যাবে। আমি এখন প্রায় নিরামিষাশী শুধু ডাক্তারের কথায় মাঝে মাঝে একটু মাছ খাই। মাংস একেবারে নয়। যাই হোক এর দরুণ ভাল আছি।

আশা করছি শীঘ্রই ডেট্রয়েটে যেতে পারব। সর্বত্র কাজের মধ্যে ঘূর্ণিপাক। এক হিসেবে ভাল। এই ঘূর্ণিপাক আবহাওয়াকে পরিষ্কার করে দেয় এবং কাজটিকে ঠিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখবার মত আমরা যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি। আমরা নতুন কিছু শুরু করি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরে।

আমি এখন বেশ সুস্থ, রীতিমত সবল। যখনই আমাকে একা কিছু করতে হয় তখনই আমি সবল বোধ করি। তুমিও সবল হও, খুব বেশী শক্ত!

Ever yours with love and ble[illegible]ngs.

বিবেকানন্দ

(১৫)

রিজ্লিম্যানার।
১৩ সেপ্টেম্বর, '৯৯

এই কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন,—

Hdd yet a cohile strong heart, nor part a life long yoke
though wheel and woe,
though blighted seems the present, future gloom
And age it seems since you and I
Began our march uphill or down
Or gliding smooth O'ercalms that are as rare.
Than nearer unto me than of times I myself,
Proclaiming mental moves, before they were
Reflector true, thy pulse so tuned to mine,
Than perfect note of thaughts however fine,
Shall we now part? Recorder say?
Though hand in hand so long, in sorrow, joy or shame.
In thee is friendship, faith, for thou dids't warn
When evil thoughts were brewing, and cheer
The stranger ones, though they were few;
And though alas! Unheeded oft, they warning
Thrown away; went on the same as ever,
good and true.

নৈনিতালে সেন দম্পতির সঙ্গে লেখিকা। ১৯৭০ খৃঃ

What a marvellous country this is! Sometimes I think it would take a thousand years to absorb it all!!

অ্যাকশা বার্লো বন্দ্রস্টারের স্মৃতিতে ভগিনী ক্রিস্টিন;—

এপ্রিলের এক অপরাহ্নে ক্রিস্টিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার। তিনি তখন ৮নং বোসপাড়া লেনের ছোট চালামত একটি বাড়ীতে থাকতেন। ওপরের জানলায় ঝোলা বারান্দা—সামনেই বড় একটা বট গাছ, কাকের আস্তানা। লোকে বলত গাছটা নাকি ভূতের বাসা। এর পাশেই 'বাঘের বাসা'। গেটের মুখে ভাঙা-চোরা বাঘের মূর্তির কিছু অবশিষ্টাংশ। এই বাড়ীতে রসায়ন-বিদ্যার কিছু ছাত্র গবেষণার কাজ করত। বাড়ীর সামনেই একটা বেঞ্চে দুটো লোক নীরবে বসে গাছের ছায়া ও শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ উপভোগ করছে। আমরা খোলা উঠোনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। মাথার ওপরে চৈত্রের নীল আকাশ। শীতল মধুর আব-হাওয়া। টবে বেশ কিছু গাছের চারা এবং একটি বড় মাটির জল-ভরা বাসনে কিছু পদ্ম ভাসছে। ওপরে ওঠবার সিঁড়ির সামনে ছোট খোলা ছাত। আমরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—তিনি সিস্টার ক্রিস্টিন। সেই তন্বী-ঋজু শ্বেতবসনা দুটি হাত বিস্তার করে সন্তানকে কাছে টেনে নিলেন। কপালে একটি চুম্বন এঁকে দিলেন। দুজনেই অন্তরের গভীর তল থেকে পরস্পরকে চিনে নিলাম। একজন ক্ষীণাঙ্গ, অপরজন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু এসব স্থূল পার্থক্যে কোন বাধার প্রশ্ন নেই যে অপার্থিব মহিলাটির সম্মুখীন হয়ে। কণ্ঠস্বর বুঝি মানুষের চরিত্রের পরিচায়ক। সুস্পষ্ট, মৃদু, মধুর এবং সুরেলা সুরে তিনি আমাদের সম্ভাষণ জানালেন। ওঁর মুখের প্রথম শব্দের ধ্বনিতেই যেন আমাদের সামনে ওঁর চরিত্রের ঐশ্বরিক ভাব, পবিত্রতা ও মাধুর্যের রূপ উন্মোচিত হয়ে গেল।

"The upright pois of her slender figure announced this as well and the proud lifting of her exqusite head the Lord's annointed verily.

প্রতিটি অঙ্গ এই ভাবই ব্যক্ত করছিল।......মুখশ্রীর প্রতিটি রেখা, নাসিকা, নাসারন্ধ্র দেখে মনে হচ্ছিল যেন রাজপুত ছবিতে সীতার মূর্তি...চোখ দুটি যেন প্রাচ্যের সন্ন্যাসিনীর.... সে চোখ থেকে যেন অন্তরতম আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল—যাকে বলে পদ্মচক্ষু!

ওপরতলার ছোট্ট ঘরখানিতে বসালেন আমাদের। ঘরটি অপূর্ব সুন্দর এবং শীতল। আমরা মেঝেতে পা মুড়ে বসলাম। আমাদের চা খেতে দিলেন। ঠিক ওঁর স্বভাবের মতই পরিষ্কার, পবিত্র, সহজ সে চা।

জানালার দিকে আঙুল তুলে তিনি আমাদের সামনের ছোট্ট বারান্দাটি দেখালেন। তারপর বললেন, একদিন ঐ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ শুনলাম কে যেন বলছে 'অ মা! এসো তো! শিগগির এসো!' তাকিয়ে দেখি নীচে একটা বুড়ি তার গরু নিয়ে যাচ্ছে গলি দিয়ে। এই রকমই সহজ সরল এরা। তাই আমি এদের ভালবাসি এবং সব সময় এদের মধ্যেই থাকতে চাই।

(১৬)

রিজলি ম্যানার
স্টোনরিজ আলস্টার কোং এন ওয়াই
এফ এইচ লেগেট এস্কোয়ার
২৫ অক্টোবর। '৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

তোমার ব্যাপার কী? অন্তত একলাইন লিখে জানিও তুমি কেমন আছ, এবং কী করছ?

এ জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না। শিগগিরি দিন-কয়েকের জন্য নিউইয়র্কে যাব। সেখানে থেকে শিকাগো। যদি তুমি চাও যাবার পথে ডেট্রয়েটে থেমে তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব। আমি এখন অনেক ভাল আছি। একেবারে অন্য মানুষ এখন আমি। যদিও সম্পূর্ণ নিরাময় নই। সেটা সময়সাপেক্ষ।

তোমাদের বিবেকানন্দ।

(১৭)

রিজলি ম্যানার
৩০ অক্টোবর, '৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

তুমি কী আমার আগের চিঠি পাও নি? তুমি কেমন আছ, সেজন্য বড় চিন্তিত আছি। এক লাইন লিখে জানাও যে তুমি খুব ভাল আছ। আমার মনে হয় আগের চিঠির ঠিকানা ভুল ছিল তাই এবারে মিসেস ফাঙ্কের ঠিকানায় পাঠাচ্ছি।

শিগগির লিখো। আমি ব্যাটেল ক্রিক আবার যাবো ভাবছি। বেবী আমাকে এজন্য জোর করছে। তোমার কী মনে হয় এতে আমার উপকার হবে? তাড়াতাড়ি লিখো।

ঠাকুরের শরণাগত
তোমাদের বিবেকানন্দ।

পুঃ—ব্যাটেল ক্রিক কোথায়? ডেট্রয়েটের কাছে কী? আমি সত্যিই ভাবছি একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। এমনিতে কিছু খারাপ নেই তবে কোন পরিশ্রম সহ্য হয় না। এমন কী হাঁটাও নয়। এ রকম জীবন ধারণ করবার কোন মানে হয় না। চেষ্টা করব একবার ব্যাটেল ক্রিকে যেতে। যদি সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় তবে তাড়াতাড়ি চলে আসব।

ভি

আমাকে ব্যাটেল ক্রিকের কথা সব জানিও তো।

নিবেদিতা, অবলা বসু, ক্রিস্টিন ও অন্য একজন

এর পর আমি ওঁকে দেখি থিয়েটার হলে। বসেছিলেন তন্বী ঋজু যেন অন্য জগতের মানুষ। আশেপাশের গলদঘর্ম দর্শকদের চেয়ে স্বতন্ত্র, অনন্য!

সেদিন ভোরবেলা আমরা দক্ষিণেশ্বর দর্শন করতে গিয়েছিলাম। তার আগে অল্পক্ষণ বসে কথা হয়েছিল। উনি জীবনী পড়তে কী রকম ভালবাসেন সেই কথা বলছিলেন। ঐ সময় উনি বাবরের জীবনী পড়ছিলেন। বাবরেরই লেখা। বইটি আমাকে ধার দিয়েছিলেন। অনেক বইয়ের বিষয় সেদিন আলোচনা করেছিলেন। তাতেই বোঝা গেল উনি একাধারে শিক্ষিকা এবং বিদুষী!

এর পর ওঁর সঙ্গে দু-একবার ঝলক দর্শন ছাড়া সামনা-সামনি বসে কোন কথা বলবার সুযোগ আর হয় নি। তারপর এলো সেই সুযোগ। ট্রেনের একই কামরাতে দুজনে গেলাম কলকাতার অগ্নিগর্ভ জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে ভারতের উত্তরে—হিমালয়ে। বেশ কিছু সন্ন্যাসী এবং পারিবারিক বন্ধুর সমাগম হয়েছিল ওঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁরা অনেকেই ওঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ওঁর পায়ের ধুলো গ্রহণ করেছিলেন। তখনই বুঝলাম উনি লোকের চোখে কতখানি পূজ্য।

ওঁর হার্টের অবস্থা বেশ খারাপ এবং প্রচণ্ড গরম আবহাওয়া পথযাত্রার পক্ষে আরামদায়ক নয়। কিন্তু কোন রুগ্নী বোধহয় কখনও এমন শুশ্রূষা পায় নি। যেমন ভক্তিভরে বশী ক্রিস্টিনের জন্য করছিল দেখলাম। বড় বড় চাদর জলে সপসপে করে ভিজিয়ে কামরার জানলায় ঝুলিয়ে দিল যতক্ষণ না তাপমাত্রা ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র হয়। পারকোলেটরে কফির ধোঁয়া ও তার সুগন্ধে কামরা আমোদিত। বড় বড় বোম্বাই আম ছাড়িয়ে নিখুঁতভাবে কেটে একেবারে আমাদের মুখের সামনে উপস্থিত করেছে বশী। একটুকুও এদিকে-ওদিকে না-ফেলে। থোকা-থোকা গোলাপী লিচু ধরিয়ে দিল হাতে। ভগিনী ক্রিস্টিন ও বশীর সঙ্গে লম্বা যাত্রাটি ছিল রীতিমত মনোরম।

দীর্ঘ রাত্রির অবসানে সকালে যখন আমরা বেনারসে পৌঁছলাম—চোখ পড়ল নদী (গঙ্গা) ও মন্দিরের চূড়ার ওপরে। ফেরিওয়ালারা গঙ্গা জলের ভাঁড় নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। সারা দিন গরমে ঝলসে বিকেলে পশ্চিমে হেলেপড়া সূর্যের প্রাক্কালে আমরা লক্ষ্ণৌ এসে পৌঁছলাম। স্টেশনে বেশ ভিড়—বেশীর ভাগই নানা রঙের পোশাকে মুসলমান জনতা। এর পর আঁধি এল। ধূসর হলুদ রঙের প্রচণ্ড ধুলোর ঝড়ে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। সূর্যও সেই ঝড়ে ঢাকা পড়ল। এর পর বৃষ্টি। শীতল হাওয়া। ঝড় থেমে গেছে। গো-পালক এখন গরু নিয়ে গড়ে ফিরছে। উটের সারির ছায়া (সিল্যুয়েট) চলেছে। মাঝ রাত্রে আমরা গাড়ী বদলালাম বেরেলিতে। ভোর পাঁচটায় কাঠগোদামে গাড়ী থেকে নামলাম। (প্রভাতের সূর্য তখন পাহাড়ের মাথায় ঝিকমিক করছে।) আমাদের ধোঁয়া কালি মাখা নাকে তখন পাচ্ছি গাছগাছালি ও ফুলের সুবাস। সমতল এখানে যেন আচমকা শেষ হয়ে গেছে। চোখের সামনে তখন সারি সারি পাহাড়ের চূড়া।—একে অপরের মাথা ছাড়িয়ে যেন উঠতে চায় মজা করে। ভগিনী ক্রিস্টিন একটি সুন্দর গাছের মত ঋজু দাঁড়িয়ে পড়লেন! সুঘ্রাণ গ্রহণ করতে নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত হল। কালো চোখের বঙ্কিম ভ্রূ রেখা তুলে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকালেন। রাজকীয় ভঙ্গীতে মাথা তুলে সুরেলা স্বচ্ছ স্বরে বললেন, 'ঐ পাহাড়ের দিকে তাকালে—আমি আমার শান্তি পাব।'

দেখলাম সত্যিই সেই শান্তি আমাদের ওপরেও যেন বর্ষিত হল। সব ক্লান্তি দূরীভূত হল। মোটর গাড়ী ক্রমেই উপরে উঠতে লাগল। সর্বাঙ্গে খিল ধরিয়ে ৮০ মাইল (?)১ এইভাবে কখনও উঁচুতে কখনও নীচুতে এঁকে বেঁকে চলে এসে থামলাম নৈনিতালের কাছে ভাওয়ালীতে দ্বিপ্রাহরিক খাবারের জন্য। পাহাড়গুলো এখানে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। রাস্তার ধারে নানা রকম ফুল গাছে ফুল ফুটে আছে। কোথাও সাদা গোলাপ শুভ্রতায় উদ্ভাসিত, সৌরভে আমোদিত।

মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে পাথরের বাড়ী। শুকনো নদীর ওপরে সুউচ্চ সেতু—যেন অপেক্ষা করে আছে কবে বর্ষাপ্লাবিত হয়ে ক্রুদ্ধ বন্যার জলরাশিতে ফুলে উঠবে। চায়ের সময় এসে পৌঁছলাম রানীক্ষেতে। পাইন বন আর সুনির্মিত রাজপথ, মিশনারী ও সেনাবাসের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললাম। এর পর গাড়ীর টায়ার ফাটল। এক দল সিপাহীদের রোদে পোড়া রুগ্নমত ছেলে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখছিল। 'জীবন এদের কী দিতে পারে বল ত?' সিস্টার ক্রিস্টিন বললেন।

সূর্য যখন প্রায় অস্তমিত, লালরশ্মির আভায় আরক্ত হয়ে উঠছে আমরা তখন প্রায় যাত্রা শেষে গন্তব্য স্থানে এসে পড়েছি। পাইন বনের মধ্যে দিয়ে বেগে উঠে চলেছি। দেখলাম পাহাড়ের মাথায় ছড়িয়ে আছে আলমোড়ার গ্রাম। হঠাৎ গাড়ী থেমে পড়ল। এমন তো হবার কথা নয়! চলার পথ তো শেষ হ'ল প্রায়! দেখলাম ক্লান্ত অবসন্ন না হয়ে ভগিনী ক্রিস্টিন সোজা হয়ে বসে আছেন। চোখ দুটি উজ্জ্বল। দুজন ইংরেজ মহিলা এগিয়ে এলেন দেখলাম। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কী মিস ম্যাকলিঅড?' 'না, ইনি সিস্টার ক্রিস্টিন।'

ইনি ছিলেন কমিশনরের স্ত্রী!২ কুলিতাঞ্জিত নিয়ে এসেছিলেন। তাইতে বসিয়ে নিয়ে গেলেন ভগিনী ক্রিস্টিনকে বিশাল পাইনরাজির মধ্য দিয়ে পাহাড়ের মাথায়। কম্পাউন্ডের প্রবেশদ্বারে সাদা একটা থামে লেখা আছে দি পিনস্। একটা চৌকোমত

---

১ সম্ভবত তখন অন্য রাস্তা ছিল। নচেৎ কাঠগোদাম থেকে ভাওয়ালীর দূরত্ব অনেক। অথবা শ্রীমতী ব্রুস্টারের মাইলের হিসাব ঠিক নয়।

(২) সম্ভবতঃ ডেপুটি কমিশনর হবে। আলমোড়ায় কোন কমিশনের Post নেই।

বাংলোবাড়ী, চওড়া শ্লেটের ছাত। দেখলে মনে হয় যেন একটি সুরক্ষিত কচ্ছপের খোলস......

রাত্রি নামল। ল্যাম্প ও মোমবাতি জ্বালা হ'ল। আমরা কোকো এবং মাখন দিয়ে টোস্ট খেলাম চিড়ু কাঠের আগুনের পাশে বসে। ভগিনী ক্রিস্টিন বিছানার মধ্যে মুড়ি দিয়ে বসলেন। বল্লেন 'আমি পাহাড় থেকে শান্তি সঞ্চয় করছি।' বেশ বুঝতে পারছি-আমার মধ্যে তার সঞ্চার হচ্ছে।

পরদিন সকালে দেখি ন্যাসটারশিয়ম, জেরেনিয়াম, ফক্সগ্লাভ, লিলি, গোলাপী রংয়ের গোলাপের বেড়া সব ফুলে সমৃদ্ধ। চওড়া লন...পাইন বন...বিশাল ইউক্যালিপটাস গাছ...উত্তরে দেখা যাচ্ছে সাদা রংয়ের রান্নাবাড়ী, আঙ্গুরের লতা ঝুলে আছে।

পেছনে চাকরদের কোয়ার্টার।......গরু এসে ডাকছে জল খাবার জন্য। হাজার তাড়না, আপত্তি বৃথা! পেতলের ঘড়া করে ভারীরা জল আনছে এবং ঢালছে সারাদিন ধরে।

ইউক্যালিপটাস গাছের দিকে মুখ করে বশীর ছোট্ট গোছানো গবেষণাগার। পাশেই ড্রইংরুম এবং ভগিনী ক্রিস্টিনের ঘর। তারপর আর্দেল (১) শোবার ঘর এবং হারউড (২) ও আমার। এরপর খাবার ঘর ও প্যান্ট্রি। প্রতিটি ঘরে ফায়ারপ্লেস। এর আগে বাড়ীটিতে কোন ইংরেজ Officer থাকতেন আসবাব ইত্যাদি যথেষ্ট ছিল এবং সুরুচিসম্পন্ন। প্রথম দিন থেকেই আমরা বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করেছি।

ভগিনী ক্রিস্টিন ও'র ফুলতোলা গোলাপী রংয়ের সিল্কের ড্রেসিং গাউনটি পরে তাঁর মেওয়ারের বিছানায় শুয়েছিলেন। গায়ে একটি পুরু শাল। ও'কে বেশ স্বচ্ছন্দ দেখাচ্ছিল। আমরা নিজেদের মেওয়ারের চেয়ার নিয়ে ও'কে ঘিরে বসলাম। ও'র রীতিমত খিদে পেয়েছিল। গোল মেহগিনি টেবিলে আমাদের সঙ্গে বসে খেতে চাইলেন। এক কামড় খাবার মুখে নিয়েই উনি অলিভার টুইস্টের মত কথা বল্লেন। বশী বল্লে, 'সে কী মা! আপনি এত পেটুক তাতো জানতাম না।'

'পেটুক তুমি বশী! আমি নই। আমি রীতিমত উপোসী! দেখতে পাচ্ছো না।' সখেদে কথাটা বল্লেন।

বশী উত্তর দিল, 'ও' তাহলে বোধহয় এটা আপনার হোলিনেসের লক্ষণ! আমাদের ভারতবর্ষে বলে যে, সাধক জীবনে এমন একটা প্রচণ্ড খিদে জাগে যা' কিছুতেই মেটেনা।' তারপর সযত্নে একটা সোডার বোতল খুলে উদারভাবে ও'র দিকে এগিয়ে ধরল।

'আঃ! ধন্যবাদ ডিয়ার! এইটাই চাইছিলুম।'

এই রকম কখনও তরল কখনও গম্ভীরভাবের আলাপ-আলোচনা চলছিল। চেহারাটা থাইরয়েডের জন্য রীতিমত অনাহার ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল। খাবার হজম করতে পারতেন না, আবার হার্টের কষ্টও ছিল। দিনের বেলা ও'কে বিছানা করে দেওয়া হ'ত দক্ষিণের বারান্দায় এবং বিকেলে উত্তরের বারান্দায়।

আমাদের পৌঁছবার পরদিনই ছোট্ট কুটীরের (রামকৃষ্ণ কুটীর) চারজন সন্ন্যাসী এলেন শ্রদ্ধেয় মহিলাকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং দেখা করতে। এই মহিলাটি তাঁদেরই মত সন্ন্যাসিনী-সংসারের সব কিছু ত্যাগ করে নিজেকে দারিদ্র্য, পবিত্রতা এবং পরহিতকামনা ও ঈশ্বরের উপলব্ধির জন্য বিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। একদিনও যায়নি সেদিন সন্ন্যাসীদের কেউ না-কেউ ও'র সঙ্গে দেখা করতে আসেননি।

উনি বসে বসে নিজের গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলতেন—'অমন কণ্ঠস্বর আমি কখনও শুনিনি— so flexibles so sonorous It was voice of God to me! আবেগে স্বরের ওঠানামা, সেই সঙ্গীতময়তা, কান্না-কণ্ঠে কখনও শুনিনি। সবটাই পরিপূর্ণ সঙ্গীত।'

যখন বলতেন তখন ও'র (ক্রিস্টিন) নিজের স্বরও সুরময় হয়ে উঠত। বিবেকানন্দের নাম ও'র মুখে উচ্চারণ হওয়ামাত্র যেন ঈশ্বরের উপস্থিতি সকলে অনুভব করতেন। মনে হ'ত আমরাও যেন তাঁকে দেখেছি এবং চিনেছি।

মে মাসের মাঝামাঝি বৃষ্টি নামল। প্রতিদিন বৃষ্টি—সঙ্গে দেখা দিল প্রথমে গোলাপী পরে লাল লিলির সমারোহ। পাহাড়ের ঢাল, বাগানের সীমানায়—সর্বত্র লিলিময়। সন্ন্যাসীরা আসতেন। যেতেন আর একপাল বাঁদরের দল গম্ভীর, গোল হয়ে বসে সভা জমাতে, পাইন বনে।......

'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী সম্বন্ধে তাল লিখেছেন ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডার' বললেন সিস্টার ক্রিস্টিন। 'তোমরা শোননি আলেকজাণ্ডারের কথা?' ক্রিস্টিন মাথা উঁচু করলেন এবং আরক্ত কালো চোখের ভারী পাতা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন।......মেরাস্কার এক সন্ন্যাসিনী (নান) ওকে লালনপালন করেন। ওর মা-বাবার পরিচয় কেউ জানত না। চেহারা দেখে মনে হ'ত আধা জার্মান আধা আইরিশ। অর্থাৎ দুদিকেই যোদ্ধার বৈশিষ্ট্য ওর স্বভাবে। ওর অনেক সময় মনে হ'ত আবাসিক হাসপাতালের বন্ধকী মাদার সুপিরিয়র যাঁর নাম ছিল সিস্টার 'এস' বোধহয় ওর আসল মা ছিলেন। তিনি মাত্র তিরিশ বছর বয়সে মারা যান। শিশু বয়সে ফ্রাঙ্ক খুব দামী এবং ভালো কাপড়-জামা পরত।..... এই বয়সের কাপড়-জামা এবং চব্বিশ ঘণ্টা মেয়েদের সঙ্গ ও তাদের বিরক্তিকর যত্ন ওর পক্ষে অত্যন্ত অপছন্দের ব্যাপার ছিল।

ক্রিস্টিনের চিঠি

বশী সেন মহাশয়কে লেখা ক্রিস্টিনের হাতে লেখা চিঠির নকল।

Vermount July 23, 1919

প্রিয় বৎস,

জানিনা তুমি কোথায় আছ এবং কেমন আছ। সম্ভবতঃ কলকাতাতে। আমি ভাল আছি এবং আমার ভাল সব খবর ভাল। ডেট্রয়েটের চেয়ে এখানকার তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি নীচে।......তবুও ডেট্রয়েটে যাবার সুযোগ এলে আমি খুশী হব। আমার বিশ্বাস নার্স যখন আমাকে বল্লে আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি তখন সে নিজেও সেকথা আদৌ বিশ্বাস করেনি। বোধহয় এইভাবে আমাকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিল। যাই হোক ভালই আছি এবং নিজের যত্ন কেমন করে করতে হবে তা' জানলাম। তুমি আমাকে সব সময় মনে করিয়ে দেবে যে, আমাকে সর্বদা সাবধানে থাকতে হবে, তাহলে আমি ভাজা জিনিষ খাবো না, পেস্ট্রি খাবো না, মিষ্টি নামমাত্র, টক জিনিষ বা টক জাতীয় ফল রান্না ছাড়া কাঁচা খাবো না।

বৎস, ওরা আমাকে কী পরিমাণে যে মাখন ও ক্রীম খেতে দেয় প্রথমে তো খেতে ভয় পেয়েছিলাম। তারপর গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে খেয়ে দেখছি বেশ সেরে উঠছি এবং সেজন্য কোন কষ্ট বোধ

---

১. আর্দেল অ্যাকল্যান্ড গুরুস্বামীর খ্রিস্টিনের স্বামী ও ২ কন্যা। এঁদের বিস্তৃত পরিচিতি পরের পরিচ্ছেদে পাওয়া যাবে।

আর্ল এবং অ্যাকশ্য ব্রুস্টার
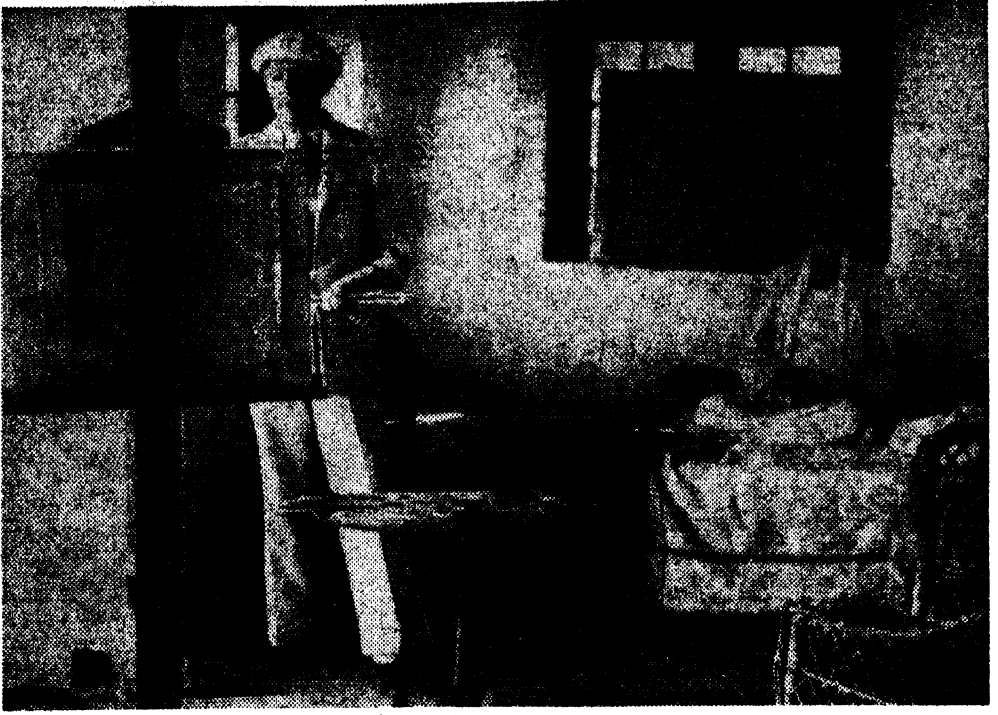
করি না। আমার আর পেট ফাঁপা ইত্যাদি নেই। ভুলেই গিয়েছি আমার একটা পিঠ আছে! তোমার কী মনে হয়? ও বৎস,—এই কথাই আমি ভাবছি। কী অদ্ভুত ব্যাপার। এত বছর ধরে এই যে একঘেঁয়ে, একটু ভাল, 'ভাল না, আবার 'সামান্য ভাল'—কী যে চলছিল! এখন আশা হচ্ছে জেনে যে সুস্পষ্ট উন্নতি—সর্বপ্রকার উন্নতি।

আমি বুঝতে পারছি না ডেট্রয়েটে ফেরবার আগে মিঃ থ্রপের সঙ্গে দেখা করব কিনা? কি বলব তাঁকে? তানা'তিনা' বলছেন, যতক্ষণ না......তিনি (ওরা) অর্থ সাহায্য কখনই করবেন না।—আমি বড় খুশী যে আমি এইসব ঝঞ্ঝাট থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। যদি তোমাকে না জানতাম তাহলে মনে সন্দেহ আসত যে, সংসারে আনুগত্য ও ভালবাসা বলে আদৌ কিছু আছে কিনা!

তুমিও তো বৎস, নিজের ব্যাপারে এই রকম সমস্যার মধ্য দিয়েই চলেছ। আহা আমি যদি তোমাকে এসময় কোনো সাহায্য করতে পারতাম। জানি না, শারীরিক শুধু নয় মানসিকই বা তুমি কেমন আছ! জানি না পারিপার্শ্বিক অসুস্থ, অপ্রিয় আবহাওয়ার মধ্যে (হয়ত আরও খারাপ) তুমি কীভাবে নিজের ভারসাম্য বজায় রেখেছ, অথবা সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছ। দুটি কাজই বড় কঠিন! জানো আমার কী ধারণা? মনে হচ্ছে মাসকয়েকের মধ্যেই আমরা উভয়ে এইসব অপ্রিয় ব্যাপার থেকে নিষ্কৃতি পাবো।

হ্যাঁ, তোমার বক্তৃতার বিষয়। 'ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হবে ধর্মবোধ দিয়ে'—একথা তুমি যেমন সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে অবতারণা করেছ এমন পরিষ্কার ব্যাখ্যা আমি কখনও শুনিনি। দুটি কয়েক মন্দির তৈরি করে বা প্রাচীন রীতিনীতিকে (যা এখনও বর্তমান আছে) পরিবর্তন করে নয়—

"But by using the Idea, feeling, and power and adopting them to present day needs."

(This is the most cruel summery after the brilliant way you put it)

তুমি কী সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে কথাটা বলেছিলে অথচ ওরা কী তার স্থূল অর্থ করল! তুমি লিখেছ 'হাসপাতাল ও গবেষণাগার হবে রুগ্ন ও দুঃস্থের মন্দির এবং মেধাবী ব্যক্তির মন্দির'। আমি হলাম সেই রকম এক মন্দির যেখানকার পুরোহিত—প্রধান পুরোহিত হবে আমার বৎস (বশী সেন)—এক নতুন ধর্মমতের! আমি আমার দৃষ্টি দিয়ে ভবিষ্যতের এইরকম এক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। স্বামীজী যথাসময় তাঁর গবেষণাগারের ব্যবস্থা ঠিক করে নেবেন। আমরা সেই আশায় প্রতীক্ষা করব; তাঁর জন্য কাজ করতেও কী আনন্দ; সত্যি কথা—

"This gives them the dignity they require, and the ideality now they lack".

এই পংক্তিটির মধ্যে একটি গভীর অর্থ নিহিত আছে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত উকীল হিসেবে এবং অন্যদিকে বিবেকানন্দ হিসেবে।

And with what a clarion note of triumph it ends! Blessings, Blessings on 'Sadananda's' Dog' —precious Blessed.

আমরা আছি এবং ঈশ্বর আছেন। আমরাই তিনি। সোঽহম্, শিবোঽহম্; এগিয়ে চল প্রিয় সদানন্দের কুকুর, বিশ্বস্ত, খাঁটি এবং অনুগত। ঐ সুন্দর কোমল চোখ দুটি যে দেখবে সেই বুঝবে কী গভীর ভক্তি বিশ্বস্ততা ও সততা সেখানে আছে।

তোমাকে ও টাবিকে সদা প্রাণভরা ভালবাসা।

(ক্রিস্টিনের সেন মহাশয়কে লেখা চিঠিগুলির নীচে কোথাও নাম সই নেই) উপরিউক্ত পত্রটিতে স্কুল ত্যাগ করবার মামলা কথা আছে যা' এতদিন বাদে নিরর্থক মনে করে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি।) (ক্রমশঃ)

প্রথম বেসরকারী মেডিকেল স্কুল

তরুণকুমার চক্রবর্তী

উনিশ শতকের শেষে বাংলাদেশে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের তিনটি প্রতিষ্ঠান ছিল, মেডিকেল কলেজ, বেঙ্গল; ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল ও ঢাকার মেডিকেল স্কুল। এইসব শিক্ষায়তন থেকে প্রতিবছর যে সংখ্যায় ডাক্তার বেরোত, বাংলাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় সেই সংখ্যা ছিল নগণ্য। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি ব্যাধিতে বাংলার পল্লীঅঞ্চল তখন বিধ্বস্ত। চিকিৎসার অভাবে গ্রামবাংলার মানুষ অসহায়। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত চিকিৎসকরা শহরাঞ্চলেই প্রতিষ্ঠিত। গ্রামে শিক্ষিত চিকিৎসকের নিতান্ত অভাব। এই অভাব দূর করার একমাত্র উপায় আরো মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা। বেশ কয়েকটি মেডিকেল স্কুল গড়ে উঠল কয়েক বৎসরের ব্যবধানে। কয়েকজন মিলে একটা যে কোন রকম বাড়ি ভাড়া করে স্কুলের সাইনবোর্ড টানিয়ে দিলেই হল। হাসপাতাল নেই, রোগীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তবু স্কুল গড়ে উঠতে লাগল। ছাত্রও জুটে যেত। এইসব স্কুলের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য ছিল চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেবার ছলে ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা। অবস্থা এমনি শোচনীয় হয়ে উঠল যে অর্থের বিনিময়ে ভুয়ো ডিপ্লোমা বিতরণ হতে লাগল। এক্ষেত্রে যা হওয়া স্বাভাবিক, তাই হল। প্রায় সবকয়টি স্কুলের বিলুপ্তি ঘটল অল্প দিনের মধ্যে। নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও টিকে রইল ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল। এটি শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতের প্রথম বেসরকারী স্কুল। এই স্কুলটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে বারবার, তবু এটি যে বিলুপ্ত হয়নি, তার কারণ কয়েকজন আদর্শবাদী, স্বার্থত্যাগী চিকিৎসক এই স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখতে জীবনপণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের ত্যাগ ও নিষ্ঠা প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে।

১৮৮৬ সালের একটি দিন। কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এক সভায় মিলিত হলেন। আলোচনার বিষয় বেসরকারী মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা। সভাপতি ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, এল এম এস; ডাঃ বিপিনবিহারী মৈত্র, এম বি; ডাঃ জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী; ডাঃ বিনোদবিহারী মিত্র, এম বি; ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, এল আর সি পি, এল এম; ডাঃ এম এল দে, এম বি সি এম; ডাঃ বি বি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ, এম আর সি এস, এল এস এ; ও ডাঃ কুমুদনাথ ভট্টাচার্য, এম বি। এই সভায় সরকারী মেডিকেল স্কুলের সমমানের একটি বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করতে গঠিত হয় একটি অস্থায়ী কমিটি। এই কমিটির সভাপতি হলেন ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কর্মসচিব ডাঃ কুমুদনাথ ভট্টাচার্য। স্কুল স্থাপিত হল ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, পুরানো বৈঠকখানা রোডের ১৬১ নম্বর বাড়িতে। স্কুলের নাম 'ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিন'। কিছুদিন পর স্কুলটি স্থানান্তরিত হয় বৌবাজার স্ট্রীটের ১৫৫ নম্বর বাড়িতে, আরো কিছুদিন পর ঐ স্ট্রীটেরই ১১৭ নম্বর বাড়িতে। ১৮৮৭ সালে স্কুলের নাম পরিবর্তন করে 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল' নাম রাখা হয়। সে যুগের খ্যাতনামা বাঙালী চিকিৎ[সকদের] অনেকে এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে তা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৮৯ সালে এই স্কুলটির পরিচালনার জন্য একটি সোসাইটি গঠিত হয় এবং তা আইনমতে রেজিস্ট্রি করা হয়। সোসাইটির প্রথম সভাপতি হলেন ডাঃ লালমাধব মুখোপাধ্যায় এবং প্রথম কর্মসচিব ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। সোসাইটির অন্য সভ্যরা হলেন—আর ডি মেহতা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ আর কে সেন, হরিপদ ঘোষাল ও সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ছাত্রদের পড়তে হত তিন বৎসর এবং পড়ান হত ক্যাম্পবেল স্কুলের মত বাংলা ভাষার মাধ্যমে। স্কুলের সঙ্গে যুক্ত কোন হাসপাতাল ছিল না, তবে রোগী দেখার জন্য ছাত্রদের পাঠান হত মেয়ো হাসপাতালে।

১৮৯৭ সালে স্কুলটির আবার স্থান পরিবর্তন হল। ২৯৮ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে। এখানে ১৪ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতালও খোলা হল। এই সময়ে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫২০। শিক্ষাকাল তিন বৎসর থেকে বাড়িয়ে চার বৎসর করা হল।

ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার জন্য কর্তৃপক্ষ স্কুলের নিজস্ব বাড়ির চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৮৯৮ সালে বেলগাছিয়াতে ১২ বিঘা জমি ক্রয় করা হল ২৫ হাজার টাকায়। ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করে একটি একতলবিশিষ্ট বাড়ি নির্মিত হল। ঐ টাকার মধ্যে ১৮ হাজার টাকা দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল যুবরাজ এলবার্ট ভিকটরের ভারত আগমনের স্মারক-ভাণ্ডার থেকে। ৩৬ শয্যার এই 'এলবার্ট ভিকটর হাসপাতাল' উদ্বোধন করেন, লেঃ গভর্ণর স্যর জন উডবার্ণ ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯০৩ সালের আগষ্ট মাসে মেডিকেল স্কুলটি উঠে আসে নতুন বাড়িতে।"

১৮৯৫ সালে 'কলেজ অব ফিজিশিয়ান্‌স্‌ অ্যান্ড সার্জন্‌স্‌ অব বেঙ্গল' নামে একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় ২৯৪ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে। এই কলেজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এমন কয়েকজন চিকিৎসক, যাঁরা পরবর্তীকালে চিকিৎসক-সমাজের শীর্ষস্থানীয় হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার ও লেঃ কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী। এঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, মেডিকেল কলেজে আই এম এস ডাক্তারদেরই প্রাধান্য এবং তাঁদের প্রায় সকলেই ইংরেজ। সেখানে দেশীয় চিকিৎসকদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অল্প। কলকাতা মেডিকেল কলেজের সমমানের একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য। এই কলেজের পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। কলেজটি যে খুব সুষ্ঠুভাবে চলছিল, এমন বলা যায় না, কারণ ছাত্রসংখ্যা ১২।১৩ জনের বেশি কখনো হয়নি।

১৯০৪ সালের জুলাই মাসে 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল' ও কলেজ অব ফিজিশিয়ন্‌স্‌ অ্যাণ্ড সার্জন্‌স্‌ অব বেঙ্গল এই দুটি প্রতিষ্ঠান মিলিত হয়ে যায় এবং নাম হয় 'ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল এবং কলেজ অব ফিজিশিয়নস্‌ অ্যাণ্ড সার্জনস অব বেঙ্গল'। এখানে বিভাগ ছিল দুটি। একটি স্কুলবিভাগ, স্কুলের নাম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হত বাংলা ভাষায়, শিক্ষাকাল চার বৎসর। অন্যটি কলেজ বিভাগ, শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি, শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর।

সরকার এ পর্যন্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি উদাসীন ছিলেন। আই এম এস অফিসারদের অনেকে বিরূপও ছিলেন কিন্তু বেলগাছিয়াকে স্থানান্তরিত এবং দুটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হওয়ার পর, প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা এতই বেড়ে যায় যে, সরকারের পক্ষে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। সংক্রামক
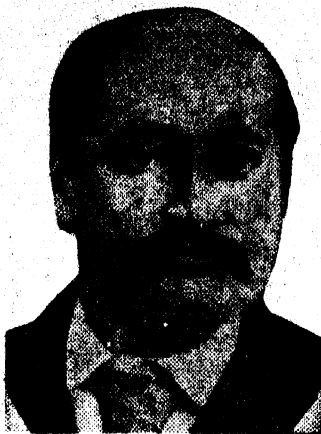
ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর

ব্যাধির একটি ব্লক নির্মাণের জন্য বাংলা সরকার ১৯০৫ সালে ১০ হাজার টাকা এককালীন সাহায্য দিলেন। কর্তৃপক্ষ তখন সংলগ্ন ১২ বিঘা জমি কিনে একটি বাড়ি নির্মাণ করালেন। গৃহ নির্মাণের জন্য পোস্তা রাজপরিবারের রাণী কস্তুরীমঞ্জরী দান করেন ৩৭ হাজার টাকা।

এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছিলেন স্কুলটিকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে রূপান্তরিত করতে, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায় এবং ছাত্ররা ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে পারে। সরকারী সাহায্যের জন্য কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে আবেদন জানান। ১৯১১ সালে সরকার বেসরকারী স্কুলগুলির কাছে প্রস্তাব দিলেন, সব কয়টি স্কুল একত্রিত করে একটি উচ্চমানের শিক্ষায়তন গড়ে তুলতে। এই সময়ে বেলগাছিয়ার স্কুল ছাড়া আরো চারটি স্কুল ছিল। সেগুলি হল, ডাঃ শরৎকুমার মল্লিকের স্কুল, ডাঃ ফার্ণাণ্ডেজের স্কুল, ডাঃ বি বসুর স্কুল এবং মেজর বি কে বসু ও কর্নেল এন পি সিনহার স্কুল। এই স্কুলগুলির অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। দুই বৎসর ধরে আলাপ-আলোচনা চলল, কিন্তু কর্তৃপক্ষদের মধ্যে মতৈক্য হল না। সরকার যখন দেখলেন, স্কুলগুলির একত্রিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, তখন বেলগাছিয়ার স্কুলকে সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। এককালীন দানরূপে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারিত হল—পাঁচ লক্ষ টাকা। সরকারের পক্ষ থেকে এই শর্ত দেওয়া হল যে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে প্রথমে প্রস্তাবিত দানের অর্ধেক অর্থাৎ আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে হবে। সরকার আরো প্রতিশ্রুতি দিলেন—৫০ হাজার টাকা বার্ষিক সাহায্যের। এতেও একটি শর্ত আরোপ করা হল। তা হল, পৌর প্রতিষ্ঠান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে যথাক্রমে ত্রিশ হাজার ও দশ হাজার বার্ষিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে।

আড়াই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করতে কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। সে সময় বাঙালীদের মধ্যে ছিলেন দুই বিখ্যাত দানবীর—স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিত। এঁরা দিলেন ৫০ হাজার করে। পি এন ঠাকুর দিলেন ২৫ হাজার, বর্ধমানের মহারাজা দিলেন ১০ হাজার। বহির্বিভাগশালা নির্মাণের জন্য রাজা যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক দিলেন ৭৫ হাজার টাকা। এছাড়া ১৮টি শয্যার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও দান করেন। অর্থ দিয়ে ও অন্যভাবে পরিচালকমণ্ডলীকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লর্ড এস পি সিনহা, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। স্কুলের শিক্ষকরা অর্থ সংগ্রহ করলেন রোগীদের কাছ থেকেও। কেউ হয়ত অপারেশনের ফি না নিয়ে বলতেন হাসপাতালের একটি শয্যা দান করতে, কেউ হয়ত ভিজিটের ফি না নিয়ে বলতেন রোগীদের জন্য কম্বল কিনে দিতে। নিজেদের উপার্জিত অর্থ সবাই দান করেছিলেন। সে সময়ে ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর যেভাবে দিনরাত পরিশ্রম করেছেন, তার তুলনা নেই। বন্ধু আত্মীয় রোগী—প্রত্যেকের কাছে হাত পেতেছেন সাহায্যের জন্য। লোকের বাড়িতে বাড়িতে গেছেন টাকা জোগাড় করতে। এইভাবে সংগৃহীত হল আড়াই লক্ষ টাকা। শর্ত অনুযায়ী সরকার ৫ লক্ষ টাকা দান করলেন।

১৯১৬ সালের ৫ জুলাই বাংলার গবর্নর লর্ড কারমাইকেল কলেজটির উদ্বোধন করেন। কলেজের নতুন নাম হল—বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ। এই বৎসরেই এম-বি ডিগ্রীর জন্য প্রথম ছাত্রভর্তি শুরু হল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ও শেষ এম-বি পরীক্ষার জন্য কলেজটিকে অনুমোদিত করে যথাক্রমে ১৯১৭ ও ১৯১৯ সালে। কলেজে রূপান্তরিত করায় জন্য উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন লর্ড কারমাইকেল। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ১৯১৯ সালে কর্তৃপক্ষ কলেজের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন—'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ'।

প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য আগে যে সোসাইটি ছিল, তার নাম পরিবর্তন করে ১৯১৮ সালের ২০ মার্চ নাম রাখা হয়, 'মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি অব বেঙ্গল'। আইনমত রেজিস্ট্রী করা হয় ১৯১৮ সালের ১ জুলাই। এই সোসাইটির প্রথম সভাপতি হলেন লেঃ কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং কর্মসচিব হলেন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা পরিচালক সমিতির সভাপতি ছিলেন তাঁরা হলেন—রায়বাহাদুর লালমাধব মুখোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯১৪), ডাঃ এম এন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৪-১৯১৮); লেঃ কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৯১৮-১৯২০); স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু (১৯২০-১৯২২); স্যার নীলরতন সরকার (১৯২২-১৯৪১); ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (১৯৪১-১৯৪৭); ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৭-১৯৫৬); ডাঃ

সুবোধদত্ত (১৯৫৬-১৯৫৮)। কলেজের অধ্যক্ষরা হলেন— ডাঃ এম এন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৬-১৯২২); স্যার কেদারনাথ দাস (১৯২২-১৯৩৬), ডাঃ এম এন বসু, ডাঃ এস কে সেন, ডাঃ এ কে রায়চৌধুরী।

১৯৪৮ সালের ১২ মে কলেজের নতুন নাম হল 'আর জি কর মেডিকেল কলেজ'। স্বাধীনতালাভের পর ছাত্রদের পক্ষ থেকে কলেজটিকে জাতীয়করণ করার দাবী উত্থাপিত হয়। ছাত্রদের দাবী ক্রমে তীব্রতর হয়ে ওঠে, ফলে ১৯৫৮ সালের ১২ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেজটির পরিচালনাভার গ্রহণ করেন।

আর, জি, কর মেডিকেল কলেজের অগ্রগতির ইতিহাস বাঙালীর উদ্যম ও স্বার্থত্যাগের ইতিহাস। একটি নগণ্য স্কুল কিভাবে নানাপ্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে একটি বৃহৎ কলেজে পরিণত হল, তার বিচিত্র ইতিহাস আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। উনিশ শতকের শেষভাগে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালীর মনীষা দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছিল। সে সময়ে আদর্শের জন্য, মহৎ কাজের জন্য, বাঙালী ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে দ্বিধা করতেন না। এই স্কুলটি যে অন্যান্য বেসরকারী স্কুলগুলির মত কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি, তার কারণ এর পেছনে ছিলেন কয়েকজন স্বার্থত্যাগী কর্মনিষ্ঠ বাঙালী চিকিৎসক। অনেকেরই নাম করা যায়, যেমন লালমাধব মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার, সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ চিকিৎসক।

রাধাগোবিন্দ করের নামে কলেজের নাম হওয়ায় তিনি সকলেরই পরিচিত হয়ে আছেন, কিন্তু লালমাধব এবং মহেন্দ্রনাথের নাম আজ আর কারো মনে নেই, অথচ লালমাধব স্কুলের সভাপতি ছিলেন বলেই সম্ভব হয়েছিল স্কুলের উন্নতি, কারণ সরকারী মহলে ছিল তাঁর প্রতিপত্তি। সরকারী মহলে তাঁর প্রভাব কত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, একটি ঘটনায়। একবার জয়পুরের মহারাজা সিওয়াই মানসিংহ চোখের অসুখে আক্রান্ত হলে তাঁর চিকিৎসার জন্য ভাইসরয় লর্ড মেয়ো লালমাধবকে অনুরোধ করেন। সাধারণতঃ সাহেব আই, এম, এস, অফিসারদেরই এসব ক্ষেত্রে পাঠান হত। এই ঘটনার পর থেকে দেশীয় রাজন্য পরিবারে চোখের চিকিৎসার জন্য নিয়মিত তাঁর ডাক পড়ত।

লালমাধব বাঙালী চিকিৎসকদের মধ্যে প্রথম চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। কলকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৫ সালে, কিন্তু ১৮৪০ সালের আগে চোখের জন্য পৃথক কোন বিভাগ ছিল না। ঐ বৎসরে একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয় এবং এই বিভাগের পার্ট-টাইম অধ্যাপক হন ডাঃ মার্টিন। চক্ষুরোগের জন্য পৃথক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬০ সালে হ্যালিডে স্ট্রীটে (বর্তমান মহম্মদ আলি পার্ক)। ডাঃ আর্চার এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ডাঃ

ডাঃ এস এন ব্যানার্জি

আর্চারের পর অধ্যাপক হন বিখ্যাত চার্লস ম্যাকনামারা। ম্যাকনামারাই হলেন চক্ষু বিভাগের প্রথম পূর্ণ অধ্যাপক। তাঁর রচিত 'ডিজিজেস অফ দি আই' এবং 'ট্রীটিজ অন কোবরা' সেকালের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। লালমাধব ম্যাকনামারার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

লালমাধবের জন্ম ১৮৪১ সালে। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। ফ্রি চার্চ কলেজে পড়াশুনা করেন লালমাধব। ১৮৬১ সালে ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে। ১৮৬৬ সালে এল, এম, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী কাজে যোগ দেন 'ফেমিন হাসপাতালে।' উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর চিকিৎসার জন্য চিৎপুর ও শিয়ালদাতে চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছিল।

এরপর লালমাধব যোগ দেন হ্যালিডে স্ট্রীটের চোখের হাসপাতালে। ম্যাকনামারার সঙ্গে কাজ করে অতি অল্পদিনেই চক্ষুরোগের বিশেষজ্ঞ হিসাবে যশস্বী হয়ে ওঠেন। এখানে তের বৎসর কাজ করার পর ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের চক্ষু বিভাগের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। চিকিৎসায় তাঁর বিরাট পসার ছিল, অর্থও উপার্জন করেছেন প্রচুর। দূর দূর জায়গা থেকে রোগী আসত তাঁকে দেখাতে। ইংরেজ চিকিৎসকরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, লালমাধব শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিকিৎসকদের সমকক্ষ। বিদেশীদের চোখে তাঁর স্থান এতই উচুতে ছিল যে তিনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি ক্যালকাটা মেডিকেল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪০ সালে। এর প্রথম সভাপতি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডি, বি, স্মিথ এবং যুগ্ম-সম্পাদক বিখ্যাত সার্জন কেনেথ মেকলিয়ড ও রবার্ট হার্ভে।

শিক্ষক হিসাবেও ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের সুনাম ছিল। ম্যাকনামারার দুটি গ্রন্থ তিনি বাংলায় অনুবাদ করে স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করেন।

লালমাধব ১৮৭৯ সালে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন, ১৮৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ১৮৯০ সালে সিন্ডিকেটের সভ্য হন। ক্যালকাটা বেথুন সোসাইটির কাউন্সিলেরও সভ্য নির্বাচিত হন। সরকার রায় বাহাদুর উপাধি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন।

মেয়ো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা চার্লস ম্যাকনামারা। লালমোহনও ম্যাকনামারার কাজে বহুভাবে সাহায্য করেন। মেডিকেল স্কুলের উদ্যোক্তারা এমন এক ব্যক্তিকে পরিচালক-সমিতির সভাপতি হিসাবে চাইছিলেন, যিনি দেশী ও বিদেশী সকলের সমান শ্রদ্ধার পাত্র। সে হিসাবে লালমাধব ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। এই স্কুলের জন্য তিনি যে শুধু অন্যের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তাই নয়, নিজের উপার্জিত অর্থও অকৃপণভাবে দান করেছেন। লোকে বলত, লালমাধবের গৃহের দ্বার সকলের কাছে অবারিত। তাঁর কাছ থেকে কোন প্রার্থী বিফল হয়ে ফিরে যায়নি। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের সভাপতি ছিলেন। তাঁর মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বিশাল বাড়িতে যেমন লাটসাহেব আসতেন, রাজা-মহারাজারা আসতেন, তেমনি আসত সাধারণ মানুষ, প্রার্থী হিসাবে।

লালমাধবের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়েছিল বিখ্যাত চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যার নামে ডাঃ এম, এন, চ্যাটার্জি আই হাসপাতাল।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেডিকেল স্কুলের পরিকল্পকদের একজন। স্কুল-প্রতিষ্ঠা, স্কুলের উন্নতি প্রভৃতিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তিনি

ছিলেন লণ্ডনের এম, আর, সি, এস, প্র্যাক-টিস ছিল ব্যাপক। স্কুল যখন কলেজে পরিণত হল, তখন তিনি হলেন এর প্রথম অধ্যক্ষ।

মহেন্দ্রনাথের জন্ম নদীয়া জেলার স্বর্ণপুর গ্রামে। প্রথমে লেখাপড়া করেন গ্রামের পাঠশালায়। দশ বৎসর-বয়সে চলে আসেন কলকাতায়। এখানে প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়েন। ১৮৭৭ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বি-এ পাশ করে ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে রসায়নের অধ্যা-পনা শুরু করেন। একই সঙ্গে মেডিকেল কলেজেও পড়তে থাকেন। ১৮৮০ সালে যান ইংলন্ডে। লণ্ডনের কিংস কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮২ সালে এম, আর, সি, এস, এবং এল এস এ উপাধি লাভ করেন এবং সেন্ট টমাস হাসপাতালে রেসিডেন্ট মেডি-কেল অফিসার হিসাবে কিছুকাল কাজ করেন।

১৮৮৬ সালে ডাঃ ব্যানার্জি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং প্র্যাকটিস শুরু করেন। অতি অল্পদিনেই সুচিকিৎসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। বেসরকারী মেডিকেল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা এই সময়েই তাঁর মাথায় আসে।

জনসেবা ডাঃ ব্যানার্জির স্বভাবধর্ম। জনসেবায় নিজে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তেমনি অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৮৯৫ সালে কলকাতায় প্লেগ মহামারি আকারে দেখা দেয়। শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে কলকাতার মানুষ দিন কাটাচ্ছিল। ১৮৯৪ সালে কিটাসাটো এবং ইয়ারসিন প্রায় একই সঙ্গে প্লেগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। জীবাণু আবিষ্কৃত হলেও রোগ বিস্তারের কারণ তখনো ছিল অজ্ঞাত। ১৮৯৪ সালে বোম্বাই শহরে প্লেগ মহামারি শুরু হয়েছিল। সেখানে গবেষণা করছিলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সিমন্ড। ১৮৯৭ সালে তিনি রোগ বিস্তারের তথ্য সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্লেগ আসলে ইঁদুরের রোগ, মানুষ আক্রান্ত হয় দৈবাৎ। আরো পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সিমণ্ডের ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং এ তথ্যও আবিষ্কৃত হয় যে ইঁদুরের গায়ের কীট প্লেগ ছড়ায়। ডাঃ ব্যানার্জি প্লেগে আক্রান্ত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সে সময় প্লেগের সুচিকিৎসা ছিল না। প্লেগ হলে মৃত্যু ছিল প্রায় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু রোগাক্রান্ত মানুষ চায় যন্ত্রণার উপশম। চিকিৎসক সব সময় মৃত্যু ঠেকাতে পারেন না, কিন্তু যন্ত্রণা লাঘব করতে পারেন। তার উপর চিকিৎসক যদি সংবেদনশীল হন, তবে রোগীর যন্ত্রণা বহুলাংশে হ্রাস পায়। ডাঃ ব্যানার্জির ছিল সংবেদনশীল মন। দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছেন, প্লেগঅধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সব সময় ঘুরেছেন। বহু রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, কিন্তু নিজেও আক্রান্ত হলেন সেই ভয়া-বহ ব্যাধিতে। জীবনের আশা প্রায় ছিলই না। সৌভাগ্যবশতঃ আরোগ্যলাভ করলেন। জনসেবার এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন কর-লেন তিনি। ১৮৯৯ সালের ১৪ সেপ্টে-ম্বরের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ডাঃ ব্যানার্জির এই কর্মনিষ্ঠার কথা প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়।

ডাঃ ব্যানার্জি মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে ১৮৮৬ থেকে ১৯২২ এই দীর্ঘ ৩৬ বৎসর জড়িত ছিলেন। এই স্কুলের উন্নতিই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। ১৯১৬ সালে স্কুল যখন কলেজে পরিণত হয়, তখন তিনি হলেন এর অধ্যক্ষ। নব প্রতিষ্ঠিত কলেজের অধ্যক্ষপদের গুরু-দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে কঠিন ছিল না, কারণ অধ্যক্ষের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, সবগুলিই তাঁর ছিল। বিদেশের শিক্ষা, চিকিৎসায় প্রসার, সেবাধর্মের প্রতি প্রবণতা, আবার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসনে দক্ষতা। কর্তব্যে অবহেলা কখনো ক্ষমা করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনু-মোদনলাভ করেছে কলেজ, ছাত্ররা এম-বি পরীক্ষা দেবে। সকলের দৃষ্টি এই কলেজের উপর। ছাত্রদের পরীক্ষা দিতে হবে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে, ডাইকসাইটে আই, এম, এস অফিসারদের কাছে। যদি পরীক্ষার ফল খারাপ হয়, তবে বেসরকারী কলেজের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকবে না এবং এতদিনের এত পরিশ্রম, সবই পণ্ড হবে।

ডাঃ ব্যানার্জি হাসপাতালের অনেক-গুলি শয্যা নিজের অর্থে স্থাপন করেন। ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনিই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

চিকিৎসাবিদ্যা প্রসারে মহেন্দ্রনাথ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং এদেশে চিকিৎসা বিষয়ে সরকারকে যে সমস্ত সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, তার জন্য সরকার ১৯২১ সালে তাঁকে সি, আই, ই উপাধিতে সম্মানিত করেন। তিনি ১৯২২ সাল অবধি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর মহেন্দ্রনাথ বিডন স্ট্রীটে অরবিন্দ ফার্মেসী খুলে প্র্যাকটিস শুরু করেন। এখানে তিনি নিজের বাড়ি তৈরী করেছিলেন। পরে থিয়েটার রোডে বাড়ি কিনে সেখানে চলে যান। তাঁর এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার ছিলেন এবং বিবাহ করেছিলেন স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জির কন্যাকে। ১৯৩১ সালের ১৪ জানুয়ারী মহেন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর যখন কলেজের নাম পরিবর্তনের কথা উঠল, তখন কলকাতার কোন এক ধনী ব্যক্তি কলেজ-ফান্ডে দুই লক্ষ টাকা দান করতে এগিয়ে এলেন এই শর্তে যে কলেজটির নাম হবে ঐ পরিবারের অনৈক ব্যক্তির নামে। কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর কোন কোন সদস্য কলেজের চিরকালীন অর্থ সমস্যার কথা চিন্তা করে এই লোভনীয় প্রস্তাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু কেউ কেউ এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। তাঁরা প্রস্তাব করলেন রাধাগোবিন্দ করের নামে কলেজের নামকরণ করতে। সকলে সানন্দে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন (এই ঘটনা ডাঃ সুবোধ দত্তের কাছে শোনা)।

ডাঃ রাধাগোবিন্দ করকে নিঃসন্দেহে এই কলেজের জনক বলা যায়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিকল্পক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকে তিনি এর কর্মসচিব। তাঁর কোন সন্তান ছিল না, এই প্রতিষ্ঠানকেই তিনি সন্তানবৎ লালন করেছেন। তাঁর দিনরাতের একমাত্র চিন্তা ছিল, কিভাবে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বড় করে তোলা যায়। বেসরকারি মেডিকেল স্কু চালানো সহজ ব্যাপার নয়, প্রধান সমস্যা অর্থের। হাসপাতালের ফ্রি-বেডের খর কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতির জন্য দরকা মোটা টাকার। অর্থের জন্য ডাঃ কর ব ব্যক্তির কাছে হাত পেতেছেন, অনেক সম অপমানিত হয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই ত উদ্যম হ্রাস পায় নি। বিদেশের দ মেডিকেল ডিপ্লোমার অধিকারী ডাঃ করে চিকিৎসা ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রসার ছিল। লিখেও উপার্জন করেছেন প্রচুর।

ইচ্ছা করলে বহু টাকার মালিক হ বিলাসিতায় জীবন কাটাতে পারতেন। কি তা না করে অর্জিত সব অর্থই দ করেছেন মেডিকেল স্কুলে। মৃত্যুর স বাড়িটি ছাড়া তাঁর নিজস্ব আর কিছুই ছি না। মৃত্যুর আগে উইল করে বাড়িটিও দ করেন বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজকে উইলে নির্দেশ দেন, যতদিন তাঁর জীবিত থাকবেন, ততদিন স্ত্রী বাড়িটি ভো করবেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বাড়ি পিতার নামে দুর্গাদাস আরোগ্য নিকেত নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হবে। করের স্ত্রীর মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে। মা কারণে ডাঃ করের শেষ ইচ্ছা কার্যে পরিণ

করা সম্ভব হয়নি। সম্পত্তি বিক্রয় করে পাওয়া গিয়েছিল ৭৫ হাজার টাকা। সে টাকা কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ফাণ্ডে জমা করা হয়। এই কলেজের জন্য অনেকে অনেক দান করেছেন সত্য, তবে ডাঃ করের মত সর্বস্ব দান করার দ্বিতীয় কোন নজির নেই।

রাধাগোবিন্দ করের জন্ম ১৮৫২ সালের ২৩ আগস্ট, হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে। পিতা ডাঃ দুর্গাদাস কর বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলে বহুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'ভৈষজ্য-রত্নাবলী' সেকালে বাংলা মেটিরিয়া মেডিকার সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র যখন ঢাকায় পোস্ট-অফিসে কাজ করতেন, তখন দুর্গাদাসও সেখানে ছিলেন। দুজনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। দুর্গাদাস 'স্বর্ণ শৃঙ্খল' নামে একটি নাটকও রচনা করেছিলেন। তাঁর চার পুত্র ও ছয় কন্যা। পুত্রদের নাম, রাধা-গোবিন্দ (ডাক নাম গোবি), রাধামাধব (ডাক নাম মাধু), রাধারমণ ও রাধাকিশোর। শ্যামবাজার স্ট্রীটে দুর্গাদাস একটি বিরাট বাড়ি তৈরি করেন।

রাধাগোবিন্দ প্রথমে কলকাতার মেডি-কেল কলেজে পড়েন। ১৮৮৩ সালে ইউ-রোপে যান। এডিনবরা থেকে এল, আর, সি, পি ও এল, এম ডিপ্লোমা লাভ করে ১৮৮৬ সালে ফিরে আসেন দেশে। সর-কারী কাজে যোগ না দিয়ে প্রাইভেট প্র্যাক-টিস শুরু করেন শ্যামবাজারে। প্র্যাক-টিসও জমে উঠে অল্প দিনের মধ্যে।

১৮৮৬ থেকে ১৯১৮ অর্থাৎ মৃত্যু অবধি মেডিকেল স্কুল ছিল ডাঃ করের ধ্যানজ্ঞান। সে সময়ে লোকে এই স্কুলকে আর জি করের স্কুল নামেই অভিহিত করত। ১৯১৬ সালে স্কুলটি যখন কলেজে পরিণত হয়, তখন শিক্ষার মাধ্যম হয় ইং-রেজী। আর, জি, কর যে উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুল স্থাপন করেছিলেন, কলেজে পরিণত হওয়ায় সে উদ্দেশ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ হল। তাই তিনি আরেকটি স্কুল স্থাপনের পরি-কল্পনা করতে লাগলেন। যেখানে বাংলাতে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ান হবে। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সে পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি।

ডাঃ কর কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রণেতা। সে সব গ্রন্থ মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের জন্য বাংলায় লেখা। গ্রন্থগুলি হল, সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব বা মেটিরিয়া মেডিকা সার-সংগ্রহ, ভিষক-সুহৃদ, ধাত্রী সহায়, অ্যানাটমি, কর-সংহিতা, সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা, রোগী পরিচর্যা, নূতন ভৈষজ্যতত্ত্ব, প্লেগ, স্ত্রীরোগ চিকিৎসা, গাইনিকলজি।

ডাঃ করের চরিত্রে একটি বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। মেডিকেল স্কুলের জন্য তিনি সর্বস্ব দিয়েছেন সত্য, তবে ব্যক্তিগত জীবনে বেশ শৌখিন ছিলেন। তাঁর শ্যাম-বাজারের বাড়িটির নকসা গ্রীক স্থাপত্যের অনুকরণে রচিত হয়। বাড়ির প্রবেশপথ থেকে শুরু করে ভিতর পর্যন্ত ইটালিয়ান মার্বেল ব্যবহার করা হয়। বিখ্যাত শিল্পী-দের তৈলচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন। বাড়িতে অনেককটি ভাল জাতের কুকুর ছিল। কুকুরদের জন্য আলাদা একটি ঘরও ছিল। তাঁর আস্তাবলে ছিল অনেকগুলি ঘোড়া। ঘোড়ার গাড়িগুলি সব সময়ে ঝকঝক করত। সাধারণ লোকের কাছে তিনি কর সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন।

ছাত্রজীবনেই রাধাগোবিন্দের বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন পরে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। রাধাগোবিন্দের বৈচিত্র্যময় কর্মযজ্ঞে এই মহিলার অকৃপণ সহযোগিতা অবশ্যই স্মরণীয়। ডাঃ কর ছিলেন খেয়ালী মানুষ, অল্পেই রেগে যেতেন। স্ত্রী সব সময়েই স্বামীর অযৌক্তিক বাড়াবাড়ি নীরবে সহ্য করতেন। হাসপাতালের রুগীদের জন্য অনেকসময় নিজের হাতে পথ্য তৈরি করে দিতেন। মাঝে মাঝে দুঃখ করতেন, সন্তান নেই বলে। ডাঃ কর তখন বলতেন, 'তোমার ছেলের অভাব কি? আমার স্কুলের সব ছাত্রই তো তোমার ছেলে।'

শিল্প, সাহিত্য, অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ করের বিশেষ আকর্ষণ ছিল; ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে কর পরিবারের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে অনেকবার এসেছিলেন। ডাঃ কর ও তাঁর ভাইদের মধ্যে একমাত্র রাধারমণের সন্তান ছিল। রাধারমণের চার পুত্র ও ছয় কন্যা। কন্যা মনোরমার সঙ্গে বিবাহ হয় সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে। যখন হেমেন্দ্রপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের কঠোর সমা-লোচনায় লিপ্ত এবং দুজনের সম্পর্ক তিক্ত, তখনও মনোরমা ও তাঁর সন্তানরা রবীন্দ্র-নাথের কাছে আগের মতই স্নেহলাভ করে-ছেন।

ডাঃ কর অভিনয় ভালবাসতেন, বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। অনুজ রাধামাধব খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন এবং তাঁকে নাট্যাচার্য বলা হত। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু কর-গৃহে নিয়মিত যাতা-য়াত করতেন। অমৃতলাল তাঁর 'হীরক-চূর্ণ' নাটক কর-গৃহে বসেই রচনা করে-ছিলেন।

'লিখেছি হীরক-চূর্ণ পূর্ণপাত্র করে।
বয়স বাইশ যবে বাঁশি কর ঘরে।।'

অমৃতলাল মেডিকেল কলেজে রাধা-গোবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। দুই বৎসর পড়ার পর মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেন। তিনি লিখেছেন, 'ডাক্তার ম্যাকনামারা নামে তখন কলিকাতায় চক্ষুরোগের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও অন্যান্য কয়েকটি বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ধরিয়া বলিলেন, 'যেমন করিয়া হউক, একটা দেশীয় হাসপাতালের জন্য কিছু টাকা তুলিয়া দেওয়া চাই।' ....'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। আমি দুই টাকা দর্শণী দিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়েছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, গিরীশবাবু নবীনমাধব সাজিয়া-ছিলেন, মতিবাবু তোরাপ, গোবি (ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর) সৈরিন্ধ্রী, মাধু (শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর) সাজিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমার এখন মনে পড়িতেছে না। ......সে রাত্রির টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ডাক্তার ম্যাকনামারার হস্তে অর্পিত হইল। এমনি করিয়া মেয়ো হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনে বাঙ্গালীর থিয়েটার অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হইলেন।'

মনোরমার বিবাহের আগে কর পরি-বার থেকে অভিনয় চর্চা উঠে যায়। রাধা-রমণ দাদাদের বললেন, 'তোমরা যদি থিয়ে-টার কর, তবে তো আমার মেয়েদের বিবাহ হবে না।' এই কথায় কর-ভ্রাতারা পেশা-দারী থিয়েটার ত্যাগ করলেন। রাধামাধব শেষ বয়সে সস্ত্রীক কাশীবাসী হন। কনিষ্ঠ রাধাকিশোরও থিয়েটার করতেন। তিনি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান।

১৯১৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর ডাঃ কর দেহত্যাগ করেন। সে সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারি চলছিল। ডাঃ কর এই রোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর সময় তিনি দেখে গেলেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেডি-কেল স্কুল এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী

সুধাংশুকুমার রায়

আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামীর নাম শুনলে বুদ্ধশিষ্য আনন্দের কথা মনে পড়ে। যাঁর স্থির অনুগত ও ছায়ার -মত অনুগামী শিষ্য আনন্দ, গুরু ও পরমাত্মীয়, বুদ্ধের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধের অত্যন্ত স্নেহভাজন। আনন্দের সেবা ও আনুগত্যই ছিল এই সম্পর্কের মূল। কুমারস্বামীর গুরু ছিল না কেউ—ছিল জননী ভারতবর্ষ। সেই ভারতজননীর সেবায়, তাঁর কীর্তনগানে, তাঁর রূপের ব্যাখ্যায়ই কুমারস্বামীর জীবন কেটেছে। বোস্টন মিউজিয়মের চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের সময় বিদায় সভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা পড়লে চোখে জল আসে। সে যেন কোন প্রবাসী সন্তানের বহুদিন পরে মাতৃক্রোড়ে ফিরে যাওয়ার কান্না। 'আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাব'—যদিও তাঁর পিতৃভূমি সিংহল, সে দেশের কথা বলেন নি—তাঁর আত্মীয়, প্রাণদায়িনী ভারতমাতার কথাই বারে বারে বলেছিলেন। ভারতবর্ষ ছিল তাঁর ধ্যানের ধন; সেখানেই, হিমালয়ের তপোবনে বাস করার ও দেহ রাখবার একান্ত বাসনা ছিল মনে।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের ত্রিভুজের তিনি 'গ' কোণ। ভারতবর্ষ পুতুল-পুজোর দেশ নয়, ভারতবাসী পৌত্তলিক নয়—তার ধর্ম হল শিল্পের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা—এই সত্যই তিনি জগদ্বাসীকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে গেছেন। আমাদের পোড়াকপাল, তাই তাঁকে ঈশ্বর আমেরিকা থেকে ফিরতে দেননি। অবসর নেবার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়—যেমন হয় গুরুসদয় দত্তের। গান হল কিন্তু পুজো হল না, অর্থাৎ আশ্রম হল না। প্রশ্ন হয়ে গেল ভারতবর্ষে ফিরে তিনি কি করতেন আমরা তাঁকে পেলে কি করতাম? তিনি কি করতেন তা তাঁর ঐ বিদায় বক্তৃতায় ইঙ্গিত করা আছে। আমরা দিতাম তাঁকে অকৃতজ্ঞের অবজ্ঞা—আমাদের অবহেলার জন্যই শূন্যহাতে ফিরেছেন অবনীন্দ্রনাথ, উদয়শংকরও ফিরে যাবেন। এসব মহাপুরুষ সর্বদেশে সর্বকালে জন্মান না—তাঁদের পায়ের তলায় বসে শিক্ষালাভের সুযোগ; সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। সে শিক্ষার আগ্রহ, আমাদের নেই। অবনীন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট উঠে গেছে, উদয়শংকরের নৃত্যশিক্ষা কেন্দ্রও উঠে গেছে আমাদেরই অবহেলায়। আমরা, বিশেষতঃ বাঙালীরা তাই অপরাধী। কুমারস্বামীর বহু আকাঙ্ক্ষিত শিল্পানুশীলন আশ্রম ও প্রত্নানুসন্ধানের মঠ-মন্দির কই?

ভূতত্ত্ব না জানলে ভূগোল বোঝা যায় না, ভূগোল না জানলে প্রত্নতত্ত্ব বোঝা যায় না। প্রত্নতত্ত্ব জানতে হলে নৃতত্ত্ব জানা চাই, মনস্তত্ত্ব না জানলে নৃতত্ত্ব বোঝা যাবে না। এতসব জানলে তবে একটা দেশের শিল্পের বা আর্টের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কুমারস্বামী ছিলেন আদিতে ভূতত্ত্ববিদ—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ভূতাত্ত্বিক। তাই তলার মাটিতে তার বিদ্যাবুদ্ধির বনিয়াদ গাঁথা ছিল বলে, অনায়াসে ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, এমনকি কঠিন সংস্কৃত ভাষার বেড়া ডিঙিয়ে ভারতশিল্পের সত্যার্থ বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেউ তাঁকে মাথায় 'দীক্ষা' দিয়ে একাজ করতে বলেনি বা শেখায় নি। একাজে তিনি নিজেকে নিজেই শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। বিরাট এই পুরুষ, পুরুষার্থ ও প্রতিভায় একমাত্র উদাহরণ উত্তুঙ্গ হিমালয় এবং শেকসপিয়র সম্বন্ধে আর্নল্ডের ভাষাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য—স্বশিক্ষিত, স্বপরীক্ষিত, স্বসম্মানিত এবং স্বনির্ভর। একজন ভূতাত্ত্বিক তৈলানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়ে কি করে শিল্পানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন, কি করে নিজেই নিজেকে সেকাজের উপযুক্ত করে তুললেন, কি করে নিজের কাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিজেই করলেন, নিজেই আপন কাজের দ্বারা নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে জগৎ-সভায় সম্মানিত করে তুললেন—সে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার। আর শুধু তাই নয় ইংরেজ-দেবকীর গর্ভে জন্ম নিয়ে কি করে ভারতী-যশোদাকে মা বলে ডাকতে পারলেন? মৃত্যুর পূর্বে কি করে বললেন 'আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাব?' রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে 'ভারত আত্মার বাণীমূর্তি তুমি'; আর কুমারস্বামী ভারতশিল্পের বাণীমূর্তি তো বটেই—ভারত-আত্মার তিনি যথার্থই আনন্দমূর্তি! আনন্দই শিল্পসৃষ্টির মূল; উপনিষদের বাণীই হল আনন্দে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। সেই আনন্দের প্রকাশই ভারতশিল্প—সে আনন্দ, সে অমৃত কুমারস্বামী আকণ্ঠ পান করেছিলেন, আত্মপ্রচারের জন্য নয়, ভগবদারাধনার জন্য।

'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়'—তাঁর বই তাঁর বক্তৃতা, ভারত-ধর্মের তথা শিল্পের তাঁরই ধ্যানলব্ধ উপলব্ধির লিখিত প্রকাশ—সেসব আমাদের শিক্ষার জন্য, আমাদের ধ্যানের জন্য উপলব্ধির জন্য। আনন্দের অংশভাগী হওয়ার জন্য ভগবদারাধনার জন্য সঞ্চিত রেখে গেছেন। বিদেশীদের তিনি ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে ভারতশিল্প হিন্দুদের পুতুল-পুজোর আনুষঙ্গিক ইয়ারকির বস্তু নয়, পরন্তু তাদের ভগবদারাধনার মাধ্যম; যে মাধ্যম ঈশ্বরের নৈকট্য, লীলা ও দর্শনের সাক্ষ্য বহন করে, তাঁর গোপন রহস্যময় ইতিবৃত্তের অবতারণা করে তাঁরই সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটায়। এই সাক্ষাৎই মঙ্গলকাব্যের মঙ্গল বা ঈশ্বরের আবির্ভাব (অ্যাপিয়ারেন্স অব গড)। সেই কারণে হিন্দুধর্ম হল—'ওয়ার্শিপ অব গড থ্রু আর্ট'।'

কুমারস্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যই কেবল বই লেখেন নি, তাঁর বই আমাদের সমগ্র জাতীয় চেতনার, ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার মূলাধার স্বরূপ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে অবাধ আলাপ, আলোচনা ও পরামর্শ উভয় শিবিরের মানসিক

রিবর্তন আছে। এখানেই কুমারস্বামী
নয়েছিলেন স্বদেশীয়ানার দীক্ষা, অব-
ীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন স্বদেশী শিল্পের
না এক শক্তিশালী কলারসিকের উৎসাহ,
। শিল্পসৃষ্টির জন্য একান্তই প্রয়োজনীয়
দা। এ খাদ্য (স্টিমুলান্ট) রবীন্দ্র-
াথকেও খেতে হয়েছিল তাঁর কাছ থেকে,
দিও অনেক পরে। কুমারস্বামীর ভারত-
ল্পের ব্যাখ্যা, বিশেষ করে নৃত্যরত শিব-
ূর্তির সত্য ও অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ
ঃপস্থাপন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে তখনই
াভিভূত করেছিল। শুধু অভিভূতই
রেনি—শিবের পরমাত্মীয়, একান্ত-ঋদ্ধ
বং আত্মভাবকে পরিণত করেছিল;
বীন্দ্রনাথই তো আমাদের জন্মজন্মান্তরের
াদিকবি বাল্মীকি, হরিগুণগানরত, বীণা-
ন্তহাতে দেবর্ষি নারদ। সেই সম্বিৎ ফিরে
পয়েই কবি শিবের বিবাহের বরযাত্রী হয়ে
লেন—নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে নয়—
চরকালের দেবকবির অধিকারে, শিবের
রমাত্মীয়ের পরিচয়ে, মহাদেবের ভক্তিপ-
াহক হয়ে নয়, ঈশ্বরের কুলমর্যাদার প্রতীক
ূপে। এ উৎসবযাত্রায় রবীন্দ্রনাথ না গেলে
শবের বিবাহ-অনুষ্ঠান অশুদ্ধ, অপবিত্র
য়ে যেত, হিন্দু-ভাবতত্ত্ব রয়ে যেত অব-
হেলিত ও অবজ্ঞাত। তিনি তাই বলেই
দয়েছেন 'কবি সঙ্গে চলে'। এই পৃথিবীতে
ামরা জন্মগ্রহণ করি খাবার জন্য নয়,
াকরির জন্য নয়, বিলাস-বাসনের জন্যও
য়, সে শুধু আত্মীয়দের সঙ্গে থাকার জন্য,
সার জন্য। একবার গ্রামের এক চাষীকে
িজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার সঙ্গে ওই
ছেলেটি কে?' বললে না ছেলে কি ভাগ্নে,
লেলে সঙ্গে ঘোরে। পরমাত্মীয় বলেই 'কবি
সঙ্গে চলেন' শিবের।

জানি না অপরে কি মনে করবেন। আমার কবিগুরুর এই তিনটি শব্দের বাক্য প্রাণে অপূর্ব সাড়া জাগায়। কল্পনা করি—দীর্ঘাকৃতি, শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত, পুরুষসিংহ, দেবানমপিয়েন পিয়দশীন রবীন্দ্রনাথ চলে-ছেন, তাঁর আগে বরবেশে সজ্জিত মহাদেব শিব দোলায় চড়ে, পিছনে দেবতাদের শোভা-যাত্রা। সবার আগে ডোমেরা বাজিয়ে চলেছে কাড়া, নাকাড়া আর জগঝম্প। এতো বীর-ভূমের মটরু চিত্রকরের অঙ্কিত পট। এ পট কুমারস্বামী জোড়াসাঁকোয় না এলে তৈরী হত না। ঠাকুরবাড়ির দরদালানে তিনিই শিবগীতের 'আধুনিক কথক ঠাকুর।'

কুমারস্বামী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন না। আচার্য জগদীশচন্দ্র বা প্রফুল্লচন্দ্রের মত দিকপাল শিষ্য-মণ্ডলীও রেখে যান নি। তবু একথা বলতেই হবে যে, আচার্য 'কালিদাস নাগ, নীহাররঞ্জন রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ, সরসীলাল সরস্বতী, কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীর মত বহু মানসশিষ্য তিনি ভারতবর্ষে রেখে গেছেন। এঁরা তাঁরই মন্ত্রপূত বারির স্নাতক; ভারত-শিল্প কথকতার যোগ্য উত্তরাধিকারী কথক।

আমাদের স্বীকার করতেই হবে—আজ যে আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে পট, পাটা, মাটির কাজ, কাঠের বা পাথরের মূর্তি, কাঁথা, মাদুরের খোঁজ করছি, তাই নিয়ে মিউজিয়ম গড়ছি, গবেষণা করে বই লিখছি, বক্তৃতা দিচ্ছি— এতো সবই কুমারস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। মহাভারতীয় শিল্পের খোঁজ ছিল তাঁর নখদর্পণে; এ খোঁজ তাঁকে অন্য কেউ দেয়নি। ভারত-বর্ষের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত—'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর'—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে এই কষ্ট-সাধ্য অভিযান তিনি একলাই চালিয়েছিলেন

নিরন্তর। আর তা এমন এক সময়ে, যখন ছিলেন যখন ছিল না স্কুল, কলেজ, নেই, নইলে অকাল। নাছিল কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কলাবিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা, না ছিল বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদ, না ছিল আশুতোষ সংগ্রহশালা ও উদ্যান ম্যুজিয়মের মর্যাদা। রাজঘাট, লোথাল, পাহাড়পুর শিল্প-কলার নিদর্শন। আরও কত বিচিত্র শিল্প-সম্ভার। এসব দিয়ে তৈরী ছিলেন বিশ্বকীর্তি মিউজিয়ম গড়ে তুলতে, যেখানে বসে

গবেষণা করতে বই লিখতে। স্বদেশী যুগে স্বদেশী শিল্পের এই স্বদেশীয়ানা, ইংরেজ বিদেশী শাসনকর্তারা সন্দেহের চক্ষে দেখেছিল; বিশেষ করে তাঁর লেখা বই 'আর্ট ও স্বদেশী' বিপদ ডেকে এনেছিল। তাঁর গ্রন্থতো বাজেয়াপ্ত হয়েইছিল, উপরন্তু, তাঁকে ভারত ত্যাগ করে অ্যামেরিকায় চলে যেতে হয়েছিল। অ্যামেরিকা শুধু যে তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল তাই নয়, সেই বিরাট মহামূল্য শিল্পসংগ্রহ দিয়ে মিউজিয়ম গড়ে তাঁকেই দিয়েছিল রক্ষকের ভার। শাপে বর হল। নিশ্চিন্ত মনে আরম্ভ করলেন ভারত-শিল্পের ব্যাখ্যান। বিবেকানন্দ আরম্ভ করেছিলেন ভারতধর্মের ব্যাখ্যান প্রথম অ্যামেরিকায়, আর কুমারস্বামীও ভারতশিল্পের ব্যাখ্যান আরম্ভ করেছিলেন প্রথম সেখানেই। তিনি কি বিবেকানন্দের অনুপূরক?

আমার তাই মনে হয়। কুমারস্বামী স্বামীজির দুরধিগম্য রাস্তার সহগামী—একজন করেছেন ধর্মের ব্যাখ্যা, আর একজন ধর্মশিল্পের ব্যাখ্যা—একজন গায়ক, আর একজন বাদক। বাদক ছাড়া গান জমে না। চিকাগোর গানের সঙ্গত বোস্টনে বেজেছিল; দুজনের মিলিত ধর্মসঙ্গতই বিদেশে ভারতধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছে। রোঁলার ভাষায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন মূর্তি ঈশ্বরের এ্যাটরিবিউট', অর্থাৎ তাঁর প্রতীক-রূপে কল্পিত দ্রব্য, যার মধ্যে তাঁরই বৈশিষ্ট্য, ধর্ম ও গুণাবলী প্রকাশ পায়।' বিবেকানন্দ করেছিলেন ঈশ্বরের ব্যাখ্যা, কুমারস্বামী ঈশ্বরের মূর্তির ব্যাখ্যা। একজন ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী, অন্যজন গৃহী ধর্মশিল্প-সমালোচক (আর্ট ক্রিটিক)। কুমারস্বামী না থাকলে বিবেকানন্দের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে যেত; কারণ প্রতিমাপূজার পুতুলগুলির ব্যাখ্যা দেবার জন্য নিপুণ 'আর্ট ক্রিটিকের' অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন তিনি অতীব যোগ্যতার সঙ্গে মিটিয়ে গেছেন। আর সে প্রয়োজন তখন বিবেকানন্দের চেয়ে আর কেউ বেশী অনুভব করেন নি—বিদেশে বিধর্মীদের মধ্যে হিন্দু-ধর্মের প্রচারে প্রধান বাধাই ছিল প্রতিমা-পূজা (আইডল্যাট্রি)। এই প্রতিমা লক্ষণের ব্যাখ্যা দেবার জনই কুমারস্বামীর জন্ম হয়েছিল, বিবেকানন্দের মতই তিনি ভারত-ভাগ্য-বিধাতার আদিষ্ট পুরুষ। বিবেকানন্দের তিনি অদীক্ষিত গুরুভ্রাতা, তাঁর কর্মের সহকারী শরিক—রামের লক্ষ্মণ। হিন্দু নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ দীক্ষা দিয়ে উন্নিত করেছিলেন বিবেকানন্দে, হিন্দুধর্মের প্রবক্তা সন্ন্যাসীতে, কিন্তু অ্যাংলো সিংহলী খ্রীস্টান সন্তান কুমারস্বামীকে কেউ প্রবুদ্ধ করে তোলেনি হিন্দু ধর্মশিল্পের অধ্যয়নে, আলোচনায় ও ব্যাখ্যায়। নিজের অন্তর প্রদীপ তিনি নিজেই প্রজ্বলিত করেছিলেন। তাঁর মধ্যেই বুদ্ধের সেই মহাবাণী 'আত্মদীপভবঃ' সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল। সেই প্রদীপের আলোকেই তিনি নিজের জন্ম, জাতি ও ধর্মের গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উঠে, ভারতীয় প্রতিমা-লক্ষণের প্রধান ও প্রথম ভাষ্যকার হয়েছিলেন। আর সে ভাষ্য ছিল যেমন শাস্ত্রীয় ও বৈদান্তিক তেমনই শিল্পানুগ; অন্যদিকে বৈদান্তিক বিবেকানন্দের ধর্মভাষ্য যেমন বেদান্তানুগ তেমনই লোকায়ত—এক তুলাদণ্ডের দুই পাল্লা সমান ওজনের। অন্ধকার ভারতবর্ষে এই দুজনেই আমাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আলোকের রাস্তা দেখিয়েছেন — তাঁরা আমাদের ভারত-পথের যুগ্ম দিশারী।

কুমারস্বামীকে যাঁরা নিছক কলা-সমালোচক ও ঐতিহাসিক বলে মনে করেন তাঁরা তাঁর কর্মকাণ্ডের ও জীবনের গতি-বিধি ভাল করে অনুধাবন করেন নি। তাঁর আবির্ভাবের কাল, স্থান ও উদ্দেশ্যের রহস্য আসলে ধর্মীয়, কিন্তু তা উহ্য। এ যেন ঈশ্বরের গোপন পরিকল্পনার মায়াজাল-- 'যা দেখায় তা নয়, যা বলায় তা নয়, এমন কি যা করায় তাও নয়—যা হয়ে ওঠে তাই।' আমরা তাঁরই জন্য হয়ে উঠেছি কলারসিক, রিকথগ্রাহী ও ঐতিহাসচেতন ভারতধর্মী মানুষ।

স্বামী বিবেকানন্দ চলে গেছেন, রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন, শ্রীঅরবিন্দ, কুমারস্বামীও চলে গেছেন—বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকেই তাই আমার শূন্য মনে হয়। শান্ত সমাহিত বুদ্ধের দেহত্যাগের পরে ভারতবর্ষের এমনই অবস্থা হয়েছিল। 'মিডিওকর' মানুষের হুল্লোড়! আড়াই হাজার বৎসর পরে আবার আলো জেলেছিলেন আঁস্তাকুড়ে রামমোহন—শ্রীঅরবিন্দ কুমারস্বামীর মৃত্যুতে সে আলো নিভে গেছে। সে বাতিতে তেল দেবার মানুষ নেই। ভারতবর্ষে আমরা বুদ্ধের কা ভুলেই আছি—তাঁর কথা আমাদের আ মনে পড়ে না। কুমারস্বামীর কথাও আম ভুলতে চলেছি—এই তো তাঁর শতবার্ষি জন্মজয়ন্তী বছর। কই তাঁর আবির্ভা দিবস উদ্‌যাপনের আয়োজন? এ উৎস আমাদের পালন করতেই হবে, আর উৎসবের পৌরোহিত্য করতে ডাকতে হ উদয়শংকরকে— তিনিই একমাত্র জীবি অধিকারী। কুমারস্বামীর 'শিবনৃত্যে তিনি শেষ নটরাজ। সে ১৯৩০।২৯শে কথা। একদিন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এ গিয়ে শুনলাম উদয় শংকর আসবেন—নাচ দেখাবেন। সোসাইটি হলে স্টেজ বাঁধা হল। লোকে লোকারণ্য— আমরা ছাত্রেরা এক পাশ ঘিরে ব রইলাম। স্টেজের উপর এক কোণে চৌকি বসে অবনীন্দ্রনাথ— দেবসভার সিংহাস দেবরাজ ইন্দ্র! আমাদের হতস্তম্ভিত ক ইলোরার কৈলাশ মন্দির, দক্ষিণ ভারতে নটরাজ মূর্তির ধাতব বন্ধন, এলিফ্যান্ট গুহার পাষাণ প্রাকার, পরিত্যাগ করে, ছি করে, ভঙ্গ করে, সেই দেবসভায় নে এলেন পরম সুন্দর নৃত্যরত শিব। সে দেহসৌষ্ঠব, সে কি ভঙ্গী, সে কি মুদ্রা— মুহূর্তে সভা হয়ে উঠল পবিত্র, গম্ভীর ধ্যানস্থ। চমক ভাঙল যখন নৃত্য শে উদয়শংকর তাঁর হাতের নীলপ অবনীন্দ্রনাথের পায়ে প্রণামী রাখলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বদলে যুগন্ধ নটেশ্বরের গলায় শ্বেতপুষ্পের বরণমাল পরিয়ে দিলেন। সে যুগ তো কুমার-স্বামীর, সে মালা তো তাঁরই রচনা!

নন্দলাল বসুর অঙ্কিত সেই বিখ্যা পোস্টকার্ড—যার মধ্যে গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, তিন ভা খাটের উপর শোয়া, নিদ্রা বা তন্দ্রামগ্ন কুমারস্বামীর এক হাতে গড়গড়ার নল অন্য হাতে ... চিত্রাংকনের পদ্ধতি বা বর্ণসমাবেশের সমালোচনা অঙ্গু নির্দেশে বুঝিয়ে বলছেন, সে ছবি নন্দ-লাল স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক দলিল হিসা গণ্য হবে—সাক্ষ্য দেবে কুমারস্বামী সাহচর্য ও সমালোচনা অবনীন্দ্র-প্রবর্তি নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার বিকাশে কতখা সাহায্য করেছিল। চিত্রকলা ভাস্কর্যের বিকাশে সমজদার কলারসি সমালোচকের স্থান একান্তই অপরিহার্য এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজ কুমারস্বামী দরদ ও আন্তরিকতার স মিটিয়েছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসর করেছিলেন ও, সি, গাঙ্গুলী। যে কা কুমারস্বামী সময়ের ও যোগাযোগের অভা করতে পারেন নি, সে কাজ অধ্যাপক গাঙ্গুলী তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রাবলী পরিচয় ও ব্যাখ্যা কুমারস্বামীকেই লিখতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রচিত শিল্পের যথার্থ ব্যাখ্যা আমরা তাঁর কাছ থেকে

কলকাতায় ঠাকুরবাড়ী দর্শনের সময় নন্দলাল বসুর রেখায় কুমারস্বামীসহ শিল্পী। ছবির ওপর দিকে আছেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর.

...র শুনে, সেই চিত্রকলার, সেই আর্টের ...না বুঝতে পেরেছিলাম। বলেছিলেন 'এ ... আধুনিক কালের আদিম আর্ট।' এ ...চয়, এ ব্যাখ্যা, দ্বিধাগ্রস্থ রবীন্দ্র...থের তখন একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে...ল। বিপদের দিনে তিনি আমাদে... ...শেষ ছিলেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষ ... বাঙালীরা অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। ...ন্দ্রসাহিত্যকে যেমন ইয়েটস্ জগৎ ...ক্ষে প্রথম তুলে ধরেছিলেন, রবীন্দ্র ...কলাকে তেমনই কুমারস্বামী প্রথম তুলে ...ছিলেন বিশ্বের দরবারে—একথা যেন ...রা বিস্মৃত না হই। বিশ্বকবিকে তিনি ...চিত্রকরের আসনে অভিষিক্ত করে ...ছেন। তিনি অভয় দিয়েছিলেন বলেই ...র মনে চিত্রকরের বল, সাহস ও কল্পনা ...দীপিত হয়ে বাসা বেঁধেছিল; হাতের ...মের সঙ্গে তুলিও সমান পাল্লা দিয়ে ...তো, কবি-চিত্রকরের আন্তরিক অভিলাষ ...র্ণ করেছিল।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ২২ আগস্ট আনন্দ ...টিশ কুমারস্বামী [illegible] কলম্বো শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা স্যার মুথু কুমারস্বামী ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে বিলাতের কেন্ট শহরবাসী এলিজাবেথ ক্লে বিবি নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। কেন্টের এলিজাবেথ-এর গর্ভে জন্মেছিলেন বলে তাঁর 'আনন্দ' নামের পরেই মায়ের আদি বাসস্থানের নাম জুড়ে দেওয়া হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী খনিজ-বিদ্যাবিদ, কুমারস্বামী মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে সিংহল রাজ্যের খনি বিভাগের অধি-কর্তার পদ গ্রহণ করে বিলাত থেকে দেশে ফিরে এলেন। এই কাজ করবার সময় তাঁকে সিংহলের প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়েছিল। সরকারী কাজে দেশ ভ্রমণের মাধ্যমেই কুমারস্বামী জানতে পেরেছিলেন দেশের শিল্পীদের চিনতে পেরেছিলেন দেশের শিল্পসম্ভারকে। তাঁর প্রাণে শিল্প ও শিল্পসৃষ্টির রহস্য এমনই ব্যাকুলতার অভিঘাত হেনেছিল যে চির-দিনের জন্য অধীত খনিজবিদ্যাকে তো বিসর্জন দিলেনই—সুভাষচন্দ্রের মত—উচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করে গ্রহণ করলেন শিল্পানুসন্ধান মাধুকরী, আর তার জন্যই আরম্ভ করলেন বিবেকানন্দের মত কঠোর প্রব্রজ্যা। কিন্তু সিংহল তাঁর স্বল্প পরিধির মধ্যে বেশীদিন তাঁকে আবদ্ধ রাখতে পারে নি। বুঝতে পেরে-ছিলেন সিংহলী শিল্পের মূল ভারতবর্ষে নিহিত রয়েছে। কন্যাকুমারীর সমুদ্রতটে বসে বিবেকানন্দ শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান 'অ্যামেরিকায় যাও', আর সমুদ্রের ওপারে সিংহলে বসে কুমারস্বামী শুনে-ছিলেন ভারতমাতার আহ্বান 'ভারতবর্ষে এসো।' এ কাকতালীয় ঘটনা নয়—ঈশ্বরের গোপন পরিকল্পনার জাগতিক অভিনয়। কুমারস্বামীর ইংরেজ মাতার গর্ভে জন্ম ও লণ্ডনে শিক্ষালাভের কারণ নিরপেক্ষ দূরদৃষ্টি লাভ, ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও জ্ঞান, অ্যামেরিকা প্রবাসের লক্ষ্য লভ্যের প্রচার। আর এই সত্য হল ভারতশিল্পের তথা ভারতবর্ষের সত্য। সেই কারণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একলব্য-শিষ্য, শ্রীঅরবিন্দের আত্মীয়। ...

[illegible]

[illegible] রায়চৌধুরী

উত্তরবঙ্গে এখন তিতা পাট বোনার মরসুম চলছে। পাটের জমির পাট সারার কাজ শুরু করেছেন কোচবিহার ও জলপাই-গুড়ির পাটচাষীরা। একাজ শুরু হয়েছে মাঘী পূর্ণিমার দিন থেকে।

কোচবিহারের প্রফুল্ল সরকার কিংবা ধূপগুড়ির পুলিন রায় তিতা পাটের বীজের খোঁজ করছেন। গত বছর প্রফুল্লবাবু বোম্বাই ১নং পাট-বীজ বুনেছিলেন। এবার এখনও বীজ যোগাড় করতে পারেন নি। চিঠি চালা-চালি করছেন ভাল বীজের জন্য। ওঁরা দুজনের কেউই সোনালী বা শ্যামলীর নাম শোনেননি। না, এরা কেউ ছায়াছবির নায়িকা নয়। অথবা নামকরা যাত্রা দলের নায়িকার ভূমিকায় এদের কেউ কোন দিন দেখেননি! উন্নত মানের তিতা পাটের নাম সোনালী। মাঝারি ও নিচু জমিতে বোনার উপযোগী। বোনার সময় এখন। সবুজ সোনা ও শ্যামলী বোনার সময় চৈত্র মাস। ফলনের দিক থেকে সেরা।

বীজ আইন চালু হবার পর থেকে সার্টিফায়েড বীজ ছাড়া বেচা-কেনা করা আইনতঃ দণ্ডনীয়। কিন্তু এই সব উন্নত-মানের বীজ যদি কেউ বিক্রি করেন তাহলে সরকারি তরফে বাধা দেওয়া হয় না।

অবশ্য বাধা না দেওয়ার প্রধান কারণ হল, বাজারে প্রচুর পরিমাণে সার্টিফায়েড বীজের অভাব। সরকারি কৃষি বিভাগ এবছর কৃষ্ণনগর, কুচবিহার, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি খামারে ৪৫ টন সার্টিফায়েড বীজ উৎপাদন করেছেন। জাতীয় বীজ নিগম ও বিদর্ভ কোয়ালিটি সিড্‌স লিঃ মিলে ২০০ টনের মতো সার্টিফায়েড পাট-বীজ পশ্চিমবঙ্গে সরবরাহ করতে পারবেন বলে জানা গেছে।

এর মধ্যে তিতা পাটের বীজ হল মাত্র ৩০ টন। ৩০ টন বীজে মোটামুটি দশ হাজার একরে পাট বোনা চলে। সমস্যাটার মূল এখানে।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বেশির ভাগ পাট চাষী তিতা পাটের চাষ করেন। এবছর কোচবিহারে পাট চাষের লক্ষ্য-মাত্রা ধার্য হয়েছে কিছু কম সওয়া লাখ একর। জলপাইগুড়িতে ধার্য লক্ষ্যমাত্রা হল ৮৫ হাজার একর। এছাড়া পশ্চিম দিনাজ-পুর ও মালদাতেও বেশ কিছু এলাকায় তিতা পাটের চাষ হয়ে থাকে। শোনা যাচ্ছে যে, সার্টিফায়েড পাট-বীজ শেষ পর্যন্ত কোচবিহার জেলায় পৌঁছবে না। জলপাইগুড়ি জেলাতেও যে যাবে তেমন আশা কম।

তাহলেও ভয় পাওয়ার মতো কারণ নেই: এতদিন যা হয়েছে—অর্থাৎ বেসরকারি পাট-বীজ ব্যবসায়ীরা সরাসরি অথবা ডিলার মারফত সময়মত বীজ পাঠাতে চেষ্টা করবেন। এবং সেকাজ শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

পাটবীজের ব্যবসায়ে অনেক দিন যাবত যুক্ত রয়েছেন বঙ্কিমপ্রসাদ ঘোষ। যতদূর খবর পাওয়া গেছে তাতে ঐ প্রতিষ্ঠান এ বছর ১৭০ টনের মতো পাট-বীজ সরবরাহ করতে পারেন। বি. কে. রায় গেল বছর বিবিধ ভারতীতে পাট-বীজের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। এবছর বিজ্ঞাপনের তেমন জোর নজরে না পড়লেও বলা যায় যে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি কমবেশি একশ' টন পাট-বীজ সরবরাহ করতে পারবেন। এম সাহার হাতে পাট-বীজ রয়েছে প্রায় দু'শ' টন। শেওড়া-ফুলীর বাজারে কমকরেও ৫০ টন পাট-বীজ আনা হয়েছে। ভারত লক্ষ্মী মার্সারি সরবরাহ করবেন ৩০ টন। দশ—বিশ টন বীজ সংগ্রহ করেছেন এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম নয়।

এরা পাট-বীজ আনেন মহারাষ্ট্র, উত্তর-প্রদেশ, বিহার এবং ওড়িশা থেকে। খরা ও বন্যায় ঐ সব রাজ্যে পাট-বীজ উৎপাদন কিছুটা কম হলেও ঘাবড়াবার মতো কারণ কিছু ঘটেনি। তবে, এ কথাও ঠিক যে, পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষের এলাকা ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকায় বীজের চাহিদা কেমন হবে তা অনেকে বুঝে উঠতে পারেন নি।

এ বছর পাট চাষ বাড়বে। বিদেশের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ও রপ্তানির সুযোগ বেড়েছে। কারণ, সারা বিশ্বে তেল-সংকটের ফলে পাটের বিকল্প তন্তুর বাজার দর অনেক বেশি। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চান পশ্চিমবঙ্গের পাট-চাষীরা। ন্যায্য দর পেলে পাট-চাষের ভেল্কি দেখাতে পারেন এ রাজ্যের পাট-চাষীরা। এবার সরকারি কৃষি বিভাগ তাঁদের সংগে সহ-যোগিতা করবেন সবদিক দিয়ে।

তিতা পাটের চাষ পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা জেলাতেও বেশ হয়ে থাকে। তবে এদুটি জেলায় তুলনামূলকভাবে বাগ ব[illegible] তোষা পাটের চাষ বেশি হয়।

তোষা পাটের চাষ সবচেয়ে বেশি হ[illegible] নদীয়া জেলায়। এবছর নদীয়া জেলায় পা[illegible] চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় দু'লা[illegible] একরে। তার পরেই মুর্শিদাবাদের স্থান[illegible] পৌনে দু' লাখ একর। পশ্চিমবঙ্গে এবছ[illegible] মোট পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে দ[illegible] লাখ একর। তার মধ্যে দক্ষিণ বঙ্গে নি[illegible] জমিতে তিতা পাটের চাষ হয়ে থাকে। উ[illegible] ও মাঝারি জমিতে চাষ হয় বাগ বা তোষ[illegible] পাটের।

জানা গেছে যে, এবছর পুরুলিয়া বাঁকুড়ার মতো খরা প্রবণ জেলায় পাট-বী[illegible] উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হচ্ছে। চাষীরা জমিতে সার্টিফায়েড পাট বী[illegible] উৎপাদন করে উৎপন্ন বীজের জন্য ন্যায্য দা[illegible] ছাড়াও কেজি পিছু দু'টাকা অনুদান দি[illegible] সেই বীজ সংগ্রহ করা হবে।

এভাবে যত বেশি বীজ উৎপাদন ক[illegible] যায়, পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষীর দিক থেকে [illegible] মঙ্গল। বীজের জন্য টাকাটা এ রাজ্যে[illegible] থাকবে। আর, খরা-পীড়িত এলাকায় চাষ[illegible] চাষীরা বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়ে [illegible] বাড়তি আয় করতে পারবেন।

....সি এম ডি এ বলছে, পাতাল রেলের কাজের জন্য সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ বন্ধ হলেও চিন্তা নেই। ক্যানাল ইস্ট আর ক্যানাল ওয়েস্ট রোড কমপ্লিট। যানবাহন সেখান দিয়েই চলতে পারবে।....

কলকাতার নাম কলকাতা কি করে হ'ল তাই নিয়ে নানা কথা, নানা মত। পুরাণে লেখা আছে দক্ষরাজ যজ্ঞ করার সময় উমার কাছে শিবের খুব নিন্দা করেছিলেন। পতিপ্রাণা উমা এই নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন, খবর পেয়ে শিব সতী উমার দেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেন। সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয় এই ভয়ে বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ বাহান্ন অংশে কেটে ফেলেন। যেখানেই যে অংশ পড়ে সেখানেই মহাতীর্থের সৃষ্টি হয়। এমনই এক তীর্থক্ষেত্র হল আদি গঙ্গার তীরে কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট। এখানে পড়েছিল সতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল। অনেকে মনে করেন কালীক্ষেত্র থেকেই এসেছে কলকাতা নাম।

চোদ্দশো পঁচানব্বুই সালে বিপ্রদাস লিখেছিলেন মনসামঙ্গল। এই কাব্যে কলকাতার নাম খুঁজে পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কাব্যের নায়ক ভাগীরথী নদীর উপর দিয়ে নৌকায় পাল তুলে যাত্রা করেছিলেন। অনেক ঘাট পার হয়ে নৌকা ভিড়েছিল কলকাতায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় ধনপতি সওদাগর বাণিজ্য করতে সমুদ্র যাওয়ার পথে কালীঘাটে পুজো দিয়ে গিয়েছিলেন। মুকুন্দরাম এই কাব্যটি লিখেছিলেন ষোড়শ শতকের শেষ দিকে।

আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে অনেক তথ্যের মধ্যে সপ্তগ্রাম জেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সপ্তগ্রাম জেলার একটি গ্রামের নাম ছিল কলকাতা।

যে বাঙালী বাদশা আকবরকে চিন্তিত করে তুলেছিলেন তার নাম প্রতাপাদিত্য। আকবর প্রতাপাদিত্যের গর্ব খর্ব করার জন্য একজন সামন্তকে ভার দিয়েছিলেন। সেই সামন্তের নাম ছিল লক্ষ্মীকান্ত। আকবর খুশী হয়ে লক্ষ্মীকান্তকে যে গ্রামগুলি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন তার মধ্যে কলকাতা।

জব চার্নক এবং চার্নকের আগমনে .... [illegible]

ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। চার্নক সাহেব না এলে সুতানুটি থেকে কলকাতার এই ক্রম রূপান্তর সম্ভব হত না। কিপলিঙ সাহেবের লেখা থেকে জানা যায় কেন চার্নক কলকাতায় তার বাণিজ্য কেন্দ্র গড়েছিলেন। কিপলিঙের মতে চার্নক বুঝেশুনেই কলকাতাকে বেছে ছিলেন, খেয়ালের ঝোঁকে করেননি। কারণ বড় বড় জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসতে পারতো। ব্যবসা করতে হলে জাহাজের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় এমন একটা জায়গাই ভাল। এ ছাড়াও একটা কারণ ছিল ইংরেজ ব্যবসায়ীরা যদি কোন কারণে ফৌজদার বা নবাবের বিরাগভাজন হতেন তাহলেও পালানোর পথ খোলা ছিল জলপথেই। চার্নক বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন স্থান নির্বাচনে।

কেমন ছিল কলকাতা সেই ষোলশো নব্বুই সালে জব চার্নকের আমলে? ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, কলকাতা ছিল অস্বাস্থ্যকর, এখানকার জমি ছিল খুব নীচু। জলযানবহুল, জঙ্গলে ভরা। শেঠ আর বসাকেরা তখন বেশ জমিয়ে ব্যবসা করছে কলকাতায়। হুগলী যেতে হলে কলকাতা দিয়েই যেতে হত সবাইকে। তখনকার কলকাতার একটি বটগাছের ছায়ায় বসে এক ছিলিম তামাক খেয়ে যেত পর্তুগীজ, ওলন্দাজ কিংবা ইংরেজরা। এই বটগাছটির ছায়া একটি পরিচিত বিশ্রামাগার ছিল সেকালের। এখন যেখানে বৌবাজার স্ট্রীট এসে মিশেছে সার্কুলার রোডের সঙ্গে তার কাছেই ছিল এই বটগাছটি। কলকাতার রাস্তা ভাল করার জন্য মর্কুইস অফ হেস্টিংস এই গাছটি কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন।

প্রাচীন কলকাতার রাস্তাঘাট কেমন ছিল? নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পরেও কলকাতায় পাকা রাস্তার সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। বারাসত থেকে কলকাতা পর্যন্ত একটা রাস্তা ছিল। সেটাও পাকা নয়, কাঁচা। কলকাতার রাস্তাঘাটের চিরস্থায়ী পরিবর্তন আনার জন্য যিনি বিখ্যাত তার নাম লর্ড ওয়েলেসলী। তাঁরই সময়ে পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরী হয়েছিল ইজিরট রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, উড স্ট্রীট হেস্টিংস স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, হেয়ার স্ট্রীট প্রভৃতি। আর একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে আঠারশো তেত্রিশ থেকে আঠারশো আশী খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট একশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিডন স্ট্রীট, গ্রে স্ট্রীট, ক্যানিং স্ট্রীট, ক্যানিং স্ট্রীট সহ আরও কয়েকটি রাস্তার পত্তন হয়। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে কলকাতা শহরে আঠারশো অষ্টআশী সালে সব রাস্তা এক করলে হিসেব দাঁড়াতো মোট একশো একাশী মাইল, লম্বায়।

প্রচ্ছদ উত্তম পাল

কলকাতার গলি কেমন? বেশী অতীতে যাবার দরকার নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের লেখা থেকে দেখতে পাচ্ছি গলির চেহারাটা প্রায় একই রকমের। বাঁশি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'গলিটার কোণে কোণে/জমে ওঠে পচে ওঠে/মরা বেড়ালের ছানা ছাইপাঁশ আরও কত কি যে।' জ্যোতিরিন্দ্র বলেছেন 'মধুবংশীর গলি তোমারেই শুধু বলি'...। সেই গলিতেও আরশোলা, তক্তপোশ, আবর্জনা। আজও গলিতে ঢুকলে এসব দেখা যাবেই। দেখে শুনে পা না ফেললে যাচ্ছেতাই কাণ্ডমাণ্ড হয়ে যেতে পারে। অথচ এমন তো চলতে দেওয়া যায় না। বাঁচার ন্যূনতম প্রয়োজনে এই রকম পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন হওয়া দরকার।

দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ দেখে কেউ যদি কলকাতায় এসে নাক সিঁটকান তবে তার জন্য বিরক্তি প্রকাশের অধিকার আর আমাদের নেই। অন্য সব শহর যখন ঝকঝকে হয়ে উঠছে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের প্রাচীন কলকাতার চেহারায় মালিন্য, অনেক বাড়ি বার্ধক্যে ধুঁকছে। যে কোন সভ্য শহরে সেই শহরের মোট আয়তনের শতকরা কুড়ি শতাংশ হয় রাস্তাঘাট। অথচ এই শহরে বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি, ট্রাক নিয়ে জমজমাট রাস্তাগুলো শহরের মোট আয়তনের মাত্র ছয় শতাংশ নিয়ে আছে। সভ্যতার মানদণ্ডে আমাদের রাস্তাঘাটের সীমা এখনও অ-সভ্য পর্যায়ে আছে।

মাঝে কিছুদিন বনমহোৎসবের ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছিল। রাস্তার পাশে পাশে লাগানো হয়েছিল গুলঞ্চ, কৃষ্ণচূড়া, শিরিষ, এখন আর ততটা হচ্ছে না। তবু ফুটপাথের ইঁটের ঘেরাটোপ থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অনেক গাছ।

কিন্তু ফুটপাথকে এই শহরে আর রক্ষে রাখা যাবে কি? মনে হয় না। রাস্তা বড় করতেই হবে। শহরের সৌন্দর্য কিম্বা যানবাহন আরও অনায়াসে চালানোর জন্য অবস্থা সৃষ্টি করতে হলে রাস্তা চওড়া করতেই হবে। প্রতিটি রাস্তার গায়ে গায়ে বাড়ি। বাড়ি ভাঙলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর সবার ক্ষতিপূরণ করতে গেলে উন্নয়নের কাজ শিকেয় উঠবে। বাকি থাকছে তাহলে কি? ফুটপাথ। জব চার্নকের কলকাতায় রাস্তা চওড়া করতে হলে এখন ফুটপাথের মাপ ছোট না করে উপায় নেই। ফুটপাতের শরীরকে অপারেশন করে ছোট করে রাস্তার মাপ বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। রাস্তা চওড়া হচ্ছে, কাজ চলছে। বহু জায়গায় কাজ শেষ, বহু জায়গায় কাজ জোর কদমে এগুচ্ছে। অন্তত রাস্তাঘাট দেখলে মনে হয় একটা কাণ্ডমাণ্ড সত্যিই ঘটছে।

রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি নিয়ে কয়েকদিন আগে একটা মজার ঘটনা শুনলাম। যাদবপুরের সুবোধ মল্লিক রোড-এর এক বৃদ্ধ রাস্তায় খোঁড়া একটি খন্দে পড়ে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধ হাড় বড় অশক্ত। পট করে মুচকে গিয়ে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল। বৃদ্ধ মানুষটির চোখে ক্যাটারাক্টের অস্পষ্টতা, তায় রাস্তায় সর্বত্র খানাখন্দ। সহ্য হয় নাকি? তিনি রাগে ঝলসে উঠেছিলেন, কাজ শেষ হচ্ছে। এর নাম কাজ নাকি। মানুষমারার কল। যতসব চ্যাংড়াদের ব্যাপার।

মিস্ত্রির ছেলেটির মেজাজ খুব ঠাণ্ডা। সহজে রাগে না। বলল, দাদু, এত রাগ করলে তো চলবে না, ওখানে তো সাইন-বোর্ড টাঙানো আছে দেখেননি। দেখলে আর এমনটা হোত না।

সাইনবোর্ড! কিসের! দাদু জানতে চেয়েছিলেন।

সি এম ডি এ—কাজ [illegible] কলকাতা [illegible] অসুবিধার।—বিনীত বক্তারিরা।

দাদু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, ও ব্যাটারা কিছু করবে না। শ... কাটি কাটকে আর যাটি [illegible]। আমাদে... শুধু গর্তখন্দরা।

হালদার থাকে বেহালায়। বলল, ... আমি যাবা একেবারে অস্থির [illegible] কবো মা... কাজ হচ্ছে। আমাদের বেহালার রাস্ত... ছিল সাকুল্যে পঁয়তাল্লিশ ফুট। চো... সামনে দেখলাম ভাঙচোর শুরু হ... এখন সেই রাস্তা একশো কুড়ি ... চওড়া। লম্বায় ছয় কিলোমিটার। ... রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমাকে আসতে ... হাল কি ছিল আর কি হয়েছে। আমার ধা... আপনাদের এখানেও হবে। শুধু এ... ধৈর্য ধরতে হবে। ময়দানবও নিমেষে বি... করতে পারতো না। তারও সময় লাগতে... আর এটা তো করছে একটা সংস্থা।

মিস্ত্রির বলল, হালদার, এটা ... শেষ হবে? আমরা ওপারে গিয়ে ভগবা... কাছে হ্যাণ্ডসেক করতে করতে এটা ... হয়েছে দেখতে পাবো, তাই না!

হালদার রাগলো না। বলল, তো... যদি অকালমৃত্যু কপালে থাকে, তবে ... হবে। আর যদি স্বাভাবিক মানু... মত বাঁচো, তবে বছর দেড়েকের মধ্যে... দেখতে পাবে।

হালদার কনস্ট্রাকশন লাইনের লো... উদ্যোগী মানুষ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ... করে চাকরির খাতায় আর নাম লেখানি... সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু ক... ছিলেন। এখন ফুলে-ফেঁপে ঢোল। হাল... আমাকে বলেছিল, এই শহরটার রাস্তা... চওড়া করার অসুবিধা কি জানেন! ... শহরের মাটির তলায় কোথায় কি আছে ... কেউ জানে না। মাটির নিচে জলের পাই... ইলেকট্রিক, টেলিফোনের কেবলস, ম...

তবু... ভাব ভোলবার নয়

নর্দমা দিয়ে আরম্ভ করে পৌঁছে যায় উপনগরীতে। নর্দমা-নালা, পাইপ বসানো, রাস্তা চওড়া করা, রাস্তা তৈরী করা, সেতু বানানো, সুড়ঙ্গ-পথ বানানো, উড়াল-পুল নির্মাণ, রাস্তায় আলো, বস্তিতে আলো, বস্তিতে জল, বস্তিতে পাকা-রাস্তা, পাকা পায়খানা বস্তিতে, শহরে এবং মিউনিসি-প্যালিটিতে খাটা পায়খানা সরিয়ে তার জায়গায় স্যানিটারী পায়খানা বানানো, হাসপাতাল বানানো, এ্যাম্বুলেন্স চালানো স্কুল বিল্ডিং বানানো ও মেরামতি, পার্ক তৈরী করা, বাগান তৈরী করা, গাছ লাগানো খেলার মাঠ তৈরী করা, নীচু জমি ভরাট করা, বাজার বানানো, নাট্যশালা বানানো, এমন কি গোটা উপনগরী নির্মাণ।

এই হল সি এম ডি এ-র পরিচয়। অর্থাৎ কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে কাজগুলি করছে আর গালা-গালও শুনছে।

ভরসা আছে, কারণ গালাগাল তাঁদেরই শুনতে হয় যাঁরা কাজ করেন। কাজ না করলে গালাগাল শুনতে হয় না।

আরও ভরসা আছে। বিদ্যাসাগরের কথায় উপকার না করলে নিন্দে শুনবার কোন কারণ নেই।

'এগুলো বলে অত বড়াই করবার কি আছে? ট্যাক্স দিচ্ছি না? তোমাদের কোটি কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে না?'

তাহলে বলতে হয় যার জন্য চুরি চুরি, সেই বলে চোর, অর্থাৎ......অর্থাৎ নিজেরাই-তো স্বীকার করছেন যে টাকা চুরি করছে সি এম ডি এ।

না-না সে অর্থে বলি নি, বলছি যে [illegible]র কেন্দ্রীয়রোক জোরের জন্য আমরা ২০০ কোটি টাকা খরচ করল... তাঁরাই আমাদের গালাগালটা দিলে... 'চোরের' মহাঅপরাধ। সে চুরি ... গৃহস্থের বাড়িতে কতগুলি মহামূল্য... সম্পত্তি রেখে গেছে।

যেমন কলকাতার জন্য প্রচুর জ... ব্যবস্থা। যেমন বহু চওড়া রাস্তা, ... কয়েকটা ব্রিজ, সাবওয়ে, উড়ালপ... ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভাবছেন প্রচার? ভাবছেন চো... মায়ের বড় গলা? চোখ বুজে যদি না চ... তাহলে বিস্তীর্ণ মহানগরীতে সি. এম ... এ-র কিছু কিছু নিদর্শন-তো দেখবেন... আর যদি জানতে চান তাহলে একটা পোস্ট... কার্ড খরচ করুন। লিখুন জনসংযো... অফিসার-কে বা সি এম ডি এ-র চেয়া... ম্যান-[illegible]-কে।

ছেন—সব মিলিয়ে জট পাকিয়ে যেমন বাড়ির একটা প্ল্যান থাকে ক করা—তেমনি সব শহরের মাটির ও একটা প্ল্যান থাকা উচিত ম্যাপ-রা। আই মিন সব নক্সা দেখেই তাই অথচ কলকাতার মাটির নিচে কি তার শেষ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছিল না এগার সালে। একবার ভাবুন টা। তারপর কলকাতার লোকসংখ্যা করে বেড়েছে। এখানে মানুষের নানা য মেটাতে এখানে-সেখানে যখন-ইচ্ছে কলের পাইপ, ইলেকট্রিক, ান কেবল, বসানো হয়েছে। কোন কিংবা পরিকল্পনার খুব একটা ধার র না। ওপর থেকে বোঝা যায় না, রটার মাটির নিচে সর্বত্র একটা অ্যথনা তদিন পাকিয়ে উঠছে। মাটিতে হাত ই বিপদ, নিচে কি আছে জানা নেই। ন গুপ্তধন নয়। মাটি খুঁড়তে গিয়ে দেখলেন কলের পাইপ ফাটিয়ে বসে কিংবা কেবলের গায়ে ছেঁদা করে ন।

লনাম, সোকি! গত সাতষাট্টি বছরে নচের কোন ম্যাপ আমরা বানাইনি। ওপরে তো অনেক ক্যারদানী করি। এাপ্রুভ করিয়ে বাড়ি করি। আর নিচে সব হচপচ।

ালদার হাসলো। বলল, একেই বলে টুিন ফক্কা গেরো। মাটির ওপরে া নিচে যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। লকাতার মোড়ে মোড়ে সি এম ডি ইনবোর্ড। লেখা আছে—সি এম ডি ওয়ার্ক। কিন্তু কাজ হবেটা কি করে নিচের মানচিত্র ছাড়া? ওরা নিজেদের একটা মানচিত্র তৈরি করছে এখন।

ালদারের কথায়বার্তায় সন্দেহ হল। া সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। মাথায় ঝিলিক ল্ল প্রশ্নটা, হালদার সি এম ডি এ-ান করেনি তো! ওর এত আগ্রহ ও এত ভাবনাই বা পেটাচ্ছে কেন? া তো কনস্ট্রাকশন করে লোকের কাছ য়সা নেওয়া। ও এত ভাবছে কেন? আজকের দিনে এত অকারণ ভাবনার দরকার কি?

হালদার আবার বলল, আপনি কন-স্ট্রাকশন লাইনের লোক হলে বুঝতেন। বছর দুই আগে আমার বাড়ির সামনে ওরা রাস্তা খোঁড়া শুরু করল অনেকটা খোঁড়া হবার পর আমি একদিন উঁকি দিয়ে দেখলাম। আমার উঁকি দেওয়াটা কেমন জানেন? জলে কেউ জাল ফেললে মেছুনী যেমনভাবে তাকায় সেইরকম। লাইনের ব্যাপার তো। ভাবলাম, ব্যাটারা এত সময় নিয়ে কি করছে। স্কোয়ার ফুট হিসেবে কাজ হবে। দমাদম কাজ চলবে। তা নয়। কাজ কচ্ছপের মত এগুচ্ছে। তাকিয়ে যা দেখলাম, তা আর কি বলবো ভাই। তারের জট, কলের পাইপের জট। সামনে ছিল একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার, তাকে পরিচয় দিয়ে বললুম, একি অবস্থা। মাটির নিচে একি হাল হয়ে আছে!

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক হতাশভাবে তাকালেন। বললেন, কোথায় কোদাল মারবো বলুন। সব জায়গাতেই এক হাল। খুব সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে মশাই।

—তোমার কোন দরকার ছিল না! দেখেই বুঝতে পারছিলাম।—হালদার বলল। ওদের বাহাদুরী আছে মশাই। তাও কাজ তো শেষ করে ফেলল।

কলকাতার রাস্তার আর একটি বড় সমস্যা হল যানবাহন নিয়ন্ত্রণ সমস্যা। ট্র্যাফিক পুলিশ বিভাগ যত নৈপুণ্যের সঙ্গেই কাজ করুক না কেন, তাদের সাহায্য করার জন্য এমন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার যাতে যানবাহনের জট যখন তখন পাকিয়ে না উঠতে পারে। কলকাতায় যে রোজ কেন ট্র্যাফিকের জট পাকায় না, তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। বিস্ময়কর দক্ষতা এঁরা দেখিয়েছেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে। এবার তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সি এম ডি এ।

শহরের সবচেয়ে জট এই শহরের দুটি স্টেশনকে ঘিরে। যেহেতু হাওড়া স্টেশন কলকাতার মুখ দেখে সেইহেতু একই শহরের বলে বলছি। স্টেশন দুটির নাম শেয়ালদা আর হাওড়া। প্রতিটি লোকাল ট্রেনের পেট থেকে পিল পিল করে লোক স্টেশন পেরিয়ে রাজপথে চলে আসে। অগুন্তি নিযুত সংখ্যা তাঁদের। তার একেবারে সেখানে অন্য গাড়ির জটলা। জটলা থেকে জট। আর জট মানেই জনতার দুর্ভোগ।

বিটিশরা দুটি স্টেশনের পত্তন করে দিয়েছিল। যখন করেছিল, তখনকার সঙ্গে এখনকার বিরাট তফাত। সেই তফাতের দিকে চোখ রেখে হাত দেওয়া হয়েছিল হাওড়ার সাবওয়েতে। ওপরের যানবাহন চলাচলকে কিছুমাত্র বিপর্যস্ত না করেই মাত্র দু' বছরে তৈরি করা হল সাবওয়ে। লম্বায় সওয়া তিরিশ ফুট। চোখ ধাঁধানো আলোর ইন্দ্রপুরী। স্টেশন থেকে সোজা বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে যাচ্ছেন মানুষেরা নিরাপদে। ওপরে ফুলের পাপড়ির মত মার্কারির গুচ্ছকার আলো। চেনা যায় না। ভাবা যায় না হাওড়ার মত শহরে এটা সম্ভব। ট্র্যাফিকের জট উধাও। দুম করে চলে যাচ্ছে সব রকমের গাড়ি। অনেকদিন পরে যাঁরা আসছেন, তাঁরা খাবি খাচ্ছেন। হাওড়া স্টেশন দেখতে পাচ্ছেন অথচ বাসস্ট্যান্ড থেকেও বুঝতে পারছেন না কোন দিক দিয়ে যাবেন। এমন অন্তত পাঁচজন মানুষকে আমি সাবওয়ের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছি। সাবওয়ের মুখে থমকে দাঁড়িয়ে তারপর আবার চলা শুরু করার মুখে আমি দেখেছি তাঁদের পরি-তৃপ্তির হাসি।

এবার হাত পড়ছে দ্বিতীয়টিতে। মানে শেয়ালদায়। কাজ শুরু হল বলে। এখানে সাবওয়ে নয়। র‍্যাম্প। কি সুন্দর ঝকঝকে হয়েছে নতুন স্টেশনটা। যেন একটা এয়ারপোর্ট। তার সঙ্গে মিলিয়ে গড়ে তুলতে হবে তো আশপাশটা। শেয়ালদার র‍্যাম্প আমাদের দেশের ইঞ্জি-নিয়ারদের কাছে একটা মস্তবড় চ্যালেঞ্জ। ট্র্যাফিককে কোন রকম বিরক্ত না করে শেষ করতে হবে কাজটা। র‍্যাম্প হলে শেয়ালদার চেহারাটা পাল্টে যাবে। এই ঘিঞ্জি, অপরি-ষ্কার, ফুটপাত দোকানঘর সব উধাও হয়ে যাবে। ছোট্ট উড়াল পুল দিয়ে গাড়ি যাবে। নিচ দিয়ে মানুষ। ঝকঝকে হবে সব। সামনেই হবে দশতলা বাজার কমপ্লেক্সন।

[illegible]

গড়ার পথে বেহালার রাস্তা

কিন্তু.........একটা বিরাট কিন্তু আছে। সবই হবে বলে ঠিক আছে। কিন্তু সবই নির্ভর করছে মাটির নিচের অবস্থার ওপর। যেখানে কাজ হবে সেখানে মাটির নিচে রয়েছে আদ্দিকালের তৈরী কর্পোরেশনের ইঁট দিয়ে গাঁথা মল নিষ্কাশী বন্দোবস্ত। গ্যাস জমে তার অবস্থা কি কেউ জানে না। সেই উনিশশো এগার সালের পর এর গায়ে হাত পড়েনি। গায়ে হাত পড়লে হঠাৎ যদি গ্যাস গেঁজিয়ে ওঠে কিংবা ফেটে যায় তাহলে একটা কেলেংকারীর সম্ভাবনা। পূতিগন্ধে চারপাশ ভরে যাবে। অবশ্য এটা নিছকই একটা সম্ভাবনার ব্যাপার। যদি ঘটে তাহলে কাজে দেরি হয়ে যাবে। যদি না ঘটে তাহলে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হবে। কলকাতার এবং শহরতলীর যে সব মানুষেরা শেয়ালদার বুক দিয়ে হেঁটে এসে এই শহরে ঢোকেন তাঁরা নিশ্চয় মনেপ্রাণে চাইবেন অবস্থা যেন অনুকূলই থাকে। যেন সময় মতই কাজ শেষ হয়।

'সেতু শহরের সৌন্দর্য বাড়ায়'—কথাটা কে বলেছিলেন মনে পড়ছে না। নতুন কোন সেতুর সামনে দাঁড়ালে কথাটা মনে পড়ে যায়। এই শহর পেয়েছে তিনটি সেতু। সি এম ডি এর তকমা লাগান সেতু তিনটির নাম, অরবিন্দ সেতু, যতীনদাস সেতু, কালীঘাট সেতু। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা হজম করে নিয়ে সেতুগুলি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের রাজ্যের প্রথম উড়ালপুল শেষ হয় হয়। ব্যাবোর্ণ রোডের এ্যাপ্রোচে যে কাজ হচ্ছিল তার একদিকের কাজ শেষ। আর এক দিকও শেষ হতে চলেছে। যে দিকটা শেষ হয়েছে তার ওপর ঘুরে দেখেছি। মসৃণ রাস্তা, মনে হয় তিনতলা বাড়ি থেকে গঙ্গা দেখছি। বেশ চওড়া। রেলিং ঘেরা। আলো বসে গেছে। উড়ালপুল নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে এক নতুন ব্যাপার। হাওড়ায়ও শুরু হয়েছে একটা। বঙ্কিম সেতু। কাজ শেষ হবে ১৯৭৮এ। শহরের মুখ সত্যিই পাল্টাচ্ছে দেখছি। শুধু শহরই নয়, শহরতলীর দিকেও সি এম ডি এ হাত বাড়িয়েছে। তৈরী হচ্ছে দমদম থেকে গড়িয়া পর্যন্ত ইস্টার্ণ মেট্রোপলিটান বাই পাশ; বারাকপুর থেকে কল্যাণী পর্যন্ত 'বারাকপুর কল্যাণী এক্সপ্রেস ওয়ে'; হাওড়ার দিকে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর মুখ থেকে কোণা পর্যন্ত কোণা এক্সপ্রেসওয়ে। এগুলোর কাজ শেষ হবে পাঁচ বছরের মধ্যেই। শহরতলী এসে দাঁড়াবে শহরের গায়।

ক্যানাল ওয়েস্ট রোড মজবুত।

উল্টোডাঙ্গা থেকে বালিগঞ্জ বা বেহালা যেখানেই যাই না কেন ব্যাপার চোখে পড়ছে। ফুসফুসে বাতাসের শব্দ পাচ্ছি ব্যাপারটা পরিচিত বুশ রাস্তাগুলো তারুণ্য পাচ্ছে। চকচকে চেহারা সব। চওড়া হচ্ছে। আগে এটা কল্পনাও ক না, মনে করতাম, এই রকম একটা জঘন্য পরিবেশেই জীবনটা কাটিয়ে যাব দেখে-শুনে ইচ্ছে হচ্ছে একবার জ্যোতির্ষির কাছে যেতে। কোন পাথর নিয়ে আয়ুটা যদি আর একটু বাড়ান তবে খারাপ হয় না। পরিচিত এই আরও কিছু দিন বেঁচে থাকার বড় হচ্ছে।

হেমামালিনী যা বল্লেন

কলকাতায় নাচ দেখিয়ে যত তৃপ্তি পাই আর কোথাও সেরকম-টা হয় না। কলকাতার দর্শক সমঝদার। বলছেন হেমামালিনী।

ব্যারিংটন, গেগ তো কলকাতায় ক্রিকেট খেলতে এসে খুব খুশী—এ তো আমাদের শহর, আমাদের দর্শক।

বহু ওস্তাদের মুখে শুনেছি কলকাতার গান শুনিয়ে বা বাজনা বাজিয়ে তাঁরা আনন্দ পান।

বহু বিদেশী এসে বলে গেছেন এরকম জীবন্ত শহর পৃথিবীর কোথাও নেই।

আমরাও কলকাতাকে পছন্দ করি। সেই জন্য যেখানে-সেখানে পেচ্ছাব করতে বসে যাই। জঞ্জাল ফেলি। আর নিন্দে করি। নিন্দে করবার কারণ আছে বৈ-কি? কলকাতায় এত জঞ্জাল, এত সমস্যা, কিন্তু যে সমস্যাগুলি আমরা নিজেরাই তৈরী করছি সেইগুলির জন্য সি এম ডি এ-র ওপর দোষ চাপালে কি হবে?

আজ নয় গত দু এক বছর ধরে সি এম ডি এ বলে আসছে যে সমস্যাটা আছে তবে এই প্রথম সেই সমস্যার মোকাবিলা করবার চেষ্টা হয়েছে। চেষ্টা একেবারে সফল হয়েছে একথা কেউ বলছেন-না। বলা সম্ভব নয় কারণ শহর বাড়তে থাকলে সমস্যাও বাড়তে থাকে। কাজেই একেবারে সমস্যার সমাধান বলতে যা বোঝায় সেটা কারও প্রতিশ্রুতি নয়। সি এম ডি এ-র তো নয়ই।

কাজেই সুনাগরিকদের কাছে আবেদন শহরটা আপনাদের। আপনারা এটার দেখা শুনা করুন। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন হয়েছিল কাঠবেড়ালির বালুকা সংগ্রহে। জঞ্জালের পাহাড় আমরা তৈরী করছি একটু একটু করে, আর প্রত্যেকেই যদি একটু কম করে জঞ্জাল তৈরী করি তাহলে আর পাহাড় জমে না, ঢিবি হয়। সেই ঢিবি পরিষ্কার করবার শক্তি আমাদের আছে। সেইজন্যে অনুরোধ [illegible]

থুথু ফেলবেন না, সিগারেটের টুকরো ফেলবেন না, ট্রামে-বাসের যেখানে-সেখানে ফেলবেন না, ফেলবেন না আর একান্তই ফেলবার ডাস্টবিনের খোঁজ করুন। না থাকলে নিন।

অনুরোধ করছি বড় বড় প্রতি তাঁরা এক একটা এলাকার ভার অমৃতবাজার, যুগান্তর, অমৃত প্র বাগবাজার স্ট্রীটের সবকটি খোলা কলের মুখে ট্যাপ লাগিয়ে দিতে নাকি? অথবা জলখাবেক ডাস্টবিন?

আনন্দবাজার, কেন আর পত্রিকা গোষ্ঠী কিছু করতে পারে অথবা স্টেটসম্যান?

তা-স্বাট-স্বামন্ত — [illegible]

আপনগন্ধো

দীপালী দত্তরায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নাঃ হোল না। ঠিকানা না নিয়েই আসতে হোল। ভেবেছিল নাইবা পেল, নাইবা হোল দেখা। তার চেষ্টারই বা কি? ঠিকানা পেলেও কি তার যাওয়া যাবে? চিঠি লেখা যাবে? ফোন বিব্রত করেই বা কি লাভ? হয়তো না। তার থেকে এই ভাল। একই বাস, কোনও দিন মুখোমুখি দেখা যা করার করা যাবে।

কিন্তু এসে অবধি দিন কাটছে না। ই পথের জনারণ্য, যত গাড়ী যায়, লক ও যাত্রীদের ওপর নজর ফেলে নয়, তাদেরই মধ্যে কেউ সেই আছে কিনা। বলা বাহুল্য, চোখে।

[illegible] অফিসে মঞ্জু আগন্তুক। কটি গুজরাটি মেয়ে আছে, তারই [illegible]। গোলগাল ফর্সা চেহারা, চোখে [illegible] চশমা। সঙ্গীতা ভাট। গম্ভীর তারাই দুজনে বম্বের অফিসে এগ্‌জিকিউটিভ। মঞ্জুকে সুকর্মী [illegible] সঙ্গীতা খুশী হোল। বুঝলো [illegible]। সব পুরুষের মধ্যে [illegible] যদি এলে, আমার একটু জোরও

বাড়লো। মঞ্জু ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলো মাঝে মাঝে ফাইট-টাইট হয় নাকি? না না। বরং মুখ বুজে কাজ করতে হয়। আমার গম্ভীর চেহারা দেখে ওরা বেশী কেউ এদিকে ঘেঁসেই না। সামান্য কথাবার্তা, ভদ্রতার মোড়কে ঢাকা সব সময়। ভদ্রতা পছন্দ নয় বুঝি? মিথ্যে ভরসা দিচ্ছ নাতো?' সঙ্গীতা চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে। তারপর বললো 'বনবে ভালো তোমার সঙ্গে মনে হচ্ছে। একটু সেন্স অভ হিউমারেরই অভাব বোধ করতাম। পরিচ্ছন্ন সেন্স অভ্ হিউমার। আর যারা ইয়াং এগ্‌জিকিউটিভ্‌স আছে, তারা বড্ড বেশী রোবাস্ট। ওদের হার্স সেন্স অভ হিউমার আমার ঠিক হজম হয় না। জানে খালি বিজ, আর পার্টি আর মেয়েবন্ধু নিয়ে হৈ হল্লা করা। আমার পছন্দসই নয়।' মঞ্জু কথা বাড়ালো না বেশী। শুধু জিজ্ঞেস করলো 'তোমার পার্টি ভালো লাগে না বুঝি?' 'আপটু এ লিমিট। পার্টির শুরুগুলো ভালো, শেষগুলো নয়। তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি ওদের পাল্লায় পড়ো না। তাহলে আর বুঝতেই পারবে না পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছ না মাথার ওপর।' 'তোমাকে চেষ্টা করেছিল?' 'করে আবার নি!' 'তুমি ঠিক-ঠিক নিজের পায়েই দাঁড়িয়ে থেকেছ?'

'আরে আমার কথা ছাড়। আমি এদের হাল-চাল সবই জানি। তাছাড়া আমি আমার নিজের একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাই; যখন খুশী কেটে পড়তে পারি। তুমি নতুন এসেছ, তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।' 'থ্যাংকস।' বম্বে বড্ড খারাপ জায়গা। সেখানে ভাঁওতা। অপরিচিত লোকের ইনভিটেশান মোটেই নেবে না।' মঞ্জু কিছু না বলে হাসলো একটু। মনে মনে বললো, আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার বনবে কিনা! অবোধ বালিকাটি ভেবে কেভাবে উপদেশের ঘটা দেখছি।

সঙ্গীতার সতর্কতা সত্ত্বেও, মঞ্জুর দু-চারজন কলীগের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। মৌখিক আলাপ তো সকলের সঙ্গেই হয়েছে, ইনট্রোডাকশনের সময়। প্রায় সমবয়সী শোভন পুরী, পাঞ্জাবী ছেলে। ওকে মঞ্জুর বেশ ভাল লেগেছে। হাসিখুশী প্রাণবন্ত। অবশ্য কেবলই পার্টি, আড্ডা ছাড়া মুখে আর কথা নেই। যে বয়সের যা, মঞ্জু ভেবেছে। এসব দেখে সে অভ্যস্ত। তার চোখে শোভনের হাবভাব মোটেই অশোভন লাগলো না। বরং মন একটু হালকা হোল। এই নির্বান্ধব সহরে, তার প্রথম বন্ধু শোভন পুরী, সঙ্গীতা ভাট নয়, একথাই তার মনে হোল। শোভন তাকে সহর চিনিয়ে দেবার ভার নিল। এক ছুটির সকালে, গাড়ী করে একেবারে নারিম্যান পয়েন্টে গিয়ে সেখান থেকে ঘুরে চার্চগেট, মেরিন ড্রাইভ হয়ে একদৌড়ে মালাবার হিলস পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনলো। এসে, একটা কফি বারে ঢুকে দু কাপ কফির অর্ডার দিল। মঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলো 'কেমন লাগলো বম্বে, যতটা দেখলে?' 'ভালোই।' ভালো মানে কতটা ভালো? তোমার কলকাতা ভালো, না বম্বে?' দেখালে তো শুধু ভাল জায়গা খানিকটা। তা জেনেই বা কি লাভ তোমার? তুমি তো কোলকাতারও নও, বম্বেরও নও। বরং তুমি দিল্লী নিয়ে গর্ব করতে পারো।' 'আরে দূর! বম্বে ইজ মাই সিটি। আমি প্রমিজ করছি বম্বের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। সামনের শনিবারে কি করছ? যাবে এক জায়গায়?' 'কোথায়?' 'একটা পার্টিতে। ভেরী এক্সক্লুসিভ। তোমার ভালো লাগবে।' 'কি করে জানলে?' 'না লাগার কিছু নেই। ফ্যাবুলাস মিউজিক, ফ্যান্টাস্টিক ডান্সিং আর গ্রুভী এ্যাটমস্‌-ফিয়ার। তোমার ভালো লাগবেই আমি বলছি।' মঞ্জু হাসলো। 'তার আগে বল, আমি কি তোমাকে চিনি?' মঞ্জুর মুখে দুষ্টুমীর হাসি দেখে শোভন চেয়ে রইলো। 'কি বলছ? বুঝতে পারছি না?' 'বলছি যে আমাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে অপরিচিত লোকের কাছ থেকে যেন নেমন্তন্ন না নিই। তাই আগে বল, আমি কি তোমাকে চিনি?' শোভনের চোখে-মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটলো। 'বুঝেছি! মিস আউল! ওই তোমাকে বলেছে এসব কথা! এক নম্বরের স্পয়েল স্পোর্ট! আমি তোমার কলীগ, এক অফিসে কাজ করি, আমার সঙ্গে তুমি পার্টিতে যেতে পারবে না? আমিই বরং হয়তো জড়োসড়ো হয়ে থাকবো।' 'তাহলে

থাক না হয়। অন্য কাউকে নিয়ে যাও।' 'আরে না না। ওটা কথার কথা বললাম। আফটার অল তুমি নতুন এসেছ। বম্বের ক্রাউডের সংগে তোমার একটা ইনট্রো করিয়ে দেওয়া আমার স্বাভাবিক কর্তব্য। মিস্ আউলের কাছে সব ছেলেই এক-একটি শয়-তান।' মঞ্জু সংগীতার নামকরণ শুনে এতক্ষণ হেসে মরছিল। হাসি থামিয়ে বললো, 'মিস্ ভাটকে তোমরা মিস আউল বল বুঝি? আমাকে তবে কি বলবে?' 'দ্যাট উইল বী টেলিং।' শোভনের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নাঃ। মঞ্জু যা ভেবেছিল, তা হোল না। শোভনদের পার্টিগুলি চব্বিশ পঁচিশ পর্যন্ত ছেলে-মেয়েতেই ভর্তি থাকে বেশী। এর চেয়ে কিছু বড় যারা, তারা যে একে-বারেই আসে না, তা নয়। কিন্তু কোনও একটি আকাঙ্ক্ষিত মুখ সেখানে দেখতে পায় না সে।

একটি চোখ, একটি কান, প্রিয় একটি মুখ অথবা প্রিয় একটি স্বর শোনার জন্য সুধ সময় নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও কোনও লাভ হয় না। বৃথাই খুঁজে বেড়ায় সে। নতুন ফ্ল্যাট নতুন করে সাজালো। তাও পুরোন হয়ে এলো। কোনও প্রতীক্ষিত পদ-ক্ষেপ তাতে ঘটলো না। বম্বে বড় বিরাট শহর। কে কোথায় লুকিয়ে থাকে, কার সাধ্য খুঁজে বার করে? এর ওর কাছে জিজ্ঞেস করে উল্টোপাল্টা খবর পায়। কেউ বলে 'ও মজুমদার? বয়স্ক লোক? আমার শ্বশুর বস্।' অন্য কেউ বলে 'মজুমদার? ডাক্তার? খারে থাকেন? খুব চিনি। তোমার আত্মীয়?' মঞ্জু আশা ছেড়ে দেয়।

বম্বেতে কত মজুমদার আছে? এমনকি ফোন ডিরেকটরি খুঁজে জয়ন্ত মজুমদারই সাত আটজন। একদিন এক এক করে টেলিফোন করেছিল। তিনবার মহিলা কণ্ঠ। 'মঞ্জু মিত্র? ঠিক চিনতে পারছি না তো? কোলকাতা থেকে? ও প্রবীরের স্ত্রী!' অন্য জায়গায় ঠাণ্ডা গলায়, 'মঞ্জু মিত্র বলে কাউকে চেনেন না আমার স্বামী। আপনার ভুল হচ্ছে।' আরেক জায়গায়, 'কে? মঞ্জু মিত্র? কোন্ মঞ্জু? লীলার মেয়ে নাকি? লীলা কেমন আসে?' পূর্ববঙ্গীয় গলা। 'ভালোই' বলে, দীর্ঘ শ্বাস ফেলে মঞ্জু ফোন নামিয়ে রাখে। আবার করেছে অন্য নম্বরে। এবার পুরুষের গলা। যুবকণ্ঠ। 'হু? মঞ্জু মিত্র? শিওর শিওর। হাই! কি কোরছ আজ সন্ধ্যেবেলা? আসবো নাকি? ঠিকানাটা যেন কি?' যতসব অসভ্যতা। মঞ্জু বিরক্ত হয়। আর দু জায়গায় ফোন শুধু বেজেই গেল, ধরলো না কেউ; শেষ নম্বরে শুনলো 'সাব্‌কা ভারী বিমার হ্যায়। অসপাতালমে হ্যায়। বাবালোগ, মেমসাব্ সবহি অসপাতাল গিয়া সাবকো দেখনে।' নাঃ, কিছু হোল না।

অগত্যা আবার সন্ধ্যেবেলায় ব্যাল-কনিতে দাঁড়িয়ে দূরের সমুদ্র দেখা, কাছের আলোর মালা, আর চলমান যানবাহনের আর মানুষের স্রোত দেখে দেখে সময় কাটানো। কখনো সখনো শোভনের 'ডেট' হয়ে এখানে ওখানে যাওয়া। মুভী পার্টি, নয়তো অন্য কোনও আড্‌ডা। বেশী ভালো লাগে না। অনেকের ডেট রিফিউজ করে। ভালো লাগে না আর এসব। বরং শোভন যদি কিছুক্ষণ বসে ওর ফ্ল্যাটে, গল্পগুজব করে কাটিয়ে দেওয়া যায় সময়। কিন্তু শোভন বড় ছটফটে আর আড্‌ডাবাজ। মঞ্জুর ফ্ল্যাটে একাএকা ওর বেশীক্ষণ ভালো লাগে না। নতুন অফিসার, সন্ধ্যাবেলা শুধু কফি অথবা কোকাকোলা খেয়েও ওর তৃষ্ণা মেটে না। তাই বেশীক্ষণ বসে না। চকিতে এসে কখনো হঠাৎ হাসিয়ে দিয়ে চলে যায়। নয়তো ওকে নিয়ে বেরোয়।

যে প্রতীক্ষার সমাপ্তির নিশানা থাকে, তা যত দীর্ঘ হোক সহনীয়। কিন্তু যে প্রতীক্ষার শুধু শুরু আছে, শেষ নেই, সে বড় মর্মবিদারক। মঞ্জু ক্রমাগত অধীর হয়ে উঠছে। ঠিক করার কিছু নেই প্ল্যান করার কিছু নেই। শুধু ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিবিষ্ট থাকা। বড় কষ্টকর। তার ওপর এ প্রতীক্ষার ওপারে প্রাপ্তির আশা কতটুকু আদৌ আছে কিনা, খুব সম্ভবত নেই, হয়তো একটু চোখের দেখা, দুটো কথা বলে জেনে নেওয়া যে কবর খোঁড়া হয়েছে বলে সে জানে, তাতে মাটির শেষ চাপড়াটুকুও পড়েছে কিনা! এটুকুও যদি জানা যেত, তবু মনকে প্রবোধ দেওয়া যেত। নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে একটা যাহোক কিছু ব্যবস্থা করা যেতো। কোনও পথ খোঁজা যেতো। যদিও ভবিষ্যৎ বলে আর কিছু আছে কিনা তাও জানে না। হয়তো বর্তমানের মালা গেঁথে গেঁথেই তার জীবনের বাকি শেষ হবে। জীবনের শেষ দিনে সেই অনাদৃত শুকনো মালা অবহেলায় ফেলে রেখেই বিদায় নেবে এ পৃথিবীর কাছ থেকে। তার তো আর কিছু কাম্য নেই? শুধু জেনে নেওয়া, কেমন করে একটা লোক এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যায়?

সেই চেকটার কথা একদিন মনে পড়লো। যে চেক জয়ন্ত ফিরে আসার পরে ব্যাংক মারফৎ তার কাছে পৌঁছেছিল। সে চেক তার এ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছিল। মনে আছে গ্রীন্ডলেজ ব্যাংকের চেক। কোন ব্রাঞ্চ? আশার একটু নতুন আলো। অফিসে বসে বম্বে শহরের ঐ ব্যাংকের সবগুলি ব্রাঞ্চে চিঠি লিখলো। 'আমি এক আত্মীয়ের খোঁজ করছি। তাঁর নাম জয়ন্ত মজুমদার। তাঁর এ্যাকাউন্ট আপনাদেরই কোনও শাখায় আছে এটুকু জানি। আপনারা আমায় কোনও সাহায্য করতে পারেন কি? উনি কোথায় থাকেন কোথায় কাজ করেন জানি না। শুধু জানি উনি একজন আর্কিটেক্ট, কোন এক ইন্ডো-জার্মান কোম্পানীতে এটাচ্‌ড আছেন। যদি তাঁর কোনও খবর আপনারা অনুগ্রহ করে দেন তবে বড় বাধিত হব।' নীচে নিজের নাম ঠিকানা এবং ফোন নম্বর সব দিয়ে দিল। যদি ব্যাংক তাকে নাও জানায়, সেই লোকটি, সেই অদ্ভুত নির্মম লোকটি এ খবর জানতে পেরে, হয়তো নিজে থেকে কোনও খবর দিতেও পারে...

আবার চললো প্রতীক্ষার পালা ... করে সঞ্জীবিত হোল মৃত আশার তরু ... দুরু দুরু বুকে সে বসে রইলো বাড়ীতে ... সন্ধ্যায়, দরজায় কার পায়ের আওয়াজ ... বেজে ওঠা হাতের মৃদু স্পর্শের ... শোনবার জন্য। নিজেকে শক্ত রাখা ... করলো। ভেঙে পড়লে চলবে না। খু... গলায় বিনা আড়ম্বরে অভ্যর্থনা ... হবে। গোপন করতে হবে রক্তক্ষরণে ... মুখটিকে। লুকিয়ে রাখতে হবে তাঁর ... জ্বালা। শুধুমাত্র দুটি কথা। 'কেন ... যদি হোল, তবে জানালে না কেন ...

সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কেটে মাস গে... বম্বে থেকে বম্বেতে চিঠি পৌঁছতে ... লাগে। না হয় ব্যাংকের কর্মচারীরা ... দিন দেরী করেই খবর দিয়েছে। খবর পাওয়ার পরও কি এত দে... হতে পারে। শুধু একটি কারণে। মিত্রের নাম আজ আর কোনও এ... গুঞ্জন তোলে না। না তুলুক। ভদ্রতা ... নেই? স্মৃতির তাড়না? কৌতূহল? সৌজন্যবোধ? তাও নেই? নিজের ... কি সে এতই লজ্জিত, যে আর তা... এসে নিজেকে উপস্থিত করা চ... একবারের জন্যও না? কত দুঃখে ... বাধায় কোনও মেয়ে ঐভাবে চিঠি লে... কি বোঝে না? কত জ্বালায় একটি ... এত নির্লজ্জ হয়? একটা টেলিফো... চলে না? একবার জিজ্ঞেস করা য... 'মঞ্জু তুমি কেমন আছ?'

প্রতীক্ষার অবসান একদিন ... আশা করে যখন ক্লান্ত মঞ্জু, তেমনি ... এলো। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ... দরজা বন্ধ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নি... শুয়ে পড়েছে। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির আওয়াজে ... ঘরে তার কানে কলিং বেলের ... পৌঁছল না। ... চোখের ওপর হাত ... রেখে শুয়ে আছে। ঘুম তত সহ... না। তাকেও অনেক সাধ্যসাধনা করে ... হয় আজকাল।

আঙ্গি এসে দাঁড়ালো তার ... 'বেবী? ঘুমিয়ে পড়েছ? অলসভাবে ... সরিয়ে তাকালো আঙ্গির দিকে। 'না ... খাওয়া হয়েছে? আঙ্গি তার দিকে ... তাকিয়ে রইলো। তারপর মৃদু স্বরে ... 'সে এসেছে।' মঞ্জু ঠিক বুঝতে পা... 'কে এসেছে?' আঙ্গি আঙ্গুল ... কোলকাতা বুঝিয়ে বললো 'সেই ... মঞ্জুর হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল ... কথা নেই শুধু তাকিয়ে আছে আঙ্গি... হৃদপিণ্ড আবার সচল হোল। এত ... দ্রুত চলতে লাগলো যে মঞ্জুর মনে ... সে কাঁপছে। উঠতে যাচ্ছিল আঙ্গি ... দিয়ে বাধা দিল 'দাঁড়াও হট ... যেয়ো না। মদ খেয়ে এসেছে মনে ... আমার সঙ্গে চল। তার আগে নাই... শাড়ী কিম্বা অন্য কিছু পর। মঞ্জু ... মতন নাইটি বদলে শাড়ী ইত্যাদি ... তারপর অবশ বিবশ ভঙ্গীতে আঙ্গির ... [illegible] এলো। আঙ্গি

...তেটায় দাঁড়িয়ে পড়ে ওকে ইশারা করলো ...রে যেতে। সোফায় কে অন্যান্ত ভঙ্গীতে ...া হেলিয়ে দিয়ে বসে আছে।' সারা ...রে তার ক্লান্তি সারা মুখে অবসাদ। ...মুখ বসা কেমন শীর্ণ মুখ! একে? এ ...ন জয়ন্ত? এই কি কোনও সার্থক ...ষের চেহারা? বেশবাস উজ্জ্বল ও ...তবু কেন এক ব্যর্থতার প্রলেপ ...খ আছে ও? মঞ্জুকে দেখে সামান্য উঠে ...বার চেষ্টা করলো মাত্র। উঠলো না। না ...ই বললো 'হাই।' তারপর ওর মুখের ...র থেকে চোখ সরিয়ে বললো 'বোসো।' ...ায় মঞ্জুর মন ভরে উঠলো। এ কেন? ...তো আমি চাইনি? মনে পড়লো ...ই ডেকে পাঠিয়েছে বলতে গেলে। অত-...দ্রতা রক্ষা করতেই হয়। বসলো। ...ন্ত এখনও ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে ...দেখে আশ্বস্ত হোল। নিজেই ওকে ...িয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। 'কেমন ...ছ?' দেখতেই পাচ্ছে কেমন আছে, তবু ...জ্ঞেস করতে হয় তাই করা।

'ভালোই। তুমি কবে এলে এখানে?' ...থেমে গম্ভীর গলায়।

'আট ন মাস হোল।'

'কেন?' গলার স্বর এবার রুক্ষ।

'পার্ডন?'

'কেন এসেছ এখানে?'

'বেড়াতে নয়। কাজে। ট্রান্সফারড ...।' মঞ্জুর গলায় ব্যঙ্গ।

'চলে যাও এখান থেকে।'

'কেন বলতো? ব্যঙ্গের সঙ্গে হাসি ...লো।

'প্লীজ। আমি অনুরোধ করছি।' ...ন্তর গলার স্বর আশ্চর্য নরম এবার। ...ই সুরেই, অন্যমনস্কের মতন যেন ...লো 'বলেছিলাম না, তুমি যেখানে আছ, ...খানেই থাকবে? আমারই শুধু সর্বনাশ ...?'

'কিসের সর্বনাশ?'

'সেদিন ছোট ছিলে, বোঝোনি। ...ও কি বুঝতে পারছ না? নাকি বুঝতে ...রেও খেলা করছ, সেই আগের মতন।'

'ভদ্রভাবে কথা বল।'

'জয়ন্ত মজুমদারের খবর চাই।' ...ন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে বললো। 'কি হবে ...র খবর দিয়ে? নির্বাসন দণ্ড দিয়েও ...ন্তি নেই, আবার তার পিছু ধাওয়া ...রেছ?'

'তুমি নীচ হয়ে গেছ।' নিষ্ফল রাগে ...ঁট কামড়ে মঞ্জু জবাব দিলো।

'উঁচু কে? শোভন পুরী? ঐ বাচচা ...লেটা? তার কোনও আশা আছে, না ...খাটাই শুধু চিবিয়ে খাবে?'

মঞ্জু উঠে দাঁড়ালো। 'চুপ।' চাপা ...র্জনের মতন শোনালো। 'আমারই ভুল ...য়েছে, তোমার ঠিকানা চাওয়া। হাত জোড় ...রে তোমায় অনুরোধ করছি তুমি এবার ...ও। একবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। সে ...ধ মিটেছে।'

'তোমার ইচ্ছা! তোমার সাধ!' মুখে তিক্ত হাসি। 'তোমার দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল, মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে, তার চেহারা কেমন হয়। পথের কুকুরের মতন যাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, সে কতটা হীন, কতটা দীন তাই দেখবার ইচ্ছা হয়েছিল?'

জয়ন্তও উঠে দাঁড়ালো এবার। দেখ। প্রাণ ভরে দেখ। মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকতে পারি, তবু ভিখিরী নই। জয়ন্ত মজুমদারকে ভিখিরী বানাতে, আরো কয়েকটা মঞ্জরী মিত্র লাগবে। বুঝলে?' ওর গলার স্বর বেশ কাঁপছে এখন।

'প্লীজ জয়ন্ত। চুপ করো। আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। এ কি রকম ভাষায় তুমি কথা বলছ? আর কেনই বা?'

জয়ন্ত ধাতস্থ হল যেন। চোখে মুখে বেদনার ছাপ ফুটে উঠলো। আবার নরম সুরে বললো, 'আয়্যাম সরি। আই বিলিভ আয়্যাম এ বিট হাই। আমার আসাই উচিত হয়নি। আমি যাই। চিঠিটা পেয়েছি কদিন হোল। আসব কি আসব না ভাবতে ভাবতে সময় গেল। আজো আসতে দেরীই হয়ে গেল।'

মঞ্জু বুঝলো, শুধু দেরীই হয়নি, সাহস সঞ্চয় করতে অন্য কিছুরও প্রয়োজন হয়েছে। তাই এই অবস্থা। কি দরকার ছিল ওর আসার?

না এলে কি হোত? চুপ করেই রইলো মঞ্জু। বলার সব কথা হারিয়ে গেছে। 'যা বলেছি ভুলে যেয়ো। আমি বোধহয় ঠিক প্রকৃতিস্থও নই। আসাই উচিত হয়নি আমার।' জয়ন্তর চোখ মুখ কেমন হয়ে উঠছে। ওর এই দীনহীন চেহারা মঞ্জুর সহ্য হচ্ছে না। চলে যাচ্ছে না কেন? তবু জয়ন্ত যেন আরো কিছু বলবে বলে দাঁড়িয়েই রইলো। মঞ্জুর অস্বোয়াস্তি হচ্ছে। ক্লান্ত লাগছে হঠাৎ। আশার বেলুন চুপসে গিয়ে সব কিছু কেমন কুৎসিত, কুৎসিত দেখাচ্ছে। অসহ্য লাগছে ঐ অনাবশ্যক উপস্থিতি। তবু সে দাঁড়িয়েই আছে।

'কিছু বলবে?'

'উঁ?' হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেলো। এতক্ষণ সিগারেটে টান দিতে দিতে কোথায় উধাও ছিল। ওঃ হ্যাঁ! একটা কথা জানবার ছিল।'

ঝুঁকে থাকা শরীরটাকে টান টান করে দাঁড়ালো এতক্ষণ বাদে। সোজা দৃষ্টিতে তাকালো মঞ্জুর দিকে। সে দৃষ্টি মঞ্জুর সারা দেহ পর্যটন করে এসে থামলো মঞ্জুর চোখের তারায়। মঞ্জুও তাকিয়ে রইলো ওর চোখে। হঠাৎ চমক লাগলো তার। এতক্ষণ বাদে, যেন চোখে পড়লো, সেই ধ্বংস-স্তূপের আড়াল থেকে এখনও দুটি আকাঙ্ক্ষার বাতি জ্বলজ্বল করছে। ব্যর্থতার বেদনা আর তিক্ততায় সে বাতির আবরণ অস্বচ্ছ। তবু সে নিশানা ভুল হবার নয়। সে আমন্ত্রণও উপেক্ষা করার নয়। যেন এই বাতি দুটি, অনন্তকাল ধরে, অন্ধকারে এই একটি পথহারার পথ চেয়েই জ্বলেছে, জ্বলতেই থাকবে। যে ডাক শোনার জন্য এতকাল তার প্রাণ মন তৃষিত হয়ে ছিল, সেই ডাকই কি অনুচ্চারিত শব্দে বাজছে ঐ বাতি দুটিতে? দৃষ্টির বাহু মেলে, ঐ চোখ দুটি কি তাকে আজ এতদিন, এতদিন বাদে আবার জড়িয়ে নিতে চাইছে? মঞ্জু মন্ত্রমুগ্ধের মতন চেয়েই থাকলো। জয়ন্তও দাঁড়িয়ে রইলো তেমনি ভাবে।

(ক্রমশঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একদিকে পাহাড়, একদিকে গভীর খাদ—দার্জিলিংএ, নয়তো নদী যেমন কালিম্পংএ, একদিকে পাহাড়, একদিকে সমুদ্র পর্যন্ত পেয়েছি পেনাংয়ে। গভীর জংগলে ঢাকা পাহাড় আন্দামানে দেখেছি। লতা, গুল্ম, ফার্ণ, মস্, ঘাসে ঢাকা ভিজে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে পাহাড় দার্জিলিং অঞ্চলে, গয়ার ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়, মসৃণ চকচকে পাথুরে, রুক্ষ, প্রাণহীন তাও তো দেখেছি। কিন্তু এখন সামনে দু'পাশে একি রূপহীন রূপ? মাইলের পর মাইল পার হচ্ছি, মনুষ্য সমাজ থেকে, পৃথিবী থেকেই যেন বেরিয়ে এসেছি। প্রাণের চিহ্ন নেই বলে এ যেন অবিনশ্বর ঊর্ধ্বের, আদি - অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দেখছি। এ তো আমাদের চেনা নয়। কবিমন হয় তো একে 'রুদ্রের রূপ, সন্ন্যাসী, বৈরাগী বলবে। বৈশাখের রুদ্ররূপের রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে পড়ছিল। না, কোন সাদৃশ্য নেই। বেড়াতে তো কসুর করিনি—সুইজারল্যাণ্ডে ইন্টারলাকেন অঞ্চলে সাদা বরফের রাজ্য দেখেছি। আর কিছু নেই। সেও ভয়াবহ। তবু মনে হয়েছে—সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া। নীচে প্রাণের স্পন্দন আছে নিশ্চয়। কিন্তু এ তো ছাল ছাড়ানো! উঃ কি ভয়াল, করাল! যে দৃশ্য চোখের ওপর দেখতে দেখতে চলেছি তাতে কোন ব্যক্তিত্বের রূপ আরোপ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অসহ্য কড়া রোদ। সোনার বরণ নয়, চোখ ধাঁধানো সাদা মনে হচ্ছে। চারিধার বালি রংয়ের, পাটকিলে, পাংশু রংয়ের উঁচু নীচু ছোট বড় স্থির ঢেউ শুধু। চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। ঢেউ-এর পরে ঢেউ, অফুরন্ত কিন্তু গতিহীন। একটা ফড়িং উড়ছে কি একটা ছোট্ট পাখী দেখলেও আবার মনে মনে নিজেদের জগতে ফিরে আসা যেত। সেই বেলা নটা থেকে কালো পিচের রাস্তার যেন জল দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি এগোনো মাত্র জল সরে সরে একটু দূরে, আর একটু দূরে চলে যাচ্ছে। মরীচিকা। কলকাতার রাস্তাতেও এ মরীচিকা খুব চেনা জিনিস। কিন্তু মরীচিকার এই যথার্থ পরিবেশ। এই মরুভূমির মধ্যে। এও খাঁটি খাঁটি মরুভূমি নয়। মরুপ্রায়, কঠিন মাটি। মরুভূমিতেও ঝুরঝুরে বালি থাকবে যা হাওয়ায় ওড়ে। অন্ততঃ আমার ধারণায়। এ বালি প্রায় পাথরের মত জমাট। কোথাও কোথাও বালিই পাথর হয়ে গেছে। এক গাছি ঘাস খুঁজলে মিলবে? দূরে দূরে পাহাড়ের নীচে

নীচে ধূ ধূ প্রান্তরে ঘূর্ণির পর ঘূর্ণি উড়ছে পাকিয়ে পাকিয়ে। একসঙ্গে দুধারে পাঁচটা সাতটা ঘূর্ণি তৈরি হচ্ছে। ধোঁওয়ার কুণ্ডলীর মত। ধুলোর ঘূর্ণি না কি বালির ঘূর্ণি কে জানে?

মটরের দুধারের পথে তো কোথাও ঝুরঝুরে বালি নেই। শক্ত জমাটবাঁধা মাটি। হঠাৎ দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বেশী দূরে নয়, কাছেই সাদা ধবধবে, ঠিক সমুদ্রের মত কি দেখা গেল। তাপের চোটে ওপরটা ঝাপসা মত কাঁপছে। গরম হাওয়ার হলকায় যেমন হয়। ওটা কি? আমরা বললাম—রেজা, উও-অ চিহ্নত? দরিয়া? তাই বা হবে কি করে। রেজা—নো, নো। নামচ, নামচ, সলত। এরা অনেকেই ক-কে চ বলে। নামক বলতে চায়। বুঝলাম—এ সেই সল্ট ডেজার্ট, লবণময়। খানিকটা পর পথ ঘুরে গেল। আর দেখা গেল না। পাহাড়ের আড়ালে পড়ে গেল।

রাস্তাটা পিচ ছেড়ে মাঝে মাঝে কাঁচা রাস্তাও হচ্ছে। সে জায়গাগুলো খারাপ। গাড়ি নাচছে। ঝাঁকি লাগছে। এমনি একটা জায়গায় রাস্তাটা বেশ খানিকটা নেমে গেছে। ঢালটা যেন হঠাৎই এসে পড়ল; মুহূর্তের জন্যে রেজার হাত কেঁপে গেল। স্পীড বেশীই ছিল, রেজা বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। গাড়ি টলমল করে বেঁকতে বেঁকতে খুব জোর ঝাঁকি খেয়ে সামলে গেল, রেজার দক্ষতার গুণে। উনি এবার উপায় না দেখে বললেন—রেজা স্লোলি প্লীজ। বি কেয়ারফুল। টিংক ফাস্টটা মনে করিয়ে দিল—আগা লোৎফান, ইয়াভাস, আয়াস্তে। আমি কিছু বলিনি। ভালই হল—রেজার একটু শিক্ষা হল, এবার থেকে নিজেই একটু আস্তে চালাবে নিশ্চয়। এই যে জনপ্রাণীহীন প্রান্তর দিয়ে চলেছি তো চলেইছি, কারো তো কই এই গরমে ক্লান্তি কি ঢুলুনি কিছুই তো আসছে না। ঘাড় একটু হেলে পড়ছে না। চোখের পলকই যেন পড়ছে না।

একটানা এই নগ্ন পাহাড়েও অজস্র রং-এর খেলা। বিভিন্ন স্তরের 'শেড'এর ঢেউ খেলানো মজার মজার রেখাটানা ছবি যেন। শুধু রেখার পর রেখা, সরু-মোটা, আঁকাবাঁকা। কখনো পাহাড়ের গায়ে দিগন্তের সংগে সমান্তরাল (ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ অনুভূমিক) টানা টানা রেখা। পাহাড়ের, মাটির স্তরের নীচে নীচে যেমন কোথাও কয়লা আছে, কোথাও লোহা, তামা, গন্ধক, ম্যাঙ্গানিজ—কোথাও আর কিছু, তার রঙের বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশছুম্বি পাহাড় তো নয়, দৃষ্টি আট-

সাধারণ ঝকমকেও তো নেই। তাই এই অন্
স্থির অকম্পীর যেন এক সময়ে। তার পি
কঠিন ঢেউয়ের ফেনায়-আছাড়ের জায়গায়
রংয়ের বাহার। কোথাও কালো, কো
মরচের রং, কোথাও বেগুনের মত। মি
বালি রং থেকে শুরু করে গাঢ় কাল
খয়েরী তো আছেই। বেশ ঘন কাল
লাল—যাকে কৃষ্ণমল বলে—সেই সু
রংয়ের স্তর রয়েছে।

এখানে তামার খনি আছে। পাথ
স্তরে সোনালী, তামাটে, লালচে রং দে
যায়। তেহরানে এসে পর্যন্ত একরকম এ
নারে সবুজ রংয়ের পাথর যেখানে সেখা
খুব দেখি। বস্তাবন্ধ সিমেন্ট জলে ভি
জমাট বেঁধে গেলে যেমন দেখায় ঠি
তেমনি। আসলে তার চেয়েও সুন্দর গা
সবুজ রংয়ের পাথর দিয়ে বাঁধানো পাঁচি
দেওয়াল। কোথাও রাস্তা বাঁধানো হচ্ছে,—
ঘর-বাড়ি তৈরী হচ্ছে, রাস্তার ধারে ধা
এই সবুজ পাথর স্তূপীকৃত করে রাখ
অনেক দেখেছি। পাহাড়াঞ্চলে বেড়াতে গি
অনেক কুড়িয়েও এনেছি। সেই রকম সবু
পাহাড়কে পাহাড় এখন পার হচ্ছি।....

গাছ-পালা, ফুল-ফলের রংয়ের বৈচি
দেখেছি। এখন নগ্ন পাথরের পাহাড়ে
রংয়ের বিচিত্রতার সম্ভার দৃষ্টি পথে
দু'পাশে বয়ে চলেছে। এটা অদ্ভুত জিনি
দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি। এর ঠিক ব্যাখ্যা
কিছু মাথায় আসছে না। বেশীর ভা
পাহাড়ে দেখছি এই রংয়ের স্তরগু
স্বাভাবিকভাবে অনুভূমিক সাজানো। জ
থেকে ওপর দিকে বিভিন্ন রংয়ের স্তরটা
লম্বা লম্বা সরু-মোটা লাইন চলেছে
বইয়ে যেমন ছবিতে মাটির স্তর বোঝা
থাকে। কিন্তু এক এক জায়গায় দেখা
পাহাড়ের মাথা থেকে পায়ের দিকে খ
লম্বা (ভার্টিকাল, উল্লম্ব) দাঁড় করা
ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের স্তর। এর কারণ বি
এ কি করে সম্ভব হল? মাঝে মাঝে প্রচ
বড় বড় ফাটল। পাহাড় দুভাগ হয়ে গে
ফিরে গিয়ে পরে প্রশ্ন করে এর সন্তোষজন
কারণ শুনেছি। হয়তো অনেক বছর আ
ভূমিকম্পে তোলপাড় হয়ে ধ্বংসস্তূপ প্রাণ
ফুলে-ফেঁপে বেঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে পাহ
সৃষ্টি করেছে। তাই তার খনিজ পদার্থে
স্তর ওমনি খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ে এই অদ্
বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাখ্যা বিশ্বা
যোগ্য মনে হয়েছে।

গাড়ি চলেছে মাঝারি গতিতে। পাহ
আর পাহাড়। ধূ ধূ প্রান্তর। অবিশ্র
মরীচিকা, ক্রমাগত ঘূর্ণি, এর কি শেষ নে
কিন্তু এইভাবে বর্ণনার তো শেষ কর
হয়। বর্ণনায় বৈচিত্র্য ফুটবে আর কত
টুকু। গাড়ির ভেতর আমরাও মনুষ্য সন্তা
কেন্টর জীব তো বটে। তাই মাঝে মা
ক্লান্তি ঘুলে জল, ঠাণ্ডা ফল পার ওকে এ
খেয়ে যায়। রসিকতাও একটু একটু চলে
বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করছেন—কি
টিংকু, নিঃশব্দে, ঘুমোচ্ছ না
যে? উঃ গরমও হচ্ছে বটে
টুটু বলছে, বাবা, তোমার চুলে

কন্ধা! হাওয়া খেয়ে খেয়ে মাথা যে ফুল। ইতিমধ্যে দূ পাশে অনেক উঁচু পাহাড় আসতে আরম্ভ করেছে।

বলছে—দ্যাখ টিংকু। ঐ দূরের ড়ের সারির পাগড়ো দ্যাখ। কেমন য় বেরিয়ে রয়েছে। মাথাটায় ঠিক যেন ল ঘেরা। যেন কোন দুর্গের পাচিল।

টংকু—হ্যাঁরে। পুজোর সময় রাজস্থানে দেখেছিলাম। একেবারে যেন চিতোর না রে? বাস্তবিকই আমিও এক-এক ার পাহাড় দেখে মনে মনে বারবারই ছলাম—যেন কোন হাজার বছরের প্রাচীন া চাপা পড়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে ভর খেয়ালে এমন সব পাথরের চাই-এর স, যে ঠিক মনে হচ্ছে, কোথাও কোনটা দের ভিত, কোনটা বা প্রাচীরের বশেষ। সত্যিই অদ্ভুত। টুটু বসে বলতে লাগল—ইরানে এখন তো মা কেই আর্কিয়োলজিকাল সার্ভে করে খুঁড়ে কত হাজার হাজার বছরের পড়া স্থাপত্য বের করছে।

পার্সেপোলিসের প্রাচীন সভ্যতাই তো া দেখতে চলেছি। টিংকুর পাথর আর পদার্থ সম্বন্ধে জানবার খুব ঝোঁক। লে বড় হয়ে জিওলজি পড়ে ও জিও-স্ট হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত কাকু, শচীনাথ কাকুর মত। কসের ছাত্রী টুটু বলছে— া না, আমার তো ফাইনাল , এম, এস-সিটা হয়ে যাক, র কিছু প্রত্নতত্ত্ব পড়ে নিয়ে আমি আর্কিওলজিস্ট হব। তখন তোতে তে এই সব জায়গায় এসে মাটির তলা খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার নমুনা বের । কি বলিস? আর যায় কোথা! ওদের যেন এক খেলা হল। দুজনেই ঐ রকম লের মত পাহাড় এলেই চেঁচিয়ে ওঠে—ঐ দুটো প্রাচীন সভ্যতা। এ বলে ঐ দুরে। ও বলে আরে আরে এদিকে , এটা আরো ভাল প্রাচীন সভ্যতা। বলছে—এটা কিন্তু একেবারেই সত্যি া। দ্যাখ এ চাপা পড়া ভাঙ্গা পাচিল না ই যায় না। একেবারে ইঁটের মত টুকরো রা করে খাঁজে খাঁজে পাথর সাজানো। কি করে জায়গাটা চিনে রাখা যায়? নেই আসতে হবে। টিংকু দীর্ঘশ্বাস —কতোদিনে আমরা আসব। ততোদিন আর অন্য প্রত্ন....কি বলো মা ওদের—তাত্ত্বিক—হ্যাঁ, ওরা কি আর রেখে । সব আবিষ্কার-টাবিষ্কার করে বসে বে।

ক্রমে পাহাড়ের সারির উচ্চতা কমে এল। বাতাসটা বাড়ছে। দূরে অল্প অল্প জের নমুনা এতোক্ষণ পর। মাঝে মাঝে একটু ঝিরঝিরে জলের চিহ্ন যায় হাঁচ্ছ। তারই দুধারে গাছপালা, সবুজ আমরা যে একটা কোন গন্তব্যের দেশ্য বেরিয়েছি, একেবারে নিরুদ্দেশ নয়, এতক্ষণে যেন মালুম হল। হাই , আড়মোড়া ভেঙে আমি বললাম—, ইস্পাহান আর কতো দূরে? কতোক্ষণে ছব?

একটা নাগাদ পৌঁছে যাব, রেজা বললে।

টুটু—কেন তোমার ভাল লাগছে না?

আমি—আঃ, রাখ বাবা তোদের ভাল-লাগা! আছে কি সারা পথে, যে ভাল লাগবে? খালি তো পাহাড়। ঐ পাথুরে সৌন্দর্য আর কতো দেখবো? টুটু—কেন, আমার তো বেশ লাগছে। পাহাড়ের গায়েই তো কতো রকমারি ব্যাপার।—তোদের ঐ একঘেঁয়ে বৈচিত্র্য নিয়ে তোরা থাক। সত্যি বলতে আমার আর একদম ভাল লাগছে না। নামতে পারলে বাঁচি। চান, খাওয়া। এই করে করে ক্রমে পাথুরে পাহাড় কমে আসছে। একটু যেন গাছপালা। জল।.... ক্রমে চাষাবাদ।

ফলের বাগান, ঘর-বাড়ি। আস্তে আস্তে এক সময়ে সওয়া একটা নাগাদ ইস্পাহান শহরে ঢুকে পড়া গেল। এখন ঠিকানা মিলিয়ে অশোক গাঙ্গুলীর বাড়ির অন্বেষণ। পেটে ক্ষিদে? ভাতের অর্ধাশাই। কিন্তু হাত-পা ধরে গেছে। চোখ জ্বালা করছে। হাই উঠছে।

অল্প আয়াসেই অশোকের বাড়ি পাওয়া গেল। আমাদের যৎসামান্য চেনা ভদ্রলোক। এতোই সজ্জন সে তার কেয়ার-টেকারের জিম্মায় রাখা বন্ধ বাড়ি আমাদের থাকার জন্যে খুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করে নিজেরা কি কাজে তেহরাণ গেছে। অতিবেশী মিস পিলু মেহতাকে বলাই ছিল। চটপটে স্মার্ট। সুন্দরী তরুণী পিলু হাসিমুখে ছুটে এল। দেড়টা বেজে গেছে। সে আমাদের লাঞ্চের আয়োজন করার জন্যে পেড়াপিড়ি করতে লাগল। আমরা ব্যস্ত হতে বারণ করায় রফা হল সন্ধ্যায় তার বাড়ি চায়ের নেমতন্ন। অশোকের চৌকিদার এখন খুব যত্ন করে চা তৈরি করে দিল। খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ধাতস্থ হওয়া গেল। যা গরম স্নান করলে অনেক ভাল লাগত। এরই ভেতর টুটু চটপট স্নান সেরে নিয়েছে। সময়াভাবে আমাদের হল না।

আবার হাওয়া-গাড়ি চড়ে মুকন্দম নামে শহরের চেলো কাবাবের বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে গিয়ে রেজা সহ বেশ করে ভরপেট চেলো কাবাব, ভাত আর প্রায় পঞ্চাশ গ্রাম মাখন, খুব ভাল কাবাব আর এক বোতল দুধ অর্থাৎ নোনতা ঠাণ্ডা ঘোল। প্রাণ ঠাণ্ডা হল। এই দুপুর রোদে ঘোরা তো অসম্ভব। অশোকের প্রকাণ্ড সুন্দর সাজানো বাড়িতে আরামের শয্যায় গা এলিয়ে দেওয়া গেল। বিকেল পাঁচটায় শহরের সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে বের হলাম।

ইস্পাহানের ট্যুরিস্ট গাইড ম্যাপটা সঙ্গেই আছে। আগেই চোখ বোলান ছিল। খেয়ে ঘুমিয়ে বিশ্রাম করে নিজের মগজটা দেখবার, ভাববার, অনুভব করবার ক্ষমতা ফিরে পেল। সত্যিই তবে বই-এ পড়া কতোদিনের স্বপ্নরাজ্য পারস্য সুলতানদের অতি গর্বের শহর, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীর ইস্পাহানের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। তেহরাণ থেকে ইস্পাহানের দূরত্ব ৪২৭ কিলোমিটার। মধ্য ইরানের সমতল ভূমিতে অবস্থিত। জাগ্রস পর্বতমালা পার হয়ে আমরা এলাম। জায়ানদেরুদ নদী বয়ে গেছে। শহরে ঢুকেই চমৎকার পোলের ওপর দিয়ে পার হয়ে অশোকের বাড়ি পৌঁছে-ছিলাম। ইস্পাহানের উচ্চতা সমুদ্র থেকে ৫১৮১ ফুট। ইস্পাহান যেন একটি সুন্দর বাগান। উত্তর-পূর্বে প্রশস্ত মরুভূমি, দক্ষিণে সুউচ্চ সোফে পাহাড়। পশ্চিমে ঝোপঝাড়, ফলের বাগান, চারণ ভূমি। মাঝখানে সুন্দর শহর ইস্পাহান।

ইস্পাহানের লোকেরা চারু শিল্পের জন্যে খ্যাত। সৌন্দর্যপ্রিয় জাত। সুকুমার কলাজ্ঞানের জন্যে এদের হাজার বছরের খ্যাতি। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ, পঞ্চম শতাব্দী থেকে অ্যাকামেনিয়ান পার্থিয়ন, স্যাসানিয়ান-দের রাজত্বকাল থেকেই ইস্পাহানের নাম-ডাক। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানরা পারস্য জয় করার পর থেকে এখানকার স্থাপত্যে জোরাস্ট্রিয় ও ইসলামির সংমিশ্রনের নমুনা দেখা যায়। এই শহরের সবচেয়ে সমৃদ্ধি হয় সাফাবিদ রাজবংশের রাজত্বকাল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই সময়কার প্রাসাদ মসজিদই দেখতে দলে দলে লোক দেশ-বিদেশ থেকে আসে। ইস্পাহানে দ্রষ্টব্য একাধিক মসজিদ আছে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর সবচেয়ে পুরনো পোল আছে নদীর ওপর বর্তমান শহরের একটু বাইরে। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রথমেই শহরের কেন্দ্রস্থল ময়দান-এ-শাহ গেলাম। শহরের মাঝখানে এতোবড় খোলা চত্বর নাকি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম-দের অন্যতম। মাঝখানে চৌকো আকারের বাগান। ছোট ছোট ফোয়ারা। তার চারদিকে বাঁধান সড়ক। তারপর ফুটপাথ। একদিকে বাজার, একদিকে রাজপ্রাসাদ। বাকী দুদিকে দুটো মসজিদ ছাড়া অসংখ্য হাতের কাজের দোকান। লোকে বসে বসে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে তামার পাতে নকসা খোদাই করছে। পথ চলতে চলতেই দেখা যায়। এই ময়দানকে ঘিরেই একদিকে বাজার।

শুধু বাজার বললেই, এ ব কি বস্তু তা ধারণায় আসবে না। এ মাঝে মাঝে বড় হাট বা খোলা বাজার না। দ দশখানা এয়ারপোর্ট জুড়লে যত লম্বা চওড়া হবে সে রকম হল ঘর। মোটা মোটা থামওয়ালা পাকা বাড়ি। ছাদ খুব উঁচু। গোল গোল আর্চ বা খিলান করা। সবাই বলে শীতের দিনে গরম আর গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা রাখার কৌশলে নাকি তৈরী। তার মধ্যে রীতিমত চওড়া চওড়া রাস্তা আড়া-আড়ি চলে গেছে। সমস্ত বাজারটাই পাকা গাঁথুনী ইঁটের তৈরী। দুধারে খোপে খোপে অসংখ্য দোকান। দোকান, বোঝাই জিনিসপত্র উপচে পড়ছে। পাকা ছাদ ও ঘরের মধ্যে রাস্তাগুলো এতোই লম্বা যে সুড়ঙ্গ মনে হয়। এসব চোখে না দেখলে বোঝান যাবে না। ইস্পাহানীদের হাতের কাজ সত্যিই বিশেষত্বের দাবী রাখে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বোধহয় কার্পেটের দোকান।

(ক্রমশঃ)

লক্ষ্য গোড়া ধরে গড়া

অজয় বসু

এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে, সবাই স্কুলের পড়ুয়া, সারা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কেউ দৌড়চ্ছে। কেউ লাফাচ্ছে। কেউ বা সমস্ত শক্তি সংহত করে বর্শাটিকে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করছে দূরে দূরান্তে। ওদের চেষ্টায় ভেজাল নেই। আন্তরিকতার নেই অভাব। যার যা সামর্থ্য সেইটুকু যোগাড় করে এগিয়ে যেতে চাইছে লক্ষ্যে। লক্ষ্য জয়। সততার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে জয়-লক্ষ্যে পৌঁছে যেতেই ওরা সমর্পিত প্রাণ।

বাচ্চাদের খেলাধুলোর এই দৃশ্যকাব্য যখন চোখের সামনে অভিনীত হয় তখন বড়দের মন আশায় বুক বাঁধে। তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। অনুষ্ঠানকেন্দ্র যদি হয় নিয়ন্ত্রিত, শৃঙ্খলিত তাহলে অ্যাথলেটিক আসরের রূপমণ্ডিত ঐশ্বর্য ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

এমনি এক সাজানো আসর সম্প্রতি দেখেছি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে—উপলক্ষ ক্যাডবারি-ফ্রাই আয়োজিত আন্তঃ স্কুল ক্রীড়ানুষ্ঠান। কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের সাড়ে ছশরও বেশি ছেলেমেয়ে এতে যোগ দিয়ে পরপর তিনটি দিন স্টেডিয়ামের ট্র্যাক-ফিল্ডকে মাতিয়ে রাখে। দৌড় ঝাঁপের মাতন ছাড়া কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা থাকায় যূথবদ্ধ ছেলেমেয়েরা শৃংখলাবোধের পরিচয় রাখারও সুযোগ পেয়েছে।

ক্যাডবারি অ্যাথলেটিকস কলকাতার ক্রীড়াজীবনে নতুন কোনো অনুষ্ঠান নয়। বছর চারেক ধরেই এই প্রতিযোগিতা চলে আসছে। তবে চার বছরের চেষ্টায় অনুষ্ঠানটি যে এক অর্থবহ রূপ নিতে পেরেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্কুলের ছাত্রছাত্রী মহলে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে তো বাড়ছেই। এই আন্তঃ স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মূল অর্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে সর্বভারতীয় স্কুল গেমস ফেডারেশন এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডও এই আয়োজনের দিকে চোখ রাখছেন। অনুষ্ঠান সংগঠনে সর্বাবিধ সাহায্যও পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের তরফ থেকে।

ক্যাডবারি-ফ্রাই এমন এমন সামগ্রী তৈরী করেন ছেলেমেয়েদের কাছে যেগুলির আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। ফলতঃ বাচ্চাদের নিয়েই তাঁদের কাজ-কারবার। খেলাধুলোর প্রতিও বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের টান স্বভাবজাত। তাই সেই টানে তাঁদের আরও কাছে টেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ক্যাডবারি-ফ্রাই কর্তৃপক্ষ এই খেলাধুলোর আয়োজন ঘটিয়েছেন। জিভের স্বাদ মিটিয়ে তাঁরা ছোটদের আপনজন হয়েছেন আগেই। এখন প্রাণের উষ্ণতায় তাদের মনপ্রাণ ভরিয়ে তোলাতেই খেলাধুলোর যজ্ঞভূমি সাজানোর ব্যবস্থা।

ক্যাডবারি অ্যাথলেটিকস প্রতি বছরেই দিল্লি, কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হয়। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার ফলাফলের মূল্যায়নে বাছাই করা প্রতিযোগীরা যান দিল্লিতে আন্তঃ শহর ক্রীড়ায় যোগ দিতে। সেখানে যারা সম্ভাবনা দেখাতে পারে তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে জনা দশেক ছাত্রকে পাতিয়ালায় নেতাজী সুভাষ ক্রীড়াশিক্ষায়তনে উচ্চতর পাঠ নিতে পাঠানো হয়। দিল্লি যাওয়া ও পাতিয়ালায় যাওয়া ও থাকা-খাওয়ার খরচ-খরচা সবই ক্যাডবারি-ফ্রাই সংস্থার। তাছাড়া এই সংস্থার পক্ষ থেকে কিছু কিছু ছাত্রকে বার্ষিক বৃত্তিও দেওয়া হয়। মূল পরিকল্পনা আশ্বাসজনক। অধ্যয়ন ও ক্রীড়াচর্চা বজায় রাখায় ছেলেমেয়েরা যাতে অবাধ সুযোগ-সুবিধে পায় তারই জন্য এই অকাতর পৃষ্ঠপোষকতা। এই পরিকল্পনায় সুফলও ফলছে। যেহেতু এই পথে লালিত পালিত হয়ে কেউ কেউ ক্যাডবারি অ্যাথলেটিকসের আসর থেকে উঠে জাতীয় অ্যাথলেটিকসের ট্র্যাক-ফিল্ডে নিজের জায়গা করে এগিয়েছে।

দৃষ্টান্ত দক্ষিণ ভারতের আন্নামালাই এবং পশ্চিমের সনৎ কুলকার্নি। দুজনেরই অ্যাথলেটিক জীবন শুরু হয় ক্যাডবারি ক্রীড়া উপলক্ষে। পাতিয়ালায় শিক্ষা সমাপনে উভয়েই আজ জাতীয় আসরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছেন। আর এক উঠতি কিশোর হলো ভাস্কর দেববর্মণ। বর্শা ছোড়ায় সে ইতিমধ্যে যে প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছে, সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হলে ভাস্করকে আরও বড় আসরে দেখতে পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস রাখি।

ছোটদের বড় কাজের উপযোগী করে তোলাই ক্যাডবারি অ্যাথলেটিকসের মূল লক্ষ্য। উদ্দেশ্য গোড়া ধরে গড়ার চেষ্টা করা। আন্তর্জাতিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের কৌলীন্য গর্ব নেই। ওলিম্পিক আসরে চেনা ভারতীয় অ্যাথলিট বলতে সেই আদিকালের নর্ম্যান প্রিচার্ড এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের মিলখা সিং, গুরুবচন সিং, শিবনাথ ও শ্রীরাম সিংকেই বোঝায়। বাকিরা খরচের খাতায়। ষাট কোটি অধিবাসীর দেশ বিশাল ভারতবর্ষে এমন অ্যাথলিট সহজে নজরে পড়ে না, যিনি আন্তর্জাতিক আসরে ভারতের পতাকাটিকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে রাখতে পারেন। এ কী কম আফশোষের কথা! এমন নিদারুণ আক্ষেপ থেকে ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের মুক্তি ঘটাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে[illegible] শিখিয়ে পড়িয়ে, সুযোগ সুবিধে দিয়ে গ[illegible] পিটে তৈরী করতে হবে। কাজটি সম[illegible] পক্ষের। এবং সর্বাত্মকও বটে। ক্যাডবা[illegible] ফ্রাই সেই সর্বাত্মক প্রয়াসে নিজেকে [illegible] রাখতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে[illegible] দেখে ভারতীয় ক্রীড়ার শুভাকাঙ্ক্ষীমহ[illegible] আজ আশ্বস্ত বোধ করতে পারছেন।

তবে তাঁদের গঠনাত্মক কাজে মাধ্য[illegible] শিক্ষাবোর্ড, স্কুল গেমস ফেডারেশন, রা[illegible] অ্যাথলেটিক সংস্থা এবং আরও অনেক [illegible] সহযোগিতা করলেও, বিবেক বর্জিত প্র[illegible] বুদ্ধির উৎপাত এখনও সংগঠকদের সহ্য[illegible] হচ্ছে। পরিণামে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়[illegible] আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

ছোটদের আসর। তবু সেখানে [illegible] ভাঙা বাঁদুরের উৎপাত আরম্ভ হয়ে গেছে[illegible] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট হাতে [illegible] বড়রাও ছোটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর[illegible] চাইছে। এবারের ব্যাপারটা যেন আ[illegible] বিসদৃশ।

ক্যাডবারি অ্যাথলেটিকসের কর্মকর্ত[illegible] অবশ্য বড়দের এই ছেলেমানুষীকে [illegible] চোখে দেখেন নি। খাস কলকাতাতেই ত[illegible] ষাট জন প্রতিযোগীকে বাতিল করে দি[illegible] ছেন। তাঁরা শক্ত হতে চেয়ে বিপথগা[illegible] ছেলেমেয়েদের [illegible] ফেরাতে চেয়েছে[illegible] হয়তো এতে কাজ হবে। কাজ আরও হ[illegible] পারে যদি প্রকৃত বয়স যাচাইয়ে ডাক্ত[illegible] পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। অথবা পুরসভা প্র[illegible] জন্ম-পরিচয়পত্র পরীক্ষা করা হয়।

সত্যিকথা বলতে কী, বয়স ভাঁ[illegible] ছোটদের ফাঁকিতে ফেলার চেষ্টা করা [illegible] ধরনের সংক্রামক ব্যাধি। সারা ভারত[illegible] বিভিন্ন ক্রীড়ামহল এই ব্যাধিতে ভুগ[illegible] রোগ সারাতে সাহায্য না করে বড়রা, কো[illegible] কোনো শিক্ষায়তনের প্রধানেরা সেই [illegible] বাড়াতে উস্কানিও যোগাচ্ছেন। ব্যাপা[illegible] দুঃখজনক ও লজ্জাকর। সোজা আঙ্[illegible] আজ আর বোধহয় ঘি তোলার আশা নে[illegible] কাজেই সুপারিশ, ব্যবস্থা বদলে ডাক্ত[illegible] পরীক্ষা নেওয়ারই দাওয়াই প্রয়োগ [illegible] হোক। বিনা এই দাওয়াইয়ে ভারতীয় ক্র[illegible] যে ফাঁকিতে পড়বে, তাতেই বা সন্দেহ ক[illegible] হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। তাই জানি যে [illegible] ভোগান্তি দেশ জুড়ে এতোদিনে আ[illegible] হয়ে গেছে।

দর্শক

ইংলণ্ড বনাম ভারত
পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট

বোম্বাইয়ের ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ড বনাম ভারতের ১৯৭৬-৭৭ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের শেষ পঞ্চম টেস্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ড বনাম ভারতের এই সদ্য সমাপ্ত ১৯৭৬-৭৭ সালের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ফলাফল দাঁড়ায় ইংল্যান্ডের জয় ৩, ভারতের জয় ১ এবং খেলা ড্র ১। এই নিয়ে ইংল্যান্ড বনাম ভারতের যে ১৪টা টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হল তার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যান্ডের রাবার জয় ৯, ভারতের রাবার জয় ৩ এবং সিরিজ ড্র ২। এই ১৪টা টেস্ট সিরিজের ৫৩টা টেস্ট খেলার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ২৫, ভারতের জয় ৭ এবং খেলা ড্র ২১।

বোম্বাইয়ের শেষ পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতের অধিনায়ক টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রথম দিনে ভারতের প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট পড়ে ২৬১ রান উঠেছিল। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে প্যাটেল (৮৩ রান) এবং গাভাসকার দলের মূল্যবান ১৩৯ রান যোগ করেছিলেন। প্যাটেল ১৪০ মিনিট ব্যাট করে তাঁর ৮৩ রানে ১৬টা বাউন্ডারী করেন; অপর দিকে গাভাসকার ৩৩০ মিনিট খেলে তাঁর ১০৩ রানে ১০টা বাউন্ডারী মেরে অপরাজিত থেকে যান। টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই নিয়ে গাভাসকারের সেঞ্চুরী দাঁড়াল ১০টা—ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৬, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২ এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২। এখানে উল্লেখ্য, গাভাসকারের আগে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র পলি উমরীগড় ১০টা টেস্ট সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন। উমরীগড় এইভাবে তাঁর ১২টা টেস্ট সেঞ্চুরী করেছিলেন—পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫, ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩টে করে এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১।

দ্বিতীয় দিনে ভারতের প্রথম ইনিংস ৩৩৮ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন ভারত তার বাকি ৬টা উইকেটে মাত্র ৭৭ রান সংগ্রহ করেছিল। গাভাসকার ১০৮ রান করে আউট হন। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যান্ড তার প্রথম ইনিংসের কোন উইকেট না-খুইয়ে ৯৯ রান তুলেছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ২৮৫ (৬ উইকেটে)। এইদিন ইংল্যান্ড তাদের ৬টা উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ৯৯ রানের সঙ্গে ১৮৬ রান যোগ করেছিল। এইদিনের খেলার শেষে দেখা গেল ভারতের থেকে ইংল্যান্ড তখনও ৫৩ রানের পিছনে পড়ে আছে। প্রথম উইকেটের জুটিতে অ্যামিস (৫০ রান) এবং ব্রিয়ারলি ১৪৬ রান সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। অধিনায়ক গ্রেগ ১৯০ মিনিট খেলে তাঁর ৫৭ রানে সাতটা বাউন্ডারী করে অপরাজিত থেকে যান।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩১৭ রানের মাথায় শেষ হলে ভারত মাত্র ২১ রানে এগিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৭৬-৭৭ সালের টেস্ট সিরিজে প্রথম ইনিংসের রানের ভিত্তিতে ভারতের এগিয়ে যাওয়ার ঘটনা এই দ্বিতীয়। চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড প্রায় এক ঘণ্টার খেলায় শেষ চারটে উইকেটে মাত্র ৩২ রান সংগ্রহ করেছিল। অধিনায়ক গ্রেগ চার ঘন্টা খেলে তাঁর ৭৬ রানে ৯টা বাউন্ডারী এবং একটা ওভার-বাউন্ডারী করেছিলেন।

চতুর্থ দিনের বাকি ২৬৩ মিনিটের খেলায় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৪০ রান করে ১৬১ রানে এগিয়ে যায়।

শেষ পঞ্চম দিনে লাঞ্চের ৪৫ মিনিট আগে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯২ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন ভারত তার শেষ ৫ উইকেটে ৫২ রান যোগ করেছিল। খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জয়লাভের জন্যে ভারতের প্রয়োজন ছিল ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১০টা উইকেট পাওয়া এবং অপর দিকে ইংল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৪ রান সংগ্রহ করা। সময় ছিল ২৪৫ মিনিট। কিন্তু দেখা গেল কোন দলই জয়লাভের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে নি। ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৫২ রানের মাথায় (৭ উইকেটে) খেলা শেষ হয়। ফলে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ৩৩৮ রান (গাভাস্কার ১০৮ এবং প্যাটেল ৮৩ রান। আন্ডারউড ৮৯ রানে ৪, লিভার ৪২ রানে ৩ এবং গ্রেগ ৬৪ রানে ৩ উইকেট)
ও ১৯২ রান (এস অমরনাথ ৬৩ এবং গাভাস্কার ৪২ রান। আন্ডারউড ৮৪ রানে ৫ এবং লিভার ৪৬ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৩১৭ রান (এ্যামিস ৫০, ব্রিয়ারলি ৯১ এবং গ্রেগ ৭৬ রান। বেদী ১০৯ রানে ৪ এবং প্রসন্ন ৭৩ রানে ৪ উইকেট)
ও ১৫২ রান (৭ উইকেটে। ফ্লেচার নট-আউট ৫৮ রান। ঘাউরি ৩৩ রানে ৫ উইকেট)

টেস্ট ক্রিকেটের শতবার্ষিকী

ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী ১২ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ মাঠে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার সেন্টিনারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসর বসবে। এই মেলবোর্ণ মাঠেই ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন হয়। উভয় দেশের এই খেলাটিই আবার পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা। ১৮৭৭ সালে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয় ৪৫ রানে এবং দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড জয়ী হয় ৪ উইকেটে। ইংল্যান্ড স্বদেশের মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে ওভালে, ১৮৮০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। এই খেলায় ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দেয়। ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট জয় ১৮৮২ সালের ওভালে—৭ রানে। অস্ট্রেলিয়ার এই জয় খুবই অপ্রত্যাশিত এবং এই জয়কে কেন্দ্র করে যে 'এ্যাসেজ' কথার উৎপত্তি হয় তা শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় অমরত্ব লাভ করেছে। ইংল্যান্ড - অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার আর এক নাম—'ফাইট ফর দি এ্যাসেজ'—অর্থাৎ 'ছাই নিয়ে যুদ্ধ।' ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে যে দল বেশী খেলায় জয়ী হয় তাদের বলা হয় 'এ্যাসেজ' জয়ী। আসলে 'এ্যাসেজ' একটি কাল্পনিক পুরস্কার—কোন মেডেল, কাপ বা শীল্ড নয়।

হিট ছবির ফরমুলা

এ্যাকিজ্জাল

এখান থেকে মারলাম তীর
লাগল কলা গাছে;
হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে
চোখ থেয়ে গেল মাছে।

অনুকিয়েও কি সরকার বাংলা ছবিকে বাঁচাতে পারবেন?

হয়ত একদিন বাংলা ছবি দেখতে বাধ্য করাবার জন্য একটা বিল পাশ করিয়ে প্রত্যেক সিনেমা হলকে নির্দেশ দেওয়া হবে, যাতে প্লেনের মত প্রতিটি সিটে সেফটি বেল্টের ব্যবস্থা থাকে এবং সেই সঙ্গে থাকে অটোমেটিক লকিং ডিভাইস। প্রতিটি শো-এর শেষে সেই চাবি খুলে দেওয়া হবে। তখন তো ইচ্ছে থাকলেও ছবি শেষ হবার আগে উঠতে পারবেন না, এমন কি প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও নয়।

উপন্যাসের কাটতি হয় লেখকের যোগ্যতায়। সেই বই বিক্রির ফলে শুধু লেখকই লাভবান হন না, সেই সঙ্গে ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু লোকেরই আর্থিক সঙ্গতি নির্ভর করে। ঠিক তেমনই একটা বাংলা ছবির আর্থিক সাফল্যের ওপর নির্ভর করে ছায়াছবির সঙ্গে জড়িত বহু লোকের রুজি-রোজগার। বই-এর ব্যবসায়ের পাবলিশার হচ্ছে, ছবির জগতের প্রোডিউসার ডিস্ট্রিবিউটার। বই-এর পাতায় লেখকই হচ্ছে একমাত্র স্রষ্টা কিন্তু সিনেমার, কাহিনীকার ছাড়াও আরও একজন স্রষ্টা থাকেন, যিনি বইয়ের পাতায় কালো হরফের মধ্যে লুকিয়ে থাকা চরিত্রগুলোকে যোগ্য পট-ভূমিকায় দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলেন সেলুলয়েডের ভাষায়, তিনিই হচ্ছেন চিত্র পরিচালক। একটা ছবির মূল গল্পটা হচ্ছে প্ল্যান, এবং তার ওপর 'স্বপ্নে দেখা সাতমহলা বাড়ি।' তোলার কাজ পরিচালকের। কিন্তু, পরিচালক বাছাই করবেটা কে?

বাংলা ছবির চিত্র পরিচালকদের শতকরা নব্বইভাগ (এই লেখাটা পড়ে সব পরিচালকই ভাববেন, তাঁরা বাকি দশভাগের মধ্যে পড়েন) পরিচালকদের ভূমিকা হচ্ছে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান-দের মতো; এরা গল্পের গরুকে গাছে তোলার পরিবর্তে চাবুক মেরে খোঁয়াড়-খালিতে নিয়ে এসে বাংলা ছবির গোরোস্থান তৈরী করছেন।

হলিউডের ছবি দেখতে গিয়ে কখনই আপনার উঠে আসতে ইচ্ছে হবে না। কিন্তু আজকাল কটা বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে শুরু থেকে শেষ অবধি বসে থাকতে ইচ্ছে হয়? ফরমুলা অনু-যায়ী দুঃখের গান শেষ অবধি জ্বালিয়ে মারে।

ছবির প্রথম কাজ হচ্ছে গল্প বাছাই। চিত্র পরিচালকদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী ভারী বা হাল্কা ধরনের গল্প বাছাই করতে হবে। শরৎচন্দ্রের গল্প নিয়ে যে কোনও পরিচালকই ছবি করুন না কেন, সে ছবি হিট হতে বাধ্য। আর একদিকে 'পথের পাঁচালী' সত্যজিৎ রায়ের হাতে পড়েছিল বলেই চলচ্চিত্র জগতে অমর হয়ে আছে। বিভূতিবাবুর আরণ্যক অক্ষমের হাতে পড়ে অরণ্যে রোদন করতে চলে গেল।

ট্যাক্সিচালক হতে গেলে ড্রাইভিং লাইসেন্স চাই। কিন্তু চিত্র পরিচালক হতে গেলে কোন যোগ্যতা থাকার দরকার নেই। কারণ সাহিত্যিকের গল্পকে চিত্রনাট্যে রূপ দেবেন চিত্র নাট্যকার। আর্ট ডিরেক্টার সেট সাজাবেন। নায়করা অভিনেতা-অভি-নেত্রীরা নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী অভিনয় করবেন। এ্যাসিসটেন্ট—ডায়ালগ পড়াবেন। আর কন্টিনিউটি রাখবেন। গীতিকার গান লিখবেন। সঙ্গীত পরি-চালক সুর দেবেন। ক্যামেরাম্যান ছবি তুলবেন। এডিটার এডিট করে ছবিটা শেষ করবেন। পরিচালকমশাই শুধু চেয়ারে বসে প্রডিউসারের পয়সায় দামি সিগারেট মুখে দিয়ে মাতব্বরি করবেন।

পরিচালকের শুধু একদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়—হিট ছবির ফরমুলা অনু-যায়ী ছবিতে সব রকম মশলা সঠিক পরিমাণে মেশানো হচ্ছে কিনা অথবা কত মিনিট অন্তর ছবিতে গান থাকছে। প্রযোজক পরিচালকদের মতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে নরম গদির চেয়ারে বসে, দর্শকরা যদি সমানে গল্পের পেছনে দৌড়ান, তাহলে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, সেইজন্য মানসিক ক্লান্তি দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে রিলিফ হিসাবে গানের একান্ত প্রয়োজন সেটাই যদি মূল উদ্দেশ্য, তাহলে গানের বদলে চার-পাঁচবার মিনি ইন্টারভ্যাল দিলে হয় না। ছবির বাজেটও অনেক কমে যাবে।

বাংলা হিট ছবির ফরমুলাটা কোথা থেকে এসেছে জানেন? —একটা ছড়া থেকে—

'এখান থেকে মারলাম তীর,
লাগল কলা গাছে।

হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ে,
চোখ থেয়ে গেল মাছে।।'

—এবার বাংলা ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই ফরমুলাটা মিলিয়ে নিন। দেখবেন, হুবহু মিলে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, তীর মারার মধ্যে আছে—হিরোইজিম, কলাগাছে আঘাত লাগার মধ্যে আছে—প্যাথোস হাঁটু বেয়ে রক্ত পড়ার মধ্যে আছে—'হরর'। আর মাছে চোখ খেয়ে যাবার ব্যাপারটার মধ্যে আছে—কমেডি। আর এসবটা মিলিয়ে বলে সেন্সরের আপত্তি থাকার বাকী সব রসের মিশ্রণকে বলা হয়—'হিট ফরমুলা'—সাতে জন্মাকর।

ট্যাক্সিচালক
হতে গেলে
ড্রাইভিং লাইসেন্স
চাই।
কিন্তু চিত্র পরিচালক
হতে গেলে কোন
যোগ্যতা
থাকার দরকার নেই

নায়ক : মেয়েদের চোখে

ইংরেজী সিনেমায় দর্শক গ্রেগরী পেক বা এ্যান্থনী কুইনকে নায়ক হিসেবে একটু আসনে বসাতে মোটেই গররাজী নন। কিন্তু আমাদের ছবির দর্শক উত্তমকুমারের 'হীরো' ইমেজের পাশা-পাশি কালী ব্যানার্জীকে (নীল আকাশের নীচে) বা চিন্ময় রায়কে (গোপালের বিয়ে) নায়ক হিসেবে মেনে নিতে অনভ্যস্ত। আমাদের নায়কের সংজ্ঞাটা তাঁর মূর্তিকে ঘিরে, তাই বাংলা ছায়াছবিতে 'অ্যান্টি - হীরো' ব্যাপারটা এখনও দূরে অস্পষ্ট।

ছায়াছবির দর্শকের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কিছু বেশী: তাই তাঁদের কাছেই প্রশ্ন রেখেছিলাম বাংলা ছায়াছবির কোন নায়ককে সবচেয়ে ভালো লাগে? —জানতে চেয়েছিলাম শ্রীমতী ঘোষের কাছে। উনি সরাসরি জবাব দিলেন, নিঃসন্দেহে উত্তমকুমার। ওঁর মত চমৎকার এ্যাপিয়ারেন্স বা এক্সপ্রেশন আর কার আছে? স্বামীর কাজের খাতিরে বহু ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার বা বড় বড় সিভিল বা মিলিটারী অফিসারদের সঙ্গে আমাদের জানা-শোনা হয়েছে। এই সব জগতের চাল-চলন, হাব ভাব আমাদের খুব চেনা। এ-ধরণের চরিত্রে যখন উত্তমকুমারকে দেখি তখন পুরো ব্যাপারটা বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। ওঁর অভিনয়ে যে একটা স্বাভাবিক আচরণ দেখা যায় সেটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। অবশ্য ওঁর ব্যক্তিত্বটাই এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট। আর চেহারার জৌলুষ সম্বন্ধে আমি আর নতুন করে কী বলব। রোম্যান্টিক অভিনয়ে এখনও তো উনি অদ্বিতীয়। এই বয়সে 'অমানুষ' ছবিতে কী স্পার্টিং এ্যাক্টিং করেছেন। নতুনদের মধ্যে রঞ্জিত মল্লিক খুব রিফ্রেশিং, আর দীপংকর দের মধ্যে কেমন একটা বুদ্ধির ছাপ আছে। তবে হঠাৎ হঠাৎ এক-একটা ছবিতে দারুণ অভিনয় করে সৌমিত্র সত্যিই অবাক করে দেন। আমাদের পাশের বাড়ীর এক বৃদ্ধাকে অবশ্য এ ব্যাপারে আমাকে সেচে কিছু আর জিজ্ঞেস করতে হয়নি। ওঁরা কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা এবং ওঁর শ্বশুরেরাই দুই ভাই মিলে এ শতকের প্রথমে মাতিয়ে রেখেছিলেন কলকাতার ফুটবল ময়দান। দেখলাম ছাদে চুল শুকোতে শুকোতে কাকে যেন চেঁচিয়ে বলছেন, সব্যসাচী দেখেছিস? আঃ—কী পার্ট করেছে উত্তম। এক-একটা মেক-আপে এক এক রকম অভিনয়। দেবী মুখার্জী আর সুমিত্রা দেবীর পুরোনো 'পথের দাবী' দেখেছি। কিন্তু এ ছবি দেখে বোঝা যায় সত্যি আমাদের দেশ কত উন্নতি করেছে। কতো স্পষ্ট ছবি। এসব আমাদের চোখে ঠিক ধরা পড়ে। আর গাই বল জোকটার ভাগ্য ছিল বটে, একেবারে দু হাতে লুটে নিচ্ছে। রাজ-বংশের সাংঘাতিক অভিনয় করেছে। তুই তো নিজেই দেখেছিস। তবে একই ছবিতে একজনকে নিয়ে একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শ্রাবন্তী। উচ্চ মাধ্যমিকে ফোর্থ স্ট্যান্ড করে ফিলজফিতে অনার্স নিয়েছেন। বাবা বিদগ্ধ কবি, মা কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'নায়ক' প্রশ্ন তুলতে একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন। আকস্মিকতার জের কাটতে একটু ভেবে বললেন, অনিল চ্যাটার্জী। এবার আমার বিস্ময়ের পালা। জানতে চাইলাম, হঠাৎ এরকম বিশেষ পছন্দ? উনি বললেন, মানে আমার ভালো লাগে বেশ ন্যাচারাল এ্যাকটিং। তবে ঠিক নায়ক বলতে আমরা যা বুঝি সেই ধারণায় বিশেষ বিশেষ ছবিতে সৌমিত্র চট্টো-পাধ্যায়কে আমার খুব ভালো লাগে। ভীষণ বুদ্ধিমত্তার ছাপ তাঁর ভাব-ভঙ্গিতে। হাব-ভাবের মধ্যে বেশ একটা আর্টিস্টিক এ্যাটিচিউডের রেশ রয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে সৌমিত্রকে দারুণ লাগে। তবে অন্যান্য কিছু ছবিতে কেন জানি না ওঁকে কেমন যেন বোকা বোকা লাগে। পাশেই বসেছিল ওঁর ছোট্ট বোন টিয়া। ও সগর্বে বলল, আমিও মা-বাবার সঙ্গে সিনেমা দেখি। আমার সব-চেয়ে ভালো লাগে ফেলুদাকে। আর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে বলে দিও আমি ওঁর লেখার খুব ভক্ত।

মুকুলিকা রায় ঘোষ

সুকন্যা প্রণতা ঘোষ

শ্রীমতী মানু দেবী

গৃহবধূ মানুদেবী বললেন, আমাদের সবচেয়ে পছন্দ উত্তমকুমারকে। যেমন চেহারা, তেমনি স্মার্ট।

মেঘন্তী (টিয়া)

সুনীত ঘোষ
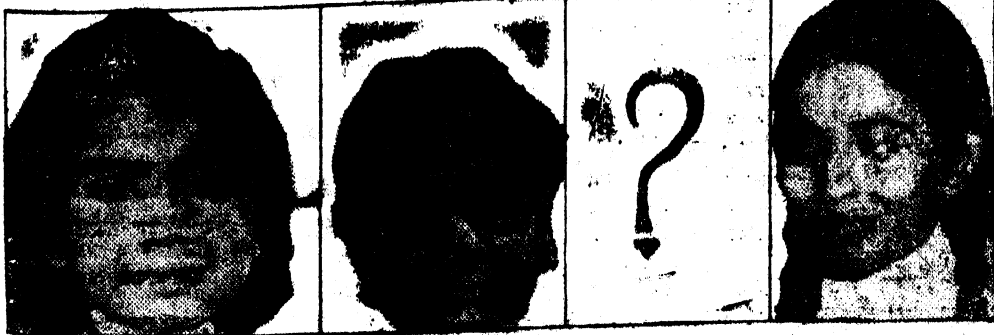
শ্রাবন্তী ঘোষ

অসাধারণ ছবির জন্য চাই অসাধারণ ধৈর্য

'অসাধারণ' ছবিটি অ-সা-ধা-র-ণ হয়ে উঠল না, বরং উত্তম-দর্শকরা এই ছবিটি দেখার জন্য একশো আশি মিনিট অসাধারণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে হল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। উত্তমকুমারকে একসপ্লয়েট করে ছবি করার যে প্রবণতা বাংলা ছবির জগতে সৃষ্টি হয়েছে, এই অসাধু প্রচেষ্টা এখুনি বন্ধ হওয়া উচিত। এবং সেটা একমাত্র উত্তমকুমারই করতে পারেন। উত্তমবাবুকে উদ্দেশ্য করে জানাই—এভাবে আপনি নিজের ইমেজ নষ্ট হতে দেবেন না, এখনও সময় আছে। আপনার জনপ্রিয়তা ভাঙিয়ে যেসব প্রযোজক ও পরিচালকরা বৈতরণী পার হতে চাইছেন, তাঁদের পরিত্যাগ করুন।

'অসাধারণ' ছবির কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সলিল সেনের। এক-সময়ে সলিলবাবু বাংলা নাটকের জগতে প্রগতি চিন্তার জন্য সুখ্যাত ছিলেন। সময় এবং বয়েসের প্রাজ্ঞতায় সলিলবাবু 'অসাধারণ' ছবিটির মাধ্যমে বাস্তবানুগভাবে আমাদের এই সমাজের যে চিত্র আঁকতে চাইলেন—সেটা একেবারেই হাস্যকর ও অবাস্তব।

এবার দেখা যাক 'অসাধারণ' ছবিতে কি আছে। জগবন্ধু বটব্যাল এই কাহিনীর নায়ক। তিনকুলে কেউ নেই, পরের উপকার ও সেবাই তার একমাত্র ব্রত। নিজের ঘরে কিছু নেই, উপার্জন সে করে না, দিনের পর দিন উপোস করে থাকতে পারে কিন্তু কারুর প্রয়োজনে সে নিজের ঘড়ি বিক্রি বা বাঁধা দিয়ে টাকা জোগাড় করে দেয়। কিংবা অনাথ আশ্রম বা টিউবওয়েল বা খবারাপে নিজের জলখাবার পেতলের কলসিটাও বিক্রি করে কর্তব্য পালন করে। গ্রামের যে কোনো লোকের প্রয়োজনে জগবন্ধু সবার আগে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, এস-ডি-ও, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, ডাক্তার, ব্যবসায়ী সবাই জগবন্ধুকে ভয় করে, খাতির করে। এহেন জগবন্ধু কোনরকম সইসাবুদ ছাড়াই গ্রামের একটি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে দশ হাজার টাকাও যোগাড় করে পাঁচ মিনিটে। ঘটনার বেড়াজালে শেষপর্যন্ত সেই মেয়েটিকে জগবন্ধুই বিয়ে করে।

ছবিটিতে জগবন্ধু চরিত্রটির মাধ্যমে যে বক্তব্য পরিচালক রাখতে চেয়েছিলেন, দুর্বল চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দোষে তা সম্ভব হয়নি। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও বক্তব্য বুদ্ধিদীপ্ত মজার ব্যাপার ছবিটিতে ছিল, যাকে সুগ্রন্থনের মাধ্যমে ভাল ছবি করা যেত। মফস্বল শহর বা গ্রামে এখন জগবন্ধুর মত চরিত্র আছে কিনা জানি না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাঙালীর কাছে সই ছাড়া দশ হাজার টাকা পাওয়া এ যুগে সম্ভব কিনা, ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে সবাই গোপনে জগবন্ধুকে ভয় করে যেতে আসা যাওয়া করে—ইত্যাদি বিষয়গুলি মেনে নেওয়া যায় কি?

শ্যামল চক্রবর্তী

পল রবসন ও সিডনি পয়টিয়ারের ছবি

হলিউডের ছবিতে নিগ্রো অভিনেতা অভিনেত্রীরা বহুকাল ধরেই অভিনয় করে আসছে। বর্ণবৈষম্য সেখানে প্রতিবন্ধক হয়নি। তবে সম্পূর্ণ নিগ্রো জীবন তাঁদের সমস্যা, স্বাধীকার ইত্যাদি নিয়ে খুব বেশী ছবি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

প্রথম দিককার ছবিতে নিগ্রো শিল্পীদের ভূমিকাও খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। প্রায় চরিত্রই শ্রমনির্ভর ছিল। এর পরিবর্তন ঘটে বোধহয় বিশ্ববিখ্যাত গায়ক পল রবসন ও সিডনি পয়টিয়ারের আবির্ভাবের পর। বস্তুত হলিউডের ছবিতে এঁদের উপস্থিতিতে যেন ছায়াছবির গল্পের পরিবেশই পাল্টে গেল।

পল রবসন অবশ্য খুব বেশী ছবিতে অভিনয় করেননি। বড়জোর পাঁচ ছ'টা। তার মধ্যেও আবার কটা ছবি বিটেনে তোলা। তবে সিডনি পয়টিয়ার বেশ কিছু ছবিতেই (আমেরিকায় তৈরি) অভিনয় করেছেন এবং কয়েকটি ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য বিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমীদের কাছে আজও অম্লান হয়ে আছেন। সম্প্রতি গ্লোব সিনেমার বড়দিনের আকর্ষণ 'দি অর্গানাইজেশন' ছবিতে ভিন্ন ভূমিকায় সিডনি পয়টিয়ারের দুরন্ত অভিনয় কলকাতার দর্শকদের কাছে আর একবার তাঁর অসাধারণত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

ক'দিন আগে কলকাতার [illegible] কর্তৃপক্ষের দৌলতে পল রবসন ও সিডনি পয়টিয়ারের দুটি পুরনো ছবি দেখার সুযোগ হল। পল রবসনের ছবিটির নাম ছিল 'এমপারার জোন্স' এবং সিডনি পয়টিয়ারের ছবির নাম 'এ রেইজিন ইন দি সান'। দুটি ছবিই নিগ্রো জীবন ও সমাজের ওপর ভিত্তি করে তোলা।

প্রথম ছবির নায়ক পল [illegible] সাহসের দ্বারা কি করে জীবনে [illegible] চেয়েছিল (অবশ্য [illegible] শেষরক্ষা সম্ভব হয়নি) তারই [illegible] চালের গল্প। গল্পের শেষের দিকে [illegible] একটা রূপকথার আমেজ আছে। এই ছবির দুটো ব্যাপার লক্ষণীয়। প্রথম [illegible] দেখানো হয়েছে নিগ্রো আদিম [illegible] পুরুষের নাচ। [illegible] দৃশ্যান্তরে [illegible] গেল শিক্ষিত [illegible] পুরুষের ভিন্ন [illegible] নাচ। আর ভাবার পরের দিকে দেখা [illegible] একজন ব্যবসায়ী নিরীহ অর্ধসভ্য মানুষের মধ্যে দোশ[illegible] পরার প্রচলন করার [illegible] কি ভাবে [illegible]দের শোষণ করছে। [illegible] বণিকের মানদণ্ড কথাটাকে মনে [illegible] দেয়।

দ্বিতীয় ছবিতে এক নিগ্রো পরিবারকে দেখান হয়েছে। সিডনি পয়টি[illegible] এক অপরিচিত পুরুষ। যেমন [illegible] তেমনি আধুনিক জীবনযাপনে বিশ্বাসী। সিডনি, তার স্ত্রী, মা ও বোনের অসাধারণ অভিনয় এ ছবির সম্পদ। সম্পূর্ণ পারিবারিক গল্প, অথচ কি ক্ষিপ্রগতি। এ ছবি সচরাচর দেখা যায় না।

'ব্যাক স্যাডো' আন এ [illegible] স্ক্রীন' নামাঙ্কিত এই ছবি দুটি [illegible] ইউসিস অডিটরিয়ামে দেখান হয়।

শান্তিরঞ্জন চ্যাটা[illegible]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য

বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম ভ্রমণকাহিনী

শঙ্কু মহারাজ রচিত

মধু-বৃন্দাবনে

তিন পর্বে সম্পূর্ণ ॥ প্রতি পর্ব বারো টাকা

শ্রীকৃষ্ণের মহাজীবন ও কৃষ্ণলীলাস্থল অবলম্বন করে লেখকের আর একখানি ভ্রমণকাহিনী

মন-দ্বারকায় ১২৲

দ্বারকা, ওখা ও বেট-দ্বারকা পরিক্রমার কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের যৌবনলীলা।

অমলেন্দু ঘোষের একটি বলিষ্ঠ প্রয়াস

বিপ্লব ও বিপ্লবী ৮৲

নারায়ণ সান্যালের একটি অসাধারণ গ্রন্থ

গজমুক্তা (২য় মুদ্রণ)

অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঁচাজাগানো গ্রন্থ

সুবর্নাশীর ২০৲

প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার রক্ষিত-রায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ২৫৲

সুভাষ সমাজদারের পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮৲

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আর একটি অনবদ্য ভ্রমণকাহিনী

গোমুখীর পথ ১৬৲

গোমুখীর দুর্গম ও রহস্যময় পথের পটভূমিকায় এক বিস্ময়কর গ্রন্থ-সৃষ্টি। সাধারণ ও অসাধারণের সঙ্গমে ভয়াল-ভয়ঙ্কর পথের প্রান্তে জীবনের মৌলিক কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর-অন্বেষণ।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর

বিপ্লবীর জীবন দর্শন ২০৲

প্রখ্যাত বিপ্লবীর স্মৃতি-চারণে বিপ্লবান্দোলনের বহু অকথিত ও অপ্রকাশিত ঘটনা-বিন্যাস।

দৃষ্টিহীনের উপন্যাস

মঞ্চ ১০৲

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অভয়ারণ্য [illegible]

নিখিলচন্দ্র সরকারের

সুজনে নির্জনে ১২৲

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০৲

নটরাজনের

থানার মাটি নোনা ১৬৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পূর্ব পুরুষ

১ম খণ্ড ৮৲ ২য় খণ্ড ১২৲

চিরঞ্জীব-এর

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫৲

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩
ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

MG পাখা
MG
সারাজীবন সাথী
হবে তৈরী করা
এমনি ভাবে
নিশ্চিন্তে কেনা যায়
খুব কম খরচে চলে
ঘর জুড়ে হাওয়া দেয়
প্রয়োজনে 'এম জি' মেকানিক
সাথে সাথে হাজির হয়।
প্রস্তুতকারক ঃ মেটকোগ্রুপ ইঞ্জিনীয়ার্স প্রাঃ লিঃ
২৩৫/২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২, ফোন : ৩৪-৫৭৩১ ও ৩৪-৯৯৫৮

শুক্রবার, ৪ চৈত্র, ১৩৮৩ ।

Friday, 18th March, 1977

১৬ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা ।

আজকের সূচী

সম্পাদকীয়	৪	
কবিতায় একটি বিকেল	৫	নিশীথ ভড়
রাম বসুর কবিতা	৬	
কবি পরিচিতি	৭	অমিতাভ দাশগুপ্ত
সমালোচনা	৭	
সাহিত্য : বাংলা নাটকে জোতদার	১০	বৈকুণ্ঠ পাঠক
চিঠিপত্র	১২	
আমাদের নদী	১৫	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
গঙ্গা থেকে আদি গঙ্গা	২০	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
কোন বাগানের আপেল (গল্প)	২৩	সুধাংশু ঘোষ
নর্তকী (গল্প)	৩১	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভোট সাহিত্য	৩৭	অমিতাভ চক্রবর্তী
নারী : নির্যাতনী অভিযান	৩৮	সোম দত্ত
অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন	৩৯	পদ্মা দে
খোজাকাহিনী	৪৬	নারায়ণ দত্ত
বাবু বিলাস (উপন্যাস)	৪৯	প্রবীণ বর্ধন
আপনগন্ধা (উপন্যাস)	৫২	দীপালী দত্তরায়
মহেঞ্জোদাড়ো দুর্গের নিচে বৌদ্ধস্তূপ	৫৩	সুধাংশুকুমার রায়
পার্সিপোলিসের পথে	৫৭	সুমিতা ঘোষ
বিশ্বনাথ কি যোগী হবেন ?	৫৯	দীপক সাহা
খেলাধুলো	৬০	দর্শক
নাচ গান বাজনা	৬১	কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়
জীবনের কাছাকাছি : সত্যানন্দ	৬২	প্রভাত চৌধুরী
কবি ও অভিনেতার চোখে নরক গুলজার	৬৩	

প্রচ্ছদ
ও অঙ্গসজ্জা
সুবোধ দাশগুপ্ত

আগামী সংখ্যায়

আগামী সংখ্যা থেকে
শুরু হচ্ছে
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস

বনবিবি উপাখ্যান

গল্প লিখেছেন
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
প্রদীপ আচার্য

কবিতা লিখেছেন
মানস রায় চৌধুরী

বাংলাদেশের সাহিত্য পত্রিকা
প্রসঙ্গে দাউদ হায়দার

ঋত্বিক ঘটকের নাগরিক
ছবি প্রসঙ্গে
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

লেখক শব্দের প্রভু
লিখেছেন
অমলেন্দু বসু

সুদীর্ঘ প্রচ্ছদ কাহিনী

খুদে শহর হজম করেই কলকাতা

লিখেছেন
গৌতম ঘোষ

বই নিয়ে

কিছুক্ষণ

রাজনীতি মানুষের আজ শতকরা নিরানব্বুই ভাগ সময় গ্রাস করে বসেছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কেননা আমাদের বাস্তব জীবনের প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতির মারফৎ। কিন্তু আজকের এই প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত মার্কা দিনেও যখন শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখা যায় মানুষকে, তখন বেশ একটু গরিমা বোধ করতে ইচ্ছা হয় বৈকি।

লেখাপড়া এবং বই পড়ার বিষয়ে ওয়াকিবহাল যাঁরা সকলেই তাঁরা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন, কলকাতায় একটি বইয়ের মেলা বসেছিল গত সপ্তাহে। এটি ছিল দ্বিতীয় বছরের মেলা। আয়োজনের দিক থেকে বৃহত্তর, পড়ুয়া মহলে প্রচারের দিক থেকে এখন পর্যন্ত বৃহত্তম। কাজেই, স্বীকার করতে হবে উদ্যোক্তাদের একটা উদ্দেশ্য অন্তত সিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বাণিজ্যিক সাফল্য কী পরিমাণে হয়েছে সেটার হদিস পেতে নিশ্চয়ই কিছুটা সময় লাগবে। ইতিমধ্যে অনায়াসে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যেতে পারে।

একথা সকলেই জানেন, বইপত্র বিক্রির প্রসারের জন্যে প্রথমেই দরকার সর্বজনীন সাক্ষরতা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, নিরক্ষরতার সমস্যাটির বিষয়ে আলোচনা ও সেমিনার ইত্যাদি যে পরিমাণে বেড়েছে, সাক্ষরতা সে অনুপাতে বাড়েনি। তাছাড়া একালের এই ঊর্ধ্বশ্বাস এবং সঞ্চয়হীন জীবনযাত্রাও বই কেনা ও বই পড়ার পক্ষে কতোটা অনুকূল সেটা ভেবে দেখার বিষয়।

একালে বইয়ের দাম বাজারের আর দশটা পণ্যসামগ্রীর মতোই চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে। সেজন্যে বিজ্ঞাপনের আকর্ষণে এবং মনোলোভা মলাটের টানে বইয়ের দিকে হাত বাড়ালেও, টাইটেল পাতা উল্টে দামের অংক দেখেই বহু ক্রেতা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো হাত সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। প্রকাশকরা অবশ্য কাগজের দাম এবং ছাপা ও বাঁধাইয়ের খরচের দোহাই দিয়ে থাকেন। কিন্তু এক্ষেত্রে 'জনতাকাপড়ে'র মতো 'জনতা সংস্করণ' বার করা যায় কিনা সেটাও ভেবে দেখা যেতে পারে।

কেননা এ তো পরীক্ষিত সত্য যে, ইংরাজি পেপার ব্যাক বই (এবং বেশ কিছুকাল ধরে হিন্দি বইও) অজস্র সংখ্যায় বিক্রি হয় বাজারে। বাংলা বইয়ের বেলায় একজন কি দুজন প্রকাশক ছাড়া আর কেউ এগিয়ে আসছেন না এখনো। কেন? সেটা কি লেখকদের আপত্তির জন্যে—যাতে বেশি দামের বইয়ের দরুন বেশি হারে রয়ালটি নষ্ট না হয়? অথবা সেকি প্রকাশকেরই বাণিজ্য-বুদ্ধির জন্যে?

কারণ যাই হোক, ফলে কিন্তু যা দাঁড়ায় তাকে সাদা বাংলায় বলা যায়, পাঠক বিতাড়ন।

দ্বিতীয়ত, প্রকাশকের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, ভালো লেখকের সংখ্যা সে অনুপাতে বাড়ছে না। তাই বাজে লেখকের বাজে বই ক্রমাগত ছেপে বার করা হচ্ছে এবং সেই কারণে সত্যিকারের পড়ুয়া মহলে পুস্তক-অনীহা দেখা দিচ্ছে। অবশ্য স্ট্যাটিসটিক্স দিয়ে এটা প্রমাণ করা সহজ যে বইয়ের বিক্রি যথেষ্টই বেড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সে বৃদ্ধি কি সেই হারে হচ্ছে যে হারে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল ফাইনাল পাশ করা যুবকের সংখ্যা বাড়ছে। তর্ক উঠতে পারে, স্কুল ফাইনাল পাশ করলেই বই কেনার আর্থিক সঙ্গতি আসে না। কিন্তু যদি তা না-ই আসে তবে সিনেমা দেখার উৎসাহ আসে কী করে?

অর্থাৎ মাসে চার সপ্তাহ ধরে বাজে সিনেমা দেখে যে আনন্দ পায় বাঙালি 'শিক্ষিত' যুবক, আজকের বাংলা বই থেকে তার চার ভাগের এক ভাগ আনন্দও পায় না, এবং মাসে একখানা বই কিনতেও উৎসাহ পায় না।

কঠিন সমস্যা।

কবিতার একটি বিকেল

রামায়ণ রচনার পর তার প্রচার বিষয়ে বাল্মীকি মনোযোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য সে সময়টা ছিলো অন্য। কাব্য ছিলো লোক-শিক্ষার মত্তো গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। আজকের অভিমানী বাংলাকর্মীরা তাঁদের আমলকীবিহীন করুজলের কথা ঘোষণা করতে লজ্জিত নন, বরং দাবী করেন কবিতা তার গৌরবের ভূমিকা থেকে নেমে আসুক সব সময়ের সবরকম উত্তেজনা উন্মাদনা অস্থিরতায়। জীবন যাপনের সমস্ত রকম দ্বন্দ্ব ও ভুলগুলি আহত করুক তাকে। অন্যদিক থেকে যতোই নির্জনতম হোক না কবিতা শিল্প, তার মুক্ত হবার বাসনা থেকেই যাচ্ছে। আর তাই একদিন কবিতাকে পথের মোড়ে মোড়ে নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন অরুণকুমার সরকার প্রমুখ কয়েকজন। চলমান শিল্পের উপাদানে অতটা করেন নি। পন্থা হিসেবে তাঁরা বেছে নিয়েছেন 'সুরের' মধ্যম-কে।

টিপ টিপ বৃষ্টির পর, ৬ই মার্চ, বেলা ৪টে ১৫-য় মনোহর দাস তড়াগের পাশে আরম্ভ হলো গ্যালারী 'এ'-র এ-মাসের দ্বিতীয় অধিবেশন—ষাটের কবি সম্মেলন। উল্লেখযোগ্য অনেকেই ছিলেন, উল্লেখযোগ্য আরও অনেকে আসতে পারেন নি, এই সমগ্র উপস্থিতি অনুপস্থিতি মিলিয়ে-মিশিয়েই সেদিন কবিতার আসর। প্রযোজক দেবী রায় দেবকুমার বসুকে অনুরোধ জানালেন অনুষ্ঠানটি পরিচালনার। শ্রোতা ছিলেন তরুণ ও তরুণী, বৃদ্ধ ও কিশোর, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান অনেকেই।

আবাহনের আরম্ভে দোলোৎসবের একটু ছোঁয়া দেওয়া হলো। সুতনুকা বাগচী সবার কপালে আবীরের ফোঁটা দিলেন। শংকর দে-র 'একজন মানুষ, দেখো, সামান্য পোষাকে হেঁটে যাচ্ছেন'—দিয়ে সূচিত হলো অনুষ্ঠান।

যাঁর কবিতার বইয়ে ছিলো আশ্চর্য প্রচ্ছদ, সেই কমল তরফদারের পড়ার পর জেল থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া শম্ভু রক্ষিতকে দেখতে পেলাম অনেক দিন বাদে। 'আর সে রব তুলছে জাতীয় ঐক্যের, গণতন্ত্রের—কিন্তু দেশটাতে যুদ্ধকালীন অবস্থার সৃষ্টি করছে...' জানিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর 'রচনার অগ্নি' স্পর্শ করছিলো অনেককে। এরপর সজল বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন সুর, এরপর সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন সুর, মৃণাল বসুচৌধুরী এবং রত্নেশ্বর হাজরার কবিতা পড়া হলে আসরকে আরেকটি মাত্রা দেওয়ার জন্যই স্বপন সোম ও সুতনুকা গান ধরলেন 'ঝরঝর ঝরঝর ঝরে রঙের ঝরনা'।

এরপর ছিলো আলোচনা। কথোপকথনের সময়, এমনকি গভীর, জটিল বিষয় নিয়ে কথোপকথনের সময় আমি লক্ষ্য করেছি, আমার উক্তি কখনো ভ্রান্ত হয় না।' এই কিছুদিন আগেই লিখেছেন আলোক সরকার। ধরে নেওয়া যেতে পারে সেদিনের আলোচনা ছিল

বিজয়া কবিতা পড়ছেন

তাঁরই স্বভাবানুগ, দায়িত্ববান। 'কবিপত্র' 'ক্রান্তদর্শী' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে ষাট দশক কবিতাকে একটা বড় জায়গায় পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছে। এঁদের কবিত্ব আছে, কবিত্বহীনতাও আছে। আছে আবেগময় লেখা ও আবেগবিহীন রচনাপুঞ্জ। বড়ো বিষয় বড়ো ভাবনা নিয়ে লেখা কবিতার পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিষয়হীন কবিতা। পঞ্চাশের কবিতাকে দু-তিনটি ভাগ করলে হয়তো ধরতে পারা যায় তার চরিত্র। কিন্তু ষাটের দশকে এমন কোনো ভাগাভাগি চলে না। বিচিত্র ও বিভিন্ন কাব্যচর্চার একটা ঐকতান বেজে উঠছে ষাটের কবিতায়। এই কবিদের কয়েকজন পরবর্তীকালে নিশ্চিত শ্রদ্ধেয় হবেন। এসব কথার অনেকটাই গ্রহণযোগ্য, কিছু বা বিতর্কসাপেক্ষ।

সভা তাই থেমে থাকে নি ওখানে। ঠাকুরের থানে পয়সা ছোঁড়ার মত পয়সা ছুঁড়ে চা খাবার চাঁদা তোলা হলো।

ভাঙা সভা আবার জমে উঠেছে বাসুদেব দেব, শান্তনু দাস, গৌতম গুহ, সামসুল হক, রাণা চট্টোপাধ্যায় এবং কালীকৃষ্ণ গুহের কবিতা পাঠে। সন্ধ্যের মুখে মোমবাতি জ্বালাতে হলো, তবু বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ার সময় কে যেন বলে উঠলেন 'আলো করে নিন।' বিজয়ার সপ্রতিভ উত্তর 'আলো করে নেব! ক্ষমতা আছে?' আরও বললেন তিনি 'তারপরে সব শ্মশানযাত্রীরা সব বাড়ি যান।'

কিন্তু বাড়ি যাওয়া হয়ে উঠল কই। তুলসী মুখোপাধ্যায়, মতি মুখোপাধ্যায় ও অনুষ্ঠানের শেষতম কবি দেবী রায়ের কবিতা এখনও শোনা হয়নি। তাও এক সময় শেষ হলো, যদিও অনুষ্ঠানের শেষ হতে তখনও কিছু বাকী।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কবিতা পড়েন নি। ভাস্কর চক্রবর্তী আর পবিত্র মুখোপাধ্যায় আসেন নি। মানস রায়চৌধুরী এসেছিলেন, আলোচনায় যোগ দেন নি। আসতে পারেন নি উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' সত্যি সত্যিই 'বিভিন্ন কোরাস' হয়ে উঠলো তখন। সে আগুন নানাজনের প্রাণে নানাখানা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চিত। সন্ধ্যে পেরিয়ে অন্ধকার, ট্রামের আওয়াজ ও লোকায়ত সংস্কৃতির ঢোল-করতাল চর্চা চমৎকার আবহ তৈরী করেছিলো। পর্দানটি 'আকাশ-ভরা সূর্য তারা' মাঝপথে থামিয়ে কবি-শিল্পীরা এবার শূন্য চাতালটি তুলে দিলেন আগের গানের একটি পংক্তির কাছে। যেতে যেতে দেখলাম সারা রাত ফোটাক তারা 'নব নব' শাসন করছে গ্যালারী 'এ'।

নিশীথ ভড়

রাম বসুর কবিতা

শৃঙ্খলিত সাধক

ভোর হল পাখির কান্নায়
নিজের সত্তাকে খুঁজে না পেয়ে ধ্রুবতারা ডুবে গেল
দিনের আলোর বিবর্ণ মসৃণতায়
কেবল উলঙ্গ দীর্ঘশ্বাসগুলো আমাদের নাম ধরে ডাকছিল
পৃথিবীর শেষতম প্রান্ত থেকে
ভালবাসার কাতরতায় মার খাওয়া হরিণীর মতো

আমরা সাড়া দিতে পারিনি

ভাঙা সোপানের শেষ ধাপে আমরা, শৃঙ্খলিত সাধক
নক্ষত্রের বর্ণমালা পাঠ করবো বলে বসেছিলাম
আর পাথরের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে থাকা সুগন্ধি
বুকে চোখে মাখছিলাম অপরিমিতের স্বাদ পাবো বলে
জোয়ারের ধাক্কায় দেহের কাঠামো বেঁকে গেলেও
এগিয়ে যেতে পারিনি এক পা-ও

সেই থেকে সঙ্গছাড়া, সেই থেকে নির্বাসিত আমরা

সেই থেকে জলরাশি ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে ঋতুচক্রের গোলাপ
প্রবাল পাহাড়ের ঘাড় ধরে উপড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ধাতব নৈঃশব্দ্য
দস্যুর মতো হানা দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করছে নক্ষত্রের সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য
লবণাক্ত নখে আকাশ ফালা ফালা করে মুখ ডুবিয়ে দেখছে
আমরা আছি কি না
পরক্ষণেই বিপুল কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠছে বালিতে মুখ গুঁজে
গুহার পাথরের মায়াবী দর্পণে আমাদের মুখ দেখবে বলে
পা ছড়িয়ে চুল এলিয়ে বসেছে অমাবস্যার স্তব্ধতায়

আমরা সব দেখি তবু সাড়া দিতে পারি না
আমরা শৃঙ্খলিত সাধক।

সবটা নিষ্ফলা নয়

সবটা নিষ্ফলা নয়
জল ছিল, শস্য ছিল কিছু
উদ্ধত ঘোড়ার ডাকে রোমাঞ্চিত দেহগুলি ছিল
তাই তার আনন্দের বিস্ফারিত কান্তি
জন্মায় আমার বুকে
নক্ষত্রের মাটি পেয়ে স্থির

তাইতো সমস্ত ক্ষত হল আজ অঙ্গের তিলক
রূপকার স্তব্ধ নত সমাধির সৌন্দর্যের পাশে
চোখের পাতার নিচে তিক্ততার ফলার নগ্নতা
অনাবৃত করে মন, যে মনের নিচে কাজ করে
প্রবালপুঞ্জের মধ্যে আরও এক উদ্ভাসিত মন
রূপময় বোধের জগৎ

খামচিয়ে তুলে আনি সমুদ্রের নীল
শিকড়ের সমৃদ্ধ নৈঃশব্দে স্নান করে
মুছে যাওয়া চিত্রপট আঁকি ফের শিশুর বিস্ময়ে
রক্ত ও চন্দনে লিপ্ত শ্বেতপদ্ম রাখি তার মূলে

সবটা নিষ্ফলা নয়
শস্য আছে, জলও আছে কিছু
যদিও তা আয়নায় ধরে না।

জবান কবুল

নেইরে নেই অতটা পুঁজি
আছি ছিঁড়ে-জুড়ে, খাড়াটি গুঁজি
ঘৃণা যে করবো—তার দাম চড়া
নদীতে ভাসাবে পচে-ঢোল মড়া
ভাল যে বাসবো কোথায় সে মন
তারও দাম জানা একটা জীবন।

রাম বসু

জন্ম : ১৯২৫
পেশা : সরকারি চাকরি

কবিতা লেখার বয়স অনেক দিন হল রাম বসু-র। চল্লিশের গনগনে দিনগুলিতে বেশ বেপরোয়া ভাবে লেখালেখি শুরু করেছিলেন, শুধু স্মরণীয় কবিতা নয়, পরপর উপহার দিয়েছিলেন কয়েকটি সম্পন্ন কাব্যনাট্য। মানুষ ও সংঘের ওপর তর্কাতীত বিশ্বাসে এগিয়ে গিয়েছিলেন অনেকখানি। বিশ্বাস করতেন, এখনো করেন—রাজনীতি-বিহীন তার সাহিত্য হয় না। গাঁ-গঞ্জ, অবাধ প্রকৃতি গমগম করে কথা বলে উঠত তাঁর কবিতায়। মিনমিনে, হালকা লেখার জন্মশত্রু রাম বসু, আস্থা রেখেছিলেন, আজও রাখেন কবিতার ক্লাসিক্যাল আঁটোসাঁটো গঠনে। তাঁর কবিতার শব্দমালা কখনোই পদাতিক ছিল না, ছিল অশ্বারোহী। এমনকি একান্ত তাৎক্ষণিক ঘটনাকেও কবিতায় বেঁধে ফেলার যাদু ছিল তাঁর মুঠোয়।

এখন রাম বসু-র চুলে রুপোলি ছোঁয়া কায়েম হয়েছে। শুধু বয়সে নয়, কবিতাতেও সতর্ক, সন্দিগ্ধ, বিষণ্ন হয়ে উঠছেন ক্রমশ। সবকিছু আপ্তবচনকে আর বিশ্বাস করার জন্য মুখিয়ে নেই তিনি, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার তিক্ত ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তুলতে চাইছেন সময় ও শিল্পকে। সারল্য বা একমাত্রিকতার জায়গায় তাঁর একালে লেখা কবিতাগুলিতে আসছে জটিলতা, যা তাঁর আগের চেহারার ফ্রেমকে অধীর হাতে ভেঙে ফেলছে। আশা ও আশাভঙ্গের সমান্তরাল টানে এখন অনিবার্য ভাবে ভেসে চলেছেন তিনি। কোথায়? তার উত্তর জেনে গেলে আর কবিতা লেখা যায় না।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কবিতা টাইপের চরিত্র

অতীনের গল্পে ভয়ংকর

সমালোচনা

অতীনের গল্প বড় বেশী লিরিক্যাল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

যেকোন সৃষ্টিধর্মী লেখকই সারাজীবন ধরে তাঁর পেছনের রাস্তাটির সন্ধান করে যান। অর্থাৎ এই পেছনের রাস্তাটির অনুসন্ধানই তাকে একটু একটু করে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে। অতীনও খুঁজেছেন এইরকমই একটি রাস্তা—যে রাস্তা ধরে বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন তাঁর পিতার হাত ধরে চলে এসেছিলেন কলকাতায়—সেই রাস্তা ধরে অতীনকেও একদিন চলে আসতে হয় তাঁর বাবার সঙ্গে সঙ্গে এক বৃহত্তর নগরীতে আশ্রয়ের সন্ধানে। সামান্য এক আশ্রয় তিনি পেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সারাজীবন ধরে এখনো পর্যন্ত সেই রাস্তাটিই তাকে অনুসরণ করে চলেছে। রাস্তাটির যন্ত্রণা, দুঃখবোধ আর গ্লানি বারবারই তাকে অস্থির করে তুলেছে। তাই অতীনের অধিকাংশ গল্পই কোন না কোনভাবে একটি যাত্রার গল্প।

রামায়ণী প্রকাশভবনের চতুর্থ গল্পসংকলন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একালের বাংলা গল্প।

মোট উনিশটি নানাজাতের গল্প নিয়ে এই সংকলন। যদি চরিত্র হিসেবে গল্পগুলোকে আলাদা করে নেয়া যায় তাহলে দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি গল্পের কেন্দ্রভূমিতেই ঋজু বনস্পতির মত দাঁড়িয়ে আছেন অতীন। তাই নাম বাদ দিলেও পড়তে পড়তেই কিন্তু ধরে ফেলা যায়—হ্যাঁ এগুলো অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প। আসলে তাঁর একটা নিজস্ব স্টাইল আছে, তাঁর গল্পে একটা আলাদা—একেবারে অন্যরকম শুরু আছে, তার উপর তাঁর গল্পের চরিত্ররা উঠে আসে নিজস্ব পরিমণ্ডল থেকে—সেজন্যই গল্পগুলো পড়তে গিয়ে অতীনকে আবিষ্কার করতে দেরী হয় না।

সংকলনের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলোর মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে 'গ্রেট ক্যালকাটা শো' 'রাজা গোপালের আত্মচরিত', 'কাফের', 'কালের যাত্রা রূপক মাত্র', 'নরকে আগমন' কিংবা 'শাদা অ্যাম্বুলেন্স'।

'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'শাদা অ্যাম্বুলেন্স' গল্পটি অনেকের নজরে পড়েছিল। ধনীর গৃহের এক বিশ্বাসী ভৃত্যের গায়ে বসন্তের গুটি উঠেছে। কিন্তু ভৃত্যটি প্রথমে জানতে পারেনি, যখন জানল তখন থেকেই সে ভীতসন্ত্রস্ত; ভয়টা তার হুহু করে বেড়ে গেল—কেননা সে তো জানত মনিবের বাড়িতে তা ধরা পড়লেই তার চাকরী যাবে এবং তাকে বের করে দেয়া হবে বাড়ির বাইরে। ভয়ে ভয়ে ভৃত্যটি প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু এড়ালে কি হবে ধরা তো পড়বেই। পড়লও তাই। আর ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাই ভৃত্যটিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। ভৃত্যটির ভয়, মনিবের প্রতি [illegible] এবং বড়বাড়ির

[illegible] চইদের চরিত্র অতীনের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্তত যে সময়ে দাঁড়িয়ে একদল তারস্বরে চিৎকার করছে—কিছুই হচ্ছে না, আমাদের সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিপর্যয়ের কথা কেউ তেমন বিশ্বাসী হয়ে লিখতে পারছে না তখন কিন্তু অতীনেরে হাত থেকেই বেরিয়েছিল এই গল্পটি—যেখানে তিনি আমাদের সামাজিক অবস্থানকে চেনাতে ভুল করেননি।

'গ্রেট ক্যালকাটা শো'-এ অবিনাশের হাত ধরে পুত্র বকুল শহরে চলে আসে। কিন্তু শহরের সমস্তরকম গ্লানি আর নিষ্ঠুরতা আস্তে আস্তে এমনভাবে পুত্রের সুকুমার মনকে বিষাক্ত করে দিল যে বকুল শেষপর্যন্ত অবিনাশের প্রতিই অবিশ্বাসী হয়ে উঠল। গল্পের শেষের দিকে বকুল যখন অবিশ্বাসের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে গেছে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুততায় যখন সে ছোট্ট পায়ে এই শহর ছেড়ে পালাচ্ছে, তখন গল্প শেষ করতে গিয়ে অতীন একটি সুন্দর লাইন বসিয়েছেন 'কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মশাই এই পথে পিতার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন।'

[illegible] আলোচনা

১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'প্রবাসী'তে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' বইখানি এইভাবে সমালোচিত হয়েছিল্ঃ

এই বহিখানি কৌতুকাবহ মামুলি উপন্যাস নয়, নায়কের খচিত কথা। এই ধরণের গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখিয়াছি—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিত্রবহা'। বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী'তে বালক অপুর যে জীবনকাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন 'অপরাজিত' তাহারই অনুবৃত্তি। অপু এখন বড় হইয়াছে, কিন্তু স্বভাবগত বালকত্ব ঘুচিবার নয়। তাই তাহার প্রেমে যৌবনসুলভ আবেগ দেখিতে পাই না। তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষোভ নাই কারণ প্রেমই কথাসাহিত্যের একমাত্র উপকরণ নয়। গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে যে ভোজ্য বিতরণ করিয়াছেন তাহা নিরামিষ, কিন্তু বিচিত্র ও পরম উপাদেয়। এই স্নিগ্ধ অনাবিল রচনা পাঠে মন পরিতৃপ্ত হয়। লেখকের নিসর্গ-চিত্রণ চমৎকার। মধ্যপ্রদেশের শীতকান্ত অরণ্যের বর্ণনা তুলনা নাই।

রাজশেখর বসু

'কালের যাত্রা রূপকমাত্র'—এক নিদারুণ অসুখ আর অস্বস্তিকর গল্প। এই অস্বস্তি অস্তিত্বের সংকট থেকে এসেছে। পড়তে গেলে যদিও পাঠককে ভীষণ মরীয়া করে দেয়, তবু বলব এই অসুখ আর অস্বস্তির জগৎ থেকে এখানেও বেরিয়ে যাবার জন্য অতীন একটা অন্য সুন্দর জগতের কথা শুনিয়েছেন। এই জগতটা কোথায় আমাদের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না। 'কাফের' দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা একটি দুঃসাহসিক গল্প। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে পরাণ এবং হাসিম এই গল্পের দুটি উজ্জ্বলচরিত্র।

'রাজা গোপালের আত্মচরিত' কিংবা 'নরকে আগমন' গল্পে নড়বড়ে সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চরিত্রগুলোকে উলঙ্গ করে দেখাবার এক অসামান্য প্রচেষ্টাই সার্থকতর হয়ে উঠেছে।

এই গল্পগুলো ছাড়াও এই সংকলনে অতীনের আরও অনেক ভাল গল্প আছে—'রাজার টুপি', 'নির্জনে বসো একা', 'মানিকলালের জীবনচরিত', 'যথাযথ মৃত্যু' অথবা 'কঠিন হৃদয়', ইত্যাদি। কিন্তু যে কথা অতীন সম্পর্কে মনে হয় যে কোন কোন গল্পে গল্পের আসল বিষয় ছেড়ে বড় বেশী লিরিক্যাল হয়ে ওঠেন—যে লিরিক হয়ত গল্পকে অন্তর্মুখী হয়ে উঠতে ক্ষতি করে। তবে পাশাপাশি আবার একথাও ঠিক—কোন জটিলতা নয়, অকারণ ফর্মের মারপ্যাঁচও নয়, শুধুই সহজ সরল করে ছোটগল্পের আসল বক্তব্যটিই তার গল্পের ভেতরে এক অসামান্য দক্ষতায় তুলে আনেন অতীন—এখানেই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

শচীন দাশ

একালের বাংলা গল্প। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। রামায়ণী প্রকাশ ভবন। ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা—৯। দাম ষোলো টাকা।

প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়

যাঁরা লেখক অথবা অন্য ধরনের ইতিহাসবেত্তা, যাঁরা দেশের প্রাচীনতাকে সত্যিই চিনতে চান—এই দুই ধরনের মানুষের দরকার পড়ে যে ইতিহাসের, তা রাজারাজড়ার ইতিহাস নয়। ভূমিকা লেখক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যেতে পারে, তা হলো সংস্কৃতির ইতিহাস। এই বইটিতে সেই ইতিহাস আছে, যা পথকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই বই যদি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয়ে যাবার রাস্তা-চেনানো মাত্র হতো, একে টুরিস্ট গাইড বলা যেতো অসংকোচে। বইটা তার থেকে বেশি কিছু। ধরা যাক, আজকের ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর কোনো কবি হঠাৎ নিজের স্বচ্ছেই আদিষ্ট হয়ে, অতীত-বর্তমানে ধরা ভারতীয়তার অনুষঙ্গে নিজের কল্পনাকে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন। সে সময়, তথ্য ও ইতিহাস না থাকলে, তাঁর নির্ভর হয়ে পড়বে লোকশ্রুতি আর পৌরাণিকতা—যা সব সময় তাঁকে সুফল দেবে না। কারণ, তাঁর কল্পনার চার পাশে একটি বিশ্বাস্যতার বেষ্টনী দরকার। এই হিসেবে, এই গ্রন্থটি একটি 'ইমাজিনেশন গাইড'। বহু সংখ্যক ইংরাজি ভ্রমণবৃত্তান্ত দলিল-দস্তাবেজ ঘাটবার শ্রমস্বীকার লেখক নিজে করে, অন্যান্য লেখকদের পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অতীত যুগ ভারতবর্ষের পথচ্ছবি তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য ছিল; সিন্ধু সময়ের পথ থেকে [illegible] পথের বিবরণে তিনি এসেছেন। এখানে তাঁর সাফল্য মাত্র এটুকুই নয় যে এই ধরনের বইয়ের—এই বিষয়ের প্রথম বাঙালি লেখক তিনি হতে পেরেছেন। এর সঙ্গে তাঁর শ্রম, আমাদের মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ করেছে।

এমন বই কম দামের কাগজে কেন ছাপা হল সে নিয়ে অভিযোগ না হয় না-ই করা গেল, কিন্তু প্রচ্ছদ অনেক ভাল হতে পারত এবং, তথ্যবহুল দীর্ঘ লেখা কাজ-চালানো স্মলপাইকায় পাঠকের চোখে কোন রিলিফ দেয় না। লেখকের প্রতি আমাদের আর একটি আবেদন আছে। সাধু ক্রিয়াপদ এই বইয়ের ভাষার পক্ষে অনাবশ্যক বলেই, গ্রন্থকারের লক্ষ্য পাঠকসংযোগে তা মাঝে মাঝেই বিচ্ছিন্নতার বিড়ম্বনা ঘটিয়েছে। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিকতার স্বাদ অনেক বেশি পাওয়া যেত যদি এই তথ্য-ভাষা থাকত চলচ্চিত্রময় চলিত ক্রিয়াপদের কাঠামোয়। আশা করছি যে ভবিষ্যৎ-সংস্করণে এই সামান্য অসতর্কতার লেশমাত্রও থাকবে না।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। প্রকাশক—ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়, দাম [illegible]।

জার্ণাল সত্তর

জর্নাল সত্তর। তৃতীয় বর্ষ। সপ্তম সংকলন
সম্পাদক : শামসের আনোয়ার। সমর তালুকদার
৯৫ সার্কাস রো, কলকাতা-১৭, দাম চার টাকা।

কমলকুমার মজুমদারের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে লেখা একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস জর্নাল সত্তরের চলতি সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ। বলতে দ্বিধা নেই শ্রীমজুমদার তাঁর উপন্যাসে নিজস্ব রচনারীতি এবং প্রয়োগ-কৌশল পূর্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ব্যবহার করেছেন—এবং সার্থকও হয়েছেন। যাঁরা তাঁর পাঠক, উপন্যাসটি সম্ভবতঃ তাঁদের ভালো লাগবে।

কিছু ভালো কবিতা আছে 'জর্নাল সত্তর'-এ, যা থেকে ভালো লাগল। সমস্যাটি জ্যান্তো এবং বোধহয় কিছুটা অপ্রতিরোধ্য। 'তাঁরা যেন ভুলে না যান, তাঁদের জন্য আছে, হয়তো স্বল্প সংখ্যক, কিন্তু প্রকৃত পাঠক, যারা বিশ্বাস হারালে, বাংলা কবিতা কোনদিনই আর মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়াতে পারবে না'—সাবধানবাণীটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

কিছু ভালো কবিতা আছে 'জর্নাল সত্তর'-এ, যা থেকে কিছু কিছু উজ্জ্বল পংক্তি তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতায়, 'রেনগান শব্দ করে সন্ধ্যার বাতাসে এ পৃথিবীতে এখনো ধর্মের মতো সুগন্ধ রয়ে গেছে।' কিংবা 'গোলার্ধ বদল করে যে পাখি এসেছে। তাকে বলো গ্রীষ্ম এসে গেছে'। সে এখনই ফিরে যেতে পারে। দেবাশিস বন্দোপাধ্যায়ের কবিতার পুটিকয়েক লাইন মুহূর্তে মনে আসে, 'তো তো করে হেসে ওঠে মোটর গাড়ির ড্যাস বোর্ড', নিস্তব্ধ সুইচ আর কাউন্টার/বেয়ারা হাসে না হাসেন অফিসার/হাসতে হাসতে কান্নায় ফেটে পড়ার আনন্দ যে কী ওরা/আজো তেমনভাবে কেউ জানতেও পারল না।

এদের কবিতা ছাড়াও বিজয় সান্যাল, রত্ন চক্রবর্তী, গৌতম চক্রবর্তী, গৌতম চৌধুরী এবং সমর রায়চৌধুরীর কবিতা ভালো লাগল। পরিচ্ছন্ন পত্রিকাটিতে কিছু অপ্রত্যাশিত মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়ল। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে যত্ন নেওয়া দরকার।

দিগম্বর দিকপতি

মজলিসী ঠুংরী

শম্ভুনাথ ঘোষের 'মজলিসী ঠুংরী' বইটি প্রধানত ছাত্রছাত্রীদের জন্য লেখা। মোট ৫৬ পাতার বইতে ১০ পাতা 'গীতের সংজ্ঞা' 'রাগ পরিচয়' ও 'তাল পরিচয়'-এর স্বল্প বিবরণ আছে। বাকী ১১ থেকে ৫৬ পাতায় ঠুংরী, টপ্পা ও কাজরী গানের বাণী, তালের নাম ও স্বরলিপি আছে। শম্ভুনাথ ঘোষ মহাশয় ঠুংরী, টপ্পা ও কাজরী গানের পরিচয় খুব সংক্ষেপে করেছেন। ঠুংরী গানের বৈশিষ্ট্য বলতে উনি যে ১১টি বিষয় বলেছেন, সেগুলোর অনেকগুলোই, 'মিলিয়ে' একটি করে দেওয়া যায়। যেমন, পাঁচ নম্বরে উনি বলছেন, 'এই গানে ব্যঞ্জনা ও উচ্ছলতার প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটে'—এই বিশিষ্টতা আর ছ' নম্বরের 'অফুরন্ত গতির স্বাধীনতা' কী গুণগতভাবে আলাদা? টপ্পা গানেও কাজ আছে, ঠুংরীতেও কাজ আছে—টপ্পার অলংকরণের থেকে ঠুংরীর অলঙ্করণের কী তফাত, সেটা শম্ভুবাবু দেখালে ভালো করতেন।

টপ্পা ঠুংরী ও কাজরী গানের যেসব উদাহরণ কথা ও স্বরলিপি সহ আছে, ছাত্রছাত্রীদের সেসব নিশ্চয়ই কাজে লাগবে। তাল-পরিচয়ও তালের মাত্রা বুঝতে সাহায্য করবে। তবে, টপ্পা-ঠুংরী রবীন্দ্রসংগীতের মতো সহজে স্বরলিপি থেকে পুরো মেজাজ দিয়ে তোলা মুশকিল। তাতে, টপ্পার ও ঠুংরীর কাজগুলো এক হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশী।

বইটিতে আর একটু ছাপার যত্ন নিলে ভালো হতো।

সিদ্ধার্থ রায়

মজলিসী ঠুংরী ।। শম্ভুনাথ ঘোষ। গান্ধার প্রকাশনী।
দাম : ছ'টাকা।

বই মেলা

কলকাতা বইমেলা '৭৭ উপলক্ষে গত ২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট এবং বাঙলা বইয়ের প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা গিল্ডের যৌথ উদ্যোগে ক্যালকাটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, ১নং শেকসপীয়র সরণীর অডিটোরিয়মে বাঙলা প্রকাশন নিয়ে একটি সুন্দর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল আগামী দশকে বাঙলা প্রকাশন কী রূপ নেবে এবং তা কি চরিত্র গ্রহণ করতে পারে ও সংশ্লিষ্ট কোন কোন ক্ষেত্রেই বা কী কী পরিবর্তন ঘটতে পারে সেটাই খতিয়ে দেখা এবং সেসম্পর্কে ভবিষ্যতের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আলোকপাত।

মোট তিনদিন ধরে এই আলোচনার প্রথমদিনেই মূলত বাঙলা বইয়ের প্রকাশ, বাঙলা প্রকাশনা, বই তৈরির জগৎ, বিপণন প্রথা এবং গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। বক্তারা প্রত্যেকেই তাদের লিখিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মতামত প্রকাশ করেন। পরে এই আলোচনার উপরেই নানারকম বিতর্ক ও পাল্টা আলোচনা জমে ওঠে। প্রথমদিনের বক্তারা ছিলেন চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীশকুমার কুণ্ডু, দীপেন মিত্র, অশোক ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু পালিত এবং সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

পরবর্তী দুদিনে যে সমস্ত বক্তা তাদের লিখিত বক্তব্যে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেন তাদের মধ্যে সত্যানন্দ প্রামাণিক, অরুণ মিত্র, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, বিনয় ঘোষ, অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং রঘুনাথ গোস্বামীর নাম উল্লেখ্য। মহাশ্বেতা দেবীর অনুপস্থিতিতে অবশ্য তার লিখিত বক্তব্যটি পড়ে শোনান শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যানন্দ প্রামাণিকের পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত রচনাটি নিয়ে বেশ বিতর্ক শুরু হয়। বিভিন্ন প্রকাশক এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের একজন অধিকর্তাও এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। নতুন পাঠ্যক্রমে পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের সামনে যে নানান অসুবিধে এবং সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে মোটামুটি তাই ছিল এই বিতর্কের মূল সূত্র। অবশ্য প্রথমেই শ্রীপ্রামাণিক তার নিবন্ধটির মধ্যে নতুন পাঠ্যক্রমের ফলে প্রকাশকদের নানা অসুবিধের কথাও আলোচনা করেছিলেন। পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত আলোচনা ছাড়াও অনুবাদ এবং অনুবাদের সমস্যা, উত্তম অনুবাদকের অভাব এবং তার অন্যান্য দিক নিয়েও আলোচনা হয়।

সুপ্রিয় সরকার আমাদের দেশের প্রকাশনার জগতে মার্কেটিং সিস্টেম এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার কিভাবে কতটা করা হয় তার উপরে আলোকপাত করেন।

বাঙলা প্রকাশন জগতের চেহারাটা যে ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে যাচ্ছে, অন্যান্য ভাষাভাষীর তুলনায় আগামী দশকে বাঙলা বইয়ের বাজার যে ক্রমশ অন্ধকার একটা ভাঙ্গনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—এই তিনদিনে সেসমস্ত সমস্যা নিয়েই আলোচনা চলে। অবশেষে বিভিন্ন মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাঙলা প্রকাশন জগতকে আগামী দশকে কতটা নতুনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে সেসম্পর্কেও এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের সর্বসম্মতিতে বিভিন্ন প্রস্তাব নেয়া হয়—যাতে বাঙলা প্রকাশন জগত আগামীকালে এক অন্ধকার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

বাংলা নাটকে জোতদার

ব্যপারটা শুরু হয়েছে অনেক দিন আগে। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে। নিষ্ঠুর ভূস্বামী। নিরুপায় চাষী। অত্যাচার। শোষণ। ইত্যাদি।

শুরু অবশ্য তারও অনেক আগে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভেতরেই ছিল এর বীজ।

তারপর দুশো বছর অতিক্রান্ত।

পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। কিন্তু ধারণা বদলায়নি।

স্বাধীনতার আগে রায়তের কথা। তারপর তারাশংকর-মানিকেও এ প্রসঙ্গ ভূরি-ভূরি।

স্বাধীনতার সমকালীন কিছু গল্প-উপন্যাসেও পুরাতন ভূতের ভূতকে দেখা যাচ্ছিল।

বিধানচন্দ্র রায় জমিদারী উচ্ছেদ (মধ্যস্বত্ব লোপ) আইন পাশ করেছেন—সেও তো অনেক দিন। গল্প উপন্যাসে জমিকে কেন্দ্র করে শোষক ও শোষিতের চেহারা প্রায় বিশ বছর হল আর পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি কয়েক বছর হল বাংলা নাটকে এই ভূতকে পরপর দেখতে পাচ্ছি। জমিকে কেন্দ্র করে নিরুপায় চাষীকে শোষণ আর তাই নিয়ে নাটক। হামেশাই চোখে পড়ছে। শাসক ও বিরোধী—দু তরফেই এখনো বলা হচ্ছে—জোতদারের শোষণ আমরা বন্ধ করবই।

উৎপল, অজিতেশের নাটকে ভূমিহীনের উপর ভূস্বামীর অত্যাচার দেখেছি। কল-কাতা-র ক্যাডারদের মুখে শুনেছি—জোতদারের কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও। গুঁড়িয়ে দাও। ইত্যাদির ইতিকথা নামে একটি নাটকে বছর খানেক আগে দেখেছি—জোতদার চাষীর মেয়ের সম্মান কিনছে। বড় দৈনিকে কৃতী রাজনৈতিক সংবাদদাতা গভীর আত্মবিশ্বাসে জোতদার প্রসঙ্গ লিখে যাচ্ছেন।

ক'দিন আগে আকাদেমিতে অশোক মুখার্জীদের নরক গুলজার দেখলাম। এর আগে দেখেছি—ওদেরই চাকভাঙা মধু। দুই নাটকেরই কাগজে কাগজে প্রশংসা। লোকমুখে প্রশংসিত। নিজেই হলের ভেতর দেখলাম—দর্শকরা নাটকের আবেগের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত, বিমর্ষ, গম্ভীর, ক্রুদ্ধ।

এই দুই নাটকেই (আরো বহু নাটক-গুলোর মতই) একটি করে জোতদার চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাধান্য পেয়েছে—কিছু শোষিত চরিত্র।

জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বয়স প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল। সেই সময় থেকে দেশের জনসংখ্যা এখন প্রায় দ্বিগুণ।

নাটকে বর্ণিত জোতদারের যদি অত জমি থেকেও থাকে—তাহলে তা এতদিনে বংশ বৃদ্ধির দরুণ ভাগ হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পিছু তিন কাঠা।

কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে। এইসব নাটক যাঁরা লিখছেন, যাঁরা অভিনয় করছেন, যাঁরা রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছেন—যাঁরা সংবাদপত্রে রিপোর্ট লিখছেন—তাঁরা কি জানেন—যে জোতদারকে এত প্রধান করে আঁকা হচ্ছে—সেই জোতদার নামক প্রাণীটি এখন আর প্রায় নেই! বাস্তবে জোতদার নামক ভূস্বামী এখন প্রাগৈতিহাসিক বস্তু হতে চলেছে।

লোকসভায় ভূমি বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য একজন এম পি-কে প্রশ্ন করেছিলাম—জোতদার কথাটির মানে কি? তিনি বলেছিলেন অভিধানে বলে—যে জোতাইয়া চাষ করে। অর্থাৎ, লাঙলে বলদ জুতে যে চাষ করে। সেই কথাটি খারাপ অর্থে এখন জোতদার।

যাঁরা গাঁয়ের বাসিন্দা—তাঁদের প্রশ্ন করলে দেখা যাবে—তাঁদের বাসস্থানের দশ মাইলের ভেতর তিরিশ বিঘার ওপর জমি মালিকের সংখ্যা অতি অল্প। এক গুনলেই শেষ হয়ে যায়। এই সেদিনও দেশের আইনে মাথাপিছু ৭৫ বিঘা পর্যন্ত জমি রাখা যেতো। এই ৭৫ বিঘার ওপর জমি আছে—এমন কত লোক পশ্চিমবঙ্গের কোন গাঁয়ে দেখা যায়? কদাচিৎ ২।১ জন। বর্তমান আইনে পাঁচ জনের সুনির্দিষ্ট পরিবার পিছু মাত্র ৪৫ বিঘা জমি রাখা যায়। ৪৫ বিঘার ওপর জমি কত পরিবারের আছে?

বৈকুণ্ঠ বছর ৯।১০ চব্বিশ পরগণার একটি গাঁয়ে কাটিয়েছেন। সেখানে ইলেকট্রিক ট্রেন, ব্যাংক, হাসপাতাল, কলেজ, টেলিফোন থাকা সত্ত্বেও এলাকাটি টাকায় ষোল আনা কৃষিপ্রধান। বর্ষাকালে চাষীরা ট্রেনে করে ধান চারা বোঝাই এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে নিয়ে যান। মাছের ভেড়ি থেকে মাছ এনে নিলামে হয়। সেখানে তাড়ি ও মদের খুব প্রচলন। বৈশাখ মাস-ভোর লোকে নামসংকীর্তন করে। বিয়ে করতে যাওয়ার সময় বর মোজা দিয়ে পাম্পসু পরে। এম এল এ-র বাবা বর্ষাকালে মাছ ধরার পোলো বিক্রি করে। পাগল আছে, ওয়াগান ব্রেকার আছে, চোর আছে, হোমিও-প্যাথি, এল বি বি এস ডাক্তার আছে: তেঁতুল, নারকেল দিয়ে সাজানো দিগন্ত আছে। মানুষ যেমন হয়—তেমন আর কি। মামলা আছে। ইটখোলা আছে। ঝগড়া আছে। মধ্যস্থ আছে।

সেখানটা বৈকুণ্ঠ তার দ্বিতীয় জন্মস্থান করে ফেলে। বিশাল বিশাল গ্রাম। রামপুর, দ্বারিকপোতা, চাকবেড়ে, জাফরপুর, সাহেবপুর—ইত্যাদি। বিরাট জায়গা। চারদিকে ৮।১০ মাইলের ভেতর জায়গা, লোক, দীঘি, খাল—প্রায় সবই সে চেনে। বেগমপুর থেকে সুন্দর চর। বাঁশবেড়ে থেকে খোলাপোতা। এ এলাকায় অন্তত এক লক্ষ লোকের বাস। সেখানকার রেল স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ালে খালি হয়। ভর্তি হয়। সেখানে বৈকুণ্ঠের অভিজ্ঞতা—দশ বছরের ভেতর মাত্র ৪ জন লোককে সে দেখেছে—যাদের জমির পরিমাণ সমগ্র পরিবার মিলিয়ে ৭৫ বিঘার ওপর। আইন সামলাবার জন্যে জমি নানা নামে বেনামী। চারজনেরই বিশাল পরিবার।

ক বাবু: দরিদ্র চাষী থেকে মাটি কেটে মজুরী জমিয়ে একটু একটু করে জমি কিনেছে। তখন জমির দাম খুব কম ছিল। এখন বহু লোককে ধার দেয়। ব্যাংকে বিশ্বাস নেই। সামান্য যা পুঁজি তা রাত জেগে পাহারা দেয়। দিনে ঘুমোয়। একটি বন্দুক আছে। সংসারে লোকসংখ্যা ৫৯। কাউকে অত্যাচার করতে দেখিনি। বরং টিউবয়েল বসাতে অগ্রণী। অভাবী চাষীর পাশে দাঁড়ায়। ছেলেরা চাকরি খুঁজছে। আর না। সেচ নেই। জমি এখন বোঝা।

খ বাবু: যৌবনে দুটি রক্ষিতা ছিল। তারা এখন বৃদ্ধা। ছাগল চরায়। তাদের ছেলেমেয়েরাই খ বাবুর পুত্রকন্যা। নিজের সরকারী সন্তানদের সঙ্গে ওইসব পুত্র-কন্যাকেও সমান মর্যাদায় লালনপালন করে-ছেন। সুপুরুষ। ডায়াবেটিস রোগী। গ্রামকে ভালোবাসেন। দেশে এখন কাউকে অত্যাচার বা শোষণ করা যায় না—বিশেষ করে চাষের ব্যাপারে, জমির ব্যাপারে। তার প্রমাণ পেয়েছি তাঁকে দেখে। বরং তিনি নিজে লোকের উপকার করেন। অভাবী লোকের অভাব মিটাতে গিয়ে তিনি অতিষ্ঠ।

গ বাবু: এম-এ পাশ। বৈষয়িক জমি ৬৫ বিঘার ওপর। সরকারী চাকরি ছেড়ে

অবসর নিয়েছেন। জমির জমি থেকে ধান প্রায় পান না। সংসার চলে প্রধানত পেনসন ও ছেলেদের মাইনের টাকায়। বই পড়েন। দেশের কথা ভাবেন।

ঘ বাবু: হাজার বিঘার ওপর জমি ছিল। বিদ্যাধরীর মরা সোতা সংলগ্ন পয়োস্তি জাগা-চরে। এখন আর বিশেষ নেই। চর হাসিল করে চাষ করে নিজের গাঁয়ে পাকা স্কুলবাড়ি করেছেন। কয়েক বছর আগে শহরের উগ্ররা দল বেঁধে গিয়ে আদর্শ কায়েম করতে তাঁর বাড়ি আক্রমণ করেন। গাঁয়ের লোক পাল্টা আক্রমণ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করেন।

মনে রাখা দরকার—চব্বিশ পরগণায় প্রায় এক কোটি লোকের বাস। প্রায় ৪ হাজার রকমের ধান আছে। জনসংখ্যার একটা বিপুল অংশ ভূমিহীন। আশা করি শ্রদ্ধেয় নাট্যকারগণ জানেন: বর্গাদারী এখন উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায়। অর্থাৎ ভাগে দিয়েও সে-জমি ভূস্বামী বর্গাদারের সম্মতি ছাড়া বেচতে পারেন না। রেজিস্ট্রি অফিস রেজিস্ট্রিই করবে না।

অবশ্য এটাই পুরোপুরি বাংলা দেশের ছবি নয়। তবু এটা তো বাংলাদেশের অংশ।

১৯৭২ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বলা হয়েছিল—অমুকের হাজার হাজার বিঘা জমি আছে। তখনই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান করে এই চোরাই জমি অনুসন্ধানের জন্য কমিটি করা হয়। সে-কমিটি ব্যতিক্রম হিসেবে ২।৪ জনকে পেয়েছেন।

আমাদের পুরনো ধারণা মত (সে-ধারণা গল্প উপন্যাস নাটক যাত্রা রাজনৈতিক বক্তৃতায় গড়ে উঠেছে) সেই ঐতিহাসিক জোতদার আর নেই। সে এখন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী প্রায়।

এই প্রাণীটিকে জীবন্ত ও বাস্তব ভেবে যাঁরা নাটক লিখছেন—বক্তৃতা দিচ্ছেন—কাগজে রিপোর্ট লিখছেন—তাঁরা সবাই কিন্তু অন্নের ব্যাপারে প্রধানত রেশন কার্ড নির্ভর। তাঁরা বিজলীবাতিতে জোতদারের কথা লিখে চলেছেন। মঞ্চে চলেছেন অভিনয় করছেন। রাজনীতি ও শিল্পের প্রয়োজনে মনে মনে লালন করছেন জোতদারকে। কিন্তু খেয়াল হয়নি—বেশ কিছুদিন হল জোতদার প্রায় আর নেই।

সেখানে জায়গা নিয়েছে—সারের দোকানদার, মধ্য-মালিক, ইঁটখোলার মালিক, কয়লার দোকানদার, সুদখোর এবং সর্বোপরি পরোক্ষভাবে স্থানীয় ব্যাংকের ম্যানেজার। আর্থিক শক্তি এখন জমিতে নেই। তা ওদের হাতে হস্তান্তরিত। অতীতের জোতদার এখন ভগ্ন—কিংবা অন্য জীবিকায়—কিংবা কৃপাপ্রার্থী।

এইসব আদর্শবাদী নাট্যকার, বক্তা ও রিপোর্টার খেয়াল করলেই এই সত্যটি জানতে পারবেন।

আকাদেমি, রবীন্দ্রসদনে ভবানীপুরে শ্যামপুকুর, চক্রবেড়ের বাঙালী বাসিন্দারা সন্ধ্যে সন্ধ্যে সপরিবারে এই নাটক দেখে হৃষ্টচিত্তে বিপ্লব ভ্রমে হাততালি দিচ্ছেন। আভিনেত্রীও হৃষ্ট। চাষী মেয়ের ভূমিকায় অফিসের কেরানী মেয়েটি কথার টানে টোনে, অঙ্গভঙ্গীতে নিদারুণ ক্লেশের শিকার। তার অভিনয়ের সময় আসল চাষী মেয়ে কিন্তু লেক মার্কেটের বাইরের ফুটপাথে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে পোলট্রির ডিম বেচছে। সে কিন্তু ওই কেরানী মেয়েটি কিংবা শহরের

বনবিবি উপাখ্যান

সুন্দরবনের দ্বীপগুলো ছিল বোম্বেটে, হার্মাদ, ফিরিঙ্গি দস্যুদের আস্তানা। দেশে ইংরেজরা থিতু হয়ে বসে ওগুলোকে মাপজোক করে 'লট' নম্বরে ভাগ করলো। লোকে তাকে বলে 'লাট'। অমুকের লাট, তমুকের লাট।

কাহিনীর শুরু অরণ্য সংকুল একটি দ্বীপ নিয়ে। জনা চল্লিশেক রগচটা খ্যাপা মানুষ এল অরণ্য উৎখাত করে জনপদ বসাতে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের লড়াই নিয়েই এই কাহিনী বনবিবি উপাখ্যান।

একদিন জয় জয়কার হল মানুষের। বনবিবি প্রতিষ্ঠিত হল নতুন আসনে। উৎসবে মুখর হল মানুষ। আর এমন দিনে একটি হরিণ-শিশু একান্তে নোনা ধুলোয় মুখ গুঁজে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। তার দিকে এক ফোঁটা জল এগিয়ে দেওয়ার কথাও মনে রইল না কারো।

সেই কাহিনী শুরু হচ্ছে আগামী সংখ্যার অমৃতে। এই ধারাবাহিক উপন্যাসটি লিখেছেন একালের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

যে কোন বেশ্যার চেয়ে চিন্তায় ও কর্মে অনেক অগ্রণী ও আধুনিকা। তার নিজের পরিবারে বসে একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। আমাদের নদী-বাঁধ নির্মাণে পরিশ্রমের একটা বড় অংশ সাঁওতাল আদিবাসিনীদের।

শুনেছি—বাংলা নাটক এখন একটি আন্দোলন। অনেক এগোনো ব্যাপার। যতবারই দেখতে যাই—ততবারই হোঁচট খাই। হয় তর্জমা। না হয় স্মৃতি-নির্ভর বর্তমানের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ খুবই কম। তবু চলে যাচ্ছে—কারণ অভিনেতারা ভয়ংকর শক্তিশালী। উৎপল, অজিতেশ, অশোক মুখোপাধ্যায়—এঁরা নির্জীব স্ক্রিপ্ট পেলে যাত্রে সিনেমাকে এক জায়গায় দিয়ে জের করে দিতে পারেন।

মনোজ মিত্র মহাশয় চাকভাঙা মধু ও নরক গুলজারে যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে নরক গুলজারে মস্তান নেংটি যখন তার মৃত্যুর সময়কার বিবরণ দেয়—তখন মনে হয়—এই তো শিল্প। তন্ময় হয়ে যাই তখন। কিন্তু তাঁর আঁকা চরিত্রগুলো শুধু ভালো কিংবা মন্দ হয় কেন? ভালো-মন্দে মেশানো হতে পারে না? তাঁর জোতদার তো মানুষ। সেই জোতদার তো অবস্থার শিকার। তাকেও ভালোবাসা যায়—এমন অবস্থা তাঁর লেখা নাটকে থাকে না কেন? সেকসপীয়র মিত্রের তো থাকে। মানিক-তারাশংকরের তো থাকে। বাংলা গল্প উপন্যাসে তো এ ভুল হয়নি। নাটকে কেন হচ্ছে? যাত্রার প্রভাব? টিকিট ঘরের? অজ্ঞ শহুরে সমালোচকের প্রশংসা? তাহলে?

নরক গুলজারে গুইবাবা, পান্নালাল, নেংটি, পুলিশ চরিত্র আঁকতে গিয়ে তো এ গন্ডগোল হয়নি। যেমন অভিনয়—তেমন নাটক। খুবই সুন্দর। যত গন্ডগোল গরীব চাষী আর জোতদারকে আঁকতে গিয়ে।

আর গোলমাল ভগবান বিষয়ে। শ্রদ্ধেয় অজিতেশ ভালোমানুষ নাটকেও একই কান্ড করেছেন। ঈশ্বরকে বাচাল করে আঁকায় সাময়িক কিছু চমক থাকে। স্থায়ী কিছু থাকে না।

মনে রাখা দরকার—আমাদের সভ্যতা ও শিল্পের মূল কথা ধান। বছরে ৭০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় এদেশে। ছ' মাস ধরে জনসংখ্যার ৭০ ভাগ মানুষ ১ কোটি ১০ লক্ষ একরে ধান বোনে—ধান কাটে। এটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজো। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ও সম্যক জ্ঞান ও ভালবাসা না থাকলে নাটক-নভেল-কবিতা-রাজনীতি না করাই ভালো।

অন্য পথ তো পড়ে আছে। ভাবাবেগের কবিতা। পরীর সঙ্গে প্রেম। তাই নিয়ে গল্প। উপন্যাস। নাটক। প্যানপ্যানানি। ঘ্যানঘ্যানানি। বই বেরোবে। প্রশস্তি। তারপর ঠোঙা।

বৈকুন্ঠ পাঠক

শরৎ প্রসঙ্গেঃ দুই লেখক ও পাঠক

'সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত।' শ্রীঘোষ এবং শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করতে বড়ো সাধ হয়, এখনকার লেখকরা অনেক লিখছেন এবং আমরাও পড়ছি, তবুও সে উপন্যাসের নাম ও চরিত্রগুলি আমরা তেমন মনে রাখতে পারি না কেন? শুধু কি একান্তই দায়ী আমাদের স্মৃতি? অথচ আশ্চর্য আমি 'মহেশ' পড়েছিলাম আমার মাত্র ১২ বছর বয়সে। অথচ আজও ভোলা যায় নি। শরৎবাবুর বর্ণিত উপন্যাসের গ্রামগুলি বাস্তবে আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয় 'আধুনিক লেখকদের উপর তার কোন প্রভাব নেই।' হয়তো বা সত্যি! কিন্তু পাঠকদের মনে যে প্রভাব? আর পাঠক বাদ দিয়ে কি সাহিত্য? —সুমন্ত-কুমার পাল; আওরঙ্গবাদ, মহারাষ্ট্র।

(২)

গত ২১ জানুয়ারী আনন্দবাজার কলকাতার সংকলিত পত্রিকায় একালের লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার ঘোষের শরৎ-চন্দ্র এবং তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে বিবৃতি পড়লাম।

শ্রীগাঙ্গুলীর ধারণায় শরৎচন্দ্র-সৃষ্ট গ্রামগুলি নাকি অবাস্তব। এখন নাকি সেই গ্রাম আদৌ দেখা যায় না। কিন্তু সুনীল-বাবু এটুকু নিশ্চয়ই যে জগৎটা পরি-বর্তনশীল। সব কিছুরই পরিবর্তন সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের গ্রাম আর শরৎচন্দ্রের সময়ের গ্রাম নিশ্চয়ই এক হতে পারে না।'

এ ব্যাপারে সন্তোষবাবু আরো এক ধাপ এগিয়েছেন। তাঁর মতে—একটা বয়সে শরৎচন্দ্রকে ভাল লাগত। এখন লাগে না। শরৎবাবুর গল্প রূপকথার মতো। বাস্তবে এসব চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া শরৎচন্দ্র ভালবাসার কথা লিখেছেন কিন্তু অনিবার্য পরিণতিতে সে ভালবাসা পৌঁছয় নি অর্থাৎ তিনি পাত্র-পাত্রীর বিয়ে দিতে পারেন নি।

কিন্তু সন্তোষবাবুর প্রতি আমার প্রশ্ন—শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এ অভিযোগ যদি সত্য হয় তবে ভাবছেন অসংখ্য পাঠকের আজও তিনি এত প্রিয় কেন? আর কেনই বা তাঁকে নিয়ে এত ঘটা করে অনুষ্ঠান করতে বসা? —দিলীপ গুহ; দুর্গাপুর-৫।

(৩)

'দেশ'-এর এক সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত সন্তোষকুমার ঘোষ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তৃতা দুটিকে উপলক্ষ করে সম্প্রতি শরৎ প্রেমী ও শরৎ-বিরোধী-দের মধ্যে 'অমৃতের' পাতায় আলোড়ন কাজিয়া জমে উঠেছে। 'স্পেকটেটর' পত্রিকায় একবার সুরসিক এডিসন লিখেছিলেন যে প্রোটেস্ট্যান্টরা সেন্ট এ্যানের 'সেন্টত্ব' বর্জন করে যতই 'সেন্ট এ্যানস স্ট্রীট'কে 'এ্যানস্ স্ট্রীট' বলুক না কেন তাতে মহীয়সী সাধিকার গৌরব সামান্যই কমে। ঠিক তেমনি 'শরৎ বাতিল হয়ে গেছেন' বলে কেউ কেউ মন্তব্য করলেই কি শরৎচন্দ্র পাততাড়ি গুটিয়ে আমাদের চিন্তা-চেতনা-অনুরাগ থেকে বিদায় নেবেন? এডিনবরা রিভিউ-এর বা ব্ল্যাকউডস্ ম্যাগাজিনের রূঢ় সমালোচনা কি শেলী-কীটসের কবিতাকে কালের বাতাস দিয়ে পাঠকের রস-রুচি থেকে তাড়াতে পেরেছে?

আসলে শরৎচন্দ্র ঠিকই টিঁকে থাকবেন। তবে কেন টিঁকে থাকবেন সেটাই প্রশ্ন। প্রধানত কোন্ গুণে তাঁর গরিষ্ঠ সংখ্যক লেখা একশো বছর টিঁকে থেকেছে এবং সম্ভবতঃ আরও কয়েক দশক পাঠকের মনে ও স্মৃতিতে সেগুলি খানিকটা জায়গা জুড়ে থাকবে? —এই প্রশ্নের এক কথায় জবাব দেওয়া কঠিন। কেউ বলবেন, শরৎ আজও স্মরণীয় বহু বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টির গুণে। কেউ বলবেন, নারী চরিত্রের পুনর্মূল্যায়নে ও পূর্ণ মূল্যায়নে। কেউ বা বিচিত্র কাহিনী-বিন্যাস কৌশলে। কেউ বা সমাজ সমীক্ষার ব্যাপকতায় ও গভীরতার জন্যে। কারও ধারণায়, বহুদর্শিতা, দরদী মনোভাব ও মানব-মনস্তত্ত্বে জ্ঞানের বিশিষ্টতায়। এমন আরও কত।

আসলে, শরৎচন্দ্রের বহু গল্প-উপন্যাস প্রধান চরিত্রের বৈচিত্র্যের জন্যেই স্মরণীয়। মাল গল্প ভুলে গেলেও চরিত্রগুলি ভোলা যায় না। এই জাতীয় অবিস্মরণীয় চরিত্র এর আগেও বা ঐ সময়ে। প্রভাতকুমার, ত্রৈলোক্যনাথ, যোগেশ-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কলমে আমরা পেয়েছি। আসলে বাংলা গদ্য-গদ্যের আদর্শ স্থাপয়িতা হিসাবেই শরৎচন্দ্র স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। শরৎচন্দ্রের গদ্য শৈলী সম্পর্কে তেমন সবিস্তার গবেষণা এখনও হয় নি। হলে দেখা যাবে ঠিক কেমন ভাষা ও ভঙ্গিতে উপন্যাস লেখা উচিত সেটা একালের লেখকদের যেন শরৎচন্দ্রই প্রথম দেখিয়ে দিলেন। শরৎচন্দ্রই প্রথম শিষ্ট অথচ সরল, মিতাবেগ অথচ তীব্র, সংহত অথচ গতিময় এক গদ্য রীতির প্রবর্তন করলেন। ঐ রীতিতে উপন্যাস লিখে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বস্তরের পাঠকের মন আকর্ষণ করলেন। ঐ রীতিটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান ও স্থায়ী উত্তরাধিকার। তাই নয় কি? —উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ২৪-পরগণা।

(৪)

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনায় সাহিত্যিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের বক্তব্য নিয়ে 'চিঠিপত্র' বিভাগে অনেকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমিও ঐ দুই সাহিত্যিকের বক্তব্য পড়ে বিস্মিত ও দুঃখিত হয়েছি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস যদি রূপকথাই হবে তাহলে আমাদের দেশের গ্রাম ও আমাদের দেশের নারীদের জীবন সবই মিথ্যা হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্র তখনকার দিনের যে সমাজ জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন, সে উপন্যাসের চরিত্রগুলি এখনও আমাদের সমাজ থেকে অদৃশ্য হয় নি। তাই শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রূপকথা ও অবাস্তব বলে আমরা আজও উড়িয়ে দিতে পারি না। আমার মনে হয় ভবিষ্যতেও এই উপন্যাসগুলিকে অবাস্তব বলা যাবে না। এবং এসব মন্তব্য করে কোনদিনই শরৎচন্দ্রের পাঠকের সংখ্যাকে কমানো যাবে না।
—শুক্লা গুপ্ত, সোদপুর, কলকাতা-৪০।

(৫)

২১ জানুয়ারী 'অমৃত'-এ বৈকুণ্ঠ পাঠকের সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত গোরা। শ্রীকান্ত। অপু—এই তিনটি চরিত্র পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এবং এই তিনটি চরিত্র যে আজ প্রতিটি বাঙালীর হৃদয় জুড়ে বসে আছে সে কথাও বলেছেন। আর ঠিক এর পাশাপাশি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সন্তোষকুমার ঘোষ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কিছু অন্য ধরনের কথা বলেছেন। প্রথম সাহিত্যিক সরাসরি বলে বলেছেন, রূপকথা লেখেন নি তিনি। আসল মানুষের গল্পই লিখেছেন।' পাশাপাশি সন্তোষবাবু লিখেছেন, 'শরৎবাবুর গল্প রূপকথা মত'। কোনটা বিশ্বাসযোগ্য? —বন্যা ঘোষ, কাঁচরাপাড়া।

(৬)

বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শরৎ শতবার্ষিকী সমাপ্তি অধিবেশনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শরৎ-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব মতামত দিলে কিছু বাদ প্রতিবাদ হয়েছে আপনার সাহিত্য পত্রিকাতে (২১ ২-৭৭)। উপরোক্ত সাহিত্য সম্মেলনের আহ্বায়ক-রূপে আমার কয়েকটি বক্তব্য ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের অবগতির জন্য জানাতে চাই।

রাজনীতিতে যেমন গণতন্ত্র ও বাক্-স্বাধীনতার কথা তোলা হয়, সাহিত্য নীতিতেও সেটা কেন আমরা গ্রহণ করব না। সন্তোষবাবু, সুনীলবাবুর পূর্ণ অধিকার আছে, তাদের মতামত প্রকাশ করার, এমন কি শরৎ সাহিত্য সম্মেলনেও। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র, সেঁদের মহারাষ্ট্রের বুদ্ধিমন্ত সমাজের অন্যতম পুরোধা শ্রীপু-ল-দেশপাণ্ডে তার

শরৎসাহিত্যকে অকৃত্তিম ভারতীয় সাহিত্যের 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর' আখ্যায় ভূষিত করেছেন)—এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন, জনমানসের মধ্যে এদের সাহিত্য এমনভাবে গ্রথিত রয়েছে, যে এঁরা আজ আমাদের প্রশংসা বা বিরুদ্ধ সমালোচনা, সব কিছুর উর্ধ্বে বিরাজ করছেন।

তাই শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় কোন্ সময় কিভাবে শরৎবাবু বা তাঁর প্রকাশকদের আমন্ত্রণ করেছিলেন, সন্তোষবাবুর আজ আর শরৎ-সাহিত্য ভাল লাগে না,' বা সুনীলবাবুর 'শরৎবাবুর গ্রাম খুঁজে পান নি', এ-সবে ক্ষুব্ধ হবার কোনই কারণ নেই। সর্বভারতীয় সম্মেলনে অবাঙালী সাহিত্যিকরা, যাঁরা শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রাখেন তাঁরা কি ভাববেন সে নিয়েও আমাদের চিন্তান্বিত হবার কোনই কারণ নেই। আমার মনে হয় এঁদের আলোচনা কোনই ক্ষতি করে নি আমাদের।
—সলিল ঘোষ, বোম্বাই।

(৭)

অমৃতের ৩৫ সংখ্যায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের মন্তব্য পড়লাম। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ আমার প্রিয় লেখক, কিন্তু প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে তাঁরা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে উক্তি তাতে নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব পেলেও সত্যের অপলাপ ঘটে।

সুনীলবাবু বলেছেন 'শরৎবাবু যে সব গ্রামের কথা লিখেছেন বাস্তবে তার হদিস পাওয়া কঠিন। আধুনিক লেখকদের ওপর তাঁর কোনও প্রভাব নেই।' একথা সত্যি যে কালের পরিবর্তনে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। একশো বছর আগের গ্রামের চেহারা আর নেই। এবং থাকা স্বাভাবিক নয়। শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ প্রকৃত বাংলাদেশের পল্লী সমাজেরই ছবি। কুঁয়াপুরের বিষয় নিয়ে মুখুজ্যে ও ঘোষালের লড়াই হয়ত আজ আর চলে না, কারণ জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির ফলে ঐ কলহের অবসান হয়েছে। কিন্তু আজও কুঁয়াপুর কুঁয়াপুরেই আছে এবং তারিণী ঘোষাল ধর্ম দাস, গোবিন্দ শুধু বাইরের চেহারা পাল্টিয়ে অন্য চেহারায় বর্তমান।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ লিখেছেন 'সাহস ছিল না ভদ্রলোকের, ভালবাসার কথা লিখেছেন, বিয়ে দিতে পারেন নি।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ আইন সিদ্ধ ঘোষণা করা সত্বেও আজ পর্যন্ত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ তা মেনে নেয় নি। শরৎ-সৃষ্ট রমা রাজলক্ষ্মী সাবিত্রী ইত্যাদি নায়িকা সকলেই বিধবা, তখনকার সমাজে বিধবাদের বিবাহ সর্বজন গ্রাহ্য হয় নি। তাই তিনি তাদের অন্তরের প্রেম, ভালবাসার গোপন খবরটুকু আমাদের জানিয়েছেন, পূর্ণতার পথে নিয়ে যান নি। পল্লীসমাজে রমার সঙ্গে রমেশের বিয়ে দেবার সাধ্য তাঁর ছিল না ঠিকই, কারণ সমাজ তাকে কোনও মতেই স্বীকৃতি দিত না। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট অভয়ার মধ্যে সাহসের অভাব ছিল না। অভয়ার মত বিদ্রোহিনী চরিত্র যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাহসের অভাব কোথায়? আর একথাও ঠিক সাহিত্যিকের কাজ আর পুরোহিতের কাজ এক নয়। তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সুখ, দুঃখ আশা, আনন্দ আর সমস্যার ছবি আমাদের জানিয়েছেন। ওঁর সম্পর্কে আজকের সাহিত্যিক হিসেবে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঘোষের মন্তব্য বেদনাদায়ক। —অনীমা রায়চৌধুরী, নতুন দিল্লী।

চীনের কথা
আমার কথা

অমৃত পত্রিকায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ বেরিয়েছে তা আমার অননুমোদিত। আপনার প্রতিনিধি আমার বক্তব্য বলে যা লিখেছেন তাও সত্যের অপলাপ মাত্র। এসম্পর্কে আমার বক্তব্য পত্রিকায় আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করলে বাধিত হব।

আমি বলেছিলাম, সাংহাই-এর মত শহর যেখানে এক কোটি লোকের বাস, সেখানে মাত্র হাজার তিনেক লোক জেলে বন্দী। এর মধ্যে রয়েছে গুপ্তচর, প্রতারক, ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি ও কিছু চোর বদমায়েস। জনসংখ্যার তুলনায় বলা চলে, পুরো ব্যবস্থার কলহ দূরে করার কাজে যথেষ্ট সাফল্য এসেছে। তবে তা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে বলা যায় না।

(২) চীনে এখন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধার কাজ চলেছে। এখানে বুর্জোয়া অধিকারের অংশ বিশেষ এখনও আছে। পুরনো সমাজ-ব্যবস্থার গলদ থেকেই এর উৎপত্তি। তবে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঐসব অধিকারকে সঙ্কুচিত করার কাজ চলেছে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে একাজ করা হচ্ছে না। কারণ তাঁদের লক্ষ্য হল, সারাও রোগীকে বাঁচাও।

(৩) চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙের নির্দেশ হল, শ্রেণী সংগ্রাম, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় তাঁরা প্রকৃতিকে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

(৪) এছাড়া রচনাটির বিভিন্ন অংশে আমার ব্যক্তিগত মতামতকে মাও-সে-তুঙ-এর অভিমত বলে বলা হয়েছে। এটাও অশোভনীয়।

বিজয়কুমার বসু
১-৩-৭৫
কলকাতা-৪৫

একটি অনুরোধ

ইংরাজীতে লেখা ভারতের খাঁটি বাঙালী কবি প্রীতিশ নন্দীকে প্রথমে অভিনন্দন জানাই 'পদ্মশ্রী' পাওয়ার জন্য। এই কবির কাছে আমাদের ছোট্ট একটি অনুরোধ আছে, তিনি যেন ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেও কবিতা লিখতে শুরু করেন। অতীতে অনেক বাঙালী কবি ও লেখক প্রথম জীবনে ইংরাজীতে লেখা শুরু করলেও পরে বাংলায় লিখে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আশা করি, এই দৃষ্টান্ত কবি মনে রাখবেন। তাঁর মত প্রতিভাসম্পন্ন কবির কাছে আমাদের বাংলা সাহিত্য কিছু আশা করে, সে সঙ্গে আমাদের মত পাঠকেরাও। দেবব্রত ঘোষ, মালঞ্চ, হাওড়া।

আমাদের নদী

নদী আমাদের জীবন। নদী আমাদের ভাব, ভালবাসা, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। নদীতে আমাদের দর্শন, আমাদের কর্ষণ। নদী আমাদের প্লাবন, নদী আমাদের ধরণ-ধারণ। নদী এনেছে পর্যটক, লুটেরা। নদী এনেছে ধর্ম, নদীর তীরে সভ্যতার সামিয়ানা। নদী প্রেমিকের উদাসী মন, নদী বধূর মুগ্ধলামা চোখে পরপারের ইংগিত। নদীতে অবগাহনে পাপস্খালন। নদীতে তীর্থস্নানের অক্ষয় পুণ্য। উৎস থেকে মোহনা, জীবনের মতই জটিল নদীর প্রবাহপথ। কোথাও গহীন গম্ভীরে, কোথাও চরভূমি, শৃগালের হাহাকার, পলিতে ফসলের উচ্ছ্বাস। কোথাও শাখানদীর মিলনকামনা।

নদীর তীরে শিল্পশহর, জীবনের জলসা। তীর্থ থেকে তীর্থে, সংগম থেকে সাগর মানুষ নদীময়। নদী আছে তাই আছে জীবন। মানুষের চিরকালের কণ্ঠে একই আবেগ— ও নদীরে...। নদী আমাদের মা, নদী আবার [illegible]।

নদী আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতার কোল ছুঁয়ে পর্বতের স্নেহ বহন করে নিয়ে চলেছে সুনীল সমুদ্রে। নদী আমাদের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

নদীই এনেছিল একদিন পরাধীনতার গ্লানি। নদীর জল ছুঁয়েই উঠেছিল স্বাধীনতার সূর্য। বিচিত্র ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, মেজাজ আর মনের অখণ্ড মিলনমালা গেঁথে গেঁথে নদী আমাদের প্রবাহের আনন্দ, মিলনের উল্লাস।

পশ্চিম বাংলার ভাগীরথী, দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ, তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, আরো আরো ছোটোবড় নদী, মানুষের প্রযুক্তির হাতে পড়ে অর্থনীতির বাধ্যসন্তান। নদী তোমার কাছে কোটি মানুষের অজস্র দাবী—

* আমরা সেচের জল চাই। প্লাবন চাই না।
* তোমার শক্তির কাছে ভাঙন চাই না, চাই আমাদের শিল্প-শক্তি বিদ্যুৎ।
* তোমার কাছে মৎস্যবিলাসী বাঙালী চায় সুস্বাদু মাছ।

নদী তুমি আমাদের বন্দর রাখো। তুমি আরো জীবিকা দাও। আমরা তোমাকে কি দেবো! কিন্তু ফুল, প্রদীপের টিপ, আর আরো শিল্পশহরের যত আবর্জনা আর মলিনতা।

সমস্ত বিষয়টি তুলে ধরেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নথিপত্র, ইতিহাস ঘেঁটে। তিনি নিজে কাঁসাইয়ের তীরে টিয়ার ঝাঁক নামতে দেখেছেন। দেখেছেন গংগার বুকে নেমে আসা মার্বেল পাথরের সিঁড়ি, ভাঙা ছাদ।

জলসা ঘরের নায়কের মত, ঝুলঝাড়া দিয়ে ঝাড়লন্ঠনের ঝুমকোগুলোকে টিং টিং করে নাড়িয়ে দিয়ে, বিশ্বম্ভর বললে, ঘোড়া আর ওই গংগা, এই পরিবারের সর্বনাশ করে দিলে। দুটোরই চরিত্র এক। দিতেও পারে আবার নিতেও পারে। এই বত্রিশ বছরে মা আমার দু লক্ষ টাকা গিলে বসে আছেন। অবশ্য ঘোড়ার পিছনে উড়েছে আরো বেশী। যে ঘোড়াটার পেছনে বাবা সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছিলেন সে ব্যাটার নামও ছিল রিভার। বিশ্বম্ভর গুনগুন করে গান গাইল, শাস্ত্রপথে আশ নদী তীরে বাস, কখন কি যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। নীলকণ্ঠের পরের লাইনটাও বল, এককূল নদী ভাঙে নিরবধি, আবার অন্যকূলে আকুলে সাজায়। বিশ্বম্ভর হাসল, তাতে আমার লাভটা কি? পশ্চিম দিকটা সাজালে হামলা কেয়া হোগা। আমার পুবের দিকটা তো বিলকুল হজম হয়ে গেল রে!

এই সেই জমিদার বাড়ি। কার্পেটের মত ঢালাও লম্বা উঁচু পোস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে সাদা রেলিং ধরে একসময় গংগার দিকে ঝুঁকে থাকতো। দুকোণে ছিল দুটো সৌখীন জলটুঙি। একদিকে গংগা অন্যদিকে প্যাভিলিয়নের মত লাইব্রেরী। ইতালি থেকে আনানো সাদা আর কালো মার্বেল পাথরের মেঝে। নীচু সোফায় বসে বই পড়তে পড়তে পশ্চিমে তাকাও। বিকেল [illegible]। সবুজ লন, গেরুয়া গংগার জল কুলকুল ছুটছে। উপুড় হয়ে আছে নীল আকাশ। দূর পারে মন্দিরের ত্রিশূল বিঁধে আছে আকাশের গায়ে। লনে টেনিস খেলা হত, ব্যাডমিন্টন। জিমনাসিয়াম ছিল একপাশে। সেই লন আজ নিশ্চিহ্ন। জলটুঙির থামগুলো জলের তলায় সমাধিস্থ। বিশ্বম্ভরের গৃহশিক্ষকদের জন্যে নির্দিষ্ট দোতলা ফরাসী কোয়ার্টার নদীগর্ভে। ছোটো ছোটো পাথর বসানো স্নানঘাট ভেঙে চুরমার। নিয়ে যাও সব নিয়ে যাও। তোমাকে দেবার জন্যে বসে আছি আমি এক রাইচরণ।
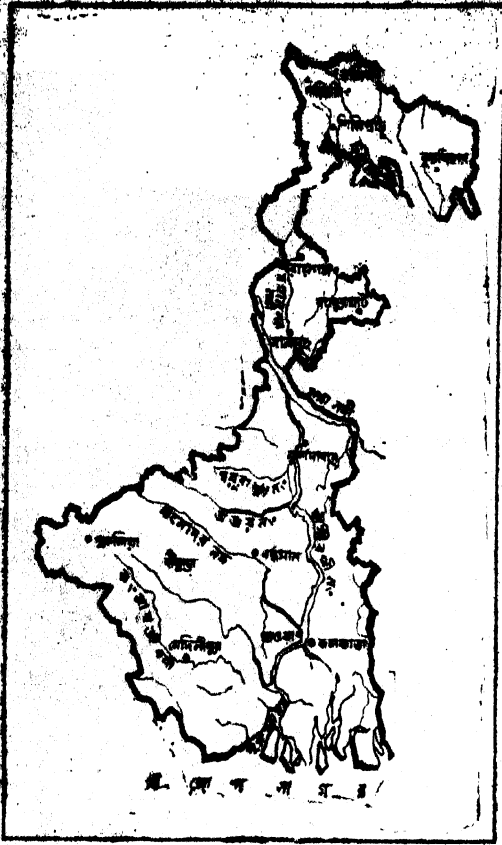
একটা চড় মারতে হবে

জয় পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি। ওই তো সেই ঘাট। শ'দেড়েক বছর আগেকার পদচিহ্ন পড়ে আছে। জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যান করছেন। একটি নৌকো আসছে দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে। আরোহী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। নৌকো ভেড়াও ঘাটে। জয়নারায়ণকে একটা চড় মারতে হবে। আহ্নিকের সময় বিষয়চিন্তা করছে। সেই ঘাট আছে। সেই নদীও আছে। কেবল সমান্তরাল আর একটি নদী, সময়ের স্রোতে চরিত্ররা অনবরতই ভেসে চলেছে, বর্তমান থেকে অতীতে। নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বিজ্ঞানীর সেদিনের সেই বিখ্যাত প্রশ্নের উত্তর হয়তো এইরকম, ভবিষ্যত হইতে, বর্তমান হইতে অতীতে।

'লাভ দিস রিভার, স্টে বাই ইট, লার্ন ফ্রম ইট।' ভালবাস নদীকে, বাস কর নদীর তীরে, নদীই তোমার গুরু। জীবনের শেষ প্রান্তে হেরম্যান হেসের 'সিদ্ধার্থ' নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সেই চরম সত্যকে উপলব্ধি করল—'হু এভার আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দিস রিভার এণ্ড ইটস সিক্রেটস, উড আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মাচ মোর, মেনি সিক্রেটস, অল সিক্রেটস।' এই নদী, এই নদীর গোপন তথ্য যার বোধগম্য হয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত রহস্য তার কাছে পরিষ্কার। 'হি স দ্যাট দি ওয়াটার কনটিনিউয়ালি ফ্লোড এণ্ড ফ্লোওড এণ্ড ইয়েট ইট ওয়াজ অলওয়েজ দেয়ার। ইট ওয়াজ অলওয়েজ দি সেম এণ্ড ইয়েট এভরি মোমেন্ট ইট ওয়াজ নিউ': প্রতি মুহূর্তে যার নতুন জীবন, অস্তিত্বে যে প্রবাহিত, একই মুখে যার অসংখ্য মুখ, সেই নদী আমাদের জীবন-দর্শনের সবচেয়ে বড় দর্শন, জীবন ধারণের সবচেয়ে বড় ধরণ।

নদী তোমাকে কি বলছে কান পেতে শোনো—জীবনের দেনা-পাওনার হিসেব যখন মিলবে না—চলে এস আমার তীরে পর্ণকুটিরে, আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমাকে বন্ধু থেকে শেয়তা করে তুলবো। সব গ্লানি আমি, শান্ত হয়ে বসো, পাঠ গ্রহণ কর আমার কাছে। আমার নিম্নাভিমুখী গতির সঙ্গে তোমার জীবনের গতি মেলাও, ডুবে যাও, তলিয়ে যাও আমার গভীরে। আমি সেই অনন্ত কালের বাউল, আমার চলার ছন্দে সেই সঙ্গীত।

> ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন তলাতল খুঁজলে পাতাল
> তলাতল খুঁজলে
> পাতাল পাবিরে সেই কৃষ্ণধন

নদী কি তোমাকে শেখাতে পারে নি—সময় বলে কিছু নেই? একই সময়ে আমি সর্বত্র প্রবাহিত। আমি গোমুখীতে। আমি উৎসে। আমি প্রপাতে। আমি পারাপারের ঘাটে। আমি স্রোতে। আমি সমুদ্রে। আমি পর্বতে। আমি সমতলে। বর্তমান-তাই আমার ধর্ম। অতীতের ছায়া আমাতে প্রলম্বিত নয়। ভবিষ্যৎ আমাতে দীর্ঘায়িত নয়। কাল আমাতে স্তব্ধ।

> শোন্ চলচল্ ছলছল্ সদাই গাহিয়া চলেছে জল।
> ওরা কারে ডাকে বাহু তুলে, ওরা কার কোলে বসে দুলে?

দার্শনিকরা যাই বলুন না কেন, নদীরও কিন্তু যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য আছে। তরুণ নদী প্রাণশক্তিতে ভরপুর। অসংখ্য ধারায় তার অবরোহণ, অসংখ্য ঢালে সে বেগবান, উদ্দাম শক্তির ঐশ্বর্যে সে ঐশ্বর্যশালী। সেই প্রবাহের শক্তিতে যেমন প্লাবনের ক্ষমতা আছে তেমনি ভাঙনের ক্ষমতাও আছে। চলার পথে **তরুণ নদী ত্রিভুজ আকৃতির উপত্যকা সৃষ্টি করে।** দু কূলের ব্যবধান তখন খুবই কম, যেন হাতে হাত রেখে চলা। সেই নদী যখন বয়সে আর বিস্তারে পরিপূর্ণ, তখন সে প্রৌঢ়। আর প্রগলভতা নয়: সর্পিল আকারে এঁকে বেঁকে চলাই তখন তার ধর্ম। **সে চলার ছন্দে তৈরি হবে ইংরেজী ইউ হরফের আকারে বিস্তীর্ণ উপত্যকা।** কখন সে ভাসবে কখন সে ফেলবে পলি। খুশির খেয়ালে সে কখন গভীর, কখন অগভীর। নদী যখন স্থবির তখন সে পাহাড়ী পথের চপলতা হারিয়েছে। আর তো পারি না। ধীর, মন্থর তার গতি। সে তখন সমতলে প্রবাহিত। শক্তি নেই স্নায়ুতে—তাই যা কিছু বহন করে এনেছে সব শিথিল মুঠো থেকে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে। সামনে তার সমুদ্রের আহ্বান। তবু যাবার আগে দিয়ে যেতে চাই যা এনেছি সঞ্চয় করে। এই নাও চরভূমি। পলির স্বাদে নোনতা। ফলাও ফসল। এই নাও ব-দ্বীপ। গড়ে তোলো জনপদ। আমার মহাপ্রয়াণের পথে জ্বলে উঠুক তোমাদের জনপদের দীপমালা।

> 'নদী কোথা হতে এল নাবি,
> কোথায় পাহাড় সে কোন্খানে?
> তাহার নাম কি কেহই জানে?
> কেহ যেতে পারে তার কাছে?

গিরি জননীর নিভৃত সূতিকাগৃহে আমার জন্ম। যৌবনের চলার পথে ছড়ানো নিঃসঙ্গতা। এখন আমাকে তোমরা সঙ্গ দাও। জীবনের বিচিত্র বাসরের মধ্য দিয়ে পথ করে সাগরে মিশে যাই। নদী তুমি বৃদ্ধ:

> Wild river in thy cataract far-murmured and rash rapids to sea hasting,
> Far now is that birth- place mid abrupt mountains and slow dreaming of lone valleys.

একই অঙ্গে যার যৌবন, আর জরা তারই আশ্চর্য নাম নদী। পৃথিবীর তাবৎ বিশাল নদীরই এই-এক ধর্ম। মিসিসিপি,

গঙ্গা। গঙ্গা তুমি পুণ্যতোয়া। তুমি সুবিশালা। প্রদেশ থেকে প্রদেশে প্রবাহিতা। তুমি শাক্তের, তুমি শৈবের, তুমি বৈষ্ণবের। তবু পৃথিবীর নদী বর্ণমালায় তোমার স্থান নেই। তোমার অন্য সহোদরারাও স্থান পায়নি। সেখানে সবার উপরে—অ্যামাজোন—যার প্রবাহপথের দৈর্ঘ্য ৩৮৫৪ মাইল। এরপর আছে নীলনদ, ইয়াংসিকিয়াং, কংগো, হোয়াংহো, নাইগার, ম্যাকেঞ্জি, পারানা, ইউকোন, কোলোরাডো, সেন্ট লরেন্স, রাইন, ডেনিয়ুব, হাডসন। গঙ্গা ১৫৬০ মাইল। নীলনদ দৈর্ঘ্যে গঙ্গার দ্বিগুণ। অ্যামাজোনও তাই। এমনকি মিসিসিপি-মিসৌরি, ইয়াংসিকিয়াং, এমনকি ডেনিয়ুবও দৈর্ঘ্যে গঙ্গার চেয়ে বড়। তাতে কি যায় আসে? তুমি পুরাণে, তুমি বর্তমানে। একদা সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের জীবন দান করেছিলে, আজ তুমি আধুনিক শিল্প জীবিকার পথ প্রশস্ত করে হাজার হাজার মানুষের জীবনে প্রবাহিতা। তুমি বন্দরে নাবিকের স্বপ্ন, তুমি জল সিঞ্চনে কৃষিতে পূর্ণ। তোমাতে উদয় তোমাতে অস্ত। তুমি ধর্মে, তুমি সাহিত্যে, তুমি কাব্যে। তোমাতে অবগাহনে পাপমোচন, তোমাতে অঞ্জলি ভরে তৃষ্ণা নিবারণ। তোমার জলে আজ শিল্প দূষণ। ৪৩ কোটি হিন্দুর তুমি পবিত্র জননী।

পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিত-গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে
ভীষ্ম জননী খলু মুনিবরকন্যে
পতিতোদ্ধারিণী ত্রিভুবন ধন্যে।

গাড়োয়াল হিমালয়ের বারো হাজার ফুট উঁচুতে সেই দুর্গম মহাতীর্থ, অভিযাত্রীদের বিজয়ের স্বপ্ন, গঙ্গোত্রী হিমবাহ। সেই হিমবাহের পাদদেশে প্রকৃতির বিস্ময়কর খেলা। মানুষের কত সহস্র বছরের কল্পনার চোখে দেখা একটি গোমুখ। সেই গোমুখী নিঃসৃত সধূম গঙ্গার উৎসমুখের নাম ভাগীরথী। ভক্তজনের মুদিত নয়নে এখনো সেই দৃশ্য—ভগীরথ শাঁখ বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছেন। মকরবাসীনা। গঙ্গা তাঁর পশ্চাতে। প্রাচীন সে কাহিনী কার অজানা! বৈষ্ণব বলবেন, বিষ্ণুর পদাঙ্গুলি থেকে নির্গত হয়েছেন দেবী গঙ্গা। উত্তর ভারতের ধ্রুপদিয়া আকাশ রাঙানো উষায় ভৈরোঁতে গাইবেন—

বিষ্ণু চরণজল
ব্রহ্মাকে কমণ্ডলু দেবী গঙ্গে।

অকসাস

ভারতের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে, পর্বত গুহায় শিবের গঙ্গাধর মূর্তি পাওয়া গেছে। শিব তাঁর জটার একটি গুচ্ছ থেকে পেছন দিকে ডান হাত বাড়িয়ে মা গঙ্গাকে ছেড়ে ফেলছেন—অন্য হাতে উমার চিবুক ধরে আদর করছেন। লক্ষ্মীটি হিংসে কোরো না। শিবের দুই স্ত্রী—উমা আর গঙ্গা। হিমালয়ের সঙ্গে শিব চিরকালই জড়িত। শিবের সঙ্গে গঙ্গা। ভারত এবং ইরান এই চিন্তায় পরস্পর প্রভাবিত। ইরানের পুরাণে বলছে—অনাহিতা গঙ্গার মতই স্বর্গীয় নদী। পৃথিবীতে যার জুড়ি অকসাস—সে নদী নেমে আসছে—আবর্দুজ-ভাবা :খজোইতি পর্বত থেকে। অনাহিতার সঙ্গে মিথরার যে সম্পর্ক—গঙ্গার সঙ্গে শিবের সেই সম্পর্ক।

বেদে যে সমস্ত স্বর্গীয় নদীর উল্লেখ আছে—সরস্বতী তাদের মধ্যে একটি। ঋগ্বেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে গঙ্গার উল্লেখ আছে কত নামে : অলকানন্দা, দাধুনী, দারুন্দি, মন্দাকিনী, ভাগীরথী, জাহ্নবী। পুরাণে নদী হল হোমকুণ্ডের জননী। বেদের আর্যদের যুগের পদযাত্রা ছিল নদী অনুসারী। যজ্ঞাগ্নির স্পর্শে অরণ্য ভস্মীভূত করে গড়ে উঠেছিল আর্য উপনিবেশের পর উপনিবেশ। আর্য সভ্যতার প্রসার ছিল নদীবাহী। সাতটি নদী উপত্যকায় পড়েছিল আর্য প্রভাব—সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরী—আমাদের প্রধান সাতটি নদী—ভারত সভ্যতার পীঠস্থান। আর্য এবং অনার্য সভ্যতার আদান প্রদানে গড়ে ওঠা প্রাচ্যভূমি—আর্যদের নদীমাতার সঙ্গে অনার্য মহাদেবের মিলন।

গঙ্গোত্রী থেকে তিনশো মাইল নেমে এসে, গঙ্গা শিবালিক পর্বত শৃঙ্গ থেকে মুক্ত হলেন হরিদ্বারের সমতলে। বৈষ্ণবের হরির দ্বার। শৈবের হরদ্বার : হিন্দুর মহাতীর্থ। মা গঙ্গার সমতলে উত্তরণ। পুরাণের মতে গঙ্গা নেমেছেন মহাদেবের জটা থেকে সাতটি ধারায়। গঙ্গোত্রীর একশো মাইল দূরে কেদার। সেখান থেকে নামছেন মন্দাকিনী। বদরীনাথের দক্ষিণ-পশ্চিমে নন্দাদেবীর পাশ থেকে মুক্ত হয়েছেন ঋষিগঙ্গা—যুক্ত হয়েছেন ধবলগঙ্গায়। তারপর দুই বোনে গিয়ে পড়েছেন যোশী মঠের কাছে অলকানন্দায়। দেবপ্রয়াগের কাছে অলকানন্দা মিশলেন ভাগীরথীতে। ভাগীরথী এইখানে হলেন গঙ্গা।
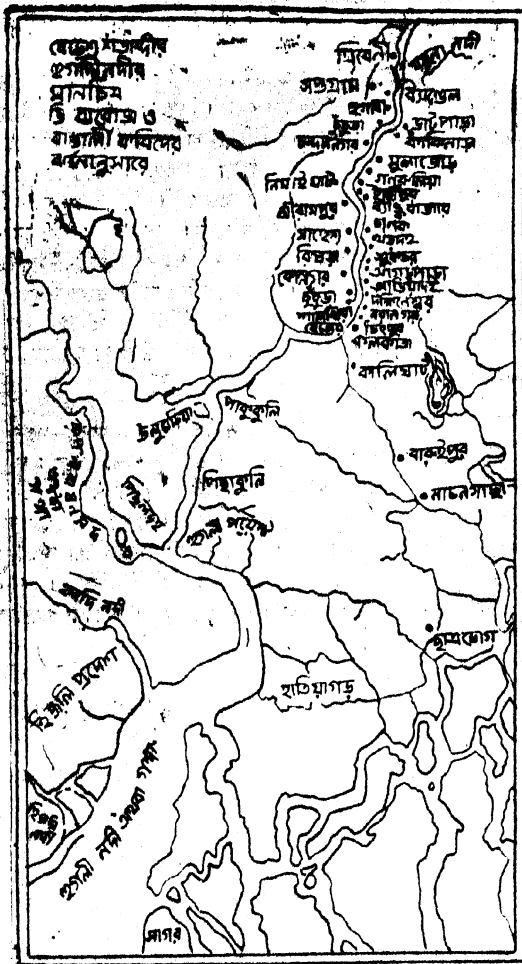
১৯ কোটি মানুষ

হিমালয় থেকে সাগর, গঙ্গার এই বিশাল প্রবাহপথ যে সমতলে—সেই সমতল ভারতের একটি সুবিশাল উপত্যকা—যার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত। চার লক্ষ বর্গমাইলের একটি অববাহিকা। সবচেয়ে চওড়া অংশের দৈর্ঘ দুশো মাইল। হাজার মাইলের সমুদ্র যাত্রায় গঙ্গা উচ্চতায় নেমে এসেছে ৭৫০ ফুট। তিনটি প্রদেশের ১৯ কোটি মানুষের জীবনে এই গঙ্গা অমৃতধারা।

তবতট নিকটে যস্য হি বাস ঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।।

সারা ভারতের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই তিনটি রাজ্যে—উত্তরপ্রদেশ, বিহার, আর পশ্চিমবঙ্গ।

হরিদ্বারের কাছে মা গঙ্গাকে মানুষের সেচবিজ্ঞান কৃশ করে দিয়েছে। শক্তি হরণ করেছে। গঙ্গা অতঃপর ক্ষীণতোয়া। ভিক্টোরিয়ার আমলের বাস্তুকারেরা বাঁধ তৈরি করে তিনের চার ভাগ জল টেনে নিয়েছেন। খরা আর দুর্ভিক্ষপীড়িত দোয়াবে সেই জলে ফসল ফলছে। গঙ্গা আর যমুনার মধ্যবর্তী এই দোয়াব আজ সম্পন্ন কৃষি এলাকা। হরিদ্বারের পর পরবর্তী একশো মাইলের যাত্রাপথ অতি নিঃসঙ্গ। ডান দিকে তার নীচু জলা জমি। লম্বা ঘাসে শুধু হাওয়ার দুলুনি। বর্ষায় দুর্গম। রাশিয়ার গন্ডার জায়গা থাকে থাকে উঠে গেছে হিমালয়ের কোলে।

শিবালিক পর্বত থেকে নেমে এসেছে পাথরের চাঙড়া শিলা খণ্ড। উপলভূমির উপর নদীর নৃত্য।

শীতে শুধুই স্মৃতি

তরুণী গঙ্গা এর পরের যাত্রাপথে প্রবীণা। শান্ত, ধীর। অনবরত পরিবর্তনশীল যার গতি। শীর্ণ। ধারা থেকে উপধারার গতি উদ্দেশ্যহীন। গ্রীষ্মে জলে পা ডোবে কি ডোবে না। শীতে শুধুই স্মৃতি। শীতে যার দুই তটের দৈর্ঘ্য আধ মাইলের বেশী নয়—বর্ষায় সেই নদী কূলহীন অনন্ত। দীর্ঘ বিশ মাইলের পারাপার। শীতের শুকনো নদী বর্ষায় তিরিশ ফুট গভীর। ঐতিহাসিক শহর, পুণ্য তীর্থভূমি দু পাশে রেখে এলাহাবাদ থেকে ছশো মাইল নীচে রাজমহলের কাছে গঙ্গা বাঁক নিয়েছে বঙ্গোপসাগরের দিকে। সাগরের দিকে গঙ্গার সবচেয়ে বড় মোচড়। এই সেই 'বেন্ড অফ দি গ্যাঞ্জেস।' এই নামে মনোহর মুলগাওকরের একটি বিখ্যাত উপন্যাস আছে। ৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলছে গঙ্গার বাঁকে। আর্যদের আদি উপনিবেশের যজ্ঞানল নয়। অনার্যসুলভ অসভ্যতার দাবানল। এই সেই বেন্ড অফ দি গ্যাঞ্জেস যেখানে গঙ্গার স্বচ্ছ জলধারা ঘোলাটে হয়েছে। একদিকের পাড় বিশ থেকে ত্রিশ ফুট উঁচু, আর একদিকের নীচু। কাদা আর বালির ছোট ছোট ধাপ। জলে ধুয়ে আসছে ঘোলাটে কাদা, চিক চিক করছে অভ্রের দানা, মেয়েদের নাকের নাকছাবির মত। মোহনা পর্যন্ত প্রবাহিত এই হলুদ বর্ণ ঘন স্রোত যেন গলন্ত সোনা। রাজ মহলের কাছ থেকে গঙ্গা প্রতি মাইলে এক ফুট করে ঢালু হতে শুরু করেছে। এই বাঁকের কাছে সেকেন্ডে ১০ লক্ষ কিউবিক ফুট জল ছ নট বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। জোয়ারের মিসিসিপি কিম্বা টেমসের জল নিকাশের চেয়ে ১৫০ গুণ বেশী।

আগমহল থেকে রাজমহল

রাজমহল। বাংলার নবাবী বিশ্বাসঘাতকদের শেষ ঘাঁটি। নদীই তার সাক্ষী। ১৫৯২ সালে রাজমহলের নাম ছিল আগমহল। আকবরের রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ মানসিংহ নাম পাল্টে রাখলেন রাজমহল। রাজমহল হল বাংলার শাসন কেন্দ্র। ১৬০৭ সালে ইসলামখান রাজধানী বসালেন ঢাকায়। ১৬৩৯-এ সুলতান সুজা রাজ্যপাট তুলে আনলেন রাজমহলে। ১৭০৭ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ রাজমহল থেকে সব সরিয়ে আনলেন মুর্শিদাবাদে। ডানাভাঙা জটায়ুর মত রাজমহল মুখ থুবড়ে পড়ে রইল গঙ্গার ধারে। ১৮৬৩ সালে গঙ্গাও রাজমহল ছেড়ে চলে গেল তিন মাইল দূরে। এইখানেই শেষ শয্যায় শুয়ে আছে সিরাজের ঘাতক মীরজাফর পুত্র বজ্রাহত মীরন। ইতিহাসের রক্তাক্ত খেলা শেষ হতেই ১৯২৯ সালে গঙ্গা আবার ফিরে এল রাজমহলে। রাজমহলের তখন আর কোনো গ্ল্যামার নেই। নির্বাপিত ইতিহাস। কিছু পেট-রোগা মানুষের উদর মেরামতের জায়গা।

প্রয়াগের সঙ্গমে একদা রাজা-মহারাজারা আত্মাহুতি দিতেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গম, পাপহারিণী, ত্রিভুবনতারিণী। বৈদিক পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট একদিন এখানেই দেহ বিসর্জন করেছিলেন। তারপর যুগ থেকে যুগান্তরে সেই প্রথা এগিয়ে গেছে। সেই বিশাল বটবিটপী তলে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে মুক্তিকামী মানুষের অস্থি। প্রয়াগের এই অক্ষয় বটের বিবরণ পর্যটক হিউয়েন সাং লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই প্রয়াগে চতুর্বেদ উদ্ধারের আনন্দে ব্রহ্মা করেছিলেন অশ্বমেধ। তিন বোনেরই জন্ম হিমালয়ের কোলে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী। তান্ত্রিক বলেছেন, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। হাজার মাইল অবরোহণের পর আবার তিনজনের মিলন। উত্তর থেকে এলেন গঙ্গা। প্রত্যেক তের মাইলে আবর্তিত, উর্মিক জলধারায়, স্রোতোবান। যমুনা

এলেন পশ্চিম থেকে। প্রস্থে আধ মাইল। গভীর নীল জলধারা। আর এলেন পুরাণোক্ত সরস্বতী। নীল আর গেরুয়া মিলে-মিশে একাকার। প্রতি বারো বছরে এই ত্রিবেণী সঙ্গমের কুম্ভ-মেলা, মুমুক্ষুর স্বর্গ কামনায় সার্থক—

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।

বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র আশী মাইল দূরে ভাগীরথী তার মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হল। আজ থেকে ৫০০ বছর আগে পঞ্চদশ শতকে রাজমহল থেকে গঙ্গার পূর্ববাহী গতি গৌড়, পাণ্ডুয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু ভগী-রথীর খাতে গঙ্গার দক্ষিণ ধারা ক্রমশ অবলুপ্ত হতে চলল। নদী খুঁজে নিল দক্ষিণ-পূর্বে আর একটি ধারা। গঙ্গা মিশে গেল পদ্মায়।

বিশাল দুটি রাজ্য অতিক্রম করে গঙ্গা এখন ভাগীরথী নামে প্রবেশ করল পশ্চিম বাংলায়। এখন তাঁর মাতৃভাষা বাংলা। এই সেই বাংলা। যার ঐশ্বর্যের খ্যাতি পুরাণে রয়েছে। অযোধ্যা-পতি দশরথ তাঁর দ্বিতীয়া মহিষীর মানভঞ্জন করছেন, ভূভারতের সমস্ত ঐশ্বর্য মহিষী তোমার পদতলে রাখব, বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত শুধু একটু হাসো,—

দ্রাবিড়াঃ সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণা পথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশী কোশলাঃ॥
তত্র জাতং বহু দ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ্ যত্ত্বং মন সেচ্ছসি॥

প্রাচীন ইতিহাস বলছে, বঙ্গ এক বৈচিত্র্যময় ভূভাগ। এর সর্বত্র বহে চলেছে উদ্দাম স্রোতস্বিনী। সেগুলির জলরাশি ভূভাগটিকে বৎসরের কয়েক মাস জলমগ্ন করে রাখে। শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে গৌড় আর বঙ্গের উল্লেখ আছে এই ভাবে :

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব সিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥
বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড় দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব বিদ্যা বিশারদঃ॥

এসব বহু যুগ আগের কথা। এর পর পাঠান এসেছে। মোগল এসেছে। এসেছে ইংরেজ। অনবরতই সীমানার অদল-বদল। রাজ্য গঠন, পুনর্গঠন। কাটাকুটি, ছারখার। তবু নদী তো কোন বাধা মানে না। সমস্ত শাসনের ঊর্ধ্বে। তার গতি, প্রকৃতি, ভাঙা, গড়া মানুষের তন্ত্র মানে না। উত্তর ভারতের প্রধান দুটি নদী—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। সিন্ধু নদের অববাহিকার সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানে। ব্রহ্মপুত্রের সমভূমির তলার দিকের সবটাই বাংলাদেশে। ভারতের উত্তর সমভূমি গঙ্গারই দান। সঙ্গে আছে বামাবর্ত উপনদী—রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কুশী, মহানন্দা। দক্ষিণের উপনদী যমুনা, শোন, চম্বল, বেতোয়া।

মালদার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ দিয়ে পশ্চিম বাংলায় গঙ্গার প্রবেশ। কিছু পথ চলেই প্রধান শাখা পদ্মা হয়ে চলে গেল বাঙলাদেশে। দ্বিতীয় শাখা নেমে এল দক্ষিণে। মুর্শিদাবাদে, নবাবী ব্যাভিচার দেখেছে, নবদ্বীপে দেখেছে চৈতন্যের অভ্যুদয়, পলাশীর আম বাগানে সূর্যাস্ত দেখেছে, চন্দননগরে ফরাসী স্ট্র্যাণ্ড দেখেছে, ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসকে দেখেছে রামায়ণ রচনায়, হালিশহরে রামপ্রসাদকে দেখেছে অবগাহনে, রামকৃষ্ণকে দেখেছে দক্ষিণেশ্বরে। হুগলীর বুকে দেখেছে চার্ণকের নৌকো। কল-কাতার ঘাটে দেখেছে হুতোমের বাবু কালচার। বোতল বগলে পানসির ছাদে বাঙালীবাবুর নিসর্জনের নাচ।

নদী আমাদের ভাষা, নদী আমাদের সংস্কৃতি, নদী আমাদের ধর্ম, নদী আমাদের কৃষি, শিল্প, অরণ্য, স্বাধীনতা, পরাধীনতা। সমুদ্র আর নদীর বেষ্টনীতে আমরা মৌসুমি এলাকার মানুষ। পৃথিবীর প্রাচীনতম দুটি সভ্যতার জন্মভূমি এই মৌসুমি অঞ্চল। একটি সিন্ধু সভ্যতা অন্যটি উত্তর চীনের হোয়াং-হো অববাহিকার সভ্যতা। নদীর ধারেই মানুষের প্রথম বসতি। সভ্যতার হাতে-কলমে শিক্ষা। প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার। জমি কামড়ে যাযাবর বৃত্তির অবসান। নদীকে অবলম্বন করেই আমাদের ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র। অভিজ্ঞতার উপলব্ধি। মৌসুমী অঞ্চলের জীবনের কি কি বৈচিত্র্য :

(১) অতি প্রাচীন, অতি স্বতন্ত্র, সু-উন্নত সভ্যতার পীঠস্থান।
(২) স্ব-নির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি ভিত্তিক জীবন।
(৩) বিশাল এবং দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যা।
(৪) ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট।
(৫) **অর্থনীতির স্বাভাবিক** দুর্বল বিকাশ।

২৩ জুন/১৭৫৭

ইতিহাসের পুরনো পাতায় যেতে পারেন ঐতিহাসিক। **হুগলী নদীর জোয়ার** টানে ফিরে আসছে চার্ণকের নৌকো। **১৬৮৭ সাল। ১৬৪২** সালে স্থাপিত হয়েছিল ইংরেজদের প্রথম ফ্যাক্টরি। ১৬৮৬তে তিনটি গ্রাম, সুতানুটি গোবিন্দপুর, আর কালি[illegible]শ তাঁরা ফিরে গিয়েছিলেন। আবার ফিরে এলেন—সেই মার্শি, সোয়াম্প ল্যাণ্ডে—হুইচ ইজ আনফিট ফর হিউম্যান হ্যাবিটেশান। ভাগ্যের আকর্ষণ নদীর আকর্ষণে[illegible] চেয়ে বেশী। **শা-এন-শা ঔরঙ্গজীবের** প্রপৌত্র আজিম-উশ-শান, হুগলীর এই **তিনটি জলা জায়গা** তুলে দিলেন ইংরেজ বণিকের হাতে। তারপর ইতিহাসের সেই অপ্রতিরোধ্য গতি। একশো বছরের ব্যবধানেই ভিত নামলো ফোর্ট উইলিয়ামের। ১৭৫৮ সাল। ৮১ সালে তৈরি **হল দুর্গ। খরচ হল ২০ লক্ষ** স্টার্লিং। ৫ লক্ষ স্টার্লিং খরচ হল **ভাঙনের হুগলীর** পাড় বাঁধাতে। তার আগেই ঘটে গেছে **পলাশী। হায় পলাশী!** ২৩শে জুন। সাল ১৭৫৭।

এর আগে নদী তুমি বাংলার সমাজ জীবনে এই সব **কাল দেখেছো :**

চর্যাপদের কাল, গীতগোবিন্দের কাল, বাংলা পুরাণের **কাল, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের** কাল, কৃত্তিবাসের কাল, শ্রীচৈতন্যের কাল। এইবার এল অবক্ষয়ের কাল। অবক্ষয় থেকে এল মন্বন্তর। শকুন **উড়ল দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন** করে। তুমি দেখলে বঙ্কিমচন্দ্রকে। **ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখালে** ফোর্ট উইলিয়ামে। পেলে বন্দেমাতরমের **উজ্জীবন মন্ত্র।** দেখলে ৪২ সাল। ৪৬-এর শব তুমি বহন করেছ।

স্বাধীন ভারতে নদীর ধারা অর্থনীতির ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অ্যাফরেস্টেশান, ডিফরেস্টেশান, ড্যাম, এমব্যাঙ্কমেন্ট, ডাইকস, ইরিগেশান, ইনল্যাণ্ড ওয়াটারওয়েস, ডিসিলটিং প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে নিতান্ত লে ম্যানও আজ পরিচিত। **ভূমিক্ষয় রোধ কর। পতিত জমিকে ফেল লাঙলের মুখে,** খরা বাঁচাও, **দুর্ভিক্ষকে বল গুড বাই। কৃষি আর শিল্পের** নতুন বুনিয়াদ গড়ে **তোলো। যারা বাঙালীকে কাঙালী করেছিল** তারা **তক্ত তাউস ছেড়ে গেছে। নদী তুমি এখন আমাদের** নতুন দিনের **স্বপ্ন। পৃথিবীর মানুষ আমাদের প্রগতির দিকে সতর্ক** দৃষ্টি রেখেছে, **কারণ—দি ইন্দো-গ্যানজেটিক প্লেন স্ট্যাণ্ডস আউট অ্যাজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইমপরট্যাণ্ট লোল্যাণ্ড এরিয়াস ইন দি ওয়ার্ল্ড।**

দুর্দান্ত দামোদর

গঙ্গা **যদি সুখের নদী হয়, দুঃখের নদীর নাম** দামোদর। গঙ্গা আমাদের **বরফের নদী। হিমবাহ হল এই নদীর** জলাধার। দামোদর **হল বৃষ্টির নদী।** ছোটনাগপুরের ২ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উৎস থেকে দামোদর নামছেন। ইনি নদী নন, নদ। প্রকৃতিতে ম্যাসকুইলাইন। স্বভাবে দুর্দান্ত। চরিত্রে, অবিশ্বাসযোগ্য। বিহারের মধ্যে দিয়ে এর ১৮০ মাইল চলা শেষ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে এসে। নদীটি নেমে এসেছে পাহাড়ের গা বেয়ে দুমুখো **সাঁড়াশীর মত দুটি ধারায়।** ২৬ **মাইল** পাহাড়ের পথ পেরিয়ে হাজারিবাগ জেলায় এসে একটি প্রবাহে **পরিণত** হয়েছে। জেলার বুক চিরে পূর্বমুখী এই নদী টেনে নিয়েছে উত্তর-**পশ্চিমাঞ্চল** থেকে আগত বোকারো কোণার এবং অন্যান্য শাখা নদীর ধারা। এর পর যাত্রাপথে পড়েছে মানভূম জেলা। মানভূম থেকে বেরিয়েই মিশেছে এর প্রধান শাখা উত্তর থেকে আগত বরাকর নদীর সঙ্গে। এই মিলিত প্রবাহ তখন প্রকৃতই নদ। বিশাল তার ব্যাপ্তি, দুর্দান্ত তার গতি, অসম্ভব তখন তার শক্তি। এই বিশাল নদ তখন দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে প্রবেশ করেছে বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়া থেকে গেছে বর্ধমানে। বর্ধমান শহরের কাছাকাছি এসে নদী হঠাৎ দক্ষিণমুখী হয়েছে হুগলী নদীর আকর্ষণে। হুগলী আর হাওড়ার মধ্য দিয়ে কিছু পথ অতিক্রম করে কলকাতা থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে নদ মিলেছে নদীতে। কবি বলছেন—

গঙ্গা থেকে আদিগঙ্গা

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির উৎস হয় উত্তরের হিমালয় পর্বত নয়তো পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের মাটির ঢাল উত্তর থেকে দক্ষিণে। তাই এ রাজ্যের নদীগুলিও খাড়া দক্ষিণমুখী, নয়তো কিছুটা পূর্ব-দক্ষিণে এগিয়ে শেষে দক্ষিণের যাত্রী।

প্রধান নদী গঙ্গা মধ্য হিমালয়ের গাড়োয়াল পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে বেরিয়ে উত্তর ভারতের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাজমহল পর্যন্ত ঘুরে বাংলার সমতলভূমিতে এসে পড়েছে। তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে গিরিয়ার কাছে গঙ্গা ভাগ হয়ে গেছে দু'ভাগে। যে ধারাটি মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত দিয়ে এগিয়ে বাংলাদেশে গেছে সে ধারাটি কোন কোন পর্যটনলিপিতে, প্রাচীন মানচিত্রে কিংবা কবি কথায় গঙ্গা নামে উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে খাড়া দক্ষিণবাহী স্রোতটিই বরাবর পুণ্যতোয়া গঙ্গার মর্যাদা লাভ করেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাস দক্ষিণমুখী ধারাকে বলেছেন গঙ্গা আর পূর্ব-দক্ষিণ ধারাকে বড় গঙ্গা। তাঁর জন্ম গ্রাম ফুলিয়ার বর্ণনায় কবি বলেছেন, যাঁর দক্ষিণে-পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী। আর পড়াশুনোর জন্য উত্তরবঙ্গের গৌড় যাত্রার কথা লিখতে কবি বলেছেন, "পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার।" কিন্তু বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষ ছোট গঙ্গাকেই বরাবর গঙ্গা বলে প্রণতি জানিয়েছে। গঙ্গার দক্ষিণমুখী ধারা যেখানে সাগরে মিলেছে, সেই গঙ্গা-সাগর সুদূর অতীত থেকে বাঙালীর এবং ভারতীয়ের তীর্থক্ষেত্র। গঙ্গার দক্ষিণমুখী ধারা ভাগীরথী ও পূর্বমুখী ধারা পদ্মা নামে পরিচিত। কিন্তু গঙ্গা ও ভাগীরথী সমার্থক, পদ্মা স্নান গঙ্গাস্নান নয়।

ভাগীরথী গৌড় সভ্যতার জননী। গৌড়, পাণ্ডুয়া, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম প্রাচীন বাংলার সমৃদ্ধ জনপদ ও রাজধানী নগরীগুলি ভাগীরথীর দুই তীরে গড়ে উঠেছে। এখনও জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, কাটোয়া, চন্দননগর, হাওড়া ও রাজধানী কলকাতা ভাগীরথীর উভয় তীরে। গাঙ্গেয় অঞ্চলের ভাষাই সারা বাংলার ভাষা।

মুর্শিদবাদ, নদীয়া, বর্ধমানের সীমানা নির্দিষ্ট করার পর এবং হুগলী হাওড়া জেলার পূর্বসীমানা ছুঁয়ে ও কলকাতার কোল ঘেঁষে বয়ে গেছে গঙ্গা। এগিয়ে গেছে চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার সীমানা ভাগ করে। তারপর সাগরদ্বীপের কাছে সাগরে মিলেছে ভাগীরথী-গঙ্গা। সাগরদ্বীপ ও তার কাছাকাছি

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ, ক্ষীরসম স্বাদু নীর।

সাধারণ মানুষ বলে অন্য কথা।

দামোদর আমাদের ভাঙনের নদী, প্লাবনের নদী। ভারতীয় নদীর দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দামোদরে প্রকট। গতিপথের প্রথম দিকে এই নদী মাটি খেয়ে খেয়ে চর ধসিয়ে খরবেগে বয়ে চলেছে। অথচ যখন নীচের দিকে নেমে এসেছে তখন মন্থর গতি, বন্যা প্রবণ। দুপাশের পাড় বারে বারে ভাঙছে। দামোদরের প্রবাহপথ ৩৩৬ মাইল। দুটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্তা। সাড়ে আট হাজার বর্গমাইল এলাকায় জলধারা নিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখে এই নদী। উপরের উপত্যকার গড়পড়তা বাৎসরিক ৪৭ ইঞ্চি বৃষ্টির সবটাই প্রায় বুকে করে প্রবাহপথের দুপাশের ধ্বসে যাওয়া ফুলে ফেঁপে এই নদী যখন নীচের উপত্যকায় লাফিয়ে পড়ে তখন মনে হয় না, নদী ভূমি জীবের মতো। প্রতি বছরই বন্যা হচ্ছে, ইতিহাস হয়ে আছে তিনটি সাল ১৮২৩, ১৮৫৫, ১৯৪৩।

৪৩ সাল ছিল যুদ্ধের সময়। ১৬ই জুলাই বর্ধমানের কাছে শ্রীরামপুরে সামান্য বন্যায় বাঁদিকের পাড় একটু ভাঙল। বাঁধের ওপারেই ছিল মজাহাজা আর একটি নদী দেবীদহের শুকনো খাত। ২ লক্ষ কিউসেক জল ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবীদহে। বাঁকা, বেহুলা, ওরাও চেষ্টা করেছিল বন্যা বাঁচাতে, পারে নি। তিনটি নদীরই বহনী ক্ষমতা বহুকাল আগেই শেষ। হঠাৎ যৌবনে অসহায়। শক্তিগড় থেকে কালনার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল চলে গেল ৫ ফুট গভীর জলের তলায়। জুলাই থেকে অক্টোবর ট্রেন বন্ধ। ইংরেজের তখন যুদ্ধের ছমাস দেরি হয়ে গেল। রেল কোম্পানীর ৫০ লক্ষ টাকা গেল নদীপথে ট্রেন চালাতে।

টেনেসি ভ্যালি অথরিটির বিশেষজ্ঞরা এলেন বন্দনী পরিকল্পনা নিয়ে। দামোদর উপত্যকা আজ শান্ত। সমৃদ্ধির বোধ জাগবে অসংখ্য মানুষ। দামোদর বাঁধা পড়েছে। তার কাছে চাই বন্যা নিবারণ, জল নিকাশ, জল সেচ, ম্যালেরিয়া নিবারণ, জলপথে যাতায়াত, পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প বিকাশ, শহর গড়া, আধুনিক জীবনযাত্রার পত্তন। পরিকল্পনার এত বছর পরেও, দামোদর উপত্যকার কোনো শহর কি গাইবে —

কোথাই রে বোন গিয়েছিলাম
ঠিক করতে হালের কাঠি
কোথাই আমি দাঁড়িয়েছিলাম বাঁশ
বৃষ্টি আজো এল নাকো
বৃষ্টিকে দে আসতে দে।

দামোদর আজ শুধু সেচের জল, কি জলপথ, কি বিদ্যুৎ দিচ্ছে না। যৌবনের অমিত তেজ ঝরিয়ে সে আজ নাব্য। দামোদর উপহার দিয়েছে একাধিক পর্যটন কেন্দ্র—তিলায়া, কোনার, বোকারো, মাইথন পাঞ্চেট, আয়ার, বারমো, বনপাহাড়ি। শীতের নরম রোদে পিঠ রেখে, মাথায় পাতার টুপি চাপিয়ে বাংলোর বারান্দায় বসে তাকিয়ে থাকো বাঁধের দিকে। স্থির জলে আকাশ লুটিয়ে আছে। নীল গুলে যাচ্ছে জলে। লাল ঠোঁট টিয়ার ঝাঁক উড়ছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ আছে কুঁচকে। পাথরের দেয়াল ঘেরা জলাধারে অলস ডিঙিতে দোল খাও। ছিপ ফেলে দাও ধৈর্যের পরীক্ষা।

যন্ত্রবিদদের তৈরী বিস্ময় দেখার জন্যে আছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র—তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পাবে বোকারো, দুর্গাপুর, চন্দ্রপুরা। সবই ডি ভি সির দান। চন্দ্রপুরার মত এতবড় স্টিম টারবাইন জেনারেটার খুব কমই ছিল। সবচেয়ে বড় জেনারেটারের ক্ষমতা ছিল ৭৫ হাজার কিলোওয়াট। পঞ্চাশ সাল অবধি ৫০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিই ছিল সর্বোচ্চ। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার কিলোওয়াট একটি বড় লাফ।

কলকাতা বন্দর বাঁচাও। আজকে পূর্বে ভারতের সবচেয়ে বড় বন্দর আটিসাট পলির বাঁধনে শ্বাসরুদ্ধ। জীবন যায়, জীবিকা যায়। এতবড় কলকাতার সব আয়োজনই বুঝি সপ্তগ্রামের মত অতীতের স্মৃতি হয়ে যাবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত। হলদিয়া একটি বিকল্প মাত্র। কলকাতার প্রাণভোমর ফারাক্কায় বন্দী। বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছেন, বন্দর বজায় রাখার জন্যে সারা বছর হুগলী নদীতে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার কিউসেক জলের প্রবাহ বজায় রাখতে হবে, তবে নদী মুখের সঞ্চিত পলিস্তর সাগরে ধুয়ে যাবে। দেশী, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অভিমত ৪০ হাজার কিউসেকে নদীকে আমরা ৩৬ সালের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। ২৬ ফুট ড্রাফটের

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘদিন ভাগীরথীরই সৃষ্টি। ভাগীরথীর এই সৃষ্টির প্রয়াস কোনদিনই শেষ হবে না। বঙ্গভূমি সমানেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে বঙ্গোপসাগরের বুকে।

কয়েক শতাব্দী আগে আদি গঙ্গা ছিল ভাগীরথীর প্রধান প্রবাহপথ যা এখন সংকীর্ণ খাল মাত্র। কর্নেল টালি ১৭৮৫ সালে খিদিরপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত ঐ ধারাটি পুনরুদ্ধার করেন বলে আদি গঙ্গা টালি নালা নামেই বেশি পরিচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের কবি বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদসদাগরের সমুদ্র যাত্রায় যে বর্ণনা আছে তাতে আদি গঙ্গাকেই গঙ্গা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে সেদিনের সমৃদ্ধপল্লী কলকাতাও ছিল সেই আদি গঙ্গার তীরে। ভ্যানডেন ব্রুকের (১৬৬০) নকসাতেও সাগরের পথে কাকদ্বীপ পর্যন্ত আদি গঙ্গার চিহ্ন মেলে। কিন্তু তার একশো বছর পর রেনেলের মানচিত্রে আদিগঙ্গা নিশ্চিহ্ন।

হুগলী জেলায় ভাগীরথী ও তার দুই শাখা নদী মিলিত হয়ে যে সঙ্গমের সৃষ্টি করেছে তার নাম ত্রিবেণী। বলা হয়, এলাহাবাদের প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর যে মিলন তারই বিসমাপ্তি ত্রিবেণীতে। তাই ত্রিবেণীর অপর নাম মুক্তবেণী।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিক অভিযাত্রীদের বিরাট বিরাট বাণিজ্য জাহাজের ভিড়ে সরস্বতী চঞ্চল থাকত। তাই হুগলী জেলার উপকূলে হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি শহরগুলিতে কলকাতার অনেক আগেই বিদেশী উপনিবেশের পত্তন হয়। কিন্তু সরস্বতী মজে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুগলী জেলার গৌরবের দিন শেষ হয়। আর মঙ্গলকাব্যে বিপ্রদাস বর্ণিত যমুনা বিশাল অতি বর্তমানে প্রায় অস্তিত্বহীন।

পলিমাটিই ঐসব নদীর মৃত্যুর কারণ এবং একই কারণে ভাগীরথীও ধীরে ধীরে স্রোতের বেগ হারিয়ে ফেলেছে। ফলে বিপন্ন হয়ে বসেছে কলকাতা শহর-বন্দর। অনেক টাকা খরচ করে নিয়মিত মাটি কেটে ভাগীরথীর নাব্যতা বজায় রাখার চেষ্টা হয়। ভাগীরথী দুর্বল হয়ে পড়ায় সমুদ্রের জল উজান বেয়ে কলকাতা পর্যন্ত লবণাক্ত করে দেয়। মিষ্টি জলের মাছ পালাতে থাকে ভাগীরথী থেকে। এই সঙ্কটের সমাধানেই ফারাক্কা বাঁধের সৃষ্টি। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর সীমান্তে ফারাক্কার কাছে গঙ্গার ওপর যে বাঁধ বাঁধা হয়েছে তাতে ধরে রাখা গঙ্গার জল পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ খালে প্রবাহিত করে জঙ্গীপুরের কাছে গঙ্গায় ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এতে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে গঙ্গা।

জাহাজ তখন বন্দরে ঢুকতে পারবে বছরের যে কোনো সময়ে। ধানের উৎপাদনও কমে যাবে। ফারাক্কার জল নিয়ে দু'দেশের বিবাদ আর একটি ঐতিহাসিক বিবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাজেন্দ্র চোল

এই যুদ্ধের নায়ক সম্রাট রাজেন্দ্র চোল। সময় দশম শতাব্দির শেষার্ধ। পরকেশরী বর্মা রাজেন্দ্র ছিলেন শৈব। তাঞ্জোরের বিরাট রাজরাজেশ্বর মন্দির পিতা রাজরাজের অক্ষয়-কীর্তি। পিতা-পুত্র দুজনে মিলে ভারতে এবং সাগরপারের বিজিত রাজ্যে বহু শিবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেইসব মন্দিরে পুজোর জন্যে জালা জালা গঙ্গাজলের প্রয়োজন। তাছাড়া বিজিত রাজ্য থেকে বৌদ্ধধর্মের আবিলতা ধুয়ে শুদ্ধ করার জন্যেও গঙ্গাজলের প্রয়োজন। কিন্তু গঙ্গা কোথায়! দক্ষিণ ভারত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে গঙ্গার কলকল্লোল। ভগীরথ তপস্যাবলে গঙ্গা এনেছিলেন, সূর্যবংশীয় সম্রাট রাজেন্দ্র ঠিক করলেন বাহুবলে গঙ্গা আনবেন।

যেসব রাজ্য মাড়িয়ে গঙ্গায় পৌঁছোতে হবে, সেইসব রাজ্যের রাজারা, রাজেন্দ্রের জলবাহীদের আস্কারা দিতে রাজী নন। রাজেন্দ্রের সেনাপতি বিক্রম রণ দোহি বলে বেরিয়ে পড়লেন। চোলের শত্রু চালুক্য। চালুক্যরাজ ছোটো ছোটো রাজাদের মদত দিতে লাগলেন। প্রথম বাধা এল চন্দ্রবংশীয় রাজা ইন্দ্ররথের কাছ থেকে। বিক্রম তাঁকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দিলেন। চোল সৈন্য দুর্গম ওড্রবিষয় ও মনোরম কোশলনাড়ু পার হয়ে বর্তমান মেদিনীপুর তৎকালের দণ্ডভুক্তি ভেদ করে গৌড় সীমান্তে ঢুকে গেলেন। দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল অসহায়। তাঁর প্রতিরোধ চূর্ণ করে চোল সৈন্যরা এলেন দক্ষিণ রাঢ়ে। গঙ্গা এখন হাতের মুঠোয়। রণ শূর তখন রাঢ়ের রাজা। পরাজিত হলেন বঙ্গাধিপতি গোবিন্দচন্দ্র। গৌড়েশ্বর মহীপাল এলেন সাহায্যে। দাঁড়াতে পারলেন না। রণে ভঙ্গ দিলেন। উত্তর রাঢ়ও এল চোলের দখলে। রাঢ়ের ঐশ্বর্য, সুন্দরী নারী, পবিত্র গঙ্গাবারি সবই চোল সম্রাটের দখলে। গঙ্গা থেকে খাল কেটে তাঞ্জোরে প্রবাহিত করার কথা স্বয়ং বিশ্বকর্মাও ভাবতে পারেন না। পরিবর্তে দলে দলে গেল জলবাহীরা কালীঘাট আর নবদ্বীপ থেকে ভারে ভারে জল নিয়ে গিয়ে তাঞ্জোর মহামন্দিরের শিবগঙ্গা পূর্ণ করল। কাবেরী নদীতে কিছু ঢেলে দিল, গংগাইকোণ্ডা, চুলপুরমে চোলগঙ্গাও পবিত্র করে নিল।

নব কলকাতা

এই তো রাজার খেয়াল। আমাদের খেয়ালও কম যায় না। তবে তা পাগলামি নয়। ফারাক্কায় কত কোটি গেছে। দামোদরকে বাগে আনতে রাজঐশ্বর্য লেগেছে। এমন পরিকল্পনা গঙ্গার বদ্বীপ এলাকায়, হল্যান্ড তৈরি করতে হবে। এই স্বপ্ন স্বর্গত ডাঃ রায়ের। ১৬শোর কলকাতার চেহারাও তো ওই সুন্দরবনের মতই ছিল। কলকাতা যদি কলকাতা হতে পারে সুন্দরবন কেন নব কলকাতা হতে পারবে না। ডাচ ডেল্টা প্ল্যানের কারিতকর্মা স্থপতি, কলকাতা-বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং রিভার রিসার্চের বিজ্ঞানী, সকলে মিলে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ এবং পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছেন। সি এম পি ও করেছেন খরচের হিসেব। ১৮-৭৫ কোটি টাকা লাগবে প্রথম স্তরের কাজ শেষ করতে।

পশ্চিম বাংলার দক্ষিণ সীমানায় অজস্র নদী নালার জট। জঙ্গলেরই শেষ পরিণতি সমুদ্র। জীবন দানের জন্যে উন্মুখ। হুগলী নামখানা, সপ্তমুখী, ওয়ালস, কারচারা, গোবাদিয়া, ঠাকুরান, মাতলা এই ত্রিস্তর পরিকল্পনায় সমস্ত নদীই ধরা পড়বে বাঁধের আবেষ্টনীতে। গ্রেট মাস্টার প্ল্যানে হুগলীর মুখ থেকে মাতলা পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াবে বাঁধের প্রাচীর। ঝটিকাক্ষুব্ধ সুন্দরবনে মানুষের আধিপত্য স্থাপিত হবে। এক লক্ষ ২৫ হাজার একর সমুদ্র উপকূলে গড়ে উঠবে শিল্প, কৃষি, শহর, অরণ্য, মৎস্যাধার, ভ্রমণকেন্দ্র। তৈরি হবে ১০ কোটি ২০ লক্ষ কিউবিক মিটারের সুমিষ্ট জলাধার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা হবে অর্থনীতির জাপান, সমৃদ্ধির হল্যান্ড।

চার হাজার বর্গ কিলোমিটার সুন্দরবনের সম্পদ নদীরই দান। জঙ্গল থেকে আসছে—কাঠ, ১২,৮১,০০০ কিউবিক ফিট, জ্বালানী ৩,৭৭,৯০০০ কিউবিক ফিট, ৩০০০ মনের মত চাকভাঙা মধু, বছরে বছরে। মাছ আসছে বছরে ৩২০০ মেট্রিক টন। মৎস্য কেন্দ্র হল—নামখানা, কাকদ্বীপ, হাসনাবাদ, ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিংগর, রায়দিঘি, পোর্ট ক্যানিং। মৎস্য সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে ৩৪টি। ফ্রেজারগঞ্জে বসেছে সমবায়ী কেন্দ্র—তৈরি হচ্ছে শুঁটকি মাছ আর হাঙরের তেল।

নেদারল্যান্ড পরিকল্পনায় চতুর্থ বছরে ফল প্রত্যাশা করা যাবে। ষষ্ঠ বছরে বিশ হাজার একর জমি চাষে আসবে। সাত হাজার একর পাবে সেচের জল। সপ্তম বছরে ৮৫০০ একর জমি এবং অষ্টম বছরে ১৭০০০ একর জমি দোফসলী হবে। মাছের চাষ বেড়ে যাবে ৫০ শতাংশ। মাতলার সৌন্দর্য দেখে মানুষ মাতাল হয়ে যাবে। সাগর নয় অথচ সাগরের স্বাদ, নোনা জলে স্বাদু জল, সুন্দরবনের নতুন রূপের এই সুন্দর প্রতিশ্রুতি।

গঙ্গাকে অনুসরণ করে আমরা দামোদরকে নিয়ে সাগরে এসে পড়েছি। পশ্চিম বাংলার উত্তরের হিমমুকুটের কথা প্রায় ভুলেই গেছি। অথচ ভূগোলের প্রাথমিক শিক্ষাই হল, সমস্ত দুটি ভাগে পশ্চিমবাংলার ভূপ্রকৃতিকে ফেলা যায়, গাঙ্গেয় উপত্যকা, হিমালয় সংলগ্ন ভূভাগ। এইভাবে একটা শ্লোগান লেখা যেতে পারে—নদী যদি দেখতে চান উত্তরবঙ্গে চলে আসুন। পাহাড়ের ব্যালকনি থেকে মুখ ঝুলিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন। চশমা সাবধান। বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট হেড স্পিনিং। ভার্টিগো থাকলে নিয়ারবাই গাছের সঙ্গে মাফলার দিয়ে নিজেকে বেঁধে রাখুন। এন্ড ডাউন ফেলোস দি তিস্তা। পর্বতরাজের দুগ্ধবর্ণ কন্যা। মেঘবরণ চুল মাইনাস

উত্তর সিকিমের ২১ হাজার ফুট উঁচু এক হিমবাহ থেকে তিস্তা নামছে। সমগ্র সিকিমের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে উঠছে দার্জিলিং-এ। যেখানে রংপু এসে তিস্তায় মিশছে সেইখান থেকে শুরু করে, পশ্চিম দিক থেকে ছুটে আসা বড় রঙ্গিতের মিলনস্থান পর্যন্ত তিস্তা দার্জিলিং-এর সীমানা এঁকেছে। এরপর সিভক পর্যন্ত তিস্তা দার্জিলিং-এর। সিভক অতিক্রম করে তিস্তা চলে গেছে বাংলাদেশের রংপুরে। সেখানে ব্রহ্মপুত্র তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। ওয়েলকাম মাই ডটার।

মগনচর

তিস্তায় স্নানের চেষ্টা না করাই ভাল। এমনকি পায়ের পাতা ডোবাবার চেষ্টা থেকেও বিরত থাকুন। সাঁতার জানলেও নো হোপ। নৌকো অচল। দুঃসাহসী ভেলা ভাসাতে পারেন তাও বর্ষায় নয়। ঘণ্টায় গতিবেগ ১৪ মাইল। এই চওড়া গিরিনদী ছুটে আসছে অসংখ্য মগনচর আর প্রপাত সৃষ্টি করতে করতে। প্রকৃতপক্ষে গিরিসংকটে মাঝে মাঝে সংকীর্ণ হয়েছে, ফলে, কখন যে হঠাৎ জল ফুলে ফেঁপে উঠবে নদীও জানে না।

শুকনোর সময় জলের রং সিন্ধু-সবুজ। সিকিমে যখন বরফ গলতে থাকে তিস্তার তখন যৌবন। বর্ষায় তার একটিই সংগীত—এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে! জলের রং তখন

দুগ্ধ-ধবল। রঙ্গিতের সঙ্গে দেখা হবার পর তিস্তা ঢুকেছে গভীর গিরিসংকটে, তখন তার দুই তীরের ব্যবধান একশো গজেরও কম। সংকট ছেড়ে যখন সে সমতলে তখন তার ব্যাপ্তি বিশাল, দুশো থেকে তিনশো গজ।

কে যেন বলেছিলেন—আহা তিস্তা। দূরে গিরি খাতের মধ্যে দিয়ে ফিতের মত এ'কে বে'কে চলেছো। দুধারের খাড়া পাড় বেয়ে ঘন জংগল বৃক্ষের ঐশ্বর্য নিয়ে ঘন কুয়াশায় ছাদে গিয়ে ঠেকেছে। মাঝে মাঝে প্রবাহের পাশেই সবুজ উপত্যকা। প্রজাপতি ভোমরা কত রংয়ের হতে পারে; ক্রান্তীয় পতঙ্গের এই কি স্বর্গ। ৫০ সালের পর থেকে তিস্তা আরো ভয়াবহ হয়েছে। ৭২ ঘন্টার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে তিস্তা সিকিমে একটি জলাধার ভেঙে ফেলে এখন অমিত বলশালী।

বড় রংগীত তিস্তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপনদী। উৎস সিকিমে। উত্তর সীমানা বরাবর জেলায় প্রবেশের সময় দক্ষিণ তীরে যুক্ত হয়েছে রম্মাম। এরপর পূর্ব দিকে চলতে চলতে দার্জিলিং-এর দিক থেকে দুটি উপনদী পেয়েছে—ছোট রংগীত এবং রংনু। রম্মাম উঠেছে ফালুট পর্বতের তলা থেকে ছোটো রংগীত টংলুর তলা থেকে আর রংপু সেঞ্চলের বুক চিরে হাজার হাজার ফুট নীচের উপত্যকায় নেমে গেছে। গর্জন শোনা যাবে। উপত্যকায় প্রান্ত থেকে প্রান্ত দেখা যাবে। নদী কিন্তু গভীর খাতে অদৃশ্য। সায়রের মত গলা বাড়িয়েও ওপর থেকে দেখার কোনো উপায় নেই।

বড় রংগীতের কোনো তুলনা নেই। রানীর মত তার চালচলন। চলন তার পাথর আর বালির ওপর দিয়ে। দুপাশে খাড়া পাহাড়, কুঞ্চিত মেষপালের মত জংগলে ঢাকা। বড় রংগীত আর তিস্তার মিলন ও আনফরগেটেবল। কি জিনিস। মাই গড। প্রগাঢ় সবুজ স্বচ্ছ রংগীত নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছে তিস্তার দুগ্ধ ধবলে। প্রকৃতির সেরা ককটেল।

তিস্তার পূর্বদিকে আরো অনেক গিরিনদী নেচে নেচে ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলে গেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেগবান এবং ভরপুর হল জলঢাকা। সিকিমের ন্যাটং পর্যন্ত সমগ্র অববাহিকার বর্ষাবারির ঐশ্বর্য জলঢাকার বুকে। ন্যাটং থেকে এক সময় তিব্বতের সংগে বাণিজ্য পথ চালু ছিল। ১২ হাজার ফুট উঁচু থেকে নীচের উপত্যকার দিকে তাকান। ওই দেখুন রূপালী তলোয়ারের ফলার মত সোজা পড়ে আছে বহু নীচে জলঢাকা। জলঢাকা আমাদের জলবিদ্যুৎ দিচ্ছে। তিনটি ভাজনের নদীর নাম—লিশ, গিশ আর চেল। নদীর বেড ক্রমশই ঠেলে উঠছে। বাস্তুকারদের সংগে ব্রিজ উঁচু করার প্রতিযোগিতা চলেছে।

তিস্তার পশ্চিমের নদী—মহানদী, বালাসন, মেচি। সবাই যুক্ত হয়েছে গংগায়। মহানদী উঠেছে কার্সিয়াঙের পূবে মহালদিরাম থেকে। প্রচুর বর্ষার জলে হুটপুট। শিলিগুড়ি অবধি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ দক্ষিণ পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে। মহানদী তখন ফাঁসিদেওয়া পর্যন্ত তরাই আর জলপাইগুড়ির সীমানাসূচক।

নেপাল আর দার্জিলিংয়ের মাঝে বইছে আর একটি মজার নদী, মেচি। মেচির উপনদীরা সব সীমান্তের ওপারে। বছরের শুকনো সময়ে মেচি গিরিসংকটে মুমূর্ষু। যেই বর্ষা এল লাফিয়ে পড়ল সমতলে তাল ঠুকে, পাথরের গোলাগুলি নিয়ে, সংগ্রাম তার জমির সংগে, অরণ্যের সংগে। মেচি হল পাথরের প্রবাহ।

উত্তর বাংলার আদিবাসী লেপচাদের মধ্যে তিস্তা আর রংগীতকে নিয়ে একটা রূপকথা আছে। লেপচাদের আর এক নাম

রং। লেপচা ভাষায় 'রং-নয়ে' হল নারী, 'রং-ইৎ' হল পুরুষ। দুজনের মধ্যে ভালবাসা। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। দুজনে ঠিক করল, হিমালয়কে বিদায় জানিয়ে, সমতলে চলে যাবে। ঠিক হল তিতির পাখি 'তুতু-ফো' আর গোখরো সাপ 'পারিল-বু', পথ প্রদর্শক হয়ে পেশক পর্যন্ত দুজনকে নিয়ে যাবে। কথা ছিল পেশক থেকে দুজনে জোড় বেঁধে সমতলে নেমে যাবে। পেশকে আগে এসে পৌঁছোলো রং-নয়ে। রং-ইৎ পরে এসে লজ্জায় রং-নয়েকে বলল, আগেই এসে পড়েছো—থিসথা নন-থো। এই হল লেপচা ভাষায় তিস্তা নামের উৎপত্তি। রং-ইৎ পুরুষ মানুষ। দেরিতে আসার লজ্জায় সে আবার জন্মস্থান হিমালয়ে ফিরে যেতে শুরু করল—বন্যায় চারিদিক ভেসে যায়। জীবন নষ্ট হল বহু। তারংং পাহাড় যখন ডুবডুবু, তখন দেবতা 'কইম-ফো' পাখি হয়ে সেই পাহাড়ের চুড়োয় বসে 'চি' মানে মদ ছিটিয়ে রং-ইথকে বললেন—শান্ত হও। নদী নামতে শুরু করলো। তিস্তা বোঝালো দেরি হয়েছে—সব ওই গাইডের দোষে। সব দোষ তোমার ওই পাখির। তিস্তা বুদ্ধিমতী নায়িকা রঙ্গিতের মান ভাঙাতে প্রস্তাব করলো—আমার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, এসো আমি মিশে যাই তোমাতে। রঙ্গিত আর তিস্তার মিলন হল। উত্তরবঙ্গে নিজেকে খুঁজে নিন উপত্যকার আরোহী কুয়াশার প্রেমিকা আঁচলে, চির, পাইন আর ধূপি গাছের বিশালতায় নিজের ক্ষুদ্রতাকে—

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ
সবুজ পাতার পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্যের আঁচ
নদীতে স্মরণ করে একবার পৃথিবীর সকাল বেলাকে
আবার বিকেল হলে অতিকায় হরিণের মতো শান্ত থাকে।

কালান্তর বিল

নদী নিয়ে মানুষে বহুকাল নাকাল হয়েছে। কাজের চেয়ে তার অকাজ বেশী। ভাগিরথীর কথাই ধরা যাক। মুর্শিদাবাদে এতকাল তার কি খেলা ছিল! উত্তর থেকে দক্ষিণে জেলাকে চিরে দু খণ্ড করে প্রবাহিত হয়েছে। দুদিকে প্রকৃতির চেহারা দু-রকম। পশ্চিমের ভূখণ্ড হল রাঢ় পূবের বাগরি। একটা এরিয়েল ভিউ নিলে মনে হবে রাঢ়ের জমি যেন ঢেউ খেলানো নদী। নদীর বুকে কোনোকালে উঠেছিল ঢেউ, অদৃশ্য শক্তি চিরকালের মত সেই তরঙ্গকে স্তব্ধ করে জমির বুকে ধরে রেখেছে। আবহাওয়া উগ্র, একটা শুকনোর ভাব। বাগরি হল নিচু অঞ্চল—নদীবিধৌত, জল সিঞ্চিত। উপচীয়মান ভাগীরথীর জলে বর্ষায় থৈ-থৈ। জেলার দক্ষিণ পশ্চিমে মোর আর দ্বারকা নদীর সংযোগ স্থলে তরুশূন্য উজল প্রান্তরে দাঁড়ালে প্রেতলোকের কথা মনে পড়বে। পিপা মিলনকে আর দক্ষিণ পূবে সেই কালান্তর বিল। চাপ চাপ থক থকে কালো কাদার আকন্ঠ সমুদ্র—আর এক ইংল্যাণ্ড। রোজ রাতে এখানেই বোধহয় বেরোয় হাউণ্ডস অফ বাস্কারভিল! জেলার ৫০ বর্গ-মাইল এই বিল গ্রাস করে নদীয়াতেও ঢুকে পড়েছে।

বন্যার নদী জেলায় অনেক। বাঁশলৈ পাগলা, চোরা ডেকরা, দ্বারকা, হাজার ডোবা, ভৈরব, ব্রাহ্মণী, মোর, কুইয়া। সংগদোষে ভাগীরথীও দুর্দান্ত। পদ্মা থেকে বর্ষার শক্তি ধার করে চারিদিকের পাড় ভেঙে এক সাংঘাতিক খেলায় মেতে আছে। হঠাৎ সাতসকালে দেখা গেল চর জেগেছে। দেখতে দেখতে ঘাস গজাল, হাতির চেয়ে উঁচু ঝাউগাছের জঙ্গলে ছেয়ে গেল চারদিক। জঙ্গল সাফ করে মানুষের চাষপাট বসল। চরগ্রামে রাতের বেলা হ্যারিকেনের সারি, খোলের আওয়াজ। ধানের শিষে হাওয়ার দোলা। আবার আর এক সকালে সব ভোজবাজী। কোথায় কি? কোথায় তীর! কোথায় চর! চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল আপনার রুদ্র নৃত্যে দেয় করতালি লক্ষ লক্ষ হাতে। ভাগীরথী আধ ঘন্টায় এক একর জমি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এমন নজিরও আছে।

নবদ্বীপ নদীরই দান।
'নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাহি ?
যহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।'

কে সেই সাধক যিনি ত্রিনদী-বিধৌত এই ত্রিভুজ আকৃতি ভূখণ্ডে গভীর রাতে নয়টি প্রদীপ জেলে সাধনা করে সিদ্ধ হয়ে নিজেকে ইতিহাসের উদাসীনতায় হারিয়ে যেতে দিয়ে তাঁর নটি দ্বীপের সাধনাকে জেলার নামে অক্ষয় করে রেখে গেছেন? নবদ্বীপ এক সময় নদীদের অভয় অঙ্গন ছিল। জলঙ্গী, ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী, ইছামতী নিজেদের খেয়াল খুশীমত এঁকে-বেঁকে একূলে ভেঙে ওকূলে ভেঙে বেশ ছিল। দূর-দূরান্তরের মানুষ হঠাৎ সংগমে স্নানের পুণ্যার্জনে ছুটে এল, বসল জনপদ। আটশো বছর আগে গৌড় থেকে রাজপাট গুটিয়ে ভাগীরথীর তীরে পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় নবদ্বীপে এলেন লক্ষণ সেন। পিতা বল্লাল সেনও চিনতেন এই জেলাকে।

মাটিতে কান পাতলে মহম্মদ বখতিয়ারের তুরকী ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আর শোনা যাবে না। প্রত্যাপাদিত, ইতিহাসের পাতায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কাহিনীমাত্র। গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা বটতলার প্রকাশনে। শ্রীমন্ত সওদাগরের ময়ূরপঙ্খী বীরনগরের ঘাটে বাঁধা নেই। সেই ঐতিহাসিক ঝড়ের রাতে মা ওলাইচণ্ডী সওদাগরকে পথ দেখিয়ে বীরনগরে নোঙর করিয়েছিলেন। মায় স্থান পাকা হয়েছে বীরনগরে। ভাগীরথী বহুকাল সরে গেছে নিজের খেয়ালে। ওলাইচণ্ডীর মেলায় ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে যখন একটু জলের কথা মনে পড়বে তখন হয়তো অনেক দিন আগের জলোচ্ছ্বাসের শব্দের সঙ্গে কাঠের পাটাতনে নোঙর তোলার শব্দ শোনা যাবে। ফুটিফাটা মাঠে দাঁড়িয়ে কানে ভেসে আসবে নাবিকের গান—হেই হো।

কালচারাল ব্লেণ্ড

নবদ্বীপ থেকে প্রবাহিত হয়েছে আর এক নদী—বৈষ্ণব ধর্ম। রসিক ভাঁড় অমর রসের ভাণ্ডারে। ঘূর্ণির মৃৎশিল্পে ইংরেজ প্রভাব। নবদ্বীপ একটি কালচারাল মিক্স। উঁচু জাতের ব্লেণ্ড। অনেক বছরের প্রবাহে সিজনড। আমাদের সাহিত্যের বাংলা ভাষার প্রচলিত রূপ তৈরী হল নদীয়ার মাটিতে। কালচার উঠল এই ভূমি থেকে। শিখলাম—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।

এবার নদী তুমি আমাদের একবার বাউলের দেশে নিয়ে চল। নিয়ে চল সেই নিকেতন শান্তিনিকেতনে। রাতের অন্ধকারেই যাই গরুর গাড়ি চলেছে বিলম্বিত একতালে। তলায় দুলছে লন্ঠন। একটি তারে একটি সুর—

গুরু আমায় মুক্তি ধনের দেখাও দিশা
কম্বল মোর সম্বল হোক দিবানিশা
সম্পদ হোক জপের মালা
নাম-মণির দীপ্তিজ্বলা
তুম্বীতে পান করব যে জল
মিটবে তাহে বিষয় তৃষা।

'আমি যখন তখন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা-অধিত্যকার মধ্যে অদ্ভুতপূর্ব কোনো একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংস্টোন। এটা যেন

একটা দুরবীণের উল্টোদিকের দেশ। নদী পাহাড়গুলো যেমন ছোটো ছোটো, মাঝে মাঝে ইতস্তত বুনো জাম বুনো খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটেখাটো।' পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় ছেড়ে এখানে এসে বসলেন। 'সেখানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্বদিকের প্রান্তর-সীমায় সূর্যোদয় হইত।' সে উপাসনা আজও চলেছে। চলেছে ময়ূরাক্ষী এঁকে বেঁকে। দুই তীরে মাদলের শব্দ শুনতে শুনতে সাঁওতাল পরগণা থেকে এই নদী এসেছে প্রেমিকের কলগুঞ্জন নিয়ে। খোয়াইয়ের পাশ দিয়ে তার ব্রীড়িত চলন। আমি চলেছি ভাগীরথীতে। সাঁওতালের গান যদি কানে আসে, সে গানে শুধুই প্রেম—

বাড়ীতে তুমি
আমি নদীর ধারে
কি করে আমি তোমায় জানব, প্রেমিক আমার ?
নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থেকো
বাঁশী বাজিও তোমার
শুনবো আমি আসব আমি
আমার প্রেমিক।
যদি কানে আসে—
আত্মতত্ত্বায় স্বাহা
বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা
শিবতত্ত্বায় স্বাহা।

বুঝতে হবে তন্ত্রের পীঠস্থান বীরভূম। এখানেই সেই মহাপীঠ। তারাপীঠ। এখানেই সেই বক্রেশ্বর। বক্রেশ্বর ওয়াটার। বাঘের থাবা। ময়ূরাক্ষী সেচ পরিকল্পনা বীরভূমের কৃষির স্বপ্নকে সফল করেছে। মশানজোড়ের জলবিদ্যুৎ জেলায় আলো এনেছে, শিল্প আসতে শুরু করেছে। পাঁচ-পাঁচটি সতীপীঠের শক্তি নিয়ে এই জেলা আকাশের তলায় মানুষের মেলা বসিয়েছে। আধুনিক জীবনের তলা থেকে সুর উঠছে—

তারে খুঁজলে মিলতে পারে
বাইরে খুঁজলে পাবি কোথা
দেখ আপন ঘরে।

২০টা তিমি

এইবার একটু পা ছড়িয়ে বসব বাঁকুড়ায় কংসাবতী বিশ্রাম করবে। আকাশ যখন উষায় লাল তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবো জলাধারের দিকে। কোনো শব্দ নেই, আকাশের সীমানায় টিপি টিপি পাহাড়। মাঝে মাঝে মাছরাঙা ইলেকট্রিক তারের ওপর থেকে ছোঁ মেরে জলের কিনারা থেকে মাছ তুলে নিচ্ছে। কংসাবতীর জলাধারে বড় শান্তি। যেন সাধনার জায়গা। গ্রাম নদী। মৎস্যাশী বাঙালীর মাছরাঙা মন বড় মাছ মাছ করছে মা গো। কোথায় গেল তারা। এই যে মৎস্যপুরাণ—

মাগুর, সিঙ্গি, বোয়াল, বাচা
পাবদা, কাজলী, পাঙাশ
সিলন, আড়, ট্যাংরা
রুই, কালবোস, গোনি, বাটা
মৃগেল, কাতলা, মহাশোল
ভেটকি, তপসে, ইলিশ
শোল, শাল, পাঁকাল, চ্যাং
ফলুই, ফ্যাসা, পাঁকাল।

হরেক রকম চিংড়ি। জেলায় জেলায় এত জল, এত ড্যাম এত নদী। মাছ কোথায় ভাই! শেরউইল সাহেব লিখছেন ১৮৫০ সালে কলকাতার দু মাইল উত্তর পূর্বে ১৬ থেকে ২৪ ফুট লম্বা ২০টা তিমি মাছ মারা হয়েছিল। তিনি লিখছেন, সুন্দরবন বড় অস্বাস্থ্যকর জায়গা মশাই, দুনু জংগলে রয়েল বেংগল ঘাপটিয়ে আছে, এদিকে জলে কিলবিল করছে, কামট, কেমোট, হাঙর-কুমির, গোটা কতক গণ্ডার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তেমনি মাছ—নোনা জল এসে যায়, তিমিও আছে। তখন তিমি উঠতো কলকাতায়, আর এখন একটা ইলিশ উঠলে পার্ক স্ট্রীটে নিলাম ডাকতে হয়। কালস্য কুটিলা গতি।

কংসাবতীর মাছরাঙা দেখে বিভোর হয়ে লাভ কি। শালি, বোদাই, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, গন্ধেশ্বরী—কেউ কিছুই দেবে না। সেচের জল দিক, তাহলেই যথেষ্ট। দামোদর ১৬২৩ গজের প্রস্থ নিয়ে দেখতে চুল বাঁধার রিবনের মত। জল বইছে। কংসাবতী মেদিনীপুরে গিয়ে, জেলার তলার দিকে পেয়েছে হলদীকে তারপর দুজনে মিলে পড়েছে হুগলীতে। আমাদের অর্থনীতির নতুন ফ্রন্ট হলদিয়া। কলকাতার নিচের দিকে প্রায় ৫৬ জল মাইল দূরে বন্দর হলদিয়া যেখানে ৪০ ফুটের মত ড্রাফট পাওয়া যাবে। বড় বড় জাহাজ ভিড়বে। শিল্পের নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠবে। বিশাল তর্জনীর মত তেলের জেটি মধ্য জলে উঁচিয়ে আছে। আসছে, আরো আসছে। আপাতত এই শীতের বেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার নূরপুরের জেটিতে বসে দেখি সেই মিলিয়ান ডলার দৃশ্য—চোখের সামনে সোজা রূপনারায়ণ এসে পড়ছে হুগলীতে, আর একপাশ থেকে এসে পড়েছে হলদী। সেই ত্রিবেণী সঙ্গমের ডানদিকে হাওড়ার তটরেখা সামনে বাঁয়ে মেদিনীপুর। রূপনারায়ণের নতুন ব্রিজের ধারে দেনানের ডাকবাংলোয় একদিন পূর্ণিমার রাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রইল। এই স্পটটার বেলায় অবশ্যই ফাইভ মিলিয়ান ডলার। মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ধনুক হয়ে আছে সুবর্ণরেখা। ঘাটশীলায় দেখেছি, এখানে দেখলুম, আবার ওড়িশায় দেখবো। সব নদীই বাঁধা পড়েছে রাজ্য ঐশ্বর্যের বিনিময়ে। কিছু নদী এখনো খেয়ালে চলছে। হুগলীর মুণ্ডেশ্বরী, কুন্তি, কানা নদী, সরস্বতী, কানা দামোদর, কানা দ্বারকেশ্বর, বেরিয়া মানাবিয়া, কৌশিকী, বিহুলা সব কটাই হল পোটেন্ট সোর্স অফ ফ্লাড, আদারওয়াইজ ইমপোটেন্ট। আমাদের তিন হাজার একশো সতের মাইল জলপথ পণ্য চলাচলের আর একটি সহজ উপায়। নদী তার নিজস্ব ভালবাসায় মন থেকে মনে সহজ সেতু-বন্ধন গড়ে তোলে। রেলপথ, স্থলপথ বড় কঠিন, বড় বিজাতীয়। এই রাজ্যে বছরে ২০২০০০ টন পণ্য নদীপথে চলাচল করে থাকে। কিন্তু বাদকোর নদীতে এখন পলির ছানি ক্রমশই পুরু হচ্ছে।

শিল্প, কৃষি, খরা, বৃষ্টি, প্রাচুর্য, রিক্ততা, বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস অবিশ্বাসের সুর বেয়ে নদী চলেছে সাগরে। মানব জীবনের সমান্তরাল প্রবাহ চলেছে কোন সাগরে! নদী দর্শন, জীবন দর্শন প্রায় এক।

ভেসে যাওয়া কত কী যে ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভক্ষতি কান্না হাসি
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া
সেই প্রবাহের পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া।

....

রাখিতে চাহিনা কিছু, আঁকড়িয়া চাহিনা রহিতে
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে।

নদীই বৃষ্টি, বৃষ্টিই নদী। অনন্ত লীলা চক্রাকার। মেঘ, বৃষ্টি, হিমবাহ, প্রবাহ জগৎ নিয়মের সুচতুর কৌশল। দি রিভার গোওজ অন রিয়ার্স ইটস গোল। অল দি ওয়েভস এণ্ড ওয়াটার হেসিটেনড, সাফারিং, টোয়ার্ডস গোলস, মেনি গোলস। যেমন চলেছি আমরা শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পারে। আমরা সর্বত্র, আমরা উৎসে, আমরা প্রবাহে, আমরা মিলনে, আমরা বিচ্ছেদে। কেবল মনে রাখি চৈনিক দার্শনিক লাও সজুর কথা!

নাথিং ইন দি ওয়ার্লড ইজ মোর সাপল এণ্ড সফট দ্যান ওয়াটার বাট ইভন দি মোস্ট হার্ড এণ্ড স্টিফ ক্যান নট ওভারকাম ইট।

অনেক তো দূরে আসা হল। অজগরের মতন মোচড়ের পর মোচড় দিয়ে জাতীয় সড়ক চেনা শহর, মানুষজন ক্রমান্বয়ে পেছনে সরিয়ে দিয়েছে। দিনের বেলায় দুঃসহ গরমের জন্য রাত্তিরেই বেশি চলছিল গাড়িটা। হেডলাইট জ্বলছিল, অজগরের মাথার মণি। চেনামহল কয়েক শো মাইল পেছনে ফেলে এখানে এসে পোঁছিতে আজ প্রায় দুপুর।

হালকা বৃষ্টির গুঁড়ো হাওয়ায় উড়ে এল বিকেলের দিকে। ঝিরঝির বৃষ্টি নয়, তার থেকেও অনেক মিহি। বৃষ্টি নেমেছে বলেই যে বাংলোয় আটকে থাকতে হল এমন নয়। আগেই ঠিক করে রেখেছিল, আজকের দিন আর রাতটা এই বাংলোয় কাটিয়ে কাল সকালে আরো উত্তরে যাবে। দিনে গাড়ি চালাতে আর অসুবিধে নেই, এখানে তো শীত। শীত অবশ্য বৃষ্টির মতন মৃদু, গায়ে কাঁপুনি ধরার মতন কিছু নয়। তাছাড়া এই বিকেলে বারান্দার টেবিলটায় শরীর উষ্ণ রাখার উদার আয়োজন। বাংলোর কাঠের বারান্দা একটা অসম্পূর্ণ বৃত্তের মতন। তার এক ধারে ভারী গোলটেবিলটা পেতেছে। টেবিলে দুটো পূর্ণ পাত্র। মুখের কাছে আনলেই স্বর্ণাভ পানীয় থেকে মৃগনাভির গন্ধ আসছে। এখানে বেশ সস্তা। আবগারির খাঁড়া এখানে তেমন করে গলা কাটে না।

কোন এক পাহাড়ী নদী থেকে দুপুরের একটু পরেই দুটো মাছ ধরে এনেছিল বিরজুলাল। এখন বিকেল বেলায় বাংলোর রান্নাঘরে বসে স্টোভ জেলে সেই মাছ কড়া করে ভাজছে বিরজুলালের বউ। রান্নাঘর থেকে বিরজুলাল গরম মাছ ভাজা প্লেটে করে এনে বারান্দায় শোভন আর শাহানার টেবিলে রাখছে। ইতিমধ্যে দু-তিনবার খালি প্লেট নিয়ে গিয়ে আবার ভরে এনেছে। গরম ভাজামাছের গায়ে মাখানো তেলের খুদে বুদবুদগুলো ফাটছে, কিন্তু বাইরে ফাটছে, কিন্তু শোভনের জিভের ওপর আর দাঁতের তলায়। মৃগনাভির গন্ধ মেশানো স্বর্ণাভ পানীয় শোভনের ঠোঁটের ছোঁয়া পুরোপুরি ধুয়ে নিতে পারছে না। শাহানা এতক্ষণ ধরে দুখানা মাত্র মাছভাজা মুখে তুলেছে, আর তার এক পাত্রও এখনো শেষ হল না।

সোজা সামনে তাকালে হাজার দেড়েক ফুট উঁচু পাহাড়। তার খাড়াই থেকে ঝিলমিল দিয়ে জলের ছড় নামছে। চাপড়ে নেমে তা-ই ফেনশুভ্র দুরন্ত নদী। এই বারান্দায় এতটা দূরে তার গর্জন নরম হয়ে কানে বাজছে গানের মতন। বরং রান্নাঘরের স্টোভের শব্দ বেশি জোরালো।

বিকেলটা ম্লান। উজ্জ্বল আলো নেই। তাছাড়া বিকেলও প্রায় শেষ হল, একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে। বাংলোয় বিদ্যুৎ বাতি নেই। বিরজুলালের বউ কেরোসিনের আলো জ্বালাবে। বউটা কাজের। লন্ঠনের চিমনি মুছে রেখেছে। কাঠের মেঝেয় হোলডল বিছিয়ে সযত্নে শাহানা আর শোভনের বিছানা পেতে রেখেছে একটা ধারে। বউটা বিরজুলালের তুলনায় অনেক কালো। তবে শরীর আশ্চর্য সুন্দর। একটি মাত্র কথায় বলা যায়, ভয়ঙ্কর। প্রায় মোটেই কথা বলে না, বোবা বলে সন্দেহ হতে পারে। শুধু সব সময় সারা মুখে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে রেখেছে সুবিন্যস্ত সাদা দাঁতের সারিতে, স্নিগ্ধ ধারালো চোখে কী এক দুঃসহ রহস্য লুকিয়ে রেখেছে। গলায় বড় বড় রক্তবর্ণ পাথরের একটি বিচিত্র মালা। প্রত্যেকটি পাথরে যেন এক ফোঁটা করে স্বর্ণাভ পানীয় জমে আছে। স্বর্ণাভ পানীয়ের ফোঁটাগুলো জমে গিয়ে এখন রক্তবর্ণ।

মেয়েটার নাম জানে না শাহানা। প্রথম দর্শনেই জানতে চেয়েছিল, পারে নি। আর দুপুর নাগাত সৌভাগ্যের মতন বিরজুলাল এসে পড়ার পর, তার সঙ্গে জানা করে পরিচয় হয়ে যাওয়ার পর মেয়েটা এসেছিল। বিরজুলাল সলজ্জ হেসে বলেছিল, আমার জরু। এক নজর দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল শাহানা। নাম জানতে চেয়েছিল, পারে নি। মেয়েটা শাহানার কথার কোনো জবাব দেয় নি। কেবল সারা মুখে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে দিয়েছিল।

—তুমি কী যেন ভাবছো? শোভন শব্দ করে শূন্য পাত্রটা টেবিলের ওপর রাখল।

—ভাবছি না কিছু।

কয়েক শো মাইল মোটর চালিয়ে এসেছে শোভন। অবশ্যই খুব ক্লান্ত। শাহানার তেমন কোনো ক্লান্তি আসে নি। ক্লান্তি আসে নি বলে শেষ বেলাটা এমন করে বসে কাটাতে ভালো লাগছে না। শাহানা তো গাড়ি চালায় নি, শুধু শোভনের পাশে বসেছিল। এখন মেঘলা আকাশ ছায়া ফেলেছে এই বাংলোর বারান্দায়, যদিও বাতাসে আর বৃষ্টির গুঁড়ো ভেসে আসছে না। বিকেলটা ফুরিয়ে এল। সামনের দেড় হাজার ফুট উঁচু পাহাড় আর তেমন স্পষ্ট নেই। তবু এখন একবার বেড়াতে বেরুলে হয়ত ভালো লাগত।

বিরজুলালের বউ নিজে একবার এল মাছভাজা নিয়ে। প্লেটখানা শাহানার দিকে এগিয়ে রাখল। কথা বলল না, তবে দু সারি সুবিন্যস্ত সাদা দাঁত বিকশিত হল একবার। তার তেলসিক্ত কাল ঠোঁট ঝিকমিক করছিল। মাছ ভাজাতে বসে নিজেকে বঞ্চিত করে নি তা হলে বিরজুলালের বউ! শাহানার হঠাৎ হাসি পেল। তখনই আবার বিরজুলালের বউয়ের রান্নাঘরে ফিরে যাওয়ার দিকে চোখ পড়ায় হাসি মিলিয়ে গেল। কী ভয়ঙ্কর সুন্দর শরীর!

কয়েক শো মাইল পেছনে পড়ে আছে কলকাতা। কলকাতার প্রতিদিনের অনুশাসন নির্দিষ্ট। সে-টিলার ওপর এই বাংলো তার সামনের ঢালু জমিতে নদীখাত। [illegible] নদী। তার ওপারে পাহাড়ের খাড়াই থেকে, ফিনকি দিয়ে জলের [illegible] নামছে। বাংলোর বারান্দার কাঠের রেলিং-এর পরেই ফুলের বাগান। বাগানে [illegible] ফুল। [illegible] [illegible]। [illegible] নামবার মুখে দুটো [illegible] গাছে দুটো আনারসের মতন ফুল। শাহানা নাম জানে না।

আরো একবার বেড়াতে এসেছিল এদিকে। পাঁচ-সাত বছর আগে। শোভন [illegible] সবে নতুন বন্ধু ছিল, তাদের [illegible] ছিল। বয়েস কম ছিল, তখন। শুধু [illegible] তখন [illegible] ঢল নামত। উপকরণ অনাবশ্যক ছিল। এখনকার মতন ভালো [illegible] খুঁজে বেড়াতে হত না। সুখের [illegible] তখন সবাই ছিল হাতের মুঠোয়। গত পাঁচ সাত বছরে সব কেমন ভোঁতা হয়ে গেল। খুব ধারালো নখদাঁত কিছু না-থাকলে এখন আর অনুভবে খোঁচা লাগে না। অথচ বাসনা [illegible], [illegible] মেটে গেছে, প্রতিদিন বাড়ছে। সব খোয়া যাবার [illegible] আতঙ্ক সর্বক্ষণ শরীর-মনে সঞ্চারিত।

ভালো করে চোখ খুলে তাকাতে পারছে না শোভন। কয়েক শো মাইল মোটর চালিয়ে এসেছে। অবশ্যই খুব ক্লান্ত। কলকাতার কাজের চাকা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে এক মাসের জন্য। বিশ্রাম চাওয়া, আলস্যে এলিয়ে পড়া স্বাভাবিক। এই শোভন কলকাতায় একবার একটা কাণ্ড করেছিল। এক সান্ধ্য আসরে উত্তো- [illegible]

শাহানার কোমর জড়িয়ে ধরে নেচেছিল, উড়ে উড়ে নেচেছিল। হাতের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে থেকে সুন্দরবনের বাঘের মতন লাফিয়ে এসেছিল শোভন। সেই ঘটনা আর আজকের মধ্যে মাত্র পাঁচ-সাত বছরের ফারাক। এখন শোভন ভালো করে চোখ খুলে তাকাতে পারছে না। বড় মায়া হয়। আজ রাত্তিরে আর কিছু খাবে না শোভন, শাহানাও না। আজ রাত্তিরে শোভন একবারে মরে যাবে। সকালবেলা যান্ত্রিক নিপুণতায় স্টিয়ারিং ধরবে আবার। গাড়ি চালিয়ে আরো উত্তরে যাবে।

শাহানার হাতের পাত্রটি এতক্ষণে শূন্য হল। হঠাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বিরজুলালকে ডাকল শাহানা। সেই ডাকে ঈষৎ চমকে উঠেই শোভন আবার ঝিমিয়ে গেল। সেই ডাক শুনে রান্নাঘরের দিক থেকে এসে বিরজুলাল সামনে দাঁড়াল; সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার বাতাসে মৃগনাভির সুবাস তীব্রতর হল। প্রসাদে তাহলে কার্পণ্য ছিল না। শোভনের তুলনায় বিরজুলালের শরীরের উচ্চতা কম। গায়ের রঙ কাল নয়, তবু শোভনের তুলনায় অবশ্যই অনুজ্জ্বল। নিটোল নয় পেশীগুলো, মনে হয় বড় কঠিন আর কর্কশ।

শাহানা ক্লান্তিহীন অথচ কেমন অলস গলায় বলল, চল একটু বেড়িয়ে আসি, বিরজুলাল। তোমাদের জায়গাটা আমাকে একটু ভালো করে দেখাও। কাল সকালেই তো চলে যাব।

বিরজুলাল শোভনের দিকে তাকাল, শোভন কষ্টে চোখ খুলে তাকায় বিরজুলাল আর শাহানার দিকে। সে এখন উঠবে না, গলায় এখন ইঙ্গিত মিশিয়ে শোভন বলল, কোথায় আর যাবে?

কোনো উত্তর দিল না শাহানা। সামনের ছায়া ছায়া পাহাড়ের খাড়াই থেকে সেখানে ফিনকি দিয়ে জলের ছড় নামছে সেদিকে তাকিয়ে একটু বিচিত্র হাসল।

বাংলোর বারান্দা বাগান পার হয়ে ঢালুতে নেমে এল, সামনে বিরজুলাল, প্রায় পাশে শাহানা। শোভন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে কিনা, পেছন ফিরে দেখল না। গাড়িখানা রয়েছে বাগানের পশ্চিম কোণে। চার চাকার গায়ে বিরজুলাল পাথরের মাঝারি টুকরো চেপে দিয়েছে, গড়িয়ে যেতে পারবে না। গাড়ির গায় ধুলো নেই, বিরজুলাল ধুয়ে মুছে রেখেছে। কয়েকটা শুকনো হলুদ পাতা শুধু এখানে-ওখানে খসে পড়ে হাওয়ায় কাঁপছে।

আজ প্রায় দুপুরে ইস্পাতের দড়ির সেতুটা পার হয়ে বাংলোর কাছাকাছি এলে শোভনের মোটর একেবারে অচল হয়ে যায়। অনেক আগে থেকেই বুঝেছিল, মোটরের অন্ত্রে কোনো কঠিন ব্যাধি হয়েছে। শোভন নিজে কয়েকবার বনেট তুলে রোগ ধরতে পারে নি। অচল গাড়ি ঘিরে দু-দশজন লোক জমে গিয়েছিল। এমন সময় সৌভাগ্য বিরজুলালের উদয় হল। এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটরের বেকেলাইটের ঢাকনা খুলে প্লাটিনাম পয়েন্ট না কী একটা যেন বার করে আনল। এক টুকরো শিরীষ কাগজ দিয়ে পয়েন্টটা ঘসে দিল একটু। রোগমুক্ত মোটর নিখাদ গর্জন করে স্বাস্থ্যের উল্লাস শোনাল।

শোভন মুগ্ধ। তখন থেকে বিরজুলাল লেগে রয়েছে। দুপুরের পর কোন [illegible] নদী থেকে দুটো মাছ ধরে

এনেছে। বিরজুলাল ভালো হিন্দি জানে, বাংলা ইংরাজীও কিছু কিছু। শৈশবে নাকি কোন এক মিশনারি স্কুলে পড়েছিল চার বছর।

ওরা ডাইনে মোড় নিলে ইস্পাতের দড়ির সেতুটা বাঁয়ে রয়ে গেল। এক শো গজ লম্বা সেতুটা তার প্রায় এক শো গজ নিচে ফেনশুভ্র দুরন্ত নদী। নদীটা দুই দেশের সীমানায়। অজস্র কাঠের টুকরো স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, পাথরের চাঁইয়ে আটকেও আছে অনেক। নদীর এপারে আবগারী কর খুব কম, ওপারে খুব বেশি। কাঠকুড়ুনি বুড়িরা ভার মাথায় নিয়ে একসঙ্গে চার-পাঁচজন হাত ধরাধরি করে স্রোতে ঠেলে নদী-পার হচ্ছে। বিরজুলাল জানাল, ওদের কাছে কাঠ ছাড়া আরো কিছু অবশ্যই লুকনো আছে। এমন সব জিনিস লুকনো আছে যা আবগারী করের এক্তিয়ারে পড়ে। জলের তোড়ে বুড়িগুলো টলে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিচ্ছে। হাসছে কিনা এতদূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না, তা সন্দেহ হয়—হাসছে।

মোটর আর গরুর গাড়ি চল রাস্তা নদীর পাড় বরাবর। সেই রাস্ বাঁয়ে রেখে ওরা আবার ডাইনে ঘুরল দু-পাশে কমলালেবুর বাগান। অল্পদূ এগিয়ে একেবারে বদলে গেল নিসর্গ দূরের বড় শহরের একটা ক্ষুদে ভগ্নাং কোনো ভয়ংকর ঘা খেয়ে পাহাড়-না ডিঙিয়ে এখানে এসে ছিটকে পড়েছে বাংলোর দিকে বৈদ্যুতিক আলো নে

এখানে আছে। নদী থেকে সরে এসে ডাইনামোর বিরামহীন ঝিকঝিক কানে বাজছে। এইমাত্র আলোগুলো জ্বলে উঠল। বিকেল কখন ফুরিয়ে গিয়ে চারপাশে পাতলা অন্ধকার। হালকা কুয়াশা ভাসছে বাতাসে।

ছিটকে আসা টুকরো শহরটা পার হয়ে গেলে পথ বড় বিপজ্জনক। শাহানা অল্পেই হাঁপিয়ে উঠল। হয়ত সামনেই চড়াই, কষ্ট করে ওপরে উঠলে আবার হয়ত সামনেই এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মারাত্মক ঢাল। সাহায্য ছাড়া এগোনো শাহানার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শহুরে আলো এখানে নেই। একবার প্রায় কাঠকুড়ুনি বুড়িদের মতন টলে পড়ছিল শাহানা। বাঁ কাঁধে বিরজুলালের থাবার মতন হাত তাকে বাঁচাল। বিরজুলালের হাত ধরে পার হতে হল খানিকটা পথ।

নিজে গাড়ি চালায় বলে শোভনের হাতের তালু কিছু শক্ত। কিন্তু বিরজুলালের হাতের চেটোর চামড়ার তলায় বোধ হয় ইস্পাতের দড়ি আছে। এমন কঠিন হাতে জড়ায়।

পাহাড়গুলির দিকে এগোতে ডাইনামোর বিরামহীন ঝিকঝিক মিলিয়ে গিয়ে দুরন্ত জলস্রোতের গর্জন ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হল। সেখানে পাহাড়ের খাড়াই থেকে জলের ছড় নামছে, এই জায়গাটা হয়ত তার কাছাকাছি। ডানদিকে দূরে দূরে হয়ত তারই কাছে আবার ফিরে এসেছে। অথবা হয়ত তার অন্য দিকে ঠিক তারই মতন আর একটা জায়গা।

বাংলো থেকে এতদূরে চলে আসার কি কোনো মানে আছে? মানে না থাকলেও শাহানার ভালো লাগছে। এখানে অন্তত বাংলোর বারান্দার সেই মৃদু, ম্লান বিষণ্ণতা নেই। মৃগনাভির সুবাসে সেই বিষণ্ণতা কাটে নি। অথচ বাইরে পাতলা অন্ধকার প্রসারিত, হাওয়ায় কুয়াশা ভাসছে, পাথুরে পথ বিপজ্জনক, দুরন্ত জলস্রোতের গর্জন তীব্রতর, বিরজুলালের হাতের চেটোর চামড়ার তলায় ইস্পাতের দড়ি লুকনো। শাহানার শান্তি নেই, সুখের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে ... কিছুই মেলে না। তবু, এই মুহূর্তে ... ভালো লাগছে। এমন মুহূর্তের ... সুখের জন্যও শাহানা অনেক দাম দিতে রাজী।

পাহাড়তলীর গ্রামটাকে ঠিক গ্রাম বলা যায় না। ফাঁকে ফাঁকে দশ-বারখানা খাপছাড়া ঘর। তার একটা বিরজুলালের আস্তানা। ঘরগুলো যে কী দিয়ে তৈরী বলা মুশকিল। কাঠ, টিন, টালি, অ্যাসবেস্টস, ইট, পাথর— সব কিছুর অপূর্ব মিশেল। অথচ দেখতে প্রায় গুহার মতন। ... কাছ থেকেও এখন অন্ধকারে সব একাকার। কেবল প্রত্যেকটি ঘরের চালের ওপর কুয়াশার সাদাটে আস্তরণ স্পষ্ট। বিরজুলাল একটু আগে আঙুল দিয়ে তার ঘর দেখিয়েছে। বিরজুলালের ঘরে, বলা বাহুল্য, এখন কেউ নেই। অন্য ঘরগুলোর কোনোটাই কাছাকাছি নয়। তবু ওইসব

ঘরের বাসিন্দারা কোথায় গেল ? বাইরে অন্ততঃ একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। হয়ত কেউ শহরে-বাজারে গেছে, কেউ ঘরের মধ্যে। সন্ধ্যের পর ধারালো হয়েছে শীত।

—তোমার ঘর কেমন দেখব না, বিরজুলাল ? নিজের গলার স্বর এমন আদুরে-আদুরে হতে পারে শাহানার নিজেরই জানা ছিল না।

দুজন ঘরের মধ্যে এল। বিরজুলাল কেরোসিনের আলো জ্বালতে চেয়েছিল, শাহানা জ্বালতে দিল না। ঘরের ভেতরে বেশি অন্ধকার। প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু বোঝা গেল ঘরের মেঝে পাথরের। একটু পরে চোখ অভ্যস্ত হলে একপাশে একটা বিছানার আদল দেখা গেল। পাথরের টুকরো সাজিয়ে উঁচু করে তক্তা পাতা হয়েছে, তার ওপর বিছানা। সেই বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল শাহানা। ঘরের অন্য পাশে দেওয়ালে জানলার মতন একটা কিছু ছিল। তার ওপর বিরজুলাল বসল। বিরজুলালের মুখ দেখা যাচ্ছে না, চোখও না। যেন গভীর-তর অন্ধকারের মস্ত একটা চাংড়া। ঘরের নিচু দরজাটা খোলা। তবু বাইরে থেকে আলোর আভাস আসছে না। বাইরেও এখন প্রায় সমান অন্ধকার।

বাংলোর বারান্দা থেকে বাইরের খোলামেলায় আসতে চেয়েছিল শাহানা। এখন আবার কী যে হল, অনেকটা পথ হেঁটে বিরজুলালের ঝুপসি ঘরের বিছানায় এসে বসল।

খুব কাছেই পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ঝিরঝির দিয়ে জলের অজস্র ছড় নামছে। তার গর্জনে কোনো কথা বলা অর্থহীন। এই বিছানা নিশ্চয়ই নোংরা। তবে মৃগ-নাভির তীব্র সুবাস ছাড়া এই ঘরে কোনো গন্ধ নেই। শীত আরো বেড়েছে। জুতো সরিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে পাথরের মেঝে ছুঁয়ে দেখল, ঠাণ্ডা। এখন এই মুহূর্তে পাহাড়তলির এই ঘর, উঁচু থেকে পাথরের ওপর জল আছড়ে পড়ার শব্দ আর অন্ধকার ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব কিছু কোন অতলে ডুব দিয়েছে। শাহানা বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছে, সামনে জানালার খাঁজে বিরজুলালের অবয়ব গভীর-তর অন্ধকারের চাংড়া। শাহানার শান্তি নেই।

হেঁটে এসেছে এতটা উঁচুনিচু পথ। এই ঘরে এই বিছানায় এখন একটু গা এলিয়ে দিলে হয়ত ভালো লাগবে। পা দুটো তুলে এনে বিছানায় শরীর বিছিয়ে দিল শাহানা। অনুচ্চ গলায় বলল, বালিশ কোথায় ?

পাথরের ওপর জল আছড়ে পড়ার শব্দে সেই মৃদু কথা বিরজুলালের শুনতে পাওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিরজু-লালের কান অভ্যস্ত। এক চাপ গাঢ় অন্ধকার জানলার খাঁজের নিচে নেমে এসে বিছানার এক কোণ থেকে একটা বালিশ টেনে এনে শাহানার মাথার তলায় পেতে দিল। বিরজুলালের আঙুল জড়িয়ে গেল শাহানার চুলে। নিজের হাত বাড়িয়ে বিরজুলালের চারটে আঙুল শিথিল মুঠোয় ঢাকল শাহানা, হয়ত চুল থেকে সরিয়ে দিতে চাইল। হাতের চেটোয় চামড়ার তলায় ইস্পাতের দাঁড় লুকোনো আছে। এমন কঠিন করে জড়ায়!

পাথরের ওপর অনেক উঁচু থেকে জল আছড়ে পড়ার গর্জন তীব্রতর হল। যেন শুভ্র স্রোতস্বতীর একটা নতুন দুরন্ত শাখা প্রসারিত হয়ে শাহানার টান টান শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। পাহাড়ের খাদ, গুহা আর পাতালের আদিম অন্ধকার লাফ দিয়ে উঠে এসে এই ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই অন্ধকার চিৎকার করে উঠল, জলের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠে নিজের শরীর ফালাফালা করে দিল। সেই অন্ধকারের পরমাণুগুলো ভয়ংকর শব্দে ফেটেফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল চরাচরে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল বেশ খানিকটা সময় পরে। বিরজুলাল আগে, প্রায় পাশে শাহানা। বিরজুলালের হাত ধরে বেসামাল পা ফেলে ফেলে শহরের ভগ্নাংশটায় ফিরে এল। সেখান থেকে আরো কিছু অসমান পথ পার হয়ে পৌঁছে গেল বাংলোর সীমানায়। বাংলোর কাছাকাছি এসে বিরজুলাল ফিরে গেল, উধাও হল অন্ধকারে।

শাহানা বাংলোর বারান্দায় উঠে দেখল, ঘরের দরজা খোলা। এখানে চোরচোর নেই। বিরজুলালের বউ নেই, এতক্ষণ থাকবার কথা নয়। রান্নাঘরের সব কাজ সেরে চলে গেছে।

আজ রাতের মতন বিছানায় মরে আছে শোভন। জানলা দিয়ে ঈষৎ কুপণ আলো আসছে। বিছানার শাহানার অংশে ছায়া পড়েছে শোভনের শরীরের। জানলার ওপাশে খানিকটা দূরে একখানা ছোট ঘর আছে। একটি বন্দুকধারী পাহারাদার থাকে সেই ঘরে। সেই ঘরের সামনে খুদে শহরটার বিশুদ্ধ জলের ট্যাংক। লোকটি জলের ট্যাংক পাহারা দেয়। হয়ত তার ঘর থেকে জানলা দিয়ে একটু কৃপণ আলো আসছে।

শাহানা সন্তর্পণে বিছানায় নিজের অংশে শুয়ে পড়ল। শুয়েই মনে হল, পিঠের তলায় চাদরের কাছে কী যেন বিঁধছে। পিঠের তলায় হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে একটা পাথরের টুকরো তুলে আনল। চোখের সামনে পাথরের টুকরোটা ধরে সব কিছু মনে হল বড় রহস্যময়। বিছানা থেকে উঠে দ্রুত অথচ নিঃশব্দে জানলার পাশে একটু বেশি আলোয় চলে এল শাহানা। চোখের সামনে হাত মেলে ধরল। একটা মসৃণ রক্তবর্ণ পাথরের টুকরো। পাথরটায় যেন মৃগনাভির গন্ধ মেশানো এক ফোঁটা স্বর্গীয় পানীয় জমে আছে। স্বর্গীয় পানীয় জমে গিয়ে এখন রক্তবর্ণ। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, সেই রক্তবর্ণ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

আবার নিজের বিছানায় ফিরে এসে পাথরের টুকরোটা মেঝেয় গড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল শাহানা। ছেঁড়া মালার একটি পাথর কুড়িয়ে নিতে পারে নি বিরজুলালের বউ। নাকি ইচ্ছে করেই পাথরের একটা টুকরো রেখে গেছে তার বিছানায় ? ভয় হচ্ছিল সহজে ঘুম আসবে না। ঘুম এল, কিছুক্ষণ পরে গভীর ঘুম এল।

নিথাদ ঘুমে সারা রাত ডুবে থেকে সকালবেলা শোভন আর শাহানা সব গুছিয়ে নিয়ে মোটরে উঠল। সামনের আসনে পাশা-পাশি বসল দুজন। স্টার্ট দিয়ে স্টিয়ারিং একটানা গর্জনে স্বাস্থ্যের উল্লাস শুনল। বাংলোর ঢাল বেয়ে নেমে এসে নদীর পাড় বরাবর রাস্তায় ডাইনে মোড় নিল। কুয়াশা নেই, বৃষ্টির মিহি গুঁড়ো নেই, অন্ধকারের বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই কোথাও, দুজনের হাসিহাসি মুখে সকালবেলার প্রথম নরম রোদ্দুর।

আরো একটা সেতু দুরন্ত ফেনিল নদীটার ওপর। ইস্পাতের দড়ির ঝুলন্ত সেতু নয়, লোহা আর কংক্রিটের। দ্বিতীয় সেতুটা পার হতে হল। পার হয়েই সামনে একটা বাজার। বাজারের রাস্তায় পৌঁছে পাহারাদার খবর দিল, আরো উত্তরে যাবার পথে ধস নেমেছে, ব্যারিকেড হচ্ছে, এখন ওদিকে গাড়ি যাবে না, এখানে খানিক অপেক্ষা করতে হবে।

গাড়িটা একপাশে রেখে শোভন আর শাহানা নামল। পৃথিবীর সব পণ্য যেন এই রাস্তার দুপাশে মাটিতে চটের ওপর সাজানো। নানা বিচিত্র সবজি, ফুলের গাছ, ফল, চাল, ডাল, নুন, লংকা, [illegible], পেঁয়াজ, মাছ, পরিচ্ছদ, কাচের চুড়ি নানা রঙের খেলনা, খৈনির তামাকপাতা। চালের স্তূপের দিকে তাকালে চট করে চাল বলে চেনা যায় না। অদ্ভুত মোটা আর লাল। এই চাল এরা খায়, ভাবলে কেমন লাগে। বাজারে বড় ভিড়। হাঁটাচলা মুশকিল।

এইসব পসরার পাশ কাটিয়ে এখানে কয়েকটা চায়ের দোকান। শোভন বলল, এস, আবার একটু চা খাই।

শাহানারও তাই ইচ্ছে। দোকানটার বারান্দায় দুখানা বেঞ্চ পাতা। ভিড় হলে বসার জায়গা [illegible] গেল, কিন্তু চায়ের গুঁড়োচলা সত্ত্বেও চায়ে এক চুমুক দিয়েই শাহানা হেসে বলল, অসম্ভব। ভয়ংকর মিষ্টি।

চায়ের দোকানের বারান্দা থেকে নেমে এসে দুটো আপেল কিনল শোভন। এসব কি স্বর্গের বাগানের আপেল ? স্বর্গের বাগান থেকে ছিঁড়ে এনে এখানে চটের ওপর ছড়িয়ে রেখেছে ? এমন সুন্দর আপেল কোনোদিন দেখেছে মনে হল না। আবার গাড়িতে ফিরে এসে বসল। শাহানার সন্দেহ যে শোভন জানে, শোভনের সন্দেহ যে শাহানা জানে। অথচ আপেলে দাঁত বসিয়ে দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মধুর মধুর করে হাসল।

পাহারাদার খবর দিল, রাস্তা সাফ, যেতে পারেন।

শোভন আর শাহানার মোটর নিখাদ গর্জনে স্বাস্থ্যের উল্লাস শুনিয়ে আরো উত্তরে চলে গেল। একরাশ ধুলো উড়ে এল। ছড়িয়ে পড়ল বাজারের নানাবিধ পসরায়।

নয়নতারা দরজার খিল খুলে রাখল। এখন সবে আটটা। এখনও এ পাড়ার আসর জমতে অনেক দেরি।

কিন্তু লোকটি আসে ঠিক সাড়ে আটটায়। আটটায় দোকান বন্ধ করে সোজা এখানে চলে আসে। মোটরে কতক্ষণেরই বা পথ।

এসে দরজা খোলা না পেলেই মুস্কিল। দুম দুম ধাক্কা। আওয়াজে পাড়া অস্থির করে তুলবে। সেই জন্য নয়নতারা লোকটি আসবার আগেই দরজা খুলে রাখে।

কেন লোকটি এমন করে কে জানে। মানে সব সময় তার অবারিত দ্বার সেটা জানাবার জন্যই কি!

নয়নতারা অবশ্য দরজা একেবারে হাট করে খুলে রাখে না। তাতে অনেক বিপদ। উটকো লোক এসে ঢুকবে। মাতাল ঢুকলে তো বিদায় করাই দায়। সোজা এসে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে। কিছুতেই উঠবে না। কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ বা হুড় হুড় করে বমি করে।

শেষ পর্যন্ত শম্ভুলালকে ডেকে বের করে দিতে হয়।

সাতটার মধ্যে নয়নতারা সাজগোজ করে তৈরি থাকে। একেবারে গৃহস্থবধূর সাজ। সীমন্তে সিঁদুর থেকে পায়ে আলতা। পরনে ডোরাপাড় শাড়ি। কপালে টিপ। তখনই পান খায় না। বাবু এসে পান খাইয়ে দেয়। একটি নিজে খায়, আর একটি নয়নতারার মুখে তুলে দেয়।

অবশ্য এসেই পান খায় না।

কি শীত, কি গ্রীষ্ম, এক গ্লাশ সরবত চাই। ঘোলেরই হক ডাবেরই হোক। তার সঙ্গে মোড়ের দোকানের গরম চারটে সিঙাড়া।

এক এক বাবুর এক এক রকম পছন্দ। এর আগে যে বাবু আসত, সে এই গৃহস্থবধূর সাজ দু চোখে দেখতে পারত না। বলত, এ সাজ কেন? এ সাজ তো বাড়িতে অনবরত দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। তোমাদের মতন সাজো।

তোমাদের মতন সাজা মানে অঙ্গে বস্ত্র যত কম থাকে, ততই ভাল।

নয়নতারারা তো জলের মতন। ঘটি, বাটি, গ্লাশ যাতে রাখবে তার রূপ নেবে। যে রংয়ের গ্লাশে রাখবে, সেই রং।

কিন্তু নয়নতারার গৃহস্থবধূর সাজই ভাল লাগে। হয়তো অবচেতন মনে বধূ সাজবার আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে থাকে বলেই।

আজ দশ বছর বাবু আসছে। একটানা।

এ পাড়ায় আসবার কোন বয়স নেই। স্কুলের ওপরতলার ছাত থেকে ঘাটে যাবার আগে মড়ার অবাধ গতি।

তবু এই ধরনের বাবুরা বিশেষ আসে না।

যখন প্রথম আসে, তখনই বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছে। ফর্সা ভারিক্কি চেহারা। গলায় কাঁঠির মালা। কাঁচাপাকা চুল ছোট করে ছাঁটা। চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা।

ঠিক যে ধরনের লোক হরিসভা কিংবা বেদান্ত মঠে কথকতা শুনতে আসে, তেমনি।

প্রথম দিনের কথা নয়নতারার মনে আছে। বেশ স্পষ্ট।

নয়নতারা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। আটটা বাজার অল্প বাকি। তখন তার বাঁধা বাবু কেউ ছিল না। দিনমজুরীর সগোত্র। রোজ দেহ বন্ধক রেখে নগদ রোজগার।

গলিতে একটা মোটর ঢুকেছিল। মোটর কোটরে বাবুর মুখ।

বারান্দায়, রাস্তায় দাঁড়ানো মেয়েদের জরিপ করতে করতে বাবু আসছিল।

হঠাৎ শব্দ করে নয়নতারার বাড়ির সামনে মোটর থেমেছিল।

বাবুটি নেমে নয়নতারার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল, ঘরের মধ্যে চল।

নয়নতারা বাবুকে নিয়ে ঘরের মধ্যে এসেছিল।

দরজায় খিল তুলে দাও।

এ পর্যন্ত ঠিক আছে। এসব কথা সবাই বলে।

তারপর বাবু যা করেছিল, তাতেই নয়নতারা অবাক।

বিছানার ওপর বসে পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট নয়নতারার সামনে ফেলে দিয়ে বলেছিল, এখন থেকে রোজ আমি আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে আসব। আমার জন্য চারটে সিঙাড়া আর এক গ্লাশ সরবত এনে রাখবে। অন্য কোন লোকের আসা চলবে না। আর তোমার ওই উৎকট সাজ-পোশাক ছাড়তে হবে। বাড়ির বৌরা যেমন সাজে, তেমনই সাজতে হবে।

নয়নতারা অবাক হয়েছিল তার কারণ ছিল।

এ পাড়ায় বাঁধা বাবু অনেকেরই আছে, কিন্তু সে সব বাবুরা আসে যায়, মেয়েদের শরীরের স্বাদ নেয়, তারপর বন্দোবস্ত করে।

এ বাবুটি সে সব কিছুই করল না। অথচ একেবারে আগাম ব্যবস্থা।

সেই থেকে বাবুটি আসছে। ঝড়জল বজ্র বিদ্যুৎ উপেক্ষা করে।

শরীর নিয়ে যে বিশেষ মাতামাতি করে এমন নয়, বরং ঘণ্টা দুয়েক গল্প করে, দেয়ালে টাঙানো সেতারটা পেড়ে একটু টুং টাং, তারপর চলে যায়।

বেশ কয়েক দিন আসার পর একটু একটু করে নয়নতারা সব জেনেছে।

বাবুটির মহর্ষি দেবেন্দ্র রোডে মাঝারি সাইজের একটা লোহার দোকান আছে। অকৃতদার। বৃন্দাবন বসাক লেনে ছোট বাড়ি। ঠাকুর চাকরের সংসার।

গৃহের স্বাদ পাবার জন্যই বুঝি নয়নতারার কাছে আসে।

সাহস করে নয়নতারা একদিন বলেও ছিল, সময়ে বিয়ে করলেই তো পারতেন। তাহলে এই বয়সে ভরা-সংসার হত। সুখের আশায়, শান্তির আশায় বেপাড়ায় ছুটতে হত না।

বাবু হেসেছে। ঠোঁট অল্প কুঁচকে মুচকে হাসি।

তাকিয়াটা কোলের ওপর নিয়ে দুলতে দুলতে বলেছে, বিয়ে করার আর সময় পেলাম কোথায়? বাবা হঠাৎ মারা গেলেন আমার ঘাড়ে বিরাট দেনার বোঝা আর কুমারী তিনটি বোনকে চাপিয়ে। অহোরাত্র পরিশ্রম করে বোন তিনটি পার করে, দেনা মিটিয়ে ছোটখাট দোকান গড়ে তুলে দেখলাম বয়সের দুপুর কবে শেষ হয়ে গেছে। এ বয়সে আর টোপর পরা সাজে না।

কিন্তু দোকান বন্ধ করার পর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করত না। মোটর নিয়ে গঙ্গার ধারে, ময়দানে বেড়াতাম, তবু কিসের একটা জ্বালা পাঁজরগুলোর মধ্যে।

গুরুদেব ধরলাম। আশ্রমে এক কলসি টাকা ঢাললাম, কিন্তু বৃথা, মন আগের মতই অশান্ত।

নয়নতারা হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, তারপর আমার কাছে এলেন বুঝি?

হুঁ, কিছু না ভেবেই একদিন এ পাড়ায় চলে এলাম। ড্রাইভারটাও বোধ হয় মনে মনে চমকে উঠেছিল। তোমাকে দেখে পছন্দ হয়ে গেল। তবে তোমার সাজ-পোশাক নয়, তোমার চোখ-মুখ। তাতে যেন এ পাড়ার ছাপ পড়েনি। সোজা তোমার কাছে চলে এলাম।

নতারা-বললু-বাবু এখানে জুড়োতে আসে।

এ পাড়ায় অনেক বাবুই জুড়াতে আসে: …টা এখানকার খামখেয়ালী কথা। অন্য পাড়ার …হলে জ্বালাযন্ত্রণার মাত্রা অনেক বেশী?

কিন্তু নয়নতারা তো এর বিপরীতটাই …ত্যি বলে জানে। এ পাড়ার জ্বালাযন্ত্রণার …ষ নেই। সবাই অমান্য যন্ত্রণার গরল পান …রে নীলকণ্ঠী হয়ে আছে।

বাবু শুধু আসে না, আপদে বিপদে …রেও খুঁজে।

একবার নয়নতারা অসুস্থ হয়ে পড়ে-…ল। অসুস্থতা এমন কিছু নয়। মাথার …ণা আর শরীরের গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা: …ম জ্বরের পূর্বাভাস। আর হলও তাই।

কিন্তু বাবু হৈ চৈ করে, ডাক্তার ওষুধ পথ্য এনে এমন কাণ্ড করেছিল বলবার কথা নয়।

মুখে রাগ করলেও মনে মনে কিন্তু নয়নতারা খুশী হয়েছিল। এই আন্তরিকতার দামটুকুও কম নয়। বিশেষ করে তাদের মতন বঞ্চিত জীবনে।

এ পাড়ায় সবাই সুখের পায়রা। দেহ ঠিক থাকে তো লোক এসে ভীড় করবে। দেহ বিকল হলেই সব বেপাত্তা।

বাবুর আরও একটা গুণ ছিল। বাবুরা ঘরে ঢুকেই বোতলের ফরমাস করে। যার যেমন সাধ্য, যার যেমন সখ।

কেউ আসল বিলিতী খোঁজে, কেউ ধেনো। সঙ্গে চাটেরও রকমফের। মাংসের কাটলেট থেকে ছোলাসেদ্ধ।

এ বাবুর ওসব বালাই ছিল না।

প্রথম দিন নয়নতারা কথাটা পেড়েছিল: কি খাবেন বলুন, কি আনাবো?

ওই যে বললাম সিঙ্গাড়া আর সরবত।

ওতো খাওয়ার জন্য। নেশার জন্য কি আনতে দেবো।

বাবুটি নিজের কণ্ঠির মালার ওপর হাত রেখে বলেছিল, মন্ত্র নিয়েছি, ওসব আমার চলে না।

নয়নতারার বেশ রাগই হয়েছিল। ঘরে আচ্ছা শুকদেব এসে ঢুকেছে তো! বাবুদের কল্যাণে নয়নতারা মাল চাখবার সুযোগ পায়। সে গুড়ে বালি।

মাল টানা নয়নতারার অভ্যাসে

দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু না খেলে কষ্ট হত। আলস্য নামতো শরীরে

তাই সে দুপুরবেলা অল্পস্বল্প খেত।

একদিন মাত্রাটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। তার কারণও ছিল।

পাশের ঘরে [illegible] বাবু বেশ কয়েক বোতল আসল মাল [illegible] গিয়েছিল। সবাই মিলে জোর ফূর্তি করেছিল।

রাত্রে যখন বাবু আসে তখনও নয়নতারার শরীর বিজিবিজ করছিল। সামনের কোন কিছুই স্পষ্ট [illegible] গা ধোয়া নয়, প্রসাধন নয়, আলুথালু পোশাকে বিছানায় শুয়েছিল।

কি, শরীর খারাপ ?

না, শরীর ঠিক আছে। বসুন।

বাবু বসেনি। খাটের কাছে এগিয়ে এসে নয়নতারাকে নিরীক্ষণ করে বলেছিল।

আবার এই সব ছাই গিলে মরেছ ?

কথায় ধমকের সুর।

সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা উঠে বসেছিল। অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলেছিল, কিছু মনে করবেন না। জোর করে বিনি খাইয়ে দিয়েছিল।

এ জিনিস জোর করে কেউ কাউকে খাওয়াতে পারে না।

নয়নতারা একটি কথাও না বলে মাথা নীচু করে বাথরুমে চলে গিয়েছিল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে গা ধুয়ে পোশাক বদলে সরবতের গ্লাস হাতে যখন ফিরে এসেছিল তখনও বাবু দাঁড়িয়ে।

অনেক অনুনয় বিনয়ের পর নয়নতারা বাবুকে বসাতে পেরেছিল।

সেই থেকে মনে মনে নাক-কান মলে-ছিল, আর না। ওসব আর স্পর্শ করবে না, যতই প্রলোভন আসুক।

বাবুদের তুষ্টির জন্যই তো তাদের জীবন। বাবুরা যেমন চাইবে তেমনিভাবে তাদের চলতে হবে।

হঠাৎ নয়নতারার খেয়াল হল দেয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িটার ঢুং ঢুং শব্দে।

নটা বাজল। অথচ বাবুর দেখা নেই।

এমন তো কোনদিন হয়নি। কোথাও খুব দরকারী কাজে থাকলেও একবার এখানে ছুঁয়ে তবে বের হয়।

নয়নতারা উঠে জানলার কাছে দাঁড়াল।

এদিকের আলোটা জ্বলেনি, ফলে রাস্তার কিছুটা অন্ধকার।

ওপারের একটা বাড়ি থেকে ঘুঙুরের শব্দ ভেসে আসছে। নয়নতারা বুঝতে পারল নয়না নাচছে, তার নতুন যে বাবু এসেছে তার খুব নাচের শখ।

এ পাড়ার সব মেয়ের জীবনই বাবুদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় করে। এদের আলাদা কোন ইচ্ছে নেই, কোন সত্তাও নয়।

রাস্তা দিয়ে বেলফুল চলেছে। পিছন পিছন পাঁঠার ঘুগনি।

নয়নতারা একটু সরে এপাশে এল। উল্টোদিকের লাল বাড়িটার সামনে এসে মোটরটা থামে। জায়গা [illegible] ফাঁকা।

এদিকে ঘড়িতে নটা পনের। এমন তো হবার কথা নয়। এই দীর্ঘ দশ বছর এমন হয়নি।

বাবুর অসুখ-বিসুখ করেনি তো। মানুষের শরীরের কথা কিছু বলা যায় না। বিকল হতে কতক্ষণ।

সাড়ে নটা বাজতে নয়নতারা মন ঠিক করে ফেলল।

কাউকে একবার খোঁজ নিতে পাঠানো দরকার। আজ আর বাবু আসবে বলে মনে হয় না।

নয়নতারা কোণের দিকে গিয়ে সুটকেশ খুলল।

শাড়ির ভাঁজে রাখা একটা কার্ড তুলে নিল।

বাবুর নাম ঠিকানা লেখা।

বাবুর নাম, দোকানের আর বাড়ির ঠিকানা লেখা।

কার্ডটা হাতে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে নয়নতারা রকে গিয়ে দাঁড়াল।

শুকলাল, অ শুকলাল।

রাস্তার পাশে রাখা এক খাটিয়ার উপর শুকলাল বসেছিল। শুকলাল একলা নয়, এপাড়ার আরো কয়েকজন দরোয়ান গোত্রের লোক।

এরাই এ পাড়ার ত্রাণকর্তা। শুধু বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণই করে না, দায় বিপদে ছুটে আসে।

যেমন বাবুদের পথ দেখিয়ে নিয়েও যায় আবার দরকার হলে বেয়াদব বাবুদের টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে দেয়।

নয়নতারার ডাক শুনে শুকলাল সামনে এসে দাঁড়াল।

বলুন মাইজী।

তুমি বৃন্দাবন বসাক লেন চেন?

একটু চিন্তা করল শুকলাল তারপর ঘাড় নেড়ে বলল, যে বাবু আসেন তার ঠিকানা তো?

হাঁ।

তিন মাইজী। সবেক নতুন বৃন্দাবন বসাক লেন। ড্রাইভারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

নয়নতারার মনে পড়ে গেল, মোটর যখন অপেক্ষা করত তখন ড্রাইভার শুকলালের পাশে আরও দুজন ফুটপাথে মাদুর বিছিয়ে তাস খেলত। সেই সময় হয়তো খবরের আদান প্রদান হয়েছে।

একবার বৃন্দাবন বসাক লেনে গিয়ে বাবুর খোঁজ আনতে হচ্ছে। বাবু প্রতিদিন আসেন, আজ এলেন না এখনও পর্যন্ত। অসুখ বিসুখ করল কিনা কে জানে। বাবুর নাম জান তো?

বাবুর নাম? এবার শুকলাল থতমত খেয়ে গেল। বাবুর নাম তো তার জানা নেই।

গিরিজা গুহ। নয়নতারা নামটা বলে দিয়েছিল।

বার দুয়েক বিড় বিড় করে নামটা উচ্চারণ করে শুকলাল বলল, আমি যাচ্ছি মাইজী পাত্তা নিয়ে আসছি।

শুকলাল চলে যেতে জানলার গরাদে মাথা রেখে নয়নতারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কোন বাড়ি থেকে ফেলে দেওয়া এঁটোকাঁটা নিয়ে দুটো কুকুরের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধেছে। গানের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, কুকুরদের চীৎকার সব মিলে একটা নারকীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে।

নয়নতারার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। ইচ্ছা হল, আলমারি খুলে একটা বোতল বের করে ঢকঢক করে মুখে ঢেলে দেবে। এই আচ্ছন্ন ভাবটা তাতে কেটে যেতে পারে।

কিন্তু সাহস হল না। কি জানি বাবু যদি এসে পড়ে।

মুখে একটু গন্ধ পেলেই সর্বনাশ।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই শুকলাল ফিরল।

নয়নতারা জানলা থেকে সরে গিয়ে বিছানার ওপর চুপচাপ বসেছিল।

দরজায় শব্দ হতেই চমকে উঠল।

কে ?

নয়নতারা ভেবেছিল বাবু। বাবু ঠিক এইভাবেই দরজার কড়া নাড়ে।

মাইজী, বড় খারাপ খবর।

খারাপ খবরের স্বরূপ শুকলাল বলল। বৃন্দাবন বসাক লেন পর্যন্ত তাকে আর যেতে হয়নি। কিছুটা যেতেই ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে মোটর নিয়ে ফুল আনতে চলেছে। বাবু দোকানে হঠাৎ হার্টফেল করেছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়নতারা শুনল। দু হাতে খাটের বাজুটা চেপে ধরে।

বাবু আর কোনদিন আসবে না। গৃহবধূ সাজা নয়নতারার সামনে বসে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করবে না হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে সবরকমের গেলাস টেনে নেবে না।

শুকলাল একটা ট্যাকসি ডেকে আন। আমি বের হবো।

আনছি মাইজী।

শুকলাল বেরিয়ে যেতে নয়নতারা কাপড়ের আলমারি খুলল। খুঁজে খুঁজে খুব সরু পাড় একটা শাড়ি বের করল। সাদামাটা ব্লাউজ। দু হাতে দু গাছা চুড়ি রেখে বাকি সব অলঙ্কার তুলে রাখল।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই চমকে উঠল।

ট্যাকসিটা একটু দূরে রেখে নয়নতারা নেমে পড়ল। শুকলালকে গাড়ির মধ্যেই বসিয়ে রাখল।

লোকটার আপনজন বলতে কেউ নেই। বিয়ে থা করেনি। তেমন আত্মীয়-স্বজনও কেউ নেই। বাবুর মুখেই কথাগুলো শুনেছিল।

সব কিছু সম্ভবত পাড়ার লোকেরাই করবে। নয়নতারার বুকের মধ্যে টনটন করে উঠল। এমন তাদের জীবিকা, একদিন অসহায়তার ছায়া তাদের জীবনে আসবেই। সেইজন্যই আর একটা মানুষের অসহায় অবস্থা দেখলে অন্তর ব্যথিত হয়ে ওঠে।

দুতলা বাড়ি। উঠানে বেশ কিছু লোকের ভীড়। রাস্তার ওপর গোটা তিনেক মোটর দাঁড়িয়ে।

কাছাকাছি যেতেই বাবুর ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নয়নতারার মনে হল তাকে দেখে ড্রাইভার যেন আঁতকে উঠল।

আপনি ?

বাবুকে একবার শেষবারের মতন দেখে আসি।

নয়নতারার কণ্ঠ অশ্রুস্নাত।

না, না, আপনি যাবেন না। গোলমাল হবে।

গোলমাল ? কেন ?

বাবুর বউ, ছেলে, মেয়ে জামাই সব রয়েছে, তারা গোসা করবে।

বউ, ছেলে, মেয়ে জামাই !

নয়নতারার চোখের সামনে সব কিছু যেন নিষ্প্রভ হয়ে এল। চাপ চাপ অন্ধকারে সব নিশ্চিহ্ন। বাবু তাহলে মিথ্যাবাদী। এতদিন তাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। অসহায়তার ছদ্মবেশ পরে তার কাছে বসে ইনিয়ে-বিনিয়ে যে সব কাহিনী বলেছে সব অসত্য।

বাবুর ওপর নয়নতারার অনুকম্পা পলকে ঘৃণায় পরিণত হল।

সে ফিরে ট্যাকসিতে গিয়ে বসল। শুকলালকে নির্দেশ দিল বাড়ি ফিরে যেতে।

ফাঁকি, সব, ফাঁকি ! সব মানুষ এক। ওদের কাছে সত্য কথা কেউ বলে না। ফাঁকি দিয়ে সোহাগ কাড়াতে যায়।

বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নয়নতারা চমকে উঠল।

ফাঁকি কি কেবল বাবুই দিয়েছে, সে দেয়নি ?

বাবুর মন ভোলাবার জন্য এই যে তার গৃহবধূর সাজ, বাবুর চলে যাবার খবর পেয়ে আজকের এই পোশাক, এসব কি তার আসল সজ্জা ?

কাল যদি নতুন বাবু আসে, তাকে খুশী করার জন্য নয়নতারা চটুল সাজ করবে না, তার পছন্দমত বেহায়াপনা ?

বাবু যেমন ফাঁকি দিয়েছে তাকে, সে কি বাবুকে ফাঁকি দেয়নি !

নিজে যা নয়, তাই সাজার ভান করে।

নারী ঃ নির্বাচনী খতিয়ান

পশ্চিমবঙ্গ এমনিতেই পুরুষ প্রধান। একাত্তরের সেনসাস অনুসারে এ রাজ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত ৮৯২ : ১০০০। দশ বছর আগে একষট্টি সালে ওই অনুপাত ছিল প্রতি এক হাজার পুরুষে ৮৭৯ জন নারী। দশ বছরে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে—হাজার করা তেরো, শতকরা হিসাবে ১-৩। এবার এই সব সংখ্যা ও অনুপাতের হিসাবের পাশে রাখা যাক লোকসভার নির্বাচনে আমাদের মহিলা প্রার্থীদের গত পাঁচটি সাধারণ নির্বাচনের সংখ্যা এবং এবারের নির্বাচনেই বা তাদের কি হাল হয়েছে তার হিসাব।

বাহান্ন সালে স্বাধীন ভারতের লোকসভার প্রথম নির্বাচন হয়েছে। তারপর হয়েছে আরো চারটি—সাতান্ন, বাষট্টি, সাতষট্টি ও একাত্তরে। সাতাত্তরের ষষ্ঠ নির্বাচন আসন্ন। এই ছ' বারে এ রাজ্য থেকে ওই সভায় প্রতিনিধির মোট সংখ্যা যোগ দিলে দাঁড়ায় ২৩০। আর মোট মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা কুল্যে ত্রিশটি। পুরুষ-শাসিত বলে কি স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতের অন্যতম অগ্রসর রাজ্যে মেয়েদের এই হাল হবে? এ প্রশ্নের জবাব খোঁজা বৃথা। কারণ প্রগতিশীল প্রগতি-শীল ডাক ছেড়ে যারা সারা দেশ মাথায় করছেন তাঁরা এবং তাঁদের ভাষায় প্রতি-ক্রিয়াশীল সকলেরই দৃষ্টি এই একটি ব্যাপারে পুরোপুরি অন্ধ।

শুরু করা যাক বাহান্ন সাল দিয়ে। ঠিক তার এক বছর আগে স্বাধীন দেশের প্রথম সেনশাস হয়ে গিয়েছে। ওই আদম-শুমারী অনুযায়ী ওই বছর পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ২,৪৮,১০,৩০৮। এর মধ্যে পুরুষ—১,৩৩,৪৫,৪৪১। নারী—১,১৪,৬৪,৮৬৭। বাহান্ন সালে লোকসভায় এ রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ছত্রিশ। মোট ১৫৭ জন প্রার্থী দাঁড়ান। আর সব দল মিলিয়ে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ওই বছর ছিল মাত্র পাঁচ। ওই পাঁচের মধ্যে কংগ্রেসের দুই—ঘাটালে মৈত্রেয়ী বসু এবং হুগলীতে রেণুকা রায়। কমিউনিস্টদের এক—বসিরহাটে রেণু চক্রবর্তী। বল-শেভিকদের এক—ব্যারাকপুরে সুধা রায়। এবং সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের এক—কলকাতা দক্ষিণ পশ্চিম কেন্দ্রে কল্যাণী ভট্টাচার্য। জয়ী হন শুধু রেণু চক্রবর্তী। তখন বসিরহাট কেন্দ্রটি ছিল দুই-আসনের। সপ্তমুখী প্রতিযোগিতায় সব-চেয়ে বেশি ভোট পান রেণু চক্রবর্তী—১,৭২,১৮২। দ্বিতীয় বিজয়ী কংগ্রেসের পুরুষ প্রার্থী সতাহরি দত্ত পান ১,৪৯,২১২ ভোট।

এবার আসুন সাতান্ন সালে। আসন সংখ্যা সেই একই—ছত্রিশ। পাঁচ বছরে জনসংখ্যা ধরুন আরো ৫০ লাখ বেড়েছে। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা কম করেও বিশ লাখ। মোট প্রার্থী সেবার ছিল ৯৮ জন, মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা যে-কে সেই : ৫। তবে কংগ্রেসের রেকর্ড অন্য দলগুলির তুলনায় ঢের ভাল। পাঁচজনের মধ্যে চার-জনই তাদের। মালদায় তাদের প্রার্থী রেণুকা রায়, বসিরহাটে প্রতিমা বসু, ব্যারাকপুরে লাবণ্যপ্রভা দত্ত এবং নবদ্বীপে ইলা পাল-চৌধুরী। কমিউনিস্টদের কুল্যে একজন—বসিরহাটের সিটিং এম-পি রেণু চক্রবর্তী। নির্বাচনে জিতলেন তিনজন মহিলা রেণুকা রায় পঞ্চমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শতকরা ৪৬-৪৭ ভাগ (৯৭,২১৭) ভোট পেয়ে; বসির-হাটের ডবল সিটে রেণু চক্রবর্তী সপ্ত-মুখী প্রতিযোগিতায় শতকরা ২২ ভাগ (১,৮৬,০০৪) ভোটপেয়ে এবং নবদ্বীপে দ্বিমুখী প্রতিযোগিতায় শতকরা ৬১-২১ ভাগ (১;৩৪;০৮৪) ভোট পেয়ে।

এবার দেখুন বাষট্টির রেকর্ড। জন-সংখ্যা বেড়েছে। মোট ৩,৪৯,৬৭,৬৩৪। পুরুষ ১,৮৬,১০,৮৫১ এবং নারী ১,৬৩,৫৬,৭৮১। আসন বাড়ল না। ছত্রিশ ছত্রিশই থাকল। প্রার্থীর সংখ্যা সাতান্নর তুলনায় কিছুটা বাড়ল, হল ১১৯। কিন্তু মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ঝপ করে কমে গিয়ে দাঁড়াল তিনে। গত নির্বাচনে বিজয়ী তিন-জনই শুধু মনোনয়ন পেলেন। মালদায় রেণুকা রায় (কং), নবদ্বীপে ইলা পাল-চৌধুরী (কং), এবং ব্যারাকপুরে রেণু চক্রবর্তী (কমু)। হারলেন শুধু ইলা দেবী। ত্রিমুখী প্রতিযোগিতায় ৪৩-৭৪ শতাংশ (১,০১,৩৩৬) ভোট পেয়ে রেণুকা রায় এবং পঞ্চমুখী প্রতিযোগিতায় ৫৭-৫৭ শতাংশ ([illegible]) ভোট পেয়ে রেণু চক্রবর্তী জিতলেন।

এর পর এল সাতষট্টি। আসন সংখ্যা চারটি বেড়ে হল চল্লিশ। প্রার্থীর সংখ্যাও বাড়ল, হল ১২০। কিন্তু বাড়ল না শুধু মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা। তিন সেই তিনই রইল। দার্জিলিংয়ে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ালেন ডঃ মৈত্রেয়ী বসু। মালদায় কংগ্রেসের নমিনেশন পেলেন উমা রায় আর ব্যারাকপুরে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বিগত তিনটি যুদ্ধের পরীক্ষিত সৈনিক রেণু চক্রবর্তীকে দাঁড় করালেন। জিতলেন দুজন। দার্জিলিংয়ে চতুর্মুখী প্রতি-যোগিতায় ৩৯-২৭ শতাংশ (৯৭,৪৭৬) ভোট পেয়ে ডাঃ বসু এবং মালদায় পঞ্চমুখী প্রতিযোগিতায় ৪১-৬৮ শতাংশ (১,২৩,১০৬) ভোট পেয়ে উমা রায় হলেন এম-পি।

গত একাত্তরের নির্বাচনে ঘটল নারী-বিপ্লব। চল্লিশটি আসনের জন্য প্রার্থী দাঁড়ালেন ১৯৫ জন। এর মধ্যে নজনই মহিলা। এক দফায় পূর্ববর্তী বারের তিন গুণ। নব কংগ্রেস দিল তিনজনকে মনো-নয়ন—মালদায় উমা রায়, কৃষ্ণনগরে ইলা পালচৌধুরী, এবং বোলপুরে ডঃ ফুল্লরেণু গুহ। আদি কংগ্রেস দাঁড় করাল কাঁথিতে আভা মাইতিকে এবং বোলপুরে বিভা মিত্রকে। সি পি আই থেকে মনোনয়ন পেলেন তমলুক কেন্দ্রের জন্য অরুণা আসফ আলি এবং ব্যারাকপুরের জন্য রেণু চক্র-বর্তী। সি পি এম দাঁড় করাল একজনকে—নবদ্বীপে বিভা ঘোষ গোস্বামী। আর দাঁড়ালেন নির্দল ডঃ মৈত্রেয়ী বসু দার্জিলিংয়ে। ভোট বাকসের গননায় শুধু একজন দিল্লি যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেন। সি পি এমের বিভা ঘোষ গোস্বামী। চতুর্মুখী প্রতিযোগিতায় ১,৭৬,৫৪৩ ভোট পেয়ে একাত্তরে এ রাজ্যের একমাত্র মহিলা এম-পি হিসাবে নির্বাচিত হলেন। অবিশ্যি বছর খানেকের মধ্যে আর একটি মহিলা আসন বাড়ল। বাহাত্তরের উপ-নির্বাচনে বিধান-সভায় নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় তাঁর রায়গঞ্জের এম পির সিটটি ছেড়ে দিলেন। ওই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে লড়াই করে জয়ী হলেন সিদ্ধার্থ-বাবুর স্ত্রী মায়া রায়।

ছ বছর বাদে সাতাত্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে লোকসভার ষষ্ঠ নির্বাচন। আসন সংখ্যা বেড়েছে — চল্লিশের জায়গায় বিয়াল্লিশ। সেই তুলনায় গত বারের চেয়ে এবার প্রার্থীর সংখ্যা কম ১৭১। মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা আরো কম, মাত্র পাঁচ। কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছেন দুজন—পাঁশ-কুড়ায় ডঃ ফুল্লরেণু গুহ এবং জলপাই-গুড়িতে মায়া রায়। জনতা পার্টির এক—পাঁশকুড়ায় দ্বৈরথে নেমেছেন আভা মাইতি। সি পি এমেরও এক—নবদ্বীপে সিটিং এম পি বিভা ঘোষ গোস্বামী। আর গণতন্ত্রী কংগ্রেসের এক—দার্জিলিংয়ে রুথ লেপচানি।

ছ বছর আগে দেশের জনসংখ্যা ছিল ৪,৪৪,৪০০৯৫। পুরুষ ২,৩৪,৪৮,২৪৪, নারী ২,০৯,৫১,৮৫১। কিছু না হোক অন্তর্বর্তী সময়ে আরো ৫০, ৬০ লাখ লোক বেড়েছে এ রাজ্যে। এর মধ্যে অর্ধেক না হোক ৪৫ শতাংশ নিঃসন্দেহে নারী। মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ল না। কংগ্রেস ৩৪টি আসনের মধ্যে ২টি ছেড়েছে মহিলা-দের। সি পি এম ২১টি আসনের মধ্যে একটি দিয়েছে মহিলাদের। জনতা ...টির মধ্যে একটি। আর গণতন্ত্রী কং... তিনটির মধ্যে একটি। সি পি আই ... আটটি আসনে—কোন মহিলা প্রার্থী দাঁড় করায় নি। একই কাজ করেছে ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি। মজার ব্যাপার ... সেদিন আমরা নারী বর্ষ খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে পালন করেছি। আর এটা না... বিশ্ব নারী যুগ। দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নির্বা-চনে এসব ঘটনার কোন ছাপ নেই। ... কোন মহিলা আজ খেদ করে বলেন, ... করে মেয়েরা নির্বাচনে দাঁড়াবে, সব রা... নৈতিক দলের বাসনাই যে পুরু... তাহলে কি তা খুব অন্যায় হবে? তফসিলভুক্ত জাতি ও উপজাতীয়দের জন্য আ... সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। শুধু ... সমাজের শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশের জন্য—... যেমন তারা বঞ্চিত বাইরেও সেই একই ... অর্ধাঙ্গিনীদের।

সোম

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও ভগিনী ক্রিস্টিন

(১৮)

C/o. F. Leggett, Esq.
Ridgely Maner
Stone Ridge,
Ulster Co., Y.K.
1st. Nov. '99

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

তোমার আগের চিঠিটি পড়ে দুঃখ হল। মনে হল তোমার মনে বিষাদ ছেয়ে আছে। এসব গায়ে মেখো না। কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। জীবনও চিরস্থায়ী নয়। জীবনের নানাবিধ কষ্ট-ভোগ সংসারের সবচেয়ে ভাল শিক্ষা দেয় বলে আমি কৃতজ্ঞ-চিত্ত হই।..........মানসিক শিক্ষাবিধি মানুষের স্বপ্নভঙ্গ করে এবং তখন প্রকৃতিস্থ মনে আমি আমার দুঃখভোগের জন্য আনন্দিত হই। এই সংসারে কিছু কষ্টভোগ করতেই হয় এবং আমি খুশি হই যে—সংসারে অন্যান্য দুঃখভোগীদের মধ্যে আমি নিজেও একজন।

তোমার চিঠি কাল পেয়েছি। এ-চিঠি পাবার আগেই আমি তোমাকে চিঠি লিখেছি। বুঝতে পারছি তুমি মোটেও বিশ্রাম নাওনি,—এখন ভালরকম বিশ্রাম [illegible]। স্যানেটোরিয়ামে যাবার আমার [illegible]। থাকার খাবারের জন্য কত খরচ হবে এবং আর নির্দেশাবলী ও দাম ইত্যাদির সব খবর তুমি জোগাড় করতে পারো। তারপর মাসখানেক বা মাসদুয়েকের ছুটি নিয়ে চুপচাপ

থেকে বিশ্রাম করা। ডেট্রয়েট, নিউইয়র্ক বা যে-কোন জায়গা তোমার পছন্দ। যদি তুমি চাও আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকব। তুমি আমাকে জার্ম্মান পড়াবে। পড়াবে তো? টাকা-পয়সার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি এ-ব্যাপারটা খুব সহজে সমাধান করে নেব—নিজের ওপরে বিন্দুমাত্র জুলুম না করেই। গতবার তুমি স্কুলের ছুটিতে ছিলে, ছুটি পাওনি। তাই না? এবারে যা বলছি তাই কর এবং বিশ্রাম নাও। আমি এখন দারুণ সবল এবং স্বাস্থ্যবান, সিংহের মত। যে-কোন কাজের দায়িত্ব আবার নিতে পারি।

পয়সার ব্যাপারে নিজের মনকে একেবারে বিচলিত করবে না। আমি এ-বিষয় সমস্ত ব্যবস্থা এখনই ঠিক করে ফেলেছি। নচেৎ এত কথা তোমাকে লিখতুম না। আমি এবারে কিছু লেখার কাজও করতে চাই।

যদি মনে কর বাড়িতে বিশ্রাম নিলে তোমার ভাল হয়, তবে তাই করো। ছুটি নিয়ে বাড়িতেই বিশ্রাম করো। আমি সেখানেই সানন্দচিত্তে থাকব যদি তুমি আমাকে একটা পত্র মাত্র দাও। আমরা হিন্দুরা বিলাসিতা চাই না। আমি কিছু লিখতে চাই এবং সেই সঙ্গে জার্ম্মান শেখা।—

তাড়াতাড়ি উত্তর দিও।

—ঠাকুরের শরণাগত তোমাদের বিবেকানন্দ।

পুঃ—মিসেস বুল আমাকে অনুরোধ করছেন, তোমাকে বোস্টনে, তাঁর কেমব্রিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতে। সেখানে তুমি একখানি ঘর পাবে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আমাকে দিনকয়েকের জন্য ওয়াশিংটনে যেতে হবে। তারপরে আমি ফিরে আসবার ছুটি পাবো। তবে তুমি যদি ইচ্ছুক হও, তাহলে কালই আসতে পারো। তুমি আমাকে লিখলেই আমি তোমার ভাড়া এবং মাইনে ইত্যাদি পাঠাবো। তুমি যেদিন ইচ্ছে আসতে পারো। বাড়ির দ্বার তোমার জন্য সর্ব্বদা মুক্ত থাকবে। দিনকয়েকের মধ্যে আমি তোমাদের কাছে আসব। মিসেস বুল আমার প্রতি মায়ের মত স্নেহশীলা। আমি তাঁকে যা বলব তিনি তাই করবেন। তোমার এতটুকু সংকুচিত হবার কিছু নেই। ছুটি নিয়ে এসে যাও। মিসেস বুল নিজেই তোমাকে এই নিমন্ত্রণ পাঠাচ্ছেন। আমি তো মনে করি তাঁর কাছে আসা সবচেয়ে ভাল, অন্ততঃ আমার পক্ষে। ছুটি নাও এবং এসে পড়। নিশ্চয় এসো।

(১৯)

রিজলি ম্যানার। ৪ঠা নভেম্বর
১৮৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

চিঠিটা ঠিক পৌঁছেছে। ওটা কেবল আমার নার্ভাস স্বভাবের দরুণ। আমি জানি তুমি এটুকু বুঝবে এবং মার্জ্জনা করবে। তোমাকে কেম্ব্রিজে দেখবার জন্য আমি অত্যন্ত আগ্রহী।

আগামী সপ্তাহে আমি নিউইয়র্কে যাচ্ছি। তারপর ক'দিনের জন্য ওয়াশিংটনে এবং পরিশেষে কেমব্রিজ। নিশ্চয় এসো। আর মনে রেখো, আমি কিন্তু জার্ম্মান শিখব। আমি ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করব বলে দৃঢ়চিত্ত। ফেব্রুয়ারীতে [illegible] সাহায্যে কিছু চালিয়ে নিতে পারব মনে হয়। মাসখানেক সময়ে যদি জার্ম্মান ভাষাতেও এটুকু জ্ঞান লাভ করতে পারি তাহলেই খুশি হব। এখান থেকে চিঠি পৌঁছতে বেশ সময় লাগে। এখানে দিনে একবারই চিঠি বিলি হয় এবং একবার মাত্র ডাকে বেরোয়। অনেক ভালবাসা সহ—

ঠাকুরের চিরশরণাগত
তোমাদের বিবেকানন্দ

(২০)

১২ই নভেম্বর, '৯৯
180 W. 59 C/o Dr. E.

ক্রিস্টিনা,

মিসেস বুল আমার সঙ্গে দেখা না করে বোস্টন চলে গেছেন। আমি গার্নসেদের সঙ্গে আছি এবং সর্দিতে শয্যাগত ওঃ! যাচ্ছেতাই সর্দি। এখানকার ডাক্তারদের মতে আমার কো হল অত্যন্ত স্নায়ুর পরিশ্রমে অবসাদ। এমনকি আমার হজমে গোলমালের ব্যাপারটাও সেই একই কারণে।

এখানে আরও দিনকয়েক আছি। তারপর কোথায় যাবে এখনও জানি না। হেলথ ফুডের ব্যাপারে আমি যথেষ্ট আগ্রহী তুমি নিঃসংকোচে লিখো আমি কোথায় থাকলে তুমি খুশি হ যদি মনে করো আমি ডেট্রয়েটে থাকলেই ভালো, তাহলে এই চি পেয়েই আমাকে চিঠি লিখো, অথবা 'তার' কোরো। আ তৎক্ষণাৎ যাবো। শুধু একমাত্র সমস্যা এখন আমার ডিসপেপসিয়া

মিসেস ফাঙ্কেকে ভালবাসা। তোমাকে চিরআশীর্বা

বিবেকানন্দ।

পুঃ—যদি মনে করো কেমব্রিজে গেলে ভালো তবে পত্র [illegible]।

(২১)

21 West Thirty Fourth,
New York, Nov. 13th

স্নেহের ক্রিস্টিনা,

তোমার চিঠি এই মাত্র পেলাম। এখন আমি নিউইয়র্কে আছি। ডাঃ গ্যারনসে আমার প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখেছেন সুগার ও এলবুমিন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তবে আমার কিডনি এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে হার্ট বড় নার্ভাস, তাকে শান্ত রাখবার জন্য চাই কিছু প্রফুল্লস্বভাবের সঙ্গী যাঁরা স্নেহময় সুহৃৎ, ও শান্ত পরিবেশ। কেবল নষ্টের গোড়া এই ডিসপেপসিয়া। যেমন ধর, সকালের দিকে আমি এত ভাল থাকি যে, মাইলকয়েক হেঁটে আসতে পারি। আর সন্ধ্যেবেলা একপাও হাঁটতে পারি না। খাবার পরেই পেটে গ্যাস হয়—মনে হয় খাদ্যই এজন্য দায়ী। তাই না? ব্যাটেল ক্রিক ফুড আমাকে চেষ্টা করে দেখতেই হবে। যদি ডেটরয়েটে যাই, তাহলে শান্ত পরিবেশ এবং ব্যাটেল ক্রিক ফুড—দুই ই পাবো।

তবে তুমি যদি ব্যাটেল ক্রিক ফুডের সব নির্দেশনা নিয়ে কেমব্রিজে আসতে পারো, তাহলে চুপিচুপি তোমাকেই শুধু জানাচ্ছি—আমরা দুজনে মিলে রান্না করে নেব। রান্নায় আমি বেশ পারদর্শী। তুমি তো রান্নার বিষয় কিছু জানো না। তা তুমি প্লেটফোট ধোবার কাজে আমাকে সাহায্য করতে পারো। আমার যখনই টাকার দরকার হয়, আমি ঠিক পেয়ে যাই 'মা' এ-বিষয় সবসময় খেয়াল রাখেন। অতএব সেদিক থেকে কোন বিপদ নেই। আমার জীবনের বিষয়েও কোন আশংকা নেই ডাক্তারা এ বিষয়ে একমত। এই ডিসপেপসিয়াটা যদি কোনমতে বিতাড়িত হয়! 'খাবার', 'খাবার' সেইটাই হল আসল কথা। সেটা ঠিক হলে আর কোন চিন্তা নেই। ওঃ! কী দুশ্চিন্তাই যে আমার গেছে।

বলত, কেমন হয় যদি আমরা কয়েকজন মিলে কোথাও গিয়ে নিজেদের ঘরবাড়ির কাজের ব্যবস্থা নিজেরাই করি। কেমব্রিজে মিসেস বুলের নিজের একটা আলাদা বাড়ি আছে নিরিবিলিতে—তাঁর স্টুডিও-বাড়ি। সেখানেও ঘর পাবে।

মিসেস বুলের সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক এটা আমি চাই। বড় সাধু স্বভাবের—খাঁটি সাধু স্বভাবের মানুষ তিনি; এমন দেখা যায় না। আমার পরের চিঠির অপেক্ষা করো। মিসেস বুলের সঙ্গে দেখা করে তোমাকে আজই অথবা কাল একটা চিঠি লিখব।

ঠাকুরের চিরশরণাগত
তোমাদের বিবেকানন্দ

১৮৯৬ পর্যন্ত

১৮৯৬ পর্যন্ত বিবেকানন্দের চিঠিপত্র পেয়েছেন শ্রীমতী লুই বার্ক: শ্রীমতী সেনের কাছ থেকে।

শ্রীমতী বার্ক আলমোড়ায় এসে বিবেকানন্দের কয়েক বছরের চিঠিপত্র নিয়ে গিয়েছেন। তারপর যা-ছিল তাই দিয়ে এই লেখা। মেরী লুই বার্ক—সানফ্রানসিস্কোর স্বামী অশোকানন্দের কাছে দীক্ষিতা এবং রামকৃষ্ণ মিশন থেকে গার্গী নাম পেয়েছেন। ১৯৭৫ সালে ভারতে এসে তিনি কিছু দিন মায়াবতী ও বেলুড় মঠে ছিলেন। এবং স্বামীজীর জীবনচরিত রচনায় তাঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় সম্ভবত এই নতুন নামটি পেয়েছিলেন। সানফ্রানসিস্কোতে ফিরে গিয়ে এখন তিনি নিজেকে গার্গী নামেই পরিচয় দেন। স্বামী বিবেকানন্দের উপরে তিন দুখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে তিনি ক্রিস্টিন সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন এজন্য শ্রীযুক্তা সেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাঁর সাম্প্রতিক ভারত ভ্রমণকালে।

তিক্ত-বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি সিস্টারের সাহায্যে সতেরো বছর বয়সে ফ্রাংক মানদের আবাস থেকে আবার পালিয়ে যায়। উক্ত সিস্টারটিও এই ধরনের জীবন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পালিয়ে গিয়েছিল! বাইরের জীবন সম্বন্ধে ফ্রাংক সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। ফলে এক রকম অনাহারে তার দিন কাটছিল। বয়সের চেয়ে ওকে যথেষ্ট ছেলেমানুষ দেখাতো। একটা সংবাদদাতার কাজ পাবে ও এইরকম ভরসা ছিল ওর। কিন্তু তাও পেল না! তবুও প্রতিদিন সম্পাদকের কাছে এসে ধর্ণা দিতে লাগল। অতঃপর সম্পাদক কতকটা কৌতুকচ্ছলে বল্লেন যদি একটা পুলিশ কেসের বিষয় ঠিকমত লিখে দিতে পারে তাহলে কাজটা দেওয়া সম্বন্ধে ভেবে দেখবেন। উনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে একাজ ওর দ্বারায় হবে না। কিন্তু ফ্রাংক বিশদ বিবরণসহ সমস্ত খবর সংগ্রহ করে আনল। সেই থেকে শুরু তার সাংবাদিকতার জীবন। ওর ভেতরে অদ্ভুত এক মিস্টিক ভাব দেখা দিত। একটি দ্বৈত প্রকৃতি। কখনও মনের অবস্থা এমন এক স্তরে পৌঁছে যেত যে মনে হত ও এই জগতে খাপ খাবার মত মানুষ নয়। কেমন যেন ও পূর্বের কোন জন্মে ভারতবর্ষে কোন বৌদ্ধ সন্ন্যাস ছিল এই রকম অনুভূতি হত ওর। প্রথম যখন ওকে আমি দেখেছিলাম, আমি তখন ভারতবর্ষে আসবার জন্য গোছগাছে ব্যস্ত। আমার কাছে খবর এল একটি যুবক আমার সংগে দেখা করতে চায়। আমি জানালাম আমি এখন দারুণ ব্যস্ত আছি,-এক মুহূর্ত অবসর নেই, ভারতবর্ষে যাবার আয়োজন করছি! দুঃখিত!' খবর এল, 'আপনি প্যাকিং করতে করতেই আমি আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলে নেব।' বুঝলাম ছেলেটির বড়ই দরকার আমাকে। ছেলেটি এল। কথা বল্ল। ফিরে গেল। তারপর জানালো সে আমার সঙ্গে নিউইয়র্ক পর্যন্ত যেতে চায়। আমার সেখানে এক বন্ধুর অতিথি হয়ে থাকবার কথা। কিন্তু ও বারবার চাপ দিতে লাগল আমার সংগে যাবার জন্য। আমাকে জিজ্ঞাসা করল ভারতবর্ষে যেতে কত ভাড়া লাগবে। আমি জানালাম ৩০০ শ' ডলার। তখন বল্ল যদি টাকা জোগাড় করতে পারে তাহলে ও আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে যাবে। হঠাৎ কেমন করে এক বন্ধু ওকে ৬০০ শ' ডলার দিল এবং ও আমার সংগে ভারতবর্ষে এল।'

সিস্টার ক্রিস্টিন থামলেন এবং খুব খানিকটা হাসলেন ছেলেটির ঘ্যানঘ্যানে করা জিদের কথা মনে করে। "নশীকে ও কী ভালবাসত।" স্নেহভরে বল্লেন। 'মায়াবতীতে প্রায় ৬।৭ বছর ছিল। তারপর আলমোড়াতে বাজারের দিকে একটি ভারতীয় পরিবারের সংগে ছিল। তারপর হঠাৎ ওর মধ্যে আমেরিকায় ফিরে যাবার জন্য অদম্য ঝোঁক দেখা দিল। ডেট্রয়েটে ফিরে গিয়ে ও খুব অসুবিধের মধ্যে ছিল। প্রথমে ওর টিউবরকুলোসিস্ হল। কিন্তু মারা গেল অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে। ঠিক মৃত্যুর আগে ওকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। ২৬ বছরের (অথবা ৫০?[১]) যুবকমাত্র সে তখন। আমাকে দেখে বল্ল 'অ্যান অ্যারাইজিং থিং ইজ এ লিভিং থিং। আমি বহুবার এসেছি এবং গিয়েছি। আবারও আসব।'

---

(১) এই অংশটুকু শ্রীযুক্তা সেনের হস্তাক্ষরে পাই; মনে হয় টাইপ করবার সময় ভুল করে '২৬ বছর' ছাপা হয়েছে।

ক্রিস্টিনের সঙ্গে বশী সেন

যখন নীরব হলেন, যেন আমাদের উপস্থিতি ভুলে গেলেন। ফ্র্যাংক আলেকজান্ডার তখন ও'কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বশী নিজের গুরুর স্মৃতিচারণ করছিল। সিস্টার ক্রিস্টিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেইসব মনে পড়ে। বল্লেন 'কিন্তু বিবেকানন্দ এদের চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনি অবতার ছিলেন, —আমি বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরকে আমি দেহধারী রূপে দেখেছি।'

আর একদিন আমরা উত্তরের বারান্দায় বসেছিলাম। সামনেই আই ভি জেরেনিয়মের লতা উঁচু হয়ে উঠেছে। ক্রিস্টিনকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল। কিন্তু বল্লেন—না, কোন কষ্টবোধ করছেন না। 'সেই তীব্র ব্যথাটা এখন চলে গেছে। অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। একবার যখন সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল, তখন আমি যন্ত্রণায় জোরে বলে উঠলাম ওঃ, স্বামিজী'। সঙ্গে সঙ্গেই যেন ও'কে সামনে দেখতে পেলাম। একটা কেমন বিকৃত জীব,—কী বলব, ভূত? জানিনা এরচেয়ে ভালো কী বলব—সে যেন আমাকে পাশ থেকে একটা লোহার রড দিয়ে গুঁতোচ্ছিল। আর স্বামী বিবেকানন্দ তাকে বল্লেন, 'থামো, একে তুমি অনেক যন্ত্রণা দিয়েছ।'

তখনই সব ব্যথা থেমে গেল। তারপরে সেরকম তীব্র যন্ত্রণা আর কখনও হয়নি।'

বিকেলের দিকে সূর্যাস্তের আগে একটা বেশ ঝড় বয়ে গেল। উজ্জ্বল আকাশের পেছনে নীলপাহাড়ের সারি প্রতীয়মান। মুহুর্মুহু রংয়ের পরিবর্তন আকাশের গায়ে। এইরকম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা যেন কোন এক উন্নত মনোরাজ্যে চলে গেলাম। বশী বল্লে 'আলো জ্বেলে আমরা একটু ইন্সপায়ারড্ টক্ ১ (দেববাণী) পড়ি। বশী যখন বল্ল সন্ধ্যার অন্ধকার তার আগেই নেমে এসেছে। আমরা আগুনের পাশে সবাই বসলাম। বশী ভূমিকাটি পড়া শুরু করল।

যখন বশী পবিত্র ও শুদ্ধ চিত্তের পরিচয় বোঝাবার জায়গায় এল তখন একটু থেমে ভগিনী ক্রিস্টিনের দিকে তাকিয়ে বল্ল 'যেমন মা।'

এম সি এফ অর্থাৎ মিসেস ফাঙ্কে বললেন 'একদিন উনি (বিবেকানন্দ) আমাকে বলেছিলেন যাঁরা ও'র জীবনের কাজে যোগ দিতে চায় তাদের শুদ্ধচিত্ত হতে হবে। ও'র একজন শিষ্যার ওপরে ও'র খুব আশা ছিল। তাঁর মধ্যে উনি রিনানসিয়েশন এবং আত্মত্যাগের সম্ভবনার পরিচয় পেয়েছিলেন। একদিন আমাকে একা পেয়ে উনি সেই শিষ্যাটির জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন। সব প্রশ্নের উত্তর দেবার পর উনি প্রফুল্লভাবে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে 'ও খুব পবিত্র, শুদ্ধচিত্ত-নয় কী?' আমি বল্লুম 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বামীজী! উনি মনেপ্রাণে শুদ্ধ: ও'র (স্বামীজীর) মুখ স্বর্গীয়ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বল্লেন 'আমি জানি। আমি সেটা অনুভব করেছি। ওকে আমার কলকাতার কাজে একান্ত প্রয়োজন। খুব উৎসাহিতভাবে বল্লেন। (এ সমস্তই সিস্টার ক্রিস্টিন সম্বন্ধে আলোচনা)।

তারপর আমরা ইন্সপায়ারড টক পড়তে লাগলাম।

'কী অপূর্ব'! আমরা বল্লাম।

'আহা, যদি তোমরা তাঁর মুখ থেকে এসব শুনতে। ও'র মুখ থেকে যারা শুনেছে তারা জানে বই থেকে শোনা সে তুলনায় কিছুই নয়।'

'আপনি আমাদের জন্য সেগুলি লিখে রাখলে তো পারেন!'

'মাঝে মাঝে মনে হয়, লিখলে হ। মনে হয় সবই স্পষ্ট মনে আছে। আমার ওপরে কিভাবে যে ও'র প্রভাব হত।—উনি যা বলতেন সবই আমি উপলব্ধি করতাম। উনি প্রথম পংক্তিটি বলবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার জগত থেকে অন্য এক জগতে যেন চলে যেতাম। চিন্তা বা ভাষার মধ্য দিয়ে তাকে আমি প্রকাশ করতে পারি না। নিবেদিতা বরং নোটখাতা নিয়ে বসত। প্রতিটি কথা লিখে নিতো। বুঝতে না পারলে আবার বলবার জন্য অনুরোধ করত। কিন্তু আমি তা পারতাম না। আমি ব্যক্ত করবার চেষ্টার চেয়ে উপলব্ধি করবার দিকে মন দিতাম।

এই 'ইন্সপায়ারড্ টক্স' কী অপূর্ব বিষয়! এমন বাগ্মিতা আমি কখনও শুনিনি। যে কোন বিষয় হোক এবং বিনা প্রস্তুতিতে বলতে হোক, অগনিত শ্রোতার সামনে হোক অথবা একজনমাত্র শ্রোতাকে হোক, কী সাবলিলভাবে অভিভূতকারী ভাষার বন্যায় স্বামী বিবেকানন্দ বলে যেতে পারতেন। তরুণ বয়সে শিকাগো কংগ্রেসের ধর্মসভায়, যখন সম্পূর্ণ বিনা প্রস্তুতিতে তিনি বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তৃতায় সমস্ত শ্রোতার মন জয় করে নিলেন তখনকার কথা একবার ও'কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'স্বামীজি! এমন অলোকিক কান্ড আপনি কেমন করে করেছিলেন?' উনি

---

১ স্বামীজীর বিভিন্ন বক্তৃতার সঙ্কলন। লিপিবদ্ধ করেছিলেন, শিষ্যা মিস্ ওয়াল্ডো।

উত্তর দিয়েছিলেন—'অলৌকিক তো নয়: সবই প্রতিবিম্ব! যা' কিছু একবার দেখা যায় সেইটাই প্রতিচ্ছায়া হয়ে আমার মনে আসে। আমি মনশ্চক্ষে যা দেখছিলাম, তাই বলে যাচ্ছিলাম। যদি উপলব্ধির জমি খাঁটি হয় তবে সবই সহজ হয়।'

'কিন্তু আমাদের মত এইসব হাস্যকর অকিঞ্চিৎকর মানুষদের উনি কেমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন! মাঝে মাঝে ভাবতাম যদি উনি কখনও আমাদের না জানতেন, যদি কখনও আবিষ্কার না-হত যে আমরা পাশ্চাত্যের হয়েও আসলে প্রাচ্যের,—তাহলে? তারপরই মনে হত,—নাঃ, এতো তাঁরই মহত্ত্ব যে আমরা যাই হই তিনি আমাদের গ্রহণ করবেন, যা আমাদের দেবার,· তা দেবেন। কী বিচিত্রই না ছিল আমাদের দলটি। একটি তো ছিল অভিনেত্রী তাকে উনি বলতেন 'বেবী'। 'বেবী' হবার বয়স তো তার কবেই পেরিয়ে গিয়েছিল তবুও বেশীর ভাগ সময় তার কেটে যেত নিজেকে খুকী দেখাবার জন্য। তারপর সেই বৃদ্ধ ডাক্তার মাথায় চকচকে একটি টাক ছিল। স্বামীজীর বক্তৃতা বা আলোচনার পর যখন সবাই একে-একে চলে যেত, তখন ঐ চকচকে টাকের ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে জোরে বলে উঠতেন 'অতঃপর স্বামীজী, আমি হলুম সেই পরম ব্রহ্ম—এই হল মোদ্দা কথা।'

"It never failed to be his ultimatum."

আর ছিলেন মিস ওয়ালডো। তখনই বয়স যথেষ্ট হয়েছিল। নিয়ম, নিয়মের বাঁধনে বাঁধা চিন্তার ধারা। স্বামীজীর কথাগুলি সব লিখে নিতেন। কাজকর্ম সব কিছুই নিয়মিত ঠিকভাবে করতেন। তবু তাঁর চিন্তা অসীমকে কী করে সসীমের সীমানায় ধরা যায়? উনি লিখেছিলেন এই ইনসপায়ারড টক শুনে আমি খুবই বুঝতে উপকৃত। কিন্তু where is the infinite to sweep that limitless vision of Swamiji......?

তারপর মিসেস ফাঙ্কে। উনিই আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন স্বামীজীর বক্তৃতায় ওঁর সঙ্গে।

What charm and beauty she has, yet she was worldly.

মিস ডি— আর একজন। ইনি থাউজ্যান্ড আইল্যান্ডের সেন্টলরেন্স নদীর ধারে আমাদের থাকতে কটেজ দিয়েছিলেন।

"So generous and conscientious and a little fearfull of the motley array we were, in her orderly, conventional life."

দু'পাশে সারিবদ্ধ বনস্পতির মাঝ দিয়ে প্রস্তুত পার্ক রোড ধরে আমরা হাঁটতে যাই। দু'দিকে সুন্দর করে কাটা বেড়ার সারি। সামনে নন্দা দেবীর শৃঙ্গরাজি। আলমোড়ার সর্বোচ্চ পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি সাদা বাড়ী—আকর্ষণীয় সুন্দর। গেটকে লেখা নামটি পড়লুম—'কর্ণেল হাউস'। বাড়ীটা খালি ছিল। বৃদ্ধ চৌকীদার দরজা খুলে বাড়ীটা দেখালো এবং বল্ল ইচ্ছে করলে এ-বাড়ীটা আমরা নিতে পারি। আমরা 'পাইন' বাড়ীতে ফিরে এসে ঐ বাড়ীটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শতমুখ হয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে 'কর্ণেল হাউসের' অধিকারী দেখা দিলেন। বল্লেন আমরা ওঁর বাড়ীটা নিতে পারি এই 'পাইনের' ভাড়াতে। ওঁর বাড়ীতে ঘর, জায়গা বেশী। সব দিক দিয়ে সুবিধের।.. সিস্টার ক্রিস্টিন বলতে লাগলেন আমার (অ্যাকশা) জন্যই এটা সম্ভব হল। আমারই ইচ্ছা ছিল এই বাড়ীটা সম্বন্ধে। বলতে লাগলেন খানিকটা সাধনার দরুণ—এই ফল আমি পেলাম। তবে এটা একটা পরীক্ষা মাত্র। এরপর আরও আসবে। বল্লেন—

"This is a great power and you must think well if you do really want it, before you set your heart upon anything."......

নীচের বাড়ীটা ছাড়বার আগে কদিন আমাদের বেশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কেটেছে। মনে পড়ে একদিন, বিকেলে বেশ গরম ছিল। একটু ধুলো উড়ছিল। 'কুটীর' থেকে তিনজন সন্ন্যাসী

ভগিনী ক্রিস্টিন

এসেছিলেন এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা ছিলেন। সিস্টার ক্রিস্টিন সেদিন খুব উৎসাহের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা করেছেন। বলতে বলতে উত্তেজনায় এবং বাগ্মীতায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। পরে অবসাদে এলিয়ে পড়লেন।

ক্রিস্টিনের চিঠি

বশী সেনকে লেখা

স্নেহের বৎস,,

ভেরমন্ট।৬ জুলাই।১৯১৯

পরশু দিন বিশেষ করে তোমার কথা মনে হচ্ছিল। চিন্তাতেই এত শক্তি ক্ষয় হল যে বৎস একখানি চিঠি লেখবার মত শক্তি আর থাকল না। শেষ পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে চলে গেলাম। সেখানেই ধ্যানে বসলাম। আমার বাবা,—যাঁকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করতাম তিনি দেহরক্ষা করেন ৩রা জুলাই, স্বামীজী ৪ঠা জুলাই এবং ফ্র্যাঙ্ক ১৩ জুলাই। কথিত আছে জ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবিত বা মৃত কারো জন্য শোক করেন না।....বৎস তুমি জানো কি পাশ্চাত্যের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আজকাল গীতার তত্ত্বে মনোনিবেশ করেছেন এবং স্বীকার করছেন গীতার মধ্যে তাঁরা এমন কিছু জানছেন, পাচ্ছেন—যা অন্য কোথাও পান নি। আমি তোমাকে এ বিষয় বহু উদাহরণ বলতে পারি।

টাবি আমাকে যে প্রবন্ধ ১৯১৮ সালে পাঠিয়ে ছিল সেটা কিন্তু আমি এ পর্যন্ত পাই নি। তুমি লিখেছিলে ও পাঠাবে

এবং আমি সেই প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসে নি। পথে হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। বরং ১৯১৯ সালে তুমি যেটা পাঠিয়েছিলে সেটা বহু আগেই পেয়ে গিয়েছি। তোমার একটি পংক্তি পড়ে আমি রীতিমত খুশী হয়েছি—'আমি এবারে নিজের বইয়ের জন্য কাজ করছি।' আমি পড়তে গিয়ে বুক-এর জায়গায় হুক পড়লাম প্রথমে। মজার কথা হয়ত এটা একদিন একাধারে হুক ও বুক হয়ে দাঁড়াবে। তবে তুমি নিশ্চয় এতটা ধৃষ্টতা করবে না—'ওয়ার্কিং অন ইয়োর ওউন হুক' নিজের *বিশ্রাম, ছুটি, সব পণ্ড করে পরিশ্রম করছ বাবা?*

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবেনের কথা। আমাদের জাহাজ আসছে এবং ও যদি মাস কয়েক আগে আসতে পারে তাহলে আমরা এমন কিছু পাবো যা ও পায় নি। ডেট্রয়েটে মার্চ মাসের সেই দিনের পর প্রায় বছর খানেক তো হল।...

এবারে প্রিয় বৎস, ২৫শে মের চিঠিখানির কথায় আসছি—তোমার ও নাগের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল।...বড় দুঃখের কথা যে কাজ ভারতবর্ষের মহৎ কাজের মধ্যে পরিগণিত হতে পারত তা যাঁজেই ধ্বংসের রূপ নিল। এত বড় ভুল যে কি পরিমাণ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, একটি ভুল সমস্ত কাজকে ধ্বংস করে দেয়।....

তানতিন তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটি এক্ষুনি মিটেয়ে ফেলবার জন্য চাপ দেবেন। কিন্তু মনে রেখো যদি তুমি তাই কর তাহলে উনিই তোমাকে উল্টে দোষ দেবেন এই বলে যে, পরিস্থিতিকে নিজের দখলে রাখবার মত যথেষ্ট মহত্ত্ব এবং শক্তি তোমার মধ্যে নেই। আমি লক্ষ্য করেছি আগেও উনি তোমাকে এ রকম করেছেন এবং আমাকেও স্কুলের ব্যাপারে। প্রথমে আমার স্কুল ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উনি খুব উৎসাহসহকারে আমাকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পর দিনই আমাকে আমার অকৃতকার্যতার জন্য দায়ী করলেন। তোমার সমস্যাতেও ঠিক তাই।(১)...উনি ঠিক বুঝতে পারেন না আমরা কী অবস্থায়, কী পরিস্থিতিতে থাকি। আমি হয়ত তোমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারতাম বৎস; কিন্তু তার দরকার নেই। তুমি আমার চেয়ে বেশী পরিষ্কার দেখতে পাও এবং....ও স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করো। তাঁদের বলো তোমাকে কোন ভুল যেন তাঁরা করতে না-দেন। আমি যতদূর বুঝতে পারছি পরিস্থিতিকে শুধরে নেওয়া যাবে না। এখনই বা অদূরে তোমাকে অবস্থাচক্রে পড়ে ওখান থেকে স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্যবাধকতায় ছেড়ে চলে আসতে হবে। কে-যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে তাতে তোমার আর কোন দায়িত্ব নেই,—তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। তুমি ইচ্ছে করলেই এই মুহূর্তে ছেড়ে চলে যেতে পারো, অথবা অপেক্ষা করে থাকতে পারো। কতক্ষণে পারিপার্শ্বিক চাপ তোমাকে ঠেলে বের করে দেয়। যদি তুমি প্রথম পথটি বেছে নাও তাহলে বিচ্ছেদের ব্যাপারটি অনিবার্য। ডঃ ক্ষেকে দুঃখ দিতেও কষ্ট হবে এবং যদি সেজন্য তাঁর কোন ক্ষতি হয় সেটাও মনকে ব্যথিত করবে। তাছাড়া অন্য কোথাও গিয়েও হয়ত তুমি এই রকম পরিস্থিতির (কিঞ্চিৎ অন্যরূপে) সম্মুখীন হতে পারো। তবুও এই সব থেকে বেরিয়ে এলে হয়ত নিজের স্বাস্থ্যটি রক্ষা করতে পারবে যেটি সবচেয়ে বেশী দরকার। আর তোমার স্বভাববিরুদ্ধ এই যে চাপের মধ্যে পড়েছ তাইতে স্বাস্থ্যটি তোমার সবচেয়ে বেশী ভেঙে পড়েছে। অতএব এই তিনটি ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়া দরকার বৎস! কীভাবে করবে সে তুমি জানো।

To look upon this....as an opportunity to practise certain great ideas — to work for work's sake without any thought of result, to watch every thought, feeling and emotion and conquer it at its source; to turn resentment into magnanimity, irritation into sweetness and calm, repression into freedom. I know of no greater 'Tapasya' than such a conquest. It is horoic. I know that if you decide upon this, your time of discipline will be short. Circumstances will free you and there will be no pain, no regret, no remorse, and above all you will never meet the same conditions again. Childe, (সব সময় এইরকম বানান লিখতেন ক্রিস্টিন) this I have learned after years of suffering. Had I known it fifteen year, ago. I should not have had this breakdown. Possibly I could not do it now but my health is not yet robust and I shall not risk it. Perhaps this absence of more than five years is the force of circumstances freeing me ...... I am glad for I have no more attachment or duty."

(উক্ত পংক্তি কটি হুবহু ক্রিস্টিনের ভাষায় উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। এই উক্তির মধ্যে ওঁর নিজের ব্যক্তিগত ব্যথা ও দুঃখের অনেকখানি উল্লেখ আছে। স্বামীজী যে নারী শিক্ষার ধারা নিয়ে থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে ক্রিস্টিনের সঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছিলেন এবং যা নিয়ে গুরু-শিষ্যা দুজনেই স্বপ্ন দেখতেন, এবং যে স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য স্বামীজী দীর্ঘ ৭ বছর অপেক্ষা করে থেকেছেন বার-বার চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন 'কবে ভারতবর্ষে আসবে' (যে সব পত্র এই গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে) কার্যত সে স্বপ্ন ক্রিস্টিন সার্থক করে তুলতে পারেন নি। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ভুল বোঝাবুঝির মাঝখানে পড়ে তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল। সে সব আলোচনা এত দিন বাদে অর্থহীন। কিন্তু সরে যাবার দুঃখ বহু দিন ধরে তাঁকে পীড়িত করেছে এবং গুরুদেবের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারবার যাতনায় ভুগেছেন। এইখানেই ক্রিস্টিন ও নিবেদিতার পার্থক্য! ক্রিস্টিন যেখানে হার মেনে অন্তরালে চলে গেলেন—নিবেদিতা হলে ফ্লাইট বা ফাইট এর জোরে স্ব-মহিমায় অধিষ্ঠাত্রী [illegible]ক্রন হয়ত।)

'দেখছো তো বৎস আমরা দুজনে একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। ফ্লাইট বা ফাইট-এর জোরে নিজেকে বাধা, বিরক্তি ও চাপ থেকে মুক্ত করে ফেল। যে পথ তুমি গ্রহণ করবে, তোমার পক্ষে সেইটাই হবে ঠিক। আর আমি চেষ্টা করব তোমার সে চেষ্টাতে আরও শক্তি জোগাতে। আমরা দুজনে মিলে সব বাধা—এই জীবনেই জয় করে ফেলব।

Jai, Jai, Blessings of the beloved little head. Than art the radiant one. All ever love.

গোখলের চিঠি

ক্রিস্টিনকে লেখা জি কে গোখলের (স্বহস্ত লিখিত) পত্রাবলী।

১

১৩।১ ওয়েলেসলী স্কোয়ার ইস্ট
৮ই ফেব্রুয়ারী। ১৯০৪

প্রিয় ভগিনী ক্রিস্টিনা,—

গত দিন আপনাকে যে বিষয় বলেছিলাম, উকিল যা বলেছেন,—সেটা বুক পোস্টে আজ পাঠালাম।

আগামীকাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে

(১) তানতিন তাঁর Dominant স্বভাবের জন্য অনেকের কাছে অপ্রিয় হতেন। এ চিঠিতে আরও আছে কিন্তু উল্লেখ অযথা মনে করি।

ছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেক্ট কমিটির বিলের ব্যাপারে কাল বেলা ১১টায় মিটিং হবে সেজন্য দেখা করবার আনন্দটি আজকে স্থগিত করে অন্য দিনের জন্য থাকল।

With kind regards
Sincerely G. K. Ghokhale

(২)

৮৯ চক্রবেড়ে রোড।
৮ই জানুয়ারী। '০৫

প্রিয় ভগিনী ক্রিস্টিনা,—

আগামী মঙ্গলবার আপনার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম এবং সেই আনন্দের প্রতীক্ষায় ছিলাম, কিন্তু স্যার হেনরী কটনকে অভ্যর্থনা জানাবার Public address মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় নির্ধারিত হয়েছে এবং আমাকেও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে। অতএব মঙ্গলবারে যেতে পারব না বলে দুঃখিত। বুধবার তো আপনার পর্দানশীন মহিলাদের দিন। আশা করি বৃহস্পতি-বারে আপনার যথারীতি অবসর থাকবে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টেতে যাবো যদি না এর মধ্যে আপনার কাছ থেকে অন্য রকম খবর পাই......

চিঠিটির বাকী অংশ পাওয়া যায় নি।

(৩)

৯৪নং চক্রবেড়ে লেন। বালীগঞ্জ
১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৬।

My dear Sister Christina,

দেখলাম রবিবারে আমার দুটি engagement আছে। এবং সেগুলি এড়ানো সম্ভব নয়। তাই রবিবারের বদলে আমি শনিবারে আসব। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

From ever G. K. Ghokhale

(এই সময় ক্রিস্টিন ১৭নং বোসপাড়া লেনে থাকতেন)

(৪)

৯৪, চক্রবেড়ে রোড। ৩০শে মার্চ, '০৬

প্রিয় ভগিনী ক্রিস্টিনা,

আপনার বই পাঠালাম। আরও আগেই ফেরৎ পাঠানো উচিত ছিল আমার। পাঁচজন ভারতবাসী যে সাক্ষ্য দিয়েছে (আমি তাদের মধ্যে একজন) ১৮৯৭ সালে ইংলণ্ডের এক্সপেন-ডিচার কমিশনের কাছে, তার একটি কপি এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। ভারতীয় রেভেনিউ বিভাগের শাসন-ব্যবস্থা ও তার বাস্তবিক বা কার্যকরী দিকটা (ভবিষ্যতের আদর্শের প্রশ্ন তো আছে।) এই ভল্যুমে সব জানানো হয়েছে।

এখন বিদায়—ডিসেম্বর পর্যন্ত। গতকাল তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্য খুব দুঃখিত। গত সন্ধ্যাতে যখন আমি আমার শেষ এনগেজমেণ্ট শেষ করলাম, মনে হল এবার মরে ধপ্ করে পড়ে যাবো। আন্তরিকভাবে আশা করছি যে, পাহাড়ে গিয়ে আপনার শরীর ভাল হবে এবং ডিসেম্বরে যখন কলকাতায় ফিরে আসব, তখন আপনার আগের চেয়ে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভাল দেখব।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন, বন্ধু আমার।

From ever Sincerely
G. K. Ghokhale

একটি ভিজিটরস্ কার্ডসহ চিঠি। কার্ডটি এইরূপ—

Visitors card,

Admit Miss Christina Greestidel to the meeting of Legislative Council of the Governor-General to be held at Government House, on Tuesday, the 28th March at 11 A.M. Issued through the Hon'ble Mr. G. K. Ghokhale by order of the President.

J. M. Macpheron
Sect. to the Covt. of India
Legislative Deptt.

অস্পষ্ট সই—

Registrar Legislative Department
This order is not transferrable

সঙ্গের চিঠিটি এইরূপ :—

৩৬নং রোল্যাণ্ড রো
২৩শে মার্চ। বছর ?

(৫)

Dear Sister Christina,

Bhupen Babu's resolution on the Edu-tional Service which was expected to come up to-morrow, has been postponed to the Simla Service. So there will be nothing interesting to-morrow. The Budget in its final form will be presented,—which won't take more than a few minutes and we shall adjoin to the 27th. I send you tickets for 27th and 28th. I will most probably speak on the 28th, and in any case not before 3 P.M. on the 27th I fear most of the speeches on the 27th will be provincial—each member speaking of the needs of his province. I don't expect that will interest you, and in any case a whole day of that sort of thing is sure to tire you.

I think it will save me a good deal of time, if you will kindly come here on Saturday in the afternoon. The days are hot and you must not leave home till after 5 P.M. If you start at 5, you will probably be here about 6.15 P.M. But this is on the assumption that the trouble will be too great for you,—for you, one not well. If however it would be better for your health, I will come to your place more, personally.

From ever
G. K. Ghokhale

P.S.—

After writing the above, it strikes me that I had better come to Bosepara Lane on Sa-turday. If I am here, members of Council are sure to come to consult me about one thing or another. Moreover I must see Dr. Bose once be-fore I go and perhaps I had better go to him on Saturday. I wish to go to his place about 5 P.M. and will came to Bosepara as soon as I can leave Dr. Bose. So it is settled that come to your place on Saturday. Don't have any tea for me as I shall have it here before starting and probably Mrs. Bose may give me to drink a cup at her home.

খোজা কাহিনী

নারায়ণ দত্ত

'ক্ষুধিত পাষাণে'র সেই তুলোর মাশুলে কালেকটরের মত আপনি আমি যদিব। কপাল জোরে মধ্যযুগের সেই নবাবী হারেমের দ্বারপ্রান্তে হাজির হই, তবে আমরাও দেখব—পর্দার সম্মুখে ভীমকায় কিংখাবের সাজপরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের ওপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।' দেখব শুধু মুঘল হারেমের দুয়ার গোড়ায় নয়, মুঘল দরবারে সম্রাটের দু পাশে দাঁড়িয়ে পাখীর পালকের পাখা নিয়ে হাওয়া করছে তারাও সেকালের কাফ্রী খোজা, সম্রাট যখন তাঁর চতুর্দোলা করে চলেছেন প্রমোদ ভ্রমণে কিংবা রাজ্য জয়ে, তাঁর পাশে পাশে পতাকা বয়ে যারা চলেছে, যারা চলেছে ঘোষণা করতে করতে, তারাও সেই মধ্যযুগের এক বিকৃত সৃষ্টি হাবসী খোজা। আবার গভীর রাত্রে দিল্লী আগ্রার প্রাসাদে মিনারে যখন নূপুর নিক্বণ শান্ত হয়ে আসে, দরবারের আলো নিভে যায়, ঝাড়-লণ্ঠনের আলো হয়ে আসে নিষ্প্রভ, মুঘল হারেমের আলোর মহলে যেখানে গাটিয়ে বসে, মহলে মহলে বাঁদী বেগমাদের চোখে জড় হয় রাজ্যের ঘুম, সন্তর্পণে পদক্ষেপে যারা সমান উৎসাহে জটিল দুরূহ রাজকার্য কিংবা রাজকুমারী বা বেগম সাহেবার গোপন লিপিকা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়, তারাও এই পৃথিবীরই কোন দূর দূর প্রান্ত থেকে ছিনিয়ে আনা এই কাফ্রী খোজার দল।

দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুর শিক্রি থেকে অনেক দূরে—আফ্রিকার কোন গাঢ় তমিস্রঢাকা অরণ্যসঙ্কুল কুটীর থেকে কেড়ে আনা মানবক এরা। অথবা বাংলা দেশের কোন ঝিঁঝিঁ-ডাকা, বনতুলসীর গন্ধ-ভাসা গ্রামের কোনো কুঁড়ের তেলের প্রদীপের শান্ত আলোয়, বুড়ী ঠাকুমার কোলে বসে প্রতিটি সন্ধ্যায় সে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর মিষ্টি গলার গল্প শুনতে শুনতে ঘুমোত। এক সময় দেশের বুকে লুঠেরার দল আসত হারে রে রে শব্দ করে, কিংবা পড়ত দুর্ভিক্ষের ছায়া। না খেতে পেয়ে মানুষ মরে উজাড় হয়ে যেত। আর সেই ছন্নছাড়া নৈরাজ্যের ঢেউ একদা সেই ফুটফুটে কিশোরকে তার স্বপ্নের রাজ্য—তার মা ঠাকুমার কোল থেকে ছিনিয়ে একেবারে কঠিন বাস্তবের দুয়ার গোড়ায় আছড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলত। সভয়ে সেই বালকের জলভরা চোখ লক্ষ্য করত, অকস্মাৎ তার বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, কেউ নেই। সংসার নেই। এক বিচিত্র নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় তাকে বিচিত্র জীবে পরিণত করা হল। বেশির ভাগই মরে বাঁচল। তারপর সমরখন্দ

বসরা, দিল্লি বা আগ্রা, বা সুদূর সেন্ট হেলেনার বাজারের কোন নীলামে কোন আমীর তাকে কিনে নিল আর তাকে টেনে তোলা হল এমন এক রাজ্যে যেখানে ভোগের, বিলাসের মৌক অতলান্ত পঙ্কিল সমারোহ। আর মানুষের নিষ্ঠুর হাতে বিকৃত তার ভাগ্যের সে কি নির্মম পরিহাস—ভোগের এই বিপুল আয়োজন সাধারণতঃ তার তৃষ্ণার্ত অন্তরের কাছে চিরকাল মরীচিকা হয়েই থাকত।

সম্রাট আলমগীরের খোজা ইতিবর খাঁ সেকথাই বলেছিল তার বুড়ো বাপ মার কাছে। ইতিবর খাঁ তখন শাহানশার প্রধান খোজা। আলমগীরের মত লোকেরও একান্ত বিশ্বাসভাজন। সম্রাট শাজাহানকে তাঁর বন্দীশালায় পাহারা দেবে কে?—না, এই ইতিবর খাঁ।

বান্দা এসে বললে, দুজন বুড়োবুড়ী জনাবের সাক্ষাৎপ্রার্থী। সে অবশ্য বলেছে যে হুজুর এখন ভীষণ ব্যস্ত। কারও সঙ্গে দেখা করা মোটে সম্ভব নয়। কিন্তু বৃদ্ধ দম্পতি যখন বললে যে তারা খাস বাঙলাদেশ থেকে এসেছে এবং তারা জনাবের পিতামাতা, তখন আর হজরতকে না জানিয়ে পারল না।'

ইতিবর খাঁর চোখজোড়া ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায় তার ভীষণ মুখ ভীষণতর হয়ে উঠল। বান্দাকে কর্কশ গলায় হুকুম দিলে, তাদের ডেকে নিয়ে এস। অভ্যাগত বুড়োবুড়ী সামনে আসতেই ইতিবর খাঁ তাদের ভালো করে নিরীক্ষণ করলে। দেখলে, এ মুখও তার চেনা। যেন সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতে এদেরই কোলে ত একদিন সে পৃথিবীর আলো দেখেছিল। এ মায়েরই স্তন্যে একদা তার জীবন লালিত হয়েছে। এই বাপেরই স্নেহে শৈশব আবরিত করে রেখেছিল। আর এরাই তাকে কয়েক কার্ষাপন মূল্যে পণ্যে

মত বিক্রি করে দিলে। এদেরই নিষ্ঠুরতার মূল্যে সে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান তার পৌরুষ থেকে বঞ্চিত হল। ভাবনার ছবি ফুটে উঠে মিলিয়ে যেতে লাগল চলচ্চিত্রের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের মত আর ইতিবর খাঁর চোখ ফেটে যেন রক্ত বেরোতে লাগল। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে চিৎকার করে উঠল খোজা ইতিবর—'ওরে কে আছিস, বাঁধ এদের। চাবুক লাগা। চাবুক লাগা। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দানকে বেচে খেয়েছে এরা। কানাকড়ির মূল্যে বেহস্তকে বিক্রি করে দিয়েছে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান থেকে বঞ্চিত করেছে আমাকে। চাবুক লাগা।'

খোজা ইতিবর খাঁর সেই চাপা ক্ষোভের বিস্ফোরণে বৃদ্ধ দম্পতি সত্যিই হয়ত শেষ হয়ে যেত। কিন্তু সেই অকুস্থলে হাজির ছিলেন এই কাহিনীর কথক। সে ভদ্রলোক বিদেশী—এক ভেনিসীয় পরিব্রাজক – নাম নিকলস ম্যানুসী। ম্যানুসী খাঁ সাহেবকে ঠাণ্ডা করলেন। তার রাগের দোষ নেই। তবু বাপ মা ত। ইতিবরের ক্রোধ এক সময়ে পড়ে এল। বাপ মাকে রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে বিদায় দিলেন।

কিন্তু এ কাহিনী থেকে এই কথা মনে করা ঠিক হবে না যে, মধ্যযুগে কেবল মাত্র দারিদ্র্যের দায়ে বিক্রি করা ছেলে-মেয়েরাই শুধু খোজা হত। কাজীর বিচারে অসচ্চরিত্রতার অভিযোগেও অনেক সময় খোজা করে দেওয়া হত। সেই রকম একটা কাহিনীও বলেছেন ম্যানুসী। শহরের নাম বার্না। স্নানের থেকে এ আড়াই মাইল দূরে। দিল্লীর পথে সেখানে কয়েকদিন কাটানোর সময় ম্যানুসী স্বয়ং এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে দাবী করেছেন।

আরব রাজ্যের অন্যান্য শহরের যেমন রেওয়াজ—এই শহরেও স্নানের জন্য কয়েকটা পাবলিক বাথ—স্নানঘর বা হামাম ছিল। সাধারণের জন্য অবারিত দ্বার। টার্কিস বাথের মনোরম আয়োজন। সেখানে ছেলে-মেয়ে—স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্নান করতে পারত। ম্যানুসী বলছেন, ব্যবস্থাটা ছিল এই রকম। সকাল ছয়টা থেকে স্নানের জন্য মেলা লেগে যেত। গরম জলে স্নান বা পারসী স্নান—সবেরই বিশদ বন্দোবস্ত। কেবল আইনটা ছিল—আগে যেত পুরুষেরা। দল বেঁধে। তাদের হলে তারা চলে আসত। আসবার পর ভোঁপোঁ পোঁ—ভোঁপোঁ পোঁ করে ভেঁপু বাজিয়ে দিত। তারপর যেত বোরখা-পরা মেয়েদের দল। আরবরা, দেখা যাচ্ছে, বেশ কাঠখোট্টা জাত। 'লেডিজ ফার্স্টে'র শিভলরি—মেয়েদের আগে যেতে দেবার মত শৌর্যের তারা পরোয়া করত না। হামামে-হামামে পুরুষদের স্নান করিয়ে গোঁফ-দাড়ি কাট ছাঁট করে দিত নাপিতরা। মেয়েদের তদ্রূপ করত রসিকা নাপিতিনীর দল।

এখন সেদিন ঘটেছে কি, এক বদমাস ছোকরা মেয়েদের মত বোরখা পরে ঢুকেছে তার প্রণয়িণীর সঙ্গে মিলনের জন্যে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে। বলে না প্রেমের দেবতা অন্ধ। নয়ত এমন কাঁচা কাজ কেউ করে? অন্যান্য সব মেয়েরা দেখতে পেয়েই হৈচৈ ব্যাপার। চেঁচামেচি। ছোকরা হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। কোতোয়াল বেঁধে নিয়ে গেল কাজীর কাছে। কাজী আর তাকে প্রাণে মারলেন না। খোজা করে দিতে হুকুম দিলেন। আর খোজা যখন, তখন আর আপত্তি কি, সেই হামামের পর্যবেক্ষকের চাকরিটাই দিয়ে দিলেন। তবে চাকরি নামেই, কেন না তার কোন বেতন নেই। তবে পিতৃদত্ত প্রাণটা যে সে যাত্রায় বেঁচে গেল, এই যা।

তবে এ থেকে এটা ধারণা করা অমূলক যে এইসব হৃতপৌরুষ মানুষ-গুলির বিকৃতকামিতা কিছু কম বীভৎস ছিল। এই গল্প বলেছেন দু জন। একজন সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো। অপরজন তাঁরই সম-সাময়িক ভারত-পরিব্রাজক যাজক—এডওয়ার্ড টেরী। দু জনেই প্রায় একই বিবরণ লিখে গেছেন তাঁদের রোজ-নামচায়। সেটি মুঘল রঙমহালের রঙদার গল্প। তার নায়িকা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিয়ারের বাঁদী। আর প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে। কখন কে ধরা পড়ে কে জানে। নয়ত এমন রূপসী তরুণীটি কিনা প্রেমে পড়ল কোন সুদর্শন আমীরের নয়—এক কাফ্রী খোজার। এবং এই প্রেমেও সেই চিরাচরিত ত্রিভুজ রয়েছে। কেননা, সেই রূপসী বাঁদীটি আবার কামনার ধন ছিল অপর এক ঊর্ধ্বতন পদের খোজার।

একদিন সেই রাজপ্রাসাদমালার সুর-ভৃত মুঘল অন্তঃপুরের এক নিভৃত অলিন্দে, মুঘল ভোগবিলাসের এই লীলানিকেতনের একান্তে সেজপ্রদীপের ম্লান রহস্যময় আলোকে সেই কাফ্রী খোজার উষ্ণ ওষ্ঠের আস্বাদে ডুবে ছিলেন নূরজাহান বেগমের সেই সুন্দরী পরিচারিকা। ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনের সেই নিবিড় সোনালী মুহূর্ত। আর তখনি সেই প্রায়ান্ধকার অলিন্দে একটা নাটক ঘটে গেল। আঁধারের রহস্য মেশা আলোকে ভেসে উঠল এক বিপুল ছায়া-শরীর। হিংস্র শ্বাপদের মতো ধক ধক করে জ্বলতে লাগল অপর প্রণয় ভিখারীর কামনাকুটিল চোখজোড়া। তার উদ্যত খড়্গের শাণিত ঝলকে ছিটকে পড়ল আলিঙ্গনাবদ্ধ সেই কাফ্রী খোজার ভারী মাথাটা। রক্তে ভেসে গেল বেগমমহলের সেই প্রস্তরগঠিত চত্বর। বিভৎসভাবে হি-হি করে হেসে উঠল সেই দ্বিতীয় প্রণয়ী। স্তম্ভিত বিস্ময়ে তরুণীটি আয়ত চোখজোড়া মেলে শুধু তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল। তার চাপা করুণ বুকভাঙা আর্তনাদ এক বিচিত্র শব্দ করে রংমহালের রাত্রির বৌচত্বরের মধ্যে হারিয়ে গেল।

এবং এই ঘটনারও বিচার হল কাজীর। টমাস রো অন্তত তাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এবং বিচারে সেই দাসীটিরই প্রাণদণ্ড হল বোধহয় এই কারণে, যে সে মুঘল হারেমের তথা-কথিত পবিত্রতা নষ্ট করেছে! সেই চরম শাস্তির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার একটানা কান্না একটুও থামেনি। শেষবারের মত জ্ঞান হারাবার আগে তার নবনীকোমল বুকে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে সে শুধু কেঁদেছিল কপাল চাপড়ে সে শুধু কেঁদেছিল, কেঁদে-ছিল মাটিতে আছাড়-পিছাড়ি খেয়ে। যে কারণে সেই বাঁদীটির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হল অনেকটা সেই কারণেই সম্রাট আরঙ্গজেব একবার মুঘল হারেমের খোজাদের কঠিন শাস্তির আদেশ দেন। অথচ ব্যাপারটা সম্রাট ভগিনী রোশেনারা বেগমের কেচ্ছা কাহিনী। হারেম ত নয়—পাপের আখড়া। হিংসা দ্বেষ কামনা লালসার পীঠস্থান।

মুঘল রাজদুহিতারা বিবাহ করেন না। কাজেই গোপন পিচ্ছিল পথে তাঁদের ব্যভিচার—তাঁদের কামনা চরিতার্থতার পথ খোঁজে। তা ছাড়া বেগমরা পরস্পর পরস্পরের নির্মমতম শত্রু। কাজেই প্রাসাদ-চক্রান্তে বেগমের প্রণয়পাত্র দুই যুবক মুঘল হারেমেই ধরা পড়ে গেলেন। এবং কাজির মতই সম্রাট তাদের বিচার করলেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করা হল, কি ভাবে সে ঢুকল এই মুঘল অন্তঃপুরে—সূর্যালোক যেখানে প্রবেশাধিকার পায় না? যুবকটি চালাক হয়ে বললে, সে পাঁচিল ডিঙিয়ে এসেছে। সম্রাট নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, হারেমের সুউচ্চ পাঁচিলে উঠিয়ে যেন অপর দিকে ফেলে দেওয়া হয় যুবককে। অপর যুবকটি সমূহ বিপদের কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলো। সে নিবেদন করলে, সে সহজ-পথে রাজদ্বার দিয়ে এসেছে। সম্রাট তাকে সেইভাবেই ফিরে যেতে দিলেন। তবে তার পথে গুপ্তসর্পগুচ্ছফণা অভ্যর্থনা করেছিল কিনা জানা যায়নি। বড়-ঘরের কেচ্ছা বড়ই রকমারি।

কিন্তু সম্রাট আলমগীর সেখানেই থামলেন না। রংমহালের খোজাদের তিনি কঠিন শাস্তি দিলেন। কেননা তাদেরই কাজের অবহেলায় না এরা মুঘল হারেমে ঢুকতে পেরেছে। তা ছাড়া বাইরের লোকেরা এখানে ঢুকলে স্বয়ং সম্রাটেরই বা নিরা-পত্তা কিসে?

তবে আশ্চর্যের কথা, পৌরুষহীন খোজাদের প্রেমের কথা শুধু রো বা টেৰী নয়, বার্নিয়ারও শুনিয়েছেন। মুঘল হারেমের অন্যতম প্রধান ছিলেন দীদার খাঁ। তাঁর নিজের ছিল বিরাট প্রাসাদ। নিত্য হারেমের ডিউটি শেষে তাঁর নিজের বাড়ি ফিরে যেতেন। আহার নিদ্রা করতেন। রং-তামাসারও আয়োজন কম ছিল না। এখন হয়েছিল কি, তাঁর প্রতিবেশী ভদ্রলোক হিন্দু। মুঘল রাজ দপ্তরে কলমপিষে তাঁর সংসার চলে। তাঁর বোনটি কিন্তু ভারী সুন্দরী। দীদার খাঁ সেই হিন্দু কেরানীটির বাড়ি দেদার যাতায়াত শুরু করলেন। কেমন যেন দৃষ্টিকটু। কিন্তু সবাই জানত দীদার খাঁ ত খোজা! কাজেই ভয়ের কি আছে? খোদ সম্রাট যখন তাঁর সুন্দরী-দের হারেম এর হাতে বিনা সন্দেহে তুলে দিয়েছেন, তখন হিন্দু কেরানীর বোনের ব্যাপারে ভয়টা কিসের?

কিন্তু ব্যাপারটা অচিরে ঘোরালো হয়ে উঠল। যাকে বলে কানপাতা দুষ্কর। সারা মহল্লায় টি টি ব্যাপার। কেননা, ঐ প্রণয়ী-দম্পতিকে বিভিন্ন অবস্থায় বিস-দৃশভাবে দেখেনি, এমন লোকই নেই পাড়াখানায়। কেরানী ভদ্রলোক ত ভোর-বেলায় বেরোয় দরবারে রুজিরোজগারে। মাঝে কোনদিন বাড়ি আসে, কোনদিন না। একেবারে গভীর রাতে। তাঁর এসব নজরে পড়বার কথা নয়। কানেও ওঠে না কেলে-ঙ্কারী কেচ্ছা। একদিন কিন্তু ঐ অত ভোরেই দরজার কড়া নেড়ে, ভদ্রলোককে প্যাকড়াও করল তার এক গভীর শুভা-কাংখী প্রতিবেশী।—হ্যাঁ মশায়, সংসারের কিছু খবর রাখেন? অমন আগুনের খাপ-রার মত একটা বোন বাড়িতে রেখে সারা-দিন যে ভাতভিক্ষে করছেন, এদিকে যে পাড়ায় বাস করা দায় হয়ে উঠল।

সাতসকালে কোথায় ঠাকুর-দেবতার নামকরবে তা নয়! এই সব তীর্যক ইঙ্গিত, দেখা গেল, একজন নয়, রসের সন্ধান পেয়ে, কাজকর্ম ছেড়ে নেহাৎ পর-হিতৈষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আশেপাশের বাড়ির লোকেরা পাগড়ী বেঁধে, টিকি নেড়ে হাজির। প্রতিবেশীর একটা দায়িত্ব আছে না? এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে দীদার খাঁ এবং তার ভগিনীর যেসব ঘটনা বিবৃত করতে লাগল, তাতে কানে আঙুল দিতে হয়। ভদ্রলোক রেগে মেগে তেড়ে গেল। তবে কেরানীত! মেরুদণ্ড কলম পিষতে পিষতে ইতিমধ্যে বেশ বেঁকে গিয়েছিল। ফোঁস ফোঁস করেই তিনি গর্জন শেষ করলেন এবং ব্যাপারটা দেখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেযাত্রা অব্যাহতি নিলেন দায়িত্ব-সম্পন্ন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে।

তবে প্রতিবেশীরাও নাছোড়বান্দা সেদিন চলে গেলেও তারা রবার্ট ব্রুসের ধৈর্য নিয়ে এই রসাল ব্যাপারটার পিছনে লেগে রইল। এবং একদা তেতে গিয়ে সেই উত্তেজিত বড়ভাই শপথই করে ফেললে, যে এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, সে তার বোন ও ঐ কাফ্রী খোজাকে কেটে ফেলবে।

এ-দিকে দীদার খাঁর ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছিল যে তাদের আর সাব-ধান হবার উপায় ছিল না। একদিন অসময়ে বেলা দ্বি-প্রহরে বাড়ি ফিরে হিন্দু কেরানীটি তাদের হাতে নাতে ধরে ফেললে। খুবই বিশ্রী অবস্থায় তারা বিছানায় শুয়ে। কেরানী হোক, সে তার শপথ রাখলে। তার খরসান তরবারি প্রখর দিবালোকেই ঝলসে উঠল এবং মুঘলহারেমের সেই খাঁ সাহেবের গলাটা দু-ফাঁক হয়ে গেল। স্নেহ এসে বোধকরি বাধা দিয়েছিল। কিংবা কেরানীর রাগ ধুপ করে জ্বলে উঠেই বুঝি তক্ষুনি নিবে যায়। বোনটা সে যাত্রায় অব্যাহতি পেয়েছিল। তবে সম্রাট আলম-গীরের বিচারে কেরানীর জানটা বাঁচলেও রক্ষা পায়নি তার ধর্ম!

কাফ্রী খোজাদের সম্বন্ধে এক বিদেশী পরিব্রাজক বলছেন যে সেকালে ভারতীয়-দের মধ্যে এই ধারণাই প্রবল ছিল, খোজা করার পর খোজা হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর, বেয়াড়া, অবাধ্য এবং বিকৃত-কামী। তবে তাদের মধ্যে অনেকে যে বিশ্বাসভাজন, সাহসী এবং সজ্জনও হয় তাও অবশ্য অস্বীকার করা যায় না। তরুণ কাফ্রীখোজাদের মক্কা বা আফ্রিকার বাজার থেকে আনবার সময় পথেই মারা যেত অর্ধাংশ কি তারও বেশি, তেমনি খোজা করার ফলে হেকিমদের হাতেই অনে-কেই অকালে অক্কা পেত। মধ্যপ্রাচ্যের বাজারেও দক্ষ চিকিৎসকদের হাতেও এই প্রক্রিয়ার পূর্ণতা লাভ ঘটে নি। সর্বত্র এটা ছিল আসুরিক পদ্ধতি।

কিন্তু এই সব অপহৃত-পৌরুষ বিচিত্র জীবের দল অবলীলায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে উনিশ শতকে এসে আস্তানা নিয়েছিল লক্ষ্ণৌতে। অযোধ্যায় দেখা যাচ্ছে, তারা নবাবী জেনানামহলের দাসদাসীর শিরোমণি-রূপে বিরাজ করছে সেখানে অপরাধী ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী-দের ওপর তাদের হাতের নির্মম কশাঘাত চলছে উপর্যুপরি। চামড়া কেটে রক্ত বেরোচ্ছে, আর কাফ্রীখোজাদের মুখ যেন পরিতৃপ্ত জিঘাংসায় শয়তানের মত হাসছে দেখা যাচ্ছে, সেখানে জেনানামহল তাদের স্নানঘরের জন্যে ক্রীতদাসীদের চেয়ে বেশি পছন্দ করছে এই সব কর্কশ খোজাদের।

আবার কোন কোন স্থানের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হিসেবেও আসীন সেও এক-জন খোজা। বলতে কি, আলমাস আলি খাঁনের মত খোজা অযোধ্যা কখনও দেখেনি। স্লীমান সাহেবের ভ্রমণপঞ্জী থেকে জানা যায় অযোধ্যার মিঞাগঞ্জ পর-গণা ও আশে পাশের কয়েকটা জমিদারীর শাসন কর্তা ছিলেন আলমাস দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে। বছরে আশি লাখ টাকা করে রাজস্ব জমা দিতেন তিনি অযোধ্যার রাজকোষে। তাঁর শাসনকাল এই অঞ্চলের স্বর্ণযুগ। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনের জন্য তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আলমাস খাঁর জীবনের সবচেয়ে মজা হল কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর। ইসলামী আইনে খোজা ক্রীত-দাসের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে তার অধীশ্বর। কাজেই খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পরেই নবাব দরবার থেকে লোক-লস্কর তাঁর সম্পত্তি অধিকার করতে ছুটে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে ফক্কা। খাঁ সাহেব বহু টাকা পেতেন নানা ব্যবসায়ীদের কাছে। অন্তেকাল আসন্ন দেখে তিনি তাঁদের ডেকে সেই সব তমসুক উসুল করে দিয়েছেন। আর তাঁর মৃত্যুর আগেই বহু জনহিতকর কাজে বহু টাকা ত দিয়েই গিয়ে-ছিলেন খাঁ সাহেব। নবাবরা ত রেগে কাঁই। কিন্তু খাঁ সাহেব তখন তাদের ক্রোধের আওতার অনেক উর্ধ্বে।

এমনি কিছু নামী, কিছু নামগোত্র-হীন একদল মানুষ ইতিহাসের সেই বিলাস-পঙ্কিল মধ্যযুগ থেকে রাজতন্ত্রের ক্লেদ-কুটিল বীভৎসতার সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। খোদার ওপর খোদকারি করে পুরুষকে তার জন্মগত ঐশ্বর্য থেকে বিচ্যুত করে এদের দিয়ে বাদশা-আমীরের দল তাদের কামনা লালসার বিচিত্র বিকৃত প্রয়োজন মিটিয়েছে। কে জানে, আজও কোন অজানা ভূখণ্ডে নানা রাজতন্ত্রের অভি-শাপের মধ্যে এইসব খোজা ক্রীতদাসের দল তাদের বিকৃত ক্লীব জীবন যাপন করে চলেছে কিনা? কে জানে, তাদের মুক্তি বা কতদূরে?

জোরালো যে আমার গোয়েন্দা মন দিশে খ‍ুজে পাচ্ছে না।'

'একদম না ?'

'কোইনসিডেন্স, মানে, কাকতালীয় ছাড়া আর কি হতে পারে, বলো ?'

'কোইনসিডেন্সের মাথায় ঝাড়ু। নিশ্চয় কিছু চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে আমার। তাই আমিও দিশে খ‍ুজে না পেয়ে ডেকেছি তোমাকে। এক ব্রেনে যা হয় না, দু ব্রেনে তা হয়।'

ফিল্মী ঢংয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললে ফোয়ারা—'সুমন্ত: আই অ্যাম সরি। আমার এ-ব্রেনও ফেল করছে। মঙ্গলবার আমার ফটো যখন তুলছিলে, তখন জল অনেক তফাতে ছিল—এর বেশী আর কিছুই জানি না; ভাবতেও পারছি না।'

চোখের পাতা পড়ল না আমার। চেয়ে রইলাম ফোয়ারার পানে। ফ্ল্যাটটি মিলিয়ে গেল মনের চোখে—ভেসে উঠল গঙ্গার পাড়, সবুজ ঘাস আর একটা সাদা পরীর অসংকোচ দেহভঙ্গিমা।

'কি হল ? ভুল বললাম ?'

'না,' বললাম মাথা নেড়ে। 'বরং ঠিক তার উল্টোটাই বলেছো। মঙ্গলবার। মানে, শুক্রবারের চারদিন পর।'

'তাতে কি ?'

'শুক্রবারে সনাতন যখন ফটো তুলল—তখন দেখা গেল জোয়ারের জল অনেক উঁচুতে ঠেলে উঠেছে। মাত্র চারদিন পরে তা অতদূরে যেতে পারে কি ?'

'গড্ড হেভেন্‌স! এ আবার কি প্রশ্ন ? পূর্ণিমা অমাবস্যার সঙ্গে জোয়ার ভাঁটার একটা সম্পর্ক আছে, এইটুকুই তো জানি......'

'সবাই জানে।—আমি আরও জানি। দিনে প্রায় আধ ঘন্টার মত তফাত হয়।'

'ভারী জেনেছো। জেনে কি লাভ হল ?'

'কিস্‌সু না।—দাঁড়াও... শুক্রবার জোয়ার কখন এসেছিল ?......ওয়েট এ মিনিট। কাগজ তো রয়েছে। কাগজেই খবরটা আছে। কিন্তু শুক্রবারের কাগজটা আছে তো ? দেখি।'

রোজ কাগজ পড়বার পর ছুঁড়ে ফেলে দিই খাটের তলায়। একগাদা জমলে বিক্রি করি ঘর থেকে। সুতরাং একটু সময় গেল খাটের তলায় ঢুকে শুক্রবার আর মঙ্গলবারের কাগজ বার করতে। বাইরের ঘরে এসে দেখি গেলাসটা প্রায় খালি করে এনেছে ফোয়ারা। খাইয়ে মেয়ে বটে!

বললাম—'আগে দেখা যাক শুক্রবারের কাগজ। এই তো ক্যালকাটা ওয়েদার — হুগলী রিভার টাইড্‌স অ্যাট গার্ডেন-রীচ।' তার পরের চারটে লাইন পড়তে চার সেকেণ্ডও লাগল না। কিন্তু পড়বার পর বাক্যরহিত হয়ে গেলাম। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ লাইন চারটের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললাম—'ফোয়ারা, তুমি বাড়ী যাও।'

চোখ দুটো পুরো ফুটে গেলো ফোয়ারার।

'বাড়ী যাবো ?'

'হ্যাঁ যাও। পাগলের সঙ্গে থেকো না। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি অথবা গেছি।'

হেসে ফেলল ফোয়ারা।

'বেচারা! বলো কি দেখলে।'

'শুক্রবার হাই ওয়াটার ভোর পাঁচটা আট মিনিটে। লো ওয়াটার দুপুর একটা তিপান্ন মিনিটে। কি বুঝলে ?'

'লো ওয়াটার একটা তিপ্পান্ন মিনিটে? কিন্তু তার একটু আগেই তো সনাতন......'

'জানি। জানি। ফটোতে দেখা যাচ্ছে হাইওয়াটার। অথচ এ-ফটো নাকি তোলা হয়েছে শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে একটার মধ্যে। কিন্তু শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে একটার মধ্যে ভাঁটার টান চলছে। হাইওয়াটারের প্রশ্নই নেই। জল তখন অনেক নীচে। আর এক গেলাস স্ট হুইস্কি না খেলেই নয়। তলানিটুকু আর রাখছো কেন—তুমিও নাও আর এক গেলাস।'

এক চুমুকে গ্লাস খালি করে নামিয়ে দিল ফোয়ারা। পাশের ঘর থেকে গেলাসদুটো ভরে নিয়ে ফিরতেই ফোয়ারা বললে—'সুমন্ত, তুমি বলছ শুক্রবার সনাতন এ ছবি তোলেনি ?'

গেলাসটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে মুখোমুখি চেয়ারে বসলাম। এক চুমুকে অর্ধেক খালি করে দেওয়ার পর মুখ খুললাম।

'তাছাড়া আর কিছু বলা যায় ?'

'কিন্তু আমার মাথায় তো ঢুকছে না।'

'প্রিয়দর্শিনী, ও ব্যাপারে তুমি একা নও, আমিও আছি তোমার সঙ্গে। আমার মাথাতেও কি কিছু ঢুকছে ? কেসটা শুরু হয়েছিল সলিড প্ল্যাটফর্মের ওপর। সিম্পল হলেও ভীষণ সত্যি। সনাতন গাঙ্গুলী একজন নেকেড মডেলের ছবি তুলেছিল শুক্রবার। সেই মডেল মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে পারলেই চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিতাম—খুনী কে। সমাধান হয়ে যেত কেস। কিন্তু এখন—'

'কিন্তু ও ছবি শুক্রবারেই তোলা হয়েছে। নেগেটিভ ক্যামেরার মধ্যে—'

'না—না—না। শুক্রবার এ ছবি তোলা হয়নি।'

'দুপুরে না তুলে হয়তো সন্ধ্যের দিকে তুলেছে। যখন জোয়ার এসেছে।'

মিটিমিটি হেসে বললাম—'দুর্ভাগ্য, তার বেলা আরও এক বিপত্তি সখী, কাগজটা খুললেই দেখবে শুক্রবার সূর্য উঠেছিল ভোর ছ'টা তিন মিনিটে গঙ্গায় যখন হাই ওয়াটার, আকাশ অন্ধকার। তাছাড়া, আমরা জানি ফটোটা তোলা হয়েছে দুপুর নাগাদ সব একদিন।'

'জানো ?'

'আলবৎ জানি। সূর্য আকাশের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে মডেল হওয়ার সময়ে। মগজ না যদি স্কুলের খাতাগুলোয় একটু মন দিতে তাহলেই জানতে ভরদুপুরেই সূর্য মাথায় পৌঁছোয়—ভোরে নয়।'

'আই অবজেক্ট। খুব অপমানের কথা। কে বলেছে তোমাকে আমি মডেল হওয়ার সময়ে মগজকে ছিলাম ?'

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কয়েকটি মুহূর্ত অথবা কয়েকটি যুগ পরে, শুধু একটি আওয়াজ জানতে চাইলো 'কেন? কেন মঞ্জু?'

'কি? কি কেন?' আরেকটি বিহ্বল স্বর প্রশ্ন করলো।

'এই যে! সেদিন বুঝতে পারিনি, আজো না। কোনওদিন পারবো কি?' স্বপ্নচারিণীর মতন হাত বাড়িয়ে জয়ন্তর এগিয়ে ধরা হাত থেকে, কি একটা টেনে নিল মঞ্জু। ছোট্ট একটুকরো কাগজ। একদিকে লেখা ইংরিজীতে, 'মঞ্জু, অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা কর। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। জে, এম।' উল্টোদিকে, তারই নিজের হাতে লেখা, 'দুঃখিত। কিন্তু না বোঝার কি আছে? মঞ্জু।' প্রথমে কিছু বুঝতে পারলো না। উল্টেপাল্টে বারদুই আবার পড়লো। বিস্ময়ের রেখায় সারা মুখ ভরে গেছে।

চোখ তুললো। দৃষ্টি বিস্ফারিত। বড় বড় দুটি চোখে আতংক। 'তুমি? তুমি ছিলে সেদিন? জো সাব—জো সাব তুমি ছিলে?' জয়ন্তও তাকিয়ে রইলো। তারও চোখে বিস্ময়। শুধু তার সঙ্গে একটু অবিশ্বাস, একটু সন্দেহ। মঞ্জু দু পা এগিয়ে এলো ওর সামনে। 'এ চিঠি তুমি লিখেছিলে? তুমি এসেছিলে সেদিন?' তার সারা শরীর কাঁপছে। জয়ন্ত সামান্য একটু কাঁধ ঝাঁকালো। 'আর কে হতে পারে?' মঞ্জু আরো এগিয়ে আসছে। ওর নাকে হুইস্কির গন্ধ লাগছে। জয়ন্তর নিশ্বাসের। লাগুক। 'এতদিন কি করছিলে? ইউ স্টুপিড ম্যান, ইউ হামবাগ, ইডিয়োসিন, এতদিন কি করছিলে? এ চিঠি বিশ্বাস করতে লজ্জা হোল না তোমার? কি করে পারলে? আমি, আমি কি ভাবে দিন কাটিয়েছি, কতভাবে খুঁজেছি, আর তুমি, তুমি কোথায় বসেছিলে?'

'এখানেই। বসেবসেই। প্রাচীনতম প্রথায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখছিলাম।' বোকাদের মতন হাসলো সে। 'অর্থাৎ অ্যালকোহল মাই সরোজ। আমি তো আর মঞ্জরী মিত্র নই, যে একের পর এক সঙ্গী জোটাবার খেলা খেলব।'

মঞ্জু নিজেকে ভুললো। এতদিনের জ্বালা, দুঃখ, রাগ, অভিমান, ব্যর্থতা সব একত্রিত করে, ভীষণ আওয়াজ তুলে জয়ন্তর গালে প্রচণ্ড চড় কষালো। 'ইমবেসাইল! লোফার! ইডিয়ট! স্কাউন্ড্রেল! ইউ—ইউ—সান অফ এ.......' জয়ন্তর হাত ওর মুখ চেপে ধরলো। 'শাটাপ! আই সে শাটাপ—! ভদ্র ভাষায় আমাকে কথা বলতে বলছিলে? এটা ভদ্র ভাষা? এ রকম ভাষায় তুমি কথা বল?'

'বলি! বলি! বলব! নিশ্চয়ই বলব!' উত্তেজিত কাঁপা, চড়া গলায় মঞ্জু বললো।

'আমার সঙ্গে নয়। লেভার! যাদের সঙ্গে বলা যায়, তাদের সঙ্গে যত খুশী বল।'

'তোমার সঙ্গেই বলব। আর তুমি, তুমি, তোমাকে তা সহ্য করতেই হবে।' দুজনেরই গলা চড়া। মঞ্জুর চোখের জল চাপা ও কঠিন হয়ে পড়ছে। 'যত খুশী বলব! তুমি সহ্য করবে। আমি কি সহ্য করেছি তার তুমি কি জান? তুমি এটুকু করবে না? করতেই হবে।' জেদের গলায় মঞ্জু বলেই যাচছে।

'আমার কি দায়?'

'তোমার ছাড়া আর কার দায়? তোমারি দায়। সব দায় তোমার। তোমার'

'বাঃ চমৎকার'

'চমৎকার তুমি। শুধু বোকা Zomb

'আবার!' হতাশ কণ্ঠে জয় বললো। কেমন অসহায় মনে হচ্ছে জ কেন যে এই লাভাস্রোত ওর দিকে আসছে বুঝতে পারছে না। শু নিজেও, কোথায় যেন, কিসের এক জোর ঊর্ধ্বচাপ অনুভব করছে। কোথায় যেন মাথা কুটে মরছে, বেরিয়ে আসার চড়, গালাগালি এসবেও যেন ঠিক অপমানিত বোধ করতে পারছে না।

'বলব। বলবই তো!' এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো জয়ন্তর বুকে। দু দিয়ে আঁকড়ে ধরলো ওর পিঠ। চিরি রোগীর মতন ওর বুকে মাথা ঠু ঠুকতে ক্রমাগত বলতে লাগলো বলব, বলবই তো।' চোখের জলে ও ভেসে যাচ্ছে। জয়ন্তর সার্টের বুক যাচ্ছে। জেকে সে থামাতে পারে কিছুতেই না।

জয়ন্ত জোর করে ওর মুখ তুলে ধরলো। রুদ্ধস্বরে বললো আছে বল! কিন্তু, আর কিছুই কি না?'

'জানিনা। সব রাগ, সব দুঃখ কথা ফুরিয়ে যাবে যখন, তখন বলব। এখন না।'

'বেশ!' ওর কপালে ঠোঁট চেপে ধরলো। একই দুঃখের অশ্রু ধারা গিয়ে মিশলো মঞ্জুর চোখের সঙ্গে। ওর সারা শরীর কেমন দিয়ে কেঁপে উঠলো। হাত দুটো কাছে টেনে নিলো মঞ্জুকে। 'মঞ্জু!

আজ এবার বেরিয়ে গেল ওর আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই চোখ মুছতে হবে।

(শেষ)

কারণও ভাবার্থ কি; শব্দার্থই বা কি? এই এই সংকট মুহূর্তে বেদের মধ্য থেকেই আমাদের পূর্বোল্লিখিত নির্দেশ সংগ্রহ করতে হবে। এ কাজ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতের।

ত্রিশির রহস্যময় সীলমোহরটি (অ্যানিগম্যাটিক ট্যাবলেট) আরও ইঙ্গিতবহ ভারতবর্ষের আদি রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও লিপিতত্ত্বীয় সমস্যাব উপর নতুন আলোকপাত করে। আসলে এটি জৈন্ধব দক্ষিণাদ্বারের পট কাহিনীর ব্যাখ্যার লিপিক হাজিরা। অক্ষরগুলির মধ্যে দুটি প্রাচীন মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মিশরীয় ভিক্কান্ন বলে মনে হলেও এরা পরাজিত দক্ষিণদ্বারের সেই চাব্বিশ ফুটের জলে ডোবা রাজ্যের সৈন্ধব অবদান হতে পারে। একটি স্তনের স অনটি শনির শ। ঋ ক অ ম অবশ্যই ভারতীয়: কোনটা ভারতীয় আর কোনটা অভারতীয় পরে বিচার করব—এখন গার্ডিনারের পঞ্জিকা দেখে পড়ে নিই। ত্রিশির সীল মোহরের [illegible] পিঠের নীচের দিকে এক সারিতে [illegible] পশুর মিছিল। উপরের সারিতে [illegible] কুমির তার ফাঁক করা দন্তুর মুখে [illegible] রয়েছে মাছ। তেকোণা দংষ্ট্রা কায়ের প্রতিচ্ছবি, মাছ র-এর—দুটিতে মিলে হল র। পিছনে উড়ন্ত তীর অর্থাৎ কিউ বা অন্তস্থ ক ফল দাঁড়াল রক্ত। ব পিঠেরও নীচের দিকে পশুর সারি আছে—কিন্তু যেন আগের চেয়ে পোষমানা নতশির ও স্থাবর। উপরের সারিতে কুমিরের মুখে আ-কার পায়ে ন। তার সঙ্গে হাঁসের পায়ে জ বা জে। সর্বশেষ কোণে স্তনের স। সবটা মিলে আ—ন জ স বা এজস (যজুস-) সি পিঠেই কাহিনীর চূড়ান্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে মাথায় লম্বা ক্রুট মুকুট পরা দক্ষিণদ্বার বা দক্ষিণেশ্বরকে জোর করে ধরে নিয়ে চলেছে উত্তরাধিপতি শনি বা শোট বালিদেবনে জন্য নয়—যুক্ত রাষ্ট্রের শরিক করার জন্য, দুই পশুর যুগ্মমূর্তি (ডান পাশে) তারই প্রতীক। উত্তর ও দক্ষিণ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড় আর্য ও অনার্য (?) স্থলচর ও জলচর গরুর গাড়ির সংস্কৃতি ও নৌকার সংস্কৃতি এক সূত্রে বাঁধি দিল শনি মহারাজ। মা দুর্গার ভাই—তিনি পাহাড়ী শাক্য; তাঁর মাথায় দশর-মুকুট। পিছনে তাঁর চিহ্ন বরাহ (?) মুণ্ড, শেট বা শনির আদ্যাক্ষর শ। বরাহ-মুণ্ড গোমুণ্ডকে তাড়না করছে—গো-মুণ্ড স। দক্ষিণের গাভীটিকে উপড়ে এনে উত্তরের পাঞ্জেয় সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে—সে গাছ মানুষের মত দেখতে অর্থাৎ য-এর প্রতীক। পড়ছে হল সত্তম (ডানদিক থেকে)। আদি যুগের ভৌগোলিক ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রিক এমন কি আঞ্চলিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা এই পটে পেলাম। কিন্তু ধর্মীয় ব্যাখ্যার ইঙ্গিত মেলে কই? তিন বেদের নাম আছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে রাজনীতির বন্ধন কেন? কারণ রাজনীতির জন্য যজ্ঞ আর যজ্ঞের জন্যই বেদের উৎপত্তি। সামের জন্য চাই সামা সম বা সামান্য (দিনও রাত্রির কাল ও সাদার মিলন) অর্থাৎ দুই ভূখণ্ডের রসাতল ও মহতলের সাদা ও কাল অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় মিলন আর সেই যুক্ত রাষ্ট্র থেকে আহৃত যৌথ সম্পদ— সোমরস (কমনওয়েলথ-)। সোমরস খেলে দেবতারা বাঁচবেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র না থাকলে রস যোগাবে কে? তার জন্য দুই দলের দুই দেশের শপথ করা চাই: যুক্তরাষ্ট্রের শরিক থাকার জন্য মতি-গতির স্থিরতা অর্থাৎ শম চাই। এই মানসিক স্থিরতার জন্য চাই যজ্ঞ (ম্যাজিকাল রাইটস ও রিচুয়ালস) ও যোগ।

মিসরে দক্ষিন ও উত্তর রাজ্যদ্বয়ের সংযোজন সম্ভব হয় দক্ষিনেশ্বরের সামরিক কার্যকলাপের জন্য। সিন্ধুতে উত্তরাধিপতির জন্য মিলন ঘটেছে। যাই হোক, এই রাষ্ট্রীয় মিলন প্রাচীন মিসরীয়রা কি চোখে দেখতো? ফ্রাংফোর্ট বলছেন: 'মিসরীয়দের নিকট এই দুই ভূমির (উত্তর ও দক্ষিণ) মিলন শুধুমাত্র যে তাদের ইতিহাসের সূচনা করে তা নয়, এক পূর্বনির্দিষ্ট দেশ পূরণ করে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ঊর্ধ্বে, তাদের সামাজিক ও চারিত্রিক সম্পর্কে এক অবিনশ্বর ঐক্য স্থাপনও করে।' (দি বার্থ অব সিভিলিজেশন ইন দি নিয়ার ইস্ট, পৃঃ, ৯১)। 'পূর্বনির্দিষ্ট আদেশ' কেন? এ আদেশ দক্ষিনেশ্বরকে কে দিল? এই আদেশ রক্ষার জন্যই কি আমাদের বেদ লেগেছিল? বৈদিক সূক্তগুলির মধ্যে আমরা কি দেবা-দেশের কোন ইঙ্গিত পাই? দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও প্রার্থনার মূলে কি মিলনের বাণী বা মন্ত্র ছিল? থাকলে তার মধ্যে যুক্তরাজ্যের উল্লেখ আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

আমি ঠিকই পড়েছি—ঋক, সাম, যজুস—তিনটি বেদের নাম, আর তা লিপিবিজ্ঞান দিয়ে পড়েছি। এই ত্রিশির বৈদিক সীলমোহরের বয়স কত? পট আর পটের গল্পের বয়স কি এক? সেই কবে রাম-রাবনের যুদ্ধ হয়েছিল, কবে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন পরম্পরাগত ধারায় মেদিনীপুর-বীরভূমের পটুয়ারা তা এখনও এঁকে চলেছেন। সীলমোহর ও তার কাহিনী কি একই সময়ের? সে যাই হোক, সীলমোহরের বয়স অনুযায়ী ঐ তিনখানি বেদের বয়স ফিলহাল আমি ৪৫০০ বৎসর বলে ধরে নিলাম, অর্থাৎ ইওরোপীয়দের হিসাব থেকে ১০০০ এক হাজার বৎসর আগে। তিলক আরও প্রাচীন বলেছিলেন, সেজন্য তাকে কত না গালিগালাজ শুনতে হয়েছে! এই সেদিনও ডঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন: 'আজগুবী মতবাদ, যেমন শ্রীযুক্ত তিলক মনে করেন যে, বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির বয়স খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০ বৎসর, কোনক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা যায় না।' (আলফাবেট পৃ, ২৬০)। ওরে বাপরে—কত বড় বেদান্তবাগীশ। পেট্রীর ভুল করে মিশরের ফ্যারোদের রাজত্বকাল ১০০০০ বৎসরের পুরাতন বলে ধরে নিয়ে বই লিখে গেছেন। কই—কেউ তো এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। ১০০০০ হাজার কমে এখন ৫০০০ হাজারে ঠেকেছে। তিলকের হিসাবও একদিন ঠিক হবে—পাইওনিয়রদের এমন ভুল হয়ই। পরবর্তী ভারতীয় পণ্ডিতেরা এসব ভুল সংশোধন করবে।

এখন দেখা যাক সীলমোহরের মধ্যে লিপির সঙ্গে যে সব জানোয়ারের ছবি রয়েছে তার থেকে আর্যভাষী লোকদের খোঁজ পাই কিনা পাই তবে তা আমার বেদ-পাঠের বিচারে অত্যন্ত কাজে লাগবে। পশুত্ত্ব অধ্যাপক মাইনারের সঙ্গে আমি [illegible] করে তাঁকে ঠিক এই প্রশ্নই করেছি বললেন, তুমি আমার লেখা বই পড়ে দেখবে লিখেছি সীলমোহরের গরু (বলদ) জেবু জাতীয় ইউরোপীয় (ডোমিসটিকেটেড অ্যানিম্যাল) কিন্তু মহেঞ্জোদাড়র দুর্গের [illegible] সঙ্গে ছিল আজগবীরা, গরুর অ-গরুরা—সেইসুকুমার রায়ের হাঁসজারু ও হাতিমিরাও! এ আর্ট ডিজাইন কাদের? একটা শরীরে দেহ স্বর হবে তিন রকমের তিনটি মাথা রকম তার শিং। একটা গাছের ডাল নীচে, কাণ্ড থেকে বের হবে এক একশৃঙ্গ জন্তু! একটা জন্তুর চারটি চার রকম জন্তুর—হাতীর শুঁড় গলায়। সাধু ভাষায় যাকে বলি কিম্ভূতকিমাকার। এ আর্ট, এ ডিজাইনের আমি গন্ধ পাই সিথীয়ান [illegible] বকচ্ছপের আর্ট তাদের [illegible] যাদের আর্ট তাদেরই লেখা, তারাও —এরা আর্যভাষী আদি ভারতীয় হিমাচলবাসী উত্তরাপথের শাক্য।

পৃথিবীর আদি শিল্পস্রষ্টা নির্মাণকারী, যোগী ও জ্যোতির্বিদ হিমালয় শৃঙ্গ তাদেরই প্রাকৃতিক মন্দির—সেখানেই পেয়েছিল গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও বেগ, তিথি, মাস, বৎসরের গণনার [illegible] বেষ্টিত হিমালয়ই তাদের আদি দুর্গ: [illegible] কেটে শিল্প [illegible] সৃষ্টি এই শাকদ্বীপী [illegible] মিত্র, সুমেরু, গঙ্গা, সিন্ধু, [illegible] তৃতীয় শক্তি (থার্ড পার্টি) ব্রাহ্মণ। জগৎ-কালীঘাটের [illegible] পটুয়া। কার্যত এক-তৃতীয় [illegible] পার্টির) সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের [illegible] গুলি অবাধে মিসর ও [illegible] প্রচলিত হয়েছিল বলে ধরে নিলে সভ্যতার মূলে সে ঐক্য ও [illegible] পাওয়া যায়, তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা (আর্মেনি—আরকেইক ইজিপ্ট [illegible] ১৭৭)। আদি সুমেরীয় কিম্ভূতকিমাকার আর্টের [illegible] স্থান ও উৎপাদকের সন্ধান ভারতবর্ষই দিতে পারে—[illegible] খুঁজে খুঁজে হয়রান [illegible] ফ্র্যাংকফোর্ট উপদেশ দিয়েছেন [illegible] সরাতে। (বার্থ অব সিভিলিজেশন নিয়ার ইস্ট, পৃ, ১৩৬-১৩[illegible]) কস্তুরীর গন্ধ, সে তো [illegible] ওরে——ডঃ মারে তা অনেক বলে গেছেন, কিন্তু চোরা না [illegible] কাহিনীর।

পার্সেপোলিসের পথে

সবিতা ঘোষ

থেকে সমস্ত দেওয়ালে ছোট বড় শুধু ঝুলছে। কার্পেটের তৈরী আসন, ঝোলা। মাটিতে চারিধারে থাক সাজানো বড় বড় কার্পেট হয় ভাঁজ জোটানো। তার মধ্যে প্রায় কবরস্থ সোনার বরণ দোকানী। দামও খাঁটি সোনার মতই। কার্পেটের কদর বা কৌলিন্য এমন একটা তো নয় হাজার নাম করতে হয় মেন্টা কাঠের ব্লক দিয়ে ছাপা ফুল নানান নকসা। এর নাম কাজ। এই ছাপা কাপড়ের থলি সুজনী, মেয়েদের পরবার কোট। অনুরূপ ছাপ বা নকসা দের টালি বসানো দেয়ালে। আমাদের দেশে কলকারি নকসা চালান গেছে। লোকে এই সব শিল্প রক্ষা

খোদাই করা প্লেট, ঘর উপকরণ। অন্য ধাতুর করা ফুলদানী, অ্যাশ ট্রে। কতো কি। খুব বেশী পার্শিয়ান কাজ করা স্যামোভারের মত চা তৈরী করে খাবার খুব স্যামোভারের চল। দোকানে লোকেরা দাঁড়িয়ে হয়। এরা চা খায়, ছোট গেলাসে। দুধহীন। গুঁড়ো না। কিউব সুগারকে এরা কান্দ সেই একটি প্রথমেই মুখে ফেলে ধা রেখে দেয়। তারপর ঐ পাতলা দিয়ে দিয়ে খায়। চিনির প্রতি ঢোক চায়ের সঙ্গে গলে গলে মিশে যায়। এরা এইভাবে চা অভ্যস্ত যে চা ও সেই চিনির টুকরো শেষ হয়। আমি চেষ্টা চিনির টুকরোটাকে গালের প্রতি চুমুক চায়ের সঙ্গে একটা গালিয়ে নিয়ে চা খাওয়া ব্যাপার। চায়ের চুমুকে নেবার গাল থেকে বেরিয়ে চিনির ওপর হাজির হয়ে যায়। ঢোক ভাঙা পিল-এর মত গিলে না, গলায় আটকাবার কি ভয়। দু এক ঢোক চা মুখে গলে যায়, নয়তো চিবিয়ে। যাক চা পর্ব এখন থাক।

আরো খানিকটা বাজারে ঘোরা যাক। এইসব রকমারি দোকান দেখে দেখে—ওঃ, হাঁ। মিনিয়েচার পেন্টিং সেও এখানকার এক বৈশিষ্ট্য। রাজস্থানেও এ জিনিস দেখেছি। ফ্রেমে বাঁধানো মিনিয়েচার ছবির খুব বিক্রী। রাজপুত আমলের ভারতীয় ছবির সঙ্গে খুব মিল। এই বাজারে খানিকক্ষণ ঘুরলে পাগল হয়ে যেতে হয়, কি কিনবো কি না কিনবো। তারপর দোকানীর সঙ্গে দর নিয়ে দরাদরি। যতক্ষণ দম থাকে লড়ে যাও। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটা জিনিসেরই মাত্র নাম করলাম। তবে বাজার যেমন হয়।

তেন জিনিস নেই যার দোকান না আছে। পারস্যের এইসব বাজারের ঐতিহ্য বহুকালের। তেহরানেও এমনি প্রকান্ড বাজার আছে। বাজারে খানিক ঘোরাঘুরি করে হাতে বোনা কার্পেটের তৈরী ব্যাগ, শাড়ির ওপর পরবার মত কোট, মেয়ের জন্যে সওদা হল। ফুলদান, ছাইদান আরো টুকি টাকি, কর্তার ভাষায় ছাইপাঁশ কেনা হল। অনেকক্ষণ পর
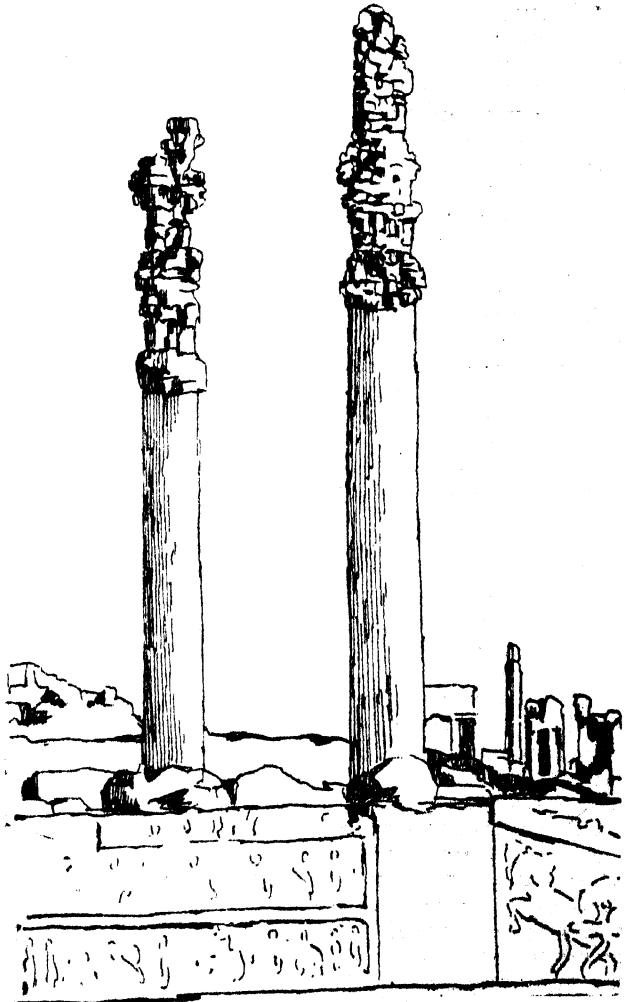
কর্তা বললেন—কিগো, এইখানেই সমস্ত সময়টা কাটিয়ে দেবে নাকি? না আর কিছু দেখার ইচ্ছে আছে?

বাজার থেকে বেরিয়ে কাখ-এ-আলি-কাপু—কাখ মানে রাজপ্রাসাদ দেখতে গেলাম। সপ্তদশ শতাব্দীতে সাফাবিদ রাজবংশের শাহ্-আব্বাস দি গ্রেটের সময় এই আলিকাপু তৈরী হয়। খোলা প্রকান্ড ছাদ, আমরা যাকে গাড়িবারান্দা বলি, সেখান থেকে রাজা নাকি পোলো খেলা দেখতেন। ঐ বিশাল চৌক চত্বর তখনকার দিনে পোলো খেলার মাঠ ছিল। সাফাবিদ স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাসাদটি তৈরী। দেয়ালে পুরনো আমলের মিনিয়েচর পেন্টিং রয়েছে। কিছু কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে যেখানে যেখানে বড় বড় করে রাজা রাণী, হুরী, পরী, সভাসদ, পরিচারিকা আঁকা আছে, মুখগুলোতে জাপানী ঢং চোখে পড়ে। কেন কে জানে?

ইরানীদের নাক, মুখ, চোখ তো খুবই সুন্দর। হয়তো অংকন পদ্ধতিতে চীন, জাপানী ছাপ কোন কারণে এসে গেছে। এ সব বিষয়ে চর্চা বা জ্ঞান না থাকলে বোঝা মুস্কিল। রাজপ্রাসাদ বলে কথা—ছাদে, দেয়ালে, অলিন্দে, খিলানে সর্বত্র কারু-কার্য। প্রাসাদ দেখা হল। ফটো নেওয়া হল। নেমে বাজারের মুখোমুখি, অর্থাৎ ময়দান-এ-শাহ্‌র উত্তরে বাজার, দক্ষিণে মসজিদ-এ-শাহ্‌ দেখবো বলে সামনে যেতেই ফটক বন্ধ হয়ে গেল। একি, এখনো দিনের আলো রয়েছে! ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যে সাতটা। মসজিদ আজ আর দেখা হল না। ফিরে চললাম চা খেতে পিলুর মেহতাব বাড়িতে। সে অপেক্ষাই করছিল। সুদিনাপাতা দেওয়া সুগন্ধি চা, পেস্তা বাদাম ভাজা, বিস্কুট ও পিলুর স্বহস্তে তৈরী কেক খাওয়া হল। পিলু অসীম উৎসাহী, অত্যন্ত ছট-ফটে মেয়ে। সে বললে চলো তোমাদের শহরের বাইরে চমৎকার একটা বোট ক্লাব দেখিয়ে আনি। ফেলে দেওয়া কাঠের টুকরো, বনজঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনা গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরী প্রকান্ড লেকের ধারে অপূর্ব কায়দায় তৈরী এই বোট-ক্লাব। ইস্পাহান শহরের পরই আধুনিক স্টীল সিটি আরিয়া মেহর-এর লোকদের জন্যে এই বোট ক্লাব।...

চা খেয়ে বেরিয়ে দেখি আমাদের চালাক রেজা সাহেব লাপাত্তা। সে সারাদিনের পর ছুটি পেয়ে স্বাধীনভাবে একটু ঘুরতে বেরিয়েছে। সন্ধ্যের পর আবার যে কোথাও যাবার প্ল্যান হতে পারে ভাবেনি। পিলু বললে—অপেক্ষা করা যাক। অনেকটা দূর কিন্তু। এখান থেকে মাইল কুড়ি হবে। আমরা একটু ক্লান্তই। কিন্তু পিলুর এতো উৎসাহ দেখে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছি না। তার অত্যন্ত প্রিয় জায়গা বোট ক্লাব, সে আমাদের না দেখিয়ে ছাড়বে না। বলছে—আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যদিও এটা টুরিস্ট গাইডে নেই, নতুন খুলেছে তো, আপনাদের ভাল না লেগেই পারে না। যখনই কেউ ইস্পাহানে বেড়াতে আসে, আমি সঙ্গে করে তাদের দেখিয়ে আনি। পিলু খুব মজার করে কথা বলতে পারে। বলা বাহুল্য পিলু বাংলা জানে না। ইংরিজিতেই কথাবার্তা হচ্ছে। ও নানারকম গল্প জমিয়ে ফেলল। ওর সঙ্গ আমাদের খুবই উপভোগ্য লাগছিল। নাটকীয় ভঙ্গীতে খুব হাসাতে, ক্যারিকেচার করতে পারে। ও না থাকলে অশোকের খালি বাড়িতে আমাদের একঘেঁয়ে লেগে যেত।

অন্ধকার হয়ে গেল। রাত প্রায় নটা বাজে। হেনকালে রেজার আবির্ভাব। অত্যোদূরে যাবার প্রস্তাব শুনে রেজা এক-বার শুধু বললে—এখন এতো রাতে? পিলু বলল—তাতে কি? কারু পরোয়া নেই। রেজা—না, না। আপনারা যেতে চাইলে আমার আর নিয়ে যেতে আপত্তি কি? পিলু খুব ভাল ফার্সী ইংরিজি দুটোই বলে। ও আসলে ভারতীয় পার্শী অর্থাৎ ওর পূর্বপুরুষ ইরানীই বটে। ওর দাদা স্টীল প্ল্যান্টে ভাল চাকরি করেন। ও দাদার কাছে থাকে। আর কি, গাড়িতে চড়ে বসা। চলল হাওয়া গাড়ি হাওয়া বেগে। আমি কর্তাকে—ওগো রেজাকে সাবধানে চালাতে বল। পিলু—ইরানী ড্রাইভাররা দুর্ধর্ষ গাড়ি চালায়। আইন কানুনের কেউ ধার ধারে না। একেবারে বেপরোয়া! এই প্রসঙ্গে, ও কবে কোথায় কেমন সব এ্যাকসি-ডেন্টে পড়েছিল হাত-মুখ নেড়ে যতদূর সম্ভব রোমহর্ষক করে বর্ণনা করতে লাগল। আমরা খুব হাসাহাসি মজা করতে করতে চললাম।

পাশ দিয়ে—বিশাল ইস্পাতনগরী, আলোয় চারিধার আলোকিত, যেন ইন্দ্রপুরী—পার হয়ে গেল। পিলু বললে বেলাবেলি এলে এসব দেখতে পেতেন। এও দেখার মত। আর বাগান কি! এতো বড় রাস্তা, বুলেভার্ড—মাঝখান দিয়ে ফুলগাছের সারি। ফুল আর অন্ধকারে চলন্ত গাড়ি থেকে দেখব কি করে? আরিয়া মেহর শহর ছাড়িয়ে চলেছি তো চলেছি। শেষে বোট ক্লাবের আলো দেখা গেল। নেমে দেখি সত্যিই চমৎকার—বাগানের মধ্যে অতি চমৎ-কার ক্লাব! গাছের ডালপালার আকৃতি রেখেও কি সুন্দর ঢঙে যে প্রকান্ড বাংলো—বাড়িখানি তৈরি। গ্রীষ্মের রাত্রি দশটা বারোটা তো ক্লাবের পক্ষে কিছুই নয়। ভেতরে রেস্টুরেন্টে খুব খাওয়া-দাওয়া চলছে। মুরগী, মটন রোস্টের গন্ধে জায়গাটা ম ম করছে। বাগানেও ছোট ছোটরা খেলা করছে। সেখানেও খাওয়া-দাওয়ার বিরাম নেই। রাত্রি দশটা বেজে গেছে। উনি বললেন—সবাই এখানেই ডিনার সেরে ফেরা যাক। পিলু ভীষণভাবে ডায়েটিং করছে। সে খুবই হালকা খেল। নানরুটি, কাবাব, স্যালাড—সকলে খেয়ে এবার ফেরার পালা। এই ট্রিপে আমার আগে কথা ছিল রেজা পাওনাগন্ডা যা পাবার তো পাবেই, কিন্তু তার থাকা খাওয়ার সে নিজে ব্যবস্থা করবে। কিন্তু পথের সঙ্গী রেজার সঙ্গে সকলেরই বেশ ভাব হয়ে গেছে। বিশেষতঃ টি... সঙ্গে। টিংকু তার কাছে ফার্সী শিখছে। সুতরাং এক যাত্রায় পৃথক আর কি হবে? ও আমাদের সঙ্গেই খা... থাকছে।...

নির্জন ফাঁকা রাস্তা। রেজা ম... খুশীতে গাড়ি চালিয়ে চলেছে। স্প... কতো কে জানে? পিলু গল্পের ঝা... খুলে দিয়েছে। আমরা তন্ময়। এমন... একটা বাঁক ঘোরার মুখে জায়গাটা আ... অন্ধকার—গাড়ি টালমাটাল। ডাইনে ... পাগলের মত বেঁকছে। রেজা কিছু... কায়দা করতে পারছে না। আমরা—এ... একি! এ্যাকসিডেন্ট! বলে চ্যাঁচাচ্ছি।... আর টাল সামলাতে পারল না। তী... ডাইনে রাস্তাটাস্তা ছেড়ে, কাঁকর পা... কাঁকর, পাথর, ঘাসের মধ্যে প্রচন্ড ... ঝাঁকি দিয়ে ক্যাঁ-চ করে বিকট শব্দে দাঁ... পড়ল। কি ভাগ্যিস পাহাড়ী পথ ... তাহলে এতোক্ষণে খাদের মধ্যে পড়ে ... হত। আর তার চেয়েও আশ্চর্যে... সামনে থেকে বা পেছন থেকে সেই ... কোন গাড়ি আসছিল না। তবে তো ... দুটোতে ধাক্কা লেগে যাচ্ছেতাই ... হত!

রেজা নেমে বললে—টায়ার পাংচার হয়ে গেছে। সে আর বিচিত্র কি? যা হোক, সঙ্গে স্পেয়ার টায়ার ছিল। মিনিট... পর গাড়ি আবার প্রস্তুত। সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে—কি কি সম্ভব ... ঘটতে পারত, কতো অল্পের জন্যে ... গেলাম—এইসব বলাবলি ... সারে ছিলাম। আর হয়তো ধাক্কা ... বার জন্যে হাত দিয়ে দরজাটা ... তাই হাতের বুড়ো আঙুলে চো... লেগেছে। তবে ঐ পর্যন্তই। আর কিছু হয়নি। পিলুই আমাদের স... ভগবানকে ধন্যবাদ দিল। আমাদের রেজার খোদা, আর পিলু, তো... ওদের কি আহুর মাজ দা—? উনি এই একটুখানি রসিকতা করে ... বোঝালেন—দ্যাখ, ইচ্ছে করলেই ... পারতাম। বাঁচিয়ে দিলাম। দেখলি...

বাড়ি পৌঁছেছি রাত্রি এগারোটা... চৌকিদার দরজা খুলেই প্রথম কথা—দেখুন খোদার কি দোয়া, আপনারা বিকেলে বেরিয়ে গেলেন, তক্ষুনি ... ছাদ থেকে এই এ-ত্তোখানি প্ল্যাস্টা... পড়ল। আমি সব পরিষ্কার করে ... ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখি সত্যি ... খানি চুন, বালি, সিমেন্টের চা... গেছে। বাবা, আমাদের আজ খু... গেল তো। জলে কুমীর ডাঙায় ... অবস্থা। তবে এ পর্যন্ত সবাই আছি। শুধু আমার দেখলাম জায়গাটায় বেশ কালসিটে পড়ে গে... প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে, শুয়েই

৮

ক্রিকেটার বিয়ারলি কি যোগী হবেন?

ইংল্যান্ড টিমের সহ-অধিনায়ক মাইক বিয়ারলি আবার ভারতে আসছেন। না—সদ্য ভারত ঘুরে যাওয়া এম সি সি দলের এই সর্বজ্যেষ্ঠ ক্রিকেটারটি ওর ব্যাটিং অস্ত্রটি ঝালিয়ে নেবার জন্য আসছেন না। ক্রিকেট মাঠের বাউন্ডারী ছাড়িয়ে এবার ওর দৃষ্টি আরও প্রসারিত। ভারতের চিরন্তন ও শাশ্বত বাণী-ই এবার বিয়ারলিকে টেনেছে। বাংলার এক ক্রিকেটারকে উনি বলেছেন—'দেশে ফিরে গিয়ে ক্রিকেটের দায়দায়িত্ব কিছু দিনের জন্য চুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি আবার ভারতে আসছি।'

প্রথমবার বিয়ারলি ভারতে আসেন [illegible] বছর আগে সাংবাদিক হিসেবে [illegible] রাইটার ঝুলিয়ে—টনি লুইসের দলের সঙ্গে ভারত সফরের ইতিবৃত্ত বিবরণ করার জন্য। এবছর ক্রিকেট [illegible] তকমাগুলো এঁটে মাঠে নেমেছিলেন টনি গ্রেগের সতীর্থ হয়ে। [illegible] জন্য ওর পদার্পণ ঘটেছে [illegible] স্পৃহায়। ভারতীয়দের [illegible]শাস্ত্র, উপলব্ধ সত্তা, কৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে নেবার জন্যই [illegible] কলেজ তনয় শিগগিরই ছুটে আসছেন।

অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ মাইক বিয়ারলি। এবারের এম সি সি টিমের [illegible] ও চপল স্বভাবের অন্য সব খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন মূর্তিমান ব্যতিক্রম। ওর আচরণে ছিল মার্জিত [illegible] এবং আভিজাত্যের বহিঃপ্রকাশ। [illegible] মেজাজের মাইক বিয়ারলি ক্রিকেট মাঠে শালীনতার প্রতীক।

সব দিক দিয়েই কৃতী পুরুষ। স্কুল জীবনে ক্রিকেটের মাদকতায় [illegible] ঢেলে দিয়েছিলেন। কলেজে [illegible] ভাবলেন লেখাপড়াটাও জরুরী। [illegible] বল শিকেয় তুলে বইয়ের মধ্যে [illegible] গেলেন। বি-এতে হলেন প্রথম। [illegible] ভাল প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য [illegible] ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়—তাতেও প্রথম। কিন্তু [illegible]-র কাজে একঘেঁয়েমির জন্য [illegible] ছেড়ে ফিরলেন খেলার মাঠে। এই সঙ্গে ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের স্নাতকোত্তর [illegible] জন্য। যখন বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] তখন দুটি কৃতিত্ব ওর হাতের মুঠোয়। এক, দর্শনশাস্ত্রে প্রথম [illegible] প্রথম। দুই, সে পর্যন্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড (৪,৩১০)। ক্রিকেট ও অধ্যয়ন দুটোতেই সমান তালে স্কোর করে যাওয়া মাইক বিয়ারলি অতঃপর বেছে নিলেন অধ্যাপনার কাজ। বর্তমানে নিউ ক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক বিয়ারলি আবার এবারের কাউন্টি চ্যাম্পিয়ান দল মিডলসেক্সেরও অধিনায়ক। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে রৌদ্রস্নাত সবুজ ক্রিকেট মাঠের হাতছানিতে এখন বিয়ারলি দোদুল্যমান চিত্ত।

এই ক্রিকেট বোম্বার গল্প বলেছিল আমায় বাংলা ক্রিকেটের 'অ্যাংরি ইয়ংম্যান' রাজু মুখার্জি।

গৌহাটিতে পূর্বাঞ্চলের হয়ে রাজু এম সি সি-র বিরুদ্ধে স্বচ্ছন্দে ৬২ রান করার পর বিয়ারলিই লাঞ্চ টেবিলে ওর সাথে যেচে আলাপ করেন। ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা, রাজু নিজের জীবন জিজ্ঞাসার কিছু উত্তর পেয়ে যায় বিয়ারলির কাছে। জানিয়ে রাখি, রাজু এমন ধরনের ক্রিকেটার যে ব্যাটিং ক্রিজে দাঁড়িয়েও হিপ পকেট (যেখানে একটি রামকৃষ্ণদেবের ছবি বিদ্যমান) ছুঁয়ে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে ভাল খেলার জন্য। ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এ এম এ রাজু ক্রিকেট ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের পলিটিক্যাল থটসের উপর রিসার্চের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলবে কিনা এখন ভাবছে।

বিয়ারলির ব্যক্তিত্বই শুধু রাজুকে আকর্ষণ করেছে তা নয়। সবচেয়ে যেটা ওর ভাল লাগছে ক্রিকেট মাঠে এবং বাইরে বিয়ারলির অপেশাদার মনোভাব। একদা-সাংবাদিক এই ব্রিটিশ ভদ্রলোকের ভারত সম্পর্কে আন্তরিকতা এবং আগ্রহ রাজুর চোখে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে।

রাজু আমাকে বলেছে, 'ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিয়ারলির ঔৎসুক্য দেখে কয়েকটা বই ওকে উপহার দিয়েছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের 'থটস অন দি বেদান্ত', 'থটস অন দি গীতা', 'রামকৃষ্ণস মেসেজ', 'কাস্ট কালচার এ্যান্ড সোসালিজম।' গভীর আগ্রহ নিয়ে এই খেলার ব্যস্ততার মাঝেও যে বিয়ারলি বইগুলো খুঁটে পড়েছে তার প্রমাণ পেয়ে অবাক হয়ে গেছি। একদিন ওকে বলেছিলাম পড়াশুনার জগতে যার এতো স্বচ্ছ সে কেন পেশাদারী ক্রিকেটের মাঝে নিজেকে নষ্ট করছে। নাগপুর থেকে বিয়ারলি পত্র মারফৎ বই পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছে। কর্মযোগ পড়েও লিখেছে—'কর্মযোগ মিন টু মি দ্যাট উই হ্যাভ আওয়ার ডিউটিস ইন ইচ প্লেস অ্যান্ড স্টান্ডার্ড অফ দি ওয়ার্কস আর নট দ্যাট অফ দি অ্যাপেল টিজ, নো ভাইস ভারসা।' বিবেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে নিজের অধিক্ষেত্রে কর্তব্য করে যাওয়ার কথাও বিয়ারলি বলেছেন। ভারতীয় দর্শনের ওপর আরো বই-এর প্রত্যাশায় রয়েছেন উনি।

গৌহাটি থেকে কলকাতায় ফেরার পথে বিয়ারলি রাজুকে বলেছেন, শুধু অধ্যাপনা করে গেলে হয়ত কোনদিনই ভারত ভ্রমণের অবকাশ পেতেন না। ক্রিকেট খেলার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন বলে উনি আনন্দিত।

বিয়ারলির চোখে ধরা পড়েছিল বিরাট এই ভারতীয় জনারণ্যের অধিকাংশই ক্রিকেট খেলে না। গ্রামাঞ্চলে ক্রিকেটের চল নেই এবং এদেশের শতকরা আশিজন কৃষিজীবী। শহরে যেখানে রাজমিস্ত্রির দিনমজুরি তিন টাকা এবং ঈষৎ দক্ষ শিল্প শ্রমিক পায় চার টাকার কাছাকাছি সেখানে ক্রিকেট খেলে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম এবং মুষ্টিমেয়ক ব্যক্তি ছাড়া ক্রিকেট প্রসারের রাস্তা বন্ধ।

বাহাত্তর-তিয়াত্তর সালে প্রেস-বক্স থেকে বসে ক্রিকেটকে মাধ্যম করে ব্রিয়ারলি ভারতবর্ষকে জানতে চেয়েছিলেন। এ বছরও নিঃশব্দে ওর কৌতূহলী চোখ বুলিয়ে গিয়েছেন খেলার মাঠের চৌহদ্দীর ভেতর থেকেও। এবার আসছেন ভারতবর্ষকে জানার পুরোপুরি মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে, প্রাচীন এই দেশটির জ্ঞানের ভান্ডার থেকে কিছু মণি-মুক্তা তুলে নিয়ে যাবার জন্য।

রূপক সাহা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা এক মহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ১৮৭৭ সালের মার্চ ১৫ তারিখে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট ক্রিকেট খেলার শুভ উদ্বোধন হয়। এই খেলাটিই আমাদ পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলা একশ বছরের পুরনো এবং এই দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলার সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২২৪। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা ছাড়া অপর কোন দুই দেশের টেস্ট ক্রিকেট খেলা ২০০ সংখ্যায় পৌঁছতে পারেনি।

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট খেলার উল্লেখযোগ্য রেকর্ড নীচে দেওয়া হল :

এ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড - অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের ফলাফল দাঁড়িয়েছে : অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ২৪ বার, ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ২২ বার এবং সিরিজ অমীমাংসিত ৭ বার। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৫৩টি টেস্ট সিরিজের ২২৪টি টেস্ট খেলার ফলাফল : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮৭, ইংল্যাণ্ডের জয় ৭১ এবং খেলা ড্র ৬৬।

টেস্ট খেলার বিবিধ রেকর্ড

(১৯৭৭ সালের মার্চ ১১ পর্যন্ত)

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার বিবিধ উল্লেখযোগ্য রেকর্ড নীচে দেওয়া হল :

টেস্ট খেলার ফলাফল

	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যাণ্ড	খেলা
স্থান	জয়ী	জয়ী	ড্র
অস্ট্রেলিয়া	৫৯	৪৩	১৭
ইংল্যাণ্ড	২৮	২৮	৪৯
মোট :	৮৭	৭১	৬৬

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ড : ৯০৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ), ওভাল, ১৯৩৮ (বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ৭২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেঃ), লর্ডস, ১৯৩০।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান
(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ইংল্যাণ্ড : ৪৫, সিডনি, ১৮৮৬-৮৭

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬, বার্মিংহাম, ১৯০২

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ইংল্যাণ্ড : ৩৬৪ রান-লেন হাটন, ওভাল, ১৯৩৮

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪ রান-ডন ব্র্যাডম্যান, লিডস, ১৯৩০

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান
(ব্যক্তিগত রানের সমষ্টি)

অস্ট্রেলিয়া : ৯৭৪ রান (গড় ১৩৯.১৪) —ডন ব্র্যাডম্যান, ১৯৩০ (বিশ্বরেকর্ড)

ইংল্যাণ্ড : ৯০৫ রান (গড় ১১৩.১২) —ওয়ালটার হ্যামণ্ড, ১৯২৮-২৯

সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৯টি—ডন ব্র্যাডম্যান

ইংল্যাণ্ড : ১২টি—জ্যাক হবস

দলগত সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়া : ১৭৩টি

ইংল্যাণ্ড : ১৫২টি

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান
(ব্যক্তিগত রান)

৩০৯ রান : ডন ব্র্যাডম্যান, লিডস, ১৯৩০ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে (৩ জন)

(১) ভি টি ট্রাম্পার (১০৪ রান), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯০২;

(২) সি জি ম্যাকার্টনী (১৫১ রান), লিডস, ১৯২৬ এবং

(৩) ডন ব্র্যাডম্যান (৩৩৪ রান), লিডস, ১৯৩০

দ্রষ্টব্য : যে রান করে খেলোয়াড় আউট হন তা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যাণ্ড : ৪৬টি (গড় ৯.৬০)—জিম লেকার, ১৯৫৬

অস্ট্রেলিয়া : ৩৬টি (গড় ২৬.২৭)—এ মেইলী, ১৯২০-২১

একটি খেলায় সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যাণ্ড : ১৯টি (৯০ রানে)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ১৬টি (১৩৭ রানে)—আর এ এল ম্যাসী, লর্ডস, ১৯৭২

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট

ইংল্যাণ্ড : ১০টি (৫৩ রানে)—জিম লেকার, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়া : ৯টি (১২১ রানে)—এ মেইলী, মেলবোর্ণ, ১৯২০-২১

টেস্টের এক ইনিংসে দুই ভাইয়ের সে

জি এস চ্যাপেল (১১৩ রান) আই এম চ্যাপেল (১১৮ রান), ও ১৯৭২ (আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট প্রথম নজির)

ইংল্যাণ্ড দলে ভারতীয় খেলোয়াড়

ইংল্যাণ্ড - অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলায় এ পর্যন্ত এই ভারতীয় খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডের খেলেছেন : কে এস রঞ্জিৎ সিংজী খেলায় ৯৮৫ রান—গড় ৪৪.৭৭), কে দলীপ সিংজী (৪টা খেলায় ৪১৬ রান-৫৯.৪২), পতৌদির পরলোকগত ইফতিকার আলী খান (৩টে খেলায় রান—গড় ২৮.৮০) এবং রমন (৩টা খেলায় ৪৬৪ রান—গড় ৬৬.৬

সর্বাধিকবার দলের অধিনায়ক

ইংল্যাণ্ড : ২২ বার—এ সি ম্যাকলারেন

অস্ট্রেলিয়া : ১৯ বার—ডন ব্র্যাডম্যান

উল্লেখযোগ্য জয়

ইংল্যাণ্ডের জয় : এক ইনিংস ও ৫৭৯ ওভাল, ১৯৩৮ (আজও বিশ্বরেকর্ড)

অস্ট্রেলিয়ার জয় : এক ইনিংসে ও রানে, ব্রিসবেন, ১৯৪৬-৪৭

উল্লেখযোগ্য প্রথম টেস্ট খেলার উদ্বোধন

অস্ট্রেলিয়াতে : ১৫ই মার্চ মেলবোর্ণ

ইংল্যাণ্ডে : ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৮০, ওভা

টেস্টে প্রথম জয়

অস্ট্রেলিয়া : ৪৫ রানে (মেল ১৮৭৭)

ইংল্যাণ্ড : ৪ উইকেটে (মেলবোর্ণ টেস্ট ১৮৭৭)

প্রথম ব্যাটিং, প্রথম রান, প্রথম বাউ ও প্রথম সেঞ্চুরী

চার্লস ব্যানারম্যান (অস্ট্রেলি মার্চ ১৫, ১৮৭৭ মেলবোর্ণ

প্রথম বোলিং :

টি আর্মিটেজ (ইংল্যাণ্ড), মার্চ ১৮৭৭, মেলবোর্ণ

প্রথম টসে জয়ক :

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডি ডি গ্রেগরী (মার্চ ১৫, ১৮৭৭, মেলবোর্ণ

প্রথম 'ডবল' সেঞ্চুরী :

অস্ট্রেলিয়া : ২১১ ডাবলিউ মার্ডক ১৮৮৪)

ইংল্যাণ্ড : ২৮৭ আর ই ফস্টার (সি ১৯০৩)

প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরী :

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪ ডন ব্র্যাডম্যান (লি ১৯৩০)

ইংল্যাণ্ড : ৩৬৪ লেন হাটন (ও ১৯৩৮)

নাচ গান বাজনা

জোড় মিলিয়েই রাগের শরীর

চৌরঙ্গীতে ভারতীয় মিউজিয়মের নতুন তৈরি আশুতোষ জন্মশতবর্ষ ...হলে সঙ্গীত সম্পর্কে একটি ...হয়েছিল ৬ ফেব্রুয়ারি। ...ফর প্রোমোশন অব ইণ্ডিয়ান ...সঙ্গীতাচার্য শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-...পরিচালনায় এই 'সিম্পোজিয়ম' সঙ্গীত - আলোচনা - পরিবেশন ...টিকে প্রায় ষোলো বছর ধরে ...সদনের সেমিনার হল, তানসেন ...সম্মেলন থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ ...নরেন্দ্রপুর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ...সঙ্গীতকেন্দ্র, কাশী বিশ্ব-...পাটনা তানসেন সঙ্গীত পরিষদ ও ...সঙ্গীতবিদ। আয়তনে ছড়িয়ে ...এটা যে সবাই মেনে নিয়েছেন তা ...তাঁর সঙ্গীতের বক্তব্য নিয়ে তর্ক ...যথেষ্ট হয়েছে আর তার দ্বারাই ...এঁরা সমস্যাটি তুলে ধরেছেন এবং ...স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কণ্ঠ যন্ত্র ও ...এই তিনের সমবায়ে সমস্ত প্রদর্শনী ...পরিকল্পনা শৈলেনবাবুর। ...সঙ্গীত জগতে তিনি প্রবীণ প্রাজ্ঞ ...এবং বাস্তব বিজ্ঞানসম্মত ভারতীয় সঙ্গীতের বিচিত্র অলঙ্কার ...প্রকাশ কেমন করে এক একটি রাগের জন্ম দিচ্ছে ও তাকে সরস ...করে তুলছে সেটিকে ভালভাবেই ...ও গেয়ে বাজিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ...ধরনের সামগ্রিক প্রচেষ্টা এর আগে ...চোখে পড়ে নি। ভারতীয় সঙ্গীতে ...কখনও আমরা স্থির রাখি, কখনও ...সা থেকেই সুরের উৎপত্তি। ...স্বরটি স্থির, আবার একে যখন ...হয় তখন তাও একটা নিয়ম বা ছন্দ ...কখনও গলার বা বাজনার পর্দার ...দিয়ে একটি আর একটিকে ছুঁয়ে ...কখনও ঢেউ তুলে ধাক্কা দিচ্ছে ...নাটকীয়ভাবে থমকে দাঁড়াচ্ছে। ...ধরা যাক 'ইমন' শুনতে শুনতে মনে ...উদারায় নিখাদ স্বরটি 'সা'কে ...আশায় উন্মুখ হয়ে উঠছে। এগুলি ...কণ্ঠ ও যন্ত্র থেকে বের হওয়া শব্দ। এর সঙ্গে কি মানুষের ...অভ্যাসের মিল খুঁজে পাওয়া যায় ...না পাওয়া যাবে তবে শাস্ত্রে কেন ...স্থিতি আশ স্পর্শ মূর্চ্ছনা (মূর্চ্ছা) ...টিকা এ জাতীয় নাম দেওয়া হল?

ব্যাখ্যা করে বোঝানো হল মানুষে প্রথম আলাপে করমর্দন আলিঙ্গন স্পর্শ আশা প্রতীক্ষা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পরিচয়কে নিবিড় করে যেমন আত্মীয় আপনজন হয়ে ওঠে সুরও তেমনই তার কড়ি-কোমল মিলিয়ে বারোটি স্বরের সঙ্গে নানাভাবে চেনা-জানা হয়ে মিশে গিয়ে একটি রাগের জন্ম দেয়। এক স্বরের সঙ্গে অন্য স্বরের খাপ খাওয়ানো অংশগুলির জোড় মিলিয়ে রাগের শরীর গড়া হয়। যেমন আলাদা আলাদা পার্টস জুড়ে মোটর গাড়ী।

মানুষের আচরণ অভ্যাস স্বভাব গুণের সঙ্গে যদি সঙ্গীতের স্বভাব ও ক্রিয়ার মিল না থাকত কখনই তবে মানুষ তাকে নিজের করে নিতে পারত না।

যেমন দেখা যায় বাবা মা তাঁর ছেলেমেয়েদের সমানভাবে ভালবাসলেও কাউকে সবচেয়ে বেশি কাউকে বা তার চেয়ে কিছু কম ভাল-বাসেন। ঠিক সেইরকম একটি রাগে কোনো একটি স্বর সবাইকে ছাপিয়ে শ্রোতার মনে দাগ কাটে। তাকে বলব বাদীস্বর আবার তার চেয়ে কিছু কম প্রাধান্য পায় এমন যে স্বর তা হল সম্বাদী। আর একটি তুলনা বেশ ভাল লাগল। ওঁরা বলতে চাইছিলেন মানুষের সমাজে তিন হল একটা বিশেষ ইশারা দেওয়া সংখ্যা, যেন একটা সংকেত মত। মন্দ আওড়াই তিনবার মিছিলে স্লোগান দিই তিনবার, বেশ দিয়ে উনিশ জানিয়ে 'না না না' বলি, দেখ তিনবার। আবার তিন সত্যি করে আবার দিব্যি দিলে তবে কোনো মেয়ে বিশ্বাস করে তার প্রণয়ীটি ঠিক বিকেল তিনটে নাগাদ বসুশ্রীর সামনে তার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমাদের সঙ্গীতে তেমনি সুর তাল বাণীকে সমান মাপে যেটা অনেক সময় গাইয়ে-বাজিয়েরা করেন না, অথবা দুবার ফেলে 'দোহাই' পাড়েন এনে ফেলবার (সমের ওপর, তার আগে, বা পরে সম তেহাই অনাঘাত তেহাই আর অতীত তেহাই। একটা তাৎপর্য আর মজা আছে।

কণ্ঠ ও যন্ত্রের সাহায্যে আলাদা আলাদা করে গেয়ে বাজিয়ে অলংকার ও তান ইত্যাদির বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করে বোঝান ও দেখান হল। আর পাশাপাশি তুলনা। মানুষের নড়ে চড়ে বেড়ানো সামাজিক জীবনের সঙ্গে এইভাবে তাদের সাদৃশ্য। প্রায় দু ঘন্টার এই অনুষ্ঠান, তেমন একঘেয়ে লাগে নি। বিশ্লেষণের পর আলাপে ও খেয়ালে, ভীম-পলশ্রী এবং বাগেশ্রীর পরিবেশন, একটি অখণ্ড সুর-মূর্তি। শৈলেনবাবু যন্ত্রীদের নিয়ে ভাবগম্ভীর ধীর আলাপে ও তারপরে তাঁর তাললয়ের অতিশিক্ষিত তৎপরতায় মীড় গমক স্থিতি স্পর্শ আশ ইত্যাদি অলঙ্কার ও বিচিত্র তানের শাস্ত্র-অনুগ ক্রিয়ায় আগেকার ব্যাখ্যা করা সব জিনিসটাই মেহনত ও নিষ্ঠা নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। দেখালেন, ভীমপলশ্রী ও বাগেশ্রীতে একই পর্দা লাগলেও তাদের প্রয়োগ বিন্যাসের তারতম্যে দুটি রাগরূপের রহস্যটি কোথায়।

হার্মোনিয়ম ধরেছিলেন যাদু বোলানো পাকা আঙুলে মন্টু ব্যানার্জি, তবলায় নিখুঁত স্পষ্ট বুলি তুলেছিলেন স্বপন চৌধুরী, সেতারে উদীয়মান তরুণ কৌশিক নাগকে প্রথমটায় জড়তা থাকলেও পরে প্রতি-শ্রুতির চিহ্ন রেখে যাচ্ছিলেন, ও বেহালায় আলাউদ্দিন ঘরানার সুযোগ্য শিল্পী রবীন ঘোষ শিল্পি গায়কের যথার্থ অনুসরণ করেও সংকীর্ণতায় সমস্ত অনুষ্ঠানের মোট আবহ —এককটাকে ধরে রাখছিলেন আর বেহালায় সে সুযোগ প্রশস্ত। সূত্রধার, অধ্যাপক ডঃ কে এল মুখোপাধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ সহজ পাঠের ভঙ্গীতে বোঝাবার উপযুক্ত এক মনোজ্ঞ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

গীত বাদ্য-এর সঙ্গে নৃত্য থাকলে কেমন হয়? তিনের মিলনকেই ত সঙ্গীত বলেছেন আমাদের শাস্ত্রকারেরা। সেই সঙ্গে যদি ফিল্মোস্লাইড দিয়ে সিনেমার পর্দার ওপর কিছু ছবির প্রতিফলন করা যায় তবে বোধ হয় নিমূর্ত আলোচনাটা আরো আকর্ষণীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

আন্তরিক অন্বেষণ আর জোলো নাটক

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার ক্লাব তাঁদের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে কয়েকটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন যার প্রথম অনুষ্ঠানটি রঙমহল মঞ্চে, উদ্বোধন ও নাট্যানুষ্ঠান সহযোগে। পয়লা মার্চ সাতাত্তরের সাড়ে পাঁচটার বিকেলে, প্রায়-পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের চোখে মঞ্চস্থ লালপাড় গেরুয়া পর্দার সামনে ছিলেন প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, বিশেষ অতিথি শ্রীবিমল কর, ক্লাবের সভাপতি শ্রীসোমেন্দ্রনাথ রায় ও সম্পাদক শ্রীবিশ্বপতি রায়।

শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান অতিথি বললেন, শুনলাম মেয়েরা কি একটা নাটক করবে, তাই এসেছি, আর সেজন্যেই বেশি কিছু বলছি না—নাটকটা শুরু হোক। এরপর বিশেষ অতিথি বিমল কর জানালেন, প্রধান অতিথি তাঁকে 'শর্টকাট' নিতে বলেছেন। তাই শর্টকাটেই সারছি। উদ্যোক্তাদের প্রীতি জানিয়ে বিমল কর বললেন, আপনারা যা করছেন সেটা শুধুমাত্র শিল্পচর্চা নয়, অনেকে মিলে সমবেতভাবে একটা আনন্দের ব্যবস্থা; পঁচিশ কেন, পঞ্চাশ-পঁচাত্তর বছর ধরে আপনাদের সংস্থা টিকে থাকুক। অতিথিদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রদ্ধা জানিয়ে সভাপতি

এবং [illegible] নিয়ে গেলেন।

দুটি নাটক এঁরা স্টেজে নিয়ে এসেছিলেন, যাদের প্রথম ও শেষ শর্ত ছিল অভিনয়প্রধান মনোরঞ্জনের। প্রথম নাটকটি, উদ্যোক্তাদের কথামতোই, সময় নিয়েছিলো তেত্রিশ মিনিট। শৈলেশ গুহ নিয়োগীর এই একাঙ্ক নাটিকা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'র কুশীলবরা সবাই ছিলেন মহিলা। নয়জনের মধ্যে, চারজন সম্পূর্ণ প্রথম মঞ্চে আসছেন। এই অবাস্তব এবং সেই কারণেই হাসি-রঞ্জক নাটকে অভিনয়ের তেমন কোন সুযোগ ছিল না। কুশীলবদের সাতটি পুরুষ-চরিত্র নিজেদের প্রকৃত কণ্ঠ লুকিয়ে রাখতে এবং আসল ধরণধারণকে পুরোপুরি করতে খুব একটা সমর্থ হননি। বরাবরই মহিলা শিল্পীমহলের প্রয়োজনার কথা মনে পড়ছিল।

[illegible] ছিল দাবী। সম্ভবত, পথের দাবির জন্য ছিল এই নির্বাচনের কারণ। নাট্য ঘিরে একটি মোটামুটি আফিস প্রোডাকশন দাঁড়িয়েছে। টিম ওয়ার্কের উঠছে না, কারণ পথের দাবী উপন্যা নাটক—দুটিই একনায়ক সব্যসাচী। প্রমোদ মুখোপাধ্যায়) নিয়ন্ত্রিত এবং সাচীতেই সমর্পিত। পরাধীন বা বৈপ্লবিক চেতনা যে কেবলমাত্র ঘটনামালাতেই ধরা ছিল না, একথা অফিস ও ক্লাবের বহু বাঙালিই বিস্মৃত মান। কিন্তু তথ্য ও জনসংযোগে রয়েছেন তাঁরা কোন নিরিখে সাতাত্তরে পথের দাবির প্রয়োজন-যৌক্তিকতা পাচ্ছেন। কাছাকাছি সিনেমা ছাড়া। বলা কঠিন।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জ

আন্তোনিওনির দি প্যাসেঞ্জার

বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনির ছবিতে সংলাপের চেয়ে দৃশ্য কথা বলে বেশী। আন্তোনিওনি গল্প বলেন ক্যামেরার চোখে বং ফিলমে। তাই তাঁর ছবি সব সময়ই যেমন ইঙ্গিতবহ, তেমনি এক শ্রেণীর দর্শকের কাছে চিন্তার খোরাক জোগায়। এবং সেই জন্যেই বোধ হয় কেউ কেউ বোকার মত তাঁর ছবিকে অস্বচ্ছ বা দুর্বোধ্য বলে থাকেন। আসলে আন্তোনিওনি এমন এক দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ছবির গল্প বলেন, যা অন্য সব বিশ্ববিখ্যাত দর্শকদের চেয়ে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যই আন্তোনিওনির সব ছবিকে বিশিষ্ট করে তোলে।

'লা নোত্তে'র মত আন্তোনিওনির এই ছবিটির বিষয়বস্তুও হতাশা বা জীবনের প্রতি অনীহা। আর অন্যদিকটা হল জীবনে অনিশ্চয়তাবোধ। যে বিষয়কে ভিত্তি করে আন্তোনিওনি ইতিপূর্বে 'দি এক্লিপ্স' নামে একটা ছবি করেছিলেন। একদিক থেকে এটাকে আন্তোনিওনির ইতালিয় ছবির ষাটের দশকের প্রারম্ভকালে ফিরে যাওয়া (চিন্তা মানসিকতার দিক থেকে) বলে মনে করা যেতে পারে। অর্থাৎ তিনি যেন দেড় দশক পিছিয়ে গিয়েই 'দি প্যাসেঞ্জার' ছবিটি করেছেন। এবং নিশ্চয় সচেতনভাবেই।

'লা নোত্তে'র নায়ক পণ্টানোর মত এ ছবির নায়ক টি ভি রিপোর্টার ডেভিড লোকেও (জ্যাক নিকলসন) জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ, হতবাক এবং ক্লান্ত—বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক মিকেলাঞ্জেলো আন্তোনিওনির ছবিতে সংলাপের দৃশ্য কথা বলে বেশী। আন্তোনিওনি বলেন ক্যামেরার চোখে বং ফিলমে। তাঁর ছবি সব সময়ই যেমন ইঙ্গিতবহ, তেমনি এক শ্রেণীর দর্শকের কাছে খোরাক জোগায়। এবং সেই জন্যে হয় কেউ কেউ বোকার মত তাঁর অস্বচ্ছ বা দুর্বোধ্য বলে থাকেন।

পৃথিবী জুড়ে নৈতিক ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো হাজার হাজার মুখোসধারী মানুষ সাঁকয়ে এবং অন্যভাবে বলা যায় খেলায় মত্ত, তার কথাই আ[...] বেশীর ভাগ সময় ক্যামেরায় [...] বিনা [...] বলতে চেয়েছেন। এ[...] দৃশ্য বা না-বলা অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ গোটা ছবিটাতে ভয়াবহভাবে ছড়ি[য়ে] তা লিখে বোঝানো অসম্ভব। এ[...] দেখার এবং দেখে অনুভব করার। এ ছবি দেখে, সঠিকভাবে বু[ঝে] বর্ণনা দেওয়া বোধ হয় নিষ্ফল।

এই ছবির মাধ্যমেই মিকে[লাঞ্জেলো] আন্তোনিওনি আর একবার প্রমাণ [করলেন] যে পৃথিবীর চলচ্চিত্র জগতে তি[নিই] মাত্র পরিচালক, যিনি অসাধারণ [দক্ষতার] সঙ্গে, আশ্চর্য নির্বিকার [...] কাহিনীর চিত্ররূপ দিতে পারেন। মূল উদ্দেশ্য মানবিকতার স্বপ[ক্ষে]।

এ ছবির কাহিনীকার মার্ক [...] প্রযোজক কার্লো পন্টি।

শান্তিরঞ্জন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটি

শুক্রবার, ১১ চৈত্র, ১৩৮৩

Friday, 25th March, 1977

১৬ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা

সম্পাদকীয়	১	
সাহিত্য	৫	বৈকুণ্ঠ পাঠক
মানস রায়চৌধুরীর কবিতা	৬	
সমালোচনা	৭	
চিঠিপত্র	৯	
কারা আমাকে লেখায়	১১	পার্থপ্রতিম বাঁন্দোপাধ্যায়
সত্তরের কবিতা	১২	দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
		তপন চৌধুরী সাজিত সরকার সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
নাচ গান বাজনা	১৩	কংকলাল মুখোপাধ্যায়
গোষ্ঠবাবুর স্বদেশী নিউ প্যালেস	১৪	প্রভাত চৌধুরী
লেখক শরদের প্রভু	১৫	অমলেন্দু বসু
চলমান শিল্প : চৌরঙ্গীতে গ্যালারী ৭	১৮	সুভাষ রায় চৌধুরী
		দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যাদের শহর হয়েছে কলকাতা	১৯	গৌতম ঘোষ
বাবু (গল্প)	২৩	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
কুসুমকুমারীর স্নেহ (গল্প)	৩১	প্রদীপ আচার্য
বর্নার্ডার উপাখ্যান (উপন্যাস)	৩৪	বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

এই সপ্তাহে

বাংলাদেশের সাহিত্য পত্রিকা	৩৭	দাউদ হায়দার
পার্সিপোলিসের পথে	৪০	সবিতা ঘোষ
অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন	৪৩	প্রণতা দে
বনু ফিকম (উপন্যাস)	৫০	অদ্রীশ বর্ধন
কৃষি	৫৩	সুভাষ রায় চৌধুরী
আলোয় খেলা ১	৫৪	অজয় বসু
আলোয় খেলা ২	৫৫	রূপেন্দ্র সাহা
খেলাধুলা	৫৬	দর্শক
শেষ সাক্ষাৎকার	৫৮	শ্যামাপ্রসাদ সরকার
মাইডিয়ার হাজব্যান্ড	৫৯	শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি
ঋত্বিকের নাগরিক ছবিঘরে আসছে	৬২	সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

অঙ্গসজ্জা
সুবোধ দাশগুপ্ত

গত সংখ্যার প্রচ্ছদে ব্যবহৃত
ছবিটি জন চার্ণকের

আগামী সংখ্যায়

গল্প লিখেছেন
শৈবাল মিত্র
দীপঙ্কর দাশ

কবিতা লিখেছেন
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সুধাংশুকুমার রায়ের প্রবন্ধ
সিন্ধুলিপি নিজে শেখ

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন
ডিজেলের গন্ধ/পাখির গান

গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন
শরৎচন্দ্রের একজন ছোট বোন ছিলেন

প্রচ্ছদ কাহিনী

মানুষ : মাছ : সমুদ্র

লিখেছেন
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

পৌর প্রতিষ্ঠানের

দ্বিতীয় পরিকল্পনা

কলকাতা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, ভারতেরও এক প্রধান শহর,
হয়তো বা প্রধানতম শহরও। কাজেই এ শহরের সমস্যাগুলি নিয়ে দেশী-বিদেশী সকল শুভানুধ্যায়ীই যে
দুশ্চিন্তা বোধ করবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

আশ্চর্যবোধ করতে হয় বরং তখনই যখন দেখা যায় এতরকমের সাহায্য পরিকল্পনা এবং
ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও শহরটি এখনও বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। যে অর্থে ইয়োরোপীয় কোনো শহর বাসযোগ্য
সে অর্থে তো নয়ই, এমন কি বম্বে শহরের ভারতীয় মানও অতিক্রম করতে পারেনি কলকাতা।

এই পটভূমিতে বিশ্ব ব্যাংক থেকে কলকাতা উন্নয়নের জন্যে সাত কোটি টাকা ঋণ পাওয়া যাবে খবর শুনে
সকলেই রীতিমত আশ্বস্তবোধ করছেন।

বিশ্ব ব্যাংক আগেও একবার কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে তিন কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন।
সেই টাকা দিয়েই কলকাতা উন্নয়নের কাজ করছেন সি এম ডি এ। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হবে,
রাস্তাঘাট মেরামত ও পয়ঃনালী সংস্কার ইত্যাদি নানা প্রকল্পে সাফল্য অর্জন করার পরও কলকাতার
নাগরিক জীবন এখনও সমস্যামুক্ত হতে পারেনি।

শহরবাসী সাধারণ মানুষ অবশ্য দফাওয়ারি ফর্দ মিলিয়ে কোনটা কতটা
পৌর প্রতিষ্ঠান আর কোনটি সি এম ডি এ-র ভাগে পড়ে তা নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহ বোধ করবেন না।
তাঁরা দেখতে চান শুধু একটি ঘটনা— শহরটি বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে কিনা। জল সরবরাহ, আবর্জনা
পরিষ্কার, মশক নিবারণ ইত্যাদি নানাদিকেই যে তা এখনো হয়নি, এতো সকলেরই জানা। কাজেই
কলকাতার উন্নয়নের যে এখনো তিন ভাগ কাজই বাকী তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ্ব ব্যাংক থেকে তাই সাত কোটি টাকা ঋণ পাওয়ার খবরটি খুবই আশ্বাসজনক।
এই টাকা দিয়ে বস্তি উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পরিবর্তন আনার জন্যে নতুন একটি
পরিকল্পনা রচনা করেছেন পৌর প্রতিষ্ঠান। এবং সে পরিকল্পনা দেখে খুশিও হয়েছেন নাকি
বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিবর্গ।

ভালোই। কিন্তু পরিকল্পনা যখন রচিত হয় এবং তার কাজকর্ম যখন শেষ হয় তার মধ্যেই পুরনো সমস্যার
অনেক শাখা-উপশাখা দেখা দিতে থাকে, আমাদের অনেক পরিকল্পনাতেই সে বিষয়ে কোনো দূরদৃষ্টির
পরিচয় থাকে না।

সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে তো?

প্রিয় কেয়া

ছায়াছবির স্যুটিং করতে গিয়ে গত শনিবার বেলা ৩-৩৫ মিনিটে আপনি সাঁকরাইলের কাছে নদীস্রোতে ভেসে গিয়েছেন। রবিবার দুপুরে আপনার বডি পাওয়া যায়।

ছবির গল্পের লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমায় বলেছেন—নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার কোন দৃশ্য তার বইতে ছিল না। হয়তো সিনেমার জন্যে দৃশ্যটি বানানো। সে দৃশ্যে নদীতে ঝাঁপ দিতে সাঁতারে পটু একজন ডামি তৈরি ছিলেন। তিনি নিজে পুলিশকে জানিয়েছেন, ওইদিন ছবি তোলার আগে বলা হয়েছিল—তাকে আর দরকার নেই।

আপনার স্বামী—নট ও নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদের মুখে এসব কথা গত রবিবার সকালে শুনেছি।

জীবন এরকমই হয় কেয়া। আপনি সাঁতার জানতেন কিনা জানি না। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের কাছাকাছি তো কোন পুকুর নেই। জানলেও নদীর জোয়ারের মধ্যে পড়লে কে আর সাঁতরে ফিরে আসতে পারে। এ চিঠিও আপনার কাছে কখনো পৌঁছবে না।

আপনি অভিনয়ের মানুষ। জীবনের শেষ মুহূর্তেও অভিনয়ের ভেতরেই ছিলেন। এই অল্পদিনের জীবনে আপনি নিজেই আপনার উদাহরণ। কলেজে ইংরাজি পড়াতেন। নান্দীকার গোষ্ঠীর তিন নামের যে ফুলের তোড়াটি ছিল—যা বাঙালী এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণে অভ্যস্ত—অজিতেশ-কেয়া-রুদ্র।

ছুটির দিনে ট্রানজিস্টার থেকে আচমকা আপনার গলা পেয়েছি। সেই রহস্যময়, তেজী, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ইথারে ঢেউ দিয়ে আমাদের ঘরে ভেসে এসেছে। মুক্তাঙ্গনে নটী বিনোদিনী করার পর মেকআপ না মুছেই আপনি আর রুদ্রপ্রসাদ আমাদের সামান্য ঘরে এসে বসেছেন। তখনো আপনার গলায় গিরিশযুগের ছোঁয়াচ। আপনি ইতিহাসের প্রাণ পাওয়া কোন মানুষের মতই তখনি নাটক নিয়ে কথা বলেছেন—তর্ক করেছেন—বাংলা নাটকের এই ঐতিহাসিক দম্পতিকে তখন বেশি রাতে উত্তরের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছি। কানে বাজছে গিরীশবেশী অজিতেশের কথা—'বিনোদ'। ক্ল্যারিওনেটে তখনো বৃন্দবাদন প্রবল।

১৯৪২-এ আপনার জন্ম। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগের সময় আপনি ছিলেন নেহাৎ বালিকা। তবু, ইতিহাসের নিশ্বাস আপনি অভিনয়ে তুলে নিয়েছিলেন।

বাবামশা শান্তা ভালমানুষ হতে চেয়েছিল। আপনি শান্তা সেজে দিনের পর দিন আমাদের সব প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন। আমাদের মুখোশ, আমাদের মুখ আপনি চিনতেন। কত অল্পবয়স থেকেই প্রজ্ঞা আপনার সঙ্গিনী। কথায় কথায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণ রশ্মি ছড়িয়ে দিয়ে আপনি জীবনে এগিয়ে চলেছিলেন! আমরা বাঙালীরা আপনাকে নীরবে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছিলাম। আপনি মঞ্চে নানা মায়া তৈরি করে এক এক দৃশ্যে কাঁদিয়েছেন, হাসিয়েছেন, ভাবিয়েছেন। আমরা জানতাম আপনি একটি পরিণত জীবনের দিকে চলেছেন। আপনার অভিনয় আমাদের জীবনের একটা অংশ হয়ে উঠেছিল। এমন যে ঘটবে আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ আমরা খুবই ভাগ্যহীন। আপনি ছিলেন আমাদের জীবনের একটি পুরস্কার।

আন্তিগোনে অভিনয়ের সময় আপনি আমাদের মনের কথার প্রতীক হিসেবে একটি প্রতিবাদের শিখা হয়ে মঞ্চে জ্বল জ্বল করে জ্বলতেন। এত প্রতিভাশালিনী, এত নিরভিমান, এত একাকী—বিদায়ের চিহ্ন সেই তখনই চোখে পড়ে। আশা অধিক বলেই একদা নাথের মত এটি খুঁজেছি। সেজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী।

গ্রীষ্মের দুপুরে আপনাদের তেতলার ঘরে অজিতেশ, আপনি, রুদ্র নাটক, অভিনয়, সময়, জীবন নিয়ে তোলপাড় আলোচনা করেছেন। নান্দীকার গড়ে ওঠার কথা বলেছিলেন আমাকে। অনেকদিন আগে।

তারপর ফোনে, সাজঘরে দু'চারবার কথা হয়েছে। নাটকে কতটা বাহুল্য—তাই নিয়েও কথা হয়েছে। আপনি যে শেষে এমন করবেন—তা তো কথা ছিল না।

গত ১০ মার্চ সকালে টেলিফোনেই জানলাম—আপনাদের 'ফুটবল' নাটকের বিশেষ শো সন্ধ্যেবেলা। সেদিনই দুপুরে অজিতেশ বলেছিলেন—কেয়াকে তো জানেন—যে-জামাজোড়াটি ও'র পছন্দ হবে না—সেটি ও বলবে না। রুদ্র এ-নাটকে কঠিন পরীক্ষায় হাত দিয়েছেন।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা শেষবারের মত আপনাকে মঞ্চে দেখলাম—আপনি অসহায় বোনপো আর বোনঝিকে মানুষ করতে গিয়ে অসৎ মাসী হয়ে পড়েছেন। তখন আপনার গলার স্বরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা—দারিদ্র্য, অশিক্ষা, গাঢ় ভালবাসা, নিরুপায়ের আত্মঘাতী বিষপান। স্ত্রীকে লুকিয়ে কাঁদতে হল। তিনিও আপনার অভিনয়ে কাঁদছিলেন। আমাকে লুকিয়ে। বয়স্ক লোকের যে কাঁদতে নেই।

সেদিন অভিনয়ের পর সাজঘরে গিয়ে আর দেখা করিনি। সেজন্যে শুক্রবার ভোরে টেলিফোনে ভর্ৎসনা জুটেছে। তখনো জানি না এই পৃথিবীতে আপনি আর মোটে একটি দিন আছেন। তখন একটি কাজের ভার দিয়েছিলেন। ফুটবল নাটকে যা ভালো লাগেনি—তা যেন লিখে পাঠাই। নান্দীকারের বৈঠকে চিঠিখানি পড়া হবে।

বৈকুণ্ঠ চিঠি লিখেছিল। আপনি পাননি কেয়া। রুদ্রপ্রসাদ রবিবার সকালে সেকথা জানালেন। তাঁর কাছে চিঠিখানি আছে। আপনি পরে পড়ে নেবেন। আপনার জীবনের শেষ চিঠি। আর সম্ভবত আপনার শেষ সাক্ষাৎকারও নিয়েছে অমৃত। এইতো কদিন আগে। আপনি প্রবাসে যাবার পর এই আমার প্রথম চিঠি।

কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, ছবি আঁকিয়ে, অভিনেতা, সাংবাদিক, গাইয়ে, গৃহবধূ, অধ্যাপিকা, ডাক্তার—কত শিল্পী, কত বুদ্ধিজীবী, কত মানুষ আপনাকে যে কি চোখে দেখতেন—আপনাদের ওই তিনটি নামের ফুলের তোড়াকে যে কি চোখে দেখেন—তা আপনি জানতেন না কেয়া। বাঙালীর মানস-সম্রাজ্ঞী ছিলেন আপনি। সবটাই ছিল অভিনন্দন। অভিনন্দন। বুদ্ধিদীপ্ত পূর্ণাঙ্গ অভিনেত্রীর শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা।

এসব কি ঘটে গেল! এমন তো কথা ছিল না। এত তাড়াতাড়ি। এত আচমকা।

বাংলা নাটক আপনার নামে পতাকা তুলুক।

ইতি—

বিনীত

বৈকুণ্ঠ পাঠক

মানস রায়চৌধুরীর কবিতা

কৌমার্য

বহু রকমের মেলামেশা হয়েছিল চড়ুকে, ঝুলনে
মেশামেশি হয়েছে রোদ্দুরে আরো মেঘভাঙা ছায়ার ভিতরে
আঙুর পেকেছে চৈত্রে নিজের নিয়মে
সংসারী কৃষক তাকে মুঠোর উত্তাপে নিয়ে গঞ্জে বেচে আসে
চোখ থেকে দৃষ্টি খসে ওড়াওড়ি করেছিলো
মাছির স্বভাবে রূপ খুঁজে
রূপ ও নিরূপে হলো মেশামেশি অপার আলস্য ছিলো মেঘলা দুপুরে
জ্যোৎস্না-ফেটে-পড়া রাত্রে শূন্য ছাদে উড়িয়ে বেলুনে
মাখামাখি হয়েছিলো কতভাবে আজ কিন্তু বিশ্বাস হয় না
কিভাবে সহজ শব্দ নেমে আসে ঠোঁট থেকে ঘুমন্ত চিবুকে
কিভাবে নীরক্ত মুখ জ্বলে ওঠে আকাঙ্ক্ষার আঁচে
তা এখন ভাবতে দেরী হবে......

ঢের হয়েছিলো মেশামেশি
তার পরিণতি এই ছন্নছাড়া ছেঁড়া তাঁবু, গলাভাঙা কুঁজো
এখন, জল যে জল, তাকেও মেশাতে ভয় হয়
সন্ধ্যার পানীয়ে, সুরা কৌমার্য অটুট রাখে কাঁচে।

অনন্তের হাত

রান্নাঘরে উনুনের পাশে
বিড়াল ও তোমার স্বপ্ন পাশাপাশি জেগে
শীতঋতু তাড়া করে তোমাকে এনেছে ওইখানে
জানলা বন্ধ, কাঁচে কার ছায়া পড়ে? অনন্ত বোধহয়...
মাংসে জ্বাল দিতে দিতে সুরুয়ার দিকে চোখ পড়ে
বাদামী বিকেলে গন্ধ, জীবন এভাবে এসে মিশেছে রান্নায়
এ ছাড়া সত্যের রেখা কোনো হাতে খুঁজে পেয়েছিলে?

নিজে ভেবেছিলে কিছু সঞ্চয় হলেই
কিনে নেবে নীল নাকছাবি আর কাশ্মিরী চাদর
স্বীকারে কি দোষ ছিলো? সঞ্চয় হয়নি এতে লজ্জাটা কোথায়?
মাথা রাখো অহেতুক অতো টান টান এবং শরীর
শীতেতে রান্নার আঁচে কে তোমার রূপ দেখতে আসে
জানলায় অনন্ত উঁকি মারে, দূরে ডিমে চাঁদ
শীতের কুয়াশা আর একা একা তুমি
কি যে কথা বলছো আমি কিছুই জানিনা
এইমাত্র আঁধারে রেখেছি নিবেদন :
ভঙ্গী খুলে রাখো নইলে ঘাড়ে ব্যথা হবে
লোক দেখানোর কিছু নেই, সুলক্ষণ
উনুনে রয়েছে আঁচ অতো গনগনে
রান্না শেষ হলে নয় তুলে নিও অনন্তের হাত!

শেষ বসন্ত

এ যেন বসন্তকাল অথবা বসন্ত শেষে গ্রীষ্মের বাতাস
দরোজায় কড়া নাড়া দেয়—
পূবে থেকে পশ্চিমে ঘুরেছে রোদ্দুর
প্রৌঢ়ত্ব বল্কল ওই তোমার খোঁপার শাদা চুল
চিনে নিতে বেশ দেরী হয়
এ যেন বসন্ত শেষে নিশ্চিত গ্রীষ্মের আবির্ভাব
রুমাল হারায়, খুঁজে পাই না তোমার ঠিকানাও
জনারণ্যে অচেনা চিবুক।

ঘুমে ভেঙে যেন চেয়ে আছো
ডাক হরকরা কাল দিয়ে গেছে দুঃখী বিবরণ
সুখ কি দরোজা খুলে তোমাকে ডেকেছে
স্বপ্নের ভিতরে থাকে অজস্র আলপিন
এ যেন বসন্ত শেষে গ্রীষ্মে সমাসীন
অনধিকারের হাত ছুঁয়ে যায় নিদ্রিত শরীর।

মানস রায় চৌধুরী

জন্ম : ১৯৩৫
পেশা : অধ্যাপনা

মানস রায়চৌধুরী পেশায় অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞানী ও অক্লান্ত গবেষক। স্বভাবে ধ্রুপদী নন্দন শিল্পের অনুগত। সৌখিন আলোকচিত্রশিল্প ও সঙ্গীতে তার গভীর অনুরাগ ও সহজ অধিকার। মেজাজে তিনি সামাজিক ও ভ্রাম্যমান। তাই তাঁর রচনায় ভ্রাম্যমাণ অন্বেষণের রক্তিম যন্ত্রণার শেষেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ এবং বলতে দ্বিধা নেই, সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও এই বহমান মানব প্রেম ও সমাজচেতনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি আপাত জনপ্রিয়তার মোহকে উৎসর্গ করেন অবলীলায়। তাঁর রচনায় গার্হস্থ্যের অনুরাগ ও আসক্তির অন্তরাল থেকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রকৃতির কাছাকাছি এক অনন্ত ভিখারি মানুষের অসহায়তা ও বেদনা বিষাদ।

জনপ্রিয়তার মুখর রাজপথ থেকে কিছুদূরে মানস রায়চৌধুরীর কাব্যজগৎ এক ভ্রাম্যমান ভূখণ্ডের মত তাৎক্ষণিকতায় লিপ্ত আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয় তার প্রচ্ছন্ন রহস্যের ল্যাসো। চেতন জগতের প্রখর নাগরিকতার অভিঘাত থেকে উঠে আসে তার অতি আধুনিক আন্তর্জাতিক শব্দরূপ, অবচেতনের প্রদোষ থেকে দেখা দেখা দেয় তার গূঢ় প্রতীকের দূরে মাস্তুল। আত্মরতির নিষ্ফলতা বা দায়িত্বহীন প্রগলভ বিস্ফোরনে বিশ্বাসী নন পঞ্চাশের এই স্বতন্ত্র ও অগ্রগণ্য কবি। সতর্ক সম্পাদনা ও শৈল্পিক নৈপুণ্যের বিরল মিলনে তাঁর রচনা সুষম ও সংহত। তাঁর কবিতায় আমরা পাই ভিন্ন স্বাদের ও রূপের চিত্রকল্প, যদিও গঠনরীতি ও প্রকরণে দুঃসাহসের পরিচয় রাখতে তাঁর অনাগ্রহ আমাদের উদ্দীপন করে।

বাসুদেব দেব

ঘুমের মধ্যে বাঘের স্বপ্ন দেখি

ওরা আমায় বলে দাড়িবাবা

'শিকার' এমন একজন লেখকের লেখা শিকারের কাহিনী যিনি আরম্ভেই সবিনয়ে বলে নিয়েছেন যে তিনি লেখক নন, আকর্ষণীয় করে গল্প জমাবার ক্ষমতাও তাঁর নেই এবং গ্রন্থের অন্যত্র তাকে বড় শিকারী বলে একজন পরিচয় দিতে গেলে তিনি আপত্তি করেছেন এবং লজ্জা বোধ করেছেন। বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিচ্ছিন্নভাবে এই কথাগুলো আমার চোখে পড়তে আমি বইটি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠি। উঠি আরও এইজন্য যে শিকার কাহিনী লেখার পক্ষে যে-গুণগুলো দরকার তা না-থাকতেও কি করে একজন প্রায় চারশো পাতার ঠাস বুনোটের একখানা বই লিখে ফেলতে পারলেন এবং সেটাও একজন প্রকাশক ছাপিয়ে কুড়ি টাকার মত উচ্চ মূল্যে বাজারে ছাড়তে সাহস পেলেন।

ভাবতে ভাবতে বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ থমকে দাঁড়াল। লেখক জীবনে কোনোদিন বাঘ শিকার করতে পারেন নি বলে অশেষ পরিতাপ প্রকাশ করে বলছেন 'আমার শোবার ঘরের চার দেওয়ালে জঙ্গলে বাঘের স্বাভাবিক চলা-ফেরার ছবি টাঙানো আছে, প্রমাণ মাপের। এই ছবিগুলো আমার খুব ভাল লাগে এবং এই ছবিগুলো আমার শোবার ঘরে এমনভাবে টাঙিয়েছি যে, বিছানাতে শুলেই অন্ততঃ তিন দেওয়ালের ছবির বাঘ আমার চোখে পড়ে। আপনারা শুনে হাসবেন আমি বছরের পর বছর এই বাঘগুলোকে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছি।'

দারুন উৎসাহে এবার বইটা নিয়ে নড়েচড়ে বসতে হল। প্রথম থেকে বইখানা শুরু করতে যাব এমন সময় হাওয়ায় খান দুয়েক পাতা আপনি উল্টে গেল। দেখলাম নিজেকে কৌতুকের উপাদান করে একটি অসাধারণ রসিকতা করেছেন লেখক। বলছেন তিনি বছরের পর বছর বাঘ শিকারের জন্য বনে জংগলে ঘুরে ঘুরে যে টাকা ব্যয় করে শূন্য হাতে ফিরে এসেছেন, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মতে কলকাতার চিড়িয়াখানায় গিয়ে খাঁচায় বন্দী একটি বাঘকে গুলি করে মেরে ফাইন দিলেও খরচ অনেক কম পড়তো।

বুঝতে পারলাম শিকারের নেশাটা ভদ্রলোকের রক্তে আছে। আরো ভাবলাম সাদামাটা চাকুরীজীবী লোক—উঁচুদরের স্বপ্ন দেখতে পারতেন, চাকরীতে উন্নতির—নিদেনপক্ষে কোনো আদিবাসী রূপসীর মুখচ্ছবি না হয় কিছুই নয়। একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্য সজীব বাঘের ছবি। এই যাঁর স্বপ্ন এবং অমন উন্নতমানের রসিকতা করা যাঁর

আনন্দে—তার শিকার কাহিনী কিছুতেই বৃথা যেতে পারে না। এই হিসাব করে, অনেকদিন পরে একটি চমৎকার শিকার কাহিনী (এক নিঃশ্বাসে বললে মিথ্যা কথা হবে) বেশ চেখে চেখে কয়েকদিন ধরে পড়ে ফেললাম।

গ্রন্থটিতে শিকারের গল্প আছে পাঁচটি। একটি প্রত্যন্ত ত্রিপুরা অঞ্চলে পাগলা হাতী শিকার। রাজস্থানের চম্বল নদীর উপত্যকার বেহড়ে বাঘ শিকার। নাগপুরের কাছে এন্কাবান্ডার দক্ষিণ চাঁদায় বাঘিনী শিকার। বিহারের লাতেহার ডিভিশনের কুমান্ডিং শুটিং ব্লকে অভিযান এবং সবশেষে গয়া জেলার চোরদিহাতে বাঘ শিকারের চেষ্টা।

'শিকার' কাহিনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—শিকার না-পাওয়ার কাহিনী। ফলে শেষের দিকের গল্পগুলি খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। লেখক অনেক জায়গায় ভুলে গেছেন, শিকার পেলে তবে তার কাহিনী হয়। সব শিকার কাহিনীরই একটা ক্লাইম্যাক্স থাকে। তাই পাঠকেরও উৎসাহ থাকে। শিকার না-পাওয়ার বা না-করতে পারার সকল কাহিনীই প্রায় এক রকমের। সে কাহিনী শোনবার ধৈর্য না-থাকলে কাউকে দোষারোপ করা যায় না। তার উপর যদি প্রায়ই এই রকমের ঘটনা, শিকার ফস্কে যাওয়ার দুঃখ, আপশোস ও পরিতাপের প্রকাশ, শিকার কালে 'মারী' বাঁধবার সাবধান বাণী ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি ঘটে ঘটে গ্রন্থের কলেবরকে অকারণ বাড়িয়ে দেয় তাহলে প্রত্যাশাপূর্ণ পাঠকের মেজাজ খারাপ হতে বাধ্য।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যা-ঘটে তার সবটা বললে কাহিনী হয় না। কাহিনী রচনা করতে হলে কিছুটা বাদছাঁট দিতেই হয়—কাহিনী সাজানোর ট্যাকনিক্যাল দিকটার উপর নজর দিতে হয়। তা না হলে দুশো পাতার কাহিনী চারশো পাতায় পরিণত হবে। যতদূর মনে হয় লেখক হয়তো রোজনামচার পাতা থেকেই কাহিনীগুলি রচনা করেছেন। আপন লেখার মমতায় পড়ে কিছুই বাদ দেন নি। ফলে 'চা ও জলখাবার' প্রসঙ্গ কাহিনীগুলির মধ্যে এসেছে প্রায় ১১৩ বার। বাঘ শিকার করতে না-পারার আফশোষ প্রসঙ্গ এসেছে ৫৩ বার। কে কোথায় কতটা যত্ন করে খাইয়েছেন সে প্রসঙ্গ ৩৭ বার। শিকারী-লেখক নিজের লেখার এমন প্রেমে-পড়ে গিয়েছেন যে কোনো রকমের প্যারাগ্রাফিং-এর নামগন্ধ না-রেখে একটানা লেখা চালিয়ে গেছেন ৬।৭।৮।১০ পৃষ্ঠা ধরে।

তবু বলছি, শিকার কাহিনীর যথার্থ শিকার অংশের নাটকীয় উত্থানপতন ব্যতিরেকেও শিকারের জন্য প্রস্তুতি, গহন অরণ্যে যাত্রা, শিকারের সহস্র খুঁটিনাটি ও শিকার অন্তে প্রত্যাবর্তন অংশে যাদের উৎসাহ আছে তারা এই গ্রন্থে যথেষ্ট আকর্ষণ অনুভব করবেন। প্রকৃতপক্ষে হিমাংশু বন্দোপাধ্যায়ের 'শিকার' গ্রন্থটিকে ভ্রমণ ও শিকার কাহিনীর একটি মিশ্র গ্রন্থ বলাই ঠিক হবে। জা-মনুর পাগলা হাতী শিকারের পর সেখানকার আদিবাসীদের হাতীর মাংসের প্রতি লোভ ও হাতীর মাংস কাটার পদ্ধতি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে—তা যেকোন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে পারে। অথবা দক্ষিণ চাঁদায় যে মানুষটি লেখকের আতিথ্যদাতা ও সহকারী হিসেবে কাজ করেছে সে যে চম্বলের কুখ্যাত ডাকাত ঠাকুর সাহেব—জেনে এতদাঞ্চলের ডাকাত সম্পর্কে একটি নূতন দৃষ্টি গড়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া বিপদের মুখে শিকারীর নিজস্ব মানসিক অবস্থা জানার কৌতূহল যাদের আছে তারা সবিস্ময়ে শুনতে পাবেন: 'এই ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যে মৃত্যুর খেলাতে আমি এখন দারুণ মেতে উঠেছি; আমার তখন কোন অনুভূতিই কাজ করছে না ভয় নেই, ডর নেই—অনিবার্য মৃত্যুকে আমি তখন যেন হাসিমুখে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। বার বার বধ উন্মাদের মত ভীষণ চেঁচিয়ে বাঘকে আহ্বান করছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য বলছি—আমি প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য, হয় আজ তোমার মৃত্যু, নয়তো আমার। সাহস থাকে তো বেরিয়ে এস'—সরল লেখকের এমনি অনেক অকপট উক্তির মধ্যে বইখানির বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে।
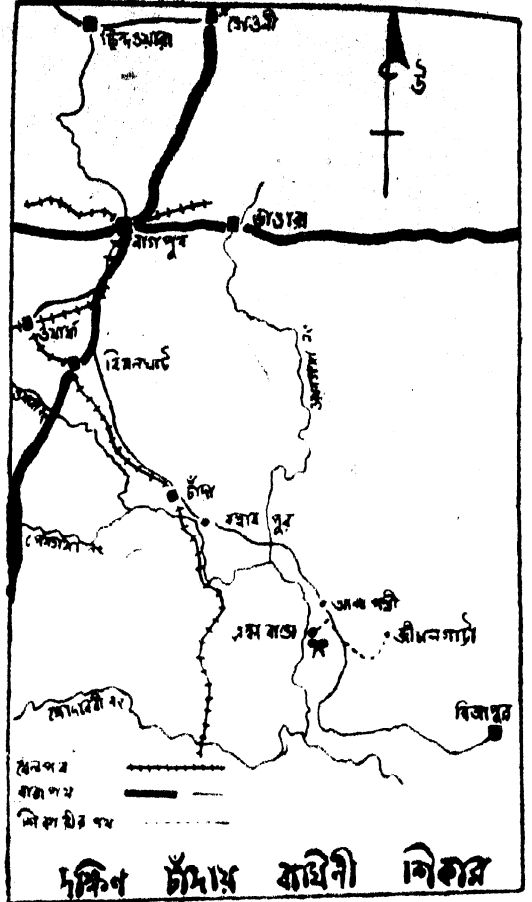
ছাপা ও বাঁধাই বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মত ভাল। প্রচ্ছদ, অসাধারণ। গ্রন্থটিতে অনেকগুলি মূল্যবান ছবি আছে।

অমল মুখোপাধ্যায়

শিকার। হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়। নবপত্র প্রকাশন। ৫৯ পটুয়াটোলা লেন। কলিকাতা-৯। দাম কুড়ি টাকা।

দক্ষিণ চাঁদায় বাঘিনী শিকার

বই পড়া

অমৃতলোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে কোনদিন আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন 'তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ' সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

*

পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে, —কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, যদি মনে করি, যে-বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেগুলিই রক্ষা করিব, তবে শত বৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার দুর্ভর হইয়া উঠে না। **রবীন্দ্রনাথ**

চিঠিপত্র

রহস্যের কিনারা কোনদিনই হবে না

অনেক কৌতূহলের পর পেলাম ১৬ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যার অমৃত পত্রিকাটি। পত্রিকাটি পেয়েই এক নিঃশ্বাসে পড়তে বাধ্য হলাম অমল মুখার্জীর লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শিল্প ও বাণিজ্য' প্রবন্ধটি। এরকম রহস্যজনক প্রবন্ধ পড়ে চমকে উঠতে হল, বিভূতিভূষণের মৃত্যু স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক সেই রহস্যটি প্রবন্ধে পড়ার পর মনকে ব্যথিত করে রাখলো। এরকম প্রবন্ধ উপহার দেওয়ার জন্য সম্পাদক (অমৃত পত্রিকা) ও প্রবন্ধ লেখক অমল মুখোপাধ্যায়কে জানাই আমার আন্তরিক নমস্কার। কিশোরকুমার সাহা অশনি পত্রিকা নৈহাটী, ২৪ পরগণা।

(২)

শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়-এর তথ্য সমৃদ্ধ 'বিভূতিভূষণ' পড়লাম। দীর্ঘ আলোচনার মাঝে বিভূতিভূষণের মৃত্যু প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ? না অস্বাভাবিক ? প্রশ্ন যুক্ত উপ-শীর্ষকটি হৃদয় স্পর্শ করেছে।

'১৯৫০ সালের ১ নভেম্বর সৌন্দর্য' সাধক বিভূতিভূষণ 'তীব্র আর্সেনিক' বিষে ঘেমে ঘেমে উঠছেন। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন কিম্বা নির্জন সুবর্ণরেখা নদী তীরে বিভূতি অনুজ নুটবিহারী কার্বলিক এ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করছেন কল্পনা। প্রবণ পাঠক মাত্রেই এ দৃশ্য দুটি কল্পনা করে যন্ত্রণায় অধীর হবেন।

কিন্তু যন্ত্রণার শেষ এখানেই নয়। অনুজ ডাক্তার, বিখ্যাত ডাক্তার বন্ধু এবং অগণিত ভক্ত থাকা সত্ত্বেও এই বিখ্যাত সাহিত্যিক বিনা চিকিৎসায় তিন-চার দিন ধরে বিষের নির্মম আক্রমণ সহ্য করে গেলেন কেন ?

ধলভূমগড়ের রাজবাড়ীতে কার স্বার্থে বিষাক্ত সিঙ্গাড়া পরিবেশিত হল ? কেনই বা নুটবিহারী তার প্রিয় দাদার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলেন না এবং সেই জন্যই কি আত্মগ্লানিতে নুটবিহারী আত্মহত্যা করলেন ? না বিভূতিভূষণের হত্যা-চক্রান্ত জেনে ফেলেছিলেন বলেই কি তাকেও আত্মহত্যার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল আড়াল থেকে ? টাটার বিখ্যাত ডাক্তার বঙ্কু মুখোপাধ্যায়কে ঘাটশীলা আসায় কে বা কারা পরোক্ষ বাধা সৃষ্টি করেছিল ? কিম্বা পাকুর থেকে পাঠানো চিঠিখানা যথা সময়ে ঘাটশীলার ও-সির হস্তগত হল না কেন ?

অনেক অনেক প্রশ্ন ভীড় করে আসে বৈকি। কিন্তু উত্তর মেলে না !!

বিভূতিভূষণের হত্যা রহস্যের কিনার হয়তো কোন দিনই হবে না। কারণ এই পাওয়া যাবে না, কারণ হত্যাকারী প্রভাবশালী ব্যক্তি। নিখুঁতভাবে ছড়ানো তার জাল।

সে নিখুঁত জাল ভেদ করে কোন খবর আসেনি কলকাতার কাগজে! অথচ সেই সময় বিদেশী লেখকের (?) মৃত্যু শয্যার প্রতিটি মুহূর্তের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছিল প্রতিটি কাগজে। মিহির বিশ্বাস বাকসাড়া, হাওড়া।

(৩)

অমৃত। ফাল্গুন মাস। ৬ই। শুক্রবার ১৩৮৩। লেখক-অধ্যাপক অমল মুখোপাধ্যায়-এর বিভূতিভূষণের অন্বেষণ দোসরহীন। অনন্য। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন হোয়ে পড়েছে। গুণীজনেরা এ বিষয়ে মতামত দিলে সুখী হই।

বিভূতিভূষণের মৃত্যু যে ঠিক স্বাভাবিক নয়, তার প্রথম হদিশ পেয়েছিলুম প্রায় বছর দুই আগে কোন একটি দৈনিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত রমা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'কাছে থেকে দেখায়।' রমাদেবী তাঁর ধারাবাহিক রচনায় স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে কোন সন্দেহজনক মন্তব্য রাখেননি। রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবার সময় নিজেই স্বামীকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাজবাড়ী থেকে হঠাৎ-ই অসুস্থ হয়ে তাঁর স্বামী ফিরে এসেছিলেন—উল্লেখ ছিল শুধু এটুকুই। সুতরাং অমলবাবুর লেখাটি পড়ে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা কোরেছি এক প্রবীণ সু-সাহিত্যিকের সঙ্গে। তিনি জানালেন—ব্যক্তিগতভাবে আমি যতদূর জানি এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যা খোঁজ পেয়েছিলুম তাতে এর মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র নেই। বিভূতিবাবু ছিলেন ভোজনপ্রিয়, এইমাত্র

প্রশ্ন রেখেছিলুম—তবে তাঁর অনুজ আত্মহত্যা করেছিলেন কেন ? তিনি জানালেন—লোকে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যে রটনা করতে লাগলো। বললে, দাদাকে (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) মেরে ফেললেন ? তাঁর চরিত্রে কালিমা লেপন করলো লোকে। নুটুবাবু দাদাকে খুবই ভক্তি করতেন। ফলে, শোকে-দুঃখে-লজ্জায় তিনি আত্মহত্যা করলেন।

কিন্তু তবু অমলবাবুর একটি তথ্য আমাদের দারুণ চিন্তার মধ্যে রেখে দিয়েছে। ঘাটশীলার ও-সির কেয়ার অফ-এ ওরকম একটি পোস্টকার্ড আসে কি করে ? এটা অনাত্মীয়দের কিংবা ঈর্ষায় জর্জরিত ব্যক্তিদের কোন চক্রান্ত ? আজ সিকি শতাব্দী পরে সেই রহস্যের সমাধান হয়তো হবে না, কিন্তু একথা ঠিক যে, একটা আলোড়ন হলে কিছু কিছু নির্ভুল তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল বিভূতিভূষণ পুত্র তারাদাস তখন ছোট, তিনি হয়তো কিছু বলতে পারবেন না, কিন্তু রমাদেবী আজও জীবিতা—তিনি কথঞ্চিৎ আলোকপাত করলেও করতে পারেন বলেই মনে হয়।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য অমলবাবুর একটি মন্তব্য সম্পর্কে। তিনি বলেছেন—সম্ভবত দু-একবার বমিও হয়েছিল। 'সম্ভবত' নয় বমি হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে বলছি—কাছে থেকে দেখায়' রমা দেবী লিখেছিলেন উনি বমি করতে চাইলে আমি দু করতল জড়ো করে তাঁর মুখের সামনে ধরলাম।

শেষ অনুচ্ছেদটিতে অমলবাবু দারুণ একটা মূল্যবান কথা বলেছেন। পাঠকদের একটু চিন্তার মধ্যেই রেখে দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে এখনই তা বলতে চাননি। আমার বলেও কাজ নেই। তবে একটু যত্নবান যাঁরা তাঁরা অতি সহজেই সেই অনুল্লেখিত উপন্যাসিককে চিনে নিতে ভুল করবেন না।

এবার চতুর্থ বক্তব্য। অমলবাবু লিখেছেন—কিছু কিছু সমালোচক সত্যজিৎ রায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে এতই উদ্বাহু হয়েছেন যে বিভূতিভূষণের কথা বেমালুম চাপা পড়ে গেছে।' মন্তব্যটিকে দারুণভাবে সাধুবাদ জানাই। এর একমাত্র কারণ—চিত্র সমালোচকরা সাহিত্যিক নন কিংবা সাহিত্য সমালোচক নন। মনে রাখা ভালো—সাহিত্যিক ইচ্ছা করলে সাংবাদিক হতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিক ইচ্ছা করলেই সাহিত্যিক হতে পারেন না। তেমনি চিত্র সমালোচকরাও। মাঝে মধ্যে তাঁদের লেখায় স্পার্ক দেখা গেলেও ওটা সৃষ্টি নয়। সুতরাং সাহিত্যও নয়। এই অবস্থায় তাঁদের কাছে মূল স্রষ্টার অনুল্লেখই স্বাভাবিক। আর এটা যে শুধু বিভূতিভূষণের বেলাতেই হয়েছে এমন নয়। হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও। 'নষ্টনীড়' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প (কিছুদিন আগে কেউ আবার এটিকে 'বড়গল্প' আখ্যায় ভূষিত করেছেন—অবশ্যই বিস্ময়কর)। কিন্তু চিত্র-সমালোচকরা সত্যজিতের 'চারুলতা' নিয়ে আহা-মরি করলেন। রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত রইলেন। বিজ্ঞরা হাসলেন।

আমার পঞ্চম বক্তব্য। অমলবাবু বললেন—'ক্ল্যাসিক রচনার ছবি ক্ল্যাসিক হবে এটাইতো স্বাভাবিক।' এখানে অমলবাবু কিসের যেন একটু ইঙ্গিত রেখে দিয়েছেন। অর্থাৎ ক্ল্যাসিক রচনার ছবি ক্ল্যাসিক হবে, ক্ল্যাসিক হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সব সময় তা হয় না। চিত্র সমালোচকরা যাই বলুন—সত্যিই তা হয় না। যে রকম হয়নি সত্যজিৎ রায়ের চারু-

জাতা। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়ের মূল সুর ধরা সম্ভব হয়নি বলেই ঐ রকম চিত্ররূপ এবং 'স্ক্রিপ্ট'-এ পরিসমাপ্তি। যেটা ভিন্নদেশীয় অনুকরণ। শ্রদ্ধাস্পদ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) একজন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকই ছিলেন না, পণ্ডিত সাহিত্য সমালোচকও ছিলেন। তিনি আজ জীবিত নেই, কিন্তু তার কথাগুলি আজও স্পষ্ট মনে আছে। বহু বছর আগে (নষ্টনীড়-এর চিত্ররূপ তখন সবেমাত্র মুক্তিলাভ করেছে) 'নষ্টনীড়' ব্যাখ্যা করবার সময় বর্তমান লেখকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তার সাক্ষী আরো অনেকেই এখনো জীবিত। সুতা রায়, ৭৪৩৩৫২।

(৪)

সম্প্রতি অমৃত সাপ্তাহিকে অমল মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়ে বিভূতিভূষণের মৃত্যু, স্বাভাবিক? না অস্বাভাবিক? সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা কর্তব্য মনে করি। এতদিন এই দুঃখদায়ক ঘটনা নিয়ে কোথাও কোন আলোচনা হয়নি—এটা নিঃসন্দেহে লজ্জার বিষয়। যে অমর কথাশিল্পীর সাহিত্য বাঙ্গালী পাঠককেই শুধু নয় দেশ-বিদেশের মানুষের হৃদয় জয় করে চলেছে এখনো, তাঁর জীবনের এমন ঘটনাটি সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অনীহা শুধুই বেদনাদায়ক নয় চরম অপমানের।

১৯৪০ সালে আমি ঘাটশীলায় বিভূতিবাবুর গৌরীকুঞ্জের কাছেই নগেন্দ্র ভিলায় ৮।৯ মাস কাটিয়েছি। শুধু ঘাটশীলায় নয়, সিংভূমের অরণ্য অঞ্চলে দিনের পর দিন আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি। সিংভূমের গহন অরণ্যে দিনের পর দিন কাটাবার সময় বিভূতিবাবু বলতেন, আঃ ভাগলপুরের ঝোপঝাড় জঙ্গল দেখে 'আরণ্যক' লিখেছিলাম হে তখন যদি সিংভূমে দেখতাম 'আরণ্যক' অন্য জিনিস হোত। বিভূতিবাবু ঘাটশীলায় সব সময় থাকতেন না। মাঝে মাঝে আসতেন। গৌরীকুঞ্জে থাকতেন নুটুবাবু ও তাঁর স্ত্রী যমুনা দেবী এবং তাঁদের ৯।১০ বছরের ভাগ্নে শান্ত। সেই সময় বিভূতিবাবু 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' লিখছিলেন। সুবর্ণ সংঘ সাহিত্যের আসর বসাতেন। বিভূতিবাবু আসতেন। আরেকজন আমাদের বন্ধু ছিলেন, কবি কমলরাণী মিত্রের স্বামী অমর মিত্র। অমরবাবু এবং বিভূতিবাবু আমার ঘরে অনেক রাত অবধি কেরোসিনের কুপী জ্বালিয়ে বসে আড্ডা দিয়েছেন।

বিভূতিবাবু ভোজন রসিক ছিলেন না। একমুঠো মুড়ি দিলেও উল্লসিত হয়ে কোঁচরে নিয়ে বাঃ বাঃ বলে খেতে আরম্ভ করতেন। তাঁর সরলতা ছিল এমনি। ঘাটশীলায় বেড়াতে বেরিয়ে কুলীদের আঙিনায় বসে তাদের দেওয়া চুটি ধরিয়ে মনের আনন্দে টান দিতেন।

এই সব লিখতে হোল কারণ, এর থেকে কিছু আভাস পাওয়া সহজ হবে। অমরবাবু তখন কপার কর্পোরেশন-এ চাকরি করতেন এবং আনন্দবাজারে সংবাদদাতার কাজও করতেন। তিনি পায়ে কোনদিন জুতো পরতেন না। পাথুরে পথে বিভূতিবাবুর সাথে মাইলের পর মাইল হাঁটতেন।

যে রাজবাড়িতে লেখকদের চায়ের আসর বসেছিল, সেই স্টেইটের ম্যানেজার ছিলেন বঙ্কিমবাবু।

অমরবাবু এখনো বোধহয় জীবিত আছেন। কিন্তু ঘাটশীলায় নয়। কলকাতা বহুবাজার স্ট্রীটে।

এইবার কতগুলি সূত্র দিচ্ছি।

কলকাতা থেকে যে লেখকরা এসে সে অপরাহ্নে রাজবাড়িতে চা-চক্রে সম্মিলিত হয়েছিলেন, তাঁরা অসুস্থ বিভূতিবাবুকে ছেড়ে ভ্রমণে বেরোলেন কেন? আমি জানি, রাজবাড়ি থেকে অসুস্থ হয়ে বিভূতিবাবু যখন 'গৌরীকুঞ্জে' ফিরছিলেন তখন গাড়ির মধ্যেই তাঁর বমি হয়। চারদিন সময় পাওয়া গেছিল। নুটুবাবু দাদাকে প্রাণের অধিক ভালবাসতেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি খুব একটা বড় ডাক্তার ছিলেন না তো। হার্ট এ্যাটাক, কি ফুড পয়জনিং? এই দুটি কারণ বিবেচনা করা হচ্ছিল। নুটুবাবু কয়েকবার কোরামিন দিয়েছিলেন। তারাদাস না জানতে পারে, কিন্তু যমুনাদেবী রমাদেবী ও শান্ত (তখন ১৮।১৯ বছরের যুবক) নিশ্চয়ই এসব কথা বলতে পারবেন। টাটায় বঙ্কুবাবুকে খবর দেওয়া হয়েছিল ঠিক কথা। কিন্তু ঘাটশিলা থেকে টাটা চার স্টেশন। বঙ্কিমবাবুর কিম্বা ভট্টাচার্য মহাশয়ের (তখন তিনি কপার কর্পোরেশন-এর সর্বেসর্বা ছিলেন) মোটর নিয়ে গিয়ে কেন চারদিনের মধ্যে বঙ্কুবাবুকে টাটা থেকে আনা হোল না একবার? খবর দিয়ে অপেক্ষা করা হোল কেন? সেটা কি কেবল কোন গুপ্ত শত্রুকে সেই অবকাশে নিশেষ করে পাঠানোর সুযোগ দেওয়ার সামিল হোল না? পাকুড়ের পোস্টকার্ডখানা নিয়ে ঘাটশিলা থানার ও-সি বিভূতিবাবুর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে গৌরীকুঞ্জে আসবার সময় করে উঠতে পারলেন, এটা বিচিত্র শোনায় নাকি? পোস্টকার্ড নিশ্চয় রাত্রে বিলি হয় নি। ঘাটশিলায় সকাল ৮।৯টার মধ্যেই চিঠি বিলি করতে পোস্টম্যান বেরিয়ে পড়ত। সারা দিনের মধ্যে থানার কেউ কেন সেই সাংঘাতিক পোস্টকার্ড গৌরীকুঞ্জে পৌঁছে দিল না। পাকুড়ের জনৈক বৈদ্যনাথ মুখার্জি কে? পুলিশ কি তদন্ত করেছিল? সাদা পোস্টকার্ড পাকুড় থেকে পোস্ট হয়ে পরে ঘাটশিলায় লেখা হয়েছিল কিনা জাল নাম দিয়ে, তার তদন্তের প্রমাণ কোথায়?

বিভূতিবাবুর মৃত্যুর দু ঘণ্টা পর অর্থাৎ রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় ও-সি পোস্টকার্ডটি হাতে করে নিয়ে বিভূতিবাবুর বাড়ি এলেন। কিন্তু অস্বাভাবিক মৃত্যু জেনেও রাজবাড়ির বিষাক্ত সিঙ্গারা কোথা থেকে এসেছিল তার তদন্ত হোল না কেন? থানার সঙ্গে ব্যাপারটার যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই যদি পোস্টকার্ডটির উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে ঘাটশিলা থানার পরবর্তী কর্তব্য কি ছিল? সেসব কর্তব্য কখনই পালিত হয়নি। হলে মনে হয়, চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যেত এবং নুটুবাবুকেও তার শিকার হয়ে কারবালিক এসিড পান করে যুবা বয়সে প্রাণ দিতে হোত না।

অমলবাবু যখন পর্দা একবার তুলেছেন, অনুরোধ করব, অমৃত সাপ্তাহিকের মাধ্যমে তিনি আরো এগিয়ে যান। হয়তো অবিশ্বাস্য অনেক কিছু উদ্ঘাটিত হতে পারে।—বাদশা খাঁ। হাজারীবাগ।

অমৃত পত্রিকায় শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়ের বিভূতিভূষণ সম্পর্কিত লেখাটি একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। ইতিপূর্বে তাঁকে নিয়ে এমন প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ লেখা কোথাও পড়িনি। শৈশব-কৈশোর-যৌবন ও বার্ধক্যকে এমন করে পৃথিবীতে আর কে চিত্রিত করেছেন জানি না। চেতন-অচেতন, চেনা-অচেনা অনুভূতিকে আর কে এমনভাবে এঁকেছেন? বহু সমালোচক ও সাহিত্যিক তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলতে রাজী নন। তাঁর লেখায় নাকি চরিত্রের স্পন্দন জীবননিষ্ঠ নয়। আসলে যে মানসিক অনুভূতি ও চেতনার প্রয়োজন তা ওদের নেই। অমলবাবুর যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধটি ওদের কিছু শিক্ষা দেবে বলে বিশ্বাস রাখি। অমলবাবু ঠিকই বলেছেন—বিভূতিভূষণ শুধু 'পথের পাঁচালী'র নন, অপরাজিত, আরণ্যক, দৃষ্টিপ্রদীপ ও ইছামতীরও। যে কোন একটি বইতে তিনি যে কোন সম্মান বা পুরস্কার পেতে পারেন। এমন একটি লেখার জন্য লেখক ও সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ। সত্যানন্দ গুপ্ত, দক্ষিণ চাতরা, ২৪ পরগণা।

ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গে

৪ ফেব্রুয়ারী সংখ্যার আপনার পত্রিকায় ধর্ম ও দর্শন বিভাগে মনোরঞ্জন বসুর লেখা 'অরবিন্দ ঘোষ' রচনাটি বেশ ভালো লাগলো। কিন্তু এতে সামান্য ভুল রয়েছে।

উনি লিখেছেন—বরোদায় আসবার অব্যবহিত পরেই অরবিন্দ বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ নামক' এক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে কতকগুলি ছিল রাজনৈতিক নিবন্ধ—লেখাগুলি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট থেকে ১৮৯১-র ৬ মার্চ পর্যন্ত চলে।

অথচ—'১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ড ত্যাগ করে ভারতে ফিরে আসেন। অরবিন্দের বয়স তখন ২১ বৎসর'—উনি আগেই লিখেছেন। তাহলে উনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বরোদায় আসছেন কি করে? লেখাগুলি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট থেকে ১৮৯৪-র ৬ মার্চ পর্যন্ত চলে—হবে। লোকশিক্ষার জন্য মনোরঞ্জনবাবুর এ ধরনের আদর্শমূলক লেখার প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনার পত্রিকায় এরকম লেখা আরো প্রকাশিত হলে খুব ভাল হয়। নিতাই দাস, পাটপুর, বাঁকুড়া।

কারা আমাকে লেখান

লেখা-শেখা যায় খুব কম লেখকের কাছ থেকেই।

দেড় বছরও লিখছেন না এমন কোনো তরুণ লেখককে শুধুমাত্র উড়োচুপ কি ফ্রিফাউস দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয়। এ চেষ্টা কতোদূর বাস্তবিক তার তর্কে না গিয়েও বলা যায়, যখন নতুন কোনো একটি লেখা দেখে কোনো কোনো মানুষের চোখের তারা অল্প বড়ো হয়ে ওঠে, তখন কাছাকাছি থাকা পোড়খাওয়া যে কোনো লেখকই বুঝতে পারেন, আগ্রহী একজন তরুণ লেখক। যিনি, লিখতে চান।

লাইব্রেরিতে, পাতিরাম পত্রিকায় কি ভরেন বুক এক্সেলসিয়রে চকচকে কিছু বিদেশি ক্লাসিক থাকে। গ্রন্থাবলীও নানা-রকমে বেরোচ্ছে। কিন্তু যাদের কৌশল পর্যন্ত সমালোচকের নিষ্ঠায় ছাপা হয়ে গেছে, তাঁরা টেবিলের সামনে যে কোনো প্রতিভাবানকে কি শেখাবেন? একজন ফিনিশড লেখক মাঝে মধ্যে লেখার মজার জন্যে হয়তো স্মরণ করলেও করতে পারেন মোপাসাঁ কিভাবে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছেন, কিংবা, কাটা-কাটা পাল তোলা গদ্য অন্নদাশঙ্করকে কি সুফল দিতো। এরকম লেখকরা গরুড়জাতীয়। অরুণজাতীয় নয়।

কাজেই মফস্‌সলকালীন অবস্থায় লেখকরা লেখা শেখেন পরস্পরের কাছেই, দাদা— অগ্রজ কিংবা সতীর্থদের কাছে। নিজেকে যদি লেখক হিসেবে ধরে নিই, তাহলে আমারও লেখা-শেখা হয়েছে এভাবেই। তেষট্টি-চৌষট্টির বাল্যবয়সে জেনেছিলাম, পদের মিলটা শব্দানুপ্রাসে ঠেকতেও পারে, না-ও পারে। তখনকার নবীনতম পত্রিকায় লেখাগুলোই এ জিনিসটা শিখিয়েছিলো। এভাবেই, আরো কিছু, লেখা হয়েছে- হয়তো। তার মানে এই নয় যে খুল্লতাতের বয়সী যে কোনো লেখক এবং সহোদরপ্রতিম যে কোনো লেখকের কাছেই আমার ঋণ রয়েছে। যাঁরা জীবিত সচেষ্ট অথচ নিজের ভঙ্গিমায় নিজেই অপূর্ণ, তাঁরাই শেখাতে পারেন।

অর্থাৎ, সাদা কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ, সতীনাথ বা কমলকুমার, বিভূতিভূষণ বা তারাশংকর—কেউই আমাকে লেখাতে শেখাননি—যেমন আমার সতীর্থ-রাও তাঁদের কাছে ঠিক শেখার অর্থে কিছু পাননি। ব্যতিক্রম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নশ্বর আর সক্রিয় না থাকলেও, তাঁর লেখা— তাঁর গোটা লেখার থেকে অনেক বেশি লেখার খসড়া আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। লেখকের ভুল থেকে, বলয়িত হতে না পারার অবস্থা থেকেই অন্যান্য তরুণরা শেখেন এবং লেখার উপকরণগুলি হাতিয়ে নেন—নেমন্তন্ন বিয়ে বাড়ি থেকে যেমন জিনিসপত্র খোয়া যায়। গোছানো লেখকের কাছ থেকে, শেখা আর চুরি করা দুটোই খুব মুশকিলের।

কিন্তু যাঁর কাছ থেকে শিখবো বা হাতাবো, তাঁকে তো লেখক হতেই হবে। তাঁর ভাঁড়টি ভাঙা, তিনি নিজে কোনো ভাঁড়ে মা ভবানী নন। যিনি আমার থেকে বছর কুড়ি অগ্রজ বা বছর কুড়ি অনুজ এমন কোনো লেখকের কাছ থেকেও আমি কিছু শিখতে পারছি না, সেখানে শারীরিক শক্তিতে পাল্লা দেওয়া মন বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আলাদা, তিনি অনেক বেশি অস্থির ছিলেন। কাজেই, এখন যাঁরা প্রায় পঞ্চাশবর্তী এবং যাঁরা অন্যপ্রান্তে আমার দশ বছরের অনুজ এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অনেকের কাছ থেকেই আমার লেখা-শেখা চলছে। আমি বিদেশি নই, কি করে বিদেশিদের কাছ থেকে শিখবো? যাঁদের কাছ থেকে লেখা শিখেছিলাম বা এখনো শিখছি, সবাইকার নাম লিখে দেওয়াটা নিষ্প্রয়োজন। যে যুক্তিতে আমি তাঁদের ছাত্র, সেই যুক্তিটা মনে রেখে, সবাইকার লেখা পড়ে গেলেই বোঝা যাবে কেন তাঁরাই এই সময়ের শিক্ষণীয় লেখকচরিত্র। আর এই সংখ্যাটা পৃথিবীতে উপস্থিত আছেন এমন জীবিত-অজীবিত লেখকদের সংখ্যার অনুপাতে সত্যিই খুব কম। আমাদের সমসাময়িক তুষার রায়, রাজশেখর বসুর কাছ থেকে একটি শব্দ, মাত্র একটিই শব্দ লেখার জন্য শিখেছেন। সেটি হলো জগঝম্প। তুষার রায় ব্যতিক্রম, কিন্তু আজ আমরা কে মুজতবার ধরনে লিখতে চাই অথচ 'পশ্য পশ্য?' কেউই লিখি না। আমরা যে কেউই 'গড়াতেছে' 'ফুরায়েছে' লিখলাম না, এমন কি চারমাত্রার একটা ফ্ল্যাট শব্দ কাজে লাগতো এটা জেনেও 'ফুরায়েছে' বা ঐ ধরনের কিছু বসালাম না, এখান থেকেই দুটো জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। 'ফুরায়েছে' বা এই ধরনের আকস্মিক ক্রিয়াপদে জীবনানন্দকে একেবারে গোছানো একটি যতিচিহ্ন হিসেবে আমরা মেনে নিয়েছি, এবং সেই কারণেই এই ক্রিয়াপদগুলিকে লেখবার বিষয় হিসেবে আমরা বর্জন করেছি উদ্ভাসিত গদ্যশৈলীর চর্চা এখনো চলছে, কিন্তু মুজতবার ইডিয়ম অবসৃত। ক্রিকেটে আহত ব্যাটস-ম্যানদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, আর সমসময়ের লেখায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় অনাহতদের। আর এই লেখার ঘটনাকেই আলগা চোখে দেখে প্রভাব খোঁজার চেষ্টাও হতে পারে কোনো কোনো অধ্যাপনা-রসিকের হাতে, যাতে আমাদের মতো লেখকরা বলে উঠতে পারি: 'উনি এটাই দেখলেন যে আমি অমুকের দ্বারা প্রভাবিত, এটা তো দেখলেন না আমি কতোজনের প্রভাবিত নই।'

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

চিঠি

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরোনো কড়ির মধ্যে ছিঁড়ে ফেলে দাও সব
রাত্রির নিস্তব্ধ গম্ভীর আকাশকে
    চিঠি লিখে জানো : কতটা সময় আছে
                                        উত্তর আমার

বারান্দার কোণে পায়চারি করতে করতে
'ফুটুস' করে একটা বরফ তারা উঠলো আকাশে
ঐ তারাটিকে চিঠি লিখে জানো :
                                ওর বয়েস কত ?
ঐ তারাটি কি আমার সমান,
    ওর হৃদয়ে কি আমার মতোই
                        নিস্তব্ধ আপেক্ষিকতা ?

সত্তরের কবিতা

তখন নক্ষত্রে ফোটে আকাশ

তরুণ চৌধুরী

আর অশ্রুফোঁটায় তিমির ফুটল, ঘরে ঘরে জানলা দরজায়
বন্দী আলো জ্বলল, নক্ষত্রে ফুটল আকাশ।
এ গোলাদেশের প্রাণ, তিমিরবাসী হয়ে কাটাল পূর্বদিকে তাকিয়ে,
তাকিয়ে তাকিয়ে ......।
গুহার মধ্যে ফুটপাত। লম্বালম্বি ফুটপাথ থেকে ল্যাম্পপোস্ট
দাঁড়িয়ে জ্বলে উঠল চতুর্দিক।
বদ্ধ বাতাসে টান পড়ে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
একবিন্দু শূন্যস্থান একা একা হ্যাংলাপনা পছন্দ করে না।
ভবিষ্যৎ-শূন্যস্থানে কেউ না কেউ অপেক্ষায়
দাঁড়িয়ে কিংবা উবু হয়ে বসে আছে।
তার অশ্রুফোঁটায় তিমির ফুটলে এইসব,
এইসব রকম রকম ফসল ফলে রোজ রোজ—।

মনে রেখো

সুজিত সরকার

আমি তোমার ঝড়-জল-মেঘের দিনের বন্ধু ছিলাম,
আমায় তুমি মনে রেখো।

শান্ত সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যে এসেছে তার নীলিমার সোনাতে,
দ্যাখো, তার সারা ভুবন জুড়ে হেমবর্ণ নবীনতা—
ওখানে কোনো হাহাকার নেই,
            নেই চাঁদের আগুন-সংকেত, সর্পের দংশন।
তাহলে ওকেই আজ এই উৎসবের সঞ্চিত আলোয়
তুমি বরণ করে নাও।

না গো না, এমন রুক্ষ পরিচয় নিয়ে আর আমি কোনোদিন
তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো না, শুধু
আমার পোড়ো মুখ,
            আমার বাদল দিনের উৎসর্গ তুমি মনে রেখো।

এই রকম

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

এই ঘরের বিছানাবালিশ বাক্সপেঁটরার মতো
আসবাব হয়ে আছি আমিও বহুদিন
সারসার চলাফেরা, টুথপেস্ট খাই, লাগাই বার্নল—আর
মহার্ঘ বস্তুর মতো বৌকে রেখে দিই আলমারিতে
সবাই বলে, সে নাকি মিষ্টি এক পুতুলসুন্দরী
এ রকম পুতুলসংসারে
মাঝিক বন্ধুরা আসে, কেউ চা দাঁ চায়, কেউ খেলে
পুতুলোগিন্নীর হাতে চিনিকম চা খেয়েও মধুর-মধুর তারিফ জানায়
আর কোনো কোনো দিন
চাঁদের জীবন্ত জ্যোৎস্নায় হাঁ হা শূন্যতায়
                                ঘর খোলা থাকে

আমরা ফড়িং হয়ে চলে যাই জোছনা রাতে, মন মধুবনে

নাচ গান বাজনা

ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল...

সুচিত্রা মিত্র

'বিষাদে হয়ে খ্রিয়মাণ, বন্ধ না করিও গান'—কলকাতা কবির এই আবেদন রক্ষা করেছে। কলকাতাকে গানের তীর্থ বলে মোটেও বেশি বলা হয় না। কলকাতার সাংস্কৃতিক বাতাসে গানের চিরবসন্ত। দাম বাড়ছে জিনিসের সুখ নেই, শান্তি নেই কিন্তু গান আছে।

তিন মার্চের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে বসে বসে এই কথাটি আর একবার মনে হল। বাইরে ভীড়, গাড়ীর শব্দ বইমেলা, আর দোলের আগে বসন্তের উন্মনা জ্যোৎস্না। ভিতরে বসে সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনছিলাম। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বাইশটি গানের নিটোল উপহার; 'প্রতিধ্বনি' আয়োজিত একক রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান 'মুকুলগুলি ঝরে।'

সংলাপ প্রসন্নবালির 'দুর্ভিক্ষ' না শতলো আফিংস ? ম্যাণ্ডেভেসের একটি শ্লোক এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে রূপান্তরিত এই শ্লোকেরই বাংলা যদি 'ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল অন্তর' গানখানি দিয়ে শুরু করে সুচিত্রা একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। প্রভু দয়া কোরো এই কলিটির ফিরে ফিরে আবর্তন সময় শিল্পীর সমস্ত আবেদন যেন মাটি থেকে ঊর্ধ্বের আকাশের দিকে উঠতে চাইছিল।

পূজা আর প্রেম পর্যায়ের গানগুলিই বেশি করে গাইছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানে প্রিয় যে সে দেবতা আবার দেবতা যিনি তিনি প্রিয়। 'বীণা বাজাও মম অন্তরে' গানখানির দীর্ঘায়ত ১৪ মাত্রার তাল ও ছন্দের নিপুণ রূপায়ণে শিল্পী উদাত্ত ইঙ্গিতঞ্জনা সৃষ্টি করলেন আপন নিষ্কম্প স্বর মাধুর্যে। উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রায়শই দেখি শিল্পীরা ভাবের অবলীলায় ভেসে যেতে পারেন না যত রাগ নয় তালটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুচিত্রা মিত্র এর ব্যতিক্রম। আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে 'ঘাটে বসে আছি আনমনা' গানটি। সঞ্চারীতে কোমল ঋষভ আর দুই মধ্যমকে লাগালেন তিনি এমন অনায়াসে, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল গানখানির বৈরাগ্য ব্যঞ্জনার দিকেই। 'ঘরের ঠিকানা হল না গো মন করে তবু যাই-যাই' এই দ্বিধা আর ভয়ের সমস্ত দোলাটুকু শিল্পী নিঃশেষে উপলব্ধি করে যেন ভৈরবীর অতলে নেমে আমাদেরও ডুবিয়ে রাখলেন গানখানির ভাব-আবেগে শতধার। 'তরী ডুবুডুবু কার যে পাথে ভরসা নাহি পাই।' সঞ্চারীর এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে রবীন্দ্রসঙ্গীতে। এর পর যেন এক নতুন শিক্ষা পেয়ে ভক্ত বলে ওঠেন বলাকা কাব্যের সেই বিখ্যাত কবিতার ভাব সাযুজ্যে। 'তোমার কাছে শান্তি চাব না।' 'থাক না আমার দুঃখ ভাবনা।' সংশয়ের ধূসর অবস্থা থেকে প্রত্যয়ের মধ্যে হঠাৎ জেগে ওঠার সাড়া। গানটির ধরতাই চড়ার সা থেকে।

'শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে ফিরি হে দ্বারে দ্বারে'—একটি বিখ্যাত গান। ঝাঁপতালের ছন্দ বৈশিষ্ট্য গানখানিকে যেন সমতলে ছড়িয়ে দেয় না, কেবলই গোল হয়ে আমাদের অনুভূতিকে প্রদক্ষিণ করে আর সেই সঙ্গে শিল্পীর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গীতে সর্বাঙ্গীণ আত্মাকে শব্দগুলির কারুণ্য সার। পাই তাই হারাই তাঁর প্রসাদে।' মনে হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে চুঁচুড়ার বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ যে গানগুলি শুনিয়ে পাঁচ শ টাকার একখানি চেক পুরস্কার পান তার মধ্যে 'শূন্য হাতে ফিরি হে' গানটিও ছিল।—ভাবে আর অভাবে সাতটি বৈপরীত্য। বিরতির সময় ফিরলেন চৌধুরী মহাশয় বললেন এ গানখানির পিছনে যদি হচ্ছে ঐ ঘটনাটাই আছে।

প্রথম দিকটায় গলায় একটু ক্লান্তি থাকলেও পরে সেই মেঘ সরে গিয়ে আওয়াজটা বেশ চনচনে হয়ে উঠেছিল। তালহীন টপ্পা অঙ্গের গানগুলিতে তাঁর স্ফূর্তি দেখা গেল। কেননা টপ্পার কাজ বড় কঠিন, স্বর কম্পনের বেলায় অনেক আচ্ছা আচ্ছা ওস্তাদও বেসুরো হতে দেখেছি। 'আমার পরান লয়ে কি খেলা খেলাবে ওগো কাঙাল প্রিয়' গানখানিতে নিখুঁত টপ্পার অলঙ্কারে এই বয়সেও তাঁর অনুশীলন করে পাওয়া স্বরের ঋজুতা কী চমৎকার ভাবে ঝিলমিল করে উঠেছিল।

পনের কুড়ি মিনিটের বিরাম দিয়ে এসেই সুচিত্রা গেয়েছিলেন কিনা 'অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে কে, কোন ভুলে যাওয়া বসন্ত থেকে।' এই বসন্ত যেন আমাদের দিয়েও বলিয়ে নিতে চাইছিল 'পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে।' রবীন্দ্রনাথের গানে বসন্ত সত্যিই শুধু ফোটা ফুলের মেলা নয়। এর অন্তরে এক গেরুয়া বৈরাগীর একতারা বাজে, তাই দুটি বিপরীতভাবের আবহ সৃষ্টি করা বেশ কঠিন। 'প্রতিধ্বনি' যে শিল্পীকে নির্বাচিত করেছিলেন সেদিন তিনি সেটি একবারও ভুলে যান নি, তাই যেমন উদারা গ্রামের গাম্ভীর্যে তেমনি মুদারা তারার তীক্ষ্ণ উচ্চতায় সুচিত্রা মিত্র বিপরীত ভাবের মধ্যে অনায়াসে চলা ফেরা করছিলেন। 'নীলদিগন্তে ঐ ফুলের আগুনের পর মন অন্তর উদাসে পাওয়া বেশ কঠিন যেমন কঠিন হঠাৎ খুশির হাসির দমক থামিয়ে চোখের জলের বিষাদ ঘনিয়ে আনা।

'তোমায় নতুন করে পাব বলে' গানটি গাওয়ার জন্যই কি শিল্পী স্কেল বদলে নিলেন ? না হলে হাম্বীর রাগের ছায়ায় 'ফলফলাবার আশা' গাইবার পর আবার শেষ গান—'এই কথাটাই ছিলেম ভুলে' গাইবার আগে স্কেল বদল করলেন কেন ? তাঁর এদিনের অনুষ্ঠানে চড়া পর্দার গানগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত নামানো সুরের গানে বেশি স্পষ্টতা লক্ষ্য করছিলাম—গলাটা এই দিন উপরের দিকে বোধহয় তেমন স্বচ্ছ ছিল না।

যাইহোক শেষ গানের রেশ দিয়ে সুচিত্রা মিত্র আবার সার্থক অঙ্গীকার জানিয়ে গেলেন 'মিলব আবার সবার সাথে ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।' কলকাতার আসা যাওয়ার পথের ধারে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আরো অনেক সন্ধ্যায় সুচিত্রা মিত্রের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে আর কর্মক্লান্ত দিনের অবকাশ উঠবে অনেক মধুর হয়ে। 'প্রতিধ্বনি'র আয়োজন পরিচ্ছন্ন, রথীন ও চন্দনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবার প্রভূত সম্ভাবনা দেখি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের নিশ্চল সুর পিয়াসী শ্রোতাদের অখণ্ড মনোযোগে।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

সেলুমার জেলে তপনকুমার

'যাত্রা শিল্পের প্রাচীন ও আধুনিক রূপটি আপনি আপনার আলোক সামান্য প্রতিভায় আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।' ১১ই মাঘ, ১৩৮২-তে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা সম্মেলনের পক্ষ থেকে গোষ্ঠবিহারী ঘোষ মশায়কে যে মানপত্র দেওয়া হয়েছিল, তাতে মুদ্রিত আছে এই কথাটি। নিউ গণেশ অপেরার গদিঘরে সেই মানপত্রটি আজও যে কেউ দেখে যেতে পারেন। কিন্তু এই মানপত্রের মালিক বিদায় নিয়েছেন এই পৃথিবী থেকে এবং তাঁর প্রিয়তম স্বপ্নভূমি যাত্রা জগৎ থেকে। ১৯৭৬-র ১৫ আগস্ট তাঁর মৃত্যুতে চিৎপুর চিরদিনের জন্য হারালো বাধ্য হয়েছে একজন বিশিষ্ট যাত্রা প্রেমিককে। যাত্রাকে প্রকৃত ভালোবাসা কি জিনিষ গোষ্ঠবাবুর কাছে তা শিক্ষণীয় ছিল।

শুধুমাত্র ব্যবসায়িক সাফল্যই মূল লক্ষ্য, এটা গোষ্ঠবাবু বিশ্বাস করতেন না। আর করতেন না বলেই গণেশ ঘোষ মশায়ের কাছ থেকে হাত বদল হয়ে নিউ গণেশ অপেরার (পূর্বতন গণেশ অপেরা) মালিকানা যখন তাঁর হাতে এল, তিনি তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ সঁপে দিলেন যাত্রায়। আন্তরিকতার সঙ্গে যাত্রার অগ্রগতিতে মনোনিবেশ করলেন এই নিরহংকারী দক্ষ ব্যবসায়ী। নিউ গণেশের জয়যাত্রা শুরু হল।

গোষ্ঠবাবু চিরকাল সেরা শিল্পী নিয়ে সেরা দল করতে চেয়েছেন। উদ্দেশ্য, ভালো গান করতে হবে। শ্রোতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে, অভিনন্দন এবং আশীর্বাদ। শ্রোতারা সে দাবী মিটিয়ে দিয়েছেন সুদে আসলে। প্রায় প্রতিটি পালাই সুপার হিট।

অতীতের পৃষ্ঠা ওল্টালেই দেখা যাবে সেই সব ইতিহাস। অকাল বোধন, কালাযুক্ত শুম্ভ-নিশুম্ভ শিবাজী, পৃথ্বীরাজ, সম্রাট নাদির শাহ, গীতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য পালা আসরে এসেছিল নিউ গণেশ অপেরার পতাকা তলে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের আসরে প্রথম আগমন সম্ভবত গোষ্ঠবাবুর প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। ১৩৬৬ তে 'দেবী চৌধুরাণী' পালা করেছিল নিউ গণেশ। পালারূপ দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়। নিউ গণেশের অধিকাংশ পালার পালাকার উনি।

শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রথম যাত্রা উৎসবের প্রথম রাতের পালা গানের দায়িত্ব নিউ গণেশ অপেরার উপর বর্তে ছিল, শুধু মুখ দেখে নয়, সংগঠকরা বুঝেছিলেন, এরাই জমাতে পারবে প্রথম রাতের পালা। এবং জমেছিল সেই 'পরিচয়'। গোপাল চ্যাটার্জি, ছবিরাণী, অনাদি চক্রবর্তীর মতো নামী শিল্পীরা দাপটে অভিনয় করে কলকাতার সুধী সমাজের কাছে 'পরিচয়'কে পরিচিত করিয়েছিলেন শুধু নয়, যাত্রাকেও চিনিয়েছিলেন। প্রথম রাতের পালা সার্থক।

পরের বছরের পালা ছিল 'মুদ্রা' ও 'মসনদ'। শিল্পী ছিলেন মোহিত বিশ্বাস, ভোলা পাল, ছবিরাণী, পান্নালাল নস্কর। তারপর ১৯৭৩-এর ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত পালা 'মরেও যারা মরে না', বিভিন্ন কারণে উল্লেখযোগ্য। শিল্পী ছিলেন, পশুপতি ঘোষ, ভোলা পাল, মধুছন্দা।

পরের বছরগুলিতে, 'হাটেবাজারে', 'বামাক্ষ্যাপা', 'ভুলি নাই', সন্তান, মুমূর্ষু পৃথিবী, পলাতক, নীল আকাশের নিচে, এবং ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের পালা 'কবি বিদ্যাপতি' আসরের পর আসর জয় করে চলেছিল নিজস্ব যোগ্যতাতেই।

১৩৮২-৮৩, জমিদার কৃষ্ণকান্ত সংহারের পালা 'ময়নামতীর মাঠ', ভৈরববাবুর পালা আর প্রসাদবাবুর পালা। কথায়

গোষ্ঠবাবুর স্বপ্নভূমি এবং নিউ গণেশ

দায়'-এ ছিল মালিক
মোহিত বিশ্বাস
চৌধুরী, তারাদেবী-র
ছিলেন দলে।

এ বছরের পাল
জেল' ও 'মায়ার
মাতিয়ে দিয়েছেন।

গোষ্ঠবাবু যারা
সুযোগ্য সহধর্মিনী
হাল ধরেছেন দলের
ভাই গোবর্ধন ঘোষ
সহযোগিতায় স্বামী
আছেন এই গদিকা

সর্বোপরি
যামিনী গুপ্ত মশায়
বাবুকে বর্ধমানের
রাইস মিল থেকে
জগতে। চিৎপুর
বাবুর কাছে যাবতী
বাবুর। বললেন,
এ পাড়ায় যথানই
পরি স্বীকার কর
রুচির প্রাধান্যে। পাল
সেনজাই যখন যাত্রা
লাগে, বিনোদন
জেনে নেবার কোন
শুধু বিজ্ঞাপনে
জমে না। যাত্রা পা
হয়। তাদের আপন
গ্রামের মানুষের
না। পৌঁছোয় গ
গান অর্থাৎ পালা

এ বছর ১৬
এরাই মধ্যে।
কাতায়। বাকী যা
ব্যবসায় ক্ষতির স
না। যামিনীবাবু
গ্রামেই যাত্রার
সেকারণে চাহিদাও

যাত্রা জগতে
পাওয়ার কারণ
অনুযায়ী পাল
বাজার দর তো

সারা বাংলা
কোন খবর উনি
কিভাবে হওয়া স
পারলেন না। ব
যে সংবাদটা।
আওয়াজ মশাই।
সাইনবোর্ড এমন
ঠিক না হতেই
চলেছে।

পুরস্কার
নিউ গণেশ অ
ওঁরা গোষ্ঠবাব
করেই নিউ গণে

লেখক শব্দের প্রভু

অমলেন্দু বসু

অসীম রায় লিখছেন আজ ত্রিশ বৎসর যাবত। লিখেছেন কবিতা, গল্প, উপন্যাস —তিন ধরনের সাহিত্যফর্মে—কিন্তু প্রতিটি ফর্মের সৃজনী স্বরূপ অন্য ফর্মের স্বরূপের সঙ্গে নিবিড়ভাবে আশ্লিষ্ট। তাঁর গল্প হয়তো উপন্যাসের অংশ হতে পারত, তাঁর গল্পে উপন্যাসে কবিতার আমেজ পাওয়া যায়। ধরা যাক দুটি কবিতার কথা : 'জন্মমৃত্যু' (প্রায় তিনশো লাইন), 'আমি হাঁটছি' (প্রায় একশো লাইন, একই নামের কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। এ হেন কবিতা অনায়াসে, স্বধর্ম সঙ্গতিতেই কোনো কোনো উপন্যাসের অঙ্গীভূত হতে পারত,—'গোপালদেব', অথবা 'একদা ট্রেনে', অথবা 'শব্দের খাঁচায়'। 'তরমুজ' বা 'তাড়ি' এমন ধরনের ছোটগল্প যা কিছু নিপুণ-তাবে যে কোনো উপন্যাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়।

আসলে অসীম রায় যে ফর্মেই লিখুন না না কেন, তাঁর লেখার মেজাজ সর্বত্র অভিন্ন এবং এই অভিন্নতার মূল আভাসিত হয়েছে ভারতী পরিষদের দ্বিতীয় স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর এক ভাষণে। ভাষণটিতে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলা হয়েছে, তার মাত্র দু'তিনটির উল্লেখ ও প্রয়োগ করছি এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে।

অসীম রায় বলেছেন তাঁর উপন্যাসের পেছনে ঠিক গল্প লেখার তাগিদ নেই। তিনি বলেছেন, উপন্যাস মানে একটা জমাট গল্প নয়। বলার পরে তিনি উনিশ ও বিশ শতকের উপন্যাসচর্চার গতির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি 'আবিশ্বস্বীকৃত উপন্যাসের দুটি সমান্তরাল ধারা'র কথা বলেছেন, এক ধারায় জমাট গল্প, অন্য ধারায় 'চৈতন্যের আলোড়ন'। অসীম রায়ের দাবি, তিনি দ্বিতীয় ধারার উপন্যাসকার।

অসীম রায় ঘটনাময় গল্পের জন্য উপন্যাস রচনা করলেন না, করলেন কোনো অন্তর্জগৎ প্রকাশের জন্য, এই প্রয়াস সম্পূর্ণতই আধুনিক সাহিত্যের ধারাবাহী। গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, সর্বত্রই অসীম রায় উদ্ভাসিত করেছেন কোনো না কোনো অন্তর্জগৎকে, সর্বত্র লেখকের এক মৌল শৈল্পিক প্রয়াস।

অন্তর্জগৎ-সন্ধানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে একটি বিশিষ্ট শিল্পকৌশল, যাকে ইংরেজি সমালোচকরা বলেছেন দি পয়েন্ট অফ ভিউ টেকনিক, অর্থাৎ যে সব ঘটনা বিবৃত হচ্ছে বা আভাসিত হচ্ছে সেগুলি ঘটনা হিসেবে মূল্যবান নয়, সেগুলি যে কোনো চরিত্রের (অথবা একাধিক চরিত্রের) অন্তরে প্রতিফলিত হচ্ছে সেই বিশেষাত্মক প্রতিফলনেই, বিশেষ দৃষ্টিকোণেই, ঘটনার মূল্য। অসীম রায় যে তিন পর্বের (ট্রিওলজি) উপন্যাস রচনা করেছেন—'একালের কথা', 'গোপাল দেব', 'একদা ট্রেনে'—সেখানে ঘটনাগুলি মুখ্য নয়, সংখ্যায়ও অধিক নয়, কিন্তু প্রতিটি পর্বেই কয়েকটি দৃষ্টিকোণ, কিছু মনোভঙ্গি পাওয়া যাচ্ছে, এবং এই প্রবহমান মনোভঙ্গিপুঞ্জে লেখকের শিল্প-ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে। অসীম রায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন ভারতী পরিষদে তাতে তিনি বলেছেন, 'উপন্যাস মানে চৈতন্যের আলোড়ন'। আলোড়ন কথাটি আমার কাছে ঝাপসা মনে হয়। চেতনা তো অনেক সময় আদৌ আলোড়িত হয় না, নিথর নিষ্পন্দ-তায় মণ্ডিতও থাকতে পারে। একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাচ্ছি 'দেশদ্রোহী' উপন্যাসটির সমাপ্তি অংশে :

> সেদিন সন্ধ্যায় নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে ভবানীপ্রসাদ তার ব্যালকনিতে গিয়ে বসে। ...ম্লান চাঁদনীতে বসে বসে ভবানীপ্রসাদ কিছুই ভাবে না। কিছুই ভাবতে চায় না.... অবাস্তব আলোছায়ার নিষ্প্রদীপ বিভীষিকা থেকে চোখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে সে সান্ত্বনা খোঁজে। কিন্তু সেই ম্লান চাঁদনী এমন অস্পষ্ট এমন আবছা এমন লক্ষ্যশূন্য নৈর্ব্যক্তিক যে চোখ নামিয়ে নেয় ভবানীপ্রসাদ। আরো একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন :

> গোপালের মনে হয় সে একটা গান শুনেছে আর এমন গান যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে ঠোঁট কুঁচ-কিয়েছে, তার ভয় হয়েছে অবাস্তব বলে। কিন্তু এখন সে একেবারে তন্ময় এ গানের সুরে।....একথা মনে হতেই এক অতলস্পর্শী গভীরতা গোপালকে স্পর্শ করে।....হঠাৎ তার অফিসের ক্যালেণ্ডারটার কথা মনে পড়ে। কোনারকের গাঁথুনীদের জ্বলন্ত সাক্ষী সেই ঘোড়ার ছবিখানা যেন লাফিয়ে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
>
> ('গোপাল দেব', ৩১৭-৩১৮)

এরকম দৃষ্টান্ত অসংখ্য দেওয়া যায় যে দৃষ্টান্তে আলোড়ন নেই, বরং আছে প্রায় নিশ্চল সৌম্য প্রগাঢ় অন্তশ্চেতনা, যে-চেতনায় ব্যক্তিসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুত যে অন্তর্জগৎ বিধৃত হয়েছে ডস্টয়-এভস্কির, টমাস মান-এর জেমস জয়স-এর কামুর উপন্যাসে, সে-জগতে আলোড়নের চেয়েও মহত্তর এক সদর্থক সৃজনী শক্তি কাজ করে, সে-শক্তিতে ব্যক্তিসত্তা উদ্ভাসিত হয়। ব্যক্তিসত্তার চেয়ে জটিলতর গহনতর আয়তন তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। সেই ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সন্ধান দীর্ঘকাল অবধি সাহিত্যে শিল্পে অনুসৃত হয়েছে ব্যক্তির বহিরঙ্গ কর্মবিচার দিয়ে, আধুনিক সাহিত্যে শিল্পে হচ্ছে ব্যক্তির মনোজগতের আবিষ্কারে। অসীম রায়ের উপন্যাসে, গল্পে, কবিতায় সর্বত্র আমি লক্ষ্য করি এই ব্যক্তিসত্তার সন্ধান। কে আমি, কে তুমি, এ হেন প্রশ্ন কেবল শঙ্করাচার্য অথবা পোপ গোগ্যা অথবা অগণিত আরো অধ্যাত্মপন্থী করেছেন এমন তো নয়, এ প্রশ্ন তুলতে পারেন সামান্য সাহিত্যিক সামান্য পাঠকও, এবং এই সত্তাসন্ধানেই আধুনিক অন্তর্লোকিক সাহিত্যের কীর্তি। অসীম রায়ের উপন্যাস পড়ে আমার ধারণা হয়েছে তিনি ঘটনার রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার অভিলাষী নন, তিনি ছক কাটা প্লটের সংযোজনায় মুগ্ধ নন, তাঁর নিয়ত লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার উন্মোচন। একজন নিত্যগোপাল, একজন গ্রাসি, একজন আমি (বংশী মিত্তির, বি-এস-সি প্লাকড্‌), একজন সূর্য, একজন সোমা, একজন নির্মল, একজন রাজু—এমনি আরো কতজন ব্যক্তি

আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে, আমরা চোখের সামনে দেখছি তাদের ঐকান্তিক ব্যক্তিত্বের উন্মোচন, যে-উন্মোচনের পরিণামে ব্যক্তি-সত্তাগুলি উদঘাটিত হয়ে যায়। এ যেন ইবসেনের পেয়ার গিন্ট-এর সেই অবিস্মরণীয় স্বগতোক্তি: পেয়ার গিন্ট নিজ সত্তা-সন্ধানের উপমায় ভাবছে একটি পেঁয়াজের কথা; পেঁয়াজের খোসা ছাড়াও, যে-খোসা সব চেয়ে বাইরে, তখন দেখবে আরেকটি খোসা এবার বাইরে থাকছে; সেটিকে ছাড়াও আবার একটি খোসা বাইরে দাঁড়াবে; এটিকেও ছাড়াও, আবার একটি খোসা বাইরে দাঁড়াবে; এটিকেও ছাড়াও, আবার একটি খোসা বাইরে দাঁড়াবে। এমনি করে খোসার পরে খোসা ছাড়াও, তোমার কৌতূহল সূচাগ্র থেকে সূচ্যগ্রতর হচ্ছে, তুমি জানতে চাচ্ছ, এর ভিতরে কী আছে, এই পেঁয়াজের অন্তরতম সত্তা কী এবং কোথায়। —সব খোসা তুমি ছাড়িয়ে ফেললে। ভিতরে তো কিছুই নেই। অন্তরতম সত্তা তো অসংখ্য স্তরায়িত কামনা-বাসনার অতীত অতিরিক্ত কোনো সত্তা অন্তরতম ব্যক্তিসত্তা তো সর্বধাত্রী ব্যক্তিত্বের সর্বত্রই বিরাজমান।

ব্যক্তিসত্তার সন্ধান অসীম রায়ের রচনার সর্বোজ্জ্বল আত্মিক বৈশিষ্ট্য। ঘটনা সংযোজনার সংগঠনী কৃতিত্ব তাঁর কাম্য নয়, অভিপ্রেত নয়। ঘটনার ততটুকুই মূল্য যতটুকুতে ব্যক্তিসত্তার অন্তত কিছুটা ধরা পড়ে। ঘটনার এই গৌণ মূল্যের দরুন অসীম রায়ের উপন্যাস-রচনায় একটি বিশেষ ধরণের কৌশল আমি দেখতে পাই। অসীম রায়ের উপন্যাস এপিসোড-ধর্মী; প্রতিটি উপন্যাস অনেকগুলি এপিসোডের সমষ্টি। প্লট-সমৃদ্ধ উপন্যাসে যদি কোনো এপিসোড থাকে (ডিকেনসে, হার্ডিতে টলস্টয়ে প্রচুর আছে) তাহলে সেই এপিসোড বৃহত্তর ঘটনাপুঞ্জের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, সেই এপিসোডের প্রবেশ ও নির্গমের সঙ্গে সমগ্র উপন্যাসটির কর্মকাণ্ড অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু অসীম রায়ের উপন্যাসে এপিসোডগুলির মূল্য কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে, ক্রম-মুকুলিত, ক্রম-উন্মোচিত অন্তর-সত্তার অংশ হিসাবেই তাদের প্রয়োজন ও মূল্য। আমি যতদূর জানি উপন্যাস শিল্পের প্রকরণ হিসাবে এপিসোডের এহেন প্রয়োগ বাংলা ভাষায় বেশি নেই।

সত্তা-সন্ধানের আরেকটি পরিপ্রেক্ষিত আমাদের নজরে আসা উচিত। সত্তা-সন্ধান একটি অতীব দার্শনিক, তার্কিক, অ্যাবস্ট্র্যাকট, বিমূর্ত প্রচেষ্টা হয়ে যেতে পারে; অনেক সময় তেমনটি হয়ও। শিল্পের পক্ষে অনভিপ্রেত এই বিমূর্তায়ন থেকে অসীম রায় তাঁর উপন্যাসকে রক্ষা করেছেন সদা-সতর্ক কালচেতনা পরিবেশচেতনা প্রয়োগ করে। ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তিত্বর পরিবেশের মধ্যে বিরাজ করে। সেই পরিবেশ ও সত্তার সম্পর্ক কখনো নিবিড়, কখনো শিথিল। পাতার পরে পাতায় নিত্যগোপাল ও নয়নের সম্পর্ক বিধৃত হয়েছে। তার পূর্বেই, তার পরেই, সম-সাময়িক জগতের (বৃহত্তর জগৎ না হ... ...স কলকাতায় তারা বাস করছে ... সেই কলকাতায়) বিক্ষুব্ধ কলরব আমাদের কানে পৌঁচাচ্ছে। অসীম রায়ের ট্রিলজির প্রথম উপন্যাসটির নাম "একালের কথা। নামে সূচিত হয়েছে, রচনায় বিস্তৃত হয়েছে লেখকের কালচেতনা। এই কালচেতনা অসীম রায়ের প্রতিটি রচনার (কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস) ব্যাক গ্রাউণ্ড, পশ্চাৎ-পট। দেশদ্রোহী রক্তের হাওয়া (চমৎকার আমাদের জেনারেশনের একটা ভাল ছবি এঁকেছেন ১২৬ পৃঃ), 'অসংলগ্ন কাব' (এই শহরটাকেই দ্যাখো না। তোমরা কী করলে! এখানকার সমস্ত ইংডাস্টি তোমাদের অসম কর্মাপটিশানে ভেঙে দিলে ১৬০ পৃঃ) শব্দের খাঁচায় (তাদের এই পরস্পর তদগত অথচ সম্পূর্ণ পৃথক স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে বসার ভেতরে তারা যেন এই দ্বিখণ্ডিত বাংলা দেশের অস্তিত্বই ঘোষণা করছে যেনে, ১৯২ পৃঃ), প্রতিটি বইয়ে ব্যক্তিসত্তার চারপাশে সমকালীন জগতের আভাস পাই, কখনো প্রবলভাবে, কখনো আলতোভাবে, কিন্তু আভাস পাই সর্বত্র। কবি করুণাসিন্ধু দের কাব্যগ্রন্থের শিরো-নামা-অনুসারে বলতে পারি লেখক অসীম রায়ের কণ্ঠে পারিপার্শ্বকের মালা।

এই পারিপার্শ্বিক জগৎ নিছক প্রাকৃতিক জগৎ নয়। যদি নিছক প্রাকৃতিক হত, যদি নেহাৎ ইঁট, চুন, পাথরের তৈরি একটা জগৎ হত, যদি রাস্তা, গাড়ি, হাওয়াই জাহাজ, মোটর গাড়ির জগৎ হত, তাহলে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে এই প্রাকৃতিক জগতের সম্পর্ক হত নিতান্ত সীমিত, নিতান্ত আলগা। পারিপার্শ্বিক জগৎ ভাবেরও জগৎ, ধ্যানধারণার, চিন্তার অনুভূতির অভিজ্ঞতারও জগৎ। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে আহরণ করা যায় জ্ঞান, সংকল্প, বিচারবুদ্ধি, যদি আহরণ করার ইচ্ছা ও শক্তি থাকে। সে-ইচ্ছা ও শক্তি অসীম রায়ে সুতীক্ষ্ম, সুতরাং তাঁর উপন্যাসে (এবং গল্পে ও কবিতায়ও) উন্মোচনমান ব্যক্তিসত্তায় কিছু-না-কিছু প্রজ্ঞা আভাসিত হয়। এই প্রজ্ঞাসমূহের একটি (আমি এই প্রবন্ধে একটিরই প্রসঙ্গ পেশ করছি।) আধুনিক সমাজভুক্ত মানুষের শব্দ-দাসত্বের, শব্দ-মোহের ধারনায়। কতকগুলি বাঁধি-গৎ, অথবা পাকাপাকি বাঁধিও নয়, ঘূর্ণায়মান, কালচক্রে-মুহুর্মুহু-পরিবর্তিত ক্ষণ-ভঙ্গুর গৎ, যেসব গৎ, যেসব শব্দপুঞ্জ মানুষের চিন্তার শর্টকাট, মানুষকে চিন্তা করতে দেয় না, শুধু প্রচলিত কয়েকটি শব্দবন্ধের শরণাপন্ন করিয়ে রাখে, সেসব শব্দপুঞ্জ দ্বারা এ-যুগের মানুষ চালিত হচ্ছে এবং তার ফলে একটা সর্বব্যাপী অনুত চিন্তার আবরণে মানুষের সত্তা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। সে-আবরণেই সত্তার সন্ধান

আজকের দিনের দুরূহতম প্রয়াস। অসীম রায়ের একটি কবিতায় কয়েকটি ছত্র পাই:

শব্দকে বড়ই ভয়
শব্দের খাঁচায় বন্দী মানুষের ডানা
ঝাপটানো
অভিনব আওয়াজেই মনীষার অন্তিম আশ্রয়
কথার পেছনে কথা শব্দের ওপারেই
নৈঃশব্দের যতি নিরবধি

* * *

যেমন কামিক লাগে সাংবাদিক
শব্দের বিলাস
শব্দের পেছনে সেই নৈঃশব্দের যতি
কই কথার পেছনে সেই কথা
শব্দ কি অনড় প্রতিমা ?
('আমি হাঁটছি')

সত্যি কথা। 'শব্দ কি অনড় প্রতিমা' ? শব্দ তো বাহন, মিডিয়াম মাত্র। যার বাহন তারই যখন পরিবর্তন হয়, তখন বাহনটিরও পরিবর্তন হয়। পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় স্থান থেকে স্থানান্তরে, গোরুর গাড়িতে অথবা ঘোড়ায় চেপেও যাওয়া যায়, সাইকেলে যাওয়া যায়, রেলগাড়িতে, মোটরগাড়িতে, এরোপ্লেনেও যাওয়া যায়। প্রতি ক্ষেত্রেই গমন কিন্তু স্থানান্তরণ ক্রিয়াটি সম্পর্কে বাহকের মনোভঙ্গি হওয়ার ফলে বাহনটির পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। ভাষা আমার মিডিয়াম বটে কিন্তু কোন্ ক্ষেত্রে কার সঙ্গে, কেন ভাষা ব্যবহার করছি সেই অনুসারে ভাষার চরিত্রও বদলাচ্ছে। সমাজের পরিবেশ ও প্রয়োজন বদলাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দের তাৎপর্য ও ব্যবহার বদলাচ্ছে। 'জনগণ', 'মজদুর', 'সংগ্রাম', 'শ্রেণী'—এইসব শব্দের সঙ্গে আজকের দিনে যে চিন্তা ও ভাবাবেগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে, সে-চিন্তা ও আবেগ একশো বছর আগেও বাংলা ভাষায় ছিল না, এই শব্দগুলির তাৎপর্য এখন connotative. পূর্বে ছিল পুরোপুরি denotative আর যেই আমরা কোনো শব্দের অথবা শব্দগুচ্ছের connotative তাৎপর্যে পৌঁছলাম, তখন (সমাজের প্রয়োজন অনুসারে) সেই তাৎপর্যের বন্দী হয়ে গেলাম যতকাল পর্যন্ত না তাৎপর্যই বদলে যায়। অতএব মানুষেরা কতকগুলি খাঁচায় বন্দী হয়ে যায়, শব্দের খাঁচা, যে-খাঁচা লোহার বা কাঠের খাঁচার চেয়েও সাংঘাতিক।

উপরে উধৃত কবিতাটির তারিখ দেওয়া হয়েছে ৭ জানুয়ারি, ১৯৬৭। অসীম রায়ের উপন্যাস 'শব্দের খাঁচা'র প্রথম প্রকাশ-তারিখ অক্টোবর, ১৯৬৮। কবিতাটি ও উপন্যাসটি সমকালীন। যে-চিন্তা কবিতাটিতে ঝিলিক মেরেছে, সেই চিন্তা 'শব্দের খাঁচা' উপন্যাসে সর্বগ্রন্থিল সূত্র হিসাবে বিদ্যমান। এই উপন্যাসে এবং অন্যত্র খাঁচা-ব্যঞ্জক অনেক শব্দ প্রয়োজন মতো সুসঙ্গতভাবে প্রযুক্ত হয়েছে: রিভিশনিস্ট, ডেমোক্র্যাটিক রাইটস্, রেভল্যুশনারী পার্টি, রিফর্মিস্ট, আমেরিকান ইম্পিরিয়ালিজম্, ইনার পার্টি (২১৮, ২১৯ পৃঃ); হিউম্যান টাচ্, ডিপ্লোম্যাটিক টাচ, সোসিও-ইকনমিক প্লেন, পজিটিভ পার্সোনালিটি (৬৫ পৃঃ, 'একদা ট্রেনে'); interesting exhibition, exellent presentation, eilluminating discussion, perfect poise, mastery of language, ভাবগম্ভীর পরিবেশ, মানবিক আবেদন, উল্লেখযোগ্য, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি (৬৮, ৬৯ পৃঃ, 'একদা ট্রেনে')। 'শব্দের খাঁচা'য় উপন্যাসটিতে দশম পরিচ্ছেদটি প্রায় আগাগোড়া ফোঁপড়া শব্দের মোহ-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ।

মানুষ চেয়েছিল ভাষাকে গোলাম বানাতে, ভাষা তার সঙ্গে করল মস্করা, দিল্লগী, মানুষের জন্য বানালো খাঁচা এবং তাই করে ব্যক্তিসত্তার সত্যতা মোহাচ্ছন্ন করে দিল। ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনাঁদ দ্য সোশ্যুর, চমস্কি এবং আরো অনেকে লক্ষ্য করেছেন ভাষার বিশ্বাসঘাতকতা, এবং এলিয়ট বলেছেন কাব্যের ভাষা সার্থক হতে হলে আয়ত্ত করতে হবে a distortion of meaning. অসীম রায় খুবই সম্ভবত ভাষাতত্ত্বের মধ্য দিয়ে শব্দ-দাসত্বের ধারণায় পৌঁছননি, পৌঁছেছেন সৎ উপন্যাসকারের বাঁকিম বন্ধুর পথে চলে, জীবন-অভিজ্ঞতার পথে। যিনি উপন্যাস লেখেন, তাঁরও তো মশলা শব্দই। অসীম রায়ের যে পরম অন্বিষ্ট আমি তাঁর উপন্যাসে (এবং কবিতায় ও গল্পে) দেখতে পেয়েছি—ব্যক্তিসত্তার সন্ধান, সত্তার সত্যরূপ—সেই অন্বেষণই তাঁকে নিয়ে যাবে শব্দের দাসত্ব থেকে শব্দের প্রভুত্বে, খাঁচা থেকে মুক্তিতে। এই আসন্ন মুক্তির দূরশ্রুত পদধ্বনি আমি তাঁর রচনার প্রবীণ পর্যায়ে শুনতে পাচ্ছি।

একালের কথা (নতুন সাহিত্য ভবন, দাম ৪-৫০); গোপাল দেব (বিহার সাহিত্য ভবন, দাম ৪-০০); রক্তের হাওয়া (কথাশিল্প, দাম ৫-০০); দ্বিতীয় জন্ম (বাক্, দাম ৩-০০); দেশদ্রোহী (সুবর্ণরেখা, দাম ৩-০০); শব্দের খাঁচায় (মনীষা, দাম ৬-০০); অসংলগ্ন কাব্য (প্রাইমা, দাম ৮-০০); একদা ট্রেনে (অধুনা, দাম ১০-০০); অসীম রায়ের গল্প (অধুনা, দাম ৩-৭৫); কবিতা—ফুটপাথে ফুলের গল্প (দাম ১-০০) আমি হাঁটছি (অধুনা, দাম ৪-০০)।

চলমান শিল্প ঃ চৌরঙ্গীতে গ্যালারী "এ"

কবিতা পড়ছে অভিজিৎ

বর্ষাকাল বাদ দিয়ে বছরের বেশিভাগ সময় মনোহর দাস তড়াগের দক্ষিণ কোণে গ্যালারী 'এ' তরুণ কবি ও শিল্প-রসিকদের ডাকাডাকি করে। ছোট একটা গম্বুজ, যার মাথা বিচিত্র রূপে ধরেছে শিল্পী অসিত পাল-এর জোরালো রং-এ। প্রতি শনি-রবিবার সেখানে হয় কবিতা পাঠ, নয় গল্প, সাহিত্য আলোচনা, গান কিংবা ছবির প্রদর্শনী, কিছু-না-কিছু একটা লেগেই থাকে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দুটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল। উনিশে শনিবার সমবেত গানের জন্য এসেছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। দুপুর তিনটেয় সুরু হবার কথা। শেষ পর্যন্ত গাইয়েরা এলেন চারটে নাগাদ, সঙ্গে একদল শ্রোতা, তাঁদের মধ্যে থেকে একজন মহিলা একটি অজ্ঞাত কোণ থেকে হঠাৎ নিজের বসার জায়গাটা ঝাঁট দিয়ে বসলেন।

মাঝখানে হার্মোনিয়াম এতক্ষণ গাইয়ের অপেক্ষায় ঝিমোচ্ছিলো। শৈলেন্দ্র দাস লোকগীতি সুরু করে দিলেন। শ্রোতারা মন দিয়ে কতটা শুনছেন বোঝা ভার। মাঝে মাঝে ট্রামের ঠং, ঠং, সিগারেটের ধোঁয়া, পথচারীর কৌতূহলী দৃষ্টি এসব উপেক্ষা করেই চলমান শিল্পের শিল্পী তাঁর সংগীত পরিবেশন করে যাচ্ছেন। এরপর রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়-এর দরাজ গলায়—আমি হাড় কালা করলাম রে। ওরে আমার দেহ কালার লাইগ্যা রে। ঐ গলার পাশে ছোঁয়ার মত রীণা দাস, মঞ্জু দাস ও পাপিয়া বসুর গলা—কিন্তু এঁদের কে কতটা গাইছিলেন আর কতটা ঠোঁট নাড়ছিলেন ধরা মুস্কিল ছিল।

লোকগীতির সুর মুছে দিয়ে, গোল-গলা গেঞ্জী ও বেল-বটম প্যান্ট পরা তমাল ঘোষ, গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান। তাঁর গলা ও গান জমতে না জমতেই হাজির হলেন অজিত পাণ্ডে যাঁর বাংলা হিন্দী ইংরেজী দেহাতী সব ধরনের গান শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলে। তমাল গাইছেন, অজিত পাণ্ডে গম্ভীর মুখে শুনছেন, প্রেমিক উড়িয়া'র—'ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে।' এক রাউণ্ড চায়ের পর অজিত পাণ্ডে একের পর এক বিষ্ণু দে, নাজিম হিকমত ইত্যাদি গেয়ে চললেন। গান সুরু ও শেষ—কাঁধের ঝোলা কাঁধে তুলে অজিত পাণ্ডে রাস্তায় নেমে গেলেন, এত আকস্মিক যে কারো কিছু বলার সুযোগ পর্যন্ত হলো না।

চলমান শিল্পের গানের আসর এক নতুন মাত্রা পেল একটু বাদেই—রীণা, মঞ্জু ও পাপিয়া যখন দ্রুততালে গাইছেন দেহাতী গান—'ঝিঙাফুল নিলেক জাতি কুল গো। পিরীতি হইলো গো শূল গো' কিংবা 'হোলি রে রসিয়া'—আর সেই গানের টানে শহুরে ভিড় মুখ বাড়াচ্ছে, একদল সাঁওতাল নারী-পুরুষ—সে এক আশ্চর্য সমাবেশ। কাছেই পাতাল রেলের মাটি খোঁড়া চলছে। কাজ শেষ করে দেহাতী মানুষ বোধহয় দেশের স্মৃতি পাচ্ছে। অভাব শুধু মাদল আর মাদকের। এই সময়ের আলো বড়ো মারাত্মক, মন খারাপ করিয়ে দিয়ে হঠাৎ অন্ধকার থাবা বাড়ায় শহরের মাথায়। সেই সময় চলমান শিল্প কোয়ার্টেট রূপ নিচ্ছে 'উই শ্যাল ওভারকাম/উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে'...চলমান শিল্প নিশ্চয়ই কোনদিন সব কিছু পার হয়ে যাবে। মনে হলো শ্রোতাদের বিশ্বাস গানে ফুটে উঠছে ঃ ওহ্ ডিপ ইন মাই হার্ট আই ডু বিলিভ।

পরদিন অর্থাৎ বিশে, রবিবার-এর অনুষ্ঠান অভিজিৎ ঘোষের কবিতা পাঠ—কিছুটা নাটকীয়, কিছুটা আবেগ-আক্রান্ত—

> রঙিন ঘাঘরার নীচে জ্বলছে আগুন
> ওকে এখন ফুসলে নিয়ে যেতে পারো
> আইবুড়ো ওই সুন্দরীকে আপাততঃ
> দু'একটা দিন সবুর করো, ধৈর্য ধরো
> ছোট্ট এই খড়ের গাদা,
> অনায়াসেই হবে বুড়ো
>
> মোমশিখার ঠমক ঠারে কাঁপছে মাটি
> সবুর করো, দু'একটা দিন সবুর করো।

'সবুর করো' এই দীর্ঘ তান চৌরঙ্গীকে যেন ঘিরে ফেলেছে। অন্ততঃ স্পষ্ট উচ্চারণে অনেক শিথিল কবিতাও শ্রোতাদের কানে ঢুকিয়ে দিলেন অভিজিৎ।

কবিতা পড়া শুধু নয়, কবিতার আলোচনাও এই সভার অন্যতম আকর্ষণ ছিলো। পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দত্ত, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, অসিত পাল এবং কমার বসু এবং আরো শ্রোতাজন এক কবির কবিতা ও তার সঙ্গে কবির ব্যক্তিজীবনের বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করে ফেললেন। ঐ আলোচনায় সব কিছু স্পষ্ট না হোক এটুকু বোঝা গেল যে সমাজের এই তরুণ কবির জীবনে ও প্রতি পদক্ষেপে ভয়ংকর অস্থিরতা লেগে আছে সেই অস্থিরতার পরিণতি ভালো কি মন্দ তা নিয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসে নি এমন মন্তব্য কে কে করলেন। গ্যালারির আশেপাশে দু'চারজন পথচারীর কৌতূহল, আলো কমে আসছে—তরুণ কবি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, আপনারা গল্প করা বন্ধ করলে তবে কবিতা পড়বো। গল্প থামলো, যখন অখিল মিত্র গলা খুলে সুরু করলেন অভিজিতের একটি কবিতা গীতিরূপে। কবিতা তার আলোচনা এ সব শেষে এই খোলা প্রাঙ্গণ অনুষ্ঠানকে যেন তাঁর শমন-এ ফিরিয়ে দিল। "গ্যালারী-এ" এইভাবেই শেষে চলমান শিল্পের গম্বুজের মাঝ-বয়সী ও কম-বয়সী শিল্পী, অনুরাগী-রাগিনীদের ডাকছে। এই ডাকাডাকি আমাদেরও বাদ দেয়নি।

সুভাষ রায়চৌধুরী
দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যা

খুদে শহর হজম করেই কলকাতা

কলকাতা একদিন গড়ে উঠেছিল পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা, আসাম, ওড়িশা, বিহারের সমগ্র এলাকার রস গ্রহণ করে। কিন্তু আজ ভারত বিভাগের পরে এবং অন্যান্য এলাকায় তাদের নিজেদের শহর বৃদ্ধির ফলে বিশাল কলকাতার শোষণের টান একা পশ্চিমবঙ্গকেই সহ্য করতে হয়। এই নিয়ে বলছেন **গৌতম ঘোষ**।

মহানগর থেকে মেগালোপলিস

সতেরোশ' তেষট্টির সতেরোই মার্চ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোলকাতার অফিসে এক ইংরেজ কর্মচারীর দরখাস্ত এল। দীর্ঘদিন কোলকাতায় থেকে তাঁর শরীর ভেঙে গেছে। তিনি কাশিমবাজারে বদলী চান স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য।

ঠিক চার বছর পর আরেক মার্চে, কর্ণেল রিচার্ড স্মিথ একই আবেদন জানালেন : গত বৎসরের কলিকাতার বর্ষায় আমার প্রচুর সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমার একান্ত অনুরোধ নবাগত ইউরোপীয় সৈন্যগণকে যেন প্রথমেই ফোর্ট উইলিয়মের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে লইয়া আসা না হয়। তাহাদের যেন জলপথে প্রথমে কাশিমবাজারে পাঠান হয়।

এই ছিল কোলকাতা। এখানে-ওখানে জঙ্গল। পচা গেঁদো ডোবা। কাঁচা রাস্তা। ভিজে স্যাঁতসেঁতে একটানা লম্বা বর্ষা। জোয়ান জোয়ান সাহেবদের কাছেও এই বর্ষা ছিল ভীতিপ্রদ। অক্টোবরের মাঝামাঝি বর্ষা কেটে গেলে সাহেবরা পার্টি দিতেন। একটা বর্ষা কাটিয়ে দিতে পেরেছেন বলে আনন্দ করতেন। যীশুকে ধন্যবাদ দিতেন।

তখন পশ্চিমবাংলার শহর বলতে বোঝাত কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খালদা, সোনামুখী, ক্ষীরপাই, মেদিনীপুর, মালদা এইসব। মুর্শিদাবাদ তো তখনকার লণ্ডনের চাইতেও সুন্দর ছিল। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। এক শহরে এত বড় বড় প্রাসাদ তিনি আর কোথাও দেখেননি। শান্তিপুরে ছিল এক বর্ধিষ্ণু শিল্পনগরী। দেড় লাখ পাউণ্ড দামের কাপড় প্রতি বছর চালান হত শান্তিপুর থেকে লণ্ডনে।

সাম্রাজ্য স্থাপন এবং ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের পর সবকিছু দ্রুত পাল্টে গেল। কাশিমবাজারে যাবার জন্য কোম্পানির সাহেব কর্মচারীরা পাগল হতেন। মাত্র একশ বছর পর রেভারেণ্ড লং দেখেছেন, সেই কাশিমবাজার একটা নোংরা, জংলা শহর, ম্যালেরিয়ার ডিপো। এরও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শান্তিপুরের মৃত্যু হয়ে গেছে। শান্তিপুরের মসলিনের কথা লণ্ডনের মহিলারা ভুলেই গেছেন। ম্যাঞ্চেস্টার তখন কলে তৈরি সস্তা কাপড় দেওয়া আরম্ভ

সলভিনসের আঁকা সেকালের সরকারবাবু

করেছে। সে কাপড় এদেশেও আসছে। আর ঢাকা-শান্তিপুরে ক্ষীরপাই-এর তাঁতীরা তাঁত বন্ধ করে চাষবাস বা চাকরী বাকরীর চেষ্টা করছেন।

একদিকে এসব শহরের মৃত্যু এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মচ্যুতি। অন্যদিকে মন্বন্তর ও মহামারীর মারণভূমিকা। বাংলা শ্মশান হয়ে গেল। বলতে গেলে, এই শ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে কোলকাতা ধীরে ধীরে কল্লোলিনী হয়ে উঠল।

প্রায় দশ লক্ষ

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই কোলকাতার জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষের কাছে পৌঁছে গেল। বৃটিশ ভারতের রাজধানী তখন এই শহর। এই শহরে বসেই সাম্রাজ্যের ভিত গাঁথা হয়েছিল। সাহেবরা ভালবাসতেন এ-শহরকে। তাই শহরের যেসব পাড়ায় তাঁরা থাকতেন, সেসব পাড়া মনের মত করে গড়ে তুলতে তাঁদের পরিশ্রমের অবধি ছিল না। বড় চওড়া রাস্তা, পার্ক, বাগান, জল সরবরাহ, জল নিষ্কাশন, স্যুয়ারেজ---সবদিক থেকে কোলকাতা দ্রুত আধুনিক নগরী হয়ে উঠল। শতাব্দীর গোড়ায় মুগ্ধ লর্ড কার্জনের মনে হয়েছিল, এশিয়ার বুকের ওপর কোলকাতা এক ইউরোপীয় শহর। সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। ইংরেজের কর্মক্ষমতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

এই শহরে বসেই বাঙালী মধ্যবিত্ত ইংরেজী শিখেছিল। ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, বাণিজ্য, শাসনব্যবস্থা --- সবকিছুর আধুনিকীকরণের বীজ এ-শহরেই রোপন করা হয়েছিল। আমাদের সামাজিক ইতিহাসে

কোলকাতার এই ভূমিকার কথা গৌরবের কালিতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই গৌরবগাঁথার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ট্রাজিক মৃত্যু। বহু-ঘোষিত রেনেশাঁসের গৌরবে বাঙালী বিভোর। কিন্তু অল্প মানুষই এ বিষয়ে সচেতন যে, উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যেই বাংলার দেশীয় শিল্পগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। আরম্ভ হয় এক অর্থনৈতিক বিপর্যয়, এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার রেনেশাঁসের বিচার এখনো হয়নি। হলে হয়তো দেখা যাবে রেনেশাঁসের সূতিকাগার এই যে কোলকাতা, তার আকস্মিক শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রভুত্ব বাংলার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি।

কোলকাতাকে বলা হয় মেট্রোপলিস। গ্রীকরা বলত মেট্রোপলিস হল মাতৃস্বরূপা নগরী। পশ্চাদভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই নগরী তার আলো বিকীরণ করে, ছায়া দেয়, বেঁচে থাকার সংগ্রামে সহায়তা দেয়। পশ্চাদভূমি থেকে যেমন সে নেয় তার জীবনীশক্তি, তেমনি ফিরিয়ে দেয় সেই অঞ্চলকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল।

বাংলার শ্মশানের ওপর দাঁড়িয়ে কোলকাতার শ্রীবৃদ্ধি। প্রায় তিনশ' বছর তার বয়স। জন্মলগ্নের কলঙ্ক মুছে সে কী আজ মফস্বল বাংলার জননীর ভূমিকায় দাঁড়াবার গৌরব অর্জন করেছে?

উনিশশ' একুশ সালে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন পাশ করার সময়, এই আইনের প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, কোলকাতা কর্পোরেশনের পরিধি এক সময়ে ব্যারাকপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যাবে। সুরেন্দ্রনাথের বাড়ী ছিল ব্যারাকপুরে। তাঁর সে আশা আংশিক পূরণ হয়েছে, কর্পোরেশনের পরিধি যদিও ব্যারাকপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি, তবু কোলকাতা বলতে এখন আর আমরা কেবল কর্পোরেশন এলাকা বুঝি না, পরিকল্পনা [illegible] এখন কোলকাতা মেট্রো-

পলিটান অঞ্চল। এর উত্তরে কল্যাণী-বাঁশবেড়িয়া, দক্ষিণে বারুইপুর, দক্ষিণ-পশ্চিমে বজবজ আর উত্তর-পূর্বে বারাসত। পাঁচশ' তেত্রিশ বর্গমাইলব্যাপী এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বেশীর ভাগই একটানা নগরাঞ্চল। এর মধ্যে রয়েছে কর্পোরেশন এলাকা, ৩৪টি মিউনিসিপ্যালিটি এবং প্রায় ৬৫টি মিউনিসিপ্যালিটি বহির্ভূত নগরাঞ্চল। তাছাড়া আছে কিছু গ্রাম যা হয়তো অচিরেই শহর হয়ে যাবে।

সি এম ডি এর কর্মকাণ্ড এই মেট্রোপলিটান অঞ্চল জুড়ে।

কলকাতা বিনে শহর নাই

একাত্তরের সেন্সাসে দেখা যাচ্ছে, মেট্রোপলিটান অঞ্চলের শহরবাসীর লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চুয়াত্তর লক্ষ সারা পশ্চিমবাংলার শহরবাসীর সংখ্যা ছিল এক কোটি সাড়ে ন' লাখের কিছু বেশী। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোলকাতাকে বাদ দিলে বাংলার অন্য সমস্ত শহরগুলিতে সব মিলিয়ে বাস করেন পঁয়ত্রিশ লাখ লোক, পশ্চিমবাংলার শহরবাসীর শতকরা ৬৮ ভাগই থাকে তাহলে কোলকাতা মেট্রোপলিটান অঞ্চলে। অর্থাৎ কুম্ভ বিনা যেমন গান নেই, কোলকাতা বিনা তেমনি আর শহর নেই। একটি পরিসংখ্যান দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। আর নগরায়ণের দিক থেকে পশ্চিমবাংলার স্থান ভারতের মধ্যে চতুর্থ। রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে চব্বিশ ভাগ লোক বাস করেন শহরে। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং গুজরাট আমাদের আগে আছে যথাক্রমে ৩১, ৩০ এবং ২৮ ভাগ শহরবাসী নিয়ে। কিন্তু মেট্রোপলিটান অঞ্চল বাদ দিলে পশ্চিমবাংলার শহরবাসীর সংখ্যা রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৭ ভাগ। খুব পশ্চাদপদ রাজ্য ছাড়া দেশের আর কোথাও শহরবাসীর সংখ্যা শতকরা দশ ভাগের নীচে নয়।

অথচ এই রাজ্যে শহর কিছু কম নেই, মেট্রোপলিটান অঞ্চল বাদ দিলেও এখানে শহর আছে ১৩০টি। যেখানে এক লাখের উপর জনসংখ্যা আছে তাকে প্রথম শ্রেণীর শহর বলা হয়। এমন শহর মেট্রোপলিটান এলাকা নিয়ে পাঁচটি : খড়্গপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান এবং কোলকাতা। এ হল একাত্তরের সেন্সাসের হিসেব। হয়তো গত দু' বছরে আরো অন্তত দুটি শহর প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করেছে : একটি শিলিগুড়ি এবং অন্যটি নবদ্বীপ। প্রথম শ্রেণীর শহরগুলি ছাড়া, একাত্তরের সেন্সাসে অন্যান্য শহরগুলির হিসেব ছিল এরকম :

দ্বিতীয় শ্রেণী : পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখের কম জনসংখ্যা।

তৃতীয় শ্রেণী : কুড়ি হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারের কম জনসংখ্যা।

চতুর্থ শ্রেণী : দশ হাজার থেকে কুড়ি হাজারের কম জনসংখ্যা।

পঞ্চম শ্রেণী : পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজারের কম জনসংখ্যা।

ষষ্ঠ শ্রেণী : পাঁচ হাজারের কম জনসংখ্যা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পনেরোটি শহরের বেশীর ভাগ হল জেলার বা মহকুমার সদর শহর, পর পর দুটি সেন্সাসে দেখা গেছে—এই ধরনের শহরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশী। স্বাধীনতার পর জেলায় সরকারি কাজকর্ম বেড়ে গেছে। ফলে সদর শহরগুলোর ওপর সরকারি অফিস বেশি করে বসছে। এ-শহরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বড় ঘাঁটি। ফলে জনসংখ্যা এখানে দ্রুত বাড়ছে।

আদ্রা অনাদতে

কিন্তু, সবচাইতে হতাশার কারণ হল অন্য চারটি শ্রেণীর শহরগুলির স্থিতাবস্থা অথবা ক্রম অবনতি। একাত্তর সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে : ১৯০১ সালে রাজ্যের শহরবাসীর শতকরা ৩৮.৭১ ভাগ লোক বাস করত শেষের এই চার শ্রেণীর শহরগুলোতে। একাত্তরে তা নেমে দাঁড়ায় শতকরা মাত্র ২৫.৬৬ ভাগে। তারপরেও এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। রাজ্যের নগরায়ণে এ-শহরগুলোর একেবারেই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা। অথচ জায়গার দিক থেকে ছোট ছোট এই চার শ্রেণীর রাজ্যের সমগ্র শহরাঞ্চলের শতকরা ষাট ভাগ জায়গা দখল করে আছে। একদিকে একটু করো জমির জন্য হাহাকার। এক বর্গকিলোমিটার এলাকায় তিরিশ হাজার লোক কোনক্রমে মারামারি করে মাথা গুঁজে আছে। অন্যদিকে গোবরডাঙা বা ঝাড়গ্রাম, কান্দী বা আদ্রা অনাদৃত, অবহেলিত জনবিরল জনপদ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

মানুষ শহরে বাস করতে আসে কাজের সন্ধানে। গ্রামের মানুষের চাষবাসের কাজ আছে। জমি থাক বা না থাক, গ্রাসাচ্ছাদন হোক বা না হোক ঐ জমিতেই সে থাকে। সে-কাজ হয়তো সারা বছরের বা সারাদিনের কাজ নয়। তবু, জমি ছাড়া আর কুটীরশিল্পের টুকিটাকি কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের সন্ধান করে না বা পারে না। কিন্তু, শহরের মানুষের কৃষি-বহির্ভূত কাজ দরকার। আর এই কাজ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যদি শহরে শিল্প বা কল-কারখানা থাকে। এখানেও সেই কলকাতার প্রাধান্য।

দুটি পরিসংখ্যান দিয়ে এই চেহারাটি পরিস্ফুট করা যাক। কুটীরশিল্প এবং ছোট-বড়-মাঝারি শিল্পে সমগ্র রাজ্যে কাজ করে এগারো লক্ষ আটষট্টি হাজার লোক। এর মধ্যে দশ লাখ এক হাজার কর্মী আছেন শুধু কোলকাতা অঞ্চলে। এই অঞ্চলকে বাদ দিলে রাজ্যে আর মাত্র একটি শিল্পাঞ্চল আছে : দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি, বরাকর, চিত্তরঞ্জন-রূপনারায়ণপুর। এই অঞ্চলে শিল্পের শ্রমিক আছেন বিরাশি হাজার মানুষ। বাকি থাকে মাত্র পঁচাশি হাজার শিল্পকর্মী, যাঁরা বাস করেন অন্য শহরগুলোতে; কোলকাতা মেট্রোপলিটান অঞ্চলের সমগ্র কর্মী-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ যেখানে শিল্পকর্মী, উপরোক্ত জেলা শহরগুলিতে সেখানে শিল্পে নিয়োজিত আছেন শতকরা বারো ভাগ মানুষ মাত্র।

আলো আমার আলো

আরো শোচনীয় চিত্র পাই যদি রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরীর কর্মীসংখ্যার হিসেব নিই। বিদ্যুৎ ব্যবহার করে দশজন অথবা বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে কুড়িজন কর্মী যে ফ্যাক্টরী নিয়োজিত করে, তাকেই বলে রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরী। রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরীর শিল্প-শ্রমিকের শতকরা চুরাশি ভাগই আছেন কোলকাতার শিল্পাঞ্চলে। বাকি ষোল ভাগের বেশ মোটা অংশই নিয়োজিত আছেন দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে। অন্য শহরগুলোতে তাহলে রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরী নেই বললেই চলে। তার মানে হল, সেন্সাস সংজ্ঞা অনুযায়ী যদিও বিরাশি হাজার মানুষ নিয়োজিত আছেন ছোট এবং মাঝারি জেলা শহরগুলির শিল্প প্রতিষ্ঠানে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির বেশির ভাগ নামেই শিল্প। অনগ্রসর, অনাধুনিক এসব প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মী বা মালিকের এমন কিছু উদ্বৃত্ত থাকা সম্ভব নয়, যা থেকে শিল্পের ক্রমোন্নতি সম্ভব।

এসব হিসেব থেকে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যে তথ্য বেরিয়ে আসছে, তা হল, রাজ্যের উন্নয়ন কর্মধারায় জেলার ছোট ও মাঝারি শহরগুলির কোন ভূমিকাই নেই।
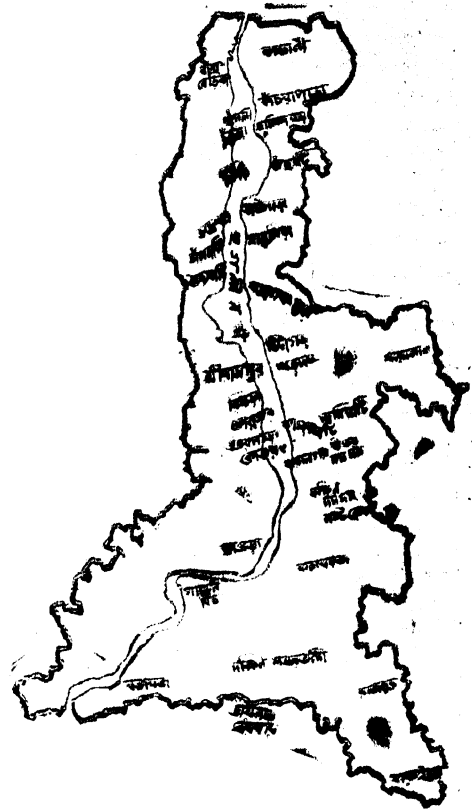
রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে এ-শহরগুলির দুটি প্রধান কাজ। এক, জেলার বা মহকুমার সদর হিসেবে সরকারি অফিসের আবাসের ব্যবস্থা করা। দুই, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা পরিবহন ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা। এই কাজগুলি গৌণ বলছি না। বিশেষ করে দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত কাজটি। স্বাভাবিক কারণেই জেলার শহরগুলির বাজার-শহর হিসেবে একটা বড় ভূমিকা থাকবে। কিন্তু, দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল জুড়ে অনাধুনিক ও অনগ্রসর কৃষি ব্যবস্থা। ফলে গ্রামের মানুষ সামান্য পণ্যই বিক্রির জন্য শহরে পাঠাতে পারে। ক্রয় ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে কম হওয়ায়, কিঞ্চিৎকর শিল্পদ্রব্যই সে শহর থেকে কিনতে পারে। ফলে শহরগুলির পক্ষে বর্ধিষ্ণু বাজার-শহর হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সীমিত। গ্রামের দারিদ্র্যের ছোঁয়াচ তার কাছাকাছি শহরগুলোতে স্বাভাবিকভাবে পৌঁছে গিয়ে শহরগুলোকে দরিদ্র করে।

দারিদ্র্য এবং ধ্বংসের বিস্তীর্ণ পশ্চাদভূমির ওপর দাঁড়িয়ে কোলকাতার ওপর মহানগর গড়ে উঠেছিল ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। সাম্রাজ্যের শোষণ ব্যবস্থাকে সাহায্য করতেই কলকাতা। গ্রাম এবং ছোট-বড়-মাঝারি শহরগুলির আধুনিকীকরণের দায়িত্ব এ-শহর পালন করেনি। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও এ-শহরের সেই ভূমিকা অব্যাহত আছে। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা বা সংস্কৃতি যা-কিছু অগ্রগতি এ-রাজ্যে হয়, সব-কিছু জড় হয় এই মহানগরাঞ্চলে। বাকি গ্রাম-শহরগুলো হাহাকার করতে থাকে।

ক্লাইভ

একঘরে তিনজনের রাত্রিবাস

অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে এ-শহরও দরিদ্র, জীর্ণ এবং অনাধুনিক। এই শহরের একশ' পরিবারের মধ্যে ৬৩টি পরিবারের আয় তিনশ' টাকার নীচে। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পরিবারের মাসিক আয় দুশ' টাকার নীচে। দুশ' থেকে তিনশ' টাকার আয়ে একটি পরিবার এ শহরে কীভাবে দিন কাটায় ভাবতেও পারা যায় না। গৃহ সমস্যায় এ-শহরের জুড়ি পাওয়া কঠিন। প্রায় দু' লাখ মানুষ ফুটপাতে শুয়ে রাত কাটান। দোকানে বা অফিস ঘরে কত যে মানুষ রাত্রিবাস করেন তার হিসেব আমরা জানি না। বসত-বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা আছেন গাদাগাদি করে ঠেসাঠেসি করে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গড়ে প্রতি ঘরে রাত্রিবাস করেন তিনজন করে মানুষ। শহরের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ থাকেন বস্তিতে। অন্তত চার লাখ বেকার কোলকাতার এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে নাম লিখিয়ে বসে আছেন, তার মধ্যে দু' লাখের ওপর শিক্ষিত। ঈশ্বরই জানেন নাম-না-লেখানো বেকার কত আছেন। যে শহরের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করেন, সে-শহরাঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে চোখ বুজেই তা বলে দেওয়া যায়।

হয়েছেও তাই। ষাটের দশকে কোলকাতা নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখা গেল এই নগরাঞ্চলের নাগরিক কাঠামোটি একেবারেই ভেঙে গেছে। জল, ড্রেনেজ, স্যুয়ারেজ, রাস্তা-ঘাট, পরিবহণ, হাসপাতাল, ইস্কুল, মাঠ-পার্ক—সবকিছুরই শোচনীয় অবস্থা। বহু দিনের অব্যবস্থায় জীর্ণ এই শহরের প্রতি দৃষ্টি পড়ল সত্তরের দশকে। তার আগে নকসালবাড়ীর আগুনে এ শহর পুড়েছিল। প্রায় খরচের খাতায় তোলা হয়ে গিয়েছিল এই দুঃস্বপ্নের নগরী। ছেষট্টি সালে তাঁদের বেসিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বইতে সি এম পি ও-র বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন নিশ্চিত ধ্বংসকে এড়াতে হলে এখনই নগরীর উদ্ধারকার্য আরম্ভ হওয়া দরকার। সেই উদ্ধারকার্য আরম্ভ করল সি এম ডি এ সত্তরের শেষের দিকে। পরে একে একে এল পাতাল রেল প্রকল্প এবং হুগলীর দ্বিতীয় সেতু প্রকল্প।

কয়েকশো কোটি টাকা

কত টাকা খরচ হচ্ছে এসব উন্নয়নের কাজে। সি এম ডি-এর হিসেবটাই প্রথমে ধরা যাক। ছিয়াত্তরের মার্চ পর্যন্ত এই সংস্থা খরচ করেছে ১৮৬ কোটি টাকা। একাশির মার্চের মধ্যে আরো ২২২ কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা এই সংস্থার আছে। তাহলে মাত্র দশ বছরে এ সংস্থাকে খরচ করতে হবে ৪০৮ কোটি টাকা। হুগলীর দ্বিতীয় সেতুর জন্য খরচ হবে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকা। তা ছাড়া আছে পাতাল রেল প্রকল্প। এর খরচ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলা মুস্কিল। এখনই এ প্রকল্পের অনুমিত ব্যয় দু'শ কোটি টাকার ওপর।

এসব অর্থকরী হিসেবের মধ্যে আসতে হচ্ছে শুধু একটি কারণে। কোলকাতা নামে অতিকায় জীবটিকে দেখ-ভাল করার জন্য কোষাগারের ওপর কতটা চাপ পড়ছে? এই খরচের ঠিক ঠিক হিসেব কেউ করেন নি। মোটামুটি একটা হিসেবে দেখা যায় সত্তর-একাত্তর থেকে আশি-একাশির দশকে কোলকাতার মেট্রোপলিটান অঞ্চলের উন্নতির জন্য খরচ করা হবে গড়ে বছরে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা। এই যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে তার সিংহভাগ চলে যাচ্ছে শুধু কোলকাতা কর্পোরেশন এলাকার তিরিশ বর্গমাইল এলাকার জন্য যেখানে বাস করেন ৩১ লক্ষ লোক। সমগ্র মেট্রোপলিটান অঞ্চলে বাস করেন তিরাশি লাখ লোক অথচ ঐ ছোট এলাকাটার জন্য খরচ করার প্রয়োজন হচ্ছে মোট বিনিয়োগের অন্ততপক্ষে তিন ভাগের দুই ভাগ। অর্থাৎ প্রতি কোলকাতা শহরবাসী পিছু গড়ে বছরে ১৪৬ টাকা। এ খরচ শুধুমাত্র সি এম ডি এ, পাতাল রেল এবং হুগলী সেতু বাবদ। এ ছাড়াও আরো অনেক সংস্থা উন্নয়নের কাজ করছে। যেমন, আবাসন পর্ষদ, স্বাস্থ্য দপ্তর, পূর্ত দপ্তর ইত্যাদি। সব খরচ যোগ করলে মাথা পিছু বিনিয়োগের পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। এ তো গেল শুধু উন্নয়নের জন্য খরচ। রক্ষণাবেক্ষণ এবং দৈনন্দিন মিউনিসিপ্যাল কাজকর্মের হিসেব এর মধ্যে নেই। সেও এক বিপুল অর্থ। কোলকাতা কর্পোরেশন এবং ৩৭টি মিউনিসিপ্যালিটি মিলিয়ে সেও কয়েক কোটি টাকার ব্যাপার। সব মিলিয়ে এ এক রাজসূয় যজ্ঞ।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ফলে কি আমাদের নাগরিক অর্থনীতি লাভবান হয়েছে? এ শহরের ক্রমবর্ধমান বেকারী, গৃহ সমস্যা, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং আয়ের বিষম বণ্টনের হার দেখে মনে হয় এখনও পর্যন্ত এই বিনিয়োগের প্রভাবে শহরের আর্থিক কাঠামোর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি।

এখনও পর্যন্ত নগরীর উন্নয়ন কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল নাগরিক প্রয়োজনগুলির অবনতি রোধ করা—জল, ড্রেনেজ, স্যুয়ারেজ, রাস্তা-ঘাট, পরিবহণ ইত্যাদির আধুনিকীকরণ।

অল্পকিছু উচ্চবিত্ত

এই আধুনিকীকরণের আশু প্রয়োজন ছিল কি না তা কিন্তু প্রশ্নাতীত নয়। মনে রাখতে হবে এর জন্য প্রচুর অর্থ-ব্যয় করতে হচ্ছে এবং এমন অঞ্চলের জন্য এই ব্যয় হচ্ছে যেখানে তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র। মাথা পিছু ষাট গ্যালন করে খাবার জল, মল ও জল নিষ্কাশণের আধুনিক ব্যবস্থা সি এম ডি এর জরুরী প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত। অথচ এই শহরের নিম্নবিত্তদের সিকি ভাগেরও আলাদা বাথরুম নেই। স্নান এবং খাবার জন্য মাথা পিছু চল্লিশ গ্যালন করে জল ব্যবহার করার সামর্থ্য এমন কি প্রয়োজন শতকরা পঁচিশ তিরিশ জন নিম্নবিত্তের আছে কি না সন্দেহ। অথচ জল সরবরাহ, স্যুয়ারেজ এবং ড্রেনেজের আধুনিকীকরণের জন্য কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ হচ্ছে। শহরাঞ্চলের অল্প কিছু উচ্চ বিত্ত মানুষই এই বিনিয়োগের সুফল যথাযথভাবে ভোগ করতে পারবেন।

রেভারেণ্ড লঙ

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। একটা দরিদ্র এবং অনাধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোর পশ্চাদভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে এক অতিকায় মেট্রোপলিস। তার প্রয়োজনগুলো বিদেশের আর পাঁচটা মেট্রোপলিসের মতই। এখানেও সেই একই সমস্যা শৃঙ্খলা। গৃহ সমস্যা, জঞ্জাল ফেলার সমস্যা, জল ও মল নিষ্কাশনের সমস্যা, জল সরবরাহের সমস্যা, ট্রাফিক জ্যামের সমস্যা। বিদেশের আর পাঁচটা সহোদরের সাথে কোলকাতার যেখানে পার্থক্য, তা হল অর্থের সমস্যা। সীমিত কোষাগারে পাল্লা আনতে নুন ফুরোয়। নুন পান্তার এই দেশেতে আমরা কিন্তু মিটাই মণ্ডার স্বপ্ন দেখছি। সুয়েজ ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট বা অতিকায় ওয়াটার ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট আমাদের চাই। কারণ বিদেশের শহরে জল দেবার ব্যবস্থা এবং মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এসবের মাধ্যমেই হয়েছে। এর পরিপূরক সস্তা অথচ স্বাস্থ্যসম্মত কোন পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তাই আমরা চিন্তা করছি না। প্রচণ্ড গৃহ সমস্যার জালে আবর্তিত লক্ষ লক্ষ নিম্নবিত্তের জন্য আমরা যদি মাটি-খড়ের বাড়ী, টিনের চালের বাড়ীর কথা ভাবি তাহলেই বা ক্ষতি কি? দেশের একশ জন মানুষের আশি জনই তো এরকম বাড়ীতে থাকেন। তবে শহরের জন্য পাকা ফ্ল্যাট-বাড়ী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না কেন? পারি না বলেই লো কস্ট হাউসিং এর নামে যে গবেষণা দেশে চলে তা অশ্বডিম্ব ছাড়া এখনো পর্যন্ত কিছুই প্রসব করতে পারে নি। এই কোলকাতায় এখনও পর্যন্ত তথাকথিত নিম্নবিত্তদের জন্য যেসব বাড়ী বাজারে ছাড়া হয়েছে, তা শতকরা পনেরো জন মানুষেরও ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।

আসলে, কথায় কথায় পশ্চিমের দিকে তাকানো আমাদের অজান্তে দাঁড়িয়ে গেছে। এই অভ্যাসের শুরু প্রায় দু'শ বছর আগে যখন এই কোলকাতা শহরে প্রথম ইংরেজী শেখার ইস্কুল খোলা হয়। সেই শুরু। তার জের আজও টেনে চলছি। আমাদের প্ল্যানিং, ইঞ্জিনীয়ারিং, আর্কিটেকচার—সবই ইংরেজী বই থেকে ধার করে আনা। চড়া হারের সুদে এই ধার। তবু ঐ ধারই করতে হবে। কারণ 'লেটেস্ট' না হলে 'ফ্যাশন' হয় না।

বকরাক্ষস

বিদেশের কথা যখন এলই তখন বলা ভাল মেট্রোপলিসের সমস্যা বিদেশীরাও সমাধান করতে পারে নি। যুক্তরাষ্ট্রের মত লক্ষপতির দেশেও না। আমাদের মত দরিদ্র দেশে তো এ এক বোঝা। এই বোঝা আরও অসহনীয় হয় যদি সে আর সবাইকে বঞ্চিত করে, বকরাক্ষসের মত স্ফীত হতে থাকে। পশ্চিম বাংলায় কোলকাতার ভূমিকা অনেকটা ঐ বকরাক্ষসের মত। দেশের যা কিছু ভাল, সে টেনে নেয়। কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, অভিনেতা, খেলোয়াড়—সবাই তৈরী হবার পর এখানেই মাথা গুঁজে থাকার চেষ্টা করেন। অন্য কোন ছোট শহরে কর্মস্থান বেছে নেবার কথা ওঁরা ভাবতেই পারেন না।

এই বাংলাদেশে এককালে দুটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। একটি ছিল ঢাকায়। সত্যেন বসুর মত বৈজ্ঞানিক, মোহিতলালের মত কবি ও অধ্যাপক, রমেশ মজুমদারের মত ঐতিহাসিক ঢাকার এই বিশ্ববিদ্যালয় আলোকিত করেছিলেন। এখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল বাংলার ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ। আজ মেট্রোপলিটান অঞ্চলের বাইরে পশ্চিম বাংলায় অন্তত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে: বর্ধমান, শিলিগুড়ি এবং বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতীর কথা একটু স্বতন্ত্র হলেও, নির্ভয়ে বলতে পারি, নেহাৎ অপারগ না হলে কোন প্রতিভাবান পণ্ডিত স্বেচ্ছায় কলকাতা ছেড়ে ওসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে যাবেন না। কোলকাতার আর সে জৌলুষ নেই, তবুও যাবেন না। এমন ঘটনাও বিরল নয় মফঃস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডারের পদ ছেড়ে দিয়ে কোন তরুণ অধ্যাপক কোলকাতায় ফিরে এলেন লেকচারারের পদ নিয়ে। তেমনি লেখক বা শিল্পী বা অভিনেতারও ঐ একই লক্ষ্য। কোলকাতার জনারণ্যে জায়গা করে নেওয়া। কারণও একটা। কোলকাতার বাইরে এখন আর 'সভ্যতা' নেই! তাই কোন প্রতিভার দৃষ্টি আর মফঃস্বল শহরের দিকে পড়ে না, গত দেড়'শ বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বা বনফুলের মত ক'জন লেখক আছেন যাঁরা কোলকাতার বাইরে বসে সাহিত্য রচনা করেছেন? রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিম অবশ্যই হিসেবের বাইরে। বহুদিন আগেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের আসর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন এই একতরফা গ্রাস, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তাই। আগেই বলেছি রাজ্যে যা কিছু কৃষিবহির্ভূত কাজ তার প্রায় সবটাই জমা হয়েছে কোলকাতায়। সামান্য কিছু আছে দুর্গাপুর-আসানসোলের শিল্পাঞ্চলে। অন্য শহরগুলো ধুঁকে ধুঁকে মরছে। তার বিশাল পশ্চাদভূমি থেকে কোলকাতা আহরণ করছে তার জীবনীশক্তি; প্রতি দিনের আহার, শিল্পের কাঁচামাল। কিন্তু এই আহরণ একতরফা। প্রতিদানে সে এমন কিছুই দেয় না যা থেকে পশ্চাদভূমি তার নিজের জীবনীশক্তি অর্জন করতে পারে। গ্রামের অর্থনীতির আধুনিকীকরণের জন্য যা প্রয়োজন তার কিছুই কোলকাতার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তৈরী করে না। দুটি মহৎ কর্তব্য অবশ্য কোলকাতা চরম সাফল্যের সাথে পালন করে। সস্তায় গ্রামের পণ্য কেনা এবং চড়া দরে শিল্পের ভোগ্যপণ্য মফঃস্বলে পাঠিয়ে দেওয়া। এরই নাম এক তরফা শোষণ। জন্মলগ্ন থেকেই কোলকাতার এই পরভোজী শোষকের ভূমিকা।

১৩৭

এই ভূমিকার পরিবর্তন না হলে রাজ্যের সামাজিক বা আর্থিক উন্নতির কোন আশাই নেই। গ্রাম-শহরের এই খাদ্য-খাদক সম্পর্ক পরিবর্তনের কথা ভাবতে গেলে আমাদের তাকাতে হবে ঐ ১৩৭টি ছোট ও মাঝারি শহরগুলির দিকে।

কোলকাতায় মানুষ আসে কাজের সন্ধানে। কাজ যে এন্তার আছে তা নয়। বরং কাজের তুলনায় লোক বেশী। কাজ নেই, তার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প নেই। এবং যথেষ্ট পরিমাণে শিল্প নেই, কারণ পণ্যের উল্লেখযোগ্য চাহিদা নেই। শিল্পদ্রব্যের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বাজারে প্রতিফলিত হতে পারে যদি গ্রামের অর্থ-নীতি চাঙ্গা ও তেজী হয়। কারণ দেশের বেশীরভাগ মানুষেই বাস করে গ্রামে। গ্রামীণ মানুষের হাতে যদি উদ্বৃত্ত টাকা থাকে, তবেই সে ভালভাবে বাঁচবার প্রয়োজনে শহরে শিল্পদ্রব্য কিনতে আসবে। তার হাতে এই উদ্বৃত্ত টাকা আসতে পারে একমাত্র কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ, নানা ধরণের কৃষি পণ্য উৎপাদন, বিক্রীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা, জমির মালিকানা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি এই আধুনিকীকরণের কর্মসূচীতে পড়বে। আধুনিক কৃষির একটি মূল্যবান অঙ্গ হল এমন কিছু সম্পদ চাষে ব্যবহার করা যা আগে করা হত না বা যথেষ্ট পরিমাণে করা হত না। যেমন, সার, জল এবং বিদ্যুতের ব্যবহার, পাম্প সেট, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি। আধুনিক কৃষির অবশ্য আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন। দ্রুতগামী পরিবহণের ব্যবস্থা—ট্রাক, টেম্পো, ভাল রাস্তা। প্রয়োজন গুদামের, বড় বাজারের, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানার। তালিকায় আরো অনেক কিছুই যোগ করা যায়।

আধুনিক কৃষির এসব চাহিদা মেটাতে গেলে, তাহলে, শিল্পের প্রসার হওয়া চাই। এমন শিল্প যা কৃষির প্রয়োজনে লাগে। ভারতীয় কৃষির প্রয়োজনভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান কোলকাতায় গড়ে ওঠে নি। শুধু কোলকাতায় কেন, সারা পশ্চিমবঙ্গেই কৃষির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে ওঠে নি। দুর্গাপুর বা হলদিয়ার সার কারখানা ব্যতিক্রম মাত্র। এ রাজ্যে শিল্পের যে প্যাটার্ন গড়ে উঠেছে, তা অনেকটা উটকো। বিদেশের বাজারের ওপর নির্ভর করে কোন শিল্প নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। চট শিল্পের বর্তমান দুরবস্থা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দেশের শিল্পকে দাঁড়াতে হবে আভ্যন্তরীন বাজারের ওপর। সেই বাজার তৈরী করতে হবে বাংলার সাড়ে আটত্রিশ হাজার গ্রামে। কৃষির আধুনিকীকরণের জন্য সে সব গ্রামকে দাবী করতে হবে নতুন নতুন শিল্প সম্পদ : ছোট ট্রাকটর, যান্ত্রিক লাঙ্গল, পাওয়ার টিলার, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ, সার, বিদ্যুত সর-বরাহের তার, পোল, বাড়ী বা গুদাম তৈরী করার মালমশলা, পি ভি সি পাইপ, প্লাস্টিক বা নাইলনের নানাধরণের জিনিষ ইত্যাদি। গ্রামের মানুষের হাতে টাকা এলে সে ভোগ্য পণ্যও কিনবে, সস্তা জুতো, মোটা কাপড় ইত্যাদির চাহিদা এখনি বেড়ে গেছে। অবস্থা ভাল হলে আরো বাড়বে, তখন হয় তো সস্তা রেডিও। মোটর চালিত হাল্কা সাইকেল কিনতেও গ্রামের লোক শহরে আসবে।

কথা হল এসব শিল্প কোথায় বসবে? নতুন নতুন এসব শিল্পের জন্য কি আমরা কোলকাতার দরজা খুলে অন্য সব দরজা বন্ধ করে রাখব? কিংবা নতুন নতুন শিল্পনগরী তৈরী করব যেমন করা হয়েছে দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন বা রূপনারায়ণপুরে? অথবা খুঁজে নেব মেদিনীপুর, কাঁথি, বাঁকুড়া, ঝালদা, পুরুলিয়া, বহরমপুর শান্তিপুর, মালদা, রায়গঞ্জ, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার বা কুচবিহারের মত ছোট বা মাঝারি শহর।

আধুনিক কোন শিল্প গড়তে হলে তা বড় বড় শহরে করতে হবে—এ বিশ্বাস আজকের দিনে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। শিল্পগুলিকে যে বড় শহরে বাসা বাঁধতে হয় তার বড় কারণ বৃহৎ নগরের অন্তর্কাঠামো বা ইনফ্রাস্ট্রাকচার সুদৃঢ় এবং মজবুত। বিদ্যুৎ, জল, পরি-বহণ ব্যবস্থা, বাসস্থান, দক্ষ শ্রমিক ইত্যাদি সহজলভ্য বলেই বড় শহরে আসা। বড় শহরের প্রতি শিল্পের এই আকর্ষণ শিল্প বিকাশের প্রথম অধ্যায়ে স্বাভাবিক ঘটনা। চারি-দিকের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের মাঝে মাঝে দ্বীপের মত বড় বড় শহরগুলো তখন তাদের শিল্পের পরিবার নিয়ে বাসা বাঁধে। কিন্তু এই আধুনিক যুগে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবহনের উন্নতির ফলে শিল্পের যা কিছু চাহিদা সব কিছুই মফঃস্বল শহরেও হাজির করে দেওয়া যায়। জেলার উল্লেখযোগ্য সব শহরেই এখন বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। আশানুরূপ না হলেও পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি এখনই হয়েছে। সুতরাং মফঃস্বলের শহরগুলিতে কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার বাধা কোথায়? ছোট শহরেও শিল্প গড়ে তোলা যায়। এমনকি যে-শহরে কুড়ি হাজারের মত মানুষ বাস করেন, সেখানেও। আসলে দেখতে হবে বাজার কোথায়? কাঁচামালের উৎস কোথায়? ব্যাংক আছে কিনা, শ্রমিক পাওয়া যাবে কিনা, বিদ্যুৎ এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থা উন্নত কিনা। এসব প্রশ্ন যথাযথ বিচার করে, জেলার উল্লেখযোগ্য বাজার-শহরগুলিতে কৃষির প্রয়োজনভিত্তিক শিল্প এবং গ্রামীণ মানুষের ভোগ্যপণ্যের ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা অসম্ভব মনে করার কারণ নেই। এসব শিল্পের সাথে সাথে পাশাপাশি গড়ে তোলা যায় বাজার, গুদাম, যন্ত্রপাতি মেরামত করার কারখানা, ইস্কুল, ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদি।

এর ফলে জরাজীর্ণ মফঃস্বলের শহরগুলি প্রাণ ফিরে পাবে। শুধু তাই না। শহরগুলির নতুন নতুন কর্মধারার মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভবপর হবে। গ্রামের অর্থনীতি চাঙ্গা ও জোরদার হবে। গ্রাম এবং শহর একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উজ্জ্বলতর দিনের জন্য একসাথে সংগ্রাম করতে পারবে।

এখনই যে জেলার এসব শহর তাদের নতুন দায়িত্ব পালন করতে পারবে তা নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই এই শহরগুলি জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। হঠাৎ আধুনিক শিল্পনগরী বা বাণিজ্যনগরী হবার ক্ষমতা এদের নেই। শহরগুলির কিছু পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হবে। শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয় এমন জায়গা এ-শহরগুলির মধ্যে তৈরি করে দিতে হবে। রাস্তা-ঘাট বাড়াতে হবে, মজবুত করতে হবে, জলের ব্যবস্থা চাই, যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ চাই, বাজার, গুদাম ও [illegible]কের জন্য জায়গা চাই, শহরের পুরোনো ঘিঞ্জী এলাকাগুলো প্রশস্ত করা চাই, নতুন বাড়ীঘর চাই।

এসব করতে টাকা লাগবে ঠিকই। কিন্তু সে-টাকার পরিমাণ কোলকাতার সংস্কার বা নতুন নগরী স্থাপন করবার খরচের তুলনায় অনেক কম। কোলকাতার উন্নতির জন্য ৭১-৮১-র দশকে যে টাকা খরচ করা হবে, তার পরিমাণ মাথাপিছু দেড় হাজার টাকার কম নয়। দুর্গাপুর তৈরি করতে খরচ হয়েছিল মাথাপিছু তিন হাজার টাকা। এখনকার দামে নতুন করে আরেকটা দুর্গাপুর তৈরি করতে দ্বিগুণের চাইতেও বেশি টাকা লাগবে। অথচ, কোলকাতার উন্নতিতে যে টাকা লাগছে, তার এক-তৃতীয়াংশ টাকায় মফঃস্বলের অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটি শহরকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা যায় যাতে শহরগুলি আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের সুষ্ঠু কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

একথা বলার অর্থ এ নয় যে, কোলকাতার উন্নতির কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে হবে। রাজ্যের আর্থিক জীবনে কোলকাতার একটা ভূমিকা থাকবেই। প্রশ্ন হল, সে-ভূমিকার রূপটি কেমন হবে। এখনও পর্যন্ত এই মহানগরী গ্রাম-বাংলার শোষক ভিন্ন আর কিছু নয়। একদিন তার জন্ম হয়েছিল বাংলার আর্থিক কাঠামোর ধ্বংসের শ্মশান-ভূমিতে দাঁড়িয়ে। আজও তার রাজকীয় রশ্মি গ্রাম-বাংলাকে শুধু তাপ দেয়, আলো দেয় না। গ্রামীণ অর্থ-

নীতির পুনর্জীবনের জন্য তার এই চিরাচরিত কলোনিয়াল রূপটি পাল্টানো প্রয়োজন। মফঃস্বল শহরগুলির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে ধীরে ধীরে কোলকাতার জন্য নতুন ভূমিকা তৈরি করতে হবে। অন্য শহর যা দিতে পারবে না, কোলকাতা তা দেবে। যেমন বন্দর, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শাসন-ব্যবস্থার মূল দপ্তর, প্রতিরক্ষা, বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আধুনিকতম চিকিৎসা ব্যবস্থা, বড় গবেষণা কেন্দ্র, জাতীয় নাট্যশালা ইত্যাদি। শিক্ষা বা সংস্কৃতির এমন কতগুলি দিক থাকে যার প্রসার কোলকাতার মত মহানগরীতেই সম্ভব। তেমনি শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি বা শাসনব্যবস্থার এমন কিছু কাজ আছে যার জন্য কোলকাতাকে প্রয়োজন হবে। কিন্তু নগরাঞ্চলের বাকি কাজগুলি ভাগ করে ছড়িয়ে দিতে হবে মফঃস্বলের শতাধিক ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে। নাগরিক এসব কাজের আবার লক্ষ্য থাকবে হাজার হাজার গ্রামের প্রয়োজনের দিকে। এভাবেই গ্রাম, ছোট ও মাঝারি শহর এবং কোলকাতা মহানগরীর মধ্যে একটা সুষম সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। এসম্পর্ক যদি গড়ে তোলা যায়, তবেই কোলকাতার জনপ্লাবনের কলঙ্ক ঘুচবে।

কাজটা সহজ নয়। মহারাষ্ট্র সরকারের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বোম্বাই শহরের বাইরে শিল্পগুলিকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নাসিক বা পুণের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, যেমন আমাদের দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চল। তবে সহজ না হলেও কাজটা অসম্ভব নয়। আর, বৃহদাকার নগরীর নৈরাজ্য রোধ করতে হলে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে জোয়ার আনতে গেলে এই কঠিন কাজটা সমাধা করতেই হবে।

"কোলকাতা তখন বনগা থেকে আসানসোল পর্যন্ত ছড়ানো।" একবিংশ শতাব্দীর কোলকাতাকে এভাবেই বাংলার একজন আধুনিক উপন্যাসিক কল্পনা করেছেন। শুধু কল্পনার ফানুস নয়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও কয়েকজনের ধারণা কোলকাতাকে ক্রমশ 'মেগালোপলিস' হয়ে উঠবে। এই মেগা-নগরীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা রোধ করার কাজ আজ এবং এখনই আরম্ভ করতে হবে।

শীতের রাত। জ্যোৎস্না থিকথিক করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বসন্ত এসে গেছে।

তার মানে কি। হাওয়া আছে বলে কুয়াশা ধোঁয়াশা জমতে পারে নি। অথচ শহরতলি। বস্তি কলকারখানায় গিজগিজ চারদিক। ফুরফুরে বাতাস না থাকলে জ্যোৎস্নার বারোটাই বাজিয়ে দিত।

হুঁ, হাওয়া নেই। তাই চাঁদের আলোর এই চাকচিক্য। ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট নালা-নর্দমা ছবির মতন লাগছে।

তা বলে কি কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধ নাকে লাগে না। খুব লাগে। এদিক ওদিক খাটাল আছে কয়েক গন্ডা। গোবর গো-মূত্রের কটকটে গন্ধ টের পাওয়া যায়।

তবু ভাল লাগে।

রাস্তার দুধারে মস্ত-মস্ত দেবদারু গাছ মাথা উঁচু করে সৈন্যসামন্তের মতন দাঁড়িয়ে। শহরতলীর রাত বারোটায় নির্জন রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। আর কি ... করার কোনো কারণ নেই ... আছে। ... পাতায় ঢাকা মাথা নেড়ে দেবদারু গাছেরা সৈনিকদারের মতন থেকে থেকে জানান দেয়।

নির্জন তো হবেই। আজ ছুটির দিন। ঈদের ছুটি। কলকারখানার কাজ বন্ধ। তার ওপর সন্ধ্যার পর থেকে কন-কনে হাওয়া। বস্তির মানুষ খেয়েদেয়ে কখন কাঁথা কম্বলের তলায়। বাইরে একটা মানুষ চোখে পড়ে না। দু একটা বেও-য়ারিশ কুত্তা এপাড়া থেকে ওপাড়ায় যাবার সময় রাস্তাটা পার হয় শুধু। ওরাও শব্দটুকু করে না। আর চোখে পড়ে একটি দুটি বেড়াল। যেন কোন গেরস্থ বাড়ির মাছের কাঁটা গিলে এসে এখন ফাঁকায় কাঁচা ঘাসপাতা খেয়ে বমি করতে বেরি-য়েছে। গলায় কাঁটা আটকে খক খক কাশছে না যদিও। গরগর শব্দ করছে।

আর মাঝে মাঝে শেয়াল ছুটছে হাঁস মুরগি চুরি করতে। জোটের ওপর চরাচরের দৃশ্যটা সুন্দর। কালো পিচ ঢালা লম্বা রাস্তা শহরতলির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ফিতের মতন দূর গাঁ গঞ্জের দিকে চলে গেছে। দুধারে দেবদারু পাতা হাওয়ায় কাঁপছে ঝিলমিল করছে। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো মাটিতে পড়ে নানা-রকম নকশা কারুকাজ তৈরী করছে। আর কুকুর বেড়াল যখন রাস্তা পার হয় এইসব ছায়া ও জ্যোৎস্নার ছাপ তাদের গায়ে পড়ে সুন্দর দেখায়। যে জন্য জগতটা এখন অন্যরকম মনে হতে পারে।

এমনিও অবশ্য জগতটা অন্যরকম হয়ে গেছে। কেবল রিকসার ঠুনঠুন ও গাছের পাতার সরসর ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

তাই যেন রিকসায় বসা বাবুটি জড়ানো খুশির গলায় রিকসাওয়ালার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কইছে। বাবুর গায়ের দামী শালের আঁচল কাঁধের ওপর দিয়ে নিশানের মতন পতপত করছে। বাবুর দু হাতের আঙুলে নানা সাইজের নানা রঙের পাথরের আংটি। জ্যোৎস্না লেগে কোনোটা বেগুনি ফুলের মতন দেখাচ্ছে। কোনটা টুকটুকে লাল ডালিম দানা হয়ে জ্বলছে। একটা আংটি থেকে জোনাকির আলোর মতন রুপালি সবুজ দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। জ্যোৎস্না লেগে বাবুর পায়ের জুতো চক-চক করছে কম ...

স্যুটবুট না পরে ধুতি গরম পাঞ্জাবি ও তার ওপর কাশ্মিরী শাল চাপিয়ে জামাইবাবুটি সেজে কেন বাবু আজ বেরিয়েছে রিকসাওয়ালার মাথায় আসছে না।

তা যাই করুক। বাবু তার রিকসায় চেপেছে এটাই বড় কথা।

আর একটু হলে ফসকে যাচ্ছিল। জগা যেমন হাঁ হাঁ করে দামী সওয়ার পাকড়াও করতে ছুটে এসেছিল। নিদানও কম যাচ্ছিল কি। হাসিমের রিকসার সামনে বাবু এসে পয়লা দাঁড়ায়। দাঁড়ালে হবে কি। গাঁজা টানলে হাসিম রাজা বাদশা বনে যায়। পয়সা-কড়ি রোজগারের দিকে মন থাকে না। রিকসার গদীতে পিঠ ঠেকিয়ে আধশোয়া হয়ে ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে গাড়ির পাটাতনের ওপর আঙুল ঠুকে সে গান গাইছিল। হাসিম যে এই সময় তার গাড়িতে সওয়ার তুলবে না সবাই জানত। জেগে আছে। বাবুকে দেখে সে মাথা নাড়তেই পিছনের সারির জগা, তারপর নিদান ছুটে আসে। 'আসেন—বাবু আসেন! নয়া রিকসা।' ওরা খুব ডাকাডাক করছিল।

কিন্তু বাবুরা নিয়মকানুন মেনে চলে। হাসিমের রিকসা পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে জগা ও নিদানের ডাকাডাক কানে না তুলে বাবু হাসিমের রিকসার পিছনেই যে রিকসা দাঁড়িয়ে—সরাসরি তাতে চেপে বসে। নিদান ও জগার তখন কী রাগ। মুখে কি আর তা প্রকাশ করছিল। বোঝা গেছে তাদের কাশির শব্দে। নানারকম শব্দ করে দুজনে কাশছিল। গলা খাকার দিচ্ছিল।

তা রাগ হবার কথাই দুজনের। হাসিম ইচ্ছে করে সওয়ার ছেড়ে দিলে। তারপর যে খুশি সওয়ার ধরতে পারে। এখানকার রিকসার এই নিয়ম। তা কিনা এমন দামী ধাড়ি আংটি পরা গায়ে শাল চাপান এক বাহারের বাবু।

বাবুও যে তখন হাসিমের মতন ঘোরে ছিল। বাবুর টলোমলো অবস্থা দেখে রিকসাওয়ালারা বুঝতে পারে। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে বাবু ট্যাকসি স্ট্যান্ডের দিকেই আগে যায়। দুখানা মোটে ট্যাকসি ছিল আজ স্ট্যান্ডে। দুখানার একখানা বাবু ধরতে পারল না। তার আগেই দুই বাবু ট্যাকসি দুটো ধরে ফেলে। এক বাবুর সঙ্গে একটি জেনানা ছিল। আর এক বাবুর সঙ্গে জেনানা ছাড়াও তিন চারটে বাচ্চাকাচ্চা ছিল।

এই বাবু একলা। ট্যাকসি না পেয়ে শেষটায় রিকসার কাছে আসে। বাড়ি ফিরতে হবে তো। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা তখন। আরও বেশি। ভয়ানক বড় শীতের ছবি ছিল। সাড়ে এগারোটায় শো ভাঙে। তার পরেও পনেরো কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে। তার মানে এখন বারোটা বাজবে।

'তুই বোসপাড়া চিনিস তো?'

হ্যাঁ বাবু। বোসপাড়া হালদারপাড়া, কাজীপাড়া—সব আমার চেনা—আমি কি নতুন রিকসা টানছি এই তল্লাটে।'

'মাঝেসাঝে দরকার হলে আমি ট্যাকসিতেই চলি। আমার নিজের গাড়ি আছে। বুইক।' বাবু জড়ান গলায় বলল, 'অনেকদিন পর আজ রিকসায় চাপছি—হি-হি।' বাবু হাসে।

'গাড়ি কোথায়?' রিকসাওয়ালা খুব একটা অবাক হয় না।

'সারাই করতে গ্যারেজে গেছে। সেদিন অ্যাকসিডেন্ট করেছিলাম। নিজেই ড্রাইভ করি কিনা। আমার বিশেষ কিছু হয়নি। ডান হাঁটুতে সামান্য চোট লাগল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে একটা গাছের সঙ্গে গাড়িটা জোর ঠোকা লাগল। ইঞ্জিনটা জখম হয়েছে।'

মাল টেনে গাড়ি চালালে গাছের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবেই। রিকসাওয়ালা মনে মনে বলল।

'বুঝলি', বাবু আবার বলল, 'চৌদ্দ বছর পর রিকসায় চাপলাম। তোদের রিকসাওয়ালাদের দেখলে আমার খুব দুঃখ হয়, কান্না পায়।'

আহা! রিকসাওয়ালা মনে মনে বলল, মুখে মুখে তোমরা বাবুরা অনেক দুঃখ কর। তারপর এক টাকার জায়গায় পাঁচসিকে ভাড়া চাইলেই বাবুদের চোখ লাল। রিকসাওয়ালাকে ধরে মারতে আস।

'বুঝলি রিকসাওয়ালা — গরীবের দুঃখ আমার একদম সহ্য হয় না—তোদের অবস্থা দেখে আমার বুকের ছাতি ফেটে যায়। আমার প্রাণটা যে তখন কেমন করে না।'

চুপ কর চুপ কর। রিকসাওয়ালার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল। তোমার এই সখের কান্না শুনলে হাসি পায়। কত টাকা রোজ মাল খেয়ে ওড়াও বাবু। আজ তো তোমার একেবারে বেসামাল অবস্থা। তোমাকে দেখেই নিদান ও জগা টের পেয়েছে। হাসিমের কথা আলাদা। গাঁজা টেনে বোম। আজ তার রুজিরোজগারের দরকার নেই। কিন্তু আমাদের চোখকান সজাগ। তুমি বাবু প্রাণভরে মাল টেনে গাড়ি নিয়ে সিনেমা দেখতে আস। যেদিন গাড়ি থাকে না ট্যাকসি। আমরা রিকসাওয়ালারা তোমাকে দেখি আর হায় আফশোস করি। বলতে হবে আজ আমার জোর বরাত। নিশুতি রাতে তোমায় নিয়ে মোদকপাড়ায় খালপোলের কাছে চলে এলাম।

'এটা কি মোদকপাড়া?'

'না না এটা নন্দীপাড়া।' বলে রিকসাওয়ালা চুপ করে রিকসা নিয়ে পোলের ওপর ওঠে। ঠুং ঠুং শব্দ হয়।

'হুঁ, নন্দীপাড়া, ঠিক বলেছিস।' আধবোজা চোখে বাবু ঘাড় দোলায়। নন্দীপাড়ায় নতুন বাজার হয়ে কি সুবিধে না হয়েছে। গাড়ি নিয়ে চোঁ করে খাল পার হতে আর কোনো কষ্টই রইল না। কি বলিস!'

'হুঁ, হুঁ,' ঘাড় নেড়ে রিকসাওয়ালা মনে মনে হাসল। মালের দৌলতে মোদকপাড়া আর নন্দীপাড়া বড়বাবুর চোখে এক হয়ে গেছে। নন্দীপাড়ায় কবে খাল ছিল গো বড়বাবু।'

'ঐ যে রিকসাওয়ালা!' বাবু আঙুল তুলে দেখায়। 'হালদারপাড়ার সেনচক্রবর্তীদের ফ্লাওয়ার মিলের চিমনি দেখা যায়।'

'তাই তো।' রিকসাওয়ালা মহানন্দে ঘাড় দোলায়। কাজীরঘাটের তাল গাছ দুটো সেনচক্রোবর্তীদের ময়দা কলের চিমনি হয়ে গেছে। তা না হলে আর মাতাল।

'আজ আমি একলা। বুঝলি রিকসাওয়ালা।' বাবু বলল 'অন্যদিন আমার সঙ্গে জেনানা থাকে।'

হুঁ, তা থাকে। রিকসাওয়ালা মনে মনে বলল, সুন্দর মুখের একটি জেনানা তোমার সঙ্গে থাকে। আজ তুমি একা বলেই তো আমার সুবিধে

বাবু হো-হো করে হাসল।

'লজ্জা! লজ্জা ধুয়ে জল খাবি—মায়ের পেট থেকে ন্যাংটো এসেছিলি না? মরে গেলে যখন শ্মশানে পোড়াবে তখন আবার ন্যাংটো ছাই সে।'

রিকসাওয়ালা কথা বলে না। মুখটা ঘুরিয়ে রাখে।

'যাক এক হিসেবে ভালই হল। আমার উদোম দেহখানা দেখে তোর নেশাটা কাটল।' বাবু আর হাসে না মাটি থেকে তুলে নিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে। শালটা গায়ে জড়ায়। বিয়াল্লিশ টাকা দামের জুতোর মধ্যে ধীরে-সুস্থে পা গলায়।

এবার রিকসাওয়ালা ঘাড় ফেরাল।

'নাও, এখন গাড়িতে উঠে বোসো। আর এই নাও তোমার ঘড়ি আংটি।'

'অ্যাঁ!' বাবুর মুখে খুশি ধরে না। 'কি রে বেটা—তুই যে আমার তাজ্জব বানিয়ে ছাড়াচিস।' রিকসাওয়ালার হাত থেকে বাবু ঘড়ি আংটি তুলে নেয়। 'এই ছোরা ধরেছিলি—এই এখন একেবারে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। ব্যাপারখানা কি!'

শ্মশানের গা ঘেঁষে আসসাওড়ার ঝোঁপের মাথায় জ্যোৎস্না চিকচিক করে। রিকসাওয়ালা চুপ করে সেদিকে চেয়ে থাকে।

'নে—একটা আংটি অন্তত রাখ।' যেন নিজের মনে বাবু চোখ টিপল, বলল, 'আমি আদর করে দিচ্ছি, নিয়ে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কর।'

বলে বাবু হাতে ঘড়ি বেঁধে নেয়। একটা একটা করে আংটিগুলি আঙুলে ঢোকায়।

'থাক বাবু, আমার আংটির দরকার নেই।' রিকসাওয়ালা মাথা নাড়ল। 'তোমার বাড়ি পৌঁছে দেই। আমার চা ডিমের বড়া

খাইয়ে দিও।' বলে ঝুপ করে হাতের পিঠ দিয়ে সে চোখ মুছল।

'আ মলো! তুই যে একেবারে নাটক শুরু করে দিলি।' বাবু এবার হৈ-হৈ করে উঠল। 'আজ আমার ছেলে হয়েছে। কত আহ্লাদের দিন। কেমন একখানা অসুপিশ্যাস্ ডে। আর তুই কিনা চোখের পানি ফেলছিস—কি হয়েছে তোর শুনি?'

রিকসাওয়ালা একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল।

'বাবু, ছেলে হয়ে তোমার এত আহ্লাদ আর ঐ ছেলে হতে গিয়ে আমার খোকার মা মরে গেল—কথাটা মনে হলে এখনো বুকটা কাঁপে।'

'তাই নাকি!' তালুর সংগে জিভ ঠেকিয়ে বাবু চুকচুক শব্দ করল। 'ভারি আফসোফের কথা তো।'

'হ্যাঁ বাবু—এই কাঁটাপুকুরের শ্মশানে এনে বউকে পুড়িয়েছিলাম।' রিকসাওয়ালা আবার চোখ মুছল।

'তবে তো খুব ভাল জায়গায়ই আমার টেনে এনেছিলি খুন করতে।' বাবু খিকখিক হাসল। 'এখানে এলে সব বেটার মনে বৈরাগ্য আসে তুই কি জানতিস না—নে এখন গাড়ি চালা। অনেক রাত হল।'

রিকসাওয়ালা এবার উল্টো পথে রিকসা ঘুরিয়ে টানে। ঠুন ঠুন শব্দ হয়।

'আসল কথা কি জানিস—'

বাবু গদীর পিঠে আরাম করে পিঠ এলিয়ে দেয়। 'তোরা রিকসাওয়ালারা বেজায় বোকা। এই জন্যই তোদের কিছু হল না। সারাজীবন মানুষ টেনে টেনে মরলি।'

'হ্যাঁ, বাবু আমরা বেকুব।'

'বেকুব নয়তো কি!' বাবু ভেংচি কাটল। 'অমন নিরিবিলি শ্মশানমশান জায়গা—আমার ঘড়ি আংটি জামাকাপড় সাল জুতো কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে আমায় কেটে রেখে দিলেও কেউ টের পেত না—আর তুম করে কিনা তোর মরা বৌয়ের কথা মনে পড়ে গেল—আরে মানুষ তো মরেই—আমি মরা তুই মরবি—চিরকাল কে বেঁচে থাকে।'

'হ্যাঁ, বাবু মানুষ মরে।'

'তবে আর কি।' বাবু বোঝাল, 'আসলে তোরা রিকসাওয়ালারা গরু-ছাগলের মতন। ঐ যে সেদিন রাজাবাজারের রাস্তায় টাকার থলে কুড়িয়ে পেল তোদের এক রিকসা-ওয়ালা। আর তক্ষনি বেটা ছুটল থলেশুদ্ধ টাকাটা জমা দিতে থানায়। বেকুব নয়?'

সরু রাস্তা ছেড়ে রিকসা বড় রাস্তায় ওঠে। কনকনে হাওয়া। বাবু জম্পেশ করে শালটা জড়িয়ে নেয়। ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে রিকসাওয়ালা ঠিরঠির কাঁপে। ছুটতে পারে না। রিকসা নিয়ে হেঁটে হেঁটে এগোয়।

'বুঝলি!' বাবু আবার বোঝায়, 'থলের ঐ দু হাজার তনখা পেলে বেটা কদিন পায়ের ওপর পা তুলে মৌজ করে খেত। ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ বাবু।' রিকসাওয়ালা একটা মর্মভেদী নিশ্বাস ছাড়ল। 'কিন্তু এখন আমি টাকাকড়ি ভাবছি না—ভাবি আমার মন্দ নসিব।'

'ঐ আবার তোর মরা বৌয়ের চিন্তা মাথায় এল।' মুখ দিয়ে বাবু চুকচুক শব্দ করল।

'না বাবু—ভাবি ঐ হারামজাদা ছেলের কথা। তোকে বিয়োতে গিয়ে আমার বৌ চোখ বুজল। তুই এখন পোস্টাপিসের পিওন। মাস গেলে তো কড়কড়ে মাইনে। বাপকে দেখিস না। বৌ নিয়ে মজা করে খাস। বাপ পৌষের রাতে রিকসা টানে।'

'অ, এই দুঃখ!' বাবু হি-হি করে হাসল। 'আরে এটাই জগতের নিয়ম। ছেলে হয়েছে বলে আজ আমি আহ্লাদে নাচি। বড় হয়ে ঐ সোনাচাঁদ ছেলে পিপে পিপে টানবে—কিছু বলতে গেলে জুতোপেটা করে আমায় বাড়ি থেকে তাড়াবে। ঠিক কিনা!'

'কিন্তু ধম্ম বলে একটা বাঁকা আছে বাবু—'

'ধুত্তুরি ধম্ম—ধম্ম ধুয়ে জল খাবি—দ্যাখ দ্যাখ একটা ট্যাকসি যায়—হেই ট্যাকসি।' দু হাত উঁচিয়ে বাবু চেঁচায়। তারপর ঝুপ করে রিকসা থেকে নেমে ছুটতে থাকে; ট্যাকসি দাঁড়াল। বাবুকে তুলে নিয়ে তখনি আবার ছুটে চলল।

প্রথমটা বোকা হয়ে গিয়ে হাঁ করে হাওয়া গাড়ির পিছনের লাল আলোর ফুটকিটা দেখল ঘেনু। বাবু কি ভাড়া দিয়েছে। রিকসা ভাড়া দিতে বাবু ভুলে গেছে। এত দুঃখের মধ্যেও ঐ ফুটকি আলোর মতন ঘেনুর শুকনো পুরু ঠোঁটের মাঝখানে একটা হাসি উঁকি দেয়। কিন্তু উঁকি দিয়েই থেমে থাকে না। হাসিটা বাড়তে থাকে, ক্রমে বড় হয়ে হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাবুর মতন খিকখিক শব্দ করে সে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে এমন হয়—তার পেটে খিল ধরে যায়। যে জন্য রিকসা ছেড়ে দিয়ে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। তবু হাসির দমক কমে না। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ঘেনু। হেসে হেসে তার চোখে জল এসে গেল। কে বুঝতে পারল বাবুর তখনকার মূর্তিটা মনে পড়ে তার মধ্যে এই হাসির ভূমিকম্প। তাই এবার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হাসিটা রুখতে চেষ্টা করল। আকাশ দেখল। শীতের দুধপুলির মতন চাঁদটা ঝুলছে!

মনে মনে সে বলল, ছেলে হয়েছে যখন বেঁচে থাক। খোকা কোলে নিয়ে গিন্নীমা ভালয় ভালয় হাসপাতাল থেকে ফিরে আসুক। আমরা রিকসাওয়ালারা বার বার ঠকে গিয়েও বাবুদের ভালটাই দেখি—ইচ্ছটা চাই।

কুমারীর সব দুঃখ ঢেকে রেখেছিল। কুসুমকুমারীর সে সুখের দিন ফিরে না আসুক ভ্রমর তার কাছে ফিরে আসছে, এই পরম সুখ, আনন্দ, শান্তি কুসুমকুমারী নিজে ছাড়া আর কেই বা বুঝবে?

ঘাট থেকে ফিরেছে কুসুমকুমারী, সূর্য ওঠার তখনও বাকী। শরীরে না দিলেও ভ্রমর আসার আনন্দে আজ আর কোন কষ্টই যেন কষ্ট না। টুকটাক হাতের পাঁচ এটা-ওটা সারতে সারতে ক্রমে সূর্য উঠে বেলা বেড়েছে খানিক। উঠোন নিকোন সেরে দাওয়ায় উঠে মাজা ঝারতে ঝারতে চেঁচিয়ে বেড়ার ওপাশে আস্তির মাকে খবরটা দিল শেষটায়। যেন এত বড় খবরটা চেপে রাখার জন্যে যদি অনুযোগ করে? না করলেও না বলে সে নিজেও থাকতে পারছিল না। সংসারে কে কবে সুখ-দুঃখের কথা কাউকে না বলে থাকতে পেরেছে? পারা যায়? যায় না বলেই তো মুখ ঝামটা খাবে জেনেও কালিন্দীকে সে না বলে পারল না।

'শুনিছস রে কালিন্দী বর্জাত পারিস আজ কেডা আসপে?'

কালিন্দী উনুনের ঝিকে মাটি লেপ্‌ছিল। খানিক ঝাঁঝিয়ে বলল 'জানিনে, ক্যান?'

'আজ আমার নাতনীডা আসপেরে, তোমরা।'

'কে বললে?'

'ময়জানই তো বললে।'

গ্রাহক করা হচ্ছে

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সমগ্র রচনা ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১ম ও ২য় খণ্ড এখন পাওয়া যাচ্ছে। দাম প্রতি খণ্ড ২০ টাকা। গ্রাহকরা পাবেন প্রতি খণ্ড ১২ টাকায়। গ্রাহক ভুক্তি ৬ টাকা

গ্রন্থমেলা এ-১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

'তা সে মুখপুড়ি আবার গরীতি এ পুরীতে আসপে ক্যান?'

কুসুমকুমারীর কানের পাশটাগুলোয় যেন সাঁই করে বিদ্যুৎ খেলে গেল। রাগে গলা শুকিয়ে এলেও, কুসুমকুমারীর সেদিন আর সে বয়েস নেই, থাকলে কথার তোড়ে কালিন্দীর হাড়মাসে আগুন লাগিয়ে ছাড়ত। কিন্তু আজ কিছু না বলে চুপ করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। মনে মনে বিড়বিড় করল শুধু 'অরা তো বলবেই' একটা বড় নিঃশ্বাস ছেড়ে দাওয়ায় কুলোর ওপর থেকে গামছা তুলে ঘাড়ে, বুকের ঘাম মুছল।

আকাশে মেঘটা সব সময় থাকে না। মেঘ কেটে এক এক সময় রোদ এসে কুসুমকুমারীর দাওয়ায় ফালি হয়ে শুয়ে থাকে। কুসুমকুমারী সেখানে গেল বছরকার আমের আচারের বয়াম শুকতে দেয়। 'নাতনি তোমরাডা আচার ভাল খায়' তাই সে নিজে হাতে খুব যত্ন করে আচারে পাক দিয়েছিল কালিন্দীর উনোনে। সেই তো কার আচার কে খায়! ফটিকের ছেলে ন্যাপলার সঙ্গে ভ্রমর রাতে ভেগে পড়ল। ভাল ভালবাসা গোড়া থেকেই ছিল। কুসুমকুমারীর জানতে বাকী ছিল না। বাপ-মা মরা মেয়েটাকে নিজে থেকে কষ্ট দিতে চায়নি সে। খুব কম বয়েসে ভ্রমর একবার কঠিন অসুখে সে দুয়োরে যাচ্ছিল আর কি। কুসুমকুমারী গাঁয়ে কারো কাছে হাত পাতে নি। নানান গাছগাছালির ওষুধ তৈরী করে ভ্রমরকে খাইয়ে ভাল করে তুলেছিল। তবু তো দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েই ভ্রমর বড় হয়েছে।

'তবু তো ভোমরার সে হবে, শ্বশুরির ঘর করবে। বড় কথা আজকালকার মেয়ে কি বলতি কি বলে বসপে' কুসুমকুমারীর ভয় হয়। এ নিয়ে কোন দিন কিছু বলেনি ভ্রমরকে। তবে ন্যাপলার সঙ্গে মেলামেশায় যে সে সুখ পায় কুসুমকুমারী তা ভ্রমরের চেয়েও ঢের ভালো বুঝত। ভালো জমি-জায়গা সম্পত্তির মালিক যে ন্যাপলার বাপ, তা না। তবু সে ঘরে ভ্রমরকে লক্ষ্মীর মতো মানাবে। কুসুমকুমারী এসবও ভেবে রেখেছিল।

ভ্রমর সকাল সন্ধ্যে ছ'বাড়ী ঠিকে কাজ করত রেল বাবুদের কোয়ার্টারে। দুপুরের ভাত দু'জনের ওজন ভ্রমর বাবুদের কোয়ার্টার থেকেই নিয়ে আসত। মাঝে মধ্যে ঠাকমার জন্যে ভ্রমর দুধ যোগাড় করে আনত। একটু মিষ্টান্ন হলে দুজনই ভাল খায়।

গেল শীতে ঘাট পেরিয়ে ভ্রমর ন্যাপলার সঙ্গে ওপারে কোদালে গাঁয়ে মেলায় গিয়েছিল। ঠাকমার জন্যে একটা ভাল থানকাপড়, আর চাদর ন্যাপলাই কিনে ভ্রমরের হাতে দিয়েছিল। এসব কর্তব্যজ্ঞান ন্যাপলার আছে বলেই, ন্যাপলাকে নিয়ে বুকের মধ্যে একটা মস্ত গর্বকে পুষে রাখে ভ্রমর। সহজ সরল ন্যাপলার শহরে একটা গমকলে চাকরী হয়েছে। রোজ ঘাট পেরিয়ে চাকরীতে যায়। ভ্রমর তখন বকসীদের কাছ থেকে সকালের পাওনা শুকনো জলখাবার, কাগজে মুড়ে দৌড়ে গিয়ে ন্যাপলার হাতে গুজে দেয়। কুসুমকুমারীর কানে সবই আসে। দিলেও নিজেদের খাওয়ার কষ্ট ছিল না। শুধু ভয় ছিল না। শুধু ভয় ছিল, ভ্রমরের ভরা ঘাটের মত উপচে পরা যৌবনটা নিয়ে। লোকের নজর ভাল না। কেবলই হাড়গিলের মত ভ্রমরের দিকে জিভ মেলে রাখে। ফাঁকতালে ফাউ কিছু ভোগ করতে পারলেই যেন চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার পায়। বড়বাবুর কোয়ার্টারে কাজ ছেড়ে দিল ভ্রমর। বড়বাবু ওর বুকে হাত দিয়েছিল। চারদিক আটকে ফেলেছিল। অসহায় ভ্রমর প্রাণপণ নিজেকে বাঁচিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে। বুকের ভেতরটায় সেদিন কি যে হচ্ছিল, কি রকম যেন উথাল-পাথাল বড় বড় নিঃশ্বাস, আর ঠোঁট কাঁপিয়ে চোখে অনবরত জল বেয়ে পরছিল, ভ্রমর তার কিছুই বুঝতে পারেনি। ন্যাপলাকে জানায় নি। কুসুমকুমারী সে কথাও জানে।

ভ্রমরটা যাওয়ার সময় কিছু বলে গেল না। কখন যে মাঝরাতে উঠে পালালো। ভোরবেলা জেগে উঠে সব জেনে বুঝে বিস্তর কেঁদেছে কুসুমকুমারী। আগে থেকে সামান্য টের পেলেও যে কুসুমকুমারী কিছুতেই এভাবে ভ্রমরকে চলে যেতে দিত না সেটা জেনেই কৌশলে কাজ সেরেছে ভ্রমর। কুসুমকুমারী পরদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত দেখে, পাগলের মত এ গাঁ সে গাঁ খুঁজতে গিয়েই আরও বেশী লোক জানাজানি হয়েছে। তখন এসব ভাববার জ্ঞান ছিল না কুসুমকুমারীর। পরে একই দিনে ন্যাপলাও বেপাত্তা জেনে বুঝল ওরা বিয়ে করবে। তবু দুঃখ যায়নি কুসুমকুমারীর।

তবে আজ সকাল থেকেই বেশ ঝরঝরে খুশী খুশী ভাব তার। কেলো, বুটো, দৌড়ে এসে ঘুঁটে ভেঙ্গে দিলেও গালাগাল করল না। ভ্রমরের আসার আনন্দে আজ যেন কুসুমকুমারী সাত জন্মের শত্রুরকেও এক কথায় ক্ষমা করে দিতে পারে। কালিন্দীর সঙ্গেও তাই কথা বাড়াল না। শুধু কালিন্দী কেন গাঁয়ের সকলেই তো ভ্রমরের কুৎসা রটায়, আড়ালে আবডালে গালাগাল দেয়। তবে

কুসুমকুমারীও মুখ কাড়তে জানে। এক এক সময় ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতে তো দিদিই। ওরে জেনাথিস্ত দশ বে না। তোরা জোরা বে দিতি?' কুসুমকুমারী জেনা চেপে রাখে। কিছু বলতে যায় না। রুস করে না। পাছে কালিন্দী ভাত বন্ধ করে দেয়। এমনি মায়া আছে কালিন্দীর। বেলা কেষ্টোর হাতে করে ভাত পাঠায়। কুসুমকুমারী দাওয়ায় বসে সে ভাত খেলে, কালিন্দীই এঁটো থালা গ্লাস ধুয়ে দেয়।

তবু ভ্রমর এলে ন্যাপলাকে বলে করে দের এখানেই রেখে দেবে দুজনকে! আগের মত আবার ঘাট পেরিয়ে ন্যাপলা গমকালে পারে। ন্যাপলা কি এতে রাজী হবে না? রাজী হবে। আলবৎ হবে। একশোবার হবে। দুপুরে খেতে বসে এসব ভাবতে ভাবতে যখন কুসুমকুমারীর চোখ জলে ভার হয়ে গিয়েছিল, তেমনই বুকের মধ্যিখানে হাজার খুশীর হাওয়া জোরজার দুলে উঠেছিল। 'ভোমরাডা তাল্লি আমারে মনে রাখিসে।'

দুপুরের পরে অস্থিরতা বেড়ে গেল কুসুমকুমারীর। 'ভোমরাডা এখন পর্যন্ত এলো না। তবে কি রমজান ভুল বললো? নাঃ! তা বলতি যাবে কোন্ দুঃখ্যি? পথে দেরী আছে না বেরোতি দেরী করল? ন্যাপলাডা আবার কিছু কিনতি টিনতি বেলা গড়াচ্ছে কিনা কে কেডা?' এইসব হাজার রকম ভাবতে ভাবতে বিকেল গড়িয়ে গেল। দাওয়ায় বিছানো রোদ ছোট হতে হতে কখন উধাও হলো। ভ্রমর তখনও এলো না। হঠাৎ কি কথা মনে পড়তেই কুসুমকুমারীর বুকটা ধড়াস করে উঠেই যেন সহসা শুকিয়ে গেল। আবার চট্ করে বুদ্ধি খেলে গেল কুসুমকুমারীর মাথায়।

দরজায় শেকল তুলে তাড়াতাড়ি ছুটল নেতাই পোদ্দারের দোকানে। ভ্রমরের জন্যে তেঁতুল আচারের বয়েম দুটো বেচে দিয়ে, খাবারের দোকান থেকে দুজনের পেটভরা পুরী তরকারী নিয়ে ফিরল। কুসুমকুমারীর রাতের ভাত কালিন্দী দিলেও ভ্রমর ন্যাপলার জন্যে কোথায় যাবে? এই প্রথম বিয়ের পর ওরা আসছে। ভাল মন্দ খাওয়ানো দূরের কথা, তাও যদি পরের ওপর ভরসা করে সময়মত বিপদে পড়ে? কুসুমকুমারী একটু আগে ভাগেই এসব চিন্তা করে রাখে।

বয়েসের শরীর নিয়ে নেতাই পোদ্দারের দোকানে হেঁটে যেতে, ফিরে আসতে পরো-পুরি সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো। রাস্তায় দু-একবার কুসুমকুমারী ভেবেছে, বাড়ী ফিরে হয়ত দেখবে ভ্রমর আর ন্যাপলা দাওয়ায় বসে। কুসুমকুমারী ফাঁকা দাওয়ার যেখানে মধ্যে থেকেই চাঁদের আলো এসে পড়ে সেখানে নেন্টেদের ঢোস্কা কালো কুকুরটা গাছের ধুলো মেখে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। কুসুমকুমারী 'হেই হেই' আওয়াজ তুলে কুকুর তাড়িয়ে ঘরে গিয়ে সাবধানে খাবার রাখল। তারপর উঠোনে এসে গোবরজল ছিটিয়ে দিল। রোজকার তুলসী গাছের নিচে প্রদীপ জ্বালাল। কালিন্দীর উনোন থেকে ল্যাম্ফোটা জ্বালিয়ে ঘরে উঠল কুসুমকুমারী। মনটা খারাপ হতে লাগল। মাথার মধ্যে হাজার চিন্তা ঢুকে গেল। 'ভোমরাডা এখন পর্যন্ত এলো না!' কুসুমকুমারী ভ্রমরের মরণ কামনা বা সে কষ্ট পাক একথা রাগের মনেও ভাবতে পারে না। শুধু বলে, 'মাইয়ে জাতডাই অ্যাচে বেইমান। সুখ পালি আল্লার নাম ভোলে।'

অনেকটা রাত দাওয়ায় বসে পার করে দিল কুসুমকুমারী। তারপর ঘরে গিয়ে শুলেও ঘুমতে পারল না অনেক চেষ্টা করেও। কেবলই মনে হচ্ছে এই বুঝি ভ্রমর এলো, এই বুঝি এলো। কত দিন দেখে না সে ভ্রমরকে। 'ভোমরার নিকৃথাত বাচ্চা-কাচ্চা অবে। বছর তো ঘুরতি চললো। সময়ডা ঠিকই। বাচ্চা কাচ্চাই অবে। নিকৃথাত তাই অবে।' শুয়ে শুয়ে কুসুমকুমারী খানিক বিড়বিড় করল।

ঘরের উত্তরদিকে বেড়ার মাথায় ঝাঁপ নেই। এখান থেকে শুয়ে আকাশটা খানিক দেখা যায়। কুসুমকুমারী সেদিকে তাকিয়ে। তুলোর মতন মেঘগুলো বয়ে যাচ্ছে, না চাঁদটা বয়ে যাচ্ছে ঠিক পাওয়া মুশকিল। শেষ রাতের দিকে ভ্রমর এলো। কুসুম-কুমারীর চোখ তখন সবে ঘুমে বুজে এসে-ছিল। গলা চিনতে ভুল করেনি সে। তাড়া-হুড়ো করে আলো হাতে দরজা খুলতেই দরজায় কুসুমকুমারী ভ্রমরকে দেখল। অল্প আলোয় ভ্রমরের অবয়বটা বোঝা গেল মাত্র। খুশীতে পাগল হওয়ার মত কুসুমকুমারী বলে উঠল, 'ঘরে উঠে আয়, ন্যাপলা আসে নি?' ভ্রমর কিছু না বলে চুপচাপ ঘরে উঠে এল। কুসুমকুমারী আঁচ করল ভ্রমরের মুখটা বিষণ্ণ। তাই 'ঝগড়া করে মরিছিস্ নাকি দেখি' সামান্য রসিকতার মত কথাটা বলে, আলো তুলে ভ্রমরের মুখের সামনে ধরতেই কুসুমকুমারীর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্পে ধ্বসে খেয়ে গেল সব। পায়ের তলার মাটি দু ফাঁক হতে থাকলো। ভ্রমরের সিঁথিতে সিঁদুর নেই।

'তুই বিধবা হইচিস্?'

ভ্রমর ঝাপটে কুসুমকুমারীর মুখ চেপে ধরে বলল 'চেঁচামেচি টাম-ও ন্যাপলা আমারে যে করতি নে যায় নি শুনিরে। বেচতি নে গেছিল। কাউরি জানাতি দিয়েনা, তালি থাকা মুশকিল হবে।'

'থাকা মুশকিল অবে তো তুই মরতি আসলি কি জন্যি?' অসহায় জিজ্ঞাসা কুসুম-কুমারীর।

'রোগে ধরিসে। কেউ আর আমার ঘরে আসতি চায় না। অরাও থাকতি দিলে না' শিশুর মত শব্দ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল ভ্রমর। অপার মমতায় কুসুমকুমারী ওর চামড়ায় মোড়া হাড়পাঁজরার বুকে ভ্রমরকে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল 'চুপ কর চুপ কর কেউ শুনতি পাবে কেউ শুনে ফ্যালবে।' আর নাগাড়ে ভ্রমরের গলায় মুখে চুমু দিতে থাকল।

কাঁদতে কাঁদতে ভ্রমর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। রাত তখনও আছে। কুসুমকুমারী ল্যাম্ফো হাতে বাইরে বেরিয়ে এলো। তার-পর আমবাগানের সরু রাস্তা দিয়ে সোজা হাঁটতে থাকল। আমগাছের মাথায় অসংখ্য জোনাকী যেন একটা তারা জ্বলা রাতের আকাশ তৈরি করেছে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় কুসুমকুমারী হঠাৎ একটা জঙ্গলায় ঢুকে পড়ল। তারপর ল্যাম্ফোর ক্ষীণ আলোতে দু'হাতে হাতড়ে একটা ওষুধী গাছ খুঁজতে থাকল।

বনবিবি উপাখ্যান

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

দেশটাকে যদি মা রূপে কল্পনা করি, তবে দ্বীপগুলি তাঁর শ্রীচরণের ঘুঙুর আর নদীগুলো সেই ঘুঙুর বাঁধার সুতো। একটু নড়ে উঠলেই শব্দ উঠবে ঝুমঝুম ঝুমঝুম। সুতোয় সুতোয় জট পাকিয়ে যাওয়ার মতো নদীতে নদীতে জট। যেন গোলোক ধাঁধা। কোথায় তার শুরু আর কোথায় তার শেষ, কে জানে। একটা ধরে এগিয়ে যাও, বেশ যাচ্ছ, যেতে যেতে যেতে.....এল এক তিন মোহনা, কি চার মোহনা মুখ। দিশেহারা না হয়ে কি উপায় থাকে তখন। কোন দিকটা বাছবে, তিন দিক ছেড়ে দক্ষিণে যাবে? যাও....পাবে সেই প্রকাণ্ড নীল আকাশের নিচে আরো গভীর নীল একখানা সমুদ্র। নাম তার বঙ্গোপসাগর। উত্তরে যাবে? ধান ভাঙা সিঁড়ির দেশ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে তোমার। আর পুবেই যাও কি পশ্চিমেই যাও, ছোট ছোট দ্বীপ, বুকে তার গহীন অরণ্য।

সব ছোট ছোট দ্বীপ: কোনটা আঙুরের মতো গোল, কোনটা শিমের মতো বাঁকা, আবার কোনটা গোলও নয়, বাঁকাও নয়, কাঁকড়ার মতো চারপাশে দাঁড়া ছড়ানো। এমনি ধারা আরো কত। ছোট, বড়, হাজার হাজার, অসংখ্য।

সত্যি সত্যি ঝুমঝুম করে শব্দ হয় দ্বীপগুলির মধ্যে। বাতাস যখন নিথর হয়ে জমে থাকে, শব্দও বন্ধ হয়। আবার যখন সুন্দরী, গরাণ, গেঁও, গর্জনের ডালে পাতায় মাখামাখি করে বাতাস....আহা কী মধুর কী মধুর! শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যাবে, দেখতে দেখতে চোখ যাবে জুড়িয়ে। এমন রূপ বর্ণনা করবে সাধ্য কার।

তাই বলে চন্দনের মতো মোলাম মাটিতে পা দাও, দিলেই বুঝবে, বাস্তব বড় কঠিন হে। কাদায় পা চেপে চেপে হাঁটতে হবে তোমাকে। সাবধান, ভাঙা শামুক কুচিতে পা পড়ে না যেন। আর সামনে একবার তাকিয়ে দেখ, কী দুর্গম ঝোপঝাড়, শুলো আর শেকড়ের কয়েদখানা। প্রাণ তোমার উড়ে যাবে। হয়তো দেখবে, ওঁৎ পেতে আছে কোন বীভৎস [illegible] [illegible]। নয়তো [illegible] অপরূপ [illegible]।

আর দেখ, হেঁতাল, গোল, [illegible] কেলোর ঝোপে ঝোপে সারাক্ষণই [illegible] ঠাসা। যেন সূর্যকে ফাঁকি দিয়ে [illegible] অন্ধকার ওরা লুকিয়ে রেখেছে। [illegible] কি ভর দুপুরে এসেছো, তাই বল। [illegible] যা দেখছ, রাতে দেখবে ঠিক এর বিপরী[illegible] সকালে যা দেখবে, সন্ধ্যায় আবার [illegible] রকম। বহুরূপীর মতো, এখন [illegible] সাজে, আবার একটু পরেই অন্য।

একেবারে সমুদ্র ঘেঁষা যেগ[illegible] সেগুলো এখনো অনেক কাঁচা। [illegible] তলিয়ে যায় জলের নিচে, আবার [illegible] ভেসে ওঠে কাছিমের পিঠের মতো। [illegible] এক জলজ প্রাণী। খানিক পরে নি[illegible] নেয় বাতাসে নাক উঁচিয়ে।

আর সমুদ্র থেকে দূরে দূরে [illegible] গুলো, সেগুলোর কথা আলাদা। [illegible] মজবুত বেশ পোক্ত। হ্যাঁ, এই [illegible] দ্বীপগুলোর দিকেই প্রথম নজর পড়[illegible]

রের সরকারের। প্রথমে তারা মাপ-জোক সেরে নিল দ্বীপগুলির। পরে লট দিয়ে জমা খরচের খাতা বানাল। যাকে বলে, লোট। অমুকের লাট, তমুকের লাট। তা, লটই বলো, আর লাটই বলো, ভেড়ি দিয়ে বেঁধে নদীর দাপট থেকে আলাদা করে রাখা হল দ্বীপ-গুলিকে। যেন প্রকারান্তরে নদীগুলোকে বুঝিয়ে দেওয়া হল, তোমার সর্বনাশা নোনা জল দিয়ে আর সোহাগ করতে হবে না গো, খুব হয়েছে, এবার থামো। এবার থেকে এই বনভূমির মালিকানা আমাদের।

মানুষ এল, নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠল। একদিকে অরণ্যের ঠাসা বুনোট, অন্য দিকে সাপ, বাঘ, কুমীর, কামটের উপদ্রব। সে কি প্রচণ্ড লড়াই। মানুষকে যেন নেশায় পেয়ে বসল। হয় আমরা, না হয় অরণ্য।

তা বাপু, মানুষের সঙ্গে পেরে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা। দ্বীপে দ্বীপে বন-জঙ্গল তছনছ করে ফেলল মানুষ। দুর্ধর্ষ অরণ্যানীকে পুরে ফেলল হাতের মুঠোয়।

এ কাহিনী সেই প্রাণান্তকর শুরুরেই কিছু অংশ। তা, শুরু হয়েছিল অনেক, অনেক বছর আগে। এক কথায় অত দিনকার ইতিহাস বলে ফুরোবে কে! বরং বরাতে ভাটা চারটে জোয়ারের মাপ তুলে হই। বনমাতা বনবিবির বন্দনা গেয়ে শুরু করা যাক সেই উপাখ্যান।

বনের মধ্যে বনবিবির কত্তরে ভাই খেলা
দক্ষিণকে গাছের পানি মধ্যে
গোলের মেলা।

এক

বাংলা সনের তেরশ বাইশ। কার্তিক মাস, আর সেদিন রাত্রি শেষ হতে বিশেষ বাকি ছিল না। প্রচণ্ড কুয়াশা পড়েছে। হাত কয়েক দূরের জিনিসও স্পষ্ট চোখে পড়ে না। নদী বুড়ো রাসুকির বুকের উপর তখন ভাটা। জল নেমে এসেছে বাদাল অবধি। চালু পারের কাদায় লাল কাঁকড়া আর নোনা কুঁচে মাছ ছুটোছুটি করছে। দুপারেই বনভূমি। নদী, কুয়াশা আর অরণ্য সব কিছু মিলে মিশে একাকার। এমন রহস্যময় পরিবেশে বুড়ো রাসুকির বুকের উপর একটা ডিঙি আপন খেয়ালে স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে।

দেখা গেল, গলুই দুটো ঢেকির মতো পাড় দিচ্ছে জলে। দাঁড় নেই, মাঝি নেই; অদ্ভুত এক খেয়ালি ভঙ্গি। কে এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে আসছে কে জানে!

কান পেতে থাকলে শোনা যাচ্ছে, করুণ কাতরানির শব্দ। যন্ত্রণাতেই কেউ যেন গোঙাচ্ছে ঐ নৌকোয়। কেউ যেন কান্নায় ভাসিয়ে আকুতি জানাচ্ছে ঈশ্বরকে, হে ঈশ্বর, আমাকে মুক্তি দাও। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না গো। এবার আমাকে অব্যাহতি দাও।

ডিঙির ভেতর উঁকি দিলে দেখা যাবে সেই হতভাগা মেয়েটিকে। নাম তার গৌরী। দেখা যাবে সারা গায়ে তার মুসুর ডালের মতো ছড়ানো অসংখ্য গুটি দানা। সন্দেহ নেই, মায়ের দয়াতেই আক্রান্ত হয়েছে ও। বিষে ব্যাথায় জর্জর হয়ে এখন কাতরাচ্ছে। একা।

বেচারির এক মাথা চুল, রুক্ষ, অযত্নে জট ধরে গেছে। সারা গায়ের কাপড় বড় এলোমেলো। চোখের মণি কড়ির মতো শাদা, সজল। আহা রে, হতভাগী না হলে কি এমন হয়।

ছইয়ের ভেতর নিভু নিভু একখানা হ্যারিকেন জ্বলছে। তলানির তেলটুকু এখনো শেষ হয়নি বোধ হয়। ডিঙিখানা দোলার তালে তালে হ্যারিকেন খানাও দুলছে। এক একবার আলো এসে ঝাপটে ধরছে মুখ, পরক্ষণেই আবার আঁৎকে উঠে লাফিয়ে সরে যাচ্ছে। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বেশ জল জমে আছে নিচে। দিন কয়েক ধরে নৌকোর উপর দৃষ্টি দেয় নি কেউ। জল ছেঁচবে কে! তলানি জলটা ছলকে ছলকে তাই শব্দ করছে। শব্দ করছে একটা শূন্য কুঁজো। পায়ের কাছে ওটা গড়াগড়ি খাচ্ছে নৌকোর দোলায়।

গৌরী, হ্যাঁ এই মেয়েটারই নাম গৌরী। এই ভাবেই মানুষের আশ্রয় থেকে পরিত্যক্ত হয়ে একা ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে লোপ পেয়ে যাচ্ছে চেতনা। মাঝে মাঝে আবার চেতনা ফিরে পেয়ে ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ও। চেতনা ফিরে পেলেই বুঝতে পারছে, মাথার কাছে কাপড়ের পুঁটলিটা খোয়া যায় নি। হাতা কড়াই ইস্তক মাটির কাঁচা জালাটা অবধি যথাস্থানেই রয়ে গেছে; দুলছে, সমস্ত কিছুই দুলছে। আকাশ বাতাস নদী অরণ্য সমুদ্র সমস্ত কিছুই দুলছে।

এ দুলুনি বুঝি থামবে না আর। বুঝি আর দেশের বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে না ও। দিন দুয়েক আগে যখন ধরা পড়ল অসুখটা, তখনই ওকে ত্যাগ করেছে নিমাই। ওঝা ডাকার নাম করে সেই যে ও ডিঙি থেকে ডাঙায় নামল সেই তার শেষ দেখা। গৌরী কি জানত না, এই সুন্দরবনের নদীপথে কোথায় পাবে ও ওঝা! জানত, কিন্তু বিপদ মানুষকে দিশেহারা করে। বাড়ি থেকে পালাবার মুখেই অল্প অল্প জ্বর শুরু হয়েছিল ওর। তখনো ও বুঝতে পারেনি নদীর বাতাসে একটা রাত পেরুতে না পেরুতেই সারা গায়ে ফুটে বেরুবে কাল বসন্ত। হয়তো এমন বুঝলে নিমাইও ওকে কলকাতা দেখাবার প্রলোভন দেখাত না। কত পরামর্শ, কত উত্তেজনা! মানুষ যে এত স্বার্থপর হতে পারে কিশোরী গৌরীর পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। কতটুকুই বা নিমাইকে ও চেনে! অথচ গোপনে গোপনে সেই নিমাইয়ের সঙ্গেই ও নৌকায় উঠেছিল। কাকপক্ষীও টের পেল না। বেচারী মায়ের চোখে ধুলো দিতে একটুকু কষ্ট হয়নি তখন।

মা। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল গৌরী, মা গো। না জানি একা ঘরে গৌরীর জন্য কাঁদতে কাঁদতে মাও ওর অন্ধ হয়ে গেছে। অথচ কেমন করে যে ও ফিরে যাবে মায়ের কাছে, কে জানে!

নিমাইকে দেখে অমন ভাবে কেন ভুলে গেল গৌরী। নিমাই ওদের গায়েরই ছেলে। না হয় ছেলেবেলা থেকে শহরে শহরেই কাটিয়েছে নিমাই। গ্রামে এলে কলকাতা শহরের গল্প, কলকাতা যেন স্বপ্নের দেশ। স্বপ্নের দেশ কি সত্যি সত্যি হাতছানি দিয়ে ডাকত গৌরীকে! হ্যাঁ, গৌরী মন্ত্র-মুগ্ধের মতো নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকত। রহস্যময় নিমাইই ওকে আচ্ছন্ন করে রাখত সব সময়।

আজ থেকে মাসখানেক আগের কথা। পদ্মপুকুরের ধারে সাপলা তুলতে গিয়ে-ছিল গৌরী, অমন ভাবে একা একা যে নিমাইয়ের মুখোমুখি পড়ে যাবে ও ভাবতে পারে নি। ছুটে পালিয়ে আসতে গিয়েছিল, খপ করে নিমাইই ওর হাত চেপে ধরেছিল, কোথায় পালাচ্ছিস শুনি?

—ধরে, পালাব কেন। চোখ নিচু করে উত্তর দিয়েছিল গৌরী। চোখের দিকে তাকাতে ওর সাহসে কুলোয় নি।

—পালাচ্ছিস না বুঝি! ফের মিথ্যে কথা?

—হাত ছাড় নিমাইদা। কেউ দেখবে। ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল গৌরী।

নিমাই ফিস ফিস করে বলেছিল, এই একটা কথা বলব, শুনবি?

—কি কথা?

বাংলাদেশের সাহিত্য পত্রিকা

দাউদ হায়দার

বছর পনের আগে কলকাতার বই পত্র-পত্রিকা ঢাকায় তথা তৎকালীন পূর্ব পাকি-স্তানে ঠিকমতো পাওয়া যেত। কিন্তু পঁয়ষট্টির পাক ভারতের যুদ্ধের পর থেকেই সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, ওপারে বসে আমরা কিছুই জানতে পারতাম না, এপারে কি হচ্ছে। আমাদের একমাত্র মাধ্যম ছিল রেডিও। রেডিওতে সাহিত্য অনাদৃত, শুধু ছবির গান এবং নাটক শুনি। কিন্তু তাতে মন ভরে না। সাহিত্যের সংবাদ কিছু কিছু পাই বৈকি সংবাদ পাই আরেকটা, অন্য-ভাবে। সীমান্ত পেরিয়ে গোপন পথে দুই একটা পত্রপত্রিকা ঢাকায় পৌঁছয় তাও পড়ি খুব।

শারদীয় সংখ্যাগুলোই সাধারণত এখন দুষ্কর। শারদীয় সিনেমা পত্রিকায় আমরা একসঙ্গে অনেকগুলো গল্প উপন্যাস পেতাম।

পঁয়ষট্টির পরে কলকাতার সাহিত্যক্ষেত্রে কারা কারা নতুন প্রবেশ করলেন আমরা জানতে পারিনি। আর এই গত দশ বছরে কি কি উল্লেখযোগ্য বই বেরুল, তারও হিসেব নেই আমাদের কাছে। হঠাৎ পাওয়া পত্রিকা দেখে ঠিক নির্ণয় করা যায় না, কোন লেখক কতখানি এগিয়ে আছেন।

কিন্তু এক সময় ঢাকায় কলকাতার সব পত্রপত্রিকা বই ঠিকই পাওয়া যেত। ঢাকায় নিয়মিত দেশ, চতুরঙ্গ, নতুন সাহিত্য, পরিচয় ইত্যাদি ছিল বহু পাঠকগণের প্রয়োজন। ঢাকার অনেক লেখক ওইসব পত্রপত্রিকায় লিখে সুনাম অর্জন করে-ছিলেন।

ঢাকায় কলকাতার পত্রপত্রিকা আসা বন্ধ হয়ে গেলে, ঢাকার সাহিত্যিক মহল বেশী নতুন করে অনুভব করলেন, এবার আমাদের কিছু করতে হবে। অবশ্য, তার আগে যে উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকা ছিল না, তা নয়। সমকাল, পূর্বমেঘ, কণ্ঠস্বর, সংলাপ, পূবালী, পরিক্রমা তখনো বর্ত-মান। সংলাপ, সমকাল, পূর্বমেঘ, উত্তরাধিকার পত্রিকাগুলো নতুন সাহিত্য, চতুরঙ্গের অভাব পূরণ করতে চেষ্টা চালাতে থাকে। সমকাল দিয়ে এক নতুন সাহিত্য জগৎ সৃষ্টি হলো। সম্পাদনা করলেন সিকান্দার আবু জাফর। ঠিক চতুরঙ্গের পর্যায়ে না পড়লেও, কোন অংশে কম নয়। সংলাপ প্রথম থেকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এ পত্রিকার সমকাল কিংবা পূর্বমেঘের মতো নতুন সাহিত্যিকদের তেমন আড্ডা নেই, আছে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ভীড়। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন পত্রিকার সম্পাদক। অনেকের ধারণা ছিল বোধহয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ত্রৈমাসিক মুখপত্র।

সমকাল প্রথম থেকেই প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নবীন প্রবীণ লেখকেরা একত্রে জমায়েত হলেন। সিকান্দার আবু জাফর চেষ্টা চালালেন, নতুন সাহিত্যিক তৈরী করতে। ডবল ডিমাই সাইজ। পাঁচ-ছয় ফর্মার মাসিক পত্রিকা। আবু জাফরের নিজের প্রেস। ফলে অনিয়মিত নয়। বিজ্ঞাপন তেমন নেই। তবে অসুবিধা হয় না। লেখকরা পারিশ্রমিক নেন না। বরং নানা দিক থেকে সাহায্য করবার চেষ্টা। সম-কালেই প্রথম 'পাঠকের প্রতিক্রিয়া' নামে একটি পাতা খোলা হোল। পাঠকেরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করলেন। এই সময় রাজশাহী থেকে বেরুল পূর্বমেঘ। পূর্বমেঘ ত্রৈমাসিক। পূর্বমেঘ বেশ কয়েক বছর নিয়মিত বেরিয়েছিল। সম্পাদনা করতেন মুস্তাফা নূরুল ইসলাম এবং জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। পূর্বমেঘ দিয়ে যে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রথম দেখা দিয়েছিল, শেষের দিকে আর তেমন ছিল না। কেননা, বিজ্ঞাপন, ছাপার খরচ, কাগজ ইত্যাদির অভাবে পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত টেকেনি। তবু, বছর পাঁচেক রাজশাহীর পাঠকমহলকে চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল।

সমকাল এবং পূর্বমেঘ চলাকালেই কয়েকজন তরুণ কবি মিলে 'কণ্ঠস্বর' প্রকাশ করলেন। 'কণ্ঠস্বর' শুরুতেই হয়ে উঠলো তরুণদের প্রিয় কাগজ। এরা একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হলেন। কণ্ঠস্বর বেশি-দিন চলে নি। গল্প সংখ্যা, কবিতা সংখ্যা প্রকাশ করবার পরেই হঠাৎ করে ডুব মারে। বাংলাদেশের সব চাইতে দীর্ঘস্থায়ী পত্রিকা সমকাল। পাঁচ পঁয়ষট্টির পর থেকে কখনোই নিয়মিত বের হয়নি। উনসত্তর থেকে একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। উনিশ শ' পঁচাত্তর থেকে আবার এখন নিয়মিত বেরুচ্ছে। সম্পাদনা করছেন হাসান হাফি-জুর রহমান। হাসান হাফিজুর রহমান সম-কালের প্রথম সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তান সরকারের প্রকাশনী সংস্থা থেকে বেরুল 'মাহেনও'। মাহেনও পুরোপুরি সরকারী কাগজ। তবে সাহিত্য পত্রিকা। ডবল ডিমাই সাইজ। ঝকঝকে ছাপা। এতে গল্প কবিতা প্রবন্ধ চিত্রকলার অগ্রাধিকার বেশি। লেখকদের পারিশ্রমিক দেয়া হতো নিয়-মিত। পারিশ্রমিকের হার ছিল লোভনীয়। কিন্তু পত্রিকার যে চরিত্র, তাতে অনেকেই লিখতে আগ্রহী হননি।

কলকাতার 'পরিচয়' ছিল পূর্ব বাংলার লেখকদের কাছে জনপ্রিয় কাগজ। পূর্ব বাংলার লেখকেরা ওরকম একটি পত্রিকা বের করতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু সাফল্য অর্জন করতে পারেননি।

বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' ছিল তরুণ কবিদের আদর্শ।

ঢাকায় প্রথম থেকেই একটি মজার ব্যাপার লক্ষণীয়। যা কলকাতায় নেই। তবে ইদানিং দুই-একটি হচ্ছে। তাও এই গত বছরের রোজার ঈদ থেকে।

পূজোর সময় কলকাতায়, সব ধরনের দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাহিত্য, সিনেমা পত্রিকাগুলো পূজো সংখ্যা বের করেন। উপন্যাসের সংখ্যা বেশী। বোধহয় এই কারণেই অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছিলাম, যখন কলকাতা থেকে ঢাকায়, কলকাতার এই সমস্ত পূজো সংখ্যাগুলো যেত, তখন ঢাকার পত্রপত্রিকা ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করবার তেমন গরজ অনুভব করতেন না। না করার কারণ আছে। কেননা, কলকাতার পত্রিকায় এক-সঙ্গে এতগুলো উপন্যাস গল্প পাচ্ছে। ঢাকায় তখন উল্লেখযোগ্য উপন্যাসিক নেই বললেই চলে। আর বের করলেও পাঠকেরা কিনতে চায় না। কেননা, আমরা ইতি-পূর্বে পশ্চিম বাংলার লেখকদের লেখার সঙ্গে অধিকভাবে পরিচিত। তাদের লেখা ভালো লাগে। নতুন লেখকদের নিয়ে এরকম একটি ঝুঁকি, সম্পাদক কখনোই নিতে চান না। তাছাড়া আরেকটি মজার ব্যাপার লক্ষণীয়। বাঙালী সাধারণ মুসলিম পাঠক-পাঠিকাদের একটি অদ্ভুত ধারণা যে, মুসলিম লেখকরা কখনোই ভালো উপন্যাস লিখতে পারেন না। হিন্দু লেখকরা যা-ই লিখবেন, সবই ভালো। এই কারণে, আমি দেখেছি, এখনো ঢাকায় অনেক লেখক হিন্দু নামে লিখে বই বাজারে ছাড়ছেন। আমি হিন্দু বলতে বোঝাচ্ছি, আমাদের বাঙালী মুসলিম পাঠকদের মানসিকতার কথা। তাদের এ ধরনের ধারণার যথোপযুক্ত সঙ্গত কারণ আছে। কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য মুসলিম লেখকের আবি-র্ভাব ঘটে নি। যা পাঠকদের আনন্দ দেবে। দুই-একজন ছাড়া। যেমন মীর মোশাররফ হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখ। পরে অবশ্য কয়েকজনকে আমরা দেখতে পাই, তাও নামে মাত্র। অবশ্য কবিতায় কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেছিল। শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীতে নয়, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ

পর্যন্ত, হাতের আঙুলে গোনা যায়, এমন দু-একজন ঔপন্যাসিক এসেছেন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, যথার্থ উপন্যাসের শুরু ১৯৫৫-র পর থেকে। ৫৫ থেকে ৬০ পর্যন্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বাজারে বেরিয়েছে।

পাক-ভারত যুদ্ধের পর থেকে ঢাকায় কলকাতার পত্রপত্রিকা পাওয়া যেত না। কিন্তু বই পাওয়া যেত। অবশ্য কলকাতায় ছাপা নয়।

ঢাকায় এক ধরনের চোরা ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারলেন, এখানকার লেখকদের লেখার কদর নেই। বই বের করলেও কেউ কিনতে চায় না। তারা তখন এখানকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত সমস্ত ধরনের উপন্যাসগুলো বেনামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করতে লাগলেন। কোথা থেকে বেরোয়, জানা যায় না। ঠিকানা যা থাকে, অবশ্যই ভুল। প্রথম প্রথম ঢাকার যে কোন পাড়ার নামে প্রকাশনী সংস্থার নাম ছাপা হতো। কিন্তু পরে দেখা গেল, হয়তো সমস্ত বই-ই পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর, করাচী থেকে ছাপা। এই বেনামী ব্যবসার জোরে ঢাকার লেখকেরা প্রচণ্ডভাবে মার খেলেন। প্রকাশকরা বই নিতে চান না। তারা জানেন, বই বের করলে বিক্রী হবে না। শুধু তাই নয়, এক শ্রেণীর গোপন-লেখকেরা আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দুই হাতে পয়সা কামাতে শুরু করলেন। তাঁরা কলকাতার লেখকদের নামে নিজেরা বই লিখে বাজারে ছাড়ছেন। একই বই, দু-তিনজনের নামে। শুধু বইয়ের নাম আর প্রচ্ছদ পাল্টানো হয়েছে।

একাত্তরের পর থেকে এই দাপট কিছুটা কমতে শুরু করল। কিছু কিছু পত্রিকা বই আবার পাওয়া যায়। পুনরায় দেশ, অমৃত আবার বাজার অধিকার করে নিল।

পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের পত্রিকা 'পরিক্রমা'। এই রাইটার্স গিল্ড তৈরী হয়েছিল দুই পাকিস্তানেই।

'পরিক্রমা'র ছিল রমরমা অবস্থা। নিজেদের আলাদা অফিস। সদস্য সংখ্যা একাধিক। সদস্যরা নিয়মিত চাঁদা দেন: প্রতি মাসে পত্রিকা বের হয়। লেখার মান, ছাপা, বিষয়বস্তু, সবই চতুরঙ্গের মতো। আমরা চতুরঙ্গের স্বাদ কিছুটা পাই, কিন্তু সব নয়। পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের পত্রিকা, এই পরিক্রমা কিছুদিনের মধ্যেই বই প্রকাশ করতে শুরু করলেন। পরিক্রমায় পুস্তক সমালোচনার উপরে বেশি জোর দেয়া হয়। কেননা, ঢাকার অন্যান্য পত্রিকাগুলো পুস্তক সমালোচনায় তেমন গুরুত্ব দিত না। একমাত্র সমকাল ছাড়া। পরিক্রমা আটষট্টি পর্যন্ত চলেছিল। পরিক্রমা ছিল ডবল ডিমাই সাইজের পত্রিকা। দাম দেড় টাকা। ছয় থেকে আট ফর্মার পত্রিকা। মনো টাইপে ছাপা।

সমকাল চৌষট্টির শেষের দিকে কবিতা সংখ্যা বের করেন। এতে দুই বাংলার প্রায় দেড়শ জন কবির কবিতা ছিল, পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচশ। সমকালের এই কবিতা সংখ্যা, বাংলাদেশের সাহিত্য পত্রিকা জগতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া এর আগে কখনোই এমন মোটা আকারে কোন পত্রিকা বেরয়নি। সমকাল চলাকালেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের 'কণ্ঠস্বর' বের হয়। কণ্ঠস্বরের জন্ম ছেষট্টিতে। অবশ্য তার আগে কয়েকজন তরুণ কবি মিলে 'স্বাক্ষর' বের করেন। স্বাক্ষর তিন সংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয়নি। পুরো কবিতার কাগজ। অতীতের কৃত্তিবাসের মতো। দুই-একটি কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পেত। 'স্বাক্ষর গোষ্ঠী'ই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ কবিদের প্রথম সাহিত্যগোষ্ঠী। 'স্বাক্ষর' কবিতা পত্রিকা হিসেবে যথেষ্ট হৈ চৈ বাঁধিয়েছিল। কণ্ঠস্বর প্রথম দিকে 'সানন্দবাজের' মতো করতে চেয়েছিল। কিন্তু খরচ বেশি হওয়ায় সে প্ল্যান বাদ দিতে হয়। ডবল ডিমাই সাইজের পত্রিকা। আট ফর্মা। এখানে একেবারে নতুন লেখকদের ভীড়। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ চাচ্ছিলেন, তরুণদের নিয়ে একটি আলাদা সাহিত্য জগৎ তৈরী করতে। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সাফল্য অর্জন করলেন। মোটা কার্টিজে, মনো টাইপে ছাপা। দাম দেড় টাকা। কণ্ঠস্বরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রচ্ছদে ফটোগ্রাফ ব্যবহার। পরে অবশ্য আর হতো না। কণ্ঠস্বর প্রথম ছিল মাসিক। বছর পাঁচেক চলার পর হয়ে গেল ত্রৈমাসিক। ত্রৈমাসিক হবার পর থেকে ডিমাই সাইজ। ফর্মা বেড়ে গেল। ছাপা হলো লাইনো। দাম তিন টাকা। কেননা, তদ্দিনে কাগজ, ছাপা, বাঁধাইয়ের দাম বেড়েছে। কণ্ঠস্বর বছরে একটি করে কবিতা এবং গল্প সংখ্যা বের করতো।

কণ্ঠস্বর জীবিত থাকতেই, ভূঁইয়া ইকবাল বের করলেন 'পূর্বলেখ'। ত্রৈমাসিক কবিতার কাগজ। ডিমাই সাইজ। চার থেকে পাঁচ ফর্মা। তিন সংখ্যা বেরুনোর পর, আর চলেনি। ঢাকায় তথা বাংলাদেশে একমাত্র ২১শে ফেব্রুয়ারীতে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন বেরয়। সবই সংকলন। বেশির ভাগই কবিতার। যেমন কলকাতায় পঁচিশে বৈশাখের প্রভাতে।

২১শে ফেব্রুয়ারীতে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা বেরয়, তা মূলত পাড়ার নানা ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। উঠতি লেখকেরা নিজেরা কিছু বের করেন। সে সব পত্রিকা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীত। এতে কাঁচা লেখার সংখ্যা বেশি। দাম খুব অল্প। বিজ্ঞাপন তেমন নেই।

পাড়ার বাড়ি বাড়ি থেকে চাঁদা তুলে এই সব পত্রিকার জন্ম।

গত চার-পাঁচ বছর হলো, কয়েকটি কাগজ প্রবন্ধের সংকলন বের করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রতিটি পত্রিকার স্থায়িত্ব মাত্র একটি দিনেই। এগুলো প্রভাতফেরীতে বিক্রি হয়।

বাংলাদেশের জন্মের পর, মুক্তধারা প্রকাশনী, ২১শে ফেব্রুয়ারীতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সংকলনের জন্যে পুরস্কার প্রদান করছেন।

ঊনিশ শ সত্তরের ২১শে ফেব্রুয়ারীতেই বেরিয়েছিল 'গণসাহিত্য'। গণসাহিত্যে বাংলাদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা কবি চিত্র-শিল্পী উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছেন। পত্রিকাটি ডিমাই সাইজের। লাইনোতে ছাপা। দাম দু টাকা। এই পত্রিকায় লিখলে কোন অর্থ প্রদান করা হয় না—কেননা, পত্রিকাটি কয়েকজন সাহিত্যকর্মীর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের একমাত্র নাট্য পত্রিকা 'থিয়েটার'। থিয়েটার গত চার বছর ধরে বেরুচ্ছে। এই পত্রিকায় নাটক বিষয়ে প্রবন্ধ, মতামত ও দুটি তিনটি নাটক বেরয়। কাগজটি থিয়েটার গোষ্ঠীর মুখপাত্র। দাম তিন টাকা। ছাপা হয় কার্টিজে। এই ত্রৈমাসিক কাগজে লিখলে কোন পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না—তবে নতুন নাট্যকারদের লেখার প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়া হয়। থিয়েটারের দেখাদেখি ইদানীং কয়েকটি নাট্য-পত্রিকা বেরুচ্ছে। কিন্তু [illegible]

লেখযোগ্য নয়। ছাপা, অঙ্গসজ্জা সব মিলে তেমন দৃষ্টি কাড়ে না। ফলে বেশি দিন টিকতে পারছে না।

পাকিস্তানের আমলে কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, কালির দাম ছিল খুব সামান্য। ষোল পৃষ্ঠার এক ফর্মার ছাপার খরচ ছিল দেড় শ টাকা। এক রিম কার্টিজের দাম ৫০ থেকে ষাট। বাঁধাই ছ আনা থেকে আট আনা। ফলে পত্রিকার দাম তেমন কখনোই বাড়তো না। কিন্তু, বাংলাদেশ হবার পর থেকেই সব কিছুর দাম বেড়ে গেল। এক রিম কার্টিজ হলো তিন শ টাকা। যে কোন প্রেসে এক ফর্মা ছাপা আড়াই শ থেকে তিন শ। বাঁধাই এক টাকা থেকে দেড় টাকা। পত্রিকার দাম গেল বেড়ে। কিন্তু, বিজ্ঞাপনের হার তেমন বাড়লো না।

বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকরা লিটল ম্যাগাজিনের চাইতে বেশি লেখেন দৈনিক সাপ্তাহিকে। ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর রবিবারের সাহিত্য পৃষ্ঠায় কবিতা ছাপা হয়। তার সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধ তো আছেই। এখানকার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পুস্তক সমালোচনার জন্যে একটি আলাদা পৃষ্ঠা করা হয়, এবং তা রবিবাসরীয়-র সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কিন্তু ঢাকার দৈনিক পত্রিকাগুলোর সাহিত্য সাময়িকীতেই পুস্তক সমালোচনা হয়ে থাকে।

ঢাকার বেশ কিছুদিন আগেও সাপ্তাহিক বেরুতো। প্রত্যেক দৈনিকেই সাহিত্য সাময়িকী আছে। এতে কবিতা বিশেষভাবে প্রকাশ করা হয়।

ঢাকার দৈনিক সাহিত্য সাময়িকীগুলো সব ধরনের রচনার জন্যে মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক প্রদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান সময়ে ঢাকা থেকে আরো কিছু পত্রিকা বেরুতো। আমিনুল ইসলাম বেদুর 'সাপ্তাহিক', ডঃ মাহফুজুল ইসলামের ... 'অন্বেষা' বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তবে সাপ্তাহিক ... কালে-ভদ্রে বেরয়। কিন্তু উত্তর ... একেবারেই স্তব্ধ। স্তব্ধ হলো আব্দুল মান্নান সৈয়দের 'শিল্পকলা'। শিল্পকলা আগাগোড়া প্রবন্ধের পত্রিকা। ... পত্রিকায় শিল্প সাহিত্য নিয়ে ... মাত্র আলোচনা। আটটি ... যথারীতি বেরিয়েছিল। কিন্তু, বিজ্ঞাপনের অভাবে আর চলতে পারেনি। শিল্পকলা ডিমাই সাইজের। চার ফর্মা। দাম ... টাকা। রাজশাহী থেকে 'অনিকেত ...' (মহসিন রেজা সম্পাদিত ডবল ডিমাই সাইজ, তিন চার ফর্মা) বগুড়া থেকে ... (ফারুক সিদ্দিকী সম্পাদিত, ... ডিমাই সাইজ) এবং চট্টগ্রাম থেকে অচিরা ... (মোহাম্মদ রফিক, পরে আবুল মোমেন সম্পাদিত, ডিমাই সাইজ), রংপুর থেকে ... (কায়সুল হক সম্পাদিত)। তিনটি ... কবিতা পত্রগুলো কয়েক বছর ... অনিয়মিত ভাবে বেরিয়েছিল। ... থেকে প্রকাশিত 'নিসর্গ' প্রবন্ধের ..., ঘোষণা ছিল [illegible]। কিন্তু

সময়মতো কখনোই বেরয়নি। তবে পত্রিকাটি সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে প্রকাশিত হলো, বাংলা একাডেমী থেকে 'উত্তরাধিকার'। উত্তরাধিকার মাসিক সাহিত্যপত্র। এতে বই আলোচনার প্রাধান্য গোড়া থেকে মাত্রাধিক। ডবল ডিমাই সাইজের পত্রিকা। বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা করে। এতে, একেবারে নবীন কবিরা একটি করে কবিতা লিখলে পঞ্চাশ টাকা পান। আর প্রতিষ্ঠিত, প্রবীণ কবিরা পান দেড়শ থেকে দুশ। তবে কোন কবির কবিতা দুটির বেশি নয়।

পাকিস্তান সরকার দেশের দুই খণ্ডে দুটি ন্যাশনাল বুক সেণ্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মগুলো অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুনিপুণভাবে সম্পাদন করা হতো।
পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাশনাল বুক সেণ্টারের কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্দীন।

বুক সেণ্টার প্রতি সপ্তাহে খোঁজ নেন ঢাকা এবং বাংলাদেশের কোন্ কোন্ অঞ্চল থেকে কি কি বই, পত্রপত্রিকা বেরুচ্ছে। সমস্ত ধরনের বই ও পত্রপত্রিকা দু কপি করে কিনছেন। ভবিষ্যতে যাতে গবেষকদের অসুবিধা না হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখছেন।

বুক সেণ্টার শুধু বই পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করেই চুপ নন, সেই সঙ্গে বইয়ের প্রদর্শনী, বই পড়ার গুরুত্ব প্রচার করা, নতুন বই নিয়ে আলোচনা, প্রকাশনা শিল্প যাতে সুন্দর হয়, তার দিকে প্রকাশকদের আগ্রহী করে তোলা, এবং সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রকাশনার জন্যে পুরস্কার দিয়ে পাঠক ও প্রকাশকদের সচেতন করে তোলা।

বুক সেণ্টারের মাসিক কাগজ 'বই'। ডবল ডিমাই সাইজের পত্রিকা। 'বই' পত্রিকায়, পত্রপত্রিকা ও বইয়ের সমালোচনা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। সেই সঙ্গে আছে বই বিষয়ে প্রবন্ধ। এবং সদ্যপ্রকাশিত বইয়ের খবরাখবর। 'বই'-য়ের আরেকটি প্রশংসনীয় কাজ, যে গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা, এবং সে মাসের শ্রেষ্ঠ বই (তাঁদের বিবেচনায়) থেকে একটি লেখা পুনর্মুদ্রণ করা। 'বই' প্রায় পনের বছর বেরুচ্ছে।

প্রতিটি লেখার জন্যে পারিশ্রমিক উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তানের বুক সেণ্টারের নাম এখন পাল্টে গেছে। নাম হয়েছে, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে আরেকটি ইংরেজি পত্রিকা বেরুচ্ছে। ইংরেজি পত্রিকার উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের বই সম্পর্কে বিদেশী পাঠকদের সচেতন করে তোলা।

বাংলাদেশের তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে পুরনো পত্রিকা 'সওগাত'। সওগাত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বেরুচ্ছে। সওগাত প্রথমে কলকাতা থেকে বেরুতো। সম্পাদক নাসিরউদ্দিন আহমেদ এই পত্রিকা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলেন। সওগাতে একসময় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা লিখতেন। তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যিকদের নিয়ে এই সওগাতে একটি আড্ডা বসতো। এবং সওগাতের দৌলতেই একটি মুসলিম সাহিত্যিক গোষ্ঠীর জন্ম হয়।

সওগাতের আগেই অবশ্য 'মোহাম্মদী' বেরুত। মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি তাঁর দৈনিক আজাদ প্রকাশনীর। 'মোহাম্মদী' বাংলাদেশের জন্মের বছর দুয়েক আগে বন্ধ হয়ে গেছে। মোহাম্মদী আর সওগাতকে ঘিরে এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের নতুন সাহিত্যিক, কবির আবির্ভাব ঘটে।

ঢাকায় মহিলাদের জন্যে দুটি সাপ্তাহিক কাগজ আছে। একটি 'বেগম' আরেকটি 'ললনা'। 'ললনা' এখন আর বেরয় না। কিন্তু 'বেগম' এখনো নিয়মিত বেরুচ্ছে। এই পত্রিকার প্রচার ও বিক্রি প্রায় প্রবাদতুল্য। 'বেগম' বাংলাদেশের নবীনা লেখিকাদের জন্যে একটি আদর্শ সাপ্তাহিক। 'বেগমের' ঈদ সংখ্যা দেখবার মতো। এই সংখ্যায় যাঁরা লিখছেন, তাঁদের ছবি ছাপা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এখন নানারকম পত্রিকা বেরুচ্ছে। সবই প্রায় নিজেদের উদ্যোগে। ফলে বেশিদিন টিকছে না। তার কারণ, বাংলাদেশে কাগজ, ছাপা, কালি, বাঁধাই, খরচ প্রতিদিনই প্রায় বেড়ে যাচ্ছে। দাম বেশি বেশি হচ্ছে। পাঠকরা কিনে উঠতে পারছেন না।

পার্সিপোলিসের পথে

সবিতা ঘোষ

পরদিন সকালে উঠেই পিলুর কাছে চা পরোটা ডিমভাজা খাওয়া। সত্যি আমাদের কপালটা ভাল—না? ওর সঙ্গেই ট্যাক্সি করে বাকী দ্রষ্টব্য স্থানগুলি যতটা পারি দেখে নিতে হবে। রেজা গেল বাজারে ফাটা টায়ারটা সারাতে। প্রোগ্রাম মাফিক আজ দুপুরের মধ্যেই সিরাজের পথে রওনা দেওয়া চাই।

ঘন্টা হিসেবে ট্যাক্সি নেওয়া হল। প্রথমেই কালকের সেই মসজিদ-এ-শাহ গেলাম। প্রার্থনার হলঘরে গম্বুজের নীচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে চতুর্দিকে প্রতিধ্বনী ওঠে। গম্বুজের নীচের গোল গোল খিলানে, আর্চে পল তোলা। খোপ, খোপ কাটা। এই ধরনের কাজ নিশ্চয় পারস্যেরই বৈশিষ্ট্য। আগে কোথাও দেখিনি। ভারী সুন্দর দেখতে। এছাড়া চারদিকের মিনারগুলোর গায়ে, গম্বুজের গায়ের বাইরেটা, ভেতরের দেয়াল, সব চীনে মাটির ওপর চকচকে পাথর কাজ করা। ফুল, লতাপাতার সুন্দর সব নকসা। কাশ্মীরী শালের গায়ে যেমন সূক্ষ্ম কারুকার্য থাকে ঠিক তেমনি। মুসলমান আমলে এসব দিক থেকেই এই শিল্পকলার নমুনা আমাদের দেশে গেছে—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে। মসজিদের বাইরের চত্বরে প্রকাণ্ড তেকোণা পাথরের সূর্যঘড়ি আছে। এ মসজিদও শুরু করা হয়েছিল শাহ্ অব্বাসের সময়ে। পরের সুলতানের আমলে শেষ হয়। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর সৃষ্টি। মসজিদের ছবি তুলেই ক্ষান্ত নেই, পিকচার পোস্ট কার্ডও কেনা হল। টুটুই ফটো তোলে আজকাল। টিংকু চেয়ে-চিন্তে রফা করেছে প্রতি স্পুলের বারোটা শটের দুটো ও তুলবে। সুতরাং ও ওর সিস্সে ঠিক সামলাচ্ছে।

এবার সেই বিখ্যাত বাজারের পাশ দিয়েই মিনার যনবান্—শেকিং মিনারেট দেখতে চললাম। বাজার পার হবার সময় টুটুর আর আমার ইচ্ছে করছিল আর একবার নেমে পড়ে কিছুক্ষণ ঐ বিচিত্র বস্তুসম্ভারের মধ্যে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু সময়াভাব। তাই প্রস্তাবটা তোলা গেল না। বাজার পেরোবার সময় জুলজুল করে তাকিয়ে রইলাম ট্যাক্সির জানলা দিয়ে।

মিনার যনবান, একটি বাগানের মধ্যে ছোট্ট একটি একতলা প্রাসাদ, এই মিনারের নির্মাতার কবরও এই ঘরের মধ্যেই আছে। প্রাসাদের ছাদে উঠে দেখি আরো কিছু লোক এটা দেখতে এসেছে। ছাদের দুধারে দুটি বেঁটে বেঁটে মিনার। সৌধটির গা থেকে মিনার দুটো। খানিকটা ফাঁক করা। নীচের অংশ দুটো অর্থাৎ মিনার দুটোর নীচের অংশদুটো প্রাসাদের সঙ্গে জোড়া। মিনার দুটো বাড়ির গা থেকে উঠে ওপর অংশ দুটো ফাঁক হয়ে গেছে। মিনারের ভেতর সিঁড়ি আছে ওপর পর্যন্ত।

একটা ছেলে সেই সিঁড়িতে চড়ে খুব জোর ধাক্কা দিয়ে মিনারটাকে নড়াতে লাগল। আমরা দেখলাম ইঁটের তৈরী পাকা মিনার ঢক ঢক করে নড়ছে। ওপাশের মিনারটাও ঐ ধাক্কায় দুলছে। আমি তো ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল দেখে তাজ্জব হতে যাচ্ছিলাম। উনি প্রাসাদ আর মি দুটোর মাঝখানের ফাটল দুটো দেখে উঠলেন। সেই দিকে তাকিয়ে হঠাৎ উঠলেন—যাঃ, একদম ধাপ্পাবাজি। খেলা। ঐ রকম ফাঁক থাকলে নড়া নড়বেই। অসম্ভব বিপজ্জনকও অনবরত নড়ালে যে কোন সময়ে
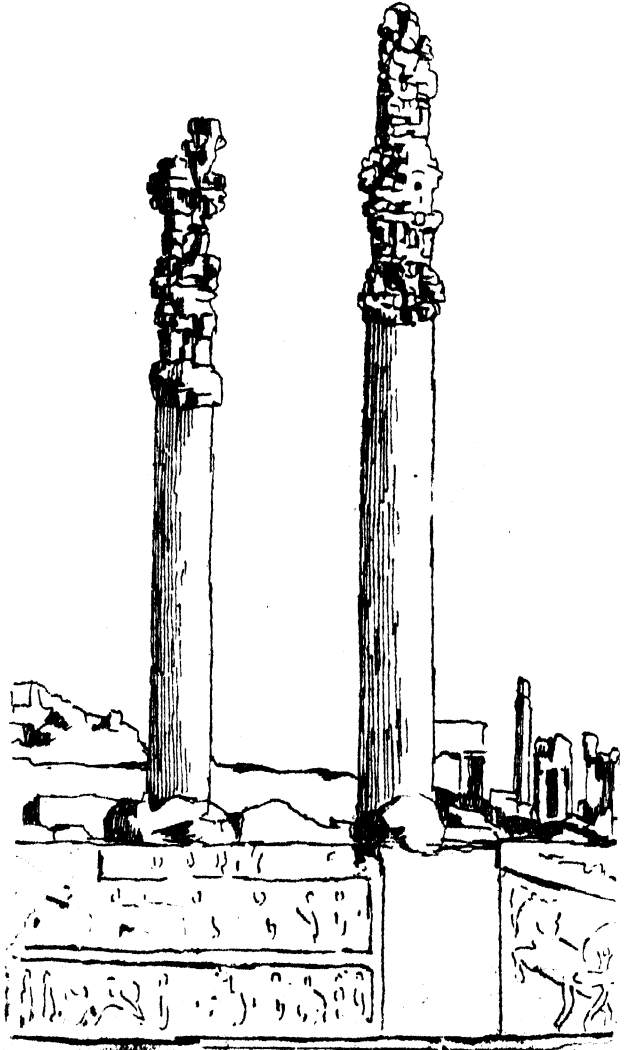
পড়ে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারি হতে
র।

খুবো সব। আমার মনে হতে লাগল—
া, তবে এতো লোক দেশ বিদেশ থেকে
তে আসে কেন? নিশ্চয় এ'র ভেতর
িনিয়ারিং যথেষ্ট কোন দক্ষতা আছে।
খ কিন্তু কিছু বললাম না। পিল,
ানি বলে উঠল—হ্যাঁ এদের সব কাণ্ডই
় রকম। একবার তো শুনেছি একটা
নার সত্যিই পড়ে গিয়েছিল। আবার
নেক কষ্টে খাড়া করেছে। আমি বোকা
কা মুখ করে গিয়ে গাড়িতে বসলাম।
িনিসটার কেরামতি দেখে অবাক হব কি
তারিফ করব কি না বুঝতে পারলাম না।
ন ভাল ইঞ্জিনিয়ার যে এগুলো দেখে
ছে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

বলতে ভুলে হয়ে গেছে। ঘুড়ি ছোঁওয়া
াছের এক একটা জিনিস দেখছি তো।
ন তো হতেই পারে। আসার পথে আমরা
ক-এ-চেহেল-সতুন অর্থাৎ চল্লিশ থামের
জপ্রাসাদ দেখে এসেছি। মস্ত সুন্দর
ানের মধ্যে প্রকাণ্ড রাজবাড়ি। সামনের
তলার গাড়ি বারান্দাটা কুড়িটা কাঠের
মের ওপর দাঁড় করানো। আস্ত একটি
ছের কাণ্ড দিয়ে একটি করে থাম। তিনশ
বেও বেশী পুরনো শাহ আব্বাসের
কারই। প্রাসাদের সামনে বাঁধানো প্রশস্ত
ল। ঐ ঝিলের জলে থামসমেত প্রাসাদের
া পড়ে। কুড়িটি থামও সংখ্যায় চল্লিশটি
দাঁড়ায়। তাই কোন রসিক পুরুষ
নাম দিয়েছে চল্লিশ থামের রাজপ্রাসাদ।
ির সুলতান হুমায়ুন নাকি একবার
লিয়ে এসে এখানে দীর্ঘদিন, বোধ হয়
বছরের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।
াদের ভেতরে, বাইরের দেয়ালে প্রকাণ্ড
াণ্ড ছবি আঁকা। লড়াই-এর দৃশ্য।
দরবারের দৃশ্য।

ঘড়িতে দেখি বারোটা বেজে গেছে।
র মধ্যে ট্যাকসি ছেড়ে দিতে হবে।
র ইচ্ছে, এতোই যখন দেখা হচ্ছে, তখন
। কাছের শাহ-আব্বাস হোটেলটাও পাঁচ
টের জন্যে ঘুরে দেখে যাওয়াই বুদ্ধির
। আবার কবে আসবেন না আসবেন।
শুধু ইস্পাহান কেন, ইরাণের মধ্যে
ট অত্যন্ত 'পশ' হোটেল। শাহেনশাহ
-বানুকে নিয়ে ইস্পাহানে এলে এখানেই
ন। এটির ঐশ্বর্যের কথা টুরিস্ট বইতেও
। যথার্থই দ্রষ্টব্য বস্তুগুলির
খানি এই আধুনিক হোটেলটি
তিনশ বছর আগে ঠিক এই
াতেই তখনকার দিনের পান্থশালা
্যারাভান সরাই ছিল। আধুনিক সমস্ত
সুযোগ সুবিধেওয়ালা পাশ্চাত্যধরনের
টেল শাহ আব্বাস। কিন্তু পারস্যের
ত শিল্পকলা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে
আরোপ করা হয়েছে। আধুনিক
ারিব কীর্তি এটি। অবশ্যই দ্রষ্টব্য।
পশ্চিমের শিল্প-সৌন্দর্যের সমন্বয়।
ন ঢুকে হোটেলটি ঘুরে, অত্যন্ত
কায়দার লাউঞ্জে বসে এক গ্লাস করে
তরমুজের সরবত খেয়ে ফেরা।

রেজার রথ তৈরী। মালপত্র নিয়ে
আমরাও হাজির। কোথাও কোন রেষ্টু-
রেণ্টে ঢুকে অর্ডার দিয়ে লাঞ্চ খাবার সময়
নেই। কোনমতে তাড়াহুড়ো করে স্নান
সেরেই গাড়িতে ওঠা। ডিম, কলা, কেক,
বিস্কুট, রুটি কেনাই ছিল। চৌকিদার
ডিম সিদ্ধ আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি করে
দিল। চৌকিদারকে, পিলুকে অসংখ্য ধন্য-
বাদ দিয়ে, ইস্পাহানকে বাই বাই করে সেই
ঝাঁঝা রোদে সিরাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া
হল। পথে নেমেই খাবারগুলোর সদ্গতি
করে ফেলা গেল।

এবার পাড়ি চারশ চুরাশী কিলোমিটার।
তেহরাণ থেকে সিরাজ ৯১৯ কিলোমিটার।
ইস্পাহান প্রায় মাঝামাঝি পড়ে। সারা রাস্তা
সেই মরীচিকা দেখা। সেই ধুলোর ঘূর্ণি
অসংখ্য। ইস্পাহান থেকে বেরিয়েই যতক্ষণ
লোকালয়ের কাছাকাছি—শুকনো বা নামমাত্র
জলধারার নদীর ধারে ধারে কিছু গাছপালা।
দূরে দূরে সেই খাঁ খাঁ প্রান্তর। অনুচ্চ
পাহাড়শ্রেণী। ঐ মাঠের মধ্যে লম্বা লম্বা
মাইলজোড়া মাটির দেয়াল, মানুষের বুক
সমান উঁচু হবে। অনেক আসছে। দুধারে
এমন কতো যে পাঁচিল পড়ছে খানিকটা বাদ
বাদই। বেশীরভাগই ভাঙা পরিত্যক্ত।
একেবারে মাটি দিয়েই তৈরী। এতো অজস্র
পরিত্যক্ত লম্বা পাঁচিলের তাৎপর্য কি বুঝতে
পারছিলাম না। ভাঙা ঘরবাড়ি তো নয়
যে ছেড়ে যাওয়া গ্রাম ভাবব।

পরে তেহরাণ ফিরে বই পড়ে জেনেছি—
এই মরুভূমির দেশে পাহাড়ী ঝর্ণার বা
জলের উৎসের সন্ধান পেলে সেকালে মাটির
তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে কেটে সেই জল
প্রায় সমতলভূমি পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেত।
তারপর গর্ত কেটে সেই জল জমির ওপর
দিয়ে বইয়ে দিত। এইভাবে জলসেচের
ব্যবস্থা করে ক্ষেত করে চাষবাস হত। এই
দুর্লভ জল খুবই চুরি যেত। তাই এই
পাঁচিলের উৎপত্তি। সুড়ঙ্গ যখন মাটির
ধস নেমে বন্ধ হয়ে যেত তখন জলধারাহীন
ক্ষেত শুকিয়ে যেত। লোকে সেই জায়গা
ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। পরিত্যক্ত
মাটির প্রাচীর তাই নিষ্কর্মা আজও দাঁড়িয়ে
আছে। কোথাও আবার মাটির দেয়াল দিয়ে
চৌক করে অনেকটা জায়গা ঘেরা। তার
মধ্যে নীচু নীচু মাটির গোল গোল ঘরের
ছাদ। তাও মাটি লেপা সমতল। দরজা,
জানালা কিছুই দেখা যায় না, চলন্ত গাড়ি
থেকে দেয়ালের ঘেরের মধ্যে ছাদগুলো
একটু একটু দেখা যায়—"রেজা-ইন্
চিহ্নস্ত? রেজা—'দেহ দেহ'। অর্থাৎ
দেহাত-গ্রাম। এই নাকি গ্রাম! না লোক-
জন, না লোকজনের কাপড় চোপড় শুকোচ্ছে
—বসবাসের কিছুই নমুনা দেখা গেল না।
লোক সংখ্যা খুবই কম। এই অঞ্চলের
মরুভূমির দিকের গ্রামই এ রকম। এক এক
পরিবার—বিয়ে হওয়া ছেলে, মেয়েরা—
সকলেই এক চৌহদ্দির এক পাঁচিলের
ঘেরের মধ্যেই ঘর বেঁধে থাকে।

ঐ এক একটা গ্রাম। মুসলমান গ্রাম।
মেয়েদের আব্রু তো খুবই বেশী তাই
পাঁচিল। তাছাড়া নিরাপত্তাও বটে। চুরি
ডাকাতির মধ্যে জল চুরি একটা বড় রকমের
চুরি। সুড়ঙ্গ কেটে মাটির তলা দিয়ে
ঝর্ণার জল চালিয়ে নিয়ে যাওয়াকে কানাত
সিসটেম বলে। অনেক অবস্থাপন্ন গৃহস্থ
পয়সা খরচ করে নিজের জমিতে বা বাড়ির
সীমানায় কুয়ো খুঁড়ে ঐ সুড়ঙ্গের জলে
ভাগ বসায়। আমাদের দেশের মত যেখানে
খুশি মাটি খুঁড়লেই জল পাবার জো নেই।

ধূসর রং-এর পাহাড়ের পটভূমিতে,
ধূসর প্রান্তরে, ঐ একই রং-এর দেয়াল
ঘেরের মধ্যে, একই রং-এর নীচু গোল ছাদ
বিশিষ্ট গ্রাম—একেবারে গা ঢাকা দিয়ে
আছে। নজর না করলে বোঝার উপায় নেই।
একটু গাছপালা, কি ছাগল, মুরগী চরছে—
কিছুরই চিহ্ন নেই। এ কেমন গ্রাম বিমর্ষ
হয়ে গেলাম।

চলেছি বিখ্যাত সিরাজ দেখতে। না
জানি কি দেখবো। টুরিস্ট গাইডে দেখলাম
লেখা আছে—সিরাজ গোলাপ, বুলবুল
পাখি, সুরা আর কাব্যের দেশ। স্বপ্নের
দেশ সিরাজ নাকি এককালের রোমান্টিক
ক্যাপিটল অব ইরাণ। হাজার বছর আগে
থেকেই সিরাজ আর ইস্পাহানের রেষারেষি।
কে বেশী সুন্দরী নগরী। সমজদারের কাছে
কার মান বেশী? সিরাজ—কবি সাদি আর
হাফিজের জন্মভূমি। সিরাজ ইরাণের
দক্ষিণ-পশ্চিমের ফার্স প্রদেশের অন্তর্গত
শহর। ফার্স নাম থেকেই ফার্সী, অথবা
পার্স বা পারস্য কথার উৎপত্তি। সবুজ
সমতল ভূমিতে সিরাজ যেন একখানি
বাগান। টাং-এ-আল্লাহো আকবর পর্বতের
পায়ের নীচেই সিরাজ। গাইড বুক ছাড়া এ
হেন নামের পাহাড় ম্যাপে কোথাও পেলাম
না। হয়তো কোন যুগের লোকমুখে
প্রচলিত নাম। জাগ্রস পর্বতমালা ম্যাপে
দেখেছি। উত্তর-পশ্চিমে এই পর্বতমালার
নীচের দিকে সমতল ভূমি শস্য ক্ষেত্র।
ফার্স প্রদেশের নীচেই পার্সিয়ান গালফ্।

একটা দেশকে তার চারপাশের পাহাড়,
সমুদ্রের পরিবেশে কেমন দেখায় একমাত্র
প্লেন থেকে ছাড়া ধারণা করা সম্ভব নয়।
ম্যাপে দেখে সামান্যই বোঝা যায়। মটর
গাড়ি চড়ে, হাতে ম্যাপ নিয়ে দ্রষ্টব্য স্থান-
গুলি ঘুড়ি ছোঁওয়া করে দু-চারখানা
ফটো নেওয়া। আবার গাড়িতে চড়া। এ
আমরা ঠাট্টা করে বলি আমেরিকান টুরিষ্ট-
দের বেড়ান। আমরাও সময়াভাবে এই-ই তো
করছি। একটা দেশের রূপ দেখা, তার
মেজাজ বোঝা এতে অসম্ভব। শুধু লোককে
বলা যাবে যে হাঁ, এসব জায়গা আমরা
দেখেছি। যাক এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ
নেই। তবুতো তেহরাণ থেকে এতো দূরে
আসতে পেরেছি।

শিরাজের ইতিহাস চলে আসছে সেই খৃষ্টপূর্ব ৫৫০ থেকে। প্রথম ঐশ্লামিক যুগে দশম শতাব্দী থেকেই শিরাজের নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ে। পারস্যের রাজধানী হিসেবে শিরাজ তখন বাগদাদ, কাইরো [illegible] সমকক্ষ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মঙ্গোলিয়ানদের পারস্য আক্রমণ ও ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা থেকে শিরাজ [illegible] রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। [illegible] সভ্যতা, সংস্কৃতির [illegible] রাজনৈতিক, শিল্পনীতির অগ্রগতির ছিল। শাহান শাহ আরিয়া মেহের বর্তমান শাহ আমির মজুর করে শিরাজে শিল্প সাংস্কৃতিক মেলার প্রবর্তন করেছেন। সম্প্রতি এদের পঞ্চম সংস্কৃতি মেলা হয়ে গেল পার্সে (পোলিসে)। আমরা টেলিভিশনে দেখলাম। শিরাজের আবহাওয়া শিরাজের চতুষ্পার্শ্ব অমর হয়ে আছে সাদী হাফেজের কবিতায়। সাদী (১১৮৪-১২৯১) এবং হাফেজ (১৩২০)(১৩৮৯) পারস্যের দুই বিখ্যাত কবি এখানেই জন্মেছিলেন। এইখানেই তাঁদের কবর। আজও লোকে শান্ত পরিবেশে সুন্দর বাগানে তাঁদের কবর দেখতে আসে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। শিরাজ হল—সৌন্দর্য আর শিল্পের পূজারীদের মক্কা-মদিনা, আমাদের গয়া, কাশী।

মুসলমান ধর্মে মদ্য পান নিষেধ। কিন্তু শিরাজ পারস্যের সেরা সুরা উৎপাদন করে। শহর থেকে মাইল চোদ্দ দূরে বিস্তীর্ণ দ্রাক্ষাক্ষেত্র। জায়গার নাম খোলার। 'গোল্ডেন খোলার' সেরা মদই সুস্বাদু। গাইড বই থেকে শিরাজ সম্পর্কে জেনে নিয়েছি।

কতোক্ষণে শিরাজ পৌঁছব? কত যুগ ধরে শিরাজ কি পসরা নিয়ে না জানি আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে! এই ধু-ধু মরুভূমির ওপারে কোন নন্দন কাননে পৌঁছব, যখন তন্ময় হয়ে ভাবছি, তখন টুটু, টিংকু—ওমা, দেখ দেখ, কি অদ্ভুত মাটির খেলনা মত কি সব। তাকিয়ে দেখি দুপাশে বেশ উঁচু পাহাড়। মধ্যিখানে পিচের রাস্তা দিয়ে চলেছি। পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে মিশিয়ে সাজানো যেন মাটির অনেক খেলনা। কোন উঁচুতে ছোট ছোট বুদবুদ মত। যেন পাহাড়ের গায়ে গায়ে সব উঁই ঢিবি।

রেজা এসব কি?

রেজা বললে—এও গ্রাম। পাহাড়ী গ্রাম।

(কু-এ দেহ কুহ হল পাহাড়) খুব লক্ষ্য করে যেন কদাচিৎ দু-একটি মুখ এক পলকের জন্যে দেয়ালের পাশে দেখতে পেলাম। পর্দা প্রথার জন্যে চট করে কেউ সামনে আসে না। চকিতে আড়ালে সরে গেল। চারপাশটা কি অদ্ভুত লাগছে দেখতে। এখানে লোক কি করে থাকে। খায় কি? জীবিকাই বা কি? কিছুই ভেবে পেলাম না। টুটু বললে—থামো থামো। এইখানে নেমে একটু চারদিকটা দেখি।

ক্যামেরা বের করে টিপ করা মাত্র টিংকু ফুঁপিয়ে পড়ল—এই দিদি এবার আমার পালা না? তুই তো দশখানা তুলেছিস। আমি মাত্র সেই একটা। এই শেষ শটটা কিন্তু আমার ছিল। অতএব টিংকু এই বিচিত্র গ্রামখানির একখানা ফটো নিল। আসলে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পৃথিবীর কতো প্রান্তে কতোভাবেই থাকে। অদ্ভুতভাবে মস্তিষ্কের মধ্যে ঠিক বিপরীত দৃশ্য সমুদ্রপাড়ে নুলিয়াদের [illegible] পুরী, গোপালপুরের দৃশ্য ঝলক দিয়ে গেল। ফটো তোলা হল, গাড়ি চলেছে। হঠাৎ বাঁক ঘুরতেই কর্তার গলা—দেখ, কি কাণ্ড। একটি ট্রাক—চার পা নয়, একেবারে ষোলটা না, কুড়িটা চাকা তুলে উল্টে পড়ে আছে। জনপ্রাণী নেই। এক্ষুনি না হোক, খুব সম্প্রতিই যে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা গাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়। আমার মুখ থেকে অজান্তে বেরিয়ে এল—আগা রেজা সাবধানে প্লীজ। টিংকু বললে বাংলা, ইংরিজি মিলিয়ে বলছ, ও বুঝল কিছু?—ঠিক বুঝেছে। এই দৃশ্যের পর আমার মুখ থেকে কি কথা বেরোতে পারে রেজা ঠিকই আন্দাজ করতে পারে। ওর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।....

মাঝে মাঝে মরুদ্যানের মত সবুজের ছিঁটেফোঁটা। ক্রমে দেখছি বেশ কিছুটা জায়গায় পাহাড়ের উচ্চতা কমে আসছে। বললে বিশ্বাস হবে না, একেবারে হঠাৎ চমৎকার বেগুনী রং-এর বন্যা! একি, একি, এ আবার কি? দুধারের ছোট ছোট টিলার গা, মাথা ভর্তি অপরূপ বুনো ফুল ফুটেছে। সেকি একটি দুটো? হাজারে, হাজারে লাখে লাখে গাছ, গুল্ম বলে কিছু নেই। সবুজ পাতার চিহ্ন নেই। শুধু বেগুনী রং-এর স্রোত। ফুলের আকার প্রকার কিছু বোঝা যায় না। চলন্ত গাড়ি থেকে শুধু তরল বেগুনী রং দুধারে দেখছি। প্রায় এক মিনিট ধরে ঐ অঞ্চল পার হলাম।

এবার ফুলের ঝাঁক কমে আসছে। ঘন রং পাতলা হয়ে এল। এখানে সেখানে কিছু কিছু। থামাও থামাও রেজা লোভনীয় প্লীজ একটু গাড়ি থামাও। এ ফুল তেহরাণ নিয়ে যাব। রেজা হেসে গাড়ি থামাল বটে, কিন্তু মাথা নেড়ে ফার্সিতে কি বলল। ভাবে মনে হল বললে, নামো, কিন্তু লাভ হবে না।

গাড়ি থেকে তো নামলাম। কিন্তু দাঁড়াবো বা পা ফেলব কোথায়? শুধু মাটির সঙ্গে রঙে মিশে আছে শুকনো কাঁটা। পায়ে তো চটি, খালি পায় সামিল। ফুলগুলোর কাছে গিয়ে দেখি বেগুনী রং-এর বিলিতি থিসল বা দিশি কদম ফুল; প্রতিটি পাপড়ি শক্ত সূচলো কাঁটা। কি নির্মম নিষ্ঠুর সৌন্দর্য। হাত দেবার উপায় নেই, তোলা তো দূরস্থান। শক্ত বেগুনী কাঁটা, দু-চারটে কাঠের মত শক্ত বেগুনী কাঠি কাঠি পাতা চারদিক থেকে উঠে মধ্যিখানে বেগুনী ফুলটা সজারুর মত কাঁটা উঁচিয়ে আত্মরক্ষা করছে।....

বিকেল হল। আমরা অবিশ্রাম চলেছি। গ্রীষ্মের বেলা, সন্ধ্যে আর হয় না। বহু কষ্টে টিমেতালে পশ্চিমে হেলে হেলতে সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে [illegible] গেলেন। সারা আকাশ রাঙা হয়ে র[illegible] কিছুক্ষণ। দিনের আলো নিভে নেভে [illegible] সারাদিন খররোদে জনপ্রাণীর সাড়া ছিল না[illegible] এখন এই গোধূলি বেলায় যেন মন্ত্রের [illegible] গাধার পিঠে পা ঝোলান লোক, শত [illegible] ভেড়া, ছাগল নিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসতে লাগল। তাদের পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। গরুর পায়ের ধুলো [illegible] গোধূলি শুরু। প্রাণের সাড়া পেয়ে আম[illegible] সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। টিংকু—আগা রেজা, ইন্ চি হস্ত? রেজা বোজ বোজ (ছাগল)। ভেড়া দেখিয়ে বললে—গুসফান্দ। টিংকুর ভাণ্ডারে দুটি ফার্সি শব্দ বাড়ল। ছাগলের চেয়ে ভেড়াই বেশী। কিছু দূরে যেতে যেতে বেশ কয়েকটা দল ভেড়াও চালক, কখনো পায়ে হাঁটা, কখনো গর্দভ পৃষ্ঠারূ[illegible] পাহাড়ের আড়াল থেকে নিমেষে প্রায়ান্ধকার আকাশের পটে আবছা ফুটে উঠছে। [illegible] চমৎকার তো! ক্রমে সন্ধ্যা। এই আমাদের পাহাড় ঘেরা মহানির্জন স্থানে যদি হঠা[ৎ] গাড়ি খারাপ হয়? না না তা হয় না।

সন্ধ্যেবেলাটা যেখানেই থাকি, এ[illegible] থাকলে এটা আমার মন কেমন করায় যেন। কার জন্যে, কিসের জন্যে মন কেমন [illegible] বলতে পারব না। কিছুক্ষণের জন্যে যে[illegible] ইহলোক, পরলোক ভুলে মনটা কেমন শা[illegible] সমাহিত, আত্মস্থ হয়ে আসে। বেদনা[illegible] [illegible]। আমরা চলেছি কোথায়? কিসে[র] সন্ধানে? এই গাড়ি ভর্তি করে পাশে যা[রা] বসে আছে, তারা কে? তারা কি সত্যি আমার কেউ?....

রেজার সময় জ্ঞান খুব ভাল। যেমনি সন্ধ্যে পার, অমনি দূরে আলোর ঝিকিমিক[ি] দূরে লোকালয়ের ইসারা। প্রায় আরো আ[ধ] ঘণ্টা ধরে দূরেই আলোর ঝিকিমিকি একবার সামনে একবার বাঁক ঘুরে আড়ালে।

ঐ নাকি শিরাজের আলো। [illegible] আলোর মেলা, আলোর হাট, এতোক্ষ[ণ] সাঁ সাঁ চলার পর কি যে ভাল লাগল। আমরা ঐ আলোর দেশে পৌঁছবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলাম। ইস্পাহানের ম[ত] আমাদের চেনা কেউ শিরাজে নেই। কাজেই তেহরাণ থেকেই ইনটো ইন্—ইরাণ টুরিস্ট অর্গানিজেশন-এর হোটেলে ঘর বুক করা ছিল। নামেই ইন কিন্তু কেতাদুরস্ত চমৎকার হোটেল। দোতলার ওপর চমৎকার বড় বড় দুটি ঘর। পৌঁছে গেছি বুঝতে পারছেন। জিনিসপত্র নামিয়ে চেহারার একটু ছিরিছাঁদ ফিরিয়ে বাগানের মধ্যে গাছপালা ঘেরা দিঘীর পাড়ে চমৎকার পরিবেশে ওপেন এয়ার ডিনার টেবিলে বসা গেল। আঃ কি তৃপ্তি। সমস্ত দিন শুধু ফল বিস্কুট কেক চিবিয়ে, কফি গিলে গিলে আমরা এখন চেলো কাবাব অর্থাৎ ভাত মাখন কাবাব স্নিটজেল আইসক্রীম খেয়ে ঠাণ্ডা হওয়া গেল।

(চলবে)

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উদ্দেশিতা ক্রিস্টিন

(২২)

স্নেহের ক্রিস্টিন,—

তোমার কথাই ঠিক। কেমব্রিজে বসে ব্যাটেল ক্রিকের খাদ্য নির্দেশ অনুসরণ করলে আমি ঢের বেশী সময় ও বিশ্রাম পাবো। কয়েকজন নামী ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করেছেন। প্রস্রাবও পরীক্ষা করা হয়েছে। আপাততঃ সুগার, এলবুমিন কিছু নেই। কিডনিও ঠিক আছে। সত্যিই খুব ভাল আছি। কেবল খানিকটা মানসিক ব্যাপার এখনও আছে! তার জন্য বিশ্রাম চাই। কেমব্রিজই এজন্য সবচেয়ে সেরা জায়গা;

তুমি তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে যে চিঠি লিখেছ সে চিঠি মিসেস বুল আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছ জেনে আমি খুশী হয়েছি। যত শীঘ্র সম্ভব কেমব্রিজে চলে এসো। অন্ততঃ সপ্তাহ কয়েক আমরা বেশ আনন্দে কাটাবো। আমি কিছু পড়াশুনো করব এবং রচনার কাজ শুরু করব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াবে। মনে হয় আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে এখন দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এইরকম স্নায়ুর দরুন অসুস্থ শরীরের কোন স্থিরতা নেই। কখনও এই শরীরে সুর বেঁধে গান গাওয়া যায়, কখনও মনে হয় চারিদিক শুধু অন্ধকার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শরীরের যন্ত্রপাতি কখনও এজন্য বিকল হয় না।

তাড়াতাড়ি এসে পড়। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই কৈলিয়িকে পৌঁছাচ্ছি।

ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানবে
বিবেকানন্দ

(২৩)

লস্ এঞ্জেলস, ৯২১ ডবল; ২১
৯ ডিসেম্বর ১৮৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা,—

এখানে, এই ক্যালিফোর্নিয়াতে এসে আমার নিজের এবং যাদের আমি ভালবাসি তাদের পক্ষে ভাল হয়েছে। আমাদের একজন কবি বলেছেন 'কোথায় কাশী, কোথায় কাশ্মীর, কোথায় খোরাসান, কোথায়—(গুজরাট?) ও তুলসী, পূর্বের কর্মফল মানুষকে ঠিক সেইখানে টেনে নিয়ে যাবে।' সেইজন্য আমি এখানে এসেছি। এটা মঙ্গলের জন্যই,—কী বল?

তুমি কী বোস্টনে যাচ্ছ? মনে হয় বোধ হয় যাচ্ছ না। তোমার পরিকল্পনা আশা করি আমি গোলমাল করে দিইনি। দিয়েছি কী? অযথা খরচ? বেশ, যদি তাই হয় আমি সব ঠিক করে নেব। হাঙ্গামাটুকু কেবল তোমার। আমার খামখেয়ালীর জন্য আমি লজ্জিত!

কেমন আছ বল? কী করছ? কাজকর্ম সব কেমন চলছে? পারলে একটু ঘুমিও। জেগে থাকার চেয়ে এটু ঘুমুতে পারলে ভাল। প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গল হোক, শান্তি পাও, সবরকম কাজ ও দুর্ভোগকে বহন করবার শক্তি পাও। কাজ করবার শক্তি আমার খুব আছে কিন্তু কষ্ট ভোগের শক্তি বড় কম!

আমি আবারও বড় স্বার্থপর হয়ে পড়ছি! কেবল নিজের কষ্টের কথাই ভাবছি, অন্যের কষ্টের বিষয় কান দিচ্ছি না। আমার জন্য প্রার্থনা কোরো, বেশ উৎসাহের এবং শক্তি সঞ্চার করবার মত কথা আমাকে লিখো, যাতে কষ্ট সহ্য করবার জোর মনে পাই। আমি জানি তুমি করবে।

এখানে এই শহরে সপ্তাহ কয়েক থাকব—তারপর 'মা' জানেন! গত ক'মাসের চেয়ে এখন শারীরিক অনেক ভাল আছি। হার্টের দুর্বলতা প্রায় নেই বললেই হয়! বদহজমের কষ্টও অনেকটা ভালর দিকে। এখন বেশ মাইল কয়েক হাঁটতে পারছি এবং কোন কষ্ট বোধ করি না সে জন্য। যদি এই ভাবটা চলে তবে জীবনের মেয়াদটা বেড়ে যাবে মনে হয়।

তোমাকে বোস্টনে আসতে বলে নিজে ঘুরে বেড়াচ্ছি এজন্য অত্যন্ত দুঃখিত আমি। যদি তুমি ওখানে পৌঁছে থাকো তাহলে তুমি জায়গাটা এবং সভাগুলি পছন্দ করবে বলে মনে হয়। কিন্তু যদি তুমি সে ইচ্ছা ত্যাগ করে থাকো? ভাল কথা, ছুটি নিয়েছিলে কী? অথচ বোস্টনেও গেলে না? ইস্, আমি কী যে ভণ্ডুল করে দিলাম সব! তোমার কাছে হাজারবার মার্জনা চাইছি যদি সত্যিই ব্যাপারটা তাই হয়! যাক, অদূরেই পরিস্থিতি ঠিক এবং উজ্জ্বল হবে বলে মনে করি। জীবনের মাত্র গোটাকয়েক দিন একটু গোলমাল হলে কী আর এসে যায়!

মিসেস ফাঙ্কে কেমন আছেন? গাদাগাদা ভালবাসা তাঁকে জানাচ্ছি। ক্রিস্টমাসে তুমি ক'দিন ছুটি পাবে? কবে থেকে শুরু হবে? যদি তোমার ইচ্ছে হয় তো আমাকে লম্বা চিঠি লিখবে। কেমন? কিন্তু আমার বন্ধুদের আমার ঠিকানা জানিও না। কিছু দিনের মত একটু গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই, যদি সম্ভব হয়।

মিসেস বুলকে মিসেস ব্লোজেটের ঠিকানা পাঠিও। তো ও'র দরকার আছে।

কাল রাত্রে একটা বক্তৃতা দিয়েছি। হলে খুব ভীড় হয়নি। কারণ, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি তেমন। তাহলেও শ্রোতার দল খুব কম ছিল না। আশা করি তারা শুনে খুশী হয়েছে। যদি জমে থাকি তাহলে এই শহরে কিছু ক্লাস নেব। যাতেই পারি একটা ব্যবসায়িক বুদ্ধি—অর্থাৎ কিছু অর্থাগমের প্রয়োজন তাড়াতাড়ি অবশ্য, যদি সম্ভব হয়।

ঠাকুরের শরণাগত তোমার
বিবেকানন্দ

(২৪)

৯২ ডবল; ২১ স্ট্রীট
লস এঞ্জেলস, ২৭ ডিসেম্বর '৯৯

স্নেহের ক্রিস্টিনা—

তুমি তাহলে ঘুমোতে পারছ না, জেগে থাকছ। তবে জাগ্রত থাকো, ব্যাপকভাবে জাগ্রত। এখানে এসে কাজ হয়েছে প্রথমতঃ আমি সেরে গিয়েছি। কী, ভাবছ কী? রোজ ভোরবেলা মাইল তিনেক করে হাঁটি! ভাল, না?

খুব চটপট পয়সা উপার্জন করছি দিনে ২৫ পাউণ্ড এরপর আরও বেশী করে কাজ করব এবং দিনে ৫০ পাউণ্ড উপার্জন করব। মানক্লার্নিসস কোতে আরও বেশী হবে আশা করছি। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই সেখানে যাবো। ভাল, তুমি 'খুব ভাল' বলবে—এবারে সব টাকা নিজের জন্য রেখে দেব আর ওড়াবো না মোটেও!

তারপর? হিমালয়ে একটা জায়গা—পুরো একটা পাহাড় হাজার ছয়েক ফিট উঁচু চিরতুষারাবৃত শিখরের মনোরম দৃশ্য সেখানে যাবো। সেখানে ঝরণা ও ছোটছোট জলাশয় থাকবে

ক্রিস্টিন

করিয়া দিত। ইহার জন্য স্বতন্ত্র আট টাকা নিবেদিতার মাসিক খরচ হইত। শ্রীমতী রুস্টারের তথ্য সঠিক মনে হয় না।)

সেই দামী সোনালী পোষাকে সিস্টার ক্রিস্টিন রানীর মত বসেছিলেন। তখন আর তিনি ভীরু তরুণীটি নন যিনি প্রত্যুষপ্রায় বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকতেন।

সামান্য কটি মাত্র কথায় উনি এক-একটি প্রধান চরিত্রকে আশ্চর্য রকম জীবন্তভাবে আমাদের কাছে চিত্রিত করতেন। এখনও মনে হয় ও'র বর্ণনায় সেই চরিত্রগুলিকে আমি যেন নিজে চোখে দেখতে পেতাম।

"তার সারদাদেবী। সাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত সমস্ত শরীর মুখ সব ঢাকা। শুধু চোখ দুটির কাছে একটু ফাঁক যাতে উনি সকলকে দেখতে পান, কিন্তু ও'র মুখ কেউ দেখতে না পায়। জনকুড়ি একসঙ্গে আসত ও'র আশীর্বাদ গ্রহণ করতে। অসীম ধৈর্যশালিনী ছিলেন সারদাদেবী। বিশেষ করে ও'র নিজের পরিবারবর্গের প্রতি। ওরা ও'র ধৈর্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়েছিল যেন। ও'র এক ভাইঝি ছিল মাথায় ছিট, তার ওপরে অকারণে রাগে ফেটে পড়ত। যে কোন লোক হলে ওকে ঠিক পাগলাগারদে বন্ধ করিয়ে দিত। কিন্তু হিন্দুঘরের মানুষ, তিনি ওর সব কিছু সহ্য করেছিলেন এবং ওর যত্নের ত্রুটি রাখতেন না। এই মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েটি জন্মেছিল ওর বাবার মৃত্যুর রাতে। কলেরায় মারা যান ওর বাবা এবং মায়ের মাথা খারাপ হয়ে গেল। সারদাদেবী চারদিকে কলহ অশান্তির অবস্থার মধ্যে থেকেছেন তাঁর ঐশ্বরিক মাধুর্য নিয়ে। এত অনাড়ম্বর মানুষটি ছিলেন যে দেখলে মনে হত বাড়ির কাজ করে অতি সাধারণ কোন স্ত্রীলোক বুঝি' অথচ কী বিরাট ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। এমন কী মৃত্যুর দিন পর্যন্ত নিজে হাতে রান্না করেছেন। আমি সবসময় ও'র মধ্যে একটা বিষাদের ভাব দেখেছি। কী যেন একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এক-এক সময় ভীড় করা মানুষের দল তাদের নিজেদের দুঃখকষ্টের কথা বলে ও'কে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে রেখে যেত। বিশ্বের সমস্ত মহাত্মা ব্যক্তিদের এইভাবেই বড়রকম মূল্য দিতে হয়েছে জন্য।"১

সারদাদেবীর পরেই এসে পড়ে বিশ্বজননী মহামায়ার কথা "জানো, হিন্দুরা মহামায়ার বারোটি রূপের আরাধনা করে। কোন রূপে তিনি অসামান্যা সুন্দরী, কোনরূপে তিনি ভয়ঙ্করী। একদিন দীনেশচন্দ্র সেন কোথা থেকে ধূসর রঙের পাথরে তৈরী মায়ের একটি সুন্দর মূর্তি নিয়ে এলেন। যেমন সুন্দর তার খোদাইকার্য তেমনি মধুর তার রূপ! উনি ওটা নিবেদিতা আমার কাছে রেখে যেতে চাইলেন। বললেন উনি নাকি অসুস্থ এবং এই মূর্তিটি যে বাড়িতে রাখা যায় সে বাড়ির গৃহকর্তা মারা যায়। আশ্চর্য যোগাযোগ। এর অল্প কিছুদিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে নিবেদিতা মারা গেল। আমি তখন বিদেশে। ফিরে এসে আমি মূর্তিটি বাড়িতে রাখতে চাইলুম না। দীনেশচন্দ্র সেনকে ডেকে পাঠালাম। বেশ কিছু আলোচনার পর ঠিক হল এবারে উনি ওটা কোন ব্যক্তিকে দেবেন না। আবার যদি তার বাড়িতে কোন অকল্যাণ হয়। বরং ভারতবর্ষের যে জায়গা থেকে ওটা এনেছিলেন সেখানে পাঠিয়ে দেবেন সেখানকার কোন মিউজিয়মে রাখবার জন্য। সেখানে 'বাড়ির গৃহকর্তার' কোন ভয় থাকবে না। মূর্তিটা একটা দেওয়ালে প্লাস্টার করে আটকানো ছিল। সেখান থেকে খুঁড়ে তোলা হল। সেখানে একটা বড় আকারের গর্ত হয়ে থাকল। মায়ের মূর্তিটা নিয়ে যাবার পর সেদিকে তাকালেই আমার মনে কিরকম একটা শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গতার ভাব পীড়ন করত।"

২৭শে মে আমরা অর্লের ছোট বোঙ্কের পুষ্পসজ্জিত টেবিল ফুল দিয়ে সাজালাম ওর টেবিলের ওপরে। তারপর রাতে চাঁদের আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গেট ট্রিস্টা পড়লাম।

৩০শে মে সিস্টার ক্রিস্টিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন হার্ট খারাপ, পেট খারাপ। তিনদিন তিনরাত্রি আমরা নিঃশব্দে তাঁকে ঘিরে থেকে শুধু অপেক্ষা করলাম এর পরিণাম কী হয়।

জুনের প্রথমে আমরা কর্নেল হাউসে২ চলে এলাম... আমরা সবাই নিজেদের ছবি আঁকা, পড়াশুনো, গবেষণার কাজ এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তারই মাঝে খানিকক্ষণ করে বসি সিস্টার ক্রিস্টিনের কাছে। উনি বসে থাকেন বারান্দায় দড়ির খাটে বিছানায় পশ্চিম দিকে মুখ করে। ও'র উপস্থিতিতে আমরা প্রত্যেকে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতাম।

প্রথম বৃষ্টি সঙ্গে করে নিয়ে এল প্রথমে গোলাপী লিলি তারপর লাল লিলি। চালের ওপর দিয়ে সশব্দ বৃষ্টির ধারা নামে। বিশাল দেওদার গাছ আরও মাথা উঁচু করে ওঠে। নীল মেঘে পরতে পরতে পাহাড় প্রতিভাত। তাদের খাঁজে খাঁজে মেঘ আটকা পড়েছে। সেইখানে উনি ও'র বিছানায় বসে থাকেন প্রায়ই একটি নীল ক্যাপ পরে থাকেন এবং একটি নীল শালে মাথা মুড়ি দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত ঢেকে।"

---

(১) ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ খৃঃ ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার পত্র... 'ক্রিস্টিন তাঁকে (শ্রীশ্রীমাকে) তেমন বুঝতে পারে না। এতে আমি মজা পাই। কারণ ক্রিস্টিন আন্তরিকভাবেই সেকথা বলে তবে ক্রিস্টিনের এ মনোভাব স্থায়ী হবে না। একদিন নিশ্চয় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে।' নিবেদিতার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে সারদামা সম্বন্ধে ক্রিস্টিনের মতবাদ পড়ে আমরা সেকথা বুঝতে পারছি।)

(২) এই বাড়িটি এখন আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনার অফিসিয়াল রেসিডেন্স হিসেবে খালি করিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছেন একদিন আর্টিস্ট অফিসাররা থাকতেন

শ্রীমতী ব্রুস্টার বলছেন

"She was like inscrutable Byzantine Madonna with her long heavily lidden dark eyes, turned inward to vision not vouchsafed others".

সাধারণত উনি হাতে-কাটা সুতোর সাদা খদ্দরের কাপড় পরতে ভালবাসতেন। সাদা এবং সোনালী এই দুটো রংয়ে সবচেয়ে বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। তবে সহজে যা বা যেটা পেয়ে যেতেন তাকে বিনা অভিযোগে গ্রহণ করে নিতেন।

প্রতিদিন সকালে কফির সুগন্ধে সমস্ত বাংলো বাড়ি ভরে যেত। ...গুরুদাস প্রতিদিন এসে বলতেন 'শিব শিব'। সেই শিব-ধ্বনি সমস্ত বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত। ওর নম্র মধুর উপস্থিতিতে একটা স্বর্গীয় আশীর্বাদের ভাব ছিল। এই দুটি [illegible] মানুষ যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় প্রাচ্যে এসেছিলেন সংসার ত্যাগ করে তাঁদের মধ্যে কোন লৌকিক ভাব ছিল না।...এই দুটি মানুষে ঈশ্বরের অত্যন্ত নিকটবর্তী ছিলেন। অর্থের মোহ এই দুটি শুদ্ধচিত্ত মানুষের ওপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অ্যাকশা ব্রুস্টার বলছেন "The power of knowing and valuing only the highest of putting all its treasure in the Eternal, raised Sister Christine to a highest world untouched by any stain."

যাঁরা শুধু সাধুস্বভাবের নন, তাঁদের কাছে 'সাধুব্যক্তি' কথাটির খুব গুরুত্ব না থাকতে পারে; কিন্তু যদি তাঁরা সিস্টার ক্রিস্টিনকে দেখতেন তবে বুঝতেন সাধুব্যক্তি বলতে কী বোঝায়!

ঠিক জিনিসটি বোঝবার এবং বিচার করবার গভীর ক্ষমতা ছিল তাঁর। মানুষের অন্তঃস্থল পর্যন্ত যেন উনি দেখতে পেতেন এবং তাদের সঠিক রূপ বুঝে নিতে পারতেন। সেন্টিমেন্টাল না হয়ে সবকিছুর ভাল এবং মন্দ দুদিকটাই যথাযথভাবে বোঝবার বা বিচার করবার স্বচ্ছ বুদ্ধি ওঁর ছিল। সবকিছুর সারার্থ মূল্যায়ণ করে উনি ন্যায়বিচার করতেন। এমন ন্যায়বুদ্ধি কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখিনি।

আমরা গান্ধীর স্বরচিত জীবনী পড়ছিলাম এবং কফি খেতে খেতে সে বিষয় আলোচনা করছিলাম। গুরুদাস বললেন,

"Gandhi is inside the phenomenal circle, Vivekananda was outside the phenomenal in the moamenal (? (ছাপার ভুল ?)।

সিস্টার ক্রিস্টিনের মুখ উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে উঠল, যদিও উনি চুপ করে থাকলেন।......

বশী পিলগ্রিম কার্মিনটা পড়ে শোনাচ্ছিল আমাদের। অনেকক্ষণ আলোচনা হল। প্রশ্ন হল, ঈশ্বর কী কর্মফলের হিসেব করে কাজ করেন? যেমন ক্রুশবিদ্ধ চোর এবং পিলগ্রিম কার্মিনটার চোরের ব্যাপারে ঘটেছিল? বশী বললে, ঈশ্বরকে আমাদের সীমায়িতভাবে দেখা উচিত নয়। তিনি নিজের ইচ্ছামত নিজের করণীয় পথ ঠিক করে নিতে পারেন। ক্রিস্টিন চুপ করে সব শুনছিলেন। ওঁর আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল, চোখেও কিছু ইনফেকশান হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক কোন কষ্টের জন্যে ওঁকে কখনও কাবু হতে দেখা যেত না। এমনকি যখন ব্যান্ডেজে থাকতেন, তখনও নয়। এসব যেন ওঁকে স্পর্শই করত না।......

'স্বামীজীকে জানবার আগে আমি একজন ক্রিশ্চান সায়ান্টিস্ট ছিলাম।

"I was at once sensitive to the power of healing and being healed, but it repelled me to see such a spiritual power turned to such material ends often".

বশী সেন এবং শ্রীমতি সেন। ১৯৩০ খৃঃ

বলেছিলেন সিস্টার ক্রিস্টিন'...... স্বামীজী আমার জন্য রাজযোগের পথ নির্দেশ করে গিয়েছেন। আমার মনে হয়, এই পথেই আমার না থেমে এগিয়ে যাওয়া ভাল। এইটাই আমার পথ।"

সামান্যতম একটা কথাও উনি এমন মন দিয়ে, গাম্ভীর্যভাবে শুনতেন যে, অন্যের মনে তাতে একটা মুক্তির স্বাদ এবং ব্যাপকতার ভাব আসত। এমন গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অন্যের কথা শুনতেন যে, অনেক সময় মনে হত, এই চিন্তা বা ধারণাগুলি তাঁর নিজের।

(She listened so gravely and earnestly to the most trivial remarks one made that it liberated one's thoughts and opened them out into wider ways. Sometimes one was left pondering whether the ideas were hers or yours,—so deep and life giving was her sympathy.) ....

কী শান্ত আর ধৈর্যশালিনী ছিলেন তিনি। একবার তিনটি ভারতীয় স্ত্রীলোক দুটি বাচ্চা নিয়ে এল ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। না উনি ওদের আঞ্চলিক ভাষা বুঝলেন, না ওরা ওঁর ভাষা বুঝল। তবুও চেষ্টা করে গেলেন। এদিকে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওরা বুঝতে পারল না ওদের পক্ষে এভাবে আসাটা যেমন আনন্দের, ওঁর পক্ষে তা একেবারেই নয়।

ওঁর মধ্যে আত্মাভিমান যথেষ্ট ছিল। তার ফলে কেউ অপমানজনকভাবে কিছু দিলে সেটা সসম্মানে গ্রহণ করতে ওঁর অভিমান আহত হত। পয়সাকড়ির ব্যাপারে ওঁর অত্যন্ত বিতৃষ্ণা ছিল। বিশেষ করে পয়সাওয়ালাদের দম্ভ সম্বন্ধে।

ক্রিস্টিনের চিঠি

ভেরমণ্ট। ১৬ই জুলাই। '১৯

কী সুন্দর জিনিস এল। [illegible] দুটি প্রবন্ধ ও তোমার বক্তৃতা। আমার অহংকার হবে না? কোনটা আগে শুরু করব? বক্তৃতাটাই আগে পড়লাম আর পড়ে আনন্দে হৃদয় নেচে উঠল। এই তো চাই।........যখন ওটা পড়ছিলাম, আমি যেন ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম আমার বন্ধু সবকিছু তিক্ততা ও অপমানের থেকে মুক্ত হয়ে সংহত ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে

"Voicing the wondrous message with his buoyant radiancy'.........

এই ভারতবর্ষকে তিনি (স্বামীজী) দেখেছিলেন তাঁর দেশে, তাঁর ভালবাসাতে—এর চেয়ে বেশি আর কোন কিছুকে বোধহয় তিনি ভালবাসেননি। প্রাচীনের গৌরবময় অধ্যায়কে যেমন তিনি জানতেন, তেমনি গৌরবময় ভবিষ্যতের কথাও তিনি ভাবতেন। অতীত থেকে তিনি শক্তি আহরণ করতেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি থাকত বর্তমান পরিস্থিতির ওপরে।

The triumph of spirit majestic and glorious over this little mud puddle of a world. The triumph of divinity over humanity—Jai Jai Jai Swamiji!

তোমার কয়েকটি পংক্তি খুব উপভোগ্য।

("Imitation is the particular virtue of our Darwinian grand-fathers."

অনুকরণ প্রবৃত্তিটি হল ডারউইনের মত অনুযায়ী আমাদের পূর্বপুরুষদের লক্ষণ।........এবং তারপরে কয়েকজন মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করে তুমি শেষে লিখছ—

"What thought, what life must have envolved this Mahadeva? What infinite power his dorment around him."

.......আরও একটি পংক্তি তুমি লিখেছ—

"He begged the austire to desend from his Himalayan heights and the devout to come out of his temple and renew this contact with life throbing, life moving, life evolving."............

.......আর এইখানেই যদি শেষ না করি, তাহলে আজকের মেইল মিস্ করব। যে-কোন মুহূর্তে চলে যাবে। আমাদের একটা ট্যুরিং ফোর্ড গাড়ি আছে। তাইতে করে আমরা পোস্ট অফিসে যাই।

পরের চিঠিতে এইটাই আরো আলোচিত হবে। তাছাড়া টাবির প্রবন্ধ দুটিও। আমি ঐ প্রিয় ছেলেটিকেও চিঠি লিখব। আমি ভাল আছি এবং ওরা বলে আমি ইমপ্রুভ করছি। আমাকে উৎসাহিত করবার জন্য ওরা যা বলে, আশা করি সেগুলো সত্য কথাই বলে। আমার চিঠিপত্রের ব্যাপারে এখানে অনেকেরই খুব কৌতূহল। যে চিঠিগুলো 'ডাকে' যায় তার ঠিকানা পড়ে, এবং যেগুলো আসে তার ওপরে মন্তব্য করে। যাক্, কী এসে যায় তাতে? আমার স্নেহের বৎসকে আশীর্বাদ ও প্রাণভরা সদা ভালবাসা, তোমাকে ও টাবিকে।

(নিম্নলিখিত চিঠিটি হাতে লেখা নয়। টাইপড্ চিঠি—মূলে চিঠির কপি। চিঠিটির ওপরে কোন সম্বোধন নেই, নীচেও নাম সই নেই। মনে হয় চিঠিখানি বশী সেন মহাশয়কে লেখা। কারণ শ্রীমতী বুয়েস্টার, শ্রীমতী ওর অন্যান্যদের লেখা চিঠিগুলির নীচে নাম সই আছে। কেবল সেন মহাশয়কে লেখা চিঠিতে নেই।)

Grand Isles
July 17th 1929.

এখানে এসে খুব ভাল হয়েছে। কী যে আরাম বোধ করছি। এখন বুঝতে পারছি আমার একটু বিলাসিতা চাই। অন্ততঃ তার অভাবটা বোধ করি যখন পাই না। অজিয়ানে যে জীবনযাত্রা গ্রাম্যমত ছিল, কিন্তু সেখানে থেকে আমার যেরূপ উপকার হয়েছে, এরকম কোথাও হয়নি। শেষ দু' সপ্তাহ ডেট্রয়েটে খুব বেশি কাজ করেছি। বেশির ভাগ সময় বাইরে কাজে যেতাম যেমন আগেকার দিনে করতাম। মানসিক দিক দিয়ে এটা খুব ভাল হয়েছে আমার পক্ষে। এই অভিজ্ঞতাটুকুর প্রয়োজন ছিল আমার। বাসে কোথাও যাওয়া বা পোস্ট অফিসে যাওয়া, কোথাও গিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করা, বা কোন ডিনারে যাওয়া অথবা যে কোন অন্য কাজ করতে কোন দ্বিধা করতাম না। সত্যি কথা বলতে কী, মাঝে মাঝে একটু বেশি করে ফেলেছি—যেমন আগেও করেছি। কিন্তু আঃ, মনে একটু খুব নিশ্চিন্ত ভাব—'আমি করতে পারি।' ফলে শেষটায় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম এবং ক্যানাডা গিয়ে খুব বিশ্রাম হয়েছে—এটাই দরকার ছিল। মিসেস অব্ ১ একটি পাকা রাঁধুনি এবং কী রকম খাবার দরকার, সেটি ভাল বোঝে। ওর খাবার সবসময় খুব ব্যালান্সড্। ওষুধপত্র কদাচিৎ খেয়েছি! আমাদের ওদের মধ্যে পেয়ে ওরা যেমন খুশী তেমনি ওদের ভালবাসা। সেইটাই মনে ওষুধের কাজ করেছে। আমার যা-কিছু২ ছিল, সব ওদের দিয়েছি এবং ওরা সেটুকুকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসাসহ গ্রহণ করেছে।

তুমি শুনলে খুশী হবে ওখানে একটি তেব বছরের ছেলের ওপরে আমি সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছি। রাত্রে যখন আমি আলোচনা শুরু করতাম ও বিছানা থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে আসত। একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে মেঝেতে বসত। আমাদের যা কিছু গভীর আলোচনা শুরু হত তিন বছরের প্যাটসী ঘুমুলে পরে। জেগে থাকলেই ও চাইত সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে রাত্রি ৯টার সময় কার্টারকে শুতে পাঠানো হত। ও বসবার ঘরে কৌচের ওপরে শুতো আর ঠিক তার বাইরের বারান্দায় আমরা বসতাম। রাত্রি এগারোটা নাগাদ ওর মা ওকে তাড়া দিয়ে শুতে পাঠিয়ে দিতো কিন্তু তখনও ও আমাদের আলোচনা শুনত বুঝতে পারতাম পরদিন আমাকে একা পেয়ে ও যেসব প্রশ্ন করত তাই থেকে! প্রত্যেকটি বিষয়ে ওর কী যে আগ্রহ ছিল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম আমি যে গল্পগুলি বলি কেবল সেইগুলোই ওর আকর্ষণ। সেগুলো ওর ভাল লাগত ঠিকই, কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করত নানাবিধ যোগ সম্বন্ধে। আমাকে বলত 'হ্যাঁ, এখন আমি রাজযোগ এবং কর্মযোগ বুঝতে পারি, কিন্তু ভক্তিযোগের কথা আপনি কী বলছিলেন? আর প্লিজ ওম্ তৎ সৎ কী করে বলতে হয় আমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন, আর ঐ যে আপনি শেষকালে বলেন 'শিবোহম্' সেটাও। অতএব বারবার আমরা দুজনে মিলে সেটুকু বলি। তখন সে বল্লে "ওটুকু আমাকে সংস্কৃত ভাষায় লিখে দিন।' আমি ওম্ তৎ সৎ লিখতে পারি, কিন্তু অন্যটা (শিবোহম্) লিখতে অসুবিধে হয়!' যাই হোক শেষ পর্যন্ত মনে পড়ল। ও ইংরাজী অনুবাদে সুন্দর কয়েকটি কপি করল, তারপর বারবার বলে চলল ওম্, তৎ, সৎ ইত্যাদি। এরপর হঠাৎ বলে উঠল 'গি' আমার ইচ্ছে আপনি যাবেন না। আমার বড় ইচ্ছে আপনি পুরো গ্রীষ্মকালটা থাকুন। থাকবেন?'

কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না। শেষে বলল, 'আগামী সপ্তাহে মিসেস জুপ আসবেন তখন তো আমার জন্য আর ঘর থাকবে না।' ছেলেটার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, 'আমি ওঁকে আমার বিছানা দিয়ে দেব, আমি ছাতের ঘরে শোবো।' ছাতের ঘরে কেবলমাত্র ক্যানভাসের ছাত এবং বাড়ির যত আজেবাজে জিনিস গুদাম হয়ে আছে! কী ভাল ছেলেটা!

---

(১) ক্রিস্টিন ভারতবর্ষে যখন অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন শ্রীমতী ওর যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

(২) প্রতিদিন স্বামীজীর বাণী, অদ্বৈতবাদ ইত্যাদি আলোচনা করতেন।

মিডল্যাণ্ডে যাবার সময় সারা রাস্তা আমরা ওম্ তৎ সৎ
...নি উচ্চারণ করতে করতে গিয়েছি। আরম্ভ করল কার্টার।
...কভাবে আমাকে বলল 'যদি আমি আপনাকে পঞ্চাশ সেণ্ট
(আমি জানতাম ওর সঞ্চয়ের ধন কেবলমাত্র পঞ্চাশ সেণ্ট।)
...আপনি ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে আমাকে
...সংস্কৃতের প্রথম বই কিনে পাঠাবেন? আমি
...তে শিখতে চাই।' শেষ কথা ও আমাকে বলেছিল 'দু বছরের
...আমি ভারতবর্ষে যাবো!'

স্বামীজী বলতেন 'তোমাদের গোখরো সাপে ছোবল
...আমি তোমাদের আমার জালে ধরেছি। তোমরা আর
...তে পারবে না।' কথাটা খাঁটি। দেখলাম এই হানি ছার্টারের
...টি মানুষের বেলায়ও ঠিক তাই—এমন কী ছেলেটাও।

...t may take a whole life time for him, he may
...n the whole gamut of experience, but the
...bra has bitten him. It was worthwhile. I
...onder if that is way I had to go there."

ক্রিস্টিনকে লেখা গোখলের চিঠি

(৬)

Servants of India Society
Poona City
23rd June, 1907

ভগিনী ক্রিস্টিনা,

মাসখানেক হল কলকাতা থেকে ফিরেছি। তারপর থেকে
...র কতকগুলি দুশ্চিন্তা ও দুঃখের ঘটনা ঘটে গেল। এর
শেষেরটি সবচেয়ে মর্মান্তিক।

দিনদশেক আগে কাগাল থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম
আমার বড় ভাই খুব অসুস্থ। এই ভাই বাবার মৃত্যুর পর
আমার জন্য যা-কিছু করেছেন, আমাকে লালনপালন
...ন। এদিককার বড় ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সবচেয়ে
যে ট্রেনটা পাওয়া সম্ভব হল, তাইতে চেপে কাগাল গেলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম দাদার অবস্থা অত্যন্ত আশংকাজনক
এবং ওঁকে বাঁচাতে হলে এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মিরাজে
নিয়ে যেতে হবে। ভারতের এই অংশটিতে ভাল চিকিৎসা পেতে
হলে কাছাকাছির মধ্যে মিরাজ একমাত্র জায়গা। অতএব পরদিন
অনেক হাঙ্গামা করে তাঁকে মিরাজে নিয়ে গেলাম। পথযাত্রা খুবই
কষ্টকর ছিল কিন্তু দাদা সেটা সহ্য করে নিয়েছিলেন। সপ্তাহ-
খানেক কাটল। প্রথম দুদিন সামান্য উন্নতি মনে হয়েছিল কিন্তু
শেষটা কোন চেষ্টাই সফল হল না। পরশু সকালে তিনি মারা
গেলেন। কাল সকাল এখানে ফিরে এসেছি। আর এসে দেখলাম
আমার জন্য যে চিঠিগুলি অপেক্ষা করছে, তার মধ্যে আপনার
বারো তারিখের চিঠি।

দাদা যে আমার কাছে কতখানি ছিলেন, সে-কথা ভাষা
দিয়ে বোঝানো যাবে না। আমার বারো বছর বয়স থেকে তিনি
আমার পিতৃস্থান অধিকার করেছিলেন, আর যে প্রভূত পরিমাণ
স্নেহসম্পদ তিনি অকৃপণভাবে আমার ওপরে ঢেলে দিয়েছিলেন
এত বছর ধরে, তার তুলনা এই ভারতবর্ষের মত দেশেও আর
পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তিনি ছিলেন আমার জীবনের প্রধান
খুঁটি। আজ ক্লান্ত, রিক্ততাবোধে আমাকে আমার সমস্ত দায়িত্ব
নিয়ে একলা যুঝে যেতে হবে। দাদার বিধবা স্ত্রী চারটি ছেলে
রেখে গিয়েছেন। বড়টির বয়স বারো মাত্র। এখন তাদের দেখাশুনো
আমাকে করতে হবে—মানে আমার ওপরে আরও খানিকটা কঠিন
দায়িত্ব। প্রথমটায় আমি বিমূঢ় বোধ করলাম। কিন্তু ভেবে
দেখলাম পরে সবই ঠিক হয়ে যাবে এবং সেই আশায় এই কঠিন
আঘাত যা আমার ওপরে এসে পড়েছে তাকে আমি নত হয়ে
মেনে নিচ্ছি।

আগামী মাসে সপ্তাহখানেকের জন্য আমি কলকাতায়
যেতে পারি ভাইসরয়ের মেমোরিয়াল সংক্রান্ত কাজে। আমি এর
উদ্যোক্তা। আমি এই মেমোরিয়ালকে নিজেই সিমলায় নিয়ে
যাবো এবং ভারত সরকারের হাতে এটি যাবার আগে সপ্তাহখানেক
লাহোরে থেকে এর বিশদ বিবরণ সব সংগ্রহ করে নিয়ে যাবো।
সম্ভবতঃ সিমলার কাজ ব্যর্থ হবে এবং সেক্ষেত্রে অক্টোবর নাগাদ
আমাকে ইংলণ্ডে যেতে হতে পারে। তবে ইতিমধ্যে নতুন কোন
সম্ভাবনা দেখা দিলে এ-পরিকল্পনাগুলি বদলে যেতে পারে।
আমি নিজেও M. Morley'র উক্তি পড়েছি এবং বেশ আপত্তি-
জনক মনে হয়েছিল। তবে ওঁকে সেজন্য খুব দোষ দিতে পারি
না। সিস্টার নিবেদিতা ও বোসেদের আমার কথা স্মরণ করিয়ে
দেবেন।

For ever
G. K. Ghokhale

চলবে

ক্রিস্টিন ভারতবর্ষে আর ফিরে আসেননি। ১৯৩০-এ তিনি
মারা যান।

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

(রহস্য উপন্যাস)

হতে অনেক কিছুই পারে। ফাঁক এ থিওরীতেও আছে।'

'কি ফাঁক ?'

'এক নম্বর। বন্যা লাল এনলার্জমেন্টগুলো পেল কোথায় ?'

'উত্তর সোজা। খুনী এক্সট্রা শট নিয়েছিল। এনলার্জ করে দেখেছিল কি রকম দাঁড়াচ্ছে। সেই থেকেই খান কয়েক দিয়েছিল বন্যাকে।'

'আজ্ঞে না। খুনীকে অত কাঁচা ভেব না। বন্যার হাতে এনলার্জমেন্ট চালান করা মানে নিজের প্ল্যান নিজেই ভেস্তে দেওয়া। ফটোগুলো পরে তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসেবে প্রয়োগ করা হতে পারে তো ? পাগল না হলে এমন আহাম্মুকি সে করবে না। না, ফোয়ারা না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বন্যা লাল খুনীকে খুন করতে সাহায্য করেছে। যে মেয়েকে নিয়ে খুনের প্লট সে সাজিয়েছে, খুনের জায়গাতেই যে মেয়ের ফটো নিয়েছে, সে মেয়ে নিশ্চয় ধোয়া তুলসী পাতাটি নয় এবং খুনীও জেনে-শুনে তাকে ভীড়ের মধ্যে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।' ষড়যন্ত্রটা দুজনেরই।'

সিরিয়াস চোখে তাকাল ফোয়ারা।

'সুমন্ত, তুমি বলছ কি! খুনী তাকে হাতছাড়া করলে বিপদে পড়বে, এই তো ?'

'তাই নয় কি ?'

'তাহলে...তাহলে...সুমন্ত, সে কি আর বেঁচে আছে ?'

'হোয়াট !'

'খুনী তাকেও শেষ করে দিয়েছে।'

'মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু আপাততঃ সম্ভাবনাটা মাথার মধ্যে রাখতে চাই না। এই জট ছাড়াতেই অস্থির—আবার একটা জটলেই গেছি আর কি। থিওরীটা মোটের ওপর সুবিধের মনে হচ্ছে না। কারণ, ভিত নড়বড়ে আরও একটা ব্যাপারে।'

'আবার কি ব্যাপার ?'

'সনাতনকে ওর ক্যামেরা-ট্যামেরা সমেত গঙ্গার ঘাটে নিয়ে ফেলল কি করে খুনী ?'

'বন্যাকে হাত করতে পেরেছিল বলে। বন্যা তো একই চক্রান্তের চক্রী। ধরো, খুনী একজন পুরুষ এবং ফটোগ্রাফার। বন্যা আর সনাতনের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিল, আউটডোর ন্যুড ছবি তোলার উপদেষ্টা হিসেবে ?'

'মাই লিট্ল পরী, তুমি একটা জিনিয়াস। মার্ভেলাস! ক্রাইমের লাইনে দয়া করে এসো না—আমাদের চাকরী যাবে।'

'খুশী ?'

'একটু।'

'একটু কেন ?'

'কারণ এইমাত্র যে থিওরীটা কপচালে, ফাঁক তার মধ্যেও রয়েছে।'

'যেমন ?'

'অজ্ঞাত ফটোগ্রাফার যদি গঙ্গার পাড়ে শুক্রবার গিয়েই থাকে সনাতন আর বন্যার সঙ্গে, তাহলে আগে সনাতনকে খুন করে পরে নেগেটিভগুলো এক্সপোজ করল না কেন ? অথবা, শটগুলো আগে নেওয়ার পর সনাতনের মাথা ফাটালো না কেন ? কয়েক হপ্তা আগে ফটো তোলার কি দরকার ছিল ?'

চিবুক তুলে চোখ ছোট করে অনুকম্পা ভরে আমাকে নিরীক্ষণ করল ফোয়ারা।

'জবাব তারও আছে, মাই লিট্ল কিংকং।'

'আছে ? শুনি তো।'

'ধরো বন্যা পোজ দিয়েছিল অরিজিনাল শটগুলোর। কিন্তু শুক্রবার মিস্টিরিয়াস ফটোগ্রাফার আর সনাতন অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে গেল গঙ্গার পাড়ে। এই মেয়েটির সঙ্গেও হয়ত ষড় ছিল আরেকজন ফটোগ্রাফারের। কিন্তু শুক্রবার কোনো ছবিই উঠল না। দুজনে মিলে খুন করল সনাতনকে। যাবার সময়ে তোমার জন্যে রেখে গেল বন্যার ফটোগুলো। ছবি তোলার অকুস্থলে বন্যার তাই কোনো সন্দেহ হয় নি।

কেননা, প্ল্যান ছিল অন্য মেয়েকে নি
গিয়ে খুন করা হবে সনাতনকে।'

'ফোয়ারা, ইউ আর ক্লেভার! বড়
বেশী ক্লেভার। অতি চালাক। ফলে গল
দড়ি পড়ল বলে। কি বলতে কি ব
ফেললে বুঝেছো ?'

চক্ষু বিস্ফারিত হল ফোয়ারার।

'না তো।'

'ফটোর মেয়ে যে তুমি নও, তা প্র
করার জন্যেই তোমাকে নিয়ে গিয়ে এ
ছবি তুলতে হয়েছে আমাকে। এখন য
দেখা যায়, ফটো তোলা হয়েছে কয়েক হ
আগে, তাহলে আমি এইটুকুই প্রমাণ কর
পেরেছি যে কয়েক হপ্তা আগে তুমি প
দাও নি। শুক্রবার যে সনাতনের সঙ্গে তু
ছিলে না, সেটা কিন্তু প্রমাণ করি
তুমিই বললে শুক্রবার সনাতনের
বন্যা যায় নি অন্য একটি মেয়ে গিয়েছি
সেই মেয়ে তুমি হলেও হতে পার।'

ঘটনাকে ঘটনার মত বলতে গ
নির্দয় না হয়ে থাকা যায় না। ফোয়া
মুখ থেকে রক্ত নেমে গেল আ
কথায়।

'কিন্তু.... ডার্লিং....তুমি বি
করো, সনাতনকে আমি খুন করি নি।'

কাজ হল ঐ 'ডার্লিং' শব্দটায়
উৎকণ্ঠাময় সেই মুহূর্তটিতে শব্দটা লা
ভারের মিঠে আমেজের মতই নি
ছড়িয়ে গেল স্নায়ুতে স্নায়ুতে। বড়
লাগল শুনতে। কান যেন জুড়িয়ে গে
উঠে গিয়ে দু হাতে ওর মুখটি তুলে
ঠোঁট রাখলাম ঠোঁটের ওপর। নিঃশে
হয়ে মিলিয়ে গেল সব উৎকণ্ঠা।

বললাম—'আমি জানি তুমি
করো নি।'

'জানো ?' ব্যাকুল চাহনি মেলে
যেন আমার মনের কথাকে খুঁজতে
চোখের তারার মধ্যে।

'জানি। অজানা সেই ফটোগ্রাফ
সঙ্গে খুনের ধান্দাতে যদি তুমি থা

দেখতে পেতে না। যাই হোক, একটা গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেরোতে আর পারছি না। বন্যা লাল টাকে না পাওয়া পর্যন্ত রহস্যের কিনারা হবে না। সুতরাং সব ভাবনা শিকেয় এসো আর এক গেলাস পান করা যাক।'

অতএব দৌড়েছি মিত্তিরে আবার শরাব করলাম। তার পরেও চলল আরও এক গেলাস। ওকে ধরে ধরে নিয়ে ট্যাক্সিতে তুললাম। বাড়ীতে পৌঁছে দিলাম। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নয়নে চেয়ে ফোয়ারা বললে একটু বসে হয় না? আমি তো জানি একটু মানেই ঘণ্টা কয়েক থেকে যাওয়া। তদন্তে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে অফিসারের এত মাখামাখি ভাল নয়—তায় আবার সে যদি দেখতে ভালো মেয়ে-মানুষ হয়। তদন্তের খাতিরে যা করেছি, তা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং নয়। চিবুক ধরে পদ্মিনী মুখ তুলে ফিস করে বললাম, 'কেসটা শেষ হয়ে গেলে আসব।'

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি।'

তারপর মনোবল অটুট থাকতে থাকতেই দুড়দাড় করে নেমে এলাম নীচে।

পরদিন সকালে খুব খারাপ মুড নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম। ডিপ্রেসনে ভুগছি। মনে আর উদ্যম নেই। গত কয়েক দিন অফিসে প্রায় যাই নি বললেই চলে, আজকে যেতে হবে। দিল্লী থেকে টেলিফোন মেসেজের আশায় থাকতে হবে। মুড খারাপ সে জন্যে হাতের মামলা নিয়ে আপাততঃ আর কিছু করবার না থাকলেও রুটিন কাজ অনেক আছে। ব্যস্ত থাকা যাবে। কিন্তু দিন চলে যাচ্ছে অথচ হয়ে যাচ্ছে অমূল্য বরাটের চেহারাটা চোখের সামনে ভাসলেই। ডেকে বসেন? এই কদিন কি করেছি রিপোর্ট শুনতে চান? আউট-ডোর ডিউটি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমার নাগাল পাননি—কিন্তু যেই শুনবেন অফিসে আছি, তলব করবেন। দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে উঠছিলাম বার বার।

নীতিগতভাবে আমি যা করেছি তার নেই। এক জাল থেকে বেরোতে আরেক জালে জড়িয়ে গিয়েছি। ন্যুড ফটো তোলার সময়ে মনকে বুঝিয়েছিলাম কাজটা পুলিশী পদ্ধতির মধ্যে পড়লেও তদন্তের মধ্যে। সন্দেহভাজন নারীর পক্ষে সনাতন গাঙ্গুলীকে খুন করা সম্ভব কিনা, হাতে কলমে যাচাই করছিলাম; যুক্তি দিয়ে নিজের চামড়া বাঁচাতে চেয়েছিলাম। এক্সপেরিমেন্টের পর দেখা গেল, ফটোগ্রাফের ফোয়ারা পোজ দেয় ভাল, তার শেষ ভাল, তার সব ভাল। সুতরাং ফটো তোলার অপরাধের ক্ষমা পেতাম, বিশ্বাস এসেছিল মনে। এখন সে বিশ্বাস কর্পূরের মত উবে গেছে। যে যুক্তির জোরে এত কাণ্ড, সেই যুক্তিই আমাকে ফাঁসিয়েছে।

এত কাণ্ডকারখানার পর কি প্রমাণ করলাম? না, ফোয়ারা কয়েক সপ্তাহ আগে ফটো তোলে নি। কিন্তু সে যে গত শুক্রবার সনাতন নিধন করে নি—তা তো প্রমাণিত হল না। আমার প্রাইভেট মত—ফোয়ারা নির্দোষ। ও যা বলেছে, সব নির্জলা সত্যি; সনাতনের গাড়ু শূন্য দেখে ফিরে গিয়েছিল স্বগৃহে। কিন্তু অমূল্য বরাট লোকটাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। সুবোধ বালকের মত আমার কথা তিনি বেদবাক্য বলে গ্রহণ করবেন তা তো নয়। হাড়ে দুর্বো গজিয়ে ছাড়বেন। বেকায়দায় পড়েছি শুধু একটা অকমার্ক অপরাধের জন্যে নয়—খুনের সন্দেহ থেকে বেরোতে পারে নি এমন একটি মেয়ের মনের সঙ্গে নিজের মন মিশিয়ে দেওয়ার জন্যেও বটে। ফোয়ারা দোষ আমার চোখে নির্মল—আইনের চোখে নয়।

কেননা, বাড়ী না গিয়ে ফোয়ারা অনায়াসেই গঙ্গার পাড়ে যেতে পারত সনাতন আর সেই লোকটার সঙ্গে যার গলা টেলিফোনে শুনতে পেয়ে চলে এসেছিলেন। অবশ্য এর বিরুদ্ধেও বক্তব্য আছে। যেমন, লোকটা তাহলে খান কয়েক ফটো সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। যে ফটো দেখলে মনে হবে যেন সনাতনই শুক্রবারে ন্যুড মেয়ের শট নিয়েছে। তার মানে, একটা ঘোর ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়ে পড়ছে ফোয়ারা। ব্যক্তিগতভাবে যুক্তিটা অপছন্দ হলেও পুলিশম্যান হিসেবে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। যে কোনো ছল ছুতোয় তিনজন যেতে পারত গঙ্গার পাড়ে। মনে পড়ল এ রকম একটা সম্ভাবনা ফোয়ারা নিজেই বলেছিল; বলেছিল, অ্যাডভাইস দেওয়ার অছিলায় নাকি অন্য এক ফটোগ্রাফার যেতে পারে, সনাতন আর মডেল মেয়ের সঙ্গে। সম্ভাবনাটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য হতে পারে—অন্যের কাছে নয়। অমূল্য বরাটের কাছে তো নয়ই। ওঁর বিশ্বাস খণ্ডন করার মত সত্যিকারের সাক্ষ্য প্রমাণও জোটাতে পারি নি আমি। গত শুক্রবার দুপুরে বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে গঙ্গার পাড়ে খুন হয়েছে সনাতন—এটা একটা ঘটনা। খুন করার জন্যে তার সঙ্গে একজন ছিল—সেটাও একটা ঘটনা। ঘটনা তো আর ধামাচাপা দেওয়া যায় না। দুটো ঘটনা থেকে যে সম্ভাবনাটি বেরোচ্ছে, সেটিকেও ধামাচাপা দেওয়া যায় না। সেটি এই: সনাতন ক্যামেরা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল ফটো তোলার জন্যে এবং জেটি-বিচ্ছিন্ন সন্নিকটে বা পাড়ে থাকার একমাত্র কারণ—ফটো তোলা হচ্ছিল ন্যুড মেয়ের।

ফোয়ারার পরিত্রাণ নেই। কেসটা ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছে ওর প্রতি। বেচারা? মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সত্যিই হয়ত পোজ দেয় নি ফোয়ারা। শুধু খুন করতে সাহায্য করেছে। তারপর বা ফেলে এসেছে যাতে মনে হয় আতংকে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালিয়েছে মডেল মেয়েটা।

দাড়ি কামাতে কামাতে জীবনে বোধহয় সেই প্রথম ঈশ্বরের শরণাপন্ন হলাম। মনে মনে বললাম, হে ঠাকুর, অমূল্য বরাট আজ যেন দারুণ ব্যস্ত থাকেন, অথবা যেন হেড-কোয়ার্টারের বাইরে থাকেন। আর যেন দিল্লীর পুলিশ আজকেই বন্যা লালকে পাকড়াও করে ফেলে। ঠাকুর অবশ্য আমার ইচ্ছে কতটা পূরণ করবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল—বিশেষ করে দ্বিতীয় ইচ্ছেটার বেলায়। বন্যা লাল যদি সত্যিই খুনের সাগরেদি করে থাকে, তার টিকি ধরা যাবে না এত সহজে।

তবে সুমন্ত সেনের কৃপায় এবার খুলে গেল।

চোরের মত ঢুকেছিলাম অফিসে। পাছে অমূল্য বরাটের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়, এই ভয়ে সোজা পৌঁছোলাম আমার টেবিলে। গিয়ে দেখি পেপারওয়েট চাপা একটা স্লিপ। এস-আই সুমন্ত সেন যেন এখুনি দিল্লী পুলিশের ইন্সপেক্টর মাধো সিংকে ফোন করে।

সত্যি সত্যিই ছোঁ মেরে টেলিফোন তুললাম, লাইন চাইলাম এবং পরবর্তী কয়েকটা মিনিট কয়েকটা শতাব্দীর মত বড় লম্বা মনে হল। ইচ্ছে হচ্ছিল আনন্দে ড্যাং ড্যাং করে নাচি, বগল বাজিয়ে গিটকিরি ছাড়ি। অচিরে ইন্সপেক্টর মাধো সিংয়ের পরুষ কণ্ঠ ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে। বন্যা লালকে খুঁজে পাওয়া গেছে।

'পেয়েছেন?' কি কষ্টে যে ভেতরের উত্তেজনা গলা পর্যন্ত উঠতে দিলাম না, তা আমি জানি আর ভগবান জানেন।

'বললাম তো পেয়েছি। উই ইনভেস্টিগেট কুইকলি। নেভার ওয়েস্ট টাইম।'

আমার মনটা তখন, বলব কি, ঠিক রেসের ঘোড়ার মত ছুটছে। এখন তো দিল্লী না গেলেই নয়। বন্যা লাল এ-তদন্তে এত ইম্পরট্যান্ট যে পার্টিকুলার মানি অপচয়ের প্রশ্নই ওঠে না। ইন্সপেক্টর মাধো সিংকে বললাম, বন্যা লালকে যেন নজরবন্দী রাখা হয়। আমি আসছি

বর্ধমানে লাভ হয়েছে বড় চাষীর

সুভাষ রায়চৌধুরী

…ও নভেম্বর মাসে বিশ্বের বড় ব্যাঙ্কার …হর্ট ম্যাকনামারাকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি …দেখাবার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল …কে। কারণ, বর্ধমান চাষবাসে পশ্চিম… …র মধ্যে সেরা বলেই। নিঃসন্দেহে এটা …ন জেলার চাষীবাসীর পক্ষে গৌরবের।

'বর্ধমান সেরা' কথাটা আমার নয়। …কার চাষবাস খতিয়ে দেখে এসে লিখে… …কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিক। …লিখেছিলেন, 'মাদ বাড়াক …। এই ধরনের প্রশংসার আরো নজীর …। কিন্তু তার কোন দরকার নেই। পরি… …ই বলে দেবে কেন বর্ধমান মান… …অথবা কেন সেরা'। … …বের সাড়াবাড়ি অনেকে পছন্দ করেন …, কৃষিতে বর্ধমান কতটা এগিয়েছে … কিছুটা সংখ্যা তথ্যের ওপর …বোঝাতে হবে।

…খ্যা তথ্যের ওপর আস্থা কম থাকলে …বরের জন্য পাঁয়ে পায়ে ঘুরতে হয়। … মানুষের পক্ষে শহরের কাছাকাছি …দের সুযোগ আছে এমন দু'একটা …ঘুরে দেখা সম্ভব। বর্ধমান জেলার …ন গ্রামে গেলে প্রথমে নজরে পড়বে …াড়ির সংখ্যা বেড়েছে। যেখানে আগে …ড়ি ছিল না। অথবা কম ছিল, … আজ পাকাবাড়ির ছড়াছড়ি। সবই …তে গেলে ধান বা আলু বেচা টাকায় …।

…ল গ্রামের প্রভাত রায় চাষীবাসীদের …একটা সমিতি করেছেন। রায় মশাই …বেশ মজার কথা বলেছিলেন। তাঁদের …আগে প্রাতঃকৃত্যের কাজ সারতে হত …জঙ্গলে, পুকুরপাড়ে। আর আজ …নিতে হয় কার বাড়িতে পাকা পায়… …নেই। ঠিক উল্টো। রায়মশায়ের মতে …মনেকে এটা হয়নি। হয়েছে কৃষির …র জেরে।

… সবটাই এমনিতে হয়নি। চাষবাসের …ন কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে এটা …ভব হয়েছে। সেচের সুযোগ যথেষ্ট …। ডি ভি সির সেচ থাকার জন্য …বিশেষ শুখা হলেও বর্ধমানের চাষী… …কম বেশি পাঁচ লাখ একরে সেচ …পেন। ময়ূরাক্ষী থেকেও পাওয়া যায় … হাজার একরে। অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ … মাধ্যমেও কম-বেশি প্রায় আড়াই …বে সেচের সুযোগ বেড়েছে।

বর্ধমান জেলায় আবাদী জমির পরিমাণ হল সাড়ে দশ লাখ একরের কাছ কম। এবং লোকসংখ্যা ১৯৭১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী প্রায় সাড়ে ৩৯ লাখ। শহরে বাস করেন জনসংখ্যার শতকরা ২৩ ভাগ। গ্রামের লোকসংখ্যা শতকরা ৭৭ ভাগ। কৃষিজীবী পরিবারের সংখ্যা হল দু লাখ ৬৫ হাজার। কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লাখ। গড়ে ফসল তোলা হয় বছরে একই জমি থেকে দেড়া। অর্থাৎ প্রায় ১৫ লাখ একরের কাছাকাছি দাঁড়ায়।

৫১ শতাংশ চাষীবাসীর জমির পরিমাণ আড়াই একর পর্যন্ত। মোট জমির শতকরা ১৭ ভাগ তাঁরা চাষ করেন। আড়াই থেকে ৫ একর পর্যন্ত জমির মালিকের সংখ্যা প্রায় ২৫ শতাংশ। এঁরা চাষ করেন মোট জমির শতকরা ২৫ ভাগ। ৫ থেকে ১০ একর পর্যন্ত জমির মালিক হলেন শতকরা ১৮ জন। এঁদের হাতে মোট জমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ। ১০ একরের ওপর জমি আছে শতকরা ছয় জনের হাতে। মোট জমির প্রায় ২৫ ভাগে তাঁরা চাষবাস করেন।

সম্প্রতি বর্ধমান সরকারি কৃষি খামারে সার সংক্রান্ত এক আলোচনাচক্রে জেলা শাসক শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন যে, এ পর্যন্ত বর্ধমান জেলায় চাষবাসে যে উন্নতি ঘটেছে তার সুফল ভোগ করেছেন বড় চাষীরা। অর্থাৎ যাদের হাতে ৭ একরের বেশি জমি রয়েছে। ইদানীং অবশ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দিকে বেশি করে নজর দেওয়া হচ্ছে। কম জমির মালিক চাষীরাও চাষ-বাসের কাজে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এবং ক্রমশঃ বেশি সংখ্যায় লেখাপড়া জানা যুবকেরা চাষবাসের কাজে এগিয়ে আসছেন। এ ব্যাপারে মহিলারাও পিছিয়ে নেই বলা যায় গেছে।

২৮২৫টি মৌজার মধ্যে ২২১০টিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। বিদ্যুতের সাহায্যে সেচের কাজ চলছে। চাষবাসের কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার যথেষ্ট বেড়েছে। যেমন ১নং ব্লকে ১০০টির বেশি ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলার গ্রাম তৈরির কাজে অংশ নিচ্ছে।

গেল বছর মোটামুটি দশ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। বর্ধমানের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রায় চার লাখ টন উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ঘাটতি এলাকার প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

প্রচুর ফসল ফলাতে সেচ যেমন দরকার, তেমনি ব্যবহার করা চাই রাসায়নিক সার। ১৯৬৬-৬৭ সালে নাইট্রোজেন ফসফেট ও পটাশ মোট ব্যবহৃত হয়েছিল ৫ হাজার ২৬১ টন। ১৯৭৫-৭৬ সালে এই সারের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭ হাজার ৯৭ টন। সুষম রাসায়নিক সার ব্যবহারে এই জেলার চাষীবাসীরা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মাটি পরীক্ষার সুযোগ এই জেলায় সবচেয়ে বেশি। সরকারি কৃষি বিভাগের ও ভারতীয় সার সংস্থার দুটি মাটি পরীক্ষাগার এই জেলার চাষীবাসীর প্রয়োজন মিটিয়ে অন্যান্য জেলার চাষীবাসীর মাটির নমুনা পরীক্ষা করেন। মাটি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচীর মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মীরা চাষীবাসীদের সঙ্গে চাষবাসের সব ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কর্মীরাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকেন। জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পালাক্রমে ঘুরে তিন ও পাঁচ দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে চাষীবাসীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বলা যায় যে, গ্রামে বসেই চাষীবাসীরা কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ পেয়ে থাকেন।

উন্নতমানের বীজের ব্যবহার এ জেলায় বাড়ছে

বর্ধমান জেলায় ব্লকের সংখ্যা ৩৩। তার মধ্যে ২৪টি ব্লক নিবিড় কৃষি প্রকল্পের আওতায়। বাকি ৯টি ব্লক শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে চাষের জমি কম। এবং সেচের ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত। মাটিও ভাল এবং কাঁকুরে। নানা অসুবিধে সত্ত্বেও বর্ধমানের চাষীবাসীরা চাষবাসে যে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা প্রশংসনীয়। ম্যানিলার আন্তর্জাতিক চাল গবেষণাগারের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ চ্যান্ডলার বর্ধমান জেলার চাষবাস ও ফসল দেখে মন্তব্য করেছিলেন 'এমনটি আর দেখি নি।'

আলোয় খেলা—১

অজয় বসু

হ্যালোজেন বাতির স্নিগ্ধ আলোমাখা মনোরম পরিবেশে কলকাতার ফুটবলে নতুন প্রজন্মের সূচনা ঘটলো।

সনাতন ক্রীড়ারীতিকে বিদায় দেওয়ার জন্যে, খেলোয়াড়দের সাজপোষাকের ঢিলেঢালা চেহারা ছেঁটেকেটে আটোসাঁটো করার মুহূর্তে, প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দেওয়ার লগ্নে কলকাতার ফুটবলের মনের মূলে আধুনিকতার বীজ বপন করা হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই। এখন বুঝি সেই বীজ শাখায় প্রশাখায় পল্লবিত হওয়ারই সময়। এক কথায়, আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে অঙ্গে। মনের গভীরে তা দোলা লাগাতে পারলেই আমাদের ফুটবলে আধুনিকতার পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রটি হবে সুগম।

ছিল অপরাহ্নের আসর। অধুনা স্থানান্তরিত হয়েছে সন্ধ্যায়। এই রূপান্তর অর্থবহ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সন্ধ্যার মোলায়েম আবহাওয়ায় খেলতে সুবিধে হবে। পরিশ্রমের ধকল কমবে। মেহনতী তরুণেরা বাড়তি প্রাণশক্তি উজাড় করে দিতে ফুরিয়ে যাবেন না। ফুরফুরে বাতাস গায়ে মেখে গ্যালারি জোড়া দর্শকদের ফুটবলের রস আস্বাদনে ভাল লাগবে। অসুবিধে হবে সেই ছেলেপুলেদের, আঁধার ঘনিয়ে এলেই বইয়ের পাতায় চোখ রাখার তাগিদ যাদের সামনে বড় হয়ে দেখা দেয়। তাদের ঝামেলা হয়তো বাড়লো। তবে ফুটবলের এবং চাকুরে মানুষের সমস্যা যে অনেক কমলো, তাতে আর সন্দেহ কী।

এগিয়ে যাওয়া সব দেশেই একালে আসর বসে সন্ধ্যাকালে। খেলা হয় আলোর মেলায়। ভারতকেও মাঝে মাঝে সেই সব আসরে হাজিরা দিতে হয়। শুনেছি যে প্রকৃতির রাজ্য থেকে হঠাৎ কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর মাঝে ছিটকে পড়ায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের অসুবিধে হয়েছে। অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়-চড় করেছে। সেই অনভ্যাস ও অস্বস্তি দূরীকরণের ব্যবস্থা এবারেই হলো পাকা।

ভালোই হলো যে নতুন কালকে আবাহন জানাতে স্বচ্ছন্দ পদে এগিয়ে এসেছে কলকাতা। পথ দেখালো মহানগরীই। তা, কলকাতা ছাড়া এ কাজের উপযুক্ততা আর কারই বা ছিল? ভারতীয় ফুটবলের তীর্থভূমিই তো কল্লোলিত কলকাতা। এই শহরে ফুটবলের সংসার পরিপাটী এখানকার ক্রীড়াঙ্গনও সারা ভারতের ঈর্ষার বস্তু। ভারতীয় ফুটবলের জন্মকর্ম এখানেই। 'জনক' নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী তো এই শহরেরই মানুষ।

ভারতীয় বণিক সমাজকে ধন্যবাদ। গাঁটের পয়সা ব্যয় করে তাঁরা কলকাতার ফুটবল-কাঠামোর ছিরি বদলাতে কর্মোদ্যমে জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ রাজ্য সরকারেরও প্রাপ্য। যেহেতু অন্য দুনিয়ার কারবারী বণিক সভাকে মাঠে টেনে আনতে সরকারই গ্রহণ করেছিলেন এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা। কলকাতার ক্রীড়ানুরাগীরা সেই পরিকল্পনারই সুফল ভোগ করতে চলেছেন।

বণিক সভার উদ্যোগে এক বিদেশী দল কলকাতায় খেলে গড়ের মাঠে নৈশ ফুটবলের উদ্বোধন ঘটিয়ে গেল। এই পরিকল্পনাও সুরুচির পরিচায়ক এবং এক ঐতিহাসিক লগ্নের সঙ্গে সুসমঞ্জস। ফুটবলের আধুনিক আসরে সেই দলেরই খেলা। সবচেয়ে মানানসই যে দল আধুনিকতার পাঠ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। শিখতে শিখতে এবং খেলতে খেলতে গরুর গাড়ীর যুগ পেরিয়ে জেট যুগে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তাদের খেলার ধরণ ভিন্ন জাতের। স্বতন্ত্র স্বাদের। অন্য মেজাজের। গ্যালারিতে বসে ওঁদের ক্রীড়াকৃতির সাক্ষী সাজার কালে আমাদের মেজাজের রঙও গিয়েছিল পাল্টে। ওঁদের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দেখা বা তুলনা করার কাজকে নেহাৎই আকাঙ্ক্ষা বলে মনে হয়েছিল। যেহেতু সার্বিক মূল্যায়নে আমাদের ফুটবল অনেক পেছনে পড়ে আছে।

যে দলটি কলকাতার নৈশ আসরে খেললো সেটি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় স্তরের দ্বিতীয় বিভাগভুক্ত—নাম পাখতাকোর। তবে স্বদেশের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হলে কী হবে, পাখতাকোর দলের ক্রীড়ারীতি যথার্থই উন্নত পর্যায়ের। এক পলকে দেখেই বোঝা গেছে যে ফুটবলের আধুনিক প্রথা প্রকরণ অধিগত করায় এই দলটি যেমন চিন্তা করেছে তেমনি সাধনা করেছে নিরলস।

ফুটবল শুধু গতরেরই নয়, মস্তিষ্কের খেলাও বটে। ভাল খেলতে হলে শুধু শারীরিক সঙ্গতির যোগাড় রাখলেই চলে না। সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের প্রেরণারও সমন্বয় ঘটানো চাই। মস্তিষ্কের তাগিদই খেলোয়াড়দের সৃজনধর্মীতায় প্রেরণা যোগায়। বিনা সেই তাগিদে খেলোয়াড়েরা কলের পুতুল বনে যান। মাঠে স্বতঃউদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কলের পুতুলদের কাজ নয়। সেকাজ সম্ভব তাদেরই পক্ষে যাঁরা পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাৎক্ষনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। যাঁরা তা পারেন তাঁদেরই আমরা বলি খেলোয়াড়। তাঁরা ভাঙেন, গড়েন, নতুন নতুন সৃষ্টির আনন্দে মেতে থাকেন।

অপরপক্ষের সাজানো প্রাচীর আগল ভাঙতে পাখতাকোরের খেলোয়াড়েরা নিত্যই নতুন কিছু করার সুযোগ খুঁজেছেন। তাঁরা সে সুযোগের ঠিকানা পেরেছেন। কখনো পারেন নি। কিন্তু কামাই পড়েনি। গতিময়তাই তাঁদের পথের পরম পাথেয়। ভারি পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াবিন্যাস। গায়ে যেন গা লাগে না। কী সহজেই না ফাঁক-ফোঁকর গলে মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বল নিয়ন্ত্রণে রাখা, পাস করা, জায়গা করে নেওয়া, দোলায় প্রতিপক্ষকে মাটাল করা, হেডিং, সবকিছুতেই সিদ্ধকর্মা। সবই অভ্যাসের গোলাম। সত্যো দেখা চোখের সুখ। মনের তৃপ্তি। এবং শিক্ষা পাওয়ার অবকাশ।

আমাদের খেলোয়াড় এবং প্রশিক্ষকদের কাছে ওঁরা ছিলেন শিক্ষণীয়, অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আমাদের ডাকসাইটে ক্রীড়াবিদরা কথায় কথায় বলে বেড়ান যে চার প্রথায় খেলার আমলে লম্বা বা সামনের দিকে থ্রু পাস বাড়াবার দিন বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব বল ঠেলো কাছি, আরাআড়ি। ওঁদের বক্তব্য যে কতো অসার পাখতাকোর চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিনেই তাঁরা দু দুটি গোল এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে লম্বা আক্রমন সাজিয়ে। আসলে কার্যকর পথ অবলম্বনে ছোট-বড়, ফরোয়ার্ড কস, রকম পাসেরই দরকার পড়ে। যেমন ব্যবস্থা তেমনিই যে নিতে হয় এ পাখতাকোরের ধারণা ছিল খুবই। কোনো বদ্ধ ধারণার গোলামী করতে রাজী ছিলেন না। তাই মুক্ত মনে মাঠে বাহারি অথচ কার্যকর খেলা তাঁরা আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন। খেলার ভলুষে আলোকিত আঙিনার লাবণ্য আরও বেড়েছে। তাঁদের দেখা অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা শুধু বাহ্যিক নয়। শিক্ষাপ্রদও বটে।

আলোয় খেলা—২

রূপক সাহা

ফ্ল্যাড-লাইটের মাদুলি ঝুলিয়ে কল-
র এক শতাব্দীর ফুটবল-বুড়ো এ
আধুনিক হলো। আলোর বন্যা, রঙের
রবাইয়ের চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও আমার
কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বরনখত পাক
—সেটা হলো, ফ্ল্যাডলাইটের কোরা-
ফুটবলকে কতটুকু চাঙ্গা করতে
। এ সম্পর্কে 'মেঠো' জনতার প্রতি-
কি তা জানতে চেয়েছিলাম— কেউ
ন এতে ফুটবলের উন্নতি অবধারিত,
র মতে ফ্ল্যাড-লাইট ফুটবল লীগে
করার কিছু অসুবিধেও আছে।

আমার প্রশ্নের উত্তরে আই এফ এ-র
সম্পাদক শ্রীদিলীপ ঘোষ বললেন—
ফুটবল খেলানো হচ্ছে বলে এবার
লীগ জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ
করতে পারব। চেষ্টা করছি যাতে একই
ফ্ল্যাড লাইটে দুটো খেলার ব্যবস্থা
যায়। তাহলে সব মিলিয়ে একদিনে
ম্যাচ খেলানো যাবে। সেপ্টেম্বরের
লীগ শুরু করার মাঝের এক দেড়
সময় ফাঁকা থাকায় আমরা ইন্ডিয়া
জন্য প্লেয়ার ছাড়তে পারব। এটাই
ন কাজ। ওই সময়ে প্লেয়ার পাঠাতে
যে হয় গেরোয়া লীগের জন্য। গত
এই নিয়ে অনেক ঝঞ্ঝাট হয়েছিল।'

মাত্র একটি মাঠে ফ্ল্যাড-লাইট অথচ
সব টিমকেই রাতে খেলতে হবে—
দিনের আলোয় প্র্যাকটিস করা টিম-
অসুবিধে হতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা
শ্রীঘোষ বললেন—'সব টিম যাতে
লাইটে ভালোমত রপ্ত হওয়ার সুযোগ
তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে। কেউ
অভিযোগ না করে একটি ক্লাব এতে
সুযোগ পাচ্ছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেক্রেটারী ডঃ
দাসের মতে ফ্ল্যাডলাইটের ব্যবস্থা
চেয়েও ঘেরা মাঠগুলোতে দর্শকদের
সন বাড়াবার ব্যাপারটায় 'প্রায়োরিটি'
উচিত ছিল। লোকে এখনও একটা
জন্য হন্যে হয়ে ঘোরে। তবে নৈশ-
অবশ্যই ফুটবলের মান বাড়াবে।
বললেন—'গভর্নমেন্ট আমাদের মাঠেও
ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন বলে শুনছি।
বছর হয়ে যায় তাহলে ওয়েল এ্যান্ড
হলে ফ্ল্যাড-লাইটে খেলতে বলার
আগে আমাদের যথেষ্ট প্র্যাকটিসের সুযোগ
দিতে হবে।'

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ফুটবল কোচ
শ্রীঅমরাজ ঘোষের মন্তব্য— 'ফুটবলের
উন্নতির সঙ্গে ফ্লাড-লাইটে খেলার কোন
সম্পর্ক আছে বলে মনে করি না। ইংল্যান্ড
ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে ফুটবল
খেলা হয় শীতকালে। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা
নেমে আসে বলে ওরা ফ্ল্যাড-লাইট ফুটবল
শুরু করেছিল। কলকাতার ফুটবল মরশুম
গরমকালে—যখন দিনের আলো অনেক সময়
পর্যন্ত থাকে। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবল
জগতের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য নৈশ-
ফুটবলে আমাদের অভ্যস্ত হওয়া দরকার।
তাছাড়াও প্রচণ্ড রোদ্দুরে খেলতে হয় বলে
আমাদের ছেলেরা তাড়াতাড়ি নিজেদের
ক্লান্ত করিয়ে ফেলে। রাতে খেলা হলে সেদিক
দিয়ে সুবিধে। এতে ছেলেদের স্ট্যামিনা
বাড়বে।'

খেলার মাঠে চৌত্রিশ বছর ধরে জড়িয়ে
থাকা ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীঅজিত মিত্রের
মতে ফ্ল্যাড-লাইটে খেলা হলে ফুটবলের
মান বাড়বেই। তবে খেলার সময় বৃষ্টি হলে
কি হবে বলা শক্ত। ফুটবল সীজনে বৃষ্টি
হবেই। সে সময় কৃত্রিম আলোর নীচে
প্লেয়াররা বল দেখতে পাবে তো।

মোহনবাগানের ফুটবলার বিদেশ বোস
বললেন—দিনের চেয়ে রাতের ফুটবল খেলা
সহজ। গরমে কষ্ট পেতে হয় না। দম
পাওয়া যায়, অনেক বেশী খাটতে ইচ্ছে
করে।' বিদেশ বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপে
একাধিকবার ফ্ল্যাড লাইটে খেলেছে—এবার
বার্লিনের দলটির বিরুদ্ধেও কলকাতায় খেলা
ওর এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ছোট ছোট ক্লাবগুলোর সমস্যা কিন্তু
আরো গভীরে। ময়দানে যত ফুটবলারকে
দাপাদাপি করতে দেখা যায় তার বেশীর
ভাগই আসে কলকাতার আশেপাশের জেলা-
গুলো থেকে। রাতে খেলা হলে ওদের
বাড়ী ফেরার সমস্যা দেখা দেবে। এ
সম্পর্কে উয়াড়ী ক্লাবের ফুটবল সেক্রেটারী
শ্রীশংকর সেনগুপ্ত বললেন আমার টিমে
পাঁচ ছজন প্লেয়ার বাইরের। রাতে খেলা
হলে ছেলেদের কলকাতায় রেখে দেওয়ার
ব্যবস্থা ছাড়া উপায় নেই। ক্লাবের ঘাড়ে এতে
চাপবে বাড়তি খরচ—কিন্তু দেবেটা কে?
এমনিতেই ফুটবলের বরাদ্দ তিরিশ হাজার
টাকায় কুলোয় না।

খেলার মাঠে শান্তি শৃংখলা বজায়
রাখার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার—ডি-সি
হেড কোয়ার্টারস শ্রী এ ঘটক ফ্ল্যাড লাইট
ফুটবল সম্পর্কে কোন মন্তব্য এখনই করতে
চান না। উনি বললেন—'লীগের খেলায়
কম্পিটিসন আছে স্বভাবতই থাকবে
গ্যালারীতে উত্তেজনা। দিনের আলোয়
দর্শক নিয়ন্ত্রণ যতটা সহজ রাত্রিরে ততটা
সম্ভব হয়ত হবে না মাঠের বাইরেও পর্যাপ্ত
আলো না থাকলে। রাতে স্ট্যাম্পেড হওয়ার
সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া রাতে ক্রাউড
ডিসপার্সড হতে সময় নেবে তাই বেশী সময়
পর্যন্ত ওদিকের বাস-ট্রাম চালানোর সাজে-
সানও আমরা দেব।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-কমের
ছাত্র শ্রীদিলীপ দত্ত মনে করেন—ফ্ল্যাড-
লাইট ফুটবল চললে পড়ুয়াদের অসুবিধে।
স্কুল-কলেজের ছাত্ররা খেলা দেখে রাত্রির
দশটায় বাড়ী ফিরে পড়াশুনার সময় পাবে
না। তা সত্ত্বেও ফুটবলের স্বার্থে নৈশ-
ফুটবল কাম্য।

কাঁকুড়গাছিতে থাকেন ব্যাংক-কর্মী
শ্রীকানাই বসু। ফ্ল্যাড-লাইট ফুটবলে
চাকুরীজীবিরা লাভবান। অফিস কাটবার
ধান্দা করতে হবে না।

নিউ আলিপুরের গৃহিণী শ্রীমতী
শান্তা সিনহা চৌধুরী খেলার খোঁজখবর
রাখেন। বললেন—'লোড শেডিংয়ের যুগে
ফ্ল্যাড-লাইট কেমন জমবে তাই ভাবছি।
আচ্ছা একটি দল তিন গোলে জিতছে,
খেলা শেষ হতে পাঁচ মিনিট বাকী—এমন
সময় লাইট নিভে গেলে কি হবে?

৭৯বি বাসের কন্ডাকটর মন্টু চরণ
দাস: 'খেলার মাঠের লোকেরা তাড়া দেয়
না বাবু। খেলা ভাঙার সময় বাস ওদিকে
নিয়ে যেতাম না। অফিস-টাইমে লোকসান
হোতো। রাতে খেলা হলে ওদিক থেকে
অফিসবাবুদের তুলতে পারব। আমাদের
ভাল হবে বাবু।'

দর্শক

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

মাদ্রাজে ৪১তম জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। খেলাটি ০—০ ও ১—১ গোলে অমীমাংসিত থাকার ফলে রেলওয়ে এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স দলকে যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ে রেলওয়ে দল ১৮ বার ফাইনালে খেলে মোট ১৫ বার চ্যাম্পিয়ান হল (এর মধ্যে ৪ বার যুগ্মবিজয়ী)। রেলওয়ে এইভাবে চারবার যুগ্মবিজয়ী হয়েছে: ১৯৬৬ সালে সার্ভিসেস ১৯৬৭ সালে তামিলনাড়ু, ১৯৭০ সালে পাঞ্জাব এবং ১৯৭৭ সালে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দলের সঙ্গে। আরও উল্লেখ্য, রেলওয়ে এই নিয়ে উপর্যুপরি ৬ বার ফাইনালে খেলে উপর্যুপরি ৪ বার রঙ্গস্বামী কাপ জয়ের দুর্লভ গৌরব লাভ করলো। রেলওয়ের আগে উপর্যুপরি চারবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে একমাত্র পাঞ্জাব (১৯৬৯-৭২)। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দল প্রথম অংশ গ্রহণ করে ১৯৭৬ সালে। তারা দ্বিতীয়-বারের চেষ্টায় চ্যাম্পিয়ান হল।

১৯৭৭ সালের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী দলগুলি চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলেছিল এবং প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স আপ দল শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ হয়েছিল—এ গ্রুপে দিল্লী ও রেলওয়ে, বি গ্রুপে তামিলনাড়ু ও সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয়, সি গ্রুপে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও বিহার এবং ডি গ্রুপে সার্ভিসেস ও পাঞ্জাব। লীগের সব খেলায় জিতেছিল বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান তামিলনাড়ু—৬টা খেলায় ১২ পয়েন্ট। লীগের খেলায় অপরাজিত ছিল : এ গ্রুপে দিল্লী ও রেলওয়ে, বি গ্রুপে তামিলনাড়ু, সি গ্রুপে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ও বিহার এবং ডি গ্রুপে সার্ভিসেস।

কোয়ার্টার ফাইনাল

রেলওয়ে ৮ : তামিলনাড়ু ৭ (টাইবেকারে)
এয়ারলাইন্স ৩ : পাঞ্জাব ১
দিল্লী ১ : বিশ্ববিদ্যালয় ০
সার্ভিসেস ৬ : বিহার ৫ (টাইবেকারে)

সেমিফাইনাল

রেলওয়ে ২—০ ও ৪—০ গোলে দিল্লীকে এবং ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ০—২ ও ৩—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল।

বাংলার খেলা

প্রাথমিক লীগের বি গ্রুপে বাংলার খেলা পড়েছিল। এই গ্রুপে তামিলনাড়ু ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। বাংলা এবং সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ৯ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছিল। শেষ পর্যন্ত গোলের গড়ের ভিত্তিতে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয় দল যেখানে ২১টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছিল সেখানে বাংলার পক্ষে ছিল ১৯টা গোল এবং বিপক্ষে ৪টে গোল। ১৯৭৭ সালের প্রতিযোগিতায় বাংলা ৭—০ গোলে অন্ধ্র, ৬—০ গোলে জম্মু ও কাশ্মীর, ১—০ গোলে গুজরাট এবং ৩—১ গোলে মধ্যভারতকে পরাজিত করে। সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিপক্ষে বাংলার খেলা ১—১ গোলে ড্র যায় এবং বি গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান তামিলনাড়ুর কাছে বাংলা ১—২ গোলে হেরে যায়। এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বাংলা এ পর্যন্ত পাঁচবার ফাইনালে খেলে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে তিনবার (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫২ সালে)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তান

প্রথম ক্রিকেট টেস্ট

ক্রিকেট কত যে অনিশ্চয়তার খেলা তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের সদ্য সমাপ্ত প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা। খেলায় জয়-পরাজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা না হয়ে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস ২৯১ রানের মাথায় শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩০৬ রানের দরকার ছিল। খেলার শেষ দিনের লাঞ্চের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১২৯ (১ উইকেটে)। খেলার এক সময় দেখা গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান দাঁড়িয়েছে ১৪২ (১ উইকেটে)। জয়লাভের জন্যে তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর ১৬৪ রান দরকার। এদিকে হাতে জমা ৯টা উইকেট, আড়াইঘণ্টা সময় ও ২০ ওভারের খেলা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় অবধারিত। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় দারুণ ভাঙ্গন নেমে এল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৩৭ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়ে গেলে পাকিস্তানের অনুকূলে খেলার হাওয়া ঘুরে যায়। এবার পাকিস্তানের জয়লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু পাকিস্তানের জয়লাভের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অপরাজিত শেষ উইকেট জুটি দুই পেস বোলার অ্যাণ্ডি রবার্টস এবং কলিন ক্রফট। রবার্টস ১০৬ মিনিট মাটি কামড়ে খেলেছিলেন। তাঁর সংগ্রহ ছিল ৯ রান। অপরদিকে তাঁর জুটি ক্রফট ৮ ওভার খেলে ৫ রান করেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসের ২৫১ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলা শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েডের মতে এই খেলাটি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে শ্রেষ্ঠ খেলা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ১৮০ রান (ওয়াসিম রাজা ১১৭ নট আউট)
ও ২৯১ রান (ওয়াসিম রাজা ...)
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৪২১ রান (... ১৫৭ রান)
ও ২৫১ রান (৯ উইকেটে। রিচার্ডস ৯২ এবং রয় ... ৫২ রান। সরফরাজ নওয়াজ ... ৪ এবং সেলিম আলতাফ ... ৩ উইকেট)

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

পোর্ট অব স্পেনের কুইন্স পার্ক ওভাল মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে ১—০ খেলায় এগিয়ে গেছে। দুই দেশের বর্তমান টেস্ট সিরিজের প্রথম খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

পাকিস্তান টসে জিতে ... করার দান নেয়। পাকিস্তানের ইনিংসের মাত্র ১৮০ রানের ... ইণ্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসের ... রান করে ১৩৬ রানে এগিয়ে ... ফ্রেডেরিকস ১২০ রান করেন। ... খেলোয়াড়-জীবনে এটা তাঁর ... খেলার চতুর্থ দিনে পাকিস্তান ... ইনিংস ৩৪০ রানের মাথায় ... ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভের প্রয়ো... রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস ... এক উইকেটের বিনিময়ে ১৪৮ ... করে। চতুর্থ দিনের খেলার ... গেল, খেলায় জয়লাভের জন্যে ... ইণ্ডিজের আর মাত্র ৫৭ রান দর... হাতে জমা ছিল দ্বিতীয় ... উইকেট এবং পুরো একদিনের ...

শেষ পঞ্চম দিনের খেলা... পাকিস্তান সহজে হার স্বী... পাকিস্তানের বোলিং এবং ফি... কড়া হয়েছিল। এইদিনের ... খেলায় পাকিস্তান তিনটে উইকে... এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ... বাউণ্ডারী করা সম্ভব হয়নি। ... নায়ক ক্লাইভ লয়েড বাউণ্ডা... জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০৫ রান ... ২০৬ রানে দাঁড়ায়—প্রয়োজনের ... রান বেশী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নবাগত ... কলিন ক্রফট ১৫ রানে ৯টি উই... ইনিংসে ২৯ রানে ৮) নেওয়ার ... অব দ্য ম্যাচ' আখ্যা লাভ করেন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান : ১৮০ রান (ওয়া... ৬৫ রান। কলিন ক্রফট ... উইকেট)
ও ৩৪০ রান (ওয়াসিম রাজা ... মহম্মদ ৮১ এবং মজিদ খা... রবার্টস ৮৫ রানে ৪ এবং ... রানে ৩ উইকেট)
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩১৬ রান (রয় ... ১২০ রান। মুস্তাক মহম্ম... ৪ উইকেট)
ও ২০৬ রান (৪ উইকেটে। ... ৫৭ এবং গ্রীনিজ ৭০ ... প্রাম ৫৯ রানে ৩ উইকেট)

দু'বছর আগে আমি স্পেন্সার্স থেকে একটি কেলভিনেটর কিনেছিলাম, কেননা আমার বন্ধুরা সকলেই একবাক্যে এটি কেনার স্বপক্ষে সায় দিয়েছিলেন। কেলভিনেটর কিনে আমি খুব খুশি হয়েছি কেননা এর থেকে কাজ পাচ্ছি চমৎকার। তাছাড়া আমার কেলভিনেটর অপূর্ব সুন্দর দেখতে—এবং যখনই আমার বন্ধুরা এর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন, তখনই গর্বে আমার বুক ফুলে উঠে।
বলেন, প্রণতি ব্যানার্জি, কেলভিনেটরের অসংখ্য সুখী মালিকদের একজন।
কেলভিনেটর
তৈরী করেছেন

স্পেন্সার্স
— ১৮৬৫ থেকে জনগণের সেবায় নিয়োজিত
SC. 662(b)-BEN
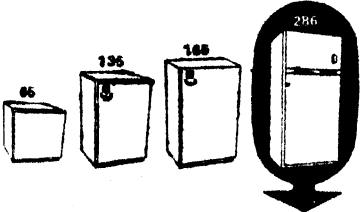
65
135
165
286
স্পেন্সার্স এণ্ড কোং লিঃ
১৫৩ মাউন্ট রোড, মাদ্রাজ-৬০০ ০০২, ১৯ এ, আলিপুর রোড, দিল্লি-১১০ ০৫৪, স্পেন্সার্স বিল্ডিং, ফোরজেট স্ট্রীট, বোম্বাই-৪০০ ০৩৬, ৭০ ডায়মণ্ড হারবার রোড, খিদিরপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৩
২৮৬, ১৬৫, ১৩৫ এবং ৬৫ লিটার উপযোগী পাওয়া যায়।
নতুন ২৮৬ লিটার মডেল, আপনা হ'তেই বরফ গলানো ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাসম্বলিত মডেলেও পাওয়া যায়।
কেলভিনেটর রেফ্রিজারেটর ২৮৬ ও ১৬৫ লিটার মডেল এখন আইএসআই সার্টিফিকেট চিহ্নিত।

আন্তিগোনে : কেয়া চক্রবর্তী

শেষ সাক্ষাৎকার

যে লোকটা আন্তিগোনে করে সে আবার কেমন করে বিবিধ ভারতীতে হর-লিকস্‌এর বিজ্ঞাপনে গলা দেয়, আকে মেলে না ভাই না! কেয়া চক্রবর্তী আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেই তো-বাধো বাধো লাগছিল আপনার। চোখ-দুটো একসময় বন্ধ হয়ে এলো। কপালে আলতো করে আঙুল ছোঁয়ালেন। তারপর ভারী হয়ে এলো তাঁর গলা, টাকার জন্য একটা কিছু তো করতেই হয়। অল্প থেমে কেয়া সরব হন, নিজস্ব খুব একটা খরচ কিছু নেই আমার; তবে কিছু ফিনানশিয়াল কমিটমেন্ট আছে। আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়ের বুকে পেস-মেকার বসানো আছে। দু বছর অন্তর পাল্টাতে হয়। দাম সাড়ে চার হাজার টাকা। এ ছাড়া অপারেশন ও হাসপাতালের খরচ আছে। আগে অধ্যাপনা করে পৌনে সাতশো টাকা হাতে পেতাম। চাকরী ছাড়ার পর বাঁধা ধরা কোন আয় নেই। একটা কোম্পানি হাউস ম্যাগাজিনে কিছু অনুবাদ করি। সপ্তাহে একদিন। তিন ঘণ্টা। রেডিওতে দু মাসে একবার নাটকের কল পাই। টেলিভিশনে এখন পর্যন্ত চারটে প্রোগ্রাম করেছি, তৃপ্তি মিত্র, রবি ঘোষ ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনবার, আর একবার নান্দীকারের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'তে অংশ গ্রহণ করে। ছবি করেছি দুটি, মঙ্গল চক্রবর্তীর 'প্রণয়পাশা' এবং স্বদেশ সরকারের 'জীবন যে রকম'। কিন্তু এগুলি সবই ভয়ংকর অনিয়মিত ও অনিশ্চিত অর্থ।

মানিকতলা অঞ্চলের এক ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলায় বসে কেয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। অভিনয় কেমন করে কেয়াকে টানলো সেই গল্পই শুনছিলাম তাঁর কাছে।

কেয়া বললেন, আমি নান্দীকারে প্রথম নাটক করি ১৯৬১ সালে। তখন আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। বাড়িতে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। কিছু-দিন নাটক করা প্রায় ছেড়েই দিই। এছাড়া অন্য একটা ব্যাপার ছিল। পড়াশুনা আমার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং মনে হত। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ানোর সময় আবার নিয়মিত নাটক করা শুরু হয়। পড়ানোর ব্যাপারটা নানা কারণে ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছিল আমার কাছে। যে সব ছেলেমেয়েরা ছোট-বেলা থেকে ইংরেজি ভাষা শেখার ঠিকমত সুযোগ পায় নি, তাদের হঠাৎ জোর করে ধরে (পারসেন্টেজ এবং পরে চাকরীর লোভ দেখিয়ে) শেকসপীয়র, শেলী, কীটস পড়ানো আমার হাস্যকর প্রহসন বলে মনে হত।

অবাস্তব সিলেবাস, বিশৃংখল পরীক্ষা-ব্যবস্থা এবং সবচেয়ে বড় কথা আমার একান্ত অন্তরঙ্গ, সৎ ও বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীদেরও পরীক্ষার পর চাকরী পাবার অনিশ্চয়তা— সব মিলিয়ে খুব খারাপ লাগলো। এদিকে থিয়েটারটা ক্রমশ আরও বেশি করে টান-ছিল। 'বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত গিরীশ কর্নাডের 'তোঘলক' নাটকে অংশ গ্রহণ করি এই সময়। পরিচালক ছিলেন, শ্যামানন্দ জালান। তোঘলক হন শম্ভু মিত্র। তোঘলকের বিমাতা ও প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় আমি। বহুদিন সকালে এই না রিহার্সাল করতে গিয়ে দেখেছি শ তোঘলক পর্বের ইতিহাস নিয়ে প করছেন। নান্দীকারে দেখতে পেতাম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সকাল থেকে উঠে লিখছেন, নাটক পড়ছেন এবং সন্ধ্যা আবার নান্দীকারের জন্য নাটকের রি দিচ্ছেন কিম্বা অভিনয় করছেন। পুরো নাটক নি[illegible] আছেন। নাটকের ম মানুষ [illegible] গেছেন তিনি। এ সব ঠিক করলাম, যে কোন ব্যাপারে পুরো মন দিতে না পারলে কাজ করা যা তখনই স্থির করলাম চাকরী ছে অনেকেরই আপত্তি ছিল তাতে। এম আমার স্বামীরও। কিন্তু আমার মা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যে লো ভালো লাগে না তাকে দিয়ে তা করানো

আমাদের মত নাটকের দলের কাতায় শো করে কোন লাভ হয় না, বলছিলেন, নান্দীকারের রঙ্গনার [illegible] বললেই তা বুঝতে পারবেন। ১৯৭০ আমা রঙ্গনা নিই। পুরো সত্তর সাল জুড়ে উত্তর কলকাতার অন্যতম দুর্গত এলাকা হয় ওই অঞ্চলটি। এমন এক একদিন হয়েছে যে সব দেড়শো টাকা সেল গেছে। অথ মালিকের ভাড়া, বিজ্ঞাপনের টাকা আনুষঙ্গিক খরচপত্তোর করতেই রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়া আমাদের কতকগুলি ব্যাপারও ছিল। লাভ না কারণ। যেমন ধরুন আমরা সপ্তাহে

জীবনযাত্রার পরতে পরতে পৃথিবীর নানা দেশের আবিষ্কারের ফসল। পেনিসিলিন থেকে মিনিবাস পর্যন্ত। ভালো জিনিষের আবার দেশী বিদেশী কি? রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্মে এরকম ছোট অর্থে স্বাদেশিকা হওয়া সাজে না। তাছাড়া আপনার যুক্তিটা আর একটু লম্বা করে দেখুন, ফলটা কি দাঁড়ায়। বিদেশী নাটকের রূপান্তর করে অভিনয় করা যদি অনুচিত হয়, শুধু নিজের দেশের নাট্যকারের লেখা নাটক অভিনয় করাটাই যদি কর্তব্য হয়, তাহলে বিদেশী বই পড়া কিংবা তার অনুবাদ করাও তো খারাপ, অনুচিত। অথচ ভেবে দেখুনতো, সোফোক্লেসের অনুবাদ হয় নি; শুধু গ্রীসের লোক পড়ছে আর অভিনয় করছে। কিংবা শেকসপীয়র শুধু ইংল্যাণ্ডে পঠিত এবং অভিনীত হচ্ছেন। আবার ধরুন বাংলাদেশের বাইরে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ যদি না হতো, তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক তার স্বাদ পেত কি করে? আমাদের কাছে যা ভালো লাগে—দেশী হোক, বিদেশী হোক, আমাদের নিজেদের লোকের কাছে পৌঁছে দেব—এটাই তো স্বাভাবিক আরও মজা কি জানেন? এত বছর ধরে এত জায়গায় অভিনয় করলাম কোন দর্শক কখনও কিন্তু এ প্রশ্ন তোলেন নি। নাটকের দেশ বিচার না করে রসের বিচারই করেছেন। তাছাড়া দেখছিই তো বাজারে পয়সা থাকলে, হলের মালিক হলে অনেকেই মৌলিক নাট্যকার রূপে পরিচিত হন।

আপনি কি বলেন ইবশেন, বেখ্‌ট ছেড়ে ছাদের ধরব? যে কোন কারণেই হোক এদেশে উপন্যাস এবং কবিতা লেখার ঝোঁকই বেশি। ভালো অরিজিন্যাল নাটক পেলে তো করিই। বিভিন্ন কবি ও ঔপন্যাসিককে পাকড়াও করে নাটক লিখে দিতে বলি—সুনীল গাঙ্গুলীকে বলেছি, শ্যামল গাঙ্গুলীকে বলেছি, শঙ্খ ঘোষকে বলেছি। এঁরা আমাদের শুভার্থী তাই জোর করতে পারি। ভালো বাংলা নাটক পেলেই করি—নটী বিনোদিনী, সবাই যার কুল পাড়তে, হে সময় উত্তাল সময়—করেছি। এখনও তো করছি সওদাগরের নৌকা। কিন্তু তাবলে বিদেশের মহান নাট্যকারদের রচনা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবো কেন?

প্রশ্ন : ক্ল্যাসিক বাংলা ছোট গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার কোন চেষ্টা আপনারা করেছেন কি? না করে থাকলে কেন করেন নি?

কেয়া : হ্যাঁ করেছি। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের পরিণীতা।

প্রশ্ন : ইতিমধ্যে যে কটি নাটকে অভিনয় করেছেন তার সঙ্গে নিজের মানসিকতাকে আইডেনটিফাই করতে পেরেছেন কোথাও? করে থাকলে কোন নাটকে, কোন চরিত্রে?

কেয়া : ভালো মানুষ এবং আন্তিগোনের মধ্যে আমি নিজের মানসিকতা খুঁজে পাই। ভালো থাকতে পারার সামাজিক সমস্যার কথা আছে ভালো মানুষে। আর আন্তিগোনেতে আছে ব্যক্তিগত বিদ্রোহের কথা। এ দুটি ব্যাপারই আমাকে খুব টানে—খুব বেশি করে ভাবায়।

প্রশ্ন : আপনার কি বিশ্বাস যে নাটকগুলি আপনারা অভিনয় করেন সেগুলি দিয়ে এদেশে সত্যিকারের সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব? যদি সম্ভব হয় কি ভাবে, না হলে তাই বা কেন?

কেয়া : যে দেশে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং অধিকাংশ লোকেরই নাটক দেখা কেন ভালোমত খাওয়া দাওয়া চিকিৎসার পয়সা নেই সেখানে শুধু নাটক করে একুণি সামাজিক পরিবর্তন আনা সম্ভব বলে মনে হয় না। তবে বহু ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। সেটা পরিবর্তনের প্রথম ধাপ। সেই চেষ্টাই করছি। পরিবর্তন বহুমুখী চেষ্টার ফসল—নাটক করা তার একটি দিক।

প্রশ্ন : ঠিক এই মুহূর্তের প্রয়োজনে এমন কোন রচনার কথা কী ভাবছেন যার নাট্যরূপ এই মুহূর্তে দেওয়া প্রয়োজন কিংবা নাট্যরূপে দেওয়া থাকলে তার অভিনয় প্রয়োজন?

কেয়া : হাঁ, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের ঝাঁসীর রাণীর জীবনীটির নাট্যরূপ দিলে খুব ভালো হয় মনে হয়। কিংবা ওঁরই লেখা মুণ্ডা বিদ্রোহের কাহিনীর নাট্যরূপ।

প্রশ্ন : বাংলা, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান এবং রুশ সাহিত্যের ক্ল্যাসিক রচনাগুলির মধ্যে কোন নারী চরিত্রটি আপনার সবচেয়ে মোহনীয় মনে হয়? সেই চরিত্র হিসাবে নিজেকে কখনও কল্পনা করে দেখেছেন?

কেয়া : বার্ণার্ড শ-এর সেণ্ট জোন নাটকের জোন অভ্ আর্ক এবং গোর্কির 'মাদারের' মা চরিত্র আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়। কিন্তু নিজেকে কল্পনা করতে ভয় করে।

প্রশ্ন : আপনার প্রিয় বাঙালী কবি কে? কবিতা কি নাটককে আরও গতিময় করতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেন?

কেয়া : জীবানন্দ দাশ। আর একেবারে হাল আমলের হলে শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের প্রায় সব কবিতা—বিশেষ করে সদ্য প্রকাশিত বাবরের প্রার্থনা খুবই ভাল লেগেছে আমার। কবিতা নাটককে গতিময় করতে পারবে কি না বলতে পারি না। কি রকম কবিতা এবং কি রকম নাটক তার ওপর নির্ভর করছে।

প্রশ্ন : বহুরূপী এবং পি এল টি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র এবং উৎপল দত্তকে কি আপনি বাংলা নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন? বাংলায় একটি জাতীয় নাট্যমঞ্চ তৈরির প্রচেষ্টায় শম্ভুবাবুর সঙ্গে আপনারা হাত মিলিয়ে ছিলেন কি? সেই প্রচেষ্টাই বা কতদূর এগুলো?

কেয়া : বহুরূপী এবং পি এল টি বাংলাদেশে এবং বাইরেও সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র এবং উৎপল দত্তর ভূমিকাও এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে এ ধরণের সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের মাঝখানে হঠাৎ দু চার কথায় উত্তর দেওয়া যায় না। বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য বি শুভার্থী দর্শকের দানে দু লক্ষের মত তোলা হয়েছিল। উদয়শংকর, অমলাশ সত্যজিৎ রায়, বিষ্ণু দে প্রমুখ গণ্য ব্যক্তিরা আবেদন জানিয়ে ছিলেন। নিজেও বিভিন্ন কাগজপত্রে চিঠিপত্র ছেন। কিন্তু রাজ্য সরকার এক খণ্ড ব্যবস্থা না করলে শুধু ওই টাকায় জমি-বাড়ি দুটো হওয়া সম্ভব নয়। অপেক্ষা করা ছাড়া গতি কি?

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় যে রাজ্যের তরুণ নাট্য-চলচ্চিত্র শিক্ষার্থ অভিনয় এবং অন্যান্য দিকে শিক্ষা জন্য স্বতন্ত্র একটি নাট্য একাডেমী করা উচিত? বর্তমানে এই জাতীয় ব্যবস্থা চালু আছে সেগুলি যথেষ্ট নয়?

কেয়া : নাট্য একাডেমী স্থাপন ধরুন ছেলেমেয়েরা অভিনয় শিখল পর? করবে টা কী? যথেষ্ট সংখ্যক কোথায়? যেগুলি আছে সেগুলিতেও পাওয়া যায় না—আমরা নিজেরা না। ভাড়াও প্রচণ্ড। সুতরাং শুধু একাডেমী করে কি হবে? যথেষ্ট সংখ্যক তৈরি হলে তার হল—অল্প ভাড়া পাওয়া গেলে তবেই তো তরুণ শিক্ষার্থ নাট্যচর্চা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর সঙ্গে শিক্ষানবিশী করতে পারেন অথবা নি অভিনয় করতে পারেন।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় না বেশি আঞ্চলিক নাটক অনুবাদ বাংলায় অভিনয় করা উচিত

কেয়া : হ্যাঁ মনে হয়। একাজ অনেকেই করছেন। আমি বলব ... গার্গীর উর্দু নাটক ... অনুবাদ করেছি, উর্দু কবির সাহায্য নিয়ে।

প্রশ্ন : বাংলা নাটকে প্রেম কি উজ্জ্বল? অথবা তার মধ্যেও নাটকীয়তা?

কেয়া : বাংলা নাটকে প্রেম যথেষ্ট কি না বলতে পারবো না। বিষ আমার খুব আগ্রহ নেই। আগ্রহ দারিদ্র্যকে স্পষ্ট করে এবং দায়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

প্রশ্ন : ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং নিক নাটকের মধ্যে কোন অভিনয় করে আপনি বেশি পান এবং কেন?

কেয়া : ঐতিহাসিক নাটকে তো বিশেষ অভিনয় করার সুযোগ নি। খুব ইচ্ছা করে—জাহান উদিপুরী কি ধরুন ঝাঁসীর বা ধাত্রী পান্না হয়ে যাই। সামাজিক বা অন্য যে কোন বক্তব্য আমার মনের মত হলে

ঋত্বিকের নাগরিক ছবিঘরে আসছে

গত বছর চৌঠা ফেব্রুয়ারি প্রচণ্ড জল ঝড়ের মধ্যে ঋত্বিক ঘটককে শেষবারের মত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আর এ বছর এই চৌঠা ফেব্রুয়ারিতেই টালিগঞ্জ পাড়ায় আমাদের সৌভাগ্য হল তাঁর প্রথম সন্তানকে রোগমুক্ত দেখবার—আমি তাঁর প্রথম ছবি 'নাগরিকের' কথা বলছি। আমার সঙ্গী ছিলেন ঋত্বিকবাবুর শেষ ছবির সহকারী পরিচালক ও তরুণ কবি অনন্য রায়।

নাগরিক-এর চিত্রনাট্য ১৯৫০-৫১ সালের রচনা। এর চলচ্চিত্রায়ণ শেষ হয় ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে। স্মৃতির অজস্র স্তর উন্মোচিত হয়ে মনে পড়ে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক, বক্তব্য প্রকাশের তাড়নায় কবিতা-গল্প-নাটক ঘুরে অবশেষে ছবির জগতে এসেছে। তাঁর স্বপ্ন বানানো হাসি কান্নার বদলে বাইরের কঠোর বাস্তবতাকে সে শিল্পরূপ দেবে। অনেক কষ্টে তৈরি হল 'নাগরিক' সেন্সর্ডও হল। কিন্তু হায়। ছবি মুক্তি পেল না।

সে যাই হোক, এতদিন পরে এই ছবির জীর্ণ প্রিন্টটাকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং শিগগিরই 'নাগরিক' বাণিজ্যিকভাবে মুক্তি পাচ্ছে।

আমাদের ছায়াছবির ইতিহাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত জীবন-যন্ত্রণার এটিই প্রথম বাস্তব শিল্পরূপ। পথের পাঁচালিতেও দারিদ্র্য আছে; কিন্তু তা পেলব ও নমনীয়। আমাদের আধুনিক রক্তস্রোতে তা সুদূর গীতি কবিতার অব্যক্ত চরণবন্ধের মতো। অথচ ঋত্বিক প্রথম থেকেই গদ্যময়, রূঢ় ও নিষ্ঠুর। এলোমেলোভাবেই তিনি ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারেন সুখী গৃহকোণ ও ইচ্ছাপূরণের মধ্যবিত্ত বাতাবরণ। সেখানেই এই ছবির প্রাথমিক সার্থকতা।

আজকে হয়ত তেমন উল্লেখযোগ্য মনে হবে না, অন্তত সমগ্র ঋত্বিক-নাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে, পঞ্চাশ দশকের সূচনায় কিন্তু এই বিষয়ই যথেষ্ট অপ্রত্যাশিত ছিল। অর্থনৈতিকভাবে ঘুন ধরা একটি পরিবারের সন্তান রামু। সে ভাবে চাকরী পেলেই

নাগরিকের সেই পুরনো পোস্টার যা এখনও দেওয়ালে লাগানো হয় নি

তাদের সুদিন ফিরে আসবে। কিন্তু না, রামুর চাকরী জোটে না। কালো, রূপহীন বোনের বিয়ে হয় না। বাবার একশো দশ টাকার পেনসনে সংসার চলে না। অবস্থা ধাপে ধাপে নীচে নেমে যাচ্ছে, মৃত্তিকার মতো সহিষ্ণু মা রও ধৈর্যের বাঁধ বুঝি ভেঙে পড়ে। অবশেষে বাইরের ঘরে জনৈক পেয়িং গেস্টকে আশ্রয় দিতে হল। এবার শুরু হয় রামুর প্রকৃত সমস্যা। অত্যন্ত নির্মম ও সত্যনিষ্ঠভাবে ঋত্বিক দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক ভিত্তি কিভাবে আমাদের সুকুমার অনুভূতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। রামু অসহায় ভাবে বুঝতে শুরু করে পরিবারে তার চাইতে গুরুত্ব পেতে চলেছে সাগর, আগত অতিথি। বাইরে উমার তপস্যায় আগেকার উত্তাপ নেই।

বাবা মারা যান। রামু, রামুর বোন সীতা। রামুর প্রেমিকা উমা, সাগর—কারুরই একক প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয় না। অবশেষে ছবির শেষে বেজে ওঠে 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত। আমরা বুঝতে তরুণ মার্কসবাদী পরিচালক বলতে চ —বর্তমান সমাজ কাঠামোয় সংগ্রাম মুক্তির অন্য উপায় নেই।

এখানেই ছবিটির প্রধান 'নাগরিক'ই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ছবি। তার আগে, ধরা নিমাই ঘোষকৃত 'ছিন্নমূল' সমসাম ছাপ পেয়েছিল। কিন্তু 'নাগরিক'ই বেকারীর মতন একটি ঝাঁঝালো স নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও স্ত এ প্রসঙ্গে সত্যেও পরবর্তীকালে বামপন্থার ঝোঁক লক্ষ্য করেছেন মার্কসবাদী বক্তব্যময় এই চল ভিত্তিতে স্বচ্ছন্দে বলা যায় ঋত্বিক এদেশে পলিটিক্যাল সিনেমার জনয়

ঋত্বিকবাবুর নন্দনতত্ত্বে ত্রু ছন্দপতন থাকাটাই স্বাভাবিক। পোশাক-আসাক সেদিক থেকে খারাপ। সাউণ্ড-ট্রাক বা

...। আশ্চর্য, পরবর্তীকালে সঙ্গীতে অলৌকিক দক্ষতা, ঋত্বিক এখানে ব্যবহারেও উপযুক্ত মর্যাদা দাবী পারেন নি। অভিনয়ে, ঋত্বিকবাবু ...য়েই নাটকীয়তাকেই আঙ্গিক হিসেবে করেন। এই ছবিতেও ব্যতিক্রম ... তবে 'অযান্ত্রিক' থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত প্রসারিত কর্মজীবনে সেটা ... অপরদিকে আলোচ্য পর্বের ত্রুটি। ... আমাদের উল্লেখ করতে হবে রামুর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা দেবীর কথা। ... আর কারিগরের দিক বিচার করলে ... শব্দের অনবদ্য ব্যবহার ঃ দুপুরে ... মোটর সারাই কারখানার আওয়াজ। ...নাটোর কোন কোন ধারালো অংশ ...তের প্রাকৃতিক সম্পদ, দাম কত ...ক টাকা। । ভোলা যায় না রামুর বাবার ...দৃশ্য যা উত্তরকালে 'সুবর্ণরেখায়' ...রামের মা-র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পূর্ণা... হবে। আর শেষত দুর্গা প্রতিমার ...র্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঋত্বিক ... পর থেকেই জাতীয় ঐতিহ্যের ...রূপাতে মহীয়সী মাতার রূপকল্প ...ণে মনোযোগ অর্পণ করবেন।

...য় মুখোপাধ্যায়

...লকাতায় কাবুকি

'কাবুকি' কথাটা কয়েকটি বিষয়ের ...ক্ষর নিয়ে, বাংলা তর্জমা করলে যার ... দাঁড়ায় নাচ, গান ও অভিনয়ের ...য়ে সৃষ্টি একটি অনুষ্ঠান। যাকে ...কবে পরিবেশন করা হয় দেশীয় এবং ...য় ইতিহাস।

...প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে যখন কাবুকি থিয়েটার প্রবর্তন হয় তখন ...কুশীলব ছিলেন মহিলা। এবং সেই মহিলারা আসতেন সমাজের নিম্নবিত্ত ...র থেকে। ১৬২৯ সাল পর্যন্ত ... অভিনয় করেছেন। তার পরে ... মধ্যে নারী ও পুরুষের ভূমিকয় ...পুরুষই অংশ গ্রহণ করত। কিন্তু ...দল খারাপ হওয়ায় অর্থাৎ নারী ও ...র মধ্যে ক্ষতিকারক সম্পর্ক গড়ে ...শের পর্যন্ত সম্পূর্ণটা পুরুষেরাই ...য় করতে শুরু করে।

...দল নেতা মিঃ ইচিমাবা বললেন, এর কাবুকিতে অভিনয় করার জন্য ধৈর্য ... ও চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ...ম সর্বাধিক। এ নাটক অভিনয় করা ...কঠিন। তার সঙ্গে শরীর ও মনকে ... ও সক্রিয় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। ... এখানে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ...তে ওঠার পর শিল্পী (নারীর ...বুঝতেই দেবে না যে, সে পুরুষ। ...কাবুকি'র অভিনয় ধারাটা খুব কঠিন ...বোধ জাপানেই ছ সাতটির বেশী ... দল নেই। এবং পৃথিবীর অন্য ... এমন প্রচেষ্টা নেই। ...বর্তমানে কাবুকির যে রূপ, তা ...বছরের পুরনো।

কাবুকি

কাবুকি থিয়েটারে সংলাপ কম। শিল্পীর চরিত্র বোঝাবার জন্য রঙের ব্যবহার রাখা হয়েছে। যেমন সৎ চরিত্রের ক্ষেত্রে সাদা, অসতের লাল ও নীল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গোলাপী, হলুদ ইত্যাদি। ভুরু, চোখ, ঠোঁট ও সমগ্র মুখমণ্ডলের ব্যবহার এ নাটকের প্রধান লক্ষ্য। সেই সঙ্গে হাতের মুদ্রা, শরীরের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি।

পোষাক ও সেট সেটিং অত্যন্ত বর্ণাঢ্য। কাহিনী মূলত সেকালের। তবু তার ব্যবহার অত্যন্ত কাব্যিক ও লাবণ্যময়।

আর তাই কাবুকি আজও জাপানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং জাতীয় থিয়েটার বলে স্বীকৃত।

প্রথম দিন সাংবাদিকদের সঙ্গে এবং দ্বিতীয় দিন কলকাতার গণ্যমান্য থিয়েটার- ... দল পরিচালক এবং অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে- ছিলেন যথাক্রমে পঃ বঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের পক্ষে শ্রীগোপাল ভৌমিক এবং রবীন্দ্র সদনের পক্ষে শ্রীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উভয় দিন দোভাষীর কাজ করেন কলকাতার জাপানী ভাইস কনসল মিঃ ফুজিদা ও অনিল সুর।

শান্তিরঞ্জন চ্যাটার্জি

'এতগুলো টাকা নষ্ট হল, ও জানলে আসতুম না'।—রবীন্দ্র সদন থেকে কাবুকি দেখে বেরিয়েই মন্তব্য করলেন এক ভদ্রলোক ভীষণ বিতৃষ্ণায়। সঙ্গী মহিলারা সমর্থন করলেন তাকে। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলেন, পূরণ হয়নি। আমার পাশের তরুণ কবি বললো, আমাদের দেশে অসম্ভব কোনো অভিজ্ঞতা নয়। কথা বোঝা যায়নি, তবে অভিজ্ঞতা তো একটা হল।

আমি অবশ্য কখনো কখনো অনেক দর্শকের মতন মুগ্ধ হয়েছি, নিমগ্ন হয়েছি কোনো কোনো দৃশ্যে। আবার সংলাপ না বুঝতে পারার জন্যে ছটফট করেছি। একবারও মনে হয়নি, সন্ধ্যেটা মাটি হল, বরং নতুন অভিজ্ঞতা হল, জাপানের অতি জনপ্রিয় এই শিল্পটি দেখার সুযোগ হল বলে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানালাম মনে মনে। আর দর্শকদের আনন্দ, তা তো কম দেখলাম না। উপচেপড়া কলকাতার দর্শক আনন্দ পেয়েছে, দেখেছি সাড়া দিতে দেখে।

ভারতে এই প্রথম অভিনয়, আবার তা কলকাতাতেই। কাবুকি এমন এক ধরণের শিল্পরীতি যার পেছনে কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস আছে। যাত্রা, নাটক, পুতুল নাচ, মূকাভিনয়, প্রতিটি পরিচিত ... ক

যে সব প্রচ্ছদ কাহিনী

অমৃত আপনাকে উপহার দেবে

১৫ এপ্রিল

রবীন্দ্র সঙ্গীত

নিয়ে সর্বসন্ধানী প্রামাণিক লেখা

আপনাদের জন্য গল্প লিখছেন

অরণা সেন প্রশান্ত চৌধুরী অমর মিত্র

কল্যাণ সেন নবকুমার বসু শিশির লাহিড়ী

অমল চন্দ সেলিনা হোসেন

পর পর বিভিন্ন সংখ্যায় এদের লেখা পাবেন

আমরা তিন নবীন কবিকে

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি

জীবন সম্পর্কে কবিতা সম্পর্কে

কবির জবানীতে কবিকে চিনতে পারবেন

২৯ এপ্রিলের প্রচ্ছদ কাহিনী

তিন কবি

পড়লে

মোরারজী রণছোড়জী দেশাই

দেশের এক সংকট-মুহূর্তে শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কর্মভার গ্রহণ করেছেন। ভারতের অগণিত নরনারীর সঙ্গে আমরাও এই বরেণ্য নেতাকে অন্তরের অকৃত্রিম অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাই।

শ্রীযুক্ত মোরারজী রণছোড়জী দেশাইয়ের গোটা জীবনই অতিবাহিত হয়েছে দেশের সেবায়। প্রায় অর্ধশতক আগে সেই যে তিনি বোম্বাইয়ের সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন তারপর থেকে জাতীয় জীবনের প্রতিটি পর্বেই তাঁর ত্যাগ ও নিষ্ঠা মনে রাখবার মতো। বিদেশী শাসকের কারাগারেই হোক কিম্বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবেই হোক, তাঁর মতো আপোসহীন সংগ্রামী মনোভাব এবং নিজের আদর্শ ও কর্মনীতির বিষয়ে অবিচল নিষ্ঠাও খুবই দুর্লভ। এই প্রাজ্ঞ নেতার হাতে দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় দেশবাসী খুবই আশ্বাস বোধ করবেন।

সমস্যা অনেক, জনগণের প্রত্যাশাও সীমাহীন। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর চাপে জনজীবন এখন দুর্বহ। তারপর পর্বতপ্রমাণ অশিক্ষা ও শিক্ষানীতির নৈরাজ্যও কম সমস্যা নয়।

শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাইয়ের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুপরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার এইসব সংকট কাটিয়ে উঠে ভারতের ইতিহাসে এ নতুন গৌরব যোজনা করুন, সমস্ত দেশবাসীর আজ এই প্রার্থনা।

একটি গল্প দাও গো বাবু

একটি পয়সা দাও গো বাবু। এ রকম কথা দিয়ে আগেকার বাংলা ছবিতে একখানা গান ছিল। এখন প্রায় সেই প্রার্থনার গলায় গাইতে মন চায়—একটি গল্প দাও গো বাবু।

কেমন গল্প ? যে-গল্প পড়তে গিয়ে হোঁচোট খাবো না। পড়তে পড়তে আবিষ্কারের আনন্দ পাবো। পেয়ে বিরক্ত হতে পারি। হাসতে পারি। কাঁদতে পারি। রাগতে পারি।

তেমন একটি গল্প দাও গো বাবু।

যে—গল্পে নিজেকে দেখতে পাই। যেখানে ১৯৭৭ ধরা পড়ে। যা কিনা ১৯৮৭-র হাতছানি দেবে। এবং যা ১৯৯৭-তে বসে পড়বার সময়ও বাসি লাগবে না।

তেমন গল্প কোথায় ? গল্প আজ নিরুদ্দেশ। ফেরারীও বলা যায়।

কেউ বলছেন : গল্প গল্প করে আর মড়াকান্না গাইতে হবে না। আমরা এসে গেছি। আমরা গল্পে গল্প দেব না। এমন একটা জিনিস দেব—যা কিনা আপনাকে ভাবাবে। বৈকুণ্ঠ তাতে রাজি। সে কয়েকটি গল্প পড়ে দেখলো। পড়ে তার প্রাণ, আনন্দ—কোন প্রাপ্তিযোগই হোল না। মনে হল বক্তব্যহীন—অপুষ্ট, অকালে ভূমিষ্ট কিছু গদ্যের বাচ্চা।

সে তখন গল্পের ডাক্তারদের কাছে গেল। গিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু দয়া করে আমায় একটু দেখুন তো। কোন গল্প পড়েই আমার কিছু হচ্ছে না। কারণটা কি ?

ডাক্তারবাবু সব শুনতে চাইলেন।

আপনি কি করেন ?

আজ্ঞে আমি জীবন করি।

মানে।

জীবনে বসবাস করি।

সেটা কি রকম ?

এই আর কি ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে ঘর সংসার করি। বাজার করি। ধার করি। দেনা শোধ করি। আয় করি। অসুখে পড়ি। ভাত খাই। জ্বর হয়। জ্বর সারে। বেড়াতে যাই—

থামুন। অত জটিল করে বলছেন কেন ? আপনি একজন গৃহস্থ হয়ে এসব কথা কোত্থেকে পেলেন ?

আজ্ঞে আমি নিজেও এক সময় গল্প লিখতাম।

সেগুলো কি হল ?

স্যার, সে সব ছাপা হয়ে একদিন ঠোঙা হয়ে গেছে।

কেউ পড়েনি ?

আমার দুই ভাই, তিনজন বন্ধু আর একজন সম্পাদক ও দুজন প্রুফরিডার পড়েছিলেন।

তাহলে আর লেখা কেন ? না লিখলেই হোত।

সম্পূর্ণ তাঁপাদ কিনা—তা শেষ পর্যন্ত একদিন ছেড়ে দিলাম।

ভালো করেছেন। ও আপনার লাইন নয়। তা আবার ওসব পড়ছেন কেন ?

পড়া ডাক্তারবাবু, আমার কাজ।

কাজটা পারছেন না।

কোথায় এখন কাজ পাবো ডাক্তারবাবু ?

কঠিন ব্যাপার দেখছি। আচ্ছা বসে ডাক্তারবাবু প্রেসকৃপসন লিখতে বসলেন। খানিক বাদে প্রেসকৃপসনটা হাতে পেলাম। দিয়ে বললেন—এই ক্যাপসুল, মিকশ্চার, গুঁড়োগুলো খেলে আপনার গল্পে রুচি ফিরে আসবে। তখন আস্তে আস্তে আবার ওসব পড়তে পারবেন।

না ডাক্তারবাবু। আর পড়ব না। যদি আবার অরুচি ধরে—

ডাক্তারবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। না। না। অত ভয় পাবেন না।

সাহিত্য

যে ওষুধ দিলাম—খেয়ে দেখুন। বড় ডিসপেনসারিতে পাবেন। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর ন্যাশনাল ডিসপেনসারিতে অবশ্যই পাবেন।

বাড়ি এসে প্রেসকৃপসনটা খুললাম। তাতে যা লেখা ছিল—তাই লিখে দিচ্ছি।

১। গল্পগুচ্ছের অধ্যাপক গল্পটি—রাতে শোবার আগে সাতদিন একটানা।

২। গৃহদাহে সুরেশকে রেখে—অচলা যেখানটায় ফিরে আসছে—সেই জায়গাটা রোজ ভোরে তিনদিন পর পর।

৩। তারাশংকরের অগ্রদানী ও বিভূতিভূষণের কিন্নরদল—এবেলা ওবেলা—টানা এক মাস।

৪। পরশুরামের নীলতারা আগাগোড়া তিনবার রিডিং—নির্জনে।

৫। মানিকের পুতুলনাচের ইতিকথায় কুসুম যেখানটায় বলছে—সে কুসুম আর নাই—সেখানটায় বিকেলের দিকে মাদুরে পেতে বসে শুধু তাকিয়ে থাকতে হবে। তারপর নীরবে ছবিটি ভাবা।

৬। বাঁচ ফিরে আসার মধ্যে মধ্যে সতীনাথের 'চখাচখি' সকাল ও বিকেল—একবার করে পর পর সাতদিন।

তারপর পেট ভরে জীবন করুন। আপনার নিজের ফেরারী লেখাও ফিরে আসতে পারে। এই ওষুধ সেবনের সময় অনুপান হিসেবে রেকর্ডে বড়ে খাঁ, সুচিত্রা মিত্র, আলি আকবর, জোয়ান বেইজ অবশ্য সেব্য।

এখন চিকিৎসা চলছে। ফলাফল জানানো হবে। মন অনুযায়ী এক একজনের ওষুধ এক এক রকম হয়—এ তো আমরা জানি।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

অন্যত্র

কেবল মুহূর্তের মৃত্যু, কেবল মুহূর্তের মৃত্যু, এই আমাদের জীবন।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। ছন্দমুক্ত

*

আপনাদের নিউ আলিপুর এখন সকালে কেমন লাগে, নর্থ ক্যালকাটা থেকে দেখতে এলাম।

বীরেন্দ্র দত্ত। মুখর

*

কেউ বলে ফিরে টের পাই
আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষায় আছি।

জয়ন্ত চক্রবর্তী। কাল্পনিক

তুমি জানো কোথা কোনখানে পড়ে আছে
সর্বস্বহৃত সংরক্ষিত স্বর্গের ঠিকানা।

ফণিভূষণ আচার্য। সীমান্ত সাহিত্য

*

জোৎস্নায় ভিজছে তার শরীর

প্রদীপ ঘোষ। সাহিত্য সেতু

*

সোনালী কবরে আছি সম্রাটের মতো রাজদণ্ড ছুঁয়ে।

অমিতাভ চক্রবর্তী। কণ্ঠস্বর

*

সব রাস্তা বন্ধ করে শুয়ে থাকে নদী।

মিত্র মুখোপাধ্যায়। এই দিন।

শরীরে খেলা করে বিকালের সুখী বাতাস।

পার্থ গুহবকসী। গল্প।

*

শীতল স্নানের শেষে শান্ত হাত খুঁটে খাবে ফসলের স্নেহ।

শুভ্রতময় ঘোষ। কিন্নর।

*

শুধু তোমার জন্যে বুকের ভেতর
ইঁদুরগুলো দিনরাত্তির
খুঁড়ছে কেবল কষ্টে কেনা
নাবাল জমি।

কুমার চৌধুরী। শব্দ প্রতিমা

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

যাও

লোকজনকে বলা হয়েছিল এ-বর্ষা থামবেই থামবে
সরে যাবে জল,
রোদ পড়বে আবার ওই ভিজে দেয়ালের গায়ে।
অথচ
জন্তুটাকে তখনই জবাই করলো ওরা।
দিনের পর দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি
স্যাঁতসাঁতে শীত আর কাঁপুনি কোনোদিন
থামবে না, থামবার নয়
এই ভুল ধারণা নিয়ে ও গেল তো।

ধৈর্য ধরো, আর-একটু অপেক্ষা করো;
না পারলে যাও, ভেঙে দিয়ে এসো
কালকের জন্যে মুলতুবি না রেখে আজ, এখনই
ভেঙে দিয়ে এসো ভুল ধারণাগুলো
ভুল ধারণাগুলো
ভেঙে দিয়ে এসো
আদাড়ে বাদাড়ে যা ছড়িয়ে রয়েছে।

বাল্যবন্ধু

টর্চ ফেল। দেখ ও কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে
কী চায়? কী বলতে চায়? এত রাতে কেন
উৎপাত? সরাও ওকে, বলে দাও আমি
চিনি না, দেখি নি কোনোদিন।

এসে গেছে!
আরে তুমি! মনে পড়ছে ঘুরেছি কত না
সিকন্দর নির্জন পথে। সাইকেল থামিয়ে
পেয়ারাবাগান থেকে চুরি করে ফল
এনে দিতে। ঝুলে পড়লে তুলে দিতে চেন।

ভাষা কিন্তু বুঝতেই পারছি না। কেন এত
অস্পষ্ট, জড়ানো? কেন ভারী ঠ্যাং দুটো
ওভাবে নাড়াচ্ছো? তুমি ব্রিজ তুলতে চাও?
নিচের নদীটা কত বিস্তৃত, জানো না।

বুকে হাত ছুঁয়ে দেখছি, ঝুলে আছো আজও
বৃদ্ধার স্তনের মতো কুঁচিমুচি হয়ে॥

ও গণতন্ত্র

কথা—
কম কাজ বেশি কথা কম
কাজ বেশি কথা কম কাজ
বেশি কথা কম কাজ বেশি
কথা কম কাজ বেশি কথা।

যে রকম জঙ্গলে সমাজ
দ্বন্দ্ব রেষারেষি নাশকতা॥

অ্যানালজেসিক না খেয়েও হীরক রায় পড়া যায়

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম—১৯৩০।
জীবিকা—চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট

নমিতা—এমনই এক মেয়েলি নামে পদ্য লেখা শুরু করেছিলেন শরীরে মনে রীতিমত পুরুষ শরৎকুমার কেন যে, সে রহস্য আজও অজানা রয়ে গেছে।

এই চমৎকার, ভদ্র, বন্ধুপ্রাণ মানুষটির লেখায় আমি সর্বদা স্বাদ পেয়েছি দুর্লভ সেন্স অব হিউমার-এর, যা এই গোমড়া-মুখো কপাল-কোঁচকানো যুগে গদ্যে-পদ্যে প্রায় উঠে যেতে বসেছে। সেই 'আহত ভ্রূবিলাস' থেকে অদ্যাবধি তাঁর কবিতায় এক আশ্চর্য ধরনের নির্লিপ্ত কাজ করে যাচ্ছে, যা আমাকে খুবই বিস্মিত করে। সব কিছুর মধ্যে থেকেও এই আলগা ভাব এত লেখালিখির মধ্যেও বজায় রেখে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

'আমাদের রান্না ভালোবাসো বলে রান্না ঘরে এসো না কখনো। এখানে এলেই তুমি হাঁসের ডিমের মত সেদ্ধ হয়ে যাবে'—এ রকম অনায়াস অথচ একান্ত নিজস্ব বাগরীতির মুঠো মুঠো নজীর শরতের কবিতার আশির-নখরে। একে শুধুই স্মার্টনেস বলে পাশ কাটিয়ে যেতে পারতাম, যদি না দেখতাম কিভাবে হাল্কা চালের কথার ভেতরে তিনি ক্রমশ ঘনিয়ে আনছেন দুঃখের, চাপা ব্যথার ব্যঞ্জনা, কিভাবে ছোট ছোট বাক্যবন্ধে নিবিড় আসক্তি থেকে আসক্তিবিহীনতায় চলে যাচ্ছেন তিনি। সবচেয়ে আশার কথা, বয়স বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই তাঁর কবিতার বয়স বেড়েছে। এবং কে না জানেন, বয়সের আর এক নাম বিষণ্ণতা। শরতের লম্বা আঙুলের তারে এই দুরূহ রাগের আলাপ মাঝে মাঝেই শুনতে পাই এখন। আরও শুনতে চাই।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

মানুষের সুখ দুঃখ কান্না হাসি
নানা অনুভূতির গল্প...

হীরক রায়

অস্ত্রোপচার শেষে ও-টি থেকে বেরিয়ে এসে এক শল্যবিদ কি বলেছিলেন মনে আছে?—অপারেশন ভালোই হয়েছে, কিন্তু রুগী মারা গেল! পুরনো, কিংবা বলা যেতে পারে বহু ব্যবহারে জীর্ণ এই গল্পটির কথা আবার নতুন করে মনে পড়ল বাঙালী কিছু গল্পকারের প্রসঙ্গে। গল্পের গল্পত্বটুকু বাদ না দিতে পারলে তাঁদের শান্তি নেই! যেন জামা তাঁরা তৈরি করতে চান ড্রেস মেটিরিয়াল বাদ দিয়েই! গল্প লিখবো অথচ গল্প থাকবে না—তবুও তাকে বলব গল্প। বিদঘুটে এই রসিকতা বা হেঁয়ালী, যার মর্মমোচনে অনেকেই ব্যর্থ হবেন। ছুরি কাঁচি অথবা উপযুক্ত কোন অস্ত্রের সাহায্যে গল্পের পেট থেকে গল্পত্বের টিউমার কেটে বাদ দেবার অপারেশনে এইসব গল্পকাররা সফল হন, সফল হয় তাঁদের অস্ত্রোপচার, কিন্তু রুগী—অর্থাৎ এখানে গল্প মারা যায়।

সুখের কথা যে, হীরক রায় এই ধারার গল্প লেখক নন। তাঁর রচনায় আমরা পাই মানুষের সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি ও নানা অনুভূতির গল্প যা তাঁর রচনাকে শুধু সুখপাঠ্যই করেনি, মানুষের জন্যে মানুষের মৌলিক অনুভূতিগুলিকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছে আমরা কেন কষ্ট পাই, কোথায় আমাদের সুখ কিংবা সুখের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা! 'সুখ' গল্পের মূল চরিত্র একটি লোক (যার কোনো বিশেষ নাম নেই, সে যে কেউ, যে কোন মানুষ, কিংবা সব মানুষের প্রতিনিধি!) ইহজাগতিক সব সুখ একসঙ্গে কিনতে চেয়েছিল। ঘুরেছিল বহু দোকানে। দোকানীর চোখে চোখ রেখে বলেছিল—'তোমার যা যা আছে সব দাও একটা করে। শোন, সুখ হয় না এমন কোন জিনিস দেবে না। আমি থলি ভর্তি সুখ কিনে নিয়ে যাবো।' লোকটির দু-হাতের দুই থলি ভরে গিয়েছিল 'কেনা সুখে'। তবু সুখ সে পায়নি। পেলো সেদিন যেদিন সে হাতের দুটি থলি নদীর জলস্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারল। রূপকধর্মী এই গল্পটি শেষ হয়েছে এভাবে : নদীর জলের শব্দ, গাছের গায়ে জোনাকির ঝিকিমিকি, মাথার ওপরে তারার মেলা। দেখতে দেখতে লোকটির চোখ বুজে এল। এক অদ্ভুত আবেশে সে বেদীর ওপর শুয়ে পড়ল। বহুদিন পর এমন গভীরভাবে সে গাঢ় ঘুমের স্বাদ পেল।

কি মনে করে সে ধড়মড় করে হঠাৎ উঠে বসল। থলে দুটো দু হাতে তুলে নিয়ে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর সব কেনা সুখগুলো একটা একটা করে জলে ভাসিয়ে দিল। সব শেষে থলেটাও। ঢেউয়ে ঢেউয়ে এগুতে এগুতে থলেটা বুদবুদ তুলতে তুলতে এক সময় হারিয়ে গেল। ইঁটের বেদীতে এসে তারপর সে শুয়ে পড়ল।

ছবির বাজার

একালের চিত্রশিল্পীদের ছবির মূল্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম মোটামুটি সর্বনিম্ন দাম ১০০ টাকা। আর সর্বোচ্চ দামের কোন সঠিক সীমা নেই। বলা যায় ১০০০০ টাকা কিংবা ততোধিক।

এই মুহূর্তে একাল ও সেকালের যে ক'জন শিল্পীর নাম মনে পড়ছে, তাঁদের কয়েকজনের ছবির বাজার দর এই রকমের :

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৬০০০—৩৬০০০); নন্দলাল বোস (২০০০—১০০০০); গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০০—৫০০০); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০০০০ এবং ততোধিক); হেমেন মজুমদার (৫০০০—১০০০০); অসিত হালদার (২০০০—৪০০০); ক্ষিতীন মজুমদার (১০০০—৩০০০); যামিনী রায় (৩০০—৩০০০); দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (৫০০—৪০০০); বিনোদবিহারী মুখার্জি (৫০০—২৫০০); মুকুল দে (এচিং) (২৫০—৫০০); অমৃত শেরগিল (১০০০০—২০০০০); সতীশ গুজরাল (১০০০০ এবং ততোধিক); এম এফ হুসেন (৫০০০—১২০০০); রামকিংকর বেইজ (১৫০০—২৫০০); নীরদ মজুমদার (১০০০—৬০০০); পরিতোষ সেন (২০০০—৬০০০); সুনীলমাধব সেন (৫০০—২০০০); গোপাল ঘোষ (২৫০—৩০০০); বিকাশ ভট্টাচার্য (১৮০০—৩০০০); গণেশ পাইন (১৫০০—২০০০); সোমনাথ হোড় (গ্রাফিকস্) (৩৫০—৫০০); লালুপ্রসাদ সাও (গ্রাফিকস্) (২০০—৪৫০); সনৎ কর (গ্রাফিকস্) (৫০০—৬৫০); প্রকাশ কর্মকার (৫০০—৫০০০); সুনীল দাস (৫০০—৫০০০); রবীন মণ্ডল (৫০০—৩০০০); শ্যামল দত্তরায় (১০০০); বীরেন দে (১০০০—৩০০০); যোগেন চৌধুরী (৫০০—২০০০); সুধীররঞ্জন ভূষণ (১০০০—১৫০০); দীপক ব্যানার্জি (২৫০—৫০০); বিজন চৌধুরী (৫০০—১৫০০); করুণা সাহা (৫০০—২০০০); গণেশ হালুই (৬০০—৩৫০০); সানু লাহিড়ী (৫০০—৩০০০)।

চিত্র-মূল্যের খতিয়ান অনুমান, অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত। সুতরাং উল্লিখিত মূল্যের হেরফেরের জন্য লেখক দায়ী নন।

এ তো গেল একাল ও সেকালের শিল্পীদের ছবির মোটামুটি একটা বাজার দর। এছাড়া ভারতে বর্তমানে প্রায় ১০-১২ জন চিত্রকর রয়েছেন, যাঁদের ছবি বিক্রি থেকে বার্ষিক গড় আয় এক লক্ষ টাকার ওপর। আয়ের উচ্চতা অনুযায়ী পর পর কয়েকটি নাম রাখছি—

১। সতীশ গুজরাল
২। এম এফ হুসেন
৩। কৃষন খান্না
৪। রাম কুমার
৫। গাইতুণ্ডে
৬। জে স্বামীনাথন
৭। গোলামরসুল সন্তোষ
৮। বি প্রভা
৯। শান্তি দাভে

রাজপুত, মোঘল কিংবা অন্যান্য ধারার মিনিয়েচার ছবির চাহিদা যথেষ্ট। এর প্রধান ক্রেতা সংগ্রহশালা এবং বিত্তবান শিল্পরসিক। মূল্য এক হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা।

প্রশান্ত দাঁ

চারিদিকে বইয়ের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকাতে একটা উপকার আছে। বই চব্বিশঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই পৃথিবীতে চামড়ায় ঢাকা মন নামক একটি পদার্থ আছে।

প্রমথ চৌধুরী

দ্বন্দ্ব—হীরক রায়। অনন্য প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম আট টাকা।

...একটু পরে অজস্র সুখের গাঢ় ঘুমে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

রূপক ও প্রতীকের আড়ালে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বক্তব্য। বাস্তবের জটিলতাকে লেখক বড় বেশী সরল করে দেখেছেন। সারল্যই তাঁর চরনার বড় গুণ এবং চূড়ান্ত দোষও। সহজ সরলভাবে গল্প তিনি বলে যান। ঘটনার ঘনঘটাও তিনি এড়িয়ে চলেন তাঁর গল্পে। ফলে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কিংবা তির্যক মুহূর্তরচনা তাঁর গল্পে দেখা যায় না। কিন্তু জীবন এরকম নয়। তার চলার ছন্দে থাকে চমক ও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। শুধু জটিলতা নয়, বেঁচে থাকার রহস্যও জীবনকে অপরিমেয় ভালোবাসার উপাদানে সমৃদ্ধ করেছে।

শ্রীহীরক রায় গল্প লিখতে জানেন। শান্ত তাঁর কথা বলার সুর। প্রচলিত গল্পের বিরুদ্ধে অহেতুক বিদ্রোহ ঘোষণার ভান তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর সততা আমাদের স্পর্শ করে। স্পর্শ করে বলেই একশ' একচল্লিশ পাতার সুদীর্ঘ বইটি আমরা যেভাবেই হোক শেষ না করে বুক-সেলফে বা স্যাঁতসেঁতে তোষকের নিচে লন্ড্রীর বিল, রেশন কার্ড ও ট্রামের মান্থলি টিকিটের ভিড়ে গুঁজে রা লুইয়ে রাখি না। অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট না খেলে পরীক্ষামূলক গল্পপাঠ শেষ করা যায় না—ছোটগল্পের জনৈক উৎসাহী পাঠক আমাকে বলেছিলেন, তরুণদের গল্প দেখলেই তিনি চমকে ওঠেন, ভয় পান! অনেক দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় না। দেখা হলেই তাঁর হাতে আমি এই বইটি তুলে দিয়ে বলব—পড়ে জানাবেন। আশা করি, এর জন্যে আপনাকে কোনো ওষুধ খেতে হবে না।

পদাতিক

সুতরাং ভাল আছি (কাব্য সংকলন)। সুনীল হাজরা। আত্মপ্রকাশ প্রকাশনী, ৭১৷৪৷১, [illegible]পাড়া লেন, কলকাতা—৬। দু টাকা।

সুনীল হাজরার মোট কুড়িটা কবিতা নিয়ে বর্তমান কাব্যসংকলন। কবিতাগুলিতে কবির আন্তরিকতা, ছন্দজ্ঞান, শব্দচয়নে মোটামুটি দক্ষতার পরিচয় আছে। মাঝে মাঝে শ্লেষ, বক্রোক্তি, বর্তমান সমাজ ও জগত সম্পর্কে তির্যক মনোভঙ্গি কবিতাগুলির স্বাদে এবং কবির জীবন-ভাবনা প্রকাশে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। অতি-আধুনিক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন এবং কবিতার ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট যত্নশীল ও চিন্তাশীল বলেই কবিকে আধুনিক বলতে দ্বিধা নেই।

শূন্যের পাখি। মনোজ ঘোষ। পাত্র বুক এজেন্সী, কলকাতা—৯। চার টাকা।

মনোজ ঘোষ লিখিত 'শূন্যের পাখি' কাব্যগ্রন্থের সব কবিতাই গদ্যরীতিতে লেখা। দেখা যায় মানুষের জন্য বোধ তাঁর প্রবল।

দিগ্‌ভ্রান্ত—রাজদূত। স্টাডিস্। ২২ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৯। দাম বারো টাকা।

বর্তমান জীবননির্ভর এই উপন্যাসটি পাঠককে ভাবিত করবে। কাহিনীতে গতি স্বচ্ছন্দ হওয়ায় পড়তেও মন্দ লাগে না।

সত্তরের কবিতা

বংশমর্যাদা

ব্রত চক্রবর্তী

পাথরের বাঘ এসে পাথরের বাঘকে বললো, কি করা হয়?
দুজনের কেউই কিছু করে না, তবু মাঝে মাঝে এ—ওকে,
এক পাথরের বাঘ আর এক পাথরের বাঘকে এরকম প্রশ্ন করে :
কি করা হয় কি করা হয়...হায়, দুজনে কেউই কিছু করে না।

দুজনের কেউই কিছু করে না; তবু মাঝে মাঝে
বাদামের খোসার মতন এক নিঃসঙ্গতা আঁকড়ে ধরে দুটি বাঘকে;
দুটি বাঘ, যারা বছরের পর বছর, শুধু বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য,
সিংহদরোজার দুটি থামের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে আছে।

দুজনের কেউই কিছু করে না; তবু মাঝে মাঝে এ-ওকে,
এক পাথরের বাঘ আর এক পাথরের বাঘকে এরকম প্রশ্ন করে :
কি করা হয়?...হায়, দুজনের কেউই কিছু করে না!

ভালোবাসা দৃঢ় হলে, রক্তপাত

তরুণ ভরদ্বাজ

ভালবাসা দৃঢ় হলে চুম্বনে শোণিত ঝরে পড়ে?
নিরুদ্বেগ ভীরু ওষ্ঠে সেভাবে চুম্বন ক'রো তুমি

রক্তপাতে ভয় নেই ক্রমশ প্রকাশ্য হ'ক প্রহারের চিহ্ন
নিরুপায়, দুঃস্থে নিষ্কৃতি নয় সংক্রামক ব্যাধি চাই নিরোগ শরীর।
আমরা ক্ষুধার্ত হ'বো, দুর্বল শয়নে ক্লান্ত—নিষ্প্রয়োজন মাংসের স্বাদ
এই দৃশ্য প্রকাশিত, কারুকার্যময় ছুরির পালক ছাড়াতে ব্যস্ত তবু
সমুদ্র বাতাস ছেড়ে প্রলোভনে বালি-হাঁস নির্জন টেবিলে
গভীর হিংস্রতা চাই, স্বজন হারানো ক্রোড়ে যেভাবে উন্মাদ
দাম্পত্যগুলি উত্তেজিত, বনাঞ্চল ত্রাসে কাঁপে নখের আঘাতে
নিরুদ্বেগ ভীরু ওষ্ঠে সেভাবে চুম্বন ক'রো তুমি
ভালবাসা দৃঢ় হ'লে চুম্বনে শোণিত ঝরে পড়ে।

দেখা হবে

নিশীথ ভড়

আমার ভাবতে ভালো লাগে তুমি আছ, তুমি আছ,
আসলে চারপাশে এমন আর কেউ নেই যাকে
বলতে পারি থাকো, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকো

হতেও পারে এমন আমার এই ভাবনা কদম্ব গাছ হবে
শিকড় আরও গহন যাবে, নিভৃতনিঃশ্বাসের তাপে
মুখে পড়বে আলোছায়ার দূরপ্রসারী মায়া

আমার ভাবতে ভালো লাগে তুমি এমনিভাবে বাঁচো
নইলে যা যায়, কেবলই যায়, কেবলই যায়, যায়
কিভাবে তার সঙ্গে হবে পা তোলা পা ফেলা

যে লীলাময় ব্যথার মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা
তাকেই আমি দেখতে পাবো প্রকাশ্য রাজপথে

দুঃখরাতের রাজা

অমিতাভ গুপ্ত

ব্যাঙের ছাতার নীচে এসে বসেছেন মহারাজা
বছরে হাজার দিন কিংবা প্রত্যহ আসা-যাওয়ার পথে
আমরা কুর্ণিশ করি তাঁকে
মহারাজার চোখে ঘুম নেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন নেই স্বপ্নে কোনো
মতিভ্রম নেই

আমরা অতি দ্রুত কুর্ণিশ করতে করতে রাস্তা পার হয়ে যাই
আমরা তাঁর মুকুটে একটা এবং আরো একটা কালো পালক
গুঁজে দিতে চেষ্টা করি এবং তিনি হাসতে চেষ্টা করেন
আমরা পেছনের রাস্তায় থুতু ফেলি
আমরা ডাইনে-বাঁয়ে থুতু ফেলতে ফেলতে রাস্তার মাঝামাঝিখানে
ঘুমিয়ে পড়ি
বছর যায় শেষ হয়ে

এ বছর তেমনভাবে সুখী হওয়া সম্ভব হ'লো না আমাদের
এ বছর তেমনভাবে ঘুম
কিন্তু, ঘুম ছিলো না শুধু তাঁরই চোখে
চৈত্রের শেষাশেষি তিনি দেখলেন, মেঘের আড়াল থেকে
একটা আঁকাবাঁকা গল্প বেরিয়ে এলো
আমরা দেখিনি
তিনি শুনলেন, প্রচণ্ড গর্জন করে আছড়ে পড়লো প্রতিপত্তি
আমরা শুনিনি
কিন্তু, যখন টলে উঠলো মাটি জ্বলে উঠলো বাঘের দাঁত
আমরা হোঁচট খেয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম

আমরা কিছুই দেখিনি কিছুই শুনিনি
কিন্তু, ক্যালেন্ডারের শেষপৃষ্ঠা ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলো
একটি শাদা হাতি
মহারাজার মাথায় সত্যিকারের রাজছত্র শোভা পেয়েছিলো তখন
এবং তিনি গান গেয়ে উঠেছিলেন ভাটিয়ালি সুরে
তাঁর রাজকীয় দরাজ গলায় সেই গান শুনিয়েছিলো ভালো।

আবার পড়লাম

কুসুমকে তখন কি মনে হয়েছিল স্মরণে নেই, এখন কুসুমকে আমার মেঘাবৃত অশনি মনে হয়। এই কি সেই কুসুম, আকাশে চাঁদ ভাসলে লজ্জাতুর প্রেম জেগে উঠত যার ভিতরে। লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম যৌবন। দশটি বছর অপেক্ষার পর কুসুমের প্রেম বিশীর্ণ হয়, অব্যক্ত প্রেম বেঁচে থাকে না।'...কাকে ডাকছেন ছোট বাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।'

শশীকে এই মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে হয়। সংস্কারজড়িত গাঁওদিয়ার অশিক্ষিত গ্রাম্যবধূ কুসুম তাই আমার কাছে মেঘাবৃত অশনিই। শেষ মুহূর্তে সে ঝলসে দিয়ে যায় শশী ডাক্তারের হৃদয়টাকে।

আর শশী! প্রথমেই যে মৃত্যুটির মুখোমুখি হয় সে তার বিরুদ্ধে মানুষের কিছু করার থাকে না। শশী এই প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয়। তার আকাঙ্খিত স্বচ্ছ ছন্দোবদ্ধ সামাজিক জীবনে উত্তরনের পথে বাধা অনেক। শশীকে প্রথমে আমরা দেখি জীবন ধারণের সামাজিক সম্পর্কগুলির সঙ্গে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল, অতঃপর ক্রমেই সে পরাস্ত হতে থাকে অমোঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। শশীর জীবনে শুধু আঘাতই এল, কোন ঘটনাই তার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, সুতরাং শশীর নিঃসীম স্তব্ধতা বরণ করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না—যা অনেকটাই পুতুলের মত।

এখানে শশীর প্রতিদ্বন্দ্বি কে? আমরা জানি না। বুঝি এই অদেখা প্রতিদ্বন্দ্বির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ব্যতীত পথ নেই। নিরুচ্চার ট্র্যাজেডি শশীর জীবনে। শশীর কত কিছুই করার ছিল, কিছুই করা হয় না। ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে গাঁওদিয়ার পৃথিবীটাকে অনুভব করতে করতেই সময় যায়, বলার কথা বলা হয় না—যাদব ও পাগল দিদির মৃত্যু তাকে বিমূঢ় করে দেয়।

এবং এই মৃত্যু এখানে বড় কর্কশ। এই মৃত্যু মানুষের জটিল মনের খবর পৌঁছে দেয় আমার কাছে। নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষত রাখতে মৃত্যুর ছায়ায় ঢেকে যেতে হয় দুজনকে, আত্মহত্যা করতে হয়। আসলে মানুষ এবং মন, জীবনের জটিলতাই তো সব, আমাকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শেখালেন। তিনি শেখালেন পৃথিবীটা সবচেয়ে বড় বিস্ময়। বিস্ময় চারপাশে, নতুবা কে জানতে পেরেছিল, 'মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ-জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।'

এই অসাধারণ বাক্যটি সারাক্ষণই আমার ভিতরে খেলা করে। আসলে পুতুল নাচের ইতিকথার কোন টুকরো অংশ নয়। সমগ্র উপন্যাসটি আমার কাছে আশ্চর্য স্থাপত্যকর্মের মত বিস্ময়।

আমার সামনে বিশাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন জীবন মশায়। মহাকালের মত জীবন মশায়। তিনি নিদান হাঁকছেন মৃত্যুর। মৃত্যুর অমোঘ সংকেত তাঁর অনুভবে ধরা পড়ে গেছে।

আরোগ্য নিকেতনের মূল চরিত্র কে? জীবন মশায়! অথবা সেই অন্ধ বধির পিঙ্গলবর্ণা নারী যার প্রতিটি অশ্রুবিন্দুতে সৃষ্টি হয় ব্যাধি। মৃত্যু। বনবিহারীর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু। জীবন মশায় শুনতে পেয়েছেন তার পদধ্বনি। অকম্পকণ্ঠে তিনি নিদান হেঁকেছেন। মৃত্যু ঘোষণা করেছেন একমাত্র পুত্রের। জীবন মশায় পুত্রের মৃত্যু ঘোষণা করেন মায়ের কাছে, স্বামীর মৃত্যুর ইঙ্গিত দেন ষোড়শী বধূর কাছে। তিনিই যেন মহাকাল।

সমগ্র আরোগ্যনিকেতনে মৃত্যুর উপস্থিতি এমন রহস্যময়তায় যে মৃত্যুই এখানে একটি চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চরিত্রের ছায়ায় ছায়ায় জীবন মশায়ের পদচারনা। এখানে দেখি মৃত্যু জীবনের অন্যরকম প্রকাশ, জীবনের পথ বেয়ে মৃত্যুর দিকে হেঁটে যাওয়া। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে জীবন মশায় তুলে নিয়েছেন হাত, অনুভব করেছেন নাড়ীর স্পন্দন, সেই পিঙ্গলবর্ণা মুক্তকেশী অন্ধ বধির নারী এখনো কত দূরে? মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল সীমাহীন। ভারতীয় দর্শন মৃত্যুর রহস্যময়তার কথা বলেছে। এই উপন্যাস আমাকে ভারতবর্ষের হৃদপিণ্ডকে চিনতে শেখায়। চেতনার গভীরে শিকড় চালিয়ে দেয়। জীবন মশায় এবং মৃত্যু, এই দুই চরিত্র মাথার ভিতরে অন্যরকম বোধের জন্ম দেয়।

জীবন মশায় এর সঙ্গে সংঘাত লাগে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার। তিনি শ্রদ্ধা করেন শাস্ত্রের এই নতুন দিককে। অথচ সংঘাত লাগে, নতুন যুগ তাঁকে স্বীকার করতে চায় না। জীবন মশায়-এর বিশ্বাস কখনো টলমল করে না কেন না এ বিশ্বাস তো সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু এই প্রাচীন এবং নবীনের দ্বন্দ্বে তিনি নিঃশব্দে সরে দাঁড়াবেন, নবীনের পথ হোক প্রশস্ত। জীবন মশায় তো শুধু মৃত্যু ঘোষণাই করেন না, মৃত্যুর পথ হতে জীবনের পথে মানুষকে উত্তীর্ণ করার স্বপ্ন দেখেনও। ফিরে যেতে হয় সেই রহস্যময়ী নারীকে। আরোগ্য নিকেতন-এ জীবন বোধের চিহ্ন সর্বত্র স্পষ্ট।

তবুও সমস্ত কিছু জুড়ে এসেছে মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া। জীবন মশায় সমস্ত জীবন অপেক্ষা করে থাকেন সেই অদেখা মুক্তকেশী নারীর। তার কাছাকাছি এসেও তাকে স্পর্শ করতে পারেন না, এতটা জীবন সে শুধু রহস্যময়তায় ডুবে থাকল। অবশেষে তিনি সেই পিঙ্গলবর্ণা নারীকে অনুভব করতে পারছেন, এরই জন্য এতটা বছর অপেক্ষা করে থাকা। কিশোর বয়সের মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে জীবন সায়াহ্নে। মৃত্যু কি সেই কিশোর প্রেমের মঞ্জরী। না অন্য কেউ! মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়ায় তিনি আবৃত হয়ে যাচ্ছেন।

উপন্যাস পাঠান্তে আমার সামনে আকাশের বিস্তার নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমর মিত্র

'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো'

কেয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বরাবর আমি ছিলাম দর্শকদের একজন। আর কেয়া ছিলেন মঞ্চের উপরে। মাঝখানে দূরত্ব অনেক। যদিও প্রতিবারই মনে মনে বুঝেছি, নাটক চলতে চলতে সেই দূরত্ব ক্রমে কমে এসেছে। এক একসময় বড়ো কাছাকাছি। মঞ্চের উপরে কেয়া কখনও কেয়া চক্রবর্তী নন। অন্য কোন নামে। সেই নামের আড়াল থেকে ক্রমিক উন্মোচনে তিনি অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছেন। তখন মনে হয়েছে, ওই চরিত্রটিই জীবন রসে অমৃত-ময়। এ ব্যাপারটা কেবল অভিনয় পারদর্শিতা নয়। কারো কারো জীবন নাটক-সমর্পিত। আবার কারো কারো কাছে নাটকই সমর্পিত। কেয়া ছিলেন এই দ্বিতীয় দলের।

এই কেয়ার সঙ্গেই একদিন মুখোমুখি আলাপ। আর প্রথম আলাপেই কঠিন পরীক্ষা। তখন রঙ্গনায় ভালোমানুষ চলছে। আমরা তিনজন ভালোমানুষ একদিন দুপুরের দিকে গেলাম রঙ্গনায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় গিয়েছিলেন অজিতেশবাবুর সঙ্গে কথা বলতে, বোধহয় নাটক বা নাটকের সমালোচনা নিয়ে আলোচনা করতে। সঙ্গী ছিলাম আমি আর সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেইদিনই রঙ্গনার গ্রীণরুমে আলাপ হলো কেয়ার সঙ্গে। নমস্কার বিনিময়ের পর কেয়া বললেন, আচ্ছা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুঞ্জয় কবিতাটা মনে আছে?

—আছে। তবে মুখস্থ বলতে পারবো না।

—'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো' না

'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো'—কোনটা ঠিক?

জানা ছিল কেয়া সাহিত্যের ছাত্রী, অধ্যাপিকাও। ভয়ে ভয়ে ভালোমানুষ ছাত্রের মতো বললাম, বোধহয় 'মৃত্যুর চেয়ে' হবে।

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে 'মৃত্যু চেয়ে'। একটু জানা যায় সঠিক ভাবে?

—দাঁড়ান দেখছি। বলে আমি অমিতাভ চৌধুরীকে ফোন করলাম। অমিতাদাও বললেন, 'মৃত্যুর চেয়ে' হবে হবে বলেই মনে হচ্ছে।

জানালাম কেয়াকে অমিতদার কথা।

কিন্তু কেয়ার সন্দেহ যায় না। বলে, আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে মৃত্যু-চেয়ে বড়ো। এমনই সর্বস্বতা থেকে হতো।

এ মেয়ে বড়ো সোজা নয়। আমি হাল ছেড়ে দিলাম। ইতিমধ্যে রুদ্রপ্রসাদ এলেন। কেয়া তাই দেখে একটা টিফিন বাকস এগিয়ে দিলেন। আলু ভাজা দিয়ে রুটি খেতে খেতে রুদ্রপ্রসাদ বললেন, 'মৃত্যুর চেয়ে বড়ো'—শুনতে ভালো লাগে কিন্তু।

কেয়া প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু দ্যাখো ছন্দে আটকাচ্ছে।

তবুও বললাম, অমন শুনে দেখছেন আটকাচ্ছে। কিন্তু অমন লেখায় পেতাম তো....

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই কোথা থেকে একটা সঞ্চয়িতা এনে দোলা চটপট পাতা খুলে দেখলাম কেয়ার জিৎ। হবে 'মৃত্যু-চেয়ে'।

কেয়া খুশি। নিশ্চিন্ত। চলে গেল ড্রেসিং রুমে। আর একটু পরে ভালো-মানুষের যবনিকা উঠবে।

এখন কেয়ার হঠাৎ সত্যের কথা শুনে সেদিনকার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আমার মনে পড়লো দুটি কথা: এক, কেয়া ছিলেন আমার সমবয়সিনী। দুই, সেদিন যে কবিতার লাইন নিয়ে এত কাণ্ড, তার পরেও আরও দুটি লাইন আছে। একসঙ্গে তিনটি লাইন:

আমি মানুষ-এরচেয়ে বড়ো
এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।

—অমিতাভ চক্রবর্তী, কলকাতা-৩৩

অমৃত প্রসঙ্গে

'অমৃত'র সাম্প্রতিক সংখ্যাগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে, সুস্থ ও প্রয়োজনীয় ভাবনায় অর্থাৎ এমন এক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে যে, আমার ধারণা 'অমৃত' এখন শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা।

আমি অভিনন্দন জানাই 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে এবং তারও বেশী সেই সব তরুণ প্রতিভাবানদের, যাদের পরিকল্পনাতেই সম্ভবতঃ 'অমৃত'-এর এই ব্যাপক পরিবর্তন। আমি একজন তরুণ লেখক হিসেবে, একথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছি যে, 'অমৃত' আমার পত্রিকা এবং 'অমৃতে' আমাকে লিখতেই হবে।

সবশেষে একটি অনুরোধ করি পরিচিতিতে কবিদের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয়টা কি আরেকটু 'ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার' পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় না? আমরা জানতে আগ্রহী তিনি কি খেতে ভালবাসেন ও কখন লিখতে বসেন। তার সাম্প্রতিক কবিতা বিষয়ক ভাবনাচিন্তা সব কিছু সাক্ষাৎকারে। আপনাকে আরেকটি অনুরোধ—কলকাতার বাইরে যারা ছড়িয়ে আছেন, সেই লেখকগোষ্ঠীর কথা কিন্তু ভুলে যাবেন না। 'অমৃতের' পাতায়, দুর্গাপুরে, ভাগলপুরে, জামশেদপুরে, ভিলাই, দুর্গাপুরের তরুণ লেখকরা উপস্থিত হতে পারেন যেন তাদের সৃষ্টির সম্ভার নিয়ে।
মৃণাল বণিক, দুর্গাপুর-৫।

(২)

রচনার উৎকর্ষে, আঙ্গিকে এবং বিন্যাস-নৈপুণ্যে সম্প্রতি 'অমৃত'-এর ঝকঝকে প্রতিটি সংখ্যা এক লহমায় মন কেড়ে নেয়। কবি ও কবিতার ওপর সাম্প্রতিক গবেষণা লেখাগুলোর প্রথম সফল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেখালেন 'অমৃত'।

তবু দুঃখ জাগে, গভীর দুঃখ জাগে, যখন দেখি সমালোচনায় পক্ষপাতিত্ব। তাই "গল্প এক দশক" সমালোচনায় বলরাম বসাক, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত প্রমুখ শক্তিমান গল্পকারদের ছবির পরিবর্তে ছাপা হয় শচীন দাশ, অমর মিত্রের ছবি, এবং 'ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা' সমালোচনায় অনেক কবির উল্লেখ থাকলেও শান্তনু দাস, মৃণাল বসুচৌধুরী প্রমুখ ষাট দশকের গুরুত্বপূর্ণ কবিদের নাম বাদ যায়! সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, পুরুলিয়া।

(৩)

অমৃত পত্রিকার এই চেহারা তো দেখিনি আগে। গত তিন সংখ্যা থেকে অমৃতে দেখছি কিরকম যেন অন্যরকম। ৪ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা অমৃত বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। না লিখে পারলাম না—এখন থেকে নিয়মিত অমৃত পড়বো—কারণ এবার মনে হচ্ছে অমৃত পড়তে হবে। বেশ একটা শান্তি পাচ্ছি।

আমরা পাঠক সবরকম লেখায় রুচির ও ভাষার দক্ষতা চাই। অমৃত এবার সে পথে চলেছে বলে মনে হচ্ছে। এই বৈকুণ্ঠ পাঠক কে? অসাধারণ কলম। সমালোচনা বিভাগটি খুব ভাল হয়েছে। সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারটি দিয়ে ভাল করেছেন—তিনি যে মর্যাদাকেই অনেক নীচে নেমে গেছেন—বোঝা গেল। শিবপ্রসাদ সমাদ্দার এমন লিখতে জানেন জানতাম না—আনন্দ বিস্ময় একসঙ্গে। দীপালি দত্তরায় বিশদ, ভাল লেখিকা মনে হচ্ছে। কলমটা ভাল।

এছাড়া ৪ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা হাতে নিলে বোঝা যায়— সত্য। পড়েছি পাতা। জহুরী মদাপর আমীর খাঁ নিয়ে লিখলেন—এক কথায় এমন লেখা কোন পত্রিকায় দেখিনি। আচ্ছা—ছবির ইলাস্ট্রেশন অর্থাৎ বদলে দিলেন এখন কেমন একটা স্মার্ট দেখায় চান। ফিল্ম রিভিউগুলিও উন্নত হয়েছে। আমরা চাই 'অমৃত' ভাল পড়ার এক পত্রিকা। লোক নতুন লেখকদের সুযোগ দিক। অমৃত ভাল হচ্ছে একথা আশা করি অন্য পাঠকরাও বলবেন। কিন্তু, হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন? কি? অমরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এন্টালী, কলি-১৪।

(৪)

গত ৪ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় আপনার সম্পাদকীয় খুবই সুন্দর লাগলো। সাঁতাঃ সদা যুবক পাঠকদের বই ইদানীং চোখে পড়ে না।

এই সংখ্যায় লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে 'দিকপতির ভাবনা সুন্দর ভাবে তাঁর ভাবনা আর একটু প্রসারিত করে মফঃস্বলের সেই অবহেলিত রুগ্ন শরীরের রোগা কাগজগুলো প্রশংসার 'কোটিন-এ মোড়া' সমালোচনা ছাড়াও যে অন্য রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে—এটা দেখাতে পারতেন।

যাই হোক 'অমৃত পত্রিকা শুরু থেকেই ছোট পত্রিকাগুলো নিয়ে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল'—এটা জেনে ভালো লাগল। সুশীলকুমার রায়, লাকুরডি বর্ধমান।

(৫)

বাংলা সাহিত্যের একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে আমি অমৃতের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি। কারণ পাঠক হিসেবে আমরা আর একটি প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিকের সাহিত্য রস আস্বাদ করতে পারব। 'অমৃত'-এর চরিত্র বদল অভিনন্দনযোগ্য। তবুও একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অমৃতে প্রকাশিত ছোট গল্পের সেই স্বাদের তেমন পরিবর্তন হয়নি। অনুগ্রহ করে এবিষয়ে আপনারা একটু নজর দেবেন কি?

শুনেছি অমৃত পত্রিকায় রোজ বেশ কিছু গল্প জমা পড়ে প্রকাশের জন্য। আমি বিনীতভাবে আপনাকে জানাতে চাই যে আমি সেই সব গল্পের পাঠক হতে চাই। আমি ওর থেকে কিছু ভাল গল্প বেছে দিতে রাজি। মধুজা চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-৫০।

(৬)

নতুন আঙ্গিকে 'অমৃত' পরিবেশনার জন্য প্রথমেই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানবেন। বিশেষ করে প্রতি সংখ্যায় ছোট গল্পের তো তুলনাই হয় না। বর্তমানে ছোট গল্প সম্বন্ধে যে অবজ্ঞার মনোভাব কোনও কোনও মহলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। অমৃত তাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আর শুধু খ্যাতনামারাই নন—ভাল ছোট গল্পের বহু অখ্যাত অজ্ঞাত লেখককে 'অমৃত' পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে।
কমল লাহিড়ী, চোপড়া, ২৪ পরগণা।

আমরা 'অমৃত'-এর গুণমুগ্ধ পাঠক। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অমৃত কখন যে আমাদের প্রিয়জন হয়ে গিয়েছে তা জানি না। তাই যখনই অমৃত পত্রিকায় বিষয় বৈচিত্র্যে কিছু নতুনত্বের ছোঁয়া দেখি তখনই মনটা গর্বে ও আনন্দে ভরে ওঠে।

সম্প্রতি অমৃতে নতুন নতুন

চিন্তাকর্ষক ফিচারগুলির সংযোজনে আপনি সত্যই রুচিশীলতা এবং মননশীলতার ছাপ রেখেছেন। অমৃতকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, অমৃতের বিষয় বৈচিত্র্যে আরো নতুনত্ব আনার জন্য কয়েকটি বক্তব্য রাখছি—

(১) 'বিজ্ঞানের কথা'—বিভাগটির পৃষ্ঠা সংখ্যা একটু বাড়ানো হোক। এই বিভাগে বিজ্ঞান জগতের প্রথিতযশা ব্যক্তিদের কথা ও তাঁদের কাজ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হোক। সেই সংগে সম্ভব হলে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর রাখা হোক।

(২) চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিভাগ নিয়মিত সংযোজন করা হোক। যার আলোচ্য বিষয় হবে—একটি রোগের সৃষ্টি, লক্ষণ এবং তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার।

(৩) সাহিত্য বিজ্ঞান বা শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার বিশিষ্ট পীঠস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় অমৃতের পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হোক ধারাবাহিক ভাবে।

(৪) প্রতি বছর অমৃত-এর তরফ থেকে অমৃতে প্রকাশিত বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, চিত্রশিল্প ইত্যাদি বিষয়ে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, চিত্রশিল্পীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হোক। প্রভাতকুমার দাস মীরা পাল, গৌরীবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী।

মোহিনী আটাম

শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতির মিষ্টি মধুর অথচ দাক্ষিণাত্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভরপুর উপন্যাস মোহিনী আট্টমের জন্য লেখক ও অমৃত পত্রিকাকে আমার ধন্যবাদ জানাই। কাব্যিক ছন্দোময়তা ছত্রে ছত্রে। স্নেহ, ভালবাসা, ও প্রেমে পূর্ণ করে লেখক অসীম মমতা দিয়ে এক-একটি চরিত্রের জন্ম দিয়েছেন। ললিতা, সরিতা, চন্দ্রকিরণ, মিঃ পিল্লাই, দোলন — সব চরিত্রই স্ব মহিমায় উজ্জ্বল। সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে উপন্যাসের নায়িকা প্রেমা মেনন। যাকে ঘিরেই উপন্যাসের চরিত্রগুলো সুখ-দুঃখে, স্নেহ-প্রেমে আবর্তিত হয়েছে সারাক্ষণ। লেখকের কলম অসংকোচে মনের শুদ্ধ প্রেমেরই জয়গান করেছে। ললিতা বা মিঃ পিল্লাই-এর স্ত্রী এরা লেখকের সংস্কারমুক্ত কলমের আঁচড়ে পবিত্র প্রেমের প্রতিমূর্তি। সে চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রেমা মেননের প্রতি পদক্ষেপে—সেই চরিত্রটি গৃহীক-শিল্পীর সঙ্গে দেহ-সুখের অনুভূতিকে পাপ মনে করে নিজেকে অশুচি ভেবে আরব সাগরের জলে শান্তি পেতে চাইছে—এটা একই চরিত্রের পরস্পর বিরোধী রূপ বলেই মনে হয়। লেখকের কাছে বিনীত অনুরোধ, বইয়ের আকারে আগে প্রকাশের আগে তিনি যেন প্রেমার মনের দুর্বলতাকে ক্ষমা করে দৃঢ় তেজস্বীতা দিয়েই সমাপ্ত করেন চরিত্রটিকে। বাংলা সাহিত্যে দাক্ষিণাত্যের প্রেমা মেনন থাকুক না সমস্ত প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের ঊর্ধে। এজা রায়, ভেহিকেল এস্টেট, জবলপুর।

(২)

সপ্তাহের পর সপ্তাহ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকা এতোদিনে শেষ হল। সত্যি চিত্তরঞ্জন মাইতির মোহিনী আট্টম উপন্যাসটি পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি।

'প্রেমা' লেখকের রচিত এক আশ্চর্য চরিত্র।

'তিরু আদিরায়' দেবানের জন্ম সার্থক। মন্দিরের সকল তুচ্ছ জিনিসকেই বুকে তুলে নেন—দেবন যেন তাঁরই মূর্ত প্রতিকৃতি।

ডেভিড ও মাইকেল চরিত্রাংকন দুইটিই সুন্দর। কুমার সাহেব চন্দ্রকিরণ গর্গ তো এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। দোলন একটি মিষ্টি মধুর কিশোরী চরিত্র।

ললিতাকেও আমার খুব ভালো লেগেছে।

অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্র যেমন মিঃ পিল্লাই ইত্যাদিও বেশ ভালো।

লেখক শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতিকে এই উপন্যাসের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবেন। সাগরিকা চট্টোপাধ্যায় কলি:-৬৭।

ছয় ঋতু, ছয় রিপু, ছয়তার

৬ ফেব্রুয়ারীর অমৃতে জহুরী সদাশিবের লেখায় পরলোকগত ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের সংগীত জীবনে বিশিষ্টতার মূল সূত্রটি কোথায়, কিভাবে তিনি সুরের মায়াজাল বিস্তার করতেন এবং তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের কতটা যে বর্তমান সংগীত সাধকদের সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র বিশেষ ছিল—আপনার লেখায় তা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে লেখাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। রবীন চক্রবর্তী, জগাছা, হাওড়া।

প্রথম প্রবাসের লেখককে

আমি আপনার একজন পাঠক। অমৃতে কিস্তিতে প্রকাশিত আপনার ভ্রমণ কাহিনী 'প্রথম প্রবাস' পড়েছি। আপনার শেষ কিস্তি (২৮ জানুয়ারী সংখ্যা) পড়ার পর আপনারই অনুরোধক্রমে লিখছি। আপনার ভ্রমণ কাহিনী, আমরা যারা কোনদিন বিদেশ ভ্রমণে যাইনি তাদের কাছে অনেকটা আশের হস্তি দর্শনের মত—যেন আপনার হাত ধরে কসমস্ টাওয়ের সওয়ার হয়ে ঘুরে এলাম। এ ভ্রমণে গতি আছে কিন্তু যতির আনন্দ পেলাম না।

তবু পড়তে ভাল লেগেছে আপনার নিজস্ব মতামত, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সহযাত্রী ও সহযাত্রিণীদের টুকিটাকি সংলাপ। যেখানে তারা তাদের মানসিকতাকে উন্মোচিত করেছে। এই প্রসঙ্গে আপনার একটি অনবদ্য মন্তব্য তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারলাম না—'যেমন ভবিষ্যতের ইজরায়েলী, বর্তমানের বাঙালি'।

যাই হোক আপনার এই উপন্যাসধর্মী ভ্রমণ কাহিনী পড়ে নিঃসন্দেহে আনন্দ পেয়েছি। এখন আপনার এই কাহিনীর উদ্দেশ্য যদি আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়া হয় তবে নিশ্চয়ই আশা করব ভবিষ্যতে এই কাহিনী আমরা বিশ্বাস এবং আনন্দ দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন না।

করুণা চক্রবর্তী, গৌহাটি, আসাম।

সবার আগে জল—তারপর মাছ। সবশেষে মানুষ। এইভাবে নাকি সৃষ্টি। আমরা সমুদ্র ও মাছের পাশে বহুকাল আছি। কিন্তু সঙ্গী হিসেবে ওদের কতটুকু জানি ?

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার চবিনাড়ী স্কুলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। হয়তো তারই কাছে ছাত্রের শিক্ষা—অজানার ডাকে—প্যাসিফিকে, আটলান্টিকে, নর্থ সী-তে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞানে পি এইচ ডি ডঃ ভট্টাচার্য মাছ নিয়ে বিটিশ মিউজিয়ামে কাজ করেছেন। ইলিশ গোষ্ঠীর হেরিং এর সন্ধানে উত্তর সাগরে নৌকা ভাসিয়েছেন। গবেষণা করেছেন এবারডিন-এর টোরি মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরীতে।

ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, বঙ্গোপসাগরের নীচে মহী সোপানের চরিত্র ও চেহারা যে পাল্টাচ্ছে, তা সম্ভবত ভারতীয়দের মধ্যে শুধু রবীন্দ্রবাবুই চা খেতে খেতে অনায়াসে বলতে পারেন। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ট্রলার এখন তাঁর নকশা মতই তৈরি হয়। ভারত ও রাজ্য সরকারের মাছের দফতরে কিছুকাল কর্তা ছিলেন। একবার চটে গিয়ে, প্রায় বিশ বছর আগে, কলকাতায় সামুদ্রিক মাছ বিক্রির আশীটি আড়ৎ খুলেছিলেন। তাঁর মুখেই শোনা যাবে জাপানীরা চিংড়িকে বলে এবি। তমলুক থেকে কোণারক অবধি বঙ্গোপসাগরে এই চিংড়ির রাজত্ব।

বোধিসত্ত্ব মৈত্র নামে কয়েকখানা উপন্যাস লিখেও মাত্র ছ'মাস আগে ডঃ ভট্টাচার্য এক জাপানী ছাত্রের ডাকে প্যাসিফিকে গিয়েছিলেন—কয়েকটি মাছের স্বভাবচরিত্র যাচাই করতে। উপস্থিত হোমিওপ্যাথিতে মগ্ন। দিনে তিনজনের বেশি রোগী দেখেন না।

আমরা, অর্থাৎ বাঙালীরা মাছ খাই। শুধু খাই বললে কম বলা হবে। মাছ না হলে আমাদের খাওয়া হয় না। কিন্তু মাছ এখন একটা খবরে পরিণত হয়েছে। বাজারে মাছের দাম কমলে খবর হয়ে তা কাগজে বেরোয়। অথচ আমাদের এত প্রিয় খাবার জিনিস সম্বন্ধে আমরা জানি কতটুকু ? মাছ খেতে হলে মাছ ধরতে হয়। আর মাছের আসল ভাঁড়ার হলো সমুদ্র। অথচ সেই সমুদ্রের মাছ দেখে আমরা এখনও নাক সিঁটকোই। ঠাণ্ডাঘরের বাসি রুই-কাতলা কিনে আনি চড়া দামে পকেট খালি করে। কিন্তু সমুদ্রে মাছের সম্পদ আর সেইসব মাছের স্বাদ আমাদের কাছে এখনও অজানা রয়ে গেছে। আমরা জানি না, জানতে চাই ন আমাদের খুব কাছের এই অতুল সম্পদের কথা, মাছ ধরার রোমাঞ্চের কথা আর সেই মাছের সুস্বাদে রসনা তৃপ্তির কথা শুধুমাত্র অভ্যাস আমাদের পিছিয়ে রেখেছে যথার্থ ভাল মাছের কাছ থেকে অনেক দূরে। এই অভ্যাস ছেড়ে প্রথা ভাঙার কাজে এগিয়ে এলে লাভ হবে আমাদের। বাঙালী তখন মাছ না পেয় কাঁদবে না।

উনিশশ' একষট্টির লোকগণনায় পশ্চিমবাংলার জনসংখ ছিল প্রায় সাড়ে তিন কোটি। সেই অনুপাতে মাছের চাহিদা ছি পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টন। দিনে মাথাপিছু এক ছটাক, মা আটান্ন গ্রাম হিসেবে। কিন্তু তখন মাছ যে পরিমাণ পাওা গিয়েছিল, তাতে চাহিদার অর্ধেকও মেটেনি।

মানুষ : মাছ : সমু

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রতিদিন মাথাপিছু আটান্ন গ্রামের হিসেবটা পশ্চিমবাংলা সরকারের মৎস্য দপ্তরের। ভারত সরকারের প উপদেষ্টা সংস্থার হিসেবটা কিন্তু আটান্ন গ্রাম নয়, পঁচ গ্রাম। ওই হিসেবে চাহিদার পরিমাণটা আর লাখ দেড়েক বেড়ে যায়।

সাতাত্তরে পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ কোটির কাছাকাছি। সেই অনুপাতে মাছের চাহিদা হ উচিত প্রায় সাড়ে সাত লাখ টন। কিন্তু সরবরাহ অনেক তে জোড় করেও সাড়ে তিন কি চার লাখ টনের বেশি হবে বলে হয় না। চাহিদা আর সরবরাহের মাঝখানে এই যে উপসাগ ফারাক তারই ভেতর চলেছে মাছের বাজারের যতকিছু ফাটকাবা তাই মাছের দর বছরের পর বছর কোনদিনও নামে না, উল্টে চলে আকাশমুখো।

এ-সমস্যার বীজ আজকের নয়, বহু পুরোন। তাই শতাব্দীর প্রথম দশকে সরকারের মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আ এস সেক্রেটারি, কবি অতুলপ্রসাদের শ্বশুর ও মাতুল কৃষ্ণগো গুপ্ত, ইউরোপ আমেরিকা চষে এসে আঙুল বাড়িয়ে দেখ বঙ্গোপসাগরের দিকে।

মাছ-খেকো বাঙালীর মাছের অভাব শুধু নদী- খাল-বিল-দীঘি-পুকুর আর বাঁওড়ের মাছেই মিটবে না। অভাব যদি মেটাতে হয়, তাহলে মাছ তুলে আনতে হবে স অফুরন্ত ভাঁড়ার থেকে, কলের জাহাজ দিয়ে।—লিখলেন গুপ্ত তাঁর রিপোর্টে।

প্রশ্ন উঠল, বঙ্গোপসাগরে খাবার মতো মাছ আছে তো?

আঠারশ' নিরানব্বুই-এ সামরিক জাহাজ আর আই এম এস 'ইনভেস্টিগেটর' নিয়ে কম্যাণ্ডার কারপেণ্টার আর হ্যরাকিন দুই সাহেবে মিলে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার একটা মহড়া দিয়েছিলেন। সেখানকার জলে কি কি মাছ থাকতে পারে তা দেখার জন্য এই শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই কয়েকজন জার্মান বিজ্ঞানী উৎসাহী হয়ে ধরেছিলেন কিছু কিছু মাছ, তাঁদের কলের জাহাজ 'ভ্যালডিভিয়াতে'।

এই দুটো জাহাজের উদ্দেশ্যই ছিল নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মিনবৃত্তির। ক্ষুণ্ণিবৃত্তির জন্য চিন্তা ওদের আদৌ ছিল না। সে-চিন্তা শুরু হল উনিশ শ' সাত-আট সালে কে জি গুপ্তের রিপোর্ট বেরুবার পর।

বৃটিশ সরকার কলের জাহাজ আনালেন বিলেত থেকে, নাম 'গোল্ডেন ক্রাউন'। সে-জাহাজ কলের জাল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে আঠাশ ক্ষেপ মাছ ধরে এল ট্রল করে, আট সালের জুন থেকে ন' সালের ডিসেম্বর অবধি। তাতে যা মাছ উঠল, তা উৎসাহ পাবার মতোই।

দেখা গেল বঙ্গোপসাগরে বছরের সব সময়েই কলের জাহাজ দিয়ে মাছ ধরা সম্ভব। দশ থেকে একশ' ফ্যাদম (এক ফ্যাদমে ছ' ফিট বা দু' গজ) জলে ভালভাবেই ট্রল করা যায়। তবে ভাল মাছ ওঠে কুড়ি থেকে ত্রিশ ফ্যাদমের মধ্যেই। সবচেয়ে বড় কথা হল বঙ্গোপসাগরের বেশির ভাগ মাছই সুস্বাদু ও আহারের উপযোগী।

এই রিপোর্ট পাবার পরও কেন যে অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলায় উনিশশ' নয় থেকে পঞ্চাশ অবধি সমুদ্রে মাছ ধরা চালু হয়নি, আজও তা অনুমানের বিষয়। তবে কে জি গুপ্তের পরবর্তী কালে মৎস্য দপ্তরের সব কর্তাই একবার করে সমুদ্রের কথা স্মরণ করে গেছেন তাঁদের রিপোর্টে।

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বিজ্ঞানী মাথা নানা বিষয়ে খেলতে শুরু করেছিল। প্রাণীবিজ্ঞানী ডাঃ বেণীপ্রসাদ কেন্দ্রের মৎস্য উপদেষ্টার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করতেই ডাঃ রায় তাঁকে নিয়ে এলেন পশ্চিমবাংলার মৎস্য দপ্তরের ডিরেক্টার করে। তাঁরই পরামর্শে সর্বপ্রথম সমুদ্র থেকে মাছ ধরার একটা দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা মাথায় নিলেন ডাঃ রায়। তিনি ইউরোপ সফরে গিয়ে সমুদ্র থেকে মাছ ধরার ব্যাপারটা ভাল করে নিজে দেখলেন, খোঁজখবর করলেন। শেষে একজন ডেনিশ ওস্তাদ মাছ মারার সঙ্গে দিলেন লাগিয়ে ডাঃ বেণীপ্রসাদ আর আই সি এস সুশীল দে-কে।

ফল, উনিশ শ' পঞ্চাশের শেষের দিকে ডেনমার্ক থেকে দুটি মৎস্য-তরীর কলকাতার গঙ্গায় আগমন ও তাদের ডেনিশ নাম 'শেনাডার', 'স্কারেকিনট' বদলে খাঁটি বাঙালী নামকরণ 'বরুণা' আর 'সাগরিকা'। দুটো জাহাজের সঙ্গে মাছ ধরতে ও মাছ ধরা শেখাতে এদেশে এল তেরোজন ডেনিশ মেছো। তাদের প্রায় সকলেই দেশে ফিরে গেল দু'-এক বছরের মধ্যেই। কিন্তু দু'জন মেছো ক্যাপ্টেন রবার্ট আর স্যামুয়েল এদেশে ছিল উনিশ শ' ষাট অবধি।

'সাগরিকা' আর 'বরুণা'র সঙ্গে উনিশ শ' পঞ্চান্নর এপ্রিলে যোগ হল আরও তিনটি জাপানী মাছধরা জাহাজ, ছত্রিশজন জাপানী মেছো নাবিকশুদ্ধ। নাবিকেরা এদেশে রইল মাত্র একটা বছর।

ডাঃ রায় অনেক শখ করে পাঁচটি মেছো জাহাজ, পঞ্চকন্যার নাম দিলেন কল্যাণী একনম্বর, দুনম্বর, তিননম্বর, চারনম্বর ও পাঁচনম্বর। ওরা সবাই কল্যাণী। ডাঃ রায় বড় আশা করেছিলেন এরা সবাই নিয়ে আসবে দেশের কল্যাণ। কিন্তু সে-আশা আশাই রয়ে গেল।

বাঙালীর মাছ বিচার

এখন কথা হল, সমুদ্রের মাছ বাঙালী পাতে পাড়বে কিনা? বাঙালী হল ভারতবর্ষের সেরা মাছখোর জাত। কিন্তু তাই বলে সমুদ্রের 'হাঙর-কুমীর' যা-খুশি তুলে এনে বলবে খাও, তাই কি হয়?

কলকাতার পত্তন থেকেই বাঙালী বড় বড় পোনা মাছের দাগাটি (পাদা হল পূর্ববঙ্গীয় প্রতিশব্দ), বড় গলদা চিংড়ির ঘি-ভরা মাথাটি খেতেই অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে বাগবাজারের ঘাটে ওঠা 'এন্ডাওয়ালা তপসে', কি ভরা ভাদরে বর্ষার খিচুড়ীর সঙ্গে গরম গরম দু-চারখানা ইলিশ মাছের দাগা, শীতের মুখপাতে বড় ভেটকীর কি ভাঙনের কালিয়া নতুন-ওঠা ফুলকপি সহযোগে। ব্যস। এর বাইরে কোন মাছ খাবার চিন্তা কলকাতার বনেদী বাসিন্দেরা কখনও করেনি।

কিন্তু সারা গ্রামবাংলায় বড় পোনা রুই-মৃগেল-কাতলা-কালবোস ছাড়াও আদি কাল থেকে চালু আছে অজস্র রকমের মিঠে জলের মাছ। যেমন, রাই-বাটা, ভাঙনবাটা, কুরচিবাটা, খড়কে-বাটা ইত্যাদি বাটারা। শোল-শাল-ল্যাটা-চ্যাং। গুতেগইচি-পাকাল-বান-কুঁচে। চিতল-ফলুই। পাবদা-আড়-টাই-বাচা-গড়চা। কাঁচকি-কাজলি। বোয়াল-ট্যাংরা (নানা জাতের)। কই-ন্যাদস-খলসে। শিঙি-মাগুর। পুঁটি (ছোট-বড় বহু রকমের)-মৌরলা-চ্যালা। তেচোখো-ভ্যাদা-চাঁদা-হ্যাংগাই-মদন (এরা হল বনেদী চুনো)। কাকিলে-গাংধারা। খয়রা। বেলে-বাঁশপাতা ইত্যাদি ইত্যাদি অজস্র রকমের মাছ।

এদের ওপর আছে নাবাল খাড়ি অঞ্চলের মাছ। ভেটকী-কুঁজো ভেটকী-খোড়ো ভেটকী। নোনা ট্যাংরা-রিঠে-পাঙাস-পায়রা চাঁদা। খরশোলা-পার্শে-ভাঙন। গুলে-বেণ্গো-কাঠ-কই—কইভোলা-ভোলা। গড়জাওয়ালি-সোল—আরও অনেক, অসংখ্য। আর আছে বাগদা, হরিণে, চাপড়া, সাগরে, সতীনপোড়া, চামনে, গগন ও আরও অনেক রকমের ছোট-বড় চিংড়ির জাত।

আপামর সাধারণ বাঙালীর জন্যে (অবশ্য আজকাল আর সাধারণের কাছে সহজলভ্য মোটেই নয়) পরিবারী ইলিশ, বর্ষার কটি মাস। এরা উঠে আসে সমুদ্রের অগভীর এলাকা থেকে, পার হয়ে আসে খাড়ি অঞ্চল, ঝাঁক বেঁধে চলে মিঠে জলের এলাকায় ডিম পাড়ার জন্যে।

কিন্তু পুরোপুরি সমুদ্রের মাছ? শহুরে বাঙালী তো নয়ই, গেঁয়ো বাঙালীরাও কি কোনকালে সমুদ্রের মাছ খেতে অভ্যস্ত ছিল?

কালেভদ্রে শৌখিন বংগনন্দনরা পুরী-ওয়াল্টেয়ার যেতেন হাওয়া বদল করতে। তখন শখ করে কিনে খেতেন দু'চ-রটে পমফ্রেট-ম্যাকরেল। তাতে অনেকেরই আবার বদহজম হোত, পেট ফুলত।

অথচ সমুদ্রের মাছ খেতে অভ্যস্ত তামাম উপকূল অঞ্চলের লোক। উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরল, দক্ষিণ কানাড়া, গোয়া, রত্নগিরি, বোম্বাই, গুজরাট অবধি তামাম উপকূল অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এই সাগরে মাছ খাবার রুচি। মাছ তো মাছ, হাঙর পর্যন্ত তারা তারিয়ে তারিয়ে খায়। পেটের রোগে ভোগে এমন কথা তো শোনা যায় না।

বোম্বাই-এর পাঁড় মাছ-খোর পার্শী, মারাঠি কি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকদের পাতে পাকা রুই মাছের কালিয়া দিয়ে দেখেছি, তাঁরা জিভে তুলে মুখ কোঁচকান। বলেন, স্বাদটা যেন কেমন কেমন।

তফাৎটা অভ্যাসের। আপরুচি খানা। যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় এক-একটা অঞ্চলের খাদ্য-রুচি গড়ে ওঠে। মেদিনী-পুরের আর চব্বিশ পরগণার সমুদ্র উপকূলের একচিলতে অংশ
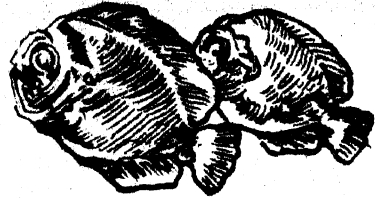
বাদ দিলে সারা পশ্চিমবাংলার বাসিন্দেরা পুরুষানুক্রমে রুচি তৈরি করেছে শুধু মিঠে জলের আর খাঁড়ি অঞ্চলের মাছ খেয়ে।

সমুদ্রের মাছ খেলে শরীর খারাপ হয়, এ-অপবাদ দেওয়া কিছুতেই চলে না। খৃষ্ট জন্মাবার শ'খানেক বছর আগে আয়ুর্বেদাচার্য সুশ্রুত আর চরক দুজনেই সমুদ্রের মাছের গুণ গেয়ে গেছেন।

সুশ্রুত তাঁর সংহিতায় সমস্ত মৎস্যকুলকে ভাগ করেছেন দুভাগে। 'মৎস্যাস্তু দ্বিবিধা। নাদেয়াঃ সামুদ্রশ্চ'—মাছ দু রকমের—নদীর আর সমুদ্রের। সমুদ্রের মাছ সম্বন্ধে সুশ্রুতের উক্তি—

'সামুদ্রঃ গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতিপিত্তলাঃ।
উষ্ণা বাতহরা বৃষ্যা বর্চ্চস্যাঃ শ্লেষ্মবর্ধনাঃ।।
বলাবহা বিশেষেণ মাংসাশিত্বাত্ সমুদ্রজাঃ।।'

—'সমুদ্রের মাছ গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, অল্প পিত্তকারক, উষ্ণ, বাতহর, বীর্য ও তেজবর্ধক ও সেই সঙ্গে শ্লেষ্মাবর্ধকও। তারা মাংস ভক্ষণ করে বলে বিশেষ বল বহন করে।'

সুতরাং সমুদ্রের মাছ খাবার বিপক্ষে একমাত্র রুচির অছিলা ছাড়া আর কোন আপত্তিই ধোপে টেঁকে না। সমুদ্রের মাছ খেয়ে যদি কোন বাঙালীর পেট ফাঁপে, তবে দোষটা বাঙালীর আন্ত্রিক গোলযোগের, সমুদ্রের মাছের নয়।

কাজেই, মাছের এই নিদারুণ অভাবের মধ্যে সমুদ্রের মাছ যে কলকাতা ও সেই সঙ্গে সারা পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলেও সচল হবে, তাতে সন্দেহের কারণ নেই।

শুধু এই সত্যের ওপর নির্ভর করেই উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সাতান্ন-তে বর্তমান প্রবন্ধকার কলকাতার বুকে বিরাশীটি ছোট-বড় কেন্দ্র খুলতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র সমুদ্রের মাছ বিকিরি জন্য। এবং এই সঙ্গে আরও নিবেদন করি, সমুদ্রের মাছের বিকিরিতে সেই সময়ে এতটুকু খদ্দেরের ঘাটতি তো পড়েইনি, উপরন্তু সামুদ্রিক মৎস্য পরিকল্পনার বিপুল লোকসানের মধ্যে মাত্র ঐ দুটি বছরেই সরকার কয়েক লাখ টাকা লাভের মুখ দেখেছিলেন।

তাই বুক ঠুকে বলতে ভরসা রাখি, দাম কমালে তাবৎ বাঙালী যে-কোন মাছ আদর করে কিনে খাবে।

অনভ্যাসের ফল

চোদ্দ বছর ধরে এদেশে সামুদ্রিক মৎস্য পরিকল্পনা চলায় ও সেই সঙ্গে বাইরের থেকে বহু সমুদ্রের মাছ কলকাতায় বাজারে আমদানি হওয়ার ফলে সমুদ্রের মাছের নামে সাধারণ বাঙালী আজ আর আঁতকে ওঠে না। তবু সন্দেহটা তাদের যে একেবারে কেটেছে তা বলা যায় না। এই সন্দেহটা পুরোপুরি পরিচয়ের অভাবে। সমুদ্রের মাছ পরিচয় করানোর দায়িত্ব কেউই কোনদিন নেয়নি। বিদেশে দেখেছি মৎস্য বিশেষজ্ঞরা শুধু মাছের বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাদের প্রত্যেকটি কিভাবে জিহ্বা-গ্রাহ্য হয়, তার জন্য রান্নার রেসিপিটুকু পর্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে প্রবন্ধ-পুস্তকাদি লিখে থাকেন। সরকারী প্রচার বিভাগ থেকে সেসব প্রবন্ধ-পুস্তকের যোগ্য প্রচার ব্যবস্থাও হয়ে থাকে।

মাছ ধরার খুঁটিনাটি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে যেসব সমুদ্রের মাছ ধরা পড়েছিল তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে হয় ইংরেজী চলতি নাম নয়তো বৈজ্ঞানিক নাম ছাড়া তাদের উল্লেখ অসম্ভব। সমুদ্রের মাছেদের সম্বন্ধে কিছু বলার প্রসঙ্গেই কলের জাহাজে কিভাবে মাছ ধরা হয়, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা সংক্ষেপে জানান দরকার বোধ করি।

সমুদ্রের উপকূল থেকে দশ ফ্যাদম (এক ফ্যাদম দু গজ, চলতি বাংলায় 'বাঁও'। অর্থাৎ দু'বাহু দু'দিকে মেলে দাঁড়ালে এক দিকের আঙ্গুলের ডগা থেকে অন্যদিকের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত) অবধি জলকে বলে 'ইনশোর' অঞ্চল। দশ ফ্যাদম থেকে পঞ্চাশ ফ্যাদম হল 'অফশোর' অঞ্চল। আর পঞ্চাশ ফ্যাদমের বাইরে হল আসল গভীর সমুদ্র (ডীপ সী)।

পালতোলা দেশী জেলে নৌকোগুলির বেশীর ভাগই মাছ ধরে এই 'ইনশোর' এলাকাতে। আবহাওয়া ভাল থাকলে 'অফশোর' অঞ্চলেও তারা অনায়াসে যাতায়াত করে। কিন্তু 'অফশোর' আর গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সবচেয়ে ভাল যান হল কলের জাহাজ। সে জাহাজ ডিজেলে চলে। তার প্রকাণ্ড জাল ইচ্ছামতো ওঠানামা করতে পারে কলের সাহায্যে। সুতরাং তাতে মাছও ওঠে অনেক বেশী। নাবিকদের নিরাপত্তাও অনেক বেশী।

'ইনশোর' এলাকায় সারা বছর যেসব মাছ থাকে, তাদের কারুর কারুর সঙ্গে বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা মাছ হল ইলিশ। খাঁড়ি অঞ্চলের কয়েক জাতের মাছও আসে এই 'ইনশোর' এলাকা থেকে।

সমুদ্রে যেসব মাছ ধরা পড়ে মোটামুটি তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, সমুদ্রের ওপরকার জলের মাছ। দ্বিতীয়, মাঝামাঝি গভীর জলের মাছ। তৃতীয়, একেবারে তলার মাছ।

সমুদ্রতলের ঠিক ওপর দিয়ে যে জাল টেনে নেওয়া হয়, তাকে বলে 'ট্রলনেট'। যে জাহাজ ট্রলনেট দিয়ে মাছ ধরে তার নাম 'ট্রলার'। মাছ ধরার নাম হল 'ট্রলিং'।

একটু-আধটু হেরফের করে ট্রলার হয়েছে নানা রকমের। তাদের একরকম হল 'অটার ট্রল'। আর একরকম হল 'বীম ট্রল'।

ট্রল জালকে ধরে নিতে পারেন একটা গোলমুখো লম্বা থলি, ক্রমশ সরু হয়ে গেছে ডগার দিকে। জলের তলা দিয়ে যখন এটাকে টানা হয় তখন দরকার হয় এর চওড়া মুখটাকে খুলে রাখার। তারজন্যে এর মুখের বেড়ের ওপরের ঠোঁটে লাগাতে হয় ছোট ছোট বলের মতো বয়া বা ফ্লোট। নীচের ঠোঁটে থাকে লোহার শেকল, তার মাঝে মাঝে সীসের ঢেলা। দুপাশে টেনে রাখবার জন্যে ঠোঁটের দু' কোণায় পাখীর ডানার মতো দুটো বড় কাঠের পাটা শক্ত করে এঁটে দেওয়া হয়। এদের নাম হল 'অটার বোর্ড'। জলে এই জালটা নামিয়ে দিলেই চারদিকে জলের টানে জালের মুখটা খুলে হাঁ হয়ে যায়। জালটা টেনে নেওয়া হয় সাধারণত স্রোতের বিপরীত দিকে। তখন জলস্রোতে মাছের ঝাঁক নিয়ে ঢুকতে থাকে হাঁ করা জালের মুখের ভিতর দিয়ে পেটের ভিতর।

এক একটা ট্রলজাল জাহাজের ক্ষমতা অনুযায়ী হয় পঞ্চাশ, একশ, দুশ, তিনশ', পাঁচশ', হাজার ফিট। জলে জাল নামাবার পর সাধারণত জাহাজের গতি হয় ঘন্টায় এক থেকে তিন নট (নট হল সামুদ্রিক দূরত্বের মাপ, এক মাইলের কাছাকাছি) পর্যন্ত।

মাছের ঝাঁক জালের পেটের ভিতর দিয়ে গিয়ে একবারে শেষপ্রান্তে জালের পুঁটুলীর মতো জগা 'কডএন্ডে' গিয়ে জমা হয়। সেটা তোলা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। বেশ খানিকটা উঁচুতে সেটাকে ঝুলিয়ে তার পিছনের ফাঁসটা আলগা করে দিলেই খোলা ডেকের ওপর ঝরঝর করে মাছের রাশি ঝরে পড়তে থাকে। তারপর বাছাই করে মাছগুলোকে জমা করে দেওয়া হয় জাহাজের খোলে কোল্ড স্টোরেজে।

আর একরকমের ট্রলজাল আছে, যা টানা হয় কাঠের পাটার বদলে দুদিকে দুটো জাহাজ দিয়ে। ঠিক দুটো বলদ দুদিকে লাগিয়ে হাল চষার মতো। এর নাম বুলট্রল।

কিন্তু ট্রলিং ছাড়াও কলের জাহাজে মাছ ধরবার আরও বহু পদ্ধতি আছে। সমুদ্রের তলার দিকে যেসব বড় মাছ আছে, তাদের ধরবার জন্য ব্যবস্থা আছে তলায় পাতা কানকো জালের। (Bottom set gill net) যেসব মাছ মাঝামাঝি গভীর জলে চরে বেড়ায়, তাদের ধরতে ব্যবহার করা হয় মাঝ জলের ট্রলজাল। আছে বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন ধরনের মাছের জন্যে পাতাজাল। সমুদ্রের তলায় প্রবালের ঝাড়ে যেসব মাছ লুকিয়ে থাকে তাদের ধরতে দরকার হয় দাঁড় বঁড়শীর। এমন কি ভাসা হাঙর কি অন্য মাছও মারা যায় দাঁড়-বঁড়শীতে। ঝকঝকে তরোয়ালের মতো মাছ সুরমাই (মার্লিন কি তলোয়ার মাছের জাতভাই, মনে পড়িয়ে দেয় হেমিংওয়ের বুড়ো মাছ মারাকে) ধরতেও দাঁড়-বঁড়শীর আকছার ব্যবহার হয়ে থাকে। জলের ওপর দিকে যেসব মাছের ঝাঁক ভেসে চলে (যেমন সার্ডিন কি ম্যাকরেল) তাদের ধরবার জন্যে ব্যবহার হয় ছোট খোপের মিহি বুননের ভাসা জাল (Drift net)। একটা বড় ভাসা মাছেদের জন্যে লম্বা খাড়াই পাতাজাল, বড় খোপের। আর বড় বড় মাছের ঝাঁক, ওপর থেকে অনেক গভীর পর্যন্ত যেসব-ঝাঁক ছড়িয়ে থাকে, যেমন বড় ম্যাকরেল, সুরমাই কি টুনা, তাদের ধরবার জন্য লাগে গভীর করে বোনা প্রকাণ্ড বেড়জাল, সীননেট।

মাছের কুলজী

সমুদ্র থেকে ধরা মাছগুলির ভিতর সবচেয়ে কুলীন হল বাগদা চিংড়ি। আর বঙ্গোপসাগরের টাইগার প্রনের নামে দুনিয়ার মৎস্যরসিকদের জিভ সজল হয়ে ওঠে। হলদে, নীলচে-পাঁশুটে আর চকোলেট রং-এর ডোরাকাটা বাগদা এক একটা ছ' ইঞ্চি থেকে দশ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা। দু-একটা এক ফুটের কাছা-কাছিও আমার নজরে পড়েছে। ট্রলজালের কডএন্ডের থেকে যখন হুড় হুড় করে সাদা মাছের রাশি ঝরে পড়তে থাকে, তখন তার ভিতর থেকে সদ্যধরা বাগদাগুলো জীয়ন্ত লাল শালুকের মতো হঠাৎ হঠাৎ ফুটে উঠে ছটাং ছটাং করে ছিটকে বার হয়। এ একটা অপূর্ব দৃশ্য! এখন দেশের বাজারে এরা একান্ত দুর্লভ ও দুর্মূল্য। বিদেশীদের রসনা তৃপ্ত করে এরা এখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ বাড়াচ্ছে।

এদের থেকে আকারে কিছু ছোট সবুজ রং-এর দু-এক জাতের চিংড়িও কুলীন মাছেদের মধ্যে পড়ে। তাদেরও প্রচণ্ড চাহিদা বিদেশে। তাই এর দেশে আমাদের দুর্মূল্য।

চিংড়ির সময় হল নভেম্বর মাস থেকে মার্চ অবধি।

পমফ্রেট উত্তম মাছ। সাদা কালো দু রকম পমফ্রেটই বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়। মাংসল কালো পমফ্রেট যার বোম্বাই নাম হালুয়াই, স্বাদে সাদার সঙ্গে তফাৎ কিছু নয়। কাঁটার ঝামেলা নেই। মাঝের কাঁটা মাত্র একটাই। তাও আবার নরম। পমফ্রেট চাখের সবচেয়ে ভাল সময় ডিসেম্বর-জানুয়ারী, যদিও নভেম্বর থেকে মার্চ অবধি কিছু না কিছু জালে উঠতেই থাকে।

সুরমাই আর একটা ভাল জাতের মাছ। ম্যাকেরেলের মতো আকৃতি, কিন্তু লম্বায় দু' আড়াই ফিট পর্যন্ত। খাবার তলোয়ারের মতো চেহারা, ওপর দিকটা নীলচে, নীচে সাদা।

ভাল জাতের মাছের মধ্যে আছে বড় জাতের ভোলা, লাল ভেটকী স্ন্যাপার, ঝকঝকে রুপোর থালার মতো গোল, মাঝে মাঝে কালো ফুটকি চিত্তল (চিতল নয়), গুড়জাওয়ালী জাতের সোল (ওদের সবচেয়ে বড় জাত হল বোম্বাই-এর বিখ্যাত রাউস), আরও দু'এক জাতের স্বাদু ও বড় মাছ যাদের কোন নামকরণ এখনও করা হয়নি। তবে তাদের সংখ্যা অনেক কম। মাঝারী ভাল জাতের মাছ ট্রল জালে ধরা পড়ে সবচেয়ে বেশী। এদের ভেতর সবার আগেই নাম করতে হয় ভোলার। মাছগুলো বিস্কুট রং-এর, লম্বায় চার থেকে আট ইঞ্চি। নরম মাংস, টাটকা রেঁধে খেলে ভালই লাগে। তবে কুলীন মাছদের মতো অতটা স্বাদু নয়। সারা বছরই এবং ট্রল জালে ধরা পড়ে বঙ্গোপসাগরের সর্বত্র। কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিমাণে জালে ওঠে ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে। বঙ্গোপসাগরে ভোলাদের শ্রেণী দশ-বারো রকমের।

ভোলার পরেই নাম করতে হয় ইলিশ বা হেরিং জাতের মাছের। এদের বেশ কয়েকটা জাত বঙ্গোপসাগরে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটা বিশেষ জাত 'পাংখা' নাম পেয়ে বাজারে চালু হয়েছে। এ মাছটা প্রায় হেরিং-এরই মতো। খেতে সুস্বাদু, কিন্তু ভয়ানক কাঁটা। ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে এরা পড়ে সবচেয়ে বেশী। এদের পরিমাণ ভোলাদের মতো অতো না হলেও খুব কমও বলা চলে না।

রুপোর টাকার মতো গোল, সাইজে টাকার ডবল, নাম দেওয়া যায় টাকা চাঁদা, বঙ্গোপসাগরের জলে মেলে প্রচুর। এক একটা জায়গায় এদের ঝাঁক ট্রল জাল ভরে উঠে আসে নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারীতে। যদিও বছরের সব সময়েই কিছু না কিছু চাঁদা জালে উঠবেই। এই মাছ থেকে তৈরী হয় ফিশ মিল বা মাছের গুঁড়ো। পোলট্রির খাবার হিসেবে।

চাঁদার মতো আর এক জাতের মাছও বঙ্গোপসাগরে সময়ে প্রচুর ধরা পড়ে। এদের আকারও প্রায় চাঁদার মতো গোল নয় চ্যাপ্টা আর একদম স্বচ্ছ। তাই এদের ইংরাজী নাম 'গ্লাস ফিশ' বা কাঁচ মাছ।

পেটা সুপোর সরু পাত, এক ফুট থেকে আড়াই ফিট লম্বা হল সিতেহার মাছের আকৃতি। মুখটা লম্বাটে, দাঁত বড় বড়। এরা ট্রল জালে উঠে আসে বেশ বেশি পরিমাণে। অকটোবর থেকে মার্চ অর্থাৎ সব সময়েই এদের পাওয়া যায়। সবচেয়ে বেশী ওঠে জানুয়ারীতে। কাঁটা বেশী হলেও সিতেহার সুস্বাদু। এদের থেকে চমৎকার চমৎকার শুঁটকী হয়।

ল্যাকটেরিয়াসের বাংলা নাম নেই। ক্ষীরসাপাতি মাছ বলে চালালে দোষ কি? সদ্য মাঝারি সাইজের মাছ, দুই থেকে চার ইঞ্চি লম্বা। ডিসেম্বরে এরা সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে ট্রল জালে।

পার্শে ভাঙনের জাত বেশ কয়েক রকম মাছ ওঠে সমুদ্র থেকে। যদিও তাদের স্বাদ-খাড়ির পার্শে-ভাঙনের মতো নয়, তবু তারা একেবারেই ফেলনা নয়। এদের সবচেয়ে সুবিধে কাঁটা কম ও নরম মাংস। এরা বেশী জালে ওঠে ফেব্রুয়ারী মার্চে।

আর পাওয়া যায় বঙ্গোপসাগরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 'ইল' বা ক্ষুন্দুসে বান। দু-তিন হাত লম্বা। দাঁড়া সাপের মতো চওড়া। লম্বাটেও সাপের আকৃতি। বড় বড় দাঁত, রুখে এসে কামড়ায়। এদের মাংস অত্যন্ত ঠাস ও সুস্বাদু। মাঝে মাত্র একটি বড় কাঁটা। এদের কদর হয় না শুধু এদের বেয়াড়া চেহারার জন্যে।

সমুদ্রের অকুলীন ব্রাত্য মাছ হল ছোট বড় মাঝারি নানান জাতের হাঙর, শংকর, বাদুড় মাছরা। বাঙালীরা এখনও হাঙর [illegible] করে উঠতে পারে নি। কিন্তু তামাম দক্ষিণাঞ্চলে হাঙর বাঙালীদের খাদ্য তালিকায় একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে। ছোট হাঙরের জন্যে চাহিদা হল ভদ্র উঁচু শ্রেণীর মাছ খাইয়েদের [illegible] আর বড় হাঙরের বিশেষ ভক্ত হল নীচু, গরীব জাতের মধ্যে। [illegible] অনেকবার সুযোগ ঘটেছে হাঙরের মাংস খেয়ে দেখবার [illegible] সুস্বাদু। কাঁটা [illegible] নরম। [illegible] অত্যন্ত মাংসাশী বলে বড় হাঙরের মাংসে [illegible] পাওয়া যায়। তাই রান্নার আগে [illegible] দুধে [illegible] তাতে হাঙরের মাংসটা কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে ঐ [illegible] চলে যায়।

শংকর ও বাদুড় মাছও দক্ষিণ ভারতে [illegible]। গরুর গাড়ীর চাকার মতো এক একটা শংকর মাছ এক একটা গরীব বস্তিতে রীতিমতো ভোজের উপাদান। কলকাতা ও হাওড়ার [illegible] এর চাহিদা খুব। আর শংকর মাছের ছোট ভাই [illegible] মাছ বা শাপলা পাতা মাছ তো অনেক বাঙালীর হেঁসেলে বহুকাল থেকে উঠে আছে। মাংস সিটে হবার ভয় থাকে। এ মাছে সে ভয় নেই। এর মাংস অতি নরম।

সমুদ্রে আর এক জাতের মাছও খুব বেশী ধরা পড়ে। এরা হল সামুদ্রিক ট্যাংরা। এদের ধরা পড়ার নির্দিষ্ট কোন ঋতু নেই। তবুও এদের বড় বড় ঝাঁক ধরা পড়ে শীতে ও বর্ষায়। ট্যাংরার আঁশ নেই। তার ওপর এর গায়ের ছাল অত্যন্ত পাতলা। তাই একটু ঘষাঘষিতেই এদের গায়ের ছাল উঠে যায়। বাজারে যখন আসে ছাল ওঠা বীভৎস আকৃতি দেখে সাধারণ খদ্দের খুব বেশী ঘেঁসে না। কিন্তু এদের ভালভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে ট্যাংরা একটা ভাল খাবার মাছ। মাঝে একটা কাঁটা। মাংসও চলনসই।

লোটে বা নিহেড়ে এক সময়ে শুধু যে পূর্ব বাংলার চাটগাঁ অঞ্চলেই কদর পেয়েছিল তা নয়। বোম্বে ডাক বলে সাহেব সুবোদের কাছে তার নাম-ডাক ছিল প্রচুর। বিশেষ করে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে তার তারিফ। শুঁটকী মাছের ভক্তরা জানে 'বোমলা' কি জিনিস। এদের ল্যালেবেলে নলশালি মাখান চেহারা দেখে ঘেন্নার কিছু নেই। টাটকা মাছ মাঝখান থেকে চিরে, কাঁটা বার করে নিয়ে (না নিলেও ক্ষতি নেই, কারণ কাঁটা নরম গলায় বেঁধার ভয় নেই); তার ওপর গামছা কি ঝাড়ন পাট করে রেখে দিয়ে তার ওপরে শীল চাপা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে নালসানিটা কেটে যাবে। এর স্বাদও অপূর্ব।

নিহেড়ের হড়হড়ে এ্যালবুমিন অতি পুষ্টিকর, ফসফরাস আর আইওডিন চোখের পক্ষে হিতকর।

আরও বহু বহু রকমের সমুদ্রের মাছ আছে, যারা আজও পরিচয়ের অভাবে ব্রাত্য হয়ে আছে। তাদের সবাইকে যদি আমরা উপযুক্ত সম্মান দিয়ে আমাদের হেঁসেলে জায়গা দিই, তবে আমাদের এই নিদারুণ প্রোটিন অভাবের একটা স্থায়ী সুরাহা হয় নিঃসন্দেহে।

কিন্তু তার আগে ভাবতে হবে ডাঙার হাঙর আর রাঘব বোয়ালদের কথা। যারা চুনোপুঁটির দামও চড়িয়ে আকাশে তুলছে। তাদের ঝাঁক শুধু তোলা যাবে কোন জালে? তুলবে কে?

শেষপ্রান্তে কুয়োটার দিকে এগিয়ে যায়। বস্তির দক্ষিণ দিকের লোকজনদের জন্যে এই কল উত্তর ভাগের বাসিন্দাদের আলাদা ব্যবস্থা। কিন্তু সেখানে এখন তো কাই মুশ-কিল। তাদের কাজ শেষ না হলে জল পাওয়া যাবে না। দুর্ভোগের কথা ভেবে হারাণের মা সিঁটিয়ে যায়। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা গাধা বিশাল কুঁজের মতো ময়লা কাপড়ের মোট নিয়ে মনমরা ভঙ্গীতে হেঁটে যায়। তাকে দেখে হারাণের মার কষ্টটা বাড়ে।

হারাণের মা কুয়োটার পাশে এসে দাঁড়ায়। কুয়োটা প্রায় আধমজা, সংস্কার হয়নি বহু দিন। দেখলে বোঝা যায় সাবেকী জিনিস। এক সময় সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো ছিল চারপাশ। সেই বাঁধানো বেড় এখন ফাটিফাটা, ঘাসলতায় ভরা। বালতি নামানোর কপিকলটা উধাও। শুধু মাঝখানে লোহার রঙ লাগানো সিমেন্টের দুটো থাম। সরকারী কল বিগড়োলে লোকে এখানে ভীড় করে। একমাত্র দড়িটা তালপাকানো পড়ে আছে একপাশে। কুয়োটা প্রায় পঞ্চাশ ফুট গভীর। ভেতর দেওয়ালে লোহার আঁকশি গেঁথে নীচে নামার ব্যবস্থা আছে। কাঠফাটা গরমেও জল থাকে কুয়োর তলায়। কালো জল, চোখে দেখা যায় না। কুণ্ডলী পাকানো দড়িটা হাতে নিয়ে হারাণের মা বুকে বল পায়। তাড়াতাড়ি বালতিটা বেঁধে নীচে নামায়। কুয়োর ভেতর থেকে জল সাড়া দেয়। বালতি বোঝাই জল সে টেনে তুলতে থাকে। হঠাৎ খপাং করে একটা শব্দ ওঠে। অনেক নীচে কুয়োর জল ছলছলিয়ে হাসে। হারাণের মার হাতের দড়ি নিজার শিথিল হয়। দড়িটা ও টেনে নেয়। বালতির হাতলটা দড়ির মুখে বাঁকা হাসির মতো দুলতে থাকে।

'হেই মা কালী'—হারাণের মা ফুঁপিয়ে ওঠে। ওর শরীর সিরসির করে। গায়ে কাঁটা দেয়। ভয়ে, কষ্টে এতক্ষণে ও সত্যিই কেঁদে ফেলে।

(তিন)

আজ একটা এসপার ওসপার হয়ে যাবে—ঘুম থেকে উঠেই বাসুর মনে হয়। আনন্দে বোঁ করে এক চক্কর নেচে নিতে ইচ্ছে করে। মনের খুশি ভেতরে চেপে জানলার পাশ থেকে একটা নিমের দাঁতন তুলে নেয়। এতে দিনে একটা হিল্লে হলো। বিনোদবাবুর চিঠি নিয়ে আজ বারোটার মধ্যে অফিসটায় যেতে হবে। চাকরী না হয়ে যায় না।

রাতে খাওয়া আধপোড়া সিগারেটটা কানে গুঁজে বাসু দাঁতন করে। মুখ ধুয়ে, চা খেয়ে ওকে বেরোতে হবে। চায়ের কথা মনে হতেই কানে গোঁজা সিগারেটটায় ও সস্নেহে হাত বোলায়। দাঁতনটা নিয়ে শেষ কয়েকবার শাবলের মতো খপাখপ দাঁত আর মাড়ির ওপর চালিয়ে দেয়। কিন্তু কলের কাছে গিয়েই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেখানে বেশ ভীড়। কলটা আবার বিগড়েছে। বাসুকে দেখে ভীড়টা একটু চঞ্চল হয়।

কেষ্টর ঠাকুমা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে—'ধন্যি লোক বটে তোমরা। শুধু কথার ধুকড়ি, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।'

সাধনের জ্যাঠাও ফুট কাটে। কেষ্টর ঠাকুমাকে উদ্দেশ্য করে বলে—'আপনিও যেমন জেঠিমা, নিজে বাঁচলে বাপের নাম। যে যার নিজেরটা বাগিয়ে নিতে ব্যস্ত, আমাদের কথা কে ভাবে?'

দাঁতনটা কামড়ে বাসু দাঁড়িয়ে থাকে। বড়ো চোর চোর লাগে নিজেকে। কিন্তু অনেক ভেবেও কি যে চুরি করলো সেটা খুঁজে পায় না। বিনোদবাবুর চিঠির কথাটা কি এরা জানতে পারলো নাকি? কিন্তু চিঠি মানেই তো চাকরী নয়। তাছাড়া শুধু চাকরীর জন্যেই কি সে সনৎ গুপ্তের দলের ঝাণ্ডা বয়? বাসু নিজেও ভেতরে ভেতরে এই দলটাকে একটু ভালবেসে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও এতোগুলো মানুষের কড়া কড়া মন্তব্যের সামনে ও দাঁড়াতে পারে না। ভীড় ছাড়িয়ে কুয়োটার দিকে ও এগিয়ে যায়। সকলে যে ওকে নিঃশব্দে টিটকিরি দিচ্ছে, সেটা না দেখেও বুঝতে পারে।

সকালের নরম রোদ বস্তি, রাস্তা আর পাকা বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে। হারাণের মার মুখেও লাগে সেই রোদ।

'কাঁদছেন কেন খুড়িমা' বাসু জিজ্ঞেস করে। তারপর দড়ির খুঁটে বাঁধা বালতির হাতলটা দেখে সে। বাসু বুঝতে পারে ব্যাপারটা। হারাণের বাবার ওপর রাগে ওর পিত্তি জ্বলে যায়। নেহাৎ লোকটা বাপের বয়েসী আর হারাণ ওর বন্ধু ছিল—তাই বলতে পারে না কিছু। বাসুদের লাইনেই চারটে ঘর ছেড়ে হারাণদের ঘর। সেখানকার সুখদুঃখের খবর সবই তার জানা। হারাণ বছর পাঁচেক হলো নিরুদ্দেশ। হঠাৎ সেই হারাণের ওপর ও ভীষণ চটে যায়। কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে বাসু নিচের দিকে তাকায়। অনেক নীচে জল। সে জলে ঢেউ নেই, সে জল দেখা যায় না। হারাণের মার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর লজ্জাটা টাটিয়ে ওঠে। দড়িটা হাতে নিয়ে শানবাঁধানো বেদীর ওপর বাসু উঠে দাঁড়ায়। ছেলেবেলায় কতোবার ও নেমেছে এই কুয়োতে। প্যান্টটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে ও প্রথম হুকটায় পা রাখে। সনৎদার ওপর বড়ো অভিমান হয়। এই বস্তিতে দুটো নতুন জলের কল বসাবার কথা দিয়েছিলেন তিনি।

সনৎদা স্থানীয় নেতা। এখানকার এম এল এ বিনোদবিহারী সেই দলের লোক। সনৎদার বন্ধু। সনৎদার কথা ফেলার সাধ্য নেই তাঁর। একটা আঁকশিতে পা রাখতে সামান্য পিছল লাগে বাসুর, সতর্ক হয়। দড়িটা কোমরে পাক দিয়ে বাঁধা। ওপরে মুখ তুলে চোখ ধেঁধে যায়। কুয়োর মুখটা যেন সার্চ লাইট। হারাণের মাকে দেখতে পায়। পরাণ আর সাধনের জ্যাঠার মুখও চোখে পড়ে। সাধনের জ্যাঠাকে দেখেই ওর লজ্জা লাগে। সবাই নিজেরটা গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। সনৎদা একটা পুরোনো অ্যাসবেস্টস দিয়েছিল বাসুদের ঘরের ভাঙা চালটা ঢাকার জন্যে। এই একটা গুছিয়ে নেওয়ার কথা ওর মনে পড়ে। বাসুর বাবার অসুখের সময় সনৎদার এক ডাক্তার বন্ধু দুদিন বিনা পয়সায় দেখে গিয়েছিলেন তাকে। বোধহয় এটা দ্বিতীয় সুবিধে। কিন্তু সেই অ্যাসবেস্টস ফুটো হয়ে এখন জল পড়ে। [illegible] বাবাও মারা গেছেন এক বছর আগে। আর এতোদিন বাদে একটা চাকরীর আবছা আশা এসেছে। বাসু আর ওপরদিকে তাকায় না। নিজের মনেই ও বলে—বিনোদবাবুকে নিয়ে মাঝে মাঝে আপনার বস্তিতে আসা উচিত সনৎদা। অন্তত একটা কল কি এই সাড়ে চার বছরে লাগানো যেত না? [illegible] সকাল [illegible] সুবিধে করে দেওয়ার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। হঠাৎ পায়ের তলার একটা আঁকশি নড়ে ওঠে। বাসু সজাগ ছিল। [illegible] চমকে ওঠে। ওর চিৎকারটা [illegible] [illegible] অন্ধকার। বাসু ঠিক বুঝতে পারে না কতোটা নেমেছে। [illegible] দুর্বোধ্য আবছা [illegible] আসছে [illegible] থেকে। ভোটের সময় [illegible] দিলে [illegible] নাথা উচিত। [illegible] পায়ের [illegible] [illegible] [illegible] কাঁপনি ওর [illegible] পায়। কিন্তু এই অন্ধকার [illegible] নামার কারণটা ওর আর মনে নেই। কি একটা অদ্ভুত অচেনা গন্ধে ওর মাথা ঘুরতে থাকে। আঁকশিটা ধরেও আবার জলেতে পা লাগায়। পায়ে শক্ত মতন কি একটা ঠেকে। ওর চটকা কেটে যায়। আর এক ধাপ নেমে ও জলের প্রায় সমতলে আসে। অন্ধের মতো হাতড়ে বালতিটা পেয়ে যায়। কোমর থেকে দড়ি খুলে বালতিটা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে। তারপর দড়িটা ধরে নাড়া দেয়। বালতিটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে থাকে। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে সেটা কানা অবধি উঠে যায়। ওপরে এখন মহা হল্লা। সবাই বেশ মজা পেয়েছে। বাসু আবার কুয়োর ওপরে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র জ্বালাধরা আলোয় ওর মাথা ঘুরে যায়। তবুও চোখ সরাতে পারে না। ওর মনে হয় বাইরের আকাশটা কুয়োর মুখের একহাত ওপরে নেমে এসেছে। কুয়ো থেকে বার হওয়ার জন্যে বুকের মধ্যে চনমন করে। দেবুর সঙ্গে আজ বৈঠক। দেবু আর রাজনীতিতে নেই

থাকবে না। বাসু ওর কথা বিশ্বাস করে। কিন্তু ও সবাই যে কেন ওকে নিয়ে ঝগড়া ঝোঁটা করছে, বাসু বুঝতে পারে না। দেবুর ওপর ওর মায়া আছে। আসলে দেবু ওর অনেকদিনের বন্ধু।

দুটো সিঁড়ি কোনমতে উঠে যায়। কিন্তু সেই মারাত্মক গন্ধটা ওকে কাবু করে ফেলে। হাত পায়ে খিল ধরে আসে বুকের দরজা জানলা বন্ধ হয়ে যায়। জ্ঞান হারাবার আগে বাসু কানের আধপোড়া সিগারেটটা সামলে রাখে। ওর দেহটা পাকা কলের মতো জলের ওপর খসে পড়ে। আধ-পোড়া সিগারেটের সাদা টুকরো। কালো জলে নেচে বেড়ায়।

(চার)

'তোমাদের মতো লোকেদের বিয়ে করা কেন?' ভারতী ঝংকার দিয়ে ওঠে।

'বিয়ে করার পরই সেটা টের পাচ্ছি—ব্যাঙ্গার মুখে কথাটা বলে সনৎ চটিতে পা ঢোকায়।

সকাল থেকে প্রতিদিন এই ঘ্যান-ঘ্যানানি তার ভালো লাগে না।

'ছেলেটার যে অসুখ খেয়াল আছে—ভারতী এবার খেপে যায়।'

'আমি বাড়ীতে বসে থাকলেই কি ও সেরে যাবে—সনতের ভেঁতো গলার প্রশ্ন।

'নির্লজ্জ!'

'ঠিক'— সনতের শরীরে কি যে এক জ্বলুনি। ড্রয়ার খুলে তুতুলের প্রেসক্রিপশনটা একেটে রাখে। একটা ইনজেকশন আনতে যেতে হবে ধর্মতলায়। একটার সময় ডাক্তার আসবে। তার আগেই ফিরতে হবে। ডাক্তার অবশ্য সনতের বন্ধু।

চৌকাঠ পেরোবার মুহূর্তে ভারতীর শেষ কথাটা কানে এলো—যে নিজের ছেলে বৌয়ের দায়িত্ব নিতে পারে না, তার আবার দেশসেবা। ছ্যাঃ!

এ-সব কথা অনেকবার শোনা। জবাবে বলা থারাপে। কথাগুলোও রক্ত কম ঝরায় নি। আজকাল সনতের ক্লান্ত লাগে। তাই অধিকাংশ সময়েই সে বোবা হয়ে থাকে। বোবার শত্রু নেই। গতকালের ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে সনতের লজ্জা লাগে। তুতুলের একশো তিন জ্বর। বেলা দশটায় ডাক্তার এলো। বারোটার মধ্যে ইনজেকশন নিয়ে আসার কথা ছিল। ফেরার পথে ডাক্তার ফুটিয়ে যাবে। ওষুধটা কিনতে রাস্তায় বেরিয়েছিল। পথে বাসুর সঙ্গে দেখা, তার রিপোর্ট শোনা। তারপর মহামায়া কেবিনে দেখা হল জ্যোতিষী বদ্যিনাথের সঙ্গে। বদ্যিনাথ এক সময় ওদের দলের লোক ছিল। এখন পেশা হাত দেখা। তুমুল তর্ক বেঁধে গেল দুজনে। সনৎ এমনিতে গম্ভীর স্বভাবের লোক। কিন্তু দলত্যাগীকে টিট করার জন্যে ও যেন খেপে গিয়েছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্র এবং বদ্যিনাথের বুজরুকিকে প্রায় তুলো ধুনে দিল। বদ্যিনাথও লড়লো। বস্তুবাদ ব্যাপারটা যে বাজে এবং নির্ঘাতই যে মূল, এটা সে বারবার বলছিলো। প্রায় দেড়টার সময় দুজনে রাস্তায় নামলো। বাড়ী ফিরতে হবে। ফাঁকা রাস্তায় হঠাৎ সনৎ বলে—আমার হাতটা একটু দেখে দে তো।

বদ্যিনাথ অবাক হয়। মজা পায়। সনতের চোখ মুখে উত্তেজনা। সনতের ডান হাতটা ও টেনে নেয়, খুব মন দিয়ে হাতের পাতাটা দেখে, তারপর বলে—এ সব বাজে ফালতু ব্যাপার।'

জানি,—সনৎ বলে—মজা করছিলুম। ওর গলাটা মিয়োনো। প্রায় দুটো নাগাদ বাড়ীর সদর দরজায় পৌঁছে জরুরী কিছু একটা রাস্তায় ফেলে আসার অনুভূতি হয়। ঘরে ঢুকে, ভারতীর মুখোমুখি হতেই মনে পড়ে ওষুধের কথা। বড়ো অপরাধী মনে হয় নিজেকে।

সামনে দ্বিতীয় কাপ চা। মুখের ওপর খোলা কাগজ। সনৎ কিন্তু পড়তে পারছে না একটা অক্ষরও। নিজেকে বড়ো খালি লাগছে আজকাল। অনেকটা অভ্যেসের সুতোয় তার দিনগুলো বাঁধা। দল ছাড়লে কিছু করার নেই। দলের পুরো সময়ের কর্মী হিসেবে ভাতা পায়। তলার মাটি কাঁপে, চুরুটের ছাই খসে যায়। নিজেকে ভারিক্কী করার মতলবে ও চুরুট ধরেছিল। দম্ভ করতে নাকের জল, চোখের জল এক হয়ে গেছে। সে দিনগুলোর কথা ভাবলে হাসি পায়। সেই চুরুট আজ ওকে খেয়ে ফেলেছে। মাস দুয়েক আগে বুকে ব্যথা হয়েছিল একবার।

ডাক্তার বলেছিল—চুরুট ছাড়ো।

রোগটা কি?

তেমন কিছু নয় (মুচকি হাসি)। ধোঁয়া আর নিকোটিনে তোমার ফুসফুসটা একেবারে কালো হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে সনৎ চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল—চুরুট ছাড়লেই কি এই কালিমা কাটবে?

ঠাণ্ডা চা এক চুমুকে শেষ করে সনৎ রাস্তার দিকে তাকায়। ওপারে কল, কুয়ো আর অষ্টাবক্র ভঙ্গীতে পড়ে থাকা বস্তি-বাড়ী। হোকলার ছাউনি দেওয়া চায়ের দোকানে কম-বয়েসী ছেলেদের জটলা। সামনের সরু রাস্তা ধরে একটা অনিচ্ছুক মোটর গাড়ী ধাপার দিকে চলে গেল।

হাত ঘড়িতে সময় দেখে সনৎ অধৈর্য হয়। বাসুর কোনো পাত্তা নেই। অথচ আটটার মধ্যে তার এখানে পৌঁছোনোর কথা। দেবুর সঙ্গে আজ একটা ফয়সালা হবে। দেবু দলে এলে ভালো, তা না হলো হাজত দেখতে হবে। প্রথমটার সম্ভাবনা কম। শুধু বাসুর চাপেই সনৎ রাজী হয়েছে কথা বলতে। গতকাল বহু দলের সভা ছিল। সেখানেও দেখা গেল, দেবুর ওপর সকলে খাপ্পা। ছোঁড়াটা বড়ো বেড়েছে। পাড়ায় রোজ অশান্তি আর মারদাঙ্গার কারণ যে দেবু, এ ব্যাপারে সব দলই একমত। বাইরে রোদ ঘন হয়। একটা খোঁড়া কুকুর চায়ের দোকানের সামনে মাটি শুঁকে বেড়ায়।

দেবুর সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিনটা সনতের মনে পড়ে। ছোঁড়াটার বড়ো চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। 'এইভাবে ঘুরে লাভ কি'—সনৎ জিজ্ঞেস করেছিল।

'কি জানি।' তবে আর কোনো রাস্তা নেই।

'এটা স্বার্থপরের মতো কথা।'

'বোধহয়।' দেবু চুপ করে থাকে কিছু সময়। তারপর নিজের নুলো হাতটা দেখিয়ে বলে—কিন্তু এটা দিয়েছি, সনৎ ঘাবড়ে যায়। জবাব দিতে পারে না।

দেবু যোগ করে—গুরুদাবাবুদের জন্যে স্কুলে লেখাপড়া আর ভূপতিবাবুদের জন্যে বাড়ী-ঘর।

সনৎ চটে যায়। বাসু চুপ।

শরীর ঝাড়া দিয়ে দেবু উঠে দাঁড়ায়, বলে—'অনেক ত্যাগ হলো, এবার একটু ভোগ করা দরকার।'

সনৎও উঠে দাঁড়ায়। ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করে—'জানিস কি, ওয়াগন ভাঙার কেসে পুলিশ খুঁজছে তোকে?'

'ভয় দেখাচ্ছেন?' ওর মুখের ভঙ্গীতে সনতের পিত্তি জ্বলে। কথা না বাড়িয়ে রাস্তা ধরে হাঁটা দেয়। বেশ কিছু বাদে সনতের খেয়াল হয়, বাসু সঙ্গে আছে। আজকাল বড়ো তাড়াতাড়ি তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়।

প্রেসার হলো নাকি—ওভাবে—অথবা ফুসফুস কালো হওয়ার কুফল?

সনৎ ঠিক করে আজ ঠান্ডা মেজাজে হাসি মুখে দেবুর সঙ্গে কথা বলবে। চটাচটির ধার দিয়ে যাবে না। দেবু ছোকরা ডেঞ্জারাস, কিন্তু কাজের। দেবুর দুর্ঘটনার দৃশ্যটা ভাবলে সনতের আজও কাঁপুনি জাগে। কব্জি পর্যন্ত উড়ে যাওয়া, মাংস ঝোলা, রক্ত মাখা হাত। সেই অবস্থায় ও ছুটছিল রাস্তা দিয়ে। বাপ্‌স্‌। জান আছে ছেলেটার। সনৎ রাস্তার দিকে তাকায়। উল্টো দিকে জলের কল, ভীড়, চীৎকার। রোজকার ঘটনা। ও-পাশের গোল-মালটা হঠাৎ জোরালো হয়, ভীড়ের মধ্যে হুড়োহুড়ি ওঠে। সনৎ কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে ব্যাপারটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে।

হাঁফাতে হাঁফাতে দোকানে ঢোকে পরাণ, বলে—বাসু কুয়োয় পড়ে গেছে।

সে কি—সনৎ ঘাবড়ে যায়। বুঝতে পারে না কিছু। দেবুর সঙ্গে আজ দেখা করার কথা। দেবুই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল নাকি? ও ভাবে। দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা কুয়োর ধারে এসে দাঁড়ায়। সনৎকে দেখে হারানের মা মাথায় কাপড় টানে। তার হাতের বালতিটা সনৎ দেখে। আসার পথেই পরাণের মুখে সনৎ ঘটনাটা শুনেছে। কুয়োর বাঁধানো উঁচু পাড়ের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে সনৎ ভেতরটা দেখার চেষ্টা করে। এক অতলস্পর্শী কালো শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না।

(পাঁচ)

হোগলার চাল, মাটির দেওয়াল; নগেনের চায়ের দোকানে দেবু বসেছিল; তার হাতে গ্লাস ভর্তি চা। দোকানটা রাস্তা ছাড়িয়ে একটু ভেতরে। নিয়মিত চা-পায়ীদের কাছে দোকানটা অস্পৃশ্য; খদ্দেররা বিশেষ সুবিধের নয়। ভাপোষা লোকজন তাদের এড়িয়ে চলে। রাতে চোলাই পাওয়া যায়।

গত সন্ধ্যেবেলায়, বাসুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কিছু পরে দেবু একটা খবর পেয়েছিল। খবরটা গোপন এবং ভয়ের। সনতের সঙ্গে মিটিং-এর পর সে নাকি সাফ হয়ে যাবে। মিটিংটা আসলে একটা টোপ। খবরটা ও বিশ্বাস করে নি। তবু সাবধানের মার নেই। তাই এই নগেনের দোকানে ও বসেছিল ওৎ পেতে। রাস্তা থেকেই সনৎদা আর বাসুকে নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে বসবে। ওদের ঠিক করা জায়গায় না বসাই ভালো। আসলে সনৎদা বা বাসুর সঙ্গে ওর আলোচনা করার কিছু নেই; হয়তো কারো সঙ্গেই নেই। ও আর এইসব রাজনীতিতে নেই। কিন্তু লোকগুলো ওকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। কিছু একটা চাই, বেশ ভরাট, তাজা, সুস্থ। কিন্তু সেটাকে দেবু ব্যাখ্যা করতে পারে না। ও জানে এসব কথা ওর মুখে শুনলে সবাই হাসবে। তার মতো একটা মাথা মোটা ছেলের বুকের মধ্যেও যে কিছু একটা গুমগুম করে, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। আসলে দেবু মানেই, ছোরা, বোম আর মস্তানি। কিন্তু ওরও যে দুটো হাত, পা চোখ আছে, একটা মাথা আছে, বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ড ধকধক করে, এটা সকলে ভুলে যায়।

দেবু জানে খামোকা আলোচনায় কোনো লাভ নেই। তবু রাজী হতে হয়। না হয়ে উপায় কি? ছিনে জোঁকের মতো ওরা পেছনে লেগে আছে। সম্ভাব না রাখলে চোরের মতো লুকিয়ে থাকতে হবে। তবে ও ঠিক করেছে, কিছুদিনের জন্যে সরে যাবে এই এলাকা থেকে। দিদির বাড়ী যাবে। খবরও দেওয়া আছে সেখানে। প্রতাপদার বাড়ী থেকে আজ সকালে জামা প্যান্ট কিডস ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে এসেছে, ব্যাগটা আছে এই দোকানে নগেনের কাছে।

রাস্তার ওপর চোখ রেখে ও বসে থাকে। বাবার কথা মনে হয়। বুড়ো লোকটা বার বার বলতো—নিজের দিকে তাকা। লোকটা মারা গেছে। কিন্তু কথাটা বলে-ছিল বড়ো খাঁটি। তখন দেবুর দুটো হাত ছিল। ইতিমধ্যে একটা খসে গেছে। একটা হাত নিয়ে কি নিজের দিকে তাকানো যায়!

কুয়োর কাছে হৈ-চৈটা বাড়ে। দেবু দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। নগেনের দোকানের ছোকরা ছেলেটা নাম কানু, এসে দাঁড়ায়। তার গলায় উত্তেজনা। সব কথা সে গুছিয়ে বলতে পারে না।

বাসুদা কুয়োয় পড়ে গেছে—এইটুকু মাত্র দেবুর কানে ঢোকে। দেবু আর শোনে না। প্রায় দৌড়েই কুয়োর ধারে এসে দাঁড়ায়। সনৎ এখানে তাকে আশা করে নি। দেবু তার মুখ দেখে বুঝতে পারে।

সনৎ সহজ হওয়ার চেষ্টা করে।

ফায়ার ব্রিগেডে একটা খবর দাও—সে দেবুকে বলে। দেবু তাকায় সনতের দিকে। কুয়োর ধারে পড়ে থাকা দড়িটা নিয়ে ও পা দিয়ে চেপে ধরে। অক্ষত ডান হাতে টেনে টেনে পরীক্ষা করে দড়িটা।

আমি নামছি—সে বলে।

দড়িটা দাঁতে কামড়ে এক হাতে লোহার আঁকশি ধরে ও আস্তে আস্তে নামতে থাকে।

সকালবেলায় শুকনো ঝামেলা—দেবু ভাবে—এ পাড়াটা কিছুদিন ছাড়া দরকার। কিন্তু আমার পেছনে সবাই কাঠি দেয় কেন? আমি তো কারো সাতে-পাঁচে নেই। বস্তির লোকেরা আমায় মানে, আমার কথা শোনে, সেটা কি আমার দোষ।

আলগা আঁকশিটায় পা দিয়ে দেবু চমকে ওঠে। একটা হাতের জন্যে অসুবিধে হয়। নিজেকে ও গাল দেয়—ল্যাংড়া। এক হাতে কি জীবন? নিজের দিকে তাকাতে হলে অন্ততঃ দুটো হাত দরকার।

কুয়োর গম্ভীর থেকে ও ওপরের দিকে তাকায়। কুয়োর মুখটা আলোয় ঝকঝকে, যেন একটা হাঁ করা দাঁতাল বাঘ। সেখানে অনেক মুখ।

'সনৎদা ভয় পেয়েছে—দেবু হাসে—ও ভাবছে আমি বাসুর ক্ষতি করে দেবো।' নিজের মনেই দেবু বিড়বিড় করে। কতো-দিন মদ খাই না, তবু সবাই জানে আমি মাতাল। ওয়াগনের ধার দিয়ে হাঁটলুম না, তবু ওয়াগন বেকোর। গুলি মারো।'

পায়ে জল লাগতেই দেবু থেমে যায়। তারপর একহাতে আঁকশি ধরে জলে পা ডোবায়। ধীরে ধীরে ও জলে নামে। এক কোমর জল। পাঁকে গোড়ালি ডুবে যায়; একটা উৎকট গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে। 'বাসু পাঁক হয়ে গেল নাকি—ও ভাবে—আর আমার জিনিষগুলো? বাসু জলে বসে আছে। গলা পর্যন্ত ডোবা। জ্ঞান নেই। একটা ধারালো গন্ধ দেবুর নাকে ঢোকে। ওর চেতনাকে দু টুকরো করে দেয়। দড়িটা বাসুর দু হাতের তলা গলিয়ে শক্ত করে ও বাঁধে। তারপর দড়িতে নাড়া দেয়। আস্তে আস্তে বাসুর দেহটা ওপরে ওঠে। ঝুলন্ত বাসুর দিকে তাকিয়ে ওর যীশু খৃষ্টের কথা মনে হয়।

হাঁটু মুড়ে দেবু দাঁড়িয়েছিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ওর হাঁটু কেঁপে যায়। একবার, দুবার। ঝিমঝিম করে মাথার মধ্যে। বাসুর শরীরটা দেখার চেষ্টা করে। দেখতে পায় না। বাইরের হল্লা কানে আসে। কুয়োর মুখে এখন কেউ নেই। ওর মনে হয় বাইরের আকাশটা একটা কালো থাবার মতো কুয়োর ওপর নেমে আসছে। ওর নাক, বুক বন্ধ হয়ে আসতে থাকে।

ছেলেবেলার একটা খেলার ছবি মনে পড়ে। নেংটি ইঁদুর বালির কৌটোয় বন্ধ করে ওরা প্রায়ই ভাসিয়ে দিত খালের জলে। বন্ধ কৌটোটা জলে ভাসতে ভাসতে লাফিয়ে উঠতো। দারুণ মজায় ওরা হাততালি দিত পাড়ে দাঁড়িয়ে। দেবু ওপরের দিকে তাকায়। আকাশের ঢাকনি কুয়োটার মুখে চেপে বসে। অন্ধকার হয়ে যায় চারপাশ।

বিকেলবেলায় হারানের মা বালতি নিয়ে কলে আসে। তখন সিংহমশা হাসছেন। চুরুট দিয়ে তোড়ে সাদা জ বেরোচ্ছে। পরিষ্কার কাচা কাপড়ের পাহা পিঠে নিয়ে একটা গাধা উদাসীন ভঙ্গী ফিরে আসছে। দেবুর কিডস্ ব্যাগটা নগে দোকানের ভেতর নিয়ে রাখে। পরের জিনি সাবধানে রাখাই ভালো।

কাল শেষরাতের ঝুমঝুম বৃষ্টির পর ও আকাশের রং ফেরেনি। পোড়া ছাই-এর মত স্তূপাকার সব মেঘ বাতাসের টানে সমস্ত আকাশ জুড়ে টালমাটাল করছে। নকুল রায় জানলার পাল্লার ফাঁক সরিয়ে দেখলেন, সকালের আলো বড় ম্রিয়মান, গলান সীসার রংয়ের মত ফ্যাকাসে। কখনও সখনও মেঘ এত নিচে নেমে আসছে যেন মাথায় ভেঙে পড়বে। বরিশাল কলোনীর পুকুর পাড় উপচিয়ে জল গড়িয়ে এসেছে। সামনের এক চিলতে পোড়ো জমিটায় এখন যেন বান ডেকেছে। জলে কচুরিপানা থিক থিক করছে। এদিকটা এমনিতেই নিচু। মেঘ হাঁচি দিলেই জল দাঁড়িয়ে যায়। আর নিচু বলেই নকুল রায় এই দু ঘরের গোটা বাড়িটাকে এখনও মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় বাঁধতে পেরেছেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে আর কোথায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবেন?

মাঠের ওপারের সার বাঁধা নারকেল গাছগুলি বাতাসের দাপটে মাথা দোলাচ্ছে। নকুল রায়ের শীত শীত করছিল। জলের ওপর বৃষ্টির শব্দে নকুল রায় ক্ষণিকের জন্য যেন একটা অন্যমনস্ক হয়ে যান। নন্দী বাড়ির টিনের চালে লতান লাউ গাছটা এক রাতের তাণ্ডবে মাটিতে আছড়ে পড়েছে। মাচাটা উল্টে শিকড় বাকড় আস্ত বেরিয়ে গেছে। নকুল রায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর জানলার পাল্লা দুটো বন্ধ করে ফিরে এলেন।

কাল সন্ধ্যা রাত থেকে বড় ছেলে পল্টু জ্বর বাঁধিয়ে বসেছে। মাঝরাতে ঝড়ো বাতাস আর পল্টুর বিকারদনি শুনে ঘুম ভাঙলে নকুল রায় পল্টুর কপালে হাত রেখে জ্বরের মাত্রা অনুমান করতে করতে টের পেয়েছিলেন: তাঁর গোদের ওপর নতুন করে আর একটা বিষ ফোঁড়া উঠল।

এমন দিনে বাড়ির বাইরে যেতে মন চায় না। তবু উপায় নেই। আজ মাসের পয়লা। পে-ডেট। গত মাসের একুশ তারিখে অফিসের নিখিলেশের কাছ থেকে ধার নেয়া তিরিশ টাকার একটাকা পঞ্চাশ পয়সা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সকাল থেকে স্ত্রী সন্ধ্যারাণী একবারের জন্যও বিছানা ছাড়তে পারেন নি। তিনি নিজের হাতেই উনোনে আঁচ দিয়েছেন, ভাত চড়িয়েছেন, বিল্টু আর শীলার জন্য খান কয়েক রুটি সেঁকে দিয়েছেন, পল্টুর জন্য সাবু, তার ওপর আকাশের এই শত্রুতা। নকুল রায়ের শির দাঁড়া বেয়ে চাপা একটা আক্ষেপ কুলকুল করে উঠে এল। বাথরুমে যাবার জন্য তৈরি হলেন। উঠোনে গোড়ালি ডোবান জল। কোন রকমে জল ডিঙিয়ে বাথরুম সেরে বেরিয়ে এলেন। সময় যেন এই বাদলা হাওয়ার মতই ছুটে যাচ্ছে। নাগাল পাচ্ছেন না নকুল রায়।

—যাই, বুঝলে... বেরুবার মুখে ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে সন্ধ্যারাণীর উদ্দেশ্যে শব্দ-কটা ভেতরের দিকে ছুঁড়ে দিলেন নকুল রায়।—উনোনে ভাতের হাঁড়ি রইল। খানিক পর বিল্টু আর শীলাকে খেতে দিও। আজ আর ওদের স্নান করে কাজ নেই। বড় গামলায় পল্টুর সাবু আছে। লেবু-ও...। থামলেন, শ্বাস নিলেন নকুল রায়। ঘরের ভেতর কিছু দেখার চেষ্টা করলেন। ঝড়ো হাওয়ার শীতলতা বাঁচাবার জন্য জানলার প্রতিটি পাল্লা শক্ত করে বন্ধ করা। ঘরের ভেতর আলো নেই একটুও। কেবল খোলা দরজা দিয়ে একফালি সীসা গলান ম্যাড়মেড়ে আলো উঠোন থেকে উঠে এসে তেরছা করে সন্ধ্যারাণীর বিছানার ওপর পড়েছে। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। তবু নকুল রায়ের মনে হল সন্ধ্যারাণী বুঝি তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। রক্তহীন কাগুজে মুখটাকে তিনি ভেসে উঠতে দেখলেন। সন্ধ্যারাণী কি কিছু বলছেন! ...তুমি খেয়েছ তো? কিংবা পেট ভরেছে ...এরকম কিছু একটা? নাহ, কোন সাড়া নেই। কেবল একটা দীর্ঘশ্বাস। নকুল রায়ের বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল। লাটাইয়ে সুতো গুটিয়ে যাচ্ছে যেন। বাধা আর বাধা। মেঘের রংয়ে, জলের বাতাসে, নারকেল গাছগুলির দোলান পাতার ফিরে ফিরে বৃষ্টির ছাটের মত একটা ব্যথা ক...

কাঁপিয়ে উঠল। —সাবধানে থেক। নকুল রায় সজো আশ্বাস দিলেন,—বেশি চলাফেরার দরকার নেই, তাড়াতাড়ি ফিরব। নকুল রায় আর দাঁড়ালেন না। হন্ হন্ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

এত করেও নটা আটাশের বারাকপুরে লোকাল মিস করলেন নকুল রায়। পরের ট্রেন, দশটা এগারোর শান্তিপুর, আধঘন্টা লেট। প্ল্যাটফর্মের শেড-এর নিচে লোক গিসগিস করছে। নকুল রায় বৃষ্টির ছাঁট বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করলেন একটু ভেতরে ঢুকতে। পারলেন না। সেখানে দাঁড়িয়েই ভিজতে লাগলেন। দূরের ডিস্টান্ট সিগ-ন্যালের লালচোখ, আকাশে মেঘস্তূপ এখন স্থির। বোঝা যায়, বৃষ্টি খুব সহজে থামবে না। মাথার ওপর সমান্তরাল ইলেকট্রিক তারের হাই-টেনশন লাইন। জল চুঁইয়ে পড়ছে। কেবিন ঘরের এ্যামপ্লিফায়ারে আবার ঘোষণা,—বি বি টু জিরো সিকস, ডাউন শান্তিপুর লোকাল আধঘন্টা লেট।...লেট আধঘন্টা লেট! চার-নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওপারে ঝিলের জলের ওপর মেঘ। শাপলা

ফুল। রিকশা স্ট্যাণ্ডে হাওয়া খেলছে। লেট....। ইউ ইজ লেট মিঃ রায়। বৃষ্টির ছাঁট ঝড়ো বাতাস। ঠাকুমা যখন মারা গেলেন, প্রথম তাঁর ওল্টানো চোখের ডিমের ওপর এমনি রংয়ের মেঘ জমেছিল।...সেই মেঘ, সেই রং।...'বড় লেট রায়বাবু। এখন এ্যাবোরশন ভিন্ন পথ নেই'।...ঝিলের ওপর হাওয়ার দাপট। ওভার ব্রিজ ডিঙিয়ে কে যেন নেমে আসছে। নকুল রায়ের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল।

সময় হয়ে এসেছে। 'টেনথ টু টুয়েলভ, এনি ডেট...।' ডাক্তার হাজরার মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'একস্পেকটিং ডেলিভারি...।' হাসপাতালে দিতে হবে সন্ধ্যাকে। একটা অম্বলের চাকা পেট ঠেলে উঠে এসে নকুল রায়ের বুকের ভেতর গুড় গুড় করে ভেঙে পড়ল। অথচ এ সন্তানটা তাঁদের কারোরই কাম্য ছিল না। শ্রীযুত নকুলচন্দ্র রায়, আই-এ (ক্যাল), এল, ডি, সি, পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ বিভাগ এবং শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী রায়, ক্লাস এইট অনুত্তীর্ণা বরদাসুন্দরী বালিকা বিদ্যা-লয়, দুই পুত্র এবং এক কন্যা লাভের পর পরবর্তী সন্তান আগমনের যাবতীয় প্রলো-ভন পরিকল্পিত পরিবারের সীমানায় গচ্ছিত রেখে অনেক সতর্কতার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের দাবিগুলি মিটিয়ে আসছিলেন এতকাল। সন্ধ্যারাণী বরদাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাশ এইটের সোপান ডিঙাতে অপারগ, মাঝে মধ্যে মৃদু আপত্তি তুললেও ভোলেন নি নকুল রায়। তাতে তাঁরা যে পরিপূর্ণ তৃপ্ত ছিলেন, এমন নয়। তবু, চলে যাচ্ছিল আর কি! পৃথিবীর জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধের তাগিদে নয়। মাসিক তিনশ একাশি টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সার অংকটাই তাঁদের এই দুঃসাহসিক কর্মে ব্রতী করেছিল। তবু সতর্কতায় কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। সেই ফাঁক গলেই অঘটন ঘটল।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে শুকনো বটপাতা ভেজানোর গন্ধে ভরপুর এক কাপ চায়ে নকুল রায় চুমুক দিলেন। কেন কি জেনেনি এমন সময় সন্ধ্যারাণী সেই ভয়ংকর সংবাদটা জানিয়েছিলেন তাঁকে।

—আসছে!

—আসছে! যেন বিষম খেয়েছিলেন নকুল রায়। গলায় চায়ের গরম তরলটা ঠিক করে আটকে গিয়েছিল। কোন রকমে শ্বাস-রোধ জিজ্ঞাসাটা কাটিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন...কে!

—আর একজন!

—আর একজন!!

হৃৎপিণ্ডটা যেন তখনই নকুল রায়ের বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে এসে ঘরের সিলিং ধরে ঝুলে পড়বে। নকুল রায় চায়ের কাপ নামিয়ে রেখেছিলেন। ডান হাতটা তুলে এনে বুকে চেপে একবার শ্বাস নিতে চেয়েছিলেন। শব্দ নেই, বাতাস নেই, ঘরে শুধু পাওয়ারের আলো। তার ওপর ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বদান্যতায় তা-ও প্রায় নিভু নিভু। সেই রহস্য-

ময় আলো-আঁধারিতে তিনি নিষ্পলক দৃষ্টি নিয়ে সন্ধ্যারাণীর মুখ দেখছিলেন। যেন এই মাত্র একটা মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছেন তাঁরা। অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যু। তাই মুখে কথা নেই। চোখে ভাষা নেই। নিশ্বাসের কোন কম্পন নেই। কতক্ষণ যে ওভাবে কেটেছিল কে জানে। নকুল রায়ই একসময় সেই অদৃশ্য শবদেহে হাত রেখে প্রেতস্বরে বলেছিলেন— উপায়? ভাবতে পারছি না।

পারার কথাও নয়। আর একজন!... কেমন করে ঘটল, কবে ঘটল, আহ্ হা! সন্ধ্যারাণী ও জানতেন,...তবে? কেন সেই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা...। নকুল রায়ের মাথাটা তখন একটা নাগরদোলার মত পাক খেতে শুরু করেছিল।...

একটু পর বড়ছেলে পল্টু খেলার মাঠ থেকে ফিরে এসে, মা খেতে দাও, বলে ঘন ঘন উত্যক্ত করায় সেদিনকার মত শোকসভা ভেঙে গিয়েছিল।

এরপর আর কোন রাস্তা ছিল না। কেবল নষ্ট করে দেয়া ছাড়া। কিন্তু এখানেই নকুল রায় ও,— আই-এ (ক্যাল) এল ডি সি, দুশো তিরিশ হইতে চারশ স্কেলে—তৎসহ সর্তাধীন মহার্ঘ ভাতা সহিত,—হোঁচট খেলেন। নষ্ট করে দোব! চিন্তাটা মাথায় এলেই শরীরটা তাঁর কেন্নর মত কুঁকড়ে যেত। কে আসছে কে জানে! হয়ত বড় হয়ে এ ছেলেই...। ভাবতে ভাবতে নকুল রায় যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলতেন। অফিস ছুটির পর-ও তিনি লালদীঘির শান্ত ছায়ান্ধকার জলে পা ডুবিয়ে কতদিন এসব কথাই ভাবতেন। ভাবতে ভাবতে রাত হত। বাড়ি ফিরতেন অনেক দেরিতে। পল্টু, বিল্টু আর শীলা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি নিঃশব্দে নৈশাহার সম্পন্ন করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়তেন। কি সন্ধ্যারাণী কি নকুল রায়, কারোর মুখে কথা নেই। যেন তাঁরা দুজনেই কোন অজ্ঞাত অপরাধে অপরাধী। এই অনাগত শিশুটির কাছে যার মুখ তুলে দাঁড়াবার সাধ্য তাঁদের নেই। কখনও যখন চোখাচোখি হলে চকিতে চোখ সরিয়ে নেন তাঁরা। রাতের বিছানায় সাড়া থাকে না। ন্যাপথা গন্ধে চাদর শরীরের সাথে এঁটে বসে যায়। হাত পাখা টানার খস খস শব্দ হয়। সন্ধ্যারাণী পাশ ফেরেন। নকুল হাই তোলেন। সন্ধ্যারাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েন তাঁরা।

সন্তানটাকে নষ্ট করা গেল না। কিংবা নষ্ট করার মত সাহসই জাগল না। আর এক-জনের অনিবার্য আগমনের চিহ্ন নিয়ে সন্ধ্যারাণীর পায়ের গোছ ভারী হল। কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এল। রক্তাল্পতায় শরীর ভাজের ফ্যানের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। স্ফীতকায় মধ্যদেশ নিয়ে সন্ধ্যারাণী যখন নকুল রায়ের সামনে এসে দাঁড়াতেন, নিজের অজান্তেই নকুল রায়ের মাথাটা ঝুঁকে আসত নিচের দিকে। পরাজয়, পরাজয়। যেন নকুল রায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক কোন সৈনিক।

নিঃশব্দে চোরের মত সন্ধ্যারাণীকে গাইনো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। ডাক্তার

ছেলে-ছোকরাদের চোখ বাঁচিয়ে, চেনা-পরিচিতদের সঙ্গ এড়িয়ে, খুব গোপনে। মানা যা মাইনে পান তাতে মাসের মাসখরচও চলতে চায় না। পল্টুর স্কুলের মাইনে, তারপর সন্ধ্যারাণীর ওষুধপথ্য, ডাক্তারের মত উবে যায় মাইনের টাকা। এরপরও সংসারের কত প্রয়োজন আছে। তাই নকুল রায় হন্যে হয়ে হাত পেতে বেড়ান।

অফিসে পৌঁছতে বড় দেরি করে ফেললেন নকুল রায়। বৃষ্টি বাদলার দিন, তাই ও নিয়ে তেমন একটা কথা হল না। নকুল রায় গায়ের জল ঝরিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। পে-ডেট, কাজের চাড় কম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি রেহাই পেলেন। মাইনে নিয়ে অফিস-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বিকেল গড়িয়ে গেল। ছিন্নভিন্ন ধনুকের মত মেঘহীন আকাশটা টান টান হয়ে আছে। রোদ-এর গা বেয়ে যেন সোনা ঝরছে। এই আকাশ দেখে কে বলবে সকাল পর্যন্ত প্রবল দুর্যোগ ছিল। নকুল রায় লম্বা শ্বাস নিলেন। লালদীঘির পাড়ের মাটি এখনও শুকোয় নি। রাস্তার খানাখন্দে এখনও জল জমে আছে। দীঘির জলে ঢেউ ভাঙছে বাতাসে। এখনও ঠিক অফিস ছুটির সময় হয়নি। তবু মাইনের দিন বলেই হয়ত সবাই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে। নকুল রায় জি পি ও-র মাথায় ঘড়ি দেখলেন। পাঁচটা বাজতে বাকি। হাতে এখনও সময় আছে। পায়ে হেঁটে গেলে অনায়াসে পাঁচটা বিশের নৈহাটি লোকাল ধরতে পারবেন। আবার কি মনে করে যেন তিনি দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। এখানে সেখানে মাছ ধরার জটলা। গোটা আকাশটা যেন জলের ওপর নেমে এসেছে। জি পি ও বাড়ির ছায়াটা টলমল করছে জলে। মাছের প্রতি আকর্ষণটা ইদানীং তাঁর ভাল যাচ্ছে না। অনেক পাওনাদার তাঁর। সবাই যেন মাসের এই তারিখটার জন্য ওৎ পেতে থাকে। অনেকেই অবশ্য তাগাদা দিতে দিতে এক রকম আশা ছেড়ে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ যেন ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে। 'আচ্ছা' শাসাচ্ছে মাসে না দিলে তোমার টুঁটির খাবো নেব।'...এরকম করে শাসিয়েও যায়। অথচ এ মাসে সামান্য কিছু শোধ করার কথাই ওঠে না। সন্ধ্যারাণীকে হাসপাতালে দিতে হবে। তবু নকুল রায় আরো কিছুক্ষণ দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। জলের ওপর তাঁর ছায়া ভেসে ওঠে। বাতাসের ধাক্কায় নকুল রায়ের ছায়াটাও টুকরো টুকরো হয়ে যায়। উন্মাদের মত হেসে ওঠেন নকুল রায়। হাসেন, হাসতে হাসতে চোখ বোজেন। আবার মিটিমিটি হেসে ওঠেন। সূর্য হেলে পড়েছে জি পি-ওর মাথা ছাড়িয়ে পশ্চিমে। গাছের মিনারটার গায়ে পড়ন্ত ছায়া। এক গাড় বাদামী রোদ কখন যেন পড়ন্ত বেলার রোদ গায়ে মেখে এসেছে। কিন্তু, আজ কি আছে নাকি এই রকম বিকেলে দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে ফিকে ঝকঝকে দিন শেষের রোদ্দুরে? নকুলরায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মুখ তুলতেই নকুলরায় ভূত দেখলেন, মণ্টু!

ঐ তো চোদ্দ নম্বর ট্রাম স্টপেজে রেলিঙ-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। মণ্টু কি দেখে ফেলেছে!...তিনি তো অনায়াসেই সামনের ঐ ভিড়টার ভেতর দিয়ে রাইটার্স-এর পাশ দিয়ে এক ছুটে গির্জাটার আড়ালে উধাও হয়ে যেতে পারেন!

পারলেন না। তার আগেই নকুলরায় মণ্টুর বুক কাঁপান হাঁক শুনতে পেলেন দেখে ফেলেছি নকুলদা।

নকুল রায়ের মনে হল কে যেন তাঁর পা দুটো মাটির সঙ্গে নাট-বল্টুর প্যাঁচের মত টাইট দিয়ে আটকে ফেলল, একটুকু নড়ার সাধ্য তাঁর নেই।

এক ছুটে মণ্টু এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে, পালাচ্ছিলেন যে বড়?

—পালাব কেন? এাঁ, পালাবার কি আছে? নকুল রায় ঠোঁট ছড়িয়ে হাসতে চাইলেন। পারলেন না। টের পেলেন তাঁর ঠোঁট দুটো ভীষণ কাঁপছে।

—তবে ছাড়ুন। মণ্টু তার ডান হাতের করতল মেলে ধরল।

—কি?

—কি! ভুলে গেছেন! ছাড়ুন ...মণ্টুর গলায় নিশ্বাস কিংবা শ্লেষ্মা কিছু একটা ঘড় ঘড় করে উঠল।—এই বাজারে এতগুলো টাকা আটকে রাখা যায় নাকি?

—কিন্তু এ মাসে যে বড় টানাটানি মণ্টু!' নকুল রায়ের বোধহয় শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। কোন রকমে বুকের বাতাস উজাড় করে সাড়া দিলেন।

—এ মাস এ মাস করে কটা মাস হল দাদা?

নকুল রায় এবার মণ্টুর মুখ দেখে চমকে উঠলেন। মণ্টুর চোয়ালটা হিংস্র কুকুরের মত নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মত জ্বল জ্বল করছে।

নকুল রায় এক পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াতে চাইলেন। পারলেন না। পা দুটো এখনও মাটির সঙ্গে আটকে আছে।

—মণ্টু...। নকুল রায় যেন এবার ডুকরে কেঁদেই ফেললেন। তুমি আমার ভায়ের মত।

—কপচানি রাখুন। মাল ছাড়ুন।

নকুল রায় আর থই পাচ্ছেন না। তিনি কি আর শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে নেই? নাকি ঐ লালদীঘির জলে তাই বোধহয় শরীরটা তাঁর ডুবে যাচ্ছে! তবু শেষ চেষ্টা করলেন

মনে কিছু করিও না।" তুমি মনে করিয়াছ আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই তোমরা আমার ভুলিবার জিনিষ নও, আমার প্রাণের প্রিয় জিনিষ। আমার চক্ষের দেখা দূরে থাক আমি আত্মীয়-স্বজনের একবার পরিচয় পাইলে তাহাকে আমি......। তুমি 'পূজার পর এখানে আসিবে বলিয়াছ, যেন মিথ্যা না হয় ও ভুলিয়া না যাও। আসিবার পূর্বে আমাকে পত্র লিখিও।

তোমার পরিচয় পাইয়া সুখী হইয়াছি। সুশীলা আমার ভাগ্যবতী, তাই অমন ঘরে ও ঐরকম স্বামী লাভ করিয়া পরম সুখী হইয়াছে। আমি কায়-মনোবাক্যে সর্বদা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি উভয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করে। সুশীলা যেন আমার আঁচলে পুত্রবতী হয়।

তাই আমি বড় মনোকষ্টে আছি। আমার মেজ কন্যা ও ছোট কন্যার আজ ২০।২৫ দিন হইল রক্ত আমাশা হইয়া যার পর নাই কষ্ট পাইতেছে। একে বালিকা কিছুই বুঝে না, আমায় যন্ত্রণায় সর্বদাই অস্থির করিতেছে। প্রাণের সুশীলাকে আমার আশীর্বাদ দিয়া বলিও, কত দিনে সে ঈশ্বর মুখ চাহিবেন, কতদিনে যে আমি বালিকার চাঁদ-মুখখানি দেখিয়া সুখী হইব, তিনিই জানেন। শরৎ বোধ হয় পূজার পরে আসিবে, সে আসিলে নিশ্চয় সকলের সহিত দেখা করিবে। সেই সময় যদি দুই ভগ্নীতে দেখা হয়। তুমি শরৎকে রেঙ্গুনে একখানি পত্র লিখিও। আমি তাহার ঠিকানা লিখিয়া দিলাম। তুমিও তোমার ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিও, সে তোমার পত্র পাইতে ইচ্ছুক। প্রভাস ভাল আছে ও কলিকাতায় চাকরি করিতেছে। সে সন্ন্যাসীর ন্যায় হইয়া ৬ মাসে একবার দেখা করে। তাই আমার অদৃষ্ট। প্রকাশ প্রায় ১৫।১৬ দিন আমার এখানে ছিল। বাটীতে পূজা বলিয়া চলিয়া গিয়াছে অগ্রদ্বীপে।

এ বাটীর আর ২ সকলে ভাল আছেন। তোমাদের উভয়ের সুস্থ সংবাদ সর্বদাই লিখিয়া সুখী করিও। আমার পত্র লিখিতে দেরি হইলে মনে দুঃখ করিও না। মনে করিও না যে আমি তোমাদের ভুলিয়া যাইব। ভাই যতদিন দেহে জীবন থাকিবে ভুলিতে পারিব না তোমাদের এক দণ্ডের জন্যও পলকে।

আর বেশী লিখিতে পারিলাম না। আমার ছোট কন্যা বড় কাঁদিতেছে। তোমরা উভয়ে আমার আশীর্বাদ ও স্নেহপূর্ণ ভালবাসা জানিও। সুশীলাকে বলিও তাহাকে পত্র লিখিতে পারিলাম না বলিয়া যেন দুঃখ না করে। ইতি—

তোমাদের বড়দিদি

শ্রীশ্রীহরি সোমবার

সহায়

পরম কল্যাণীয়

স্নেহের রামকিংকর।

ভাই, অনেক দিনের পরে তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাইলাম। পাঠ করিয়া যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমিও দিদিকে ভুলিয়া গিয়াছ। তোমার সুধামাখা পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি এতদিন তোমাকে পত্র লিখি নাই বলিয়া দুঃখ করিয়াছ। আমি ভাই ঝঞ্জাটে ছিলাম। আমার ছোট কন্যা রক্ত আমাশা হইয়া বাঁচিবার আশা ছিল না। ঈশ্বর ইচ্ছায় এখন ভাল হইয়াছে। তাই আমি কাহাকেও একখানি পত্র লিখিয়া খোঁজ লইতে পারি নাই! আশা করি দুঃখিত হইবে না।

তুমি রাগ করি নাই বলিয়া আমি তোমার উপর কোনও রাগ করি না। তা ছাড়া আমি সংসারের সকল ঝঞ্জাট বুঝি। সুতরাং অন্যায় রাগ কাহারও উপর করি না। তোমরা যেখানে থাকিবে ভাল থাকিও। মধ্যে করিয়া মধ্যে ২ একখানি করিয়া পত্র লিখিলেই আমি সুখী হইব।

তাই তোমার যখন সুবিধা হইবে একবার আসিয়া চাঁদমুখখানি দেখাইয়া যাইও, ইহাই আমার অনুরোধ। শিশুরাও ২ "এর আনন্দদাতা তোমার মুখখানি দেখিবার আমার বড়ই ইচ্ছা। সময়ে যেন পূর্ণ হয়। সেই সঙ্গে চির দুঃখিনী বালিকা সুশীলার চাঁদমুখখানি দেখাতে যেন বঞ্চিত না হই। তুমি মনে করিলে আমার অভাগিনীর আশা পূর্ণ হইবে। প্রভাস না যাওয়াতে দুঃখ করিও না। সে যেন কি এক রকম হইয়াছে। তাহার কোন কথাই মনে থাকে না। সর্বদাই অন্য মন। এখানেও অনেকদিন আসে নাই। তবে ভাল আছে। তোমার শরৎদাদা শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবে। আসিলেই তোমাদের বাটী যাইবে। প্রকাশ বৈদ্যনাথ গিয়াছে। সেখানে গিয়া ম্যালেরিয়া হইয়াছিল। এখন ভাল আছে। তাই ....তোমাদের বাঁচাইয়া রাখেন, আমার জন্ম দুঃখিনী সুশীলা যেন তোমার আশ্রয়ে সুখী হয়।

তোমরা সকলে কে কেমন আছ সময়ে ২ একখানি করিয়া পত্র লিখিয়া সুখী করিও।

ভাই আমার পত্র যথা সময় না পাইলে ভাবিত কি দুঃখিত হইও না। তুমি ও সুশীলা, বাটীর আর ২ সকলে কে কেমন আছ পত্রের উত্তরে জানাইও। এখানকার বাটীর সকল বালক বালিকারা ও গুরুজন সকলে ভাল আছে ও আছেন। তুমি ও আমার প্রাণের সুশীলা আশীর্বাদ ও ভালবাসা জানিও, গুরুজনকে প্রণাম দিও। ইতি—

তোমার আঃ বড়দিদি
অনিলা।

প্রকাশের ঠিকানা—
কেঃ অঃ বাবু রমাপ্রসাদ মল্লিক
কার্স টার্স টাউন
বৈদ্যনাথ

বাটীতে একটু কাজ আছে, বড় তাড়াতাড়ি লিখিলাম। মনে কিছু করিও না।

শ্রীশ্রীহরি
সহায় রবিবার

প্রিয় রামকিংকর,

ভাই তোমার পত্র পাইয়া সকল অবগত হইলাম। বাস্তবিক আমি অনেক দিন পত্র লিখি নাই। তাহার কারণ, বাড়ীতে অসুখ বিসুখের জন্য আদপে সময় পাই না। আশা করি মনে কিছু করিও না।

ভাই তুমি কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত দেখা করিবে শুনিয়া যে কি পর্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম লেখা যায় না। ঈশ্বর কি আমার এমন দিন দিবেন তোমার চাঁদমুখখানি দেখিতে পাইব। সে আশাও করি না। কলিকাতায় আসিয়া আমাকে পত্র লিখিও এবং কোন্ দিন আমার বাটীতে আসিবার সুবিধা হয় তাহাও লিখিও। আমি ষ্টেশানে লোক রাখিব। প্রভাসের সঙ্গে বেলুড় মঠে দেখা করিও। সে আমার ঠিকানা সকলি বলিয়া দিতে পারিবে। প্রভাস মঠে আছে। প্রকাশ গতকল্য কলকাতায় গিয়াছে। শরৎ রেঙ্গুণে চলিয়া গিয়াছে। তাহার শরীর ভাল নয়। বোধহয় শীঘ্রই কলিকাতার আসিবে চেষ্টা করিতেছে। কারণ, রেঙ্গুন তাহার আর সহিল না। শরীর আদপেই ভাল থাকে না।

সুশীলা ভগিনী ও খুকি মাতা ভাল আছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। মধ্যে ২ এই রকম করিয়া সকলের সংবাদ লিখিলে বড়ই সুখী হই। আমি তোমাদের পত্রের আশায় সর্বদাই ব্যস্ত থাকি। তুমি কেমন আছ ও বাটীর আর ২ সকলে কে কেমন আছেন? এ বাটীর এখন আপাতক সকলে ভাল আছে। তোমার মুখুজ্যে দাদা মহাশয় বাড়ীতেই আছেন। বছর দেড় হইল চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি ভাল আছেন। তোমাকে আসিবার জন্য লিখিতে বলিয়া দিলেন। আরও বলিলেন, আমিও কলিকাতায় নাই সে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। যদি ভালবাসা ও স্নেহ থাকে তাহলে নিশ্চয় আসিবে। ভাই আমার মুখ রাখিও। একবার আসিও। আমার বড় সাধ তোমাকে দেখি।

ভাই আর একটি ঝগড়া তোমার সঙ্গে ও সুশীলার সঙ্গে আছে। মেয়ের ভাতে

সুশীলা দেবীর পত্র
সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

জিনিষগুলি কি দুজনেই খাইলে? মেয়ের মাসীকে লইয়া গেলে ভাগে কম পড়িত, তাই ভয়ে একবারও লইয়া যাইবার কথা বল নাই। তা বেশ তোমরা খাইলেই আমার পেট ভরিয়াছে।

পত্রের উত্তর দিতে ভুলিও না। আমার আশীর্বাদ তোমরা উভয়ে জানিও, খুকি মাতাকে দিও। যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম রহিল। ইতি—

তোমার শুভাকাংখিনী
বড়দিদি গোবিন্দপুর

অনিলা দেবীর কটা চিঠির কয়েক জায়গা ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া জায়গার লেখাগুলো না জানতে পারায়, সেই জায়গায় ' ' দিয়েছি।

শরৎচন্দ্র ও পঞ্চাননবাবুর মণি অর্ডারের কুপনের লেখা, প্রকাশচন্দ্রের চিঠি এবং অনিলা দেবীরও ৪ খানি চিঠি, এই যে এখানে উদ্ধৃত করলাম, এগুলির কোনটাতেই কিন্তু কবেকার লেখা তার তারিখ নেই।

প্রকাশচন্দ্রের চিঠিটা পোষ্ট কার্ডে লেখা। পোষ্ট কার্ডের উপর পোষ্ট অফিসের স্ট্যাম্পের ছাপ দেখে জানা যাচ্ছে—চিঠিটা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখের লেখা।

সুধাংশুবাবুর কাছে অনিলা দেবীর খামে লেখা ৪ খানা চিঠি থাকলেও, খাম আছে কিন্তু ৫ খানা। একটা চিঠি নষ্ট হয়ে গেছে। এই চিঠিগুলোও যে ভাবে ছিল, আর দু একবার নাড়াচাড়া করলে সবই গুঁড়ো হয়ে যেত। আমি এগুলো নিয়ে নকল করার আগে পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে পর পর সাজিয়ে অন্য কাগজে আটা দিয়ে এঁটে নিয়েছি। খামগুলোও ছিন্ন, এগুলোও আলাদা কাগজে আটা দিয়ে এঁটেছি। খামগুলোর প্রত্যেকটাতেই অনিলা দেবীদের গ্রাম গোবিন্দপুরের পোষ্ট অফিস পানিত্রাসের ছাপ আছে। ঐ ছাপ দেখে জানা যাচ্ছে, চিঠি ৫ খানি লেখা হয়েছিল যথাক্রমে—

১৫।১০।১৯০৯, ১৯।১২।১৯০৯, ২৯।৫।১৯১০, ২০।৭।১৯১০ ও ৫।১।১৯১৩

এই সব চিঠি প্রভৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, রামকিংকরবাবু ও সুশীলা দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্র ও তাঁর ভাইদের এবং দিদিদেরও রীতিমতই বেশ গভীর স্নেহের ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার কথা এই যে, সুধাংশুবাবুর শোনা মতে বর্ণিত প্রকাশচন্দ্রের ঐ তাগা নেওয়ার ব্যাপার থেকেই এত নিবিড় সম্পর্ক একেবারে চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়।

এখন এই তাগার ব্যাপারেই আমার প্রথম কথা—প্রকাশ যদি সত্যই তাগা নিয়ে যেতেন, তাহলে শরৎচন্দ্র সেটা বুঝে প্রকাশকে তিরস্কার বা মারধর করলেও, নির্দোষ বোন, ভগ্নীপতিকে কখনই বর্জন করতেন না। বরং এর উল্টোটাই করতেন অর্থাৎ প্রকাশের অপকর্মের জন্য নির্দোষ ও ক্ষতিগ্রস্থ বোন, ভগিনীপতিকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিকতর আদর যত্নই করতেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা করেন নি। তাই মনে হয়, শরৎচন্দ্র নিশ্চয় বুঝেছিলেন—প্রকাশ এ কাজ করে নি।

দ্বিতীয় কথা—রামকিংকরবাবুকে লেখা অনিলা দেবীর যে চারখানা চিঠি আমি এনেছি, তার একটাতে অনিলা দেবী প্রকাশের ঠিকানা হিসাবে জানিয়েছিলেন—

কেঃ অঃ বাবু রমাপ্রসাদ মল্লিক
কার্স টার্স টাউন
বৈদ্যনাথ

এই ঠিকানা দেখে মনে হল, প্রকাশ অগ্রদ্বীপের যে জমিদারদের বাড়ীতে থাকতেন, তাঁদেরই কেউ তখন তাঁদের দেওঘরের কার্স টার্স টাউনের বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন, আর প্রকাশও তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে গেছেন।

এই রমাপ্রসাদ মল্লিক কে ছিলেন এবং প্রকাশচন্দ্র অগ্রদ্বীপের জমিদার বাড়ীতে কিভাবেই বা থাকতেন, ইত্যাদি জানবার জন্য আমি একদিন খোঁজ করে করে ঐ জমিদার বংশের রাধাগোবিন্দ মল্লিক মশায়ের কাছে গিয়েছিলাম। রাধাগোবিন্দবাবু কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, বয়স ষাটের কাছে, থাকেন কলকাতায় কৈলাস বোস ষ্ট্রীটে। তিনি সেদিন আমার প্রশ্নসমূহের উত্তরে যা যা বলেছিলেন, সেগুলো এই—

রমাপ্রসাদ মল্লিক ছিলেন আমার জ্যাঠামশায়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। প্রকাশদাকে তিনি নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন। তিনি যখন যেখানে যেতেন প্রকাশদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। দেওঘরের আমাদের সেই কার্স টার্স টাউনের বাড়ীটা

শীশঅন্তার্যের কাগজে লেখা শরৎচন্দ্র ও পঞ্চাননবাবুর চিঠি

াত্র আর নেই। সেটা বিক্রি করে দয়েছি।

প্রকাশদা ছেলেবেলা থেকেই আমাদের াড়ীতে নিজেদের লোকের মতই থাক- তেন। তিনি আমাদের ভাই-বোনদের নেকের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন বলে, ামরা তাঁকে দাদা বলতাম। আমাদের লকাতার ৪নং ভুবন সরকার লেনের াড়ীতে (শ্রীমানি মার্কেটের দক্ষিণ- শ্চিম কোণে) তখন বহু ছাত্র থেকে য়ে লেখাপড়া শিখত। এই ছাত্রদের ব্যয় নের জন্য কর্তারা মাসদহে একটা পৃথক মিদারী বরাদ্দ করেছিলেন। প্রকাশদাও দের সঙ্গে মিশে লেখাপড়া করতেন। শ বেশীদূরে পড়েন নি। মনে হয়, খনকার এইট, নাইন ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে লেন। তিনি বাড়ীর ঐ ছাত্রদের সঙ্গে খাপড়া করলেও, তাঁদের সঙ্গে খেতেন । খেতেন আমাদের সঙ্গেই।

শরৎদা রেঙ্গুন থেকে দেশে এলে, ামাদের কলকাতার বাড়ীতে এসে ছোট াই-এর সঙ্গে দেখা করে যেতেন। প্রকাশদা ামাদের বাড়ীর যাত্রা থিয়েটারের দলে নয়মিত অভিনয় করতেন।

প্রকাশবাবুর কন্যা মুকুল দেবীকে বয়স প্রায় ৫০) এই তাগার ব্যাপার ম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি তাঁর ছোট পিসিমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণটা ক বলতে না পারলেও তাগার কথাটা ম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

প্রকাশ তাগা নিতে পারে না— নিলা দেবী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি হয়তো কথা বলেছিলেন। কিন্তু রামকিংকরবাবু, দের বুদ্ধিতেই হোক বা পাঁচজনের াতেই হোক সন্দেহযুক্ত হতে পারেন । তবু যে-ই নিক, বোনের গহনা খোয়া াওয়ায় শরৎচন্দ্র আবার সেই গহনা নকে কিনে দিয়েছিলেন।

মনে হয়, রামকিংকরবাবু, অনিলা দেবী ও শরৎচন্দ্রের কথা বিশ্বাস করতে না পারায় এঁরা তখন রামকিংকরবাবুর উপর কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে রামকিংকরবাবু ও স্ত্রী সুশীলা দেবীকে আর শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে পাঠান নি। না পাঠানোর আরও কারণ, প্রকাশ- চন্দ্র শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে দাদার কাছেই থাকতেন।

এমনি একটা ভুল বোঝাবুঝির কারণেই হোক, বা কারও একটা দোষের জন্যই হোক, এত নিকট আত্মীয়তা ও এত হৃদ্যতা সমস্তই চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এটা সত্যিই এক বেদনার ব্যাপার। আর এই বেদনাটা সব চেয়ে বেশী সুশীলা দেবী ও তাঁর পুত্র কন্যাদের কাছেই। সুশীলা দেবীর মৃত্যু হয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর ছ বছর পরে তিনি বেঁচে থেকেও অত বড় দেশ বিখ্যাত দাদার কাছে যেতে পেলেন না বা দাদাকে নিয়ে গর্বও করতে পেলেন না। ঠিক এমনি অবস্থা হল— তাঁর পুত্র কন্যা দেরও। এঁরা মামাকে নিয়ে গর্ব করা তো দূরের কথা, মামাকে চোখেও দেখলেনই না। অথচ শরৎচন্দ্র যখন মারা যান, তখন এঁদের বয়স যথাক্রমে— ২৮, ২২ ও ২০।

আজ এই শরৎ-জন্ম শতবার্ষিকীতে সমগ্র দেশজুড়ে, এমন কি বিশ্ব জুড়েও যখন মহা-উৎসব চলছে, তখন শরৎচন্দ্রের এই আপন ভাগ্নে-ভাগ্নীরা ঐ উৎসব ও কোলাহল থেকে বঞ্চিত হয়ে দূরে পড়ে রয়েছেন। শুধু আজই নয়, এতকাল এঁদের কোন খোঁজ পর্যন্তও ছিল না। আমিই তো গত ২৪ বছর ধরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কত তথ্যই না সংগ্রহ করলাম, অথচ শরৎচন্দ্রের বাড়ীর লোকদের কাছে বা নিকট আত্মীয়দের কাছে সুশীলা দেবীর ঠিকানাটাও জানতে পারি নি।

এখন খোঁজ পেয়ে—সুশীলা দেবীর একমাত্র পুত্র ৬১ বৎসর বয়স্ক সুধাংশুবাবুর বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, তিনি নিজের বাড়ীতে মামা শরৎচন্দ্রের একটা বড় ফটো বাঁধিয়ে ঘরে রেখেছেন এবং শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত খাট ও ভাঙ্গা গাড়ু গড়াটা ও তাঁর বাবাকে লেখা কয়েকটা চিঠি ইত্যাদি সযত্নে রক্ষা করছেন। এজন্য সুধাংশুবাবুর চোখে মুখে কোন আনন্দ বা গর্বের উচ্ছ্বাস নেই, বরং একটা গভীর বেদনারই ভাব লক্ষ্য করলাম। দেখে বেশ কষ্ট হল।

সিন্ধুলিপি নিজে শিখুন

সুধাংশুকুমার রায়

১
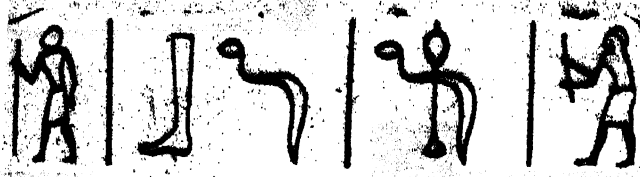
সিন্ধুলিপির সৌভাগ্য হল—সে প্রথমেই বড় বড় লিপি-বিশারদ, প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকদের হাতে পড়েছিল। রাখালদাসের মত প্রতিভাবান পুরাতত্ত্ববিদই তার পুনর্জন্মের জন্য দায়ী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হরপ্পায় প্রাপ্ত পাথরের সীল-মোহরগুলির খবর যদিও আমাদের জানা ছিল, রাখালদাস কর্তৃক ১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কার এবং সেখানে প্রাপ্ত বহু সংখ্যক সীলমোহরই নতুনভাবে সিন্ধুলিপির উপর আমাদের আগ্রহ আন্দোলিত করে তোলে। স্যার জন মার্শাল অত্যন্ত সুবিবেচনার সঙ্গে সিটাইট পাথরে উৎকীর্ণ সিন্ধুলিপির তালিকা প্রণয়ন, পরীক্ষা, পাঠোদ্ধার ও আলোচনার ভার বৃটিশ মিউজিয়ামের তৎকালীন সুমেরীয় ও মিশরীয় লিপি-বিশারদ সিডনী স্মিথ ও সি. জে. গাড এর উপর ন্যস্ত করেন। এঁরা যদিও পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি, লিপির তালিকা প্রণয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আলোচনা অতি যোগ্যতার সঙ্গে সমাপন করেন। মার্শাল সিন্ধুলিপির উপর আলোকপাত করবার জন্য অধ্যাপক ল্যাংডনকেও অনুরোধ করেছিলেন। অক্সফোর্ড-এর সুমেরীয় ও আসিরীয় ভাষার এই অধ্যাপক সিন্ধু ও ব্রাহ্মী লিপিদ্বয়ের মধ্যে অনেক মিল দেখতে পেয়েছিলেন। একটি 'অ্যান্টি-পেট্রিয়টিক পিল' খাইয়ে তিনি আমাদের সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারে মনোযোগ দিতেও উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, কারণ একটি তুলনা-মূলক অক্ষর-তালিকা প্রস্তুত করে তিনিই প্রথম ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভবে সিন্ধুলিপির অবদান আছে বলে দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই ধারণার মূলে সত্য আছে। তাই তাঁর কাছে আমরা অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তাঁর দ্বিতীয় সত্য বাক্য হল যে আপাতদৃষ্টিতে সিন্ধুলিপির সঙ্গে প্রাক-কিলকাক্ষর যুগের, কিলকাক্ষর যুগের তো বটেই, সুমেরীয় লিপির কোন যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের দৃষ্টি, তুলনামূলক আলোচনার জন্য, প্রাচীন ও সমসাময়িক মিশরের হায়রোগ্লিফিক লিপির উপরই নিবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

সে যাইহোক, এই সব মিসরতত্ত্ববিদ, সুমেরীয়তত্ত্ববিদ বা আসিরীয়তত্ত্ববিদরা যত বড় বিদ্বান ও পণ্ডিত হন না কেন, তাঁরা কখনই ভারতীয় লিপিবিশারদ ছিলেন না। অন্ততঃ রাখালদাসের মতো তাঁদের ভারতীয়লিপির উপর দখল ছিল না নিশ্চয়ই। তবে কেন ভারতীয় লিপি-বিশারদদের, বিশেষ করে রাখালদাসকে, মার্শাল সিন্ধুলিপির বিশ্লেষণে বা পাঠোদ্ধারে আহ্বান করেন নি? আমার বিশ্বাস যদি তাঁকে সুযোগ দেওয়া হোত, তবে রাখালদাস সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারতেন। আর এই লিপি নিয়ে এত হতাশা, হা-হুতাশ করতে হত না। যাক—এখন যে কথাটা সোজা বাংলায় বলা দরকার, তা হল যে ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা আর সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারবেন না। তাঁরা অগাধ সলিলে ডুবে আছেন, সেখান থেকে তাঁদের ফেরার রাস্তা নেই। এত দিন তাঁরা বলেছেন সূর্য 'পশ্চিম' দিক থেকে ওঠে। এখন সে সূর্যকে পূর্বে উঠতে দেখাবেন কি করে? আমাদের বলা হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা আর্যরা নষ্ট বা ধ্বংস করেন খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে। আর তারপরই খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ বা পঞ্চদশ শতকে তাঁরা লিখে ফেলেছিলেন বেদ; কিংবা মুখে মুখেই রচনা করেছিলেন। কাজেই সিন্ধু সভ্যতার গঠনের জন্য অনার্যরা দায়ী—আর্যরা নয়। সিন্ধুলিপির ভাষা সেই কারণে কোনক্রমেই আর্য ভাষা হতে পারে না। কিন্তু যে লিপি আমরা পড়তে পারিনি সেই লিপির ঘাড়ে আগেভাগেই একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হল না? যদি আমরা সীলমোহরগুলি পড়তে পারি তবে তো আমরা লিখিত ইতিহাসই পাব—তার পূর্বে রাম-না-হতেই রামায়ণ রচনার কি প্রয়োজন? যে বেদ আমরা হাতে পেয়েছি, সে বেদ তো বেদব্যাসের সংকলিত ও সম্পাদিত। এই বেদের সঙ্গে বেদের উৎপত্তির সন-তারিখ জোড়া কোনক্রমেই উচিত নয়। আদি বেদ রচনা হয়তো এক-দিনে বা এক কালে হয়নি। বহু ঋষির বহু সাধনায় এর সৃষ্টি। সেকাল, সেদিনের খবর আমরা জানি না। কিন্তু সংকলন ও সম্পাদনার দিন-কাল ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভর করে—খৃষ্টপূর্ব ষোড়শ বা পঞ্চদশ শতকে—বলা হয়তো ঠিকই হয়েছে। রচনার কাল ও সম্পাদনার দিন এক নয়। তাই বেদপূর্ব বেদের সন্ধান আমরা যদি সিন্ধু-লিপিতে পাই তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পিগট ঠিকই বলেছেন যে, 'ভাষাতত্ত্ব হল একটি বিপজ্জনক ভূমি—চোরাবালি ও চোরাগর্তে ভরা—অসাবধান মানুষ সে ফাঁদে পড়বেই, আর কখনও কখনও সাবধানী মানুষও পড়ে।' এই চোর গর্তের ফাঁদ ইওরোপীয়দের তৈরী—তারা সেই ফাঁদেই আটকে আছে।

এবার দেখা যাক, দ্রাবিড় সভ্যতার দৌড় কত দূর। ব্রহ্মগিরিতে খনন কাজের ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে, দ্রাবিড় সভ্যতা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকেও অতি নিম্ন মানের ছিল। অধ্যাপক হাইমেনডর্ফ তাই তাঁর বার্লিন বক্তৃতায় বলেছেন, নৃতত্ত্ববিদ হিসাবে আমাদের দ্রাবিড়ীয় সমস্যাকে নূতন পাওয়া তথ্যগুলির আলোকে পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে। বর্তমান প্রত্নতত্ত্বীয় জ্ঞানের আলোকে পাদান ধারণার বিসর্জন দিতে হবে। এটা এখন নিশ্চিতভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে, উত্তর ভারতে হয়তো দ্রাবিড়-ভাষী মানুষের কোন দিনই বসবাস ছিল না। তাঁদের দু-একটা ছোট-খাট উপনিবেশ, যেমন পাকিস্তানে রয়েছে, তেমনি হয়তো ছিল। দক্ষিণ ভারতের উচ্চতর দ্রাবিড় সভ্যতা তাই মনে হয় বয়সে নবীন।' ডঃ বি এম বড়ুয়া অনেক দিন পূর্বেই আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন: 'আমাদের হাতে এমন কোন শক্ত জমি নেই যার উপর নির্ভর করে বলতে পারি যে সিন্ধুলিপি বা সীলমোহরগুলি আদি-দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার নিদর্শন। আমরা মোটেই আশ্চর্য হব না, যদি দেখা যায় এদের

ওপরের ছবির পরিচয়: মিশরীয় হায়রো-গ্লিফিক লিপির নমুনা। পা, সাপ, মুগুর, এই তিনটি অক্ষর এইসব বস্তু বা প্রাণীর বোঝায় না, তাদের নামের আদ্যধ্বনিকে নির্দেশ করে মাত্র। পা হল 'ব' বর্ণ, সাপ 'জ' বর্ণ, মুগুর 'হজ' শব্দ প্রকাশ করে। মানুষের ছবিও শব্দের সঙ্গে যুক্ত। তবে কেন সিন্ধুলিপির অক্ষরগুলির ধ্বনিমূল্য থাকবে না? সেকি কেবলই ছবি—অসভ্য বর্বরদের মূক চিত্রলিপি না সভ্য মানুষের মুখর বর্ণমালা? ভারতীয়দের এখন তা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। মিশর আমাদের পথ নির্দেশ করছে।

বনবিবি উপাখ্যান
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

দুই

কিন্তু ভোর হওয়ার অনেক পরে ফরসা হল চারদিক। কুয়াশার দানা সূর্যের আলোর উবে গিয়ে ঝকমকে হয়ে উঠল নদী আর বনভূমি। যে আগুনটা দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল গৌরী সেই আগুনের পাশে তখন কেউ ছিল না। যে লোকগুলি গত সন্ধ্যায় তাণ্ডব করে আগুন ধরিয়ে ছিল ওখানে, তারা সারা রাত নেশা করে অকাতরে ঘুমিয়েছে নিজেদের ডেরায়। এখন তারা শয্যা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করেছে। আর যে দুর্ধর্ষ জন্তুগুলি সুন্দরবনের জঙ্গলে দাপটে সারারাত ঘুরে বেড়ায় তারাও আগুনের ত্রিসীমানা থেকে দূরে অন্য কোথাও পালিয়ে থেকেছে। আগুনে তাদের ভীষণ ভয়, ভয়ানক আতঙ্ক।

বাতাস ছিল না। তবু সারাটা রাত লকলক করে নেচেছে আগুন। ভাবখানা যেন গোটা অরণ্যটাকেই পুড়িয়ে খাক করে দেবে। অরণ্যের আদিম বীভৎসতার বিরুদ্ধে যেন সে শক্তি পরীক্ষা করতে চায়। এসো, এসো, তোমার সাহস দেখি, এসো। হাঁ হাঁ, হিঁ হিঁ....এসো।

গাছের সবুজ সতেজ পাতা মুহূর্তে মুহূর্তে রং পালটে পাঁশুটে হয়ে ঝলসে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুঁড়ি দুমড়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে, ফটফট শব্দ করে বেরিয়ে পড়ছে তার জলজ নির্যাস।

আগুনের আভায় সারা রাত বেশ কিছু দূর ফরসা হয়ে থাকে। সেই আলোতে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত, খানিকটা জায়গা জুড়ে জঙ্গল নির্মূল হয়ে গেছে। আর সেই ফাঁকা জায়গাটুকু পার হলেই শক্ত দেয়ালের মতো বুনো ঝোপ। কিছু কিছু জঙ্গল আধ-কাটা। কিছু কিছু জঙ্গল পুরোপুরি কাটা হলেও পরিষ্কার করে ফেলা হয়নি এখনো।

আগুনের তাপে পোড়া ইঁটের মতো শক্ত চোয়াড়ে হয়ে উঠেছে মাটি। এই মাটির দিকে তাকিয়ে দয়াল ঘোষ চমকে চমকে ওঠেন। মাটি কোথায়, এ যে নুনের স্তূপ। এর উপর কি করে যে লোকে ফসল ফলাবে, কে জানে। চৌধুরীদের আবাদ করার খেয়ালের কোন যুক্তিই খুঁজে পান না দয়াল। তবু আবাদ করার দায়ভার যখন ওঁরই, তখন আর ওসব নিয়ে ভাবলে চলে না। দয়াল ঘোষ পুরোদমেই উৎসাহ দেন সবাইকে, শাবাশ শাবাশ! যত তাড়াতাড়ি কাজটুকু সমাধা করা যায় ততই যেন মঙ্গল।

চল্লিশ জন কাঠুরে, চল্লিশটা ধারালো কুড়ুল নিয়ে কি কাণ্ডই না বাধিয়ে রাখে সারা দিন। সারাটা জঙ্গল যেন চিৎকার করে কাঁদে। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বিরাট বিরাট গাছগুলি উপড়ে হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। শাবাশ, শাবাশ....এরপর শুরু হয় কাঠ বাছাই, কাঠ ঝাড়াই। ফেলে ছেড়েও দামী দামী কাঠের স্তূপ জমে থাকে। নৌকাতে বোঝাই করে কতটুকুই বা টানা যায়। জঙ্গল যা জমে তাতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, বুনো পশুপাখিকে ভয় দেখাতে আগুনই যথেষ্ট।

দয়াল ঘোষ ক্যাম্পখাটে শুয়ে এখনো শয্যার শেষ আমেজটুকু পুষিয়ে নিচ্ছিলেন। সারা দেহে কম্বল জড়ানো। বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন দয়াল ঘোষ। আশ্চর্য এই অরণ্য। সকালে সন্ধ্যায় দুপুরে এর বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই।

আর ও-পাশে বুড়ো বাসুকির চোখে-মুখে আক্রোশ নিয়ে সারাক্ষণ যেন ফুঁসছে। যেন টের পেয়ে গেছে নদী, এখানে নতুন একটা জনপদ বসাবার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। জঙ্গল উৎখাত করে মানুষ এখানে নিজের প্রতিপত্তি ছড়াতে চায়। নদীর জল-

হাসিতে বাজে। চমকে চমকে ওঠেন দয়াল ঘোষ।

কিন্তু নদীর সমস্ত আস্ফালন জা... ভেড়ির শেকলে বাধা। ভেড়ি উপচিয়ে নদী... জল যে এপারে আসবে সাধ্য কি। তবু ... কাটে না দয়াল ঘোষের, ভেড়ির মাটি কা... কাদা হয়ে গলে পড়তে আর কতক্ষণ। ... সত্যি সত্যি এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটে।

সুন্দরবনের পাকা অভিজ্ঞ ... রজনী। রজনীই একমাত্র সহায় দয়া... ঘোষের। বয়স পঞ্চাশের বেশি বই কম ন... লোকটার বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে বনে... জঙ্গলে। ফলে বন-জঙ্গলের খুঁটিনাটি অনি... সন্ধিই এর জানা। পাকা শিকারী হিসাবে... রজনীর এককালে বেশ নামডাক ছিল। ... বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নির্জীব... কাছা... বাড়ির আশেপাশে আগুন জ্বালিয়ে রা... মুক্তি প্রধানত ওরই।

মাত্র মাস খানেক হল এখানকার ... শুরু হয়েছে ওদের। এরই ইতিহাস ... ঈশান একদিন সামান্য একটা কুড়োল ... করে বাঘের মুখ থেকে বেঁচে এল। ঈ... চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপের মানুষ। ... রোখা, বাড়ি-ঘরের তোয়াক্কা ছেড়ে এখ... এসে জঙ্গলে ভিড়েছে। একা একা জঙ্গ... ঢুকেছিল মধুর খোঁজে, প্রাণ নিয়ে ফির... পেরেছে, এই ঢের। ঝোপের আড়ালে ... মিঞা সম্পর্কে যখন নিশ্চিন্ত হল ... ও গাছের ডালে মৌচাক তোলার ... মধুর কথা ও ভুলে গেল। মধু নিংড়ে নি... লোমটুকু ও লাঠিতে জড়িয়ে আগুন ধ... নিল তার পর পাগলের মতো আগুন ঘো... ঘোরাতে ও সে যাত্রা রেহাই পেল।

দয়াল ঘোষ ঈশানের ঐ চেহারা ... চিৎকার করে উঠেছিলেন, এই সাহসে ... বুঝি খোয়াতে চাস। একা ঢুকেছিলি ... জঙ্গলে?

দয়াল ঘোষ আরো দেখেছেন ... পোড়া বিরাট একটা সাপকে একদিন ... শেখ তুলে এনে হাজির। তারপর তাকে ... কি নারকীয় নৃত্য তার। সাপের নেশায় ... মেতেছিল গজেন। সাপটাকে মেরেও ... শান্তি পায়নি, আগুনে পুড়িয়ে খেয়ে... গিয়েছে। বিশ্রী চামড়া-পোড়া গন্ধে ... মুখ খিঁচিয়ে গিয়েছিল দয়াল ঘোষের। ... গজেনকে এতটুকু গালমন্দ করতে ... পারেননি উনি।

এই এক মাসের মধ্যেই একদিন ... বাসুকির বুকের উপর দিয়ে ভেসে ... মানুষের মৃত দেহ দেখে আঁৎকে উঠে... দয়াল ঘোষ। মৃতদেহের ভাসমান ... উপর বসে ঠোঁট খেতে খেতে এগিয়ে... ছিল কয়েকটা শকুন। রজনীর হাত... বন্দুকটা তুলে নিয়ে দয়াল ঘোষ ... গুলিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে... গুলির শব্দ ভেঙে তছনছ হয়ে গেল... ধর আঘাতে। টিকারো টিকারো শব্দ... ওপর আকাশে শুরু করেছিল। ... অরণ্য যেন চমকে কিলবিল করে ... সেই মুহূর্তে। আকাশের গভীর নী... নিয়েছে দোমড়ানো মেঘের মতো গুটি...

রেছে গিয়েছিল। বৃক্ষ দেখতে একবার
। জাঁতো জুবে গেল, আবার জেগে
আর গন্ধিবেঁধা একটা শব্দ
য় পড়তে লাগে। যেন টাটকা রক্ত
লে বিচিত্র একটা ছবি আঁকার চেষ্টা
খাকিগুলো দিশেহারা হয়ে আকাশে
াক খেতে শুরু করল।

এক মাসের এই অভিজ্ঞতার কথা
ভাবতে দয়াল ঘোষ তন্ময় হয়ে যান।
দির এই অরণ্য ভূমির অভিজ্ঞতা,
!

য়াল ঘোষ বুঝতে পারলেন, প্রতি-
মতো আজও একটা সকাল হয়েছে
তবু আলসেমী করে শীতের আমেজ-
চুঁইয়ে চুঁইয়ে উপভোগ করতে
। ঘরের মেঝেতে আরো একটা বিছানা
াকতে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক
রজনী শয্যা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে
। অসংখ্য পাখির শব্দ শুনতে
লেন দয়াল ঘোষ। মশারীর ভেতর
সমস্ত ঘরটাকে একবার চোখ বুলিয়ে
নিলেন। গরান ডালের বেড়া, উপরে
পাতার ছাউনি। কাঁচা মাটির সোঁদা
সব সময়ই একটা অদ্ভুত আমেজ
থাকে। দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালে
দের ডেরাগুলি চোখে পড়ে। মাঝ-
কতকে পরিষ্কার একটা উঠান। কুলি
ার কাছারি বাড়ির চারপাশে রয়েছে
াছগাছালির বেড়া। বেড়ার ও-পাশে
কৃত্রিম একটা পরিখা কাটা। বুনো
জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার
একম আয়োজন। কিন্তু পোকা মাকড়
সাপ। ওদের গতিবিধি অবাধ।
ী যা নিয়ম, প্রতিদিন ঘরে ধোঁয়া
হচ্ছে কখনো সখনো নৌকো বোঝাই
োবর আনা হচ্ছে। গোবর দিয়ে
দেওয়া হচ্ছে। তবু যেন নিস্তার
েবা।

চাষুরীদের আশার অন্ত নেই। ছোট
তার স্বপ্ন এই সুন্দরবনের জমিটুকু।
জনপদ বসুক, হাট হোক, বাজার
এই বুড়ো বাসুকির উপর দিয়ে
সজোরে নৌকো চলুক। বাগবাগী
বাটি ভিড়ুক। হোক স্কুলবাড়ি,
া, মন্দির। আর সবার উপরে এর
ক সোনালীর আবাদ।

কথা, দয়াল ঘোষ জানেন, সে ঢের
অনেক বাকি। লোক কোথায়। মান
সব কাছারে নিয়ে পুরো দ্বীপটাকে
করা করার পুরুষের কাজ। এই
জন লোককে জোগাড় করতেও কম
খেতে হয়নি ওদের। কত
কত তোষামোদ। বাবা বাছা
বাছাতে, ... জামিন করা ছাড়া
নেই। দয়াল ঘোষ অলস চোখে
থাকেন। অলস চিন্তা করতে
একবার পাশ ফেরা যেন। আর ঠিক
ই উনি চমকে উঠেন। কান পেতে
লেন, বাইরে কি যেন একটা উত্তেজক
ে। কি হতে পারে, কি ঘটছে
হিংস্র সাপ আর বাঘের কথাই

প্রথমে মনে এল ওঁর। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে
উনি মশারী থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

বেরিয়ে এসে বুঝতে পারলেন, নতুন
পরিবেশে যা ঘটে সবই নতুন। শুনতে
পেলেন, বনবিবির নাও এসে ঘাটে ভিড়েছে।
নাওখানা ভেড়ির গায়ে কাত হয়ে পড়ে
আছে।

—বনবিবির নাও! অদ্ভুত চোখে
তাকিয়ে রইলেন দয়াল ঘোষ।

—হ্যাঁ দয়ালবাবু, দেখবেন চলুন।
আমরা হাঁক ডাক করলাম, কোন রা এল না।
ছইঢাকা ছোট্ট একটা ডিঙি নাও দয়ালবাবু!
ভাঁটার টানে চরায় এসে আটকে রয়েছে।

রজনী যথেষ্ট উত্তেজিত। দয়াল ঘোষ
চাদরটাকে গায়ে পিঠে জড়িয়ে নিলেন।
চল তো দেখে আসি।

দলবল নিয়ে ভেড়ির উপর উঠে
আসতে সেটুকু সময়, অনেকেই আগেভাগে
এগিয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে। দয়াল ঘোষ
পলকে একবার বুনো মানুষগুলিকে দেখে
নিলেন। তারপর নদীর চালে তাকালেন,
আশ্চর্য! কার ডিঙি ওটা। কাল সন্ধ্যায়ও
এমন কোন ডিঙি ওখানে দেখা যায়নি!

রজনী ফিস ফিস করে বলল, শুনতে
পাচ্ছেন, কে যেন নৌকার ভেতরে থিনথিনে
গলায় শব্দ করছে।

হ্যাঁ, বেশ শোনা যাচ্ছে। কে যেন
নৌকার ভেতরে কাতরাচ্ছে। কে রে বাবা!

তাকাতে আর কোন ডিঙি নজরে আসে। কি
জানি, অসম্ভব নয়। ডিঙিতে একবার ঢুকে
দেখে আসতেই বা ক্ষতি কি! একবার ঢুকে
এলে হয় না?

রজনীর হাতে বন্দুক। বন্দুকের বাঁট
শক্ত করে ধরা। চারপাশে একবার তাকাল।
কুয়াশা ভেজা বাতাসের ভেতর দিয়ে রোদ
এসে পড়ছে চোখেমুখে। অন্যদিন হলে এই
রোদটুকু আরাম করে উপভোগ করা চলত,
আজ যেন মাথার ওপর ধাঁধা লাগছে।

রজনীর পাশেই দাঁড়িয়েছিল ঈশান।
ঈশানের দিকে তাকাল রজনী, ঢুকবি নাকি
নৌকায়? চল না একবার দেখে আসি!

গোঙানীটা নারীকণ্ঠের সে সন্দেহ
নেই, তবে কেমন নারী সে। কি রূপে ওরে
সে রয়েছে, সেটাই এখন প্রশ্ন। না, একা
ঢোকার সাহস নেই রজনীর। এর চেয়ে বোধহয়
বাঘের মুখোমুখি লড়াও সহজ।

দয়াল ঘোষ আবার অনুরোধ করলেন,
যা না বাবা, একবারটি ঢুকে দেখে আয় না।

এরপর পুরুষ হিসেবে নিজেদের পরি-
চয় দিতে হলে আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে
না। নদীর কাদায় নেমে পড়ল রজনী আর
ঈশান। পা টিপে টিপে শেষ পর্যন্ত ডিঙির
কাছে এসে দাঁড়াল ওরা।

ভেড়ির উপর থেকেই দয়াল ঘোষ
অভয় দিলেন, যা, উঠে পড়। আমরা তো
আছিই, ভয় কি!

রজনী চার পাশে একবার চোখ বুলিয়ে ডিঙির ওপর উঠে পড়ল। ঈশানও।

কাদার উপর একপাশে হেলে কাত হয়ে পড়ল ডিঙিটা। নদীর জল এখন অনেক নিচে। লাল কাঁকড়াগুলিকে ছুটোছুটি কাটতে দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু লোনা মাছ কাদার ওপর সাঁতার কাটতে শুরু করেছে।

রজনী এক হাঁটু কাদাসমেত ডিঙির ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। ভিতরে ভ্যাপসা একটা গন্ধ।

চমকে উঠল রজনী, আশ্চর্য! কে এই মেয়ে! বয়স চোদ্দ পনেরর বেশি নয়। সদ্য হয়তো কিশোরীত্ব ঘুচিয়ে শাড়ি পরতে শিখেছে। লালচে কটা চুলের ঢল মুখের খানিকটা অংশ ঢেকে রেখেছে। উন্মুক্ত দেহ। শাড়িখানা এলোমেলো জড়ান। কিন্তু সারা দেহ জুড়ে কি ওগুলো! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রজনী, মায়ের দয়া হয়েছে রে! সাবধান!

কে এ! কোন দেশ থেকে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে হাজির হল! নাকি বেহুলার মতো ভাসিয়ে দিল কেউ।

রজনী ডাকল, কে গো তুমি? ও মেয়ে, শুনছ?

কোন উত্তর এল না। মেয়েটা যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, সন্দেহ নেই।

—কোথা থেকে এল বলো দেখি? আচ্ছা জ্বালাল তো। নাকি পথে কেউ তুকতাক করে ফেলে রেখে চলে গেল। তাই বা কি করে সম্ভব! এত রাজ্য থাকতে এই জঙ্গলে কেন রে বাবা! ..

রজনী যুক্তিগ্রাহ্য কোন একটা কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। আর একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য ডাকল, ও মেয়ে শুনছ? শুনতে পাচ্ছ? নৌকাটাকে দোলাবার চেষ্টা করল পায়ের ধাক্কায়।

ঠিক এই মুহূর্তেই মনে হল রজনীর কার সঙ্গে কথা বলছে ও। যদি কোন ছদ্মবেশী অপদেবতা হয়ে থাকে, বিশ্বাস কি! আতংকে সারাগায়ে শিহরণ খেলে গেল রজনীর। কার সঙ্গে কথা বলছে ও! ভয়ে ভয়ে ঈশানের দিকে তাকাল।

ঈশানের চোখ দুটোও কুঁচকে ছোট হয়ে আছে। ঠিক এই মুহূর্তে কি যে ভাবছে ঈশান, ধরতে পারে না রজনী। আবার ফিসফিস করে বলল, কি রে? কি মনে হচ্ছে তোর, বললি তো?

ঈশান যেন কথা হারিয়ে ফেলেছিল।

রজনী বলল, চল তাহলে বেরিয়ে পড়ি। জোয়ার এলে না হয় ডিঙিটাকে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে। কি বলিস তুই?

ঈশান ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল রজনীও।

বাইরে ভেড়ির উপরে উৎসুক কিছু মানুষ। সবাই স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে ডিঙির দিকে। দয়াল ঘোষ রজনীকে দেখতে পেয়ে উৎসাহে দু-এক পা এগিয়ে এলেন, কি, কি দেখলি রজনী? কে ভেতরে?

রজনী ততক্ষণে বিড়বিড় করে রাম নাম জপা শুরু করেছে। জপতে জপতে দয়াল ঘোষের কাছাকাছি এগিয়ে এল রজনী। ঈশান কাঠুরেদের সঙ্গে মিশে গেল।

—মেয়েমানুষ দয়ালবাবু। রজনী কথা বলে আর হাঁপায়। ঘটনাটা বোঝাতে তার বেশ কষ্ট হল, মায়ের দয়ার রূপ ধরে এয়েছেন গো, ছলনাময়ী।

—এই বুঝি দেখা হল! দয়াল ঘোষ ভুরু কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

—হ্যাঁ বাবু! স্বচক্ষে দেখলাম। আসলে এসব ডাইনীকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না আমাদের। ফের জোয়ার এলে না হয় ডিঙিটাকে আবার ভাসিয়ে দেবখন।

দয়াল ঘোষের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বনবিবি, ডাইনী, তুকতাকের ওপর রজনীর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু এই প্রকাশ্য দিনের আলোয় সাক্ষাৎ বনবিবির আবির্ভাব, আর যাই হোক দয়াল ঘোষ কি করে বিশ্বাস করবেন! ফলে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কি দেখেছিস আগে সেটা বল? কি করতে হবে না হবে সেটা আমি বুঝব।

রজনী ঘোলাটে চোখে দয়াল ঘোষের দিকে তাকাল। পরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা দিল রজনী। ঈশানকে কাছে ডেকে মাঝে মাঝে স্বাক্ষী মানল ও। পরে আবার রামনাম জপতে শুরু করল।

এখন কি করা উচিত! সত্যি কি জোয়ারের জলে নৌকাটাকে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত! না, অসম্ভব। দয়াল ঘোষ খানিকটা প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, হাঁ করে দেখছিস কি তোরা? যা শক্ত করে নৌওনটাকে গেঁথে দে মাটিতে। পরে যা হয় ভাবা যাবে।

রজনীর মনে হল ওর গায়ে যেন দয়াল ঘোষ চাবুক চালালেন। দূরে দাঁড়াল, কি পাগলের মতো কথা বলছেন দয়ালবাবু। এসব অপদেবতা নিয়ে খেলা করার বিপদ জানেন?

—জানি। সব দায়িত্ব আমার।

ঈশান নৌকার নোঙরটাকে ভেড়ির মাটিতে গেঁথে রাখবার জন্য এগিয়ে গেল।

দয়াল ঘোষ আর অপেক্ষা করলেন না। ভিড়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে কাছারি বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলেন।

রজনী থরথর করে কাঁপতে শুরু করল, দেখলে তো? ব্যাপারটা দেখলে তো? বনবিবিকে নিয়ে ছেলে খেলা!!

—বনবিবিই যে প্রমাণ আছে? কে যেন প্রশ্ন করল।

—আছে, আলবাত আছে। নিজের হাতের চেটোয় নিজেই একটা ঘুষি বসালো রজনী, আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তা মিথ্যে হতে পারে না।

—তুমিই তো বলছ মায়ের দয়া হয়েছে। চোদ্দ পনের বছরের ফুটফুটে একটা মেয়ে।

—ওটা ছদ্মবেশ। ঐ রকম বেশ ধরেই এসেছে গো!

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে তো আমাদের মৃত্যু।

—মৃত্যু ছাড়া কি? আমরা কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারব ভেবেছেন! বনবিবির যদি আমাদের উপর সদয় না হন তা হলে আমাদের রক্ষা আছে বা... চাল?

রজনী কিছুতেই উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছিল না। ঈশান কোথ... ঈশানকে জিজ্ঞেস কর না। ঈশান দেখেছে জিজ্ঞেস কর।

আশ্চর্য ভিড়ের মধ্যে ঈশান গেল কোথায় হারামজাদা!

জগন্নাথ বলল, ঈশানের কথায় নেই। তুমি যখন বলছ তখন নৌ... আর না রাখাই ভালো এখানে।

মকবুল বলল, চল তা হলে ... বাবুকেই গিয়ে বলি আমরা।

রজনী গাঁক গাঁক করে বোঝা... বাঁচতে চাস মকবুল, তবে এক্ষু... দয়ালবাবুকে চেপে ধরি। একজনের খেয়ালিতে আমরা সবাই মরব এ হবে না।

সমস্বরে সবাই বলে উঠল, তাই দয়ালবাবুর কাছেই চল।

ভেড়ি থেকে গোটা ভিড়টা ঢালতে নেমে এল। তকতকে উঠোনটুকু হয়ে কাছারি ঘরের সামনে এসে সবাই।

রজনী যেমন হন্তদন্ত ভঙ্গিতে এসেছিল, তেমনি ভঙ্গিতেই কাছারি ঢুকে পড়ল, দয়ালবাবু একটা কথা।

দয়াল ঘোষ ঘুরে দাঁড়ালেন, গলার স্বর কেমন অপরিচিত লাগা... কাছে। অনেক কথা বলার জন্য তৈ... এসেছিল রজনী কিন্তু কেমন যেন হারিয়ে গেল।

—বোস ওখানে একটা টুলের আঙুল দেখিয়ে দিলেন দয়াল ঘো... বলতে এসেছিস আমি জানি। তা আমার একটা কথার জবাব দে।

রজনী গলা নামিয়ে বলুন।

—মেয়েটাকে দেখে কি মা... ভদ্র ঘরের? নাকি অন্য কিছু?

রজনী আবার চোখ তুলে... কিন্তু সত্যি সত্যি ভালো ক... দয়ালবাবু। নৌকাটাকে ভাসিয়ে উচিত ছিল আমাদের।

—বটে! দয়াল ঘোষ এক ম... ভাবলেন, ভাসিয়ে দিতে আর কত... ভরে একটু সবুর করতে এত অ... তোদের? বলছিলুম, মেয়েটার অ... অবস্থা বুঝে যা হোক একটা ... যাবে।

রজনী গজগজ করে কি ব... গেল না।

দয়াল ঘোষ স্বাভাবিক ... করলেন, যাক গে, এক মুঠো ও... দিবি তো আজ? না খেতে পে... ওখানেই মরে পড়ে থাকবে। অপঘাতে মৃত্যুর দোষ কিন্তু ঘাড়ে চাপবে।

মি পারব না। দয়ালীর প্রত্যাখ্যান
জনী।
রাব না। একটু থমকে গেলেন
াব। বেশ, তবে রান্না করে দিস,
া হয় দিয়ে আসব।

নী উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর
প্রতিবাদ জানাতে এটাই যেন সহজ

র এ সময় দয়াল ঘোষের নজরে
রজার বাইরেই জটলা। ভোঁড় থেকে
জন যেন নেমে এসে কাছারি বাড়িটা
রছে। তবে কি ওদের মুখপাত্র হয়ে
সে কথা বলে গেল। চারপাশে কি
রুদ্ধ হয়ে গেল নাকি। কার বিরুদ্ধে
দয়ালের বিরুদ্ধে! আশ্চর্য!

ময় আরো কিছু অশুভ কথা মনে এল
লোকগুলি যদি দা কাটারি নিয়ে
চড়াও হয় ওর ওপরে, কে বাঁচাবে
বুকের ভিতর দুরুত্তালে রক্ত
শুরু হল। দয়াল ঘোষ অস্থির-
ঘবের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।
—কি ব্যাপার গো তোমাদের? কাজ-
নই? সব যে আজ হাত-পা গুটিয়ে
করছ?
কান উত্তর এল না। দু' দশজন বাদার
ছাড়া সবাই প্রায় সাঁওতাল, জঙ্গ
সী জংলী। বুদ্ধিতে কিছু খাটো।
দেহের জোরে অসম্ভবকেও সম্ভব
বসতে পারে। সারা গা নুন আর
মাটিতে খসখসে, চোখের মণিগুলো
করমচার মতো কঠিন আর লাল।
াত ফুর্তিফার্তা করে পচাই গিলেছে।
কে, এখনো যেন পুরোপুরিভাবে কেটে
। লোকগুলি ঝুলন্ত দেহে জটলা
কাছারি বাড়িটাকে ঘিরে আছে।
ই হোক লোকগুলির মধ্যে আবার
সঞ্চার করতে হবে। দয়াল ঘোষ গলায়
মিশিয়ে বললেন, কি হল, সবাই বসে
নাকি আজ?
এবারও কোন উত্তর এল না।

শেষ চেষ্টা করার জন্য দয়াল ঘোষ
নামালেন, কি হয়েছে বলবি তো?
বোবা হয়ে থাকলে চলে কি করে?
বাপু তোরাও যা আমিও তা।

মকবুল মুখ খুলল, ঐ বনবিবিকে
বেঁধে রাখাটা উচিত হল আমাদের?
দয়াল ঘোষ হাসলেন। রজনীর অনু-
ই যেন লোকটা কথা বলল।
—বুঝেছি, এই সামান্য কারণের জন্য
অভিমান তোদের? বেশ তো তোরা
যা চাইবি তাই হবে। চল ভাসিয়ে
আসি ডিঙিটাকে। ওঠ।

ভিড়ের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল রজনী।
এল, চলুন দয়ালবাবু, এসব দেবী
বী নিয়ে ছেলেখেলা না করাই ভালো।
দয়াল ঘোষের ইচ্ছে হচ্ছিল লোকটায়
দড়াম করে একটা লাথি কসিয়ে দেন,
সময় বিশেষে সবই সহ্য করতে হয়।
করে নিয়ে বললেন, চল।

আবার ভিড়টা টলতে টলতে এগিয়ে
এল ভোঁড়ির দিকে। বেলা প্রায় মধ্যপ্রহর
গড়াতে বসেছে। মাথার উপরে সূর্য
ঝলসাচ্ছে এখন। নদীতে এখন জোয়ারের
টান। নৌকার তলাতে জল ছুঁই ছুঁই
করছে। প্রায় তিনপো মাপের জোয়ার
ধরেছে নদীতে।

ভোঁড়ির উপর থেকে নৌকার দিকে
তাকালেন দয়াল ঘোষ। কে জানে, কোন
হতভাগী সামান্য একটু আশ্রয়ের আশায়
এখানে এসে আটকে পড়েছিল। মানুষের
কাছেই মানুষ আশ্রয় চায়! কিন্তু আমরা
কি মানুষ! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন
উনি।

মকবুলই প্রথম কাদায় নামল। এসো
দেখি এক হ্যাচকায় নামিয়ে দেই ডিঙিটাকে।
কয়েকজন এগিয়ে এসে দুড়দাড় করে
নৌকোয় হাত লাগাল। রজনী তখনো
ভোঁড়ির উপরই দাঁড়িয়ে। খবরদারী শুরু
করল রজনী, বাঁয়ের দিকে ঝুঁকটা বেশি
দিও হে। বাঁয়ে ঝুঁক না থাকলে সুঁচের
ফলার মতো নদীর মধ্যেই ঢুকে যাবে
গলুইটা। আর তাহলে ভাই কেলেঙ্কারীর
আর সীমা থাকবে না।

সবে মাত্র একটা ঝাঁকি দিয়েছে সবাই,
দয়াল ঘোষ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, এই থাম
থাম!

থমকে দাঁড়াল সবাই, কি হল আবার।
—দাঁড়া! একবার আমি নিজের চোখে
দেখে নি। দয়াল ঘোষ আর অপেক্ষা করলেন
না। তড়িঘড়ি কাদায় নেমে ডিঙির কাছে
এগিয়ে এলেন।

কাদায় হাঁটু অবধি ডুবে যাচ্ছিল
দয়াল ঘোষের। পা টিপে টিপে কসরৎ করে
নৌকার উপরে উনি উঠে পড়লেন। তারপর
চারপাশে একবার তাকালেন, লোকগুলো
স্তব্ধ, ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে।
পরোয়া না করে ছইয়ের ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

—একি! চমকে পাথরের মতো নিরেট
হয়ে গেলেন দয়াল ঘোষ। ঈশান! তুই
এখানে!

ঈশান যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। ঘুরে
তাকাল, ডিঙি ভাসিয়ে দেন দয়ালবাবু।
কিন্তু চোখের সামনে মেয়েটাকে এভাবে
মরতে দেব না। দরকার হয় ওকে বাঁচাব
না হয় নিজে মরব।

দয়াল ঘোষ দেখলেন, মেয়েটার কোন
ভাবান্তর নেই। ইস্, কি অবস্থা হয়েছে
বেচারীর। কোথাকার লোক জেনে নিয়েছিস
তো ঈশান। কিছু বলেছে তোকে?

—জ্ঞানই হচ্ছে না যে। অজ্ঞান হয়ে
পড়ে আছে?

—বেঁচে আছে তো? দয়াল ঘোষ
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। নাহ্,
বুকের ওঠানামায় বুঝতে পারলেন মেয়েটা
এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু রোগটা বড়
ছোঁয়াচে রে। এভাবে তোর বসে বসে পাহারা
দেওয়া কি ভালো হচ্ছে?

ঈশান পালটা কিছু বলতে গিয়েও
বলল না। যেন মরতে হয় মরবে, তবু
ডিঙি ছেড়ে ও নিচে নামবে না।

দয়াল ঘোষ যেন নাটক দেখছেন একটা।
বাইরে মারমুখী জনা চল্লিশেক লোক।
রজনী, মকবুল, বিশু......আর ভেতরে
একা একটা মানুষ, ঈশান। আর এই নাটকের
মাঝখানে উনি দাঁড়িয়ে। একটা কিছু
সিদ্ধান্ত ওকে এই মুহূর্তেই নিয়ে নিতে
হবে। হয় ঈশানকে জোর করে ধরে ডিঙি
থেকে নামিয়ে আনতে হবে, অথবা বাইরের
মানুষগুলোকে তাড়িয়ে দিতে হব কর্তৃত্ব
ফলিয়ে।

দয়াল ঘোষ ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে
এলেন। তারপর চারপাশে একবার চোখ
বুলিয়ে বললেন, ডিঙিটাকে জলে ভাসিয়ে
দেওয়ার আগে আমার একটা অনুরোধ রাখিস
মকবুল, ডিঙির ভেতরটা একবার দেখে নিস।
দয়াল ঘোষ এরপর আবার ডিঙি থেকে
লাফিয়ে নেমে এলেন। তারপর আর অপেক্ষা
করলেন না। কাছারি বাড়ির দিকে হনহন
করে এগিয়ে গেলেন।

আর এতেই যেন কাজ হল। যারা
নৌকো ঠেলবার জন্য এগিয়েছিল, তারা
পলকেই হাত গুটিয়ে নিয়ে পরস্পর মুখ
চাওয়াচাইয়ী শুরু করল। আর ঠিক এই
উত্তেজনার মুহূর্তেই ডিঙির ভেতর থেকে
বেরিয়ে এল ঈশান। সবাইকে আশ্চর্য করে
দিয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।
—হারামজাদা! তুই? চেঁচিয়ে উঠল
রজনী।

পাল্টা চেঁচিয়ে উঠল ঈশান, খবরদার মুখ
সামলে কথা বলো। ঈশান কারো সঙ্গে
হারামী করে নি। ঈশান যা ভালো বুঝেছে,
তাই করেছে। যা ভালো বুঝবে, তাই
করবে।

—তাই বলে—
আবার চেঁচিয়ে উঠল ঈশান, একটা
মেয়েমানুষের ভয়েই তোমরা মরে যাচ্ছ,
তোমাদের মুরোদ বোঝা আছে।
—তুই শেষপর্যন্ত মরবি হারামজাদা।
নিজে তো মরবিই, আমাদেরও মারবি।
—মরি মরব। একটা মেয়েমানুষকেই
পারছ তোমরা ভাসিয়ে দিতে। এসো দেখি
লড়বে আমার সঙ্গে। গলুইয়ের শেষসীমায়
এসে দাঁড়িয়ে বুনো পশুর মতো থাবা পেতে
গর্জাতে শুরু করে ঈশান। অনেকটা যেন
বাঘের মতো দৃষ্টি হয়েছে ওর। কারো উপরে
ঝাঁপিয়ে পড়তে যেটুকু সময়।
রজনীর গলার স্বর এতক্ষণ পর মিইয়ে
এল, তুই তাহলে নামবি না বলছিস।
—না, নামব না।
—ঠিক আছে, তাহলে রইল তোর
নৌকো। দেখিস রজনীর কথা একদিন ফলে
কি ফলে না। আগুন নিয়ে খেলছিস ঈশান,
একদিন পুড়ে খাক হয়ে যাবি।
রজনী ভোঁড় থেকে নেমে গেল। সঙ্গে
সঙ্গে অবসাদ গড়িয়ে এল আবার ভিড়ের
মধ্যে। এক এক করে সবাই সরে গেল।
জোয়ারের জল এখন তলা ছুঁয়েছে নৌকার।
ঈশান ধীরে ধীরে আবার ছইয়ের ভেতর ঢুকে
পড়ল। কিছুটা যেন ও নিশ্চিন্ত হল এত-
ক্ষণে।

(চলবে)

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

(রহস্য উপন্যাস)

'তিনমাস আগে পোজ দিয়েছিলাম।'

'তার আগেই তো চিনতেন ?'

'না। আমি মডেল। টাকা নিয়ে পোজ দিই। আর্টিস্টকে চেনবার দরকার হয় না।'

'ক্যামেরাতেও পোজ দেন ?'

"দিই বই কি। তফাৎ কোথায় ?'

'সেটা আপনারা জানেন। ন্যুড পোজ দিয়েছেন ?'

চকমকে দাঁতে ঝকমকে হাসি হাসল বন্যা।

'ন্যাচারালি।'

'পোজ দেওয়াটা তাহলে আপনার পেশা। এ সম্বন্ধে একটু বিশদ বলবেন ?'

'পোজ দেওয়াটা পেশা হিসেবে জাতে উঠেছে বলে জানা নেই। কিন্তু আমি পোজ দিই টাকার দরকার বলে। চাকরী করেও এত টাকা পেতাম না। আমি কিন্তু নেচারিস্ট মডেল— আপনাদের ভাষায় ন্যুডিস্ট। স্টুডিওর মধ্যে মডেল হওয়ার মেয়ে অনেক পাবেন—কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে ন্যুড মডেল পাবেন না। এ শিক্ষা পেয়েছি মায়ের কাছ থেকে। মা নিজেও নেচারিস্ট। ছেলেবেলা থেকেই মডেল হতে মা-ই শিখিয়েছে। বাবারও আপত্তি নেই।'

শুনে গা রি রি করে উঠল উঠে পড়তে পারলে বাঁচতাম। কিন্তু কাজ এখনো ফুরোয়নি। আবার হাত ঢোকালাম পকেটে, ফের বার করলাম ফটোর তাড়া। যে এন-লার্জমেন্টগুলো সনাতনের নেগেটিভ থেকে নেওয়া, অথবা সনাতনের নেগেটিভ বলে যেগুলো আমরা ধরে নিয়েছি, তার প্রিন্ট-গুলো বেছে আলাদা করলাম। তারপর উঠে গিয়ে খাটে বসা বন্যার কোলের ওপর ফেলে দিলাম।

'একটু চোখ বুলোবেন ?'

স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহে ঝপ করে তুলে নিল বন্যা।

'নাইস, ভেরী নাইস।'

'আপনার ফটো ?'

'আমারই তো। এত ভাল ছবি খুব কমই উঠেছে আজ পর্যন্ত।'

'কোথায় তুলেছিলেন বলবেন ?'

'নিশ্চয় বলব। গঙ্গার পাড়ে। কল-কাতা থেকে—'

'জানি কোথায়।'

'তা তো জানবেনই। সনাতন গাঁ ডেডবডি ওখানেই পেয়েছেন যে। তাই

'হ্যাঁ। এবার বলুন তো ছবি কথে তোলা হয়েছিল ?'

'হপ্তা তিনেক আগে। তারও হতে পারে। দিল্লি যাওয়ার এক আগে। এগজ্যাক্ট ডেটটা বলতে প

'এখন না বললেও চলবে। কাইন্ডলি এগুলো দেখুন।'

'এবার যে ছবিগুলো দিলাম, সে উদ্ধার করেছি মিসেস ভাদুড়ীর থেকে। বন্যা দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল কটার ওপর।

'আরও আছে' বলে সপ্রশ্ন তাকাল আমার দিকে। 'আমারই আমাকে দেখাতে দেওয়ার কারণ ?'

'একটু পরে বলছি। তার বলুন আপনি কেন বললেন 'আরও আ আপনি কি বলতে চান আরও ছবি উ সেদিন ?'

'নিশ্চয়। প্রায় ডজন তিনেক বটেই।'

আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

'ডজন তিনেক ? ঠিক বলছেন ে

'গুড হেভেনস্ ইন্সপেক্টর। বলতে যাবো কেন ? আমার ক'খানা উঠেছে আমি তা জানব না ? শুয়েছি, গাছে উঠেছি, দৌড়েছি— তিনেক ধরে ডজন তিনেক পোজ দিয়ে

আমার চোখ দুটো কি তখন বেরিয়ে এসেছিল ?'

'দয়া করে বলবেন ছবি যখন তখন আর কেউ সেখানে ছিল কিনা ?'

'দেখুন, আমাকে কে নেকেড দেখল কি না দেখল, আমি তা কেয়ার করি না। ওসব সয়ে গেছে। তবে ভীড়ের মাঝে নিশ্চয় নেকেড ছবি তোলা যায় না।'

'আমি ভীড়ের কথা বলছি না। আপনাদের সঙ্গে অন্য একজন ফটোগ্রাফার ছিল কিনা বলুন। অথবা আরেকজন ছিলেন ?'

'না। মিঃ গুঁই আর আমি ছাড়া কেউ না।'

মিঃ গুঁইয়ের সঙ্গে আপনি যে সেদিন ফটো তুলবেন, এ খবর আর কেউ জানত ?'

সিধে চুল ঝাঁকিয়ে বন্যা বললে—জো মুস্কিল। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে মিঃ গুঁই আমাকে ফোন করেছিলেন। ফোনে বললেন, একটা ম্যাগাজিনের জন্যে স্পেশ্যাল টাইপের কতকগুলো ফটো তুলতে হবে। আমাকে পোজ দিতে হবে। ন্যুড পোজ।'

'আপনার ফোন নাম্বার মিঃ গুঁই জানলেন কি করে ?'

'কেউ দিয়েছে বোধহয়।'

খুব স্বাভাবিক, সহজ উত্তর।

'অচেনা লোক ফোনে তলব করলেও চলে যান ?'

'কেন যাব না ?'

'বদলোকের পাল্লায় পড়তে পারেন তো ?'

'বদলোকেরা প্রফেসনাল মডেল নিয়ে কমায়েস করে না। বাজারের মেয়ে খোঁজে। তাছাড়া, আমি জুডো জানি।'

মনে মনে ভাবলাম, পায়ের গোছখানা দেখেই তা মালুম হওয়া উচিত ছিল। আমি খামোকা সময় নষ্ট করছি কেন ? ও কথা বলে লাভ কিছু হল কি ?

এবার বার করলাম সর্বশেষ এনলার্জমেন্টটা।

'এটাও কি আপনার ?'

হাত থেকে এনলার্জমেন্টটা নিয়ে হেসে ফেলল বন্যা। খুশীর হাসি।

'দারুণ, গর্জাস, তাই না ?'

জবরজালো ? ঈশ্বর জানেন, কতখানি।

বললাম—'কি হয়েছিল বললেন ?'

'সে ভারি মজার ব্যাপার। তখন অবশ্য অতটা ভাবিনি। মিঃ গুঁই শুধু দিক আর খাড়ের ক্লোজ-আপ নিচ্ছিলেন। এই পর্যন্ত—বাঁ উদ্ধত বুকের তলদেশে হাত দিয়ে দেখাল বন্যা।" ক্যামেরার ক্লিক শোনবার জন্যে পোজ মেরে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে পা ঘসে কি যেন সর সর করে চলে গেল। আমি ভাবলাম সাপ। হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠে শাটার টিপে দিলেন মিঃ গুঁই। তারপর একটা ভাঙা ডাল নিয়ে অনেক খুঁজলেন। কিন্তু সাপ দেখতে পেলেন না। তখন বুঝলাম সাপখোপ নয়—খুব সম্ভব গিরগিটি।"

'তারপর আর ফটো তোলেন নি ?'

"কেন তুলব না ? ডজন দুয়েক ছবি উঠেছে তারপরেও। সাপ নেই জানবার পর নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম বলেই তুলেছিলাম।"

হাঁদারামের মত শুধু চেয়েই রইলাম বন্যালালের দিকে। জিভটা অসাড় হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কি বলব ? খড়কুটো ধরে উঠতে চেয়েছিলাম তাও ভেসে গেল। লাস্ট চান্সটাও ভেস্তে গেল। সিগারেটের প্যাকেট বার করে এগিয়ে দিলাম।

বন্যা বললে—"আমি স্মোক করি না। আপনি করুন আপত্তি নেই।"

স্মোকিং হ্যাবিট নেই এটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। ঘুম থেকে উঠেই সম্ভবতঃ যোগব্যায়াম, ফ্রিহ্যান্ড একসারসাইজও করে শরীর সুগঠিত রাখবার জন্যে। অগত্যা নিজেই ধরালাম সিগারেট।

বন্যা চেয়ে থেকে বললে—"আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এবার দয়া করে বলবেন কি সনাতন গুঁইয়ের খুনের সঙ্গে এসব প্রশ্নের সম্বন্ধ কি ?"

পুরো কাহিনীটা বলতে ইচ্ছে হল। বলেও অবশ্য লাভ কিছু হত না। যা শোনবার সবই শুনেছি। নাকি ঠকে যাচ্ছি মেয়েটার সরল অভিনয়ে ? প্রাণ খুলে কথা বলাটা মেকী নয় তো ? এনলার্জমেন্টগুলো নিলাম নিজের হাতে। যে ফটোগুলো সনাতনের ক্যামেরায় পাওয়া নেগেটিভ থেকে আমরা প্রিন্ট করেছি, শুধু সেইগুলো আলাদা করে দিলাম ওর হাতে।

"মিস লাল, এ ফটোগুলো আমরা প্রিন্ট করেছি পুলিশ ল্যাবরেটরীতে। মিঃ গুঁইয়ের ডেডবডির পাশে কতকগুলো ডেভালাপ-না-করা নেগেটিভ পেয়েছিলাম। সেই নেগেটিভের প্রিন্ট।"

চোখের পাতা পড়ল না বন্যার।

"কিন্তু তা কি করে হয় ? অসম্ভব।"

"অসম্ভব জানি। কিন্তু ঘটনাটা ঘটনাই—মিথ্যে নয়।"

বন্যা যে খড়ের মত দপ করে জ্বলে উঠতে পারে, লালটুস মুখচ্ছবি দেখে আগে বুঝি নি ! দুচোখে যেন স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে গেল চোখের পলক পড়তে না পড়তে। সটান উঠে দাঁড়িয়ে এমনভাবে এক পা এগিয়ে এল আমার পানে যে সন্ত্রস্ত না হয়ে পারলাম না। একটু আগেই শুনেছি, মেয়েটা জুডোয় ওস্তাদ।

কিন্তু আমার চেহারাটি দেখেই বোধহয় অতটা এগোলো না বন্যা। শুধু বলল তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—"তবে কি আমি মিথ্যে বলছি ? কি বলতে চান আপনি ? ফটোগুলো তোলা হয়েছে গত শুক্রবার—মিথ্যে করে বলছি কয়েক হপ্তা আগে ?"

"সিট ডাউন, মিস লাল। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখুন। আমি কি একবারও বলেছি আপনি মিথ্যেবাদী ? আপনার মুখের কথা ছাড়াও আমরা খবর পেয়েছি অন্য সূত্রে যে ফটোগুলো কয়েক হপ্তা আগেই তোলা। সেটা যেমন একটা ঘটনা, এই ছবিগুলো যে সনাতনের নেগেটিভ থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে—সেটাও তেমনি একটা ঘটনা। ক্লিয়ার ? এবার এগুলো দেখুন। কি বুঝছেন ?

মিসেস ভাদুড়ীর ফটোগুলো দিলাম বন্যাকে।

"কি আবার বুঝব ? একই নেগেটিভ থেকে ফের প্রিন্ট করেছেন, এই তো ?"

"না। এগুলো এসেছে চৌরঙ্গী লেনের প্রাইভেট বোর্ডিং হাউস থেকে।"

"তাই বলুন। দ্যাট ডার্টি ন্যাস্টো উওম্যান ! আই হেট হার ! ন্যাস্টি মেয়েছেলে—ড্রয়ার থেকে ফটোগুলো পর্যন্ত সরিয়েছে। তখন জানলে চটিয়ে গাল ফাটিয়ে দিতাম ! জানেন, এই সবের জন্যেই চলে গেলাম দিল্লিতে—আবার কোথায়

বোর্ডিং হাউস খুঁজে কে কি বলবে—তাছাড়া বাবা-মাকেও দেখিনি অনেকদিন। তাই—"

"খুঁজেছি, কিন্তু মনে মনে বললাম কিছুই বুঝিনি। বন্যালাল যা কিছু বলছে, তার প্রত্যেকটি কথাই আমার জানা। ঘটনার সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে। সেই জন্যেই আরো গুলিয়ে যাচ্ছে মাথাটা।

শেষ চেষ্টা করলাম মরিয়া হয়ে।

"মিস লাল, আপনার এই পোজ দেওয়ার মধ্যে কোথাও একটা মজা আছে। কানি ব্যাপার। কেউ কি জানত আপনি সেদিন পোজ দিতে যাচ্ছেন? নেগোটিয়েশনে নিশ্চয় কেউ হাজিরেছিল। সে জানত আপনি কবে, কোথায়, কখন মিঃ গাঙ্গুইয়ের ক্যামেরায় পোজ দিতে যাচ্ছেন। বলবেন সেদিন কি-কি করেছিলেন?"

"সব বলতে হবে?"

"সমস্ত। এমন কি কখন কিভাবে মিঃ গাঙ্গুইয়ের বাড়ী গিয়েছিলেন তাও।"

"আমি নিজে থেকে তো যাইনি। মিঃ গাঙ্গুই আমাকে বাসস্টপ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"আগে কখনো ও বাড়ী গিয়েছিলেন?"

"জীবনে না।"

"তাহলে তুলে নেওয়ার পর থেকে বলুন কি করেছিলেন কি দেখেছিলেন, কি শুনেছিলেন।"

"সোজা গেলাম গঙ্গার পাড়ে। আগে থেকেই ঠিক ছিল কোথায় যাবো। জায়গাটা নির্জন। শহর থেকে বাইরে। ভীড়ভাট্টা কম। গাড়ীওলা ছাড়া সটরাচর ওপথ কেউ মাড়ায় না। গাড়ীর শব্দ পেলেই গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়া যাবে। এইসব সুবিধে ছিল। পৌঁছোনোর পর মিঃ গাঙ্গুই গাড়ী রাখলেন ঝোপের আড়ালে। ঢাল বেয়ে পাড় পর্যন্ত হেঁটে গেলাম আমি।"

"ভেরি হলেন কোথায়? মানে, ন্যুড পোজ দেওয়ার জন্যে?"

"ঝোপের আড়ালে। আর লজ্জা আমার নেই, সামান্য হামজ নয়।

"স্টেশন ওয়াগনের মধ্যে নয়?"

"না। গাড়ী ছিল রাস্তার কাছে। ওখান থেকে প্রায় এক পা সেকেন্ড হেঁটে আসতে হত।"

(চলবে)

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও [illegible] ক্রিস্টিন

প্রণতা দে

। ২৬ ।

২১ ডব্লিউ [illegible] স্ট্রীট

লস এঞ্জেলস ক্যালিফোর্নিয়া

২৩ জানুয়ারি [illegible] খৃঃ

স্নেহের ক্রিস্টিনা,—

আজই সকালে তোমার ছোট্ট একটি চিঠি পেলাম। মিস নোবেলের পৌঁছানোর সংবাদটুকু জানিয়েছে বাস। আর কিছু নয়। ও যেন কোনমতে 'হাউ ডু ইউ ডু' ভাল কথা, আমি এখন বেশী পরিশ্রম করছি না। কারণ বেশী কাজ এখন পাই না। প্রথম হিড়িকটা চলে গেছে। লোকে পয়সা দিতে চায় না। আমি সানফ্রান্সিসকোতে যেতে চাই। কারণ সেটা নতুন জায়গা হবে কাজের পক্ষে।

[illegible] এবং অন্যান্য [illegible] যেটুকু [illegible] একটা বিষয় [illegible] ভাল আছি। [illegible] অনেক ভাল। [illegible]

এক সঙ্গে [illegible] তবে নিজের খাদ্য এবং বিশ্রামের বিষয় বেশ সতর্ক থাকতে হয়। আমার চিকিৎসকের মতে 'নেচার চিকিৎসায়' সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই ভাল হয়ে যাব, আর রক্তের মধ্যে যা কিছু এত দিনের বিষ জমা হয়ে আছে সব নির্মূল হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করব। মাহলাটি বলেছেন আমার হৃদযন্ত্র বা কিডনীর অসুখ!

কিছুই নেই। ওঁর কথা আমি বিশ্বাস করছি। আমার সামনেই উনি অদ্ভুত রকমভাবে রোগ নির্ণয় করে কি রকম চিকিৎসা করেন এবং ভাল করে দেন তা তো দেখলুম।

তুমি কেমন আছ? মন ভারী করে আছ? স্বাস্থ্যহানিতে আমার আরও একটা লাভ হয়েছে। মনের সেই অস্থির উচ্ছ্বাস ভাব আর নেই। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েছি।

তবে ভয় হয় আমাকে এখন থেকে অন্যের উপরে নির্ভর করে থাকতে হবে বাকী জীবনটা। যে বিশ্রাম ও শান্তি চাই, তা কিছুই পাব না। কিন্তু 'মা' আমার মধ্য দিয়ে সবার, অন্ততঃ আমার দেশের কিছু মঙ্গল করছেন এই সান্ত্বনায় নিজে না হয় ক্ষতিটা স্বীকার করলাম, অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে!

আমরা প্রত্যেকেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে ঠিক, না-কিছুর বলি। বিরাট রকমের একটা পূজো চলছে বিশ্বে, কে তার মানে বোঝে, যদি না একটা বিরাট রকম কিছু 'বলি' হয়? যারা বুঝতে পেরে আত্মসমর্পণ করে তারা অনেক দুঃখ-যন্ত্রণাকে এড়াতে পারে। কিন্তু যারা আপত্তি করে, বাধা দেয় তারা শেষ পর্যন্ত পুরাতারে ভেঙে পড়ে, দুঃখও পায় বেশী। আমি তাই 'বলি' হবার জন্য আত্মসমর্পণ করছি।

সানফ্রান্সিসকো থেকে আমি পূর্বাঞ্চলে যাব। যদি তুমি চাও ডেট্রয়েটে তোমার সঙ্গে দেখা করব। মোটামুটি মাচ মাস অথবা তার চেয়ে পরেও হতে পারে। মনে কর না পূর্বাঞ্চলে আমি এর চেয়ে আগে যাব। মার্চেও বেশ শীত হবে। তাই না?

মিসেস ব্লগেট নামে একজন শিকাগো-মহিলার কাছে আমি আছি। খুব সাদামাটা মানুষটি। তিনখানি (আটখানি?) ঘর ও একটি রান্নাঘর নিয়ে ছোট একটি কটেজ আছে ওঁর। জীবনযাত্রাও খুব সাধারণ এখানে। নিজের রান্না নিজেই সাধারণত করে নিই। মাঝে মাঝে একটু হৈ চৈ বাধাতে আমার ভাল লাগে। বেচারী মিসেস ব্লগেট সংকুচিত হন আমার পক্ষে খাওয়া-দাওয়াটা বড়ই অনাড়ম্বর এবং সাধারণ হচ্ছে মনে করে। উনি তো জানেন না যে, ভারতবর্ষে আমরা কিভাবে থাকি। এখানকার শ্রমিকরা যেভাবে থাকে আমি জীবনেও ও রকম থাকিনি কখনও থাকিনি। এমন কি আমি যদি মিলিয়ন ডলারও উপার্জন করি তবুও ও রকম জীবনযাত্রা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—যতক্ষণ না আমি আমার জাতির জন্য কিছু করতে পারি। তারপর আমরা হলাম সন্ন্যাসী। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের চেয়েও সাধারণ।

মার্গট কী করছে? ওখানে ওঁরা ওকে পছন্দ করবেন কি? তোমার মার্গটের, মিসেস ফাংকে এবং অন্যান্য সব বন্ধুদের আমার সম্মান জানিও।

এ বছর ডেট্রয়েটে খুব ঠান্ডা! আমি ঠান্ডা ভালবাসি এবং তাতে ভাল থাকি। তবে উত্তরাঞ্চলের ঘর গরমের ব্যবস্থাটি বাস্তবিক ভীতিজনক। আমার মাথা ঘোরে তাতে! আমি খুব খুশীতে আছি এমন খবর তোমাকে দিতে পারছি না! খুশী নই অবশ্য। আমি সুখে থাকবার জন্য জন্মাইনি না তো সেজন্য মাথা ঘামাই এখন। সুখের উল্টোতে থাকতেই আমি অভ্যস্ত। কাজ করতে এসেছি। কাজ করে যাব আমরণ। তবে মন শক্ত—বস সেই যথেষ্ট। এমন কী বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হোক বা না হোক তাতেও কিছু আর এসে যায় না। আই অ্যাম কনটেন্ট অ্যান্ড রিজাইন্ড। 'মা' তাই জানেন—যা সব সময় বলে থাকি।

তোমার বোনেরা কেমন আছেন? তোমাকে সাহায্য করে কী পয়সা কিছু জমাতে পেরেছ কী? বস্টনে গিয়ে কত খরচ হয়েছে? সমস্ত জানাবে আমাকে। মিসেস বুলকে তোমার খুবই ভাল লেগেছে জানলাম। ভাল। আমি জানতাম তোমার ভাল লাগবে। উনি একজন দেবদূত। ওঁর আত্মাকে আশীর্বাদ। ওঁরা সবাই এপ্রিল মাসে প্যারিসে যাবেন। মে মাস নাগাদ আমি লন্ডনে যাব এবং মাসখানেক বা মাস-দুই বাদে ভারতাভিমুখে। তোমার ইংল্যান্ড ভ্রমণটি মজার! লন্ডনের গোটা কয়েক রাস্তা দেখে ঘরে ফিরে এলে! তবে তোমার গৃহকর্ত্রী তোমাকে খুব যত্ন করে নিশ্চয়ই খাইয়েছেন। তাই না?......

যদি আমি জীবনে এই রকম খাঁটি এবং আন্তরিক বন্ধুদের না পেতাম? 'মা'কে অশেষ ধন্যবাদ! এ একটা মস্ত লাভ হয়েছে জীবনে! মন প্রফুল্ল কর ক্রিস্টিনা! এ সংসারে দুর্বলতা বা হতাশার কোন স্থান নেই। হয় সবল হও নয় শেষ হও। এই তো সংসারের নিয়ম। তোমার ক্লান্তিকর দাসত্বের কাজ থেকে 'মা' তোমার মুক্তির উপায় নিশ্চয় করে দেবেন। আমি সুনিশ্চিত। *আমি সর্বদা সেই প্রার্থনা করি। 'মা' অনেক সময়ই আমার প্রার্থনা শোনেন। প্রফুল্ল হও বৎস! অমানিশা শেষ হল বলে, কোন সৎ কর্ম নষ্ট যায় না।* আর তুমি তো অনেক ভাল কাজ করেছ। তার সুফল তুমি শীঘ্রই পাবে।

অনেক ভালবাসা ও আশীর্বাদসহ
বিবেকানন্দ

(২৭)

১৩০২ জোন্স স্ট্রীট
সানফ্রান্সিসকো, ৮ মার্চ, ১৯০০

স্নেহের ক্রিস্টিনা,—

কাজকর্ম কেমন চলছে? মিসেস ফাংকে এবং অন্যান্য বন্ধুরা সব কেমন আছেন? তুমি খুশীতে আছ, না কাঁদছ, নাকি মন খারাপ করে আছ? আমি সমস্ত সমর্পণ করবার জন্য নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি। আমার শরীর ভালই আছে তবে আগের মত স্বাস্থ্য নয়। জানি না কখনও আর সে রকম শক্তি ফিরে পাব কিনা। তবুও খুশী থাকব যতটা এ সংসারে থাকা সম্ভব।

মার্গট বোস্টনে গিয়েছে। আমি এখন সানফ্রান্সিসকোতে খুব কাজ করছি। কাজ, শুধু কাজ। যেই পথ-খরচটা জোগাড় করে নিতে পারব তখন পূর্বাঞ্চলের উদ্দেশে পাড়ি দেব এ জায়গা ছেড়ে।

ডেট্রয়েট নিশ্চয় খুব ঠান্ডা হবে এখন! এখানকার আবহাওয়া মনোরম। উত্তর ভারতের মত অনেকটা। এই মাসটা আমাদের ভারতবর্ষে বসন্ত ঋতু। এখানেও তাই। তোমাদের বসন্ত এপ্রিলে না মে মাসে? ভুলে গিয়েছি আমি। এপ্রিলটা মার্চের মত ঠান্ডা নয়। কী বল?

এখান থেকে এপ্রিলে বেরিয়ে পূবের দিকে পাড়ি দেবার ইচ্ছে। শিকাগোতে থামব পথে, তারপর ডেট্রয়েট যাব যদি তোমাদের লোকজনরা একটু বিশ্রাম চায়। তারপর নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি।

ক্যালিফোর্নিয়ার লোকেরা আমার লেখা পড়ে আমার জন্য তৈরী ছিল। লেখার 'বাণী' অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে দেখছি। কাজেই ভিড় পাওয়া কিছু মুশকিল হয়নি। এখন দেখা যায় দরজার সামনে ৫০ সেন্ট দিতে হলে সে আগ্রহ টেঁকে কিনা!

আমি আর কাজ করতে চাই না। চাই নির্জনে বিশ্রাম করতে। আমি জানি আমার সময় কখন, এবং স্থান কোথায়—কিন্তু অদৃষ্ট বা কর্মফল আমাকে কাজের জন্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমরা হলাম ছাগলের পাল চলেছি চাবুক খেতে

থেকে কখাইখানার, পরে অজ্ঞাজাতি করে দু-চারটে খাস মুখে তুলে নিচ্ছি অন্ধকার থাম থেকে। এই যে আমাদের কাজ,— আমাদের ভীতি। ভীতি হল দুঃখ, রোগ, সব কিছুর মূলে।

আমি চেষ্টা করছি নিশ্চল্ল হতে, ঠিক আগের মত বেপরোয়া এবং সব বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু নার্ভাস ও ভীত স্বভাবের হয়ে গিয়ে কখন অপরকে আঘাত করে বসব এই ভয় হয়। এবং যত ভয় পাব অন্যকে আঘাত করা সম্বন্ধে ততই আরও বেশী ভুল করে বসব। মন্দকে এবং অনিষ্টকে এড়াবার যত চেষ্টা করি আমরা ততই তার কবলস্থ হয়ে পড়ি। কী যে বিশ্রী গণ্ডগোল বাধিয়ে বসি আমরা নিজের চতুর্দিকে। এতে ভাল তো কিছু হয়ই না, বরং অশান্তি, দুঃখ যা এড়াতে চাই তারই মধ্যে পড়ে যাই। আমি বরাবরই স্বভাবত ভাবপ্রবণ এবং এজন্য অন্যের এবং নিজের দুঃখের কারণ হয়েছি। আমি শারীরিক মানসিক দু দিক দিয়েই বেশ সবল হয়ে উঠছি। আর ভাব-প্রবণতা নয়। এখন শুধু কাজ, আর ভাবা নয়। বেশী আগে-পিছে ভাবলে আমরা কোনই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি না। এ 'রসি-গুড়' যা গুডউইন বলত—আর নয়। ওসব চুকিয়ে ফেলেছি। তুমি সারা দিন কী কর? সেই রুটিন-বাঁধা কাজ? আহা, আমার যদি তোমার মত ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং নিজেকে ওমনি বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা থাকত! নাঃ আমি ঝড়ের মত অশান্ত, সহজে উত্তেজিত, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, নির্বোধ একটা।

এবারে আমি বিশ্রাম নিতে বদ্ধপরিকর। প্রথমে নিজের মধ্যে, তারপর, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে। আর কাজে নয়। শান্তি আমার একমাত্র কাম্য। আমার জীবনের আরব্ধ কাজ আমি করেছি ঝড়ের মত। এখন লম্বা ছুটি নেব বিশ্রাম ও শান্তির জন্য।

মাঝে মাঝে এক লাইন অন্তত লিখো, কেমন? শুধু এইটুকু জানিও কী করছ, এবং কেমন আছ?

তোমাকে, মিসেস ফাঙ্কেকে এবং অন্যান্য সকলকে ভালবাসাসহ—

তোমাদের বিবেকানন্দ

স্বামীজীর সর্বশেষ আলোকচিত্র :

ক্রিস্টিন বলতেন 'দাতার মনকে অনেক সময় বিষিয়ে দেওয়া হয়। এই যেমন আমার ছোট বোন—ভারী নিঃস্বার্থ মানুষ। ও থায়রয়েডের জন্য খুব ভুগছে। আমার ভারী ইচ্ছে করে ওকে কিছু দিই। অথচ যে সহৃদয় মানুষটির দয়ায় আমি টাকা পয়সা পাই তার মন বিষিয়ে দেওয়া হয়েছে এই বলে যে আমি আমার ছোট বোনটিকে কিছু দিলে আমার আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। অথচ ওকে কিছু সাহায্য করতে ইচ্ছে করে আমার।'

"She felt misgivings about institutions and orders, because of the price of personal liberty and the mechanism of running them. She who was so fitted to establish an order of Sanyasinis for woman saw too clearly both good and evil entailed. She felt that the holy life in the world might be more difficult but more beautiful than in the order, but she was quick to accept holiness whenever she saw it".

গৃহভৃত্যদের প্রতি তিনি মায়ের মত স্নেহশীলা এবং দয়ালু ছিলেন। অথচ ওরা কী দায়িত্বহীন এবং দায়সারা কাজ করত।... নিজের বিছানা নিজে করে নেবেন অথবা নিজের কোটটা নিয়ে নেবেন কিন্তু ওদের কষ্ট দেবেন না। ওরা অন্ধকারে বা বৃষ্টিতে বা খোলা হাওয়ায় বেরুতে ভয় পায়। সেজন্য সেসময় ওদের কোন কাজ বলবেন না, পাছে ওদের কষ্ট হয়। বরং ওদের কিসে সাহায্য হয় তাই করবেন। সামান্যতম কোন উৎসব উপলক্ষে ওঁকে ডাকলে উনি খুব আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতেন।......

আমরা আলমোড়া থেকে সমতলে নামবার আগের দিন সন্ন্যাসীরা গাঁদাফুলের মালা নিয়ে এলেন ওঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে। ওঁরা সম্ভবতঃ ন'জন ছিলেন। ভুইংরুমটা গেরুয়া রংয়ের আচ্ছাদন ও উজ্জ্বল আগ্রহী মুখের সমাবেশে পূর্ণ। ওঁরা নিজেদের চেয়ারগুলো টেনে নিয়ে ক্রিস্টিনের চারদিকে গোলাকার বসে ওঁকে স্বামীজী সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। উনি সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন সেইসব কথা—মিসেস ফাঙ্কে ওঁকে (স্বামীজীর) বক্তৃতা শুনতে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু উনি যেতে আপত্তি জানিয়েছিলেন! পরে অনুশোচনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে ওঁর সামনে নতুন স্বর্গ এবং নতুন মর্তের দরজা খুলে গেল।

তানতিনের মতে 'আমার মনে হয় স্বামীজী ক্রিস্টিনকে আমাদের অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। স্বামীজী মনে করতেন ওঁর পাশ্চাত্যের শিষ্যবর্গের মধ্যে ক্রিস্টিন বেদান্তের আসল মর্মটি সবচেয়ে ভাল বুঝতে পেরেছে। সি নিডেড হিম অ্যান্ড হি কুড গিভ টু হার মোর ফুলিলি দ্যান টু আদারস।'

ক্রিস্টিন গল্প করতেন থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড এবং ইন্সপায়ারড টক্‌-এর কথা; ভারতীয় মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কাজে স্বামীজীকে সাহায্য করতে তাঁর ভারতবর্ষে আসবার কথা, উনি (ক্রিস্টিন) ভারতবর্ষে আসবার মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তিনি দেহরক্ষা করেন এবং ক্রিস্টিন 'একা' হয়ে পড়েন। সেই শোকাবস্থার সময় স্বামীজী ওঁকে দর্শন দেন এবং বলেন তিনি কাছেই আছেন।

বারো বছর উনি এবং নিবেদিতা মিলে এই স্কুলটি চালান। মহাযুদ্ধের ঠিক আগেই উনি আমেরিকা গিয়েছিলেন। উনি

ক্রিশিয়ানের মাইনস্ লেকে ক্রিস্টিন, বশী সেন এবং গ্লেন ওভারটন। ১৯২৩ খৃঃ

ভারতবর্ষে ফেরবার জন্য রিটার্ন টিকিট করে গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় উনি দশ বছর সেখানে আটকা পড়েন। ভারতবর্ষে ফেরবার পর স্কুলের কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখলেন যে স্কুলটির ব্যবস্থাপনা অন্যের হাতে গিয়েছে এবং এসময় ও'র স্বাস্থ্যেরও খুব অবনতি ঘটল।

স্বামীজীর অসংখ্য পত্রাবলীর একটি ফাইল আছে ও'র কাছে। যেগুলি উনি টাইপিং ও এডিটিং করেছিলেন।

বশী নিজেকে স্বামীজীর নাতি মনে করত। ও হল স্বামীজীর প্রথম শিষ্যের প্রথম শিষ্য। সিস্টার ক্রিস্টিনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিল এইজন্য যে ও মনে করত এইভাবে ও যেন স্বামীজীর পবিত্র কাজের দায়িত্ব পালন করছে।

আমরা আলমোড়া যেদিন ছাড়লুম সেদিনটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ছিল। আমরা সবাই মিলে মোটরে চাপলুম। গাড়ির গতি আমরা ঘন্টায় দশ মাইলের বেশী বাড়তে দিচ্ছিলাম না। কারণ পাহাড় থেকে নামতে ক্রিস্টিন অসুস্থ বোধ করেন, আমাদেরও মাথা ঘোরে। তবুও মনের জোর ও'র অদম্য এবং পথে আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, প্রভৃতি দেখতে ও'র যেরকম আগ্রহ দেখেছিলাম সেকথা স্মৃতির কোঠায় দীর্ঘ দিন জমা থাকবে। কানপুরে আমরা দল থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। উনি আমাদের বাহুল্য জিনিসপত্র নিজের সঙ্গে নিয়ে গেছেন। সেসব হল আমাদের 'রোজ' নামের তুলতুলটি, এসরাজ এবং চায়ের বাকস। এখনও যেন দেখতে পাচ্ছি স্টেশনের ওপরে 'রোজ'কে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। স্টেশনের আলোতে ও'র মুখ উজ্জ্বল।

আবার ও'র সঙ্গে দেখা হল বেনারসে। প্রতিদিন বিধবারা, ছাত্ররা, ও'কে দেখতে আসতেন এবং সন্ন্যাসীরা আসতেন শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। 'ছোট্ট রোজ' ঘরের একপাশে বসে থাকত যেন সেও রিসেপশন কমিটির একজন সদস্য। বেনারস এবং সারনাথে যাওয়া, বোধগয়াতে সেই মোহান্তের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং তাঁর অতিথি ভবনে থাকবার দিনগুলির মধ্যে সিস্টার ক্রিস্টিনের মহিমাময় প্রাণবন্ত উপস্থিতির কথা মনে পড়ছে। এখনও দেখতে পাই মোহান্তজী তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে সেই বছরে প্রথম তাঁর মঠের বাইরে বেরিয়ে এসে ক্রিস্টিনের ওপরতলার ঘরে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছি ক্রিস্টিন বিদায় নেবার আগে মঠের উঠোনে মোহান্তজীর পদতলে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে প্রণাম করছেন তাঁকে। জগতের মহৎ ব্যক্তিরা এমনি করেই কত সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে নিজেদের বিনয়াবনত করতে পারেন।

তাঁকে শেষবার দেখি গয়া স্টেশনের পিচ্ছিল বেঞ্চের ওপরে শুয়ে আছেন। মাথার ওপরে একটি অনুজ্জ্বল আলো জ্বলছে। বাথরুমের দিক থেকে তীব্র অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ আসছে। কত ক্লান্ত তবুও সেই ঘ্যানঘ্যান করা অ্যাংলোইন্ডিয়ান স্ত্রীলোকটি যে ও'কে এলাহাবাদ অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থে একটি মিশন ক্যালেন্ডার কেনবার জন্য ধরেছিল তার প্রতি কী দয়ালু, কী মধুর ব্যবহার!

এই আমার তাঁকে শেষ দেখা। তবুও যখনি তাঁকে ভাবি যেন দেখতে পাই ডেট্রয়েটের বক্তৃতা ঘরের প্ল্যাটফরমের ওপরে উনি বসে আছেন; ও'র পাশে বসে আছেন ডিভাইন সায়েন্স হিলার, নিউ থট হিলার, স্পিরিচুয়ালিস্ট এবং একাধিক বক্তার সমাবেশ। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় জানাতে লাগলেন—'আমি কুমারী অমুক, থাকি ৫ নং পূর্ব রাস্তায়,' অথবা 'আমি শ্রীমতী তমুক থাকি দশ নম্বর উত্তর রাস্তায়' ইত্যাদি। সিস্টার ক্রিস্টিনের সময় এল। উঠে দাঁড়ালেন যেন দেবতার মন্দিরে একটি ঋজুস্তম্ভ। দৃপ্ত মাথা তুলে পরিষ্কার কণ্ঠে স্ব-পরিচয় আবৃত্তি করলেন—

"I am neither the mind, nor the intellect, nor the ego, nor the mind-stuff;
I am neither the body, nor the changes of the body
I am neither the senses of hearing, taste, smell or sight
Nor am I the ether, the earth, the fire, the air.
I am Existnce Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute
I am He, I am He (Shivoham, Shivoham).

I am neither the Pra na not the five vital airs
I am neither the materials of the body, nor the five sheaths,
Neither am I the organs of action, nor object of the senses,
I am Existance Absolute, Knowledge Absolute, Bliss Absolute.
I am He, I am He (Shivoham, Shivoham)

have neither aversion, nor attachment
neither greed nor delusion
either eqilism nor envy.
neither Dharma nor Moksha
am neither desire nor object of desire
am Existence Absolute, Knowledge
Absolute, Bliss Absolute.
am He, I am He (Shivoham, Shivoham)

am neither Sin nor virtue, neither pleasure
nor pain,
or temple nor worship, nor pilgrimage nor
scriptures
either the act of enjoying, the enjoyable nor
the enjoyer,
am Existence Absolute, Knowledge Absolute,
Bliss Absolute
am He, I am He (Shivoham Shivoham).

have neither ocath nor fear of dath nor caste
or was I ever born, nor had I parents, friends
and relations;
have neither Guru nor disciple
am Existence Absolute, Knowledge Absolute,
Bliss Absolute.
am He, I am He (Shivoham, Shivoham)."

নহি, বুদ্ধি নহি, নহি অহং কিংবা মানসবস্তু
দেহ, দেহের বিবর্তন কিংবা শ্রবণ স্পর্শ দৃষ্টি গন্ধ—
নভঃ ক্ষিতি অগ্নি অথবা নহি বায়ু
আনন্দস্বরূপ শিব আমি,—আমি সেই শিব।—

প্রাণ, পঞ্চবায়ু, জড়বস্তু, পঞ্চকোষ যথা—
িন্দ্রিয়, হস্তপদ নহি
জ্ঞান আনন্দস্বরূপ শিব
শিব আমি শিব।

বৈরাগ্য লোভ মোহ নহি আমি
আমি কামনা বা কামনার বস্তু
, অর্থ, কাম, মোক্ষ, কিছু নাহি মোর
সেই পরম সত্য, জ্ঞান পরমানন্দ—
শিব আমি।

পুণ্য, সুখ দুঃখ সবের উর্ধে আমি
তীর্থ শাস্ত্রপাঠ, যজ্ঞ নাহি মোর
, ভোগী, ভোগ্য—এও নহি আমি
নন্দ রূপ শিব—আমি সেই শিব।

জাতিভেদ কিছু নাহি মোর
পিতা, নাহি মাতা—জন্মহীন আমি
ন, মিত্র, গুরু শিষ্য কেহ নাহি
নন্দ রূপ আমি শিব শিব আমি।

মুক্তি—নির্বিকল্প, অজ্ঞের আমি
াকার অসীম সর্বব্যাপী
বিরাজমান ব্রহ্মাণ্ডের আদি—
সেই পরমানন্দ শিব শিব আমি।

মূল শঙ্করাচার্যের নির্বাণষটকম্-এর ইংরাজী অনুবাদ
জীর। নীচে বঙ্গানুবাদ প্রণতা দে।

জানালেন—ন জায়তে ম্রিয়তে কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাহভবিতা বান ভূয়ঃ
অজানিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরোণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

বলে গেলেন : যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলে জানেন তিনি কিরূপে, কাকেই বা হত্যা করেন এবং কাকেই বা হত্যা করেন না?
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

জানলেন...আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল এবং সনাতন। আত্মার সনাতন রূপ যিনি অবগত হন তিনি কখনও শোক করেন না। এই আত্মাকে জানতে হলে বেদ পড়লেই জানা যায় না, বুদ্ধি দিয়েও জানা যায় না। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনেও আত্মাকে বোঝা যায় না। আত্মাকে জানতে হলে আত্মাকে উপলব্ধি করতে হয়।—এই উপলব্ধির মধ্যেই আত্মা প্রকটিত হন।

ক্রিস্টিনের চিঠি

ভগিনী ক্রিস্টিন ১৯১৪ সালে দেশে গিয়েছিলেন (জাতিতে জার্মান বলে ভারতে আসা সম্ভব হয়নি সে সময়) এবং যুদ্ধের দরুন সেখানেই দশ বছর থেকে যান। ফিরে এসে স্কুলটিতে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে অনুভব করে কোথায় যাবেন, কী করবেন চিন্তায় বেশ বিচলিত হন। অতঃপর দার্জিলিং-এ গিয়ে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু প্রচণ্ড অর্থাভাবের সম্মুখীন হতে হয়। ঐ সময় শ্রীমতী স্টার্লিং ওর্ ওঁকে অর্থ সাহায্য পাঠিয়ে প্রভূত পরিমাণে উপকার করেছেন। শেষ জীবনে উনি কানাডাতে কিছু দিন শ্রীমতী ওরের কাছে গিয়ে ছিলেন এবং তাঁর ১৩ বছরের ছেলে কার্টার ক্রিস্টিনের আধ্যাত্মিক আলোচনায় খুব আকৃষ্ট হয়েছিল।

নিম্নোক্ত চিঠিগুলিতে ক্রিস্টিনকে ভারতে প্রত্যাগমনের পর কী অসহায় অবস্থা এবং আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। এই সঙ্গে শ্রীমতী ওর-এর একটি বিরাট উদার হৃদয়ের পরিচয়।

(১)

দার্জিলিং, ৩০ সেপ্টেম্বর, '২৪

প্রিয় মিসেস ওর,

যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষের সঙ্গে আপনার একখানি চিঠি পেলাম। চিঠির মধ্যে ৫০ ডলারের ড্র্যাফটি পেয়ে মনের অবস্থা কী হয়েছে সেকথা ভাষায় জানাতে আমি অক্ষম। এটা যে কতখানি ভালবাসার দান,—কতখানি ভালবাসাকে বহন করে এনেছে,—আর এনেছে ঠিক সেই সময়ে যখন একান্তই তার প্রয়োজন বোধ হচ্ছিল। এর আর্থিক মূল্যের চেয়েও এর দাম তাই আরও বেশী। আপনার ভালবাসার দাম আপনি দশগুণ করে ফিরে পান কামনা করি। আমরা ভারতবর্ষে আসবার পর কী ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটেছিল আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। শেষ পর্যন্ত আমরা নিজেদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অনিশ্চয়তায়

শন্যেতার মধ্যে পদার্পণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই রকম অবস্থার মধ্যেই মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে। তবে প্রথমটা কিছুদিন আমি খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ভুগলাম, তারপর যত রকম বিপদ ও সমস্যা সম্ভব সবই আমাদের জীবনে দেখা দিল। মাথা গোঁজবার মত একটা বাসস্থানও আমাদের ছিল না। শেষ পর্যন্ত এক পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে এই বাড়িটা পেয়েছি। সুন্দর পরিবেশ, মনোরম ছোট্ট বাড়িটা খুব কম ভাড়াতে পেয়েছি। এর পর শরীরের কিছু উন্নতি বোধ করলাম এবং নানা জায়গা থেকে আর্থিক সাহায্য আসতে থাকল। মনে হচ্ছে অবশেষে আমরা বিপদমুক্ত হতে পেরেছি। আমাদের বন্ধুরা কী ভাল, কী স্বর্গীয় তাঁরা! ঈশ্বর তাঁদের আশীর্বাদ করুন। কী আশ্চর্য রকমভাবে সব ঘটছে! আমি ডেট্রয়েট ছাড়বার আগে আপনি আমাকে যে গল্প ছবিটি ও ৫০ ডলারসহ চিঠি লিখেছিলেন আমি কিন্তু আজও তার উত্তর আপনাকে দিইনি। আমাকে ক্ষমা করবেন তো? বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই আপনার নিজের (অথবা আপনার দলের) দানে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করেছি।

আপনার রচনার মধ্যে আমি সুস্পষ্ট প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি। আশা করি আপনি লেখবার চর্চা রেখেছেন এবং আমি ডেট্রয়েট ছাড়বার পর এর মধ্যে আপনার কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। রচনাগুলির মধ্যে অসাধারণত্বের ছাপ আছে।

জন্তুটির সম্বন্ধে স্পষ্টই রীতিমত অভিনব, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লেখাটি কবি এডগার লী মাস্টারকে পাঠিয়ে দিন না। ও কী অভিমত জেনে নিন। বছর কয়েক আগে আমি ওঁর একটি সংখ্যা কাটিয়েছিলাম। জানি না এখন ওঁর আমাকে মনে আছে কিনা। উনি সম্ভবত শিকাগো-বাসী। আমি ওঁর ঠিক জানি না। তবে আপনি ওঁর প্রকাশকের কাছ থেকে ওঁর ঠিক পাবেন। অথবা আরও ভাল হয় যদি শ্রীমতী কে উডস উইলসন (Marion, Indiana) পাঠিয়ে দিতে পারেন। তাঁকে জানা আপনি আমার বন্ধু এবং আমিই আপনাকে তাঁর মতামত গ্রহণের জন্য রচনাটি পাঠাতে বলেছি। ভদ্রমহিলা রীতিমত প্রতি সম্পন্না এবং এডগার লী মাস্টারের বিশেষ বন্ধু। ভদ্রমহি নিজেও লেখেন। ওঁর মতামতের মূল্য আছে।

অনেক লোক দেখা করতে আসছেন। যদি এখনই চিঠি পাঠাতে না পারি তাহলে এবারকার ডাকে চিঠিটা যাবে। শিগগির আপনাকে আবার লিখব।

আপনার সুদর্শন স্বামীকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা ও সুন্দরী স্ত্রীকে অনেক ভালবাসা জানাচ্ছি।

কিরী

লিট্‌ল ম্যাগাজিন

'লিট্‌ল ম্যাগাজিন : কিছু ঘনিষ্ঠ ভাবনা' শীর্ষক নিবন্ধে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর অমৃতে শ্রীদিগ্বিজয় দিকপতি বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠ ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। যদিও লেখকের কিছু মন্তব্য, যেমন '...নিতান্তই সম্পাদকের সাহিত্য জগতে একটু নাম জানানোর প্রয়াস....' কথাটা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো সত্যি; তবুও এই '...একটু নাম জানানোর প্রয়াস....' কথাটায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের প্রতি বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্য-ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

যেহেতু ঐ নিবন্ধ সমালোচনা ও আলোচনামূলক, সেহেতু নিবন্ধকারের মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হবার কোন কারণ নেই। বরং নিবন্ধের বেশ কিছু অংশ লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অসম-সংগ্রামের পক্ষে ব্যয় করেছেন দেখে আনন্দ বোধ করছি। পরক্ষণেই দুঃখ বোধ করি এই কারণে যে, বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে দিকপতিবাবু মন্তব্য করেছেন যে 'যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদকের অথবা সম্পাদকমণ্ডলীর সাহিত্য ভাবনা স্বচ্ছ নয়, সেই কারণে কিছু এলোমেলো ভাবনা চেহারা নেয় অপরিণত এবং নিতান্তই কিছু কাঁচালেখা নির্বাচনে..."। লেখকের এই বক্তব্য মেনে নিয়েও একথা বলা যায় যে, প্রথমতঃ সম্পাদকমণ্ডলীর সাহিত্যভাবনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়—বঙ্গসাহিত্যের রথী মহারথীদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনার সুযোগের অভাবে। কিংবা চাকুরি জীবনের ব্যস্ততা অথবা বেকারের সীমাহীন হতাশা একটি সুস্থ সাহিত্যভাবনার পথ বন্ধ করে। এবং সম্পাদক এলোমেলো সাহিত্যভাবনার শিকার হন।

দ্বিতীয়তঃ শুধু তাই নয়। পুশ্‌... যার মাধ্যমে লিট্‌ল ম্যাগাজিন বেঁচে কিছুদিন, এই পুশ্‌সেলারদের জন্যই কাঁচা লেখার নির্বাচন বাধ্যতামূলক।

এই নিবন্ধে লেখক কয়েকটি ... মন্তব্য করেছেন যেমন—"দ... সাহিত্য চিন্তা নিয়ে এমন কিছু ক... সময় গ্রাম গঞ্জ থেকে বেরোতে যা এখন সংবাদ।" "এ বিষয়ে বাণিজ্য সংস্থা ... বা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি সহায়তা করতে পারেন না কি?" কিন্তু যদি কলকাতার বড় কাগজগুলো এ... বেন তবে সত্যিকারের লেখক তৈরী পারবেন।"

সাহসিক ... মন্তব্যগুলির দিগ্বিজয়বাবু আমাদের প্রশং... হয়েছেন। সাহসিক বলছি এই কারণে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের বেশ খানিকটা নাক উঁচু করেই ... বঙ্গসাহিত্যের সুউচ্চ অঙ্গন থেকে এধরনের মন্তব্য সাহসিক বৈকি!

—মিহির ...
হাও...

আপন গন্ধা

অমৃতের ২৮ জানুয়ারী সংখ্যা দীপালী দত্তরায়ের 'আপন গন্ধা' ... টির প্রকাশ শুরু হয়েছে। প্রথম থেকেই শ্রীমতী দত্তরায় কিস্তিম করেছেন, এটা পড়েই বোঝা গেল। ঝরঝরে ভাষা। সবচেয়ে বড় কথা কাহিনীর সুখ পাঠ্যতা। মোট ক... থেকে উপন্যাসটি আমাদের ভীষণ...

—সতী চট্টোপাধ্যায়; হৃদয়রঞ্জন দা... রামবাটী, হুগলী।

তেলের বাজারে হাসি ফোটাবে সূর্যমুখী

কল্লোল সরকার

'সূর্যমুখীই তেলের বাজারে হাসি ...তে পারে'। —কথাটা যে কতটা সত্য তা ... আমরা প্রায় প্রত্যেকেই কম-বেশী ...তে পারছি। গত বছর পৌষ মাঘ মাসে সরষের তেল বাজারে ৬ টাকা কিলো ... দামে বিকোতো। এ-বছর পৌষ মাঘ ... সেই সরষের তেল-এর কিলো প্রতি ...দশ টাকারও বেশী। নিম্ন আয়ের ...বা মাসের অধিকাংশ দিনে খালি ...লের বোতল হাতে বাজার থেকে ফিরছে। ...বিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তদের ঘরে সরষের ...লের বোতল দিনে দিনে ছোট থেকে ছোট ...। সরষের তেলের এই আকাশ ছোঁয়া ...বৃদ্ধির পিছনে অনেক কারণ আছে। ...সব কারণের মাঝখানে যে কারণটা ...ভাবে চোখে আটকে যায়, সেটা ...। এ-রাজ্যের প্রয়োজনীয় সরষের ...বিরাট পরিমাণের জন্য আমাদেরকে ...অন্য রাজ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে ...তে হয়। অথচ এ রাজ্যের চাষীরা যদি ...মুখীর চাষ তথা সূর্যমুখীর তেল ...পাদনে ব্যাপকভাবে অংশ নেয় এবং আমরা ...প্রতিদিন রান্না ঘরে এই তেল ব্যবহারে ...স্ত হয়ে যাই। তাহলে নিঃসন্দেহে বলা ...তেলের বাজারে বিরাট বিপ্লব ঘটে ...। চাষী খুঁজে পাবে অর্থ আয়ের আর ...উৎস এবং আমরা ফেলতে পারব ...র নিঃশ্বাস। তেলের বাজারে ফুটবে ...। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি সরষের তেলে ...পরিমাণ স্নেহ জাতীয় পদার্থ ও ...মিন আছে সূর্যমুখীর তেলেও প্রায় ... আছে। তাহলে কেমন করে রাজ্যের ...রা সূর্যমুখীর চাষে বিশেষভাবে ও ...পকভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে? ...বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

সেচ বিহীন বা সেচ-যুক্ত যে কোন ...তে সূর্যমুখীর চাষ করা যায়। এবং ...বর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস বাদ দিয়ে এই ... যে কোন সময় করা যেতে পারে। তবে ...তিকের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গুনের ...ম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়' ও 'জল দাঁড়ায় ...এমন বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ ও ...টেল জমি' সূর্যমুখীর চাষের জন্য বেছে ...ওয়া অধিকতর লাভজনক। যেহেতু ঐ ...য়ে ও ঐ রকম জমিতে চাষীরা সূর্য...মুখীর চাষ করলে সবচেয়ে বেশী ফলন ...বেন। অবশ্য বেশী ফলনের জন্য চাষীকে ...ত জাতের ও সেই জেলার পক্ষে ...উপযোগী সূর্যমুখীর বীজ সংগ্রহ করতে ...বে। যেমন ২৪ পরগণা জেলার চাষী-...রা উন্নত জাতের সূর্যমুখীর বীজ ...-সি ৬৮৪১৪ ও ই-সি ৬৮৪১৫ ...নবেন। তবে চাষীরা অল্প স্বল্প নোনা জমিতেও সূর্যমুখীর চাষ করতে পারবেন।

চাষীরা আমন ধান কাটার পরই জমিতে চাষ করুন। তিন থেকে চারবার পর চাষ করে জমির মাটিকে ঝুর ঝুরে করে নিন। তারপর বাড়ীতে পচান গোবর (সার) কিংবা পচানো আবর্জনা (সার) শেষ চাষের সঙ্গে যতটা সম্ভব মিশিয়ে দিন। আপনার জমিতে কি সেচের ব্যবস্থা আছে? অবশ্য সেচের ব্যবস্থা থাকলেও চিন্তার কিছু নেই। যদি সেচের ব্যবস্থা না থাকে তবে ঐ শেষ চাষের সঙ্গে জমিতে একর প্রতি ১৮ কে-জি হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরিয়া বা একর প্রতি ৪০ কেজি হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ এমোনিয়াম সালফেট এবং একর প্রতি ৫০ কে-জি হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুপার ফসফেট মিশিয়ে দিন। যদি সেচের ব্যবস্থা থাকে তবে ঐ শেষ চাষের সঙ্গে জমিতে একর প্রতি ২৭ কে-জি হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরিয়া বা একর প্রতি ৬০ কে-জি হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ এ্যামোনিয়াম সালফেট এবং একর প্রতি ১০০ কে-জি হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুপার ফসফেট ও একর প্রতি ২৭ কে-জি হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ মিউরেট অব পটাশ মিশিয়ে দিন। চাষ সেরে বাড়ী ফিরে একটা জারার মধ্যে একর প্রতি ৫ থেকে ৬ কে-জি হিসাবে আপনার নির্দিষ্ট আয়তনের জমির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সূর্যমুখীর বীজ জলে ভিজিয়ে রাখুন। প্রায় ৮ থেকে ১০ ঘন্টা বীজ জলে ভেজার পর জল থেকে তুলে নিন এবং এই ভেজা বীজ কে-জি প্রতি ৩ গ্রাম হারে ডায়াথেন এম—৪৫ ঔষধে ভালভাবে মিশিয়ে শোধন করে নিন। এবার সার দিয়ে তৈরী করা জমিতে সারি সারি খুরপি করতে হবে। মনে রাখবেন খুরপির একটা সারি থেকে অপর সারির মধ্যেকার দূরত্ব দুই ফুট (সেচবিহীন জমিতে) বা দেড় ফুট (সেচযুক্ত জমিতে) রাখতে হবে; এবং সারির মধ্যেকার যে কোন একটা খুরপি থেকে পরবর্তী আর একটা খুরপির দূরত্ব হবে এক ফুট (সেচবিহীন জমি ও সেচযুক্ত উভয় জমির ক্ষেত্রে)। এবার শোধন করা বীজ নির্দিষ্ট পরিমাণে খুরপির মধ্যে ছড়িয়ে অল্প অল্প মাটি চাপা দিয়ে দিন।

বীজ বোনার সপ্তা দুয়েক পরে জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলার সময় মাটি আবার ঝুর ঝুরে করে দিন। এবং প্রতি খুরপিতে একটি করে সতেজ চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলুন। প্রয়োজন বোধে বীজ বোনার ৪ সপ্তাহ পরে জমি থেকে আর একবার আগাছা তুলে ফেলবেন। যেসব জায়গায় ঝড়ো হাওয়া সেইসব জায়গায় সূর্যমুখী গাছের গোড়ায় মাটি তুলে উঁচু করে দেওয়া প্রয়োজন, নয়ত গাছ নুয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

সূর্যমুখী সাধারণতঃ বিনা সেচের ফসল। তবে জমির পাশে জল থাকলে বা শ্যালোর ব্যবস্থা থাকলে ২—কি ৩টে হাল্কা সেচ দিয়ে দিন। তাতে ভাল ফসল আশা করা যায়। বীজ বোনার ৩/৪ সপ্তাহ পর প্রথম সেচ এবং ৭/৮ সপ্তাহ পর দ্বিতীয় সেচ দেবেন। আর একটা কথা মনে রাখবেন—বীজ বোনার এক মাস পরে একর প্রতি ২৭ কে জি হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইউরিয়া বা একর প্রতি ৬০ কেজি হিসাবে এ্যামোনিয়াম সালফেট জমিতে ছড়িয়ে দেবেন।

তুলনামূলক হারে কম হলেও সূর্য-মুখী ফসলে রোগ ও পোকার আক্রমণ আছে। তবে পোকার মধ্যে শ্যামা পোকা, বিছা পোকা ও রোগের মধ্যে ধসা রোগ উল্লেখযোগ্য। শ্যামা পোকার হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে প্রতি লিঃ জলে দেড় মিঃ লিঃ হারে থায়োডিন বা এক মিঃ লিঃ হারে রোগর একর প্রতি ২৫০-৩০০ লিটার ঐ মিশ্রণ ছিটিয়ে দিন। বিছা পোকার আক্রমণ দমন করার জন্য বি-এইচ-এস ১০ শতাংশ গুঁড়ো একর প্রতি ১০/১২ কেজি হারে ছড়াতে হবে। এবং ধসা রোগের জন্য ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান ১½ কেজি একর প্রতি হিসাবে ২৫০—৩০০ লিটার জলে গুলে গাছের উপর ছিটিয়ে দিন। এবার লক্ষ্য করুন সূর্যমুখীর পাতা কখন হলুদ হয়। সাধারণতঃ ১১৫—১২০ দিনের মধ্যে সূর্যমুখী পেকে যায়। এই সময় ফুলের মাঝের দানাগুলো শক্ত হয়ে যায়। এখন এই ফুলগুলো গাছ থেকে সযত্নে কেটে রোদে শুকোতে দিন। ফুল-গুলি ভালভাবে শুকিয়ে গেলে—এর থেকে দানা ছাড়িয়ে নিন। এই দানা আবার ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ঘরে তুলতে হবে। তারপর এই দানা থেকে উৎপন্ন করুন 'সূর্যমুখীর তেল' বা 'রেপ্ সীড ওয়েল'। চাষীরা যত্ন করে চাষ করলে বিনা সেচে একর প্রতি ৩০০—৪০০ কেজি এবং সেচ দিলে একর প্রতি ৬০০—৮০০ কেজি হিসাবে দানা পেতে পারেন এবং এই সঙ্গে রাজ্যের চাষী বন্ধুরা মনে রাখবেন—এমন সহজ ও কম পরিচর্যায়, এমন লাভজনক চাষ খুব কমই আছে।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বদিক থেকে আসছে বারাসত রোড, উত্তর থেকে ঘোষপাড়া রোড। বারাসত থেকে একাশি নম্বর বাস পনেরো মিনিট পরপর মানুষজন বোঁচকা-বুঁচকি কুমড়ো-বেগুনের বস্তা সব এক-একটা ট্রিপে নামিয়ে দিচ্ছে ব্যারাকপুর কোর্টের টার্মিনাসে। আর কাঁচরাপাড়া থেকে পঁচাশী নম্বর বাস ঘোষপাড়া রোড বেয়ে আসছে একই গন্তব্যে। তবে তার দৌড়ের পাল্লা একটু বেশি। যাত্রা শুরু কাঁচরাপাড়ার বিখ্যাত সতীমায়ের থান থেকে, যেখানে বছর বছর বসে ঘোষপাড়ার নামকরা মেলা। মায়ের থান বহু পুরনো জাগ্রত। এখানে ধর্না দিলে হারানো স্বামী ফিরে আসে, অপুত্রকের পুত্র লাভ হয়, অন্ধ ফিরে পায় তার চোখ। এই হলো ব্যারাকপুর মহকুমার উত্তরতম প্রান্ত।

দক্ষিণের ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড শহরতলীকে যুক্ত করছে রাজধানীর সংগে—যার নাম কোলকাতা মহানগরী। প্রায় বাইশ কিলোমিটার রাস্তা। এ পথে দৌড়াদৌড়ি করে যাত্রী লোককে পৌঁছে দেয় এবং ফেরত আনে দুটি বাস সার্ভিস। একটি সরকারী, এটি চালু হবার পর থেকে শহরতলী প্রথম দোতলা বাসের মুখ দেখে জাতে উঠলো। রুট নম্বর এক কুড়ি। আর আছে সেই সনাতন ডজ বা শেভ্রলে বা বেডফোর্ড কোম্পানীর বেসরকারী বাস। রুট নম্বর আটাত্তর। শেয়ালদা - লালগোলা লাইনের ওপর ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন। রাতদিন যাতায়াত করছে ইলেকট্রিক ট্রেন। ভোর সাড়ে চারটের প্রথম ধুনো-গংগাজল দিয়ে টিকিটবাবু জানালা খোলেন, আর রাত বারোটা পাঁচের শেষ গাড়ি চলে গেলে অং দুগ্গা দুগ্গা বলে চার নম্বর ছুটি। এত ব্যস্ত লাইন সারা ভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ। স্টেশনটিও দেখতে ভারি সুন্দর লাল রঙের পুরনো কেল্লার মতো বাড়ি, ব্রিটিশ আমলের গন্ধ গায়ে মাখানো। পাওয়ার হাইস অফেও ব্যারাকপুর বলতে লোকে বুঝতো শুধু সৈন্যদের সারি সারি ব্যারাক, মিলিটারী গুদাম আর কালোমুখো গোরা সেপাইদের দলকে। সাধারণ মানুষের বাস বিশেষ ছিল না। এখন অবশ্য অন্যরকম।

ডিজেলের গন্ধে ভরপুর ব্যারাকপুরের বাতাস। অসংখ্য বাস লরী-টেম্পো যাতায়াত করছে সারাদিন ধরে। কিন্তু এ-ই সব নয়। এখানে নিবিড় শান্তিও রয়েছে শহরের কেন্দ্র থেকে দু-তিন মাইলের মধ্যে। বারাসত যাবার রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গেলেই দুদিকে চোখ জুড়োনো ধানক্ষেত, সবুজ ঘাসেভরা দিগন্তস্পর্শী মাঠ আর ছায়াচ্ছন্ন বাঁশের বন। কালো অ্যাসফল্টের পথ নিজের আবেগে সোজা চলেছে বারাসতের দিকে

তার দুদিকে পরপর গ্রাম মোহনপুর, চককাঁঠালিয়া, শিউলি, সাবাসপুর। কি সুন্দর নাম! সত্যিকারের জায়গার নাম বলে মনেই হয় না। ঠিক যেন ভালোবেসে কেউ নাম রেখেছে। এখানে রয়েছে ঘন আম-কাঁঠালের বাগান, শীত শেষ হয়ে বসন্তের পায়ের শব্দ বাতাসে স্পষ্ট হয়ে উঠলেই আমের ডালে বসে ঋতুর প্রথম কোকিলটি ডেকে ওঠে, পড়ন্ত বেলার ঈষদুষ্ণ প্রহর ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বউলের সুগন্ধে। তখন বিশ্বাসই হয় না এর থেকে দু মাইলের মধ্যে রয়েছে ব্যস্ত শহর, যেখানে এই মুহূর্তে মানুষ ঠকাচ্ছে মানুষকে, ডিজেলের গন্ধ ছড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে বাস-লরী, এদিক ওদিক তাকিয়ে সতর্ক পায়ে বেআইনী ভাঁটিখানায় ঢুকছে সুসভ্য নাগরিক, মানুষের হৃদয় বিকিয়ে যাচ্ছে জলের দামে। অবশ্য সবাই খারাপ নয়, ভালো মানুষও কি নেই? আছে বইকি, নিশ্চয় আছে। যেমন শিউলির সেই ভদ্রলোক। 'এত আগে আগেই এবার কোকিল ডাকছে যে?' এই প্রশ্ন করায় যিনি বলেছিলেন—'গন্ধা সাধছে মশাই, রিহার্সাল দিচ্ছে'। 'আর বসন্ত ফুরিয়ে গেলেও য ডাকে?' উত্তর হল- 'তখন ওভারটাইম ক এমন মানুষও আছেন চারদিকে।

সবই আছে। ডিজেলের গন্ধ এবং পা গান।

*

এ জনপদ হঠাৎ গজিয়ে ওঠেনি, অতীত রয়েছে ঐতিহ্যপূর্ণ স্মৃ ব্যারাকপুর আধুনিক নাম, প্রাচীন নাম চানক। মংগলকাব্যে চানকের উল্লেখ রয়ে জব চার্নকের জামাইয়ের বাড়ি ছিল এ সেই সূত্রে চার্নক হয়তো মাঝে-মাঝে য যাত করে থাকতেন। কিন্তু তাঁর নাম চানক আসেনি। আরো পুরনো নব আমল থেকেই জমিজমা সংক্রান্ত দা দস্তাবেজে চানক মৌজার নাম রয়েছে। তখ চার্নক ভারতে পদার্পণ করেননি। তার অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে গংগায় এখনো সন্তু মানুষ সেটেলমেন্টের দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেন তাঁর মৌজার অধিবাসী। সে নাম আজও যায়নি। রেল ওয়ে স্টেশনের নামও যুগ আগে ছিল চানক। পরে পা গিয়েছে।

স্টেশন থেকে কোর্ট প্রায় দু মা রাস্তা। এই পথে চলতো ঘোড়ার গা পাঁচ-ছজন যাত্রী ধরতো, মাথাপিছু ভাড়া পড়তো তিন পয়সা। কি এক আ আরো পরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশ শেষের দিকে বিচিত্রদর্শন বাসও সা দিতে শুরু করে। এর ছাড়বার সময় ঠিক ছিল না। সব সিট ভর্তি হলে যাত্রা শুরু হত। পেট্রোলের অভাবের মধ্যে কিছুদিন স্টীমচালিত বাসও গিয়েছে। এ গাড়ির পেছনে বসানো থাক বিরাট লোহার উনুন। তাতে কাঠক জ্বালিয়ে জল গরম করে স্টীম তৈরি হ একবার স্টার্ট নিতেই সকাল গড়িয়ে বিক এহেন জিনিস বেশিদিন চলেনি।

স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে দুশো গ মধ্যে একটি তেমাথার মোড় আছে। এই

ব্যারাকপুর চিড়িয়াখানা—১৮২০ খৃঃ

…রোড, এম এন ব্যানার্জী রোড এবং …ল রোড এসে মিশেছে। জায়গাটার নাম …ড়িয়াখানার মোড়। প্রথমে শুনলে একটু …লাগে, চিড়িয়াখানা রইলো সেই কোথায় …লপুরে, এখানে কেন এমন নাম হলো … ব্যাপার এই—চিড়িয়াখানা আগে …কপুরেই ছিল, শ'দেড়েক বছর আগে। … কোনো কারণে আলিপুরে চলে যায়। …টা রয়ে গিয়েছে।

…কোর্টের দিকে এগুতে এগুতে বাঁদিকে …খ পড়বে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা …টি সাদা স্তম্ভ। না—কোনো লেফটেনাণ্ট …পুরুষের স্মৃতিস্তম্ভ নয়, আরো কাছে …লেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে কয়েক ছত্র ইংরেজী …খা, যার বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায়—'১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এইখানেই ছুটে গিয়েছিল …পাহী বিদ্রোহের প্রথম বুলেট। যে ছুঁড়ে-…ল তার নাম মঙ্গল পাণ্ডে, সামান্য এক-… দেশী সিপাহী, অথচ যার রাইফেলের …ক গর্জন অচিরেই ভারতের কোণে কোণে অনুনিত হতে শুরু করে।' এর কিছুদূরে …ছে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসির বেদী। যতই …তিহাসিকেরা সিপাহী বিদ্রোহকে ঠকাকারি-…র নামান্তর বলে ফতোয়া জারী করুন, …শপ্রেমী মানুষ কি করে ভুলবে মঙ্গল …ণ্ডের নাম, ভারতের প্রথম জাতীয় আন্দো-…লনের শহীদ হিসেবে যাকে বটগাছের ডালে …কে ফাঁসিতে ঝুলে পড়তে হয়েছিল?

আরো কিছুদূর এগিয়ে পথ শেষ হয়ে গিয়েছে ইংল্যাণ্ড ফিশারীর গেটে। তার কাছেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, যাঁর নামে এই রাস্তার নামকরণ। গল্প চালু আছে, সুরেন্দ্রনাথ নাকি একদিন ঘোড়ার গাড়ি চড়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন একজন সাদা চামড়ার মানুষ একটি গরীব দেশী লোককে রাইডিং হুইপ দিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করছে। এক্ষেত্রে প্রহৃত হওয়াই নিয়ম ছিল বিনা প্রতিবাদে। সুরেন্দ্রনাথ চালককে বললেন—থামাও। গাড়ি থেকে নেমে খপ করে কেড়ে নিলেন চাবুকটা, প্রহৃত মানুষটির হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—ঠিক ওমনি করে এই কুকুরটাকে মারো। সে লোক কেঁপেই সারা। পর সে আবার প্রতিবাদ হয় তাই সে কখনো ভাবেনি। তার রকমসকম দেখে সুরেন্দ্রনাথ বললেন—তুমি পারবে না? তাহলে আমাকে দাও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে মারতে হয়। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এটা গল্প হতে পারে। সত্যিও। সে যাই হোক, এতে সেই যুগটা এবং সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়।

পুরো মহকুমা সম্বন্ধে বলতে গেলে জায়গায় কুলোবে না। বহু মহাপুরুষের চরণপাতে ধন্য ব্যারাকপুর। কাঁচরাপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র, শ্যামনগর-মূলাজোড়ের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ। হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদ ইত্যাদি। তার চাইতে শহরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করাই ভালো। নানান মানুষ দেখা যাবে। শহরও একেবারে ফেলনা নয়। এই তো কিছুদিন আগেও বিভূতিভূষণ এসে প্রায়ই থাকতেন এখানে। তাঁর অনেক গল্প এবং উপন্যাসের অংশ এখানে রচিত।

ফিরে তাকালে অনেক কিছু চোখে পড়ে, এবং ফিরে তাকাবার মানুষও কম নেই। যেমন সেই পক্ককেশ চুরুটধারী বৃদ্ধ, গল্প-শুনানো যাঁর নেশা। সহৃদয় শ্রোতা পেলেই তিনি বন্ধ করে নিভে যাওয়া চুরুট ফের ধরিয়ে নিয়ে কাছে সরে এসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ষড়যন্ত্রের সুরে বলেন—সব লোগাস, কেউ কিছু জানে না, বুঝেছেন? মিলিটারী ব্যারাক ছিল বলে নাকি ব্যারাক-পুর নাম হয়েছে! ওদের মাথা আর মুণ্ডু! মিলিটারীরা আসার আগে থেকেই ব্যারাক-পুর নাম চালু ছিল। আসলে ব্যাপার কি জানেন? এখানে গঙ্গার বাঁকপথে একটি বিরাট বাঁক ছিল। এখনকার গঙ্গা নয়—তখন গঙ্গা অন্যদিক দিয়ে বইতো। 'এস'-এর মতো বিরাট সেই বাঁকের জন্য এ জায়-গাটাকে সবাই বলতো 'বাঁকরকপুর'। তার থেকে ব্যারাকপুর হয়ে গেছে। পুরনো ম্যাপ যেখানে দেখবেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

*

… ওঁর অনেক আগেই ছিল … ছাপ রয়ে এখানে। প্রথম জীবনের সাড়া পাওয়া যায় স্টেশনের চায়ের …।

সিন্দুকের মতো দেখতে বিরাট উনুনের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে বেমালুম ঢুকে যায় বাচ্চা চাকরটা। দু'হাতে বার করে ছাই পোড়া কয়লা বের করে এনে নতুন ঘুঁটে সাজিয়ে আঁচ দেয়। খবরের কাগজের হকাররা ব্যস্ত হয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে পড়ে উঁকিঝুঁকি দেয়। তাদের লোক আগের রাত্তিরে শেষ ট্রেনে চলে যায় কোলকাতায়, সারারাত শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থেকে পরের দিন সকালে কাগজের বান্ডিল নিয়ে ফেরে।

আস্তে, আস্তে ভিড় বেড়ে চলে। অফিসের সময় হয়ে আসে। স্টেশনে সরগরম নানারকম কথার টুকরো ভাসে বাতাসে।

—কি মুক্তিভাই, কাল দেখিনি কেন?

—আর ভাই বলো কেন, হঠাৎ সকালে সহধর্মিণী ভায়রা ভাইকে নিয়ে এসে হাজির। মারা গেল একটা ক্যাজুয়াল লিভ।

—এ কি সুভাষ, টাকে বেশ চুল গজিয়ে গেল যে? ভিটামিন-টিটামিন কিছু খাচ্ছো নাকি আজকাল?

অফিসের সময় ফুরিয়ে গেলেও কিছু যুবক শহরে থেকেই যায়: এরা বেকার।

মুক্তাজা মিস্তিরিকে চিঁড়িয়াখানার মোড়ে প্রায় সবাই চেনে। সে একজন বাঁধা দালাল। বিশেষ করে মোটরগাড়ি কেনাবেচার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করে থাকে। বহুদিন রয়েছে লাইনে। কিন্তু সেই যে এক রহস্যময় বিধবাক্তি আছে, যার নির্দেশে মানুষ আচমকা উঠে যায় খ্যাতির চূড়ায়, অথবা নেমে যায় অসফলতার করুণ গহ্বরে, সেই শক্তি মুক্তাজা মিস্তিরির দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসি হাসেনি। ফলে এতদিন এই কাজ করার পরে আজও তার পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা একখানা ময়লা ধুতি, গায়ে সমান ময়লা ছেঁড়া শার্ট। খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, মাথায় যেন একটা পাখির বাসা বসানো। কানের পিঠে আধপোড়া বিড়ি। আন্তরিক ব্যবহার, সুদূর ভবিষ্যতেও খদ্দের হতে পারে এমন মানুষ দেখলেই সে ডান হাতখানা কপালে তুলে তাকে 'আসসালাম আলায়কুম' জানিয়ে রাখে।

মাঝে মাঝে মুক্তাজা কিছুদিনের জন্য চিড়িয়ামোড়ের টাকীর সাইড থেকে উধাও হয়। আড্ডার স্বভাব নষ্ট আর কি। তেমন ফাঁদালো অথচ হবুচন্দ্র খদ্দের পেলে মুক্তাজা রাহাখরচ এবং অন্যান্য খরচা বলে কিছু টাকা আগাম নিয়ে নেয়। পরে গাড়ির কোনো ব্যবস্থা না করা গেলে মুক্তাজা সাময়িকভাবে অন্তর্ধান হয়। এ সময়ে হবুচন্দ্র খদ্দেররা আসে, স্ট্যান্ডের ড্রাইভারদের কাছে মুক্তাজার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ড্রাইভারেরা স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে উদাসীনভাবে বিড়ি খেয়ে যায়, বাঁ হাত দিয়ে ডানদিকে ঘাড় চুলকোয়। না, মুক্তাজা কোথায় আছে তা তারা জানে না। কবে আসবে? তাও তারা বলতে পারছে না। হবুচন্দ্র ইংরিজীতে গালাগাল দিয়ে বিদায় নেয়।

মুক্তাজার কাজকে স্ট্যান্ডের কেউ ভালো বলছে না, সমর্থনও করছে না। কিন্তু উপায় কি? ব্যর্থ দালালকেও তো খেতে হবে।

পৃথিবী নিরামত অভ্যস্ততায় সূর্যকে পরিক্রমা করে। দিন যায়, দিন আসে। তারই মধ্যে বয়ে চলে নানা রঙের জীবন। এই নিয়েই দুনিয়ার নাটক।

*

বেলা দশটা পঞ্চাশে চোদ্দ নম্বর লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টার শিবদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। শিবদাস সান্যাল। ছোকরা লোক। স্কুল-ফাইনাল পাশ করে পড়াতে ঢুকেছিল। তারপর নিজের চেষ্টায় একটু একটু করে গ্রাজুয়েট হয়েছে। ডিসটিংশন ছিল। কিন্তু হায়! শেকড় চলে গিয়েছে প্রাইমারী ইস্কুলের অনেক গভীরে। প্রথম যৌবন গত হয়েছে, তার সঙ্গে গিয়েছে নতুন কিছু করার এবং ঝুঁকি নেবার সাহস। এখন পাকা চাকরীর ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে কিছু করার কথা ভাবলে গা কেমন করে। বিয়ে হয়েছে ইতিমধ্যে, এবং একটি মেয়ে। পান মুখে দিয়ে একটা বইয়ের আকারের ডায়েরী হাতে শিবদাস রোজ বেলা দশটা পঞ্চাশে চোদ্দ নম্বর রেল গেট পার হয়ে যায়। দেখা হলেই হাত নেড়ে—কি খবর? ভালো তো?

—ভালো। তুমি কেমন?

—আমি? আমার আর দু বছর বাকি।

—দু বছর! কিসের দু বছর?

—আমার ইস্কুলে চাকরীর দশ বছর হলো যে! আর বছর দুয়েক গেলেই—বুঝলেন না?

বারো বছর ইস্কুলে পড়ালে কি হয় সেটা মনে পড়ে যাওয়াতে প্রশ্নকর্তা চুপ করে যান।

কিন্তু ইস্কুলে পড়ানো কিছু একটা খারাপ কাজ নয় এবং দুনিয়ায় সুখী শিক্ষকের অভাব নেই। তাহলে?

ঘটনার আসল কারণটা অন্য স্থানে নিহিত। শিবদাসের হাতে যে ডায়েরী ছিল সেটা খুললে আসল কারণের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। শিবদাস কবিতা লেখে। এককালে অজস্র লিখতো, এখন কম। ওই ডায়েরী তার স্বরচিত কবিতায় ভর্তি। ভালো চাকরি করে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না কখনোই। শিবদাসের ইচ্ছে ছিল কবি হবার। চাকরির প্রথম পর্যায়ে, যখন পৃথিবী চারদিকে এতটা ঘনীভূত বাস্তব রূপ নেয়নি, চার-পাঁচজন বন্ধু শহরের বাইরের দিকে একটা পুরনো বটগাছের তলায় গিয়ে বসতো। বহু প্রাচীন গাছ, ঝুরি নেমে মাটি ছুঁয়ে গুঁড়ির মতো হয়ে গিয়েছে। পাশে মাঠ, তার সামনে ঝিল। আকাশে থালার মতো চাঁদ উঠলে ঝিলের জলে তার কাঁপা কাঁপা ছায়া পড়তো, বেলাশেষের স্নিগ্ধ হাওয়া ভবিষ্যতের রঙীন আভাস নিয়ে ভেসে আসতো। রুক্ত পরিকল্পনা তখন মাথায় ঘোরাফেরা করে—কত নতুন কবিতা। সোনা মাখানো দিন গিয়েছে সেসব। শিবদাস বন্ধুদের বলতো—কবিতা লিখে আমি বিদেশ থেকে পুরস্কার আনবো দেখিস। ফেরবার সময় আফ্রিকা ঘুরে আসবো—আমার স্বপ্নের দেশ। পূর্ণিমার রাত্তিরে জাম্বেসী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে এই রকম চাঁদ দেখবো। তোদের জন্য কি আনবো জানিস? মুঠো আফ্রিকার মাটি। তোরা ভাগ করে নিস।

ঝিলের জলে থিরথির করে কাঁপে চাঁদের ছায়া। জ্যোৎস্নাকে দিনের আলো ভেবে ভুল করে কি একটা পাখি ডেকে ওঠে বটগাছের নিবিড় পত্রবিন্যাসের ভেতর থেকে।

শিবদাস বলে—তোরা আমার হাতে হাত রাখ, একটা প্রতিজ্ঞা কর সবাই। —আমরা চিরদিন পরস্পরের কাছাকাছি থাকবো। সাহিত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো চিরদিন। এক বাড়িতে থাকবো, সিন্দুকে টাকা রাখবো। এই ঝিলের মাঠ হবে আমাদের হেড অফিস। যে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন, সারা জীবন সপ্তাহে অন্তত একদিন আমরা এখানে এসে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করবো।

সেদিন ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল।

কালের বিষম ঘূর্ণিপাকে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। প্রথম যৌবনের কোমল আলো মাখা প্রহর গত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব পরে নিয়েছে তার ভয়ের মুখোশ। শিবদাস ঘামতে ঘামতে ঠিক বেলা দশটা পঞ্চাশে পার হয়ে যায় চোদ্দ নম্বর গেট। সামান্য দেরি হলেই হেডমাস্টার এটেনডান্স লেজার সরিয়ে নেয় তার [illegible] তার আগেই পৌঁছে যেতে হবে [illegible] হোক।

তার আর দু বছর বাকি।

তবু শিবদাস আশা রাখে [illegible] হারে না কিন্তু [illegible]ই। একজন কবি [illegible] কোনদিন। [illegible] সে গড়ার কাজ। আ[illegible] না? বেশ, তাহলে কাল হবে। আগামী [illegible]তো আছেই।

*

রাত দশটা। বেশ [illegible] লোকজন নেই বললেই হয়। [illegible] বাড়ি ফিরছে। আজ মাইনের দিন ছিল, পেয়ে বন্ধুরা একটু খাওয়া-দাওয়া আড্ডা দিয়েছে। তারপর তারা [illegible] জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছে [illegible] ফলে শেয়ালদা থেকে নটা পঁয়তাল্লিশের [illegible] ধরতে হয়েছে তাকে। শীতকালে অনেক রাত। তাড়াতাড়ি চলেছে [illegible] বাড়িতে সবাই চিন্তা করবে।

সিনেমা হলটা ছাড়ালেই রাস্তা দম নির্জন হয়ে আসে। ল্যাম্প[illegible] বাল্বগুলোও কারা ভেঙে রেখেছে [illegible] খুটি পরিচিত পথ, সাবধানে [illegible] পেরিয়ে যাওয়া কষ্টের নয়।

হঠাৎ পথের বাঁদিক থেকে

ব্যারাকপুর স্টোরী

গরে এলো তার দিকে, জানালাটার থেকে আরো তিনটে ছায়ামূর্তি।
দাঁড়ান!
কে দাঁড়ালো বিশ্বনাথ। ব্যাপারটা দু-তিন সেকেণ্ডেই যথেষ্ট। তার-র হাত শক্ত হয়ে চেপে ধরলো ব্যাগটাকে। কিন্তু ছজন লোকের হাতে, তার মাত্র দুটো।
র মধ্যের সবচেয়ে লম্বা লোকটি ঘড়িটা খুলে দিয়ে দিন, চটপট। করবেন না, করে লাভ হবে না

থেকে পাঁচ মিনিটে যতক্ষণ সময় লাগছে ততখানিই দেরি হয়েছে, নিকট চড় এসে পড়লো বিশ্ব-গালে। —শালা! এই ঠাণ্ডায় দাঁত কলিয়ে রেখে আমড়াগাছি না? লে, খুললে খোল, নইলে চড়ে ভেঙে দেবো—
কঠিন ঠাঁই। বিশ্বনাথ আস্তে ঘড়িটা খুলে ওদের দিয়ে দিল।
-ব্যাগ খোলো!

তবাদ অর্থহীন। ফোলিওর চেন ধরে রইলো। দুখানা ব্যস্ত হাত পলকে ব্যাগের মধ্যে ঢুকলো এবং মুহূর্তে হাত বদল হয়ে গেল র সারা মাসের পরিশ্রম। এতেও না অবশ্য, ছায়ামূর্তিরা বিশ্ব-লের পুরো হাতা সোয়েটার আর র জামাও খুলে নিল। গায় গতে গেঞ্জি পরে কাঁপতে কাঁপতে ফিরলো বিশ্বনাথ—হাতে থালি

*

ইরে কালো বোর্ডের ওপরে সাদা লেখা রয়েছে—'সাধু বর্থলময়ের র্চ'। ব্যারাকপুরের সবচেয়ে গীর্জা। সিপাহী বিদ্রোহেরও প্রতিষ্ঠা। হোলি শ্রাইনের পেছনে জুড়ে রঙীন কাচের মোজাইকে যীশুর ছবি। মূল দু পাশে দেওয়ালে গাঁথা পবিত্র জল রাখবার পেতলের ভেতরে আলো-অন্ধকারে একটা শান্তি ঘুরপাক খায়।
৮৩১ খ্রীস্টাব্দের প্রতিষ্ঠা। সে সময় সামরিক বাহিনীর মানুষেরা উপাসনা আসতেন এখানে। পরে অবশ্য সর্ব-র জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। এই ক্যাথিড্রালের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মুর্শিদাবাদ, অর্ধেক চব্বিশ পরগণা এবং প্রায় সুন্দরবন নিয়ে এর কাজ। এখানে বিশ হাজার খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ছড়িয়ে রয়েছেন।
মানুষকে পাকড়াও করে বুঝিয়ে খ্রীস্টান করবার দিন চলে গিয়েছে। বিনামূল্যে বাইবেল বিতরণ করা হয়, ভেতরে একটি কাঠের স্ট্যাণ্ডে কিছু ধর্মীয় বই রয়েছে, সেগুলি ইচ্ছে-খ্রীস্টান - অখ্রীস্টান যে কেউ পড়তে নিতে পারেন। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না। পড়ে ফেরত দিলে ভালো, না দিলও কোনো ক্ষতি নেই। গীর্জার কর্মী ভেতরের রিজার্ভ স্টক থেকে আবার বই এনে সাজিয়ে রেখে দেবেন। এই পরোক্ষ প্রচারে যা কাজ হয়। সম্প্রতি কজন খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছেন? এই প্রশ্নের জবাবে এখানকার আর্চডিকন সুখেন্দু কবিরাজ হেসে জানালেন —খুব কম। গত দু বছরে কেউ হননি। এ বছরে একজন হবেন কথা আছে। বাঙালী। পড়াশুনা করে নিজের ভেতরেই তাগিদ জেগেছে। আমরা কোনোভাবে ইনস্টিগেট করিনি, বরং, আবার ভালো করে ভেবে পরে আসতে বলেছি।
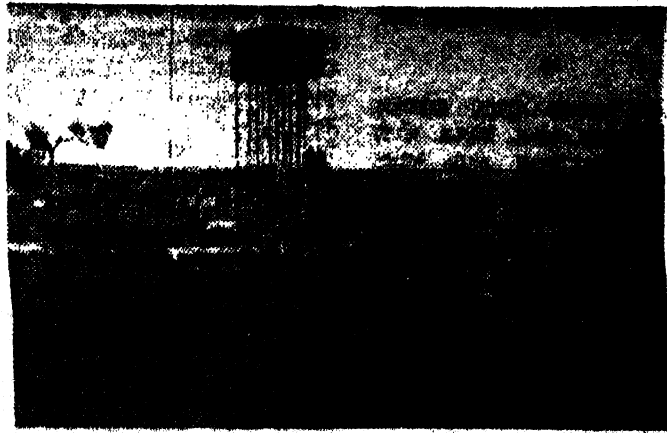
এই কাজ করে আপনি সুখী?

প্রশ্ন শুনে চোখ নিচু করে মৃদু হাসলেন সুখেন্দুবাবু। একটু চুপ করে থেকে বললেন—হ্যাঁ, আমি সুখী। অনেকদিন ধরে এই ক্যাথিড্রালের সঙ্গে আমি জড়িত। মাঝখানে কেবল ক'বছর ইংল্যাণ্ডে ছিলাম, ম্যানচেস্টার আর ল্যাংকাশায়ারে পড়তে পাঠানো হয়েছিল আমাকে। ফিরে আবার এখানে। বাই বার্থ আমি ক্রীশ্চান। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করেছি, অধ্যাপনাও। তারপর একদিন বুকের মধ্যে ঘণ্টা বেজে উঠলো। সব ছেড়েছুড়ে এই কাজে চলে এলাম। খুব হার্ডশিপের জীবন, জানেন, কিন্তু বড় তৃপ্তি, বড় শান্তি এ কাজে। যদি আমার কথা বলতেই হয়, তাহলে বললেন যে আমি খুব সুখী, আমি শান্ত। আমার সমস্ত সমস্যা ও দুশ্চিন্তা খ্রীস্টকে নিবেদন করে তার বিনিময়ে আমি অপার শান্তি পেয়েছি।

ক্যাথিড্রালের ভেতরে মোমবাতি জ্বলছে বেদীর ওপরে। সারি সারি কাঠের কারুকার্য করা আসন উপাসকদের জন্য। দেওয়ালের গায়ে অজস্র শ্বেতপাথরের ও পেতলের স্মৃতিফলকে। কোনোটাই আধুনিক নয়। গীর্জা প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে মৃত মিলিটারী অফিসারদের স্মৃতিফলক সব। বিশ শতাব্দীর তারিখ নেই একটিতেও। ফলকগুলির প্রাচীনত্ব জায়গাটিকে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য দান করেছে। কোনোটিতে লেখা—

Erected in Memory of Robert Mann Franklin, aged 28 years, died in Arrakan, at Khyook Phyoo.

কোনোটিতে :—

In Memoy of Frederick Sherwood Taylor, Colonel. Bron: November 18. 1823. Overwhelmed by a land-slip at Nainital. September 18, 1880.

কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালে ভারি আশ্চর্য লাগে। মৃত্যুকে যেন খুব পরিচিত, পাশের বাড়ির প্রতিবেশী বলে মনে হয়। ফলকের তারিখগুলো দুটো শতাব্দীকে কোন জাদুতে এনে দেয় খুব কাছাকাছি। স্বীয় অস্তিত্বের সময়সূত্র ও বাইরের পৃথিবীটা হারিয়ে যেতে থাকে ক্রমেই। আশ্চর্য কি যে এই রকম পরিবেশে একজন মানুষ শান্ত ও সুখী হবে? এখানে মানুষের কাছে স্বচ্ছ হয়ে আসে চিরদুঃখদায়িনী মৃত্যুর গাঢ় রঙের যবনিকা, লুপ্ত হয় সময়ের বোধ।

*

প্রত্যেক শহরেই কোনো সংগোপন কোণে পৃথিবীর এই সবচেয়ে পুরনো ব্যবসার কেন্দ্র রয়েছে। এ শহরও তার ব্যতিক্রম নয়। বারো নম্বর রেলওয়ে কসিং এর আশেপাশে এটা লোকালাইজড। 'পাড়া' বললে ব্যারাকপুরের সবাই এ জায়গাটাকেই বোঝে। কিন্তু কালি-দাসের কালো মাদের প্রশস্তি রয়েছে, স্বয়ং কালিদাস ভারাক্রান্ত মুহূর্ত-গুলিতে চিত্তবিনোদনের জন্য যাদের কাছে যেতেন, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সুসজ্জিতা, বরতনুবিশিষ্টা, নৃত্যগীতকলায় পারদর্শী যেসব অভিজাত জনপদবধূদের কথা রয়েছে, এরা তাদের দলের কেউ নয়। মুখে এদের লোধ্ররেণুর বদলে পাউডার ধার করে কেনা গোলা টিনের সস্তা পাউডার, কণ্ঠে মালব-কৌশিক সুরের বদলে 'জানেমন জিন্দগী হায়'-এর মনমাতানো গান। বেণীর জায়গায় খোলা চুলের রাশি, ফিতের ফাঁস দিয়ে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে নানা অঙ্গভঙ্গি করে রসিক পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

এ তো গেল লোকালাইজড ব্যবসার কথা। এ ছাড়াও ঠিকানাবিহীন বাজারে

চলেছে অন্যভাবে। রাত্র দশটার পরে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও সন্নিহিত অঞ্চলে অনেক রং করা মুখ ঘুরে বেড়ায়। তাদের সঙ্গীও জুটতে সময় লাগে না।

*

চৈত্রের পাতাঝরা দুপুরে কাঠবাদাম গাছের তলা দিয়ে, বাসের স্টপেজ বাঁয়ে রেখে, গলে যাওয়া পিচের ওপরে পায়ের ছাপকে চিরস্থায়ী করে ও কারা হেঁটে চলেছে? হাতে ওদের খাতা, ডায়েরী, কিছু পত্র-পত্রিকা। কোথায় চলেছে ওরা ?

শহরে কোথাও আজ ঘরোয়া সাহিত্য-সভা হবার কথা আছে। ওরা চলেছে সেই সভায় স্বরচিত গল্প-কবিতা পড়তে, শুনতে সমালোচনা করতে। বিকেল বিকেল সভা শুরু হবে। বসবার ঘরের মেঝেয় মাদুর সতরঞ্চি এবং লোক বেশি হলে এর সঙ্গে দু-একটা বেড্-কভার পেতে সভাস্থল তৈরি করা হয়। সভার মধ্যে একবার চানাচুর-সিঙ্গাড়া নোনতা বিসকুট আসে, দু'বার চা। যার বাড়িতে সভা, ব্যয় তারই নির্বাহ করার নিয়ম। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়ে থাকেন।

সভা শেষ হতে রাত নটা কি সাড়ে নটা। এর মধ্যে চলে অনর্গল গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ পাঠ। সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন। মাঝে মাঝে কেবল তারপ্রাপ্ত যৌবনের গলা শোনা যায়—এবার গল্প পড়ছেন নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কিম্বা কবিতা পড়ছেন উৎপল ত্রিবেদী। যাঁরা সভায় আসেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই এখনো বড় কোনো কাগজে লেখেননি। অনেকে সবে লিখতে শুরু করেছেন। কিছু কিছু সাহিত্যপাগল মানুষ নিজের সময় নষ্ট করে, গাঁটের কড়ি খরচা করে এদের নিয়ে মাসে একবার বসেন। লাভ দুপক্ষেরই হয়। যোগাযোগই তো আসল কথা—একা কি মানুষ বাঁচে ? এমন অনেক-গুলি গোষ্ঠী রয়েছে এই শহরে। প্রায় সবারই একটি করে ছোট পত্রিকা আছে। ওই পত্রিকার নামেই সাহিত্যগোষ্ঠীরও নাম। যেমন— 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'একক', 'অঙ্কুর', 'সন্ধানী', 'আবহ' ইত্যাদি। এসব পত্রিকা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেরোয় না। কি করে বেরুবে ? সম্পাদকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাঠবেকার। বাড়ি থেকে পাওয়া যৎসামান্য হাতখরচের পয়সা কিংবা টিউশনির টাকা দিয়ে কাগজ কিনতে হয়, প্রেসের দেনা মেটাতে হয়। কাগজ প্রেস-বাঁধাই এসবের খরচও দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবু এইসব অত্যুৎসাহী লেখকেরা থেমে নেই। দু-মাসে একটার বদলে হয়তো চার মাসে একটা বের হচ্ছে, কিন্তু মরে যায়নি কেউ। সম্প্রতি দৃষ্টিপ্রদীপ থেকে সম্পাদিকা মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক দিয়েছেন আঞ্চলিক সবক'টি পত্রিকাকে একত্র হবার জন্য। এককভাবে যে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়, মিলিত-ভাবে আর্থিক ও সম্পাদকীয় সহযোগিতার মাধ্যমে সেগুলিকে এড়ানো সম্ভব। অনেকের অনেক পত্রিকায় কি প্রয়োজন ? অনেককে নিয়ে একটি পত্রিকাই তো ভালো।

যাঁরা নিয়মিত লেখেন না, অথচ নিয়মিত পড়েন এমন অনেক মানুষ রয়েছেন ব্যারাকপুরে। ঘরোয়া সভাগুলি এঁদের বাড়িতেও বসে। সাহিত্য স... এঁদের অজ্ঞাতসারে স্থানীয় তরুণ লেখ... ওপরে গভীর প্রভাব বিস্তার... এঁদেরই বোধহয় সাধারণভাবে বুদ্ধি... বলা হয়। এঁরা একটু একটু ব্যারাকপুরকে অনেকখানি পালটে... ছেন। এ অঞ্চলে কিছু কিছু মানে... পুজো, বিচিত্রানুষ্ঠান ও মাঝে... কোনো উপলক্ষে চ্যারিটি ফিল্ম শো... গণপ্রমোদের আর কোনো উপায় ছিল... এমন প্রতি মাসেই সাহিত্যসভা... একটি-দুটি গোষ্ঠী তো বছরে ও... বেশ বড় করে তিন-চারদিনব্যাপী সা... সম্মেলন করে থাকেন। দূর দূর... ডেলিগেটরা আসেন, কোলকাতা... আসেন নামী লেখকেরা। সারাদিন বক্তৃতা, রচনাপাঠ চলে। খাওয়াদা... আড্ডা, মেলামেশা ইত্যাদির মধ্যে পরিচিতি গাঢ় হয়ে ওঠে।

সাত-আট বছর আগেও ব্যারাক... বইয়ের দোকানগুলোতে 'এলো যৌবন', 'যখন বদল হলো মালা', '... পতি' ইত্যাদি টাইপের বই ছাড়া কিছু পাওয়া যেত না। এখন ... শরৎ-বিভূতি-বঙ্কিম-রবীন্দ্র রচনা... পাওয়া যায় যে কোনো সময়ে কি... গেলেই, আগে অর্ডার দিতে হয়... বিদেশী সাহিত্যের জন্য কিছু ... আলাদা করা আছে, সেখানে চোখে প... টলস্টয়, হার্ডি, ডিকেনস থেকে ... কার মডার্ণ ক্ল্যাসিকের অন্তর্ভু... কাফকা, কামু, সার্ত্র ইত্যাদি লেখক... বই। বুদ্ধিজীবীদের ধন্যবাদ, তাঁরা ... চাহিদা শেষ পর্যন্ত জাগিয়ে তু... পেরেছেন। পড়ুয়া ছাড়া ... লোকালয়কে কি মানায় ? এদের ... আপনভোলা, জাগৎব্যাপারে উদাসীন ... সম্পূর্ণ পবিত্যক্ত আর কে আছে ?

*

বেলা শেষ হয়ে আসছে। রাঙা ... ছোলার ক্ষেতে এলিয়ে শুয়ে ... পেকে তৈরি এবার কাটার পালা। ... ভেতর পাকা দাড়ি যে লোকটি স... ফসলের দিকে তাকিয়ে আছে তার ... এরফান। ওরই ফসল। মাধবপুরের ... এবার এমন সুন্দর ফসল আর ... হয়নি।

ব্যারাকপুরেরই অন্তর্গত এইসব ... শহরের লাগোয়া একেবারে। ... হিন্দু-মুসলমান চাষীর বাস। এ... তাদেরই একজন। কেমন আছে ... ঝগড়া-বিবাদ নেই ? হিন্দুরা ... মুসলমানদের দিকে বাঁকা চোখে ... না ? অথবা মুসলমানরা হিন্দুদের ... ওই তো এরফান উঠে আসছে ক্ষেত ... ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন। ...

—নমস্কার কর্তা, কর্তার নাম ...

—সালাম বাবু। আমার নাম ... মিয়া। বাবুরে তো চিনলাম না।...

বি।৭৫২

—বেড়াতে এসেছি। এ তোমার ফসল
র ?

—হ্যাঁ বাবু। আমি দাদনবন্ধ, সর-
, আমি ভাগে চাষি। সার-বীজ-জল
র, মেহনত আমার। আধাআধি

চাগ নিয়ে গোলমাল হয় না
?

কচ্ছ, না বাবু। গোলমাল হবে
সরকারবাবুরা মানুষ ভালো,
ঠিকঠাক হিসেব বুঝিয়ে দিই।
আর কি ?

সময় এরফানের খেয়াল হবে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন
হয়ে সে কাঁধের গামছাটা আলের
দু ভাঁজ করে পেতে আপনাকে
বলবে। তারপর কৌটো থেকে
তো বাঁধা কড়া বিড়ি একটা
দেবে আপনাকে, নিজের 'পেট্রোল
দিয়ে ধরিয়েও দেবে।

—তোমাদের গাঁয়ে মসজিদ নেই
না ?

—আছে বাবু, ওইদিকে রয়েছে।
তো মৌলভী সাহেব সামনে দিয়ে
একটু আগে, দেখেন নি ?

—না ভাই, খেয়াল করিনি তো।

—এবার ভাবছি একটা মাইক
মসজিদে। সবাই মিলে চাঁদা
সেনো। কিন্তু এখানকার
বড় গরীব বাবু, মাইকের দামও
খেতেই পায় না তারা চাঁদা দেবে
বোধহয় আর উঠবে না।

—মসজিদে মাইক দিয়ে কি হবে
?

—আমাদের ইসলাম ধর্মে বলা
কর্তা, আজানের শব্দ যতদূর যায়
আল্লার রাজত্ব, সেই পবিত্র
আজানের কোনো হক নেই।
গলায় মানুষ আর কত চেঁচাবে
তাই মাইকের ব্যবস্থা।

—তাহলে মাইক না হলে কি করে
এরফান ?

মুখ দীপ্ত হয়ে ওঠে, বলে—
ভয় নেই কর্তা, হলে ভালই হতো—
না হলেও চলে যাবে। গ্রামের আদ্দেক
খালি গলার আজান শোনা যায়
গ্রামের একেবারে ওইদিকে একটা
মন্দির আছে বাবু, ওইদিকটা উনিই
ন। বাস, পুরো গ্রাম রক্ষে পেল
।

আপনার খুব ভালো লাগবে, আপনি
জিজ্ঞাসা করবেন—তোমরা হিন্দুদের
মানো ?

এরফান বলবে—মানি বইকি কর্তা।
তো আমাদের দরগায় মানতের
চড়িয়ে যায়। এই তো ক'দিন আগে
ছেলে কঠিন ব্যামো থেকে সেরে উঠলো
বলে গাঁয়ের রামসের আমি শিবমন্দিরের
পূজারীকে পয়সা দিয়ে এলো পুজোর জন্য।
আর তাছাড়া ফারাকটা কোথায় বলুন ?
ভগবান সবই এক, ও আপনার আল্লাহ্ যা
শিবও তাই। টাকার এপিঠ আর টাকার
ওপিঠ। টাকা একই।

*

নানা রঙের বিচিত্র জীবন গড়িয়ে চলে,
বয়ে যায় বিচিত্র মানুষের মিছিল। তারপর
এক সময় দিন ফুরিয়ে আসে, দিবসের হাত
থেকে নিশীথিনী তুলে নেয় ঘুমন্ত
পৃথিবীকে। রাত ক্রমে গভীর হয়, পথিকের
চরণশব্দ পথে পথে ক্ষীণ হয়ে আসে।
শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে থাকার মধ্যে
খুব সামান্য কয়েকজন। অনাথ পাগলা
ডাক্তারখানার বারান্দায় বসে রোজকার
মতো আকুল হয়ে গাইছে—'এবার কালী
তোমায় খাবো'। চায়ের দোকানের মালিক
নারাণ লুঙির গিঁট আলগা করে দাঁড়িয়ে
আরামে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে চাকর
দুটোকে দোকান পরিষ্কার করার নির্দেশ
দিচ্ছে। হোটেলের ষণ্ডটা রাস্তা পেরিয়ে
এদিকে এসে টিউবওয়েলের পাড়ে বসে
দুপুরে চুরি করে রাখা মাংস-রুটি ধীরে
সাবড়ে নিচ্ছে।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ছুটে আসছে
একটা খালি ট্রাক, কে এক মাতাল
বেআক্কেলের মতো রাস্তা পার হচ্ছে গিয়ে
চাপা পড়-পড় হলো। নারাণ হেঁকে
উঠলো—'সামলে! চাপা পড়বে যে'। ট্রাক
ব্রেক কষলো ক্যাঁ-চ্ করে, দৌড়ে গেল
নারাণের দুই চাকর। মাতালকে দুজন দুই
বগলের তলায় হাত দিয়ে ধরে ফেলে ফিরে
তাকিয়ে হেসে বলল—বাবু, এ দত্তদা—

—দত্তদা! আহা, দে রিক্সায় তুলে
দে বেচারীকে।

ননী দত্ত অবসন্ন গলায় চিৎকার
করছে—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমায়। গাড়ি
তো কি ? গাড়ি আমি আটকে দেবো—

চেনা রিক্সাওয়ালা দত্তকে নিয়ে
জোরে প্যাডেল করে রওনা দেয়। সিটে
আধশোয়া হয়ে ননী তখনও বলছে—গাড়ি
আটকে দেবো—ও—ও—

শেষ দোকানেও ঝাঁপ পড়ে যায়।
একটা বেওয়ারিশ দেশী কুকুর রাস্তার
দু' একটা শালপাতা করুণ মুখে শুঁকে
দেখে, তারপর হোটেলের বিরাট তন্দুরের
পাশে কিছুটা উষ্ণতার প্রতিশ্রুতি পেয়ে
গোল হয়ে শুয়ে পড়ে।

এবং নগরীতে দুপুরে রাত দলবেঁধে
নামে।

আমরা মেয়েরা

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

পড়ুয়া মেয়েরাই বড় শিকার

তবে সেই ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে বেথুন সাহেব কোলকাতায় মেয়েদের স্কুল খুলেছিলেন। তারপর কত স্রোত বয়ে গেছে গঙ্গায়। কত সুখ অ-সুখের সময় পার হয়ে বাঙালী মধ্যবিত্ত মেয়েরা আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে স্কুল-কলেজ - ইউনিভারসিটিতে ছেলেদের পাশাপাশি পথ চলতে চলতে তাদের আর থমকে দাঁড়াতে হয় না। স্বাধীনতা। স্বাধীনতা। রক্তে আন্দোলিত হয় চার-অক্ষরা সুখ।

কিন্তু শুধুই কি স্বাধীনতা? তার পেছনে অদৃশ্য থাকে কত স্বপ্ন বিসর্জনের ইতিহাস। আমার পাশের বাড়ির ভদ্র-মহিলা যখন আমাকে বলেন, 'কি আর হবে ভাই, শিলার কলেজের-খরচ টেনে। সেই ত ভাতের হাঁড়ি ঠেলতেই হবে। পাত্র যখন ভালো পেলুম, নগদটাও কম, রাজী হয়ে গেলুম। আমি অবশ্য পড়াবার কথা বলে-ছিলুম,ওর শ্বশুরবাড়ি রাজী হোল না। তা আমি বলি, কি আর হবে। মেয়েদের ঘরে-বরে সুখী হওয়াই আসল ভাগ্যের কথা।' আমার হঠাৎ মনে পড়ে যায় হায়ার-সেকেন্ডারীতে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করার পর আমার পড়ার ঘরে বই নাড়াচাড়া করতে করতে শিলা জানতে চেয়েছিল যারা বিদেশে পড়তে যায়, তারা সকলেই এখানকার ডক্টরেট কি-না। আমার চোখের সামনে শিলার স্বপ্নময় চোখ দুটি ভেসে ওঠে। কত আশা আর জিজ্ঞাসা।

শিলার ভাইয়ের বেলায় কিন্তু ওর বাবা-মায়ের হিসাবটা একটু অন্য খাতে বয়। তাঁদের ভবিষ্যত সিকিউরিটির প্রশ্নটি যেহেতু ছেলেকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, আশা-আকাংখাও তাকেই ঘিরে। অথচ শিলার সম্বন্ধে তাঁদের মূল ভাবটা হোল, বিয়ে একটা দিতে হবে, সেটা যত কম খরচে হয় এবং পড়াশুনো করানোর মূল লক্ষ্যটাও এই সুপাত্র কেন্দ্রিক। একই বয়সী ভাই-বোন ওরা, তবু একজন সুপাত্র পাওয়ামাত্র কত সহজে ওকে পড়ানোটা ওর বাবা-মায় কাছে বাহুল্য হয়ে যায়।

আপনি হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল কলেজ - ইউনিভারসিটিতে সিঁদুর মাথায় মেয়ের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। কিন্তু তার পেছনে যে কত অকারণ সংগ্রামের ইতিহাস। সীমাকে যখন দেখি প্রতিটি পদক্ষেপ বাঁচিয়ে চলতে, আমার মনে হয়, এর নাম কি? বিংশ শতাব্দীর প্রগতি-শীলতা? সামাজিক উন্নয়ন? নারী-পুরুষে সমান অধিকার? সীমার স্বামীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিলো না যে সীমা এম, এ, পড়ুক, নিতান্ত যুক্তির অভাবে ভদ্রলোক সীমার পড়ার ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন, কিন্তু তারপর থেকেই তিনি মনে করতে শুরু করেছেন যে তিনি বি, এ, পাশ অতএব এম, এ, পাশ করলে সীমা তাঁকে অবজ্ঞা করবে। সীমা বেচারীর রোগগ্রস্ত স্বামী আর ইউনিভারসিটির তাল সামলাতে সামলাতে জীবন শেষ। উজ্জ্বল মেয়েটা ক্রমশঃ ম্লানমুখী, ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্তরে বাইরে সংগ্রামের চিহ্ন ওর চোখে-মুখে। কত বড় কাজের দায়িত্ব ও নিতে পারত, তার তুলনায় কত অকারণ সংগ্রামে ওর জীবনী শক্তি নিঃশেষিত হয় প্রতিদিন।

কল্যাণীদির ফিজিওলজিতে ফার্স্ট ক্লাশ ছিল—রিসার্চ করেন, বাচ্চার দায়িত্ব প্রায় একাই পালন করেন এবং সেই সঙ্গে স্বামীর মর্জি। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন রিসার্চ। আমাকে বললেন, 'পারি না রে এত খাটুনী। বাড়ি ফিরে বই-পত্র নিয়ে যখন রাত এগারোটার পর বসার সময় পাই, ঘুমে চোখ জুড়ে আসে।' 'বিকাশদা?' কল্যাণীদি হেসে এড়িয়ে যান, ম্লান, বিষণ্ণ, কান্নার চেয়েও করুণ হাসি। আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছেন কল্যাণীদি। অকারণ সংগ্রামে ক্লান্ত। অথচ বিকাশদা যদি রিসার্চ করতেন, কল্যাণীদির অসহযোগ কত নিন্দার্হ হোত! মেনে নিতে নিতে আমরা এমন একটা জায়গায় এসেছি, যেখানে মেনে নেওয়াটা মজ্জাগত হয়ে গেছে। পড়াশুনোর সুযোগ দেওয়া না দেওয়াটা পুরুষ-নির্ভর। কেন মেয়েরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতন শিক্ষার অধিকার সমাজের কাছে দাবী করতে পারে না। অথচ যেখানে মেয়েরা গেছে কোথাও কি অকৃতকার্য শুধু মেয়ে বলে? বুদ্ধি, যুক্তি, বিচারশক্তি কোথাও কোন অপারগতা আছে?

স্বামীর অসহযোগ ছাড়িয়ে
এক অসুবিধের সম্মুখীন বিবাহিত
দের হতে হয়। তা হোল শ্বশুরবাড়ি
অমূর্ত ধারণাটি। চতুর্দিকে এক প্র
শীলতার ধুয়ো উঠেছে—মানসিকতায়
তার ছাপ পড়েনি—তার চাপে
শ্বশুরবাড়ি যদিও বা বউমার
ব্যাপারটা মেনে নেয়, কখনই তার অপ
বোধ থেকে তাকে রেহাই দেয় না
যেন এ সংসার থেকে অন্যায়
অধিকার আদায় করে নিচ্ছে এমনি
ভাব সংসারের সর্বত্র বিরাজ করে।
সে কলেজে বা ইউনিভারসিটিতে
সময় কাটিয়ে আসে, সেহেতু বাকী স
তার দায়িত্ব অনেক বেশী—তার প্র
নেই কোন বিশ্রামের অথবা বই
বসবার সময়ের। বউমাটিও সাধার
নিজের অধিকার সম্বন্ধে অসচেতন
তাই প্রতিনিয়ত তাকে মুখোমুখি হ
এক অকারণ সংগ্রামের। পরিশ
পড়তে হয়। আর শেষে একটা
লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে উপলক্ষ্য যে কখ
হয়ে ওঠে, তার হিসাব থাকে না।

আমরা, মেয়েরা অর্জন করতে
সেই স্বাধীনতা—মানসিক স্বাধীন
ধ্বসে যাওয়া মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ
মূল্য দিতে দিতে নিঃশেষ নি
ছাড়া ক্ষয়ে যাওয়া ছাড়া সঠিক
মেরুদণ্ড সোজা করতে
আত্মমর্যাদা না থাকলে মর্যাদা পাও
না। কবে আমরা নিজেদের ভাবতে
পুরুষের সমকক্ষ? শৈশবে মেয়ে
ভাইয়ের সঙ্গে বোনের পার্থক্য
স্বামীর স্ত্রীর পার্থক্য, আ
নিজেরা পার্থক্য করি ছেলে আর মে

চতুর্দিকে লিবু আন্দোলনের
অসমকক্ষ মেয়েদের সমকক্ষ করার
প্রবৃত্তি। যে অসম্মান যে আত্মমর্যা
হীনতা আমাদের প্রতিটি দৃষ্টিকে আ
করে আছে, তার জন্য বাইরের আন্দো
চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন মানসি
পরিবর্তন। নিজেদের মেয়ে হিসেবে
মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা।

আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই
ভঙ্গীরই প্রচ্ছায়া। সমাজ বাদ দিয়ে
ভঙ্গী বাদ দিয়ে শিক্ষার প্রসার ও
আমার দাদা যখন বৌদিকে বলে
চলবে কি করে তুমি যদি দিনের
কলেজে কাটিয়ে আস?' তখন তা নি
মর্মান্তিক কিন্তু আরও মর্যাদায়
মনে হয় যখন বৌদি তা নিঃশব্দে
নেয়। সংসারে মা, বোন, স্ত্রীর পদবী
পুরুষ সমাজ ভুলিয়ে দিতে চায়
ক্ষমতার পরিচয়। আর তার সবচে
শিকার পড়ুয়া মেয়েরা।

দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া

শতবার্ষিকী টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট খেলার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঐতিহাসিক মেলবোর্ণ মাঠে এই দুই দেশের শতবার্ষিকী টেস্ট ক্রিকেট খেলার যে পাঁচদিনের (মার্চ ১২—১৭) আসর বসেছিল তাতে অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে ইংল্যাণ্ডকে হারানোর গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, শতবর্ষ আগে ১৮৭৭ সালের ১৭ মার্চ তারিখে এই মেলবোর্ণ মাঠেই ইংল্যাণ্ড — অস্ট্রেলিয়ার উদ্বোধনী টেস্ট ক্রিকেট খেলাতেও অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জিতেছিল। ইতিহাসের কি চমৎকার পুনরাবৃত্তি। তবে এই শতবার্ষিকী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে ইংল্যাণ্ডের এই পরাজয় অগৌরবের হয়নি। খেলার শেষ পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৪৬ রানের মাথায় যখন তাদের ৫ম উইকেট পড়ে তখনও ইংল্যাণ্ডের জয়ের আশা ছিল। জয়লাভের লক্ষ্য ৪৬৩ রান থেকে ইংল্যাণ্ড তখন ১১৭ রান দূরে ছিল। তাদের হাতে ছিল দ্বিতীয় ইনিংসের পাঁচটা উইকেট। এই সময় ইংল্যাণ্ড যে-রকম দাপটে খেলছিল তাতে তাদের শেষ পাঁচ উইকেটে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১১৭ রান সংগ্রহ করা অসাধ্য মনে হয় নি। কিন্তু চা-পানের পর মাত্র ৭১ রানে ইংল্যাণ্ডের শেষ পাঁচটা উইকেট পড়ে গেলে অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জিতে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার লিলি তাঁর মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের আশা ধূলিসাৎ করে দেন। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের এই ৪১৭ রান—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে চতুর্থ ইনিংসের খেলায় সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ২২৫টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : অস্ট্রেলিয়ার জয় ৮৮, ইংল্যাণ্ডের জয় ৭১ এবং খেলা ড্র ৬৬।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক টনি গ্রেগ টসে জিতে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম দফায় ব্যাট করতে পাঠান। শতবার্ষিকী টেস্ট ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে বিশেষভাবে নির্মিত স্বর্ণ-মুদ্রা দিয়ে টস করা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস মাত্র ১৩৮ রানে শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের পেস বোলিংয়ের দাপটে অস্ট্রেলিয়ার যে এরকম শোচনীয় অবস্থা হবে তা কেউ ভাবেন নি। ৬ষ্ঠ উইকেট জুটিতে অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল এবং সহ-অধিনায়ক রডনি মার্শ ৫৫ রান সংগ্রহ করে দলের মুখ রক্ষা করেছিলেন। দলের ৫১ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছিল। দলের সর্বোচ্চ ৪০ রান করেছিলেন গ্রেগ চ্যাপেল। প্রথম দিনের বাকি সামান্য সময়ের খেলায় ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ২৯ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের আধঘণ্টা পর ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৯৫ রানের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যাণ্ড তাদের শেষ ৯টা উইকেটে মাত্র ৬৬ রান সংগ্রহ করেছিল। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি মাত্র ২৬ রানে ৬টা উইকেট নিয়ে ইংল্যাণ্ডের ইনিংস তছনছ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ডের ইনিংস একশ রানের কমে শেষ হল এই নিয়ে ৩ বার। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক রডনি মার্শ এইদিন চারটি ক্যাচ ধরার সূত্রে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক ডিসমিস্যালের রেকর্ড করেন (১৪৮)।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের তিনটে উইকেট খুইয়ে ১০৪ রান সংগ্রহ করে ১৪৭ রানে এগিয়ে যায়। ইয়ান ডেভিস (৪৫ রান) এবং ডগ ওয়ালটার্স (৩২ রান) অসমাপ্ত ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ৫১ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থেকে যান।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৮৭ (৮ উইকেটে)। এইদিনে অস্ট্রেলিয়া পূর্বদিনের ১০৪ রানের সঙ্গে ২৮৩ রান যোগ করেছিল আরও পাঁচটা উইকেট খুইয়ে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল অস্ট্রেলিয়া ৪৩০ রানে এগিয়ে আছে। খেলায় উইকেটরক্ষক রডনি মার্শ ৯৫ রান করে নট আউট আছেন।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের ৪১৯ রানের মাথায় (৯ উইকেটে) খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক রডনি মার্শ ১১০ রান করে অপরাজিত থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় রডনি মার্শ ছাড়া অপর কোন অস্ট্রেলিয়ান উইকেটরক্ষক সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন নি।

খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪৬৩ রান তুলতে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং দুটো উইকেট খুইয়ে ১৯১ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল খেলায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যাণ্ডের আরও ২৭২ রানের প্রয়োজন এবং তাদের হাতে জমা আছে ৮টা উইকেট। ডেরেক র‍্যাণ্ডল ৮৭ এবং অ্যামিস ৩৪ রান করে অপরাজিত থাকেন।

শেষ পঞ্চম দিনে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৪১৭ রানের মাথায় শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া ঐতিহাসিক শতবার্ষিকী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৪৫ রানে জয়লাভের গৌরব লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের ডেরেক র‍্যানডল ১৭৪ রান করেন। টেস্টে তাঁর এটা প্রথম সেঞ্চুরী। শতবার্ষিকী টেস্ট খেলায় 'ম্যান অব দা ম্যাচ' সম্মান লাভ করেছেন ডেরেক র‍্যানডল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ১৩৮ রান (গ্রেগ চ্যাপেল ৪০ রান। আণ্ডারউড ১৬ রানে ৩, ওল্ড ৩৯ রানে ৩, লিভার ৩৬ রানে ২ এবং উইলিস ৩৩ রানে ২ উইকেট)

ও ৪১৯ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ডেভিস ৬৮, ডগ ওয়ালটার্স ৬৬, হুকস ৫৬ এবং রডনি মার্শ নট আউট ১১০)

ইংল্যাণ্ড : ৯৫ রান (টনি গ্রেগ ১৮ রান। লিলি ২৬ রানে ৬ এবং ওয়াকার ৩[illegible] রানে ৪ উইকেট)

ও ৪১৭ রান (বিয়ারলি ৪৩, র‍্যাণ্ডল ১৭৪, অ্যামিস ৬৪, গ্রেগ ৪১ এবং নট ৪২ রান। লিলি ১৩৯ রানে [illegible] এবং ও' কিফি ১০৮ রানে [illegible] উইকেট)

চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ রান

ইংল্যাণ্ডের সাঁতাই পাথরচাপা কপাল। তারা এই নিয়ে তিনটি টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ রান করেও একবারও জয়ের মুখ দেখতে পেল না—তাদের [illegible] দুবার (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৪ রান [illegible] সিডনি, ১৯২৪-২৫ এবং ৪৫ রানে মেল[illegible] বোর্ণ, ১৯৭৭) এবং ড্র একবার (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ডারবান, ১৯৩৮-৩৯)।

টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ রান কর[illegible] খুবই দুরূহ কাজ। এপর্যন্ত (মার্চ [illegible] ১৯৭৭) ৮০০ টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়েছে। এই ৮০০টি টেস্ট ক্রিকেট খেলার মধ্যে [illegible] ৮টি টেস্ট খেলার চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ [illegible] তার বেশী রান উঠেছে। টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ রান করার কৃতিত্ব [illegible] করেছে এই ৬টি দেশ—ইংল্যাণ্ড [illegible] একবার করে অস্ট্রেলিয়া, ভারত, [illegible] ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রি[illegible]

টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ [illegible] বেশী রান করে শেষপর্যন্ত খেলায় জিতে[illegible] মাত্র এই দুটি দেশ—ভারত (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে, পোর্ট অব স্পেন, ১৯৭৫-৭৬) এবং অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে, হেডিংলে, ১৯৪[illegible]) টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ বা তার বেশী রান করে শেষপর্যন্ত হেরেছে এই [illegible] দেশ—ইংল্যাণ্ড (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২বার) এবং নিউজিল্যাণ্ড (ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৩৮ রানে, ট্রেন্ট ব্রিজ, ১৯৭[illegible]) টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ৪০০ বা তার বেশী রান করার পর খেলা অমীমাংসিত থে[illegible] গেছে তিনটি ক্ষেত্রে। ১৯৬৫ সালে ওভালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ ইনিংসের খেলায় ৭ উইকেটে ৪৯৩ [illegible] সংগ্রহ করে মাত্র ২৮ রানের জন্যে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে সর্বাধিক রান করেছে ইংল্যাণ্ড—৬৫৪ [illegible] ৫ উইকেটে (বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ডারবান, ১৯৩৮-৩৯)।

আঙুরবালা \ হিমঘ্ন \ মহাশ্বেতা

কীর্তন থেকে ধরলে বাংলা গানের স দুশো কেন প্রায় চারশো। তারও গ বাঙালী গান গাইত। মাঠে জঙ্গলে তে প্রান্তরে তার গানের ঝর্ণা বইত চয়ই আজকের থেকে কম তোড়ে নয়।

তবু দুশো বছর বললে নিশ্চয়ই একটা শষ ধরাকে বুঝি। 'অরূপ' শিল্পী-গষ্ঠী '৭২ সালে একটি আসর করেছিলেন রবীন্দ্রসদনেই পাঁচাত্তরটি প্রাচীন না গানের ডালি সাজিয়ে। এবারেও ঠিক। '৭২ এ সৌমেন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন তে পারেননি, আশীর্বাদ পাঠিয়ে-ন মূল উদ্যোক্তা হিমঘ্ন রায়-রীকে। আর লিখেছিলেন, 'বাংলা র কথা—সেগুলি সুরকে ফুটিয়ে নবার জন্যে নয়—সেগুলি তাদের ভাব-বাঙালীর মনকে সিক্ত করে বাঁচনীয়ের আস্বাদ দেওয়ার জন্য।'

রবীন্দ্রসদনে ৯ মার্চের আসরটির ন আকর্ষণ ছিলেন আঙুরবালা। চন ঠিক করেছে। কেননা প্রাচীন । গানের কথা বা কবিতার ভাবরস ও হয়েছে ধ্রুপদ টপ্পা কীর্তন বাউল ন সুরশিল্পে। তাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম না থাকলে ঐ সব গান বা বিড়ম্বনা। হিমঘ্ন রায়চৌধুরী এটা নবেছেন কেননা তিনি নিজে উচ্চাঙ্গ য কথার রস বজায় রেখে প্রাচীন । গান গাইবার তালিম পেয়েছেন।

বয়সের ক্লান্তিতে পাকা শিল্পীর কণ্ঠ কাঁপে না তাল লয় ও ভাবের অসামঞ্জস্য ঘটে না, এটা প্রমাণ করে আশ্চর্য মজলিসি মেজাজে আঙুরবালা গাইলেন। গোবিন্দ অধিকারীর 'শ্যাম তুমি বাঁকা', রবীন্দ্র-নাথের 'কথা কম নে লো রাই' প্রভৃতির প্রতিশোধ। নজরুলের 'কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান', কমলাকান্তের 'শ্যামা সুধা দুটি নাম', নজরুলের 'আমার আর কোনো গুণে নেই মা', নিধুবাবুর 'ভালবাসিবে বলে ভাল বাসিনে' ইত্যাদি। এগুলির ভাব-ব্যাখ্যার কাব্যের কি আত্মসমর্পণ কি রাধা-কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা কি প্রেম এটাই চরম কথা নয় আর সেখানেই এদের বৈশিষ্ট্য নয়। কেননা বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলীর প্রভাব থেকে শ্রীধর কথক কি নিধুবাবু এমন কি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদও মুক্ত নন। কবিতার ভাবের দিক থেকে আর কি কিন্তু ভাবরস পুষ্ট কথাগুলিকে যদি চৌতাল ঝাঁপতাল তেওট প্রভৃতি উচ্চাঙ্গিক তালে সুরে ছন্দে একটা বিশেষ চঙে না গাওয়া হয় তবে তাদের ভেতর দুশো বছর থাকে বাংলা গান থাকে না বাঙালীর গান থাকে না।

সুধের বিষয় হিমঘ্ন এই সুর গা গায়ন ভঙ্গিমার দিকে যথার্থ দৃষ্টি রেখে-ছিলেন। তাঁর নিজের গলায় 'শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে' (নজরুল), 'উদাস অন্তর শুধু সাগর' (গিরিশচন্দ্র), 'নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি' (স্বামী বিবেকানন্দ), 'নয়নেরে দোষো কেন' (শ্রীধর কথক), 'নর্মদিনী বোলো নগরে' (নাগরে?) (দাশরথী রায়) ও আঙুরবালার সঙ্গে দ্বৈত গলায় 'বাজে মৃদঙ্গ বীণা' (তুলসী লাহিড়ী) শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল।

মহাশ্বেতা ঘোষ এই অল্প বয়সেই গুরুর আশীর্বাদ ও সুরেলা গলা নিয়ে ভবিষ্যতের ছাপ রেখে যাচ্ছিলেন। তাঁর 'এ জীবনে পূরিল না সাধ' (দ্বিজেন্দ্রলাল) ও 'আমার হৃদয় বসে মন্দিরে' (দাশরথী রায়) নিখুঁত সুরনিষ্ঠ ও মর্মস্পর্শী। রাধা-মোহনের সরস স্পষ্ট গায়কীতে অনেক স্থানগত ইঙ্গিত ছিল। একাধিকবার তিনি তাঁর বাসভূমি গীতিতীর্থ বিষ্ণুপুরের উল্লেখ করেছেন। প্রতি গানের মাঝখানে সরস ব্যাখ্যাও যতিপতন মেজাজে বিঘ্ন ঘটায়। ওটিকে একযোগে আগে সেরে নিলে ভাল হয়। সহযোগী শিল্পীরা যদি মঞ্চেই থাকতেন তবে শুধু কেবারই আর রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কাছে এলেন কেন? অথচ গুরুদেব সাহা, খোকন সেনগুপ্ত ও মনজুল মল্লিককে দিয়ে ফাঁকে ফাঁকে সুরেলা বাজনা শোনবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। মাঝখানে অন্তত পনের মিনিটের বিরতি থাকলে ক্লান্ত হত। মুকুন্দদাস - দ্বিজেন্দ্রলাল - রবীন্দ্র-নজরুলের স্বদেশী গান কিছু থাকা উচিত।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

রুদ্রপের তাস ঃ মাস্তান কাল্ট

এরকম হয়। যাঁরা ছবিতে টাকা ন তাঁরা যেকোন বাজারের হালচাল কে বদলাতে পারে। তাঁদের উপলব্ধি ই ছবি তৈরি হয়। 'আর্থিক গোল' ক উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক ফসল।

অনেক ভেবেচিন্তেই আর্থিক গোলের চক - পরিচালকরা শেষ গুলিটি ছেন। তাঁদের ঘোষণা অনুযায়ী সত্য কাল্টের হবে কিনা, সেটা পরের । তবে আমার চোখের সামনেই দক্ষিণ কাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে এই ছবির ম লাইনে একটি খাড় খোয়া যাওয়া উপস্থিত জনতার আলোচনা প্রযোজকদে ই করবার মতন।

খুব স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাস্থল চিত হয়েছে মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য তাকা। চম্বল নয়, পরিচালক আমাদের য় এসেছেন অজনগড়ে, সেখানকার জীবন দস্যু কালাপাহাড়ের অত্যাচারে যন্ত। কে এই কালাপাহাড়? কেউ ন না। **যারা তাকে খুঁজতে যায়, তারা মৃত্যুবরণ করে। যারা তাকে দেখতে পায়,** তারা অন্ধ হয়ে যায়। কালাপাহাড় অমর। বংশপরম্পরায় সে চালিয়ে যায় তার অত্যাচারের রাজত্ব।

অবশেষে নিরপরাধ পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন তরুণ বিক্রম সিং (সুনীল দত্ত)। হিন্দি ছবিতে এই এক আশ্চর্য জিনিস। ছবি দেখলে কখনোই মনে হয় না যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় পুলিশ বিভাগের। তারা শুধু বৈঠক করে ও সবকিছু হয়ে গেলে অপরাধীর হাতে হাতকড়া লাগায়।

সুনীল দত্ত, বলা বাহুল্য, সব্যসাচী। তিনি এক হাতে নায়িকাকে (লীনা চন্দ্র-ভারকর) কাছে টানেন। অন্য হাতে নায়িকার বাবার (অজিত) হৃদয় জয় করেন অপার্থ নর্মায়। নায়কের ভূমিকায় তিনি মোটের উপর চালিয়ে নিয়েছেন।

এই মারামারির মধ্যে মোমের পুতুল সেই মেয়েটি অর্থাৎ লীনা চন্দ্রভারকরের **বিশেষ কিছু করারও ছিল না। সে একটি চমৎকার ঘাগরা ও মনোহারিণী জুলফি পরে ঘুরে বেড়িয়েছে।**

গোলে খাত আমজাদ খাঁ কিন্তু এখানে একেবারে নিষ্প্রভ। বিরতির আগে পর্যন্ত চিত্রনাট্যে খানিকটা গতি ও বক্তব্য ছিল। দ্বিতীয় পর্ব ক্লান্তিকর। সুনীল-আমজাদ সংঘর্ষ কিছুমাত্র জমে ওঠেনি।

একটি দৃশ্যে পরিচালক শিবু মিত্র একটি শিশুর জন্মের সঙ্গে একটি ফুল ফুটিয়েছেন। তিনি জানেন না তাঁর শিল্পচেতনাও উন্মোচিত হয়েছে একই সঙ্গে। অলক্ষিত বিস্তারেণ।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

দৃশ্য গ্রহণের আগে ক্যামেরা নিয়ে বসে আছেন সত্যজিৎ রায়। সামনে আমজাদ খান, নৃত্য পরিচালক বিরজু মহারাজ ও নৃত্য শিল্পী শাশ্বতী সেন।

ওয়াজিদ আলি শাহ কলকাতায় এসেছিলেন

ভিক্টর ব্যানার্জি, আমজাদ খান ও উত্তম কুমার

সময় গোধূলি। রাজা ওয়াজিদ আ
শাহ তাঁর লক্ষ্ণৌ এর প্রাসাদে বসে আ
আপন ভঙ্গিতে। হয়তো বা মনে মনে
ভাঁজছেন কোন এক নতুন গানের বাণী।

চিন্তায় ছেদ ঘটিয়ে প্রবেশ করল ন
আলি নাকি খাঁ। সে বারতা আনল
রেসিডেন্সির সাহেব নাকি সই সাবুদ
রাজ্য সমর্পণের প্রস্তাব দিয়েছেন।

চকিতে ওয়াজিদ আলি ঘ
তাকালেন মন্ত্রীর দিকে। দৃষ্টিতে ক্রো
এবং বিরক্তি। রেসিডেন্সির সাহেবের এ
প্রস্তাব তাঁর কাছে নতুন নয়। মন্ত্রী
কাছেও রেসিডেন্সির সাহেব এই এক
প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

নাকি খানের কাছে তিনি জবা
দেন—রেসিডেন্সির সাহেবকে বলে
আমি তাঁর শর্তে রাজী নই। প্রয়োজন হলে
লণ্ডনেও যাবো আলোচনার জন্য।

নকি খান ধীর পদক্ষেপে নিষ্ক্রা
হলেন।

অযোধের রাজা কবি-গায়ক ওয়াজি
আলি শাহ আবার ডুবে গেলেন নিজে
মধ্যে। দিক চক্রবালে রক্তিম অস্তা
সূর্যের আভায় মনকে রাঙিয়ে নি
চাইলেন। বৈষয়িক কাজে একেবারে জড়া

আমজাদ খান (ওয়াজিদ আলি শাহ) ও ভিক্টর ব্যানার্জি (আলি নকি খান)

...বুঝলেন না—ওঁর এই ঔদ্ধত্যের ... কি হতে পারে।

প্রাসাদের ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে উঠলেন—'জোড় চলে যব ...।'

নিখুঁত ডিটেলস্-এ তৈরি লক্ষ্ণৌ-রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর আর বেগমদেরী ... ক্যামেরায় ধরেছিলেন স্বয়ং ... রায়। নকি খান ওরফে ভিক্টর ... কম্পোজিশন থেকে বেরিয়ে যাবার ... আগে যেভাবে ধরা হল ওয়াজিদ ... শাহ ওরফে আমজাদ খানের সেই ... বিষণ্ণ মুখচ্ছবিটিকে।

সতরঞ্জ কে খিলাড়ী'র জন্য ইন্দ্রপুরী ... ডান দিকের ফ্লোর-এ সেট ... নাচ ঘরের। বাঁ দিকেরটায় রাজ-... শুটিং-এর দ্বিতীয় দিন বহুরমের ... পিকচার টেক করলেন সত্যজিৎ ... স্টুডিওর লনের মধ্যেই, তাসা বাজিয়ে ...।

আর তৃতীয় দিন শুটিং হোল ... সঙ্গে গাওয়া একটি ঠুংরীর সঙ্গে ... সেনের নাচ। বিরজু মহারাজের ... এই নৃত্য দৃশ্যটি এবং গান ... উল্লেখযোগ্য অংশ। ঠুংরীটি নিজেই ... বিরজু মহারাজ। গানটি হোল—

...মায় তো হারি
...শাড়ি,
...বিহারী,
...হ মায় দুঙ্গি তোহে গারি।

এই দৃশ্যে ওয়াজিদ আলি শাহ্ ভোরের আমেজ নিয়ে নাচ ঘরে বসে আছেন। পরণে জরির পোষাক, মাথায় শ্বেতশুভ্র পালকের মুকুট। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সুদৃশ্য গড়গড়া টানছেন। সামনে বাঈজী নাচছে। কাটা কাটা কিছু কম্পোজিশনে সুন্দর করে ফিল্মাইজ করেছেন নাচটিকে। প্রায় ছ' মিনিটের গান ও নাচ।

ওয়াজিদ আলি সাহেব এই চারদিনের কলকাতা আগমন ও অবস্থান শেষ হোল সোমবার। আমজাদ খানকে প্রশ্ন করেছিলাম—'কেমন লাগছে?'

একবারে এই সাতাত্তর সালের একজন সাধারণ মানুষের মত তিনি জবাব দিলেন—'সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করছি। খারাপ লাগার কোন স্কোপ আছে নাকি?'

সত্যজিৎবাবুও আমজাদ খানের কাজে খুশী। ওঁর অভিনয়ের রেঞ্জ তাঁকে অভিভূত করেছে।

ওয়াজিদ আলি শাহ্ আবার আসবেন কলকাতায়। বোধহয় এপ্রিলে। জেনারেল আউটরামের সঙ্গে তখন মোলাকাৎ হবে তাঁর। ইতিমধ্যে সত্যজিৎবাবু পাড়ি দেবেন সাগর পারে জেনারেল আউটরামের খোঁজে।

আর আমজাদ খান ওরফে ওয়াজিদ আলি শাহ্ বান্দ্রী ফ্ল্যাটে বসে নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিজের গানে সুর ভেঁজে যেয়ে উঠবেন—'হিন্দোলা ঝুলে শ্যাম...'

নির্মল ধর

যাত্রাদলের জবানবন্দী

'আমি পূর্ণ মোড়ল। পুরো নাম যা দলিল খতিয়ানে লেখা থাকে, তা শ্রীপূর্ণ-চন্দ্র মণ্ডল। পিতা 'রামচন্দ্র মণ্ডল। সাকিন-হৃদয়পুর, জিলা-বর্ধমান। পাশাপাশি চার-পাঁচটা মৌজার মোট পাঁচ আনি অংশের অংশীদার ছিলাম আমরা হৃদয়পুরের মোড়লরা। আমার ভাগে আগে ছিল দু-তিন শ' বিঘের মতো ধানী জমি, পুকুর বাগান ডাঙা ছাড়া। এখন সাড়ে বারো একর।

আমার দুই মেয়ে। দুজনেরই বিয়ে দিয়েছি। একসময় গ্রামের দলে ফিমেল রোলে পালা গাইতাম। নাম-ডাকও ছিল।

কলিকাতায় এসেছি-নতুন যাত্রাদল করার বাসনায়। চিৎপুরে গদিঘর চাই। লোক লাগিয়েছি দু-চারজন। খবর আসে, ১৫-২০

হাজার টাকা নাকি সেলামি দিতে হবে একটা ঘরের জন্য। এটাই রীতি। নতুন টেলিফোন চাই—তার জন্য এখনি জমা দিতে হবে ৩০৫১ টাকা। ১৩ বাই ৩ ফুট মাপের একটা সাইনবোর্ড, ৪০০ থেকে ৭০০ টাকা।

নায়কের খোঁজে বেরিয়ে জানতে পারলাম, স্বপনকুমার জনতাতেই, আর তপন-কুমার নিউ গণেশেই থেকে যাচ্ছেন। শক্তিমান অভিনেতা পূর্ণেন্দুবাবু, অনাদি চক্রবর্তী, গুরুদাস ধাড়াও পুরোনো দলেই থাকবেন। ইন্দ্র লাহিড়ী-ছন্দা চ্যাটার্জি-জুটি নব-রঞ্জন ছাড়ছেন না।

নায়িকা জ্যোৎস্না দত্ত শিল্পীতীর্থে আর বর্ণালী ব্যানার্জি লোকনাট্যেই থেকে যাচ্ছেন। দিলীপ চাটুজ্যে মশায়ের তো আবার নিজের দল—গণনাট্য। রীতিমত সংকট। বকস নায়ক-নায়িকা এখন পাই কোথায়? দল চালাতে হলে চাই দক্ষ দল-পরিচালক। তরুণ অপেরার তারাপদ ঘোষ মশায়, শিল্পীতীর্থের দীনেশ নন্দী, মোহন অপেরার মধু বড়াল, নিউ প্রভাসের রমেন দাসমল্লিক, সত্যম্বরের বিমান ঘোষ, গণ-নাট্যের শংকর কোলে, চন্দ্রালোক অপেরার বকুল খাঁ, ভারতীর জানকী মেন্দা প্রদীপের দেবপ্রসাদ হাজরা, নিউ রয়েলের সুদাম চক্রবর্তী, লোকনাট্যের রঞ্জিৎ রায় তাঁদের পুরোনো গদিতেই থেকে যাচ্ছেন, শুধু থেকে যাচ্ছেন বললে ভুল হবে, আগামী বছরের পরিকল্পনা নিয়ে খুব ব্যস্ত।

আমি হৃদয়পুরের পূর্ণ মোড়ল, একটা নতুন দল করতে চাই, সেটুকু শোনারও সময় নেই ওনাদের। নিউ গণেশের যামিনীবাবু দেশে গেছেন শুনলাম। বিজয় মিত্তির মশায়কে খুঁজে পেলাম না। আচ্ছা সমস্যা তো! সংগীত পরিচালনার জন্য প্রশান্ত ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ সরকার, অনিল বাগচি, অমল মুখোপাধ্যায়, তরুণ মুখার্জি, অধীর বাগচি, অহীন ঘোষ এঁদের বাড়ি দৌড়তে হবে। কখন যাব, আর কখনই এঁদের পাওয়া যাবে ভগবান জানেন। হারমোনিয়াম মাস্টার পঞ্চানন মিত্র, ধাদুবাবু, গুপেন মাস্টার, হিমাংশু ধাড়া, অজিত আশ্চ যাঁরা পালা আরম্ভের আগেই জমিয়ে দেন আসর, তাঁদের পাওয়া যাবে না আমার দলে—কেননা দল ছাড়বেন না।

কনেট বাজিয়ে খোকা মল্লিক বা [illegible] দাসকে পেলে বেশ হত। কিন্তু এখ[illegible] সেই এক কথা। দল-বদল না। ক্যারিওনে[illegible] বাসুদেব গোবদার, যিনি প্রয়োজনে যে[illegible] বাজনা বাজাতে পারেন, অল রাউ[illegible] তাঁকেও পাওয়া যাবে না।

পালাকার ভৈরব গাঙ্গুলী, উৎপল[illegible] শৈলেশ গুহনিয়োগী, অরুণ রায়, [illegible] ভট্টাচার্য, কানাই নাথ, আনন্দময়[illegible] নাথ, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন দে[illegible] সবাই নাকি এ-বছরের নতুন পালা [illegible] দলকে দিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। [illegible] মতো লেগে থাকতে পারলে পালা প[illegible] সম্ভাবনা আছে যদিও। সুর পার্টির [illegible] বেহালা, অ্যালথোর্ন, জুরি এসবও তে[illegible] পোষাকের বাকস চাই খান পাঁচেক[illegible] পক্ষে ২০টা মেক-আপ বাকসের জন্য [illegible] আয়না, ডিবে, রং, টিউব, সবেদা, [illegible] রুজ, ব্রাশ, তুলি, স্পিরিট গাম,ফেস প[illegible] ক্রেপচুল, আলতা, রীতিমত দুর্গা[illegible] আয়োজন। বরণডালা সাজানোর মতো।

ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, [illegible] পালার ড্রেসের জন্য দর্জি এসেছিল [illegible] দিয়েছে ১৭, ১৫, ৭ হাজার টাকার [illegible] [illegible] লাগবে দশ-বারোটা। [illegible] আয়নাও চাই। নকল তলোয়ার বন্দু[illegible] পাঁচ শ' টাকার মতো।

থালা গ্লাস বাটি চাই কুড়ি জো[illegible] পেতলের কিনব না ইনডেলিয়ামের।

একটা বাস ভাড়া করতে হবে। মোবিল, ড্রাইভার-ক্লিনারের খোরা[illegible] চারশ' টাকা দৈনিক ভাড়া দিতে হ[illegible] মালিককে। একটা পুরনো প্রাইভেটক[illegible] ১২-১৪ হাজারে [illegible] [illegible] খোঁ[illegible] হবে। পোস্টার, হ্যান্ডবিল, [illegible] বিল, বায়নাপত্র এসব ছাপার জন্য [illegible] করতে হবে।

এ [illegible] দেখছি রীতিমতো [illegible] আয়োজন। এত করার পরেও যদি [illegible] হয় তখন কুলদা গাঙ্গুলী, অনিল [illegible] জীবন মুখার্জি, শৈলেন পাল, [illegible] আছেন, ব্রোকার, শতকরা ছয় থেকে [illegible] পেলেই এঁরা খুশি। দল চলে যা[illegible] বাংলার সর্বত্র।"

পূর্ণচন্দ্র মণ্ডলের এই জ[illegible] আমি লিখিত অবস্থায় রবীন্দ্রকান[illegible] কৃষ্ণ দেবের মূর্তির পাশে কুড়ি[illegible] ছিলাম। জানি না তিনি কোনো [illegible] করছেন কিনা। তবে এ-বছর চিৎ[illegible] যে চারটি নতুন দলের ঘোষণা [illegible] তাদের নাম, নাগ কোম্পানী, য[illegible] তীর্থ এবং শিল্পীমহল।

প্রভাত

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

বিভূতি রচনাবলী

সুলভ সংস্করণ

॥ প্রথম খণ্ড এই সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে ॥

*

গ্রাহকদের পক্ষে মূল্য ম[illegible] কুড়ি টাকা

*
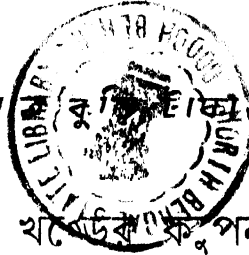
গ্রাহকগণ দয়া করে প্রথম খণ্ডের কুপন ও মূল্য কুড়ি টাকা দিয়ে নিম্নোক্ত কাউন্টার থেকে পুস্তক সংগ্রহ করুন।

*

যাঁরা রেজেষ্ট্রী ডাকে নিতে চান তাঁরা প্রথম খণ্ডের কুপন ও মূল্য ডাকব্যয়সহ মোট ২৩ টাকা ৭৫ পয়সা নিম্নলিখিত ঠিকানায় অগ্রিম পাঠাবেন। **রচনাবলী ভিঃ পিঃতে পাঠানো যাবে না।**

*

কাউন্টার থেকে সংগ্রহের সময়ঃ—

প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৬॥টা

শনিবার বেলা ১২টা থেকে ২টা

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৮৩।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯ (কলেজ স্ট্রীট জং)

২২ এপ্রিলের প্রচ্ছদ কাহিনী

আমাদের জীবনে পাখি

আমরা ছেলেবেলায় মায়ের কাছে ঘুম পাড়ানী
গানের কথায় প্রথম পাখির কথা শুনি। তাই
বুলবুলির ধান খাওয়া কিংবা ল্যাজ ঝোলাকে
গুড় ছোলা খেতে দেওয়ার গান থেকেই পাখির
সঙ্গে আমাদের পরিচয়।...........

লিখেছেন বিদ্যুৎ বন্দোপাধ্যায়,
কাজল মিত্র; সিদ্ধার্থ রায় এবং আরো একজন!

আপনাদের জন্য গল্প লিখেছেন
অরণ্য সেন প্রশান্ত চৌধুরী অমর মিত্র
কল্যাণ সেন নবকুমার বসু শিশির লাহিড়ী
অমল চন্দ সেলিনা হোসেন
পর পর বিভিন্ন সংখ্যায় এদের লেখা পাবেন

আমরা তিন নবীন কবিকে
প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছি
জীবন সম্পর্কে কবিতা সম্পর্কে
কবির জবানীতে কবিকে চিনতে পারবেন

২৯ এপ্রিলের প্রচ্ছদ কাহিনী

তিন কবি

পর পর বিভিন্ন সংখ্যায় পাবেন

মহাবিহার জগদ্দল এখন কোথায় ?
লিখেছেন গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
বাংলাদেশের উপন্যাস : একটি সমীক্ষা
লিখেছেন দিলীপ মালাকার
বাংলা গান স্বল্পায়ু কেন ?
লিখেছেন সুধীর বন্দোপাধ্যায়
যাদুপট ও যাদুপটুয়া
লিখেছেন সুধাংশুকুমার রায়
শ্রীশ চিত্রকর প্রসঙ্গে
প্রভাত চৌধুরী

শুক্রবার ২৫ চৈত্র, ১৩৮৩

Friday, 8th April, 1977

১৬ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা

সম্পাদকীয় ৪

সপ্তরের কবিতা ৫ গৌতম চৌধুরী, দেবীপদ মুখোপাধ্যায়, বেণু দত্তরায়, শমিত সান্যাল

সাহিত্য ৬ বৈকুণ্ঠ পাঠক

চিঠিপত্র ৭

অমৃতবিচিত্রা ৫৮—৬৪

কনবিবি উপাখ্যান (উপন্যাস) ৩৭ বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

...ফিলম (উপন্যাস) ৪১ অদ্রীশ বর্ধন

পার্সিপোলিসের পথে ৫২ সবিতা ঘোষ

...ষি ৫৫ সুভাষ রায়চৌধুরী

কবিতা সিংহের কবিতা ৫৬

সমালোচনা ৫৭

নববর্ষে থাকছে

বুদ্ধদেব গুহ
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের
উপন্যাস

প্রচ্ছদ কাহিনী ১৪-২৭
সক্রেটিসের জবানবন্দী / শিশির দাশ
কলকাতায় একজনও নাস্তিক নেই / প্রিয়দর্শী
আলেকজান্ডারের ভারতত্যাগের কারণ / নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রেম ভালবাসার গল্প ৮-১৩
তার নাম সে / দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

...ছে ছিলো / তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪

...সিদ্ধেশ্বরী দেবী / সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮

ভারতবর্ষ ও ইসলাম / সুরজিৎ দাশ গুপ্ত ৩৩

...চিৎকার (গল্প) / হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ২৭
...তের রেখা (গল্প) / সুনীল জানা ৩০

প্রকাশিত বিবেকানন্দ ও
...পেক্ষিতা ক্রিস্টিন / প্রণতা দে ৪৭-৫১

প্রচ্ছদ
সুবোধ দাশগুপ্ত

গৌতম রায়
অঙ্গসজ্জা

আগামী সংখ্যায়

প্রেম ভালবাসার গল্প

ভোলা কঠিন
প্রভাত চৌধুরী
গল্প লিখেছেন..
অরণ্য সেন
কবিতা লিখেছেন
সুনীলকুমার নন্দী
গোপালচন্দ্র রায়ের নিবন্ধ
যশোহরে শরৎচন্দ্র
কলকাতার প্রথম সম্পাদক নিয়ে
দেবেশ মুখোপাধ্যায়ের
আলোচনা

প্রচ্ছদ কাহিনী

রবীন্দ্র সঙ্গীত

লিখেছেন
শান্তিদেব ঘোষ
দেবব্রত বিশ্বাস
কানন দেবী
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
একরাম আলি

সিনেমা, মুনাফা

এবং জনরুচি

বম্বের সিনেমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কোন কোন মহল থেকে
কিছুকাল আগে অভিযোগ করা হয়েছিল, ফিল্ম সেন্সর বোর্ড নাকি চলচ্চিত্র তৈরির ব্যাপারে
তাঁদের নানাভাবে বাধা দিচ্ছেন। সম্প্রতি সে অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে,
শুধু হিংসাত্মক এবং যৌন আবেদনমূলক দৃশ্য দেখানোতেই কিছু বিধিনিষেধ আরোপ
করা হয়েছে, অন্য ব্যাপারে নয়।

একথা সকলেই জানেন, এক ধরনের হিন্দি ছবিতে
বেশ কিছুকাল ধরেই মারপিট খুনোখুনী এবং স্থূলে ধরনের যৌন আবেদনের দৃশ্য দেখিয়ে
বাজার মাৎ করার চেষ্টা চলে আসছিল। কাজেই সেদিকে সরকারী নজর পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়,
বরং বলা চলে সময়োচিতই।

দেশের বেশির ভাগ মানুষ এখনও নিরক্ষর, তাদের কাছে অবসরবিনোদনের
একমাত্র উপায় হল সিনেমা। সেজন্যে আমাদের মতো দেশে শুধু চিত্তবিনোদন নয়,
প্রচার ও লোকশিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও সিনেমার গুরুত্ব অপরিসীম। দিনের পর দিন সিনেমার
ভেতর দিয়ে যদি নানাভাবে অসামাজিক এবং অপরাধমূলক দৃশ্য দেখানো হয়,
তাতে মানবিক মূল্যবোধেরও অবক্ষয় সুনিশ্চিত। এই দিক থেকে বিচার করে প্রযোজক ও পরিচালকেরা
যদি নিজেরাই তাঁদের কাজের পদ্ধতি ঠিক করে নেন তাহলে ভালো হয়। শুধু মোটা অংকের
মুনাফা-শিকারই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না, সেটা শোভনও নয়।

হিন্দিতে 'অচ্ছুৎকন্যা'র সময় থেকে ভালো ছবি অজস্র হয়েছে।
এখনও অনেক প্রতিভাবান পরিচালক ভালো ছবি উপহার দিচ্ছেন। প্রশংসা ও পুরস্কারও
তাঁরা কম পাননি। কিন্তু অর্থনীতির সেই বহু পরিচিত সূত্র—খারাপ টাকা ভালো টাকাকে বাজার
থেকে হটিয়ে দেয়—সেটা তো শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।
খারাপ ছবি দেখে রুচি যদি নিচু মানে নেমে যায়, ভালো ছবির সমাদর তাহলে কমে যাবে—
এটা খুবই স্বাভাবিক। এবং সিনেমা তৈরির জন্যে টাকা লগ্নী করতে হয় বেশি বলে
ভালো ছবি তৈরি করার ব্যাপারে প্রযোজকদের উৎসাহও যে চক্রবৃদ্ধি হারে কমে যাবে এও স্বতঃসিদ্ধ।

ঘটছিলও ঠিক সেই রকমই। ভালো ছবি তো উৎখাত হচ্ছিলই, খারাপ ছবির সঙ্গে
বাজার জাঁকিয়ে বসছিল আরো খারাপ ছবি। জনরুচিরও অধঃপতন ছিল বল্গাহীন।

কিছুটা নিয়ন্ত্রণ যে সেজন্যে জনস্বার্থেই জরুরী হয়ে
উঠছিল তা অনস্বীকার্য। প্রযোজকেরা তাঁদের জাতীয় দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন হলেই সমস্যার কোনো
কারণ থাকবে না।

সত্তরের কবিতা

পুনরুক্তি

দেবীপদ মুখোপাধ্যায়

তোমাকে দেবার মতো কিছু নেই আর, একদিন নিজস্ব ফোয়ারা
আমি খুলে দিতে চেয়েছি গোপনে, তখন চর্চিত ফুলের সঙ্গে
নিশি-ঘামে প্রস্তুত ছিলে না তুমি, বস্তুত চাওনি তুমি
জানীর ভিতরে মূঢ় কঙ্কালের মতো ন্যাংটো আমার কবিতা
আমার কবিতা ? সে তো নয় রহস্য-ল্যাটিম
ঘুরে ঘুরে খুলে যাবে আমর্ম জ্যোৎস্নায়।

প্রিয়, তোমাকে উৎসর্গ করার মতো কিছু নেই আজ
তুমি নও টোটেম-বালিকা, জেনে নেবে বিদ্যুৎ, সীবনশিল্প
কাঁচ-কড়া, পুরুষের যাচ্ঞার দীনতা
পয়ঃপ্রণালী ছাড়া তুমি জানো কোটাপ্রিন্ট, তসর, পাটোলা
তুমি জানো ঐসব তন্তুবায় সমিতির বাৎসরিক হিসাব নিকাশ,
এভাবেই জানো তুমি ট্র্যাফিকের সমস্ত সিগন্যাল,
শীতকাল এলে তাই ঢুকে পড়ো শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত স্বপ্নের ভিতর
যেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হয় আমাদের চিত্রতারকার।

আমি ও জিরাফ

গৌতম চৌধুরী

বাড়ীজের দূরত্ব থেকে নদীকে দেখেছি—স্পর্ধাতীত
রহস্যের কাছাকাছি বেঁকে যেতে, হলুদ মাস্তুল
ওইখানে ভাঙছে চুরছে, অগস্টের ফিরোজা নৈঋত
যাবতীয় চক্ষুহীনতার শান্তি কোরেছে ভণ্ডুল
স্থিতাবস্থা রেখে যাই সেফটি ভল্টে তবুও আপ্রাণ
শহরে সম্পত্তি নেই, কৃষিঋণ হ'য়েছে তামাদী
জ্বলন্ত জিরাফটি শুধু নদীপথে আজো অফুরাণ
ফেলে রেখে চলে গ্যাছে ডাইনোসর বাড়ীজের সমাধি
গভীর মজ্জায় আজো পরিমাণ মিশে আছে খুব
শিল্পের লড়াই হবে তার সাথে আজ, বাস্তুসাপ
কীভাবে খ্যাদাতে হয় দ্যাখাবে সে, বধির কৌস্তুভ
হাজার বজ্রের মতো জ্বলে উঠবে, জাগবে অনুতাপ
পুরোনো ডায়েরী পড়ে, বাড়ীজটি দুলতে থাকবে, লম্বা ডুব-
সাঁতারের রুপোলী পাখনায় খেলবো—আমি ও জিরাফ

তিনি যখন কবিতা লেখেন

বেণু দত্তরায়

তিনি যখন কবিতা লেখেন, মাখন-শুন্দ রুটি
পেয়ালা-পিরীচ কফির চামচে
নাচতে থাকে বাদামি জল
সেদ্দ ডিম প্রাতরাশের আলোয়—
তিনি যখন কবিতা লেখেন, ঢোকো কাচে
জঙ্গী মাছি দুটো আসে.

রেখে দেন তাঁর ঠোঁটে কিছু ভয় ও ভাবনা
নালিশ ও আধবোঁজা ঠোঁটে
কিছু অবাক মাইলস্টোন

গতকাল সকালেও তিনি ছিলেন আশ্চর্য শান্ত
আজ সকালে
নিষ্পত্র গুলমোরের শুকনো শাখা
কাল রাত্রেও তাঁকে ঠকিয়েছে
কয়েকটা রুপোলি চুল ও কয়েক গুচ্ছ
কান্না, তিনি যখন
কবিতা লেখেন, মুঠোয়
আঁকড়ে ধরেন অভিশপ্ত ছুরিটি

এখানে সে প্রার্থনারতা

শমিত সান্যাল

সম্রাজ্ঞী ঘুমিয়ে আছো, নাকি প্রার্থনারতা ?
এইখানে এসে দ্যাখো, কেমন করে মূক বাসনা লালন করছি
কেমন করে মাথার ওপর ছায়া দিচ্ছি—
তুমি জানো, এখন আমার আঙুলে আছে চাঁদ
ঘুমের বদলে ঘষা কাঁচ, স্বপ্নের বদলে বৃষ্টি এবং সন্ধ্যে
স্মৃতির বদলে ব্যক্তিগত, সুনীল অভিমান ?
নতজানু হতে গিয়ে হাঁটুঘেরা ক্ষত দেখি মাঠে
অলৌকিক ছায়া অবলীলায় সবকিছু খায়
ফুল ছেঁড়া হয়—হাতের আঙুলে নড়ে ওঠে চাঁদ
আবরণহীন বুক জুড়ে, চোখ জুড়ে নাচে ব্যথা
পথ ঘিরে একটাই নিস্তরঙ্গ গান
পথ জুড়ে একটাই সিঁড়ি, একটাই নিদ্রাহীন কথা,
সব পথ ভরে থাক ঘাসে, সব চোখ ধর্মহীন জলে
সমস্ত শহর জুড়ে মাঠ হোক—মাঠের আঙিনা ঘিরে পা,
হে সম্রাজ্ঞী, তুমি জানো এইসব ইচ্ছের গোপন ভূমিকা

সাহিত্যে গুদাম সাবাড় সেল
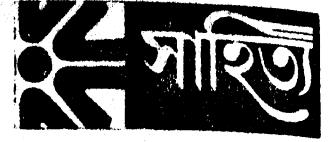
শীতকালের মুখে মুখে কিংবা নববর্ষের গোড়ায় অনেক কাপড়ের দোকান শোকেসে সেলের লেবেল এ'টে দেন। বাণিজ্যে অনেক পদ্ধতির ভেতর সেল একটি অন্যতম পাশুপত। খদ্দের মোহন বা ধরার এই অস্ত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত। আসবাব, পোশাক, স্ক্রু-ড্রাইভার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমরা লট ধরে কম দরে সেল হতে দেখেছি।

পাঠক। পাশের চিঠিখানি পড়ুন।

আপনার পড়া হয়ে গেলে তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব।

সম্প্রতি বই মেলায় গিয়ে একজন পড়ুয়া মানুষ বই বাজারে সস্তায় ওই বইগুলি পেয়েছেন। পেয়ে তিনি প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ। তাই আমাদের কাছে চিঠি লিখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

সম্প্রতি কলকাতা বই মেলায় বিশেষ সস্তায় বই বিক্রির জন্য এমন একটা 'বই বাজার' হয়েছিল—লোকমুখে শুনেছি। সেখানে শ্রদ্ধেয় লেখকদের দামী বই প্রায় লে লে বাবু ছে আনা ধাঁচে বিক্রি হয়েছে।

লেখকরা প্রায় সবাই জীবিত। প্রায় প্রত্যেকেই আমাদের বাংলা ভাষার গর্ব। এই বইগুলি জনসাধারণ যদি এত সস্তায় পান তবে তো খুবই সুখের কথা।

ভালো বই। কম দাম। কে না চায়।

বইগুলি নেড়েচেড়ে যে প্রকাশকের নাম পাচ্ছি—তাঁরা প্রকাশনার জগতে অত্যন্ত সৎ ও শ্রদ্ধেয় নাম। লেখকের প্রাপ্য তাঁরা সসম্মানে দিয়ে থাকেন।

তবে কি তাঁরা জনহিতে বই মেলার মত বিশেষ উপলক্ষে প্রকৃত বুভুক্ষু পাঠকদের জন্যে এই সুন্দর ব্যবস্থা করে থাকেন। করে থাকলে খুবই মহৎ উদ্দেশ্য।

আমাদের মনে অন্য কয়েকটি প্রশ্ন আসছে। যেমন—

১। লেখকের এই বইগুলি যদি বিক্রি হয়ে না থাকে তাহলে কি আরেকটু ধৈর্য ধরার পথ ছিল না?

২। এর ফলে কি লেখকের শুভনামে দাগ পড়ে না?

৩। কোন প্রকাশক কি বাণিজ্যিক ক্ষতি স্বীকার করে ১৫ টাকার জিনিস পাঁচ টাকায় দিতে পারেন?

৪। যদি দিতে পারেন—তাহলে কি অতিরিক্ত দামের লেবেল এ'টে বাজারে বই প্রকাশ করা হয়? যে-জন্যে তিন ভাগের এক ভাগ দামেও বই বিক্রি করলে কোন লোকসানে পড়তে হয় না।

৫। যেহেতু লেখককে তাঁর প্রাপ্য দেওয়ার ব্যাপারে এই প্রকাশন প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সৎ—তাহলে লেখক যদি মনে করেন—যা বলা হয়—তার চেয়ে কি বেশি ছাপা হয়েছিল?

৬। একই লেখকের বই অন্যত্র সুন্দর কাটে। সংস্করণ হয়। আপনাদের হাতে তাঁর বই চলে না কেন? এটা কি আপনাদের অক্ষমতা নয়?

৭। বিজ্ঞাপন কি প্রকারের? একবার দু'বার দিয়েই ডুব? না, বিশেষ কয়েকজনের জন্যে ঘন ঘন—অন্যদের বেলায় একদম কিছু না?

আমরা এই প্রকাশন সংস্থার সাহিত্যরুচি ও সাহিত্য সম্পর্কে আন্তরিকতায় শ্রদ্ধাশীল। যেসব লেখকের নাম পাশের পৃষ্ঠায় পত্রলেখকের চিঠিতে রয়েছে—তাঁদের লেখা আমরা যৌবনের শুরু থেকেই সশ্রদ্ধভাবে পড়ে আসছি। সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রফুল্লকুমার সরকার, মুজতবা আলী, পূর্ণেন্দু পত্রী, অমিতাভ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ, লীলা মজুমদারের লেখা কত আদর করে আমরা পড়ে আসছি। এ'দের লেখা এভাবে এমন সস্তায় পাওয়া যেমন ভাগ্যের—তেমনই যেসব প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে—তার একটিও সঠিক হলে—ততটাই দুঃখের।

এই শ্রদ্ধেয় লেখকরা লেখকের ধর্ম অনুযায়ী প্রকৃষ্ট অর্থেই দুঃসময়ে প্রতিবাদ করতে কখনো দ্বিধা করেননি। এখানে বিশেষ করে এই ব্যাপারে তাঁরা যদি ভাগ্যবান পাঠকদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করেন—তাহলে তা হবে যথার্থই সময়োচিত।

কেননা, অন্য আর যা কিছুই গুদাম সাবাড় করে সেল করা যাক—সাহিত্যের ব্যাপারে তা যেন কেন মনে নেয় না।

বৈকুণ্ঠ পাঠক

যে দেশে ছাপার কর্ম চালিত না হইয়াছে। সে দেশকে প্রকৃত সভ্য বলা যায় না। এই দেশে পূর্বকালে কতক লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত। এখন এই দেশে ক্রমে ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় সকল ঘরে ব্যাপ্ত হইতেছে—যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এইরূপে এদেশে বিদ্যার প্রসার হইতেছে।

সমাচার দর্পণ
২০ জানুয়ারি, ১৮১৯ খৃঃ

অন্যত্র

একুশ শতাব্দীর চলচ্চিত্রকার শ্রীঋত্বিককুমার ঘটকের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলো এই সেদিন। হাসপাতালের নির্জনতম প্রকোষ্ঠে। তখন শীত এবং মধ্যরাত। তারপর সারারাত এবং দিন।

কোলকাতার খোজা কালচারের কোনদিনই চওড়া কাঁধ ছিলো না। অতএব ট্রাক—সে তার উল্টোপিঠে চাপিয়ে, ক্যাওড়াতলার যখন মাল খালাস করলো—রাত তখন সাড়ে আটটাতো হবেই।

বস্তুত আমরা সকলেই, লিকামটা যাদের আদ্যন্ত বিলা হয়ে গেছে—শোকে মোহামান। শোকাকুল পুরীষের স্বতোৎসারণে আমাদের অক্ষম অপুষ্ট পাছা সকলের তদগত দচকে যাওয়া এবং অবধারিত ভাবেই ফুল, ফ্যাশ, মুভি, মালা, কেত্তন, রেট্রোস্পেকটিভ............।

মারহাব্বা! ছমকাও টৌনছা ছমছমাছম ছমছমাছম।

এত ভালোবাসা! ভালোবা-স্-সা!, মানকি মেরে মড়মড়ি—দাদাগো, তবু তোমার কষ বেয়ে ঐ ভয়ংকর হাসিটা গড়িয়ে পড়ছিলো কেন?

যিনি দুলছিলেন,—অর্থাৎ তিনি, ন্যাংটো ঘড়িটার নংকু —দুলতে থাকলেন—সম্ভবত দুলতে থাকবেন।

ওসব এখন প্রাগৈতিহাসিক। কয়েকশো কোটি মুহূর্তের।

শুধু একটা মালা—যে সহমরণ চেয়েছিলো, নিঃশব্দে আত্মহত্যা করলো পাশের আদিগঙ্গায়।

ঋত্বিকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়।

শব্দ। প্রতীক সংখ্যা।। ১৩৮৩

এক টাকায় সন্তোষকুমার, গৌরকিশোর

চিঠিপত্র

প্রিয় সম্পাদক,

সাপ্তাহিক 'অমৃত', ১১।১ আনন্দ চাটার্জি লেন, কলকাতা।৩

আপনি কি জানেন গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই মার্চ কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের বিপরীত ময়দানে যে বইমেলা বসেছিল সেই মেলা থেকে আমার প্রিয় লেখকদের কিছু বই আমি অবিশ্বাস্য কম দামে কিনেছিলাম। আমি একজন সামান্য পাঠক। বই পেলে খুশী হই। মাঝে মাঝে টাকা হাতে এলেই কলেজ স্ট্রিট পাড়া থেকে বই কিনি। কিন্তু আজকাল যা বইয়ের দাম তাতে কেনা তো দূরের কথা হাত দিয়েও ছোঁয়া যায় না। অথচ বইমেলায় গিয়ে একসঙ্গে এতগুলো বই সস্তা দামে পেয়ে যাওয়ায় চমকে উঠেছিলাম—এমনকি একটি টাকার বিনিময়ে ভাল একটা বই সংগ্রহ করতে পেরে নিজেও আমি মুগ্ধ।

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন—আপনার মত আমার পরিচিতরাও বিশ্বাস করতে চায়নি প্রথমে। কিন্তু পরে সব দেখেশুনে আপশোস করেছিল। এই তো দেখুন না আমি ও আমার দুজন বন্ধু মিলে যে বইগুলো কিনেছি তার যা দাম ছিল আর যে দামে আমি পেয়েছি তা শুনে আপনারও হাত কামড়াতে ইচ্ছে করবে।

যেমন ধরুন—

	যা দাম ছিল	যে দামে পেয়েছি
সুবোধ ঘোষ। বাসরদত্তা	৪-০০	২-০০
,, । কালকেতু	৭-০০	৪-০০
নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সেতু বন্ধন	৭-০০	৪-০০
সন্তোষকুমার ঘোষ। সময় আমার সময়	৫-০০	২-০০
,, । জল দাও	৩-৫০	১-০০
মুজতবা আলী। দু'হারা	৭-০০	৪-০০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এই তার পুরস্কার	১৫-০০	৭-০০
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দিন রাতের খেলা	১০-০০	৫-০০
অমিতাভ চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা	৫-০০	৩-০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। কুবেরের বিষয়-আশয়	১৫-০০	৭-০০
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। নিশীথ ফেরী	৫-০০	২-০০
ঊর্মিলা হাকসার। নিজেকে নিয়ে	১০-০০	২-০০
গৌরকিশোর ঘোষ। দুষ্টুর দুপুর	৩-০০	১-০০

এ'ছাড়াও বইবাজারে আরো বই পেয়েছি সেজন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ। ভাল ভাল বই এমন কম দামে ইতিপূর্বে আর বিক্রী হতে দেখিনি। আর যে যে বই পাওয়া গেছে তার মধ্যে—

	যা দাম ছিল	যে দামে পেয়েছি
প্রফুল্লকুমার সরকার। লোকারণ্য	৪-০০	১-০০
সুবোধ ঘোষ। বন উপবন	৬-০০	৪-০০
,, । জিয়াভরলি	৮-০০	৫-০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। সারারাত	৫-০০	৩-০০
নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ময়ূরী	৩-০০	২-০০
রবি গুহমজুমদার। মানুষ দেবতা হবে না	৩-০০	১-০০
প্রবোধকুমার সান্যাল। জনম জনম হম	৫-০০	২-৫০
শুভ্রাংশু গুপ্ত। অনুপ্রবেশ	৪-০০	২-০০
,, । দেহ নয় মন	৪-০০	২-০০
মুজতবা আলী। প্রেম	৫-০০	৩ ০০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। দ্বিতীয় প্রেম	৫-০০	১-০০
সুশীল রায়। আম্বতীর্থ	৪-০০	২-৫০
ধনঞ্জয় বৈরাগী। নুনের পুতুল সাগরে	১০-০০	৭-০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাক্ষী বালুচর	৫-০০	২-৫০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। স্বর্গে তিন পাপী	৬-০০	৩-০০
মিহির মুখোপাধ্যায়। শঙ্খমালা	৫-০০	২-০০
সমরজিৎ কর। একটি সংকেতের জন্য	৬-০০	৩-০০
শংকরলাল ভট্টাচার্য। এই আমি একা অনা	৪-০০	২-০০
ইন্দ্র মিত্র: শুভদিন	৬-০০	৩-০০
সুধাংশু ঘোষ। কে বাজায়	৬-০০	৩-০০
অভ্র রায়। হৃদয়ের শব্দ	৭-০০	৩-০০
শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সমুদ্র স্নান	৫-০০	২-০০
সুরজিৎ দাশগুপ্ত। বিদ্ধ করো	১০-০০	৫-০০
প্রফুল্লকুমার সরকার। প্রবন্ধ সংগ্রহ	৫-০০	১-০০
সুধীর ঘোষ। গান্ধীজীর দূতে	১৫-০০	৫-০০
বিশ্বদেব বিশ্বাস। কাঞ্চন জঙ্ঘার পথে	৫-০০	৩-০০
গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথকে যেকথা বলা হইল না	৬-০০	২-০০
অমিতাভ চৌধুরী ও পূর্ণেন্দু পত্রী। ইকড়ি মিকড়ি	৩-০০	২-০০
এম আর আখতার। রূপালী বাতাস	৫-০০	২-০০
আনন্দ বাগচী। বনের খাঁচায়	৫-০০	২-০০
লীলা মজুমদার। বাতাস বাড়ি	৪-০০	২-০০
অমিতাভ চৌধুরী। তেপান্তরের মাঠে	৩-০০	১-০০

অবশেষে একটা কথা না বলে পারছি না যে এমন একটি মেলার অপেক্ষায় এখনো অপেক্ষা করে আছি।

২৬শে মার্চ, ১৯৭৭

শচীন দাশ
এ।১১১ বাঘা যতীন
কলকাতা।৩২

হে খোদা, তুমি আমায় আরো দীর্ঘজীবী করো। আমি যেন আরো পড়তে পারি।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ

বই যে আমাদের জীবনে এত বড়ো জায়গা জুড়ে আছে, তার কারণই এই যে তা আমাদের অবসর সময়ে আনন্দ দেয়, এবং সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত করে, প্রতিদিনের জীবনকে সুন্দর করে, ভালো ক'রে, বাঁচতে শেখায়। ভালো ক'রে বাঁচাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, বই তার অন্যতম উপায়।

বুদ্ধদেব বসু

বই আপনাকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল কালে নিয়ে যেতে পারবে। যে দেশে আপনার কোন দিনই যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, বইএর পাতার রথ আপনাকে সেই দেশে নিয়ে যাবে।

মনীষউদ্দিন

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধকরি খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।

বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি। বই কেনার বাজেট যদি আপনি তিনগুণও বাড়িয়ে দেন তবু তো আপনার দেউলে হবার সম্ভাবনা নেই।

সৈয়দ মুজতবা আলী

এই সপ্তাহের ভালবাসার গল্প

তখন সমবেত মার্চপাস্ট হচ্ছিল। তালে তালে হেঁটে যাচ্ছিল দুসারি বালক। মাথার ওপরে গম্ভীর সূর্য। এবং সে ছায়া দিতে পারবে না এখন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

এটা একটা বিখ্যাত কলেজের মাঠ। এখানে আজ অনেক লোক। চারদিক রঙীন রঙীন লাগছিল। সে খুস্ করে সিগারেটে টান দিল। শেষ সাদা ওড়নাটা বাতাসকে দান করে সিগারেট মরে গেল। সে অন্যমনস্কের মতো ফিল্টারে টান দিল। একদম বিশ্রী একটা স্বাদ তার অবহেলিত পৃথিবীকে তেঁতো করে দিল।

সে প্রায় পাঁচ ফুট দেড় ইঞ্চি লম্বা। অবশ্য তাকে অনেক কম দেখায়। তার বয়স এখন চোদ্দ। তাকে অনেক বেশী দেখায়। সে এ্যাডাল্ট সিনেমা দেখতেই বেশী ভালোবাসে। তার কি যে উত্তেজনা। তার চোখের রঙ নিকোটিনের মতো—ফ্যাকাশে হলুদ। সে একটা চোখ ঢোকা জামা পরে। যেন সে সবকিছু দেখে নেবে। এখন সাদা রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকলো। এমনিতেই সে বেশ কুঁজো।

প্রতিযোগীরা সব স্টার্টিং পয়েন্টে দাঁড়িয়ে গেছে। ড্রিল স্যার হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছেন। অসম্ভব লম্বা। তাঁকে বেশ অশ্লীল লাগছিল। সে ভাবলো সেন্সার বোর্ড কি আর ঈশ্বরের ছবিতে নিশ্চয়ই এই দৃশ্য রাখতে দেবে না।

তার ঠিক পাশে দাঁড়িয়েছিল তার বন্ধু। তার চাইতে ইঞ্চি লম্বা। সারপর মতো ছিলছিলে রোগা ওটা ছেলেটা। বললো, 'কি হবে এসব দেখে, চল সিনেমায় যাই।'

সে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লো। অর্থাৎ তার সিনেমা যাবার ইচ্ছে নেই। সে স্পোর্টসই দেখবে। অদ্ভুত ফিগ্রেশন রেলিং টপকে সে চলে গেল মাঠের মধ্যে। এবং কেমন সুন্দর প্যান্ডেলে ঢুকলো। তার [illegible] আর এখানে ফেরানো গেলো

আছে। সে ক্রমাগত পাপী হয়ে যাচ্ছে। তার আর এইসব পুজোতে আসা হবে না।

তখনই ড্রিল মাস্টারমশাই-এর প্রচণ্ড পুরস্কার শোনা গেল। তারপর একটা ফটাস। শব্দটা এত আস্তে হলো যে তার হাসি পাচ্ছিল। মাত্র গতকালই সে গোলাবের চারপোনাহীন পাঁচাত্তরে দেখে এসেছে রিভলবার কত সাবলীল শব্দ করে।

ছেলেরা মাঠটাকে পাক দিচ্ছিল। দুশো মিটার দৌড়। হঠাৎ তার মনে হলো সে একদিন ঠিক এইরকম দৌড়ে যেত। সে উত্তেজনা কমাবার জন্য ধুপ করে সামনের একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লো।

তুমুল উত্তেজনার মধ্যে দৌড় শেষ হলো। মাইকে বিজয়ীদের নাম জানালেন কেউ। এবং তারা বিজয়বেদীতে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। তিনজন বীর। পদক্ষেপের গর্বে তারা তখন ঘাস ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক তখনই তার বাঁপাশে কেউ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিল। সে একটু অবাক হয়ে তাকালো। এবং তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

সে অর্থাৎ আমি। আমার গল্পে কোনো সে নেই অথবা সে আছে, কারণ এটা কোনো বানানো গল্প নয়।

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। হাততালি দিচ্ছিল নীল ফ্রক পরা একজন বালিকা। এবং তার সুন্দর শরীর। আমি কেমন অসহায় হয়ে যাচ্ছিলাম। কি চরম বশ্যতা।

তার চমৎকার ফর্সা চায়ের মতো গায়ের রঙ। তার নিখুঁত মুখ। তার সাবলীল উচ্ছ্বাস। আমি হাঁ হয়ে গেলাম। তার যেন গোটা পৃথিবীকে শাসন করবার ক্ষমতা।

দৌড়ে প্রথম হওয়া ছেলেটা তখন আস্তে আস্তে প্যান্ডেলের দিকে আসছিল।

ওকে আমি ভালোই চিনি। আমার সঙ্গেই পড়ে। সৌমিত্র। সৌমিত্র ঘোষ।

এবং বালিকা তখন তার সুগঠিত শরীর দেখছিল। সৌমিত্র নিয়মিত ব্যায়াম করে। দেহে কত পর্বতমালা। তাকে খুব চমৎকার লাগছিল। সে ভীষণ গর্বিত এক-জন কিশোর এখন। যেন সে যুবক হয়ে যাবে।

সেই মুহূর্তে সৌমিত্র, আমার প্রিয় বন্ধু, আমার শত্রু হয়ে গেল। বালিকা তার শরীরে দৃষ্টির চুম্বন দিচ্ছিল। সৌমিত্রও কেমন লোভীর মতো তাকাচ্ছিল বারবার।

সেই মুহূর্তে, মা, তুমি মিথ্যে হয়ে গেলে। তুমি বলো আমার লোভ নেই। তুমি যে কি ভুল বলো। আমি ভীষণ পাজী, আমি লোভী হয়ে গেছি।

আমি হ্যাংলার মতো তাকে দেখছিলাম। সে এবার আমার দিকে তাকালো। তার কি যে অসামান্য রূপ। আমি বোকার মতো হাসলাম।

সে বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সম্ভবত ঘৃণাতেও।

সারাদিন আমার আর স্পোর্টস দেখা হলো না। আমি কেবল তাকে দেখলাম।

বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই ঢুকলাম স্নানঘরে। তখনও শীত যায়নি। খুব করে সাবান মাখলাম। তারপর স্নান শেষ করে সটান আয়নার সামনে দেবাঞ্জনের মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

আমি : দেবাঞ্জন, তোমার একি হলো।

আয়না-আমি : কি হলো ?

আমি : দেবাঞ্জন, মনে হচ্ছে তুমি প্রেমে পড়ে যাচ্ছো

আয়না-আমি : পড়ে যাচ্ছো ?

আমি : দেবাঞ্জন, তুমি জানো না তুমি কত কুৎসিত ?

আয়না-আমি : কুৎসিত ?

সেই রাতে বহুকাল বাদে আমি আবার আকাশ দেখলাম। ছোটবেলায় মা আমাকে তারা চেনাতো। তারাদের আকর্ষণ আমার আর নেই। তাই রাতে আকাশ দেখিনি বহুদিন।

ঘুমোতে যাওয়ার সময় জীবনে প্রথম আমি ভাবলাম, ঈশ্বর, আমি এত কুৎসিত কেন। আমার রোগা পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি শরীর। আমি কুঁজো হয়ে হাঁটি। আমার হলদে চোখের মণি। সারা মুখে পাপী ছাপ। সে কত ভালো। আমি এই শরীর নিয়ে তার সামনে যাবো কি করে।

এইভাবে এই প্রথম আমি ঈশ্বরকে নিয়ে ভাবলাম।

অদ্ভুত একটা আধো-জাগরণের মধ্যেই রাতটা কেটে গেল। সকালে উঠে প্রতিজ্ঞা করলাম, তার কোনো পরিচয় পাই বা না পাই, আমি চেষ্টা করবো ভালো হতে। ভালো হয়ে যোগ্য হয়ে তার সামনে গিয়ে

দাঁড়াবো। তখন যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। খারাপ দিকটা আমার ভালোই জানা আছে।

সেইদিন স্কুল ছিল না। স্পোর্টসের পরের দিন—তাই ছুটি। তার পরদিন স্কুলে গেলাম বই নিয়ে। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু অবাক। আমি, বই নিয়ে, ইস্কুলে!

সে আমাকে বললো, 'চল, আজ রানি মেরা নাম দেখে আসি।'

আমি কঠোর স্বরে বললাম, 'না, আমার রোজ রোজ সিনেমা দেখবার মতো পয়সা নেই।' বলেই আমি চমকে গেলাম। কন্ঠস্বরের এ দৃঢ়তা তো আমার ছিল না।

সে অবাক হয়ে গেল। তারপর তীক্ষ্ন-ভাবে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে বললো, 'পয়সা আমি দেবো। তুই চল। তুই না গেলে মাইরী জমে না।'

আমি বললাম, 'যাবো না।'

ঠিক তখনই আমার ডানকানের পাশে শয়তান হেসে উঠলেন। খুব যে ভালো হয়ে যাচ্ছিস একদিনে। বেহেস্তের পরীর আশা ছেড়ে দাও চাঁদ। কেন শুধুমুধু নিজেকে কষ্ট দিবি।

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে আমি বললাম 'চল'।

সে খুশী হলো। বললো, 'আমি মাইরী ভড়কে গিয়েছিলাম। গুরু, তুমি যা পাল্টি দিচ্ছিলে।'

তিন ঘন্টা ধরে রঙীন সিনেমাহলে বসে আমি দেবানন্দ বা প্রাণ হয়ে বাঁচছিলাম। তার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। হেমা মালিনী কি তার মতো দেখতে? উঁহু, সে অনেক বেশী সুন্দর।

বায়স্কোপের পর্দা জুড়ে সেই মেয়ের মুখ।

তখনই ছেলের চোখ পুষ্করিণী। টান-টান জলে ভরা। সে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে। সে কিনা প্রতিজ্ঞা করেছে ভালো হবে। এই তার ভালো হওয়া।

সিনেমা দেখে ফেরার সময় বন্ধু তাকে নিয়ে নতুন একটা রাস্তায় ঢুকলো। এই পথ দিয়ে সে আগে কোনোদিন হাঁটেনি। আশপাশের লোকগুলো ভালো নয়—সে বুঝতে পারছিল। কেমন অস্বাভাবিক সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। তার এখনও ভালো করে গোঁফের রেখা ওঠেনি।

তার নাকে একটা গন্ধ এসে ঠেকলো। সে ভালো বুঝছিল না ব্যাপারটা। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কিরে, এখানে নিয়ে এলি কেন?'

—'বাংলা খাবো।'

সে প্রায় বজ্রাহতের মতো হয়ে গেল। আর এক মুহূর্তও নয়। অনেকটা নামা হয়েছে। আর নয়। সে ভেতর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল এইসব পথ তার জন্য নয়।

তার জন্য পড়ে আছে প্রশস্ত রাজপথ। যেখান দিয়ে সে কোনোদিন কোনো সম্রাটের মতো শিরদাঁড়া সোজা রেখে হেঁটে যাবে। পাশে থাকবে বালিকা।

আশ্চর্য, সে কিছুতেই বালিকার ঘৃণা আর বিরক্তিমাখা মুখ ভুলতে পারছিল না। ভাবনাটা তাড়িয়ে দেওয়া মাছির মতোই বারবার উড়ে আসছিল। এবং সে পরিষ্কার বুঝে গেল গভীর ক্ষতের অস্তিত্ব।

তার বন্ধু তাকে বললো, 'ভীতু কোথাকার, একদিন মদ খেতে ভয়? আয় মাইরী, একটুখানি খা।'

সে কোনো কথা বললো না। আসলে এইসব কথার কোনো জবাব দিতে নেই। কেবল অত্যন্ত দ্রুত পা চালিয়ে সে গলিটা পার হয় গেল। সে একা হয়ে গেল।

তারপর তার খাওয়া গেল, ঘুম গেল। ছেলের কি যে অসহায় অবস্থা। সবসময় সেই বালিকা। চোখ খুললেও সে, বন্ধ করলেও সে। তার ঘৃণা। তার বিরক্তি। বালিকা তাকে দখল করে নিচ্ছিল। তার আর কিছু ভালো লাগে না। ছেলে বদলে যাচ্ছিল।

হাফইয়ারলি পরীক্ষায় সে এইটথ হলো। এবং অত্যন্ত বাজে নম্বর। সে প্রায় জোর করে আর্টসে এসেছে। এত বাজে রেজাল্ট হলে চলবে কি করে। ক্রমশঃ সে উদাস হয়ে যাচ্ছিল। তার বন্ধুরা তাকে খ্যাপাচ্ছিল রোজ রোজ। লেখাপড়া শিখে ভালো হবি। ভালো হওয়া যায় না। একবার খারাপ হলে ভালো হওয়া যায় না!! কয়লা হজার ধুলেও তার ময়লা যায় না!'

সে মনে মনে বললো হাজার ধুলেও হয়তো যাবে না, কিন্তু তোরা কি জানিস না কয়লা একবার পুড়লেই তার রং সাদা হয়ে যায়।

আসলে তখন তার দহন চলছিল। ভেতরে ভেতরে সে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল।

অথচ বাইরে কোনো প্রকাশ নেই। কেবল উদাসীন হয়ে ওঠা।

তার বন্ধুরা তাকে উদাসীন হতে দেবে না। সে খুব চমৎকার অশ্লীল গান করে। তার মজার মজার অশ্লীল কথাবার্তা। সে কেমন সুন্দর পাপী ছিল—কেন সে ভালো হয়ে যাবে?

তার তিন-চারজন বন্ধু তাকে খ্যাপাতো। প্রচণ্ড গালাগাল করতো। মারতোও মাঝে মাঝে। তার কি যে অসহায় অবস্থা। বাড়িতে সবাই জানে সে খারাপ হয়ে গেছে। অথচ সে ভালো হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সে ক্লাসে কেঁদে ফেলতো। হীনমন্যতায় সে কেমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

এই সময় ক্লাসের অন্য ছেলেদের সঙ্গে তার একটু একটু আলাপ হচ্ছিল। এক-জনকে তার বেশ ভালো লেগে গেল। তার নাম অনিন্দ্য।

তখন দুর্গা পুজোর বেশী দেরি নেই। সে নিজের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠছিল। মেয়ে তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসে আছে। অথচ সে তার নামও জানে না, বাড়িও চেনে না। এবং এই সমস্যা, যা তার গভীরে শিকড় নামিয়ে দিচ্ছিল, তার থেকে বাঁচবে কি করে।

অনিন্দ্য আমার চাইতে পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। খুব সুন্দর দেখতে। ফর্সা, কেমন লাল-জ্যোৎস্নার মতো গায়ের রঙ। আমাকে এক-দিন সে বললো, 'আমাদের বাড়ি চলো।'

আমি তার বাড়ি যাচ্ছিলাম। অনিন্দ্য আমাকে দয়া করে—বেশ বোঝা যায়। অসম্ভব লম্বা চওড়া গম্ভীর একটা দরজা বাড়িটা পাহারা দিচ্ছিল। ভিতরে ঢুকলাম। সামনে ঝুলছিল একটা মোষের শিংআলা মাথা—যত্নের অভাবে এটা আর দ্রষ্টব্য নেই।

আর একটু এগিয়ে যেতেই উড়ে গেল এক ঝাঁক হাততালি। শাদা শাদা একরাশ দামী পায়রা। তাদের চমকে দিয়ে আমরা অনিন্দ্যর ঘরে এসে বসলাম। সে আমাকে বললো, 'দাঁড়াও, মাকে ডেকে আনি।'

ওর মা আসলেন। তার উজ্জ্বল শরীর। কি প্রচণ্ড পবিত্রতা। অনেকটা লম্বা। এই মুখ তার খুব চেনা। কোথায় সে দেখেছে। সে কমন মুগ্ধের মতো হাঁ করে তাকিয়ে

থাকলো। তার পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি শরীর এই প্রথম বেশ ভালো মতো বুঝতে পারলো জীবনে চেহারারও একটা বিরাট দাম আছে। প্রয়োজন আছে। তার নিজেকে বেশ কুৎসিত লাগছিল। এই পরিবেশে কেমন বেমানান!

'মা, এই হলো দেবাঞ্জন।' অনিন্দ্য বলছিল। সে মাথা নীচু করে প্রণাম করলো। তার মা তাকে দেখে খুশী হননি—সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। আসলে ছেলেটা কেমন পাজী দেখতে। সারা মুখে কোনো সারল্য নেই। ক্ষয়ে যাওয়া চেহারা। কোনো ধার নেই। বললেন 'বসো।' তিনি ভীত হচ্ছিলেন। অনিন্দ্য এর'ম ছেলের সঙ্গে মেশে!

তখনই ঠিক চার-পাশটা বাগান হয়ে গেল। স্নান করে বাথরুম থেকে বের হচ্ছিল কেউ। এতো সুগন্ধ। সে তাকালো একবার।

এবং অবাক হয়ে গেল। সেই মেয় এই-খানে! তার কি যে আশ্চর্য লাগছিল। মেয়ে তখন রাজহংসীর গর্ব নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সিঁড়ি ভাঙছিল, দোতলায় যাবে। তার শরীর থেকে এক ফোঁটা দু'ফোঁটা জল ঝরছে।

বাড়ি ফিরে এসে আমার মন ভালো হয়ে গেল। মেয়ের বাড়ি পর্যন্ত চিনে ফেললাম! অথচ সে অনায়াসে অন্য কোথাও থাকতে পারতো। আমি সারাজীবন আর তাকে হয়তো দেখতেই পেতাম না। ক্রমশঃ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলাম।

ধীরে ধীরে সে আবার পড়াশোনায় উৎসাহ পাচ্ছিল। অ্যানুয়াল পরীক্ষায় সে হঠাৎ থার্ড হয়ে গেল। সবাই অবাক। সে নিজেও এবং ভীষণ সুখী। আসলে এত ভালো ফল করতে পারবে তা সে জানতো না।

সে আবার অনিন্দ্যর বাড়ি গেল। বালিকা এখন অনিন্দ্যর বোন। তার কি যে আনন্দ হচ্ছিল। এত সহজে সব কিছু হয়ে যাবে তা সে ভাবেনি। মেয়েকে দেখতে পাবে তাই ভাবেনি। সে অনেক সুন্দর মেয়ে দেখেছে। তার মতো পবিত্র দেখেনি। সে একবার ভাবলো অনিন্দ্যকে মেয়ে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করে। তার পরই সে নিজেকে শাসন করলো। তুমি বড় ছটফটে। ভালো করে দ্যাখো। এটা প্রেম কিনা। এটা তো মুগ্ধতাও হতে পারে।

আগে সে অনেক মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু সাময়িকভাবে। এবার, সে নিজেকে বললো, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্য-রকম।

এবং সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বালিকাও এবার পরীক্ষয় তৃতীয় হয়েছিল। কি অদ্ভুত যোগাযোগ! তার মনে হচ্ছিল।

সবাই তাকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। কেমন দ্রুত ঘটে যাচ্ছে পরিবর্তন। ছেলের মুখ আর ফ্যাকাশে থাকে না। সে সব সময় হাসে আজকাল। সে বুঝতে পারছিল তার আর পাপ নেই। ক্রমশঃ সে সরল হয়ে যাচ্ছে।

দেবদারু গাছের মতো। রোমান্টিকভাবে টান টান।

আমার অনিন্দ্যদের বাড়ি যাওয়া একজন কখনও ভালোভাবে মেনে নেয়নি। তার নাম নরেন। নরেন্দ্র সান্যাল। হায়ার সেকেণ্ডারীতে সে খুব ভালো রেজাল্ট করেছিল। ক্রমশই সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছিল। আমাকে দেখলেই সে ব্যঙ্গ করতো। তার হাসিতে মাখানো পেট্রোল। আমি জ্বলে যেতাম।

অথচ বালিকার সামনে সে কেমন সং হয়ে যায়। আমার প্রশংসা করতে থাকে। আমি বুঝতে পারছিলাম এই যে বালিকা, সে কিশোরী হয়ে উঠছিল, তার চেহারার জন্য এক এক করে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল।

দিন কেটে যাচ্ছে প্রচণ্ড অনায়াসে। আমি সব কিছু ভুলে যাচ্ছিলাম। অর্থাৎ সে এখন ভালো ছেলে হয়ে যাচ্ছে। ছেলেবেলার ফেলে আসা গুণগুলো নিয়ে নাড়াচাড় শুরু করলম। যদি কিছু করে ওঠা যায়।

যেদিন সে প্রথম তার অহংকার খুলে আমার সঙ্গে কথা বললো, আমার বেশ মনে আছে, আমি লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলাম। তার মাস্টারমশাই এলেন অংক করাতে। ভদ্রলোক খুব চমৎকার অঙ্ক জানেন। অতএব আমি আর তার কিছু না ভেবে ধরে নিলাম তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী। তখন সমস্ত সমস্যাই কেমন সাবলীলভাবে সমীকরণ হয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রলোকের বয়স সাতাশ-আঠাশ (তার তখন তেরো-চোদ্দ), তার সম্বল হলো একটি কালো রঙের বয়স্ক ছাতা। অথচ আমি কষ্ট পেলাম—তিনি মেয়েকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। বলা যায় না সে হয়তো এর প্রেমে পড়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হবার সময় ভুলে পেনটা ফেলে চলে যাচ্ছিলাম।

সে ডাকলো, 'পেনটা।' এবং এই তার প্রথম কথা। তার কি চমৎকার কণ্ঠস্বর। শব্দটা আমাকে এতই আচ্ছন্ন করে ফেলে-ছিল যে সে যখন কলমটা আমার হাতে দিল তখন আমি আবার সচেতন হলাম। এবং এই প্রথম স্পর্শ! আমার শরীরে লালবিদ্যুৎ তাজা হয়ে উঠছিল। ধন্যবাদ শব্দটাও বলতে পারলাম না। কথা জড়িয়ে গেল। পাছে সে আমার এই অবস্থাটা ধরে ফেলে তাই তাড়াতাড়ি তার সামনে থেকে পালিয়ে গেলাম।

বাড়ি ফিরে আমি তার ওপর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠছিলাম। মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছে।

একদিন আমাদের বরুণ বললো, অনিন্দ্যর বোনটাকে দেখেছিস। হ্যাভক দেখতে মাইরী। কি ফিগার। বরুণ আমার প্রিয় বন্ধু কখনোই নয়। তার উদ্ভট আচরণ আমাদের হাসির বিষয়। তার ছিপ্রা

এরকম সাহস। আমি ভয়ংকর রেগে গেলাম। বরুণ তুই আর খবরদার এই জাতীয় কথা বলবি না। তোকে শালা পিটিয়ে প্রকাণ্ড কর্মকারের ছবি করে দেব।

বরুণ প্রথমটা বেশ অবাক হয়ে গেল। অর্থাৎ আমার এত রাগের কোনো কারণ থাকা উচিত না। তারপর কি ভেবে সে মুচকি হাসলো। তারপর সে যা করে থাকে, হাতের তেলো দিয়ে মুখটুকু ঢাকা দিল।

দিন কেটে যাচ্ছে। এখন আমি তার নাম জানি, মালা। মনে হলো এছাড়া আর কোনো নামেই তাকে ডাকা যায় না। সে এত সুন্দর। তার সমস্ত শরীরে ফুল ফুটে আছে। সে যে অনেক ফুলের সমন্বয়—মালা।

অনিন্দ্যর প্রতি দিনকে দিন আমার গোপন কৃতজ্ঞতা বেড়ে যাচ্ছিল। সে তাকে ম্যাক্সি কিনে দিয়েছে। মেয়ে যা পরে তাতেই তাকে ভালো লাগে। ম্যাক্সি পরলে তাকে ভীষণ পবিত্র লাগে—কেমন গীর্জার নানদের মতো। সে কেমন ঈশ্বরী হয়ে যায়। তখন সে বলতে পারে হেই পুরুষ! আজ থেকে তুমি আমার ক্রীতদাস হলে।

মেয়ে একবার জলে ডুবে যাচ্ছিল। অনিন্দ্য তাকে বাঁচিয়ে দেয়। অনিন্দ্যর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থেকে যাবো।

সে বছর আমি হায়ার সেকেণ্ডারী দিচ্ছি। সরস্বতী পুজোর রাতে ঠাকুর দেখতে বের হলাম আমি আর সালাম। সালাম আমার পাড়ার বন্ধু। দুপুরে অভিনবদের কারখানায় গিয়েছিলাম। ওদের কাগজের ফ্যাক্টরী। সেখানে মালী আমাদের একটা করে চমৎকার ফুলের তোড়া বানিয়ে দিয়েছিল। ওদের ফ্যাক্টরীতে ভালো বাগান আছে।

হঠাৎ দেখলাম, সালাম এগিয়ে যাচ্ছে। সোজা গিয়ে সে একটা মেয়েকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারলো। আমি কিছু বুঝে ওঠবার আগেই এটা ঘটে গেল। সালাম তুই এটা কি করলি। মেয়ে তখন অসম্ভব গাম্ভীর্যে নিজের কনুই তুলে দিয়েছে।

আমি আনন্দে দেখলাম সালাম সুবিধা করতে পারলো না। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এবং তখন মালার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। সে পড়েছিল একটা ঈষৎ গোলাপী রঙের বেলবটস্। তাকে অসামান্য লাগছিল। আমি আবার নতুন করে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

অনেকখানি সাহসী হয়ে তাকে ডাকলাম। এই প্রথম আমার ডাকা। সে প্রথমটায় দেখতে পায়নি। তারপর দেখলো এবং দাঁড়িয়ে পড়লো।

ছেলের ভীষণ লজ্জা করছিল। কি রকম অপরাধী লাগছে নিজেকে। মেয়ে কি ভাবছে। ছি ছি, সে একটা বাচ্চা ছেলের মতো রাস্তার মাঝখানে তাকে ডেকে ফেললো। এখন কি বলবে।

সে দেখলো সালাম বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ অন্য কোনো কিশোরীকে গুঁতো মারার জন্য। সে একটু স্বস্তি বোধ করলো।

বলবার মতো কোনো কথা এখন সে খুঁজে পাচ্ছে না। ছেলে তার চোখ দেখলো। মেয়ে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল। তার চোখে প্রশ্নচিহ্ন লেগে আছে।

ছেলের সরল চোখে সেই বালিকা ভালোবাসার গল্প পড়ে নিচ্ছিল। রাস্তায় কেউ কেউ তাদের দেখছিল। তারা দুজনেই একটু একটু ঘামছিল।

হঠাৎ পৃথিবীর সমস্ত সাহস জড়ো করে বলে ফেললাম মুখর সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে, 'ফুল নেবে।'

সে ঘাড় নাড়লো। আস্তে আস্তে অর্থাৎ নেবে। আমি একটা ভালো ফুল খুঁজতে লাগলাম। শেষমেষ একটা সাদা ফুল তাকে দিলাম। তখন আমার কপালে জমা কুয়াশা। তার ঘোর লেগেছিল তার চোখেও।

বললাম মনে মনে, আজ থেকে তোমার পুজো শুরু করলাম মেয়ে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বলি একটু ঠাকুর দেখবে আমার সঙ্গে? একটু হাঁটবে পাশে পাশে? বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিলাম।

রাতে বাড়ি ফিরে নিজেকে কেমন সম্রাট মনে হচ্ছিল। ভোগের খিচুড়ী আর আমার জন্য নয় এখন। এই মুহূর্তেই আমার পোলাও কালিয়া চাই।

রাতে শুয়ে শুয়ে একটা অলস ছেলের মতো সে ভাবছিল। ভাবনাগুলোর কামরা জুড়ে গেল কেমন মিলিটারী ট্রেনের মতো। অন্যরকম সবুজ। সে বুঝতে পারছিল সেটা কোনো সহজ স্টেশনেই থামবে না। সে কল্পনা করতে লাগলো পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর জায়গা—যেখানে সে আর তার সেই বালিকা—নিজস্ব গর্বে সে কেবল যুবতী হয়ে যাচ্ছে। সে ভূগোলে পড়েছে ভূমিকম্পে পর্বতমালার জন্ম হয়। কিশোরী মেয়েদের হৃদয়ে কি ভূমিকম্প হয় না? না হলে বুকের সোনালী পর্বতমালা কি করে সম্ভব।

একবার সে ভাবলো আমি ওকে কোনোদিন বলবো না ভালোবাসি। ওর শরীরটা আমার চাই না। আমি শুধু ওর প্রেমিক থাকতে চাই।

তারপরই সে ভাবলো, না, ওর সবটাই আমার চাই। আমি হেরে যেতে পারি না। এবং মেয়ে অন্য কারো হয়ে যাবে—তা সে কোনোদিনও সহ্য করতে পারবে না।

তখন সে সেই কিশোরীকে চুমুতে হবে [illegible]চ্ছিল। মেয়ে কি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে? নাকি তার কথা ভাবছে? এই মুহূর্তে তার তা জানতে ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

এইসব চিন্তা করতে করতে সে নেমে গেল স্নান করতে। ঘুমের সমুদ্রে। তার সামনে ঢেউ দুলছিল। অজানা দ্বীপের অধিবাসী ঈশ্বরকে অনুরোধ করছিল স্বপ্নে তার মুখ দেখাতে। হেই ভগবান! আমার স্বপ্নের মুখ দেখে নিতে দাও।

এরপর আমি হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিলাম। তাকে দেখিনি বহুদিন।

পরীক্ষার মধ্যে আমার এক বন্ধুর বাবা মারা গেল। শ্মশানে গেলাম মরা পোড়াতে। এবং আশ্চর্য শ্মশানে গিয়ে আমি নিজের বাবাকে হঠাৎ বেশী করে ভালোবেসে ফেললাম। মনে হলো এই বয়সে প্রত্যেকেরই একজন বন্ধুর বাবার মৃত্যু দেখা উচিত। [illegible]ন ভীষণ খারাপ গেল কটা দিন।

অনিন্দ্যদের বাড়ি গিয়ে শুনলাম সে তার দেশের বাড়িতে চলে গেছে। তার বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোথাও যাবো ভাবছি কিনা। আমি ইতস্ততঃ করছিলাম, কি বলবো। তিনি আমাকে অনিন্দ্যর কাছে যেতে বললেন।

তখনই আবার মালাকে দেখলাম। সেই বিরক্তি, সেই ঘৃণা। যেন সে আমাকে সহ্য করতে পারছে না। আমার হ্যাংলামোকে। সে আমার দিকে অদ্ভুত ভর্ৎসনাভরে তাকালো। যেন আমি তাকে বিরক্ত করছি—যেন আমি তার অচেনা কেউ। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কি এমন ঘটে গেল এর মধ্যে!

পরীক্ষার পর কোনো বন্ধুর পাত্তা নেই। সব কোথায় যে গেছে। একদিন অনির্বাণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার সঙ্গে আমি বেড়াতে চলে গেলাম।

অসলে আমার শরীরটা বেড়াতে লাগলো। মন পড়ে রইলো তার কাছে। সুন্দর কিছু দেখলেই তার অভাব বোধ করতাম। সে সঙ্গে থাকলে কি আনন্দটাই না হতো।

মাঝে মাঝে আমার নিজেকে প্রচণ্ড মূর্খ মনে হতো। গাড়ল, তুমি এ্যাপ্রোচ করতে পারছো না? একটা ভীতু কোথাকার। তোমার আবার প্রেম করবার শখ! আবার ভাবতাম এইবার সুযোগ পেলেই তাকে বলে দেবো। তারপরই ভয় হতো। বালিশ অন্য কারো হয়ে হয়ে গিয়ে থাকে যদি!

আমি তো কোনোদিনও সহ্য করতে পারবো না।

কলকাতায় ফিরলাম যখন তখন এখানে পিচ গলে। এই সময় রিকসাআলা আর ঠ্যালাআলাদের দেখলে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। অথচ কি করতে পারি আমি।

ভেবেছিলাম, প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম তার সামনে আর যাবো না। আশ্চর্য, প্রতিজ্ঞার পাখা গজালো। আমি আবার তাদের বাড়ি গেলাম। যাবার সময় ভাবছিলাম আজ তাকে সুযোগ পেলেই বলে দেবো কথাটা। নতজানু হয়ে তার প্রেম চাইবো।

দরজা খুলে দিল মালা। তাকে একলা পেয়ে গেছি। এমন সুযোগ হয়তো আর জীবনে আসবে না। বলেই ফেলতাম—হঠাৎ মনে হলো বলে দিলেই তো ব্যাপার চুকে যাবে, কোনো রোমান্স থাকবে না। আর যদি সে প্রত্যাখান করে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কেবল, "দাদা ফিরেছে?' সে বোধ হয় অন্য কথা আশা করেছিল। একটু অবাক হয়ে বললো, "না'।

আমি জড়ানো গলায় বললাম—'ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।' তারপর সোজা চলে এলাম। ইচ্ছে করছিল আরো কয়েকটা কথা বলি—তাকে আরো একটু বেশী সময় ধরে দেখি। কতদিন বাদে বাদে তাকে দেখতে পাই!

তার কিছুদিন বাদে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। দেখা গেল সব চাইতে বাজে রেজাল্ট করেছে সে।

আমি রেজাল্ট নিয়ে এর আগে কখনো মাথা ঘামাইনি। এই প্রথম আমার মনে হলো জিনিসটা খুব না হলেও বেশ কিছুটা দামী। এইখানে নরেন্দ্র আমাকে এক মাইল মেরে দিল দৌড়ে। সামান্য ফার্স্ট ডিভিশনের কি দাম? অথচ সবাই আমার কাছে অনেক কিছু আশা করেছিল।

কলেজে ভর্তি হবার সময় সংকট দেখা দিল। তার প্রিয় বিষয় অর্থনীতি। অথচ নরেন্দ্র তাকে বললো তুমি ফর্মই পাবে না।

সে কেমন অবাক হয়ে গেল। আসলে দামী কলেজটায় পড়বার তার কোনো ইচ্ছেই নেই। কিন্তু এ্যাডমিশন টেস্টই দিতে পারবে না শুনে সে হাঁ হয়ে গেল। নিজেকে এত ব্যর্থ এত অপদার্থ তার আগে কোনো দিন লাগে নি। মেয়ে তার সম্পর্কে কি ভাবছে!

নরেন্দ্র তাকে আশ্বাস দিল সে ঠিক ব্যাকডোর দিয়ে ফর্ম বের করে দেবে। তখন নরেন্দ্র আবার তার কাছে দেবতা হয়ে যাচ্ছিল।

আমার মনের সব শান্তি চলে যাচ্ছিল। আমার সব বন্ধুরা প্রেসিডেন্সিতে পড়বে আর মাত্র কয়টা নম্বরের জন্য আমি এ্যাডমিশন টেস্টেই বসতে পারবো না।

নরেন্দ্র তারপর তাকে বোঝাচ্ছিল, তুমি ফিলসফি পড়। কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় সুবিধা হবে। আমার নোটগুলো পাবে। ফিলসফি তোমার স্যুট করবে। এ্যাডমিশন টেস্ট বসলেই হবে। আমি ভেতরে ভেতরে ব্যবস্থা করে দেব।

তারপর শুরু হলো তার হাঁটাহাঁটি—নরেন্দ্রদার কাছে। নরেন্দ্র তাদের চেয়ে দু' বছরের বড়। বালিকা তখন তাকে দেখলে করুণার হাসি হাসতো। সে যেমন বুঝতে পারতো। এবং সবাই তাকে বেশ অবহেলা করছিল।

শালা, একদিন এইসব পাল্টে যাবে। আমি তখন কাউকে ছাড়বো না। সে ভাবতো।

শেষে একদিন নরেন্দ্র তাকে বললো, মার্কশীট জাল করো। না হলে ফর্ম পাওয়া যাবে না।

সে বহু কষ্টের মধ্যেও একটু হেসে ফেললো। আসলে সে ভীষণ মধ্যবিত্ত। তার ভেতরে একটুও অসাধারণত্ব নেই। সে পরিস্কার বুঝতে পারছিল এক্ষেত্রে সে ধরা পড়বেই, আর ধরা পড়লেই তাকে অন্তত তিন বছরের জন্য সমস্ত পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হবে। সে নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে কিছুতেই রাজী হতে পারলো না।

প্রচণ্ড এক দুঃখ বুকে নিয়ে কয়দিন সে মনমরা থাকলো। তারপর সোজা মৌলানা আজাদে গিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে ফেললো।

যেদিন সে মৌলানায় ভর্তি হয়ে গেল সেদিন সবাই রাজসিক অথচ সন্ন্যাসী কলেজে, যে সব সময় গেরুয়া পরে থাকে, ফর্ম নিতে যাচ্ছিল।

তার ভীষণ দুঃখ হচ্ছিল। অনিন্দ্য তাকে বললো, 'চল, তোর ফর্মটা পাওয়া যায় কিনা দেখি।' অনির্বাণ বললো, 'তুই ফর্ম পাবিই চল।'

সে একবার বিস্মিতভাবে নরেন্দ্রের দিকে তাকালো। তারপর তাদের সঙ্গে চলতে লাগলো। তার কেমন কান্না পাচ্ছিল। বুকের গভীরে সরোবর। তা থেকে ঘটি ঘটি দুঃখ তুলে নেওয়া যায়।

সে ভয়ে লাইনে দাঁড়ালো না— যদি কেউ তাকে বার করে দেয়। সে সেইসব সুখী ছেলেমেয়েদের দেখছিল। তারা কি চমৎকার অহংকারী। কি সুন্দর পোশাকপরা। তারা কেমন চটপট এ্যাডমিশন টেস্টের ফর্ম পেয়ে যাচ্ছিল। তাদের উজ্জ্বল মুখ!

কিছু বাদে অনিন্দ্য তার দুটো ফর্ম নিয়ে এলো। যে ফর্ম পেয়েছে! তার কি যে অনান্দ হচ্ছিল। অনিন্দ্য তাকে বললো 'এই নে, তোর ফর্ম, ফিলসফি আর পলিটিক্যাল সায়েন্সের।'

তার সব দুঃখ চলে যাচ্ছিল। সে অন্ততঃ এ্যাডমিশনে বসতে পাচ্ছে। তারপর আড্ডা মারতে মারতে পরীক্ষা দিচ্ছিল। মুখ নামিয়ে লিখছিল। সে হাসছিল। তার পরীক্ষাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

তারপর আমার [illegible] হয়ে গেল। অহেতুক ঘোরাঘুরি, মানসিক উৎকণ্ঠা এই-সবের জন্য। শুয়ে শুয়ে বালিকার কথা ভাবতে খুব ভালো লাগতো। তার কথা, শুধু তার কথা। কতদিন তাকে দেখিনি। সে কি আমার কথা ভাবে? সে কি জানে এখন আমার তিন জ্বর?

জ্বর একটু কমলে সে তাদের বাড়িতে ফোন করলো। সে খুব বিশ্বাস করছিল টেলিপ্যাথিতে। নিশ্চয়ই বালিকা ধরবে।

ফোন ধরলেন অনিন্দ্যর মা। 'হ্যালো'' সে ভীষণ রেগে গেল। সমস্ত পৃথিবীর ওপর। এখন কেমন অপ্রস্তুত লাগছে। কি বলবে! বলবে মালাকে দেখতে ইচ্ছে করছে, কতদিন দেখিনি!

ওদিকে আবার শোনা গেল 'হ্যালো'। সে খোকার মতো হাসলো। বললো, বলুন তো আমি কে ফোন করছি। দেখাজন! হে' হে' হে'...। সে হাসছিল। অপ্রস্তুত হাসি।

অনিন্দ্যর মা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। টা সম্পর্কে তার ধারণা ভালো হচ্ছিল। তার সংগে এমন ইয়ারকি মারবে ত পারেন নি। কড়া কথা বের হয়ে আস- তার মুখ দিয়ে।

অপ্রস্তুত আমি তখন লাইন কেটে ছি।

এ্যাডমিশন টেস্টের পর রেজাল্ট বের । তার তত্তদিনে মৌলানায় ক্যাস শুরু গিয়েছে। সে কলেজ যেত।

অনিন্দ্যর ইচ্ছে ছিল ইতিহাস পড়ে। গেল পায় নি। কারণটা বোঝা গেল না। পলিটিক্যাল সায়ান্সে ইলেভেন্থ হয়েছে। অনির্বাণ পলিটিক্যাল সায়েন্সে ফিফথ, ফিতে টুয়েলভথ। সে পলিটিক্যাল ন্স ওয়েটিং-এ নিজের নাম দেখে অবাক গেল। আসলে সে বাংলায় উত্তর ছে। সবটাও লেখেনি। সে আশ্চর্য হয়ে ল কি করে তার নাম উঠলো। পরীক্ষ প্রচণ্ড ইয়ারকির মুডে দিয়েছে।

তারপর দোটানায় ভোগা। অনিন্দ্য আর র্বাণের জন্য শেষ পর্যন্ত সে আবার ডেন্সিতে ভর্তি হলো। তারা তাকে র বলছিল। বাবাও বললেন, বাইরে রেজাল্ট করার চাইতে প্রেসিডেন্সি জ পড়। রেজাল্ট ভালো হবে।

মার তারপর কলেজে বিতর্ক প্রতি- তায় নাম দিয়ে অনিন্দ্য প্রথম, আমি য় এবং অনির্বাণ তৃতীয় হয়ে গেলাম। । বিখ্যাত হয়ে যাচ্ছিলাম।

একদিন কলেজ স্ট্রীটে পান্তিরামের ন লিটল ম্যাগাজিন দেখছিলাম— দেখলাম সে আসছে। তার শরীরে চমৎকার হলুদ ফ্রক। তাকে অসামান্য লে। আমি আবার মনে মনে স্বীকার য় এখনও আমি খুব সামান্যাই আছি, কোনোদিনই ওকে পাওয়ার যোগ্যতা হবে না। ওর পাশে অনিন্দ্য ছিল। আমাকে দেখতেই পেল না!

আমি জানি আজ অনিন্দ্যর জন্মদিন। কই আজ ওদের বাড়ি যাবে। নরেন্দ্রও। ইচ্ছে করেই আমাকে এড়িয়ে গেল! আছে শালা, আমাকে পাত্তা না দিলে ও পাত্তা দেব না। আমিই বা কম কিসে?

প্রচণ্ড দুঃখ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

অনিন্দ্য, তোকে আমি ভীষণ হিংসে তুই ওর কত কাছে থাকিস, ওকে ময় দেখতে পারিস, কথা বলিস।

পরের দিন কলেজে ক্যাসে আমার মনে অনিন্দ্যটাই যত নষ্টের গোড়া। কে ... হচ্ছে ... আমি

এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে ওকে একটা চড় মারলাম। এমন জোর শব্দ হলো যে ক্লাসের সব ছেলেমেয়েরা অবাকভাবে তাকালো। আমাদের বন্ধুত্ব রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়— তাতে আবার কি ঘটলো!

অনিন্দ্যও বেশ অবাক হয়ে গেল। তার- পর আমাকেও একটা চড় মারলো। ওকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সবাই মজা দেখছিল।

আমি বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিলাম। তারপর বহুদিন আমাদের কথা বন্ধ ছিল। আমি ওর বাড়ি যাইনি, মালাকে দেখতেও না। ওরা যদি আমাকে পাত্তা না দেয়, আমি কেন দেব?

ক্রমশঃ ঝগড়াটা মিটে গেল। অনির্বাণ এই ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করেছিল। সে না থাকলে এই ফাটল জোড়া লাগা কঠিন ছিল।

একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনিন্দ্য আমাকে বলছিল জানিস, মালার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ছেলের বাবা মেজর জেনারেল। ছেলেও রোদ্দুরে পড়ে। লম্বা- চওড়া, খুব সুন্দর দেখতে। ফর্সা।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার মুখটা একটা পানের আয়নার স্পষ্ট বোঝা গেল, কেমন খয়েরী হয়ে গেছে। আমার সামনে ভূমিকম্প হচ্ছিল, টলে টলে যাচ্ছিলাম আমি। মাঝে মাঝে মদ না খেয়েও কি ভীষণ নেশা হয়। অনিন্দ্য বলে যাচ্ছিল, পাত্রপক্ষের কোনো ডিমান্ড নেই। বিরাট বড়লোক, বাড়ি-গাড়ি আছে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। এ ছাড়া আমার আর কিই বা করার আছে। এতদিন এই ভবে খেলা হলো। সবচেয়ে বড় হলো বাড়ি গাড়ি প্রতিষ্ঠা। আমার ভালোবাসার কোনো দামই নেই!

অনিন্দ্য খুব প্রশ্ন চোখে আমার দিকে তাকালো। বললো, জানিস, আমার বোন আজকাল তোর কথা খুব বলে। তোর সম্পর্কে খুব উৎসাহী। তোর প্রশংসা করে।

আমি ভেঙে যাচ্ছিলাম। বড়ো বড়ো কান্না হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে যাচ্ছিল। অনিন্দ্য, তুই কি কিছুই বুঝতে পারিস নি। তুই আমাকে আবার এসব বলে কষ্ট দিচ্ছিস কেন?

সব শালা শুয়োরের বাচ্চা। পৃথিবীতে ঈশ্বর নেই। আমি এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব চাইতে গভীর নাস্তিক হয়ে গেলাম। আমার চোখ ভরে যাচ্ছিল জলে। আমি সমস্ত মানচিত্র ঝাপসা দেখছিলাম।

বায়স্কোপের পর্দা জুড়ে তার মুখ।

বেশ, বেশ কিছু বাদে অনিন্দ্য আমাকে বললো, জানিস, এ বিয়েটা আমি ভেঙে দিয়েছি। ওর এত অল্প বয়স। এখন বিয়ে দেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

তারপর আমার মুখের ওপর চোখ রেখে অল্প হেসে বললো, কিরে, খুশী তো?

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার আবার কথা বন্ধ হয়ে গেল। অনিন্দ্য, তোকে যে আমি কি ভালোবাসি! ও আমার, পৃথিবীতে কেউ ওকে কেড়ে নিতে পারবে না।

সে এখন খুশীতে হাঁটছিল। সে অর্থাৎ আমি অর্থাৎ দেবাঞ্জন। তার চোখে আর জল নেই। অথচ স্পষ্ট জলের দাগ। সে এখন ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসী। অনেকটা ঋষিদের মতো।

তার আকাশে মেঘ ভেঙে রামধনু। সে তার ওপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যেতে পারে। সেই নীল উধাও ঘরের মধ্যে সে একজনের মুখ দেখতে পাচ্ছিল। সেই মুখ তার নিজস্ব। এবং কেবলমাত্র তারই।

সমস্ত আকাশের নীল মাঠে একদল ছেলে দৌড় দিচ্ছিল। বেশী না, কম না, দুশ মিটার। সেই মেজর জেনারেলের ছেলে, সেই নরেন্দ্র, আরো অনেকে....

একটু পরেই দেখা যাবে প্রথমে দৌড়টা শেষ করে সে আনন্দে হাঁফাচ্ছে।

সক্রেটিসের জবানবন্দী

শিশিরকুমার দাশ

তিনশ নিরানব্বই খৃস্টপূর্বাব্দে যখন সক্রেটিসের বিচার হয় তখন তাঁর বয়স সত্তর। তখনকার দিনের অন্যতম রাজনীতিবিদ্ আনাতুস তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন যে তিনি যুবসমাজকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তিনি রাষ্ট্রস্বীকৃত দেবতাদের বিরোধী। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরেই অভিযোগ জমছিল। আরিস্তোফানেস তাঁর "নেফেলাই" (মেঘ) নাটকে সক্রেটিসকে তীব্র ব্যংগ করেছিলেন। সক্রেটিস তাঁর জবানবন্দীতে সে প্রসঙ্গ উল্লেখও করেছিলেন। বিচারে সক্রেটিসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং শেষপর্যন্ত তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর অভিযোগকারীরা অবশ্য মৃত্যুদণ্ড চাননি। সক্রেটিস যদি এথেন্স ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইতেন তাহলে সম্ভবত তাঁরা বাধা দিতেন না। কিন্তু সক্রেটিস নির্ভীকতার সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেন।

পাঁচশ একজন বিচারকের সামনে তাঁর বিচার হয়। তখনকার এথেন্সে উকীলের ব্যবস্থা ছিল না। আসামী এবং ফরিয়াদী উভয়েই বিচারকের সামনে তাঁদের বক্তব্য ব্যক্ত করতেন। বিপুল সংখ্যক বিচারকদের মধ্যে অনেকেই দেশের আইন সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন না এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা বক্তাদের ভাষণ চাতুর্যে প্রভাবিত হতেন। ভাষণ-তৈরী করে দেওয়ার জন্য একশ্রেণীর লেখক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। সক্রেটিস তাঁর জবানবন্দীতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বিচারকদের এই দুর্বলতার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন এরকম অনুমান কেউ কেউ করেছেন।

সক্রেটিসকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় মাত্র ষাটজন বিচারকের ভোটাধিক্যে। তখনকার নিয়ম অনুসারে দণ্ডনীয় ব্যক্তি নিজেই কোন লঘুদণ্ডের প্রস্তাব করতে পারতেন। বিচারকেরা ইচ্ছে করলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারতেন। সক্রেটিসকেও সেই সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু তিনি এত সামান্য জরিমানার প্রস্তাব করেন যে বিচারক সভা তাতে অপমানিত বোধ করেন। অনেক বেশী ভোটাধিক্যে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

সক্রেটিস বিচারসভায় যা বলেছিলেন তার সম্পূর্ণ প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে তাঁর বক্তব্য জানতে পারা যায় জেনোফোন এবং প্লেটোর লেখা থেকে। প্লেটো স্বয়ং বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'আপোলোগিয়া সোক্রাতেস' (সক্রেটিসের জবানবন্দী)-কে পণ্ডিতেরা বহুল পরিমাণে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছেন। বর্তমান নাটকটির উপকরণ সংগৃহীত [illegible] প্রধানত প্লেটোর এই রচনাটি থেকে।

সক্রেটিসের দোষ সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে একটু মতভেদ [illegible]

যাছে। গ্রীসের ইতিহাস রচয়িতা জে. বি. বিউরি বলেছেন যে তখনকার দিনের আইন অনুসারে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। সক্রেটিসকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ মুক্ত চিন্তাশীল, কোন কিছুকেই তিনি সন্দেহাতীত বলে মেনে নেননি। সমস্ত কিছুর মহত্ব, গুরুত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করেছেন, সমস্ত কিছুকেই বিচার করতে চেয়েছেন। যে গণতন্ত্রের জন্য এথেন্সের সংগ্রাম, সেই গণতন্ত্রের নানা দিক সম্বন্ধেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তার ফলে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তির অভিযোগ। সক্রেটিস তাঁর জবানবন্দীতে স্পষ্ট বলেছিলেন তিনি তাঁর বিবেকের দ্বারা চালিত হতে চান এবং দেশের নীতি ও রীতির চেয়ে ঈশ্বরকে মান্য শ্রেয় মনে করেন।

সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে হয় প্রায় তিরিশ দিন। এই অবসরে বন্দীশালা থেকে পলায়নের সমস্ত পরিকল্পনা তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেষ-পর্যন্ত নির্লিপ্তভাবে হেমলক বিষ পান করেন। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর অবশ্য এথেন্স গভীরভাবে অনুতপ্ত হয় এবং তাঁর অভিযোগ-কারীদের দণ্ড দেয়। সক্রেটিসের মৃত্যু তাঁকে দিয়েছে অমরত্ব আর তাঁর বিরোধীদের জন্য রেখে গেছে অনাগত মানুষের তিরস্কার।

বর্তমান নাটকের দু'একটি চরিত্র কাল্পনিক এবং দু'একটি চরিত্রের কথাবার্তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু মূল কাঠামোটির সমস্ত উপকরণ সমকালীন উৎস থেকে সংগৃহীত।

সক্রেটিস

৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।। এথেন্স

বিচারালয়

বিচারালয়ে এখনও সব বিচারক এসে পৌঁছন নি। কয়েক-জন ভদ্রলোক কথা বলছেন। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে অন্যান্য বিচারকেরা আসতে থাকেন। বিচারকের সংখ্যা পাঁচশ এক, কাজেই রঙ্গমঞ্চে তাঁদের সকলকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে না। প্রধান বিচারক রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে। অন্যান্য বিচারকেরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে এসেছেন, অনেকেরই আইনের কোন জ্ঞান নেই। এথেন্সের বিচারালয়ে কোন উকীল নেই, বাদী এবং বিবাদী উভয়েই নিজেরাই নিজেদের বক্তব্য পেশ করে থাকেন। আজ বিচারালয়ে লোকেদের ভীড় খুব। রঙ্গমঞ্চের এক কোণে তিনজন বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলে ওঠেন 'ঐ যে ক্রিটো আসছেন'। ক্রিটো সত্তর বছরের বৃদ্ধ।

ক্রিটো : এসে গেছি। তোমরা কতক্ষণ।

তিন বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন : লুসানিয়াস, আন্তিফোন ও নিকোসত্রাতুস। তাঁদের পেছনে তরুণ প্লেটো।

প্লেটো, দেরী করে ফেলিনি তো।

প্লেটো : না ঠিক সময়েই এসেছেন। চলুন ঐ দিকে বসা যাক।

ক্রিটো : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বিচার শুরু হলে তারপর না হয় বসা যাবে। এ বিচার হবে—এ আমি ভাবতেই পারিনি লুসানিয়াস।

লুসানিয়াস : আমিও কি ভাবতে পেরেছিলাম ক্রিটো। অথচ—

প্লেটো : এখন পথে ঘাটে, এই তো একমাত্র আলোচনার বিষয়—সক্রেটিসের বিচার। কিন্তু কে বিচার করবে সক্রেটিসের? কার যোগ্যতা আছে এই বিচারকদের মধ্যে—

ক্রিটো : উত্তেজিত হয়ো না, প্লেটো। তুমি বিচলিত হবেই, তা তো স্বাভাবিক। আমি সত্তর বছরের বুড়ো, সক্রেটিস আমাদের কতদিনের বন্ধু—কত দিনের—তা যাকগে কিন্তু ব্যাপারটা কি বল তো! আমি বুড়ো মানুষ, রাষ্ট্রজীবন থেকে অনেক দূরে সব ভালো বুঝিও না। সক্রেটিসের ওপর রাগ তো অনেকেরই, কিন্তু এখন কে অভিযোগ আনল?

প্লেটো : মেলেতুস। না, আপনি চিনবেন না। সক্রেটিসও ভালো করে চেনেন না। আমি তাকে দু-একবার দেখেছি!

ক্রিটো : কে বল ত? ঐ যে পদ্য লিখত? আরিস্তোফানেস যাকে তোমার ঐ 'ব্যাং' নাটকে একটু—

লুসানিয়াস : না, না—এ অন্য লোক। পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা নাক, লম্বা চুল, গালে অবশ্য দাড়ি নেই ভালো। ক'দিন আগেই এ লোকটি আন্দোসিসের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ এনেছিল। তার সেদিনের বক্তৃতা তুমি যদি শুনতে ক্রিটো। বুঝতে পারতে ধর্মীয় উন্মাদনা মানুষকে কী রকম অন্ধ করতে পারে। যদি মেলেতুসের এই বক্তৃতা পৃথিবীতে টিকে যায়, আমাদের বংশধরেরা অবাক হয়ে যাবে, আমাদের ঘৃণা করবে। যে বিদ্বেষ থেকে মেলেতুস সেদিন আন্দো-সিসকে আক্রমণ করেছিল, আজ সেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকেই সে সক্রেটিসকে আদালতের সামনে অপমানিত করতে চায়।

একজন ভদ্রলোক লুসানিয়াসের কথা শুন-ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন

এক্রিয়ন : আপনারা যাঁরা সক্রেটিসের চেলা তাঁরা তো বলবেনই। আন্দোসিসকে আক্রমণ করব না তো কি পুজো করবে? আপনারা—বয়স তো বেশ হয়েছে মনে হয়—সক্রেটিসের ভক্ত আন্দোসিসকে আক্রমণ করাই তো উচিত—একশবার উচিত।

লুসানিয়াস : আপনি হঠাৎ—

এক্রিয়ন : হঠাৎ কি—হঠাতের কি আছে? আপনারা যা খুশি বলবেন আর শুনব। সক্রেটিসের চেলাচামুণ্ডারা দেশের শত্রু। মনে নেই, সিসিলি আক্রমণের জন্য আমরা তৈরী—সারা এথেন্স তৈরী—চোখে ভাসছে এখনও একশ চৌত্রিশটা সুন্দর জাহাজ, সব তৈরী, গ্রীষ্মের রাত শেষ হতে না হতেই সেই সব জাহাজ সমুদ্রে ভেসে পড়বে হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ল মন্দিরের, দেবতার মন্দিরের সামনের পবিত্র চতুষ্কোণ প্রস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ। আপনাদের মনে নেই? কে করেছিল? কার কীর্তি? কে সে নাস্তিক? মনে নেই? আমি জানি—আলকিবিয়াদেস, ঐ মদ্যপ, উচ্ছৃংখল, আপনাদের সক্রেটিসের বন্ধু, স্নেহের পাত্র, শিষ্য—

প্লেটো : না, মোটেই শিষ্য নয়, সক্রেটিসের স্নেহ তিনি পেয়েছেন, কিন্তু তিনি সক্রেটিসের শিষ্য নন। সক্রেটিসের শিষ্যরা ক্ষমতা চায় না, যশ চায় না। ঐ দরিদ্র নগ্নপদ গৃহী সন্ন্যাসী সক্রেটিস—তাঁর শিষ্যরা—

এক্রিয়ন : কে হে ছোকরা, একেবারে ভক্তি গদগদ দেখছি। সক্রেটিস

জ্ঞান ও যুদ্ধের দেবী এথেন

জাদু জানে। এখনকার ছোকরাগুলোকে একেবারে মন্ত্র-মুগ্ধ করে রেখেছে।

ক্রিটো : তা, জাদু তো আপনারও জানা উচিত। এতদিন ধরে আপোলোর পুজো করছেন—

এজিয়ুস : বুড়ো হয়েছেন তবু রসিকতা। হ্যাঁ কি বলছিলাম—

ক্রিটো : আপনি যা বলেছিলেন তা অবশ্য আমরা শুনতে খুব ইচ্ছুক নই। তবে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের প্রস্তর চতুষ্কের কথা বলছিলেন

এজিয়ুস : ঠিক, তাই বলছিলাম। ঐ অকালপক্ক ছোকরাটির, কি যেন নাম, প্লেটো, ঐ ছোকরাটার জন্য ভুলে যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ যা বলছিলাম, ঐ যে মন্দিরের প্রস্তর চতুষ্কগুলি দেখলাম চূর্ণ বিচূর্ণ, মানে দেবতার অপমান। সেদিন থেকে ক্ষোভ জমেছিল। একদিন না একদিন নাস্তিক বর্বর আলকিবিয়াদেসকে শাস্তি পেতেই হবে। শাস্তি পেয়েও-ছিল শেষ পর্যন্ত। আর—

লুসানিয়াস : জানি। সেদিন যাকে তাকে মিথ্যে সন্দেহে তোমরা বন্দী করেছিলে, হত্যা করেছিলে, বিচার করনি। তাদের মধ্যে একজন ছিল আন্দোসিসেস—

এজিয়ুস : বিলক্ষণ। দেবদেবী নিয়ে যারা ব্যঙ্গ করে তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। সক্রেটিসের সব দলবল, শিষ্য—

প্লেটো : সক্রেটিসের কোন দল নেই—

এজিয়ুস : অর্বাচীন, চুপ কর। সক্রেটিসের দল নেই! কে সব শেখায় লোকদের—ঐ সক্রেটিস। দেবদ্রোহী। মেলেতুস আজ প্রমাণ করে দেবে, বুঝেছ বৎস? মেলেতুস কে জান তো—এউমোলপিদায়ের পুরোহিত-বংশের সন্তান—যেখান থেকে এলেউসিনিয়ার পুরোহিতগোষ্ঠী বেছে নেওয়া হয়—

ক্রিটো : তাহলে সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল—

এজিয়ুস : মহাত্মা সক্রেটিস দেবতাবিরোধী এবং—এবং যুবকবৃন্দের (প্লেটোর দিকে অংগুলি নির্দেশ করে) অধঃপতনের মূলে —ঐ যে আসছে

প্লেটো : ঐ দেখুন, মেলেতুস, আর পেছনে আনুতুস—সক্রেটিসের বিরুদ্ধে উনিই এনেছেন মূল অভিযোগ। আপনি হয়ত জানেন না, আসলে অনেক দিনের রাগ জমে আছে সক্রেটিসের ওপর—একদিন, আপনার মনে আছে কি আমাদের বন্ধু মেনোর সামনে উনি সক্রেটিসকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করেছিলেন?

ক্রিটো : হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেদিন সক্রেটিস বলছিলেন যে সত্যিকারের গুণ কাউকে শেখানো যায় না। আনুতুস ভেবেছিলেন সক্রেটিস বুঝি নগরীর সমস্ত জ্ঞানীদের ব্যঙ্গ করেছেন। আসল ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি লুসানিয়াস, সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ এটা উপলক্ষ্য মাত্র, এর পেছনে আছে রাজনৈতিক কারণ। রাজনীতি যারা করে তাদের মুখের ওপরে থাকে মুখোস, তাদের চেনা কঠিন।

(আনুতুস এবং মেলেতুসের প্রবেশ। আনুতুস ক্রিটোর শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছে।)

আনুতুস : ঠিক তাই, ক্রিটো। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আমার আসল অভিযোগ রাজনৈতিক। আমি চাই সক্রেটিস এথেন্স থেকে বিতাড়িত হোক।

ক্রিটো : বাঃ কিন্তু তাঁর নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে—

আনুতুস : রাজনীতিতে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যটা একটু ভিন্ন যাই হোক বিচার শুরু হবে এখন। এস মেলেতুস। সক্রেটি দেখছি এখনও এসে পৌঁছয়নি, দেরী করে আসা স্বভাব তো।

সক্রেটিসের প্রবেশ। খালি পা, গায়ে সাধার মলিন একটুকরো কাপড় জড়ানো।

সক্রেটিস : না, আজ কিন্তু দেরী হয়নি। আনুতুস, পণ্ডিতে বলেন যেখানে খুশি দেরীতে যাও, কিন্তু ভোজসভ দেরী করে যেও না।

আনুতুস : এটা ভোজসভা নয়, এটা বিচারসভা।

সক্রেটিস : বিচারসভায় লোকে পায় ন্যায়, ন্যায় দিয়ে সমাজের পুষ্টি হয়—আর ভোজসভায় পায় সুখাদ্য, তাতে দেহের পুষ্টি। তাই ভোজসভারই তুলনা দিচ্ছিলাম বন্ধু

আনুতুস : আজ আপনি প্রথম থেকেই পরিহাস শুরু করেছেন।

সক্রেটিস : কামনা কর যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পরিহাস প্রতি বীতরাগ না হই। এই যে বন্ধু, ক্রিটো, লুসানি আন্তিফোন, নিকোসত্রাতুস। প্লেটো তুমিও এসেছ।

প্লেটো : আমরা সবাই এসেছি—

সক্রেটিস : আজ তোমাদের দেখে বড় ভালো লাগছে। আজ তো এসেছ—বড় খুশি হয়েছি। মানুষ কত কি চায়, ভ ভালো কুকুর, তেজী ঘোড়া, দামী দামী জিনিস, যশ, খ্যাতি। মানুষ বড় লোভী আমারও লোভ আ খুবই। তবে ওসবে নয়। কুকুরের নামে শপথ করে ব পারি, আমি শুধু চাই বন্ধু, বন্ধুদের হৃদয়।

এজিয়ুস : 'কুকুরের নামে শপথ'—বাপের জন্মে এরকম কথা নি। নাস্তিক, দেবতাবিরোধী।

প্লেটো ।। প্রধান বিচারপতি বোধহয় এলেন। চলুন, আমরা গিয়ে বসি।

[কয়েকজন বিচারকের প্রবেশ। ইতিমধ্যেই বি ভরে গেছে। ৫০১ জন বিচারক, এবং বহু দ কাজেই বিচারসভায় কোলাহল শুরু হয়েছে। বিচারপতির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল শা এল। তিনি এগিয়ে এসে দর্শকদের সামনে দাঁ

বিচারক ।। আজ এই বিচারসভায় এই পাঁচশ' একজন বি সামনে সক্রেটিসের বিচার হবে। রাষ্ট্রে সক্রেটিসের এই দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মে আনুতুস এবং পোলিকেতেস সক্রেটিসের অভিযোগ উপস্থিত করবেন। আশা করি তাঁর উপস্থিত।

আনুতুস ॥
মেলেতুস ॥ উপস্থিত। মহামান্য বিচারকগণ।
পোলিক্রেতেস ॥

বিচারক ॥ যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি, মানে, সক্রেটিস উপস্থিত ?

সক্রেটিস ॥ উপস্থিত, এথেন্সের ভদ্রমহোদয়গণ।

আনুতুস ॥ 'বিচারকগণ' বলে সম্বোধন করুন।

সক্রেটিস ॥ (নির্বোধের ভঙ্গীতে) ও, আচ্ছা। তা 'বিচারক' কাকে বলে আনুতুস ?

আনুতুস ॥ (ব্যঙ্গের সুরে) যিনি বিচার করেন, তাঁকে বিচারক বলে।

সক্রেটিস ॥ বাঃ, কিন্তু তুমি কি করে জানলে যে এঁরা বিচারক।

আনুতুস ॥ এঁরাই বিচার করবেন।

সক্রেটিস ॥ বিচার ক-র্-বে-ন্ ? কিন্তু বিচার হবার পরই তো জানতে পারব এঁরা বিচারক কিনা। একজন লোক যদি বলে যে, সে দর্জি, তুমি কি করে জানবে সে দর্জি। সে জামা তৈরি করতে পারলে তবেই তো প্রমাণিত হবে সে দর্জি। (বিচারসভায় কোলাহল, হাসির শব্দ)

বিচারক ॥ আপনি বিচারসভায় বিচারকদের সম্বন্ধে পরিহাস করবেন না। ফল খারাপ হবে। যাক, আপনারা আপনাদের বক্তব্য ব্যক্ত করুন।

পোলিক্রেতেস ॥ মাননীয় বিচারকগণ, আমি সংক্ষেপে আমার অভি-যোগ উপস্থিত করছি। আজ আমি যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অভিযোগ নিয়ে এসেছি, তিনি হলেন ঐ বৃদ্ধ সক্রেটিস। তাঁকে আপনারা সকলেই চেনেন। তিনি এথেন্সের পথে ঘাটে বাজারে ব্যায়ামাগারে প্রায় সবসময় ঘুরে বেড়ান—অর্থাৎ তাঁর কোন কাজ নেই। এই কর্মবিমুখ, অলস এবং মুখর বৃদ্ধকে আপনারা চেনেন। কিন্তু আমার অভিযোগ তাঁর কর্মবিমুখতার জন্য নয়, আলস্যের জন্যও নয়, এমনকি, মুখরতার জন্যও নয়—যদিও তাঁর মুখরতার জন্য আমরা এবং আমার মত বাকসংযমী ব্যক্তিরা বহু সময়েই অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিপন্ন বোধ করি। তবু আমরা তাঁর বয়স এবং তাঁর বাক্‌সর্বস্ব জীবনের মধ্যে কদাচিৎ কখনও জ্ঞানের আভাস দেখে তাঁর নানা ত্রুটি ক্ষমা করতে প্রস্তুত। কিন্তু, বিচারকগণ, আমার মুখ্য অভিযোগ হল যে, তিনি রাষ্ট্রবিরোধী, রাষ্ট্রদ্রোহী। আমাদের এই জন্মভূমি, আমাদের মহান রাষ্ট্র এথেন্স—তার সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু এই কদাকার বৃদ্ধ সক্রেটিস। তাঁর বিচার চাই।

বিচারক ॥ আপনার বক্তব্য স্পষ্ট করে বলুন, তাতে আমাদের বুঝতে সুবিধে হবে।

সক্রেটিস ॥ আমারও।

বিচারপতি ॥ আপনার না বুঝলেও চলবে। কথা বলবেন না।

পোলিক্রেতেস ॥ বিচারকগণ, আপনারা জানেন, আমরা দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করছি যাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়—যে গণতন্ত্রে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশে একদল মানুষ রয়েছে যারা বারবার আমাদের সংগ্রামকে পিছিয়ে দিতে চেয়েছে। একদল লোক আছে, ছিল এবং যদি আমরা সতর্ক না হই, তাহলে থাকবে—যারা গণতন্ত্র চায় না। কিন্তু আমরা কি তাই চাই ? (দর্শকদের মধ্য থেকে চীৎকার : না, না)। আমি জানি আমরা চাই গণতন্ত্র, আর তার শত্রুদের অবসান। অতএব গণতন্ত্রের শত্রুদের বিনাশ করতে হবে। তাদের রক্তে হবে গণতন্ত্রের মাটি উর্বর (দর্শকদের উল্লাস)।

আনুতুস ॥ (নিম্নস্বরে) মূল বক্তব্যে আসুন।

পোলিক্রেতেস ॥ প্রথমে বিচারকদের উত্তেজিত করে নিই। (উচ্চ-কণ্ঠে) গণতন্ত্রের সেই শত্রু, এথেন্সের শত্রু, আমাদের মহান নগরীর শত্রু কে ? কে সেই অপবিত্র, ঘৃণিত মানুষ ? কে ? ঐ যে ঐ যে—(সক্রেটিসকে লক্ষ্য করে) এদিকে আসুন, এইখানে দাঁড়ান, আমি প্রশ্ন করতে চাই।

সক্রেটিস ॥ বলুন।

পোলিক্রেতেস ॥ আপনার নাম ?

সক্রেটিস ॥ জানেন না ? যার নাম জানেন না, তার বিরুদ্ধে এত কথা।

বিচারক ॥ এটা বিচারসভার নিয়ম। নাম বলুন।

সক্রেটিস ॥ সক্রেটিস।

পোলিক্রেতেস ॥ পিতার নাম ?

সক্রেটিস ॥ পিতা সোফ্রোনিস্‌কুস্। মাতা ফাএনারাতে। স্ত্রী জনথিপে। পুত্র তিনটি, তাদের নাম—

পোলিক্রেতেস ॥ অতসব কে জানতে চাইছে ?

সক্রেটিস ॥ ভাবলাম, হয়ত মা, স্ত্রী, ছেলেদেরও নাম জানতে চাইবেন। যাতে সময় নষ্ট না হয় তাই বলে দিলাম।

পোলিক্রেতেস ॥ সিসিলি আক্রমণের সময় যখন এথেন্সের সব জাহাজ তৈরি ছিল, সেদিন রাত্রে কে বা কারা দেবতার মন্দিরের প্রবেশদ্বারের চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডগুলি ভেঙেছিল। এ-খবর জানেন ?

সক্রেটিস ॥ জানি।

পোলিক্রেতেস ॥ তার ফল কি হয়েছিল জানেন ?

সক্রেটিস ॥ এথেন্সের জাহাজগুলি কয়েকদিন দেরিতে সমুদ্র-যাত্রা করেছিল।

পোলিক্রেতেস ॥ কেন ?

সক্রেটিস ॥ মানুষের সংস্কার। অকারণে সবাই ভয় পেয়েছিল।

পোলিক্রেতেস ॥ বটে। সংস্কার ? কিন্তু ঐ কাজটা কি অন্যায় হয়নি ?

সক্রেটিস ॥ কোন কিছু ক্ষতি করা অন্যায় বৈকি।

পোলিক্রেতেস ॥ কোন কিছু ক্ষতি করার কথা বলছি না। মন্দিরের ক্ষতি করা অন্যায় নয় ?

সক্রেটিস ॥ বললাম ত' অন্যায়—কোন কিছু ক্ষতি করা মাত্রেই অন্যায়।

পোলিক্রেতেস ॥ কিন্তু মন্দিরের প্রবেশদ্বার বিধ্বস্ত করা অন্যায় কি না ?

সক্রেটিস ॥ কি জন্য বিধ্বস্ত করা হয়েছিল না জানলে কি করে বলব ?

পোলিক্রেতেস ॥ কারা এই কাজটি করেছিল সেটা বোধহয় জানেন ?

সক্রেটিস ॥ না।

পোলিক্রেতেস ॥ আলকিবিয়াদেসকে চেনেন ?

সক্রেটিস ॥ চিনতাম।

পোলিক্রেতেস ॥ সে এথেন্সের শত্রু তা জানেন ?

সক্রেটিস ॥ লোকে তাই বলে।

পোলিক্রেতেস ॥ আপনি কি বলেন ?

সক্রেটিস ॥ এথেন্সের শত্রু বলতে কি বোঝায়, তা না জানলে বলতে পারি না।

পোলিক্রেতেস ॥ (বিচারপতিদের দিকে তাকিয়ে) দেশের শত্রু বলতে কি বোঝায় তা ইনি জানেন না। তা, আলকি-বিয়াদেস আপনার শিষ্য ছিল ?

সক্রেটিস ॥ শিষ্য ? না, বন্ধু বলতে পারি। কথাবার্তা হত। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ। কিন্তু অলস, ইন্দ্রিয়পরায়ণ—সেজন্য বহুবার ভৎর্সনাও করেছি তাকে।

প্রাচীন গ্রীক আইনজ্ঞ সোলোন

পোলিকেত্তেস ।। বটে! এথেন্সের বিরুদ্ধে সে বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার পেছনে আপনার প্ররোচনা ছিল—মনে পড়ে?

সক্রেটিস ।। না, এরকম কিছু মনে পড়ে না।

পোলিকেত্তেস ।। মনে পড়ে না? আপনি তাকে গোপনে পরামর্শ দেননি?

সক্রেটিস ।। না, আমি কাউকে গোপনে পরামর্শ দিই না। এখনে বহু লোক উপস্থিত আছেন, তাঁদের কেউ যদি বলেন, আমি কাউকে গোপনে পরামর্শ দিয়েছি, তাহলে তিনি মিথ্যাবাদী। যেমন যদি আমি বলতে চাই যে, পোলিকেত্তেস মূর্খ, কারণ সে সত্যের চেয়ে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বেশি ভালবাসে, বিচারপরায়ণতার চেয়ে উত্তেজনা—তাহলে আমি তা গোপনে বলব না, প্রকাশ্যেই বলব।

পোলিকেত্তেস ।। (উত্তেজিত হয়ে) আপনি বলতে চান যে, যারা দেশদ্রোহী, যেমন আলকিবিয়াদেস, যারা অভিজাততন্ত্রের দলের লোক এবং আপনার বন্ধু, যেমন খারমিদেস, আদেইমানতুস, প্লেটো—এদের কাউকেই আপনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেননি?

সক্রেটিস ।। আমি কাউকে কোনকিছুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করি না। উত্তেজনার সাহায্যে কোন কাজ করানোয় আমি বিশ্বাস করি না।

পোলিকেত্তেস ।। আপনি এথেন্সের শত্রু, আপনি গণতন্ত্রবিরোধী, আপনি দুরভিসন্ধি, আপনি—

সক্রেটিস ।। এত উত্তেজিত হবেন না, শরীরের ক্ষতি হতে পারে। পোলিকেত্তেস, যদি আপনি আমাকে কিছু অর্থ দিতে চান আর আমি যদি তা না নিই, তাহলে সে-অর্থ কার থাকে?

পোলিকেত্তেস ।। (অবাক হয়ে) আমরাই।

সক্রেটিস ।। আপনার ঐ গালাগালি আমি গ্রহণ করলাম না—তাহলে ওগুলো কার হল?

পোলিকেত্তেস ।। (রুদ্ধস্বরে) পরিহাসের সময় নয় এখন।.... গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপনি বহুবার বলেছেন, পথে-ঘাটে আপনি বহুবার—

সক্রেটিস ।। বন্ধু, অভিজাততন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্র কী অর্থে শ্রেষ্ঠ, বুঝিয়ে দিন।

পোলিকেত্তেস ।। গণতন্ত্রে থাকে মানুষের স্বাধীনতা।

সক্রেটিস ।। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিসের স্বাধীনতা?

পোলিকেত্তেস ।। ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা।

সক্রেটিস ।। চিন্তার স্বাধীনতা? যে-কোন চিন্তার স্বাধীনতা?

পোলিকেত্তেস ।। অবশ্যই। সেটাই তো গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ব্যাপার।

সক্রেটিস ।। যে-কোন চিন্তার স্বাধীনতা? তাহলে একজন লোক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেও চিন্তা করতে পারে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেও বলতে পারে। ঠিক কিনা?

পোলিকেত্তেস ।। অবশ্যই।....না, না, তা পারে না।

সক্রেটিস ।। ও, তাহলে আপনাদের গণতন্ত্রে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা নেই। আমি যদি সে-কথা বলে থাকি, তাহলে কি সত্যি বলেছি, না মিথ্যে বলেছি?

পোলিকেত্তেস ।। অন্যায় বলেছেন।

সক্রেটিস ।। ন্যায়-অন্যায় নয়, সত্য, না মিথ্যা। আপনাদের গণতন্ত্রে গণতন্ত্রের বিরোধী সমালোচনা করা যায় না—এটা সত্য, না মিথ্যা? যদি বলেন যে, গণতন্ত্রে গণতন্ত্রেরও বিরোধী সমালোচনা করা যেতে পারে, তাহলে তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা চলে না। চলে কি?

পোলিকেত্তেস ।। (উত্তেজিতভাবে) না, মানে, আমি তা বলছি না। আমি—আপনি—মানে—আপনি বিচারকদের অপমান করেছেন।

সক্রেটিস ।। এ ত' অন্য অভিযোগ দেখছি।

পোলিকেত্তেস ।। না, মানে, এও গণতন্ত্রবিরোধিতা। আপনি বিচারকদের বিরুদ্ধে—

সক্রেটিস ।। বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। একটু বুঝিয়ে বলুন। গণতন্ত্রে বিচারকদের সম্বন্ধে কিছু বলা কি অন্যায়?

পোলিকেত্তেস ।। একশ'বার অন্যায়। একশ'বার অন্যায়।

সক্রেটিস ।। যদি তাঁরা আইন না জানেন, তাহলেও তাঁদের সমালোচনা অন্যায়?

পোলিকেত্তেস ।। তাহলেও।

বিচারক ।। আপনি কি বলতে চান বিচারকেরা আইন জানেন না।

পোলিকেত্তেস ।। বিচারকেরা আইন জানেন না, আমি আইন জানি না, জানেন শুধু উনি। বিচারকেরা কি জানেন না সেটা বড় কথা নয়।

সক্রেটিস ।। তাহলে বড় কথা কি শুধু শাস্তি দেওয়া? কিন্তু বিচার না হলে শাস্তিই বা দেবেন কিভাবে? যদি আমাকে কোনভাবে দণ্ড দেওয়াই আপনাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে এই বিচারের প্রয়োজন নেই। এথেনীয় ভদ্রমহোদয়গণ, এখন বোধহয় বুঝতে পারছেন কেন আমি আপনাদের বিচারক সম্বোধন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলাম।

পোলিক্রেতেস ।। আমি স্পষ্ট করে বলছি, সক্রেটিস এথেন্সের সমস্ত যুবকদের গণতন্ত্রবিরোধিতায় উৎসাহিত করেছেন, আজ থেকে চার বছর আগে তিনি স্বয়ং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন—আমি সে-ব্যাপার এখনই প্রমাণ করব—আমি সাক্ষী ডাকছি—এজিয়ুস

[পুরোহিত এজিয়ুস ব্যস্ততার সঙ্গে এগিয়ে এসে কিছু বলতে চায়, কিন্তু সক্রেটিস বাধা দেন।]

সক্রেটিস ।। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করুন। আজ থেকে চার বছর আগে অর্থাৎ যে-বছরে আমি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করেছিলাম এবং বিদ্রোহ করেছিলাম বলে বন্ধুবর বললেন, ঠিক তার এক বছর পরে এথেন্সে একটি আইন তৈরি করা হয়েছিল, তার নাম হল 'বিস্মৃতি বিধি'। সেই আইনের বক্তব্য ছিল এখনকার গণতন্ত্র স্থাপিত হবার আগেকার রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করে কাউকে বিচারসভায় অভিযুক্ত করা চলবে না। খুবই আশ্চর্য যে, আইনটির কথা এখানে বিচারসভায় কেউ মনে রাখেননি। যদিও বর্তমান বিচারপতিদের প্রত্যেককে শপথ নিতে হয়েছে এই কথা বলে যে 'আমি অতীতের অপ্রমাণিত অভিযোগের কথা মনে রাখব না এবং যারা তা রাখে, তাদের প্রতি শিথিলতা দেখাব না।'

আনুতুস ।। এ-আইন আমরা জানি। আমরা—

সক্রেটিস ।। তুমি অবশ্যই জানবে, আনুতুস। তুমি ধীমান, এবং চরিত্রবান, সর্বোপরি আইনটি তুমি স্বয়ং রচনা করেছিলে। এই রাজনৈতিক অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে আনাটা যে আইনবিরোধী তাও তুমি জানো।

আনুতুস ।। অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে, আমি স্বীকার করছি অন্যায় হয়েছে।

বিচারপতি ।। অত্যন্ত অন্যায়। পোলিক্রেতেস, আপনি অত্যন্ত বেআইনী কাজ করেছেন। এ বিচার হতে পারে না। সক্রেটিস যেতে পারেন। (দর্শকদের প্রবল চীৎকার)

পোলিক্রেতেস ।। (নিম্নস্বরে) বুড়োটা যে বেঁচে গেল। আনুতুস—

আনুতুস ।। তুমি নির্বোধ। রাজনীতির কথা তুললে কেন? ক্ষমা চাও। মহামান্য বিচারকগণ, পোলিক্রেতেস ক্ষমা ভিক্ষা করছে। ক্ষমা চাও শিগগির।

পোলিক্রেতেস ।। বিচারপতিগণ আমি ক্ষমা চাইছি। কিন্তু—

আনুতুস ।। (হাত টেনে ধরে) আবার কিন্তু—চুপ কর। (বিচারপতিদের দিকে) কিন্তু সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আমাদের অন্যান্য অভিযোগ আছে এবং তা রাজনৈতিক অভিযোগ নয়। মেলেতুস সেই অভিযোগগুলি উপস্থিত করবেন। আপনারা অনুমতি দিলেই—

বিচারক ।। মেলেতুস, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে বলুন।

মেলেতুস ।। অবশ্যই সংক্ষেপে বলব বিচারকগণ। আমি পিথোসের পুত্র মেলেতুস আলোপেকে-নিবাসী সোফ্রোনিসকুসের পুত্র সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করছি যে আবহমানকাল ধরে এথেন্সবাসীরা যে সকল দেবদেবীর পূজা করে আসছেন এবং এখনও করেন, সক্রেটিস সেই দেবদেবীদের মানেন না, অসম্মান করেন, এবং তিনি নতুন দেবতার সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি এথেন্সের যুবকবৃন্দকে বিপথে চালিত করছেন এবং তাদের চরিত্র নষ্ট করছে।

আনুতুস ।। মহামান্য বিচারকবৃন্দ, আমারও এই অভিযোগ, মেলেতুসের বক্তব্য আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

বিচারক ।। আপনাদের বক্তব্য প্রমাণ করুন।

মেলেতুস ।। আমি অবশ্যই আমার অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ দেব, তাঁর অপরাধ আমি প্রমাণ করব এবং এই অপরাধের জন্য সক্রেটিসকে দেওয়া উচিত চরমদণ্ড—মৃত্যু।

উপস্থিত জনগণের প্রায় সকলেই আমাদের সাক্ষী, আমরা যাকে ইচ্ছে এখানে ডাকতে পারি। আচ্ছা, আপনি আসুন, এজিয়ুস। ইনি সম্মানিত ব্যক্তি, ইনি আমাদের সাক্ষী।

এজিয়ুস ।। হ্যাঁ, আমি কিছু বলতে চাই।

মেলেতুস ।। আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করব, তার উত্তর দেবেন, বেশী কিছু বলার দরকার নেই।

এজিয়ুস ।। (হতাশ সুরে) আচ্ছা, তাই।

মেলেতুস ।। সক্রেটিসকে আপনি চেনেন

এজিয়ুস ।। খুব চিনি, হাড়ে হাড়ে চিনি।

মেলেতুস ।। সক্রেটিস কেমন লোক?

এজিয়ুস ।। দেবতা বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী

মেলেতুস ।। আঃ এসব কথা এখন নয়। আপনি কি করেন?

এজিয়ুস ।। আমি দার্শনিক। সক্রেটিস গণতন্ত্র—

মেলেতুস ।। (ধমক দিয়ে) চুপ করুন। সক্রেটিসের সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই আলোচনা করার সুযোগ ঘটেছে। সাধারণত উনি কি বলে থাকেন?

এজিয়ুস ।। উনি অত্যন্ত বাচাল। উনি বলে থাকেন যে 'আমি কিছুই জানি না'। আসলে—

মেলেতুস ।। আসলে কি?

এজিয়ুস ।। উনি বলতে চান যে কেউ কিছু জানে না। গণতন্ত্র বিরোধী কিনা!

মেলেতুস ।। তা আপনি তখন কি বলতেন?

এজিয়ুস ।। দেখুন, আমার সঙ্গে প্রায়ই ও'র তর্ক হত। উনি আমাকে প্রত্যেক তর্কেই বে-ইজ্জৎ করে ছেড়েছেন।

বিচারক ।। কেন?

এজিয়ুস ।। মানে, রাস্তায় ঘাটে যদি একজন প্রমাণ করে দেয় যে আপনি একজন মূর্খ—

বিচারক ।। সক্রেটিস কি প্রমাণ করে দিয়েছেন যে আপনি একজন মূর্খ

এজিয়ুস ।। হ্যাঁ-না-মানে-উনি আমাকে অপমান করেছেন—এই নগরীর সমস্ত পণ্ডিতদের, অভিজাতদের—

ক্রিটো ।। উনি যদি অভিজাতদেরও অপমান করে থাকেন, তাহলে ও'কে অভিজাতদের মুখপাত্র বলা তো চলে না। উনি যদি বলতেন জনসাধারণ মূর্খ আর অভিজাতরাই শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী তাহলে আপনার বক্তব্য প্রমাণ হত।

বিচারক ।। আপনি চুপ করুন। এটা বিচারসভা, বিতর্কসভা নয়। মেলেতুস, আপনার বক্তব্য কি? আপনার সাক্ষী বলতে চান যে সক্রেটিস নগরীর সমস্ত অভিজাতদের অপমান করেছেন। কি কিভাবে?

মেলেতুস ।। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে কেউ কিছু জানে না।

বিচারক ।। তা কি প্রমাণিত হয়েছে?

মেলেতুস ।। না, মানে, পথে ঘাটে যদি লোকজনকে খামোকা কঠিন প্রশ্ন করেন—

বিচারক ।। কিন্তু এথেন্সের বিদ্বানরা কি সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না?

পেরিক্লিস

এরিস্তুস ।। মানে-মানে-উনি এমনভাবে প্যাঁচে ফেলেন যে—
প্লেটো ।। যে আপনারা তর্কে পরাস্ত হন।

বিচারক : আবার আপনি কথা বলছেন। (এরিউসের প্রতি) আপনি যেতে পারেন।
মেলেতুস : আমি অন্য সাক্ষী ডাকছি। পুরোহিত, এউফোরিয়ন।
(এউফোরিয়ন এগিয়ে আসেন)
পুরোহিত : উপস্থিত।
মেলেতুস : আপনি সক্রেটিসকে চেনেন?
পুরোহিত : বিলক্ষণ।
মেলেতুস : উনি কখনও আমাদের দেবদেবীদের সম্বন্ধে—
পুরোহিত : কখনও কি মশাই, সব সময় দেবদেবীদের বিরুদ্ধে বলেন।
মেলেতুস : কি বলেন?
পুরোহিত : নাস্তিক, ঘোরতর নাস্তিক, আমাদের দেবদেবী মানেন না।
মেলেতুস : উনি কি কোন নতুন দেবদেবীর কথা বলেন।
পুরোহিত : বলেন, বলেন, নাস্তিক, মশাই।
বিচারক : কি বলেন?
পুরোহিত : অত শত জানি না, তবে উনি বলেন জানি।
বিচারক : কি করে জানলেন?
পুরোহিত : আমি জানি, ব্যাস্। যেমন জানি আপনার কান আছে।
বিচারক : বেশী চালাকি করবেন না। কি করে জানলেন সক্রেটিস নতুন দেবদেবীর কথা বলেন?
পুরোহিত : ঠ্যালা সামলাও। ঐ যে মধ্যে মধ্যে সক্রেটিস বলেন না—কুকুরের নামে শপথ—

বিচারক : কুকুরের নামে শপথ?
পুরোহিত : হ্যাঁ, ঠিক—ওখানে থেকেই বোঝা যায়। আসলে কথা হল যে সক্রেটিস অত্যন্ত হারামজাদা লোক, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। আমার সাফ্ কথা।
বিচারক : সেটা আমরা ঠিক করব। কিন্তু সক্রেটিস কেন খারাপ?
পুরোহিত : মহাঝামেলা দেখছি। সক্রেটিস খারাপ, ছেলেদের খারাপ করে দিচ্ছে। বলে কি মানুষকে শ্রদ্ধা করবে গুণ দেখে, বয়সের দাম নেই। দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এই দেখুন না কালকের ছোকরা এউথুফ্রো, সে তার বাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে—
মেলেতুস : আঃ ওসব কথা থাক—
পুরোহিত : না, থাকবে কেন? সব স্পষ্ট করে বলা ভালো। এউথোফ্রোর বাপ একটা ক্রীতদাসকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। আচ্ছা, না হয় মেরেই ফেলেছে, তাই বলে তুই বাপের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ করবি। এই তোর মনুষ্যত্ব। এর মূলে কে? এর মূলে কে শুনি।
আনুতুস : মেলেতুস, তোমার এইসব সাক্ষীর জন্য সব বানচাল হয়ে যাবে। সাক্ষীর দরকার নেই। শুধু বক্তৃতা—জ্বালাময়ী ভাষায় কথার ফুলঝুরি ছড়াও, বিচারকদের ঘাবড়ে দাও।
মেলেতুস : পুরোহিত, আপনি যান। বিচারকগণ, আমার আর সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। মহান বিচারকগণ, আপনারা গণতন্ত্রের পুরোধা। আমি মেলেতুস, এথেন্সের সমস্ত মানুষের হয়ে আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমি বিচার চাই। বিচার চাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে, প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে। যারা জনগণের স্বার্থবিরোধী—তারা দেশের শত্রু; যারা জনগণকে বিপথে চালিত করে তারা দেশের শত্রু; যারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে তারা দেশের শত্রু। তাদের শাস্তি চাই। মহান বিচারকগণ, এই সেই বৃদ্ধ, যে যুবকদের বিপথগামী করেছে, এই সেই জ্ঞানী যে প্রচার করেছে অসত্য, এই সেই নাগরিক যে তার মাতৃসমা নগরীকে করেছে অপমান।
আনুতুস : (নিম্নস্বরে) রাজনীতির ব্যাপার এনো না। লোকে যেন বুঝতে না পারে।
মেলেতুস : আমার বন্ধু আনুতুস বলছেন, আমি যেন সক্রেটিসের প্রতি বেশী নির্মম না হই। বিচারকগণ, আমি জিজ্ঞাসা করি, এখানে যাঁরা এসেছেন, যাঁদের সন্তান আছে, তাঁদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন যিনি চান তাঁর স্নেহলালিত সন্তান অন্যায় পথে ধাবিত হোক, বিপথগামী হোক, যদি কেউ ভাবেন যে তাঁর পুত্রের ভালো-মন্দে তাঁর কিছু এসে যায় না, তাহলে আমি আর কিছু বলব না।
(দর্শকদের কোলাহল)

আমি নীরব হতেই চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এথেন্স, আমার জন্মভূমি, আমার দেশ আজ চলেছে অন্ধকারের পথে। সেই অন্ধকারের প্রলোভন এত দুর্নিবার যে আমার মত এক তুচ্ছ মানুষের আর্তনাদ কারো কানে পৌঁছবে না, তাই ভেবেছিলাম আমার জন্মভূমির সর্বনাশা পরিণতি দেখার আগেই যেন চিরকালের মত নীরব হয়ে যেতে পারি। কিন্তু আজ দেখতে পারছি আপনারা আমার পক্ষে, আপনারা আমার সহায়।

আমার এথেন্স, আমার পিতৃভূমি আমাকে নীরব থাকতে দেবে না। সে আমাকে বলেছে কঠিন আঘাতের সামনে দাঁড়াও পর্বতের মত। প্রতিভূত কর অলংঘ্য সত্যের স্পর্ধা-

ফেনিল পদক্ষেপ। নয়, উচ্ছৃঙ্খল অশ্বের অহঙ্কারস্ফীত কেশরগুচ্ছ। দাঁড়াও বিজয়ী বীরের মত। মদমত্ত শত্রুর মর্ম ভেদ করুক তোমার বল্লমের সুতীক্ষ্ন ফলক। তাই বলছি, আবার বলছি, সক্রেটিস, এই সেই সক্রেটিস যে আমাদের শত্রু। এর জিহ্বা সাপের মত বিষাক্ত। এর শিক্ষার ফল স্মরণ করুন—আলকিবিয়াদেস এরই শিষ্য—যে দেশ-দ্রোহী। এরই শিষ্য ক্রিটিয়াস, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যিনি স্বপ্ন রচনা করেছেন, যিনি থেসোলীতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করেছিলেন। ঐ দেখুন, প্লেটো—সুন্দর, সৌম্য, স্থিতধী কিন্তু অলসচিন্তায় মগ্ন, যে চিন্তায় সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ নেই। দেখুন—জেনোফোন, যে নিজের দেশ ছেড়ে চলে গেছে অন্য দেশে অর্থলোভে, যশলোভে।

আমাদের দেবতা, অলিম্পিয়াসনিবাসী সর্বশক্তিমান জেউস, অনলপ্রভা হেরা, দিব্যাঙ্গনা আথেনা, অগ্নিকান্ত আপোল্লো ফেনধবলা আফ্রোদিতে, মৃত্যুরাজ্যাধিপতি হাদেস—যাঁরা আমাদের উপাস্য, আমাদের পিতৃপুরুষ যাঁদের পূজো করেছেন, আমাদের কবিরা যাঁদের বন্দনা করেছেন—সেইসব দেবদেবীকে অস্বীকার করেন ঐ হতভাগা বৃদ্ধ সক্রেটিস। তাঁদের পরিবর্তে তিনি সৃষ্টি করতে চাইছেন নতুন দেব-দেবী, গোপনে গোপনে, গূঢ় গহন অভিসন্ধিতে। আমাদের ধর্মের, আমাদের ঐতিহ্যের এই অপমান কি আমরা নীরবে সহ্য করব? আমাদের চোখে জ্বলুক সেই দৈবী আগুন যে আগুনে সব ঔদ্ধত্য দগ্ধ হবে, আমাদের বুকে উদ্গত হোক সেই প্রচণ্ড প্রতিহিংসা, সেই পবিত্রতম প্রবৃত্তি, যা শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে উৎসাহিত করে, যা উদ্বুদ্ধ করে মানুষকে তার লক্ষ্যভেদ করতে। সমস্ত এথেন্স আমার পক্ষে। আমরা অবসান চাই ঔদ্ধত্যের, আমরা নিশ্চিহ্ন করতে চাই বিদ্রোহের ক্ষীণতম কণ্ঠস্বরকেও। আমরা অব-দমিত করতে চাই প্রতিক্রিয়ার নির্বিষ সর্পকেও। আমরা হত্যা করতে চাই বৃদ্ধতম শক্তিকেও।

সক্রেটিস, তোমার অপরাধ স্বীকার কর, বিচারকদের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা কর, নির্বাসন চলে যাও, বার্ধক্যের নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে বসে বসে প্রায়শ্চিত্ত কর তোমার অসংযত অভিমানের, অথবা প্রস্তুত হও সেই ভীষণ মুহূর্তের জন্য। সক্রেটিস, সমস্ত দেশ তোমাকে ঘৃণা করে, তুমি আমাদের লজ্জা। তোমার দেহ কদাকার, তুমি হতশক্তি বৃদ্ধ, তোমাকে দেশ ঘৃণা করে। বিচারকগণ, আপনারা বিচার করুন। দণ্ড দিয়ে প্রমাণ করুন এথেন্স প্রয়োজনে নির্মম হতে পারে। শুধু আজকের এথেন্স নয়, ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে, আমি সেই অনাগত মানুষের জয়ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, ভবিষ্যৎ মানববংশের প্রতিনিধি হয়ে আমি আপনাদের সাধুবাদ দিচ্ছি। পৃথিবী থেকে মুছে যাক একটি নাম—সক্রেটিস। (দর্শকদের জয়ধ্বনি)

বিচারক ।। আপনি বসুন, মেলেতুস। সক্রেটিস, আপনার কিছু বলার আছে?

সক্রেটিস ।। বলার? আছে, কিছু বলার আছে।

বিচারক ।। আমরা আপনার বক্তব্য শুনতে প্রস্তুত।

ক্রিটো ।। প্লেটো, আমার মনে হচ্ছে, সক্রেটিস যা বলবেন তাতে বিচারকেরা খুশী হবেন না, আর তার ফলে প্রতিপক্ষের সুবিধে হবে। সক্রেটিস কখনও বিচারালয়ে আসেননি—উনি জানেন না কি করে—

প্লেটো ।। লিসিয়াস সক্রেটিসের হয়ে একটি জবানবন্দী লিখে এনেছেন। কিন্তু সক্রেটিস কি রাজি হবেন—

ক্রিটো ।। তুমি যাও, তুমি একবার অনুরোধ কর

প্লেটো ।। বিচারকগণ, আমি এক মুহূর্ত সক্রেটিসের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বিচারক ।। বেশ, কিন্তু বেশী সময় দিতে পারব না।

(প্লেটো সক্রেটিসের কাছে যান)

প্লেটো ।। লিসিয়াস আপনার জন্য একটি জবানবন্দী লিখে এনেছেন—যদি আপনি সেটা পড়েন—তাহলে

সক্রেটিস ।। (বিষণ্ণ হাসি হেসে) ভয় পাচ্ছ? জানি লিসিয়াস আইনজ্ঞ, তার কথা বলার শক্তি অসাধারণ, লেখার ক্ষমতাও প্রচণ্ড। তার ভাষণে বিচারকেরা মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আর সক্রেটিস মুক্ত হবে। এই তো? কিন্তু তুমি কি তাই চাও প্লেটো?

প্লেটো ।। আমরা সকলেই তাই চাই। আপনার জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান।

সক্রেটিস ।। লিসিয়াস কথা বলবে সক্রেটিসের সমর্থনে। কিন্তু আমি কথা বলব সত্যের সমর্থনে। সক্রেটিস সাধারণ একটি লোক। তার মৃত্যুতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সত্যের মৃত্যু হলে?

প্লেটো ।। কিন্তু—

সক্রেটিস ।। কিন্তু নয়, প্লেটো। লিসিয়াসকে আমার ধন্যবাদ জানিও—ঐ যে দূরে বসে আছে। প্লেটো যাও।

প্লেটো ।। সক্রেটিস!

(সক্রেটিস হেসে আবার প্লেটোকে যেতে নির্দেশ দিলেন। প্লেটো ধীরে ধীরে চলে এসে নিজের জায়গায় বসলেন)

বিচারক ।। সক্রেটিস, আপনার বক্তব্য—

সক্রেটিস ।। পেছনে যাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন তাঁদেরও ডেকে দিন।

বিচারক ।। আবার পরিহাস।

সক্রেটিস ।। মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বক্তা নই। আমি মেলেতুসের বক্তৃতা আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলাম। কী উদাত্ত তাঁর কণ্ঠস্বর, কী আশ্চর্য তাঁর ভাষা, কী লম্বা লম্বা বাক্য, যেন আকাশে মেঘ ডাকছে আর বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে। কিন্তু কী করুণভাবে অন্তঃসারশূন্য। অসুন্দর মহিলারা যেমন তাদের সৌন্দর্যের অভাব ঢাকতে চান বহুমূল্য প্রসাধনে, মেলেতুস তার ভাবের শূন্যতা ঢাকতে চাইছিলেন কথার আড়ম্বরে। (দর্শকদের মধ্যে প্রতিবাদ) আমি সাদা মানুষ, কথার প্যাঁচ আমার জানা নেই। বিচারসভায় যে ধরনের অনর্গল, অবিরল কথার কলস্রোত আপনারা পছন্দ করেন, আমি সে ধরনের বক্তৃতা দিতে পারব না। অতএব অনুমতি দিন, আমি চিরদিন যেভাবে কথাবার্তা বলে এসেছি আজও সেইভাবেই বলব। বক্তারা চান মানুষকে উত্তেজিত করতে। আমার কাজ সত্যের সন্ধান কাজেই উত্তেজনার আশ্রয় আমি নিতে পারব না। (দর্শকদের মধ্যে প্রতিবাদ) আমার কথায় লোকে বিরক্ত হয় কারণ আপনারা আমার কথা সোজাসুজি বুঝতে পারেন। কিন্তু যেসব লোকে বোঝে না, লোকে ভাবে তা অতি মহৎ ব্যাপার, তাই তারা জয়ধ্বনি করে। মেলেতুসের বক্তৃতা শুনে আপনারা যে জয়ধ্বনি করছেন তার একটা কারণ তাঁর বক্তব্য আপনারা বুঝতে পারেননি। কথাটা পরিষ্কার করে বলি। আমার বিরুদ্ধে আজকের অভিযোগ আসলে রাজনৈতিক অভিসন্ধি।

আনুতুস ।। না, মোটেই নয়।

মেলেতুস ।।

সক্রেটিস ।। জানি আইন অনুসারে আমার বিরুদ্ধে কোন রাজনৈতিক অভিযোগ প্রকাশ্যভাবে আনা যাবে না। পোলিক্রেতেস সেই ভুল করেছেন। আপনারা জানেন যে বিস্মৃতি-বিধি অনুসারে আজকের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আগের সময়কার ঘটনা অবলম্বন করে কোন পূর্বতন অপ্রমাণিত অভিযোগ করা বেআইনি। এই বিধি যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন আমাদের বন্ধু, আনুতুস। কাজেই তিনি কিছুতেই চান না যে এই অভিযোগ রাজনৈতিক অভিযোগের চেহারা নিক।

আনুতুস ।। বিচারকগণ, আমাদের অভিযোগ মোটেই রাজনৈতিক নয়, নৈতিক এবং সামাজিক।

সক্রেটিস ।। সমাজ এবং ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগ বড় ঘনিষ্ঠ। যে ব্যাপারটি চাপা দেবার জন্য বন্ধুবর আনুতুস উঠে পড়ে লেগেছেন, সেই ব্যাপারটাই আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই।

আমি দরিদ্র সক্রেটিস, কাজকর্ম বিশেষ নেই, আগে পুতুল গড়তাম, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতাম, লেখাপড়া বিশেষ জানি না। রাস্তাঘাটে ঘুরি, অল্পবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব ভাব। ওরা আমায় ভালবাসে, আমিও ওদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি। এইভাবে আমার দিন কাটে, আমার বয়স বেড়ে চলেছে, আমার কদাকার দেহ আরো কদাকার হয়েছে। কিন্তু এই সত্তর বছরের বুড়োর অল্প-বয়সী বন্ধুর অভাব নেই। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়, তর্ক হয়, সময় কেটে যায় [illegible]।

একদিন হঠাৎ আমার এক বন্ধু গয়েছিল দেলফি-তে, দৈববাণী শুনতে। দেলফির মন্দিরে নাকি দৈববাণী হয়েছে যে পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী লোক হল সক্রেটিস। আমি তো শুনে তাজ্জব। সে কি করে হয়। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী? অথচ আমি তো মুখ্যুসুখ্যু লোক, কিছুই জানি না। ব্যাপারটা কি? ভাবলাম দৈব-বাণীর নিশ্চয়ই কোন মানে আছে। সেই মানেটা খুঁজে বার করতে হবে। আমি তখন করলাম কি জানেন, যাঁরা এথেন্সের সবচেয়ে জ্ঞানী বলে পরিচিত এক এক করে তাঁদের কাছে যেতে শুরু করলাম—যাঁরা কবি, যাঁরা শিল্পী, দার্শনিক—হ্যাঁ, সকলের কাছে যেতে আরম্ভ করলাম—আনতুসও তাঁদের মধ্যে একজন—তাঁর কাছেও গিয়েছিলাম। এইসব জ্ঞানী লোক থাকতে হঠাৎ আমাক সবচেয়ে জ্ঞানী বলা হল কেন? এঁদের সকলের কাছে গিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করলাম নানা বিষয়ে। আশ্চর্য, সত্যি আশ্চর্য, দেখলাম যে এঁদের প্রত্যেকের জ্ঞানের প্রচণ্ড অহমিকা। কেউ জানে না যে সে যতটুকু জানে তার চেয়ে অনেক বেশী তার অজানা। ওরা জানেন না যে এরা জানে না। তখনই দৈববাণীর মানে জলের মত সোজা হয়ে গেল। সত্যিই আমি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী, কারণ আমি জানি যে আমি জানি না। আমার অন্তত এইটুকু জ্ঞান আছে।

সেই থেকে আমার মনে হল আমাকে ঈশ্বর যেন নির্দেশ দিলেন যাও মানুষকে বোঝাও জ্ঞান অনন্ত, সে যতটুকু জানে তার লক্ষ গুণ তার অজানা। তাই সেদিন থেকে শহরের পথে ঘাটে হাটে বাজারে যেখানেই সুধী জ্ঞানী বলে যাঁরা পরিচিত তাঁদের দেখলেই আমি নানা ব্যাপারে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিলাম। দেখলাম তাঁরা যা জানেন না, তা জানেন বলে দাবী করছেন: জানার ভান করছেন। যখনই তাঁদের প্রশ্ন করতাম, আমার চারপাশে লোকজন জমত, তারা আগ্রহের সঙ্গে আমাদের আলোচনা শুনত—আনুতুস জানেন, এজিউনও জানেন—কিন্তু জ্ঞানীদের অভিমানে ধাক্কা লাগত, সুধীরা বিরক্ত হতেন, অনেকে রাগে ফেটে পড়তেন। এইভাবে আমার দিন কাটত, সন্ধ্যে-বেলায়—

এজিউন ।। বাড়ি ফিরলে শুনেছি বৌ ঝাঁটা মারত।

সক্রেটিস ।। আশা করি মহাশয়ের স্ত্রী সর্বদাই প্রিয়বাদিনী।

বিচারক ।। এসব বাজে কথা থাক। যা বলছিলেন বলুন

সক্রেটিস ।। এথেন্সের সুধীজ্ঞানীরা এইভাবে আমার প্রতি বিরক্ত হলেন। ধীরে ধীরে রটনা হতে লাগল যে আমি জ্ঞানীদের শত্রু, কবিদের শত্রু, নাগরিকদের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু। না, আমি শত্রু মূর্খতার, মূর্খের অহমিকার, অক্ষম অহংকারের ভানের। মহাশয়গণ, আপনারা যদি মূর্খতার, অহমিকার, মিথ্যার এবং ভানের শত্রু না হন তাহলে অবশ্যই আমি আপনাদের চোখে দোষী বলে প্রমাণিত হব। আমি দণ্ডনীয়।

আনুতুস ।। বিচারকগণ সক্রেটিসের কথা থেকে সাবধান। এঁর কথার শক্তি মোহিনী। সাবধান থাকবেন।

বিচারক ।। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখছি—

সক্রেটিস ।। আমি দরিদ্র, আমার এই একটিই পোশাক। সুসজ্জিত হয়ে এখানে আসার ইচ্ছে থাকলেও আমার সামর্থ্য নেই।

বিচারক ।। আপনি শিক্ষাদান করে অর্থ গ্রহণ করেন না?

সক্রেটিস ।। না। আমি শিক্ষাদানও করি না। শেখাবার মত কিছু আমি জানি না। যাইহোক, বন্ধু মেলেতুস এখানে এসো, হ্যাঁ এখানে। কয়েকটি প্রশ্ন করব। (মেলেতুস সক্রেটিসের সামনে এসে দাঁড়ান অস্বস্তির সঙ্গে) তোমার অভিযোগ, আমি দেবতা মানি না এবং নতুন দেবদেবীর সৃষ্টি করেছি।

মেলেতুস ।। হ্যাঁ।

সক্রেটিস ।। এবং আমি তরুণদের বিপথগামী করি

মেলেতুস ।। হ্যাঁ।

সক্রেটিস ।। আমি নাস্তিক?

মেলেতুস ।। হ্যাঁ।

সক্রেটিস ।। বাঃ। ঐ জ্বালাময় বক্তৃতার পর এই সংক্ষিপ্ত উত্তরগুলি কি সুন্দর! আচ্ছা, তুমি বলতে চাও আমি চন্দ্র সূর্যকে দেবতা বলে স্বীকার করি না।

মেলেতুস ।। আমি বলতে চাই সক্রেটিস নাস্তিক।

সক্রেটিস ।। বন্ধুগণ, মেলেতুস আপনাদের কাছে একটি ধাঁধা উপহার দিয়েছেন। ধাঁধাটি সমাধান করুন।

মেলেতুস ।। ধাঁধা?

সক্রেটিস ।। আচ্ছা বন্ধু নাস্তিক কে?

মেলেতুস ।। যে দেবদেবীতে বিশ্বাস করে না।

সক্রেটিস ।। চমৎকার। আমি দেবদেবী বিশ্বাস করি না অতএব আমি নাস্তিক।

মেলেতুস ।। ঠিক।

সক্রেটিস ।। আচ্ছা নতুন দেবদেবীর সৃষ্টি করেছি? ঠিক?

মেলেতুস ।। ঠিক।

সক্রেটিস ।। অর্থাৎ—অর্থাৎ আমি নতুন দেবদেবীকে বিশ্বাস করি ঠিক?

মেলেতুস ।। ঠিক।

সক্রেটিস ।। অর্থাৎ আমি একদল দেবদেবীতে বিশ্বাস করি। অতএব আমি নাস্তিক নই। ঠিক?

মেলেতুস ।। ঠিক। (বুঝতে পেরে) না—না, মানে আপনি রাষ্ট্র স্বীকৃত দেবতায় বিশ্বাস করেন না, তাই নাস্তিক।

সক্রেটিস ।। চমৎকার। আমি নাস্তিক এবং নাস্তিক নই। মেলেতুস আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টি করার কি প্রাণান্তকর চেষ্টা তোমার। ভগবান তোমাকে সুমতি দিন। আমি

ভগবান স্বীকার করি—রাষ্ট্র স্বীকার না করলেও করি।
আচ্ছা, মেলেতুস, আমি তরুণ সমাজের ক্ষতি করি। তুমি নিশ্চয়ই তরুণসমাজ, যুবসমাজ নিয়ে খুবই চিন্তিত।

মেলেতুস ।। (অস্বস্তির সঙ্গে) হ্যাঁ, আমি যুবসমাজের উন্নতি নিয়ে চিন্তিত।

সক্রেটিস ।। আচ্ছা, যুবসমাজকে উন্নতির পথে কারা নিয়ে চলেছে? ধর, এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যে কারা যুবকদের উন্নতির সহায়ক? কারা?

মেলেতুস ।। যেমন, যেমন, ধরুন, বিচারকেরা।

সক্রেটিস ।। বিচারকেরা? এ'রা সকলেই?

মেলেতুস ।। নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস ।। এ'রা সকলেই যুবকদের উন্নতির পথে নিয়ে চলেছেন?

মেলেতুস ।। কেন, আপনার কি ধারণা?

সক্রেটিস ।। বাঃ, এ'রা সকলেই যুবকদের উন্নতির পথে নিয়ে চলেছেন। বেশ। আচ্ছা, রাজকর্মচারীরা—ও'রাও কি যুবকদের—

মেলেতুস ।। হ্যাঁ, রাজকর্মচারীরাও যুবকদের উন্নতির মূলে।

সক্রেটিস ।। আমাদের লোকসভার প্রতিনিধিরা, তাঁরাও?

মেলেতুস ।। অবশ্যই তাঁরাও।

সক্রেটিস ।। শিক্ষকেরা?

মেলেতুস ।। নিশ্চয়ই।

সক্রেটিস ।। কবি, শিল্পী, শ্রমিক,—এ'রা?

মেলেতুস ।। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই, কবি, শিল্পী, সবাই

সক্রেটিস ।। মানে এথেন্সের সকলেই যুবকদের উন্নতির চেষ্টা করছেন?

মেলেতুস ।। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সক্রেটিস ।। শুধু আমি, একা, যুবকদের বিপথে নিয়ে চলেছি?

মেলেতুস ।। ঠিক তাই।

সক্রেটিস ।। আচ্ছা, মেলেতুস, কেউ কি চায় যে সে অন্যের দ্বারা প্রহৃত হোক। মানে, কেউ কি মার খেতে চায়?

মেলেতুস ।। অদ্ভুত প্রশ্ন। মার খেতে চাইবে কেন?

সক্রেটিস : তাহলে তুমি বলছ যে কেউ মার খেতে চায় না। আচ্ছা কেউ কি চায়, অন্যে তার ক্ষতি করুক?

মেলেতুস : না। চায় না। আমি অবশ্য আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না।

সক্রেটিস : আচ্ছা, সমাজের ক্ষতি করা মানে নিজেরও ক্ষতি করা, তাই না?

মেলেতুস : বটেই তো।

সক্রেটিস : তাহলে আমি যে তরুণদের বিপথগামী করি, অর্থাৎ সমাজের ক্ষতি করি, তার মানে হলে নিজেরই ক্ষতি করি, তাই না?

মেলেতুস : আ-আ-আ,-হ্যাঁ, তা বটে।

সক্রেটিস : আমি তাহলে নিজেরই ক্ষতি করি। অথচ কেউ নিজের ক্ষতি করতে চায় না। তাই না?

মেলেতুস : মানে—

সক্রেটিস : হ্যাঁ কি না।

মেলেতুস : মানে—

সক্রেটিস : হ্যাঁ কি না

মেলেতুস : না।

সক্রেটিস : অথচ আমি নিজের ক্ষতি করি। আচ্ছা নিজের ক্ষতি কি কেউ জেনে শুনে করে? হ্যাঁ কি না।

মেলেতুস : না, করে না।

সক্রেটিস : আমি কি জেনেশুনেই নিজের ক্ষতি করি?

মেলেতুস : হ্যাঁ, তাই করেন। কথার প্যাঁচে আপনি আমাকে জড়িয়ে ফেলে—

সক্রেটিস : সত্তর বছরের এক বুড়ো জেনেশুনে তার নিজের ক্ষতি করে এ কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? কেউ জেনেশুনে তার নিজের ক্ষতি করে? তুমি কর? মেলেতুস, উত্তর দাও।

মেলেতুস : (অনিচ্ছার সঙ্গে) না।

সক্রেটিস : তাহলে দাঁড়ায় যে আমি না বুঝে নিজের ক্ষতি করি। তাই না—

মেলেতুস : হ্যাঁ—বোধ হয় তাই।

সক্রেটিস : তাহলে সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে তোমার কর্তব্য হল আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে না জেনেশুনে, না বুঝে আমি নিজের ক্ষতি করছি। অর্থাৎ আমাকে যা দেওয়া উচিত তা হল শিক্ষা, দণ্ড নয়।

মেলেতুস : অ্যাঁ—

সক্রেটিস : যদি সত্যি সত্যি সমাজের মঙ্গল চাও, তাহলে তাই তো তোমার কর্তব্য। যদি অজ্ঞতাবশত একটি লোক নিজের ক্ষতি করে, তুমি কি তাকে দণ্ড দেবে না তাকে শিক্ষা দেবে? বল, বল, মেলেতুস—

মেলেতুস : মানে—আমি

আনুতুস : বিচারকগণ, আগেই বলেছিলাম, সক্রেটিসের কথার প্যাঁচ—

বিচারক : আপনারা বসুন।

সক্রেটিস : ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন। খুলে বলি, আমি গণতন্ত্রের বিরোধী নই, আমি অভিজাততন্ত্রের সমর্থকও নই। আমি ভানের বিরোধী, মিথ্যার বিরোধী এবং জনসাধারণকে যারা শুধু কথা দিয়ে ভোলায় আমি তাদের বিরোধী। মৃত্যুর জন্য আমি খুব চিন্তিত নই। আমার আগেও বহু মানুষ মিথ্যা এ ভানের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন। সম্ভবত আমার মৃত্যুতেই এর শেষ নয়। এর পরেও বহু মানুষ মরবে মিথ্যার বিরোধিতা করতে গিয়ে।
আমার বয়স যখন সাঁইত্রিশ তখন আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম, তারপরেও গিয়েছি। যাকে আপনারা বীরত্ব বলেন, তার কিছু পরিচয় যুদ্ধে আমি একাধিকবার দিয়েছি। মৃত্যুর ভয়ে পিছিয়ে থাকিনি। আজ থেকে সাত বছর আগে আরগিনুসায়ের সৈনাধ্যক্ষদের বিচারের কথা হয়ত

আপনাদের মনে আছে। ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে এথেন্স জিতেছিল। কিন্তু বহু মূল্যবান পঁচিশটি জাহাজ, বহু নাবিক, বহু সৈন্য সেদিন সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল। সেদিন ছিল গণতন্ত্রের দিন। সৈনাধ্যক্ষদের বিচার হয়েছিল। জনসাধারণ চেয়েছিল তাদের রক্ত। তাই তাদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল। আমি সেদিন তার প্রতিবাদ করেছিলাম—কারণ বিচারটা ছিল অন্যায়। আইন অনুসারে প্রত্যেকটি সৈনাধ্যক্ষের বিচার হবার কথা আলাদাভাবে, কিন্তু যেহেতু জনসাধারণ চাইছিল প্রতিহিংসা, তাই আইন মানা হয়নি, বিচারসভা সকলকেই একসঙ্গে বিচার করে প্রাণদণ্ড দিলো। আমি প্রতিবাদ করতে ভয় পাইনি—জনসাধারণের অন্যায় দাবী আমি মানি নি। কারণ আমি রাজনীতিক নই—সত্য কথা বলায় আমার কোন ভয় ছিল না।

আবার স্মরণ করিয়ে দিই, তার দুবছর কি তিন বছর পরে, এবার তিরিশজন স্বৈরাচারীর রাজত্বকালে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে সালামিসবাসী লেয়নকে—এক অতি সজ্জন ভদ্রলোককে অন্যায়ভাবে ধরে আনতে হবে। তখন আমি প্রতিবাদ করেছিলাম স্বৈরাচারীদের। আমি তাদের আদেশ উপেক্ষা করেছিলাম। একদিন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দাঁড়িয়েছিলাম জনগণের বিরুদ্ধে, আর একদিন প্রাণ তুচ্ছ করে প্রতিবাদ করেছিলাম স্বৈরাচারীদের।

আজ আবার দাঁড়িয়েছি। আমার কাজ আমি করে যাব। এর জন্য আমার ভয় নেই। আপনারা কি দণ্ড দেবেন তার জন্য আমি চিন্তিত নই। মহোদয়গণ, আমার স্বপক্ষে আমার কিছু বলার নেই, আমি যা কিছু বলেছি তা সত্যের স্বপক্ষে। আপানারা ডাঁশ দেখেছেন? ডাঁশ? গরুর গায়ে বসে, বিরক্ত করে; আমি সেই ডাঁশ, রাষ্ট্রের সমাজের গায়ে বসি, তাদের রোমন্থনের মুহূর্তে, তাদের স্মরণ করিয়ে দিই পথ দীর্ঘ—অনেক দূর যেতে হবে।

(সক্রেটিস বক্তব্য শেষ করে আসন গ্রহণ করলেন)

বিচারক : আপনি এই বিচারসভা এবং রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে বহু শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আপনার বয়সের কথা ভেবে আমরা সেগুলি অগ্রাহ্য করছি। বিচারকগণ আপনারা সকলে ভেবে চিন্তে বলুন, সক্রেটিস দোষী না নির্দোষ, এবং দোষী হলে তাঁর কি দণ্ড প্রাপ্য।

আনুতুস : (সক্রেটিসের কাছে এসে) আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি আপনার প্রাণদণ্ড চাই না। আপনি নির্বাসন চাইতে পারেন।

সক্রেটিস : মানে

বিচারক : আমাদের আইন অনুসারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি নিজেই একটি বিকল্প দণ্ডের কথা বলতে পারেন। বিচারসভা তা বিবেচনা করে দেখবেন। (বিচারক উঠে যান)

সক্রেটিস : ও, তাই বুঝি।

ক্রিটো : তুমি নির্বাসন চাও, সক্রেটিস। আমি বুঝতে পারছি, এরা তোমাকে প্রাণদণ্ড দেবেনই। তোমার প্রাণ আমাদের কাছে অমূল্য। তুমি থেসালীতে যাও, সেখানে আমার অনেক বন্ধু—

সক্রেটিস : এত বিচলিত হচ্ছ কেন ক্রিটো। দেশের আইন যদি আমায় মৃত্যুদণ্ড দেয়, আমি তা গ্রহণ করব। আর মৃত্যুর অভিজ্ঞতা মন্দ নাও হতে পারে। মৃত্যুরাজ্যে দেখা হবে পুরোনো দিনের লোকের সঙ্গে, হোমারের কাব্যে পড়া বীরদের সঙ্গে, জ্ঞানীদের সংগে। তার মৃত্যুরাজ্যে বোধহয় আলাপ-আলোচনার তেমন বাধা নিষেধ নেই।

ক্রিটো : সক্রেটিস, পরিহাস করছ, এখন পরিহাসের সময় নয়। তোমার স্ত্রী-পুত্রদের কথা ভাব। আমার প্রচুর অর্থ আছে, যদি তোমার প্রাণদণ্ড হয়, তার বিকল্পে আমি অর্থ দিতে চাই। তাও দেশের আইনসম্মত।

প্লেটো : আপনি তাতে সম্মত হন।

সক্রেটিস : না, প্লেটো। ক্রিটো, শোন। এথেন্সে আমার স্থান নেই। অর্থের পরিমাণ যাই হোক না কেন বিচারসভা আমায় ছাড়বে না। যেভাবেই হোক আমার মুখবন্ধ করাই আনুতুসের উদ্দেশ্য। হয় মৃত্যু নয় নির্বাসন। কিন্তু আমি মৃত্যুই চাই—ক্রিটো। বিচারকমহোদয় ফিরে আসছেন।

(বিচারকের প্রবেশ ও আসন গ্রহণ)

বিচারক : আমরা পাঁচশ একজন বিচারক অত্যন্ত বিবেচনার সংগে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছি যে আনুতুস ও মেলেতুস সক্রেটিসের বিরুদ্ধে যে দুটি অভিযোগ এনেছেন তা ভিত্তিহীন নয়। কাজেই আমরা সকলে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছি। তিনি এখন কারাগারে থাকবেন এবং কয়েকদিন পরে তাঁকে হেমলক বিষ পান করতে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রের আইন অনুসারে সক্রেটিস মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে কোন বিকল্প দণ্ডের কথা উল্লেখ করতে পারেন এবং আমরা তা বিশেষভাবে বিবেচনা করব।

সক্রেটিস ।। মহোদয়গণ, আমি কোন বিকল্পই চাই না।

বিচারক ।। (আশ্চর্য হয়ে) সে কি! (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) যেহেতু সক্রেটিস কোন বিকল্প চাইছেন না, অতএব তাঁর মৃত্যুদণ্ডই বহাল থাকল। সক্রেটিস কিছু বলতে চান, আমরা এখনও বিবেচনা করে দেখতে পারি—নির্বাসন বা...

সক্রেটিস ।। বন্ধুগণ, আমি সত্তর বছরের বৃদ্ধ। আপনারা যাঁরা আমার মৃত্যু চাইছেন, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলেই তাঁদের সেই আশা পূর্ণ হত। কিন্তু আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, আমি বৃদ্ধ নই। প্রকৃতপক্ষে আমি তরুণ, সেইজন্যই আপনারা যাঁরা বৃদ্ধ, স্থবির, তাঁদের কাছে আমি বিপজ্জনক। আমার মৃত্যু কিছু নয়, কিন্তু আমার কর্মধারাকে আপনারা কারাগারে বেঁধে রাখতে পারবেন না, বিষ দিয়ে আমার চিন্তাকে মারতে পারবেন না। আমাকে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন, আমি তাঁরই প্রহরী. আমি মানুষের অহমিকা, মিথ্যাচার ও অবিচারের বিরোধিতা করতে বার বার জন্ম নেব। যুগে যুগে আমার বিচার হবে। বন্ধুগণ, আমার শেষ অনুরোধ। আমার কয়েকটি সন্তান আছে। তারা যখন বড় হবে, তারা যদি ধর্মের চেয়ে অর্থ, চরিত্রের চেয়ে ঐশ্বর্য, মানুষের মংগলের চেয়ে নিজের স্বার্থ, সত্যের চেয়ে প্রাণ, এবং ঈশ্বরের চেয়ে সংস্কারকে বড় মনে করে তাহলে তাদের সেদিন সেই শাস্তি দিও যে শাস্তি আমি এতদিন ধরে তোমাদের দিয়েছি, যার জন্য তোমরা আমার ভয়ে ভীত।

বিদায় ভদ্রমহোদয়গণ। বিদায় বন্ধুগণ, ক্রিটো, প্লেটো, লাইসাস, লুসানিয়াস, আন্তিফোন, নিকোসত্রাতুস, পারালুস—দেখা হবে। এখনও আছি, এখনও আমার মৃত্যু হতে দেরী আছে, তোমরা এসো, তোমাদের সংগে কথা আছে—

(সক্রেটিসের শেষ কথাগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে)

প্লেটো রচিত 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' (আপোলোগিআ সোক্রাতুস) ও Anton-Hermann Chroust রচিত Socrates man and myth. গ্রন্থদুটির নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

কলকাতায় একজনও গ্রীক নেই

গ্রীক চার্চে তালা। পার্ক স্ট্রীট, উড স্ট্রীট, ক্যামাক স্ট্রীট, লাউডন স্ট্রীট এবং আলিপুর—বেলভেডিয়ার খাঁ খাঁ। কলকাতায় এখন একজনও গ্রীক নেই। বছর পাঁচেক আগে এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ওরা সবাই চলে গিয়েছেন। কর্মসূত্রে অল্প যে-কয়েকটি গ্রীক পরিবার আজও এদেশে আছেন তাদের বর্তমান ঠিকানা বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারত। কলকাতার গ্রীক বসতি এলাকাগুলি আজ বলতে শূন্য-গৃহা। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহর কলকাতা গ্রীকদের কাছে আজ একেবারেই 'নির্বান্ধব পুরী।'

অবস্থা বুঝে মহামান্য ফাদার কনস্ট্যানটিনাস হ্যালডার্ট ম্যাকিসও চার্চে তালা ঝুলিয়ে সেই যে বাহাত্তর সালে শহর থেকে বিদায় নিলেন, তাঁরও আর কোনও খবর নেই। চার্চের দরজায় মাকড়সা জাল বুনে চলেছে। দেওয়ালে এক ইঞ্চি পুরু ধুলো। ঘন্টা স্থির।

কালীঘাট ট্রাম ডিপোর ঠিক পাশের সরু গলিটি হলো গ্রীক চার্চ রো। গলির বাঁ-হাতি বিশাল গ্রীক চার্চ। বড় রাস্তার ধারেই হলুদ রঙের লম্বা খাড়াই চার্চটিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। চার্চের প্রধান ফটক বন্ধ।

চার্চের ডান পাশে লাইব্রেরী রোড ধরে খানিক এগিয়ে গেলাম। এখানেই চার্চের খিড়কি দরজা। বহু হাঁকাহাঁকির পর দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল।

পরনে ময়লা ছেঁড়া পাতলুন, গায়ে রঙ ওঠা বিবর্ণ হাওয়াই শার্ট। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। কালো, বেঁটেখাটো চেহারার একটি মানুষ দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে মিটিমিটি তাকাল। তারপর অ্যারিস্টটোলের কায়দায় বিজ্ঞের মতো আমাকে জিজ্ঞেস করল: 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?' পরিচয় দিলাম। হয়ত বিশ্বাস হল না। প্রমাণপত্র দেখাতে নিজেই লজ্জা পেল। অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল: 'প্লীজ কাম ইন—।'

গোড়ায় ভেবেছিলাম লোকটি গ্রীক না হলেও অন্ততঃ ভারতীয় নয়। যেভাবে একটানা ইংরেজীতে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে, আর যে রকম চেহারা তাতে সন্দেহ হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। লোকটি খাঁটি বাঙালী। নাম অজিত বরাট। গ্রীক চার্চের একশ সতের টাকা মাস মাইনের কেয়ার টেকার। সাত চল্লিশ সাল থেকে একটানা চার্চে আছে।

কলকাতায় গ্রীক চার্চের প্রতিষ্ঠা ১৯২৬ সালে। চার্চের প্রথম ফাদার আলেকস সুর। তিনি ৪০ বছর স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রীক হয়েও নিজেকে ভারতীয় ভাবতেন। রবীন্দ্রনাথের বড় ভক্ত ছিলেন। আলেকস সুর আমলে প্রতি রবিবার সকালে চার্চে উপাসনা হত। ঘন্টা বাজত। পুড়ত মোমবাতি। তখন চার্চে গ্রীকদের হাজিরা ছিল দুশোর ওপর। পরে আলেকস সুর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর জায়গায় ফাদার হয়ে এলেন লে অ্যাডামু। তিনি কলকাতায় ছিলেন বছর চারেক। তাঁর আমলেও চার্চে নিয়মিত প্রার্থনা সভা বসেছে। গ্রীকরা সেই সভায় হাজিরা দিয়েছেন যথারীতি। ঘন্টা শোনা গেছে।
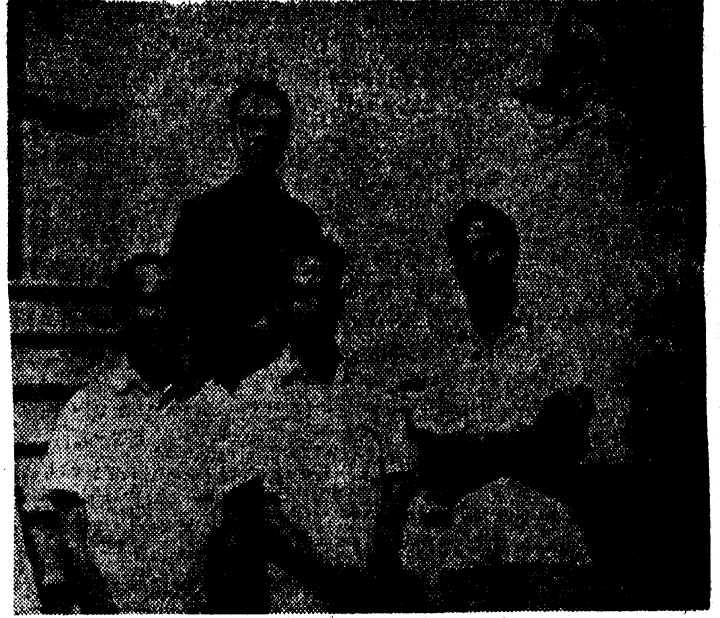
গ্রীক চার্চের তৃতীয় এবং সর্বশেষ ফাদার কনস্ট্যানটিনাস হ্যালডার্ট ম্যাকিস কলকাতায় আসেন ১৯৭০ সালে। তিনি বছর দুই শহরে ছিলেন। তখন থেকেই শহরে গ্রীকদের সংখ্যা কমতে থাকে। উপাসনা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ম্যাকিস তবু চার্চে থেকে যান। বছর দুই কাটতে গেলে নিজের ঘরে পড়াশোনা নিয়েই কাটিয়েছেন। দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে হাসিমুখে দেখা করেছেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ-ও দিয়েছেন। গ্রীক নাবিকরা তখন কলকাতায় জাহাজ ভিড়লে চার্চে প্রার্থনা করতে আসত। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ কি পঞ্চাশ।

১৯৭২ সালে ফাদার ম্যাকিসের কাছে নির্দেশ আসে: 'চার্চে তালা দিয়ে নিজের দেশে ফিরে এসো। চার্চ খোলা রাখার আর কোনও প্রয়োজন নেই। কলকাতা থেকে গ্রীকরা সব চলে গিয়েছে। বোম্বাই-মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় কেউ প্রার্থনা করতে যাবে না।' ম্যাকিস নিরুপায়। তাঁকে যেতেই হলো।

'সেই যে ফাদার ম্যাকিস চলে গেলেন, আর ফিরলেন না।' অজিত বরাট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—'কলকাতায় কি এখন একজনও গ্রীক নেই? গ্রীক পাড়ায় গিয়ে কি একটি গ্রীক পরিবারেরও দেখা পাবো না?'

—'না, না, না। একজনও গ্রীক নেই। থাকলে আমার অন্ততঃ তা জানা থাকত।' অজিত বরাট জবাব দিলেন।

—'গ্রীকদের কলকাতায় পেশা কি ছিল?' আমি কাজের প্রশ্ন করি।

একটুও চিন্তা না করে অজিত বরাট জবাব দিলেন: 'গ্রীকরা বেশির ভাগই ডকে নাবিক কিংবা খালাসীর কাজ করত। অন্যরা স্বাধীন ব্যবসাও করেছে কেউ কেউ। ওদের মতো পরিশ্রমী জাতি খুব কমই আছে বলতে হবে।'

—'ভারতীয়দের সঙ্গে গ্রীকদের সম্পর্ক কী রকম ছিলো বলে আপনি মনে করেন?'

'খুব ভালো।' অজিত বরাট বললেন, 'ভেরি মাই ডিয়ার রিলেশনস্। গ্রীকরা তো বহু বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে নিজের দেশে নিয়ে গেছে। তাদের বাচ্চাকাচ্চাও হয়েছে। আমি ঐ রকম কয়েকটি পরিবারে যাতায়াত রেখেছিলাম।'

—'ওরা হঠাৎ পাইকারি হারে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করল কেন?'

—সেটা মূলতঃ অর্থনৈতিক কারণে। এখানে ওদের কাজ মিলছিল না। সেই তুলনায় বোম্বাই দরিয়ায় ওদের যথেষ্ট কাজ রয়েছে।

প্রিয়দর্শী

গ্রীক চার্চের শেষ ফাদার হ্যালডার্ট ম্যাকিস চার্চ কর্মীদের সঙ্গে

আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগের কারণ

পাঠক, আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন কেন?—'আরে ঐ ত 'তাঁহার সৈন্যদল, অজ্ঞাত দেশে আর কালাতিপাত করিতে চাহিল না'—উত্তরটা প্রমাণ করে যে আপনি ইস্কুলে ইতিহাসে পাগল হননি। কিন্তু আসল কারণটা আপনি জানেন না, মানে ভেতরের ব্যাপারটা। —'তার মানে? —ধৈর্য ধরুন, বলছি।' ব্যাপারটা আছে রোমাঁ দালেবাঁজদের, বইটি বারোশ শতকে ফরাসীদেশে লেখা হয়, এটি পদ্যে লেখা এবং ঐ পদ্যের তরণী তাবৎ বড়ো ফরাসী কবিকে তরিয়েছে—বুঝতেই পারছেন কেতাবটির মূল্য।—কিন্তু—বলছি, বলছি, একটু ধৈর্য ধরুন।

বইটিতে আছে, আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে ছিলেন তাঁর গুরু—আর গুরু বলে গুরু—সাক্ষাৎ আরিস্টটল। গুরুদেব সর্বদা নজর রাখছিলেন যে তাঁর চেলা মেলেচ্ছদের সঙ্গে মিশে যেন তার গ্রীক শিক্ষাদীক্ষা আর সভ্যতাটাকে না খোয়ায়। ছাত্র পারস্য দেশ জয় করে ভারতের দিকে এগোচ্ছে, মাস্টারমশাই চিন্তিত, কারণ তিনি জানতেন যে ভারতের সভ্যতা বড়ো সাংঘাতিক, তা অন্যান্য সভ্যতাকে বেমালুম গিলে ফেলে। যাই হোক, গুরু গবেষণা করে বুঝলেন যে এই গিলে ফেলার কারণটা হল ভারতীয় নারী। গুরু অন্ধকারে আলো দেখলেন, যাত্রাপথে গুরু সর্বদা চেলাকে মনে করিয়ে দিতে লাগলেন যে চেলা যেন হিন্দু দেশের মেয়েদের থেকে দূরে থাকে—ওরা বড়োই সাংঘাতিক—নিজের দেশকে ভুলিয়ে দেয়। ছাত্র গুরুকে আশ্বাস দেয়, 'গুরুদেব ভাববেন না, পৌঁছেই ত লড়তে হবে, ও-সবের কথা ভাববার সময়ই পাব না। আর হিন্দুদের লড়াইয়ে হারিয়ে কিছু টাকাকড়ি নিয়েই দেশের পথে পাড়ি দেব—কতোদিন আর বিদেশ-বিভুঁইয়ে পড়ে থাকব।' গুরু চুপ করে থাকেন, কিন্তু মনে শান্তি পান না।

যাই হোক, আলেকজাণ্ডার ত পুরুকে যুদ্ধে হারালেন ও রাজত্ব ফেরৎ দিলেন। একথা ত আপনারা সবাই জানেন। পুরুকে হারিয়ে আলেকজাণ্ডার কিন্তু আর নড়তে চান না—তাঁর চরিত্রে যেন শৈথিল্য দেখা দিল—আবার একটু সাজগোজও বাড়ল—যে গুরুদেবের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় দেখা না করলে তাঁর হজম হত না, এ হেন গুরুদেবের সম্পর্কেও কেমন যেন একটু আড়ো আড়ো - ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। পর পর তিন সন্ধ্যা অনুপস্থিতির পর চতুর্থ দিন সকালবেলা গুরুদেব নিজেই গেলেন চেলার খোঁজ নিতে—গরজ বড়ো বালাই। গিয়ে দেখেন, আলেকজাণ্ডার তখনও শয্যা ত্যাগ করেননি। —এ কি, এখনও বিছানায়? অসুখে পড়ল নাকি ছোঁড়া? কে জানে, বিদেশ-বিভুঁই। —যাই হোক, খবর পাঠালেন। ছাত্র ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এল, গুরু মনে মনে ভাবলেন—দেখে ত মনে হচ্ছে না যে রোগে পড়েছে, তবে কি?—যাই হোক চেপে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—অসুখ-বিসুখ করেনি ত, তিনদিন যাওনি, তাই খোঁজ নিতে এলাম।—ছাত্র হাত কচলে জবাব দিলেন, আজ্ঞে না গুরুদেব—তবে যাওনি কেন? —আজ্ঞে, এই অম্ভী রাজা বড্ড ভদ্দরলোক, আমার সম্মানে তিন রাত্রি পানাহারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাই....। গুরুদেব চমকে উঠলেন— সর্বনাশ, একে এই হিন্দুদের খাদ্য বড়ই সুস্বাদু, তার ওপর শুনেছি এই অম্ভী রাজার নাকি অসংখ্য মেয়ে—কে জানে? —মনের ভাব গোপন করে, প্রশ্ন করলেন—কি ঠিক করলে, কবে রওনা হবে? আলেকজাণ্ডার উত্তর দিলেন— এখনও ঠিক করিনি, তবে ভাবটি আরও কটা-দিন কাটিয়ে যাব, সৈন্যরা ক্লান্ত, একটু বিশ্রামের দরকার—অকাট্য যুক্তি, গুরুদেব ফিরে গেলেন, তবে মনটা বড়ই চঞ্চল। খোঁজ নিয়ে জানলেন—যে ভয় পেয়েছিলেন তাই হয়েছে, বাবু সন্ধ্যাবেলায় দরবার-পালিয়ে অম্ভীর কোন এক মেয়েকে নিয়ে নৌকা-বিহার করেছেন, চন্দ্রভাগা নদীতে। দিন তিনেক বাদে, এক সন্ধ্যায় ছাত্র গুরু-দেবকে ঝাঁকি দর্শন দিয়ে কাজের ছুতো করে পালাতে যাবে, এমন সময় গুরুদেব একেবারে সোজা প্রশ্ন করলেন—'কি শুনছি, তুমি নাকি ছাত্র লজ্জা পেয়ে উত্তর দেয় —আজ্ঞে, মানে ইয়ে....।' গুরুদেব হিন্দু মেয়েদের বিরুদ্ধে বিরাট লেকচার দিয়ে হাঁপিয়ে গিয়ে ভাবলেন, এইবার কাজ হবে। দিন যায়, আলেকজাণ্ডার নড়বার নামও করেন না, বরং দেখা যেতে লাগল যে আলেকজাণ্ডার প্রকাশ্যেই মেয়েটিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাস্টার মহাশয়ের ঘুম গল, একদিন ছাত্রকে ডেকে পাঠিয়ে, তাঁর জন্মভূমি, প্রিয় হেল্লাস যা এলস—যাই হোক, মোদ্দা মানেটা হচ্ছে গ্রীস সম্পর্কে অনেক বড়ো বড়ো কথা, তার প্রতি মহান আলেকজাণ্ডারের কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভয়ংকর শক্ত আর ভীষণ লম্বা লেকচার ঝাড়লেন। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। অগত্যা গুরু ভাবলেন যে মেয়েটাকে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে তাড়ানো যায়, যে কথা সেই কাজ। ছাত্রকে একদিন জানালেন যে তিনি তার প্রেমিকার সঙ্গে নির্জনে একা দেখা করতে চান। ছাত্র কি আর করে, নিমপাতা খাওয়া মুখ করে রাজী হল।

গুরুদেব এক সুন্দর কাননে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করলেন, ছাত্র স্বয়ং দরজা আগলে রইলেন, কেউ যেন গুরুদেবকে বিরক্ত না করে। কিছুক্ষণ সময় যায়, ছাত্র ভাবে : বুড়ো এমনিই বেশী বকে তায় আবার এমন শ্রোতা পেয়েছে, সময় ত লাগবেই। আরও অনেকক্ষণ সময় যায়, চন্দ্রভাগা নদী লাল সূর্যের ছায়ায় লাল হল, পাখীরা বাসায় ফিরতে শুরু করল। ছাত্র আর ভদ্রতা রক্ষা করতে পারলেন না। কাননের দরজায় হুড়কো লাগিয়ে নিজেই গেলেন তাঁর প্রেমিকার— না, গুরু-দেবের খোঁজে। গিয়ে তাঁর চক্ষুস্থির—একি। —তিনি কি দেখলেন?—সেই কথাই ত বলছি। গিয়ে দেখেন যে বৃদ্ধ গুরুদেব হামাগাড়ি দিচ্ছেন আর তাঁর প্রেমিকা গুরুদেবের পিঠে চড়ে তাঁর মুখে স্বর্ণলতার লাগাম পরিয়ে হেট্ হেট্ করছে। প্রিয় হেল্লাসের জ্ঞানসূর্য সাক্ষাৎ আরিস্তোতল সাহেবের এ কি অবস্থা? —ছাত্রের ঘোর কাটবার আগেই গুরুদেব চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রিয় শিষ্যকে বললেন : 'পশ্য বৎস্য, এই অল্পক্ষণের মধ্যেই এই মায়াবিনী আমার কি হাল করিয়াছে, যাহারা এমত ভাবে বৃদ্ধকেও বশ্যতা স্বীকার করায় তাহারা তোমার মতো সরলমতি যুবককে কি করিবে তাহা ভাবিতেও আমার সাহস হয় না। অতএব বৎস, কল্যই এই ভয়ংকর দেশ ত্যাগ করো। —আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ঠক্-ঠক্ ঠর্‌র্‌র্ ঠক ঠররর, ক্লিক-ক্লক্ ক্লিক্ ক্লিক্লর্‌র্‌র্

নবীন বেশ স্পষ্ট শুনতে পায় শব্দটা। দানীং এই শব্দ সে মাঝে মাঝেই শোনে। ুব খারাপ লাগে। মাঝে মাঝে নয় বরং লা চলে যখন-তখন। খুব কাছেই কোথাও ব্দটা হয়। সামনে, পেছনে বুকের কাছে, া না বুকের কাছে নয় বুকেরই মধ্যে কিম্বা াথায়।

এমনও হয়—নবীনের ঘুম এসে গেছে া অলস ঘুম-ঘুম অবস্থায় চোখ বুঁজে ুয়ে আছে, কাঠঠোকরাটা বুকে এসে সতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসে। কিছুদিন াগে, মানে চার-পাঁচ বছর আগেও, ।-রকম হত না তার। ছোটবেলা থেকে বীন নানা রকমভাবে নানা রকম কাঠ-াকরা দেখেছে বা দেখে আসছে। বাড়ির ঠক পেছনে পুকুরের ওপারে একটা াঁঠাল গাছে প্রথম সে একটা কাঠঠোকরাকে ক্-ঠক-ঠক ঠররর ঠক-টকঠর্‌র্‌র্‌র্ করে ম্বা সরু ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে ফোঁকর তরি করতে দেখে। তারপর কতোদিন নঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে খুব কাছ থেকে নরাপদে লক্ষ্য করেছে কাঠঠোকরার কীর্তি-লাপ—কিভাবে সরসর সরসর করে াছের গুঁড়ি বেয়ে ওঠে নামে, মাঝে মাঝে াথা তুলে এদিক ওদিক কিছু দেখে নিয়ে ক-ঠক-ঠক-ঠক ঠররর গুঁড়িতে বা াড়াআড়ি কোন ডালের তলায় একনাগাড়ে াকরায় আবার মাথা উঁচু করে, দেখে, খনো সমস্ত গুঁড়িটা ঘিরে পাক দিয়ে য়, কিভাবে শক্ত সরু ঠোঁটে ক্লান্তিহীন কে যায় গাছের গুঁড়ি। ফলে তার রীরের প্রতিটি অংশের রঙের বৈচিত্র্য, াকর দেবার কৌশলও নবীনের নখদর্পণে। ইসব পুঙ্খানুপুঙ্খ তদারকীতে নবীনের াগে বেশ আগ্রহ বা মোহ ছিল। এখন নই। কিন্তু শব্দটা শুনলেই সে পাখিটাকে পষ্ট দেখতে পায়—পাখিটার ঠোঁটের ও ালকের বিভিন্ন রং, ভাব-ভঙ্গি; ঠোকর ওয়ার কায়দা সমেত।

কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়ার শব্দ এবং াক শুনে নবীনের ঘুম ভাঙে এমনও হয়। বীন আশ্চর্য হয় মাঝে মাঝে। ঠিক ঘুম াঙা নয় তার আগেও সে অস্পষ্ট হলেও লতলায় জল পড়ার শব্দ, বাইরে কাকের াক, রান্নাঘরে কাপ-কেটলি বা কড়া-ুন্তির আওয়াজ ইত্যাদি সে শুনতে পায়। র্থাৎ পুরো একটা তৃপ্তিকর আমেজের ধ্যে থাকাকালীন কাঠঠোকরার শব্দ তার ঠাৎই কানে আসে। ফলত সে আঁৎকে ঠে। তখন থেকেই শুরু হয় খারাপ লাগা। থম প্রথম এই খারাপ লাগাটাই তার কেমন যন পছন্দ-পছন্দ ছিল। কিন্তু এখন একেবারেই অসহ্য। কি করবে কি না-করবে ভবে পায় না সে। এক থেকে একশো র্যন্ত গুনে আবার একে ফিরে আসার চেষ্টা করে। এ-কাজ অনায়াসে সে করতে

ভদ্রলোক হাত দেখতে জানেন শোনামাত্র সবাই অমনি এপাশ ওপাশ থেকে একসঙ্গে হাত পেতে ধরলো টেবিলের ওপর।

আমার হাতটা একটু দেখুন না—

আমার হাতটা একটু—

আমার হাতটা—

আমারটা—

মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সামনে যেন একটা দুর্ভিক্ষের দৃশ্য তৈরি হয়ে গেল। ভদ্রলোক চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে ঠোঁটের ফাঁকে একটুকরো রহস্যময় হাসি হাসলেন। পুরু চশমার আড়ালে তীক্ষ্ণ চোখদুটো আরো তীক্ষ্ণ করে সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন। সবাই আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। একবার নিজের হাতের দিকে, আর একবার ভদ্রলোকের মুখের দিকে পালা করে তাকাচ্ছিল। ভদ্রলোক বাঁহাত দিয়ে চশমাটা একটু ঠিক করে নিলেন। নিজের কপালে মাথার চুলে কয়েকবার হাত বোলালেন। তারপর মুখে তেমনি হাসি ফুটিয়ে রেখে বললেন, নিজের হাতে নিজের ভাগ্যকে বয়ে বেড়াচ্ছি আমরা, কিন্তু তার কিছুই টের পাই না। এমন ট্র্যাজেডি আর নেই।

তেমনি সমানে হাত পেতে রেখে সবাই তাঁর কথা শুনলো। শুনতে শুনতে নিজেদের হাতের রেখাগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলো না। শুধু কতগুলো এলোমেলো বিচ্ছিন্ন রেখা চোখের ওপর ঝাপসা হয়ে ভাসতে লাগলো। অসহায়ের মত সেদিকে তাকিয়ে রইলো সকলে। ভদ্রলোকের কথাগুলো সম্পর্কে কারুর মনে সন্দেহ ছিল না।

হাত পেতে রেখে সকলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ভদ্রলোক কিন্তু কারুর হাতের দিকে তাকালেন না। চশমা খুলে একবার টেবিলে রাখলেন, রুমালে কয়েকবার চোখ মুছে আবার চশমা পরলেন। তারপর শূন্য চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবতে লাগলেন। তাঁর হাসিমুখ ক্রমশ গম্ভীর হলো। একসময় নিজের মনে বললেন, আমারও এককালে হাত দেখানোর বাতিক ছিল।

কেউ কোন কথা বললো না। কৌতূহলী চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভদ্রলোক কি ভেবে আবার হাসলেন। যেন কাউকে বিদ্রূপ করলেন। বললেন, একজন আমার হাত দেখে বলেছিল, ভাগ্য আমার হাতের মুঠোয়। কথাটার মানে আজো বুঝতে পারি নি।

বলতে বলতে তিনি একবার থামলেন। সকলের মুখের ওপর কয়েকবার চোখ ফেরালেন। যেন তিনি ওঁদের কাছে কিছু শুনবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু কেউ কোন কথা বললো না। বোধহয় কি বলবে বুঝতে পারলো না। কথার জের টেনে ভদ্রলোক আবার বললেন, সেই থেকে আমার হাত দেখার চর্চা শুরু। আমি ঠিক করেছিলাম, আমার হাতে কি আছে আমাকে জানতেই হবে।

রাগী জেদী লোকের মত তাঁর মুখখানা তখন শক্ত দেখাচ্ছিল।

সবাই অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি কথাবার্তায় সকলে একটা আকর্ষণ বোধ করছিল। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছিল ভদ্রলোকের ওপর।

একজন জিগ্যেস করলো, কিছু জানতে পেরেছেন আপনি ?

ভদ্রলোক সামান্য হেসে মাথা নাড়লেন। হাসিটা তখন ম্লান। ম্লান মুখেই বললেন, জেনেছি। তারপর মুখ নিচু করে থেমে থেমে বলতে লাগলেন, কিন্তু জানার কোন দরকার ছিল না। সব কথা আমাদের জানতে নেই।

বোকার মত মুখ করে সকলে তাঁর কথাগুলো শুনলো। শুনে পরস্পরের দিকে তাকালো। কথাগুলোর অর্থ ওদের ঠিক বোধগম্য হলো না। ভদ্রলোক তখনো মুখ নিচু করে বসে আছেন। ওরা আর অপেক্ষা করতে পারছিল না। সমানে হাত পেতে বসে থাকতে থাকতে সবাই অস্থির হয়ে উঠছিল। উসখুস করছিল। একজন খুব বিনীত গলায় বলতে চাইলো, এবার আমার হাতটা একটু—

আমার হাতটা—

আমারটা—

আমার—

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন। সকলের মুখের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। চশমার আড়ালে তাঁর চোখগুলো আবার আগের মত তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে বোধহয় একটুকরো কৌতুকের হাসি। ওদের হাত মুখের ছবি মিলিয়ে দেখতে দেখতে তিনি মন্তব্য করলেন, আপনাদের দেখে দুঃখ হচ্ছে। যদি ভগবান হতাম, আপনাদের হাতে কিছু দিয়ে দিতাম।

ভদ্রলোক কি ওদের ঠাট্টা করছেন? ওরা কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলো। কেউ ওরা হাত সরিয়ে নিল না। কেউ ওরা চোখ ফেরালো না।

ওদের দেখতে দেখতে ভদ্রলোকের মুখ আবার গম্ভীরহলো। স্থির চোখে কিছুক্ষণ তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর খুব সতর্ক গলায় জিগ্যেস করলেন, সত্যি আপনারা আপনাদের ভাগ্য জানতে চান ?

ওরা কোন কথা বললো না। শুধু সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লো।

ভদ্রলোক তখনো ওদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু ওদের দেখছেন বলে মনে হচ্ছিল না। হঠাৎ তিনি চশমা খুলে টেবিলে রাখলেন। পেছনদিকে মাথা হেলিয়ে চোখ বুঁজলেন। বললেন, আচ্ছা—কি জানতে চান বলুন।

তাঁকে তখন অসম্ভব রকমের শান্ত দেখাচ্ছিল।

প্রথমে কেউ তাঁর কথার কোন উত্তর দিল না। ভদ্রলোক একটু অপেক্ষা করে আবার তেমনি জিগ্যেস করলেন, বলুন—কি জানতে চান ? অতীত ?

না।

বর্তমান ?

না।

ভবিষ্যৎ ?

সকলে এবার চুপ করে রইলো। ভদ্রলোক তেমনি বন্ধ চোখে যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, সবাই ভবিষ্যৎ জানতে চায়। ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে বেঁচে আছি আমরা।

ভদ্রলোকের গলাটা কেমন ভাঙা ভাঙা শোনালো। ক্রমশ তিনি ওদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিলেন।

একটু থেমে আবার তিনি জিগ্যেস করলেন, বেশ—ভবিষ্যতের কি জানতে চান বলুন ? ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—কোনটা ?

ওদের প্রশ্নগুলো বোধহয় তৈরি ছিল না। প্রশ্নগুলো ভাবতে ওরা একটু সময় নিল। একজন বললো, আপনি কিন্তু আমাদের হাতগুলো ভালো করে দেখছেন না।

ভদ্রলোক তখনো চোখ খুললেন না। সংক্ষেপে বললেন, অনেক দেখেছি। নতুন করে দেখার কিছু নেই। আপনারা প্রশ্ন করুন।

আমার শরীরটা ভালো যাবে ?

না।

আমার দুশ্চিন্তা দূর হবে ?

না।

আমার কোন উন্নতির যোগ আছে ?

না

আমার ভালো সময় কবে আসবে ?

কখনো না।

ভদ্রলোকের উত্তর দেবার ধরণ দেখে সকলে অবাক হলো। এরপর কি প্রশ্ন করবে বুঝতে পারলো না। ভদ্রলোক তেমনি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে ওরা বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল।

আচ্ছা, আমার বিদেশভ্রমণ হবে ?

না।

আমার বিবাহিত জীবন সুখের হবে ?

না।

আমার চাকরিতে কোন পরিবর্তন হবে ?

না।

আমার আশা সফল হবে ?

নিশ্চয়ই না।

ওরা আবার চুপ করে গেল। ভদ্রলোকের একই উত্তর শুনতে শুনতে ওরা বিভ্রান্ত হচ্ছিল। ওদের মনে সন্দেহ জন্মাচ্ছিল। কিন্তু তাঁর গলার স্বরে এমন একটা জোর ছিল কোথাও, যার ফলে ওরা অবিশ্বাস করতেও পারছিল না। বিবৃত মুখে ওরা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলো। তাঁর আশ্চর্য শান্ত ভঙ্গিতে তাঁকে যেন অন্যজগতের মানুষ মনে হচ্ছিল।

আচ্ছা, আমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো ?

না।

আমার পরিশ্রমের পুরস্কার পাবো ?

না।

আমার কাজ শেষ করতে পারবো ?

না।

আমি হাসিমুখে মরতে পারবো?

একেবারেই না।

বলতে বলতে ভদ্রলোক নিজেই সামান্য হাসলেন। খুব ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি।

হাসিটা যেন অনেকক্ষণ তাঁর ঠোঁটে লেগে রইলো। কিন্তু তখনো তিনি চোখ খোলেন নি। সবাই আবার চুপ করে বসে থাকতে থাকতে একজন হঠাৎ জিগ্যেস করে উঠলো, আপনি কি আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছেন?

ভদ্রলোকের হাসি মুছে গেল, শান্ত মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। এতক্ষণে তিনি চোখ খুললেন, কিন্তু কারুর দিকে তাকালেন না। শূন্য চোখে দূরের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললেন, রসিকতা আমি করছি না।

তাঁর কথাগুলো মন দিয়ে শোনার ধৈর্য ওদের ছিল না। একজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, আমাদের সকলের হাতের রেখা কি একই রকম?

ভদ্রলোক খুব ক্লান্তভাবে চশমাটা তুললেন টেবিল থেকে। অন্যমনস্কের মত চশমাটা চোখে দিলেন। এখন তাঁকে খুব বয়স্ক ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। কারুর দিকে না তাকিয়ে তিনি নির্বিকার গলায় উত্তর দিলেন, বিশেষ তফাৎ নেই। আসলে ওগুলো বিভিন্ন সময়ের ক্ষতচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই না। বিশ্বাস না হলে নিজেদের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

অনেকক্ষণ হাত পেতে বসে থাকলেও হাতের দিকে একক্ষণ ওদের দেখবার ইচ্ছে ছিল না। ভদ্রলোকই ওদের সমস্ত মনোযোগ অধিকার করে নিয়েছিলেন। এখন তাঁর কথা শুনে নিজেদের হাতের দিকে তাকাতেই ওরা ভীষণ চমকে উঠলো। সকলের হাতের রেখায় রক্ত যেন ফেটে পড়ছে। দেখতে দেখতে সারা হাত রক্তে ভরে যাচ্ছে। ভদ্রলোক কি কোন মন্ত্র জানেন? ভয়ে বিস্ময়ে ওদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। মুখে কোন কথা ছিল না।

ভদ্রলোক একবার ওদের দিকে তাকালেন। বললেন, যান—রক্তাক্ত হাতগুলো ধুয়ে ফেলুন।

ভারতবর্ষ ও ইসলাম

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষের ইতিহাস শুরু থেকেই বিদেশী উপকরণের পুনঃপুনঃ সংস্পর্শে স্পন্দিত ও সমৃদ্ধ। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বিদেশীরা ভারতবর্ষে এসেছে—কেউ এসেছে দিগ্বিজয়ীরূপে , কেউ বণিকরূপে, কেউ লুণ্ঠনকারীরূপে, কেউ বা আশ্রয়-প্রার্থীরূপে এসেছে। কোনও কোনও বিদেশীর মধ্যে দেখা যায় একই সঙ্গে একাধিক রূপের সমাবেশ। ফলে বিদেশী শোণিত, বিদেশী ভাষা, বিদেশী স্থাপত্য, বিদেশী সঙ্গীত, বিদেশী ধর্ম ইত্যাদির বিচিত্র সংমিশ্রণ হয়েছে ভারতীয় জীবনে।

ইতিহাসের প্রথম দিকে যেসব বিদেশীরা এসেছিল তাদের মধ্যে বৈদিক আর্যদের আগমনই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তী-কালের আরও অনেক বিদেশীর মতো বৈদিক আর্যরা আক্রমণ ও আগ্রাসন দিয়ে ভারত-বর্ষে প্রবেশ করে। অগ্নিসংযোগ ও নগর ধ্বংস-সাধনে অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করে তারা তাদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রের নাম দেয় পুরন্দর বা নগরধ্বংসকারী। তাদের এই গৌরববোধের নানারূপ প্রকাশ দেখা যায় তাদের সাহিত্যে এবং বিশেষ করে ঋগ্বেদে। পররাজ্য-গ্রাস এবং পরধর্ম-নাশ—এই দুটো ব্যাপারেই তাদের প্রচুর উল্লাস ও গর্ব ছিল মনে হয়।

কালক্রমে বিজিতদের ধর্মচিন্তা বিজয়ীদের ধর্মচিন্তাকে প্রভাবিত করতে থাকে। দুয়ের মিশ্রণে এমন এক বিশিষ্ট ধর্মবোধ ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করে যা অর্বাচীনকালে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হয়। মনে রাখা ভালো যে বৈদিক ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, অনার্য ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ইত্যাদি নাম প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষাশ্রয়ী কোন ধর্মচিন্তাকে বোঝাতে হিন্দুধর্ম শব্দটির প্রচলন প্রাচীনকালে ছিল না। হিন্দু বা হিন্দ শুরুতে নিতান্তই ভৌগোলিক সংজ্ঞাবাচক শব্দ ছিল, পরে ওই ভৌগোলিক অভিব্যক্তিতে যারা বহুকাল বসবাস করেছে তাদেরও হিন্দু বলা হতো।

বৈদিক আর্যদের প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠার পরবর্তী আড়াই হাজার বছর ধরে গ্রীক, হূণ, শক, কুষাণ, গুর্জর প্রভৃতি বহু জন-গোষ্ঠী ভারতবর্ষে এসেছে এবং আস্তে আস্তে ভারতীয় তথা তৎকালীন অর্থে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে গেছে। বহু রক্তপাত ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদেশী শোণিতকে আত্মস্থ করার এক অভিনব সাধনা চলতে এবং তার ফলে বর্ণাশ্রম প্রথার উদ্ভব হয়েছিল মনে হয়। এসব বিদেশীদের অনেকে আর্যভাষী ছিল, কিন্তু তাদের কোনও সুস্পষ্ট, সুসংহত বা সুসংগঠিত ধর্মচিন্তা ছিল না, ভারতে এসে তারা বিজিতদের ধর্মচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং অধিকাংশ সময়ই নামমাত্র পরিবর্তন করে বিজিতদের ধর্মমতকে গ্রহণ করেছে। এভাবে এক বিপুল মিশ্র জনগোষ্ঠীর এক বিপুল মিশ্র ধর্মরূপেই ভারতবর্ষের ধর্ম বিবর্তিত ও বিস্তারিত হতে থাকে।

বৈদিক আর্যদের পরে শাস্ত্রভিত্তিক ও সুসংহত যে-ধর্মটি বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করে সেই ধর্মের নাম ইসলাম। বিদেশী শোণিতকে আত্মস্থকরণে যে-ভারতবর্ষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে সে-ভারতবর্ষের কাছে ইসলাম একটি কঠিন সমস্যা তুলে ধরে—বিদেশী শোণিতের মতো ভারতবর্ষ বিদেশী ধর্মকেও গ্রহণ করতে পারবে কি? পররক্ত-সহিষ্ণুতা আর পর-ধর্ম-সহিষ্ণুতার মধ্যে গুণগত বা মৌল পার্থক্য আছে কি? থাকলে সেই পার্থক্যটার স্বরূপ কি?

ইসলাম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে দুটি পথে—একটি হলো ইসলাম ধর্মাবলম্বী বণিক ও সাধকদের শান্তি ও প্রেম-পূর্ণ পথ আর অন্যটি হলো লুণ্ঠন ও সৈনিকদের সামরিক শক্তির পথ। মনে রাখা উচিত যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সশস্ত্র অভিযানের আগেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে মুসলিমদের বসতি গড়ে উঠেছিল। ধর্মীয় কারণে আরব-ইরানীদের সঙ্গে ভারতীয়দের বিরোধ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আরব সাগরাঞ্চলে ভারতীয় ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রথম বিবাদ ৭০৮ খৃষ্টাব্দে —এক জাহাজ মুসলিম রমনী সিন্ধুর দেবল বন্দরের কাছে অপহৃতা হয়। এর প্রত্যুত্তরে ঘটল মহম্মদ ইবন-কাসিমের যুদ্ধাভিযান।

কিন্তু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অবি-স্মরণীয় যুদ্ধাভিযানটি হলো আরও প্রায় তিনশ' বছর পরে। তার নায়ক হলেন সুলতান মাহমুদ। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসেই মাহ-মুদের সমর-প্রতিভার তুলনা পাওয়া ভার। পাঞ্জাব, কালিঞ্জর, কনৌজ, মুলতান প্রভৃতির রাজারা সম্মিলিতভাবে বারবার মাহমুদকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে—শুধু অস্ত্রে নয়, ছলে বলে কৌশলে সব রকমে—কিন্তু সমস্ত বাধাকেই তিনি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বারবার। অথচ কি ছিলেন তিনি? গজনীর মতো নগণ্য ও ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতি সবুক্তিগীনের পুত্র। শুধু অস্ত্র শিক্ষাই করেননি, গ্রীক ও সংস্কৃতও শিক্ষা করে-ছিলেন। ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের শাহী রাজা জয়পাল আর্যাবর্তের আরও কয়েকটি রাজ্যের সৈন্য একত্র করে গজনী আক্রমণে অগ্রসর হন। এর অনিবার্য প্রতিফল ভুগতে হলো উত্তর ভারতকে। পিতৃরাজ্য আক্রমণে যারা একদা উদ্যত হয়েছিল তাদের সমস্ত ঔদ্ধত্য তিনি সমূলে বিনাশ করে-ছিলেন। কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের সময়ও সৈন্যদের উপর মাহমুদের হুকুম ছিল যে সব অবস্থাতে পণ্ডিত ও নারীর সম্মান রক্ষা করতে হবে। জাতিধর্ম নির্বি-শেষে এক অতুলনীয় বীরের সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

আর্যাবর্তচেতনার সঙ্গে জড়িত সমস্ত আত্মাভিমান, সমস্ত প্রত্যয় ও শ্রেষ্ঠতা-বোধকে মাহমুদ আঘাত করেছিলেন, নিজের সাফল্য দিয়ে চূর্ণ করেছিলেন আর্যাবর্ত-বাসীদের সমস্ত অহংকার ও গৌরব। এবং তাতে আর্যাবর্তচেতনার ধ্বংসস্তূপের উপর

এক নতুন চেতনার জন্ম হয়—সেটা হলো বিজয়ীদের ইসলাম ধর্মের বিপরীতে ভারতবর্ষের সম্মিলিত ধর্মরূপকে হিন্দুধর্ম নামে পৃথক, বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ ধর্ম হিসেবে অনুধাবন করার চেতনা। এখন থেকে হিন্দু শুধু ভৌগোলিক সংজ্ঞাবাচক শব্দ হয়ে থাকল না, তা প্রাচীন তথা ইসলাম-পূর্ব ভারতীয় ধর্মচিন্তার দ্যোতক হয়ে উঠল। এখন থেকে ভারতবর্ষ শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বী বণিক ও সাধকের বাণিজ্য ও অধ্যাত্মচর্চার ক্ষেত্র হয়ে থাকল না, তা দুঃসাহসী ও আগ্রাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরও পদতলাশ্রিত হয়ে উঠল। এই সঙ্গে শুরু হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়—বিদেশী শোণিতকে আত্মস্থ করার পরে বিদেশী ধর্মকে আত্মস্থ করার সাধনা। এবং এ-ই হলো ভারতবর্ষে ইসলামের আগমনের ফলে প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া।

(২)

ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে অস্ত্রের প্রয়োগ পৃথিবীর ইতিহাসে কোনও অভিনব ঘটনা নয়। ইয়োরোপে খৃষ্টান ধর্ম প্রথমে প্রেম ও শান্তির পথ নিয়েছিল, কিন্তু পরে তা শক্তি ও হিংসার পথ নেয়। এটা লক্ষণীয় যে কেমন করে ইয়োরোপ থেকে খৃষ্টান ধর্মের পূর্বে প্রচলিত পেগান ধর্মকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হয়। এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে শাস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচার করা কাকে বলে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ইয়োরোপে দেখা যায়। ভারতবর্ষে তেমন দৃষ্টান্ত নেই। যদি ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের সুলতান বাদশাহ নবাবরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হতো তাহলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কোন অস্তিত্ব থাকত কিনা সন্দেহের বিষয়।

ধর্মের নামে নিষ্ঠুরতা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা একেবারেই করেনি একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ধর্মের নামে নিষ্ঠুরতা অথবা অসহিষ্ণুতা ভারতবর্ষেও যুগে বিভেদের উত্তরে সমন্বয়ের সাধনা অভিনব নয়। তামিল পুরাণে আছে যে জৈন ধর্মাবলম্বী বলে একদিনে আটশ জৈনকে শূলে হত্যা করা হয়। স্বয়ং রামানুজকে সশিষ্যবৃন্দ শ্রীরঙ্গম ছেড়ে পালাতে হয়েছিল, কারণ তাঁর উদার ধর্ম রক্ষণশীল রাজার কাছে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ বলে মনে হয়েছিল। অতদূরে যেতে হবে না, বাংলার রাজা শশাঙ্কই গয়ার বোধিবৃক্ষ উপড়ে ফেলেন, পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদস্পৃষ্ট প্রস্তর নদীতে ফেলে দেন, কুশীনগর বিহার থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়ন করেন এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের নির্যাতন করেন। পরম বিষ্ণুভক্ত জাতবর্মা সোমপুরের মহাবিহার ধ্বংস করার জন্যে গৌরব করেছেন। একই-ভাবে ময়নামতীও ধ্বংস হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের হাতে।

মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠনের নিদর্শনও আছে। ভারতীয়দের ইতিহাস-চর্চার প্রাচীন সাক্ষ্যগুলির অন্যতম কলহণের 'রাজতরঙ্গিনী' থেকে জানা যায় যে কাশ্মীরের হিন্দুরাজারা পররাজ্য জয় করার সময় বিজিত রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করে ধনসম্পদ লুঠ করত। বাংলায় যখন মারাঠা সৈন্যরা গৈরিক পতাকা উড়িয়ে চৌথ আদায় করতে আসত, তখন তারাও নির্বিচারে মন্দির লুঠ করত। ধর্মের সঙ্গে এহেন বর্বরতার সম্পর্ক কোনও কালে কারও ক্ষেত্রেই ছিল না। সে-সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা আধুনিককালে হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা বিশেষ শিক্ষার প্রভাবে।

এজন্য ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস পর্যালোচনার সময় কয়েকজন মুসলিম শাসক ও সৈনিক কি করল না করল শুধু সেটুকুতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ সত্যের স্বরূপ কখনই জানা যাবে না। তা জানার জন্যে দৃষ্টিক্ষেপ করতে হবে জনসাধারণের জীবনে। সেখানে দেখা যায় যে দেশের বৃহত্তর অংশ যাদের নিয়ে গঠিত তাদেরকে ইসলাম নতুন আশা বিশ্বাসের বাণী শুনিয়েছে। তার ফলে ভারতীয় সমাজ এক অভিনব আলোড়নে স্পন্দিত হয়ে ওঠে এবং তার সূত্র ধরে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি নতুন বৈশিষ্ট্যে ও লক্ষণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণের পাশাপাশি চলে আধ্যাত্মিক জাগরণের ধারা যা ভক্তি আন্দোলন নামে ইতিহাসে চিহ্নিত।

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।
প্রগট কিয়ো কবীরণে সপ্তদ্বীপ নৌখন্ড।।

অর্থাৎ দ্রাবিড় দেশে ভক্তির জন্ম, তা উত্তর ভারতে রামানন্দ নিয়ে এলেন আর সপ্তদ্বীপ নবখন্ড পৃথিবীতে তা প্রকট করলেন কবীর। ভক্তিবাদী তথা সমন্বয়-বাদী সাধকরা যেমন জন্ম অনুসারে মানুষের বিচার করেননি তেমনই ধর্ম অনুসারেও মানুষের বিচার করেননি। রামায়ণে আছে যে উচ্চবর্ণীয়ের যোগ্য তপস্যাতে রত হওয়ার অপরাধে রামচন্দ্র একজন শূদ্রকে হত্যা করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় মূল্যবোধে নিম্নবর্ণের কোনও অধিকার ছিল না যে উচ্চবর্ণীয়ের সাধনযোগ্য কোনও ধর্মকর্মে ব্রতী হয়। কিন্তু মধ্যযুগ ওই অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্নটাকেই বাতিল করে দেয়। এই যুগের অনেক সাধকই ছিলেন নিম্ন-বর্ণোদ্ভূত এবং তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে উচ্চ-বর্ণীয় ও উচ্চবংশীয়রা ছিল। অনেক সাধকেরই লক্ষ্য ছিল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলোর সমন্বয়সাধন। কবীর বলেছেন যে হিন্দু আর মুসলিম ঈশ্বরের দুটি হাত, দুটি হাত না জুড়লে অঞ্জলি পূর্ণ হয় না। এভাবে মধ্যযুগের সাধকরা অনুশাসন আচার ও শাস্ত্র অনুসারী ধর্মের পথ ছেড়ে হৃদয়ের আগ্রহ ও আকর্ষণ অনুসারী ধর্মের পথ দেখালেন এবং মধ্যযুগীয় লোকজীবনকে এক নতুন ধরনের আধ্যাত্মিক মহিমায় উদ্দীপিত করলেন।

ইসলামের আগমনের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে, বিশেষ করে লোকজীবনের স্তরে এই যে সমন্বয়ের ঐতিহ্য গড়ে উঠতে শুরু করে তা শুধু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রগুলোকেই অসাধারণ সমৃদ্ধিতে ভরে তুলল না, তা বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেও সাধারণ মানুষকে শক্তিশালী করে তুলল। পলাশীর বিপর্যয়ের পর একাধিক জন-অভ্যুত্থান হয় কোম্পানী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এবং এগুলো ছিল হিন্দু-মুসলিমের মিলিত অভ্যুত্থান। তবে সবচেয়ে বড়ো অভ্যুত্থান ঘটে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। হিন্দু-মুসলিম সংহতিই ছিল ১৮৫৭-র জন-অভ্যুত্থানের প্রধান শক্তি এবং এই অভ্যুত্থানের ফলেই ভারতবর্ষে কোম্পানী শাসনের অবসান হয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন উপকরণ হিসেবে ইসলামের আগমন ও তার ফলে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে বিচ্ছেদের চেয়ে সমন্বয়ের প্রক্রিয়াই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য বিচ্ছেদ একটা অনস্বীকার্য সত্য এবং বিচ্ছেদেরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হলো সমন্বয়। মনে রাখা উচিত যে বিচ্ছেদ আর বিরোধ এক জিনিস নয়। সমগ্র মধ্য

পুরোদমে চলেছে এই ঐতিহাসিক সত্যের থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে লোকজীবনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়।

।।৩।।

দেশীয় লোকসত্যের পরিপোষণাতে সমন্বয়ের সাধনা সাহিত্যে, সংগীতে, স্থাপত্যে ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন পুরোদমে চলছে তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা ঘটে—বহিরাগত অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইংরেজ শক্তি ভারতবর্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। ইংরেজ শক্তি এদেশে আধুনিক-তার দূতও বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা উন্নত বিচারব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা, বাস্তব প্রয়োজন-সাধক অথচ বিকাশশীল শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তা লোকজীবনের সত্তাকে নির্মমভাবে এবং, হয়তো সুপরিকল্পিত-ভাবেই ধ্বংস করে। ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের সময় ইংরেজরা ভালোভাবেই বুঝতে পারে যে লোকজীবনের সংহতিই এদেশে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বাধা এবং ওই সংহতিকে বিনষ্ট করাই হলো বৃটিশ রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। স্বভাবতই তারা এজন্যে সমাজের সেই মুষ্টিমেয়দের মুখাপেক্ষী হলো যারা কোন-না-কোন কারণে বিভেদে বিশ্বাসী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজী শিক্ষিতদের কন্ঠে ও লেখনীতে এই দাবী উত্থাপিত হলো যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এক মহান ও স্বতন্ত্র জাতি, উপরন্তু তাঁরা একথা প্রচারেও সচেষ্ট হলেন যে 'হিন্দু' আর 'ভারতীয়' শব্দ দুটি সমার্থক। কি আশ্চর্য! তাঁদের মানসে এ-প্রশ্ন জাগেনি যে যদি হিন্দুমাত্রেই ভারতীয় হয় আর ভারতীয় হলেই হিন্দু হয় তাহলে নেপালের হিন্দুরা কোন্ জাতি! পক্ষান্তরে এ-প্রশ্ন জাগাও স্বাভাবিক ছিল যে হিন্দুরা এক মহান ও স্বতন্ত্র জাতি হলে ভারতে বসবাসকারী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাই বা কোন্ জাতি-ভুক্ত হবে! যেমন বহুলাংশে বৈদিক আর্যদের প্রদর্শিত পথে কোনও কোনও ইসলাম ধর্মাবলম্বী জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল তেমনই এবারে এক শ্রেণীর ইংরেজী-শিক্ষিত হিন্দুদের অনুকরণে এক শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম দাবী ঘোষণা করল যে ভারতীয় মুসলিমরাও এক মহান ও স্বতন্ত্র জাতি। লক্ষণীয় যে দুপক্ষই দেশীয় লোকসত্যের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে জাতিতত্ত্ব প্রচারে পাশ্চাত্য ইতিহাস থেকে নির্বিচারে নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন।

তখনকার কালে 'ইংরেজী' আর 'আধুনিক' সমার্থবাচক ছিল। এখনও উত্তর ভারতে আধুনিক রসায়নাগারে প্রস্তুত ওষুধের দোকানগুলোর গায়ে আংরেজী দাবাখানার বিজ্ঞাপন থাকে। ইংরেজী শিক্ষিত বলতেও তাই আধুনিক শিক্ষার আলোক-প্রাপ্তদেরই বুঝব। স্যার সৈয়েদ আহমেদ, স্বামী দয়ানন্দ, বাল গঙ্গাধর টিলক প্রমুখ নেতাগণ বিশেষভাবেই ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন। 'কেশরী' পত্রিকাতে টিলক অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করলেন যে ইংরেজী শাসন ও শিক্ষার ফলেই এদেশে স্বাদেশিক-তার উদ্ভব হয়েছে এবং ইংরেজী শাসনের জন্যেই জাতীয় প্রসঙ্গগুলোতে স্বাদেশিকতার প্রয়োজনীয়তা বোঝা গেছে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এই ইংরেজী শিক্ষিত নেতারাই স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদকে ধর্মের প্রচ্ছদে আবৃত করে রেখেছিলেন এবং সেই ধর্মীয় রূপেই দেশবাসীকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তারই ফলে ভারতবর্ষে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা নামে এক নতুন লক্ষণের দেখা মেলে।

উনবিংশ শতাব্দীকে রেনেশাঁস ও রিভাইভ্যালের কাল বলা হয়। কিন্তু এই কাল লোকসত্যে বিপর্যয়েরও কাল। কারণ এই কালেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়। যাঁরা সাম্প্রদায়িকতাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন সেই নেতাদের মনে কখনও প্রশ্ন জাগেনি যে কেন মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির প্রধান কেন্দ্র দিল্লীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে মুসলিমরা সংখ্যালঘু অথচ দিল্লীর থেকে বহু দূরে অবস্থিত বাংলায়, কেরলে, কাশ্মীরে মুসলিম জনসংখ্যা একটা উল্লেখযোগ্য অংশে পরিণত হয়। বাংলায় না হয় সুলতান ও নবাবরা শাসন করেছে, কিন্তু কাশ্মীর তো হিন্দু রাজাদের দিয়ে শাসিত। আবার বাংলা ও কাশ্মীরের সত্য দিয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মসজিদটি কেন কেরলেই প্রতিষ্ঠিত হয় তার ব্যাখ্যা হয় না। আবার বাংলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হলেও এই গরিষ্ঠতা তারা নবাবী আমলে পায়নি, পেয়েছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলোতে———যখন 'যত মত তত পথ' এই বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তখন গ্রাম-বাংলায় কী এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে বহু লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হলো। সাধারণ বুদ্ধি ও প্রচলিত বিদ্যা দিয়ে এসব প্রশ্নের উত্তর মিলবে না।

সমস্যাকে আরও জটিল মনে হয় যখন দেখি যে ধর্মান্ধতার বশে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা একটা নতুন ঐতিহাসিক ধারা হিসেবে ১৯০৬—০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়। অবশ্য প্রথম ব্যাপক ও প্ররোচিত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে—বোম্বাই, গয়া, আজম-গড় প্রভৃতি স্থানে। তখন সেটাকে আকস্মিক মনে হলেও ১৯০৬—০৭ থেকে হিন্দু-মুসলিমের দাঙ্গা একটা নিয়মমাফিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এই উদ্ভব ভারতবর্ষের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

এরপর থেকেই মধ্যযুগ থেকে লোক সত্যের যে ঐতিহ্য চলে আসছিল তা দ্রুত ভেঙ্গে পড়তে থাকে। শুরু হয় ধর্মের নামে রাজনীতির অধ্যায়। সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় শুধু যে ভারতীয় লোক-সত্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাই নয়, সেই লোকসত্যাকেও অনর্গল উচ্চকিত ও মুদ্রিত প্রচারে বিভ্রান্ত ও পরে স্তব্ধ করে দেয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনোত্তর রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, জহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি অবশ্যই সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার প্রতিরোধে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মাঝারি মাপের নেতাগণ ও ধর্মান্ধ-স্বার্থান্ধ ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সংখ্যায় প্রচুর, তাছাড়া সুক্ষ্ম-ভাবে বিন্যস্ত যে তাদের প্রভাবকে ধর্মান্ধ ও স্বার্থান্ধরা সহজেই নিজেদের উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে, এর উপরে ছিল ইংরেজ রাজনীতির অবিশ্রান্ত প্ররোচনা যার লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীদের দুটি বিবদমান ও যুযুধান শিবিরে পরিণত করা।

কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে বিশ্বসৃষ্টি ও জাগতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদানে ধর্মের যে ভূমিকা ও তাৎপর্য ছিল তা আধুনিককালে বহুলাংশে খর্ব হয়েছে, সে সঙ্গে হ্রাস পেয়েছে মানুষের জীবনে প্রাত্যহিক ধর্মাচরণের গুরুত্ব। কিন্তু এরই বিপরীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ধর্মাচরণ এক অভূত-পূর্ব মূল্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সে সঙ্গে ধর্ম হয়ে উঠেছে নতুন নতুন স্বার্থ সাধনের ও সাফল্য অর্জনের শক্তিশালী হাতিয়ার। ধর্মের এই অভিনব ভূমিকা ও তাৎপর্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু লোকসত্যের থেকে নিরপেক্ষ রূপে ধর্মকে জাগতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের পরিণাম হলো ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ বিলোপ। ১৯৪৭-এর পরে ভারত-বর্ষ বলে আর কোনও দেশ নেই, যা আছে তার নাম ভারত—শুধু ভারত।

এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে লেখকের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ ভারত-বর্ষ ও ইসলাম-এ।

বনবিবি উপাখ্যান
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

(তিন)

চৌধুরীদের লাটের একটা বিশেষত্ব আছে। একটাই দ্বীপ নিয়ে একখানা লাট কাগজপত্রে যা পাওয়া যায় তাতে এর পরিমাণ প্রায় পঁচিশ হাজার একর। উত্তরে নদী, দক্ষিণে নদী, পূবেও, পশ্চিমেও। চতুর্দিকেই নদীর বেষ্টনী। আকৃতিতে অবশ্য শুয়োরের মুখের মতো অনেকটা ছুঁচলো একদিকে, আর একদিকে চওড়া হতে হতে পাঁচ-সাত মাইলেরও বেশি হয়ে গেছে। এত বড় একটা দ্বীপ একসঙ্গে পাওয়া চৌধুরীদের সৌভাগ্য। চারপাশে নদীর বেষ্টনী থাকায় সীমা রেখা নিয়ে ঝামেলা হওয়ার কারণ নেই। নদী যদি হেজে মজে দূরে সরে যায়, ডাঙা যদি বাড়ে, চৌধুরী-দেরই লাভ, আবার নদী যদি কূল ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে ক্ষতি বৈকি। তবে ক্ষতির সম্ভাবনাটা কম। নদীর চারপাশে আট দশ হাত উঁচু ভেড়ি। ভেড়ির একদিকে নদী থাকে নদীর মতো, অন্যদিকে অরণ্য থাকে অরণ্যের মতো। প্রধান নদী বলতে বুড়ো বাসুকিই। এরই পলি জমে জমে সৃষ্টি হয়েছে দ্বীপখানা। নদী হয়তো একদিন মরে যাবে কিন্তু বেঁচে থাকবে এই ডাঙা যেমনভাবে গোটা দেশটাই আজ ডাঙা হয়ে আছে। মরে গেছে কত নদী, বাঁক বদলেছে নদী, কে অত হিসেব রাখে তার। ডাঙাটা আছে এই তো যথেষ্ট।

দ্বীপটার তিনপাশ দিয়ে মোচড় খেয়ে বুড়ো বাসুকি বয়ে গেছে। কেবল এক দিকে পড়েছে ধুলাই নদী। শীর্ণকায়া, অথচ জলের রং অবিকল চন্দনের মতো ঘোলা। ধুলাই নদীর চড়ার উপর কুমীর উঠে রোদ পোহায়। জন মানবের সাড়া পেলে সুড়ুৎ [illegible]র নেমে পড়ে জলে। কুমীর ছাড়া বিজ-বিজ করে কামট, ভুলেও এ জলে কেউ হাত পা ছোঁয়ায় না।

আরো আছে গোটা কয়েক ক্ষীণকায়া জলের রেখা, দ্বীপের ভেতরেই। এরা সবাই খালের মতো ছোট, জোয়ার খেলে, ভাটা খেলে। ধুলাই কিংবা বুড়ো বাসুকির উপনদী এরা। এদের মধ্যে তিন কুমারীই বড়। গভীরও বটে। তিন কুমারী বয়ে এগিয়ে গেলে দু-এক মাইলের মধ্যেই নজরে পড়ে পুরনো কিছু নিদর্শন। হয়তো হার্মাদ কিংবা পর্তুগীজ জল দস্যুদের প্রাচীন কুঠি ছিল ওগুলো। লোকে বলে ফিরিঙ্গি দেউল। বন সাফ করে অত দূরে অবধি পৌঁছতে এখনো কতদিন লাগবে কে জানে। আসলে আবাদ তৈরীর কাজ যত সোজা ভাবা গিয়েছিল, তত সোজা যে নয় কার্যক্ষেত্রে তা দেখা যাচ্ছে। অন্তত দয়াল ঘোষ তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছেন।

চৌধুরীদের ছোট ছেলে অর্থাৎ ছোট কর্তা বিষয়ী মানুষ। আবাদ করার কথা তাঁর মাথাতেই প্রথম জাগে। তিনিই প্রথম এ ব্যাপারে নায়েবদের ডেকে খাতাপত্র তৈরি করান। পরে সদলবলে বজরা ভাসিয়ে দ্বীপটার চারদিকে একবার চক্কর দিয়ে দেখে যান। আজ যেখানে বন সাফ করে কাছারি বাড়িটা বসানো হয়েছে ঠিক তার সামনেই ছোট কর্তা একটা কাঠের বোর্ড টাঙিয়ে দিয়ে যান নিজের হাতে। সাইন বোর্ডে লেখা ছিল কেবল দুটি শব্দ, চৌধুরীর আবাদ। সাধ ছিল দু এক মাসের মধ্যেই লোক লাগিয়ে বন সাফাইয়ের কাজ শুরু করে দেবেন। কিন্তু একটার পর একটা বাধা। দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর কেটে যায়। অবশেষে পাঁচ বছর পরে যখন সত্যি সত্যি বন কাটার কাজে লোক এল, তখন তারা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সাইন বোর্ডটাকে বার করতে পারল না। না হোক, মোটামুটি ধরনের কাজ এগোবার পরই জাঁক-জমক করে একদিন নামকরণ করে দেওয়া হবে বলে ঠিক করে নেওয়া হল। সেই ভালো। দয়াল ঘোষ তাঁর অভিলাষ সে রকমই জানিয়েছিলেন ছোট কর্তাকে। উত্তর এল, আপনি যা ভাল বুঝবেন সেই রকমই হবে। সব দায়িত্ব এখন আপনার। জানি ওখানে আপনাদের কষ্টের সীমা নেই, তবু মনে রাখবেন চৌধুরী নগরের নায়েব হবেন আপনি। লোকে আপনাকেই চিনবে প্রথমে।

দয়াল ঘোষের সারা দেহে রোমাঞ্চ ধরে গিয়েছিল সেই চিঠি পেয়ে। কি এক গুপ্ত-ধনের চাবিকাঠি যেন ওঁর হাতে তুলে দিয়ে কেউ বলছে, এই নাও, তোমায় দান করলাম এই দৌলত। তুমি এখন থেকে ভোগ কর।

দয়াল [illegible] মনে হাসেন। নায়েবী করার [illegible] রাখার যে ছিল তা[illegible] সন্দেহই [illegible] তিনটে [illegible] ওঁর [illegible]সারে [illegible]চিড় খাওয়াতে [illegible]নে কথা[illegible]তন মানুষের ছিল তিন [illegible] চেহা[illegible]নুষ [illegible] রহস্যময় তা [illegible] ঘোষ।

বড় [illegible] সন্তান দয়াল ঘোষ। বড় বউ [illegible] ওঁর গর্ভধারিণী মা বংশানু-ক্রমিক ধারায় মাথার ব্যামোতে ভুগতেন। মেজ মা কিংবা ছোট মা কোন দিন মুখ তুলে দয়ালের দিকে তাকান নি। সংসারে যেন ভেসে আসা উদ্বৃত্ত একটা মানুষ দয়াল। নেহাতই দুর্ভাগা ওঁর। দয়াল অবিবাহিত। ওঁর বিবাহ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই জোটে নি কারো। অবশেষে মায়ের মৃত্যুর পর দয়াল ঘোষ যেন প্রায়শ্চিত্ত করতেই স্বেচ্ছায় এই বনবাস বেছে নিয়েছিলেন। নিজেকেই নিজে জনপদ থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন নতুন করে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন দয়াল ঘোষ, তখন হয়তো সংসারের কথা কোনদিন উনি ভেবে দেখতে পারেন!

প্রথম যখন এই জঙ্গলে এসে পা দিলেন তখনকার উত্তেজনার কথা ভুলবার নয়। জীবনে এখন একমাত্র কামনা খ্যাতি অর্জন আর সেই সঙ্গে কিছু অর্থ। খ্যাতি আর অর্থ একদিন না একদিন হবেই। ওর নির্বাসিত জীবনের এটুকুই যেন সান্ত্বনা।

কিন্তু একটা মাস যেতে না যেতেই যে এত সব ঘটনা ঘটবে কে ভাবতে পেরে-ছিল। নৌকায় যে মেয়েটাকে দেখে এলেন এরকম একটা দৃশ্যও যে দেখতে হবে কল্পনাও করা যায় না। ক্ষমতা থাকলে সর্বস্ব দিয়ে মেয়েটাকে উনি বাঁচাতেন। কিন্তু অবস্থা বিপাকে ইচ্ছাটাকে এখন দমাতে হচ্ছে। রজনীরা যা মারমুখী হয়ে রয়েছে তাতে হিত করতে গিয়ে বিপরীতই হয়ে যেতে পারে। সে দিক থেকে ঈশানের ওপরই ওর সমস্ত কৃতজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। কে বলে মানুষ নেই? এখনো আছে। মানুষের মতো মানুষ এখনো বেঁচে আছে।

উত্তেজনায় অনেকক্ষণ কাছারি ঘরের

অশেষেই পায়চারি করলেন দয়াল ঘোষ। মেয়েটার করুণ মুখখানা ঘুরে ঘুরেই কেবল চোখের ওপর ভেসে উঠছে। কে ভাসিয়ে দিল ওকে। কেন। কেনই বা অমন নির্দয় হল ওর পরিজনরা। মায়ের দয়া তো কত মানুষেরই হয় তাই বলে—

ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন দয়াল ঘোষ। বনের দিকে তাকালেন, কাঠুরেদের কিছু কিছু দেখা যাচছে। গাছ কাটারও শব্দ আসছে অল্প স্বল্প। অন্য দিন হলে এ সময় ওদের উল্লাসের অন্ত থাকত না। একদিকে জঙ্গলের চিৎকার অন্য দিকে ওদের উল্লাস। যেন অরণ্য তার দুর্ভেদ্য দেওয়াল তুলে প্রতিরোধ করতে চায় মানুষের এই আক্রমণ।
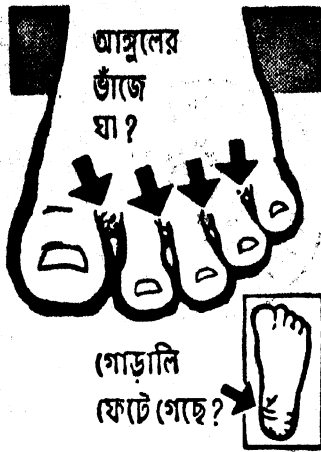
উদাসীনভাবে একা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যান দয়াল ঘোষ জঙ্গলের দিকে। গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকা জমাট অরণ্য। চির সবুজ পাতার অরণ্য। গাছ গাছালির জলসা। বুনো ফুলের রং ছড়িয়েছে কোথাও কোথাও। কোথাওবা গাছের কান্ডগুলি প্রতিযোগিতায় আকাশের দিকে সটান উঁচু হয়ে উঠেছে। ভাবখানা এ রকম যেন, কে বেশি আলো আর আকাশকে ছিনিয়ে নিতে পারবে নিজের মুঠোয়। কে কত বীর-পুরুষের মতো সবার উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বেঁচে থাকতে পারে। অরণ্যের এই প্রকৃতি দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারেন না দয়াল ঘোষ। মনে পড়ে মানুষের অরণ্যেও এই একই প্রতিযোগিতা। কে কত-খানি আকাশকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের সম্পত্তি করে রাখতে পারি তারই প্রতিযোগিতা। ভয় পেয়েছ? তবে বুনো পাতার মতো মাটির কাছাকাছি অন্ধকারেই পড়ে থাক। তোমার অস্তিত্ব মাটির সঙ্গেই মিশে যাবে একদিন।

দয়াল ঘোষ আবার ভিন্নভাবেও ভাব-ভার চেষ্টা করেন এই প্রকৃতিকে। কিছুটা যেন নিজেকে দিয়েই বিচার করার চেষ্টা। জন্মগত অধিকারের কথা মনে পড়ে যায় দয়াল ঘোষের। জন্মগত অধিকারই যদি না থাকবে তবে বাঘের পেটে বাঘই জন্মাবে কেন? আর হেলে কেউটের ডিম ফুটে হেলে কেউটেই বা বেরুবে কেন! দয়াল ঘোষের বাপ ঠাকুর্দা যদি নায়েবী না করে জমিদারী করতেন, দয়াল ঘোষকেও নায়েবী করতে হত না কোনদিন।

ফলে জন্মগত অধিকারের কথাটা উড়িয়ে দিতে পারেন না উনি। নিজের অক্ষমতাগুলি ঐভাবেই বুঝি ঢেকে রাখতে পারলে উনি খুশী হন।

অসংলগ্নভাবে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গলের ভিতর অনেক দূর অবধি এগিয়ে এসেছিলেন দয়াল ঘোষ। নিবিড় ছায়া জমে আছে চারপাশে। ছায়ার মাঝখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডানা ঝাপটানো পাখির মতো কিছু কিছু রোদ। অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে রোদের টুকরোগুলো। আর সেই সঙ্গে শীতল লতাপাতার গন্ধ। মাঝে মাঝে উদাস করে দেওয়া পাখিদের ডাক। কত নাম না জানা সব পাখি, কে জানে। এই অল্প দিনে সব পাখিদের চিনে ফেলা সম্ভব নয়।

অথচ মনে পড়ল এখানে পা দিয়ে প্রথম কদিন এন্তার পাখি মেরেছিলেন। কত সব বিচিত্র পাখি। রজনীর কাছ থেকে দু একটা পাখিকে উনি চিনে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। রজনী বুঝিয়েছিল, এই যে পাখিটা দেখছেন দয়ালবাবু, এর নাম কাস্তে চোরা। শুধু ফসলের সময়ই আবাদের মাটিতে এরা দল বেঁধে নেমে আসে। আর সারা বছর এরা বনে জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায়।

কাস্তে চোরা, বাহ্ চমৎকার নাম। চাষী কাস্তে নিয়ে ধান কাটার আগেই এরা ধান চুরি করে নিয়ে পালায়।

তা ঠোঁট দুটো ঠিক কাস্তের মতই দেখতে। হাত খানেক লম্বা, যেমন শক্ত তেমন ধারালো।

রজনী মাণিকজোড় পাখিকে চিনিয়ে দিয়েছিল। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায় এই পাখিগুলো। জোড় থেকে একটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় অপরটা ঠিক পাগলের মতো কষ্ট পাবে। দাপাবে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও প্রিয়ার পাশে আকুলি বিকুলি করে আছড়াবে।

ঐ রকম কোন পাখিই কি এমন উদাস ভঙ্গিতে ডাকছে এখন, বুঝতে পারেন না দয়াল ঘোষ। পাখির দেশ সুন্দরবন। বক, শামুক খোল, জল হাঁস, তিতির, বুলবুলি, জলকাক কত বিচিত্র সব পাখি। একটু কান পেতে পাখির ডাকটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন উনি।

পাখি ছাড়া গাছের ডালে পাতায় পোকা মাকড় পিঁপড়ে। হাত ছোঁয়াতেও গা শির-শির করে ওঠে। এ ছাড়া সাপ, গাছের ডালে ঝুরির মতো সাপ ঝুলে থাকাটাও অসম্ভব নয়। নিচে নরম নোনা মাটির ভাঁজে ভাঁজে সাপ লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে। একটু বেসামাল হওয়ার উপায় নেই এই জঙ্গলে।

একদিন একটা হরিণ মেরেছিলেন দয়াল ঘোষ। চামড়াটা এখনো যত্ন করে তুলে রেখেছেন। নুনে ভিজিয়ে রোদে সেঁকে শক্ত অবিকৃত করে রেখেছেন চামড়াটাকে। ছোট কর্তাকে নিজের হাতে উপহার দেওয়ার কথা ভেবে রেখেছেন। নিশ্চয়ই খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন ছোট কর্তা।

দয়াল ঘোষ যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করেন এ সময়। কিন্তু দু এক মুহূর্ত বুঝি সময় উনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, হঠাৎ আঁৎকে লাফিয়ে উঠলেন, কি ওগুলো!

দপিণ্ডটাকে সজোরে কেউ যেন এসে চেপে রছিল, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল, খ দিয়ে হাঁ করে বাতাস টানতে টানতে বার উনি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন।

বাক বাবা তেমন কিছু নয়, বানর। ছের ডালে এক ঝাক বানর, কুত কুত রে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। অনায়াসে খন ওগুলো তেড়ে আসতে পারে। খালি তে যতই শক্তি থাক দয়াল ঘোষের, ওদের ঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। সারা গায়ে এই তের বেলাতেও ঘাম জড়িয়ে এল দয়াল যোষের।

বন্দুকটার কথা মনে পড়ল। বন্দুকটা যে গেছে রজনীর হেপাজতে। কাঠুরেদের াহারা দেবার জন্য রজনীকে সারাক্ষণ বন্দুক তে ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়।

দয়াল ঘোষ শান্তভাবে চোখ নামিয়ে লেন। হাতে বন্দুক থাকলে একবার ন্ত পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন, ন্তু এখন সন্ধি ছাড়া আর কোন তান্তর নেই ওর।

এমনভাবে চোখ নামালেন যেন খতেই পান নি ওদের। তারপর দু-পা ক-পা করে পিছিয়ে এলেন। কাঠ কাটার দ আসছে যেদিক থেকে সেই দিকেই টতে শুরু করলেন।

জঙ্গলের ভিতরে বসে দয়াল ঘোষ লা বুঝতে পারছিলেন না। নদীতে তখন ই-টম্বুর জোয়ার। ডিঙির ভেতরে সতর্ক হরীর মতো তাকিয়ে বসে আছে ঈশান। র অচৈতন্য গৌরী তখন বিবস্ত্র ভঙ্গিতে টাতনের উপর শুয়ে।

গৌরীর জ্ঞান ফিরল অনেক বেলায়। বন তপ্ত কোন সমুদ্রের তলায় এতক্ষণ লিয়ে ছিল, এবার উঠে এল। অসহ্য ন্ত্রণা দেহকোষের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতিটি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিষাক্ত কীটের দংশন। মাথার চারপাশে অসহ্য চাপ টনটন করা একটা অনুভূতি। এটাই কি মৃত্যু-যন্ত্রণা! মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে কি মানুষ এরকম কষ্ট পায়! উহ্ মাগো—

জ্ঞান ফিরলেও জাগতিক স্পষ্টতার মধ্যে তখনো বুঝি নিজেকে স্থাপন করতে পারছিল না ও। কিছু চেতনা কিছু অবচেতনা এরই মাঝে যেন দুলছিল গৌরী। মাঝে মাঝে ক্ষীণভাবে ঢেউয়ের মতো গড়াতে গড়াতে এগিয়ে আসছে ওর জন্মভূমি গ্রামের স্মৃতি। বর্ধিষ্ণু গ্রাম বিদ্যাপুরী। গ্রামের প্রতিটি ঘরদোর যেন চিনতে পারছিল ও। খড়ের ছাউনী, মাটির দেওয়াল, নিকোন উঠোনের একপাশে সন্ধ্যামালতী ফুটে আছে। পূবে, গ্রামের শেষ প্রান্তে শিবমন্দির। পূজারী ভোলা ভট্চায খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হলুদ রঙের মিষ্টি একটা পাখি ভারী লেজখানা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে। সব এখন চিনতে পারছে গৌরী।

কত শান্ত আর স্নিগ্ধ মনে হচ্ছিল বিদ্যাপুরীকে। অথচ এরকম একটা গ্রামেই যে ওর জন্ম হয়েছিল ভাবতেও এখন কষ্ট হয়। জন্মক্ষণে কি শাঁখ বাজিয়েছিল কেউ। গ্রামশুদ্ধ লোক কি উজার হয়ে ছুটে এসেছিল ওকে দেখতে। যাই ঘটে থাক না কেন, এই গ্রামেই ও জন্মেছিল। মায়ের কোলে ঘুমন্ত একটা শিশুমুখকে যেন ও দেখতে পাচ্ছিল। যেন নিজেরই শৈশবকে এখন চিনতে পারছিল গৌরী।

কিন্তু মায়ের মুখখানা ঝাপসা। বাবার মুখও। গৌরীর যখন ছ' সাত বছর তখনই ওর পিতৃ বিয়োগ হয়। মা ছিলেন বিদুষী মহিলা। সামান্য কিছু যা জমি-জমা ছিল, মাই তা দেখাশোনা করতেন। গৌরী অন্ত প্রাণ ছিল ওর মায়ের। কিন্তু এখন!

চিৎকার করে ক্ষোভে কেঁদে উঠবে এমন শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছিল গৌরী। অনেক কষ্টে ও চোখের পাতা দুটো আবার একটু ফাঁক করল। কিন্তু এ কোথায় ও পড়ে আছে। চারপাশে এসব কি দেখছে গৌরী। ওকে ঘিরে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। মুখগুলি কেমন ছায়া ছায়া। চিনবার চেষ্টা করল সবাইকে, পারল না। পরিচিত না অপরিচিত ওরা! মনে হল গ্রামের লোকগুলিই যেন খবর পেয়ে ছুটে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে কেউ কেউ।

অথচ এদের মধ্যে নিমাইকে ও দেখতে পেল না। নিমাই কি সত্যি সত্যি ওকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। তবে কি এই লোকগুলি সবাই মিলে এখন ওর মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। কেন, এমন করে ওরা দাঁড়িয়ে আছে কেন?

—মা, মাগো—শিশুর মতো ডুকরে উঠল গৌরী।

অরণ্যের ডালে পাতায় এক ঝলক বাতাস হু হু করে বয়ে গেল। দানব ভর করেছে চতুর্দিকে। যেন গৌরীর দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে ওরা।

—একটু জল। মাগো—

এমন সময় কে যেন ওর কপালে হাত রাখল।

চমকে উঠল গৌরী। চোখ দুটো টান টান করে খুলে একবার দেখবার চেষ্টা করল। সাপের মতো কিলবিল করা যন্ত্রণা-গুলো যেন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। কে হাত রাখল ওর কপালে! কালো পাথরের মতো মুখ নিয়ে কে এই লোকটা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কে ও!

যেই হোক শত্রুই হোক আর মিত্রই হোক, মানুষ তো। আজ কতদিন পরে যেন ও মানুষের মুখ দেখছে। আবেগে আর উত্তেজনায় আবার ও চোখ বুজল। তারপর অস্ফুট গলায় ও ককিয়ে উঠল, জল, একটু জল—

ঈশানের চোখ চিকচিক করে উঠল। মেয়েটার জ্ঞান ফিরে আসছে। জল চাইছে মেয়েটা। পায়ের কাছে শূন্য কুঁজোটা তখনো কাত হয়ে পড়ে আছে। কুঁজোটার দিকে তাকাল ও। এখনি ওর কুজো ভরে জল নিয়ে আসা উচিত। আর সেই সঙ্গে খবরটাও সবাইকে জানান দরকার, জ্ঞান ফিরেছে মেয়েটার।

ঈশান উঠে কুঁজোটাকে হাতে নিল। তারপর গৌরীর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে বলল, দাঁড়াও মেয়ে, জল নিয়ে আসছি এখুনি।

ছইয়ের ভেতর থেকে এক নিমেষে বেরিয়ে এল ঈশান। বাইরে রোদ ঝলসাচ্ছে দুপুরের। এদিক ওদিক তাকাল. কাছারি বাড়ির দিকটা নির্জন। এখন দা কুড়োল নিয়ে সবাই জঙ্গলে ঢুকেছে। কিন্তু এখান থেকে জঙ্গলের দিকেও কাউকে নজরে পড়ল না। সব কেমন সামসুম ফাঁকা। দয়াল-বাবুও কাছারি ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকেছেন না কি আজ, বুঝতে পারল না ঈশান। আপাতত এক কুঁজো জল এনে মেয়েটার মুখে দেওয়া উচিত। ঈশান আর অপেক্ষা করল না। কাদায় নেমে ছুটতে ছুটতে কাঠুরেদের ঝুপড়ি ঘরের পেছনে এসে দাঁড়াল।

নিশিকান্তরা কাঠ জ্বালিয়ে রান্না করছে। ওরা কেমন ভূত দেখার মতো ঈশানকে দেখে থমকে গেল।

ঈশান গ্রাহ্য করল না। ভালোমন্দ একটা কথাও বলল না। কুজোতে জল ভরে নিয়ে যেরকম ব্যবস্ততায় ছুটে এসেছিল ঠিক সেইভাবেই আবার ডোঙির দিকে ছুটতে শুরু করল।

আবার ডিঙিতে এসে লাফিয়ে উঠল ঈশান। এই যে, জল নিয়ে এসেছি মেয়ে।

লক্ষ্য করল, মেয়েটা আধবোজা চোখে তাকিয়ে আছে। ঈশান জল তুলে মেয়েটার মুখে গড়িয়ে দিল। তারপর কাপড়ের খুঁট তুলে মুখ মুছিয়ে দিল ওর। গলার স্বরে আবেগ মিশিয়ে শুধাল খুব কষ্ট হচ্ছে?

গৌরীর দৃষ্টিতে বিস্ময় ছাড়া কিছুই নেই। ঠোঁট জোড়া তিরতির করে কেঁপে উঠল। অথচ একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না।

মেয়েটা কথা বলতে পারছে না কষ্টে, এ দৃশ্য দেখা যায় না। অথচ ঈশানের কিছুই করার নেই। কিভাবে এই রুগীকে সেবাশুশ্রূষা করতে হয় ওর জানা নেই। হাজার মাথা কুটে মরলেও ডাক্তার-বদ্যি বা ওঝা জোগাড় করা যাবে না এখানে। কাঠুরেদের মধ্যে এমন কারো কথাই মনে পড়ল না যে টোটকা টুটকি জানে।

আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে বসল ঈশান। মানুষ হয়ে আর একজন মানুষের এই কষ্ট চোখে দেখা যায় না।

আবার শুধাল, কি নাম গো তোমার? কোথা থেকে আসছ?

গৌরীর চোখের তারা কেঁপে উঠল। যেন বোবা হয়ে গেছে ও। চোখের মনি বেয়ে কুলকুল করে জলের স্রোত নেমে এল।

—আচ্ছা, থাক থাক! এখন আর কিছুই বলতে হবে না। পরেই বলো। আবার ওর কপালে হাত রাখল ঈশান। বসন্তের গুটিগুলো নরম দানার মতো ওর হাতে লাগল। আগুনের মতো গরম হয়ে আছে গা। একটু কিছু পথ্য আর অষুধ না দিলে বাঁচবে না মেয়েটা। পথ্য না হয় জোগাড় করে আনা যাবে, কিন্তু অষুধ যে জুটবে না তাতে সন্দেহ নেই।

ঈশান ভুলে গেল, সর্বনাশা এক ছোঁয়াচে রুগীর সংস্পর্শে ও বসে আছে; মেয়েটার নিশ্বাসের কণায় কণায় ঘুরে বেড়াচ্ছে রোগজীবাণু! এই জীবাণু সংস্পর্শে এলে তরতাজা ফুলের কুঁড়িও শুকিয়ে যায়। এই ছোঁয়াচে রোগের কবলে পড়লে নিস্তার থাকে না কারো। হয়তো ঈশানেরও থাকবে না। তবু জীবনে বোধ হয় এমনি এক একটা সময় আসে যখন মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও মানুষ সে দিকেই পা বাড়ায়। কোন বাধাই তাকে আর দমিয়ে রাখতে পারে না।

ঈশানের পক্ষে তাই নৌকো ছেড়ে এক পা নড়াও সম্ভব হল না। একটা অদ্ভুত আকর্ষণে ডিঙির মধ্যেই নিজেকে অবিচল রাখল ঈশান।

জোয়ারে নদী এখন টুবুটুবু। কাঁচ কাঁচ জলের ঢেউ এসে ডিঙির গায়ে আঘাত করছে। একটু একটু দুলে উঠছে ডিঙিটা। গরুর বাঁটে বাছুর যেভাবে উৎসাহে চাট দেয়, নদীও যেন তেমনিভাবে তার হাজার হাজার জিহ্বা মেলে নৌকার গায়ে চাট দিচ্ছে এখন। ডিঙিটা অল্প অল্প লাফিয়ে উঠছে। কিছুটা বিরক্ত, কিছুটা গর্ব এই নাচুনির তালে তালে যেন প্রকাশ পাচ্ছে।

ঈশান আবার তাকাল ওর দিকে। মেয়েটা আবার চোখ দুটো বন্ধ করেছে। কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিল ঈশান। মেয়েটার সঙ্গে জিনিসপত্র বলতে এমন কিছুই নেই। কাপড়ের পুঁটলিটার দিকে তাকাল ঈশান। খুলে দেখতে ইচ্ছে হল না। ওপাশে একটা উনোন, কিছু বাসনপত্র, হাতা কড়াই বঁটি। আবার চোখ সরিয়ে নিল।

হঠাৎই মনে হল ডিঙিটা যেন ডাঙা ছেড়ে আপন খেয়ালে চলতে শুরু করেছে! তবে কি গতির আনন্দেই ডিঙিটার এই দুলুনি। তবে কি মেয়েটার সঙ্গে ঈশানও অনিশ্চিত পথে ভাসতে শুরু করল! ছইয়ের ফাঁক গলিয়ে ঈশান দেখে নিল, নাহ্, গেরাফিটা যথাস্থানেই গাঁথা আছে।

আসলে নকল একটা গতির মধ্যে যেন এগিয়ে চলেছিল ওরা। গতিটা নকল জেনে নিশ্চিন্ত হল। মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল। বসন্তের গুটিতে মুখের আসল চেহারাটা ঢাকা পড়ে গেলেও ঈশান বুঝতে পারছিল মেয়েটা যথেষ্ট রূপসী। টানা টানা চোখ, চিবুক। কানে রুপোর ঝুমকো, উঁচু ধারালো নাক। নাকের পাতায় পাথর বসানো নোলক।

অথচ সিঁথিতে কোন সিঁদুর দেখতে পেল না ও। মেয়েটা মুসলমান না হিন্দু তাও বোঝার উপায় নেই। বিবাহিতা না অবিবাহিতা! কেমন করে যে একা এক ডিঙিতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এসে এখানে আটকাল কে জানে। অথচ যতক্ষণ না ওর জ্ঞান হবে পুরোপুরি কোন রহস্যেরই সমাধান হবে না।

আরো অনেকক্ষণ ও মেয়েটাকে আগলে বসে রইল। হঠাৎ এক সময় ও টের পেল, ওর হাতের মুঠির ওপর মেয়েটা হাত বিছিয়ে দিয়েছে।

ঈশান উত্তেজনায় ছটফট করে উঠল। দেখল, মেয়েটা পুরোপুরি চোখের পাতা খুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের ঈশারায় বোঝাবার চেষ্টা করছে, ভীষণ ক্ষুধার্ত ও। অসম্ভব যন্ত্রণা ওর সর্বদেহে।

—ক্ষিধে পেয়েছে? ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল ঈশান। ঠিক আছে আমি এখুনি খাবার নিয়ে আসছি।

উঠে দাঁড়াল ঈশান। তারপর নিমেষেই ও ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়াল। মেয়েটা যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সন্দেহ নেই। খবরটা এখন চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে না দিতে পারলে ওর স্বস্তি নেই। অন্তত প্রথমেই উচিত ছুটে গিয়ে দয়াল-বাবুকে খবরটা ওর জানান, জ্ঞান ফিরেছে দয়ালবাবু। এখনি ও কথা বলবে! দেখে যান, বিশ্বাস না হয় দেখে যান।
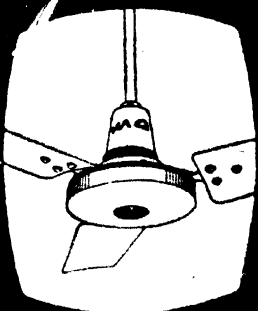
উত্তেজনায় ডিঙি থেকে ও লাফিয়ে নামল। তারপর হন্তদন্ত হয়ে কাছারি বাড়ির দিকে ও দৌড়তে শুরু করল।

(চলবে)

ব্লু ফিল্ম

অদ্রীশ বর্ধন

'মিস লাল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তন গুঁই যখন খুন হন, তখন একজন য় সেখানে ছিল। সে মেয়েটা কি টাইপের য় জানতে পারলে কেসটার একটা কিনারা হয়ে যেত। এই আমার শেষ সূত্র। কিন্তু নার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে এটাও ম কেঁচে গেল। আপনি বলছেন ফটো লা তোলা হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। ই, এমনও হতে পারে যে কেউ ফটো-দার আনডেভেলাপড় নেগেটিভ নিয়ে য় রেখে এসেছে সনাতনের ডেডবডির । সে মেয়ে হতে পারে, ছেলেও হতে য়।'

'মেয়েই যে হতে হবে, তার কি মানে চ?'

'নেগেটিভ যে নিয়ে গিয়েছে, সে মেয়ে হলেও হতে পারে। কিন্তু পাশে একটা য় ছিলই।'

'এবং সে মেয়েটি আমি নই।'

মোখমুখ নিরীক্ষণ করলাম বন্যার। য়াপ্লেনে দিল্লি থেকে সকালে উড়ে এসে র পাড়ে কাজ সেরে বিকেলে দিল্লি র যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আবার পায় চড়ছে লক্ষ্য করে চোখ নামিয়ে াম।

তীব্র গলায় বললে বন্যা—'ওভাবে কি ছেন? আমি যে কলকাতায় ছিলাম না শুক্রবার, সে প্রমাণ চান তো দিতে রি।'

'দিন না।'

'মিস্টার সি-আই-ডি অফিসার', থেমে মে কেটে কেটে বলল বন্যা—'আমার কটা মা আছে, একটা বাবা আছে, দুটো ান আছে, একটা ভাই আছে, আর অনেক েলেবন্ধু মেয়েবন্ধু আছে। শুক্রবার াল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিল্লিতে ছিাম তারা জানে।'

তারপরেও যে কথাটা বলা চলত, ন্তু বলল না, তা হল এই—'অতএব মিস্টার সি-আই-ডি অফিসার, আপনি কেটে পড়তে পারেন। আমার চুলেরও ডগাও ছুঁতে পারবেন না।'

বললাম—'মানলাম।'

'মানতেই হবে। মেয়ে কেন হাজির থাকবে বলতে পারেন? কাজটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাটাছেলের। নেগেটিভ নিয়ে গেছে, খুন করেছে, পালিয়েছে।'

আমি, বলব কি ঠিক হাবুবকের মত শুধু চেয়েই রইলাম। শুনেছি মেয়েরা দেবী হতে পারে, দানবীও হতে পারে। বন্যালাল কি?

বন্যাকে কিন্তু লেকচারের নেশায় পেয়েছে—বিশেষ করে আমার মত আহাম্মক শ্রোতাকে পেয়ে। বন্যার তোড়ের মত ফের বললে—'আপনি ব্লু-ফিল্ম দেখেছেন?'

আমি এমনভাবে ঘাড় নাড়লাম যাতে হ্যাঁ বা না কিছুই না বোঝা যায়। 'দেখলে মজা পেতেন', নাভিমূল থেকে যেন গুল-গুল করে হাসি গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠল বন্যার।

কি বলব? বলার আর কিছুই নেই। অথচ বন্যা লালকে এই অবস্থায় ফেলে যাওয়ারও সাহস নেই। জানি তো এই যাওয়াই শেষ যাওয়া হবে। অমূল্য বরাটের সামনে দাঁড়িয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে বলতে হবে—স্যার আমি হেরে গেছি।

ফটোর তাড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি তারপরে কিভাবে আমাকে কোতল করবেন অমূল্য বরাট, এমন সময়ে আমার হাত থেকে ফটোগুলো টেনে নিল বন্যা। দেখতে লাগল একটার পর একটা। আমি বাধা দিলাম না। অনেকবার দেখেছি; দেখেও তালে পানি পাই নি। এবার যে পারে দেখুক।

বন্যা কিন্তু দেখছে নিছক মজা দেখবার জন্যে নয়—ফটোর মধ্যেই যেন সনাতন-নিধনের রহস্য-সূত্র নিহিত রয়েছে কোথাও—একটু চোখ পাকিয়ে তাকালেই দেখা যাবে। দেখতে দেখতে কপাল-টপাল বেশ কুঁচকে গেল।

তারপর বললে—'মিঃ গুঁইয়ের নেগেটিভ অন্যের হাতে গেল কিভাবে বুঝছি না। ফটোগ্রাফাররা কখনো তা করে না। নিজের তোলা ছবি ডেভালাপ না করা পর্যন্ত অন্যের হাতে দেয় না।'

'কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। মিঃ গুঁই দেন নি—কিন্তু কেউ নিয়েছে।'

'কিন্তু বুঝছেন না কেন নেগেটিভ ডেভালাপ না করা পর্যন্ত মিঃ গুঁই বুঝবেন কি করে যে ছবি আদৌ উঠেছে কিনা? নো সেন্স অ্যাট অল।'

'সেন্স কোনটার মধ্যেই বা আছে বলুন?'

জবাব দিল না বন্যা। ভুরু-টুরু কুঁচকে নিবিড় চোখে চেয়ে রইল হাতের ফটোর পানে। হঠাৎ একটা চকিত তরঙ্গ ললাটে উঠেই মিলিয়ে গেল। দ্রুত ছবি-গুলো উল্টে উল্টে দেখল বন্যা। তারপর বললে ঘোলাটে গলায়—'ভারী মজার ব্যাপার তো।'

'মজার ব্যাপার। কোনটা?'

চোখ তুলল বন্যা।

'আমার জড়ুলের দাগটা এতে নেই কেন?'

'আপনার জড়ুল?'

'পিঠে আছে—মাঝামাঝি জায়গায়। সব ছবিতেই দাগটা ওঠে। এতে ওঠে নি; নিশ্চয় রিটাচ করে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

পুরো পিঠটা মেলে ধরলেও বন্যা-লালের জড়ুলের দাগ নিয়ে কৌতূহল দেখাতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে দেখালাম। গুবরেপোকার মত লাফ দিয়ে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

বললাম—'কোথায় ?'

এনলার্জমেন্ট দুটো পাশাপাশি ধরল বন্যা। পেছন থেকে দেখা যাচ্ছে পিঠের চেহারা। হুবহু এক ছবি। একটা ডেভালাপ করে এনলার্জ করা হয়েছে সনাতনের নেগেটিভ থেকে। আর একটা প্রায় ছিনতাই করে এনেছি মিসেস ভাদুড়ীর বোর্ডিং হাউস থেকে।

'দেখছেন ? জড়ুল এতে নেই। এতে আছে।'

দেখলাম। দুটো ছবিতেই আধখানা পিঠ ছায়ায় ঢাকা—বাকী আধখানায় রোদ্দুরের খেলা। রোদ্দুর যে দিকটায় পড়েছে, সেইদিকে পিঠের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা প্রিন্টে দেখা যাচ্ছে আরো একটা বাড়তি দাগ—জড়ুল চিহ্ন।

'দেখলেন ? এবার এই প্রিন্টটা দেখুন।'

আবার তাকালাম। জড়ুল চিহ্ন এ প্রিন্টে নিপাত্তা। সত্যিই কি জড়ুল আছে বন্যার পিঠে ? এই প্রশ্নটাই আগে করা উচিত ছিল। কিন্তু কিছু না ভেবেই দুম করে জিজ্ঞেস করলাম :

'প্রিন্টের দাগ নয় তো ?'

নিমেষে জ্বলে উঠল বন্যা। ভারী রাগী মেয়ে। একটুতেই ফুঁসে ওঠে। ডান পা মেঝেতে ঠুকে বললে তীক্ষ্ণ অসহিষ্ণু গলায়—'আমার পিঠে জড়ুল আছে কিনা সেটা আমি নিশ্চয় জানি। বিশ্বাস না হয় নিজে দেখলেই পারেন।'

আমি আপত্তি করবার আগেই ফটোর গোছা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বুক থেকে সাড়ির আঁচল ফেলে দিল বন্যা। বোঁ করে অ্যাবাউট-টার্ন হয়ে পটাপট ব্লাউজের বোতাম খুলে বললে—'দেখুন।'

দেখে ধন্য হলাম। ব্রা-র ঠিক ওপরে একটা জড়ুল চিহ্ন।

বললাম—'দেখা হয়ে গেছে। জড়ুল অনেকেরই থাকে। তা নিয়ে এত হই-চই করে উঠলেন কেন বুঝলাম না।'

ব্লাউজটা পরে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বন্যা।

'আপনি ফটোগ্রাফার নন', সহজ গলা বন্যার।

'নই তো। অ্যামেচার বলতে পারেন। আপনি ?'

'যে মেয়ের অর্ধেক সময় কাটে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে, ক্যামেরা সম্বন্ধে অনেক খবরই সে আপনা থেকেই জেনে ফেলে। আমিও জানি। আমার শরীরের একমাত্র কলঙ্ক পিঠের ঐ জড়ুলটা। প্রত্যেকবার ঝঞ্ঝাট হয় ঐ জড়ুল নিয়ে।'

'ঝঞ্ঝাট ? কেন ?'

'জড়ুলটা একটু বেশী লালচে। তার মানে ফটোতে জায়গাটা কালচে হয়ে যায়। এত কালচে যে চোখে লাগে। প্রিন্টে কালচে মানে নেগেটিভে সাদাটে থাকে।'

'ওটুকু বোঝার বিদ্যে আমার আছে।' অসহিষ্ণুভাবে বললাম।

'তাহলে নিশ্চয় জানেন নেগেটিভের সাদা জায়গা দিয়ে আলো দেখা যায় ? মানে জায়গাটা স্বচ্ছ হয় ?'

'জানি বই কি।'

'সেই কারণেই পিঠের জড়ুল চিহ্ন নেগেটিভে রিটাচিং পেন্সিল বুলিয়ে বুজিয়ে দেওয়া যায়। জড়ুল চিহ্ন নেগেটিভে সাদা হয়ে ফুটে ওঠে—সেটাকে কালো করে পিঠের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়। সব ফটোগ্রাফারকেই এই ঝকমারিটুকু পোহাতে হয়। ফিনিশড্ এনলার্জমেন্টের আগে টাচ আউট করতে হয় দাগটাকে প্রত্যেকটা নেগেটিভে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে দিয়ে এই এনলার্জমেন্টের দিকে তাকালেই রিটাচিং মার্ক দেখতে পাবেন—খুব ছোট বলে খালি চোখে দেখা যায় না। এবার বুঝেছেন ?'

'বুঝেছি। কিন্তু তাতে হলটা কি ? এত লেকচার দিয়ে লাভ কি হল বুঝিয়ে বলবেন ?'

'আপনার ইন্টারেস্ট নেই জানবার।'

'আছে', বলা বাহুল্য মিথ্যে বললাম।

সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল বন্যা।

'মিসেস ভাদুড়ীর খপ্পর থেকে ঐ যে প্রিন্টগুলো এনেছেন—ওগুলো কিন্তু রাফ প্রিন্ট—রিটাচ করার আগে।'

'তারপর ?'

'পয়লা দফায় ফটোগ্রাফাররা রিটাচ করে না। রাফ প্রিন্ট বা কনট্যাক্ট প্রিন্ট করে দেখে নেয় ছবি কি রকম উঠেছে তারপর.......'

'দেখুন—'

'আগে আপনি শুনুন।'

'কিন্তু—'

ধৈর্য ধরুন। আপনাকে হেল্প করা জন্যেই—'

'কিন্তু হেল্পটা হচ্ছে কোথায় ?'

'কথাটা শেষ করতে দিন—তখন দেখবেন হেল্প কিনা।'

'বেশ, বলুন।'

'কথার মাঝে কথা বলবেন না।'

'নিন, নিন, বলে ফেলুন।'

'নেগেটিভ যদি পারফেক্ট থাকে, তা থেকেই এনলার্জমেন্ট করে নেয় ফটোগ্রাফার। আর যদি না থাকে, দাগ-টাগ থাকে আমার এই জড়ুল চিহ্নের মত, টাচ করতেই হয়। এবার বুঝেছেন ?'

'কি বুঝব ?'

সত্যিই অসীম অনুকম্পার হাসি হাসল বন্যা। যেন আমি একটা বালখিল্য—হোপলেস ইডিয়ট।

বলল—'আপনি দেখছি খুবই নীচু দরের ডিটেকটিভ। সোজা জিনিসটা বুঝলেন না ? মিঃ গুঁই আমাকে যে প্রিন্টগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো নেগেটিভ রিটাচ করার আগে করেছিলেন। কিন্তু আপনারা যে প্রিন্টগুলো পুলিশ ল্যাবোরেটরীতে বানিয়েছেন, সেগুলো রিটাচ করা নেগেটিভ থেকে নেওয়া। তাই আমার জড়ুল চিহ্ন ওতে ওঠে নি।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়লাম আমি।

'মিস্ লাল, আপনি গোড়ায় গলদ করছেন। মিঃ গুঁইয়ের ফিনিশড্ এনলার্জমেন্টে আপনার জড়ুলের দাগ না ওঠার কারণটা আমার মাথায় ঢুকেছে ঠিকই। কিন্তু আপনার মাথায় কিছুতেই ঢোকাতে পারছি না যে সে নেগেটিভ আমরাই ডেভালাপ করেছি। তার আগে রিটাচ করি নি—করিনি— করিনি।'

বন্যা অসহিষ্ণুভাবে পা ঠুকল মেঝেতে।

'বড্ড লেটে বোঝেন আপনি।'

'আমি লেটে বুঝি ?'

তা নয়তো কি ? নেগেটিভ আপনারা ভালাপ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই গটিভগুলোই তো নেওয়া হয়েছিল নশড্ প্রিণ্ট থেকে। সেই কারণেই পনাদের প্রিণ্টে আমার জরুল দেখা নি।

ঢের হয়েছে। একটা বাজে মেয়ে-লের কাছে অনেক বেশি জ্ঞান নেওয়া । গেছে। যা বোঝে না, তাই নিয়ে ন্ ভ্যান্ করে অনেক বুঝিয়েছে। ওসব রাবিশ....কেসের সঙ্গে যে জিনিসের ানো সম্পর্কই নেই, তাই নিয়ে লেকচার চ্ছে নিজের বিদ্যে জাহির করার জন্যে।

তাই একটু শক্ত গলাতেই এবার লাম—'মিস্ লাল, নেগেটিভ থেকেই ণ্ট হয়—প্রিণ্ট থেকে নেগেটিভ হয় ।'

বলেই মনে হল বুঝি থাপ্পড় মেরে াবে বন্যা। জুড়ো-রপ্ত ঐ ফিগারে াধ্য কিছু নেই। কিন্তু বেশ কষ্ট করে জেকে সামলে নিল মেয়েটা। জবাব দিল ফ-ঠাণ্ডা গলায়।

'প্রিণ্ট থেকেও নেগেটিভ হয়', এমন র বলল যেন আমি একটা নাবালক গলা টিপলে দুধ বেরোয়—'ফটোরও টা ওঠে।'

বারকয়েক শুধু চোখের পাতা ফেললাম কথা বলতে পারলাম না। ফটোরও টা ওঠে—কোথায় যেন এর আগে নেছি কথাটা। তারপরেই মনে পড়ল। মারই কথা। বলেছিলাম আবদুল মাদ্দকে। ফটোর ফটো তুলছিল দেখে াক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'এ আবার ? ফটো থেকে ফটো তুলছেন কেন ?'

আচম্বিতে সুস্পষ্ট হল মিস্ বন্যা-লের বক্তৃতার তাৎপর্য।

'তার মানে....আই মীন....মিঃ গুঁই- ফিনিশড্ প্রিণ্ট কেউ জোগাড় করে তা কে ফটো তুলেছে, একই কথাই বলতে ন তো আপনি ?'

হাসল বন্যা।

'লেটে বুঝলেও বুঝেছেন।'

টিটকিরি গায়ে মাখলাম না।

'সেই নেগেটিভ ডেভালাপ না করেই ডবডির পাশে ফেলে গেছে যাতে আমরা াকা খাই ?'

'হ্যাঁ। এবং তাই খেয়েছেন।'

বললাম —'ওয়াণ্ডারফুল। —আপনি আমার কি উপকার করলেন মিস্ লাল, আপনি জানেন না। আমার লাইফটাকে ভ করে দিলেন।'

'রিয়্যালি ?'

'রিয়্যালি। পাঁচ মিনিট আগেও াবিনি এই অভিশপ্ত মামলার সুরাহা রতে পারব। অন্ধকার....অন্ধকার....স্রেফ ন্ধকার। এককণা আলোও দেখতে াচ্ছিলাম না। কিন্তু আপনার াইডিয়াটাকে আমার কাছে কতখানি .. লাল....ভাষায় তা বোঝাতে পারব না।'

'ওয়েল....ওয়েল....'

'বসুন....খাটেই বসুন .... জিনিসটা আরো বুঝে নিই।'

সকৌতুকে আমার পানে চেয়ে খাটে বসে ধবধবে সাদা পা দোলাতে লাগল বন্যা। আমি বসতে পারলাম না। সবক'টা স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে তখন উত্তেজনার ফোর-ফরটি কারেণ্ট পাশ করছে। অস্থির হাতে বার করলাম সিগারেট। ধরালাম।

বললাম—'আপনি ঠিকই বলেছেন। সব মিলে যাচ্ছে। মিঃ গুঁই যে আর এক-জন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে ছবি তুলেছিলেন, সে-প্রমাণ পেয়েছিলাম। কিন্তু লোকটা কে, জানতে পারিনি। আপনি জানেন ?'

'না। মিঃ গুঁইয়ের সম্বন্ধে অন্য কোনো খবরই রাখি না। ফ্রিলান্স ফটো-গ্রাফার—তার বেশি কিছু জানি না।'

'ঠিকই জানেন। একা একাই ছবি তুলে পয়সা কামাতো—চাকরি-বাকরি করত না। কিন্তু একজন দোসর তার ছিল। এমন একজন যে জানত মিঃ গুঁই আপনার ফটো তুলেছে, কোথায় তুলেছে এবং কিভাবে সেই ফটো থেকে কপি তৈরি করতে হয়। ফটো থেকে ফটো তোলার যন্ত্রপাতি জ্ঞান-বুদ্ধি তার ছিল।'

'টেলিফোন গাইড খুঁজলেই পারেন।'

মাথা নাড়লাম।

'গাইড খুঁজে নাম পাওয়া যাবে না মিস্ লাল।'

'কেন ?'

'মিঃ গুঁইকে আপনি চেনেন না। দোসরটিও নিশ্চয় তাই। একেবারে পয়মাল।'

'মানে ?'

'সচ্চরিত্র বলতে যা বোঝায়, তা নয়।'

'কি বলতে চান, খুলে বলবেন তো।'

'মিস্ লাল, সনাতন গুঁই যে ধরনের ছবি তুলে বেড়াতো, তার বেশির ভাগই ছাপা যায় না।'

ভ্রূকুটি করল বন্যা।

'অশ্লীল ?'

'হ্যাঁ।—নীল ছবি নিয়ে কি সব বলছিলেন না ? ঐসব আর কি।'

'অবাক করলেন। আমি তো ভেবে-ছিলাম ভদ্রলোক জাতশিল্পী। খাঁটি আর্টিস্ট।'

সেটা আপনার ফটো তোলার সময়ে। ম্যাগাজিন থেকে অর্ডার পেয়েছিলেন আর্টিস্টিক ছবি তোলার। তাই বাড়াবাড়ি করেনি। কিন্তু পরে করত। আবার ডাক পড়ত আপনার। তখন আর রেহাই পেতেন না।'

'চড়িয়ে গাল ফাটিয়ে দিতাম। জানেন আমার বাবা পাঞ্জাবী ? ফ্রিস্টাইল রেস্টলিং চ্যাম্পিয়ন ?'

'সেটা আপনাকে দেখেই বুঝেছি। সনাতন অতি ঘুঘু লোক। মেয়ে বুঝে বাছাই করত। সেই কারণেই আপনাকে হয়ত ঘাঁটাতে যেত না। ও করত কি, মেয়েদের ভুজুংভাজুং দিয়ে ফটোগুলো তুলে নিত। তারপর নেগেটিভ দিত অন্য একজনকে এনলার্জ করে বিক্রি করার জন্যে। সনাতন নিজে অ্যামেচার—পেশাদার বলতে যা বোঝায় তা নয় সেরকম এন-লার্জমেণ্টের যন্ত্রপাতিও ছিল না।'

চলবে

ইচ্ছে ছিলো

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিকেল চারটে বাইশের নৈহাটি লোকালে খুব একটা ভিড় থাকে না। সারা দিন ইস্কুলে চেঁচিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে একটু ফাঁকায় ফাঁকায় থাকতে ভালো লাগে। আজ যে ট্রেনটা কেন দেরি করছে কে জানে। খিদে পেয়েছে খুব, বাড়ি পোঁছোনো অবধি ধৈর্য ধরতে ইচ্ছে করছে না। হঠাৎ প্রয়োজনের মুহূর্তে দৈববাণীর মতো ঝালমুড়ির হাঁক। পকেট হাতড়ে মান্থলি টিকিটটা ছাড়া চার আনা পয়সা বেরুল, ঝালমুড়ি কিনে ফেললাম। এতক্ষণ ট্রেন দেরি করছিল, আর যেমনি ঠোঙাটি হাতে নিয়েছি, অমনি গড়-গড় করে এসে গেল নৈহাটি লোকাল। উঠে উল্টোদিকের দরজার পাশে দাঁড়ালাম।

মাঝে মাঝে এমন বিচ্ছিরি ব্যাপার হয় যে বলবার কথা নয়। ট্রেন ছাড়তে একগাল মুড়ি পুরতে গেলাম, দরজা দিয়ে আসা হু হু বসন্তের হাওয়া আমার সাধের প্রথম গ্রাস উড়িয়ে নিয়ে গেল। এরকম হলে ভারি লজ্জায় পড়তে হয়। হাত দেখালে বাস যদি না থামে তাহলে যেমন মনে হয় রাস্তার সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তেমনি। মিনিয়েচার গাধার টুপির মতো ঠোঙাটা হাতের মুঠোয় লুকোবার চেষ্টা করতে করতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম ব্যাপারটা কারো নজরে পড়েছে কিনা। না, ভয় অমূলক। ফলে বসন্তের হাওয়া বাঁচিয়ে আবার অপারেশন ঝালমুড়ি শুরু করলাম।

পরের স্টেশন ইছাপুর। গাড়ি থামতেই একজন সুন্দরী, ফর্সা ভদ্রমহিলা উঠলেন আমার কামরায়। পেছন পেছন হোল্ডল, সুটকেশ, জলের বোতল ইত্যাদি নিয়ে এক সুপুরুষ ভদ্রলোক। বয়েস দুজনেরই ত্রিশ-বত্রিশের ভেতর। ভদ্রমহিলার আরো কম হবে হয়তো। মিথ্যে কথা বলে নিজেকে ঠকাবো না, আমি হাঁ করে ভদ্রলোকের স্ত্রীকে দেখছিলাম। যৌবন ঈষৎ পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়লে মেয়েদের রূপে এক আশ্চর্য মহিমা আসে। আমি তাই দেখছিলাম। দুধে-আলতা রঙের পিওর সিল্কের শাড়ি, ফর্সা পায়ে চন্দনী রঙের স্লিপার—বেশ মানিয়েছে কিন্তু।

ততক্ষণে স্বামী ভদ্রলোক নিজেই টানা-টানি করে জিনিসপত্র আমার দিকে এনে ফেলেছেন। গোছানো হলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন—'কি? হলো তো? এর জন্য কি কুলী লাগে?'

কিন্তু আমার মনোযোগ তখন অন্যদিকে সরে এসেছে। ভদ্রলোকের সুটকেশটা দেখতে অদ্ভুত তো! এতবড় জিনিস আমাদের দেশে বানায় না! বিলিতি নাকি? চামড়াটা কি কুমীরের চামড়া? গায়ে সাঁটা ওই স্টিকার-গুলোই বা কিসের?
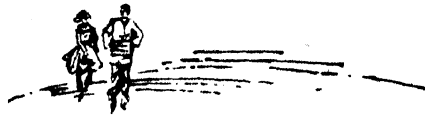
একটু ঝুঁকে একটি স্টিকার পড়লাম লেখা আছে—শেরাটন হোটেল, ব্রাসেলস বেলজিয়াম। আর একটা এয়ার ইণ্ডিয়ার তাতে নাম লেখা—শ্রী ও শ্রীমতী (অস্পষ্ট) দাশগুপ্ত।

ও'রা দুজন নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে হাসছেন। দুজনেই সুন্দর স্বাস্থ্যে করে হাসছেন। দুজনেই সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, মানিয়েছে খুব ভালো। সফল মানুষের মুখেচোখে একটা জ্যোতি থাকে—এদেরও সেরকম রয়েছে। ভদ্রলোক সম্ভবত বিদেশে থাকেন, ছুটিতে এসেছিলেন, এখন আবার ফিরে চলেছেন সস্ত্রীক। হয়তো দমদমে নামবেন, টারম্যাকে বসে কাগজের কাপে একটু কফি নিয়ে সন্ধ্যের ফ্লাইটে কোলকাতাকে গুডবাই করে দেবেন।

শেরাটন হোটেল, ব্রাসেলস, বেলজিয়াম এক বন্ধুর বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গি
গতমাসে আমার চটিজোড়া চুরি গেছে। সে থেকে হাওয়াই চটি পরে চালাচ্ছি। স্টেশ থেকে মাইলখানেক হাঁটলে তবে ইস্কুল ব্যানার্জীপাড়ার কাছে পথে বড় ধুলো আমার দুই পা ধুলোয় বিতিকিচ্ছি দেখাচ্ছে। তিন-চারদিন দাড়ি কামানো হ না। বুকের কাছে শার্টের একটা বোতা ছিঁড়ে যাওয়ায় আপাততঃ সেফটিপিন দি আটকানো রয়েছে। দু হাতের মধ্যে ঝাল মুড়ির ঠোঙা লুকিয়ে আমি কাঠ হ দাঁড়িয়ে রইলাম।

ব্রাসেলস! বেলজিয়ামের রাজধান ব্রাসেলস! আমারও যে বিদেশে যাওয়ার বড় ইচ্ছে ছিল। কেন যাওয়া হয়নি, কার দো —এসব আলাদা কথা, কিন্তু আমি য করতে পারিনি তা আর একজন করেছে এব ওই তো সে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সামনে

এ্যানটওয়ার্পের বন্দরের মতো বন্দ দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। নীল জ রাজহাঁসের মতো কয়েকটা পাওয়ার বো নোঙর ফেলে রোদ পোহাচ্ছে আর পেছ দিগন্ত জুড়ে পাকা আঁকিয়ের হাতের কাজে মতো এ্যান্টওয়ার্প। ক্যাথলিক গীর্জা তীক্ষ্ণ চূড়াবিদ্ধ করছে আকাশকে। ঘো শহরের অজস্র খাল দিয়ে চাঁদনী রাত্তি

বুকখোলা জামা পরে ম্যাণ্ডোলীন বাজাতে বাজাতে নৌকো করে বেড়াবো ভেবেছিলাম —ইংরেজী কবিতায় অমর হয়ে আছে যে ঘেন্ট শহর। দক্ষিণ ফ্ল্যান্ডার্সের হলুদ হলাভূমিতে চিৎ হয়ে সমস্ত শরীর দিয়ে রোদ্দুর শুষে নিতে নিতে সমুদ্রের গান শোনবার ইচ্ছে ছিলো আমার।

ছিলো—অথচ আজ আমি হাঁটু পর্যন্ত ধুলো নিয়ে ঝালমুড়ির ঠোঙা আঁকড়ে ধরে লোক্যাল ট্রেনের কামরায় দাঁড়িয়ে আছি।

লজ্জা কাটিয়ে আমি বাকি মুড়ি খেয়ে ফেললাম। কারণ ততক্ষণে আমি খেলাটা ঠিক করে ফেলেছি।

আমি এমন কিছু বুড়িয়ে যাইনি, প্রস্তুত আমার এখনো তিরিশই হয়নি। আগামীকাল বড়ো রকমের একটা কিছু ঘটবে—এই আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। সামনের বছর যে আমারই বিদেশে যাওয়ার একটা সুযোগ হয়ে যাবে না সেকথা কে বলতে পারে? যাই হোক, যতদিন তেমন সুযোগ না আসছে ততদিন একা একা এই খেলাটা আমি নিজের সঙ্গে খেলতে পারি।

আজ সন্ধ্যায় আড্ডা দিতে বেরুলাম না, সময় কোথায়? এখন আমি স্পেন রওনা হয়ে যাচ্ছি। প্লেন ছাড়লো বলে। আজ কি আড্ডা দেওয়া ভালো দেখায়? সেখানে আমি প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র দেখতে যাবো আলতামিরা গুহায়।

আরেস-দেল-মায়েস্ত্রো ছোট একটি স্পেনীয় গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে একটি দু' কামরার সাদা রঙের বাড়িতে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সকালবেলা পাঁউরুটি মাখন, কফি ও প্রচুর পরিমাণে আঙুর খেয়ে আমি বেড়াতে বের হই। হাঁটতে হাঁটতে পাহাড় থেকে নেমে ফিরে তাকালে আমার বাড়িটিকে চমৎকার দেখায়। খয়েরী পাহাড়ের কোলে যেন একটি সাদা বক ডানা মুড়ে বসে রয়েছে। গতকাল উড়োজাহাজে বার্সিলোনা পৌঁছেছি। বাকি পথ মোটরে। এখন এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমার জন্য একজন ভালো গাইড ঠিক করা হয়েছে। সে আমাকে দেখাবে সব কিছু। তার জন্যেই অপেক্ষা।

আজ বেড়াতে বেরিয়ে ঘুরছিলাম গ্রাম্য নদীটির আশে পাশে। নদী না বলে ঝরনা বলাই ভালো। সরু এইটুকু শরীর তার, সে শরীরে নাচের ছন্দ। স্রোতের তীব্রতায় গোল গোল নুড়ি গড়িয়ে গিয়ে নূপুরের মতো বাজছে।

হঠাৎ পেছনে চিৎকার—সেনর! সেনর!

তাকিয়ে দেখি দৌড়ে আসছে উমবের্তো —আমার পরিচারক, সেক্রেটারী, স্থানীয় অভিভাবক, সবকিছু। উমবের্তো খবর দিল —আমার গাইড এসে বসে রয়েছে অপেক্ষায়।

বাড়ি ফিরে একটু অবাক হলাম। আমার খেয়াল ছিল না যে 'গাইড' শব্দটা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। কাজেই বেতের চেয়ারে আমার অপেক্ষায় একটি তন্বী সুন্দরীকে বসে থাকতে দেখে একটু চমকে গেলাম বৈকি!

মেয়েটি দাঁড়িয়ে সুন্দর করে হেসে বলল —আমার নাম গারসিয়া। কাল আপনি আমার সঙ্গে আলতামিরায় প্রস্তর যুগের চিত্রশিল্প দেখতে যাবেন।

গারসিয়া তার মাতৃভাষায় কথা বললো এবং আমি স্প্যানিশ জানি না, কিন্তু আমার বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হলো না। উত্তরে আমার নির্ভেজাল বাংলাও সে পরিষ্কার বুঝে নিলো। উপায় নেই, নইলে এই খেলা জমবে না।

পরের দিন আলতামিরা যাওয়ার পথে আমরা আগে গেলাম সান্তোলিয়া বলে একটা ছোট্ট গ্রামে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রিও গুয়াদালুপ্ নদী। এই নদী ধরে কিছু এগুলেই একটা গুহা, তাতে দু-একটা প্রাচীন ছবি রয়েছে। দেখে গেলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি কিছুই না। বিশেষ করে গার-সিয়াকে আমার খুবই ভালো লেগেছে। অবিকল বাঙালী মেয়েদের মতো দেখতে, লম্বা চুল,—কালো চোখ, মাঝখানে সিঁথি, ঈষৎ রোদেপোড়া রং। ওর সঙ্গে থাকতে ভালোই লাগছে আমার। আজ গারসিয়া পরেছে নীল রঙের—নাঃ, নীল রংটা থাকগে —আজ ও পরেছে পিংক রঙের স্কার্ট ও ব্লাউজ। দারুণ দেখাচ্ছে।

সান্তোলিয়া থেকে রওনা হয়ে একেবারে আলতামিরা। নিজের কাজ বোঝে গারসিয়া— ছবি বোঝে। ও আমাকে নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দিল অত প্রাচীন যুগে পিগমেন্ট হিসেবে কি কি জিনিস ব্যবহার করা হতো। গুহাবাসী হলেও তখনই মানুষ কতো বলিষ্ঠ রেখা টানতে শিখেছে।

আমার যেন ঘোর ঘোর লাগছে! এই সেই বিখ্যাত আলতামিরা। পঁচিশ হাজার বছর আগে গুহামানব যার প্রস্তরগাত্রে নিজের শিল্পকীর্তির নিদর্শন রেখে গিয়েছে! গুহার ভেতরের বাতাসে এখনো কান পাতলে তার নিঃশ্বাসের শব্দ যেন প্রতি বর্ণ ইঙ্গিতে তার অদৃশ্য উপস্থিতি। এক-দিন তো সত্যিই সে ছিল এই গুহায়, এর দেয়ালে রেখেছিল তার হাত। গায়ে কাঁটা দিল আমার।

পাথরের গায়ে একটা বিরাট বাইসন, এক জায়গায়। কি অদ্ভুত রঙের ব্যবহার। আঁকার কায়দাও কি আশ্চর্য! তেড়ে এলো বলে জীবটা। গারসিয়া বলছে—বাইসন আরো আঁকা আছে অনেক গুহায়, কিন্তু এতো ভালো স্টাডি আর কোথাও নেই। গুয়েরনিকা বা ডেল-নাভাজোতে অনেক বাইসনের ছবি পাওয়া গিয়েছে কিন্তু, এর কাছে তারা কিছু না।

বাইরে এসে পড়ন্ত রোদ্দুরে গা ঢেলে আমরা কফি আর স্যাণ্ডউইচ খাই। এখানে বোধ হয় একটু ডিটেল দিলে খেলাটা আরো জমে। কি দিই? আচ্ছা—একটা কুকুর কোথা থেকে এসে সামনে বসে আমার মুখের দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে। বেওয়ারিশ রাস্তার কুকুর সব দেশেই আছে। রাস্তার হলেও ভালো জাত। আমার ভারি মায়া হয় —নিজের স্যাণ্ডউইচ থেকে আধখানা ভেঙে ওকে দিই। ও তৎক্ষণাৎ উদরস্থ করে ল্যাজ নাড়তে থাকে। এবার খুশি খুশি চোখ। আমরা গিয়ে গাড়িতে উঠি ও আমাদের পেছন পেছন এগিয়ে দিতে আসে। পথের বাঁকে পেছন ফিরে দেখি মুখ তুলে সে আমাদের দিকেই ঠায় তাকিয়ে রয়েছে। কুকুরটার ওপরে আমার ভারি মায়া পড়ে যায়।

অদ্ভুত মায়াবী রোদ্দুর ঝিমঝিম করছে। ছোটবেলা থেকেই এমন রোদ্দুরে আমার কেমন নেশা নেশা লাগে। খুব প্রাচীন কোনো যুগে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, চলে যেতে ইচ্ছে করে খুব দূরে কোথাও: আমি তো স্পেনে এসেছি, আর কতো দূরে যাবো? আসলে 'দূরে' কথাটা একটা আইডিয়া। দূরে যাওয়ার বাসনা কখনো মেটে না। এরকম রোদ্দুর উঠলে কেবলই আরো দূরে—আরো দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

স্টিয়ারিং গারসিয়ার হাতে, উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে আসা বাতাস ওর লম্বা চুল নিয়ে খেলা করছে। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে গারসিয়া বললো—আপনার ডিউটি আমার কালকেই শেষ। ব্রিটেন থেকে একটা দল আসছে,

...দের সংগে আমি পরশ্রুদিন তাসিলি-ন-আজের রওনা হবো।

—তাসিলি। সে তো সাহারা মরুভূমির মধ্যে। তুমি যাচ্ছো সেখানে?

—হ্যাঁ। সাহারার ঠিক কেন্দ্রে আহ্‌গর পর্বতমালা আছে জানেন তো? তারই বিভিন্ন অংশে কিছু প্রাগৈতিহাসিক ছবি পাওয়া গিয়েছে। তাই দেখতে ওরা আসছে, আমি গাইড করবো।

আমার রক্ত নেচে উঠলো। সাহারা! আমার অতি শৈশবের স্বপ্ন। চোখ বুজলেই দেখতে পাই জেব্রার গায়ের মতো ডোরাকাটা ঢালু বালির স্তূপ দিগন্ত অবধি বিস্তৃত, দূরে-কাছে বালির ওপরে কাঁপছে তাপতরঙ্গ, সার্থবাহ দুঃসাহসী বণিকের দল উটের ক্যারাভ্যান নিয়ে পাড়ি দিচ্ছে দুস্তর মরুভূমি।

আমি ছেলেমানুষের মতো বললাম—আমিও যাবো।

গারসিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—যাবেন। চলুন না। খুব ভালো হয় তাহলে। আপনার পরবর্তী প্রোগ্রাম জানি না বলে সাহস করিনি বলতে।

আমি হাসি। আমার প্রোগ্রাম শুধু বেড়ানো। শুধুই দূরে চলে যাওয়া—আরো দূরে চলে যাওয়া।

পাসপোর্ট হয়ে যায়, টাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

উমবের্তো বিদায়ের সময় আমার হাত দুটো ধরে বলে—আবার আসবেন সেনর ব্যানার্জী। আর কোনো গেস্ট আমার সংগে এমন সহৃদয় ব্যবহার করেন নি। তারপর একটু মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে উইশ করলো উমবের্তো—মাচো এক্‌জিতো সেনর, ই বুয়েনা সুয়ের্তে—আনন্দে থাকুন, যাত্রা শুভ হোক।

ওর চোখে জল।

আলজিয়ার্স থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। একটা ছোট প্লেনে জিব্রালটার পেরিয়ে আলজিয়ার্সে এসে নামলাম। পথে গারসিয়া আমাকে রক অফ জিব্রালটার দেখালো—এইটুকু সরু প্রণালীর ওপর ঝুঁকে রয়েছে পাথরের প্রাচীর। এপারে ইউরোপ, ওপারে আফ্রিকা।

ব্রিটিশ অভিযাত্রীরা আমার সংগে খুব ভালো ব্যবহার করলেন। আলজিয়ার্স থেকে দুই এঞ্জিনের একখানা এরোপ্লেন আমাদের নিয়ে আকাশে উঠলো। আমার পাশে গারসিয়া।

নিচে বিস্তৃত সাহারা। কোনো বৈচিত্র্য নেই। মাইলের পর মাইল একটানা বালির সমুদ্র। শহরে দিগন্তের কাছে যেমন কিছুটা জায়গা ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, এখানে তেমন নয়। দিগন্ত থেকে দিগন্ত অবধি নতুন কেনা ব্লেডের মতো ঝকঝক করছে। তামার রঙের আকাশ—একটি পাখি নেই সে আকাশে।

আইন সালাহ্‌ নামে ছোট্ট একটি মরূদ্যানে উড়োজাহাজ নামবার ব্যবস্থা রয়েছে আলজিয়ার্সের মরু-অভিযাত্রী সংঘের একটা ক্লাব হাউসও আছে এখানে। আইন সালাহ্‌-তে আমরা থামলাম বিশ্রামের জন্য। কি ভয়ানক রৌদ্র! এর কাছে কোথায় লাগে আমাদের বৈশাখ মাসের সূর্য! ঘাম হয় না সাহারায়—কিন্তু গায়ের চামড়া পুড়ে যাবার যোগাড়। গারসিয়া হেসে বললো—এখনই কি হয়েছে? মজাটা বুঝবে রাত্তিরে, যখন তাপ নেমে যাবে শূন্যেরও নিচে। সাহারায় দিনে কুম্ভীপাকের গরম, আর রাত্তিরে হাড় কাঁপানো শীত।

—সেকি! তাহলে উপায়?

আশ্বাসের হাসি হেসে গারসিয়া তার সুটকেশের লক একটু আলগা করে ডালাটা সামান্য ফাঁক করে দেখালো। ভেতরে তিন চারটে মোটা বিলিতি রাগ্‌।

বললাম—তুমি বড় ভালো গারসিয়া। সবদিকে চোখ তোমার।

প্লেন ইতিমধ্যে ফের আকাশে উঠেছে। গারসিয়া আমাকে থামিয়ে বলে উঠলো—দেখ, দেখ—নিচে আহ্‌গর পর্বতমালা!

দীপ্ত আকাশের তলায় খয়েরী পাহাড় বুক মেলে পড়ে আছে। অদ্ভুত রুক্ষ সৌন্দর্য তার। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্যানেট মরূদ্যান। এখানে যাত্রা শেষ। তাসিলি উপত্যকা এখান থেকে মাইল পাঁচেক। এখানেই তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। একা গারসিয়া এত বড়ো দল সামলাতে পারবে না। সেজন্য দু' জন তুয়ারেগ গাইড ভাড়া করা হলো। তুয়ারেগরা তাসিলির স্থানীয় আদিবাসী, মরুভূমির সন্তান—দুর্ধর্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু। টাকার কোনো মূল্য নেই এদের কাছে, কারণ জ্যানেটে দোকানপাট নেই। কিছু কিনতে হলে এদের অর্ধেক সাহারা হেঁটে পার হয়ে আলজিয়ার্স যেতে হবে। তা সম্ভব নয়; এরা সামান্য দৈনিক তামাকের র‍্যাশন ও গোটাকতক করে এ্যাসপিরিন ট্যাবলেটের বদলে কাজ করতে রাজী হলো। এ্যাসপিরিন এদের কাছে মহৌষধ—গা ব্যথা, জ্বর, পেট খারাপ থেকে শুরু করে যা হোক কিছু হলেই এদের ধারণা এ্যাসপিরিন খেলে সারবে। সারেও। জন্মে অবধি ওষুধ খায় না এরা—যে কোনো ওষুধ ফলে চট করে ধরে যায়।

তাঁবু পিচ্‌ করা ছিলো। বিশ্রামের জন্য একটায় ঢুকলাম।

আস্তে আস্তে রাত নামলো। সূর্যাস্ত ও রাত্রির মধ্যে এখানে গোধূলির অবকাশ নেই। বায়ুমণ্ডলে ধূলিকণা না থাকায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত হবার সুযোগ পায় না। সূর্যাস্তের প্রায় সংগে সংগে লাফিয়ে অন্ধকার নেমে আসে।

কি আশ্চর্য রাত। গভীর স্তব্ধতা কম্বলের মতো চেপে ধরেছে পৃথিবীকে। নক্ষত্ররা নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি। দিগন্তরেখা অবধি নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে আকাশ পরিষ্কার থাকার জন্য। মাঝে মাঝে অপার স্তব্ধতা ফুটো করে কেবল এক ধরনের গির-গিটির তীক্ষ্ম ডাক শোনা যাচ্ছে। ব্রিটিশ প্রাণীবিজ্ঞানী ডেকে বললেন—ব্যানার্জী, ডেজার্ট গেকো ডাকছে, শুনতে পাচ্ছেন?

পাচ্ছি। আরো বেশি কিছু শুনতে পাচ্ছি। আমি শুনতে পাচ্ছি এই নিঃশব্দ মরুরাত্রির আপন রহস্যময় কণ্ঠের আহ্বান। এর জন্যেই তো আসা।

তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালাম। নীল আকাশে নক্ষত্ররা যেন ...শায় টুকরে বসানো। ছোটবেলায় ইং... আরব্য রজনী ফিল্ম দেখতে গিয়ে এরকম আকাশ দেখে ছিলাম মনে আছে। এই তো চাই আমি এই রকম মুক্ত বাঁধনহারা জীবনযাপন। এই সাহারার বুকে উঠে চড়ে কাফেলার সংগে ঘুরে বেড়ানো, মরূদ্যানে শুকনো খেজুর আর উটের দুধ খেয়ে বিশ্রাম করা। আইন সালাহ্‌, এল গোলিয়া—কি সুন্দর স্বপ্নিল নাম সব।

পরের তিন দিন আমরা তাসিলি উপত্যকার বিচিত্র সব গুহাচিত্র দেখি। কোথাও ধনুর্ধর শিকারী তাড়া করেছে হাতিকে কোথাও হরিণ তীর খেয়ে পড়ে আছে ... হয়ে—আরো কত সব ব্যাখ্যাহীন চিহ্ন ও সংকেত, আজ তার অর্থ আর কেউ জানে না। একদিন সুজলা সুফলা ছিল সাহারা, তখন মানুষ বাস করতো এখানে। কালে মরু অগ্রসর হয়ে গ্রাস করেছে তার রাজ্য।

আর নয়। ফিরতে হলো এবার। দুবেলা দু মুঠো খেতে হয়। তার জন্য চাকরীটা বাঁচানো দরকার। একগাদা খাতা দেখবার অপেক্ষায় পড়ে আছে। ফেরবার সময় বড় কষ্ট হচ্ছিলো আজতামিরার সেই কুকুরটার জন্যে। আবার কবে দেখা হবে কে জানে!

অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন

(২৮)

১৭১৯ টাক্ স্ট্রীট
সানফ্রানসিসকো। ক্যালিফোর্ণিয়া
১২ই মার্চ। ১৯০০

প্রিয় ক্রিষ্টিনা,
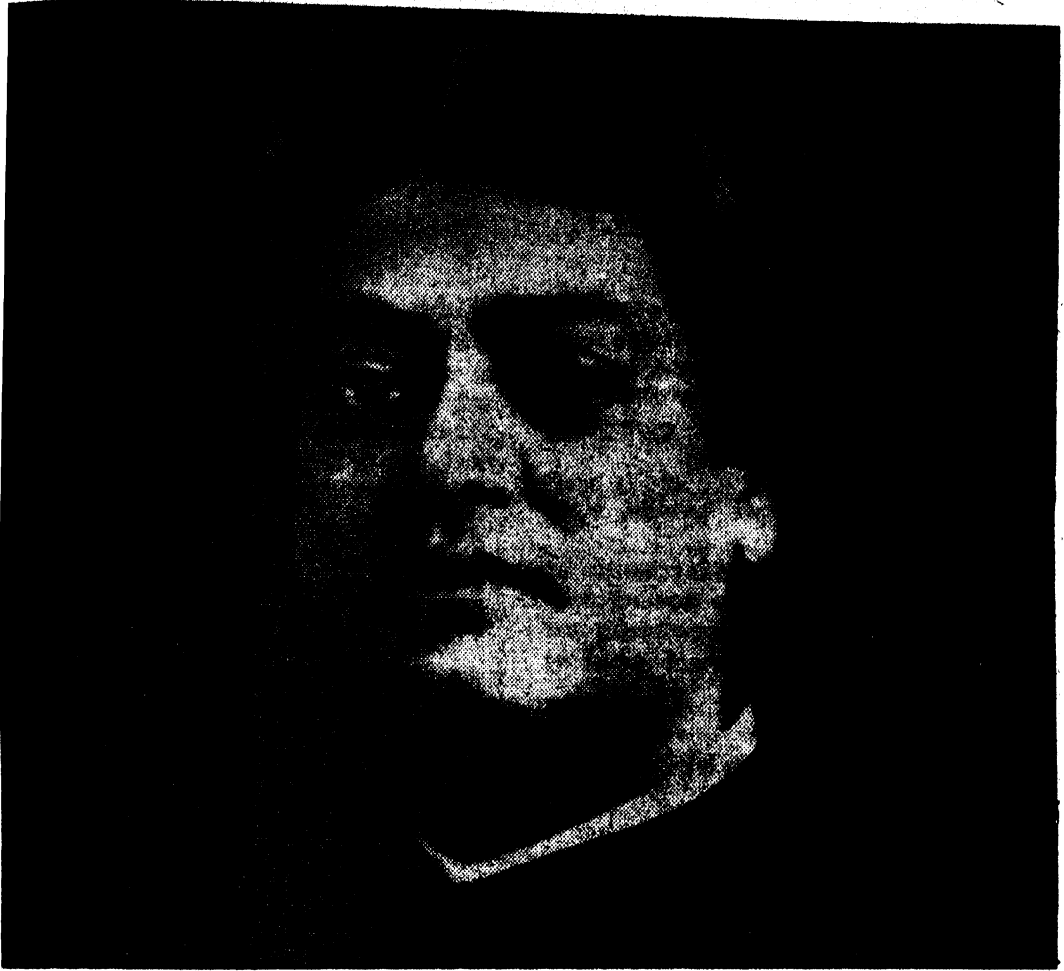
এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম---নিউ ইয়র্ক হয়ে এসেছে। কদিন আগে তোমাকে মিসেস ফাঙ্কের ঠিকানায় চিঠি লিখেছি, কারণ আমার নোটবুকে তোমার যে ঠিকানাগুলি আছে তার কোনটা যথার্থ না বুঝতে পেরে। একে মেন্টাল টেলিপ্যাথি বলবে, না, বোকামি? তুমি নিশ্চয় এতদিনে আমার চিঠি পেয়ে [illegible]। নিজের সম্বন্ধে জানাবার বিশেষ কোন [illegible] চলছে, খোরাঘুরির কাজ [illegible]

নগণ্য! আমি এপ্রিলে এখান থেকে বেরিয়ে দিনকয়েকের জন্য শিকাগো হয়ে ডেট্রয়েটে যাবো। তারপর নিউ ইয়র্ক হয়ে ইংল্যান্ড। আশাকরি তুমি ভাল আছ। আমি মানসিক দিক দিয়ে খুব স্থির ও শান্তিতে আছি। আশাকরছি জীবনের বাকী দিনগুলি এইভাবেই কাটিয়ে যেতে পারব।

মিসেস ফাঙ্কে এবং অন্যান্য বন্ধুরা কেমন আছেন?

অনেক ভালবাসাসহ
বিবেকানন্দ

(২৯)

১৭১৯ টাক্ স্ট্রীট। সানফ্রানসিসকো
২৫শে মার্চ। ১৯০০

[illegible] ক্রিশ্চিনা,

তুমি অসুস্থ জেনে দুঃখিত হলাম। তুমি সর্বদা বেশ

উদ্দেশ্যে। আর আমি যে সর্ব্বদা অসুস্থ থেকেছি এখন বেশ ভাল আছি এবং বেশ সবল হয়ে উঠছি। আমার একটা অনুভূতি হচ্ছে যে মুক্তি অদূরে, এবং গত দুবছর ধরে যে যন্ত্রণাভোগ করেছি সেটা নানাভাবে বেশ শিক্ষা মূলক। রোগ, দুর্ভোগ যা' আমাদের জীবনে আসে তার ফল ভবিষ্যতে ভালো হয় (যদিও দুর্ভোগের সময় আমাদের মনে হয় চিরতরে বুঝি ডুবে গেলাম।

"I am the infinite blue sky, the clouds may gather over me — but I am the same, same infinite blue".

এই ধরণের শান্তিকে আস্বাদন করতে চেষ্টা করছি,—জানি এই প্রকৃতি আমার মধ্যে এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে! এই সব টিনের খেলনার মত শরীর আর সুখদুঃখ সম্বন্ধে কাল্পনিক ধারণা বা স্বপ্ন, কী সেগুলি? আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওম্ তৎ সৎ।

ভালবাসাসহ
বিবেকানন্দ।

পুঃ—এপ্রিলে আমি ডেট্রয়েট যাচ্ছি। নিউ ইয়র্ক হয়ে তবে প্যারিসে যাবো। ভি।

এইটাই এখন আমার ঠিকানা।
ভি।

(৩০)

১০ই এপ্রিল ১৯০০
১৭১৯ টাক স্ট্রীট। সানফ্রানসিস্কো।

হ্যালো,—তোমার হ'ল কী? ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি? কতদিন যে তোমার কোন খবর পাইনি। আমি প্রতিদিনই ভালো বোধ করছি। যে কোন দিন,—এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একদিন সোজা গিয়ে উপস্থিত হব, বলব "হাউ ডু ইউ ডু?" এখানে সপ্তাহ দুই আরও আছি। তারপর স্টকটন বলে একটা জায়গায়,—যেখান থেকে পূর্ব্বাভিমুখে; শিকাগোতে দিনকয়েক থাকতেও পারি, বা নাও পারি। মে মাসের শুরুতে নিশ্চয় ডেট্রয়েটে উপস্থিত হব।

তোমাকে আবার চিঠি লিখে জানাবো। তোমার দিন কেমন কাটছে, —সেই জাতার কলে পিষছ? না কিছু উন্নতি? বেশ গল্পগুজব, খবরভরা চিঠি লিখো, যদি ইচ্ছে করো। খবর পাবার জন্য মরে যাচ্ছি।—

এভার ইয়োরস ইন দি ট্রুথ
বিবেকানন্দ!

(৩১)

১৯শে মে ১৯০০
C/o. Dr. Logan
৭৭০ ওক্ স্ট্রীট। সানফ্রানসিস্কো।
ক্যালিফোর্ণিয়া।

প্রিয় ক্রিশ্চিনা

কেমন আছ? তোমার স্কুলের ছুটি কবে শুরু হবে? আমি এখনও ক্যালিফোর্ণিয়াতে আছি। আর ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব্বের পথে পাড়ি দেবার ইচ্ছে।

তোমার সব খবর আমাকে জানাবে। কাজ কর্ম্ম কেমন চলছে,—সব। মিসেস ফাঙ্কে এবং অন্যান্য বন্ধুরা সব কেমন আছেন?

ইয়োরস এ্যাজ এভার
বিবেকানন্দ।

(৩২)

বেদান্ত সোসাইটী। ১০২,৫৭তম রাস্তা
নিউইয়র্ক। ১০ই জুন। ১৯০০

প্রিয় ক্রিশ্চিনা,—ক্যালিফোর্ণিয়াতে থাকাকালীন শেষের কয়েক সপ্তাহ তোমাকে বেশী কিছু লিখতে পারিনি; কারণ আবারও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এই অসুখে একটা উপকার হয়েছে যে বুঝতে পেরেছি যে রোগ আমার কিছুই নয়—কেবল দুশ্চিন্তা আর ভয়। যে কোন সুস্থ লোকের মতই আমার কিডনী। ব্রাইট ডিজিজের (কিডনীর রোগ) যা' কিছু লক্ষণ আমার দেখা দেয় তা' সব নার্ভের ব্যাপার। আমি তোমাকে ১৭১৯ টাক্ স্ট্রীট থেকে (সানফ্রানসিস্কো) যে চিঠি লিখেছিলুম তার উত্তর পাইনি। অবশ্য সে সময় আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলাম এবং আমি যে ঘরে ছিলাম ঠিকানার খাতা সেখানে ছিল না। নম্বরের কিছু গোলমাল নিশ্চয় ছিল। নচেৎ তুমি ইচ্ছে করে উত্তর দেবে না এ আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। দেখতেই পাচ্ছ আমি নিউ ইয়র্কে আছে। এখানেই এখন থাকব কদিন। ওহিও ক্লিভল্যান্ডের মিসেস (মিস?) ওয়ালটনের কাছ থেকে একটা নিমন্ত্রণ পেয়েছি। গ্রহণও করেছি। উনি লিখেছেন তোমাকেও নাকি নিমন্ত্রণ করেছেন এবং তুমিও গ্রহণ করেছ। তাহলে ক্লিভল্যান্ডে দেখা হচ্ছে! ইউরোপে যাবার আগে তোমার সংগে একবার দেখা নিশ্চয় করব। ওখানে অথবা অন্য কোথাও যা' তোমার ইচ্ছে। যদি মনে করো কোনো কারণে তোমার ওহিওতে যাওয়া সম্ভব নয় তাহলে তুমি যেখানে বলবে সেখানে গিয়ে তোমার সংগে দেখা করে বিদায় গ্রহণ করব (To say good buy). তোমার স্কুল কবে বন্ধ হচ্ছে? তোমার সমস্ত পরিকল্পনা আমাকে লিখবে—নিশ্চয় লিখবে! মিস নোবল্ চায় আমি যেন অবশ্যই ক্লিভল্যান্ডে যাই। আমি সপ্তাহ কয়েকের নিরিবিলি জীবন খুবই চাই বিশ্রামের জন্য বিশেষ করে সেই সব বন্ধুদের মধ্যে যা'রা আমাকে কখনও বিরক্ত করে না! আমি জানি এভাবে আমি খুবই বিশ্রাম ও শান্তি পাবো, এবং তোমার কাছ থেকে সর্ব্বোতঃভাবে সাহায্য পাবো। বরং ক্লিভল্যান্ডে বেশ কিছু বন্ধু সমাগম হয়ে এবং সেজন্য কথাবার্ত্তায় হবে বেশী। অতএব তুমি যদি মনে করো অন্যত্র আমি যথার্থ বিশ্রাম পাবো, তাহলে আমাকে লিখো সেবিষয়! তোমার চিঠির ওপরে আমার ক্লিভল্যান্ডের ভদ্রমহিলাকে উত্তর দেওয়া নির্ভর করছে।

আমার বড় ইচ্ছে করছে এক্ষুণি যদি ডেট্রয়েট বা এমন কোথাও যেতে পারি যেখানে আমার আন্তরিক, সহৃদয় বন্ধুরা আছেন! এটা একরকমের দুর্বলতা জানি, কিন্তু স্নায়ু যখন ক্লান্ত এবং শরীর অবসন্ন তখন মন চায় তেমন কারো ওপরে নির্ভর করে থাকি! তুমি শুনলে খুশী হবে যে পশ্চিমাঞ্চলে আমি সামান্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি। অতএব নিজের খরচপত্র চালিয়ে নিতে পারব।—শীঘ্র চিঠি লিখো।—

তোমাদের স্নেহবন্ধ বিবেকানন্দ

(৩৩)

বেদান্ত সোসাইটি।
১০২ ই ৫৭তম রাস্তা
নিউইয়র্ক। ১৩ই জুন। ১৯০০

প্রিয় ক্রিশ্চিনা,—

দুশ্চিন্তার কোন হেতু নেই। আগেই লিখেছি আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি। কিডনীর-সম্বন্ধে আগে যে ভয় ছিল সেটাও

খন আর নেই। ভাবনাই আমার একমাত্র রোগ কিন্তু সেটাকেও এখন জয় করে নিচ্ছি তাড়াতাড়ি।

এখানে ২।১ সপ্তাহ থেকে ডেট্রয়েটে যাবো। যদি ঘটনাচক্রে আমি যেতে না পারি, তাহলে নিশ্চয় তোমাকে ডেকে পাঠাবো। আগে আমার সঙ্গে দেখা করে তবে ইউরোপে যাবো। পরিস্থিতি এখন বেশ উজ্জ্বল ও অনুকূল মনে হচ্ছে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মত ভিড় সম্ভারে আসে। এবারে আমি সুনিশ্চিত যে অন্ততঃ কিছুদিনের মত কাজকর্ম নির্ঝঞ্ঝাটে চলবে।

মিসেস ফাঙ্কেকে ভালবাসা

সতত তোমাদের বিবেকানন্দ।

(৩৪)

...? ১৯০০

৫৮ (?) তম রাস্তা। বেদান্ত সোসাইটি।

স্নেহের ক্রিশ্চিনা,—

প্রতিদিনই আরও ভাল বোধ করছি। একমাত্র অসুবিধে নিউ ইয়র্কে মোটেও ঘুম হয় না। আবার কিছু কাজ শুরু করেছি— যদিও বেশী পরিশ্রম করি না। আমার কাজ এখন পুরোনো বন্ধুদের একত্র করে কাজকর্মের একটা ব্যবস্থা করা।

এবারে শোনো, সপ্তাহখানেকের মধ্যে এখানকার কাজ শেষ করে যথার্থ শান্ত জীবনের জন্য ২।১ সপ্তাহ বা তার চেয়ে কিছু বেশীর জন্য প্রস্তুত হ'ব।

হায়, ডেট্রয়েটও নিউইয়র্কের চেয়ে বিশেষ সুবিধের হবে না, কারণ সেখানেও অনেক বন্ধুর ভীড়! কিন্তু কেমন করে তাদের এড়ানো যায় যারা সত্যিই আমাকে ভালবাসে? তোমার কাছে আমি পূর্ণ স্বাধীনতা পাবো, জানি। কিন্তু বন্ধুরা দেখা করতে এলে তাদের এড়াবো কী করে? ক্রমান্বয়ে দর্শকের ভীড় আর অনবরত কথা বলা!

নিউ ইয়র্ক থেকে ৮।১০ ঘন্টার যাত্রা এমন কোন জায়গার খোঁজ জান যেখানে গেলে আমি (রাতের গাড়ীতে যেতে চাই না) একটু নির্জনে থেকে লোকের ভীড় (ঈশ্বর ওদের আশীর্বাদ করুন) এড়াতে পারি? লোকজনের সঙ্গ এখন বড় ক্লান্তিকর মনে হয়। এইসব এবং অন্যান্য দিক একবার ভেবে দেখ। তারপরেও যদি মনে করো ডেট্রয়েটে এলেই আমার পক্ষে ভালো তাহলে আমি যাবার জন্য প্রস্তুত।

সতত তোমাদের বিবেকানন্দ।

(৩৫)

বেদান্ত সোসাইটি। ১০২ ইস্ট ৫৮তম রাস্তা

নিউ ইয়র্ক। ২০ জুন। ১৯০০

প্রিয় ক্রিশ্চিনা,

তোমার অপূর্ব সুন্দর চিঠিখানির উত্তর দিতে দুদিন দেরী করে ফেলেছি। জানো 'মা' ঠিক কোন উপায় করে দেবেন। যতদূর সম্ভব আগামী সপ্তাহে ডেট্রয়েটে যাচ্ছি। যদি কোন কারণে দেরী হয়, চিন্তা কোরো না। তোমাকে না দেখে এদেশ থেকে কখনই যাবো না। এটার খুবই প্রয়োজন।

মনে হচ্ছে 'মা' আবার প্রসন্ন হয়েছেন, চাকাটা ওপর দিকে উঠছে। তুমি কী আমার বন্ধু মিস মুলারের কোন চিঠি পেয়েছ? উনি ভারতবর্ষে আমার পথ পরিত্যাগ করে ইংলন্ডে গিয়ে নাকি আমার দুর্নাম রটাচ্ছিলেন লোকে বলে। আজ সকালে ও'র একটা চিঠি পেলাম এবং জানলাম তিনি আমেরিকাতে আসছেন ও আমার সঙ্গে দেখা হওয়া তাঁর একান্ত আবশ্যক। আমাদের দল পরিত্যাগ করে তিনি আমার মনে প্রচন্ড আঘাত দিয়েছেন। উনি বুদ্ধিমতী এবং অনেক গুণ আছে ও'র; কিন্তু আমার মত মাঝে মাঝে তার নার্ভাস—ফিট হয়। অবশ্য ও'র পক্ষে বার্ধক্য একটা মস্ত সান্ত্বনা এর; আমার পক্ষে তো তা' নয়। উনি চান আমি জুনের শেষে যাই। আমি চাই উনি আরও আগে আসুন। সেই কথা এইমাত্র ও'কে লিখে দিলাম! যদি সম্ভব হয় কোন শান্ত গ্রামে গিয়ে অপেক্ষা করবো, তবে ডেট্রয়েটে যেমন করেই হোক নিশ্চয় যাবো।

অনেক ভালবাসাসহ

বিবেকানন্দ

৫

পূর্ব পরিচ্ছেদে অ্যাকশা বার্লেণ্ট ব্রুষ্টার রচিত ভগিনী ক্রিষ্টিনের উপর স্মৃতিচারণটির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। স্বভাবতঃই অ্যাকশা ব্রুষ্টার সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল পাঠকবর্গের হতে পারে। আল ও অ্যাকশা ব্রুষ্টার উভয়েই ছিলেন চিত্রশিল্পী—আমেরিকান দম্পতি। এঁদের একটি কন্যা নাম ছিল হারউড। কিন্তু বশী সেন মহাশয় তাঁর নাম লেখেছিলেন অ্যাক্স ছুঁ। বোধহয় লম্বা গড়নের ছিলেন বলে। হারউডের সেনমহাশয়কে লেখা কয়েকটি চিঠি দেখেছি। তাতে নামসই করেছেন 'ক্যাম্বর'।

ব্রুষ্টার দম্পতি প্রথম জীবনে ধর্মমতে বৌদ্ধ ছিলেন এবং নিরামিষাশী। পরে বেদান্ত ও রামকৃষ্ণ সংঘের মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে স্বামী শিবানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শেষ বয়সে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত হয়েছিলেন। এঁদের একমাত্র সন্তান হারউডের জীবনটি বড় দুঃখের। সে দুঃখ মর্মান্তিক হয়ে ব্রুষ্টার দম্পতিকে আহত করেছিল। ব্রুষ্টার দম্পতির শেষ জীবনের পরিসমাপ্তিও দুঃখের মধ্যে।

হারউড তাঁর বান্ধবীর মৃত্যুর পর তাঁর স্বামীকে বিয়ে করেছিলেন। বান্ধবীর মৃত্যুটি ছিল বড়ই আকস্মিক। একদিন বান্ধবী তাঁর স্বামী-পুত্রসহ হারউডকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্ত্রীর মৃত্যুর মাত্র কদিন বাদেই বিপত্নীকটি এসে হারউডের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং তাঁর শিশুপুত্রটির দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এ প্রস্তাবে ব্রুষ্টার দম্পতি প্রচন্ড আপত্তির আয়োজন তুলেছিলেন। উক্ত ভদ্রলোক ছিলেন রোমান ক্যাথলিক এবং ব্রুষ্টার দম্পতি বৌদ্ধ মতে নিষ্ঠাবান। বশী সেন মহাশয়কে এরা মধ্যস্থ মানলেন। সেনমহাশয় লাম্বুজীর সপক্ষে মত দিলেন। বিবাহ হল। কিন্তু জীবন সুখের হয়নি। স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হলেন। বিবাহ বিচ্ছেদ হল। হারউড শেষ জীবন কাটালেন একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চে সামান্য কিছু কাজ করে কোন মতে একটুখানি স্থান ও যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদে। ব্রুষ্টারদের মেয়ের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ ছিল না। তাঁরা শেষ জীবনে এক ইংরাজ বন্ধুর পরামর্শে আলমোড়াতে এলেন বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করতে। বন্ধুটি পরামর্শ দিয়েছিলেন আলমোড়ার নৈসর্গিক শোভা চিত্রশিল্পীর পক্ষে হবে সম্পদ। ছবি তাঁরা অনেক

এ'কেছিলেন। কিন্তু লোকালয় থেকে দূরে গ্রামতুল্য দরিদ্র পরিবেশে ছবির বিক্রি ছিল না মোটেও। সাদা কাপড়-জামা পরতেন বলে লোকে এ'দের হোয়াইট বাডস্‌ বলত। ব্রুস্টাররা ধনী ছিলেন না কোন দিনই; আলমোড়াতে এসে রীতিমত আর্থিক সঙ্কটে পড়লেন। তবুও নানারকম অসুবিধে ও অনটনের মধ্যে তাঁরা আলমোড়াতে 'স্নো ভিউ' বাংলোতে থেকে গেলেন। শেষদিকে অ্যাকশা পারনিসাস্‌ অ্যানেমিয়াতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ আর্ল স্ত্রীর সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘদিন এইভাবে চলল। অ্যাকশা প্রায় অচৈতন্য মত হয়ে ছিলেন ক'দিন। তারপর একরাত্রে স্বামীকে বল্লেন 'লেট মি গো' কথাটা তিনি সজ্ঞানে বললেন কিংবা অসুখের ঘোরে বললেন বোঝা গেল না। পরের দিন সকালে দেখা গেল দীর্ঘ দিনের যন্ত্রণার অবসান হয়েছে। অ্যাকশা নিজ-শয্যায় চিরনিদ্রায় মগ্ন! তারিখটা ছিল ১৭ জুন ১৯৪৫ (অথবা ৫০?)। মিরতোলা থেকে ডাঃ হরিদাসকে (পূর্বাশ্রমে ডঃ আলেকজান্ডার লখনো মেডিকেল কলেজের ডাক্তার) ডাকা হল। তিনি এসে ঘোষণা করলেন অ্যাকশা মৃতা।

নিঃসঙ্গ আর্লের মৃত্যু হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সালে। আশী বছর পূর্ণ হতে মাত্র দুদিন বাকী ছিল। থাকবেন না একথা বুঝতে পেরে মৃত্যুর আগে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। যাঁরা উপস্থিত কাছে ছিলেন না তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নিজের গৃহভৃত্য উত্তম সিংকে যা'কিছু দেবার দিলেন, স্নেহভরে তার কাছে বিদায় নিলেন। বশী সেন মহাশয় 'আর্ল ডেকেছে' শুনে গেলেন তাঁর কাছে। শ্রীযুক্তা সেন নিজেই সেদিন অসুস্থ ছিলেন বলে যেতে পারেন নি। সেনমহাশয়কে দেখে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বারবার কৃতজ্ঞতাভরে বললেন 'ও ইউ হ্যাভ কাম'। জানিয়েছিলেন, 'আমার বিছানার নীচে ১০০্‌ আছে।' কিন্তু মৃত্যুর পর সে টাকা দেখা যায় নি। সম্ভবতঃ উত্তম সিংয়ের কীর্তির পরিচয় সেটা!

ভগিনী ক্রিষ্টিনের কলমে আমরা ব্রুস্টার পরিবারে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই।—ব্রুস্টাররা আমেরিকান। গত পনেরো বছর ধরে (এটা তিনি লিখেছিলেন ১৯২৬ সালে) ইউরোপের প্যারিস, সিসিলী, ফ্লোরেন্স, রোম সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের বাড়ীতে সর্বদা প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের—বুদ্ধিজীবী বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের ভীড়—নারী পুরুষ নির্বিশেষে। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পেশাতে চিত্রশিল্পী। শ্রীমতী ব্রুস্টার সুন্দর সঙ্গীতশিল্পীও আর শ্রীযুক্ত ব্রুস্টার পালি ভাষায় পণ্ডিত। বছর ছয়েক আগে সিংহলে গিয়ে ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে ও পালিভাষা শিখেছে। মিসেস ব্রুস্টারের বয়স পঁচিশ আন্দাজ,—একটি সুন্দর সোনালী মেয়ে,—গ্রেসফুল, গ্রেসিয়াস, লাভিং, ইনটেলেকচুয়াল বিইং। আমি বিস্মিত হয়ে ওকে দেখি। ওর মত সুন্দরী আমি কখনও দেখিনি। সর্বদা সাদা পোশাক পরে। দেখলে মনে হয় ঋজু, লম্বা, দোদুল্যমানা একটি শুভ্র লিলিফুল। মিঃ ব্রুস্টারের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ—ডিয়ার অ্যান্ড লাভেবল্‌। বৈষয়িক ব্যাপারে এরকম উদাসীন লোক আমি কখনও দেখিনি। যখন ও'র বয়স মাত্র উনিশ তখন উনি নিউইয়র্কে থিওজফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। উনি ভারতবর্ষে গুরুর সন্ধানে এসেছিলেন। উনি ও'র গত জন্ম থেকে কতকগুলি বিশিষ্টতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। মাঝে মাঝে মনে হয় ও'র বোধহয় কিছু মনেও পড়ে গতজন্মের কথা। আমার বিশ্বাস অচীরেই ও'র সেসব স্মৃতি মনে আসবে। আমি সুনিশ্চিত যে উনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন গতজন্মে। এমনকী এখনও ও'র মধ্যে ঐ ধরনের জীবনের জন্য একটা তীব্র ইচ্ছে দেখা যায়। প্রতিদিন সকালে ভোর পাঁচটায় ওঠেন, এবং ও'র ছোট বুদ্ধ মূর্তির সামনে বসে ধ্যান করেন। মূর্তির পায়ে ফুল নিবেদন করেন ও ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করেন। ও'র মুখখানি তরুণ, কিন্তু মাথার চুল সব সাদা!

...মিঃ ব্রুস্টার ধনগোপাল মুখার্জির মাই ব্রাদার'স ফেস বইখানি পড়েন। তখন উনি কাপ্রিতে ছিলেন এবং ঐ সময় ধন-গোপালকে চিঠি লিখেছিলেন। ধনগোপাল পরে ও'র সঙ্গে দেখা করেন। তখন থেকে ও'দের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মায় এবং সেই বন্ধুত্বের মধ্যে আমরাও (ক্রিস্টিন ও অন্যান্যরা) দাখিল হই।

ক্রিশ্চিনের মৃত্যুর সময় আর্ল ব্রুস্টার বেনারসে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি বশী সেনমহাশয়কে নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখেন—

বেনারস, ৩১শে মার্চ, ১৯৩০

ডিয়ারলি বিলাভেড বশী,

আজ সকালে সিস্টার ক্রিস্টিনের দেহত্যাগের খবর শুনলাম। তাঁর পক্ষে হয়ত এটা ভাল হল। আমাদের প্রিয়, অতিপ্রিয় ভগিনীকে আমরা কী ভালইবাসতুম। নিজেদের রীতিমত ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে যে আমরা ভারতবর্ষে ও'র সঙ্গে মাসকয়েক বসবাস করতে পেরেছিলাম। আমার মনে হয় আমরা যতটা জানি তার চেয়েও বেশী উনি আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন—বিশেষ করে হারউডকে। —বশী ভাই, তোমাকে আমাদের বুকভরা সহানুভূতি ও ভালবাসা জানাচ্ছি। আমরা জানি তোমার শূন্যতার বোধ কতখানি এবং সময়ের ব্যবধান যত বাড়বে তুমি তাঁর অভাব আরও তীব্রভাবে অনুভব করবে।

আমি জানতে চাই এখন তোমার কী প্ল্যান, এবং কেমন আছ? আশা করি তুমি ভেনিস, এডেন এবং বম্বে থেকে আমার চিঠিগুলি পেয়েছিলে। আমার ইচ্ছে যে মাসের প্রথম দিকেই ইউরোপে ফেরবার। খুব আশা করছি যে শিগ্‌গীর তোমার সঙ্গে দেখা হবে এবং তোমার সবকিছু জানতে পারব। তুমি কী গেডেসের ১ সঙ্গে দেখা করবার কথা এখনও ভাবছ? কারণ গেডেস আমাদের থেকে খুব বেশী দূরে নেই।

সব ও আমি ২৫শে মার্চ বম্বে পৌঁছেছি। ২৬শে সন্ধ্যে-বেলা আমরা এলাহাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করি। আমরা ৩০শের আগেই নেহেরুদের সঙ্গে দেখা করি, এবং ৩০শে বেনারসে এসেছি। নেহেরু পরিবারের সকলকেই আমার বড় ভাল লেগেছে। বিশেষ করে জহরলালকে। তার প্রতি আমার একটা ভক্তিভাব এসেছে। আগামীকাল আমরা বেলুড় মঠের উদ্দেশে যাত্রা করছি এবং সেখানে মাসখানেক থাকবার ইচ্ছে।

---

১ স্যর প্যাট্রিক গেডেস সুবিখ্যাত স্যোসিওলজিস্ট।। এডিনবরার টাওয়ার করেছিলেন। দার্জিলিং-এ কোন বুলি মাল আনছে দেখলে তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতেন। উত্তর প্রদেশের গোণ্ডা এবং রাজ-স্থানের বিভিন্ন জায়গায় টাউন প্ল্যান করেছিলেন। বশী সেন মহাশয়কে গেডেস প্রভূতভাবে সাহায্য করেছেন। সেনমহাশয় যখন জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার কাজে মাসিক ২০্‌ বেতনে তাঁকে সাহায্য করছিলেন সেই সময় গেডেস সেনমহাশয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এ'কে সঙ্গে করে বিদেশে নিয়ে যান! সেনমহাশয়কে আদর করে ডাকতেন 'ল্যামি'। মিস ম্যাকলিয়ড এ'কে খুব শ্রদ্ধা করতেন, যদিও এঁর অসংখ্য 'ছিটের' কাহিনী এ'দের কৌতুক বর্ধন করত। ইনি দার্জিলিং-এ রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন 'প্যাশনে' চশমায় জুতোর ফিতে লাগিয়ে। এ'র সাদা স্যুটে কালো দাগ লেগে গেলে চট করে একটু সাদা 'চক' ঘষে নিতেন স্যুটের ওপরে। ইনি ইংরাজদের রেললাইন ব্যবস্থা পছন্দ করেন নি।

এই মঠে আমার গভীর শান্তির উপলব্ধি হয়। যে অভিজ্ঞতা ...র আগেও হয়েছিল। এবারেও সেই উপলব্ধিটুকু করতে চাই—... মুহূর্তকালের জন্যও হয়। গতবার ভগিনী ক্রিস্টিন এখানে ...স যে ঘরটিতে ছিলেন সেই ঘরে এবারে আমি আছি। এত ...ীরভাবে তাঁর উপস্থিতিকে আমি এখানে অনুভব করছি যে ...নই হচ্ছে না বুদ্ধগয়া স্টেশনের সেই রাত্রির পর আর তাঁকে ...মি দেখিনি।

কলকাতা ৩রা এপ্রিল

কাল এখানে পৌঁছেছি। চিঠিটা ইচ্ছে করেই পাঠাতে দেরী ...রছি। ভাবছিলুম বেনারসে থাকতে তাঁর সম্বন্ধে যে খবরটি ...নেছিলুম হয়ত সত্য নয়। কিন্তু হায়! কাল রাতে যখন আমাদের ...ড়ী গয়া স্টেশনে পৌঁছল আমি যেন স্পষ্ট তাঁকে স্মৃতির চোখে ...খলুম ঠিক সেই শেষবার সন্ধ্যেবেলা যেমন গয়া স্টেশনের ...্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। নিশ্চয় ...মারও মনে পড়ছে সেকথা।

আমার মনে হচ্ছে এই সময় যদি আমি তোমার কাছে ...কতে পারতাম হয়ত তোমাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারতাম। ...মি ইউরোপে যাবার চেষ্টা করছি। হয়ত মে মাসের প্রথমদিকে ...মি ফ্রান্সে থাকব। সম্ভবতঃ আমাদের Chatean Burn 'এর ...ড়ীটি ছাড়তে হবে। কারণ আমাদের ভাড়া দেওয়া আছে ৩০শে ... পর্যন্ত। হারউডকে দেখবার জন্য আমি খুব উৎসুক হয়ে আছি। ...এখন মাসখানেকের ছুটিতে আকশার কাছে এসেছে। মে মাসের ...য়লা নাগাদ স্কুলে ফিরে যাবে।

স্নেহের বশীভাই, মনে মনে আমি তোমার গলা জড়িয়ে ...রছি আর ভালবাসা জানাচ্ছি আগের চেয়েও বেশী।

আর্ল

...গিনী ক্রিস্টিনের মৃত্যুর সময় শ্রীমতী আকশা বুস্টার ফ্রান্সে ...ছিলেন। ক্রিস্টিনের মৃত্যুসংবাদ জেনে তিনি নিম্নলিখিত পত্রটি ...শী সেনমহাশয়কে লিখেছিলেন ঃ—

Chateam Burn,
St. Cyr-sur, France.
April 4, 1930

ডিয়ার বিলাভেড বশী,

আমাদের সতত চিন্তা ও ভালবাসা তোমাকে জানাচ্ছি। আগের চেয়েও বেশী এখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু প্রিয় সিস্টার ক্রিস্টিন যাঁর সঙ্গে দেখা হবে বলে আগ্রহ করে বসেছিলাম তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না বড়ই দুঃখের কথা, তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পেয়ে আমরা রীতিমত সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলাম আর সেই সৌভাগ্য আমাদের উপর চিরকাল প্রভাব বিস্তার করবে আর কী সৌভাগ্যবান ধন্য তুমি নিজে।....... তুমি কী যত্নের সঙ্গে তাঁর সেবা করতে আর তিনিও তোমার প্রতি কী যত্নশীলা ছিলেন। যখনই তাঁর এবং তোমার কথা ভাবি তখনই মনে সুন্দর সুন্দর স্মৃতি এবং নতুন উদ্দীপনা জেগে ওঠে। ...শিগগির তোমাকে আমাদের কাছে পাবো বলে আশা করি........ হারউড ছুটিতে বাড়ী এসেছে, চেহারাটা বেশ ভাল দেখাচ্ছে। আর্ল মে মাসের প্রথমেই ফিরে আসছে। হয়ত কদিন আগেও হতে পারে।

তোমাকে আমার গভীর এবং আন্তরিক ভালবাসা ও সহানুভূতি জানাচ্ছি। তুমি জানো সেই খাঁটি পবিত্র মানুষ সিস্টার ক্রিস্টিনকে আমরা কী ভাল না বাসতাম,—আর তোমাকেও।

তোমার অনুগত
আকশা।

যেমন ছাপা হওয়া উচিত ছিল

৬ ফাল্গুন (১৮ ফেব্রুয়ারী) সংখ্যায়ঃ—

তথ্যের ভুল;—বশী সেনকে আমেরিকা নিয়ে যান স্লেন ওভারটন— (প্যাট্রিক গেডেস নয়)।

ছাপার ভুল;—প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম অভীশ্বর সেন (বীরেশ্বর নয়) তাজমহল কবিতাটির ষষ্ঠ পংক্তির পর সপ্তম পংক্তিটি বাদ পড়ে গিয়েছে। যথাঃ— Beneath the Himalaya's steep (তারপর অষ্টম পংক্তি

Above the........

শেষ পংক্তির ওপরের পংক্তির শেষ শব্দ আণ্ডার স্টোন (আণ্ডারস্ট্যাণ্ড নয়)

দ্বিতীয় কবিতার unquered বানান (দটি 'আর' নয়) সপ্তম পংক্তি ব্যাটেল (বটল নয়) দ্বাদশ পংক্তি... Sounding toungue হবে।

চতুর্দশ পংক্তি নাথিং ইজ লেফট্ হবে।

৪ মার্চ (২০ ফাল্গুন) সংখ্যায়ঃ—

স্বামী শিবানন্দর শোকলিপির কেবলগ্রাম কলকাতা থেকে (ক্যানাডা নয়)

ট্যান্টিনের চিঠির শেষে ব্লেসিঙস্ হবে।

১১ মার্চ (২৭ ফাল্গুন) সংখ্যায়ঃ—

স্বামীজীর রিজলিম্যানর থেকে ক্রিস্টিনকে লেখা কবিতার পংক্তি,— Hold yet a while ...... Weal and Woe (Wheel নয়) হবে।

৩৮ পৃষ্ঠায় মায়াবতীতে চারজন মহিলার ছবি যথাক্রমেঃ— নিবেদিতা, মাদার সেভিয়র, অবলা বসু, পেছনে ক্রিস্টিন।

২৮ পৃষ্ঠার শেষদিকে 'কুন্জিডাপিণ্ড' (তাপিত নয়)।

'সাদা থামে লেখা আছে 'দি পাইনস্' হবে। (পিনস্ নয়)।

'নচেৎ কাঠগোদাম থেকে ভাওয়ালীর দূরত্ব অনেক 'কম'। কম শব্দটি ছাপা হয়নি।

১৮ মার্চ (৪ চৈত্র);—৪১ পৃষ্ঠায় 'অ্যান এ্যারাইজিং থিং ইজ এ সিজিং (ceasing) থিং' হবে (চিজিং নয়)।

৪৩ পৃষ্ঠায় 'মাঝ দিয়ে প্রশস্ত (প্রস্তুত নয়) পার্ক রোড।'

৪৪ পৃষ্ঠার শেষদিকে

"Blessings on the beloved little head.
Thou art the ......"

এছাড়া ছোটখাটো মুদ্রণ প্রমাদ যথা:—অ্যাকস-কে বাংলায় 'আসা' বা 'চাপামত'কে চালামত ইত্যাদি বহুল পরিমাণে আছে।

২৫ মার্চ (১১ চৈত্র) সংখ্যায়—৪৬ পৃষ্ঠায় 'তারপর সারদাদেবী' (তার সারদাদেবী নয়)

ক্রিস্টিনের চিঠি ৪৭ পৃষ্ঠায় ভেরমণ্ট, ১৬ জুলাই—'বশীসেনকে চুমো'—উল্লেখ করা হয়নি।

পার্সেপোলিসের পথে

সবিতা ঘোষ

আজ আর কিছু দেখা সম্ভব নয়। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গা ঢেলে দিয়ে ঘুম। শুয়েই মনে হল কাল যদি এই বাগানে, সিরাজের যেখানে হোক একটি বুলবুলি পাখি দেখতে পাই জীবন সার্থক হয়। আমাদের যাদবপুরে কতো বুলবুলি: আমাদের বাগানে আসে, শীস দেয়। জোড়া বুলবুলি: মাথায় ঝুঁটি। সেই বুলবুল 'বাগিচায় বুলবুলি তুই।'—এ সব দেশেরই গান তো। আশ্চর্য তেহরাণএ পর্যন্ত বুলবুল পাখি দেখিনি। কাল যেন এক-জোড়া না হোক, গানও না শোনাক, শুধু একটি বুলবুলিকে অন্ততঃ একবারও চোখে দেখতে পাই—এই ইচ্ছে নিয়ে চোখ বুঁজলাম। কখন যে মন সামান্য কি জিনিস একাগ্রভাবে চায়!

যাক আঠারই কেটে উনিশে জুলাই সকাল। বৃহস্পতিবার। স্নান সেরে ডাইনিং রুমে—বাঃ, চমৎকার ঘরটি তো। বাইরে সাজানো বাগান উইলো গাছ। ফোয়ারা সুইমিং পুল। মরশুমি ফুল অনেক। থোকা থোকা ফুলে ভরা করবী গাছ দেশ থেকে সদ্য এসে যেন দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের অভ্যর্থনা করতে। কিন্তু গোলাপ—গোলাপ কই? মনকে তৈরী করে ফেললাম—সিরাজের বিখ্যাত সব বাগানে বসরাই গোলাপের দর্শন মিলবে না। আমরা দেরীতে এসেছি তো। গোলাপের পালা শেষ। ড্রপ সীন পড়ে গেছে। ভালমত ব্রেকফাস্ট খেয়ে রেজার রথে।

মালপত্র গুটিয়ে নিয়ে হোটেল ছেড়ে দিয়েই বেরোনো হল। সবচেয়ে কাছে পড়ল কবি সাদির কবর, তথা বাগান। আমি মুখ্যু কি? কবি সাদির নাম আগে শুনে-ছিলাম? মনে তো পড়ছে না। হাফেজ, ফেরদৌসী, ওমর খৈয়ম—পারস্যের কবি হিসেবে এদের পরিচয় জানি। সাদির লেখা বিখ্যাত কাব্য 'গোলেস্তান'—গোলাপ বাগান অনেক ভাষায় নাকি এর তর্জমা আছে। যে বাগানের মধ্যে তিনি থাকতেন সেখানেই বর্তমানে তাঁর কবর। কবরের ওপরের সুদৃশ্য হাল্কা সবুজ গোল ছাদটি উঁচু উঁচু থামের ওপর দাঁড় করানো। বাগানে একটি স্বচ্ছ জলের প্রাকৃতিক উৎস আছে।

আমাদের গাড়ি বাগানের সামনে দাঁড় করানো মাত্র এক পাল ছোট ছেলে, আট দশ বছরের হবে, ময়লা ন্যাকড়া হাতে ছুটে এল। ঠিক যেন কলকাতা। এরা গাড়ির কাঁচ মোছার নামে আরো নোংরা করে দেবার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। দু, পাঁচ রিয়াল উপায়ের চেষ্টা। বোঝা যায় এসব দেশেও অভাবি লোকের অভাব নেই। দশ রিয়ালে এক তোমান হয়। এক তোমান আমাদের প্রায় এক টাকা পঁচিশ পয়সা। বেকারের সংখ্যাও মনে হয় বেশ আছে। সবাইকে দুরিয়াল করে দিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

সাদির কবর দেখেই হাফেজের কবর দেখতে গেলাম। হাফেজের কোন কোন কবিতার দু-চার লাইন বাংলা তর্জমা এখানে ওখানে কোন কোন লেখকের বইয়ে উদ্ধৃত হিসেবে পড়েছি। এখন কিছুই মনে পড়ছে না। সত্যি আমার পড়াশোনা বড্ড কম। ছায়াঘন ঠান্ডা ঠান্ডা বাগানের মধ্যে হাফেজের কবরটি ভারি ভাল লাগল। এই কবরের আচ্ছাদনটিও স্থাপত্যের দিক থেকে চমৎকার। চতুর্দিক থেকে সিঁড়ি
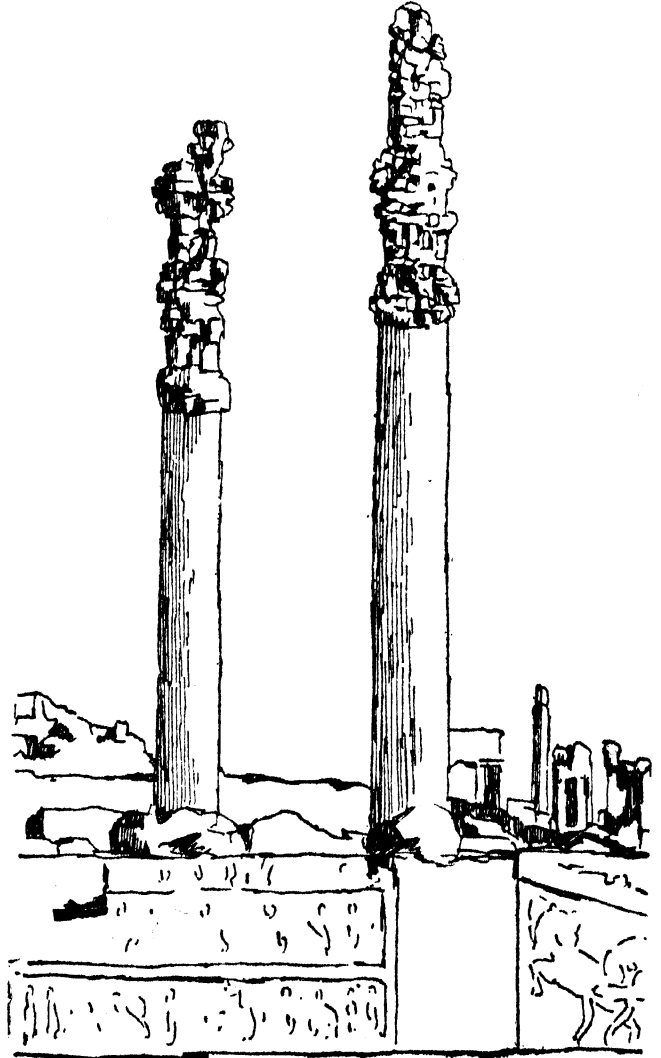
ঁার কবরটি মাঝখানে। হাফেজের র পংক্তি উর্দুতে খোদাই করা কবরের গায়ে। তার তর্জমা না পড়তে পারা গেল না। আমরা ঠিক কান ট্যুরিস্ট সেজেছি। মন শান্ত স্থির হয়ে দু' দন্ড দাঁড়িয়ে কিছু কি, সময় নেই তো। আরো অনেক এই একবেলার মধ্যেই দেখে নিতে য। অতএব এই কবির কবরের স্মৃতি াখার জন্যে টুটু একটা ফটো তুলে তার পরই ওঠ, ওঠ গাড়িতে ওঠ। ঠেই মনে হল, আহা রে যদি পারস্যের ওমর খৈয়ামের কবর দেখতে পেতাম। র মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র স্থান মাসাদের নৈশাবুর বলে জায়গায় ওমর র কবর আছে। ওমর আমাদের চেনা আদরের কবি। তাঁর লেখা রুবাইয়াৎ- ইরাজি, বাংলা তর্জমা পাঠ্য জীবনে আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। বাংলায় দেব আর কান্তি ঘোষের লেখা। র বাঁধানো বই, পূর্ণচন্দ্রের আঁকা ' ছবি সব বুকে নিয়ে। কিন্তু রে কি আর আমাদের কোনকালে হবে ? *

থাক, এবার কি দেখা ? উনি ন—শোন, দ্রষ্টব্য অনেক মসজিদ, বাগান রয়েছে। আমরা দুটো বাগান দুটো মসজিদ দেখি এর বেশী সম্ভব না। ইস্পাহানে সবই মোটামুটি শ শতাব্দীর স্থাপত্য দেখে এলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেন্দ রাজবংশের খান জেন্দ এর সময় সিরাজকে আবার রাজধানী করা হয় তখন আবার নতুন তার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্যে অনেক , অট্টালিকা তৈরী হয়।

সিরাজ আধুনিকতায় যাতে পেছিয়ে কে তাই বর্তমান শাহান শাহ জর ঐতিহাসিক মূল্য বজায় রেখেও আধুনিক শহর হিসেবেও অগ্রগণ্য জন্যে তাঁর বাবা রেজা শাহ দি গ্রেট- মত এখানে অনেক কিছু প্রতিষ্ঠা ছেন। প্রসিদ্ধ পহলভি বিদ্যালয়, তি হাসপাতাল, নার্সদের ট্রেনিং জ, বয়ন শিল্পের ও সিমেন্টের কারখানা দি অনেক কিছু গড়ে উঠেছে।

এখানকার বাজারের নাম ভকীল । ভকীল বাজারে ঘুরে কিছু সময় নাম। ঐ একই ধরনের বাজার। এই ল অট্টালিকা—অট্টালিকাই বলি যাতে ন আশিতে, আঠারো শতাব্দীর স্থাপত্য লের এক আশ্চর্য নমুনা। এখানকার ন কার্পেট বিখ্যাত। হাতেমকারি টি অর্থাৎ কাঠের মধ্যে গর্ত করে ন রং-এর কাঠের টুকরো বসিয়ে ন নক্সা করা খুব বিখ্যাত। এছাড়া র কাজ, নানা রকম ধাতুর কাজ, পাথরের গহনা তৈরী এ-সবও শংসাযোগ্য। নানা দেশের কাজ দেখি আর আমাদের উড়িষ্যার রূপোর জালি কাজের, মহিশূরের চন্দন কাঠের, হাতীর দাঁতের কাজের তুলনা কোথায় ? অবশ্য সূক্ষ্মতম কাঠের খোদাই কাজ চীন দেশেরই পৃথিবীশ্রেষ্ঠ। এখানকার বাজার থেকেও কি আর খালি হাতে বেরোনো হল ? এর ওর তার জন্যে টুকিটাকি কত কিই কেনা হল: এবার মসজিদ-এ-ভকীল দেখতে চললাম।

এটিও ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্যের সাক্ষ্য। খিলানগুলি আর তার সামনের দেয়ালে মোজেইকের নক্সা ও তার মধ্যে মধ্যে কোরাণের উদ্ধৃতি নক্শার মত করেই মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। দেখতে খুব সুন্দর। প্রধান প্রার্থনা কক্ষটিতে আট-চল্লিশটি পাথরের একই রকম দেখতে থাম আছে। লালচে রং-এর পাথর। বিশেষ কোন কারুকার্য সেগুলিতে নেই। শুধু থামগুলির গায়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে খোদাই করা রেখা রেখা করা আছে। প্রত্যেকটি থাম হুবহু এক রকম দেখতে। আর প্রত্যেকটিই নাকি এক একটি অখন্ড পাথরের তৈরী। এরও ফটো তোলা ও ছবি কেনা হল।

বাগ-এ-ইরাম ও বাগ-এ-খলিলি—দুটি বাগান দেখলাম। ইরামে উঁচু জমিতে ধাপে ধাপে বাগান। অজস্র ফুল। এখানে ওখানে কিছু গোলাপের ঝাড়ে থোকা থোকা গোলাপ এখনো আছে। ঝরে নি, কিন্তু শুকোবার দিকে। তাজা ফুলের সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে। পাপড়িগুলি বিবর্ণ। বাগানের ভেতর কাজার আমলের স্থাপত্য নমুনা—বেশ বড় দোতলা রাজপ্রাসাদ রয়েছে। কমলালেবুর বাগান। ফুল ফুটলে সারা বাগান সুগন্ধে ভরে যায়। ফটক দিয়ে ঢুকেই প্রশস্ত রাস্তার দু ধারে বিশাল উঁচু ঝাউ-এর সারি। বাগানের বাইরেই পাহাড়ের পটভূমি। রেজা সমেত একটি গ্রুপ ফটো হল।

বাগ-এ-খলিলির দরজায় যখন হাজির হলাম তখনু বাগান বন্ধ হবার সময়। আমরা বিদেশী দেখে এক ভদ্রলোক এসে ছোট্ট দরজা চাবি দিয়ে খুলে আমাদের ঢুকতে দিলেন একটুক্ষণের জন্যে। আসল দরজায় তালা পড়ে গেছে। এটা মনে হল কোন সৌখীন লোকের ব্যক্তিগত বাগান। কিন্তু, ট্যুরিস্টদের দেখতে দেবার ব্যবস্থা আছে। ঝোপঝাড় সমন্বিত, বহু রকমের গাছ জোগাড় করে খুব যত্নে তৈরী। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত লতা, সুন্দর ফুল রয়েছে। চেনা, অচেনা দুই-ই। কয়েকটি লতানে গোলাপকুঞ্জে দেখলাম, তাতে থোকা থোকা শুকনো গোলাপ। পাপড়ি একেবারে খস্‌খসে কাগজের মত হয়ে গেছে। অনেক ঝরে গিয়েও, গাছে তার চেয়েও বেশী রয়েছে। লাখে লাখে অমন মৃত, শুকনো গোলাপ দেখে মন আপসোসে ভরে গেল। মস্ত বাগান। সবটা ঘুরে দেখা হল না।

এবার আমাদের শেষ দ্রষ্টব্য—শাহ্‌-এ-চেরাগ। সিরাজের সবচেয়ে পবিত্র স্থান। এটি কোন মসজিদ নয়। এটি অষ্টম ইমাম, ইমাম রেজার দাদার কবর। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা প্রকান্ড এলাকা। তার ভেতর মসজিদও আছে। সেটা তত কিছু নয়। কবরের কাছেই প্রচন্ড ভীড়। যে প্রশস্ত সৌধটির মধ্যে কবর, সেটাই একটা দ্রষ্টব্য-বস্তু। প্রথমতঃ এক জায়গায় জুতো রেখে টোকেন নিতে হল। ছেলেরা যে পোশাকে খুশি ঢুকতে পারে। আমাকে টুটুকে চাদর মুড়ি দিয়ে ঢুকতে হল। শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়েও ছাড়পত্র মিলল না। মেম-সাহেব ট্যুরিস্টরাও দেখলাম চাদর ভাড়া করল। মুখটুকু খোলা রেখে মাটিতে লুটোনো চাদর মুড়ি দিয়ে ঢুকতে যাব, কর্তা বললেন দুজনে দাঁড়াও একটা ছবি হয়ে যাক এই পোশাকে।

সৌধটির মস্তবড় হল ঘরটি আয়নার টুকরো বসিয়ে বসিয়ে অপরূপ মোজেইক করা। শিস্ মহলের মত এই আয়নার টুকরোয় মোড়া ঘরের দেয়াল মুসলমান স্থাপত্যে অতি প্রিয়। মনে পড়ে গেল ইস্পাহানের শাহ আব্বাস হোটেলের করিডর এমনিভাবে তৈরী করেছে। হলঘরের দরজার কপাট রূপোর কারুকার্যমন্ডিত। সবাই ঢুকছে অনেক মহিলা বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এই কপাটে হাত বুলোচ্ছে। জড়িয়ে ধরছে। কড়া, ছিটকিনিতে ব্যাকুল হয়ে চুমো খাচ্ছে। হলের ঠিক মাঝখানে কবরটি। তাকে ঘিরে জালের কাজ করা আবার একটি ছোট ঘর। প্রকান্ড বড় রূপোর তালা ঝুলছে। লোকে ভীড় করে কবরের সেই ছোট ঘরটির তালাটাকে স্পর্শ করার জন্যে অধীর হয়ে উঠছে। কি ব্যাকুলতা নিয়ে সেই তালায় চুমো খাচ্ছে আর প্রার্থনা জানাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে যে যা পারছে দক্ষিণা দিচ্ছে। সেই জালের ফাঁক দিয়ে ভেতরে নোট ফেলে দিচ্ছে। টুটুকে আমাকে অতি কষ্টে সেই ছোট ঘরটির কাছে এগোলাম। ভেতরটা দেখার জন্য। এক মুহূর্তে জালের ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম, মার্বেল পাথরের কবরটি মুদ্রা ও নোটে ভেতর প্রায় ভরপুর হয়ে গেছে। চারদিকের মেঝে তো দেখাই যাচ্ছে না, হাঁটু সমান নোট, শুধু কাগজের নোট। দশ, বিশ, হাজার তোমানের নোটের পাহাড়। জালের দেয়াল লোকে পাগলের মত হাত বোলাচ্ছে। অনেক লোক বেশীর ভাগই পুরুষ মানুষ—তারা হলে লাইন করে হাঁটু গেড়ে বসে নিবিষ্ট চিত্তে প্রার্থনা করছে। অন্ধ বিশ্বাসে দেখছি কোন ধর্মই কম যায় না। মুসলমান-দের এমনি তালা ছুঁয়ে, দরজা ছুঁয়ে, চুমো খেয়ে প্রার্থনা বা মানত করা আমার ধারণায় ছিল না। আগ্রা, দিল্লীতে ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য হিসেবে মসজিদ দেখা ছাড়া মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে জানিনা কিছু। এই রকম ধর্মস্থানে এই প্রথম আসা। আমি মাত্র মাস কয়েক আগে দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থান তিরুপতি মন্দির দেখে এসেছি। এর সঙ্গে তার কোন তফাৎ নেই। মুসলমানরা মূর্তি পূজা করে না, কিন্তু এই তালাটি বা দরজার কপাটটি তো মূর্তিরই প্রতীক। যে আবেগ উচ্ছ্বাস এগুলির প্রতি দেখাচ্ছে লোকে তা মূর্তি পূজারই নামান্তর।

---

* পরে অবশ্য সে সুযোগও জুটেছিল।

সত্যি মানুষ কি অসহায়। বুদ্ধিবলে প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা মুনিঋষির মত করেই ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদের চেষ্টায় যুগ যুগ ধরে রত হয়ে আছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাণ সৃষ্টির পর্যন্ত চেষ্টা চলছে। কিন্তু অগণিত সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে সে কতো অসহায়। দৈব বা ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। জীবনের যে কোন রকম বাধা বিপত্তির সঙ্গে লোকে বুদ্ধিবলে শক্তিবলে লড়ে যায়। হার, জিত কিন্তু এখনো ভাগ্যের হাতে। লড়াই চালাবার সময়ও তাই মানুষের আত্মবিশ্বাসের অভাব। অদৃশ্য কেউ তার স্বপক্ষে আছেই ধরে নিয়ে তার কাছে তাই সহায়তা প্রার্থনারও অন্ত নেই। জিতলে তাঁর কৃপা অনুভব করে। হেরে গেলে মনকে সান্ত্বনা দেয় কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে আল্লা বা ঈশ্বরের ইচ্ছে অন্যরূপ। এ তো কোন যুক্তি নয়! এ অন্ধ বিশ্বাস বৈ কিছু নয়। তখন আবার সেই অদৃশ্য দেবতার কাছেই প্রার্থনা—প্রভু এ দুঃখ, ব্যথা সইবার শক্তি দাও। মানুষ কি ছেলেমানুষ। এতোটা ঘুরিয়ে ভাবতে পারে। তবু সোজাভাবে ভাবতে পারে না—লড়ে যাও। তবে 'ভাল মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।'

এতো সূক্ষ্মতত্ত্ব আমি বুঝি না। আমি বুঝি মানুষের পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাকে আমরা ব্যক্তিগত ভালমন্দ বলি এই ব্রহ্মাণ্ডের তাতে কিছুমাত্র যায় আসে না। মানুষ তার ক্ষুদ্র শক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি যেখান থেকেই পেয়ে থাক, এই নিয়ে সে একাই পৃথিবীতে এসেছে একাই তাকে লড়তে হবে। ব্যক্তিগত ভাল-মন্দর উর্দ্ধে উঠতে পারলে আর চিন্তা নেই। এই শিক্ষাই চরম শিক্ষা। নিজের সত্তা ভিন্ন এ শিক্ষা দেবার অন্য গুরু নেই। এই হল আমার সহজ বিশ্বাস। চারি ধারে অগণিত লোকের এই নিজের বুদ্ধি বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে, অসহায় দীনভাবে অদৃশ্য কারো কাছে শক্তি ভিক্ষা দেখলে আমি কষ্ট পাই। আমি নাচার। ঈশ্বর বিশ্বাসী লোকে আমার অর্বাচীনের মত বা নাস্তিকের মত কথা শুনে কষ্ট পাবে—সে ক্ষেত্রেও আমি নাচার।

সামান্য ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসে এসব তত্ত্বের অবতারণা এক হিসেবে অবান্তর। চোখ দিয়ে যা দেখে যাব তারই ছবি কাগজ কলমে ফোটালেই তো ভ্রমণ কাহিনী। এ আংশিক সত্য। ইতিহাস, ভূগোল, নিদেন টুরিস্ট গাইডও সে কাজ করতে পারে। ভ্রমণ যে লেখে সে তো শুধু চোখ দিয়ে দেখে না, মন দিয়েও দেখে। তাই তো শতলোকের চোখে বিশ্বের শত রূপ আমি আমার দৃষ্টিশক্তি, অনুভূতি, বিচারবুদ্ধি দিয়েই জগতটাকে দেখে বেড়াচ্ছি। তারই আভাস দেবার চেষ্টা করি। অনুভূতি বাদ দিয়ে লেখার চেষ্টা করলে সে লেখা নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। সে লেখায় আমার আনন্দ নেই।

কি থেকে কোথায় এলাম। এবার এ-প্রসঙ্গ যাক। ধর্মীয় স্থানে এসে আমার যা মনে হয়েছে না বলে পারলাম না। কবরের দিকে পিছন ফিরে বেরিয়ে যাওয়া চলবে না। সকলের দেখাদেখি আমি, টুটুও চাদরমুড়ি অবস্থায় পেছু হেঁটে হেঁটে বেরিয়ে গেলাম। শুধু মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম কারো সঙ্গে ধাক্কা লেগে না যায়। এর পাশের ঘর ও দোতলায় উঠে ছোট্ট মিউজিয়ম। মৃত ইমামদের ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসই সব রাখা রয়েছে। কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার উপায় নেই। ভাষা না জানায় পদে পদে অসুবিধে। রেজা মসজিদে নামাজ পড়ে এল। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে সেই চেলো কাবাব, এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন—চেলোকাবাব বস্তুটি অতি সুখাদ্য ও পারস্যের একটি পপুলার ডিশ। চাল থেকে চেলো, কাবাব আর ভাত। আর 'দুখ' মানে নোনতা ঘোল খেয়ে পার্সিপোলিসের পথে যাত্রা শুরু।

সূর্য তখন মাথার ওপর। বিদায় সিরাজ। বেলা দেড়টায় রওনা। সিরাজ থেকে উত্তরে ৬৫ কিলোমিটার দূরে পার্সি-পোলিস। উঃ, খুব গরম লাগছে। সকালে বেরিয়ে এতোক্ষণ ধরে বাজার, মসজিদ, কবর, বাগান একের পর এক দেখে বেড়ালাম। আচ্ছা, এই দুদিন ধরে ইস্পাহানে, সিরাজে যা যা দেখলাম, মন এতে ভরল কি? কি আশা করে এসে-ছিলাম? পেয়েছি কি? দুটো শহরের তুলনা করে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কোনটা ভাল লাগল, বলতে পারব কি? সত্যি বলতে ভাল লাগা, মন্দ লাগা, বিশেষ কোন অনুভূতিই আমার জাগেনি। শূন্য মনে ঘুরে বেড়িয়েছি। চোখ তবু কিছু কিছু দেখেছে, কিন্তু মন আমার বিশেষ কিছুই দেখেনি। ইস্পাহান বলতে তবু ময়দান-এ-শাহ আর তার চতুষ্পার্শ্বের জম-জমাট বাজার, গমগমে রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, কর্মরত শিল্পীদের নিয়ে ফুটপাথ জোড়া অসংখ্য হাতের কাজের দোকান, সব মিলিয়ে বেশ একটা মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত রূপ তবু চোখের ওপর ভেসে ওঠে। কিন্তু সিরাজ? যার এতো নামডাক? আমাদের ভাগ্যে কোথায় তার গোলাপ, কোথায় বা সিরাজি বুলবুল? সুরা, সাকী তো স্বপ্ন। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বড় বড় বাগান শুধু চোখ বুলিয়ে আর কবরগুলির সামনে দু' দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু অনুভব করবার, ভাববার সময়ই পেলাম না। লজ্জিত হয়ে ভাবছি সিরাজ আমার মনে কোন ছাপ ফেলবার অবকাশই পেল না। কি দুর্ভাগ্য—সিরাজের নয়, আমারই।

গাড়ি চলেছে। সেই ধু-ধু প্রান্তর। মরীচিকা দেখতে দেখতে, কমলালেবু আর বরফজলে গলা ভেজাতে ভেজাতে ঘণ্টাখানেক পর বেলা তখন তিনটে, পার্সিপোলিস পৌঁছলাম। ফ্ল্যাস্কের জল শেষ। ন গলা শুকিয়ে কাঠ। চোখ অসম্ভব জ্ব করছে। সিরাজের ইন-টো-ইন থে ফোনে খবর নেওয়া ছিল পার্সিপো ইন-এ জায়গা পাওয়া যাবে। মাঠের ম দু-চারটে বড় গাছও রয়েছে। খাঁ মরুর মাঝখানে এটি একটি মরূদ্যান যে জল ঢেলে ঢেলে ইনের হাতার মধ্যে স লন, সুকুমার সব মরশুমি ফু ফুটিয়েছে। মানুষের আসাধ্য কিছুই নে গাড়ি থেকে নেমে আপিস ঘরটুকু যাও এতেই গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে গে সূর্যদেব মাথার ওপর আগুনের অ উপুড় করে দিলেন, আর পুড়ে ঝলসে গেলাম। আপিস ঘরের বেয়া কাছ থেকে ঠাণ্ডা জল সবাই এক গ করে খেলাম। খেইলি মামানুল—অ ধন্যবাদ। এই ইনটি বাস্তবিকই সরা খানা। তবে আধুনিক সংস্করণ। য আজকাল মোটেল কয়। এয়ার কণ্ডিশ বা খুব একটা আরামের ব্যবস্থা নেই, ত মটরগাড়ি রাখার জায়গা আছে, তাই মোটেল। আপিস ঘর থেকে গজ তিরিশে দূরে মাঠের মধ্যে ছোট ছোট সাদা স পাকা ঘর রয়েছে পাশাপাশি গোটা বা হবে। প্রত্যেকটার সঙ্গে লাগোয়া স্না ঘর ও স্যানিটারি পায়খানা। আমা দুটো ঘর নেওয়া হল। রেজা আর টি একটায়, বাকি তিনজন আর একটায়। ঝ ঝকে তকতকে ঘর। কিন্তু পাখা পা নেই। এতো বড় টানা পথে এই প্র গরমের তাপে সবাইকেই যেন সাঁতা ক করে ছাড়ল। চারিধার ফাঁকা মাঠ, প টেনে দিয়ে এক-একটি খাটে এক-এক নেতিয়ে পড়ল।

আমাদের এই পার্সিপোলিস ইন-একপাশে অতি আধুনিক প্রকাণ্ড দামি হোটেল। এছাড়া ধা ছে আর কোন কিছু নেই। জিরিয়ে টিরিয়ে প্রায় তখনো সূর্য বেশ ওপরেই, সঙ্গে আন শশা আর পাঁউ ছিল তাই খেয়ে গাড়ি করে পার্সিপোলিসের তখত্-এ জামসি দেখতে গেলাম। জায়গার নাম পার্স পোলিস, দ্রষ্টব্য হল এই তখত্-এ জামসিদ। মানে পৃথিবীর ওপর উচ্চা বা সিংহাসন। ইন থেকে এক মাইলে মধ্যেই—প্রকাণ্ড চওড়া পিচের রাস্তা তখতের সামনে এসে থেমেছে। আ এটুকুও পা খরচ না করে গাড়িতেই এলা কারণ এই তখতটি তো অনেকখা জায়গা। সবই তো পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘ দেখতে হবে। দূরে থেকে পাথরের উঁচু উঁচু স্তম্ভ, থাম, ভাঙ্গা খিলা নির্মেঘ আকাশে মাথা তুলে আছে দেখা পেলাম। রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। মিনিটেই পৌঁছে গেলাম। টিকিট কাটা হল। সেখানেই ব্যাটারি দেওয়া ক্যাসেট, ট্রানজিস্টারের মত ভাড়া পাও যায়, তই একটা নেওয়া হল। এটা মান গাইডের জায়গায় যন্ত্ররূপী গাইড হল

চলা

কৃষি

‌…চারে

…টি পত্রিকা

…বাসের অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত …া নতুন নাম—সোনালী ফসল। দেবীপ্রসাদ নাগ। ৫৭বি টাউন-রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। ৬ টাকা।

…া সমস্যা সমাধানে ধান চাষের ওপর …লছে। গবেষণার ফলে দেশী আমন … বোরো চাষে সফল হয়েছে। …ষি বিজ্ঞানী ডঃ সৌরীন্দ্রমোহন … ধানের ফলন বাড়াতে গবেষণা … বুঝিয়ে বলেছেন ফাল্গুন সংখ্যার ফসলে।

…র ও শহরতলীর বাসিন্দারা ফাঁকা জায়গা বাড়ির ছাদ ও আঙিনাতে … শাক সব্জির চাষ করতে পারেন। …রামের প্রখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী শিব-…ন্দ্যোপাধ্যায় খুব সহজ ভাষায় … করেছেন … ও …র জন্য।

…কসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-জড়িত। জমি বাড়ছে না। কিন্তু …বাড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাব-কৃষিচিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন …গান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের প্রকল্প … মাধবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

…নচিন্তা চমৎকার। কিন্তু ভাত-…টিতেই সমস্যার সমাধান হয় না। …য় প্রোটিন চাই। দুধ হচ্ছে …সহজপাচ্য প্রোটিন। দুধের উৎপাদন …কি করতে হবে বলেছেন ডঃ রবি…শ্বেত বিপ্লবে অংশ নিতে আহ্বান …েন তিনি।

…নালী ফসলে আরো আছে আপন-…গে কৃতী চাষীবাসীর কথা। চিঠি-… মাধ্যমে চাষীবাসীর অভিযোগ। সেখানকার খবরের বিভাগ ইত্যাদি… প্রচ্ছদ ভাল। সম্পাদনা ভাল। …ু বেশি। সম্পাদকীয় এবং কনক-…ট্টোপাধ্যায়ের লেখাও ভাল লেগেছে। …রতী: অরুণিমা প্রকাশনী। ৪৩বি. …মা গোস্বামী লেন, কলকাতা-৫।

…ীত চলে যেতে না যেতেই বাজার ফাগুনের আগুনে হাতের ছোঁয়ায় …ই তাতিয়ে দিয়েছে। দাম বেড়েছে …র। সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'নবান্ন-' … ফাল্গুন সংখ্যায় মন্তব্য করেছেন … শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ।

…াম বাড়ার কথায় প্রথমেই যার নাম …সে তেল। সরষের তেল। তেল… …তেল যাওয়ার জন্য সরষের তেল …

উধাও। পশ্চিমবঙ্গে তেলের ঘাটতি মেটাতে সরষের চাষ বাড়ান দরকার।

কিন্তু শুধু সরষের চাষেই সমস্যার সমাধান হবে না।

এখন মরশুম চলছে তিলের। তিলের চাষ বাড়াতে যতটা করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। চাষীবাসীরা প্রয়োজনমতো ভাল মানের বীজ খুঁজে পাচ্ছেন না।

ভাল বীজ পেলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। চাষবাসের আধুনিক কলাকৌশলও রপ্ত করা দরকার। নবান্নভাবতীর ফাল্গুন সংখ্যায় 'তিলের চাষ বাড়াতে হলে' কি কি করা দরকার বুঝিয়ে লিখেছেন দেবব্রত সরকার।

বোরো চাষে এবার এলাকা কমে গেছে। খরায় পর্যাপ্ত জল না থাকায় ডি ভি সি, ময়ূরাক্ষী কিংবা কংসাবতী এবছর বোরো ধান চাষের জন্য সেচের জল দিতে পারেনি। 'সেচের নামে জল ঘোলা হচ্ছে' কিভাবে জানা যাবে বিশেষ প্রতিনিধির নিবন্ধটি পড়লে।

আলু চাষে বিঘাপিছু খরচ হাজার টাকা। তাতেও লাভ হয়। কিভাবে রাঘব-পুরের অনাথ পাইক লাভবান হলেন লিখে-ছেন প্রাণেশ সরকার।

সামনে খরিফ মরশুমে আমন ধানের চাষ করতে হলে নিচু জমিতে মাসুরি পরীক্ষা করে দেখুন না কেন? দেবেশকান্তি কর বর্ধমান জেলায় মাসুরি ধানের চাষে সফল চাষীদের কথা তুলে ধরেছেন ধানের নাম মাসুরিতে।

চাষবাসের গোড়ার কথা মাটি। মাটি ও সারের সার কথা নিয়ে লিখেছেন প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা সি এ ডি সি-র চাষবাসের কর্তা বিষ্ণুপদ মন্ডল।

এছাড়াও রয়েছে বসন্তের চাষআবাদ। মৌমাছির চাষ। চিঠির জবাব ইত্যাদি নিয়মিত ফিচার। দাম মাত্র এক টাকা।

আর্য পত্রিকা

বর্ধমান জেলা চাষবাসে সেরা। বর্ধমান থেকে প্রকাশিত আর্য পত্রিকার বিশেষ কৃষি সংখ্যায় চাষবাসের নানা দিক নিয়ে আলো-চনা হয়েছে।

ধানের রোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন ডঃ দেবকুমার চৌধুরী। ফাল্গুন সংখ্যার আর্য পত্রিকায় ডঃ চৌধুরীর এই লেখাটি গতানুগতিক নয়। অনেকের কাজে লাগবে।

চাষবাসের খরচ দিন দিন বেড়ে চলেছে। খরচ বেশি না করেও কিভাবে বাড়তি ফসল পাওয়া যায় বা আয় বাড়ান যায় তার হদিশ মিলবে বনবিহারী চক্র-বর্তীর লেখায়।

বার মাস চাষ করতে না পারলে লাভ কম হবে। কাজ কম হবে। তাই দরকার বহু ফসল চাষ করার কথা শুনুন পুলিন দাসের কাছে।

বর্ধমানে কিভাবে লেখাপড়া জানা তরুণেরা চাষবাসে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন সেকথা জানা গেল চাষবাসের কাজে শিক্ষিত তরুণদের ভূমিকা পড়ে। গোপাল দাসের আলোচনাটিও ভাল হয়েছে।

সুভাষ রায়চৌধুরী

কবিতা সিংহর কবিতা

একা জল

মধ্য দুপুরে একা জল
কোনো ঢেউ নেই শুধু আভূমি কম্পন
এবং একটি কাচ্-ফড়িঙের একা ঘুরঘুরে।
এরই গূঢ় ঔদাস্য জেনে গিয়ে বিষণ্ণ রন্দ্দুরে
একা চলে জলের ভিতর

আলোর সমস্ত ছটা বেঁকে যায়
প্রতিসরণের মত জন্ম নেয় আলাদা স্মরণ

মধ্য দুপুরে একা জল

কটি পলে নিয়ে আসে জাতিস্মর হীরার ঝিলিক্।

শাপ

দ্যাখো, সমস্ত অরণ্য মরে 'কাঠ' হয়ে আছে এই ঘরে,
ওই শাণিত পালঙ্কে ওই নিশিত চেয়ারে!
তুমি বৃক্ষের কবরে বসে আছো
এবং টেবিলে, পাথরের চোখ কাকাতুয়া
মরা পাখি বসে আছে মরা এক ডালে।
আর তুমি অভিশাপ কুড়াও প্রত্যহ।

কারণ সমস্ত বন তুমি একা পিটিয়ে মেরেছো।

একদিন এই কাঠ জ্যান্ত ফুলে দিত,
ডুমো ডুমো কুঁড়ির ভিতরও
জেগে উঠতো সঘন জীবন।

তোমার পালঙ্ক আজ ফুলে পুষ্পশেজ হয়ে উঠবে না।
বালিশের ভিতরের আক্রোশী শিমুলে
তোমার স্বপ্নের মধ্যে ছুঁড়ে দেবে অভিশপ্ত সিল্কের লতা

অরণ্যের বিদ্রোহী নিঃশ্বাসে
এই সব কাঠের ভিতরে তুমি ক্রমে
কাঠ হয়ে যাবে।

সমস্ত ইন্দ্রিয় থেকে ঝরে পড়বে স্পন্দন ক্ষমতা।

সে

বহুদূরে যাবে বলে তার মাপ ওজন চাহিদা
বাজারে অমিল
তার জুতো অনেক মাড়াবে তাই ফ্যান্সী হবেনা
তার হাত খস্‌খসে তৈলছোঁয়া হীন
করমর্দনের কোনো অবকাশ নেই বলে দূরে থেকে
তার দণ্ডবৎ!

বহুদূরে যাবে বলে নাভি ও শ্রোণীর চার পাশে
তার কোনো ঘুরঘুরানি নেই
কামনা এবং যৌনতা
যৌবনে সে এখনি আগাম
ত্যাগ করে হেসে উঠছে একা
কারণ সে প্রত্যহ দেখেছে
শুক্ল কেশের সঙ্গে এরা কত হাস্যকর হয়!

বহুদূরে যাবে বলে শেষবার গাঢ় বন্ধুতায়
দেখে নেয় শত্রুদের মুখ

এক রক্ত এক বুক এই কথা বলে যারা
সাম্প্রতিক আকাশ ফাটায়।
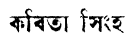
সমালোচনা

কামনা-বাসনা ব্যথা-বেদনা আশা আকাঙ্খায় রূপময় ফাউস্ট

কবিতা সিংহ

জন্ম : ১৯৩২
...িকা : আকাশবাণীতে সাহিত্য-অনুষ্ঠানের ...যোজিকা

রাগ, অহংকার, ঈর্ষা, প্যাশন, ...
...ণতা—এই সবকিছুতে ঠাসা একটি ...রোপুরি মানবীর নাম কবিতা সিংহ। আর ...ই সবকিছুই সম... তাঁর ... কবিতার ... বটে।

আমার এই প্রিয় বান্ধবী তার ... ...ক কাব্যগ্রন্থ ... পরমেশ্বরী ... ...মিকায় সরাসরি বলে দিয়েছে, ...মার লেখার উৎস ক্রোধ। প্রতিবাদ। ...লেল কবিতা অন্তত এই ... আমার ...ছে পরমেশ্বরীরূপে বিবেচিত ... ...বরই দেখেছি, কি পদ্যে কি জীবনে বেশ ...নিকটা এক্সেন্ট্রিসিস্ট ধরনের মেয়ে কবিতা —কারোর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে না, ...উকে ক্ষমাও করে না।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ... ...জাতির বিরুদ্ধে কবিতার কলম এক...রোখা। না—সে মাদাম বভোয়া নয়, ...সোয়া জিলো, আবার 'লিব' মুভমেন্টের ...নীদের মত মজাদার লড়াই-এর ফ্যাশানেও ...মে নি সে। ... তার ... রক্তে ও ...তায় বহতা এক সহজ সাবলীল ... ...স, ফেরেলের সুরে অনুযায়ী যা প্রায়ই ... লেগ স্পিনের মত বাঁকে বাঁক নেয়। ...মি যখন তার উপন্যাস 'চারজন ... ...তী' বা 'কবিতা পরমেশ্বরী' কাব্যগ্রন্থটি ...তে থাকি, তখন অনিবার্যভাবে মনে হয়, ...বিতা খুব রিয়্যাক্ট করে, তৎক্ষণি প্রতিকার ...তা খুব তাড়াতাড়ি রিয়্যাক্ট করে, ...নি প্রতিকার চায়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

গানের ঐশ্বর্য দিয়ে নিপুণ শিল্পীর মত সৃষ্টি

কিংবদন্তীর নায়ক ফাউস্টকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস যজ্ঞেশ্বর রায়ের 'ফাউস্ট'। ঔপন্যাসিক ফাউস্ট-কথার সূত্র নিয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। তবে, তাঁর মূল প্রেরণা এসেছে গ্যোতের 'ফাউস্ট' থেকে। গ্যোতের ফাউস্ট তাঁর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা-পুষ্ট দার্শনিকতার ঘন-সংসক্ত বাণীময় বিগ্রহ। নানা জটিল আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে এই চরিত্রটি। যজ্ঞেশ্বর রায়ের উপন্যাসের কাহিনী-বিন্যাস ঘটেছে গ্যোতের সেই কাহিনীর সূত্র ধরে; যদিও তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন সর্বত্র।

লেখক ফাউস্ট চরিত্র অংকনে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ফাউস্ট তাঁর কাছে শঠ বা প্রবঞ্চক নন, ভোজ-বিদ্যাবিশারদ নন বা শয়তানের দোসর নন। তিনি ফাউস্টকে দুর্বোধ্যতার আবরণ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর ফাউস্ট অনেকটা রক্ত-মাংসের তৈরি মানুষ, যে মানুষ বোধোদয়ের প্রথম প্রভাত থেকে সংগ্রাম করে আসছে অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে; যে মানুষ প্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে চায় জ্ঞানের তপস্যা দিয়ে, মানুষের মঙ্গল কামনা করে মন প্রাণ দিয়ে। এই মানুষ বাঁচতে চায়, চায় সুন্দর যৌবন আর নির্মল ভালোবাসা। কিন্তু শয়তানের সে কাম-দাবী সেই চিরায়ত কামনাকে কলুষিত করে তোলে। আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মানুষের জীবনে তখন জেগে থাকে শুধু যন্ত্রণার আর্তনাদ আর রিক্ততার বেদনা। ফাউস্ট সেই যুগ-যুগ-বিলম্বী কামনা-বাসনার, ব্যথা-বেদনার, আশা-আকাংখার রূপময় সত্তা। এরই পাশে আছে মার্গারেটের চরিত্র। ব্যর্থ প্রেমের এই নায়িকাকে লেখক তাঁর অন্তরের সমস্ত মমতা দিয়ে, প্রাণের ঐশ্বর্য দিয়ে নিপুণ শিল্পীর মতো এঁকেছেন। মেফিস্টো চরিত্রটিও অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অংকিত হয়েছে। এই মেফিস্টো শুধু পাপের প্রতিমূর্তি নয়, সে মানুষের মতোই বিচারশীল, যুক্তিতর্ক-নির্ভর এবং কূটনীতিজ্ঞ। তার ব্যঙ্গ-নিপুণ কথা-বার্তা অনেক সময় আমাদের বর্তমান সমাজকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কার্তিক ভদ্র

ফাউস্ট (উপন্যাস)—যজ্ঞেশ্বর রায়। ...চিত্রবাণী প্রকাশ ভবন। কলকাতা ১০; বারো টাকা।

কবিতা এখন খুব জটিল ঃ সমর সেন

প্রথম থেকেই মৌলিক এক বাচনভঙ্গী সমর সেনকে বাঙালী কবিদের পুরোভাগে নিয়ে এসেছিলো। ঝকঝকে, স্মার্ট, অন্তরালে বিষাদ, কৌতুক, বিদ্রূপ ও বেদনা। সিদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে, পাঠক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে দেরি করেনি। এমন তরতাজা কথনকলা তখন আমাদের কাছে অজানা ছিলো। তাই, মোহাবিষ্ট তরুণেরা তাঁকে অনুসরণ না করে নিস্তার পায়নি। এই অসামান্য ক্ষমতাবান কবি, হঠাৎ এক সময় লেখা ছেড়ে দিলেন, কবিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সাংবাদিকতায়। অপূরণীয় ক্ষতি হলো বাংলা কবিতার।

কবি এখন পুরোপুরি সাংবাদিক, নির্ভীক আর স্বাধীন, মতপ্রকাশে বে-পরোয়া।

প্রশ্ন করলাম, লেখা, অর্থাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন কেন?

স্বভাবসুলভ শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মৃদু হেসে বললেন, 'আমার পক্ষে বলা মুস্কিল, কেননা, এ নিয়ে চিন্তা করিনি। উনিশশ' ছেচল্লিশে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় লেখা বন্ধ হয়ে যায়।'

আচ্ছা, আপনার কবিতায় নগর-মনস্কতা, স্যাটায়ার ইত্যাদি কিভাবে এলো বলে আপনার মনে হয়?

'শ' এবং শেলীর লেখা বারো-তেরো বছর বয়স থেকে পড়তাম। তখন শ খুবই আকর্ষণ করতেন আমাদের। এদিকে ঈশ্বর গুপ্ত পড়তাম, তাঁরও প্রভাব আছে হয়তো। এলিয়টের কবিতাও প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া সামাজিক পরিবেশ তখন এমন হয়ে উঠেছিল যে, বিশিষ্ট দেশনেতাদের কার্য-কলাপ ও চিন্তাধারাকে ব্যঙ্গ করার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়লো। এইসব মিলেমিশে আছে কবিতায়।

আমরা যারা সমর সেনের কবিতা ভালো করে পড়েছি, তাদের কাছে এই কনফেশান আশ্চর্যজনক মনে হবে না। তবে ভয়ে ভয়ে ঈশ্বর গুপ্তের ঝকঝকে বুদ্ধি-বাদী কবিতার প্রভাব সম্বন্ধে বলতাম, এখন অনুমান সত্য হল কবির স্বীকারোক্তিতে।

আর একটি প্রশ্ন করলাম, 'আপনার

সময়ের অন্যান্য কবির ছন্দের প্রতি স্বভাব-ঝোঁক দেখেছি, গদ্যছন্দ তাঁরা বেশি পছন্দ করতেন না, আপনি কেন গদ্যভঙ্গী বেছে নিলেন?'

বললেন, 'এই ব্যাপারে নিজের সম্বন্ধে বলছি, আমার ছন্দের প্রতি অনীহা ছিল, বুদ্ধদেবকে গদ্যে লেখা কবিতা দেখাতাম, উনি আমার এরকম লেখাই পছন্দ করতেন, এটাই আমার লেখা উচিত, বলতেন ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল আমার। তবে এই গদ্য-ছন্দে কালীপ্রসন্নের হুতোম প্যাঁচার নকসার প্রভাব আছে। ওঁর এই ব্যঙ্গচ্ছলে লেখা আমি খুব ভালোবাসতাম।'

না লেখার কারণ সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন করতে, উনি সরাসরি জানালেন, অনু-প্রেরণার অভাব। ইন্সপিরেসন একটা দরকার, তা নাহলে কবিতা লেখা যায় না।

অবশ্য ৫০-৫১ সালে দু'-একটা কবিতা লিখেছিলাম, বুঝতে পারলাম, তেমন আর হচ্ছে না। জোলো হয়ে যাচ্ছে, তাই লেখা ছেড়ে দিলাম।'

এখনকার কবিতা পড়েন?

'কেউ এলে বলি, পড়বো। কবিতা খুব জটিল হয়ে গেছে। সবারই লেখা একরকম মনে হয়, আলাদা করে কাউকে চেনা যায় না। আমাদের সময়ের কবিদের আলাদা করে চেনা যেতো। অবশ্য বিষ্ণু দে-র কবিতার আমি ভক্ত নই।'

প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ আর পড়েন?

অনেক কবিতা অদ্ভুত ভালো, অনেক জোলো কবিতাও লিখেছেন। বুদ্ধদেব যেমন শেষদিকে রবীন্দ্রনাথের মূল্য[illegible] করেছেন, আমি তা পারি না।

জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বু[illegible] বসু সম্পর্কে আপনার মতামত [illegible] খুশী হব।

'তখনকার লেখকদের একটু নাক[illegible] ভাব ছিলো। সুধীন দত্ত আমি[illegible] পড়েছি। ওঁর মধ্যে লজিক আছে, ক[illegible] ভঙ্গী আছে। বুদ্ধদেবের 'বন্দীর [illegible] ইত্যাদির পরে ওঁর লেখা তেমন প[illegible] জীবনানন্দের 'আট বছর আগের [illegible] দিন' একটি আশ্চর্য সৃষ্টি। [illegible] কবিতা আর কেউ লিখতে পা[illegible] প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকটি ভালো [illegible] ছিল।'

শেষ প্রশ্ন ছিল, আপনার ক[illegible] আপাত রোমান্টিক বিরোধিতা থা[illegible] লুপ্ত রোমান্টিকতার হাহাকার আছে[illegible] সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?

'বাংলাদেশের ছেলে, রোমান্টিক [illegible] আমার সম্বন্ধে এই সমালোচনা এক[illegible] সঠিক।'

পবিত্র মুখোপা[illegible]

পট-বিমূর্ত

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস গ্যাল[illegible] শিল্পী বিজন চৌধুরীর ভূত্যাপেক্ষ [illegible] চিত্র ও রেখাচিত্রের প্রদর্শনী হয়ে[illegible] (১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী[illegible]

বিজন চৌধুরী প্রাথমিক পর্বে '[illegible] সিরিজের চিত্রমালা আমাদের সামনে [illegible]স্থিত করেছিলেন, তা ছিল মূলক [illegible] জনসাধারণের ব্যক্তিকেন্দ্রিক অসহ[illegible] উপস্থিতি। বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, পটের বিভাজন, বর্ণ সমন্বয়ের সাজ[illegible] ঘনবদ্ধ আলোছায়ার জ্যামিতিকে ভাঙা-মধ্য দিয়ে তিনি লোকায়ত জীবনে[illegible] শাস্ত্রীয় ঢঙে উপস্থিত করেছিলেন।

তাঁর পরবর্তীকালের চিত্রগুলিতে [illegible] যায় তিনি অনেক কিছুর পরিবর্তন [illegible]ছেন। এখানে জীবন আর ব্যক্তিকে[illegible] নেই, সমষ্টিকে জড়িয়ে এগিয়ে য[illegible] নতুন জীবনের দিকে। একটি ঝরনা [illegible] দূরে এগিয়ে যেতে পারে না, বিশাল [illegible] সঙ্গে না মিশে। এই জীবনবোধে [illegible] চৌধুরী আশ্রয় খুঁজেছেন। ব্যক্তি-সমষ্টি, জীবন এখানে আর অসহায় নি[illegible] নয়, পরাজিত কিন্তু সংগ্রামী। সংগ্রাম [illegible]

ত। সেই গতির স্বপ্নময় ছন্দিল মূর্ছনা থা যাবে তাঁর 'সূর্যমুখী ফুলের ঋতু' টির ঐতিহাসিক পুরাকল্পে।

এখানে তাঁর চিত্রকলার বিষয়বস্তু, ঙ্গিক ও নর-নারীর শারীরিক প্রত্যঙ্গে ও দ্রায় যে সামগ্রিকতা ধরা পড়েছে, তাতে ন হয় বিজন চৌধুরী একদিকে যেমন রতীয় ধ্রুপদী শিল্প ও পুরাকালের র্যাসে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পটের উপর ন্তুত সেই নির্যাসকে ঋজুতা দিয়েছে। রতীয় মডেল ও অনুষঙ্গের সমন্বয়ে বর্ণে ও খায় তাঁর চিত্রাবলীকে যে স্নিগ্ধতা গেছে তাতে পৃথিবীর রূপ, রস ও ন্ধের ছোঁয়া জড়িয়ে আছে একক বৈশিষ্ট্যে।

আদিম রক্তের রঙে আঁকা 'মানুষ ও ষাঁড়ের' টিকটি স্বপ্নময় ছন্দে আলোড়িত নরকের পথে স্বর্গারোহণ', 'স্নান' ও 'দুষ্ট অশ্বারোহী' এবং পুরাকল্পের 'তীরন্দাজ' ও সূর্যমুখী ফুলের ঋতু' যে বিশ্বজনীন সামগ্রিকতা এনেছে তা অবিস্মরণীয়।

দুই একটি ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে পটের উপর বেশী কাজ করা হয়েছে। যেমন 'রাজার' সিরিজের 'ষাঁড়ের সঙ্গে মুখোশ-ধারী মানুষ'। (১৬) এবং অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে মনে হয়েছে—অসম্পূর্ণ। পটের উপর আর একটু কাজ করলে ভালো হতো। যেমন 'দুষ্ট অশ্বারোহী' (৪) একটু কাজ যেমন 'দুষ্ট অশ্বারোহী' (৪) কিছু রেখা-চিত্র ভালো, বিশেষ করে ৪, ১১, ১২। কয়েকটিকে তুলনামূলকভাবে দুর্বল বলে মনে হল।

এই ভূতাপেক্ষ প্রদর্শনীতে বিজন চৌধুরীর প্রতিনিধিত্ব করে এমন তৈলচিত্র ও রেখাচিত্রের সংখ্যা যদিও খুব কম, তবু তাঁর 'ট্র্যাপিজ', 'তীরন্দাজ', 'সূর্যমুখী ফুলের ঋতু', 'পরিবার' ও 'শিল্প সংগ্রাহক'কে আমরা দেখেছি। যে তৈলচিত্রগুলি পৃথিবীর সংগ্রহশালায় অনায়াসে স্থান পাবার যোগ্যতা রাখে।

শ্যামল রায়

খোকা যদি খুশি হয়……

১৯৪৭ সালের ইংরেজ শাসনমুক্তির পর যখন সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছে, সেই সময়েই মেয়েরাও সে অধিকার পেয়েছে। ইংলণ্ডের মেয়েদের মত সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ পার হয়ে আমাদের সশ্রমে অর্জন করতে হয়নি নাগরিক অধিকার। আর সেই জন্যই কি ভোট সম্বন্ধে আমাদের এখনও সেই সচেতনতা আসেনি যা কিনা প্রতিটি নাগরিকের কাছ থেকে দেশের লোকের প্রাপ্য।

সম্প্রতি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে ভোটপর্ব হয়ে গেল, মেয়েদের নামের তালিকাও তাতে নাতিদীর্ঘ ছিল না তবু আপনার পারিপার্শ্বিককে চোখ মেলে তাকিয়ে আপনি সচেতনতার কতটুকু ছাপ মেয়েদের মধ্যে দেখেছেন? মেয়েদের সান্ধ্য আসরে অথবা দুপুরের ছাদের গৃহিণী

পূর্বী ঠুমরীর সিদ্ধি সিদ্ধেশ্বরী

১৯৪৮-এ বোম্বাইয়ে আয়োজিত এক সঙ্গীত সম্মেলনে ফৈয়াজ খাঁ উপস্থিত। ঠুমরী গানের আসর। নিস্তব্ধ পরিবেশে স্নিগ্ধ কণ্ঠ। তবলা সারেঙ্গীর ... ঠুমরীর তরী এগিয়ে চলেছে। পূর্বী ঠুমরীর সেই ... সেই বোলবিনাসের ... সেই ... যখন কায়েম হয়ে গেছে, তখন একটি বোলের শুদ্ধ প্রয়োগ শুনে ফৈয়াজ খাঁ এতই মোহিত হলেন যে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে শিল্পীকে ধন্যবাদ দিয়ে এলেন।

এই সেই সিদ্ধেশ্বরী দেবী, ১৮ই মার্চ তিনি ৬৮ বয়সে পরলোকগমন করেছেন। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মৃত্যু বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এইজন্য যে পূর্বী গায়কির ভিত তাঁর অবর্তমানে বেশ শিথিল হয়ে পড়বে। পূর্বী ঠুমরীর ধারা বহন করে তিনি এতদিন যে ঐতিহ্যকে অম্লান রেখেছিলেন তার যোগ্য সমাদর ভারতের রসিক মহল দিয়েছেন।

মৌজুদ্দীন খাঁর পরবর্তী পূর্বী ঠুমরী শিল্পীদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর স্থান সামান্য বলা চলে না। ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেখলে দেখা যায় বেনারসের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন মৌজুদ্দীন খাঁ, যাঁর ঠুমরী গীতরীতি নব সম্ভাবনা নিয়ে সংগীত অঙ্গনকে উদ্ভাসিত করে তোলে। গণপৎ রাও মৌজুদ্দীনকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ তাঁর শিষ্যবর্গের অবদানে কলকাতা হয়ে উঠলো পূর্বী ঠুমরীর এক কেন্দ্র। পরবর্তীকালে ফৈয়াজ খাঁও গ্রহণ করলেন এই গীতরীতি।

যেসময়ে পূর্বী ঠুমরী গানের উদ্ভব সেই সময়ে সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র লক্ষ্ণৌর পূর্ববর্তী অঞ্চলকে পূরব বা পূর্বী বলা হতো। বেনারস লক্ষ্ণৌর পূর্ববর্তী এবং সেই কারণে বেনারস থেকে উদ্ভূত ঠুমরীকে পূর্বী ঠুমরী বলা হতো এবং সেই নামেই আজ অবধি তা চিহ্নিত হয়ে চলেছে।

সিদ্ধেশ্বরী দেবী ১৯০৮ সালে বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দেড় বৎসর বয়সে মাতৃহীন হওয়ার ফলে মাসী রাজেশ্বরী দেবী মাতৃহীনার ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেন। রাজেশ্বরী দেবীও উৎকৃষ্ট গায়িকা ছিলেন এবং জ্ঞানার্জনের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিলো প্রচুর।

এগারো বৎসর বয়সে সিদ্ধেশ্বরীর সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় বেনারসের প্রখ্যাত সারেঙ্গী বাদক সিয়াজী মহারাজের কাছে।

সিয়াজী মহারাজের মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বরী দেবী বেনারসের সুপ্রসিদ্ধ ঠুমরী গায়ক বড়ে রামদাসজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

পূর্বী ঢং-এর ঠুমরী বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন রামদাস। চটুলতার চাইতে সুরের গভীরতাই এই ঢং-এর বৈশিষ্ট্য।

এই সম্পর্কে তিনি যে পরিবেশন-রীতি প্রবর্তন করেছিলেন তা-ই বহুলাংশে পূর্বী বা কোনারসী ঢং-এর পরিচায়ক।

শোনা যায়, এই সংক্রান্ত ব্যাপারে বড়ে রামদাস তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। স্ত্রী ছিলেন জয়করঞ্জীর এক প্রখ্যাত ধ্রুপদী বংশের কন্যা।

এহেন গুরুর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করে সিদ্ধেশ্বরী দেবীও যে একজন কৃতী শিল্পী হয়ে উঠবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। সিদ্ধেশ্বরী দেবী, রজব আলী খাঁ (দেওয়াস) এবং এনায়েৎ খাঁ (লাহোর) এই দুই গুণীর কাছেও কিছু শিক্ষা করেন। কিন্তু তা মনে হয় খেয়াল গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

মজলিসিতে কতটুকু শোনা যায় ভোটের গল্প।

ভোট কাকে দেবেন? এ প্রশ্নের মুখোমুখি একবার না একবার হতেই হয় আর অধিকাংশ সময়েই নির্দ্বিধায় বাঙালী রমণীরা সে বিষয়ে অন্যের মতামতের ওপর নির্ভর করে থাকেন। স্বামী যেমনভাবে বলে দেন, সংসারে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক, কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ, তেমনিভাবেই বলে দেন কাকে ভোট দেওয়া উচিত। এই বলে দেওয়াও সর্বত্র বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত নয়। স্ত্রীরা কি জানতে চান যে কেন ঐ বিশেষ প্রার্থীটি ভোট পাবেন? অথবা স্বামীরাই কি বুঝিয়ে দেবার জন্য কোন রকম তাগিদ অনুভব করেন? অথচ দৈনন্দিন জীবনে রাজনীতির ফলাফল মেয়েরা যেমন ভোগ করেন, তেমন ত পুরুষরাও নন। তেলের দাম বাড়লে, অথবা বাজার থেকে চা উধাও হয়ে গেলে কিংবা বাড়ীর ছোট ছেলেটি সর্বাঙ্গে কালসিটে নিয়ে বাড়ী ফিরলে, গৃহিনীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হন, তেমন আর কে! অথচ তার কারণ খতিয়ে দেখার মতন মানসিকতা বাঙালী মেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

এমন কি, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে তাজা বয়সের মেয়েদের মধ্যেও সেই সচেতনতার অভাব। তাদের গল্পের বিষয়বস্তু, আকৃতি ছাড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছয় কতটুকু? কতটুকু চিন্তা করেন তাঁরা জাতীয় ভবিষ্যত অথবা আন্তর্জাতিকতার সূত্রে? যে সব মুষ্টিমেয় মেয়ে চিন্তা করেন তাঁরা বিশিষ্ট হিসেবে পরিগণিত।

মেয়েদের মধ্যে ভোটের ব্যাপারে সবচেয়ে কার প্রভাব বেশী? শুধুমাত্র স্বামীর কি? না—এ ব্যাপারে ছেলের প্রভাবও কম নয়। কখনও কখনও অনেক বেশী। সাধারণভাবে মায়েদের ভাবটা হোল, একটা ছাপের ত ব্যাপার—খোকা যদি খুশী হয়, আমার আর খুশী করতে বাধা কি।

আমার বান্ধবীর মা স্পষ্ট আমায় জানিয়ে দিলেন, তাঁর ছেলে যেখানে বলবে ছাপটা তিনি সেখানেই দেবেন। আমি আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করলাম স্নেহের সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকারের কি বিচিত্র সংমিশ্রণ। কি অসচেতন মেয়েরা নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে। কিন্তু কেন?

মেয়েরা ত সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে যেতে অক্ষম নন, তথাপি এই অচিন্তনীয় ঔদাসীন্য কেন?

এই ঔদাসীন্যের একটা কারণ হিসেবে আমি দেখি, মেয়েদের সচেতনতাটাকে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে বাস করতে। তার ফলে যেটুকু তার স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হোত, সেটুকুও গুটিয়ে যায়। কোন মেয়ের মধ্যে যদি পুরুষের সমান হবার গুণ এবং প্রবণতা বেশী থাকে, তাহলে মধ্যবিত্ত পরিবেশ তাকে শ্রদ্ধার বদলে ব্যঙ্গ করে বেশী। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধারণগুলি এখনও ছেড়ে যায়নি।

যেমন ধরুন, শ্যামলী ষোল বছরে পড়ল। সে এখন পৃথিবীর যে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে উদগ্রীব। তার চিন্তার ক্ষেত্র কখনও ক্রিকেট মাঠে, কখনও চলচ্চিত্র উৎসবে, কখনও নতুন মন্ত্রিসভায় বিস্তৃত। আর আমি আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করি, ঘর-সংসারের কাজে তার দক্ষতার অভাব নিয়ে সে প্রায়ই বকুনী খায় কিন্তু, চিন্তার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে তার বিচরণের জন উৎসাহ পায় না। ষোল বছর বয়েসে উৎসাহের কি ভীষণ প্রয়োজন। অথচ এই শ্যামলীই যেদিন আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার নিয়ে এল, শ্যামলীর মা সকলকে ডেকে বেশ গর্বের সঙ্গে সে কথা জানালেন। সাফল্য ছাড়া মধ্যবিত্ত পরিবারে কোন মূল্য নেই। সাধনার সময়টুকু তাই বড় সুবিস্তৃত, বড় দীর্ঘ মেয়েদের পক্ষে। সেই সুদীর্ঘ পরিশ্রমের পথ পার হয়ে যে মেয়ে পৌঁছতে পারে সাফল্যের সীমায়, সেই সম্মানীয় হয়ে ওঠে। আর উৎসাহ না পেয়ে অধিকাংশ মেয়েই যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আরও সংকীর্ণ গণ্ডিতে, তাদের আমরা ফিরেও দেখি না।

দ্বিতীয়তঃ মেয়েদের রাজনৈ[তিক] অসচেতনতার কারণ হিসেবে আ[...] বস্তাপচা পুরনো মূল্যবোধের ক[...] যেতে পারে, যে সব মেয়ে রাজনৈ[তিক] দলের কর্মী তাদের সম্পর্কে সা[...] মেয়েদের মনোভাব খুব স্পষ্ট নয়। [...] নিজেদের সংকীর্ণ মূল্যবোধ দিয়ে [...] তাঁদের ঠিক বিচার করে ওঠা যায় [...] আর তাঁরাও সাধারণ মেয়েদের [...] কাছের লোক হয়ে উঠতে পারেন না। [...] কারণ অবশ্য সেই পুরনো মূল্যবো[ধ] [...] ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি যে সব মে[য়ে] এগিয়ে যান, তাদের সম্পর্কে [...] দূরত্বের ধারণা। মধ্যবিত্ত পুরু[ষ] তাঁদের সবচেয়ে বেশী বাঙ্গ করেন।

সামাজিক চাপে পড়ে মেয়েরা ক[...] মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা [...] মানুষ নন। আর সেইজন্যই বাক্[...] অধিকারবোধও গড়ে ওঠে নি। যে[...] ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাজনৈতিক [...] বোধ যা কিনা এখনও অনেক সময়ে সু[...] পথ পার হয়ে মেয়েদের অর্জন করতে [...]

বোলান গঙ্গোপাধ[্যায়]

বাড়ীতে মাছ হলে খিদে বেড়ে যায়

সাঁতারু ইলা পাল এখন মুদীর দোকান চালায়। গত কয়েক বছর ধরে চৌদ্দ বছরের এই শ্যামলা মেয়েটা জাতীয় সাঁতার থেকে বাংলার জন্য সোনা আনছে একশো ও দুশো মিটার বুক-সাঁতারের রেকর্ড ভেঙ্গে-গড়ে। এই সেদিনও মাদ্রাজে ভারত-শ্রীলংকা মৈত্রী সাঁতারে ইলা জীবনের সেরা সময় করেছে এক মিনিট ২৯-৮ সেকেণ্ডে একশো মিটার টেনে। এখন টানছে সংসারের জোয়াল।

ভদ্রেশ্বরের সমীর গোস্বামীর কাছে খবর পেয়ে যেদিন সকালে আমি শ্রীরামপুরে ওর সংগে দেখা করতে যাই সেদিন ইলা সবে ওর দোকানের ঝাঁপি খুলেছে। খদ্দের নেই খবরের কাগজের লোক শুনে [...] দূরে ওদের বাড়ীতে ছুটে গিয়ে ও [...] ডেকে আনে। গত অক্টোবরে বাব[া] [...] যাওয়ার পর দাদা—নারায়ণ পালই [...] ওদের অভিভাবক। [...] আগেও সাঁতার [...] —এখন [...] চাকরীর চেষ্টা [...] সারাদিনে মন দিয়ে [...] করেন, সেটা [...] ওর ভারত চ্যাম্পিয়ান বোনকে সাঁ[তার] শেখানো।

বাড়ীর কাছেই শাঁতরা সুইমিং ক[্লাব] গঙ্গার পাঁক ও ঘোলা স্রোতের সঙ্গে ল[ড়াই] করে ইলা সাঁতার প্র্যাকটিশ করে। সু[ইমিং] পুলে তো দূরের ব্যাপার—ঝাঁপ [...] এবং টারনিং মকসো করার জন্য প[...] পায় না। তবুও জাতীয় সাঁতারে চ্যাম্প[িয়ন] হয়—ইলা প্রতি বছরই কাপ মেডেল [...] বড় সাইজের সার্টিফিকেট নিয়ে [...] ফেরে।

এরই মাঝে নন্দলাল স্কুলের [...] সেকশনের ক্লাস এইটের ছাত্রী ইলা [...] সকালে বই পত্তর গুছিয়ে স্কুলেও [...] সাড়ে দশটার সময় বাড়ীতে এসে অ[...] ভাঙ্গে। দুটো রুটি চিবিয়ে ও দৌ[ড়ে] ছোটে ওর সেজদাদাকে বিশ্রাম দেবার জ[ন্য] দুপুর দেড়টা অবধি দোকানদারি করে [...] দিয়ে কেননা ওর বিকির ওপরই [...] করে সেদিন ওদের কপালে কি জুটবে। [...]

'এখন ভাল বিক্রি হয় না'—[...]

দোকানীর মতো ইলা। আমাকে বোঝাচ্ছিল—দিনে তিরিশ টাকার 'জিনিস' বিক্রি হয় কিনা সন্দেহ। আর পুঁজি ভেঙে খেতে খেতে দোকানের হালও এখন খুব খারাপ। [illegible] এখানে সবাই আমাকে চেনে বলে না হলে দোকান কবে উঠে যেত।'

ভাই বোন মিলিয়ে সংসারে লোক মোট তের। এই একটি দোকান আর ইলার পাওয়া সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের স্কলারশিপ [illegible] টাকাই এখন সম্বল। অনেকদিন দুপুরে ওদের খাওয়া জোটে না। ইলা ওর দাদার বন্ধুর কাছে মাঝে মাঝে দুপুরে-বেলায় তাই পড়তে যেতে পারে না। খালি পেটে পড়তে ইচ্ছে করে না। তবে না খেলেও বিকেলে প্র্যাকটিশে কামাই দেয় না। ঘণ্টা তিনেক জল তোলপাড় করার [illegible] নিজেদেরই দোকানের ছোলা ভিজিয়ে খায়। ডিম, কলা, মাংস পাউরুটি খেতে ইচ্ছে করে। বাড়ীতে কোনদিন মাছ এলে [illegible] বেড়ে যায়। কিন্তু দাদার মুখ চেয়ে ইলা চুপ করে থাকে। কোন কম্পিটিশনে নামার দিন সাতেক আগে প্রতিদিন যখন ক্লাব থেকে প্র্যাকটিসের পর এক গ্লাস দুধ দেয় তখন ইলার আনন্দ দেখে কে।

মফস্বলের সরল মেয়েটা যখন আমাকে মনের ইচ্ছেগুলো জানাচ্ছিল তখন ওকে মাঝে মাঝে [illegible] দাদার দিকে তাকাতে দেখছিলাম। ওর দাদার গলায়ও [illegible] সুর—'ইলাকে এতো প্র্যাকটিস করাই অথচ [illegible] ওকে সাপ্লিমেন্টারী ফুড দিতে পারি না। শুধু ও কেন, আমার [illegible] তাই [illegible] গত বছর পাতিয়ালায় ন্যাশনাল [illegible] মীটে [illegible] ও [illegible] মিটার [illegible] স্ট্রোক আর দুশো মিটার [illegible] স্টাইলে সোনা পেয়েছে। মাত্র আট বছর বয়েস অথচ দারুন সাঁতার কাটে। ওদের খাটাতে ভয় করে—খাওয়াব কি?'

'মাত্র এগারো বছর বয়েস থেকে ইলা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। অন্য কোন দেশ হলে ওকে হয়ত এই পরিবেশে মানুষ হতে হতো না। আমি একটা যে কোন চাকরী পেলেও ওকে নির্ভরতা দিতে পারতাম। ইদানীং দেখছি দুশ্চিন্তা করে বলে মাঝে মাঝে ওর হাত-পা ঘামছে। সব বুঝতে পারছি তবুও ওকে আমি সাঁতার ছাড়তে দেব না। আমি বিশ্বাস করি যে রকম পরিবেশ পেলে ইলা আরও সময় কমাতে পারবে। এবারের ন্যাশনালেও দেখবেন ও আরও ভালো সময় করবে।'

ইলাও সায় দিল দাদার কথায়। [illegible] যে মেয়েটা গতবার ন্যাশনালে [illegible] ফাইট দিয়েছিল ওর সঙ্গে তাকে [illegible] শত চেষ্টা করেও ইলা হারাতে পারল না। তবে বাংলায় ওর সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো আছে একমাত্র লাইফ সেভিং সোসাইটির মৌসুমী [illegible]। ইলা জানাল মৌসুমীরা খুব বড়লোক। একদিন ও মৌসুমীদের বাড়ীতে গিয়ে দুটো কুকুর দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। বাংলার আরো অনেক মেয়ে—যারা ওর সঙ্গে ন্যাশনালে যায় তারাও অনেক বড়লোক। তাদের কারো কারো সঙ্গে মা-বাবাও যায়। ইলার তখন দাদাকে ভীষণ মনে পড়ে। ওরা যখন জমকালো পোশাক পরে, পাউডার মাখে, মুখে রং চড়ায়—ইলা তখন ময়লা স্কারট গায়ে কেবল ভিকটরি স্ট্যান্ডে চড়ে গলায় মেডেল পরে।

ভালো আহার ইলার না জুটলেও সম্বর্ধনা জোটে কম নয়। সম্বর্ধনা সভায় যাবার আগে ভাবতে বসে এবার কার কাছ থেকে স্কারট ধার করে পরে যাবে। তবে এর জন্য ওর মনে ক্ষোভ নেই। ও মনে করে দাদার চাকরী হলেও ওর সব সমস্যা মিটবে।

রূপক সাহা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তান

জর্জ টাউনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্থানের তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১-০ খেলায় এগিয়ে আছে। প্রথম টেস্ট খেলাটিও ড্র হয়েছিল। দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৬ উইকেটে জিতেছিল। এই দুই দেশের ১৯৭৭ সালের টেস্ট সিরিজের এখনও দুটো টেস্ট খেলা বাকি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড টসে জিতে পাকিস্থানকে প্রথম দফায় ব্যাট করতে পাঠান।

পাকিস্থানের প্রথম ইনিংসের খেলা মোটেই সুবিধার হয়নি। প্রথম দিনেই মাত্র ১৯৪ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। পাকিস্থানের পক্ষে চল্লিশের ঘরে রান করে-ছিলেন মাত্র দুজন—অল-রাউণ্ডার ইমরান খাঁ (৪৭ রান) এবং অধিনায়ক মুস্তাক মহম্মদ (৪১ রান)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উইকেট কিপার ডেরেক মারে পাকিস্থানের প্রথম ইনিংসে ৫টা 'ক্যাচ' ধরেছিলেন।

প্রথম দিনের খেলায় বাকি সামান্য সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ৬৮ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৭৮ (৫ উইকেটে)। ফলে তারা ৮৪ রানে এগিয়ে যায়।

তৃতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ৪৪৮ রানের মাথায় শেষ হলে তারা পাকিস্থানের প্রথম ইনিংসের ১৯৪ রানের থেকে ২৫৪ রানে এগিয়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় শিলিং-ফোর্ড সেঞ্চুরী করেন (১২০ রান)। এটা তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট। এইদিনের খেলার বাকি সময়ে পাকিস্থান দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ১১৩ রান সংগ্রহ করে-ছিল।

চতুর্থ দিনে পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৯৮ (৪ উইকেটে)। ফলে তারা ১৪৪ রানে এগিয়ে যায়। পাকি-স্থান দ্বিতীয় ইনিংসে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেছিল। ওপেনিং ব্যাটসম্যান মজিদ খাঁ ১৬৭ রান করে আউট হন। এই ১৬৭ রানই টেস্টের এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রান। আগে ছিল ১৫৮ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৭৩)।

শেষ পঞ্চম দিনে পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংস ৫৪০ রানের মাথায় শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় পাকিস্থানের সর্বোচ্চ রান ৬৫৭ (বার্বাডোজ, ১৯৫৮)।

পাকিস্থানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় চা-পানের কিছু আগে। ফলে খেলার বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৮৭ রান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৫৪ রানের মাথায় (১ উইকেটে) খেলার যবনিকা পাত হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্থান: ১৯৪ রান (ইমরান খান ৪৭ এবং মুস্তাক মহম্মদ ৪১ রান। গার্নার ৪৮ রানে ৪ এবং ক্রফট ৬০ রানে ৩ উইকেট)

ও ৫৪০ রান (মজিদ খাঁ ১৬৭, জাহির আব্বাস ৮০, [illegible] ৬০ এবং সাদিক মহম্মদ [illegible] রান। রবার্টস [illegible] রানে ৩, ক্রফট ১১৯ রানে ২ এবং গার্নার ১০০ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ: ৪৪৮ রান ([illegible] ৯১, [illegible] ৫০, [illegible] শিলিং-ফোর্ড ১২০ এবং [illegible] রান। মজিদ খান [illegible] রানে [illegible] উইকেট)

ও ১৫৪ রান (১ উইকেটে। [illegible] এবং [illegible] ৫২ রান।

দর্শক

স্মরণে

সম্প্রতি [illegible] একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মধ্যে [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়ের [illegible] জন্মদিন পালন করা হয়। সভায় [illegible] শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সঙ্গীত শিল্পীদের অনু-রাগীরা। [illegible] সঙ্গীত ও [illegible] মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা [illegible] হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় [illegible] প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণও করা হয় অনুষ্ঠানে। সভায় [illegible] দেবী, [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] উপস্থিত ছিলেন। [illegible] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে একটি রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব করেন।

কানাকানি

টালিগঞ্জের এক ও দু নম্বর নায়ক সম্ভবতঃ একে অপরের ছবি দেখেন না। ও'দের একজনকে কদিন আগে এই অনাসক্তির কারণ জানতে চাইলে বললেন 'সময় কোথায়? তাছাড়া ছবি দেখে কিছু নেবার না থাকলে আজেবাজে ছবি দেখে লাভ কি?' অন্যজনের মতামত অবশ্য জানা যায়নি। কিন্তু যখন দুজনে একই ছবিতে কাজ করেন, তখন? তখন কি তাঁরা আর ছবিটি দেখেন না?

* * *

তিন পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ এখন বাংলায় নয়, হিন্দী ভাষায় ছবি করছেন। 'মৃগয়া'র সাফল্যের পর অনেকেই আশা করেছিলেন মৃণাল সেন বোধহয় এবার বাংলায় ছবি করবেন। কিন্তু না, তাঁদের আশা বোধহয় মিটবে না। মৃণালবাবুর আগামী ছবি অ-বাংলা ভাষাতেই হবে। ছবির নাম জানতে চাইলে বললেন—'এখন নয়, পরে প্রকাশিতব্য।'

* * *

মে-ফেয়ারের নতুন ফ্ল্যাটে অপর্ণার নতুন সাজানো সংসারটি এখনও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। হবে কিনা জানিও না। একটা কথা বড় জানতে ইচ্ছে করে, বিয়ের আগে ইনটিরিয়র-একসটিরিয়র ডেকোরেশনের বইপড়া বিদ্যেটা তাঁর নতুন সংসারে কতখানি ফলপ্রসূ হলো।

* * *

'রাগী' পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'রাগ' কি এখন জল হয়ে গেছে? দু-দুখানা ছবি শুরু করেছিলেন বোধহয় বছর দুই আগে। নাগরিক আর কৃষ্ণপক্ষ। শেষ হয়নি কোনটাই, এবং কোন খবরও নেই। 'যদুবংশ'-য়ের পর আপনার কাছ থেকে দর্শক এই কলকাতার পরিবেশক-প্রদর্শক বংশ ধ্বংস করার মত ছবি চায় পার্থবাবু। 'অন্য' কাজে সময় নষ্ট না করে এগিয়ে আসুন না!

* * *

জ্ঞানেশ মুখার্জিকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন আচ্ছা জ্ঞানেশবাবু নাটকের আপনি আর ছায়াছবির আপনিতে এত ফারাক কেন? আপনার কাছ থেকে আমরা স্বীকারোক্তি চাই না, চাই হারানের নাতজামাই। জ্ঞানেশবাবু নাকি সহাস্যে জবাব দিয়েছেন আমিও তো চাই মশাই হারানের নাতজামাই করতে। একটা গৌরীসেনের নাতজামাই যোগাড় করে দিন না।' প্রশ্নটা হোল গৌরী সেনের নাতজামাই পেলেই তিনি হারানের নাতজামাইকে দর্শকের পাতে দেবার মত ছবি করার গ্যারান্টি দিতে পারবেন কি?

হরিপদ রায়

বাল্মিকী প্রতিভায় অশোকতরু

দানসাগর কে দেখেননি!

রবীন্দ্র সদন কর্তৃপক্ষের প্রযোজনায় গত ১৮ মার্চ থেকে দশ দিনব্যাপী নৃত্যনাট্য ও নাটকের উৎসব সদন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দু'দিন অনুষ্ঠিত হয় শ্রুতি নিবেদিত নৃত্যনাট্য এবং গীতি-নাট্যের অনুষ্ঠান—চিত্রাঙ্গদা এবং বাল্মীকি প্রতিভা। এই প্রযোজনা দুটি দর্শকদের মন কেড়ে নেয়। তার আসল কারণই বুঝি সঙ্গীতের অপার রহস্য। চিত্রাঙ্গদা পর্বে সঙ্গীতাংশে ছিলেন শ্রুতির অন্যান্য শিল্পী-সহ বনানী ঘোষ এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্যে অর্জুনের ভূমিকায় সাধন গুহ, চিত্রাঙ্গদা (কুরূপা), পিয়ালী ঘোষ চিত্রাঙ্গদা (সুরূপা) পলি গুহ এবং অন্যান্য ভূমিকায় শ্রুতির শিল্পীরা। সুপ্রযোজিত এই নৃত্যনাট্যর পরিচালনার কৃতিত্ব অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দ্বিতীয় দিনের বাল্মীকি প্রতিভা গীতিনাট্যের মুখ্য আকর্ষণ অবশ্যই বাল্মীকির ভূমিকায় অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়। তিনি অভিনেতা নন, মূলতই সঙ্গীতশিল্পী, ফলত মঞ্চে অস্বাচ্ছন্দ্য থাকা স্বাভাবিক, ছিলও। কিন্তু সবকিছু অতিক্রম করেও তাঁর গায়কী এবং শ্রুতির আপামর শিল্পীর নিখুঁত অভিনয় এবং গান মন ভরিয়ে দেয়। শুধু একটি বিসদৃশ—অভিনয় যদিও সঙ্গীত-আশ্রিত তবু বিশেষতঃ সদন-মঞ্চে মাইক্রোফোনের ব্যবহার বিরক্তিকর।

নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের নির্দেশনায় তৃতীয় দিন সদন-মঞ্চে অভিনীত হ[illegible] থিয়েটার কমিউনের দানসাগর নাটকটি। গ[illegible] দেড় বছরে কলকাতায় অন[illegible] থিয়েটার প্রযোজনার মধ্যে [illegible] নাটক সবচেয়ে বেশি আলোচিত, তা দানসাগর। এ নাটক নিয়ে ইতিপূর্বে এই পত্রিকায় আলোচনা হয়েছে এবং এখনো দানসাগর দেখেন নি এহেন নাট্যামোদী কলকাতা শহরে আছেন কিনা সন্দেহ।

চতুর্থ দিনে অনুভব নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করেন শনিবারের বিকেল নাটকটি। মানুষের অর্থলিপ্সা তাকে কতো বিকৃত কতো অবনমনের পথে নিয়ে যায় তা নি[illegible] একটি স্নিগ্ধ ট্রাজেডী এই নাটকের আখ্যানবস্তু। নাটক দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, মূল নাটকটিই যদি যথেষ্ট জোরালো না হয়, তাহলে কুশীলবেরা কী ভীষণ অসহায় হয়ে পড়েন।

নাট্যায়নের বয়স হলো দশ। এই সংস্থা পঞ্চম দিনে মঞ্চস্থ করলেন পিঞ্জরে সুখ। নবনাট্য আন্দোলনের সময়ে যে ধরনের লিরিক্যাল-ধর্মী নাটক অভিনীত হতো, এ নাটকের ধর্মও অনেকটা সেই রকম। কিন্তু অভিনয়ের যে স্তর পেরুলে এ ধরনের নাটক সফল হতে পারে, নাট্যায়নের শিল্পীদের মধ্যে সেই বাঞ্ছিত বস্তুটি খুঁজে পাওয়া গেল না। কিছুটা ব্যতিক্রম দ্বিজদাসরূপী অনিল দে, নির্দেশক তিনিই।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

অমৃতের স্বাদ

ছোটবেলায় ইস্কুলে বাংলা পরীক্ষায় নামকরণের সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন আসত। তরতর করে উত্তর লিখে যেতাম। আমি সেইসব কথা ভাবছিলাম ছবি দেখতে দেখতে। কোথায় অমৃত? কোথায় তার স্বাদ? আমি কি লিখব?

পরিচালক সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন আমাদের ছোট ছোট দুঃখ কষ্টে ভরা জীবনে হাসির অনাবিল অমৃত ছড়িয়ে দেবেন। উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের মস্তিষ্ক উপাঙ্গ বিশেষ নয় যে, অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনে বাদ পড়বে? তাই নিরুপায়ভাবে দেখতে হলো বাংলা ছবির গঙ্গাযাত্রা। এই ছবিতে একজন প্রকাশক-কাম-ঘটক আছে। তিনটি পরিবার দেখা গেল। প্রথমটিতে দুঃস্থ পিতার দুটি অনূঢ়া কন্যা। এরা যেহেতু দুজন যুবকের গলায় ঝুলবেই, সেই সূত্রে আমদানী করতে হয়েছে দুটি পরিবার। এক নম্বরটিতে মাতৃসমা বৌদি, চিরখোকন দেওর, ভোলানাথ দাদা, (যিনি বড় ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের [illegible] করেন না।) দু নম্বরটিতে নায়ক [illegible] সেন।

মাধবী চক্রবর্তী ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের জন্য সামান্য কষ্ট হয়; সঙ্গে সঙ্গে শমিত ও সুব্রতার জন্যও।

সবশুদ্ধ বোধহয় পাঁচটি গান আছে। নামী গায়ক-গায়িকারাই গেয়েছেন। [illegible] ছবির সংকটের কথা তুলে যারা [illegible] বাংলা ছবি দেখেন। [illegible] ভুলে [illegible] নির্বুদ্ধিতার এমত অমৃত বারে বারে দেখলে স্বাস্থ্য [illegible] হবে।

শেষরক্ষা

বাংলা ছবির এই সংকটের মুখে তথাকথিত মহানায়কদের বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রটি তৈরী করা হয়েছে। এই সাহস প্রশংসার যোগ্য। শেষ রক্ষা হয়েছে।

দর্শক অভিনন্দন জানাবেন। এই জন্যই যে বাংলাদেশের ইতিহাসের সফলতম নায়ককে আশ্রয় করা হয়েছে।—তিনি রবীন্দ্রনাথ।

চিরকুমার সভা শেষরক্ষা এসব রবীন্দ্রনাথের প্রধান লেখা নয়। তবুও শরতের [illegible] মত সাবলীল গদ্য কিভাবে [illegible] সাধারণ কৌতুককেও [illegible] আভিজাত্যে বরণ করেছে। শিল্পে শেষরক্ষা কিভাবে করতে হয় তিনি জানতেন। আমাদের এখনকার রুচি কত রুগ্ন

সিনেমা ও সাহিত্য দুটি আলাদা শিল্পরূপ। ছবির সাহায্যে এখানে গল্পই বলা হয়েছে 'বই' দেখতে যাবেন।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের সহায়তা পরিচালক পেয়েছেন। কয়েকটি '[illegible]' অপ্রয়োজনীয়। একবার সম্ভবতঃ ছন্দের ওপর জুমলেনসের প্রয়োগ উৎকর্ষ প্রমাণ করেনি। সংগীত সুপ্রযুক্ত, সুন্দর।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

রমেন লাহিড়ী

অরুণ রায়

মঞ্চ থেকে আসরে : দুজন

শহরের শিক্ষিত মানুষের পাশে অসংখ্য গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে কাছে পাবার যে বিরাট সুযোগ যাত্রায় আছে, তা গ্রহণ করতে পেয়ে আমি আনন্দিত, বললেন রমেন লাহিড়ী—একালের একজন পরিচিত নাট্যকার এবং নাটকের পরিচালক। যাত্রায় বেশীদিন আসেননি।

রমেনবাবুর বাড়ির পাশেই থাকতেন বড় ফণিবাবু, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মশায়। তাঁর সংবাদে প্রথমে একদিন নট্ট-ভারতীর রিহার্সাল দেখতে যান। পরে একবার যাত্রার চারিটি শোর সংগঠক হিসাবে বিভিন্ন গদিঘরে যেতে হয়েছিল। সে সময় নিউ প্রভাসের দল পরিচালক রমেন বসু মল্লিক, যিনি বর্তমানেও নিউ প্রভাসের সত্বত্ব, তাঁরই উৎসাহে যাত্রায় আসেন, পালা লেখেন এবং পালার নির্দেশনাও দেন।

দেশের পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বা সাযুজ্য রক্ষা করে বিদেশী কাহিনী, চরিত্র বা ঘটনাকে যাত্রায় পালাগানের মাধ্যমে বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে পরিবেশনার দিকে ঝোঁক বেশী রমেনবাবুর।

লং-মার্চের কাহিনীকে ভিত্তি করে 'কড়া চাবুক' কিংবা রক্তাক্ত আফ্রিকা, 'রাহুমুক্ত রাশিয়া' বা এ বছরের সুপার হিট পালা 'হো চি মিন' থেকে এটুকু বলা যায়, রমেনবাবু একজন সার্থক পালাকার। স্বদেশের বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ'-এর পালাও অবশ্য তাঁর লেখা।

আগামী বছরের জন্য আনন্দলোককে দিয়েছেন 'জুলিয়াস সিজার'।

ইউনিটে থিয়েটারে সবসময় হোলটাইম যোগ্য শিল্পী থাকে না অথচ যাত্রায় তার অভাব নেই, সকলেই তৈরি শিল্পী। সেকারণে কাজের ক্ষেত্রে যাত্রায় সুবিধা

অনেক বেশী', বললেন, রমেনবাবু। 'গ্রুপ থিয়েটারের প্রচলিত ধারণা নিয়ে যাঁরা যাত্রা করতে আসেন তাঁদের যাত্রায় জমিয়ে নেবার সম্ভাবনা কম' রমেনবাবুর একথার থেকে বোঝা যায়, যাত্রার মেজাজটাই ভিন্ন। রাজা বা রাজন্যবর্গের মনোভাবের প্রাধান্যই অব্যাহত রয়েছে। চেহারা, সংলাপ বলার রীতি, বৃহত্তর দর্শকের মুখোমুখি হবার ব্যর্কাতত্ত্ব সব কিছুই এখানে বাড়িয়ে দেখা হয়।

পালাকার বা নির্দেশকের প্রাথমিক শর্ত হল, শ্রোতার আগ্রহকে ধরে রাখার কৌশল আয়ত্ত করা।

একথা অরুণ রায়ের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। অরুণ রায় উৎপলবাবুর লিটল থিয়েটার গ্রুপে সহযোগী ছিলেন। শিল্পী হিসাবে 'অংগার', 'ফেয়ারী কোজ' প্রভৃতি সেই সব ঐতিহাসিক ঘটনার অংশীদার। পরে 'লোকায়ণ' নামে নাটকের একটা দল করেছিলেন।

অরুণ রায়ও নিউ প্রভাসের রমেন দে, মল্লিকের সূত্রেই নিউ প্রভাসে এসেছিলেন ১৯৭১-এ। 'বর্বর সভ্যতা' পালার নির্দেশক হিসাবে।

বাঙলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ শুরু হবার পরেই দল-মালিক তিনকড়ি গড়াই মশায়ের অনুপ্রেরণায় পালা রচনা করেন প্রথম। সেই পালা 'আমি মুজিব বলছি'। অরুণবাবু জানালেন, ঐ পালা লিখতে লেগেছিল মাত্র ছয় দিন আর রিহার্সাল আরো কম, মাত্র চারদিন। শ্রেষ্ঠ পালাকার রূপে 'দিশারী' পুরস্কারও পেয়েছিলেন অরুণবাবু, ঐ পালার মাধ্যমেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রা উৎসবের প্রথম নির্দেশকের পুরস্কারও পেয়েছেন অরুণবাবু 'বিদ্রোহী নায়ক ভরত সিংহ' পালার জন্য।

তাঁর রচিত পালা 'মাদার ইণ্ডিয়া'র শিল্পী জোৎস্না দত্ত 'অপ্সরা' পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৪-এ।

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের পালা

দেবিকা ছবিতে অপর্ণা

দেবী আনন্দময়ী'র যে রেকর্ড এইচ এম ভি বের করেছেন, তার নির্দেশনাও অরুণবাবুর।

এ বছরের পুরস্কৃত পালা 'রাইকমল' ছাড়াও 'পলাতক', 'কুশবিদ্ধ যিশু', 'বান্দা' প্রভৃতি সফল পালার পালাকার অরুণ রায় বেশ দীপ্ত কণ্ঠেই বললেন, 'থিয়েটারে দর্শককে আমন্ত্রণ করে আনতে হয়। কিন্তু যাত্রাই আমন্ত্রিত হয়, দর্শক সেখানে গৃহকর্তা।'

কথায় কথায় আমাকে উঠে পড়তে হল। অরুণবাবু টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের অনুরোধে একটা পালা তৈরী করার কাজে এখন ব্যস্ত।

প্রভাত চৌধুরী

অজিত পাণ্ডের গান

গত ২০শে মার্চ রবিবার বিকেলে চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-র উল্টোদিকের গন্ধর্ব গ্যালারী 'এ' আয়োজিত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে গণসঙ্গীত পরিবেশন করে শোনান বিশিষ্ট গণসঙ্গীতশিল্পী শ্রীঅজিত পাণ্ডে। গ্যালারী 'এ'-তে এই প্রথম তাঁর অনুষ্ঠান; যদিও মনোহর দাস তড়াগের পাশে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘন ঘন ট্রামের যাতায়াত, বাসের টায়ারের ঘর্ষণের শব্দ আর অবিরত কোলাহল বারবারই শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করছিল, তবু অজিত পাণ্ডের বলিষ্ঠ কণ্ঠের সুর কখনো তাদের অন্যমনস্ক হতে দেয়নি। গান ছাড়াও শ্রীপাণ্ডের গণসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করেন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক দিলীপ মিত্র ও কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত।

শচীন দাস

জমাটি হিন্দী নাটক

কলকাতায় যে নিয়মিত হিন্দী না[টক] অভিনীত হয়, সেটা বোধহয় অনেক বাঙা[লী] নাট্যদর্শকেরই জানা নেই। এই [নাটক] পরিবেশন করেন এমন কয়েকটি দল [হিন্দী] নাট্য দর্শকদের কাছে যাঁদের সুনা[ম] আছে। এবং আরো অবাক হবার ব্যা[পার] হল, এই দলগুলির সবই প্রগতিশীল [নাট্য] আন্দোলনের সরিক। এঁরা প্রায় সবাই নাটক নিয়ে নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা [করে] থাকেন বক্স অফিসের দিকে না তাকিয়ে।

এই দলগুলির মধ্যে অগ্রণী [হল] 'অনামিকা' নাট্যগোষ্ঠী। এঁদের সাম্প্র[তিক] মঞ্চসফল নাটকের নাম 'দুলারী বা[ঈ]' এ নাটককে বলা হয়েছে মিউজিক[াল] কমেডি। আগাগোড়া হাসি, গান নাচ ও ক[থা] এর মূল উপজীব্য হলেও, তার মধ্যে একটি সামাজিক সচেতনতা লক্ষ্য করা [যায়।] রাজস্থানের পটভূমিতে এই নাট[ক] [illegible] অর্থাৎ, [illegible] গাথা বা গ্রাম্য জীবনের একটা [illegible] কলামন্দিরের বেসমেন্টে এনে উপস্থা[পিত] করা হয়েছে। যার সঙ্গে পূর্ণ একাত্ম [হয়ে] দর্শকরা এক সময় একাত্ম হয়ে যান।

এ নাটকের বড় সম্পদ [illegible] (রাজস্থানী লোকসঙ্গীত আগাগোড়া ব্যব[হার] করা হয়েছে) এবং দুলারী বাঈয়ের প্র[াণ]বন্ত অভিনয়। রাজস্থানী লোকসঙ্গীত কত মধুর এবং ভাব প্রকাশের ভঙ্গিমায় সমৃদ্ধ এ নাটক না দেখলে অনুমান করা কঠি[ন।] তেমনি সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশন ক[রেছেন] সুস্মিতা সিন্ধী, রেখা চৌরিয়া, জুনারকর, রবি দাণ্ডে, রা[ম] বিশ্বাস ও গণেশ মুখার্জি। বিশেষ করে মে[য়েদের] কণ্ঠের তুলনা হয় না।

নাটকের শুরুটি বেশ অভিনব। জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে চারজন চারণ [ও] ঢোল নিয়ে দর্শকদের সামনে দিয়ে [মঞ্চে] উঠেছে প্রস্তাবনাগীত গাইতে দুলারী বাঈকে সঙ্গে দেখে। মজাদার [illegible] গান ও প্রস্তাবনা থেকেই ক্রমে [নাট]ক এসেছে। মঞ্চের ডানপাশে বসে গান [গেয়ে]ছেন আসল গায়ক-গায়িকারা। তাঁদের সঙ্গে সমান তালে ঠোঁট [মিলিয়ে]ছেন। এ বড় কম কৃতিত্বের কথা ন[য়।]

এ নাটকে মোটা দাগের সংলাপের কিছু বাহুল্য আছে, সেটা টিকেট ঘর ও সুখী দর্শকদের তাকিয়েই করা হয়েছে। কিন্তু এ বক্তব্য তাতে চাপা পড়েনি। এ [illegible] অবশ্যই নাট্যকার, সুরকার, পরিচালক মধুকরের। তাঁকে এবং অনামিক[া] গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ এমন একটি [illegible] নাটক উপহার দেবার জন্যে।

শান্তিরঞ্জন চ্যাটা[র্জি]

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য ৭৫ পয়সা ॥ অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য